

সংবাদ

সচিত্র মাসিক পত্র

৩৪শ ভাগ, প্রথম খণ্ড

বৈশাখ—আশ্বিন

১৩৪১

শ্রীমানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা আট আনা

বিষয়-সূচী

অতুলপ্রসাদ সেন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ২১০	উত্তাপ-প্রয়োগে চিকিৎসা—শ্রীরমেশচন্দ্র রায়	... ৪০৪
অল্পবয়স্ক জাতিদের শিক্ষা ও স্তর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ২৯৫	উদারনৈতিক ও কংগ্রেসওয়াল (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৪৫৮
অল্পবয়স্ক সস্ত্রদায়ের কতিলাভ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৬১৭	উপনিবেশস্থাপন না স্বীপচালান ? (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৬২৪
অন্তর্পূর্বা (গল্প)—শ্রীসীতা দেবী	... ২১০	উর্খিলা (কবিতা)—শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্তী	... ৬৭৭
অবোধ—শ্রীশশধর রায়	... ৭২৩	এই কালো মেঘ (কবিতা)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী	... ৪৭০
অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ (দেশ-বিদেশ)	... ৮২২	একজন জো-হুকুমের উক্তি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৭৬৩
অর্থহীন (কবিতা)—শ্রীহৃদীরনারায়ণ নিরোপী	... ৩৩৬	একটি মেয়ে (গল্প)—শ্রীশিবেন্দ্রলাল ভাট্ট	... ১২০
অধিনীর আদি—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি	... ৬৬৪	কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নির্ধারণ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৭৫৮
অসহযোগ, সত্যগ্রহ ও সন্ত্রাসবাদ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ১৪৮	কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্তত যুক্তি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৯২৮
অসহযোগ সঙ্কে রবীন্দ্রনাথের একটি পুরাতন চিঠি	... ২৩২	কংগ্রেস ও কোর্ট প্রবেশ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৪২৮
অস্পৃশ্যতা—শ্রীশশধর রায়	... ৩০২	কংগ্রেসের পালেমেন্টারী বোর্ড (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৪২৯
আগামী নির্বাচনে স্বাভাবিকদের জয় চাই (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৬১০	কংগ্রেস, প্রেস ও সন্ত্রাসবাদ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৪৪৮
আগ্রা-অযোধ্যায় আবৃত্তিক শিক্ষা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৪৪৭	কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাটোয়ারা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৬০৮
আদি মানব ও আসল মানব (সচিত্র) - শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়	... ১১৭	কমলা রাজা শিল্পে, রাজকুমারী (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ১৪৯
আফ্রিকার নিগ্রো শিল্প (সচিত্র)—শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	... ৪২৭, ৬৪৫	কমলা নেহরুর কঠিন শীড়া (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৭৬৫
আমাদের শিক্ষা ও অসমত্যা—শ্রীযোগীশচন্দ্র সিংহ	... ৬৬৮	করাচীর হরিজনদের বাসগৃহ ও সমবায় সমিতি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৭৬৬
“আমরা কথা রাখিগাছি” (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৪৪৫	কলকাতায় (গল্প)—শ্রীবসন্তকুমার দাস	... ৪১২
আমেরিকার প্রতি দেনদার ব্রিটেন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৪৪৬	কলিকাতার নর্দমার নিঃসারণ স্থান (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৪৪৩
আয়ুর্বেদের ইতিহাস—শ্রীস্বরেজনাথ দাশগুপ্ত	... ১২৫	কলিকাতায় মাছ ঘোগান (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৬২৩
আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞান—শ্রীস্বরেজনাথ দাশগুপ্ত	... ৩৪২	কলিকাতার মেয়র নির্বাচন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ১৫৬, ৪৪৩, ৬২০
আলোচনা	... ২০৩, ৩৬৩, ৭০২, ২০৩	কাপুর স্পেশালে কাশ্মীরের পথে (সচিত্র)	... ২১২
আশা-নিরাশা (কবিতা)—শ্রীস্বধীরকুমার চৌধুরী	... ৩৬৩	—শ্রীহেমেন্দ্রমোহন রায়	... ২১২
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণ-সভা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৪৪৬	কাশ্মীরে বাঙালী বালিকা-বিদ্যালয় (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ২২৪
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণ-স্মৃতি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ১৪২	কাশ্মীরাম দাসের স্মৃতি-সভা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৪৪১
আসামে ও বঙ্গে জলপ্রাচীর (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৬২০	কাশ্মীরের স্বাভাবিক (সচিত্র)—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	... ৬৫৩
আর্থিক হুর্গতি মোচন—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	... ৯৩	কাহার গ্রাহক বেশী (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ১৫৩
আসামে জলের হার ও জন্মানিরোধ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৬২৪	কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল (কষ্টি)—শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী	... ২২
ইউরোপে স্বভাবচন্দ্র বসু	... ৪৪০	কৃত্তী প্রবাসী বাঙালী (দেশ-বিদেশ)	... ৮৮৯
‘ইণ্ডিয়ান একাডেমী অফ সায়েন্সেস’ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৪৪৬	“ক্যান্টাটা ক্লিক” (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ১৫২
ইন্স্পিরিয়াল কোমিক্যাল কোম্পানী (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৭৬৬	কাশ্মীরের ভাল প্রস্তাবগুলির অস্বাভাবিক কাজ চাই (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৬২৩
		কুমুদনাথ চৌধুরী (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ১৫০

কুরল বা তিরুবন্থবরের নীতি—শ্রীনলিনীমোহন সান্দাল	৬৮১
কৈলাস পর্বত আরোহণ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৩২
কৈশোরিকা (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১
কোকস অভিবান (সচিত্র)—শ্রীবিমলেন্দু কয়াল	৭১০
গবয়েন্ট ও কংগ্রেস (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪৪
গান্ধীজীর আবার উপবাসের সঙ্কল্প (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১২
নীতা ও গীতাঞ্জলি—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	৬২৫
গজরাটের ও মেদিনীপুরের কৃষক (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬২২
গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন—শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	২২৮
চতুষ্কোটি—শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য	১৬৩
চট্টগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬২৪
চরিত্রহীনতার জন্ত পদচ্যুতি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	২২৩
চাকরী-বাটোআরা ও মহারাণীর ঘোষণাপত্র (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১৫
চাকরী-বাটোআরা ও শিক্ষার উন্নতি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১৮
চাকরী-বাটোআরা ও স্বাধীনতার কষ্টব্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১৮
চাকরী-বা.টা.আরা করা এখন ভারত-গভয়েন্টের অধিকার-বহির্ভূত (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১২
চাকরী-বাটোআরার ওজুহাত (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১৪
চাকরী-বাটোআরার কারণ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১৪
চাকরীর সাম্প্রদায়িক বাটোআরার সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষতি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১৭
চাকরী-বাটোআরার হেতুবাদ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১৬
চাটার্জি মুখার্জি বানার্জি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৬০
চিত্র-পরিচয়	৩০৪
চীনা তুর্কীহানে চীনাধিকার পুনঃস্থাপিত (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬২২
চেকের কথা - শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র	৫০৭
চেতুর শঙ্করণ নারায়ণ, স্তর (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩০৩
ছোট ছোট শিক্ষিক্ত্রী ও শিক্ষক (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১১
জমির খাজনার চিৎকারী বন্দোবস্ত (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৫০
জর না পরাজয়—শ্রীঅমলাচন্দ্র ঘোষ	৮২৬
শ্রীকৃষ্ণ অলখর সেনের সর্বাঙ্গীনা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	২২১
জাগ্রত রাধিও ঘোরে (কবিতা)— শ্রীহরিনন্দন মুখোপাধ্যায়	২৩৮
জাপানে, ভারতবর্ষে ও কশিয়ার শিক্ষাবিত্তার (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬২২
জাপানকে অস্ত্র সরবরাহ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৩৮
জাপানের ও ভারতবর্ষের বজেট (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৪৪
জামশেদপুরে বাঙালী (বিবিধ প্রসঙ্গ)	২২৪
জার্মানীতে অংশান্তি ও হত্যাকাণ্ড (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬২২
জার্মানীর একটি বিন্যাস (সচিত্র)—শ্রীঅনাথনাথ বসু	৫৬০
জীবনবাণী (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬২৫

জেলা-বিশেষে চাষী জাতিদের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	
জৈনধর্মের প্রাণশক্তি—শ্রীকিন্তিমোহন সেন	
শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্তের “আপীল” (বিবিধ প্র- সঙ্গ)— কবীর ও চৈতন্যদেব প্রভৃতির প্রভাব — শ্রীকিন্তিমোহন সেন	
টিকটিক পুলিশের নির্ভরযোগ্যতা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	
টেলিভিশন (সচিত্র)—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ	
টোকিও বৌদ্ধ মহাসম্মিলন (সচিত্র)	
টোরাীদের দ্বারা ভারতীয় লোকমত নির্ণয় (বিবিধ প্র- সঙ্গ)— ডাক্তারের ডায়েরীর দুটো পাতা (গল্প) — শ্রীঅমির রায়চৌধুরী	
ডুএল (গল্প)— শ্রীকানাইলাল গাঙ্গুলী	
ঢাকার আনন্দ-আশ্রম (বিবিধ প্রসঙ্গ)	
ভ্রমের সাধনা—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী	
ভীষ্মকে বিষ দেন না কেন ? (বিবিধ প্রসঙ্গ)	
ভিক্রমতে বিপ্লব না আর কিছু (বিবিধ প্রসঙ্গ)	
তুর্ক নারীদিগের প্রগতি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	
তুরস্ক তুর্কদের জন্ত (বিবিধ প্রসঙ্গ)	
ত্রিপুরা সেবাসমিতি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	
ত্রিমূর্তি শিব (দেশ-বিদেশ)	
দক্ষিণ-আফ্রিকায় ছদ্মবেশী খেত স্বার্থপরতা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	
দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে ফুটবল দলের প্রত্যাভর্তন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	
দুই বন্ধু (গল্প)—শ্রীকানাইলাল গাঙ্গুলী	
দুটি কথা (কবিতা)—শ্রীবী.রত্ন চক্রবর্তী	
দুশমন (গল্প)—শ্রীঅমিরকুমার ঘোষ	
দেওলী কাহাদের ভোটে কারেম হইল (বিবিধ প্রস- ঙ্গ)— দেওলী কারেম হইল (বিবিধ প্রসঙ্গ)	
দেশ-বিদেশের কথা (সচিত্র)	১০৫, ২৮০, ৪১২, ৫২৮,
দেশব্যাপী ঝড় (বিবিধ প্রসঙ্গ)	
দেশী রাজাদিগকে ঋণদান (বিবিধ প্রসঙ্গ)	
দৃষ্টি-প্রদীপ (উপন্যাস)— শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২০, ১৬৬, ৩১৬, ৪৮৬
নন্দলাল বসু (কষ্টি) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
নন্দলাল বসু ও তাঁহার চিত্রকলা (সচিত্র) — শ্রীশ্রীকৃষ্ণ গুপ্ত	
নব-স্বরাজ্য দল ও পালেমেন্টারী বোর্ড (বিবিধ প্র- সঙ্গ)— নাকাজিক জগৎ (সচিত্র)— শ্রীকুমাররঞ্জন দাশ	
নাবালকদের ধমপান নিবারণ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	

নারায়ণী—শ্রীশান্তা দেবী	...	৭৭৫	প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বাঙালী ছাত্র	...	২৯৬
নারীর উপর অত্যাচার কি বাড়িতেছে না ?	...	২৯৪	(বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৭৬৭
(বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৭৬৭	প্রতুলচন্দ্র সোম (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	২১২
নারীর উপর অত্যাচার বৃদ্ধি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	১৫৮	প্রদেশসমূহে শিক্ষার সরকারী ব্যয় (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৭৫৭
নারীদের উপর অত্যাচার (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	২১২	প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের দোষ	...	৪২৮
নারীনিগ্রহের প্রতিকারে সামাজিক কর্তব্য	...	২১৭	(বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৭৫৬
(বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৬২১	প্রবাসীর চতুঃপ্তম সংখ্যা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	২৮৮
নারীহরণাদি অপরাধ বৃদ্ধি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৪২১	প্রবাসীর শারদীয় সংখ্যাঘর (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৭৬০
নারীহরণ সম্বন্ধে ভাই পরমানন্দ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৬২১	প্রমথনাথ বসু (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৪২০
নিরুপদ্রব বা অস্থির আইন লঙ্ঘন ও কংগ্রেস	...	৬২১	প্রত্যাবিত স্বাভাৱিক দল (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৫৩৮
(বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৬২১	প্রাচীন ভারতে বাসগৃহের দিগ্‌নির্বাচন	...	৬২০
নিখিল ভারত নারী-সম্মেলনের কলিকাতা শাখা	...	৪৬৪	—শ্রীপ্রসন্নকুমার আচার্য	...	১৫৪
(বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	১৫৪	প্রাচীন ভারতে বাসস্থান নির্মাণ পদ্ধতি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	১৬১
ছুলিয়া সমাজ (সচিত্র)—শ্রীনির্মলকুমার বসু	...	৪৪৫	প্রাচীন স্থাপত্য গ্রন্থ 'মানসার' (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৮২৫
নেপালে মহারাজা হইবার অধিকার (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৮২৫	প্রাণের ডাক (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৮২০
নোসেনাপতি টোগো (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৪৪৮	প্রান্তর লক্ষ্মী (কবিতা)—শ্রীমাত্তোষ সাত্তাল	...	৬১২
নৃত্যরতা ভারতী (সচিত্র)—শ্রীঅমিত মুখোপাধ্যায়	...	১৩২, ২৫২	ফরিদপুরে ত্রুতচারী বিদ্যালয় (দেশ-বিদেশ)	...	৬১২
শ্রী নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের বক্তৃতাবলী (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৪৪৮	ফিরিঙ্গিদের ও মুসলমানদের চাকরীর বধরা	...	৬১৬
পঞ্চশস্য (সচিত্র)	...	৪৪৭	(বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৪৪৫
পঞ্জাবে ও বঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	...	৪৪৭	ফিরিঙ্গী ও স্থায়ী বাসিন্দা ইউরোপীয়দের জন্ত	...	৬২১
(বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৪৪৭	চাকরীর বধরা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৬২৩
পশ্চিমে বৈশাখ (কবিতা)—শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ	...	২০	বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় আব্দুর্রাহিম ? (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৩০২
ভট্টাচার্য	...	২২৬	বঙ্গীয় মহিলাদের কোম্পিল (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	২১৫
পাটের দর (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৩০৭	বঙ্গে অবাঙালী এঞ্জিনীয়ার (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৭৫৩
পাঠিকা (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৮৫	বঙ্গে আর মন্ত্রী অনাবশ্যক (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৪৩৭
পাণিনি-ব্যাকরণ ও সংস্কৃতে প্রাকৃত প্রভাব	...	৪৪২	বঙ্গে উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে সরকারী জ্ঞাপনী (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	২৯১
—শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী	...	৩০৭	বঙ্গে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার অসুখেট বিস্তার	...	২৯৩
পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দির (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	২৮৫	(বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	২৯৩
পালেমেন্টারী বোর্ডে নারীর অঙ্গতা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৪৪৪	বঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা ও সরকারী ব্যবস্থা	...	২৯৩
পুণায় মহাস্বাভীর প্রতি (?) বোমা নিক্ষেপ	...	৬১২	(বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	২৯৩
(বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৪৫১	বঙ্গের গভর্নরকে বধ করিবার চেষ্টা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	২৯৩
পুণায়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়—শ্রীগণেশশেখর বসু	...	৬১১	বঙ্গের নারীদের উপর অত্যাচার (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	২৯৩
পুলকিন্দার হরিপদ দা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৬৫২	বঙ্গের রাজস্ব ভারত-সরকারের সিংহের ভাগ	...	৭৫৬
পুরুষসভা গায় (গল্প)—শ্রীগণেশনাথ মিত্র	...	৫৪	(বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	২২৫
পুরোহিত গল্প)—শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৪৬, ২২৬, ৩৪৬, ৬৭৮, ৮৪২	বস্ত্র সংহার মূর্তি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	১০২
পুস্তক-পরিচয়	...	৫২৭	বর (গল্প)—শ্রীমনোজ বসু	...	৮৫৮
পূজারিণী (গল্প)—শ্রীবর্ণলতা চৌধুরী	...	৪৩৮	বর-চুরি—শ্রীসীতা দেবী	...	২৯২
পূর্ণ স্বাধীনতা ও ডোম 'নয়ন ষ্টেট স' (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	৮৬৭	ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	১৩২
পৃথিবীর বৃহৎময় জন্ত (সচিত্র)—শ্রীঅনন্তবন্দ্য বসু	...	৬১৪	ব্যাহিং-অগতে বাঙালীর স্থান—শ্রীমলিনীরঞ্জন সরকার	...	৭৫৭
পেটে খেলে পিঠে নয় (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	২২	ব্রজেননারায়ণ আচার্য চৌধুরী (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	২২৬
পোয়ে নৃত্য (সচিত্র)	...	২১৬	ত্রিটিপ সাম্রাজ্য ও তুলোয়ার (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	২১৬
	...		ত্রিটেনে ও বঙ্গে উচ্চ শিক্ষা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...	

বলীদীপে অভ্যুত্থিক্রিয়া—শ্রীবিমলেন্দু করাল বহির্ভাগ (সচিত্র)	... ৩৭২ ৫২০, ৭৩২, ২০৪	ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা—শ্রীঅমৃত্যুচরণ বিজ্ঞানভূষণ	... ৫১০
বাংলা-সাহিত্যে মহাকাব্য—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন	... ৭৮৬	ভারতে রাষ্ট্রনীতি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৬০৫
বাংলার অমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	... ২৪১	ভারি জল—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য	... ৪৮১
বাংলার মুংশিল্প ও কুস্তকার জাতি—শ্রী—	... ৮১৭	ভারতীয় সামরিক অফিসারদের কর্মতা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৭৬৭
বাহিনীর রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ২২৩	ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংখ্যাভি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৪৪৭
বালিকাশিক্ষাকে সাঁতার শিখা দেওয়া (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৪৪০	ভুবনেশ্বর (সচিত্র)—শ্রীনির্মলকুমার বসু	... ৩৫
বাঁশবেড়িয়ার অবৈতনিক আবৃত্তিক শিক্ষা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ২২৭	ভূদেব মুখোপাধ্যায় (সচিত্র)—শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ	... ৩৮৪
বিদেশভ্রমণ দ্বারা শিক্ষার্থী (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৬২০	ভূষণা (গল্প)—শ্রীবিবেকানন্দ ভট্টাচার্য	... ২০৪
বিধবার সজ্জা (গল্প)—শ্রীশান্তা দেবী	... ৫৫০	ভোলানাথ দত্তের কাগজের বাঁবসা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৪৪৫
বিনা-বিচারে বন্দী বুদ্ধিমান যুবকবৃন্দ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৪৩৩	ভূদেব স্থিতি-সভা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৪৪০
বিনা-বিচারে বন্দীদের শিক্ষা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৪২২	"মুক্তব মাস্ত্রাসার বাংলা"—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ১০৩
বিপরীত (গল্প)—শ্রীসীতা দেবী	... ৭৩	মদ্রাথনাথ মুখোপাধ্যায়ের অস্বামী পদোন্নতি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৬২০
বিপিনবিহারী ঘোষ, স্তর (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৪৪০	মন্ত্রি ও শাসনপরিষদের সভ্যত্ব (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৩০১
বিবাগী (গল্প)—শ্রীবন্দনা দেবী	... ৩৩১	মণিপুরী নৃত্য-উৎসবের চিত্র (সচিত্র) —শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র	... ৭২৬
বিনা বিচারে স্বারা ভাবে বন্দী রাখিবার ফন্দি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৬২৩	মনের গহনে—শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী	... ৮৭৮
বিমানচালক চাওলা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৭৬৩	মনোরাজ্যের কাহিনী—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	... ১২৪
বিরাহী (কবিতা)—শ্রীশান্ত পাল	... ৭০২	"মস্তময়ুর" শৈবসন্ন্যাসী—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	... ২৬৫
বিলাতে সামরিক শিক্ষায় বাঙালী বালক (দেশ-বিদেশ)	... ৮৮২	মরুপথে (গল্প)—শ্রীশর্পলা চৌধুরী	... ৩২০
বিখ্যাত ভারতীয় বর্ষা-উৎসব (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৭৫৭	ময়াল সর্প (সচিত্র)—শ্রীঅশেষচন্দ্র বসু	... ৩৭০
বিহারের আক ও বজের পার্ট (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৩০৩	মহাত্মা গান্ধীর উপবাস শেষ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৭৫৬
বুদ্ধদেবের স্মারক সভা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৪৪৫	মহাত্মা গান্ধীর কলিকাতা আগমন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ২৮৭
বুলগেরিয়ায় রক্তপাতহীন বিপ্লব (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৪৪৮	মহাত্মাজী বঙ্গে স্বাগত (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৬১২
বুলবুলের প্রেতি (কবিতা) কামিনী রায়	... ১২৪	মহাত্মা গান্ধীর ভ্রমণরীতি পরিবর্তন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ২২০
বেকার অবস্থা ও সম্মানবাদ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৪৪৪	মহিলা 'বেদতীর্থ' (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ২০২
বেকারদের ভক্ত বিলাতী বায় (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ১৬৬	মহিলা-সংবাদ (সচিত্র) ১০৪, ২৬৪, ৩৭৭, ৫৮৮, ৭৩০, ৮৬৬	
বেকার সমস্যা ও শিক্ষাসঙ্কোচন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৭৫১	মহেন্দ্রলাল সরকারের জাতীয়তা-প্রীতি —শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু	... ৫৮৫
বেকারের সম্বন্ধে বড়লাটের মন্তব্য এবং বঙ্গীয় ঔষধ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ১৫৬	ম্যাডাম কুরী (সচিত্র)—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীসত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী	... ৫৮০
বেগম সাহেবের নথ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৬১২	মাদাম কুরি—শ্রীশিশিরকুমার মিত্র	... ৫৮৪
বেথুন কলেজ ও বঙ্গে নারীশিক্ষা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৬২১	মাস্ত্রাজ শিল্পপ্রদর্শনী (সচিত্র)	... ২৫৬
বৈপ্লবিক অপরাধের হ্রাস (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ২২৩	মাস্ত্রাজীরা কি কি বই পড়ে? (কষ্টি)	... ২৩
বোধনা নিকেতন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ২২১	মাস্ত্রাজ শহরে ঘনবসতি; কলিকাতায়? (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৪৪৩
বোম্বাইয়ের ধর্মঘট (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৩০২	মাসিক কাগজের সমালোচনা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৩০৪
বৌদ্ধধর্মে কর্ম ও জন্মান্তরবাদ—শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক	... ১৭৫	মাইকেলের জন্ম-তারিখ—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	... ৪৭১
ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালী—শ্রীদেবব্রত চক্রবর্তী	... ৫৩৫	মিস্ মেয়োর আবার ভারত-ভ্রমণ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ২২১
ভারতবর্ষে বিদেশী চাল (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৬২৩	মীনাবাজার—শ্রীকালিকারঞ্জন কাছুনগো	... ৫৪৬
'ভারতী' স্বরণা কলমের কারখানা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ২৮৫	মীরা কহে বিনা প্রেম সে—শ্রীধনেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ	... ৬০২

মুক্তি (উপভাস)—শ্রীশালতা দেবী	৮৫, ২৫২, ৩৫৭, ৫৭৩, ৭০৩, ৮৪৬	শারদীয় অবকাশে কর্তব্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ২১৫
মুসলমানদের মধ্যেই প্রতিযোগিতা চাই (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১৮	শ্রামল-রাণী (গল্প)—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৪৭২
মুন্সী ঈশ্বর শরণ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৪১০	শ্রামাদাস বাচস্পতি, কবিরাজ-শিরোমাণ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১০
মুহুর্তের মূল্য (গল্প)—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়	... ৪১	শিল্পকলাপ্রদর্শনী (দেশ-বিদেশ)	... ৮২১
মেঘদূত (গল্প)—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	... ২৭৩	শিক্ষায় আমেরিকার 'নিগ্রো' ও ভারতবর্ষের 'আর্ধ্য' (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ১৫৬
মেঘনাদ সাহা সম্বন্ধে অমূলক গুজব (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৪৩৮	শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গের স্থান (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ২১৩
মোদনীপুর জেলা কংগ্রেসকর্মী সম্মেলন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪২	শিক্ষাবিভাগের ভার কে পাইবেন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩০২
মোদনীপুরে সিপাহী প্রভৃতির বিরুদ্ধে অভিযোগ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৭৬৩	শিক্ষাবস্তার সম্বন্ধে দেশের লোকদের কর্তব্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৭৫৪
মৈথিলী সাহিত্য-পরিষৎ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৪৪৩	শিক্ষাব্যয়ের ছাত্রদত্ত অংশ বঙ্গ অধিকতম (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ২১৩
মোদক জাতির সেঙ্গস নাই (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৭৬৫	শিশু-সাহিত্য—শ্রীঅনাথনাথ বসু	... ২৪৭
ম্যাডেম মেরিয়া মণ্টেসরীকে আহ্বান (বিবিধ প্রসঙ্গ)	২২৪	শেষের কবিতার লাবণ্য—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ সাহা	... ৮৩৮
বন্ধু (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ৭৬২	শেতপত্র ছদ্মন, কিন্তু সাম্প্রদায়িক বাটোআরা? (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৩০০
বন্দানিবারক সভায় রমেশ মিত্র স্মারক ফণ্ডের দান (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৪৪৮	শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৪৪৮
যাত্রাওঝালা মুকুন্দ দাস (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৪৪২	স্পষ্টকথা (কবিতা)—শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী	... ২০৪
বুদ্ধ 'শ্রীঐশ্বর্যসঙ্গত' এবং সভ্যতাপাদক (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৩২	সংবাদপত্র-পরিচালনে বাঙালী (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ১৫১
রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায় (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৭৫৭	সংস্কৃত শিক্ষার জন্ত সাহায্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ২২৭
রবীন্দ্রনাথ ও সিংহল (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৩০৪	সম্ভাসক কার্যের তালিকা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ২২২
রবীন্দ্রনাথের পত্র	... ৫৪৫	সম্ভাসনবাদের উত্তরের কারণ ও প্রতিকার (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৭৪৮
রাজনারায়ণ বসুর দেওঘরস্থিত বাটী (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪১	সম্ভাসনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪২
রাজস্ব সম্বন্ধে বঙ্গের প্রতি অবিচার (বিবিধ প্রসঙ্গ)	২০২	সম্ভাসনবাদ বিনাশের উপায় (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৪৩৬
রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শুর—শ্রীসত্যপ্রিয় বসু	... ৮২	সম্ভাসনবাদের বিরুদ্ধে সরকারী অভিযান (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৩৪
রাতের দান (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ৬২৬	সর্বজাতীয় মানবিকতা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ১৫২
রাম ও বালী—শ্রীরজনীকান্ত গুহ	... ১৪	সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের সরকারী শিক্ষা ব্যয় শুধু লগনের চেয়ে কম (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ২১৬
রামনের অবদানপরম্পরা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৩০৩	"সরকারী কর্মচারীরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধান না" (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৭৬৪
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৪৪৬	সরলা (কবিতা)—শ্রীশৈলবালা দেবী	... ৪০০
রুচিরা (কবিতা)—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার	... ৬৬৩	স্বলবুদ্ধ ও আকাশবুদ্ধ শিক্ষার্থী (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪৫
রূপকার (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ৩০৫	স্পোর্টসম্যান (গল্প)—শ্রীনির্মলকুমার রায়	... ৬৭১
লগনের পত্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ৮৫৬	"বৃন্দে হিতৈষণার একচেটিয়া" (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ১৫৫
লাইব্রেরী পরিচালন বিদ্যা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৪৪৮	স্বরলিপি—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ	... ৮৮৬
লালগোপাল মুখোপাধ্যায়ের অবসরগ্রহণ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ১৫১	স্বরাজ্যভার্থ আইনলঙ্ঘনপ্রচেষ্টা স্থগিত রাখিবার কারণ বিবৃতি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ১৪৬
লুই পাস্তুর ও তাঁহার গবেষণা (সচিত্র)—আচার্য শ্রীফুলচন্দ্র রায় ও শ্রীসত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী	৪২, ৩২৪, ৮২০	স্বরাজ্য দলের পুনরুজ্জীবন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ১৪১
লেখকের বিচার (গল্প)—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু	... ৪৫২	স্বাধীনতার স্বরূপে (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৩০৩
শকুন্তলা দেবীর বৃত্তিলাভ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ৪৪৭	সাধনা (গল্প)—শ্রীসত্যমোহন চট্টোপাধ্যায়, বি-এসসি	... ৫১৪
শব্দ-প্রসঙ্গ—শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য	... ৫২১	সামুয়েল সপ্তসের লক্ষ টাকা দান (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪২
শব্দীয় প্রতীক (কবিতা)—শ্রীবীণা দেবী	... ৮৫৫		
শরৎ চন্দ্র চৌধুরী (বিবিধ প্রসঙ্গ)	... ২২৩		

স্বয়ংস্বেচ্ছা হোরের উপভোগ্য বস্তু (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৫১	স্বয়ংস্বেচ্ছা রায়, অধ্যাপক (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪২
সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাটোয়ারার প্রত্যাশিত ফল (বিবিধ প্রসঙ্গ)	২২০	সেনহাটীর মহিলাদেব পূণ্যকীর্তি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩০৪
সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬০৬	সেনহাটী মহিলা-সমিতির সংকাব্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬২১
সাহিত্যতত্ত্ব—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪	সৈন্তানল সম্বন্ধে সরকারী প্রবন্ধ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৫৩
সাহিত্যের তাৎপর্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬২৭	সোভিয়েট রাশিয়ার নারীর স্থান—শ্রীশশধর সিংহ	৪০২
সরদা আইনকে ফাঁকি দেওয়া (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬২৩	স্রোতবদল—শ্রীপারুল দেবী	৭২৬
সাহিত্যে প্রাদেশিকতা—শ্রীমবিনাশচন্দ্র মজুমদার	৭৪৫	হরিন্দাস হালদার (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪৬
সাহিত্য ও সমাজ—শ্রীঅনুরূপা দেবী	৪২৪	হরিজন বান্ধু সম্বন্ধে দলিত স্খার সমিতির পত্র (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪৩
সিংহলের চিত্র (সচিত্র)—শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত	২৮	হিংস্র (গল্প)—শ্রীনির্মলকুমার রায়	৩৪৫
সিংহলে রবীন্দ্রনাথ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪৭	হিণ্ডেনবর্গ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৬৭
স্বনামগঞ্জের কয়েকটি ছাত্রের কৃষ্ণ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৬৪	হিন্দু বিধবাদের প্রতি সমাজের কর্তব্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬২০
স্বভাবচন্দ্র বসুর নূতন পুস্তক (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬২৪		

চিত্র-সূচী

অতুলপ্রসাদ সেন	২১১	—কিকু-ক্রান্তীর কল্পা	৫০২
অনুরূপা রায়—বরণ-নৃত্য	২০০	—চিন্তাময়	৬৪৮
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪২৪	—তিন-কল্পা	৫০৪
অভিশপ্ত (রঙীন)—শ্রীরামগোপাল বিজয়বর্গী	৩২২	—নিগ্ধোকল্পার মুখ	৪২২
অমূল্যকুমার ভৌমিক	৭৩৫	—নিগ্ধো মেয়ে	৫০০
অমলা নন্দী—নৃত্য	৮২২	—নিগ্ধো যুবকের মুখ	৫০১, ৫০৩
অমৃত কাউর	৭৩১	—পক্ষী-শিকার	৪২৮
আদি মানব		—পিতল মূর্তি	৬৪৬
—আধুনিক অস্ট্রেলিয়ার আদিম-নিবাসীর কঙ্কাল	১২৩	—বাকুবা জাতির রাজার মূর্তি	৬৪৬
—নূতন প্রস্তর-যুগের মানুষদের কাল্পনিক ছবি	১২৩	—বেনিন-ঘোড়া	৫০০
—নিরাণুরখাল মানবের কঙ্কাল	১২৩	—বেনিন-রাজ	৫০০
—রোডেসিয়ার মানব	১২২	—বৃদ্ধা	৬৪২
—স্পেনদেশে প্রাচীন প্রস্তর-যুগের মানুষদের কাল্পনিক ছবি	১২১	—মাতৃমূর্তি	৬৩৭
আফ্রিকার নিগ্ধো শিল্প		—মৃগের মুখ	৫০২
—আফ্রিকার মানচিত্র	৫০৮	—শূক্রেবতার কাঠময় মুখস	৬৪২
—ইউরোপীয় ঘোড়া	৫০৪	—হাতীর দাঁতের কোঁটা	৪২২, ৫০১
—কল্পার মুখ	৪২৮	আফ্রিকার হাউসা জাতি	২৬২
—কাঠের মূর্তির অংশ	৫০৩	আমেনা খাতুন	১০৪
—কাঠময় দেবতার মুখস	৬৫০	আন্তত্বেষ মুখোপাধ্যায়ের ত্রয়-মূর্তি	১৪২
—কাঠময় দেবী বা জীমূর্তি	৬৫১	ইউরোপ-রাজ্যী মহিলাবন্দ	৩৭৮
—কাঠময় পানপাত্র	৬৫২	ইউরোপে স্বভাবচন্দ্র	৪৪০
		উৎসর্গ (রঙীন)—শ্রীকিরণময় ধর	২০০

উদয়শঙ্কর	...	৮৯৭	অয়ত্নী নৈবায় বায়জী	...	৭৩১
গুডেন্‌ডালড্‌ বিদ্যালয়, আর্শেণী	...	৭৬৪	জাপানের আদর্শ উদ্যান রচনা	...	২৬১
—অভিনয়ের দৃশ্য	...	৭৬১	জাপানের ক্রীড়াকৌতুক	...	৭৩৯, ৭৪৪
—একটি ক্লাস	...	৫৬৭	জাপানের মহিলা-প্রগতি	...	২০৫, ২০৬
—ছেলেমেয়েদের অভিনয়ের দৃশ্য	...	৫৬২	জার্মানীর নাৎসি-দলে বিপ্লব	...	৫২০
—ছেলেটা খেলার জায়গা করিতেছে	...	৫৬৩	জেনার	...	৩২৮
—ছেলেদের ব্যায়াম	...	৫৬৫	টেলিভিশন	...	৩৩৭—৩৪৭
—বিদ্যালয়ের তিনটি শিশু	...	৫৬৬	ডলফিন	...	৮৬৯
—যাত্রাগারে একটি বালক	...	৫৬৪	ড্রেসডেনে ভারতীয়দের শ্রীতিভোজ	...	৪৪০
কটল্‌ ফিশ	...	৮৭৩, ৮৭৪	তলোয়ার মাছ	...	৮৭২
কমলকৃষ্ণ স্মৃতিভীর্ণ	...	১০৮	তিমি উকুন	...	৮৭৫
কমলা রান্না শিল্পে	...	১৪২	তিমি - গ্রীণলাণ্ডের	...	৮৬৮
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	...	২৭২	তিমি হস্তাঙ্ঘ্রি	...	৮৭৬
কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দির	...	১০৫	তৈল তিমি	...	৮৬৮
করাত মাছ	...	৮৭২	তৈলতিমি—ভোঁতা মুখে	...	৮৭০
কাশেম্বাব যাত্রী	...		তুই বোন (রঙীন) - শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা	...	৫৭৬
—কাশেম্বার মহাপরিনির্বাণ স্তূপ	...	৬৫৪	দেবেন্দ্রনাথ ভাটুগী	...	৮২৮
—দাহ-স্তূপ	...	৬৫৫	নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়	...	৮২৮
কাশ্মীরের পথে	...		নন্দলাল বহুর চিত্র	...	
—আমিরাকদল সেতু	...	২২২	—কুকুর চানা	...	১৮৫
—ঝিলমতটস্থ বারামুলা শহর	...	২২০	—গরু	...	১৮২
—ডল-হ্রদের একাংশ	...	২২৪	—চিত্রকর	...	১৮৭
—দোমেল নামক স্থানে সেতুর দৃশ্য	...	২২১	—ছাগগছানা	...	১৮৮
পুতান রাজপ্রাসাদ	...	২৩২	—বানরওয়াল	...	১৮৬
—ভাসমান নৌগৃহ	...	২২৩	—শান্তিনিকেতনের গল্পলেখক	...	১৮৯
—মারি শহর-র বাজার	...	২১২	—হরিণ	...	১৮৮
—রাজপথ, শ্রীনগর	...	২২১	—সাঁওতাল জননী	...	১৮৬
কুরী, ম্যাডাম	...	৫৮১	নলিনীরঞ্জন সরকার	...	৫৯২
—পরীক্ষাগারে ম্যাডাম কুরী	...	৫৮৩	নাঃ টিকেল, ফ্লোরেন্স	...	৫১
—কুরী, পেরী	...	৫৮২	নাস্ত্রিক জগৎ	...	
কোকস্‌ অভয়ান	...		—কাসিওপিয়া, স্বাতি ইত্যাদি	...	৮০১
—ইন্কা কারিকরের খোদিত স্বর্ণমূর্তি	...	৭১৪	—কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জ	...	৮০২
—ইন্কাদের স্বর্ণময় পাত্র	...	৭১৭	—ঋষভারা ও কাসিওপিয়া	...	৮০৩
—ওয়েফার উপসাগর	...	৭১৩	—লুরুক, কালপুরুষ, রোহিণী	...	৮০৪
—ওয়েফার উপসাগরের উপকূলভাগ	...	৭১৩	—সপ্তর্ষি নক্ষত্রপুঞ্জ	...	৮০৫
—কমাণ্ডাও উরস্লে	...	৭১৭	নার্কাল	...	৮৭০
—কোকস্‌ দ্বীপের মানচিত্র	...	৭১৮	নি বদন (রঙীন)—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী	...	৪২৬
—গুপ্তধনের অমূল্যস্বান	...	৭১৫	নিশীথে (রঙীন)—শ্রীকালীকঙ্কর ঘোষ দস্তিদার	...	৫৪৪
—সোনার ঢাল	...	৭১৬	নীল ফুল (রঙীন)—শ্রীকিরণ ধর	...	৬৬৫
কুম্ভার্ভ (রঙীন)—শ্রীদীপ্তিনাথ মুখোপাধ্যায়	...	২৪৮	নীলিমা দত্ত	...	৩৭৭
গেহেব, পল	...	৫৬৩	হুলিয়া জাতি	...	
চন্দ্রাবতী লখন পাল	...	২৬৪	—অয়িকুণ্ডের চারিদিকে নৃত্য	...	৪৬৫
চিংড়ি মাছ	...	৮৭৫	—তুই জন হুলিয়া	...	৪৬৬

ছলিয়া জাতি—		বিদ্যার্থী (রঙীন)—শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্তী	...	৭৬২
—ভেলা	...	৪৬২		
—শ্রীতকালে বাবদ্বিত বড় নৌকা	...	৪৬৮		
—সমুদ্রে জাল কেলা	...	৪৬৭		
নৃত্য—নটরাজ	...	২০১		
—নর্তকী	...	৮২৮		
—পরিবাহিত ভঙ্গী	...	৮২৬		
—প্রণয়	..	৮২৬		
—ক্রমরী ভঙ্গী	..	৮২৫		
—রাস-নৃত্যে রাধাকৃষ্ণ	...	২০১		
—সাগতাল নৃত্য	...	৮২৮		
পল্লী-গৃহ	...	৩৩০		
পাল্লগাল শীল বিদ্যালয়মন্দিরের শিক্ষকগণ ও প্রবাসীর				
সম্পাদক	.	২৮৬		
পূর্বরাগ (রঙীন) শ্রীশোভনগঙ্গল গেহলোট	..	১		
পোলা নেত্রী ও উৎসবসম্বন্ধ	...	২৬৩		
প্রকৃতি দেবী	.	৫৮৮		
পাষণপুত্রীর পুতুল (রঙীন)—শ্রীদেবীপ্রসাদ				
রায় চৌধুরী	..	৬২৫		
পুরুষবরণ ঘোষ	.	৭৩৫		
পোয়ে নৃত্য	...	২২		
প্রবাসী বাঙালীর নববর্ষোৎসব	..	২৮৪		
প্রথমনাথ বসু	.	২৮৮		
প্রভাসময়ী মিত্র	.	৭৩০		
ষষ্ঠানৃত্য (রঙীন)—শ্রীঅজিতকৃষ্ণ গুপ্ত	.	৩০৫		
বলীঘোপে অস্তোষ্টিক্রিয়া				
—গরাবদিগের জন্ত নির্মিত শবাধার	...	৩৮২		
—বেদী লইয়া যাওয়া হইতেছে	...	৩৮৩		
—বেদী এবং শবাধার	...	৩৮১		
—বৌদ্ধ ভিক্ষুণী	.	৩৭২		
—মহিলাগণ অর্ঘ্যবহন করিতেছেন	.	৩৮০		
—‘মেরু’ বা সাঙ্কেতিক পর্বত	..	৩৭২		
—শবদেহ বহনকারিগণ	...	৩৮১		
—শবদেহ বেণীর উপর স্থাপন করা হইতেছে	...	৩৮২		
—সুসজ্জিত শোভাযাত্রাকারিগণ	..	৩৮০		
বাংলার পল্লী	..	২৭২		
বাংলার মৃৎশিল্প				
—ইন্দ্রমতী	..	৮৮		
—গণেশ-মূর্তি	...	৮১২		
—বুদ্ধমূর্তি	...	৮১৭		
—যমুনামূর্তি	...	৮১৭		
বিদ্যেপে কুতৌ বাঙালী ছাত্র	.	২৮৩		
বিশ্বিনী আগামিয়া	...	৫৮৮		
বৈশাখী-সম্মিলনী	...	৪১২, ৪২০		
বৌদ্ধ মহাসম্মিলন, টৌকিও	...	২০৭, ২০৮		
বাসুচিহ্ন	...	১০০-০২		
ব্রহ্মচারী বিদ্যালয়, ফরিদপুর	...	৮২০		
ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড়গণ, দক্ষিণ-অ ফ্রিকায়	...	৬০০		
ভুবনেশ্বর				
—কুপেব মধ্যে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি	..	৫২		
—কুপের মধ্যে প্রাপ্ত জৈনমূর্তি	.	৩৮		
—চিন্তাশ্রিতা নারী	...	৩৬		
—ভাস্করেশ্বর মন্দির	...	৩৭		
—ভাস্করেশ্বরের লিঙ্গ	.	৩৮		
—মন্দিরদ্বারে প্রাচীন অলঙ্কার	...	৩৬		
—মার্কণ্ডেশ্বরের মন্দিরগাত্রে মূর্তিশ্রেণী	...	৩৫		
—পাথরের বেষ্টনীর অংশ	...	৩২		
—বেষ্টনীর গায়ে প্রাচীন মূর্তি	...	৪০		
—রামেশ্বরের নিকট স্তম্ভশীর্ষ	...	৩৮		
—ঘোবনে ভূদেব	...	৩৮৫		
—প্রোঢ়ে ভূদেব	...	৩৮৭		
ভূপেশচন্দ্র কর্মকাব	...	১০৭		
ভোক্তনের ফ্যাশন	...	১৩২		
মণিপুরের নৃত্য-উৎসবের চিত্র	...	৭৩২		
‘মন্তময়ূর’ শৈব মন্দির				
—গুণীমসানের শিবমন্দির	.	২৭১		
—কামকন্দলা নটীর মন্দির	...	২৬৭		
—প্রবোধশিবের মন্দির	...	২৭০		
—মন্তময়ূর সম্প্রদায়ের মঠ	..	২৬৮		
—যুবরাজদের নির্মিত মন্দিরের তোরণদ্বার	...	২৬৬		
—লক্ষ্মণসাগর	...	২৬৫		
—হরগোরীর মূর্তি	..	২৬৭		
ময়াল সর্প				
—আক্রমণোদাত “ঘোয়া কনকিষ্টের”	..	৩৭৬		
—আমেরিকান ময়াল	...	৩৭৫		
—ময়ালসর্পী অজতাপ প্রয়োগ করিতেছে	..	৩৭১		
—ময়াল শাবক বিশ্রাম লইতেছে	..	৩৭৩		
মহাস্বামী গান্ধী	...	২৮৭		
মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন	.	৭৩১		
মহেন্দ্রলাল সরকার	...	৫৮৭		
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	..	৪৭১		
মধ্যাহ্ন গায়ত্রী (রঙীন)—শ্রীনরেন্দ্র মল্লিক	...	৮০		
মাগন (রঙীন) শ্রীইন্দ্রভূষণ গুপ্ত	...	১২০		
মাস্তাজ শিল্প-প্রদর্শনীর চিত্র	২৫৭, ২৫৮			
মার্টিন লুথার	...	২৫২		

মোহনজোড়ান স্পোর্টিং ক্লাব	...	৫৯৮	শঙ্কর	...	৮৭৫
মিলন (রঙীন) - শ্রী রামগোপাল বিজয়বর্গী	...	৮৪৮	শান্তময়ী বালিকা-বিদ্যালয়	...	৭৩৩
মূলগড় নরসিংহ	৭৩৫, ৭৩৬		শ্রীমানস বাচস্পতি, কবিরাজ-শিরোমণি	...	৫৩৭
মেক্সিকোর পিরামিড	...	১৩৩	শিব, ত্রিমূর্তি	...	৮২১
মেক্সিকো-বালক	...	১৪০	শিবাজী ও মুসলমান বন্দিনী (রঙীন)		
মেসিডো রমণী	...	১৪০	শ্রীশোভনগমল গেহলোট	...	৮০৮
মেরী-স্টেপ	...	৩২৭	শুকতরু (রঙীন) - শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী	...	৭০৪
মোরগ, দীর্ঘ লেজবিশিষ্ট	...	২৫০	শুকক	...	৮৭৫
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত	...	৭৩২	শেতলশুক	...	৮৭২
যক্ষপত্নী (রঙীন) - শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত	...	৪৪৯	শৈলেন্দ্রমোহন দাস	...	৪২৪
যাদবপুর যক্ষা-চিকিৎসালয়	৪২১, ৪২২, ৪২৩		সঙ্ঘাশ্রমীপ (রঙীন) - শ্রীন্দ্রলাল বসু	...	৮৮৮
রবীন্দ্রনাথ ও পল গেহেব	...	৫৬২	সমুদ্র-শাসন (রঙীন) - শ্রীশরদ্দিন্দু সন রায়	...	১৬১
— ভারতী স্বরণা-কলম কারখানায় রবীন্দ্রনাথ	...	২৮৫	সাক্ষী (রঙীন) - শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী	...	৩৫২
—সিংহলে রবীন্দ্রনাথ	...	৪৩২	সিংহল চিত্র		
রমা বসু	...	১০৪	—দেবনামপিয় তিস্‌সএর মূর্তি, মিহিনতাল	৩০, ৩৫	
ররকোয়াল	...	৮৬৯	—নাগপোকুন, মিহিনতাল	...	৩২
রাজপুত-নারী	...	২৬৪	—বোধিবৃক্ষ (অহুধাপুর)	২৯, ৩৪	
রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, স্ত্র	...	৮৩	—মহাসেয়া দাগোবা, মিহিনতাল	...	২৯
রামনাথ বিখাস ও শৈলেন্দ্র দে	...	৬০০	—মিহিনতালের একটি গুহা	...	৩১
রামপুরের নবাবের বেগম সাহেবা	...	৫৮৯	—মিহিনতালের সিঁড়ি	...	৩০
রুক্মিণীকেশর দত্তরায়	...	১০৬	—মিহিনতাল হইতে বাহিরের দৃশ্য	...	৩৩
লইতা নাজমুদ্দিন	...	৩৭৭	—সিংহপোকুন, মিহিনতাল	...	৩৪
লালগোপাল মুখোপাধ্যায়, স্ত্র	...	৩০৪	সিংহলে মহেন্দ্র ও সত্রাট দেবনামপিয় তিস্‌স (রঙীন)		
লিষ্টার, ঘোশেক	...	৫২	—শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত	...	৩২
লুই পাস্তর			সীতাবাদে মোরে	...	৭৩০
— গবেষণাগারে পাস্তর	...	৪৯	সেনহাটীর মহিলাবৃন্দ	...	৫৮৯
—পাস্তরের মূর্তি	...	৮২১	হর-পার্বতী	...	৩২৩
—রাখালবালক	...	৮২৪	হরিপদ দাঁ	...	৭৩৩
—সোরবেণে পাস্তরের মূর্তি	...	৮২৩	হরিপদ সাহিত্য-মন্দির	...	৭৩৩
শকুন্তলা দেবী	...	৯১০	হালফাগানের স্বাধীনতা !	...	২৪৬
শক্তিদাধনায় বাড়ালী	...	১০৭	হসেন, এম. এ. (হিলা)	...	৮৬৬

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

শ্রী অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়— নৃত্যরত ভারতী	...	৮৯৫	শ্রীথগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ— মীরা কহে বিনা প্রেম সে...	...	৬০২
শ্রী অনাথনাথ বসু— শিশুসাহিত্য	...	২৪৭	শ্রী গিরীন্দ্রশেখর বসু— পুরাণে প্রাকৃতিক বিপর্যয়	...	৪৫১
শ্রী অক্ষয় গৌর একটি বিদ্যালয় (সচিত্র)	...	৫৬০	শ্রী চাক্রচন্দ্র ভট্টাচার্য— ভারি জল	...	৪৮১
শ্রী অক্ষয়কুমা দেবী— সাহিত্য ও সমাজ	...	৪২৪	শ্রী চিন্তাহরণ চক্রবর্তী— তন্ত্রের সাধনা	...	৫৬৮
শ্রী অমিনাশচন্দ্র মজুমদার— সাহিত্য প্রাদেশিকতা	...	৭৪৫	শ্রী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়— পুরোহিত (গল্প)	...	৫৪
শ্রী অমিয়কুমার ঘোষ— দুশমন (গল্প)	...	৭১২	শ্রী দেবব্রত চক্রবর্তী— ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালী	...	৫৩৫
শ্রী অমিয় রায় চৌধুরী— ডাক্তারের ডায়েরীর দুটো পাতা (গল্প)	...	৩৬৮	শ্রী দ্বিজেন্দ্রলাল ভাট্টা— একটি মেয়ে (গল্প)	...	১২০
শ্রী অমূল্যচন্দ্র ঘোষ— অন্ন, না পরাজয়	...	৮২৬	শ্রী নরেন্দ্রনাথ বসু— ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের জাতীয়তা-প্রীতি	...	৫৮৫
শ্রী অমূল্যচরণ বিদ্যাতৃষণ— ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা	...	৫১০	শ্রী নলিনীকান্ত ভট্টশালী— কৃষ্টিবাসের আর্হিতাব-কাল (কষ্টি)	...	২২
শ্রী অক্ষয়চন্দ্র চক্রবর্তী— উর্ষ্বলা (কবিতা)	...	৬৭৭	শ্রী নলিনীকুমার ভট্ট— মণিপুরা নৃত্য-উৎসবের চিত্র (সচিত্র)	...	৭২৬
শ্রী অশেষচন্দ্র বসু— ময়াল সর্প (সচিত্র)	...	৩৭০	শ্রী নলিনীমোহন সাহা— কুরল বা তিরুবল্লুরের নীতি	...	৬৮১
শ্রী অশেষচন্দ্র বসু— পৃথিবীর বৃহত্তম অঙ্ক (সচিত্র)	...	৮৬৭	শ্রী নলিনীবঙ্কন সরকার— ব্যাকিং-জগতে বাঙালীর স্থান	...	১৩২
শ্রী আশাসতা দেবী— মুক্তি (উপন্যাস)	৮৫, ২৫২, ৩৫৭, ৫৭৩, ৭০৩, ৮৪৬		শ্রী নির্মলকুমার বসু— ভুবনেশ্বর (সচিত্র)	...	৩৫
শ্রী আশুতোষ সাহা— প্রাস্তর-লক্ষ্মী (কবিতা)	...	৮২৫	শ্রী নির্মলকুমার বসু— হুলিঙ্গা সমাজ (সচিত্র)	...	৪৬৪
শ্রী কানালাল গাঙ্গুলী— তুই বন্ধু (গল্প)	...	২২২	শ্রী নির্মলকুমার রায়— হিংস্র (গল্প)	...	৩৪৫
শ্রী কানালাল গাঙ্গুলী— ডুগল (গল্প)	...	৬২০	শ্রী স্পোর্টসম্যান (গল্প)	...	৬৭১
শ্রী কামিনী রায়— বুঝুনের প্রতি (কবিতা)	...	১২৪	শ্রী পাকল দেবী— শ্রোত-বদল	...	৭২৬
শ্রী কালিকারঞ্জন কানুনগো— মীনাবাজার	...	৫৪৬	শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রী সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী লুচ পাস্তুর ও তাঁহার গবেষণা (সচিত্র)	৪২, ৩২৪, ৮২০	
শ্রী কীর্ত্তিমোহন সেন— কৈনধর্মের প্রাণশক্তি	...	৬৩	শ্রী ম্যাডাম কুরী (সচিত্র)	...	৫৮০
শ্রী কীর্ত্তিমোহন সেন— ঝাড়খণ্ডে কবীর ও চৈতন্যদেব প্রভৃতির প্রভাব	...	৭৭১	শ্রী প্রমথনাথ রায়-চৌধুরী— স্পষ্ট কথা (কবিতা)	...	২০৪
শ্রী গগেন্দ্রনাথ মিত্র— পুরুষ ভাগ্য (গল্প)	...	৬৫২	শ্রী প্রমথকুমার আচার্য— প্রাচীন ভারতে বাসগৃহের দিঙ নির্মাচন	...	৫৩৮

শ্রী শ্রীধরব্রজেন মেন — বাংলা-সাহিত্যে মহাকাব্য ... ৭৮৬	শ্রী যতীন্দ্রমোহন বাগচী — এই কানো মেঘ (কবিতা) ... ৪৭০
শ্রী সন্দনা দেবী — বিবাগী (গল্প) ... ৩৩১	শ্রী যোগী চন্দ্র সিংহ — আমাদের শিক্ষা ও অন্ন-সমস্যা ... ৬৬৮
শ্রী বসন্তকুমার দাস — কবিতা-মে'চন (গল্প) ... ৪১২	শ্রী যোগেশচন্দ্র মিত্র — চেকের কথা ... ৪০৭
শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার — কবিতা (কবিতা) ... ৬৬৩	শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি — অখিনার আদি ... ৬৬৪
শ্রী বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় — মনে রা'জ্য : কাহিনী ... ১২৪	শ্রী রজনীকান্ত গুহ — বাম ও বামণী ... ১৪
গীতা ও গীতাঞ্জলি ... ৬২৫	
শ্রী বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য — চতুষ্কাটি ... ১৬৩	শ্রী রমা প্রসাদ চন্দ — ভূব মূগোপাধ্যায় (সচিত্র) ... ৩৮৪
পাণনি-বাকরণ ও সংস্কৃতে প্রাকৃত প্রভাব ... ৩০৭	
শব্দপ্রসঙ্গ ... ৫২১	শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় — উত্তাপ-প্রয়োগে চিকিৎসা ... ৪০৪
শ্রী বভু তভূগন বন্দ্যোপাধ্যায় — দৃষ্টি-প্রসঙ্গ (উত্তাপ) ২০, ১৬৬, ৩১৬, ৪৮৬, ৬৩৫, ৮০৭	শ্রী বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর — কৈশোরিকা (কবিতা) ... ১
শ্রী বিভূতিভূষণ মুগোপাধ্যায় — মেঘদূত (গল্প) ... ২৭৩	সাহিত্যতত্ত্ব ... ৪
শ্রী যমল রানী (গল্প) ... ৭২	নন্দান বসু (কষ্টি) ... ২১
শ্রী শশীকান্ত ঠাকুর (সচিত্র) ... ৬১৩	মুক্তব-মাত্রাসার বাংলা ... ১০৩
শ্রী বিমলেন্দু কায়াল — বলী-দ্বীপে অস্ত্রোত্তীর্ণিক্রিয়া (সচিত্র) ... ৩৭২	প্রাণের ডাক (কবিতা) ... ১৬১
কোকস অভয়ান (সচিত্র) ... ৭১০	রূপকার (কবিতা) ... ৩০৫
শ্রী বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য — ভূষণা ... ২০৪	পাঠিকা (কবিতা) ... ৪৪২
শ্রী বীণা দেবী — শবরী প্রতীকা (কবিতা) ... ৮১৫	জীবনঙ্গী (কবিতা) ... ৬২৫
শ্রী যাবেন্দ্র চক্র শ্রী — দুটি কথা (কবিতা) ... ৪৫	বাতের দান (কবিতা) ... ৬২৬
শ্রী যাবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — মা' কৈশোরের জন্মতারিখ ... ৪৭১	সাহিত্যের তাত্ত্বিক ... ৬২৭
শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ — টেল ভসম (সচিত্র) ... ৩৩৭	যক্ষ (কবিতা) ... ৭৫২
শ্রী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত — নিঃশব্দের চিত্র (সচিত্র) ... ২৮	কপুনের পত্র ... ৮৫৬
আচার্য নন্দলাল বসু ও তাঁহার চিত্রকলা (সচিত্র) ... ১০৩	রাগা-দাস বন্দ্যোপাধ্যায় — " তত্ত্বঃ যুব " শৈব-সন্ন্যাসী ... ২৬৫
শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু — লেখকের বিচার (গল্প) ... ৪২	শ্রী বাধাচার্য বিন্দু বসাক — বৌদ্ধধর্মের কর্ম ও জন্মান্তরবাদ ... ১৭৫
শ্রী নোহ বসু — বর (গল্প) ... ১০২	শ্রী বামদ মুগোপাধ্যায় — মহুর্জের মু' (গল্প) ... ৪১
	শ্রী শরৎ চন্দ্র রায় — আদি মানব ও আসল মানব (সচিত্র) ... ১১৭
	শ্রী শশধর রায় অস্পৃশ্যতা ... ৩০২
	অবোধ ... ৭২৩
	শ্রী শশধর সিংহ গোভিন্টেট বাণেশ্বর নারীর স্থান ... ৪০২

শ্রীশান্তা দেবী—		অমৃতপূর্ণা (গল্প)	... ২১০
নন্দিনী (গল্প)	... ৭৭৫	যর-চূর্ণি	... ৮৫৮
বিধবার সজ্জা (গল্প)	... ৫৫০	শ্রীস্বকুম্বরজন দাশ—	
শ্রীশর্মালা গাল—		নান্দিক জগৎ (সচিত্র)	... ৮০০
বিহা কবিতা)	... ৭০২	শ্রীস্বধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী—	
শ্রীশান্তি দত্ত ঘোষ—		অর্থহীন (কবিতা)	... ৩৩৬
স্বপ্নি পি	... ৮৮৬	শ্রীস্বধীরকুমার চৌধুরী—	
শ্রীশিবকুমার মিত্র —		আশা-নিরাশা (কবিতা)	... ৩৬৩
মাদান কুরি	... ৫৮৪	শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—	
শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার লাহা—		আফ্রিকার নিখোঁশ-শিল্প (সচিত্র)	৪২৭, ৬৪৫
যে কবিতার লাবণ্য	... ৮৩৮	শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত —	
শ্রীশৈলেন্দ্র দেবী—		আয়ুর্কেন্দ্রের ইতিহাস	... ২২৫
সরসী (কবিতা)	... ৪০০	আয়ুর্কেন্দ্র-বিজ্ঞান	... ৩৪২
শ্রীশৌভীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—		শ্রীস্বর্ণলতা চৌধুরী—	
পাঁচের বৈশাখ (কবিতা)	... ২০	মরুপথে (গল্প)	... ৩২০
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—		পূজারণী	... ৫২৭
মাধনা (গল্প)	... ৫১৪	শ্রীস্বর্ধন মুখোপাধ্যায়—	
শ্রীসত্যপ্রিয় বসু —		জাগ্রত রাধিও মোরে (কবিতা)	... ২৩৮
স্বর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	... ৮২	শ্রী স্বঃ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ—	
শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী—		আর্থিক দুর্গতি মোচন	... ২৩
স্নেহ গহনে	... ৮৭৮	বাংলার জমি-বন্দনী ব্যাঙ্ক	... ২৪১
শ্রীসৌভদ্রা দেবী—		শ্রীহেমেন্দ্রমোহন রায় —	
বিহারা (গল্প)	... ৭৩	কাপুর স্পেশালে কাশ্মীরের পথে (সচিত্র)	... ২১২



প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

“নামসাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”

৩৪শ ভাগ

১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৪১

১ম সংখ্যা

কৈশোরিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তে কৈশোরের প্রিয়া,

ভোরবেলাকার আলোক-আধার-লাগা

চলেছিলে তুমি আধঘুমো-আধজাগা

মোর জীবনের ঘন বনপথ দিয়া ।

ছায়ায় ছায়ায় আমি ফিরিতাম একা,

দেখি দেখি করি শুধু হয়েছিল দেখা

চকিত পায়ের চলার ঊসারাখানি ।

চুলের গন্ধে ফুলের গন্ধে মিলে

পিছে পিছে তব বাতাসে চিহ্ন দিলে

বাসনার রেখা টানি' ॥

প্রভাত উঠিল কুটি'

অরুণ রাঙিমা দিগন্তে গেল ঘুচে,

শিশিরের কণা কঁড়ি হ'তে গেল মুছে,

গাছিল কুণ্ডে কপোত-কপোতী দুটি,

ছায়াবীথি হ'তে বাহিরে আসিলে ধীরে

ভরা জেয়ারদের উচ্চল নদীতীরে,

প্রাণ-করোলে মুখর পল্লিবাটে ।

আমি কহিলাম, “সময় হয়েছে, চলো,
ওরুণ রৌদ্র জলে করে ঝলমলো,
নৌকা রয়েছে ঘাটে ॥”

প্রাতে চলে তরা ভাসি' ।
সে তরা আমার চিরজীবনের স্মৃতি :
দিনরজনীর সুখের দুখের গীতি
কানায় কানায় ভরা তাহে রাশি রাশি ।
পেলব প্রাণের প্রথম পসরা নিয়ে
সে তরঙ্গী 'পরে পা ফেলেছ তুমি প্রিয়ে,
পাশাপাশি সেথা খেয়েছি চেউয়ের দোলা ।
কখনো বা কথা কয়েছিলে কানে কানে,
কখনো বা মুখে ছলোছলো ছ-নয়ানে
চেয়েছিলে ভাষা ভোলা ॥

বাতাস লাগিল পালে
ভাঁটার বেলায় তরা যবে যায় থেমে,
অচেনা পুলিনে কবে গিয়েছিলে নেমে,
মলিন ছায়ার ধূসর গোধূলিকালে ।
ফিরে এলে যবে অভিনব সাজে সাজি'
ডালিতে আনিলে নৃতন কুসুমরাজি,
নয়নে আনিলে নৃতন চেনার হাসি
কান্ সাগরের অধীর জোয়ার লেগে
আবার নদীর নাড়ি নেচে শুটে বেগে,
আরবার যাই ভাসি' ॥

তুমি ভেসে চলো সাথে ।
চিররূপখানি নবরূপে আসে প্রাণে :
নানা পরশের মাদুরীর মাঝখানে
তোমারি সে হাত মিলেছে আমার হাতে ।

গোপন গভীর রহস্যে অবিরত
 ঋতুতে ঋতুতে সুরের ফসল কত
 ফলায়ে তুলেছ বিস্মিত মোর গীতে ।
 শুকতারা তব কয়েছিল যে কথারে
 সঙ্কার আলো সোনায় গলায় তারে
 সঙ্করণ পূরবীতে ॥

চিনি নাহি চিনি তবু ।
 প্রতি দিবসের সংসারমাঝে তুমি
 স্পর্শ করিয়া আছ যে-মর্ত্যভূমি
 তার আবরণ খ'সে পড়ে যদি কভু
 তখন তোমার মূর্তি দীপ্তিমতী
 প্রকাশ করিবে আপন অমরাবতী,
 সকল কালের বিরহের মহাকাশে ।
 তাহারি বেদনা কত কীর্তির ভূপে
 উচ্ছিত হয়ে ওঠে অসংখ্য রূপে
 পুরুষের ইতিহাসে ॥

হে কৈশোরের প্রিয়া,
 এ জনমে তুমি নব জীবনের দ্বারে
 কোন্ পার হ'তে এনে দিলে মোর পারে
 অনাদি যুগের চির মানবীর হিয়া ।
 দেশের কালের অতীত যে মহা দূর,
 তোমার কণ্ঠে শুনেছি তাহারি সুর,
 বাক্য সেথায় নত হয় পরাভবে ।
 অসীমের দূতী ভরে এনেছিলে ডালা
 পরাতে আমারে নন্দন ফুলমালা
 অপূর্ব গৌরবে ॥

সাহিত্যতত্ত্ব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি আছি এবং আর সমস্ত আছে আমার অস্তিত্বের মধ্যে এই যুগল মিলন। আমার বাইরে কিছুই যদি অস্তিত্ব না করি তবে নিজেকেও অস্তিত্ব করিনে। বাইরের অস্তিত্ব যত প্রবল হয় অস্তরের দত্তাবোধও তত জোর পায়।

আমি আছি এই সত্যটি আমার কাছে চরম মূল্যবান। সেই জন্তু যাতে আমার সেই বোধকে বাড়িয়ে তোলে তাতে আমার আনন্দ। বাইরের যে-কোনো জিনিষের 'পরে' আমি উদাসীন থাকতে পারিনে, যাতে আমার গুৎসুক্য, অর্থাৎ যা আমার চেতনাকে জাগিয়ে রাখে সে যতই তুচ্ছ হোক তাতেই মন হয় খুশী, তা সে হোক না ঘুড়ি-গুড়ানো হোক না লাটিম-ঘোরানো। কেন-না, সেই আগহের আঘাতে আপনাকেই অত্যন্ত অস্তিত্ব করি।

আমি আছি এক, বাইরে আছে বহু। এই বহু আমার চেতনাকে বিচিত্র করে তুলছে, আপনাকে নানা কিছু মধ্য জানছি নানা ভাবে। এই বৈচিত্র্যের দ্বারা আমার আত্মবোধ সর্বদা উৎসুক হয়ে থাকে। বাইরের অবস্থা একঘেয়ে হ'লে মানুষকে মন-মরা করে।

শান্ত্রে আছে, এক বললেন, বহু হব, নানার মধ্যে এক আপন ঐক্য উপলব্ধি করতে চাইলেন। এ'কেই বলে সৃষ্টি। আমাতে যে এক আছে সেও নিজেকে বহুর মধ্যে পেতে চায়, উপলব্ধির ঐশ্বর্য সেই তার বহুলভে। আমাদের চৈতন্যে নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে বহুর ধারা, রূপে রসে নানা ঘটনার তরঙ্গে; তারি প্রতিঘাতে স্পষ্ট করে তুলছে 'আমি আছি'— এই বোধ। আপনার কাছে আপনার প্রকাশের এই স্পষ্টতাত্ত্বিক আনন্দ। অস্পষ্টতাত্ত্বিক অবসাদ।

একলা কারাগারের বন্দীর আর কোনো পীড়ন যদি নাও থাকে তবু আবছায়া হয়ে আসে তার আপনার বোধ, সে যেন নেই-হওয়ার কাছাকাছি আসে। আমি আছি এবং না-আমি আছে এই দুই নিরন্তর ধারা আমার মধ্যে ক্রমাগতই একীভূত হয়ে আমাকে সৃষ্টি করে চলেছে; অস্তর বাহিরের এই

সম্মিলনের বাধায় আমার আপন-সৃষ্টিকে কৃণ বা নিকৃত ক'রে দিলে নিরানন্দ ঘটায়।

এইখানে তর্ক উঠতে পারে যে, আমার সঙ্গে না-আমির মিলনে দুঃখেরও তো উদ্ভব হয়। তা হতে পারে। কিন্তু এটা মনে রাখা চাই যে, সুখেরই বিপরীত দুঃখ, কিন্তু আনন্দের বিপরীত নয়; বস্তুত দুঃখ আনন্দেরই অস্তিত্ব। কথাটা শুনে তো স্বতোবিরুদ্ধ কিন্তু সত্য। যা হোক এ আলোচনাটা আপাতত থাকুক পরে হবে।

আমাদের জানা দু-রকমের, জানে জানা আর অস্তিত্ব জানা। অস্তিত্ব শব্দের ধাতুগত অর্থের মধ্যে আছে অস্তিত্ব কিছু অস্তিত্ব হয়ে উঠা; শুধু বাইরে থেকে সংবাদ পাওয়া নয় অস্তরে নিজেরই মধ্যে একটা পরিণতি ঘটানো। বাইরের পদার্থের যোগে কোনো বিশেষ রঙে বিশেষ রসে বিশেষ রূপে আপনাকেই বোধ করাকে বলে অস্তিত্ব করা। সেই জন্তু উপনিষদ বলেছেন, পুত্রকে কামনা করি বলেই যে পুত্র আমাদের প্রিয় তা নয়, আপনাকেই কামনা করি বলেই পুত্র আমাদের প্রিয়। পুত্রের মধ্যে পিতা নিজেকেই উপলব্ধি করে, সেই উপলব্ধিতেই আনন্দ।

আমরা যাকে বলি সাহিত্য, বলি ললিতকলা, তার লক্ষ্য এই উপলব্ধির আনন্দ, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ী এক হয়ে যাওয়াতে যে আনন্দ। অস্তিত্বের গভীরতা দ্বারা বাহিরের সঙ্গে অস্তরের একাত্মবোধ যতটা সত্য হয় সেই পরিমাণে জীবনে আনন্দের সীমানা বেড়ে চলতে থাকে, অর্থাৎ নিজেরই সত্তার সীমানা। প্রতিদিনের ব্যাবহারিক ব্যাপারে ছোট ছোট ভাগের মধ্যে আমাদের আত্মপ্রসারণকে অবরুদ্ধ করে, মনকে বেঁধে রাখে বৈষয়িক সঙ্কীর্ণতায়, প্রয়োজনের সংসারটা আমাদের আপনকে ঘিরে রাখে কড়া পাহারায়; অবরোধের নিত্য অভ্যাসের জড়তায় ভুলে যাই যে, নিছক বিষয়ী মানুষ অত্যন্তই কম মানুষ,— সে প্রয়োজনের কাঁচি-চাঁটা মানুষ।

প্রয়োজনের দাবি প্রবল এক তা অসংখ্য। কেন-না

যতটা আয়োজন আমাদের জরুরি তা আপন পরিমাণ রক্ষা করে না। অভাব মোচন হয়ে গেলেও তৃপ্তিহীন কামনা হাত পেতে থাকে, সঞ্চয়ের ভিড় জমে, সঙ্কানের বিশ্রাম থাকে না। সংসারের সকল বিভাগেই এই যে চাই-চাইয়ের হাট বসে গেছে, এরই আশপাশে মানুষ একটা ফাঁক খোজে যেখানে তার মন বলে চাইনে, অর্থাৎ এমন কিছু চাইনে যেটা লাগে সঞ্চয়ে। তাই দেখতে পাই প্রয়োজনের এত চাপের মধ্যেও মানুষ অপ্রয়োজনের উপাদান এত প্রভূত করে তুলেছে, অপ্রয়োজনের মূল্য তার কাছে এত বেশি। তাঁর গৌরব সেখানে, ঐশ্বর্য সেখানে, যেখানে সে প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে গেছে।

বলা বাহুল্য, বিস্ময় সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়; তার যে রস সে অহৈতুক। মানুষ সেই দায়মুক্ত রহস্য অবকাশের ক্ষেত্রে কল্পনার সোনার-কাঠি-ছোওয়া সামগ্রীকে জাগ্রত করে জানে আপনারই সম্ভাব্য। তার সেই অল্পভবে অর্থাৎ আপনারই বিশেষ উপলক্ষিতে তার আনন্দ। এই আনন্দ-দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে জানিনে।

লোকে বলে সাহিত্য যে আনন্দ দেয় সেটা সৌন্দর্যের আনন্দ। সে কথা বিচার করে দেখবার যোগ্য। সৌন্দর্য-রহস্যকে বিশ্লেষণ করে ব্যাখ্যা করবার অসাধ্য চেষ্টা করব না। অল্পভূতির বাইরে দেখতে পাই সৌন্দর্য অনেকগুলি তথ্যমাত্রকে অর্থাৎ ক্যাক্টাসকে অধিকার করে আছে। সেগুলি সুন্দরও নয় অসুন্দরও নয়। গোলাপের আছে বিশেষ আকার আয়তনের কতকগুলি পাপড়ি বোটা, তাকে ঘিরে আছে সবুজ পাতা। এই সমস্তকে নিয়ে বিরাজ করে এই সমস্তের অর্থাৎ একটি ঐক্যতত্ত্ব, তাকে বলি সৌন্দর্য। সেই ঐক্য উদ্ঘোষিত করে তা'কেই, যে আমার অন্তরতম ঐক্য, যে আমার ব্যক্তি-পুরুষ। অসুন্দর সামগ্রীরও প্রকাশ আছে, সেও একটা সমগ্রতা, একটা ঐক্য, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু বস্তুরূপী তথ্যটাই মুখ্য, ঐক্যটা গৌণ। গোলাপের আকারে আয়তনে তার স্বমায় তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরস্পর সামঞ্জস্য বিশেষভাবে নির্দেশ করে দিচ্ছে তার সমগ্রের মধ্যে পরিব্যাপ্ত এককে, সেইজন্মে গোলাপ আমাদের কাছে কেবল একটি তথ্যমাত্র নয়, সে সুন্দর।

কিন্তু শুধু সুন্দর কেন, যে-কোনো পদার্থই আপন তথ্যমাত্রকে অতিক্রম করে সে আমার কাছে তেমনি সত্য

হয় যেমন সত্য আমি নিজে। আমি নিজেও সেই পদার্থ যা বহু তথ্যকে আবৃত করে অধঃ এক।

উচ্চ অঙ্গের গণিতের মধ্যে যে একটি গভীর সৌন্দর্য, যে একটি ঐক্যরূপ আছে, নিঃসন্দেহ গাণিতিক তার মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করে। তার সামঞ্জস্যের তথ্যটি শুধু জানের নয়, তা নিবিড় অল্পভূতির; তাতে বিস্ময় আনন্দ। কারণ জানের যে উচ্চ শিখরে তার প্রকাশ সেখানে সে সর্বপ্রকার প্রয়োজননিরপেক্ষ, সেখানে জানের মুক্তি। এ কেন কাব্য-সাহিত্যের বিষয় হয়নি এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে। হয়নি যে তার কারণ এই যে, এর অভিজ্ঞতা অতি অল্প লোকের মধ্যে বদ্ধ, এ সর্বসাধারণের অগোচর। যে ভাষার যোগে এর পরিচয় সম্ভব তা পারিভাষিক, বহুলোকের হৃদয়বোধের স্পর্শের দ্বারা সে সজীব উপাদানরূপে গড়ে ওঠেনি। যে-ভাষা হৃদয়ের মধ্যে অব্যবহিত আবেগে প্রবেশ করতে পারে না সে ভাষায় সাহিত্যরসের সাহিত্যরূপের সৃষ্টি সম্ভব নয়। অথচ আধুনিক কাব্য সাহিত্যে কলকারখানা স্থান নিতে আরম্ভ করেছে। যন্ত্রের বিশেষ প্রয়োজনগত তথ্যকে ছাড়িয়ে তার একটা বিরাট শক্তিরূপ আমাদের কল্পনায় প্রকাশ পেতে পারে, সে আপন অল্পনিহিত সৃষ্টিতে স্ফুটনিক অবলম্বন করে আপন উপাদানকে ছাড়িয়ে আবির্ভূত। কল্পনাদৃষ্টিতে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গভীরে যেন তার একটি আত্মস্বরূপকে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। সেই আত্মস্বরূপ আমাদেরই ব্যক্তিরূপের দোসর। যে মানুষ তাকে যান্ত্রিক জানের দ্বারা নয় অল্পভূতি দ্বারা একান্ত বোধ করে সে তার মধ্যে আপনাকে পায়, কলের জাহাজের কাপ্টেন কলের জাহাজের অন্তরে যেমন পরম অনুরাগে আপন ব্যক্তিপুরুষকে অল্পভব করতে পারে। কিন্তু প্রাকৃতিক নির্বাচন বা যোগ্যতমের উদ্ভবন তত্ত্ব এ জ্ঞানের নয়। এ সব তত্ত্ব জানার দ্বারা নিষ্কাম আনন্দ হয় না তা নয়। কিন্তু সে আনন্দ হৃদয়বোধের আনন্দ নয়, তা পাণ্ডুর আনন্দ; অর্থাৎ এই জ্ঞান জ্ঞানীর থেকে পৃথক, এ তার ব্যক্তিগত সম্ভার অঙ্গের মহলের জিনিষ নয়, ভাণ্ডারের জিনিষ।

আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে বলেছে বাক্যঃ রসাত্মকং কাব্যঃ। সৌন্দর্যের রস আছে, কিন্তু এ কথা বলা চলে না যে, সব রসেরই সৌন্দর্য আছে। সৌন্দর্যেরসের সঙ্গে অল্প

সকল রসেরই মিল হচ্ছে ঐখানে, যেখানে সে আমাদের অল্পভূতির সামগ্রী। অল্পভূতির বাইরে রসের কোনো অর্থই নেই। রসমাত্রই তথ্যকে অধিকার করে তাকে অনির্করণীয় ভাবে অতিক্রম করে। রসপদার্থ বস্তুর অতীত এমন একটি ঐক্যবোধ যা আমাদের চৈতন্যে মিলিত হতে বিলম্ব করে না। এখানে তার প্রকাশ আর আমার প্রকাশ একই কথা।

বস্তুর ভিড়ের একান্ত আধিপত্যকে লাঘব করতে লেগেছে মানুষ। সে আপন অল্পভূতির জন্তে অবকাশ রচনা করেছে। তার একটা সহজ দৃষ্টান্ত দিই। ঘড়ায় ক'রে সে জল আনে, এই জল আনায় তার নিত্য প্রয়োজন। অগত্যা বস্তুর দৌরাত্ম্য তাকে কাঁখে ক'রে মাথায় ক'রে বইতেই হয়। প্রয়োজনের শাসনই যদি একমাত্র হয়ে ওঠে তা হ'লে ঘড়া হয় আমাদের অনাস্থীয়। মানুষ তাকে সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তুলল। জল বহনের জন্ত সৌন্দর্যের কোনো অর্থই নেই। কিন্তু এই শিল্পসৌন্দর্য প্রয়োজনের রুঢ়তার চারিদিকে ফাঁকা এনে দিলে। যে ঘড়াকে দায়ে পড়ে মেনেছিলেম, নিলেম তাকে আপন ক'রে। মানুষের ইতিহাসে আদিম যুগ থেকেই এই চেষ্টা। প্রয়োজনের জিনিষকে সে অপ্রয়োজনের মূল্য দেয় শিল্পকলার সাহায্যে, বস্তুকে পরিণত করে বস্তুর অতীতে। সাহিত্যসৃষ্টি শিল্পসৃষ্টি সেই প্রলয়লোকে যেখানে দায় নেই, ভার নেই, যেখানে উপকরণ মায়া, তার ধ্যানরূপটাই সত্য, যেখানে মানুষ আপনাকে সমস্ত আত্মসাৎ করে আছে

কিন্তু বস্তুকে দায়ে পড়ে মেনে নিয়ে তার কাছে মাথা হেঁট করা ক'কে বলে যদি দেখতে চাও তবে ঐ দেখো কেরোসিনের টিনে ঘটস্থাপনা; ঝাঁকের দুই প্রান্তে টিনের কানেস্থা বেঁধে জল আনা। এতে অভাবের কাছেই মানুষের একান্ত পরাভব। যে-মানুষ সুন্দর ক'রে ঘড়া বানিয়েছে সে-ব্যক্তি তাড়াতাড়ি জলপিপাসাকেই মেনে নেয় নি, সে যথেষ্ট সময় নিয়েছে নিজের ব্যক্তিত্বকে মানতে।

বস্তুর পৃথিবী ধুলোমাটি পাথর লোহায় ঠাসা হয়ে পিণ্ডীকৃত। বায়ুমণ্ডল তার চারদিকে বিরাট অবকাশ বিস্তার করেছে। এরই পরে তার আত্মপ্রকাশের ভূমিকা। এইখান থেকে প্রাণের নিঃস্বাস বহমান; সেই প্রাণ অনির্করণীয়। সেই প্রাণ-শিল্পকারের তুলি এইখান থেকেই আলো নিয়ে

রং নিয়ে তাপ নিয়ে চলমান চিত্রে বার-বার ভরে দিচ্ছে পৃথিবীর পট। এইখানে পৃথিবীর লীলার দিক, এইখানে তার সৃষ্টি, এইখানে তার সেই ব্যক্তিরূপের প্রকাশ, যাকে বিশ্লেষণ করা যায় না, ব্যাখ্যা করা যায় না, যার মধ্যে তার বাণী, তার যাথার্থ্য, তার রস, তার শ্রামলতা, তার হিলোল। মানুষও নানা জরুরি কাজের দায় পেরিয়ে চায় আপন আকাশমণ্ডল, যেখানে তার অবকাশ, যেখানে বিনা প্রয়োজনের লীলায় আপন সৃষ্টিতে আপনাকে প্রকাশই তার চরম লক্ষ্য, যে-সৃষ্টিতে জ্ঞান নয় পাণ্ডয়া নয় কেবল হওয়া। পূর্বেই বলেছি অল্পভব মানেই হওয়া। বাহিরের সত্তার অভিঘাতে সেই হওয়ার বোধে বান ডেকে এলে মন সৃষ্টিলীলায় উদ্বেল হয়ে ওঠে। আমাদের হৃদয়বোধের কাজ আছে জীবিকানির্বাহের প্রয়োজনে। আমরা আত্মরক্ষা করি, শত্রু হ্রনন করি, সন্তান পালন করি, আমাদের হৃদয়বৃত্তি সেই সকল কাজে বেগ সঞ্চার করে, অভিক্রটি জাগায়। এই সীমাটুকুর মধ্যে জঙ্কর সঙ্গে মানুষের প্রভেদ নেই। প্রভেদ ঘটেছে সেইখানেই যেখানে মানুষ আপন হৃদয়াল্পভূতিকে কক্ষের দায় থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে বহন করার সঙ্গে যুক্ত করে দেয়, যেখানে অল্পভূতির রসটুকুই তার নিঃস্বার্থ উপভোগের লক্ষ্য, যেখানে আপন অল্পভূতিকে প্রকাশ করবার প্রেরণায় ফললাভের অত্যাশঙ্কিতাকে সে বিশ্বৃত হয়ে যায়। এই মানুষই যুদ্ধ করবার উপলক্ষ্যে কেবল অস্ত্রচালনা করে না, যুদ্ধের বাজনা বাজায়, যুদ্ধের নাচ নাচে। তার হিংস্রতা যখন নিদারুণ বাবসাম্মে প্রস্তুত তখনও সেই হিংস্রতার অল্পভূতিকে বাবহারের উর্দ্ধে নিয়ে গিয়ে তাকে অনাবশ্যক রূপ দেয়। হৃত সেটা তার সিদ্ধিলাভে ব্যাঘাত করতেও পারে। শুধু নিজের সৃষ্টিতে নয় বিশ্বসৃষ্টিতে সে আপন অল্পভূতির প্রতীক খুঁজে বেড়ায়। তার ভালবাসা ফেরে ফুলের বনে, তার ভক্তি তীর্থযাত্রা করতে বেরোয় সাগর-সঙ্গমে পর্বতশিখরে। সে আপন ব্যক্তিরূপের দোসরকে পায় বস্তুতে নয়, তত্তে নয়। লীলাময়কে সে পায় আকাশ যেখানে নীল, শ্রামল যেখানে নবদুর্কাদল। ফলে যেখানে সৌন্দর্য, ফলে যেখানে মধুরতা, জীবের প্রতি যেখানে আছে বক্ষণা, ভূমার প্রতি যেখানে আছে আত্মনিবেদন, সেখানে বিশ্বের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সঙ্ঘর্ষের চিরন্তন যোগ অল্পভব

করি হৃদয়ে। একেই বলি বাস্তব, যে বাস্তবে সভ্য হয়েছে আমার আপন।

যেখানে আমরা এই আপনকে প্রকাশের জন্ত উৎসুক, যেখানে আমরা আপনের মধ্যে অপরিমিতকে উপলব্ধি করি সেখানে আমরা অমিতব্যয়ী, কী অর্থে কী সামর্থ্যে। যেখানে অর্থকে চাই অর্জন করতে, সেখানে প্রত্যেক সিকি পয়সার হিসাব নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকি; যেখানে সম্পদকে চাই প্রকাশ করতে সেখানে নিজেকে দেউলে করে দিতেও সঙ্কোচ নেই। কেন-না সেখানে সম্পদের প্রকাশে আপন ব্যক্তিপুরুষেরই প্রকাশ। বস্তুত, আমি ধনী এই কথাটি উপযুক্তরূপে ব্যক্ত করবার মত ধন পৃথিবীতে কারও নেই। শত্রুর হাত থেকে প্রাণরক্ষা যখন আমাদের উদ্দেশ্য তখন দেহের প্রত্যেক চান প্রত্যেক ভঙ্গী সম্বন্ধে নিরতিশয় সাবধান হতে হয়, কিন্তু যখন নিজের সাহসিকতা প্রকাশই উদ্দেশ্য তখন নিজের প্রাণপাত পর্যন্ত সম্ভব, কেন-না এই প্রকাশে ব্যক্তিপুরুষের প্রকাশ। প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় আমরা খরচ করি বিবেচনাপূর্বক, উৎসবের সময় যখন আপনার আনন্দকে প্রকাশ করি, তখন তহবিলের সীমিত সম্বন্ধে বিবেচনাশক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ যখন আমরা আপন ব্যক্তিসত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবলরূপে সচেতন হই, সাংসারিক তথ্যগুলোকে তখন গণাই করিনে। সাধারণত মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে আমরা পরিমাণ রক্ষা করেই চলি। কিন্তু যাকে ভালবাসি অর্থাৎ যার সঙ্গে আমার ব্যক্তিপুরুষের পরম সম্বন্ধ তার সম্বন্ধে পরিমাণ থাকে না। তার সম্বন্ধে অনায়াসেই বলতে পারি—

জনম অবধি হুম রূপ নেহারতু নয়ন না তিরপিত ভেল,

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখতু তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

তথ্যের দিক থেকে এত বড় অদ্ভুত অত্যাঙ্কি আর কিছু হ'তে পারে না, কিন্তু ব্যক্তিপুরুষের অল্পভূতির মধ্যে কণকালের সীমায় সংহত হ'তে পারে চিরকাল। “পাষাণ মিলায়ে ষায় গায়ের বাতাসে” বস্তুজগতে এ কথাটা অত্যাঙ্কি, কিন্তু ব্যক্তি-জগতে তথ্যের খাতিরে এর চেয়ে কম ক'রে য' বলতে ঘাই তা সত্যে পৌছয় না।

বিশ্বস্থিতিতেও তাই। সেখানে বস্তু বা জাগতিক শক্তির তথ্য হিসাবে কড়াক্রান্তির এদিক-ওদিক হবার জো নেই।

কিন্তু সৌন্দর্য তথ্যসীমা ছাপিয়ে ওঠে, তার হিসাবের আদর্শ নেই পরিমাণ নেই।

উর্ধ্ব আকাশের বায়ুস্তরে ভাসমান বাষ্পপুঞ্জ একটা সামান্য তথ্য কিন্তু উদয়াস্তকালের সূর্যরশ্মির স্পর্শে তার মধ্যে যে অপরূপ বর্ণলীলার বিকাশ হয় সে অসামান্য, সে “ধূমজ্যোতিঃ-সলিলমরুতাঃ সন্নিপাতঃ” মাত্র নয়, সে যেন প্রকৃতির একটা অদারণ অত্যাঙ্কি, একটা পরিমিত বস্তুগত সংবাদ-বিশেষকে সে যেন একটা অপরিমিত অনির্বাচনীয়াতার পরিণত ক'রে দেয়। ভাষার মধ্যেও যখন প্রবল অল্পভূতির সংঘাত লাগে তখন তা শব্দার্থের আভিধানিক সীমা লঙ্ঘন করে।

এই জগ্গে সে যখন বলে “চরণনখরে পাড়ি দশ চাঁদ-কাঁদে” তখন তাকে পাগলামি বলে উড়িয়ে দিতে পারিনে। এই জগ্গে সংসারের প্রাত্যাহিক তথ্যকে একান্ত যথাযথভাবে আটের বেদীর উপরে চড়ালে তাকে লজ্জা দেওয়া হয়। কেন-না আটের প্রকাশকে সত্য করতে গেলেই তার মধ্যে অতিশয়তা লাগে, নিছক তথ্যে তা নয় না। তাকে যতই ঠিকঠাক করে বলা যাক না, শব্দের নির্বাচনে ভাষার ভঙ্গীতে চন্দের ইসারায় এমন কিছু থাকে যেটা সেই ঠিকঠাককে ছাড়িয়ে যায় যেটা অতিশয়। তথ্যের জগতে ব্যক্তিস্বরূপ হচ্ছে সেই অতিশয়। কেজো ব্যবহারের সঙ্গে সৌজন্তের প্রভেদ ঐখানে; কেজো ব্যবহারে হিসেব করা কাজের তাগিদ, সৌজন্তে আছে সেই অতিশয় যা ব্যক্তিপুরুষের মহিমার ভাষা।

প্রাচীন গ্রীসের প্রাচীন রোমের সভ্যতা গেছে অতীতে বিলীন হয়ে। যখন বেঁচে ছিল তাদের বিশ্বের ছিল বৈষয়িকতা-দায়। প্রয়োজনগুলি ছিল নিরেট নিবিড় গুরুভার, প্রবল উদ্বেগ প্রবল উদ্যম ছিল তাদের বেটন করে। আজ তার কোনো চিহ্ন নেই। কেবল এমন সব সামগ্রী আজও আছে, যাদের ভার ছিল না, বস্তু ছিল না, দায় ছিল না। সৌজন্তের অত্যাঙ্কি দিয়ে সমস্ত দেশ যাদের অভ্যর্থনা করেছে; যেমন করে আমরা সম্মমবোধের পরিতৃপ্তি সাধন করি রাজচক্রবর্তীর নামের আদিত্তে পাঁচটা শ্রী যোগ করে। দেশ তাদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল অতিশয়ের চূড়ায়, সেই নিয়ন্ত্রণের সমতল-ক্ষেত্রে নয় যেখানে প্রাত্যাহিক ব্যবহারের ভিড়। মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের যে পরিচয় চিরকালের দৃষ্টিপাত নয়, পাথরের

বেখার শব্দের ভাবার তারি সর্ধনাকে দ্বারী রূপ ও অসীম মূল্য দিয়ে রেখে গেছে।

বা কেবলমাত্র স্থানিক সাময়িক, বর্তমান কাল তাকে যত প্রচুর মূল্যই দিক, দেশের প্রতিভার কাছ থেকে অতিশয়ের সমাদর সে স্বভাবতই পায়নি যেমন পেয়েছে জ্যোৎস্না রাতে ভেসে-বাওয়া নৌকোর সেই সারিগান,—

মাঝি তোর বৈঠা নে রে

আমি আর বাইতে পারলাম না।

যেমন পেয়েছে নাইটিঙ্গেল পাখীর সেই গান, যে গান শুন্তে শুন্তে কবি বলেছেন তাঁর প্রিয়াকে :—

Listen Eugenia,

How thick the burst comes crowding through
the leaves.

Again—thou hearest ?

Eternal passion !

Eternal pain !

পূর্বেই বলেছি রস মাত্রের অর্থাৎ সকল রকম হৃদয়-বোধেই আমরা বিশেষভাবে আপনাকেই জানি সেই জানাতেই বিশেষ আনন্দ। এইখানেই তর্ক উঠতে পারে যে-জানায় দুঃখ সেই জানাতেও আনন্দ এ কথা স্বতোবিরুদ্ধ। দুঃখকে ভয়ের বিষয়কে আমরা পরিহায্য মনে করি তার কারণ তাতে আমাদের হানি হয়, আমাদের প্রাণে আঘাত দেয়, তা আমাদের স্বার্থের প্রতিকূলে যায়। প্রাণরক্ষার স্বার্থরক্ষার প্রবৃত্তি আমাদের অত্যন্ত প্রবল, সেই প্রবৃত্তি ক্ষুণ্ণ হলে সেটা দুঃসহ হয়। এই জগ্গে দুঃখবোধ আমাদের ব্যক্তিগত আত্মবোধকে উদ্দীপ্ত করে দেওয়া সত্ত্বেও সাধারণত তা আমাদের কাছে অপ্রিয়। এটা দেখা গেছে, যে-মানুষের স্বভাবে ক্রতির ভয় প্রাণের ভয় যথেষ্ট প্রবল নয় বিপদকে সে ইচ্ছাপূর্বক আহ্বান করে, দুর্গমের পথে যাত্রা করে, দুঃসাধের মধ্যে পড়ে ঝাঁপ দিয়ে। কিসের লোভে? কোনো ছলভাঁধন অর্জন করবার জগ্গে নয়, ভয় বিপদের সংঘাতে নিজেকেই প্রবল আবেগে উপলব্ধি করবার জগ্গে। অনেক শিশুকে নিষ্ঠুর হতে দেখা যায়, কীট পতঙ্গ পশুকে ধ্বংসা দিতে তারা তীব্র আনন্দ বোধ করে। শ্রেয়োবুদ্ধি প্রবল হলে এই আনন্দ সম্ভব হয় না, তখন শ্রেয়োবুদ্ধি বাধা রূপে কাজ করে।

স্বভাবত বা অভ্যাসবশত এই বুদ্ধি হ্রাস হলেই দেখা যায় হিংস্রতার আনন্দ অতিশয় তীব্র; ইতিহাসে তার বহু প্রমাণ আছে এবং জেলখানার এক শ্রেণীর কর্মচারীর মধ্যেও তার দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই ছলভাঁধ নয়। এই হিংস্রতারই অহেতুক আনন্দ নিন্দুকদের—নিজের কোন বিশেষ ক্রতির উস্তেজনাতেই যে মানুষ নিন্দা করে তা নয়। যাকে সে জানেনা, যে তার কোনো অপকার করেনি তার নামে অকারণ কলঙ্ক আরোপ করায় যে নিঃস্বার্থ দুঃখজনকতা আছে দলেবলে নিন্দা-সাধনার ভৈরবীচক্রে বসে নিন্দুক ভোগ করে তাই। ব্যাপারটা নিষ্ঠুর এবং কদর্য কিন্তু তীব্র তার আনন্দন। যার প্রতি আমরা উদাসীন সে আমাদের সুখ দেয় না, কিন্তু নিন্দার পাত্র আমাদের অমুভূতিকে প্রবল ভাবে উদ্দীপ্ত করে রাখে। এই হেতুই পরের দুঃখকে উপভোগ্য সামগ্রী করে নেওয়া মানুষ-বিশেষের কাছে কেন বিলাসের অঙ্গরূপে গণ্য হয়। কেন মহিমের মত অত বড় প্রকাণ্ড প্রবল জগ্গকে বলি দেবার সঙ্গে সঙ্গে রক্তমাখা উন্নত নৃত্য সম্ভবপর হতে পারে, তার কারণ বোঝা সহজ। দুঃখের অভিজ্ঞতায় আমাদের চেতনা আলোড়িত হয়ে ওঠে। দুঃখের কটুস্বাদে দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকলেও তা উপাদেয়। দুঃখের অমুভূতি সহজ আরামবোধের চেয়ে প্রবলতর। ট্রাজেডির মূল্য এই নিয়ে। কৈকেয়ীর প্ররোচনায় রামচন্দ্রের নিকীর্ণন, মন্থরার উল্লাস, দশরথের মৃত্যু, এর মধ্যে ভাল কিছুই নেই। সহজ ভাষায় যাকে আমরা সুন্দর বলি এ ঘটনা তার সমশ্রেণীর নয়, একথা মানতেই হবে। তবু এই ঘটনা নিয়ে কত কাব্য নাটক ছবি গান পাঁচালি বহু কাল থেকে চলে আসছে, ভিড় জমছে কত, আনন্দ পাচ্ছে সবাই। এতেই আছে বেগবান অভিজ্ঞতায় ব্যক্তিপুরুষের প্রবল আত্মামুভূতি। বন্ধ জল যেমন বোবা, গুমট হাওয়া যেমন আত্মপরিচয়হীন, তেমনি প্রাত্যহিক আধমরা অভ্যাসের একটানা আবৃত্তি যা দেয় না চেতনায়, তাতে সত্ত্বাবোধ নিস্তেজ হয়ে থাকে। তাই দুঃখে বিপদে বিদ্রোহে বিপ্লবে অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে মানুষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়।

একদিন এই কথাটি আমার কোনো একটি কবিতায়

সিঁথেছিলেম। বলেছিলেম, আমার অন্তরের আমি আলসে
আবেশে বিলাসের প্রস্রবে ঘুমিয়ে পড়ে, নির্দয় আঘাতে
তার অসাড়া ঘুচিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলে, তবেই সেই
আমার আপনাকে নিবিড় করে পাই, সেই পাণ্ডাতেই
আনন্দ।

এতকাল আমি রেখেছিলাম তাকে যতন ভরে

শয়ন 'পরে ;

বাখা পাছে লাগে, দুখ পাছে জাগে

নিশিদিন তাই বহু অমুরাগে

বাসর শয়ন করেছি রচন কুসুম খরে,

দুয়ার কুখিলা রেখেছিলাম তাকে গোপন ঘরে

যতন ভরে।

শেষে স্বপ্নের শয়নে শ্রান্ত পরাণ আলসরসে

আবেশ বশে।

পরশ করিলে জাগে না সে আর,

কুসুমের হার লাগে গুরুভার,

ঘুমে জাগরণে মিশি একাকার নিশিদিবসে ;

বেদনাবিহীন অসাড়া বিরাগ মরমে পর্শে

আবেশ বশে।

তাই ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে নতন খেলা

রাত্রিবেলা।

মরণদোলায় ধরি রসিগাছি

বসিব দুজনে বড়ো কাছাকাছি,

ঝঙ্কা আসিলা অট্ট হাসিয়া মারিবে ঠেলা,

প্রাণেতে আমাতে খেলিব দুজনে কুলন খেলা

নিশীথ বেলা।

আমাদের শাস্ত্র বলেন, “তং বেদাং পুরুষং বেদ
যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিবাখাঃ।” “সেই বেদনীয় পুরুষকে
জানো যাতে মৃত্যু তোমাকে ব্যথা না দিক।” বেদনা
অর্থাৎ হৃদয়বোধ দিগ্ধেই থাকে জানা যায় জানো
সেই পুরুষকে অর্থাৎ পাসে ঐগ্গালিটিক। আমার
ব্যক্তিপুরুষ যখন অব্যবহিত অমৃত্যুত্ব দিয়ে জানে
অসীম পুরুষকে, জানে হৃদয় মনুষ্য মনস, তখন তাঁর
মধ্যে নিঃসংশয়রূপে জানে আপনাকে। তখন কী হয়?

মৃত্যু অর্থাৎ শূন্যতার ব্যথা চলে যায়, কেন-না বেদনীয়
পুরুষের বোধ পূর্ণতার বোধ, শূন্যতার বোধের বিকল্প।

এই আধ্যাত্মিক সাধনার কথাটাকেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে
নামিয়ে আনা চলে। জীবনে শূন্যতাবোধ আমাদের ব্যথা
দেয়, সন্তাবোধের স্নানতায় সংসারে এমন কিছু অভাব
ঘটে যাতে আমাদের অমৃত্যুত্বের সাদা জাগে না, যেখানে
আমাদের ব্যক্তিবোধকে জাগ্রত রাখবার মত এমন
কোনো বাণী নেই যা স্পষ্ট ভাষায় বলছে আমি আছি।
বিরহের শূন্যতায় যখন শকুন্তলার মন অবসাদগ্রস্ত তখন
তাঁর ঘরে উঠেছিল ধ্বনি “অমমহং ভোঃ”। এই যে আমি
আছি, সে বাণী পৌছল না তাঁর কানে, তাই তাঁর অন্তরাখ্যা
জবাব দিল না এই যে আমিও আছি। দুঃখের কারণ
ঘটল সেইখানে। সংসারে আমি আছি এই বাণী যদি
স্পষ্ট থাকে তাহলেই আমার আপনার মধ্য থেকে তার নিশ্চিত
উত্তর মেলে, আমি আছি। আমি আছি এই বাণী প্রবল
স্বরে ধ্বনিত হয় কিসে? এমন সত্যে যাতে রস আছে পূর্ণ।
আপন অন্তরে ব্যক্তি-পুরুষকে নিবিড় করে অনুভব করি
যখন আপন বাইরে গোচর হয়েছে রসাত্মক রূপ। তাই
বাউল গেয়ে বেড়িয়েছে—

আমি কোথায় পাব তাকে

আমার মনের মানুষ যে রে।

কেন-না আমার মনের মানুষকেই একান্ত করে পাবার
জন্তে পরম মানুষকে চাই, চাই তং বেদাং পুরুষং, তা হ'লে
শূন্যতা ব্যথা দেয় না।

আমাদের পেট ভরাবার জন্তে, জীবনযাত্রার অভাব
মোচন করবার জন্তে আছে নানা বিদ্যা নানা চেষ্টা ; মানুষের
শূন্য ভরাবার জন্তে, তার মনের মানুষকে নানা ভাবে নানা
রসে জাগিয়ে রাখবার জন্তে, আছে তার সাহিত্য তার শিল্প।
মানুষের ইতিহাসে এর স্থান কী রহস্য, এর পরিমাণ কী
প্রভূত। সভ্যতার কোনো প্রলয় ভূমিকম্প যদি এর
বিলোপ সম্ভব হয় তবে মানুষের ইতিহাসে কী প্রকাণ্ড শূন্যতা
কালো মরুভূমির মত ব্যাপ্ত হ'য়ে যাবে। তার কৃষ্টির ক্ষেত্র
আছে তার চাষে বাসে আপিসে কারখানায় ; তার সংস্কৃতির
ক্ষেত্র সাহিত্যে, এখানে তার আপনারই সংস্কৃতি, সে তাতে

আপনাকেই সম্যকরূপে করে তুলছে, সে আপনিই হয়ে উঠছে। ঐতরের ব্রাহ্মণ তাই বলেছেন, “আস্ম-সংস্কৃতিৰ্ভাব শিল্পাণি।”

রাস ঘরের দেয়ালে মাধব আরেক ছেলের নামে বড় বড় অক্ষরে লিখে রেখেছে “রাখালটা বাদর।” খুবই রাগ হয়েছে। এই রাগের বিষয়ের তুলনার অল্প সকল ছেলেই তার কাছে অপেক্ষাকৃত অগোচর। অস্তিত্ব হিসাবে রাখাল যে কত বড় হয়েছে তা অক্ষরের ছাঁদ দেখলেই বোঝা যাবে। মাধব আপন স্বল্প শক্তি অহুসারে আপন রাগের অহুভূতিকে আপনার থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেইটে দিয়ে দেয়ালের উপর এমন একটা কালো অক্ষরের রূপ সৃষ্টি করেছে যা খুব বড় করে জানাচ্ছে মাধব রাগ করেছে, যা মাধব চাচ্ছে সমস্ত জগতের কাছে গোচর করতে। ঐটেকে একটা গীতিকবিতার বামন অবতার বলা যেতে পারে। মাধবের অস্তরে যে অপরিণত পঙ্গু কবি আছে, রাখালের সঙ্গে বানরের উপমাও বেশি তার কলমে আর এগোলো না। বেদব্যাস ঐ কথাটাই লিখেছিলেন মহাভারতের পাতায় শকুনির নামে। তার ভাষা স্বতন্ত্র, তা ছাড়া তার কমলার অক্ষর মুছবে না যতই চুনকাম করা যাক। পুরাণবিদ নানা সাক্ষ্যের জোরে প্রমাণ করে দিতে পারেন শকুনি নামে কোনো ব্যক্তি কোনো কালেই ছিল না। আমাদের বুদ্ধিও সে কথা মানবে, কিন্তু আমাদের প্রত্যক্ষ অহুভূতি সাক্ষ্য দেবে সে নিশ্চিত আছে। ভাঁড়ু দত্তও বাদর বই কি, কবিকল্প সেটা কালো অক্ষরে ঘোষণা করে দিয়েছেন। কিন্তু এই বাদরগুলোর উপরে আমাদের যে অবজ্ঞার ভাব আসে সেই ভাবটাই উপভোগ্য।

আমাদের দেশে এক প্রকারের সাহিত্যবিচার দেখি যাতে নানা অবাস্তব কারণ দেখিয়ে সাহিত্যের এই প্রত্যক্ষ-গোচরতার মূল্য লাঘব করা হয়। হয়ত কোনো মানব-চরিত্রজ্ঞ বলেন, শকুনির মত এমন অবিমিশ্র চূর্কৃত্তা স্বাভাবিক নয়, ইয়োগের অহৈতুক বিষয়বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহৎগুণ থাকা উচিত ছিল; বলেন যেহেতু কৈকেয়ী বা লেডি ম্যাকবেথ হিড়িখা বা শূর্ণনখা নারী, মাঘের জাত, এইজন্তে এদের চরিত্রে ঈর্ষা বা কদাশমতীর অত্র নিবিড় কালিমা আরোপ করা অপ্রত্যাশিত। সাহিত্যের তরফ থেকে বলবার কথা এই যে, এখানে আর কোনো তর্কই গ্রাহ্য নয় কেবল

এই জবাবটা পেলেই হোলো যে-চরিত্রের অবতারণা হয়েছে তা সৃষ্টির কোঠায় উঠেছে, তা প্রত্যক্ষ। কোনো এক খেমলে সৃষ্টিকর্তা জিরাফ জন্তটাকে রচনা করলেন। ঐ সমালোচক বলতে পারে এর গলাটা না-গোকুর মত না-হরিণের মত, বাঘ ভালুকের মত তো নয়ই, এর পশ্চাদ্ ভাগের ঢালু ভদ্রীটা সাধারণ চতুষ্পদ সমাজে চলতি নেই অতএব ইত্যাদি। সমস্ত আপত্তির বিরুদ্ধে একটিমাত্র জবাব এই যে, ঐ জন্তটা জীবসৃষ্টিপর্ধ্যায় স্পষ্ট প্রত্যক্ষ; ও বলেছে আমি আছি, না থাকাই উচিত ছিল বলাটা টিকবে না। যাকে সৃষ্টি বলি তার নিঃসংশয় প্রকাশই তার অস্তিত্বের চরম কৈফিয়ৎ। সাহিত্যের সৃষ্টির সঙ্গে বিধাতার সৃষ্টির এইখানেই মিল; সেই সৃষ্টিতে উট জন্তটা হয়েছে বলেই হয়েছে, উটপাখীরও হয়ে ওঠা ছাড়া অল্প জবাবদিহী নেই।

মানুষও একেবারে শিশুকাল থেকেই এই আনন্দ পেয়েছে। প্রত্যক্ষ বাস্তবতার আনন্দ। এই বাস্তবতার মানে এমন নয় যা সদাসর্বদা হয়ে থাকে। যা যুক্তিসঙ্গত। যে-কোনো রূপ নিয়ে যা স্পষ্ট করে চেতনাকে স্পর্শ করে তাই বাস্তব। ছন্দে ভাষায় ভদ্রীতে ইচ্ছিতে যখন সেই বাস্তবতা জাগিয়ে তোলে, সে তখন ভাষায় রচিত একটি শিল্পবস্তু হয়ে ওঠে। তার কোনো ব্যবহারিক অর্থ না থাকতে পারে, তাতে এমন একটা কিছু প্রকাশ পায় যা tease us out of thought as doth eternity।

ওপারেতে কালো রং

বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্,

এ পারেতে লকা গাছটি রাঙা টুকটুক করে,

গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।

এর বিষয়টি অতি সামান্ত। কিন্তু ছন্দের দোল খেয়ে এ যেন একটা স্পর্শ-যোগ্য পদার্থ হয়ে উঠেছে।

ডালিম গাছে পরভূ নাচে,

তাক ধুমাধুম বাদ্যি বাজে।

শুনে শিশু খুশি হয়ে ওঠে। এ একটা স্পষ্ট চলন্ত জিনিষ, যেন একটা ছন্দ-গড়া পতঙ্গ, সে আছে, সে উড়ছে, আর কিছুই নয়, এতেই কৌতুক।

তাই শিশুকাল থেকে মানুষ বলেছে গল্প বলো, সেই গল্পকে বলে রূপকথা। রূপকথাই সে বটে, তাতে না থাকতে

পারে ঐতিহাসিক তথ্য, না থাকতে পারে আবশ্যিক সংবাদ, সম্ভবপরতা সত্ত্বেও তার হয়ত কোনো কৈফিয়ৎ নেই। সে কোনো একটা রূপ দাঁড় করায় মনের সামনে, তার প্রতি ঔৎসুক্য জাগিয়ে তোলে, তাতে শৃঙ্খতা দূর করে ; সে বাস্তব। গল্প শুরু করা গেল :--

এক ছিল মোটা কেঁদো বাঘ
গায়ে তার কালো কালো দাগ।
বেহারাকে খেতে গিয়ে ঘরে
আয়নাটা পড়েছে নড়রে।
এক ছুটে পালালো বেহারা,
বাঘ দেখে আপন চেহারা।
গাঁ গাঁ করে রেগে ওঠে ডেকে,
গায়ে দাগ কে দিয়েছে এঁকে।
চেকিশালে মানি ধান ভানে
বাঘ এসে দাঁড়ালো সেখানে।
পাকিয়ে ভীষণ দুই গৌফ
বলে, “চাই গ্লিসেরিন সোপ !”

ছোটো মেয়ে চোখ দুটো মস্ত করে হাঁ করে শোনে। আমি বলি আজ এই পযায়। সে অস্থির হয়ে বলে, না, বল তারপবে। সে নিশ্চিত জানে, সাবানের চেয়ে, যারা সাবান মাখে বাঘের লোভ তাদেরি 'পরে বেশি। তবু এই সম্পূর্ণ আজগবী গল্প তার কাছে সম্পূর্ণ বাস্তব, প্রাণীরক্তাস্তের বাঘ তার কাছে কিছুই না। ঐ আয়না-দেখা ক্যাপা বাঘকে তার সমস্ত মনপ্রাণ একান্ত অতুল্যব করাতেই সে খুশি হয়ে উঠেছে। এঁকেই বলি মনের লীলা, কিছুই-না-নিয়ে তার সৃষ্টি, তার আনন্দ।

সুন্দরকে প্রকাশ করাই রস-সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য নয়, সে কথা পূর্বেই বলেছি। সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতায় একটা গুর আছে, সেখানে সৌন্দর্য্য খুবই সহজ। ফুল সুন্দর, প্রজাপতি সুন্দর, ময়ূর সুন্দর। এ সৌন্দর্য্য একতলাওয়ালো, এর মধ্যে সদর অন্তরের রহস্য নেই, এক নিমেবেই ধরা দেয়, সাধনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এই প্রাণের কোঠায় যখন মনের দান মেশে, চরিত্রের সংস্রব ঘটে তখন এর মহল বেড়ে যায়, তখন সৌন্দর্যের বিচার সহজ হয় না। যেমন মাহুঘের মূখ। এখানে শুধু চোখে চেয়ে সরাসরি

রায় দিতে গেলে ভুল হবার আশঙ্কা। সেখানে সহজ আদর্শে যা অসুন্দর তাইও মনোহর বলা অসম্ভব নয়। এমন কি সাধারণ সৌন্দর্যের চেয়েও তার আনন্দজনকতা হয়ত গভীরতর। টুংরি টুংরি টুংরি শোনবামাত্র মন চঞ্চল হয়ে থাকে, টোড়ির চৌতাল চৈতন্যকে গভীরতায় উদ্ভূত করে। “ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন” মধুর হ'তে পারে কিন্তু “বসন্ত পুষ্পাভরণং বহস্তী” মনোহর। একটা কানের আর একটা মনের, একটাতে চরিত্র নেই লালিত্য আছে, আর একটাতে চরিত্রই প্রধান। তাকে চিনে নেবার জগ্গে অতুল্যতার দরকার করে।

যাকে সুন্দর বলি তার কোঠা সফীর্ণ, যাকে মনোহর বলি তা বহুদ্বপ্রসারিত। মন ভোলাবার জগ্গে তাকে অসামান্য হ'তে হয় না, সামান্য হয়েও সে বিশিষ্ট। যা আমাদের দেখা অভ্যস্ত, ঠিক সেইটেকেই যদি ভাষায় আমাদের কাছে অবিকল হাজির করে দেখ তবে তাকে বলব সংবাদ। কিন্তু আমাদের সেই সাধারণ অভিজ্ঞতার জিনিষকেই সাহিত্য যখন বিশেষ করে আমাদের সামনে উপস্থিত করে তখন সে আসে অভূতপূর্ব হয়ে, সে হয় সেই একমাত্র, আপনাতে আপনি স্বতন্ত্র। সম্ভবতঃ কৰ্তব্যবিশ্বত মাহুঘ অনেক দেখা যায়, মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র আছেন সেই অতি সাধারণ বিশেষণ নিয়ে। কিন্তু রাজ্যাধিকারবঞ্চিত এই অন্ধ রাজা কবিলেখনীর নানা সূক্ষ্ম স্পর্শে দেখা দিয়েছেন সম্পূর্ণ একক হয়ে। মোটা গুণটা নিয়ে তাঁর সমজাতীয় লোক অনেক আছে, কিন্তু জগতে ধৃতরাষ্ট্র অধিতীয়, এই মাহুঘের একান্ততা তাঁর বিশেষ ব্যবহারে নয়, কোনো আংশিক পরিচয়ে নয়, সমগ্রভাবে। কবির সৃষ্টি-মস্ত্রে প্রকাশিত এই তাঁর অনন্ত-সদৃশ স্বকীয় রূপ প্রতিভার কোন সহজ নৈপুণ্যে সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে, কৃষ্ণ সমালোচকের বিশ্লেষণী লেখনী তার অস্ত্র পাবে না।

সংসারে অধিকাংশ পদার্থ প্রত্যক্ষত আমাদের কাছে সাধারণ শ্রেণীভুক্ত। রাস্তা দিয়ে হাজার লোক চলে ; তারা যদিচ প্রত্যেকেই বিশেষ লোক তবু আমার কাছে তারা সাধারণ মাহুঘমাত্র, এক বৃহৎ সাধারণতার আন্তরণে তারা আবৃত, তারা অস্পষ্ট। আমার আপনার কাছে আমি নিশ্চিত আমি বিশেষ, অস্ত্র কেউ যখন তার বিশিষ্টতা

নিরে আসে তখন তাকে আমারই সমপর্যায় ফেলি, আনন্দিত হই।

একটা কথা স্পষ্ট করা দরকার। আমার ধোবা আমার কাছে নিশ্চিত সত্য সন্দেহ নেই এবং তার অসুস্থতা যে বাহন হ'ল। ধোবা ব'লেই প্রয়োজনের যোগে সে আমার খুব কাছে, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত সমস্যা অসুস্থতির বাইরে।

পূর্বে অন্তত এক জায়গায় বলেছি যে, যে-কোনো পদার্থের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারের সম্বন্ধই প্রধান, সে-পদার্থ সাধারণ শ্রেণীভুক্ত হয়ে যায়, তার বিশিষ্টতা আমাদের কাছে অগোচর হয়ে পড়ে। কবিতার প্রবেশ করতে সজনে ফুলের বিলম্ব হয়েছে এই কারণেই, তাকে জানি ভোজ্য বলে একটা সাধারণ ভাবে; চালতা ফুল এখনও কাবোর ঘরের কাছেও এসে পৌঁছয় নি। জামরুলের ফুল শিরীষ ফুলের চেয়ে অধোগ্য নয়; কিন্তু তার দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি তখন সে আপন চরমরূপে প্রকাশ পায় না, তার পরপর্যায়ের খাদ্য ফলেরই পূর্বপরিচয় রূপে তাকে দেখি। তার নিজেরই বিশিষ্টতার ঘোষণা যদি তার মধ্যে মুখ্য হ'ত তা হ'লে সে এতদিনে কাবো আদর পেত। মুরগী পাখীর সৌন্দর্য বঙ্গসাহিত্যে কেন যে অস্বীকৃত সে কথা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে। আমাদের চিত্ত এদেরকে নিজেরই স্বরূপে দেখে না, অল্প কিছু সঙ্গে জড়িয়ে তার দ্বারা আবৃত করে দেখে।

যারা আমার কবিতা পড়েছেন তাঁদের কাছে পুনরুজ্জীবিত হ'লেও একটা খবর এখানে বলা চলে। ছিলাম মফস্বলে, সেখানে আমার এক চাকর ছিল তার বুদ্ধি বা চেহারা লক্ষ্য করবার যোগ্য ছিল না। রাতে বাড়ী চলে যায়, সকালে এসে ঝাড়ন কাঁধে কাজকর্ম করে। তার প্রধান গুণ, সে কথা বেশী বলে না। সে যে আছে সে তখাটা অসুস্থ করলুম যেদিন সে হ'লো অসুস্থ। সকালে দেখি স্নানের জল তোলা হয়নি, ঝাড়পোছ বন্ধ। এল বেলা দশটার কাছাকাছি। বেশ একটু রক্তবরে জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় ছিলি! সে বললে, আমার মেয়েটি মারা গেছে কাল রাতে। ব'লেই ঝাড়ন নিয়ে নিঃশব্দে কাছে লেগে গেল। বুকটা ধক করে উঠল। ভূতরূপে যে ছিল প্রয়োজনীয়তার আবরণে ঢাকা,

তার আবরণ উঠে গেল; মেয়ের বাপ বলে তাকে দেখলুম, আমার সঙ্গে তার স্বরূপের মিল হ'য়ে গেল, সে হ'লো প্রত্যক্ষ, সে হ'লো বিশেষ।

সুন্দরের হাতে বিধাতার পাসপোর্ট আছে, সর্বত্রই তার প্রবেশ সহজে। কিন্তু এই মোমিন মিঞা, একে কী বলব? সুন্দর বলা তো চলে না। মেয়ের বাপও তো সংসারে অসংখ্য, সেই সাধারণ তখাটা সুন্দরও না অসুন্দরও না। কিন্তু সেদিন করুণরসের ইন্ধিতে গ্রাম্য মানুষটা আমার মনের মানুষের সঙ্গে মিলল, প্রয়োজনের বেড়া অতিক্রম ক'রে কল্পনার ভূমিকায় মোমিন মিঞা আমার কাছে হ'লো বাস্তব।

লক্ষপতির ঘরে মেজো মেয়ের বিবাহ। এমন ধুম পাড়ার অতিবৃদ্ধেরাও বলে অভূতপূর্ব। তার ঘোষণার তরঙ্গ খবরের কাগজের সংবাদ-বীথিকায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে। জনশ্রুতির কোলাহলে ঘটনাটা যতই গুরুতর প্রতিভাত হোক, তবু এই বহুবায়সাধ্য বিপুল সমারোহেও ব্যাপারটাকে মেয়ের বিয়ে নামক সংবাদের নিতান্ত সাধারণতা থেকে উপরে তুলতে পারে না। সাময়িক উন্মুখতার জোরে এ স্বরণীয় হয়ে ওঠে না। কিন্তু কল্পার বিবাহ নামক অত্যন্ত সাধারণ ঘটনাকে তার সাময়িক ও স্থানিক আত্মপ্রচারের আশুমানতা থেকে যদি কোনো কবি তাঁর ভাষায় ছন্দে দীপ্তিমান সাহিত্যের সামগ্রী করে তোলেন তা হ'লে প্রতিদিনের হাজার লক্ষ মেয়ের বিবাহের কুহেলিকা ভেদ করে এ দেখা দেবে একটি অদ্বিতীয় মেয়ের বিবাহরূপে, যেমন বিবাহ কুমার-সম্ভবের উমার, যেমন বিবাহ রঘুবংশের ইন্দুমতীর। সাহোপাঞ্জা ডনকুইকসোটের ভূতামাত্র, সংসারের প্রবহমান তথ্যপুঞ্জের মধ্যে তাকে তর্জমা করে দিলে সে চোখেই পড়বে না—তখন হাজার লক্ষ চাকরের সাধারণশ্রেণীর মাঝখানে তাকে সনাক্ত করবে কে? ডনকুইকসোটের চাকর আজ চিরকালের মানুষের কাছে চিরকালের চেনা হ'য়ে আছে, সবাইকে দিচ্ছে তার একান্ত প্রত্যক্ষতার আনন্দ; এ পর্যন্ত জ্বরতের ষড়গুলি বড়লাট হয়েছে তাদের সকলের জীবনবৃত্তান্ত মেলালেও এই চাকরটির পাশে তারা নিশ্চিভ। বড় বড় বুদ্ধিমান রাজনীতিকের দল মিলে অস্ত্রাঘব ব্যাপার নিয়ে যে বাদবিতণ্ডা তুলেছেন তথ্যহিনাবে সে একটা মস্ত তথ্য, কিন্তু যুদ্ধে পঙ্গু একটি মাত্র সৈনিকের জীবন যে-বেদনায় জড়িত

তাকে স্পষ্ট প্রকাশমান করতে পারলে সকল কালের মানুষ রাষ্ট্রনীতিকের গুরুতর মন্ত্রণা ব্যাপারের চেয়ে তাকে প্রধান স্থান দেবে। এ কথা নিশ্চিত জানি যে-সময়ে শকুন্তলা রচিত হয়েছিল তখন রাষ্ট্রিক আর্থিক অনেক সমস্যা উঠেছিল, যার গুরুত্ব তখনকার দিনে অতি প্রকাণ্ড উদ্বেগরূপে ছিল; কিন্তু সে সময়েও আর চিন্তামাত্র নেই, আছে শকুন্তলা।

মানবের সামাজিক জগৎ দু্যলোকের ছায়াপথের মত। তার অনেকখানিই নানাবিধ অবচ্ছিন্ন তত্ত্বের অর্থাৎ ম্যাব-ষ্ট্রাকশনের বহুবিস্তৃত নীহারিকায় অবকীর্ণ; তাদের নাম হচ্ছে সমাজ, রাষ্ট্র, নেশন, বাণিজ্য এবং আরও কত কি। তাদের রূপহীনতার কুহেলিকায় ব্যক্তিগত মানবের বেদনাময় বাস্তবতা আচ্ছন্ন। যুদ্ধ নামক একটি মাত্র বিশেষ্যের তলায় হাজার হাজার ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়দাহকর দুঃখের জ্বলন্ত অঙ্গার বাস্তবতার অগোচরে ভস্মাবৃত। নেশন নামক একটা শব্দ চাপা দিয়েছে যত পাপ ও বিভীষিকা তার আবরণ তুলে দিলে মানুষের অগ্নে লজ্জা রাখবার জায়গা থাকে না। সমাজ নামক পদার্থ যত বিচিত্র রকমের মূঢ়তা ও দাসত্বশৃঙ্খল গড়েছে তার স্পষ্টতা আমাদের চোখ এড়িয়ে থাকে, কারণ সমাজ একটা অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব, তাতে মানুষের বাস্তবতার বোধ আমাদের মনে অসাড় করেছে, সেই অচেতনতার বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে রামমোহন রায়কে, বিদ্যাসাগরকে। ধর্ম শব্দের মোহ-যবনিকার অস্তরালে যে-সকল নিদারুণ ব্যাপার সাধিত হয়ে থাকে তাতে সকল শাস্ত্রে বর্ণিত সকল নরকের দণ্ডবিধিকে ক্লাস্ত করে দিতে পারে। ইন্ডুলে ক্লাস নামক একটা অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব আছে

আড়ালে, সেই কারণে যখন তাদের মন নামক সজীব পদার্থ মুখস্থ বিদ্যার পেয়ণে গ্রন্থের পাতার মধ্যে পিষ্টে ফুলের মত শুকোতে থাকে আমরা থাকি উদাসীন। গবমেণ্টের আমলা-তন্ত্র নামক অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব মানুষের ব্যক্তিগত সত্যাবোধের বাহিরে, সেইজন্ত রাষ্ট্রশাসনের হৃদয়সম্পর্কহীন নামের নীচে প্রকাণ্ড আয়তনের নির্দয়তা কোথাও বাধে না।

মানবচিত্তের এই সকল বিরাট অসাড়তার নীহারিকা ক্ষেত্রে বেদনাবোধের বিশিষ্টতাকে সাহিত্য দেদীপ্যমান করে তুলছে। রূপে সেই সকল সৃষ্টি সসীম, ব্যক্তিপুরুষের আত্মপ্রকাশে সীমাতীত। এই ব্যক্তিপুরুষ মানুষের অন্তরতম ঐক্যতত্ত্ব, এই মানুষের চরম রহস্য। এ তার চিত্তের কেন্দ্র থেকে বিকীর্ণ হয়ে বিশ্বপরিধিতে পরিব্যাপ্ত, আছে তার দেহে, কিন্তু দেহকে উত্তীর্ণ হয়ে, আছে তার মনে, কিন্তু মনকে অতিক্রম করে, তার বর্তমানকে অধিকার করে অতীত ও ভবিষ্যতের উপকূলগুলিকে ছাপিয়ে চলেছে। এই ব্যক্তিপুরুষ প্রতীয়মানরূপে যে সীমায় অবস্থিত, সত্যরূপে কেবলি তাকে ছাড়িয়ে যায়, কোথাও থামতে চায় না! তাই এ আপন সত্তার প্রকাশকে এমন রূপ দেবার অগ্নে উৎকণ্ঠিত যে রূপ আনন্দময়, যা মৃত্যুহীন। সেই সকল রূপসৃষ্টিতে ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের একাত্মতা। এই সকল সৃষ্টিতে ব্যক্তিপুরুষ পরমপুরুষের বাণীর প্রত্যুত্তর পাঠাচ্ছে, যে পরমপুরুষ আলোকহীন তথ্যপুঞ্জের অভ্যন্তর থেকে আমাদের দৃষ্টিতে আপন প্রকাশকে নিরন্তর উদ্ভাসিত করেছেন সত্যের অসীম রহস্যে সৌন্দর্যের অনির্কচনীয়াতায়।*

রাম ও বালী

(আৰ্য ও অনাৰ্যে সংঘাত)

শ্রীরজনীকান্ত গুহ

ছন্দুধেঁরা বলে, খেতাজ রাজপুরুষগণ প্রাচ্য ভূখণ্ডে আসিবার কালে তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলখানি স্নেহে প্রণালীতে নিঃক্ষেপ করেন ; তাহার কারণ এই যে, ঐ শাস্ত্রের উপদেশগুলি স্বদেশেই অচল হইয়া উঠিতেছে, বিজিত দেশগুলিতে উহার এক বর্ণও ব্যবহারে আসিতে পারে না।

এই নিন্দা শুধু খেতবর্ণ খ্রীষ্টশিষ্যদিগেরই প্রাপ্য নয়। প্রাচীন ও আধুনিক কোন যুগেই জয়গর্ভিত প্রবলতর জাতি দুর্বলতর জাতির সহিত আদানপ্রদান করিতে গিয়া ধর্মাত্মশাসন গ্রাহ্য করিয়া চলে নাই। পরাজিত জাতির শাসন-সংরক্ষণে বিশুদ্ধ ধর্মনীতি মানিয়া চলিয়াছে, এমন জাতির নাম ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভারতের আৰ্যজাতি যদি এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতেন, তবে আজ এ-দেশে অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণের জন্ত মহা সংগ্রাম আরম্ভ হইত না।

আর একটা কথা। সকল সভ্য দেশেই শাস্ত্রে উৎকৃষ্ট বিধি ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে ; কিন্তু কাছের বেলায় সেগুলি পদে পদে লঙ্ঘিত হইতেছে। বর্তমান কালের ইতিহাস আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই—যাহা সকলেই প্রতিনিয়ত চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাইতেছে, তাহা দেখাইয়া দিবার প্রয়াস নিরর্থক। মহাভারত হইতে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রাক্কালে কুরু, পাণ্ডব ও সৌমকগণ যুদ্ধের কতকগুলি নিয়ম নির্ধারণ করিলেন—

“আরম্ভ যুদ্ধ নির্ধারিত হইলে আমাদের পরস্পর স্ত্রীতি সংস্থাপিত হইবে। সমযোগ্য ব্যক্তিরাই পরস্পর জায়গাসারে যুদ্ধ করিবে। কদাচ প্রতারণা করা হইবে না। যাহারা বাগ যুদ্ধে শ্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদিগের সহিত বাক্য ছাড়াই যুদ্ধ করিবে। যাহারা সেনার মধ্য হইতে নিষ্কাশ হইয়াছে, তাহাদিগকে কদাপি প্রহার করিবে না। রথী রথীর সহিত, গজারোহী গজারোহীর সহিত, অশারোহী অশারোহীর সহিত এক পদাতি পদাতির সহিত যোগ্যতা, অভিলাষ, উৎসাহ ও বল অনুসারে যুদ্ধ করিবে। অগ্রে বলিয়া পরে (প্রতিপক্ষকে) প্রহার করিবে। বিকৃত ও ভীত ব্যক্তিকে প্রহার করিবে না। যে একজনের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত রহিয়াছে, যে পরশাগত : যে সংগ্রামে পরাভূত, বাহ্যর

অস্ত্রশস্ত্র নিঃশেষ হইয়াছে, যে ধর্মবিহীন, তাহাকে কখনও প্রহার করা হইবে না। সারথি, ভারবাহী শস্ত্রোপজীবী, ভেরীবাদক ও শঙ্খ-বাদককে কদাপি আঘাত করিবে না।”

(ভীষ্মপর্ব। ১।২৭-৩২। প্রতাপ রায়ের অনুবাদ, স্থানে স্থানে পরিবর্তিত।)

কুরুপাণ্ডবগণ ধর্মযুদ্ধের নিয়মাবলি অঙ্গীকার করিয়া লইলেন, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে সব নিয়ম মানিয়া চলিলেন কি? কৌরবেরা ছয় রথীতে মিলিয়া কিশোর অভিমম্মাকে সংহার করিলেন। পাণ্ডবপক্ষে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, তিন জনেই কোন-না-কোনও নিয়ম পদদলিত করিয়া জয়ের পথ সুগম করিয়া তুলিলেন। “কদাচ প্রতারণা করা হইবে না,” এই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্যের বধসাধনে সহায় হইলেন। “যে এক জনের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহাকে কদাপি আঘাত করিবে না,” এই নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া অর্জুন সাত্যকির শিরশ্ছেদোদ্যাত ভূবিশ্রবার বাহু ছেদন করিয়া পরাজিত শত্রুর দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করাইলেন। ভীম অগ্নায়পূর্বক দুর্যোগেনের উরু ভঙ্গ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে সমাগরা পৃথিবীর অসমস্ত অধিকার প্রদান করিলেন। ক্রোধাক্ত অশ্বখামা গভীর নিশীথে স্থপ্ত শক্রশিবিরে উৎপত্তিত হইয়া এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র প্রভৃতি বীরগণকে সংহার করিয়া এই অর্ধশ্বের প্রতিশোধ লইলেন ; মাতুল কুরুপাণ্ডবের “ন বধঃ পূজ্যতে লোকে স্থপ্তানামিহ ধর্মতঃ”—(প্রস্থপ্ত ব্যক্তিদ্বিগের বধ ইহলোকে ধর্মাত্মগত কাৰ্য্য নহে)—এই নিষেধ বাক্যে কণপাত করিলেন না। পরিশেষে, গুপ্তশস্ত্রভীমবধে ধর্মযুদ্ধের কোন্ কোন্ নিয়ম অটুট ছিল, তাহা নির্ণয় করা এক দুর্লভ সমস্যা। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, “সারথিকে প্রহার করা হইবে না,” এই নিয়ম দুই পক্ষই প্রতিনিয়ত লঙ্ঘন করিয়াছেন।

তবেই দেখা যাইতেছে, ধর্মশাস্ত্রের উপদেশগুলি তত্ত্বের দিক্ দৃষ্টি, উৎপাদন হইলেও ব্যবহারে, যুদ্ধক্ষেত্রে, সেগুলি

সম্যক প্রতিপালিত হয় নাই। রাম-বালীর কাহিনীতেও আমরা তাহাই দেখিতে পাই। “অস্ত্রের সহিত যুদ্ধে আসক্ত ব্যক্তিকে যোদ্ধা কন্যাপি বধ করিবে না” (ন পরেণ সমাগতম্... হস্তাৎ । ৭।২২)—এই নিয়ম মনুর যুদ্ধবিষয়ক বিধানের মধ্যেও স্থান পাইয়াছে। অথচ বালী যখন স্ত্রীবেদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে হীনবল করিয়া ফেলিতেছিলেন, তখন সহসা রাম অলঙ্কিতে থাকিয়া তাঁহাকে কালাস্তক বাণে বিদ্ধ করিলেন। বালী এই অধর্মকর্মের জন্য রামকে তিরস্কার করিলেন; রামের উত্তরে অনাধ্যগণের প্রতি আর্থাভ্যতির মনোভাব সুস্পষ্ট পরিস্ফুট হইয়া উঠিল; ধর্মনীতির তুল্যদণ্ড অনাধ্য বালী না আর্থাভ্যতির আদর্শ পুরুষ রামের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল, তাহা বুঝিবার সাহায্য হইবে বলিয়া আমরা উভয়ের কথোপকথনটি সংকলন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বালী রামের শরে আহত হইয়া ভূপতিত হইলেন; তাঁহার সংজ্ঞা প্রায় লুপ্ত হইল। কিছুকাল পরে দেখিলেন, রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তখন তিনি গর্ভিত ভাবে ও পুরুষ বাক্যে বলিতে লাগিলেন—

“রাম, আমি তোমার সহিত যুদ্ধে নিহত ছিলাম না; আমাকে বধ করিয়া তোমার কি লাভ হইল? আমি অস্ত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলাম, অথচ তোমার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলাম। রাম সৎশত্রুত, বলবান, তেজস্বী, ব্রতনিষ্ঠ, দয়ালু, অধ্যগণের হিতে রত—এইরূপ তোমার গুণের আরও কত প্ৰমাণ আছে। আমি তাঁহার নিষেধ না মানিয়া স্ত্রীবেদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলাম। তোমাকে দেখিবার পূর্বে আমার এই প্রত্যয় হইয়াছিল যে, আমি যখন অস্ত্রের সহিত যুদ্ধে ব্যাপ্ত থাকিব, তোমার সহজে সাধন থাকিব না, তখন তুমি আমাকে কখনই বাণবিক্ত করিবে না। কিন্তু এখন দেখিতেছি, তুমি ছদ্মবেশী অধার্মিক; জানিলাম, তোমার আত্মা নষ্ট হইয়াছে, কেন-না, তুমি ধর্মধর্মী অধার্মিক, সজ্ঞনের বেশ ধরিয়া পাপাচরণ করিতেছ। তুমি ভূগাচ্ছন্ন কুপের স্তায়, ভয়ানকচিত্ত বক্রির স্তায়; আমি জানিতাম না, যে, তুমি ধর্মের ছদ্মবেশে আত্মগোপন করিয়াছ। আমি তোমার দেশে বা পুরীতে কোনও অস্তায় কর্ম করি নাই, তোমাকে অবজ্ঞাও করি নাই। তবে তুমি আমাকে কেন বধ করিলে? আমি নিত্য কলমুলভোজী বনবাসী বানর তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে যাই নাই, অস্ত্রের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম কেন আমায় বধ করিলে? তুমি রাজপুত্র, সুবিখ্যাত ও প্রিয়বর্শন; তোমার সঙ্গে জটাবক্ষলাদি অসিংসাহচর্য ধংসিত ও বর্ধমান আছে। কোন ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন, শাস্ত্রজ্ঞ ও সংশয়-শূন্য হইয়া এক ধর্মচিহ্নে আপনাকে আচ্ছাদিত রাখিয়া এই প্রকার নিষ্ঠুর কাণ্ড করিয়া থাকে? তুমি রাঘবকুলে জাত ও ধার্মিক বলিয়া বিখ্যাত; তবে তুমি কি অন্য অত্যাচার হইয়া অব্যয় বেশে বিচরণ করিতেছ? সাম, দান, ক্ষমা, ধর্ম, সত্য, ধৈর্য, পরাক্রম, স্তম্ভকাতীর

দণ্ডবিধান—এইগুলি রাজার গুণ। আমরা বনচর, কলমুলভোজী বানর—ইহাই আমাদের প্রকৃতি: হে নরেশ্বর, তুমি তো গ্রামবাসী ভ্রম-ভোজী পুরুষ! তুমি, স্বর্গ ও রৌপ্য (অপরকে) বধ করিবার কারণ; তবে বনে এবং আমার কুলে তোমার লোভ কিরূপে থাকিতে পারে? (বনচর ও পুরচর, বানর ও মনুষ্য, কলমুলভোজী ও অন্নভোজী, বানরেশ্বর ও নরেশ্বর—উভয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী; ইহাদের মধ্যে বিরোধের স্থল কোথায়?) নীতি ও অনীতি, নিগ্রহ ও অশুগ্রহ—এই সকল বিষয়ে রাজার আচরণ বিপরীত: রাজা কখনও খেচ্ছাচারী হইতে পারেন না। কিন্তু তুমি খেচ্ছাচারী, ক্রোধী ও অস্থিরচিত্ত: তোমার রাজস্বব্যবহারে উদায় নাই। তুমি কেবল যেখানে সেখানে শর নিক্ষেপ করিতে পট্ট। তোমার ধর্মে আত্মা নাই, অর্থে স্থির বুদ্ধি নাই: তুমি কামনার অধীন হইয়া ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা ইতস্তত: আকৃষ্ট হইতেছ। আমি নিরপরাধ, আমাকে তুমি বাণ দ্বারা হত্যা করিলে: এই নিন্দনীয় কর্ম করিয়া সাধুগণের মধ্যে তুমি কি বলিবে? সাধু লোকেরা আমার চর্ম ধারণ করেন না, রোম ও অস্থি বর্জন করেন: তোমার স্তায় ধার্মিকের পক্ষে আমার মাংসও অভক্ষ্য! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়েরা শস্য, শস্য, গোমা, লবণ ও কূর্ম—এই পাঁচটি পঞ্চনপ প্রাণী ভক্ষণ করিতে পারেন। পণ্ডিতেরা আমার চর্ম ও অস্থি স্পর্শ করেন না: আমার মাংসও অভক্ষ্য: তথাপি পঞ্চনপ আমি (অভক্ষ্য হইলেও) হত হইলাম। সর্বজ্ঞ তারা আমাকে সত্য ও হিত বাক্যই বলিয়াছিলেন; আমি মোহবশত: তাহা অবহেলা করিয়া কালের কবলে পতিত হইলাম। সুশীলা রমণী বিধর্মী পতি বিজ্ঞান থাকিতেও বৎসর অনাথা হইয়াছেন। তুমি শঠ, গোপনে অপরের অনিষ্ট করিয়া থাক: তুমি পরের অপকারী, স্বেচ্ছাকরণ, অসংযতচিত্ত মহামনা: দশরথ হইতে তোমার স্তায় পাপিষ্ঠ কিরূপে অন্য পরিগ্রহ করিল? তোমার সহিত আমাদের কোনও সংশ্রব ছিল না। আমাদের প্রতি তুমি এই বিক্রম প্রকাশ করিলে; কিন্তু, দ্বাভারা তোমার অপকারী, দ্বাভারা তোমার শ্রীকে অপহরণ করিয়াছে, তাহাদিগের প্রতি তো তোমাকে বিক্রম প্রকাশ করিতে দেখিলাম না। রাম, তুমি যদি দৃষ্টিপথে থাকিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে, তবে তোমাকে অদ্যই বধ করিয়া সমাধয়ে প্রেরণ করতাম। সর্প যেমন শূন্য ব্যক্তিকে দংশন করে, তেমনি তুমি অন্তরালে থাকিয়া দুর্জয় আমাকে হত্যা করিলে। তুমি স্ত্রীবেদের প্রিয় কাণ্ড করিবার বাসনা আমাকে বধ করিলে। কিন্তু যদি তুমি সীতাকে উদ্ধার করিবার কথা পূর্বে আমাকে বলিতে, তবে আমি একদিনেই তাঁহাকে আনিতে পারিতাম এবং তোমার স্তাৰ্থাপহারী সেই দুঃখী রাক্ষস রাবণকে কণ্ঠে বন্ধন করিয়া জীবিত অবস্থায় তোমার হস্তে সমর্পণ করিতাম। আমি স্বর্গে গমন করিলে স্ত্রীবেদ রাজ্য পাইবে, ইহা স্তায়সঙ্গত বটে, কিন্তু তুমি যে যুদ্ধে অধর্ম করিয়া আমাকে হত্যা করিলে, ইহা অস্তায় হইল। সকল প্রাণীই মৃত্যুর অধীন, কালবেশে সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়: স্তত্রাং মরণের জন্ত আমার পদ নাই; কিন্তু আমাকে বধ করিয়া তোমার কি লাভ হইল, ইহাই এখন চিন্তা কর।”

বালীর কটুক্তিগুলি বর্জন করিয়া তিনি কি কি কারণে রামের কাণ্ড গহিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে। (১) রাম ধর্মযুদ্ধের একটি সনাতন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন; (২) বালী রামের রাজ্যে গিয়া কোনও উৎপাত করেন নাই, তাঁহার

প্রতি অবজ্ঞাও প্রকাশ করেন নাই। স্বত্বাৎ অপকারের প্রতিশোধ, অথবা আত্মসম্মান বোধের প্ররোচনা (lese majeste)—আলোচ্যস্থলে এই দুইটির কোন হেতুই বর্তমান ছিল না; (৩) বালী ও রাম সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী—বনচর ও পুরচর; কলমূলভোজী ও অন্নভোজী; বানরেখর ও নরেখর—ইহাদের পরম্পরের স্বার্থ বিভিন্ন, স্বত্বাৎ স্বার্থে স্বার্থে সংঘর্ষের অবসর নাই; (৪) ভূমি, স্বর্ণ ও রৌপ্যের লোভে এক রাজা অল্প রাজাকে আক্রমণ করেন। রাম বালীর রাজ্যে লোভ করিতেছেন, ইহার কোনও প্রমাণ নাই; তিনি জটাবন্ধধারী তপস্বী, স্বর্ণ-রৌপ্যে লোভ আছে, ইহাও সম্ভবপর নহে। (বালী বানর, তাঁহার স্বর্ণরৌপ্য থাকিবেই বা কি প্রকারে? যদিচ কিচ্ছিক্যার বর্ণনায় দেখা যায়, তথায় স্বর্ণরৌপ্য-মণিমুক্তার অভাব ছিল না।) স্বত্বাৎ ধনলিপ্সাও বালীবোধের হেতু হইতে পারে না। (৫) কিন্তু রাজারা মৃগয়াপ্রিয়, মাংসার্থে বিবিধ প্রাণী হত্যা করেন। সে-হেতুও এস্থলে বিদ্যমান নাই; কেননা, বানরের মাংস রামের পক্ষে অভক্ষ্য।

(আমরা এতক্ষণ বালীকে একটা অনাথ্য জাতির রাজা বলিয়া ভাবিতেছিলাম; মাংস, চন্দ্র ও রোমের কথা তুলিয়া কবি আমাদের স্বরণ করাইয়া দিলেন, বালী সত্য সত্যই পঞ্চনথ বানর, রূপক বানর নহেন। এই বস্তুতন্ত্রতা (realism) পূর্বাঙ্গের সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারিয়াছে কিনা পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।)

এক্ষণে দেখা যাক, রাম তাঁহার উত্তরে বালীর অভিযোগগুলি খণ্ডন করিতে পারিলেন কিনা।

রাম বালী দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া তাহাকে ধর্মসঙ্গত, অর্ধসম্পন্ন ও গুণমণ্ডিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন—

“তুমি ধর্ম, অর্থ ও কাম এবং লোকাচার না জানিয়া কেন আজ অজ্ঞানতাবলতঃ আমার নিন্দা করিতেছ? তুমি বুদ্ধিমান বরোবুদ্ধ আচাৰ্য্যগণের উপদেশ শ্রবণ না করিয়াই বানরহুলত চপলতা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আমাকে এইরূপ বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। পর্কতবন-কানন সমন্বিত এই পৃথিবী ইক্ষুকাকীর্ণ নরপাতিগণের অধিকারভুক্ত; পশুপক্ষীমণ্ডলের নিগ্রহাশুগ্রহেও তাঁহারাই শত্রু। সত্যবাদী, সরল-বস্তাব, মহাত্মা ভরত এক্ষণে পূর্বপুরুষাগত এই পৃথিবী পালন করিতেছেন। তিনি ধর্ম, অর্থ ও কাম অবগত আছেন এবং ছুটের দমন ও শিক্তির পালনে রত রহিয়াছেন। তাহাতে নীতি, বিনয় ও সত্য বিদ্যমান; তিনি দেশকাল বিধরে অভিজ্ঞ এবং বতদূর দেখা যাইতেছে, তাঁহারই বিক্রমও স্বখেই আছে। আমরা ও অজ্ঞান পার্শ্ববাসী তাঁহার

ধর্মাসুগত আদেশে ধর্মবিকারের মানসে সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করিতেছি। যখন সেই ধর্মবৎসল নৃপতিশ্রেষ্ঠ ভরত অধিল পৃথিবী শাসন করিতেছেন, তখন কোন ব্যক্তি ধর্মবিগর্হিত কাণ্ড করিতে পারে? আমরাও ভরতের আদেশানুসারে পরম স্বার্থে অবস্থিত থাকিমা ধর্মশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির যথাবিধি বিচার করিতেছি। তুমি গর্হিত কর্ম দ্বারা ধর্মকে ক্রিষ্ট করিয়া তুলিয়াছ এক কামপরবশ হইয়া রাজধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছ। যাহারা ধর্মপথে চলেন, তাহাদিগের নিকটে পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও বিদ্যাভ্রাতা—এই তিন জন পিতা বলিয়া গণ্য। কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আপনার পুত্র এবং গুণবান শিষ্য—এই তিন জনকে পুত্র মনে করিবে; ধর্মই ইহার কারণ। বানর, সাধুদিগের ধর্ম অতি সূক্ষ্ম, সদৃশের উপদেশ ভিন্ন উহা অবগত হওয়া যায় না। সর্বভূতের সন্দেহিত আত্মাই শুভাশুভ জানিতেছেন। যে নিজে জন্মাক্ষ, সেইক অল্প জন্মাক্ষক পথ দেখাইতে পারে? তেমনি তুমি চপল, তুমি চপল ও মূর্খ বানরগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কিরূপে ধর্ম অবগত হইবে? আমি এই বাক্যের তাৎপর্য্য তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি: শুধু ক্রোধের বশবস্তী হইয়া আমাকে ভৎসনা করা তোমার উচিত হইবে না। যে জন্ম আমি তোমাকে হত্যা করিয়াছি, তাহার এই কারণ তোমাকে বলিতেছি, তুমি শুন:—

“তুমি সনাতন ধর্ম ত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃজায়ার সহিত বাস করিতেছ। মহাত্মা সুর্য্যীব জীবিত থাকিতেই তুমি পুত্রবধূস্থানীয়া রুমাকে কামপরবশ হইয়া শয্যাসঙ্গিনী করিয়াছ—তুমি পাপাচারী। রে বানর, তুমি ধর্মশ্রেষ্ঠ, কামপরবশ: ভ্রাতৃজায়ার এই দুষণে মৃত্যুই একমাত্র দণ্ড, তাহাই তোমাকে প্রদান করিয়াছি। বানরেখর, যে ব্যক্তি লোকবিক্রম কর্পে লিপ্ত হয় এবং লোকব্যবহারের মন্যাদা অতিক্রম করে, মৃত্যুদণ্ড ভিন্ন তাহার অল্প নিগহ দেখিতে পাইতেছি না। আমি সংকুলোক্তব দণ্ডদাতা ক্ষত্রিয় হইয়া তোমার এই পাপ কমা করিতে পারিলাম না। যে ব্যক্তি কামবশতঃ কন্যা, ভগিনী বা কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূতে প্রসক্ত হয়, শাস্ত্রে বধই তাহার দণ্ড বলিয়া বিহত হইয়াছে। এক্ষণে ভরত মহীপাল, আমরা তাঁহার আদেশ বহন করিয়া চলিতেছি; তুমি ধর্মপথচ্যুত তোমাকে আমরা কিরূপে উপেক্ষা করিব?

“তৎপরে, লক্ষণের সহিত আমার যে প্রকার সৌহার্দ, সুর্য্যীবের সহিতও সেই প্রকার সৌহার্দ। সুর্য্যীব নিজের স্ত্রী ও রাজ্য প্রাপ্তির বাসনার আমার হিতসাধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে; আমিও সেই সময়ে বানরগণের সমক্ষে তাহাকে (সাহায্য-করিবার) প্রাতঃপ্রতি দিয়াছি। আমার মত লোকে কি কখনও প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করার থাকিতে পারে? এই সকল গুরুতর ধর্মাসুগত কারণে তোমার দণ্ড শাস্ত্রানুযত হইয়াছে কিনা, তাহা তুমি ভাবিয়া দেখ। যে ব্যক্তি ধর্ম মানিয়া চলে, সে বলিবে, যে, তোমার নিগ্রহও সম্পূর্ণরূপে ধর্মকার্য্য, সখার উপকার করাও কর্তব্যকর্ম। ধর্মদৃষ্টিতে দেখিলে তুমিও তাহা স্বীকার করিবে। চরিত্রোন্নতির সহায় মনুর দুইটি শ্লোক আছে।—মানুষ পাপ কার্য্য করিলে রাজার দণ্ড গ্রহণ করিয়া নিপাপ হয় এক পুণ্যকর্মী সাধুদিগের দ্বারা স্বর্গে গমন করে। দণ্ড সহিয়াই হউক বা মৃত্তি পাইয়াই হউক, পাপী পাপ হইতে মুক্ত হয়: কিন্তু রাজা যদি পাপীকে শাসন না করেন, সেই পাপ রাজাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

“হে বানরশ্রেষ্ঠ, ইহার আর একটি কারণ আছে, তাহা তুমি শুন; তাহা শুনিলে তুমি আর (আমার উপরে) ক্রোধ করিবে না। তোমাকে প্রচ্ছন্নভাবে বধ করিয়া আমার মনস্তাপ বা শোক হইতেছে না। (কেননা, তাদৃশ ভাবে পশু বধ করা রাজগণের স্বাভাবিক কর্ম।) লোকে দৃশ্য বা অদৃশ্য থাকিয়া বাগুরা, পাপ প্রভৃতি বিবিধ কুট উপায়ে রক্ত মৃগ, ধরিয়া ধরকে। এই সকল মৃগ পলায়নের উদ্দেশ্যে থাকমান হউক।

বিষণ্ড হটক, পালিত পশুর সহিত যুদ্ধে নিরত থাকুক, প্রমত্ত হটক বা অপ্রমত্ত হটক, অথবা তাহার। সংগ্রামে বিমুখ হটক, মাংসালী মানুষ তাহাদিগকে কত কত বধ করে। ইহাতে কিছুই দোষ নাই। তৎপরে, ধর্মজ্ঞ রাজবির। যুগয়া করিতে গিয়া থাকেন। যুগয়াচ্ছেলেই তুমি যুদ্ধে আমার বাণে নিহত হইয়াছ। যেহেতু তুমি শাখামুগ তুমি আমার সহিত যুদ্ধ নাই কর অথবা অস্ত্রের সহিত যুদ্ধেই নিযুক্ত থাক, (তোমাকে বধ করিয়া আমি অধর্ম করি নাই।) হে বানরশ্রেষ্ঠ রাজগণ দুর্ভাগ্য ধর্ম, জীবন ও কল্যাণ প্রদাতা, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদিগকে হিংসা করিবে না, নিন্দা করিবে না, অপমান করিবে না, অশ্রিয় বা ক্য বলিবে না। তুমি ধর্ম না জানিয়া কেবল ক্রোধের বশীভূত হইয়া আমাকে দাব দিতেছ, আমি কুলাগত ধর্মই পালন করিয়াছি।”

এখন আমরা বালীর অভিযোগের এক একটি ধারা এবং রামের উত্তর পাশাপাশি রাখিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। তৎপূর্বে রামের উক্তিগুলির বিশ্লেষণ আবশ্যিক।

(১) কিঙ্কিঙ্ক্যা ভরতের অর্থাৎ রামের রাজ্যভুক্ত, সূতরাং বালীকে দণ্ড দিবার অধিকার তাহার আছে।

(২) বালী কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে গ্রহণ করিয়া ঘোরতর দুষ্কর্ম করিয়াছেন; মৃত্যুদণ্ডই উহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।

(৩) রাম স্বকাব্য-সাধন অর্থাৎ সীতার উদ্ধারের জন্ত সূগ্রীবের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন এই সঙ্কে যে, রাম বালীকে বধ করিয়া সূগ্রীবকে কিঙ্কিঙ্ক্যার রাজ্য করিবেন, সূগ্রীব সীতার উদ্ধারে সহায় হইবেন। রাম এই সন্ধি বা প্যাক্ট (pact) অনুসারে কাব্য করিতে বাধ্য, কেননা, কথা দিয়া কথা রক্ষা না করা গুরুতর অধর্ম।

(৪) রাম কিঙ্কিঙ্ক্যার অধিপতি, বালী তাহার প্রজা; অপরাধী প্রজার দণ্ডবিধান না করিলে রাজ্য পাপে পতিত হইয়া থাকেন।

(৫) বালীকে প্রচ্ছন্ন ভাবে বধ করিয়া রাম কিছুই অগ্নায় করেন নাই, কেননা, বালী বানর, যুগয়াতে এইরূপে পশুবধ সর্বদাই হইতেছে।

(৬) পশুবধে ধর্মযুদ্ধের নিয়ম খাটে না।

১। বালী রামের বাণে প্রবেশ করিয়া উপভব করেন নাই, তবে রাম তাহাকে মারিলেন কেন? ইহার উত্তরে রাম বলিতেছেন, কিঙ্কিঙ্ক্যা তাহাদেরই সাম্রাজ্যের অন্তর্গত, সূতরাং বালী অপকর্ম করিলে রামের কিঙ্কিঙ্ক্যায় আসিয়া তাহাকে শাসন করিবার অধিকার আছে; শুধু অধিকার আছে, তাই নয়; তিনি ধর্মতঃ রাজকর্তব্য সম্পাদন করিতে, অর্থাৎ অপরাধী বালীকে দণ্ড দিতে, বাধ্য।

কিঙ্কিঙ্ক্যা রঘুবংশীয়দিগের রাজ্যভুক্ত, ইহা আমরা এই প্রথম শুনিলাম। রাম ও সূগ্রীবের সখ্যবন্ধনের সময়ে ইহার উল্লেখ থাকিবার কথা, কিন্তু প্রাসঙ্গিক স্থলে তাহার নাম-গন্ধও নাই। ইহাতে মনে হইতেছে, এখানে কবি প্রাচীন ও আধুনিক কালে সুপরিচিত সাম্রাজ্যবাদীদিগের নীতি (imperialistic policy) স্থাপন করিতেছেন। “আমি তোমার রাজ্য আক্রমণ করি নাই, তবে তুমি আমার রাজ্য আক্রমণ করিলে কেন”—ইহার উত্তর, “তোমার রাজ্য আবার কি? উহা আমার”—অর্থাৎ “জোর ধার, মূলুৎ-তার।” আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়ার শ্বেতাঙ্গ-উপনিবেশগুলি এই নীতির প্রতিমূর্তি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষ প্রাধান্যযোগ্য। ভরত নন্দিগ্রামে রামের পাচুকা অভিষেক করিয়া তাহার প্রতিনিধিরূপে রাজ্য পালন করিতেছিলেন। (অযোধ্যা, ১১৫ অধ্যায়)। কিন্তু রাম বলিতেছেন, এক্ষণে ভরত সঙ্গার। বসুন্ধরার অধিপতি, তিনি ভরতের আজ্ঞাবহ হইয়া দুষ্টির দমন করিতেছেন। এই উক্তিতে রামের মহত্ব ও ঔদায্যই প্রকাশ পাইতেছে। রাম চতুর্দশ বৎসরের জন্ত জটাভঙ্গলধারী বনবাসী হইয়াছেন; বনবাসের প্রাতিশ্রুত সময় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি আপনাকে রাজ্য বলিয়া প্রচার করিবেন না। কবি কি রাম ও ভরতের ভ্রাতৃপ্রেম ও রাজ্যের প্রতি অলোভ দ্বারা বালী ও সূগ্রীবের রাজ্যলোভ ও জিঘাংসাকে বিচার দিতেছেন? যদি তাহাই হয়, তবে বলা যায় যে ইহা চাক্ষুশি বৈসাদৃশ্যমূলক চিত্রাঙ্কনের (a study in contrast) একটা দৃষ্টান্ত।

২। বালীর দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে রাম ও তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মী; উভয়ের স্বার্থে স্বার্থে সংঘর্ষ ঘটিবে, ইহা সম্ভবপর নহে; রাম তাহার রাজ্যের বা ঐশ্বর্যের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, তাহারও কোন নিদর্শন নাই; তবে তাহাকে বধ করিলেন কেন?

রাম এই অভিযোগ খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, হাঁ, স্বার্থে স্বার্থে সংঘর্ষ ঘটিয়াছে বইকি। তিনি যখন একেবারে নিঃসহায়, তখন সীতার উদ্ধারের জন্ত সূগ্রীবের সাহায্য একান্ত আবশ্যিক জ্ঞান করিয়া তাহাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, যে, বালীকে বধ করিয়া সূগ্রীবকে

কিষ্কিয়ার রাজ্য দান করিবেন। বালীর স্বার্থ, আপনার জীবনরক্ষা; রামের স্বার্থ সীতার উদ্ধার। এইখানে স্বার্থে স্বার্থে বিরোধ রহিয়াছে।

কিন্তু বালী বলিতেছেন, সীতার উদ্ধারের জন্ত তাঁহাকে বধ করিবার প্রয়োজন ছিল না। তাঁহাকে বলিলে তিনি অনায়াসে সীতাকে উদ্ধার করিয়া রামের হস্তে সমর্পণ করিতে পারিতেন।

রাম স্পষ্ট করিয়া এ-কথার উত্তর দেন নাই। উত্তরটা বোধ হয় এই যে, তিনি যখন নিঃসহায় অবস্থায় সীতার অন্বেষণে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন তাঁহারই গায় রাজ্য-ভ্রষ্ট ও নিঃসহায় স্ত্রীবেদের সহিত তাঁহার অগ্রে সাক্ষাৎ হয়, অবস্থাসাম্যের জন্ত সহজেই উভয়ের সখ্যবন্ধন হইয়াছিল। ‘আমি স্ত্রীবকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি, তাহা কদাপি ভঙ্গ করিতে পারি না’—এই উক্তিই উত্তর অন্তর্হিত আছে।

তারপর সহায়শূন্য বনবাসী ব্রহ্মচারী রামের সহিত দুর্দ্বন্দ্ব বানরপতি বালী যে সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইতে সম্মত হইতেন, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি ছিল?

আর একটা কথা। পিতার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্ত রাম বনবাসী হইয়াছিলেন। তিনি কি নিজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে পারেন? সত্যপালন রামায়ণের মূলমন্ত্র; উহার মুখ্য অর্থ, যে-বাক্য একবার উচ্চারিত হইয়াছে, তাহা কাযে পরিণত করিতেই হইবে।

৩। বালী বলিতেছেন, তিনি বানর; বানরের মাংস ভ্রাঙ্কণ ক্ষত্রিয়ের অভক্ষ্য; অতএব রাম তাঁহাকে নিরর্থক হত্যা করিয়াছেন। রাম এই অভিযোগের স্পষ্ট উত্তর দেন নাই; বোধ হয় দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

৪। বালীর সর্বাপেক্ষা গুরুতর অভিযোগ, রাম ধর্মযুদ্ধের একটি সুবিদিত নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া তাঁহাকে বধ করিয়াছেন।

রাম এই অভিযোগের উত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ, তিনি বালীকে কেন বধ করিলেন, তাহার কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তৎপরে ধর্মযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার যে প্রত্যবায় হয় নাই, তাহাই বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আত্মসমর্থনের এই দুই ভাগ পরস্পরবিরোধী।

(ক) বালী কনিষ্ঠ ভ্রাতার জীবদ্দশায় তাঁহার পত্নী

রুমাকে শয্যাসজ্জিনী করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছেন; মৃত্যুই উহার একমাত্র প্রার্থনাসিদ্ধ। এজন্য রাম স্বয়ং রাজা বা রাজা ভরতের প্রতিনিধিরূপে বালীকে বধ করিয়াছেন।

এই যুক্তি বিচারসহ নহে। যদি মনে করি, বালী অনাথ্য, একটা অনাথ্য জাতির অধিপতি, তবে আর্ধ্যধর্মনীতির দ্বারা তাঁহার বিচার করা কিরূপে গ্ৰাহ্যসঙ্গত হইতে পারে? “কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুত্রতুল্য, তাহার পত্নী পুত্রবধূস্থানীয়া”—ইহা আর্ধ্যজাতির ধর্মশাস্ত্রের কথা। অনাথ্যেরা ইহা শুনে নাই, শুনিলেও মানিত না। বালীর কায্য কিষ্কিয়ার পাপাচার বলিয়া গণ্য হইলে বানরেরা তাঁহার নিন্দা করিত, রাজ্যে বিদ্রোহ হইত। কবি নিন্দা বা বিদ্রোহের কোনই আভাস দেন নাই। যাহারা রামের এই যুক্তির অন্তিমোদন করেন, তাহারা বলুন ভারতবর্ষের আইনে যখন জাল করিবার অপরাধে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল না, তখন ইংলণ্ডের বিধান মতে ঐ অভিযোগে নন্দকুমারকে ফাঁসি দিয়া হেষ্টিংস ও ইস্পী কি কৃকর্ম করিয়াছিলেন? ফলতঃ আয্য ও অনায্য, সভ্য ও অসভ্য, প্রবল ও দুর্বল—ইহাদিগের সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে গ্ৰাহ্যধর্মের এই প্রকার ব্যভিচার অহরহই ঘটিয়া থাকে।

আবার আমরা ধরিয়া লই, বালী সত্য সত্যই পঞ্চনখ বানর, অর্থাৎ পশু। তবে তাঁহার প্রতি শাস্ত্রোক্ত বিধির প্রয়োগ কি একটা অবৌক্তিক, হাশ্বজনক ব্যাপার নহে? পশুদিগের কি বিবাহপ্রথা বা গম্যাগম্য বিচার আছে? একটা বানর “সনাতন ধর্ম” ত্যাগ করিয়াছে, ইহার অর্থ কি?

(খ) রাম ধর্মযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন, এখন আমরা এই অভিযোগের উত্তর পাইতেছি। বালী শাখামৃগ, পশু। তিনি মৃগয়ার কথা তুলিয়াছেন, রামও মৃগয়ার দৃষ্টান্ত দ্বারাই আত্মসমর্থন করিতেছেন। মৃগয়াতে ধর্মযুদ্ধের কোন বিধানই প্রযোজ্য নহে। বালী একটি নিষেধবচন উল্লেখ করিয়া রামের নিন্দা করিয়াছেন; রাম আরও কয়েকটি নিয়মের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন, পশুবধে সেগুলি নিয়তই লঙ্ঘিত হইতেছে, তাহাতে মৃগয়াকারীদিগকে কোনও দোষই স্পর্শ করিতেছে না।

রামায়ণের কবি অনাথ্য জাতিসমূহকে বানর ভল্লুক ইত্যাদি নামে আখ্যাত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বর্ণনা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইহারা প্রকৃতপক্ষে পশু ছিল

না। ঐশ্বর্যে ও বিলাসসামগ্রীতে কিঙ্কিঙ্ক্যা অযোধ্যার নিকটে পরাজয় স্বীকার করিত না। হনুমান শুধু বল বুদ্ধি ও পরাক্রমে বিখ্যাত ছিলেন, তাহা নহে; তিনি দেশ, কাল বুঝিয়া কার্য করিতে জানিতেন এবং নীতিশাস্ত্রেও তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল; এজন্য সূগ্রীব তাঁহাকে “নয়পাণ্ডিত” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। (কিঙ্কিঙ্ক্যা । ৪৪।৭।) ইন্দ্রপুত্র বালী ইন্দ্রের তুল্যই পরাক্রমশালী ছিলেন (১২।২৩।)। তিনি ইন্দ্রপ্রদত্ত রত্নখচিত স্বর্ণহারে অলঙ্কৃত হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন (১৭।৫।)। বানরেরা বস্ত্র পরিধান করিত (১২।১৫) ; বালী সূগ্রীব প্রভৃতি মহর্ষি পয়স্ক, মণিমুক্তা ব্যবহার করিতেন। (৩৩।১২, ২০, ২৩)। বালীর অস্তোষ্টিক্রিয়া ও দশরথের অস্তোষ্টিক্রিয়ার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। রামের উক্তি হইতেও প্রতিপন্ন হয়, তিনি বালীকে মানুষ বলিয়াই দণ্ড দিয়াছিলেন।

কিন্তু রাম অস্ত্রের সহিত যুদ্ধরত বালীকে বধ করিয়া ধর্মযুদ্ধের একটি নিষেধবাণী পদদলিত করিয়াছেন, এই অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়া তাঁহাকে বালীর মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়া বানরের আশ্রয় লইতে হইয়াছে। প্রাণদণ্ড সহিবার সময় বালী মানুষ; অধর্মযুদ্ধে নিহত হইবার সময় বালী বানর বা পশু। ইহার পোষকতার জ্ঞান বালীর দ্বারাও কবি একবার বলাইয়াছেন, তিনি বানর। এই অসঙ্গতি বানরবর্ণনায় পূর্বাপর রক্ষিত হইয়াছে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। হনুমান্ জ্ঞানে ও গুণে কোনও মানুষ অপেক্ষা হীন ছিলেন না; কবি যেন তাঁহার চিত্র আঁকিতে আঁকিতে আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন। সহসা তাঁহার মনে পড়িল, “ওঃ, হনুমান্ তো বানর,” স্মরণ্যং বহু বিলম্বে হঠাৎ একবার হনুমানের লাজুলটি উল্লেখ করিতে হইল। (কিঙ্কিঙ্ক্যা ৬৭।৪।)।

মহাকবিদিগের অসঙ্গতি ধর্মব্য নহে। মিল্টন তাঁহার

মহাকাব্যে দেবাত্মা ও দুষ্টাত্মাদিগকে শরীরী ও অশরীরী, দুই প্রকারই বর্ণনা করিয়াছেন।

ইয়ুরোপীয়েরা আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগকে পশু জ্ঞান করিত। তথাকার যুক্তরাজ্যের একটি প্রদেশে (Pennsylvaniaতে) তাত্রবর্ণ জাতির এক এক জনের মস্তকের উপরে বয়ঃক্রমাত্মসারে মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এদেশে যেমন বিষাক্ত সর্প মারিতে পারিলে লোকে পুরস্কার পাইয়া থাকে, তেমন তথায় এক একটা রেড ইণ্ডিয়ানের মাথা আনিতে পারিলে শিকারীরা রাজসরকার হইতে যথেষ্ট অর্থ লাভ করিত। রামায়ণের কবি কি বালী-বধের কাহিনীদ্বারা ইঙ্গিত করিলেন, আখ্যগণ অন্যাদিগকে পশুর অপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণীর জীব বলিয়া মনে করিতেন না?

কাহিনীটির উপসংহার চমৎকার। রামের উত্তর শুনিয়া বালীর প্রবোধ জন্মিল; তিনি আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া রামের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

বালীর প্রবোধ জন্মিল বটে, কিন্তু প্রাচীন কালে ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের সকলের প্রবোধ জন্মে নাই। দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধিষ্টির মুখে “অগ্ৰথামা হত ইতি গজঃ”—এই কথা শুনিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিলে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার শিরশ্ছেদ করিলেন। অক্ষয় তপন দূরে সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। আচার্য্যদেবের এই নৃশংস বধের বৃত্তান্ত শুনিয়া বিলাপ করিতে করিতে তিনি যুদ্ধিষ্টিরকে বলিলেন,

চিরং স্থাশ্চি চাকাশ্চিন্ধৈলোকো সচরাচরে ।

রামে বা লবধাদ্যদেবং দ্রোণে নিপাতিতে ॥

দ্রোণপর্ব । ১২৫।১৫।

“বালী-বধে রামের যেরূপ অকীর্তি হইয়াছিল, দ্রোণ-বিনাশের জন্য আপনারও সেইরূপ অকীর্তি চিরকাল সচরাচর ত্রিভুবনে বিদ্যমান থাকিবে।”

দৃষ্টি-প্রদীপ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ণাঙ্গুষ্ঠি :—

জিতু, নীতু ও সীতার পিতা চা বাগানে কাজ করিতেন ও স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া বিদেশেই থাকতেন। চরকাল তিনি নাস্তিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন ধর্মকর্ম মানিতেন না, পানদোষও ছিল। চ-বাগানে গাছিকার সময় মিশনরী মেমেরা বাসায় আসিয়া ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেলাই শিখাইত। মদ খাইয়া কাজে অযোগ্য করার দরপ হঠাৎ তাঁর চাকরি যায়। এ অবস্থায় দাঁড়াইবার বা মাথা গুঁজিবার স্থান নাই, স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া কপর্দকশূন্য অবস্থায় তিনি অত্যন্ত বিপদে পড়িয়া গেলেন। অবশেষে নিরুপায় আশ্রয় দেশে ফিরিয়া জাতি ভ্রাতার গাশ্রয় লইতে বাধ্য হন।

২

বাবা কলকাতা থেকে চুপুরে বাড়ি ফিরলেন। কাপড় জামা এত ময়লা কখনও বাবাব গায়ে দেখিনি। আমার কাছে ডেকে বসলেন। শোন জিতু, এই পুঁটলিটা তোব মাকে দিয়ে আয়, আমি একবার ও-পাড়া থেকে আসি। ভট্টচার্যীদের নসিাব কারণনার একটা লোকের নামে চিঠি দিয়েচে- ওদেব দিয়ে আসি।

আমি বললাম—এখন যেও না বাবা। চিঠি আমি দিয়ে আসবো'পন, তুমি এসে চা-টা খাও,—বাবা শুন্লেন না, চলে গেলেন। বাবার মুগ শুকনো, দেখে বুঝলাম যে-জন্তে গিয়েছিলেন তার কোনো জোগাড হয়নি, অর্থাৎ চাকরি। চাকরি না হলেও আর এদিকে চলে না।

হাতের টাকা ক্রমশঃ ফুরিয়ে এসেচে। আমরা নীচের ঘে ঘরে থাকি, গরুবাছুরেরও সেখানে থাকতে কষ্ট হয়। আমরা এসেছি প্রায় মাস-চারেক হ'ল এই চাব মাসেই যা দেখেছি শুনোচ, তা বোধ করি সারা জীবনেও ভুলবো না। যাদেব কাছে জ্যোতিমা, কাকীমা দিদি বলে হাসিমুখে ছুটে যাই। তারা যে কেন আমাদের ওপব এমন বিরূপ, কেন তাঁদের ব্যবহার এত নিষ্ঠুর, ভেবেই পাই নে এর কোনো কারণ। আমরা তো আলাদা থাকি, আমাদের ধরচে আমাদের রান্না হয়, ঐদের তো কোনই অসুবিধের মধ্যে আমরা ফেলিনি, তবু কেন বাড়িস্থলু লোকের আমাদের ওপর এত রাগ ?

আমার বাবার আপন ভাই নেই, ঠাণ্ডা হ'লেন খুঁড়তুত-জ্যাঠাতুত ভাই। জ্যাঠামশায়েব অবস্থা খুবই ভাল- পাটের বড় ব্যবসা আছে, দুই ছেলে গদিতে কাজ দেখে, ছোট একটি ছেলে এখানকার স্কুলে পড়ে, আর একটি মেয়ে ছিল সে আমাদের আসবার আগে বসন্ত হয়ে মারা গিয়েচে। মেজকাকার তিন মেয়ে- ছেলে হয়নি বড় মেয়ের বিয়ে হয়েচে আর দুই মেয়ে ছোট। ছোটকাকার বিয়ে হয়েছে বেশী দিন নয়— বৌও এখানে নেই। ছোটকাকা অত্যন্ত রাগী লোক, বাড়িতে সর্বদা ঝগড়াঝাঁটি করেন, গানবাজনার ভক্ত, ওপরের ঘরে সকাল নেই সন্ধ্যা নেই হারমোনিয়ম বাজাচ্ছেন।

জ্যাঠাইমার বয়স মায়ের চেয়ে বেশী কিন্তু বেশ সুন্দরী— একটু বেশী মোটাসোটা। গায়ে ভারী ভারী সোনাব গহনা। এঁর বিশ্বের আগে নাকি জ্যাঠামশায়েব অবস্থা ছিল খারাপ- তারপর জ্যাঠাইমা এ বাড়িতে বধুরূপে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসাবে উন্নতিরও সূত্রপাত। প্রতিবেশীরা খোসামোদ করে বলে—আমাব সামনেই আমি কত বার শুনেচি—তোমার মত ভাগ্যমানি ক'জন আছে বড়-বৌ ? এদের কি-ই বা ছিল, তুমি এনে আর সংসার সব দিক থেকে উথলে উঠলো, কপাল বলে একেই বটে! সামনে বলা নয়—এমন মন আজকাল ক'জনের বা আছে ? দেওয়ান-খোওয়ান, খাওয়ানোর-মাখানোর—আমার কাছে বাপ হক কথা। ..মেজখুড়ীমা ওর মধ্যে ভাল লোক। কিন্তু তিনি কারুর সপক্ষে কথা বলতে সাহস করেন না, তাঁর ভাল করবার ক্ষমতা নেই, মন্দ করবারও না। মেজকাকা তেমন কিছু রোজগার করেন না, কাজেই মেজখুড়ীমার কোনো কথা এ বাড়িতে খাটে না।

বছরখানেক কেটে গেল। বাবা কোথাও চাকরি পেলেন না। কত জায়গায় হাঁটাইটি করলেন, শুকনো মুখে কত বার বাড়ি ফিরলেন। হাতে যা পয়সা ছিল ক্রমে ক্রমে ফুরিয়ে এল।

সকালে আমরা বাড়ির সামনে বেলতলায় খেলছিলাম। সীতা বাড়ির ভেতর থেকে বার হয়ে এল, আমি বললুম—
চা হয়েছে সীতা ?

সীতা মুখ গম্ভীর করে বললে—চা আর হবে না। মা বললে চা চিনির পয়সা কোথায় যে চা হবে ? কথাটা আমার বিশ্বাস হ'ল না। সীতার চালাকি আমি যেন ধরে ফেলেছি, এই রকম সুরে তার দিকে চেয়ে হাসিমুখে বললুম,—যাঃ, তুই বুঝি খেয়ে এলি ? চা-বাগানে আমাদের জন্ম, সকালে উঠে চা খাওয়ার অভ্যাস আমাদের জন্মগত, চা না খেতে পাওয়ার অবস্থা আমরা কল্পনাই করতে পারিনে। সীতা বললে—না দাদা, সত্যি, তুমি দেখে এসো—চা হচ্ছে না। তারপরে বিজ্ঞের সুরে বললে—বাবার যে চাকরি হচ্ছে না, মা বলছিল দু-দিন পরে আমাদের ভাতই জুটবে না তো চা!...আমরা এখন গরিব হয়ে গিয়েছি যে।

সীতার কথায় আমাদের দারিদ্র্যের রূপটি নূতনতর মৃষ্টিতে আমার চোখের সামনে ফুটল। জানতুম যে আমরা গরিব হয়ে গিয়েছি, পরের বাড়িতে পরের মুখ চেয়ে থাকি, ময়লা বিছানায় শুই, জলখাবার খেতে পাইনে, আমাদের কারুর কাছে মান নেই সবই জানি। কিন্তু এসবেও নিজেদের দারিদ্র্যের স্বরূপটি তেমন করে বুঝিনি, আজ সকালে চা না পেতে পেয়ে সেটা যেমন করে বুঝলুম।

বিকেলের দিকে বাবা দেখি পথ বেয়ে কোথা থেকে বাড়িতে আসছেন। আমরা দেখে বললেন—শোন জিতু, চল্ শিমুলের তুলো কুড়িয়ে আনি গে—

আমি শিমুল তুলোর গাছ এই দেশে এসে প্রথম দেখেছি—গাছে তুলো হয় বইয়ে পড়লেও চোখে দেখেছি এখানে এসে এই বৈশাখ মাসে। আমার ভারি মজা লাগল—উৎসাহে ধূসার সুরে বললুম—শিমুল তুলো ? কোথায় বাবা ?...চল যাই—সীতাকে ডাকবো ?...

বাবা বললেন—ডাক, ডাক, সবাইকে ডাক—চল্ আমরা যাই—

বাবাও আমার পেছনে পেছনে বাড়ি ঢুকলেন। পরের দিন ষষ্ঠী ও দাদার জন্ম-বার। মা কোথা থেকে খানিকটা দুধ জোগাড় করে রান্নাঘরের দাওয়ার উত্থানে বসে বসে কাঁয়ের পুতুল গড়ছিলেন—বাবার স্বর শুনেই মুখ তুলে

চেয়ে এক চমক বাবার দিকে দেখেই একবার চকিত দৃষ্টিতে ওপরে জ্যাঠাইমাদের বারান্দার দিকে একবার কি জবে চাইলেন—তারপর পুতুল-গড়া ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে এল বাবার হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। আমার দিকে ফিরে বললেন—যা জিতু, বাইরে গেলা কর গে যা—

আমি অবাক হয়ে গেলুম। বলতে যাচ্ছিলাম—মা, বাবা যে শিমুল তুলো কুড়োবার—কিন্তু মার মুখের দিকে চেয়ে আমার মুখ দিয়ে কথা বার হ'ল না। একটা কিছু হয়েছে যেন—কিন্তু কি হয়েছে আমি বুঝলাম না। বাবা মদ খেয়ে আসেন নি নিশ্চয়—মদ খেলে আমরা বুঝতে পারি—খুব ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি, দেখলেই বুঝি। তবে বাবার কি হ'ল ?...

অবাক হয়ে বাইরে চলে এলুম।

৩

এখানকার স্কুলে আমি ভর্তি হয়েছি, কিন্তু দাদা আর পড়তে চাইলে না ব'লে তাকে ভর্তি করা হয়নি। প্রথম কয় মাস মাইনের জন্মে মাষ্টার-মশায়ের তাগাদার চোটে আমার চোখে জল আসত—সাড়ে ন' আনা পয়সা মাইনে—তাও বাড়িতে চাইলে কারুর কাছে পাইনে, বাবার মুখের দিকে চেয়ে বাবার কাছে তাগাদা করতে মন সরে না।

শনিবার, সকালে সকালে স্কুলের ছুটি হবে। স্কুলের কেরাণী রামবাবু একখানা খাতা নিয়ে আমাদের ক্লাসে ঢুকে মাইনের তাগাদা শুরু করলেন। আমার মাইনে বাকী দু-মাসের—আমায় ক্লাস থেকে উঠিয়ে দিয়ে বললেন—বাড়ি গিয়ে মাইনে নিয়ে এস খোকা, নইলে আর ক্লাসে বসতে দেবো না কাল থেকে। আমার ভারি লজ্জা হ'ল—দুঃখ তো হ'লই। আড়ালে ডেকে বললেই তো পারতেন রামবাবু, ক্লাসে সকলের সামনে—ভারি—

দুপুরে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করচে। স্কুলের বাইরে একটা নিমগাছ। ভারি সুন্দর নিমফুলের ঘন গন্ধটা। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলুম কি করা যায়। মাকে বলব বাড়ি গিয়ে ? কিন্তু জানি মায়ের হাতে কিছু নেই, এখুনি পাড়ায় ধার করতে বেরুবে, পাবে কি না-পাবে, ছোট মুখ করে বাড়ি ফিরবে—ওতে আমার মনে বড় লাগে।

হঠাৎ আমি অবাক হয়ে পথের ওপারে চেয়ে রইলুম— ওপারে সামু নাপিতের মৃদীখানার দোকানটা আর নেই, পাশেই সে ফিতে ঘুমিব দোকানটাও নেই—তার পাশের জামার দোকানটাও নেই—একটা খুব বড় মাঠ, মাঠের ধাবে বড় বড় বাঁশগাছের মত কি গাছের সারি কিন্তু বাঁশগাছ নয়। দুপুরবেলা নয়, বোধ হয় যেন রাত্রি—জ্যোৎস্না রাত্রি—দূরে সাদা রঙের একটা অদ্ভুত গড়নের বাড়ি, মন্দিরও হ'তে পারে।

নিমগাছেব গু ডিটাতে ঠেস দিয়ে দাড়িয়েছিলুম, সাগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকি ভাল দেখতে পাওয়া গেল, তখনও তাহ আছে জ্যোৎস্নাভরা একটা মাঠ, কি গাছের সারি দুবেব সাদা বাড়িটা। দু-মিনিট পাচ মিনিট। তাড়াতাড়ি চোখ মুছলাম আবার চাইলুম—এখনও অবিকল তাই। একেবারে এত স্পষ্ট, গাছের পাতাগুলো যেন গুণ্তে পারি, পাখীদের ডানার সব বং বেশ ধবতে পারি।

তাব পরেই আবার কিছু নেই খানিকক্ষণ সব শব্দ— তাব পরেই সামু নাপিতের দোকান, পাশেই ফিতে ঘুমিব দোকান।

বাড়ি চলে এলুম। যখনই আমি এত বকম দেখি, তখন আমাব গা কেমন কবে হাতে পায়ে যেন জোব নেই এমনি হয়। মাথা যেন হালকা মনে হয়। কেন এমন হয় আমাব? কেন আমি এ-সব দেখি, কাউকে একথা বলতে পারবিনে, মা, বাবা, দাদা, মীত্যা, কাউকে নয়। আমাব এমন কোনো বন্ধ বা সহপাঠী নেই যাকে আমি বিস্বাস ক'বে সব কথা খুঁতে বলি। আমাব মনে যেন কে বলে—এবা এ-সব বুঝবে না। বন্ধবা হয়ত হেসে উঠবে কি ওই নিয়ে ঠাট্টা কববে।

ওবেলা খেয়ে যাঠিন। বাগ্নাঘরে ভাত খেতে গিয়ে দেখি শুধু সিমভাতে আব কুম্ভোব ডাঁটা চচ্চডি। আমি ডাঁটা খাইনে সিম যদি বা খাই সিমভাতে একেবাবেই মুখে ভাল লাগে না। মাকে বাগ ক'বে বললুম—ও দিয়ে ভাত খাবো কি ক'বে? সিমভাতে দিলে কেন? সিমভাতে আমি খাই কখনও?

কিন্তু মাকে যখন আমি বক্ছিলুম আমাব মনে তখন মায়ের ওপর বাগ ছিল না। আমি জানি আমাদের ভাল

খাওয়াতে মায়ের যত্নের ত্রুটি কোনো দিন নেই, কিন্তু এখন মা অক্ষম, অসহায় হাতে পয়সা নেই, ইচ্ছে থাকলেও নিরুপায়। মায়ের এই বর্তমান অক্ষমতার দক্ষণ মায়ের ওপর যে করুণা সেটাই দেখা দিল রাগে পরিবর্তিত হয়ে। চেয়ে দেখি মায়ের চোখে জল। মনে হ'ল এ সেই মা—চা-বাগানে থাকতে মিস নটনেব কাছ থেকে আমাদের খাওয়ানোর জন্তে কেক তৈব করবাব নিয়ম শিখে বাজার থেকে ঘি-ময়দা কিচমিচ ডিম চিনি সব আনিয়ে সারা বিকেল ধরে পবিশ্রম ক'বে কতকগুলো স্বাদগন্ধহীন নিবেট ময়দাব টিপি বানিয়ে বাবার কাছে ও পব দিন মিস নটনেব কাছে হাশ্চাস্পদ হয়েছিলেন। তাবপর অবিশি মিস নটন ভাল ক'রে হাতে ধবে শেখায় এবং মা ইদানীং খুব ভাল কেকুই গড়তে পারতেন।

মা বাংলা দেশেব পাড়াগাঁয়েব ধবণ-ধারণ, বাগ্না আচাব-ব্যবহাব ভাল জানতেন না। অল্প বয়সে বি'য় হয়ে চা-বাগানে চলে গিয়েছিলেন সেখানে একা একা কাটিয়েছেন চিবকাল সমাজেব বাইবে, পাড়াগাঁয়েব ব্রত নেম্ পজোআচ্ছা আচাব এ-সব তেমন জানা ছিল না। এঁদের এই ঘোব আচাবী সংসাবে এসে পড়ে খালাদা থাকলেও মাকে কথা সহ কবতে হয়েচে কম নয়। পয়সা থাকলে যেটা হয়ে দাডাত গুণ হাত খালি থাকতে সেটা হয়ে দাড়িয়েছিল ঠাট্টা, বিক্রপ শ্লেষেব ব্যাপার—জংলীপনা খিরিষ্টান বা বিবিয়ানা। মা সব সহগুণ ছিল অসাধাবণ, মুখ বুজে সব সহ কবতেন, কোনদিন কথাটিও বলেন নি। ভয়ে ভয়ে ও দব চালচলন, আচাব-ব্যবহাব শিখবাব েষ্টা কবতেন নকল করতে যেতেন— তাতে ফল অনেক সময়ে হ'ত উট্টো।

আবও মাসকতক কে ট গেল। এহ ক মাসে আমাদের যা অবস্থা হয়ে দাঁড়ালো, জীবনে ভাবিনিও কোনো দিন যে অত কষ্টের মধ্যে পড়তে হবে। দু বেলা ভাত খেতে আমরা ভুলে গেলাম। স্কুল থেকে এসে বেলা তিনটের সময় খেয়ে রান্নে আর কিছু খাওয়াব ইচ্ছেও হ'ত না। ভাত খেয়ে স্কুলে যাওয়া ঘটত না প্রায়ই, অত সকালে মা চালেব জোগাড করতে পারতেন না, সেটা প্রায়ই ধার ক'রে নিয়ে আসতে হ'ত। সব সময় হাতে পয়সা থাকত না—এর মানে, আমাদের চা-বাগানেব সৌখীন জিনিষপত্র, দেবাজ, বাস—

এই সব বেচে চলছিল—সব সময়ে তার খন্দের জুটতো না। মা বোমামুখ, বিশেষতঃ এটা অপরিচিত স্থান, নিজের খুশুর-বাড়ি হলেও এর সঙ্গে এত কাল কোনো সম্পর্কই ছিল না—কিন্তু মা ওসব মানতেন না, লজ্জা করে বাড়ি বসে থাকলে তার চলত না, ষে-দিন ঘরে কিছু নেই, পাড়ায় বেরিয়ে যেতেন, দু-একটা জিনিষ বেচবার কি বন্ধক দেবার চেষ্টা করতেন পাড়ায় মেয়েদের কাছে—প্রায়ই সৌখীন জিনিষ, হয়ত একটা ভাল কাচের পুতুল, কি গালার খেলনা, চন্দনকাঠের হাতপাখা—এই সব। সেলাইয়ের কলটা ছোটকাকীমা সিকি দামে কিনেছিলেন। বাবার গায়ের ভারি পুরু পশমী ওভারকোটটা সরকাররা কিনে নিয়েছিল আট টাকায় মোটে এক বছর আগে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বাবা তৈরি করেছিলেন।

চাল না-হয় একরকম করে জুটলো, কিন্তু আমাদের পরণের কাপড়ের দুর্দশা ক্রমেই বেড়ে উঠছিল। আমাদের সবারই একখানা করে কাপড়ে এসে ঠেকেচে—তাও ছেঁড়া, আমার কাপড়খানা তো তিন জায়গায় সেলাই। সীতা বলত তুই বড় কাপড় ছিঁড়িস্ দাদা। কিন্তু আমার দোষ কি? পুরোনো কাপড়, একটু জোরে লাফালাফি করাতেই ছিঁড়ে যেত, মা গম্ভী সেলাই করতে বসে যেতেন।

বাবা আজকাল কেমন হয়ে গেছেন, তেমন কথাবার্তা বলেন না—বাড়িতেও থাকেন না প্রায়ই। তাকে পাওয়াই যায় না যে কাপড়ের কথা বল। তা ছাড়া বাবার মুখের দিকে চেয়ে কোনো কথা বলতেও ইচ্ছে যায় না। তিনি সব সময়ই চাকুরির চেষ্টায় এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ান, কিন্তু কোথাও এপর্যন্ত কিছু জোটেনি। মাস দুই একটা গোলদারী দোকানে খাতাপত্র লেখবার চাকুরি পেয়েছিলেন, কিন্তু এখন আর সে চাকুরি নেই—সেজজ্যাঠামশায়ের ছেলে নবীন বলছিল নাকি মদ খেয়ে গেছে। কিন্তু এখানে এসে বাবা এক দিনও মদ খেয়েছেন বলে আমার মনে হয় না, বাবা মদ খেলেই উৎপাত করেন আমরা ভাল করেই জানি, কিন্তু এখানে এসে পর্যন্ত দেখছি বাবার মত শাস্ত মানুষ্যটি আর পৃথিবীতে বৃষ্টি নেই। এত শাস্ত, এত ভালমানুষ স্নেহময় লোকটি মদ খেলে কি হয়েই যেতেন! চা-বাগানের সে-সব রাতের কীর্তি মনে হলেও ভয় করে।

রবিবার। আমার স্বপ্ন নেই, আমি সারাদিন বসে বসে

ম্যাজেটা গুলে রং তৈরি করেছি, দু-তিনটে শিশিতে ভর্তি করে রেখেছি, সীতার পাঁচ-ছখানা পুতুলের কাপড় রঙে ছুপিয়ে দিয়েছি—ক্লাসের একটা ছেলের কাছ থেকে অনেকখানি ম্যাজেটার গুঁড়ো চেয়ে নিয়েছিলুম।

সন্ধ্যার একটু পরেই খেয়ে শুয়েছি। কত রাত্রে যেন ঘুম ভেঙে গেল একটু অবাক হয়ে চেয়ে দেখি আমাদের ঘরের দোরে জ্যাঠাইমা, আমার খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই বোনের দল, ছোটকাকা—সবাই দাঁড়িয়ে। মা কাঁদচে—সীতা বিচানায় সব ঘুম ভেঙে উঠে বসে চোখ মুচচে। আমার জ্যাঠতুত ভাই হেসে বললে ঐ দ্যাখ তোর বাবা কি করছে! চেয়ে দেখি ঘরের কোণে খাটে বাবা তিনটে বালিসের তুলো ছিঁড়ে পুঁটুলি বাঁধছেন। তুলোতে বাবার চোখমুখ, মাথার চুল, সারা গা এক অদ্ভুত রকম হয়েছে দেখতে। আমি অবাক হয়ে জিগোস করলুম—কি হয়েছে বাবা?

বাবা বললেন—চা-বাগানে আবার চাকুরি পেয়েছি—ছোট সাহেব তার করেছে; সকালের গাড়ীতে যাব কিনা তাই পুঁটুলিগুলো বেঁধেছি—এখন না রাখলে—ক'টা বাজল রে থোকা?

আমার বয়েস কম হলেও আমার বুঝতে দেরি হ'ল না যে এবার বাবা মাতাল হ'ল নি। এ অন্য জিনিষ। তার চেয়েও গুরুতর কিছু। ঘরের দৃশ্যটা আমার মনে চিরকালের একটা ছাপ করে দিয়েছিল—জীবনে কখনও ভুলিনি—চোখ বুজলেই উত্তরজীবনে আবার সে রাত্রির দৃশ্যটা মনে এসেচে। একটা মাত্র কেরোসিনের টেমি জ্বলে ঘরে—তারই রাঙা ক্ষীণ আলোয় ঘরের কোণে বাবার তুলো-মাথা চেহারা—মাথায় মুখে, কানে পিঠে সর্বদিকে ছেঁড়া বালিসের লালচে পুরানো বিচি-ওয়াল তুলো মেজেতে বসে মা কাঁদছেন—দরজার কাছে কৌতুক দেখতে খুড়ীমা জ্যাঠাইমারা জড় হয়েছেন—খুড়তুতো ভাই বোনেরা হাস্চে।...দাদাকে ঘরের মধ্যে দেখতে পেলাম না, বোধ হয় বাইরে কোথাও গিয়ে থাকবে।

পর দিন সকালে আমাদের ঘরের সামনে উঠানে দলে দলে লোক জড় হ'তে লাগল। এদের মুখে শুনে প্রথম বুঝলাম বাবা পাগল হয়ে গিয়েছেন। সংসারের কষ্ট, মেয়ের বিয়ের ভাবনা, পরের বাড়ির এই যন্ত্রণা—এই সব দিনরাত ভেবে ভেবে

বাবার মাথা গিয়েচে বিগড়ে। অবিশ্যি এ-সব কারণ অনুমান করেছিলুম বড় হ'লে অনেক পরে।

বেলা হওয়া সন্ধে সন্ধে লোকের ভিড় বাড়তে লাগল, যারা কোনো দিন এর আগে বাবার সন্ধে মৌখিক ভদ্র আলাপটা করতেও আসেনি তারা মজা দেখতে আসতে লাগল দলে দলে।

বাবার মূর্তি হয়েছে দেখতে অদ্ভুত। রাত্রে না ঘুমিয়ে চোখ বসে গিয়েচে—চোখের কোনে কালি মেড়ে দিয়েচে যেন। সন্ধ্যা তুলো মেখে বাবা সেই রাতের বিছানার ওপরই বসে আপন মনে কত কি বক্চেন। ছেলেপিলের দল এপাড়া-ওপাড়া থেকে এসেছে। তারা ঘরের দোরে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে। কেউ বা উঁকি মেরে দেখে—হাসাহাসি করচে। আমাদের সন্ধে পড়ে এই পাড়ার নবীন বাঁদুঘোর ছেলে শাণ্টু—সে একবার উঁকি মেরে দেখতেই বাবা তাকে কি একটা ধমক দিয়ে উঠলেন। সে ভাণ করা ভয়ের স্বরে ব'লে উঠল—ও বাবা! মারবে না কি?—বলেই পিছিয়ে এল। ছেলের দলের মধ্যে একটা হাসির ঢেউ পড়ে গেল।

এক জন বললে—আবার কি রকম ইংরিজি বলচে দ্যাখ—

আমি ও সীতা কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছি। আমরা কেউ কোনো কথা বলছি নে।

আর একটু বেলা হ'লে জ্যাঠামশায় কি পরামর্শ করলেন সব লোকজনের সন্ধে—আমার মাকে উদ্দেশ্য ক'রে বললেন—বৌমা সবই তো দেখতে পাচ্চ—তোমাদের কপাল ছাড়া আর কি বলব। ভূষণকে এখন বেঁধে রাখতে হবে—সেই মতই সবাই করেচেন। ছেলেপিলের বাড়ি—পাড়ার ভেতরকার কাণ্ড—ওরকম অবস্থায় কখন কি ক'রে বসে, তা বলা যায় না...তা তোমায় একবার বলাটা দরকার তাই—

আমার মনে বড় কষ্ট হ'ল—বাবাকে বাঁধবে কেন? বাবা তো এক বকুনি ছাড়া আর কারুর কিছু অনিষ্ট করতে যাচ্ছেন না? কেন তবে—

আমার মনের ভাব বাক্য খুঁজে পেলে না প্রকাশের—মনেই রয়ে গেল। বাবাকে সবাই মিলে বাঁধলে। আহা, কি কসে কসেই বাঁধলে! অল্প দড়ি কোথাও পাওয়া গেল না বা ছিল না—জ্যাঠামশায়দের খিড়কী পুকুর ধারের গোয়াল বাড়ি থেকে গরু বাঁধবার দড়ি নিয়ে এল—তাই দিয়ে বাঁধা হ'ল।

আমার মনে হ'ল অতটা জোর ক'রে বাবাকে বাঁধবার দরকার কি! বাবার হাতের শির দড়ির মত কুলে উঠেচে যে। সেজকাকাকে চুপিচুপি বললুম—কাকাবাবু, বাবার হাতে লাগচে, অত কসে বেঁধেচে কেন? বলুন না ওদের?

কাকা সে-কথা জ্যাঠামশায়কে ও নিতাইয়ের বাবাকে বললেন—তুমিও কি খেপলে নাকি রমেশ? হাত আলগা থাকবে পাগলের?...তা হলে পা খুলতে কতক্ষণ—তারপরে আমার দিকে চেয়ে জ্যাঠামশায় বললেন—যাও জিতু বাবা—তুমি বাড়ির ভেতর যাও—নয় তো এখন বাইরে গিয়ে বসো।

আবার বাবার হাতের দিকে চেয়ে দেখলুম—দাঁড়র দাগ কেটে বসে গিয়েচে বাবার হাতে। সেই রকম তুলো-মাথা অদ্ভুত মূর্তি! ..

বাইরে গিয়ে আমি একা গায়ের পেছনের মাঠের দিকে চলে গেলুম—একটা বড় তেতুলগাছের তলায় শরা ছপুর ও বিকেল ৮প ক'রে বসে রইলুম।

৪

দিনকতক এই ভাবে কাটল। তার পর পাড়ার দু-পাচ জন লোকে এসে জ্যাঠামশায়ের সন্ধে কি পরামর্শ করলে। বাবাকে কোথায় তারা নিয়ে গেল সবাই বললে কলকাতায় হাসপাতালে নিয়ে গেছে। তারা ফিরেও এল, শুনলুম বাবাকে নাকি হাসপাতালে ভর্তি ক'রে নিয়েচে। শীগ্গিরই সেরে বাড়ি ফিরবেন। আমরা আশ্বস্ত হ'লুম।

দশ-বার দিন পরে একদিন বিকেলের দিকে আমি ও সীতা পথে খেলা করছি, এমন সময়ে সীতা বললে—ঐ যে বাবা!... দূরে পথের দিকে চেয়ে দেখি বাবাই বটে। ছুটে আমরা বাড়িতে মাকে খবর দিতে গেলুম। একটু পরে বাবা বাড়ি ঢুকলেন—এক হাঁটু ধুলো, কক্ষ চুল। ওপর থেকে জ্যাঠাইমা নেমে এলেন, কাকারা এলেন। বাবাকে দেখে সবাই চটে গেলেন। সবাই বুঝতে পারলে বাবা এখনও সারেন নি, তবে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসার কি দরকার?

বাবা একটু বসে থেকে বললেন ভাত আছে? কাল ওই দিকের একটা গায়ে ছপুরে ছুটো খেতে দিয়েছিল, আর কিছু খাইনি সারাদিন, খিদে পেয়েচে। কলকাতা থেকে পায়ে

হেঁটে আস্চি—ছেলেপিলে ছেড়ে থাকতে পারলাম না—চলে এলাম।

একটু পরেই বোঝা গেল বাবা হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এসেছেন এবং যেমন পাগল তেমনি আছেন। এবার আমাদেরও রাগ হ'ল—মায়ের কথা বলতে পারিনে, কারণ তাঁকে রাগ প্রকাশ করতে কখনও দেখিনি—কিন্তু আমি সীতা দাদা স্নিন ভাই বোনে খুবই চটলাম।

আমাদের চটবার কারণও আছে—খুব সঙ্গত কারণই আছে। আমাদের প্রাণ এখানে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বাবা আরার পুরোমাত্রায় পাগল হয়ে উঠলেন—তিনি দিন রাত বসে বসে বকেন আর কেবল যেতে চান। মা দুটি বাসি মুড়ি, কোনো দিন বা ভিজ়ে চাল, কোনো দিন শুধু একটু গুড়—এই খেতে দেন। তাও সব দিন বা সব সময় জোড়ানো কষ্টকর। আমরা দুপুরে খাই তো রাতে আর কিছু খেতে পাইনে—নয়ত সারাদিন পরে হয়ত সন্ধ্যার সময় খাই। মা কোথা থেকে চাল জোগাড় করে আনেন আমরা জানিনে—কখনও জিগ্যেসও করিনি। কিন্তু বাড়িতে আর আমাদের তিষ্ঠবার যো নেই। বাড়িসুদ্ধ লোক আমাদের গুপ্তর বিরূপ—দু-বেলা তাদের অনাদর আর মুখনাড়া সহ্য করা আমাদের অসহ্য হয়ে উঠেছে। চা-বাগানের দিনগুলোর কথা মনে হয়, সেখানে আমাদের কোনো কষ্ট ছিল না—অবস্থা ছিল অত্যন্ত সচ্ছল—ছেলেবেলায় সীতাকে ভুটিয়া চাকরে নিয়ে বেড়াত আর থাপা মানুষ করেছিল আমাকে। ছ-বছর বয়েস পর্যন্ত আমি থাপার কাঁদে উঠে বেড়াতাম মনে আছে। আমাদের এই বর্তমান দুর্বস্থার জন্ম বাবাকে আমরা মনে মনে দায়ী করেছি। বাবা কেন আবার ভাল হয়ে সেরে উঠুন না? তা হ'লে আর আমাদের কোনো দুঃখই থাকে না। কেন বাবা গুরুকম পাগলামি করেন? ওতে লজ্জায় যে ঘরে-বাইরে আমাদের মুখ দেখাবার যো নেই।

সে-দিন সকালে সেজখুড়ীমা এসে আমাদের সঙ্গে খুব ঝগড়া বাধালেন। মেজখুড়ীমাও এসে যোগ দিলেন। তাঁদের বাগানে বাতাবী নেবুগাছ থেকে চার-পাঁচটা পাকা নেবু চুরি গিয়েছে। খুড়ীমা এসে মাকে বললেন—এ আমাদেরই কাজ—আমরা খেতে পাইনে, আমরাই নেবু চুরি করে ঘরে রেখেছি। তাঁরা সবাই মিলে আমাদের ঘর খানাতল্লাসী করতে চাইলেন।

মা বললেন—এসে দেখে যান মেজদি, আমার ঘরে তো লোহার সিন্দুক নেই যেখানে আমার ছেলেমেয়েরা নেবু লুকিয়ে রেখেচে—এসে দেখুন—

শেষ পর্যন্ত বাবা ঘরে আছেন ব'লে তাঁরা ঘরে ঢুকতে পারলেন না, কিন্তু সবাই ধরেই নিলেন যে, নেবু আমাদের ঘরেই আছে, খানাতল্লাসী করলেই বেরিয়ে পড়ত। খুব ঝগড়া-ঝাঁটি হ'ল—তবে সেটা হ'ল একতরফা, কারণ এ-পক্ষ থেকে তার জবাব কেউ দিলে না।

জ্যাঠাইমা এ-বাড়ির কত্রী, তাঁকে সবাই মেনে চলে, ভয়ও করে। তিনি এসে বললেন—হয় তোমরা বাড়ি থেকে চলে যাও নয়ত ঘরের ভাড়া দাও।

সীতা এসে আমাকে বললে—জ্যাঠাইমা এবার বাড়িতে আর থাকতে দেবে না, না দেবে না দেবে, আমরা কোথাও চলে যাই চল দাদা।

দিন দুই পরে জ্যাঠামশাইদের সঙ্গে কি একটা মিটমাট হ'ল। ঠিক হ'ল যে দাদা চাকরির জোগাড় করতে কলকাতায় যাবে, ঘরে আমরা আপাততঃ কিছুকাল থাকতে পাব। কিন্তু বাড়ির ওপাড়ার সবাই বললে—পাগলটাকে আর বাড়ি রেখে দরকার নেই, ওকে জলেজলে কোথাও ছেড়ে দিয়ে আয়।

সত্যি কথা বলতে গেলে বাবার ওপর আমাদের কাকুর আর মমতা ছিল না। বাবার চেহারাও হয়ে উঠেছে অদ্ভুত। একমাথা লম্বা চুল জট পাকিয়ে গিয়েছে—আগে আগে মা নাইয়ে দিতেন, আজকাল বাবা কিছুতেই নাইতে চান না, কাছে যেতে দেন না, কাপড় ছাড়েন না—গায়ের গন্ধে ঘরে থাকা অসম্ভব। মা এক দিনও রাতে ঘুমুতে পারেন না—বাবা কেবলই ফাইফরমাজ করেন—জল দাও, পান দাও—আর কেবলই বলেন গিদে পেয়েচে। কখনও বলেন চা ক'রে দাও। না পেলেই তিনি আরও পেপে গঠেন—এক মা ছাড়া তখন আর কেউ সামলে রাখতে পারে না—আমরা তখন ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাই, মা বুঝিয়ে-সুজিয়ে শাস্ত করে চূপ করিয়ে রাখেন, নয়ত জোর ক'রে বালিশে গুইয়ে দিয়ে বাতাস করেন, পা টিপে দেন—কিন্তু তাতে বাবা সাময়িক চূপ ক'রে থাকেন বটে, ঘুমোন না। পাগল হয়ে পর্যন্ত বোধ হয় একদিনও বাবার ঘুম হয়নি। নিজেও

ঘুমুবেন না, কাউকে ঘুমুতে দেবেনও না—সারারাত চীৎকার, বকুনি, ইংরিজি বক্তৃতা, গান—এই সব করবেন। সবাই বলে ঘুমুলে না-কি বাবার রোগ সেরে যেত।

শেষ পর্য্যন্ত হয়ত মা মত দিয়েছিলেন, হয়ত বলেছিলেন—তোমরা যা ভাল বোঝ করো বাপু। মোটের ওপর এক দিন স্কুলে দাদা এসে বললে—সকাল সকাল বাড়ি চল আজ জিতু—আজ বাবাকে আড়াগাঁয়ের জলার ধারে ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে—তুই আমি নিতাই সিধু আর মেজকাকা যাব।

একটু পরে আমি ছুটি নিয়ে বেরুলাম। গিয়ে দেখি মা দালানে বসে কাঁদছেন, আমরা বাবার আগেই নিতাই এসে বাবাকে নিয়ে গিয়েচে। আমরা খানিক দূরে গিয়ে ওদের নাগাল পেলাম—পাড়ার চার-পাঁচ জন ছেলে সঙ্গে আছে, মধ্যখানে বাবা। ওরা বাবার সঙ্গে বাজে বকুচে—শিকারের গল্প করচে, বাবাও খুব বকুচেন। নিতাই আমাকে বাবার সামনে যেতে বারণ করতে আমি আর দাদা পেছনেই রইলাম। ওরা মার্চের রাস্তা ধরে অনেক দূর গেল, একটা বড় বাগান পার হ'ল, বিকেলের পড়ন্ত রোদে ঘেমে আমরা সবাই নেয়ে উঠলাম। রোদ যখন পড়ে গিয়েচে তখন একটা বড় বিলের ধারে সবাই এসে পৌছলাম। নিতাই বললে—এই তো আড়াগাঁয়ের জলা—চল, বিলের ওপারে নিয়ে যাই—ওই হোগলা বনের মধ্যে ছেড়ে দিলে আর পথ খুঁজে পাবে না রাস্তিরে। আমরা কেউ ওপারে গেলুম না—গেল স্খু সিধু আর নিতাই। খানিকটা পরে ওরা ফিরে এসে বললে চল পালাই—তোর বাবাকে একটা সিগারেট খেতে দিয়ে এসেচি—বসে বসে টান্চে। চল ছুটে পালাই—

সবাই মিলে দৌড় দিলাম। দাদা তেমন ছুটেতে পারে না, কেবলই পেছনে পড়তে লাগল। সন্ধ্যার ঘোরে জলা আর জঙ্গলের মধ্যে পথ খুঁজে পাওয়া যায় না—এক প্রহর রাত হয়ে গেল বাড়ি পৌছতে। কিন্তু তিন দিনের দিন বাবা আবার বাড়ি এসে হাজির। চেহারার দিকে আর তাকানো যায় না—কাদা-মাখা ধুলো-মাখা অতি বিকট চেহারা। বেল না কি ছেড়ে খেয়েচেন—সারা মুখে, গালে বেলের আটা ও শাস মাখানো। মা নাইয়ে-ধুইয়ে ভাত খেতে দিলেন, বাবা খাওয়া-দাওয়ার পর সেই

যে বিছানা নিলেন, দু-দিন চার দিন ক'রে ক্রমে পনের দিন কেটে গেল, বাবা আর বিছানা থেকে উঠলেন না। লোকটা যে কেন বিছানা ছেড়ে ওঠে না—তার কি হয়েছে—এ-কথা কেউ কোনো দিন জিগ্যেসও করলে না। মা যে-দিন যা জোটে খেতে দেন, মাঝে মাঝে নাইয়ে দেন—পাড়ার কোনো লোকে ঠিকি মেরেও দেখে গেল না।

জ্যাঠামশাইরা হতাশ হয়ে গিয়েচেন। তাঁরা আর আমাদের সঙ্গে কথা কন না, তাঁদের ঘরে-দোরে ওঠা আমাদের বন্ধ। আমরা কথা বলি চুপি চুপি, চলি পা টিপে টিপে চোরের মত, বেড়াই মহা অপরাধীর মত—পাছে ওঁরা রাগ করেন, বিরক্ত হন, আবার ঘর থেকে তাড়িয়ে দিতে আসেন।

এক দিন না খেয়ে স্কুলে পড়তে গিয়েচি—অন্য দিনের মত টিফিনের সময় সীতা খাবার জন্তে ডাকতে এল না। প্রায়ই আমি না খেয়ে স্কুলে আসতাম, কারণ অত সকালে মা রান্না করতে পারতেন না—রান্না শুধু করলেই হ'ল না, তার জোগাড় করাও তো চাই। মা কোথা থেকে কি জোগাড় করতেন, কি ক'রে সংসার চালাতেন, তিনিই জানেন। আমি কখনও তা নিয়ে ভাবিনি। আমি ক্ষুধাতুর অবস্থায় বেলা একটা পর্য্যন্ত ক্লাসের কাজ ক'রে যেতাম আর ঘন ঘন পথের দিকে চাইতাম এবং রোজই একটার টিফিনের সময় সীতা এসে ডাক দিত—দাদা ভাত হয়েছে, খাবে এস।

এ-দিন কিন্তু একটা বেজে গেল, দুটো বেজে গেল, সীতা এল না। ক্লাসের কাজে আমার আর মন নেই—আমি জানালা দিয়ে ঘন ঘন বাইরে পথের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছি। আরও আধ ঘণ্টা কেটে গেল, বেলা আড়াইটা। এমন সময় কলুদের দোকানঘরের কাছে সীতাকে আসতে দেখতে পেলাম। আমার ভারি রাগ হ'ল, অভিমানও হ'ল। নিজেরা সব খেয়েদেয়ে পেট ঠাণ্ডা ক'রে এখন আসছেন!

মাষ্টারের কাছে ছুটি নিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে গেলাম। সীতার দিকে চেয়ে দূর থেকে বললাম—বেশ দেখছি—আমার বুঝি আর খিদে-তেষ্টা পায় না? কটা বেজেচে জানিস?

সীতা বললে—বাড়ি এস ছোড়দা, তোমার বই দপ্তর নিয়ে ছুটি ক'রে এস গে—

আমি বললাম—কেন রে?

সীতা বললে—এস না, ছুটির আর দেরি বা কত? তিনটে বেজেচে।

আমার মনে হ'ল একটা কি যেন হয়েছে। স্কুল থেকে বেরিয়ে একটু দূর এসেই সীতা বললে—বাবা মারা গিয়েচে ছোড়া।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম—সীতার মুখের দিকে চেয়ে সে যে মিথ্যে কথা বলচে এমন মনে হ'ল না। বললাম—কখন?

সীতা বললে বেলা একটার সময়—

নিজের অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—নিয়ে গিয়েচে তো?

অর্থাৎ গিয়ে মৃতদেহ দেহতে না হয়। কিন্তু সীতা বললে—না, নিয়ে এখনও কেউ খাইনি। মা একা কি করবে?... জ্যাঠামশাই বাড়ি নেই—ছোটকাকা একবার এসে দেখে চলে গেলেন—আর আসেন নি। মেজকাকা পাড়ায় লোক ডাকতে গেছেন।

বাড়িতে ঢুকতেই মা বললেন—ঘরের মধ্যে আয়—মড়া ছুঁয়ে বসে থাকতে হবে, বোস্ এখানে। কেউই কাঁদচে না। আমারও কান্না পেল না—বরং একটা ভয় এল—একা মড়ার কাছে কেমন ক'রে কতক্ষণ বসে থাকব না জানি!

অনেকক্ষণ পরে শুনতে পেলুম আমাদের পাড়ার কেউ মৃতদেহ নিয়ে যেতে রাজী নয়, বাবা কি রোগে মারা গেছেন কেউ জানে না, তাঁর প্রার্থনিত্ত করানো হয়নি মৃত্যুর পূর্বে—এ অবস্থায় কেউ সংকার করতে রাজী নয়। প্রার্থনিত্ত এখন না করলে কেউ ও-মড়া ছোঁবে না।

প্রার্থনিত্ত করাতে পাঁচ-ছ টাকা না-কি খরচ। আমাদের হাতে অত তো নেই? মা বললেন। কে যেন বললে—তা এ অবস্থায় হাতে না থাকলে লোকের কাছে চেয়ে-চিন্তে আন্তে হয়, কি আর করা?

দাদাকে মা ও-পাড়ায় কার কাছে যেন পাঠালেন টাকার জন্তে। খানিকটা পরে ও-পাড়া থেকে জনকতক যণ্ডামত লোক এল—শুনলাম তারা গালাগালি দিতে দিতে বাড়িতে ঢুকচে—এমন ছোটলোকের পাড়াও তো কখনও দেখিনি? কোথায় পাবে এরা যে প্রাচিন্তির করাবে? প্রাচিন্তির না হ'লে মড়া কি সারা দিন রাত ঘরেই পড়ে থাকবে? যত

ছোট লোক সব—কোনো ভয় নেই, দেখি মড়া বার হয় কিনা।

আমি উত্তেজনার মাথায় মড়া ছুঁয়ে বসে থাকার কথা ভুলে গিয়ে তাড়াতাড়ি দোরের কাছে এসে দাঁড়লাম। এদের মধ্যে আমি এক জনকে কেবল চিনি—মাঠবাড়ির ফুটবল খেলার ময়দানে দেখেছিলাম।

ওরা নিজেরাই কোথা থেকে বাঁশ কেটে নিয়ে এল—পাট নিয়ে এসে দড়ি পাকালে, তারপর বাবাকে বার ক'রে নিয়ে গেল দাদা গেল সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানে। একটু পরে সন্ধ্যা হ'ল। সেজখুড়ীমা এসে বললেন—মুড়ি খাবি জিতু? আমি ও সীতা মুড়ি খেয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

* * *

তিন বছর আগেকার কথা এ-সব। তারপর থেকে এই বাড়িতেই আছি। জ্যাঠামশাইরা প্রথমে রাজা হননি, দাদা যষ্টীতলাম বটগাছের নীচে মুদীখানার দোকান করেছিল—সামান্য পুঁজি, আড়াই সের চিনি, পাঁচ সের ডাল, পাঁচ সের আটা, পাঁচ পোয়া বাল-মসলা—এই নিয়ে দোকান কতদিন চলে? দাদা ছেলেমানুষ, তা ছাড়া ঘোরপেচ কিছু বোনে না, এক দিক থেকে সব ধারে বিক্রী করেচে, যে ধারে নিয়েচে সে আর ফিরে দোকানের পথ মাড়ায় নি। দোকান উঠে যাওয়ার পরে দাদা চাকারর চেঁচায় বেরুলে! সে তার ছোট মাথায় আমাদের সংসারের সমস্ত ভাবনা-ভার তুলে নিয়ে বাবার প্রতির্নিধি রূপে আমাদের খাওয়া-পরানোর দুশ্চিন্তায় রাতে ঘুমুতো না, সারা দিন চাকরি খুঁজে বেড়াত। নগির কারখানায় একটা সাত টাকা মাইনের চাকরি পেলেও—কিন্তু বেশী দিন রইল না, মাস দুই পরে তারা বললে—বাবশার অবস্থা খারাপ, এখন লোকের দরকার নেই।

সুতরাং জ্যাঠামশায়দের সংসারে মাথা গুঁজে থাকা ছাড়া আমাদের উপায়ই বা কি? নিতান্ত লোকে কি বলবে এই ভেবে এঁরা রাজী হয়েছেন। কিন্তু এখানে আমাদের খাপ খায় না—এখানে মাত্র যে শুধু এ বাড়িতে তা নয়, এ দেশটার সঙ্গেই খাপ খায় না। বাংলা দেশ আমাদের কারও ভাল লাগে না—আমার না, দাদার না, সীতার না, মায়েরও না। না দেশটা দেখতে ভাল, না এখানকার লোকেরা ভাল। আমাদের চোখে এ দেশ বড় নীচু, আঁটসাঁটা,

ছোট ব'লে মনে হয়—যে-দিকেই চাই চোখ বেধে যায়, হয় ঘরবাড়িতে, না-হয় বাঁশবনে আমবনে। কোথাও উচু-নীচু নেই—একঘেয়ে সমতলভূমি, গাছপালারও বৈচিত্র্য নেই। আমাদের এ গাঁয়েই যত গাছপালা আছে, তার বেশীর ভাগ এক ধরণের ছোট ছোট গাছ, এরা নাম বলে আশশেওড়া, তাদের পাতায় এত ধুলো যে সবুজ রং দিনরাত চাপা পড়ে থাকে। এখানে সব যেন দীনহীন, সব যেন ছোট মাপকাঠির মাপে গড়া।

আমাদের দিক থেকে তো গেল এই ব্যাপার। ওঁদের দিক থেকে ওঁরা আমাদের পর ক'রে রেখেছেন এই তিন-চার বছর ধরেই। ওঁদের আপনার দলের লোক ব'লে ওঁরা আমাদের ভাবেন না। আমরা খিরিষ্টান, আচার জানিনে, হিন্দুয়ানী জানিনে—জংলী জানোয়ার সামিল, গারো পাহাড়

অসভ্য মানুষদের সামিল। পাহাড়ী জাতিদের সম্বন্ধে ওঁরা যে খুব বেশী জানেন, তা নয়—এবং জানেন না ব'লেই তাদের সম্বন্ধে ওঁদের ধারণা অদ্ভুত ও আজগবী ধরণের।

এদেশে শীতকাল নেই—মাস দুই তিন একটু ঠাণ্ডা পড়ে। তা ছাড়া সারা বছর ধরে গরম লেগেই আছে—আর সে কি সাংঘাতিক গরম। সে গরমের ধারণা ছিল না কোনো কালে আমাদের। রাতের পর রাত ঘুম হয় না, দিনমানেও ধামে বিছানা ভিজে যায় ব'লে ঘুম হয় না। গা জ্বলে, মাথার মধ্যে কেমন করে, রাত্রে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে এক এক দিন। তার ওপরে মশা। কি স্নেহেই লোকে এ-সব দেশে বাস করে!

(ক্রমশঃ)

সিংহলের চিত্র

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

সিংহলে বৌদ্ধধর্মের প্রচার

দেবনামপিয় তিসস: ৩০৭ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে সিংহলের সিংহাসনে আরোহণ করিলে তাঁহার বন্ধু ভারত-সম্রাট অশোককে বহুমূল্য উপঢৌকন প্রেরণ করেন। সম্রাট অশোকও বহুমূল্য উপহার পাঠাইয়া তিসসকে নিজের সৌহাদ্য জানান এবং সঙ্গে এই সংবাদও পাঠান ‘আমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সজ্জ্বর আশ্রয় লইয়াছি, শাক্যবংশীয়দের ধর্মে আমার আস্থা ও ভক্তি। হে নৃপতি, এই সত্য ধর্মে আপনার বিশ্বাস হউক এবং মুক্তির জন্ম আপনি ইহাতে আশ্রয় লউন।’ এই বার্তা লইয়া অশোকের পুত্র মহেন্দ্র সিংহলে গমন করিয়াছিলেন।

বুদ্ধের লঙ্কাদ্বীপে আগমন

প্রাচীন ইতিহাস মহাবংশে উল্লেখ আছে, বুদ্ধ অনেক বার সিংহলে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার যদিও

ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই, তবুও সিংহলের বৌদ্ধগণ এই আখ্যায়িকা বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

উল্লেখ আছে যে বুদ্ধ মহেন্দ্রের জন্ম পূর্ব হইতেই স্থান প্রস্তুত করিয়া রাখেন, কারণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল, লঙ্কাদ্বীপে তাঁহার ধর্ম গৌরবান্বিত হইবে। লঙ্কাদ্বীপে পূর্বে ছিল যক্ষদের (যক্ষ) বাস। বুদ্ধ তাঁহাদিগকে দ্বীপ হইতে বাহির করিয়া দেন। যক্ষরা যেখানে সমবেত হইত বুদ্ধ সেখানে আকাশপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আকাশে ঝড় বিদ্যুৎ অন্ধকার আনিয়া যক্ষদের মনে শঙ্কা জন্মাইলেন।* যক্ষরা ভীত হইয়া রূপা প্রার্থনা করিল, বুদ্ধ বলিলেন, “তোমাদের মুক্তি দিব, যেখানে আমি তোমাদের সকলের অমুমতি অনুসারে অবতরণ করিতে পারি এমন স্থান

* যক্ষদ্বীপদাসীরা বিশ্বাস করে বুদ্ধ পদ্মপত্রে ভাসিয়া যক্ষদ্বীপে আসিয়াছিলেন ধর্ম প্রচার করিতে, বরভূধরে এরূপ মূর্তি খোদিত আছে।

দাও।” যক্ষরা বলিল সমগ্র দ্বীপই তাহা বা বুদ্ধের জন্ম ছাড়া দিতে পারে। বুদ্ধ তখন মাটিতে অবতরণ করিয়া আসনে বসিলেন, অমনি আসনের চারিদিকে আগুন জলিয়া উঠিল এবং ক্রমশঃ দূরে দূরে ছড়াইতে লাগিল। তখন যক্ষরা ভীত হইয়া সমুদ্রতীরে দৌড়াইয়া গেল। বুদ্ধ তখন সমুদ্রের স্তম্ভব ‘গিবি’ দ্বীপকে তীব্র নিকট লইয়া আসিলেন, যক্ষরা সেই দ্বীপে গিয়া প্রাণবক্ষা করিল। ‘গিবি’ দ্বীপ তখন এই নতন অধিবাসীদের লইয়া সমুদ্রের ভিতর পরিস্থানে সরিয়া গেল, যক্ষরা তাড়িত হইলে বুদ্ধ নিজে আসন উঠাইয়া লইলেন। দেবতা-সকল তখন বুদ্ধের নিকটে সমবেত হইলেন। বুদ্ধ শাহাদিগকে নিজে ধম্মে দীক্ষিত করিলেন। বর্তমানে যে শৈল এডাম্‌স পিক নামে অভিহিত তার অধিপতি ছিল দেবতা স্তম্ভ, বুদ্ধ তাহাকে নিজে কেশের এক গুচ্ছ দান করিলেন। স্তম্ভ সোনার কোটায় নেশের গুচ্ছ রাখিয়া তাহা উপব মবকত মণির স্তূপ নিষ্কাশন করিয়া দিল।

আদিম অধিবাসীরা ছিল নাগপূজক। বুদ্ধ দ্বিতীয় বাব



বোধিবৃক্ষ—অনুরাধাপুর

যখন আসেন তখন নাগবাজকে দীক্ষা দিয়াছিলেন, বৎসর কয়েক পর বুদ্ধ লঙ্কাদ্বীপে আবার আসিলে নাগরাজ কেলানীতে

(কল্পে হইতে ৬ মাসের দূরে, এখানে একটি পুৰাতন বিহার আছে। একটি ভোজ দ্বারা তাহাকে অভ্যর্থনা করেন। এই আগমন চিবস্ববণীয় কাব্যে রাখা জন্ম বুদ্ধ আকাশে উঠিলেন এবং স্তম্ভ পরিত্যক্ত (এডাম্‌স পিক) শিখরে পায়ের ছাপ



মহাসেখা দাখানা মিহিনতাল

রাখিয়া গেলেন। আশ্রয় হাজার বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, এখনও হাজার হাজার তীর্থযাত্রী এই পবিত্রশিখরে আবেষ্ণন করে এবং বুদ্ধের পদচিহ্নকে পূজা করিয়া থাকে।

এডাম্‌স পিক

এডাম্‌স পিক সিংহলের মধ্যভাগে অবস্থিত, সাড়ে সাড়ে হাজার ফুট উচ্চ হইবে। উপবিভাগ সমতল, বোণানতি—বর্তবর্তী জাপানের ফজিয়ামান মত দেখিতে। নরম মাটির উপরে যে বকম পাচ আঙুলের ছাপ পড়ে, সে বকম পাথরের উপরে পায়ের ছাপ—গোড়ালি হইতে আঙুলের ডগা পর্যন্ত চার-পাচ ফুট লম্বা হইবে। বৌদ্ধরা এই পায়ের ছাপকে বুদ্ধের বলিয়া উল্লেখ করে, হিন্দুরা বলে বিষ্ণুর, মুসলমান ও খ্রীষ্টানেরা বলিয়া থাকে আদমের। মানবের আদিপিতা আদম জ্ঞানবুদ্ধের মূল খাইয়া স্বর্গ হইতে দেবদত্ত বহুক বিতাড়িত হইয়া এই শৈলশিখরে পতিত হন, তাই আদমের পায়ের ছাপ। বছরের বিশেষ

সময়ে তীর্থযাত্রীরা বৌদ্ধ হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলেই এখানে দর্শন করিতে আসে। অন্য সময়ে ঝড় বজ্রপাত ও হিংস্র পশুর আধিক্যের জন্ত এডাম্‌স্ পিক্ ছুরধিগম্য। অতি প্রত্যুষে শৈলশিখরে পৌঁছিতে হয়, সেজন্য রাত্রে মশালহস্তে



দেবানামপিয় তিস্‌স-এর মূর্তি—মিহিনতাল

পর্বতারোহণ করিতে হয়। সে এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য— অন্ধকারে পাহাড়ের গায়ে দীপের মালা মেঘে ঢাকিয়া অদৃশ্য হইতেছে, ক্ষণেক পরে প্রকাশিত হইতেছে; মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন দৃশ্যের অবতারণা! মাঝে মাঝে যাত্রীদের বিশ্রামের জন্ত পান্‌শালা অর্থাৎ পাঁশশালা আছে, এগুলি পুণ্যাভিলাষী সিংহলীরা নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছে; নারিকেল পাতায় ছাওয়া, ভিতরে বসিবার জন্ত দাঁশের বেঞ্চ আছে। পান্‌শালাতে গরম কাফি বিতরিত হয়। পথশ্রমে ক্লান্তি এবং রাত্রে পাহাড়ের শৈত্যের ভিতর এই গরম কাফিটুকু যে কি আরামপ্রদ, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অতি প্রত্যুষে শৈলশিখরে আরোহণ করিলে দেখা যায় আলোর খেলা, রঙের মেলা—

চতুর্দিকে দিকচক্রবাল ঘিরিয়া আলোর বন্যা। এডাম্‌স্ পিক্ হঠাৎ উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে—চতুর্দিকে অনেক নীচে—সমুদ্রের মত নানা রঙের পাহাড়ের ঢেউ দিকচক্রবালে গিয়া মিশিয়াছে। কোথাও সব মেঘের যবনিকায় ঢাকা—কোথাও বা যবনিকা ছিঁড়িয়া ঘন নীল শৈলশ্রেণীর প্রকাশ। এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয়ান প্রভৃতির সম্মিলিত যাত্রা এবং সকলের একই স্থানে পূজা। পৃথিবীতে এবং কোন কালে বোধ হয় এরূপ ঘটনার সমাবেশ হয় নাই। সকলেই নিজের অভীষ্ট দেবতার উদ্দেশে চলিয়াছে; কারও সঙ্গে কারও বিবাদ-বিসম্বাদ নাই।



মিহিনতালের সিঁড়ি

যাত্রাকালে বৌদ্ধরা উচ্চারণ করিতেছে “সাদু” “সাদু”, হিন্দুরা “হর” “হর”, মুসলমানেরা “আল্লা হো আকবর”।

মিহিনতাল

মিহিনতাল শৈল ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্রের স্মৃতিপুত! এখানেই প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। অমুরাধাপুর হইতে মিহিনতাল শৈল ৮ মাইল দূরে, অরণ্যের ভিতর দিয়া পথ।

বৃহৎ সর্বোবর নয়ব বেণ্ডা (Nuwara Wewa) পথের
ধাবে। বাজধানী অনুরাধাপুর হইতে মিহিনতালের পথে
এক সময় নৃপতি ভটিকাভয় (১২ পৃঃ পৃঃ) চাদর বিছাইয়া
দিয়াছিলেন—যাহাতে তথৈতীরা বলা না মাড়াইয়া
রুগ্মানবেলি দাগোবা হইতে মিহিনতালে
যাইতে পারে। মিহিনতাল শৈল
১০০ হাজার ফিট উচ্চ। ১৮৬০
খানা পাথরের সিঁড়ি পাব হইয়া উপবে
পৌঁছিতে হয়। বাবণেব স্বর্গেব সিঁড়ি
কোথাও দেখা যায় না—এই সিঁড়িকে
“স্বর্গেব সিঁড়ি” আখ্যা দেওয়া যাইতে
পারে। দুই পাশেব বৃক্ষবাজি এবং
মাঝে মাঝে বিহাবেব প্লামসাবেশ
এই সোপানাবলিকে একটা গাভীয়া দান
কবিয়াছে। ইটালীৰ শিল্পী লবেঞ্জো
গিবার্টি (Lorenzo Ghiberty)
নির্মিত দুইটি ব্রোঞ্জেব দ্বাবে
মাহেব এঞ্জেলো ‘স্বর্গদ্বাব’ বলিয়া
আখ্যা দিয়াছেন, এই সোপানাবলিকে ঠিক তের্মান ‘স্বর্গেব
সিঁড়ি’ বল যায়।

সমগ্র মিহিনতাল এক সময় বিহাব ৬ স্তপে
গিয়াছিল। তিসস হইতে আবস্ত কবিয়া সকল বৌদ্ধ নৃপতিঃ
মিহিনতালকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ভিক্ষু, চিকিৎসক, ভাস্কর
নৃপতি চিত্রকর কারুশিল্পী, ভৃত্য ও নানা শ্রেণীর কাম্যচারী
সকলেব ব্যবস্থা বিবিধ ছিল। বাজবোয় হইতে সকলেব
বেতন ও বিহাব প্রভৃতিব জগা অর্থ নিদ্বিষ্ট ছিল। মিহিনতালে
অনেক শিলালেখ পাওয়া যায় তাহাতে পাচীনকালেব
বিবিধব্যবস্থা অনেক জানা যায়। প্রাচীন চিকিৎসাশালা ও
পাকশালাব প্লামসাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। মিহিনতালেব
অধিবাসীদের জল জলনিষ্কাশনেব সুব্যবস্থা ছিল। পাহাড়ে
মাঝে মাঝে ছোট স্বাভাবিক জলাশয় আছে—সিংহলী ভাষায়
তাহাকে পোকুন (পুকুব) বলে। মিহিনতালেব নাগ
পোকুন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাহাড়েব গায়ে পাঁচ ফণা-
ওয়াল এক বিষধব সর্প খোদাই করা, সাপেব লেজ জলেব
ভিতবে রহিয়াছে, সাপ ঘেঁষে জলের উপরে মাথা তুলিয়া বিষ

উদগীৰণ কবিতেছে। চারি দিকের শ্রামল বৃক্ষবাজি, ঝাঁঝি-
পোকাব একটানা শব্দ এবং নিৰ্জনতা এ স্থানকে রহস্যময়
কবিয়াছে। সাপ হইতেই ‘নাগ পোকুন’ এই নামের
উৎপত্তি। এই পোকুন হইতে পাথরের পয়ঃপ্রণালী ও লোহাব



মিহিনতালের একটি গুহা

নলেব সাহায্যে অগ্নয় জল লওয়াব ব্যবস্থা ছিল। এসব অবস্থা
এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নাগ পোকুনের জল অনেক দূবে
একটা চৌবাচ্চায় লওয়া হইত। চৌবাচ্চার গায়ে একটা সিংহেব
মূর্তি খোদাই করা, ১ ফিট ৪ ইঞ্চি উচ্চ। সিংহ সামনের
দুই পা তুলিয়া গায়েব বসিতেছে কাবও উপবে ঘেঁষে বাঁপ
দিয়া পড়িবে এই ভাব। এই চৌবাচ্চাব নাম ‘সিংহ পোকুন’।
চৌবাচ্চা হইতে একটা লোহার নল সিংহের মাথাব ভিতবে
প্রবেশ কবিয়াছে মুখেব ভিতবে দিয়া জল পড়ার ব্যবস্থা।
হইয়া শিল্পনেপুণ্যকল্পনাব মৌলিকতা নিশ্চয়ই খুব প্রশংসার
বিষয়। প্লামসাবেশে দাগোবা এট বিহার (Lt Vihara),
বুদ্ধেব কপালে বামচন্দ্রের পর উপরে যে একটি কেশ তার
উপরে এট স্বপ্ন নিম্নিত। আর একটি প্রাচীন দাগোবা
মহাসেয় দাগোবা। এই দুই দাগোবা খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকে
প্রস্তুত। মিহিনতালে মহেন্দ্র দেহরক্ষা করেন, তাহার
দেহাবেশেব উপর ‘আদাস্তল’ দাগোবা নিম্নিত। আদাস্তল
দাগোবাব চারিদিকে পঞ্চাশটি সরু পাথরের স্তম্ভ আছে
মিহিনতালের সর্কাপেয়া দ্রষ্টব্য ‘মহিন্দ্রগুহা’—মহেন্দ্র যেখানে

শয়ন করিতেন। গুহার দুই দিক খোলা, উপরে পাথর ছাদের মত রহিয়াছে, ভিতরে স্থান মোটেই প্রশস্ত নয়। একজন মানুষ কোনো রকমে শয়ন করিতে পারে। ‘মহিন্দ-গুহা’ হইতে দূরের উপত্যকার দৃশ্য অতিশয় মনোরম।



নাগ পে.কুন—মহিন্তাল

সমুদ্রের মত উপত্যকা দিগন্তবিস্তৃত, হরিৎ পীত ও নীল রঙের অপূর্ণ সমাবেশ। অনেক দূরে সবুজ বনের মধ্যে সরোবর দেখা যায়; রূপালী জলরেখা মকমলের মধ্যে যেন তরবারি। যোগী মহেন্দ্র প্রকৃতির এই অপূর্ণ নয়নাঙ্গীকর শোভার মধ্যে ধ্যানমগ্ন থাকিতেন।

মহিন্তালে মহেন্দ্র ও দেবানামপিয় তিস্‌স

মহাবংশে উল্লেখ আছে মহিন্তাল পর্কতে অনেক সহস্র সঙ্গী লইয়া নৃপতি তিস্‌স মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন। বর্তমানে যেখানে আশ্বাস্তল দাগোবা তাহার নিকটেই আমগাছের নীচে মহেন্দ্র বসিয়াছিলেন। নৃপতি মহেন্দ্রকে দেখিয়া দাড়াইলেন। মহেন্দ্র সস্ত্রাটকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“হে রাজন্, এই যে গাছ, এর নাম কি?”

“ইহাকে আশ্বোগাছ (আম) বলে।”

“এই গাছ ছাড়া আরও আশ্বোগাছ আছে কি?”

“আরও অনেক আশ্বোগাছ আছে।

“এই আশ্বো এবং আর ঐ সব আশ্বো ছাড়া পৃথিবীতে আরও আশ্বোগাছ আছে কি?”

“প্রভু! আরও অনেক গাছ আছে, কিন্তু সে-সব আশ্বোগাছ নয়।

“অন্য সব আশ্বোগাছ এবং অন্য সব গাছ, যারা আশ্বো-গাছ নয়, সে-সব ছাড়া আরও কিছু আছে কি?”

“কি আশ্চর্য! এই যে আশ্বোগাছ।”

“হে নরপতি, আপনি জানী।”

মহেন্দ্র তখন তিস্‌স-এর কাছে বৃদ্ধের বাণী প্রচার করিলেন, তিস্‌স সদলবলে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেন।

পুরবাসী সকলে যাহাতে “থেরো”-এর দর্শন পায়, সেজগৎ মহেন্দ্রকে রাজধানীতে রাজপ্রাসাদে লইয়া গেলেন। রাজ-প্রাসাদের প্রাঙ্গণে পুরবাসীদের ভিড়। রাজা জনতা দেখিয়া বলিলেন, “এই প্রাসাদে যথেষ্ট স্থান নাই, রাজকীয় বিরাট হস্তীশালায় স্থান হউক।” লোকেরা বলিয়া উঠিল, “হস্তীশালাও যথেষ্ট প্রশস্ত নয়,” কাজেই সকলে “নন্দন” নামক প্রমোদ-উদ্যানে গমন করিল। নন্দনের দক্ষিণদ্বার খোলা ছিল, “নন্দন” স্বরমা অরণ্যে অবস্থিত, গভীর ছায়া এবং কোমল শ্যামল তণের জগ্ন শীতল। পুরবাসী-সকল “নন্দন” উদ্যানে থেরো-এর দর্শন পাইল। তাহার নিকট বৃদ্ধের অমৃতবসী বাণী শুনিয়া নিজেদের ধন মনে করিল।

মহেন্দ্র সমবেত জনমণ্ডলীকে উপদেশ দান করিয়া “নন্দন” উদ্যানের দক্ষিণ দ্বার দিয়া বাহির হইয়া “মহামেঘ” প্রমোদ-উদ্যানে উত্তর-পশ্চিম দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেন। সেখানে এক মনোরম রাজপ্রাসাদ, অল্পম শয্যা, আসন প্রভৃতি আরামোপযোগী উপকরণ দ্বারা সজ্জিত করিয়া রাজা মহেন্দ্রকে বলিলেন “এখানে আরামে বাস করুন।” রাজা তখন মহামেঘ প্রমোদ-উদ্যান ভিক্ষুদের জগ্ন উৎসর্গ করিলেন। রাজা নিজের হাতে সোনার লাক্কল দিয়া মাটিতে দাগ কাটিয়া চারিদিকের সীমা নির্দেশ করিয়া দিলেন। সীমারেখা সমাপ্ত হইবার সময় ভূমিকম্প হইয়াছিল।

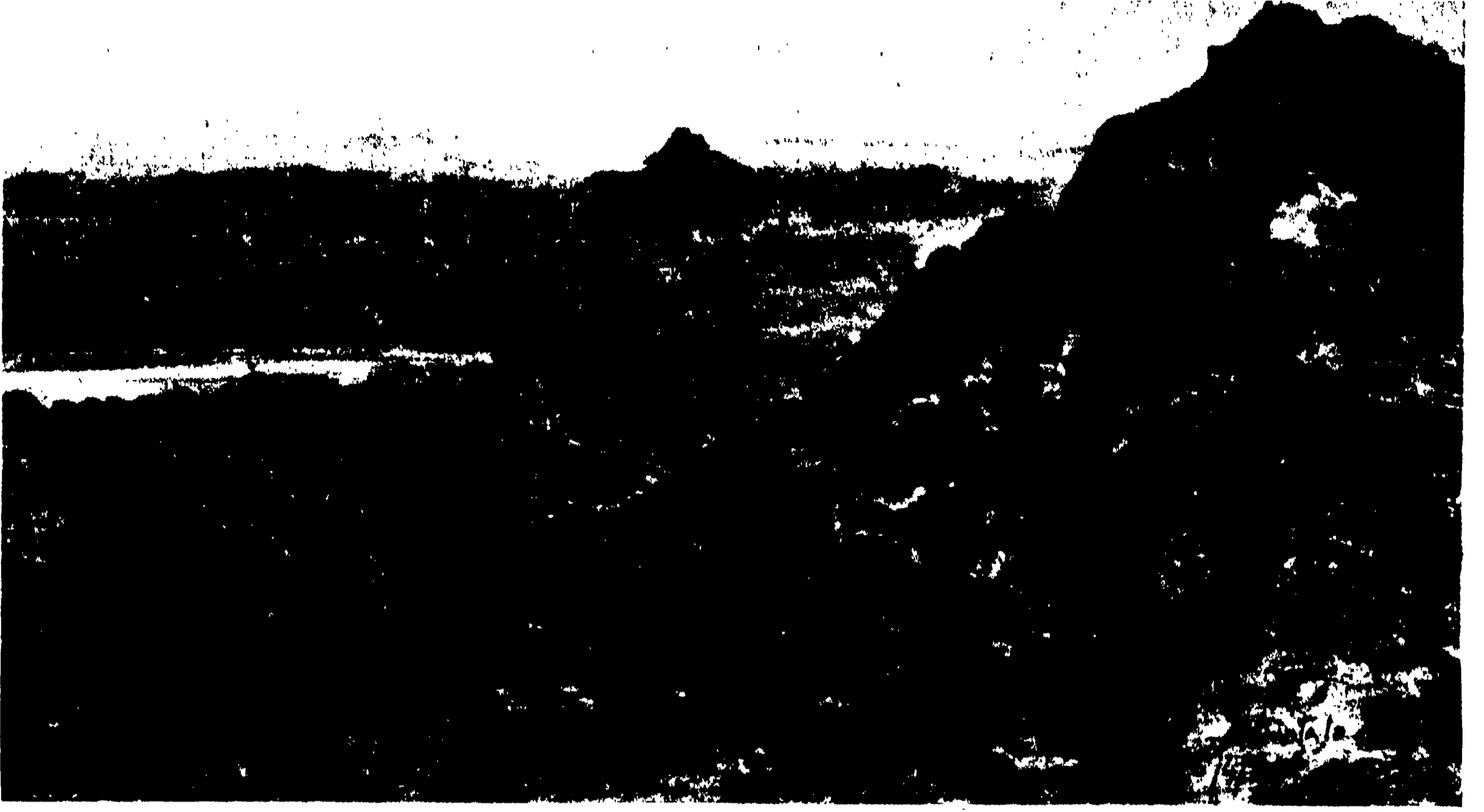
নৃপতি তিস্‌স-এর প্রধান কীর্তি অম্বরাধাপুরের বোধিবৃক্ষ।



সিংগলে মাহেন্দ্র ও সম্রাট দেবানামপির তিসস

শ্রীমণীন্দ্র-ভূষণ গুপ্ত

পবন'সী পোস, কলিকাতা



সিংহলতাল হইতে বাহিরের দৃশ্য

বুদ্ধগয়াতে যে বৃক্ষব নীচে বুদ্ধ নির্দীপনাও করিয়াছিলেন, তসম্ভাব শাখা আনাইয়া বোণা করিয়াছিলেন। ছত্র রাজ্যব বৎসরেরও অধিক হইয়া গিয়াছে, আজও এই বৃক্ষ অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে—এই বৃক্ষই এখন পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম।

রাজা এবং রাজ্যের অপরাধব সকলে বুদ্ধের সম্মুখে দাঁড়িত হইলে স্বীকোকেরাও দীক্ষালাভের ইচ্ছা জানায়। রাজকুমারী অম্বলা ও তাহার সঙ্গীরা ভিক্ষুণীর ব্রত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন। মহেন্দ্র বনে সম্মুখে দীক্ষাদানে তাহার অধিকার আছে, কিন্তু ভিক্ষুণীর ব্রতে দীক্ষা দেওয়া স্ত্রীজাতির এক জনের পক্ষেই সম্ভব। অশোকের কন্যা সংঘমিত্রা ছিলেন পাটলীপুত্রেব ভিক্ষুণীদের মধ্যে অধিনেত্রী। তাহাকে আনয়ন করার প্রস্তাব হইল। তাহাকে লঙ্কাদ্বীপে আনিতে তিস্য মন্ত্রী অধিকার পাঠান এবং অশোককে অনুরোধ করিয়া পাঠান যে, অশোক যেন এই সঙ্গে বোধিবৃক্ষের শাখা পাঠায় দেন। ইহাব পবে রাজকুমারী ভিক্ষুণী সংঘমিত্রা বোধিবৃক্ষের শাখা লইয়া লঙ্কাদ্বীপে আগমন

করেন। সংঘমিত্রা ও তাহার সঙ্গিনীদের বাসের জগু এবং সুবম্য প্রাসাদ দেওয়া হইয়াছিল, তার নাম ছিল হথালোক।

সিংহলে বোধিবৃক্ষের শাখা আনয়ন

বোধিবৃক্ষের শাখা আনয়নের অলৌকিক কাহিনীব বর্ণনা মহাবংশে আছে। শাখা স্থাপন করার জগু ১৪ টি পবিধি এবং ৮ ইঞ্চি পুরু এক সোনার পাত্র নিষ্পিত হইল।

মধ্যাহ্ন সূর্য্যোব গায় এই পাত্র দাঁপি পাইতেছিল। সেগু, সামন্ত ও ভিক্ষুদের লইয়া বোধিবৃক্ষের নিকট অশোক গমন করিলেন। বিঘাট উৎসের অগ্ৰষ্ঠান,—মণি, মুক্তা নানা প্রকার অলঙ্কার এবং পতাকা দ্বারা বোধিবৃক্ষকে সাজান হইয়াছিল। নানা সর্পের পুষ্পসজায় চতুর্দিক আয়োজিত। হাত তুলিয় সত্রাট অশোক আট দিকে প্রণাম করিলেন, পরে সোনার পাত্রটি একটি সোনার আসনে রাখিয়া নিজে বোধিবৃক্ষের উচ্চ শাখায় আরোহণ করিলেন এবং সর্গলেখনী দ্বারা শাখায় লাল সিন্দূরের দাগ টানিয়া বলিলেন, 'বোধিবৃক্ষের সর্বোচ্চ শাখা যদি লঙ্কাদ্বীপে গমন করে এবং আমার যদি

বৃক্ষের ধর্ম্মে অবিচলিত বিশ্বাস থাকে তবে এই শাখা নিজে নিজেই বিচ্ছিন্ন হইয়া এই সোনার পাত্রে আসিয়া পড়ুক।” তৎক্ষণাৎ শাখা, যেখানে সিন্দুরের দাগ টানা ছিল, সেখানে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বগন্ধ তৈলে পূর্ণ পাত্রে আসিয়া পড়িল।



সিংহ পোকন—মি. হনতাল

অশোক এই অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন; সমবেত জনমণ্ডলীও আনন্দের প্রতীকধনি করিল। ভিক্ষুগণ ‘সাদু’ ‘সাদু’ উচ্চারণ করিয়া হর্ষ প্রকাশ করিল। চারিদিকে নানা প্রকার গীতবাদ্য ধ্বনিত হইল।

স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, পাতালে, দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, দেবযোনি, ভূত, প্রেত, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকল প্রাণীর শব্দে সকল বিশ্ব নিনাদিত হইল। তার সঙ্গে প্রকৃতিও যোগ দিল, ভূমিকম্প—সব মিলিয়া যেন তুমুল প্রলয়কাণ্ড!

রাজবংশের অনেকের উপর এই শাখার ভার দিয়া পোতের উপর তুলিয়া দেওয়া হইল। সত্রাট অশোক গঙ্গাপথে এই সঙ্গে সমুদ্রসঙ্গম অবধি অহুগমন করিয়া পোত হইতে অবতরণ করিলেন। তারপর তিনি উপরের দিকে হাত তুলিয়া তীরে দাঁড়াইয়া রহিলেন; বোধিবৃক্ষের শাখার

বিদায়জনিত শোকে অধীর হইয়া গভীর আবেগে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন, অবশেষে অশাস্ত হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে করিতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

বহুদিন সমুদ্রযাত্রার পর সিংহলের তীরে পোত উপস্থিত হইল। তিস্‌স এক প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া বোধিবৃক্ষের শাখার অভ্যর্থনার জন্ত সমুদ্রতীরে বাস করিতেছিলেন। সমুদ্রপোত দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, “বৃক্ষ ধে-বৃক্ষের নীচে নির্বাণলাভ করিয়াছিলেন, সেই বৃক্ষের শাখা আসিতেছে।” তিস্‌স অধীর হইয়া সমুদ্রজলে নামিলেন এবং গলাজলে দাঁড়াইলেন। ষোল জন বিভিন্ন জাতির লোকদের দ্বারা শাখাকে পোত হইতে নামাইয়া, এক সুরম্য রথে স্থাপন করিলেন। পথে পরিষ্কার শাদা বালি ছড়ান ছিল। চৌদ্দ দিন চলার পর রথ অহুরাধাপুরে প্রবেশ করিল। পতাকা ও তোরণে পথ সাজান ছিল। দিনের শেষে ছায়া যখন দীর্ঘ, তখন এই শোভাযাত্রা মহামেঘ উদ্যানে থামিল।

স্বর্ণপাত্র রথ হইতে নামান হইলে শাখা মুহূর্ত্তের মধ্যে ৮০ হাত উর্দ্ধে উঠিয়া গেল এবং স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, ছয় রঙের জ্যোতি প্রকাশ পাইল। পৃথিবী আলোকিত করিয়া সে দীপ্তি স্বর্গ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল; সমুদ্রের ভিতরে সূর্য্য ডুবিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত সে আলোক প্রকাশিত ছিল।



বোধিবৃক্ষ (অহুরাধাপুর)

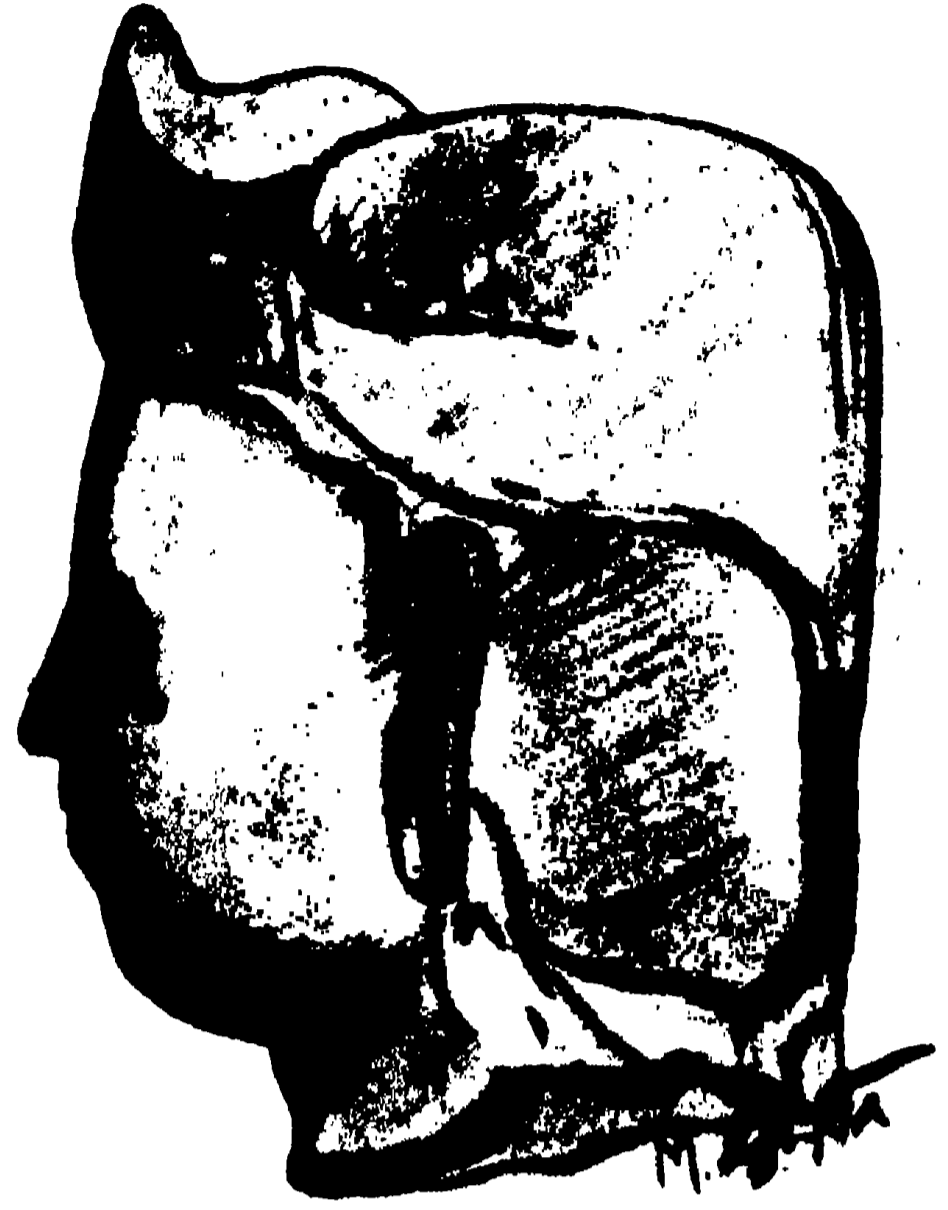
রোহিণী নক্ষত্রে বৃক্ষশাখা পুনরায় স্বর্ণপাত্রে প্রবেশ করিল এবং বৃক্ষমূল পাত্রে উপরে উঠিয়া মাটির দিবে চলিল, স্বর্ণপাত্রসমেত মূল মাটির ভিতর প্রবেশ করিল। সকলে তখন ফুল ও নানাবিধ উপাদানে বৃক্ষকে পূজা করিল। গভীর ধারায় আকাশ হইতে বৃষ্টি নামিল এবং ঘনশীতল

মেঘে বৃক্ষকে ঢাকিয়া রাখিল। সাত দিন পরে বৃষ্টি থামিলে বৃক্ষের জ্যোতি প্রকাশ পাইল।

সিংহলের বৌদ্ধদের মতে আটটি প্রধান তীর্থ আছে, তাহার মধ্যে এই বোধিবৃক্ষ অগ্রতম। সিংহলী ভাষায় এই আট তীর্থকে বলে “অটম স্থান”।

নরপতি তিস্-এর অগ্ৰাণ কীর্তি—মহাবিহার, থপারাম দাগোবা, মাহয়জন দাগোবা, ইম্বুক্ষ মুনিয়া বিহার, বেসসা গিরি দাগোবা, তিস্ বেওয়া (সরোবর) ইত্যাদি।

তিস্ ৩০৭ খৃঃ পূঃ হইতে ২৬৭ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার দীক্ষার উনিশ বছর পরে অর্থাৎ ২৮৮ খৃঃ পূঃ-তে সংঘমিত্রা বোধিবৃক্ষ লইয়া সিংহলে অবতরণ করেন। তিস্-এর মৃত্যুর আট বৎসর পর পর্যন্ত মহেন্দ্র বাঁচিয়াছিলেন অর্থাৎ ২৫২ খৃঃ পূঃ-তে দেহত্যাগ করেন। সংঘমিত্রা আরও এক বৎসর বেশী বাঁচিয়াছিলেন, অর্থাৎ ২৫৮ খৃঃ পূঃ-তে সংঘমিত্রা দেহত্যাগ করেন। অতুরাধাপুরে থপারাম দাগোবার নিকটে একটি ছোট স্তূপ আছে তাহা



দেবানামপিয় তিস্-এর মূর্তি—মিহিনতাল

“সংঘমিত্রা সোহন” নামে খ্যাত। সকলের বিশ্বাস যে, সংঘমিত্রার দেহাবশেষ এই স্তূপের নীচে আছে।

ভুবনেশ্বর

শ্রীনির্মলকুমার বসু

ভারতবর্ষের মধ্যে স্থাপত্যের জন্ম যে-সকল স্থান প্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বর তাহার মধ্যে অগ্রতম। পুরীর পথে পড়ে বলিয়া এখানে যত যাত্রীর পদধূলি পড়ে, খাজুরাহা, ওসিয়া প্রভৃতি স্থানে তত পড়ে না। অথচ দুঃখের বিষয়, এত ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও ভুবনেশ্বরের প্রাচীন ইতিহাসের সম্বন্ধে আমরা অতি অল্পই জানি।

ভুবনেশ্বরের প্রাচীন কীর্তিরাজি প্রায় চার-পাঁচ ক্রোশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। লিঙ্গরাজ মন্দিরকে যদি কেন্দ্র ধরা যায় তাহা হইলে তাহার অগ্নিকোণে চার-পাঁচ মাইল দূরে ধউলি পাহাড়ে মহারাজ অশোকের শিলালিপি অবস্থিত, অপর পার্শ্বে প্রায় অক্ষুন্নপূর্ণ দূরে ধারবেল নরপতির শিলালিপি বিশিষ্ট ধণ্ডগিরি ও উদয়গিরি পর্বত বিদ্যমান। এই দুই স্থানেই

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় অথবা দ্বিতীয় শতকের নিদর্শন রহিয়াছে। অথচ উভয়ের মধ্যস্থলে ভুবনেশ্বর গ্রামে এখন পর্যন্ত অত পুরাতন কিছু বিশেষ পাওয়া যায় নাই। যাহা আছে, এবং যাহার সন তারিখ ঠিকমত বলা যায়, তাহাও নবম খৃষ্টাব্দের চেয়ে প্রাচীন নয়। অথচ এখানে যে ধউলি ও ধণ্ডগিরির সমসাময়িক কিছুই ছিল না, একথা জোর করিয়া বলা চলে না। অস্তুতঃ কিছু ছিল কি-না তাহা আমাদের আরও ভাল করিয়া এবং নিয়মিতভাবে অনুসন্ধান করা দরকার।

মন্দিরের স্থাপত্যরীতির বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে কয়েক বৎসর পূর্বে একটি মন্দিরের গঠন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিল্পশাস্ত্রে যাহাকে রেখ-দেউল এবং যাহাকে ভদ্র-দেউল বলে বর্তমান মন্দিরটি তাহার কোনটির

মধ্যেই পড়ে না। ইহা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে মনে হয় যে মন্দিরের মধ্যে যে অতিকায় শিবলিঙ্গটি আছে, তাহাকে আচ্ছাদন করিবার জন্যই যেন কোনও রকমে, শিল্পশাস্ত্রের রীতি লঙ্ঘন করিয়া ইহা গঠিত হইয়াছিল। মন্দিরটি



চিন্তা-ব্রতা নারী

ভাস্করেখর নামে খ্যাত। ইহা কে কবে রচনা করিয়াছিলেন তাহা কিছুই জানা যায় না। তাহা সত্ত্বেও নানা কারণে ইহা ঐতিহাসিকের নিকট ভুবনেখরের অপর অনেক মন্দির অপেক্ষা সমধিক মূল্য লাভ করিয়াছে।

ভাস্করেখরের মন্দিরের মধ্যে যে লিঙ্গটি পূজিত হইতেছে তাহা প্রায় নয় ফুট উচ্চ এবং গৌরীপটের উপরে তাহার ব্যাস প্রায় চার ফুট। লিঙ্গের উপরের অংশ ভাঙা বলিয়া মনে হয়। আশ্চর্যের বিষয়, লিঙ্গটি যে-পাথরে তৈয়ারী, গৌরীপট সে-পাথরের নয়। দ্বিতীয়তঃ গৌরীপটের আয়তনের সঙ্গেও লিঙ্গের আয়তনের কোনও সামঞ্জস্য নাই। বহুদিন পূর্বে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনুমান করিয়াছিলেন যে, ইহা অশোকের স্থাপিত কোনও স্তম্ভ ছিল এবং পরে কোনও সময়ে স্তম্ভটিকে শিবলিঙ্গে পরিণত করিয়া উপরে আচ্ছাদন স্বরূপ একটি মন্দির রচনা করা হয়।

ভুবনেখর ষ্টেশন হইতে যে পথটি লিঙ্গরাজ মন্দিরের দিকে গিয়াছে তাহার উপর যাত্রীরা প্রথমে যে মন্দিরটি দেখিতে পান, তাহার নাম রামেশ্বরের মন্দির। রথযাত্রার সময়ে ভুবনেখর-মহাদেবের রথ এই মন্দির পর্যন্ত

আনা হয়। এই রামেশ্বর মন্দিরের পশ্চিমে অশোকা কুণ্ড নামে একটি কুণ্ড আছে। কুণ্ডের উত্তর তটে সারনাথের অশোকস্তম্ভের শীর্ষের মত, কিন্তু তাহা অপেক্ষা আয়তনে অনেক বড়, একটি স্তম্ভশীর্ষ আছে। ইহার উপরে হয়ত কোনও জীবমূর্তি বা অণুবিধ মূর্তি ছিল। দুঃখের বিষয়, তাহা হারাইয়া গিয়াছে। শুধু ইহার গায়ে সামান্য লতাপাতা কারুকাৰ্য্য করা আছে, উপরে মূর্তি বসাইবার জন্য সমতল আসন আছে এবং নীচে স্তম্ভের উপরে খাপ খাইয়া বসিবার মত একটি অর্ধ বর্ষলাকার খাঁজ কাটা আছে।

ভাঙ্গা স্তম্ভশীর্ষটি ৪' ৫" উচ্চ এবং তাহার ঘের ১২ ফুট, অর্থাৎ তাহার ব্যাস ৫' ফুটেরও অধিক। ইহার নীচে যে



মন্দির ঘারে এটীন অলঙ্কার

খাঁজটি আছে তাহার কানার ব্যাস ৩' ৩১" ইঞ্চ। ভাস্করেখর লিঙ্গের সহিত ইহাকে তুলনা করিলে দেখা যায় যে, সে লিঙ্গটির যাহা মাপ এবং তাহার উপরের দিকে মারেণী (batter)

যতটুকু তাহাতে তাহাকে সবস্বল্প জমি হইতে ১৫ ফুট পর্যন্ত লম্বা করিলেই অশোক কুণ্ডের শীর্ষটি তাহার উপর বসিতে পারে। কিন্তু ১৫ ফুট স্তম্ভের উপর ৭১০ ফুট শীর্ষ এবং হয়ত বা তাহারই অনুরূপ একটি জীবমূর্তি অতিশয় বিসদৃশ দেখায়। যদি স্তম্ভশীর্ষটি সতাই ভাস্করেশ্বরের তথাকথিত লিঙ্গের উপরিভাগ হয় তবে বলিতে হইবে যে স্তম্ভটি মাটির ভিতরে নিশ্চয়ই অনেক গাণি পুঁতিয়া আছে। কতখানি পুঁতিয়া গিয়াছে তাহাই প্রশ্ন।

ভারতবর্ষে বহু স্থানে প্রাচীন স্তম্ভ পাওয়া যায়। মহারাজ অশোক ছাড়াও সমুদ্রগুপ্ত, হেলিগদোরস প্রমুখ অনেকে সে সময়ে স্তম্ভ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেগুলির শীর্ষ ও দেহের অনুরূপাত বর্তমান ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে মনে হয় ভাস্করেশ্বরের স্তম্ভটি আরও ২২ ফুট হইতে ৩৩ ফুট মাটির মধ্যে লুক্কায়িত আছে। অতএব তখন জমি এখনকার জমি হইতে ঐ জায়গায় প্রায় ৩০ ফুট নীচে ছিল।*

এই অনুমানে নানাবিধ ভুল থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে অন্ততঃ আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আমরা অন্ততঃ এইটুকু বুঝিতে পারি যে, জমির উপরের চেয়ে নীচের দিকেই বেশী খোঁজ করা দরকার। ঐতিহাসিকের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট লাভ।

এই অনুমানের ইঙ্গিত অনুসারে আমরা কিছুদিন ধরিয়া আশপাশের জমি খুঁজিতে লাগিলাম। জমির নীচের স্তরে খোঁজার কৌশল হইল নিকটে যদি কোনও নদী, নালা অথবা পুষ্করিণী থাকে তবে তাহার পাড় ভাল করিয়া সন্ধান করা। অনেক সময়ে একরূপ ক্ষেত্রে জমি স্তরে স্তরে সন্ধান দেখা যায় এবং সহজবুদ্ধিতে ইহাই বলে যে নীচের স্তরের মাটি এবং সেখানে পাওয়া জিনিষ উপরের স্তরের মাটি অপেক্ষা

প্রাচীন। এই ভাবে সন্ধান করিতে করিতে একদা আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল। ভাস্করেশ্বরের মন্দিরের অনতিদূরে এক ভঙ্গলোক একটি কুটার নির্মাণ করাইতে ছিলেন। তাহার বাড়িতে কৃষা খুঁড়িবার সময়ে নীচের স্তর হইতে হঠাৎ দুইটি



ভাস্করেশ্বরের মন্দির

মূর্তি পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে একটি বুদ্ধদেবের, অপরটি কোনও জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি। বুদ্ধমূর্তির চালচিত্রে “যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবা ইত্যাদি” শিলালিপি খোদিত আছে। তাহার অক্ষর পরীক্ষা করিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে মূর্তিটি খৃষ্টীয় নবম শতকের হইবে। ইহা কম লাভের কথা নয়। অন্ততঃ বুঝা গেল মাটির নীচে কিছুদূরে খৃষ্টীয় নবম শতকের জমির স্তর বর্তমান রহিয়াছে এবং ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলে সেই স্তরে হয়ত আরও কিছু জিনিষ পাওয়া যাইতে পারে।

ভাস্করেশ্বরের কাছে জমির নীচের স্তরে যেমন সন্ধান

* Journal of the Bihar and Orissa Research Society পত্রিকার Vol. XV-এ পৃ. ১৯৯-২০২ দেখুন।

চলিতে লাগিল, উপরের দিকেও তেমনি কিছু দৃষ্টি রাখা হইল। অশোকের স্তম্ভ ও স্তূপের মধ্যে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল, তাহার চারিদিকে প্রদক্ষিণের পথ ছাড়িয়া গোলাকার একটি পাথরের বেড়া দেওয়া থাকিত। এই



কূপের মধ্যে প্রাপ্ত জৈনমূর্তি

বেড়ার গায়ে নানাবিধ মূর্তি ও চিত্র দিয়া প্রদক্ষিণকালে যাত্রীর মনোরঞ্জনও করা হইত, ধর্মশিক্ষাও দেওয়া হইত। সাঁচিস্তূপের চতুর্দিকে অথবা ভরহুতের পাথরের বেড়া যেমন, ভাস্করেখরের সন্নিকটে সৌভাগ্যক্রমে আমরা তেমনি বেড়ার তিনটি টুকরা কুড়াইয়া পাইলাম। তিনটিকে আনিতে দুইটি গরুর গাড়ী বোঝাই করিতে হইয়াছিল; অতএব সেগুলি যে কত বড় তাহা সহজেই অনুমান করা যাইবে।

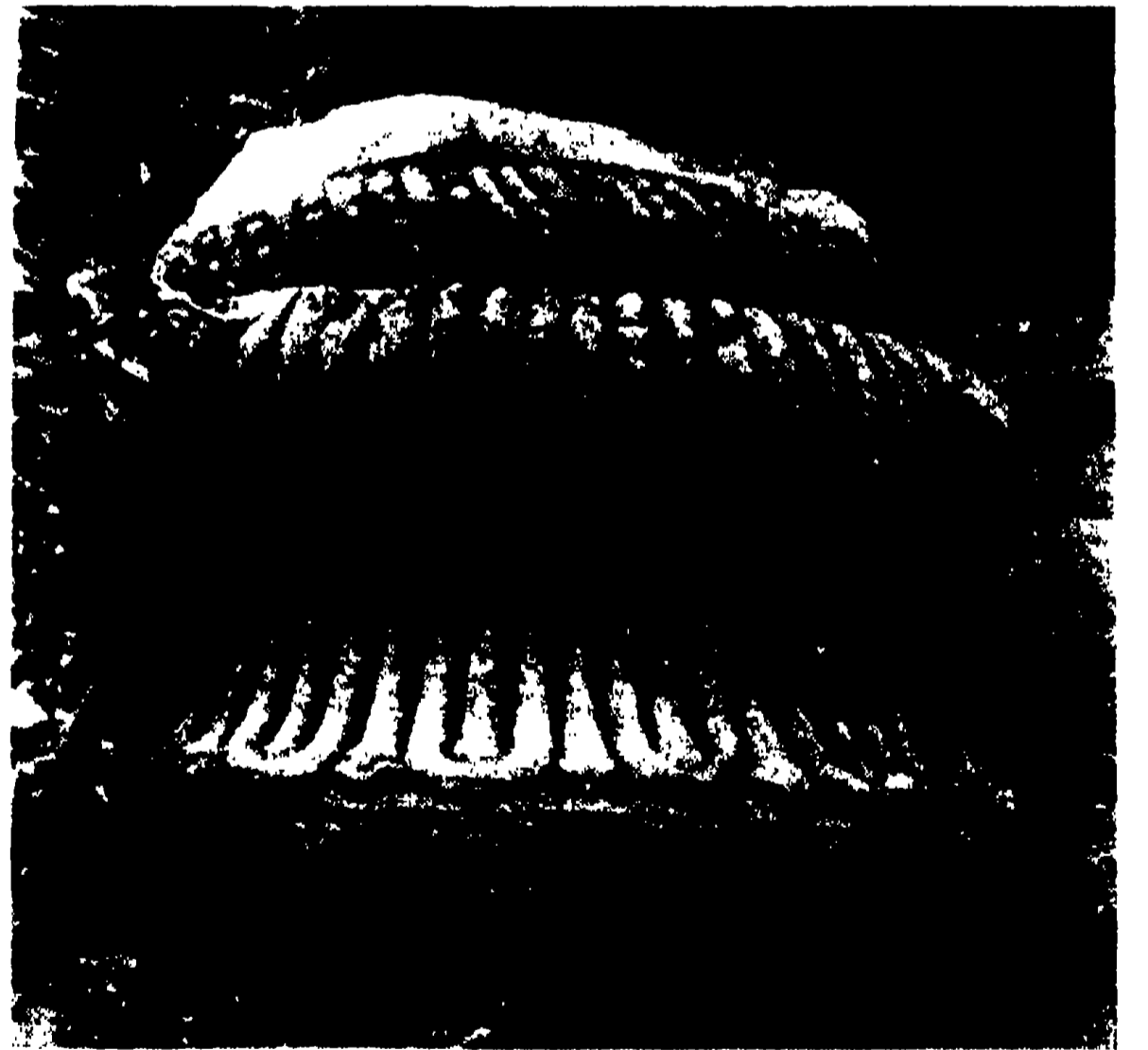
এই বেড়ার ভগ্নাবশেষ পাওয়ার পর ভাস্করেখরের লিঙ্গটি যে স্তম্ভ, এবং হয়ত বা অশোক-স্তম্ভ ছিল, তাহা অনেকটা স্থিরীকৃত হইল। বেড়ার গায়ে যে মূর্তিগুলি আছে তাহাদের গঠন, পরিচ্ছদ, মাথার উকীষ, হাতের দস্তানা প্রভৃতি দেখিলে

উদয়গিরির রাণীগুম্ফার সমসাময়িক বলিয়া মনে হয়। এগুলি হয়ত ভরহুতের কিছু পরের হইবে।



ভাস্করেখরের লিঙ্গ ও পার্শ্বে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তি

যাহাই হউক, একটি স্তম্ভের ইতিহাস সন্ধান করিতে গিয়া এতখানি পাওয়া ভাগ্যের কথা। ভাস্করেখরের চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে আরও কতকগুলি বস্তু প্রসঙ্গক্রমে দেখা গিয়াছিল। মন্দিরের উত্তর দিকে, একটু পশ্চিম ঘেঁসিয়া,



রামেখরের নিকট স্তম্ভশীর্ষ

কতকগুলি গিরিগুহা আছে। তাহার মধ্যে দু-একটি ক্ষুদ্র জৈনমূর্তি দেখা গেলেও তাহাদের বয়স সম্বন্ধে ঠিকমত কিছু বলা যায় না। গুহাগুলির মেঝে মাটিতে বুজিয়া গিয়াছে,



মার্কণ্ডেশ্বরের মন্দির-গায়ে মূর্তি-শ্রেণী

মাটি খুঁড়িয়া মেজে বাহির করিতে করিতে হয়ত বা হঠাৎ কোনও নতন তথ্যের আবিষ্কার হইয়া যাউতে পারে।

কিছুকাল পূর্বে আমার জনৈক বন্ধু এই পদ্ধতি অনুসারে ধউলির নিকট অশোকের পুরাতন রাজধানী অনুসন্ধান

করিলে পার্শ্বপুত্রের মত অনেক নতন তথ্য মিলিবার সম্ভাবনা আছে।

একদিকে ধউলি, অপরদিকে খণ্ডগিরি-উদয়গিরির মত ভুবনেখরেও তাহা হইলে প্রাচীন স্তম্ভ, স্তম্ভশীর্ষ এবং পাথরের বেষ্টনীর টুকরা পাওয়া গেল। কিন্তু ইহার পরে প্রাচীনতম মন্দিরে আসিলে একেবারে খৃষ্টীয় নবম শতকে নামিতে হয়।



পাথরের বেষ্টনীর অংশ

করিতে গিয়াছিলেন। প্রায় একমাস পরিশ্রমের পর তিনি বহু ভাঙা মাটির বাসন, মূদ্রা এবং মাটির তৈয়ারী বৃষ ও হস্তী-অঙ্কিত চাকতিও পান। সেই বৃষ ও হস্তীর অঙ্কনপদ্ধতি দেখিয়া তাহাকে বহু প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। যেখানে তাহা পাওয়া গিয়াছিল সেখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে গবেষণা



কূপের মধ্যে প্রাপ্ত বৃক্ষমূর্তি

যে শৈলীতে উড়িয়ায় প্রাচীনতম মন্দির সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে স্থানীয় প্রভাব থাকিলেও তাহা যে উত্তর-ভারতের কোথাও

হইতে আমদানী, উড়িষ্যাতেই প্রথম সৃষ্ট হয় নাই, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

গুসিয়া, খাজুরাহা, কাংড়া, পট্টাদকল প্রভৃতি স্থানে সমকালে উৎকৃষ্ট মন্দির দেখা যায় এবং সেগুলির মোট গড়ন উড়িষ্যারই মত। খৃষ্টীয় নবম-দশম শতকেই যখন এই ব্যবস্থা তখন শৈলীটি নবম শতকের পূর্বে কোনও সময়ে উত্তর-ভারতের



বেটনীর গায়ে প্রাচীন মূর্তি

কোনও স্থানে আবিষ্কৃত হইয়া নবম শতক নাগাদ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। সেই অসুমিত কেন্দ্রের সহিত ভুবনেশ্বরের যোগ নিশ্চয়ই খৃষ্টীয় নবম ও খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের মধ্যে ছিল। গোড়ার চেয়ে শেষের দিকেই তাহা ঘনিষ্ঠ থাকিবে সম্ভব। সেই যোগ কিরূপ ছিল এবং কোন পথেই বা সেই শিল্পসম্বন্ধের সূত্র ছিল তাহা আমাদের এখন অনুসন্ধান করা আবশ্যিক।

মহানদীর উভয় কূলে সোনপুর, বৌদ, নরসিংপুর প্রভৃতি

করদরাজ্যে কতকগুলি পুরাতন মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের কোন কোন লক্ষণ ভুবনেশ্বরের প্রাচীন মন্দিরগুলির মত। অতএব উত্তর-ভারতের যে অসুমিত কেন্দ্রের কথা আমরা বলিয়াছি তাহার সহিত উড়িষ্যার যোগাযোগ হয়ত বা মহানদীপথেই হইত। মহানদী ছাড়াইয়া পথটি হয় সধনপুর ও বরগড়ের ভিতর দিয়া, নয় ত গাংপুরের দিক দিয়া গিয়াছিল।

যাহাই হউক, ভুবনেশ্বরের প্রাচীন কীর্তিগুলির সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিতে গিয়া আমরা প্রথমে কয়েকটি অসুমান, পরে ইঙ্গিত ও তৎপরে কতকগুলি নূতন তথ্যের সন্ধান পাইলাম। উড়িষ্যার সঙ্গে উত্তর-ভারতের কোনও প্রাচীন শিল্পকেন্দ্রের যোগসূত্রের অসুমান তেমনই পাওয়া গেল এবং কোন পথে অগ্রসর হইলে আরও কিছু তথ্য পাওয়া যাইতে পারে তাহারও নূতন ইঙ্গিত লাভ করা গেল।

ইতিহাসে নূতন তথ্য লাভ করিবার ইহাই হইল পন্থা। ঐতিহাসিক তখনই বলিতে পারেন যে তিনি সত্য পাইয়াছেন যখন তিনি একটি যুগের মানুষের প্রবান কীর্তিগুলি এবং সেই কীর্তি-রচনার পিছনে যে উদ্দেশ্য কাব্য করিয়াছে তাহার সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। তাহার কম যাহাই হইবে তাহা অসুমান। অসুমান লইয়া কেহ বড়াই করে না। তাহার মূল্য হইল এই যে, তাহা আমাদের নূতন তথ্য-ভাণ্ডারের দিকে ইঙ্গিত দেয়। হস্ত সে-তথ্য আবিষ্কৃত হইলে পুনরায় শুদ্ধতর অসুমান গঠন করিতে হয়, আবার সেই অসুমানে নূতন ইঙ্গিত দেয়। এমনি একটির পর একটি পা করিয়া ঐতিহাসিক অনাবিষ্কৃত তথ্যের অঙ্ক-বনানীর মধ্যে বিচরণ করেন। যে অসুমান দূরের সন্ধান দেয়, গভীরতম লোকের সন্ধান দেয় তাহাই মূল্যবান। কিন্তু অসুমান চিরকালই অসুমান। সত্য সম্পূর্ণ। লোকে সহজে তাহাকে পায় না। হয়ত ঐতিহাসিককে চিরজীবন ব্যাধের মত সেই মায়ায়ুগের পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াইতে হয়। ইহাই তাঁহার লাভ, ইহাতেই তাঁহার আনন্দ।

মুহূর্তের মূল্য

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

মাসের শেষ। ছুটি হাতে জ্বনিষপত্র বোঝাই করিয়া শঙ্খ বাড়ি ফিরিতেছিল। গতি দ্রুততর। কোথায় লাল-বাজারের মোড়—আর কোথায় মাণিকতলা! মাঝপথে বৌবাজারের মণ্ডলার দোকান হইতে জ্বনিষগুলি সে কিমিয়াছে। মাণিকতলার চেয়ে হিসাবে আনাহুই সস্তাই হইয়াছে। শুদিকে সন্ধ্যা আসিবার বহু পূর্বে রাস্তায় আলো জ্বলিয়া গৃহমুখী পথিককে সত্বর গৃহে ফিরিবার ইঙ্গিত জানাইতেছে।

আপিসের বিপুল প্রাসাদকক্ষ; চেয়ার, টেবিল, আলো, শাখার যেন স্বর্গভবন। খোলা বড় জানালার ধারে দাঁড়াইলে নিম্নের চলমান জনশ্রোত চিত্রলেখার মত চক্ষুতে বিভ্রম জন্মায়। নিজেকে বহু উর্ধ্বে কল্পনা করিয়া কিছু যে গর্ব বোধ হয় না তাহাই বা কে বলিবে? তবু আশ্চর্য! শঙ্খর মত মাসমাহিনার অঙ্ক কষিতে যাহারা এই কক্ষগুলিতে আসিয়া বসে তাহাদের প্রয়োজন বাহিরের আলো বাতাস বা সৌন্দর্যকে লইয়া মিটে না। স্তূপীকৃত ফাইলের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া লাল এবং কাল কালির সাহায্যে অঙ্কগুলির মাথায় দাগ মারে, আপিস-নোটে বাঁধা গৎ লিখিয়া দিনের কর্তব্য শেষ করে। কক্ষ-অবসরে দৃষ্টি ফিরাইলে পড়ন্ত রৌদ্রের পানে চাহিয়া মনটা চঞ্চল হইয়া উঠে। কক্ষবাহু মেলিয়া এই ছরস্তু কর্তব্য যেন তাহার বন্দীভবন রচনা করিয়াছে। সৌষ্ঠবশূন্য কক্ষে চেয়ার, টেবিল, ট্রে, ফাইল, র‍্যাক—এমন কি ক্ষুদ্রকায় চক্চকে পিনগুলি পর্যন্ত কাজের কদম্বা মুর্ত্তি লইয়া অনবরত দৃষ্টিকে বিঁধিতে থাকে। চঞ্চল মন চাহে মুহূর্তের পাথায় ভর করিয়া বন্ধ গলির আলোকবঞ্চিত বায়ুস্তর বাড়িতে একখানি জীর্ণপ্রায় কক্ষে ছুটিয়া যাইতে।

সেখানে নীলের টুকরা ঢাকিয়া সন্ধ্যার ধূম-কুণ্ডলী। সঁাতা মেঝের ভাঙা তক্তপোষের উপর বসিয়া প্রাণ ভরিয়া সেই গাঢ় ধোঁয়া টানিবার মধ্যেই প্রচুরতর উল্লাস। কক্ষের

রুঢ়তা হইতে মুক্তলাভ! ধোঁয়ার মধ্যে আরাম বিলাইতে যে দু-খানি মমতান্বিত করের নিপুণ কক্ষপ্রয়াস,—কক্ষক্রান্ত কেরাণী কি বলিয়া সে-দিক হইতে মুখ ফিরাইবে!

ধোঁয়ার মধ্যেই ছেলে-ময়েরা আসিয়া পাশে বাসবে, ধোঁয়ার মধ্যেই কাপড় জামা টানিয়া নৃতনতর খেলনার খোজ করিবে। পিতার দীর্ঘ অনুপস্থিতির মধ্যে ক্ষুদ্র সংসারের ক্ষুদ্রতর ঘটনাগুলি একনিঃশ্বাসে বলিয়া যাইবে,—যে কোনো কৌতূহলজনক গল্পের চেয়ে তাহা কি কম রোমাঞ্চকর? তারপর ধোঁয়া পাতলা হইতে হইতে মিলাইয়া যাইবে। হাসিমুখে জলখাবার সাজাইয়া গৃহিণী আসিয়া দাঁড়াইবেন। দুখানা রুটি, অল্প একটু হালুয়া বা এক কাপ চা। চারিধারের প্রসাদ-পিপাসুদের মুখে অল্প ঢালিয়া দিয়া যেটুকু মুখে যায়, তাহার প্রত্যেকটি কণায় অমৃত।

তারপর রোগা তাকিয়াটায় হেলান দিতে গিয়া তক্তপোষে মচ-মচ শব্দ উঠিবে হয়ত। আর! মণ্টু পিঠে হুড়হুড় লাগাইবে। হারি দ্বিতীয়ভাগের যুক্তাকর শিখিয়াছে; বাপের পিঠে পায়রার পালক বা আঙুল দিয়া অধীত বিদ্যার পরিচয় দিবে। বাপ সে লেখা বুঝিতে পারিয়াও বলিতে পারিবে না। হারি হাসিবে, আবার লিখিবে। পিঠের সঙ্গে মনটি পর্যন্ত তক্তাতুর হইয়া উঠে। পালকের চেয়ে কাঁচ আঙুলগুলির স্পর্শ আরও মনোরম। ছোট মেয়েটা ইত্যবসরে ছরস্তু হাতে মাথার চুলগুলি এলোমেলো কারয়া দিবে। তা দিক। এমন মধুর উৎপীড়নের মধ্যে নিজেকে সপিয়া দিয়া কি যে তৃপ্তি! কোথায় লাগে খোলা মাঠ, উদার বিস্তৃত আকাশ, আকাশপটে অসংখ্য তারাবিন্দু, চাঁদ বা অন্তর্গামী সূর্য! বায়ুর সাধ্য কি এমন স্পর্শ বহিষ্ণা আনে!

দ্রুত চল—দ্রুত চল। ধোঁয়ার কুণ্ডলী মিলাইয়া গেলে স্বর্ণের স্তম্ভমা থাকিবে না। গাঢ়তর ব্যাপ্তির মধ্যেই কল্পনার প্রধরতা। কোথায় চূণবালি খসিয়া ইঁট বাহির হইয়াছে, কড়িকাঠে ঘূর্ণ জন্মিয়াছে প্রচুর, মেঝের পা ঢালাইতে গেলে

খোয়া ফুটে, আসবাবপত্র মলিন, একটি মাত্র জানালায় অপ্রচুর আলোর বাত—এ-সব বাস্তবকে আড়াল করিয়া ধূমময়ী সন্ধ্যা এ-বাড়িতে আবিভূতা হন। শঙ্করোলে নিয়মিত সময়ের বহু পূর্বেই তিনি আসেন,—প্রত্যহ। এমন মুহূর্তগুলি পাচে পলাইয়া যায়—এই জগৎ শঙ্কর গতি দ্রুততর।

কলেজ ষ্ট্রীট ছাড়াইতেই কে পিছন হইতে কাঁধে হাত দিয়া ডাকিল।

শঙ্কু ফিরিলে সে হাসিয়া বলিল, “চিনতে পার ?”

ন চিনিবার কথা নহে। তবে কয়েকটি বৎসরের ব্যবধান। অজিত তেমনই লম্বা ছিপছিপে—গৌরবর্ণ। মাথার চুল ও জুলপির ফ্যাসানটি যা নূতন। মুখে সেই অল্প হাসি, কপালে কয়েকটি রেখা, চোখের কোমল চাহনিটুকু পর্যাস্ত অপরিবর্তিত। কথা বলিবার সময় ঘন ভ্রুতে অল্প একটু তরঙ্গ খেলে। ডান হাতখানি নাড়িয়া কথার সঙ্গে সেই সঙ্কেতময়তা। বয়সের কোঠায় পড়িয়াও মাথার চুলে শুভ্র বিন্দু ফুটে নাই।

অজিত বলিল, “আরে হাঁ ক’রে কি দেখচিস ? চিনতেই পারলি নে। আমি অজিত,—ক্লাসের মধ্যে গাধা ছেলে।”

শঙ্কু স্নান হাসিয়া বলিল, “ভাল ত ?”

‘তবু ভাল যে জিজ্ঞাসা করেছিস! তোর ত দেখাছি প্রকাণ্ড সংসার। মাসকাবারি বাজার বুঝি ? সরস্বতীর মত বস্তুও যে অতি মাত্রায় রূপালু! আহা! একটু আস্তে। ছুটি যখন পেয়েছিস বাসায় তখন পৌছবিই। কি আশ্চর্য্য! পুরোণো বন্ধুর সঙ্গে কত দিন পরে দেখা, চলা কমিয়ে একটু গল্পই না-হয় করলি।’

শঙ্কু অপ্রতিভভাবে কহিল, “গল্প করতে কি আমার অনিচ্ছা ? তারপর—তোর খবর ? বিয়ে করেছিস ? ছেলে-পুলে—”

অজিত হাসিয়া বলিল, “হাঁ, ও দুর্ঘটনা বাঙালী মাত্রেই একবার না একবার হয়। তবে ফলেফুলে জীবনতরু এখনও বিকশিত হয়নি। যাবি ?—চ’ না!—এই ত কালীতলার ওপাশে ছ-মিনিটের রাস্তা।”

শঙ্কু ব্যস্ত হইয়া কহিল, “দূর, তা কি হয়। হাতে একরাশ বাঝা—”

অজিত কহিল, “এ তো আর কুটুমবাড়ি যাচ্ছ না, থাকলোই বা বোঝা ?”

শঙ্কু বলিল, “এই ময়লা কাপড়, আপিসের খাটুনীর পর দেহ টলছে।”

অজিত তাহার হাত ধরিয়া বলিল, “তা হোক, চল। একটু জিরিয়ে—”

আতঙ্কে দুই পা পিছাইয়া শঙ্কু হাত ছাড়াইবার জগৎ রীতিমত ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল। বিস্মিত অজিত হাত ছাড়িয়া দিল। ফাঁক পাইবামাত্র শঙ্কু কয়েক পা আগাইয়া গিয়া কহিল, “আজ থাক, আর এক দিন আসব। শুভ বাই।”

কয়টি বৎসরেরই বা ব্যবধান ? কলেজ-জীবনের কথাই ধরা যাক। অজিত যদি বলিত, “আমাদের এ-জীবনে ছাড়া-ছাড়ি হবে যে-দিন—”

শঙ্কু উস্তেজিত কণ্ঠে প্রতিবাদ করিত, “সে-দিন বন্ধুত্বের সঙ্গে আমরাও ম’রব। ও ভাবনা মিছে। পৃথিবীতে একটি মাত্র পথ আছে, যেখানে স্বস্থ, সবল দেহে ও মনে প্রচুর কর্ম-প্রেরণা নিয়ে আমরা জয়ীর মত চলতে পারি। সে-পথ বন্ধুত্বের।”

অজিত হাসিয়া বলিত, “তুই বড় সেন্টিমেন্ট্যাল। রোমান্সের মোহে তোরাই যাবি আগে ভেসে।”

শঙ্কু হাসিত না। মুখ গম্ভীর করিয়া কহিত, “আমার মত মনের জোর থাকলে ও-কথা তুগতিসই না।”

সে কথা সত্য। কত বার এমন কত বিপদ আসিয়াছে, পাতলা অজিতের পিছনে বলিষ্ঠ শঙ্কু—দেহের অমুবর্তী ছায়ার মতই নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অজিতের দেহে আঁচড় লাগিবার পূর্বে তার পেশীপুষ্ট বাহু আততায়ীর উদ্যম পণ্ড করিয়া দিয়াছে। কেহ কাহাকেও কৃতজ্ঞতা জানায় নাই, শুধু অন্তরগ্রস্থিতে ফাঁসের পর ফাঁস পড়িয়াছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে—নিত্য চায়ের পিপাসার মত, উভয়ের সঙ্গ উভয়ের কাছে—প্রতীক্ষামুখর। মাঝে মাঝে তর্ক তুমুল হইয়া কলহে রূপান্তরিত হইত এবং ভালবাসার ওজনে সেই কলহসঙ্কুল মুহূর্তগুলি তৌল নিরূপণ করিত।

অজিত যদি জ্বোরে কথা কহিত, শঙ্কু টেবিল চাপড়াইত আরও জ্বোরে। অজিত হাসিলে শঙ্কু গম্ভীর ভাবে বই পড়িত। অন্তর-তারে চড়া স্বর। আঙলের আঘাত

অপেক্ষা করিয়া আছে। চড়চাপড় বা হাসি—এমনই একটা হরস্ত মাতামাতির মধ্যেই তন্ত্রী উঠিত বাজিয়া। কুয়াসার মত অভিমান মিলাইয়া যাইত।

কিন্তু সে বন্ধুত্বের সূত্রপাত স্থলেই। কতকগুলি ক্ষুদ্র টিনা দু জনকে নিকটে টানিয়া বন্ধুত্বের বার্তাটি কানে কানে হানাইয়া দিয়াছিল।—

ম্যাটিক পাস করিবার পর কি করিবে এই ভবিষ্যৎ ভাবনার মধ্যে দু-জনেই স্থির করিয়াছিল, যদি পড়িতে হয় দু-জনে একই কলেজে পড়িবে, চাকুরি করিতে হয় একই ঘাপিসে চুকিবে। বিধাতা সে সুযোগ উভয়কে দিয়াছিলেন।

দুটি বাড়ির দূরত্ব অনেকগানি হইলেও বাবধান বিশেষ ছিল না। উত্তর পাড়া হইতে দক্ষিণ পাড়া এক মাইল। মাঝখানে জেলা স্কুল। স্কুলের প্রকাণ্ড মাঠে ছেলের দল প্রতিদিন খেলার কোলাহল জমাইত। খেলাশেষে নদীর ঘাটে পা ধুইয়া বাঁধানো চাতালে বসিয়া এ-দেশ ও-দেশের নানা গল্প করিত। তারপর সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনিতে গৃহে ফিরিত। অজিত ও শম্ভু কোলাহলময় নদীর ঘাটে না বসিয়া অদূরে বটতলে বাত্রীপূর্ণ খেয়ার নোকা যেখানে পারাপার করিত সেইখানে আসিয়া বসিত। গোধূলিবেলার আবছা অন্ধকারে নদীপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া কল্পনার অঞ্চল ছুটিত দেশদেশান্তরে।

“আচ্ছা শম্ভু, এই একঘেয়ে জীবন তোরা ভাল লাগে?”
শম্ভু উত্তর দিত, “মন্দ কি।”

অজিত বলিত, “চমৎকার! সামনের নদীটার মতই মস্তুর অলস। না-টেউ, না-শ্রোত। জীবন হবে পদ্মার মত। বেগমন্ততায় সে যেমন ভাঙবে এক হাতে, দানের গৌরবে অন্য হাতে করবে সৃষ্টি। আমি যুদ্ধে যাব।”

“তাতে লাভ?”

“লাভ? সে লাভ বোঝাতে পারব না। কত দেশ দেখব, গোলার সামনে বুক পেতে দাঁড়াব। এরোপ্লেন বোমা,—”

শম্ভু হাসিয়া অজিতের কাঁধে হাত রাখিয়া বলিত, “দেহের কাঠামো আর একটু শক্ত হোক, নার্ভগুলো উঠুক মজবুত হ’য়ে তবে ত! আমার ইচ্ছে—ডাক্তারী শিখব। মানুষকে মারার চেয়ে শুক্রবা করা ঢের বেশী শক্ত।”

অজিতও হাসিয়া উত্তর দিত, “তবে এস দু-জনের ইচ্ছাটা বদল ক’রে নিই। আশ্চর্য! দেহে অত কমতা থাকতে বেছে বেছে নিতে হবে করণার কাজ!”

শম্ভু উত্তর দিত, “কমতা যার আছে—সে-ই করণা করে, দুর্বল মুহূর্ত আনে উত্তেজনা। যারা খুণী তারা শতকরা নব্বই জন দুর্বল। আমি ছবি দেখেছি।”

অজিত সে তর্কের শেষ করিয়া কহিত, “চল, এখন ওঠা যাক। উছ, ও-পথে নয়, আমাদের বাড়ি হয়ে। আজ একটা মস্ত খাওয়া আছে, তুই না গেলে খাওয়াই আমার মাটি।

বিনা নিমন্ত্রণে এমন কত দিন বন্ধুর বাড়ি শম্ভু খাইয়া আসিয়াছে।

আর এক দিনের কথা।

‘এত ময়লা কাপড় প’রে আসতে তোরা ঘেমা হয় না?’

শম্ভু হাসিয়া জবাব দিত, ‘তুই ত আর কুটুপ নোস? তোরা কাছে আমার লজ্জা-ঘেমা কি?’

“বটে। চ’ দেখি আমাদের বাড়িতে মা কি বলেন?”

‘বলবেন না-হয় ওটা আমার চাকর। কিন্তু সত্যি কথা কি জানিস, অজু, একজোড়া ছাড়া কাপড়ই নেই আমার।’

“চ’ তবে আমাদের দোকান থেকে আর একজোড়া নিবি। লজ্জা হবে না ত? যে বীরপুরুষ! আবার আত্ম-সম্মানে না বাধে!”

হাসিয়া শম্ভু কহিত, “তোরা কাছে ত আত্মকে ও বিক্রয় করেছি, সম্মান দেবে কে?”

বন্ধুর দেওয়া কাপড় লইতে এতটুকু কুণ্ডা সেদিন জাগে নাই।

তারপর কলেজ হইতে বিদায় লইবার পূর্বদিন অজিত শম্ভুকে টানিয়া আনিল সেই ছায়ানিষ্ক বটতলে। গ্রীষ্মের দুপুর। পারষাত্রির কোলাহল নাই, কর্মের বাস্তবতা নাই। তীব্র রৌদ্রের তাপে সারা জগৎ ম্লিনমাণ।

বহুকণ পরে শম্ভু কথা কহিল, “কালই চল যাকি বাবা বদলী হলেন কি-না।”

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, “পড়বি নে?”

“কি জানি! জানিস ত সংসারের সব কথা। হয়ত পড়া আর হবে না।”

“আমিও কলেজ ছাড়ব।”

‘দূর পাগল! তোর এ সমবেদনার মূল্য কি?’

অজিত ধরাগলায় বলিল, “সমবেদন! নয়, আমার উৎসাহ—”

বাধা দিয়া শঙ্কু বলিল, “পাগল! না, না, ভাল ক’রে মন দিয়ে পড়বি।”

“কিন্তু পাস না করতে পারলে দোষ দিস না।”

“আচ্ছা সে দেখা যাবে। চিঠি লিখবি ত?”

“না।”

“না! তুই রাগ করছিস, অজিত। চিঠি না লিখলে—”

“কেন? আমিও ত তোর সঙ্গে চাকরি করতে পারি একই আপিসে। পারবি নে জোগাড় ক’রে দিতে?” মাথা নাড়িয়া শঙ্কু কহিল, “কিন্তু তোর পড়া ছাড়া হবে না। না, কিছুতেই না।”

মান হাসিয়া অজিত কহিল, “ও বুঝি আমার শাস্তি! আর তোর শাস্তি কি?”

শঙ্কু তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া কহিল, “এখান থেকে চলে যাওয়ার শাস্তি যে কত বড়—”

আশ্চর্য! কথাও ভাল করিয়া কহা যায় না। প্রতি বাক্যের শেষে অশ্রু কণ্ঠ রোধ করে। বুকের মাঝে ভারী নিঃশ্বাস-গুলিতে এত অশ্রুর তরঙ্গ কে জানিত?

“তুই হয়ত ভুলে যাবি?”

“তুই-ও।”

শঙ্কু পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া বলিল, “তবে একটা চিহ্ন ক’রে রাখি। কেমন? এইটে দেগলেই কেউ কাউকে ভুলব না।”

অজিত হাত আগাইয়া দিয়া কহিল, “তোমার নামের আদ্যাক্ষর থাক আমার হাতে—তুই লেখ। আমি লিখব তোমার হাতে।”

লেখা শেষ হইলে দু-জনে সেই রক্তচিহ্নিত হাত দুখানি একত্র করিয়া শপথের ভঙ্গীতে উচ্চারণ করিল, “বন্ধু”।

“আহা-হা—! সব কেলে দিলেন যে?”

চমকিত শঙ্কু ভূপতিত জিনিষগুলির পানে না চাহিয়া আমার আশ্রিত তুলিয়া দেখিল, কালো রেখায় এখনও সেই নাম লেখা।—কত বৎসর গত হইয়াছে, কে জানে, স্মৃতিতে জাগিয়া উঠিল সেই খেঁয়াঘাট—ঝুরিনামা ছায়াঘন বটতল—গ্রীষ্মের সেই বিষণ্ণ মধ্যাহ্ন! তাহারা একেবারে মরে নাই। লাল রক্ত যেমন দেহে শুকাইয়া কালো হরফের ভঙ্গ দিয়াছে, তেমনই সেই দিনের বিদায়করণ অপার বিস্মৃতির বালুগর্ভে মগ্ন হইয়া গিয়াছে। আছে মাত্র একটা রেখা—বৈচিত্র্যহীন টানা লাইনের মত নিষ্কর্ষী রূপহীন!

বিজ্ঞান,—এতটুকু তার মিথ্যা নহে। পৃথিবী প্রতি-নিয়ত ঘুরিতেছে—জীবনকে ঘুরাইতেছে।

শৈশবের নিষ্কর্ষিত দৃষ্টিতে ধরণীর যে আলোক ফুটিয়া উঠে, আজি জীবনমধ্যাহ্নে প্রত্যুষের সে প্রীতি কোথায় গেল! অহুতীর্ণ বাল্যের পরম সম্পদ ছিল একখানি হাসিভরা মুখ—প্রতিটি রেখা যার স্নেহ-সমাকুল, প্রতিটি আবেগ যার লালন-গৌরবে তটপরিপ্লাবী।

সেই শৈশব যেন একটি ক্ষুদ্র কক্ষ; মাতৃস্নেহের মটির দীপ জলিয়া অপরিণত আশা ও সসীম কামনাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিত। বিদ্যায়তনের পরিধিতে সে-কক্ষ হইল রহস্তর। মুগ্ধ দীপ ঘুচিয়া লণ্ঠনের আলোয় আসিলেন বন্ধু। তারপর শহর। প্রদীপ গেল, লণ্ঠন গেল, বিজ্ঞানে বাধা পড়িয়া উপর হইতে নামিলেন বিজ্ঞানী। সারা শহর বিছাতে ভরিয়া গিয়াছে। মাটির প্রদীপের অন্তরালে মায়ের স্নেহ সত্যই কি মরিয়া গেল? না, স্মৃতিতে তিনি নবজীবন লাভ করিলেন? যাহার হাত ধরিয়া প্রথম যৌবনের জন্ম-ধ্বনি গাহিয়াছিল সেই বন্ধুই বা কোথায়?

আজ দামিনীর দীপ্তিতে যে-সমস্ত আবেগ কেন্দ্রীভূত করিয়াছে—সে প্রিয়া। মাতৃ-অঙ্কের সুখশৈশব মরিয়াছে, কৈশোরাকাশের সুহৃদ-সুখ্যও অন্তমিত, রাত্রির রোমাঞ্চে শশী-সৌন্দর্যে প্রিয়ার আবির্ভাব; চারি পাশে নক্ষত্ররূপী পুত্র-কণ্ঠা। আকাশের অবকাশ কোথায়? উদয়গিরির বর্ণচ্ছটা য় সে অহুরঞ্জিত হইবে না, অন্তসমারোহেও তাহার স্থান নাই। ঐ ধোঁয়া, ঐ বহুতা, ঐ কোলাহল। অথবা এই বর্তমান।

ভাস্কর সে হয় নাই। যে দুঃখ এক দিন অগ্নির মত

দখ করিয়াছিল, আজ নাই। বিশ্বের হিত? নিজের মঙ্গল-মূলে যে জল ঢালিতে না পারে সে সাধিবে বিশ্বের হিত? হাসি পায়। একটি ঘণ্টা পরের ঘণ্টার মুখ চাহিয়া আসে না। সময় ও স্রোতস্থিনী ছুটিয়াছে। অসংখ্য দেশকে ছুঁইয়া সৌন্দর্য বিলাইয়া ক্রকুটি করিয়া ছুটিয়াছে। সে কি বহু গহ্বরে গহিন লালমায় গতি সংহত করিয়াছে?

আশ্চর্য-হাতের রক্তরেখায় যে-অক্ষর আঁকা প্রাণের স্পন্দন সেখানে আজ কোথায়?

মায়ের স্মৃতি সে ভুলে নাই, ভুলিবে না। কিন্তু সেই স্মৃতির ধ্যান করিয়া জীবনযাপন মৃত্যুর মতই বর্ণস্বাদহীন নহে কি? সে বাঁচিয়া আছে—এইটিই ত পরম সত্য।

আপিসের ত্রিতল গৃহে উপরিতল কর্মচারীর তাড়না পাইয়া এই ত ঘণ্টাখানেক পূর্বে তাহার একটুও দুঃখ হয় নাই। প্রত্যহের পাণ্ডনার মতই সে ক্রকুটি বা শাসন সহজ হইয়া গিয়াছে। লালদীঘি হইতে মাণিকতলার এই জনবহুল হৃদীয় পথ যেমন সহজ। তেমনই সহজ বহু ঘরের মধ্যে সঙ্ক্যার প্রাণাস্তকর ধোঁয়া, দৈনন্দিন দুঃখ, অভাব অভিযোগ!

জীবন যেন নদ। সমুদ্র অভিমুখী আবর্তসঙ্কুল উগ্রগতি নদ। যে জনপদ বন্দর দিয়া বন্দনা করিবে সেইখানেই সে বাণিজ্যের বেসান্ধি বসাইবে। যে জনপদ অনন্তবিস্তারী রুক মাঠ মেলিয়া ধরিবে, সে দানের বঞ্চনা তাহারই। মানুষ একটি মুহূর্তের নহে, প্রতিটি মুহূর্তের আয়ু তার নিঃশাস-তরঙ্গে।...বুখা জামার আস্তিন গুটাইয়া শুষ্ক রক্তলেখার পাতে চাহিয়া নিঃশাস ফেল কেন? ওই বন্ধুত্ব অবসর-মুহূর্তের বিলাস হইয়া থাক।—হাঁ, কাল--কালই আসিও। বেশে, প্রসাধনে নবীন হইয়া মুখের কথায় অতীতকে অজস্র ধারে উচ্ছ্বল করিয়া পুরাতন স্মৃতির রোমন্থন করিও। একফোঁটা অশ্রু কতকগুলি দীর্ঘনিঃশ্বাস, কিছু বা হাসি, সামান্যতর কোলাহল কাল, কালই ভাল। আজ পায়ের গতি দ্রুত কর। সঙ্ক্য বহুক্ষণ আসিয়াছেন। ধোঁয়ায় সে বাড়ি ভরিয়া গিয়াছে সর্বদা তার গাঢ় অহুভব। তোমার হাতের অতশুষ্ক জিনিষ সেখানে আনন্দের শ্রাবণধারায় ঝরিয়া পড়িবে। তুমি আকাশাংশের পানে চাহিও না, আলোর পানেও না, শুধু চর দ্রুত, আরও দ্রুত। আরও।

জামার হাতাটা বুলাইয়া শঙ্কু জিনিষগুলি তুলিয়া লইল।

দুটি কথা

শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী

যে ফলে রয়েছে মধু—

সে-ফুল চুমিও।

পথ চলিবার আগে—

পাথের গুণিও



মৃত্যু ও পুনর্জন্ম বিচার—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বলদেবপ্রসাদ পাণ্ডের যোগশাস্ত্রী, মৈত্রা, শান্তি-আশ্রম, মুর্শিদাবাদ। ৬১ পৃঃ মূল্য ১.০০ চারি আনা মাত্র।

গ্রন্থকারের স্বর্গীয় জ্যেষ্ঠপুত্র পিতার নিকট পুনর্জন্ম বিষয়ক আলোচনা শুনিত্তে চান : এক তাহার মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই এই পুস্তিকাখানি সমাপ্ত হয়, কিন্তু অর্থাভাবে ছাপা হইতে একটু দেরি হয়। তারপর, গ্রন্থকারের শিষ্য 'চারুচরিত্র', 'নন্দমুর্তি', 'পুণ্যরত' শ্রীমান্ কালিদাস পালের অর্পসাহায্যে উহা মুদ্রিত হয় (পৃষ্ঠা ১০)।

পুত্রশোকাতুর পিতা শোকাপনোদনের জন্তু যেখানে শাস্ত্রচর্চা করেন, সেখানে হয়ত তিনি সমালোচকের নিকটও কতকটা সহানুভূতি আশা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকাশিত গ্রন্থ কি অবস্থায় লিখিত হইয়াছে তাহা শুনিয়া সমালোচকে উহার মূল্য নিরূপণ করা উচিত কি-না সন্দেহ। এই বইয়ের লেখক কতকগুলি সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত করিয়া আলোচ্য বিষয়ের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এক পাশ্চাত্য দর্শনে যে পুনর্জন্ম স্বীকৃত হয় নাই, তাহার বিরুদ্ধেও যুক্তি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার চেষ্টা প্রশংসনীয়, কিন্তু সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন প্রশ্ন মীমাংসার যুগ চলিয়া গিয়াছে, এই কথাটা গ্রন্থকারের মনে রাখা উচিত ছিল। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের মতই হটক কিংবা এক-কালজ্ঞ আধুনিক কাহারও মতই হটক,—অস্ত্রের মত উদ্ধৃত করার নাম যুক্তি নয়।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পথের পথিক—শ্রীব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। স্বরূপদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

এখানি উপস্থাপন। একদল নিতান্ত স্বর্গের দেবতা আর একদল একেবারেই নরকের কীট—এই চরিত্রবৃন্দ। মাঝখানের পৃথিবীর মানুষকে কোথাও বড়-একটা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

একটু বৈচিত্র্য ফুটিয়াছে শেষের দিকে, যেখানে দুঃখক্লিষ্ট নারিকী সারা পৃথিবীর উপর অভিমানভরে, বন্ধুর সমবেদনায়-বাড়ান হাতটি প্রত্যাখ্যান করিল। বাকীটা সব একটানা স্রোত। ছাপা, বাধাই, কাগজ বেশ ভাল।

বধু—শ্রীভারতকুমার বসু প্রণীত। নিউ ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরী, ২৫১২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

একটি ছোট অনাড়ম্বর সংসারের সুখদুঃখ মান-অভিমান লইয়া উপস্থাপন। মোটের উপর একটি স্বিকৃতি আছে বটে, তবে একটি দোষ বড় চোখে ঠেকে,—তাহা এই যে অধ্যায়গুলি বড়ই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ; এক এক জায়গায় নেহাৎ যেন পণ্ডিত ঘটনার তালিকা পড়িয়া যাইতেছি বলিয়া মনে হয়। ছাপা, বাধাই চলনসই।

হরগৌরী—শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়, বি-ই, সি-ই, এম্-আর-স্যান-আই—প্রণীত। প্রকাশক কালীপদ সিংহ, এম্-এ। ৩২৮, রাসবিহারী এভিনিউ।

চার অঙ্কের পৌরাণিক নাটক : অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা। দক্ষবজ্রের সৃচনা হইতে আরম্ভ করিয়া যজ্ঞস্থলে সতীর দেহত্যাগ, আবার হিমালয়কন্ঠা উমারূপে শিবের সহিত বিবাহ—এই নাটকের বিষয়বস্তু। আজকাল অবশ্য লোকে সাতকাণ্ড রামায়ণ আর অষ্টাদশপর্ব মহাভারত এক বৈঠকে নাট্যকারে দেখিয়া আসিতেছে তবু বলিতেই হয়, দুইটি নাটকের মালমসলা একটিতেই ঠাসিয়া দেওয়ায় নাটকের মর্যাদা নষ্ট করা হইয়াছে। দেবীর দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে একটি স্বাভাবিক যতি বা বিরাম আছে, এইখানে মনের একটি রসভূমি ঘটে : ইহার পর আবার তাহাকে উমার বিবাহ দেখাইতে গেলে নাট্যকারের নিছকের উদ্দেশ্যই এক দিক দিয়া বিফল হয়।

লেখকের ছন্দে হাত এখনও একটু কাঁচা আছে। এক হাস্যরসসম্মিলনে আর একটু সংযম রক্ষা করিলে ভাল হয়।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শরীর সামলাও—শ্রীজগৎকান্ত শীল প্রণীত। সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থকার স্বয়ং একজন সুনিপুণ মৃষ্টিযোদ্ধা। কিন্তু তিনি কেবল ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যসম্পদ লাভকেই যথেষ্ট মনে করেন না আমাদের দেশের বালক, যুবক ও প্রৌঢ়ের মনেও যাহাতে নিয়মিত কায়ামাতাশীলন-স্পর্শা জাগে, তাহাদের অপরিপূর্ণ, দুর্বল দেহ যাহাতে সুস্থ, সবল ও কর্মঠ হয়, প্রাণশক্তি তে তাহারা পরিপূর্ণ হইয়া উঠেন, সে-বিষয়েও সবিশেষ যত্নবান। এতদ্বন্দ্বেষ্টে তিনি এই সুন্দর পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থখানি সহজ ভাষায় শরীরগঠনবিষয়ক নানা কার্যকরী উপদেশ ও সেগুলিকে আরও স্পষ্ট করিতে অনেকগুলি চিত্রে পরিপূর্ণ। ইহার উপদেশমালা নিয়মিত পালন করিলে অনেকেই যে স্বাস্থ্যসম্পদ লাভ করিবেন, ক্রমে জাতির একটি পরম দৈন্য বিদূরিত হইবে, ইহাতে আমরা নিঃসন্দেহ।

মোটো বোর্ডে বাঁধানো ছাপা ও কাগজ ভাল।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

সমাজ-বীণা—শ্রীঅধরচন্দ্র ঘটক প্রণীত।

কবিতাগুলির উদ্দেশ্য সমাজের উদ্বোধন করা। গ্রন্থকার বর্ণাশ্রমের শাসনকে চূর্ণ করিবার জন্তু জাতিভেদের বৃকে লাগি মারিতে বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণ-বিষেবী ব্যক্তিগণের এ বইখানি মন্দ লাগিবে না কারণ এই ছোট বইখানি আগাগোড়া ব্রাহ্মণ-বিষেবে পরিপূর্ণ। কবিতার ছন্দ কাঁচা। ছাপা ও কাগজ বিকী।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

মোপাসঁর গল্প—শ্রীননীমাধব চৌধুরী, এম-এ। মডার্ন বুক এজেন্সী, ১০ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা। ১৯৩৩

পাশ্চাত্য সাহিত্যের ইতিহাসে মোপাসঁর নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত। অনুবাদক মহাশয় মোপাসঁর আটটি গল্প বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন : ইহাদের মধ্যে সাতটি ইতিপূর্বে 'হারতী' ও 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হইয়াছিল।

এক ভাষা হইতে অল্প ভাষায় অনুবাদ দুইই বাপার এক গ্রন্থ যত উৎকৃষ্ট হইবে তাহার অনুবাদ ততই কঠিন হওয়ার কথা। গল্পগুলির নির্বাচনে রুচি ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায় এবং মূল রচনার সৌন্দর্য যে অনুবাদের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহাতে অনুবাদক মহাশয়ের কৃতিত্ব বলিতে হইবে। শেষের গল্পটি কথ্য ভাষায় নহে। কিন্তু তাই বলিয়া কোনও হানি হয় নাই; রসবোধের দিক হইতে বাংলা-রচনায় লেখ্য ও কথ্য ভাষার প্রভেদ যদি কিছু থাকে, তবে তাহা রচনা-কৌশলে দূর হইয়াছে। 'মোপাসাঁর গল্প' বাংলা অনুবাদ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবে।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

সাম্যবাদের গোড়ার কথা—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়।
দ্ব্যঙ্কশক্তি লাইব্রেরী, ১৫ নং কলেজ-স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম পাঁচ
সিকা। ১/০ + ১২০ পৃষ্ঠা।

বার্ণার্ড শ-র An Intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalism বইখানি যেমন প্রাঞ্জল তেমনই সরস। বর্তমান লেখক উপরিউক্ত গ্রন্থখানিতে তাহারই সারভাগ আপন ভাষায় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কবির ভাষা প্রাঞ্জল, কিন্তু বার্ণার্ড-শ-র পুস্তকে মূঢ়ানীতি, মর্খনীতি প্রভৃতির সম্বন্ধে যে-সকল অত্যন্ত জটিল বিষয়ও সরলভাবে ঘ্যালোচিত হইয়াছে, এই পুস্তকে সেগুলির প্রতি ঠিক তেমন সুবিচার করা হয় নাই। মূল গ্রন্থে ভাব অপেক্ষা বুদ্ধি যেমন বেশী স্থান পাইয়াছে, কবির গ্রন্থে তাহার পরিবর্তে বুদ্ধি অপেক্ষা ভাবের উপরেই বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। এই জন্ত তাহাতে সাম্যবাদের জটিল তত্ত্বগুলি অনেকাংশে বাদ পড়িয়াছে।

তাহা সত্ত্বেও মনে হয় যে হয়ত এমন গ্রন্থেরও প্রয়োজন আছে। গতটির বর্তমান দুঃখের যুগে, মানুষ যখন নিজের হাতে-গড়া দুঃখকেও বুদ্ধির আলোকে ভগবানের দেওয়া দুঃখ বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, তখন হয়ত তাহাদের জাগ্রত করিতে হইলে প্রথমে ভাবের দিকেই জোর দেওয়া প্রকার। সেইজন্য এই পুস্তকখানির যাহাতে প্রচার হয় আমরা তাহা কামনা করি।

বইখানির দাম কিছু বেশী হইয়াছে। এত সুন্দর বাধাই সংস্করণের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম দামে কোনও গুলভ সংস্করণ বাহির করিলে প্রচারের দিক হইতে হয়ত আরও ভাল হইত।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

আমীর আলী—মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ, বি-এ প্রণেতা। "বুকসেলফ"
খান বাহারুর ভবন "তামাকুমুত্তি" ৮৫ গ্রাম, মূল্য ১০ আনা, পৃ. ৪৮।

লেখক ভাষার দোষে ও অনুপ্রাসের ব্যর্থ চেষ্টায় আমীর আলীর জীবনী লিখিতে সমর্থ হন নাই। বইখানিতে তথ্য অপেক্ষা লেখকের কথ্য বেশী হইয়াছে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

বেদসারি—শ্রীদীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী, বেদোপদেশক, বঙ্গ-আসাম আধা
প্রতিনিধি সভা। ৩১ মস্তারাম রো, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য
এক টাকা দুই আনা। আকার ডবল ক্রাউন বোলপেঞ্জী—/০—১০ + ১
—১২৬।

বৈদিক মন্ত্র ও প্রার্থনাদির সংগ্রহস্বরূপ একাধিক গ্রন্থ আজকাল
বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যাটির সহিত প্রচারিত হইতেছে দেখিতে
পাওয়া যায়। সমালোচ্যমান গ্রন্থখানিও এই জাতীয় একখানি গ্রন্থ।
ইহাতে সর্বসমেত চারি শত বৈদিক মন্ত্র বিষয়বিভাগানুসারে সন্নিবেশিত

হইয়াছে। সকলগুলি মন্ত্রেরই আকরের সূচনা, প্রতি পদের অর্থ ও
বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। অনুবাদকার্যে সর্বত্র পূর্বাচার্য্য প্রচলিত
অর্থের অনুসরণ না করিয়া দামানন্দ সরস্বতী মহোদয় প্রবর্তিত অভিনব
ভাষা অবলম্বিত হইয়াছে। দুই-এক স্থলে (পৃঃ ১৩৮-৪০) তুলনার জন্ত
সায়ণভাষ্য ও তাহার অনুবাদও দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের
বিষয় এই যে, এই অনুবাদ ভাষ্যানুগত না হইয়া ভাষ্যবিরোধী হইয়াছে।
এইরূপ বিকৃতি গ্রন্থকারের হেচ্ছাকৃত কি অনবধানতাপ্রযুক্ত তাহা
বলিতে পারি না। তবে আমাদের মনে হয়, গ্রন্থকারের ব্যাখ্যার সহিত
সর্বত্র সায়ণানুসৃত অর্থের নিখুঁত অনুবাদ থাকিলে সাধারণ পাঠকের
পক্ষে অর্থ নিরূপণ বিষয়ে বিশেষ উপকার হইত। গ্রন্থের সংস্কৃত অংশে
অনেক মুদ্রাকরপ্রমাদ দেখিতে পাওয়া যায়। যে-সকল স্থলে পদচ্ছেদ
করা কর্তব্য, সেসকল বহুস্থলে পদচ্ছেদ করা হয় নাই। এজাতীয় গ্রন্থে
এরূপ প্রমাদ সর্বথা পরিহার্য্য। মন্ত্রগুলির বিষয়বিভাগ তেমন সন্তোষ-
জনক ও সুবোধ্য হয় নাই। গ্রন্থের ছাপা ও বাধাই সুন্দর। দেশের
প্রাচীন চিন্তাধারা ও জীবনযাত্রার সহিত আধুনিক সম্প্রদায়ের পরিচয়
ও যোগস্থাপনের জন্ত এ-জাতীয় গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাই
সামান্য ক্রটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও আমরা গ্রন্থখানির প্রচল প্রচার কামনা করি।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

রাজা রামমোহন—অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রণেতা। ইউ এন
ধর এণ্ড কো., ৫৮ ওয়েলিংটন স্ট্রীট ও ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।
মূল্য দশ আনা।

বত্রিশ বৎসর বয়সে অজিতকুমার চক্রবর্তীর মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের
বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। রসগ্রাহী স্ননিপুণ কাব্যমালোচকরূপে তিনি
ঐ বয়সেই সুপরিচিত হইয়াছিলেন। জীবন-চরিত রচনাতেও তাহার
কৃতিত্ব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী রচনায় পরিলক্ষিত হইয়াছিল।
তিনি আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের সাহায্যে ও উপদেশ অনুসারে
রামমোহন রায়ের একখানি বৃহৎ জীবনচরিত ইংরেজীতে লিখিতেছিলেন।
তাহা সমাপ্ত করিয়া যাঁতে পারেন নাই। যতটুকু লিখিয়াছিলেন,
তাহাও হারাইয়া গিয়াছে। রামমোহন সত্ত্বেও তিনি ছোটখাট যে-সব
প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা এই পুস্তকখানিতে সংগৃহীত হইয়াছে।
রচনাগুলির নাম রাজা রামমোহন রায়, রাজা রামমোহনের প্ররূপ, এবং
রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ। রামমোহন রায়কে বুঝিবার ও চিনিবার
এক রামমোহনের যুগকে বুঝিবার পক্ষে এই সূচিস্তৃত ও সুলিখিত
প্রবন্ধগুলি বিশেষ সাহায্য করিবে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে বুঝিবারও
সুবিধা হইবে। পুস্তকখানি ভাল কাগজে বড় অক্ষরে সুমুদ্রিত।
ইহাতে রামমোহনের, দেবেন্দ্রনাথের এবং লেখকের তিনটি ছবি আছে।

প্রাচীন কীর্তি—আচার্য্য হেমচন্দ্র সরকার, এম-এ, ডি-ডি
প্রণেতা ও শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী, এম-এ, সম্পাদিত। সচিত্র।
মূল্য আট আনা। ২১১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে
প্রাপ্তব্য।

ইহাতে ভুবনেশ্বর ও খণ্ডগিরি, ত্রিচিনপল্লী, মালব, তক্ষশিলা, তাজমহল,
আগ্রার মোগল প্রাসাদ, খাসমহল, সিকন্দার কতেপুরসিক্রী (১), কতেপুর
সিক্রী (২), ইংমাণ্ডউদৌলা, আশ্বের রাজপ্রাসাদ, দিল্লী (১), দিল্লী (২),
দিল্লী (৩)—এই প্রবন্ধগুলি আছে। বালক-বালিকারা এই বইটি
হইতে জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিবে, অধিকবয়স্কদেরও ইহা পাঠের
যোগ্য। ভাল কাগজে ছাপা। পুরস্কার দিবার উপযোগী।

জীবনীগুচ্ছ—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য যথাক্রমে আট আনা ও এক টাকা। আচার্য্য হেমচন্দ্র সরকার প্রণীত ও শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী সম্পাদিত। ২১১ কণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ প্রণয়নে প্রাপ্তব্য।

আমাদে দেশের ছেলেমেয়েরা কেবল বিদেশী বিখ্যাত লোকদের জীবনচরিত হস্তে শিক্ষা লাভ করিতে পারে, দেশী লোকদের জীবনচরিত হইতে কিছু শিখিতে পারে না, ইহা যেমন সত্য নহে, তেমনি ইহাও সত্য নহে যে, কেবল দেশী লোকদের জীবনীহতাহাদের পঠনীয় ও তাহা হইতেই তাহারা শিক্ষা পাইতে পারে। দেশী ও বিদেশী সকল রকম জীবনী হইতেই দ্ৰাণ লাভ, নৈতিক উপদেশ ও আনন্দ পাওয়া যায়। স্বর্গীয় হেমচন্দ্র সরকার 'জীবনীগুচ্ছ'র দুই ভাগে চল্লিশ জন বিদেশী পুরুষ ও মহিলার জীবনী গল্পের মত করিয়া বলিয়াছেন। বহি দু-খানি ছেলে-মেয়েদের হাতে দিবে তাহারা পড়িয়া শ্রীত ও উপকৃত হইবে। বহি দুখানি ন সচিত্র। ছাপা ও কাগজ ভাল। পুরস্কার দবার উপযোগী।

নানা প্রবন্ধ—২য় ভাগ। আচার্য্য হেমচন্দ্র সরকার প্রণীত ও শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য লেখা নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কাৰ্যালয়ে পাওয়া যায়।

ইহাও বালকবালিকাদের উপযোগী ভাল বস্তু। ছাপা ও কাগজ ভাল।

মেরু প্রদেশ—আচার্য্য হেমচন্দ্র সরকার প্রণীত ও শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী সম্পাদিত। মূল্য লেখা নাই। প্রাপ্তস্থান সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ কাৰ্যালয়, কলিকাতা। ছবি আছে। ছাপা ও কাগজ ভাল।

উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর এবং তথাকার মানুষদের বিবরণ, কি প্রকারে ঐ সব ভূখণ্ড আবিষ্কৃত হইল, ইত্যাদি বড়ই কৌতুকাবহ ব্যাপার। বালকবালিকারা আগ্রহের সহিত পড়িবে।

আচার্য্য হেমচন্দ্রের এই সমুদয় বহি নির্ভয়ে বালকবালিকাদের হাতে দেওয়া যায়। এ-গুলিতে জ্যাঠামি নাই, অথচ এগুলি উপদেশপূর্ণ নীরস বস্তু তাও নহে।

জীবনতরঙ্গ—আচার্য্য হেমচন্দ্র সরকার প্রণীত ও শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী সম্পাদিত। কাপড় বাধান। ৩৪৮ পৃষ্ঠা মূল্য লেখা নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কাৰ্যালয়ে পাওয়া যায়।

স্বর্গীয় আচার্য্য হেমচন্দ্র সরকার আত্মজীবনী বতটুকু লিখিয়াছিলেন তাহা আছে এবং বাকী, পুস্তকের আধকাংশ, তাহার দৈনন্দিন জীবন অর্থাৎ ডায়েরী। তাহার পা লতা বিহুসী কস্তা পিতৃভক্তিমতী শকুন্তলা ইহা এবং অন্যান্য বহিগুলি প্রকাশিত করিয়াছেন। এই "জীবনতরঙ্গ" প্রাপ্ত-বয়স্ক ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিদের ভাল লাগিবে। তাহারা ইহা পড়িয়া উপকৃত হইবেন।

কবি ও কাব্যের কথা—স্বর্গীয় লাবণ্যপ্রভা সরকার প্রণীত ও শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী সম্পাদিত মূল্য লেখা নাই। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ কাৰ্যালয়ে প্রাপ্তব্য। ছাপা ও কাগজ ভাল।

স্বর্গীয় লাবণ্যপ্রভা সরকার লিহুসী ও সুলোথিকা ছিলেন তাহার লিখিত কৃত্তিবাস, কাশ্যরাম দাস, দীনবন্ধু মিত্র, গঙ্গরচন্দ্র গুপ্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত ও বাঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এবং তাহার স্বামী স্বর্গীয় হেমচন্দ্র সরকারের লেখা রবীন্দ্র ঐন্দির ও অ লফ্রেড চেনিসনের সাহিত্যিক পরিচয় এই বহিখানিতে আছে। ইহা অল্পবয়স্ক ও আয়তবয়স্ক স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর পড়বার উপযোগী ভাল বহি ত বটেই, তাহার ছাত্রাবস্থা আত্মকর্ম্ম করিয়াছেন ইহা তাহাদেরও অধ্যয়নের উপযুক্ত।

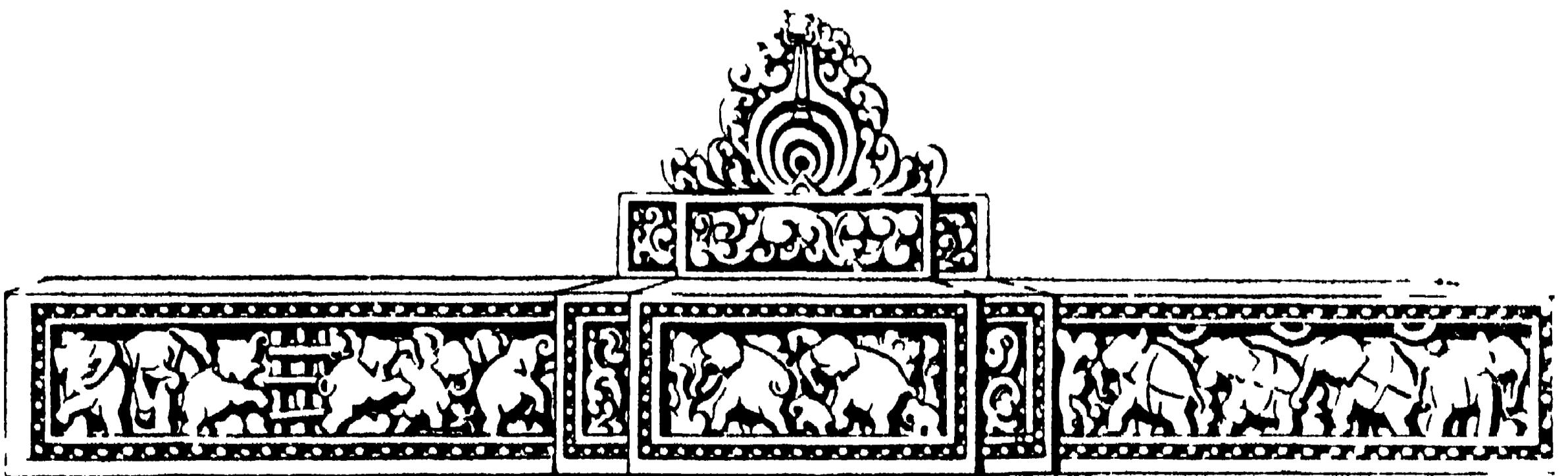
পৌরাণিক কাহিনী—তৃতীয় ভাগ (গ্রীক পুরাণ) স্বর্গীয় লাবণ্যপ্রভা সরকার প্রণীত ও শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী সম্পাদিত। মূল্য আট আনা। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ কাৰ্যালয়ে প্রাপ্তব্য এবং আছে ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট।

গ্রীক পুরাণের চৌদ্দটি বনোহর আখ্যা যক তাহাতে গার্লিফ হইয়াছে গল্পগুলি সরল সরস ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

বঙ্গীয় শব্দকোষ—শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত। প্রথম ভাগ, একাদশ খণ্ড। শাস্তিনিকেতনে প্রস্তুতকরণে নিকট প্রাপ্তব্য। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১০, ডাকমাণ্ডল ১০।

প্রথম ভাগ, একাদশ খণ্ডে 'আওয়াজ' হইতে 'আগ্রহাষণ' শব্দগুলি, অর্থ প্রভৃতি আছে।

এই অভিধানের পরচয় গত কোন কোন সংখ্যায় দেওয়া হইয়াছে



লুই পাস্তুর ও তাঁহার গবেষণা

আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীসত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী, ডি-এসসি

১

লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে বৈজ্ঞানিক তাঁহার পরীক্ষাগারে যে-সকল তত্ত্বের আবিষ্কার করেন, তাহা চিরস্থায়ী এবং সমস্ত মানব তাহার ফল ভোগ করে। যে-সকল স্বনামধন্য মনীষী নিজেদের ঐকান্তিক সাধনা বলে জগতের বিজ্ঞান-ভাণ্ডারে অমূল্য রত্নরাশি সঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন, মানুষ যুগযুগান্তর ধরিয়া তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য দান করিতেছে। লুই পাস্তুর তাঁহাদেরই অগ্রতম।

১৮২২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর ফ্রান্সের অন্তর্গত ডোল নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে পাস্তুরের জন্ম হয়। পাস্তুরের পূর্বপুরুষগণ



লুই পাস্তুর

চর্মব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার পিতা জিন্ যোসেফ্ বংশাভুগত চর্মকারের বৃত্তি অবলম্বন করেন, কিন্তু নেপোলিয়নের রাজত্ব কালে প্রায় তিন বৎসর 'তৃতীয় সৈনিকবিভাগে' সৈনিকের কার্য্য করিয়া সম্রাট কর্তৃক যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মানিত হন। পাস্তুরের

শৈশবকালে জিন্ যোসেফ্ আবুবোয়া শহরে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন এবং এই স্থানেই পাস্তুরের প্রথম বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। তিনি প্রথমে একোল্ প্রিমিয়ারে এবং পরে আবুবোয়া কলেজে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। কলেজের পরীক্ষায় পদক, পুরস্কার প্রভৃতি লাভ করা সত্ত্বেও শিক্ষকের মনে 'তিনি ভাল ছাত্র' বলিয়া দৃঢ় ধারণা ছিল না—কারণ তিনি কোন বিষয়ই তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করিতে পারিতেন না। পাস্তুরের সদাই ইচ্ছা হইত যে তিনি প্যারীর বিখ্যাত একোল্ নর্ম্যাল্ (Ecole Normale) নামক প্রতিষ্ঠানমা বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়া সেখানকার প্রথম উপাধি পরীক্ষায় (baccalaureat—Bachelor's degree) কৃতকার্য হন। ১৫ বৎসর বয়সে তাঁহার এই স্বযোগ ঘটে এবং তিনি এক বন্ধুর সহিত প্যারীতে উপস্থিত হন। কিন্তু বালা স্বথস্থতি-জড়িত গ্রাম হইতে শহরের বিলাসভূমিতে আসিয়া তাঁহার অত্যন্ত মনঃকষ্ট হয়—এবং তিনি অস্থস্থ হইয়া পড়েন। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও প্যারীর আবহাওয়া তাঁহার সহ্য হইল না—সুতরাং বাধ্য হইয়াই একোল্ নর্ম্যাল্ বিদ্যালয় করার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া পুনরায় স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। প্যারীতে শিক্ষালাভের আশা সূদূরপর্যন্ত দেখিয়া তিনি দুই বৎসর পরে পিতার অনুমতিক্রমে আবুবোয়া হইতে পঁচিশ মাইল দূরে বেসাকোঁ (Besacon) কলেজে শিক্ষা লাভ করিতে যান এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই অতিরিক্ত শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া আহাঙ্গারির ব্যয় ব্যতীত প্রতি বৎসর তিন শত ফ্রাঙ্ক বৃত্তিলাভ করেন। এই সময়ে তিনি কি প্রকার পরিশ্রম করিতেন তাহা তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নীর নিকট লিখিত এক পত্র হইতে জানা যায়।

“তোমরা পরস্পরকে ভালবাসিবে এবং অলস হইবে না। একবার কাজ করার অভ্যাস হইয়া গেলে বিনা কাজে বসিয়া থাকা যায় না। আর জানিও যে পৃথিবীর সমস্তই মানুষের কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে।”

এইখানে শার্ল'শাপুই (Charles Chappuis) এর সঙ্গে

পাস্তুরের আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় এবং তাহারা নিজেদের ভবিষ্যতের জীবনধারা নিরূপণ করেন। শাল-শাপুই একেই নর্মগলে প্রবেশ লাভ করার এক বৎসর পরে পাস্তুরও সেইখানে ভর্তি হন। বাইশ বৎসর বয়সে পাস্তুর সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু তিনি পরীক্ষায় খুব উচ্চ স্থান লাভ করেন নাই এবং পরীক্ষকগণ তাহাকে রসায়ন শাস্ত্রে মাঝারি রকম (moderate in chemistry) বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অতঃপর পাস্তুর তাঁহার ভূতপূর্ব শিক্ষক এবং ব্রোমিন্ (Bromine) নামক মৌলিক পদার্থের আবিষ্কর্তা এম্ বালার্ড (M. Balard) এর সহকারী নিযুক্ত হন। স্ফটিক-তত্ত্ব (crystallography) সম্বন্ধে বিশেষ অনুরাগ থাকায় তিনি ঐ বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন এবং সর্বপ্রথম সফলতা লাভ করেন। তিষ্টিডিকাম (Tartaric acid) হইতে উদ্ভূত একটি যৌগিক পদার্থের স্ফটিক (Sodium ammonium tartrate) লইয়া গবেষণা করিবাব সময় তিনি আবিষ্কার করেন যে, এই যৌগিক পদার্থের মধ্যে দুই প্রকারের স্ফটিক বর্তমান আছে।* উক্ত দুই প্রকারের স্ফটিক আলোকরশ্মির দিক পবিবর্তন করে (optical rotation)। আলোকতত্ত্ব ও স্ফটিকতত্ত্ব সম্বন্ধে তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞ ব্যক্তি এম্ বিয়ো (M. Biot) এর নিকট এই আবিষ্কারের বিষয় জ্ঞাপন করা হইলে তিনি পাস্তুরকে পুনরায় ঐ পরীক্ষার যথাযথ প্রতিপাদন করিতে বলিলেন। পাস্তুর পুনরায় ঐ পরীক্ষা করিলে বিয়ো দেখিলেন যে, পাস্তুরের সিদ্ধান্ত সত্য সত্যই নিভুল। বিয়োর জীবন-ব্যাপী সাধনা আজ পাস্তুরের পবীক্ষা দ্বারা জয়যুক্ত হইল। তিনি আনন্দের আবেগে পাস্তুরকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “প্রিয় পাস্তুর, আমি সারাজীবন বিজ্ঞানকে এত অধিক ভালবাসিয়াছি যে, তোমার এই আবিষ্কার আমার হৃদয়কে বিচলিত করিয়াছে।” তখন পাস্তুরের বয়স মাত্র পঁচিশ কি ছাব্বিশ বৎসর।

এই সময়ে পাস্তুরের যশঃ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই গর্ভগমেট তাঁহাকে দিঁজ লিসেতে (Dijon lycee) পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করেন।

* তিষ্টিডিকাম তেঁতুলের মধ্যে বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়।

এই পদে অবস্থান কালে তাঁহার গবেষণাকার্যে বিশেষ বিঘ্ন ঘটে। এই জন্ত বিয়ো ক্ষুব্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, “গর্ভগমেটের কতৃপক্ষগণ ধারণা করিতে পারে না যে, গবেষণাকার্য সকল কার্যের উপরে।”

বাস্তবিক দেখা গিয়াছে যে, অনেক সময়ে যাহারা আজীবন মৌলিকতত্ত্বে নিমগ্ন থাকিয়া বহু গূঢ় বহুস্তরের আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহাদিগকে কোনও বিভাগেব সর্বময় কর্তা করিলে নানাপ্রকার কার্য পরিচালনায় ব্যাপ্ত থাকিতে হয় এবং অনেক চিঠিপত্র লেখালিখি কবিতো হয়। এইরূপ ধরাবাঁধা কাজে অনেক মহামূল্য সময় অপচয় হয়। এই কাৰণে পাস্তুরের মহামূল্য গবেষণাকার্যে বিঘ্ন জন্মে।

কিছুকাল পবেই বন্ধুবান্ধবের চেষ্টায় পাস্তুর ষ্ট্রাসবুর্গ (Strasbourg)এ রসায়নশাস্ত্রেব অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন এবং এই স্থলে তাঁহার গবেষণাকার্যে সুবিধা ঘটে।

এই সময়ে ষ্ট্রাসবুর্গ একাডেমীর অধ্যক্ষ ছিলেন এম্ লোঁরাঁ (M. Laurent)। তাঁহার পবিবারবর্গের সহিত পাস্তুরবেব



গবেষণাগারে পাস্তুর

ঘনিষ্ঠতা হয় এবং কিছুদিন পরে তিনি অধ্যক্ষের কন্যা মারি লোঁরাঁর গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন।

পাস্তুরের দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে তাঁহার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু লিখাছেন যে, মারি লোর। কেবল গৃহিণী ছিলেন না, গবেষণা-কাৰ্য্যেও তিনি পাস্তুরের প্রধান সাহায্যকারিণী ছিলেন।

সন্ধ্যাকালে পাস্তুর তাঁহার দৈনিক কাৰ্য্যাবলী বলিয়া যাইতেন এবং তাঁহার উপযুক্ত সহধর্মিণী সেই সমস্ত একত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া পাস্তুরকে উহা ব্যাখ্যা করিতে বলিতেন। ইহাতে পাস্তুরের এই সুবিধা হইত যে, ঐগুলি ব্যাখ্যা করিবার সময়ে তাঁহার মনে নূতন নূতন চিন্তার ধারা প্রবাহিত হইত এবং গবেষণাকাৰ্য্য সত্যপথে পরিচালিত করিবার শক্তি সঞ্চাৰ হইত। তাঁহার দাম্পত্যজীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখের না হইলে পাস্তুর এক জীবনে এত লোকহিতকর কাৰ্য্য করিতে সমর্থ হইতেন কি-না সন্দেহ।

এই সময়ে তিস্তিডিকায় সম্বন্ধে গবেষণা সম্পর্কে তাঁহার দৃষ্টি অগ্র দিকে আকৃষ্ট হয়। তিনি 'সন্ধান' বা 'গাঁজন প্রক্রিয়া' (fermentation) সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়েন এবং সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সুযোগও জুটিয়া যায়। তিনি এই সময়ে লিল (Lille) নগরে বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন। তিনি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে লিলের বিজ্ঞান সমিতিতে দুগ্ধাঙ্গ (lactic acid)* 'সন্ধান' বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান। এই প্রবন্ধের বক্তব্য আমাদের কাছে বিশেষ বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তৎকালে এই নূতন মতের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উঠিয়াছিল। ক্রমাগত বিশ বৎসর পরীক্ষার পর পাস্তুর তাঁহার মত প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং দীর্ঘ বিরোধ অবসানের সঙ্গে সকলেই স্বীকার করিলেন যে, জীবাণু ব্যতীত 'সন্ধান' হয় না।

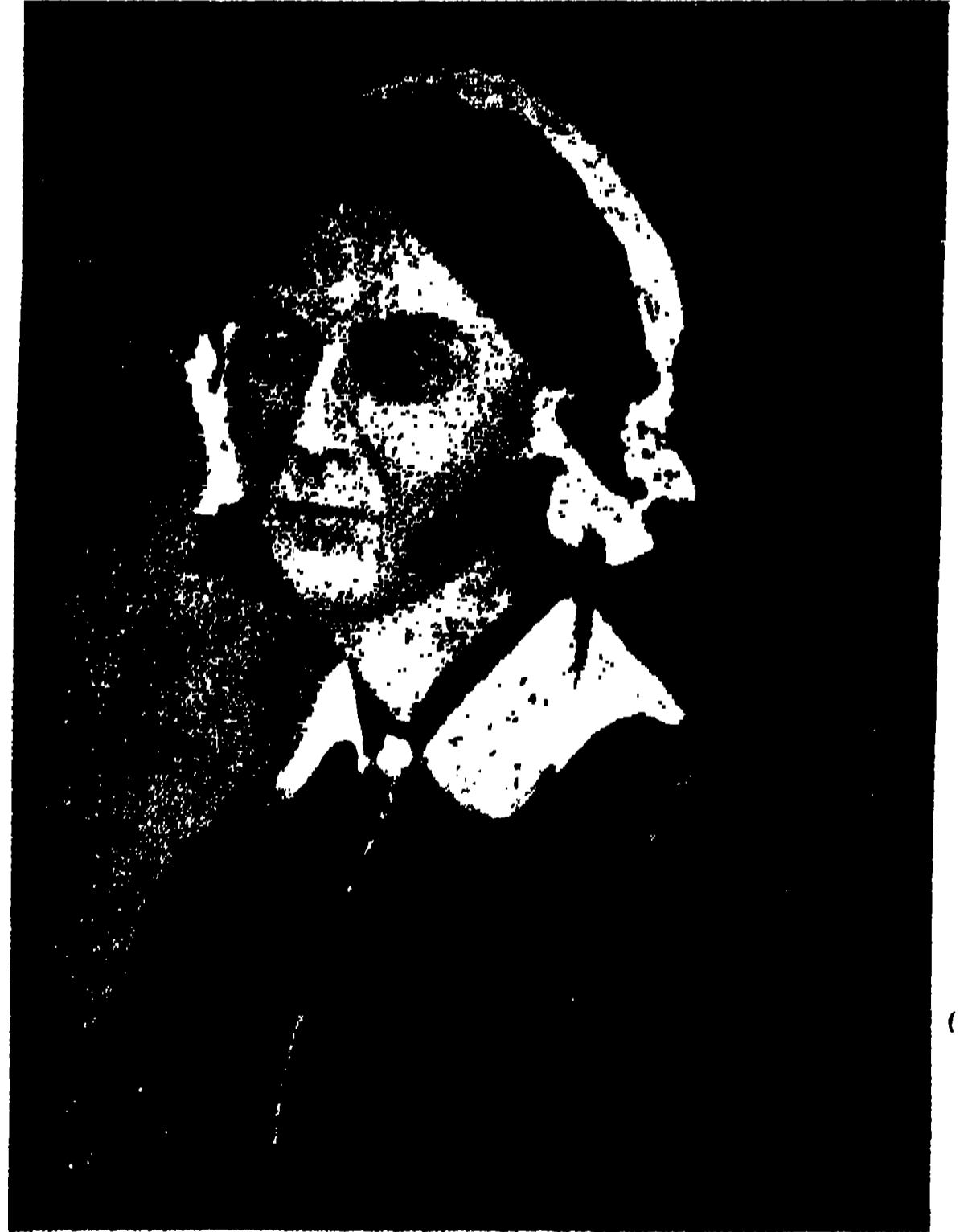
তাঁহার প্রিয় শিলা-মন্দির একোলা নর্ম্যাণের দুর্বস্থা দেখিয়া তিনি স্বহস্তে ইহার বিজ্ঞান শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। এই সময়ে কতকগুলি পারিবারিক দুর্ঘটনার জন্ম তাঁহার গবেষণাকাৰ্য্যের সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। মাত্র ছেচল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি সন্ধ্যাস রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার বন্ধুবান্ধব সকলেই ভাবিলেন যে, এইবার তাঁহার কর্মজীবনের অবসান

* দধি তৈয়ার করিবার সময় দুধে যে দ্রব দিতে হয় তাহাতে এক প্রকার জীবাণু থাকে। এই দ্রব দেওয়ায় জীবাণুর প্রসার বৃদ্ধি হয় এবং এই কারণে দুধ অম্লানু দধিতে পরিণত হয়।

ঘটিত। কিন্তু ভগবানের রূপায় পাস্তুর আরোগ্য লাভ করেন এবং কিছুকাল পরেই গুটীপোকায় সংক্রামক রোগের দুইটি জীবাণু আবিষ্কার করিয়া তাঁহার প্রিয় মাতৃভূমির নষ্টশিল্পের পুনরুদ্ধার করেন।

এইখানে বলা অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না যে, পাস্তুরের প্রবর্তিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ফরাসী দেশে লিয়ঁ (Lyons) নামক স্থানে কোটি কোটি টাকার রেশমের ব্যবসা হইতেছে। জাপানও এই উন্নত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া রেশমের ব্যবসায় প্রভূত লাভবান হইতেছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশে মালদহ, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে রেশমশিল্প প্রায় লুপ্ত হইবার উপক্রম হইতে চলিল, কিন্তু তথাপি আমাদের দেশের লোকের চোখ ফুটিল না। আমাদের দেশের রেশমশিল্প উন্নত করিতে হইলে বর্তমান বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যিক।

তৎকালে কোন যুদ্ধের সময়ে শত শত পীড়িত এবং



লুই পাস্তুর

আহত ব্যক্তি উপযুক্ত পরিচর্যার অভাবে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। যুদ্ধক্ষেত্রের হাসপাতালগুলির উন্নতির কথা

বলিতে গেলে আমাদের সর্বাগ্রে কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের কথা মনে পড়ে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ব্রিখাত 'ক্রিমিয়ান' যুদ্ধ সংঘটিত হয়, এবং স্কুটারীতে (Scutari) যে সামরিক হাসপাতাল ছিল তাহার অবস্থা তখন অতীব শোচনীয়।

মাতৃমুখের দুঃখ এবং যন্ত্রণা দেখিলে কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের হৃদয়ে অত্যন্ত করুণার সঞ্চার হইত এবং তিনি দেশের এই দুর্দিনে নিজেকে সর্বতোভাবে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সাইত্রিশ জন শুশ্রূষাকারিণীর সহিত তিনি স্কুটারীতে উপস্থিত হন। এই সময় তিনি যেরূপ পরিশ্রম এবং সূচাক্রমে তাহার কর্তব্য সমাধান করিয়াছিলেন, ইংরেজ জাতির ইতিহাসে তাহা চিরকাল সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত থাকিবে। তিনি অস্ত্রোপচারের গৃহে উপস্থিত থাকিয়া নিম্নত আহত ব্যক্তিদিগকে সাহসনা ও সাহসের কথা শুনাইতেন। রাত্রিকালে একটি প্রদীপহস্তে তিনি হাসপাতালের প্রতি গৃহে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং অনেক সময় হতভাগ্য আহত ব্যক্তিগণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি যে-সমস্ত পরিচর্যার নিয়মাবলী অবলম্বন করাইলেন তাহাতে হাসপাতালে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কমিয়া গেল। তিনি আদিবার পূর্বে মৃত্যুসংখ্যা শতকরা বিয়াল্লিশ জন ছিল, কিন্তু তাহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মৃত্যুসংখ্যা অবশেষে মাত্র শতকরা দুই জনে দাঁড়াইল। তাহার পরিশ্রমের প্রতিদানে কৃতজ্ঞ ইংরেজ জাতি টাদা তুলিয়া তাহাকে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় সাত লক্ষ টাকা উপহার দেন, এবং তিনি সেই অর্থ দ্বারা সেন্ট টমাস ও কিংস্ কলেজ হাসপাতালে শুশ্রূষাকারিণীদিগের শিক্ষার জন্ত 'নাইটিঙ্গেল হোম' (Nightingale Home) প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ফ্রান্সো-প্রুসিয়ান (Franco-Prussian) যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মাতৃভূমির পরাজয়ে এবং লোকস্বয়ে পাস্তুরের মনে অত্যন্ত বেদনার উদ্রেক হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে যাহারা প্রাণ দিয়াছে তাহারা বীরোচিত সম্মান লাভ করিয়াছে। কিন্তু যে সমস্ত সৈনিক সামান্য আহত হইয়া হাসপাতালে ক্ষতস্থান-বিষাক্ত (septic) হওয়ায় অসহায় ভাবে মৃত্যুর কবলে পতিত হয় তাহাদের জন্ত পাস্তুরের দয়ার্দ্র প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। পচন নিবারণের জন্ত পাস্তুর দেখাইলেন যে, মাংসের বোলকে উত্তপ্ত করিয়া জীবাণু-

বিহীন বাতাসে (filtered air) রাখিয়া দিলে পুনরায় পচন হইতে পারে না। কিন্তু মনুষ্যশরীরে পচন নিবারণ সম্বন্ধে এই পদ্ধতি প্রযোজ্য নহে। গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের শল্য-বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক লিষ্টার পচননিবারক



জোসেফ লিষ্টার

চিকিৎসা প্রণালীর (antiseptic treatment) প্রবর্তন করিয়া মনুষ্য জাতির অশেষ উপকার করিয়াছেন এবং এই সূত্রে জোসেফ লিষ্টার সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা বলা অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না।

এই বিখ্যাত ইংরেজ অস্ত্র-চিকিৎসক এসেক্সের অন্তর্গত আপটন (Upton) নামক স্থানে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা জোসেফ জ্যাকসন্ লিষ্টার যশস্বী বৈজ্ঞানিক ছিলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে জোসেফ লিষ্টার লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে এম, বি. ও এফ, আর, সি, এস্ উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎকালে হাসপাতালে অনেক রোগী তাহাদের ক্ষতস্থানে পচনের জন্ত মারা যাইত। লিষ্টার অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা এই পচনের কারণ নিরূপণ করিতে চেষ্টা আরম্ভ করেন। তিনি পায়েমিয়া (Pyæmia) নামক দুস্তর

ব্যাদির কারণও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

লিষ্টারের কাজের প্রকৃত উপকারিতা বুঝিতে হইলে, আমাদের সেই সময়কার অস্ত্র-চিকিৎসার প্রণালী মোটামুটি জানা আবশ্যিক। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অস্ত্র-চিকিৎসায় জ্ঞানলোপকারী বা বেহুঁস করিবার (anaesthetic) পদার্থের ব্যবহার আরম্ভ হইলে পর তৎকালীন অস্ত্র-চিকিৎসকগণ ক্লোরোফর্ম প্রয়োগের দ্বারা অধিকতর সাহস এবং দক্ষতার সহিত রোগীর শরীরে অস্ত্রোপচার সমাধান করিতেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ রোগীরই ক্ষত স্থলে পচন আরম্ভ হইয়া প্রাণসংশয় হইত। সুতরাং তৎকালে হাসপাতালে অস্ত্র-চিকিৎসা করা ভয়ের ব্যাপার ছিল এবং লোকের শরীরের কোন স্থানে অস্ত্র-চিকিৎসার বিশেষ প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও কেহ তৎকালীন অতি বিচক্ষণ অস্ত্র-চিকিৎসক দ্বারাও অস্ত্রোপচার করিতে সাহস করিত না।

লিষ্টার গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্র চিকিৎসার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া তাঁহার অধীনস্থ হাসপাতালগুলিতে এইরূপ পচনজনিত মৃত্যুর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক দেখিয়া ইহার মূল কারণ নির্ণয়ের জন্ত বন্ধপরিষ্কার হইলেন। তিনি রোগীর ঘরের জানালাগুলি খুলিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন এবং প্রত্যেক রোগীর নিকট তাহার ব্যবহারের জন্ত পরিষ্কৃত তোয়ালে রাখিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এই সকল সতর্কতা সত্ত্বেও পচনের

জন্ত মৃত্যুসংখ্যা কিছুই কমিল না। এই সময়ে রোগের জীবাণুর প্রকৃতি সম্বন্ধে পাস্তুরের অভিনব আবিষ্কার লিষ্টারের নিকট এক নূতন আলোক আনিয়া দিল। লিষ্টার প্রথমে ভাবিয়াছিলেন যে, পচনের সহায়ক জীবাণুগুলি বাতাসে ভাসিয়া ভাসিয়া আসে। তখনকার দিনে কারবলিক এসিড জীবাণু ধ্বংসের একটি প্রধান ঔষধ বলিয়া পরিগণিত হইত। লিষ্টার ক্ষতস্থানে কারবলিক এসিডের প্রয়োগ আরম্ভ করিলেন। তাহাতে ফল এই হইল যে, ক্ষতস্থানের উপরে একটি পর্দা পড়িয়া যাইত এবং ক্ষতস্থানও তাড়াতাড়ি শুকাইয়া আসিত। কিন্তু রোগীর শরীরে কারবলিক এসিড পোড়ার ভীষণ দাগ থাকিয়া যাইত এবং সেজন্য অস্ত্রোপচারের পক্ষে ইহা রোগীদের মনঃপূত ছিল না। ইহার পরে আরও গবেষণার পর লিষ্টার বুঝিতে পারিলেন যে বাতাসের জীবাণুগুলি ক্ষত স্থানের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর নয়। পচনকার্যের প্রধান সহায়ক হইতেছে চিকিৎসকের হাতের, এবং ছুরি, কাঁচি, ব্যাণ্ডেজ ও রোগীর পোষাক পরিচ্ছদের ময়লা। তিনি উপযুক্ত ঔষধ দ্বারা এই সকল জিনিসকে জীবাণুবিহীন করিতে লাগিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে তখন হইতেই উচ্চাঙ্গ অস্ত্র-চিকিৎসা-বিদ্যার উৎপত্তি। আজও পর্যন্ত সকল অস্ত্রোপচারে লিষ্টার প্রবর্তিত পচননিবারক প্রণালী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অস্ত্র-চিকিৎসায় লিষ্টারের অমূল্য দান লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে অকাল মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইতেছে।



পুরোহিত

শ্রীতারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মা বলিলেন—দিন যখন খারাপ তখন আজ যাওয়া হ'তেই পারে না। কিন্তু দিন খারাপ বলিয়া পৃথিবী ত তাহার কক্ষপথে নিয়মিত একটি আবর্তন না দিয়া বসিয়া থাকিবে না এবং সে আবর্তনে একটি দিবারাত্রি অতিক্রান্ত হইলেই বিমলের চেষ্টার দিবার নির্দিষ্ট দিনটি যে পার হইয়া যাইবে! সে উত্তপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—কে বললে যে দিন খারাপ? কোন্ মূর্খ বলেছে?

মা চোখ রাঙাইয়া বলিয়া উঠিলেন—দেখ বিমল লঘু গুরু মাণ্ড ক'রে কথা ক'সু। দিন দেখেছেন ভটচাষ মশায়।

পুরোহিত যত্ন ভট্টাচার্য্য বিমলের বাপের বয়সী লোক। এ-বাড়িতে তাঁহার প্রতাপ অপ্রতিহত। বিমলের পিতা জমিদার পঞ্চানন রায় তাঁহার কথায় না-কি উঠিতেন বসিতেন। লোকে বলিত যত্ন ভটচাষ পঞ্চানন রায়কে 'বাদর নাচ' নাচাইত। এক সোনার তুলসীপত্র আর বিলপত্র একত্র করিয়া যত্ন ভটচাষের স্ত্রীর দশখানা ভারী ভারী গহনা হইয়াছে। একবার তাগা, একবার হার, একবার চুড়ি বার-বারের হিসাব মনে থাকে না, তবে মনে করিলেই মনে পড়িবে ইহা নিশ্চয়। বিমল মনে মনে ভটচাষের মাথা খাইয়া বলিল—আচ্ছা, যাই আমি ভটচাষের কাছে।

রাধাগোবিন্দজীউর মন্দির-প্রাঙ্গণে বসিয়া ভটচাষ চশমা-চোখে ঘাস ছিঁড়িতেছিলেন। বাধান আঙিনায় একটা ফাটল দেখা দিয়াছে, সেই ফাটল আশ্রয় করিয়া উঠিয়াছে ঘাস।

বিমল ডাকিল—এই যে ভটচাষ মশাই।

ভটচাষের চশমাটা ঝুলিতেছিল নাকের ডগায়। নাকের ডগাটা বিমলের মুখের উপর নিবন্ধ করিয়া ভটচাষ বলিলেন—বিমল! ভালই হয়েছে। তোমাকেই খুঁজছিলাম আমি। দেখ দেখি—উঠানের ফাটল—এটা মেরামত—

বাধা দিয়া বিমল বলিল—কি বলেছেন মাকে আপনি?

বিস্মিত হইয়া ভটচাষ বলিলেন—কি বলেছি?

—আমার জরুরি কাজ রয়েছে আর আপনি মাকে বলেছেন আজ দিন খারাপ—যাত্রা নাই।

ভটচাষ একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—তা কাজ যখন রয়েছে তখন যাত্রা না থাকলে চলবে কেন? চলে যাও তুমি আজ।

বিমল একটু নরম হইল, বলিল—কিন্তু মা যে—

—দাঁড়াও পাঁজিটা একবার দেখি। ভটচাষ উঠিয়া হাত-পা বাঁড়িয়া পাঁজি লইয়া বসিলেন। দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন—ছোটো আর্টচল্লিশ মিনিটের পর তিনটের মধ্যে চলে যাও তুমি গোবিন্দ স্মরণ ক'রে। গমনে বামনশ্চিব—বামনমূর্তি মনে মনে কল্পনা ক'রে বেরিয়ে পড়বে।

—বেশ লোক ত তুমি ভটচাষ ঠাকুরপো! বিমলকে যেতে বলছ তুমি? তবে যে আমাকে বললে আজকে দিন খারাপ—যাত্রা হতেই পারে না।

মা কখন সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন কেহ লক্ষ্য করে নাই। ভটচাষ নাকের ডগা আকাশে তুলিয়া তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন—সে কথা ত মিথ্যে বলি নাই আমি। দেখ না পাঁজি—যাত্রা নাই আজ।

বিমলের মা বাক্য দিয়া বলিয়া উঠিলেন—তবে? তবে যে বিমলকে যেতে বলছ তুমি?

বিমল বলিল—এই যে বললেন আমাকে ছোটো আর্টচল্লিশ মিনিটের পর তিনটের মধ্যে যাবে।

—হাঁ তা যাওয়া চলতে পারে। ভাল সময় ওটা। ঐ সময়টাতেই বেরিয়ে যেয়ো তুমি।

বিমলের মা রুঢ়ভাবে বলিয়া উঠিলেন—যাত্রা নাই ক'রে বেরিয়ে যাবে কি রকম? তুমি কি পাগল হ'লে না কি?

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—ওর যে কাজের ক্ষতি হবে বলছে বোঠাকরুণ।

গিন্নী বলিলেন—তা ব'লে অ-দিনে অ-ক্ষণে যাওয়া-আসা করে না-কি? তুমি বলছ কি?

ভট্টাচার্য বলিলেন—ঠিকই বলছি বউ। বুঝিয়ে দিই তোমাকে। বিমল ব্যবসায়কর্ম ত আজ থেকেই আরম্ভ করছে না। এ কর্মে যাত্রা করেছে ও অনেক দিন আগেই—শুভদিন শুভক্ষণেই সে ও আরম্ভ করেছে। এটা হচ্ছে মধ্যপথে সেই যাত্রাতেই একটা ছোট যাত্রা আর কি। ধর না, যেমন তুমি শুভ দিন ক্ষণ দেখে যাত্রা করলে তীর্থে। পথে গাড়ী বদলের সময় পড়ল বারবেলা কি একটা খারাপ লগ্ন। সে ক্ষেত্রে গোবিন্দ স্মরণ করে বামনমূর্তি চিন্তা করে যাত্রা করলেই দোষ খণ্ডন হয়ে যায়।

বিমলের হাসি পাইয়াছিল। অতি কষ্টে সে আত্ম-সংবরণ করিয়া রহিল। গিন্নী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন— তা হ'লে তুমি অনুমতি দিচ্ছ ত ?

ভট্টাচার্য বলিলেন—হ্যাঁ আমি দিচ্ছি—তুমিও দ্বিধা না করে আশীর্বাদ করে অনুমতি দাও।...হ্যাঁ—আর গোবিন্দের চরণে পাঁচ পাতা তুলসী—সেটাও বরণ ব্যবস্থা করা ভাল, বুঝলে। গিন্নীর যেন ব্যবস্থাটা এতক্ষণে মনঃপূত হইল। হৃষ্টচিত্তে বলিলেন—সেই ভাল। তা হ'লে আর আমার মনে কোন খুঁত থাকবে না। তুমি ত সহজে সে ব্যবস্থা করবে না। বিমল, নায়েবকে তুই তা হ'লে ডেকে দে আমার কাছে। বাগল সেকরার কাছে গড়ান মজুতই আছে সোনার তুলসীপাতা—ওজনটোজন দেখে নিয়ে আসুক।

বিমলের মনটা কিন্তু খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। এমনি করিয়া যাত্রার লগ্ন শুদ্ধ করিতে হইলে যে অবশেষে দিন দেখিবার জন্তু পাজি কেনার পয়সা জুটবে না! টিকি ও ফোঁটার উপর বিরূপ সে চিরদিন। কিন্তু আজ আর সে-বিরূপতা ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় পরিণত না হইয়া পারিল না।

ভট্টাচার্য বলিতেছিলেন তাহার মাকে—তোমার ত সব জানাই আছে—কি-কি লাগবে। পঞ্চগব্য—পঞ্চামৃত—নৈবিদ্য, আর কাপড় একখানা। কাপড়খানা দশ গজা শাড়ীই যেন আনে। কাপড় কাপড় করে আমাকে জালিয়ে খেলে বাপু।

বিমল ঘৃণাভরে সে স্থান পরিত্যাগ করিল। স্থির করিল এবার কলিকাতা হইতে ফিরিয়া ভট্টাচার্যের ব্যবস্থা একটা করিতে হইবে। মনে মনে বলিল—দাঁড়াও—

তোমারও যাত্রার দিন আমি দেখছি। অগস্ত্য যাত্রা—কিংবা ত্রাহস্পর্শ কি মঘাই হবে প্রশস্ত দিন।

* * *

মাসখানেক পর বিমল দেশে ফিরিল। মনটা খুশীই ছিল। টেণ্ডার তাহার মঞ্জুর হইয়াছে। পাঁচ পাতা সোনার তুলসীপত্রের জন্তু ক্ষোভটা কমিয়া গিয়াছে। আর কথাটা তাহার মনেও ছিল না। কাজের ভিড় অত্যন্ত বেশী। বিষয়পত্র কোথায় কি সে-সব জানিবার জন্তু বিপুল পরিশ্রম তাহাকে করিতে হইতেছে। বাল্যকাল হইতে লেখাপড়ার জন্তু কলিকাতায় মাসির বাড়িতে মানুষ হইয়াছে। তাহার পর মাসতুত ভাইদের দেখাদেখি কয়লার ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া কর্মজীবনও কলিকাতায় কাটিতেছিল। এমন সময় পঞ্চানন রায় হঠাৎ মারা গেলেন। অকস্মাৎ বিষয় জমিদারী ঘাড়ে পড়ায় সে বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কাঁটার মুখে সান দিতে হয় না। বিষয়ী ঘরের ছেলে সে—নিজেও ব্যবসায়বুদ্ধিতে খানিকটা সাফল্য লাভ করিয়াছিল—তীক্ষ্ণ চতুরতার সহিত সব দিক গুছাইয়া লইতে তাহাকে বেগ পাইতে হইবে বলিয়া তাহার মনে হয় না। তবে কলিকাতায় ব্যবসা আর এখানে জমিদারী—দুই দিক লইয়াই হইয়াছে মুশ্কেল। মা বলেন—কাজ কি বাপু তোর ব্যবসায় ? জমিদারের ছেলে জমিদারী কর। বার যা কাজ বুঝলি ? বিমল হাসে। জমিদার ! হাজার-পাঁচেক টাকা আয়ের জমিদার। চামচিকাই বা তবে পাণ্ডী নয় কেন ? স্ত্রীও তাই বলেন। কাজ কি বাপু ব্যবসায় ?

বিমল মনে মনে বলে—দাঁড়াও না বছর দুই তোমাকে কলিকাতার জল খাইয়ে আনি। তারপর আবার শুনব তোমার মত।

যাক।

সে-দিন ভোরেই তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল খুকীর কান্নার শব্দে। খুকী তাহার আট বছরের মেয়ে সুষমা। কান পাতিয়া শুনিয়া মনে হইল দক্ষিণের জানালার নীচেই বাগান হইতে কান্নাটা ভাসিয়া আসিতেছে। সময়টা কার্তিক মাস। ঠাণ্ডা পড়ার জন্তু জানালাটা বন্ধ ছিল। জানালাটা খুলিতেই নজরে পড়িল খুকী বৃদ্ধ ভট্টাচার্যের পিছনে পিছনে কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটাছুটি করিতেছে বৃদ্ধ ভট্টাচার্যও লম্বা লম্বা পা

ফেলিয়া একরূপ ছুটিতেছেনই। আর পট পট করিয়া ফুল ছিড়িয়া সাজতে পুরিতেছেন।

খুকী চীৎকার করিতেছিল—ওগো বাবা গো,—সব নিলে গো—আমি কি করব গো? আমার সেজুতি কেমন ক'রে হবে?

ফুল তুলিতে তুলিতে ভট্‌চাষ বলিল—এ্যাঃ, ভারি তোর সাজপুজুনী। তাব জন্যে আবার ফুল চাই! গোলাপ ফুলটা তুলে নিয়েচিস তুই—ওইটি দে। তা হ'লে তোকে চারটি ফুল আমি দেব। নইলে একটি ফুলও আজ পাবে না তুমি। রাধাগোবিন্দের চেয়ে ওর সাজপুজুনী বড়!

খুকী তীব্র ঝঙ্কার দিয়া মুখ ভেঙাইয়া উঠিল—এ্যা-এ্যা-এ্যা, ভারি ত ওর রাধাগোবিন্দ! চাই চাই চাই তোমার রাধাগোবিন্দ! কালো—ড্যাবড্যাবে চোক—এ-দিক ঝাংকা ও-দিক ঝাংকা—

বিপুল রোষে ভট্‌চাষ চীৎকার করিয়া উঠিল—এ্যাই-খুকী! এক চড়ে তোর গাল ভেঙে দেব বলছি। খবরদার।

খুকী ঘাড় উঁচু করিয়া বলিল—বটেই ত, বটেই ত তোর ঠাকুর চাই কালো। বলছিই ত—চাই—চাই—চাই! আমার 'সঙ্কোমণি অরুন্ধতী'কে কেন এ্যাঃ বলবে তুমি!

—নাঃ বলবে না! যেমন ব্রত তেমনি তার মস্তুর! তিনি ভেঙাইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—সঙ্কোমণি অরুন্ধতী অঙ্কবতী বেলফুল—

খুকী কৃষ্ণমূর্তির ভঙ্গিমা বিকৃতভাবে অন্তর্করণ করিয়া ভট্‌চাষকে মুখ ভেঙাইয়া দাঁড়াইল। সহসা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের জ্ঞান-গম্য যেন লোপ পাইয়া গেল। পাগলের মত খুকীকে ধরিয়া তাহার গালে সজোরে এক চড় বসাইয়া দিলেন। খুকী আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ভট্‌চাষ তাহাতেও তাহাকে নিষ্কৃতি দিলেন না। খুকীর আঁচল হইতে গোলাপ ফুলটি কাড়িয়া লইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন মন্দিরের দিকে। জানালায় দাঁড়াইয়া বিমল যেন বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছিল। ষাট বৎসর বয়সের বৃদ্ধ আট বৎসরের শিশুর সহিত এমন আচরণ করিতে পারে এ জ্ঞান তাহার ছিল না।

সে রুচস্বরে ডাকিল - ভট্‌চাষ মশাই!

লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া ভট্‌চাষ তখন দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া গেছেন। তর তর করিয়া বিমল নীচে নামিয়া আসি—

খুকীর চীৎকার তখনও থামে নাই। তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া সে দেখিল তাহার কচি গালে পাঁচটি আঙুলের দাগ রাঙা দড়ির মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। আপন মনেই সে বলিয়া উঠিল—বর্কর—জানোয়ার!

খুকী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—ভট্‌চাষ-দাদা মেলে আমায়। বিমল মনে মনে ভাবিতেছিল প্রতিবিধানের কথা। সে গম্ভীর ভাবে বলিল—চূপ কব। আজই তাড়াব ওকে আমি। খুকী চূপ করিল না, তাহার অভিযোগ তখনও শেষ হয় নাই। সে বলিল—রোজ আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে, রোজ আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে। একটি ফুল আমাকে দেয় না।

তাহাকে বুকে করিয়াই বিমল কাচারীঘর দিকে চলিল। জানোয়ারের সঙ্গে জানোয়ারের মত ব্যবহার করিয়া ফল নাই, তাহাকে আজই বিদায় করিয়া দিবে। কাচারীঘরে তখনও নায়েব আসে নাই! এক জন পাঠককে সে হুকুম করিল—নায়েববাবুকে এক্ষুনি ডেকে নিয়ে আয়। বলবি বাবু ব'সে আছেন।

নায়েব আসিতেই বিমল বলিল—আজই একজন পুরোহিত ঠিক করতে হবে দুপুরেব আগেই।

কথাটা সম্পূর্ণ বৃষ্টিতে না পারিয়া নায়েব বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বিমল বলিল—যত ভট্‌চাষকে জবাব দিয়ে দেন। আজই—এক্ষুনি।

নায়েব চূপ করিয়া রহিল। এমন পরমাশ্চর্যের কথা সে যেন কখনও শোনে নাই। বিমলের রুদ্ধ রোষ যেন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। সে আবার বলিল—লোকটা লোভী, অতিবড় লোভী, তা ছাড়া বর্কর, জানোয়ার, কাণ্ডজ্ঞানহীন।

নায়েব বলিল—আজ্ঞে— তা যে হবার উপায় নাই।

—উপায় নাই! কেন?

রোষে বিমল গর্জন করিয়া উঠিল।

—আজ্ঞে দেবোত্তরের দলিল বোধ হয় আপনি দেখেন নি?

অসহিষ্ণু হইয়া বিমল বলিয়া উঠিল—কি বলছেন আপনি স্পষ্ট করে বলুন। হাঁ, দেবোত্তরের দলিল দেখিনি আমি, কিন্তু কি হয়েছে তাতে?

—আজ্ঞে কর্তাবাবু তাতে শব্দতা ক'রে গেছেন যত

ভট্টাচার্য মশায় মন্দিরের হর্তাকর্তা থাকবেন। যাবতীয় পূজা-পার্বণ তাঁর নির্দেশমত হ'তে হবে। তাঁর জীবনভোর ত তিনি পুরোহিত থাকবেনই, এমন কি তাঁর পরে কে পুরোহিত হবেন তাও নির্দেশ ক'রে যাবেন তিনি। তবে গিন্নীমায়ের একটা সম্মতি চাই।

বিমল অবাক হইয়া নায়েবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল লোকটা প্রলাপ বকিতেছে। নায়েব তখন বলিতেছিল—এমন কি যত্ন ভট্টাচার্য ইচ্ছে করলে দেবোত্তর সম্পত্তির হিসেব-নিকেশ পর্য্যন্ত ট্রাষ্টীর কাছে চাইতে পারেন। যদি তাঁর মতে ট্রাষ্টী স্বেচ্ছাচারী হয়, কি হিন্দুধর্মবিগর্হিত কোন কাজ করেন, তবে তিনি আদালতে ট্রাষ্টীকে পদচ্যুত করতে পারবেন। তাঁর আর গিন্নীমায়ের ক্ষমতা এক।

বিমল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর বলিল—নিয়ে আসুন দলিল।

নায়েব দলিল আনিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিল—দলিলের আবার তিনখানা কপি,—একখানা আছে এষ্টেটের সেরেস্তায়, একখানা আছে গিন্নীমায়ের কাছে, আর একখানা আছে ভট্টাচার্যের হাতে।

ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তিন-চার বার দলিলখানা পড়িয়া বিমল টেবিলে মাথা গুঁজিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। তাঁহার ইচ্ছা করিতেছিল চাবুক মারিয়া সে পাষাণকে বিদায় করে। আপনার ত্রায্য অধিকারে বঞ্চিত হওয়ার একটা প্রচণ্ড আক্ষেপ আছে, সে আক্ষেপে সে যেন পাগল হইয়া যাইবার উপক্রম করিল। ইচ্ছা করিতেছিল সর্বাগ্রে ঐ দলিলখানা কুটিকুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে।

আবার সে দলিলখানা পড়িল। দেখিল ইহার প্রতি-বিধানে কিছু করিতে পারেন না। সে উঠিয়া চলিল তাঁহার কাছে। মা সমস্ত শুনিয়া বিমলের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন—একবার যা বলুলে তুমি—বিমল, বারাস্তরে আর ব'লো না। বললে—দেবোত্তরের ট্রাষ্টী ঘুচোবার জন্তে আমাকে দরখাস্ত করতে হবে।

বিমল আর কিছু বলিল না। সে সটান উপরে উঠিয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। নারীচরিত্র তাহার অজানা নয়—বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের মেয়েদের সে বেশ চেনে।

খুব বেশী দৃঢ় সংস্কারকে টলাইতে হইলে বড়-জোর প্রয়োজন এক দিন উপবাস।

চাকর চা লইয়া আসিতেই সে বলিল—নিয়ে যা, আমি খাব না।

জলখাবার-হাতে স্ত্রী প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াই বলিলেন—তোমার এ মতিগতি দিন দিন কি হচ্ছে বল দেখি ?

বিমল ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া সে বলিল—ইচ্ছে করছে আজ কালাপাহাড় হ'তে। শুধু ওই বামুন কেন—দেবতা-টেবতা টান মেরে জলে ফেলে—

শিহরিয়া উঠিয়া স্ত্রী কানে আঙুল দিয়া বলিলেন—চূপ—চূপ—চূপ!

তাহার মুখের শঙ্কাতুর বিবর্ণতা দেখিয়া বিমল আপনা হইতেই চূপ করিয়াছিল। তাহার স্ত্রী তখনও থবু থবু করিয়া কাঁপিতেছিলেন।

একটু সামলাইয়া লইয়া তিনি বলিলেন—যাই মাকে বলিগে—গোবিন্দের চরণে তুলসী দেওয়ার ব্যবস্থা করুন মা। কি হবে মা আমার সর্বশরীর কাঁপছে। আবার বিমল চীৎকার করিয়া উঠিল—খবরদার। এই জানোয়ার বামুন—

স্ত্রী ধুরিয়া দাড়াইয়া বলিলেন—তুমি কি পাগল হয়েছ না-কি? কা'কে কি বলছ? জান, গোবিনজীর সঙ্গে গুর কথা হয়!

এবার বিমল হতবাক হইয়া গেল। এত বড় সংবাদটা ত তাহার জানা ছিল না! স্ত্রী বলিলেন—আজ আর এখন কিছু খেয়ো না তুমি। তোমার নামে তুলসী দেওয়া হবে। চরণাম্নেত—আশীর্বাদ নিয়ে তবে...। হাঁ—হাঁ—করছ কি—ছি—ছি—ছি, তুমি যে মেলেছ হয়ে উঠলে দিন দিন।

চায়ের ট্রেতে চায়ের কাপটা তখন ঠাণ্ডা জল হইয়া গিয়াছিল। বিমল ঢক্ ঢক্ করিয়া সেই ঠাণ্ডা চা গিলিয়া কাপটা ঠক্ করিয়া নামাইয়া দিল।

স্ত্রী বলিলেন—যাক্, আমি উপোস ক'রে থাকলেই হবে। আর কিছু খেয়ো না যেন।

তিনি জলখাবারের ডিসটা লইয়া আক্ষেপ করিতে করিতেই চলিয়া গেলেন।

—কি হবে মাগো, ভয়ে আমার সর্বশরীর কাঁপছে।

মাকেই বা বলব কি করে আমি। লজ্জার ঘেয়ায় মাথাটা আমার কাটা যাচ্ছে যে! ছি! ছি!

বিমলের ইচ্ছা করিল র্যাক হইতে বন্দুকটা লইয়া নিজের বুকেই দাগিয়া দেয়।

দুই হাতে মাথা ধরিয়া সে বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পর সে শুনিল—ভটচাঘের কর্ণস্বর।

—কই—সে শালী কই গো বউঠাকরুণ?

গিন্নী গদগদ ভাবে বলিলেন—কি হ'ল আজ আবার সখীর সঙ্গে!

—ভারি ছুটু হয়েছে সে বউ। গোবিন্দজীকে বলেছে ছাই কালো। বাল্যভোগের প্রসাদ আনলাম—চরণাম্বেত এনেছি।

সঙ্গে সঙ্গে খুকীর ক্রন্দনধ্বনি শোনা গেল। তারপরই ভটচাঘের তীব্র তিরস্কার প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল—খবরদার বউ মা, খবরদার! কেন মারবে ওকে তুমি! মার বউঠাকরুণ, বউটাকে এক চড় তুমি কসে দাও।

তারপর গম্ভৈরকণ্ঠে তিনি বলেন—কৈদ না ভাই সখি, কৈদ না তুমি। এস আমার সঙ্গে এস। বাল্যভোগের প্রসাদ খেতে খেতে গল্প শুনবে এস। এস ভীম কি করে বক রাক্ষসকে মেরেছিল বলব এস। খুকী থিল্ থিল্ করিয়া হাসিয়া উঠে—বলে—সেই পায়ের খেতে খেতে—

কথা তাহার সম্পূর্ণ হয় না। কলস্বরূপ হাসি চক্‌মিলান বাড়ির খিলানে খিলানে জলতরঙ্গের মত বাজিয়া বাজিয়া উঠে।

ভটচাঘ বলেন—বউমা তোমার আজকাল দেবসেবায় এমন অবহেলা হ'ল কেন বল ত? আগের মতন ত কই—

গিন্নী বাধা দিয়া বলেন—তুমি এক এক সময় এমন কথা বল ঠাকুরপো! বিমল বাড়ি রয়েছে এখন—

হা হা করিয়া হাসিয়া ভটচাঘ বলেন—বুড়ো হয়েছে কি-না বউ। তা স্বামী-সেবা করা ভাল—পরম ধর্ম।

বিছানার উপর বিমল লাফ দিয়া উঠিয়া বসিয়া বলে ক্রট!

ভটচাঘ বলেন—তুমসী ক-পাতা গড়ান আছে ত?

* * *

নিরুপায়ের মনের ঘা মনে রাখিয়াই বিমলের দিন কাটিতেছিল। যেখানে সমস্ত সংসার বিরোধী সেখানে সে ছাড়া

উপায় কি? তাহা ছাড়া আর একটা দিকও ছিল। আর একদিক দিয়া বিপুল পরিতৃষ্টিতে মন তাহার ভরিয়াছিল। জমিদারী ও ব্যবসায়ের আশাতীত সাফল্য তাহাকে এ-দিকটা যেন ভুলাইয়া দিয়াছিল। সম্পত্তির পর সম্পত্তি সে কিনিয়া চলিয়াছে।

সে-দিন নামেব বলিল—সরকারদের লাট খড়বোনা বিক্রী হচ্ছে বাবু।

লাটখড়বোনা! বিমল লাফাইয়া উঠিল। লাটখড়বোনা যে সোনার সম্পত্তি! এ চাকলায় এমন সম্পত্তি আর নাই। তাহা ছাড়া যে-গ্রামে বিমলের বাস সে-গ্রামখানিও লাটখড়বোনার অন্তর্গত। নিজে জমিদার হইয়া অপরের জমিদারীর মধ্যে প্রজা হইয়া বাস করার আক্ষেপ ও লজ্জা আজ তিনপুরুষের মধ্যে মিটিল না।

নামেব বলিল—রত্নপুরের চাটুজ্জেরা না-কি কিনছে।

বিমল বলিল—এক্ষুনি যান আপনি সরকারদের ওখানে।

নামেব হাসি। বলিল—কাল রাত্রে শুনে রাত্রেই আমি সেখানে গিয়েছিলাম।

—তারপর?

—কথাবালা একরকম কয়ে এসেছি। পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দাম চায়। চাটুজ্জেরা তেত্রিশ হাজার কথা কয়ে গেছে। বড় সরকার বললেন পরশু পর্যন্ত দলিল রেজেষ্ট্রী ক'রে কাজ শেষ করতে হবে। কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত টাকা দিয়ে রাত্রেই দলিল লেখাপড়া শেষ করতে হবে, নইলে আর হবে না। চাটুজ্জেরা পরশু টাকা নিয়ে আসবে।

বিমল বলিল—আসুন আমার সঙ্গে। বাগল সেকরাকে ডাকতে পাঠান।

সিন্দুক খুলিয়া বিমল দেখিল মজুত মাত্র দশ হাজার। ব্যাঙ্কের খাতায় মজুত বার হাজার দু-শ পঁচিশ। কথাটা শুনিয়া মা-স্ত্রী আপনাদের গহনা বাহির করিয়া দিলেন। বাগল স্বর্ণকার ওজন করিয়া মূল্য অনুমান করিল—হাজার আষ্টেক। এখনও চাই পাঁচ হাজার! ঋণ সংগ্রহের সময় নাই। মধ্যে মাত্র ঘণ্টা-ত্রিশেক সময়। বিমল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

সহসা তাহার মাথায় বিছাতের মত একটা কথা খেলিয়া গেল। দেবোত্তরের খাতায় সে দেখিয়াছে বিগ্রহের

অলঙ্কারে বহু টাকা আবদ্ধ হইয়া আছে। সে মায়ের পা দুইটা
জড়াইয়া উপুড় হইয়া পড়িল।

বাস্ত হইয়া চিবুকে হাত দিয়া চুমা খাইয়া মা বলিলেন—
ওঠ—ওঠ—কি হ'ল কি ?

বিমল উঠিল না। বলিল—আগে বল—আমার কথা
রাখবে ?

—রাখব রাখব—ওঠ তুই।

—আমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি কর।

—তাই করছি—সাধ্য থাকলে করব। তুই ওঠ বাবা।

বিমল উঠিয়া বলিল—ঠাকুরদের গয়নাগুলি দাও।

মা সভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন।—সে কি রে ?

বিমল বলিল—আমি আবার গড়িয়ে দেব। যত টাকার
নেব তার চেয়ে বেশী দেব।

মা কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। বিমল বলিল—
গোবিন্দজীর নামেই ও-সম্পত্তি কিনব মা। তা হ'লে ত হবে।

মা দ্বিধাভরে বলিলেন—তাই ত বিমল।

আবার তাঁহার পা দুইটা ধরিয়া বিমল বলিল—তিন পুরুষের
লজ্জা মা—এ স্বেযোগ গেলে সে লজ্জা আর ঘুচবে না।

মা বলিলেন—দাঁড়া বাবা, ভট্টচাষ ঠাকুরপোকে ডাকি।

বিমল বলিয়া উঠিল—না—না—না। তা হ'লে আর হবে
না। সে একধারার মানুষ—সে প্রাণ ধরে কখনও দিতে
বলতে পারবে না।

মা বলিলেন—কিন্তু গয়না যে তাঁর কাছেই বাবা।

বিমল আঁতকাইয়া উঠিল।—বল কি মা! সে কি ?
সে যদি হঠাৎ মরে যায়—কি—

মা বাধা দিয়া বলিলেন—ছিঃ বিমল—কাকে কি বলছ ?
দৃঢ়স্বরে বিমল বলিল—ঠিক বলছি মা। তোমরা যাই
ভাব এমন লোভী আমি কখনও দেখিনি।

মা বলিলেন—গয়না কখনও তিনি বাড়ি নিয়ে যান না
বিমল! ঠাকুরঘরেই দেবোত্তরের আয়রণ চেটে সে-সব
মজুত থাকে।

—চাৰি ?

—চাৰি তাঁরই কাছে থাকে।

—হঁ।

নায়েববাবু ভট্টচাষ মশায়কে ডাকুন ত।

উত্তেজনায় বিমল অস্থিরভাবে পায়চারি করিতেছিল।
হাসিমুখে বাড়ি ঢুকিয়া ভট্টচাষ বলিলেন—কি ছকুম গো
বউ-ঠাকুরগণ।

বিমল এবার তাঁহার পায়ে উপুড় হইয়া পড়িল। বাস্তভাবে
ঠাকুর তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—কি—কি—হ'ল
কি—বাবা বিমল ?

বিমলের মা সমস্ত কথা বলিয়া বলিলেন—সম্পত্তি
গোবিন্দজীর নামেই কেনা হবে ঠাকুরপো। আর যে-টাকার
গহনা নেওয়া হবে এক বছরের মধ্যে বিমল তার দেড়গুণ
বেশী দেবে।

মাথা নাড়িয়া ভট্টচাষ বলিলেন—তা হয় না বউ। সে
আমি দিতে পারব না। না—সে কিছুতেই হবে না।

বিমল বলিল—বুঝুন আপনি ভট্টচাষ কাকা—গোবিন্দজীর
সম্পত্তি বাড়বে।

—উছ। সম্পত্তি নিয়ে কি করবে ঠাকুর ? উছ। সে আমি
দিতে পারব না।

নায়েব বলিল—নিজ গ্রাম ঠাকুরের দখলে আসবে।
পরের জমিদারীতে ঠাকুরকে বাস করতে হয় ভট্টচাষ
মশাই—

ভট্টচাষের সেই এক জবাব—উছ—গহনা আমি দিতে
পারব না বাপু। উ—হঁ!

এবার বিমল উঠিল। দৃঢ়স্বরে বলিল—চাৰি দেন সিন্দুকের।
বিশ্বিতভাবে ভট্টচাষ তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—
কেন ?

কঠোর স্বরে বিমল আদেশ করিল—দেন ! দেন বলছি !
ভট্টচাষ বলিলেন—চাৰি ত আমার কাছে নাই।
অকস্মাৎ তাহার হাত ধরিয়া রুঢ় ভাবে ঝাঁকি দিয়া বিমল
চীৎকার করিয়া উঠিল—চাৰি দে বলছি ভণ্ড বামুন ! নইলে
গুলী ক'রে তোকে মেরে ফেলব !

গিন্নী চীৎকার করিয়া ডাকিলেন—বিমল !

ভট্টচাষ বিমলের মূর্তি দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলেন—
ভীতস্বরে বলিলেন—চাৰি ত তোমার মায়ের কাছে থাকে
বাপু!

দৃঢ়স্বরে বিমল বলিল—চাৰি দাও মা !

মা বলিলেন—ঠাকুরপো !

ভটচাঁষ ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—উহ—সে হয় না বউ। প্রাণ ধরে সে আমি বলতে পারব না। উ-হু!

বিমল দ্রুতপদে মায়ের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। তাঁহার কাঠের হাতবান্ধটা থাকিত সম্মুখেই একটা জলচৌকীর উপর। সেটাকে আনিয়া সে উঠানের উপর আছাড় মারিয়া ফেলিয়া দিল। পাথরের টালি দিয়া বাঁধানো উঠানে আছাড় খাইয়া বান্ধটা চৌচির হইয়া ফাটিয়া গেল। ভিতরের জিনিষপত্র চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। রিঙে-গাঁথা গোছা ছই চাবি তাহার মধ্য হইতে কুড়াইয়া লইয়া বিমল উন্নতের মত মন্দিরের দিকে চলিয়া গেল।

একটা মানুষ যখন উন্নত হইয়া উঠে তখন অপর সকলে হইয়া যায় যেন মুক—পঙ্গু। বাড়ির সমস্ত লোক বিমলের উন্নততায় মুক-পঙ্গুর মত দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর বিমল আঁচলে করিয়া একরাশি অলঙ্কার আনিয়া বাগল স্বর্ণকারের সম্মুখে ঢালিয়া দিল। বলিল—ওজন কর।

মুক-পঙ্গু ভটচাঁষ অলঙ্কারগুলির দিকে তাকাইয়া বার বার করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তার পর বাঁপ দিয়া উপুড় হইয়া পড়িলেন অলঙ্কাররাশির উপর। বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—না—না—এ দেব না, দিতে পারব না। আমার—এ আমার।

বিমল রুচভাবে হাতে ধরিয়া সবলে ভটচাঁষকে টানিয়া সরাইয়া ফেলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা প্রলয় ঘটিয়া গেল যেন। সহসা ভটচাঁষ পাথরের উঠানে মাথা ঠুকিতে আরম্ভ করিলেন উন্নতের মত।

—এই নে—এই নে—তবে এই নে। এই নে—এই নে।

আঘাতের পরিমাণ বোধ নাই—জীবনের মমতা নাই—উন্নত বিকারগ্রস্ত যেন! ফিন্‌কি দিয়া রক্ত পড়িতেছিল। সে রক্তে ভটচাঁষের দেহ ভাসিয়া গেল—খানিকটা মাটি রক্তাক্ত হইয়া উঠিল।

বিমলের মা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। ছুটিয়া আসিয়া ভটচাঁষকে জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিলেন—ঠাকুরপো! ঠাকুরপো!—

ভটচাঁষ বলিয়া উঠিলেন—না—না—পারব না—পারব না আমি দিতে।

মা বিমলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—বাবা বিমল!

লঙ্কাসরম ভুলিয়া গিয়া স্ত্রী আসিয়া বলিল—ওগো! খুকী ওপাশে দাঁড়াইয়া ভয়ে কাঁদিতেছিল। নায়েব দাঁড়াইয়াছিল পাথরের মূর্তির মত। বিমলেরও উন্নততা ছুটিয়া গিয়াছিল। বিপুল ঘণাবিমিশ্রদৃষ্টিতে সে চাহিয়াছিল ঐ লোভজর্জর বৃদ্ধের দিকে। সে বেশ বুঝিল, বৃদ্ধের সর্ব্বাঙ্গের ঐ লোল-কুঞ্চন—ও জরা নয়—লোভজর্জরতা। সে স্থান ত্যাগ করিতে করিতে বলিল—নেঃ—নিয়ে যা। ইচ্ছে হয় ত বাড়িও নিয়ে যা ওগুলো।

কাছারীবাড়িতে গিয়া সে উঠিল। কিছুক্ষণ পর দেখিল বাগল স্বর্ণকার আবার চলিয়াছে অন্তরের দিকে। সে বুঝিয়াছিল—তবু জিজ্ঞাসা করিল—কি রে বাগল?

—আজ্ঞে তুলসী পাঁচপাতা।

* * *

বিমল ভাবিয়াছিল এই ঘটনার পর সে এখানে বাস করিবে কি করিয়া। তাহার দারুণ পরাজয়ের বার্তা লেখা রহিল ওই লোভী ব্রাহ্মণটার ললাটে। নিত্য দুইটি বেলা ঐ লিপি-অঙ্কিত ললাট লইয়া তাহারই সম্মুখ দিয়া তাহারই বাড়িতে যাইবে আসিবে—সে তাহা কেমন করিয়া সহ্য করিবে? কিন্তু নিরুপায়ে মানুষকে সব সহ্য করিতে হয়—ধীরে ধীরে সব সহ্য হইয়া যায়ও। বিমলেরও সহ্য হইল। যেমন পৃথিবী চলিতেছিল তেমনি চলিয়াছে। কিন্তু আক্রোশ বিমলের গেল না। মনে মনে সে স্নেহে সন্ধান করিয়া চলিল। বহুকষ্টে কৌশলে তুলসী-পাতার ওজন সে কিছু কমাইল। শুভদিন না দেখিয়া সে আর যায় না। মামলা-মকদ্দমার সংবাদ গোপনে থাকে। বাড়িতে মেয়েদের কানে আর তোলে না। কিন্তু তবুও বাগলের আসা-যাওয়ার বিরাম নাই। তাহার মুখে দ্বিতীয় কথাও নাই।

—বাগল—কি রে?

—আজ্ঞে—তুলসীপত্র।

বিমল মনে মনে গর্জায়। খুকীটা পর্য্যন্ত যত বড় হইতেছে তত তাহার ঐ লোভী ব্রাহ্মণটার উপর ভক্তির প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। দিবারাত্রি সে এখন মন্দিরে আছে। ফুলতোলা মালাগাঁথার ভার নাকি রূপা করিয়া বৃদ্ধ তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। এক এক সময় মনে হয় যাক্‌ গে যাহা করিতেছে সে করুক, উহার আর কয় দিন? পরক্ষণেই সে অস্থির হইয়া

উঠে। অক্ষয়ের মত বিপন্নের মৃত্যুকামনা ও আয়ুর দিন গণনার লজ্জা কাঁটার মত তাহাকে বিধিতে থাকে।

সে-দিন সকালে বসিয়া এই চিন্তাই সে করিতেছিল। এই মাত্র বৃদ্ধ সম্মুখ দিয়া ঘড়ির কাঁটাটির মত একগতিতে চলিয়া গেল।

খুকী আসিয়া ডাকিল—বাবা! ঠাকুমা তোমাকে ডাকছেন।

বিমল তেলেবেগুনে জলিয়া উঠিল। নিশ্চয় কোন ব্রত-পাক্ষণ!

বৃদ্ধ গেল—অব্য-বাহিত পরেই মা ডাকিলেন—ডাক লইয়া আসিল খুকী। সাজান বন্দোবস্ত। এ ঘেন নালিশ দায়ের হইল—হাকিম সমন সহি করিয়া দিলেন—পেয়াদা সমন জারি করিল। সে বিরক্তিভরে বলিয়া উঠিল—যা—এখন আমার সময় নাই যা!

খুকী বলিল—মায়ের যে জ্বর হয়েছে বাবা।

বিমলের মনে পড়িল সত্যই ত গত রাত্রে চারু সমস্ত রাত্রি কাতরাইয়াছে। শরীরে ঘেন উত্তাপও সে অনুভব করিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাড়ির ভিতর গেল।

মা বলিলেন—বউমার জ্বর হয়েছে রে, ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে দে।

—কতটা জ্বর হয়েছে?

—খুব বেশী নয়। কিন্তু বেলার সঙ্গে জ্বরটা বাড়ছে মনে হচ্ছে। ওঠেনি বেচারী আজ সকাল থেকে।

বিমল উপরে উঠিয়া গেল। বিছানায় শুইয়া চারু ছটফট করিতেছিল। দাহে সুন্দর রং রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। কপালে হাত দিয়া সে অনুভব করিল উত্তাপ অনেকখানি।

* * *

দেখিতে দেখিতে চারুর অসুখ ভীষণাকার ধারণ করিল। জেলার সদর হইতে বড় ডাক্তার আনান হইল। তিনি বলিলেন—টাইফয়েড। দিনের পর দিন কাটিতে আরম্ভ করিল—ঘমের সঙ্গে বৃদ্ধ করিয়া। বিমল মাথার শিয়রে বাসা গাড়িয়াছে। একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া তাহার বিন্দ্র নমনে দিনরাত্রি কাটিয়া যায়। মনের মধ্যে অনুশোচনার তাহার অন্ত নাই। ইদানীং ঐ বৃদ্ধের প্রতি আক্রোশ—বৃদ্ধের প্রতি ভক্তির জন্ম চারুর উপরও কতকটা

আসিয়া পড়িয়াছিল। শুধু চারু কেন ঐ বৃদ্ধ আজ তাহার সংসারের সকলকে আড়ালে রাখিয়া তাহার প্রতিপক্ষরূপে দাঁড়াইয়া আছে। একদিকে সে একা; অন্য দিকে বৃদ্ধের আড়ালে দাঁড়াইয়া সকলে যেন সতয়ে তাহার দিকে চায়।

—বউঠাকুরণ:—

মা বলেন—এস ঠাকুরপো!

—গোবিনজীর চরণামৃত এনেছি।

বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া তিনি ডাকেন—বউমা! বউমা! গোবিনজীর চরণামৃত—ইঁ কর!

সামান্য জ্ঞান থাকিলেও চারু মুখ মেলিয়া চরণামৃত পান করিয়া বলে—আ:

জ্ঞান না থাকিলে সজলনমনে বৃদ্ধ ললাটে স্পর্শ বুলাইয়া দিয়া চলিয়া যান। মা বলেন—ঠাকুরপো, সেবার ভার তোমার ওপর।

কথা বলিতে বৃদ্ধের ঠোঁট দুইটা থর থর করিয়া কাঁপে। বলেন—নিশ্চিত থাক বৌ!

প্রয়োজনে বা বিপুল আশঙ্কার দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিতেছে মনে হইলে বিমল পলাইয়া আসে কাছারীতে। পথে দেখে মন্দিরের মধ্যে বসিয়া বৃদ্ধ কিছু-না-কিছু করিতেছে। সম্ভাষ ডাক্তার আসেন—তাহাকে বিদায় করিতে গিয়া নিত্য বিমলের নজরে পড়ে একটি পুঁটলী হাতে বৃদ্ধ চলিয়াছে। এই অবস্থাতেও বিমলের হাসি পায়—লুণ্ঠন চলিয়াছেই—লুণ্ঠন চলিয়াছেই।

যাই হউক, চারু বাঁচিল। আটাশ দিনের পর ডাক্তার হাসিমুখে বলিলেন—আজ ভরসা হচ্ছে বিমলবাবু। উঃ, যা ভয় আমাদের হয়েছে। সকল কথা ত আপনাকে বলতে পারতাম না। বত্রিশ দিন পেরিয়ে গেলেই ‘আউট অফ ডেঞ্জার’।

তিনি একটু হাসিলেন।

বিমল কৃতজ্ঞ ভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল—কি বলে ধন্যবাদ দেব আপনাকে—

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন—ওপরের তাঁকে ধন্যবাদ দেন বিমলবাবু। ধন্যবাদ আমাদের পাওনা নয়—আমরা নিই ফি। একটা কথা জানেন—Medicine can cure disease but cannot prevent death. ডাক্তার চলিয়া গেলেন। বিমল

দেখিল চাকু প্রশান্তভাবে নিজা ষাইতেছে। পরম স্নেহভরে তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া দেখিল জ্বর নাই। পাণ্ডুর ললাটে বিন্দু বিন্দু স্নেহবিন্দু দেখা দিয়াছে।

বাহির হইতে মা ডাকলেন—বিমল!

—মা।

—রয়েছিস? একটা কথা আছে বাবা।

মন ছিল প্রশান্তিতে ভরিয়া। পরম পরিতুষ্ট স্বরে একান্ত আত্মবাহের মত সে বলিল—বল মা।

মা ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজার দিকে চাহিয়া বলিলেন—এস ঠাকুর পো, এস।

বুদ্ধ ভটচাষ ভিতরে প্রবেশ করিয়া অকারণে বার-কতক কাসিয়া উঠিলেন। হাতে তাঁর নিত্যকার সেই একটি পুঁটুলী।

মা বলিলেন—বল ঠাকুরপো—তুমি বল।

—বলছিলাম কি—ডাক্তার বললেন—বউমার নাকি আর কোন ভয় নাই। তা হ'লে যদি তোমরা বল তবে আমি সঙ্কল্প ভঙ্গ করি।

মা বলিলেন—কি বলিস বিমল?

ক্রকৃষ্ণিত করিয়া বিমল বলিল—কিসের সঙ্কল্প মা?

মা বলিলেন—তুই-বুঝি জানিস নে। বউমার অস্থখের পাঁচ দিনের দিন থেকে বরাবর সমস্ত দিন উপবাসী থেকে ঠাকুরপো গোবিনজীর পূজা ক'রে যাচ্ছেন। রাত্রে দুটি হবিষ্য করেন। তাই বলছেন...

তাহার চাকুর জন্ম ভটচাষ কৃচ্ছ-সাধন করিয়াছেন শুনিয়া বিমল একটু খুশী হইল। বলিল—তা'বেশ।

ভটচাষ বলিলেন—তা হলে কালকেই ব্রত শেষ করব। তুলসীপত্র ইত্যাদি যা-যা লাগবে ফর্দ ক'রে দিগ্বেছি। সে-গুলো জোগাড় ক'রে রেখো।

বিমলের মা বলিলেন—আমি বলছিলাম কি ঠাকুরপো—চল্লিশ দিন না গেলে বৌমা ঝোল পাবেন না। আর এ রোগটা নাকি ভারি কু-পেকো রোগ।

ভটচাষ বলিলেন—তাই হবে বউ। তুমি যখন বলছ তখন তাই হবে। যা হুকুম করবে তোমরা।

বিমল ভটচাষের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। সে ভাবিতেছিল এই জীবটির উপর আক্রোশ সে পোষণ করিয়াছিল কেমন করিয়া!

সে প্রচ্ছন্নবাক্য তাঁক হাসি হাসিয়া প্রশ্ন করিল—কত দিন আপনি উপোস ক'রে থাকতে পারেন ভটচাষ-মশায়?

ভটচাষও হাসিলেন একটু শুষ্ক হাসি; বলিলেন—এই যে আমাদের জীবিকা বাবা। এতে অশক্ত হলেও যে উপবাস ক'রে মরতে হবে। না পারলেও প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে বইকি।

উপবাসক্রিষ্ট কণ্ঠস্বর—কথা বলার করুণ দীন ভঙ্গী বিমলের প্রশান্ত মনকে স্পর্শ করিল। অকস্মাৎ তাহার লজ্জার আর অবধি রহিল না। দৃষ্টিতে পড়িল দারিদ্র্যশীর্ণ কঙ্কালসার মানব—আর তাহার ক্ষুধার্তরিক্ত অন্তরের অন্তরাল হইতে উকি মারিতেছে এক স্নেহরায়ণ কাঙাল।

সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—না—মা—থাক। কালই কাকা ব্রত শেষ করুন। কেন শুঁকে কষ্ট দেওয়া—ডাক্তার ত বলে গেলেন—

ভটচাষ বলিলেন—না—না—বাবা। কোন কষ্ট হবে না আমার। আমার বৌমার জন্ম গোবিন্দের মুখচেয়ে আনন্দেই কেটে যাবে ক'টা দিন।

বিমল আর আপত্তি করিল না। ভটচাষ তাঁহার পুঁটুলিটি তুলিয়া লইয়া ঠুকঠুক করিয়া নিত্য যেমন যান তেমন চলিয়া গেলেন। মাও নামিয়া গেলেন নীচের তলায়। বিমল তখন ভাবিতেছিল—শুধু কি উদরের দায়ে—শুধু কি লোভ? আর কিছ? দেবতার প্রতি একবিন্দু ভক্তি? তাহাদের প্রতি একবিন্দু ভালবাসা?

কথপোকথনের মধ্যে চাকু কখন আগিয়া উঠিয়াছিল। নিরালায় স্বামীকে পাইয়া সে বলিয়া উঠিল—ভটচাষকাকা! আমায় বড় ভালবাসেন।

জৈনধর্মের প্রাণশক্তি

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

আমার কাজ প্রধানতঃ ভারতীয় মধ্যযুগের ধর্মের আন্দোলন লইয়া। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম-আন্দোলনের সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে তাহার যোগ থাকিলেও আমার আলোচনার ক্ষেত্র ততটা দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিতে চাহি না। তবু আমার একটি স্নেহাস্পদ জৈন ছাত্র আমাকে ধরিয়াছেন এই মহাবীর-জন্মদিনের উপলক্ষ্যে যেন আমি আমার তরফ হইতে কিছু বলি।

মধ্যযুগের ভারতীয় সাধনার প্রধান গৌরবের কথা হইল মানব-মনের ধর্মচিন্তার স্বাধীনতা। জৈন ও বৌদ্ধ মতেরও উৎপত্তি তো এই স্বাধীনতা হইতেই। প্রচলিত বেদবাদের বিরুদ্ধে সত্য ও মহৎ আদর্শ লইয়া কিত্তীষণ যুদ্ধই তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন! তাই মধ্যযুগের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা আছে তাঁহারা জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের এই স্বাধীন সাধনাকে কখনও শ্রদ্ধা না করিয়া পারেন না।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫৯৯ অব্দে বিহার প্রদেশে পাটনা হইতে ২৭ মাইল দূরে, 'বসার'তীর্থে শ্রীমহাবীরের জন্ম। সে দিন ছিল শুক্র শুক্লা ত্রয়োদশী। কিন্তু এখন তাঁহার জন্মোৎসব প্রধানতঃ পালিত হয় ১লা ভাদ্রে, পশুচর্ষণের চতুর্থ দিনে। ৫২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বিহারের পান্ডুপুরীতে মহাবীরের তিরোধান ঘটে, তাই পান্ডুপুরী জৈনদের একটি বিশেষ তীর্থ, ইহা দক্ষিণ-বিহারে রাঙ্গুণহের নিকটে অবস্থিত।

বুদ্ধের সময় খুব সম্ভবতঃ ৫৮৮ হইতে ৫০৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ, কাজেই মহাবীর ও বুদ্ধ অনেক পরিমাণে সমসাময়িক। উভয়েই অনেকটা একই প্রদেশে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। কাজেই অনেকে যে মনে করেন বিহার ও পশ্চিম-বঙ্গে পরি-ব্রজন কালে উভয়ের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক নয়।

মহাবীর ও বুদ্ধ উভয়েই বেদের উপদিষ্ট যাগযজ্ঞাদির বিরোধী, সাংখ্য ও যোগ মতও তাই। ইহাদের সবারই মতে, "সত্তামাত্রই দুঃখময়, কর্মবশেই নিরন্তর সংসারপ্রবাহ; তাই

দুঃখময় জন্ম-মৃত্যুপ্রবাহ হইতে মুক্তিই সাধনার পরম ও চরম কথা।" জৈন বৌদ্ধ ও সাংখ্য মতে ঈশ্বরের স্থান নাই। যোগমতের ঈশ্বরও প্রায় না-থাকারই সাক্ষ্য। মহাবীর ও বুদ্ধ উভয়েই সর্বজাতিনির্কিশেষে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রাকৃত ভাষায় ধর্ম প্রচার করেন। উভয়েই সন্ন্যাসের উপর খুব ঝোঁক দেন, যদিও গৃহস্থ-আশ্রম লুপ্ত হয় নাই; হইলে ধর্মের ধারা এতকাল কেমন করিয়া টিকিত? এই সব নানা কারণে কেহ কেহ জৈন ও বৌদ্ধ মতকে গোলেমালে এক করিয়া ফেলিয়াছেন।

বুদ্ধের সময়েও দেখা যায় নিগ্রহ মত চলিয়াছে। নাত-পুত্র তাহার উপদেষ্টা। তখন নিগ্রহদের যে খবর মেলে তাহাতে বুঝা যায় তাহা এই জৈনদেরই কথা।

জৈনধর্মে সংসারী ও সন্ন্যাসী এই দুই ভাগ তো আছেই, কিন্তু তাহাদের আসল বিভাগ হইল শ্বেতাশ্বর ও দিগম্বর এই দুই বিভেদ লইয়া। এই বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাইবে।

বুদ্ধের ধর্মের সঙ্গে মহাবীরের ধর্মের এক বিষয়ে পার্থক্য বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে। বুদ্ধ তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মের আদি উপদেষ্টা আর মহাবীর তাঁহার ধর্মের চতুর্কিংশ বা শেষ তীর্থঙ্কর। বুদ্ধ পূর্ব পূর্ব আচার্য্যগণের উপদেশে বীতশ্রদ্ধ হইয়া স্বাধীন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিলেন আর মহাবীর হইলেন তাঁহার মতবাদের পূর্বতন সব মহাপুরুষদের সমাপ্তি ও পরিপূর্ণতা।

চক্ৰিণ জন তীর্থঙ্করের শেষ হইলেন মহাবীর আর তাঁহার পূর্ববর্তী তীর্থঙ্কর হইলেন পার্শ্বনাথ। ওসওয়ালরা পার্শ্বনাথকেই বিশেষ করিয়া মানেন। অনেকে বলেন পার্শ্বনাথ মহাবীর হইতে ২৫০ বৎসর পূর্বকার। উত্তরাধারন সূত্রমতে (২৩ অধ্যায়) পার্শ্বনাথের শিষ্য কেশীর সঙ্গে মহাবীরের শিষ্য গৌতমের দেখা ঘটিয়াছিল বলিয়া যে কেহ কেহ মনে করেন পার্শ্বনাথ ও মহাবীর প্রায় সমকালীন তাহা ঠিক নহে,

কারণ পার্থনাথের শিষ্য কেশী ছিলেন সেই পরম্পরাতে বহু পরে উৎপন্ন।

মহাবীরের পরবর্তী আচার্য্য ও শ্ববিরাবলীর সন্ধান পাওয়া যায় জৈন কল্পস্থত্রে। মহাবীরের শিষ্য সূর্য্যম্ হইতে শাণ্ডিল্য পর্য্যন্ত তেত্রিশ জন শ্ববির। দিগম্বর-মতেও বহু শ্ববির আছেন। তাঁহাদের প্রথম ও ষষ্ঠ শ্ববিরের নাম শ্বেতাশ্বর-মতের সঙ্গে মেলে, আর সব নাম ভিন্ন।

ষষ্ঠ শ্ববির ভদ্রবাহু হইতে চতুর্দশ শ্ববির বজ্রসেন পর্য্যন্ত শ্ববিরগণের শিষ্য, নাম, গণ, কুল ও শাখা জৈনশাস্ত্রে লিখিত আছে।

বুলর তাঁহার এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকায় (১৮২২) যে মথুরায় প্রাপ্ত এক খোদিত লিপি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে লিখিত সব নামের সঙ্গে জৈনশাস্ত্রোক্ত নামের মিল আছে।

এই সব গণ-কুল-শাখা প্রভৃতি অনুসরণ করিয়া জৈন সাধনার ধারা অনেকটা দূর পর্য্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। তাহার পর আবার বহু সন্ধান মেলে হেমচন্দ্রের গুর্জাবলী ও পট্টাবলীতে। তাহাতে বহু “গচ্ছ” বা পরম্পরার কথা আছে।

গুজরাতে শ্বেতাশ্বর জৈনদের মধ্যে স্থানকবাসীরা মূর্তি-পূজা স্বীকার করেন না; ডেরাবাসীরা করেন। ডেরাবাসীদের প্রধানতঃ চারিটি গচ্ছ—

- ১। তপাগচ্ছ। ইহাদের ভিক্ষাপাত্র লাল।
- ২। খরতর গচ্ছ। ইহাদের ভিক্ষাপাত্র কাল।
- ৩। অচঞ্চল গচ্ছ।
- ৪। পয় চন্দন গচ্ছ।

গুজরাতে ইহা ছাড়া আরও চারিটি গচ্ছ দেখা যায়।

শ্বেতাশ্বরদের মতে মহাবীর ছিলেন বিবাহিত। পিতার মৃত্যুর পরে বড় ভাইয়ের অমৃত্যু লইয়া কন্যা প্রিয়দর্শনাকে ঘরে রাখিয়া ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাসী হন। সংসার ত্যাগ করিয়া গেলে মহাবীরের দৌহিত্রী যশোবতী জন্মগ্রহণ করেন। দিগম্বর-মতে মহাবীর ছিলেন বাল-সন্ন্যাসী। অষ্টম বৎসরে তিনি সংসার ত্যাগ করেন।

শ্বেতাশ্বরদের মতে মহাবীরের জামাতা জমালি হইতেই ‘নিহুব’ বা জেদের সূত্র। অষ্টম ‘নিহুব’ই হইল দিগম্বর মত; এই জেদ ঘটে ৮৩ খৃষ্টাব্দে।

দিগম্বররা আবার কেহ কেহ বলেন ষষ্ঠ শ্ববির ভদ্রবাহুর সময়ে অর্দ্ধকালক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, তাহা হইতেই (৮০ খৃষ্টাব্দে) হয় শ্বেতাশ্বরদের উদ্ভব। ইহার পূর্বে আর কোনো নিহুব বা বিভাগ ঘটে নাই। মূল সত্য আবার পরে (১) নন্দী, (২) সেন, (৩) সিংহ, (৪) দেব—এই চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়।

শ্বেতাশ্বর সাধুরা কোপীন ও উত্তরীয় এই দুইখানি বস্ত্র ব্যবহার করেন। কোপীনের নামে তাহারা বলেন “চোল পট্ট” আর উত্তরীয়কে বলেন “পছেড়ী”। তাহা ছাড়া তাঁহারা কঞ্চল বা কাঁথাও ব্যবহার করিতে পারেন।

স্থানকবাসী সাধুরা মুখের উপর একটি বস্ত্রাচ্ছাদন বাঁধেন, তাহাকে বলে “মুখ-পত্নী,” সাধারণ লোকে বলে “মোমতী”। ধূল কীটাদি সরাইবার জন্য সাধুরা যে বাঁটা রাখেন তাহার নাম “পিছী”। তাহা ছাড়া কাষ্ঠ পাত্র প্রভৃতি লইয়া চৌদ্দটি জিনিষ পর্য্যন্ত তাঁহারা রাখিতে পারেন।

দিগম্বর সাধুরা বস্ত্র ব্যবহার করেন না কাজেই তাঁহারা বনবাসী। তাঁহারা ময়ূরপুচ্ছের “পিছী” রাখেন কীটাদি জীব সরাইতে। শ্বেতাশ্বর সাধুদের মত তাঁদের “উপাশ্রয়” বা থাকিবার নির্দিষ্ট বাড়ি নাই। শ্বেতাশ্বর ধনী গৃহস্থেরা নিজেদের জন্য আপন বাড়িতে গৃহ-মন্দির রাখিতে পারেন; দিগম্বররা পারেন না। উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিমার মধ্যেও পার্থক্য আছে। শ্বেতাশ্বরদের প্রতিমাতে বস্ত্র অলঙ্কার মণিমাণিক্যাদি বহু আভরণ থাকে, দিগম্বরদের সেরূপ থাকে না। শ্বেতাশ্বর প্রতিমার চক্ষু স্ফটিকনির্মিত, দিগম্বর প্রতিমার চক্ষুতে এমন কোনো বিলাসবৈভব নাই এবং তাহার দৃষ্টি ভূতলবিগ্নস্ত। ইহা ছাড়া পূজার উপচার বা উপকরণাদিতেও পার্থক্য আছে।

শ্বেতাশ্বর দিগম্বর উভয় মতই আপন আপন মতকেই বলেন প্রাচীন। মহাবীরের সময়েও মনে হয় এইরূপ কোনো একটা ভাগ ছিল। তিনি শ্ববিরকল্প ও জিনকল্প এই দুই দলকে একত্র করেন। প্রথমোক্ত দল বস্ত্র ব্যবহার করিতেন, দ্বিতীয় দল করিতেন না। তাই কেশী ছিলেন সবস্ত্র আর গৌতম ছিলেন বিবস্ত্র। তৈরিকদের অনেক গুরু তো নয়ই থাকিতেন। কাজেই অতি প্রাচীনকাল হইতেই নয় হইয়া সাধনা করার ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে।

খেতাঘর দিগঘর বিভাগ বিষয়ে স্থানবাসীদের দুইটি মত প্রচলিত আছে। প্রথম মতে সত্রাট চন্দ্রগুপ্তের সময়ে একটি মহাহুর্ভিক হয়। তখন জৈন সাধুর সংখ্যা ছিল চব্বিশ হাজার। সকলের আর ভিক্ষা মেলে না। তাই বার হাজার নিষ্ঠাবান দূরত সাধু, গুরু ভদ্রবাহুর সঙ্গে দক্ষিণ-ভারতে চলিয়া যান ও বার হাজার সাধু গুরু স্থূলভদ্রের সঙ্গে এই দেশেই থাকেন। এই স্থূলভদ্রের অধীনস্থ সাধুর দল কুচ্ছাচার সহ করিতে না পারিয়া বজ্রাদি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। হুর্ভিক চলিয়া গেলে যখন ভদ্রবাহু এদেশে ফিরিলেন তখন এই দল আর বস্ত্র ব্যবহার ছাড়িতে পারিলেন না।

দ্বিতীয় মতে হুর্ভিক বশতঃ যখন ভদ্রবাহু দক্ষিণ-ভারতে যান তখন তাঁহার অনুপস্থিতির অবসরে স্থূলভদ্র পাটলিপুত্রে একটি মহাসম্মেলন আহ্বান করেন। তাহাতে প্রাচীন উপদেশের আরটি অঙ্গ সংগ্রহের চেষ্টা হয়। এগারটি অঙ্গ তো যথেষ্টভাবে মিলিল, বাকী অঙ্গটি পূরণ করিয়া দিলেন স্থূলভদ্র। ভদ্রবাহু যখন আসিয়া দেখিলেন তাঁহাকে বাদ দিয়াই মহাসম্মেলন হইয়া গিয়াছে তখন তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন ও ঘোষণা করিলেন ঐ দ্বাদশ অঙ্গ-অপ্রামাণ্য।

এই বিভেদ সত্ত্বেও কিছুকাল এই উভয় দল একত্র চলিল, তারপর আর একত্র থাকা অসম্ভব হইল। খেতাঘর তপাগচ্ছ মতে এই বিচ্ছেদটি পূর্ণ হয় ১৪২ খৃষ্টাব্দে, চল্লিশবর্ষব্যাপী এক হুর্ভিকের অবসানে। স্থানবাসীরা বলেন এই বিচ্ছেদটি ঘটে ৮৩ খৃষ্টাব্দে। কেহ কেহ বলেন বজ্রসেনের দুর্বলতা বশতঃই এই বিচ্ছেদটি সম্ভব হয়।

খেতাঘরদের মধ্যে একটি গল্প চলিত আছে যে সাধু শিবভূতি গৃহস্থ অবস্থায় এক রাজার অধীনে কাজ করিতেন। শিবভূতি যখন সন্ন্যাসী হন তখন সেই রাজা তাঁহাকে একটি মহাই কঞ্চল উপহার দেন। শিবভূতির গুরু বলিলেন, এইরূপ বহুমূল্য বিলাসদ্রব্য সন্ন্যাসীর পক্ষে রাখা উচিত নয়। তবু শিবভূতি তাহা ত্যাগ না করাতে গুরু একদিন তাহা গোপনে কাটিয়া কুটিয়া রাখিলেন। শিবভূতি যখন তাহা দেখিলেন তখন হঃখিত হইয়া মহারীরের মত একেবারে সর্বপ্রকার বস্ত্রই ত্যাগ করিলেন। ইহা হইতেই হইল দিগঘর দলের উদ্ভব। কাজেই দেখা যায় নগ্নতার উদাহরণ জৈনধর্মের আদি ভাগেও আছে।

সন্ন্যাসীকে দিগঘর হইতে হইলে নারীদের সন্ন্যাস হইল না। তাই শিবভূতির ভগ্নী যখন সন্ন্যাস লইতে চাহিলেন তখন কহিলেন, “আমি কেমন করিয়া বস্ত্রত্যাগ করি?” শিবভূতি তাঁহাকে বুঝাইলেন, “এই ক্ষমের স্বকৃতিবশে পর ভয়ে পুরুষ হইয়া জন্মাইও, তার পর সন্ন্যাসী হইও।” তাই দিগঘরদের মধ্যে নারীর সন্ন্যাস মাঠে নিবারণও নাই। উনবিংশ তীর্থঙ্কর “মল্লি”কে খেতাঘররা নারী বলিয়া সম্বোধিত হইয়াছিলেন, তিনি ছিলেন পুরুষ, কারণ নারী হইয়া কেহ তীর্থঙ্কর হইবেন ইহা একান্ত অসম্ভব কথা।

এ-পর্যন্ত জৈনধর্ম সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ কথাই আলোচনা করা গেল মাত্র। এখন দেখা যাউক ভারতের বৈদিক ধর্ম হইতে জৈনধর্মের বিশেষত্ব কোথায়? বৈদিক মতে মুখ্য ধর্মই হইল যজ্ঞ, তাহাতে পশুবধ আবশ্যিক। জৈনধর্মে প্রধান কথাই অহিংসা। বৈদিক ধর্মে স্ত্রী গো আলম্বনীয়, জৈনধর্মে প্রধান ব্রতই গো-রক্ষা। এখনও ভারতে জৈনদের প্রধান কাজ গো-রক্ষার্থ পিঞ্জরাপোল প্রভৃতি করা।

বৈদিকদের আগমনের পূর্বে ভারতে সম্ভবতঃ এমন কোনো অতি প্রাচীন সভ্যতা ছিল যাহাতে গো ছিল অতি পবিত্র। তাহার প্রমাণও এখন কিছু কিছু মিলিতেছে, যদিও এখন এখানে সে-সব কথা আলোচনার অবসর নাই। জৈনরা হয়ত সেখান হইতেই তাঁহাদের এই বস্তুটি পাইয়াছেন। পরে বৈদিক মতেও ক্রমে গো হইয়া দাঁড়াইল অগ্নি। এক সময় বিবাহকালে যে গবালম্বন হইত তাহা বুঝা যায় এখনও বিবাহকালে উচ্চারিত বিখ্যাত “গৌ গৌঃ” মন্ত্রে। ভূত্য যখন উচ্চারণ করে “গৌঃ গৌঃ” অর্থাৎ “এই যে গো ইহাকে এখন কি করায়?” তখন বর বলেন, “ওঁ মুঞ্চগাম্” ইত্যাদি, অর্থাৎ “গো-টি ছাড়িয়া দাও।” তারপর এই মন্ত্র দিয়া শেষ করেন—“মা গাম্ অনাগাম্ অদিতিম্ বধিষ্ঠ।” অর্থাৎ “এই বেচারী নিরপরাধ গো-কে বধ করিয়া কাজ নাই” (সায়বেদ মন্ত্র-ব্রহ্মণ ২, ৮, ১৩-১৫; গোভিল গৃহ্যসূত্র ৪, ১০, ১২-২০; ইত্যাদি ইত্যাদি)

ক্রমে ভারতে গোমেধ লুপ্তই হইয়া গেল। আজ ভারতে গবালম্বনের কথা কেহ চিন্তাও করিতে পারেন না। যে বেদপূর্ব অতি প্রাচীন ধর্মধারা ধরিয়া ভারতে এত বড়

অবতনও ঘটিতে পারিল হয়ত সেই ধর্মধারার সঙ্গে জৈন বৌদ্ধাদি অহিংসাবাদীদের মূলতঃ বিলম্বণ যোগ ছিল।

বেদের কাম্য ছিল স্বর্গ; মুক্তিবাদ বেদের বাহিরের কথা। অবশ্য পরে এই মুক্তিবাদ বেদেও প্রবেশ করিয়াছে। এই মুক্তিবাদ হয়ত বেদের পূর্ব হইতেই ভারতে প্রচলিত ছিল। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মে, সাংখ্যাদি মতেও সেই স্থান হইতেই হয়ত মুক্তিবাদটা আসিয়াছে। জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে এই একই কথা। এক সময়ে দক্ষিণ-ভারতে জৈন-মত অতিশয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। জৈন-মত যে শুধু সেখানে গিয়াছেই তাহা নহে; হয়ত সেখান হইতে বহু প্রাচীন বেদ-পূর্ব ভারতীয় ভাব ও জৈন মতের আদিতে আসিয়াছে।

বেদের প্রাচীন আদর্শ ছিল গার্হস্থ্য ধর্ম। সম্মাসাচার বেদের পূর্ব হইতেই ভারতে ছিল এবং পরবর্তী বৈদিক কালে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছিল। চতুরাশ্রম ব্যবস্থার মধ্যে কি এই উভয়ের মধ্যে একটা আপোষ-রক্ষার চেষ্টা দেখা যায় না? জৈন বৌদ্ধাদি ধর্মের সম্মাস-প্রাধিক্তের মূলও হয়ত এখানেই।

বেদে সাহিত্য সঙ্গীত নাট্য অভিনয়াদি কলার প্রসারের পীঠস্থান ছিল ঋক্ভূমি। অবৈদিক কালচারের সেই ভূমি ছিল তীর্থে। বেদবিরুদ্ধ প্রখ্যাত অষ্টাদশ তৈর্থিক ছাড়া আরও বহু তৈর্থিকের কথা আমরা পাই। জৈনদের আচার্যরাও তীর্থঙ্কর।

রথযাত্রা স্নানযাত্রা প্রভৃতি উৎসবও আর্ধ্যপূর্ব এমন কোনো ধারা হইতে আসিল কি-না তাহা সন্ধান করিয়া দেখিবার বিষয়। দামো গেজেটিয়রে আছে কুস্তলপুরে রথ-উৎসবের প্রধান কথা হইল জলযাত্রা। তাহাতে মহাবীরকে স্নান করান হয়। সেই স্নাতাবশেষ জল ভক্তরা ক্রম করিয়া প্রকার সহিত হাতে মুখে মাখেন।

জৈন বৌদ্ধাদি ধর্মে ধর্মপ্রবর্তকরা সবাই কত্রিহ। সকলেই দেখাইতে চায় তাহার ধর্ম খুব উচ্চবংশীয় মহাপুরুষের কাছে প্রাপ্ত। তাই ভারতে মধ্যযুগে জোলা ধুনকার প্রভৃতি জাতীয় ধর্মপ্রবর্তকদেরও ব্রাহ্মণ বানাইবার চেষ্টা হইয়াছে। হিন্দুদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে গিয়াও জৈনরা কখনও একথা বলেন নাই যে তাঁহাদের আদি গুরুরা ব্রাহ্মণ। দেখা যায় ভারতে বেদের বাহিরের সত্যগুলি উদারভাবে সর্ব-প্রথমে প্রায় কত্রিয়রাই স্বীকার করিয়াছেন।

মগধ ও বঙ্গের পশ্চিম সীমাতেই জৈনধর্মের আদি ও পবিত্র স্থান। খুব সম্ভব এক সময় বাংলা দেশে বৌদ্ধ মত অপেক্ষা জৈনধর্মেরই বেশী পসার ছিল। ক্রমে জৈনধর্ম সরিয়া গেলে বৌদ্ধধর্ম সেই স্থান অধিকার করে। এখনও বঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে সরাক জাতি শ্রাবকদের পূর্বস্মৃতি বহন করিতেছে। এখনও বহু জৈন-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, বহু জৈনমূর্তি, শিলালেখ প্রভৃতি জৈন-চিহ্ন বাংলার নানা স্থানে দৃষ্ট হয়।

বাংলার অনেক স্থানে দিগম্বর বিশাল সব জৈনমূর্তি ভৈরব নামে পূজিত হয়। বিশেষতঃ বাঁকুড়া মানডুম প্রভৃতি স্থানে বহু গ্রামে এখনও অনেক জৈনমন্দিরের অবশেষ দেখা যায়। পঞ্চকোটের রাজাদের অধীনে অনেক গ্রামে বড় বড় জৈনমূর্তির পূজা এখন হিন্দু পুরোহিতরা করেন। দেবতার নাম ভৈরব। সাধারণে সেখানে পশু বলি দেয়। সেই সব মূর্তির গায়ে এখনও জৈন-লেখ পাওয়া যায়। স্বর্গীয় রাখালদাস বানার্জিও এইরূপ মূর্তি ওখান হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। বাংলার ধর্মে ত্রতে ও আচারে এখনও জৈন-ধর্মের প্রভাব খুঁজিলে বাহির হইয়া পড়ে। জৈন বহু শব্দ এখনও বাংলাতে প্রচলিত। পার্শ্বনাথ হেমচন্দ্র প্রভৃতি বহু জৈন নামে এখনও বাংলার নামকরণ হয়।

জৈন সাধুদের উত্তরীয়কে বলে 'পাছেড়ী' তাহাই আমাদের 'পাছুড়ি'। জৈন সাধুদের কীট-অপসারণের জন্ত যে ঝাঁটা তাহাকে বলে 'পিছী', পূর্ব-বাংলাতে ঝাঁটাকে বলে 'পিছী'। দিগম্বর সাধুরা ময়ূরপুচ্ছ দিয়া এই 'পিছী' করেন। এইরূপ খোজ করিলে আরও বহু শব্দ বাহির হয়। বেদবিরুদ্ধ ধর্মদেশক প্রাকৃত ভাষাকে এক সময় বাংলা দেশ জৈন ভাষা বলিয়াই জানিত। বুদ্ধও জিন কি-না। পালি বলিয়া আশা দা কোনো ভাষার উল্লেখ তাঁহারা করেন নাই।

প্রাচীন বাংলা-লিপির অনেক অক্ষর—বিশেষতঃ বৃজ্জাক্ষর-গুলি দেবনাগরী অক্ষরের সঙ্গে মেলে না অথচ প্রাচীন জৈন-লিপির সঙ্গে মেলে। এইরূপ লিপি গুজরাত রাজপুতানা পঞ্জাব প্রভৃতি দেশের পুঁথিতেও দেখা যায়। জৈন সাধুরা এখনও ঐ লিপিতেই লেখেন।

বাংলা দেশে জৈন ধর্ম কেন তবে টিকিল না তাহা অল্পসন্ধান করা উচিত। এখানকার আহার বিহার আচারাদির

তাহার সামঞ্জস্য হইল না ; না তাহার আরও কোনো আছে, তাহা দেখা দরকার। বৌদ্ধধর্ম হয়ত সেই বয়ে অনেকটা মিটমাট করিয়া বাংলা দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত পারিল।

ধ্যাপক সিলভা লেভি প্রমুখ কেহ কেহ অভিযোগ যে বৌদ্ধধর্ম যেমন অকুণ্ঠিত ভাবে ভারতের ভিতরে আপনাকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে, জৈনধর্ম করিতে পারে নাই। উভয় ধর্মের উৎপত্তিস্থান এক ক্রমে এইরূপ দাঁড়াইল যে বৌদ্ধধর্ম বেশী প্রতিষ্ঠিত পূর্ব-ভারতে ও জৈনধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইল পশ্চিম-ভারতে। পূর্ব দিকে বৌদ্ধধর্ম ভারত ছাড়িয়া ব্রহ্ম শ্রাম প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হওয়ায় ঐসব দিক হইতে বর্ষের কোনো রাজনৈতিক বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা দূর হইয়া। জৈনধর্ম যদি তেমন করিয়া ভারতের পশ্চিমে ছড়াইয়া পড়িত তবে হয়ত ভারতের বহু দুঃখ ও দুর্গতি ঘটিতেই পারিত। কথাটা দেখিবার মত। আবার অনেকে এই অভিযোগও যে, জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্মের মত পরকে আপনার করিয়া পারে নাই, সকলকেই দূরেই ঠেকাইয়া রাখিয়াছে।

জনদের গ্রন্থভাণ্ডারগুলি ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের অমূল্য সব উপকরণে ভরা। যদি এগুলি সবার কাছে হইতে পারিত তবে ভারতের ইতিহাসগত অনেক দূর হইয়া যাইত আর জৈনধর্মের মাহাত্ম্যও হইত। কিন্তু যখন দেখি মুনি জিন বিজয়জী, সুখলালজী, পণ্ডিত বেচরদাসজী প্রভৃতির মত লোকের কাছেও তাহা উন্মুক্ত হইতে চাহে না তখন আর কোথায় ?

তাহারা অভিযোগ করেন তাঁহারা ইহাও বলেন জৈনধর্মে বণিকরাই হইলেন প্রধান, তাই সংগ্রহ ও রক্ষার কাজ হইয়াছে প্রসার ও প্রচারটা তত সহজে হয় নাই। হিংসার আদর্শ যে-জৈনধর্মে সর্বাপেক্ষা বড় কথা ছিল মৈত্রী-প্রধান জৈনধর্মের বণিকদের বাণিজ্যনীতি আজ ত্য সব নিষ্ঠুর বাণিজ্য-ব্যবহার সঙ্গে মিশিয়া কলুষিত হইয়াছে। আজ গৌণভাবে নানাবিধ ব্যাপক মানব-জন্ম এই ব্যবসায়পদ্ধতি দায়ী। সত্যতঃ জটিলতায়

এই দিনে দেখা যাইতেছে 'হাতে মারা' হইতেও বহুব্যাপক ও অতি নিষ্ঠুর ভাবে ধীরে ধীরে অজান্তসারে বধ করা যায় 'ভাতে মারিয়া'। যাহাতে এইরূপ বহুব্যাপক সুগভীর নরহিংসার অপ্রত্যক্ষ রক্তে এই প্রাচীন পবিত্র ধর্ম কলুষিত না হইতে পারে তাহা প্রত্যেক মৈত্রীর সাধক জৈনধর্ম-হিতৈষীর দেখা উচিত।

যে-জৈনধর্ম ছিল সম্যাস ও তপশ্চর্যার আদর্শে অনুপ্রাণিত আজ তাহাই কত ব্যর্থ ঐশ্বর্যবিলাসে ও আড়ম্বরে হইয়াছে পর্যাবসিত! জৈন দেবালয় প্রতিমা উৎসব প্রভৃতি সবই নিষ্ঠুর বৈভববিলাসে ভারাক্রান্ত। একটু তলাইয়া দেখিলেই দেখা যাইবে আর্থিক যে ভিত্তির উপর এই সব ধর্ম-উৎসবগুলি প্রতিষ্ঠিত তাহা নানা প্রকারের লোকসম্মত বহুব্যাপক হিংসার অপ্রত্যক্ষ রক্তে কলুষিত, কাজেই এই সব ধর্মাচরণকে পবিত্র করার জগৎ সর্ববিধ বিলাস ও আড়ম্বর তাগ করা প্রয়োজন।

ধর্মের পক্ষে দারিদ্র্য মোটেই অশোভন নহে। এবং আদর্শের বিশুদ্ধির জগৎ আদি ধর্মগুরুরা সেই দারিদ্র্যকে গৌরবের সঙ্গেই বহন করিয়া গিয়াছেন। বরং যে ঐশ্বর্যের মূলে কোথাও কিছুমাত্র বিশুদ্ধির অভাব আছে, সেই ঐশ্বর্যই ধর্মের পক্ষে একান্ত অশোভন ও সাধনার সর্বাপেক্ষা কঠিন বাধা। জৈনদের এক একটা শোভাযাত্রায় যে ব্যয় হয় তাহা ভাবিলেও অবাক হইয়া যাইতে হয়। এমন অবস্থায় ইহাদের মহাতপসীদের কঠোর তপস্বী দেখিয়াও যদি কেহ মনে করেন তাহার মূলেও এক প্রকার অপ্রত্যক্ষ রাজসিকতা আছে, তবে তাহাকে নিতান্ত দোষ দেওয়া যায় না। তপস্বীর মূলেও যদি দেখাইবার ইচ্ছা বা রাজসিকতা থাকে, তবে তাহা বাহ্য বৈভব হইতেও ধর্মের পক্ষে সাত্বাতিক, কারণ তাহাকে ধর্মের অঙ্গ বলিয়াই সবাই জানে।

সকলের উপর শোচনীয় ইহাদের একান্ত তীব্র আত্ম-কলহ। অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহাদের মধ্যে দলাদলির আর অন্ত নাই। ইহাদের 'নিহুব' 'গচ্ছ' প্রভৃতি ভেদের কথা ত পূর্বেই বলা হইয়াছে, তাহা ছাড়াও দেখা যায় ইহাদের ডেরাবাসী মূর্তিপূজক শাখাতে চৌরাশিটি সম্প্রদায়, স্থানবাসী শাখাতে বত্রিশটি ভেদ। ভেদ ও ভাগের আর অন্ত নাই।

এক-একটি তীর্থে লইয়া মোকদ্দমায় ইহাদের'বে অনন্তব্য হয় হইয়াছে তাহা ভারত ছাড়া আর কোনো দেশে কেহ বিশ্বাসই করিতে পারিবে না। এক পরেশনাথ পর্বতের অর্থাৎ সমেত তীর্থে মোকদ্দমা লইয়া খেতাবর ও দিগম্বর এই উভয়দলে যে বিপুল ব্যয় হইয়াছে তাহাতে আর একটি পরেশনাথ পর্বত নির্মাণ করিয়া আর একটি তীর্থ প্রতিষ্ঠিত করা যাইত। শুধু টাকার স্তূপ দিয়াই পর্বতই করা যাইত।

এই সব তীর্থ লইয়া যে লাঠালাঠি মারামারি হস্তা প্রভৃতিই কতকটা তাহা কি লিখিয়া শেষ করা যায়? ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে উদয়পুরে কেসরিয়া তীর্থে একটি জীর্ণ ধ্বংস সংস্কার লইয়া খেতাবর ও দিগম্বর এই দুই দলে যে দাঙ্গা হয় তাহাতে খেতাবররা দিগম্বরদের পাঁচ জনকে তখনই খুন করে, পনের জনের আর জীবনের আশাই দেখা যায় নাই, আর ১৫০ জন আহত হয়। এই খবরটি বাহির হয় খেতাবরদেরই মুখ্য পত্র "জৈন যুগে" (১৯২৭ বৈশাখ)। পরবর্তী জ্যৈষ্ঠ মাসে ঐ কাগজেই বোম্বাইয়ের একজন খেতাবর জৈন সলিসিটর এক প্রতিবাদ বাহির করেন। তিনি লেখেন—এই দাঙ্গার খেতাবরদের কোনোই দোষ নাই, যদিও তিনি এ-কথা স্বীকার করেন যে, চারি জন দিগম্বরী মারা গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মতে সে দোষ তাঁহাদের নিজেরই। তিনি এই কথাও লেখেন যে, যাহা হউক, জৈনতীর্থে মাছুষ মারা গেলেও এক বিলু রক্তপাত ঘটে নাই। কাগজেই দেখা যাইতেছে যাহারা মারা গিয়াছেন তাঁহারা লোক ভাল, কারণ তাঁহারা ধাক্কা ও মর্দনেই মরিতে রাজি হইয়াছেন। অস্বাভাবপ্রাপ্তির ছুরাকাজকা করিয়া তাঁহারা প্রতিপক্ষকে বুঝা হইয়া করেন নাই। যাহা হউক, প্রাণ গেলেও এমন পবিত্র জৈন-তীর্থে রক্তপাত যে ঘটে নাই ইহাই পরম সত্যনা। সলিসিটর মহাশয় জৈনতীর্থে পবিত্রতার সাক্ষ্যরূপে এই পরম সত্যনার কথা বছবার উৎসাহ-ভরে প্রকাশ করিয়াছেন।

এই জাতীয় নানা রকমের অভিযোগ জৈনদের ধর্মের বিরুদ্ধে দেশে বিদেশে শোনা যায়। মুখে বা লেখায় নিপুণ রচনায় তাহার কোনো উত্তর দিয়া কিছু লাভ আছে কি? জৈনধর্মের উন্নত সাধনা পবিত্রতা ও প্রেমে মৈত্রীতে

পরিপূর্ণ জীবনের দ্বারা যদি এই সব অভিযোগকে নিঃশব্দে নিরস্তর না করা যায়, তবে তর্কের বিরুদ্ধে তুমুল স্তম্ভ তর্ক দিয়া বুঝা বুঝ করা লাভ কি? তাহাতে নৈশূন্য প্রকাশ করা যাইতে পারে, কিন্তু ধর্মের মহত্ব তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয় না।

এতকম শুধু নানা অভিযোগ ও বিরুদ্ধতার কথাই বলা গেল। এখন বলিতে চাই ইহাতেও হতাশ হইবার কোন হেতু নাই; যদি দেখা যায় যে এই ধর্মের মধ্যে এখনও প্রাণশক্তি আছে। যে ধর্মে হেমচন্দ্র যশোবিজয়জীর মত বহু বহু মহাপণ্ডিত জন্মিয়াছেন আর যাহারা জগতে অতুলনীয় সব গ্রন্থভাণ্ডার রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের হতাশ হইবার কোনো কারণ নাই। এই সব লক্ষ্য ছাড়াও জৈনধর্মের মধ্যে নানাভাবে যে অতিগভীর প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে আজ সে-সম্পর্কে দুই একটি কথা বলিলে ষথার্থই অন্তরে আশার সঞ্চার হয়।

জৈনরা যদিও সম্ভ্রান্তভাবে ভারতের বাহিরে প্রচার করেন নাই, তথাপি ব্যক্তিগত ভাবে মাঝে মাঝে এক এক জন জৈন সাধু ভারতের বাহিরে গিয়া অহিংসা মৈত্রী প্রভৃতির মহা আদর্শ জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসিয়াছেন। খোঁজ করিয়া দেখিলে এইরূপ খবর মাঝে মাঝে পাওয়া যাইবে।

প্রাচীন কালেও ভারতে যোগী নাথপন্থী প্রভৃতি মতের সাধুরা পারশ্ব আয়ব সিরিয়া মিশর তুরক প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করিতে যাইতেন। আমার বাল্যকালেও কানীতে আমি মাঝে মাঝে এমন যোগী দেখিয়াছি যাহারা নীলনদী ও কাম্পিয়ান সাগরে স্নান করিয়া আসিয়াছেন।

১৯৮ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি এইরূপ বিশ জন যোগী সাধু একত্র হইয়া এক দল বাঁধিয়া ভারতের বাহিরে পরিভ্রমণে বাহির হন, তাঁহাদের সঙ্গে চিকিৎসকরূপে এক জন জৈন সন্ন্যাসীও গিয়াছিলেন। তাঁহারা মাঝে একবার দেশে ফিরিয়া আবার ঐ সব দেশে পর্যটন করিতে যান। দুইবার এইরূপ নাম দেশ পর্যটন করিয়া ছাষিষ বৎসর পরে ১০২৪ খ্রীষ্টাব্দে শেষবার তাঁহারা দেশে ফেরেন। এই দলের সঙ্গে সিরিয় দেশের প্রখ্যাত কবি অহম জানী সাধক আবুল আলার পরিচ ঘটে।

সিরিয়া দেশে "মা অব্ রাত অল-মুমান" নামক এক গ্রামে ১৭৩ বা ১৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্ভ্রান্ত "তনু" নামক আর

বংশে আবুল আলার জন্ম তাঁহার পিতামহ হুসেইন অল মলআরী দীর্ঘকাল কাজী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। চারি-বৎসর বয়সে আবুলের বে দারুণ বসন্তরোগ হয়। তাহাতে তিনি দৃষ্টিহীন হইয়া যান। তথাপি তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল এমন অদম্য যে তিনি মোরক্কো হইতে বোগদাদ পর্য্যন্ত নানা স্থানে জ্ঞানার্থী হইয়া ঘুরিয়া বেড়ান। তাঁহার মত ছিল অতিশয় উদার ও একেবারে অনাস্পদায়িক। তিনি এতদূর স্বাধীন-চেতা ছিলেন যে, কি ধনী, কি প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুরু কাহারও কোনো অঙ্গায়কে তিনি রেহাই দিয়া কথা বলেন নাই। তাঁহার রচিত “সকৃত-অল-জন্দ” সেই দেশে অতিশয় সম্মানিত কাব্যগ্রন্থ ছিল। উদার মত ও স্পষ্টবাদিতার জন্য তাঁহার সময়ে তাঁহার বিরুদ্ধে বহু তীব্র আন্দোলন চলিয়াছে, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্যই করেন নাই। পরিশেষে বোগদাদে গিয়া ভারতীয় এই সব জ্ঞানীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে, তার পরই তাঁহার মতামত একেবারে আশ্চর্যরূপে পরিবর্তিত হইয়া যায়। আবুল আলার কাব্যের শক্তিশালী প্রভাব ও মর থল্যামের মত মহাকবিও এড়াইতে পারেন নাই।

এই দলের সঙ্গে পরিচয়ে ও আয়ত্ত নানা স্থানে আবুল আলার ভারতীয় অধ্যয়জ্ঞানের প্রতি-রীতিমত অহুরক্ত হইয়া উঠিলেন। বোগদাদে তিনি ভারতীয় সাধকদের মতই মর্শ্বের কথা বলিয়াছেন। তাঁহার ঈশ্বর তাঁহার চারিদিকে বা তাঁহার সমধর্মাবলম্বী সকলের স্বীকৃত ঈশ্বরের মত নহেন; তিনি অনেকটা ভারতীয় যোগীদের ঈশ্বরের মতই সর্বব্যাপী নির্গুণ। ধর্মজগতের কুসংস্কার ছিল আবুল আলার অসহ্য। এই-সব কুসংস্কারের বলে যে একদল লোক অল্প সকলের উপর প্রভুত্ব করিয়া বেড়ায় ইহা তিনি সহ করিতে পারিতেন না।

স্বর্গাদিতে তাঁহার বিশ্বাস ও আস্থা আর রহিল না বরং জৈন-বৌদ্ধাদির মত তিনি মনে করিতে লাগিলেন মুক্তিতেই আমাদের দুঃখময় সত্তার অবগান ও সত্যই আমাদের সকল দুঃখের আধার। তাই একমাত্র নির্বাক মুক্তিই প্রার্থনীয়। তিনি বোগদাদ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া ভারতীয় তপস্বীদের মত গুহাতে বাস করিয়া অতি কষ্টে তপস্চরণ করিতে লাগিলেন। ইহার পর তাঁহার কাব্য আর এক ভাবে ভরপুর হইয়া উঠিল। মদ্য মৎস্য মাংস ভিৎ, এমন কি দুগ্ধ

প্রভৃতিও তিনি ভাগ করিলেন। তাঁহার বাস্তব-তীক্ষ্ণতা ক্রমে তপস্চার কষ্টের পরিণত হইল। জীবন শান্তি ও মৈত্রীতে ভরিয়া উঠিল।

কৃত্ত বৃহৎ সর্বজীবের প্রতি তিনি ছিলেন অপরিসীম করুণাপরায়ণ। তাঁহার কবিতাতে দেখা যায়, “কেন বৃথা পশুহিংসার জীবন কর কলঙ্কিত? বেচারী বনচারী শিশুর কেন নিষ্ঠুর হইয়া কর শিকার? চিরদিন তুমিও কিছু ব্যাধ রহিবে না, সেও কিছু ব্যাধ থাকিবে না। একদিন তোমাকে এই পাপের কালম করিতেই হইবে।”

সাম্প্রদায়িকভাবে লোকে তাঁহার বিরুদ্ধ হইলেও তাঁহার পাণ্ডিত্য ও তপস্চর্যার খ্যাতিতে নানা স্থান হইতে তাঁহার কাছে বহু উপহার আসিত। তিনি তাহা দীনভাষীকে বিলাইয়া দিয়া নিজে মূনিজনোচিত সরল জীবন যাপন করিতেন।

আবুল আলার এই অহিংসবাদের মূলে যে ভারতীয় ধর্মের প্রভুত্ব প্রভাব আছে ইহা ত সকল দেশের বিদ্বজ্জনেরাই জানেন। কিন্তু তাঁহার মতামতে জীবনযাত্রার তপস্চর্যায় কি বিশেষভাবে জৈনধর্মের কোনো প্রভাব দেখা যায় না? তাঁহার কবিতার রস-বাহারা ইংরেজী ভাষায় আবাদ করিতে চান, তাঁহার তীব্র অমীর রিহানী কর্তৃক অনুবাদিত আবুল আলার “লুছু মিয়াত” নামের কাব্যগ্রন্থ পড়িয়া দেখিতে পারেন। (James T. White, & Co., New York)।

আবুল আলার এই-সব মতবাদ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হইয়া যায় নাই। পরবর্তী সুফী-মতবাদের মতো তাহা স্থান পাইয়াছে। তাই বিখ্যাত মরামী কবি জালাল অল-দীন রুমীর (জন্ম ১২০৭ খ্রীষ্টাব্দে) কবিতার মধ্যেও অনাস্তরবাদের চমৎকার উল্লেখ মেলে।

রুমী বলিতেছেন; “ছিলাম পাষণ; মরিয়া হইলাম বুদ্ধতা; ছিলাম উদ্ভিদ; মরিয়া হইলাম জন্তু; ছিলাম জন্তু, মরিয়া হইলাম মানব। এখন আমি বাঁচিয়া উঠিব অমরলোক-বাসী হইয়া; ক্রমে সে অবস্থাও অতিক্রম করিয়া আমি অলুর্ক অল্পম গতি করিব লাভ; আমি হইব শূণ্য, শূণ্য হইব লক্ষ্যস্থ”—ইত্যাদি। এই-সব কথায় মধ্যে কি নির্বাকের ভাব পাই না?

তাঁহার আবার এমন সব বাণীও আছে যাহাতে ভারতের

পূর্ণ প্রেমপন্থী মরমীদের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—“সূর্যের রশ্মির মধ্যে দীপ্ত রেণুরূপে আমিই, ভাসমান, সূর্যের দীপ্ত গোলকরূপে আমিই দীপ্যমান, আমিই উবার প্রথম জ্যোতি-লেখা, আমিই সন্ধ্যার শাস্ত্রপ্রাণ সমীরণ”—ইত্যাদি।

জৈনধর্মের অন্তরে যে গভীর প্রাণ আছে তাহার আর একটি মহালক্ষণের কথা এখন বলিব। অনেক সময় মনে হয় একটা বৃক্ষ পুরাতন হইয়া মরিয়া গিয়াছে। বুঝাই যায় না যে, তাহার মধ্যে কোথাও প্রাণ আছে। তাহার পর হঠাৎ একদিন যখন নব বসন্তাগমে কি আকাশের বারিবর্ষণে দেখা যায় তাহাতে পল্লবমুকুল ধরিয়াছে, তখন আর আশা না হইয়া যায় না।

ভারতে এইরূপ একটি নবযুগ আসিল গুরু রামানন্দের সঙ্গে সঙ্গে। তাহার পরই কবীর, রবিদাস, নানক প্রভৃতি নানা মহাপুরুষের সাধনায় উত্তর-ভারতবর্ষের ধর্মের ঐশ্বর্য উঠিল ভরপুর হইয়া।

জৈনদের মধ্যেও এই সময়ে এক মহাপুরুষের জন্ম হয়, তাঁহার নাম লোকা শাহ। মূর্তিপূজক জৈনধর্মের মধ্যে জন্মিয়াও ইনি কবীর নানক প্রভৃতির মত মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে ঘোর বুদ্ধ করিয়াছেন। জৈন বৈশ্বকুলে তাঁহার জন্ম। আমেদাবাদেই তিনি বাস করিতেন, কিন্তু কেহ কেহ বলেন তাঁহার পূর্ব নিবাস ছিল কাঠিয়াওয়াড়ে।

জর্মান পণ্ডিত স্ত্রীণের একটি হস্তলিখিত লেখায় দেখিয়াছি যে, তাঁহার মতে লোকসার সময় ১৪৫২ খৃষ্টাব্দ। লোকসার সময়ে আর কোনো খবর স্ত্রীণের সেই লেখায় পাইলাম না, তাঁহার নিরূপিত সময়ের উপরও নির্ভর করিতে পারিলাম না। ১৪৫২ খৃষ্টাব্দ কি স্ত্রীণের মতে লোকসার জন্মসময়? তাহা কেন যে সম্ভব নহে তাহা পরে দেখান যাইতেছে।

কবীর প্রভৃতির মত লোকা শাহ পুরাতন শাস্ত্র প্রভৃতি সব একেবারে ছাড়িয়া দিয়া কেবল স্বাধীন আত্মাত্মভবের উপর ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। তিনি প্রচলিত মূর্তিপূজা শাস্ত্রবিরুদ্ধ ব্যর্থ আচার-অহুষ্ঠান, হুসংস্কার প্রভৃতি দূর করিতে প্রধানতঃ প্রাচীন বিত্ত্ব শাস্ত্রকেই আশ্রয় করিলেন। তাঁহার সঙ্গে এই বিষয়ে অনেকটা মার্টিন লুথরকে তুলনা দেওয়া চলে। লোকা শাহ এই অনুবর্তীদের বলে স্থানকবাসী। লোকসার মৃত্যুর প্রায় তিন শতাব্দী পরে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে কাঠিয়াওয়াড়ের

স্থানকবাসীদের মধ্যে পাঁচটি “সংঘাড়া” বা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। স্থানানুসারে এই পাঁচ সম্প্রদায়ের নাম (১) গোঙাল, (২) লিমড়ী, (৩) বড়বালা, (৪) চূড়া ও (৫) ধাংগড়া। এই গোঙাল শাখার সাধুদের প্রকৃত্ত বিবরণ অল্পসারে লোকসার কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

মুসলমানদের রাজত্ব যখন গুজরাটে সুপ্রতিষ্ঠিত তখন একদিন লোকা শাহ দেখিলেন একটি মুসলমান “চিড়া” নামক যত্নসারা পক্ষীশিকার করিতেছে। এই নিষ্ঠুর ব্যাপার দেখিয়া লোকা মনের চুঃখে মুসলমান রাজার রাজ্যে চাকরি ছাড়িয়া দিলেন এবং সাধারণ শ্রাবক রূপে পুঁথিলেখার দ্বারা জীবিকানির্ভর করিতে লাগিলেন ও আমেদাবাদেই রহিলেন।

একদিন এক “লিঙ্গধারী” খেতাবের জৈন ভক্তলোক একখানি “দশ বৈকালিক সূত্র” গ্রন্থ লোকাকে নকল করিতে দেন লোকা গ্রন্থখানি পড়িয়া মুগ্ধ হন ও নকল করিতে গৃহে লইয়া আসেন। তাঁহার একটি বিধবা কন্যা ছিলেন। তাঁহাকে লইয়া তিনি গ্রন্থখানির চুইটি প্রতিলিপি করিয়া একখানি নিজের কাছে রাখিয়া দিলেন ও অন্য একখানি সেই ভক্তলোককে দিলেন। এরূপ ভাবে আরও কিছু গ্রন্থ তিনি সংগ্রহ করিয়া খুব ভাল করিয়া তাহা অধ্যয়ন করিতে ও লোকমধ্যে বিত্ত্ব জৈন-মত প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার মধুর ও সহজ শ্রদ্ধায় উচ্ছ্বসিত উপদেশে লোকের চিত্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল।

তিনি সাধু নহেন, তাই সাধুরা তাঁহার এই আচরণ পছন্দ করিলেন না। এমন সময় একদল জৈন তীর্থযাত্রী তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে আমেদাবাদে আসিয়া উপস্থিত হন। এই দলের মধ্যে বোধ হয় প্রধান যাত্রী ছিলেন শঙ্কুজী নামে এক ভক্তলোক তাঁহার পৌত্রী মোহ বার্জ অতি অল্পবয়সে বিধবা হওয়ায় সেই বালিকা ও তাহার মাতাকে লইয়া তিনি তীর্থযাত্রার বাহির হন। সেই দলে নাগজী, মোতিচন্দ, গুলাবচন্দ প্রভৃতি ভক্তলোকও ছিলেন। আমেদাবাদে লোকা শাহ নাম শুনিয়া তাঁহারা তাঁহার উপদেশ শুনিতে যান।

সেই যাত্রীদের নেতা সাধুরা এই-সব কথা শুনিয়া গেলেন চটিয়া, কারণ লোকা একজন সামান্য বৈশ্ব গৃহস্থ মাত্র, তিনি সন্ন্যাসীও নহেন। কিন্তু লোকসার উপদেশ সকলের এত ভাল লাগিল যে, তাঁহারা সেই সাধুদের

নেষে মানিলেন না। তাই সেই সব সাধু ষড়্ভিরা ঐ পাত্রীদের ত্যাগ করিয়া বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। তখন সেই দলের পয়তাল্লিশ জন লোক লোকসার কাছে নৃতন করিয়া দীক্ষা লইলেন। এই ঘটনা ঘটিল ১৫৩১ সংবতের জ্যৈষ্ঠ শুক্লাপঞ্চমীতে, অর্থাৎ ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে। কেহ বলেন এই ঘটনা ঘটে ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে।

এই ঘটনার কিছু পূর্বে হইতেই লোকসার প্রচার চলিয়াছিল এবং তাঁহার প্রচারের পূর্বে তিনি পুঁথী তাঁহার বিধবা স্ত্রীকে দিয়া প্রতিলিপি করাইতেন। তাঁহার বিধবা কন্যার মরণ যদি তখন কুড়ি বৎসরও ধরা যায় তবে সেই পুঁথী বকলের সময়ে লোকসার বয়স আনুমানিক পয়তাল্লিশ বৎসর হওয়া সম্ভব। তার পরও কয়েক বৎসর প্রচারকাণ্ডে ব্যতীত হইলে এই দল তাঁহার কাছে দীক্ষা নেয়। যাহা হউক, খুব আবধানে খুব কম করিয়া ধরিলেও লোকসার তখন বয়স পয়তাল্লিশ হইতে কম হইতেই পারে না। তাহা হইলেই দেখা যায়, ১৪২০ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই লোকসার জন্ম। মোটকথা, ইহা বলা চলে যে, ১৪২৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি লোকসার জন্মকাল। কাজেই দেখা যায় কিছুকালের জন্য অন্ততঃ লোকসার কবীরের সমসাময়িক।

প্রাচীনপন্থী সাধু ও গৃহস্থরা লোকসার বিরুদ্ধে সর্বতোভাবে গাঙ্গিয়া গেলেন, তবু নানাবিধ বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়াও লোকসার প্রভাব বাড়িয়াই চলিল। লোকসার গৃহস্থই রহিলেন, দম্যাসী হইতে স্বীকার করিলেন না; অথচ তাঁহার শিষ্যরা অনেকেই মুনি হইলেন। তাহার মধ্যে মুনি সর্বাঙ্গী, মুনি ভাগাঙ্গী, মুনি মুন্নাঙ্গী, মুনি জগমলঙ্গী সমধিক প্রখ্যাত। লোকসার ধর্মকে তখন সকলে দম্যধর্ম বলিত এবং গৃহস্থ হইলেও লোকসাকে সকলে দম্যধর্ম মুনি বলিত। লোকসার দল দম্যগচ্ছ নামে প্রসিদ্ধ হইলেও কেহ কেহ তাঁহাকে তপাগচ্ছও বলিত। এই হইল স্থানকবাসী সাধুদের সম্প্রদায়ের সূচনা।

তখন মুসলমান রাজত্ব। নানাস্থানে মূর্তি ও জৈনপ্রতিমা ভাঙিয়া-চুরিয়া ফেলা হইতেছে; কোথাও কোথাও তাহা দিয়া মসজিদ, প্রাসাদ, সেতু প্রভৃতি নির্মাণ করা চলিয়াছে। শুধু এই-সব কারণে নয়, বিশুদ্ধ ধর্ম বলিয়াও লোকসার এই প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধে লাগিয়া গেলেন। জৈনধর্ম তখন তাহার প্রাচীন বিশুদ্ধি হারাইয়া প্রতিমাপূজা, উৎসব, আড়ম্বর ও

নানা ব্যর্থ অল্পটানে ও মিথ্যা রাজসিকতার ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। লোকসার সেই সব মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মহাবীরের জন্ম-উৎসব উপলক্ষে যে ব্যর্থ আড়ম্বর হইত স্থানকবাসীরা তাহাও তীব্রভাবে আক্রমণ করিলেন।

আমেরাবাদের পর পাটনে লোকসার কাছে রূপচন্দ শাহ প্রভৃতি ১৫২ জন দীক্ষা লইলেন। রূপচন্দদের নাম হইল রূপ ঋষি। লোকসার অর্থাৎ দম্যধর্ম মুনির পর রূপ ঋষিই বসিলেন গুরুর আসনে। তাঁহার পর বসিলেন সুরতের জীবা ঋষি।

যতদিন পর্যন্ত ইহারা নানা বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছেন ততদিন আপন বিশুদ্ধ আচার রক্ষা করিয়াই চলিয়াছিলেন। তার পর যখন লোকসার ইহাদের রীতিমত প্রতিষ্ঠা হইল, তখন এই সম্প্রদায়ের লোকেরা এক এক জায়গায় জমাইয়া বসিয়া যাইতে লাগিলেন, সাম্প্রদায়িক বৈভব জমিয়া উঠিতে লাগিল। তখন ক্রমে ‘স্থানক দোষ’ তাঁহাদের স্পর্শ করিতে লাগিল বলিয়া লোকে তাঁহাদিগকে বলিতেন স্থানকবাসী। সাধুরা পাত্রাদির মর্যাদা লঙ্ঘন করিতে আরম্ভ করিলেন অর্থাৎ শাস্ত্রের অননুমোদিত নানা বস্তুর ব্যবহার ও সঞ্চয় চলিতে লাগিল। কেহ কেহ আবার জ্যোতিষাদি শাস্ত্রের দ্বারা অর্থোপার্জনেও প্রবৃত্ত হইলেন।

জীবঋষির পর তাঁহার স্থানে বসিলেন নানাঋষি, তাঁহার পরে সম্প্রদায়গুরু হইলেন জীবরক্ষা ঋষি। এই পন্থে ভীমাজী, রতনজী, উদাজী, বীজাজী, জীবরাজজী, শ্রীচন্দ্রজী, লালজী প্রভৃতি সকলে ঋষি নামেই প্রখ্যাত হইয়া গিয়াছেন।

কিন্তু স্থানকবাসীরা চিরদিনের জন্য প্রতিমাদি পরিহার করিয়া রাখিতে পারিলেন না। পরে তাঁহাদের সম্প্রদায়ে আবার প্রতিমা কিরিয়া আসিতে লাগিল। ডেরাবাসীদের প্রতিমা ক্রমে স্থানকবাসীদেরও পাইয়া বসিল। এই ভাবে স্থানকবাসীদের পুণ্য প্রভাব পরে ক্রমে ক্ষীণ ও নান হইয়া আসিল।

গোণ্ডাল শাখার স্থানকবাসী সাধু প্রাণলালজীর লিপি অনুসারে আমরা আরও অনেক শাখার উৎপত্তির খবর পাই। যথা, ১৫৬৪ সংবতে কতুক সাধু কতুক-মত প্রবর্তন করেন। ১৫৭০ সংবতে বীজসাধু বিজয়-মত চালান—

এই সময় আগমনকরত। ১৯৭২ সংকতে পাশ্চাত্য নিকৃতি, ভাষা, চুলী, ছেদন প্রভৃতির প্রাধান্যতা অব্যাহত করেন।

১৭৬২ সংকতে কঙ্কণা ষাণ্মি কঙ্কণ-মত চালান।

১৭৭২ সংকতে বংশোদ্ভূত আনন্দঘনজীর সময়।

১৮১৮ সংকতে ভীষ্মজী তের জন সাধু লইয়া বস্ত্র হইয়া তেরপদ নামে এক মত চালান। ইত্যাদি ইত্যাদি এই-সব খবরে সকলের কৌতূহল হইবে না মনে করিয়া আর উদ্ধৃত করিলাম না।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি মহাপণ্ডিত বংশোদ্ভূত আনন্দঘনজীর কবি আনন্দঘনজীর কাল। আনন্দ ঘনজীর কবি পরিচয় আমি পূর্বে আর একটি লেখায় লিখিয়াছি। চন্দ্রানন্দ প্রভৃতির কথা আর উল্লেখ করিলাম না।

পূর্বেই বর্ণিয়াছি ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কাঠিয়াওয়াড়ে স্বনক-বান্ধিয়া পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হইয়া যান। তার পর

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে লিমডী শাখা হইতে “সন্ন্যাসী” শাখার উদ্ভব হয়। এই সন্ন্যাসী শাখার প্রথমলয়ে বাংলা অক্ষরে লেখা সন্ন্যাসী সাধুর লগ্নহীত তন্ত্র ও চিকিৎসার পুঁথী দেখিয়াছি।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে গোপাল শাখা হইতে সংঘাণী শাখা এবং

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আংগড়া শাখা হইতে রোটাড শাখার উদ্ভব হয়। এই ত গেল বংশোদ্ভূত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাহার একটু বিবরণ।

দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীতে তারণ-পন্থের বিশেষ প্রভাব হয়। তারণ মূনি তাহার প্রকর্তক। তিনিও বুদ্ধিশূন্য, কদমচার ও মিথ্যা ধর্মের বিরুদ্ধে ঘোর যুদ্ধ করেন।

কিন্তু এই বৈধর্ম্য যুগে যুগে এই জাতির নব-নব প্রাণ-শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহার সবচেয়ে হতাশ হইবার কোনোই হেতু নাই। শুধু তর্ক করিয়া বিগলকে নিকৃতির পরিচয় চেষ্টা করিয়া কোনো আশা নাই, সাধনার জীবনে

কিছু তপস্যার অগ্নি জ্বালাইয়াই প্রাণশক্তির লক্ষ্য দিতে হইবে।

সত্য ও জীবন্ত মহৎ আদর্শকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার সরল পথ গ্রহণ না করিয়া যদি শুধু নিপুণ কাক্য, তর্ক ও প্রমাণ-চাতুর্যের পথেই এই সম্প্রদায় চলিতে চাহেন তবে বিশ্বের শাস্ত ধর্মের মহাকাব্যের বিধান ইহাদের কোনোই ভরসা নাই।

এখন এই জিনভাষিত ধর্ম যদি আপনার নানা মিথ্যা আড়ম্বর, অর্থহীন সব আচার, আত্মঘাতী ব্যর্থ সব আত্ম-কলহ পরিহার করিয়া দয়া, মৈত্রী ও উদারতার আপনাকে বিশুদ্ধ করিতে পারে তবে সে নিজেও ধন্য হইবে এবং সমগ্র মানবসভ্যতাকেও ধন্য করিবে। অন্তরে-বাহিরে নব আন্দোলকের নব প্রেমের উদার ভূপত্যার দ্বারা যদি এই জিন-প্রবর্তিত মহাধর্ম আজও আপনার অন্তর্নিহিত মুক্তহীন অধ্যাত্মজীবনের পরিচয় দিতে পারে, তবে বাহিরের নানা প্রকারের অভিযোগ আপনিই শাস্ত হইয়া যুক হইয়া যাইবে।

মহাবীর প্রকৃত মহাসাধকগণের মুক্তহীন তপস্যার অনন্ত সাধনার বেদীর কাছে সেই মহতী আশা ও আকাঙ্ক্ষা আজও আমরা উপস্থিত করিতে চাই। আজ সমস্ত জগৎ হিংসায় স্বন্দে কুটিলতার ভরিয়া উঠিয়াছে। কে আজ ইহার মধ্যে মৈত্রী ও প্রেমের নবপ্রাণ সঞ্চার করিবে? তাই হিংসায় কুটিলতার মিথ্যাচারে ব্যথিত মুম্বু মানবসভ্যতা এই সব মহাপুরুষের সাধনার দ্বারে অনেক ভরসা লইয়া আজ দাঁড়াইয়াছে। তাঁহাদের মহাসাধনার ফিহারা উত্তরাধিকারী তাঁহারা কুদ্র চালাকী ও সম্প্রদায়গত কোনো চাতুরীর দ্বারা আমাদের কখনও ফাঁকি দিবেন না, এই আশা অন্তরের অন্তরে না রাখিয়া পারি না। এই-মহা-বিদ্যাসে এই সাধনার জবিগ্ন মহাসাধকদের উদ্দেশে ভক্তি ও প্রসন্ন-নম্র আমাদের প্রার্থনা রাখিয়া যাইতেছি।

বিপরীত

শ্রীসীতা দেবী

শ্রীশ্রী রামহরি মুখুজ্জোর অদৃষ্টে সবহ উল্টা লাখয়া- ছিলেন। এক ত মা-বাপ তাঁহাকে স্থখের পৃথিবীতে আনিয়া দিয়াই বিদায় হইলেন, রামহরিকে মামুষ হইতে হইল মামাবাড়ির ছড়কো ঠাণ্ডা এবং দই সন্দেশ উভয়ের সাহায্যে। দিদিমা ঝাঁচিয়া থাকিতে দই সন্দেশের ভাগটাই বেশী ছিল, তিনি মারা যাইবার পর ছড়কো ঠাণ্ডার অংশটাই প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু রামহরি তখন ডানপিটে হইয়া উঠিয়াছেন, কাজেই ইহা সন্ধেও টিকিয়া রহিলেন।

তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইবার বিশেষ কোনো চেষ্টা হইল না। কিন্তু তবু লেখাপড়া তিনি শিখিয়াই ফেলিলেন। বড়মামীর এক ভাই তাঁহাকে কলিকাতা লইয়া আসিয়াছিলেন, ছেলেটার একটা গতি করিয়া দিবার জন্ত। ইচ্ছা ছিল বামুন-স্বাকুরের স্থানে না হোক, বাজারসরকারের পদে তাঁহাকে অবৈতনিকভাবে বাহাল করিয়া রাখিবেন। কিন্তু রামহরি প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর প্রভৃতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া লেখাপড়া শিখিবার জন্ত অসম্ভব উৎসাহ দেখাইতে লাগিলেন। বাজারসরকারের কাজে সময় খুব বেশী যাইত না, কাজেই পড়ার সময় ছিল। দেখিয়া শুনিয়া বাড়ির গৃহিণী তাঁহাকে বৈঠকখানাঘর ঝাড়পোঁছের কাজটাও দিয়া দিলেন। ইহাতেও রামহরিকে দমান গেল না, বরং কোথা দিয়া সুপারিশ করাইয়া তিনি অবৈতনিক ছাত্ররূপে স্কুলে ঢুকিয়া গেলেন। বড়মামীর বৌদিদি ইহাতে একান্তই চটিয়া বেমান্দব ছেলেটাকে বাড়ি হইতে বিদায় করিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, এমন সময় কর্তা বলিলেন, “থাক না ছোঁড়া, টেবী আর ঝণ্টুর মাষ্টারটাকে ডাড়িয়ে দিলেই হবে। দুবেলা ব’সে গিলছে আর এইটুকু পারবে না?”

রামহরির আপত্তি ছিল না, তিনি পড়িতে লাগিলেন, এবং পড়াইতে লাগিলেন। নিজের পদমর্যাদা সন্ধে তাঁহার নিজের কোনো চেতনা ছিল না, সুতরাং এম্-এ পাস না করা পর্যন্ত এইখানেই থাকিয়া গেলেন এবং বাড়ির ছেলেমেয়েদের যখন

যাহাকে প্রয়োজন পড়াইতে লাগিলেন। আগের চেয়ে যে তিনি ভাল খান, শুইবার জন্ত যে তক্তাপোষ এবং ভাল বিছানা পাইয়াছেন, বাড়ির সব কয়জন চাকরের সঙ্গে যে তাঁহাকে শুইতে হয় না, এ-সব তুচ্ছ ব্যাপার সন্ধে তিনি কোনোদিনই মনোযোগ দিলেন না।

সর্বপ্রথম তাঁহারও মনে সাড়া আগিল যখন তিনি শুনিলেন তাঁহার কৈশোরের প্রথম ছাত্রী শ্রীমতী টেবী ওরফে কুমারী নীহারিকার সঙ্গে তাঁহার বিবাহের আয়োজন হইতেছে। অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বাড়ির গৃহিণীর কাছে গিয়া বলিলেন, “রাঙা মামীমা, এটা কি রকম যেন হ’ল। টেবীকে আমি ছোটবেলা থেকে—”

রাঙামামী সাতজন্মেও রামহরিকে কোনো ভাবে খতির করা আবশ্যক বোধ করেন নাই; আজ কিন্তু ভবিষ্যৎ শাশুড়ী রূপে তাড়াতাড়ি মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া বলিলেন, “হ্যাঁ বাবা, সেই জন্মেই ত ভরসা করে মেয়েকে তোমার হাতে দিচ্ছি। মেয়ে আমার দেখতে ভাল নয়, অল্প জায়গায় বড় হেনস্থা হবে। তোমার কাছে সে ভয় নেই, তুমি ওর ভিতরে কত গুণ তা জান।”

টেবীর রূপ বা গুণ কিছুই বেচারী রামহরির অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু এ বাড়িতে তাঁহার সন্ধে যখন যা ব্যবস্থা হইয়াছে, কোনটাতেই তিনি যেমন আপত্তি করেন নাই, এটাতেও তেমনি করিলেন না। শুভদিনে শুভক্ষণে শ্রীমতী নীহারিকা তাঁহার পত্নীত্বে অধিষ্ঠিত হইয়া ঘর জুড়িয়া বসিলেন।

নীহারিকার রূপ গুণ যাহা থাক বা না থাক, পয় ছিল। রামহরির একটা চাকরিও ভালমত জুটিয়া গেল। খণ্ডরবাড়ি ত্যাগ করিয়া এইবার তিনি বাড়ি ভাড়া করিয়া আলাদা সংসার করিলেন। নীহারিকা গৃহিণীপণায় মাকে এবং পিসিমাকেও ছাড়াইয়া গেল। রামহরি কতকগুলি টাকা রোজগার করিয়া আনেন মাত্র, সংসার পরিচালনায় আর তাঁহার কোনোই হাত নাই। তাঁহাকে যাহা খাইতে দেওয়া

হয় তাহাই তিনি খান, যাহা পরিতে দেওয়া হয় তাহাই তিনি পরেন এবং যাহা শুনিতে বলা হয় নীরবে তাহা শুনিয়া যান। অবশ্য এ ব্যবস্থায় তাঁহার নিজের কোনো অমত ছিল না। অস্বাভি কোনো-না-কোনো রমণীকে ভাগ্যবিধাত্রী হিসাবে সমীহ করিয়া চলিতে তিনি অভ্যস্ত, সেই হিসাবেই তিনি নীহারিকাকেও মানিয়া চলিতেন। বরং আগে আগে যাহারা তাঁহার দণ্ডমুণ্ডের কর্তী ছিলেন, এটি তাহাদের চেয়ে অনেক অংশে দয়াবতী, ইহার অধীনে আদর যতটা ঢের বেশী পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে যত্নের আধিক্যটা অসহ লাগিলেও রামহরি সহ করিয়া যাইতেন, কারণ স্ত্রীজাতির কথাই যে প্রতিবাদ করিতে নাই, এ শিক্ষা তাঁহার ভাল রকমই হইয়াছিল। স্মরণ্য স্বামী হইয়াও তিনি অতি সাধী পত্নীর মত নীহারিকার একান্ত অনুগত হইয়া রহিলেন এবং নীহারিকা আসলে গৃহিণী হইলেও কার্যতঃ কর্তা হইয়া উঠিলেন।

ইহাদের সংসারে যে-দুইটি শিশুর আবির্ভাব হইল, তাহারাও যেন ঠিক যাহা হওয়া উচিত, তাহার উল্টাটাই হইল। ছেলেটি হইল অতি সুন্দর দেখিতে, মেয়েটি হইল শ্রামবর্ণ অতি সাধারণ চেহারার। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই বুঝা যাইতে লাগিল যে, স্ত্রীমান দেখিতেই শুধু সুন্দর, ভিতরে বিশেষ কোনো বস্তু নাই। বুদ্ধি সূক্ষ্ম নাই, লেখাপড়া শিখিবার প্রবৃত্তি নাই, তবে স্বপ্নের বিষয় এইটুকু যে, সুবুদ্ধিও বিশেষ নাই। চুপ করিয়া এক জায়গায় বসিয়া থাকিতে পাইলে সে সবচেয়ে খুশী হয়, একমাত্র সুখাদ্যের প্রলোভনে তাহাকে একটু নড়িতে চড়িতে দেখা যায়। স্বাস্থ্যও ভাল নয়, অল্পতেই তাহার ঠাণ্ডা লাগে, পান হইতে চুপ খসিলেই তাহার হৃৎকমের গোলমাল উপস্থিত হয়। নীহারিকা দেখে শোনে কপাল চাপড়ায়, আর বলে ভগবান্ একে গরিবের ঘরেই বা কেন পাঠালেন? আর বেটাছেলে করেই বা কেন পাঠালেন? রাজবাড়ির রাজনন্দিনী হলেই এর শোভা পেত। কিন্তু সমস্ত হৃদয় তাহার এই অকর্মণ্য সুন্দর ছেলেই জুড়িয়া থাকে। মেয়ের দিকে মন দিবার তাহার অবসরই হয়না, যদিও মেয়েই ছোট।

তা কপালগুণে মেয়ের তাহাকে খুব বেশী দরকারও হয় না। মেয়ে ত নয় যেন লোহার বাঁটল। বেশ শ্রামবর্ণ,

গোলগাল চেহারা, মাথায় এক মাথা ভ্রমরকৃষ্ণ কোঁকড়ান চুল। সে দশ মাসে হাঁটিতে শিখিল, এগারো মাস পুরিতে না পুরিতে কলরব তুলিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিল।

দুধ কোথায় থাকে, ফল কোথায় থাকে, মিছরী চিনি কোথায় থাকে, তাহার কিছুই জানিতে বা কি নাই। ছেলের তদারক করিতে করিতে নীহারিকা হয়ত খুকীকে খাওয়াইতেই ভুলিয়া গেল, কিন্তু খুকী দমিবার মেয়ে নয়। সে বাটি হাতে করিয়া, সিকি কড়া দুধ উল্টাইয়া দিয়া, খানিক দুধ খাইয়া, খানিক বুকে পেটে মাখিয়া কাজ উদ্ধার করিয়া বসিয়া আছে। রাত্রে নিজের কাঁথা টানিয়া নিজে পাতে, দাদার বালিশ ঠিক করিয়া দেয়, খোকা ভয়ে ভা করিয়া উঠিলে খুকী তাহাকে বসিয়া সান্ত্বনা দেয়। নীহারিকা অবাক হইয়া বলে. “একে ভগবান করলেন কি-না মেয়ে, এ যে জেলার ম্যাজিষ্টার হবার যুগিয়া।”

যত দিন যাইতে লাগিল, ছেলেমেয়ের অসাধারণ তফাৎটা বড় বেশী উগ্র হইয়া উঠিতে লাগিল। ছেলের নাম হইল কান্তিচন্দ্র, তিনি শুধু কান্তিসর্বস্বই হইয়া রহিলেন। স্কুলে তাহাকে ভক্তি করিতে না করিতে ছেলে অস্বখে পড়িয়া শয্যাগ্রহণ করিল, মাস কয়েক শুধু শুধু মাহিনা গণিয়া নীহারিকা শেষে তাক্তবিরক্ত হইয়া ছেলের নাম কাটাইয়া দিলেন। ঘরেই অল্প মাহিনার এক ছোকরা-মাষ্টার রাখিয়া দেওয়া হইল, সে বোজ নিয়মমত হাজিরা দিতে লাগিল, তবে কান্তিচন্দ্রের বিদ্যালোভ কতটা হইল, তাহার কেহ কোনো খোজ করিল না। চেহারাটা কিন্তু দিনের দিনই বেশী খুলিতে লাগিল, পাড়াপড়শীর নজরের ভয়ে কান্তির মা ক্রমেই বেশী করিয়া সশঙ্কিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

মেয়ের নাম রাখিলেন বাপ শ্রামলতা, ডাকনামটা লতাই থাকিয়া গেল। সাধারণ হিন্দু গৃহস্থঘরের মেয়ে, তাহার শিক্ষার ভাবনা বড় একটা কেহ ভাবে না। আর ভাবিয়াই বা হইবে কি? বড় হইয়া ত দেবী সরস্বতীর সহিত কোনো সম্পর্কই তাহার থাকিবে না, দিন কাটিবে রান্নাঘরে আর স্মৃতিকাগুহে, তখন তাহাকে আবার অত ঘটা করিয়া লেখা পড়া শেখান কেন? তাহার উপর লতা দেখিতে সুন্দরী নয়, নীহারিকার ইচ্ছা খুব ছোট থাকিতে থাকিতে কোনগতিকে তাহার বিবাহ দিয়া পার করিয়া দেওয়া। কচিবল্যায়

তবু গোলগাল আছে, হাসি খুশী আছে, এক রকম দেখায়, বড় হইয়া এ যে আবার কি রকম দেখিতে হইবে কে জানে ? বলা বাহুল্য, দেশে তখনও শারদা আইন জারি হইতে অনেক বিলম্ব ছিল, সুতরাং নীহারিকার ইচ্ছাটাকে কেহই আপত্তিজনক বা অদ্ভুত মনে করিত না। লতাকে যে বাপের বাড়ি বছর নশের বেশী বাস করিতে হইবে না, এ-বিষয়ে ঘরে বাহিরে কাহারও কোনো সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু যে-মেয়ে এক বছর বয়স হইতে না হইতে নিজের খাওয়া পরা, শোয়া সব-কিছুর ব্যবস্থা নিজে করিয়া আসিতেছে, তাহার চিরজীবনের ব্যবস্থা অল্প লোকে অত চট করিয়া করিয়া দিতে পারে না। দাদাকে মাষ্টার পড়ায়, সে উন্টা দিকে বসিয়া দেখে। হঠাৎ এক দিন একখানা পবরের কাগজ উন্টা করিয়া ধরিয়া গড় গড় করিয়া পড়িয়া সে সকলকে তাক লাগাইয়া দিল। ছোকরা-মাষ্টারটির ব্যাপারটা বড়ই মনে লাগিল। এই একটা মাকাল ফলের মত ছেলে, ইহার পিছনে সে পূরা একটা বছর খাটিতেছে, ইহাকে কি সে বিন্দুমাত্র কিছু শিখাইতে পারিল ? আর এইটুকু মেয়ে, ইহাকে কোনো দিন কেহ ক'খ চিনাইবারও চেষ্টা করে নাই, ইহার বুদ্ধি দেখ ? সে-দিন হইতে কাস্তিচন্দ্রের মাষ্টার নামে তাহারই মাষ্টার থাকিলেও কার্যতঃ লতারই মাষ্টার হইয়া দাঁড়াইল। লতাকে যাহা শেখান যায়, তাহা ত সে শেখেই, যাহা না শেখান হয় তাহাও কোথা হইতে যে সে শিখিয়া আসে তাহার মাষ্টার ভাবিয়া পায় না।

শুধু পড়াশুনাতাই নয়, অল্প দিকেও লতা বাড়ির লোককে থাকিয়া থাকিয়া তাক লাগাইয়া দেয়। ঠিক ঠিক আসে নাই, নীহারিকার মাথা ধরিয়াছে। কলতলায় স্তপীকৃত এঁটো বাসনের দিকে তিনি যতবার তাকাইতেছেন, তাহার ধরা মাথা আরও বেশী ধরিয়া যাইতেছে। হঠাৎ বাসন নাড়ার শব্দ হইল, চৌবাচ্চার মধ্যে কলের জল ঝিরঝির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। নীহারিকার মনে হইল যেন মরুতে পথভ্রান্ত পথিকের কর্ণে জলধারার শব্দ আসিতেছে। আকুল আগ্রহে শয়নকক্ষ হইতে গলা বাড়াইয়া বাহিরের উঠানে দৃষ্টিনিষ্ক্রেপ করিলেন। ওমা, কোথায় বা পোড়ার-মুখী কাঙালীর মা। ছোট লতা ডূরে শাড়ীর আঁচলটি কোমরে আচ্ছা করিয়া জড়াইয়া, হাতের সোনার

বালা উর্কে বাহতে টানিয়া তুলিয়া মহোৎসাহে বাসন মাজিতেছে।

নীহারিকা ধরামাথার যন্ত্রণা ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন, “এই, এই, সব বলছি, সব শীগ্গীর। একরত্তি মেয়ে, রকম দেখ না, কাঁড়িখানেক এঁটো মাজতে বসেছে। তারপর সর্দি কাশি ক’রে মর আর কি। একেই ত আমার ছেলেকে নিয়ে কত সুখ।”

লতা নড়িবার কোনো লক্ষণ না দেখাইয়া বলিল—“আমি তোমার আহ্বানে ছেলের মত কি-না ? কতবার আমি কাঙালীর মায়ের সঙ্গে বাসন মেজেছি, কখনো আমার কিছু হয় না, বলিয়া ঘষ ঘষ করিয়া মাজিয়া চলিল।

নীহারিকা হয়ত জ্বরে শয্যাশায়ী, বামুন ঠাকরণ সময় বুঝিয়া নিজের বাড়িতেই থাকিয়া গেলেন। কাস্তি সময়মত গোছাভরা লুচি না পাইয়া নাকে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। রামহরির চোক প্রায় কপালে উঠিবার ভোগাড়, এমন সময় দেখা গেল লতা গোল গোল ছোট দুইটি হাত প্রাণপণে চলাইয়া আটা ঠাসিতেছে এবং দাদাকে সাধনা দিতেছে, “বাবা, আচ্ছা ছেঁচ কাঁদনে ছেলেবাপু তুমি। একটু সবুর কর না, লুচি এখনি হয়ে যাবে।”

আট বছরের মেয়ে যখন লতা, তখনই সে রান্নাবান্না সব শিখিয়া ফেলিল। বামুনঠাকরণ না আসিলে নীহারিকাকে আর একেবারে পথে বসিতে হয় না, লতাই তাহার অর্ধেক কাজ করিয়া দেয়। এইটুকু মেয়ের গায়ে ভগবান্ শক্তিও দিয়াছেন আশ্চর্য। সে-দিন পাড়ার শ্রেষ্ঠ ডান্‌পিটে ভোগলাকে এমন এক চেলা কাঠের বাড়ি লাগাইয়াছে যে, পাড়ায় লতার নাম রটিয়া গিয়াছে। কাস্তিচন্দ্র সকালে নিজে খাইবার জন্ত দুইটি রসগোল্লা কিনিয়া আনিতেছিল, হঠাৎ ভোগলা কোথা হইতে চিলের মত ছৌ মারিয়া রসগোল্লা দুটি ঠোঙা হইতে তুলিয়া নিজের মুখে ফেলিয়া দিল। কাস্তি ভ্যা করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেই লতা বাহির হইয়া আসিল। কাঠ কাটিয়া দিয়া সে মায়ের উল্লন ধরানোর সাহায্য করিতেছিল। সদর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া দেখিল কাস্তি খালি ঠোঙাটা হাতে করিয়া হাঁ করিয়া কাঁদিতেছে, আর ভোগলা একটু দূরে দাঁড়াইয়া তাহাকে কলা দেখাইয়া বলিতেছে “ও বাঁদর, কলা খাবি, জয় জগন্নাথ দেখতে যাবি ?”

তীরের মত ছুটিয়া গিয়া লতা ভোম্বলার পিঠে চেলা কাঠের বেশ এক ঘা বসাইয়া দিয়া বলিল, “বাবু ত তুমি, এইবার দেখ অম্ম অগম্মাথ” বলিয়া ক্রন্দনপরাশ্রয় দাদার হাত ধরিয়া ভিতরে টানিয়া আনিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। এই-টুকু মেয়ের হাতে মার খাইয়া ভোম্বলচন্দ্র এতই অবাক হইয়া গিয়াছিল যে, প্রতিবাদ করিবার চেষ্টাও সে করিল না। নীহারিকা অবশ্য ব্যাপার শুনিয়া গালে হাত দিয়া বলিলেন, ‘ওমা কোথায় যাব! বেটাছেলেকে ঠেঙিয়ে এলি অমন করে? লোকে বলবে কি? মা, মা, মা, এ মেয়ে ত নয়, একেবারে মহিষমর্দিনী।’

লতার মাষ্টার হঠাৎ এই সময় দেশে চলিয়া গেল। কাস্তির আর আনন্দ ধরে না, সকালবেলাটা এখন বেশ খুশীমত খেলা এবং খাওয়ার চর্চা করিতে পারিবে। লতা কিন্তু ভাবিয়াই অস্থির, তাহাকে পড়াইবে কে? মায়ের এ-সব দিকে সহানুভূতি নাই, তাহা সে এখনও বুঝিতে পারে, অগত্যা নিরীহ বাবাটিকেই গিয়া আক্রমণ করিল, “আমি বুঝি পড়ব না? আমি বুঝি তোমার ঝাকা ছেলেব মত মুখ্য হয়ে থাকব?”

রামহরি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “না মা না, মুখ্য কেন হবে? মাষ্টার ত খোঁজা হচ্ছে, পাওয়া গেলে সে তোমাকেও পড়াবে।”

লতা বালিল, “হ্যাঁ, মাষ্টারও এসেছে, আর আমিও পড়েছি। ঐ যে বালিকা বিদ্যালয়ের গাড়ী যায় রোজ এই গলি দিয়ে, সেই বালিকা বিদ্যালয়ে আমি পড়ব।”

রামহরি অমুগত অধস্তন কর্মচারীর মত নীহারিকাকে খবর দিলেন। গৃহিনী ঠোট উন্টাইয়া বলিলেন, “হুয়েছে, হুয়েছে, মেয়ে সত্যিই ত আর ম্যাজিষ্টার হবে না, এখন বসে বসে তাঁর ‘টাইমে’র ভাত রাঁধি আর ইস্কুলের মাইনে গুণি। অতন্ন কাজ নেই।”

কিন্তু কে বা তাঁহার কথা শোনে? তাঁহারই মেয়ে ত? লতা খাওয়া, নাওয়া, শোওয়া, কাজ করা, দাদাকে সামলান, সব হঠাৎ একসঙ্গে তাকে তুলিয়া রাখিয়া, এমন সগর্জনে কান্না সুরু করিল যে, নীহারিকাসহ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। রাগটা পড়িল রামহরির উপরেই। এমন বাপ না হইলে, এমন মেয়ে হয়? সাতজন্মে তিনি এমন কাণ্ড দেখেন নাই। তাঁহারাও ত মা-বাপের মেয়ে, এমন অগ্নায় আবদার করিতে কে কবে

তাঁহাদের দেখিয়াছে? আপদ মেয়েকে ইস্কুলেই দিয়া আসা হোক, মানুষের কান দুটা জুড়াক। রামহরি লতাকে স্কুলে ভর্তি করিতে চলিলেন। মনে মনে বুঝিলেন, তাঁহার রাজ্যে আবার সম্রাজ্ঞী বদলের সময় উপস্থিত হইয়াছে।

লতা স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের একেবারে অবাক করিয়া দিল। এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, এমন মনোযোগ, তাঁহারা ইতিপূর্বে কোনো ছাত্রীর মধ্যে দেখেন নাই। স্মৃতিশক্তিও তাহার অসাধারণ, কোনো কথা তাহার কাছে পড়িতে পার না। বৎসরের মাঝখানে ভর্তি হইল বটে, কিন্তু বৎসরের শেষে পরীক্ষায় সব কটা বিষয়ে প্রথম হইয়া ক্লাসের সব কয়জন মেয়েকে সে একান্তভাবে চটাইয়া দিল। হরেক রকম প্রাইজে দুই হাত ভরিয়া যে-দিন সে বাড়ি আসিয়া হাজির হইল, সে-দিন এমন কি নীহারিকা পর্যন্ত খুশী না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। সত্যি মেয়েটার গুণ আছে। হায়, হায়, ইহার শতাংশের একাংশ বুদ্ধি যদি ছেলেটার থাকিত। পোড়া ভগবানের কি বিচার আছে গা? এই মাকাল ফলের মত ছেলে, বাপ-মা যখন থাকিবে না, তখন খাইবে কি? স্বাস্থ্যও তাহার এমন যে, মুটেগিরি করিবার যোগত্যাও তাহার কোনো দিন হইবে না। আর এই মেয়ে, গুণের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে হীরার টুকরা, কিন্তু একটুখানি রূপের অভাবে কোনো আদরই ইহার হইবে না। বিবাহ দিতেই জিব বাহির হইয়া পড়িবে, কেমন যে বর জুটিবে কে জানে?

লতার পড়াশুনায় ক্রমেই উন্নতি হইতে লাগিল। বিশ পঁচিশ বৎসর আগের কথা, তখন কলিকাতা শহরেও হাজারে হাজারে মেয়ে স্কুলে পড়িত না। পরীক্ষা দিতে অগ্রসর যে-ক’টা মেয়ে হইত, তাহাদের দিকে লোকে সন্দেহবিন্ময়ে তাকাইয়া থাকিত। আই-এ, বি-এ পাস করা মেয়ের সংখ্যা তখন এক হাতের আঙুলে গোনাই যাইত। মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যে পরীক্ষায় প্রথম দ্বিতীয় হইতে পারে এমন অসম্ভব সম্ভাবনাও কাহারও মাথায় আসিত না।

কিন্তু লতা সম্বন্ধে ক্রমে এই রকম একটা অস্পষ্ট সন্দেহ, তাহার স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের মাথায় আসিতে আরম্ভ করিল। এমন ছাত্রী তাঁহারা কখনও পান নাই, ইহাকে শিখাইতে গিয়া নিজেদেরই যেন মধ্যে মধ্যে লাজ্জিত হইয়া পড়িতে হয়। স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষার প্রথম প্রাইজওলা ত তাহার হাতে ধরা,

এন্ট্রান্স পরীক্ষা অবধি দিতে পারিলে সে ছেলেদের মাথায় চাঁটা মারিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিবে। সুবিধা পাইলেই তাঁহার লতার মাকে বলিয়া পাঠান, যেন অনর্থক বিবাহ দিবার জন্ত তাড়াতাড়ি করিয়া এমন মেয়ের ভবিষ্যৎ তিনি নষ্ট না করেন।

লতার বয়স এখন বছর তেরো। চেহারাটি আগেরই মত আছে। শুধু লম্বা হইয়াছে খানিকটা, আর ঘন চুলের গুচ্ছ কাঁধ ছাড়িয়া পিঠের মাঝামাঝি নামিয়া আসিয়াছে। চোখ দুটি বুদ্ধিতে সমুজ্জ্বল, হাত দুটি কশ্মে তৎপর। নীহারিকার মেয়ের বিবাহ দিবার ইচ্ছাটা মাঝে মাঝে মাথা ঝাড়া দিয়া ওঠে, আবার শিক্ষয়িত্রীদের কথা ভাবিয়া সে উৎসাহটাকে তিনি চাপিয়া যান। অপদাখ ছেলের জন্ত তাঁহার মনে একটা প্রচ্ছন্ন লজ্জা সর্বদাই গুমরিতে থাকে। পাড়ার অগ্র ছেলেরা টপাটপ ক্লাসে উঠিতেছে, স্পোর্টে প্রাইজ পায়। বড় হইয়া, কাহাকে কোন্ লাইনে দেওয়া হইবে, তাহা লইয়া বাপ-মায়েরা কত আশা উৎসাহে আলোচনা করে। আর তাঁহার ছেলে দেখ না? ইহাকে পুতুল সাজাইয়া এক দেয়ালের তাকে বসাইয়া রাখা চলে, আর কোনো কাজ ইহার দ্বারা হইবে না। মেয়ে হইতে হয়ত তাঁহার মুখের জননী হওয়ার অপবাদ ঘুচিবে। রামহরির আর যা দোষই থাক, মুখ তিনি নন, স্ততরাং নীহারিকার জন্তই ছেলে মুখ হইল, এ কথা কি আর লোকে বলিতে ছাড়িবে? কাজেই মেয়ের বিবাহের বিষয় তিনি চূপ করিয়াই আছেন। মেয়েটা কপালক্রমে দেখিতে ছোটখাট, এখনও তাহাকে দশ-এগার বছরের বলিলে লোকে জোর করিয়া মিথ্যাবাদী বলে না।

কাস্তি এখনও বেশীর ভাগ সময় বাড়িতেই পড়ে। স্কুলে তাহার নাম আছে, কিন্তু ঐ নাম পর্যন্তই। স্কুলে পাঠাইলেই তাহার হজমের গোলমাল হইতে শুরু হয়, আর নীহারিকা ব্যস্ত হইয়া তাহাকে আবার ঘরে আটক করেন। দেখিতে সে কিশোর কন্দর্পের মত সুন্দর, বেশ সাজিয়াগুজিয়া থাকে। সবে গোঁফের রেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাস্তব ভিতর একখানি মোটা বাঁধান খাতা আছে, মাঝে মাঝে তাহাতে কাব্যলক্ষীর আরাধনাও করে। সম্প্রতি এ-বিষয়ে তাহার বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইতেছে। শ্যামলতার স্কুলের গাড়ীতে উমা বলিয়া একটি মেয়ে যায়, মেয়েটি দেখিতে ভারি সুন্দর।

মেয়েটি আবার ঠিক দরজার সামনেই বসে, বড় বড় হরিগনঘন মেলিয়া কাহার সন্ধানে যেন এদিক ওদিক তাকায়। কাস্তিকেই সে দেখিতে চায় কি? তাঁহার মত সুদর্শন অস্তিত্বঃ এ গলির ভিতর আর কেহ নাই। উমা লতারই বয়সী হইবে বোধ হয়। তবে লতার চেয়ে লম্বায় বড়, চোখ দুটিও একেবারে শিশুর সারল্যেই শুধু পূর্ণ নয়। স্কুলের গাড়ীর সহিস আসিয়া যখন ডাক দেয়, “গাড়ী আয়া বাবা,” তখন লতার আগে কাস্তিচন্দ্রই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসে। কিন্তু দুই মেয়েগুলি আবার ইহা লইয়াও হাসাহাসি করে। তাই মাঝে মাঝে সে সামনের ঘরের জানালার আড়াল হইতে দেখে। মধ্যে মধ্যে সে অবশ্য বাহিরও হয়, কারণ উমাকে দেখাষ্ট ত তাহার কাজ নয়, উমাকে দেখা দেওয়াও কাজ। কি সুন্দর মেয়েটি। আর সর্বদাই হালকা এক একটা রঙের শাড়ী পরে, এমন চমৎকার তাহাকে মানায়। কাস্তি যদি কবি না হইয়া চিত্রকর হইত, তাহা হইলে উমার একখানি ছবি আঁকিয়া নিজে ধন্য হইত, উমাকেও ধন্য করিয়া তুলিত, বোধ হয়।

শ্যামলতা দাদার কাণ্ড দেখে আর রাগে তাহার সর্বদা জলিয়া যায়। আর উমালক্ষীছাড়ীর রকম দেখ। বিষের সঙ্গে খোজ নাই সব কুলোপানা চক্র। বিদ্যা দাদারও বত, উমারও তত। রাগের চোটে আর কিছু করিতে না পারিয়া লতা গাড়ীতে উঠিবার সময় বেশ করিয়া উমার পা মাড়াইয়া দেয়। উমা আপত্তি করিলে বলে, “তা ভোঁদা শরীর নিয়ে সামনেটা জুড়ে বসিস কেন? তোকে কি ডিঙিয়ে উঠব?”

উমাদের বাড়ি কাছেই, কলিকাতা শহর তাই, না হইলে হাঁটিয়া যাওয়া-আসা চলিত। তাহার বাবার অবস্থা ভাল নয়, মেয়ে অনেকগুলি, ছেলে মাত্র তাঁহারও একটি। মেয়েদের ভিতর উমা দ্বিতীয়া, বড়মেয়েটির অর্থাভাবে অতি অপাত্রে বিবাহ হইয়াছে। ইহাকে তাই কষ্ট করিয়াও তিনি স্কুলে দিয়াছেন। মেয়ে দেখিতে খুব ভাল, পড়াশুনা করিলে ভাল বিবাহ হয়ত হইবে। চেহারার গুণে লোকের স্ননজরেও পড়িতে পারে। স্কুলের প্রাইজ ইত্যাদিতে লোকের চোখের সামনে তাহাকে ভাল করিয়াই তুলিয়া ধরা হয়। উমার ভাই সকলের বড়।

কাস্তিচন্দ্র কয়েক দিন ঘোরাফেরা করিয়াই বিনয়ভূষণের সঙ্গে ভাব জমাইয়া লইল। সে অগ্র স্কুলে পড়ে, না

হইলে তাহার সঙ্গে বেশী করিয়া খাতির জমাইবার লোভে কাস্তি স্কুলে স্কুল যাইতে রাজী ছিল। বিনয় ছেলোট ভাল, পড়াশুনার মন আছে, কিন্তু স্বাস্থ্য তাহারও ভাল নয়। তবে গরিবের ঘরে তাহাকে অত নন্দলালী ঢঙে মানুষ করা সম্ভব নয়। কাজেই অল্প দশ জনে যাহা খায় পরে, সেও তাহাই খায় পরে। অস্থির করিলেও স্কুলে যায়। সম্প্রতি সে ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য প্রাণপণে খাটিয়া প্রস্তুত হইতেছে। তাই ইচ্ছা থাকিলেও কাস্তি বেশী আড্ডা দিতে পারে না।

দিনগুলি যেন পাখায় ভর করিয়া ছ ছ করিয়া উড়িয়া চলিতেছে। শ্রামলতা সে-দিন শিশু ছিল, দেখিতে দেখিতে কিশোরী হইয়া উঠিল। পাড়ার ছেলেদের সম্বন্ধেও সে আজকাল সচেতন হইয়া উঠিতেছে, তবে তাহার ভিতর রোমান্সের ভাব বেশী কিছু নাই, প্রতিযোগিতার ভাবই প্রবল। এক দিন কাস্তিচন্দ্র রাত্রে একখানা প্রশ্নপত্র হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, “দেখেছিস এবারে ইংলিশের কোশ্চন্ কি রকম শক্ত? তোদের বারে এই রকম হল্ট চক্ষু স্থির। বিনয়টাও ভাল করে লিখতে পারেনি।”

লক্ষ্মী কাগজখানা হাতে করিয়া বলিল, “ইং, ভারি ত, দাও আমাকে খাতা, আমি পটাপট সব লিখে দিচ্ছি, তোমার বিনয়কে দেখিও।”

সত্যই একখানা খাতা টানিয়া লইয়া সে প্রশ্নের উত্তর লিখিতে বসিয়া গেল। ঘণ্টা দুই খাটিয়া, সব ক’টা প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া কাস্তির হাতে দিয়া বলিল, “যাও তোমার বন্ধুকে দেখাও গিয়ে।”

রাত্রেই না দেখাইলে কিছু চণ্ডী অশুদ্ধ হইয়া যাইত না। কিন্তু কাস্তি রাত্রেই চলিল, তাহার নয়নতারাটিকে আর এক বার দেখিতে পাইবার লোভে।

বিনয় খাতাখানা লইয়া উন্টাইয়া পান্টাইয়া অনেকগুলো পাতা পড়িয়া ফেলিল। তাহার পর সংক্ষেপে বলিল, “তোমার বোন ইউনিভার্সিটিতে নাম রাখবে।”

কাস্তিচন্দ্রের কানে কথাটা গেল কি-না বুঝা গেল না, পাশের ঘর হইতে কে মিষ্টি গলায় মিহি সুরে গান করিতেছিল, সে তন্ময় হইয়া তাহাই শুনিতোছিল।

লতারও পরীক্ষার বৎসর দেখিতে দেখিতে আসিয়া

পড়িল। তাহার পরিচিত জগৎ-সংসারে এই কয় বৎসরের মধ্যে নানা পরিবর্তন আসিয়া পড়িয়াছে। নীহারিকা দারুণ পক্ষাঘাত পীড়ায় একেবারে জীবন্ত হইয়া পড়িয়াছেন, কথা পর্যন্ত একরকম বন্ধ। অত্যন্ত অস্পষ্ট ভাবে জড়াইয়া জড়াইয়া যাহা বলেন, তাহা স্বামী পুত্র কন্যা ভিন্ন কেহ বোঝে না। শ্রামলতা ঘরের কাজও দেখে, পরীক্ষার পড়াও পড়ে। কাস্তিচন্দ্র এখনও তেমনি পাড়ার লোকের চোখে বিশ্বয় জাগাইয়া গলিতে গলিতে ঘোরে। তাহার শরীর আরও খারাপ হইতেছে, স্ততরাং নিশ্চয়ই সে পরীক্ষা দিবে না। মা অকম হইয়া পড়ার পর তাহার আর নিয়মমত খাওয়া-দাওয়া হয় না। লতা পোড়ারমুখী নিজের পড়ার জাঁক করিতেই ব্যস্ত। বাবা ত মানুষের মধ্যেই গণ্য নহেন।

উমাদের বাড়িতেও বিপদ আপদের শেষ নাই। তাহার বাবা মারা গিয়াছেন, বিনয় আই-এ পাস করিয়া অর্থাভাবে পড়িতে পারে নাই, গোটা পাঁচ ছয় টাশনি করিয়া কোনো মতে সংসার চালাইতেছে। উমা আর স্কুলে পড়ে না, তাহার মা তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত। কিন্তু গরিব ঘরের পিতৃ-হীনা মেয়ে, কে তাহাকে বিবাহ করিবে?

লতার পরীক্ষা হইয়া গেল। শেষের দিন বাড়ি ফিরিয়া সে নিজেই বলিল, “ফাষ্ট না হই, সেকেণ্ড ত নিশ্চয় হব।”

নীহারিকার রোগপাণ্ডুর মুখে হাসি দেখা দিল। রামহরি বলিলেন, “তা হবে বৈ কি মা? শুধু কাস্তি মুখখানাকে অনশ্চব বাঁকা করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বন্ধুবান্ধব সকলকে মনের দুঃখ জানাইয়া, দিন কয়েক বলিয়া বেড়াইল, বোনের ষোল বছর বয়স হইয়া গেল, মা-বাবা বিবাহ দিবার নাম করেন না, ইহাতে কাস্তির মানসস্ত্রমের বড় হানি হইতেছে।

তাই ত, এখন আর লতাকে দশ-এগার বৎসর বলিয়া চালাইয়া দেওয়া চলে না। তাহার স্বস্থ সবল দেহটি হঠাৎ যেন বর্ষার নদীর মত ফুলে ফুলে ভারিগা উঠিয়াছে, লক্ষ্যও বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছে। তা ছাড়া ম্যাট্রিক পরীক্ষা যে দিল, সে-ই ত বয়সের একটা স্থির নিদর্শন? ষোল বৎসর না পূরিলে কাহাকেও ত খাতির করিয়া পরীক্ষা দিতে দিবে না? পাড়ার লোকে রামহরিকে এমন কি পীড়িতা নীহারিকাকেও বাড়ি বহিয়া অঘাচিত উপদেশ দিয়া যাইতে

লাগিল। মেয়ে যে হাজার পড়ায় ভাগ হইলেও জঙ্গ বা ম্যাঞ্জিষ্ট্রেট হইবে না, ইহাও বিদ্রূপের স্ববে অনেকে জানাইয়া দিল।

রামহরি এখনও বিচলিত হইলেই নীহারিকার কাছে ছুটিয়া আসেন, চিরদিনের অভ্যাস যাইবে কোথায়? জিজ্ঞাসা করেন, “কি করা যাম্বু, থোকার মা?”

নীহারিকা জড়াইয়া বলেন—“কিছু করতে হবে না, মেয়ে পড়ুক।

রামহরি বলেন, ‘পাড়ার লোকে বড় নিন্দে করছে।

নীহারিকা বলেন, “তাদের মুখে পোকা পড়ুক, আমরা নৈকিয়া কুলীনেয় ঘর, মেয়ে চিরকুমারী থাকলেও নিন্দে নেই।

লতা পরীক্ষায় প্রথমই হইল। সে নিজে কিছুই বিস্মিত হইল না। কিন্তু চেনা-অচেনা সকলকে রিস্মিত করিয়া দিল। নীহারিকা মেয়েকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া আদর করিতে লাগিলেন। রামহরি আনন্দে অধীর হইয়া কি যে করিবেন ভাবিয়াই পাইলেন না। কাস্তিচন্দ্র রাগের চোটে বাড়ি হইতে সেই যে বাহির হইয়া গেল। আর রাত বাবটার আগে ঘরেই ফিবিল না। চেনা শুনা কাহারও বাড়িতে না গিয়া, ইডেন গার্ডেনে গিয়া বসিয়া রহিল। চেনা মানুষে দেখিলেই ত লতার সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করিতে বসিবে? আর তাহার সহ হয় না। একে ত উমার বিবাহের সঘঙ্ক হইতেছে শুনিয়া অবধি সে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। এ-হুঃখের কথা কাহাকে সে জানাইবে? আঠার বৎসরের ছেলে, পড়াশুনা কিছু করে নাই, শুধু রূপ দেখিয়া কেহ কি তাহাকে কণ্ডা সম্প্রদান করিবে? মা বাবা তাহার দারুণ মনোবেদনার কথা একবারও কি ভাবেন? তাঁহারা বলিলে কহিলে উমাকে কি আর কাস্তির সঙ্গে বিবাহ দেয় না? যাহা হউক, গরিবের মেয়ে ত? কত ভাল বিবাহই আর তাহার হইবে? কাস্তি একগাদা ইংরেজী বইই না হয় মুখস্থ করে নাই, কিন্তু তাহার মত সাহিত্যিক প্রতিভা তাহার বয়সের কোন্ ছেলের আছে? আর ঘরটা কত বড় তাহাও ত দেখিতে হইবে? কিন্তু পিতামাতা নিজেদের ঐ কলে হৌংকা মেয়ের বিদ্যাবত্তার গর্বে একেবারে দিনে তারা দেখিতেছেন, কাস্তি-বেচারার কথা ভাবিবারই তাঁহাদের সময় নাই।

লতা আই-এ পড়িতে ঢুকিল। এখন স্বলারশিপের জোর আছে, কাজেই কিছুতে আর আটকাইবে না। ঘরের বাহিরের কোনো কথাতেই আর সে কান দেয় না। প্রতিবেশিনীরা তাহার দেমাক দেখিয়া দিনের দিন রুগ্ন হইয়া উঠিতেছে। অভ্যন্তরিত রকমের দুই-চারটি পাত্রও অনেক সময় তাঁহারা খুজিয়া আনে, কিন্তু তাহাদের পরিচয় শুনিবা মাত্র লতা এমন হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া দেয় যে, ঘটকী এবং পাত্র অপ্রসন্ন হইয়া পলাইবার পথ পায় না। কাস্তির ইচ্ছা করে বোনের মাথাটা গুঁড়া করিয়া দেয়, কিন্তু সে জোর তাহার কোথায়?

ফাষ্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ারের দুইটা বৎসর প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এমন সময় নীহারিকা হঠাৎ ঘর-সংসারের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেলেন। শেষ কথা স্বামাকে বলিয়া গেলেন, “লতু আমার যত পড়তে চায় পড়িও।”

শোকের ঘোরে কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল। লতাই ঝাড়িয়া উঠিল সবার আগে। মুখ স্নান, চোখে জল, কিন্তু সমানে ঘরের কাজ করিতেছে, পড়া করিতেছে। প্রতিবেশিনীরা গালে হাত দিয়া বলিল, “ধন্তি মেয়ে বাবা, এমন যারপরনাই মা, সে চলে গেল, তাতেও দু-দিন সবুজ নেই, কেতাবী বিবির মুখ থেকে কেতাব নামল না। সাধে শাস্ত্রে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে মানা আছে?”

কাস্তিচন্দ্রের বয়স এখন কুড়ি বৎসর। দেখিতে রাজপুত্রের মত। দেবাজে কবিতার খাতাও জমা হইয়াছে অনেকগুলি। ভাগ্যবিধাতা নিতান্তই প্রসন্ন, তাই উমার এখনও বিবাহ হইয়া যায় নাই। তাহার বয়স আজকাল বৎসরে বৎসরে কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। কাস্তিচন্দ্রের অবস্থা অবর্ণনীয়। তলে তলে এক দিন বিনয়ের কাছে বিবাহের প্রস্তাবও তুলিয়াছিল, সে একরকম অপমান করিয়াই কাস্তিকে বিদায় করিয়া দিয়াছে। বিনয় বলিয়াছে, “তুমি না হয়ে লতা যদি পাত্ররূপে হাজির হ’ত, এখনি বোনকে ধরে দিতাম। তুমি বিয়ে ক’রে স্ত্রীকে খাওয়াবে কি? ঐ বুড়ো বাপ যে ক’দিন সেই ক’দিন ত?”

কাস্তি ভারি ক্রিচলে বাবার কাছে গিয়া বলিল, “বাবা, সংসারটা ত রসাতলে যেতে বসল, লতা কিছুই দেখে না।”

রামহরি বলিলেন, “এই যে পরীক্ষাটা হয়ে যাক, এখন কিছু ব্যস্ত আছে কি-না?”

কান্তি বলিল, “ওর ভরসা করা বৃথা, আই-এ হয়ে গেলেই বি-এ পড়তে শুরু করবে ত?”

রামহরি অতি অবুঝ মানুষ, বলিলেন, “তা আর কি করা যাবে বল, ক’টা বছর একটু কষ্ট করেই চলবে। কান্তি মুখ হাঁড়ি করিয়া চলিয়া গেল। এতদিন পর্যন্ত তলে তলে নানাপ্রকার ভাঙ্টি দিয়া উমার বিবাহ সে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে, কিন্তু চিরকালই কি পারিবে?”

লতা আই-এতেও প্রথম হইল এবং সত্যই বি-এ পড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বি-এ পরীক্ষা দিতে যখন আর মাস তিন মাত্র বাকি, সেই সময় হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটিল। তাহার জীবনে মস্ত একটা উলটুপালট হইয়া গেল। লতা দেখিল, যতই কেন-না নিজের জীবনের সব ব্যবস্থা সে করিয়া থাকুক, তাহারও উপরে এক জন অদৃশ্য দেবতা বসিয়া আছেন, তাহার বিধির উপর কথা নাই।

উমার দাদা বিনয় হঠাৎ পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার বলেন অতিরিক্ত খাটুনি এবং পুষ্টির অভাবই এ রোগের মূল। এই সময় সাবধান না হইলে, ক্রমে ক্ষয়রোগে দাঁড়ানও অসম্ভব নয়। কান্তি রোজ দুপুরে খাইয়া বাহির হইয়া যায়, বাড়ি ফেরে রাত এগারটায়। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, “বিনয়ের কাছে থাকি। ডাক্তার তাকে একটু চিনিয়ারফুল রাখতে বলেছে।”

সে-দিনও সে নিয়মমত বাহির হইয়া গেছে। লতার টেবিলে হইয়া গিয়াছে, এখন সে বাড়িতে থাকিয়া পড়ে। পড়িতে পড়িতে একবার জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিল, রোদ পড়িয়া আসিতেছে, বাবার চা খাইবার সময় হইল বোধ হয়। চেয়ার হইতে না উঠিয়া বামুন-ঠাকরণকে ডাক দিয়া বলিল, “বামুন-ঠাকরণ, চায়ের জল চড়িয়ে দাও, আর চারটি চিড়ে ভাজ।”

লতার ঘরের পাশেই কান্তির ঘর। হঠাৎ বিবর্ণ পাংশুমুখ, আর দুই চোখভরা জল লইয়া কান্তি হন্ হন্ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া দড়াম্ করিয়া নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তাহার কান্নার শব্দ এ ঘর হইতে স্পষ্ট শোনা যাইতে লাগিল।

লতা একেবারে অবাক হইয়া গেল। এ আবার কি কাণ্ড? দিন দুপুরে দাদা কাঁদিতে বসিল কেন? লতার মনে হইতে লাগিল, হঠাৎ মাঝের দশ-বারটা বৎসর তাহার জীবন হইতে মুছিয়া গিয়াছে, সে আবার বাল্যকালে ফিরিয়া গিয়াছে চক্কাহুনে কান্তিকে সামলাইয়া বেড়াইতেছে।

অনেক ঠেলাঠেলির পর ত কান্তি দরজা খুলিল। তখনও রুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। লতা জিজ্ঞাসা করিল, “কি হয়েছে কি?”

কান্তি বলিল, “ওরা চুপি চুপি উমার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে। কাল তার বিয়ে।”

লতা বলিল, “তা তোমার সঙ্গে ওর বিয়ে হবে না, তা ত জানই, নূতন কথা ত নয়? এখন কেঁদে লাভ কি? তোমাকে মেয়ে দেবে কে?”

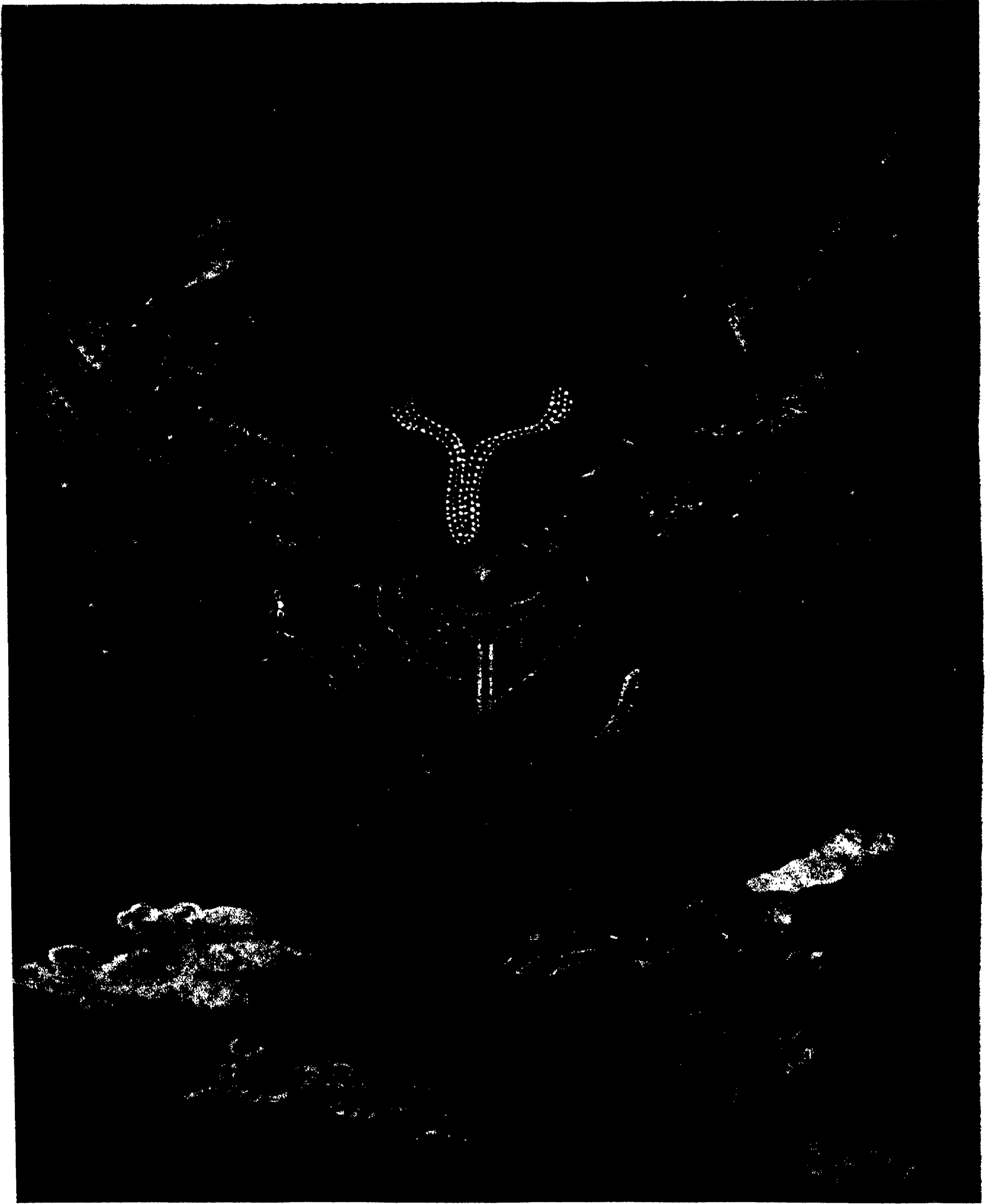
কান্তি বলিল, “উমার সঙ্গে যদি অগ্র কারো বিয়ে হয়, আমি আত্মহত্যা করে মরব। তোরা কেউ আমায় রাখতে পারবি না।”

লতা অত্যন্ত চটিয়া বলিল, “তুমি একেবারে অপদার্থ। লজ্জা করে না তোমার এই রকম “সীন” করতে? পুরুষ হয়ে জন্মে শেষে কেঁদে জিততে চাও?”

কান্তি বলিল, “তা ত তুমি বলবেই, উচ্চশিক্ষিতা মহিলা কি-না? আমার মা বেঁচে থাকলে এটা হতে দিতেন না, যতই মূর্থ হই, আমাকে তিনি বাঁচাতেনই, যেমন করে হোক। তুমি যাও আমাকে নিজের ব্যথা নিয়ে একলা থাকতে দাও।”

সে এক রকম ঠেলিয়াই লতাকে বাহির করিয়া দিল। রাগে, উত্তেজনায়, এবং খানিকটা ভয়েও লতার পা তখন কাঁপিতেছিল, কোন মতে নিজের ধরে গিয়া সে শুইয়া পড়িল। বই পড়িবার মত মনের অবস্থা আর তাহার ছিল না।

কিন্তু শুইয়াও স্থির থাকিতে পারিল না। কান্তি বয়সে লতার বড় বটে, কিন্তু তাহাকে লতা বাল্যকাল হইতে একান্ত অসহায় শিশুর মতই দেখিয়াছে এবং যথাশক্তি তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছে। মা অস্থস্থ হইয়া পড়ার পর কান্তির সকলরকম ধাক্কা সামলাইয়াছে ছোটবোন লতা, যদিও অকৃতজ্ঞ কান্তি একদিনের জন্তও তাহা স্বীকার করে নাই।



মধ্যাহ্ন-গায়ত্রী
শ্রীনরেন্দ্র মল্লিক

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা।

মাজুও তাই কাস্তিকে কাঁদিতে দেখিয়া লতা অস্থির হইয়া উঠিল, কোনোমতে তাহাকে শাস্ত করিবার জন্ত তাহার প্রাণ ছটফট করিতে লাগিল। সত্যই যদি আত্মহত্যা করিয়া বসে? অতবড় মূর্খের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। উমার উপরেও তাহার রাগ হইতে লাগিল। জানিয়া গিয়া সে দাদাকে অত আশ্চর্য দিল কেন?

স্থির থাকিতে না পারিয়া লতা উঠিয়া বাবার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, “বাবা, দাদার কাণ্ড শোন। তুমি ত কিছু দেখবে না এ-দিকে সে যে কি-না করছে!

রামহরি ভীত ভ্রমভাবে বলিলেন, “কি করেছে সে মা?”

লতা সব কথা খুলিয়া বলিল। রামহরি চিন্তিতভাবে মাথায় গত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, “তাই ত কাল বিয়ে? এর মধ্যে কিই বা করা যায়?”

লতা বলিল, “সময় থাকলেই বা কি করতে? ওরা অমন ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে কেন?”

রামহরি বলিলেন, “তা বুঝিয়ে বললে কি হয় বলা যায় না। আমার লাইফইনস্যুরেন্সের হাজার কয়েক টাকা পাওনা আছে, আর তোমার মা থাকতে দেশের সেই জমিটা কেনেছিলেন। এর ভিতর কিছু টাকা তোমার জন্তে—”

লতা বাধা দিয়া বলিল, “আমার জন্তে তোমার কিছু রাখতে হবে না বাবা, আমি ক’রে খেতে পারব। যা আছে সব দিয়েও তোমার হাবা ছেলেকে বাঁচাতে পার ত দেখ।”

রামহরি বলিলেন, “তা হ’লে আমি যাব না-কি একবার বিনয়ের কাছে?”

লতা একটু খামিয়া বলিল, “তিনি ত বড় অসুস্থ, উমার মায়ের কাছে বলতে পারলে হয়। চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

লতা প্রস্তুত হইবার জন্ত উপরে ছুটিল। দাদার ঘরের দরজায় একটা ধাক্কা দিয়া বলিয়া গেল, “আমরা উমাদের ওখানে যাচ্ছি, একটু ঠাণ্ডা হও।”

উমার মা তাহাদের দেখিয়াই মুখ গম্ভীর করিলেন। রামহরি বিনয়ের কাছে গিয়া বসিলেন। লতা বলিল, “আপনি দোজবরে পাত্রে দিচ্ছেন ত, সেও খুব ভাল নয়; না হয় দাদার সঙ্গেই দিন। তার অন্ততঃ বয়স কম, আর কোনো ঝগড়া নেই। খাবার পরবার মত ব্যবস্থা হয়েই যাবে।

উমার মা বলিলেন, ‘কি ব্যবস্থা? ছেলে কি কোনো দিনও কিছু রোজগার করবে?’

লতা বলিল, “তা হয়ত করবে না, কিন্তু বাবার জমিজমা টাকাকড়ি কিছু আছে, তাতে সাধারণভাবে একটা সংসার চলতে পারবে।”

উমার মা খানিক চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন,—“তবে বাচ্চা আসল কথা বলি, মেয়েকে শুধু খাওয়ালে ত হবে না, আমাদের সকলেরই একরকম ভার নিতে হবে। আমার বিনয়ের যদি ভগবান স্বাস্থ্য ভাল রাখতেন তা হ’লে কি আর উমাকে আমি বুড়ো বয়ে দিই? অমন সুন্দর মেয়ে আমার। কাস্তির সঙ্গে বেশ মানাত, কিন্তু যেমন অদৃষ্ট। এ পাত্রের কিছু টাকাকড়ি আছে, তাই ভরসা আমাদের ফেলবে না।”

লতা গম্ভীর হইয়া গেল। খানিক বাদে জিজ্ঞাসা করিল, “উমা কই?”

উমার মা বলিলেন, “ছাদে আছে বুঝি।”

লতা ধীরে ধীরে ছাদে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবা মাত্রই উমা মুখে আঁচল গু জিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

লতা একটুক্ষণ তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, “তোমরা আছ ভাল। কাঁদলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আমার কোনো দিন কাঁদবারও সুবিধে হ’ল না।” বলিয়া আবার নীচে নামিয়া গেল।

উমার মা তাহাকে নামিতে দেখিয়া বলিলেন, “উমি নেই ছাদে? তবে গেল কোথা, এই সন্ধ্যা বেলা?”

লতা বলিল, “উপরেই আছে, ব’সে ব’সে কাঁদছে।”

উমার মা গ্লানমুখে বলিলেন, “কি আর করব মা, পোড়া অদেষ্ট।”

লতা বলিল, “দেখুন, এক কাজ করলে হয়, আপনি যদি রাজী হন। তা হ’লে সকলেরই সুবিধে হয়।”

উমার মা ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি?”

“আপনি যদি উমাকে আমাদের বাড়িতে দেন, আর আমাকে ঘরে নেন। বি-এতেও আমি ফাষ্টই হব। টাকাকড়ির দুর্ভাবনা আপনাকে আর কিছু ভাবতে হবে না।”

উমার মা তাহার দিকে ইঁা করিয়া চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, “সে ভাগ্যি কি আর

আমার হবে? আমার রোগা ছেলে। তোমার বাবা রাজী হবেন কেন?”

লতার মুখখানা একটু লাল হইয়া উঠিল, বলিল, “তা তিনি রাজী হবেন।”

এমন সময় উমা ছুটিয়া আসিয়া লতাকে টানিয়া লইয়া গেল।

এক দিনেই এক জোড়া বিবাহ হইয়া গেল। বাসর ঘরে লতার কানের কাছে মুখ লইয়া উমা ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া বলিল, “আচ্ছা ধিক্বী তুই, নিজেই নিজের বিয়ের সম্বন্ধ করলি।”

লতাও তেমনিভাবে বলিল—“তা তোমার বরটি যে পৌরাণিক রাজনন্দিনীর মত “হা হতোস্মি” বলে গড়িয়ে গেলেন, কাজেই আমাকেই নায়করূপে অবতীর্ণ হতে হ’ল।”

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীসত্যপ্রিয় বসু

আজকাল বেকার-সমস্যার দিনে যুবকেরা ক্রমেই হতাশ হইয়া পড়িতেছেন। আমি এক কৃত্তী পুরুষের জীবনের প্রতি যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তিনি অতি সামান্য অবস্থা হইতে নিজ অধাবসায় ও কশ্মশক্তির বলে উন্নতি লাভ করিয়া বাঙালীর গৌরবস্থল হইয়াছেন।

রাজেন্দ্রনাথ ১৮৫৪ সনে ভাবলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, তাঁহার মাতাই তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। তিনি খুব মেহশীল ও তেজস্বিনী রমণী ছিলেন। রাজেন্দ্রনাথ পরে যে-সব গুণাবলীর জন্ম যশ ও কৃতিত্ব লাভ করেন, তাহা বাল্যকালে মাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যখন রাজেন্দ্রনাথ এগার-বার বৎসরের বালক তখন তাঁহার মাতা নিজের স্বল্প পুঁজি ভাঙিয়া পুত্রকে উচ্চ শিক্ষার্থ হৃদয় আগ্রায় কোন আত্মীয়ের নিকট প্রেরণ করেন; কিন্তু রাজেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলে পুত্রের অভাব এত অনুভব করেন যে, অনেক দিন পর্যন্ত তিনি পীড়িত থাকেন। তথাপি পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও উচ্চ শিক্ষার যাহাতে কোনও ব্যাঘাত না হয়, এজন্য নিজের স্বখ-স্ববিধার প্রতি কখনও দৃষ্টিপাত করেন নাই।

রাজেন্দ্রনাথও অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। একবার যখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্ম প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন তাঁহার আত্মীয়স্বজনরা মাতার অসুস্থতার খবর দিয়া একটি তার পাঠান। তিনি এই সংবাদ পাইয়া অতি দুঃখিত মনে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন এবং আসিয়া দেখেন, মাতার অসুস্থতার কথা সত্য নহে; তাঁহার বিবাহ স্থির হইয়াছে। পাছে তিনি না আসেন, সেজন্য এই মিথ্যা সংবাদ পাঠান হইয়াছিল; কেন-না, তাঁহারা জানিতেন মাতার অসুস্থতার সংবাদ শুনিলে তিনি স্থির থাকিতে পারিবেন না। তখনকার প্রচলিত রীতি অনুসারে অতি অল্পবয়সে তাঁহার বিবাহ হয়।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি কলিকাতায়

প্রেসিডেন্সী কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসে ভর্তি হন। কিন্তু এ-সময় এমন ভীষণ রোগে আক্রান্ত হন যে, তাঁহার জীবন-সংশয় হইয়া পড়ে। পারিবারিক অবস্থাও এরকম যে আর্থিক সাহায্যের নিতান্ত প্রয়োজন হয়। স্মৃতরাং কাজের চেষ্টায় তাঁহাকে বাহির হইতে হইল। শেষ পরীক্ষা দিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি চিরকাল দুঃখ অনুভব করিয়াছেন এবং পরে যখন তাঁহার অবস্থার উন্নতি হয় তখন বহু ছাত্রকে আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন। বহু অর্থব্যয়ে নিজগ্রামে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও একটি বালিক-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন এবং যাহাতে তাঁহার অবর্তমানে অর্থাভাবে বিদ্যালয়ের কোন ক্ষতি না হয় সেজন্য ট্রাস্টিদের হাতে বহু টাকার কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া দিয়াছেন।

কালকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান। তিনি বহুকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির সভ্য আছেন এবং শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের উন্নতির জন্ম যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সর্বোচ্চ অনারারি ডি-এসসি উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন। আর একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। সেটি বঙ্গীয় অন্তর্গত জাতিসমূহের উন্নতি-বিধায়ক সমিতি (Society for the Improvement of the Backward Classes)। আজকাল অন্তর্গত জাতির প্রতিলোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে, কিন্তু যাহারা খবর রাখেন তাঁহারা জানেন যে, এই প্রতিষ্ঠানটি প্রায় পঁচিশ বৎসর কয়েকটি নীরব কশ্মীর সাহায্যে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্ম যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ শুধু অর্থসাহায্য করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ইহার সভাপতিরূপে ইহাকে দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে পরিশ্রম করিয়াছেন। ইহার সাফল্যের মূলে ইহার বহু যত্ন নিহিত আছে। এই সমিতির তত্ত্বাবধানে প্রায় ৪৫০টি বিদ্যালয়ে অন্যান্য ১৭০০০ বালকবালিকা শিক্ষা পায়। রাজেন্দ্রনাথের সাফল্যের কারণ নির্দেশ করিতে গেলে

দেখা যায় কয়েকটি গুণের অপূর্ব সমাবেশ। এইরূপ দৃষ্টিপ্রতিভা উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অক্লান্তকর্মী, কষ্টসহিষ্ণু ভাগ্যবান পুরুষ খুব কমই দেখা যায়। তাঁহার জীবনচরিত-লেখক শ্রীযুক্ত মহীন্দ্র তাঁহার পুস্তকে একস্থানে লিখিয়াছেন যে, তিনি যখন পলতা জলকলে কাজ আরম্ভ করেন, তখন দিনে তের-চৌদ্দ ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম করিতেন। মস্তকের সাধন কিংবা শরীর পতন ইহাই তাঁহার জীবনের মঙ্গলমন্ত্র।

তিনি জীবনের প্রারম্ভে দুঃখকষ্ট ও অর্থক্লান্ততার ভিতর কাহারও অধীনতা স্বীকার করিবেন না বলিয়া যে-প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আজও জীবন-সাম্রাজ্যে সে-প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

যখন তিনি মাটিন কোম্পানীতে অংশীদাররূপে প্রবেশ করেন, তখন মাটিন কোম্পানীর অগ্রতম অংশীদার শ্রী একুইন মাটিনের সহিত এই চুক্তি করেন যে, সমান অংশীদার রূপেই তিনি আসিতে রাজী, নতুবা নহে। সেই সময় তিনি ইউরোপীয় কর্মক্ষেত্র ক্লাইভ ষ্টেটে অপরিচিত ছিলেন।

যদিও তিনি জানিতেন যে, মাটিন কোম্পানীতে প্রবেশ না করিলে তাহার বহু আর্থিক ক্ষতি হইবে এবং ব্যাপকভাবে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার অপূর্ব সুযোগ হারাইবেন তথাপি তিনি নিজের আদর্শচ্যুত হইলেন না। শ্রম একুইন মাটিন রাজেন্দ্রনাথের গুণাবলীর পরিচয় পাইয়াছিলেন, সুতরাং তাহাকে সমান অংশীদার রূপেই গ্রহণ করিলেন, তাহারই সাহায্যে তিনি এলাহাবাদ, লক্ষ্মৌ, পাটনা ইত্যাদি শহরে জলকলের কণ্টাক্তি পান ও তাহা সূচাক্রমে সম্পন্ন করেন। কোন কাজে হাত দিলে তাহা সুন্দররূপে সম্পন্ন করাই তাহার বিশেষত্ব। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে মাটিন কোম্পানীর ইমারতসকল নির্মাণ প্রণালীতে তাহার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়। কলিকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তাঁহার নির্মাণশক্তির অপূর্ব নিদর্শন। যদিও ইহার পরিকল্পনা বিলাতের প্রসিদ্ধ স্থপতি শ্রী উইলিয়াম এয়ারসন প্রস্তুত করেন, তথাপি রাজেন্দ্রনাথের পরামর্শ অনুসারে মূল নক্সা তিনি অনেক পরিবর্তন করেন। যদি রাজেন্দ্রনাথের পরামর্শ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হইত,

তাহা হইলে পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে সবটাই শেষ করা যাইত। ভিত্তি অত্যধিক ভারাক্রান্ত হওয়ায় কয়েকটি মিনারেট বসান হয় নাই।

কলিকাতার উপকণ্ঠে ও অন্যান্য স্থানে তিনি লাইট



শ্রম রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রেলপথে স্থাপন করিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের অনেক অসুবিধা দূর করিয়াছেন। জলকল বা বেলপথে নির্মাণ অথবা এলাহাবাদ, লক্ষ্মৌ, বেনারস, জব্বলপুর, ইত্যাদি স্থানে বৈদ্যুতিক কাথানা স্থাপন প্রভৃতি জনহিতকর কায়ে তাঁহার নৈপুণ্য নিয়োগ করিয়াছেন।

আগ্রা জলকল প্রস্তুত করিবার জন্য টেণ্ডার বাহির হইলে রাজেন্দ্রনাথ যে দর দেন তাহা অন্যান্য কোম্পানী হইতে অনেক কম হইলেও, তিনি দেশী লোক তরুণ বাঙালী এই

অজুহাতে সেই অর্ডার পান নাই। এই সম্পর্কে তিনি তখনকার একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের সহিত বিশেষ পরিচিত হন এবং এলাহাবাদ জলকল প্রস্তুত করিবার স্কীম ঠিক হইলে, তিনি রাজেন্দ্রনাথকে কোন ইউরোপীয় কোম্পানীর নামে কোটেশন পাঠাইতে পরামর্শ দেন। এই সূত্রেই তিনি স্যর একুইন মার্টিনের সহিত মিলিত হইয়া মার্টিন কোম্পানী স্থাপন করেন। টেওয়ার খুলিবার দুই-তিন দিন আগে তিনি ও একুইন মার্টিন এলাহাবাদ গমন করেন এবং পারিপার্শ্বিক সমস্ত অবস্থার খোঁজ করিয়া টেওয়ার দাখিল করেন। টেওয়ার খুলিবার দিন সকালবেলা দেখা গেল, যে-বাস্তে টেওয়ার ছিল, তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। বহু অনুসন্ধানের ফলেও তাহার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। টেওয়ার খুলিবার মাত্র দুই ঘণ্টা বাকী। দুই জনে সেই একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে সঙ্গে লইয়া ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলায় যান এবং বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত সময় চাহিয়া লন। নূতন টেওয়ার-পত্র লইয়া দু-জনে হোটেলের ফিরিয়া আসেন এবং বহু পরিশ্রমে দুই জনে মিলিয়া পাঁচ ঘণ্টার ভিতর আবার টেওয়ার-পত্র সম্পূর্ণ করেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যদিও চার-পাঁচ লক্ষ টাকার কাজের টেওয়ার, তথাপি তাঁহাদের পূর্ব টেওয়ারে যে দর খরিয়াছিলেন এটাতে তাহায় চেয়ে অতি সামান্য তফাৎ হয় এবং টেওয়ার খুলিলে দেখা গেল যে, তাঁহাদের টেওয়ারই সর্বনিম্ন এবং তাঁহারা সেই কাজ পাইলেন। কোন বোম্বাইওয়ালার উপর সন্দেহ হয়, কিন্তু কে যে সেই বাস্ত চুরি করিয়াছিল তাহা আজ পর্যন্ত জানা যায় নাই।

শ্রর প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেন যে, বাঙালীর ব্যবসার অবনতির অন্ততম কারণ, পাকা ব্যবসায়ীরা মুনাফার টাকা হয় কোম্পানীর কাগজ, না-হয় জমিদারী ক্রয়ে খাটান, কিন্তু রাজেন্দ্রনাথ সশ্রদ্ধে এ-কথা বলা চলে না। তিনি আজীবন যে-প্রতিষ্ঠানটি স্বহস্তে গড়িয়া তুলিয়াছেন, সেইটি যাহাতে উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে পারে এবং তাহার উন্নতিসাধন হইতে পারে সেই চেষ্টাতেই ব্যাপৃত আছেন।

কিছুদিন হইল তিনি বার্ন কোম্পানীর সুপ্রসিদ্ধ লৌহ কারখানা ক্রয় করিয়াছেন এবং তাহার সুযোগ্য পুত্র বীরেন্দ্রনাথকে তাহা চলাইবার ভার দিয়াছেন।

অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, কেন তিনি রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগদান করেন না। তাহার কারণ, যাহাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি হইতে পারে, তাহাতে তিনি যোগদান করিতে চান না; কেন-না, তিনি মনে করেন ব্যবসা-বাণিজ্যের ভিতর দিয়াই দেশের ও দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে পারেন। তাই যখন বাংলার মন্ত্রীত্ব গ্রহণের ডাক আসিল, বা গোলটেবিলের বৈঠকে যোগদানের নিমন্ত্রণ আসিল, তিনি তাহা গ্রহণে অসম্মত হইলেন।

লোক চিনিবার ক্ষমতা, ব্যবসায়ের সততা, তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি,

অধিকন্তু কর্মচারীদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ মিষ্ট ব্যবহার তাঁহার উন্নতির অন্ততম কারণ। গত বৎসর তাঁহার অষ্টতম জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহার কর্মচারীরা তাঁহাকে একটি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন, উত্তরে তিনি তাঁহার কারবারের কর্মচারীদের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ও প্রীতির সশ্রদ্ধে উল্লেখ করেন। তাঁহার একথা বর্ণে বর্ণে সত্য। একবার কোন একটি জরুরী কার্যোপলক্ষে তিনি আমাকে জলপাইগুড়ি পাঠান এবং ফিরিয়া আসিলে প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন আমার থাকিবার বা খাইবার কোন অসুবিধা হয় নাই ত। তারপর কাজের কথা জিজ্ঞাসা করেন। কেন তিনি তাঁহার কর্মচারীদের শ্রদ্ধাভক্তি ভালবাসা পান, তাহা এই সামান্য ঘটনা হইতে বুঝা যায়।

বাল্যকালে তিনি একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে মানুষ হইয়াছিলেন এবং এখনও একান্নবর্তী পরিবারের কর্তারূপে বাস করিতেছেন। সব জিনিষেই ভালমন্দের সংমিশ্রণ বিদ্যমান। একান্নবর্তী পরিবারেও সুখে বাস করা যায় যদি পরিবারের সকলে স্বার্থপর না হন। রাজেন্দ্রনাথের পত্নী লেডী যাহুমণি মুখার্জী হিন্দু স্ত্রী ও মাতার কর্তব্য সূচাক্রমে সম্পন্ন করিতেছেন এবং তাঁহার সাহায্য ব্যতিরেকে শ্রর রাজেন্দ্রনাথ এই উন্নতির শিখরে আরোহণ করিতে পারিতেন কি-না সন্দেহ।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা বিদ্যমান। এক সময় এই সমাজ দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হইলেও তিনি দীক্ষিত হন নাই এবং প্রচলিত হিন্দুধর্ম অনুসারেই ছেলে-মেয়েদের বিবাহ দিয়াছেন।

কলিকাতার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট আছেন। বাঙালীদের স্বাস্থ্যানুতির প্রতি তাঁহার চেষ্টায় ও যত্নের কথা কাহারও অবিদিত নাই। বয়স্কাউট, অলিম্পিক এসোসিয়েশন্, মোহনবাগান ক্লাব, আহিরীটোলা ক্লাব, স্পোর্ট ইউনিয়ন ক্লাব ইত্যাদি বহু ক্লাব তাঁহার সাহায্য লাভ করিয়াছে।

কলিকাতা গ্রামবাজারে একটি অতি পুরাতন অনাথ আশ্রম আছে। প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ রাজেন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানটিকে বহু যত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। অল্পদিন হইল ইহার অধিবাসীদের জন্ম একটি হাসপাতাল খোলা হয়। ডাক্তাররা তাঁহার অসুস্থতার জন্ম সিঁড়ি দিয়া উঠা-নামা বারণ করা সত্ত্বেও তিনি উপরে না উঠিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, পাছে অনাথ বালক বালিকাদিগের জন্ম সুবন্দোবস্ত না হয়। এখানে যে-সব অনাথা বালিকাদিগকে পালন করা হয় তাহাদের কয়েক জনের উপযুক্ত পাত্রের সহিত গুজরাটে বিবাহ হয়। অল্প কোন একটি প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের প্রতি ভাল ব্যবহার হয় নাই এবং নানা রূপ গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে শুনিয়া

তিনি এই প্রতিষ্ঠানের একটি কর্মচারীকে স্বদূর গুজরাটে প্রেরণ করেন ও প্রত্যেকটি মেয়ের প্রতি ভাল ব্যবহার হইতেছে কি-না এবং তাহারা সুখে আছে কি-না ইহা জানিয়া আসিবার আদেশ দেন। তাহারা সাদরে পরিবারে গৃহীত হইয়াছে এবং আনন্দে ঘরসংসার করিতেছে এই সংবাদ পাইয়া তবে তিনি নিশ্চিন্ত হন।

রাজেন্দ্রনাথ বাঙালীর কর্মপ্রচেষ্টাকে একটি নতুন ধারা দিয়াছেন। নিজের জীবন দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, অতি

সামান্য অবস্থা হইতেও চরিত্রবলে অদ্ভুত কর্মশক্তি দ্বারা উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করা যায়।

তিনি জীবনে অনেক অর্থ উপার্জন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা হইতেও একটি বড় জিনিষ অর্জন করিয়াছেন, দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। পরামুখাপেক্ষী হইয়া গবর্নমেন্টের চাকুরির জগ্ন বসিয়া থাকিলে আর চলিবে না। স্বাধীন ব্যবসা ও কর্মশক্তি দ্বারা বাঙালীকে আবার বড় হইতে হইবে।

মুক্তি

শ্রীআশালতা দেবী

পূর্বানুবৃত্তি:—নির্মলার বাবা চন্দ্রনাথ বাবু আজকালকার অনেক উচ্চশিক্ষিত স্বাধীনচিন্তাশীলের মত আচারব্যবহার এবং চালচলনে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। যদিচ প্রকাশ্যে কোন্‌দিন দীক্ষা লন নাই। তাহার স্ত্রী পল্লীগ্রামের মেয়ে, অল্পবয়সে বিবাহ হইয়াছিল। স্বামী এবং স্ত্রীর ভাবনা, বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার মাঝে ছিল আকাশপাতাল ব্যবধান। সেটা যে কেবল চন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরক্তির কারণ তাহাই নয়। তিনি ছিলেন স্বভাবতঃই জ্ঞানলোকের মানুষ। সংসারের প্রয়োজন এবং তাগিদের চাপে তাহার প্রকৃতিকে খর্ব করিয়া চলা—এ তাহার ধাত্তে আদৌ সঙ্গিত না। বস্তুতঃ আইডিয়া এবং আইডিয়ার জগতে পুরুষ যেমন চিরনিঃসঙ্গ, তিনিও ছিলেন তাহাই। তা এজন্য তাহার স্ত্রীর কোন রোগ ক্ষোভ ছিল না; যদিবা ছিল বাহিরে প্রকাশ পাইত না। তিনি পল্লীগ্রামের মেয়ে, জীবনের সমস্ত অভাব অপূর্ণতাকেই নিয়তির মত মানিয়া লইতে শিখিয়াছিলেন। এমনি করিয়া একধারে তাহার স্ত্রী সশীলা ছেলেপুলে ঘরসংসার লইয়া নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন, অন্যধারে চন্দ্রকান্ত ভাবরাজ্যের নেশায় ভরপুর হইয়া থাকিতেন। এমনি করিয়া অনেক দিন কাটিয়াছিল। কিন্তু চন্দ্রকান্তের নবচেয়ে ছোট মেয়ে নির্মলা যখন হইতে হইয়াছে, তখন হইতে প্রকৃতিতে তাহার পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। উদাসীন পুরুষের যে দিকটা ছিল শুষ্ক, স্নেহাতুর, অনেকদিন পরে আজ তাহাই এই গুজ্র সুন্দর সুকুমার শিশু-কন্যাটিকে কেন্দ্র করিয়া বিমথিত হইয়া উঠিল। চন্দ্রকান্ত নির্মলাকে শিশুকাল হইতে শিক্ষায় দীক্ষায় সর্বতোভাবে নিজেকে দিয়া বেঞ্ছন করিয়া ধরিলেন। এমনি করিয়া নির্মলা ক্রমে সতের বৎসরের হইয়াছে, এখন সে বেঞ্ছন কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে, কিন্তু কেবলমাত্র পিতার ন্যূন এবং সাহচর্য্যে আশৈশব অভ্যস্ত হওয়ার ফলে তাহার প্রকৃতিতে রহিয়া গেছে একটা অপূর্ণতা। নবযৌবনের প্রত্যন্তপ্রদেশে পা দিলে তরুণীর মনে যে-সকল কথা যেমন করিয়া উদয় হয়, মনে যেটুকু ভাবের নায়া, যেটুকু আবেশ বাষ্পসঞ্চিত হইতে থাকে নির্মলার তাহা হয় নাই। বরঞ্চ অবিশ্রান্ত চন্দ্রকান্তের মত পিতার সম্পর্কে থাকিয়া জ্ঞানের এবং

মননশীলতার একটা আভাস তাহার চরিত্রে লাগিয়াছিল এক তাই তাহার প্রকৃতিতে একটা অনাসক্তির ভাব ছিল, যাহা ঠিক স্ত্রী-সুভ নয়।

এমনি করিয়া বাকী সংসারের প্রতি উদাসীন থাকিয়াও পিতা এবং কন্যার মাঝে একটি সুমধুর স্নেহসম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। একদিন কলেজ ঘাইবার আগে চন্দ্রকান্তের ঘরে যামিনীর সঙ্গে নির্মলার একটুখানি আলাপের মত এবং সামান্য দুই চারিটা কথা হইল। হয়ত তাহার মধ্যে বৈশিষ্ট্য কিছুই ছিল না। যামিনীর মত এমন কত ছাত্র কত লোকই তাহার বাহিরের ঘরে তাহার সহিত বিখবাপারের যাবতীয় বস্তু লইয়া তর্ক করিতে আসিত এবং সকলের সহিতই নির্মলাকে তিনি পরিচয় করিয়া দিতেন।

৪

নির্মলা বাবার কাছে রাজ্যের বই পড়িয়াছে। নব্য রাশিয়ার অসমসাহসিক উদ্যম হইতে সুরু করিয়া বার্গসোঁ এবং সোপেনহাওয়ারের দার্শনিক মতামত পর্যন্ত সমস্ত বিষয়েই সে কিছু কিছু জানে। কিন্তু আশৈশব বাবার কাছে মানুষ হইয়া তাহার এমন স্বভাব হইয়া গিয়াছিল, যে, বইয়ের আলমারীতে ঠাসা তাহাদের এই বাইরের ঘরের বাহিরে যে আর একটা জগৎ আছে, যে-জগতে সমস্তই ন্যায়শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে চলে না এবং যেখানে সুখদুঃখ কামনা-আকর্ষণের ঘাত-প্রতিঘাত অহরহ চলিতেছে, তাহা সে অনুভবই করিত না। সে জগৎ হইতে সে অনেকটাই বাহিরে রহিয়া গিয়াছিল। নির্মলাদের সংসারের এই বাহিরের ঘরটিতে সংসারের ভাবনা-চিন্তা দুঃখ-

দৈন্য কিছুই প্রবেশ-পথ পায় নাই। এখানে চন্দ্রকান্তবাবু বন্ধুদের সঙ্গে বসিয়া সাহিত্যের সীমা এবং দর্শন ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ লইয়া তর্ক করিতেন, গোপুলী বেলার আলোতে নির্মলা সেতার বাজাইত; এবং দীপালোকিত এই ঘরেই সে শুক হইয়া বসিয়া বই পড়িত। এইখানেই জ্ঞানের অপরিমিত মুক্তির মধ্যে এবং সাংসারিক চিন্তাবিরহিত বিশুদ্ধ আর্টের আলোচনায় সে তাহার সমস্ত দিনরাত্রি কাটাইয়াছে। সুশীলা যেখানে সংসারের খরচ বাঁচাইবার জন্ত গুঁড়া কয়লার সহিত মাটি মাখাইয়া গুলু প্রস্তুত করিতেন, নিজের হাতে গরুর জন্ত ছানি কাটিতেন, যেখানে তাঁহার সেজ্ঞভাইটি আই-এ পরীক্ষায় বৃত্তি না পাইয়া কলেজ হইতে আসিয়াই এক পেয়লা চা খাইয়া গৃহশিক্ষকতা করিতে ছুটিত—সংসারের সেই নীচের তলার সহিত তাহার বিশেষ জানাশোনা ছিল না। তাহার সপ্তদশ বর্ষের জীবনে সে কখনও বাংলা বা ইংরেজী নভেল পড়ে নাই, লুকাইয়া আড়ি পাতে নাই, পান চিবাইতে চিবাইতে কিংবা চকোলেট চুষিতে চুষিতে সমবয়স্কাদের সহিত সরস আলোচনা করে নাই। এখনও তাহার তরুণ জীবনের মধ্যে সে আত্মনিমগ্ন, একা। চন্দ্রনাথ এককালে কলিকাতার কোন বে-সরকারী কলেজে বছর দুই-তিন অধ্যাপনা করেন, তাহার পরে কি জানি কেন তাহা হঠাৎ ছাড়িয়া দেন। কিন্তু সেই হইতেই কলেজের ছেলেদের প্রতি, ধীমান্ চিন্তাশীল অল্পবয়সী ছেলেমাত্রের প্রতিই তাঁহার একটা আকর্ষণ থাকিয়া গিয়াছে। পথেঘাটে ট্রামে বইয়ের দোকানে সামান্য দু-চার ঘণ্টার আলাপীকেও তিনি সাগ্রহে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাহার সহিত হাসিয়া অজস্র বকিয়া তর্ক করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার অন্তরঙ্গ হইয়া উঠেন।

যামিনী অল্প কয়েক দিন হইতে এখানে আসিতেছে, কিন্তু ইহারই মধ্যে তাহার আর আসা-যাওয়ার কোন আইন-কানুন নাই। তাহা সময় হইতে অসময়ে গিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। রাত্রি দশটা অবধি সে চন্দ্রকান্তের সঙ্গে বসিয়া তর্ক করে, সকালের দিকে কখনও কখনও বেলা বারটাও হইয়া যায়। সে যে কেবল হোয়াইটহেডের নৃতন বই এবং হিটলারের প্ল্যান আর বলশেভিজমের মূল ধারাটা লইয়াই তর্কালোচনা করিতে এত উৎসাহ দেখায়—তাহা ত মনে হয় না।

কিন্তু নির্মলা তাহাকে লক্ষ্যও করে নাই। চন্দ্রকান্তের সহিত যামিনী নানা বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে মাঝে মাঝে যখন বিমনা হইয়া যাইত তখন নির্মলা বাবার পাশে প্রায়ই উপস্থিত থাকিত বটে; কিন্তু চিরকালের অভ্যাসমত চুপ করিয়া শোনা ছাড়া আর কোন কথা তাহার মনেও আসিত না। বস্তুতঃ সাধারণ মেয়েদের চেয়ে অগুরুত্ব ভাবে মানুষ হওয়ার জন্ত নির্মলার কোন কোন হৃদয়বৃত্তি একেবারে অপরিণত ছিল। তাহার বাবা এই বয়স হইতে জ্ঞানের প্রতি, গভীর চিন্তার প্রতি তাহার মনে এমন একটা আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন, যে, নিজের বয়সের সঙ্গিনীদের সঙ্গে থাকিলেও স্বভাবতঃই সে থাকিত একা। তাহারা যখন শাড়ী, গয়না, নতন উপন্যাস এবং মুখরোচক পরচর্চা লইয়া পরম উৎসাহে মাতিয়া উঠিত, তখন সে-সব হইতে মন তাহার বিতরণ্য সরিয়া আসিত।

যেদিন নির্মলা জন্মিয়াছিল সেই দিন হইতেই চন্দ্রনাথ তাঁহার নেয়ের জীবনকে এমন আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন, যে, তাঁহাকে বাদ দিয়া অপর কোনখানে তাঁহার কণ্ঠার জীবনের যে কোন অর্থ থাকিতে পারে এ কথাটাই যেন তাঁহার মনে আসিত না। নির্মলাও তেমনি করিয়া ভাবিতে শিখিয়াছিল এবং সেইজন্তই শিশুকাল হইতেই বাবা ছাড়া আর কাহাকেও সাথী বলিয়া ভাবিতে পারে নাই। তাই সমবয়সী সখী এবং সঙ্গিনীদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া হাসিকৌতুক ঠাট্টা মান-অভিমান এই সকল জড়াইয়া তরুণ বয়সে মনের উপর রহস্যবিজড়িত যে একটি সুমধুর ভাবের ছায়াপাত হয়, নির্মলার তাহা হইতে পায় নাই। তাহার কুমারী-জীবনের সু-উচ্চ গিরিশিখরে কেবল অপরিমেয় শুক তুষারের কঠিনতা এবং বর্ণহীন শুভ্রতা। তাহার চোখের চাওয়ায় এখনও যেন কোন বেদনার ঘোর লাগে নাই, মুখের উপর তরুণকালের ভাবমুগ্ধতার বিশেষ কোন চিহ্ন নাই। সে সহজ সরল স্বচ্ছ।

কিন্তু সেই নীরব সৌন্দর্য্য দেখিয়াই আর একজন পলে পলে মুগ্ধ হইতেছিল। চন্দ্রকান্তের সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিবার ইচ্ছা যামিনীর দিন দিন কেন যে এত প্রবল হইয়া উঠিতেছে, কেন যে এ বাড়িতে চুকিলে নিজেকে স্থির করিয়া

রাখা তাহার পক্ষে এত কঠিন হইয়া উঠে, একটা কথা বলিতে বলিতে সে এমন অশ্রুমনস্ক হইয়া যায়, হঠাৎ সমস্ত মন এত উতলা হইয়া উঠে যে, প্রাণপণ বলে আপনাকে সংবরণ করিতে হয়, এ-সকল কথার উত্তর দেওয়া কঠিন।

৫

সেদিন সকাল হইতে বাদলা করিয়াছিল। মেঘলা খোলাটে আকাশ, শীতের তীক্ষ্ণ বায়ু। মাঝে মাঝে টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। বাহিরের আবহাওয়ার জগ্ন ভিতরটাও ভারাক্রান্ত হইয়াছিল। পাঁচটা বাজিতে না বাজিতেই ইলেকট্রিক আলো জ্বলাইয়া কাচের শাসি বন্ধ করিয়া চন্দ্রকান্ত বিকালবেলাকার দ্বিতীয় পেয়ালা চা খাইতে খাইতে কহিলেন, “নির্মলা, একটা গান কর তো, মা।”

বাজনার ডালা খুলিয়া নির্মলা গান করিতেছিল, এমন সময় বন্ধ দরজার শাসিতে কে টোকা মারিল। এমন বাদলায় কলিকাতার কদমাক্ত পথ বাহিয়া যে কেহ আসিতে পারে, চন্দ্রকান্ত কল্পনাও করেন নাই। তাই যামিনীকে দেখিয়া অতিমাত্রায় খুশী হইয়া বলিলেন, “আরে এই যে! এস যামিনী। ভাল কথা—কাল সকালে যে বইটা নিয়ে তর্ক করছিলে, সেইটে তুমি চলে যাবার পরেই খ্যাকারের দোকান থেকে কিনে আনলুম। অনেক দিন আগে এক বন্ধুর কাছে চেয়ে নিয়ে পড়েছিলাম কি-না, ঠিক মনে ছিল না। আর একবার আগাগোড়া মন দিয়ে পড়লুম। অনেক জিনিষ নতুন করে চোখে পড়লো। সে-সব আমি দাগ দিয়ে রেখেছি। দাড়াও, বার করে নিয়ে আসি পাশের ঘরের আলমারী থেকে।”

চন্দ্রকান্ত ব্যস্তমস্ত হইয়া লাইব্রেরী ঘাঁটিতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু যামিনীর বইয়ের প্রতি আদৌ মনোযোগ ছিল না। বাজনার উপর নির্মলার স্কুমার আঙুলের গতি-নীলার দিকে সে নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। বৃষ্টি পড়িতেছে, আজ আর চন্দ্রকান্ত বাবুর বাড়িতে যাইবে না এমনই স্থির করিয়া যামিনী আইনের একখানা মোটা কেতাব খুলিয়া তাহাতে মনঃসংযোগ করিতে পারে নাই, কিন্তু দৃষ্টি সংযোগ করিয়াছিল। অথচ যতই সময় বহিয়া যাইতে লাগিল, ততই চেয়ার টেবিল এবং আইনের বইসমেত এই শুষ্ক

শূন্য ঘরটা একটা বিরাট ভারের মত তাহার মনের উপর চাপিয়া বসিতে লাগিল। অবশেষে নিজের সঙ্কল্প এবং নিজের কামনার সহিত বিবাদ করিতে করিতে সে আলন হইতে বর্ষাতি কোট টানিয়া লইয়া গায়ে দিয়া চন্দ্রকান্তের বাড়ি অভিমুখেই দ্রুতপদে আসিতে সুরু করিল। বর্ষার দিনে পিচ্ছিল কদমাক্ত পথে বর্ষাতি গায়ে দিয়াও একজন যে আর এক জনের বাড়িতে কেবল মাত্র তর্ক করিতেই যায়, একখাটা আর যাগরই কাছে অবিখ্যাস্য হটক, চন্দ্রকান্তের কাছে ছিল না; কারণ তাঁহার এ-সকল কথা খেয়ালেও আসিত না।

তিনি ত পাশের ঘরে বই খুঁজিতে গেলেন, বাহিরে চাপিয়া বৃষ্টি আসিল এবং গানের সুরের মধ্যে নির্মলা তন্দ্রায় হইয়া গেল। কেবল যামিনী নিজের মনের মধ্যে সাগরের মত আবেগ চাপিয়া ধরিয়া সেই সঙ্গীতাবিষ্ট তরুণীর পানে চাহিয়া থাকিল। তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, বাজনার পর্দার উপর সুন্দর রক্তাভ যে আঙুলগুলো সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে তাহাদের চাপিয়া ধরে। এমন সময়ে চন্দ্রকান্ত বাবু পাশের ঘর হইতে ডাকিলেন, “নির্মলা, নতুন বইখান কোথায় রেখেছি খুঁজে পাচ্চিনে যে মা।” তাঁহার আহ্বানে নির্মলা বাজনা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সুর কাটিয়া গেল। গান থামিয়া গেল এবং যামিনী স্বপ্নলোক হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিল, তাহার মানসী শুভ্র সুন্দর হাত দুইখানি একত্র করিয়া তাহাকে নমস্কার করিতেছে।

সুশীলা তাঁহার বড় বৌমাকে কিছুদিনের জগ্ন এ-বাড়ি আনিয়াছেন। এ তাঁহার বছদিনের সখ। সুধাংশুর স্ত্রী প্রতিমাসুন্দরীর রং উজ্জ্বল শ্রামবণ, গড়ন মোটাসোটা। বয়স বছর পনের যোল। বয়সে নির্মলার চেয়ে বছর-খানেকের ছোটই বোধ করি। কিন্তু ইহারই মধ্যে একটি ছেলে হইয়াছে। মেয়েমানুষের জীবনে স্বামীকে হাতের মুঠোয় রাখা ছাড়া আর যে কোন লক্ষ্য থাকিতে পারে, প্রতিমা তাহা ভাবিতেও পারে না। সকালবেলায় সামান্য দুই-একটা কাজের পর স্নান সারিয়া মাথার ভিজা এলো চুলে একটা গেরো দিয়া লইয়া জলযোগের পরে প্রতিমাসুন্দরী আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া তাহার টিপের কোঁটা বাহির করিয়া

সময়ে একটি কাঁচপোকার টিপ পরিণত। টিপ পরিণত পান চিবাইতে চিবাইতে পানের রসে ঠোঁট দুইটি লাল করিয়া যখন যুধিকা-সাহিত্য-মন্দিরের একটি বই হাতে বিছানায় একটু গড়াইয়া লইবার উপক্রম করিতেছে, ঠিক তখনই জানালা হইতে দেখিল নিখুঁত হাতে খাতা বই লইয়া কলেজের জগু প্রস্তুত হইয়া বাসের অপেক্ষায় বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে। প্রাত্যহিক অবাক লাগিল। বুঝিতে পারিল না, মেয়েমানুষ হইয়া এই বয়সে এতখানি কষ্ট করিয়া লেখাপড়া শেখার প্রয়োজনটা কোন্‌খানে? বড় হইয়া আর কিছু তাহাকে জিজ্ঞাসী করিতে হইবে না। পানের বোঁটায় করিয়া একটু চূর্ণ লইয়া এই কথাটাই ভাবিতে ভাবিতে সে উপগ্রাসের প্রথম পাতাখানা খুলিয়াই একবার শেষের পাতাটা দেখিয়া লইল।

বিকালবেলায় কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া গা ধুইয়া নিখুঁত। সেই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রতিমা তাহাকে একেবারে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, “ঠাকুরঝি ভাই, আমার মাথা খাস, একটা টিপ পর।”

নিখুঁত অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এই কয়েকদিন দূর হইতে কি যেন লক্ষ্য করিয়া প্রতিমার মন ভিতরে ভিতরে রহস্যসমাকুল ও পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া সে বলিল, “অবাক হয়ে অমন ক’রে মুখের পানে চাইছিস কেন ভাই? আমি বলছি একটা টিপ পর আর একটা পান খা। অমন রাঙা দুটি ঠোঁটে পান না খেলে কি মানায়?...তাছাড়া যামিনী বাবু দেখলে কত খুশী হবেন, বল ত?”

নিখুঁত কিছুক্ষণ চূপ করিয়া থাকিল; তাহার পরে প্রতিমার দিকে চোখ তুলিয়া কহিল, “যামিনী বাবু কেন খুশী হবেন? তিনি কি আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখতে যাবেন যে, আমি টিপ পরেছি কি না-পরেছি।”

প্রতিমা অবাক হইয়া গেল। সে আশা করিয়াছিল যামিনীবাবুর নাম শুনিবামাত্র নিখুঁত লজ্জায় লাল হইয়া উঠবে, ভিতরে ভিতরে খুশী হইবে, কিন্তু উপরে কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া বলিবে, ‘যাও!’ কিন্তু তাহার ধারণার সহিত কিছুই মিলিল না। প্রতিমা অবাক হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার একটু রাগও হইল। ‘মেয়ে অনেক লেখাপড়া

শিখিয়া মনে করিয়াছেন যেন পুরুষ হইয়া গিয়াছেন’— নিখুঁতকে উদ্দেশ্য করিয়া সে মনে মনে বলিল, ‘ছাই অমন লেখাপড়ায়! যাহার একটু ঠাট্টা বুঝিবার ক্ষমতা নাই, হৃদয়ের রস জীবনের সহজ আনন্দ-কৌতুক সমস্তই বর্জন করিয়া আগাগোড়া যে ঠিক ঐ ছাপার বইয়ের মতই ঝংঝং হইয়া উঠিয়াছে, সে কেবল দশটা পাচটা কলেজই করিতে পারে, আর কিছু পারে না।’

এমন রসবোধহীন মানুষের কাছে প্রতিমা আর তাহার দুর্ভাগ্য টিপের বাস্তব খুলিতে কোন উৎসাহ বোধ করিল না। সেখান হইতে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। নিখুঁত প্রতিদিনকার মত তেতলার ছাদে বেড়াইতে বেড়াইতে ভাবিতে লাগিল, নীটশের যে বইখানা বাবা পড়িতে দিয়াছেন তাহার অনেক স্থল সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই, সেই সব জায়গাগুলো বাবাকে দিয়া বুঝাইয়া লইতে হইবে। তখন একেবারে সর্বনিম্নতলায় সংসারের খরচ বাঁচাইবার জগু তাহার মা স্নানীলা একরাশ কয়লার গুঁড়া একত্র করিয়া তাহাতে মাটি মিশাইয়া গুল প্রস্তুত করিতেছিলেন।

এমনি করিয়া নিখুঁত মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে হইয়া জন্মিয়াও মধ্যবিত্ত পরিবারের সমস্ত দুঃখ দৈন্য সঙ্কীর্ণতা অভাব অনটন হইতে একেবারে দূরে রহিল। তাহার রাজ্যে কেবল নীটশের শক্ত অধ্যায়গুলো বুঝিতে না পারার ক্ষোভ, তাহার পৃথিবীতে কেবল রবীন্দ্রনাথের পূর্ববী আর মহুয়ার কবিতাগুলির সম্পূর্ণ রস হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারার অতাপ্তি।

সে বছর পূর্ববঙ্গে বণ্ডা হইয়াছিল। বণ্ডা রিলীফ কমিটির সাহায্যের জগু কলেজের মেয়েরা নিজেদের মধ্যে কিছু ছোটখাট অভিনয় ইত্যাদি করিবে স্থির করিয়াছিল। মাসাধিক কালব্যাপী উদ্যোগ আয়োজন এবং রিহাসালের পর অবশেষে সেই বিশিষ্ট দিনটি আসিয়া পৌঁছিয়াছে। স্থির হইয়াছে ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী সভায় উপস্থিত থাকিবেন। অভিনয় অন্তে যাহাদের অভিনয় ভাল হইবে ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী তাহাদের নিজে হইতে কতকগুলি প্রাইজ্ এবং মেডেল দিবেন বলিয়াছেন।

নিখুঁত কলেজের মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল গান

করে। তাহার সেতারের হাতও মিষ্ট এবং নিপুণ। কয়েক মাস পূর্বে একজন মহিলা-অধ্যাপকের বিদায়-অভিনন্দন উপলক্ষে শেক্সপীয়রের 'মার্চেন্ট অব্ ভেনিস' হইতে সে যে আবৃত্তি করিয়াছিল, তাহার সেই আবৃত্তির নিতুল উচ্চারণ, লালিতা এবং মধুরতা সকলকেই অবাক করিয়াছিল। তাই এবারেও অভিনয়ে সে অনেক ভূমিকাতেই দেখা দিবে। শেক্সপীয়রের 'ম্যাক্বেথ' হইতে কোন কোন অংশ এবং রবীন্দ্রনাথের দুই একটি কবিতাও সে আবৃত্তি করিবে, এইরূপ ঠিক ছিল।

চন্দ্রকান্ত মেয়ের বিষয়ে সর্বদাই গল্প করেন এবং তাহার নানা বিষয়ের কুতিছে কল্পনার আরও রং চড়াইয়া লোকের কাছে বলিয়া সুখ পান। তাই তাহার কথাবার্তা হইতে নিশ্চিন্দাদের কলেজের এই সকল ব্যাপার এবং তাহাতে নিশ্চিন্দার প্রধান ভূমিকা লইবার কথা সমস্তই যামিনী জানিয়াছিল।

সোমবার সন্ধ্যা সাতটায় অভিনয় আরম্ভ। চঞ্চলা সাজঘরে ছুটাছুটি করিতেছিল, টিকিটের ঘণ্টা পড়িয়াছে। হঠাৎ এক সময় চঞ্চলা সেখান হইতে ছুটিয়া আসিয়া নিশ্চিন্দার কানে কানে কহিল, 'তোমার বাবার সঙ্গে আর একজন কে ফর্সা মত চসমা পরা এসেছেন রে? তোমার বাবার সঙ্গে তিনিও দশ টাকা আর একটা টিকিট কিনলেন। কেবল তোদের বাড়ি থেকেই আমরা কুড়ি টাকা পেলুম।'

নিশ্চিন্দা জানালার কাছে দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, 'উনি যামিনীবাবু।' তাহার স্বভাব কলেজের মেয়েরা সকলেই জানিত। এই নিদ্দিষ্ট, সংক্ষিপ্ত উত্তরের চেয়ে আর একটুখানিও তাহার কাছে আশা করা চলে না। তথাপি চঞ্চলা একটু হাসিয়া, কানের ইয়ারিংটা একবার ঠিক করিয়া লইয়া, চোখের চসমাটা খুলিয়া আবার মুছিতে মুছিতে কহিল, 'যামিনীবাবু কে রে? মানে তোমার কে হন? দাদা?'

'না।'

'তবে কে?'

এবারে চঞ্চলার চাপাহাসি অঞ্চলপ্রাস্ত দিয়া হাস্যরোধ করিবার চেষ্টা মানিল না।

'কে? ঠিক জানিনে ত। বাবার বন্ধু।'

'সংসারে কোন্ জিনিষটা তুই ঠিকমত জানিস?'

চঞ্চলা নিশ্চিন্দার বেণী ধরিয়া একটা টান দিয়া সেখান হইতে

চলিয়া গেল। কারণ আর দাঁড়াইবার সময় নাই, অভিনয় আরম্ভ হইবার তৃতীয় ঘণ্টা পড়িয়াছে।

আলো জলিল, পর্দা উঠিল। নিশ্চিন্দা প্রথম উদ্বোধন-সঙ্গীত গাহিল। বারংবার লোকের 'এনকোরে' তাহাকে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া দুই তিন বার গাহিতে হইল। দুই একটা অভিনয়ের ছোটখাট পালা শেষ হইয়া যাইবার পবে সে যখন শেক্সপীয়রের ম্যাক্বেথ হইতে আবৃত্তি করিতে লাগিল,

'To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
Creeps in this petty pace from day to day
To the last syllable of recorded time;
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death—out, out, brief candle!'

তখন তাহার সমস্ত সত্তা যেন সেই সর্বকালান্তক মরণের প্রতি ম্যাক্বেথের এই ক্লান্ত উক্তির সহিত নিজেকে এক করিয়া মিলাইয়া লইল। শেক্সপীয়রের কাব্যের এই সকল ভীষণ মধুর অংশের অনেকখানি সৌন্দর্যই সাধারণের কাছে শুধু পড়ার ভিতর দিয়া ধরা দেয় না, তাহার আবৃত্তির মধ্য দিয়া সেই সকল অনাবিকৃত সৌন্দর্যও যেন সকলের কাছে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা হইতে সে যখন বলিতে লাগিল,

'হে ভারতী, দেখেছি তোমাকে
সত্তার আন্তর্য তটে
যেখানে কালের কোলাহল
প্রতিক্রমে ডুবিছে অতলে
নিস্তরঙ্গ সেই সিদ্ধনারে
তীক্ষ্ণান করি'
রাত্রির নিকম কৃষ্ণ শিলাবেদী মূলে
এলোচুলে করিছ প্রণাম
পরিপূর্ণ সমাপ্তিরে।

তখন মনে হইতে লাগিল, এ শুধু তাহার আবৃত্তি করিয়া যাওয়া নয়। তাহার সমস্ত অস্তিত্বই যেন এই শুভ্র শাস্ত্র শেষ প্রণামের সহিত নিজেকে আনত করিয়া ধরিয়াছে।

যামিনী বসিয়া মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিল। সপ্তদশবর্ষীয়া তরুণীর অম্লান সুন্দর যৌবনাকাশে কুমারী-জীবনের নিশ্চল নীলিমা এখনও দিগন্তবিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে—কোথাও এতটুকু ভাবের বাষ্প, বেদনার মেঘ আসিয়া ছায়া ফেলে নাই। চোখের দৃষ্টি সহজ। শুভ্র স্কুমার ললাটে এখনও অনাহত প্রশান্তি। তাহার সমস্ত মনখানি যেন স্বচ্ছ দর্পণের মত, জলেধোওয়া বৃষ্টিহীন শরতের আকাশের মত। সে-মনে

কোন বাসনা-বেদনা বিকার জন্মায় নাই। তাই সে যাহাই অভিনয় করিতেছে, তাহার স্পষ্ট সত্য প্রতিক্রম নিজেই দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেছে। অভিনয় শেষ হইলে ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী তাহাকে ডাকিয়া স্মিতহাস্তে একটুখানি আলাপ করিলেন। তাঁহারই দেওয়া একরাশি বই, সোনার মেডেল ও ফুলের ভারে নির্মলা যখন বিব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার শিথিল হস্ত হইতে দুই-একটা জিনিষ স্থলিত হইয়া এদিকে-ওদিকে পড়িয়া যাইতেছিল, তখন যামিনী পিছন হইতে নিঃশব্দে আসিয়া তাহার হাত হইতে জিনিষগুলো লইয়া কহিল, “চলুন। আপনার বাবা ট্যাক্সি ঠিক করে অনেক ক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছেন।”

দ্বারাস্তরাল হইতে চঞ্চলা তাহার সঙ্গিনীর গা টিপিয়া কহিল, “দেখলি, আমি সেই কালেই বলেছিলুম, There is something... (এর ভিতর কিছু আছে...

তরলা কহিল, “কিন্তু তোরা যাই বলিস, নির্মলা যতটা সরল সাজতে চায়, আসলে ও তা নয়। ওর অনেকখানিই পোজ (টং)।”

“নিশ্চয়।”

“তা কি আর আমরাও বুঝতে পারিনে!”

“আর তোরা যাই বলিস, নির্মলার চেয়ে যুথিকার চেঁচাল আরুতি করে।”

“আমরাও তাই মনে হয়।”

“যুথিকার উচ্চারণগুলো খাঁটি ইংরেজী।”

“হবে না কেন? ওদের বাড়ির পার্টিতে সাহেব-সুবোর আসা প্রায়ই ত লেগে রয়েছে। তা ছাড়া যুথিকার দাদা ফি ইংরেজী টকিতে (সবাক ছায়াচিত্র প্রদর্শনে) ওকে নিয়ে যায়। একটাও বাদ দেয় না।”

ক্রমশঃ

পাঁচিশে বৈশাখ

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বাজা তোরা শাঁখ,

ধন্য হোক পাঁচিশে বৈশাখ।

কোন সে আদিম উষা-চক্রবাল-তলে,

অনাদি শ্রীসুন্দরের আনন্দের রসপদ্মদলে,

প্রথম সে মূর্তি নিল রূপে, গগনে অথও মহাকাল—

সৃষ্টির অনন্ত মহাসুরে খণ্ডে খণ্ডে বেঁধে দিল তাল।

সেই তালে বন্দী হ'ল তিথিরূপে আনন্দসুন্দর,

সে বন্ধন-গ্রন্থি হ'তে ঝরিল ঝঝ'র,

ব্রহ্মের মানস-মধু-ধারা।

সারা সৃষ্টি চিত্তহারী

চাহিল উন্মানে,

কোন পুণ্যক্ষেণে—

সেই মধু-ধারা

রবিরূপে হ'ল মূর্তিহারী।

হেরেছিলু তারে বিষ্ণুনাভিপদ্মদলে,

জন্মজন্মান্তর বহি কোটি মূর্তি ধরিল সে ছলে।

সৃজনের নব চন্দ্রে গানে বহি এল যুগযুগান্তর,

গ্রহ হ'তে ফিরি গ্রহান্তরে চন্দ্রে সূর্যো করিল সুন্দর।

হেরিলাম স্বর্গলোকে তারপর তমসার তীরে,

তারোপরে অকস্মাৎ কালগর্ভচিরে,

বন্ধে রবি হইল উদয়,

চিরন্তনী সৃষ্টির বিস্ময়।

বাজে তারি জয়শাঁখ,

পাঁচিশে বৈশাখ।



নন্দলাল বসু

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্পিনোজা ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁর তত্ত্ববিচারকে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় থেকে স্বতন্ত্র করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু যদি মিলিয়ে দেখা সম্ভব হয় তবে তাঁর রচনা আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। প্রথম যখনই সনাজ তাঁকে নিঃসমভাবে তাগ করেছে কিন্তু কঠিন দুঃখেও মতাকে তিনি তাগ করেননি। সমস্ত জীবন সামান্য কয় পয়সায় তাঁর দিন চলত; ক্রান্তির রাজা চতুর্দশ লুই তাঁকে মোটা অঙ্কের পেন্সন দেবার প্রস্তাব করেছিলেন, সন্ত ছিল এই যে তাঁর একটি বই রাজার নামে উৎসর্গ করতে হবে। স্পিনোজা রাজি হলেন না। তাঁর কোনো বন্ধু মৃত্যুকালে আপন সম্পত্তি তাঁকে উইল করে দেন, দ সম্পত্তি তিনি গ্রহণ না করে দাতার ভাইকে দিয়ে দেন। তিনি য তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন, আর তিনি যে মানুষ ছিলেন এ দুটোকে এক কাঠায় মিলিয়ে দেখলে তাঁর সত্য সাধনার যথার্থ স্বরূপটি পাওয়া যায়, বোঝা যায় কেবলমাত্র তार्কিক বুদ্ধি থেকে তাঁর উদ্ভব নয়। তাঁর সম্পূর্ণ স্বভাব থেকে তাঁর উপলক্ষ ও প্রকাশ।

শিল্পকলায় রসসাহিত্যে মানুষের স্বভাবের মুখে মানুষের রচনার স্বরূপ বোধ করি আরো ঘনিষ্ঠ। সব সময়ে তাদের একত্র করে দেখবার সুযোগ পাইনে। যদি পাওয়া যায় তবে তাদের কল্পের মকুতম সত্যতা সন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হোতে পারে। স্বভাব-বোধকে স্ভাবশিল্পীকে কেবল যে আমরা দেখি তাদের লেখায়, তাদের হাতের কাজে তা নয়, দেখা যায় তাদের বাহ্যিক তাদের দিনযাত্রায়, তাদের জীবনের প্রাণাত্মিক ভাষায় ও ভঙ্গিতে।

চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসুর নাম আমাদের দেশের অনেকেরই জানা আছে। নিঃসন্দেহে আপন আপন রুচি মেজাজ শিক্ষা ও প্রথাগত মভ্যান অনুসারে তাঁর ছবির বিচার অনেকে অনেক রকম করে থাকেন। এরকম ক্ষেত্রে মতের ঐক্য কখনো সত্য হোতে পারে না, স্ত্রুত প্রতিকূলতাই অনেক সময়ে শ্রেষ্ঠতার প্রমাণরূপে দাঁড়ায়। কিন্তু নকটে থেকে নানা অবস্থায় মানুষটিকে ভাল করে জানবার সুযোগ আমি পেয়েছি। এই সুযোগে যে-মানুষটি ছবি আঁকেন তাঁকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা করেছি বলেই তাঁর ছবিকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পেরেছি। এই শ্রদ্ধায় যে দৃষ্টিকে শক্তি দেয় সেই দৃষ্টি প্রত্যক্ষের ভাৱে প্রবেশ করে।

নন্দলালকে সঙ্গে করে নিয়ে একদিন চীনে জাপানে ভ্রমণ করতে গিয়েছিলুম। আমার সঙ্গে ছিলেন আমার ইংরেজ বন্ধু এলম্‌হুন্ট। তিনি বলেছিলেন, নন্দলালের সঙ্গে একটা এডুকেশন। তাঁর সেই কথাটি একেবারেই যথার্থ। নন্দলালের শিল্পদৃষ্টি অত্যন্ত খাঁটি, তাঁর বচার-শক্তি অস্বদর্শী। একদল লোক আছে আর্টকে যারা কৃত্রিম শ্রীর্গতে সীমাবদ্ধ করে দেখতে না পারলে দিশেহারা হয়ে যায়। এই রকম করে দেখা খোঁড়া মানুষের লাঠি ধরে চলার মত, একটা বাঁধা বাহু আদর্শের উপর ভর দিয়ে নিজের মিলিয়ে বিচার করা। এই রকমের যাচাই-প্রণালী মুর্জিয়ম সাজানোর কাজে

লাগে। সে জিনিষ মরে গেছে তার সীমা পাওয়া যায়, তার সমস্ত পরিচয়কে বিশেষে সংগ্রহ করা সহজ, তাই বিশেষ ছাপ মেরে তাকে কোঠায় বিভক্ত করা চলে। কিন্তু যে আর্ট অতীত ইতিহাসের স্মৃতিভাণ্ডারের নিশ্চল পদার্থ নয়, সজীব বর্তমানের সঙ্গে যার নাড়ার সঙ্গ, তার প্রবণতা ভবিষ্যতের দিকে; সে চলেছে, সে এগোচ্ছে, তার সন্তুতির শেষ হয়নি, তার সত্তার পাকা দিলে অস্তিম স্বাক্ষর পড়ে নি। আর্টের রাজ্যে যারা সনাতনীর দল তারা মৃতের লক্ষণ মিলিয়ে জীবিতের জন্তে শ্রেণীবিভাগের বাতায়ন-হীন কবর তৈরি করে। নন্দলাল সে জাতের লোক নয়, আর্ট তাঁর পক্ষে সজীব পদার্থ। তাঁকে তিনি স্পর্শ দিয়ে দৃষ্টি দিয়ে দরদ দিয়ে জানেন, সেই জন্তই তাঁর সঙ্গে এডুকেশন। যারা ছাত্ররূপে তাঁর কাছে আসবার সুযোগ পেয়েছে তাদের আমি ভাগ্যবান বলে মনে করি,—তাঁর এমন কোনো ছাত্র নেই এ কথা যে না অনুভব করেছে এবং স্বীকার না করে। এ সন্ধে তিনি তাঁর নিজের গুরু অবনীন্দ্রনাথের প্রেরণা আপন স্বভাব থেকেই পেয়েছেন সহজে। ছাত্রের অশুনিহিত শক্তিকে বাহিরের কোনো সনাতন ছাঁচে ঢালাই করবার চেষ্টা তিনি কখনোই করেন না; সেই শক্তিকে তাঁর নিজের পথে তিনি মুক্তি দিতে চান এবং তাতে তিনি কৃতকায হন যে হেতু তাঁর নিজের মধোই সেই মুক্তি আছে।

কিছুদিন হোলো, বোধ্যে নন্দলাল তাঁর বর্তমান ছাত্রদের একটি প্রদর্শনী খুলেছিলেন। সকলেই জানেন, সেখানে একটি স্কুল অফ আর্ট আছে, এবং একথাও বোধ হয় অনেকের জানা আছে সেই স্কুলের অধিবর্তীরা আমাদের এদিককার ছাবির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে লেখালিখ করে আসছেন। তাঁদের নালিশ এই যে, আমাদের শিল্পস্থিতিতে আমরা একটা পুরাতন চালের ভঙ্গিমা সৃষ্টি করেছি, সে কেবল সত্তায় চোখ ভোলাবার ফন্দি, বাস্তব সংসারের প্রাণ-বৈচিত্র্য তাঁর মধো নেই। আমরা কাগজেপত্রে কোনো প্রতিবাদ করিনি,—ছবিগুলি দেখানো হোলো। এতদিন যা বলে তাঁরা বিক্রম করে এসেছেন, প্রত্যক্ষ দেখতে পেলেন তাঁর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ প্রমাণ। দেখলেন বিচিত্র ছবি, তাতে বিচিত্র চিত্তের প্রকাশ, বিচিত্র হাতের ছাঁদে, তাতে না আছে সাংবক কালের নকল না আছে আধুনিকের; তা ছাড়া কোনো ছবিতেই চলিত বাজারদরের প্রতি লক্ষ্য মাত্র নেই।

যে নদীতে শ্রোত অল্প সে জডো করে তোলে শৈবালদামের বাহু, তাঁর সামনের পথ যায় রুদ্ধ হয়ে। তেমন শিল্পী সাহিত্যিক অনেক আছে যারা আপন অভ্যাস এবং মুদ্রাভঙ্গীর দ্বারা আপন অচল সীমা রচনা করে তোলে। তাদের সঙ্গে প্রশংসাযোগ্য গুণ থাকতে পারে কিন্তু সে আর বাঁক করে না, এগোতে চায় না, ক্রমাগত আপনাবির নকল আপনি করতে থাকে, নিজেরই কৃতকর্ম থেকে তাঁর নিরন্তর নিজের চুরি চলে।

আপন প্রতিভার যাত্রাপথে অভ্যাসের জড় দ্বারা এই সীমা বন্ধন নন্দলাল কিছুতেই সহ করতে পারেন না আমি তা জানি। আপনার মধো তাঁর এই বিদ্রোহ কতদিন দেখে আসছি। সর্বত্রই এই বিদ্রোহ

সৃষ্টিশক্তির অন্তর্গত। যথার্থ সৃষ্টি বাধা রাস্তায় চলে না, প্রলয় শক্তি কেবলি তার পথ তৈরি করতে থাকে। সৃষ্টিকায়ো জীবনীশক্তির এই অস্থিরতা নন্দলালের প্রকৃতিসিদ্ধি। কোনো একটা আড্ডায় পৌঁছে আর চলবেন না, কেবল কেদারায় বনে পা দোলাবেন, তাঁর ভাগালিপিতে তা লেখে না। যদি তাঁর পক্ষে সেটা সম্ভবপর হতো তাহলে বাজারে তাঁর পসার জমে উঠত। যারা বাধা খরিদদার তাদের বিচারবুদ্ধি অচল শক্তিতে খুঁটিতে বাধা। তাদের দর-বাচাই প্রণালী অন্ত্যস্ত আদর্শ মিলিয়ে। সেই আদর্শের বাইরে নিজের রুচিকে ছাড়া দিতে তারা ভয় পায়, তাদের ভাল লাগার পরিমাণ জনশ্রুতির পরিমাণের অনুসারী। আর্টিন্টের কাজ সম্বন্ধে জন-সাধারণের ভালো লাগার অভ্যাস জমে উঠতে সময় লাগে। একবার জমে উঠলে সেই ধারার অনুবর্তন করলে আর্টিন্টের আপদ থাকে না। কিন্তু যে আয়বিক্রোহী শিল্পী আপন কৃতির অভ্যাসকে ক্ষণে ক্ষণে ভাঙতে থাকে আর যাই হোক, হাটে বাজারে তাকে বারে বারে ঠকতে হবে। তা হোক বাজারে ঠকা ভালো, নিজেকে ঠকানো তো ভালো নয়। আমি নিশ্চিত জানি নন্দলাল সেই নিজেকে ঠকতে অবজ্ঞা করেন, তাতে তাঁর লোকসান যদি হয় তো হোক। অমুক বই বা অমুক ছবি পয়সান্ত লেখক বা শিল্পীর উৎকণ্ঠের সীমা— বাজারে এমন জনরব মাঝে মাঝে ওঠে, অনেক সময়ে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, লোকের অভ্যাস বরাব্দে বিয় দটেছে। সাধারণের অভ্যাসের বাধা জোগানদার হবার লোভ সামলাতে না পারলে সেই লোভে পাপ, পাপে মুড়া। আর যাই হোক সেই পাপলোভের আশঙ্কা নন্দলালের একেবারেই নেই। তাঁর লেখনী নিজের অত্যন্ত কালকে ছাড়িয়ে চলবার যাত্রিণী। বিষয়সৃষ্টির যাত্রাপথ তো সেই দিকেই, তাঁর অভিসার অগুহানের আহ্বানে।

আর্টিন্টের স্বকায় আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যায় তার চরিত্রে তার জীবনে। আমরা বারম্বার তার প্রমাণ পেয়ে থাকি নন্দলালের স্বভাবে। প্রথম দেখতে পাই আর্টের প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ নিলেীভ নিষ্ঠা। বিষয়বুদ্ধির দিকে যদি তাঁর আকাঙ্ক্ষার দৌড় থাকত, তা হলে সেই পথে অবস্থার উন্নতি হবার সুযোগ তার যথেষ্ট ছিল। প্রতিভার সাচ্চাদাম-বাচাইয়ের পরীক্ষক ইন্দ্রদেব শিষ্ঠ মাধকন্দর তপস্কার সম্মুখে রজত নুপুরনিকণের মোহজাল বিস্তার করে থাকেন, সরস্বতীর প্রসাদস্পর্শ সেই লোভ থেকে রক্ষা করে, দেবী অর্থের বন্ধন থেকে উদ্ধার করে সার্থকতার মুক্তিবর দেন। সেই মুক্তিলোকে বিরাজ করেন নন্দলাল, তাঁর ভয় নেই।

তাঁর স্বাভাবিক আভিজাত্যের আর একটি লক্ষণ দেখা যায় সে তাঁর অবিচলিত বৈধা। বন্ধুর মুখের অস্থায় নিন্দাতেও তাঁর প্রসন্নতা ক্ষুণ্ণ হয় নি তার দৃষ্টান্ত দেখেছি। যারা তাঁকে জানে এমনতরো ঘটনায় তারাই দুঃখ পেয়েছে, কিন্তু তিনি অতি সহজেই ক্ষমা করতে পেরেছেন। এতে তাঁর অস্তরের ঐশ্বর্য সপ্রমাণ করে। তাঁর মন পরাব নয়। তাঁর সমবাবসায়ার কারো প্রতি জ্বার অভ্যাস মাত্র তাঁর ব্যবহারে প্রকাশ পায় নি। যাকে যার দেয় সেটি চুকিয়ে দিতে গেলে নিজের যশে কম পড়বার আশঙ্কা কোনোদিন তাঁকে ছোটো হোতে দেয় নি। নিজের সম্বন্ধে ও পরের সম্বন্ধে তিনি সত্য; নিজেকে ঠকান না ও পরকে বঞ্চিত করেন না। এর থেকে দেখতে পেয়েছি নিজের রচনায় যেমন, নিজের স্বভাবেও তিনি তেমনি শিল্পী, ক্ষুদ্রতার ক্রটি স্বভাবতই কোথাও রাখতে চান না।

শিল্পী ও মানুষকে একত্র জড়িত করে আমি নন্দলালকে নিকটে দেখেছি। বুদ্ধি, হৃদয়, নৈপুণ্য অভিজ্ঞতা ও অস্তৃষ্টির এরকম

সমাবেশ অল্পই দেখা যায়। তাঁর ছাত্র, যারা তাঁর কাছে শিক্ষা পাচ্ছে, তারা একথা অনুভব করে এবং তাঁর বন্ধু যারা তাঁকে প্রতাহ সংসারের ছোটো বড়ো নানা বাপপারে দেখতে পায় তারা তাঁর উদ্যোগ ও চিন্তের গভীরতায় তাঁর প্রতি আকৃষ্ট। নিজের ও তাঁদের হয়ে এই কথাটি জানাবার আকাঙ্ক্ষা আমার এই লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। এরকম প্রশংসার তিনি কোনো অপেক্ষা করেন না, কিন্তু আমার নিজের মনে এর পেরণা অনুভব করি।

বিচিত্রা—চৈত্র ১৩৫০

কৃত্তিবাসের আবির্ভাব কাল

“বাস্তালা রামায়ণের আদি কবি কৃত্তিবাস কবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন” তাহা লইয়া পণ্ডিত সমাজে যে “বাদানুবাদ” চলিতেছিল, বোধ হয় এই বার তাহা শেষ হইল। “ভারতবর্ষ” পত্রিকায় শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বালিতেছেন যে, বাঁকুড়া ও হুগলী জিলার সীমানায় বদনগঞ্জে কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটি পুঁথি পাওয়া যায়—ইহা ১৪২৩ শকাব্দের (১৫০১ খৃষ্টাব্দের) নবম এবং ইহাঃঃ কৃত্তিবাসের আয়-বিবরণ আছে।

“এই আয়-বিবরণ দীনেশবাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের দ্বিতীয় সংস্করণে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হইয়া সাধারণের পরিচিত হয়।

এই আয়-বিবরণেই আছে—

আদিভাবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাস মাস।
তথি মধো জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥

ইহা অবলম্বন করিয়া রায় মহাশয় গণনা আরম্ভ করেন। ১৩২০ সনের পরিষৎ পত্রিকায় তিনি যে গণনার ফল প্রকাশিত করেন তাহাতে দেখা যায়, ১২৫৯ শকে ৩০শে মাস রবিবার শ্রীপঞ্চমী তিথি হইয়াছিল এবং ১৩৫৪ শকে ২৯ দিনে মাস পূর্ণ হইয়াছিল এবং ত্রিদিনও রবিবার শ্রীপঞ্চমী ছিল। নানা প্রমাণে তখনকার মত ১৩৫৪ শকই (১৪৩২ খ্রীষ্টাব্দ) কৃত্তিবাসের জন্ম শক বলিয়া নির্দিষ্ট হইল।

কিন্তু এই নির্দ্ধারণে সমস্ত সন্দেহ মিটিল না। প্রধান আপত্তি, আয়-বিবরণ পড়িয়া পরিষ্কার বুঝা যায়, যে গোড়েশ্বরের সভায় বিদ্যা সমাপনান্তে কৃত্তিবাস উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয়ই হিন্দু রাজসভা। উহাতে একটিও মুসলমান কণ্ঠচারার বা মুসলমান আচার ব্যবহারের উল্লেখ নাই। বাস্তালায় একমাত্র হিন্দু গোড়েশ্বর রাজা গণেশ ১৩৩৯ ও ১৩৪০ শকে সমগ্র বাস্তালায় প্রবল ছিলেন। কাজেই রাজা গণেশের সভায় ২০ হইতে ৩০ বছর বয়সে কৃত্তিবাস উপস্থিত হইয়া থাকিলে তাহার জন্ম শক ১৩০৯।১০ হইতে ১৩১৯।২০ শক হওয়া আবশ্যিক।

আর এক আপত্তি ‘পূর্ণ’ শব্দটিতে। প্রাচীন পুঁথি যাহারা খাটিয়া থাকেন তাহারা জানেন, কোন কোন মাসকে ‘পূর্ণা’ বিশেষণে বিশেষিত করা প্রাচীন সাহিত্যের প্রথা ছিল এবং ‘পূর্ণা’ প্রাচীন পুঁথিতে সর্বদা ‘পুর্ন’রূপে লিখিত হয়। কাজেই গণনায় সম্বল মাত্র আদিভাবার এবং শ্রীপঞ্চমী।

আমার এই সকল আপত্তি রায় মহাশয়কে জানাইলে তিনি আবার গণিতে বসিলেন। এইবার তিনি গণিয়া বাহির করিয়াছেন,

১৩২০ শকে রবিবার দিন শ্রীপঞ্চমী ও সরস্বতী পূজা হইয়াছিল। এই শকেই কৃত্তিবাসর জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তিনি শেষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কাজেই, যখন কৃত্তিবাস ১৯২০ বছরের নবযুবক, তখন তিনি বড় গঙ্গা অর্থাৎ মূল গঙ্গার (ভাগীরথীর নহে) তীরস্থ রাঢ় দেশীয় গুরুগৃহে বিদ্যা সমাপন করিয়া রাজপণ্ডিত হইবার আশায় গোড়েশ্বরকে ভ্রটিতে চলিয়াছিলেন। রাজা গণেশ ১৩৩৯৪০ শকে (১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে) এই প্রতিভাশালী কুলিয়ার মুখটিকে বাঙ্গালা ভাষায় রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ করিলেন।”

প্রকার চাঁদা দিতে হইবে না, প্রত্যেকেই গ্রামা কেন্দ্রে বিলি করা সকল পুস্তকই পাঠ করিতে পারেন। এক মাসের মধ্যে পাঠ সমাধা করিতে হইবে, এবং এক মাস বাঁদে চলন্ত লাইব্রেরী উপস্থিত হইলে সেই সেই বইগুলি ফেরত দিতে হইবে।

চলন্ত লাইব্রেরীতে পুস্তকসংখ্যা ৩,৭৮২। এক বৎসরে যে যে সংখ্যক পুস্তক বিলি হইয়াছিল তাহার শ্রেণী বিভাগ সহ নিম্নে দেওয়া হইল।

ধর্ম	২৪৩	চিকিৎসা	৪০
জীবনী	২৩৫	রাজনীতি	৩৭
স্কুল পাঠ্য	১৪৮	স্বাস্থ্য	১৩১
ইতিহাস	৯২	সাময়িক পত্রিকা	১৭৩
কৃষি	৪৯	ভূগোল	৫৮
সাহিত্য	৫৩	শাসন-সংস্কার	২৪
রামায়ণ ও মহাভারত			৩২
নভেল			১২৪
গল্প			১১২
উপদেশাবলী			৯১
প্রকৃতি পাঠ			২১
ইসলাম			২৭

উপরি উদ্ধৃত অঙ্কগুলি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মাদ্রাজী গ্রামা পাঠকগণের মধ্যে নভেল বা গল্প পড়িবার আগ্রহ থাকিলেও বাঙ্গালা দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পাঠকগণের নাটক নভেল পড়িবার আগ্রহের স্থায় উৎকট নহে। তাহারা ধর্মসংক্রান্ত পুস্তক, রামায়ণ, মহাভারত যথেষ্ট পাঠ করেন। আজকাল যে বাঙ্গালীরা ক্রমাগত পিছাইয়া যাউতেছেন মনে হয় অধীত পুস্তক সম্বন্ধে তাহাদের এইরূপ রুচি তাহার অত্যন্ত কারণ। সেকালের বাঙ্গালীরা আমাদের স্থায় এত অধিক বাজে বই পড়িতেন না।

মাদ্রাজীরা কি বই পড়ে ?

“মধ্যবিত্ত বাঙ্গালা নভেল, নাটকই বেশীর ভাগ পড়ে” এবং অনেক মনে করেন যে “পাঠকগণ আপিসে ছাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর কেবলমাত্র সময় কাটাটাইবার ও চিত্তবিনোদনের জন্ত পড়েন, কোনও প্রকৃত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা তাহাদের পক্ষে বিরক্তিকর” অথবা “বাটার স্ত্রীলোকদের পাঠের সুবিধার জন্ত অনেক বাবা মেইয়া নাটক, নভেল লাইব্রেরী হইতে লইয়া যান”। “ক্লাইভ স্ট্রিট” পত্রিকায় শ্রীযুক্ত হরিবন গঙ্গোপাধ্যায় মাদ্রাজের মান্নারগুড়ি চলন্ত লাইব্রেরীর বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।

মান্নারগুড়ি হইতে ১২ মাইলের মধ্যে যে যে গ্রাম আছে, সেই গ্রামে যদি অন্ততঃপক্ষে ১৬ জন পাঠক একত্র হইয়া একটি “গ্রামা কেন্দ্র” স্থাপন করেন এবং তাহাদের মধ্যে তিন জন পুস্তক বিলি, ফেরৎ লওয়া ও যত্ন লওয়ার ভার এবং হারাইয়া গেলে ক্ষতিপূরণের ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সেই গ্রামে গরুর গাড়িতে করিয়া চলন্ত লাইব্রেরী উপস্থিত হইবে। গ্রামা কেন্দ্রের সাহায্যে যে যে বই পড়িতে ইচ্ছা করেন সেই সেই বই লইতে পারেন। কাহাকেও কোন

আর্থিক দুর্গতি মোচন

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

ভারত-সরকার ও বাংলা-সরকার এদেশে আর্থিক দুর্গতি মোচনের উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট হইয়াছেন। ইহা আশার কথা, সন্দেহ নাই। বিলাত হইতে দুইজন বিশেষজ্ঞ আনা হইয়া ভারত-সরকার যে অনুসন্ধান আরম্ভ করাইয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য কি, সে-সম্বন্ধে ভারত-সরকারের কথা সে-দিন ব্যবস্থা-পরিষদে ব্যক্ত হইয়াছে :—

(১) উৎপন্ন দ্রব্যাদির হিসাব সম্বন্ধে বিবরণ সংগ্রহের জন্ত সরকারের একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা ;

(২) উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব কি-না, সে-বিষয়ে মত প্রকাশ ;

(৩) জাতির আয় ও সম্পদ নির্ধারণ সম্বন্ধে যে-সব উপকরণ পাওয়া যায়, সে-সকলের আলোচনা ;

(৪) দ্রব্যের মূল্য, উৎপন্নদ্রব্য, পারিশ্রমিক প্রভৃতির হিসাবের পত্তন।

স্বথের বিষয় বাংলা-সরকার পুনর্গঠনের কার্যে যে কর্মচারীকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহার কাজ এইরূপ নহে।

তাঁহার কাজের প্রত্যক্ষ ফল পাইবার আশা করা যায়। এ-বিষয়ে সম্প্রতি বাংলা-সরকার হে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে :—

বর্তমান অর্থনীতিক অবস্থায় পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা যে দশায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে সরকার শঙ্কিত হইয়াছেন এবং সেই জন্য পল্লীগ্রামের অর্থনীতিক অবস্থার পুনর্গঠনভার একজন কর্মচারীর উপর ন্যস্ত করিবার উদ্দেশ্যে “ডেভেলপ-মেন্ট কমিশনার” নাম দিয়া একজন কর্মচারীকে নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি যে-সমস্তার সমাধানে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহা নানা অংশে বিভক্ত এবং সেইজন্য নানা বিভাগের সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে যে-যে কাজ আছে, সে সকল কোনরূপে বিচলিত করা হইবে না। কমিশনার যে কাজ করিবেন, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের সহিত একযোগে কার্যে প্রবৃত্ত হইবেন এবং ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কার্য যাহাতে সন্মিলিত ভাবে করা যায়, সেজন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিবেন।

এই ব্যবস্থার সুবিধা যে সপ্রকাশ, তাহা বলাই বাহুল্য। সাধারণ হিসাবে পল্লীগ্রামের অধিবাসীদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইলে স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি, শিক্ষা, সেচ প্রভৃতি বিবিধ বিভাগের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়; শিক্ষা ও স্বাস্থ্য যদি বর্তমানে বাদ দেওয়া যায়, তবে যে অভিপ্রেত ফললাভে বিলম্ব ঘটবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, কৃষিশিল্পও বহু পরিমাণে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। আবার সেচের দ্বারা যেমন কৃষির উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তেমনই স্বাস্থ্যেরও উন্নতি সাধিত হয়। বাংলায় ম্যালেরিয়ার প্রবল প্রকোপের উল্লেখ করিয়া বাংলার গতপূর্ব আদমশুমারের বিবরণে লিখিত হইয়াছিল :—

“বৎসরের পর বৎসর জ্বর লোকনাশ করিতেছে। প্রেগ যদি সহস্র লোককে সংহার করে, তবে জ্বর দশ সহস্র লোকের মৃত্যুর কারণ। জ্বর যে কেবল মৃত্যুর দ্বারাই লোকসংখ্যা হ্রাস করে, তাহা নহে; পরন্তু যাহারা জীবিত থাকে তাহা-দিগের জীবনীশক্তি ক্ষুণ্ণ করে, উদ্যম ও প্রজননশক্তির ক্ষতি করে, লোকের সাধারণ জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে বাধা জন্মায় এবং ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতির গতি প্রহত করে। বাংলার দারিদ্র্য ও অন্ত বহুরূপ দুর্দশার ইহাই অন্ততম প্রধান কারণ

বাঙ্গালীর উদ্যমহীনতার জন্ম ম্যালেরিয়া প্রধানতঃ দায়ী।” ডাক্তার বেটলী সেচের ব্যবস্থা করিয়া ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় করিতে বলিয়াছেন। সেজন্য বাংলার নদীনালা প্রভৃতির সংস্কার করিতে হইবে।

আবার পল্লীগ্রামের দুর্দশার জন্ম গ্রামে শিক্ষিত লোকের অভাবও অল্প দায়ী নহে। দেশের শিক্ষিত লোকরাই অল্প লোককে আদর্শ ও উপদেশের দ্বারা উন্নতির পথ দেখাইয়া দিবেন।

এইরূপে নানা কারণের সমন্বয়ে যে সমস্তার উদ্ভব তাহার সমাধান সহজসাধ্য নহে। সহজসাধ্য নহে বলিয়াই এই কাব্যে সকলের একযোগে কাজ করা প্রয়োজন। এ কাব্যের শেষ যাহাই কেন হউক না—ইহার আরম্ভ স্থির করাই দুষ্কর। যে দুর্দশা বাংলার জলবায়ুতে দ্রুতবর্দ্ধনশীল বটবৃক্ষের মত সমাজসৌধে তাহার সহস্র মূল প্রসারিত করিয়া তাহাকে আয়ত্তাধীন করিয়াছে, তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করা যেমন দুষ্কর, সে-কাব্য অসাধ্য ভাবে করিলে তাহাতে সমাজসৌধের সর্বনাশ সাধনের সম্ভাবনাও তেমনই প্রবল। সুতরাং সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। ইহাকে অবহেলা করা যায় না; অবজ্ঞা করা অসম্ভব। কাজেই আরম্ভ করিতেই হইবে। সেই আরম্ভ হইতেছে দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি।

বাধা আছে, কিন্তু উদ্যোগ ত্যাগ করিলে চলিবে না। আমরা একটি দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা সুস্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিব। বাংলার অনেক জলপথ ও প্রায় সব জলাশয় কচুরী-পানায় পূর্ণ হইয়াছে—ইহাতে বাংলার লোকের স্বাস্থ্যহানি হইতেছে; কোন কোন জলপথে নৌকাচলাচল বন্ধ হইয়াছে—কোন কোন নদীতে বা নালায় বর্ষার জল পতিত হইলে জন যখন কূল ছাপাইয়া যায়, তখন জলের সঙ্গে সঙ্গে পানায় ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, ফলে ধান নষ্ট হয়। কয় বৎসর ধরিয়া পানায় দূর করিবার কথা আলোচিত হইতেছে—ফল কিছুই হইতেছে না। পানায় দূর করিবার উপায় উদ্ভাবন জন্ম প্রথম যে সামতি গঠিত হইয়াছিল, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু তাহার অন্ততম সদস্য ছিলেন। তিনি আমাদেরকে বালিয়াছিলেন—যাহার পানায় দৌরাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তাহাদিগের দ্বারা পানায় দূর করানই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। গ্রামের লোককে পারিশ্রমিক দিয়া যদি নালা, খাল, পুকুরিণী পরিষ্কার করান যায়, তবে

তাহারা পারিশ্রমিক লাভ করে—পানাও যায়; এরোপেন হইতে ঔষধ দিয়া পানা দূর করিবার কল্পনা কার্যে পরিণত করা যাইবে না। কেহ কেহ বলেন, পানা পরিষ্কার করিলে আবার হইবে; সুতরাং পরিষ্কার করিয়া লাভ কি? ইহা অনসের উক্ত। উড়িয়ায় দেখা গিয়াছে, যে-সব পুষ্করিণী হইতে পানা তুলিয়া ফেলা হইয়াছে, সেগুলি পরিষ্কারই আছে। কোন দেশই একরূপ বিপদে নিশ্চেষ্ট থাকে না। অষ্ট্রেলিয়ার গবেষণা-সমিতির গত বৎসরের যে কার্যবিবরণ তথায় পার্লামেন্টে পেশ হইয়াছে, আমরা তাহার এক খণ্ড পাইয়াছি। তাহাতে দেখিতে পাই, ঐ দেশে যে-সব উদ্ভিদ অনিষ্টকর ও বাড়িয়া যাইতেছে, সে-সকল নষ্ট করিবার জন্য নানা উপায় পরীক্ষা করা হইতেছে—এমন কি যে-সব কীট-পতঙ্গ এই সব উদ্ভিদ নষ্ট করে বিদেশ হইতে তাহা আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। উহা হইতে আমরা নিম্নলিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি :—

“Consignments of seven species of insects attacking St. John's wort have been received from abroad, and a number of some of them have already been liberated in the districts where the weed is a pest...In 1933, liberations were made in Queensland of a seedfly which attacks Noogoora burr.”

এদেশে আচাৰ্য জগদীশচন্দ্র যে সহজ উপায় নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার পরীক্ষা করিলে সফল ফলিতে পারে; কারণ, এদেশে শ্রমিকের পারিশ্রমিক অল্প। এইরূপ কার্য যে পল্লীগ্রামের পুনর্গঠনকার্যে সহায় হয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

সরকার যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে :—

কমিশনারকে যে-সব সমস্যার বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে, সে-সকলের সংখ্যা অল্প নহে। পল্লীগ্রামের অর্থনীতিক উন্নতি সাধন সম্বন্ধে নানা প্রস্তাবও বিচার করিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, পল্লীগ্রামের অধিবাসীদিগের ঋণের বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। যাহাতে কৃষকের ঋণভার লঘু হয় এবং কৃষিকার্যের জন্য সে আবশ্যিক অর্থ পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে তাঁহাকে নানা প্রস্তাব বিচার করিতে হইবে। সে-সব প্রস্তাবের মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা গেল—

(১) স্বেচ্ছায় অর্থাৎ আইনের সাহায্য না লইয়া ঋণ মিটাইয়া লওয়া।

(২) বর্তমানে যে-ঋণ পুঞ্জীভূত হইয়াছে, তাহা মিটাইয়া লইতে বাধ্য করা অর্থাৎ সে-বিষয়ে আইন করা।

(৩) যাহাতে পল্লীগ্রামে লোক সহজে দেউলিয়া হইতে পারে, আইনে তাহার ব্যবস্থা করা।

(৪) কৃষক যাহাতে অমিতব্যয়ী হইয়া পুনরায় ঋণগ্রস্ত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা।

(৫) জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা।

(৬) কৃষকের যে টাকা প্রয়োজন হয় তাহার অধিকাংশ দিবার জন্য ঋণদান প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা।

বলা বাহুল্য, এই সব ব্যবস্থা বিচারকালে বাংলার সমবায় অনুষ্ঠানের অবস্থা বিবেচনা করিতে হইবে।

কৃষকে মহাজনের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়া তাহার আবশ্যিক অর্থ পাইবার সুবিধা করিয়া দিবার উদ্দেশ্যেই সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি প্রবর্তিত হইয়াছিল। সেগুলির ফল যে আশানুরূপ হয় নাই, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অল্পদিন পূর্বে এদেশে সমবায় সমিতিসমূহের প্রতিনিধিদিগের যে সম্মিলন হইয়াছিল তাহাতে দেখা গিয়াছে, জার্মান যুদ্ধের সময় হইতে সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহের যে অবনতি আরম্ভ হইয়াছে তাহা নিবারণ করা যায় নাই। ইহার কারণ কি? কারণ যাহাই কেন হউক না, এই অবনতির নিদান নির্ণয় করিতে হইবে। বিশেষ নূতন যে-সব প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, সে-সকল সমবায় নীতিতে গঠিত করাই প্রয়োজন হইবে।

জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। এ-বিষয়ে যে তৎপরতা দেখা গিয়াছে, তাহা প্রশংসনীয়। প্রথমে পাঁচটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে। ময়মনসিংহে প্রথমটির উদ্বোধনকার্য সম্পন্ন করিবার সময় মন্ত্রী তাহার উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়াছেন। এবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাংলা-সরকারের যে বজেট পেশ হইয়াছে তাহাতে এই বাবদে ৪০ হাজার টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। ইহা কেবল ব্যাঙ্কের কর্মচারী প্রভৃতির বেতনের জন্য। মন্ত্রীর উক্তি প্রকাশ—

“ভিবেঞ্চার” ঋণ করিয়া এই-সব ব্যাঙ্কের মূলধন সংগৃহীত হইবে এবং যত দিনের জন্য ঋণ গৃহীত হইবে, ততদিনের জন্য

সরকার ঐ টাকা সরদের জন্ম জামিন থাকিবেন। বর্তমানে ঋণদান সমবায় সমিতিগুলি যেভাবে সভাদিগকে ঋণ দিয়া থাকে, তাহাতে কৃষকের কৃষিকার্যের জন্ম প্রয়োজন টাকা পাওয়া গেলেও তাহার অল্প ঋণ শোধের উপায় হয় না—এমন কি জমির উন্নতিসাধনের ব্যবস্থা করাও সম্ভব হয় না। সেজন্য অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালে পরিশোধ করা যায়, এমন ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই-সব ব্যাঙ্কে তাহাই হইবে। মন্ত্রী বলিয়াছেন—এইরূপে দীর্ঘকাল মেয়াদে যে-সব ঋণ প্রদান করা হইবে, কিছু দিন তাহা পূর্ক ঋণ ও জমি বন্ধক দিয়া গৃহীত ঋণ পরিশোধ করিতেই প্রযুক্ত হইবে। জমির ও চাষের উন্নতিসাধন, জমিক্রয় প্রভৃতি ব্যবস্থা-বিষয় পরে বিবেচিত হইবে। এইরূপ ব্যাঙ্ক পরিচালিত করিয়া অগ্ণাণ দেশে যে অভিজ্ঞতা লাভ করা গিয়াছে তাহার সম্যক সদাবহার করা যে প্রয়োজন হইবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যদি আইনের সাহায্য গ্রহণ না করিয়াই মহাজনের সহিত খাতকের ব্যবস্থায় ঋণ মিটাইবার উপায় হয়, তবে তাহাই যে অভিপ্রেত তাহাতে দ্বিমত থাকিতে পারে না। কিন্তু সেরূপ কাজের জন্ম কোন কর্মচারীর বা কোন সমিতির মধ্যস্থতা অবশ্যই প্রয়োজন হইবে।

এ-বিষয়ে যত শীঘ্র কাজ আরম্ভ হয়, ততই ভাল; কারণ বর্তমান ব্যবসা-মন্দার সময় মহাজন স্বভাবতই প্রাপ্য টাকা কতকটা বাদ দিয়াও লইতে আগ্রহশীল। কিন্তু আইন করিবার প্রয়োজন যে অতিক্রম করা বাইবে, এমন মনে হয় না। বরং আইন থাকিলে মহাজনের মিটাইয়া লইবার আগ্রহ হইবে।

ঋণভার লঘু হইলে কৃষক যাহাতে আবার অমিতব্যয়ী হইয়া ঋণ না করে, সে ব্যবস্থার ভিত্তি—শিক্ষা। কিভাবে তাহাকে শিক্ষা দিতে হইবে—কিভাবে সেজন্য প্রচারকাণ্ড পরিচালিত করিতে হইবে, তাহা বিবেচনার বিষয়।

এই প্রসঙ্গে আমরা আর একটি অল্পস্থানের উল্লেখ করিতে পারি। অল্পদিন পূর্ক বাংলা-সরকার লোককে স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে একখানি মোটরযান সজ্জিত করিয়া পাঠাইয়াছেন। তাহাতে ছবি দেখাইবার ব্যবস্থাও আছে। পঞ্জাব প্রদেশে এখন বেতারের সাহায্যে লোককে শিক্ষা ও উপদেশ দিবার প্রস্তাব বিবেচিত হইতেছে।

বাংলায় এখন সেরূপ ব্যবস্থা হয়ত সম্ভব হইবে না। কিন্তু গ্রামে গ্রামে যদি চলচ্চিত্র সহযোগে বা এইরূপ যানের সাহায্যে প্রচারকাণ্ড পরিচালিত হয়, তবে তাহাতে সহজে সফল ফলিতে পারে।

ইহাতে নানা বিভাগের কাজ হইতে পারে। বাংলার শিল্পবিভাগ ইতোমধ্যেই মফস্বলে শহরে শিক্ষকদল পাঠাইয়া কতকগুলি শিল্পের উন্নত পদ্ধতি শিখাইতেছেন। যাহাতে লোক সে-সকলের সংবাদ পায় ও সে-সকলের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহা এইরূপ যানের দ্বারা করা যায়। প্রধানতঃ বাংলার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্যার সমাধানকল্পে এই-সব শিল্পশিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু ইহার কাণ্ড-ক্ষেত্র প্রসারিত করা সহজসাধ্য। প্রথমে যাহারা সন্দেহ করিয়াছিলেন, ভদ্র সম্প্রদায়ের যুবকরা কাণ্ডিক শ্রমবিমুগ্ন বলিয়া শিল্পে আত্মনিয়োগ করিতে চাহিবে না তাহাদিগের সে সন্দেহের আর অবকাশ নাই। এখন দেখা যাইতেছে, যুবকরা যেমন “হাতে হাতিয়ারে” কাজ করিতে আগ্রহশীল, তাহাদিগের অভিব্যবহাও তেমনি তাহাদিগকে এ-বিষয়ে উৎসাহ দিতে প্রস্তুত; দেখা যাইতেছে, যুবকরা শিক্ষালাভ করিলে অভিব্যবহা তাহাদিগকে কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ম আবশ্যক মূলধন প্রদান করিতেছেন। ইহার মধ্যেই শিক্ষালাভ করিয়া যুবকরা নানা স্থানে আপনারা কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে ও করিতেছে এবং যে-সব কারখানা আছে অনেকে সেইগুলিতে চাকরি পাইতেছে।

যাহারা এইরূপে শিল্প প্রতিষ্ঠা করিবে, তাহারা যাহাতে সরকারের কাছে ঋণহিসাবে অর্থসাহায্য পাইতে পারে, সেজন্য আইন হইয়াছে। কিন্তু আইন বিধিবদ্ধ হইলেও অর্থাভাবে সাহায্যদান সম্ভব হয় নাই। সেইজন্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, এঞ্জিনিয়ার ও বাহিরের কয় জন ভদ্রলোক টাকা দিয়া একটি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহার পর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা স্থির করিয়া দিয়াছেন, এই কার্যের জন্ম সরকার জামিন হইয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যাঙ্ক হইতে দিতে পারিবেন। ঋণ হিসাবে আরও টাকা দিবার ব্যবস্থাও এবার হইতেছে। কাজেই আশা করা যায়, এই সব শিল্পপ্রতিষ্ঠার কাণ্ড অগ্রসর হইবে। পল্লীগামেও এই-সব শিল্প অনায়াসে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে

এবং তাহাতে পল্লীগামের পুনর্গঠনকার্য সহজে সম্পন্ন হইবে—অন্ততঃ সে-কার্যে সাহায্য হইবে।

সরকারী বিবৃতির শেষাংশে লিখিত হইয়াছে :—

কমিশনারকে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। বাংলার যে-সব অঞ্চল লোকশূন্য ও শ্রীহীন হইতেছে, সে-সব অঞ্চলে বস্তার জলে সেচ ব্যবস্থা করিলে অর্থাৎ যাহাতে বস্তার জল জমিতে যায় তাহা করিলে উপকার-সম্ভাবনা আছে। সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান ও পরবর্তী সেচের খালের আয়ের বিষয়ও বিবেচনা করিতে হইবে।

পলিপূর্ণ বস্তার জল জমিতে আসিলে যে জমির উর্বরতা বর্ধিত হয় এবং মালেরিয়ার প্রকোপও প্রশমিত হয়, তাহা এক দিকে যেমন ডাক্তার বেণ্টলী, অপর দিকে তেমনই সেচ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ স্যর উইলিয়ম উইলকিন্স দৃঢ়তা সহকারে বলিয়া গিয়াছেন। স্যর উইলিয়ম মিশরে এইরূপ ব্যবস্থার দ্বারা অসাধ্য সাধন করিয়া অক্ষয় যশ অর্জন করিয়া গিয়াছেন। তিনি পরিণত বয়সে হতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বাংলার অবস্থা পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন—জমিতে বস্তার জল প্রবেশ বন্ধ হওয়াতেই পশ্চিম-বঙ্গের দুর্দশা ঘটিয়াছে। ঝাঁপগুলি এই দুর্দশা আরও দ্রুত করিতেছে। কি উপায় অবলম্বন করিলে ইহার প্রতিকার হয়, তিনি তাহাও বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তখন তাঁহার উপদেশ গৃহীত হয় নাই। কিন্তু এখন সেচের প্রয়োজন ও উপযোগিতা উপলব্ধ হইতেছে। কিরূপে বস্তার জল জমিতে প্রবেশ করান যায়, তাহার বিষয় বিবেচিত হইবে জানিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি।

আমাদিগের মনে হয়, আজ যখন নূতন পদ্ধতি প্রবর্তিত হইতেছে, যখন বাংলার শ্রীহীন পল্লীগামকে শ্রীসম্পন্ন করিবার—বাংলার দুর্দশা দূর করিবার উপায় আলোচিত হইতেছে, তখন যদি পুনর্গঠন-কর্মচারী স্যর উইলিয়ম উইলকিন্সের প্রস্তাবটি পরীক্ষা করিয়া তাহা কার্যে পরিণত করিবার কথা বলেন, তবে কৃষি, স্বাস্থ্য ও সেচ তিন বিভাগই তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন। এতদিন এই পথে বিরাট বাধা ছিল—অর্থাৎ বাধা। এবার সে বাধা দূর হইবার সম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্তনাবধি বাংলা-সরকারের আর্থিক দুর্গতির অন্ত ছিল না।

বাংলার জনমত ও বাংলা-সরকার উভয়েই সেই জন্ত বলিয়া আসিয়াছেন—

(১) পার্টের উপর যে রপ্তানি-শুল্ক আদায় হয়, তাহার সব টাকা বাংলার প্রাপ্য; সে টাকা বাংলাকে প্রদান করা হউক;

(২) বাংলায় যত টাকা আয়কর হিসাবে আদায় হয়, তত টাকা আর কোন প্রদেশে আদায় হয় না; সে টাকার কতকাংশও বাংলার প্রাপ্য।

দীর্ঘকাল আন্দোলনের ফলে পার্লামেন্ট প্রস্তাব করিয়াছেন, —পার্টের উপর রপ্তানি-শুল্কের আয়ের অর্ধাংশ পার্ট-উৎপাদনকারী প্রদেশগুলিকে যথাযথভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে এবং সেই জন্তই পার্লামেন্ট বাংলার আয়ে তাহার ব্যয় সঙ্কুলান হইবে, ধরিয়া লইয়াছেন। এবার ভারত-সরকার সেই হিসাবে বাংলাকে তাহার প্রাপ্য ঐ টাকার অর্ধাংশ দিতে উদ্যত হইয়াছেন। ফলে বাংলা এবার আর পূর্ববৎ আর্থিক দুর্গতি দুঃখ ভোগ করিবে না। অতঃপর বাংলা উৎপাদক কাঙ্ক্ষের জন্ত ঋণগ্রহণ করিতেও পারিবে। বলা বাহুল্য, যাহাতে পার্টের শুল্কের সব টাকাই বাংলা পায়, সেজন্ত এখনও আন্দোলন পরিচালিত করিতে হইবে এবং আয়করের কতকাংশও পাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। সে-বিষয় আজ আমাদের আলোচ্য নহে। আজ আমরা বাংলার আর্থিক দুর্গতি মোচনের স্থায়ী উপায়ের কথাই বলিতেছি।

বাংলার অর্থনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রণয় যে সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহার সদস্যদিগের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা সরকারের নির্দিষ্ট বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে বলিবেন, তাহাও কমিশনার স্থির করিয়া দিবেন। কমিশনার কোন বিশেষ বিভাগের অধীন থাকিবেন না, পরন্তু লার্ডপরিষদের আর্থিক সমিতির সভাপতির অধীনে কাজ করিবেন। গভর্নর, তাঁহার শাসন-পরিষদের সদস্যত্রয় ও মন্ত্রিত্রয়—এই কয়জনে বাংলার গভর্নরের পরিষদ গঠিত। ইহার মধ্যে তিন জনকে লইয়া আর্থিক সমিতি। পরিষদের সর্বাপেক্ষা পুরাতন সদস্য স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র, অর্থসচিব এবং কৃষি ও শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এই কয়জন এই সমিতির সদস্য ছিলেন। স্যর প্রভাসচন্দ্র

মৃত্যুতে যিনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন তিনিই, তাঁহার মত, এই সমিতির সভাপতি হইবেন কি-না, তাহা আমরা জানি না। প্রভাসচন্দ্র বিষয়টি বিশেষ যত্নসহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেই জন্ত তাঁহার মৃত্যুতে এই কার্যে কিছু বিঘ্ন ঘটান্নাছে, বলিতে হইবে। আমরা আশা করি, এখন যিনি সমিতির সভাপতি হইবেন, তিনি এই প্রয়োজনীয় বিষয়ে আবশ্যিক মনোযোগ দিবেন। কারণ, বাংলার পল্লী-গ্রামের দুর্দশা দূর না হইলে বাংলার উন্নতি অসম্ভব।

অর্থনীতিক অনুসন্ধান জন্ত বাংলায় যে বোর্ড বা সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহার নিকট হইতে পরামর্শ হিসাবেও যে উল্লেখযোগ্য কিছু পাইবার আশা আছে, তাহা মনে হয় না। নানা সম্প্রদায়ের ও নানা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি লইয়া যে সমিতি গঠিত হয়, তাহার সদস্যরা যে অনেক সময় কোন বিষয়ে একমত হইতে পারেন না, তাহার প্রমাণ সম্প্রতি পাট-কমিটির রিপোর্টে পাওয়া গিয়াছে। বোর্ডের সভারা কেহ কেহ বাঙালী নহেন—বাংলার আর্থিক অবস্থার সহিত তাঁহাদিগের প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই; কেহ কেহ এই বিষয়ে কখন মন দেন নাই। তথাপি যদি বোর্ড তাঁহাদিগের নির্দিষ্ট কার্য সুসম্পন্ন করিতে পারেন, আমরা তাহা ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করিব।

কাজ কমিশনারকেই করিতে হইবে। আর তাঁহার কাজ করিবার উৎসাহ ও দক্ষতার উপর সরকারের এই প্রশংসনীয় চেষ্টার সাফল্য নির্ভর করিতেছে। যে বক্তৃতায় বাংলার গভর্নর এই চেষ্টার কথা প্রথম উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি কার্যের বিরাটত্ব ও জটিলতা বিবেচনা করিয়া বলিয়াছিলেন, এ-কাজ এক। সরকারের নহে এবং ইহা সম্পূর্ণ করিতে হইলে সমাজের সকল উৎকৃষ্ট অংশকে ইহাতে প্রযুক্ত করিতে হইবে। আমরা আশা করি, দেশের লোক উপদেশ ও সহযোগ দিয়া এই কাজ সম্পূর্ণ করিতে সহায় হইবেন।

বাংলার পল্লীগ্রামের ও পল্লীগ্রামের অধিবাসীদিগের আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধনের উপায় যিনি যাহা চিন্তা করিয়াছেন, তাহা কমিশনারকে জানাইবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে—তাহা এইবার কার্যে পরিণত হইতে পারে। আর গ্রামে কোন কাজ আরম্ভ হইলে তাহার সাফল্য সম্বন্ধে আবশ্যিক সাহায্য প্রদান করা প্রয়োজন। ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত বিহারে গণ্ডক নদীর বাঁধ মেরামত করিবার জন্ত যেমন সরকারী কাম্‌চারী ও বে-সরকারী লোক, ধনী ও দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলে একযোগে কাজ করিয়া কাজ সফল করিতে হইলে কি করিতে হয় তাহা দেখাইয়াছেন, তেমনই এ কাজে বাঙালী মাত্রেই অগ্রসর হইয়া সোৎসাহে কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। লোকের আন্তরিক উৎসাহই সরকারের কার্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে।

আজ বহুদিন পরে শ্রীহীন বাংলাকে পুনরায় শ্রীসম্পন্ন করিবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে, যেন সহসা বহুশ্রোত নদীতে বন্যার জল প্রবাহের সৃষ্টি করিতেছে। আজ যে সুযোগ আসিয়াছে, তাহার সম্যক সদ্ব্যবহার বাঙালীকেই করিতে হইবে; বুঝিতে হইবে—যে-টাকা ব্যয়িত হইবে তাহা যেমন বাঙালীর, যে উপকার হইবে তাহাও তেমনই বাঙালীর—এই পুরাতন পরিচিত বাংলায় শাসন-পদ্ধতির পরিবর্তন, ব্যবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে ও হইবে—কিন্তু ইহার অধিকারী হইয়া থাকিবে—বাঙালী; সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, রোগে-সন্তোকে, প্রাচুর্যে-অভাবে—বাঙালীর সম্বল এই বাংলা।

বাংলার ও বাঙালীর উন্নতির চেষ্টা বাঙালীকেই করিতে হইবে—নহিলে সে চেষ্টা কখনও সফল হইবে না। তাই আমরা আশা করি, আজ যে-চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, তাহা অদূর ভবিষ্যতে বাঙালীর সাহায্যে সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইবে—বাংলা আবার তাহার পূর্বরূপ ফিরিয়া পাইবে।

পোয়ে নৃত্য



পোয়ে নৃত্য

ব্রহ্মদেশের একরকম লোকনৃত্যকে 'পোয়ে নৃত্য' বলে।

পোয়ে নৃত্যে সাধারণতঃ দুইটি মেয়ে, দুইটি অভিনেতা ও কয়েকটি বাদ্যকর থাকে। প্রথমে একটি মেয়ে নৃত্য করে। পরে অভিনেতারা হাসি-তামাসার কথা বলিয়া আসর জমায়। অতঃপর দ্বিতীয় মেয়েটি আসরে অবতীর্ণ হয়। এই রূপে এক একটি মেয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা নৃত্য করে। অভিনেতাদের ভাষা বুঝা যায় না বটে কিন্তু তাহাদের ভাবভঙ্গী বেশ কৌতুকপ্রদ।

নর্তকীদের মাথার চুল মুকুটের মত করিয়া বাঁধা। সেই চুলের গায়ে ঝোলে ফুলের মালা। ইহার ফিন্ফিনে পাতলা আদির কোট পরে, গলায় পরে নানা রঙের জরি, কাচ, সাজের মালা ও হার। রাত্রির আলোতে এই সব ঝক্‌ঝক্‌ করে। ইহাদের পরণে রঙীন রকমারি লুঙ্গী। পায়ে মোজা, তাহার উপর সোনার একগাছি করিয়া মল।

নৃত্যকালের বাদ্য বড়ই মনোরম—তাল লয় সংবদ্ধ! তিমিরবরণের বাদ্য যাহারা শুনিয়াছেন তাহাদের পক্ষে এই বাদ্য কত উচ্চাঙ্গের তাহা বুঝা কঠিন নয়। তাল মান জ্ঞানে ইহার সত্যই উন্নত। অথচ ইহার মুখ, নিরঙ্কর।

পোয়ে নৃত্য কতকটা আমাদের দেশের যাত্রার মত। ধনীরা এই নৃত্যের আয়োজন করিয়া থাকেন। ধনীদের বাড়ির চত্বরে বা বাহিরে রাতায় একটি স্থানে মঞ্চ তৈরি হয়। সেখানে নৃত্য ও অভিনয় হয়। ধনী দরিদ্র, পাড়া-প্রান্তবেশী সকলেই মঞ্চের চারিদিকে সমবেত হইয়া ইহা দর্শন করে।

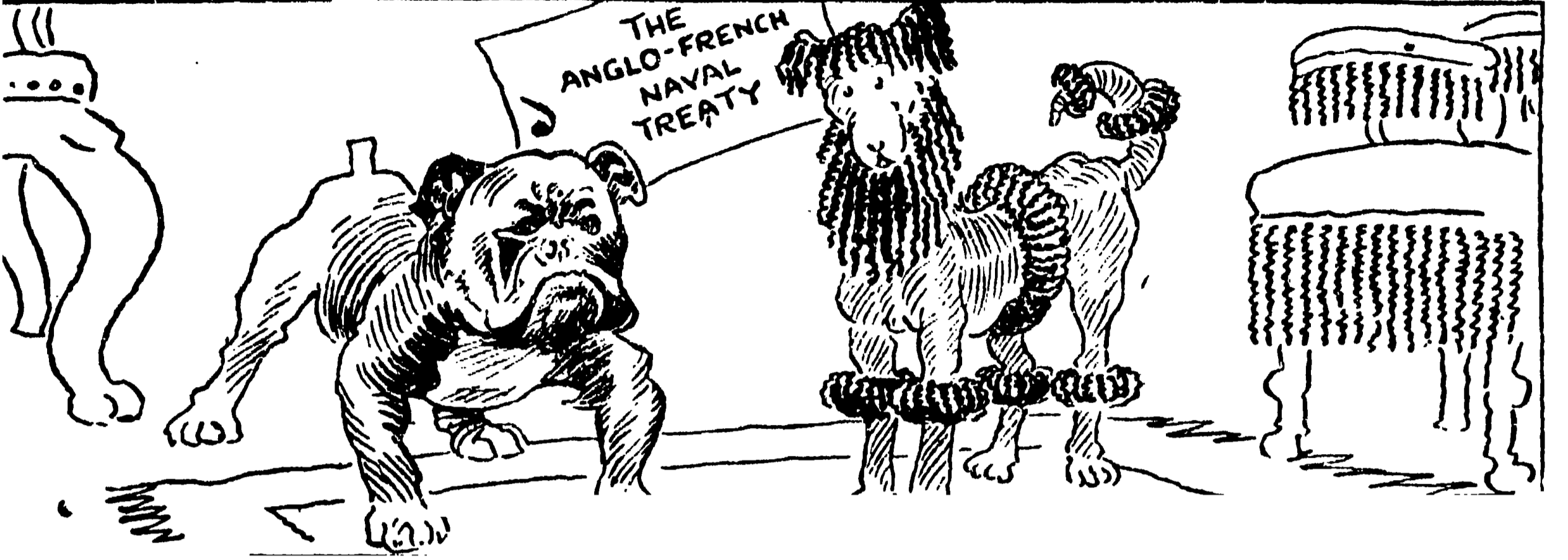
ব্রহ্ম-সরকার এই পোয়ে নৃত্যের পোষকতা করিয়া থাকেন। লাটের বাড়িতে, স্কুলে-কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এই নৃত্য হয়। সাধারণের আমোদ-প্রমোদের জন্ত রেডুন কর্পোরেশন প্রায় সপ্তাহে পোয়ে নৃত্যের আয়োজন করিয়া থাকেন।

প্রসিদ্ধ নর্তকী পাভলোভা তাহার পুস্তকে পোয়ে নৃত্যের প্রশংসা করিয়াছেন। নৃত্যকলাবিশারদ উদয়শঙ্করের এই নৃত্য এত ভাল লাগিয়াছিল যে, তিনি ইহার অনুকরণে একবার নৃত্য করিয়াছিলেন।

পোয়ে নৃত্যে মিঞা তান জি ও মা তান জি ইদানীং বেশ নাম করিয়াছেন। ইহাদের দলের নাম "ভাসিটি ট্রুপ" (Versity Troup)—মিঞা তান জি ইহার প্রধান নর্তকী। মিঞা তান জির নৃত্যে ব্রহ্মদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা মুগ্ধ।

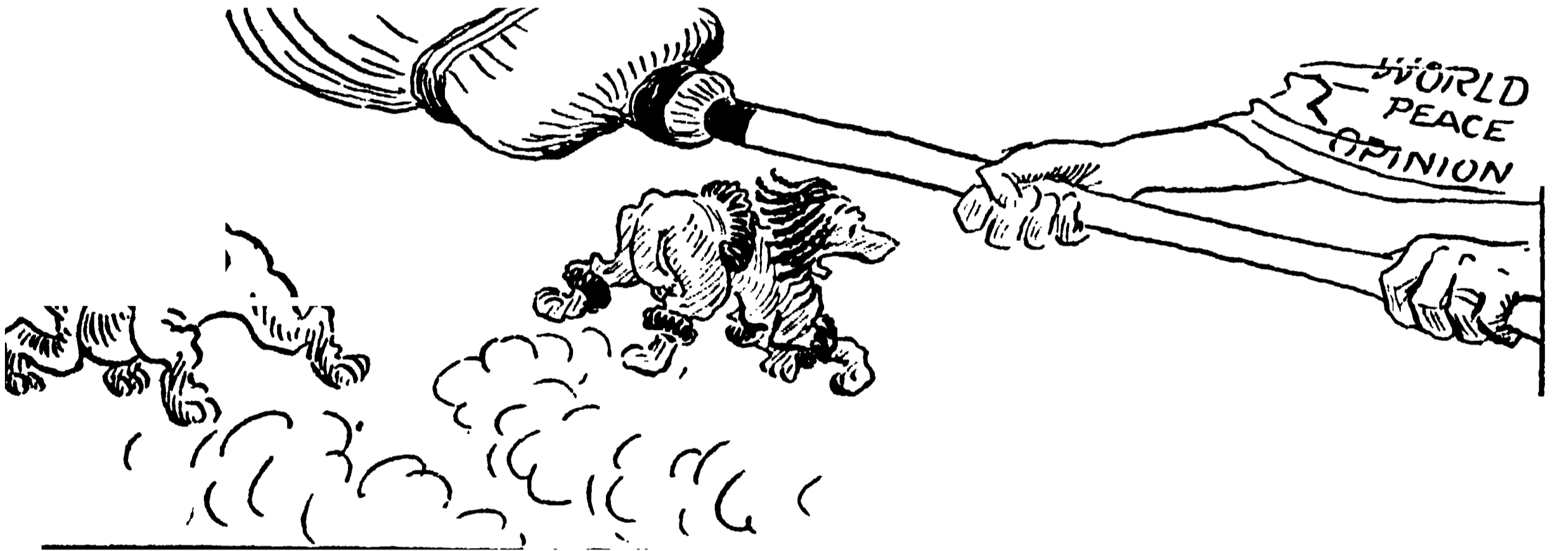
আমেরিকার চোখে ইউরোপ

দুর্ভাগ্যকর আন্তর্জাতিক বিবাহ !



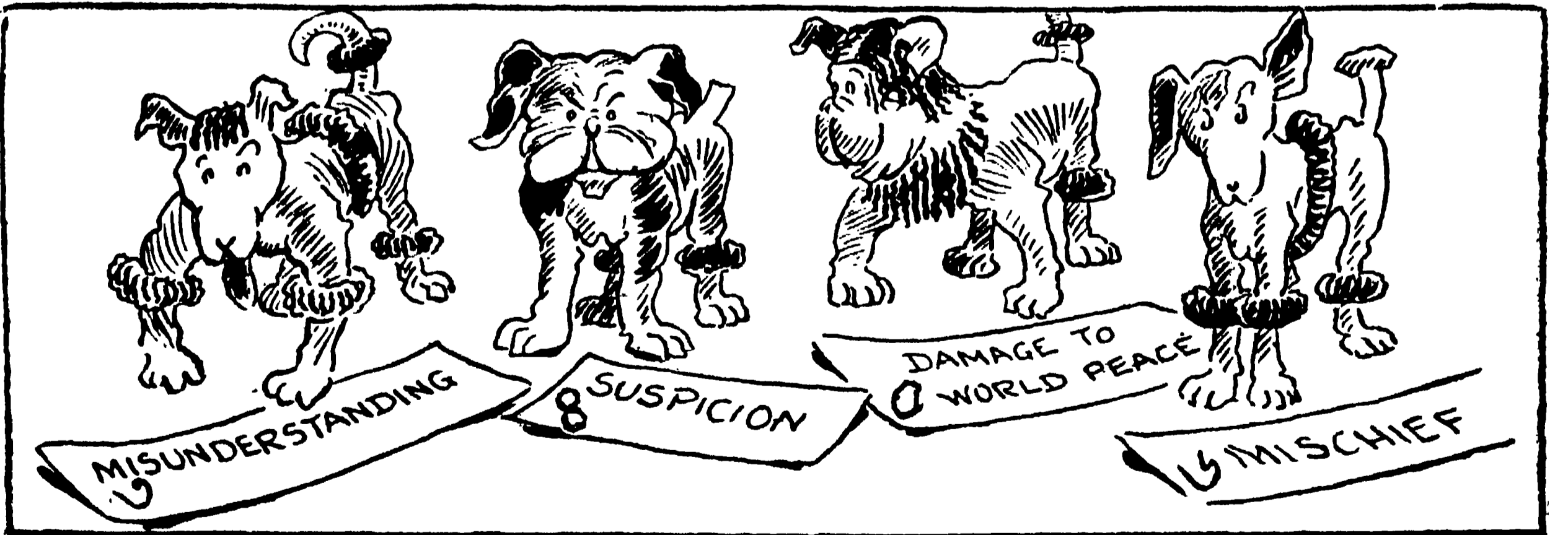
বিবাহিত।

১। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যে জলযুদ্ধ ও রণতরী সম্বন্ধে সন্ধি হইয়াছিল, তাহাকে আমেরিকান্ ব্যঙ্গচিত্রকর বিবাহ বলিয়াছেন।



বিবাহ বিচ্ছিন্ন।

২। পৃথিবীব্যাপী শান্তিপ্ৰবণ মতের চোটে ইঙ্গ-ফরাসী বিবাহ টিকিল না।



কুফল।

৩। পরস্পরকে ভুল বুঝা। ৪। সন্দেহ। ৫। জগতের শান্তির ক্ষতি। ৬। অনর্থ।



নেতৃত্বের জন্য ঝগড়া !

- ৭। বৃহৎ জাতিসমূহ।
- ৮। ক্ষুদ্র জাতিসমূহ।
- ৯। পৃথিবীর ভাগ্য।
- ১০। লীগ অব নেশন্স বা জাতিসংঘ।
- ১১। ইউটোপিয়ায় বা কাল্পনিক আনন্দময় দেশের অভিমুখে।

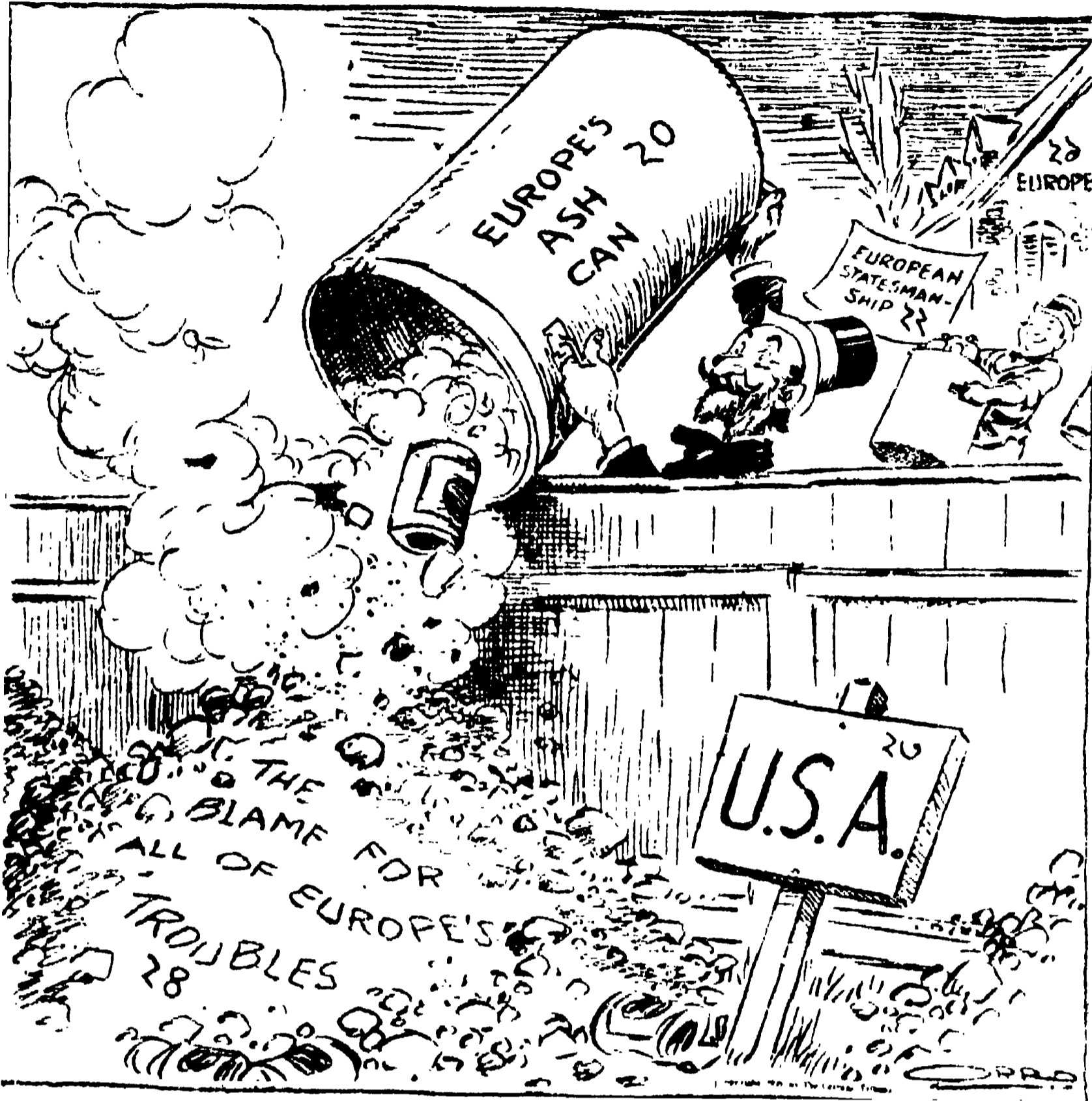
মানবজাতিকে ইউটোপিয়ায় লইয়া
 যাইবে কে, তাহা লইয়া
 ঝগড়া !

আরও ফাঁপিতেছে !

- ১২। মুসোলিনীর ক্ষমতার বিস্তার।
- ১৩। ইটালীর রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল।
- ১৪। সিংহাসন।
- ১৫। রাজনৈতিক দলসমূহ দলন।
- ১৬। সংবাদপত্র দমন।
- ১৭। বক্তৃতার স্বাধীনতা লোপ।
- ১৮। সভা করিয়া সমবেত হইবার অধিকার লোপ।
- ১৯। ধর্ম বিষয়ক স্বাধীনতায় ব্যাঘাত উৎপাদন।



আমেরিকা ইউরোপের আস্তাকুড় !



- ২০। ইউরোপের আবর্জনার পাত্র
উজাড়।
- ২১। ইউরোপ।
- ২২। ইউরোপীয় রাজনীতি-
কৌশল।
- ২৩। আমেরিকার ইউনাইটেড
স্টেটস।
- ২৪। ইউরোপের সব ঝগড়ার
বাহা মূলভূত।

এই ছবিতে এই ব্যঙ্গ করা হইতেছে যে, ইউরোপের সব ওঁচা লোক ও অল্প আবর্জনা আমেরিকায় ঢালিয়া দেওয়াই ইউরোপের রাজনীতিকৌশল! তাহারাই নাকি ইউরোপের সব অনর্থের মূল।

এই ছয়খানি ছবিতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে, লাগ্ন অব্-নেশ্বনের সভা বড় ও ছোট জাতিসমূহকে, মুসোলিনাকে, এবং সমগ্র ইউরোপকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। এগুলি আমেরিকার সংবাদপত্র হইতে গৃহীত।

কেবল মুসোলিনাই যে অল্প সকলের সব রকমের স্বাধীনতা লোপ করিতেছে, তাহা নহে। ইউরোপে ও এশিয়ায় অল্প অনেক স্বাধীনতাশত্রু স্বদেশে বা বিদেশে এইরূপ চক্রম্বয় করিতেছে।

“মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[গত ১৩৩৯ সালের ভাদ্র মাসের প্রবাসী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ মক্তব মাদ্রাসার বাংলা ভাষা বিষয়ে যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন তাহারই আলোচনা করিয়া জনৈক মুসলমান পত্রলেখক কবি কে একটি চিঠি দেন। নিম্নলিখিত পত্রট তাহারই উত্তর স্বরূপে লিখিত। পত্রলেখকের বক্তব্য কি ছিল তাহা জানিলে কবির উত্তরটি দুনিবার পক্ষে অধিকতর সুবিধা হইবে এই জন্ত তাহার চিঠি হইতেই কয়েকটি পংক্তি তুলিয়া দিতেছি।

“বাংলার মুসলমান যেদিন হাতে দ্বাধে পেরেছে বাংলা তার নিজের ভাষা সেদিন হাতে সে তার ভাষায় নিজেদের হামেশা বোলচালের দু-একটা শব্দ ক্রমশঃ এ্যাবজরব করে নিচ্ছে।”

“মুসলমান ঘরে ‘মা’কে ‘আম্মা’ বলে। লিখতে বসে ঠিক ‘আম্মা’ না বললে তার মা ডাকার সাধ মেটে না। প্রাণের ভাষাকে কলম যদি নকল না করে তর্জমা করতে সুরু করে তবে অচিরে সাহিত্য একটা স্বষ্টজালা ভাষার অভিনয় মাত্র হবে।”

ও

সবিনয় নিবেদন,

সর্বপ্রথমে বলে রাখি আমার স্বভাবে এবং ব্যবহারে হিন্দু মুসলমানের ছন্দ নেই। দুই পক্ষেরই অত্যাচারে আমি সমান লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হই এবং সে রকম উপদ্রবকে সমস্ত দেশেরই অগৌরব বলে মনে করে থাকি।

ভাষা মাত্রেই একটা ইতিহাসমূলক মজ্জাগত স্বভাব আছে, তাকে না মানলে চলে না। স্কটল্যান্ডের ও ওয়েলসের লোকে সাধারণত আপন ঘরে ঘরে স্বজন পরিজনের মধ্যে সর্বদাই যে সব শব্দ ব্যবহার করে তাকে তারা ইংরেজী ভাষার মধ্যে চালাবার চেষ্টা মাত্র করে না। কেননা, তারা এই সহজ কথাটি মনে নিয়েছে যে, যদি তারা নিজেদের অভ্যস্ত প্রাদেশিকতা ইংরেজী ভাষায় ও সাহিত্যে চালাতে চায় তা হলে ভাষাকে বিকৃত ও সাহিত্যকে উচ্ছৃঙ্খল করে তুলবে। কখনো কখনো বর্নস (Burns) প্রভৃতি বিখ্যাত স্কচ লেখক যখন কবিতা লিখেছেন তখন সেটাকে স্পষ্টত স্কচ ভাষারই নমুনাক্রমে স্বীকার করেছেন। অথচ স্কচ ও ওয়েলস ইংরেজের সঙ্গে এক নেশনের অন্তর্গত।

আমরল্যাণ্ডে একদা আইরিশে ব্রিটিশে “ব্লাক্‌ গ্যাণ্ড ট্যান্‌”

নামক বীভৎস খুনোখুনি ব্যাপার চলেছিল, কিন্তু সেই হিংস্রতার উত্তেজনা ইংরেজী ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে নি। ওয়েলসবাসী ও আইরিশরা অনেকে দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্ত এখন তাঁদের প্রাচীন কেল্টিক ভাষা অবলম্বন করতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু তাঁদের কবি ও লেখকেরা তাঁদের রচনায় যে ইংরেজী ব্যবহার করেন সে অবিমিশ্র ইংরেজীই। তাঁদের লিখিত ইংরেজীর মধ্যে পারিবারিক বা প্রাদেশিক ভাষার শব্দ আরোপ করবার চেষ্টা মাত্র তাঁরা করেন নি। এ থেকে ঐ সকল জাতির সভ্য মনোভাবেরই প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই।

আজকের বাংলা ভাষা যদি বাঙালী মুসলমানদের ভাব সুস্পষ্টরূপে ও সহজভাবে প্রকাশ করতে অক্ষম হয়, তবে তাঁরা বাংলা পরিত্যাগ করে উর্দু গ্রহণ করতে পারেন। সেটা বাঙালী জাতির পক্ষে যতই দুঃখকর হোক না, বাংলা ভাষার মূল স্বরূপকে দুর্ব্যবহারের দ্বারা নিগীড়িত করলে সেটা আরো বেশি শোচনীয় হবে।

ইংরেজীতে সহজেই বিস্তর ভারতীয় ভাষার শব্দ চলে গেছে। একটা দৃষ্টান্ত jungle—সেই অজুহাতে বলা চলে না, তাই যদি হ’ল তবে কেন “অরণ্য” শব্দ চালাব না। ভাষা খামখেয়ালি। তার শব্দনির্বাচন নিয়ে কথা কাটাকাটি করা বৃথা।

বাংলা ভাষায় সহজেই হাজার হাজার পারসি আরবি শব্দ চলে গেছে। তার মধ্যে আড়াআড়ি বা কৃত্রিম জেদের কোন লক্ষণ নেই। কিন্তু যে-সব পারসি আরবি শব্দ সাধারণ্যে অপ্রচলিত, অথবা হয়ত কোনো এক শ্রেণীর মধ্যে বদ্ধ, তাকে বাংলা ভাষার মধ্যে প্রক্ষেপ করাকে জ্বরদস্তি বলতেই হবে। হত্যা অর্থে খুন ব্যবহার করলে বেখাপ হয় না; বাংলার সর্বজনের ভাষায় সেটা বেমালুম চলে গেছে। কিন্তু রক্ত অর্থে খুন চলে নি, তা নিয়ে তর্ক করা নিফল।

উর্দু ভাষায় পারসি আরবি শব্দের সঙ্গে হিন্দী ও সংস্কৃত

শব্দের মিশ্রণ চলছে—কিন্তু স্বভাবতই তার একটা সীমা আছে। কোনো পণ্ডিতও উদ্ভুলেখার কালে উদ্ভূই লেখেন। তার মধ্যে যদি তিনি “অপ্রতিহত প্রভাবে” শব্দ চালাতে চান তাহলে সেটা হাস্যকর বা শোকাবহ হবেই।

আমাদের গণশ্রেণীর মধ্যে যুরেশিয়েরাও গণ্য। তাঁদের মধ্যে বাংলা লেখায় যদি কেউ প্রবৃত্ত হন এবং বাবা মা শব্দের বদলে পাপা মামা ব্যবহার করতে চান এবং তর্ক করেন, ঘরে আমরা ঐ কথাই ব্যবহার করে থাকি, তবে সে তর্ককে কি যুক্তিসঙ্গত বলব? অথচ তাঁদেরকেও অর্থাৎ বাঙালী

যুরেশিয়কেও আমরা দূরে রাখা অন্তায় বোধ করি। খুশী হ তাঁরা বাংলা ব্যবহার করলে; কিন্তু সেটা যদি যুরেশিয় বাংলা হয়ে ওঠে তাহলে দিক্কার দেব নিজের ভাগ্যকে। আমাদের ঝগড়া আজ যদি ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে সাহিত্যে উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ হয়ে ওঠে, তবে এর অভিসম্পাত আমাদের সভ্যতার মূলে আঘাত করবে। ইতি ১১ই, চৈত্র ১১৪০।

ভবদীয়
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহিলা-সংবাদ

কলিকাতার কয়েকটি চিত্র-প্রদর্শনীতে যে-সব মহিলার আঁকা ছবি প্রশংসিত হইয়াছে তাঁহাদের নামের তালিকা গত মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। মহিলাদের মধ্যে শ্রীমতী রমা বসু অন্যতম। শ্রীমতী রমা চিত্রাঙ্কনে বিশেষ পারদর্শিনী। তাঁহার যে চিত্রগুলি প্রশংসিত হইয়াছে তাহার মধ্যে “শেষ আরতি” মাত্র পনের বৎসর বয়সে ও “নিরঙ্কনা” ষোল বৎসর

উভয় সম্প্রদায় হইতে অধিকসংখ্যক ভোট পাইয়া যশোহর মিউনিসিপালিটির সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। কলিকাতা



শ্রীমতী রমা বসু

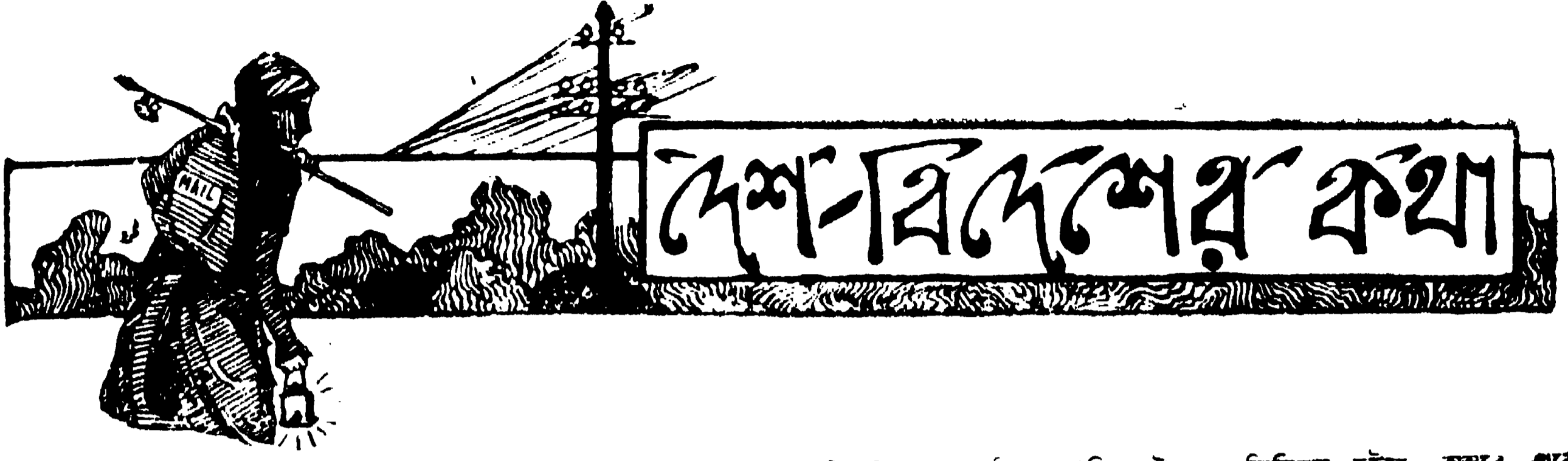
বয়সে আঁকা। তিনি গৃহে বসিয়া মাতার নিকট চিত্রে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার মাতা শ্রীমতী প্রভাময়ী মিত্রের আঁকা ছবিও প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত হইয়াছে।

শ্রীযুক্তা আমেনা খাতুন গত ২৩এ মার্চ হিন্দু ও মুসলমান



শ্রীযুক্তা আমেনা খাতুন

করপোরেশন ছাড়া বঙ্গদেশের মিউনিসিপালিটিতে তিনিই প্রথম মহিলা-সদস্য নির্বাচিত হইলেন।



বাংলা

কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দির—

চন্দননগরে শ্রীযুক্ত হারহর শেঠ মহাশয় প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দির নামক যে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন

পরিবর্তন সাধন করিয়া বাহির হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবে, অন্তরে প্রবেশ করিয়া, আমাদের একান্ত নিজস্ব চরিত্র-সম্পদ হইতে আমাদের বিচ্যুত করিতে পারিবে না, এই সঙ্কল্প দৃঢ়রূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়া ব্রহ্মচারিণী বিদ্যাগিণীকে শিক্ষারত উদ্যাপন করিতে হইবে।

“তোমরা এই প্রতিষ্ঠানে যে শ্রমোগ লাভ করিয়াছ তাহার যথাসাধ্য



কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা মন্দিরে পুরস্কার-বিতরণ সভা

করিয়াছেন ও চালাইতেছেন, তাহার পরিচয় আমরা আগে আগে দিয়াছি। এখানে বালিকাদিগকে সন্ধ্যাকাল শিক্ষা দিবার আয়োজন আছে এবং চেষ্টা করা হয়। ইহার গত পুরস্কার-বিতরণ সভায় ছাত্রীদিগকে সম্বোধন করিয়া সভানেত্রী বেথুন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীমতী ভাটনৌ দাস বলেন :—

“সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সমস্ত প্রতিকূল শিক্ষার মধ্যেও আমাদের নিজস্ব বিশেষত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। আমরা আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিতেছি, পশ্চিমের ভাষা কলা বিজ্ঞান বহু বিষয়েরই সহায়তা প্রতিনিয়ত আমাদের গ্রহণ করিতে হইতেছে। বিদ্যার এই আদান-প্রদান নিম্ননায় নহে, কারণ বিদ্যার জাতিভেদ নাই। যাহা-কিছু শিক্ষণীয় স্বদেশীয়-বিদেশীয় নিকশেষে আমরা তাহা গ্রহণ করিব, কিন্তু এই শিক্ষার মধ্যে আমরা নিজেকে হারাইয়া ফেলিব না। বিদেশাগত বিদ্যা আয়ত্ত করিতে গিয়া, সকল রকমে বিদেশীয়ে অধিকার করিব না। বিদ্যার মধ্যে যাহা বাহিরের বস্তু, তাহা বাহির হইতে আসিয়া, বাহিরের

ব্যবহার করিয়া লও, প্রভূত পরিমাণে বাহিরের বিদ্যা আয়ত্ত কর কণ্ড তাহার মধ্যে আত্মসমাহিত থাকিও, বাহিরের মোহে মুগ্ধ হইয়া অন্তরের পরম বস্তুকে বিস্মৃত হইও না।



কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দির—চন্দননগর

“যাঁহার স্মরণে এই শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহার পুত্র চরিত্রের মাধুর্য্য তোমাদের অন্তরে প্রতিকলিত হউক।”

হুগলী জেলার ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ও সাহিত্যিক সমিতি—

গত মাসে চুঁচুড়ায় একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ও সাহিত্যিক সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। সমগ্র হুগলী জেলা আপাততঃ ইহার কার্যক্ষেত্র হইবে। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ ইহার সভাপতি ও শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রদেব রায় মহাশয় ইহার সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন ‘চুঁচুড়া বার্তাবহে’র সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ মুখোজ্যে, শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ আচা, শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোজ্যে, শ্রীযুক্ত কানাইলাল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত হুবোধ রায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বড়োজ্যে, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল, শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন মুখোজ্যে ও শ্রীযুক্ত কপীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। রাজশাহীর বয়েস-অনুসন্ধান-সমিতি অনেক ঐতিহাসিক গবেষণা করিয়াছেন এবং একটি মিউজিয়মে প্রাচীন মুক্তি, শিলালিপি প্রভৃতি রাখিয়াছেন। হুগলীর সমিতিটিরও ক্রমে ক্রমে এইরূপ কাজ করিতে পারা উচিত।

চুঁচুড়ায় প্রাচ্যকলা প্রদর্শনী—

চুঁচুড়ায় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মণ্ডলের চণ্ডীমণ্ডপে একটি প্রাচ্যকলা-প্রদর্শনী গত মাসে খোলা হয়। তাহাতে অনেক ছবি, কাঠের কাজ, কাপড়ের উপর সেলাইয়ের কাজ এবং চামড়ার কাজ প্রদর্শিত হয়। চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায় ইহা উদ্বোধন করেন। মফস্বলের সর্বত্র এইরূপ প্রদর্শনী হওয়া উচিত।

চুঁচুড়া দেশবন্ধু স্মৃতিরক্ষক বিদ্যালয়—

চুঁচুড়ায় দেশবন্ধু স্মৃতিরক্ষক বিদ্যালয় একটি সুপরিচালিত বিদ্যালয়। ছাত্র ভিন্ন ইহা হইতে একটি বালিকাও প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং আরও কয়েকটি ছাত্রী এখানে পড়িতেছে।

তালতলায় সাহিত্য-সম্মেলন—

তালতলা সাধারণ পুস্তকালয়ের উদ্যোগে এ-বৎসরও কুমার সিংহ হলে অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদারের সাধারণ সভাপতিত্বে সাহিত্য-সম্মেলনের অধিকেশন হইয়াছিল। ইহাতে অনেকগুলি ভাল অভিভাষণ ও প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। প্রতি বৎসর কুমার সিংহ হল ব্যবহার করিতে দিয়া শ্রীযুক্ত পুরণচাঁদ নাহার সর্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বোড়াল গ্রামে রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি-বার্ষিকী—

চব্বিশ পরগণার বোড়াল গ্রামে স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের শেষ ভাগ তিনি বৈদ্যনাথ-দেওগরে যাপন করেন। বোড়ালে এখনও তাঁহার বাসগৃহের বৈঠকখানা অংশের দেওয়াল-গুলি দাঁড়াইয়া আছে। চারিদিকের বাগান জঙ্গলময় হইয়াছে। বোড়ালের মিলনসঙ্ঘ তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্ত বার্ষিক সভা করিয়া থাকেন, গত মাসেও করিয়াছিলেন। সঙ্ঘ যদি বসু মহাশয়ের বাড়ির গুণাবশেষ মেরামত করাইয়া তাহাতে কোন গ্রামহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। বসু মহাশয়ের বাংলা ও ইংরেজী গ্রন্থাবলী তাঁহার তাঁহার দৌহিত্রী শ্রীমতী কুমুদিনী বসু ও দৌহিত্র শ্রীযুক্ত হুমুদার মিত্রের সহযোগিতায় পুনর্মুদ্রণ করাইলে একটি জাতীয় কর্তব্য করা হইবে। পাঁচ শত খণ্ড বিক্রী হইলেই গ্রন্থাবলীর ব্যয় নির্বাহিত হইবে। উহার আনুমানিক ব্যয় স্থির করিয়া উজোস্তারা যদি পাঁচ শত জন গ্রাহক সংগ্রহের চেষ্টা করেন, তাহা সম্ভব হইবে মনে করি। আমরা গ্রাহক-সংগ্রহ কাণ্ডের সাহায্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ দ্বারা করিতে পারি। সুবিধাতঃ শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ বসু মহাশয়ের দৌহিত্র।

তিনি মাতামহের গ্রন্থাবলী প্রকাশে তাঁহার প্রভাবের সাহায্য দিলে কাজ অগ্রসর হইতে পারে। বসু মহাশয় যে কিরূপ খাঁটি স্বাভাবিক ছিলেন, তাহা আজকালকার তরুণেরা জানেন না। তিনি ধর্ম্ম-সংস্কারক ও সমাজ-সংস্কারক ছিলেন বলিয়া তাঁহার অনাদর হওয়া উচিত নয়।

কোমলগরের বিদ্যালয়ে পারিতোষিক বিতরণ উৎসবে লোকনৃত্য—

কোমলগর ইংরেজী বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণ উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত প্রবর্তিত কিছু লোকনৃত্য বালাকেরা দেখাইয়াছিল। নৃত্যগুলি স্মৃতিবি্যঞ্জক, স্মৃতিজনক ও নির্দোষ আমোদপ্রদ। যে অল্পবয়স্ক পরিবর্তন আবশ্যক মনে হইল, তাহা দুঃসাধ্য নহে।

চট্টল দিয়াশলাই কারখানা—

চট্টগ্রামে “চট্টল দিয়াশলাই কারখানা” নাম দিয়া একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনটি জাপানী কল ছাড়া ইহার আর সমস্ত কল কলিকাতার ভবানী এঞ্জিনিয়ারিং ট্রেডিং কোম্পানী নির্মাণ করিয়াছেন, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই কারখানার দিয়াশলাই শীঘ্রই বাজারে বাহির হইবে।

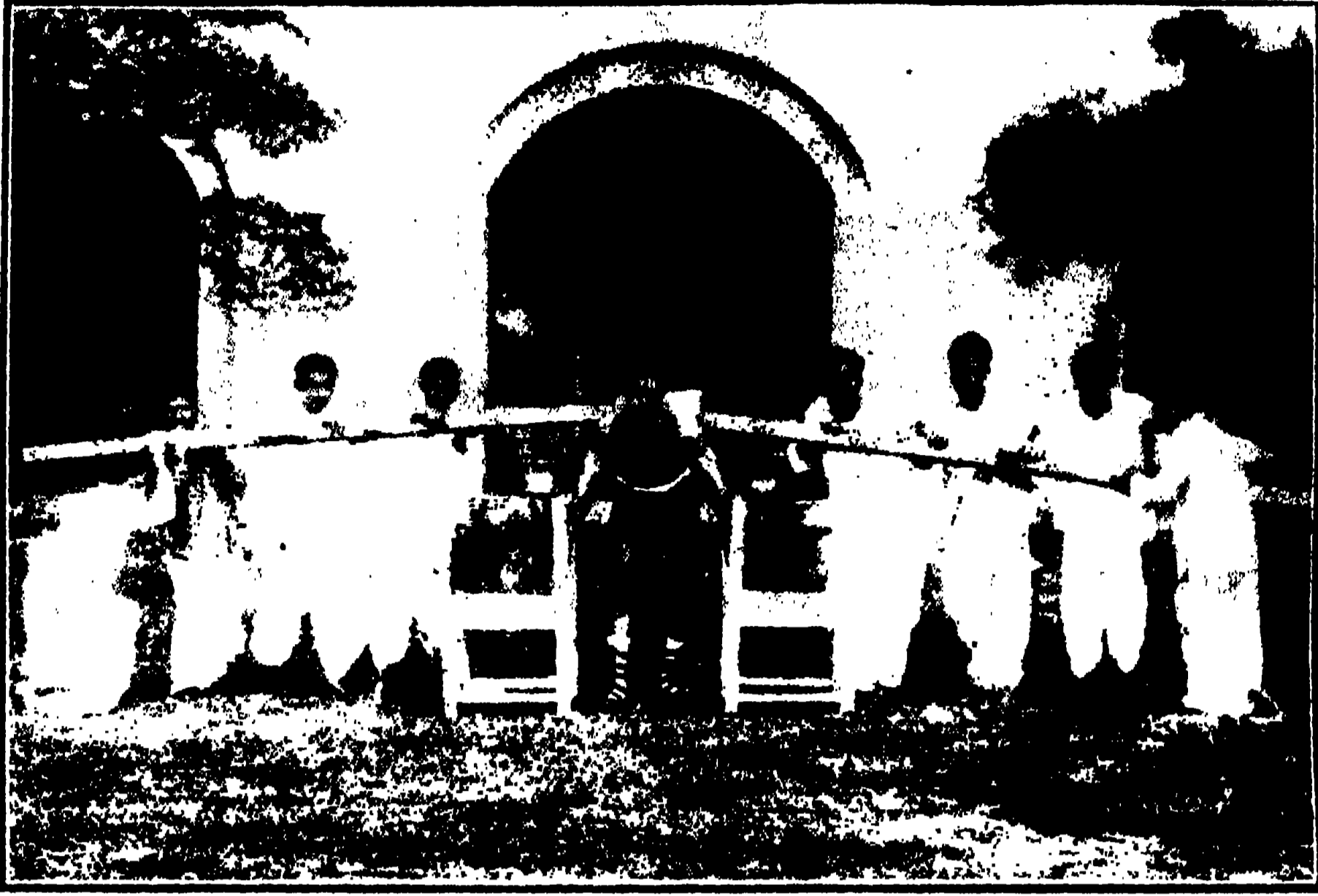
কৃতী বাঙালী ছাত্র—

শ্রীযুক্ত রুশ্বীণীকিশোর দত্তরায় সম্প্রতি জার্মেনী হইতে দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। জার্মেনীর হেনোফের টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (Technical University, Hannover) হইতে তিনি কৃতিত্বের সহিত জার্মেনীর সর্বোচ্চ স্টেট ডিগ্রী (State Degree) ডক্টর অব ইঞ্জিনিয়ারিং



শ্রীযুক্ত রুশ্বীণীকিশোর দত্তরায়

(Dr. Eng.) লাভ করিয়াছেন। তিনি তথাকার কেমিক্যাল টেকনোলজিকেল ইনস্টিটিউশনের ডিরেক্টর প্রথিতযশা অধ্যাপক ডাঃ কেপলারের



শ্রীযুক্ত ভূপেশচন্দ্র কর্মকার দুই মণ ওজনের লৌহদণ্ড বাঁকাইতেছেন।
দণ্ডটির পরিমাণ ১৮' x ৩" x ৪"

অধীনে ভারতীয় কয়লা সঙ্ঘকে মৌলিক গবেষণা করিয়া ভারতবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম উপরি উক্ত সম্মান লাভ করিয়াছেন।

চিত্রে দেওয়া হইল। বাঙালী যুবকগণের শরীর-মনের উন্নতিতে অধিকতর মনোযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শক্তি-সাধনায় বাঙালী—

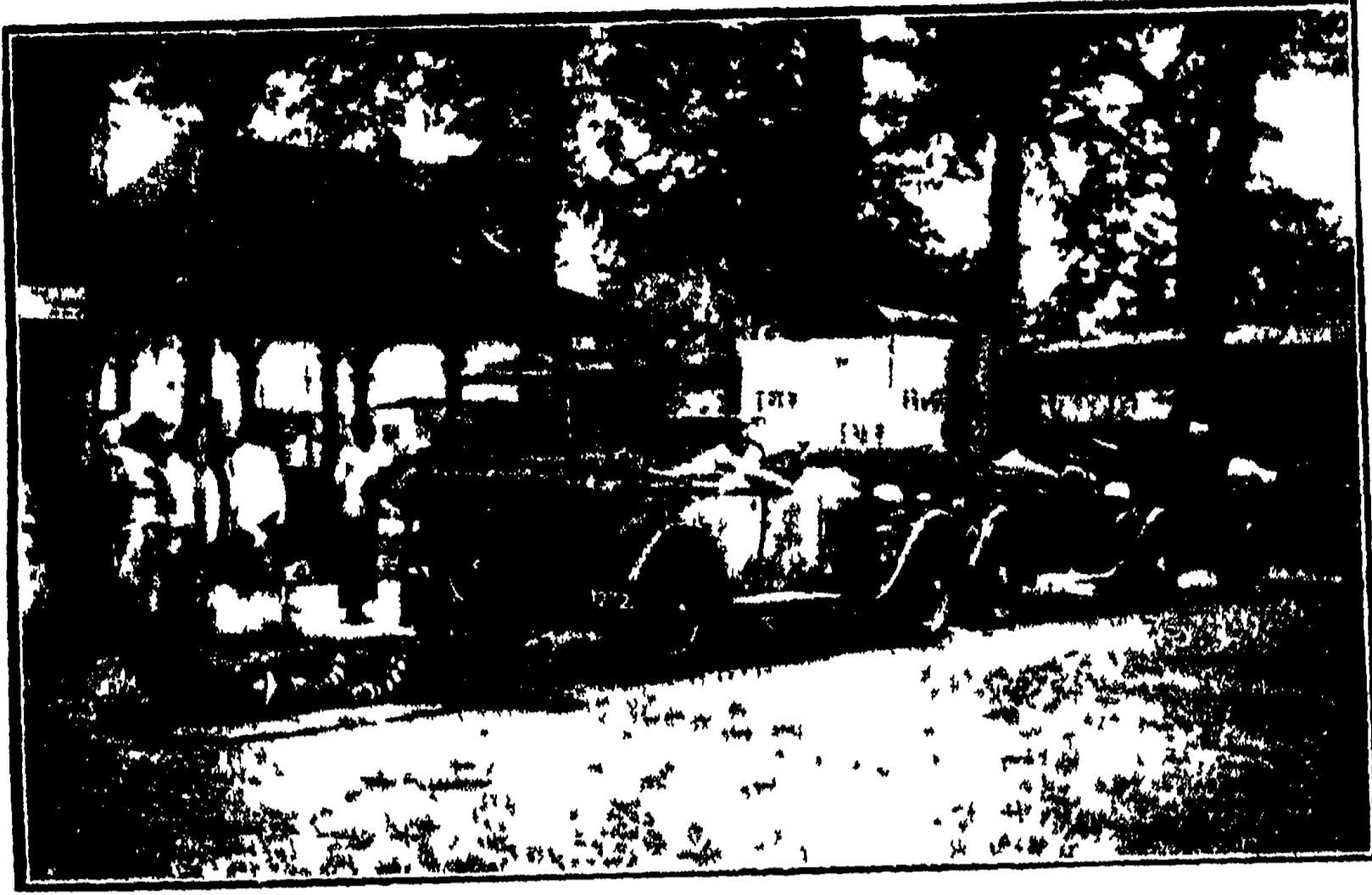
স্বদেশী-আন্দোলনের সময় হইতে বাঙালীরা সমষ্টিগত ভাবে শারীর চর্চার দিকে অবহিত হইয়াছে। এই প্রচেষ্টা ইদানিং দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই শক্তি-সাধনার ক্ষেত্রে কলিকাতার সিটি কলেজের দান যথেষ্ট। সিটি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ১৯২০ সনে কলেজে একটি ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ গুহঠাকুরতা ব্যায়াম-শিক্ষক রূপে উহাতে যোগদান করেন। গুহঠাকুরতা মহাশয়ের শিক্ষকতা ও সাহচর্যে একদল শিক্ষিত শক্তিমান যুবক গঠিত হইয়াছে। ইহার পর ১৯২৫ সনে ইউনিভার্সিটি ল কলেজের কর্তৃপক্ষ ও তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলার বিচারপতি গ্রিভস সাহেবের উৎসাহে ঐ কলেজেও একটি ব্যায়ামাগার স্থাপিত হয়। এখানেও রাজেন্দ্রবাবুই শিক্ষক নিযুক্ত হন।

ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্রনাথ বাঁড়ুজ্যে, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতির উৎসাহে ১৯২৭ সনে নিখিল-বঙ্গ শারীর অকুশীলন সমিতি (All-Bengal Physical Culture Association) স্থাপিত হয়। সশিখর রাজেন্দ্রবাবু ও কলিকাতার অস্কাঙ্ক ব্যায়ামবীরগণের চেষ্টায় ইহা ক্রমেই প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে। সমিতির নিজস্ব ব্যায়ামাগার স্থাপনের জন্ত কলিকাতা করপোরেশন শহরের মধ্যস্থলে এক বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ভূপেশচন্দ্র কর্মকার রাজেন্দ্রবাবুর একজন বিশিষ্ট ছাত্র। তিনি শারীর চর্চার বিভিন্ন ধারায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। পেশী সঞ্চালনে লৌহদণ্ড বক্র করায় ও চলন্ত মোটর গাড়ীর গতিরোধে ইতিমধ্যেই বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছেন। এইখানে তাঁহার কয়েকটি



পেশী-সঞ্চালন-নিরত শ্রীযুক্ত ভূপেশচন্দ্র কর্মকার



ভূপেশবাবু এক কালীন তিনখানা মোটর গাড়ীর গতিরোধ করিতেছেন

পরলোকে কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ—

ভাটপাড়া-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন স্মৃতিশাগ্রে তাহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছি। তিনি অনিরুদ্ধ ভট্ট (একাদশ শতাব্দী), চন্দ্রেশ্বর ঠাকুর (চতুর্দশ শতাব্দী), বাচস্পতি মিশ্র, বঙ্কমান উপাধ্যায় ও গোবিন্দানন্দ কবিকঙ্কণচাবী (সোড়শ শতাব্দী) প্রভৃতি রঘুনন্দন-পূর্ব অজ্ঞাত স্মৃতকারগণের গ্রন্থ উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বিব্রিওথিকা ইণ্ডিকা গ্রন্থমালার কয়েকখানি গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুতে বাংলা দেশ এক জন প্রসিদ্ধ পাণ্ডিত হারাইল।

শিক্ষার জন্ত দান—

ডক্টর শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এপযাস্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাড়াও লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। তাহা বাঙালী প্রচেষ্টান্ত খৃষ্টিয়ান যুবকদের উচ্চতর শিক্ষাদির জন্ত। পণ্ডিত ধনশালী ব্যক্তির পক্ষেও একপ দান প্রশংসনীয় হইত, একজন অধাপকের পক্ষে ত খুবই প্রশংসনীয়।

বায়াম-শিক্ষায় দান—

ডক্টর হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালী যুবকদের বায়ামাদির দ্বারা স্বাস্থ্যোন্নতি ও বলবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এক লক্ষ টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। উদ্দেশ্য ও দান মহৎ।



পরলোকগত কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ

বর

শ্রীমনোজ বসু

এতক্ষণে সময় হইল বুঝি !

দোর খুলিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া সম্ভূর্ণে ছায়ামূর্তি ঘরের মধ্যে আসিল। আসিয়া করিল কি—জানালার ধারে যেখানে উমা একেলা পড়িয়া আছে ঠিক সেই খানটিতে একেবারে শিয়রের উপর বসিয়া চোখের পল্লবের কাছে মুখটি নামাইয়া আনিল।

—উমারাণী, উমারাণী—

চুপ, চুপ,... কি লজ্জা !

মাঠের যেখানে যত জ্যোৎস্না ছিল স্তূপাকার মল্লিকার মতো সব কি ঘরের মধ্যে আসিয়া জমিয়াছে ! তেঁতুল গাছে কুয়োপাখী একটানা ডাকিয়া চলিয়াছে, ক্লান্তি নাই।...ফাল্গুন রাত্রির মিঠা হাওয়া এক একবার আসিয়া ছোট মেয়ের দোলনার মতো বিছানা-মশারী দোলাইয়া দিয়া যায়।

উমারাণী, রাণী গো—জাগো, চোখ দুটো মেল দিকি একবার

কিন্তু চোখ না মেলিলে কি হয়, কীর্তিকলাপ তোমার সব খে দেখা যাইতেছে ! স্বকুমার সুন্দর চোরের মুখখানি ভরিয়া মধুর চাপাহাসি। হাসিভরা সেই মুখ ধীরে ধীরে নীচু হইয়া আসিতেছে, আরো নীচু—আরো—আরো—আরো—

ধোং, দুষ্টু কোথাকার !

খিল-খিল করিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইতে উমার ঘুম ভাঙিল। .. কে কোথায় ! ঘরের দরজা বন্ধ। হঠাৎ এঞ্জিনের স্ততীর বাঁশি। নৈশ নিস্তরতা ভাঙিয়া চুরিয়া প্রলয়ের শব্দে বাড়ির পাশের রেললাইন বহিয়া এগারোটার গাড়ী স্টেশনের দিকে ছুটিয়া গেল।

পাড়ার গুটি পাচেক মেয়ে সোরগোল করিয়া রান্নাঘরে কাজে লাগিয়াছিল। বিভার ক্ষুণ্ণিটাই সব চেয়ে বেশী। গাড়ীর শব্দে তার টনক নড়িয়া উঠিল। ডাকাতির মতো ছুটিয়া আসিয়া সে এ ঘরের দরজা বাঁকাইতে লাগিল।

—গুট, গুট, এসেছে—

অলস তন্দ্রাচ্ছন্ন হাসি হাসিয়া উমারাণী বলিল—আর নেই ; চলে গেছে।

—আবার তর্ক করে। খোল না দরজা ; দেখ এসে কি চমৎকার বর—

জানে, পোড়ারমুখী আসিয়াছে যখন, না উঠাইয়া কিছুতেই ছাড়বে না। তবু যতক্ষণ পারা যায়। বলিল—তোমার বর—

—দিবি ? এদিক ওদিক তাকাইয়া বিভা বলিল—দিতে পারিস প্রাণ ধরে ?

উমারাণী সচ্ছন্দে এবং পরম নির্ভয়ে বলিয়া দিল—নি গে যা—

—ইস, দাতাকর্ণ একেবারে। বুঝেছি, বুঝেছি। কেদার মিত্তির চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে।

দুই সখীর মধ্যে কেদার মিত্তিকে লইয়া আজকাল প্রায়ই এমনি আলোচনা হয়। আসলে কিন্তু মিত্র মহাশয় মোটেই তুচ্ছ ব্যক্তি নহেন। বাড়ী তাঁর ক্রোশ দুই তিনের মধ্যে ; প্রচুর মান সম্ভ্রম, কোন অংশে কাহারও অপেক্ষা খাট নহেন—না বিত্তে না বয়সে। সম্প্রতি ভদ্রলোকের পর পর দুইটি মহা সর্কনাশ ঘটিয়া গিয়াছে। প্রথমে স্ত্রী গত হইলেন, তারপর সেই পিছু পিছু সেজ ছেলেটা। ছেলেটা আবার পথ কিছু সংক্ষেপ করিয়া লইল। রাত্রে বাপের সঙ্গে সামান্য একটু কথাস্তর—প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখা গেল, তার প্রাণহীন দেহ গোয়ালের আড়ার সঙ্গে ঝুলিতেছে। তারপর থানা, সেখান হইতে সদর। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ চুকিয়াছে এই মাস থানেকের বেশী নয়।

বিভা নিতান্ত ভাল মানুষের মতন বলিয়া চলিল—কেদার মিত্তিরই মাথা খেয়েছে। তা তোমার দোষ দেব কি তাই। একসঙ্গে অমন ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী—একেবারে একটা পুরো সংসার। কার না লোভ হয় বল্।

—দেখাচ্ছি তোমায়। বলিয়া বড় রাগে রাগে দরজা খুলিয়া উমারাণী বিভাকে টানিয়া ঘরে লইল। বলিল—

তুই বড় ইয়ে হয়েছিস। বিপদের সময় মানুষকে নিয়ে ঠাট্টা ?

— ঠাট্টা ? ককখনো না। দুঃখ করছি। বলিয়া বিভা চেষ্টা-চরিত্র করিয়া মুখখানা মলিন করিল। বলিল—বিপদই বটে। এমন সাধু সজ্জন লোকেরও এমনি দুর্গতি হয়। থানায় নিয়ে বটতলায় নাকি খাড়া দাঁড় করিয়ে দিল। তখন দারোগাকে ধরমবাপ বলে সমস্ত বেলা ধরে ভেউ ভেউ করে কাশা। বাবার কাছে গল্পটা শুনে অবধি—। কথা আর শেষ করিতে পারিল না ; প্রবল দুঃখের যন্ত্রণাতেই বোধ করি বিছানার উপর একেবারে লুটোপুটি খাইতে লাগিল।

কিন্তু উমারানী তাহাতে যোগ দিল না, স্নান হাসিয়া বলিল—কিন্তু, বুড়ো হোক, যাই হোক—ঐ কেদার মিত্রের ছাড়া তোর সইকে আর কার মনে লাগল বল দিকি ? একটু চুপ থাকিয়া গভীর কণ্ঠে বলিতে লাগিল—দাদুর অবস্থা দেখে কাশা আসে ভাই। বুড়ো মানুষ, এ দেশ সে দেশ করে এক একটা সম্বন্ধ নিয়ে আসেন ; মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে দাদুর আহা-নিদ্রা ত্যাগ। আজ এই দুপুর থেকে ষ্টেশনে যাবার ঝাঁক। বলেন, কলকাতার ছেলে পাড়াগাঁয়ে আসছে, পথঘাট চেনে না—আগে গিয়ে বসা ভাল। যেন কলকাতার ছেলেকে খাতির করে গাড়ী আজ সকাল সকাল পৌঁছে যাবে। গাড়ী ত এল এতক্ষণে, আর সেই সন্ধ্যা থেকে ষ্টেশনে গিয়ে বসে আছেন।

বিভার চোখে জল আসিয়া পড়িল। দুই জনে বড় ভাব। উমার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—বসে বসে ঐ সব ভাবছিস। আজকে বর আসবার দিন, আনন্দ করতে হয়। চল দিকি রান্নাঘরের দিকে—

হঠাৎ উমারানী বলিল—বিভা, একটা জিনিষ ধার দিবি ?

—কি ?

—তোর ঐ গায়ের রঙটা। বড় ভয় করছে। ওরা দেখে শুনে চলে গেলে কাল আবার তোকে ফিরে দেব।

বিভা একেবারে আগুন হইয়া উঠিল—তুই হিংসুক, তুই কাণা। একবার আয়না ধরেও দেখিস নে ?

উমারানী বলিল—সে ভাই, তোর চোখে। তুই যদি পুরুষ হতিস্—

—আলবৎ। গ্রীবা দোলাইয়া প্রবলকণ্ঠে বিভা বলিতে লাগিল—তা হলে নিশ্চয় তোকে বিয়ে করতাম। বিয়ে না করে সকালে ঘাড়ের উপর এক কিল, আর সন্ধ্যায় আর এক দফা। বলিতে বলিতে পরম স্নেহে উমাকে সে জড়াইয়া ধরিল। বলিল—চুলোয় যাকগে কেদার মিত্রের। আমি ছাড়া আর কারো চোখে লাগে না—বটে ? আজকে তবে কি হচ্ছে মনি ? ছবি দেখে যে পাগল হয়ে রাজপুত্রু ছুটেছে—

রাজপুত্র অর্থাৎ প্রশান্ত। কলিকাতায় কলেজে পড়ে। ফোটোগ্রাফ দেখিয়া বিচার বিবেচনা করিয়া অবশেষে আজ সে নিজের আসিতেছে। সদয়গোপাল ষ্টেশনের বেঞ্চে বসিয়া বসিয়া বিমাইতেছিলেন। চারিদিকে ফাঁকা মাঠ, বড় শীত করিতে লাগিল। চাদরটা গায়ে দিয়া কমফটার ভাল করিয়া গলায় জড়াইয়া সোজা হইয়া বসিলেন। অবশেষে গাড়া আসিল।

কলিকাতার ছেলে, দেখিয়াই চেনা যায়। দুজন আসিয়াছে। একজন টুকটুকে সুন্দর, চশমা-পরা। অপর জন ফর্সা তেমন নয়, লম্বা চওড়া স্তম্ভিত দেহ। গাড়ী হইতে নামিয়া সেই সর্বাগ্রে পরিচয় দিল—আমার নাম নিমাই গোস্বামী, নিবাস নীলগঞ্জ। পাত্র কিছুতে এল না।

সদয়গোপালের এমন ভাব হইল, বুঝি ঐখানেই বসিয়া পড়িবেন। নিমাই বলিতে লাগিল—এত করে বললাম, চলো যাই প্রশান্ত, আজকালকার দিনে এতে আর লজ্জা কি ? শিয়ালদহে এসেও টানাটানি। কিছুতে নয়। আমাদের দু'জনকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসছি বলে চম্পট।

কিন্তু বয়স কম হইলে কি হয়, নিমাই গোস্বামী অতিশয় বিবেচক ব্যক্তি। বাড়ি পৌঁছিয়া বলিল—ঐ রাত্তিরে আজকে আর হাদ্যম হুজুত করে কাজ নেই। আমরা কে ? দেখা-টেখা হবে একেবারে সেই আসল মানুষের সঙ্গে শুভদৃষ্টির সময়। আমরা দেখব শুধু তরিবৎটা। বরঞ্চ খাবার টাবার গুলো খুকীকে দিয়ে পরিবেশন করান। তাতে আন্দাজ পাওয়া যাবে—

বিভা ছুটিয়া গিয়া উমারানীকে চিমটি কাটিল।—যা খুকী,

খাবার দিগে যা। রাগের আর তার অন্ত রহিল না। খুকী! পিতামহ ভীষ্মেরা সব আসিয়াছেন কিনা, তাই খুকী বলা হইতেছে!

বিভার বাপ ভুবনবিহারী রায় চৌধুরী—চৌধুরীদের বড় তরফের কর্তা। তিনি আসিয়াছেন; রাত্রি একটু বেশী হইলেও গ্রামস্থ আরও দু'পাঁচজন আসিয়াছেন। খাইতে খাইতে নানাবিধ উচ্চাঙ্গের আলোচনা চলিয়াছে। ভুবন চৌধুরী ত নিমাইএর মুখের দিকে চাহিয়া হাঁ হইয়া গিয়াছেন। ঐ টুকু ছেলে, এই বয়সে এত শিথিয়া ফেলিয়াছে—অবলীলাক্রমে এমন করিয়া কহিয়া যায় যেন তার বিদ্যাবুদ্ধির তল নাই। পাশের ঘর হইতে বিভা উকি দিয়া দিয়া দেখিতেছিল। হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল এবং সেই আনন্দে ছুটিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে রান্নাঘরে গিয়া খবর দিল, বর আসিয়াছে, উহারই মধো আছে।

মেয়েরা নিরাশ হইয়া চলিয়া গিয়াছিল, আবার পাশের ঘরে জমায়েত হইতে লাগিল। সদয়গোপাল আনন্দে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—সত্যিই বিভা, সত্যি?

বিভা চশমা-পরা ভদ্রলোককে দেখাইয়া দিল।—দেখছেন না, কি বকম ঘাড় ঝুঁকে পড়েছে। তাকায় না, মুখ তোলে না। ঐ—ঐ—

সদয়গোপাল সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন উনি যে আর কি একটা নাম বললেন—

—বলেছে তবে আর কি! একেবারে বেদবাক্য বলেছে। দাহুর যেমন কথা!

বিভা একেবারে হাসিয়া খুন।

চশমাপরা ভদ্রলোকটির ইহার পরে আর বিপদের অবধি থাকিল না। জানালার ওদিক হইতে কাপড়ের খসখসানি, চুড়ির আওয়াজ। ভদ্রলোক বুঝিলেন, দৃষ্টির শতলীবাণ গুলা তাঁহারই পিঠে আসিয়া পড়িতেছে; মুখ ও চশমা থালার উপর ততই যেন ঠেকিয়া যাইবার উপক্রম করিল। ওদিকে উমারাণীও বিদ্রোহী। হাতের পাত্রটা ফেলিয়া ঝপ করিয়া সে বসিয়া পড়িল। বিভাকে বলিল—আমি পারব না, তুই যা—

বিভা জিভ কাটিয়া বলিল সর্বনাশ। তা করিস নে।

জীবে দয়া করতে হয়। তা হলে ওর চোখ ফেটে জল বেরাবে। দেখিস নি, তোয় পিছনে কি বকম চেয়ে চেয়ে দেখে চোরের মতো। দেখিস নি তাই,—দেখলে মায়া হত।

উমার বিশ্বাস হইল কথাটা। মানুষটি এমনি দেখিতে গোবেচারার মতো, আসলে কিস্তি দুষ্টের শিরোমণি।

খাওয়ার পরে আবার পানের জন্ড ডাকাডাকি।

উমা হাতজোড় করিয়া বলিল—বিভা, লক্ষ্মী ভাই, এবারে আর কাউকে—

কিস্তি বিভার দয়ামায়া নাই। হাত মুখ নাড়িয়া ঝগড়া আরম্ভ করিল—কি বকম মেয়ে তুই লো? আমাদের হলে আরও কত ছুতোনাতা খুঁজে বেড়াতাম। যা পোড়ারমুখী—যা শিগগির—

ভদ্রলোকেরা তখন সতর্কতার উপর স্থখাসীন হইয়াছেন। উমারাণী গিয়া দাঁড়াইতে ভুবন রায় গুণ-ব্যাখ্যা শুরু করিলেন—মেয়ে নয়, আমার মা লক্ষ্মী। বুঝলেন মশাইরা, আমার বিভাও যা এ-ও তাই। ঐ রং যা একটুখানি চাপা, নইলে কাজ-কর্ম স্বভাব-চরিত্র দেখলেন ত যাই হোক কিছু। আহা-হা, মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে। বড্ড খেটেছিস—বোস দিকি মা, বুডো ছেলের পাশে একটুখানি বোস—

নিমাই গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল। কলিকাতার ছেলে, কথায় ভুলিবার পাত্র নহে। বলিল না খুকী, দাঁড়াও আর একটু। চুলটা একবার খুলে দিন না কেউ। ঐ দরজাটার ঐখানে চলে যাও খুকী, তাড়াতাড়ি যাও, একটু জোর জোর পায়ে এইবার চোখ তুলে তাকাও ত নজরটা দেখতে হবে—

অকস্মাৎ বিভা আসিয়া উমারাণীর হাত ধরিয়া লইয়া গেল। ভুবন রায় হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিলেন—ওরে কি করিস? ভদ্রলোকেরা যে—

বিভার জবাব আসিল—ভদ্রলোকেরা বিশ্বাস করুন। হান্সামা হুজুরের ত আজ কথা ছিল না বাবা। খুকী মানুষ—খেটে খুটে এখন বড্ড ঘুম ধরেছে, ও আর চোখ তুলতে পারবে না।

সকালে উঠিয়াই নিমাই গোস্বামী বলিল—নমস্কার!

সদয়গোপালের মুখ শুকাইল, দেবতা রুপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু অপরাধ ত তাঁহার কিছুই নয়।

নিমাই হাসিমুখে বৃদ্ধকে নির্ভয় করিল। বলিল—আর কত দেখবো? ঐ ত হোলো। অনর্থক কলেজ কামাই করে দরকার কি?

সদয়গোপাল শুনিলেন না। শ্রেশন অবধি সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। গাড়ী প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ নিমাই অবাক করিয়া দিল। বলিল—মাপ করবেন আমাকে; একটু মিথ্যাচার হয়েছে। পাত্র নিজেই এসেছে।

বিভার সন্দেহ ঠিক তাহা হইলে। বৃদ্ধ ছুই স্তম্ভিত-চোখের সকল প্রত্যাশা লইয়া চশমাধারীর দিকে তাকাইলেন।

গোস্বামী পুনশ্চ বলিয়া উঠিল—আজ্ঞে আমিই প্রশান্ত।

আরও আশ্চর্য হইয়া সদয়গোপাল বলিলেন—আপনার বাড়ি কি তবে—

কথা লুফিয়া লইয়া প্রশান্ত বলিল—নীলগঞ্জ নয়। জন্মে দেখিনি কখনো। তারপর উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল—পরিচয় দিলে কি আর অর্মানি করে দেখা যেতো! তা ছাড়া অন্টারটাই বা কি? আপনার সঙ্গে ত ঠাটা-তামাসারই সম্পর্ক।

সাহস পাইয়া এতক্ষণ পরে বৃদ্ধ মুখ তুলিলেন। ঢোক গিলিয়া বলিলেন—মেয়ে তবে পছন্দ হয়েছে দাদা?

—হয়েছে।—ফর্সাটি। আপনার ঐ যে কে হয় বলছিলেন না?

সদয়গোপালের কথা ফটিল না। তারপর অনেকক্ষণ পরে কথা যখন বলিলেন, যেন হাহাকারের মতো শুনাইল। বলিলেন—ও ভুবন চৌধুরীর মেয়ে, ওর পাত্রের অভাব কি? আমার এই মা-বাপ মরা বাছার একটা গতি করে দাও তোমরা—

প্রশান্ত উদাসীনের মতো আর একদিকে চাহিয়া রহিল। তারপর বলিল—গাড়ী এসে পড়েছে; আচ্ছা, নমস্কার। ভুবন চৌধুরী মশায়কে বলবেন ঐ কথা। আয় সুনীল দাঁড়িয়ে রইল যে—

গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু চশমাধারী ছেলেটি নড়িল না। এক মুহূর্ত্ত সে সেই সর্বহারা বৃদ্ধের দিকে তাকাইল। কথা সে কাল হইতে বড় বেশী কহে নাই,

গাড়ীর সামনে থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমার নাম সুনীলকুমার রায়, বাড়ি প্রশান্তদের গুথানে। আমার সম্বন্ধে একটু খোজ খবর করে দেখবেন। আমি অযোগ্য, কিন্তু যদি আপনার পৌত্রীকে—

বৃদ্ধ যেন পাগল হইয়া উঠিলেন, শুষ্ক চোখ এতক্ষণে সজল হইয়া উঠিল। অধীর আকুলকণ্ঠে বারম্বার বলিতে লাগিলেন—আমার উমারাণীকে নেবে তুমি? দুঃখিনীকে পায়ে ঠাই দেবে তুমি দাদা?

অশ্রুট স্বরে সুনীল বলিল যদি দেন দয়া করে। এবং তারপর সে-ই বা আর কি কি বলিল, বৃড়াই বা কি বলিতে লাগিলেন গাড়ীর শব্দে লোকজনের কোলাহলে তাহার একবর্ণ শোনা গেল না।

বৃত্তান্ত শুনিয়া ভুবন চৌধুরী মহাখুসী। বলিলেন—বেশ হয়েছে, দিবিয়া হয়েছে। এক টিলে দুই পাখী। হারের টুকরো ছেলে ও দু'টি। দেখেই বুঝেছি—

এবং আরও ভাল করিয়া বুঝিবার জ্ঞান পরদিনই রঙনা হইয়া গেলেন। ফিরিতে দিন আষ্টেৎ দেবী হইল। খিড়কীতে পা দিয়াই আনন্দোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন—উলু দাশ মব—শঙ্খ বাজাও—

উদ্যোগীপুরুষ। একেবারে বিয়ের তারিখ পয্যন্ত ঠিক। সামনের চৈত্রটা বাদ দিয়া বৈশাখ মাসের এগারোই।

হাত-পা ধুইয়া চৌধুরী মহাশয় বৈঠকখানায় গিয়া দোঁগিলেন, সদয়গোপাল আসিয়া ফরাসের একপাশে চুপচাপ বসিয়া আছেন। ই, সম্বন্ধ বটে। সেই কথাটাই সর্ব্বাগ্রে উঠিয়া পড়িল। এমন ঘর-বর ভুবন স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই প্রায় বেকুব হইতে বসিয়াছিলেন; তারপর বুদ্ধি করিয়া নিজের হাতের হীরার আংটি বরের আঙুলে পরাইয়া মান বাঁচাইয়া আসিয়াছেন। সদয়গোপাল খুব ঘাড় নাড়িয়া ভুবনের বুদ্ধির তারিফ করিলেন, তারপর কাছে গিয়া কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া সম্বন্ধোচ্রে জিজ্ঞাসা করিলেন—ই ভুবন, আর ঐ খবরটা নিয়েছিলে কিছু?

ভুবন বলিলেন—নেব না কি রকম? সে-ও ত এবাড়ি ওবাড়ি। ওটাও ভাল সম্বন্ধ। উনিশ আর বিশ। বরঞ্চ

এক হিসেবে উমার অদৃষ্ট আরও ভাল। খশুর শাশুড়ী দুইই বর্তমান। খশুর নিশি রায়—ও অঞ্চলের ডাকসাইটে লোক। আমি গিয়ে পরিচয় দিলাম। ভ্রলোক তখনি পুকুরে জাল নামিয়ে দিলেন।

সদয়গোপাল জিজ্ঞাসা করিলেন—আর সুনীল যে কথাটা বলে গিয়েছেন?

ভুবন ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—তাও হোলো। নিশিবাবু বাইরে লোক মন্দ নন। বললেন—ছেলের পছন্দেই আমাদের পছন্দ। উপযুক্ত ছেলে, আমরা কি তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাব?

আনন্দে বিহ্বল হইয়া সদয়গোপাল বলিলেন—ভুবন, তবে তোমাকে আরও একদিন যেতে হচ্ছে। ঘাড় নাড়লে হবে না—আমিও যাব। গিয়ে বলব, আমার দুই নাতনীকেই একদিনে নিতে হবে—ঐ এগারোই বোশেখ। তা নইলে শুনব না।

ভুবন বলিলেন,—তাও বলেছিলাম। কিন্তু বিস্তর অজুহাত। ছেলেরই নাকি আপত্তি, পরীক্ষার আগে স্ত্রিবিধে হয়ে উঠবে না। বাবাজী বাড়িতে নেই—আসল কথাটা তাই বোঝা গেল না। আমার মনে হয়, বুড়োরও কিছু দুষ্টমি আছে।

তারপর অনেকক্ষণ ধরিয়া হুজনে অনেক পরামর্শ চলিতে লাগিল।

এদিকে খুব জাঁকাইয়া প্রাণপণ শক্তিতে উলু দিরা উমারাণী হাঁপাইতে হাঁপাইতে অবশেষে বিভাকে নির্জনে ধরিয়া বসিল।

—ওরে রাকুসী, সত্যি সত্যি আমার বর ছিনিয়ে নিলি?

এই কথাটাই বাঁকা হাসির সঙ্গে ক’দিন ধরিয়া মেয়ে মহলে মুখে মুখে চলিতেছে। উমারাণীকে দেখিলেই সকলে চুপ করিয়া যায়। সেই কথা মনে করিয়া লজ্জায় সহসা বিভার উত্তর যোগাইল না। উমা বলিতে লাগিল—তুই ডাকাত। ডাকাতি করে বর কেড়ে নিয়ে শেষে এদিন পরে আমাদের ছেড়ে ছুড়ে চলি—

—ছাড়ব কি সহজে? বিভা সামলাইয়া তখন ঝগড়া শুরু করিল।—অত আহ্লাদ করিসনে রে। না হয়, দুটো একটা মাসের এদিক ওদিক। সেখানেও পাশাপাশি বাড়ি। তোর সঙ্গে চুলোচুলি না করলে একদিনেই যে মরে যাব ভাই—

তারপর আবার বলিতে লাগিল—বোশেখে না হয় কলেজের এগজামিন। জ্যোষ্টিতে বাঁচবে কি করে? পুরুষগুলো ভাই বড্ড বোকা। সেই সেই মাথা খুঁড়তে হবে, খামকা আমাদের চটিয়ে রেখে দেয়। তখন আচ্ছা করে কৈফিয়ৎ নিবি, ছাড়িস নে—বুঝলি?

উমা বলিল—দয়ার উপর জুলুম?

বিভা মুখ ঘুরাইয়া বলিল—কিসের দয়া লো? মেয়েমানুষ গাঙের জলে ভেসে আসে নাকি? পুরুষ জাতকে অমন আন্ধারা দিস নে—দিস নে। তা’হলে কত হেনস্তা করবে দেখে নিস—

যেন পুরুষের সঙ্গে ঘরকন্না করিয়া করিয়া বিভা মস্ত বড় গিন্নি ঠাকরুণ হইয়া গিয়াছে। উমারাণী হাসিয়া উঠিল।—সবাইকে তোর গৌসাই ঠাকুর ভাবিস নাকি? তারপর টিপি টিপি হাসিতে হাসিতে বলিল—ভাল হয়েছে যে ঐ দিন আমাকে বৌ সেজে বসতে হবে না, বাসরঘরে নিমাই গৌসাইয়ের কাছে দিব্যি ভাগবত শোনা যাবে। রাগ করিস নে ভাই, আর একটা লোকও এসেছিল সেদিন—কিন্তু জালিয়াতি বুদ্ধি তার ত মাথায় আসে নি—

বলিতে বলিতে অকস্মাৎ উমার মুখ অপূর্ব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, এক মুহূর্ত সে চুপ করিয়া রহিল, তারপর মৃৎ স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিল—দাদু বলেন, দেবতা। আমার দাদুর মুখে যিনি হাসি ফুটিয়েছেন, সত্যি তিনি দেবতা। তোর কাছে বলব কি ভাই, সকালে উঠে রোজ মনে মনে তাঁকে প্রণাম করি। সেদিনের কাণ্ড নিয়ে লোকে হাসাহাসি করে, আমি তা বুঝি। তবু আমি ভাবি, ভাগ্যিস গৌসাই ঠাকুর আমাকে পছন্দ করে বসেন নি।...কিছুতে বিশ্বাস হতে চায় না যে সত্যি সত্যি কোনদিন ঐ দেবতার পায়ে মাথা রাখতে পারব—

ছাতের প্রান্তে দুইজনে নিঃসীম মাঠের দিকে চাহিয়া চাহিয়া পরম মধুর আসন্ন সেই দিনগুলিকে লইয়া স্বপ্নের জাল বুনিয়া চলিল। শেষ ফাল্গুনের মাঠ। শিমূল বনে এখনও সব ফুল ফুটে নাই, তালের মাথায় নূতন জটা পড়িতেছে, বৈচিগাছে

লাল লাল ফুলের কুঁড়ি দেখা দিয়াছে। গাঙের দিক হইতে আকাশে মেঘের কোলে কোলে এক ঝাঁক সাদা পাখী উড়িয়া যাইতেছে। যেন খেতপদ্মের মালা; সে মালা কখনো দীর্ঘ হইতেছে—কখনো আঁকিয়া ঝাঁকিয়া তার কাটিয়া যাইতেছে। ...ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তখনো দুজনে বসিয়া আছে।

সেদিন বাড়ি ফিরিয়া সকল কাজকর্ম সারিয়া উমারাণী একেলা তার জানালাটিতে বসিল। বাহিরে ছোট্ট উলুক্ষেতের উপর ঝাপসা ঝাপসা অঙ্ককার। তাহারই সীমানা দিয়া সারবন্দী টেলিগ্রাফ-পোস্টগুলা। যেন রাত্রি জাগিয়া তাহার সান্দ্রীর মতো রেললাইন পাহারা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। উমার মনের উপর তন্দ্রা চাপিয়া বসিল, বিয়ে যেন তার আজই। আলো জালিয়া বাজনা বাজাইয়া বড় জাঁকজমক করিয়া ষ্টেশন হইতে বর তাদের বোধনতলায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; চীৎকার কোলাহলে কান পাতা যায় না। বিভা মল বাজাইয়া ছুটিল বর দেখিতে। সে-ও ছুটিল। গুড়ুম করিয়া তার পিঠে বিভা দিল এক কিল।

—যাচ্ছিস কোথা পোড়ারমুখী? বসে থাক পিড়ির উপর। একদিনে লোভ মেটে নি? শুভদৃষ্টি হয়ে যাক, তারপর দেখিস যত খুসী

অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক যুক্তি পরামর্শের পর ঠিক হইল, শুভকর্ম কিছুতে ফেলিয়া রাখা যাইবে না; যেমন করিয়া হোক ঐ এগারোই এক দিনে দুইটি সারিতে হইবে। ভুবন চৌধুরী অনেক মুন্সিয়ানা করিয়া একখানা চিঠি লিখিলেন। পড়িয়া দেখিয়া সদয়গোপাল খুব খুসী হইলেন।

কিন্তু নিশি রায় অবিচল। জবাব আসিল, জ্যেষ্ঠের শেষাশেষি ছাড়া কোন ক্রমে বিয়ে হইবার যো নাই। শ্রীমানের পরীক্ষার জন্ত অসুবিধা তেমন নয়; দু-তিনটা দিনে এমন কি আর আসিয়া যাইবে। আসল কথা, ওদিককার গোছ-গাছ সমস্ত হইয়া উঠিবে না। বাড়ির মধ্যে প্রথম ছেলে, অতএব—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলে কাল্পনিক টাকা বাজাইয়া ভুবন চৌধুরী কথাটা পরিষ্কার করিয়া দিলেন।

সদয়গোপাল আরও কথিয়া উঠিলেন - এগারোই খুসীর

বিয়ে আমি দেবোই। স্থানল কিছু জানে না; সে আমার ভোলানাথ।—সমস্ত ঐ বুড়োর কারগাজি।

ইতিমধ্যে বৃত্তান্ত শুনিয়া একদিন কেদার মিত্র মহাশয় স্বয়ং চলিয়া আসিলেন। উপযুক্ত শোক ও বিপদের অবধি নাই, কিন্তু সে সব সত্ত্বেও তিনি এক কথার মানুষ; ভদ্রলোকের উপকারার্থ ঐ এগারোই তারিখেই তিনি রাজী। মাথা নাড়িয়া পরম গম্ভীরভাবে কেদার কহিলেন—নিশি রায়কে আমি জানি মশায়,—দু-এক হাজারের কর্ম নয়। মিছে মিছি হয়রান হচ্ছেন। আমাকেও হয়রান করছেন।

—দেখা যাক।

সদয়গোপাল ও ভুবন চৌধুরী যাত্রা করিলেন। এবং মন্ত্রবলেই নিশি রায়ের গোছ-গাছের সমস্ত অসুবিধা দূর হইয়া গেল। আর কোন আপত্তি রহিল না। তারপর এক দিন গ্রামের মেয়েরা আনন্দ উৎসব সারিয়া যে যার বাড়ি চলিয়া গিয়াছে, সদয়গোপাল ভুবনের বৈঠকখানায় নিবিষ্ট মনে ফর্দ করিতে বসিয়াছেন, সেই সময়ে উমারাণী চুরি করিয়া দাছুর দেবরাজ হইতে টাকার ছাপ-মারা চন্দন-মাখানো লগ্ন-পত্র টানিয়া বাহির করিল। সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইল, ষ্টাম্প-আটা আর একখানি কাগজ।

এগারোই বৈশাখ পাশাপাশি দুই বাড়িতে পাল্লা দিয়া রত্ননচৌকি বাজিতেছে। সদয়গোপালের ফুর্তির আর অবধি নাই। সন্ধ্যার পর জ্যোৎস্নার ঘন প্লাবন বহিয়া যাইতে লাগিল। ঘটিয়াছেও বেশ--দুইটা লগ্ন। উমারাণী বয়সে একটু বড়, তার বিয়ে প্রথম লগ্নে হইবে। শেষের লগ্নে বিভার। ভুবনই বিবেচনা করিয়া এই রকম ব্যবস্থা করিয়াছেন। বরাসন এক জায়গাতেই; খাওয়া দাওয়া সমস্তই একত্র হইবে। সন্ধ্যার গাড়ীতে দুই বর আসিবে। আলো জালিয়া বাজনা বাজাইয়া সকলে ষ্টেশনে বর আনিতে গিয়াছে।

সর্বান্তে অলঙ্কার ঝলমল করিয়া উমারাণী বসিয়া আছে। বিভা পলাইয়া আসিয়া পাশে বসিল। হাসিয়া হাসিয়া দু'জনে কি গল্প করিতেছে। এমনি সময়ে হঠাৎ

বাহির বাড়িতে আর্ন্তনাদ। সদয়গোপাল ছুটিয়া আসিলেন।
 ষেখানে তারা বসিয়াছিল সেইখানে আসিয়া উমার চুলের
 মুঠি ধরিয়া পিড়ি হইতে মাটিতে ফেলিলেন। নিজেও
 আছড়াইয়া পড়িলেন। চীৎকার করিয়া উঠিলেন—হতভাগী—

বিহ্বল উমারাগী; বিভা কাঁদিয়া উঠিল। সদয়গোপাল
 আকাশ ফাটাইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন—হতভাগী,
 এত লোকে মরে তুই মরিস না কেন? ঘেমা করে না?
 গলায় দড়ি দিগে যা, কুয়োয় ঝাপ দিয়ে পড়গে যা।
 যা—যা—বলিয়া সবলে তাহাকে ঠেলিয়া দিলেন।

বিভা আকুল হইয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল—কি হয়েছে
 দাদু, কি হয়েছে বলুন শিগগির—

আর কথা নাই। বৃদ্ধের সন্নিহ্ন নাই। সেইখানে
 এলাইয়া পড়িয়াছেন। ভুবন চৌধুরীও ছুটিয়া আসিয়াছেন,
 আরও কে কে আসিয়াছে। বিভা ঝাঁপাইয়া বাপের কোলে
 পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—কি হয়েছে? ও বাবা,
 কি হয়েছে বল আমায়—

ভুবন একবার উমারাগীর দিকে তাকাইলেন, পাষাণ
 প্রতিমার মতো স্থির নির্নিমেঘভাবে সে বসিয়া আছে। বিভা
 বলিতে লাগিল—বলছ না কেন বাবা? বলো, বলো, পায়ে পড়ি
 তোমার—

ভুবন বলিলেন—স্বনীল আসে নি। শুধু একলা
 প্রশান্ত—

একজনে প্রশ্ন করিল—গাড়ি ফেল করেছে?

—না গো। সর্বনাশ করেছে। বিয়ের সওদা করতে
 নিজেই কলকাতা যায়! তারপর আর পাত্তা নেই।
 আজকে বাপের কাছে হঠাৎ এই টেলিগ্রাম। ওরা
 এনে দিল।

টেলিগ্রামখানা সকলে পড়িল। ঘটনা সংক্ষিপ্ত। অবস্থা-
 গতিকে স্বনীলকুমার কলিকাতাতেই বিবাহ করিয়া বসিয়াছে।
 ঝোঁকের মাথায় একটা কথা দিয়া বসিয়াছিল বটে, কিন্তু
 সেই হইতে ভাবিতে ভাবিতে সে পাগল হইয়া উঠিয়াছে।
 বাবা যেন তাকে ক্ষমা করেন। এবং উপসংহারে বাপকে
 আশ্বাস দিয়াছে, দু-এক দিনের মধ্যেই তাঁর পুত্রবধূর
 মুখদর্শন ঘটবে।

সদয়গোপাল চেতনা পাইয়া আর্ন্তনাদ করিতে লাগিলেন—

আমার কি হবে? ও বাবা ভুবন, কি উপায় হবে আমার?
 জাত গেল, মান ইচ্ছত গেল। ঐ হতভাগী কালামুখী
 বাপ খেয়েছে, মা খেয়েছে, আমার জাতকুল খেলে, আমাকে
 খেয়ে ফেলে—

যুবকের দল তখন ক্ষেপিয়া উঠিয়া চোঁচামেচি শুরু
 করিয়াছে—বেইমান। আমরা ত তাকে দেখেছি; ঠিক চিনব।
 গাড়ি পাহারা দেব—দেখি, বউ নিয়ে কবে যায়। হিড় হিড়
 করে নামিয়ে এনে অষ্টেপিষ্টে জুতো—

সদয়গোপাল উঠিয়া আলো ও লাঠি হাতে লইলেন।

—কোথায় যান?

—কেদারের কাছে। তার দয়ার শরীর, সে কথা
 ফেলবে না।

ভুবন চমকিয়া বলিলেন—কেদার মিত্তির?

—হাঁ বাবা। এক্ষুনি যাব। আজ রাত্রে মধোই
 ঐ আপদ বিদায় করব। তোমরা কেউ যাবে সঙ্গে?

হু-একজন সঙ্গ লইল।

আশ্চর্য্য, উমারাগীর চোখে জল নাই। ধীরে ধীরে সে-ও
 উঠিয়া দাঁড়াইল। সেখানে তখন একেলা মাত্র বিভা। সন্ধ্য
 সে জিজ্ঞাসা করিল—কোথা যাচ্ছিস?

উমারাগী সহজ কণ্ঠে বলিল—যাই, একটু ঘুমিয়ে নি গে।
 কেদার মিত্তিরের খুব দয়া, নিশ্চয় আসবেন। এলে উঠব
 তারপর—

আর একটি কথাও বলিল না, বিছানায় গিয়া পাশ ফিরিয়া
 সে শুইয়া পড়িল। বিভা ডাকাডাকি করিতে বলিল—ঘুমুই
 ভাই। তোরও লগ্ন একটু পরে। তুই যা।

হয়ত চুপি চুপি কাঁদিয়া লজ্জা ও অপমানের ভার একটু
 লঘু করিবে। বিভা আর কিছু না বলিয়া উঠিল। তখন
 এ বাড়ী একেবারে নিস্তর, উৎসবের বাজনা কোলাহল সমস্ত
 থামিয়া গিয়াছে। এখানে ওখানে মুখোমুখি দু-চারি জন
 ফিসফিস করিয়া বোধ করি এইসব আলোচনাই করিতেছিল।

টং টং করিয়া ষড়ি বাজিয়া যাইতেছে,—নয়, নাড়ে নয়,
 দশ...

মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা! কথাটা মনে করিয়া উমারাগীর

বুকের মধ্যে আনন্দ যেন নাচিয়া উঠিল। ওরা সব ঠাট্টা করিয়াছে, টেলিগ্রাম মিথ্যা,—তুমি নিশ্চয় আসিবে। কলিকাতা হইতে ঝলমলে বরের সজ্জা কিনিয়া রাজপুত্রের মত তুমি আসিতেছ।...এগারোটীর গাড়ীর আর দেবী কত? দিগদিগন্ত ভ্রম করিয়া বর লইয়া কলিকাতার গাড়ী ছুটিতেছে। কেদার মিত্রের আগেই পৌঁছিতে হইবে। এঞ্জিনের গতি দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতেছে— একশো মাইল, হাজার মাইল, দশ হাজার মাইল, হাউই যত জোরে আকাশে ওঠে, আকাশের উচ্চা যত জোরে ছুটিয়া আসে—

সহসা উমারাগীর মনে হইল, শিয়রের ধারে আসিয়া চুপিচুপি আদর করিয়া বর ডাকিয়া উঠিল উমারাগী, উমারাগী—

জবাব সে দিবে না। উপুড় হইয়া জোর করিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িল। তোমার সঙ্গে কথা সে আজ কিছুতে কহিবে না। তুমি যাও—

—তোমার পরীক্ষার পড়া নিয়ে থাক তুমি। গোছগাছ হয় ত সমস্ত এখনো হয়ে ওঠেনি। কেন এই পাড়াগাঁয়ের বন জঙ্গলে কষ্ট করে এলে? কেন—কেন?...

দাছুর চোখের ঘুম গেছে কত দিন থেকে। আমার কিছু নয়, আমার বয়ে গেছে,—আমি খুব ঘুমুই।...দাছুর কি করেছে জান?

বর জিজ্ঞাসা করিল—কি?

এই বাড়ির সমস্ত বিক্রি করেছে ভুবন চৌধুরীর কাছে। দলিল আর লগ্নপত্রের একসঙ্গে দেবাজে রয়েছে। আমার দাছুরকে ওরা পথে বের করে দেবে।

—রাগী, উমারাগী!

মুহূ হাসিয়া, হাসিতে গিয়া মুখখানি রাঙা করিয়া দেবতার মতো পরম স্নন্দর বর কত কাছে আসিয়া বসিয়াছে। চোখ মুছাইয়া দিয়া কোমল স্নেহে ধীরে ধীরে মাথাটি কোলের উপর লইল। কোলের উপর লইয়া তারপর—

—না, না, না। খুব চিনেছি তোমায়। সময় হল এতদিন পরে। তুমি যাও—তুমি যাও—

চুপচাপ। আর কিছু নাই। চমকিয়া উমারাগী উঠিয়া বসিল। চৌধুরী বাড়ির কোলাহল অল্প অল্প কানে আসিতেছে।

সে কান পাতিয়া রহিল। আবার যেন শুনিল, বৈচিত্রনের আবছায়া হইতে সেই ডাক অতিশয় মৃদু হইয়া আসিতেছে—

—রাগী, উমারাগী গো—

স্বপ্নাচ্ছন্ন কিশোরী উঠিয়া দাঁড়াইল। দিগন্তবিসারী জ্যোৎস্নার সমুদ্রে নৈশ বাতাস আজ তরঙ্গ তুলিয়াছে, তরঙ্গে তরঙ্গে সেই ডাক ক্ষীণ—ক্ষীণতর—অশ্রুষ্টিতম হইয়া দূর হইতে দূরে মিলাইয়া যাইতে লাগিল। সুপারীবনের ফাঁকে ফাঁকে, শুকনা ঝিলের পাশ দিয়া, উলুকেত পার হইয়া সেই ডাক শুনিতে শুনিতে উমারাগী রেললাইনের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। যতদূর অবধি দেখা যায় লোহার পাটি ঝিকঝিক করিতেছে। অশ্রুর উৎস খুলিয়া আকুল হইয়া সেইখানে সে কাঁদিতে বসিল।

চৌধুরী বাড়িতে ভারী গগুগোল। বাজনা বাজিতেছে, বাজি পুড়িতেছে, লোকজনের হাঁকডাক। লগ্নের আর দেবী নাই।...হঠাৎ এ বাড়িতেও রসুনচৌকি বাজিয়া উঠিল। কেদার মিত্র আসিলেন নিশ্চয়। দয়ার শরীর, পুত্র-শোকের মধ্যেও পরের বিপদ অবহেলা করিতে পারেন নাই।

দুই চক্ষের সমস্ত দৃষ্টিশক্তি পুঞ্জিত করিয়া উমারাগী তখন দেখিতেছে, কোথায় রেলগাড়ী? দূরে—অনেকদূরে যেন একটুখানি আলোর মতো। লগ্ন যে আসিয়া গিয়াছে। গাড়ীর এত দেবী!

বাড়ির মধ্যে খোঁজাখুঁজি পড়িয়া গিয়াছে। চাপা গলায় হাঁকডাক চলিয়াছে। সদয়গোপাল অত্যন্ত ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন—কোথায় গেল খুকী, ওরে তোমরা দেখাদকি একবার।... লগ্ন লইয়া কারা যেন এদিকে আসিতেছে।... আর উমার কাণ্ডজ্ঞান রহিল না। ধরিয়া ফেলিল বুঝি। পাগল হইয়া লাইন বহিয়া সে ছুটিল। খোয়া তোলা পথ— দুইদিকে লোহার সীমানা। আঘাতে আঘাতে পা কাটিয়া রক্তের ধারা বহিল। ভবু ছুটিয়াছে। যেদিক দিয়া কলিকাতার গাড়ী আসে উমাদিনীর মতো দুই ব্যাকুল বাহু সেদিকে প্রসারিত করিয়া সে কাঁদিতে লাগিল— তুমি এসো—এসো—আর কত দেবী করছ, এসো—তুমি—

না, দেবী নাই আর। সহসা ষ্টেশনে সিগনালের ডগমগে লাল আলো স্ননীল স্নিগ্ধ হইয়া চিরহুঃখিনী মেয়েটিকে অভয় দিল। স্তম্ভিত সার্চলাইটে চারিদিক উদ্ভাসিত

করিয়া বিপুল সমারোহে বর আসিতেছে। তারপর কি হইয়া গেল; সকল দুঃখ ভুলিয়া পরম আরামে উমরাণী সেইখানে শুইয়া পড়িল। শুইয়া শুইয়া দেখিতে লাগিল, আলোর বস্ত্র সমস্ত একাকার করিয়া গাড়ী ছুটিতেছে, পৃথিবী কাঁপাইয়া রাত্রির নিঃশব্দতা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া হাজার

হাজার মাইল বেগে যেন বড় আদরের আহ্বান ছুটিয়া আসিতেছে—উমরাণী, উমরাণী!

সেই বন্ধুর রাস্তা, লোহার লাইন, অগ্ন্যুৎসর্গী প্রত্যঙ্গ এঞ্জিন একমুহুর্তে তার কাছে পরম মনোহর হইয়া উঠিল। নিশ্চিন্ত আলস্তে উমরাণী চোখ বুজিল।

আদি মানব ও আসল মানব

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়, এম্ এ, বি এল

গত চৈত্র মাসের প্রবাসীতে “নর ও বানর” শীর্ষক প্রবন্ধে আদিম নর-কল্প জীবের বা “প্রাক্‌মানবের” (Pre-manএর) এবং তৎপরবর্তী “গোড়ার মানুষের” (Proto-manএর) সামান্য পরিচয় দিয়াছি। এই প্রবন্ধে তাদের পরবর্তী “আদি মানব” (Homo Primigenius) এবং তারও পরের “আধুনিক” বা “আসল মানব” (Homo recens বা Homo sapiens) সম্বন্ধে একটু আলোচনা করব।*

আমরা দেখেছি যে, ক্রমবিকাশবাদীরা “বানর হ’তে মানুষের উৎপত্তি নির্দেশ করেন,” এরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। আমরা দেখেছি যে, তাঁরা ভূস্তর-প্রোথিত কঙ্কালবশেষ পর্যালোচনা করে কেবলমাত্র এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, তৃতীয়ক যুগের (Tertiary period-এর) উষাধুনিক (Eocene) অস্ত্যুর্গে, যখন মানুষও ছিল না, বন-মানুষও ছিল না, বানরও ছিল না, কেবলমাত্র তাদের সকলের পূর্বজ অ-বিশিষ্ট-মনুষ্যকল্প গোষ্ঠী (undifferentiated generalized anthropoid stock) ছিল, সেই কালে বাহুপ্রকৃতির সমধিক কঠোর প্রভাব ও পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে চলবার উপযোগী দৈহিক ও বৈজিক (germinal) পরিবর্তন সাধন করতে না পেরে, ঐ মনুষ্য-কল্প গোষ্ঠীর এক দল ক্রমোন্নতির সোজা পথে অগ্রসর হ’তে অসমর্থ হ’ল এবং অবাস্তর পথে গিয়ে আটকে থাকলো ও ক্রমে পারিপার্শ্বিক

প্রাকৃতিক অবস্থার প্রভাবে অণু প্রকারের দৈহিক ও বৈজিক পরিবর্তন লাভ করে ‘বানর’ হয়ে পড়ল। আবার আধুনিক বন-মানুষদের পূর্বজেরাও অ-বিশিষ্ট-মনুষ্যকল্প গোষ্ঠীর সঙ্গে অভিন্ন ভাবে আরও কিছু দূর সোজা উন্নতির পথে অগ্রসর হয়ে পরিবর্তনশীল নৈসর্গিক অবস্থার সঙ্গে আর যুঝতে না পেরে ক্রমে পথভ্রষ্ট হ’য়ে অবাস্তর পথে স’রে দাঁড়াল ও পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক অবস্থার প্রভাবে বিভিন্ন বনমানুষ (anthropoid apes) জাতিতে পরিণত হ’ল। কিন্তু অ-বিশিষ্ট মানবকল্প গোষ্ঠী অধিকতর উদ্যমশীল নাছোড়বন্দা জীবগুলি পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিক নৈসর্গিক অবস্থার অল্পরূপ আপনাদিগকে প্রাকৃতিক ও ঐন্দ্রিয়িক নির্বাচনের (natural and organic selection-এর) দ্বারা প্রয়োজনীয় দৈহিক ও বৈজিক পরিবর্তন (germinal variations) হাসিল করে মানবীয় শাখা (Humanoid stem) রূপে উন্নতির সোজা পথে ক্রমিক অগ্রসর হ’তে লাগল।

গত মাসের প্রবন্ধে আমরা আরও দেখেছি যে, তৃতীয়ক যুগের অস্ত্যাধুনিক (Pliocene) অস্ত্যুর্গে এক দল জীব অ-বিশিষ্ট-মানবকল্প গোষ্ঠী হ’তে বিচ্ছিন্ন হয়ে সোজা উন্নতির পথ হারিয়ে মানবীয় শাখার একটি ফ্যাকড়া বা প্রশাখা (offshoot) রূপে কিছু দূর চ’লে গিয়ে যব-দ্বীপের ট্রিনিল মানব (Trinil man বা *Pithecanthropus Erectus*) জাতীয় প্রাক্‌-মানবে পরিণত হ’ল এবং কালক্রমে লয়প্রাপ্ত হ’ল। ট্রিনিল মানবের মস্তিষ্ক-গহবরের পরিমাণ (cranial

* লাতিন “হোমো সেপিয়েন্স” শব্দ দুটির অর্থ “বুদ্ধিশক্তিবিশিষ্ট মানুষ”।

capacity) ও অস্থান্য লক্ষণ দেখে উহাকে সম্পূর্ণ মনুষ্য-পদ-বাচ্য নির্দেশ করা যায় না। যদিও ইহা সোজা হ'য়ে মানুষের মতন দুই পায়ে চলতে পারত, এবং সম্ভবতঃ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী অপর আঙ্গুলগুলির উপর ফেলে দ্রব্যাদি ধরতে পারত, তবু এই জাতীয় নর-প্রায় জীবের মানুষের মতন বাক-শক্তির এবং বুদ্ধি-শক্তির সম্পূর্ণ স্ফূরণ হয় নি। এজন্য ইহাদিগকে প্রাক-মানব বলা যেতে পারে। ইংলণ্ডের সাসেক্স জেলার পিল্টডাউন (Piltdown) গ্রামে সম্ভবতঃ অস্ত্যাধুনিক (Pliocene) অস্তযুগের ভূস্তরে প্রাপ্ত পিল্টডাউন-মানব (*Eoanthropus Dawsonii* বা Piltdown man), যদিও যবদ্বীপে প্রাপ্ত ট্রিনিলা মানব অপেক্ষা অধিকতর পরিণত অবয়ব-বিশিষ্ট ছিল, তবুও ইহাকেও সম্পূর্ণ মনুষ্যপদবাচ্য বলা যায় না। এরাও প্রাক-মানবের মধ্যে পরিগণিত হ'তে পারে। জার্মানি দেশের হাইডেলবার্গ শহরের নিকটস্থ ময়্যার (Mauer) গ্রামে অস্ত্যাধুনিক অস্তযুগের শেষভাগের ভূস্তরে কিংবা পরবর্তী উষ্মস্তরে প্রাপ্ত চিবুক-হীন চোয়ালবিশিষ্ট ককালাবশেষ হ'তে যে হাইডেলবার্গ মানুষের (*Homo heidelbergensis* বা *Palaeanthropus* এর) সন্ধান পাওয়া যায়, তাকেও ঐ প্রাক-মানব দলভুক্ত করা যেতে পারে। দক্ষিণ-আফ্রিকায় টাঙ্গস (Taungs) রেলওয়ে স্টেশন হ'তে সাত মাইল দূরে বাক্সটন (Buxton) চূণের খনির (limestone quarryর) নিকট যে নর-প্রায় জীবের মাথার খুলি পাওয়া গেছে, তাহা স্মর আরথার কীথ (Sir Arthur Keith) প্রমুখ পণ্ডিতদের মতে প্রাক-মানবের নয়, একটি উন্নত বন-মানুষের মাথা ব'লে স্থির করা হয়েছে ও ইহার অস্ট্রেলোপিথেকস (Australopithecus) নাম রাখা হয়েছে।

অ-বিশিষ্ট-নরকল্প গোষ্ঠী হ'তে কোন্ দেশে প্রথম মানবীয় গোষ্ঠীর উদ্ভব হ'ল, ইহা নিশ্চিত নির্ধারণ করার উপযোগী উপকরণ এখনও পাওয়া যায় নি। সুতরাং এ-সম্বন্ধে পণ্ডিতদের প্রধানতঃ তিনটি বিভিন্ন মত দেখা যায়। কেহ কেহ মধ্য-এশিয়া, কেহ বা উত্তর-ইউরোপ ও কেহ দক্ষিণ-আফ্রিকা মানবীয় গোষ্ঠীর উদ্ভবস্থান ব'লে নির্দেশ করেন। কিন্তু যতদূর দেখা যায়, মধ্য এশিয়া বা তার নিকটবর্তী স্থানেই মানুষের উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা বেশী ব'লে মনে

হয়। তৃতীয়ক যুগে মধ্য-এশিয়া খুব উর্বর ও জলময় দেশ ছিল। যেখানে এখন হিমালয় পর্বত ও তিব্বত দেশ বর্তমান, সেখানে তখন টেথিস্ সমুদ্র (Tethys sea) ছিল। ক্রমে ঐ যুগে মধ্যভারতের ও টেথিস্ সমুদ্রের মাঝে হিমালয় পর্বত-শ্রেণী মাথা ঠেলে উঠল। কাজেই ঐ সমুদ্র হ'তে যে বাষ্প উঠে মেঘ হয়ে বৃষ্টিদ্বারা মধ্য-এশিয়ার ভূমিকে উর্বর করতো, তা আটকে দিল ও সেই বৃষ্টির গতি হিমালয়ের দক্ষিণে চালিত করল। কাজেই মধ্য-এশিয়া ক্রমে নর-কল্প জীবের বাসের অযোগ্য হ'য়ে উঠল। হরিৎ বর্ণ বনরাজির স্থলে প্রথমে লম্বা লম্বা ঘাস জন্মাতে লাগলো; পরে তাও লুপ্ত হয়ে যাওয়ায় মধ্য-এশিয়া মরুভূমিতে পরিণত হ'ল। প্রাকৃতিক পরিবর্তনে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হ'য়ে অনেকজাতীয় পশুপক্ষী লোপ পেল; আর কোনও কোনও জাতীয় পশুপক্ষী প্রয়োজনীয় দৈহিক পরিবর্তন হাশিল ক'রে রক্ষা পেল। জীবের পাখ বদলে গেল। অ-বিশিষ্ট-নরকল্প গোষ্ঠী, যাহা এতদিন প্রধানতঃ ফলমূল ভক্ষণ ক'রত ও গাছে গাছে বেড়াত, এখন তাদের বাসভূমি গাছশূন্য হওয়ায়, মাটিতে দুই পায়ে হাঁটতে অভ্যস্ত হ'তে লাগল; ও ক্রমে হাতের অন্ত আঙ্গুলগুলার সাহায্যে কাজ করার উপযোগী বৃদ্ধাঙ্গুলী (opposable thumb) হাশিল ক'রে পিথেকানথোপাস বা পিল্টডাউন মনুষ্য প্রভৃতির রূপ প্রাপ্ত হ'য়ে "প্রাক-মানবে" পরিণত হ'ল ও নানা দেশে ছড়িয়ে পড়লো। হিমালয়ের দক্ষিণে যে উপসাগর হয়েছিল, তা ক্রমে পলিমাটিতে ভরে গেল ও ক্রমে সঙ্কুচিত হ'য়ে কেবল একটি প্রকাণ্ড নদে পরিণত হ'ল। ঐ নদ তখন বর্তমান সিন্ধুনদের মুখ হ'তে গঙ্গার মুখ পর্যন্ত,— অর্থাৎ আরব্যোপ-সাগর হ'তে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। কালক্রমে তাও অনেকটা ভরাট হ'য়ে সিন্ধু উপত্যকা ও গঙ্গাভীরের সমতল ভূমি গড়ে উঠল, ও আরও ভরাট হয়ে পঞ্জাব বা পঞ্চ-নদের দেশ, উত্তর-পশ্চিমের দোয়াব, বিহারের পলিমাটিপূর্ণ সমতল ভূমি ও বাঙ্গলার ব-দ্বীপ তৈরির হ'ল এবং তাদের মধ্যে সিন্ধুনদ ও তার শাখাগুলি, এবং গঙ্গা ও যমুনা প্রবাহিত হ'তে লাগল। এই সব কারণে মধ্য-এশিয়া হ'তে দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে যাতায়াতের পথ সুগম হ'ল।

মধ্য-এশিয়াতে মানবের উদ্ভব হওয়ার সপক্ষে অস্থান্য যুক্তির মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য যুক্তি এই যে, প্রথমতঃ, সব চেয়ে

আদিম নর-প্রায় জীবে - অর্থাৎ, পিথেকানথে পাস ইরেটাস বা টি নিল মানবের কঙ্কালবশেষ এশিয়ায়ই যব-দ্বীপে (Javaতে) পাওয়া গেছে; দ্বিতীয়তঃ এশিয়াতে মানবের তিনটি প্রধান শাখাই (শ্বেত, পীত ও কৃষ্ণ-ত্বক মানব) বর্তমান; তৃতীয়তঃ, যে সব ভাষা একস্বর-শব্দ-বহুল (monosyllabic), যে-সব ভাষার শব্দরূপ ও ধাতুরূপ হয়, এবং যে-সব ভাষায় মূল শব্দসমূহ অর্থ বা রূপের পরিবর্তন ব্যতিরেকে সমাস-বদ্ধ হয়, ভাষার এই তিন প্রধান শাখাই এশিয়ায় ব্যবহৃত হয়; চতুর্থতঃ, সকল প্রাচীনতম মানব সভ্যতার জন্মস্থান এশিয়াতে; পঞ্চমতঃ, আধুনিক মানব জাতির (Homo sapiens এর) সর্বপ্রথম প্রধান ইউরোপীয় প্রতিনিধি ক্রোমাগনন (Cromagnon) জাতিরও কোনও কোনও দৈহিক আকৃতিতে মধ্য-এশিয়াবাসী মানবের আকৃতির আভাষ পাওয়া যায়; এবং ষষ্ঠতঃ, অধিকাংশ গৃহপালিত জন্তুরও উৎপত্তিস্থান এশিয়াতেই অবস্থিত।

সে যা হোক, এ-পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য প্রমাণ যত দূর পাওয়া গেছে, তার সাহায্যে মানবের অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশের ইতিহাস যতটা অনুমান করা যায়, তা এইরূপ। অ-বিশিষ্ট মানবীয় গোষ্ঠী সোজা উন্নতির পথে উঠতে উঠতে অ-বিশিষ্ট মানবগোষ্ঠীতে পরিণত হ'ল। কিন্তু তাদেরও এক দলের পর আর এক দল খানিকদূর এগিয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে অবাস্তর পথে এক একটি ফাঁকড়া বা প্রশাখা রূপে মানবীয় শাখা হ'তে বিচ্যুত হ'তে লাগলো এবং কালক্রমে লয়প্রাপ্ত হ'ল। এইরূপেই পেকিং মনুশ্য (Sinanthropus Pekinensis) এবং রোডেসিয়ান মনুশ্য (Homo Rhodesiensis) প্রধান মানব শাখা হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে সোজা ক্রমোন্নতির পথ হারিয়ে ফেললো, এবং অবাস্তর পথে প্রশাখারূপে কিছু বৃদ্ধি পেয়ে অবশেষে ক্রমে লোপ পেল। সম্ভবতঃ তৃতীয়ক যুগের (Tertiary period এর) অন্তে কিংবা চতুর্থক যুগের (Quaternary period এর) প্রারম্ভেই এই দুই জাতিরই লয় হয়। ইহাদিগকে সকলের "গোড়ার মানুষ" বলা যেতে পারে। এদের হিংস্রপশুভাবাপন্ন (brutal-looking) আকৃতি এবং এদের নির্মিত উষা-শিলা (Eoliths) বা প্রাথমিক পাথরের অস্ত্রের কথা পূর্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করেছি। এই উষা-শিলাগুলির গঠনভেদে রয়টেলিয়ান (Reutelian),

ম্যাফলিয়ান (Mafflian) এবং মেসভিনিয়ান (Mesvinian) নামকরণ করা হয়েছে।

এই গোড়ার মানব-জাতি যদিও মানব-শাখার প্রথম প্রশাখা বলে পরিগণিত হয়, তবুও আধুনিক মানব (Homo recens) বা আসল মানব (Homo sapiens) হ'তে দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষে এদের স্থান অনেক নীচে। এদের কঙ্কালবশেষ এবং হাতের তৈরি অস্ত্রাদি ইহার প্রমাণ।

বস্তুতঃ এই 'গোড়ার মানবে'র আবির্ভাবের অনেক পরে অ-বিশিষ্ট মানবগোষ্ঠীর আর একটি অধিকতর পরিপুষ্ট ও উন্নত প্রশাখা রূপে আর-এক-জাতীয় মানুষের হঠাৎ অভ্যুদয় দেখা যায়। অত্যাধুনিক যুগের (Pliocene age-এর) শেষভাগ হ'তে চতুর্থক যুগের (Quaternary period-এর) অন্ততঃ তৃতীয় তুষার অন্তর্গুণে (Third glacial age) ও তৃতীয় অন্তস্তুষার অন্তর্গুণে (Third Interglacial age) পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল পৃথিবীর নানা দেশে এই জাতীয় মানবের প্রাদুর্ভাব হয়। এই জাতীয় মানবের কঙ্কালবশেষ প্রথমে প্রুসিয়া দেশের ডুসেলডরফ (Dusseldorf) শহরের নিকটবর্তী নিয়াগোরথাল (Neanderthal) নামক গিরিবন্ধে (ravineএ) তুষার-কালে (Pleistocene) ভূস্তরে ডাক্তার ফুলরট (Dr. Fuhlrott) ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন। এই স্থান হ'তেই ইহার নামকরণ হয়। এই জাতির মাথা একটু চাপা এবং ধড়ের উপর ঘাড় ও মাথাটা সামনে ঝুঁকে পড়েছে; ভুরুর উপরের হাড় (eye-brow ridges) অনেকটা উঁচু (beetling), কপাল খোদল (retreating forehead), খুব মস্ত চোয়াল (massive cheek-bones) জজ্বা দেশ একটু বাঁকা (curved), ঠাং দুটি ধড়ের তুলনায় একটু লম্বা; আর লোকগুলি কিছু বেঁটে - ৫ ফুট ৪ ইঞ্চির বেশী লম্বা নয়। মোটের উপর সব চেয়ে গোড়ায় মানুষদের মতন ইহাদেরও খানিকটা পশুভাবাপন্ন (brutal-looking) চেহারা। যদিও আধুনিক মনুষ্যজাতির (Homo sapiensদের) মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার খর্বকায় অসভ্য আদিমনিবাসীদের সঙ্গেই নিয়াগোরথাল মানবের কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, এবং যদিও কোনও কোনও নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মনে করেন যে, নিয়াগোরথাল মানবের রক্ত অষ্ট্রেলিয়ানদের

ধমনীতে কিছু থাকিতে পারে, তবু এই দুই জাতি শারীরিক গঠনে কত দূর বিভিন্ন, তাহাঁ এই প্রবন্ধের চিত্র দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা প্রায় সর্বসম্মতি-ক্রমে এই নিম্নাণ্ডারথাল জাতিকে আধুনিক মানব-জাতি হইতে বিভিন্ন জাতি ব'লে স্থির করেছেন এবং নিম্নাণ্ডারথাল মানুষকে “আদিম মানব” (*Homo Primigenius*) ও তৎপরবর্তী মানব বা আধুনিক মানবকে “আসল মানব” (*Homo sapiens*) নাম দিয়াছেন।

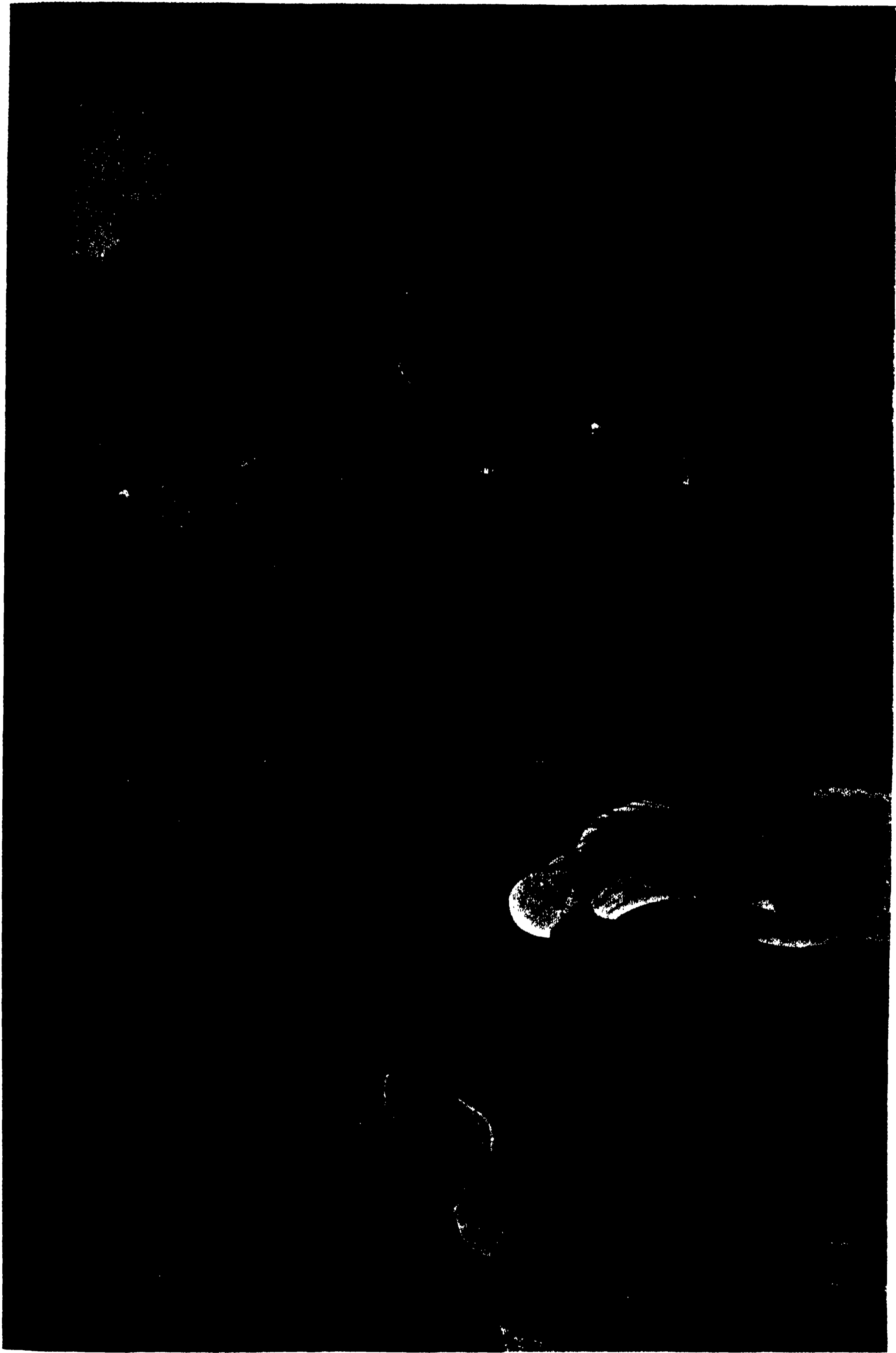
আসল বা আধুনিক মানব-জাতির মধ্যে যেমন তিন রকমের মাথার গড়ন দেখা যায়,—গোল ধরণের মাথা (*brachycephaly*), লম্বাটে মাথা (*dolichocephaly*) এবং মাঝারি ধরণের মাথা (*mesocephaly*), নিম্নাণ্ডারথাল মানবের মধ্যেও সেইরূপ তিন বিভিন্ন ধরণের মাথা-বিশিষ্ট লোক দেখা যায়; যেমন ক্রাপিনায় (*Krapina*) প্রাপ্ত দশটি নিম্নাণ্ডারথাল কঙ্কালের গোল মাথা, স্পাই (*Spy*) এবং ডুসেলডরফে (*Dusseldorf*) প্রাপ্ত কঙ্কালের লম্বাটে মাথা এবং জিব্রালটারে প্রাপ্ত কঙ্কালের মাঝারি ধরণের মাথা। ইহাতে অনুমান হয় যে, আধুনিক মানবের মধ্যে যেমন লম্বাটে মাথা-বিশিষ্ট (*long-headed*) নর্ডিক (*Nordic*) ও মেডিটারেনিয়ান (*Mediterranean*) প্রভৃতি জাতি, গোল ধরণের মাথা-বিশিষ্ট (*round-headed*) আলপাইন (*Alpine*), মঙ্গোলিয়ান (*Mongolian*) প্রভৃতি জাতি, এবং মাঝারি ধরণের মাথা-বিশিষ্ট (*Medium-headed*) আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান জাতি প্রভৃতি দেখা যায়, ঐ ‘আদি-মানব’ জাতিও তেমনি নানা জাতিতে বিভক্ত ছিল।

এই “আদিম মানব” জাতির কঙ্কালবশেষগুলির সঙ্গে তাদের হস্তনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র ও অন্ত্র যে-কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা হ'তে জানা যায় যে, ইহারা পূর্ববর্তী “গোড়ার মানুষ” (*Proto-man*)দের চেয়ে কেবল যে দৈহিক গঠনে উন্নত হয়েছিল তা নয়, সভ্যতার সিঁড়িতে কয়েক ধাপ উপরে উঠেছিল। এরা আগুনের ব্যবহার জানতো; মাংসাদি বোধ হয় ঝলসে খেতে জানতো; মৃত আত্মীয়দের যত্নের সঙ্গে কবর দিত এবং মৃতের কবরে তাদের অস্ত্রাদিও দিয়া দিত। স্ততরাং অনুমান করা যায়, তারা পরলোকে বিশ্বাস করতো। ইহাদের অস্ত্রগুলি পাথরের তৈরি

এই জাতির নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র যা-কিছু পাওয়া গেছে তার মধ্যে অবশ্য তেমন বৈচিত্র্য নেই। একটা পাথরের ঢেলা নিয়ে অস্ত্র পাথর দিয়া ভাঙতো আর পাশগুলি (*sides*) ভেঙে (*chipping*) আগাটা ধার করতো; পরবর্তী নূতন প্রস্তর-যুগে (*Neolithic age*) যেমন পাথর ভেঙে টুকরো করে এক একটি টুকরোকে ইচ্ছা ও প্রয়োজন মতন বিভিন্ন আকার দিয়া অস্ত্র পাথরে ঘষে পালিশ করা হ'ত, এরা তেমন করতে শেখেনি। পুরাতন প্রস্তর-যুগ (*Palaeolithic age*)কে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—নিম্ন ও উর্দ্ধ। যদিও নিম্নাণ্ডারথাল-মানবের অস্ত্র-শস্ত্রে বিশেষ বৈচিত্র্য ছিল না, তবুও তাহাদের বহুসহস্রবর্ষব্যাপী স্থিতিকালের মধ্যে অস্ত্রের গঠনভঙ্গীর যে ক্রমিক উন্নতি সাধিত হয়েছিল, তাহা তাহাদের নির্মিত স্ট্রেপিয়ান (*Strepyan*), চেলিয়ান (*Chellian*), আসোইলিয়ান (*Acheulian*) এবং মুষ্টিরিয়ান (*Mousterian*) অস্ত্রগুলি একের সহিত অপরের তুলনা করলে বুঝতে পারা যায়। এগুলি সব নিম্নের পুরাতন প্রস্তর-যুগের (*Lower palaeolithic*)।

এই নিম্নাণ্ডারথাল জাতি সম্ভবতঃ উত্তর-আফ্রিকা হ'তে ইউরোপে যায়; উত্তর-পশ্চিমে ইংলণ্ড পর্যন্ত এই জাতির কঙ্কালবশেষ ও হস্তনির্মিত অস্ত্রাদি পাওয়া গেছে। পূর্বে প্যালিওস্টাইন দেশের গ্যালিলি প্রদেশেও ইহাদের কঙ্কালবশেষ পাওয়া গেছে। ভারতবর্ষে যদিও নিম্নাণ্ডারথাল মানবের কঙ্কালবশেষ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি, তাদের নির্মিত চেলিয়ান ও মুষ্টিরিয়ান অস্ত্রের অনুরূপ পুরাতন প্রস্তর-যুগের অস্ত্র (*palaeoliths*) ভারতের নানা স্থানে, বিশেষতঃ দক্ষিণ-ভারতে, পাওয়া যায়; বর্তমান লেখক এবং আরও কেহ কেহ এরূপ অস্ত্রাদি পেয়েছেন; এবং ভারতের কোনও কোনও যাহুঘরে কিছু নমুনা রক্ষিত আছে।

কোনও কোনও নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মনে করেন যে, তুষার-যুগের (*Glacial age*) শেষ ভাগে যেমন ইউরোপে তুষার-নদী (*glacier*)গুলি উঠরে স'রে যেত লাগলো ও পৃথিবীর জলবায়ু, উদ্ভিদ ও জীব-জগতের পরিবর্তন হ'তে লাগলো, মানুষের চেহারাও তেমনি বদলে গিয়ে নিম্নাণ্ডারথাল মানবেরই বংশধরেরা তুষার-যুগের পরবর্তী কালে (*Post-glacial period*) অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায় ও স্ত্রী অওরিগনেশিয়ান (*Aurignacian*) ও ক্রোমাগনন



গান
শ্রী কৃষ্ণ কৃষ্ণ

প্রবাল প্রেস, কলিকাতা



স্পেন দেশে প্রাচীন প্রস্তর-যুগের মানুষদের কার্টনিক ছবি

(Cromagnon) প্রভৃতি জাতিতে পরিণত হ'ল। কিন্তু অধিকসংখ্যক নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের মতে এই নিয়োগারথাল জাতিও অবশেষে প্রকৃতির সঙ্গে জীবনসংগ্রামে পরাস্ত হয়ে ক্রমে লোপপ্রাপ্ত হয়। তবে হয়ত অষ্ট্রেলিয়া দেশের অসভাদের মধ্যে তাহাদের কিছু রক্তসংশ্রমণের চিহ্ন বর্তমান। তুয়ার-যুগের পরবর্তীকালে ইউরোপে যে অওরিগনেসিয়ান ও ক্রোমাগনন প্রভৃতি জাতির আবির্ভাব হ'ল এবং অগ্নাত্ত নামে অগ্নাত্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ল, তারা নতন মানব-জাতি (Neanthropic Man)। নিয়োগারথাল মানুষ জীববৃক্ষের মানবশাখার প্রশাখামাত্র ছিল; প্রধান মানব শাখা আরও পরিপুষ্ট হয়ে উঠে শেষে এই নতন মানব-জাতিতে পরিণত হ'ল। এই ক্রোমাগনন প্রভৃতি নতন মানুষের (Neanthropic Man এর) চেহারা: আধুনিক মানুষের (Homo recens বা Homo sapiens এর) অনেকটা অনুরূপ, যদিও তত সুশ্রী ও সুন্দর নয়। বস্তুত: এদেরই বংশধরেরাই আধুনিক মানব (Homo sapiens) হয়ে দাঁড়াল। এদের মাথার খুলি উঁচু, নিয়োগারথাল-মানবের মতন চ্যাপ্টা নয়; ভুরুর হাড় নিয়োগারথালদের মতন উঁচু (prominent বা bulging) নয়, দাঁতের নীচের মাড়ি (lower jaw) ছোট, দাঁতও ছোট, এবং লম্বায় ক্রোমাগনন জাতি দীর্ঘকায়।

তুয়ার-যুগের পরবর্তী নাতিশীত নাতিগ্রীষ্ম আবহাওয়ায় এই সব জাতিদের জীবনসংগ্রামের দায় অনেক হালকা হয়ে গেল; এবং সভ্যতার সিঁড়িতে এগিয়ে উঠবার অনেক বেশী সুবিধা ও সময় এরা পেল। নানা রকমের সুন্দর সুন্দর

গঠনের পালিশ করা অস্ত্র এই পুরাতন প্রস্তর-যুগের শেষভাগে (Upper Palaeolithic age) প্রস্তুত হ'তে লাগলো। ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে আজকাল আমরা তৎকালীন সভ্যতার স্তর বা শ্রেণী বিভাগ করেছি। প্রথম, অওরিগনেসিয়ান সভ্যতা (Aurignacian Culture); সেই আদিম সভ্যতার নিদর্শন-স্বরূপ প্রস্তরের বহুবিধ সুন্দর অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া পশ্চিম-ইউরোপের পর্বতগুহার গাত্রে বা ছাদে আঁকা অনেক জীবন্ত (life-like and realistic) রঙীন চিত্র, বিশেষত: শিকারের, শিকারীর ও বহু পশুপক্ষীর, পাওয়া গেছে। ভারতে মধ্যপ্রদেশের নিকটবর্তী ছাঁত্তিগড়ের অন্তর্গত রায়গড় রাজ্যে দিঙ্গানপুর গ্রামের পর্বতগুহায় সেইরূপ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বেঙ্গল-নাগপুর বেলপথের দিঙ্গানপুর স্টেশন থেকে প্রায় এক মাইল দূরে ইহা অবস্থিত। এই প্রবন্ধ-লেখক দিঙ্গানপুরের সেই পাহাড়ের নীচে অওরিগনেসিয়ান শিলা-অস্ত্রের অনুরূপ (Aurignacian flakes) কয়েকটি পেয়েছেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মিরজাপুর জেলার ছাতা গ্রামের অনতিদূরে কাইয়ুর পর্বতশ্রেণীর কয়েকটি গুহার (cave shelters) ও পাহাড়ের গায় যে-সমস্ত প্রাগৈতিহাসিক চিত্র দেখা যায়, সেগুলি নতন প্রস্তর-যুগের হওয়া সম্ভব। ভালদারিয়া নদীর তীরে লিথুনিয়া গুহার নিকট নতন প্রস্তর-যুগের শিলা-অস্ত্র পাওয়া গেছে। আক্ষেপের বিষয় এই যে, অনুসন্ধানের অভাবে ভারতের প্রাগৈতিহাসিক কালের নরককালাবশেষ এখনও বিশেষ পাওয়া যায় নি।

ইউরোপে অওরিগনেসিয়ান সভ্যতার প্রাহর্ভাব কালে

যে গ্রিমালডি জাতির কঙ্কালবশেষ পাওয়া গেছে, তারা আফ্রিকার আধুনিক নিগ্রোজাতির পূর্বপুরুষদের জাতি বলিয়া অনুমিত হয়। আর ফারফুজ (Furfooz) নামক গোলমস্তকবিশিষ্ট (brachycephalic) যে জাতির কঙ্কালবশেষ ইউরোপে পাওয়া গেছে, তারা সম্ভবতঃ



রোডেসিয়ান মানব দেখিতে সম্ভবতঃ এইরূপ ছিল

এশিয়ার মোঙ্গোলিয়ানদেরই পূর্বপুরুষদের জাতি ছিল ব'লে মনে করা হয়।

অওরিগনেসিয়ান সভ্যতার (Aurignacian cultureএর) পরে ইউরোপে ক্রোমাগনন জাতির পর্যায়ক্রমে সলুউটিয়ান (Solutrean) ও তার পর ম্যাগডেলেনিয়ান (Magdalenian) সভ্যতার (cultureএর) অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। সলুউটিয়ান সভ্যতাকালের সুন্দর লরেল পাতার নমুনায় নির্মিত (laurel-leaf pattern) শিলা-অস্ত্র দেখিতে বড় সুন্দর। তার পরের ম্যাগডেলেনিয়ান সভ্যতা-প্রসূত আরও সুন্দর অস্ত্রশস্ত্র ও ইউরোপের পর্বত-গুহায় অঙ্কিত চিত্রগুলি আরও মনোরম। এই সময় হাতীর দাঁতের ও হরিণের শিঙের দ্বারা সুন্দর বল্লম বা বর্ষা ও তীর তৈরি হ'ত এবং তার উপর সূচিকণ কারুকাৰ্য্য করা হ'ত। ইহাদের গোরস্থানে সুন্দর সুন্দর অস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি পাওয়া যায়, এবং কোনও কোনও শব এক প্রকার লাল মাটির (red ochreএর) ভিতর পোতা হ'ত।

এর পরে কিছু দিন মধ্য-প্রস্তর-যুগ (Mesolithic culture) আরম্ভ হ'ল এবং অপেক্ষাকৃত অল্পকালের মধ্যেই তিরোহিত হ'ল। এটা পুরাতন প্রস্তর-যুগ হ'তে নতন প্রস্তর-যুগের পরিবর্তন হবার সন্ধিকাল (transitional period)। তার পর চতুর্থক যুগের (Quaternary periodএর) প্রাথমিক (Pleistocene) অন্তর্যুগ শেষ হ'য়ে আধুনিক (recent) অন্তর্যুগ এল। এই অন্তর্যুগের প্রারম্ভে এ সময়ে ইউরোপে শিল্পকলা কিছু জ্ঞান হয়েছিল। এই কালের আজিলিয়ান ও টারডিনেসিয়ান সভ্যতায় (Azilian-Tardenoisian Cultureএর) সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু নেই। কেবল অতি ক্ষুদ্র শিলা-অস্ত্র নির্মাণে তখনকার লোক সিদ্ধহস্ত ছিল।

চতুর্থক যুগের (Quaternary Periodএর) প্রাথমিক (বা Pleistocene) অন্তর্যুগের অন্তে, “আধুনিক মানব” জাতি-সমূহের অ-বিশিষ্ট পূর্ব-পুরুষেরা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। চতুর্থক যুগের (Quaternary Periodএর) প্রাথমিক (Pleistocene) অন্তর্যুগ শেষ হয়ে আধুনিক (Recent) অন্তর্যুগ এল। এই অন্তর্যুগের প্রারম্ভে নতন প্রস্তর-কাল ছিল। ঐ সময় সুন্দর পালিশ করা নানা রকম পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ও অলঙ্কারাদি তৈয়ার হ'ত। চাম্বাসের ও পশুপালনের আরম্ভ হ'ল। মাটির বাসন ও হাঁড়িকুড়ি হাতে গড়া হ'তে লাগল। মানুষের মৃতদেহ প্রোথিত করবার জগ্ন পাথরে মণ্ডিত গোল এবং লম্বা কবর (dolmens, stone-circles, etc.) প্রভৃতি প্রস্তুত হ'তে আরম্ভ হ'ল; এবং স্মরণীয় মৃত ব্যক্তিদের স্মৃতিচিহ্নরূপ প্রস্তরস্তম্ভ (menhirs) খাড়া করবার প্রথা প্রবর্তিত হ'ল। এই কালের পাথরের ও মাটির প্রস্তুত অনেক প্রকার তৈজসপত্র ও শকটের চাকা পর্যন্ত পাওয়া যায়।

কিছুকাল পরে ইউরোপে দস্তা ও তামার সংমিশ্রণে প্রস্তুত একরূপ কঁাসার (bronzeএর) চলন হ'ল ও ভারতে তামার ব্যবহার আরম্ভ হ'ল। ছোটনাগপুরে এই প্রবন্ধলেখক একটি ব্রোঞ্জের কুঠার পেয়েছিলেন। এটি পাটনা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। ভারতে আর দ্বিতীয় ব্রোঞ্জের কুঠার আবিষ্কৃত হয়েছে ব'লে জানা নাই। নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র, অলঙ্কার, ও বাসন হাঁড়িকলসী প্রভৃতি এই সব ধাতুতে প্রস্তুত হ'তে লাগল; সোনার এবং মূল্যবান পাথরের অলঙ্কারাদিও তৈয়ার হ'তে লাগলো। প্রথমে পাথর ও তামা দুই-ই এক সময় ব্যবহার হয়; তাই সে কালকে তাম্র-প্রস্তর-যুগ (chalcolithic period) বলা হয়। তাম্র-যুগ ও তাম্র-প্রস্তর-যুগের এত সুন্দর সুন্দর ধাঁচের (patternএর) অলঙ্কারাদি দেখা যায় যে, তা আধুনিক সেকরাদের তৈরি জিনিষের সঙ্গে সমকক্ষতা করতে পারে। সিঙ্কনের উপত্যকায় মহেঞ্জোদাড়ো এবং

হারাপ্পায় এবং ভারতের আরও কোনও কোনও স্থানে ঐ যুগের ধসাবশেষের মধ্যে একরূপ দ্রব্যসম্ভার পাওয়া গেছে। তাম্র-যুগের পরে পুরাতন লৌহ-যুগ এবং এখন আধুনিক লৌহ-যুগ।

তৃতীয় যুগের অন্ত্যাধুনিক (Pliocene) অন্তর্ভুক্ত যে মানবীয় শাখা (Humanoid stem) মানব-শাখায় (Human stem) পরিণত হ'য়ে ক্রমে প্রাথমিক মানব (Homo Primigenius) বা নিয়াণ্ডারথাল-মানব নামক প্রশাখা উৎপন্ন করেছিল; এবং ক্রমে মূল অ-বিশিষ্ট মানব-গোষ্ঠীর উদ্যমশীল প্রধান শাখা আবার পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিক নৈসর্গিক অবস্থার সঙ্গে প্রাকৃতিক ও ঐচ্ছিক নির্বাচনের সাহায্যে আপনাদিগকে মিলিয়ে বীজের ক্রমিক প্রয়োজনীয় পরিবর্তন হাঙ্গল ক'রে অবশেষে চতুর্থক যুগের প্রাথমিক অন্তর্ভুক্ত অস্ত্যাধুনিক 'আসল মানব' বা 'আধুনিক মানবে' পরিণত হ'ল,—সেই ক্রম-বিকাশ-পদ্ধতির সমগ্র ইতিহাস

(main human stem) হ'তে যে আধুনিক মানব-জাতির (Homo sapiens) উৎপত্তি হয়েছে, তাহা প্রাকৃতিক ও ঐচ্ছিক নির্বাচনের এবং বৃদ্ধির পরস্পরসাপেক্ষ নিয়মের (law of correlated growth) সাহায্যে যথোচিত



নতন প্রস্তর-যুগের মানুষদের কাল্পনিক ছবি



নিয়াণ্ডারথাল
মানবের কঙ্কাল



আধুনিক অস্ট্রেলিয়ার
আদিম-নিবাসীর
কঙ্কাল

আমরা জানতে পারিনি। তৃতীয়ক যুগের অজ্ঞাত ইতিহাস অলিগোসিন (Oligocene) ও মধ্যায়ুগিক (Miocene) যুগদ্বয়ের অঙ্ককারে অ-বিশিষ্ট মানবকল্ল গোষ্ঠীর কত কত প্রশাখা পারিপার্শ্বিক নৈসর্গিক পরিবর্তনের সঙ্গে আপনাদিগকে মিলিয়ে নিতে না পেরে বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে, তার সব নিদর্শন পাওয়া যায় না। চতুর্থক যুগের প্রাথমিক (Pleistocene) অন্তর্ভুক্ত যে-সব মানব-শাখার যে-সব প্রশাখা আপন আপন অযোগ্যতার জগ্ঘ বিলুপ্ত হয়েছে, তাদের সমস্ত হিসাব আমরা পাই না। কেবল এই মাত্র অনুমান করতে পারি যে অন্ত্যাধুনিক (Pliocene) কালের প্রধান মানব-শাখা

ক্রমিক অনুকূল পরিবর্তন (successive favourable variations) জমিয়ে যোগ্যতমের উদ্বর্তন (survival of the fittest) নিয়ম অনুসারে অসাধারণ বৈশিষ্ট্য হাঙ্গল করেই (by a process of extraordinary progressive differentiation) এইরূপ হ'তে পেরেছে।

যে-সমস্ত অনুকূল পরিবর্তনের সমষ্টি অ-বিশিষ্ট মানব-গোষ্ঠীকে আসল মানব বা আধুনিক মানবে পরিণত করতে পেরেছে, সেগুলি সমস্তই ক্রমিক বা ধীরে ধীরে আয়ত্ত (gradual) নয়, কোন-কোনটিকে হঠাৎ করায়ত্ত পরিবর্তন (saltatory changes বা sudden mutations) বলা যেতে পারে। এইরূপে যে-সমস্ত পাশবিক লক্ষণ অ-বিশিষ্ট মানব-গোষ্ঠীকে 'আসল মানবে' পরিণত হ'তে বাধা দিচ্ছিল, সেগুলি একে একে অপসারিত হওয়ায় আধুনিক উচ্চতর মানব-জাতির আবির্ভাব হ'ল।

পিথেকানথ্রোপাস (Pithecanthropus) প্রভৃতি প্রাক-মানবের উদ্ভবকাল হ'তে আজ পর্যন্ত কত শত লক্ষ বৎসর গত হয়েছে। পশুপ্রায় অসভ্য বর্কর 'গোড়ার মানুষের' অপেক্ষা 'আধুনিক মানুষ' সভ্যতার পথে অনেক দূর অগ্রসর

হয়েছে সত্য, কিন্তু এখনও মানবের চরম উন্নতির—যথার্থ মনুষ্য বা 'দেবত্ব' লাভের আশা সুদূরপর্যন্ত। এখন পর্যন্ত উচ্চপভাভিমানী জাতিদের মধ্যেও পশু-গন্ধ (smell of the beast) বিলুপ্ত হয় নি; এখনও মানুষের রক্ত মানুষে শোষণ ক'রছে—কেবল অসভ্য মানব-মস্তক-শিকারী (head-hunters) আদিম জাতিরা নয়, সুসভ্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমৃদ্ধিশালী জাতিরাও এ-বিষয়ে তাদের চেয়ে পশ্চাৎপদ নন। কেবল হনন-কৌশলে যা-কিছু প্রভেদ।

এই সব দেখে মনে হয়, মানুষ এখনও উন্নতির পথের নূতন যাত্রী মাত্র; উন্নতির সুদীর্ঘ রাস্তা এখনও অসুস্থান বলে মনে হয়। ইংরেজ-কবি টেনিসন তাঁহার "উষা" ("The Dawn") নামক কবিতায় যথার্থই বলেছেন,—
আমরা এখনও সভ্যতার রক্তাভ উষাকাল অতিক্রম করিনি :—

"Red of the dawn !

* * * * *
For Babylon was a child new-born, and Rome was a
tube in arms,
And London and Paris and all the rest are as yet
but in leading strings."

কবির সঙ্গে বিবর্তনবাদী নৃতত্ত্বসেবীরাও মনশিক্ষে দেখেন,
একদিন—

"Earth at last a warless world, a single race,
a single tongue,
—I have seen her far away—for is not earth
as y t so young ?—
Every tiger madness muzzled, every serpent
pussion killed,
Every grim ravine a garden, every blazing
desert till'd."

(Locksley Hall Sixty Years After.)

কারণ,—

"Only that which made us, meant us to be mightier
by and by
Set the sphere of all the boundless Heavens within
the human eye,
Sent the shadow of Himself, the boundless, through
the human soul ;
Boundless inward, in the atom, boundless outward,
in the Whole."

(Locksley Hall Sixty Years After.)

মনোরাজ্যের কাহিনী

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

নদীর বুকে যেমন ঢেউয়ের পর ঢেউ জাগে, মনের মধ্যেও তেমনি চিন্তার পর চিন্তা জাগে। ঢেউ জলের ভিতর হইতে উঠিয়া জলের ভিতরেই আবার মিলাইয়া যায়; চিন্তাও মনের অতল হইতে উঠিয়া আবার মনের অতলেই আত্মগোপন করে। নদীর বুকে ঢেউয়ের ওঠা-পড়া যেমন বিরাম নাই, মনের মধ্যেও চিন্তার তরঙ্গ তেমনি কেবলই উঠিতেছে, কেবলই পড়িতেছে।

মনের উপরিভাগে যখন একটি চিন্তা জাগিয়া থাকে, তখন অগাধ চিন্তা মনের অতলে অপেক্ষা করে উপরে উঠিবার জন্ত। যে-চিন্তাটি চেতনার ক্ষেত্র অধিকার করিয়া থাকে, সেটি কিছুক্ষণ পরে বিশ্বতির রাজ্যে চলিয়া যায়। চেতনার রাজ্যে নূতন নূতন চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয় নেপথ্যের অন্ধকার হইতে। মন যেন খিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ। রঙ্গমঞ্চে নটবালকেরা নাচিয়া গাহিয়া নেপথ্যে চলিয়া যায়। নূতন অভিনেতার আসে নূতন ভূমিকা লইয়া নেপথ্য হইতে প্রকাশে। মনের রঙ্গমঞ্চেও তাই। বিশ্বতির অন্ধকার হইতে চেতনার আলোকে এবং চেতনার আলোক হইতে বিশ্বতির অন্ধকারে চিন্তার ছুটাছুটির বিরাম নাই।

মনের যে-দিকটা চেতনার আলোকে আলোকিত তাহাকে

মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন, সজ্ঞান অবস্থা (conscious state) মনের যে-দিকটা চেতনার রাজ্যের বহির্ভূত, যে-দিকটা বিশ্বতির অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, সেই দিকটার নাম আন্তর্জ্ঞানিক অবস্থা (sub-conscious state)। এই আন্তর্জ্ঞানিক প্রদেশের অলক্ষ্যে কত চিন্তাই যে লুকাইয়া আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা জীবনে যত কিছু চিন্তা করি তাহার কোনটাই একেবারে নষ্ট হয় না। সেগুলি চেতনার রাজ্য হইতে বিশ্বতির রাজ্যে চলিয়া যায়। সেই বিপুল অন্ধকারের রহস্যময় রাজ্যে কত দিনের কত আশা-আকাঙ্ক্ষাই না লুকাইয়া আছে। কবে গৈশবের সোনালী প্রভাতে মা আমার চিবুক ধরিয়া মাথা আঁচড়াইয়া দিগছে, ঠাকুরমা ভোরের বেলায় কৃষ্ণের শতনাম শুনাইয়াছে, আহার করাইবার সময় রামায়ণ মহাভারতের গল্প বলিয়াছে, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, অভিমত্যাধের কাহিনী শুনিতে শুনিতে দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রুজল ঝরিয়াছে, প্রবন্ধ লিখিতে লিখিতে একে একে কত কথাই না মনে পড়িতেছে। সে কতকালের কথা!

এতক্ষণ এই সব ছবি কোথায় আত্মগোপন করিয়া ছিল? কোথায় ছিল আমার ছোট চিবুকটিতে মায়ের হাতের সেই স্পর্শের স্মৃতি?

দমদম জেলের কক্ষের শয্যা বসিয়া লিখিতে লিখিতে মনের সামনে বাহুস্কোপের ছবির মত শুধু ছবির পর ছবি জাগিতেছে। অনেক দিন তাহাদের কথা ভাবি নাই। কিন্তু একটি কথাও শূন্যের মধ্যে নিঃশেষ এবং নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। নিঃশেষে মুছিয়া গেলে আজ তাহারা মনের আকাশে তারার মত এমন করিয়া একটির পর একটি ফুটিয়া উঠিত না। আরও অনেক কথা, লজ্জার কথা, গৌরবের কথা, ভয়ের কথা, সাহসের কথা, দুঃখের কথা, স্নেহের কথা, সোহাগের কথা, শাসনের কথা—অনেক কথা মনের কোণে গুপ্ত হইয়া আছে, স্তূপ হইয়া আছে। মনের যে-প্রদেশে অতীতের এবং বর্তমানের শত শত আশা-আকাঙ্ক্ষা লুকাইয়া আছে তাহাই হইতেছে অবচেতনার প্রদেশ। সেই বিশ্বতির কুহেলিকাচ্ছন্ন প্রদেশে এক দিন এই দমদম জেলের ছবিও মিলাইয়া যাইবে। সে-দিন নূতন দৃশ্য চোখের সামনে জাগিয়া উঠিবে; চোখ দেখিবে নূতন মানুষের মুখ, কান শুনিবে নূতন মানুষের কণ্ঠস্বর। বর্তমান সে-দিন অতীতের গর্ভে ঢলিয়া পড়িবে, ভবিষ্যৎ বর্তমানের মধ্যে আসিবে। এমনি করিয়া যাহাকে বর্তমানে জানিতেছি রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের মধ্য দিয়া, তাহা অতীতের মধ্যে নিমিষে নিমিষে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে; যাহাকে পূর্বে জানি নাই তাহাকে মুহূর্তে মুহূর্তে জানিতেছি। কিন্তু সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে একটি সত্য আছে যাহা আমরা ভুলিব না। যাহা যায় তাহা নিঃশেষে মুছিয়া যায় না—তাহা মনের অতল প্রদেশে সঞ্চিত হইয়া থাকে।

মনের এই অবচেতনার ক্ষেত্রে আমরা চিন্তের চোরাকুঠুরীও বলিতে পারি। অন্তরের অসংখ্য বৃত্তি বা চিন্তা চেতনার আলোকে দীপ্তিমান মনের প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে দেখা দিয়া চোরাকুঠুরীতে চলিয়া যায়। তখন তাহাদের কথা আমরা ভুলিয়া যাই। কোন কারণের সূত্রে অবলম্বন করিয়া তাহারা যখন-তখন চেতনার ক্ষেত্রে আসিতে পারে।

দুঃস্বপ্নের হৃদয় হইতে শকুন্তলার স্মৃতি মুছিয়া গিয়াছিল। কণ্ঠের তপোবনে প্রিয়ার সহিত সেই প্রথম সাক্ষাৎ, কুঞ্জকুটীরে প্রেয়সার সহিত সেই গোপনমিলন, কানে কানে সেই কত সোহাগবাণী—দুঃস্বপ্ন সব ভুলিয়া গিয়াছিল। শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিবার মূলে এই বিশ্বাস। তাহার পর ধীরে আসিয়া যখন শকুন্তলার হারাণে অঙ্গুরীয়টি আনিয়া রাজাকে দেখাইল তখন রাজার একে একে সব কথা মনে পড়িয়া গেল। বিশ্বাসিত হওয়ার খুলিয়া রাজার চেতনার রাজ্যে আসিয়া দাঁড়াইল কণ্ঠের দুহিতা শকুন্তলা; নবযৌবনা স্নন্দরী যুবতী সখীদের সঙ্গে আলবালে জলসেচন করিতেছে। আরও কত কথা একে একে রাজার স্মৃতিপথে উদ্ভিত হইল। অঙ্গুরীয়কে আশ্রয় করিয়া বিশ্বাসিত আবার

ঠেলিয়া শকুন্তলা স্মৃতিপথে আসিয়া দাঁড়াইল এবং রাজাকে অহুশোচনার তীক্ষ্ণ শরে একেবারে অভিভূত করিয়া দিল। এমনি করিয়াই যাহা বিশ্বাসিত রাজ্যে এক দিন চলিয়া যায় তাহা সহসা স্মৃতিপথে আসিয়া উদ্ভিত হয়—যাহাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল সে আসিয়া কখন চোখের স্লে বক্ষ ভাসাইয়া দেয়—যাহার মুখের ছবি বহু দিন মনে পড়ে নাই সে কখন রাতের অন্ধকারে নিদ্রাহীন আঁধির আগে আসিয়া দাঁড়ায় এবং অভিমানভরা ছলছল চোখে নীরবে আমাদিগকে তিরস্কার করে।

সকল সময়ে একটা কোন হেতুকে অবলম্বন করিয়াই যে বিশ্বাসিত চিন্তা মনের চোরাকুঠুরী হইতে চেতনার প্রকাশ্যে আসিয়া উপস্থিত হয় এমন নহে। অনেক সময় অকারণে অনেক কথা মনে পড়িয়া যায়। উদাস সঙ্কায় ধূসর আকাশের পানে চাহিয়া হঠাৎ মনে পড়ে প্রিয়জনের কথা। বিরহী মন কাঁদিয়া উঠে। নিশীথ রাতে বাণীর করুণ স্বর শুনিয়া সহসা মনে পড়িয়া যায় গত জীবনের বিষাদমাগা স্মৃতি; অতীতের অস্পষ্ট গর্ভ হইতে জাগিয়া উঠ বেদনার সক্রমণ ছবিগুলি। কেন যে এমন হয় ইহার উত্তর দেওয়া স্বকঠিন। হেমস্তের সঙ্কায় মাঠের পথে চলিতে চলিতে মনে পড়িয়া যায় বাল্যবন্ধুর কথা যাহার সঙ্গে জীবনের বহুস্মৃতি জড়াইয়া আছে। শ্রাবণরাত্রি; আকাশে জল বারিতেছে; বাতাস হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে; সহসা মন কাঁদে প্রিয়জনের জন্ম। যাহাকে বহু দূরে ফেলিয়া আসিয়াছি তাহাকে বৃকের কাছে পাইবার জন্ম হৃদয় অস্থির হয়। দূরের বিশ্বাসিত মানুষ কেন যে বর্ষার মেঘ-কঙ্কল দিবসে, আষাঢ়ের বর্ষণমুখর রাত্রে প্রাণের অন্তঃপুরে আসিয়া আমাদিগকে কাঁদায়, কে বলিবে? মেঘের নীলিমা দেখিয়া রাখা কাঁদিতেন। সেখানে নূতন মেঘের ঘনিমার পানে চাহিয়া রাখার মনে পড়িত ক্রমের চন্দনচর্চিত নীল-কলেবরের কথা। মেঘের সেতু বাহিয়া ক্রম আসিতেন রাখার মনের মধ্যে। কিন্তু বর্ষণমুখর বাদলরাত্রে কেন শূন্য হৃদয়মন্দির বাজিতের জন্ম হাহাকার করিতে থাকে? ইহার উত্তর কে দিবে?

কিন্তু কতকগুলি স্মৃতি ও চিন্তাকে সহস্র চেষ্টাতেও আমরা চেতনার আলোকে আনিতে পারি না। তাহারা বিশ্বাসিত অন্ধকারে চিরতরে অবলুপ্ত হইয়া যায়। সেই অতল অন্ধকার হইতে কোন ডুবুরীই তাহাদিগকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে তুলিতে পারে না। মনঃসমীক্ষণে (Psycho-analysis) ইহাদিগকে সঙ্কবিচ্ছিন্ন চিন্তা (dissociated thoughts) বলে। মনস্তত্ত্ববিদগণের মতে এই-সব চিন্তাকে চেতনার ক্ষেত্রে আনা যায় না। ম্যাকডুগাল সাহেব তাহার গ্যাবনমর্গাল সাইকোলজী (Abnormal Psychology) নামক গ্রন্থের মধ্যে মানসিক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত কতকগুলি রোগীর ইতিহাস দিচ্ছিলেন। ইহার বিগত যুদ্ধের সৈনিক। একটি ক্যানাডাবাসী কৃষক

সৈনিক হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিল। একটি সাংঘাতিক যুদ্ধের দৃশ্য দেখিয়া তাহার মনের রাজ্যে একেবারে ওলটপালট ঘটয়া গেল। ঐ যুদ্ধে তাহার প্রিয়তম বন্ধুর মৃত্যু ঘটে। মৃত বন্ধুটির ক্ষতবিক্ষত দেহের বীভৎস দৃশ্য তাহার মনকে এমন নাড়া দিল যে, সেই আঘাতে তাহার মন একেবারে বিকল হইয়া গেল। সে ভুলিয়া গেল চাষবাসের কথা, ক্যানাডার জীবন-যাত্রার কথা। গাধার ছবিকে বলিতে লাগিল ঘোড়ার ছবি, শেয়ালকে বাল্ল কুকুর, লাল্লের বর্ণনা দিতে পারিল না। তাহার সন্তার এক অংশ যেন অতীতের গর্ভে চিরতরে বিলীন হইয়া গিয়াছে; তাহার মনের এক অংশ যেন ছিঁড়িয়া গিয়া কোথায় ছিটকাইয়া পড়িয়াছে; তাহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। এমনি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, রোগীর অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটয়াছে। অতীতে সে যাহা করিয়াছে, দেখিয়াছে, শুনিয়াছে তাহার কোন কথাই তাহার মনে নাই। অতীতের মানুষ আর বর্তমানের মানুষটি যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; তাহাদের কোথাও যোগ নাই। রোগী কিছুতেই তাহার অতীত জীবনের কথা মনে করিতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসার সাহায্যে পূর্বের স্মৃতি আবার ফিরিয়া আসে, অতীত ও বর্তমানের মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়া যায়। ক্যানাডার সৈনিকটি তাহার পূর্বস্মৃতি ফিরিয়া পাইয়াছিল। অনেক ক্ষেত্রে স্মৃতি আর চেতনার ক্ষেত্রে জাগে না। অপ্রীতিকর চিন্তাকে চেতনার ক্ষেত্রে হইতে নির্কাসন করিবার প্রাণপণ চেষ্টা হইতে অনেক সময়ে এই স্মৃতিলোপ ঘটয়া থাকে। রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রের বীভৎস দৃশ্য ও গৃহের চিন্তাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিতে গিয়াই বহু সৈনিক এই মানসিক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। গৃহে বহু বিপদের মধ্যে অসহায় স্ত্রীপুত্রকে ফেলিয়া আসা সহজ ব্যাপার নহে। চক্ষের সম্মুখে মানুষের মাথা উড়িয়া যাইতেছে, নাড়িভূঁড়ি বাহির হইয়া পড়িতেছে—সেও কি দুঃসহ দৃশ্য! এই-সব অপ্রীতিকর স্মৃতিকে জোর করিয়া দাবাইয়া রাখার চেষ্টা অনেক সৈনিকের মনকে বিকল করিয়া দিয়াছে। মনঃসমীক্ষণে (Psycho-analysisএ) ইহাকে বলে সঙ্গবিচ্যুতি (Dissociation)

“আমরা যাহাকে চেতনা বলিয়া থাকি তাহা আমাদের সত্তার অংশ-মাত্র—অতিকল্প অংশমাত্র। যে-কোন একটি সময়ে আমাদের সত্তার প্রায় সবটুকু অংশ দৃষ্টির আড়ালে থাকে। চেতনা সত্তার উপরিভাগে খেলিয়া বেড়ায়—ইহা এবং সত্তা এক নহে। আমাদের পক্ষে যত কিছু চিন্তা করা, স্মরণ করা অথবা দর্শন করা সম্ভবপর তাহাদের অতি অল্প অংশ কোন একটি সময়ে আমাদের চেতনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে।”
—Outline of Modern Knowledge.

তাহা হইলে বুঝিতে পারা গেল, আমার মনের যে-অংশ চেতনার আলোকে আলোকিত হইয়া আছে তাহাই আমার সত্তার সবটুকু নয়। সেই অংশ আমার সমগ্র সত্তার অতি

ক্ষুদ্র ভগ্ন অংশ। আমার অবশিষ্ট সত্তা সকল সময়েই দৃষ্টির বাহিরে লুকাইয়া থাকে। সমুদ্রের উপর দিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের পাহাড় অনেক সময়ে ভাসিয়া যায়। পাহাড়ের খানিকটা অংশ জলের উপরে জাগিয়া থাকে—বাকী অনেক-খানি থাকে সমুদ্রের ভিতরে দৃষ্টির বাহিরে। আমার মনের যে-অংশ চেতনার ক্ষেত্রে অধিকার করিয়া থাকে তাহা সমুদ্রের উপরে ভাসমান বরফখণ্ডের মত—তাহা আমার সবটুকু নয়। আমার মনের প্রায় সবটুকুই গুপ্ত হইয়া আছে আমার চেতনার বহির্ভাগে। উহাকে আমি জানিতে পারিতেছি না, দেখিতে পারিতেছি না। উহা সমুদ্রের তলদেশে লুকায়িত বরফের পাহাড়ের মত।

আমাদের মনের গোপন কক্ষে, অন্তরের অতল প্রদেশে যে-সকল ইচ্ছা বিদ্যমান আছে তাহারা সর্বদাই চেষ্টা করিতেছে চেতনার রাজ্যে আসিবার জন্ত। কিন্তু অন্তরের সকল ইচ্ছাকে চেতনার ক্ষেত্রে আমরা স্থান দিতে পারি না। কোন চিন্তা ভাল এবং কোন চিন্তা মন্দ তাহার সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা বোধ আছে। যে-ইচ্ছাকে আমি মন্দ ইচ্ছা বলিয়া মনে করি, যে-ইচ্ছাকে মনে স্থান দিলে আমি নিজের কাছে ছোট হইয়া যাই, সেই ইচ্ছাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিবার জন্ত আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি। সেই অন্তত চিন্তা যখন চেতনার ক্ষেত্রে আসিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করে তখন তাহাকে তাড়াইবার জন্ত আমিও প্রাণপণ চেষ্টা করি। মনের মধ্যে ইচ্ছার সহিত ইচ্ছার, প্রবৃত্তির সহিত প্রবৃত্তির সংগ্রাম সর্বদাই চলিতেছে। ‘পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক তোমা।’ আমি সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হইয়াছি—স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে বসা আমার পক্ষে অধর্ম। কিন্তু অন্তরে আমার মধ্যে যে আদিম পুরুষ রহিয়াছে সে নারীর অধরসুধা পান করিবার জন্ত পিপাসু হইয়া আছে। তাহাকে কত বুঝাইতেছি, কত শাসাইতেছি—কিন্তু কোন ধর্মকথাই সে শুনিতে চাহে না, কোন শাসনই সে মানিবে না! সে চায় রমণীর প্রেম, সে চায় নারীদেহের সৌন্দর্য। আমার সন্ন্যাস-ধর্মের বাধ ভাঙিয়া সেই আদিম পুরুষ আপনাকে প্রকাশ করিতে চায়। কিন্তু আমি তো তাহাকে স্বীকার করিতে পারি না! আমার মধ্যে যে বৈরাগী-মানুষ একতার বাজাইতেছে সে বলিতেছে, নারীর সৌন্দর্য ক্ষণস্থায়ী; নারীর প্রেমে শাস্তি নাই। দেহের জন্ত দেহের যে বাসনা সেই উন্নত বাসনা অগ্নিশিখার মত জ্বালাময়ী; তাহা আমাদের দগ্ন করে, স্নিগ্ধ করে না। লোকলজ্জা আমাকে বলিতেছে, ছিঃ ছিঃ, সামান্য ইন্দ্রিয়শ্রোতে যদি ভাসিয়া যাও তবে সমাভে মুখ দেখাইবে কেমন করিয়া? লোকের নিকট চিরকাল কলঙ্ক হইয়া রহিবে। তোমাকে দেখিয়া রাস্তার লোকে হাসিবে, আত্মীয়-স্বজন বিদ্রূপ করিবে। এমনি করিয়া একদিবে আমার মধ্যে আদিম পুরুষের উদ্দাম কামনা এবং

আর একদিকে সন্ন্যাসীর ত্যাগের আদর্শ, অনাসক্তির আদর্শ—এই উভয়ের মধ্যে সংগ্রাম চলিতেছে। নরনারীর অন্তরে এই আদিম যৌনপ্রবৃত্তি সাগরের মত তরঙ্গিত হইতেছে। এই সাগরের আক্রমণকে প্রতিহত করিবার জ্ঞান মানুষ নীতির কত বাধাই না বাধিয়াছে! কিন্তু সহসা সাগরে দোলা লাগে; বাধ ভাঙিয়া উচ্ছ্বসিত তরঙ্গরাশি সমস্ত একাকার করিয়া দেয়। কোন্ নিষ্ঠুর দেবতা আমাদেরকে পাগল করিয়া বিনাশের পথে ঠেলিয়া দেয় তাহা আমরা জানি না। শুধু জানি, অতি কঠোর সন্ন্যাসীরও আজন্মের সাধনা কখনও কখনও এই তরঙ্গবেগ সহ্য করিতে পারে না; উর্বশীর চটুল নয়ন উর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসীর মনকে শ্রলুক করে; উমার সৌন্দর্যরাশি সর্বভাগী শঙ্করের তপস্বী ভাঙিয়া দেয়।

যে-ইচ্ছাকে আমরা মনের মধ্যে স্থান দিতে চাই না সেই ইচ্ছাকে আমরা দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে চাই। অনভিপ্রেত চিন্তাকে চেতনার ক্ষেত্রে হইতে দূরে রাখিবার এই প্রযত্নই 'Repression' অথবা 'অবদমন' বলিয়া অভিহিত হয়।

যে-পেয়াদা অনভিপ্রেত ইচ্ছাগুলিকে দূরে ঠেলিয়া দেয়, চেতনার ক্ষেত্রে অথবা চিন্তের খাসকামরায় তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেয় না, তাহার নাম Censor অথবা প্রহরী। আমরা ইহাকে বিবেকও বলিতে পারি। জমিদারের কাছারিবাটি ও খাসকামরার মত যে-দুইটি প্রকোষ্ঠ আমাদের মনের মধ্যে বিদ্যমান, যে প্রকোষ্ঠ দুইটির একটির নাম সংজ্ঞান (the conscious) এবং অপরটির নাম অন্তর্জ্ঞান (the sub-conscious) সেই প্রকোষ্ঠ দুটির মধ্যবর্তী দ্বারদেশে প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া আছে সেন্সর। প্রহরীর অনুমোদন ব্যতীত কোন ইচ্ছা চেতনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে না। মহাদেবের তপস্বীক্ষেত্রের প্রান্তে সে নন্দীর মত বেত্র উঁচাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন। কোন চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে আসিবার উপক্রম করিতেছে দেখিলেই দ্বারী জিজ্ঞাসা করে, হু কামস্ দেআর (Who comes there)? যদি ইচ্ছাটি আমাদের নীতিধর্মের অনুমোদিত হয় প্রহরী তাহাকে চেতনার ক্ষেত্রে আসিবার অনুমতি দান করে। যদি ইচ্ছাটি আমাদের নীতিধর্মের অনুমোদিত না হয় তবে প্রহরীর কাছে উহা বন্ধু (friend) নহে, শত্রু (foe)। প্রহরী ধাক্কা দিয়া তাহাকে দূরে সরাইয়া দেয়।

প্রহরী যে-সকল ইচ্ছাকে চেতনার রাজ্য হইতে নির্বাসিত করে তাহাদের সবগুলিই যে সেই আজ্ঞানতশিরে মানিয়া লইয়া প্রস্থান করে এমন নহে। অনেক ইচ্ছা আমাদেরকে জড়াইয়া থাকে তাহাদিগকে আমরা নীতিপথে বাধা বলিয়া জানি। তাহাদিগকে আমরা যে ছাড়াইয়া যাইতে চাই না এমন নহে, কিন্তু ছাড়াইতে গেলেই কোথাও যেন ব্যথা

পাই। তাহাদিগকে আমরা শত্রু বলিয়া জানি; তবুও তাহাদিগকে প্রাণপণে আদর করিতে ইচ্ছা করে। প্রহরী তাহাদিগকে চেতনার ক্ষেত্রে কখনই আসিতে দিবে না—কিন্তু তাহারা যে আমার মর্মের মূলে বাসা লইয়াছে! তাহাদিগকে নির্বাসন দিতে আমার মন যে কিছুতেই চাহে না! উপায় কি?

উপায় ছদ্মবেশ। যে-সকল প্রবৃত্তিকে নীতিধর্মবিগহিত বলিয়া প্রহরী চেতনার ক্ষেত্রে আসিতে দেয় না অথচ যাহারা আমার একান্তই প্রিয় তাহাদিগকে ছদ্মবেশ পরাইয়া তবে চেতনার ক্ষেত্রে আনিতে হয়। নিজের সঙ্গে এমনি করিয়া আমরা কতই না লুকোচুরি খেলিয়া থাকি। আমরা ডুবিয়া ডুবিয়া জল খাই, ভাবের ঘরে চুরি করি। রোমা রংলার একখানি উপন্যাসের নাম মায়ামন্ত্রমুগ্ধ আত্মা (Soul Enchanted)। এই উপন্যাসের নায়িকা এনেট তরুণ চিত্রকর ফ্রাঙ্কে ভালবাসিয়াছে। নায়িকা চিত্রকরটির মাতার বয়সী; নায়িকার নিজেরও একটি পুত্র আছে। এইস্থলে সোজাসৃজি প্রেমিকার মত ভালবাসিতে নায়িকার সংস্কারে বাধে। যে ছেলের বয়সী, যাহার সঙ্গে বয়সের এত ব্যবধান তাহাকে সোজাসৃজি প্রেমিকের আসন দান করিতে সংস্কারে যখন বাধে তখন উপায় কি? প্রহরী মনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, হুসিয়ার! চিত্রকরের চিন্তা মনে স্থান দিতে পারিবে না। তাহাকে ভালবাসা অশাস্ত। নারীর মন কাঁদিয়া বলিতেছে—সে না থাকিলে জীবন শূন্য হইয়া যায়। সে যে প্রাণের প্রাণ! নিরুপায় হইয়া নায়িকা নিষ্করণ প্রহরীকে ফাঁকি দিল। সে প্রহরীকে বলিল, আমি উহাকে ছেলের মত ভালবাসি। এই ভালবাসার মধ্যে কামগন্ধ নাই। প্রহরী চিত্রকরের চিন্তাকে নারীর চেতনা ক্ষেত্রে তখন আসিতে দিল। রমণী আপনাকে ফাঁকি দিল, প্রহরীকে ফাঁকি দিল—কিন্তু সত্যকে ফাঁকি দিতে পারিল না। সে অলক্ষ্যে হাসিল এবং সময় আসিলে নারীকে বুঝাইয়া দিল, মায়ের ভালবাসার মুখোমুখি প্রবৃত্তির মধ্যে লুকাইয়াছিল কামনা—পুরুষের জ্ঞান নারীর চিরন্তন দুর্বল কামনা।

এমনি করিয়া তুষারশুভ্র নিষ্কলঙ্ক ভালবাসার মুখোমুখি পরিয়া কামনা আসিয়া আমাদের চিত্তকে অধিকার করে। আমরা অন্তরে অন্তরে জানি, যাহাকে ভয়ী বলিয়া কাছে রাখিবার চেষ্টা করিতেছি তাহাকে ঠিক ভয়ীর মত দেখি না, যাহাকে ভাই বলিয়া আদর করিতেছি তাহার প্রতি ভালবাসা আপনার সহোদরের প্রতি ভালবাসার ঠিক অনুরূপ নহে। তবুও এ-কথা বন্ধুর কাছে দূরে থাকুক, নিজের কাছেও সহজে স্বীকার করি না। স্বীকার করিতে আমরা লজ্জিত হই, আমাদের সংস্কারে বাধে। পাছে বিবেকের দংশনে উৎপীড়িত হইয়া তাহাদিগকে ছাড়িতে হয় তাই নিজেকে

এই বলিয়া ভুলাই—আমি উহাকে ভগ্নীর মত ভালবাসি, ভায়ের মত ভালবাসি, বন্ধুর মত ভালবাসি। আমি যদি এখন উহাকে ত্যাগ করি তবে সে মনে নিদারুণ ব্যথা পাইবে। অথচ সে-সব ক্ষেত্রে নিষ্করণ হওয়ার মত কক্ষণ আর নাই। যেখানে মিলনের কোন আশাই নাই, পরিণয় যেখানে অপরাধ, সেখানে প্রিয়জনের নিকট হইতে সরিয়া আসা নিষ্ঠুরতা সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাকে আমি বন্ধুর মত ভালবাসি—এই ভাবে নিজেকে ভুলাইয়া রাখিয়া প্রিয়জনকে আকড়াইয়া থাকা আরও নিষ্ঠুরতা। কারণ বিচ্ছেদের দিন যখন একান্তই আসিবে তখন ভালবাসার জনকে মিলনের আনন্দ যত বেশী করিয়া দিয়াছি বিচ্ছেদের বেদনাও তত বেশী করিয়া দিব। তাহা ছাড়া নির্মল ভালবাসার মুখোপরি পরিয়া যাহারা হৃদয়ে বাসা লইয়াছে তাহারা কখন যে গভীর রাত্রে অতর্কিত মুহূর্তে অকস্মাৎ ছদ্মবেশ খুলিয়া ফেলিয়া নিজমূর্তি ধারণ করিবে—কে বলিবে? মনের ক্ষেত্রে ভালবাসা চিরদিন যে সীমাবদ্ধ থাকিবে তাহার নিশ্চয়তা কি? মানুষের মধ্যে যে আদিম যৌনপ্রবৃত্তি রহিয়াছে হুনিবার তাহার আকর্ষণ। যে-কোন মুহূর্তে ভালবাসা মনের ক্ষেত্রে ছাড়াইয়া দেহের ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে পারে।

এই জন্তই আমাদের মনকে ভাল করিয়া জানিবার প্রয়োজন আছে। প্রহরীর উপর একান্ত ভাবে সবটুকু ছাড়িয়া দিয়া আমরা নিশ্চিত থাকিতে পারি না। কারণ, নিজেরই যেখানে নিজের সঙ্গে শক্রতা করি সেখানে প্রহরী কি করিবে? বিতাড়িত ইচ্ছাকে ছদ্মবেশ পরাইয়া প্রহরীকে ভুলাইয়া যখন চেতনার ক্ষেত্রে আসিতে দিই তখন সেই ফাঁকির পথ রুদ্ধ করিবে কে? এই ফাঁকির পথেই ত পাপ আসিয়া মনের মধ্যে বাসা গ্রহণ করে। সদর দরজায় প্রহরী পথ আগুলিয়া আছে—পাপ তাই আত্ম-প্রবঞ্চনার খিড়কির দরজা দিয়া চোরের মত অন্তরে আসিয়া আশ্রয় লয়; তাহার পর এক অতর্কিত মুহূর্তে আমাদের দুর্বলতার সুবিধা লইয়া সে অন্তরের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি হরণ করে। মানুষের পতনের ইতিহাস এই আপনাকে ভুলাইবার ইতিহাস। প্রহরী যে-সকল ইচ্ছাকে নীতিবির্গাহিত বলিয়া দূরে সরাইয়া দেয় তাহারা নিঃশেষে শূন্যতার অন্ধকারে মিলাইয়া যায় না—মনের চোরাকুঠুরীতে গিয়া আশ্রয় লয়। রাতের বেলায় আমরা যখন ঘুমাইয়া পড়ি প্রহরীর চক্ষুও তখন ঘুমে মুদ্রিয়া আসে সে বিমাইতে থাকে। চেতনার ক্ষেত্রে আসিবার এই ত উপযুক্ত সময়! প্রহরী বিমাইতেছে! দিনের বেলায় যাহার অতন্ত্র চক্ষু এড়াইয়া চেতনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার কাহারও উপায় ছিল না, রাতের বেলায় সে ঘুমাইতেছে! দিবসের বিতাড়িত ইচ্ছাগুলি চোরাকুঠুরী হইতে বাহির হইয়া আসে এবং নিশ্চিন্ত মনে চেতনার ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। বিড়াল যখন ঘুমায় ইন্দুর তখন

মহোন্মাদে নৃত্য করে; গৃহস্থ যখন নিদ্রামগ্ন তখনই ত তঙ্করের গৃহপ্রবেশের সময়!

দিবসে প্রহরীর তাড়নায় যে-সকল বাসনা অপূর্ণ থাকিয়া যায় রাত্রে স্বপ্নে সেই সকল সাধ আমরা মিটাইয়া থাকি। তখন বাধা দিবার কেহ থাকে না। এই সব স্বপ্ন এমন সব মূর্তি ধারণ করিয়া আমাদের চেতনার আলোকে ভাসিয়া উঠে যে ঘুম ভাঙিয়া গেলে লজ্জায় আমরা অভিভূত হইয়া পড়ি। অত্যন্ত সাধুপুরুষ বলিয়া যাহাদের খ্যাতি আছে তাঁহারাও স্বপ্নে অনেক ঘৃণ্য কাজ করিয়া থাকেন। কিন্তু মনোবিজ্ঞান যাহারা আলোচনা করেন তাঁহারা ইহার মধ্যে বিশ্বাসের হেতু খুঁজিয়া পাইবেন না। আমরা কেহই নিষ্কলঙ্ক দেবতা নহি। আমাদের সকলের প্রকৃতির মধ্যেই আদিম যুগের বর্বর মানুষটা এখনও লুকাইয়া আছে। সভ্যতার প্রলেপটুকু একটু সরাইয়া ফেলিলেই সকলের ভিতর হইতেই বুনো মানুষের কদর্যা মূর্তিটা বাহির হইয়া পড়ে। আদিম যুগের বন্য প্রবৃত্তিগুলিকে চাপিয়া রাখিবার জন্ত আমাদের চেষ্টার বিরাম নাই। কিন্তু চাপা দিলেই তাহারা যে নিঃশেষ হইয়া যাইবে এমন কোন কথা নাই। বস্তুতঃ আমরা তাহাদিগকে চাপিয়া রাখিবার যত চেষ্টাই করি না, তাহারা সময়ে সময়ে আত্মপ্রকাশ করে। তাহাদের এই আত্মপ্রকাশের সুযোগ মিলে স্বপ্নে। তখন প্রহরীর চোখে নিদ্রা ঘনাইয়া আসে। আমাদের ভিতরের বন্য শূকরটা তখন দস্ত উচাইয়া নির্ভয়ে খেলা করিতে থাকে, সর্প নিঃশঙ্ক চিত্তে বিষ উদ্‌গীরণ করে, শকুনিটা অগাদ্য বস্ত্র কুণ্ডা বর্জন করিয়া উদরে পুরিয়া দেয়, নিলজ্জ ছাগটা অতল হইতে চেতনার ক্ষেত্রে জাগিয়া উঠে।

স্বপ্ন আমাদের সমগ্র রূপটিকে চেতনার আলোকে প্রকটিত করে। আমাদের চেতনার বাহিরে অন্তরের বিপুল অন্ধকারময় প্রদেশে যে-সকল ইচ্ছা তরঙ্গিত হইতেছে প্রহরীর সতর্কতার জন্ত জাগ্রত মুহূর্তগুলি তাহাদিগকে প্রকাশ করিতে পারে না। স্বপ্নের রহস্যময় লোকে মনের অতল হইতে তাহারা জাগিয়া উঠে অনাবৃত মূর্তি লইয়া। আমরা স্বপ্নলোকের নিজের সেই অনাবৃত রূপ দেখিয়া লজ্জায় শিহরিয়া উঠি সত্য, কিন্তু সেই লজ্জার মধ্য দিয়া জানিতে পারি নিজের স্বরূপকে। স্বপ্নের এই দিক দিয়া একটা বিপুল সার্থকতা আছে। স্বপ্নের কষ্টপাথরে আমাদের যথার্থ চেহারাটার যাচাই হইয়া যায়। স্বপ্নের দর্পণে আমাদের মনের সত্যিকারের রূপটি প্রতিফলিত হইয়া উঠে। এখানে একটি কথা। স্বপ্নে নিজের কদর্যা ইচ্ছা সব সময়েই যে অনাবৃত রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করে এমন নহে। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আদিম ইচ্ছা ছদ্মবেশে অথবা বিকৃত মূর্তি লইয়া স্বপ্নলোকে দেখা দিয়া থাকে।

আমরা আমাদের যত ভাল মনে করি আমরা ঠিক তত ভাল নই। আমাদের মনের কোণে অনেক কলুষ,

অনেক ফাঁকি লুকাইয়া থাকে যাহার কথা আমরা নিকটতম বন্ধুর কাছেও বলিতে সাহস করি না। সেই ফাঁকির কথা প্রকাশ পায় শুধু আমার কাছে এবং আমার অন্তর্যামীর কাছে।

“লোকে যখন ভালো বলে,
যখন সুখে থাকি,
জানি মনে তাহার মানে
অনেক আছে ফাঁকি।”

কিন্তু আমার মধ্যে যে উলঙ্গ বর্ষের রহিয়াছে—যাহাকে ঢাকিবার জন্ত আমি ভদ্রতার ছদ্মবেশ পরি—সেই বর্ষেরটাই আমার সবটুকু নয়। তাহাকে একান্ত বড় করিয়া দেখিলে নিজের প্রতি অবিচার করা হয়। আমার মধ্যে কাঁদিতেছে নিঃসঙ্গ দেবতা। তাহাকে ত আমি জীবনে উচ্চ আসন দান করি নাই। সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, পরিবার, সাহিত্য আমাকে যে সংস্কার এবং আচারের অচলায়তনের মধ্যে গড়িয়া তুলিয়াছে তাহাদিগকেই আমি পদে পদে কুণিশ করি। তাহারাই আমার জীবনের অনেকখানি স্থান নিলজ্জভাবে জুড়িয়া বসিয়া আছে। আমার সত্তার যে-অংশ এইভাবে সামাজিক নিয়মকানুন এবং আদবকায়দার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে তাহাকে আমি আমার বাহিরের মানুষ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। এই বাহিরের মানুষটা হাসে, নাচে, গল্প করে; নিমন্ত্রণ করিয়া লোক খাওয়ায়, ঘটা করিয়া ছেলেমেয়ের বিবাহ দেয়। ইহার মুখে হাসি, ললাটে সিন্দূরবিন্দু, চুলে রেশমী ফিতা, অনামিকায় অঙ্গুরীয়, অঙ্গে সুন্দর পরিচ্ছদ; রেল, ষ্টীমারে, কংগ্রেসে, উৎসবপ্রাঙ্গণে নিমন্ত্রণসভায় এই বাহিরের মানুষটা সকলের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিয়াছে।

কিন্তু আমার অন্তরের দেবতা যবনিকার অন্তরালে নিঃশব্দে অশ্রমোচন করিতেছে। আচার-অনুষ্ঠানের রান্ধস-পুরীতে সে অশোককাননের সীতার মত একাকিনী; নিয়মকাননের জটিল-কুটিল-পরিবৃত্ত হইয়া সে রাধার মত নিঃসঙ্গ। তাহার রক্তে কাঁদিতেছে ক্রোধের বাঁশী। সভ্যতার সহস্র আড়ম্বরের মধ্যে তাহার তৃপ্তি নাই। তাহার মধ্যে বাজিতেছে শ্রামল অরণ্যের গান, উন্মুক্ত আকাশের বাঁশরী, অব্যবহিত প্রান্তরের আহ্বান, কুলহীন সাগরের কলধ্বনি। সে মিথ্যার আবরণ চেলিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে চায় সত্যের মধ্যে। সঙ্কীর্ণতা তাহাকে পীড়িত করে, বন্ধন তাহাকে বেদনা দেয়, কপটতা তাহাকে আঘাত হানে, কদর্যতায় সে অশান্তি পায়। অন্তরের এই গোপন দেবতা—এই দেবতাকে আমরা অনুভব করি ব্যথার মধ্যে, অশান্তির মধ্যে। এই ব্যথা, এই অশান্তি আমাদের প্রত্যেকের বুকে। কিন্তু পাছে কঠোর সত্যের আঘাতে আমাদের সমাজ ও পরিবার ভাঙিয়া-চুরিয়া যায়, পাছে আমাদের আত্মীয়-স্বজন কিছু আঘাত পায়, এইজন্ত অন্তরের এই কাহার কথা স্বামী স্ত্রীকে বলে না, স্ত্রী

স্বামীকে বলে না, বন্ধু বন্ধুকে বলে না, পিতা পুত্রকে বলে না, পুত্র পিতাকে বলে না। দেবতা আড়ালে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সভ্যতার সমস্ত উপাদান, সংসারের সমস্ত আয়োজন, পরিবারের সমস্ত স্নেহের অভিনয়ের মধ্যে মানুষের অন্তরতম দেবতার এই যে গোপন বেদনা—এই বেদনার ছবি আঁকিয়াছেন আমেরিকার বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সিনক্লেয়ার লুইস (Sinclair Lewis) তাহার ব্যাবিট মেনস্ট্রীট (Babbit Mainstreet) প্রভৃতি উপন্যাসগুলির মধ্যে। সমস্ত বন্ধনের বিরুদ্ধে দেবতার এই বিদ্রোহের গানই উৎসারিত হইয়াছে হুইটম্যানের কণ্ঠ হইতে। টলষ্টয়, ইবসেন, বার্গার্ড-শ সকলের মধ্যেই বিদ্রোহী দেবতার এই অসন্তোষের সুর। মাঝে মাঝে কোথা হইতে আসে এইরূপ এক একজন অদ্ভুত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। তাহার হাতে হাঁড়ি ভাঙিয়া দেয়, মানুষের গোপনতম কথা প্রকাশ করে। নিঃস্বপ্ন সত্যের অনাবৃত মুখের দিকে চাহিবার ক্ষমতা অতি অল্প লোকেরই আছে। তাই সত্যের দুঃসহ মুখে ভীক সমাজ ঢাকিয়া রাখে মিথ্যার মনোহর আবরণে। সেই আবরণ রচনা করিয়া থাকে প্রবীণ পাকার দল আর স্বপ্নবিলাসী কবিদের বাক্যজালের অলীক ইন্দ্রধনুচ্ছটা। শেলী, ইবসেন, হুইটম্যান, বার্গার্ড-শয়ের মত মানুষেরা আসিয়া সেই আবরণ ছিঁড়িয়া ফেলে, যাহা কালো তাহাকে কালো বলে; সত্যের অনাবৃত কঠিন নিঃস্বপ্ন রূপকে প্রকাশ করে। যে-কথা সকলেই জানিত অথচ কেহ কাহারও নিকট প্রকাশ করিত না, যে-ব্যথা সকলেরই ব্যথা অথচ যাহা একে অন্নের নিকট মুখ ফুটিয়া বলিত না তাহাকে যে হাতে জানাইয়া দেয় সমাজ তাহাকে কোন দিনই ক্ষমা করে নাই। তাহাকে প্রবীণ পাকার দল ক্রুশে বিদ্ধ করিয়াছে, আঙুনে পোড়াইয়াছে, তাহার পুত্রকন্যাকে তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছে, সমাজ হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, তাহার উপর নিন্দা ও অপমানের বোঝা চাপাইয়াছে।

আমাদের মধ্যে বৃহত্তর, মহত্তর জীবনের জন্ত এই যে বেদনা রহিয়াছে, এই বেদনাই আমাদের কাছে বলিয়া দেয়, আমি আমাকে যত ভাল বলিয়া মনে করিতাম তাহার অপেক্ষা আমি অনেক ভাল, অনেক বড়।

“I am larger, better than I thought,
I did not know I held so much goodness.”

আমার মধ্যে দেবতা অমৃতের জন্ত কাঁদিতেছে, তাই ত আমি বর্তমানের বন্ধনকে অতিক্রম করিতে চাই। তাই ত আমার মধ্যে এই চাঞ্চল্য, এই অতৃপ্তি, এই সূদূরের পিপাসা। আমি ভিতরে ভিতরে শুধু বর্ষের নহি, আমি ভিতরে ভিতরে দেবত। যেখানে আমি বর্ষের সেখানে আমাকে সাবধানে হিসাব করিয়া পথ চলিতে হইবে; কিন্তু যেখানে আমি দেবতা সেখানে আমি আশা করিব, বিশ্বাস করিব, আপনাকে শ্রদ্ধা করিব; সেখানে কোন দুঃখে আমি

বিমর্ষ হইব না, কোন পরাজয়ে পিছাইয়া যাইব না, কোন আঘাতে হৃদয়কে বিচলিত হইতে দিব না। অন্তরেই এই দেবতা-মানুষটির প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়া ফ্রয়েড্ (Freud) বলিয়াছেন,—

“The normal man is not only far more immoral than he believes (referring to the repressed tendencies) but also far more moral than he has any idea of (referring to the Super-Ego).”

“প্রকৃতিই মানুষ নিজেকে বেরূপ মনে করে, তার চেয়ে কেবল যে অনেক বেশী দুর্নীতিপূর্ণ তাহা নহে, কিন্তু তার চেয়ে এত বেশী সুনীতিপূর্ণ, যে, তাহা তাহার ধারণার অতীত।

প্রহরী যে-সকল ইচ্ছাকে চেতনার আলোকে আঁসিতে দেয় না, জ্ঞানের বাহিরে ঠেলিয়া দেয় সেই অনভিপ্রেত বিতাড়িত ইচ্ছাই গূঢ়ৈষণা (complex) বলিয়া অভিহিত হয়। দলিত ইচ্ছা সহজে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। বাঁকাচোরা পথে ভোল বদলাইয়া চেতনার ক্ষেত্রে উহা দেখা দেয়। প্রথমদৃষ্টিতে তাহাকে চিনিতে পারা মুশ্কিল—কিন্তু সূক্ষ্ম অন্তর্ভেদী দৃষ্টি লইয়া দেখিলে দেখা যাইবে, আমাদের অনেক বিদলিত বিতাড়িত ইচ্ছাই পোষাক বদলাইয়া আমাদের স্বভাবের এবং আচার-ব্যবহারের মধ্যে প্রকাশ পায়। গূঢ়ৈষণার একটি দৃষ্টান্ত আমরা নিম্নে দিলাম। এই দৃষ্টান্তটি লণ্ডন হইয়াছে ম্যাগডুগাল সাহেবের স্মারনম্যাল সাইকলজী (Abnormal Psychology) হইতে।

রবিবাসরীয়া বিদ্যালয়ের একজন উৎসাহী ধর্মশিক্ষক গোড়া নাস্তিক হইয়া গেলেন। ভগবান নাই—ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার অপরিসীম উদ্যম দেখা যাইতে লাগিল। আপনার মত সপ্রমাণ করিতে বহু গ্রন্থ তিনি অধ্যয়ন করিলেন। ধর্মশিক্ষকের হঠাৎ এই অদ্ভুত ভাবান্তরের কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখা গেল, তিনি একটি মেয়েকে ভালবাসিতেন। ঐ মেয়েটি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গাঁহার সহিত পলায়ন করেন তিনি ছিলেন তাঁহার এক বন্ধু এবং রবিবাসরীয়া বিদ্যালয়ের উৎসাহী সহকর্মী। এই আচরণে সহকর্মীর প্রতি তাঁহার মন অত্যন্ত বিরূপ হইয়া গেল। বন্ধুর উপর এই তীব্র বিতৃষ্ণাই প্রকাশ পাইল পূর্বের ধর্মবিশ্বাসগুলির প্রতি বিতৃষ্ণারূপে। কারণ ঐ সকল বিশ্বাসই ষোগসূত্ররূপে বন্ধুর সহিত তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল।

এইরূপ অনুসন্ধানের ফলে জানা যায়, আমাদের মনের তলদেশে অনেক বিতাড়িত ইচ্ছা আত্মগোপন করিয়া থাকে। সেই গুপ্ত ইচ্ছাই অনেক সময়ে বিকৃত মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে।

আমাদের মনে ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার দ্বন্দ্ব লাগিয়াই আছে। কতকগুলি ইচ্ছা আছে যাহাদের মূল আমাদের আদিম

প্রকৃতির মধ্যে নিহিত। যৌন ইচ্ছাকে আমরা এইরূপ একটি আদিমপ্রবৃত্তির মধ্যে গণ্য করিতে পারি। নরের নারীদেহের জন্য আকাঙ্ক্ষা এবং নারীর নরদেহের জন্য আকাঙ্ক্ষা—ইহা চিরন্তন। কোন্ আদিকাল হইতে নরনারী পরস্পরকে তনুমন দিয়া আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিতেছে। এক দিন ছিল যখন মানুষ সহজভাবে তাহার যৌন-আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করিতে পারিত। বিধি-নিষেধ তখন যে ছিল না—এমন নহে। তবে এখনকার মত এত বেশী ছিল না। মানুষের স্বজন-শক্তির প্রকাশ তখন দেহের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রমে মানুষ সভ্যতার সোপানে যতই উঠিতে লাগিল ততই সে দেখিতে পাইল, কতকগুলি আদিম প্রবৃত্তি লইয়াই তাহার জীবন নহে। তাহার অন্তরের মধ্যে রহিয়াছে অসীমের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিবার দুনিবার পিপাসা; তাহার আত্মায় আত্মপ্রকাশের ক্রন্দন। মানুষ দেহের স্তর অতিক্রম করিয়া মনের স্তরে উঠিল এবং সমাজকে নতুন ভাবে গড়িল। এই নতুন সমাজ আদিম প্রবৃত্তিগুলির আহ্বানকে উপেক্ষা করিতে সাহস করিল না বটে, কিন্তু বিধি-নিষেধের পর বিধি-নিষেধের সৃষ্টি করিয়া সেই প্রবৃত্তিগুলিকে থকা করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল।

একদিকে সমাজের বিধি-নিষেধের শৃঙ্খলগুলি এবং আর একদিকে আদিম প্রকৃতির দুর্ভীর দাবি—এই দুইয়ের সংঘর্ষের ফলে আমাদের অনেকের জীবন ফেনিল, বিষময় এবং দুর্ভীহ হইয়া উঠে। যখন সমস্যার কোনরকমেই নিরাকরণ করিতে পারি না তখন তাহার সমাধানের জন্য আমরা অবদমন অথবা নিগ্রহের পন্থা অবলম্বন করি। মনের মধ্যে যৌন ইচ্ছা বা অন্য কোন আদিম ইচ্ছা জাগিলেই সেই ইচ্ছাকে জোর করিয়া ঠেলিয়া ফেলি। ইচ্ছার সহিত ইচ্ছার সংঘর্ষ হইতে মনের মধ্যে যে অশান্তি জাগে একটি ইচ্ছাকে দমন করিবার ফলে সেই অশান্তির হস্ত হইতে কিছুকালের জন্য আমরা রক্ষা পাই এবং তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলি, আঃ বাঁচিলাম।

কিন্তু ভবী ভুলিবার নয়। সমাজ ও প্রকৃতি—এই উভয়ের দাবির মধ্যে সমাজের দাবি মানিয়া লইয়া মনে করিলাম, খুব জিতিয়া গিয়াছি—তুই সতীনের টানাটানির মধ্যে পড়িয়া আর প্রাণান্ত হইতে হইবে না! প্রত্যাখ্যাত প্রকৃতি এবার নিষ্কৃতি দিবে।

কিন্তু প্রকৃতি এত সহজে কাহাকেও নিষ্কৃতি দেয় না। সে অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া নিঃশব্দে প্রতিশোধের পথ খুঁজিয়া বেড়ায়। আমাদের এই আদিম প্রকৃতি বেগবতী পার্শ্বত্যা নদীর মত। আমরা এই নদীর সন্মুখে নিগ্রহের পাথর ফেলিয়া মনে করি, জলধারাকে পাষণশৃঙ্খলে বাঁধিয়া ফেলিলাম। কিন্তু নদী বাঁধা পড়ে না। সোজা সহজ পথ চাড়িয়া উহা বাঁকিয়া অন্তপথে প্রবাহিত হইবার চেষ্টা করে।

আমাদের আদিম প্রবৃত্তিগুলি সহজেও এই কথাই খাটে। সেই প্রবৃত্তিগুলির বেগ অতি প্রচণ্ড। মনের যৌন-ইচ্ছার দুর্ব্বার শক্তিকে ক্রয়েড বলিয়াছেন লিবিডো। এই লিবিডোর সহজ প্রকাশকে যখনই আমরা চাপিয়া মারিবার চেষ্টা করি ধর্মের নামে, নীতির নামে, সংযমের নামে তখনই দেখিতে পাই, অবরুদ্ধ ইচ্ছা মনের অতল গুহায় ফেনিল আবর্তনের সৃষ্টি করে। আমাদের ভিতরে ভিতরে একটা দারুণ সংগ্রাম চলিতে থাকে। সেই সংগ্রাম নিজের সঙ্গে নিজের সংগ্রাম। একদিকে উদ্যম আদিম যৌনপ্রবৃত্তির দাবি, আর একদিকে সংযমের দাবি, ত্যাগের দাবি, নীতিধর্মের দাবি। যুদ্ধ করিতে করিতে মনের শক্তি চলিয়া যায়, সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা হ্রাস পায়, অশ্রদ্ধা এবং দীর্ঘশ্বাসে জীবন ভরিয়া উঠে, আমরা দিন-দিন নিশ্বেজ হইয়া পড়ি।

আমাদের অনেক মনের অসুখের কারণ এই অবদমন অথবা নিগ্রহ। নিগ্রহীত ইচ্ছাগুলি মনের কোণে জঞ্জালের সৃষ্টি করিয়া অত্যন্ত উৎকট আকারে ব্যবহারে আত্মপ্রকাশ করে। হিষ্টিরিয়া অসুখের কারণ অনেক সময়েই এই নিগ্রহ। বাল্যেই স্বামী হারাইয়াছে—এমন অনেক বয়সী পল্লী-বিধবাকে পরচ্ছিন্ন অশ্বেযণে অত্যন্ত উৎসাহী দেখা যায়। কে কাহার সহিত কু-অভিপ্রায়ে হাস্যাত্মক করিয়াছে, কাহার সহিত কাহার অবৈধ প্রণয় জন্মিয়াছে,—পল্লীর সমস্ত ঘটনা তাহাদের নন্দনপুত্র এবং সেই সমস্ত প্রণয়-ঘটিত ব্যাপার লইয়া পথেঘাটে তাহাদের আলোচনার অস্ত্র নাই। অস্ত্রের প্রণয়-ঘটিত দুর্ব্বলতা লইয়া এই অত্যধিক মাথাঘামানোর মূলে নিজের নিগ্রহীত যৌন-ইচ্ছার প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নাই। অনেক সময়ে এইরূপ নারীর দিকে কেহ নির্মূল দৃষ্টিতে চাহিলেও সে মনে করে এবং বলিয়া বেড়ায়, অমুক লোকটা অত্যন্ত অসচ্চরিত্র। সে নারীর মর্যাদা জানে না। আসলে মেয়েটির নিজের মনেই যৌন-ইচ্ছা জাগিয়া রহিয়াছে। নিজের সেই অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাই সে অস্ত্রের উপর বৃথা আরোপ করে।

তবে কি নিগ্রহ অথবা অবদমন আমাদের কল্যাণের পথে অস্ত্রায় ? এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব। উহার উত্তরে 'না' এবং 'হ্যাঁ' দুই-ই বলা যাইতে পারে। নিগ্রহ আমাদের দেহের এবং মনের কি পরিমাণ ক্ষতি করে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অবদমনের মধ্যে রহিয়াছে প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ইহা অস্বাভাবিক। দেহ এবং দেহের ক্ষুধাকে অস্বীকার এবং যুগা করিবার অধিকার আমাদের দেহের কে দিয়াছে ? আমার দেহ ভগবানের মন্দির—আমার প্রতি অঙ্গে বিধাতার চূষনের ছাপ !

ছেলেবেলা হইতে আমরা শুনিয়া আসি, মানুষের যৌন আকাঙ্ক্ষা একটা অপরাধের ব্যাপার। দেহের ক্ষুধার মধ্যে আছে কেবল পশুর প্রবৃত্তি। ফলে প্রবৃত্তিগুলিকে আমরা

গলা টিপিয়া মারিবার চেষ্টা করি। পারি না; প্রকৃতি পরিশোধ লয়। এই জগুই মনস্তত্ত্ববিদেরা বলিয়া থাকেন,

“আমাদের অস্ত্রের যৌনপ্রবৃত্তিকে সুপথে পরিচালিত করিতে হইলে একটা জিনিষের প্রয়োজন আছে। আমরা এ-পর্যন্ত প্রবৃত্তির দাবিগুলিকে রুঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়াছি। এখন হইতে এই দাবিগুলির প্রতি আমাদের আরও সদর হইতে হইবে।” (*Outline of Modern Knowledge*)

কিন্তু সহজ আদিম প্রবৃত্তি যখন একান্ত বড় হইয়া উঠে তখনও সর্বনাশের কারণ ঘটে। আমাদের মনের মধ্যে যে যৌন-ইচ্ছার দুর্ব্বার শক্তি পুঞ্জীভূত রহিয়াছে তাহাকে ইঞ্জিয়-পরিতৃপ্তির পথে যথেষ্ট পরিচালিত করিলে উচ্চতর বৃত্তির বিকাশ হওয়া অসম্ভব। আমাদের জীবন শুধু দেহকে ঘিরিয়া নহে। দেহকে ছাড়িয়া আমরা মনের ক্ষেত্রেও বিচরণ করিতে পারি। আমরা কেবল আহাৰ এবং বংশবৃদ্ধি করি না। আমাদের মধ্যে রহিয়াছে সুদূরের পিপাসা, স্নানের স্বপ্ন, আলোকের ধ্যান। সেই পিপাসা এবং স্বপ্ন হইতে যুগে যুগে কবিতার জন্ম হইয়াছে, সঙ্গীতের প্রসবণ বহিয়াছে, তাজমহল ফুটিয়াছে, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার ঘটিয়াছে। অস্ত্রের সমস্ত শক্তি যদি ইঞ্জিয়ার পথে ধাবিত হইয়া আপনাকে নিঃশেষ করিয়া ফেলে তবে মনের রাজ্যে আমরা দেউলিয়া হইয়া যাইব। এইজগু শক্তির সঙ্গে সংযমের প্রয়োজন। যে বিরাট আদিশক্তির উৎস হৃদয়ে বর্তমান রহিয়াছে সেই শক্তির খানিকটা অংশ আদিম যৌন প্রবৃত্তির পথে পরিচালিত করা সমীচীন। কিন্তু সেই প্রবৃত্তির খেলা কখনও উদ্যম হইবে না। শক্তির ধারাকে ইঞ্জিয়ার খাত হইতে উচ্চতর সৌন্দর্য এবং আনন্দসৃষ্টির নব-নব খাতে বহাইতে হইবে। মানুষের ইতিহাসকে ষাহারা প্রতিভার দানে সম্পদশালী করিয়াছেন তাহাদের প্রায় সকলের মধ্যেই যৌন-শক্তি রূপান্তরিত হইয়া প্রেমের মধ্যে, সৌন্দর্য-সৃষ্টির মধ্যে আপনাকে সার্থক করিয়াছে। তাহা উদ্যম ভোগের পথে অথবা অস্ত্রের ঘন্থের জটিলতার মধ্যে ব্যর্থ হয় নাই।

“All great mystics and the majority of great idealists, the giants among the creators of spirit have clearly and instinctively realized what formidable power of concentrated soul, of accumulated creative energy, is generated by the renunciation of organic and psychic expenditure of sexuality. Even such free-thinkers in matters of faith, and such sensualists as Beethoven, Balzac and Flaubert, have felt this.”

(Romain Rolland—*Ram Krishna's Life*.)

“Chastity is the flowering of man; and what are called Gounis, Heroism, Holiness and the like, are but various fruits which succeed it.” (Thoreau—*Walden*).

আমাদের বক্তব্য বিষয়কে আরও পরিষ্কৃত করিবার জগু আমরা রোমা রল্লা এবং থোরোর লেখা উপরে উদ্ধৃত করিলাম। যৌনশক্তিকে এই উচ্চতর শক্তিতে রূপান্তরিত করাকেই ক্রয়েড বলিয়াছেন Sublimation বা উদ্যম।

যাহারা প্রতিভাবান এবং যাহারা মানসিক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত—এই উভয় শ্রেণীর লোকের মধ্যে ভেদরেখা অত্যন্ত কীর্ণ। পাগল এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তি উভয়েই প্রবল প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। উদ্দাম ভাব না থাকিলে কোন মানুষ বড় হইতে পারে না। উহা কাজের মধ্যে বেগ আনিয়া দেয়। যেখানে উদ্দাম প্রবৃত্তিগুলি সত্য, শিব ও স্তম্ভের পথে ধাবিত হয়, যেখানে মনের আদিম সহজ ইচ্ছাগুলি একটি বিরাট মহান আদর্শের কাছে মাথা নত করে, সেখানে মানুষ হইয়া উঠে প্রতিভাবান অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন। যেখানে উদ্দাম আদিম প্রবৃত্তিগুলি ইচ্ছার ক্ষেত্রে অতিক্রম করিতে পারে না, যেখানে ইচ্ছার সঙ্গে রহিয়াছে ইচ্ছার স্বন্দ, প্রবৃত্তির সঙ্গে

রহিয়াছে প্রবৃত্তির বিরোধ, যেখানে একটি মাত্র অত্যাচ আদর্শ বিভিন্নমুখী ইচ্ছাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে না, সেখানে হৃদয় মগের মুল্লুক হইয়া উঠে। সেই হৃদয় হয় পাগলামীর আড্ডা, ব্যর্থতার মরুভূমি, ব্যাধির আলয়। সেই জীবনই হইতেছে পরিপূর্ণ সার্থক জীবন, যেখানে ত্যাগ ও ভোগের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে, যেখানে প্রবৃত্তির সঙ্গে নিবৃত্তির স্বন্দ মিটিয়াছে, যেখানে দেহ আত্মাকে স্বীকার করে, আত্মাও দেহকে স্বীকার করে, যেখানে ব্যক্তিত্বের মধ্যে ভেদের কোলাহল নাই, যেখানে জীবনের সকল সুর একত্র মিলিত হইয়া এক অখণ্ড ঐক্যতানের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাকেই মাগডুগাল সাহেব বলিয়াছেন স্বরাট আত্মন (autonomous self); গীতা বলিয়াছে যতাত্মা।

ব্যাঙ্কিং-জগতে বাঙালীর স্থান

শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার

বাংলা দেশের শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙালীর স্থান আজ কত পশ্চাতে, তাহা আমরা প্রত্যেকেই অবগত আছি; তাহার আর্থিক দুর্গতি প্রতিনিয়ত আমাদের চক্ষুর সম্মুখে অতি করুণভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে; ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত তাহার ব্যর্থতা ও নৈরাশ্রের বেদনা আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি। এই দারুণ দুর্দশার হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, সর্বসাধারণকে, বিশেষতঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রসম্প্রদায়কে, বিগত পঞ্চাশ বৎসরের কর্মপন্থার অনেকটা পরিবর্তন করিতে হইবে। এযাবৎ কৃষিকার্যের উন্নতি-অবনতির উপরই প্রায় সকল প্রকার ব্যবসায়ীর লাভক্ষতি নির্ভর করিয়া আসিয়াছে। বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এতদিন শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মনোযোগী না হইয়া, নিজেদের সামান্য ক্ষেতখামারের রক্ষণাবেক্ষণ, জমিদারী, চাকুরি, ডাক্তারী বা ওকালতী প্রভৃতিতে লিপ্ত থাকিতেন। ফলে এই হইয়াছে যে, তাঁহাদের পরিত্যক্ত ক্ষেত্রে অবাঙালী কায়েমী হইয়া বসিয়া গিয়াছে এবং ছুনিয়ার ধনদৌলত যত, তাহারাই এখন ভোগ করিতেছে। শুধু ওকালতী, ডাক্তারী, জমিদারী প্রভৃতির আয়ের উপর নির্ভর করিয়া বাঙালীর আর চলিতেছে না; উপস্থিত সমস্তার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এতদিনের পরিত্যক্ত শিল্প-ব্যবসায়ের প্রতি তাহাকে আজ অধিকতর মনোযোগী হইতে হইবে। এখানে কেহ যেন মনে না করেন, আমি চাকুরি, জমিদারী—এই সকলকে অবহেলা করিতে বলিতেছি। আমার বক্তব্য এই যে, বর্তমানে

দেশের আশু উন্নতিবিধান করিতে হইলে প্রধানতঃ শিল্প-বাণিজ্যের পথই অবলম্বনীয়। কিন্তু এই পথে বাঙালীকে যথেষ্ট প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। বিদেশী এবং অবাঙালী ব্যবসায়ীগণ এই ক্ষেত্রে যে ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা হইয়া বসিয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের প্রবল শক্তির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া স্বীয় প্রতিষ্ঠা স্থাপন করা বর্তমানে একমাত্র বাংলার প্রতি বাঙালীর মমত্ববোধ এবং সজ্জবদ্ধতা দ্বারাই সম্ভবে।

ব্যবসায় বা শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং তাহার পরিচালনার জন্ত, ব্যবসায়-শিল্পের মেরুদণ্ড যে অর্থ-শক্তি, সেই অর্থ-শক্তি সঞ্চয় করিতে হইলে বাঙালীর এখন সঞ্চয়পন্থা অধিক প্রয়োজন,— সজ্জবদ্ধতা। বর্তমান জগতে যে আর্থিক সজ্জবদ্ধতার উপর নির্ভর করিয়া ব্যবসায়-শিল্পের মূলধন সংগৃহীত হইতেছে, ব্যাঙ্ক তাহারই একটি নিদর্শন। আজিকার দিনে এই চট্টগ্রাম শহরে যে শাখা-প্রতিষ্ঠানটি জন্মলাভ করিতেছে, তাহাকে আমি বাঙালীর জাগ্রত সজ্জবদ্ধতার নিদর্শন বলিয়া মনে করিতেছি। এই প্রকার প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের সহিত সমগ্র বাঙালীজাতির শিল্পব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষা ও সজ্জবদ্ধতা যে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে, একথা বলাই বাহুল্য। এই ভাবী মঙ্গলের সজ্জবদ্ধতায় আজিকার অহুষ্ঠানে যোগদান করিয়া আমি বিশেষ আনন্দলাভ করিতেছি। শুধু আনন্দিত কেন,— আপনাদের এই প্রচেষ্টা আমাকে বিশেষ আশাশ্রিতও করিয়াছে। চট্টগ্রাম বাংলার দ্বিতীয় প্রধান বন্দর, এই বন্দরের শিল্প

এবং ব্যবসায় এখনও সম্পূর্ণ বিস্তার লাভ করে নাই; শীঘ্রই ইহা ব্যবসায়-বাণিজ্যের একটি বিরাট কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই বন্দরের উন্নতিশীল ব্যবসায় বাঙালী তাহার গ্রায়া স্থান অধিকার করিয়া লউক,— ইহাই আমার আন্তরিক কামনা।

ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাঙালীজাতির যে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন, তাহা আজ সকলেই অনুভব করিতেছেন। এই প্রতিষ্ঠালাভের অনুকূলে চট্টগ্রামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতকগুলি লক্ষণ বর্তমান দেখিতেছি। বর্তমানে কলিকাতায় বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ব্যবসায়িকগণ যেরূপ বিস্তৃত ও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে সেখানে বাঙালীর পক্ষে এখন আপনার স্থান করিয়া লওয়া সহজসাধ্য নহে। কিন্তু চট্টগ্রামের অবস্থা এখনও তেমন সমৃদ্ধাসঙ্কুল হইয়া উঠে নাই; এখানে বিদেশীয় এবং অবাঙালী-সম্প্রদায় এখনও তেমন প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই;— বাঙালীর পক্ষে এখানে ব্যবসায়শিল্পে যথাযোগ্য স্থান করিয়া লইবার যথেষ্ট সুযোগ আছে। যে-সকল প্রতিকূল কারণে কলিকাতার ব্যবসায়ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঙালীর পক্ষে আপাততঃ নিতান্ত দুর্লভ ব্যাপার বলিয়া মনে হয়, চট্টগ্রামে সে-সকল কারণ অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকিলেও, কৃতকার্য হইবার পক্ষে অনুকূল কারণও যথেষ্ট আছে। বাঙালী ব্যবসায়িকগণ এ বিষয়ে অবহিত হইয়া তাহাতে তাঁহারা এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, তাহার জন্ত এখন হইতেই চেষ্টা করা উচিত। এখানকার এই সমবেত ব্যবসায় প্রচেষ্টাকে দৃঢ় করিবার কাণ্ডে এই নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাকটি যথেষ্ট সহায়তা করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। শিল্পবাণিজ্যের সম্প্রসারণের দিক দিয়া যে ইহার বিশেষ সার্থকতা আছে, তাহা বিস্তৃতভাবে বলা অনাবশ্যক।

এই উৎসবের আরও একটি বিশেষ সার্থকতা আছে বলিয়া আমার মনে হয়। আমাদের দেশে ব্যবসায় শিল্পে আত্মনিয়োগের প্রচেষ্টা এবং আকাঙ্ক্ষা এখনও তেমন বিস্তৃতিলাভ করে নাই। এই প্রচেষ্টাকে ব্যাপকভাবে জাগ্রত করিতে হইলে সাধারণের মনোযোগ ক্রমাগত এইদিকে আকর্ষণ করিতে হইবে। আজিকার এই উৎসব সেই বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিবে বলিয়াই আমার মনে হয়।

বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতি ও প্রসারকল্পে এই প্রকার ব্যাকিং প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ও প্রভাব যে কত বেশী তাহা আজ চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারিতেছেন। পাশ্চাত্য দেশে ব্যাককে দেশের ধনসম্পদের মাপকাঠি বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে; কারণ সেখানে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য—সকলেরই ভারকেন্দ্র ব্যাক-প্রতিষ্ঠানের উপর। সেই সকল দেশে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সহায়তার জন্ত যে অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহা বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাকই সরবরাহ করিয়া থাকে এবং ঐ সকল কার্যক্ষেত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে

ব্যাকের কারবারও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। ব্যাকের সঙ্গে কৃষি-শিল্পাদির এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই ইহাকে অগ্রতম জাতীয় প্রধান প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করা হইয়া থাকে। কিন্তু ব্যাকের শুধু এই সকল প্রয়োজনীয়তার দিক লক্ষ্য করিয়াই যে আমি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাকের শাখা-প্রতিষ্ঠানকে চট্টগ্রামের কার্যক্ষেত্রে বরণ করিতেছি, তাহা নহে। আমাদের বাংলা দেশে বাঙালীর আর্থিক জীবনে এইপ্রকার প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন যে আরও গুরুতর ও ব্যাপক তাহা বাংলা দেশে ব্যাকিং কারবারের উদ্ভব ও প্রসারের তুলনায় তাহার বর্তমান ব্যবসায়, বাণিজ্য ও শিল্পের আর্থিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে।

আপনারা জানেন, বাংলা দেশে মহাজনী-নীতিতে টাকা ধার দিবার প্রথা অনেককাল হইতেই প্রচলিত আছে; এই প্রকার বিষয় অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, মহাজনগণ আপন আপন মূলধনে আপন আপন কারবারই চালাইয়াছেন এবং তাহাদের প্রদত্ত কর্কের টাকা অধিকাংশ স্থলেই ‘জমি-বন্ধকী’ কারবারে নিয়োজিত হইয়াছে। বহু জনের টাকা সংগ্রহ করিয়া ব্যাপকভাবে লগ্নীকারবার করার প্রথা সাধারণতঃ এই মহাজনী-কারবারের অঙ্গীভূত ছিল না। ভূ-সম্পত্তির প্রতি অত্যধিক মোহবশতঃ প্রত্যেক মহাজনই নিজ নিজ সংস্থান অনুযায়ী কর্ক দিতেন। আর বাংলার ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’ এই প্রদেশের ভূ-সম্পত্তির উপর যে অসাধারণ মূল্য আরোপ করিয়াছে, তাহাতে জমির উপর টাকা ধার দেওয়া এতকাল খুব সহজ ও নিরাপদ বলিয়াও বিবেচিত হইয়াছে। বাংলার ব্যাকিং-কারবারের ক্রমবিকাশের ইহাই প্রথমাবস্থা;— ইহার জের এখনও চলিতেছে।

তারপর বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে এই ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয়—বাংলা দেশে বাঙালীর চেষ্টায় ষৌধনীতি কারবারের সূত্রপাতের সহিত। ইহাতে দেশের জনসাধারণের সঞ্চিত টাকা বিভিন্ন ব্যাকিং প্রতিষ্ঠানে গচ্ছিত হইতে থাকে এবং তাহার সাহায্যে দেশের শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতিসাধনের পথ প্রস্তুতিরও সুযোগ উপস্থিত হয়। কিন্তু এই ব্যাকিং-প্রতিষ্ঠানগুলিও প্রথমাবধিই কতকটা নিজের উদাসীনতায়, কতকটা বা ব্যবসায়-বাণিজ্যে টাকা খাটাইবার উপযুক্ত উপায়ের অভাবে, তাহাদের সংগৃহীত অর্থ পূর্কোক্ত মহাজনদিগের গ্রায়াই মুখ্যতঃ ‘জমি-বন্ধকী’ কারবারে নিয়োজিত করিতে থাকে। টাকা-লগ্নী ব্যাপারে খাটি কমার্শ্যাল বা বাণিজ্যসহায়ক ব্যাকের সহিত বাংলার এই ব্যাক প্রতিষ্ঠানগুলির বিশেষ একটা পার্থক্য লক্ষিত হওয়ার এইগুলিকে ‘লোন-অফিস’ আখ্যা দিয়া বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত করা হয়।

বাঙালীর শিল্পব্যবসায় এই লোন-অফিসগুলি দ্বারা পুষ্টিলাভ করিবার সুযোগ পায় নাই। দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যে

সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এষাবৎ মহাশয়েরা নিজেই দিচ্ছিলেন ;—কখনওবা নিজ জামিনে অপরের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রয়োজন মিটাইয়াছেন। কিন্তু এই প্রকার ব্যক্তিগত সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া বর্তমান ব্যবসায়-জগতে দীর্ঘকালের জন্য টিকিয়া থাকা সম্ভবপর নহে ; কারণ, দেশের ব্যবসায়ের পোষকতা করিবার সমগ্র শক্তি কোনও ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে কখনও যথেষ্ট হইতে পারে না। যে-যুগে বাংলার লোন-অফিসগুলি ব্যবসায়-শিল্পের প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইয়া কেবলমাত্র জমি-বন্ধকী-কারবারে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিল, দেশের শিল্প-জীবনে তাহাকে 'অন্ধযুগ' বলা যাইতে পারে। বাঙালীজাতি তখন চাকরি, জমিদারি প্রভৃতির মোহে আকর্ষণ ডুবিয়াছিল। সেই স্বযোগে ইংরেজ বণিকগণের সহিত একযোগে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত অবাঙালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বাঙালীকে ব্যবসায়-শিল্প হইতে স্থানচ্যুত করিয়া আপনাদিগকে স্বদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

এইরূপে একদিকে যেমন লোন-অফিসগুলি হইতে বাঙালী ব্যবসায়িগণ কোনও সাহায্য পান নাই, তেমনি আবার লোন-অফিসগুলিও ব্যবসায়-শিল্পের প্রতি বাঙালীর বিমুখতার জন্য খাটি কমার্শ্যাল বা বাণিজ্যসহায়ক ব্যাঙ্করূপে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। ফলে, বাঙালীর লোন-অফিস এবং বাঙালীর ব্যবসায় দুই-ই আজ এই প্রকার বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

এই লোন-অফিসগুলি অনেক স্থলেই কমার্শ্যাল বা বাণিজ্য-সহায়ক ব্যাঙ্কের মূলনীতি অনুসারে সংগঠিত। ইহাদের মূলধনের অধিকাংশই অল্পকালের জন্য আমানতহিসাবে বন্ধিত টাকা হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই টাকা আমানত-কারীদিগকে অল্পকাল মধ্যেই ফিরাইয়া দিবার সর্ত্ত থাকার দরুন লোন-অফিসগুলির উচিত ছিল,—অল্পকালের জন্যই এই টাকা লগ্নী করা। কিন্তু এই দিকে লক্ষ্য না করিয়া অধিকাংশ লোন-অফিসই আমানতী টাকা জমিবন্ধকী কারবারে নিয়োগ করিয়াছে। আজ ব্যবসায় বাজার মন্দা, জমির মূল্য কম ; কাজেই সেই টাকা আদায় করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। ফলে, লোন-অফিসগুলির অবস্থাও আজ শঙ্কাজনক।

এই লোন-অফিসগুলি বিভিন্ন লোকের সঞ্চিত টাকা সংগৃহীত করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে সন্দেহ নাই ; বর্তমানে ব্যবসায় বাজার মন্দা এবং জমির মূল্য হ্রাস না হইলে হয়ত এগুলির তেমন দুঃবস্থা হইত না। কিন্তু ব্যবসায়সম্বন্ধ উপায়ে কার্য পরিচালনা না করার জন্য বাংলার লোন-অফিসগুলির পক্ষে যে সম্যক সাফল্য লাভ করা অসম্ভব ছিল, তাহা সহজেই অসম্ভব। যাহা হউক, কি ভাবে কার্য-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করিলে লোন-অফিসগুলি বর্তমান বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারে, তাহা এখনও ভাবিয়া দেখা কর্তব্য।

বাংলার বাঙালীপরিচালিত ব্যাঙ্কিং-কারবারের প্রসার সম্বন্ধে এখন আমাদের ব্যাপকভাবে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। 'এই কারবারে বাঙালীর যথেষ্ট উদ্যম নাই'—এ-কথা সত্য নহে। এই প্রদেশে বাঙালীর উদ্যোগেই সমস্ত বৎসর পূর্বে প্রথম লোন-অফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই হইতে এপর্যন্ত বাঙালীর চেষ্ঠায়,—বাঙালীর মূলধনে যত লোন-অফিস স্থাপিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা আট শতেরও অধিক হইবে ; ইহাদের সবগুলিই যৌথনীতিতে প্রতিষ্ঠিত। সংখ্যাহিনাবে ভারতের অল্প কোন প্রদেশে এত ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠান হয় নাই। কিন্তু আপনারা মনে করবেন না,—এই সংখ্যাবাহুল্য বাংলার ব্যাঙ্ক-সমৃদ্ধির পরিচায়ক। এই সকল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার মধ্যে কোন ব্যাপক পারিকল্পনা নাই ; অবস্থার সংঘাতে পড়িয়া এগুলি ক্রমশঃ বাণিজ্যসহায়ক অথবা কমার্শ্যাল ব্যাঙ্কের মূলনীতি হইতে বিচ্যুত হইয়া গিয়াছে এবং ব্যাঙ্কের কারবারের কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট গভীর মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে ; কিন্তু এই সীমাবদ্ধ কার্যপদ্ধতি যে ব্যাঙ্ক-পরিচালন নীতির দিক দিয়া মোটেই নিরাপদ নহে, তাহা পূর্বে কেহই বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই ; তাই আজ বাঙালী-পরিচালিত ব্যাঙ্কিং কারবার সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও হীনশক্তি এবং অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি,—এতদিন বাঙালীর প্রচেষ্টায় যে-সকল ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের সংগৃহীত টাকা মুখ্যতঃ জমি-বন্ধকী কারবারেই নিয়োজিত হইয়াছে এবং সেই কারণে ব্যবসায় জগৎ যে-প্রকার ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা থাকার দরকার, সে প্রকার ব্যবস্থা করা হয় নাই। বাংলার লোন-অফিসগুলি একান্তভাবে জমি-বন্ধকী কারবারে আত্মনিয়োগ করিয়া ভুল করিয়াছে। আমার এ-কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, বাংলার ব্যাঙ্কসংস্থানে জমি-বন্ধকী কারবারের স্থান অপ্রধান। বাংলার স্থায় কৃষিপ্রধান দেশে এই কারবারের যে নিত্যান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে, তাহা প্রত্যেকেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু ক্ষুদ্রশক্তি লোন অফিসগুলি এই প্রকার কারবারের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া ব্যবসায়সম্বন্ধ ব্যাঙ্ক-পরিচালনা-পদ্ধতির অনুসরণ করেন নাই,—ইহাই আমার মন্তব্য। এই সত্ত্বে আমি ইহাও বলিতে চাই যে, জমি-বন্ধকী কারবারের প্রতি অত্যধিক আসক্তি থাকার দরুন আমাদের ব্যাঙ্কিং-কারবারের প্রসার বিভিন্নমুখী হইতে পারে নাই। বর্তমান জগতের অগ্রণী দেশগুলির দিকে যখনই দৃষ্টিপাত করি, তখনই আমরা ব্যাঙ্কের মধ্যে বিবিধ শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাই। সর্বত্রই কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। এই সকল ব্যাঙ্কের মূলধন সংগ্রহের পদ্ধতি ও লগ্নীব্যবস্থার উপর ইহাদের শ্রেণী-বিভাগ নির্ভর করে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি-

বিধানের জন্ত প্রয়োজনীয় ঋণের স্থিতিকাল সমান নহে ; এই বিভিন্ন প্রকার ঋণের স্থিতিকাল অনুসারে ব্যাঙ্কেরও অর্থসংগ্রহের জন্ত যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। দেশের আর্থিক সংস্থানে রুচি, শিল্প, বাণিজ্য—এই তিন প্রকার কর্মক্ষেত্রই প্রশস্ত,—এই তিনটিই অবলম্বনীয় ; ইহাদের কোনটিকেই উপেক্ষা করা সমীচীন হইতে পারে না এবং প্রত্যেকটির জন্তই যথাযথ ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা থাকা দরকার।

জমি-বন্ধকী কারবারের জন্ত এদেশে ব্যাঙ্কের গঠন এবং পরিচালনপদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে কিছুদিন পূর্বে 'ভারতীয় ব্যাঙ্ক অনুসন্ধান কমিটি' যে বিস্তারিত অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহা হয়ত আপনারা অবগত আছেন। এই তদন্ত কমিটির প্রস্তাব অনুসারে বাংলার গবর্নমেন্ট কিছুদিন পূর্বে মৈমনসিংহে এবং কুমিল্লায় দুইটি 'জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক' স্থাপনের আয়োজন করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে যে, গবর্নমেন্ট হুদ দিবার জামীন স্বীকারে 'ডিবেঞ্চার' অর্থাৎ দীর্ঘকাল মেয়াদে পরিশোধনীয় প্রতিজ্ঞাপত্র বিলি করিয়া, এই সকল ব্যাঙ্কের মূলধন সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন এবং এই টাকা দ্বারা বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি রুচক ও জমিদারবর্গের পূর্বকৃত ঋণ পরিশোধের সহায়তা করিবে। জমিবন্ধকী কারবারের জন্ত যে-মূলধন প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহ করিতে হইলে দীর্ঘকাল মেয়াদী আমানত অথবা হস্তান্তর-যোগ্য ডিবেঞ্চার বিক্রয়ই প্রকৃষ্ট পথ। বাংলা গবর্নমেন্টের ব্যবস্থায় শেষোক্ত উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে আমাদের লোন-অফিসগুলি মূলধন সংগ্রহের ব্যাপারে সর্বতোভাবে অনতিকালস্থায়ী আমানতের উপর নির্ভরশীল হইয়াও জমি-বন্ধকী কারবারে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। তাহার অবশ্যস্বাবী কুফল আপনারা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আজ এখানে যে ব্যাঙ্কের শাখা-কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে তাহা প্রধানতঃ কমার্শ্যাল বা বাণিজ্যসহায়ক ব্যাঙ্কের আদর্শে পরিচালিত ; কাজেই এখানে লোন-অফিসের সমস্তার আর বিস্তৃত পুনরালোচনা অনাবশ্যক।

বাংলাদেশে কমার্শ্যাল বা বাণিজ্যসহায়ক ব্যাঙ্কিং-কারবার এখন মূখ্যতঃ বিদেশীয় এবং ভিন্ন প্রদেশবাসিগণের কর্তৃত্বাধীন হইয়া রহিয়াছে। কলিকাতার গায় বন্দর, যেখানে বাংলার প্রায় সমগ্র অন্তর্বর্ণিজ্যা এবং বহিবর্ণিজ্যা কেন্দ্রীভূত

হইয়াছে এবং যেখানে ব্যবসায়গত কর্ম সর্ববরাহ করিবার সুবিষ্ঠীর্ণ ক্ষেত্র রহিয়াছে, সেখানেও দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙালীর প্রচেষ্টায় কোন বৃহৎ কমার্শ্যাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

বাংলায় ব্যাঙ্কিং-কারবারের প্রসার আলোচনা করিতে গিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, বিদেশীয় বা ভিন্নপ্রদেশবাসী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইলেও শিল্প-ব্যবসায়ের সাহায্যকল্পে যে যে প্রকার ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন, বাংলায় তাহার অভাব নাই। কেহ কেহ আবার বাংলায় স্বত্বাধিকারীনির্কিশেষে বিভিন্ন ব্যাঙ্কগুলির মোট কারবারের পরিমাণ লক্ষ্য করিয়া, তাহাকেই বাংলার ধনসম্পদের বাস্তব মাপকাঠি বলিয়া ভ্রম করিয়া বসেন। সত্য বটে, বিদেশী একস্বেচ্ছ ব্যাঙ্ক এবং কমার্শ্যাল ব্যাঙ্কগুলির সহায়তায় বাঙালী ব্যবসায়িগণও কোন কোন ক্ষেত্রে অন্তর্বর্ণিজ্যা এবং বহিবর্ণিজ্যা চালাইতে সক্ষম হইতেছেন ; কিন্তু তাই বলিয়া ইহা কোনমতেই স্বীকার করা যায় না যে, বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত কোন ব্যাঙ্কের প্রয়োজন নাই, তাহার অভাব আমরা অনুভব করিতেছি না। দুর্ভাগ্যক্রমে আজ বাংলা এবং বাঙালী তুল্যার্থবোধক কথা নহে। আপনারা এখানে গাহারা ব্যবসায়ী রহিয়াছেন, তাহারা সকলেই জানেন যে, বিদেশীয় ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের স্বদেশবাসী ব্যবসায়িগণের ব্যবসায়ের পোষকতা করিবার জন্ত অনেক বিষয়ে তাহাদিগকে অনেক সুবিধা দিয়া থাকে ; পক্ষান্তরে বাঙালীরা সে-সকল সুবিধা পায় না। অগ্নিবীমা, নৌ-বীমা প্রভৃতির সুবিধা বিদেশী প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলি হইতে বাঙালী ব্যবসায়িগণ কখনও আশা করিতে পারেন না। ঐ সকল ব্যাঙ্কে বাঙালীদিগকে কেরাণী প্রভৃতি নিম্নতন কর্মচারীর পদে নিযুক্ত করা হয় বটে, কিন্তু কোন দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ পদে প্রায়ই তাহাদিগকে স্থান দেওয়া হয় না। এই প্রকার আচরণ যে সকল ক্ষেত্রেই পক্ষপাতমূলক, তাহা বলিতে চাই না। ব্যাঙ্কিং-কারবারে অনেক সময় ইহা স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ এই-সব কারণেই ব্যাঙ্ক জাতীয়প্রতিষ্ঠান রূপে গণ্য হইয়া থাকে।

আজ আমরা বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক শুধু ব্যাঙ্কিং-কারবারের জন্তই চাহিতেছি না ;—এই প্রতিষ্ঠান বাঙালীর শিক্ষাকেন্দ্র হইয়া বাঙালী জাতির প্রতি বাঙালীর

মমত্ববোধ জাগাইয়া তুলিবে, ব্যবসায়-শিল্পের প্রতি বাঙালীকে অনুপ্রেরণা দিবে এবং এই ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তারে তাহাকে সহায়তা করিবে, এইগুলিও এই প্রকার ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার অন্ততম উদ্দেশ্য। বেকার-সমস্যা সমাধানের দিক দিয়া বিচার করিলেও বাংলা দেশে বাঙালী প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কের প্রয়োজন যে যথেষ্ট রহিয়াছে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

দেশের অর্থনৈতিক জীবনে কমার্শ্যাল ব্যাঙ্কের প্রয়োজনের প্রতি বাঙালীর মনোযোগ যে আকৃষ্ট হয় নাই, এমন নহে। বস্তুতঃ, স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতেই এ-বিষয়ে বাঙালী জাতি অবহিত হইয়াছে। অল্পকালমধ্যেই অনেকের সমবেত চেষ্টায় কলিকাতায় দুইটি কমার্শ্যাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; ইহার একটি 'বেঙ্গল গ্রাশনাল ব্যাঙ্ক,' অপরটি 'হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক'। দুর্ভাগ্যক্রমে এই দুইটি ব্যাঙ্কই কারবার বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই ব্যাঙ্ক দুইটির শোচনীয় পরিণতির জন্ত বাঙালীর ব্যাঙ্ক-পরিচালনের অক্ষমতার উপর যে কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে, তাহার গ্লানি এখনও আমরা ভোগ করিতেছি। কিন্তু ইহার জন্ত আমাদের নিরুৎসাহ হইবার কোন কারণ নাই। এই সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া আমি কয়েকটি কথা বলিতে চাই।

আমার মনে হয়, যাহারা এই দুই ব্যাঙ্কের দৃষ্টান্তে বাঙালীর ব্যাঙ্ক-পরিচালনার ক্ষমতার উপর কটাক্ষপাত করেন, বিভিন্ন দেশের ব্যাঙ্কের ইতিহাসের সহিত তাহাদের সম্যক পরিচয় নাই। প্রথম কথা,—অসাধুতাই ব্যাঙ্কের সর্বনাশ ঘটবার একমাত্র মুখ্য কারণ নহে। তা ছাড়া অসাধুতা কোন ব্যাঙ্কের সর্বনাশ সাধনে সমর্থ হইলেও এ-কথা মনে রাখা দরকার যে, এই দোষ সর্বদোশে সর্বজাতির মধ্যেই অস্বাভাবিক পরিমাণে বিরাজ করিতেছে এবং সর্বত্রই কোন-না-কোন ব্যাঙ্ক ইহার জন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; কিন্তু পৃথিবীর কোন অগ্রণী দেশেই এই কারণে ব্যাঙ্কের প্রণার ও শ্রীবৃদ্ধি প্রতিহত হয় নাই।

বেঙ্গল গ্রাশনাল ব্যাঙ্কের পতনের পর আমি তাহার ষথাযথ কারণ নির্দেশ করিবার জন্ত অসুস্থানে প্রবৃত্ত হই। এই অসুস্থানের কলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, আমাদের দেশে ব্যাঙ্কের এই প্রকার দুর্গতির মুখ্য কারণ হইল,—স্বনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার অভাব। ব্যাঙ্কের কর্মচারীবৃন্দের

অসাধুতায়ও ব্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে ব্যাঙ্কের সমূহ সর্বনাশ সাধিত হইতে পারে না। ষথাযথভাবে কার্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকিলে এই প্রকার অসাধুতা প্রশ্রয় পায় না এবং বিধি-বিগর্হিত কার্য বন্ধ করাও সহজসাধ্য হয়।

ব্যাঙ্কের পতনের কালে তাহার যে-সমস্ত টাকা যে-যে স্থানে নিয়োজিত ছিল, তৎপ্রতি একটু মনোযোগী হইলেই কতকগুলি বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কমার্শ্যাল ব্যাঙ্কের মূলনীতি এই যে, এমন ভাবে টাকা খাটাইতে হইবে যে, নির্দিষ্ট সময়মধ্যে ঐ টাকাটা আপনা-আপনি ফিরিয়া আসিবার উপায় বা বন্দোবস্ত থাকে; কিন্তু গ্রাশনাল ব্যাঙ্ক এই নীতির দিকে আদৌ লক্ষ্য করেন নাই। রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ অথবা নিজের দলকে পরিপুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে অনেক লোককে বিনা জামীনে অথবা উপযুক্ত জামীন না থাকা সত্ত্বেও টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল। লগ্নীর টাকার অনুপাতে তাহার জামীন সম্বন্ধে বিশেষ প্রণিধান করা হয় নাই। আর স্বদেশিকতার প্রেরণায় এমন অনেক শিল্পে টাকা নিয়োগ করা হইয়াছিল যে, যাহা আদায় হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। ব্যাঙ্কের ব্যবসায়নীতিসম্মত মূলধন সংগ্রহের রীতি এবং তাহা লগ্নী করিবার বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা হইতে বিচ্যুতি ঘটিতে থাকিলে তাহার সর্বনাশ অবশ্যস্বাভাবী; চরম সাধুতাও তখন তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না। পরিচালকবর্গের অসাধুতায়ও ব্যাঙ্কের অনেক ক্ষতি হয় বটে; কিন্তু এস্থলে আমি আপনাদের নিকট নিবেদন করিতে চাই যে, স্বনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার অভাব ঘটিলে অতি বড় সাধুও অসাধু হইয়া দাঁড়ায়,—বেঙ্গল গ্রাশনাল ব্যাঙ্কের ব্যাপারে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কের পতনের মূলে বিশেষ কোন অসাধুতার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই বটে; কিন্তু ব্যাঙ্কিং কার্য প্রণালী সম্বন্ধে অজ্ঞতাই ইহার ধ্বংসের প্রধান কারণ।

আপনারা হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, বর্তমান সময়ে সাধু বলিয়া পরিচিত লোক অসাধু লোক অপেক্ষাও সমাজের অনেক অধিক অনিষ্ট করিতেছেন।

এই দুইটি ব্যাঙ্কের পতনের প্রকৃত কারণগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, সাবধানতার সহিত যদি আমরা কার্যে প্রবৃত্ত হই,

তাহা হইলে ভবিষ্যতে অমোদের প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই সাফল্যমণ্ডিত হইবে। 'বাঙালীর ভিতর এমন কোন মজ্জাগত দোষ আছে, যাহাতে তাহারা ব্যাঙ্ক-পরিচালনায় অক্ষম'—একথা মোটেই স্বীকার্য্য নহে। ব্যাঙ্কগুলির অসাফল্যের মূল কারণ অনুসন্ধান করিয়া এই ধারণা আমার স্পষ্ট জন্মিয়াছে যে, স্থানীয়স্থিত ব্যবস্থাদ্বারা কাজ চালাইলে সাফল্য অনিবার্য্য। আমার মনে হয়, কলিকাতার মত সুবৃহৎ বাণিজ্য-কেন্দ্রে বাঙালীদের দ্বারা একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইতে পারে। যাহারা অর্থশালী, যাহারা এই কাজে উপযুক্ত, যাহাদের উপর লোকের বিশ্বাস আছে, তাহারা যদি এই কাজে হাত দেন, তাহা হইলে তাহাদের সাফল্যমণ্ডিত না হইবার কোনই কারণ নাই। কালকাতায় এইরূপ একটি ব্যাঙ্ক মফঃস্বলের ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে অতীব শক্তিদায়ক হইবে।

কেবল কলিকাতা বা চট্টগ্রাম বন্দরেই নয়,—মফঃস্বল বাংলায়ও এই প্রকার কমার্শ্যাল ব্যাঙ্কের প্রয়োজন রহিয়াছে; নতুবা মফঃস্বলের শিল্পব্যবসায়ের পুষ্টিলাভ হইবে না এবং তাহার ফলে বাঙালীকে এই দিকে আকৃষ্ট করিবার পথ আরও সর্কীর্ণ হইয়া উঠিবে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, কলিকাতাতে বিদেশী এবং ভিন্ন প্রদেশবাসীরা এমনভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছে যে, সেখানে বাঙালীর পক্ষে তাহার স্থায়স্থান অধিকার করিয়া লওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার হইবে। কিন্তু বাংলার মফঃস্বলে অবাঙালী ব্যবসায়িগণ তেমনভাবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই। এক হিসাবে মফঃস্বলই বাণিজ্যের প্রধান স্থান; অধিকাংশ জিনিষপত্র এবং কাঁচামাল সেখানে উৎপন্ন হয় এবং সেখানেই জিনিষপত্রের ব্যবহার হয় বেশী। আমরা যদি মফঃস্বলে একবার কায়েমী হইয়া বসিতে পারি, তাহা হইলে কলিকাতায়ও প্রতিষ্ঠালাভ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না।

মফঃস্বল-বাংলার ব্যবসায়েও বাঙালীর ক্রমশঃ স্থানচ্যুত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা হইতেছে। বিদেশীয় এবং অবাঙালী ব্যবসায়িগণ এখন নিজ নিজ শাখা-কার্যালয় বা 'এজেন্সী' প্রতিষ্ঠা করিয়া বাংলার মফঃস্বল ব্যবসায় অধিকার করিয়া লইবার আয়োজন করিতেছে। এই আসন্ন প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইলে, মফঃস্বলে কমার্শ্যাল ব্যাঙ্কের মূল পদ্ধতিতে পরিচালিত ব্যাঙ্কের সহায়তা নিতান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু এখানে আমি বলিতে চাই, এই প্রকার ব্যাঙ্কের প্রবর্তন-কালে আমাদেরকে কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, মফঃস্বলে কমার্শ্যাল ব্যাঙ্কিং-কারবারের পক্ষে যথেষ্ট সুযোগ আছে কি-না। এই প্রকার ব্যাঙ্কিং-কারবারের মূলনীতি যে 'লগ্নীটাকা অল্পকাল মধ্যেই আদায়-যোগ্য হওয়া চাই,'—তাহা আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সাধারণতঃ ব্যবসায়ক্ষেত্রেই এই শ্রেণীর লগ্নীর পথ প্রশস্ত দেখা যায়। আমাদের দেশের অন্তর্বাণিজ্য বৎসরের দুই এক সময়ে প্রধানতঃ দুই একটি ফসলের উপরই নির্ভর করে বেশী। এই বাণিজ্যে একস্থান হইতে আর একস্থানে মাল পাঠাইবার ব্যাপার সাধারণতঃ অল্পকালই স্থায়ী হইয়া থাকে। এই প্রকার মাল চলাচল সম্পর্কে যে-সকল দলিলের উদ্ভব হয়, তাহা হস্তান্তরকরণোপযোগী হইলে, কমার্শ্যাল ব্যাঙ্কের কাজ দিবার পক্ষে ঐগুলি বিশেষ উপযোগী 'সিকিউরিটি' বা জামীন বলিয়া বিবেচিত হয়। আমাদের দেশে ছত্তী, রেলের রসিদ, গুদাম রসিদ প্রভৃতি ঐ শ্রেণীর দলিল। ছত্তীর উপর টাকা ধার দেওয়ার কারবার অনেককাল হইতেই এদেশে প্রচলিত আছে। আমার মনে হয়, কমার্শ্যাল ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা এবং সহায়তা দ্বারা গুদামী ও আড়ৎদারী কারবারাদি বৃদ্ধি পাইবে এবং এই সকলের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমার্শ্যাল নীতিতে টাকা ধার দিবার পক্ষে উপযুক্ত 'সিকিউরিটি' বা জামীনের অভাব ঘটিবে না।

দ্বিতীয়তঃ, বিস্তৃতভাবে কমার্শ্যাল ব্যাঙ্কিং-কারবার চালাইতে হইলে কতকগুলি মূলনীতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ কর্মচারী নিয়োগ, শাখা কার্যালয় প্রতিষ্ঠা, গুদামী ও আড়ৎদারী কারবারের পরিপোষণ এবং অগ্রাণ্ড স্বল্পবহুল ব্যয়সাপেক্ষ ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইবে। কার্যক্ষম কর্মচারী ও পরিচালক নিয়োগ করিয়া সর্ববিষয়ে স্থানীয়স্থিত ব্যবস্থা করিবার পক্ষে ব্যাঙ্কের যথেষ্ট আর্থিক সংস্থান না থাকিলে, সেই ব্যাঙ্কের পতন অবশ্যজ্ঞাবী। আর এইরূপ ক্ষুদ্রশক্তি ব্যাঙ্কের উপর নির্ভরশীল শিল্প ব্যবসায়েরও উন্নতি নাই। এজন্য দৃঢ় এবং ব্যাপক ভিত্তির উপর কমার্শ্যাল বা বাণিজ্যসহায়ক ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কমার্শ্যাল ব্যাঙ্কের এই নীতির অনুসরণ না করিবার ফলে, আমেরিকার মত দেশেও বিগত তিন-চার বৎসরের

মধ্যে অন্যান্য বার হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাক অল্প বিবিধ প্রকার স্ববিধা পাওয়া সত্ত্বেও কারবার বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। আমেরিকার এই দৃষ্টান্ত হইতে অক্ষয় ক্ষুদ্রশক্তি কমার্শ্যাল ব্যাক প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। বিপুল আর্থিক সংস্থানের দিকে লক্ষ্য না করিয়া যাহারা কেবল প্রতিযোগিতা করিবার জন্তই এক নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে অসংখ্য ব্যাক খুলিয়া বসেন, প্রতিযোগিতায় জয়লাভ সেখানে তাঁহাদের হয় না—হয় কেবল দুর্গতি।

বাংলায় বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত কমার্শ্যাল ব্যাকগুলির যে আজ দায়িত্ব এবং গুরুত্ব কত, তাহা দুই-এক কথায় বলিয়া শেষ করা যায় না। এইগুলির উন্নতি অবনতির উপর বাংলার জাতীয় উন্নতি-অবনতি নির্ভর করিতেছে। এইগুলির সাফল্য আজ ব্যক্তিবিশেষের বা দলবিশেষের সাফল্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না, আজ সমস্ত বাঙালী জাতির সাফল্য এদের উপর একান্তভাবে গুস্ত রহিয়াছে। এই এক একটি ব্যাক আজ সহস্র সহস্র বাঙালীকে শিল্প-ব্যবসায়ের দিকে আকৃষ্ট করিবে; আবার এক একটি শিল্প-ব্যবসায় বিরাট রকমের এক একটি ব্যাক গড়িয়া তুলিবার পক্ষে সাহায্য করিবে; সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর আর্থিক দুর্গতির ও বেকার সমস্যার অবসান ঘটবে। সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার অভাবে অথবা পরিচালকবর্গের শৈথিল্যে যদি বাংলায় বাঙালী প্রতিষ্ঠিত ব্যাকের পতন হয়, তাহা হইলে বৃষ্টিতে হইবে, জগতের অগ্রণী দেশগুলির সঙ্গে বাঙালীর আর পা ফেলিয়া চলিবার উপায় নাই।

বর্তমানে কুমিল্লা দুইটি ব্যাক কমার্শ্যাল নীতিতে কাজকর্ম পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন; আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, ইহাদের পরিচালকবর্গ যে কেবল আমানতী টাকা লইয়াই সন্তুষ্ট আছেন বা কাজ চালাইতেছেন, তাহা নহে; ইহারা নিজেদের টাকাও যথেষ্ট পরিমাণে এইগুলির মধ্যে রাখিয়াছেন, ইহার ফলে ব্যাক পরিচালনা বিষয়ে ইহাদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব আরও বাড়িয়া গিয়াছে এবং ব্যাক দুইটির পূর্ণ সাফল্যের দিকে ইহারা প্রত্যেকেই মনোযোগী হইয়াছেন। এই দুইদিনেও তাঁহারা যে কেবল বাঁচিয়া রহিয়াছেন, তাহা নহে,—প্রসার-লাভও করিতেছেন যথেষ্ট। ১৯২৩ সনে কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাক

কারবার আরম্ভ করিয়াছিলেন; ব্যাকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দত্ত মহাশয় সর্বজনবিদিত। ব্যাকিং-কারবার বিষয়ে তাঁহার প্রগাঢ় দক্ষতা ও অমুরক্তি যে এই ব্যাকটিকে সকল রকমে সাফল্যমণ্ডিত করিবে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ হয় না। তাঁহার বাচনিক জানিতে পারিলাম এবং জানিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম যে, ইউনিয়ন ব্যাক আমানতী টাকার লগ্নী কারবারে কমার্শ্যাল নীতির অনুসরণ করিতেছে। এই ইউনিয়ন ব্যাক কলিকাতায় এবং ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর প্রভৃতি মফঃস্বলের বিভিন্নকেন্দ্রে শাখা-কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সকলস্থানেই তাঁহারা বাঙালীর সহায়ত্ব পাইতেছেন ও পাইবেন। চট্টগ্রামের এজেন্ট শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রচন্দ্র সেন এবং কলিকাতার এজেন্ট শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন,—এঁদের আমি বিশেষ জানি। ব্যাক সম্বন্ধে মহৎ এবং বৃহৎ পরিকল্পনা এবং তাহার পরিচালনা সম্বন্ধে এদের যথেষ্ট ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা আছে। ইহারা উভয়েই বাংলার সম্রাজ্ঞীর লোক এবং বহু বিশিষ্ট লোকের সহিত ইহারা সংশ্লিষ্ট। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং চাঁদপুরের এজেন্টদের সঙ্গেও আমার আলাপ-পরিচয় করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। কমার্শ্যাল ব্যাক পরিচালন সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতা থাকার দরকার, তাহা তাঁহাদের যথেষ্টই আছে বলিয়া মনে হইল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বৃষ্টিতে পারিলাম, ব্যাকের উপর ইহারা কত মহতী আশা পোষণ করেন। ব্যাককে জাতীয় বিরাট প্রতিষ্ঠান রূপে গড়িয়া তুলিবার পক্ষে ইহাদের উৎসাহ উদ্যম আমাকে চমৎকৃত করিয়াছে। আমার দৃঢ় আশা এবং বিশ্বাস, এই কমার্শ্যাল ব্যাক প্রতিষ্ঠায় এবং পরিচালনায় ইহারা দেশের এবং জাতির যে দায়িত্বভার স্বৈচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছেন, তাহাতে অচির ভবিষ্যতে ইহারা অবশ্য জয়যুক্ত হইবেন। দেশের বর্তমান প্রয়োজনের তুলনায় এখনও ইহাদের প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র হইলেও অদূর ভবিষ্যতে সকলের সাধু প্রচেষ্টায় ইহাই সুদৃঢ় ও বিরাট হইয়া উঠিবে,—বাংলায় বাঙালী আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। ভগবানের আশীর্বাদ আমাদের সহায় হউক।*

* কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাকের চট্টগ্রাম শাখার উদ্বোধন-উৎসব উপলক্ষ্যে অভিভাষণ।



ঈশ্বর



ভোজনের ফ্যাশন—

উবুড হইয়া শুইয়া কিংবা বাম কনুইয়ের উপর ভর দিয়া অর্ধশয়ান অবস্থায় ভোজনের রীতি হোমরের যুগে গ্রীসে প্রচলিত ছিল না। কিন্তু তাহার পরবর্তী ঐতিহাসিক যুগে গ্রীক ও রোমানদের মধ্যে ইহার চলন দেখা যায়। এই প্রকারে ভোজন করিবার ছবি গ্রীস ও রোমের প্রাচীন ভাস্কর্য আদিপাত্রেণের গায়ে অঙ্কিত দেখা যায়। কথিত আছে, যে, এই রীতি প্রাচ্য দেশ হইতে ঐ দুই দেশ গ্রহণ করে। কিন্তু কোন্ প্রাচ্য দেশ হইতে উহা গৃহীত তাহা জানি না। যাহারা এই প্রকারে



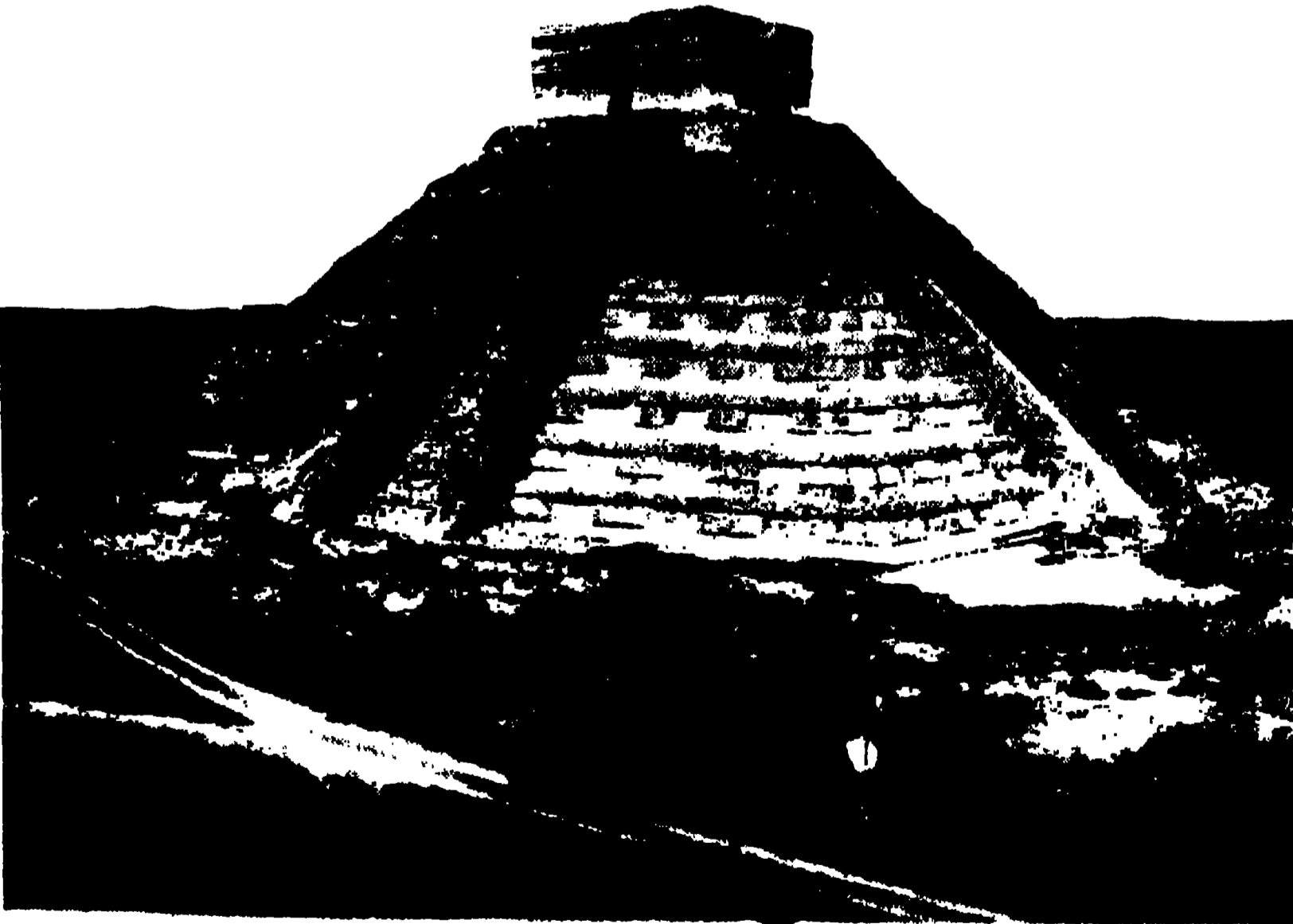
অর্ধশয়ান অবস্থায় ভোজন

ভোজন করিত, তাহার। কোঁচে শুইয়া বা অর্ধশয়ান হইয়া খাদ্য আহার করিত। তাহাদের বুকের বা বাঁ কনুইয়ের নীচে গদি বা বালিশ থাকিত। যে-টেবিলে ভোজ্য জব্য থাকিত, তাহা কোঁচের চেয়ে কিছু নীচু করা হইত। এরকম রীতি অলস অকর্ম্মা বিলাসীদের উপযোগী।

আফ্রিকার উগাণ্ডা দেশের এক জায়গার রাজা নিজের হাতে খাওয়াটাকে অপমানকর মনে করেন। তাঁহার পাচক তাঁহাকে খাওয়াইয়া দেয়। কিন্তু খাওয়াইতে খাওয়াইতে বেচার। যদি নৃপপুত্রবের দাঁত ছুঁইয়া কেলে, তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হয়।



আফ্রিকার উগাণ্ডা দেশের এক রাজাকে পাচক খাওয়াইতেছে



মিশরের অসুরূপ মেক্সিকোর একটি প্রাচীন পিরামিড

মেক্সিকোর সভ্যতা ও সংস্কৃতি—

কলম্বাস ভারতবর্ষ আবিষ্কার করিতে রওনা হইয়া আমেরিকার উপস্থিত হইয়াছিলেন, এই হেতু আমেরিকার অস্ত্র নাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। ইহার আদিম অধিবাসিগণও রেড ইণ্ডিয়ান (লাল ভারতীয়) বলিয়া পরিচিত। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আদিম অধিবাসীরা প্রায় নিমূল হইলেও মেক্সিকোতে এখনও বাঁচিয়া আছে। সেখানে আদিম অধিবাসীরা এখনও জনসংখ্যার শত করা উনচল্লিশ ভাগ। স্পেন-দেশীয় হারনেন্ডো কোর্টেজ ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে মেক্সিকো জয় করেন। তদবধি প্রায় তিন শতাব্দী পর্যন্ত ইহা স্পেনের সম্পর্কে থাকায়, ইহার অধিবাসীদের মধ্যে স্পেনীয় রক্ত প্রবেশ করিয়াছে। স্পেন ও ইণ্ডিয়ান জনিত 'মেটিজো' নামক মিশ্র জাতি শতকরা তিনভাগ জন। অবশিষ্ট সাড়ে সাত ভাগ মাত্র স্পেনীয়।

স্পেনীয়দের আবির্ভাবের পূর্বে পশ্চিম মেক্সিকোর আদিম অধিবাসীর নিজেদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়াছিল। আদিম অধিবাসী বলিতে আমাদের মনে কোল, ভীল সাঁওতাল, নাগা, কুকী প্রভৃতির কথা স্বতঃই উদয় হয়। কিন্তু মেক্সিকোর আদিম অধিবাসীরা এরূপ ছিল না।

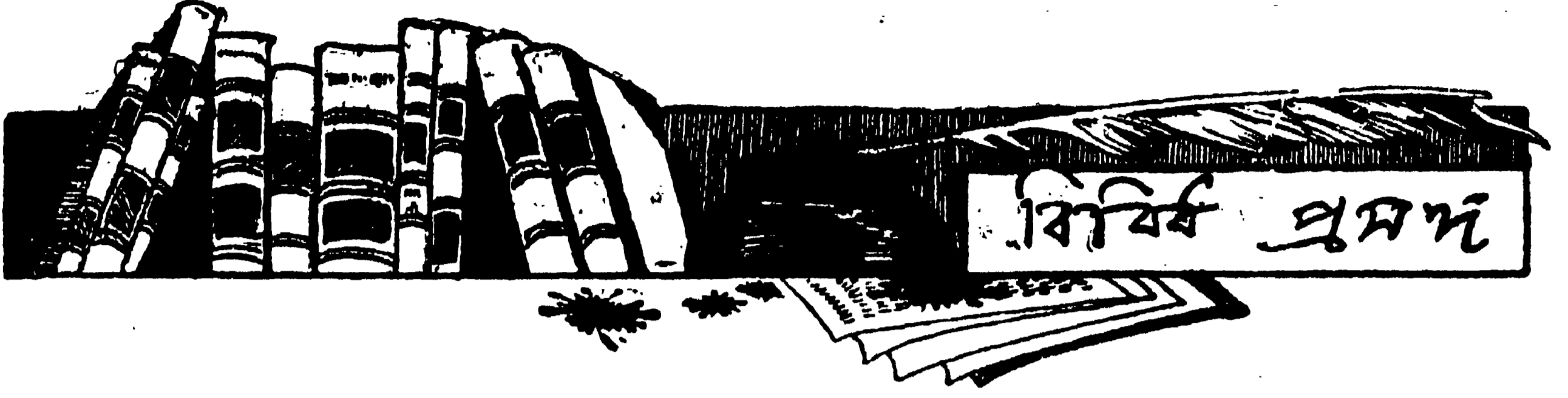


একটি মেক্সিকো রমণী (স্পেনীয়-ইণ্ডিয়ানের দৃষ্টান্ত)



স্বহৃৎ খড়ের টুপী মাথায় মেক্সিকো-বালক

তাহারা স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তাহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা 'কোয়েটসকোটল'। ইনি মানুষের সকল রকম মহৎ গুণের প্রতীক। মেক্সিকোর এরূপ উন্নত অধিবাসীরা স্পেনীয়দের অধীনে আসিয়া ক্রমশঃ বৈশিষ্ট্য হারাইতে বসিয়াছিল। ইদানিং ইহারা আবার আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছে।



স্বরাজ্য-দলের পুনরুজ্জীবন

কংগ্রেস যখন রাজনৈতিক বিষয়সমূহে গবন্মেণ্টের সহিত অসহযোগ নীতি অবলম্বন করেন, তখন সমগ্রভারতীয় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সভা হওয়াও কংগ্রেস-ওয়ালাদের পক্ষে নিষিদ্ধ হয়। পরে, ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে সদস্যরূপে প্রবেশ করিয়া সেখানেও গবন্মেণ্টের কোন কোন প্রকার আইনপ্রণয়নাদি কাষ্যে বাধা দিবার জন্ত অনেক কংগ্রেসওয়ালার ব্যবস্থাপক সভার সভা হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেন। কংগ্রেসের এই দলের নেতা হন চিত্তরঞ্জন দাস। বস্তুতঃ তিনিই এই স্বরাজ্য-দল গঠন করেন এবং এই দলের মতের প্রবর্তকও তিনি। তাঁহার মৃত্যুর পর পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু এই দলের নেতা হন।

অসহযোগ নীতির অমুসরণ দ্বারা যেমন, তেমনই এই স্বরাজ্য-দলেরও নীতির অমুসরণ দ্বারা কংগ্রেসের বাঞ্ছিত পূর্ণ স্বরাজ্য লক্ষ্য হয় নাই, ডোমিনিয়নও লক্ষ্য হয় নাই। কিন্তু অসহযোগ নীতির অমুসরণ দ্বারা পরোক্ষ লাভ অনেক হইয়াছে এবং ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্য-দলের সভ্যেরা যত দিন ছিলেন, তত দিন তাঁহারা জাতীয় স্বাধীনতা, প্রগতি ও উন্নতির প্রতিকূল আইনাদির বিরুদ্ধ আচরণ করিতে পারিয়াছিলেন।

ব্যবস্থাপক সভাসমূহে স্বরাজ্য-দলের উদ্দেশ্য সফল না হওয়ায় তাঁহারা কোন্সিলপ্রবেশ নীতি পরিত্যাগ করেন। এখন, কিছু দিন হইতে কংগ্রেস বিশেষ কিছুই করিতেছেন না দেখিয়া অনেক কংগ্রেসওয়ালার আবার স্বরাজ্য-দলের পুনরুজ্জীবন দ্বারা ব্যবস্থাপক সভাসমূহে প্রবেশের সমর্থন করিতে ছিলেন। এ বিষয়ে দিল্লীতে তাঁহাদের কন্ফারেন্স হইয়া গিয়াছে। কন্ফারেন্সে কোন্সিল প্রবেশের সপক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ-বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর সহিত আলোচনাও ডাক্তার আঙ্গারী, শ্রীযুক্ত ভূলাভাই দেশাই

এবং ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় কন্ফারেন্সের পক্ষ হইতে পার্টনারি করিয়াছেন। তাহার ফলে গান্ধীজী ডাক্তার আঙ্গারীকে এক খানি ইংরেজী চিঠিতে লিখিয়াছেন :—

I have no hesitation in welcoming the revival of the Swarajya party and the decision of the meeting to take part in the forthcoming election to the Assembly, which, you tell me, is about to be dissolved. My views on the utility of the legislatures in the present state are well known. They remain on the whole what they were in 1920, but I feel that it is not only right but it is the duty of every Congressman, who for some reason or other does not want to, or cannot take part in, civil resistance and who has faith in entry into the legislatures, to seek entry and form combinations in order to prosecute the programme which he or they believe to be in the interest of the country. Consistently with my view above mentioned, I shall be at the disposal of the party at all times and render such assistance as it is in my power to give.

তাৎপৰ্য্য। স্বরাজ্য-দলের পুনরুজ্জীবন এবং ব্যবস্থাপক সভার আগামী সভানির্বাচনে আপনাদের যোগ দিবার সিদ্ধান্তকে 'স্বাগত' বলিতে আমি দ্বিধা বোধ করিতেছি না। বর্তমান অবস্থায় ব্যবস্থাপক সভাগুলির (দেশের পক্ষে) উপকারিতা সন্দেহে আমার মত স্থবিচিত। তাহা ১৯২০ সালে যাহা ছিল এখনও মোটের উপর তাহাই আছে। কিন্তু আমি অনুভব করি, যে, যে-সব কংগ্রেসওয়ালার যে-কোন কারণে নিরুপদ্রব প্রতিরোধে যোগ দিতে চান না বা পারেন না, এবং ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশে তাঁহাদের বিশ্বাস আছে, ব্যবস্থাপক সভায় দল বাধিবার জন্ত এবং দেশের পক্ষে যাহা তাঁহারা হিতকর মনে করেন সেই কর্তব্যের অমুসরণ করিবার নিমিত্ত ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে চাহিবার শুধু যে অধিকার তাঁহাদের আছে, তাহা নহে, তাহা তাঁহাদের কর্তব্যও বটে। আমার উপরি উল্লিখিত (ব্যবস্থাপক সভাসমূহের উপকারিতা সন্দেহী) মতের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আমি সর্বদাই স্বরাজ্য দলের আজাদী খা কিব এবং আমার যেরূপ সাহায্য করিবার ক্ষমতা আছে তাহা করিব।

গান্ধীজীর চিঠিটির মানে যিনি যেরূপ বুঝিতে চান বুনুন, আমরা এ-বিষয়ে কোন তর্ক করিব না। যত কংগ্রেসওয়ালার মত কাগজে বাহির হইয়াছে, তাঁহাদের প্রায় সকলেই স্বরাজ্য-দলের পুনরুজ্জীবনের পক্ষেই মনে হইতেছে। বড় নেতাদের মধ্যে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু কিছু কিছু করিয়াছেন। তিনি মনে করেন, সমগ্রভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে এ-বিষয়ে কোন নির্ধারণ না-হওয়া পর্যন্ত দিল্লী-কন্ফারেন্সের

প্রস্তাব কংগ্রেস-ওয়ালারা মানিতে পারেন, না-মানিতেও পারেন।

এ-বিষয়ে আমাদের মত অনেক বার প্রকাশ করিয়াছি। সকল কংগ্রেসওয়ালারা তা কার্যতঃ অসহযোগ নীতির বা নিরুপদ্রব প্রতিরোধ নীতির অমুসরণ করেন না—এখন তা অতি অল্প লোকই তাহা করিতেছেন। যাহারা অসহযোগ নীতির অমুসরণ করেন না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের কোম্পিলে গিয়া বক্তৃতা, তর্কবিতর্ক ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার যোগ্যতা আছে। ব্যবস্থাপক সভাগুলি কার্যতঃ জো-ছকুমদের একচেটিয়া লীলাক্ষেত্র যাহাতে না-হয়, তাহা তাঁহারা করিতে পারেন এবং তাহা করা তাঁহাদের কর্তব্য।

প্রশ্ন হইতে পারে, তাহাতে কি লাভ? আগেই বলিয়াছি, কোম্পিল প্রবেশ দ্বারা স্বরাজ লক্ষ হয় নাই, হইবেও না। সে আশায় কোন দল কোম্পিল প্রবেশ করিলে তাঁহারা নিরাশ হইবেন। কিন্তু স্বরাজ্য-দলের লোকেরা দলবলে বর্তমানে কোম্পিল দখল করিতে পারিলে দেশের পক্ষে অনিষ্টকর কোন আইন ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা প্রণয়নের চেষ্টা ব্যর্থ করিতে পারেন। অস্তুতঃ তাঁহারা এরূপ বিরোধিতা করিতে পারেন, যে, এদেশে বা বিদেশে একথা রটান চলিবে না, যে, অমুক আইন দেশ-প্রতিনিধিরাই বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

অসহযোগ আন্দোলন যখন আরম্ভ হয়, তখন দেশহিতকর অনেক কাজ কোন আইন লঙ্ঘন না করিয়া করা চলিত, দেশহিতকর অনেক কথা লেখা ও বলা কোন আইন লঙ্ঘন না করিয়া লেখা ও বলা চলিত। তাহা সত্ত্বেও অনেক হাকিম ও পুলিশের লোক তাহাতে বেআইনী ভাবে বাধা দিত বটে; কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে আদালতে প্রতিকার চাহিতে পারিত। কিন্তু তৎপরে অনেকবৎসরব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে সরকারী কর্মচারীরা এসব কাজ ও কথা ক্রমশঃ ব্যবস্থাপক সভায় নূতন নূতন আইন করাইয়া এখন বেআইনী করিয়া ফেলিয়াছে। কংগ্রেসওয়ালারা দলবলে ব্যবস্থাপক সভায় থাকিলে হয়ত কোন কোন আইন ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা করান যাইত না, বা করাইতে খুব বেগ পাইতে হইত, কিংবা কিছু সংশোধিত আকারে প্রণীত হইত।

অত্যাচারের সংবাদ পর্য্যন্ত প্রকাশ করা ক্রমশঃ কঠিন হইতে কঠিনতর হইতেছে। এখন যে আইন হইয়াছে, তাহাতে

খবরের কাগজে—বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের কোন খবরের কাগজে—অত্যাচারের অভিযোগ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইতেছে না। কিন্তু এই সব অভিযোগ অস্তুতঃ এক শত দেড় শত জন লোকও যদি শুনে, তাও ভাল। শ্রোতাদের মধ্যে একজনেরও মনুষ্যত্ব যদি উদ্বোধিত হয়, ভাল। সে দিন দিল্লীর ব্যবস্থাপক সভায় মেদিনীপুরের কোন কোন গ্রামের কোন কোন মহিলার ও পুরুষের উপর যে অত্যাচারের অভিযোগ সত্যোদ্ভবাবু গবর্নমেন্টের গোচর করেন, তাহা নামধামসহ কোন খবরের কাগজেই বাহির হয় নাই। তিনি যখন দিল্লীতে অভিযোগসমূহ পাঠ করিতেছিলেন, তখন শ্রোতাদের চেহারা ও মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল জানি না। ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসওয়ালার সংখ্যা বেশী হইলে আশা করা যায় কোন গুরুতর অভিযোগই অকথিত থাকিয়া যাইবে না, এবং অভিযোগ শুধু কথিত হইবে না, তাহার প্রকাশ্য তদন্তের দাবী অধিকাংশের ভোটে গৃহীত হইবে। সত্যোদ্ভবাবুর দুই বৎসরের অভিযোগবিবৃতির ফলে এরূপ দাবীর প্রস্তাব উত্থাপিত পর্য্যন্ত হয় নাই। ইহা লঙ্কার বিষয়। তদন্তের দাবীতেই কি প্রতিকার হইবে? হইবে না জানি। এক বৎসর পূর্বে ঠিক এরূপ অত্যাচারের অভিযোগ সত্যোদ্ভবাবু ব্যবস্থাপক সভার ও গবর্নমেন্টের গোচর করিয়াছিলেন। তাহার কোন অমুসন্ধান পর্য্যন্ত হইয়াছিল বলিয়া অবগত নহি। তথাপি, অভিযোগ উচ্চারিত হওয়া ভাল। ব্যবস্থাপক সভায় যাইব না, এবং সেখানে গিয়া কিছু করিব না, ব্যবস্থাপক সভার বাহিরেও কিছু করিব না—অথচ দেশহিতৈষী বলিয়া পরিচয় দিব। এরূপ মনের ভাব অস্তুতঃ কংগ্রেসওয়ালাদের হওয়া উচিত নয়। অবস্থাটা কিন্তু এখনও এরূপই আছে। স্বরাজ্য-দল ব্যবস্থাপক সভায় গেলে কংগ্রেসের রাজনৈতিক পক্ষাঘাত-গ্রস্ততাটার কিঞ্চিৎ উপশমও যদি হয়, তাহা খুবই বাঞ্ছনীয়। সঙ্গে সঙ্গে এই সফলও যদি ফলে যে, ব্যবস্থাপক সভাগুলি জো-ছকুম ও ভাতা-উপার্জকদের একচেটিয়া লীলাক্ষেত্র হইয়া না-থাকে, তাহাও কম লাভ হইবে না।

ব্যবস্থাপক সভায় একাধিক বার ভোটের আধিক্যে জাতীয় দাবী ('national demands') গৃহীত হয়। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট সে দাবী শুনিয়া স্বরাজ্য মঞ্জুর করেন নাই। বস্তুতঃ শুধু দাবী দ্বারা স্বরাজ্য পাওয়া যাইবে না। যখন আমাদের

স্বরাজ্য লাভে সম্মতি না দিলে চলিবে না, তখন ব্রিটিশ জাতি সম্মতি দিবে, তাহার আগে নয়।

এই জ্ঞা, কি ব্যবস্থাপক সভায়, কি ব্যবস্থাপক সভার বাহিরে এরূপ কাজ করিতে হইবে যাহাতে ব্রিটিশ গবর্নেন্ট ও ব্রিটিশ জাতির উপর অপ্রতিরোধ্য চাপ পড়ে। দেশকালপাত্র বুঝিয়া প্রত্যেক জাতিকে এই প্রকার স্বরাজ্য-সংগ্রাম চালাইতে হয়।

ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক থাকিতে হইলে তাহা কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা প্রদর্শন ও নির্দেশ করিবার জন্য ভারতীয়দিগকে এখনও অনেক বক্তৃতা, আলোচনা ও তর্কবিতর্ক করিতে হইবে, অনেক প্রবন্ধ, পুস্তিকা ও পুস্তক লিখিতে হইবে। যাহা কিছু বলা বা লেখা হইবে, তাহা যুক্তিসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত, সত্যসঙ্গত, মানবিকতাসঙ্গত হওয়া আবশ্যিক। এই প্রকার উক্তির ও লেখার একটা প্রভাব অন্যান্য জাতির আদর্শানুসারী মানুষদের মত আদর্শানুসারী ইংরেজরাও অনুভব করিবে। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা কম। সমগ্র ইংরেজ জাতি—বা অন্য কোন জাতি—যদি কখন আদর্শানুসারী হয়, তাহা দূর ভবিষ্যতের কথা। আমরা তত দিন অপেক্ষা করিতে পারি না, অপেক্ষা করা উচিত নয়। এই জন্য অন্যবিধ চাপ প্রয়োগ আবশ্যিক। এই চাপ ভারতীয় ঘটনা, ভারতের বাহিরের ঘটনা, বা উভয়বিধ ঘটনার দ্বারা প্রযুক্ত হইতে পারে।

সম্ভবপর যত রকম চাপ আছে, তাহার মধ্যে যাহা দৈহিক ও আঙ্গিক বলপ্রয়োগসাপেক্ষ, তাহা ভারতীয়দিগকে কার্যের ও অভিপ্রায়ের বাহিরে রাখিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধীর মত যাহারা অহিংসাকে পরম ধর্ম মনে করেন, তাঁহারা যে-যে কারণে দৈহিক ও আঙ্গিক বল পরিহারের পক্ষে, অন্য অনেকে সেই সেই কারণে বিশ্বাসবান না হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও প্রধান নেতৃস্থানীয়েরা মনে করেন ও বলিয়াছেন, যে, ভারতবর্ষের স্বরাজ্য-সংগ্রাম দৈহিক ও আঙ্গিক বলপ্রয়োগ ব্যতিরেকে অথচ সমষ্টিগত ভাবে চালাইতে হইবে। আমরা এই মত ঠিক মনে করি।

যে-সব কংগ্রেসওয়ালারা কোঙ্গিলে ঢুকিবেন, তাঁহারা কি করিবেন না-করিবেন, সে বিষয়ে আমরা বিস্তারিত কিছু বলিতে চাই না। কিন্তু একথা নিশ্চয়, যে, তাঁহারা যদি

যত্নিত বা তদ্রূপ কোন চাকরী গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহা গর্হিত হইবে।

কৌঙ্গিল প্রবেশের বিরুদ্ধেও ভাবিবার কথা আছে। ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতা, প্রশ্ন, প্রস্তাব-পেশ ইত্যাদি করিলেই দেশের প্রতি সব কর্তব্য করা হইল, অনেকের পক্ষে এরূপ মনে করিয়া মনকে প্রবোধ দিবার খুব সম্ভাবনা আছে। সমস্ত বা অধিকাংশ কংগ্রেসওয়ালারা যদি এই ভ্রমের বশবর্তী হন, তাহা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে।

এখন ভারতবর্ষের কঙ্গটিটিউশন যেরূপ আছে, তাহাতে ভারতীয় বা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস দল প্রবল হইলে দেশের পক্ষে অনিষ্টকর আইন প্রণয়নে বাধা দিতে পারেন এবং সেরূপ বাধা জন্মিলে লার্টসাহেবদের ছয়মাসস্থায়ী অর্ডিণ্যান্স জারী করা ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু খেত পত্রে ভারতের মূল শাসনবিধির যে বর্ণনা পাওয়া যায়, ভবিষ্যৎ কঙ্গটিটিউশন সেইরূপ হইলে ব্যবস্থাপক সভায় কোন আইন প্রণয়নে বাধা জন্মিলেও গবর্নেন্টকে অল্পকালস্থায়ী অর্ডিণ্যান্সের আশ্রয় লইতে হইবে না, বড়লাট ও প্রাদেশিক লার্টরা ইচ্ছা করিলেই গবর্নর-জেনারালের আইন ও গবর্নরের আইন নামক আইনসকল করিতে পারিবেন, সেগুলো ব্যবস্থাপক সভার সাহায্যে প্রণীত আইনের সমান বলবৎ ও স্থায়ী হইবে। কিন্তু ভবিষ্যৎ কঙ্গটিটিউশন এরূপ হইলেও একটা কাজ কংগ্রেসপক্ষীয় সদস্যেরা করিতে পারিবেন—তাঁহারা লার্টদিগকে নিজের নিজের আইন বানাইতে বাধা করিয়া ইহাই কায্যতঃ ঘোষণা করিতে বাধা করিতে পারিবেন, যে, তাঁহারা লোকমতের বিরুদ্ধে দেশশাসন করিতেছেন।

কিন্তু কংগ্রেসপক্ষীয় সদস্যেরা ভবিষ্যৎ কঙ্গটিটিউশন অনুসারে ইহাও করিতে পারিবেন কি না, সে-বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। সমগ্র ভারতীয় ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাপক সভায় দেশীয় রাজাদের মনোনীত সদস্যদিগকে এবং অমুগ্ধীত মুসলমান, “অবনত” হিন্দু ও ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় প্রভৃতিকে যত আসন দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে স্বাধীনচেতা নির্বাচিত সদস্যদের পক্ষে নিজেদের দলে ভোট দিবার জ্ঞা অধিক সদস্য পাওয়া অসম্ভব, অন্ততঃ দুঃসাধ্য, হইবে। সুতরাং গবর্নেন্ট ইচ্ছা করিলে নিজের আবশ্যক-

মত আইন ব্যবস্থাপক সভা দ্বারা করাইয়া লইতে পারিবেন। তবে, কংগ্রেসওয়ালারা সদস্য অনেক থাকিলে তাঁহারা খুব তর্কবিতর্ক করিতে এবং সংশোধক প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারিবেন বটে। পূর্বেই বলিয়াছি, গবন্মেণ্ট ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা কোন আইন করাইয়া লইতে অসমর্থ হইলে বড়লার্ট ও অন্ট লার্টেরা নিজেদের ইচ্ছামত স্থায়ী আইন জারী করিতে পারিবেন।

অতএব, পুনর্বার বলিতেছি, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে কিছু কাজ করিয়া পূর্ণ বা রকম বার আনা বা তার চেয়েও কম আংশিক স্বরাজ্য লাভের আশা বৃথা। ঐ সকল সভা দ্বারা ছোটখাট দেশহিতকর কাজ—সামাজিক, কৃষিশিল্পসম্বন্ধীয়, শিক্ষাসম্বন্ধীয় কিছু কিছু ব্যবস্থা—করান সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু সাক্ষাৎ ভাবে বা বিশেষ ভাবে জাতীয়শক্তিবর্ধক ও জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠাপক কিছু কাজ কোন সদস্য করিতে গেলেই তাহাতে সরকার-পক্ষ হইতে তিনি বাধা পাইবেন।

ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ না করিয়া কংগ্রেসওয়ালারা অসহযোগ নীতি যত প্রকারে প্রয়োগ করিতে পারেন, তাহার দ্বারাও যে স্বরাজ্য লব্ধ না হইবার সম্ভাবনা কি কি কারণে আছে, আমরা তাহা ১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে ‘মডার্ন রিভিউ’ মাসিক পত্রের ৪৫৭-৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলাম। আমাদের ঐ মত ঠাহারা জানিতে চান, তাঁহারা ঐ মাসের ‘মডার্ন রিভিউ’ দেখিতে পারেন। ঐ মত ঐতিহাসিক মেজর বামন দাস বসু তাঁহার “ইণ্ডিয়া আন্ডার দি ব্রিটিশ ক্রাউন” পুস্তকের ৫১৫-৫১৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই পুস্তকের ৫১৪-৫১৫ পৃষ্ঠায় লাল লাজপৎ রায়ের তর্কসম্বন্ধ কোন কোন মতও উদ্ধৃত হইয়াছে।

যে-সব কারণে আমরা ১৯২০ সালে বলিয়াছিলাম অসহযোগের পথে স্বরাজ্য লব্ধ না হইবার সম্ভাবনা, সেই সব কারণ এখনও বিদ্যমান আছে এবং সেগুলি এখন আগেকার চেয়ে প্রবলতর বাধা।

পুনরুজ্জীবিত স্বরাজ্য-দল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ “সাধারণ” আসনগুলি দখল করিতে পারিলে অন্ততঃ এই কাজটি হইবে, যে, কংগ্রেস যে দেশের বৃহত্তম প্রতিনিধি দল, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ ইংরেজ জাতিও পাইবে।

পাঠকেরা বলিতে পারেন, কিসে কি হইবে না আপনি তাহাই বলিতেছেন, স্বরাজ্য কি প্রকারে লব্ধ হইবে, তাহা ত বলিলেন না? তাহার উত্তর, আমরা উহা বলিতে অসমর্থ।

জাপানের ও ভারতবর্ষের বজেট

আগামী বৎসরে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের এবং এক একটি প্রদেশের সরকারী রাজস্ব ও ব্যয় কত হইবে, তাহার একটা আনুমানিক হিসাব প্রতিবৎসর বসন্ত কালে ভারতীয় ও প্রাদেশিক রাজস্বসচিবেরা ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে পেশ করেন। সদস্যেরা তাহা লইয়া তর্কবিতর্ক করেন, কাটছাঁটের প্রস্তাব করেন, কোন কোন বিভাগের বরাদ্দ কমাইয়া অন্ট কোন কোন বিভাগের বরাদ্দ বাড়াইবার চেষ্টা করেন। এরূপ তর্কবিতর্কের প্রয়োজন ও উপকারিতা আছে। কিন্তু এই উপকারিতা সীমাবদ্ধ। প্রকৃত কথা এই যে, সমগ্র ভারতের ও প্রদেশ-গুলির রাজস্ব অনেক বেশী না-বাড়িলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিভাগে যথেষ্ট ব্যয় করা যাইতে পারে না; কিন্তু অন্ট দিকে ইহাও সত্য যে, এই সব বিভাগে যথেষ্ট ব্যয় না-করিলে, ব্যয় ক্রমশঃ বাড়াইয়া না-গেলে, দেশের লোকদের ধন বাড়িতে পারে না ও সরকারী রাজস্বও বাড়িতে পারে না। দেশ স্বশাসক না হইলে শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভাগের বরাদ্দ ক্রমশঃ আশামূরূপ অধিক হইবে না, দেশ স্বশাসক না-হইলে দেশের ধনবৃদ্ধি ও সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধি দ্বারা শিক্ষাদি বিষয়ে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধিও সম্ভাবপর হইবে না। অতএব, যে-দিক দিয়াই বিষয়টি বিবেচনা করা যাক, দেশ স্বশাসক হওয়া সকলের চেয়ে অধিক আবশ্যিক রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের চেয়ে ছোট এবং অল্প লোকের বাসভূমি প্রত্যেক সভ্য দেশের বজেট স্বশাসক দেশসমূহের ধনশালিতার সাক্ষ্য দেয়। ইউরোপ আমেরিকার কথা ছাড়িয়া দিয়া এশিয়ারই একটি দেশ জাপানের দৃষ্টান্ত লওয়া যাক।

খাস জাপানের আয়তন ১,৪৭,৫২২ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ৬,৪৪,৫০,০০৫; জাপান সাম্রাজ্যের আয়তন ২,৬০,৬৪৪ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ২,০৩,৯৬,০৪৩। ব্রিটিশ ভারতের আয়তন ১৩,১৮,৩৪৬ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ২৭,১৫,২৬,৯৩৩।

জাপান ভারতবর্ষের একটা প্রদেশের সমান পার্বত্য ভূমিকম্পবহুল দেশ। ইহার ষষ্ঠাংশ মাত্র চাষের যোগ্য। জাপান-সাম্রাজ্যও ভারতের চেয়ে ছোট।

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী জাপানী পালেমেণ্টে জাপানের আগামী বৎসরের বজেট মঞ্জুর হইয়াছে। উহার পরিমাণ দুই শত বার কোটি ইয়েন। অত্র দেশের মুদ্রার তুলনায় সব দেশেরই মুদ্রার মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। জাপানী ইয়েনেরও আপেক্ষিক মূল্য বাড়ে কমে। সাধারণতঃ উহা দেড় টাকার সমান ধরা হয়। তাহা হইলে আগামী বৎসর জাপানের রাজস্ব ও ব্যয় তিন শত আঠার কোটি টাকা হইবে ধরা হইয়াছে। জাপানী বজেট কেবল খাস জাপানের, না সমুদয় জাপান-সাম্রাজ্যের, তাহা ঠিক জানি না। দুই রকম অনুমানই করা যাক। উহা যদি জাপান-সাম্রাজ্যের হয়, তাহা হইলে, ব্রিটিশ ভারতের লোকসংখ্যা জাপান-সাম্রাজ্যের তিনগুণ বলিয়া, ভারতবর্ষ জাপানের মত ধনী হইলে ব্রিটিশ-ভারতের রাজস্ব জাপানের তিনগুণ অর্থাৎ নয় শত চুয়ান্ন কোটি টাকা হওয়া উচিত। কিন্তু যদি উহা খাস জাপানের হয়, তাহা হইলে, ব্রিটিশ-ভারতের লোকসংখ্যা খাস জাপানের চারিগুণেরও বেশী বলিয়া, ভারতীয়েরা জাপানীদের সমান ধনী হইলে ব্রিটিশ ভারতের বজেট হওয়া উচিত বার শত বাহাত্তর কোটি টাকার। এখন দেখা যাক, ভারতবর্ষের বজেটে দ্রুত রাজস্ব কিরূপ হইয়া থাকে। ব্রিটিশ-ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বজেট আলাদা আলাদা ধরা হয়, অর্থাৎ ভারত-গবন্মেণ্টের বজেট এবং প্রত্যেক প্রাদেশিক গবন্মেণ্টের বজেট আলাদা ধরা হয়। জাপানে তাহা ধরা হয় না, সমস্ত রাষ্ট্রটির একটি বজেট হয়। তাহা হইলে জাপানের সহিত তুলনার জন্য, ভারত-গবন্মেণ্টের ও সমুদয় প্রাদেশিক গবন্মেণ্টের বজেটের সমষ্টি লইতে হইবে। বর্তমান বা আগামী বৎসরের এই সমষ্টি আমাদের সম্মুখে নাই, কোন প্রামাণিক বহিতে পাওয়া যায় না। ১৯৩৩ সালের ষ্টেটসম্যান্স ইয়ারবুকে ১৯৩১-৩২ সালের আছে। তাহা ২০৩,৭২,৫২,০০০ টাকার। জাপানকে মাপকাঠি ধরিলে ইহা নিতান্ত কম। জাপানী বজেটে যদি সে দেশের মিউনিসিপালিটি ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডগুলির আয়ও ধরা হইয়া থাকে—খুব সম্ভব হয় নাই, তাহা হইলে ভারতবর্ষের বজেটেও

তাহা ধরা উচিত। তাহা ধরিলে ভারতীয় বজেট হয় মোট ২৫৭,৮৭,০১,৪৫২ টাকার। ইহাও জাপানী মাপকাঠি অনুসারে অত্যন্ত কম। এরূপ তর্ক উঠিতে পারে, যে, ইয়েনের দর ১১০ টাকা ধরা হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক এখন উহার দাম এত নয়। তাহা মানিয়া লইয়া যদি ইয়েনের দর বার আনা ধরা হয়, তাহা হইলেও, জাপানী বজেট খাস জাপানের হইলে সেই মাপকাঠি অনুসারে ব্রিটিশ-ভারতের বজেট হওয়া উচিত ছয় শত ত্রিশ কোটি টাকার; আর উহা জাপান-সাম্রাজ্যের হইলে সেই মাপকাঠি অনুসারে ব্রিটিশ-ভারতের বজেট হওয়া উচিত চারি শত সাতাত্তর কোটি টাকার। কিন্তু ব্রিটিশ-ভারতের রাজস্ব এই উভয় অঙ্ক অপেক্ষাই অত্যন্ত কম।

ভারতবর্ষের তুলনায় জাপান ধনী এই জ্ঞাত। যে, জাপান “জাতিগঠনমূলক” শিক্ষাশিল্পবাণিজ্যাদি বিভাগে ভারতবর্ষ অপেক্ষা অধিক টাকা খরচ করে ও করিয়া আসিতেছে, এবং জাপান তাহা করিতে পারে, যেহেতু জাপান ধনী। এক দিক দিয়া দেখিলে যাহা কারণ, অত্র দিক দিয়া দেখিলে তাহা ফল। আরও একটা কারণ আছে। জাপানের সরকারী কর্মচারী দগকে নবাবী চালে থাকিবার বা প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিবার মত বেতন দেওয়া হয় না। প্রভূত শক্তিশালী জাপান-সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর বেতন এ-দেশের প্রথম শ্রেণীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বেতনের চেয়ে অনেক কম। এই জ্ঞাত দেশকে উন্নত ও শক্তিশালী করিবার নিমিত্ত জাপানী গবন্মেণ্ট যথেষ্ট খরচ করিতে পারে।

সকলের মূলে এই কথাটি রহিয়াছে, যে, জাপানের গবন্মেণ্ট নিজের দেশের জাতীয় গবন্মেণ্ট; উহাকে কেবল জাপানের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিতে হয়, অত্র কোন দেশের স্বার্থ ও প্রভূত রক্ষাকে মুখ্য লক্ষ্য করিতে হয় না। তাই, ভারতবর্ষে বজেটের আলোচনার প্রয়োজন থাকিলেও, ভারতীয়দের প্রধান চেষ্টা হওয়া উচিত ভারতবর্ষে জাতীয় গবন্মেণ্ট স্থাপন করা। এই চেষ্টা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয়ের এবং প্রত্যেক ভারতীয় লোকসমষ্টির বা দলের করা একটি প্রধান কর্তব্য।

স্বরাজ্যলাভার্থ-আইনলঙ্ঘন-প্রচেষ্টা স্থগিত

রাখিবার কারণ বিবৃতি

মহাত্মা গান্ধী স্বরাজ্যলাভার্থ নিরুপদ্রবভাবে আইন লঙ্ঘনের বা তাহা প্রতিরোধের প্রচেষ্টাকে স্থগিত রাখিতে পরামর্শ দিয়াছেন। বিশেষ কোন অভিযোগের প্রতিকারার্থ নিরুপদ্রব প্রতিরোধ করিতে তিনি নিষেধ করেন নাই। এইরূপ পরামর্শ দিবার কারণ তিনি যে মতবিবৃতি পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দৈনিক কাগজসকলে মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু দৈনিক কাগজ অল্প লোকেই বাধাইয়া রাখেন, মাসিক কাগজ তাহা অপেক্ষা অধিক লোক রক্ষা করেন। মহাত্মাজীর মতবিবৃতিটি পুনঃ পুনঃ পড়িয়া উহার মর্ম গভীর ভাবে অনুভব করা আবশ্যিক। এই জগ্ন আমরা উহা প্রবাসীতেও আদ্যোপান্ত ছাপিতেছি। উহার বাংলা অনুবাদে উহার অন্তর্নিহিত সত্য সম্পূর্ণ পাওয়া যাইবে না বলিয়া মূল ইংরেজী বিবৃতিটি আগে ছাপিতেছি।

This statement owes its inspiration to a personal chat with the inmates and associates of the Satyagraha Ashram who had just come out of prison and whom at Rajendra Babu's instance I had sent to Bihar. More especially is it due to revealing information I got in the course of a conversation about a valued companion of long standing who was reluctant to perform the full prison task and preferred his private studies to the allotted task. This was undoubtedly contrary to the rules of Satyagraha. More than the imperfection of the friend, whom I love more than ever, it brought home to me my own imperfection. The friend said he had thought that I was aware of his weakness. I was blind. Blindness in a leader is unpardonable. I saw at once that I must for the time being remain the representative of civil resistance in action. During the informal conference week at Poona in July last, I had stated that while many individual civil resisters would be welcome, even one was sufficient to keep alive the message of Satyagraha. Now after much searching of the heart, I have arrived at the conclusion that in the present circumstances only one, and that myself and no other, should for the time being bear the responsibility of civil resistance if it is to succeed as a means of achieving Purna Swaraj.

ADULTERATION

I feel that the masses have not received the full message of Satyagraha owing to its adulteration in the process of transmission. It has become clear to me that spiritual instruments suffer in their potency when their use is taught through non-spiritual media. Spiritual messages are self-propagating. The reaction of the masses throughout the Harijan tour has been the latest forcible illustration of what I mean. The splendid response of the masses has been spontaneous. The workers themselves were amazed at the attendance and the fervour of vast masses whom they had never reached. Satyagraha is a purely spiritual weapon. It may be used for what may appear to be mundane

ends and through men and women who do not understand its spiritual (nature ?), provided the director knows that the weapon is spiritual.

EXPERT IN THE MAKING

Everyone cannot use surgical instruments. Many may use them if there is an expert behind them directing their use. I claim to be a Satyagraha expert in the making. I have need to be far more careful than the expert surgeon who is complete master of his science. I am still a humble searcher. The very nature of this science of Satyagraha precludes the student from seeing more than the step immediately in front of him.

SUSPEND CIVIL RESISTANCE

The introspection promoted by the conversation with the Ashram inmates has led me to the conclusion that I must advise all Congressmen to suspend civil resistance for Swaraj as distinguished from a specific grievance. They should leave it to me alone. It should be resumed by others in my lifetime only under my direction, unless one arises claiming to know the science better than I do and inspires confidence. I give this opinion as the author and instigator of Satyagraha. Henceforth, therefore, all who have been impelled to civil resistance for Swaraj under my advice, directly given or indirectly inferred, will please desist from civil resistance. I am quite convinced that this is the best course in the interest of India's fight for freedom.

I am in deadly earnest about this greatest of weapons at the disposal of mankind. It is claimed for Satyagraha that it is a complete substitute for violence or war. It is designed, therefore, to reach the hearts both of the so-called "terrorists" and the rulers who seek to root out the "terrorists" by emasculating the whole nation. But the indifferent civil resistance of many, grand as it has been in its results, has not touched the hearts either of the "terrorists" or the rulers. Unadulterated Satyagraha must touch the hearts of both. To test the truth of the proposition, Satyagraha needs to be confined to one qualified person at a time.

The trial has never been made. It must be made now. Let me caution the reader against mistaking Satyagraha for mere civil resistance. It covers much more than civil resistance. It means relentless search for truth and the power that such a search gives to the searcher. The search can only be pursued by strictly non-violent means. What are the civil resisters thus freed to do if they are to be ready for the call whenever it comes? They must learn the art and the beauty of self-denial and voluntary poverty. They must engage themselves in nation-building activities, the spread of *khaddar* through personal hand-spinning and handweaving, the spread of communal unity of hearts by irreproachable personal conduct towards one another in every walk of life, the banishing of untouchability in every shape or form in one's own person, the spread of total abstinence from intoxicating drinks and drugs by personal contact with individual addicts and generally by cultivating personal purity. These are services which provide maintenance on the poor man's scale. Those for whom the poor man's scale is not feasible should find a place in small unorganized industries of national importance which give a better wage. Let it be understood that civil resistance is for those who know and perform the duty of voluntary obedience to law and authority.

It is hardly necessary to say that in issuing this statement I am in no way usurping the function of the Congress. Mine is mere advice to those who look to me for guidance in matters of Satyagraha.

বিবৃতিটির বাংলা তাৎপর্য নীচে দিতেছি।—

সত্যগ্রহআশ্রমবাসী যে-সকল কথা এবং আশ্রমের সহযোগী সম্প্রতি শাসন হইয়াছেন এক বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের অনুরোধে আমি তাহাদিগকে বিহারে প্রেরণ করিয়াছি, তাহাদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে কথাবার্তা হইতে আমি এই বিবৃতি প্রদানের প্রেরণা লাভ করি। বহুদিনের এক সমাদৃত সঙ্গী কারাগারের সমস্ত নিদ্দিষ্ট কর্তব্য করিতে অসম্মত হইয়া ডাঙানা করাই পছন্দ করিয়াছিলেন। ইহা নিশ্চয়ই সত্যগ্রহের নীতি-বিরুদ্ধ। তাহার সম্বন্ধে কথাবার্তা যাহা জানিতে পারি, তাহাই আরও বেশম ভাবে এই বিবৃতির কারণ। এই সংবাদ অবগত হইয়া আমি যে কেবল আমার বন্ধুর অসম্পূর্ণতা জানিতে পারিলাম, তাহা নহে—তাহার প্রতি আমার ভালবাসা পূর্বাগ্রে বর্ধিত হইল, এই সংবাদে আমি আমার সম্পূর্ণতাও বুঝিতে পারিলাম। বন্ধু বলিয়াছেন, তিনি মনে করিয়াছিলেন, আমি তাহার দুর্বলতা অবগত ছিলাম। আমি অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম, —কিন্তু একজন নেতার পক্ষে অন্ধতা ক্রমাগত অপরাধ। আমি সংকপাৎ বুঝিতে পারিলাম, একাকী আমারই আচরণগত নিরপদ্রব প্রতিরোধের প্রতিরূপপ্রদর্শক থাকা উচিত।

গত জুলাই মাসে আমি ধরোয়া পুণা বৈঠকে বলিয়াছিলাম, একা একা নিরপদ্রবপ্রতিরোধপ্রতীক সংখ্যা যত অধিক হয়, ততই ঐচ্ছনীয় বটে, কিন্তু সত্যগ্রহের বাণী বা মন্ত্র চির-সঞ্জীবিত রাখিবার পক্ষে একজন সত্যগ্রহীই যথেষ্ট। আত্মহৃদয় পরীক্ষার পর এখন আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, যে, পূর্ণ স্বরাজ লাভের উপায় স্বরূপ নিরপদ্রব প্রতিরোধ যদি সার্থক করিতে হয়, তাহা হইলে বর্তমান অবস্থায় কেবল এক ব্যক্তি—একমাত্র আমারই, আপাততঃ নিরপদ্রব প্রতিরোধের দায়িত্ব গ্রহণ করা কর্তব্য।

আমি বুঝিতে পারিলাম, দেশের জনগণ সত্যগ্রহের পরিপূর্ণ বাণী শ্রবণ করিতে পায় নাই; কারণ এই বাণী প্রচার কালে ইহাতে ভেজাল মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, যদি মাধ্যমিকতাবিহীন মধ্যবর্তী মারফতে আধ্যাত্মিক উপায়সমূহের ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহার কার্যকারিতার লাভ হয়। মাধ্যমিক বাণী আত্মপ্রচারশীল। আমার হরিজন-ভ্রমণ কালে সর্বত্র জনসাধারণের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিয়াছি তাহাই আমার বক্তব্য বর্ণন করিবার পক্ষে নূতনতম দৃষ্টান্ত। জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার আস্থানে সাড়া দিয়াছে। তাহারা যে বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত হইয়া সংসাহ প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা দেখিয়া কর্মীরাও বিশ্বাসবিষ্ট হইয়াছেন—ইতিপূর্বে তাহারা এই সব লোকের কাছে পৌঁছেন নাই।

সত্যগ্রহ নিছক আধ্যাত্মিক অগ্রবিশেষ ঐহিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত তাহার আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে অল্প নরনারীগণের সাহায্যেও এই অস্ত্রের প্রয়োগ সম্ভবপর হইতে পারে, যদি ঐ অস্ত্রের প্রয়োগ-পরিচালকের এই স্থান থাকে যে অস্ত্রটি আধ্যাত্মিক। সব লোকেই অস্ত্রোপচারের যত্নপাতি ব্যবহার করিতে পারে এমন নহে। তবে একজন বিশেষজ্ঞ যদি পিছনে থাকিয়া নির্দেশ দিতে থাকেন, তবে হয়ত অনেকেই ঐগুলি ব্যবহার করিতে পারে। আমি সত্যগ্রহ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হই নাইই, হইয়া উঠিতেছি বলিয়াই দাবী করি; সুতরাং অস্ত্রচিকিৎসক সম্পূর্ণ পারদর্শী সার্জন অপেক্ষা আমার অধিকতর সতর্কতার সহিত চলা দরকার, কেন-না, আমি এখনও সত্যগ্রহ সম্বন্ধে একজন সামান্ত তথ্যানুসন্ধী। সত্যগ্রহ-বিজ্ঞানের

প্রকৃতিই হইল এই যে, ইহা বিদ্যার্থীকে ঠিক তাহার সম্মুখবর্তী ধাপটি ছাড়া আর একটুও বেশী দেখিতে দেয় না।

আশ্রমবাসীদের সহিত কথাবার্তা হইতে উদ্ধৃত আত্মপরীক্ষণ আমাকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত করিয়াছে যে, বিশেষ কোন অভিযোগের প্রতিকারার্থ নহে, কিন্তু কেবল স্বরাজলাভার্থ এরূপ নিরপদ্রব প্রতিরোধ প্রচেষ্টা স্বগিত রাখিবার জন্ত সমস্ত কংগ্রেস কমিটিগণকেই আমার পরামর্শ দেওয়া একান্ত কর্তব্য। স্বরাজ লাভের জন্ত নিরপদ্রব প্রতিরোধ প্রচেষ্টা চালাইবার ভার কংগ্রেস-কমিটিগণ কেবলমাত্র আমার উপরই স্থাপন রাখুন। নিরপদ্রব প্রতিরোধের নীতি সম্পর্কে আমি অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অপর কোন ব্যক্তির অভ্যুত্থান না-হওয়া পর্যন্ত আমার জীবদ্দশায় কেবলমাত্র আমার নির্দেশে পরিচালিত হইয়াই অপর সকলে ঐ আন্দোলনে পুনরায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন। সত্যগ্রহ আন্দোলনের শ্রেষ্ঠা এবং প্রবর্তক হিসাবেই আমি এই অভিমত জ্ঞাপন করিতেছি। কাজেই যাহারা আমার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্দেশে চালিত হইয়া স্বরাজ লাভার্থ নিরপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন, তাহারা অনুগ্রহপূর্বক এখন হইতে উহা ত্যাগ করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সিদ্ধির দিক হইতে ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

মনুষ্টের আয়ত্ত যত অল্প আছে, তাহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুধ এই সত্যগ্রহ সম্বন্ধে আমি সর্বান্তঃকরণে আগ্রহান্বিত। [অর্থাৎ ইহা আমার বা অন্য কাহারও খেলার জিনিস নয়।] সত্যগ্রহকে যুদ্ধ-বিগ্রহ বা বল-প্রয়োগের পরিবর্তে ব্যবহারযোগ্য পূর্ণফলপ্রদ অস্ত্র বলিয়া দাবী করা যাইতে পারে। তথাকথিত সন্ন্যাসবাদীদের এবং সমগ্র জাতিকে পৌরুষহীন করিয়া ফেলিয়া সন্ন্যাসবাদীদের উচ্ছেদকামী সরকারের হৃদয় জয় করা সত্যগ্রহের উদ্দেশ্য। কিন্তু অনেকের আন্তরিকতাহীন নিরপদ্রব প্রতিরোধ—উহার ফল জাঁকাল হইয়া থাকিলেও, সন্ন্যাসবাদী বা শাসকসম্প্রদায় কাহারও হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই। খাঁটি সত্যগ্রহ নিশ্চয়ই উভয়ের হৃদয়কেই স্পর্শ করিবে। এই উক্তির সত্যতা পরীক্ষা করিতে হইলে, এক সময়ে কেবল একজন করিয়া যোগ্য ব্যক্তির সত্যগ্রহ করা উচিত। এতাবৎ সেরূপ পরীক্ষা করা হয় নাই—এক্ষণে তাহাই করিতে হইবে।

পাঠককে আমি সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, কেবলমাত্র নিরপদ্রব প্রতিরোধকে তিনি যেন সত্যগ্রহ বলিয়া ধরিয়া না লন। ইহা আরও ব্যাপক। সত্যগ্রহের অর্থ নিষ্করণ সত্যানুসন্ধান এবং এইরূপ সত্যানুসন্ধানজাত শক্তির সন্ধান। কেবলমাত্র নিরপদ্রব উপায়েই এই সন্ধান সম্ভবপর।

যে-সকল নিরপদ্রবপ্রতিরোধকারিগণকে বর্তমানে স্বাধীনতা দেওয়া হইল, তাহাদিগকে যদি ভবিষ্যতের আহ্বানের জন্ত প্রস্তুত থাকিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে কি করিতে হইবে? তাহারা আত্মস্বত্ববর্জন এবং স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্যব্রতের বিদ্যা ও মাধুর্য হৃদয়ঙ্গম করিবেন। তাহারা জাতিগঠনমূলক কাষে, যথা—স্বহস্তে কাটা সুতার স্বহস্তে বোনা খন্ডরের প্রচার সম্প্রসারণে, ব্যক্তিগত আচরণ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অস্ত্রের মিলন সজ্জটনে আত্মনিয়োগ করিবেন; তাহারা নিজ আচরণের মধ্য দিয়া সর্বতোভাবে অস্পৃশ্যতা বর্জন করিবেন, নিজ পবিত্রতা সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়া ও নেশাখোরদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে মেলামেশা করিয়া পানদোষাদির সম্পূর্ণভাবে বর্জনের আন্দোলন চালাইবেন। এই সকল জনসেবার কাজে গরীব লোকদের মত চা'লে, জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যবস্থা হইতে পারে। গরীবদের মত জীবনযাত্রা-প্রণালী যাহাদের পছন্দ

না হইবে বা যাঁহাদের পক্ষে উপযুক্ত না হইবে, তাঁহারা জাতীয়তার দিক হইতে গুরুত্বসম্পন্ন এরূপ শ্রমশিল্পের প্রতি মনোযোগ দিতে পারেন, যাঁহাতে মানুষ দলবদ্ধভাবে কারখানায় ব্যাপ্ত হয় না, এক যাঁহাতে গরীবিন্যাসের জন্ত আবশ্যিক আয়ের চেয়ে বেশী মজুরী পোষায়। সকলেই মনে রাখিবেন যে, যাঁহারা আইন ও কর্তৃপক্ষের প্রতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বাধ্যতা স্বীকারের কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত এক উহা পালনও করিয়া থাকেন, নিরুপদ্রব প্রতিরোধের অধিকারী কেবলমাত্র তাঁহারা হই।

একথা বলার প্রয়োজন নাই বলিলেই হয়, যে, এই বিবৃতি প্রকাশ করিয়া আমি কোন মতেই কংগ্রেসের ক্ষমতা আত্মসাৎ করিতেছি না। যাঁহারা সত্যগ্রহ সম্পর্কে আমার নির্দেশ চাহেন, আমি কেবল মাত্র তাঁহা-দিগকেই এতদ্বারা পরামর্শ দান করিলাম।

মহাত্মা গান্ধী যাঁহাকে পরামর্শ বলিয়াছেন, অধিকাংশ কংগ্রেসওয়ালারা তাঁহা আদেশ বলিয়াই পালন করিবেন।

আমরা কখনও সত্যগ্রহ করি নাই, নিরুপদ্রব ভাবে আইনলঙ্ঘন বা প্রতিরোধ করি নাই; (অবশ্য সোপদ্রব আইন লঙ্ঘন ত করিই নাই!)। যাঁহারা নিরুপদ্রব অসহযোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া অসহযোগ প্রচেষ্টাটিকে ভিতরের দিক হইতে জানিবার বুঝিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই। হয়ত সেই কারণে এবং আধ্যাত্মিকতার পথে আমরা অনগ্রসর বলিয়া মহাত্মাজীর সব কথা বুঝিতে পারিরাছি কি-না সন্দেহ হইতেছে। বাহির হইতে দেখিয়া শুনিয়া আমাদের যে ধারণা হইয়াছে, তাঁহাতে মহাত্মাজী স্বরাজ্যভার্থ-নিরুপদ্রব-আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টা যে স্থগিত করিয়া দিয়াছেন, তাঁহা আমাদের ঠিকই মনে হইয়াছে। যাঁহারা মধো আর উৎসাহ আগ্রহ প্রাণ ছিল না তাঁহারা কেবল ঠাট্টা বজায় রাখিলে তাঁহাকে কেবল লোকের চক্ষে অবজ্ঞেয় ও হাস্যাস্পদই করা হইত। তার চেয়ে, যিনি নিজের মন বুঝেন, যিনি নিজের হৃদয় পরীক্ষা করিয়াছেন, যিনি অসহযোগ সত্যগ্রহ প্রভৃতির প্রবর্তক, একা সেই মহাত্মাই ব্রতী থাকুন, ইহাই ভাল।

তবে, গান্ধীজী বিশেষ করিয়া তাঁহারা যে সমাদৃত পুরাতন বন্ধুর হেলের আচরণ হইতে আলোচ্য সিদ্ধান্তটিতে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়াছেন, তাঁহা তাঁহাদের সিদ্ধান্তের পক্ষে যথেষ্ট হেতু বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে না। আমরা সত্যগ্রহের নিয়ম কি কি জানি না, কিন্তু গান্ধীজী যখন বলিতেছেন, যে, তাঁহারা বন্ধুর আচরণে সত্যগ্রহের নিয়মভঙ্গ হইয়াছে, তখন তাঁহা নিশ্চয়ই ঠিক। কিন্তু এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত হইতে ত প্রমাণ হয় না যে, অনেক অমৃত সত্যগ্রহীর মধ্যে অধিকাংশই সত্যগ্রহের অন্তরে প্রবেশ করে নাই, তাঁহারা আধ্যাত্মিক

স্বরূপ বুঝে নাই, সকলেই বা অধিকাংশই সত্যগ্রহের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে। হইতে পারে, যে, মহাত্মাজী সব কথা খুলিয়া বলেন নাই। অনেকেই হয়ত বাহিরে সত্যগ্রহী কিন্তু অন্তরে তাঁহারা বিপরীত কিছু ছিলেন। কিন্তু আমরা মহাত্মাজী যাঁহা বলিয়াছেন, তাঁহারা হই আলোচনা করিতেছি। তাঁহারা মনের মধ্যে কি আছে, তাঁহা জানি না; সুতরাং তাঁহারা আলোচনাও অনধিকারচর্চা হইবে। তিনি যাঁহা বলিয়াছেন, তাঁহা হইতে মনে হয়, তাঁহারা উদ্ভিতে অনেক প্রকৃত সত্যগ্রহীর উপর অবিচার ও তাঁহাদের অপমান করা হইয়াছে।

মহাত্মাজী যে-সব গঠনমূলক কার্যের কথা বলিয়াছেন, শিক্ষার বিস্তার, জ্ঞান-বিস্তার, নিরক্ষরতা-দূরীকরণ তাঁহারা মধ্যে নাই। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় নহে। কারণ ঠিক এই জিনিষটিতে তাঁহারা বিশেষ উৎসাহ কোন কালেই দেখা যায় নাই। এই কারণে তিনি এক সময় বাঙালীদিগকে শিক্ষাপাগল' বলিয়াছিলেন। আমরাও লিখনপঠনক্ষম-ত্ব ও শিক্ষিত-ত্বকে অভিন্ন মনে করি না। কিন্তু লিখনপঠনক্ষমত্বকে ভিত্তি না করিলে আধুনিক কালে কোন জাতি যথেষ্ট উন্নত ও শক্তিময় হইতে পারে না, ইহাও আমাদের বিশ্বাস। যাঁহা হউক, শিক্ষা সাধারণ ভাবে গান্ধীজীর “জাতিগঠনমূলক” কাজের তালিকার মধ্যে না থাকিলেও ‘হরিজনদের’ উন্নতির জন্ত উহাদের প্রয়োজন গান্ধীজী স্বীকার করিয়াছেন, এবং শিক্ষাদানকে ‘হরিজন’-সেবার একটি অঙ্গ করা হইয়াছে।

ইহাও হইতে পারে, যে মহাত্মাজী তাঁহারা মতবিবৃতিটিতে ‘জাতিগঠনমূলক’ কার্যের পূরা তালিকা দিতে চান নাই; কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র দিয়াছেন।

অসহযোগ, সত্যগ্রহ ও সন্ত্রাসবাদ

মহাত্মা গান্ধী তাঁহারা বিবৃতিতে বলিয়াছেন, খাঁটি সত্যগ্রহ এক দিকে সরকারী শাসকসম্প্রদায় ও অন্য দিকে বেসরকারী সন্ত্রাসবাদী উভয়েরই হৃদয় স্পর্শ করিবে। উক্ত দুই শ্রেণীর লোকদের কাহারও সঙ্গে অল্প বা অধিক সাহচর্য আমাদের ঘটে নাই বলিয়া আমরা বলিতে পারি না তাঁহাদের হৃদয় কিসে সাড়া দিবে। কিন্তু সত্যগ্রহ-প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে সম্ভবতঃ সন্ত্রাসবাদের উদয় হইত না, কিংবা উহা উদ্ভবের পর লোপ পাইত, এরূপ কোন একটা অল্পমান

বা তৎ হস্ত সরকারী মনের কোণে উঁকি মারিয়া থাকিতে পারে। কারণ, দেখিতেছি, বঙ্গের ১৯৩২-৩৩ সালের সদ্যঃপ্রকাশিত শাসনবৃত্তান্তের প্রথম ভাগের একাদশ অনুচ্ছেদ এই বলিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে :—

“II. While the star of civil disobedience and the prestige of Congress were thus waning, numerous incidents illustrated the strength and the widespread nature of the terrorist movement.”

তাৎপৰ্য্য। যখন এই প্রকারে নিরপদ্রব আইন-সম্মত প্রচেষ্টার শুভ-ফল ও কংগ্রেসের প্রতিপত্তি ক্ষয় পাইতেছিল, তখন বহুসংখ্যক ঘটনা মন্ত্রাসকদিগের প্রচেষ্টার শক্তি ও ব্যাপকতা সপ্রমাণ করিতেছিল।

একের হ্রাস ও অন্যটির বৃদ্ধির মধ্যে কারণকায় সম্পর্ক আছে কি ?

সরকারী মতে তাহা থাক বা না-থাক, বেসরকারী বিস্তর লোকের মতে তাহা আছে।

রাজকুমারী কমলা রাজা শিন্দে

গোআলিয়রের মহারাজা শিন্দের ভগ্নী রাজকুমারী কমলা রাজা শিন্দের সহিত শিবাজীর বংশধর আকালকোটের



রাজকুমারী কমলা রাজা শিন্দে

রাজার বিবাহ হইবার পর এক মাসের মধ্যে রাজকুমারী আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় সমস্ত গোআলিয়র শোকে নিমগ্ন হইয়াছে। এই রাজকুমারীকে তাঁহাদের পিতামাতা কেতাবী শিক্ষা ত দিয়াছিলেনই— তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, অধিকন্তু

তিনি চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি ললিতকলাও শিখিয়াছিলেন। তিনি আধুনিক বঙ্গীয় চিত্রকলার অমুরাগিনী ছিলেন। ইতা ছাড়া মহারাষ্ট্রীয় রীতিতেও তিনি শিক্ষা পাইয়াছিলেন। অথারোহণে তিনি পারদর্শনী ছিলেন এবং সৈন্যদলে ভর্তি হইয়া পুরুষ সৈনিকদের মত যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়াছিলেন।

শ্রী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ব্রঞ্জ মূর্তি

চিত্তরঞ্জম অভিনিউ ও চৌরঙ্গীর মোড়ে শ্রী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ব্রঞ্জ মূর্তিটির প্রতিষ্ঠাকার্য্য সেদিন সম্পন্ন হইয়া



শ্রী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ব্রঞ্জ মূর্তি

গিয়াছে। ভালই হইয়াছে। অন্তর্ধানটির বর্ণনা করিতে গিয়া স্টেটসম্যান কাগজ লিখিয়াছে, মূর্তিটি ইটালীতে প্রস্তুত। যাহারা মনে করে ভাল কোন জিনিষ ভারতবর্ষের লোকেরা করিতে পারে না, স্টেটসম্যান চালায় সেই বকম লোকেরা। ঐ প্রকৃতির লোকেরাই রটাইয়াছিল, তাজমহল ইটালীর লোকদের

পরিকল্পিত। প্রকৃত কথা এই যে, মূর্তিটির আসল শিল্পী কাজ, শিল্প-প্রতিভার কাজ যাহা, তাহা করিয়াছেন বাঙালী চিত্রকর ও মূর্তিনির্মাতা শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী। তিনি এখন মাদ্রাজের সরকারী আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল। ইহার পরিকল্পনাটি তাঁহার, ছাঁচ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তিনি। এত বড় মূর্তির ঢালাই ভারতবর্ষে হয় না বলিয়া কেবল ঢালাইটি ইটালীতে হইয়াছে। ইউরোপেরও অনেক বড় বড় মূর্তিকার নিজেদের তৈরি ছাঁচের অনুযায়ী মূর্তি ঢালাই করান ব্যবসায়ী কারিকরদের দ্বারা। কিন্তু তাহাতে কেহ বলে না, যে, ঐ ঢালাইকারীরাই মূর্তিকার।

কুমুদনাথ চৌধুরী

কুমুদনাথ চৌধুরী কলিকাতা হাইকোর্টের অগ্রতম বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ছিলেন। তা ছাড়া তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল শিকারী বলিয়া। তাঁহার লেখা শিকারবিষয়ক পুস্তক ও অনেক প্রবন্ধ আছে। দুঃখের বিষয়, তিনি গত মাসে মধ্যপ্রদেশে বাঘ শিকার করিতে গিয়া বাঘের দ্বারাই নিহত হইয়াছেন।

জমির খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

আমরা ইহা বার-বার দেখাইয়াছি, যে, বাংলা দেশে সংগৃহীত রাজস্বের খুব বেশী অংশ ভারত-গবর্নেন্ট লণ্ডনায়, অথবা যে-কোন দুই প্রদেশ হইতে গৃহীত রাজস্বের সমষ্টি অপেক্ষা বেশী লণ্ডনায়, বাংলা দেশের রাষ্ট্রীয় কার্য নির্বাহের জন্য প্রধান প্রধান প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্নেন্টের চেয়ে কম টাকা বাংলা-গবর্নেন্টের হাতে থাকে; অথচ বঙ্গের লোকসংখ্যা অথবা যে-কোন প্রদেশের লোকসংখ্যার চেয়ে বেশী। বঙ্গের প্রতি এই অবিচারে ও বঙ্গের এই দুঃস্থায়ী দুঃখিত হওয়া দূরে থাক, অথবা প্রদেশের অনেক নেতা বলেন, ভূমির খাজনা প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্নেন্টের প্রাপ্য, যে-যে প্রদেশে এই খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই তাহাদের গবর্নেন্ট ভূমির খাজনা বাবদে অনেক টাকা পায়, কিন্তু বাংলা দেশে খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায় উহার গবর্নেন্ট এই বাবদে বেশী টাকা পায় না, এই কারণে বাংলা সরকারের ভাগে কম টাকা থাকে। ইহার তাৎপর্য এই যে, বঙ্গ যত জমি আছে তাহার তুলনায় জমির খাজনা কম। তাহা সত্য কি-না দেখা যাক।

বাংলার লোকসংখ্যা সর্বাধিক হইলেও বাংলার আয়তন বড় সব প্রদেশের চেয়ে কম। ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত সরকারী স্ট্যাটিস্টিক্যাল য়াববুক নামক বহিতে প্রদেশগুলির আয়তন ও সর্বাধুনিক যে বৎসরের ভূমির খাজনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা নীচে লিখিত হইল।

প্রদেশ	বর্গমাইলে আয়তন	জমির খাজনার টাকা
মাদ্রাজ	১৪২২৭৭	৪,৮৮,৬১,৯৬৪
বোম্বাই	১২৩৬৭৯	৪,৭৪,৫৫,১৩৯
বাংলা	৭৭৫২১	৩,০৮,৯৩,১০২
আগ্রা-অযোধ্যা	১০৬২৪৮	৬,৪৭,৯৮,৯৩৩
পঞ্জাব	৯৯২০০	২,৬৯,৪২,৬৩১
বিহার-উড়িষ্যা	৮৩০৫৪	১,৮০,০৩,৭০৮
মধ্যপ্রদেশ-বেরার	৯৯৯২০	২,১৮,৫৯,২৯২

বঙ্গের আয়তন এই সব প্রদেশের মধ্যে কম, কিন্তু বাংলার প্রত্যেকের চেয়ে কম খাজনা দেয় না; যাদের চেয়ে কম দেয়, তাদের চেয়ে বঙ্গের বিস্তৃতিও খুব কম।

তবে একথা উঠিতে পারে বটে, যে, সব প্রদেশের সমস্ত ভূমি ত চাষের যোগ্য নয়, হয়ত বঙ্গ চাষের যোগ্য জমি বেশী। তাহা সত্য কিনা দেখা যাক। অক্ষুণ্ণ নিযুত একরে দেওয়া হইয়াছে। এক একর তিন বিঘার কিছু বেশী।

প্রদেশ	বাস্তবিক বাপিত জমি	চলিত পতিত	তত্ত্বিন্ন চাষাযোগ্য পতিত
মাদ্রাজ	৩৪	১০	১২
বোম্বাই	৩২	১০	৬
বাংলা	২৩	৫	৫
আগ্রা-অযোধ্যা	৩৫	২	১০
পঞ্জাব	২৬	৪	১৪
বিহার-উড়িষ্যা	২৪	৬	৬
মধ্যপ্রদেশ-বেরার	২৫	৩	১৪

যত জমি বাস্তবিক কষিত ও বাপিত হইয়াছে, তাহার পরিমাণ বঙ্গ সব চেয়ে কম। যত জমি সাধারণতঃ চাষ করা হয়, কিন্তু কোন কোন বৎসর হয়ত পতিত রাখা হয় এবং যত জমি চাষযোগ্য অথচ এপর্যন্ত যাহাতে চাষ হয় নাই, এই উভয় প্রকার জমির সমষ্টিতেও বাংলা দেশ সকলের নীচে।

সুতরাং বঙ্গ জমির খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না থাকিলেই এখন হইতে গবর্নেন্ট বেশী খাজনা পাইতেন বা ন্যায়তঃ পাইবার অধিকারী হইতেন, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। বস্তুতঃ রামমোহন রায় লিখিয়া গিয়াছেন, এবং এ-বিষয়ের বিশেষজ্ঞেরা জানেন, যে, ১৭৯৩ সালে

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় যে খাজনা ধার্য হয় তার চেয়ে বেশী কখনও ধার্য হয় নাই, বরং ইহা অনেক স্থলে পূর্ববর্তী মুসলমান ও ইংরেজ গবর্নেন্টের সর্বোচ্চ আদায়ের চেয়ে বেশী।

কথিত হইতে পারে, যে, বঙ্গের অনেক জমি খুব উর্বরা, কিন্তু তাহা ত অল্প অনেক প্রদেশের পক্ষেও সত্য। অল্প দিকে বঙ্গের দুটা অস্থবিধা আছে, যাহা অল্প প্রদেশগুলির নাই। যথা—বাংলা দেশকে অল্পতম জমীর দ্বারা অধিকতম কৃষিজীবী লোকদিগকে পালন করিতে হয়, এবং অল্প বহু প্রদেশ কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নিশ্চিত সরকারী জলসেচনের খালের যে স্থবিধা পাইয়া থাকে, বঙ্গের তাহা নাই।

শ্রী লালগোপাল মুখোপাধ্যায়ের

অবসর গ্রহণ

এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ শ্রী লালগোপাল

মুখোপাধ্যায় অবসর গ্রহণ করিতেছেন। সেই উপলক্ষে তাঁহাকে গত মাসে এলাহাবাদে বিদায়-ভোজ দেওয়া হইয়াছে। ভোজ-সভায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অল্প অনেকে তাঁহার বিচারকার্যদক্ষতা ও অল্প গুণাবলীর প্রশংসা করেন। তিনি সৌজন্যের জন্ম এবং সুবিচারক বলিয়া সকলের শ্রদ্ধাভাজন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখিলে মনে হয় না, যে, তাঁহার বয়স ৬০ হইতে যাইতেছে। শুধু চেহারায় নয়, তিনি কর্মিষ্ঠতাতেও অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক কর্মিষ্ঠ লোকদের মত। সুতরাং তিনি জিজ্ঞাস্যতী আরও কয়েক বৎসর বেশ করিতে পারিতেন। তাঁহার অবসর গ্রহণে এলাহাবাদ হাইকোর্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং তাঁহারও আয় কমিবে। কিন্তু তিনি অল্প প্রকারে দেশের হিত করিতে পারিবেন।

প্রবাসী বাঙালীরা তাঁহার নেতৃত্ব দ্বারা উপকৃত হইবার আশা রাখে। তিনি আগে হইতেই প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের সচিব ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। এখন

গত বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীর ১৫১ পৃষ্ঠায় যে ছবিটি ছাপা হইয়াছে তাহা শ্রী লালগোপাল মুখোপাধ্যায়ের নহে; তাহার স্থলে এই ছবিটি গ্রাহকগণ বসাইয়া লইবেন।



কলিকাতায় ইংরেজদের দৈনিক তিন খানা ছিল। এখন কমিরা এক খানায় ঠেকিয়েছে। 'ইণ্ডিয়ান ডেলাই নিউস' অনেক বৎসর আগে উঠিয়া যায়। 'ইংলিশম্যান' কয়েক বৎসর হুঁল সাপ্তাহিকের আকার ধারণ করে। সম্প্রতি সাপ্তাহিক ইংলিশম্যানও ভারতের ভাবী স্বাধীনতার বিরুদ্ধে 'বিদ্বেষ-স্তোত্র' (hymn of hate) শেষবার গাহিয়া দেহত্যাগ করিয়াছে। দেশী কাগজের প্রতিযোগিতার প্রবলতার ইহা একটি প্রমাণ। কিন্তু এক দিকে যদিও ইংরেজ সাংবাদিককে ও সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারীকে হটিতে হইয়াছে, অন্য দিকে বঙ্গের বাহিরের সংবাদপত্র এবং সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী কলিকাতায় নিজেদের স্থান করিয়া লইতেছে। উদ্যোগিতার দ্বার সর্বত্র অব্যাহত থাকা ভাল। এলাহাবাদের কাগজখানার যেমন কলিকাতায় কাটতি হইতেছে, তেমনই মাদ্রাজী স্বত্বাধিকারীর দৈনিক ইংরেজী কাগজও কলিকাতা হইতে বাহির হইতেছে। বাঙালী স্বত্বাধিকারীর ইংরেজী দৈনিক বঙ্গের বাহিরে কোন জায়গায় নাই।

বাঙালী সাংবাদিকদের দৃষ্টি আর একটা বিষয়ে পড়িয়া থাকিবে। পাটনা হইতে 'ইণ্ডিয়ান নেশন' নামক একখানি দৈনিক একবার বাহির হইয়া বন্ধ হয়। উহা আবার বাহির হইতেছে। উহার সম্পাদক লওয়া হইয়াছে বিহার, বাংলা ও উড়িষ্যা ডিঙাইয়া মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী হইতে। আগ্রা-অধোধ্যা প্রদেশও নিকটতর ছিল। সেখান হইতেও লওয়া বা পাওয়া যায় নাই। এই সম্পাদকটির যোগ্যতা সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি না—সে-বিষয়ে কিছু জানি না। বাঙালী সাংবাদিকদিগকে কেবল লক্ষ্য করিতে বলিতেছি, যে, আজকাল তাঁহাদিগকে লোকে চায় না বা পুঁছে না। তাহার অনুমিত অন্তিম কারণ, তাঁহারা পরস্পরকে পুঁছেন না; যেখানে কোন প্রতিযোগিতা নাই—প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রই নাই, সে-স্থলেও বাঙালী সংবাদপত্রপরিচালকদের অ-সহযোগিতা ও ঈর্ষার প্রমাণ পাওয়া যায়। কার্য উদ্ধারের জন্য অতিভদ্র, এমন কি খোসামোদকারী, কিন্তু অন্য সময়ে নিজমুর্তিধারী, এরূপ লোকও আছেন।

ক্ষুদ্রতম কাগজও বৃহত্তম কাগজের বাস্তবিক সহযোগী। প্রত্যেক কাগজেই এমন কিছু থাকে, যাহা জ্ঞাতব্য এবং যাহা অন্য কাগজে পাওয়া যায় না।

কলিকাতার স্বাস্থ্য

বড় শহর মাত্রেরই স্বাস্থ্য ভাল রাখা অতিশয় কঠিন— বিশেষতঃ সেই রকম শহরের যেখানে স্থলপথে জলপথে আকাশ-পথে দেশবিদেশ হইতে নানা রকমের মানুষ ও অন্ত্র জীব এবং বাণিজ্যদ্রব্য আসে, এবং তাহাদের সঙ্গে নানা রোগবীজ আসে। কিন্তু রোগের আগমন এইরূপে হইতে পারে বলিয়া কোন শহরেরই অন্য সব স্থানের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করা চলে না—সম্পর্ক ত্যাগ করা উচিতও নহে। যাহা করা যায় ও করা উচিত, তাহা নগরপালদিগের দ্বারা নগরের স্বাস্থ্যরক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা এবং যাহারা স্বাস্থ্যতত্ত্ব বুঝেন তাঁহাদের দ্বারা স্বাস্থ্যতত্ত্বের প্রচার। ইংরেজী সাপ্তাহিক কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সাধারণসংখ্যাসমূহে শহরের স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় তথ্য এবং রোগের প্রতিষেধক উপায় ও রোগের প্রতিকার সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি থাকে। তা ছাড়া সম্পাদক মধ্যে মধ্যে যে একটি স্বাস্থ্যসংখ্যা বাহির করেন, তাহাতে এরূপ জিনিষ প্রচুর থাকে। এই সংখ্যাগুলি, এবং বার্ষিক সংখ্যাগুলিরও পঠিতব্য জিনিষ, চিত্র ও মূদ্রণের উৎকর্ষে এইজাতীয় পত্রিকাসমূহের মধ্যে যে স্থানটি অধিকার করিয়া আছে, তাহা অনন্যাসুলভ। সম্প্রতি যে ষষ্ঠ স্বাস্থ্যসংখ্যা বাহির হইয়াছে, তাহা কলিকাতায় বর্তমান ঋতুতে প্রাদুর্ভূত রোগসমূহের ভয়ে ভীত লোকদের বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য।

“ক্যালকাটা ক্লীক্”

বিলাতে যেমন লণ্ডনে রয়্যাল সোসাইটি আছে, ভারতবর্ষে সেই-রকম একটি বৈজ্ঞানিক সভা (ইণ্ডিয়ান একাডেমি অব সায়েন্স) প্রতিষ্ঠিত করিবার কথা অনেক দিন হইল উঠিয়াছে। বিষয়টির সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত ও আলোচনা গত মার্চ মাসের 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার একটি প্রবন্ধে আছে। তাহা মাসিক কাগজের প্রবন্ধ এবং কলিকাতার মাসিকের প্রবন্ধ; সুতরাং কলিকাতার দৈনিক কাগজওয়ালারা তাহা না-পড়িতে বাধ্য, এবং তাহার শিরোনামটা দেখিয়া থাকিলেও তাহার উল্লেখ না-করিতে বাধ্য। (এই প্রবন্ধ হোনোলুলুর কোন কাগজে থাকিলে অবশ্য উদ্ধৃত হইতে পারিত।) সেই অন্য যখন দক্ষিণ-ভারত হইতে বৈজ্ঞানিক শ্রম চন্দ্রশেখর বেক্ট রামনের

এই-বিষয়ক একটা বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট তারযোগে কলিকাতার দৈনিকগুলির আফিসে পৌঁছিল, তখন তাঁহারা এই বিষয়ের সংবাদের জ্ঞান ব্যাকুল হইলেন। অধ্যাপক আঘরকর কিছু সত্য খবর দিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিলেন। পরে ডক্টর মেঘনাদ সাহার উক্তিও আসিয়া পৌঁছিল।

ব্যাপারটা এই, যে, যেহেতু অধ্যাপক রামন্ নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন, অতএব তাঁহার মতে ভারতবর্ষে আর কোন বৈজ্ঞানিক নাই, এবং তিনি যেখানে বিরাজ করিবেন, তাহাই ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক কেন্দ্র স্বতই হইতে বাধ্য! পৃথিবীতে মোটে কয়েক গুণ বৈজ্ঞানিক নোবেল প্রাইজ-ওয়াল আছে। কিন্তু সেই জ্ঞান কোন পাগলেও এরূপ ভাবে না, যে, অল্প বহু সহস্র বৈজ্ঞানিক নগণ্য। কলিকাতা তাঁহাকে বড় হইবার সুযোগ দিয়াছিল, কিন্তু এখন তিনি কলিকাতায় নাই। অতএব, যদিও কলিকাতায় ভারতবর্ষের যত সরকারী বৈজ্ঞানিক বিভাগের (ডিপার্টমেন্টের) সদর কার্যালয় অবস্থিত ভারতীয় অল্প কোন শহরে তত নাই, এবং যদিও কলিকাতায় সরকারী ও বে-সরকারী অনেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে যত রবমের যত গবেষণা হয়, ভারতবর্ষের অল্প কোথাও তত হয় না, এবং সেই কারণে ইণ্ডিয়ান একাডেমী অব সায়েন্সের পীঠস্থান স্বভাবতঃই কলিকাতায় হইবার কথা, তথাপি অধ্যাপক রামন্ কল্পনা করিয়াছেন, কলিকাতার একটা ক্লাব (অর্থাৎ মন্দ অভিপ্রায়ে গঠিত একটা ক্ষুদ্র দল) ঐ একাডেমীকে কলিকাতায় বসাইবার চেষ্টা করিতেছে! কেহই সে চেষ্টা করিতেছে না, কারণ তাহা অনাবশ্যক। বৃহত্তর সহিত ক্ষুদ্রের উপমা দেওয়া মার্ক্সনীয় হইলে বলা যায়, সূর্যকে পূর্বদিকে উদ্ভিত করিবার জ্ঞান যেমন কোন ক্লাবের দরকার হয় না, তেমনি কলিকাতা যাহার কেন্দ্র উহাকে তাহার কেন্দ্র বানাইবার জ্ঞানও ক্লাবের প্রয়োজন নাই।

কাহার গ্রাহক বেশী

এটা সবাই জানে, সরকারী বেসরকারী যে-সব প্রতিষ্ঠান, আফিস, ডিপার্টমেন্ট প্রভৃতির কৰ্ত্তা ইংরেজ বা ফিরিঙ্গী, সেই সকলের বিজ্ঞাপন ইংরেজদের কাগজগুলো পায়—যদি বিজ্ঞাপনগুলো প্রধানতঃ ভারতীয়দের অবগতির জ্ঞান অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলেও সেগুলো এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজে বেশী দাম দিয়া দেওয়া হয়। স্টেটসম্যান এইরূপ কোন কোন বিজ্ঞাপনের প্রকাশে অমৃতবাজার পত্রিকা খুঁত ধরেন। তাহাতে চৌরঙ্গীর কাগজ বলিতেছেন, তাঁহার ভারতীয় পাঠকসংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত যে-কোন কাগজের চেয়ে বেশী। অমৃতবাজার তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং সন্দেহের যুক্তিসঙ্গত কারণও বলিয়াছেন।

আনন্দবাজার পত্রিকাও এ-বিষয়ে কলম চালাইয়াছেন,

লিখিয়াছেন, “স্টেটসম্যান একটু অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিতেন যে, এই কলিকাতা শহর হইতে প্রকাশিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র আনন্দবাজার পত্রিকার প্রচার তাঁহাদের চেয়ে বহুগুণে অধিক। স্টেটসম্যান যদি প্রকাশে প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া এ-বিষয়ে মীমাংসা করিতে সম্মত থাকেন, আমরা প্রস্তুত আছি।” স্টেটসম্যান এই হিসাব-বুদ্ধে অগ্রসর হইবেন বলিয়া মনে হয় না। আমরা অবশ্য কোন কাগজেরই কাটতি কত জানি না। কিন্তু আজকালকার দিনেও যদি স্টেটসম্যানের বাঙালী পাঠক যে-কোন বাঙালী-পরিচালিত ইংরেজী বা বাংলা কাগজের চেয়ে বেশী থাকে, তাহা বাঙালীদের লজ্জার বিষয় হওয়া উচিত।

শুনিয়াছি, কোন কোন বিজ্ঞাপনসংগ্রাহক, যে-কাগজের জ্ঞান বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করেন, শুধু তাহার কাটতি বাড়াইয়া বলিয়াই ক্ষান্ত হন না, অল্প সব কাগজের কাটতিও খুব কমাইয়া বলেন। মাসিক পত্রিকাগুলিও বেহাই পায় না।

বুদ্ধিমান বিজ্ঞাপনদাতারা শুধু কাটতির পরিমাণ বিবেচনা করেন না, দৈনিকের সঙ্গে মাসিকের কাটতির তুলনাও করেন না। কেন-না দৈনিক কাগজ কম লোকেই বাধাইয়া রাখে বা বাসি হইয়া গেলে পড়ে; কিন্তু মাসিক অনেকে মাসের ১লা তারিখের পরেও পড়ে, এবং বাধাইয়া রাখে। তাহার বাধান পুরাতন ভলুমের পর্যন্ত পাঠক অনেক। যিনি যে-রকম জিনিষের বিজ্ঞাপন দিতে চান, সেইরূপ জিনিষের ক্রেতা কোন কাগজের পাঠকদের মধ্যে কত, তাহার একটা অনুমানও তাঁহাকে করিতে হয়।

সৈন্যদল সম্বন্ধে সরকারী প্রবন্ধ

কাগজের কাটতি ও সরকারী বিজ্ঞাপনের বিষয়ে কিছু লিখিতে গিয়া একটা কথা মনে পড়িল। যখন কলিকাতার ও অন্য কোন কোন শহরের ইংরেজী দৈনিকে ভারতবর্ষের সৈন্যদলের সম্বন্ধে লম্বা লম্বা সরকারী প্রবন্ধ দেখি, তখনই মনে প্রশ্ন উঠে, “আচ্ছা, এগুলার জন্যে সরকার বাহাদুর কি কাগজ-ওয়ালাদিগকে বিজ্ঞাপনের দরে টাকা দিতেছেন?”

আনন্দবাজার পত্রিকার নিয়োক্ত বাক্যগুলি পড়িয়া সেই প্রশ্নটা আবার মনে উদ্ভিত হইল।

কয়েক দিন পূর্বে আমরা বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের প্রেস-অফিসারের মারফৎ “ফিজিক্যাল ডিরেক্টর, বেঙ্গল” মিঃ জেমস বুকাননের নিকট হইতে একটি “সংবাদ” প্রকাশার্থ পাই। আমরা সন্নিহনে দেখিলাম যে, গত ৭ই এপ্রিল তারিখে ‘স্টেটসম্যান’ এবং ‘ষ্টার অব ইণ্ডিয়া’—এই উভয় পত্রই ঐ সংবাদটি বিজ্ঞাপনরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। যে-সংবাদ জনসাধারণের উপকারার্থে আমরা দিগকে প্রকাশ করিবার জ্ঞান অনুমোদন করা হইল, তাহাই বিজ্ঞাপনরূপে ছাপাইবার জ্ঞান ‘স্টেটসম্যান’ ও ‘ষ্টার অব ইণ্ডিয়া’কে অর্ধ দেওয়া হইল। এই বৈষম্যের কারণ কি? কাহার আদেশে এইরূপ ব্যবস্থা হইল! ইহা কি অনুগ্রহভাজন সংবাদপত্রবিশেষকে “সব সিঁড়াইয়া” করা নয়?

সরকারী সাময়িক প্রবন্ধসমূহ দৈনিকগুলি বিনামূল্যে ছাপিতেছেন, না তাহার অন্য বিজ্ঞাপনের দরে টাকা পাইতেছেন, তাহা জানিবার কৌতূহলের কারণ বলিতেছি।

বেসরকারী লোকেরা অনেক মূলধন ফেলিয়া খবরের কাগজ বাহির করেন, এবং অনেক খরচ করিয়া ও দায়বুঁকি লইয়া সেগুলি চালান সর্বসাধারণকে সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য, লোকমত প্রচার করিবার জন্য এবং আপনাদের মত ও মন্তব্য ও স্বাধীনচিত্ত জ্ঞানবান্ লোকদের লেখা প্রবন্ধ প্রকাশ দ্বারা লোকদের মত

বিস্তারিতভাবে লোকেরা খুব খবর বাহির হয়, তাহার সরকারী সংশোধন মুদ্রিত করা কর্তব্য বটে। কিন্তু বেসরকারী লোকেরা পয়সা খরচ করিয়া দায়বুঁকি লইয়া কাগজ চালাইবে আর সরকার বাহাদুর আত্মপক্ষ প্রচার ও সমর্থনের জন্য লম্বা লম্বা প্রবন্ধ তাহাতে বিনাব্যয়ে ছাপাইবেন, এই বন্দোবস্ত যুক্তিসঙ্গত বা বাণিজ্যরীতিসঙ্গত মনে হয় না। সরকার বাহাদুর যদি লোককে বুঝাইতে চান, যে, ভারতবর্ষের সৈন্যদল প্রয়োজনের অতিরিক্ত বড় নহে এবং ইহার ব্যয়ও যথাসম্ভব কম, তাহা হইলে নিজের পয়সায় কাগজ বাহির করিয়া বা বহি লিখাইয়া তাহার মারফতে ঐসব কথা প্রচার করুন।

যে-সব সংবাদপত্র ঐ সকল লম্বা প্রবন্ধ ছাপাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পাঠকেরা সেগুলি খুব আগ্রহের সহিত পড়িয়াছেন, না ভাবিয়াছেন এগুলার পরিবর্তে পাঠযোগ্য যুক্তিসঙ্গত কিছু পাইলে তাঁহারা খুশী হইতেন, বলিতে পারি না। আমরা ঐ সরকারী প্রবন্ধসমূহের একটি বাক্যও পড়ি নাই, সুতরাং তৎসমুদয়ের উৎকর্ষাপকর্ষ সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি না।

প্রাচীন স্থাপত্য-গ্রন্থ “মানসার”

গত চৈত্রের প্রবাসীর ৮৮৭ পৃষ্ঠায় আমরা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর প্রসন্নকুমার আচার্য মহাশয়ের সম্পাদিত প্রাচীন স্থাপত্য-গ্রন্থ মানসারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি। তাহার বিস্তারিত পরিচয়ও দিবার ইচ্ছা আছে। এখন, চৈত্রে যাহা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তাহা লিখিতেছি। এই গ্রন্থের এই সংস্করণে কেবল যে মূল সংস্কৃত পাঠটি দেওয়া হইয়াছে তাহা নহে, ইংরেজী অক্ষরাদিও দেওয়া হইয়াছে এবং বিস্তারিত নক্সাও দেওয়া হইয়াছে। এই জন্য ইহা ভারতবর্ষের যে-সব বিশ্ববিদ্যালয়ে এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ আছে, তাহার অঙ্গীভূত এঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্পর্কশূন্য এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও বিদ্যালয়সমূহে অগ্রসর ছাত্রদের অধীভব্য পুস্তক বলিয়া নির্ধারিত হওয়া কর্তব্য। আমাদের বিশ্বাস এই, যে, যদি স্তর আন্তোভ মূখোপাখ্যার এখন

জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই এই পুস্তকখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এঞ্জিনিয়ারিং উপাধি-প্রার্থীদের অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থসমূহের অন্ততম বলিয়া নির্ধারণ করিতেন। এখন ইহা অন্ততঃ কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধীত হওয়া উচিত। গ্রন্থখানিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীভব্য করিলে পরোক্ষ সুফল এই হইবে, যে, প্রাচীন ভারতীয়দের স্থাপত্য ও মূর্তি-শিল্পের জ্ঞানের পরিমাণ সম্বন্ধে সত্য ধারণা জন্মিবে

থাকেন, নূতন জ্ঞান ও গবেষণার প্রভাবে তাহার সংশোধন হইবে। কারণ, প্রাচীন বা আধুনিক কোন লেখকদিগেরই কোন বিষয়ের জ্ঞান সম্পূর্ণ বা চূড়ান্ত নহে।

নেপালে মহারাজা হইবার অধিকার

নেপালের নৃপতিকে বলা হয় মহারাজাধিরাজ। কিন্তু তিনি প্রতীক মাত্র। সমুদয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রধান মন্ত্রীর তাঁহার উপাধি মহারাজা। নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে রাণা-পরিবারের লোকেরা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রধান মন্ত্রীর পদ পাইয়া থাকেন। ইহাদের সকলের আছে কিনা জানি না, কিন্তু অনেকের যেমন বৈধভাবে বিবাহিতা “উচ্চজাতীয়া” পত্নীর গর্ভে জাত সম্ভান আছে, তেমনি “নীচজাতীয়া” রমণীর গর্ভে জাত সম্ভানও আছে। এইরূপ কেহ কেহ খুব যোগ্য লোক। ভূতপূর্ব মহারাজার “রুদ্র” নামক এইরূপ এক পুত্র সেদিন পর্যন্ত নেপালের প্রধান সেনাপতি ছিলেন এবং সৈনিকদের খুব প্রিয় ছিলেন। সম্প্রতি তিনি, তাঁহার মাতা সমর্থ্যাদার ছিলেন না এবং “নীচজাতীয়া” ছিলেন বলিয়া, প্রধান সেনাপতির পদ হইতে অপস্থত হইয়াছেন। তাঁহাদের মাতা “নীচজাতীয়া” বলিয়া বা বৈধরূপে বিবাহিতা হন নাই বলিয়া এইরূপ আরও অনেকের কাজের অদলবদল হইয়াছে। বর্তমান মহারাজা এইরূপ করিবার এই কারণ দেখাইয়াছেন, যে, তাহা না করিলে রুদ্রই ইহার পর প্রধান মন্ত্রীর পদের স্তায় অধিকারী হইতেন, কিন্তু তাহাতে প্রজারা অসন্তুষ্ট হইত এবং শাসক রাণা-বংশের রক্তের বিত্ত্বি নষ্ট হইত। প্রজারা অসন্তুষ্ট হইত কি না জানি না কিন্তু যোগ্যতা সম্বন্ধে অধিকারলোপরূপ ও পদচ্যুতিরূপ শাস্তি পাইবে এইরূপ মাতাদের পুত্রেরা, ইহা স্তায়সঙ্গত নহে। দুর্নীতিপরায়ণ মহারাজাদের সামাজিক বা অন্তর্বিধ কোন শাসন বা শাস্তি হয় কি?

পৃথিবীতে জাতির বিশুদ্ধতা (racial purity) বলিয়া কোন জিনিস নাই; উহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। পৃথিবীর সব দেশের সব জাতির লোকদের মধ্যে অস্বাভাবিক রক্তমিশ্রণ

ঘটিয়াছে। সুতরাং কেবলমাত্র বংশের রক্তশুদ্ধির কারণে এতটা করা গ্রামসঙ্গত হয় কি? তবে যদি প্রজাদ্রোহের আশঙ্কা বা অন্য রাষ্ট্রনৈতিক কারণ ইহার সঙ্গে জড়িত থাকে সে অন্য ব্যাপার।

‘তাঁহাকে বিষ দেন না কেন?’

খান্ ওবেইদুল্লাহ্ খান্ নামক একজন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজনৈতিক বন্দীর কারাগারে ক্ষয়রোগ হইয়াছে। তিনি মুলতান জেলে আবদ্ধ আছেন। (অদ্য ২৮শে চৈত্র কাগজে দেখিতেছি, তিনি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া আছেন।) তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইবে কিনা, কিংবা তাঁহাকে অন্ততঃ মুলতান জেল হইতে তদপেক্ষা স্বাস্থ্যকর স্থানের জেলে সরান হইবে কিনা, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। ভারত-গবর্নমেন্টের স্বরাষ্ট্রসচিব স্মর হ্যারি হেগ এই মর্শ্বের উত্তর দেন, যে, সেরূপ কিছু করা হইবে না। তখন মিঃ মাসুদ আহমেদ নামক এক জন সদস্য বলেন :—

“If the Government propose to get rid of the man, why not poison him?”

“যদি গবর্নমেন্ট একেবারে মানুষটিকে সরাইয়া ফেলিতে চান, তাহা হইলে তাহার প্রতি বিষপ্রয়োগ করেন না কেন?”

প্রশ্নকর্তা মুসলমান, হিন্দু নহেন; ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে থাকেন বঙ্গ নহে।

স্মর হ্যারি হেগ মৃদুভাবে উত্তর দিলেন :—

“That’s not a reasonable way of looking at a hunger-striker who chooses to do so voluntarily, with the result that he has impaired his health.”

“একজন প্রায়োপবেশক যে নিজে স্বৈচ্ছায় উপবাস দিতেছে ও তাহার ফলে যাহার স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছে, তাহার বিষয়ে এই প্রকার মানসিক দৃষ্টিনিক্ষেপ যুক্তিসঙ্গত নহে।”

মিঃ মাসুদ ব্যবস্থাপক সভায় অচিস্তিতপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি কি জানেন, সন্দেহ করেন বা কল্পনা করেন, যে, গবর্নমেন্ট কখনও কোন বন্দীকে মারিয়া ফেলিবার জন্য বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন বা করেন বা গবর্নমেন্টের পক্ষে তাহা করা সম্ভব; অন্ততঃ তিনি কি মনে করেন, যে, গবর্নমেন্ট কোন বন্দীর মৃত্যুকামনা করিয়াছিলেন বা করেন বা গবর্নমেন্টের তাহা করা সম্ভব, যে তিনি এরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন? স্মর হ্যারি হেগও হয়ত মিঃ মাসুদ আহমেদের প্রশ্নের উত্তরে এরূপ প্রতিপ্রশ্ন করিতে পারিতেন। স্মর হ্যারি তাহা করিলে মিঃ আহমেদ কি উত্তর দিতেন জানিতে কৌতূহল হয়! কিন্তু বাহা হয় নাই তাহা হইলে আরও কি হইত, সে-বিষয়ে জল্পনা বৃথা।

“স্বদেশহিতৈষণার একচেটিয়া”

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্তিম সদস্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র বিনাবিচারে বন্দীকৃত বাঙালীদের অসুস্থতাদি অভিযোগের কথা মধ্যে মধ্যে সভায় তুলিয়া থাকেন। সেই সম্বন্ধে ভারত-গবর্নমেন্টের স্বরাষ্ট্রসচিব স্মর হ্যারি হেগ বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

Referring to the problem of detenus, Sir Harry Haig was astonished at Mr. Mitra’s charges. Mr. Mitra had declared that Government should not imagine that by merely keeping in restraint a few thousand young men they would kill the ideas of patriotism.

Sir Harry asked : Does Mr. Mitra think that we are keeping these young men in order to kill the ideas of patriotism? The problem of detenus is practically confined to Bengal. Are there no patriots in other provinces? Has Bengal the monopoly of patriotism? Or is it not that Bengal has the monopoly of something different (political murder)? What Government are seeking is not to suppress patriotism, but the desire for murder. That is the justification for the policy of keeping these young men under restraint. We fully believe that they are terrorists...

...I would invite Mr. Mitra to make it clear whether by expressing his feelings, as he did, he in any way desired to support the murder of Government officials or their friends.

Mr. Mitra immediately answered in the negative.

তাৎপর্য। স্মর হ্যারি মিঃ মিত্রের অভিযোগগুলিতে আশ্চর্যাবিত হইয়াছিলেন। মিঃ মিত্র বলিয়াছিলেন, গবর্নমেন্টের কল্পনা করা উচিত নয়, যে, কয়েক হাজার যুবককে আটক রাখিয়া স্বদেশহিতৈষণার ভাব বিনষ্ট করিবেন।

স্মর হ্যারি জিজ্ঞাসা করেন : মিঃ মিত্র কি মনে করেন, যে, আমরা এই যুবকগুলিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি স্বদেশহিতৈষণার ভাব নষ্ট করিবার নিমিত্ত? বিনাবিচারে আটক রাখার সমস্তটা কার্যতঃ বঙ্গই সীমাবদ্ধ। অন্তান্ত প্রদেশে কি স্বদেশহিতৈষী নাই? স্বদেশহিতৈষণা কি বঙ্গের একচেটিয়া? না, পৃথক একটা জিনিষ (রাজনৈতিক হত্যা) বঙ্গের একচেটিয়া? গবর্নমেন্ট বাহা চাহিতেছেন তাহা স্বদেশহিতৈষণার দমন নহে, কিন্তু নরহত্যার ইচ্ছার বিনাশ। তাহাই এই যুবকদিগকে আটক রাখিবার নীতির স্তাযাতাপ্রতিপাদক। আমরা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি, যে, তাহারা সম্মানবাদী।.....

.....মিঃ মিত্র যে প্রকারে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহার দ্বারা তিনি সরকারী কর্মচারী বা তাহাদের বন্ধুদের হত্যা সমর্থন করিতে কোন রকমে ইচ্ছা করিয়াছেন কিনা, তাহা পরিষ্কার করিয়া জানাইতে তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি।

মিঃ মিত্র তৎক্ষণাৎ বলিলেন, তিনি সেরূপ কোন ইচ্ছা করেন নাই।

পাঠকেরা লক্ষ্য করিবেন, স্মর হ্যারি হেগ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্রের কথাগুলিতে বিশ্বয় প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং ভদ্রভাষায় তাঁহার কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মিঃ মাসুদ আহমেদের প্রশ্নে বিশ্বয় প্রকাশ করেন নাই, এবং তাঁহাকে ভদ্রতম ভাষাতেও আহ্বান করেন নাই তাঁহার প্রশ্নের কারণ বলিতে। অথচ, মিঃ আহমেদের প্রশ্নের মধ্যে, গবর্নমেন্টের পক্ষে কাহাকেও বিষপ্রয়োগ সম্ভব হইতে

পারে, এইরূপ যে কল্পনা উহা থাকিতে পারে মনে করা যাইতে পারে, তাহা মিঃ মিত্রের উক্তি মধ্য, গবর্নমেন্টের পক্ষে স্বদেশহিতৈষণা বিনাশের জন্য কতকগুলি লোককে আটক করিয়া রাখিবার যে সম্ভাবনা উহা থাকিতে পারে মনে করা যাইতে পারে, তাহা অপেক্ষা কম আশ্চর্যজনক নহে— বরং বেশী আশ্চর্যজনক।

বিনাবিচারে বন্দী সব বাঙালী যুবককে স্ত্র হ্যারি হেগ সন্ত্রাসবাদী মনে করেন, বলিয়াছেন। সুতরাং তিনি সত্যোক্ত বাবুকে যাহা কৈফিয়ৎ দিতে আহ্বান করেন, তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। কিন্তু বিনাবিচারে বন্দীদিগকে বেসরকারী প্রত্যেক লোক সন্ত্রাসবাদী বলিয়া ধরিয়া লইতে বাধ্য নহে, কারণ তাহা প্রমাণ হয় নাই। সেই কারণে, বঙ্গে বিস্তর লোক বিশ্বাস করে, যে, তাহাদের মধ্যে সবাই না হউক, অনেক যুবক সন্ত্রাসবাদী নহে, এবং বঙ্গে কিছু কিছু সন্ত্রাসবাদী থাকায় পুলিশ বিস্তর অ-সন্ত্রাসবাদী স্বদেশভক্ত যুবককে সন্ত্রাসবাদ দমন উপলক্ষ্যে আটক করিয়াছে। সত্যোক্ত বাবুর উক্তি এইরূপ কোন বিখ্যাতের ফল বলিয়া অনুমান করি।

তিনি কিংবা সার্বজনিক কার্যে ব্যাপৃত অন্ত কোন বাঙালী এমন আহাম্মক নহেন, যে, স্বদেশহিতৈষণা বন্ধের একচেটিয়া সম্পত্তি বলিবেন। স্ত্র হ্যারি বলিয়াছেন, রাজনৈতিক হত্যা বন্ধের একচেটিয়া জিনিষ। স্যর হ্যারির উক্তি সর্বদেশে ও সর্বকালে প্রযোজ্য সত্য না হইলেও ভারতবর্ষে আপাততঃ তাহা বটে।

কলিকাতার মেয়র নির্বাচন

এ-বৎসর কলিকাতার মেয়র নির্বাচন যে সুশৃঙ্খলভাবে হইতে পারে নাই, ইহা দুঃখ ও লজ্জার বিষয়। যে-রূপে ইহা হইয়াছে তাহা নিয়মানুগতোর ও নিয়মানুগত প্রণালীতে কাজ করার পক্ষে বিপজ্জনক। অবিসংবাদিত নিয়ম অনুসারে নির্বাচনের ফলে যে-কেহ নির্বাচিত হউন, তাহাতে কিছু বলিবার থাকে না। কিন্তু স্বাভাৱিক ও স্বায়ত্তশাসনপ্রার্থী কোন দলের পক্ষে এমন কিছু করা আশ্চর্যাতী, যাহা স্বায়ত্তশাসক প্রতিষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিবার ছিদ্র গবর্নমেন্টকে দেয়, কিংবা যাহা হাইকোর্টে মোকদ্দমার কারণীকৃত হইতে পারে।

শেখপীরের জুলিয়স সীজর নাটকে জীবিত জুলিয়স সীজর বরাবর না থাকিলেও যেমন তাহার অশরীরী আশ্রয় প্রভাব অনুভূত হয়, তেমন বন্ধের দুই কংগ্রেস উপদলের একটির নেতা স্বর্গগত ও অন্যটির নেতা বিদেশ-প্রবাসী হইলেও দলাদলি মরিতেছে না, ইহা দুঃখের বিষয়।

শিক্ষায় আমেরিকার নিগ্রো ও ভারতবর্ষের “আর্য্য”।

আমেরিকার নিগ্রোদের আদি বাসস্থান আফ্রিকা, সেখানে তাহাদের বর্ণমালা বা সাহিত্য ছিল না। তাহারা ক্রীতদাস রূপে আমেরিকায় আনীত হয়। ১৮৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তাহারা দাসত্বমুক্ত হয়, এবং তখন হইতে তাহাদের শিক্ষালাভ ও তাহাদিগকে শিক্ষাদান আইন-সঙ্গত হয়—তাহার আগে উহা আইনবিরুদ্ধ ও দণ্ডনীয় কাজ ছিল।

১৮৬৫ সালের পর ৬৫ বৎসরে ১৯৩০ সালে দেখা গেল, অসভ্য, নিজেদের বর্ণমালাহীন, নিজেদের সাহিত্যহীন আমেরিকান নিগ্রোদের মধ্যে শতকরা ৮৩.৭ জন মোটামুটি ৮৪ জন, লিখনপঠনক্ষম হইয়াছে। অনেক হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের লোকদের বর্ণমালা আছে, সাহিত্য আছে, ব্রিটিশ শাসনের আগে লিখনপঠনক্ষমতা এখনকার চেয়ে বেশী লোকের ছিল। কিন্তু ১৯৩১ সালের সেন্সসে দেখা গিয়াছে, ভারতে শতকরা ৮ (আট) জন, বঙ্গে শতকরা ১১ (এগার) জন লিখনপঠনক্ষম। অর্থাৎ আমেরিকান নিগ্রোরা ভারতীয়দের চেয়ে শতকরা দশগুণেরও বেশী লিখনপঠনক্ষম।

বেকারদের সম্বন্ধে বড়লাটের মন্তব্য, এবং বঙ্গীয় ঔষধ

ভারতবর্ষের সমৃদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের একটি কনফারেন্স গত মার্চ মাসে দিল্লীতে হয়। তাহার কাজ আরম্ভ করিতে গিয়া বড়লাট যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে, বহু যুবক অনেক কষ্টস্বীকার ও পরিশ্রম করিয়া উচ্চ ডিগ্রী ও সম্মান লাভ সম্বন্ধে যে জীবিকানির্বাহের বা স্বদেশবাসীদের সেবার সুযোগ পান না, এজন্য দুঃখ প্রকাশ করেন, এবং বলেন :—

“Keen and unmerited disappointment, accentuated by irksome inactivity, are apt to lead high-spirited young men into dangerous and unexpected channels.”

তাৎপর্য। যে-রূপ আশাভঙ্গের তাহারা যোগ্য নহে সেইরূপ ভীত নৈরাশ্র বিরক্তিকর নিষ্ক্রিয়তার ফলে বৃদ্ধি পাইয়া অতিভেদস্বী যুবকদিগকে বিপজ্জনক ও অপ্রত্যাশিত পথের পথিক করিতে পারে।

অতি সত্য কথা।

এরূপ সম্ভাবনার বঙ্গে প্রযোজ্য প্রাথমিক ঔষধ হিজলী, বঙ্গা, দেওলা ইত্যাদি স্থানে বিনামূল্যে বিতরিত হয়।

পুলিসের মতে এই সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত হইলে, কিন্তু তখনও কোন নরহত্যা না-ঘটিয়া থাকিলেও, অব্যর্থ ঔষধের ব্যবস্থা বঙ্গীয় অতি-আধুনিক সংশোধিত ফৌজদারী আইনে আছে। উহা ফাঁসী।

টোরীদের দ্বারা ভারতীয় লোকমত নির্ণয়

বিলাতের রক্ষণশীল অর্থাৎ টোরী দলের দুইজন সভ্য, ভাইকোর্ট লাইমিংটন ও মেজর কোর্টল্ড্, ভারতীয়দের রাজনৈতিক মত সাক্ষাৎভাবে জানিবার জন্ত ভারতভ্রমণ করিতেছেন। ইতিমধ্যেই নেতৃস্থানীয় কাহাকেও কাহাকেও প্রশ্নাবলী দিয়া তাহার জবাব চাহিয়াছেন এবং কিছু জবাব পাইয়াছেন। প্রশ্নগুলি নীচে দিতেছি।

1. Do you approve of or do you condemn the White Paper scheme ?
2. Are the Hindus in British India really interested in the Federation between the Princes and British India, or are you indifferent to the Federal programme ?
3. What are the dangers in the Federal scheme which the Hindus visualize ?
4. If the Federal scheme is scrapped and only reforms in the British Indian Provinces are granted, will this meet with the approval of the Hindus ?
5. Would the Hindu community prefer the Simon recommendations on the assumption that those recommendations will not be based on the Prime Minister's Communal Award ?

এই প্রশ্নগুলি একটি একটি করিয়া বাংলায় দিয়া তাহার উপর কিছু টিপ্সনী যোগ করিয়া দিতেছি।

১। আপনি ষেত পত্রের প্রস্তাবাবলীর অনুমোদন করেন. না তাহা গৃহণের অযোগ্য বলিয়া তাহার নিন্দা করেন ?

এরূপ প্রশ্ন যে করা হইয়াছে, তাহাতেই বুঝা যায়, যে, ইংলণ্ডের লোকেরা ভারতের জনমত সম্বন্ধে কত অজ্ঞ, এবং যে অল্পসংখ্যক ইংরেজ হযুত তাহা জানে, তাহাদের অনেকে কি পরিমাণ অজ্ঞতার ভাণ করে।

মনুষ্যানামধেয় যে-যে ভারতীয় জীব বা জীবসমষ্টি সরকার বাহাদুরের অঙ্গুষ্ঠীত ও ভবিষ্যতে অধিকতর অঙ্গুগ্রহপ্রার্থী, এবং ধামাধরা ও ধামা ধরিতে আগ্রহান্বিত, তাহারা ছাড়া কেহই যে ষেত পত্রের অনুমোদন করে না, ইহা ভারতবর্ষে সুবিদিত। কোনও স্বাভাষিক (nationalist) ইহার অনুমোদন করে না, করিতে পারে না—তাহার ধর্ম ও জাতি যাহাই হউক। ইহার অনুমোদনকারী কোন ব্যক্তি স্বাভাষিক বলিয়া নিজের পরিচয় দিলে সে হয় ছদ্মবেশী, নয় বন্ধনাবিলাসী আত্মপ্রতারণক।

ষেত পত্রের ভিত্তি প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোআরা। ইহাতে হিন্দুদের উপর ঘোরতর অবিচার এবং ইউরোপীয় ও মুসলমানদের প্রতি অতি অন্যায় ও গর্হিত পক্ষপাতিত্ব দেখান হইয়াছে।

সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোআরা ছাড়িয়া দিলেও, ইহাতে ভারতীয়দিগকে যতটুকু ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে—যদি কিছু দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা নিতান্ত অসুখেই, এবং তাহার দ্বারা ভারতীয়দের অনন্তোব দুরীভূত হইবে না।

২। ব্রিটিশ ভারতবর্ষের হিন্দুরা কি দেশী রাজ্যের রাজাদের এক ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলির মধ্যে কেডারেশনে আগ্রহান্বিত? না, তৎসম্বন্ধে উদাসীন?

ভারতবর্ষের হিন্দুরা ও অল্প ভারতীয়েরা বস্তুতঃ দেশী রাজাদের সহিত কেডারেশনে আগ্রহান্বিত নহে। তাহারা চায় ব্রিটিশ ভারতের যত শীঘ্র সম্ভব দায়িত্বপূর্ণ স্বশাসন—তাহাকে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটস বা পূর্ণ স্বরাজ বা অল্প যে নামই দেওয়া হউক। যাহারা কেডারেশনে রাজী হইয়াছেন, তাঁহারাও এই কারণে রাজী হইয়াছেন, যে, ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট বলিয়াছেন যে তা ছাড়া কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্টকে ব্যবস্থাপক সভার কাছে দায়ী করা হইবে না। দেশী রাজারা কবে কি সর্বো কেডারেশনে রাজী হইবেন, তাহার জন্ত আমরা অপেক্ষা করিতে পারি না। তাঁহারা যত মাস বৎসর ইচ্ছা নিজেদের মন স্থির করিবার জন্ত সময় লউন। আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে স্বশাসন চাই। আর, বাস্তবিক, নৃপতি-পুত্রবদের ত নিজেদের মত অনুসারে কাজ করিবার স্বাধীনতা নাই। তাঁহাদিগকে ভারত-গবন্মেণ্টের রাজনৈতিক বিভাগের মত অনুসারে চলিতে হয়।

কেডার্যাল ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের রাজ্যের প্রতিনিধি রাজারাই মনোনীত করিবেন, তাঁহাদের প্রজারা নহে। রাজারা এই কাজ করিবেন তাঁহাদের প্রধান মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে। ইহা ভুলিলে চলিবে না, যে, একটি এংলো-মুসলিম সন্ধি বিদ্যমান আছে। যেমন উপরে আকাশ ও নীচে মাটির মধ্যে মিলনরেখা, অর্থাৎ চক্রবাল আছে, নিশ্চয়, অথচ তাহাকে কেহ ধরিতে চুইতে পারে না, তেমনি এংলো-মুসলিম সন্ধিও নিশ্চয় আছে—যদিও সে জিনিষটি ধরিতে চুইতে পারা যায় না। এই সন্ধি অনুসারে যেমন ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানরা তাহাদের সংখ্যা শিক্ষা ধনশালিতা প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষমতা ইংরাজদের নীচে পাইয়াছে ও পাইবে, তেমনি দেশীরাজ্যসকলের প্রধান মন্ত্রীর কাজও বড় বড় রাজ্যগুলিতে হয় ইংরেজ নয় মুসলমানকে দেওয়া হইতেছে। এই সব রাজ্যেরই প্রতিনিধির সংখ্যা বেশী হইবে, এবং তাহাদিগকে রাজাদের নামে মনোনীত করিবে এই ইংরেজ ও মুসলমান প্রধান মন্ত্রীরা।

যদি সব দেশী রাজ্যগুলিতে ব্রিটিশ ভারতের মত সামাজ্য আইনানুযায়ী শাসনও থাকিত, যদি রাজ্যগুলির প্রতিনিধির সংখ্যা প্রজাদের সংখ্যার অনুপাতে নির্দিষ্ট হইত, যদি প্রতিনিধিরা প্রজাদের দ্বারা নির্বাচিত হইত, এবং যদি রাজারা ইংলণ্ডের রাজার অধীনতার জন্ত ব্যাকুল না হইয়া সমগ্র-ভারতীয় কেডার্যাল গবন্মেণ্টকে কর্তৃপক্ষ বলিয়া মানিতে রাজী হইতেন, তাহা হইলে কেডারেশনের বিরোধী না হইয়া আমরা সে-সম্বন্ধে হয়ত কিছু আগ্রহান্বিত হইতাম। ষেত পত্রের বেক্স কেডারেশনের প্রস্তাব আছে, আমরা তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী।

রাজাদিগকে ও তাহাদের প্রতিনিধিদিগকে ফেডারেশনে আনা হইতেছে, ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতাদিগকে সম্পূর্ণ হীনবল করিবার জন্ত। হীনবল করা হইবে নানা উপায়ে। একটা উপায়, ইউরোপীয়দিগকে অত্যন্ত বেশী প্রতিনিধি দান, আর একটা উপায় দেশী রাজাদিগকে বেশী করিয়া প্রতিনিধি দান, তৃতীয় উপায় মুসলমানদিগকে বেশী প্রতিনিধি দান, এবং চতুর্থ উপায় হিন্দুদিগকে দ্বিগুণিত করিয়া ‘সবর্ণ’ হিন্দু ও ‘অবনত’ হিন্দুদিগকে আলাদা আলাদা প্রতিনিধি দান। এ ছাড়া আরও অনেক উপায় আছে। তাহার আলোচনা গত দু-তিন বৎসরের প্রবাসীতে অনেক বার করিয়াছি।

৩। ফেডারেশনের স্বীকৃতি বা পরিকল্পনা হিন্দুরা কি কি বিপদ দেখিতেছেন?

ইহা অনেক বার বলা হইয়াছে। ফেডার্যাল ব্যবস্থাপক সভার ব্রিটিশ-ভারতীয় অংশে থাকিবে ২৫০টি আসন। তাহার মাত্র ১০৫টি ‘অবনত’ হিন্দুসমেত সকল হিন্দুবা পাইবে। বাকী ১৪৫টির অধিকাংশ মুসলমান, ইংবেজ, ফিরিঙ্গী, দেশী খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতির পাইবে, যাহারা অল্পগৃহীত বলিয়া গবর্নমেন্টের অল্পগত। অর্থাৎ হিন্দুরা যদিও সংখ্যায় অল্প সকলের সমষ্টির বহুগুণ, তথাপি তাহাদিগকে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত করা হইবে। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া স্বতন্ত্রপন্থিতার সমগ্র ফেডার্যাল ব্যবস্থাপক সভায় রাজাদের প্রতিনিধিদিগকে রাজ্যগুলির লোকসংখ্যারূপে প্রাপ্য অপেক্ষা অনেক বেশী আসন দিতেছেন। তাহাতে হিন্দুদিগকে একেবারে নগণ্যে পরিণত করা হইবে। ইহার উপর হিন্দুদের আরও বিপদ ঘটাইবার প্রয়োজন আছে কি?

৪। যদি ফেডার্যাল পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়, এবং যদি ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলিতেই শাসনসংস্কার মঞ্জুর করা হয়, তাহা কি হিন্দুদের অনুমোদন পাইবে?

যাহাকে সরকারপক্ষীয় লোকেরা বলেন প্রভিন্সিয়াল অটনমি অর্থাৎ প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব, ইহা যদি সেই চীজ হয়, তাহা হইলে বলি, ইহাতে ভারতীয়েরা সন্তুষ্ট হইবে না। তাহারা কেন্দ্রীয় ভারত-গবর্নমেন্টেও ‘দারিদ্র্য’ চায়। অবশ্য নির্দিষ্ট দু-চার বৎসরের জন্ত যাহা ভারতবর্ষের হিতের জন্ত আবশ্যিক একরূপ কোন কোন বিষয় গবর্নমেন্টের হাতে রাখিতে থাকিতে পারে।

৫। হিন্দুরা কি সাইমন কমিশনের সুপারিশগুলি গৃহীত করিবে, যদি এই সর্ব করা যায় যে তাহা প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারা অনুযায়ী হইবে না?

সাইমন কমিশনের সুপারিশগুলি প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার চেয়ে ভাল বটে। কিন্তু তাহাতেও হিন্দুদের প্রতি সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করা হয় নাই। তাহা ছাড়িয়া দিলেও, হিন্দুরা ও অন্য স্বাধীন ভারতীয়েরা এমন একটি রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা চায়, যাহাতে কেন্দ্রীয় দারিদ্র্য থাকিবে, এবং যাহা

কয়েক বৎসরের মধ্যে আপনা আপনিই, অর্থাৎ ব্রিটিশ জাতির বা পালেমেন্টের পুনর্বিচার ব্যতিরেকে, ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বশাসনে, অস্তিত্ব: ডোমিনিয়নভে, উপনীত করিবে।

আমরা উপরে যে প্রশ্নাবলী দিলাম, দেখা যাইতেছে, যে, তাহা হিন্দুদের জন্ত। অন্য লোকদিগকে কিরূপ প্রশ্ন করা হইয়াছে জানি না। ভিন্ন ভিন্ন লোকসমষ্টিতে আলাদা আলাদা প্রশ্ন করা হইয়া থাকিলে, তাহার মধ্যেও ভেদনীতি বিদ্যমান মনে করা যাইতে পারে।

দেশী রাজাদিগকে ঋণদান

দেশী রাজারা বলেন, তাহাদের সম্পর্ক সাক্ষাৎভাবে ব্রিটিশ নৃপতির সহিত, তাহারা তাহাদেরই ভুক্ত। ভারত-গবর্নমেন্টের কাছে, অর্থাৎ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায়, তাহাদের স্বদেশী লোকদের সামান্য একটু ক্ষমতা আছে বলিয়া তাহারা ঐ সভায় তাহাদের রাজ্যের বা তাহাদের কোন কিছুর আলোচনা বরদাস্ত করিবেন না। কিন্তু ধার চাহিবার বেলা তাহারা ব্রিটিশ নৃপতির বা ব্রিটিশ পালেমেন্টের কাছে হাত পাতিতে পারেন না; হাত পাতেন ভারত-গবর্নমেন্টের কাছে এবং ভারত-গবর্নমেন্টকে ঋণের আবেদন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিতে হয়। ইহাতে মহামহিম রাজা মহাশয়দের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে না।

এরূপ ঋণ দেওয়া অত্যন্ত অস্বাভাবিক। ঋণ আদায় হইবে কিনা তাহার কোন স্থিরতা নাই। বাহাওজপুরের নবাবের কাছে পাওনা কয়েক কোটি টাকা খুব সম্ভব পাওয়া যাইবে না। তার পর, এই যে ঋণ দেওয়া হয়, ইহা উদ্ভূত টাকা হইতে নয়। ভারতীয় বজেটে ঘাটতি লাগিয়াই আছে। ঘাটতি পূরণের জন্য ব্রিটিশ ভারতের গরীব লোকদের উপর ট্যাক্স বসাইয়া টাকা আদায় করা হয়। এইরূপে সংগৃহীত টাকা হইতে বহু লক্ষ, কখন কখন বহু কোটি টাকা অমিতব্যয়ী স্বেচ্ছাচারী সেই সব রাজাকে দেওয়া হয়, যাহাদের প্রজাদের উপর ব্যবহার সম্বন্ধে ব্রিটিশ ভারতের ট্যাক্সদাতাদের কিছুই বলিবার অধিকার নাই।

নারীদের উপর অত্যাচার

১৯৩২-৩৩ সালের বাংলা দেশের যে সরকারী শাসনব্যবস্থা সম্প্রতি বাহির হইয়াছে, তাহাতে নারীদের উপর অত্যাচার-মূলক অপরাধ সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ আছে। তাহাতে বলা হইতেছে, যে, এইরূপ অপরাধ বাড়িয়া চলিতেছে, এই বেসরকারী ধারণাটা ঠিক নয়। শাসনব্যবস্থান্তে অপরাধের যে সংখ্যাগুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহার নিতুলতা পরীক্ষা করিবার উপায় নাই। কিন্তু সেগুলি নিতুল বলিয়া

ধরিয়া লইলেও, সরকারী রিপোর্টের উক্তি প্রমাণিত হয় না। রিপোর্টে প্রথমতঃ ১৯২৯-৩২ এই চারি বৎসরের অঙ্ক দেওয়া হইয়াছে। পুলিশের কাছে এই চারি বৎসরে যথাক্রমে ৭৭৮, ৬৯৭, ৭২৯, ও ৭৭২টি অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে উপস্থাপিত “সত্য” অভিযোগ ঐ চারি বৎসরে যথাক্রমে ১০২৯, ৬৮৪, ৭২০ এবং ৮২১। ঐ চারি বৎসরে অপরাধের জ্ঞান গ্রেপ্তার করা হয় যথাক্রমে ২০০৬, ১৩৮৯, ১৫৫২ ও ১৬৫৭। যদি ১৯২৯ সালের সংখ্যাগুলি বিবেচনা না করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, তাহার পর পর তিন বৎসর ক্রমাগত সংখ্যাগুলি বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং সরকারী রিপোর্টের সংখ্যাগুলিতে ত সর্বসাধারণের ধারণাই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে! অথচ গবর্নেন্ট বলিতেছেন, তাহা ঠিক নয়।

অতঃপর সরকারী রিপোর্টে বলা হইতেছে, ১৯২৬ হইতে ১৯৩১ পর্য্যন্ত ছয় বৎসরে অত্যাচারিতা হিন্দুনারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩২৪, ৩২৫, ৩০৪, ৩৬৭, ৩৬২, ও ৩৩৮; এবং অত্যাচারিত মুসলমান নারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৪৯৪, ৫৯২, ৬৫৭, ৫৩৮ এবং ৫৮২। অত্যাচারিতারা যে ধর্মাবলম্বিনীই হউন, অত্যাচারটা পাশবিক বা পৈশাচিক এবং তাহার দমন হওয়া চাই। সরকারী সংখ্যাগুলি ঠিক হইলে, মুসলমান কাগজওয়ালারা ও নেতারা যে বলিয়া থাকেন তাঁহাদের সমাজে চিরবৈধব্য আদি সামাজিক প্রথা না-থাকায় মুসলমান সমাজে নারীদের উপর এরূপ অত্যাচার হয় না, তাহা সত্য নহে। অথচ এ-পর্য্যন্ত নারীর উপর অত্যাচার দমনে মুসলমান সমাজের কোন উৎসাহ দেখা যায় নাই।

সরকারী রিপোর্টে দেখান হইয়াছে, যে, ঐ ছয় বৎসরে মুসলমান দ্বারা অত্যাচারিতা হিন্দু নারীদের সংখ্যা যথাক্রমে ১১৪, ১২২, ১০৫, ১১৪, ১০৯ ও ১২৫, এবং হিন্দুদ্বারা অত্যাচারিতা হিন্দু নারীর সংখ্যা ২০৫, ২০১, ১৯৮, ২৩১, ২৩৪ ও ১৯৪। কিন্তু রিপোর্টে ইহাও দেখান উচিত ছিল, যে, মুসলমানদের দ্বারা অত্যাচারিতা মুসলমান নারী ঐ ছয় বৎসরে কত, এবং হিন্দুদের দ্বারা অত্যাচারিতা মুসলমান নারীই বা কত। তাহা হইলে বুঝা হইত, মুসলমান বদমায়েসরা কত নারীর উপর অত্যাচার করিয়াছে, এবং

হিন্দু বদমায়েসরাই বা কত নারীর উপর অত্যাচার করিয়াছে। আমরা সব বদমায়েসের শাস্তি ও সংশোধন চাই, এবং সর্বধর্মের নারীর রক্ষা চাই। কিন্তু গবর্নেন্ট যদি দেখাইতে চান কোন্ সম্প্রদায়ে বদমায়েস বেশী আছে, তাহা হইলে সরকারী রিপোর্টে লেখা উচিত ছিল, মুসলমানরা মোট হিন্দু-মুসলমান কত নারীর উপর অত্যাচার করিয়াছে এবং হিন্দুরা মোট কত হিন্দু-মুসলমান নারীর উপর অত্যাচার করিয়াছে। ছয় বৎসরে হিন্দুরা কত মুসলমান নারীর উপর অত্যাচার করিয়াছে এবং মুসলমানরা কত মুসলমান নারীর উপর অত্যাচার করিয়াছে, এই দুই প্রস্ত সংখ্যা রিপোর্টলেখক গোপন রাখায় তাঁহার উদ্দেশ্য সন্দেহ নানাবিধ অনুমান হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য, রিপোর্টে বলা হইতেছে, যে, রিপোর্ট-প্রদত্ত সংখ্যাগুলি হইতে সিদ্ধান্ত করা যায়, যে, এই প্রকার অপরাধ দমনের জ্ঞান বিশেষ কোন আইন প্রণয়ন বা বিশেষ কোন উপায় অবলম্বন করা অনাবশ্যক। আশ্চর্য্য সিদ্ধান্ত! এরূপ পাশব ও পৈশাচিক অপরাধ বাড়ুক বা না-বাড়ুক, যাহা আছে, তাহারই ত বর্তমান আইন দ্বারা ও বর্তমান পুলিশকার্য্যপ্রণালী দ্বারা দমন হইতেছে না। সেই জ্ঞানই আইনের ও কাৰ্য্যপ্রণালীর পরিবর্তন ও উন্নতি আবশ্যক।

সর্বজাতীয় মানবিকতা

সেদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক ক্লাব প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলায় একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। যাহাকে ইংরেজীতে ইন্টার-ন্যাশনালিজম ও ইন্টারন্যাশনাল কালচার বলে, তিনি সেই বিশ্বমানবীয় সংস্কৃতি ও একপ্রাণতা বিষয়ে কিছু বলেন। তাঁহার বক্তৃতাটির ভাল বাংলা বা ইংরেজী রিপোর্ট বাহির হয় নাই। তবে, শ্রোতারা আশা করি ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে, তিনি, এই বাংলা দেশেই যে এক শত বৎসর পূর্বে রামমোহন রায়ের দ্বারা বিশ্বমানবিকতার আদর্শের প্রতিষ্ঠার আশ্রয় চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা অস্বাভাবিক মনে করেন নাই, পরিহাস উপহাসের বিষয় মনে করেন নাই, বরং গৌরবের বিষয়ই মনে করিয়াছিলেন।

বেকারদের জন্য বিলাতী ব্যয়

আমাদের দেশে কর্তৃপক্ষ বেকারসমস্যা বিষয়ে বক্তৃতা করেন, তাও খুব বেশী বার নয়. এবং বড়লাট পর্যন্ত, “মহাতেজা” (“high-spirited”) যুবকেরা বেকার থাকায় বিপজ্জনক বিপথে যায়, তাহার জন্ত দুঃখও করিয়াছেন। কিন্তু কার্যতঃ এই অবস্থার প্রতিকারের জন্ত প্রধানতঃ শান্তিরই ব্যবস্থা হইয়াছে। বিলাতী ব্যবস্থা অন্য প্রকার। ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ সম্প্রতি একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন, যে, ১৯২০ সাল হইতে এ-পর্যন্ত অলস বেকারদিগকে ভিক্ষা দিবার নিমিত্ত ব্রিটেন ১১০,০০,০০,০০০ এক শত দশ কোটি পাউণ্ড খরচ করিয়াছে। তাহা মোটামুটি ১৪৬৭ (চৌদ্দ শত সাতষটি) কোটি টাকার সমান। তিনি মনে করেন, এই টাকাটা ভিক্ষা দেওয়ায় বেকারদের কেবল নৈতিক অবনতি হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যয় না করিলে খুব অসম্ভব হইত, হয়ত বিপ্লব ঘটিত। তিনি মনে করেন, কোন জনহিতকর সার্বজনিক পুস্ত বা অন্য কাজে ইহা ব্যয় করিয়া সেই কাজে বেকারদিগকে লাগাইয়া দিলে সফল হইত। তাহা সত্য কথা।

ভারতবর্ষে কিন্তু এরূপ কোনপ্রকার ব্যবস্থাই হয় নাই, যদিও এদেশে বেকারের সংখ্যা ব্রিটেনের চেয়ে ঢের বেশী।

আমাদের ক্ষমতা থাকিলে আমরা কয়েক কোটি টাকা সরকারী ঋণ করিয়া তাহার সুদ হইতে বঙ্গের সর্বত্র বিদ্যালয় চালাইতাম এবং তাহাতে সমুদয় বেকার যোগ্য শিক্ষিত যুবককে

শিক্ষক নিযুক্ত করিতাম। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সামান্ত এক-একটা অভিযানের জন্ত ২০।২৫।৩০ কোটি ঋণ বাড়িয়া যায়। তাহা শোধও হয়। শিক্ষার জন্ত ঋণ তাহার চেয়ে কম হইত এবং তাহা শোধও হইত। কিন্তু শিক্ষাকে সরকার অবশ্য-প্রয়োজনীয় মনে করেন না।

চাটার্জি মুখার্জি বানার্জি

বাংলা দেশে কে যে প্রথমে ইংরেজীতে চাটার্জি মুখার্জি বানার্জি ইত্যাদি পদবী লিখিতে আরম্ভ করেন, জানি না। তাঁহার প্রতি একটুও কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতেছি না। আমি নিজেও কুকণে ছেলেবেলা ইংরেজীতে চ্যাটেজি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহা এখনও চালাইতে হইতেছে। কিন্তু তা বালয়া বাংলায় চাটার্জি মুখার্জি ইত্যাদি অসহ্য। চাটুজ্যে, মুখুজ্যে, প্রভৃতি কি দোষ করিল? এগুলি লিখিতে বেশী জায়গা লাগে না, বেশী অক্ষরও লাগে না।

বাংলা বক্তৃতায় ও খবরের কাগজে আর এক উপদ্রব দেখিতে পাই। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীর ‘মালব্য’ নহেন। তিনি নিজেও লেখেন মালবীর। অথচ বাঙালীরা তাঁহাকে ‘মালব্য’ না করিয়া ছাড়িবেন না। গোথলেকে গোথেল, নটরাজনকে নটরজন, নটেশনকে নেটসন, রামনকে রমণ অনেকেই করেন। নামগুলির প্রতি তাঁহাদের একটু দয়া থাকা আবশ্যিক।



সমুদ্র-শাসন
শ্রীশরদিন্দু সেনবাহু

প্রবাসী, প্রদ, কলিকাতা

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

“নামমাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”

৩৪শ ভাগ

১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

২য় সংখ্যা

প্রাণের ডাক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এখনো কি ক্লান্তি ঘোচে নাই,
ওঠো তবু ওঠো,
দুখা হোক তবুও দুখাই
পথপানে ছোটো ।
স্বপ্ন যত ঘিরেছিল রাতে
অবসন্ন তারাদের সাথে
মিলাল আলোকে অবগাহি ।
আয়ুঃক্ষীণ নিঃস্ব দীপগুলি
নিশীথের স্মৃতি গেছে ভুলি,
অন্ধ অঁাখি শূন্যে আছে চাহি ।

সুদূর আকাশে ওড়ে চিল,
উড়ে ফেরে কাক,
বারে বারে ভোরের কোকিল
ঘন দেয় ডাক ।
জলাশয় কোন্ গ্রামপারে,
বক উড়ে যায় তারি ধারে,
ডাকাডাকি করে শালিখেরা ।
প্রয়োজন থাক্ নাই থাক্
যে যাহারে খুশি দেয় ডাক
যেথা সেথা করে চলাফেরা ।

উছল প্রাণের চঞ্চলতা
 আপনারে নিয়ে ।
 অস্তিত্বের আনন্দ ও ব্যথা
 উঠিছে ফেনিয়ে
 জোয়ার লেগেছে জাগরণে,
 কলোল্লাস তাই অকারণে,
 মুখরতা তাই দিকে দিকে ।
 ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায়
 কী মদিরা গোপনে মাতায়,
 অধীরা করেছে ধরণীকে ।

নিভতে পৃথক কোরো নাকো
 তুমি আপনারে,
 ভাবনার বেড়া বেঁধে রাখো
 কেন চারিধারে ?
 প্রাণের উল্লাস অহেতুক
 রক্তে তব হোক না উৎসুক,
 খুলে রাখো অনিমেষ চোখ,
 ফেলো জাল চারিদিক ঘিরে
 যাহা পাও টেনে লও তীরে,
 বিমুক শামুক যাই হোক ।

হয় তো বা কোনো কাজ নাই
 ওঠো তব ওঠো,
 বথা হোক তবুও বথাই
 পথপানে ছোটো ।
 মাটির হৃদয়খানি ব্যোপে
 প্রাণের কাঁপন ওঠে কেঁপে,
 কেবল পরশ তার লহ,
 আজি এই চৈত্রের প্রভাতে
 আছ তুমি সকলের সাথে
 এ কথাটি মনে প্রাণে কহ ॥

চতুষ্কোটি

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

বুদ্ধ ধর্মে প্রধানত দুইটি মধ্যম পথের কথা দেখা যায়। নীর্বাণলাভের জন্য যে, অষ্ট-অঙ্গযুক্ত পথের ('আষ্টাঙ্গিক মার্গ') কথা বলা হইয়াছে, ইহা প্রথম মধ্যম পথ; কারণ এক দিকে বিষয়সম্ভোগে অত্যন্ত আসক্তি, এই এক অস্ত বা কোটি; আর অন্য দিকে শরীরকে নিতান্ত ক্লেশ দিয়া তপস্যা করা, এই অপর অস্ত বা কোটি; এই উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া ইহাদের মধ্য অবলম্বন করিয়া ঐ পথের নির্দেশ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় মধ্যম পথে পরস্পরবিরুদ্ধ কতকগুলি মত পরিহার করিয়া তাহাদের মধ্য অবলম্বন করিয়া চলিবার কথা আছে। ঐ পরস্পরবিরুদ্ধ মতগুলি এইরূপ:—অস্তি, নাস্তি; নিত্য, অনিত্য; সুখ, দুঃখ; আত্মা, অনাত্মা; শূন্য, অশূন্য; ইত্যাদি।

এই দ্বিতীয় মধ্যম পথের সম্বন্ধে নাগার্জুন নিজের মূলমধ্যমককারিকা (১৫.৭) বলিয়াছেন:—

“কাত্যায়নাববাদেচ অস্তি নাস্তীতি চোভয়ম্ ।
প্রতিষিদ্ধং ভগবতা ভাবাত্তাবিভাবিনা ॥”

“যিনি ভাব ও অভাব উভয়কেই ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছেন সেই ভগবান্ কা ত্যা য না ব বা দ (সূ ত্রে) 'আছে' ও 'নাই' এই উভয়কেই নিষেধ করিয়াছেন।”

নাগার্জুনের এই কথার মূল কাশ্যপ পরিবর্তে (Stail Halstein-সংস্কৃত, §৬০. দ্রষ্টব্য §§৫২-৫৩) এইরূপ দেখা যায়:—

“অস্তীতি কাশ্যপ অয়মেকোহস্তঃ, নাস্তীত্যয়ঃ দ্বিতীয়োহস্তঃ । যদনয়ো-
হায়োরস্তয়োমধ্যম ইয়মুচ্যতে কাশ্যপ মধ্যমা প্রতিপদ ভূতপ্রত্যবেক্ষা ।”

“হে কাশ্যপ, 'আছে' এই এক অস্ত, আর 'নাই' এই দ্বিতীয় অস্ত। যাহা এই উভয় অস্তের মধ্য, তাহাকেই মধ্যম পথ বলা হয়, ইহা দ্বারা পরমার্থের প্রত্যবেক্ষণ হয়।”

এই কথাটি পালিতেও (সং যুক্তি নি কা য়, PTS, ২. ১৭) পাওয়া যায়:—

“সকং অখীতি খোকচ্চায়ন একো অস্তো, সকং নখীতি অয়ং
দ্বিতীয়ো অস্তো । এতে তে কচ্চায়ন উভো অস্তে অনুপগম্য মাঝামেন
তথাগতো ধম্মং দেসেতি ।”

“হে কা ত্যা য ন, 'সমস্ত আছে' এই এক অস্ত, 'সমস্ত নাই'

এই দ্বিতীয় অস্ত। হে কা ত্যা য ন, এই উভয় অস্তেই গমন না করিয়া তথাগত মধ্য দ্বারা ধর্ম দেশনা করেন।”

নাগার্জুন যে মত প্রচার করিয়াছেন তাহা এই দ্বিতীয় মধ্যম পথে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাহার নাম হইয়াছে মধ্যমক; এবং এই মত অনুসরণ করিয়া চলেন বলিয়া তাহার অনুগামিগণ মাধ্যমিক।

মাধবাচার্য নিজের সর্বদর্শন সংগ্রহে লিখিয়াছেন যে, নাগার্জুনের অনুগামিবর্গের প্রজ্ঞা মধ্যম রকমের ছিল বলিয়া তাহাদের নাম হইয়াছে মাধ্যমিক। বলাই বাহুল্য, এ ব্যাখ্যা নিতান্ত কল্পিত।

নাগার্জুন পূর্বোক্ত এই দুইটি অস্তের সম্বন্ধে বলিয়াছেন (মূল মধ্যমককারিকা, ৫. ৮):—

“অস্তিৎ যে তু পশ্বস্তি নাস্তিৎ চান্নবুদ্ধয়ঃ ।

ভাবানাং তে ন পশ্বস্তি দ্রষ্টব্যোপশমং শিবম্ ॥”

‘যাহারা বস্তুসমূহের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব দর্শন করে, তাহাদের বুদ্ধি অল্প, তাহারা বস্তুসমূহের দর্শনীয় যে উপশম (নিবৃত্তি), যাহা শিব, তাহা দর্শন করিতে পারে না।’

জ্ঞানসারসমুচ্চয় নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক আছে। ইহার মূল সংস্কৃত এখনও পাওয়া যায় নাই। তিব্বতী ভাষায় ইহার একখানি অনুবাদ আছে (তঞ্জুর, মদো, চ. ; Cordier, III. p. 267)। ইহাতে তাহার নাম যে. যে. স্. স্. ঐণ্ড্. পো. কু. ন্. ল. স্. বৃ. তু. স্. প। ইহা আর্ধ্যদেবের রচনা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহার ২৮শ শ্লোকটি বহু বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্লোকটি এই:—

“ন সন্ নাসন্ ন সদসন্ ন চাপ্যনুভয়ান্নকম্ ।

চতুষ্কোটিবিন্মুক্তং ওঙ্কং মাধ্যমিকা বিদ্বঃ ॥”

‘মাধ্যমিকেরা জানেন যে, তত্ত্ব হইতেছে চতুষ্কোটি-বর্জিত, সেই চারিটি কোটি এই—(১) সৎ নহে, (২) অসৎ নহে, (৩) সৎ ও অসৎ এই উভয় নহে, এবং (৪) সৎ নহে ও অসৎ নহে এই উভয়ও নহে।’^১

১। এখানে মা তু ক্য কারিকা (৪.৮৩) নিম্নলিখিত পঙক্তিটি তুলনীয়—

“অস্তি নাস্তিনাস্তীতি নাস্তি নাস্তীতি বা পুনঃ ।”

দুই দিকে দুই অস্ত বা কোটি থাকায় উহাদের মধ্যবর্তীকে মধ্যম অথবা মধ্যমক বলা হইয়া থাকে, কিন্তু উল্লিখিত কারিকায় আমরা দুইটির স্থানে চারিটি কোটির কথা দেখিতে পাইতেছি। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রথমত দুইটি কোটি ছিল, পরে তাহাতে আর দুইটি যোগ করা হইয়াছে।

অস্তি ও নাস্তি, অথবা সৎ ও অসৎ, এই শব্দযুগল পরম্পর-বিরুদ্ধ ভাবে প্রকাশ করে। এই উভয়কেই অস্বীকার করার প্রথম উল্লেখ আমরা ঋগ্বেদে র অস্তর্গত না স দা সী য় শ্লোকে (১০. ১২২. ১) দেখিতে পাই :—

“নাসদাসীন্ ন সদাসীং তদানীম্ ।”

‘তখন সৎ ছিল না, অসৎ ছিল না।’^২

ক্রমশ এই ভাব উপনিষদে দেখা গেল। শ্বেতাশ্বতরে (৪. ১৮) উক্ত হইয়াছে :—

“ন সন্ ন চাসন্নিব এষ কেবলঃ ।”

‘সৎ নহে, অসৎও নহে, কেবল শিব।’^৩

নিম্নলিখিত পঙ্ক্তিটি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়া (১৩.১২) রহিয়াছে :—

“ন সৎ তন্ নাসদৃচ্যত ।”

‘তাহাকে সৎ বলা যায় না, অসৎ বলা যায় না।’

বৌদ্ধ ধর্মের মূল শাস্ত্রসমূহে আমরা দুইটিমাত্র অস্তের কথা দেখিতে পাই। সমাধিরাজশ্লোকে (কলিকাতা, পৃ. ৩০)^৪

“অস্তীতি নাস্তীতি উভোহপি অস্তা

শুক্লী অশুক্লীতি ইমেপি অস্তা ।

তস্মা উভে অস্ত বিবর্জয়িত্বা

মধ্যেহপি স্থানং ন করোতি পণ্ডিতঃ ॥”

‘অস্তি ও নাস্তি এই উভয়ই অস্ত; শুদ্ধি ও অশুদ্ধি

এই উভয়ও অস্ত। অতএব পণ্ডিত জন উভয় অস্ত বর্জন করিয়া (তাহাদের) মধ্যেও অবস্থান করেন না।

“অস্তীতি নাস্তীতি বিবাদ এষ

শুক্লী অশুক্লীতি অয়ং বিবাদঃ ।

বিবাদপ্রাপ্ত্যা ন দুঃখং প্রশাম্যতে

অবিবাদপ্রাপ্ত্যা চ দুঃখং নিরুধ্যতে ॥”

‘অস্তি ও নাস্তি ইহা বিবাদ; শুদ্ধি ও অশুদ্ধি ইহাও বিবাদ; বিবাদে গেলে দুঃখ প্রশান্ত হয় না, অবিবাদে না গেলেই দুঃখ নিরুদ্ধ হইয়া থাকে।’

এখানে একটা কথা লক্ষ্য করিবার আছে। এই উদ্ধৃত শ্লোক দুইটির প্রথমটিতে বলা হইয়াছে যে, পণ্ডিতেরা উভয় অস্তের যে মধ্য, তাহাতেও অবস্থান করেন না। ইহাতে বুঝা যায়, উভয়ের মধ্য একটি অস্ত নহে। কিন্তু, মনে হয়, যোগাচার সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য্য মৈত্রেয় নাথ ঐ মধ্যকেও অস্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ তিনি নিজের একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থের নাম রাখিয়াছেন মধ্যাস্ত বিভঙ্গশ্লোকে।^৫ এখানে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যিক যে, মাধ্যমিকদের দ্বারা যোগাচার সম্প্রদায়ও মধ্যম পথ অবলম্বন করিয়া চলেন, যদিও ইহার মাধ্যমিক নামে পরিচিত নহেন।^৬

বস্তুর দুইটি অস্ত প্রসিদ্ধ, কিন্তু ক্রমশ আরও একটি অস্তের আলোচনা আরম্ভ হইল। আমরা মহোপনিষদে (পৃ. ৩৭২)^৭ দেখিতে পাই :—

“ন সন্ নাসন্ ন সদসন্ ।”

‘সৎ নহে, অসৎ নহে, সৎ ও অসৎ এই উভয়ও নহে।’

পরত্র স্কোপনিষদে (পৃ. ৪৫৭)^৮ আছে :—

“ন সন্ নাসন্ ন সদসদ্

ভিন্নাভিন্নং ন চোভয়ম্ ॥”

৫। ইহার চীনা ও তিব্বতী অনুবাদ আছে। কিন্তু মূল সংস্কৃত এখনও পাওয়া যায় নাই। বসু বঙ্কু ইহার একখানি ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, ইহারও মূল সংস্কৃত পাওয়া যায় নাই, তবে তিব্বতী অনুবাদ আছে। স্থিরমতি আবার এই ভাষ্যের একখানি টীকা লিখিয়াছেন। এই টীকারও তিব্বতী অনুবাদ আছে। ইহার মূল সংস্কৃতের একখানি মাত্র পুঁথি নেপালের রাজপুত্র শ্রী হেমরাজজীর নিকটে আছে। ইহা নানাস্থানে খণ্ডিত। ইহারই প্রতিলিপি লইয়া মূল, ভাষ্য ও টীকার তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে রোমক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জি. তুচ্চি ও বর্তমান লেখক টীকাখানির প্রথম অধ্যায় সংস্করণ করিয়াছেন (Calcutta Oriental Series)। ইহাতে মূল মধ্যাস্ত বিভাগেরও পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

৬। ঋগ্বেদ মধ্যমক বৃষ্টি, পৃ. ২৭৪।

৭। ঋগ্বেদ টিপ্পনী ৩।

২। সেই স্থানেই (২) তুলনীয় :—

“ন সূত্বারাসীদসূতং ন তর্হি ।”

‘তখন সূত্বা ছিল না, অসূত্ব (অমরণ) ছিল না।’

৩। অষ্টাশীত্বান্তরশতোপনিষৎ (ত্রিপাদবিভূতি-মহা নায়ায় শোপনিষৎ), নির্ণয় সাগর, ১৯১৭, পৃ. ৩০৮ :—

“দ্বমেব সদসখিলক্ষণঃ ।”

‘তুমিই সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন।’

৪। মূল মধ্যমক বৃষ্টির (চন্দ্রকীর্তি-রচিত প্রসঙ্গপদ্যর, Bibliotheca Buddhica) ১৩০ তম পৃষ্ঠায় এই শ্লোক দুইটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

‘সং নহে, অসং নহে, সং ও অসং এই উভয়ও নহে; ভিন্ন নহে, অভিন্ন নহে, ভিন্ন ও অভিন্ন এই উভয়ও নহে।’

বৌদ্ধশাস্ত্রেও এই তিন অঙ্ক বা কোটির আলোচনা দেখা যায়। সঙ্ঘর্ষ পুণ্ডরীকে (২.৬৫, পৃ. ৪৮) আছে :—

“বিলগ্ন দৃষ্টিগহনেষু নিত্যম্
অস্ত্যতি নাস্ত্যতি তথাস্তি নাস্তি।”

‘অস্তি, নাস্তি, ও অস্তি-নাস্তি এইমত রূপ গহনে বিলগ্ন।’

লঙ্কা বতারে (ত্রাঞ্জি ও, ১২২৩, পৃ. ১৫৬) দেখা যায় :—

“অসন্ ন জায়তে লোকে। ন সন্ ন সদসন্ কচিৎ।
প্রত্যয়েঃ কারণৈশ্চাপি যথা ঝালৈবিকল্পাতে ॥
ন সন্ নাসন্ ন সদসন্ যদা লোকং প্রপশ্যতি।
তদা বাবর্ততে চিত্তং নৈরাশ্রাং চাধিগচ্ছতি।”

‘বালকেরা যেমন কল্পনা করে, বস্তুত সেইরূপ মূল কারণ ও সহকারী কারণে সং-স্বরূপ, অসং-স্বরূপ, বা সদসং-স্বরূপ (এই) লোক উৎপন্ন হয় না। কেহ যখন (এই) লোককে দেখে যে, ইহা সং নহে, অসং নহে, এবং সদসং নহে, তখন তাহার চিত্ত নিবৃত্ত হয়, সে নৈরাশ্রা অধিগত হয়।’

নিম্নলিখিত কারিকাটি নাগার্জুনের, ইহা তাঁহার লোকাভিত্তিক্তবে (১৩).ও অচিন্ত্যস্তবে (২) আছে :—

“ন সন্সংপদ্যতে ভাবো নাপ্যসন্ সদসন্স চ।
ন স্বতো নাপি পরতো ন স্বাভ্যাং জায়তে কথন্ ॥” ৮

‘সং বস্তু উৎপন্ন হয় না, অসংও উৎপন্ন হয় না, সদসংও উৎপন্ন হয় না। আবার বস্তু নিজ হইতে উৎপন্ন হয় না, অণু হইতেও হয় না, এবং ইহাদের দুইটি হইতেও হয় না। অতএব কিরূপে ইহা উৎপন্ন হয় ?

আর্য দেব এক স্থানে (চতুঃ শতক, ১৬. ২৫) বলিয়াছেন :—

“সদসং সদসচ্চাপি যস্য পক্ষো ন বিদ্যতে।
উপালম্বশ্চিরেণাপি তস্য কর্ত্বুঃ ন শক্যতে ॥”

‘যাঁহার নিকটে সং, অসং, ও সং-অসং বলিয়া কোনো

পক্ষ নাই, দীর্ঘকালেও তাহার তিরস্কার করিতে পারা যায় না।’

পূর্বে যাহা বলা হইল তাহা দ্বারা ইহা মনে করিতে পারা যায় না যে, লঙ্কা বতার, নাগার্জুন, বা আর্য দেবের সময়ে চতুষ্কোটি বা চারিটি অঙ্কের আলোচনা আরম্ভ হয় নাই, কারণ উল্লিখিত গ্রন্থ কল্পখানির প্রত্যেকটিতেই তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। লঙ্কা বতারে (পৃ. ১২২, ১৫২) চতুষ্কোটিকা শব্দটিরই বহুবার প্রয়োগ আছে, উহার অর্থ চতুষ্কোটি-বিষয়ক পদ্ধতি। মূলমধ্যমকারিকা, ২২. ১১, ও চতুঃ শতক, ৮. ২০, ১৪. ২১ দ্রষ্টব্য।

এইরূপে বুঝা যাইবে যে, যদিও এই সময়ে ত্রিকোটি ও চতুষ্কোটির চিন্তা উৎপন্ন হইয়াছিল, এবং প্রয়োজনানুসারে যে-কোনোটি প্রয়োগ করা হইত, তথাপি সাধারণত দ্বিকোটিরই প্রথম স্থান ছিল।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, প্রথমত দ্বিকোটির চিন্তা বেদে পাওয়া যায়। বৃহদেব ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। চতুষ্কোটির প্রথম প্রবর্তক তিনি বা তাঁহার সাক্ষাৎ অনুগামিগণ নহেন। সামঞ্জস্য ফলসূত্র (দীর্ঘনিকায়া, ২.৩২) অধ্যয়ন করিলে বুঝা যায় যে, বৌদ্ধগণের মতে ছয় ‘বিধর্মী’ আচার্যের মধ্যে অন্যতম বেলটুঠিপুত্র সঞ্জয় কেই প্রথমে এই মত প্রচার করিতে দেখা যায়। ইহার মতের দ্বারা জৈন ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ই বিশেষরূপে প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

জৈনগণের স্যা দ্বাদ অথবা সপ্তভঙ্গীনয় প্রথমত ‘অস্তি’ ও ‘নাস্তি’ এই দুইটি মাত্র ভঙ্গী অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছিল, পরবর্তী আর পাঁচটি ভঙ্গী পরে যোজিত হইয়াছে, ইহাই মনে হয়। এই দুই কোটির সম্বন্ধে এখানে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, জৈন ধর্মে বা দর্শনে ইহা বিধিরূপে (affirmation), কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মে বা দর্শনে তাহা নিষেধরূপে (negation) গৃহীত হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে ইহাই ভেদ।

দৃষ্টি-প্রদীপ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জ্যাঠামশাইদের বাড়ির শালগ্রামশিলার ওপর আমার ভক্তি ছিল না। ওঁদের জাঁকজমক ও পূজার সময়কার আড়ম্বরের ঘটা দেখে মন আরও বিরূপ হয়ে উঠল। আগেই বলেছি আমার মনে হ'ত ওঁদের এই পূজা-অর্চনার ঘটার মূলে রয়েছে বৈষয়িক উন্নতির জন্তে ঠাকুরের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখান ও ভবিষ্যতে যাতে আরও টাকাকড়ি বাড়ে সে-উদ্দেশ্যে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানান। তাঁকে প্রসন্ন রাখলেই এদের আয় বাড়বে, দেশের খাতির বাড়বে—আমার জ্যাঠাইমাকে সবাই বলবে ভাল, সংসারের লক্ষ্মী, ভাগ্যবতী—তাঁর পয়েতে এ-সব হচ্ছে, সবাই খোশামোদ করবে, মন জুগিয়ে চলবে। পাশা-পাশি অম্মনি আমার মায়ের ছবি মনে আসে। মা কোন্ গুণে জ্যাঠাইমার চেয়ে কম? মাকে চা-বাগানে দেখেছি কল্যাণী মৃত্তিতে—লোকজনকে খাওয়ানো-মাখানো, কুলীদের ছেলে-মেয়েদের পুঁতির মালা কিনে দেওয়া, আদরযত্ন করা, আমাদের একটু অস্থখে রাত বেগে বিছানায় বসে থাকা। কাছাকাছি কোনো চা-বাগানের বাঙালীবাবু সোনাদায় নেমে যখন বাগানে যেত, আমাদের বাসায় না-খেয়ে যাবার উপায় ছিল না। আর সেই মা এখানে এদের সংসারে দাসী, পরণে ছেঁড়া ময়লা কাপড়, কাজ পারলে স্বখ্যাতি নেই, না পারলে বকুনি আছে, গালাগাল আছে—সবাই হেনস্থা করে, কারও কাছে এতটুকু মান নেই, মাথা তুলে বেড়াবার মুখ নেই। কেন, ঠাকুরকে ঘৃণা দিতে পারেন না বলে? আমার মনে হ'ত জ্যাঠাই-মাদের শালগ্রামশিলা এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন, তিনি ঘোড়শোপচারে পূজা পেয়ে জ্যাঠাইমাকে বড় ক'রে দিয়েছেন, অল্প সকলের ওপর জ্যাঠাইমা যে অত্যাচার অবিচার করছেন, তা চেয়েও দেখছেন না ঠাকুর।

এক দিন সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর ঘরে আরতি শুরু হয়েছে; নরু, সীতা, সেজকাবার ছেলে পুলিন আর আমি দেখতে গেছি।

পুরুতঠাকুর ওঁদের সবারই হাতে একটা ক'রে রূপোবাধানো চামর দিলে—আরতির সময় তারা চামর তুলুতে লাগল। আমার ও সীতার হাতে দিলে না। সীতা চাইতে গেল, তাও দিলে না। একটু পরে ধূপ ধূনোর ধোঁয়ায় ও স্নগন্ধে দালান ভরে গিয়েছে, বুলু ও কেশী কঁাসর বাজাচ্ছে, পুরুত-ঠাকুরের ছোট ভাই রাম ঘড়ি পিটচে পুরুতঠাকুর তন্নয় হয়ে পঞ্চপ্রদীপে ঘিয়ের বাতি জ্বলে আরতি করচে—আমি ও সীতা ছিটের দোলাইমোড়া ঠাকুরের আসনের দিকে চেয়ে আছি—এমন সময় আমার মনে হ'ল এ-দালানে শুধু আমরা এই ক'জন উপস্থিত নেই, আরও অনেক লোক উপস্থিত আছে, তাদের দেখা যাচ্ছে না, তারা সবাই অদৃশ্য। আমার গা ঘুরতে লাগল, আর কানের পেছনে মাথার মধ্যে একটা জায়গায় যেন কতকগুলো পিপড়ে বাসা ভেঙে বেরিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে গেল। আমি জানি, এ আমার চেনা, জানা, বহুপরিচিত লক্ষণ, অদৃশ্য 'কিছু দেখবার আগেকার অবস্থা—চা-বাগানে এ-রকম কতবার হয়েছে। শরীরের মধ্যে কেমন একটা অস্থিতি হয়—সে ঠিক বলে বোঝানো যায় না, জ্বর আসবার আগে যেমন লোকে বুঝতে পারে এইবার জ্বর আসবে, এও ঠিক তেমনি। আমি সীতাকে কি বলতে গেলাম, পিছু হঠে গিয়ে দালানের থাম ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম, গা বমি-বমি ক'রে উঠলে লোকে যেমন সে ভাবটা কাটাবার চেষ্টা করে, আমিও সেই রকম স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবার জন্তে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলাম—কিছুতেই কিছু হ'ল না, ধীরে ধীরে পূজার দালানের তিন ধারের দেওয়াল আমার সামনে থেকে অনেক দূরে...অনেক দূরে সরে যেতে লাগল...কঁাসর ঘড়ির আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে এল...কতকগুলো বেগুনী ও রাঙা রঙের আলোর চাকা যেন একটা আর একটার পিছনে তাড়া করেছে...সারি সারি বেগুনী ও রাঙা আলোর চাকা খুব লম্বা সারি আমার চোখের সামনে দিয়ে বেলে যাচ্ছে...তারপর আমার বাঁয়ে

অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটা বড় নদী, ওপারেও সুন্দর গাছপালা, নীল আকাশ...এপারেও অনেক ঝোপ বন...কিন্তু ঘেন মনে হ'ল সব জিনিষটা আমি ঝাড়-লঠনের তেঁকোণা কাঁচ দিঘে দেখছি...নানা রঙের গাছপালা, নদীর জলের ঢেউয়ে নানা রং...ওপারটা লোকজনে ভরা, মেয়েও আছে, পুরুষও আছে...গাছপালার মধ্যে দিয়ে একটা মন্দিরের সৰু চূড়া ঠেলে আকাশে উঠেছে...আর ফুল যে কত রঙের আর কত চমৎকার তা মুখে বলতে পারিনে, গাছের সারা গুঁড়ি ভ'রে যেন রঙীন ও উজ্জ্বল থোবা থোবা ফুল...হঠাৎ সেই নদীর এক পাশে জলের ওপর ভাসমান অবস্থায় জ্যাঠামশাইদের ঠাকুর-ঘরটা একটু একটু ফুটে উঠল...তার চারিদিকে নদী, কড়ি কাঠের কাছে কাছে সে নদীর ধারের ডাল তার থোকা থোকা ফুলস্বন্ধ হাওয়ায় তুলচে...ওদের সেই দেশটা যেন আমাদের ঠাকুর-ঘরের চারি পাশ ঘিরে...মধ্যে, ওপরে, নীচে, ডাইনে, বাঁয়ে; আমার মন আনন্দে ভরে গেল...কান্না আসতে চাইল...কি জানি কোন্ ঠাকুরের ওপর ভক্তিতে...আমার ঘোর কাটল একটা চেষ্টা-মেচির শব্দে। আমার সবাই মিলে চেষ্টা। সীতা আমার ডান হাত জোব ক'রে ধরে দাঁড়িয়ে আছে...পুরুতঠাকুর ও পুলিন বেগে আমায় কি বলচে...চেয়ে দেখি আমি ভোগের লুচির খালার অভ্যস্ত কাছে পা দিঘে দাঁড়িয়ে আছি...আমার কৌচা লুটুচ্ছে উঁচু ক'রে সাজানো ফুলকা লুচির রাশির ওপরে। তারপর যা ঘটল! পুরুতঠাকুর গালে চার-পাঁচটা চড় কসিয়ে দিলেন...মেজকাকা এসে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। জ্যাঠাইমা এসে নরু-পুলিনদের ওপর আশ্বাস দিয়ে বলতে লাগলেন সবাই জানে আমি পাগল, আমার মাথার রোগ আছে, আমার তারা কেন ঠাকুরদালানে নিয়ে গিয়েছিল আরাতির সময়।...

মেজকাকার মারের ভয়ে অন্ধকার রাত্রে জ্যাঠামশায়দের খিড়কীপুকুরের মাদার-তলায় একা এসে দাঁড়ালাম। সীতা গোলমালে টের পায়নি আমি কোথায় গিয়েছি। আমার গা কাঁপছিল ভয়ে...এ আমার কি হ'ল? আমার এমন হয় কেন? এ কি খুব শক্ত ব্যারাম? ঠাকুরের ভোগ আমি ত ইচ্ছে ক'রে ছুঁইনি? তবে ওরা বুঝলে না কেন? এখন আমি কি করি?

আমি হিন্দু দেবদেবী জান্তাম না, সে-শিক্ষা আজন্ম আমাদের কেউ দেয়নি। কিন্তু মিশনরী মেয়েদের কাছে জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত যা শিখে এসেছি, সেই শিক্ষা অনুসারে অন্ধকারে মাদারগাছের গুঁড়ির কাছে মাটির ওপর হাঁটু গেড়ে হাতজোড় ক'রে মনে মনে বললাম—হে প্রভু যিশু, হে সদাপ্রভু, তুমি জ্ঞান আমি নির্দোষ—আমি ইচ্ছে ক'রে করিনি কিছু, তুমি আমার এই রোগ সারিয়ে দাও, আমার যেন এ-রকম আর কখনও না হয়। তোমার জয় হোক, তোমার রাজত্ব আহুক, আমেন্।

২

সকালে স্নান ক'রে এসে দেখি সীতা আমাদের ঘরের বারান্দাতে এক কোণে খুঁটি হেলান দিয়ে বসে পড়ছে। আমি কাছে গিয়ে বললাম—দেখি কি পড়ছিস সীতা?...সীতা এমন একমনে বই পড়ছে যে বই থেকে চোখ না তুলেই বললে—ও-পাড়ার বৌদিদির কাছ থেকে এনেছি—প্রফুল্লবালা—গোড়াটা একটু পড়ে দ্যাখো কেমন চমৎকার বই দাদা—

আমি বইখানা হাতে নিয়ে দেখলাম, নামটা 'প্রফুল্লবালা' বটে। আমি বই পড়তে ভালবাসিনে, বইখানা ওর হাতে ফেরৎ দিয়ে বললাম—তুই এত বাজে বইও পড়তে পারিস!...

সীতা বললে—বাজে বই নয় দাদা, পড়ে দেখো এখন। জমিদারের ছেলে সতীশের সঙ্গে এক গরিব ভট্টচাষি বামুনের মেয়ে প্রফুল্লবালার দেখা হয়েছে। ওদের বোধ হয় বিয়ে হবে।

সীতা দেখতে ভাল বটে, কিন্তু যেমন সাধারণতঃ ভাইয়েরা বোনদের চেয়ে দেখতে ভাল হয়, আমাদের বেলাতেও তাই হয়েছে। আমাদের মধ্যে দাদা সকলের চেয়ে সুন্দর—যেমন রং, তেমনই চোখমুখ, তেমনই চুল—তারপর সীতা, তারপর আমি। দাদা যে সুন্দর, এ-কথা শত্রুতেও স্বীকার করে—সে আগে থেকে ভাল চোখ, ভাল মুখ, ভাল রং দেখল ক'রে বসেছে—আমার ও সীতার জন্তে বিশেষ কিছু রাখেনি। তা হলেও সীতা দেখতে ভাল। তা ছাড়া সীতা আবার সৌখীন—সর্বদা ঘষে মেজে, খোঁপাটি বেঁধে, টিপটি প'রে বেড়ান তার স্বভাব। কথা বলতে বলতে দশ বার খোঁপায় হাত দিয়ে দেখতে খোঁপা ঠিক আছে কি-না। এ নিয়ে এ-বাড়িতে তাকে কম কথা সহ করতে হয়নি। কিন্তু সীতা বিশেষ কিছু গায়ো.

মাথে না, কারুর কথা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না—চিরকালের একশুঁয়ে স্বভাব তার।

আমার মনে মাঝে মাঝে কষ্ট হয়, আমাদের তো পয়সা নেই, সীতাকে তেমন ভাল ঘরে বিয়ে দিতে পারব না—এই সব পাড়ারগায়ে আমার জ্যাঠামশায়দের মত বাড়িতে, আমার জ্যাঠাইমার মত শাশুড়ীর হাতে পড়বে—কি দুর্দশাটাই ঘে ওর হবে! ওর এত বইপড়ার ঝোঁক যে, এ-পাড়ার ও-পাড়ার বৌঝিদের বাস্তব বই আছে চেয়ে-চিন্তে এনে এ-সংসারের কঠিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে সব পড়ে ফেলে দিয়েচে। জ্যাঠাইমা তো এমনিই বলেন, “ও-সব অলুকুণে কাণ্ড বাপু—মেয়েমাহুষের আবার অত বই পড়ার সখ, অত সাজগোজের ঘট কেন? পড়বে তেমন শাশুড়ীর হাতে, ঝাঁটার আগায় বই পড়া ঘুচিয়ে দেবে তিন দিনে।”

সীতার বুদ্ধি খুব। ‘শতগল্প’ ব’লে একখানা বই ও কোথা থেকে এনেছিল, তাতে ‘সোনামুখী ও ছাইমুখী’ ব’লে একটা গল্প আছে, সংসার সংসারে গুণবতী লক্ষ্মীমেয়ে সোনামুখী ঝাঁটা লাথি খেয়ে মাহুষ হ’ত—তারপর কোন্ দেশের রাজকুমারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল ভগবানের দয়ায়—সীতা দেখি গল্পটার পাতা মুড়ে রেখেছে। ও-গল্পটার সঙ্গে ওর জীবনের মিল আছে, এই হয়ত ভেবেচে। কিন্তু সীতা একটি কথাও মুখ ফুটে বলে না কোনো দিন। ভারি চাপা।

সীতা বই থেকে চোখ তুলে পথের দিকে চেয়ে বললে—ঐ হীরাঠাকুর আসচে দাদা আমি পালাই—

আমি বললাম—“বোস, হীরাঠাকুর কিছু বলবে না। ও ঠিক আজ এখানে খাবার কথা বলবে দ্যাখ্।”

হীরাঠাকুরকে এ-গাঁয়ে আসা পর্যন্ত দেখছি। রোগা কালো চেহারা, খোঁচা খোঁচা একমুখ কাঁচা-পাকা দাড়ি, পরনে থাকে আধময়লা থান, খালি পা, কাঁধে ময়লা চাদর, তার ওপরে একখানা ময়লা গামছা ফেলা। নিজের ঘরদোর নেই, লোকের বাড়ি বাড়ি খেয়ে বেড়ানো তার ব্যবসা। আমরা যখন এখানে নতুন এলাম, তখন কত দিন হীরাঠাকুর এসে আমাদের বলেছে, “তোমার মাকে বল খোকা, আমি এখানে আজ দুটো খাবো।” মাকে বলতেই তখনুনি তিনি রাজী হতেন—মা চিরকাল এমন ছিলেন না, লোককে খাওয়াতে-মাখাতে চিরদিনই তিনি ভালবাসতেন।

সীতার কথাই ঠিক হ’ল। হীরাঠাকুর এসে বললে—“শোন খোকা, তোমার মাকে বলো আমি এখানে আজ দুপুরে চাট্টি ভাত খাবো।” সীতা বই মুখে দিয়ে খিল্ খিল্ ক’রে হেসেই খুন। আমি বললাম, “হীরা-জ্যাঠা, আজকাল তো আমরা আলাদা খাইনে? জ্যাঠামশায়দের বাড়িতে খাই বাবা মারা গিয়ে পর্যন্ত। আপনি সেজকাকাকে বলুন গিয়ে। সেজকাকা কাঁটালতলায় নাপিতের কাছে দাড়ি কামাচ্ছেন।”

সেজকাকা লোক ভাল। হীরাঠাকুর আশ্বাস পেয়ে আমাদেরই ঘরের বারান্দায় বসল। সীতা উঠে একটা কঞ্চল পেতে দিলে। হীরাঠাকুর বললে, “তোমার দাদা কোথায়?” দাদার সঙ্গে ওর বড় ভাব। হীরাঠাকুরের গল্প দাদা শুনতে ভালবাসে, হীরাঠাকুরের কষ্ট দেখে দাদার দুঃখ খুব, হীরাঠাকুর না খেতে পেলে দাদা বাড়ি থেকে চাল চুরি ক’রে দিয়ে আসে। এখানে যখন খেতে আসত, তখনুনি প্রথম দাদার সঙ্গে ওর আলাপ হয়, এই বারান্দায় বসেই। হীরাঠাকুরের কেউ নেই—একটা ছেলে ছিল, সে না-কি আজ অনেকদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। হীরাঠাকুরের এখনও বিশ্বাস, ছেলে এক দিন ফিরে আসবেই এবং অনেক টাকাকড়ি আনবে, তখন তার দুঃখ ঘুচবে। দাদা হীরাঠাকুর ওই সব গল্প মন দিয়ে বসে বসে শোনে। অমন শ্রোতা এ-গাঁয়ে বোধ হয় হীরাঠাকুর আর কখনও পায়নি।

খেতে বসে হীরাঠাকুর এক মহা গোলমাল বাধিয়ে বসল। জ্যাঠামশায়ের ছোট মেয়ে সরিকে ডেকে বললে, (হীরা কারুর নাম মনে রাখতে পারে না) “খুকী শোনো, বাড়ির মধ্যে জিগোস কর তো ডালের বাটীতে তাঁরা কি কিছু মিশিয়ে দিয়েছেন? আমার গা ঘেন ঘুরচে।” সবাই জানে হীরাঠাকুরের মাথা ধারাপ, সে ও-রকম একবার আমাদের বাড়ি খেতে বসেও বলেছিল, কিন্তু বাড়িহুচ্ছ মেয়েরা বেজায় চটল এতে। চটবারই কথা। জ্যাঠাইমা বললেন—“সেজঠাকুরপোর খেয়ে-দেয়ে তো আর কাজ নেই, ও আপদ মাসের মধ্যে দশ দিন আসে এখানে খেতে। তার ওপর আবার বলে কি-না ডালে বিষ মাখিয়ে দিইচি আমরা। আ মরণ মড়ুইপোড়া বামুন, তোকে বিষ খাইয়ে মেরে কি তোর লাখো টাকার তালুক হাত করব? আজ থেকে বলে দাও সেজঠাকুরপো, এ-বাড়ির দোর বন্ধ হয়ে গেল, কোনো দিন সদরের চৌকাঠ মাড়ালে ঝাঁটা মেরে তাড়াবো।”

হীরা তখন খাওয়া শেষ করেছিল। জ্যাঠাইয়ার গালাগালি শুনে মুখখানা কাঁচুমাচু করে উঠে গেল। দাদা এ-সময় বাড়ি ছিল না—আমাদের মুখে এরপর শুনে বললে—আহা, ও পাগল, ছেলের শোকে পাগল হয়েছে। ও কি বলে না-বলে তা কি ধরতে আছে? ছিঃ, খাবার সময় জ্যাঠাইয়ার গালমন্দ করা ভাল হয়নি। আহা!

সীতা বললে, “গালাগাল দেওয়া ভাল হয়নি কেন, খুব ভাল হয়েছে। খামোকা বলবে যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে? লোকে কি মনে করবে?”

দাদা আর কিছু বললে না, চুপ করে রইল। সে কারুর সঙ্গে তর্ক করতে পারে না, সীতার সঙ্গে তো নয়ই। একবার কেবল আমায় জিগোস করলে, “হীরা জ্যাঠা কোন্ দিকে গেল রে নিতু?” আমি বললাম আমি জানিনে।

এর মাস দুই তিন পরে, মাঘ মাসের শেষ, বিকেল বেলা। আমাদের ঘরের সামনে একটুখানি পড়ন্ত রোদে পিঠ দিয়ে ফুলের অঙ্ক কষি—এমন সময় দেখি হীরাঠাকুরকে সন্তর্পণে আস্তে আস্তে ধরে নিয়ে আসছে দাদা। হীরাঠাকুরের চেহারা শীর্ণ, মাথার চুল আরও উস্কোখুস্কো, মুখ প্যাঙাস—জ্বরে ধেমনি কাঁপচে, তেমনি কাসচে। সুন্যাম আজ না—কি চার-পাঁচ দিন অসুখ অবস্থায় আমাদেরই পাড়ায় ভটচার্যীদের পূজোর দালানে শুয়েছিল। অসুখে কাশ-খুখু ফেলে ঘর অপরিষ্কার করে দেখে তারা এই অবস্থায় বলেচে সেখানে জায়গা হবে না। হীরাঠাকুর চলতে পারে না, যেমন দুর্বল, তেমনি জ্বর আর সে কি ভয়ানক কাশি! কোথায় যায়, তাই দাদা তাকে নিয়ে এসেচে জ্যাঠামশায়দের বাড়ি। ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল। দাদার কি এতটুকু বুদ্ধি দেননি ভগবান! এটা কি নিজের বাড়ি যে এখানে যা খুশী করা চলবে? কোন্ ভরসায় দাদা ওকে এখানে নিয়ে এল দ্যাখো তো?

যা ভয় করেছি, তাই হ'ল। হীরাকে অসুখ গায়ে হাত ধরে বাড়িতে এনেচে দাদা, এ-কথা বিদ্রোহেণে বাড়ির মধ্যে প্রচার হয়ে যেতেই আমার খুড়তুতো জ্যাঠাতুতো ভাই বোনেরা সব মজা দেখতে বাইরের উঠানে ছুটে এল, সেজ-কাকা এসে বললেন—“না না—এখানে কে নিয়ে এল ওকে? এখানে জায়গা কোথায় যে রাখা হবে?” কিন্তু ততক্ষণ

জ্যাঠামশায়দের চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় হীরা শুয়ে ধুঁকচে, দাদা চণ্ডীমণ্ডপের পুরোনো সপটা তাকে পেতে দিয়েচে। তখন একটা ও-অবস্থার রোগীকে কোথায় বা সরানো যায়? বাধ্য হয়ে তখনকার মত জায়গা দিতেই হ'ল।

কিন্তু এর জন্তে কি অপমানটাই সহ করতে হ'ল দাদাকে। এই জন্তেই বল্চি দিনটা কখনো ভুলবো না। দাদাকে আমরা সবাই ভালবাসি, আমি সীতা দু-জনেই। আমরা জানি সে বোকা, তার বুদ্ধি নেই, সে এখনও আমাদের চেয়েও ছেলেমানুষ, সংসারের ভালমন্দ সে কিছু বোঝে না, তাকে বাঁচিয়ে আড়াল করে বেড়িয়ে আমরা চলি। দাদাকে কেউ একটু বকলে আমরা সহ করতে পারিনে, আর সেই দাদাকে বাড়ির মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রথমে সেজকাকা আখালিপাখালি চড়াপড়া মারলেন। বললেন, “বুড়ো ধাড়ী কোথাকার, ওই হাঁপকাশের রুগী বাড়ি নিয়ে এলে তুমি কার ছকুমে? তোমার বাবার বাড়ি এটা? এতটুকু জ্ঞান হয়নি তোমার? সাহসও তো বলিহারি, জিগোস না বাদ না কাউকে, একটা কঠিন রুগী বাড়ি নিয়ে এসে তুললে কোন্ সাহসে? নবাব হয়েচ না খিঙ্গী হয়েচ? না এটা তোমার চা-বাগান পেয়েচ?”

এর চেয়েও বেশী কষ্ট হ'ল যখন জ্যাঠাইমা অনেক গালি-গালাজের পর রোয়াকে দাঁড়িয়ে ছকুম জারি করলেন, “যাও, রুগী ছুঁয়ে ঘরে দোরে উঠতে পাবে না, পুকুর থেকে গায়ের ও-কোটস্থদ্ধ ডুব দিয়ে এস গিয়ে।”

মাঘ মাসের শীতের সন্ধ্যা আর সেই কনকনে ঠাণ্ডা পুকুরের জল—তার ওপর চা-বাগানের আমলের ওই ছেঁড় গরম কোটটা ছাড়া দাদার গায়ে দেবার আর কিছু নেই, দাদা গায়ে দেবে কি নেয়ে উঠে? সীতা ছুটে গিয়ে শুকনো কাপড় নিয়ে এসে পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে রইল। মাও এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি ভালমানুষ, দাদাকে একটা কথাও বললেন না, কেবল ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে জল থেকে সে যখন উঠে এল, তখন নিজের হাতে গামছা দিয়ে তার মাথা মুছিয়ে দিলেন, সীতা শুকনো কাপড় এগিয়ে দিলে, আমি গায়ের কোটটা খুলে পরতে দিলাম। রাত্রে ম সাবু করে দিলেন আমাদের ঘরের উত্তানে—দাদা গিয়ে হীরাঠাকুরকে খাইয়ে এল।

সকালবেলা সেজকাকা ও জ্যাঠামশাই দস্তদের কাঁটাল-বাগানের ধারে পোড়ো জমিতে বাড়ির কুবাণকে দিয়ে খেজুর-পাতার একটা কুঁড়ে বাঁধলেন এবং লোকজন ডাকিয়ে হীককে ধরাধরি করে সেখানে নিয়ে গেলেন। দাদা চুপি চুপি একবাটি সাবু মা'র কাছ থেকে ক'রে নিয়ে দিয়ে এল। দিন দুই এই অবস্থায় কাটলো। মুখুঞ্জ-বাড়ির বড়মেয়ে নলিনীদি রাত্রে এক বাটি বালি দিয়ে আসতো আর সকালবেলা যাবার সময় বাটিটা ফিরিয়ে নিয়ে যেত। একদিন রাত্রে দাদা বললে—“চল্ নিতু, আজ হীকজ্যাঠার ওখানে রাতে থাকবি? রামগতি-কাকা দেখে বলেচে অবস্থা খারাপ। চল্ আগুন জ্বালাবো এপন, বড্ড শীত নইলে।”

রাত দশটার পর আমি ও দাদা দু-জনে গেলাম। আমরা যাওয়ার পর নলিনীদি সাবু নিয়ে এল। বললে, “কি রকম আছে রে হীক-কাকা?” তারপর সে চলে গেল। নারকালের মালা দু-তিনটে শিয়রের কাছে পাতা, তাতে কাশথু ফেলেচে রুগী। আমার গা কেমন বাঁম-বাঁম করতে লাগল। আর কি কনকনে ঠাণ্ডা! খেজুরের পাতার বাঁপে কি মাঘ মাসের শীত আটকায়? দস্তদের কাঁটালবাগান থেকে শুকনো কাঁটালপাতা নিয়ে এসে দাদা আগুন জ্বাললে। একটু পরে দু-জনই ঘুমিয়ে পড়লাম। কত রাত্রে জানি না, আমার মনে হ'ল হীকজ্যাঠা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হীক-জ্যাঠা আর কাশচে না, তার রোগ যেন সেরে গিয়েচে! আমার দিকে চেয়ে হেসে বললে, “নিতু বললে, আমি বাঁশবেড়ে যাচ্ছি গঙ্গা নইতে। আমায় বড় কষ্ট দিয়েছে হরিবল্লভ (আমার জ্যাঠামশাই), আমি বলে যাচ্ছি, নির্বংশ হবে, নির্বংশ হবে। তোমরা বাড়ি গিয়ে শোওগে যাও।”

আমার গা শিউরে উঠলো—এত স্পষ্ট কথাগুলো কানে গেল, এত স্পষ্ট হীকজ্যাঠাকে দেখলাম যে বুঝে উঠতে পারলাম না প্রত্যক্ষ দেখেছি, না স্বপ্ন দেখছি। ঘুম কিন্তু ভেঙে গিয়েছিল, দাদা দেখি তখনও কুঁকড়ি হয়ে শীতে ঘুমুচ্ছে, কাঁটালপাতার আগুন নিবে জল হয়ে গিয়েচে, হীকজ্যাঠাও ঘুমুচ্ছে মনে হ'ল। বাইরে দেখি ভোর হয়ে গিয়েচে।

দাদাকে উঠিয়ে নলিনীদিদির বাবা রামগতি মুখুঞ্জকে

ডাকিয়ে আনলাম। তিনি এসে দেখেই বললেন, “ও তো শেষ হয়ে গিয়েচে। কতক্ষণ হ'ল? তোরা কি রাত্রে ছিলি না-কি এখানে?”

হীকঠাকুরের মৃত্যুতে চোখের জল এক দাদা ছাড়া বোধ হয় আর কেউ ফেলেনি।

অনেক দিন পরে শুনেছিলাম, হীকঠাকুর পৈতৃক কি জমিজমা ও দুখানা আমকাঁটালের বাগান বন্ধক রেখে জ্যাঠামশায়ের কাছে কিছু টাকা ধার করে এবং শেষ পর্যন্ত হীকঠাকুর সে টাকা শোধ না করার দরুণ জ্যাঠামশায় নালিশ করে নীলামে সব বন্ধকী বিষয় নিজেই কিনে রাখেন। এর পর হীকঠাকুর আপোষে কিছু টাকা দিয়ে সম্পত্তিটা ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিল—জ্যাঠামশায় রাজী হননি। কেবল বলেছিলেন, ব্রাহ্মণের ভিটে আমি চাইনে—ওটা তোমায় ফিরিয়ে দিলাম। হীক তা নেয়নি, বলেছিল, সব যে-পথে গিয়েছে, ও ভিটেও সে-পথে যাক। এর কিছুকাল পরেই তার মাথা খারাপ হয়ে যায়।

৩

বিষয় বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জ্যাঠামশায়দের দানধ্যান ধর্মামুষ্ঠানও বেড়ে চলেছিল। প্রতি পূর্ণিমায় তাঁদের ঘরে সত্যনারায়ণ পূজা হয় যে তা নয় শুধু—একটি গরিব ছাত্রকে জ্যাঠাইমা বছরে একটি টাকা দিতেন বই কেনবার জন্তে; শ্রাবণ মাসে তাঁদের আবাদ থেকে নৌকো আসে নানা জিনিষপত্র বোঝাই হয়ে—বছরের ধান, জালাভরা কইমাছ, বাজরাভরা হাঁসের ডিম, তিল, আকের গুড় আরও অনেক জিনিষ। প্রতি বছরই সেই নৌকায় দুটি একটি হরিণ আসে। ধনধান্যপূর্ণ ডিঙা নিরাপদে দেশে পৌঁছেচে এবং তার জিনিষপত্র নির্বিঘ্নে ভাঁড়ার-ঘরে উঠল এই আনন্দে তাঁরা প্রতিবার শ্রাবণ মাসে পাঁচালি বালি দিয়ে মনসাপূজা করতেন ও গ্রামের ব্রাহ্মণ খাওয়াতেন। বৈশাখ মাসে গৃহ-দেবতা মদনমোহনের পূজার পালা পড়ল ওঁদের। জ্যাঠামশায় গরদের জোড় পরে লোকজন ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে কাঁসরঘটা, ঢাকঢোল বাজিয়ে ঠাকুর নিয়ে এলেন ও-পাড়ার জাতিদের বাড়ি থেকে—জ্যাঠাইমা খুড়ীমারা বাড়ির দোরে দাঁড়িয়েছিলেন—প্রকাণ্ড পেতলের সিংহাসনে বসানো

শালগ্রাম বয়ে আনছিলেন জ্যাঠামশায় নিজে—তিনি বাড়ি ঢুকবার সময়ে জ্যাঠাইমা জলের ঝারা দিতে দিতে ঠাকুর অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন—মেয়েরা শাঁখ বাজাতে লাগলেন, উলু দিলেন। আমি, সীতা ও দাদা আমাদের ঘরের বারান্দা থেকে দেখছিলাম—অত্যন্ত কৌতূহল হলেও কাছে যেতে সাহস হ'ল না। মাকে মেমে পড়াতে সে-কথা ওঁদের কানে যাওয়া থেকে মাহুঘের ধারা থেকে আমরা নেমে গিয়েছি ওঁদের চোখে—আমরা খ্রীষ্টান, আমরা নাস্তিক, পাহাড়ী জানোয়ার—ঘরেদোরে ঢুকবার যোগ্য নই। বৈশাখ মাসের প্রতিদিন কত কি খাবার তৈরি হ'তে লাগল ঠাকুরের ভোগের জন্তে—ওঁরা পাড়ার ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করে প্রায়ই খাওয়াতেন, রাত্রে শীতলের লুচি ও ফলমিষ্টান্ন পাড়ার ছেলেমেয়েদের ডেকে দিতে দেখেছি তবুও সীতার হাতে একখানা চন্দ্রপুলি ভেঙে আধখানিও কোনো দিন দেননি।

জ্যাঠাইমা এ সংসারের কর্ত্রী, কারণ জ্যাঠামশাই রোজগার করেন বেশী। ফরসা মোটাসোটা, একগা গহনা, অহঙ্কারে পরিপূর্ণ—এই হলেন জ্যাঠাইমা। এ-বাড়িতে নববধূরূপে তিনি আসবার পর থেকেই সংসারের অবস্থা ফিরে যায়, তার আগে এদের অবস্থা খুব ভাল ছিল না—তাই তিনি নিজেকে ভাবেন ভাগ্যবতী। এ-বাড়িতে তাঁর ওপর কথা বলবার ক্ষমতা নেই কারও। তাঁর বিনা ছকুমে কোনো কাজ হয় না। এই জ্যৈষ্ঠ মাসে এত আম বাড়িতে, বৌদের নিয়ে খাবার ক্ষমতা নেই, যখন বলবেন খাওগে, তখন খেতে পাবে। জ্যাঠামশায়ের বড় ও মেজ ছেলে, শীতলদা ও সলিলদার বিষে হয়েছে, যদিও তাদের বয়স খুব বেশী নয় এবং তাদের বোয়েদের বয়স আরও কম—দুই ছেলের এই দুই বৌ ও বাড়িতে গলগ্রহ হয়ে আছে এক ভাগ্যবৌ তার ছেলেমেয়ে নিয়ে, আর আমার মা আমাদের নিয়ে—এ ছাড়া ভুবনের মা আছে, কাকীমা আছেন—এর মধ্যে এক ছোটকাকীমা বাদে আর সব জ্যাঠাইমার সেবাদাসী। ছোটকাকীমা বাদে এইজন্তে যে তিনি বড়মাহুঘের মেয়ে—তাঁর ওপর জ্যাঠাইমার প্রভুত্ব বেশী খাটে না।

প্রতিদিন খাওয়ার সময় কি নিম্নর্জ্জ কাণ্ডাই হয়! রোজ রোজ দেখে সয়ে গিয়েচে যদিও, তবুও এখনও চোখে কেমন ঠেকে। রান্নাঘরে একসঙ্গে ভায়ে, জামাই, ছেলেরা খেতে

বসে। ছেলেদের পাতে জামাইয়ের পাতে বড় বড় জামবাটিতে ঘন দুধ, ভাগ্যেদের পাতে হাতা করে দুধ। মেয়েদের খাবার সময় সীতা ভাগ্যবৌ এরা সবাই কলায়ের ডাল মেখে ভাত খেয়ে উঠে গেল—নিজের দল, দুই বৌ, মেয়ে নলিনীদি, নিজের জন্তে বাটীতে বাটীতে দুধ আম বাতাসা। নলিনীদি আবার মধু দিয়ে আমদুধ খেতে ভালবাসে—মধুর অভাব নেই, জ্যাঠামশাই প্রতি বৎসর আবাদ থেকে ছোট জালার একজালা মধু নিয়ে আসেন—নলিনীদি দুধ দিয়ে ভাত মেখেই বলবে মা আমায় একটু মধু দিতে বলা না সহুর মাকে? কালেভদ্রে হয়ত জ্যাঠাইমার দয়া হ'ল—তিনি সীতার পাতে দুটো আম দিতে বললেন কি এক হাতা দুধ দিতে বললেন—নয় তো ওরা ওই কলায়ের ডাল মেখে খেয়েই উঠে গেল। সীতা সে-রকম মেয়ে নয় যে মুখফুটে কোন দিন কিছু বলবে, কিন্তু সেও তো ছেলেমাহুঘ, তারও তো খাবার ইচ্ছে হয়? আমি এই কথা বলি, যদি খাবার জিনিষের বেলা কাউকে দেবে, কাউকে বঞ্চিত করবে, তবে একসঙ্গে সকলকে খেতে না বসালেই তো সবচেয়ে ভাল?

এক দিন কেবল সীতা বলেছিল আমার কাছে,—দাদা, জ্যাঠাইমারা কি রকম লোক বল দিকি? মা ভাল ভাল বাটনা বাটবে, বাসন মাজবে, রাজ্যের বাসি কাপড় কাচবে, কিন্তু এত ভাবের ছড়াছড়ি এ-বাড়িতে, গাছেরই তো ভাব, একাদশীর পরদিন মাকে কোনো দিন বলেও না যে একটা ভাব নিয়ে যাও।

8

আমি মুখে মুখে বানিয়ে কথা বলতে ভালবাসি। আপন মনে কখনও বাড়ির কর্তার মত কথা বলি, কখনও চাকরের মত কথা বলি। সীতাকে কত শুনিয়েছি, এক দিন মাকেও শুনিয়েছিলাম। এক দিন ও-পাড়ার মুখুজ্জ-বাড়িতে বীকর মা, কাকীমা, দিদি—এরা সব ধরে পড়ল আমাকে বানিয়ে বানিয়ে কিছু বলতে হবে।

ওদের রান্না-বাড়ির উঠোনে, মেয়েরা সব রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকটা ভাবলাম কি বলব? সেখানে একটা বাঁশের ঘেরা পাঁচিলের গায়ে ঠেসান ছিল। সেইটের দিকে চেয়ে আমার মাথায় বুদ্ধি

এসে গেল। এই বাঁশের ঘেরাটা হবে যেন আমার স্ত্রী, আমি যেন চাকরি করে বাড়ি আসছি, হাতে অনেক জিনিষপত্র। ঘরে যেন সব ঢুকেছি, এমন ভাব করে বললাম—“ওগো কই, কোথায় গেলে, ফুলকপিগুলো নামিয়ে নাও না? ছেলোটোর জর আজ কেমন আছে?” মেয়েরা সব হেসে এ গুর গায়ে গড়িয়ে পড়ল।

আমার উৎসাহ গেল আরও বেড়ে। আমি বিরক্তির সুরে বললাম—“আঃ, ঐ তো তোমার দোষ! কুইনিং দেওয়া আজ খুব উচিত ছিল। তোমার দোষেই গুর অস্থখ যাচ্ছে না। খেতে দিয়েছ কি?”

আমার স্ত্রী অপ্রতিভ হয়ে খুব নরম সুরে কি একটা জবাব দিতেই রাগ পড়ে গেল আমার। বললাম—“ওই পুঁটুলিটা খোলো, তোমার এক জোড়া কাপড় আছে আর একটা তরল আলতা—” মেয়েরা আবার খিল খিল করে হেসে উঠল। বীরুর ছোটবোঁদিদি মুখে কাপড় গুঁজে হাসতে লাগল। আমি বললাম—“ইয়ে করো, আগে হাত-পা ধোয়ার জল দিয়ে একটু চায়ের জল চড়াও দিকি? সেই কখন ট্রেনে উঠেছি—ঝাফুনির চোটে আর এই দু-কোশ হেঁটে খিদে পেয়ে গিয়েচে—আর এই সঙ্গে একটু হালুয়া—কাগজের ঠোঙা খুলে দেখ কিসমিস এনেচি কিনে, বেশ ভাল কাবুলী—”

বীরুর কাকীমা তো ডাক ছেড়ে হেসে উঠলেন। বীরুর মা বললেন—“ছোঁড়া পাগল! কেমন সব বল্চে দেখ, মাগো মা উঃ—আর হেসে পারিনে।...”

বীরুর ছোটবোঁদিদির দম বন্ধ হয়ে যাবে বোধ হয় হাসতে হাসতে। বললে—“উঃ মা, আমি যাবো কোথায়! গুর মনে মনে ওই সব সখ আছে, গুর ইচ্ছে গুর বিয়ে হয়, বোঁ নিয়ে অমুনি সংসার করে—উঃ, মা রে!”

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আমি রান্নাঘরে বসে স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করছি। রান্না এখনও শেষ হয়নি। আমি বললাম—“চিংড়ি মাছটা কেমন দেখলে, খুব পচেনি তো? কালিয়াটার ঝাল একটু বেশী করে দিও।”

বীরুর কাকীমা বললেন, “ই্যা রে, তুই কি কেবলই খাওয়া-দাওয়ার কথা বলবি বোঁয়ের সঙ্গে?” কিন্তু আমি আর কি ধরণের কথা বলব খুঁজে পাইনে। ভাবলাম ঝানিকরণ, আর কি কথা বলা উচিত? আমি এই ধরণের কথাই সকলকে

বলতে শুনেচি স্ত্রীর কাছে। ভেবে ভেবে বললাম, “খুকীর জন্তে জামাটা আনবো, কাল গুর গায়ের মাপ দিও তো? আর জিগোস করো কি রং গুর পছন্দ—না, না—এখন আর ঘুম ভাঙিয়ে জিগোস করবার দরকার নেই, ছেলেমানুষ ঘুমুচ্ছে, থাক। কাল সকলেই—খুব গম্ভীর মুখে এ-কথা বলতেই মেয়েরা আবার হেসে উঠল দেখে আমি ভারি খুশী হয়ে উঠলাম। আরও বাহাদুরী নেবার ইচ্ছায় উৎসাহের সুরে বললাম—“আমি নেপালী নাচ জানি—চা-বাগানে নাচতো আমি দেখে দেখে শিখেচি।” মেয়েরা সবাই বলে উঠলো, “তাও জানিস না কি? বারে, তা তো তুই বলিসনি কোনো দিন? দেখি—দেখি—”

“কিন্তু আর একজন লোক দরকার যে? আমার সঙ্গে আর কে আসবে? সীতা থাকলে ভাল হ'ত। সেও জানে। আপনাদের বীণা কোথায় গেল? সে হ'লেও হয়।”

এ-কথায় মেয়েরা কেন যে এত হেসে উঠল হঠাৎ, তা আমি বুঝতে পারলাম না। বীণা বীরুর মেজবোন, আমার চেয়ে কিছু ছোট, দেখতে বেশ ভাল। সে ওখানে ছিল না তখন—একা একা নেপালী নাচ হয় না বলে বেশী বাহাদুরীটা আমার আর নেওয়া হয়নি সে-দিন।

সীতার বইপড়ার ব্যাপার নিয়ে জ্যাঠাইমা সকল সময় সীতাকে মুখ নাড়া দেন। সীতা যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফিটফিট থাকতে ভালবাসে, এটাও জ্যাঠাইমা বা কাকীমারা দেখতে পারেন না। সীতা চিরকাল ওই রকম থেকে এসেচে চা-বাগানে—একটি মাত্র মেয়ে, মা তাকে সব সময় সাজিয়ে-গুজিয়ে রাখতে ভালবাসতেন, কতকটা আবার গুঁড়ে উঠেছিল মিস্ নটনের দরুণ। মিস্ নটন মাকে পড়াতে এসে নিজের হাতে সীতার চুল আঁচড়ে দিত, চুলে লাল ফিতে বেঁধে দিত, হাত ও মুখ পরিষ্কার রাখতে শেখাত। এখানে এসে সীতার দুখানার বেশী তিনখানা কাপড় জোটেনি কোনো সময়—জামা তো নেই-ই—(জ্যাঠাইমা বলেন, মেয়েমানুষের আবার জামা গায়ে কিসের?) কিন্তু ওরই মধ্যে সীতা ফরসা কাপড়খানি পরে থাকে, চুলটি টান টান করে বেঁধে পেছনে গোল খোঁপা বেঁধে বেড়ায়, কপালে টিপ পরে—এ-গায়ের এক পাল অসভ্য অপরিষ্কার ছেলেমেয়ের মধ্যে

ওকে সম্পূর্ণ অন্ধ রকমের দেখায়, যে-কেউ দেখলেই বলতে পারে ও এ-গাঁয়ের নয়, এ অঞ্চলের না—ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

দুটো জিনিষ সীতা খুব ভালবাসে ছেলেবেলা থেকে—সাবান আর বই। আর এখানে এসে পর্যাস্ত ঠিক ওই দুটো জিনিষই মেলে না—এ-বাড়িতে সাবান কেউ ব্যবহার করে না, কাকীমাদের বাসে সাবান হয়ত আছে, কিন্তু সে বাক্স-মাজানো হিসেবে আছে, যেমন তাঁদের বাসে কাচের পুতুল আছে, চীনেমাটির হরিণ, খোকা পুতুল, উট আছে—তেমনি। তবুও সাবান বরং খুঁজলে মেলে বাড়িতে—কেউ ব্যবহার করুক আর নাই করুক—বই কিন্তু খুঁজলেও মেলে না—দুখানা বই ছাড়া—নতুন পাজি আর সত্যনারায়ণের পুঁথি। আমরা তো চা-বাগানে থাকতাম, সে তো বাংলা দেশেই নয়—তবুও আমাদের বাসে অনেক বাংলা বই ছিল। নানা রকমের ছবিওয়ালা বাংলা বই—যীশুর গল্প, পরিত্রাণের কথা, জবের গল্প, স্বর্ণবণিক পুত্রের কাহিনী—আরও কত কি। এর মধ্যে মিশনরী মেমেরা অনেক দিয়েছিল, আবার বাবাও কলকাতা থেকে ডাকে আনাতেন—সীতার জন্মে এনে দিয়েছিলেন কঙ্কাবতী, হাতেমতাই, হিতোপদেশের গল্প, আমার জন্মে একখানা ‘ভূগোল-পরিচয়’ ব’লে বই, আর একখানা ‘ঠাকুরদাদার বুলি’। আমি গল্পের বই পড়তে তত ভালবাসিনে, হু-তিনটে গল্প পড়ে আমার বইখানা আমি সীতাকে দিয়ে দিয়েছিলাম।

আমার ভাল লাগে যিশুখুষ্টের কথা পড়তে। পর্কতে যিশুর উপদেশ, যিশুর পুনরুত্থান, অপব্যয়ী পুত্রের প্রত্যাবর্তন—এ-সব আমার বেশ লাগে। এখানে শু-সব বই পাওয়া যায় না ব’লে পড়িনে। যিশুর কথা এখানে কেউ বলেও না। একখানা খুষ্টের রঙীন ছবি আমার কাছে আছে—মিস্ নর্টন দিয়েছিল—সেখানা আমার বড় প্রিয়। মাঝে মাঝে বার ক’রে দেখি।

হিন্দু দেবতার কোনো মূর্তি আমি দেখিনি, জ্যাঠামশায়েরা বাড়িতে যা পূজো করেন, তা গোলমত পাথরের হুড়ি। এ-গ্রামে দুর্গাপূজা হয় না, ছবিতে দুর্গামূর্তি দেখেছি, ভাল বুঝতে পারিনে, কিন্তু একটা ব্যাপার হেঁচে মধ্যে। চৌধুরী-পাড়ায় বড় পুকুর ধারের পাকুড়গাছের তলায় কালো পাথরের একটা দেবমূর্তি গাছের গুঁড়িতে ঠেসানো

আছে—আমি এক দিন দুপুরে একলা পাকুড়তলা দিয়ে যাচ্ছি, বাবা তখন বেঁচে আছেন, কিন্তু তাঁর খুব অস্থখ—ওই সময় মূর্তিটা আমি প্রথম দেখি—জায়গাটা নির্জন, পাকুড়গাছের ডালপালার পিছনে অনেকখানি নীল আকাশ, মেঘের একটা পাহাড় দেখাচ্ছে ঠিক যেন বরফে মোড়া কাকন-জজ্বা—একটা হাতভাঙা বদিও কিন্তু কি সুন্দর যে মুখ মূর্তিটার, কি অপূর্ব গড়ন—আমার হঠাৎ মনে হ’ল ওই পাথরের মূর্তির পবিত্র মুখের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ যীশুখুষ্টের মুখের মিল আছে—কেউ ছিল না তাই দেখিনি—আমার চোখে জল এল, আমি একদৃষ্টিতে মূর্তিটার মুখের দিকে চেয়েই আছি—ভাবলাম জ্যাঠামশায়েরা পাথরের হুড়ি পূজো করে কেন, এমন সুন্দর মূর্তির দেবতাকে কেন নিয়ে গিয়ে পূজো করে না? তার পরে শুনেছি ওই দীঘি খুঁড়বার সময়ে আজ প্রায় পঁচিশ বছর আগে মূর্তিটা হাত-ভাঙা অবস্থাতেই মাটির তলায় পাওয়া যায়—সীতাকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিলাম একবার—একবার সীতা জবা, আকন্দ, ঝুম্কা ফুলের একছড়া মালা গেঁথে মূর্তির গলায় পরিয়ে দিয়েছিল। এমন সুন্দর দেবতাকে আজ পঁচিশ বছর অনাদরে গ্রামের বাইরের পুকুরপাড়ে অমন ক’রে কেন যে ফেলে রেখে দিয়েছে এরা!

একবার একখানা বই পড়লাম—বইখানার নাম চৈতন্য-চরিতামৃত। এক জায়গায় একটি কথা প’ড়ে আমার ভারি আনন্দ হ’ল। চৈতন্যদেব ছেলেবেলায় একবার আঁস্তাকুড়ে এঁটো হাঁড়িকুড়ি যেখানে ফেলে, সেখানে গিয়েছিলেন ব’লে তাঁর মা শচীদেবী খুব বকেন। চৈতন্যদেব বললেন—মা, পৃথিবীর সর্বত্র ঈশ্বর আছেন, এই আঁস্তাকুড়েও আছেন। ঈশ্বর যেখানে আছেন, সে-জায়গা অপবিত্র হবে কি ক’রে?

ভাবলাম জ্যাঠাইমাদের বিরুদ্ধে চমৎকার যুক্তি পেয়েছি ওঁদের ধর্মের বইয়ে, চৈতন্যদেব অবতার, তাঁরই মুখে। জ্যাঠাইমাকে একদিন বললাম কথাটা। বললাম—“জ্যাঠাইমা, আপনি যে বাড়ির পিছনে বাঁশবনে গেলে কি শেওড়া গাছে কাপড় ঠেকলে হাত-পা না ধুয়ে, কাপড় না ছেড়ে ঘরে ঢুকতে দেন না, চৈতন্যচরিতামৃতে কি লিখেছে জানেন?” চৈতন্যদেবের সে-কথাটা বলবার সময়ে আনন্দে মন আমার ভরে উঠল—এমন নতুন কথা, এত সুন্দর কথা আমি কখনও শুনিনি। ভাবলাম জ্যাঠাইমা বই পড়েন না ব’লে এত সুন্দর কথা যে

ঔদের ধর্মের বইয়ে আছে তা জানেন না—আমার মুখে শুনে
জেনে নিশ্চয়ই নিজের ভুল বুঝে খুব অপ্রতিভ হয়ে যাবেন।

জ্যাঠাইমা বললেন—তোমাকে আর আমার শেখাতে
হবে না। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেচে, উনি এসেচেন
আজ আমায় শান্তর শেখাতে। হিহর আচার-ব্যভার তোরা
জানাব কোথেকে রে ভেঁপো ছোড়া। তুই তো তুই, তোর
মা বড় জানে, তোর বাবা বড় জানতো—

আমি অবাক হয়ে গেলাম। জ্যাঠাইমা এমন সুন্দর
কথা শুনে চটলেন কেন? তা ছাড়া আমি নিজে বানিয়ে
কিছু বলছি কি?

আগ্রহের স্বরে বললাম—আমার কথা নয় জ্যাঠাইমা,
চৈতন্যদেব বলেছিলেন তাঁর মা শচীদেবীকে—চৈতন্যচরিতামৃত
লেখা আছে—দেখাবো বইখানা?

—খুব তকোবাজ হয়েচ, থাক। আর বই দেখাতে
হবে না। তোমার কাছে আমি গুরুমন্ত্র নিতে যাচ্ছিনে—
এখন যাও আমার সামনে থেকে, আমার কাজ আছে—
তোমার তকো শুন্বার সময় নেই।

বা রে, তর্কবাজির কি হ'ল এতে? মনে কষ্ট হ'ল
আমার। সেই থেকে জ্যাঠাইমাকে আর কোনো কথা
বলিনে।

সীতা ইতিমধ্যে এক কাণ্ড করে বসল। জ্যাঠামশাইদের
বাড়ির পাশে যত্ন অধিকারীর বাড়ি। তারা বারেন্দ্রশ্রেণীর

ব্রাহ্মণ। তাদের বাড়িতে যত্ন অধিকারীর বড় মেয়েকে বিয়ে
জন্ত দেখতে এল চার-পাঁচ জন ভদ্রলোক কলকাতা থেকে
সীতা সে-সময় সেখানে উপস্থিত ছিল।

যত্ন অধিকারীর বাড়ির মেয়েরা তাকে নাকি জিগ্যাস
করেছে—শোন সীতা, আচ্ছা উমার যদি বিয়ে না হয়
ওখানে, তোর বিয়ে দিয়ে যদি দি, তোর পছন্দ হয় কা'বে
বলত?

সীতা বুঝতে পারেনি যে তাকে নিয়ে ঠাট্টা করচে—
বলেচে না-কি চোখে চশমা কে একজন এসেছিল তাকে।

ওরা সে-কথা নিয়ে হাসাহাসি করেচে। জ্যাঠাইমার কানে
গিয়েছে কথাটা। জ্যাঠাইমা ও সেজকাকীমা মিলে সীতাবে
বেহায়া বোকা বদমাইস্ জ্যাঠা মেয়ে যা তা বলে গালাগাতি
আরম্ভ করলেন। আরও এমন কথা সব বললেন যা ঔদের
মুখ দিয়ে বেরুলো কি ক'রে আমি বুঝতে পারিনে। আমি
সীতাকে বকলাম, মাও বকলেন—তুই যাস্ কেন যেখানে
সেখানে, আর না বুঝে যা-তা কথা বলিস্ই বা কেন? এ-সব
জামগার ধরণ তুই কি বুঝিস্?

সীতার চোখ ছলছল ক'রে উঠল। সে অতশত
বোঝেনি, কে জানে ওরা আবার এখানে বলে দেবে! সে মনে
যা এসেচে, মুখে সত্যি কথাই বলেচে। এ নিয়ে এত কথা উঠবে
তা বুঝতে পারেনি।

ক্রমশঃ



বৌদ্ধধর্মে কর্ম ও জন্মান্তরবাদ

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক, এম-এ, পিএইচ-ডি

কোন সময়ে কি ও প্রকারে জন্মান্তরবাদ ভারতবর্ষীয় লোকের মনে আত্মপ্রকাশ করিয়া ক্রমে ক্রমে ভারতীয় ধর্মতিহাসের গতি ঘুরাইয়া দিয়া মানুষের ধর্মভাবনায় সরসতা বা আশ্বাস আনয়ন করিয়াছিল, সর্বাগ্রে ইহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। মনীষিগণ, বিশেষতঃ প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ, মনে করিয়া থাকেন যে, সুপ্রাচীন সময়ে আর্যগণ স্বনিবাসস্থান হইতে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িবার পূর্বে, খুব সম্ভবতঃ, তাঁহাদের ধর্মচিন্তার ধারাতে জন্মান্তরবাদ (Theory of Transmigration or Transmutation of Souls) ধর্মবিশ্বাসরূপে হৃদয়ে পোষণ করিতেন না। মানুষের আত্মা মৃত্যুর পরে যে পুনর্বার মানুষী তরু অথবা পঞ্চাশরীর পরিগ্রহ করিতে পারে, এইরূপ মত যে গ্রীকজাতীয় দার্শনিক পাইথাগোরাস (Pythagoras) ও প্লেটো (Plato) পোষণ করিতেন, হয়ত ইহাও কেবল এই দুই দার্শনিকের স্বচিন্তাপ্রসূত ভাবমাত্র ছিল, ইহা যে গ্রীক জনসাধারণেরও বিশ্বাস বস্তু ছিল তাহা ঠিক বলা যায় না। প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ এমনও মনে করেন যে, মিশর দেশীয় দার্শনিকগণের সংস্পর্শে আসিয়া গ্রীক দার্শনিকগণের মনে এইরূপ কল্পনা উদ্ভিত হইয়া থাকিতে পারে। ভারতীয় আর্যগণের অতিপ্রাচীন ধর্মসাহিত্য ঋগ্বেদাদিতেও জন্মান্তরবাদ পরিষ্কাররূপে বিশেষ কোন স্থান লাভ করিয়াছে বলিয়া প্রতিভাত হয় না। ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে সিদ্ধ ও পঞ্জাবের মহেঞ্জদারো, হরপ্পা প্রভৃতি স্থানে অচিরাবিকৃত প্রত্ননিদর্শনসমূহের নিপুণভাবে পরীক্ষার ফলে স্মরণ জন্মার্শাল-প্রমুখ মনীষিগণ প্রাগাৰ্য্য ভারতীয়গণের সভ্যতা সম্বন্ধে যে-সমস্ত মতবাদ প্রচার করিতে সমর্থ হইতেছেন, তৎপাঠেও জানা যায় যে, ভারতীয় আর্যগণ পঞ্চনদ ও সিদ্ধ দেশবাসী প্রাগাৰ্য্য জাতিগণের সহিত মিশ্রণের ফলে সেই সেই প্রাচীনতর আদিম জাতিসমূহ হইতে অনেক প্রকার ধর্মভাব ও ধর্মমত ক্রমে ক্রমে অবলম্বন করিয়া সেগুলিকে পরবর্তী সময়ে রচিত বেদাংশ, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ ও আরও পরবর্তীকালে রচিত শ্বত্ৰু-পুরাণাদিতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। শিব-শক্তির

উপাসনা, নাগ-নাগীর ও যক্ষ-যক্ষিণীর পূজা, লিঙ্গ-যোনির অর্চনা, বৃক্ষ-পঞ্চাদির পূজা, ভক্তিবাদ, এমন কি সংস্কৃতি (Doctrine of metempsychosis) বা জন্মান্তরপরিগ্রহবাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে মতামত কেন যে ভারতীয় আর্যগণ তাঁহাদের অতিপ্রাচীন নিজস্ব গ্রন্থে (অর্থাৎ প্রাচীন বেদাদি গ্রন্থে) স্পষ্টতঃ উল্লেখ বা আলোচনা করেন নাই, এইরূপ প্রশ্ন বহুকাল যাবৎ প্রশ্নরূপেই থাকিয়া যাইতেছিল। সম্প্রতি পরিজ্ঞাত প্রায় পাঁচ হাজার বৎসরের পূর্ববর্তী এই সুসভ্য পঞ্চনদ ও সিদ্ধ দেশবাসী প্রাগাৰ্য্য ভারতীয়গণের সংসর্গে আসিয়া আর্যগণ যে জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি ধর্মবিশ্বাস ক্রমশঃ ক্রমশঃ ধার করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকিবেন, এমন কথা আর সহসা নিষেধ করা যায় না। তৎপর কালে কালে দেশে দেশে প্রচারের ফলে এই মতবাদ সাধারণের ধর্মবিশ্বাসরূপে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছিল। এ সম্বন্ধে কোন কোন পণ্ডিত এমনও মনে করিতেন যে, ভারতবর্ষে আর্যগণের আগমনের পূর্বে, যদি অথবা কোন বৈদেশিক জাতি ভারতে প্রবেশলাভ করিয়া থাকেন এবং যদি বাস্তবিক আর্যগণ সেই জাতিকে পরাভূত করিয়া নিজ গোষ্ঠীতে মিশাইয়া লইয়া থাকেন তাহা হইলে এমনও অসম্ভব নহে যে, আর্যগণ সেই সেই পরাজিত জাতি হইতে একত্রবাসের ফলে জন্মান্তরবাদের কল্পনার ধারা ধার করিয়া শিথিয়া থাকিবেন। সে যাহা হউক, এখন দেখা যাউক কোন্ প্রাচীন আর্যগ্রন্থে এই বাদটি প্রথমতঃ সুস্পষ্টভাবে সূচিত ও ধর্মাকাজ্ঞী ব্যক্তিগণের বিশ্বাসবস্তু বলিয়া উল্লিখিত পাওয়া যায়। ছান্দোগ্যোপনিষদে (পঞ্চম অধ্যায়ের দশম খণ্ডে) ইহজন্মে আচরিত স্কৃত দৃষ্ণতের ফলাফলস্বারে শরীরীর বা আত্মার পরজন্মে শরীরান্তর পরিগ্রহের বিষয় অতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রুতি* বলিতেছেন যে,

* “তদ্য ইহ রমণীচরণা অভ্যাশো হ যন্তে রমণীনাং যোনিমাপদোরুন্
ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাহথ য ইহ কপূরচরণা
অভ্যাশো হ যন্তে কপূরাং যোনিমাপদোরুন্ময়যোনিং বা স্কুল্লযোনিং বা
চাণালযোনিং বা ॥”—ছা° উ° ৫।১০।৭

বর্তমান জন্মে রমণীয় কর্মের আচরণ দ্বারা শুভাশুভ হওয়ায় জীব পরজন্মে ব্রাহ্মণাদি রমণীয় ঘোনিতে জন্মলাভ করিবে এবং জুগুপ্সিত কর্মের আচরণদ্বারা অশুভাশুভ হইয়া অশুভ জুগুপ্সিত ঘোনিতে জন্মলাভ করিবে। উপনিষদের রচনাকাল মোটামুটি ভাবে বুদ্ধদেবের জন্মের অন্যান্য তিন চারি শত বৎসর পূর্বে ধরিয়া লইলে শাস্ত্রের মধ্যাদা নষ্ট হইবে এরূপ বিবেচিত হয় না। বুদ্ধদেবের ধর্মপ্রচারের পরবর্তী সময়ে রচিত কোন কোন উপনিষদে এবং ধর্মশাস্ত্র, স্মৃতি-সংহিতা ও পুরাণাদিতে দেখা যায় যে, তৎ-তৎ সময়ে পুনর্জন্মবাদ ও জন্মান্তরে দেহান্তর-প্রাপ্তিবাদ সমগ্রভাবে ভারতবাসিগণের স্বীকৃত বিশ্বাস হইয়া উঠিয়াছিল। এই বিষয়ে কাহারও কোনরূপ সন্দেহের কারণ নাই। কিন্তু জীবের এই সংসৃতি বা সংসার কি কেবল দুই একবার মাত্রই ঘটে, অথবা ইহা অনন্তকালস্থায়ী—এইরূপ প্রশ্নও উত্থিত হইতে পারে। দেখা যায় যে, বুদ্ধদেবের পূর্বে জীবের পুনঃ পুনঃ সংসৃতির কল্পনাটি ধর্মযুক্তিধারাতে ততটা প্রকৃষ্ট স্থান লাভ করিতে পারে নাই। এমনও মনে করা অসঙ্গত হয় না যে, বুদ্ধদেবের ধর্মবিশ্বাসে ও তৎকর্তৃক ধর্ম-প্রচারেই পুনর্জন্মের অনন্ত প্রবাহের কল্পনা প্রথমতঃ ভারতবর্ষে এতটা পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পুনর্জন্মের অনন্ত চক্রের ধারণা বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী কোন ঋষি বা ধর্মাচার্য প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন—তদ্বিষয়েও পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া কঠিন। বৌদ্ধগণের দৃঢ় বিশ্বাস এই ছিল যে, মোক্ষ বা নির্রাণের পূর্ক পর্যন্ত জীব বা পুঙ্গলের জন্মচক্র প্রবর্তিত হইতে থাকে। এক একটা জন্ম পাপপুণ্য কর্মে ভোগের শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলিতে থাকে। জন্মের অবধি হইল জীবের কর্মক্ষম। ভোগের ক্ষয়ে জীবের তৎ-তৎ-জন্ম শেষ হইলে পূর্বকৃত অশুভ কর্মের সঞ্চিত ফলে পুনর্জন্ম হইতে থাকে। ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী ব্যক্তি এই স্থলে গীতার প্রসিদ্ধ বাক্য স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে বলিবেন—“বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন” (হে অর্জুন, আমার ও তোমার, উভয়েরই, বহু বহু জন্ম অতীত হইয়া গিয়াছে), কিন্তু, “তান্ধং যেদ সর্কানি ন ত্বং বেথ পরস্তপ” (আমি ইহার সবগুলির বিষয় অবগত আছি, আর হে পরস্তপ, সেগুলিকে তুমি বুঝিতে পার না)।

কি হিন্দুশাস্ত্রে, কি বৌদ্ধশাস্ত্রে কর্মকে মানসিক, বাচিক ও কাষিক ভেদে তিন প্রকারে কল্পনা করা হইয়াছে। এই তিন প্রকার কর্মের শুভাশুভ ফলেই মানুষের মনুষ্য-তির্য্যগাদিভাবে উত্তম, মধ্যম বা অধম জন্মান্তর ঘটয়া থাকে। হিন্দু মনে করেন যে, অগ্নি হইতে সৃষ্টিজের স্রায় পরমাত্মার রূপ হইতে অসংখ্য সৃষ্টি লিঙ্গশরীরাবচ্ছিন্ন হইয়া নির্গত হইয়াই যেন জীবরূপে সর্বভূতকে কর্মে প্রেরিত করিতেছেন। ধর্মাধর্ম কর্মের আচরণজনিত স্বর্গনরকাদি-ভোগের কল্পনাও মানুষের ধর্মশিক্ষার জন্ত একটি উপাদেয় উপায়। অশুভভাবে শাস্ত্রকারগণ কর্মকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—স্বর্গাদিস্বর্গপ্রাপ্তিকর সংসরণের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেয় বলিয়া কোন কোন কর্ম (যথা—যজ্ঞ, উপাসনা প্রভৃতি) ‘শুভকর্ম’ (বা ‘সুখাত্ম্যাদায়িক’) এবং কোন কোন কর্ম (যথা, তপোবিদ্যা প্রভৃতি) জীবের সংসরণ নিবৃত্ত করিতে পারে বলিয়া ‘নিবৃত্তকর্ম’ (বা ‘নৈঃশ্রেয়সিক’) বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু ‘জ্ঞানাগ্নিদগ্নকর্মা’ না হইতে পারিলে জীবের পক্ষে পরমপুরুষার্থ বা মোক্ষলাভের আধিকারী হওয়ার জন্ত উপায় হিন্দুশাস্ত্রে কীর্তিত হয় নাই। ব্রহ্মজ্ঞানী কর্মজ দোষকে দহন করিয়া এই লোকেই ব্রহ্ম লাভ করিতে সমর্থ হয়। অগ্নি সংবর্দ্ধিত হইলে আর্দ্র কাষ্ঠও দহন করিতে সমর্থ হয় না কি ? যিনি পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হন, তিনিই ধর্মাধর্ম কর্মের অতীত হইতে পারেন। কর্ম-সম্বন্ধে আরও এক প্রশ্ন এইরূপ উত্থিত হয়, জীব বা পুঙ্গলের কর্মে প্রেরণা উৎপাদন করিয়া দেন কে ? হিন্দু তৎক্ষণাত উত্তর করিবেন—

“এষ হ্যেব সাধু কর্ম কারয়তি যমুর্জ্জং নিনীষতি এষ হ্যেবাসাধু কর্ম কারয়তি যমধো নিনীষতি”—

আত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞাদিতে কর্মসাধনের প্রেরণা উৎপাদন করিয়া দেন। তাই ইহা সকলেরই অমুভূত হইতেছে যে, কর্মহেতুক পুনর্জন্ম ও জন্মান্তরপ্রবাহ স্বীকার না করিলে পরমাত্মার উপর বিষমসৃষ্টির দোষ ও নিষ্ঠুরত্ব আরোপ করিতে হয়। কিন্তু, পরমাত্মা সাধারণভাবে জীবের কর্মাকরূপ সৃষ্টির বিধান করেন মাত্র ; বৈসম্য কেবল জীবের কর্মজনিত ঘটনা। বিষমসৃষ্টির এই ব্যাখ্যা কর্মবাদ স্বীকার দ্বারাই সুসাধিত হয়। পর্জন্মদেবত্ৰীহিবাদিসৃষ্টিতে সাধারণ

কারণ, কিন্তু ত্রীহিবাদির বৈষম্য তত্ত্ব-বীজগত-কারণ জন্ম ঘটনা থাকে। জীবের কর্মকে অপেক্ষা করিয়াই পরমাত্মা অনাদিকাল হইতে বিভিন্ন প্রকার সংসারের বিধান করিতেছেন।

কর্মের পারতন্ত্র্য জীবের পক্ষে ত্যাগ করা বড়ই দুঃখ ব্যাপার। কর্মই বন্ধনদুঃখের ও বার-বার জন্মান্তরপরিগ্রহের হেতু। তবে কি পুনর্জন্ম নিরোধ করিতে হইলে কর্মের নিরোধ বা সন্ন্যাস করিতে হইবে? মানুষের চেষ্টা থাকিবে কেমন করিয়া তাহার আত্মা—‘তাক্তা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি’—দেহত্যাগের পর আবার দেহান্তরগ্রহণদ্বারা সংসারে ফিরিয়া না আসেন এবং আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ বা ত্রিতাপের হস্ত হইতে, অর্থাৎ জন্ম, জরা, রোগ, মৃত্যু ও পুনর্জন্মের কঠোর ও কর্কশ শৃঙ্খলবন্ধন হইতে নিজকে মুক্ত করিবার উপায় খুঁজিয়া লইতে পারে। কিন্তু, কোন জীবের পক্ষেই সর্বতোভাবে ‘অকর্মকুং’ থাকা সম্ভাবিত নহে। কৃষ্ণ, জনক, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি অবতার ও মহাপুরুষগণের জীবনচরিত লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা জীবের উদ্ধারকল্পে কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষায় কর্মযোগের, অর্থাৎ কৌশলপূর্বক কর্মের আচরণের, পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কর্মের পরিসমাপ্তি জানে, সুতরাং কর্মের জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি সম্ভাবিত হয়। পরলোকে অধিকতর সুখের ও আনন্দের আশা না থাকিলে, মানুষ ইহলোকে দুঃখ এড়াইবার জন্ম আত্মঘাত দ্বারা নিজের ও হত্যাদিদ্বারা শিশুসন্তানের প্রাণনাশ অবিধেয় মনে করিত না। স্বর্গাদিতে সুখভোগের আশা, অথবা ঐকান্তিকভাবে অপবর্গ লাভ, করিতে হইলে, কোণলে কর্মসাধন করিতে হইবে। হঠাৎ কর্মত্যাগ করিয়া বসিতে চাহিলেও তাহা কাহারও সম্ভবপর হইয়া উঠে না। যে কৌশলদ্বারা—“কুত্বাপি ন নিবদ্যতে, কুর্কল্পপি ন লিপ্যতে”—কর্ম করিয়াও মানুষ নিবদ্ধ বা লিপ্ত হইবে না এবং সংসৃতির কবল হইতে মুক্ত হইতে পারিবে, হিন্দু ও বৌদ্ধশাস্ত্রে সেই কৌশলের শিক্ষা উপদিষ্ট রহিয়াছে। জলে ও বায়ুতে অদৃশ্যভাবে অনেক রোগবীজাণু বিদ্যমান থাকে, কিন্তু তজ্জন্ম যেমন সেই ভয়ে আমরা জীবনরক্ষার জন্ম প্রয়োজনীয় এই প্রধান দ্রব্যদ্বয়ের ব্যবহার ত্যাগ করিয়া আত্মঘাতী হই না, কেবল বুদ্ধির কৌশলে দ্রব্যদ্বয়কে নির্দোষ করিয়া

পান ও সেবন করি, তেমনই জ্ঞানদ্বারা কর্মকেও নির্দোষ করিয়া লইতে পারিলে জীবকে আর কর্মবশতঃ পুনর্জন্ম-বন্ধনে পড়িয়া অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। ছানোগ্য উপনিষদের সেই মহাবাক্য এস্থলে স্মরণীয় যাহাতে শ্রুতি বলিতেছেন—“যথা পুঙ্করপলাশ আপো ন স্নিগ্ধ্যস্ত এবমেবংবিদি পাপং কর্ম ন স্নিগ্ধ্যতে”—যেমন পদ্মপত্র জল স্নিগ্ধ হয় না, তেমন তদ্বিৎ জ্ঞানীতে পাপকর্মও স্নিগ্ধ হয় না। কর্ম করিব, অথচ তৎফলদ্বারা বদ্ধ হইয়া পুনর্জন্মের জন্ম সংসৃতি লাভ করিব না—এমন কোন উপায়ের কথা শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে কি? গীতার কর্মযোগ-অধ্যায়ে উক্ত আছে যে, যে-কর্ম করণীয়, তাহা অনাসক্ত ও নিরভিমান হইয়া তৎফলাকাজ্জ্বা বর্জন করিয়া ভগবদর্পণপূর্বক সম্পাদন করিতে পারিলে তদ্বারা জীব ভববন্ধন প্রাপ্ত হয় না, বরং তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। মনে রাখিতে হইবে যে, সর্বপ্রকার কর্ম প্রশংসাই নহে; স্বার্থপরতায় প্রণোদিত হইয়া কস্মাচরণ বিধেয় নহে, কিন্তু কর্মের মূলে পরার্থপরতা নিহিত রাখিয়া কর্ম করিলে তবেই জগতের কল্যাণার্থ কর্ম অমুচ্যেয় হইল—এরূপ বলা যাইতে পারে। কর্মের ফলে আকাজ্জ্বা রাখার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, জগতের প্রাণীর জন্ম হিতকর কর্ম করিব, তাহাতে আমার নিজের লাভ, ক্ষতি, সিদ্ধি, অসিদ্ধি কিছুতেই উৎফুল্ল বা বিষন্ন হইব না। হিন্দুদর্শনের মতে কর্মফলভোগের প্রধান কারণ এই যে, জীব মায়াপ্রভাবে নিজের উপর কর্মের কর্তৃত্বাভিমান করিয়া থাকেন, তিনি যে ‘অকর্তা’ তাহা তিনি যেন বিস্মৃত হন। ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির অত্যাচারে বা মায়া-প্রভাবে যে সর্বকর্ম অমুচ্যেয় হয়, জীব তাহা যেন সর্বদাই ভুলিয়া যান। তাই নিকাম-কর্ম-কর্তা ইহা সর্বদা স্মরণ রাখিয়া কাম্য কর্মের সন্ন্যাস বা পরিহারপূর্বক সর্বভূতের হিতার্থে কর্ম করিয়া তৎফলত্যাগী হন। ইহারই অপর ব্যাখ্যা পরমাত্মা বা ভগবানের প্রীতির জন্ম তদর্পণপূর্বক কর্ম-সম্পাদন। এই ত গেল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উপদেশমত কর্মফলের আলোচনা।

বৌদ্ধগণের ধর্মশাস্ত্রেও পুণ্যকর্মের সঞ্চয় ইহ-পরলোকে সুখের নিদান ও পাপকর্মের সঞ্চয় দুঃখের আকর বলিয়া উদ্ঘোষিত হইয়াছে। তবে আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই যেন এই

পৃথিবীতে পাপী নানারূপে হুখ অহুভব করিতেছে ও পুণ্যকারী হুখ ভোগ করিতেছে—কিন্তু, ইহা দৃশ্যতঃ সত্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও বাস্তবিকপক্ষে সম্পূর্ণরূপে সত্য নয়, কারণ পাপপুণ্যের বিপাক বা পরিপাক প্রাপ্তির পূর্বে পর্য্যন্ত পুরুষের প্রত্যয়ে এইরূপ বিসদৃশ ভাব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে মাত্র। ‘ধর্মপদ’ গ্রন্থে (পাপবগ্গে) এইরূপ উপদেশ আছে,—

“তোমার নিকট পাপকর্ম আসিবে না, এই মনে করিয়া তুমি পাপকে অবজ্ঞা করিও না ; তোমার নিকট পুণ্যকর্ম উপস্থিত হইবে না ইহা মনে করিও না পুণ্যকেও অবজ্ঞা করিও না। কারণ, কিন্তু কিন্তু করিয়া জলপাতে যেমন জলকলস পরিপূর্ণ হইতে পারে, তেমনি মুর্থ বা অজ্ঞানী ব্যক্তি অল্প অল্প পাপ সঞ্চয় পূর্বক, এবং ধীর বা জ্ঞানী ব্যক্তি তেমনি অল্প অল্প পুণ্য সঞ্চয় পূর্বক যথাক্রমে পাপ ও পুণ্য পরিপূর্ণ হইতে পারে। প্রভূত-ধন-বিশিষ্ট বণিকের যেমন স্বল্পসংখ্যক সঙ্গী সঙ্গে থাকিলে, ভরসকুল পথ পরিত্যাগ বিধেয় এবং যেমন জীবনাভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে বিষ-বর্জন বিধেয়, তেমনি পুঙ্গলের বা জীবের পক্ষেও পাপ-বর্জন সর্বদা কার্য।”

কারণ, কি অন্তরীক্ষে, কি সমুদ্রতলে কি পর্বতগুহায়—
জগতে এমন কি কোন নিভৃত স্থান আছে, যেখানে পাপ অনাচরিত থাকিতে পারে ? তাই, সেই শাস্ত্রে আরও উপদেশ আছে—

গতমেকে উপপঙ্কস্তি নিরন্ন পাপকামিনো ।

সগং হুগতিনো যন্তি পরিনিকন্তি অনাসবা ॥ (পাপবগ্গে-১১)

এই শ্লোকে কর্মবাদ সম্বন্ধে বৌদ্ধগণের বিশ্বাসটি সুন্দর ভাবে উল্লিখিত পাওয়া যাইতেছে। তাহাদের ধারণা এই যে, “পাপ আচরণ করিয়া কেহ কেহ পুনর্জন্ম জন্ম গর্ত পরিগ্রহ করিয়া থাকে, কেহ কেহ নরকে গমন করে, কিন্তু, পুণ্য-কর্মকারীরা স্বর্গে গমন করেন এবং ‘আসব’ বা আশ্রব-রহিত (অর্থাৎ বিষয়বাসনাবিহীন) ব্যক্তিগণ নির্বাণ প্রাপ্ত হন।” এক কথায় বলিতে গেলে, পুঙ্গল সর্বদাই ‘কম্মসকো’ অর্থাৎ কর্ম-পরতন্ত্র। বৌদ্ধগণের নিত্য প্রত্যবেক্ষণের মধ্যে এই ভাবনাটিও নিরন্তর ভাবিতে হইবে বলিয়া উল্লিখিত আছে, যথা,—

“যং কম্মং করিস্সামি কল্যাণং বা পাপকং বা তন্ম দানাদো ভবিস্সামি”

“আমরা কল্যাণ কর্ম বা পাপ কর্ম যেটারই আচরণ করিব, তদনুরূপ ফল-ভাগী বা ‘দানাদ’ অর্থাৎ উত্তরাধিকারস্বত্রে তৎফলভাগী হইব।”

সুতরাং তাহাদের মতে কর্মই (ফলরূপে) জীবের বা পুঙ্গলের অনুধাবন করিয়া নব-সৃষ্টির হেতু হইয়া দাঁড়ায়। পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ অশোক তদীয় অনুশাসনে পাপ পুণ্য কর্ম সম্বন্ধে প্রজাবর্গের ধর্মোন্নতিকামনায় নিজ মত দ্বারা

পরিপোষিত যে উপদেশবাণী প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে প্রস্তরস্তম্ভলিপি রূপে উৎকীর্ণ করাইয়া রাখিয়াছেন তাহা হইতে কয়েকটি বাক্য এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইতে পারে। নীতিমূলক কর্ম আচরণ করার উপদেশ যে বৌদ্ধধর্মের একটি বিশেষত্ব, তদ্বিষয়ে মহারাজ অশোকের এই কথাগুলি অলঙ্কৃত নিদর্শনরূপে গৃহীত হওয়ার যোগ্য। ধর্ম কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে সত্রাট (দ্বিতীয় স্তম্ভলিপিতে) লিখাইতেছেন—

“কিয়ং চু ধমে তি ? অপাসিনবে বহকরণে দয়া দানে সচে সোচরে চ খু।”

‘ধর্ম কাহাকে বলা যায় ? (উত্তর) অপাদীনব (বা মতান্তরে অপাস্রব) অর্থাৎ দোষরাহিত্য, বহুকল্যাণ, দয়া দান সত্য ও শৌচ।’ তৎপরে সত্রাট (তৃতীয় স্তম্ভলিপিতে) আরও লিখাইয়াছেন যে, সর্বসাধারণের পক্ষে পাপপুণ্যের প্রত্যবেক্ষণ নিত্যকরণীয় হইলেও, ইহা বড়ই কঠিন কার্য। কোন্ কোন্ পাপ চিত্তবৃত্তি আদিনব-গামিনী বা দোষোৎপাদনকারিণী বা পরলোক-নাশ-বিধায়িনী, প্রজাবর্গকে তদ্বিষয়ে সাবধান রাখিবার জন্ম তিনি সেই সেই বৃত্তিগুলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা লিপিবদ্ধ করাইয়াছেন। তিনি লিখাইতেছেন প্রত্যেক ব্যক্তিই—

“কেবল স্বকৃত কল্যাণ বা পুণ্যকর্মই দেখিয়া থাকে (এবং বলিয়া থাকে) ‘আমি এমন কল্যাণ কার্য করিয়াছি’। কিন্তু, সে কিছুতেই তাহার স্বকৃত পাপ কার্য দেখিতে চায় না (এবং বলিয়া থাকে না) ‘আমি এমন পাপ কার্য করিয়াছি এবং ইহা আমার পরিক্রমের বা ভবিষ্যৎ অনিষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে’। বাস্তবিক এইরূপ অমুভূতি দুপ্রত্যবেক্ষ্যা অর্থাৎ পাপ-পুণ্যের এমন পরিমাপের প্রত্যবেক্ষণ কঠিন কার্য। (অতএব) সকলেরই এইটি লক্ষ্য করিয়া রাখা উচিত যে, চণ্ডতা নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, মান, ঈর্ষ্যা—এইরূপ মনোবৃত্তিগুলির আচরণ মানুষের পরিক্রমের কারণ হইয়া থাকে এবং সকলকেই সর্বদা সাবধানে থাকিতে হইবে যেন, এই পাপবৃত্তিগুলি তাহাদিগকে পরিভ্রষ্ট না করিয়া ফেলে। আরও লক্ষ্য রাখা উচিত—কোন কর্মটি ঐহিক সুখদুঃখের ও কোনটি পারত্রিক সুখদুঃখের নিদান।”

তবেই দেখা যাইতেছে যে, বৌদ্ধগণের মতেও তাহাই সুকর্ম, যাহা পারত্রিক মঙ্গলকর এবং যাহাদ্বারা সর্বসত্ত্বের প্রতি কল্যাণ আচরিত হইতে পারে। বৌদ্ধশাস্ত্রেও অভিহিত হইয়াছে যে সুকর্মকারী ব্যক্তিগণ অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিলে তাহার ফলে পুনর্জন্মরহিত হইয়া নির্বাণ বা বন্ধনমুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়, অর্থাৎ কর্মাচরণ দ্বারাই কর্মজনিত বন্ধন ছিন্ন করিতে পারা যায়। ‘মিলিন্দ-পঞহো’

গ্রন্থে লিখিত আছে যে, শ্ববির নাগসেন রাজা মিলিন্দকে (Menandar) বুঝাইতেছেন যে তিনি নিজে যদি—

“স-উপাদানো ভবিসসামি—পটিসন্দহিসসামি, সচে অনুপাদানো ভবিসসামি ন পটিসন্দহিসসামীতি”—

“আসক্তিযুক্ত হন, তবেই তাহার পুনর্জন্ম হইবে, অনাসক্তিযুক্ত হইলে তাহা হইবে না।” উভয় শাস্ত্রই (হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্র) স্পষ্ট শিক্ষা দিতেছেন যে, অনাসক্ত হইয়া জগতের হিতের অগ্র অদীনবগামী নিষ্ঠুরাচরণ প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্বক দয়া, মৈত্রী, করুণা প্রভৃতি সদবৃত্তিধারা প্রণোদিত হইয়া কল্যাণ কর্ম করিতে পারিলে, তাহার ফল উত্তম এবং তজ্জন্ম তদাচরণ-কারীর পুনর্জন্ম লাভ করিতে হইলেও, সেই কারণে তাহার উত্তম যোনিতে জন্মান্তর পরিগ্রহ হইতে পারে।

প্রব্রজিতের পক্ষেও বন্ধনের হেতুভূত কর্মসমূহের মধ্যে দুইটি কোটি বা অস্ত (extremes) পরিত্যাগ করিবার জন্ম বুদ্ধদেব স্বয়ং ধর্মচক্রপ্রবর্তনসময়ে তদীয় পূর্ব ধর্মবৈরী কোণ্ডিয়া প্রভৃতি ভিক্ষুপঞ্চকের নিকট যে ধর্মদেশনা (sermon) ঋষিপত্নে বা মৃগদাবে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, এই প্রথম অস্তটি ‘কামসুখল্লিকানুযোগো’ অর্থাৎ গ্রাম্য ও পামরজনোচিত কামসুখে ও বিষয়ভোগে আসক্তি এবং দ্বিতীয়টি “অন্তকিলমথানুযোগো” অর্থাৎ কঠিন ও কঠোর তপসাদিধারা শরীরের ক্লেশোৎপাদন। এই দুইটি অস্তপদ্ধতির কোনটিই ব্রহ্মচর্যা, বিরাগ, সংবর (ধর্মক্রিয়াসম্পাদন), নির্বেদ, নিরোধ, বিমুক্তি, অভিজ্ঞা, বোধি বা নির্বাণ সম্পাদন করিতে সমর্থ নয়। বরং এই দুই পদ্ধতিই কেবল দুঃখকর, অনাৰ্থ ও অনর্থযুক্ত পদ্ধতি। তিনি তাঁহাদিগকে আরও বলিয়াছিলেন—

“অয়ং ধো সা ভিক্খবে মচ্ছিমা পটিপদা তথাগতেন অভিসম্বুদ্ধা চক্খুকরণী এগনকরণী উপসমায় অভিঞ্ণায় সম্বোধায় নিব্বানায় সংবত্ততি।” “তথাগত যে মধ্যম পথের আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা চক্ষুর ও জ্ঞানকর মার্গ—ইহা দ্বারা অগ্রসর হইলে উপশম, অভিজ্ঞা, সংবোধি ও নির্বাণলাভ হকর।” ইহাই ‘অট্টটিকোমগ্গো’—আষ্টাঙ্গিক মার্গ। যথা ‘সম্মাদিট্ট’ (সম্যক দৃষ্টি—বিষয়ের ঠিক দর্শন), ‘সম্মা-সংকল্পো’ (সম্যক সংকল্প—সংকল্প স্থির রাখা), ‘সম্মা বাচা’ (সম্যক বাচ্য—প্রিয় সত্য কথন), ‘সম্মা কম্মস্তো’ (সম্যক কর্মাস্ত—সদাচরণ ও সদ্যবহার), ‘সম্মা আজীবো’ (সম্যক আজীব—সাধু

উপায়ে জীবিকোপার্জন), ‘সম্মা বায়ামো’ (সম্যক ব্যায়াম—সাধু উদ্যোগ বা চেষ্টা), ‘সম্মী সতি’ (সম্যক স্মৃতি—স্মরণ ও ধারণশক্তি) ও ‘সম্মা সমাধি’ (পরমতত্ত্বাবগতির অগ্র শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন প্রভৃতির সম্পাদন)। ভগবান বুদ্ধের মতে ভিক্ষু ভিক্ষুণীরা ও উপাসক উপাসিকারা যদি এই মধ্যম পন্থা অবলম্বন করিয়া কর্ম করিতে থাকেন, তাহা হইলেই তাঁহারা দ্বাদশ-নিদানাঙ্ক কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ ও পুনর্জন্মের দুঃখ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়া তথাগতের ন্যায় সম্বোধি-জ্ঞানার্জনপূর্বক নির্বাণরূপ পুরুষার্থ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন। বৌদ্ধধর্মের মূল উপদেশ এই ধর্মচক্রপ্রবর্তনসূত্রেই নিহিত আছে। ভগবান বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম যে অনেকাংশেই নৈতিক ধর্মের ধর্ম তাহা ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়। সাধু ও শুদ্ধ জীবন যাপন করিয়া সর্বস্বের দুঃখ হানির সহায়তা করিতে পারিলেই নির্বাণ-পথ পরিষ্কার হইয়া উঠে। মুক্তির জন্য বুদ্ধের নিকট বৈদান্তিকের তত্ত্বভাসক-নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সত্য-স্বভাব প্রত্যর্কচৈতন্য পরমাত্তার জ্ঞান, সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞান, অথবা পাতঞ্জলের প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরের জ্ঞানের প্রয়োজন অনুভূত হয় না। ‘চতুরাধ্যসত্য’ ঠিক নয় কি? ‘যাহা কিছু জন্মশীল তাহাই নশ্বর’—ইহা সত্য নয় কি? এইরূপ ধ্যানই বৌদ্ধের প্রধান ধর্মাচরণকর্ম।

আষ্টাঙ্গিক মার্গে চলিলে চতুরাধ্যসত্য উপলব্ধি করা যায় এবং সর্বশেষে গন্তব্য স্থান নির্বাণে উপস্থিত হওয়া যায়—ইহাই বুদ্ধের বিশ্বাস ও জ্ঞান এবং তিনি সংবোধিলাভের পর ইহাই জীবনের শেষ পর্য্যটাল্লিশ বৎসর প্রচার করিয়া জগতের উদ্ধারকাণ্ডে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

উপরি উল্লিখিত ‘কার্য-কারণ-শৃঙ্খলা’ কথাটির অর্থ কি? এবং চতুরাধ্যসত্যই বা কি, তাহার একটু উল্লেখ প্রয়োজনীয়। যে রজনীতে গোতম বুদ্ধগম্মায় বোধিজন্মের নীচে (অর্থমূলে) সম্যক জ্ঞানলাভসহকারে “সম্বুদ্ধ” হইয়াছিলেন, তাহার প্রথম যামে তিনি প্রাস্তন জন্মসমূহের সর্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারিয়াছিলেন, দ্বিতীয় যামে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া বর্তমান কালের সর্বভূতের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন, তৃতীয় যামে সর্ববিষয়ের কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার জ্ঞান লাভ

করিয়াছিলেন এবং রাজি প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অতি-প্রত্যুষে তিনি সর্বজ্ঞতালাভে কৃতকৃত্যার্থ হইয়া সিদ্ধার্থ হইয়াছিলেন। তিনি যে কার্য-কারণ-শৃঙ্খলা বা দ্বাদশ নিদান উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা এইরূপ—জগতের লোকের জরা-মরণ-দুঃখ (শোক পরিদেবনাদি সহকারে) জাতি (জন্ম) হইতে সমুদ্ভূত হয়, জাতি ভব (হওয়ার ভাব) হইতে, ভব উপাদান (হওয়ার আসক্তি) হইতে, উপাদান তৃষ্ণা (আকাজক্ষা) হইতে, তৃষ্ণা বেদনা (অহুভূতি) হইতে, বেদনা স্পর্শ (বিষয়ের সহিত সংসর্গ বা সম্পর্ক) হইতে, স্পর্শ ষড়ায়তন (ইন্দ্রিয়গ্রাম) হইতে, ষড়ায়তন নামরূপ (মানসিক ও বাহ্যিক ব্যাপার বা বৃত্তি - ইহার অপর নাম 'পপঞ্চ' = প্রপঞ্চ বা মায়ার অর্থাৎ 'human body as an aggregate of physical and mental phenomena,' রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান - এই পঞ্চসঙ্কেত সমষ্টিও 'নামরূপ' সংজ্ঞায় আখ্যাত) হইতে, নামরূপ বিজ্ঞান (অহংভাব, consciousness) হইতে, বিজ্ঞান সংস্কার (বাসনা, impressions) হইতে, এবং সংস্কার অবিদ্যা হইতে সমুৎপন্ন হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে এই নিদান-পরম্পরার নাম প্রতীত্য-সমুৎপাদ (পটচ্চসমুৎপাদ)। সূত্রাং দুঃখবাদী ভারতীয় অন্যান্য দর্শনে যেমন অবিদ্যাকেই সর্বদুঃখের কারণ বলিয়া অভিহিত করা হয়, বৌদ্ধশাস্ত্রের মতে তদ্রূপ মাহুঘের অবিদ্যামূলক দুঃখসঙ্কেত সমুদ্ভূত হয়। মাহুঘ এই দুঃখ হইতে "নিঃসরণং ন জানাতি"—কেমন করিয়া মুক্ত হইবে তাহা জানে না। এই শৃঙ্খলাতে উক্ত অবিদ্যা প্রভৃতি দ্বাদশ নিদানগুলির মধ্যে পূর্ব-পূর্বটির নিরোধে পর-পরটির নিরোধ হইলেই সর্বদুঃখহানি নিশ্চিত, বুদ্ধদেব ইহাও সকলকে জানাইয়াছিলেন। সন্দোধির ফলে তিনি আরও একটি মহাসত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, যথা—

'ইদং দুঃখমক্ক দুঃখ-সমুদয়ো জগৎখাপ।
অয়ং দুঃখ-নিরোধোহপি চেয়ং নিরোধগামিনী।
প্রতিপদিত্তি বিজ্ঞায় যথাভূতমবুধ্যত ॥'

প্রথম সত্য—সংসারে দুঃখ আছে, দ্বিতীয়—দুঃখের কারণও আছে, তৃতীয়—দুঃখের অতিক্রম বা নিরোধও আছে এবং চতুর্থ—দুঃখের উপশমের আষ্টাঙ্গিক মার্গরূপ উপায়ও আছে। পূর্বোল্লিখিত মধ্যম পথ বা 'মজ্জিম পটপদাই' দুঃখবিনাশের প্রকৃষ্ট সাধন। মোট কথা, বৌদ্ধ প্রতীত্য-সমুৎপাদ হইতেও

ইহাই অস্বীকৃত হয় যে, অবিদ্যাই জরা, মরণ, পুনর্জন্মাদিরূপ রোগের বীজাণুসদৃশ। এই রোগের চিকিৎসার জন্য প্রধান বৈদ্য বুদ্ধদেবও প্রতীকার বা ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আমাদের শেষ প্রশ্ন এই—বৌদ্ধমতে কর্মজনিত পুনর্জন্মটা কাহার ও কেমন করিয়া ঘটয়া থাকে ?

হিন্দুশাস্ত্রে আত্মার অস্তিত্ব ও সেই আত্মারই পুনর্জন্ম ও জন্মান্তর পরিগ্রহ বা সংসৃতি স্বীকার করিয়া কর্মবাদের অভ্যুপগম লক্ষিত হয়। সেই জন্য কর্মকারীর সঙ্কেতও বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করিয়া কর্ম করা বিধেয়। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রে আত্মা বা ঈশ্বর বিশেষ কোন স্থান লাভ করেন নাই। এই শাস্ত্র এক প্রকার অনাত্মবাদী শাস্ত্র। বৌদ্ধ নরপতি কণিকের সমসাময়িক মহাকবি ও দার্শনিক অশ্বঘোষের রচিত 'বুদ্ধচরিত' নামক মহাকাব্যে প্রতীত্য-সমুৎপাদ ও তৎক্রমনিরোধের উপদেশ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব যে-ভাবে সংসারের কারণ ও মুক্তি বিষয়ে সমসাময়িক দার্শনিকগণের প্রচলিত মতভেদের খণ্ডন করিয়াছিলেন, সে-সঙ্কেত একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। কবি বর্ণনা করিতেছেন যে, বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন—চতুরাধ্যসত্য ও আষ্টাঙ্গিক মার্গই যে মুক্তিবিধায়ক তাহা না জানিয়া "দৃষ্টি-বিপন্ন"বাদিগণ অভিমান-বশতঃ স্ব-স্ব মত পোষণ ও প্রচার করিয়া সংসৃতি হইতে মুক্তিলাভ দূরে থাকুক, বরং সংসারবন্ধনের পথ অধিকতর পরিষ্কার করিতেছেন। এই বিপ্রবাদ সঙ্কেত তিনি আরও বলিয়াছেন,—কোন কোন বাদীরা কেবল আত্মাকে একমাত্র অস্তিত্ব-বস্তু মনে করিয়া মননাদিদ্বারা তাহারই জ্ঞান ও তৎপুণ্যজনিত মুক্তির উপদেশ করিয়াছেন, অপর শ্রেণীর বাদীরা বলেন সবই 'স্বাভাবিক' অর্থাৎ অকারণ-সমুদ্ভূত, আবার অন্য দলের বাদীরা বলেন সবই 'ঈশ্বরাদীন,' কিন্তু তথাগতের মতে এই মতগুলির প্রত্যেকটিই সংসার-সাধন-ধর্ম। তিনি মনে করেন যে, এই বাদিগণ সকলেই সংসৃতি-ধর্মবাদী, কেহই নিবৃত্তি-বিধান-বিৎ নহেন। তাই তিনি প্রতীত্য-সমুৎপাদকে সংসৃতি-ধর্ম-সাধন মনে করিয়া তাহার নিরোধকেই নিবৃত্তি-পদ-সাধন বলিয়া প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে—

"পঞ্চসঙ্কেতময়ং দেহং পঞ্চভূতসমুদ্ভবম্।
শূন্যমনাস্ককং সর্বং প্রতীত্যোৎপাদ(ন)সত্তবম্ ॥"

পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন দেহ রূপাদি পঞ্চস্বক্কে সমষ্টি (এবং) প্রতীত্য-সমুৎপাদ-সম্বৃত্ত সব বস্তুই অনাত্মক। বৌদ্ধগণও পরলোক মানেন, দেব-দেবীর কল্পনা করেন, স্বর্গ-নরকভোগের কথাও বলেন—কিন্তু তাঁহাদের মতে দেবদেবীর স্থান বড় নীচে। অত্যুচ্চ স্থান কেবল কর্মের। কর্মকেই তাঁহারা পুনর্জন্মের কারণ বলিয়া মানেন। ভববন্ধ-বিমুক্তির জন্ম দুঃখমূলক অবিদ্যার সংছেদ করিতে হইবে; তাহা করিলেই সংসারের নিবৃত্তি ও পুঙ্গলের নির্বাণপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে। এই নির্বাণের লক্ষণ এই যে, ইহা নিস্পন্দ, অনুৎপাদ, অসংভব ও অনালয়,—ইহা বিবিক্ত, প্রকৃতিশূন্য ও অলক্ষণ;—ইহা “আকাশেন সদাতুল্যং নির্বিকল্পং প্রভাস্বরং”—ইহা ‘অস্তি-নাস্তি-বিনির্মুক্ত’ ‘আত্ম-নৈরাত্ম্য-বর্জিত’। হিন্দুদিগের গ্রাম বৌদ্ধগণ সালোকা, সারূপ্য বা সাযুজ্য প্রভৃতি নামে অভিহিত মুক্তির আকাজক্ষী নহেন। তাঁহারা নির্বাণান্তে শূন্যে শূন্য হইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাদের মতে এই শূন্য ব্যতিরেকে আর যাহা কিছু আছে, তাহা সবই—

“মায়া-মরীচি-স্বপ্নাভং জলেন্দু-প্রতিনাদবৎ”

“মায়া বা মরীচিকার গ্রাম, তাহা স্বপ্নের গ্রাম, জলচন্দ্রের গ্রাম, অথবা প্রতিধ্বনির গ্রাম প্রতীয়মান হয়।” পূর্বেও স্মৃতি হইয়াছে যে, বৌদ্ধধর্মে প্রকৃতিপুরুষের সংযোগে সৃষ্টি বা সংসারের কোন কথা লক্ষিত হয় না। স্নেহ বা তৈলের অভাবে প্রদীপ নিবিয়া গেলে, তাহা যেমন অন্তরীক্ষ বা অবনী বা অন্ত কোন দিগ্-বিদিকে গমন করে না, সেইরূপ কর্মজনিত ক্লেশক্লেষে পঞ্চস্বক্কাত্মক (নাম-রূপী) পুঙ্গলও কেবল শাস্তিই লাভ করে এবং তাহার অস্তিত্ব পূর্ণভাবে লোপ পাইয়া যায় মাত্র। পরবর্তীকালে আচার্য্য নাগাজ্জুন রচিত চতুঃস্তব পাঠেও জানা যায় যে, এই শূন্যতার উপলব্ধিরই নামান্তর পরমার্থ। এই অবস্থায় বোধা ও বোধব্যের কোন ভেদ থাকে না, এমন কি সংসারের অপকর্ষদ্বারা নির্বাণলাভের কোন কথাই খাটে না, সংসার ও নির্বাণ এই দুইটি পর্য্যন্ত অভিন্ন হইয়া দাঁড়ায়। বেদান্তের ব্রহ্মের গ্রাম, কেবল লোকানুবৃত্তি ও লোকানুকম্পার জন্মই শূন্যতার লৌকিকী ক্রিয়া ও “কর্মপুতি” প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

কোন বস্তুর নাশ না হইলে, তাহা হইতে নূতন জন্ম হয় না। বৌদ্ধদের মতে “বয়ধম্মা সংখারা”—“অনিচ্ছা সংখারা”

—যাহা কিছু সংস্কার বা আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক বস্তু (all mental and physical constituents of being) আছে, তাহাই নাশশীল, তাহাই অনিত্য। নাশ ও অনিত্যতা আছে বলিয়া সেগুলিরই পুনরাগমন বা পুনর্জন্ম সম্ভাবিত। এগুলি সবই মৃত্যুর অধীন, কেবল ব্যতিক্রম কর্মের বেলায়। বৌদ্ধ-মতে কর্মের উপর মৃত্যুর হাত নাই। মরণের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চস্বক্কে পরস্পর বিয়োগ ঘটিলেও কর্মফলে সেগুলির পুনঃ-সংযোগের সম্ভাবনা থাকে। নূতন পুঙ্গলে যেন পূর্কের কর্মেরই সংযোগ বা আবর্তন (transfer) ঘটিয়া থাকে। নূতন সৃষ্ট ব্যক্তির পূর্কজন্মের জ্ঞান আবৃত থাকে মাত্র, কিন্তু তিনি পূর্কজন্মের ব্যক্তিরই প্রবাহস্বরূপ। বৌদ্ধগণ এই স্থলে একরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন, যেমন—এক প্রদীপ হইতে জালিত অন্য প্রদীপ, এবং শেষোক্ত প্রদীপ হইতে জালিত অপর এক প্রদীপ এবং তাহা হইতে জালিত আর একটি ইত্যাদি; এবং এক আত্মবীজ হইতে নূতন বৃক্ষ এবং তৎফলের বীজ হইতে অপর বৃক্ষ ইত্যাদি।

‘মিলিন্দ-পঞ-হে’ পাঠ করা যায় যে, রাজা মিলিন্দ স্ববির নাগসেনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“ভস্তুে নাগসেন, যো উল্লজ্জতি সো এব সো, উদাহ অঞ-ঞোতি” ?—ভদন্ত নাগসেন, যিনি উৎপন্ন হন, তিনি কি তিনি (অর্থাৎ পূর্বেকার তিনি) অথবা অন্য কেহ? স্ববিরের উত্তর হইল—“ন চ সো, ন চ অঞ-ঞোতি”—তিনিও নহেন, অন্যও নহেন। রাজা মিলিন্দ নাগসেনকে কথাটি উপমাধারা বুঝাইয়া দিতে অনুরোধ করায়, নাগসেন ‘রাজন, শিশু অবস্থার তুমি এবং যুবক অবস্থার তুমিই যে বৃদ্ধ অবস্থার তুমিই রহ, না—ও তুমি রহ; প্রথম প্রহরের প্রদীপ যেমন মধ্যম ও পশ্চিম বা শেষ প্রহরের প্রদীপও রহে, না-ও তাহা রহে; দুগ্ধ যেমন দধি, নবনীত ও ঘৃতও রহে, না-ও তৎসমুদয় রহে’ ইত্যাদি রূপ দৃষ্টান্তধারা বুঝাইয়া দিলেন যে, যিনি উৎপন্ন হন, তিনি তিনিও নহেন, অন্যও নহেন। দেখা যাইতেছে যে, যাহা ধর্মসম্বৃত্তি বা বস্তুর ধর্মপ্রবাহ তাহাই বস্তুতে সম্মিলিত হয়। যাহার নিরোধ ঘটে তাহারই ঠিক উৎপত্তি হয় না, কিন্তু নিরোধমানের ধর্মপ্রবাহ উৎপাদ্যমান বস্তুতে সংক্রান্ত হয় মাত্র।

নিজের পুনর্জন্ম আর হইবে কি না, মাহুষ তাহা কিরূপে জানিতে পারে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে নাগসেন রাজা

মিলিন্দকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, “যো হেতু যো পচম্মো পটিসন্দহনায়, তস্স হেতুস্স তস্স পচম্মস্স উপরমো জানাতি সো—ন পটিসন্দহিসসামীতি।”—পুনর্জন্মের যাহা হেতু, যাহা কারণ তাহার উপরমের দ্বারাই সে জানিতে পারিবে যে, আর তাহার পুনর্জন্ম হইবে না। জন্মান্তরপরিগ্রাহী পুঙ্গলে কি প্রকারে পূর্বজন্মের পাপকর্ম সংক্রান্ত হয়, তৎপ্রসঙ্গে সেই গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, “কোন ব্যক্তি মরণ পর্ষস্ত যেমন একপ্রকার নামরূপ, আবার তাহার পুনর্জন্ম হইলে তিনি অন্য প্রকার নামরূপ। তথাপি পরবর্তী নামরূপ পূর্ববর্তী নামরূপ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য সে পাপকর্ম হইতে মুক্ত হইবে না।” আরও উক্ত হইয়াছে— “প্রথম নামরূপ যে পাপ পুণ্য কর্ম আচরণ করে, তৎফলে পুনর্জন্মে পরবর্তী নামরূপও সেই কর্ম হইতে মুক্ত হয় না।”

বৌদ্ধদর্শনে কর্মই যেন একমাত্র সত্য পদার্থ, ইহাই ছায়া মত সর্বদা জীবের অহুসরণ করিয়া থাকে। কর্মবন্ধনই পুঙ্গলের স্বল্পপঞ্চকে আটকাইয়া রাখিয়াছে—এই কর্মফল-বশতঃ স্বল্পসমষ্টিরূপী পুঙ্গলের সংসৃতি বা পুনঃ পুনঃ জন্ম। এই জীবনপরম্পরায় জীব একও নয়, ভিন্ন নয়। হিন্দুদর্শনে জীব শরীরী ও ক্ষেত্রজ্ঞ নামেও পরিচিত—এবং সেই দর্শনের উপদেশ এই যে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জীবের পঞ্চভূতাত্মক (ষাটকৌশিক) শরীর বা ক্ষেত্র পরিত্যক্ত হইলে, জীব বা পুরুষ আমোক্ষস্থায়ী লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মশরীর লইয়া সংসৃতি প্রাপ্ত হইতে থাকে। বৌদ্ধমতে যখন জীব বা পুঙ্গল পঞ্চস্বক্কা-ত্মক সমষ্টিবিশেষ, তখন ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত নয়। তাই ইহা বড় কঠিন কথা, কেমন করিয়া পুঙ্গলের যোনিভ্রমণ সম্ভাবিত হয়। দৃশ্যতঃ অনাত্মবাদী বুদ্ধদেব পাপ ও পুণ্যের ফলে সুখদুঃখভোগী জীবের জীবনসমস্যার মীমাংসা করিতে

উদ্যত হইয়া কর্মফলের বলবত্তা সম্বন্ধে এক অভিনব বিচারের প্রবর্তন করিয়াছেন। কর্মের আদি নাই—কিন্তু ইহার অন্ত হইতে পারে। আষ্টাঙ্গিক মার্গের অহুসরণ করিয়া কর্মফল নষ্ট করিতে পারিলে পুঙ্গলের নিরুপাধি নির্বাণ লাভ হয়। এই দর্শনে আমার আমিষ, তোমার তুমিষ ও তাহার তত্ত্ব কিছুই স্বীকৃত নাই। অথচ কোন্ অজ্ঞাত বা বা অজ্ঞেয় নিয়মাত্মসারে কর্মফল আমাকে তোমাকে ও তাহাকে পঞ্চস্বক্কাত্মক শরীরধারী করিয়া পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিতে পারে, এবং এইভাবে জীবনপ্রবাহও আমোক্ষ চলিতে থাকে? বৌদ্ধ-গণের উত্তর এই হইবে যে, পুঙ্গলের সমস্ত উপাদান নষ্ট হইয়া গেলেও তাহার কর্মফল (হিন্দুর আত্মার মত) অবিনাশী এবং বৈদ্যাতিক শক্তির ন্যায় সেই কর্মশক্তি পুঙ্গলের বিশ্লেষিত স্বল্পগুলিকে পুনঃ সংযোজিত করিয়া নব নব সৃষ্টিসাধনে সমর্থ হয়। ইহাই সংসৃতির অর্থো নিয়ম। প্রকৃতির বশে পড়িয়া কর্মকারী কোন পুরুষের বা ‘নিত্যোপলব্ধিস্বরূপ’ আত্মার স্বাধীন বা স্বতন্ত্র অস্তিত্বস্বীকারের কোন প্রয়োজন বুদ্ধদেব অহুভব করেন নাই।

তবে মোটামুটি এই মনে হয় যে, বৌদ্ধের ‘শূণ্য’, বৈদান্তিকের ‘ব্রহ্ম’, সাংখ্য ও পাতঞ্জলের ‘পুরুষ’ ও ‘ঈশ্বর’ এবং প্রথমের প্রতীত্য-সমুৎপাদ জগৎ ‘স্বল্পপ্রপঞ্চ’, দ্বিতীয়ের ‘মায়ী’ ও তৃতীয়ের ‘প্রধান’ বা ‘প্রকৃতি’ প্রায় পরস্পর সমস্থানীয়।

ললিতবিস্তরের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি—

“চিরাতুরে জীবলোকে ক্লেশ-ব্যাধি-প্রপীড়িতে।

বৈদ্যরাট্‌ ডং সমুৎপন্নঃ সর্বব্যাধিপ্রমোচকঃ ॥”

“হে বুদ্ধদেব, ক্লেশরূপ ব্যাধিদ্বারা প্রপীড়িত হইয়া বহুকাল জীবলোক আতুর অবস্থায় পতিত রহিয়াছিল, তুমিই সর্বপ্রকার ব্যাধির প্রমোচন কারিরূপে বৈদ্যরাজ হইয়া সমুৎপন্ন হইয়াছিলে।”

আচার্য নন্দলাল বসু ও তাঁহার চিত্রকলা

শ্রীমণীন্দ্র ভূষণ গুপ্ত

মনে পড়িতেছে অনেক বছর আগে কোন একটা বাংলা দৈনিক কাগজে এক ব্যক্তচিত্র ও ব্যক্তকবিতা দেখিয়াছিলাম ; বিষয় ছিল “রাজ্ঞী পক্ষী নিরীক্ষণ করিতেছেন”। মনে পড়িতেছে কবিতাটা যেন এরূপ—

“রংবেরঙের অগ্নিকণা
হাত দুটো ঠিক সাপের ফণা
মৎস্যকন্ঠা কিম্বা নারী
সেইটি বোঝা শক্ত ভারি।”

সে দিন বোধ হয় আজ চলিয়া গিয়াছে। রাস্তায় যখন বাহির হই, চারিদিকে দেখি দেওয়ালে পোষ্টার ; সাবান, এসেন্স, তেলের বিজ্ঞাপন। মাসিকপত্রে নানা চিত্র—সবটাতেই “তথাকথিত” ভারতীয় শিল্প চুকিয়া বসিয়াছে। “তথাকথিত” বলিলাম, কেন-না ভারতীয় শিল্পের রূপ সম্বন্ধে নানা আলোচনা চলিতে পারে। সরিষাপড়া দিয়া ভূত তাড়ান হয়, কিন্তু সরিষার ভিতর যদি ভূত চুকিয়া বসে, তবে ভূত তাড়াইবার উপায় কি? আমার এই উক্তি একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিই।

বোধে স্কুল অব আর্ট নিজের স্বাতন্ত্র্যে চলে ; বাংলার নয়া পদ্ধতির অনুসরণ করে না। কিন্তু সেখানকার শিল্পীরাও বলিয়া থাকেন যে তাঁহারাও ভারতীয় শিল্পের “রেনেসাঁ” বা পুনরভ্যুদয় সংঘটন করিতেছেন। ১৯২৯ সনে বোধে স্কুল অব আর্ট পরিদর্শন করি। তথায় ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের কয়েকটি সিঞ্চলিক্যাল চিত্র দেখি—তাহার একটি গুপ্ত-যুগের চিত্র। একটি মেয়ে সোজা দাঁড়াইয়া, গ্রীক মূর্তির ছায় নিখুঁত গডন, কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদ অঙ্গটার মত, পিছনে আবার পরীর মত ডানা আছে। অঙ্গটার পোষাক থাকা সত্ত্বেও ছবিখানি গুপ্ত-যুগ অপেক্ষা বিলাতের ভিক্টোরিয়া যুগের “প্রিয়াকফেলাইট” আর্টিষ্ট—রসেটি, ওয়াটস, বা বার্ন জোনস্ প্রমুখ শিল্পীদের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। ছবিখানির সবই বুঝিলাম, ম্যানাটমি ঠিক হইয়াছে, কোনো চিত্রপরিচয়ের দরকার নাই ; কিন্তু অঙ্গটার পোষাকটা যেন বিসদৃশ লাগে—এ যেন সরিষার ভিতর ভূতের প্রবেশ।

গুপ্ত-যুগের আবহাওয়া যদি সত্যই আনিতে হয়, তবে কিরূপ মূর্তি হইবে ?

“মুখে তার লোধ রেণু লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুন্দবক মাথে
তনুদেহে রক্তাশ্রয় নীবিবকে বাধা,
চরণে নুপুরখানি বাজে আধা আধা।”

অথবা

“কার্য্য সৈকতলীন হংসমিথুনা শ্রোতবহামালিনী
পাদাস্তম্ভমণ্ডিতো নিমগ্নহরিণা গৌরীপ্তরোঃ পাবনাঃ
শাখালম্বিত বকলস্য চ তয়ো নির্মাতুমিচ্ছামাশ্বঃ
শৃঙ্গে কৃকমৃগস্য বামনয়নঃ কণ্ডু রমানাং মৃগীম্।”

এবং

কৃত্ত : ন কর্ণাপিত বকনং সখে শিরীষমাগস্ত বিলম্বী কেশরম্
নবা শরচ্ছত্র মরীচি কোমলঃ মৃগালসূত্রং রচিতং স্তনাস্তরে

(শকুন্তলা)

গুপ্ত-যুগের আদর্শ চিত্র করিতে গিয়া বোধাইয়ের শিল্পী অঙ্গটার আভরণখানি লইয়াছেন, তার স্পিরিট বা প্রাণ ধরিতে পারেন নাই। শিল্পের সেই প্রাণ কোথায়? বিশেষ ধরণে কাপড়-পরানোতে এবং অলঙ্কারে? শিল্পের এই প্রাণটুকু ধরিতে পারিলে শিল্পের ভাষা বোঝা হইল।

বাংলায় যে ভারতীয় শিল্পের পুনরভ্যুদয়, তার উৎপত্তি ক্লাসিক্ হইতে। ক্লাসিকাল ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্য হইতে তাহার প্রেরণা। কিন্তু যদি কেহ শুধু ক্লাসিক্ লইয়া থাকে, তার মন পঙ্ক হইয়া যাইতে পারে। নন্দলালের কাছে ক্লাসিকাল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ক্লাসিকাল ভারতকে তিনি তাঁর শিল্পে যেমন ব্যক্ত করিয়াছেন, অল্প কেহই তেমনটি করেন নাই। তাহা সত্ত্বেও নন্দলাল ক্লাসিকস-এ বদ্ধ হইয়া থাকেন নাই, প্রকৃতি বা বর্তমানকে উপেক্ষা করেন নাই।

তাম্রাভ বালুকার উপরে গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরের রৌদ্র, তার মধ্যে তালপাতার ক্ষুদ্র এক সবুজ শীষ মাথা তুলিয়াছে, যেন মরকত মণি জ্বলিতেছে। আচার্য বসু মহাশয় তাঁর এক ছাত্রকে বলিতেছেন, “দেখ, তালপাতার সবুজ পাতাটুকু যেন আগুনের ফুলকি, এ যদি জ্বালা যায় এরই দাম হবে লাখ টাকা ; এ ছবি কম কি? বুদ্ধ কি শিবের ছবি থেকে এ কম হবে কেন?”

এ যেন ক্লাসিকাল নন্দলাল হইতে পৃথক্ আন এক শিল্পীর উক্তি।

আমাদের জাতীয় রুষ্টির পরিপূরণের পক্ষে নন্দলালের কাজ কম নয়। বর্তমানে শিল্পজগতে ভারতের প্রতিনিধি যদি কেহ থাকে, তবে নন্দলালই হইতে পারেন। কি চিত্রশিল্পে কি মণ্ডনশিল্পে, তাঁর স্বাতন্ত্র্য সর্বটার ভিতরেই আছে। বাংলার থিয়েটারে নূতন রূপসজ্জায় তাঁর কাজই কি কম? রবীন্দ্রনাথের ‘কালিনী’, ‘তপতী’, ‘নটীর পূজা’, ‘শাপমোচন’, ‘তাসের দেশ’ প্রভৃতি নূতন ধরণের নাটিকা বাংলার নাট্যজগতে নূতন রূপলোকের সন্ধান দিয়াছে। তার সাজসজ্জা পরিকল্পনা জোগাইয়াছে কে? নন্দলালের মত শিল্পীর হাত না পড়িলে রবীন্দ্রনাথের নাটিকার অর্ধেকই মারা যাইত।

শুধু বড় চিত্রে বা মাষ্টারপীসে নয়, পেন্সিল ড্রয়িং ও স্কেচেও তাঁর প্রতিভার ছাপ পড়ে। অটোগ্রাফের অখাং নানা জনের নামস্বাক্ষরের বহিতে তিনি যে-সব ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন, স্বজনী শক্তির পরিচয় তাহাতে কম পাওয়া যায় না। এ-সব কাজ কেবল তাঁহার পক্ষেই সম্ভব। তাঁহার সম্মুখে অটোগ্রাফের খাতাখানা ধরিলে নিমেষে আঁকিয়া দেন—অনন্ত আকাশে উড্ডীয়মান বলাকাশ্রেণী, পদ্মানদীর বালুর চর, পাল-তোলা নৌকা, হাঁস, মুরগী, কুকুর ছানাকে স্তম্ভদান করিতেছে, এক টুকরা পাথরকে ঘিরিয়া বর্ষার জলধারা চলিতেছে, কেয়া ফুল ফুটিয়াছে, পলাশ গাছে রঙের উৎসব, বাছুর লাফাইয়া লাফাইয়া চলিয়াছে, হরিণের দল দৌড়াইতেছে, এমন কত কি!

তিনি যখন ভ্রমণে বাহির হন সঙ্গের থাকে একতাড়া সাদা কার্ড, তাতে কত রকমের স্কেচের সংগ্রহ। এগুলি অনেক সময় আঁকা হয় খেলাচ্ছলে। শিল্পামোদীর কাছে যে এতে কেবল রেখার দৃঢ়তা, পেন্সিল তুলি চালাইবার অপূর্ব ক্ষমতা প্রকাশ পায় তাহা নহে - অনেক সময় ইহার ভিতর পাওয়া যায় শিল্পীর একটি প্রচ্ছন্ন হিউমার বা অনাবিল হাস্যরস।

তিনি অল্প আর্টিষ্টদের বা তাঁর ছাত্রদের কাছে যখন চিঠি লেখেন, তার ভিতর লেখা বিশেষ কিছু থাকে না, ছবি আঁকা থাকে। শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষের মেলা উপলক্ষ্যে সাদা কার্ডে ছবি আঁকা হয়, মেলায় নামমাত্র দামে এগুলি বিক্রী হয়। নববর্ষ বা অল্প কোন সময়ে শুভ ইচ্ছা ব্যক্ত করিতে এগুলির ব্যবহার হয়। নন্দলালের স্কেচ (নকশা)

ও পোর্ট কার্ডের ছবি আপানের বিখ্যাত আর্টিষ্ট হোকুসাইর কাজকে স্মরণ করাইয়া দিবে। ছই শিল্পীর যেন এ-বিষয়ে খুবই নিকট সম্বন্ধ। জাপানীরা নববর্ষে ছোট ছোট ছবি পাঠাইয়া বন্ধু ও আত্মীয়দের কাছে শুভ ইচ্ছা জানাইয়া থাকে। এ-সব ছবিকে জাপানীরা বলে সুরিমোনো (Surimono) হোকুসাইর ডিজাইন (এগুলি হইত রঙীন উডকাটের ছবি) করা। সুরিমোনো জাপানীদের কাছে খুব আদৃত ছিল, এগুলির সহিত শান্তিনিকেতনের ৭ই পৌষের কার্ডের যেন সাদৃশ্য আছে। এই প্রবন্ধের সঙ্গে যে-আর্টিষ্ট চিত্র দেওয়া গেল, এগুলি ৭ই পৌষের কার্ড। লরেন্স বিনিয়ন যেমন হোকুসাইর ছবি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, সেইরূপ নন্দলালের কার্ডের ছবি সম্বন্ধে বলিতে পারি—“কল্পনা ও মাধুর্যে অফুরন্ত; শিল্পীর পরিপক্ব ক্ষমতা ব্যক্ত করে... তাঁর অল্পসঙ্কীর্ণ চক্ষু এবং লিপিকুশল হাতের কাছে প্রকৃতির কিছুই এড়ায় না, প্রকৃতির সকল বস্তু তাঁর গতিমান রেখাপাতে মূর্ত হইয়া উঠে।”

নন্দলালের অটোগ্রাফ এবং অঙ্কিত স্কেচ সংগ্রহ করিতে পারিলে ভারতীয় শিল্পের একটি অপূর্ব সামগ্রী হইতে পারে।

বৈষ্ণব গান আছে “কানু ছাড়া গীত নাই।” তিনি তাঁর স্বজনী শক্তিকে “কানুর গীতে” বা কোনো বিশেষ বিষয়ে আবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। তাঁর প্রতিভা “নবনবোন্মেষ-শালিনী বুদ্ধি” শিল্পের বিভিন্ন দিকে প্রকাশিত হইয়াছে। নানা কারুকার্যে তাঁর যত্ন পাওয়া যায়। কারুশিল্পকে তিনি তাঁর চিত্র অপেক্ষা হেয় জ্ঞান করেন না। একবার এক আমেরিকান আর্টিষ্টের কাছে নন্দলালকে আর্টিষ্ট বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে তিনি উত্তর দেন—“আমি আর্টিষ্ট নই—কারিগর মাত্র।” তখন সেই আমেরিকান বলেন—“তাহলে আমি জানি না যে আমি কি!”

কারুশিল্পের বিভিন্ন বিষয়ে ও ক্ষেত্রে তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। বিভিন্ন শিল্পীজনোচিত উপকরণে ব্যঞ্জন দেওয়ার চেষ্টা—কাগজ, সিঁদ, মাটি, কাঠ, পাথর, রবার প্রভৃতিতে রূপ দেওয়ার চেষ্টা—বিভিন্ন উপকরণে ব্যক্তিব্যবহার ছাপ ফোটান তাঁর বৈশিষ্ট্য। উডকাট, লিনোক্যাট, লিথো, বাটিক ওয়াক, টুকো, টেমাকোটা, মূর্তি নির্মাণ প্রভৃতি সকল কাজই তিনি করিয়াছেন। সকল কাজেই দেখা যায় তাঁর মণ্ডনশিল্পের দক্ষতা। তাঁর চিত্রের ভিতরে আছে আকারগত সৌন্দর্য।

তিনি যে-কিছু মূর্তি নির্মাণ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া মনে হয় তিনি যদি চিত্রকর না হইয়া ভাস্কর হইতেন তবে একজন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর বলিয়া পরিচিত হইতেন। গণেশ, নটীর পূজা প্রভৃতি মূর্তিতে তাঁর মূর্তি-নির্মাণের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর তুলির টানে যে লিপিকুশলতা বা ক্যালিগ্রাফির পরিচয়, মূর্তি নির্মাণেও সে-রকম, আঙুলের টানে গঠনের (moulding) পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন কালের চিত্রকররা, আমাদের দেশেই হউক বা ইউরোপেই হউক, শুধু চিত্রকর ছিলেন না। তাঁহারা কারিগরও, ছিলেন; তাঁহারা ছিলেন—এনগ্রেভার, স্বর্ণকার, ভাস্কর, স্থপতি ইত্যাদি। বর্তমানে জগতের শিল্পীদেরও যৌক বোধ হয় এদিকে; শিল্পীর পরিকল্পনাকে নানা কারুকার্যে প্রকাশ করা। বাংলার নয়া শিল্পীদের যে আজকাল নানা কারুশিল্পে মনোনিবেশ করিতে দেখা যায়, তার আরম্ভ নন্দলাল হইতে।

বাংলার এই নয়া শিল্পীদের গোড়াপত্তন করিয়াছেন অবনীন্দ্রনাথ ত্রিশ বৎসর পূর্বে। অবনীন্দ্রনাথ গোড়ার দিকে লিখিয়াছিলেন “ভারতীয় শিল্প”। তার ভিতর একটা রক্ষণশীলতার ভাব লক্ষ্য করা যায়। তখন হয়ত এরূপ গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল—নয়া পদ্ধতিকে প্রকাশের জগু। এখন “ইণ্ডিয়ান আর্ট” এই নামের আওতায় অনেক আগাছা জন্মিতেছে। যে-সব চিত্র বাহির হইতেছে, তাহার ভিতর না-আছে মৌলিকতা, না-আছে রেখা বা বর্ণের সৌন্দর্য্য। তাহার ভিতর কোনো অস্থূলন নাই; অস্থূলক্ষিৎসা নাই, পর্য্যবেক্ষণ নাই—আছে কেবল মান্যারিজ্জ্ বা মূজাদোষ। যে-সব বিষয় লইয়া চিত্র রচনা করা হয়, আমাদের প্রাত্যহিক জীবন ও চারি দিকের আবেষ্টনের সঙ্গে তাহার কোনো সম্বন্ধ নাই। কল্পনার অসংযত দৌড় তাহাতে খুব বেশী। বর্তমানের অনেক চিত্র বেশী দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। শক্তি কোথায় মিলিবে? প্রকৃতির ভিতরে শক্তি মিলিবে। শিল্পী প্রকৃতির ক্রোড়ে ফিরিয়া গেলেই নবজীবন ও নবচেতনা লাভ করিবে। এই যে প্রকৃতির

ভিতর ফিরিয়া যাওয়া—Back to Nature—এর নীতি - এর থেকে উৎপত্তি “রোমান্টিসিজম্” ইউরোপে উদ্ভূত রেনেসাঁর শিল্প ক্রমশঃ বহু বিদ্যায় ভারাক্রান্ত প্রাণহীন ইণ্টেলেক্চুয়ালিজম্ দ্বারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রকৃতির ভিতরে শিল্পীরা পাইল সহজ সরল মুক্তির আশ্বাদ।



কুকুরছানা

অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্পে যদি রেনেসাঁ আনিয়া থাকেন, তবে নন্দলাল আনিয়াছেন রোমান্টিসিজম্। নৈসর্গিক যে-সব চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন বা স্কেচ করিয়াছেন, তাহাতে তাহার উদাহরণ মিলিবে। এ-বিষয়ে একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ “প্রত্যাবর্তন” নামে একটি বড় পেন্সিল ড্রয়িংয়ের চিত্র। সাঁওতাল পুরুষ বহুদিন পরে প্রবাস হইতে ফিরিয়াছে, দরজায় দাঁড়াইয়া স্ত্রী, বিশ্বয়বিমুগ্ধ, আনন্দের আতিশয্যে বাক্য আর সরে না। অবনীন্দ্রনাথ স্বহস্তে এর নীচে নিজের গান লিখিয়া দিয়াছেন—“ফিরে চল মাটির টানে।” সমস্ত ছবির স্বর যেন এই গানের ভিতর পাওয়া যায়, আর রোমান্টিসিজমের উদ্দেশ্যই এই—“ফিরে চল মাটির টানে” Back to Nature—শিল্পের বন্ধনমুক্তি হইবে মুক্ত আকাশে, প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে।

“ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি” সৃষ্টি করিয়াছেন অবনীন্দ্রনাথ, তাকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন নন্দলাল। এ-সময়ে নন্দলালের সম্বন্ধে যে আলোচনা হওয়া উচিত তা বলাই বাহুল্য।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে খড়্গপুরে নন্দলালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ছিলেন সেখানে দ্বারভাঙ্গা ষ্টেটের ম্যানেজার। তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা হয় খড়্গপুরের মিডল ভানিকুলার স্কুলে। পনের বছর অবধি এখানে কাটে; হিন্দী ভাষাতেই

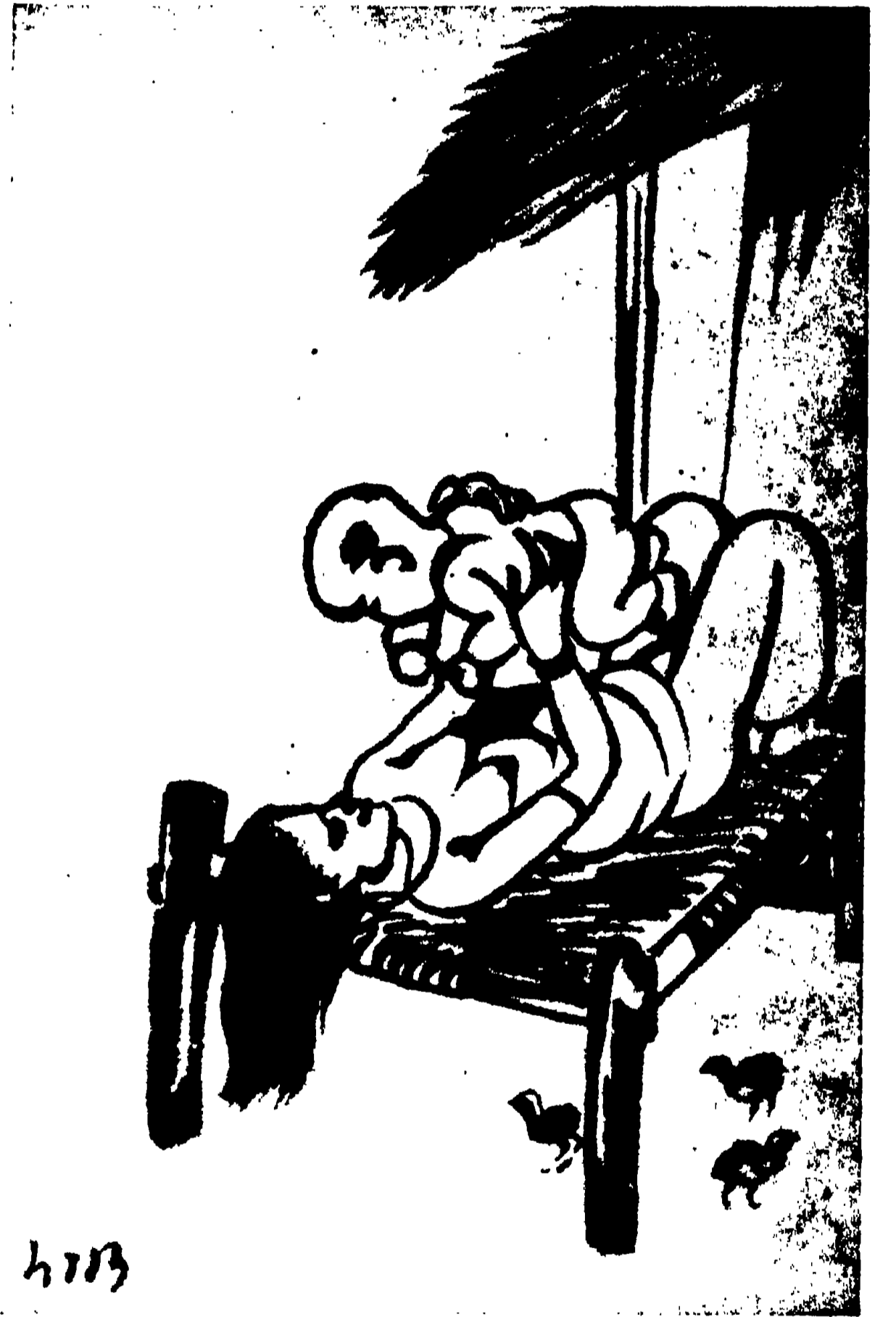


বানরওয়াল

শিক্ষা পাইয়া থাকেন। এই স্কুল হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতায় স্কুদিরাম বোসের স্কুলে (সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল) ভর্তি হন—এখানে কুড়ি বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। একুশ বছরে তাঁর বিবাহ হয়।

ইহার পর তিনি আর্ট স্কুলে ভর্তি হইবেন স্থির করিলেন, কিন্তু অভিভাবকদের অসম্মতি মিলিল না, তাঁহাকে বি-এ পাস করিতে হইবে। তিনি জেনেরাল এ্যাসেম্বলীতে এফ-এ ক্লাসে ভর্তি হইলেন। এফ-এ ফেল করিয়া মেট্রোপলিটন কলেজে (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) ভর্তি হইলেন,

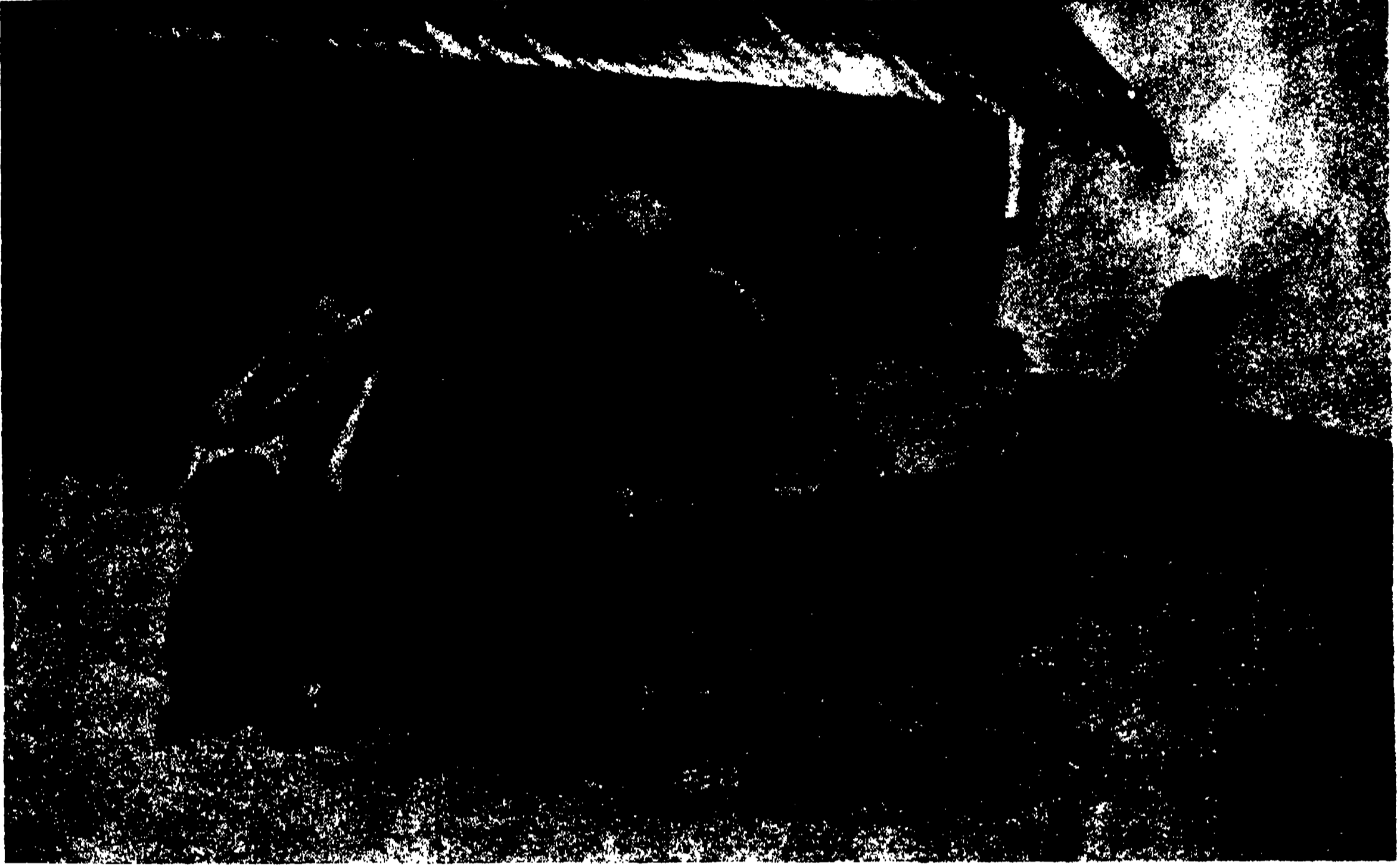
এখানেও এফ-এ ফেল করিলেন। দাদাখণ্ডুর মশায় ছিলেন অভিভাবক, তিনি বেলগাছিয়ার আর. জি. করের মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হইতে বলিলেন। নন্দলালের মেডিক্যাল কলেজ ভাল লাগিল না। প্রেসিডেন্সী কলেজে তখন কমার্শ্যাল (বাণিজ্য-বিষয়ক) ক্লাস ছিল, মিঃ চ্যাপম্যান ছিলেন তার প্রিন্সিপাল; তিনি সেখানে ভর্তি হইলেন। ছয় মাস ছিলেন সেখানে—কিন্তু পড়াশুনা কিছুই করেন নাই, বইও কেনা হয় নাই, ছয় মাসের মাহিনাও দেওয়া হয় নাই। তখন ভর্তির ফি দিলেই কলেজে প্রবেশ করা যাইত। তিনি মাহিনার টাকা দিয়া হারিসন রোডের মোড়ে পুরাতন বইয়ের দোকান হইতে ছবির ম্যাগাজিন কিনিতেন।



৫১১৩

সাঁওতাল-জননী

কমার্শ্যাল ক্লাসে যখন কিছু হইল না, দাদাখণ্ডুর মশায়কে বার দফা দিয়া এক চিঠি লিখিলেন—(১) কমার্শ্যাল ক্লাস ভাল লাগে না; (২) ক্লাক হইলে বড়-জোর ঘাট টাকা রোজগার করিবেন, কিন্তু আর্টের লাইনে গেলে এক শত টাকা মাসে



চিত্রকর

নিশ্চয়ই রোজগার হইবে ইত্যাদি। আর্টস্কুলে ভর্তি হওয়ার অমুমতি আসিল। কিন্তু এর আগেই তিনি আর্ট স্কুলে ভর্তি হইয়া গিয়াছেন। অবনীন্দ্রনাথের চিত্র 'বুদ্ধ ও স্বজাতা' এবং 'বজ্র মুকুট' পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। এই চিত্র দেখিয়া এণ্ট্রান্স পাস করার পরই তিনি স্থির করিয়াছিলেন অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য হইবেন। একদিন তিনি অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন; সঙ্গে ছিল নিজের আঁকা কয়েকখানা চিত্র—রাফায়েলের মেডোনার নকল, সস্ পেন্টিং, গ্রীক মূর্তির নকল, still life painting ও কাদম্বরীর চিত্র। অবনীন্দ্রনাথ চিত্র দেখিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন—“ইস্কুল পালিয়ে আসা হয়েছে?” উত্তর, “না, এণ্ট্রান্স পাস করে এসেছি।” “বিশ্বাস হয় না, সার্টিফিকেট দেখতে চাই।” নন্দলাল সার্টিফিকেট দেখাইয়া ভর্তি হন।

আর্ট-স্কুলে অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালকে হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন; হ্যাভেল নন্দলালের চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হন। ঈশ্বরীবাবুর নিকট ডিজাইনের ক্লাসে নন্দলাল ভর্তি হইলেন। তিনিই ডিজাইনের ক্লাসে প্রথম ছাত্র। তখন এই বিভাগের ছাত্রেরা stained glass

stencilling ও jesso work করিত। নন্দলাল কতক সময় করিতেন ডিজাইন, কতক সময় কারিগরের কাজ—কাঁচ কাটা ইত্যাদি।

ভর্তির সময় ঈশ্বরীবাবু পরীক্ষা করিলেন, গণেশ আঁকিতে দিলেন; নন্দলালের কাজ দেখিয়া অবনীন্দ্রনাথ বলিলেন, “হাত পোক হ্যাং।” হরিনারায়ণবাবুর কাছে মডেল ড্রয়িংয়ের পরীক্ষা হইল। টেবিলের উপর কুঁজা, বাটি সাজান। হরিনারায়ণ বাবু ঘড়ি ধরিয়া বলিলেন, “সব পনের মিনিটের মধ্যে আঁকতে হবে।” নন্দলাল দুই ইঞ্চি জায়গার ভিতর সব আঁকিয়া দিলেন পাঁচ মিনিটের ভিতর। হরিনারায়ণবাবু বলিলেন, “ও, তুমি ফাঁকি দিয়েছ, ও-সব হবে না।” অবনীন্দ্রনাথ বলিলেন, “ঠিক হয়েছে—সবই তো আছে।”

ভবিষ্যতের “ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির” বীজ উণ্ড হইল, একা নন্দলালকে লইয়া কাজ আরম্ভ হইল।

বাল্যে নন্দলালের কাজ আরম্ভ হইয়াছিল মূর্তি-নির্মাতা রূপে। খড়াপুরে থাকিতে তিনি কুম্ভকারের কাজ দেখিয়া মৃগয়-শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হন। চিত্রাঙ্কনের পূর্বে তাঁহার মূর্তিনির্মাণ শিক্ষা আরম্ভ হয়। কলিকাতায় আসিয়া

স্কুলে পড়িবার সময় তিনি ড্রয়িং ক্লাসেই সর্বপ্রথম ছবি আঁকিবার উৎসাহ পান। কলেজে ভর্তি হইলে ওয়ার্ডসওয়ার্থের যে কবিতার বই পড়ানো হইত তাহার পাতার দুই পাশে বর্ণনীয় বিষয়ের ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন।

নন্দলাল আর্ট-স্কুলে পাঁচ বছর ছিলেন, সেখানে মাছিনা



হরিণ

দিতে হইত না। বছর দুই পরে বার-তের টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতে থাকেন।

ক্লাসে সর্বপ্রথম তিনি যে চিত্র অঙ্কিত করেন তাহার বিষয়—বুদ্ধ হাঁস কোলে করিয়া বসিয়া আছেন। তিনি হাঁসের পা আঁকিয়াছিলেন গোল, অবনীন্দ্রনাথ শুদ্ধ করিয়া দেন। ছাভেল সাহেব এই ছবি দেখিয়া খুব খুশী হন, আর বলেন, “বেশ হয়েছে, বেশ অর্নামেন্টাল ছবি।” নন্দলালের আর্টস্কুলে আসার আট-দশ মাস পরে ছাভেল সাহেবের মস্তিষ্ক বিকৃত হয়। তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে অবনীন্দ্রনাথ চার বছর অস্থায়ীভাবে প্রিন্সিপালের কাজ করেন। বাঙালীকে এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত করা তখন সরকারের নীতিবিরুদ্ধ ছিল।

অবনীন্দ্রনাথ স্কুলে বসিয়া নিজে ছবি আঁকিতেন, তাহাতে ছেলেদের ভাল শিক্ষা হইত। তাঁহার প্রথম ছবি “বঙ্গমাতা” বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে আঁকা স্বদেশী ভাবের ছবি।

আর্ট-স্কুলে আঁকা নন্দলালের ছবি সতী, শিবসতী, কর্ণ, তাণ্ডবনৃত্য, বেতালপঞ্চবিংশতি, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয় ইত্যাদি।

মোগল চিত্র সকল এখন ঘাছঘরে থাকে, আগে এগুলি ডিজাইনের ক্লাসে টাঙান থাকিত। এই ছবির চার পাঁচখানা নন্দলাল নকল করেন। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের প্রদর্শনীতে শিবসতী চিত্রের জন্য তিনি পাঁচ শত টাকা পুরস্কার পান। এই টাকায় তিনি মথুরা অর্বাধ ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

যখন আর্ট-স্কুল ত্যাগ করেন, তখন পার্সি ব্রাউন সাহেব স্কুলের প্রিন্সিপাল। তিনি বলিলেন, “এখানেই কাজ কর, এখানে জায়গা পাবে।” অবনীন্দ্রনাথও ডাকিলেন তাঁর বাড়িতে থাকিয়া কাজ করার জন্য। নন্দলাল ব্রাউন সাহেবকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অবনীন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণই গ্রহণ করিলেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁহাকে ষাট টাকা করিয়া একটা বৃত্তি প্রায় তিন বছর দিয়াছিলেন। এ সময়ে নন্দলাল নিবেদিতার *Indian Myths of Hindoos and Buddhists* পুস্তকের চিত্র আঁকেন। ডক্টর আনন্দ কুমারস্বামী আসিয়া অবনীন্দ্রনাথের বাড়িতে ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের সংগ্রহে যে প্রাচীন চিত্র আছে তাহার তালিকা করিতে নন্দলাল সাহায্য করেন।



ছাগলছানা

বিলাত হইতে লেডী হেরিংহাম আসেন অঙ্কটার প্রতিলিপি লওয়ার জন্য। নন্দলাল এবং অসিতকুমার হালদারকে অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কটার পাঠান, পরে আসিয়া জুটিলেন ভেঙ্কট আপ্পা এবং সমর গুপ্ত।

অষ্টার এই অভিযান নূতন পদ্ধতিকে একটা স্থনির্দিষ্ট পথ দিয়াছে।

অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যমণ্ডলী শিল্পীদের একটা উপনিবেশ স্থাপন করার জল্পনা-কল্পনা করিতেছিলেন। বাড়িও একটা দেখা হইয়াছিল। এমন সময় রবীন্দ্রনাথের ডাক পড়িল। ১৯১৬ সনে কবি জোড়াসাঁকোর নিজ বাড়িতে “বিচিত্রা” স্থাপন করেন। শিল্প কারুকার্য প্রভৃতির সৌকর্যার্থ এই



গরু

“বিচিত্রা” মণ্ডলীর উদ্বোধন। নন্দলাল, অসিতকুমার হালদার, মুকুল দে ও সুরেন্দ্রনাথ কর বিচিত্রার শিল্পী নিযুক্ত হইলেন। সকলের ষাট টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি নির্দিষ্ট হইয়াছিল। মুকুল দে তখন আমেরিকা জাপান ঘুরিয়া আসিয়াছেন।

জাপানের খাতনামা শিল্পী আরাই সান এ-সময়ে কলিকাতায় আসেন। তিনি বিচিত্রার অতিথি ছিলেন।

বিচিত্রা উঠিয়া যাইবার পর নন্দলাল শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর মহাশয়ের পত্নী প্রতিমা দেবীর শিক্ষকতার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। এর পরে তিনি নিজের দেশে হাওড়া জেলায় রাজগঞ্জ গ্রামে অবস্থান করেন। এ-সময়ে আঁকেন আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের বাড়ির জন্ত মহাভারতের চিত্র ও তাঁর ল্যাবরেটরীর চিত্র। দেশে অবস্থানকালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। বিশ্বভারতী স্থাপিত হইলে নন্দলাল কলাভবনের অধ্যক্ষ হইয়া আসেন—



শান্তিনিকেতনের গল্পকথক

পূর্বে কিছুদিন কলিকাতায় ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির অধ্যক্ষ ছিলেন।

শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে নন্দলালের জীবনের এবং কর্মধারার এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। শিল্পী-জীবনের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে তাঁহার মানবতা ও আদর্শবাদ। তাঁর ত্যাগ ও জীবনের সাধনাকে অবলম্বন করিয়া শিল্পের কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে।

অর্থলিপ্সা তাঁহাকে সাধনা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে

নাই; বাজারের চাহিদা অনুযায়ী শিল্প সৃষ্টি করিয়া তিনি শিল্পকে সস্তা ও খেলো করেন নাই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণ যেমন শিল্পের নূতন ধারার, নূতন অভিব্যক্তির প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার শিল্পেও তেমনি নূতনের অভিব্যক্তি আছে। তাঁহার শিল্পে ভারতের শিল্পযুগের নূতন অধ্যায় সূচিত হইবে। তিনি “সিদ্ধ শিল্পী”।

নন্দলালের অসামান্য প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া বাংলার নানা

জেলা হইতে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে, অন্ধ্র তামিল, মালাবারী, মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাটী, রাজপুত ছাত্র আসিয়াছে। এমন কি সুদূর সীমান্ত-প্রদেশ, সিংহল ও জাভা হইতেও ছাত্র আসিয়াছে।

নন্দলালের বহুমুখী প্রাতিভা শুধু শিল্পসৃষ্টিতে নিঃশেষিত হয় নাই, তিনি শিল্পীও সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য-মণ্ডলী কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহা স্বীকার করিবে।

একটি মেয়ে

শ্রী দ্বিজেন্দ্রলাল ভাট্টা

“হচ্ছে কি?”

প্রশ্ন থেকেই বুঝতে পারছেন, যিনি প্রশ্নকর্ত্রী তিনি হচ্ছেন শাস্ত্রমতে আমার হৃদয়-মনের অধীশ্বরী আর লোকমতে আমি তাঁর খুঁটিতে বাঁধা, একান্ত তাঁরই বলে ছাপমারা একটি বুদ্ধিহীন জীববিশেষ।

স্থানটি হচ্ছে ছাদের ঘর। একটা টেবিল—তার ওপর কাগজ ছড়ানো, এক দিকে একটা দোয়াত আর এক দিকে একটা কলম। আমার সামনেই খোলা জানলা এবং জানলার ঠিক পাশেই একটা আয়না। আয়নার ওপর একটু চোখ ঘুরিয়ে নিলেই দেখা যাবে, আমার পিছনে দাঁড়িয়ে শাড়ীবেষ্টিত একটি নারীমূর্তি এবং তাঁর চোখের কোণে অর্থাৎ অপাঙ্গে একটু বক্ররেখা।

“দেখতেই পাচ্চ।”

বেশ সহজ ও মোলায়েম কণ্ঠস্বরে প্রত্যেক বর্ণটি স্পষ্ট করে উচ্চারিত উত্তর।

আয়নায় দেখা গেল, রেখার বক্রিমতা বেড়েছে, আশেপাশে সঙ্গী দেখা দিয়েছে।

“ব’সে ব’সে কুঁড়েমি করে সময় কাটাতে লজ্জা করে না?”

“উপায় কি?”

“বলতে লজ্জা করল না? রোজ খানিকক্ষণ করে ছেলেমেয়েদের ধরলেও ত সংসারের একটু আয় দেখে—”

তারপরেই যে আওয়াজটা সহসা খর হতেই ক্ষীণ হয়ে

মিলিয়ে গেল তার নাম দেওয়া যেতে পারে স-রাগে স-শব্দে দ্রুত প্রশ্বাস।

প্রিয়া দিয়ে গেলেন একটা আর্থিক তত্ত্ব। টংকা আনা পাইয়ের হিসাব ক’ষে এর ওপর একটা বড় প্রবন্ধ লেখা চলে। আমার মত নিষ্কর্মা ব্যক্তির তাই কর্তব্য এবং তারপর তার জ্ঞে অনুশোচনা করা। কিন্তু সামনের এই জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে গাঢ় নীল রঙের একটুখানি আকাশ আর তারই এক কোণায় একটি ছোট্ট নক্ষত্র, সঙ্ঘার আভাসে অস্পষ্টভাবে ঝিকমিক করা শুরু করেছে। অর্থশাস্ত্রের কেতাবে নক্ষত্রদের কোনো কথাই লেখা নেই।

তাই ভাবচি—কাগজ, কলম, দোয়াতও সামনে হাজির—

হঠাৎ দেখা গেল, মনটা হয়ে উঠেছে রূপকথার সেই অতি বৃহৎ পাখীটির মত, আকাশের বুকে বিশাল পক্ষপুট বিস্তার করে উড়ে চলেচে ওই নক্ষত্রলোকটি লক্ষ্য করে। পৃথিবীর লতা পাতা গাছ, ঘর বাড়ি ছাদ, মানুষ পশু পাখী, তাদের অসংখ্য বিচিত্র কলকাকলি—সবই একে একে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাচ্ছে। তারপর নক্ষত্রলোক পৌঁছে জানা গুটিয়ে স্থির হয়ে বসল ওর ছাদে। বসে বসে সন্নেহে নিরীক্ষণ করতে লাগল তার পরিত্যক্ত নিশ্চিহ্ন-জীবন পৃথিবীটাকে।

দেখতে লাগল একটা অত্যতিবৃহৎ অগ্নিমণ্ডলকে পরিবেষ্টন করে ঐ মাটির তাল জড়পিণ্ড পৃথিবীটা বিপুল বেগে

ঘুরচে। একটা নিরুদ্দেশ অন্ধ গতি। ছুটচে আর তার সঙ্গে বোধ করি একটু তুলচেও।

আরও পরে দেখা গেল, ঐ চলন্ত পৃথিবীর বুকে অকস্মাৎ জেগে উঠেচে একটি মুখ। একটি মেয়ের মুখ। কবি-প্রসিদ্ধ উপমায় বলা যায়, পদ্মপত্রের ঢাকা সরোবরের মাঝখানে ফুটে উঠল কমলদল, যেন অরুণোদয়ে একটি মাত্র সদাফোটা সূর্যমুখীর নিঃশব্দ নিরাড়ম্বর প্রণতি।

একটি মেয়ের মুখ। ডাগর ডাগর দুটি চোখ। চোখের তারা স্থির থাকলেও মনে হয় যেন ওর চাঞ্চল্য ঐ শৈশব্য উপচে বেয়ে পড়চে। পাতলা দুটি ঠোঁট, লাল টুকটুকে। গাল দুটি ঈষৎ ভারি, ওর হাসিভরা মুখে সর্কদাই টোল খেয়ে আছে। একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কালো চুল, কান ঢেকে ঝুমকোর মত ঝুলচে।

কেউ কেউ মনে করচেন, শুধু প্রেম করার জন্মেই বৃষ্টি ওকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে-কথা এখনও ঠিক ক'রে বলতে পারচিনে; তবে প্রেম করার বয়সে ওর প্রেমে হয়ত অনেকেই পড়বে,—সে-বয়সে পৌঁছুতে ওর ডের দেরি। ওর গলায় ঐ যে ছোট্ট ভাঁজের রেখাটি দেখা যাচ্ছে, বয়স-কালে ওটি হয়ে উঠবে আশ্চর্য্য বস্তু; তখন মনে হবে এই পেলব রেখাটির আদেশ সব চেয়ে কঠিন আর অনতিক্রম্য।

ওর গায়ের রং চাঁপার মত হওয়াই উচিত। সত্যিই তাই; চাঁপার মত নরম, মসৃণ, আলো-করা। ও যখন বড় হয়ে ব্রীড়ায় মুখ নেবে ঘুরিয়ে, তখন ওর গণ্ডে দেখা দেবে রক্তোচ্ছ্বাসের প্রাণব্যাঞ্জনা। সেই জন্মেই ত ওর রং হয়েছে অত গৌর আর ও হয়েছে গৌরী।

বিরল বিজ্ঞান প্রান্তে ফুলের মত ছোট্ট একটি মেয়ে অকারণ খেলায় সর্কক্ষণ মত্ত, খলখলিয়ে হাসে, আপন মনে মাথা নাড়ে, চুলগুলো এসে পড়ে কানের ওপর, চোখের ওপর, আর সেই সঙ্গে ছলে ওঠে সমগ্র পৃথিবীটা। নিরীকরণীর মত ওর হুরস্তু চাঞ্চল্য, কুলের সীমানা পেরিয়ে দূর দিক্চক্রবালে তার আভাস যায় হারিয়ে।

ওকে দেখে আমার মনটা খুশীতে ভ'রে উঠেচে। আমার ইচ্ছে করচে ওকে ডেকে ওর সঙ্গে দু-দণ্ড আলাপ করি।

“ও খুকী, ও খুকী, শোনো।”

ও চোখ তুলে চাইলে।

“তোমার নাম কি খুকী?”

ভ্রুকুটি ক'রে তাকিয়ে ও বললে “খ্যোত, বলব না।” তার বলার ভঙ্গীটা এই যে, নাম জিজ্ঞাসা করলেই যে বলতে হবে তার কোনো মানে নেই।

“ও খুকী, শোনই না। তুমি কি খেলা খেলচো?”

“বেশ করচি”—ব'লেই সে দিল ছুট।

ও আমার সঙ্গে ভাব করতে চায় না।

এতক্ষণ ওই ছিল আলো ক'রে, আর চারপাশে অন্ধকার, — কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এখন দেখা গেল ওর বিধবা মাসী বলচেন, “কোথায় ছুটে চল্লি ওরে হতভাগী মেয়ে? তোমরা কি কেউ গৌরীকে একটুকুও শাসন করবে না?...”

তোমরা অর্থাৎ গৌরীর মা ও পিসি ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, “মেয়েটা গেল কোথায়? আন তো ধরে—”

গৌরী ততক্ষণে বৃদ্ধ ঠাকুরদাদার আশ্রয় নিয়েচে। প্রশ্ন করচে, “দাদু, তোমার মাথায় নোংরা কেন? কালো-কালো চুল তুলে দেবো?”

গৌরী বড়ই চঞ্চল, বড়ই অস্থির। ওর মা-পিসি-মাসীরা সর্কক্ষণ ওকে নিয়েই ব্যস্ত। বাপও চিন্তিত,—“তাই তো মেয়েটা বড় হ'লে . . .”

বাড়িতে ছেলেমেয়ের অভাব নেই, কিন্তু তাদের সঙ্গে গৌরীর বনে না, বড়র শাসন মানতে চায় না, বরঞ্চ উন্টে ও-ই করতে যায় শাসন। যেমন হুরস্তু তেমনি অবাধ্য মেয়ে। দয়ামায়া যেন ওর মধ্যে স্থান পায় নি, স্বেযোগ পেলেই ভাইবোনদের ধ'রে অকারণেই মারে।

তবু সর্কক্ষণই ও কৌতুকে ভরা। কেউ আছাড় খেতে পড়লে ও ওঠে খলখলিয়ে হেসে, যেন লোকের আছাড় খাওয়া ওর হাসির খোরাক যোগান দেওয়ার জন্যেই।

নোংরায় ওর বড় ঘেন্না। কারুর নাকে সর্দি ঝরতে দেখলে ওর গা বমি-বমি করে, তাই মলমূত্রের ত্রিসীমানা দিয়ে যায় না। মাসী পিসি রেগে আঙুন হয়ে বলেন, “ওরে হতভাগি, মেয়ে হয়ে জন্মালি কেন?”

গৌরী উত্তর দেয়, “বেশ করেচি, খুব করেচি।” ওরা করেন জোর, মেয়ে দাঁড়ায় বঁকে। মা মঙ্গলচণ্ডীর পায়ে গৌরীর মা প্রণতি জানান, “হে মা মঙ্গলচণ্ডী, মুখ তুলে চেয়ো. বয়সকালে মেয়ের বুদ্ধিবুদ্ধি শুধরে দিও।”

গৌরীর দোষ অনেক, তবুও ওকে আমার খুব ভাল লাগে। পিসি-মাসীর কাছে ওর যা দোষ, সুদূর নক্ষত্রলোকে বসে আমি দেখি, তাই যেন মুক্তির হাসির টুকরো। ওর যত কিছু মাধুর্য ওর অস্থিরতায়। ওর চঞ্চলতা দিকদিগন্তে প্রাণের ঢেউ তোলে। ও যেন একটা জাগরণ, একটা অবিচ্ছিন্ন মিষ্টি হাসি, ভোরের ঝরণার কলকলানির সুর। তাই পুতুলখেলায় ওর মন বসতে চায় না, ও চায় প্রাণের আনন্দে অকারণে ছুটে বেড়াতে বন-হরিণীর মত। ওকে কি বাঁধা যায় ?

তবুও গৌরী হ'ল বড়, শিখল কিছু লেখাপড়া, অনিচ্ছা সত্ত্বেও নামলো ঘরকন্নার, রান্নাবান্নার কাজে। কিন্তু ঘেমা তাকে ছাড়ল না, নোংরা পরিষ্কার করতে হলেই ও এখনও বসি করে। সুযোগ পেলেই ছুটু মিও করে। পেয়ারাগাছে যে ছেলেটা ওঠে তাকে ও ক্লেপায়, আবার তার সঙ্গে ভাব ক'রে পেয়ারা পাড়া শিথিয়ে দিয়ে ভাগ বুঝে নেয়। ছোট ভাইবোনদের ওপর তেমনি কঠিন শাসন চলে, তারপর মুখ বুজে বকুনি ঝায়।

ওর দেহে পড়চে আঁট-স টি-বাঁধন, চলন হ'তে শুরু করেচে ভারী, ঘরে হ'তে চলেচে বন্দিনী। তবুও ওর মনটা আছে ছাড়া; জানলার ধারে, চিকের ফাঁকে, ছাদের উন্মুক্ততায় ও পায় মুক্তি; ওর মন আকাশে ডানা মেলে উড়ে বেড়ায় প্রাস্তরে প্রাস্তরে খুশী বিলিয়ে।

তারপর একদিন বাজল সানাই করুণ সুরে। আলো ও কোলাহলের মধ্যে দিয়ে একরাতে গৌরীর আঁচলটি বাঁধা পড়ল এক তরুণের উত্তরীয়ে। মেয়ে চলেচে অচেনা অজানা ঘরে। মা ঘুরেফিরে চোখের জলে ভিজে বারংবার উপদেশ দেন, “দেখিস মা, জোরে হাসিস না, শাশুড়ী ননদের কথা শুনে চলবি, মুখটি বুজে সব কাজ করবি”—ইত্যাদি।

গৌরী এল খুশুরবাড়ি। ওর একদিকে শাশুড়ী, জা, ননদ; আর একদিকে খুশুর, ভাসুর, দেওর; তার সঙ্গে উৎসুক দাসদাসীর দৃষ্টি আর প্রতিবেশীদের নানা মন্তব্য। তাই ওকে এখানে পা ফেলতে হয় গুণে গুণে। অবগুষ্ঠনে আবৃত রাখতে হয় ওর আকাশে-ওড়া চঞ্চল দৃষ্টি।

গৌরীর বর দেখতে মন্দ নয়, স্ত্রীই বলা চলে। এরই মধ্যে

গৌরী বরের চলনের ছন্দ, পায়ের শব্দ চিনে ফেলেচে। তার আভাস কানে গেলেই ও হয় খুব জড়ো-সড়ো, হাতের চূড়ী অকারণে বেজে উঠে ওর অবস্থিতি আনিয়ে দেয়। ননদেরা হেসে পরম্পরের গায়ে গড়িয়ে পড়ে। উদ্যত হাসি চাপতে গৌরী ওষ্ঠাধর দাঁতে চেপে ধরে।

আমার চোখ জলে ভরে উঠতে চাইচে। চাঞ্চল্যের ধারা বন্দিনী হয়ে হয়েছে বুঝি ফস্তু !

মহাশূণ্ডের দিকে তাকিয়ে আমি ভাবচি, প্রাণ ত পড়ল বাঁধা, ওর আকাশ কি আর থাকবে তেমন বড়, তেমন দিগন্ত-প্রসারিত ? সেখানে কি আর মেঘের গায়ে অহেতুক রঙের লীলা দেখতে পাব ?

রাত্রে গৌরীর বর আসে ওর গা-ঘেঁষে, কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে, “তোমায় আমি খুব ভালবাসি, গৌরী— খুব ভালবাসি।..”

এই সুযোগে অতি সজোপনে ও বরকে চিম্টি কাটে। “ওঃ,” বলে ওর বর সুরে যায়। ও খুব ব্যস্ত হয়ে বলে, “কিছু কামড়ালো নাকি ? ওমা, বিছে এল কোথেকে ?”

ওর বর লাফিয়ে খাট থেকে নেমে পড়ে। আর সেই সঙ্গে ওর চাপা হাসির ফিন্কে ছোট্টে, ঘরের বন্ধ বায়ু আলোড়িত হয়ে ওঠে, বরটির প্রাণে পুলকের কাঁপন ধরে।

কখনও দেখা গেল বরটি এসে ওর আঁচলটি চেপে ধরেচে, আর ও জোর ক'রে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টায় বলচে, “আঃ, কি যে করো ! ছাড় বলচি এখুনি, এখুনি—”

“আচ্ছা চললুম, আর কথুখনো আসব না—” বর যাচ্ছে দরজার দিকে। আর ও তার হাত ধ'রে টেনে আনতে আনতে বলচে, “ঈস, ভারী যে তেজ। কই যাও দিকি— দেখি কেমন পার—”

এমনিতির কত ব্যাপার। কপট ক্রোধ, ভুরুর শাসন আর মান-অভিমানের মায়ামেলা। বন্ধ ঘরের অল্প পরিসরে আজ গৌরী পায় তার মুক্তি। বাইরের আকাশ গাছপালার ইসারায় আর সাড়া দেয় না, ঐ এক টুকরা ঘরের জন্তেই ওর মন থাকে উন্মুখ। ও ঘরে ও ফেটে পড়ে হাসিতে, ঘরের দেয়াল ভেদ ক'রে তা আর দিকচক্রে রঙ ধরায় না। ওর যতকিছু কৌতুক, রঙ্গ, খেলা—সবই এখন

ঐ একটি লোককেই কেন্দ্র ক'রে। ঐ লোকটি আজ হয়েছে ওর আকাশ, হৃদয়ের স্বর অকারণ খেলার ডাক। আমার মনে পড়েছে, কালো চুলের রাশি নিয়ে এই চঞ্চলাই একদিন মাথা দুলোতো আর তালে তালে ছলে উঠত পৃথিবী, সমগ্র বিশ্বলোক। অগোছালো চুলের রাশি বাধা পড়েছে কৃষ্ণসর্পিণীর বেণীতে, যার দোলনে ঢেউ ওঠে ঐ একটি লোকেরই বুক। বিশ্বলোকের কথা কি আজ ও তুলল ?

একটা কিছু ঘটেছে। গৌরী অত্যন্ত প্রবল হয়ে আপত্তি জানায় যদি ওর জা বলে, “তোমার কিছু হয়েছে বাপু গৌরী।” আপত্তির ভঙ্গীটা সম্পূর্ণ নতুন, ওর ছেলেবেলাকার মোটেই নয়। এ পর্যন্ত ওর তছদেহটি ঘিরে রয়েছিল পুষ্পসৌরভের অপূর্ণ রহস্য; বাধনের সে আঁট যাচ্ছে খুলে, ফল সম্ভাবনায় হয়ে আসচে নত, যেন মধ্যাহ্নের ধানের ক্ষেতে কালো মেঘের লঘু ছায়া।

দিন এল। গৌরীর সেই ডাগর ডাগর চোখ দুটি ভ'রে উঠল জলে।...আমি এখানে বসেই শুনতে পাঁচ নক্ষত্র-লোকের চেয়ে বহুদূরে ঐ নীহারিকাপুঞ্জ ঢাকা কোনো এক অচেনা অজানা দেবতার কাছে ও প্রার্থনা জানাচ্ছে, “আর যে আমি সহিতে পারচি না ঠাকুর।...আমায় মুক্তি দাও, মুক্তি দাও...”

কি করণ আর্তনাদ !

গৌরী নিশ্চয় মরতে বসেছে। দেখছিলাম ও মবছিল তিলে তিলে, ক্ষয়ে ক্ষয়ে; এবার মরবে সত্যি করেই।

একটি ঘরে গৌরী আছে শুয়ে। ওর পাশেই বিছানায় ছোট্ট একটি ছেলে,—অতি ক্ষুদ্র মানবক। আমি ঘরের অস্পষ্ট আলোর স্রোত নিয়ে ওর কানে কানে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলুম, “গৌরী, তোমার হ'ল কি ?”

ও হাসল। আমার চোখে ওর এই স্নিগ্ধ হাসিটি ঠেকলো ম্লান। বলল, “আমার ছেলে হয়েছে—” ব'লে ঐ ছোট্ট শিশুটিকে কাছে টেনে নেবার চেষ্টায় হাত বাড়াল। হাতের রেখায় দেখলুম সর্কালের স্বকঠিন বাধা রূপ নিয়েছে একটা নিবিড় স্নেহে।

“দেখেচ, কেমন পিট পিট ক'রে চাইছে। ওর নাকটি হয়েছে ঠিক ওর বাপেরই মত।”—গৌরীর গণ্ডে রক্তোচ্ছ্বাস খেলল।

কত আশাই ছিল, ওই চম্পকবর্ণে দেখা দেবে শোণিত-রাগের লীলায় প্রাণের বাজনা। আজ দেখলুম, শুধু উচ্ছ্বাসই আছে, বাজনা নেই, রূপ উপচে ওঠে না, শীতের নদীর শীর্ণতার মত শান্ত, ধীর, শীতল। ওর চঞ্চল চোখ আজ হয়েছে স্থির, সেখানে নেমেছে কালো গভীরতা, একটা কাজল মায়া।

মরণ আর কা'কে বলব ? আমি স্পষ্ট দেখছি গৌরীর চিতার অগ্নিশিখা উর্দ্ধমুখী হয়েছে।

ছেলে কোলে ক'রে গৌরী বাপের বাড়ি ফিরেছে। পিসি-মাসী-মায়ের মুখে আর হাসি ধরে না। ভাইবোনের আবদার আজ ও হাসিমুখে সহ্য করে, বাপকে জল দেবার সময় ভাল ক'রে দেখে জলে কিছু পড়েছে কি-না।

গৌরীর পিসি শোনাচ্ছেন গৌরীর মাসীকে, “তখুনি আমি বলোছিলুম, ছেলেপিলের মা হ'লে এতটা ঘেমাপিস্তি আর থাকবে না। দেখলে ত...”

আর ওর মা মনে মনে নীরব প্রগতি জানাচ্ছেন, “মা মঙ্গলচণ্ডী, মুখ রেখেচ।”

নক্ষত্রলোক থেকে আমি যে-গৌরীকে দেখেছিলুম সে-গৌরী আজ মরে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে। এ গৌরী আর একটি মেয়ে। কি আশ্চর্য, পিসি মাসী মায়ের দল বুঝতে পারচে না, ও তাদের সেই ছোট্ট গৌরীটি নয়, সেই দেহে অগ্নি কেউ,—সম্পূর্ণ আলাদা আর একটি মেয়ে !

মানুষের জীবনের কি অদ্ভুত ট্রাজেডি,—এই মরণের অপরূপ রূপ ! শোকাশ্র দিয়ে মানুষ এ মরণের তর্পণ করে না।

গৌরীকে বারম্বার আমার মনে পড়েছে, বারম্বারই তুলনা করছি, প্রাণের সঙ্গে প্রাণীর, চঞ্চলের সঙ্গে শান্তর, অধৈর্যের সঙ্গে ধৈর্যের। মনে হচ্ছে, ভোরের শিশিরের মরণোৎসব চলচে এমনি অগোচরে, অস্তরালে, সহজ অনাড়ম্বরে। আর আমার চোখ বেয়ে পড়েছে জল, বুকভরা দীর্ঘশ্বাস মুক্তি খুঁজচে মহাকাশে। সমগ্র সৌরলোককে আহ্বান ক'রে বলতে চাইছে,—সব নবসৃষ্টিকে তোমরা বরণ করো শঙ্করানি ক'রে, উলু দিয়ে, লাজ ছড়িয়ে।

কিন্তু সৃষ্টির মধ্যে এই যে মহতী বিনষ্টি, এই যে অপরূপ

মরণ, তাকে কি এক ফোঁটা চোখের জলে বিদায় দেবে না? সে কি মায়ের প্রসব-বেদনার, অশ্রুর মধ্যে চিরকালই লুকিয়ে থাকবে?

ব্যথাময় মনটা হঠাৎ জেগে উঠে দেখলো, কাঁধের উপর কার কোমল হাতের স্পর্শ এলিয়ে পড়েচে। পরিচয় দেওয়া বাহ্যিক। আমার মন-মোহিনী বললেন, “উচ্ছ্বাসের মাত্রাটা যে খুব বেড়ে উঠেচে দেখচি।”

“তাই নাকি? দেখে ফেলেচো?”

“তোমরা মিথ্যে নিয়ে এত হা ছতাশও করতে পার। তোমার গৌরীরা মরেও না নতুন ক’রে হয়ও না। ওরা যা তাই-ই থাকে। সবটাই ঢঙ্ আর গ্যাকামি—”

আমার অন্তর্ধামিনীর দৃষ্টিটা খুব তীক্ষ্ণ। বস্তুর বাস্তবতা এঁরই স্পষ্ট চেনেন।

বললুম, “সত্যি নাকি? খুব বাঁচিয়ে দিলেচ আর একটু হলেই চোখের জল খরচ ক’রে ফেলেছিলুম আর কি?”

বুলবুলের প্রতি

কামিনী রায়

তুমি চলে গেছ, বারটি বছর গিয়াছে তাহার পরে,
তোমারে কি আমি পেরেছি ভুলিতে একটি দিনেরও তরে?
ষাটশ বরষ, সে তো দীর্ঘকাল। আজ তাই মনে হয়
আমাদের মাঝে বর্ষ মাস দিন এ-সব কিছুই নয়।
দেশ কাল নাহি আনে ব্যবধান, মায়ের ব্যাকুল মন
পাশাপাশি রেখে গত অনাগত, খোঁজে তোরে অনুক্ষণ।

আমি হেথা; তুমি যেথাই থাক না, তুমি যে আমারি মেয়ে,
মাতৃপদ সহ অমৃতের স্বাদ লভেছিলি তোরে পেয়ে;
বুকে যেই দিন তুলিলি প্রথম, সে-দিন হিম্মার পুরে
তোমার লাগিয়া বাঁধিলি যে বাসা আজও তা’ রয়েছ জুড়ে।
শিশু ও কিশোরী হাসিতে রোদনে, চাহনি চলনে আর
খেলায় সেবায়, আলাপে সঙ্গীতে টেলেছ যে স্মৃতিধার,

এতটুকু তার না ফেলি হেলায়, আগ্রহে করেছি পান,
অন্তরেতে মোর অক্ষয় হয়ে করে তা’ আনন্দ দান।

শৃণু করি যবে দেহের পিঞ্জর জীবন-বিহীন তোর
অলক্ষ্যে উড়িল অমরের দেশে, রহিল স্মৃতির ডোর,
সেই ডোর টানি নিত্য তোরে আনি,

পার কি ছি ড়িতে তায়?

পার কি ভুলিতে, স্বর্গবিহারিণি,

ধুলিতে লুপ্তিতা মায়?

এস তবে আজ এস ভাল ক’রে, মায়ের নীরব প্রাণ
নব গীতিরসে ভরে তোল পুন:

তোমারে শুনাতে গান।

২১শে ও ২২শে জুলাই,

১৯৩২

আয়ুর্বেদের ইতিহাস

ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

আয়ুর্বেদ অনাদি। যতদিন ধরিয়া মনুষ্যজীবন আরম্ভ হইয়াছে, ততদিন ধরিয়াই জীবনকে জানিবার চেষ্টা চলিয়াছে। এমন কি পশুপক্ষীর মধ্যেও আহারবিহারের একটা নিয়ম আছে; রোগ হইলে তাহারাও রোগ-প্রশমনের কোন-না-কোনও উপায় অনেক সময়েই অবলম্বন করিয়া থাকে। অত্যন্ত অসভ্য জাতিদের মধ্যেও রোগ-নিবারণের নানাবিধ যাদুমন্ত্র, নানাবিধ প্রক্রিয়া ও ভেষজ-সেবনের ব্যবস্থা দেখা যায়। প্রাচীন সভ্য জাতিদের বিষয়ে আলোচনা করিলে প্রত্যেক জাতির মধ্যে নানারূপ ব্যাধি, তাহার লক্ষণ ও সেই রোগ নিবারণের বিবিধ উপায় দেখা যায়। প্রাচীন মিশরীয়গণের মধ্যে নানারূপ তৈল ঘৃত ব্যবহারের কথা শুনা যায়, নানারূপ ধাতব বস্তু ও বৃক্ষভৈষজ্যের প্রয়োগের কথাও শুনা যায়। প্রায় সাড়ে চারি হাজার বৎসর পূর্বের চীনাগ্রন্থে দশ হাজার রকম জ্বর ও চৌদ্দ রকম আমাশয়ের উল্লেখ আছে। নাড়ীবিজ্ঞানের প্রতি তাঁহাদের প্রধান দৃষ্টি ছিল। পিয়ানো বাজাইবার মত আঙ্গুল বাজাইয়া তাঁহারা নাড়ী পরীক্ষা করিতেন। চীনা ভৈষজ্যগ্রন্থে আদা, বেদানার মূল, বৎসনাভ (একোনাইট), আফিং, স্কোবিষ (আসেনিক), গন্ধক, পারদ, বহুবিধ প্রাণীর মলমূত্রাদি ও অসংখ্য বৃক্ষের পত্রমূলাদি ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। চীনদেশে লক্ষ লক্ষ টাকার গাছগাছড়ার ঔষধ প্রতি বৎসর বিক্রয় হয়। প্রাচীন চীনারা বসন্তের টীকা দিতে জানিতেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাস প্রণেতা গ্যারিসন বলেন যে এই তথ্যটি তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে শিখিয়াছিলেন। খৃষ্টপূর্ব এগার-শ অব্দ হইতে চীনদেশে প্রতিবর্ষে কি কি জাতীয় রোগ কি কি পরিমাণে হয় তাহার তালিকা প্রস্তুত হইত। প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যেও খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর হিপোক্রেটিসের পূর্ব হইতেই চিকিৎসাশাস্ত্রের উদ্ভব দেখা যায়। কিন্তু হিপোক্রেটিসের সময়েই তাহার সমধিক উন্নতি হয়। হিপোক্রেটিস নিজে রোগী দেখিবার সময়ে নাড়ী দেখিতেন, তাহার খাসপ্রখাস শুনিতেন, মলমূত্রাদি পরীক্ষা

করিতেন ও তাহার মুখচোখের বিকারাদি লক্ষ্য করিতেন। নানাবিধ শস্ত্রোপচারেও তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। হিপোক্রেটিসের পূর্ব হইতেই অনেক ক্ষতস্থান আশুন দিয়া পোড়াইয়া সারাইবার ব্যবস্থা ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা মনে করেন যে এই পদ্ধতি গ্রীকেরা হিন্দুদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিল।

ঋগ্বেদে ১ম মণ্ডলের ৩৪শ সূক্তে ত্রিধাতুর উল্লেখ আছে। সামনাচার্য্য এই ত্রিধাতুতে বায়ু পিত্ত ও কফ বুঝিয়াছেন। সুশ্রুত বলেন, আয়ুর্বেদ অথর্কবেদের উপাদ্ধ এবং সহস্র অধ্যায়ে লক্ষ শ্লোকে ইহা ব্রহ্মার দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। ডহ্লগ তাঁহার নিবন্ধসংগ্রহ নামক টীকায় বলেন যে, অল্পাধ বলিয়া আয়ুর্বেদকে উপাদ্ধ বলা হইয়াছে, কিন্তু অথর্কবেদে মোট ছয় হাজার মন্ত্র আছে, লক্ষশ্লোকাত্মক আয়ুর্বেদ তাহার উপাদ্ধ হইতে পারে না। চরক বলেন যতদিন হইতে প্রাণ ততদিন হইতে আয়ুর্বেদ, যতদিন হইতে দেহ ততদিন হইতেই দেহবিদ্যা। আয়ুর্বেদের উৎপত্তি বলিতে এইটুকু বোঝা যায় যে কোন সময়ে কোনও মনুষী কোনও একটি বিশেষ নিয়মশৃঙ্খলার দ্বারা রোগ রোগহেতু ও আরোগ্যোপায়কে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। চরক আয়ুর্বেদকে স্বতন্ত্র বেদ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং ইহা দ্বারা জীবন পাওয়া যায় বলিয়া এবং জীবনের উপরেই ইহলোক ও পরলোকের মঙ্গল নির্ভর করে বলিয়া ইহাকে সকল বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বেদ বলিয়াছেন। গ্রায়সূত্রে ও তাহার টীকাভাষ্যাদিতে আয়ুর্বেদের প্রামাণ্যদ্বারাই অগ্র সকল বেদের প্রামাণ্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। জয়ন্ত তাঁহার গ্রায়মঞ্জরীতে বলিতেছেন প্রত্যক্ষীকৃতদেশকালপুরুষদশা-ভেদানুসারিসমস্তব্যস্তপদার্থসার্থশক্তি-নিশ্চয়শ্চরকাদয়ঃ। এই আপ্তোক্ত-ত্ব নিবন্ধন আয়ুর্বেদের যেমন প্রামাণ্য বেদাদি গ্রন্থেরও সেইরূপ আপ্তোক্ত-ত্বনিবন্ধন প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়। বৃদ্ধ বাগ্ভট আয়ুর্বেদকে অথর্কবেদের উপবেদ বলিয়াছেন। অথর্কবেদের সহিত আয়ুর্বেদের বোধ হয় অতি প্রাচীনকাল হইতেই কোনও বিশেষ যোগ ছিল। কৌশিক সূত্রের টীকায়

দারিলভট্ট বলেন যে, ব্যাধি দুই প্রকার—অনিষ্টআহার জন্ত আর অধর্মজন্ত। আয়ুর্বেদের দ্বারা প্রথম জাতীয় ব্যাধির নিবৃত্তি হয় এবং আথর্কবেদ প্রয়োগের দ্বারা দ্বিতীয় জাতীয় ব্যাধির নিবৃত্তি হয়। চরক নিজেও প্রায়শ্চিত্তকে ভেষজ বলিয়া ধরিয়াছেন।

আয়ুর্বেদ অষ্টাঙ্গে বিভক্ত। শল্যা (শস্ত্রচিকিৎসা), শালাকা (শিরোরোগ-চিকিৎসা), কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমার ভৃত্তা (শিশুচিকিৎসা), অগদতন্ত্র (বিষচিকিৎসা), রসায়ন (শরীরে তারুণ্য আনয়নের বিধি) এবং বাজীকরণ (ইন্দ্রিয় সামর্থ্য বৃদ্ধি)। সুশ্রুত বলেন যে পূর্বকালে আয়ুর্বেদের মধ্যে এই আট প্রকার বিভাগ পৃথক পৃথক করিয়া নির্দিষ্ট ছিল না। ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্যের মধ্যে সুভিষজ নামক প্রাচীন আয়ুর্বেদ গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়, মহাভারতের মধ্যেও আয়ুর্বেদ অষ্টাঙ্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং বায়ু পিত্ত স্নেহেরও উল্লেখ আছে। অথর্কবেদের মধ্যেও তিন জাতীয় রোগের কথা উল্লিখিত আছে। সঞ্চারী রোগ, সিক্তা রোগ ও শুষ্ক রোগ—এই তিন প্রকার রোগই বোধ হয় পরে বায়ুপিত্ত-কফাত্মক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অথর্কবেদ পড়িলে দেখা যায় যে, সে সময়েও শত শত চিকিৎসক ছিলেন এবং সহস্র সহস্র ঔষধ পৃথিবীতে প্রচার ছিল। শতং হস্ত ভিষজঃ সহস্রম্ উত বীরুধঃ—অথ, ২৯৯। সকালে দুই উপায়ে রোগের চিকিৎসা চলিত। মন্ত্র ও কবচধারণাদি এবং ঔষধ প্রয়োগ। এই দুই প্রকারের চিকিৎসাই আমাদের দেশে এখনও পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে।

চরক ও সুশ্রুত উভয়েই আয়ুর্বেদ অথর্কবেদের সহিত সংশ্লিষ্ট এইরূপ লিখিয়াছেন। চরক লিখিতেছেন, তত্র ভিষজা গৃধেন এবং চতুর্গাম্ ঋক্সাময়জুবথর্কবেদানাম আত্মনোত-থর্কবেদে ভক্তিরাদেশা। বেদোহ্যথর্কণঃ স্বস্তয়নবলিমঙ্গল হোমনিয়ম্প্রায়শ্চিত্তোপবাসমন্ত্রাদিপরিশ্রাং চিকিৎসাং প্রাহ। উভয়েই বলেন যাহা দ্বারা আয়ু পাওয়া যায় বা যাহাতে আয়ুর বিচার আছে তাহাকে আয়ুর্বেদ বলে এবং আয়ুর্বেদের প্রয়োজন ব্যাধিপরমোক ও স্বাস্থ্যের পরিরক্ষণ। কিন্তু এই উভয় পদ্ধতির সম্প্রদায় বিভিন্নরূপ ছিল বলিয়াই মনে হয়। আয়ুর্বেদের উৎপত্তি বর্ণনা করিতে গিয়া সুশ্রুত যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, কাশীরাজ দিবোদাস ধর্মস্তুরি প্রভৃতির

উল্লেখ করিয়াছেন, চরকে সেইরূপ দেখিতে পাই না। আবার সুশ্রুতে অষ্টাঙ্গ চিকিৎসার মধ্যে শল্যকেই প্রধান অঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (এতদ্বি অঙ্গপ্রথমং প্রাগভিঘাতব্রগসং রোহাং যজ্ঞশিরঃসঙ্কানাচ্চ)। সুশ্রুত পড়িলে দেখা যায় যে, ইহাতে শস্ত্রচিকিৎসা ও বিষচিকিৎসাই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে, অথচ চরকে কায়চিকিৎসাই প্রধান। সুশ্রুতে অস্থিসংখ্যা-গণনার সহিত চরকের অস্থিসংখ্যা-গণনার সামঞ্জস্য নাই। সুশ্রুতের মতে অস্থিসংখ্যা ৩০০, চরকের মতে ৩৬০। চরক ও সুশ্রুতের সহিত অথর্কবেদ ও শতপথব্রাহ্মণের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, অস্থিসংখ্যা-গণনায় চরকের সহিত ইহাদের সঙ্গতি আছে, সুশ্রুতের সহিত নাই। সুশ্রুত নিজেও বলিয়াছেন যে বেদবাদীদের মতে অস্থিসংখ্যা ৩৬০। ইহা ছাড়া যেরূপ সাত্ব্যাদি সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া চরক তাঁহার গ্রন্থ লিখিয়াছেন, সুশ্রুত সেরূপ করেন নাই। সুশ্রুতের সাত্ব্য, ঈশ্বরকৃষ্ণের সাত্ব্যাকারিকার সাত্ব্য এবং চরকোক্ত সাত্ব্য ইহাতে অনেক পরিমাণে বিভিন্ন। ইহা ছাড়া, চরকে যে সমবায় সামান্য বিশেষ প্রভৃতির উল্লেখ আছে, সুশ্রুতে সেরূপ নাই। এই সমস্ত দেখিয়া মনে হয় যে, সুশ্রুতের সম্প্রদায় চরকের সম্প্রদায় হইতে বিভিন্ন। চরককে যদি আত্রেয় সম্প্রদায় বলা যায়, তবে সুশ্রুতকে ধর্মস্তুরিসম্প্রদায় বলা যাইতে পারে। এই দুইটি সম্প্রদায় ছাড়া চিকিৎসাশাস্ত্রের আরও বিভিন্ন সম্প্রদায় প্রচলিত ছিল বলিয়াই মনে হয়। চরক বিমানস্থানে বলিয়াছেন—“বিবিধানি ভিষজানি প্রচরন্তি লোকে।”

যদিও অথর্কবেদে শুষ্ক, সিক্ত ও সঞ্চারী এই তিন প্রকার ব্যাধির উল্লেখ দেখা যায়, তথাপি অনেক স্থলেই অথর্কবেদের রোগনিদান, ভূতবিদ্যার সহিত প্রায় এক পর্য্যায়ভুক্ত বলা যাইতে পারে। অথর্কবেদের বহুস্থলতেই অরতি, পিশাচ, রক্ষঃ, অত্রিন, কণ্ঠ, প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় ভূতবর্গের আক্রমণে নানাবিধ ব্যাধির উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত বিভিন্ন রোগের উৎপাদক বলিয়া যে-সমস্ত প্রাণীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের কতকগুলির নাম দিতেছি ;— যাতুধান, কিম্বীদিন, পিশাচ, পিশাচী, অম্বীবা, দম্বাবিন্, রক্ষঃ, মণ্ডুণী, অগ্নিশ, বৎসক, পলাল, অম্বুপলাল, শর্ক, কোক, মলিনুচ, পলীজক, বত্ৰীবাসস, অশ্রৌষ, বিক্ষগ্রীব, প্রমালিন ইত্যাদি। এই সমস্ত পিশাচ-জাতীয় প্রাণীরা দেহের

নানাস্থানে বিচরণ করিয়া নানাবিধ রোগের উৎপত্তি করিত, এইরূপ কথার অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেক সময়ে এই সমস্ত প্রাণীর সহিত ব্যাধিকে অভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অপচিৎ নামক ক্ষতের কথা উল্লেখ করিয়া এরূপ কথিত আছে যে, তাহারা বাতাসে উড়িয়া বেড়াইত এবং মানুষের দেহে আশ্রয় লইয়া মানুষকে আক্রমণ করিত। কোন-কোন স্থানে এই অপচিৎকে একরকম কীট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। একজাতীয় ক্রিমির আক্রমণে নানাবিধ ব্যাধি উৎপন্ন হয়, ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে। এই সমস্ত দেখিলে মনে হয় যে, নানাবিধ ক্রিমিদ্বারা যে ব্যাধি উৎপন্ন হইত তাহা অথর্কবেদ স্বীকার করিয়াছেন। বুদ্ধের সমসাময়িক আত্রেয়শিষ্য জীবকের সম্বন্ধে যে-সমস্ত উপাখ্যান লিখিত আছে তাহাতে দেখা যায় যে, তিনিও মনে করিতেন যে, নানা প্রকার জীবাণু বা ক্রিমি হইতে নানা প্রকার ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। জীবকের সম্বন্ধে ইহাও লিখিত আছে যে, তাহার এক প্রকার মণি ছিল, সেই মণি শরীরের রুগ্নস্থানে রাখিলে শরীরের অভ্যন্তর দেখা যাইত। জীবক অনেক সময়ে সেই মণি দিয়া রুগ্নস্থানের অভ্যন্তরবর্তী জীবাণুগুলি প্রত্যক্ষ করিয়া শস্মোপচারের দ্বারা সেই স্থান ছেদন করিধা এই জীবাণুগুলি নিষ্কাশিত করিয়া দিয়া পুনরায় সেই স্থান সীবন করিয়া দিয়া লোককে রোগমুক্ত করিতেন।

অথর্কবেদে 'তন্মন' বলিয়া যে রোগের উল্লেখ আছে তাহার লক্ষণ পড়িয়া মনে হয় যে, তাহা আধুনিক কালের ম্যালেরিয়া জ্বর। এই তন্মনের প্রায়ই শরৎকালে প্রাদুর্ভাব হইত ও ইহা হইতে কামলা উৎপন্ন হইত। ইহা ছাড়া কাসিকা (কাস), যক্ষ্ম (যক্ষ্মা), পামন (পাঁচড়া), অক্ষত (ত্রণ বা টিউমার), বিদ্রব, কিলাস (কুষ্ঠ), গণ্ডমালা, জলোদর, আশ্রাব (অতিসার), বলাস (ক্ষয়), শীর্ষক্তি (শিরঃপীড়া), বিশল্যক (স্নায়ুবেদনা বা নাড়ীবেদনা), পৃষ্ঠাময়, বিলকন্দ (বাতব্যাধি), আশরীক, বিশারীক অন্তভেদ (বাতব্যাধিরই রূপান্তর), অলজী (চক্ষুরোগ), বিলোহিত (রক্তস্রাব), অপস্মার, গ্রাহি (ভূতেশ্বর) প্রভৃতি বহুবিধ রোগের উল্লেখ আছে। ইহা ছাড়া, বংশানুক্রমে যে-সমস্ত রোগ হইয়া থাকে তাহাদিগকে ক্ষেত্রীয় বলিয়া ধরা হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অথর্কবেদের সময়ে একদিকে যেমন শাস্তি-স্বস্ত্যয়ন মন্ত্রপাঠ

কবচধারণাদির ব্যবস্থা ছিল, অপর দিকে তেমন বহুবিধ ঔষধ ব্যবহারের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু অথর্কবেদে মন্ত্র-চিকিৎসারই প্রাধান্য দেখা যায় এবং অথর্কবেদের অনেক স্থান পড়িলে মনে হয় যে, মন্ত্রবাদী ও ভেষজবাদীদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু গোপথব্রাহ্মণ ও কৌশিকসূত্রের সময়ে এই উভয় বাদীদের মধ্যে একটা সন্ধিচাপন হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কৌশিক সূত্রে বহুবিধ ঔষধের উল্লেখ আছে, যথা— পলাশ, কাম্পিল, বরণ, জন্দিড, অজ্জুন, বেতস, শমী, শমকা, দর্ভ, দূর্কা, যব, তিল, ইন্দিড তৈল, বীরিণ, উষীর, ক্ষদির, ত্রপুস, মুঞ্জ, ক্রিমুক, নিতন্ত্রী, জীবী, অলাকা, লাফা, বিস, হরিজা, পিপ্পলী, সদ্যপুস্পা, কুণ্ড অলাবু, খলতুল, করীর, শিগরু, বিভীতক, নিকটা, শামীবিষ, শীর্ষপর্ণা, প্রিহঙ্গু, হরীতকী, পুতিকা, ইত্যাদি।

কৌশিকসূত্রে ক্ষতস্থানে জলোকা লাগাইবার বিধি দেখা যায় এবং সর্প-দষ্ট স্থান অগ্নিকর্ম্মদ্বারা পুড়াইয়া দিবারও বিধি দেখা যায়। ঋগ্বেদ প্রভৃতিতে অশ্বিনীকুমারের চিকিৎসা-নৈপুণ্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে তিনি বিম্বলার একটি পদ যুদ্ধে ছিন্ন হওয়াতে তাহার বদলে একটি লোহার পা জুড়িয়া দেন। ঋজাশ্ব ও পরাবৃজের আঙ্কা দূর করেন। ঘোষাকে কুষ্ঠব্যাধি হইতে মুক্ত করেন।' কং ও কক্ষিবংকে নবদৃষ্টি প্রদান করেন, বামদেবকে মাতৃকুক্ষি হইতে প্রসব করান, বক্ষ্যা নারীদিগকে সুপ্রজা করিতে পারিতেন। যজ্ঞীয় পশুর ছিন্নশিরকে প্রতিসন্ধান করিতে পারিতেন এবং এই কৃতিত্ব দেখাইয়া তিনি পূর্বে শত্রুচিকিৎসকদিগকে লোকসমাজে সমাদৃত করেন। তাহাদের নামে অশ্বিনীকুমারের সংহিতা নামক গ্রন্থের কথা শুনা যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে লিখিত আছে যে, তিনি চিকিৎসা-সার নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ডাক্তার কডিগ্নান লিখিয়াছেন যে, তিনি এই গ্রন্থের খণ্ডাবশেষ পাইয়াছেন। ইহা ছাড়া তাহার নামে বহু ঔষধ প্রচলিত আছে। কাশ্যপের নামেও কাশ্যপতন্ত্র কাশ্যপসংহিতা নামে প্রাচীন গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। শতপথব্রাহ্মণ পড়িলে জানা যায় যে, সে সময়েও সূক্ষ্মতের শাস্ত্র সমাজে প্রচলিত ছিল। শতপথ-ব্রাহ্মণের রচনাকাল ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ ৭০০ বলিয়া মনে করেন। কাজেই দেখা যাইতেছে যে,

সুশ্রুতের শস্ত্রচিকিৎসা অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ ৮০০, ৯০০ কি ১০০০ হইতে চলিয়াছে এবং সে সময়েও বেদবাদীদের একটি স্বতন্ত্র চিকিৎসা ছিল। সুশ্রুত প্রায় ১২০টি শস্ত্রযন্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। হারিতেও ১২টি যন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। বাগ্ভটে ৬০টি যন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। ইহা ছাড়া পশুশাস্ত্রেও অগ্ন্যস্ত্র শস্ত্রোপচার যন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। পালক্যাপ্য নামক হস্তায়ুর্বেদে প্রায় পঁচিশটি স্বতন্ত্র যন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুশ্রুত পড়িলে দেখা যায় যে, সে সময়ে যে কেবল শবব্যবচ্ছেদ হইত তাহা নহে, শরীরের হস্তপদাদি বিভিন্ন স্থানে যে শস্ত্রোপচার হইত তাহা নহে, এমন কি উদরের মধ্যেও শস্ত্রোপচার চলিত এবং কঠিন শস্ত্রোপচারের দ্বারা উদরস্থ সস্তানকে প্রসব করান হইত। তাহা ছাড়া মাথার মধ্যেও শস্ত্রোপচার করিয়া অনেক হুরারোগ্য ব্যাধি দূর করা হইত।

নানা গ্রন্থে জীবক সম্বন্ধে যে সমস্ত কাহিনী বিবৃত আছে তাহাতে দেখা যায় যে তিনি অনেক স্থলেই মাথার করোটিকা কর্তন করিয়া মাথার মধ্যের ক্ষতস্থান হইতে ক্রিমি নিঃসারণ করাইয়া অনেক শিরঃপীড়া আরোগ্য করাইয়াছিলেন। রাজগৃহে তিনি যে একটি শস্ত্রোপচার করিয়াছিলেন তাহাতে দেখা যায় যে, একটি ধনীর স্ত্রীকে হস্তপদাদি বন্ধ করিয়া তাহার উদরে শস্ত্রোপচার করিয়া উদরের অন্ততন্ত্রগুলি বাহির করিয়া তাহার মধ্যে যে কতগুলি গ্রন্থি পাকাইয়া গিয়াছিল সেগুলি উন্মোচন করাইয়া পুনরায় সমস্ত অন্ততন্ত্রকে যথাস্থানে নিবেশ করাইয়া সীবন করিয়া দেন। জীবক ভগবান বৃহস্পতির সমসাময়িক ছিলেন এবং অনেক সময়ে তাঁহাকে নানা হুরারোগ্য ব্যাধি হইতে নীরোগ করিয়াছিলেন। জীবক আত্রেয়ের শিষ্য ছিলেন। চরকও আত্রেয়-সম্প্রদায়ের লোক। চরক প্রধানতঃ কায়চিকিৎসক ছিলেন, সেইজন্য অনেক স্থানে (যথা—উদরি) শস্ত্রসাধ্য ব্যাধির কথা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, এই সমস্ত ব্যাধি শস্ত্রবিদেরা আরোগ্য করিতে পারেন। অতএব মনে হয় যে, ধনুস্তরি সম্প্রদায় ছাড়া আত্রেয় সম্প্রদায়ের মধ্যেও শস্ত্রোপচারের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। সুশ্রুতের মধ্যে চক্ষুর ছানি কাটিবার যে পদ্ধতি ছিল আজও তাহা হইতে উৎকৃষ্টতর ছানি কাটিবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না সন্দেহ। সাধারণ আতুরালয় স্থাপনের পদ্ধতি

বোধ হয় ভারতবর্ষেই সর্বপ্রথম। অশোকের শিলালিপিতে দেখা যায় যে, সে সময়ে পশুদিগের ও মহুযাদিগের জন্য স্বতন্ত্র চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছিল এবং ভৈষজ্য উদ্যান স্থাপনা করিয়া নানা দেশের দুপ্রাপ্য ওষধি সকল একত্র রোপিত হইত। সিংহলীয় লেখমালা হইতে জানা যায় যে খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতেও এদেশে আতুরালয় বা হাসপাতাল ছিল। এই সমস্ত হাসপাতাল এবং গৃহীদের আতুরালয় ও প্রসবগৃহ প্রভৃতির ব্যবহারের জন্য নানাবিধ উপকরণের ব্যবস্থা দেখা যায়। সুশ্রুত চরক প্রভৃতির মধ্যে স্বাস্থ্যবিধানের অঙ্গ বলিয়া দস্তকাষ্ঠ, জিহ্বানিলেখন, ক্ষুর, কেশপ্রসাধনী বা চিকুণী, আদর্শ, পট্টবস্ত্র পরিধান, উষ্ণীষ, ছত্র, উপানহ বা ব্যজন ইত্যাদির উল্লেখ দোঁখতে পাওয়া যায়। অপরিষ্কৃত জল পরিষ্কার করিবার জন্য নানাপ্রকার ফিল্টারের ব্যবস্থা দেখা যায়। আতুরালয়ের জন্য চামচ, নিষ্ঠীবনপাত্র, মলপাত্র (বেডপ্যান্) মূত্রপাত্র ও পূঁজপাত্র প্রভৃতির ব্যবহার দেখা যায়। ঔষধাদি পানের জন্য রজত, স্তবর্ণ, তাম্র, মৃৎ বা শুক্লি পাত্র ব্যবহৃত হইত।

আলেকজান্ডারের পূর্বে গ্রীকদের সহিত ভারতীয়দের বিরূপ আদানপ্রদান চলিত তাহা বলা কঠিন, কিন্তু নিয়ার্কাস (Nearchus) বলেন যে, গ্রীকবৈদ্যেরা হিন্দুদের চিকিৎসা-শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। গ্রীকদের ভৈষজ্যগ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যায় যে, পদ্মবীজ, তিল, জটামাংসী শৃঙ্গবের, মরীচি, এলাচি প্রভৃতি বহুবিধ ভারতীয় ঔষধ তাঁহারা ব্যবহার করিতেন। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে আরবেরা চরক সুশ্রুত ও মাধবনিদান অনুবাদ করেন, ইহা ছাড়া ভারতীয় সর্পবিদ্যা, বিষবিদ্যা ও পশুচিকিৎসাও আরব ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল, এবং অনেক সময়ে হিন্দু চিকিৎসকেরা আরব দেশে চিকিৎসার উন্নতি হইতেন। আরব দেশের চিকিৎসা-গ্রন্থে বহু ভারতীয় ঔষধের ব্যবহার দেখা যায়, যথা—দেবদারু, স্তবর্ণ মরীচি, সোণামুখী, স্তবর্ণধ, কুলীজল, গুগগুল, তিস্তিডী, ত্রিফলা, হরীতকী, বিষ, চন্দন, নিম্ব, তাম্বুল, খদির, বিষমুষ্টি, কদলী, নাগরজ, মাতুলুজ, ইত্যাদি বর্তমানে ইউরোপে প্রচলিত ভৈষজ্যমধ্যেও বহু ভারতীয় ঔষধের ব্যবহার দেখা যায়, যথা—অতিবিষ, পলাণ্ডু, খদির, যবস, সপ্তপর্ণ, এলা, উশীর দারুহরিদ্রা, পলাশ, সোণামুখী,

ইন্দ্রবরণ, ধূস্তুর, অতসী, করঞ্জ, আঁজমোদ, এড়ু, শত-পুষ্পা, উন্দুরকর্ণিকা, চন্দন, অজকর্ণ, গুরুচি, টগর, ইন্দ্রযব ইত্যাদি। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সহস্র সহস্র আয়ুর্বেদীয় ঔষধের মধ্যে ইউরোপীয় ঔষধ প্রায় একটিও দেখা যায় না। উপন্যাস কৃষ্ণাদি ব্যাধিতে নাসিকা প্রভৃতি খসিয়া গেলে শস্ত্রোপচার করিয়া নূতন হাড় বসাইয়া আরোগ্য করিবার যে বিধি ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল তাহা ভারতবর্ষ হইতেই ইউরোপে গৃহীত হইয়াছে। বালিনের ডাক্তার রিসবার্গ বলেন যে, এই জাতীয় শস্ত্রবিদ্যায় ইউরোপ যে পারদর্শিতা দেখাইয়াছে তাহার প্রথম নিদর্শন ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট হইতেই পাওয়া গিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, চামড়া কাটিয়া চামড়া জোড়া লাগাইবার যে পদ্ধতি তাহাও ভারতবর্ষ হইতেই গৃহীত হইয়াছে। কোষে শস্ত্রোপচারের অনেক ব্যবস্থাও ভারতবর্ষ হইতেই ইউরোপে গৃহীত হইয়াছে, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কীট ও জীবাণু দ্বারা যে নানাবিধ ব্যাধি উৎপন্ন হয় তাহা অতি প্রাচীন কালেই এদেশে জানা ছিল তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মার্কোপলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে মশক-দংশনে যে জ্বরের উৎপত্তি হয় তাহাও এদেশে জানা ছিল এবং মশক-নিবারণের জন্ত দক্ষিণ-ভারতবর্ষের সমুদ্রোপকূলবর্তী স্থানে মশারি ব্যবহৃত হইত।

মহুঘাচিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিচিকিৎসাও অতি প্রাচীন কালেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। অশ্চিকিৎসার প্রধান প্রণালী ছিলেন শালিহোত্র ঋষি। ইহা ছাড়া অগ্নি-পুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও গুরুড় পুরাণে অশ্চিকিৎসার কথা দেখা যায়। গুরুচার্যের নীতিশাস্ত্রেও অশ্চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা আছে। সহদেব ও লব উভয়েই অশ্চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রবীণ ছিলেন। জয়দত্তসূরীর অশ্চিকিৎসাকও-বিষয়ের একখানা প্রধান গ্রন্থ। তাহা ছাড়া সিংহদত্ত অশ্চিকিৎসাসমুদ্র নামে এক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। মল্লিনাথ হর-নীলাবতী হইতে স্থানে স্থানে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভাঙ্গ ও বাজীচিকিৎসা নামে এক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। পিঙ্গলও অশ্চিকিৎসাসমুদ্র নামে এক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া শাঙ্গর লিখিয়াছিলেন তুরঙ্গ পরীক্ষা, এবং ইন্দ্র-দন শালিহোত্রের সার সংগ্রহ করিয়া সারসংগ্রহ নামে গ্রন্থ

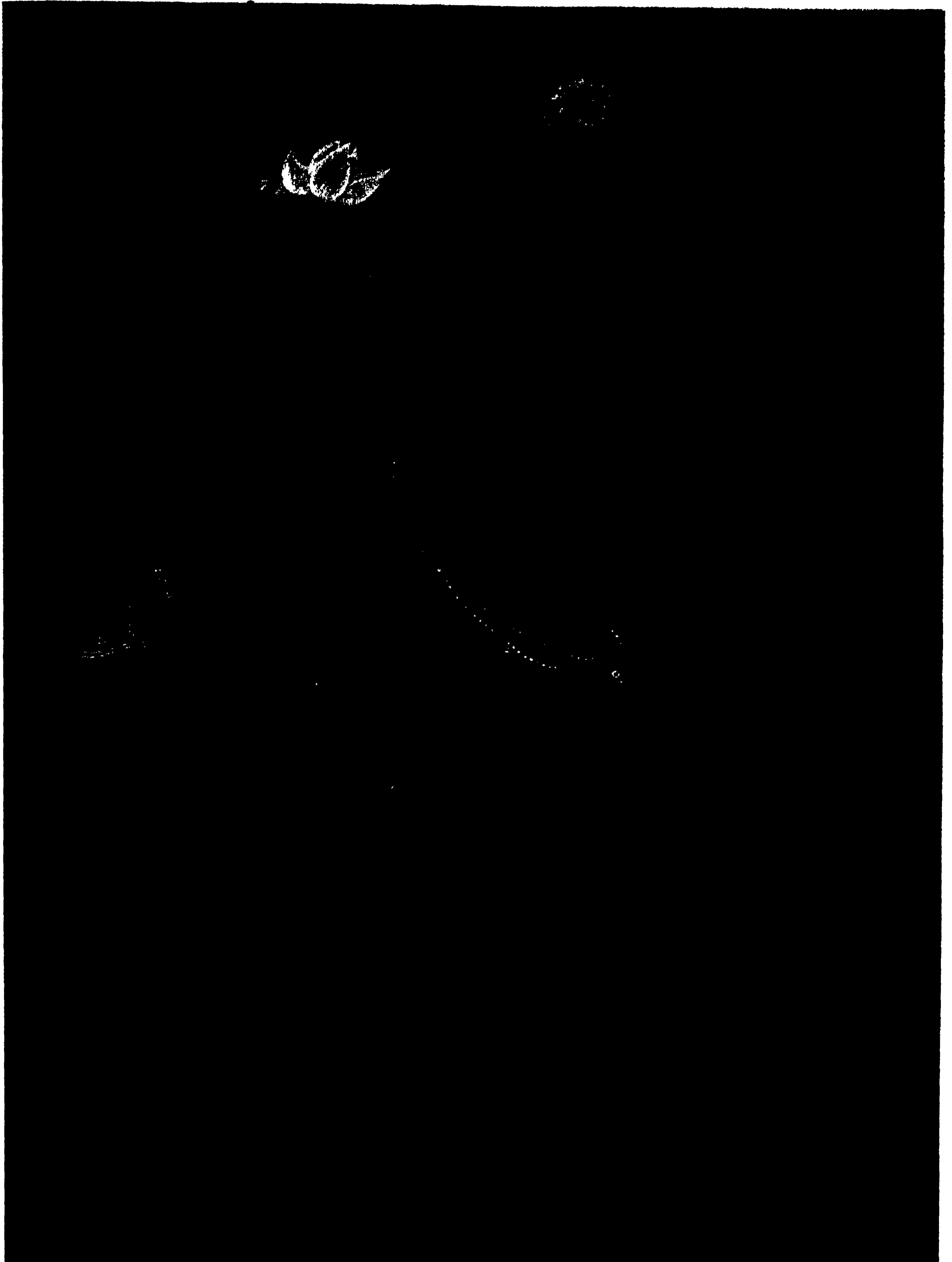
লিখিয়াছেন। পালকাপ্য প্রণীত গজায়ুর্বেদ অতি প্রাচীন গ্রন্থ ইহা ছাড়া গজনিরূপণ, মাতঙ্গলীলা, গজচিকিৎসা প্রভৃতি গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। অগ্নিপুরাণে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও কামন্দকীয় নীতিশাস্ত্রেও গজচিকিৎসার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শৈবিক শাস্ত্রে পশ্চিকিৎসা ও পক্ষীদের আহা-প্রণালীর ব্যবস্থা দেখা যায়। গো-চিকিৎসার কথা অথর্কবেদে উল্লিখিত হইয়াছে এবং পরাশরসংহিতা ও আপস্তম্ব সম্যক ও বিষ্ণুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে গো-চিকিৎসার কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। শালিহোত্রের সম্পূর্ণ গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায় না। যে পুস্তকখানি পাওয়া যায় তাহা স্থানে স্থানে খণ্ডিত। এই গ্রন্থখানি শল্য শালাক্যাদি ক্রমে ৮টি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। কথিত আছে যে, শালিহোত্র ছিলেন হর-ঘোষের পুত্র এবং সূশ্রুতের পিতা, এবং সূশ্রুতের প্রপ্নের উত্তর দিতে গিয়াই শালিহোত্র তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু কোন কোন স্থানে সূশ্রুতকে বিধামিত্রের পুত্র বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে। গণ তাঁহার অথায়ুর্বেদে সূশ্রুতকেও স্বতন্ত্রভাবে অথশাস্ত্রের কর্তা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু অগ্নিপুরাণে দেখা যায় যে, সূশ্রুত অথবিদ্যা, গজবিদ্যা ও গোচিকিৎসা-বিদ্যা ধর্মস্তুরির নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। শালিহোত্র গান্ধার দেশের লোক ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। শালিহোত্রের গ্রন্থখানি ১৩৮১ খৃঃ অব্দে পারস্য ভাষায় অনূদিত হয়। গ্রন্থখানির উন্নয় স্থান, উত্তর স্থান, শারীরিক, চিকিৎসা স্থান, কিশোর চিকিৎসা, উত্তরোত্তর ও রহস্য স্থান— এই কয় অধ্যায়ে বিভক্ত। পালকাপ্য ঋষি সামগায়ন্যাক মুনির পুত্র ছিলেন। ইনি চম্পা (ভাগলপুর) দেশের রোমপাদ রাজ্য কর্তৃক হস্তিচিকিৎসার জন্ত আহূত হন। এই কাণ্ড-শেষে লিখিত আছে যে, পালকাপ্য ও ধর্মস্তুরি একই ব্যক্তি ছিলেন। ইহার গ্রন্থখানি অতি বিস্তৃত এবং ইহাতে প্রায় ১৬৪টি অধ্যায় আছে। মহাবগ্গে লিখিত আছে যে আকাশগোত্ত যখন একটি বৌদ্ধ ভিক্ষুর ভগন্দর স্থানে শস্ত্র প্রয়োগ করিয়া তাহার একটি বিরাট মুখ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া বুদ্ধদেব অত্যন্ত বীভৎসভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং মহুঘাদেহে এইরূপ শস্ত্রপ্রয়োগ করিতে নিষেধ করিলেন। বোধ হয় তাহার পর হইতে এই দেশে শস্ত্রোপচারের অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল। কালক্রমে এই শস্ত্রচিকিৎসার

এমন অবনতি হইয়াছিল যে, যখন শঙ্করাচার্য ভগবদ্রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন তখন এই রোগ অচিকিৎস্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। কিন্তু চরকাদির সময়েও শস্ত্রবিদ্য-দিগের বিশেষ সমাদর ছিল এবং বাগ্‌ভটাদির সময়েও শস্ত্রবিদ্যা যে একেবারে চলিত ছিল না, এ-কথা বলা যায় না।

চরক পড়িলে দেখা যায় যে, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিরা ভরদ্বাজকে ইন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেন এবং তিনি তাঁহার নিকটে হেতু লিঙ্গ ও ঔষধজ্ঞানাত্মক জিস্মুত্র শিক্ষা করেন। অগ্নি ঋষিরা ভরদ্বাজের নিকট হইতে ইহা শিক্ষা করেন। ভরদ্বাজের নিকট হইতে আত্রেয় পুনর্কর্ষ এই শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষারপাণি— এই ছয় শিষ্যকে ইহা শিক্ষা দেন। ইহাদের মধ্যে অগ্নিবেশই সর্বাধিক বৃদ্ধমান ছিলেন। সেইজন্ত তিনিই প্রথম অগ্নিবেশসংহিতা প্রণয়ন করেন। তদনন্তর ভেল, পরাশর, জতুকর্ণ প্রভৃতিরাও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিয়াছিলেন। এই পুনর্কর্ষ আত্রেয় ছাড়া কৃষ্ণাত্রেয় ও ভিক্ষু আত্রেয় নামে আরও দু-জন আত্রেয়ের কথা পাওয়া যায়। জীবক কোন্ আত্রেয়ের শিষ্য ছিলেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। ইহা ছাড়া নাড়ীতত্ত্ববিধির প্রণেতা দত্তাত্রেয় নামে আর একজন আত্রেয় ছিলেন। চরক পড়িলে পুনর্কর্ষ আত্রেয়ের সমসাময়িক আরও অনেক ভিষকের নাম পাওয়া যায়, যথা—হিরণ্যকেশী বড়িশ, সাংকৃত্যায়ণ, শরলোম কাপ্যা, কাংকায়ন কুমারশিরা, ভরদ্বাজ, রাজর্ষি, বামক, বাখ্যোবিদ, শৌনক, মৈত্রেয়, পৈল, শাকুন্তেয় ইত্যাদি। চরকের অনেক অধ্যায়ের লিখন-প্রণালীতে ইহা বোঝা যায় যে, এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসক একত্র সম্মিলিত হইয়া নানা রোগের বিষয় ও আয়ুর্কর্ষদের নানা সমস্তা পরস্পর আলোচনা করিয়া প্রত্যেকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করিতেন এবং পরিশেষে আত্রেয় যেন সভাপতিরূপে সেই সব মতের সামঞ্জস্য করিয়া সমাধান করিতেন। এই সমস্ত স্থানগুলি দেখিলে অনেক সময়েই মনে হয় যে, চরকসংহিতাখানি যেন কোনও ভিষকসমিতির বক্তৃতাগুলির সারসংকলন। যে-সকল স্থলে মতবৈধ ছিল না সে-সমস্ত স্থলে আত্রেয় যেন নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। অগ্নিবেশ-লিখিত তন্ত্র চরক পুনরায় প্রতিসংস্কার করিয়া তাহার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই অগ্নিবেশসংহিতা একাদশ শতাব্দীতে

চক্রপাণির সময় পর্য্যন্তও পাওয়া যাইত। যে কারণেই হউক চরকসূত্র, নিদান, বিমান, শারীর ও চিকিৎসাস্থানে ১৬শ অধ্যায় পর্য্যন্ত লিখিয়া যান। চিকিৎসাস্থানের শেষ ১৭টি অধ্যায় এবং সিদ্ধিস্থান ও কল্পস্থান কাশ্মীরী ভিষক কপিলবলের পুত্র দৃঢ়বল খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে আপূরণ করেন। দৃঢ়বল যে কেবলমাত্র আপূরণ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, অনেক সময়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন রোগাধ্যায়ের মধ্যেও কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়াছিলেন, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। চক্রপাণি ও বিজয় রক্ষিত যখন কাশ্মীরপাঠ বলিয়া সময়ে সময়ে নির্দেশ করিয়াছেন তখন এই দৃঢ়বলেরই প্রতিসংস্কারকে লক্ষ্য করিয়া তাহা বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। মাধব সম্ভবতঃ দৃঢ়বলের পূর্বের লোক ছিলেন, কাজেই মাধব নবম শতাব্দীরও পূর্বের লোক। বৃদ্ধ বাগ্‌ভট বোধ হয় ৭ম শতাব্দীর লোক ছিলেন, কারণ সপ্তম শতাব্দীতে ইংসিন সমসাময়িক বলিয়া তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। চক্রপাণিদত্ত একাদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন এবং অক্ষয়-দত্ত ও বিজয় রক্ষিত উভয়েই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রাদু ভূত হইয়াছিলেন।

প্রাচীন কালে কাশী ও তক্ষশিলা বিদ্যার প্রধান কেন্দ্র ছিল। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, শালিহোত্র গান্ধার-দেশীয় লোক ছিলেন। জীবকও তক্ষশিলার লোক ছিলেন। চীন-দেশীয় বিবরণ হইতে জানা যায় যে, চরক কণিষ্ক মহারাজের রাজবৈদ্য ছিলেন। কণিষ্ক খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর লোক এবং তাঁহার রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা পেশোয়ার। চরক পড়িলে দেখা যায় বাহ্লীক-দেশীয় ভিষকরা আত্রেয় পুনর্কর্ষের ভিষক-পরিষদে সমবেত হইতেন। ইহা হইতে এরূপ অনুমান করা অসম্ভব নহে যে, আত্রেয় পুনর্কর্ষ যেখানে বাস করিতেন, বা তাঁহার সমধর্মী চিকিৎসকেরা যেখানে বাস করিতেন তাহা বাহ্লীক দেশের নিকটবর্তী স্থান; কাজেই এরূপ মনে করা যাইতে পারে যে, তক্ষশিলার নিকটবর্তী কোনও স্থানে তাঁহাদের এই চিকিৎসা-পরিষদ বসিত। দৃঢ়বল যে কাশ্মীরের লোক ছিলেন তাহাও পূর্বে বলা হইয়াছে। ইংসিন নলান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন এবং তিনি যে-ভাবে বাগ্‌ভটের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে বাগ্‌ভট যেন তৎসমীপবর্তী কোন স্থানের লোক ছিলেন। তাহাতে এরূপ



উৎসর্গ
শ্রীকিরণময় ধর

প্রবাসা প্রেস, কলিকাতা

মনে করা যাইতে পারে যে, বৃদ্ধ বাগ্‌ভট সম্ভবতঃ মগধেরই লোক ছিলেন। মাধব কোন দেশের লোক ছিলেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। অনেকে বলেন যে, মাধব এবং বিজয় রক্ষিত উভয়েই বাংলা দেশের লোক। ইহার সপক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ নির্দেশ করা কঠিন। দৃঢ়বল যদি নবম শতাব্দীর লোক হন তাহা হইলে মাধব হয়ত ৭ম শতাব্দীর লোক হইবেন এবং অষ্টাঙ্গহৃদয়কার বাগ্‌ভট হয়ত ৯ম শতাব্দীর লোক হইবেন। চরক ও মাধবের মধ্যে এই যে প্রায় ৬০০ বৎসরের ব্যবধান ইহার মধ্যে কোনও প্রসিদ্ধ ভিষকের নাম পাওয়া যায় না। কিছু দিন হইল তুর্কীস্থানের বালুস্তূপের মধ্যে নাবনীতক নামে এক সংগ্রহগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এই সংগ্রহগ্রন্থ খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর লেখা এইরূপই পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। ইহা চরক, সুশ্রুত ও অগ্ন্যাণ্ড গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত এবং প্রধানতঃ একখানি ভেষজসংগ্রহের গ্রন্থ। এই নাবনীতকে সাম্বা, গর্গ, বশিষ্ঠ, করাল, সুপ্রভ, বাড্‌বলি প্রভৃতি ভিষকের নাম পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে হৃদযাবস্তি নামে একরূপ অস্তবস্তি (Enema) ব্যবহারের বিধান আছে। চরক সুশ্রুতেও মলদ্বার দিয়া প্রয়োগের জন্ত নানাজাতীয় বস্তির বিধান ছিল। এই সকল বস্তিদ্বারা নানাবিধ ঔষধ সঞ্চারনের মধ্য দিয়া অস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইত। ইহা ছাড়া স্ত্রীলোক ও পুরুষের মূত্রদ্বারের নানা প্রকার ব্যাধির জন্ত বিভিন্ন প্রকারের বস্তি প্রয়োগের (cathetar) বিধি ছিল।

চক্রপাণিদত্ত গৌড় দেশেরই লোক ছিলেন ইহা প্রমাণ করা কঠিন নহে। সম্ভবতঃ অষ্টম কি নবম শতাব্দী হইতেই বঙ্গদেশে আয়ুর্বেদ-চর্চার প্রসার বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে। বিজয় রক্ষিতের পূর্বেও যে বহু আয়ুর্বেদের গ্রন্থকর্তা গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহারা অনেকেই যে চরকের উপরে টীকা ও অগ্ন্যাণ্ড প্রকার গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তাহার পরিচয় আমরা বিজয় রক্ষিতের টীকার মধ্য হইতে পাই। ডহ্লন (১১শ কি ১২শ শতাব্দী) তাঁহার নিবন্ধসংগ্রহে বলিয়াছেন যে, প্রাচীন বৃদ্ধসুশ্রুতকৃত সুশ্রুতসংহিতা নাগার্জ্জুনের দ্বারা প্রতिसংস্কৃত হইয়া বর্তমান সুশ্রুতসংহিতা নামে চলিয়াছে। বর্তমান সুশ্রুত গ্রন্থে যে একটা উত্তর তন্ত্র আছে তাহাও ইহার পরিচায়ক। চক্রপাণি

তাঁহার ভানুমতী নামক টীকাতে এই প্রতिसংস্কারের উল্লেখ করিয়াছেন; সুশ্রুতচন্দ্রিকা বা গ্রামচন্দ্রিকা নামে প্রচলিত গয়দাসের পঞ্জিকাতে নাগার্জ্জুনের পাঠ বলিয়া যে পাঠটি চলিয়াছে তাহা বর্তমান সুশ্রুতেরই পাঠ, অষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতার ভট্টনারায়ণকৃত বাগ্‌ভটখণ্ডনমণ্ডনটীকায় সুশ্রুতের নাগার্জ্জুনের পাঠ বলিয়া বর্তমান পাঠোপলেক্ষ আছে। আমরা তিনটি নাগার্জ্জুনের কথা জানি। প্রথম, শূন্যবাদী নাগার্জ্জুন (খ্রীঃ প্রথম শতাব্দী); দ্বিতীয়, বৃন্দসিদ্ধযোগে যে নাগার্জ্জুনের কথার উল্লেখ করিয়াছে, ইনি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্থ কি পঞ্চম শতকের লোক ছিলেন; তৃতীয়, নবম শতাব্দীর গুর্জরের রাসায়নিক নাগার্জ্জুন। এই তৃতীয় নাগার্জ্জুনেরই বোধ হয় কক্ষপুটতন্ত্রের লেখক ছিলেন। আর দ্বিতীয় নাগার্জ্জুন বোধ হয় সুশ্রুতসংহিতার প্রতिसংস্করণ করিয়াছিলেন। জৈষাট, গয়দাস, ভাস্কর, শ্রীমাধব, ব্রহ্মদেব প্রভৃতির বহুলঘুপঞ্জিকা আর গ্রামচন্দ্রিকা, পঞ্জিকা ও শ্লোক-বার্তিক নামে সুশ্রুতের টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া চক্রপাণিদত্তও ভানুমতী নামে এক টীকা লিখিয়াছিলেন। গোমিন্‌ আষাঢ় বর্ষা, জিনদাস, নরদত্ত, গদাধর, বাপ্পচন্দ্র, সোম, গোবর্দ্ধন, প্রশ্ননিধান প্রভৃতিরও সুশ্রুতের টীকা লিখিয়াছিলেন। চরকের উপর চক্রপাণিদত্তের টীকাখানি এখন মুদ্রিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া স্বামিকুমার, হরিশ্চন্দ্র, শিবদাস সেন, বাপ্পচন্দ্র ঈশান দেব, ঈশ্বর সেন, বকুল কব, জিনদাস, মুনিদাস, গোবর্দ্ধন, সন্ধ্যাকর, জয়নন্দী ও গয়দাস প্রভৃতিরও চরকের টীকা লিখিয়াছিলেন।

চক্রপাণির সময় পর্য্যন্ত জতুকর্ণসংহিতাখানি পাওয়া যাইত। পরাশরসংহিতা ও ক্ষারপাণিসংহিতা ও শ্রীকণ্ঠদত্ত ও শিবদাসের সময় পর্য্যন্ত পাওয়া যাইত। চক্রপাণির টীকায় ধরনাদসংহিতা ও বিশ্বামিত্রসংহিতারও উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন হারীতসংহিতাখানি চক্রপাণি ও বিজয় রক্ষিতের সময় পর্য্যন্ত ছিল। ভেলসংহিতাখানি কিছুদিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে। ধনুস্তরির চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞান, কাশীরাজের চিকিৎসাকৌমুদী, দিবোদাসের চিকিৎসাদর্শন, অশ্বিনীর চিকিৎসাসারতন্ত্র ও ভ্রমর, নকুলের বৈদ্যকসর্কস্ব, মহাদেবের ব্যাধিসিদ্ধবিমর্দন, যমের জ্ঞানার্ণব, চ্যবনের জীবাদন, জনকের ব্যাধিসন্দেহভঞ্জন, চন্দ্রসুতের সর্কসার,

জাবালের তন্ত্রসার, জাজলির বেদান্তসার, পৈলের নিদান, করঠের সর্কধর, অগস্ত্যের ষ্ঠধনির্ঘনতন্ত্র প্রভৃতি প্রাচীন চিকিৎসা-গ্রন্থের কথা কেবল নামমাত্রই শুনিয়াছি। বৃহৎ বাগ্‌ভট তাঁহার ইন্দুকৃত টীকাসহ মুদ্রিত হইয়াছে। বাগ্‌ভটের অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতার অরুণদত্ত, আশাধর, চন্দ্রচন্দন, রামনাথ ও হেমাদ্রিকৃত পাঁচ খানি টীকা ছিল। তন্মধ্যে কেবলমাত্র অরুণদত্তের সর্কধরহৃদয় টীকাটি ছাপা হইয়াছে। মাধব-নিদানেরও অন্ততঃ সাতটি টীকা ছিল। বিজয় রক্ষিতকৃত মধুকোষ, বৈদ্যবাস্পতিকৃত আতঙ্কদর্পণ, রামনাথ বৈদ্যকৃত টীকা, ভবানীসহায়কৃত টীকা, নাগনাথকৃত নিদানপ্রদীপ, গণেশভিক্কৃত টীকা, নীলকণ্ঠ-ভট্টপুত্র নরসিংহ কবিরাজকৃত বিবরণসিদ্ধান্তচক্রিকা। এই শেষোক্ত গ্রন্থের মুদ্রাপনের আয়োজন চলিতেছে। এই গ্রন্থখানি আমার পারিবারিক গ্রন্থাগারে পাওয়া গিয়াছে। বিজয় রক্ষিতকৃত নিদানের টীকা নিদানের ত্রয়স্বিন্দুশদধায় পযুক্ত আসিয়া ক্ষান্ত হয়। বাকী অংশটি তাঁহার ছাত্র শ্রীকৃষ্ণদত্ত সমাপন করিয়াছেন। বৃন্দকৃত সিদ্ধযোগখানিও একখানি অতি প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ। অনেকে বলেন যে, বৃন্দ এবং মাধব একই ব্যক্তি ছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীর শাক্তধরের গ্রন্থখানি ও পঞ্চদশ শতাব্দীর শিবদাসকৃত চক্রদত্তের টীকা ও বঙ্গসেনের গ্রন্থখানি কবিরাজসমাজে অত্যন্ত সমাদৃত। ভাস্করের শারীরপদ্মিনী গ্রন্থের এখন আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। ঔপধেনবতন্ত্র পৌষ্কলাবততন্ত্র, বৈতরণতন্ত্র এবং ভোজতন্ত্র ডহলণের সময় পর্য্যন্ত ছিল। তালুকাতন্ত্র ও কপিলতন্ত্র চক্রপাণির সময় পর্য্যন্ত ছিল। বিদেহতন্ত্র, নিমিত্তন্ত্র, কাঙ্ক্ষয়নতন্ত্র, সাত্যকী-তন্ত্র, করালতন্ত্র, কৃষ্ণাত্রেয়তন্ত্র গ্রন্থগুলি চক্ষুরোগের উপর লিখিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণদত্তের টীকার মধ্যে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। চক্ষুরোগের উপর লিখিত শৌনকতন্ত্র চক্রপাণি ও ডহলণের টীকায় উল্লিখিত দেখা যায়। ধাত্মী-বিদ্যা সম্বন্ধে লিখিত জীবকতন্ত্র, পর্কতক-তন্ত্র ও বন্ধকতন্ত্রের কথা ডহলণের টীকায় দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সম্বন্ধে হিরণ্যাক্ষ-তন্ত্রের কথা শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন। বিষশাস্ত্র সম্বন্ধে কাশ্যপ ও আলম্বায়ন সংহিতা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন। বিষশাস্ত্র সম্বন্ধে উশনস্ সংহিতা-সনক-সংহিতা ও লাটায়ন-সংহিতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নাগার্জুনের যোগশতক জীবসূত্র ভেষজকল্প ও অষ্টাঙ্গ-হৃদয়ের চারখানি টীকা (অষ্টাঙ্গহৃদয়বৈদ্যকভাষ্য, পদার্থ-চক্রিকাপ্রভাস, অষ্টাঙ্গহৃদয়বৃত্তি, অষ্টাঙ্গহৃদয়ভেষজসূচি) তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় ইহাদের পুনরনুবাদ একান্ত আবশ্যিক। খৃঃ ১৬শ শতাব্দীতে ভাবমিশ্র তাঁহার ভাবপ্রকাশ লিখিয়া যান। ইহার কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালে লিখিত বলরামের আতঙ্কতিমির ভাস্কর, মাধবের আয়ুর্বেদপ্রকাশ, ত্রিমল্লের যোগতরঙ্গিণী, রঘুনাথের বৈদ্যবিলাস, বিদ্যাপতির বৈদ্যরহস্য, কবি-চন্দ্রের চিকিৎসারত্নাবলী, মণিরাম মিশ্রের বৃন্তরত্নাবলী, জগন্নাথের যোগসংগ্রহ, হৃষকীর্তিশুরীর যোগচিন্তামাণ বৈদ্যকসারসংগ্রহ ও লোলিন্দ্ররাজের বৈদ্যজীবন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে যোগরত্নাকর নামেও এক গ্রন্থ লিখিত হয়, তাহাতে চিকিৎসাপ্রণালীর সহিত শস্ত্রাক্রমারও নানা পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। ইহার কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালে নারায়ণের রাজবল্লভীয়দ্রব্যগুণ, বৈদ্যচিন্তামণির প্রয়োগামৃত, নারায়ণের বৈদ্যামৃত, বৈদ্যরাজের সূত্রবোধ, গোবিন্দদাসের ভৈষজ্যরত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষভাবে অনুধাবন-যোগ্য। আধুনিক কালেও কবিরাজচূড়ামণি গঙ্গাধর তাঁহার জল্পকল্পতরু টীকাতে আয়ুর্কর্ষেদের প্রসার বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া গৈলার মদনকৃষ্ণ কবীন্দ্র ও তাঁহার শিষ্যবর্গ, কবিরাজ দ্বারিকা-নাথ সেন, গঙ্গাপ্রসাদ সেন, কৈলাসচন্দ্র সেন, পীতাম্বর সেন ও শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন প্রমুখ কবিরাজগণ বঙ্গদেশকে আয়ুর্কর্ষেদ-চিকিৎসার পীঠস্থান করিয়া গিয়াছেন। জার্মান ভাষায় পণ্ডিত জলী আয়ুর্কর্ষেদ সম্বন্ধে একখানি নাতিবিস্তার গ্রন্থ ১২০১ সালে বাহির করেন। ১২০৭ খৃঃ অব্দে হর্গলে ইংরেজী ভাষায় আয়ুর্কর্ষেদীয় অস্থিতত্ত্ব সম্বন্ধে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বাহির করেন ও কর্নেল বাওয়ার কর্তৃক প্রাপ্ত গুপ্তাস্ত্রের লিখিত ৪র্থ শতকের নাবনীতক গ্রন্থখানি অশেষ পাণ্ডিত্য প্রদর্শনপূর্বক অক্সফোর্ড হইতে মুদ্রিত করিয়াছেন। ডাঃ গিরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় আয়ুর্কর্ষেদীয় শল্যযন্ত্র সম্বন্ধে ও আয়ুর্কর্ষেদের ইতিহাস সম্বন্ধে দুই খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। মংকৃত হিন্দুদর্শনের ইতিহাসের ২য় খণ্ডে আয়ুর্কর্ষেদ সম্বন্ধে এক অতিবিস্তৃত নিবন্ধ লিখিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ

গণনাথ সেন মহাশয় তাঁহার প্রত্যক্ষশারীর, সিদ্ধান্তনিদান প্রণয়ন করিয়া কবিরাজমণ্ডলীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। প্রথম গ্রন্থে তিনি ইউরোপীয় অস্থিবিজ্ঞানের কতকগুলি তথ্য আয়ুর্বেদ-পাঠীদের জন্য সংস্কৃত ভাষায় আহরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থে অধুনাতন কালে প্রচলিত অনেকগুলি রোগকে আয়ুর্বেদীয় প্রণালীতে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বর্তমান কবিরাজমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই কিছু কিছু আয়ুর্বেদীয় গবেষণায় লিপ্ত আছেন ও নানা আয়ুর্বেদ পত্রিকার প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া নানা প্রবন্ধাদি প্রণয়ন করিয়া আয়ুর্বেদের জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন। ৬যামিনীভূষণ-কৃত কুমারভদ্র, বিষভদ্র ও শ্রীযুক্ত বিরজাচরণ গুপ্তের 'বনৌষধি-দর্পণ'ও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। হারাণচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের

স্বশ্রুতের টীকা এবং যোগীন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের চরকের টীকা সুধীসমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত উ. সি. দত্ত মহাশয়কৃত *Materia Medica of the Hindus*, শ্রী ভগবৎ সিংহীর "A Short History of Aryan Medical Science", উমেশচন্দ্র গুপ্তের বৈজ্ঞানিকসিদ্ধি, বিনোদলাল সেনগুপ্তের আয়ুর্বেদীয় জর্যাভিধান, গোড়বালের নিঘণ্টুরত্নাকর, দত্তরাম চৌবের বৃহস্মিৎ রত্নাকর, রঞ্জিত সিংহের চৌবটানী-প্রকাশ ও বিনোদলাল সেনের আয়ুর্বেদবিজ্ঞান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আয়ুর্বেদের আর একটা বড় দিক তাহার রসশাস্ত্রের দিক, তাহা আগামী প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

আলোচনা

“ ‘অগ্রসর’ হিন্দু বাঙালী শিক্ষায় ভংগুর ! ”

এই বিষয়ে গত চৈত্র মাসের 'প্রবাসী'র বিবিধ প্রসঙ্গে সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, “বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে সকলের চেয়ে শিক্ষায় অগ্রসর জাত বৈদ্যারা। কিন্তু তাহাদের মধ্যেও শতকরা ৩৬.৫ জন নিরক্ষর।... বৈদ্যদের চেয়ে কম অগ্রসর ব্রাহ্মণেরা, তাহাদের মধ্যে নিরক্ষরের সংখ্যা শতকরা ৫৪.৮—এই নিরক্ষরদের মধ্যে শিক্ষাধীন হইবার বয়সের বিস্তর লোক আছে।” ইত্যাদি

মধ্যে মধ্যে পত্রিকায় দেখিয়া থাকি বৈদ্যদের চেয়ে কম অগ্রসর ব্রাহ্মণেরা। কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিতে যে আমরা কি বুঝি তাহা অনেকেই জানেন না। ব্রাহ্মণ অর্থে—রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক ব্যতীত লগ্নাচাখা, অগ্রদানী, ভাটব্রাহ্মণ, বর্ণব্রাহ্মণ, উড়িয়া, হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী, গুজরাটী, মারাঠী, মাল্লাজী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ বোধ হয় বুঝায়।

সংখ্যালঘু বাঙালী বৈদ্য জাতির সহিত যদি তুলনা করিতে হয় তাহা হইলে শুধু বাঙালী রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক ব্রাহ্মণগণের সহিত তুলনা করিলেই বোধ হয় উহা সমীচীন হইবে। কারণ সর্বশ্রেণীর সমন্বয়ে বিরাট ব্রাহ্মণ জাতি গঠিত, কাজেই উহার সহিত বৈদ্য জাতির তুলনা কোনরূপেই সম্ভব নয়। আমার মনে হয় ঐরূপ তুলনামূলক আলোচনা করিলে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে নিরক্ষর শতকরা ৫৪.৮ হইবে না, উহার অনেক কম হইবে সন্দেহ নাই।

এখানে লিখিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, ব্রাহ্মণের জাতির মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মণ পরিচয়জ্ঞাপক ভট্টাচাখা, চক্রবর্তী প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন না। এই জাতীয় উন্নতির যুগে বাধা দিবার কেহ নাই। হিন্দুস্থানী বা উড়িয়া প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের অধিকাংশই অশিক্ষিত এবং বাংলায় তাহাদের সংখ্যা নেহাৎ কম হইবে না, মনে হয়। আমার বিশেষ পরিচিত বর্ণব্রাহ্মণ অর্থাৎ জেলে, ভূঁইয়ালী ও মাহিষদিগের ব্রাহ্মণগণের অনেকেই মোটেই লেখাপড়া জানেন না।

ভাটব্রাহ্মণ, কামরূপী প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণও শিক্ষায় বহু নিচে। কাজেই এক পদ্যে সকল ব্রাহ্মণকে ফেলিলে ভুল হইবে।

গত সেমসে অনেক ত্রুটিও হইয়াছে। নেত্রকোণায় হিন্দুদিগের চেয়ে মুসলমানগণ শিক্ষায় উন্নত, গণনাথ এইরূপ প্রমাণিত হইয়াছে। 'প্রবাসী'তে জনৈক ভদ্রলোক উহা লিপিয়াছেন।

গণনার সময় অনুন্নত ব্রাহ্মণগণের অনেকেই ভয়ে স্ত্রীলোকগণ লিখিতে পড়িতে জানিলেও, অশিক্ষিতা বলিয়া লেখাইয়াছেন।

গণনাকারীদের মধ্যে অনেকই তথাকথিত শিক্ষিত। কাজেই তাহারা নিজেদের ইচ্ছামত ঘর পুরণ করিয়াছেন এবং মফস্বলের অধিকাংশ বাড়ির স্ত্রীলোকগণকে অশিক্ষিত পধ্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। এরূপ আরই ঘটিয়াছে।

বৈদ্য জাতের সংখ্যা কম, কাজেই শিক্ষায় তাহারা উন্নত সন্দেহ নাই, আর তাহাদিগের মধ্যে জাতীয় সহানুভূতি বাংলার যে-কোন জাতির চেয়ে যে বেশী তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইব। দারা বাংলার ব্রাহ্মণগণের কোন সভা থাকিলেও শিক্ষার জন্ত তাহারা কোন চেষ্টা করিয়াছেন কি-না জানি না। এ-বিষয়ে সকল ব্রাহ্মণের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। আমার সনিক্ষক অনুরোধ, শুধু রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের লোকসংখ্যা কত বা তাহাদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা কত, সঠিক জানিতে পারিলে 'প্রবাসী'র 'বিবিধ প্রসঙ্গে' লিখিয়া আমার ঔৎসুক্য নিবারণ করিবেন।

শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র মজুমদার

সম্পাদকীয় মন্তব্য—

পত্রলেখক যে-যে তথ্য জানিতে চাহিয়াছেন সেমস রিপোর্টে তাহা নাই। হিন্দুদের মধ্যে কোন্ কোন্ জাত শিক্ষায় অগ্রসর এবং কত অগ্রসর, সেমস রিপোর্টে ও শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্টে এইরূপ তথ্য ও আলোচনা থাকতেই আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছিলাম। আমরা সকল জাতকেই অগ্রসর দেখিতে চাই। “অগ্রসর”দিগকে অহত ও “অনগ্রসর”দিগকে কুণ্ঠিত করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই।—প্রবাসীর সম্পাদক।

ভূষণা

শ্রীবিবেকানন্দ ভট্টাচার্য

বেঙ্গলের মানচিত্রের দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে, বর্তমান ফরিদপুর ও যশোহর জেলার অনেকটা স্থান জুড়িয়া সেকালে ছিল ভূষণা। ভূষণা অতি প্রাচীন স্থান, কিন্তু বর্তমান সময়ে উহা নামে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে। এখানে হিন্দুরাজ্যের রাজত্ব ছিল, মুসলমান ফৌজদারের শহর ছিল; হিন্দু ও মুসলমান, পাঠান ও মোগলের বহু বার সঙ্ঘর্ষ ঘটিয়াছিল। মুকুন্দরামের ভূষণা, সীতারাম রায়ের ভূষণা এখন খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। ইহাই কালের নিয়ম।

ফরিদপুর নগর হইতে পশ্চিম দিকে প্রায় আঠার মাইল দূরে মধুখালি গ্রাম। এখানে অল্পদিন পূর্বেও পুলিশের একটা আড্ডা ছিল। সাবেক কালের ভূষণা এখন হইতে প্রায় তিন-চার মাইল। গ্রাম্য রাস্তা ও মাঠের মধ্য দিয়া কোনমতে সেখানে পৌঁছিতে হয়। যেখানে জনাকীর্ণ নগর ছিল সেখানে এখন ক্ষুদ্র পল্লী। নিকটেই প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ। প্রাচীর ও পরিখার চিহ্ন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। বনজঙ্গলের মধ্যে ইষ্টকনির্মিত গৃহও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে এখনও দেখাইয়া দেয়, অমুক স্থানে অপরাধীকে শূলে দেওয়া হইত। সেকালে একদিকে চন্দনা নদী, অত্র দিকে কালীগঙ্গা ভূষণার নৈসর্গিক রক্ষিরূপে বিদ্যমান ছিল। কালীগঙ্গা এখন মৃত, চন্দনা মুমূর্ষু। দুর্গের পাদদেশে একটি সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা কোনরূপে কালের সর্কগ্রাসী কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আছে। পুলিশ স্টেশনের নাম এখনও ভূষণা থাকিলেও বহুকাল পূর্বে উহা ভূষণা হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। কিছু কাল ইহার অবস্থিতি ছিল সৈয়দপুর নামক স্থানে, তাহার পর গিয়াছে বোয়ালমারিতে। ভূষণার সমৃদ্ধি এক সময়ে সৈয়দপুরকে গৌরবান্বিত করিয়াছিল। এখানে পূর্বে মিউনিসিপ্যালিটি ছিল, বাণিজ্যের শ্রী বিরাজ করিত। তাহাও এখন অতীতের কথা।

ভূষণা-মামুদপুর কথাটা খুব প্রচলিত, কিন্তু ভূষণা মধুমতী নদীর পূর্বদিকে, মামুদপুর পশ্চিমে। বোধ হয় মধ্যবর্তী নদী

পূর্বে ক্ষুদ্রকায় ছিল এবং উভয় স্থানের সামাজিক যোগ থাকায় নামটার উদ্ভব হইয়াছে। এখন ভূষণা ফরিদপুর জেলায়, মামুদপুর যশোহরের মধ্যে।

‘দিগ্বিজয়প্রকাশ’ নামক হিন্দু ভৌগোলিক গ্রন্থে পাওয়া যায়, ধেনুকর্ণ নামে এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তিনি যশোরেশ্বরীর মন্দির পুনর্নির্মাণ করেন। তাঁহার পুত্র কণ্ঠহারের ‘বঙ্গভূষণ’ উপাধি ছিল এবং তিনিই যশোহরের উত্তর ভাগ অধিকার করিয়া তাহার নাম ভূষণা রাখেন। কোন সময়ে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা ঠিক জানা যায় না, তবে অবস্থা দৃষ্টে বলিতে হয় বারভূঞার অভ্যুদয়ের বহু পূর্বে।*

মুসলমান আমলে ভূষণা নগর ছিল সাতের পরগণার অন্তর্গত। মোগল শাসনকালে যখন সুবে বাংলা (উড়িষ্যা সমেত) চাক্ষুশি সরকারে বিভক্ত হয় তখন এই সাতেরকে সরকার মামুদাবাদের অন্তর্গত দেখা যায়। সরকার মামুদাবাদ ও সরকার ফতেহাবাদ দুইটি পাশাপাশি সরকার, একের ইতিহাস অত্রের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আইন-ই-আকবরীতে আমরা ফতেহাবাদকে একটি বিস্তীর্ণ জনপদরূপে দেখিতে পাই। বর্তমান ফরিদপুর জেলার অনেকটা অংশ, যশোহর জেলার খানিকটা এবং বর্তমান বাখরগঞ্জ, ঢাকা ও নোয়াখালি জেলার খানিকটা ইহার অন্তর্গত ছিল। মামুদাবাদ সরকারের মধ্যে বর্তমান ফরিদপুর জেলার পশ্চিমাংশ, যশোহর জেলার অনেকটা এবং নদীয়া জেলার কতকটা ছিল। ইহাতে মহাল ছিল ৮৮টি এবং ইহার রাজস্ব ছিল ১১৬১০২৫৬ দাম। ফতেহাবাদ অপেক্ষা এই সরকার অধিক রাজস্ব যোগাইত, কিন্তু সৈন্ত যোগাইতে হইত ফতেহাবাদকে অনেক বেশী।

* ‘দিগ্বিজয়প্রকাশ’ খুব প্রাচীন বা প্রামাণিক গ্রন্থ না হইলেও প্রাচীন ঘটনাবলীর স্মৃতির উপর লিখিত এবং হিন্দুদিগের এই শ্রেণীর গ্রন্থের অভাব ইহাকে মূল্যবান করিয়া রাখিয়াছে।

এই দুইটি পাশাপাশি জনপদ^০ নামে মুসলমান-প্রতাপ ঘোষণা করিলেও বহুকাল পর্যন্ত হিন্দুরাজার প্রভাবাধিত ছিল। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বিজয়গুপ্ত-প্রণীত মনসামঙ্গলের কোন পাঠে এক ‘অর্জুন রাজা’র উল্লেখ পাইয়াছেন যাহার ছিল “মুল্লুক ফতেহাবাদ বঙ্গরোড়া তক সাম”। এই অর্জুন রাজা সম্ভবতঃ পাঠানরাজের আনুগত্য স্বীকার করিতেন, কিন্তু মামুদাবাদের হিন্দুরাজা গোড়ের প্রতাপ ক্ষুণ্ণ দেখিলেই মন্তক উন্নত করিতে ক্রটি করিতেন না। আইন-ই-আকবরীতে আমরা পাই, এখানে কেলা ছিল, আশেপাশে নদী ছিল, পূর্বে জয় সবেও শের শাহকে আবার এই প্রদেশ আক্রমণ করিয়া জয় করিতে হইয়াছিল। সেই জয়ের সময়ে এখানকার রাজার কতকগুলি হস্তী জঙ্গলে পলায়ন করে এবং তাহার পর জঙ্গলের মধ্যে তাহাদের বংশবৃদ্ধি হয়। এই রাজার রাজধানী ভূষণায় ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ঠিক কোন সময়ে মামুদাবাদ নামের উৎপত্তি তাহা বলা যায় না, তবে মনে হয় বাংলার পাঠান নৃপতি ফখ শাহ (১৪৮১-৮৭ খৃঃ অক) নামানুসারে ফতেহাবাদের নাম হইয়াছে আর মামুদাবাদের নামও তাহার নিকটবর্তী কোন সময়ের। শের শাহের আক্রমণের পরবর্তী সময়ের কোন ধারাবাহিক বিবরণ না পাইলেও আমরা বুঝিতে পারি যে হিন্দুরাজাদের প্রভাব প্রবল ছিল—নতুবা মোগল আমলে মামুদাবাদ ও ফতেহাবাদকে শাসনে আনিতে দিল্লীর বাদশাহকে গলদঘর্ষ হইতে হইত না। আকবরের রাজত্বকালে বাংলা দেশে বরাবর গোলমাল চলিয়াছিল। আকবরনামায় পাওয়া যায়, সর্বদা বিবাদ থাকায় বাংলা দেশের নাম হইয়াছিল ‘বুলঘাক’। আকমহলের যুদ্ধের পর মুরাদ খাঁ নামক জনৈক সেনাপতি ফতেহাবাদ ও বাকুলা সরকার জয় করেন বলিয়া ইতিহাসে পাওয়া যায়। বাকুলা চন্দ্রধীপে বহুকাল পর্যন্ত স্বাধীন বা অর্ধস্বাধীন হিন্দু রাজার রাজত্ব ছিল—সুতরাং এই জয়ের অর্থ সম্পূর্ণ খাসদখল নহে, আনুগত্য-স্বীকার। ইহার পরও পাঠান ও মোগলের সঙ্ঘর্ষ বাংলা ও বিহারে ভালভাবেই চলিতে লাগিল। বাদশাহের কর্মচারীদের মধ্যেও বিশ্বাসঘাতকের অভাব ছিল না। মুরাদ খাঁ ফতেহাবাদে বিদ্রোহ দমন করিয়া সেখানে অবস্থিত ছিলেন। তিনি মুখে রাজভক্ত ছিলেন, কিন্তু কার্যতঃ বাদশাহের স্বার্থ অপেক্ষা নিজের স্বার্থের

চিন্তাই বেশী করিতেন। আকবরনামায় পাওয়া যায়, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে সে-অঞ্চলের ভূম্যধিকারী মুকুন্দরাম রায় তাঁহার পুত্রগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের হত্যাসাধন করেন ও সম্পত্তি অধিকার করিয়া লন। “বারভূঞা” গ্রন্থ প্রণেতা আনন্দনাথ রায় কিন্তু লিখিয়া গিয়াছেন, “মোরাদের সহিত তাঁহার বিশেষরূপ সখ্যতা! থাকায়, মুকুন্দ তাঁহার পুত্রগণের যথোচিত সহায়তা সাধনে বহুপরিকর হন।” ইহা তিনি কোথায় পাইলেন জানি না। আনন্দনাথ রায় আরও বলেন, “টোডরমল্ল জানিতে পারিলেন যে, মুকুন্দ মোগল পক্ষাবলম্বী হইয়া পাঠানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এজগ্ন নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়া ফতেহাবাদে অগ্নি কোন মুসলমান শাসনকর্তা নিয়োগ না করিয়া মুকুন্দ রায়কে রাজোপাধি প্রদান ও ঐ সরকারের কতক শাসনভার অর্পণ করিলেন।” “মানসিংহ মধ্য সময়ে যখন একবার বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করেন তৎসময়ে শাসনকর্তা সায়দ খাঁ, মুকুন্দ রায়কে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে এক জন মুসলমান শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান। মুকুন্দ রায় এই আকস্মিক বিপদে পতিত হইয়া চিন্তিত হইলেন বটে, কিন্তু কোনও মতে নব শাসনকর্তার হস্তে ফতেহাবাদ সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। উভয় পক্ষের মধ্যে একটি যুদ্ধঘটনার অবতারণা হইল। তেজস্বী বীরবর মুকুন্দ রায় অনায়াসে সেই যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে তাড়াইয়া দিলেন। পরে সায়দ খাঁ দলবল সহ উপস্থিত হইয়া মুকুন্দ রায়কে পরাস্ত ও হত করেন।” এই সকল কথাও রায়-মহাশয় প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করেন নাই। মুকুন্দরাম রায় প্রদত্ত ব্রহ্মত্র জমীর দলীলের সন্ধান কালেঙ্করীতে পাওয়া গিয়াছে।

আকবরনামায় পাই, খাঁ আজিম কোকা বঙ্গদেশে বিদ্রোহ-দমনে প্রেরিত হইলে (১৫৮২ খৃষ্টাব্দ) তাঁহার বিরুদ্ধে যে-সকল বিদ্রোহী নেতা সমবেত হইয়াছিলেন তাহার মধ্যে ফতেহাবাদের কাজীজাদা ছিলেন একজন। ইনি অনেক রণতরী লইয়া আসিয়াছিলেন। কামানের গোলায় ইহার মৃত্যু হইলে কালাপাহাড় ইহার স্থলে নৌবিভাগের ভার গ্রহণ করেন।

ইহার কিছুকাল পরে রাজা মানসিংহের উড়িয়া জয়ের

পর আমরা ভূষণায় বিষম গোলযোগের সংবাদ পাই। এই সময়ে, যেরূপেই হউক, ভূষণা চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের হস্তগত হইয়া পড়িয়াছিল। মুকুন্দরাম সম্ভবতঃ তখন মৃত, তাঁহার পুত্র সত্রাজিৎ কি করিতেছিলেন বা কোথায় ছিলেন জানা যায় না। বিদ্রোহী আফগানেরা লুটপট করিতে করিতে ভূষণার দিকে অগ্রসর হয়। আবুলফজল এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া বোধ হয় চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের সহকৃষিপর্ধ্যায় ঘটাইয়াছেন। তাঁহার মতে কেদার রায় ছিলেন চাঁদ রায়ের পিতা। চাঁদ রায় কেদার রায়ের পরামর্শে বিদ্রোহী আফগানদিগকে বন্দী করার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু ফলে তাঁহার নিজেরই প্রাণ গেল। চাঁদ রায় না-কি আতিথেয়তার ভাণ করিয়া পাঠানসর্দার দেলওয়ার, সুলেমান ও উসমানকে ভূষণা-দুর্গে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেখানে ছলক্রমে দেলওয়ারকে বন্দী করা হইলে সুলেমান তরবারি উন্মুক্ত করিয়া নিকটবর্তী বহু লোককে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তিনি দুর্গদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে চাঁদ রায় তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন, কিন্তু উসমান আসিয়া সুলেমানের সহায়তা করিতে লাগিলেন এবং ঘটনার বিবরণ শুনিয়া পাঠানেরা প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। চাঁদ রায়ের নিজের পাঠান-সৈন্যও তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। ফলে চাঁদ রায় নিহত হইলেন। আফগান-সৈন্য লুটপট করিতে করিতে অগ্রসর হইলে দুর্গস্থ লোকেরা মনে করিল চাঁদ রায় বুঝি ফিরিতেছেন। তাহার দুর্গদ্বার খুলিয়া দিল, আফগানেরাও সহজেই জয়লাভ করিল। তাহার পর ইশা খাঁর ষড়যন্ত্রে আফগানেরা তাঁহার সহিত মিলিত হইলে ভূষণা-দুর্গ ও রাজ্য কেদার রায়ের হস্তে সমর্পিত হইল।

কেদার রায় এইরূপে আফগানদিগের যোগে ভূষণার মালিক হইয়া বসিলেন, কিন্তু প্রবল মোগল কর্তৃপক্ষ বেশী দিন এ অবস্থা স্থির থাকিতে দিলেন ন। মানসিংহ শীঘ্রই দুর্জন সিংহের অধীনে একদল বাছা সৈন্য ভূষণায় প্রেরণ করিলেন (১৫২৬ খৃষ্টাব্দ)। সুলেমান ও কেদার রায় দুর্গ দৃঢ় করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। মোগল-সৈন্য দুর্গ অবরোধ করিল, প্রতিদিন যুদ্ধ চলিতে লাগিল। দুর্গমধ্যে এক কামান ফাটিয়া যাওয়ার সুলেমান ও আরও অনেকে নিহত

হইলেন। কেদার রায় আহত হইয়া পলায়ন করতঃ ইশা খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। (আকবরনামা)

সম্ভবতঃ ১৫২৮-২৯ অব্দে মানসিংহের স্থানান্তরে অবস্থানকালে সত্রাজিৎ আবার ভূষণায় প্রবল হইয়া পড়েন।

কথিত আছে, টোডরমল মুকুন্দরামকে ভূষণার অমিদার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন (১৫৮২ খৃঃ)। ৬সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন যে, প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেকের সময় মুকুন্দরাম ও তৎপুত্র সত্রাজিৎ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন (১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু, তৎপরে অভিষেক)। সতীশচন্দ্র আরও বলেন, মুকুন্দরাম কায়স্থ রাজা কেশব সিংহের বংশধর। কেশব সিংহ উত্তর-রাঢ় হইতে আসিয়া দক্ষিণ-রাঢ়ে আন্দুল-সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। কি সূত্রে মুকুন্দরাম ভূষণায় প্রাধান্য লাভ করেন তাহা স্থির করা কঠিন। তবে তিনি যে সত্রাট আকবরের সময়ে ভূষণা ও নিকটবর্তী ফথেদাবাদ অঞ্চলে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা সমসাময়িক বিবরণ হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। কায়স্থদিগেব দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গ সমাজ উভয়ই তাঁহাকে দাবি করে। ফথেদাবাদের বঙ্গ কায়স্থ সমাজের ইনিই প্রতিষ্ঠাতা। এই কার্যের জন্য ইহাকে চন্দ্রদ্বীপ অঞ্চল হইতে অনেক দুলীন কায়স্থ আনাহঁতে হইয়াছিল।

মুকুন্দরামের পুত্র সত্রাজিৎ কখনও মোগল-পক্ষের সহায়তা, কখনও বিরোধিতা করিয়া বহুকাল ভূষণার প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। স্যার যত্নাথ সরকার মহাশয় যে আবদুল লতিফের ভ্রমণকাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন ও বাহারিস্তান নামক পুস্তকের সন্ধান দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায়, সত্রাজিৎ কিছুদিন মোগল বাদশাহের বিদ্রোহিতাচরণ করিয়াছিলেন। সুবেদার ইসলাম খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে ইফ্তখর নামক এক সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। ইহাতে সত্রাজিৎ দমেন নাই। তিনি বাদশাহের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু মোগলেরা নদী পার হইয়া অতর্কিত ভাবে তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিল। সত্রাজিৎ তখন বশতা স্বীকার করিয়া ইসলাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। * ইসলাম খাঁ যখন আঠারবাঁকা ও

* এই প্রসঙ্গে মাত্রাজ হইতে প্রকাশিত *Journal of Indian History*, Dec. 1932 তে বাহারিস্তানের অনুবাদ উল্লেখ্য।

ভৈরব নদের সন্মুখে অবস্থিত আলাইপুর হইতে কুচ করিয়া নসরপুর বা নাজিরপুরের দিকে যাইতেছিলেন তখন পশ্চিমধ্যে ফতেপুর নামক স্থানে সত্রাজিৎ আসিয়া দেখা করিলেন (১৬০৯ খৃঃ অব্দ) এবং সুবেদারকে আঠারটি হস্তী উপহার দিলেন। দুই পক্ষে মৌহাদ্দা স্থাপিত হইলে সত্রাজিৎ মোগলপক্ষে বিদ্রোহদমনে মন দিলেন। এই সময়ে যিনি ফথেয়াবাদের অধিকারী হইয়া পড়িয়াছিলেন তাঁহার নাম মজলিস্ কুতব। কবি সৈয়দ আলাওলের আত্মপরিচয়ে এই মজলিস্ কুতবের উল্লেখ আছে। হবিবুল্লা নামক এক সেনাপতি বিদ্রোহী মজলিস্ কুতবের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন আর রাজা সত্রাজিৎ হইলেন এই সেনাপতির সহায়। মজলিস্ কুতব ফথেয়াবাদ-দুর্গে অবরুদ্ধ থাকিয়া মুশা খাঁর সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। সাহায্য আসিল কিন্তু মজলিস্ মোগল সৈন্যকে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। মোগল ঐতিহাসিকের বিবরণ হইতে জানা যায়, এই যুদ্ধে সত্রাজিৎের সৈন্যপত্য ও সাহস মোগলদিগের বিশেষ উপকারে লাগিয়াছিল। পাঠানপক্ষীয় লোক পুনঃ পুনঃ দুর্গ হইতে নিজ্জাস্ত হইয়া মোগলপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল, কিন্তু সত্রাজিৎ তাহাদিগের সকল উদ্যম ব্যর্থ করিয়া দিলেন। অনেক মারামারির পর মজলিস্ মুশা খাঁর সহিত যোগ দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। অবশেষে তিনি দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।

ইহার পর আমরা ভূষণারাজ সত্রাজিৎকে মোগলপক্ষে কুচবিহারের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে ব্যাপৃত দেখিতে পাই। মোগল-সুবেদার সেখ আলাউদ্দিন ইসলাম খাঁর আস্থানে তিনি মোগল-সৈন্যের যোগে কোচ-রাজ্যে আক্রমণ করেন। কোচ-রাজ্যে বিজিত হইলে তাঁহার শৌর্য্যে প্রীত সুবেদার তাঁহাকেই পাণ্ডু ও গৌহাটির খানাদার বা সীমান্তরক্ষক পদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার বহু অস্থির এবং ভূষণার অধিপতিরূপে একটা বিশিষ্ট খাতির ছিল। ইহার ফলে তিনি আসামবাসীদিগের বন্ধুত্ব লাভ করেন এবং কোচ-রাজবংশের সহিতও ঘনিষ্ঠতা সম্পাদনে সমর্থ হন। সেখ আলাউদ্দিনের পরবর্তী শাসনকর্তারা তাঁহাকে অনেক বার ডাকিয়া পাঠাইলেও তিনি সে ডাক গ্রাহ্য করেন না, পূর্বপ্রথামত পেশকশ ও পাঠান না। এদিকে তিনি কোচরাজ্যের ভ্রাতা বলিনারায়ণের সহিত ষড়যন্ত্রে

লিপ্ত হন এবং মোগল-সেনাপতি আবদার সালামের কর্তৃত্বাধীনে সৈন্য প্রেরিত হইলে সত্রাজিৎের বিশ্বাসঘাতকতায় অহোম নৌবাহিনী কর্তৃক মোগল-সৈন্যের পরাজয় ঘটে। ইহার ফলে সত্রাজিৎ ধুবড়ীতে ধৃত হইয় ঢাকায় প্রেরিত হন এবং এখানে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড হয় (খৃঃ ১৬৩৬ অব্দে বা তাহার নিকটবর্তী সময়ে)।

ইহার পর ভূষণা কিছুকাল মোগল-সেনাপতি সংগ্রাম শাহের 'নাওরা' মহলভুক্ত থাকে। সংগ্রাম পশ্চিমদেশীয় লোক। কেহ বলেন, তাঁহার আদি বাসস্থান ছিল রাজপুতানায় (৮ আনন্দনাথ রায়), কেহ বলেন জম্মুতে (৮ সতীশচন্দ্র মিত্র)। তিনি পূর্ববঙ্গে নানা স্থানে বিদ্রোহদমন ও দস্যাদলন কার্যে যশ অর্জন করিয়া শেষে ভূষণা অঞ্চলে ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তখনও তাঁহাকে সত্রাজিৎের কার্যে আবশ্যিকমত নৌ-সৈন্য যোগাইতে হইত। ঠিক কোন্ সময়ে তিনি ভূষণায় আধিপত্য প্রাপ্ত হন ঠিক করা কঠিন। তবে তিনি বেশ প্রতাপের সহিতই শাসনকার্য চালাইতেন। বোধ হয় এখানে তাঁহার স্থায়ী ভাবে বাস করিবার ইচ্ছা ছিল, তাই বৈদ্য-সমাজে পুত্র-কন্যার বিবাহ দিয়া "হাম বৈদ্য" বলিয়া পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বৈদ্যের সহজে অজ্ঞাতকুলশীল রাজ্যের সহিত বিবাহসম্বন্ধ আবদ্ধ হন নাই। কুলজী গ্রন্থের প্রমাণে বুঝিতে পারা যায়, নবাগত সামন্তকে সময়ে সময়ে বল-প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। মথুরাপুর গ্রামের সুবিখ্যাত "দেউল" ইহারই কীর্তি। এই দেউল সম্বন্ধে শ্রীবৃন্দ গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের কৃপায় এখন আমরা অনেক কথাই শুনিতেছি।*

সংগ্রাম বা তাঁহার পুত্রের প্রতাপ ভূষণা অঞ্চল হইতে কিরূপে গেল ঠিক জানা যায় না। মনে হয়, প্রায় তাঁহাদের তিরোধানের সময়েই ফথেয়াবাদ হইতে কোঁজদারের আসন স্থানান্তরিত হইয়া ভূষণায় আসে। ফথেয়াবাদের উপর পদ্মাদেবীর অস্থির এবং সংগ্রাম শাহ বা তাঁহার পুত্রের ভূসম্পত্তি শাসন ইহার কারণ হইতে পারে। †

* ১৩৪০ চৈত্র সংখ্যার 'প্রবাসী' ভ্রম্য।

† আনন্দনাথ রায় তাঁহার করিমপুরের ইতিহাসে সত্রাজিৎ আওরংজেবের সময়ে বঙ্গদেশে সংগ্রাম শাহের নানা কীর্তির উল্লেখ করিয়াছেন, আবার যশোহর কালেক্টরীর তালিকাতে ১৬২৬ ও ১৭৪১ (১৬৪১?) খৃষ্টাব্দে সংগ্রাম শাহ কর্তৃক ভূমিদানের কথাও লিখিয়াছেন। ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর সত্রাজিৎ এবং সত্রাজিৎ ভূষণার রাজা। সে সময়ে সংগ্রাম শাহের ভূমিদান কিরূপে সম্ভব হয়? ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে শাহজাহান বাদশাহ

ইহার পর আমরা সীতারাম রায়ের পিতা উদয়নারায়ণকে ভূষণার ফৌজদারের অধীনে সাজোয়ালরূপে দেখিতে পাই। উদয়নারায়ণ ভূষণা নগরের অদূরে গোপালপুর গ্রামে বাসস্থান স্থির করেন; পরে হরিহরনগর নামক গ্রামে বাস করিতে থাকেন। তিনি উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকুলসম্ভূত ছিলেন। কাটোয়ার নিকট কোন গ্রামে তিনি দয়াময়ী নামী এক ঘোষ-দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। সীতারাম এই বিবাহের ফল।

সীতারাম সম্বন্ধে অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন। তবু, বর্তমান প্রবন্ধে কিছু না-বলিলে ভূষণার কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তিনি প্রথম বয়সে কিছু সংস্কৃত, ফার্সি ও উর্দু শিখিয়াছিলেন কিন্তু অল্পশিক্ষায়ই তাঁহার মনোযোগ ছিল অধিক। তাঁহার পিতা ঢাকায় রাজদরবারে নিযুক্ত থাকার সময়ে তিনিও সেখানে যাতায়াত করিতেন। পরে উদয়নারায়ণ ভূষণার সাজোয়াল হইয়া আসিলে, তিনিও দস্যদমনের কার্যে ভূষণা অঞ্চলে আসিলেন। এই কার্যে সাফলালাভ করিয়া সীতারাম নবাবসরকার হইতে জায়গীরও লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পিতার স্থায় নবাব সরকারে চাকরি করিয়াই জীবনক্ষেপ করিবার লোক ছিলেন না। তাঁহার অস্ত্রবিদ্যা নিজের কার্যে ভালমত লাগাইতে তিনি কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। নবাবপক্ষে নিযুক্ত হইয়া করিম খাঁ পাঠানের বিদ্রোহদমনই তাঁহার উন্নতির সূত্রপাত। সে সময়ে দস্যবৃত্তি দেশে বিশেষভাবে প্রচলিত। সীতারাম জায়গীর ও সেই সঙ্গে আরও দস্যদমনের ভার পাইলেন। তাঁহার বীর সঙ্গীও অনেক জুটিয়া গেল। জুনিরাম রায় ও রামরূপ বা মেনাহাতী ইহাদের মধ্যে প্রধান। দস্যদমনে তিনি ক্রমেই অধিকতর কৃতকার্যতা দেখাইতে লাগিলেন; অন্তত বাসস্থান স্থাপন করিলেও সমৃদ্ধ ভূষণা নগরীতে প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। তাঁহার খ্যাতি বাড়িতে লাগিল ও 'রাজা' উপাধি লাভ হইল। তিনি দক্ষিণ-বাংলা আবাদে আনিবার সন্দেহ পাইলেন এবং বর্তমান মাগুরা মহকুমায় অবস্থিত মহম্মদপুর নগর স্থাপন করিলেন। হিন্দুর এই নতুন রাজধানীর মুসলমানী নাম হইল কেন? এ-সম্বন্ধে নানা প্রবাদ আছে। খুব সম্ভব, তখনও তিনি মোগলের বশ্যতা অস্বীকার করেন নাই, মোগল শাসনকর্তাকে সম্বোধন রাখিবার জন্যই নিজ নগরের মুসলমানী নাম

দিয়াছিলেন। তাঁহার অধীন কর্মচারীদের মধ্যেও যোগ্য মুসলমানের অভাব ছিল না। মুগ্ধ দুর্গ, সুবৃহৎ মনোরম জলাশয়, সুন্দর দেবমন্দির ইত্যাদি দ্বারা মহম্মদপুর ভূবিত হইয়াছিল। সীতারামের কীর্তি অতীতের অনেক ঝঙ্কারে স্মৃতি করিয়া এখন পর্যন্ত দর্শকের চিত্ত বিনোদন করে। নানা স্থান হইতে রাজসরকারে কর্ম ও বাণিজ্যাদি উপলক্ষে লোক আসিয়া মহম্মদপুরকে ক্রমে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে। এই সময়ে নানা স্থানে রাজা-প্রজায় অসম্ভাব-রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা—সীতারামকে রাজ্যবিস্তারে সহায়তা করে। জমিদারীতে বিশৃঙ্খলা?—সীতারাম অমনি শৃঙ্খলার নামে গ্রাস করিতে প্রস্তুত। অন্য জমিদারের প্রজা বিদ্রোহী?—সীতারাম সেখানে সেই প্রজাকে নিজের প্রজায় পরিণত করিতে পশ্চাৎপদ নহেন। সীতারামের জমিদারী ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। এক সময়ে মুকুন্দরাম ও সত্রাজিতের প্রতাপে ভূষণা অঞ্চল কম্পিত হইত। সীতারাম সত্রাজিতের বৃদ্ধ প্রপৌত্রগণকে নিজের এলাকাভুক্ত করিলেন। নলডাকার রাজা তাঁহার জমিদারীর পূর্বভাগ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

সীতারামের সকল কথা বিস্তৃতরূপে লিখিবার স্থান এ নয়। উত্তরে পদ্মা পর্যন্ত অনেক পরগণা—নসিবসাহী, নসরৎসাহী, মহিমসাহী, বেলগাছী প্রভৃতি এবং সম্ভবতঃ পদ্মার উত্তরেও কিছু কিছু তিনি ক্রমে হস্তগত করেন। দক্ষিণেও তাঁহার রাজ্য অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে—কতক গায়ের জোরে, কতক আবাদী সন্দেহের বলে। উজানীর রাজাদের অনেক স্থান তিনি অধিকার করিয়া লন।

সীতারাম কেবল রাজ্যবিস্তারই করিতেন না, তিনি নিজের রাজ্যে শৃঙ্খলাস্থাপনের চেষ্টা করিতেন, পাণ্ডিত্যের সমাদর ও সাহায্য করিতেন, বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতেন, সমাজসংস্কারেও অমনোযোগী ছিলেন না।

মোগল স্ববেদারগণের দুর্বলতাই সীতারামের প্রতাপ বহুদিন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। ক্রমে ভূষণার ফৌজদারের সহিত তাঁহার বিবাদ বাধিল। বারাসিয়া নদীর কূলে এক ক্ষুদ্র বৃহৎ ফৌজদার আবুতোরাপ নিহত হইলে সীতারাম ভূষণা অধিকার করিলেন। ভূষণার তখন অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি; নানারূপ সুন্দর কারুকাৰ্য, কাগজ, গালা, বাসনপত্র, তুলা

ইত্যাদির জন্য ভূষণা বিখ্যাত ছিল। কাগজ ও গালার কাজ এখনও সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। সাত্তরের পাটীর তায় সূক্ষ্ম পাটী বোধ হয় এখনও অল্প কোথাও প্রস্তুত হয় না। সৈয়দপুরের প্রকাণ্ড পানী নৌকা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় একটা দর্শনীয় বিষয় ছিল।

আবুতোরাপ নিহত হইলে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। বক্স আলি খাঁ নামক এক ব্যক্তি ভূষণায় ফৌজদার হইয়া আসিলেন। নিকটবর্তী জমিদারদিগের উপর সীতারামকে দমন করিবার জন্য আদেশ প্রেরিত হইল। নবাবের হুকুম—জমিদারেরা সীতারামের উপর বৈকিয়া দাঁড়াইলেন। সংগ্রাম সিংহ, দয়ারাম প্রভৃতি হিন্দু সৈন্যধ্যক্ষেরা বক্স আলির সঙ্গে আসিয়া সীতারাম-দমনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমে সীতারাম জয়লাভ করিলেন, কিন্তু তাঁহার ভূষণা-দুর্গ অবরুদ্ধ হইল। দয়ারাম মহম্মদপুরের দিকে ছুটিলেন। সীতারামের সেনাপতি মেনাহাতীর গুপ্তহত্যার কথা এ অঞ্চলে সুপ্রসিদ্ধ। ভূষণায় অবস্থান নিরাপদ নহে দেখিয়া সীতারাম মুহুম্মদপুরে পলায়নকরতঃ তাঁহার কতক পরিজন স্থানান্তরিত করিলেন। শেষে বৃদ্ধে আহত হইয়া বন্দী হইলেন। মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হওয়ার পর তাঁহার মৃত্যু হয়। কিরূপে মৃত্যু হয় সে-সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

এই উপলক্ষে নাটোরের রামজীবন ও রঘুনন্দন বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত হন ; দয়ারামের ও জমিদারী লাভ ঘটে।

রঘুনন্দন নবাব-সরকারে কার্য করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি-শালী হইয়াছিলেন, তাঁহারই প্রভাবে ভূষণা জমিদারী তাঁহার ভ্রাতা রামজীবনের সহিত বন্দোবস্ত হয়। জমিদারীটি তখন প্রকাণ্ড ছিল। অনেক পরগণা ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ নবাবের সময় যখন পূর্বতন সরকারগুলির পরিবর্তে তেরটি চাকলার সৃষ্টি হয় তখন একটি চাকলা হইয়াছিল ভূষণা। প্রত্যেক চাকলার একজন করিয়া ফৌজদার ও তাঁহার অধীন নানা কর্মচারী ছিলেন। সীতারামের পতনের পরও ভূষণায় ফৌজদার রহিলেন কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ অনেক স্থান নাটোরের জমিদারীভুক্ত হইয়া গেল। রামজীবন যখন ভূষণা জমিদারীর সনন্দ প্রাপ্ত হন, তখন দিল্লীতে সম্রাট ফাররোকশের। সনন্দ তাঁহারই মোহরাঙ্কিত ছিল।

রঘুনন্দন হইতেই নাটোর জমিদারীর অক্ষয়দয়। সামান্ত

অবস্থা হইতে নিজের প্রতিভাবলে রঘুনন্দন বড় হইয়া উঠেন এবং ভ্রাতা রামজীবনের নামে বিস্তীর্ণ জমিদারী অর্জন করেন। দৌঘাপাতিয়া রাজবংশের পূর্বপুরুষ প্রতিভাশালী দয়ারাম রায় ছিলেন রঘুনন্দনের দক্ষিণহস্তস্বরূপ, আর জমিদারী পরিচালনে সূক্ষ্ম ছিলেন রামজীবন।

রামজীবন নাটোর জমিদারী বৃদ্ধিই করিয়াছিলেন। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর কিছুকাল দয়ারাম জমিদারীর কাজকর্ম চালান, পরে রামজীবনের পৌত্র রামকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার উপরই জমিদারীর ভার পড়ে। তখনকার জমিদারী পরিচালনা এখনকার মত ছিল না। জমিদারেরা পুলিশের তত্ত্বাবধান করিতেন, ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার করিতেন। রামকান্ত বিষয়কার্যে অপেক্ষা ধর্মকার্যেই অধিক অমুরাগী ছিলেন। অল্পবয়সে তাঁহার মৃত্যু হইলে জমিদারী তাঁহার পত্নী প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর হস্তে আসে। রাণী যেমন বিষয়কর্মে, তেমনি দেবার্চনা, দান-খ্যানাদি কার্যে মনোযোগ দিতেন। কিন্তু ভূষণার জমিদারীকে যে খাজনা যোগাইতে হইত, তাহাতে তাঁহার স্ত্রী দানশীলা রমণীর পক্ষে ইহার রক্ষা অনেক সময়েই দুষ্কর হইয়া পড়িত। ইংরেজ শাসনের প্রথম আমলের কাগজপত্রে দেখা যায় ভূষণা জমিদারী রাজস্ব আদায়ের জন্য সময়ে সময়ে ইজারা দেওয়া হইত। তখন ভূষণায় আদালত ছিল এবং ইহা রাজসাহীর সুপারভাইসরের তত্ত্বাবধানে চলিত। রাজসাহীর সুপারভাইসর থাকিতেন নাটোরে। তাঁহার উপরে ছিল মুর্শিদাবাদে রাজস্ব-কৌশিল। ইংরেজ রাজস্ব আরম্ভের অল্পদিন পরই (১৭৭০-১৭৭১ খৃষ্টাব্দ) ভূষণা হইতে আদালত উঠিয়া যায়, কিন্তু তখনও রাজসাহীর সুপারভাইসরের এক সহকারী সাহেব ভূষণায় থাকিতেন। রাণী ভবানীর সময় রাজস্ব আদায়ের জন্য ভূষণার জমিদারী যে-সকল ইজারাদারের হস্তে দেওয়া হইত তাঁহাদের মধ্যে নড়াইলের জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা কালীশঙ্কর রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। সরকারী কাগজপত্র হইতে মনে হয় ভূষণায় যে অত্যধিক পরিমাণে কর ধাৰ্য হইয়াছিল তাহা পুনঃ পুনঃ ইজারা বন্দোবস্ত সত্ত্বেও আদায় করা যাইত না। কালেক্টর নিয়োগের ব্যৱস্থা হওয়ার পর ভূষণার জন্য একজন অ্যাসিষ্টেন্ট কালেক্টর থাকিতেন। ক্রমে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ভূষণা স্বশাসন

জেলাভুক্ত হইল এবং রাণী ভবানীর দত্তক পুত্র সাধক রামকৃষ্ণের সময়ে রাজস্বের দায়ে ইহার পরগণাগুলি খণ্ডে খণ্ডে বিক্রীত হইয়া অন্য অমীদারের হস্তে চলিয়া গেল। নাটোর

রাজবংশের হাতে থাকিল কেবল রাণী ভবানীকৃত দেবত্র গ্রামগুলি। কালের প্রভাবে সেই প্রাচীন স্থানীয় রাজধানী ইহার দুর্গসমেত জহলে পরিণত হইয়া গেল।

অন্যপূর্বা

শ্রীসীতা দেবী

শীতশেষের প্রভাত, তখনও সূর্যোদয় হয় নাই। গাঢ় কুয়াসার ষবনিকার ভিতর দিয়া পল্লীগ্রামের পথঘাট কিছুই ভাল করিয়া দেখা যাইতেছে না। তবু মানুষকে উঠিয়া ঘরের বাহির হইতে হইয়াছে, কারণ এ শহর নয় যে যত-খুশী বেলা অবধি শুইয়া থাকিলেও চাকর-বাকর ঘরের কাজ সাবিয়া, সামনে খাবার অগ্রসর করিয়া দিবে। তাহা ছাড়া, কথা হইতেছে ঠিক একালের নয়, পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্বের। তখন শহরেও ঝি-চাকরের প্রাচুর্য্য এত ছিল না।

শীত শেষ হইয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু যাইবার আগে যেন মরণ-কামড় বসাইয়া যাইতেছে। তীব্র তীক্ষ্ণ বায়ু যেন হাড়ের ভিতর ফুটা করিয়া দিতেছে, মানুষের হাত-পাও আর তাহার অধীন নাই, চালাইতে গেলে চলে না—কাপুনি ধামাইতে চাহিলেও থাকে না।

অত ভোরেও দস্তবাধে একটি মেয়ে স্নান করিতে আসিয়াছে। ঘাট তখন জনশূন্য, কিন্তু মেয়েটির তাহাতে কিছু ভয় নাই। ভীষণ শীতের আঘাতে তাহার তনুলাতা থাকিয়া থাকিয়া কাপিয়া উঠিতেছে, কিন্তু মন তাহার সেদিকে নাই। যদি কেহ আসিয়া পড়ে এই ভাবনাতেই সে উৎকণ্ঠিত। থাকিয়া থাকিয়া ঘাটের পথটির দিকে শঙ্কাকুল চোখে তাকাইতেছে, আর তাহার হাত আরও দ্রুততর হইয়া উঠিতেছে। মস্তবড় একটি ঘড়া সে লইয়া আসিয়াছে, বাড়িতে জল লইয়া যাইবার জন্য। সেইটাই সে মাজিয়া পরিষ্কার করিতেছে।

ঘড়া বাজা হইয়া গেল। মেয়েটি জলে নামিয়া টপ-টপ করিয়া গোটা দুই ডুব দিয়া উঠিয়া পড়িল। বেশী সময় লইয়া স্নান করিবার যত দিন নয়, হাতের ভিতরটাসুদ্ধ

শীতে অবশ হইয়া উঠিতেছে, লোকজন কেহ আসিয়া পড়ে সে ভয়ও আছে। ঘড়াটি টানিয়া লইয়া সে জল ভরিয়া লইল। কিন্তু সিক্ত বস্ত্রে বাড়ি ফেরা অসম্ভব, সে তাহা হইলে পথেই মারা পড়িবে। কুয়াসার ভিতর দিয়া চক্ষু যথাসাধ্য বিক্ষারিত করিয়া সে দেখিবার চেষ্টা করিল, কোনো মানুষের আগমনের কোনো লক্ষণ দেখিতে পাইল না। তাড়াতাড়ি সঙ্গে আনীত একখানি লাল চওড়া পাড়ের শাড়ী পরিয়া ভিজা শাড়ীখানি সে ছাড়িয়া ফেলিল। কিন্তু শীত কি তাহাতেও বাগ মানিতে চায়? আঁচলটাকে দুই ফের দিয়া সে নিজের গায়ে শক্ত করিয়া জড়াইয়া পিতলের ঘড়াটি কোমরে তুলিয়া লইয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিল।

কুয়াসায় মেয়েটির মুখ ভাল করিয়া দেখা যায় না। তবে বেশী দীর্ঘাকী ও অঙ্গসৌষ্ঠববতী, তাহা বুঝা যায়। তাহার পরিপূর্ণ দেহখানিতে লাবণোর জোয়ার উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। মুখখানি নিশ্চয়ই সুন্দর। বিধাতা যাহার দেহখানিকে এত সুষমা ঢালিয়া নিপুণ ভাবে গড়িয়াছেন, মুখখানিতে তিনি কার্পণ্য করিবেন কেন?

পূর্বাকাশে একটুখানি রঙের ছোপ লাগিল। কুয়াসার ষবনিকা এইবার তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে, হয়ত তাহার অপমৃত হইবার সময় হইয়া আসিল। মেয়েটির চলা আরও দ্রুততর হইয়া উঠিল। লোকচক্ষুর আড়ালেই কোনোমতে বাড়ি পৌঁছিয়া গেলে সে যেন বাঁচে।

কিন্তু ভাগ্য বিমুখ। প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে, ঐ যে তাহাদের আটচালাটা দেখা যায়, পাশ দিয়া রান্নাঘরের ধূমের কুণ্ডলী লাকাইয়া পাকাইয়া উঠিয়া কুয়াসার রাশিতে মিশিয়া যাইতেছে, আর মিনিট পাঁচ ছয়ের পথ মাত্র।

এমন সময় কে যেন সম্মুখ হইতে বলিয়া উঠিল, “এরই মধ্যে নাওয়া-ধোওয়া সেয়ে এলি গা? ধলি তোদের গতরকে, শীতও লাগে না!”

মেয়েটি চমকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। মাথা হেঁট করিয়া চলিতেছিল বলিয়া একজন ক্ষীণাকী প্রৌঢ়া, তসরের খাটো শাড়ী পরিয়া ডিকি মারিতে মারিতে যে প্রায় তাহার গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই।

উত্তর না দিয়া উপায় নাই, অগত্যা সে বলিল, “হ্যাঁ গঙ্গাজলমাসী, সকাল সকালই এসেছি।” প্রৌঢ়া নারী মেয়েটির মায়ের ‘গঙ্গাজল’, সাতিশয় শুচিবাইগ্রস্তা, কখন কি অশুচি ত্রিনিষ মাড়াইয়া ফেলেন, সেই ভয়ে লাফ দিয়া দিয়া চলেন।

গঙ্গাজল ঠাকুরাণী বলিলেন, “তা ত দেখতেই পাচ্ছি। তা এত তাড়া কিসের লা? জন-মনিষ্য নেই, একলা সোমন্ত মেয়ে ঘাটে এসেছিস কেন? তোর মা কি সঙ্গেও আসতে পারে না?”

মেয়েটি শুষ্কমুখে বলিল, “মায়ের বড় অসুখ, ক’দিন বিছানা থেকে উঠতেই পারেনি।”

“ভালা মা-বাপ বাছা তোমার। ইনি ওঠেন ত উনি ওঠেন, উনি ওঠেন ত ইনি—এই মরেছে, রাম, রাম, রাম—ভোরবেলাই এ কি নরকে পা দিলাম মা! পোড়ারমুখি শতেক পোয়ারিদের ভাত খাওয়া চিরদিনের মত ঘুচে যাক, পাত যেন আর ঘরে পাততে না হয়!” বলিয়া অজ-শিশুর গায় লক্ষ দিতে দিতে প্রৌঢ়া নিমেষমধ্যে অস্তহিত হইয়া গেলেন।

মেয়েটি একটু বিস্মিত হইয়া মাটির দিকে তাকাইয়া দেখিল। আর কিছু নয়, একখানা ছেঁড়া শালপাতা উড়িয়া আসিয়া পথের উপরে পড়িয়াছে, তাহাতেই গঙ্গাজলমাসী এতখানি সম্ভ্রস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। মনে মনে বলিল, “বাঁচাই গেল, নইলে কত যে বক্বক্ব করত বুড়ী, তার ঠিকানা নাই।”

কলসীটিকে দৃঢ়ভাবে কক্ষে চাপিয়া ধরিয়া তরুণী দ্রুতপদে বাকী পথটুকু অতিক্রম করিয়া বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

গঙ্গাজলের জেরা এড়াইবার জন্ত সে বলিয়াছে, মা অত্যন্ত অসুস্থ, কিন্তু মায়ের অসুখটা সত্যই তত বেশী কিছু নয়। পাড়ারগায়ে ম্যালেরিয়ায় কালেভদ্রে না ভোগে কে? তিনিও

তাই দিন দুই তিন জ্বরের প্রকোপে শুইয়াছিলেন। আজ সকালে জ্বর নাই, উঠিয়া •তাই মেয়েকে একটু সাহায্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এ কয়দিন হতভাগী একলা হাতে খাটিয়া খাটিয়া সারা হইয়া গিয়াছে। ঘরকরণার সমস্ত কাজ ত আছেই, গোয়ালঘরে দুইটি গরু আছে, তাহাদের সেবাও করিতে হয়, তাহার উপর দুইটি রোগীর সেবা। উমাগতি ঘোষাল ত হাঁপানিতে ভুঁগিয়া ভুঁগিয়া ককালসার হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি যে আবার কোনো দিন সারিয়া উঠিয়া সাধারণ মানুষের মত চলাফেরা করিতে পারিবেন, সে ভরসা আর মা বা মেয়ে কেহই করে না।

মেয়ের সাড়া পাইয়া মা রান্নাঘর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, “অন্য, এলি মা?”

ভিজা কাপড়খানি উঠানের বাঁশের উপর মেলিয়া দিতে দিতে মেয়ে বলিল, “এই এলাম মা।”

তাহার পর জলের ঘড়াটি তুলিয়া লইয়া রান্নাঘরের ভিতর গিয়া প্রবেশ করিল, সেটি এক কোণে নামাইয়া রাগিয়া বলিল, “তুমি সাত-তাড়াতাড়ি উনন ধরাতে বসলে কেন মা? আমি এসেই ধরাতাম।”

মা বলিলেন, “তা হোক গে, আমি এখন ত ভালই আছি। দুটো দিন ত দাঁতে কুটো কাটলাম না, আজ সকাল সকাল রেঁধে মুখে একটু কিছু দিই। তা যা অকচি, মুখে সব যেন তেতো হালিম লাগে।

মেয়ে বলিল, “ম্যালেরিয়া জ্বরের ধারাই ঐ। ও-বছর দেখলে না আমার কি দশা হ’ল?” শুড় অঞ্চলস্থ তেতো লাগত। হ্যাঁ মা, বাবা উঠেছেন?”

মা বলিলেন, “না বাছা, এই ভোরের দিকে তবে ত একটু ঘুমলেন। যা যন্ত্রণা গিয়াছে সারারাত, সে আর বলবার নয়। এ আর চোখে নয় না, কিন্তু ঠাকুর কতদিন যে পাপচোখে এই যাতনা দেখাবেন তা তিনিই জানেন।”

অন্য বলিল, “সেই শাদা গুঁষুটা ফুরিয়ে গিয়েই ত এই বিপদ বাধল। আমি বললাম যেমন ক’রে হোক আমি নিয়ে আসি। তা তুমি নিজেও যেতে পারবে না, আমাকেও যেতে দেবে না, এরকম করলে কি চলে?”

মা বলিলেন, “কোন্ প্রাণে তোমায় যেতে দেব মা? এ গায়ে কি মানুষ আছে? সব পিশাচের বাস। চুর্কলের

উপর অত্যাচার করা ছাড়া এদের আর কিছুই যোগ্যতা নেই। দেখি আজ যদি আমি ছপুয়ে বেয়তে পারি, ত নিজে আসব। সে কি এ রাজ্য? সাতপাড়া ডিঙিয়ে তবে ভূষণ সেনের বাড়ি।”

এতক্ষণ কুম্বাসার পরদা খানিকটা ছিঁড়িয়া গেল। তাহার ভিতর দিয়া এক বলক আলো উঠানে, রান্নাঘরের দাওয়ায় আদিয়া পড়িল। অম্বা তাড়াতাড়ি উঠানে বাহির হইয়া রোদে পিঠ দিয়া দাঁড়াইল, স্তমধুর উত্তাপটুকু সমস্ত দেহ দিয়া উপভোগ করিতে লাগিল।

এইবার তাহার মুখখানি বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। টিকল নাক, দুর্গাপ্রতিমার মত টানা বড় বড় চোখ, প্রবালের মত রাজা ঠোঁট। দোহারা গড়ন, দেহখানি কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। দেহের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণই হইবে, তবে শীতের প্রকোপে খানিকটা স্নান হইয়া গিয়াছে।

রোদে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অম্বা মাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, “হাজার ভোরেই উঠি মা, তোমার গনাজলের সঙ্গে পারবার জো নেই। এই শীতেও বেরিয়েছে।”

মা অপ্রসন্ন স্বরে বলিলেন, “তোকে দেখে বললে নাকি কিছু মাগী?”

মেয়ে বলিল, “বলবে আবার না? তা হলে ত তার নামই বৃথা। তবে একখান ছেঁড়া শালপাত উড়ে এসে পায়ের উপর পড়াতে, গাল দিতে দিতে হুঁহুনিয়ে পুকুর-ঘাটে চলে গেল।”

মা আর কিছু বলিলেন না, উনানে হাঁড়ি চাপাইতে ব্যস্ত ছিলেন বোধ হয়। অম্বা রোদে দেহখানি একটু উত্তপ্ত করিয়া লইয়া পিতার খোঁজে ধীরে ধীরে তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

উমাগতি তখন জাগিয়াছেন, কিন্তু খাট ছাড়িয়া ওঠেন নাই। মেয়েকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বেলা হয়ে গেছে মা?”

অম্বা তাঁহার মশারিটা গুছাইয়া তুলিতে তুলিতে বলিল, “তা খানিক হয়েছে বইকি বাব? বেশ রোদ উঠে পড়েছে। তোমার মুখ খোবার পরম জল এনে দেব?”

উমাগতি বলিলেন, “আজ একবার চান করব মনে করছি। মেহটা তত খারাপ নেই, এরকম মেহ হয়ে আর থাকা যায় না।”

অম্বা ব্যস্ত হইয়া বলিল, “না বাবা, আর একটু স্থস্থ হও, তারপর। কাল রাতে তোমার যা কষ্ট গিয়েছে। মা বলছিল আজ ভূষণ সেনের কাছ থেকে ওষুধ এনে দেবে। ঐ ওষুধটা খেলেই তুমি ভাল থাক।”

উমাগতি বলিলেন, “আচ্ছা, জল দে, মুখটা ত ধুই। কাপড়চোপড়গুলোও ছেড়ে কেলতে হবে।”

অম্বা জল আনিতে চলিয়া গেল। তাহার পর ঘটি করিয়া জল, দাঁতের মাজন, জিবছোলা সব গুছাইয়া পিতার কাছে রাখিয়া গোয়াল-ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। গোয়ালাদের ঘোষানী বুড়ী রোজ সকালে আসিয়া গাই দুটি দুহিয়া দিয়া যায়, বেতন-স্বরূপ আঁচল ভরিয়া মুড়ি, মুড়কি বা চিড়া লইয়া যায়। পয়সার লেনাদেনা পাড়াগাঁয়ে বিশেষ ছিল না তখনকার দিনে। মেয়েদের মধ্যে ত একেবারেই নয়। চিঁড়া, মুড়ি, ধান বা চালের মূল্যেই তাহারা নিজেদের কেনাকাটা বা জনখাটানোর ব্যাপার চুকাইয়া ফেলিতেন।

গরু দুটিতে দুধ মন্দ দেয় না। মা ও মেয়ে ইহাদের সেবা ও আহারে কোন ক্রটি ঘটিতে দেন না, ইহারাও যথাযোগ্য প্রতিদান দেয়। আজও মাপিয়া দেখা গেল সের-চার দুধ হইয়াছে। অম্বা ডাকিয়া বলিল, “মা আজ চার সের দুধ হয়েছে।”

মা রান্নাঘর হইতে জবাব দিলেন, “সের দুই রাখ ঘরে, বাকিটা ঘোষানীকে দে, বেচে আস্থক।”

ঘোষানীর ঝারাই যা তাঁহাদের একটু-আধটু সাহায্য হয়। সে রোজই প্রায় দুধ বেচিয়া পয়সা আনিয়া দেয়, হাটের দিন হাট করিয়া দেয়, অন্য কোনো কাজের দরকার হইলে তাহাও করে। আর কাহাকেও ডাকিতে অম্বার মা সাহস করে না, নিজে যাচিয়াও কেহ আসেন না। ঘরে বয়স্কা কস্তা, শত চেষ্টাতেও তাঁহারা তাহার বিবাহ দিতে পারিতেছেন না। তাই নিজেদের কোভ ও লজ্জা লইয়া যথাসাধা লোকচক্রের অন্তরালে থাকিতেই তাঁহারা চেষ্টা করেন। ঘোষানী বুড়ী অম্বাকে অত্যন্ত ভালবাসে। উহার বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনিলে রাকসীর মত গিলিয়া থাইতে যায়। তাহার নিজের একটি মেয়ে ছিল, নাম তাহার রাখা, সে নাকি অম্বারই বয়সী, আর তার মতই দেখিতে ছিল। সে মেয়ে কোন্ কালে জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে, কিন্তু আজও ঘোষানী অম্বার মুখের মধ্যে

তাহার মুখখানি দেখিতে পার ; তাই বাধিনীর মত ভীষণ স্নেহে অন্ধাকে আগলাইয়া বেড়ায়। তাহার দীর্ঘ, বলিষ্ঠ দেহে পুরুষের বল, তাহাকে সহজে ঘাঁটাইতে গ্রামের অতি বকাটে ছেলেও সহসা সাহস করে না।

ঘোষানী দুধের কেঁড়েটি উঠাইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। অন্ধা বাকী দুধটা রান্নাঘরে আনিয়া পিতলের কড়ায় ঢালিয়া দিয়া বলিল, “এইটা আগে জ্বাল দিয়ে দাও মা, বাবার এতক্ষণে মুখ ধোওয়া হয়ে গেল।” মা তাড়াতাড়ি কড়াটা উনানের উপর বসাইয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে দুধ ফোঁস ফোঁস করিয়া উৎলাইয়া উঠিল, অন্ধা শাড়ীর আঁচল দিয়া কড়া চাপিয়া ধরিয়া সেটাকে নামাইয়া ফেলিল। তাহার মা ধমক দিয়া বলিলেন, “অত সাততাতাড়া তুই ছুটলি কেন কড়া নামাতে? এতবার বারণ করি, আঁচল দিয়ে হাড়ি-কড়া ধরিস্ নে, ধরিস্ নে, তা কিছুতেই যদি মেয়ে শোনে। একদিন কাপড়ে আঙুন লাগিয়ে একটা কাণ্ড কর আর কি?”

অন্ধা বলিল, “সে হ’লে ত বেশ হয়, তোমরাও বাঁচ, আমিও বাঁচ।” স্নেহের সুরেই কথাটা বলিল বটে, কিন্তু সবটাই যেন স্নেহ নয়। মা অত্যন্ত আহত হইয়া বলিলেন, “তুইও শেষে অমন কথা বললি? কেন রে? আমরা কোনো দিন তোঁর অনাদর করেছি?”

অন্ধা তাড়াতাড়ি মাকে সাস্তুনা দিতে লাগিয়া গেল, “না, না তাই কি আমি বলছি? তুমি বাপু ঠাট্টা বোঝ না।” বলিয়া তাড়াতাড়ি আধ সের খানিক দুধ বাটিতে ঢালিয়া তাহা একটি কানা-উঁচু খালায় জ্বলের ভিতর বসাইয়া ঠাণ্ডা করিতে লাগিল। তাহার পর বকুবকে একখানি ছোট কাঁশিতে বেলফুলের কুঁড়ির মত একরাশ খই ঢালিয়া লইয়া, দুধের বাটিটিও বামহাতে উঠাইয়া লইয়া উমাগতিক খাইতে দিতে চলিল।

অন্ধার বয়স বছর পনেরো ষোলো হইবে, দেখিলে তাহার চেয়ে ছোট ত মনে হয়ই না, বরং বড়ই মনে হয়। পিতামাতার এক সন্তান সে, দেখিতে সুন্দরী। উমাগতি ধনী নহেন, কিন্তু দরিদ্রও নহেন। রোগে জীর্ণ ও অকর্মণ্য হইয়া পড়িবার আগে তাঁহার ঘরছয়ার, গোলাভরা ধান, গোমালভর্তি গরু, এবং মাছভরা পুকুর দেখিয়া সকলে তাঁহাকে সম্পন্ন গৃহস্থই বলিত। কিন্তু হঠাৎ কোন্ সূত্রে যেন বছর চার-পাঁচ আগে

হইতে তাঁহার সোনার সংসারে অলসী প্রবেশ করিয়াছে। ঘরগুলি জীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, সময়ে মেরামত হয় না। গোলাগুলির কয়েকটি খালিই পড়িয়া থাকে, কারণ তাগাদা নাই বলিয়া ধান আগের মত আদায় হয় না। গরুগুলিও কমিতে কমিতে দুইটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পুকুরের মাছ চুরি যায় বেশীর ভাগ, চোরকে শাসন করিবার কেহ নাই। উমাগতি বৎসরের ভিতর এগারটা মাস ম্যাে যিয়া এবং হাঁপানিতে শয্যাগত হইয়া থাকেন, একটা মাস কোনো মতে চলিয়া ফিরিয়া বেড়ান। মা-মেয়েতে কোনোমতে সংসারের বোঝা বহিয়া চলিতেছে, রোগীর সেবাও করিতেছে। অর্থকষ্ট বা অভাব তাহাদের নাই, কারণ তাহাদের প্রয়োজন অতি সামান্যই। অনেক গিয়াও যাহা আছে তাহাতে তাহাদের স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়। কিন্তু মনোহুঃখে সকলেই কাতর, অজানা ভয়ে সদাই সশঙ্কিত। দুইটিরই কারণ অন্ধা। এতবড় অরক্ষণীয়া মেয়ে যাদের গলায় ঝুলিয়া আছে, তাহাদের স্বস্তি কোথায়?

অন্ধার বিবাহ হয় না কেন? সুন্দরী মেয়ে, সুস্থ মেয়ে, কোন খুঁৎ নাই। বাপেরও পয়সার অপ্ৰাচুর্য্য নাই। পল্লীগ্রামে মেয়ের বিবাহ যতখানি খরচপত্র করিয়া লোকে দেয়, তাহা দিবার সম্ভতি উমাগতির যথেষ্টই আছে। তবে অন্ধার বিবাহ হয় না কেন? একটার পর একটা সম্বন্ধ আসে, ঘটা করিয়া মেয়ে দেখান হয়, পাকা-দেখার দিন পড়ে, তাহার পর কেমন করিয়া জানি না সব ব্যাপারটা ফাঁসিয়া যায়। একবার নয়, দুইবার নয়, এমন কাণ্ড দশ-বার বার ঘটিয়া গেল বোধ হয়। অন্ধার জীবনে ঘৃণা ধরিয়া গিয়াছে, উমাগতি এবং শারদার বৃকের রক্ত ক্রমে শুকাইয়া উঠিতেছে। মেয়ের বিবাহ কি তাঁহারা শেষ অবধি দিতে পারিবেনই না নাকি? যতদিন কুচক্রী মধু-ভট্টাচার্য বাঁচিয়া আছে, আর গ্রামের সমাজপতি আছে, ততদিন ত নয়? কিন্তু তাহার আগেই না উমাগতির পরমায়ু শেষ হইয়া যায়।

তবু দিন কাহারও জন্ম বসিয়া নাই, একটা একটা করিয়া কাটিয়া যাইতেছে। কয়েক দিন উমাগতি একটানা ভুগিয়াছেন, আজ একটু ভাল বোধ করিবা মাত্র কত চিন্তাই যে তাঁহার মনে আসিয়া ভীড় করিতেছে তাহার ঠিকানা নাই। আজ যদি ভাল থাকেন, রাতে ঘুমাতে পারেন, তাহা হইলে কাল এক

আয়গার যাওয়ার চেষ্টা করিবেন। একটি পাত্রে সন্ধান পাইয়াছেন, লুকাইয়া সেখানে গিয়া মেয়ের সম্বন্ধ করিতে চেষ্টা করিবেন। তাহার পর অল্প কোথাও গিয়া বিবাহটা দিবার চেষ্টা করিবেন। এ-গ্রামে থাকিয়া বিবাহ দিবার সাধ্য তাঁহার নাই, তা এই কয় বৎসরেই প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। এখানে তাঁহার সহায় কেহ নাই, শত্রুই সকলে। অথচ জানে তিনি কখনও কাহারও অপকার করেন নাই, উপকারই করিয়াছেন। যতদিন শরীর সুস্থ ছিল, আটচালাটিতে অবৈতনিক পাঠশালা খুলিয়া গ্রামের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিয়াছেন, দরিদ্রকে সাহায্য করিয়াছেন, বিপদের জন্ত যথাসাধ্য করিয়াছেন। কিন্তু এ সমস্তই গ্রামবাসীর মন হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে। তাহার সুদখোর, মূর্খ, চরিত্রদোষ-দুষ্ট মধু ভট্টাচার্যকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করে, তাহার কথায় ওঠে বসে; কিন্তু উমাগতি মরিয়া গেলেও কেহ তাহার দিকে কিরিয়া তাকায় না। বাংলা দেশের পল্লীবাসীর মন এক বিচিত্র জিনিস।

উমাগতি নানা ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে খাইতে দেরি করিতেছিলেন, অথা তাড়া দিয়া বলিল, “শীগগির ক’রে খেয়ে নাও বাবা, দুধ যে জুড়িয়ে হিম হয়ে যাচ্ছে। গরম গরম খেলে একটু ভাল বোধ করতে।”

উমাগতি বলিলেন, “আর ত একটু ভালই আছি মা,— দুখটা চুমুক দিয়া নিঃশেষ করিয়া তিনি বাটিটা নামাইয়া রাখিলেন। বলিলেন, “এ ক’দিন তোমার বড় খাটুনি গেছে না মা? তোমার মায়েরও অস্থ হুয়ে পড়েছিল, একলা সব করতে হয়েছে।”

অথা উপেক্ষার হাসি হাসিয়া বলিল, “ভারি ত কাজ, ধাবার লোক ত নগদ আমি। একবেলা রাখলেই চলত।”

উমাগতি ম্লান হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “পড়াশুনা কিছুই করতে পারিস নি না?”

অথা বাটি ও কাঁশি উঠাইতে উঠাইতে বলিল, “না এক’দিন আর হ’ল কই?”

পড়া আর পড়ানো ছিল উমাগতির কাছে নিঃশাস-বায়ুরই মত প্রয়োজনীয়। পাঠশালাও খুলিয়াছিলেন এই ভাগিদেই। উহা উঠিয়া যাইবার পর তাঁহার একমাত্র ছাত্রী হইয়াছিল অথা। তাহার শিক্ষাতেই তিনি মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন।

সে বাংলা এবং সংস্কৃত উত্তমরূপেই শিখিয়াছে, অথও কিছু কিছু জানে। উমাগতি কাশীর টোলে পড়িয়া পণ্ডিত, ইংরেজী প্রথমে মোটেই জানিতেন না, পরে নিজের চেষ্টায় খানিকটা শিখিয়াছিলেন। অথাকেও তাহা শিখাইবার ইচ্ছা তাঁহার আছে, তবে গ্রামবাসীদের ভয়ে হইয়া ওঠে না।

পিছনের পুকুরের ঘাটে গিয়া অথা কাঁশি, বাটি ও ঘটি মাজিতে বসিল। বাবা, কি শীত! জলে ঘেন ছুরির মত ধার, হাত দিলে হাত কাটিয়া যায়। শহরে নাকি জলের কল আছে, ঘরের ভিতর বসিয়াই জল পাওয়া যায়, গাঁয়ে তেমনি থাকিলে বেশ হইত।

হঠাৎ ঠিক তাহার সামনেই জলের মধ্যে মস্ত একটা টিল আসিয়া পড়িল। হিমশীতল জল ছিটকাইয়া উঠিয়া অথার দেহ সিক্ত করিয়া দিল। অথা চকিত ভাবে চারি দিকে তাকাইয়া দেখিল। ঐ ত বাঁশঝাড়ের আড়াল দিয়া কে একজন চলিয়া যাইতেছে। লুকাইবার বিশেষ চেষ্টা তাহার নাই, কারণ সে জানে ধরা পড়িলেও তাহাকে শাস্তি দিবার কেহ নাই। অথা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। এ-সব উৎপাত নূতন নয়, কিন্তু এখনও তাহার সহিয়া যায় নাই! এখনও যে বুকের রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিয়া ওঠে, ঐ কাপুরুষ ভীকর দলের কণ্ঠ নখরে ছিঁড়িয়া দিতে ইচ্ছা করে! কিন্তু উপায় নাই। বাংলার পল্লীর সহায়হীনা নারী সে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিবার ক্ষমতা তাহার কোথায়?

বাসন কয়খানি লইয়া দ্রুতপদে সে বাড়িতে ফিরিয়া আসিল। তাহার পর সেগুলি নিঃশব্দে রান্নাঘরের দাওয়ায় নামাইয়া রাখিয়া, মাতার অজ্ঞাতেই ঘরে ঢুকিয়া আবার কাপড় ছাড়িয়া ফেলিল। শারদার এমনিতেই দুঃখের অস্ত নাই, মড়ার উপর খাড়ার ঘা দিয়া আর লাভ কি?

বাড়ির কর্তাই যেখানে অস্থ, সেখানে রান্নাবান্না সর্বদাই সংক্ষেপে সারা হইয়া থাকে, সুতরাং শারদারও রান্না শেষ হইতে দেরি হইল না। খাওয়াদাওয়াও কিছুকণের মধ্যেই চুকিয়া গেল। অথা বলিল, “ঐ ভাত ক’টার জল দিয়ে রাখ মা। ওতেই আমার রাস্তিরে হয়ে যাবে। আবার একটা পেটের জন্তে কে ঘটা ক’রে রাখতে বসছে?”

শারদা বলিলেন, “নিতি পাক্ত খেয়ে তুইও শেষে একটা রোগ বাধা। একেই ত অস্থের বড় কন্মতি।”

অম্মা বলিল, “হাঁ তা আর না? শীতের দিন, ছুটো পাক্স খেলেই অম্মনি আমার অস্থখ করে যাবে।” অগত্যা ভাতে জল ঢালিয়া শারদা হাঁড়ি তুলিয়া দিলেন।

সকালবেলাটা যেমন কুয়াসাচ্ছন্ন ছিল, এখন হইয়াছে তেমনি প্রথর রৌদ্র। শারদা মেয়েকে ডাকিয়া বলিলেন, “ওরে আমি এই বেলা একটু ভূষণের কাছে হুয়ে আসি। তুই ঘরে দোর দিগে বোস, তোর বাবা ঘুম থেকে উঠলে দুধ-সাবুটা দিস।”

অম্মা ঘরের ভিতর বসিয়া ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলা’ পড়িতেছিল, বইখানি হাতে করিয়াই বাহির হইয়া আসিল। তাহার বিশাল চক্ষু দুটি তখন স্বপ্নাচ্ছন্ন, ক্ষুদ্র ও নিষ্ঠুর বর্তমানকাল ছাড়িয়া সে অতীতের কোন্ অপূর্ব মাগ্নাময় রাজ্যে উধাও হইয়া গিয়াছে। বনবাসিনী আশ্রমবালাও সত্ৰাটের প্রেমের যোগা যেখানে, সেই রাজ্যেই অম্মার মন তপনকার মত বাধা পড়িয়া গিয়াছে।

মায়ের কথামত দরজাটা বন্ধ করিয়া বসিয়া সে আবার বইয়ে মন দিল। এমন নিবিষ্ট হইয়া সে পড়িতেছিল যে, বেলা কোথা দিয়া গড়াইয়া চলিয়াছে সেদিকে তাহার লক্ষ্যমাত্র ছিল না। উমাগতি ডাকাডাকি করায় তাহার চমক ভাঙিল। বইখানা সাবধানে উপুড় করিয়া রাখিয়া সে বলিল, “দাঁড়াও বাবা, তোমার দুধ-সাবুটা গরম ক’রে এনে দিই।”

দুধ সাবু গরম করিয়া রান্নাঘরে আবার শিকল তুলিয়া দিয়া সে ফিরিয়া আসিল। দুধের বাটি পিতার সম্মুখে রাখিয়া বলিল, “তুমি খেয়ে নাও বাবা, তারপর আমাকে ডেকো, আমি বাটি তুলে নিগে যাব।”

বিকালের পড়ন্ত রোদ তখন আড়াআড়ি ভাবে দাওয়ায় আসিয়া পড়িতেছে। খানিক পরে আবার সেই হিমশীতল রাত্রি। যতক্ষণ আছে ইহার মধুর উত্তাপটুকু উপভোগ করিয়া লওয়া যাক। অম্মা মাত্রটা রৌদ্রের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বইখানি আবার খুলিয়া বসিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার একে বারে অমরকাব্যের সুধাসাগরে ডুবিয়া গেল।

বাহিরের দরজার শিকলটা ঝন্ঝন্ করিয়া উঠিল। অম্মা চকিত হইয়া উঠিয়া চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল। ওমা রোদ একবারে উঠানের কোণে গড়াইয়া গিয়াছে, সূর্যাস্তের আর বিলম্ব নাই। ছুটিয়া গিয়া দরজাটা খুলিয়া

দিল, বইখানি তখনও তাহার হাতে। বাহিরে তাহার মায়ের সঙ্গে গ্রামের চিকিৎসক ভূষণসেন দাঁড়াইয়া। অম্মা লক্ষ্য লাল হইয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সরিয়া আসিল।

শারদা ভূষণের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, “ওই আমার মেয়ে বাবা। বড় লক্ষ্মী, কিন্তু গ্রামের লোকের অত্যাচারে মা আমার চোখের উপর শুকিয়ে উঠছে। আজ আমার বললে আমি পুড়ে মরলে ত সকলেরই ভাল হয়।”

ভূষণ বলিল, “আপনারা আমার কথা শুনুন, ভিটার মায়া ছেড়ে কলকাতায় চলে যান। সেখানে এত অত্যাচার আপনাদের সহ করতে হবে না। আপনাদের সমান অবস্থার মাহুষও সেখানে আছে, কাজেই একেবারে সশয়সীন বা বন্ধুহীন আপনারা হবেন না।”

শারদা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “হয়ত তাই-ই আছে অদৃষ্টে,”—তিনি যেন বিমনা হইয়াই কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভূষণ চারি দিকে তাকাইয়া দেখিল, কিন্তু যে আশায়, তাহা পূর্ণ হইল ন। সেই স্তম্ভর মুখখানির অধিকারিণী কোথায় লুকাইয়া আছে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তখন শারদাকে ডাকিয়া সচেতন করিয়া বলিল, “চলুন মা, ঘোষাল মশাইকে দেখে আসি।”

শারদা বলিলেন, “চল বাবা। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। এই গাঁয়ে স্বজাতি যারা আমাদের, তারা এখন রাক্ষসের মূর্তি ধরেছে, মানুষের প্রাণ শুধু তোমার মধ্যেই আছে।” দুই জনে গিয়া উমাগতির শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

অম্মা গিয়া রান্নাঘরে লুকাইয়া ছিল। ভূষণ সেনের সঙ্গে সে কথা বলে না, কিন্তু দু-জনে দু-জনকে দিবা চেনে। ঘোষানী বুড়ীর মারফতে একের কথা আর একজন শুনিতে পায়। একবার বুঝি সে অম্মার সংস্কৃতজ্ঞানের কথা শুনিয়া বলিয়াছিল, “তোমাদের দিদি ঠাকুরণের নাম বদলে সরস্বতী নাম দাও।” সে-কথা আর সকলে তুলিয়া গিয়াছে, অম্মা ভোলে নাই। কিন্তু মধ্যাহ্নে, নিদ্রাহীন রাতে, অনেক বার এইভাবে শোনাকথাগুলি মনে করে, আর তাহার বুকের রক্ত উত্তপ্ত হইয়া ওঠে। কিন্তু নিজের মনের ভাব কখনও বুঝিবার চেষ্টা সে করে না, যাহা স্বপ্নেও অভাবনীয়, সে চিন্তা সাধ করিয়া কি কেহ ডাকিয়া আনে?

খানিক বাদে আবার সদর দরজা বন্ধ করার শব্দ হইল। তখন অম্বা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “উনি বাবাকে ওষুধ দিয়ে গেলেন মা?”

শারদা বলিলেন, “হ্যাঁ মা, ভাল করে দেখে-শুনে ওষুধ দিয়ে গেল। তা, তুই কি সত্যিই এবেলা রাখিবি না?”

অম্বা বলিল, “ভারি ত একটা পেট, তার জন্তে আবার দু-বেলা হাঁড়ি চড়ান, তার চেয়ে আমি বইখানা সেরে ফেলি।”

শারদা স্নেহের হাসি হাসিয়া বলিলেন, “যেমন বাপ তার তেমন বেটি, দুটিই পড়া পাগলা। তুই কি বেটাছেলে যে খালি পড়লেই চলবে? পড়ায় আমাদের দরকার কি, মা? ঘর-গেরস্তালির কাজ যত ভাল করে শিখবে ততই লাভ।”

অম্বা বলিল, “তা কেন মা? জ্ঞানলাভ করবার অধিকার ছেলে মেয়ে সকলেরই আছে। ঐ যে কলকাতায় শুনি আজকাল মেয়েরা ইন্সুল-কলেজে শুদ্ধ যান, তারা কি অগ্রায় করে?”

শারদা বলিলেন, “কি জানি মা ত্রায় কি অগ্রায়। ও-সব বিচারে আমার কাজ নেই। তা তুই পিড়িমগুলো আগে ঠিক কর, তারপর আবার বই নিয়ে বসিস। ঘোষানী এখনও আসেনি?”

অম্বা বলিল, “না, তুমি তাকে কত কি কিনি আনতে করমাশ করলে, তাই খুঁজে পেতে আনতে দেরি করছে বোধ হয়।”

শারদা বলিলেন, “এদিকে গরু দুইবার সময় যে উৎরে গেল। নিজেই দেখব না-কি?” বলিতে বলিতে ঘোষানী আসিয়া আঙ্গিনায় ঢুকিল। মাথার বুড়িটা নামাইয়া রাখিয়া বলিল, “এই আমার লক্ষ্মীদিদি ঠাকরণের শাড়ী মা, এই জোড়াই হাটের সবার সেরা কাপড়।”

অম্বা ব্যস্তভাবে বলিল, “কেন মা. তুমি আবার খরচ করে আমার জন্তে কাপড় কিনতে গেলেন? আর এই রকম ডুরে কাপড় বুঝি আমার বয়সী মেয়েতে পরে?”

শারদা বলিলেন, “খাম্ ত, মেয়ের ঘেন আর বয়সের গাছ-পাশর মেই। ঘোষানী, যা—গরু দুইতে দেরি হয়ে গেল, অম্বা পিড়িমগুলো চর্ট করে শুছিয়ে নে,” বলিয়া ডুরে শাড়ীজোড়া তুলিয়া লইয়া তিনি ঘরের ভিতরে চলিয়া গেলেন।

শীতকালের স্ক্রুজ দিন দেখিতে দেখিতে শেষ হইয়া গেল। তুলসীতলার প্রদীপ দেখাইয়া শব্দধ্বনি করিয়া মা ও মেয়ে আবার ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। রৌদ্র চলিয়া গিয়াছে, সেই হাড়ে কম্প লাগান বাতাস আবার স্ক্রুজ হইয়াছে, বাহিরে বসিবার আর জো নাই।

এত শীতেও অম্বার রাত্রে ঘুম আসিতেছিল না। খাওয়া-দাওয়া চুকাইয়া পাড়াগাঁয়ের মাহুঘ সকাল সকালই শুইয়া পড়ে, জাগিয়া থাকিবার কোনো ছুতা তাহাদের নাই। তবু ঘুম ত ইচ্ছা করিলেই আসে না। মা এখনও শুইতে আসেন নাই, পাশের ঘরে বাবার সঙ্গে একটানা কি সব পরামর্শ চলিতেছে। অম্বা কথাগুলি কানে শুনিতেছে না, কিন্তু কি যে কথা তাহার আর বুঝিতে বাকী নাই। ভগবান, কতদিনে এই দশার অবসান হইবে? কোন্ পাপে পরিবার-স্বদ্ধ তাহারা এমন তুষানলে দগ্ন হইতেছে? কোনোমতে একটা বিবাহ হইয়া গেলে অম্বা বাঁচে, সে যাহার সঙ্গে হোক। মা-বাপের এ যন্ত্রণা আর সে চোখে দেখিতে পারে না। হঠাৎ যেন বুকের ভিতরটা তাহার ব্যথায় স্কেচকিয়া উঠিল, সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

উমাগতি বোধ করি ভালই ছিলেন, কারণ অত ভোরে উঠিয়াও অম্বা দেখিল, মা বাবা তাহার আগেই উঠিয়াছেন, এমন কি বাবার মুখ-হাত ধোওয়া হইয়া গিয়াছে। নারিকেল-নাড়ু ও মুড়ি সহযোগে তিনি জলযোগ করিতে বসিয়াছেন। অম্বা বিস্মিত হইয়া বলিল, “বাবা কোথাও বেরবে নাকি?”

উমাগতি বলিলেন, “হ্যাঁ মা, একটু ভিন্ গাঁয়ে যাব”— বলিয়া তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিতে লাগিলেন। তাহার ভিন্ গাঁয়ে যাওয়ার অর্থও অম্বা জানিত, কাজেই চুপ করিয়া গেল।

খাওয়া শেষ করিয়া উমাগতি উঠিলেন। আপাদমস্তক শীতবস্ত্রে এমন করিয়া আচ্ছাদিত করিলেন যে, তিনি মাহুঘ না ভল্লুক, তাহাই বুঝিবার আর কাহারও ক্ষমতা রহিল না। জুতা পরিয়া ছাতা হাতে করিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। শারদা ডাকিয়া বলিলেন, “সন্ধ্যে নাগাত ঠিক কিরবে, কিছুতে দেরি না হয়।”

উমাগতি লক্ষ্মীতুল্যক মাথা নাড়িয়া অদৃষ্ট হইয়া গেলেন। শারদা তখন মেয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “চল মা আমরা

স্নান সেরে আসি। এখনি ত পথঘাট লোকে ভরে উঠবে। কাপড় গামছা ও জলের ঘড়া জোগাড় করিয়া দুই জনেই পথে বাহির হইলেন, সদর দরজায় শারদা তালা বন্ধ করিয়া গেলেন।

তাহার পর দিনের কাজ একই চিরন্তন সূত্র ধরিয়া চলিতে লাগিল, বিরাম নাই, বৈচিত্র্য নাই। সন্ধ্যা হইবার আগে শারদা ব্যস্ত হইয়া ক্রমাগত ঘর-বাহির করিতে লাগিলেন, উমাগতি আসেন কি-না। রুগ্ন, দুর্বল মানুষ নিতান্তই দায়ে ঠেকিয়া তাহাকে বাহিরে পাঠাইতে হইয়াছে, কিন্তু প্রাণ তাঁহার ছটফট করিতেছে।

যাহা হউক, প্রায় সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিয়া আসিয়া উমাগতি শারদার চিন্তার তখনকার মত অবসান ঘটাইয়া দিলেন। তাঁহার হাত হইতে ছাতা, লাঠি লইয়া অম্বা জিজ্ঞাসা করিল, “পা ধোয়ার জন্তে একটু গরম জল দেব, বাবা?”

উমাগতি বলিলেন, “দাও মা।” অম্বা জল আনিতে রান্নাঘরে ঢুকিবামাত্র শারদা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিছু করতে পারলে?”

উমাগতি মুহূর্ত্তে বলিলেন, “ঠিক ত একরকম ক’রে এলাম। তাদের খাঁই বড় বেশী, বুঝেছে কি না যে আমাদের বড় দায়। তা আমি রাজী হয়ে এসেছি।”

শারদা বলিলেন, “বেশ করেছ, আমাদের ত আর ঐ একটি বঁই নেই? কোনোমতে দু-হাত এক হয়ে যাক, তারপর এ পাপপুরী ছেড়ে দু-জনে কাশীবাস করব।” এই সময় অম্বা জল লইয়া ফিরিয়া আসিল।

সেই দিন হইতেই বাড়ির শাস্ত, ধীর, মন্থর গতিটা বদলাইয়া গেল। ভোরে সন্ধ্যায় চুপি চুপি লোক আসে, কি-সব পরামর্শ হয়, আবার চলিয়া যায়। জিনিষপত্র আসে কতরকম, বাসনকোসন, শাড়ী, গহনা। অম্বাকে কিছুই বুঝাইতে হয় না, সবই সে বোঝে। অনেক বার সহিয়াছে, আরও কতবার সহিতে হইবে কে জানে? ভগবান কি চিরদিনই তাহার বাপ মাকে দুঃখ দিবেন?

হঠাৎ শীতের রাতে, ঘোর অন্ধকারের ভিতর তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া কোথায় চলিল। দুইখানি গরুর গাড়ীতে জিনিষপত্র বোঝাই, একখানিতে তাহারা তিন জন। গাড়ীতে উঠিবার পর অম্বা জিজ্ঞাসা করিল, “মা, কোথায় যাচ্ছ?”

শারদা সংক্ষেপে বলিলেন, “তোমার মামার বাড়ি।”

ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে তাহারা আর একটি গ্রামে প্রবেশ করিল। মামার বাড়ির লোকেরা সবই জানে দেখা গেল। আজই সকালে গায়ে হলুদ, রাতে বিবাহ। অম্বার বৃকের ভিতরটা একবার মাত্র বিপুল বেগে তুলিয়া উঠিল, তাহার পর অসাড় হইয়া গেল। এ ব্যথা ত নূতন নয়, সে ত জানে ইহা তাহার জন্ম জীবনপথে অপেক্ষা করিয়াই আছে? যাক, বাবা মা ত মুক্তি পাইবেন।

গ্রামেরই জনকতক এয়ো আসিয়া জুটিলেন, বরের বাড়ি হইতে হলুদ আসিল, কণ্ঠকে তাহা দিয়া স্নান করান হইয়া গেল। তখনকার দিনে এত ঘটনার তর ছিল না। তেল হলুদ ছাড়া অতি সামান্য কিছু জিনিষই আসিত। এক্ষেত্রেও তাহাই আসিয়াছিল।

অম্বা একলা একটা ঘরে মাদুর পাতিয়া শুইয়া দুপুরটা কাটাইয়া দিল। উপবাসক্লিষ্ট দেহ, ব্যথাক্লিষ্ট মন লইয়া কখন যে ঘুমের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছিল, তাহা নিজেরই জানিত না। বিকালের দিকে কয়েকটি যুবতী ও বালিকা আসিয়া হাসির কল্লোলেই তাহাকে জাগাইয়া দিল। মহা ঘটা করিয়া সকলে কণ্ঠা সাজাইতে বসিয়া গেল। রক্তাশ্রয়া, চন্দনচর্চিতা অম্বা যেন রূপের জ্যোতিতে প্রদীপের ক্ষীণ আলোক ম্লান করিয়া দিল। বর আসিল। শারদা আশা-আশঙ্কাপূর্ণ হৃদয়ে এয়োদের সঙ্গে করিয়া উঠানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, এইবার বর আসিবে, স্ত্রী-আচার আরম্ভ হইবে। ওদিকে নির্জজন ঘরে অম্বা অশ্রুহীন শুষ্ক চোখে নক্ষত্র-বিভূষিত আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

হঠাৎ বাহর বাড়িতে একটা প্রচণ্ড কোলাহল শোনা গেল। বর ভিতরে আসিতেছিল, কে একজন লোক তাহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল, এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, “চলেছেন ত বিয়ে করতে, কিন্তু কাকে বিয়ে করছেন তা ভাল করে খোঁজ করেছেন? কণ্ঠার নিজের পিসী বিধবা হবার পর কলকাতায় বিদ্যোগারী মতে আবার বিবাহ করেছিলেন, তা জানেন?”

সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থ লোক হৈ হৈ করিয়া উঠিয়া পড়িল। “কি অশ্রদ্ধা, কি পাপিষ্ঠ! ব্রাহ্মণের জাত মারবার চেষ্টা!” উমাগতি অভিভূতের মত চাহিয়া রহিলেন, ভিতর-বাড়িতে শারদা কাঁদিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন, বরণডালা তাঁহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল।

বাহির বাড়ির কোলাহল ক্রমে ক্রমে প্রশমিত হইয়া আসিল। আরামারি, বকাবকি সব শেষ হইল, বরযাত্রের দল গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

উমাগতির শ্যালক তাঁহাকে নাড়া দিয়া বলিলেন, ‘অমন পাথরের মত বসে থাকলে ত চলবে না। মেয়ের গায়ে হলুদ হয়ে গেছে, বিয়ে আজ রাত্রের মধ্যে দিতেই হবে, এখনও দুটো লগ্ন আছে।’

উমাগতি শূণ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “পাত্র কোথায় পাব ?”

তাঁহার শ্যালক অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন, “তা আমি কি জানি ? চল খুঁজে দেখা যাক। কানা, খোঁড়া বুড়ো যা হোক, একটা কিছু জোটাতে হবে।” মন্ত্রমুগ্ধের মত উমাগতি তাঁহার পিছন পিছন বাহির হইয়া গেলেন।

শারদাকে সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া ঘরে তুলিয়া লইয়া গেল। অম্বা একবার চাহিয়া দেখিল, কোন কথা বলিল না। তাহার বিশাল চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল, যাহা সহ করিতে না পারিয়া সকলে ধীরে ধীরে তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইয়া চলিল। হিমশীতল বায়ু আর্তনাদ করিয়া ফিরিতেছে, বিবাহসভার প্রদীপগুলি এক একটি করিয়া নিবিয়া আসিল। শেষ লগ্নও প্রায় কাটিয়া যায়। এমন সময় উমাগতি ফিরিয়া আসিয়া মেয়ের সামনে দাঁড়াইলেন। পাগলের মত চোখে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “মরতে পারবি মা ?”

অম্বা তাহার বিশাল চোখ দুটি তাঁহার মুখে স্থাপিত করিয়া বলিল, “পারব বাবা, চল, আমরা তিন জনেই একসঙ্গে যাই।” শারদা হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। ছুটিয়া আসিয়া কন্যাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, “না, না, চল এ পাপরাজ্য ছেড়ে যাই। জগতে কোথাও কি আশ্রয় পাব না ?”

তাঁহার ভাইও আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন, বলিলেন, “তাই যাও। কাশী চলে যাও, আজ রাত্রেই রওনা হও। অন্তপূর্বা মেয়ে নিয়ে গ্রামে যেয়ো না, প্রাণে মারা যাবে।”

যে গরুর গাড়ীতে তাঁহারা সকালে এ-গ্রামে আসিয়াছিলেন, তাহাতেই আবার উঠিয়া বসিলেন। বাড়ির মেয়েরা অম্বার

বিবাহসজ্জা খুলিয়া শাদা কাপড় পরাইয়া দিল, অম্বা জিনিষপত্রও গুছাইয়া সব গাড়ীতে তুলিয়া দিল। শারদার ভ্রাতা বলিলেন, “আমি ওখানের জমিজমা ঘরদোর সবেব ব্যবস্থা করব, তোমাদের কোনো চিন্তা নেই।”

গাড়ী ছাড়ে প্রায়, এমন সময় একজন লোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। উমাগতির সামনে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় যাচ্ছেন ? গ্রামে যাবেন না। ওরা দুই দলে মিলে আপনাদের ঘরে আগুন দেবার ষড়যন্ত্র করছে।” সে ভূষণ।

অম্বার মুখ তাহার দিকে চাহিয়া একবার ভোরের আকাশের মত অরুণ-রাগ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি অম্বা দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

শারদা কাঁদিয়া বলিলেন, “আমরা কাশী যাচ্ছি বাবা। ও-গ্রামে জাত যখন ছিল, তখন টিকতে পারিনি। আজ জাত গেছে, এখন কোন সাহসে যাব ?”

ভূষণ সেন বলিল, “চলুন আমি যাচ্ছি ষ্টেশন অবধি আপনাদের সঙ্গে। পথে বিপদ ঘটা অসম্ভব নয়।” গাড়ীগুলি চলিতে আরম্ভ করিল।

গ্রামের সীমানা ছাড়াইবা মাত্র ভূষণ বলিল, “কাশী যাবেন না, কলকাতায় চলুন।”

উমাগতি বলিলেন, “কলকাতায় কে আমাদের আশ্রয় দেবে বাবা ?”

ভূষণ বলিল, “সেখানে ত আপনার বোন ভগ্নীপতি, তাঁরা রয়েছেন। যে-সমাজ আপনাদের ত্যাগ করল, কেন আর তাকে আঁকড়ে থাকা ? আপনি পণ্ডিত, আপনাকে আর আমি কি বোঝাব ?”

উমাগতি বলিলেন, “সত্য। আগে এ-কথা ভাবিনি। তাই চল গিন্নি।”

শারদা কথা বলিলেন না। ভূষণ তাঁহার দুই পায়ের উপর মাথা রাখিয়া বলিল, “মা, আমি তোমার স্বজাতি নই, কিন্তু আমি মানুষ, পশু নই।”

শারদা তাহার মাথায় হাত দিয়া নীরবে আশীর্বাদ করিলেন, তাঁহার কণ্ঠে ভাষা ফুটিল না।

অম্বা একবার ফিরিয়া ভূষণের দিকে তাকাইল, তাহার দুই চোখে অরুণোদয়ের আভাস।

কাপুর স্পেশালে কাশ্মীরের পথে

শ্রীহেমেশ্রমোহন রায়

রাওলপিণ্ডি—১৩ই মে। আজ ভোর টোয় সুদীর্ঘ পথের যাত্রারস্তের কথা ছিল, কিন্তু চা-পান ইত্যাদি সারিমা লটবহর লরিতে এবং পথের উপযোগী হালকা জিনিষপত্র নিজ নিজ মোটরগাড়ীতে গুছাইয়া তুলিতে কিছু বিলম্ব হইয়া গেল। কাপুর কোম্পানীর নির্দেশমত পনেরখানা মোটরগাড়ী ও তিন-চার খানা লরি ষ্টেশনের প্লাটফর্মের শেষভাগে সারি দিয়া দাঁড়াইলে যাত্রীরা নিজ নিজ মালপত্র উঠাতে উঠাইতে লাগিলেন। আমরা দলে চারি জন ছিলাম বলিয়া একখানি গাড়ী নিজস্বরূপে পাইলাম। সকলে প্রস্তুত হইয়া নিজ নিজ গাড়ীতে উপবেশন করিলে আমাদের মোটরবাহিনী মন্থর গতিতে প্লাটফর্ম হইতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই থামিয়া গেল। ইহার কারণ পরক্ষণেই বোধগম্য হইল বটে,

কিন্তু অযথা বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া আমরা কিছু অধীর হইয়া পড়িলাম, কারণ আকাশের মেঘাচ্ছন্নতা ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল এবং সন্ধ্যার পূর্বেই রাওলপিণ্ডি হইতে ১৩০ মাইল দূরবর্তী উরি নামক স্থানে পৌঁছিয়া তত্রত্য পান্থশালায় অর্থাৎ ডাকবাংলায় রাত্রিযাপনের কথা ছিল। যাহা হউক দেখা গেল এই মোটরবাহিনীর ফোটো লইবার উদ্দেশ্যেই কর্তৃপক্ষের আদেশে গাড়ীগুলি দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। আলোকচিত্রের উদ্যোগ-আয়োজনে আরও অর্ধঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইল। অতঃপর ফোটো-তোলা শেষ হইয়া গেলেই রাজপথে অবতীর্ণ হইয়া বেলা প্রায় ৯টার সমস্ত গাড়ী একযোগে ছুটিল। সে এক অভিনব দৃশ্য, কিন্তু পরক্ষণেই মোটরচালকদের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়া গেলে আমরা সকলে পৃথক হইয়া পড়িলাম। এই সুদীর্ঘ পথে চালকেরা যাত্রীদের ভিকটি অসুখায়ী গাড়ী না চালাইয়া, নক্ষত্রবেগে ছুটাইয়া

দেয়; এই কারণে পরম রমণীয় দৃশ্যাবলী উপভোগ করিবার অবসর হয় না, আকাজ্জক অতৃপ্ত থাকিয়া যায় এবং মনে হয় এই মোটর-যুগের পূর্ববর্তী কালে টোঙ্গা নামক দ্বিচক্র অশ্বযানই এ-পথের উপযোগী ছিল। তাহাতে তিন-চার দিনে এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হইলেও নমন-মনের



মারি শহরের বাজার

পরিতৃপ্তিকর বলিয়া শ্রান্তি বা ক্লান্তি অনুভূত হইত না। বিশেষতঃ মধ্যে মধ্যে সুসজ্জিত ডাকবাংলা বিরাজিত বলিয়া বিশ্রামস্থলেরও কোনও ব্যাঘাত ঘটিত না।

সতের মাইল দূরবর্তী টোল গেটে যখন পৌঁছিলাম তখন আকাশ রীতিমত মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং আরও আট মাইল অগ্রবর্তী ট্রেট নামক স্থানে পৌঁছিবার পূর্বেই অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইল। পরক্ষণেই ৩,৫০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত পাইন-বৃক্ষবহুল 'সামলি সেনিটরিয়াম' অতিক্রম করিয়া সাত মাইল অগ্রবর্তী ঘোরাগলি নামক স্থানে পৌঁছিবার পূর্বেই বেশ বৃষ্টি নামিল। পথ ক্রমশঃ উর্দ্ধগামী হইয়া পয়ত্রিশ মাইল দূরবর্তী মারি ক্রয়ারি (Murree Brewery) অতিক্রম করিয়া আরও দুই মাইল অগ্রবর্তী রাওলপিণ্ডি বিভাগের প্রখ্যাত স্বাস্থ্যাবাস 'মারি' শহরের পাদদেশে (সমুদ্রতট হইতে ৬৫০০ ফুট উচ্চ) 'সানি ব্যাক'



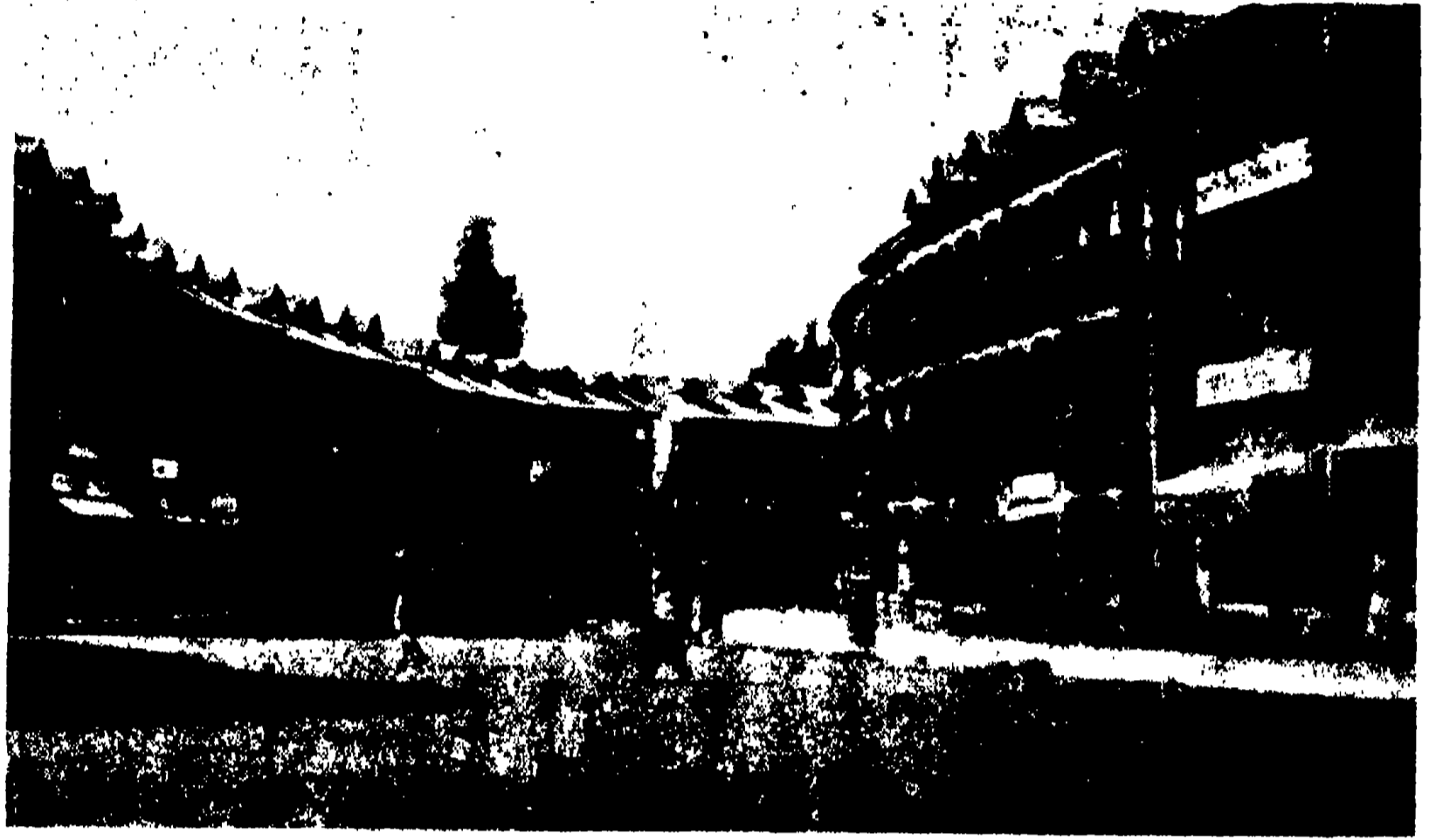
খিলম-তটস্থ বারামুলা শহর

(Sunny Bank) নামক স্থানে মোটর পৌঁছিলে আমরা চারি জন নামিয়া পড়িলাম এবং কাপুর কোম্পানির প্রদত্ত টিফিন ক্যারিয়ার ও ফ্লাস্কে রক্ষিত আহাৰ্য ও পানীয়ের সহ্যবহারার্থ মোটর-ষ্ট্যাণ্ডের সংলগ্ন ইম্পিরিয়াল হোটেলের কক্ষে প্রায় এক ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করিয়া বৃষ্টির বেগ কিছু কমিলেই দুই মাইল উর্দ্ধস্থিত মারি শহর দেখিতে পদত্রজে রওনা হইলাম। কারণ এ ১৫ ডাই-পথে মোটরে গমনাগমন সম্ভবপর নয়। অবশ্য সঙ্গী মহিলাদ্বয়ের জন্ত দুইটি ডাণ্ডির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অপর পর্যটক দল এ শহরটি না দেখিয়া ইতঃপূর্বেই কাশ্মীরের পথে অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছেন। মারি অনেকটা দার্জিলিং শহরের মত তবে অপেক্ষাকৃত ছোট কিন্তু উচ্চতায় বেশী। ইহার সর্বোচ্চ স্থানটি সমুদ্রবক্ষ হইতে ৭,৫০০ ফুট। শহরের নানা স্থান হইতে চতুর্দিকের দৃশ্য অতি চমৎকার। উত্তরে হাজারাগলির পর্বতশৃঙ্গগুলি ও দক্ষিণে রাণুলপিণ্ডির সমতলক্ষেত্র পর্যন্ত পরিদৃশ্যমান। এ শহরে বহু হোটেল এবং সুসজ্জিত দোকানপাট। ১৮৭৬ সালের পূর্বে এখানে পঞ্জাব সরকারের গ্রীষ্মাবাস ছিল এবং এখনও ইহা উত্তর-ভারতের সামরিক অধ্যক্ষের গ্রীষ্মাবাস রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পঞ্চনদ প্রদেশের স্বাস্থ্যদায়ী ব্যক্তি-কর্গেরও সমাগম বেশ আছে। তবে ইদানীং পঞ্জাব হইতে

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পৃথক হওয়ায় নাথিয়াগলি (৮,০০০ ফুট) নামক সীমান্ত প্রদেশের গ্রীষ্মাবাসটি ক্রমশঃ লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে এবং এ-শহরের প্রয়োজনীয়তা ও আদর অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। স্থানীয় ভাটিতে বিয়ার নামক যে মদ্য প্রস্তুত হয় তাহা সমগ্র ভারতে সরবরাহ হইয়া থাকে। প্রায় দুই-তিন ঘণ্টাকাল এখানে অতিবাহিত করিয়া পুনরায় যখন রওনা হইলাম তখনও বৃষ্টির বিরাম নাই। এখন আমাদের পথটি ক্রমশঃ উত্তর-পূর্বাভিমুখে নামিয়া চলিয়াছে। এই মারি শহরের পাদদেশ হইতে বিভক্ত হইয়া একটি মোটরবাহী পথ গোজা উত্তর দিকে ছাঙ্গলাগলি হইয়া দুঙ্গাগলি নামক অপর একটি স্বাস্থ্যাবাস পর্যন্ত গিয়াছে। ইহার উচ্চতা ৮,০০০ ফুট এবং পূর্বকথিত নাথিয়াগলি হইতে মাত্র দুই মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। বহুদূর অগ্রসর হইয়া যাইবার পরেও মারি পাহাড়ের চূড়াস্থিত ঘরবাড়ি চিত্রাৰ্পিতের গায় পশ্চাতে দেখা যাইতে লাগিল।

বৃষ্টির বেগ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। গাড়ীর পর্দা তুলিয়া দেওয়া সত্ত্বেও ভিতরে ছাট আসিয়া আমাদের ভিজাইয়া দিতে লাগিল। লগেজ ক্যারিয়ারে রক্ষিত মালপত্রের ত কথাই নাই। দেখিতে দেখিতে মারি হইতে সতের মাইল দূরবর্তী গিরিসঙ্কটপ্রবাহিণী ধরশ্রোতা

ঝিলম বা পৌরাণিক বিতস্তা নদীর তটসংলগ্ন রাস্তায় আরম্ভ হইল। পরপারেই কাশ্মীর-মহারাজের এক প্রাসাদ উপনীত হইয়া আমাদের গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিল। তখন আর চারি পার্শ্বের দৃশ্য বড় একটা দৃষ্টিগোচর হইল না, কেবল এই শ্রোতস্বিনীর আবর্তিত ফেনিল তাণ্ডব ও গর্জন গোচরীভূত হইতেছিল। বড় বড় কাঠের তক্তা ও রলা অসংখ্য ভাসিয়া চলিয়াছে। পার্কত্য চীর, পাইন প্রভৃতি কাঠের ব্যবসায়ীরা এইরূপে কাঠ চিরিয়া নদীর ধারে ধারে আটকাইয়া রাখে এবং বণ্টার সময়ে ভাসাইয়া পঞ্চনদের নানা স্থানে চালিত করে; তাহাতে কম খরচে নদীসংলগ্ন বিভিন্ন কাঠগোলায় নিম্ন নিম্ন চিহ্নিত মালগুলি পাঠাইয়া থাকে। মোটর ও বৃষ্টির বেগের বিরাম নাই। ক্রমে নিম্নগামী পথে রাওলপিণ্ডি হইতে চৌয়টি মাইল দূরে কোহালা নামক ক্ষুদ্র



রাজপথ, মীনগর



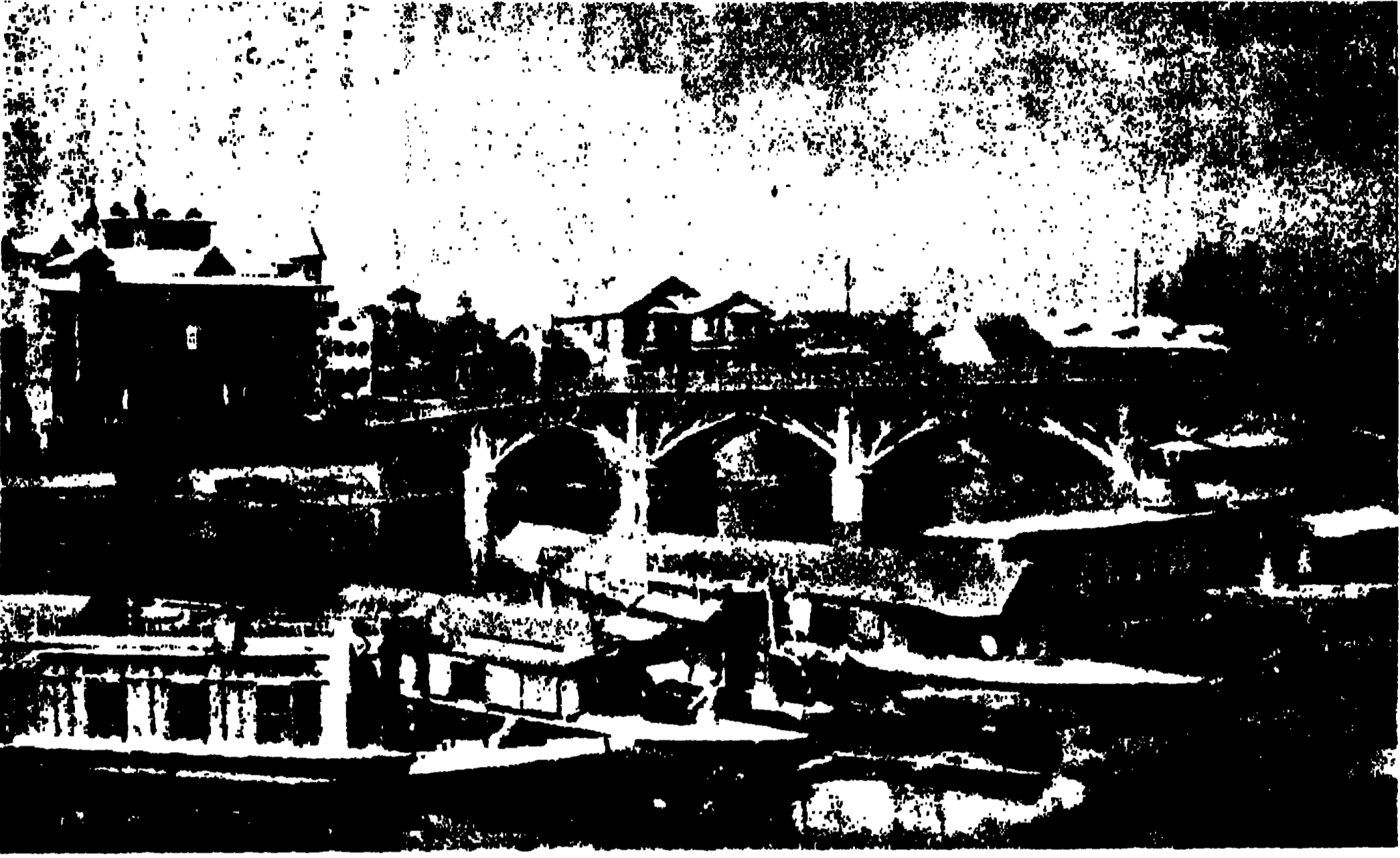
দোমেল নামক স্থানে একটি ঝুলা-সেতুর দৃশ্য

শহরে উপনীত হইলাম। এখানে পান্থনিবাস অর্থাৎ ডাকবাংলা পোষ্ট ও তার আপিস এবং সামান্য দোকানপাট ইত্যাদি আছে। শুক্ক (Customs) আপিসের কাছের কক্ষকাল অতিবাহিত হওয়ার পরেই নদীর উপর সুদৃশ্য সেতুটি পার হইয়া কাশ্মীর রাজ্যাস্তর্গত পথে আমাদের গতি

আরম্ভ হইল। পরপারেই কাশ্মীর-মহারাজের এক প্রাসাদ বিরাজমান। এই উভয় রাজ্যের সংযোগস্থলটি পরম রমণীয়। ইহার আপেক্ষিক উচ্চতা ১৮০০ ফুট মাত্র, কিন্তু পথের দুই ধারে গগনচুম্বী শৈলরাজি বিরাজিত। উভয়

রাজ্যের সীমান্তস্থিত এই রাস্তাটি ঝিলম নদীর সহচররূপে চলিয়াছে, কোথায়ও বিচ্ছেদ নাই। ক্রমে আমরা পঁচাশি মাইল দূরবর্তী ঝিলম ও কিষণ-গঙ্গার সংযোগস্থলে অবস্থিত অপূর্ব দৃশ্য দোমেল নামক স্থানে পৌঁছলাম। এখানেও পান্থশালা, ডাক ও তার আপিস এবং হাসপাতাল আছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হাজারা জেলার সদর এবটাবাদ নামক ছাউনী-শহর হইতে একটি মোটরগমনোপযোগী রাস্তা এখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। দোমেলের উচ্চতা ২,২০০ ফুট। এখানেও

শুক্ক আপিসে আমাদের ও সঙ্গের অপর পর্যটক দলের গাড়ী এবং মালবাহী লরি প্রভৃতির ভিড় লাগিয়াছে দেখা গেল। বৃষ্টির বেগ কথঞ্চিৎ কম থাকায় এবং প্রায় এক ঘণ্টাকাল বিলম্ব হওয়ায় আমরা চা পান করিয়া লইলাম। দোমেল-সংলগ্ন ঝিলম নদীর উপর ঝুলা-সেতুর



আমিরাকদল সেতু—শ্রীনগর

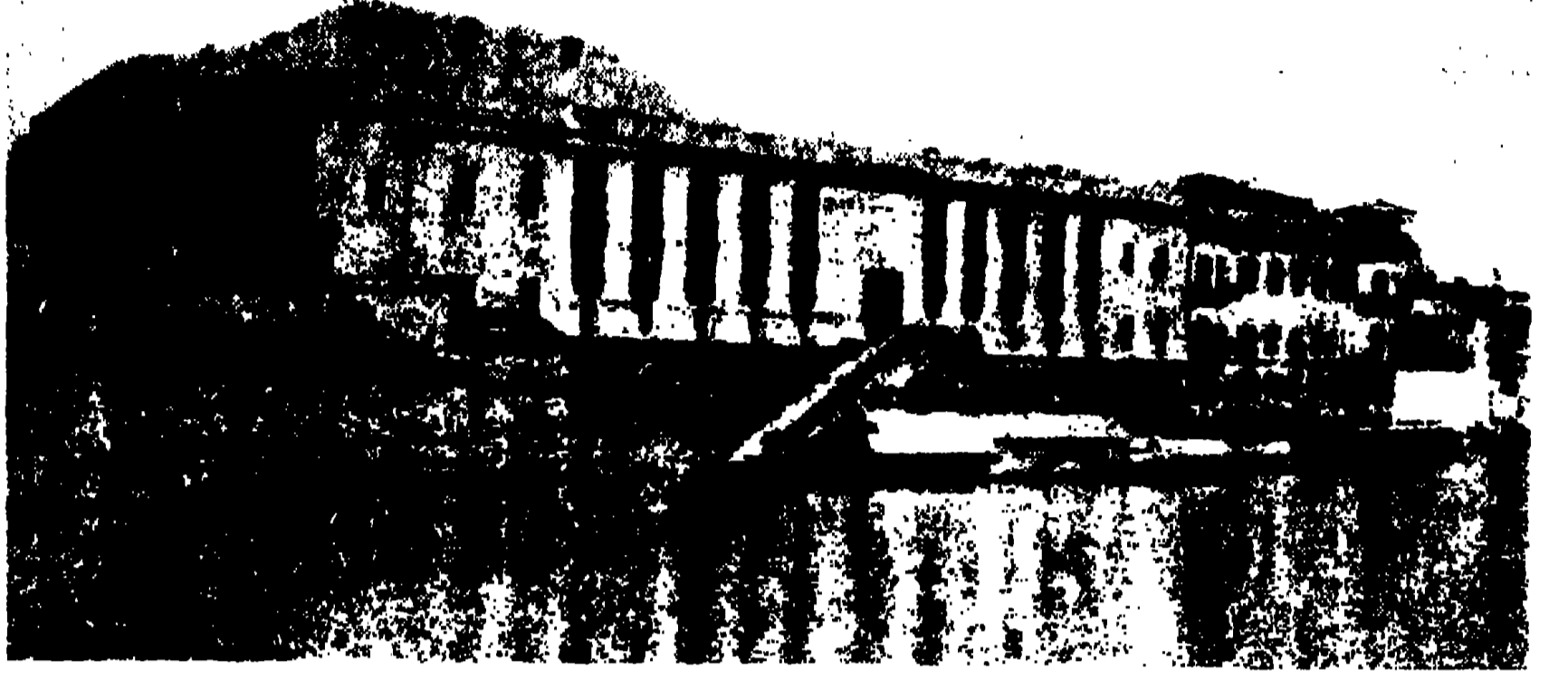
পরপারেই কাশ্মীর-রাজ্যের অন্যতম শহর মুজাফারাবাদ অবস্থিত। বর্ষণজনিত জলবৃষ্টির সঙ্গে পার্শ্বতীয় নদীঘরের গর্জন শুনিতে শুনিতে আমরা পুনরায় যাত্রা করিলাম। ক্রমে পাহাড়ের উচ্চতর স্তরে আমাদের গাড়ী উঠিতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে আরও চৌদ্দ মাইল অগ্রবর্তী পান্থশালা সমন্বিত গঢ়ী নামক স্থানটিও ছাড়াইয়া গেলাম। বৃষ্টির বেগ এখন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মনে ভাবিলাম কক্ষণেই রাওলপিণ্ডি হইতে যাত্রারস্ত্র করা হইয়াছিল। মারি হইতে রাস্তা ক্রমাগত উত্তরাভিমুখে চলিয়া দোমেলে হঠাৎ বক্রগামী হইয়া গেল; অতঃপর দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখে নদীর গতি ধরিয়া উরি পর্যন্ত চলিল। ক্রমে চিনারা, চাকোঠা নামক স্থানদ্বয় অতিক্রম করিলাম। আমাদের গাড়ী অবিশ্রান্ত গতিতে চলিয়াছে, কারণ সন্ধ্যার পূর্বেই উরি বাংলায় পৌঁছিতে হইবে নচেৎ সকল পর্যটকের উপযোগী পান্থশালা নিকটে আর নাই। সন্ধ্যার প্রাকালে এক শত তেত্রিশ মাইল দূরবর্তী উরি বাংলায় আমাদের গাড়ীর গতিরোধ হইল। দেখিতে দেখিতে অগ্ন্যান্য গাড়ীগুলিও প্রায় আসিয়া জুটিল।

সমুদ্রতট হইতে উরির উচ্চতা চার হাজার পাঁচ শত ফুট, সুতরাং বিলক্ষণ শৈত্য অনুভব করিলাম। তখন সকলেই

বিশ্রামস্থলের জন্ম লালায়িত, কিন্তু পান্থশালাটি বৃহৎ হইলেও একযোগে এতগুলি যাত্রীর স্থান সঙ্কুলান হওয়া দুর্ঘট। এই কারণে বিলম্বে আগত কতিপয় সহপরিষটক এখানে না নামিয়া তের মাইল অগ্রবর্তী রামপুর বাংলায় রাত্রিযাপনোদ্দেশে রওনা হইয়া গেলেন। আমরা কিন্তু সিন্ধু বসনে আর অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক ছিলাম না, কাজেই মালপত্র গাড়ী হইতে নামাইয়া এই পান্থশালার একটি কক্ষ দখল করিলাম এবং টিফিন-কারিয়ার হইতে যৎকিঞ্চিৎ আহাৰ্য্য দ্রব্য উদরস্থ করিয়া শয়নের ইচ্ছায় বিহানাপত্র খুলিতেই দেখা গেল যে, প্রায় সমস্তই সিন্ধু। তথাপি অপেক্ষাকৃত শুষ্ক আচ্ছাদনাদির সদ্যবহার করিবার ইচ্ছায় শয্যা রচনা করিতেই এক বাধা উপস্থিত হইল। কতিপয় মহিলা-যাত্রী বিলম্বে উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাদের অল্প কোনও ঘরে স্থানলাভের সুবিধা হইল না, সুতরাং আমাদের অধিকৃত কক্ষেই আগমন করিলেন। অগত্যা সঙ্গী মহিলাদ্বয়ের সহিত তাঁহাদেরও রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আমরা উভয় ভ্রাতা অপর কোন কক্ষে স্থানসঙ্কুলানের চেষ্টা করিতে লাগিলাম; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বারান্দায় শয্যা রচনা করিয়া লইলেন এবং আমি বহির্বাটীর এক প্রকোষ্ঠে অপর তিন জন যাত্রীসহ রাত্রিবাসের জন্ম প্রস্তুত হইলাম। তখনও বৃষ্টির

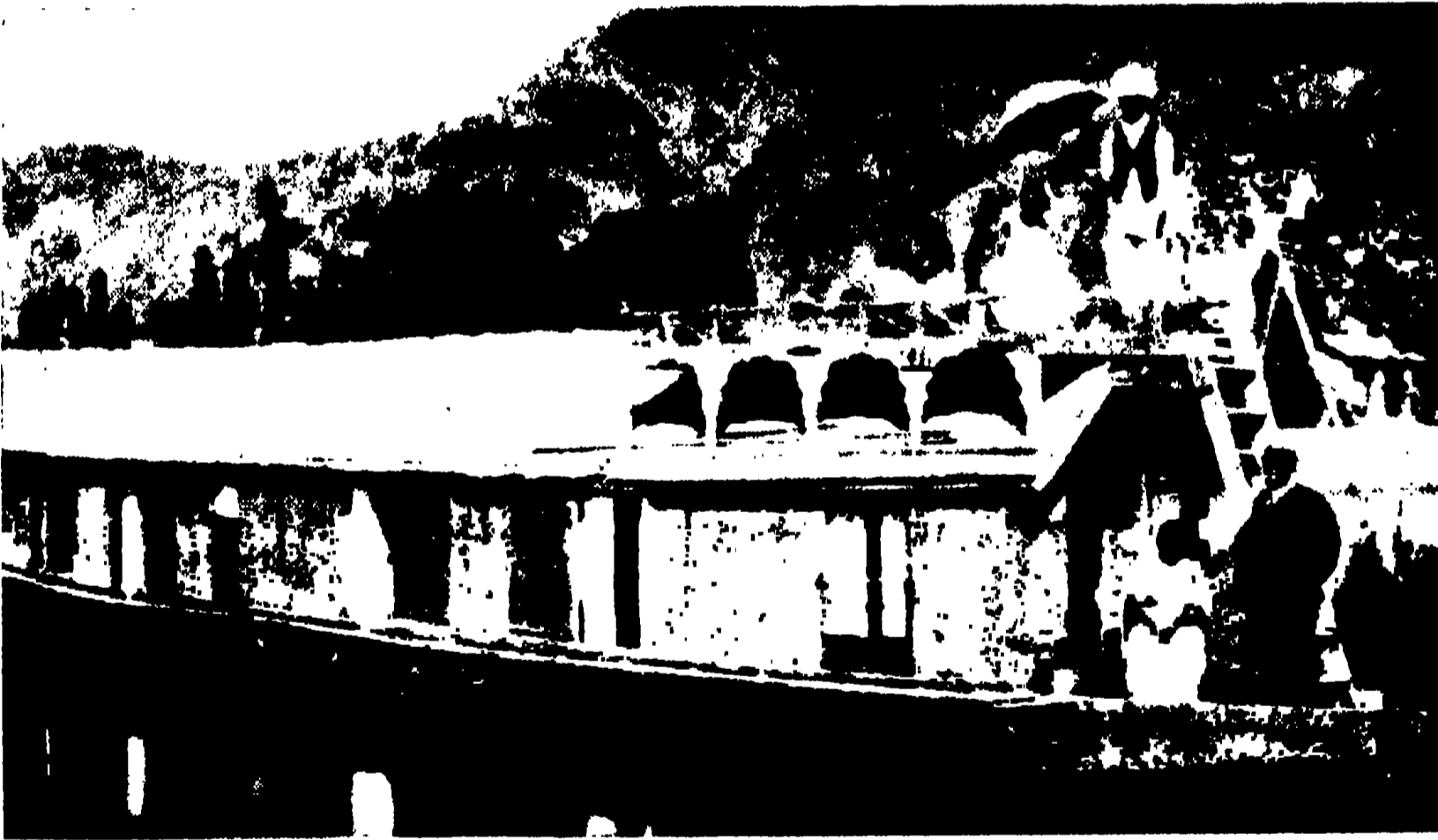
বিরাম নাই, এমন কি শিলাবর্ষণও হইতেছিল। সমস্ত রাত্রি একরূপ অনিদ্রায় কাটিল। পরস্পরের এইরূপ সহানুভূতি ছিল বলিয়াই এই সুদীর্ঘ পর্যটন এত আনন্দের হইয়াছিল। সকলেই পরস্পরের সাহায্যার্থ বন্ধপরিষ্কর, যেন সমগ্র স্পেশাল ট্রেনের যাত্রীবর্গ এক বৃহৎ পরিবারভুক্ত, নিজ নিজ স্বার্থ-বিস্মৃত! জীবনে এরূপ অভিজ্ঞতা বোধ হয় দুর্লভ। সহযাত্রীদের একখানি গাড়ী অনেক রাত পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছায় নাই বলিয়া আমরা সকলেই চিন্তাশ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলাম; অবশেষে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর ঐ গাড়ীর যাত্রীরা পৌঁছিলে জানা গেল আমাদের মালবাহী একটি লরি পথে বিপন্ন হওয়ায় উহার সাহায্যার্থ তাঁহাদের এত বিলম্ব

শ্রীনগর পৌঁছান অসম্ভব হইবে, আমাদের পরিচালকেরা এইরূপ আশঙ্কা ব্যক্ত করিলেন। সুতরাং মালপত্র বাঁধিয়া ১৪ই বেলা সাড়ে সাতটায় পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া পুনরায় যাত্রারম্ভ করা হইল। উরি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে



পুরাতন রাজপ্রাসাদ, শ্রীনগর

একটি মনোলোভা স্থান বটে, কিন্তু দুর্দৈববশতঃ চতুর্দিক ঘুরিয়া দেখিবার অবসর পাওয়া গেল না। এই স্থান হইতে একটি রাস্তা দক্ষিণ দিকে কাশ্মীরের অগ্রতম উপ-করদ-রাজ্যের রাজধানী পুঙ্ নামক ক্ষুদ্র শহরাভিমুখে গিয়াছে। রওনা হইবার পর কয়েক মাইল পযুক্ত আমাদের রাস্তার অবস্থা বড়ই খারাপ হইয়াছে দেখা গেল এবং প্রতি মুহূর্তেই বিপদাশঙ্কা মনে জাগিতে লাগিল, কারণ বৃষ্টি ও মোটরের বেগ সমভাবেই চলিয়াছে। উরি হইতে



লেখকের ভাসমান নৌগৃহ

হইয়াছে। এইরূপ দুর্ঘ্যোগে পর্বতগাত্র হইতে সবেগে পতিত জলপ্রবাহে রাস্তা স্থানে স্থানে ঘেরূপ কাটিয়া যাইতেছিল তাহাতে যে নির্ঝিল্লি সকলে গন্তব্য স্থানে আসিয়া পৌঁছিব তাহা মনে হয় নাই।

রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই পুনরায় যাত্রার আয়োজন আরম্ভ হইল। কারণ এখনও তেষটি মাইল পথ বাকী আছে, বিশেষতঃ বর্ষণের যখন বিরাম নাই তখন দৈবদুর্ঘ্যোগ আরও ঘনাইয়া আসিলে পথের কোনও স্থান যদি ধসিয়া যায় তবে

তের মাইল অগ্রবর্তী রামপুর বাংলা ছাড়াইলাম। তখনও পূর্বরাত্রে উরি বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন অগ্রগামী পর্যটকদের চার-পাঁচটি গাড়ী পাশ্চাত্যের দ্বারে দণ্ডায়মান। তাঁহারা বোধ হয় তখনও গতরাত্রে অবসাদ কাটাইয়া পথের জন্ত প্রস্তুত হইতে পারেন নাই। পথিমধ্যে মহরা নামক স্থানে কাশ্মীর রাজ্যের বিজলী-কারখানা দৃষ্ট হইল। আরও পনের মাইল ছুটিয়া ঝিলম-তটস্থ বারামুলা শহরে উপনীত হইলাম। এই স্থান হইতে কাশ্মীরের



ডাল-হ্রদের একাংশ

উপত্যকাভূমি আরম্ভ হইল। এ রাজ্যের জলযানচালিত ব্যবসা-বাণিজ্যের ইহাই কেন্দ্রস্থল। বারামুলার নীচে আর জলযানের গতি সম্ভবপর নয়, কারণ নদীর ঢাল ক্রমশঃ খরতর ও বিপজ্জনক। বারামুলা হইতে ইসলামাবাদ বা অনন্তনাগ পর্যন্ত সত্তর মাইলের অধিক এই নদীর গতিপথটির সমতা (level) প্রায় সমান বলিয়া তরণীর গতিবিধি অব্যাহত। ঐ উভয় স্থানের মধ্যবর্তী শ্রীনগর শহরে গমনেচ্ছুক পর্যটকেরা অনেকে বারামুলা হইতেই বজ্রা অর্থাৎ হাউস-বোট ভাড়া করিয়া জলপথেই যাত্রা করিয়া থাকেন। অবশ্য ষাহাদের প্রচুর সময় হাতে নাই তাঁহারা একরূপ নৌবিহারের আনন্দলাভে বঞ্চিত হন, তাহা বলা বাহুল্য। নানা শ্রেণীর বহু তরণী এখানকার ঘাটে লাগিয়া আছে দেখিলাম। এ শহরের আপেক্ষিক উচ্চতা প্রায় ৫,২০০ ফুট। এখান হইতেই শকটচারীদের বিলম্ব নদীর সঙ্গ ত্যাগ করিতে হয় এবং শ্রীনগরে পৌঁছিয়া পুনরায় মিলন ঘটে। বারামুলা হইতে শ্রীনগর পর্যন্ত ইতস্ততঃ জলাকীর্ণ সমতল ক্ষেত্রে চাষ-আবাদের পর্যাপ্ত পরিচয় পাইয়া এবং যথাতথ্যা চিরবিশ্রুত কাশ্মীর কুম্বের সুষমা দেখিয়া হঠাৎ স্বপ্নাবেশে বাংলা দেশে বৃষ্টি স্থানান্তরিত হইলাম বলিয়া ভ্রম জন্মিতে লাগিল, তবে পরক্ষণেই দিগন্তের কোড়ে হিমাচলের তুষার-মণ্ডিত উত্তুঙ্গ চূড়াগুলি দৃষ্টিপথে পড়িতেই সে ভ্রম বিদূরিত হইল। আর

এক অদ্ভুত পাদপরাজির সহিত প্রথম পরিচয় ঘটিল—তাহার নাম পপ্‌লার। ইহার বন্ধলশন্য শুভ্র কাণ্ডগুলি সরলভাবে গগনমার্গে উঠিয়াছে। এই পাদপের সারি কাশ্মীরের উপত্যকা-বীথিগুলি শোভিত করিয়া রাখিয়াছে। এ-জাতীয় বৃক্ষ ইউরোপ হইতে প্রথমে আমদানী করা হয়, এ প্রদেশের আদিমজাত নহে।

ক্রমগতিতে কাশ্মীর রাজ্যের রাজধানী শ্রীনগর শহরের উপকণ্ঠে আসিয়া পড়িলাম। পাহাড়-পর্বতের পরিবর্তে চতুর্দিকেই খাল বিল ও হরিৎ শোভার প্রাচুর্য্য দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে শহরের মধ্যে আমিরা-কদল নামে বিলম্বের উপর সাতটি সেতুর প্রথমটির উপর আসিয়া পড়িলাম। এই সেতুর দুই দিকেই প্রশস্ত রাজপথ-সংলগ্ন হর্ম্য ও বিপণিশ্রেণী বিরাজমান। ইহার সন্নিকটেই নদীতটে সুরম্য রাজপ্রাসাদটি প্রথমেই নয়নগোচর হয়। অসংখ্য বজ্রা ও শিকাড়া নামক এক প্রকার ডিক্কী নদীবক্ষে ভাসমান। তন্মধ্যে মহারাজের খাস বজ্রাগুলি ও খালসা হোটেলের নামাঙ্কিত ভাসমান দ্বিতল বজ্রাটি প্রধানতঃ আগন্তকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ষাহারা উক্ত হোটেলের পাকা বাড়িতে না থাকিয়া জলবক্ষে অবস্থানের প্রয়াসী, তাঁহাদের জন্তই হোটেলওয়ালারা ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীনগর শহরটি যে এত বৃহৎ ও জমকাল এবং

উহার রাস্তাঘাট এত সুন্দর তাহা আমাদের ধারণাই ছিল না। অবশ্য আলো ও আঁধার প্রায় সর্বত্রই পাশাপাশি বিরাজ করিতে দেখা যায় এবং এখানেও যে সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই তাহার দৃষ্টান্ত অতঃপর যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে। যাহা হউক, রেলপথ হইতে এতদূরে অবস্থিত এরূপ বন্ধিষ্ণু শহরের প্রথম দর্শন যে একেবারে চমকপ্রদ তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। যেন হঠাৎ এক স্বপ্নরাজ্যে আসিয়া পড়িলাম। আমিরাকদলের নিকট আমাদের মোটর কোম্পানীর আপিসে অপর সহযাত্রীদের গাড়ীগুলি আসিয়া না মিলিত হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের তথায় অর্ধঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিতে হইল। তৎপরে আরও দুই মাইল দূরবর্তী শহরের প্রান্ত-সীমান্বিত ডাল হ্রদ সংযুক্ত প্রণালীর গাগ্রিবল নামক অংশের দিকে আমাদের গাড়ীগুলি চলিতে লাগিল। কারণ সেখানেই জলবন্ধে আমাদের বার দিন আবাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। নিমেষে নেড়ু হোটেল, পোলো ময়দান, ডাল গেট প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া মোটরের গতিরোধ হইল এবং স্থলযান হইতে জলযানে অধিষ্ঠিত হইবার আয়োজনে সকলে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলাম। তখনও বর্ষণের বিরাম নাই, তবে প্রকোপ কমিয়াছে। উপরোক্ত প্রণালীর গাগ্রিবল নামক অংশটি ডাল-হ্রদের প্রায় মোহনায় অবস্থিত। এখানে নানা শ্রেণীর বহু বজরা তীরে সংলগ্ন আছে, তন্মধ্যে আমাদের চার জনের উপযুক্ত একটি বজরা পছন্দ করিয়া মালপত্র তাহাতে স্থানান্তরিত করিলাম। সিন্ধু বন্দনে তখন আমরা প্রায় কম্পমান; যে পর্য্যটকেরা দলে চার-পাঁচ জনের কম ছিলেন তাঁহারা সম্পূর্ণ একটি বজরার অধিকারী হইতে পারিলেন না, অপর যাত্রীর সহিত কোন বজরার আংশিক অধিকারী হিসাবে বাসস্থান পাইলেন মাত্র। বজরাগুলি নানা শ্রেণীর আছে। তন্মধ্যে আমাদের বজরাটি অত্যুচ্চ শ্রেণীর না হইলেও মূল্যবান আসবাবপত্রে সুসজ্জিত পাঁচটি কামরা ও দুটি স্নানকক্ষ-বিশিষ্ট ছিল। প্রত্যেক বজরা-সংশ্লিষ্ট আরও দুটি করিয়া তরণী পাওয়া যায়, উহার একটি পাকশালা (kitchen boat) ও অপরটি শিকাড়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শিকাড়া বলিতে মধ্যস্থলে ছত্রীবিশিষ্ট জলীবোট বা ডিল্লী বুঝায়। উহার যাত্রীরা বেচ্ছামত জলবিহার ও মাঝিরা ইতস্ততঃ

গমনাগমন করিয়া থাকে। কারণ মূল বজরাটি তীরে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবেই থাকে, সচরাচর গতিশীল নহে। আর পাকশালাটি রন্ধনাদি ও ইঞ্জি বা মাঝিদের বাসস্থানরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহাদের অল্প বাসস্থান নাই। ইতঃপূর্বে কাঙড়ি নামক জিনিষটির সহিত পরিচিত ছিলাম না। অন্য বজরায় অধিষ্ঠানকালে প্রথমেই উহা পরিলক্ষিত হইল, গঙ্গদেশবিন্দু ৫ প্রজ্জলিত অন্ধারবিশিষ্ট বেত্রমণ্ডিত মুংপাত্র বিশেষ। যখন হিমঝতুতে এ-প্রদেশ তুষারাচ্ছন্ন থাকে তখন ইহাই সর্বদা দরিদ্র কাশ্মীরীদের বন্ধুলে বিরাজ করে। শ্রীনগর শহরে প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার মুসলমান-জাতীয় ইঞ্জির বাস। ইহাদের ব্যবসায় নৌচালনা এবং সম্পত্তির মধ্যে নিজ নিজ বজরা কিংবা জোড়া। উহারই ভাড়াই তাহারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে। ইহারা ধূর্ত এবং ভুলিয়াও সত্য কথা বলিতে চায় না। অনেকে বাবুটির কাজও শিখিয়াছে। ইহাদের রমণীরা পুরুষ অপেক্ষা কর্মপরায়ণা ও সুশ্রী, কিং তদ্রূপ সুশীলা নহে।

আমাদের প্রায় তিন দিকই গিরিমাল্য পরিবেষ্টিত। উহাদের উচ্চ চূড়াগুলি ডাল-হ্রদের স্বচ্ছ নীরে প্রতিফলিত হইয়া এক অপরূপ দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। ডাল গেট হইতে এই প্রণালীর মোহনা পর্য্যন্ত প্রায় দেড় মাইলব্যাপী প্রশস্ত পাষণ-ময় বাঁধ-সংযুক্ত রাস্তাটি (Strand) আধুনা দুই বৎসর যাবৎ প্রস্তুত হইয়া ক্যারান্ বুলভার নামে অভিহিত হইয়াছে এবং রাস্তার অপর পাশেই প্রাচীন হিন্দুমন্দির-শোভিত শঙ্করাগাধ্য বা তখুত-ই সুলেমান নামক পাহাড়টি বিরাজমান। ইদানীং এই রাস্তার ধারে সুন্দর সুন্দর দ্বিতল বাড়ি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা ভাড়া পাওয়া যায়। 'আহারাদি কোনও প্রকারে সমাধা করিয়া বিশ্রামস্থলের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বিচানাপত্র, এমন কি বাসপেটরার অভ্যন্তরস্থ পরিধেয় বস্তাদি পর্য্যন্ত বৃষ্টির জলে ভিজিয়া গিয়াছে। বেলা প্রায় দুইটা পর্য্যন্ত বর্ষণের পর আকাশ মেঘমুক্ত হইলে শীতবস্ত্রাদি বজরার ছাদে প্রসারিত করিয়া শিকাড়া সাহায্যে হ্রদবন্ধে বিচরণের জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। এই হ্রদে তরঙ্গ না থাকায় এইরূপ জলবিহারে কোনরূপ বিপদাশঙ্কা নাই। অবশ্য বৃহত্তর উলার-হ্রদের কথা স্বতন্ত্র, কারণ উহাতে বাত্যাভিতাড়িত তরঙ্গের সৃষ্টি হয়।



শান্তিদেবকৃত বোধিচর্যাবতার—প্রজ্ঞাপারমিতা নামক নবম পরিচ্ছেদ। প্রথম ভাগ। (গোবিন্দকুমার সংস্কৃত গ্রন্থাবলী—১) শ্রীগোপালদাস চৌধুরী, এম-এ, বি-এল সম্পাদিত। ৩২নং বিডন রো, কলিকাতা। হইতে শ্রীগোপালকুমার চৌধুরী, এম-এ, বি-এল কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১০ আট আনা।

শান্তিদেবকৃত এসিদ্ধ বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ বোধিচর্যাবতারের নবম পরিচ্ছেদের মূল ও বাংলা অনুবাদ এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। বৌদ্ধ-দর্শনের মতবাদ ও হিন্দুদর্শনের সহিত তাহার সম্পর্ক বিস্তৃত ভাবে তুলিকার আলোচিত হইয়াছে। এই অনুবাদ ও মিকা শ্রীযুক্ত হরিহরানন্দ আরণ্য মহাশয় কর্তৃক লিখিত। অনুবাদকে সর্বত্র আক্ষরিক করিবার জন্ত ব্যর্থ শ্রম করা হয় নাই। পক্ষান্তরে অনুবাদ সুবোধ্য করিবার জন্ত স্থানে স্থানে বন্ধনীর মধ্যে অথবা স্বতন্ত্রভাবে টিপ্সনী পদ্ধতির দ্বারা গ্রন্থের তাৎপর্য বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, ইহা সঙ্কট ভাব। অনেক স্থলে জটিল ও দুর্বোধ্য হইয়াছে ভাষা আর একটি সরল হইলে সাধারণ পাঠকের বিশেষ সুবিধা হইত। যাহা হউক, অনুবাদ-দ্রষ্টব্য বাংলা সাহিত্যে এই নূতন অনুবাদগ্রন্থ আমরা সাদরে বরণ করিতেছি। প্রজ্ঞাপারমিতা বৌদ্ধদর্শনে অতি সুপরিচিত বস্তু। নানা গ্রন্থে ইহার সম্বন্ধে অতি বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। শান্তিদেবের গ্রন্থে প্রাথমিক ভাবে অতি সংক্ষিপ্ত আকারে এই বিষয়টি আলোচিত হইলেও পাঠক ইহা পড়িয়া তৃপ্তি লাভ করিবেন। ইহার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধমাত্রাও নাই। স্বতরাং ধর্মতত্ত্বের বৌদ্ধশাস্ত্র সম্বন্ধে কোনও আগ্রহ বা অনুসন্ধিৎসা নাই এমন সাধারণ পাঠকও গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিবেন, সন্দেহ নাই। সম্পাদক-মহাশয় গ্রন্থের প্রান্তে জানাইয়াছেন যে, কতকগুলি পালিগ্রন্থের অনুবাদ তিনি অল্প ভবিষ্যতে প্রচার করিতে সমর্থ হইবেন। আমরা প্রার্থনা করি তাহার এই সাধু আশা সফল হউক এবং চৌধুরী-মহাশয়ের মত সুপ্রসিদ্ধ বদান্ত বক্তার প্রচেষ্টায় বাংলার অনুবাদ-সাহিত্য পুষ্ট হইয়া সাধারণ বাংলার জ্ঞানভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিতে সহায়তা করুক। আমাদের বিশেষ আনন্দ। কথা এই যে, চৌধুরী-মহাশয়ের প্রণবিত অনুবাদ গ্রন্থমালা এক জন প্রাচীন সুপ্রসিদ্ধ বাঙালীর গ্রন্থের অনুবাদের দ্বারা আরম্ভ করা হইল। এহলে ইহা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, মূল গ্রন্থের রচয়িতা শান্তিদেব অনেক পণ্ডিতের মতে বাংলা দেশেরই লোক ছিলেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

হালিদা হানুম — গোলাম মকসুদ হিলালী, এম-এ, বি-এল। এম্পায়ার বুক হাউস, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। আশ্বিন, ১৩৪০। বাংলা আনা।

তুরস্কের নবজাগরণে পুরুষের পাশে দাঁড়াইয়া যে-সকল নারী জাতিকে বলিত ও উন্নত করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে হালিদা হানুমের নাম সর্বপ্রথমে স্মরণীয়। তিনি একাধারে শিক্ষক, নৈনিক, কেরাণী, সাহিত্যিক—একসঙ্গে সবার পক্ষে তুরস্কের স্বাধীনতার জন্ত প্ররোগ করিয়া গিয়াছেন। তাহার চরিত্র হইতে শ্রীপুরুষনির্ভিক্ষেবে আমাদের দেশের

লোকে অনেক কিছু শিখিতে পারিবে। তিনি যে স্বামী বিবেকানন্দ ও করাসী দার্শনিক ওগুস্ত কোং, এই উভয়ের অনুরাগিণী, বৌদ্ধধর্মের রক্ষণা ও মৈত্রীর প্রশংসা করেন, পাশ্চাত্য সাহিত্যে ইস্তাখুল বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, লেখক সে-সকল তথ্য হৃদয় ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। হালিদা হানুম ও রহিমার মত নারী যে-কোনও দেশের, যে-কোনও জাতির গৌরবস্থল। এরূপ পুস্তকের প্রচার বাঞ্ছনীয়। পুস্তকের তথ্যসংগ্রহ ও সন্নিবেশ মন্দ নহে, তবে মুদ্রাকর-প্রমাদ কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে এবং তুরস্কের একটি মানচিত্র দিলে ভূগোল-মনভিষ্ট পাঠকের উপকার হইত। লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

রঙীন স্বপ্ন—মোহাম্মদ আবদুর রশীদ, বি-দি গ্রেট ইন্টার্ন লাইব্রেরী। ১৫ কলেজ স্কোয়ার। দাম বার আনা।

বারোটি ছোট গল্প। একটি তালিকা হইতে বোঝা গেল, প্রায় সবগুলিই মুসলমান-পরিচালিত বড় বড় মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছিল।

গল্পগুলি অধিকাংশই খুব সাধারণগোছের মনে কোন একটা দাগ বসায় না। দু-পাতা পড়িয়াই অনেকগুলি গল্পের পরিণতি সম্পূর্ণ হইয়া ওঠে, তাহাতে আগ্রহ শিথিল হইয়া পড়ে। কোন কোন গল্পের মাঝে, শেষে মর্যাদার অবতারণা করায় সাহিত্যরস আরও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ইহার উপর এক আধ জায়গায় ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতার স্বাক্ষর আছে। লেখক এ সম্বন্ধে উদ্বেজনাস্থি ছাড়ুন—ইহাই অনুরোধ। ইহাতে মুসলমানেরও শক্তিবৃদ্ধি হয় না, হিন্দুরও গায়ে ফোঁসা পড়ে না। মাঝে পড়িয়া বইয়ের সার্বজনীনতাটুকু নষ্ট হয় মাত্র।

শেষের কয়েকটি গল্পে লেখকের হাত সবদিক দিয়াই পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। “অই-যে অই-গাছের তলে” “তুফান”, “খালিকার স্থির বৃদ্ধি” আমাদের ভাল লাগিল।

ছাপা, বাধাই ভাল।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

হিন্দুধর্ম ও স্পৃহা—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সরকার কবিরত্ন প্রণীত। প্রকাশক শ্রীহরেকৃষ্ণ বিশ্বাস, ৮নং কৃপানাথ লেন কলিকাতা। মূল্য ১০ আনা। ৪+১২৭ পৃঃ।

বর্তমান বর্ণ-হিন্দুদের ধর্মের অসারতা দেখাইয়া লেখক বলিয়াছেন যে, একমাত্র প্রেম ও ভগবন্তের বিস্তারের দ্বারাই সর্বজাতির মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হইতে পারে। প্রাচীনপন্থী হইয়াও তিনি যে উদারতা দেখাইয়াছেন তাহা সকলের প্রশংসা আকর্ষণ করিবে।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

খিলে জঙ্গলে শিকার—কুমুদনাথ চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক এম. ব্যানার্জি। মূল্য এক টাকা।

স্বর্গীয় কে. এন. চৌধুরীর পরিচয় মিশ্ররোজন। বর্তমান গ্রন্থখানি তাহার *Sports in Jheels & Jungles* পুস্তকের হৃদয় অনুবাদ।

ইহার ঘটনাবলী যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি শিক্ষাপ্রদ এবং ছবিগুলিও চমৎকার। গৃহকোণবাসী নিরীহ পাঠক বা অরণ্যপর্বতচারী তরুণ শিকারী, উভয়েরই ভাল লাগিবে।

জরীন্ কলম—প্রকাশক, মৌলবী মঈনুদ্দীন হুসাইন, বি-এ, ১২১১, সারেং লেন, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

একখানি সুত্র গার্হস্থ্য উপন্যাস। ইহাতে মুসলমানের পরিচয় না থাকিলেও কয়েক স্থানে সাম্প্রদায়িক রোষ কিঞ্চিৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দু মহাজনের কঠোর নির্ধাতন কেবল “শত শত মুসলমান পরিবারকেই” ভোগ করিতে হয় না, শত শত অভাবগ্রস্ত হিন্দুপরিবারও তাহার কবলে পতিত হইয়া সর্ব্বশাস্ত হইতেছে। “বাংলার মুসলমানকে ধ্বংসের দিকে” লইয়া যাইবার প্রধান ও একমাত্র কারণ তাহার। আর, মহাজন-গণকে সাধারণতঃ নীচতা, ক্রুরতা প্রভৃতি দোষ-দ্রষ্ট দেখা গেলেও তাহাদের প্রতীক গ্রন্থের “রায় মহাশয়ের” অন্তঃপুরের যে চিত্রখানি অঙ্কিত করা হইয়াছে তাহা অতি জঘন্য। ইহাতে কবির “দরদী” অন্তরের পরিচয় পাওয়া গেল না।

লেখকের ভাবার উপর দখল আছে। ছাপা ও কাগজ ভাল।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

বাংলার সজী—শ্রীঅমরনাথ রায় প্রণীত। মূল্য ১১০ টাকা, ৩২০ পৃঃ।

আমরা এই ৩২০ পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তক পাঠ করিয়া অত্যন্ত শ্রীতি ও আনন্দ লাভ করিয়াছি। পুস্তকের ভূমিকায় রায়সাহেব দেবেন্দ্রনাথ মিত্র যাহা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ আমরা সংবরণ করিতে পারিলাম না। এই উদ্ধৃত অংশ হইতেই পুস্তকের উপকারিতা সম্যক পরিষ্কৃত হইবে। দেবেন্দ্র বাবু লিখিতেছেন:—“বর্তমান অর্ধসহস্রাব্দে দিনে প্রত্যেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ যদি নিজ নিজ বাড়িতে নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে তরিতরকারীর চাষ করেন, তাহা হইলে তাহারা যে কেবল ভাইটামিনপূর্ণ টাটকা তরিতরকারী পাইবেন তাহা নহে তাহাদের দৈনিক বাজার খরচেরও অনেকটা হ্রাস হইবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। মনীষী রায়-বাহাদুর গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয় প্রত্যক্ষ ভাবে দেখাইয়াছেন যে গ্রামের সকলে যদি আশপাশের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া এবং ডোবা, খানা প্রভৃতি ভরাট করিয়া তরিতরকারীর আবাদ করেন, তাহা হইলে গ্রাম হইতে ম্যালেরিয়া অদৃশ্য হইয়া যায় এবং গ্রামখানি শ্রী, সম্পদ ও স্বাস্থ্যে পূর্ণ হইয়া উঠে। বিনা অভিজ্ঞতায় কোন কাজই সুসম্পন্ন হয় না। বিশেষতঃ তরিতরকারীর উৎপাদনের জন্ত বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। এই বিষয়ে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাই প্রধান।”

গ্রন্থকার নিজে “প্রত্যেক দিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত...খালি পায়ের খালি গায়ে, হাঁটু পর্যন্ত খন্দর পরিয়া মাটি খোঁড়েন, গাছ লাগান ও বাগানের অস্বাস্থ্য যাবতীয় কাজ করেন।” গ্রন্থে তাহার নিজ অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এ কারণ আশা করা যায় যে, প্রত্যেক গুরুচাষী এই পুস্তকপাঠে উপকৃত হইবেন। এইরূপ পুস্তকের বহুলপ্রচার কামনা করি।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

প্রেমের ফাঁদ—শ্রীপুলনাবহারী দত্ত প্রণীত। “দৈব ও পুরুষকারের খেলা, নাট্যাকারে উপন্যাস।” দাম পাঁচ টাকা।

কুম্মিকা—শ্রীশচীন্দ্রনাথ কুম্মিপাধ্যায় রচিত কবিতার বই। দু-একটি কবিতা মন্দ নয়। দাম দুশ আনা।

বোবার বাঁশী—লেখকের নাম নাই। কবিতার বই। দাম বারো আনা।

অর্পণ—শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় রচিত কবিতা পুস্তক।

স্নেহের দাবী—শ্রীনিধিরাজ হালদার প্রণীত একটি উপন্যাস।

শ্রীহেমসুন্দর চট্টোপাধ্যায়

ব্রাহ্মপথ—স্বাধীনচেতা সাহিত্যিক শ্রীশুভদাস হালদার প্রণীত। স্বাধীন আর্ট বিউরো, কানপুর। পৃ. ২০২। মূল্য দুই টাকা।

আগাগোড়া ভাষা ও বানানের ভুল। কিন্তু তোড়জোড়ের ক্রটি নাই। নীল কাপড়ের বকঝকে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা, লেখকের পূর্ণপৃষ্ঠা ছবি এবং প্রকাশ সমাসবন্ধ বিশেষণ;—আবার প্রকাশক মহাশয় শাসাইয়াছেন “স্বাধীনচেতার সমস্ত গ্রন্থ ছাপিবার জন্ত এই ‘স্বাধীন আর্ট বিউরো’ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।” কিন্তু গ্রন্থের নাম-নির্বাচনে কিঞ্চিৎ ভ্রম হইতেছে—ব্রাহ্মপথ। ‘স্বাধীনচেতা’র এই সত্যভাষণের জন্ত হৃদয় হইলাম। প্রগতিশীল সমাজের যে পরিচয় দিতে লেখক চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার মাথামুণ্ড কিছু নাই এবং এই সম্পর্কে রচিত যে জঘন্যতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে বক্রণা হয়, তাহা আলোচনা করিবার বস্তু নহে। ‘বস্তুবো’র মধ্যে লেখক বাঁজতেছেন, “আমি ভুল করেছি বলে আমার গালে একটা চড় মারলেই বন্ধুর কাজ করা হয় না।” বন্ধুরা হবে কি করিবে?

দক্ষিণ-আফ্রিকা দৌত্য-কাহিনী—শ্রীদেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ২০ হরি লেন, কলিকাতা। পৃ. ১৭৫। দাম বারো আনা।

অনেককাল হইতে ভারতীয়েরা দক্ষিণ-আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আশ্রয় পরিশ্রমের ফলে সে দেশকে বসতিযোগ্য করিয়াছেন। এখন ইহাদের ঝাড়িয়া ফেলিবার দরকার। বোয়ার ও খেতচর্ম্মের কবলে হতভাগ্যেরা যে নিদারুণ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া থাকে, ব্যবস্থা-পরিষদ ও খবরের কাগজের কল্যাণে তাহার কতক কতক আমরা মাঝে মাঝে শুনিতে পাই। কিন্তু অনেক চেষ্টা ও আন্দোলন সত্ত্বেও কল বিশেষ কিছু হইতেছে না, গায়ের রক্ত জল-করা জমা-জমি অন্যের হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিঃসহায় ও নিঃসম্বল অবস্থায় অনেককেই দেশে ফিরিতে হইবে।

এই সম্পর্কের একটা ডেপুটেশনে লেখক এক জন সত্য ছিলেন। সমালোচ্য বইটিতে তিনি তাহার আফ্রিকা-ভ্রমণ ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির অল্পবিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। ঐ নিগূহীত উপনিবেশিকদের সহিত সাধারণের পরিচয় অত্যন্ত ভাষাভাষা রকমের। লেখকের এই সহজবোধ্য বইখানি এই বিষয়ে একটা স্পষ্ট ধারণা আনিয়া দিবে। প্রবর্তমান জাতীয়তার দিনে এই বই অত্যন্ত উপযোগী হইয়াছে: প্রত্যেক দেশবাসীর ইহা পড়িয়া দেখা উচিত। ছবি, ছাপা প্রভৃতির তুলনায় দাম অল্পই হইয়াছে।

ছিন্ন পাঁপড়ী—শ্রীনবগোপাল দাস। শুভদাস চট্টোপাধ্যায় এও সন্স। ২০৩১১১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা। পৃ. ১৩০। দাম দেড় টাকা।

গল্পের বই। মোট পাঁচটির মধ্যে তিনটির বিষয়বস্তু, বাঙালীর ছেলে ইউরোপে পড়িতে গিয়া বিদেশিনীর সঙ্গে রকমারী প্রেম করিতেছে। নূতনত্ব আছে, সন্দেহ নাই এক প্রথম গল্প ‘ব্যথার মালা’র কোন কোন

জারগার লেখক সত্য সত্যই উচ্চ শিল্প প্রতিভার পরিচয় দিরাছেন। তবু সমগ্রভাবে কোন গল্পই রসোত্তীর্ণ হইতে পারি নাই। বইটা পড়িলে এই কথাটাই সকলের আগে মনে আসে, লেখক তাঁহার ইউরোপীয় ঠসক, বুকনী ও বিদ্যার বোঝা লইয়া পঁরতারা কসিয়া বেড়াইতেছেন, রসাবেশে কোথাও এক মুহূর্তের জন্ত এতটুকু আত্মবিস্মৃত হইতে পারেন নাই। ঠিক এই কারণেই পাঠকের মনে একবিন্দু ছাপ পড়ে না। যেখানে-সেখানে অনাবশ্যক ইংরেজী শব্দের ব্যবহারে ভাবার সহজ রূপটি ফুটেতে পারে নাই, যদৃচ্ছা দৃষ্টান্ত দিতেছি—“দু'জনে সীট বদল করলে—কিন্তু সম্মুখে স্পেশ খুবই অল্প, তাই চেঞ্জের সময় দু'জনের গায়ে গায়ে ঠোকাঠুকি হয়ে গেল—” লক্ষ্য করিতে হইবে, একই বাক্যের মধ্যে আগে “বদল” ব্যবহার হইয়াছে,—সম্ভবতঃ তাহাতে জাতিপাত হয় নাই,—তবু পুনশ্চ চেঞ্জ আসিয়াছে। আবার মাঝে মাঝে কথাবার্তার মধ্যে একেবারে ইংরেজী গোটা বাক্যই তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে বিলাতী নায়িকার সঙ্গে কথাবার্তা সমস্তই ইংরেজীতে হইয়াছে নিশ্চয়। অতএব পাত্র-পাত্রীর মুখের কথাগুলো তর্জমা। সেই তর্জমার মধ্যে এক একটা ইংরেজী বাক্য রাখিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্য আর কি থাকিতে পারে, একমাত্র গোবেচারা বাঙালী পাঠকদের চমক লাগাইয়া দেওয়া ছাড়া? উপমাগুলিও কোথাও কোথাও হাস্যকর। যথা—“আমি এখন মাটির চেলা, তুমি কর্ণকার, তুমি আমার যে ভাবে গড়াবে সেইভাবেই গড়ে উঠবে।” কিন্তু বাংলা দেশে কর্ণকারেরা যে লোহা পিটার, এখনও ভাঁড় গড়িতে সক্ষম করে নাই।

কিন্তু এইরূপ অক্ষুরন্ত ক্রটি সত্ত্বেও মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ-চমকের মত লেখকের অসাধারণ ক্ষমতার প্রকাশ পাইয়াছে। সেই জন্তই এত কথা বলিবার আবশ্যিক হইল। আশা করি, পরবর্তী লেখায় পাঠককে তাক লাগাইয়া সস্তার কিস্তিমাৎ করিবার এই লোভ কাটাইয়া লেখক পূর্ণশক্তিতে ফুটিয়া উঠিত পারিবেন।

জাগৃহী—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। প্রবর্তক পারিশিঃ হাউস; ৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দুই টাকা। পৃ. ২৪২।

লেখকের স্নিগ্ধ সুরচিবোধ ও বলিবার একটি মনোরম সঙ্গীর গুণে বইখানি উৎসাহিত গিরাছে, পাড়িয়া তৃপ্তি পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে পাত্র-পাত্রীর মুখের অবস্থা দীর্ঘ বক্তৃতাগুলি ছাঁটিতে পারিলে বইটার আরতন

কমিত এক গরুটি আরও অমিরা উঠিত। আখ্যানভাগের কতকাংশে অক্ষুরূপা দেবীর ‘মন্ত্রশক্তি’ সাদৃশ্য ফুটিয়া উঠায় সেখিক দিয়া উৎকট অশোভনতা প্রকাশ পাইয়াছে। ছাপা বীধাই ভাল।

শনির দশা—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিদ্যাস। প্রকাশক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বিদ্যাস, ৩৬১১ হরি বোব ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নায়ক রাখালের শোচনীয় পরিণাম দেখান হইয়াছে। কিন্তু এই ট্রাজেডি যেন পাঠকদের অশ্রু নিকাশন করিবার উদ্দেশ্যে জোর করিয়া আমদানী ঘটনার অবশ্যস্বাভিতা নাই। কাজেই অশ্রু ত আসেই না, চরিত্রগুলিও কোন নির্দিষ্ট আকারে মনের মধ্যে ফুটিতে পারে না। তবু ইহার মধ্যে আমরা সুরচি নীলিমা, ও নেপাল-চরিত্রের আংশিক সাক্ষ্যের জন্ত লেখককে অভিনন্দন জানাইতেছি। সম্ভবতঃ ইহা তাঁহার প্রথম রচনা; তাহা হইলে ইহার সম্বন্ধে ভবিষ্যতের আশা পোষণ করা যাইতে পারে।

হিন্দুদের পুনরুত্থান—শ্রীমতিলাল রায়। প্রবর্তক পারিশিঃ হাউস, ৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম পাঁচ টাকা। পৃ. ১২২।

হিন্দুজাতি সকল ক্ষেত্রেই দিন দিন পিছু হটিয়া যাইতেছে, শক্তি ও বিশ্বাসের দৈন্য এবং শতাব্ধি অনাচারের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ পঙ্গু হইতেছে, সংহতি-জীবন লাভ করিয়া বাঁচিবার তীব্র প্রচেষ্টা নাই। বস্তুতঃ তলাইয়া দেখিতে গেলে এ জাতির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ভয় হইবার কথা। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় এই বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়াছেন এবং কাব্যরূপে পন্থা নির্দেশ করিবার তিনি যে একজন অধিকারী ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। আলোচ্য বইখানায় তিনি আশার বাণী শোনাইয়াছেন যে, বাঙালীর দ্বারাই হিন্দুদের নবজাগরণ ঘটতেছে। অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া রোগের কারণ নির্ণয় করিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন এবং প্রদীপ্ত ভাবার প্রতিবিধানের পথও অনেকগুলি বলিয়া দিয়াছেন। সকল বিষয়ে মত না মিলিতে পারে, কিন্তু বইখানি এ বিষয়ে চিন্তার খোরাক আনিয়া দিবে এবং আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া দিবে, ইহা নিঃসন্দেহ।

শ্রীমনোজ বসু



দুই বন্ধু

ডক্টর শ্রীকানাইলাল গাঙ্গুলী

১

এক ছিল পরমাসুন্দরী মেয়ে, দেখতে ঠিক লক্ষ্মীর মত।
তেমনি সুরূপা, তেমনি স্থিরযৌবনা, আর তেমনি বিষণ্ণ-
বদনা। এ তারই জীবনের করুণ অথচ স্বাভাবিক কাহিনী।

স্থান হচ্ছে ব্রাইস্ গাও-এর ফ্রাইবুর্গ শহর। সেটা যেন
দক্ষিণ-জার্মানীর “কালো বনের* পরী।” তার একধারে সবুজ
গাছপাতা আর ছবির মত ছোট ছোট বাড়িতে ভরা অশুচ
পাহাড় এবং অগ্ৰধারে এক ছোট্ট নদী সূর্যের আলোয় বিক্-
মিক্ করে। এই মনোহর পাহাড় আর এই ছোট্ট নদীর
মাঝে যে উপত্যকা সেই স্থানে জার্মানীর নিজস্ব স্থপতিকলার
নিরুপম রেখাটানা অনেকগুলি অনতিবৃহৎ বাড়ি, মনোরম
বাগান, পরিষ্কার রুজু রুজু রাস্তা, মেরীর গীর্জা, সুবিখ্যাত
বিশ্ববিদ্যালয়, বাজার, দোকান, হোটেল, নাচঘর, রেস্তোরাঁ, কাকে
ইত্যাদি নিয়ে এই ছোট্ট শহর তৈরি হয়েছে। জার্মান শহরের
বিশেষত্ব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চিমনীওয়াল কাঠখানা বা অতিকায়
অট্টালিকা এর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। পাহাড়ের
ওপরে উঠলে সমস্ত “কালো বনের” নৈসর্গিক দৃশ্যের অতুলনীয়
সৌন্দর্য্য প্রাণ মন ভরে দেয়। মনে হয় প্রকৃতি যেন এক আঁচলা
জামিকে পট ক’রে তার উপরে তুলির ডগা দিয়ে যত রঙের
সমাবেশ, যত শিল্পের নিপুণতা, যত রূপের অমুভূতি সব ব’সে
ব’সে ফুটিয়ে তুলেছে।

এমন কি এই অতুল সৌন্দর্যের ছাপ ঐ শহরের
মেয়েদের ওপরও পড়েছে। মনে হয়, ওর গাছে গাছে যে-
সব পাখী গান করে তার সুরের সঙ্গে এর স্বচ্ছন্দ-বিচরণ-
শীলা তরুণীদের হৃদয়মুখরিত আলাপের সুর একই তানে
বাঁধা, ওর তরু-লতা-ফল-ফুলে যে-সব রঙ ফোটে এর তরুণীদের

পোষাক-পরিচ্ছদ ও চক্ গণ্ডের রঙের সঙ্গে যেন তার
কত মিল! এই সব হৃদয়ময়ী সুন্দরীদের মধ্যে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা
ছিল ঐ সতের-আঠার বছরের লক্ষ্মীর মত দেখতে একটি
মেয়ে—নাম তার লুইসে।

লুইসের মা ছিল ফুলওয়ালী। তিনি বিধবা। লুইসের
বাপ ছিল হ্যান্সবের্গের এক প্রকাণ্ড কারখানার মজুর।
লুইসে জন্মাবার অল্প কাল পরেই তার হয়েছিল মৃত্যু।
শহর থেকে পাহাড়ে ঠাঠা যে রাস্তা, তারই গোড়ায় ছিল
তার মার ফুলের দোকান। দোকানের সামনেটায় আগা-
গোড়া কাঁচের দেওয়াল। এর এক অংশে ফুলের প্রদর্শনী।
সেখানে সকল সময়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ক্রিসান্থেমাম্, কার্ণেশন্,
মেরিগোল্ড, ভায়লেট ইত্যাদি বিবিধ ফুলের তোড়া বা
বাসকেট মূল্যবান আধারে সাজানো থাকে। দেওয়ালের
মধ্যখানে দোকানে ঢোকান দরজা, তারও সমস্ত পাল্লা
কাঁচের। তার ভেতর দিয়ে এবং দরজার অপর পার্শ্বের
দেওয়ালের ভেতর দিয়ে দোকানের সব-কিছু দেখা যায়।
দোকানের ভেতরেও বড় বড় ফুলদানী বা চুবাড়িতে ভরা
চারিদিকে নানা বর্ণের, নানা গন্ধের, নানা সজ্জার
ফুল আর পাতা। এরই মাঝে ফুলরাণী হয়ে প্রায়ই
দাঁড়িয়ে থাকত ও ফুল বেচত ঐ সৌন্দর্যের রাণী লুইসে।

এ শহরে ফুলের আদর বড় বেশী, কারণ এখানে বাইরের
লোক যে আসে তারই প্রাণে জাগে বসন্ত। আর এই ছোট্ট
শহরে সবচেয়ে প্রিয় ফুলের দোকান ছিল ঐটি। বহু ব্যক্তি
ওখানে ফুল কিনতে আসত—তার মধ্যে নিত্য বৈকালে
আসত দুটি তরুণ, তারা ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।
একটির নাম কাল, অপরটির নাম হান্স। দু-জনে পরম
বন্ধু এবং একই “বুর্শেন্ কোরের” * সভ্য। তারা তার

কালো বন :—দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানীর সুবিখ্যাত অরণ্য, নাম
Schwarzwald বা Black-forest। ইহা Badenএর অন্তর্গত। এর
সৌন্দর্য্য ও এর জলহাওয়ার খ্যাতির জন্যে পৃথিবীর সকল স্থানের ধনীরা
এখানে বায়ুপরিবর্তনের উদ্দেশ্যে আসেন।

* বুর্শেন্ কোর জার্মান-ছাত্র-সভ্য বিশেষ। এগুলি নেপোলিয়নের
সময়ে বা তার অব্যবহিত পরে গঠিত। জার্মান জাতীয় জীবনে ইহাদের
দান অতি মূল্যবান।

এতই গোঁড়া সভ্য যে কোর্সের সনাতন নিয়ম অমুসারে নানা রঙের ট্রাইপওয়াল টুপি আর ব্যাজ না পরে কখনও রাস্তায় বার হ'ত না। দু-জনেই জার্মান ছাত্রের নিয়ম ধর্থাবিহিত পালন করেছে অর্থাৎ ডুএল লড়ে কয়েকটি তুরোয়ালের খোঁচার দাগ গালে চিরস্থায়ী ক'রে নিয়েছে। দু-জনে একই অধ্যাপকের সেমিনারে 'নাতসনাল্' ওয়াকোনোমি অর্থাৎ সমাজতত্ত্ব অধ্যয়ন করে। দু-জনেই গোঁড়া হিটলার-ভক্ত। দু-জনেই কাল'মার্কস্ ও লাসালের নিছক নিন্দক। দু-জনেই রডবেতু'সের স্তাবক—আর দু-জনেই ছিল একান্তরূপ মুগ্ধ ঐ রূপসী লুইসের।

এ ছাড়া আর সব ব্যাপারেই ছিল তাদের চরম বৈষম্য। কাল' ছিল প্রাচীন সম্রাজ্ঞ বংশীয়। তার পিতার ব্যারণ পদবী গণ-তন্ত্রের যুগে অর্থহীন হ'লেও তাঁর জমিদারীর ক্ষীণ আয়টুকু এখনও তাঁকে আভিজাত্যের গৌরবে মগ্নিত ক'রে রেখেছে অর্থাৎ তাঁকে খেটে খেতে হয় না। আর হান্সের পিতা হঠাৎ-ধনী—প্রকাণ্ড কারখানাওয়াল। হ্যার্নবের্গ ক্রাফুট ইত্যাদি বহু শহরে তাঁর সসৈন্যের কারখানা আছে—এ ছাড়া পেন্সিল, খেলনা, নকল রেশম ইত্যাদি বহু দ্রব্যের কারখানার তিনি মালিক। হ্যার্নবের্গের এক গলিতে তিনি বালাকালে সসৈন্য বিক্রী করতেন এবং সেই অবস্থা থেকে নিজ বুদ্ধি, পরিশ্রম ও ভাগ্যাগুণে এখন কোটিপতি হয়েছেন।

কাল'ের দেহ ছিপছিপে পাতলা; দৈর্ঘ্যে ছয় ফুট আড়াই ইঞ্চি! প্রকাণ্ড লম্বা মুখ, প্রকাণ্ড উঁচু নাক, কেউ তাকে সুপুরুষ বলবে না। কিন্তু তার শাস্ত চক্ষুর নিক্ত দৃষ্টি পরম তৃপ্তিদায়ক, দেখলেই মনে হবে এ সেই ধীর, সমাহিত-চিত্ত ব্যক্তি যে মনে করে “মনেনে সহ যঃ জীবতি সঃ এব জীবতি।” আর হান্স-কে প্রাচীন গ্রীসের নিখুঁত প্রস্তরমূর্ত্তি বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। জার্মানীর মতন দেশেও তার মত অত বলিষ্ঠ যুবক আর অত নিখুঁত পুরুষের রূপ অল্পই দেখা যায়। তার মুখের দীপ্ত আভা দেখলেই মনে হয় ওর মধ্যে কি প্রচণ্ড প্রাণশক্তি!

সামাজিক ব্যাপারে কাল' মনে করে শ্রমজীবী আর আভিজাত্যের মধ্যে একটা সত্যিকারের মিলন আনা প্রয়োজন। কাল'ের মুখে এই রকম মস্তব্য শুনে হান্স ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর করে, “রেখে দাও তোমার প্যানপেনানি!

ঐ কুস্তাগুলোকে নাই দিলেই ওরা চড়ে মাথায়—ওদের সব সময়ে শাসনে না রাখলে রক্ষা আছে।” কাল' বলে, “তার পরিণামে যে জাতীয় সঙ্কট উপস্থিত হবে।” হান্স বলে “হ্যাঁ; জাতীয় সঙ্কট আনবে ঐ কুস্তার দল! কি করবে ওরা? ধর্মঘট? কাজ বন্ধ করলেই শূন্যরঙলোকে সঙ্গীনের খোঁচা মেরে কাজ আদায় করবো না!”

প্রবৃত্তির ব্যাপারে হান্স ভালবাসে তীব্রতা ও উজ্জলতা, আর কাল' ভালবাসে ন্মিত্ততা ও গভীরতা। নাচের আসরে গিয়ে হান্স খোঁজে যত চটকদার সুন্দরী আর অ্যামেরিক জ্যাজ ব্যাণ্ডের উন্নত সুর। তার সঙ্গে সে মত্ত হয়ে নাচতে ভালবাসে চাল'স্টন, ব্র্যাক্‌বটম্ আর রাধা। কাল' ভালবাসে ইউরোপের নিজস্ব নাচ—‘ভাল্‌তস্’ আর তার সঙ্গে ‘ট্রাউসে’র সুর! যদি ‘মোজার্ট’ বাজলো বা তার সঙ্গে ‘মিছুয়েত’ বা ‘পোলকা’ নাচ হ'ল তাহলে তো সে মুগ্ধ! তার মুচ্ছনার আনন্দে সে বিভোর হয়ে যায়। হান্স ভালবাসে ‘স্লাম্পন’ বা কড়া ‘লিকার’! কাল' ভালবাসে বহু পুরাতন ‘রাইন ওয়াইন’। কিন্তু তাদের আকৃতি ও প্রকৃতি এত বিপরীত হলেও তাদের কোথায় কোন্ মিলনস্থত্র ছিল কে জানে, তারা ছিল পরম বন্ধু, আর তারা ছিল এক বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে ঐ শহরের অধিষ্ঠিতা সুন্দরী আর কেউ নয়, শুধু ঐ লুইসে!

প্রতি অপকাঙ্ক্ষের নির্দিষ্ট সময়ে দুই বন্ধুতে ঐ ফুলের দোকানের দোরগোড়ায় আসত—আর হান্স খুলত দরজা- শব্দ হ'ত টুং-ং-ং! লুইসেও ঠিক সেই সময়ে অল্প সব কাজ ফেলে দোকানে থাকত—কোন দিন তার ভুল হ'ত না। শত শত ক্রেতার দরজা খোলার ‘টুং’ শব্দ থেকে ঐ শব্দটির পার্থক্য সে অনুভব করত, তাই ঐ টুং-ং-ং কানে বাজলেই তার অত লালিত্যের উপরেও দুই গণ্ডে নতুন নতুন রঙের চেউ খেলে তাকে আরও সুন্দর ক'রে তুলত। ওরা প্রায়ই কিছু কিনত না, শুধু লুইসের সঙ্গে আলাপ করতেই আসত। লুইসেও তা ভাল রকম বুঝত, কিন্তু তবু প্রতিদিন তাদের কাছে দোকানের প্রতি ফুলটি, প্রতি পাতাটির পরিচয় দিত। যতক্ষণ তারা সেখানে থাকত হান্সই লুইসের সঙ্গে কথা বলত। আর কাল' থাকতো চুপ করে, শুধু লুইসে যখন তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করত তখন তার মুখ ফুটত। না হ'লে সে শুধু দেখত ঐ অনিন্দ্যসুন্দরী লুইসে।

২

সেদিন ছিল রবিবার, মে মাসের প্রারম্ভ। বর্শেন কোরের বসন্তোৎসব অর্থাৎ নাচের দিন। শহরের উপকণ্ঠে “গ্র্যান থাল” গ্রামের সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে সৌখীন রেস্তোরাঁর বৃহত্তম হলের সাজিয়ে-গুছিয়ে নাচের আসর করা হয়েছে। বর্শেন কোরের তরুণ সভারা সকলে তো এসেছেই, ঐ শহরের প্রবীণ নিবাসী, কোরের পুরাতন সভারাও এসেছেন, আর এসেছে ঐ শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তরুণী কন্যারা— ঐ উৎসবের উপযুক্ত সাজে সজ্জিত হয়ে। এ ছাড়া যে-সব সভ্যের ভদ্রবংশীয়া বান্ধবী আছে তাদের নিয়ে তো তারা এসেছেই।

হান্স সেদিন লুইসেকে নিমন্ত্রণ করে সেখানে নিয়ে গেল। কাল অবশ্য সন্ধ্যা গেল। লুইসের আবির্ভাব সেখানে দস্তবন্দিত চাকল্য সৃষ্টি করলে। প্রথমতঃ সে অত রূপসী বলে, দ্বিতীয়তঃ সে ভদ্রঘরের মেয়ে নয় বলে। তৃতীয়তঃ সে হান্সের সঙ্গে এসেছে বলে। হান্সের প্রচণ্ড খ্যাতি, সে নাকি নারী-হৃদয় জয় করতে অদ্বিতীয় এবং তার জন্তে বহু তরুণীর হৃদয় ভেঙেছে। কোরের নিয়ম, তরুণ-তরুণীরা পরস্পরের সঙ্গে অবাধে নাচে। কোন তরুণ কোন তরুণীকে নাচতে অনুরোধ করলে সে যদি অন্তের কাছে প্রতিশ্রুত না থাকে তো সে-নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে সে বাধ্য। কিন্তু পূর্বে দু-একবার হান্সের বান্ধবীকে নাচে আহ্বান করে বিষম বিপত্তি ঘটেছিল, এমন কি সে ব্যাপার ডুএলে পর্যন্ত গড়িয়েছিল। হান্সের সঙ্গে ডুএল লড়ার অর্থ অবধারিত পরাজয় নিমন্ত্রণ করা। সুতরাং লুইসের মত সুন্দরীর সঙ্গে একবার নাচা পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করলেও বহু তরুণ সে ইচ্ছা দমন করাই শ্রেয়ঃ মনে করলে।

নাচ শুরু হ'ল। প্রথমেই বাজল উদ্দাম ‘জ্যাঙ্ক’। বহু যুগলমুষ্টি তার তালে তালে নাচছে। কিন্তু পদবিক্ষেপে তারা নাচছে ‘চালস্টন’। হান্স ও লুইসেও নাচছে। সুর ও নাচের উদ্দাদনায় তারা উৎফুল্ল! তাদের চোখে মুখে হয়েছে কি আনন্দের উজ্জ্বল! তাদের সৌন্দর্যের হয়েছে কি অপূর্ণ বিকাশ। এই যুগল-সুন্দরের আত্মহারা নাচ সকলের নজরে পড়ল। অনেকে নাচ খামিয়ে তাদের দেখলে, অনেকে তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নাচলে। শেষে সকলেই গেল খেমে।

বাজনা আরও উদ্দাম সুরে চলল। তারা আরও উৎফুল্ল হয়ে নাচল। অনেকে বিমুগ্ধ হয়ে তাদের ‘সোলো’ নাচ দেখলে। বাজনা যখন থেমে গেল, সকলের প্রচণ্ড করতালি-ধ্বনি সেই বৃহৎ নাচ-ঘর প্রতিধ্বনিত করলে। পুলকিত চিত্তে তারা এসে কালের পাশে বসল। স্নূত্যের মিষ্ট-শ্রম-জাত মধুর ক্রান্তি লুইসের সুন্দর মুখকে সুন্দরতর করে দিল।

কয়েকটা নাচের পর একটা নাচের মধ্যে হান্স জিজ্ঞাসা করলে, “কেমন লাগছে?” লুইসে প্রফুল্ল মনে বললে, “চমৎকার।”

হান্স—ভারি খুশী হ'লুম।

লুইসে—সত্যি আপনি বড় ভাল নাচেন।

হান্স—ভাল নাচি বলে আমার খ্যাতি আছে বটে।

লুইসে—আগে বুঝি খুবই নাচতেন?

হান্স—নিশ্চয়! বার্লিন, ম্যানশেন, লাইপ্‌সিগ্‌ ইত্যাদি শহরের শ্রেষ্ঠতম সুন্দরীদের সঙ্গে বহু নেচেছি।

লুইসে—বটে!

হান্স—নিশ্চয়! সে সুযোগও আমার অনায়াসে জোটে। জানেনই তো আমার পিতা হচ্ছেন বিখ্যাত ধনী, তাঁর অনুগ্রহের জন্ত বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি লালায়িত।

লুইসে—ও!

হান্স—কিন্তু জানেন আপনার মত সুন্দরী কোথাও দেখিনি! আপনার সৌন্দর্যের খ্যাতি শুনেই তো এই গের্টে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছি।

লুইসে—এ সব বাজে কথা। বড় বড় শহরের সোসাইটি-মহিলাদের সঙ্গে কি আর আমার তুলনা হয়?

হান্স—সত্যি আপনার মত এত সুন্দর শরীরের গঠন, এত সুন্দর চোখ, মুখ, নাক—এত সুন্দর রঙ—এত সুন্দর হাত-পায়ের গড়ন—আর এত সুন্দর চুলের বাহার কোথাও দেখিনি।

লুইসে—ইস! মিথ্যা চাটুবাদ করবেন না।

হান্স—সত্যি বলছি! আপনার প্রয়োজন শুধু একটু আভিজাত্যের কুলটুয়ের স্পর্শ, তাহলেই আপনি আশ্বানীর শ্রেষ্ঠা সুন্দরী হবেন।

লুইসে—খামুন, খামুন।

বাজনা গেল খেমে। কিছুক্ষণ পরে আবার নাচ আরম্ভ

হ'ল—এবার হ'ল আধুনিক 'রার্গকবটম্'। এবারও নাচের মধ্যে হান্স কথা আরম্ভ করলে, বললে, “এ নাচটা খুবই নতুন, অনেকে জানে না। দেখুন না সকলে কি বিস্মী নাচছে!”

লুইসে—কিন্তু আপনি তো এও বেশ নাচেন দেখছি।

হান্স—তা আর হবে না? এর পেছনে কত অর্থব্যয়, কত পরিশ্রম করেছি।

লুইসে—এটাও বুঝি বালিনে শিখেছেন?

হান্স—নিশ্চয়, বালিন থেকে মাত্র গত মাসে শিখে এসেছি।

লুইসে—ও!

হান্স—জানেন, এখানেও অনেক মহিলা এই নাচটি আমার সঙ্গে নাচবার জন্তে লালসিত?—সকলেই তো জানে—এ শহরে এ নাচের ওস্তাদ একমাত্র আমি।

লুইসে—সত্যি? তা'হলে তো ঐ সব মহিলাদের ইচ্ছা অপূর্ণ রাখা ঠিক হচ্ছে না।

হান্স—আমি ঠিক করেছি আজ শুধু আপনার সঙ্গেই নাচব।

লুইসে—বহু ধন্যবাদ! কিন্তু আমি এমন স্বার্থপর নই এবং এত লোকের অভিশাপ কুড়োতেও চাই না।

হান্স—ওরা আমার পেছনে ছোট্টে ব'লে ওদের সঙ্গে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও নাচতে হবে এমন কিছু ধতেপত্রে লেখা আছে?

হঠাৎ তাদের নাচ কেমন বেখাপ্লা হয়ে গেল—লুইসের পায়ের ওপর হান্স দিল পা মাড়িয়ে, লুইসে ‘উঃ’ ব'লে চীৎকার করে উঠলো—তাদের নাচ গেল থেমে। দু-জনে গিয়ে বসলে।

পরের নাচে হান্স জিজ্ঞাসা করলে, “পূর্বে কখনও সুপুরুষের সঙ্গে নেচেছেন?” লুইসে বললে, “না, এই প্রথম!” হান্স পরম আশ্চর্যসাদ লাভ করলে। অস্তরে অস্তরে অতি সন্তুষ্ট হ'ল। লুইসের মুখভঙ্গী ও কণ্ঠস্বরে শ্লেষের ক্ষীণ আভাসটুকু তার বোধগম্য হ'ল না। সে মুখে বললে, “তা কি হয়? আচ্ছা, আমার বন্ধুটিকে কি মনে করেন—সুপুরুষ?”

লুইসে—মন্দ কি?

হান্স—হাঃ, হাঃ, আপনার শ্লেষটুকু আমি বুঝেছি। কিন্তু ভেবে দেখুন ওর বতাবটি কেমন?

লুইসে—ভাল।

হান্স—বেচারি! অতি ভাল, অতি ভাল! অনেক সময়ে ভাবি, ভগবান ওকে মেয়ে করবেনই ঠিক করেছিলেন, কিন্তু হাত পা মুখ অত লম্বা হয়ে গেল দেখে পুরুষ ক'রে দিলেন! হাঃ, হাঃ, হাঃ!

আবার নাচ বেখাপ্লা হয়ে গেল। লুইসে অকস্মাৎ নাচ থামিয়ে আপন আসনে গিয়ে বসলে। হান্স হ'ল বিস্মিত—এরকম তো কখনও হয় না!

পরের নাচ হ'ল ‘ভালতস্’, বেজে উঠল, “রোস অফ ইস্তাম্বুলের” সেই সুমধুর সুর। এবার লুইসেকে নিয়ে কার্গেল আসরে নাচতে। যেতে যেতে লুইসে জিজ্ঞাসা করলে, “আপনি তো আধুনিক নাচ একটাও নাচলেন না?” কার্গেল বললে, “আমি ও-সব জানি না।”

লুইসে, “ও! আপনি বুঝি ও-সব ভালবাসেন না?”

কার্গেল—“ঠিক কথা! আমেরিকা হ'তে আমদানী ঐ আফ্রিকানদের নকল নাচে আমি কোন রস পাই না। [তাদের নাচ আরম্ভ হ'ল] কিন্তু এ নাচ কি মনোহর! [দুই তিন পাক ঘোরার পর] এ যে ইউরোপের আপন জিনিষ! [আরও দু-তিন পাক ঘুরে] কি মধুর!!

কার্গেল নাচতে নাচতে ভাবে বিভোর হ'ল—তার চোখ দুটি জড়িয়ে এল! লুইসে হ'ল বিমোহিতা—আবেগভরে বললে, “সত্যিকারের নৃত্যরসিক আপনিই!”

কার্গেল বলে—“আপনার সঙ্গে নেচে তা না-হয়ে উপায় আছে?” লুইসে তার উত্তর না দিয়ে বাজনার সঙ্গে সুর মিলিয়ে কিম্বর-কণ্ঠে গেয়ে উঠল—

বিস্তৃত দু আইনে ফাল্শে সোয়াল্বে

সোয়াল্ভিন্ গেএত দান্ ফোত'।*

কার্গেল বিমুগ্ধ হয়ে বলে, “কি সুন্দর! জার্মানীর সব সৌন্দর্য আপনাদের মধ্যে রূপ নিয়েছে!” লুইসে চূপ! সুরের কেমন একটা আমেজ, ছন্দের কেমন একটা দোলা, নাচের কেমন একটা হিল্লোল তাকেও বিভোর ক'রে দিয়েছে। আর দুই গাজেল-আঁধি বুজে এসেছে। কার্গেল ভাববিজড়িত কণ্ঠে

* “Bist Du eine Falsche Schwalbe Schwalbin geht dann fort!”

তুমি যদি অবিধায়ী পাখী হও, পক্ষীগণী যাবে উড়ে!

আবার বলে, “আমার জীবন ধন, যে ভেতরে বাইরে এত সুন্দর তাকে নিয়ে এই স্বর আর এই নাচের মধুরতা উপভোগ করতে পেলুম।” ঐ স্বর, অত জাবভরে নাচ, আর অত কোমল প্রাণের অত মোলায়েম স্ততি! লুইসের অন্তরের গভীরতম প্রদেশের কোন্ তন্ত্রীতে এক অভূতপূর্ব স্বাক্ষর হ’ল—লুইসের সারা অঙ্গে এল শিহরণ। তার কোকিল কণ্ঠে আবার বেজে উঠল গান—

“দু বিস্তু মাইন, উন্ত ইশ্ বিন্ দাইন

উন্ত ভির সিন্ত সোয়াই গেসেলেন্।”*

কাল হ’ল আরও মুগ্ধ! তার মনে হ’ল এ তো শুধু আসরের গান নয়—এ যেন লুইসের জীবনসঙ্গীত! তারও এল সারা অঙ্গে শিহরণ!! উভয়ের চোখ উভয়েতে নিবদ্ধ হ’ল—উভয়ে উভয়ের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখলে,—উভয়ে উভয়কে চিনলে!

এ ব্যাপারটা হান্সের নজর একেবারে এড়ায় নি। সে মনে মনে অধীর হয়ে প্রতিজ্ঞা করলে, অবিলম্বে লুইসের সঙ্গে কায়মী ব্যবস্থা ক’রে ফেলতে হবে। বাজনা শেষ হ’লে কাল ও লুইসে আচ্ছন্ন মত এসে বসলে। উভয়ের চক্ষু যেন কোন্ রঙীন স্বপ্নের আবেশে অর্ধনিমীলিত! সে স্বপ্নের জাল বিচ্ছিন্ন ক’রে হান্সের কর্কশ কণ্ঠ তাদের কর্ণপটে আঘাত করল, “আশ্চর্য! বিংশ শতাব্দীতেও লোকে এই সব নাচে!” দু-জনের কেউ কোন উত্তর দিলে না। এমন কি কাল ও এর প্রতিবাদ করলে না! হান্স আরও চঞ্চল হয়ে বললে, “কাল! তোমাকে নিয়ে বাপু কোন ভঙ্গসমাজে যাওয়া চলে না”—সেই মুহূর্তে আবার সেই ‘জ্যাজের’ উন্নত স্বর সকলকে বিচলিত ক’রে তুললে, হান্স লাফিয়ে উঠল। আশা করলে প্রতিবারের মত লুইসে আনন্দে উত্তলা হয়ে নাচতে উঠবে। কিন্তু লুইসে চূপ ক’রে রইল—যেন এ উদ্যম স্বর তার কানেই ঢোকে নি, যেন হান্সের লাফিয়ে ওঠা তার নজরেই পড়ে নি। অগত্যা হান্স বসল, কিন্তু তার চিত্ত আরও অস্থির হয়ে উঠল। লুইসেকে সে বললে, “আপনার কি হয়েছে?” লুইসে তবু নিরুত্তর! হান্স আরও অধীর হয়ে ওয়েটারকে ডেকে এক তীব্র পানীয়ের হুকুম দিল—দু-গ্রাস!

* “Du bist mein und ich bin Dein
Und wir sind zwei Gesellen !”

“তুমি আমার এবং আমি তোমার—আর আমরা দু-জনে দু-জন যুগল বঁধু!”

দু-গ্রাস কড়া লিকার এল হান্স তার একটা লুইসেকে দিলে। লুইসে অস্বীকৃত হ’ল তা পানী করতে। হান্স সম্পূর্ণ ধৈর্য হারিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে, আপন প্রচণ্ড অহঙ্কার চূর্ণ ক’রে এই প্রথম নিজে লুইসেকে অনুরোধ করলে তার সঙ্গে নাচতে।

স্বতরাং লুইসেকে যেতে হ’ল নাচের আসরে। নাচ আরম্ভ ক’রে হান্স জিজ্ঞাসা করলে, “আপনারও ঐ সেকেন্দ্রে নাচ ভাল লাগে?”

লুইসে—খুব ভাল লাগে!

হান্স—আশ্চর্য, আমি এতো সুন্দরীর সঙ্গে মিশেছি—কত জোরপতি, জেনারেল, মন্ত্রী প্রভৃতির মেয়ে আমার বাছবী—কিন্তু কাউকে বলতে শুনি নি ভালতস্ ভাল লাগে।

লুইসে কোন উত্তর দিলে না! তাদের নাচ আবার বেখাপ্পা হ’তে আরম্ভ করেছে। হঠাৎ হান্স কেমন অদ্ভুত স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, “তিতির সেতে কখনও গেছেন?—সেখানে গিয়ে কখনও হোটেলে থেকেছেন? জানেন, সেখানকার হোটেলে ইউরোপের শুধু কোটিপতি এবং রাজরাজড়াদের থাকবার ক্ষমতা হয়—”

লুইসে শুধু বললে, “না!”

হান্স—তা জানি! সেখানে থাকতে গেলে দৈনিক অন্ততঃ দুশো মার্ক হোটেল খরচই লাগে!

লুইসে—তাতে আমার কি?

হান্স—তোমার কি?—আমি তোমাকে কালই সেখানে নিয়ে গিয়ে একমাস থাকব—” লুইসে তৎক্ষণাৎ নাচ থামিয়ে নিমেষে হান্সের বাছবেটনী হ’তে নিজেকে মুক্ত ক’রে বললে, “আপনি অতি বর্বর!” তারপরই দ্রুতপদে আপন আসনে গিয়ে বসলে। হান্স প্রথমে একটু বিস্মিত হ’ল। এও সম্ভব? সামান্য মজুরের মেয়ে তার মত ধনবান রূপবান যুবকের ঐ রকম স্পষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে? কিন্তু পর মুহূর্তেই মনে মনে বললে, “গ্ৰাকামি!” অবজ্ঞার সহিত একটু মুচকে হেসে আপন আসনে গিয়ে বসলে। সে রাতে আর তাদের নাচ হ’ল না।

লুইসে বললে, “আমার বড় মাথা ধরেছে! এখনি বাড়ি যাব।” অগত্যা তাদের নাচের আসর থেকে বিদায় নিতে হ’ল।

৩ ৫

নাচের আসর থেকে বার হ'য়ে রাত্তর এসে কিছুক্ষণ হাঁটার পরই তারা ট্রামে উঠল। ট্রাম প্রায় এক মাইল গিয়ে শহরে প্রবেশ করে। ট্রাম তখন একেবারে খালি, কারণ তখনও নাচ ভাঙেনি, ট্রামে আসা পর্যন্ত তাদের মধ্যে একটা কথাও হ'ল না। ট্রামে উঠে লুইসে জানালার ধারে এক আসনে বসলে, হান্স তার পাশে বসলে। লুইসে উৎসাহে সেখান থেকে উঠে সামনের বেঞ্চে বসলে। হান্স একটু মুচকে হাসলে, ভাবলে, “ইস্! এ চণ্ডের অর্থ যেন বুঝি না!” কার্ল হ'ল পরম বিস্মিত—এ আবার কি? বাই হোক সে হান্সের পাশে বসলে। ট্রাম দিল ছেড়ে। ট্রাম চলতে লাগলো। অনেকক্ষণ সকলে চুপ ক'রে রইল। অকস্মাৎ হান্স জিজ্ঞাসা করলে, “এতক্ষণ ঐ বাজনার পর, ট্রামের কন্সার্টটা কেমন লাগছে মিস লুইসের?” লুইসে কোন উত্তর দিলে না—বাইরের দিকে মুখ ফেরালে। কার্ল বললে, “তোমাদের জ্যাজের হট্টগোল আর এই ট্রামের ষড়ঘড়ানিতে পার্থক্যটা কোথায়?” হান্স হেসে উঠল।

কার্ল—যতই হাস, আমেরিকা থেকে আমদানী এই অসভ্য নাচ ইউরোপের যত ক্ষতি করেছে এমন আর কিছু করে নি।

হান্স—হাঃ, হাঃ, হাঃ—সত্যি নাকি?

লুইসেরও প্রথমটা মনে হয়েছিল, কার্ল হয়ত একটু বাড়িয়ে বলছে, কিন্তু হান্সের এই বিকট হাঃ, হাঃ, হাঃ তাকে এত বিরক্ত করলে যে মুহূর্তে তার কাছে যেন একটা সত্য প্রকাশিত হ'ল, সত্যিই ত এই-সব অ্যামেরিক নাচ কি বিলী!

কার্ল—হেসে উড়াবার চেষ্টা করলে আর কি হবে? আমার কথা সত্যি!

হান্স—যেহেতু তুমি এ-সব নাচ জান না—এর মর্ম বোঝ না—এর রস গ্রহণ করতে পারো না! কিন্তু লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, এমন কি তোমার মোজার্ট ট্রাউসের দেশ ভিয়েনাও যে এর স্রোতে ভেসে গেল! আসল কথা আর কিছুই নয়—আধুনিকতার সব-কিছু তোমার খারাপ লাগে, কারণ তোমার মন হয়েছে অতি বৃদ্ধ—তুমি থাক মধ্য-যুগে!

কার্ল—আমি ইউরোপের বৈশিষ্ট্য ভালবাসি—

হান্স—তা জানি এ ব্যাপারে তুমি রক্ষণশীল, কিন্তু আসল ব্যাপারেই তুমি উদার—অর্থাৎ অকেজো।

লুইসে—তার মানে?

কার্ল—থাক—থাক!

হান্স—তার মানে উনি মজুর বেটাদের মাথায় তুলে জাখানীর এত শিল্পের উন্নতি সমস্ত নষ্ট করতে—

কার্ল—কিন্তু হান্স—

হান্স—ইস্—অমনি রাগ! কোদালকে কোদাল বললেই যে রাগে সে অকেজো নয় তো—

কার্ল—কিন্তু হান্স—মানুষকে অত ঘৃণা করা, বিশেষতঃ যে-সব মানুষের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ—

হান্স—কৃতজ্ঞ! কিসের জন্তে কৃতজ্ঞ? ঐ কৃত্তাদের আমরা খেতে দিই ব'লে আমাদেরই ওদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে হবে?—না—

কার্ল—কিন্তু হান্স—

হান্স—ওদের আমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত—কিন্তু ওদের কৃতজ্ঞতা ব'লে কোন জিনিষ আছে? ওদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর—দেখবে তোমার ভাল-মানুষির সুবিধা নিয়ে তোমারই সর্কনাশ করবে। চাবুক লাগাও দেখবে ফুকুরটির মত তোমার সব কাজ করছে! কি বলেন মিস লুইসে? [লুইসের মুখ বিবর্ণ, কার্লের মুখ লাল হয়ে উঠেছে] হাঃ, হাঃ, হাঃ—সতীত্ব, সাধুত্ব, কৃতজ্ঞতা—ওদের মধ্যে যেন এসবের অস্থি আছে! ওদের কোন মেয়ে যদি সতীগিরি ফলায় তো জানবে, সে শুধু দর বাড়াবার ফন্দি—

কার্ল [চীৎকার ক'রে উঠলো]—হান্স থাম!

হান্স—হাঃ, হাঃ, হাঃ! তোমার নারীমূলভ নরম মনে এই সত্যি কথার খোঁচা বুঝি বেজায় আঘাত দিল? কিন্তু আমি তোমাকে এখুনি প্রমাণ ক'রে দেব—চাক্ষুস প্রমাণ ক'রে দেব এ কথা কত সত্যি! [লুইসের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত ক'রে] কি মিস লুইসে আপনারও এ-কথায় সন্দেহ হয়?

এমন সময়ে ট্রাম কণ্ডাক্টর গম্ভীর কণ্ঠে বললে, “আবটাইগেন” [নেমে যাও]! ট্রাম তাদের গম্ভব্য স্থানে পৌঁছেছে। ট্রাম থেকে নামতে নামতে কার্লের মনে হ'ল—আজ ঐ কন্ডাক্টরের গুরুগম্ভীর নাদ “আবটাইগেন” তাদের যেন একটা আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার করলে।

তিন জন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে চূপ ক'রে হাঁটতে লাগল। তিন জনের প্রাণেই আলোড়ন—কি প্রবল আলোড়ন! অল্প দূরেই লুইসের বাসা। তার বাসার দোর-গোড়ায় এসে লুইসে চাবি বার ক'রে দরজায় লাগিয়েছে—এমন সময়ে হান্স তার অতি নিকটে এসে ছকুম দিলে, “লুইসে, দাঁড়াও! তোমাকে একটা কথা শুনতে হবে!” লুইসের প্রাণে কেমন একটা প্রচ্ছন্ন আতঙ্ক জাগল! দরজা খুলতে গিয়ে তার হাত কেঁপে উঠল—তার সমস্ত শরীরে একটা কণ কম্পন এল—শুককণ্ঠে সে না ব'লে থাকতে পারলে না, “কি কথা?” হান্স তার মুখের কাছে মুখ এনে বললে, “দেখ, তোমার এ গ্রাকামির অর্থ আমি বুঝি—”

যেন এক বিদ্যৎ-ফুলিঙ্গের আঘাত লুইসেকে নিমেষে সচেতন ক'রে দিলে—তৎক্ষণাৎ তার কণিকের ভীতি দূর হ'ল—সে দীপ্ত হ'য়ে বললে, “আমাকে বুঝি অপমান করতে চান?” পর মুহূর্তেই চাবিতে এক মোচড় দিয়ে দরজা খুললে এবং দরজাকে মাত্র একটু ফাঁক করেছে, হান্স তার হাত চেপে ধ'রে বললে, “খামো! স্পষ্ট বল কি চাও?” লুইসে বললে, “হাত ছেড়ে দিন!” হান্স বললে, “সোজা বল, কি চাও? ভাল বাড়ি? মোটর গাড়ী? মাসহারা? কত মাসহারা—কত?—এক হাজার?—পাঁচ হাজার? দশ হাজার?—কত? কত?”—বলতে বলতে লুইসের কুন্মকোমল বাহুগল দুই হাত দিয়ে চেপে ধ'রে লুইসেকে বকের কাছে টেনে আনলে। লুইসে চীৎকার ক'রে উঠল, “ছেড়ে দাও” এবং শরীরের সকল শক্তি দিয়ে তার কবল থেকে নিজকে মুক্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলো—কিন্তু বুথা! হান্সের অধর তার গণ্ড স্পর্শ করলে—এমন সময়ে হান্স অনুভব করলে তার দুই স্বন্ধে লম্বা লম্বা আঙ্গুলের এক অদ্ভুত চাপ—তার অসহ্য যন্ত্রণা হ'ল—তার দুই চক্ষু যেন অন্ধ হ'য়ে এল—তার দুই হাত অবশ হ'য়ে এল। লুইসে তার শিথিল মুষ্টি হ'তে নিজকে নিমেষে মুক্ত ক'রে দরজা খুলে ফেললে এবং বাড়িতে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে আরম্ভ করলে! ঠিক সেই মুহূর্তে কাঁধের সে চাপ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে হান্স বেগে গিয়ে দরজার ওপর পড়ল এবং চীৎকার ক'রে উঠল “খামো!” কিন্তু লুইসে তখন এত প্রচণ্ড বেগে দরজায় ধাক্কা দিয়ে সেটা বন্ধ ক'রে দিলে যে, ঐ অতি গুরু দরজার আঘাত সোজা

হান্সের মাথায় লাগল—মাথাকটার সেই ভীতিপ্রদ শব্দ হ'ল “থাড্” এবং পরমুহূর্তে হান্সের মত বলিষ্ঠ পুরুষ দু'রে ছিটকে পড়ে কাতর আর্তনাদ ক'রে উঠলো, ‘ও’!

8

পরের দিন শহরের ছাত্রসমাজে এই সংবাদ অতিরঞ্জিত ভাবে প্রচারিত হ'ল। বেচারী হান্সকে হাসপাতালে আশ্রয় নিতে হয়েছে। তার সমস্ত মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হয়েছে। হান্সের প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য শত্রুর সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না—তারা এই ব্যাপার নিয়ে একটা তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করলে। বেচারি হান্সের নারী-হৃদয়-জয়শক্তির প্রচণ্ড খ্যাতি বিনষ্ট হ'ল।

সঙ্গে সঙ্গে এ-সংবাদও শুধু ছাত্রমহলে নয় সমস্ত শহরে প্রচারিত হ'ল যে এক ব্যারণের ছেলে সামান্য এক মজুরের মেয়েকে বিয়ে করছে। সমস্ত শহরে এ-সংবাদ দস্তুরমত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলে। অনেকেরই দুর্ভাবনা হ'ল লর্ড-ব্যারণের ছেলেরাও যদি এই কাজ করে, সমাজের কি পরিণাম হবে? ছোট ছোট কাফেতে বাড়ির গিন্নীরা বৈকাল চারটার শকোলাডে* ও কুখেনা খেতে সমবেত হয়ে এই আলোচনা করেন; সন্ধ্যায় ‘ডিল্লার’ টেবিলে সমবেত হয়ে সকল পরিবারে এরই বিচার চলে; বাজার করতে বার হয়ে প্রতি মাংসের দোকানে, প্রতি সসেজের দোকানে, প্রতি তরিতরকারির দোকানে গিন্নীরা এই ব্যাপার নিয়ে তর্কবিতর্ক করেন;—এমন কি রাত্রে বিয়ার-হলে সমবেত হয়ে বৃদ্ধেরা লিটারের পর লিটার বিয়া ওড়ান, তাঁদের বৈকানো পাইপ টানেন আর রাত্র বারটা-একটা পর্যন্ত উত্তেজিত হয়ে এই প্রসঙ্গ চালান। তরুণদের মধ্যে একদল এই সংবাদ পেয়ে মহা উত্তেজিত হ'ল, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের A. St. A, র † যে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক দল তারা কালকে সম্বন্ধনা করবার আয়োজন করলে। কিন্তু কালের আপন ‘কোর’ মহা গণ্ডগোল বাধলো, একদল স্থির করলে কালকে ‘কোর’ থেকে তাড়াতে, অন্য দলের মত হ'ল কাল ঠিক করেছে।

* শকোলাডে—কেকোজাতীয় পানীয়।

† কুখেন—কেক।

‡ A. St. A.—Allgemeiner Studentes Ausschuss—সাধারণ ছাত্রসমাজ।

কিন্তু তাদের জন্তে এই আন্দোলন, এই কোলাহল, তারা এর কোন সংবাদই রাখে না। পাহাড়ের কোন স্থানর কন্দরে, ক্ষুদ্র শ্রোতবিনীর কূলে কোন নিভৃত কুঞ্জে, বনাস্তের কোন শ্রামল ক্ষেত্রে উভয়ে উভয়েতে নিমগ্ন থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটায়ে আর মনে করে মাত্র এক নিমেষ অতীত হ'ল। এমন কি সৌন্দর্যের ললাম, ঐ কালো বনের যত কোকিলের গান, যত পাখীর কলরব, যত ভেসে-আসা নৈসর্গিক গুঞ্জর, যত পুষ্পের সুবাস তাদের প্রেম-সম্বোধিত চিত্তে কোন বিক্ষেপ আনতে পারে না, হয়ত তাদের অস্তরের অজ্ঞাত ক্ষেত্রে শিহরণ সৃষ্টি করে তাদের প্রেমকে আরও মধুর করে দেয়!

কিন্তু যথাসময়ে এ সংবাদ পৌছল কালের পিতার কাছে। তিনি ছুটে এলেন ফ্রাইবুর্গে জানতে এ-খবর সত্য কি না। কাল তাঁর একমাত্র সন্তান। তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন, তুচ্ছ রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে তাদের শত শত বৎসরের আভিজাত্য ঘেন সে নষ্ট না করে। তা করলে তার উর্দ্ধতন সকল পুরুষের অভিষাপ তার মস্তকে পড়বে—সে কখনও স্থধী হবে না। এই রকম অনেক কিছুই তাকে বোঝান হ'ল, কিন্তু সবই হ'ল বৃথা। এমন কি তিনি লুইসেকে দশ সহস্র মুদ্রার লোভ দেখিয়ে এ থেকে নিবৃত্ত হ'তে অনুরোধ করলেন—তার ফলে হ'লেন অপমানিত, কিন্তু কাল রইল অটল! শেষে তাকে ত্যজ্যপুত্র করার ভয় দেখান হ'ল—কাল রইল তবু অটল! কালের একমাত্র যুক্তি আভিজাত্য ও শ্রমজীবীর মধ্যে যদি মিলন না হয়, তাহলে জাতি যাবে উৎসন্ন—তাকে এ-বিবাহ করতেই হবে!

কালের পিতা শেষে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন—তাঁর সমস্ত প্রতিপত্তির প্রভাবে গভর্নমেন্ট কর্তৃক তাদের বিবাহের অনুমতি দান বন্ধ করলেন। গভর্নমেন্টের অজুহাত, যেহেতু কাল পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত, সে নিজে উপার্জনক্রম না হ'লে, বিবাহ করার অনুমতি পেতে পারে না। অগত্যা তাদের বিবাহ গেল অনিশ্চিত কালের জন্তে পেছিয়ে। এমন কি টেট থেকে কালের পড়ার খরচও গেল বন্ধ হয়ে।

পুস্তকের কীট ব'লে যে কালের খ্যাতি বা অখ্যাতি ছিল—সে হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কশূন্য—অতএব পুস্তকহীন।

সে এখন প্রবল উদ্যমে চাকরির সন্ধান করে—উদ্দেশ্য লুইসেকে বিবাহ করার উপযোগিতা অর্জন করা! শেষে জার্মানীর উত্তর-পূর্ব প্রান্তের শহর ক্যোনিগবের্গে তার একটা কাজ জুটল। ঠিক হ'ল উভয়ে সেখানে যাবে—লুইসে যাবে পালিয়ে। পালানরই প্রয়োজন, কারণ যেদিন সংবাদ এল কাল পিতার ত্যজ্যপুত্র হয়েছে, সেই দিন থেকে লুইসের মা তাকে বিশেষ করে বারণ করেছেন কালের সঙ্গে মিশতে। এমন কি লুইসের ওপর কড়া পাহারা বসেছে, এমন কি লুইসের অগ্রস্থানে যাতে তাড়াতাড়ি বিবাহ হয়ে যায় সে-চেষ্টা তিনি উঠে-পড়ে করছেন। এ-সব বিষয়ে তিনি অত্যন্ত 'প্র্যাক্টিকাল'! আর অত 'প্র্যাক্টিকাল' বলেই কপর্দকশূন্য অবস্থায় শিশু-কন্যাকে নিয়ে বিধবা হবার পর তিনি আপন চেষ্টায় অত ভাল ফুলের দোকান গড়ে তুলেছেন এবং মেয়েকে ভ্রোচিত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন!

কিন্তু তরুণ-তরুণীর প্রথম প্রেমের বন্ধা এ বাধা বলীল-ক্রমে অতিক্রম করে। প্রতিদিন অন্ততঃ কয়েক মিনিটের জন্তু তাদের লুকিয়ে দেখা হয়ই—তবে তাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে একত্রে কাটানো আর ঘণ্টে ওঠে না। কাজ পাওয়ার সংবাদ এলে তারা ঠিক করল—আগামী রবিবার সকালে যখন লুইসের নিষ্ঠাবতা মাতা মেরী-গীর্জায় উপাসনা করতে যাবেন—লুইসে আসবে পালিয়ে! এবং উভয়ে তৎক্ষণাৎ ট্রেনে উঠে জার্মানীর অপর প্রান্তে রওনা হবে। তারপর দুনিয়ার যা হয় হোক—তাদের বয়ে গেল।

নির্দিষ্ট দিন প্রত্যুষে কাল জিনিষপত্র গোছাচ্ছে। গৃহ-কত্রীকে পাঠিয়ে দিল বাজারে তার জন্তে রাস্তার রসদ কিনতে। এমন সময়ে বাহিরের দরজায় আওয়াজ বেজে উঠল—'ক্রি-ডিং'! কাল গিয়ে দরজা খুলতেই দেখে সামনে হান্স। কোন অভিবাদন না করে, কোন কথা না বলে, সোজা তার ঘরের মধ্যে ঢুকে টুপিটা খুলে সোফার ওপর ছুঁড়ে ফেলে চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করে প্রস্থানের তোড়জোড় দেখে বিস্মিত হয়ে হান্স জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় যাওয়া হবে?"

কাল—সে সংবাদে তোমার প্রয়োজন?

হান্স—কোন প্রয়োজন নেই! তোমার যত কুলাদার

রসাতলে গেলে সমাজের মজল বই অমজল হবে না! শুধু জানতে চাই এ কি লুইসেকে সঙ্গে নিয়ে পালাবার ষড়যন্ত্র?

কাল—সে সংবাদেই বা তোমার প্রয়োজন?

হান্স—তোমার মত লোকের কাছে আমার প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের কৈফিয়ৎ দিতে চাই নে—আমাকে ঠিক করে বল লুইসেও সঙ্গে যাবে কি-না?

কাল—কোন অধিকারে এ সংবাদ চাও?

হান্স—শ্রেষ্ঠতম অধিকারে। কাল বৈকালে লুইসেদের সম্মতি পেয়ে আমি হয়েছি লুইসের ভাবী স্বামী!!

কাল [চমকিত]—ললে?

হান্স—এতে অত চমকাবার কি আছে? সকলেই কি আশা করে নি লুইসের সঙ্গে আমার সম্পর্কের এই হবে স্বাভাবিক পরিণতি? তুমিও কি তা জানতে না? জেনে-শুনে হীন বিশ্বাসঘাতকতা করে তুমি কি একটা বিস্ত্রী গণ্ডগোল বাধাও নি?—কিন্তু শোন! এখানে এসেছি শুধু তোমাকে সাবধান করে দিতে, আবার যেন আমাদের জীবনে উৎপাত সৃষ্টি করে না।

কাল—যেন বজ্রাহত হ'ল! কিছুক্ষণ তার আর বাক্য-শূরণ হ'ল না। হান্সের মুখে দেখা দিল ক্ষুদ্রচেতা বিজয়ীর সেই অবজ্ঞাপূর্ণ হাসি, যা পরাজিতকে পরাজয়ের চেয়েও অধিক ব্যথা দেয়। সে-হাসি দেখা মাত্র কালের চমক ভাঙল, সে জিজ্ঞাসা করলে, "লুইসে নিজে রাজী?"

হান্স—হাঃ, হাঃ, হাঃ! নিশ্চয়! আর—

কাল [চীৎকার পূর্বক]—অসম্ভব!

হান্স—অসম্ভব?—অসম্ভব কেন শুনি?

কাল—তুমি বললে কাল বৈকালে তাদের সম্মতি পেয়েছে—অথচ কাল রাতে লুইসের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, সে ত এর বিন্দুবিসর্গ জানেই না, বরং—

হান্স [বাধা দিয়ে]—হোঃ, এই কথা? লুইসের মা আমাকে বলেছেন, লুইসের মত আছে, তাই যথেষ্ট! লুইসে যে নিজে সম্মত হবে তা নিঃসন্দেহ—

কাল—অসম্ভব—অসম্ভব!

হান্স—হেঁ হেঁ—অসম্ভব! তোমার মত গর্দভই ভাবে ছোটলোকের মেয়েদের পক্ষে কোন কাজ অসম্ভব—

কাল—সাবধান হয়ে কথা বল!

হান্স—আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, চলে যাচ্—ভালই হচ্ছে—আপদ দূর হ'ল—কিন্তু আমার আর লুইসের জীবনে আর কখনও উকি দিও না।

কাল—সে বারণ আমি করছি! লুইসে কখনও তোমাকে চায় না—

হান্স—তোমার মত কীটের সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। কিন্তু আবার সতর্ক করে দিচ্ছি, আমার অবর্তমানে আমার প্রণয়মুগ্ধার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করে যথেষ্ট অনর্থ বাধিয়েছ - ভাল চাও তো আর এর মধ্যে এস না!

কাল—কোনো দিন সে তোমার প্রণয়মুগ্ধা হয় নি। কাল রাতেও আমার প্রতি তার গভীর প্রণয়ের এতটুকু ব্যতিক্রম দেখিনি! সে আমাকে ভালবাসে—প্রাণ দিয়ে ভালবাসে—

হান্স—বটে, বটে! হাসির কথা বটে! সে আমার প্রণয়মুগ্ধা হয়নি, হ'য়েছে তোমার? আমি একবার যে-নারীকে পছন্দ করেছি, সে ভালবাসবে অত্র পুরুষকে—তাও আবার তোমার মত লম্বা লম্বা ঠ্যাঙসর্কস্ব, কদাকার, কপর্দকশূন্য অপদার্থকে?—হাঃ, হাঃ, হাঃ!—শোন, ইভিগট শোন! তোমাকে সে শুধু বাঁদর নাচিয়েছে! ভালবাসার ভাগ করে তোমার মত বুদ্ধিহীন ব্যারণ-পুত্রের কাছ থেকে বিবাহের প্রস্তাব আদায় করে সে শুধু আমার কাছে নিজের দর বাড়িয়েছে। তুমি না বাধা দিলে, সেই বল-ডানসের রাতেই সে আমার অকশায়িনী হ'ত—

কাল—খামো!—তাকে বিবাহ করতে চাও এই শ্রদ্ধা নিয়ে?—

হান্স—শ্রদ্ধা?—হাঃ, হাঃ, হাঃ!—কুলির মেয়েকে আবার শ্রদ্ধা!—তোমার বোকামির জন্তে তার মার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করতে হয়েছে—অকারণ কতকগুলো অর্থব্যয় করতে হচ্ছে—এই যেন যথেষ্ট নয়! তাকে আবার শ্রদ্ধাও করতে হবে?

কাল—তাহ'লে তোমার অভিপ্রায় তাকে বিবাহ করা নয়—তার সর্কনাশ করা—

হান্স—তাই যদি হয়, তাতেই বা কার ক্ষতি? কৌশল করে একটা ছোটলোকের মেয়ের স্ত্রীকামি যদি ভাঙতে পারি, তাতে লাভ বই লোকসানটা কার? শোন, বোকা,

শোন! আমাদের জন্মগত (শদিকার আছে এই-সব ছোট-লোকের মেয়েদের যে উপায়ে হোক উপভোগ করা—

কাল হান্সের গণ্ডদেশে সজোরে চপেটাঘাত করলে। হান্স প্রথমটা স্তম্ভিত হ'ল, কিন্তু পর মুহূর্তেই তার বজ্র-মুষ্টি কালের মুখে পড়লো! কাল দূরে ছিটকে পড়ল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ উঠে, ছুটে এসে হান্সকে উপযুঁপরি ঘুষি মারতে আরম্ভ করলে। হান্স তাকে আপটে ধরলে, তারপরই আরম্ভ হ'ল ধ্বস্তাধ্বস্তি। ঘরের যত আসবাব, যত কাঁচের

জিনিষ, ডেসিণ্টেবিলের আয়না, চেয়ারের পায়া, আল্‌মারির কবাট, জানলার সারুবি, খাটের ব্যাটন, সোকার কাঁধা, বইয়ের আল্‌মারি ইত্যাদি সব ভাঙতে আরম্ভ হ'ল! দু-জনে উন্মত্তের মত কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করবার পর কালকে হান্স মেঝের উপর চিং করে ফেলে দুই হাত দিয়ে তার গলা চেপে ধরলে এবং শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে টিপতে আরম্ভ করলে! এক চাপ—দুই চাপ—তিন চাপ—কালের প্রাণ-বায়ু নির্গত হ'ল!!

জাগ্রত রাখিও মোরে

শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায়

জানিতে চাহি না আমি—কত যুগ ধরি
কত ক্লেশে, কি অপার তিমির সস্তরি
এসেছি এ ধরণীর স্নেহ-স্নিগ্ধ ক্রোড়ে।
জানিতে চাহি না আজ—কোথা পুন মোরে
যেতে হবে আয়ুশেষে।

আমি শুধু যাচি
হে ঈশ্বর, জাগ্রত রাখিও মোরে। যাঁচি
যেন যাঁচিবাদ মত চির-অমুক্ষণ।
বিমুখ না হয় কভু উদাসীন মন
আকণ্ঠ করিতে পান উঘেলিত কূলে
কূলে জীবন-জাহ্নবী-বারি। কোনো ভুলে
কভু যেন, হে ঈশ্বর, ভুলিয়া না যাই
রয়েছি যাঁচিয়া।—

রয়েছি যাঁচিয়া তাই—
বন্ধে আজি জাগে মোর উদধি-উচ্ছ্বাস;
রয়েছি যাঁচিয়া তাই ধরণী, আকাশ,
আবরেছি মোর প্রাণ-বর্ণ-গরিমায়।
তরু-তুণে, শস্ত-শীর্ষে ধূলি-মুক্তিকায়,
ব্রততী-বিতানে, পুষ্পে—সর্বঠাই 'পরে
বৃষ্টি-সম লক্ষধারে নিয়ত যে ঝরে
মোর স্নেহ-ভালবাসা। নিখিল গগনে
আমারই মমতা বৃষ্টি পবনে পবনে
স্বমেতুর মেঘ-রূপে হেরি সঞ্চারিতে
দিকে দিকে নব নব দেশে বেষ্টিতে!

বাঁচিয়া রয়েছি তাই—জল-ধারা প্রায়
অনায়াসে অধোলোকে চিত্ত মোর ধায়
স্তরে স্তরে ভেদিয়া পৃথিবী। স্বর্গবাসী
দেবতার মত চিত্ত সর্ববাধা নাশি
ভ্রমিয়া বেড়ায় স্থখে জ্যোতিষ্ক-সভায়।
তাই যাচি, হে ঈশ্বর, দিবস নিশায়
এমনি জাগ্রত যেন রহি অমুক্ষণ
এমনি যাঁচিয়া যেন থাকি আমরণ
পূর্ণ প্রাণ লয়ে। দিও দুঃখ, দিও ব্যথা
অযুত আঘাত হেনো—কহিব না কথা,
করিব না অভিযোগ—শুধু, দেখো হায়
হাসি-অশ্রু-উৎস মোর কভু না শুকায়!
শুধু দেখো, হে ঈশ্বর, এমনি জাগ্রত
যেন রহি চিরকাল। এমনি নিয়ত
পরম উল্লাসে চলে জীবন-ভুঞ্জন।
তারপর, অকস্মাৎ যে-দিন মরণ
চাঁপিয়া ধরিয়া কর অতিদ্রুত করে
আকষিবে রক্ত হীন তিমির-জঠরে—
সে-দিনও তোমার পানে আর্দ্র আঁখি মেলি
শুধাব না, হে বিধাতা, দীর্ঘস্থায় ফেলি
এ আকাশ, এ পৃথিবী—চন্দ্র, গ্রহ, তারা,
সাগর, ভূধর, বন—কেহ গো ইহারা
ধাইয়া চলিবে কি-না মোরে অমুক্ষণ
সে-আঁধার পথে। শুধু এ-মিনতি করি
এমনি জাগ্রত মোরে রেখো অমুক্ষণ
এমনি যাঁচিয়া যেন রহি আমরণ।

অ-সহযোগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি পুরাতন চিঠি

[রবীন্দ্রনাথ আমাকে গত ৬ই বৈশাখ এই চিঠিখানি লেখেন।—প্রবাসীর সম্পাদক।]

৩

শাস্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাষ্পদেষু

১৯১৬ থেকে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আমেরিকা ও যুরোপে বক্তৃতায় নিযুক্ত ছিলাম। সেই সময়ে সংবাদপত্রযোগে খবর পাওয়া যেত,—মহাত্মাজী অসহযোগ প্রচার করছেন, একথা স্বীকার করব, আমার সেটা ভালো লাগে নি। তার কারণ, যেমন খিলাফতের লক্ষ্য ভারতবর্ষের বাইরে, অসহযোগের লক্ষ্য প্রায় তাই। ইংরেজরাজের সঙ্গে কোমর বেঁধে সহযোগই চালাই বা অসহযোগই জাগাই, তাতে আমাদের সাধনা কেমন হইবে? ওটা কলহ মাত্র, সেই কলহের পারিণামে সার্থকতা নেই। মহাত্মাজী দেশের লোকের মনে যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, অত বড়ো প্রভাব অপর পক্ষকে তারস্বরে অস্বীকার করবার নওর্থক উদ্দেশ্যে খরচ হয়ে যাচ্ছে, এই কথা কল্পনা করে আমার মন পীড়িত হয়েছিল। সেদিন আমার মনে এই একান্ত কামনা জাগছিল যে মহাত্মাজী নিজের চারদিকে দেশের বিচিত্র শক্তিকে আহ্বান করবেন দেশের বিচিত্র সেবার কাজে। কারণ, দেশের শিক্ষা স্বাস্থ্য পূর্তকার্য বাণিজ্য—এই কর্তব্যগুলিকে প্রবল বলে অকৃত্রিম নিষ্ঠার সঙ্গে চালনা করাই যথার্থ দেশকে লাভ করা, জয় করা। সকলে মিলে কেবল চরকায় সূতো কাটায় দেশচিন্তের সম্পূর্ণ উদ্বোধন হ'তে পারেই না। জানি এই সময়ে বাধার সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল—তখন সেই বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করা সার্থক হ'ত। এতদিন ধরে সংগ্রাম ত যথেষ্টই হ'ল, দুঃখের তো অস্ত নেই। তার পরিবর্তে আজ রক্তহীন সাদা কাগজ পাওয়া গেল। সেই কাগজে শূন্যতা যথেষ্ট কিন্তু রচনা কতটুকু?

সেই সময়ে আমি জগদানন্দকে যে চিঠি লিখেছিলাম আমাদের কোনো প্রাক্তন ছাত্র সেটি কপি করে রেখেছিল। আজ দৈবাৎ সেই কপি আমার হাতে পড়েছে। লেখাটি

আপনার কাছে পাঠালুম। প্রকাশ করার প্রয়োজন আছে যদি মনে করেন তবে ছাপাবেন। সংক্ষেপে আমার বলবার ছিল এই যে পরের সঙ্গে অসহযোগ নিয়ে আন্দোলন না করে নিজের মধ্যে পরিপূর্ণ সহযোগের জন্তে দেশের বহু শক্তিকে একত্র করতে পারলে তাতে স্বরাজের ধর্মরূপ অভিব্যক্ত হ'ত, সেই রূপটি হ'ত সত্য। ইতি ৬ বৈশাখ ১৩৪১

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অধ্যাপক জগদানন্দ রায়কে লিখিত
রবীন্দ্রনাথের চিঠি

De Duinev
Huizen N. H.

স্বনিয়ম নমস্কার নিবেদন—

হল্যাণ্ডে একটি সুন্দর জায়গায় সুন্দর বাড়ীতে এসেছি। অদূরে সমুদ্র; চারিদিকে বাগান ফলে ফুলে সুরমা, পাখীর গানে মুখরিত। শরতের সূর্যালোক এই মনোহর জায়গাটির উপর সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে। যিনি গৃহকর্তী তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাদের যত্ন করছেন সূতরাং দেবে মানবে মিলে যখন আমাদের আতিথ্যে নিযুক্ত হয়েছেন তখন ক্রটি কোথাও থাকতে পারে না। প্যারিসে আমরা যার আতিথ্যে ছিলাম তিনিও আমাকে একান্ত যত্নে সমাদর করেছেন। তিনি খুব ধনী অথচ আহায়ে বিহারে সন্ন্যাসীর মত। মাসুকের কল্যাণের জন্তে তাঁর মনে যে সব সঙ্কল্প আছে তাতেই অহরহ তাঁর সমস্ত শক্তি ব্যয় করছেন। এখানকার যারা বড়লোক মাসুকের ইতিহাসকে সমস্ত ভাবী-কালের মধ্যে প্রসারিত করে তাঁরা দেখেন। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, দেশকালের ক্ষেত্র আমাদের পক্ষে অত্যন্ত ছোট হয়ে গেছে, এই জন্তে আমাদের শক্তিকে আমরা বড়ো করে ফলাতে পারিনে। শক্তি যেখানে রস পায় না, খাদ্য পায় না, সেখানে মরুভূমির গাছপালার মত কেবল প্রচুর কণ্টক বিকাশ করে।

দেশে আজকাল কী সব গুণগোল চলছে দূর থেকে তার অল্প আভাস পাই। আমাদের গুণগোল দেশে এ সব গোলমাল ভালো—মনকে তার সর্কার গণ্ডি থেকে জাগিয়ে তোলে। কিন্তু গোলমালেরই আবার নিজের একটা গণ্ডি আছে। অন্ধকার আমাদের পথ ভোলাবার ওস্তাদ বটে কিন্তু আলোর আলোও পথ ভোলায়। দেশব্যাপী গোলমালের মধ্যে যদি সত্যের অভাব ঘটে তা হলে সে আমাদের ঘূর্ণির মধ্যে ঘুরিয়ে বেড়ায়, কোথাও এগোতে দেয় না। ঘোরো গণ্ডি আমাদের ধরে রাখে, উত্তেজনার গণ্ডি আমাদের ঘুরপাক খাওয়ান। ছুইয়েরই পরিধি সর্কার। একটা স্থির গণ্ডি, আর একটা চলতি গণ্ডি; একটাতে ঘুম পাড়ায়, আর একটাতে মাথা ঘোরায়। সত্য হচ্ছে পরমা গতি, অর্থাৎ এমন গতি যার প্রত্যেক পদক্ষেপেই সার্থকতা। আর মোহ হচ্ছে সেই গতি যার চলায় সার্থকতা আনে না, কেবল নেশা আনে। একটা হচ্ছে ধনাত্মক গতি, আর একটা হচ্ছে ঋণাত্মক গতি। দেশ জুড়ে যখন ভোলাপাড়া ঘটেছে তখন ভালো করেই ভাবতে হবে, এই গতির প্রকৃতি কি। যে জলে স্রোত প্রবল কিন্তু তট অবর্তমান সে-ই হচ্ছে বন্যা। বন্যায় ভাঙে, ভাসিয়ে দেয়, ফসল নষ্ট করে। আমাদের দেশে যে আবেগ এসেছে সে যদি একমাত্র ভাঙনেরই বার্তা নিয়ে আসে তা হলে অনাবৃত্তিতে শুকনো ডাঙার ক্ষেতে অতিবৃষ্টির অগাধ ক্ষতির মধ্যে ডুবে মরতে হবে। আমার অল্পরোধ এই যে, মন যখন কোনোমতে জেগেছে, তখন সেই শুভ অবকাশে মনটাকে কবে কাজে লাগিয়ে দাও, অকাজে লাগিয়ে শক্তির অপব্যয় কোরো না। Non-Co-operation (নন্-কো-অপারেশন) অকাজ—তার আবির্ভাব অস্তিম্বে। শাস্ত্রে বলে কর্মের দ্বারাই কর্ম থেকে মুক্তি, নৈর্কর্মের দ্বারা নয়; পাস করার দ্বারাই স্থূল থেকে মুক্তি, আমার মত ইস্তুল ত্যাগ করার দ্বারা নয়। আজ সময় এসেছে নিজেদের সব কাজ নিজেরা মিলে করতে হবে। সে কাজ কতখানি বাস্তব দেবে তা ভাববার দরকার নেই, কিন্তু কাজের উপলক্ষ্যে আমাদের যে মিল সেই মিলই সত্য মিল, সেই সত্য মিলই হচ্ছে চরম লাভ! অ-কাজ করবার উপলক্ষ্যে যে মিল সে কখনই সত্য এবং স্থায়ী হতে পারে না। আহায়ে

শরীরে যে শক্তি আনে সেইটাই শ্রেয়, মদের নেশায় যে শক্তি তার বেগ আপাতত বেশি হলেও পরিণামে প্রতিক্রমার দিনে তার হিসাব নিকাশ হতে থাকে। গীতা বলেছেন— স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো। ভয়াৎ—সত্যের মিলও অল্প যেটুকু দেয় সেও মস্ত বড়, আর জোন্দের মিল, খিলাফতের মিল, এমন বর দিতে পারে যাকে নিয়ে কোথায় ফেলব ভেবে অস্থির হতে হবে। মিথ্যা জোড় যখন ভাঙে তখন ভালোয় ভালোয় সরে যায় না, নিজের মধ্যে দমাদম মাথা ঠোকাঠুকি করতে থাকে। এই জন্তে আবার একবার দেশকে এই কথা বলবার সময় এসেছে যে সমিধ যদি সংগ্রহ হয়ে থাকে তবে সে যজ্ঞ করবার জন্যই, দাবানল জালাবার জন্তে নয়। একদিন আমি স্বদেশী সমাজে যা বলেছিলাম আবার সেই কথাই বলতে চাই। আমরা যে রাগারাগি করছি তার গতি বাইরের দিকে অর্থাৎ অস্ত পক্ষের দিকে অর্থাৎ পরে তার কর্তব্য করেছে, কি, না-করেছে, সেইটেই তার মুখ্য লক্ষ্য। ভিক্ষা করবার বেলাতেও সেই লক্ষ্যই প্রবল। আমি বলি আপাতত বাইরের পক্ষকে ভোলো। পরের সঙ্গে অসহকারিতার দিকেই সমস্ত ঝোঁক দিয়ে না। নিজের লোকের সঙ্গে সহকারিতার দিকেই সমস্ত ঝোঁক দাও। আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পূর্তকার্য, বিচার প্রভৃতি সমস্ত কার্যভার সম্পূর্ণভাবে নিজের হাতে নেব এই পণ করো। সেজন্তে সমস্ত দেশ জুড়ে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দরকার। গান্ধিজী সেই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে আমাদের প্রত্যেককে কাজে আহ্বান করুন, অকাজে না। আমাদের কাছ থেকে টাকার এবং কাজের খাজনা তলব করুন। আমাদের অল্পকষ্ট, জলকষ্ট, পথকষ্ট, রোগকষ্ট, সমস্ত নিজেরা দূর করব বলে আমাদের সত্যগ্রহ করান। তার বাস্তব আপাতত কী হবে তার হিসাব করবার কোনো দরকার নেই, কিন্তু এই সত্য গ্রহণ ও পালনের ফল গভীর ও স্থায়ী। সনো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুক্তু। আমাদের সংযোজনের দরকার আছে, কিন্তু সেই যোগ শুভবুদ্ধির যোগ, যে বুদ্ধি আমাদের পুণ্যকর্ম নিবৃত্ত করে। সেই কল্যাণ কর্ম আমাদের শুভবুদ্ধনে বাধে বলেই অশুভ বন্ধন থেকে স্বতই মুক্তি দেয়। আমাদের দেশের অতি লক্ষ্মীছাড়া পলিটিক্‌স্ এই সহজ কথা আমাদের কুলিয়ে দিয়েছে।

বাংলার জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

কিছুদিন পূর্বে বাংলার পুনর্গঠন সম্বন্ধে গভর্নর স্যর জন এণ্ডারসন যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, পুনর্গঠনের যে সকল উপায় সম্বন্ধে উল্লেখ দেখা যায়—জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা সে সকলের অন্ততম।

তাঁহার এই বক্তৃতার পর জানা গিয়াছে, বর্তমান বৎসরের মধ্যেই পরীক্ষা হিসাবে বাংলায় পাঁচটি জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সেই সব ব্যাঙ্কের পরিচালন-ব্যয় নির্কাহের জন্য সরকার চল্লিশ হাজার টাকা দিবেন। সম্প্রতি সরকারের এক বিবৃতিতে জানা গিয়াছে, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও পাবনা—এই তিনটি জিলায় তিনটি ব্যাঙ্ক ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং আর দুইটি জিলায় অবশিষ্ট দুইটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এই জাতীয় ব্যাঙ্ক নানা শ্রেণীর এবং দেশের অবস্থার উপযোগী কার্যে হয়। জার্মানীতেই এইরূপ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সফল ফলিয়াছিল এবং সেই জন্য বিলাতের সরকার (কৃষি ও মৎস্য বিভাগ) মিষ্টার কাহিলকে জার্মানীর ব্যবস্থা অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার অধ্যয়নফল প্রদান করিবার কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি যে বিবরণ প্রদান করেন, তাহাতে দেখা যায়, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে সে দেশে জমির উন্নতি-সাধন জন্য এক কেন্দ্রী “ফণ্ড” প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এই তহবিলে প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা সঞ্চিত হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এই টাকার অধিকাংশ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সরকারকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় এবং সে-সব সরকারেরই জমির উন্নতি-সাধন জন্য প্রতিষ্ঠিত “ফণ্ড” আছে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রত্যেক প্রদেশকে সেইরূপ “ফণ্ড” প্রতিষ্ঠায় অধিকার প্রদান করিবার জন্য আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে স্যাক্সনীতে, ১৮৮০ ও ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে হেসে, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বাভেরিয়ায় ও ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ওলডেনবার্গে এইরূপ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

মিষ্টার কাহিল বলেন, সেচের ব্যবস্থা করা, জলনিকাশের বন্দোবস্ত করা এবং বাঁধ ও নদীর কূলরক্ষা করাই এইরূপ

ঋণ গ্রহণের প্রধান কারণ। অধিকাংশ স্থলেই জমির অধিকারীরা জমির ঘেরূপ উন্নতিসাধন জন্য ঋণ গ্রহণ করেন, সে রূপ উন্নতিতে আয় বর্ধিত হয়। জমির উন্নতিসাধন জন্য যে ঋণ লওয়া হয় তাহাকে ব্যক্তিগত ও বন্ধকী ঋণের মধ্যবর্তী বলা যাইতে পারে। খাতকের নির্ভরযোগ্যতা ও উন্নতি-জনিত জমির মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ বিবেচনা করিয়া ঋণ প্রদান করা হয়। কৃষিজ দ্রব্যের বিষয় বিবেচনা করিলে খাতকের সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয় :—

- ১। ঋণের পরিমাণ উপযুক্ত হইবে ;
- ২। সুদের হার অধিক হইবে না ;
- ৩। পরিশোধ জন্য সক্ষম ভাণ্ডারে কিস্তিমত টাকা দিতে হইবে বটে, কিন্তু ঋণের টাকা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে পরিশোধ করিতে হইবে না। সাধারণতঃ মহাজনরা বা ঋণদান প্রতিষ্ঠানগুলি এইরূপ সর্বো ঋণ দান করিতে পারেন না ; কারণ, উন্নতির ফলে জমির মূল্য কিরূপ বর্ধিত হইবে তাহা স্থির করিবার ও জমি-পরিদর্শনের ব্যবস্থা তাঁহাদিগের থাকে না। মহাজন বা ঋণদান প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকালব্যাপী কিস্তিতে টাকা লইতে পারেন না। সেই জন্যই একরূপ ঋণদানের জন্য স্বতন্ত্র শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

জার্মানীর প্রথার আলোচনা করিলে প্রথমেই দেখা যায়—বাংলার অবস্থার সহিত সে দেশের অবস্থার বিশেষ প্রভেদ আছে। বাংলার জমির উন্নতিসাধনের প্রথম প্রয়োজন—পূর্বেকৃত ঋণ পরিশোধ করা। সেই জন্য বাংলায় জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্যক্রমের মধ্যে সর্বপ্রথম ঋণপরিশোধ-ব্যবহার উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই উদ্দেশ্যক্রম—

- ১। জমি বন্ধক রাখিয়া গৃহীত ও পূর্বেকৃত অন্তরূপ ঋণ পরিশোধ ;
- ২। জমির ও কৃষিপ্রথার উন্নতিসাধন ;
- ৩। যে স্থানে আর কিছু জমি কিনিলে কৃষকের পক্ষে

ক্ষেত্রের ও অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয় চাষের সুবিধা হয়, সে স্থানে নৃতন জমি হয়।

বাংলার কৃষকের ঋণভার বহুদিনের এবং দুর্বল। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত অর্থনীতিক এডাম স্মিথের 'ওয়েল্থ অব নেশন্স' গ্রন্থ প্রচারিত হয়। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, বাংলার ফসল পূর্বেই বহুক রাখিয়া কৃষক শতকরা ৪০, ৫০, ও ৬০ টাকা হুদে টাকা ঋণ লয়।

ইহার অল্পদিন পূর্বে, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কমিটি অব সার্কিট বাংলার ঋণ ও হুদে পরিশোধ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়ম করেন—

“পুরাতন ঋণ পরিশোধ অর্থাৎ মহাজনের প্রাপ্য নির্ধারণ সম্বন্ধে এই নিয়ম হইবে যে, একবার মোট টাকা স্থির করিবার পর তাহার আর হুদে চলিবে না এবং খাতকের অবস্থা বিবেচনা করিয়া ঋণ কিস্তিবন্দী হিসাবে পরিশোধ করা হইবে। তদন্ত এতদিন হুদের যে হার চলিয়া আসিয়াছে, তাহা অত্যধিক বলিয়া পূর্বেকৃত ঋণের ও ভবিষ্যতে গৃহীত ঋণের হুদের হার নিম্নলিখিতরূপ হইবে—

(ক) আসল একশত টাকার অনধিক হইলে, শতকরা মাসিক ৩ টাকা ২ আনা বা টাকার ২ পয়সা।

(খ) আসল এক শত টাকার অধিক হইলে, শতকরা মাসিক ২ টাকা। [আসল ও হুদের টাকা দিল্লির সর্ব্ব অনুসারে শোধ করা হইবে এবং মধ্যকার সময় কোন ব্যবহার চক্রবৃদ্ধি হারে হুদে চলিবে না—তাহা আইন-বিরুদ্ধ ও অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে। নাশিণে যদি দেখা যায়, নির্দিষ্ট হার অপেক্ষা উচ্চ হারে হুদে দেওয়া হইয়াছে, তবে হুদের সব টাকা বাজেয়াপ্ত ও খাতকের প্রাপ্ত বলিয়া সেরূপ হলে কেবল আসল টাকাই আদায় হইবে। যদি কেহ আইনের ব্যতিক্রম চেষ্টা করিয়াছে, প্রতিপন্ন হয়, তবে আসলের অর্ধেক টাকা সরকার ও অর্ধেক খাতকের প্রাপ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।”

ব্যবস্থার কঠোরতাতেই বুঝা যায়, মহাজনরা অত্যন্ত অধিক হুদে লইত এবং খাতককে মহাজনের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা সরকার কর্তব্য ও প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন।

হুদের হার যে হ্রাস হইয়াছে, তাহাও বলা যায় না। কোন কোন স্থানে “আখা বাড়ী” হিসাবে যে ধান্স দান করা হয়, তাহার নামেই শতকরা ৫০ টাকা হুদে প্রকাশ। আবার উহাও চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়িয়া যায়। সরকার হুদের হার কমাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু আইনের সঙ্গে সঙ্গে আইনের বিধান অতিক্রমের নানা উপায়ও অবলম্বিত হইয়াছে। যে স্থানে খাতক বিপন্ন ও বর্ণজ্ঞানশূন্য, সে স্থানে চতুর মহাজনের পক্ষে নানারূপে প্রাপ্যের অতিরিক্ত টাকার জন্য তাহাকে দায়ী করা দুঃসাধ্য হয় না।

কয় বৎসর পূর্বে যে ব্যাঙ্কিং-অফিসদান-সমিতি নিবৃত্ত হইয়াছিল, তাহার নির্ধারণ—বাংলার কৃষিক্ষেত্রের পরিমাণ— একশত কোটি টাকা। যখন এই হিসাব হয়, তাহার পর যে কয় বৎসর গত হইয়াছে, সেই কয় বৎসরে ব্যকসাম্পাদা হেতু কৃষিক্ষেত্রের মূল্য হ্রাস প্রভৃতি কারণে খাতক যে অনেক স্থলে হুদে দিতে পারে নাই তাহা সকলেই জানেন। সেই জন্য এই কয় বৎসরে এই ঋণের পরিমাণ আরও বাড়িয়াছে।

ইহার জন্য জমিই অনেক স্থানে দায়ী; হুতরাং জমি বহুক হইতে খালস করিতে না পারিলে, তাহার উন্নতিসাধনে কৃষকের কোন উপকার হইবে কি-না সন্দেহ এবং তাহাতে তাহার উৎসাহও থাকিতে পারে না।

এই ঋণের ভার হইতে বুঝা যায়, কিছুকাল পূর্বে কৃষককে সাহায্য করিবার জন্য যে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে আশাভূরূপ ফল ফলে নাই। না কলিবার যে অনেক কারণ ছিল ও আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আজ সে সকল আমাদের আলোচ্য নহে। তবে সেই সব কারণের মধ্যে আমরা প্রধান দুইটির উল্লেখ করিব— প্রচারকার্যে অমনোযোগ, সমিতিগুলিকে আবলম্বী করিতে আবশ্যিক চেষ্টার অভাব। সমবায়-প্রথার মূল নীতি এদেশের কৃষকের নিকট নূতন নহে। কিন্তু তাহা যে বিদেশী বেশে দেখা দিয়াছিল, তাহাতে কৃষকের পক্ষে তাহাকে আপনার মনে করা অসম্ভব হইয়াছিল। এই নীতি যে তাহাদিগের পরিচিত এবং তাহাতে যে সফল ফলে, তাহা কৃষককে বুঝান হয় নাই। সরকারী কর্মচারীরা ডাক-বাংলায় বা খানায় গিয়া দুই দিনে কাজ করিলে তাহা কখনও ফলপ্রসূ হয় না—হইতে পারে না। বর্তমানে পল্লীগ্রামে উপযুক্ত লোকের অভাব যে সমিতি গঠনের ভার-প্রাপ্ত কর্মচারীরা উপযুক্তরূপে অনুভব করেন নাই, তাহা সপ্রকাশ। তাহার প্রতীকারোপায় করা হয় নাই। তাহার পর কার্যের ভার সমবায় সমিতির সভ্যদিগের প্রতিনিধিদিগকে না দিলে কি হইবে? এই সব সমিতি সরকারের বিভাগের মতই হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং সরকারের কর্মচারীরা দরিদ্র কৃষকের সামান্য কথা তুলিয়া পাট বিক্রয় সমিতির মত বিরাট প্রতিষ্ঠানগঠনের চেষ্টায় সমবায় সমিতিগুলির সর্বনাশ সাধন করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ সমবায়

নীতি অবলম্বন ব্যতীত পথ নাই। সুতরাং লক্ষ অভিজ্ঞতার ক্রটি সংশোধন করিতে হইবে।

আমরা জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বিবৃত করিবার সময় বলিয়াছি, জমি বন্ধক রাখিয়া বা অন্তরূপে গৃহীর ঋণ পরিশোধ জন্য ব্যাঙ্ক হইতে টাকা দেওয়া হইবে। কিন্তু এখন বিবেচ্য—কি রূপ টাকা দেওয়া হইবে? কাহারাই বা টাকা লইতে পারিবে? ঋণগ্রহণ সম্বন্ধে অবশ্য নিয়ম হইয়াছে। সে-নিয়ম যে বিশেষ সতর্কতার পরিচায়ক তাহাও আমরা দেখিতে পাইতেছি। বিবৃতিতে দেখা যায়—

(১) কোন সদস্য ব্যাঙ্কে যে টাকার ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ২০ গুণ পর্যন্ত টাকা পাইতে পারিবেন। তবে সাধারণতঃ টাকার পরিমাণ ২ হাজার ৫ শত টাকার অধিক হইবে না এবং সমবায় সমিতির রেজিষ্টারের অনুমোদনে তিনি ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত পাইতে পারিবেন।

(২) যত দিনের জন্য ঋণ গৃহীত হইবে, ততদিনে জমি হইতে উৎপন্ন শস্যের মূল্যের শতকরা ৭৫ ভাগ বা জমির মূল্যের অর্ধাংশের অধিক টাকা কাহাকেও দেওয়া হইবে না।

(৩) যিনি কৃষিজ আয় হইতে নিজ প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করিয়া হ্রদ ও কিস্তি ৩ টাকা দিতে পারিবেন না, তিনি ঋণ পাইবেন না।

(৪) ঋণ কখন ২০ বৎসরের অধিক কালে পরিশোধ হইবে না।

(৫) খাওয়াকে দুই জন সদস্য জামিনদার দিতে হইবে।

(৬) জমির উপর ব্যাঙ্কের প্রথম অধিকার থাকিবে।

কিন্তু পূর্বকৃত ঋণ কি ভাবে পরিশোধ করা হইবে, তাহা জানা যাইতেছে না। স্মরণ জন এণ্ডার্সন বলিয়াছেন— ঋণ মিটাইবার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। এ-বিষয়েও বিশেষ বিবেচ্য—ঋণের পরিমাণ কিরূপ? ঋণ যদি পরিশোধযোগ্য হয়, তবে ব্যবস্থা একরূপ হইবে, তাহা পরিশোধাতীত হইলে ব্যবস্থা অন্তরূপ না করিলে চলিবে না। বাংলার মোট কৃষি-ঋণ যদি এক শত কুড়ি কোটি টাকা হয়, তবে তাহা জমি হইতে পরিশোধ করা সম্ভব কি-না? অথচ ঋণ উপেক্ষা করাও সম্ভব নহে; মহাজনের স্বার্থ অবজ্ঞা করা যায় না। যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে কেবল দুই শ্রেণীর কৃষক বা ঋণগ্রহণকারী বা স্বল্প আয়ের লোকই ব্যাঙ্কের টাকায় উপকৃত হইতে পারিবে :—

(১) যাহারা অক্ষয়ী;

(২) যাহাদিগের ঋণের পরিমাণ অল্প বলিয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইয়া পরিশোধ করা যাইবে।

কিন্তু বাংলার অধিকাংশ কৃষক ঋণভারপীড়িত—যতক্ষণ তাহাদিগের ঋণ মিটাইয়া দিয়া তাহা পরিশোধ করা না হইবে,

ততক্ষণ তাহারা অসহায় ও নিরুপায়। বিশেষ আর্থনীর প্রভৃতি দেশের মত বাংলায় অনেক জমি লইয়া চাষের ব্যবস্থা নাই— কৃষকরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে চাষ করিয়া কোনরূপে দিনপাত করে। যিনি পঞ্জাবের কৃষকের অবস্থা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন, সেই মিষ্টার ডালিং বলিয়াছেন,—তাহার মনও তাহার ক্ষেত্রের মত সর্পিণ (“as narrow as the plots he cultivates.”)

এই অবস্থায় ঋণ মিটাইবার ব্যবস্থা না করিয়াই ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠায় বাংলার অধিকাংশ কৃষকের—প্রায় সব কৃষকের উপকার হইবে না। তবে ইহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া শিক্ষিত যুবকরা যদি কৃষিকার্যে প্রবৃত্ত হন তবে তাহাতেও মঙ্গল হইবে। যাহারা বলেন, বাংলায় একসঙ্গে অধিক জমি পাওয়া যায় না, তাহা বা বাংলার সকল ভাগের বিষয় অবগত নহেন। কারণ দেখা গিয়াছে নদীয়া, যশোহর ও মুর্শিদাবাদ জিলায় অনেক জমি পতিত আছে এবং সেচের ব্যবস্থা করিতে পারিলে বীরভূম ও বাঁকুড়া জিলায়ও উপযুক্ত পরিমাণ জমির অভাব হয় না।

এই জন্য ঋণ মিটাইবার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন বিষয়ে আমরা বাংলা সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। সে ব্যবস্থা না হইলে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের দ্বারা আশাহুরূপ ফললাভ সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না।

শত কোটির অধিক টাকার ঋণভারে যে পিষ্ট লোক মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইবে, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? কেবল তাহাই নহে—মহাজনের নিকট ও জমিদারের নিকট তাহার ঋণের প্রকৃত পরিমাণ কি, তাহাও অনেক কৃষক জানে না। এত দিন যে ব্যবস্থা চলিয়া আসিয়াছে তাহার “সর্বোচ্চ কত”। প্রজার জন্য শাসকদিগের সহায়ভূতি যে ছিল না, তাহা বলা যায় না; কিন্তু সে সহায়ভূতি সুপ্রযুক্ত হয় নাই বলিয়াই প্রজা তাহাতে উপকৃত হয় নাই। বন্দী প্রজাস্বয় বিধায়ক আইন শাসকদিগের সহায়ভূতির পরিচায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে প্রজা যে আশাহুরূপ উপকৃত হইয়াছে, এমন বলা যায় না। ইংরেজ এদেশে রাজস্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার চেষ্টায় যে “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” ভূমিরাজস্ব জমিদারের সহিত চুক্তি করিয়াছিলেন, তাহাতে যে মধ্যবর্তী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে, তাহারা শিক্ষিত এবং সজ্জিত—সুতরাং

অজ্ঞ ও দরিদ্র প্রজা তাঁহাদের আইন-অতিক্রম নিবারণ করিতে পারে না। কি ভাবে অনেক জমিদারের সেরেস্তার কাজ হয়, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। আমরা একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। ১৯৪ খৃষ্টাব্দে সারণ জেলায় জরিপ ও বন্দোবস্ত সম্বন্ধে সরকার যে বিবৃতি প্রকাশ করেন, তাহাতে লিখিত ছিল—

“Illegal enhancement of rent, oppression by the landlords and consequent discomfent among the tenantry were found to be prevalent to a greater or less degree in nearly all parts of the district.”

অর্থাৎ জিলার সকল অংশেই অল্প বা অধিক পরিমাণে বেআইনী খাজনাবৃদ্ধি, জমিদারের অত্যাচার ও সেই কারণে প্রজার মনে অসন্তোষ লক্ষিত হইয়াছে।

কোন প্রসিদ্ধ ও দানশীল জমিদারের জমিদারী সম্বন্ধে ঐ বিবৃতিতে লিখিত হয় :—

“The rayats complained not so much that the rates arbitrarily fixed by the Raj officials were more than they could afford to pay, but the constant changes in the rent rolls had destroyed all sense of security.”

অর্থাৎ জমিদারের কর্মচারীরা বখেছা খাজনা ধাৰ্য্য ত করিয়াই ছিলেন; তাহার উপর আবার শেহা করণ প্রভৃতি বার-বার পরিবর্তন করার প্রজার ঠিকিয়া ও খাজনা সম্বন্ধে কোন স্থিরতাই ছিল না!

সরকার এই সব ব্যাপারের প্রতিকারকল্পে থাকবন্ত জরিপ ও বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু ইতিপূর্বে কখন প্রজার ঋণ পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা হয় নাই। বহু দিন পূর্বেই যে প্রজার ঋণভারের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার প্রমাণে আমরা কমিটি অব মার্কেটের নির্দারণ উদ্ধৃত করিয়াছি বটে, কিন্তু সে নির্দারণও কার্যে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

প্রজাস্বত্ব আইনে প্রজাকে সে অধিকার প্রদান করা হইয়াছে, তাহা যে মহাজনের হস্তগত হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচিত হয় নাই। বলা বাহুল্য, কেহ কেহ বলিবেন—প্রজা যদি তাহার অধিকার রক্ষা না করে, তবে কে তাহার ঋণ তাহা রক্ষা করিতে পারে? কিন্তু তাহার উত্তরে বলিতে হয়, যে-দেশে শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক নহে, সে-দেশে সরকারকে অল্প দেশ অপেক্ষা প্রজার স্বার্থরক্ষার-অধিক অবহিত হইতে হয়।

সরকার তাহা বুঝিয়াই সমবায় ঋণ দান সমিতি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আর সেই জন্ত আজ জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইতেছে। যাহাতে এই অল্পটান সাফল লাভ করে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা দেশের লোকের কর্তব্য এবং তাহা হইলেই ইহা এক দিকে যেমন স্বাবলম্বী হইতে পারিবে অপর দিকে তেমনই প্রকৃত কৃষকের ঋণ সম্বন্ধে একট ব্যবস্থা হইলে তাহার পক্ষে এই সব ব্যাঙ্ক হইতে আবশ্যিক অর্থ লইয়া জমির ও চাষের প্রকৃত উন্নতি সাধন কর সম্ভব হইবে।

ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা কিরূপ হইবে, তাহার আভাস আমরা পূর্বে দিয়াছি। কিরূপে ইহার মূলধন সংগৃহীত হইবে তাহাও জানিবার বিষয়, সন্দেহ নাই। ব্যাঙ্কের সদস্তদিগকে অংশ বিক্রয় করিয়া প্রথমতঃ মূলধন সংগৃহীত হইবে যিনি যত টাকার অংশ ক্রয় করিবেন, তাঁহার দায়িত্ব কখন তাহার অতিরিক্ত হইবে না। লাভ হইলে লাভের টাকার শতকরা ৭১ টাকা সঞ্চয়-ভাণ্ডারে জমা হইবে এবং অবশিষ্ট ২৫ টাকা মাত্র লভ্যাংশ বোনাস বা বৃত্তি প্রভৃতি বাবদে ব্যয়িত হইবে। ব্যাঙ্ক মূলধন হিসাবে যত টাকা সংগৃহীত হইবে তাহার সহিত সঞ্চয়-ভাণ্ডারের তহবিল যোগ করিয়া মোট টাকার বিশ গুণ টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ হিসাবে লইতে পারিবেন। বন্দী কেস্ট্রী সমবায় ব্যাঙ্ক এই টাকা ঋণ দিবেন এবং কেস্ট্রী জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সব জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক এই সমবায় ব্যাঙ্কের সহিত সংযুক্ত থাকিবে। ব্যাঙ্ক ‘ডিবেঞ্চার’ করিয়া টাকা সংগ্রহ করিবেন এবং যত দিনের জন্ত “ডিবেঞ্চার’ থাকিবে, সরকার তত দিনের জন্ত সুদের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। মোট ‘ডিবেঞ্চার’ ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার অধিক হইতে পারিবে না। কেস্ট্রী সমবায় ব্যাঙ্কের এই কাজের জন্ত স্বতন্ত্র বিভাগ থাকিবে। যাহাতে গৃহীত ঋণের টাকা যথাযথ ভাবে থাকে, তাহা দেখিবার জন্ত সমবায় সমিতিসমূহের রেজিষ্টারই প্রথম ট্রাষ্টি থাকিবেন এবং জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি যে বন্ধকী দলিলে টাকা ধার দিবে, তাহা তাহারা কেস্ট্রী সমবায় ব্যাঙ্কের ও ঐ ব্যাঙ্ক ট্রাষ্টির বরাবর লিখিয়া দিবে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, যাহাতে টাকা-নষ্ট না হয়, সেই

জমি ঋণদান সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বিত হইবে। যাহাতে খাতক যথাকালে সুদ ও আসলের কিস্তির টাকা দেন, সে-বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইবে। যাহাতে খাতক বাহিরে কোথাও আবার ঋণ করিলে তাহা নিয়ন্ত্রিত করা যায়, সেই জমি তাঁহাকে তাঁহার ঋণের হিসাব বার্ষিক ব্যাঙ্কে দাখিল করিতে বাধ্য থাকিতে হইবে। যদি কোন কারণে অল্পদিনের জমি সমবান্-সমিতি হইতে বা অন্য কোথাও ঋণ গ্রহণ করিতে হয়, তবে সে জমি ব্যাঙ্কের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

ব্যাঙ্ক তাহা করিলে এমন সর্ভও করিতে পারিবেন যে খাতক—

(১) কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের মারফতে বীজ ও যন্ত্রপাতি কিনিবেন এবং

(২) ঐরূপ নির্দিষ্ট ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের মারফতে পণ্য বিক্রয় করিবেন।

ইহার ফলে ঐরূপ বীজাদি বিক্রয়ের ও ফসল বিক্রয়ের প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইবে, এমন আশাও করা যায়।

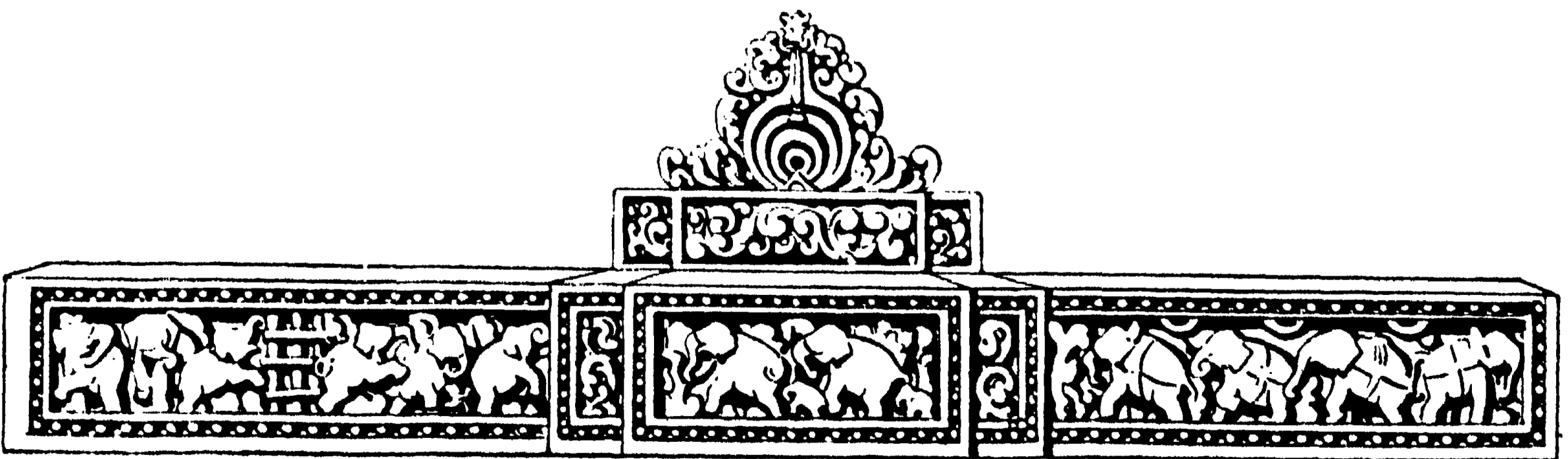
ঐরূপে কতকগুলি পরম্পরাপেক্ষী প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত হইলে যে বাঙালীর স্থায়ী উপকার হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

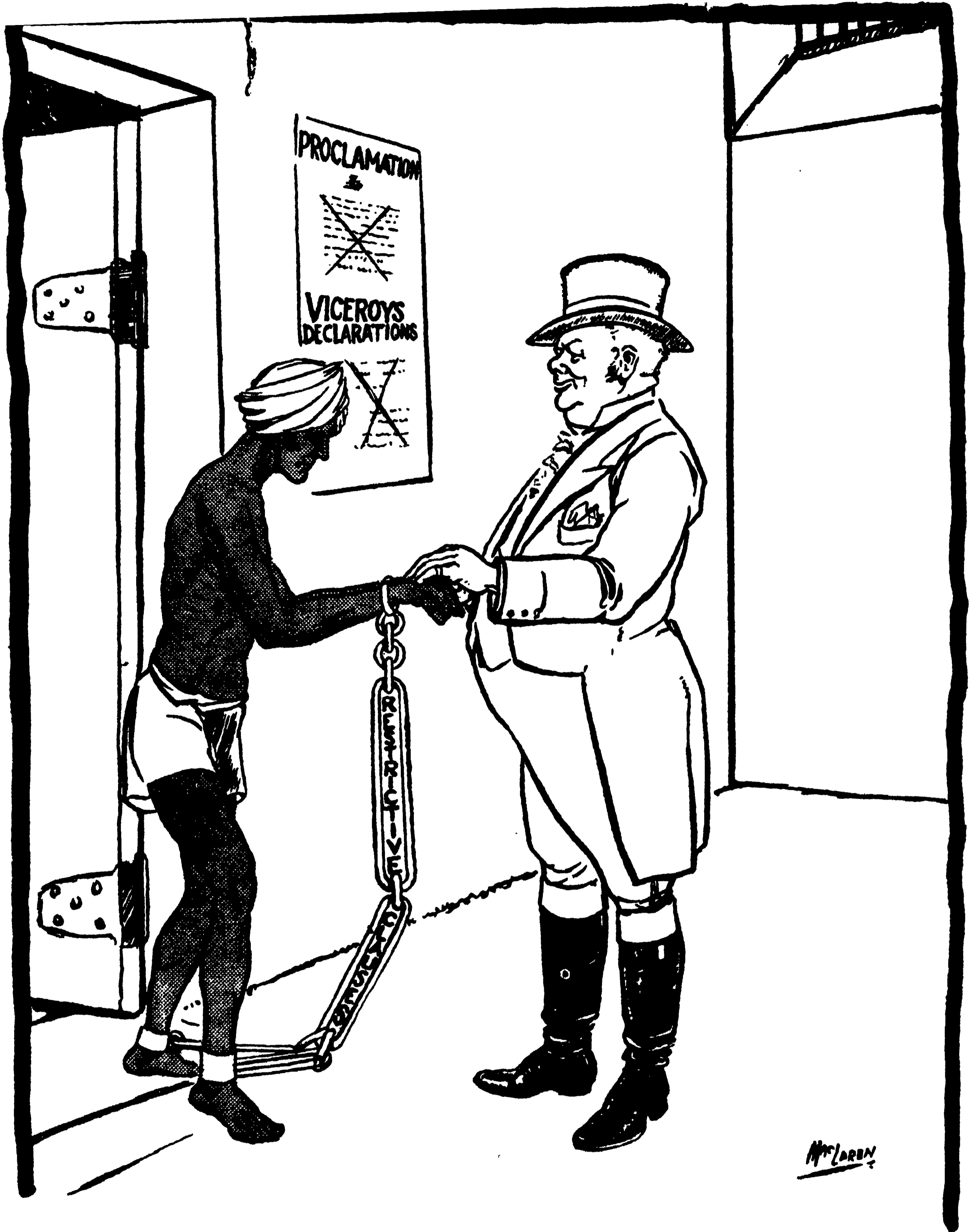
বর্তমানে যে ব্যবস্থা হইল, আমরা তাহার পরিচয় প্রদান করিলাম। যাহা পাওয়া গেল, তাহা কিন্তু আমরা ঘেঁষে বলিয়া নিশ্চিত হইতে পারি না। সরকারও বলিয়াছেন, ইহা আরম্ভ এবং ইহা পরীক্ষা। আমরা সর্বাঙ্গতঃ করণে

এই আরম্ভের জমি আশা ও আনন্দ প্রকাশ করিতেছি, এই পরীক্ষার সাফল্য কামনা করিতেছি।

আমাদিগের আশা ও কামনা, এই পরীক্ষা সফল হউক; কারণ, তাহা হইলে এই অল্পদিনের প্রসার সাধিত হইবে— যাহাদিগের জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক উদ্ভিষ্ট সেই কৃষক-সম্প্রদায়— বাংলার সেই কোটি কোটি বিপন্ন অধিবাসী উন্নতির পথারূঢ় হইবার সুযোগলাভ করিবে। লর্ড কার্জন ভারতবর্ষে কার্যভার ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় বলিয়াছিলেন, কৃষকই ভারতের—এই কৃষক-সাম্রাজ্যের প্রকৃত অধিবাসী। আমরা তাহাকে নগরের আবর্জনার বা ঐশ্বর্যের মধ্যে দেখিতে পাই না—সে সভাসমিতিতে যোগ দেয় না—সে সংবাদপত্র পাঠ করে না, কেন-না সে বর্ণজ্ঞানহীন—সে রাজনীতিচর্চা করে না; কিন্তু ভারতবর্ষের রাজত্বের অধিকাংশ সে-ই প্রদান করে, তাহারই শ্রমের দ্বারা ভারতবর্ষে অর্থ উৎপন্ন হয়। যতক্ষণ তাহার আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হইবে, ততক্ষণ উন্নতির সব চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে—উষরে বীজ বপন হইবে। জাতির শক্তি ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই জনগণের স্তর হইতে উদ্ভূত হয়।

এতদিনে ইহাদিগের অবস্থার উন্নতিসাধনের চেষ্টা হইতেছে—অন্ধকারে আলোকবিকাশ-সূচনা লক্ষিত হইতেছে। এই চেষ্টায় বিরত হইলে চলিবে না—ইহা যাহাতে সুপ্রবৃত্ত হয়, সেই বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। বাংলা-সরকার পথনির্দেশ করিয়াছেন; এখন কার্যভার আমাদিগকেই গ্রহণ করিতে হইবে।





“হালফ্যাশনের স্বাধীনতা” !

পা.ল.মেন্টের হাউস-অফ-কমন্সের ভূতপূর্ব সভ্য ও হৃদয় ব্যঙ্গচিত্রকর মি: এডওয়ার্ড ম্যাকলারেন কর্তৃক ‘বর্তমান’ রীতিনীতি পত্রের জন্ম বিশেষভাবে অঙ্কিত। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার যোগ্যপত্র নাকচ করিয়া, লর্ড আকইনের প্রচার-বাণী উপেক্ষা করিয়া, নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের নামে যে অতিনব ‘বেশপত্র’ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে স্বাধীনতার নামে “রুম-কাক-ক”-রূপী দৃঢ়তর বন্ধনের আরোজন হইয়াছে। এই চিত্রে শিল্পী এই কথাটি নিপুণ ভাষে পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছেন।

শিশুসাহিত্য

শ্রীঅনাথনাথ বসু

আমাদের বাংলা ভাষা শিশুসাহিত্যে সমৃদ্ধ নয়, এ-কথা বলিলে বোধ করি বিশেষ অত্যাক্তি করা হয় না। হয়ত পঁচিশ পঞ্চাশ বৎসরের পূর্বের অবস্থার সহিত তুলনা করিলে শিশুদের পাঠোপযোগী গ্রন্থের সংখ্যা এখন অনেক বাড়িয়াছে, কিন্তু দেশের অভাবের ও অন্য দেশের অবস্থার তুলনায় ইহা মোটেই যথেষ্ট নয়। জেনেভায় জঁ জ্যাক্ রুসো অ্যাস্টিটুট (Jean Jacques Rousseau Institute) নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। তাহারই এক অংশে বুরো দ্য'হুক্যাসিঁ ও অ্যাটারগ্লামশিওনাল (আন্তর্জাতিক শিক্ষাদপ্তর) নামক দপ্তরের একটি গৃহে পৃথিবীর অনেক দেশের শিশুসাহিত্য সংগৃহীত হইতেছে। প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ আমাকে এই শিশুসাহিত্য-গ্রন্থাগার দেখাইতে দেখাইতে যেখানে ভারতীয় গ্রন্থগুলি রাখা হইয়াছে তাহা দেখাইয়া বলিলেন, “আপনাদের দেশের বেশী বই আমরা পাই নাই, আপনাদের শিশুসাহিত্যের অবস্থা কেমন?” পাশেই ক্ষুদ্র দেশ চেকোস্লোভাকিয়ার গ্রন্থগুলি রাখা দেখিলাম, সেলফের দুই-তিন খাক ভরিয়া রহিয়াছে; ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় লিখিত কয়েকটি মাত্র গ্রন্থ সেখানে দেখিতে পাইলাম। এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ শিশুসাহিত্যের একটি তালিকা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইল যে, আমাদের দেশে শিশুসাহিত্য বিশেষ পরিপুষ্ট নহে, তবে দেশে যতগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলিও এখানে আসে নাই। বাহিরের লোকের কাছে যাহাই বলি না কেন, নিজের মনে বুঝি যে আমাদের দেশের সাহিত্যিকগণ এ-দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন নাই; দেশের অভিভাবকগণও শিশুসাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এ-কথা উঠিতে পারে যে, আমরা দরিদ্র স্মৃতরাং শিশুসাহিত্যের ক্রেতা মেলা ছলভ; কথাটার মধ্যে আংশিক সত্য নিহিত থাকিলেও কথাটা পুরাপুরি সত্য নহে। যে-দেশে উপন্যাস গল্পের বইয়ে পুস্তকের বাজারে বন্যা চলিয়াছে, সে-দেশে মনোজ্ঞ শিশুসাহিত্যের ক্রেতার অভাব ঘটিবে

এ-কথা সত্য নহে। তবে হয়ত দেশের লোককে এ-বিষয়ে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে, শিশুসাহিত্যের প্রয়োজনীয়তার দিকে দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে। এই শিক্ষার যে একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি। আমাদের দেশের সাধারণ অভিভাবক ও শিক্ষকগণ শিশুদের হাতে বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, কথামালা তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হন, ভাবেন তাঁহাদের কর্তব্যের শেষ হইল; বাকিটুকুর বরাত তাঁহারা টেকস্ট-বুক কমিটির হাতে দেন। টেকস্ট-বুক কমিটির দ্বারা অনুমোদিত শিশুদের উপযোগী বলিয়া বর্ণিত সাধারণ গ্রন্থের স্বরূপ কি, তাহা সেই বইগুলি খুলিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়; তাহাদের মধ্যে ভাল গ্রন্থ যে নাই তাহা বলিতেছি না। তবে তাহাদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। কোন কোন দায়িত্ববোধপূর্ণ অভিভাবক হয়ত ইহার উপরে বড়জোর একখানা রামায়ণ বা মহাভারত কিনিয়া দেন। যে-যুগে শিশুবোধকই ছিল শিশুদের একমাত্র সাহিত্য, তাহার চেয়ে এ-অবস্থা অনেক উন্নত এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই উন্নতিতে আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার কিছু নাই। এক হিসাবে শিশুবোধকের যুগেও আমাদের দেশের শিশুরা যাহা পাইত, আজ তাহা হইতে বর্তমান কালের শিশুরা বঞ্চিত হইয়াছে। তখনকার দিনের ছড়া ও রূপকথাগুলি ছিল সে-যুগের শিশুসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। ছড়াগুলি লোপ পাইতেছে, রূপকথাগুলি আমরা তুলিতে বসিয়াছি; রূপকথা ও ছড়া বলিতে পারেন এমন দিদিমা ঠাকুরমার সংখ্যা আজ অতি অল্প। অথচ এগুলি শিশুসাহিত্যের অপূর্ব রসবস্ত। অনেক দিন পূর্বে শুনিয়াছিলাম কেহ কেহ ছড়াগুলি সংগ্রহ করিতেছেন, সে-সংগ্রহের কি হইল জানি না।* সেগুলি যদি লোপ পাইবার পূর্বে সংগৃহীত হয় তাহা হইলে যে দেশের শিশুরা কৃতজ্ঞ হইবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

* মুদ্রিত বাংলা ছড়ার বহি আছে। কিন্তু তাহা যথাযথ সংগ্রহ নহে।—প্রবাসীর সম্পাদক।

তাহা ছাড়া সে-যুগে রামায়ণ মহাভারত সকলেই পাঠ করিত, শিশুরাও মাতৃমুখে রামায়ণকাহিনী ও মহাভারতের উপাখ্যানগুলি শুনিয়া পাঠশালার বর্ণপরিচয় শেষ করিয়াই আমাদের দেশের এই দুইটি অপূর্ণ সাহিত্যগ্রন্থে প্রবেশ-অধিকার লাভ করিত। এক হিসাবে কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের রচনা পাঠ করিতে প্রভূত পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না; সুতরাং শিশুরাও ইহা উপভোগ করিতে পারে। কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাসের ইহাই বিশেষত্ব যে, আবালবৃদ্ধ-বনিতা তাহাদের মধ্যে আপন আপন চিত্তবিকাশ অনুধায়ী রস লাভ করে। এই সার্বজনীনত্ব বর্তমান কালের কোন গ্রন্থের আছে কি-না সন্দেহ। যাহা হউক, পঞ্চাশ এক-শ বৎসর পূর্বে সমাজের গঠন ছিল অন্য ধরণের এবং তাহারই সহিত মিলাইয়া শিশুসাহিত্যের প্রচলনও ছিল। তখন শিশুর নিজস্ব অধিকারের কথা কেহ বলিত না, শিশুজীবনকে তখন পরিণত জীবনের ক্ষুদ্র সংস্করণ রূপে গ্রহণ করিয়া সেই দৃষ্টি হইতে শিশুসাহিত্য সৃষ্ট হইত। এই যুগের আর একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবার বিষয়। তখন অতি অল্প লোকেই লেখাপড়া শিখিত, সুতরাং তখনকার শিশুসাহিত্যের অধিকাংশ লিখিত না হইয়া কথিত আকারেই প্রচার লাভ করিয়াছিল।

তাহার পর অনেক কাল গিয়াছে! বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন “বর্ণপরিচয়” লিখিলেন তখন শিশুবোধকের উপর কতটা উন্নতি হইল তাহা আমাদের পক্ষে আজ ধারণা করা কঠিন। বিদ্যাসাগর প্রথম শিশুসাহিত্য রচনায় মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলির সহায়তা লইলেন, কিন্তু তখন ছিল মনোবিজ্ঞানের শৈশবকাল; তাহার পর মনোবিজ্ঞানেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু শিশুসাহিত্য-রচনায় তাহার ব্যবহার উন্নতির অমুরূপ হয় নাই। এখনও আমরা পরিণত বয়স্কের দৃষ্টি লইয়া শিশুসাহিত্য রচনা করিতেছি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এই মনোভাব হইতে মুক্ত ছিলেন না। তবে ভুবনের মাসীর কর্ণকর্ণনের ব্যাপারে শিশুরা কোন শিক্ষা লাভ করুক বা না-করুক, যথেষ্ট আনন্দ যে লাভ করিত এটা নিজেই অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি।

শিশুসাহিত্য-রচনার মাপকাটি কি? বর্তমান কালের শিশুপাঠ্য গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে এই মাপকাটির ঠিক সন্ধান মেলে না; তাহাদের মধ্যে কতকগুলো দেখি পরিণত বয়স্কের

মাপকাটি দিয়া লেখা। এগুলির সম্বন্ধে পূর্বে কিছু বলিয়াছি, পরেও বলিব। মনে পড়িয়া গেল কে এক জন এই শ্রেণীর কোন কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, জনহীন মরুভূমিতে সঙ্গীর একান্ত অভাব ঘটিলেও তিনি সেগুলো পড়িবেন না। দ্বিতীয় শ্রেণীর বইগুলি দেখিলে মনে হয় শিশুদের আনন্দ দিবার একটা চেষ্টা সেগুলির মধ্যে আছে। কিন্তু সে-চেষ্টার মধ্যে কোন চিন্তা ও সংযম নাই। সেইটাই দুঃখের কথা। অন্য ক্ষেত্রেও সাহিত্য-সৃষ্টিচেষ্টায় সূচিস্থিত ও সংযত চিন্তার প্রয়োজন আছে সত্য, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োজনীয়তা আরও অধিক। কারণ যাহাদের হাতে এই গ্রন্থগুলি দিব তাহাদের বিচারশক্তি পরিণত নহে, ভাল-মন্দ বাছিয়া লইবার ক্ষমতা তাহাদের হয় নাই; সুতরাং খারাপ গ্রন্থ তাহাদের যত ক্ষতি করিতে পারে অতের বেলায় ততটা পারে না। এইজন্যই শিশু-সাহিত্য-রচনার দায়িত্ব অনেক বেশী। দুর্ভাগ্যক্রমে সকল লেখকের মধ্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না।

অনেকে বলেন, শিশুসাহিত্যের মাপকাটি হওয়া উচিত চরিত্রগঠন, জ্ঞানদান বা এমনই একটা কিছু। সাহিত্যের যে প্রাথমিক উদ্দেশ্য আনন্দদান সেটাকে স্বীকার করিয়াও তাহাকে তাঁহারা গৌণ মনে করেন। সুতরাং তাঁহাদের রচিত শিশুসাহিত্য নীতি-শিক্ষারই একটি আলাদা সংস্করণে পরিণত হয়। এ যেন চিনি-মাখান কুইনিনের বাড়ি। শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে ইহার উদাহরণ আমরা পদে পদে পাই।

এখানে শিশুসাহিত্যের উদ্দেশ্য বিচার করিবার স্থান নাই। আমাদের মতে শিশুসাহিত্যের মুখ্য আদর্শ আনন্দ-দান, শিক্ষা বা চরিত্রগঠন বা জ্ঞানদান গৌণ; সেটাকে আনন্দের by-product বা ‘কাউ’-স্বরূপ লওয়াই উচিত এবং শিশুসাহিত্য-রচনায় এই আদর্শ আমাদের মনে সর্বদা জাগ্রত থাকা উচিত। এক জন বলিয়াছিলেন আমরা বাহিরের তথাকথিত বাজে বই পড়িয়া যাহা শিখি তাহার অতি সামান্য অংশই তথাকথিত কাজের বই পড়িয়া পাই। কথাটা অত্যন্ত সত্য। যে-বই আনন্দ দেয় তাহা জীবনে ছাপ রাখিয়া যায়, আর যে-বই পড়িতে পদে পদে কষ্ট ও চেষ্টা করিতে হয়, মনের সমস্ত শক্তি তাহারই মধ্যে নিঃশেষিতপ্রায় হইয়া যায়,



ক্ষুধার্ত

শ্রীদীপ্তিনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শেখার শক্তি আর থাকে না মনোবিজ্ঞানও এ-কথার সমর্থন করে।

এ-কথা যেন কেহ মনে না করেন যে, আমি তপস্কার কথা অস্বীকার করিতেছি। ভাল সাহিত্য চর্চা করিতে তপস্কার প্রয়োজন; শিশুদেরও ভাল সাহিত্যে প্রবেশ-অধিকার দিতে হইবে। কিন্তু যাহা প্রাণ মন দিয়া চাই, যাহা ভালবাসি, যাহার রস কিছু অমুভব করিতে পারিয়াছি আমরা তাহারই জন্ত তপস্কা করি। সাহিত্যের রসবোধ জাগ্রত হইবার পূর্বেই যদি নীতিশিক্ষার মুখব্যাধান শিশুচিন্তে ভীতির সঞ্চার করে তবে সে শিশুসাহিত্যকে দূর হইতেই নমস্কার জানায়। আমাদের দেশের অতি অল্প লোকেই যে পর-জীবনে লেখাপড়ার চর্চা রাখে, ভাল ভাল বইয়ের সহিত পরিচয় রক্ষা করে, তাহার কারণ শৈশবের এমনই একটা ট্রাজেডি। বর্ণপরিচয়ে বিপত্তির প্রভাব জীবনের ক্ষেত্রে অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়ায়। অথচ কথাটা আমরা তেমন করিয়া ভাবি না।

ব্যাপারটা মূলে এই যে, যাহাকে লইয়া আমাদের কারবার, তাহার মনের খবর আমরা বিশেষ রাখি না। শিশুসাহিত্য-রচনার একমাত্র মাপকাটি শিশুমনের ক্রমবিকাশ ও সেই ক্রমবিকাশের প্রত্যেক পর্য্যায়ের অমুযায়ী প্রয়োজন। যেমন দেহের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তেমনই মনোবিকাশের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকারের সাহিত্যের প্রয়োজন হয়। দেহ একবার পুষ্ট হইলে তখন খাদ্যের ভেদাভেদের বিশেষ আবশ্যিকতা থাকে না, কিন্তু সে-অবস্থায় পৌছাইবার পূর্বে এ-বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার হয়। মনের ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটে। সেইজন্তই এই শ্রেণীর সাহিত্য-রচনার এত সতর্কতা চাই।

এতক্ষণ শিশুসাহিত্য কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছি; উপরে যাহা বলিলাম তাহাতে বোঝা যাইবে ইহার মধ্যে শ্রেণী-ভাগ ও স্তর-ভাগ আছে, মনোবিকাশের ক্রম-অমুযায়ী এই শ্রেণী-ভাগ ও স্তর-ভাগ হয়। আমাদের দেশে সাধারণতঃ যৌবন-বিকাশ হয় ষোল-সতের বৎসর বয়সে; তাহার পূর্বে পর্য্যন্ত কালকে মোটামুটি তিনটি ভাগে আমরা ভাগ করিতে পারি; পাঁচ-ছয় বৎসর পর্য্যন্ত অবস্থা শৈশব, পাঁচ-ছয় হইতে এগার-বার বৎসর পর্য্যন্ত অবস্থা বাল্য ও তাহার পরে যৌবনারম্ভ

পর্য্যন্ত কালকে কৈশোর বলা যাইতে পারে। স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে এই হিসাবে এক-আধ বৎসর কম-বেশী হইতে পারে, তবে মোটামুটি ভাবে এই হিসাব ঠিক বলিয়া লওয়া যাইতে পারে। এক্ষেত্রে এ-কথা বলা প্রয়োজন যে, এই ভাগ-গুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন নহে, অর্থাৎ এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থার বিকাশ ক্রমশগতিতে হয় বলিয়া তাহাদের কোন একটির সঠিক সীমা ও সুপরিষ্কৃত সীমা নির্দেশ করিতে পারা যায় না। তবে এ-কথাও ঠিক যে প্রত্যেক অবস্থারই এক একটা বিশেষত্ব আছে। কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালে উভয় অবস্থারই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়।

শৈশবে শিশুর জগৎ একান্তই তাহার আপনাকে লইয়া; তাহার খেলাধুলা সকল কিছুরই কেন্দ্র সে নিজে। সে যখন খেলার সঙ্গী চায় সে তাহার নিজের আনন্দের জন্ত, আত্মতৃষ্টি, আত্মঅভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্ত। ইহাকে স্বার্থপরতা বলিতে পারি, কিন্তু সে স্বার্থপরতা জীবনরক্ষার জন্ত অত্যন্ত প্রয়োজন। পরবর্তীকালে স্বাভাবিক বিকাশ লাভ করিলে শিশুচিন্ত এই স্বকৃত স্বার্থপরতা হইতে ধীরে ধীরে মুক্তিলাভ করে, স্বার্থপরতার গণ্ডি ধীরে ধীরে বিস্তৃততর হইয়া পরার্থপরতা দেখা যায়; শিশু সামাজিক জীব হইতে শেখে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই বিকাশের পথে বহু বাধাবিলম্ব আসে; একদিকে হয় স্বার্থপরতা রক্ষা করিবার চেষ্টা চলে, না-হয় অসময়ে শিশুকে সামাজিক করিবার, ভদ্র করিবার প্রয়াস দেখা দেয়। তাহাকে নানারূপ নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়; অবিকশিত চিত্ত শিশুর নিকট এই শ্রেণীর শিক্ষার কোন মূল্য নাই; ঠিক এই বয়সটায় সে নীতিবিধানের উর্দ্ধে।

এই বয়সে মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যোগ অত্যন্ত বিকশিত অর্থাৎ পরবর্তী বয়সে ইন্দ্রিয়বিকার ঘটিলে যে মানসিক নানাবিধ উপাধিদ্বারা আমরা অর্থ নির্ণয় ও বিচার করি, সেগুলির তখনও সৃষ্টি না হওয়াতে তখন প্রত্যেক অমুভূতির মূল্য অনেক বেশী হয়। শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে মনোজগতের এই ব্যাপারটার মূল্য অনেকখানি। এই জন্তই শিশুসাহিত্যে প্রত্যেক অমুভূতির ধোরাক যথেষ্ট পরিমাণে থাকা প্রয়োজন। আমাদের দেশে শিশুসাহিত্যে ভাল ছবি থাকে না; যাহা থাকে তাহা অত্যন্ত নিরুৎশ্রেণীর। অথচ চোখের সাহায্যে শিশু যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষালাভ করে, অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বোধ করি

ততটা পারে না। ভাল ভাল ছবি-দেওয়া বইয়ের অভাব হওয়াতে অনেক সময়ে স্থলিখিত বইয়ের মূল্য কমিয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশে এইভাবে শিক্ষা দিবার যে আয়োজন হইয়াছে তাহা আমাদের দেশে প্রবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন।

পড়িতে গেলে নানা ইঞ্জিরের যে সমবায়ের (co-ordination) প্রয়োজন নৈশবে তাহার একান্ত অভাব; তাই তখন ইঞ্জিরগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে লইয়া তাহাদের বিকাশ চেষ্টা করা প্রয়োজন হয়। চোখের ব্যবহারের কথা কিছু বলিয়াছি। এইবার কানের কথা বলি। এককালে আমাদের দেশে নানারকমের ছড়া প্রচলিত ছিল, শিশুরা সেগুলি শুনিতে, তাহাদের মনের অঙ্গুল্য তাহার রস আনন্দ করিত; ধীরে ধীরে তাহার ভিতর দিয়া কাব্যবোধ ছন্দবোধ জন্মাইত। আমার এই কথাটির মধ্যে কিছু পরিমাণ অত্যুক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা যে আংশিকভাবে সত্য এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজকাল ছড়াগুলি আমরা হারাইয়াছি, কিন্তু তাহাদের স্থান অধিকার করিতে পারে এমন কিছু সৃষ্টি করি নাই। শিশু-কবিতার নামে প্রচলিত কবিতাগুলি নীতিশিক্ষার জন্য রচিত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশের মধ্যে ছন্দ নাই, শব্দসঙ্গীত নাই, আছে শুধু নীরস নীতিকথা; সেগুলি শিশুচিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে না।

এক 'ধুমপাড়ানি গান' বাদ দিলে শিশুদের উপযোগী গান আমাদের দেশে কোনদিনই বেশী ছিল না। অথচ সকল পিতা-মাতাই জানেন শিশুরা ছন্দ ও গান কত ভালবাসে। ইহার কোন আয়োজনই কি আমাদের গান-রচয়িতা ও সাহিত্যিকগণ করিতে পারেন না?

শৈশবে ছেলেমেয়েরা গল্প বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা ভালবাসে কি-না সন্দেহ; তাহারা যে-শ্রীীর গল্প ভালবাসে তাহা অত্যন্ত সরল; তাহার মধ্যে গুটী আছে কি-না চরিত্র-চিত্রণ আছে কি-না সে-বিষয়ে তাহারা দৃষ্টি দেয় না। বোধ করি এই বয়সে কথার একটা মোহ আছে, সেই মোহের অন্তর্গত শিশু ছড়া গান কবিতা গল্প শুনিতে চায়। তাই দেখি একই গল্পের পুনরাবৃত্তিতে শিশুচিত্ত ক্লাস্তিবোধ করে না। শিশু যে রূপকথা ভালবাসে সে-ভালবাসাও তখন পরিপূর্ণ লাভ করে না; বাল্যে সে-ভালবাসা সত্যই ভালবাসা হইয়া দাঁড়ায়। তবুও শৈশবে রূপকথার মূল্য অনেকখানি;

কল্পলোকে বিচরণ করার শক্তি শিশুর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আছে। তাহারই উপাদান হয় এই রূপকথাগুলি।

যে ভাষা শিশু বলে ও শোনে তাহা ছাড়া যে একটি মনগড়া সাধুভাষা আছে শিশুর পক্ষে তাহা একান্তই অবাস্তব; সুতরাং শিশুর কণ্ঠে তাহা দিবার চেষ্টা অগ্রায়। ইহার জন্য যে মানসিক পরিশ্রম প্রয়োজন শিশুর পক্ষে তাহা কঠিন; তাহাতে যে সময় যায় তাহার মূল্যও কিছু নাই। আর সেই চেষ্টা করিতে গিয়া শিশুর সামগ্রিক শক্তির যে অপব্যয় হয় তাহার ফলে অন্তত যেখানে তাহার শক্তি-প্রয়োগ স্বাভাবিক-ভাবে প্রয়োজন সেখানে তাহা সম্ভব হইয়া উঠে না। সুতরাং শিশুসাহিত্য লিখিতে হইবে তাহাদেরই ভাষায়। পাশ্চাত্য দেশে দেখিয়াছি শিশুদের শব্দসংগ্রহের তালিকা করা হইয়াছে; অর্থাৎ কোন্ বয়সে শিশু কি কি শব্দ ব্যবহার করে বা কোন্ কোন্ শব্দের তাহার প্রয়োজন হয় তাহা স্থির করা হইয়াছে; তাহার পর সেই শব্দগুলি দিয়া শিশুদের উপযোগী গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ফলে সে-সকল গ্রন্থ শিশুরা সহজে পড়িতে পারে, পড়িয়া আনন্দ লাভ করিতে পারে। অযথা অপ্রয়োজনীয় শব্দের ভায়ে শিশুচিত্ত ভারাক্রান্ত হয় না। আমাদের দেশে শিশুরা পড়া আরম্ভ করিয়াই "মানের বই" খোঁজে। দোষ দিব কাহাকে? এ-বিষয়ে আমাদের দেশের শিক্ষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও বলা উচিত। বর্ণপরিচয় বর্ণবোধের যে প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে, তাহা বিকলনমূলক (analytical) ও কতকটা ধ্বনি-অনুসারী (phonetic)। ধ্বনির ও কথার এইরূপ বিচার শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক নহে। বর্তমান মনোবিজ্ঞানের মতে এইরূপ বিকলন (analysis) শিক্ষার দ্বিতীয় ধাপ; প্রথম ধাপে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি সমগ্রভাবে দেখা দেয়, পরে শিক্ষিত জন ত'হাকে ভাঙিয়া-চূড়িয়া বিশ্লেষণ করিতে শেখে। বর্ণপরিচয়ের প্রথম ধাপ বর্ণবোধ নহে, কথাবোধ। সুতরাং "বর্ণপরিচয়"ও নূতন করিয়া লেখার সময় হইয়াছে।*

* চল্লিশ বৎসরের অধিক পূর্বে আমি কথাবোধকে প্রথম ধাপ করিয়া সচিত্র বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ লিখি, এবং তাহা কিরূপে পড়াইতে হইবে, তাহাও লিখিয়া দিই। এ বই এখনও ব্যবহৃত হয়, কিন্তু শিশুগণকে উহা পড়ান হয় পুরাতন রীতিতে, অর্থাৎ বর্ণবোধকে প্রথম ধাপ করিয়া।— প্রবাসীর সম্পাদক।

মুক্তি

শ্রী আশালতা দেবী

৭

যামিনীর স্বভাবের গতি ছিল অত্যন্ত বেগবান এবং চঞ্চল। নিজেকে লইয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা, নিজের মনকে টানাহেঁচড়া করিয়া তাহা হইতে চুনিয়া চুনিয়া চিরিয়া চিরিয়া তৎ উদ্ঘাটন করা এ-সকল তাহার খাতে সয় না। তাহার সমস্তই ষিধাহীন, সোজাসজি। যাহা তাহার ভাল লাগে না, তাহা হইতে লবল বিতৃষ্ণায় সে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং লইবার সময়ে কোন ছলে কোন মিহি এবং মিষ্ট বাক্য দিয়া তাহা ঢাকিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে না। আবার ইহার উল্টা দিকেও সে ঠিক এমনি জোরের সঙ্গে চলে। যেখানে তাহার মন আকৃষ্ট হয় সেখানেও এতটুকু রাখিয়া-ঢাকিয়া চলা তাহার অসাধ্য।

সেই সে মবারের প্রায় সপ্তাহখানেক পরে যামিনী বিকালবেলায় চন্দ্রকান্তের লাইব্রেরী-ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, নির্মলা দরজার দিকে পিছন ফিরাইয়া আলমারী খুলিয়া কি বই বাহির করিতেছে। ঘন কালো চুলের রাশি হাতে, পিঠের উপর, কপোলে সমস্ত জায়গায় অবিচ্ছিন্ন হইয়া ছড়ান। পিছনে পায়ের আওয়াজ পাইয়া সে মুখ ফিরাইয়া কহিল, ‘ও, আপনি এসেছেন! বাবা সেই কখন বেরিয়েছেন, তাঁর কোন এক বন্ধু তাঁকে ছপুয়ের খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এবারে তো তাঁর আসার সময় হ’ল। হয়ত এখনি এসে পড়বেন।’

‘আচ্ছা আমি ততক্ষণ বসছি।’

‘হ্যাঁ, একটু বসুন। এই আলমারীটা গোছান শেষ হ’লেই আমি চায়ের জল চড়াব। বাবার জগে আর পনের মিনিট অপেক্ষা করব। তার পর তিনি না এলেও চা করব, এত অল্পমনস্ক প্রকৃতির লোক! এই যে আলমারীটা দেখছেন এইটে আমি দু দিন অন্তর গোছাই, আবার যেমনকার তেমনি নোঙরা হয়ে যায়।’

যামিনীর কাছ হইতে কোন উত্তর আসিল না। নির্মলা

আপনার হাতের কাজে মন দিল। হঠাৎ যামিনী কহিল, “আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?”

“কি কথা?”

“আচ্ছা, আপনার সঙ্গে ব্যবহারে আমি কি কোন দিন কোন অসঙ্গত আচরণ করেছি বা অগ্রায় কিছু?”

বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া নির্মলা বলিল, “আপনি কি বলছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে।

যামিনী নির্মলার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “অন্ত কেউ হ’লে এইটুকুতেই বুঝত। আপনি ব’লেই পারছেন না। কিন্তু আমিও আর সঙ্কোচ করব না, আরও স্পষ্ট ক’রে বলছি। ধরুন, আপনার বাবার সামনে আপনার সঙ্গে যেমন ব্যবহার করি সকল সময়েই আমার তা-ই করা উচিত। কিন্তু আমি তা পারিনি। আপনি যখন একলা থাকেন তখন আমার ইচ্ছে করে শুধু আপনার দিকেই একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকি। আর তাই থাকিও। আরও অনেক কিছুই ইচ্ছে করে, অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ ক’রে নিই। কিন্তু আপনার বাবার সম্মুখে আপনাকে একদৃষ্টিতে চেয়ে দেখিনি। তাই, যদি মনে করেন কোথাও কোনখানে আমার অগ্রায় হচ্ছে তাহলে আমাকে সাবধান ক’রে দিন। আপনার উপর কোন দিক থেকে এতটুকু অগ্রায় করব তা আমি ভাবতেও পারিনি।”

নির্মলা বিম্বনা হইয়া যামিনীর দিকে চাহিল। আলমারীর পাল্লাটা তখনও খোলা, কালো চুলে তাহার মুখখানি অর্ধ আবৃত। কি একটা অজানা ভয়ে তাহার গলাটা একবার কাঁপিয়া উঠিল। তারপরই আর একটু স্পষ্ট করিয়া সে বলিল, “আপনার কথা আমি এখনও খুব স্পষ্ট ক’রে বুঝতে পারছি নে। কি হয়েছে বলুন তা! আপনি যে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন তা অপরেও লক্ষ্য করেছে।”

যামিনীর মনে হইল নির্মলা এমন সহজ গতিতে কুঠাহীন ভাবে কথা বলিতেছে, যেন এ আর কাহারও কথা। অন্ত

কেহ অপর কাহাকেও বলিতে। কিন্তু যামিনী ভিতরে ভিতরে লক্ষ্য অভিব্যক্ত হইয়া যাইতেছিল। তথাপি একটা কৌতূহলমিশ্রিত উৎসাহে তাহার মনকে নাড়া দিতেছিল। যতদূর কহিল, “কে দেখেছে? বলুন।”

নিজের সম্বন্ধে আলোচনার লক্ষ্যবোধ করিয়াও নির্মলা বলিল, “সে-দিন আমার বৌদি এই ধরণের কি বলছিলেন। আমাকে টিপ্-পরতে অস্বস্তি করছিলেন আপনি দেখে খুশী হবেন বলে। আমি তাঁকে বললুম, আপনি কি সর্বদাই আমার মুখের পানে চেয়ে অত লক্ষ্য করে দেখেন আমি কি পরেছি বা না-পরেছি? আমাকে এত করে দেখবার কি যে মানে বুঝতে পারছি না।”

নির্মলার মনটা ভিতরে ভিতরে একটু খুশী হইয়াছিল, কিন্তু তবু কারণটা ঠিক সে ধরিতে পারিতেছিল না।

“এর মানে যে কি হ’তে পারে তা কি সত্যি তুমি বুঝতে পার না? তুমি কি বুঝবে না.....।” যামিনী হঠাৎ অত্যন্ত আবেগভরে কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। চন্দ্রকান্ত ঘরে ঢুকিতেছেন। আলমারীর পালাটা খুলিয়া রাখিয়াই নির্মলা বিমনাচিত্তে সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সে হাজার দর্শনযোগ্য হইলেও যামিনীর এতখানি বিচলিত হইবার কারণ কি জ্ঞান হইল ভাবিয়া নির্মলা বিস্মিত হইতেছিল। সুন্দর জিনিষ দেখিয়া সে নিজে ত কখনও এমন করে না। আনন্দ ও ভয়মিশ্রিত অচেনা একটা কি অস্বস্তি নির্মলার হৃদয়-দ্বারে আসিয়া উকি দিতে লাগিল। যামিনী চেয়ার হইতে উঠিয়া ঘরময় পাশচারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। চন্দ্রকান্তবাবু তাহার কোন ভাবান্তর লক্ষ্যের মধ্যেই না আনিয়া কহিলেন, “যামিনী, আমাদের নির্মলের সেই মীনাকরা রিটওয়্যাচটা দেখেছ? সেই যে ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী বাড়িতে গিয়ে তার নাম করে তাদের কলেজে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, নির্মলের সেক্সপীয়রের আবৃত্তি শুনে তিনি এতদূর মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তাকে তার উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হয়নি বলে মনটা তাঁর খুঁৎ খুঁৎ করছিল। তাই তাড়াতাড়ি নিজের হাতের ঘড়িটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। দেখবে?...এই আলমারী-তেই সেইটে আছে।”

যামিনী ঘড়ি দেখিবার জ্ঞান বিন্দুমাত্র কৌতূহল না দেখাইয়া কহিল, “আচ্ছা, চন্দ্রকান্ত বাবু, একটা কথা আপনাকে বলব?”

“কি কথা? রোসো আগে ঘড়িটা বার করি। কোথায় রাখলুম ঠিক মনে পড়ছে না। নির্মল, ...নির্মলা—”

“থাক, তাঁকে আর ডাকবেন না। তাঁর সম্বন্ধেই কথা, তাঁর অস্বস্তিভিত্তিতেই বলতে চাই। আচ্ছা চন্দ্রকান্ত বাবু, সত্যি করে স্বীকার করুন, পাত্র-হিসাবে আমাকে আপনি কেমন মনে করেন?”

“পাত্র!” চন্দ্রকান্ত তখনও ঘড়ির খাপটা খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন, একটু আশ্চর্য হইয়া যামিনীর দিকে চাহিলেন। পাত্র সম্বন্ধে কোন কথা যে ভাবা তাঁহার প্রয়োজন আছে, আজ পর্যন্ত তাহা তাঁহার মনে পড়ে নাই।

“ধরুন আমি যদি নির্মলাকে বিয়ে করতে চাই, আপনি কি তাতে রাগ করবেন?...আপনার কি কোন রকম আপত্তি আছে?”

চন্দ্রকান্ত কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন, “নির্মলের বিয়ে! সে-কথা তো এখনও আমি কিছু ভাবিনি।”

যামিনী গম্ভীর ভাবে কহিলেন, “এইবারে ভাবা উচিত।”

চন্দ্রকান্ত তাঁহার টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে অপ্রস্তুতের মত কহিলেন, “ভাবব বইকি। নিশ্চয় ভাবব। ওর বয়স কত হ’ল, এই তুমিই হিসেব করে দেখ না, উনিশ-শো তের সালে জন্ম, এখন আঠারো হ’ল। তাই তো এ-সব কথা এতদিন খেয়াল করিনি।”

আরও অনেকক্ষণ তিনি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া সহসা স্তম্ভোচ্ছিতের মত যামিনীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “আচ্ছা যামিনী, নির্মলার বিয়ের পর আমি তাকে দেখতে পাব ত?”

তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া যামিনীর মনটা আর্দ্র হইল। কিন্তু তাহার পরেই তাহার রাগ হইল, নির্মলার বিবাহের কথা উঠিতেই প্রথম প্রশ্ন তাঁহার মনে জাগিল তাহার স্বখ বা কল্যাণ কামনা নয়, কেবল এখনকার মত তখনও তিনি সর্বদা তাহাকে চোখে দেখিতে পাইবেন কি-না। সে বলিল, “আমার বাবা পশ্চিমের উকীল, আর আমাদের বাড়িও সেখানে। কিন্তু আপনার যখনই দেখবার ইচ্ছা হবে তাঁকে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু আপনি সাধারণের চেয়ে এত অল্প রকম চন্দ্রকান্তবাবু! যার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেখেন তার অবস্থা আতি কুল—এ সকল

বিচার না করে প্রথম ভাবনা আপনার বিয়ের পরেও তাঁকে দেখতে পাবেন কি-না ?”

চন্দ্রকান্ত নিস্তব্ধ হইয়া অগ্রমনে বসিয়াছিলেন ; এখন ধীরে ধীরে কহিলেন, “কিন্তু যামিনী, তোমার বিয়ে তোমার বাবা স্থির করবেন। তাঁর যাকে পছন্দ হবে—।”

যামিনী উত্তেজিত হইয়া কহিল, “কখনো না। আমার বাবা বিয়ে করবেন না। করব আমি।”

চন্দ্রকান্ত তথাপি মৌন হইয়া রহিলেন।

যামিনী পুনশ্চ কহিল, “তাঁদের মত করাবার ভার আমার। কিন্তু তাঁরা যদি সম্মতি দেন তাহলে বলুন আপনার আপত্তি দরবার কিছু নেই।”

চন্দ্রকান্তের মুখ হইতে অক্ষুট স্বরে বাহির হইল, “আমার মার কিসের আপত্তি। নির্মলার বিয়ে হবে সে তো ভাল কথা, স্থখের কথা।”

৮

যামিনীর স্বভাবের গতিশীলতা এমন দ্রুত তাহাকে চালনা করে যে, সে যখন যাহা কামনা করে সমস্ত শক্তি দিয়া তাহাকে ততক্ষণ না আপনার করায়ত্ত করিয়া তোলে ততক্ষণ এক নিমেষের জ্ঞানও ধামিতে পারে না। অনেক সময় এমনও হয় তাহার একাগ্র বাসনাটাই তাহার কাছে সর্বব্যাপী হইয়া উঠে। যাহাকে পাইবার জ্ঞান এত দুর্শ্বদ আকাজক্ষা সেই আসল বস্তুটিই তখন চেষ্টার উগ্রতায় কর্মের জালে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিবার ঘো হয়।

নির্মলার ঈশৎ-উদ্ভিন্ন ঘোবনের উপর স্নিহতার, অপরিমিত শুভ্রতার সে কী অনির্বচনীয় জ্যোতি আসিয়া পড়িয়াছিল। সে রূপ পুরুষের মনকে আচ্ছন্ন করে না, নেশায় মাতাল করে না, কিন্তু সমস্ত মন অধীর হইয়া উঠে এই শুভ্র অচঞ্চল মনের অন্তরালে কী আছে দেখিবার জ্ঞান। হৃদয় লোভাতুর হইয়া উঠে এই অনাহত মনে প্রথম বীণার তারটি ঝঙ্কত করিয়া তুলিতে, ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে প্রথম প্রেমের ভারাতুর ছায়া ঘনাইয়া তুলিতে।

যামিনী কিপ্রগতিতে সমস্ত ঠিক করিয়া আনিল। তাহার বড়দাদা নির্মলাকে পূজার ছুটির পরে দেখিতে আসিলেন এবং পছন্দও করিয়া গেলেন। টাকার কথা

তুলিতেই চন্দ্রকান্ত ছল ছল চক্ষু কহিলেন, “আমার মেয়েটি যদি সুখী হয়, তবে আমার যাহা কিছু আছে তাহাকে দিব।”

বিবাহের ব্যবসাদারী পণ কষাকষির অবশ্য ইহা রীতি নয়। কিন্তু চন্দ্রকান্ত যেমন স্বরে এবং যেমন বাস্পাত্ম্য চোখে কথা বলিলেন, তাহাতে তাহার কথার আন্তরিকতা সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ থাকে না। তাহার উপর তাহার পৈতৃক বাড়িটি তেতলা, বেশ বড়। আর নির্মলা যখন যামিনীর দাদার সম্মুখে বসিয়া সেতার বাজাইল তখন অদূরে তাহার ভূতপূর্ব ওস্তাদ বসিয়াছিলেন। তিনি মাথা নাড়িয়া দু-একটা বিজ্ঞতাসূচক কথা বলিলেন এবং ছাত্রীর বিস্তর সুখ্যাতি করিলেন। যামিনীর দাদা বুঝিলেন যিনি মেয়েকে বেতুন কলেজে পড়াইতেছেন এবং পয়সা খরচ করিয়া গান-বাজনা শিখাইয়াছেন তাঁর অবস্থা নিশ্চয়ই ভাল। তা ছাড়া আত্মকালকার এ রীতিটাও তিনি জানিতেন, যেখানে কল্যাপকের অবস্থা বেশ ভাল সেখানে সুস্পষ্ট ভাষায় দাবির পরিমাণ জানাইয়া দেওয়ার চেয়ে যদি বলা যায়, ‘আপনার সাধ্যমত আপনি দিবেন। আপনাদেরই মেয়ে, তাহাকে যাহা দিতে চান সে আপনারই বিবেচনার উপর নির্ভর করে’, তাহা হইলে ঢের ভাল ফল হয়।’ অতএব তিনিও তাহাই করিলেন।

যামিনীর দাদা বিনোদবাবু পূজার ছুটিতে কলিকাতায় বাড়ি ভাড়া করিয়া সস্ত্রীক আসিয়াছিলেন। মেয়ে দেখিয়া ফিরিয়া যাইবার পরের দিন যামিনী দ্বিতলের একটি শয়ন-কক্ষে ঢুকিয়া কহিল, “বৌ দি, তারপরে দাদা কী বললেন ?”

বৌদি হাসি চাপিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া কহিলেন, “মন্দ নয়।”

যামিনীর মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। বৌদি আড়চোখে একবার তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, “আর রাগ করতে হবে না। না গো তোমার দাদা তা বলেনি। বরঞ্চ বলছিল, ‘মেয়েটি বেশ ভাল। ভায়া যখন আমার কাছে এসে বললে, ওই মেয়েকে ছাড়া সারা পৃথিবীতে সে আর কাউকে বিয়ে করবে না, তখন আমি মনে করেছিলুম ঘোরালো ক’রে কোথাও প্রেমে পড়ে গেছে বুঝি। কিন্তু মেয়েটিকে চোখে দেখার পরে বুঝতে পারলুম—না, এ মুখে এমন একটি শান্ত আভা আর লক্ষ্মী আছে, গারে পড়ে প্রেম

করবার ক্ষেত্রে এ নয়।' কেমন ঠাকুরপো এইবারে খুশী তো ?'

যামিনী কথা না বলিয়া নতমুখে ভিবেটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

“কিন্তু তাই একটা কথা আছে।”

যামিনী উৎসুক ভাবে চাহিল।

“মা বলে দিয়েছেন আর সব দিকে যতই ভাল হোক ছ-সাত হাজার টাকার গরন চাই। তার কমে কিছুতেই রাজী হ'তে পারবেন না। ঠিক এই কথাটাই ওঁদের সামনাসামনি বলতে তোমার দাদার কেমন সঙ্কোচ লাগল। আভাস দিয়েছেন। তুমি বরঞ্চ স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিয়ে।”

“এত গরন পরবে কে ?”

“তোমার বৌ।”

“তোমাদের যত গহনা আছে তার অর্ধেকও কি প'র ?”

“ওমা! তাহলে যে গরনার ভারে নড়তে চড়তে পারব না। সে-সব সিন্দুক তোলা আছে।”

“তাহলেই দেখ মেয়েদের যুক্তিশক্তি এত কম। যে-সব জিনিষ বারো মাস সিন্দুকে তোলা থাকে তাই নিয়ে এত মেদাজেদি। তারই উপর নির্ভর করছে জীবনমরণের ব্যাপার।”

“কেন ?”

“ধর চন্দ্রকান্ত বাবু যদি অত টাকার গরন না দিতে পারেন—”

“তাহলে তার মেয়ের সঙ্গে বিয়েতে মা কিছুতেই রাজী হবেন না। কিন্তু কেন ? শুনেছি ত যে তাঁর অবস্থা খুব ভাল।”

যামিনী তাড়াতাড়ি কহিল, “না না, সে কথা আমি বলছি নে। তিনি হরত দিতে পারবেন। কোন বিশেষ মেয়ের কথা আমি বলছি নে, কিন্তু মেয়েদের হাতে পড়ে মেয়েদেরই বিয়ের ব্যাপারটা কেমন নির্ভর অসুস্থগোছের হয়ে দাঁড়িয়েছে সাধারণ ভাবে আমি সেই কথারই আলোচনা করছি।”

“মেয়েদের হাত কি ?”

“কেন নিরানন্দের ইটা ক্ষেত্রে আমি তো দেখেছি কবের মায়ের দাবির পরিষ্কারই আর মিটতে চায় না। এত ভরি

চাই, তত ভরি চাই, তার বিরাট কড়কা মুখে মুখে দাখিন হয় অন্তঃপুর থেকেই।”

“কে জানে তাই অত কথা। মূর্খ মেয়েমানুষ, তোমাদের যত কথায় কথায় তো আর তর্কের বান ডাকাতে পারি নে, কিন্তু সোজা কথাটা বেশ বুঝতে পারি। সেটা হচ্ছে এই যে, বিয়ে করতে তুমি পাগল হয়ে উঠেছ।”

“প্রায়।” যামিনী হাসিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

২

সমস্ত ঠিকঠাক হইয়া যাইবার পরে যামিনীর মনটা যেন বসন্তবাতাসে উড়িয়া বেড়াইতেছিল। আর কোনখানে কোন বাধা নাই। যতদূর দৃষ্টি যায় স্বচ্ছ বাধাহীন নীলাকাশ ব্যাপিয়া আনন্দের শ্রোত বহিয়া যাইতেছে। মনের আনন্দে সে বৌদিকে লইয়া থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখাইল। শিবপুরের বোর্টনিক্যাল গার্ডেন, বালির ব্রীজ, দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার দৃশ্য, এমন কি যাহুঘর চিড়িয়াখানাও বাদ দিল না।

আজ দুপুরবেলার তাঁহাকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল দেখাইয়া আনিবে স্থির করিয়া সে ট্যান্ডি ডাকিয়া আনিল।

মোটরে চড়িয়া বৌদি শ্বিতহাশ্বে কহিলেন, “ঠাকুরপো যে দেখছি এবারে আমার উপর বড় সদয়। কলকাতায় যা কিছু দেখবার সমস্তই দেখালে। কিছুই প্রায় আর বাকী নেই।”

“যা দেখবার তাই এখন দেখনি।”

“কি, ওই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল ? তা তাই যতই বল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের লোকে স্মৃতি কবে বটে, কিন্তু—”

“কে বললে তোমাকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল ? যা দেখনি তা এখনই দেখবে। অত ব্যস্ত কেন ? তখন কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে আসল দেখাটাই ছিল বাকী।”

মোটর ততক্ষণে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গেটের কাছে দাঁড়াইয়াছে। সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে তিনি নির্ঝলাকে দেখিলেন। চন্দ্রকান্তের সঙ্গে সে আসিয়াছে। এইটুকু আয়োজন যামিনীর আগে হইতে করিয়া রাখা। বাড়ি ফিরিবার সময় বৌদি হাসিয়া কহিলেন, “যা দেখবার তা তো দেখলুম। কিন্তু তাই ঠাকুরপো, তোমার ভাবখানা

যেন একেবারে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। মাটিতে আর পুঁ পড়ছে না।

যামিনী হাসিয়া চুপ করিল।

ইহারই দিন দুই পরে দাদা ও বৌদিকে ট্রেনে তুলিয়া দিতে গিয়া ফিরবার পথে ক্রীমে আশুবাবুর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। তিনি চন্দ্রকান্তবাবুর একজন বন্ধু, সাখা আড্ডাতে প্রায়ই হাজির থাকেন। তিনি যামিনীর সঙ্গে নির্মলার বিবাহের কথা শুনিয়াছিলেন। পাত্রী-পক্ষকে যে কোন চেষ্টাই করিতে হয় নাই, যামিনী নিজে উদ্যোগী হইয়া সমস্ত করিয়াছে, বিবাহে পণ লাগিবে না, এসমস্ত কথাই তিনি জানিতেন। ইহাতে মনে তাঁহার একটু ঈর্ষ্যার সঞ্চার হইয়াছিল। মেয়ে তো তাঁহারও আছে, তাহারও বিবাহযোগ্য, কিন্তু কই তাঁহার বেলায় তো ঠিক এতখানি স্ববিধা যাচিয়া ধরা দেয় না। যামিনীকে দেখিয়া এধার-ওধার দু-পাঁচটা গল্পের পরে তিনি বলিলেন, “আর শুনেচ চন্দ্রের ব্যাপারটা?”

“কী?”

“সে তো বলতে গেলে অনেক কথা। এই যে হারিসন রোডের মোড়েই আমার বাড়ি। চল না এক পেয়লা চা খেয়ে আসবে। (হাতে রিট-ওরাচের দিকে চাহিয়া) চারটে কুড়ি। তোমার চা খাওয়ার সময়ও বোধ হয় হ'ল। কোথায় গিয়েছিলে? ...ও, দাদা বৌদি বৃষ্টি পূজোর ছুটিতে কলকাতায় বেড়াতে এসেছিলেন। আজ দেশে ফিরে গেলেন, তাই ষ্টেশনে রাখতে গেছিলে। তা বেশ ভাল। নাববে?”

তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া যামিনী নামিয়া আশুবাবুর বৈঠকখানায় বসিল। ভৃত্য চা দিয়া গেল। তখন চা-রসের সহিত মিশাইয়া মিশাইয়া সুদীর্ঘ ভূমিকার জালে গাঁথিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, “এই যে সেদিন চন্দ্র ফট করে আমার কাছে হাজার তিনেক টাকা ধার চেয়ে বসলো। মেয়ের বিয়ে। আমি তো বলি লোকটার মাথার ছিট আছে। ভিতরের কথা জানতে আমার কিছু বাকী নেই।”

যামিনী বাধা দিয়া পাংশুমুখে জিজ্ঞাসা করিল, “কেন, তাঁর অবস্থা কি ভাল নয়?”

“কোথায় ভাল। সে ওই বাইরে থেকেই দেখতে। বললুম তো লোকটা ওই রকম ক্যাশাটে-গোছের। যা সফতি

ছিল কুলিমে-গুছিয়ে রেখে-টেকে চলতে পারলে তাতেই কি চলত না? কিন্তু চল বেশী। দেবার খরচ করবে। গেরস্তুর হয়ে মেয়েকে টাকা খরচ করে গান-বাজনা সেখান, কলেজে পড়ান, এ-সব চাল দেবারই বা দরকার কি?”

যামিনী তাঁহার রসাইয়া-তোলা আলোচনার মাঝে আবার বাধা দিয়া কহিল, “আপনি টাকাটা তাঁকে ধার দিলেন?”

“ক্যেপেচ! আমি কোথা পাব টাকা? লোকে বাড়িয়ে বলে বটে বড়লোক, হেন তেন কত কি। কিন্তু লোকে কী না বলে, লোকের কথার কান দিতে গেলে চলে না। আমার নিজের মেয়েও তো রয়েছে। তাদের বিয়ে দেবার কথাও ভাবতে হবে।”

“তাঁর কি টাকাকড়ি একেবারেই নেই?”

“তবে তোমাকে খুলেই বলি ভিতরের কথাটা। কোম্পানীর কাগজগুলো তো সবই গেছে। হাজার দুই টাকার অবশিষ্ট ছিল। সে-টাকাটাও গত বছর সিমলা গিয়ে অর্ধেক উড়িয়ে এসেছে। সংসার কি করে চালান জানিনে। শুনতে পাই ছেলেগুলো টুশানি করে পড়ার খরচ চালান। পৈতৃক বাড়ি রয়েছে, কলকাতায় বাড়িভাড়া লাগে না এই যা রকম। এই অবস্থা নিয়েও চালবাজী করতে ছাড়েন না। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা বের করেও মেয়েকে কলেজে পড়ান চাই। আমি টাকা ধার দেব, বল কি বাবাজী! আমি বরক পুরামর্শ দিয়েছি, যেমন অবস্থা তেমনি চল। টাকা ধার করে মেয়েকে গয়না দিতে হবে না। কেন তোমরা তো কোন পণ নিচ্ছ না। তোমার দাদা তো বলেই গেছেন, যেমন অবস্থা সাধ্যমত দেবেন। আমরাই ফাঁকে পড়ে গেলাম তারা। তোমাদের মত একটা পাত্রটাজ দেখে দাও কষ্ট করে।”

যামিনী কিছু অভ্যস্ত করিয়া আশুবাবুর কথার মাঝ-খানেই ঝড়ের বেগে সেখান হইতে চলিয়া গিয়া একেবারে রাস্তায় আসিয়া পড়িল।

তাঁহার চক্ষুপ্রান্ত সমস্ত হইয়া আসিতেছিল। নির্মলার মান-অপমানের জন্ত এখন হইতেই সে যেন নিজেকে দারী মনে-করিতেছিল। কৃষ্ণ চিত্তে ভাবিতেছিল, লক্ষীর পায়ের আলিঙ্গনরোগের জন্তও আবার চিন্তা করিতে হয়, ছুটিতে হয় বাহু ব্যবসায়ীর কাছে টাকা ধার করিতে! সেই রাত্ৰিতেই সে মনে মনে একটা সঙ্কল্প স্থির করিয়া লইল। সে

ছোট ছেলে বলিয়া যাদের অতিশয় আদরের ছিল। মা যখন যাহা কিছু টাকা নিজে হইতে জমাইতেন, যামিনীর নামেই তাহা জমাইতেন। বছর আড়াই আগে এমনি তাহার নামে একটা পোষ্টাল সার্টিফিকেট কিনিয়াছিলেন। সেটা হুদে আসলে এখন প্রায় হাজার-দশেক দাঁড়াইয়াছে। টাকাটার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখন বাহির করিয়া লইতে হইবে কিংবা আবার নতুন করিয়া জমা দিতে হইবে। কালই সে জননী নিকট হইতে পত্র পাইয়াছে টাকাটা আবার আড়াই বছরের সর্ব্ব জমা দিতে। যামিনীর পিতা পশ্চিমের বিখ্যাত একজন উকীল। অত্যন্ত ধনবান। তাঁহার নিজের

নামে জমান টাকা ছাড়াও তাঁহার জীর হাতে দশ-পাঁচ হাজার টাকা এমন প্রায়ই থাকিত।

পরদিন সকালে উঠিয়াই যামিনী ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে গেল এবং টাকাটা নতুন করিয়া জমা দিবার পরিবর্তে উঠাইয়া লইয়া আসিল। উঠাইয়া লইয়া সারা সকাল ধরিয়া অহরহাল পারালালের দোকান, বেঙ্গল টোস এবং বড় বড় জুয়েলারির দোকানগুলোয় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। জিনিষ যা কিনিল তাহাতে একটা ট্যান্সি বোঝাই হইয়া যায়।

ক্রমশঃ

মাদ্রাজ শিল্প-প্রদর্শনী

গত মার্চ মাসে মাদ্রাজ গভর্ণমেন্ট আর্ট-স্কুলের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। রঞ্জিত চিত্র, রেখাচিত্র, এবং মৃত্তিকা ও মৃত্তিকাবৎ পদার্থে গঠিত মূর্তি, এই তিন প্রকারের সর্ব্বসমেত ২২৪টি চিত্র ও মূর্তি প্রদর্শিত হয়। প্রদত্ত চিত্রগুলি হইতে বিদ্যালয়ে কিরূপ উচ্চাঙ্গের শিল্পাভ্যাস-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার কিঞ্চিৎ ধারণা করা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী এই বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল।

বর্ণ-বৈচিত্র্য ও অঙ্কন-পারিপাট্যে শ্রীযুক্ত ভেকটরথন অঙ্কিত 'পৃথীরাজ' চিত্রখানি সুন্দর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভেকটরনারায়ণ মৃত্তিকা-ভাস্কর্যে যে 'রাসলীলা'র চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন

তাহাতে এক নিপুণ রূপদক্ষ শিল্পীর তুলিকাপাতে লীলায়িত মাধুর্য্য পরিষ্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত কুম্ভা রাওয়ের 'অভিসারিকা'য় ভাব-সম্পদ ও বর্ণ-মাধুর্য্য যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁহার 'মাম্বুকের মাথা' নীর্ঘক চিত্রখানিও প্রশংসার যোগ্য। সৈয়দ হামেদের 'ভবিষ্যৎকন্য' চিত্রখানিতে মুসলমান ভাবধারা পরিষ্ফুট হইয়াছে। শ্রীযুক্ত এস. ভি. এস. রামা রাওয়ের সম্পূর্ণ নতুন ধরণের দৃশ্য-চিত্র 'গোধুলির আলো'র কবিত্বসম্পদ অতুলনীয়।

পরবর্ষে মাদ্রাজ গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলের শিল্পপ্রদর্শনী যে অল্পরূপ সাক্ষ্য লাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।



অভিনয়িকা
পি, ভি কুমারাও

ভ ব্যাঙ্কু
সৈয়দ হা মদ

মাহুভের মাথা (উড -কাট)
পি, ভি, কুমারাও





গোধূলের আলো
এম, ভি, এস, রামারাও



পৃথীরাজ ও সংযুক্তা
এম, ভেঙ্কটরথন্



রাসলীলা
ভেঙ্কটনারায়ণ রাও



ঈশ্বরশাস্ত্র



চিত্রে মার্টিন লুথার—

খৃষ্টধর্মের দুইটি প্রধান শাখা—রোমান কাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট। প্রোটেস্ট্যান্ট শাখার প্রবর্তক মার্টিন লুথার (১৪৮৩—১৫৪৬)। লুথার জার্মানীর অধিবাসী। তিনি ওথাকার হিট্টেনবেয়ার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দশমতন্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দের পর হইতে প্রচলিত ধর্মের প্রতি বাতরাগ হইয়া এক নূতন ধর্ম প্রচার করেন। খৃষ্টান-জগতের অধিনায়ক পোপের কর্তৃত্ব অস্বীকার করার জন্য তাহার প্রচলিত মতবাদের নাম হইল প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম। সে-সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশসমূহের রাজারাও ছিলেন প্রধানতঃ পোপের অনুবর্তী। এই হেতু রাজপুরুষগণের হস্তে লুথারকে কম নিযাতিত হইতে হয় নাই। তাহার জীবনের বিশিষ্ট ঘটনাসম্বলিত কয়েকটি চিত্র এখানে দেওয়া হইল।



মার্টিন লুথার

১৫৪০ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি



সাম্মানিতে মার্টিন লুথার ও পুলিশ





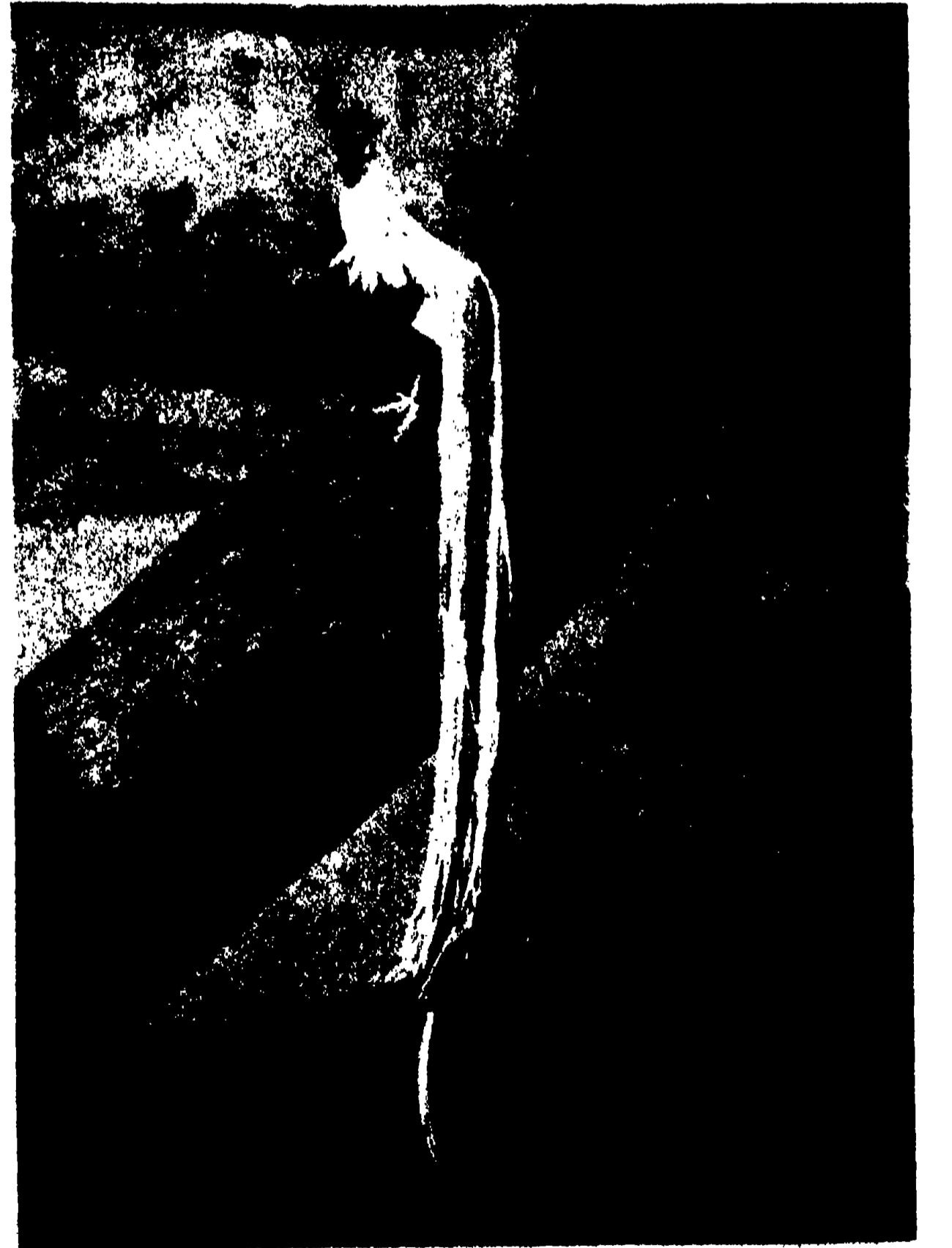
পাঠশালায় মাটিন লুথার

দীর্ঘলেজবিশিষ্ট মোরগ—

চিত্রে হৃদয় লেজ বিশিষ্ট একটি মোরগ দেখা যাইবে। জাপানের ওশিনো-মুরা নামক স্থানে এই মোরগ পাওয়া যায়। ইহার লেজ ছাব্বিশ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। মুরগীর কিন্তু এরকম লেজ থাকে না। যে মোরগের লেজ ষত দীর্ঘ তাহার মূল্যও তত বেশী। দীর্ঘতম লেজবিশিষ্ট মোরগের মূল্য চার-পাঁচ হাজার টাকা!

জাপানের আদর্শ উদ্যান-রচনা—

জাপানীরা সৌন্দর্যের পূজারী। তাহারা যে-সব জিনিষ তৈয়ার করে, তাহাদের নিপুণহস্তে তাহা সুন্দর হইয়া উঠে। ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চারু ও কারু শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে তাহাদের নৈপুণ্য সকলেরই জানা। জাপানীরা ফুল ভালবাসে, তাই ইহার জন্মভূমি উদ্যান রচনাতেও তাহাদের অদ্ভুত কৃতিত্ব। উদ্যানে তরু-লতা কুঞ্জবন ত থাকিবেই, উপরন্তু স্থাপত্য ভাস্কর্য ও কারু শিল্পের নানা নিদর্শনও ইহাতে স্থান পাইয়া থাকে। এই সকল জিনিষের বর্ণ তরু-লতারই মত। এই-সব কারণে জাপানের উদ্যান বিদেশীর নিকট বড়ই সুন্দর লাগে। আবার বড় বড় উদ্যানের মত সেখানে ছোট ছোট উদ্যানও রচিত হইয়া থাকে। এই সকল উদ্যান যে আরতনে ছোট তাহা নহে, বড় উদ্যানের গাছপালা বেরূপ বড়, ছোট উদ্যানের গাছপালাও সেই অনুপাতে ছোট হয়। শিল্পকলার নিদর্শনাদিও এইরূপ ছোট করিয়া তৈরি। জাপানের উদ্যান-রচনা-কৌশল বাস্তবিকই চমৎকার।



দীর্ঘলেজবিশিষ্ট মোরগ



জাপানের রাইক্যাকোতে জাপানের আদর্শে রচিত উদ্যান

প্রতীচা প্রাচ্যের অনুকরণ করে ইহা স্মৃতিতে অভিনব। কিন্তু জাপানের সৌন্দর্যপ্রিয়তা প্রতীচ্যকে হার মানাইয়াছে। ইদানীং প্রতীচ্যে জাপানের আদর্শে উদ্যান রচিত হইতেছে। জার্মানীর রাইনল্যাণ্ডে ডক্টর ডুইসবার্গ এইরূপ উদ্যান রচনা করিয়াছেন। তিনি সেখানকার একটি বৃহৎ কারখানার পরিচালক। তিনি জাপানে গমন করিয়া সেখানকার উদ্যান-রচনাকৌশল আয়ত্ত করিয়াছেন। উদ্যানের তরু-সতা, ঘর-বাড়ি, তথাগতের মূর্তি ও অন্যান্য শিল্পস্রবোর সংস্থান ঠিক যেন জাপান উদ্যানের মত।

আফ্রিকার হাউসা জাতি—

হাউসারা আফ্রিকার আদিম অধিবাসী। হৃদানের পশ্চিমে নাইজেরিয়া প্রভৃতি প্রায় পাঁচ লক্ষ বর্গমাইল পরিমিত স্থান তাহাদের আবাসভূমি। হাউসারা মধ্যযুগে খুবই উন্নত ছিল। তাহারা দেশ-বিদেশে বাণিজ্য-বাণিজ্য করিত। বহু শতাব্দী ধরিয়া তাহারা স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছিল। পরে ১৮১০ সনে মুসলমানদের অধীন হয়।

হাউসারা সংখ্যায় প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ। তাহারা কৃষিকায়, একারণ অনেকে তাহাদিগকে কাক্রী বলিয়া ভ্রম করে। বস্তুতঃ তাহারা কাক্রী



হাউসা-আমীরদের রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ তোরণ



দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ হাউসা। হাউসারা দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয় ফুট

নহে। প্রাচীন 'ফুলা' ও আরব জাতির সংমিশ্রণে ইহাদের উৎপত্তি। হাউসারা শক্তিতে ও বুদ্ধিমত্তায় কাফ্রাদের অপেক্ষা উন্নত। দেড় কি দুই মণ জিনিষ লইয়া তাহারা হামেশা চলাকেরা করে ও একদিনের পথ পথান্ত বাইতে পারে। তাহারা পরিশ্রমী। মধ্য-আফ্রিকার উষ্ণতার মধ্যেও তাহাদের কাণো বিরতি নাই। কৃষি ও শিল্পই তাহাদের জীবিকা। বস্ত্র-বয়নে ও বস্ত্র-রঞ্জন এবং মাছ, চামুরার ত্রাণ ও কাচ প্রস্তুতে তাহারা সুনপুণ। লাগোস, টিউনিস, টিপালি, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি স্থানে তাহাদিগকে এখনও বাবসা করিতে দেখা যায়।

হাউসাদের ভাষাও বেশ সমৃদ্ধ। আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে যত ভাষা চলিত আছে তাহাদের মধ্যে হাউসার ভাষাতেই সর্ব-প্রথম পুস্তক লিপিত হয়। এই ভাষার শব্দ-সংখ্যা ১৭ হাজার। দিনের বিভিন্ন অংশের আটটি নাম। এই শব্দের এক-তৃতীয়াংশ আরবী শব্দ হইতে উৎপন্ন। কবিতা ও রাষ্ট্রীয় বিষয়মূলক



হাউসার ও কুবসার নৃগ

কয়েকখানি পুস্তকের খণ্ডাংশ পাওয়া গিয়াছে। আদিম অধিবাসীদের মধ্যে হাউসারা শিক্ষায়ও বেশ অগ্রসর। প্রতি গ্রামে একটি করিয়া পাঠশালা আছে। হাউসাদের এক-তৃতীয়াংশ মুসলমান ধর্মাবলম্বী, এক-তৃতীয়াংশ মূর্তিপূজক ও অবশিষ্ট লোকেরা একরূপ কোন ধর্মই মানে না।

হাউসারা দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ, বুদ্ধিমান এবং নিয়ম মানিয়া চলে। তাহারা এখন ইংরেজের প্রভাবে আসিয়াছে। পুলিশ ও সামরিক কায়ে তাহারা অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।

শ্রীমতী পোলা নেগ্রী ও শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্কর—

ভারতায় নৃত্য উদয়শঙ্কর বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ভারতবর্ষে ও ইউরোপের নানা দেশে নৃত্য করিয়া তিনি জনসমাজের দিম্ময় উৎপাদন করিয়াছেন। উদয়শঙ্কর এখন আমেরিকায় নানা প্রদিক্ষ রঙ্গমঞ্চে নৃত্যকলা দেখাইতেছেন। শ্রীমতী পোলা নেগ্রী চলচ্চিত্র এক জন বিখ্যাত অভিনেত্রী। নিউইয়র্কে উদয়শঙ্করের সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তথাকার নেট জেমস্ রঙ্গমঞ্চে উদয়শঙ্করের নৃত্য দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন। উদয়শঙ্করের নৃত্য শেষ হইলে শ্রীমতী পোলা নেগ্রীর সহিত নৃত্য সম্বন্ধে তাহার আলাপ হয়। শ্রীমতী নেগ্রী ভারতবর্ষে আগমন করিবেন—উদয়শঙ্করের নিকট এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। উদয়শঙ্করের নৃত্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, “ইহা বাস্তবিকই স্বর্গীয়।”



শ্রীমতী পোলা নেগ্রী ও শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্কর

মহিলা-সংবাদ

হরিদ্বারের গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যব্রতের সহধর্মিণী শ্রীমতী চন্দ্রাবতী লখনপাল 'স্ত্রীয়েঁ কি স্থিতি' নামক পুস্তক লিখিয়া এলাহাবাদের হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন হইতে পাঁচ শত টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন। গত বৎসরে মহিলায়া ঘে-সকল হিন্দী পুস্তক রচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে এখানি সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে শ্রীযুক্তা বিমলা সান্যাল কাশী-আয়ুর্বেদ-সম্মিলনীর শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন। তিনি সেখানকার সরকারী হাসপাতাল ও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ুর্বেদ-বিভাগে প্রায় তিন বৎসর কাল ধাত্রী-বিদ্যা শিক্ষা করেন। উদয়পুরের মহারাণার পারিবারিক চিকিৎসক হিসাবে ও কাশীর আয়ুর্বেদ হাসপাতালে মহিলা কবিরাজ রূপে কিছুকাল কার্য করিয়া শান্তিপুর অটলবিহারী মৈত্র দাতব্য আয়ুর্বেদ চিকিৎসালয়ের ভার প্রাপ্ত হন। সম্প্রতি তিনি স্বাধীনভাবে কলিকাতায় চিকিৎসা-ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি মহিলা ছাত্রীদের আয়ুর্বেদ পড়াইবার ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করিয়াছেন। আমরা শ্রীযুক্তা বিমলা সান্যালের উন্নতি কামনা করি।



শ্রীমতী চন্দ্রাবতী লখনপাল

কাঠ-খোদাই শিল্প

বাংলা দেশে ললিতকলার নবজাগরণের সময় চিত্রাঙ্কন বিষয়ে অনেক নূতন এবং কিছু পুরাতন পদ্ধতির উদ্ভাবন এবং সংস্কার আরম্ভ হয়। উড্-কাট (কাঠ-খোদাই) রীতিতে চিত্রাঙ্কন এক সময়ে জগৎবিখ্যাত ছিল। জাপানী উড্-কাটের সূক্ষ্ম রেখাপাত এবং বর্ণসংযোগ এখনও ললিতকলাক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ। আমাদের দেশে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বহু ও তাঁহার কুতী ছাত্র শ্রীযুক্ত রমেন্দ্র চক্রবর্তী এই রীতির নূতন সংস্কার ও অভ্যাস বিষয়ে পথপ্রদর্শক। এই



রাজপুত-নারী
শিল্পী—শ্রীনরেন্দ্রকেশরী রায়

গুরুশিষ্যদ্বয়ের পরিচয় প্রবাসীর পাঠকদিগের নিকট দেওয়া নিম্নয়োজন।

রমেন্দ্রবাবু কলিকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট-স্কুলে এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করিতেছেন। এই সংখ্যায় তাঁহার এক ছাত্র শ্রীমান নরেন্দ্রকেশরী রায়ের শিল্প-কোর্সলের পরিচয় আমরা দিতেছি। শ্রীমান নরেন্দ্রের হস্তলেখের আলো-ছায়ার বিস্তার এবং রেখাপাতের সৌন্দর্য্য বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। ভবিষ্যতে ইঁহার কার্য সমাদর পাইবে আশা করা যায়।

ক. চ.

“মত্তময়ূর” শৈব সন্ন্যাসী

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বে মালব ও মহারাষ্ট্র দেশে এক সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় ছিল, যাহার নাম আজ লোকস্মৃতির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। ঐ সম্প্রদায়ের নাম ছিল “মত্তময়ূর”। নয় শত বৎসর পূর্বে জব্বলপুর অঞ্চলের হৈহয়-বংশীয় রাজগণ ঐ সম্প্রদায়ের তিন-চার জন সন্ন্যাসীকে নিজ রাজ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং উহাদের জন্ম কয়েকটি বিশাল মঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ মঠগুলির মধ্যে রেওয়া রাজ্যে দুইটি এবং জব্বলপুর জেলায় দুইটি এখনও বর্তমান। বহু গ্রাম ও বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড ঐ সম্প্রদায়কে দেবোত্তররূপে দান করা হয় এবং ত্রিপুরী রাজ্যের হৈহয়-বংশের রাজত্ব কালের শেষ পর্য্যন্ত ঐ সন্ন্যাসীদিগের বিলক্ষণ প্রভাব ছিল।

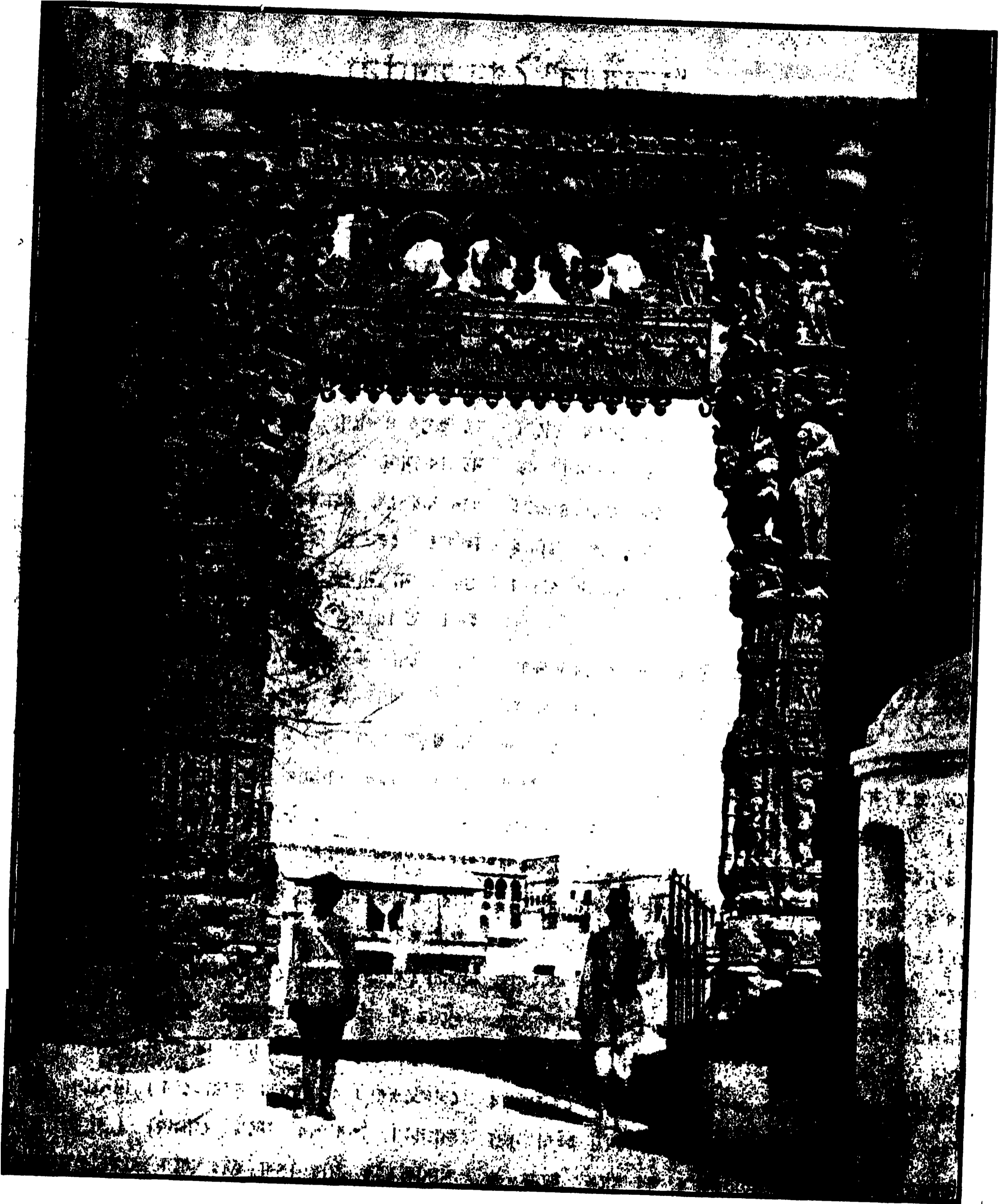
ঐ মত্তময়ূর সম্প্রদায়ের নামের উল্লেখ সর্বপ্রথমে দক্ষিণা-পথের শিলাহার-বংশীয় রাজা রট্টরাজের তাম্রশাসনে পাওয়া যায়। বোম্বাই প্রদেশের রত্নগিরি জেলার খারেপটন গ্রামে প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে চারটি তাম্রপত্র পাওয়া যায়। ঐ পত্রগুলির পাঠোদ্ধারে জানা যায় যে, ৯৩০ শকাব্দার জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমার দিন শিলাহার রাজপুত্র বংশের মাণ্ডলিক রট্টরাজ, মত্তময়ূর সম্প্রদায়ের কর্করোগী শাখার বায়-সংস্থানের জন্ম তিনটি গ্রাম দান করেন। ঐ দিন খ্রীষ্টীয় ১০০৮ সালের ২২শে মে। মত্তময়ূর সম্প্রদায়ের পৌরাণিক উৎপত্তি কাহিনীতে কথিত আছে, যে, ভগবান শিব কৈলাসপর্বতে আপন গণ-পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন। সেই সময় কাঙ্ক্ষিকেশের বাহন ময়ূর যদি কখনও প্রসন্ন হইয়া কেকা রব করিত তখন ঐ গণসমষ্টিমধ্যে কয়েক জন মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেন। কেকা রবে দুইটি মাত্র স্বর আছে - ষড়্জ ও কোমল ঋষভ। ঐ গণদল কেবল মাত্র ঐ দুইটি আশ্রয় করিয়া নৃত্য করিতেন, যদিও নৃত্যকলা অহুসারে উহা অত্যন্ত দুর্লভ ব্যাপার। কথিত আছে যে, ভগবান শিব তাঁহার অহুচরদিগের ঐ নৃত্যে প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে বর দান

করেন—“তোমরা পৃথিবীতে যাও এবং সেখানে জন্মগ্রহণ করিয়া মত্তময়ূর নামে প্রসিদ্ধ হও। অষ্টবিংশতি শিবতন্ত্র মধ্যে তোমাদের গণনা হইবে।” কথিত আছে যে, ঐ শিব-গণই এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক।

কোন সময়ে মত্তময়ূর সন্ন্যাসী সম্প্রদায় দক্ষিণ হইতে মালব দেশে আগমন করেন। তাহার অন্তর্গত গোয়ালিন্দরে উপেন্দ্রপুর ও রাণোড় নামক দুইটি স্থানে ইহাদের বড় বড় মঠ বিদ্যমান আছে। রাণোড় মঠের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ইহাদের গুরুপরম্পরা ইতিহাস পরে পরে লিখিত হইত। মালবের মত্তময়ূর সম্প্রদায়ে কদম্ব-গুহাধিবাসী নামক মোহন্তই সর্বপ্রথমে ঐ পদে অধিষ্ঠিত হন। উহার পর শঙ্খমঠাধিপতি এবং তাঁহার পর তিরস্বি-পাল রাণোড় মঠের মোহন্ত পদ পাইয়াছিলেন। জব্বলপুরের চৌষটি যোগিনী মন্দিরের শিলালেখ অহুসারে “তিরস্বি” দ্বাদশভূজা দুর্গা বা মহিষমর্দিনীর নাম। তিরস্বিপালের শিষ্য আমদক তীর্থনাথ এবং তাঁহার শিষ্য পুরন্দর ছিলেন। মালবরাজ অবন্তিবর্মা শৈবধর্মে দীক্ষা গ্রহণের জন্ম পুরন্দরকে মালব দেশে আনয়ন করেন। পুরন্দরের নিকট দীক্ষার পর অবন্তিবর্মা উপেন্দ্রপুরে মঠ স্থাপনা করেন। পুরন্দরের শিষ্য কবচশিব এবং তাঁহার শিষ্য সদাশিব ছিলেন। সদাশিবের শিষ্য হৃদয়েশের শিষ্য ব্যোমশিবের সময়ে রাণোড় বা রণপত্র-পুরের শিলালিপি খোদিত হয়।

পুরন্দরের অন্য শিষ্য চূড়াশিব (বা শিখাশিব) হৈহয়রাজ চেদিচন্দ্রের (বা দ্বিতীয় যুবরাজদেব) নিমন্ত্রণে চেদিরাজ্যে আসেন। শিখাশিব নিজে গোলকী (বা গুর্গকি) মঠে আসীন হইয়া স্বীয় শিষ্য হৃদয়শিবকে রাজা লক্ষ্মণরাজপ্রদত্ত বিলহরীর মঠে প্রতিষ্ঠিত করেন।

নর্মদা-জলপ্রপাততটস্থ বৈদ্যনাথ মহাদেবের মন্দির ও মঠ এই সন্ন্যাসীদিগের অধিকারে ছিল। শিখাশিবের অন্য শিষ্য প্রভাবশিবের গুরুপরম্পরায় গোলকী ও বৈদ্যনাথ



সুবরাজদেব কর্তৃক নির্মিত শিবমন্দিরের তোরণদ্বার। এখন ইহা গুর্গী হইতে আনিয়া রেওয়ার রাজপ্রাসাদের সম্মুখে রক্ষিত হইয়াছে। এই দুই মঠ লাভ হয়। ইহার শিষ্যের শিষ্য প্রবোধশিব পুরাতন। রেওয়া নগরের উনিশ মাইল দক্ষিণে শোন-নদের প্রাচীন হৈহয়-রাজ্যে তিনটি বৃহৎ প্রস্তরনির্মিত মঠ স্থাপন তটে অমরশৈল পর্বতের নিম্নে অতি মনোরম স্থানে এই করেন। ইহার মধ্যে রেওয়া-রাজ্যের চন্দ্রহীর মঠ সর্ব-মঠ ও শিবমন্দির বিদ্যমান। রাণোড়ের মঠের জায় চন্দ্রহীর

মঠও দ্বিতল। ইহার সম্মুখে বারোটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত একটি বারাণ্ডা আছে। বারাণ্ডার সম্মুখে প্রস্তর-নির্মিত লম্বা চত্বর আছে যাহা সন্ন্যাসীদের বসিবার জন্য নির্মিত হইয়াছিল। বারাণ্ডার পিছনের দেওয়ালে মোহন প্রবোধ-শিবের শিলালিপিতে জানা যায় যে, তিনি কলচুরি চেদি ৭২৪ সংবতে গুরু প্রশান্তশিব নির্মিত শিবমন্দিরের নিকট এই প্রস্তরের মঠ নির্মাণ করেন। বারাণ্ডা হইতে এক প্রবেশপথ ভিতরে যায় এবং উহার শেষে এক অঙ্গন আছে। এই অঙ্গনের চারিদিকে বারাণ্ডা এবং ঐ বারাণ্ডায় স্থিত ১২-১৪টি দ্বার মন্দিরের বিভিন্ন কক্ষে যাইবার পথ। ঐ কক্ষগুলি দুই প্রকার, প্রথম দেবগৃহ বা গুরুগৃহ, দ্বিতীয় বাসগৃহ। প্রথম শ্রেণীর কক্ষের দ্বারের উপরের চৌকাঠে এক-একটি বা তিন-তিনটি করিয়া দেবমূর্তি আছে, সন্ন্যাসী-বাসকক্ষের চৌকাঠে ঐরূপ কোনও মূর্তি নাই।

গুরুগৃহের চৌকাঠে জটাজুট কৌপীনধারী গুরুদেবের মূর্তি আছে। দেবগৃহের চৌকাঠের মূর্তির মধ্যে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণপতি, সূর্য্য, ক্রম্ব, বিরূপাক্ষ, নটেশ ও অন্যান্য দেবমূর্তি দেখা যায়, তবে সকল মূর্তির পরিচয় পাওয়া যায় না।



যুবরাজদেবের রাজহকালের হরগৌরীর-মূর্তি। উচ্চতা ১২ ফুট



বিসহরি গ্রামে লক্ষ্মণসাগরের তীরে প্রশান্তশিব কল্পক নির্মিত শিবমন্দির (খৃঃ সন ১৭১) এখন ইহা 'কামকক্ষলা মন্দির মন্দির' নামে খ্যাত

অঙ্গনের দক্ষিণ পার্শ্বে এক বিরাট কক্ষে চারটি ছোট ছোট সমাধিগৃহ আছে। ঐগুলিতে একটি করিয়া দ্বার আছে, কিন্তু জানালা বা অস্ত্র পথ নাই।

মঠের বর্তমান অবস্থায় বুঝা যায় না যে, দ্বিতলে যাইবার পথ কি ছিল। দ্বিতলে দুইটি প্রস্তর কক্ষের চিহ্ন আছে এবং মনে হয় ঐদুইটি শিক্ষালয় ছিল। কারণ দেবগৃহ বা গুরুগৃহের উপরের তলে সন্ন্যাসীদের শয়ন-ভোজন নিবিদ্ধ এবং আয়তন পরিমাপেও ঐ দুইটি কক্ষ বিশাল। স্বতরাং চন্দ্রহী মঠের দ্বিতলের ঐ কক্ষগুলি ছাত্রদের শিক্ষাগৃহ রূপেই নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।



শোন-নদীর তটবর্তী চন্দ্রহী গ্রামে শৈবাচায়া প্রশান্তশিব কর্তৃক নির্মিত মত্তময়ূর-সম্প্রদায়ের মঠ। (কলচুরি চেদি নং ৭২৪)

মঠের সম্মুখে এক শিবালয় আছে। ঐরূপ শিবালয় খুব অল্পই দেখা যায়, যেহেতু ইহা গোলাকার এবং ইহার শিখরও গোলাকৃতি। কিছুদিন পূর্বে (প্রায় পঁচিশ বৎসর) কানপুর ও মত্তময়ূর জেলায় ঐ প্রকার দুইটি মন্দির আবিষ্কৃত হয়, সেগুলি ইটের তৈয়ারি এবং তাহাদের নির্মাণের সময় এখনও অনির্দিষ্ট। এগুলির আবিষ্কারের প্রায় দশ-বার বৎসর পরে আমি রেওয়া-রাজ্যের গুর্গী মঠের নিকট ঐরূপ এক মন্দির আবিষ্কার করি। গুর্গী মঠের শিলালিপিতে ঐ মন্দিরের বিস্তৃত বিবরণ আছে। গুর্গী ও চন্দ্রহীর শিলালেখের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ঐ প্রকার মন্দিরনির্মাণ মত্তময়ূর সম্প্রদায়ই সর্বপ্রথম করেন। নিজের মঠের সম্পর্কে চন্দ্রহীর শিলালিপিতে প্রবোধশিব বলিয়াছেন, “আমি আমার গুরুকৃত স্বরাগারের (মন্দির) সম্মুখে এক মঠ নির্মাণ, সিদ্ধ নামক পুষ্করিণী খনন এবং প্রশান্তশিব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক কূপের সংস্কার করাইয়াছি।

রেওয়া নগরের ছয়কোণ পূর্বদিকে, গুর্গীতে ত্রিপুরী রাজ্যের মত্তময়ূর সম্প্রদায়ের এক বিশাল ‘আখড়া’ ছিল। গুর্গীর সহস্র পুষ্করিণী ও অশাশ্বত উহার প্রাচীন কালের

বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধির পরিচায়ক। শতবর্ষ পূর্বে এইখানে ছোট একটি পাহাড়ের উপর অতি আশ্চর্যজনক এক তোরণ ছিল। রেওয়া-রাজ্যের বঘেল-বংশীয় রাজগণ সেই তোরণ স্বীয় নগরে লইয়া গিয়া প্রাসাদদ্বাররূপে স্থাপিত করেন। তোরণ লইবার সময় গুর্গীর ঐ পাহাড়ে একটি শিলালেখও পাওয়া যায় এবং ঐ তোরণের সঙ্গে উহাও রেওয়া নগরে আনীত হয়। এখন উহা রাজপ্রাসাদের দরবারগৃহের নীচের দেওয়ালে সংলগ্ন আছে। উহাতে জানা যায় যে, পুন্দরের প্রশিয়া প্রভাবশিব হৈহয়-বংশের মহারাজাধিরাজ মুক্তত্বের পুত্র দ্বিতীয় যুবরাজদেবের নিমন্ত্রণে হৈহয়-রাজ্যে গমন করেন ও মোহন্ত-পদ গ্রহণ করেন। উহার শিষ্য প্রশান্তশিব যুবরাজদেব নির্মিত কৈলাসশৃঙ্গোপম আকাশস্পর্শী মন্দিরের উত্তরভাগে অত্র এক স্তম্ভশৃঙ্গোপম মন্দির নির্মাণ করিয়া উমা, শিব, দুর্গা, ষড়ানন (কার্তিকেয়) ও গণপতির মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। গুর্গীর পাহাড়ে দুর্গার দুটি অতি বৃহৎ মূর্তি এখনও রহিয়াছে, কিন্তু কার্তিকেয় বা গণপতির মূর্তিগুলির কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। গুর্গীর শিলালেখে ইহা লিখিত আছে যে, প্রভাবশিব প্রায়ই তীর্থবাস করিতেন এবং বহুবার কাশ্মীরে মাইয়া শিবপূজা করিতেন।

শিলালেখের মধ্যের অংশ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় পাঠোদ্ধার অসম্ভব। শেষের অংশে প্রথম যুবরাজদেবের যুদ্ধযাত্রা এবং মত্তময়ুর সন্ন্যাসীদিগকে গ্রামদানের বিবরণ খোদিত আছে।

গুর্গীর ঐ পাহাড়ের আধুনিক নাম গুর্গজ। ইহার চারিদিকে পুরাতন মন্দির ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে।

রেওয়া-রাজ্যের বঘেল-বংশীয় রাজগণ যখন বাঁধোড়গড়ের পুরাতন কেল্লা ছাড়িয়া রেওয়া নগর প্রতিষ্ঠা করেন তখন ঐ সকল প্রাচীন মঠ ও মন্দিরের মালমশলা দ্বারাই নগরের অর্ধেক নির্মিত হয়। ঐ নগরের পুরাতন গৃহমাত্রই গুর্গীর কারুকাৰ্য্যখচিত প্রস্তর আজও দেখা যায়। গুর্গীর মত্তময়ুর মঠের চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর ছিল; সেই প্রাচীরে প্রায় দুই তিন মাইল ব্যাপী অংশ আজও বর্তমান। প্রাচীরের পাশে চড়াই উৎরাই দেখিলে মনে হয় যে, প্রাচীরের পরে প্রশস্ত পরিখা ছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মত্তময়ুর সম্প্রদায়ের মঠ দুর্গের ধরণে নির্মিত হইত। ষাট বৎসর পূর্বে শুর আলেকজান্ডার কানিংহাম ঐ প্রাচীরের ভিতরের

ভূমিখণ্ডে দুই-তিনটি মন্দিরের ভিত্তি দেখিয়াছিলেন, কিন্তু পরে রেওয়া-রাজ্যের লোক তাহাও উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে। গুর্গজ টিলার উত্তর-পূর্ব দিকে এক প্রাচীন বিশাল জলাশয়ের তটে চঞ্জেরী মন্দিরের স্থায় একটি মন্দির আছে, কিন্তু তাহার শিখর নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই মন্দিরটির গর্ভগৃহও গোলাকার এবং ইহার সম্মুখে আটটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত মণ্ডপ আছে।

মত্তময়ুর সম্প্রদায় মন্দিরনির্মাণের যে রীতি প্রচলন করেন তাহার সহিত চন্দেল (বুন্দেলখণ্ড) এবং পরমার বা মালবীয় মন্দিরনির্মাণ-পদ্ধতিতে অনেক প্রভেদ আছে। চন্দেল-মন্দিরের গর্ভাগারের সম্মুখে একটি বৃহৎ মণ্ডপ এবং গর্ভাগারের অন্তর্গত তিন পার্শ্বে ছোট ছোট “অর্ধমণ্ডপ” নির্মিত হইত। চন্দেল-মন্দিরমণ্ডপের একটি দ্বার থাকে এবং

ইহার সম্মুখে একটি অর্ধমণ্ডপ থাকে। গর্ভগৃহের উপর উচ্চতম শিখর (চূড়া) নির্মিত হইত, প্রধান মণ্ডপের চূড়া উহা অপেক্ষা নীচু এবং চারটি অর্ধমণ্ডপের ছাদ সর্বাপেক্ষা নীচু হইত।

চন্দেল এবং মালবীয় রীতির প্রভেদ এই যে, মালবীয় মন্দিরের গর্ভগৃহের তিন পার্শ্বে অর্ধমণ্ডপ স্থাপিত হয় না এবং

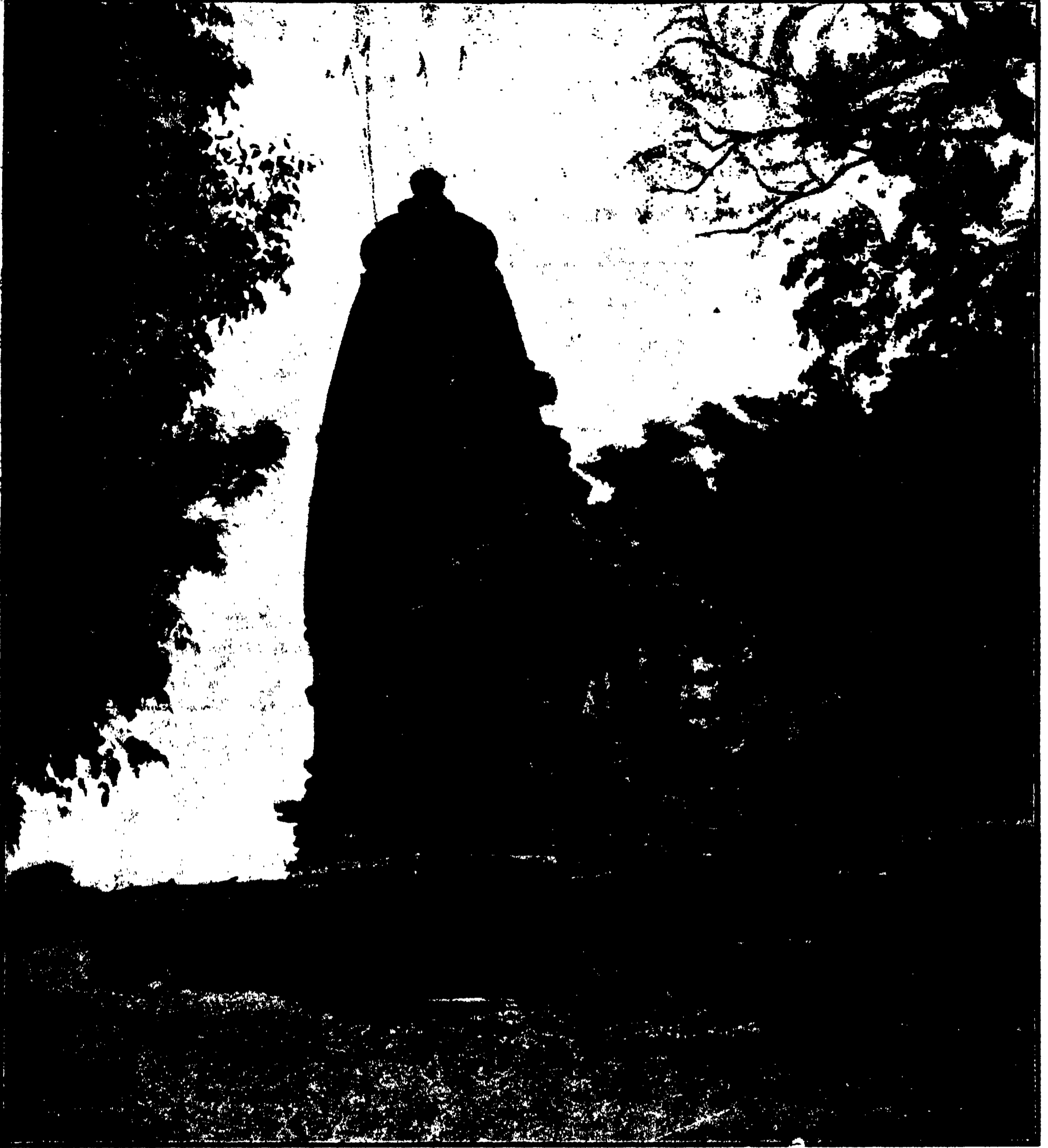


লক্ষ্মণসাগর (খৃঃ সন ১৫০)

কাটনার নিকটবর্তী বিলহার গ্রামে রাজা কর্ণদেব দাহরিয়ার প্রপিতামহ রাজা লক্ষ্মণ রাও কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

মণ্ডপ হইতে গর্ভগৃহ প্রদক্ষিণা-পথও থাকে না। মালবীয় মণ্ডপের তিনদিকে দ্বারপথ থাকে এবং প্রধান মণ্ডপের সম্মুখে আট, বারো অথবা ষোলটি স্তম্ভযুক্ত, চতুর্দিক উন্মুক্ত, ছোট মণ্ডপ থাকে। মালবরাজ পরমার-বংশীয় অবনীজনাশ্রয় কবি-বল্লভ ভোজদেব মন্দিরনির্মাণের এই রীতি প্রবর্তন করেন এবং এই পদ্ধতিতে নির্মিত মন্দির নর্মদা-নদীতটে হোলকর-রাজ্যের অন্তর্গত নেমাওর নগরে এবং রামপুরা-ভানপুরা জেলার অর্থুনা মৌজায় আছে। নাসিক নগরের চার কোশ পশ্চিমে সিন্নার গ্রামের মন্দির, অহমদনগর জেলার রতনবাড়ি গ্রামের মন্দির এবং ধানেশ অঞ্চলের বহু মন্দির এই মালবীয় প্রথায় নির্মিত।

মত্তময়ুর সম্প্রদায়ের পদ্ধতিতে নির্মিত মন্দিরে প্রধান



চন্দ্রহী গ্রামে শোন নদার তটবর্তী চোদ-পদ্ধতিতে নির্মিত প্রবোধশিখের মন্দির (কলচুরি চেদি সংবৎ ৬৯৫)

মণ্ডপ বা অর্ধমণ্ডপ জাতীয় কিছুই থাকে না। চন্দ্রহী এবং গুর্গীর মন্দিরের সম্মুখে এক একটি করিয়া উন্মুক্ত বারাগু আছে। চন্দ্রহীর বারাগু অটুট অবস্থায় আছে, ইহাতে কলচুরি চেদি ৭০০ (সন ২৪২) সংবতের এক লেখ আছে। ঐ দিন মকরধ্বজ নামে এক যোগী মন্দির দর্শন করিতে

আসিয়াছিলেন। ঐ বারাগুর উপবেশনের অল্প উচ্চপ্রস্তরাসন (বেঞ্চ) বর্তমান আছে। কানপুর এবং ফতেপুর জেলায় পারোলী তিন্দুলী এবং বহুয়ায় এই প্রকার গোল মন্দির আছে। পারোলী গ্রামের মন্দির ইটের তৈরি, কিন্তু ইহার এক অংশে শিখর হইতে ভিত্তি পর্যন্ত ধ্বংস হইয়া যাওয়ার

ইহার কোন্ পার্শ্বে দ্বার ছিল, বারাণ্ডা ছিল কি-না নির্ধারণ করা অসম্ভব। ফতেপুর জেলার তিন্দুলী গ্রামের ঐরূপ মন্দিরে চতুর্ভূজ বিষ্ণুমূর্তি স্থাপিত আছে। ইহার সম্মুখের বারাণ্ডা এক শত বর্ষ পূর্বে নির্মিত হয়। ঐ জেলার বহুয়া ও কুকারী গ্রামে ঐ প্রকার চারটি মন্দির আছে। তন্মধ্যে একটিতে এখনও পূজা হয়। বৃহত্ত্রদেশের এই সব মন্দিরে প্রাচীন পদ্ধতির বারাণ্ডা দেখিতে পাওয়া যায় না। পারোলী, তিন্দুলী, বহুয়া ও কুকারীর মন্দির কোন্ সময়কার, আজ পর্যন্ত তাহার কিছুই প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু চন্দ্রহী ও গুর্গীর মন্দিরের সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয় যে, এই সকল মন্দিরও খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে নির্মিত। ইহাও সম্ভব হইতে পারে যে, মত্তময়ুর সম্প্রদায়ের শৈব সন্ন্যাসিগণ ঐরূপ মন্দির-নির্মাণ-পদ্ধতি বৃহত্ত্রদেশেও প্রচলিত করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ী হৈহয়-বংশীয় মহারাজাধিরাজ কর্ণদেব (খৃঃ সন ১০৪১-৭) কাণ্ডকুজ জয় করিয়া অস্তুরাজ-পত্তল বা অস্তর্বেদ অর্থাৎ গঙ্গা-ধর্মনার দোয়াব অধিকার করিয়াছিলেন, ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। কর্ণদেবের পুত্র যশঃকর্ণদেব অস্তর্বেদের অস্তর্গত করণ্ড গ্রাম নিজ গুরু শৈব মহাযোগী রুদ্রশিবকে দান করিয়াছিলেন, কিন্তু গাহডবাল-বংশীয় কনৌজরাজ গোবিন্দচন্দ্র মত্তময়ুর-যোগীদিগের নিকট হইতে এই গ্রাম কাড়িয়া লইয়া ঠাকুর বশিষ্ঠ শর্ম্মাকে (বিঃ সংবৎ ১১৭৭) দান করেন।

জব্বলপুর শহর হইতে তের মাইল দক্ষিণে নর্ম্মদার তটবর্তী ভেড়াঘাট গ্রামে একটি প্রাচীন শিলালিপি পাওয়া যায়, কিন্তু সেই শিলালিপি এখন বৃহত্ত্র-রাজ-আমেরিকার 'নিউ হ্যাভেনে' সুরক্ষিত। এই শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, কর্ণদেবের পৌত্র জয়কর্ণদেব মেবারের গুহিল-বংশীয় বিজয়সিংহের কন্টার পাণিগ্রহণ করেন। জয়কর্ণদেবের মৃত্যুর পর অহলনদেবী কলচুরি চেদি ১০৭ সংবৎসরে বৈদ্যনাথ নামক মহাদেবের মন্দির নির্মাণ করেন। এই মন্দিরের খরচ চালাইবার জন্ত রাণী অহলনদেবী জাউলীপত্তলাতে নামউণ্ডী গ্রাম এবং নর্ম্মদার দক্ষিণ তটে মকরপাটক গ্রাম দান করেন। গুর্জর-দেশীয় পাণ্ডপতাচার্য শৈব সন্ন্যাসী রুদ্রশিবকে এই দুইটি গ্রামের কর সংগ্রহ করিবার

ভার অর্পণ করা হয়। ইহা হইতে মনে হয় যে, যশঃকর্ণদেবের গুরু রুদ্রশিব খৃঃ ১১২০ সন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কারণ, খৃঃ ১১২০ সনে কনৌজরাজ গোবিন্দচন্দ্র রুদ্রশিবের উক্ত দেবোত্তর ভূমি করণ্ড গ্রাম ছিনাইয়া লইয়া অল্প কাহারেও



গুর্গীমসানের গোল শিবমন্দির

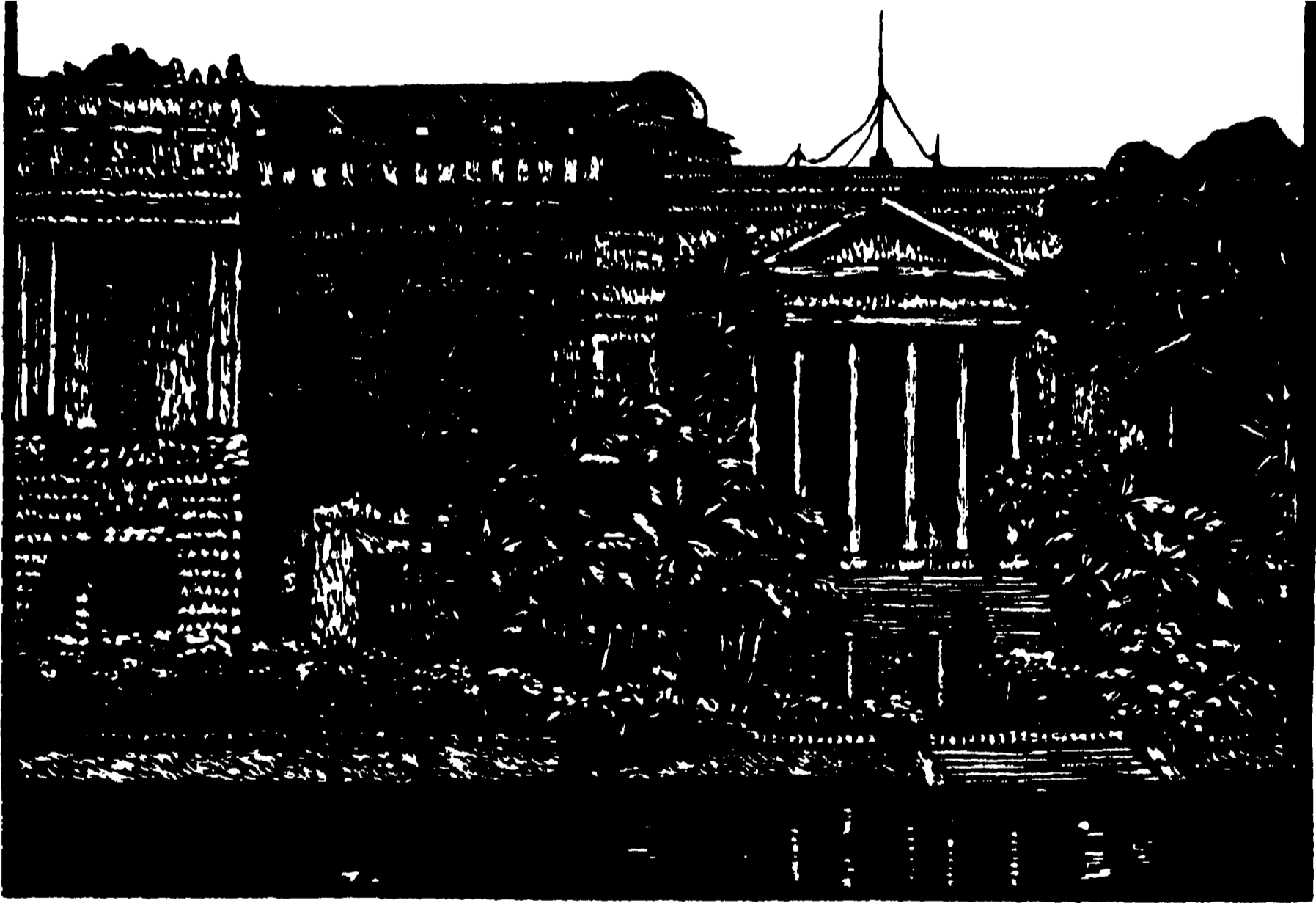
দিয়াছিলেন। অহলনদেবীর পৌত্র হৈহয়-বংশীয় মহারাজাধিরাজ বিজয়সিংহের রাজত্বকালে শৈবাচার্য বিদ্যাদেব রাজকুলা ছিলেন। বিজয়সিংহের দেহাবসান হইলে মত্তময়ুর সন্ন্যাসিগণ দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করেন। তেলিঙ্গানাতে কাকতীয়-বংশীয় রাজবর্গের রাজধানী বরঙ্গল এবং একগিলা নগরীতে যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে মত্তময়ুর সন্ন্যাসী বিখ্যেখর শঙ্কু কাকতীয়-রাজ গণপতি এবং চেদি মালব ও চোল-রাজ্যের রাজগুরু ছিলেন। খৃঃ ১২৬১ সনে কাকতীয়-বংশীয় মহারাণী রুদ্ৰাম্মা উক্ত বিখ্যেখর শঙ্কুকে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে কতকগুলি গ্রাম প্রদান করেন। উক্ত শিলালিপি অনুসারে বিখ্যেখর শঙ্কু গৌড়দেশীয় রাঢ়া মণ্ডলের পূর্বগ্রামে বাস করিতেন। জব্বলপুর জেলার ভেড়াঘাট ও বিলহরি এলাকায় মত্তময়ুর সন্ন্যাসীদের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।

মত্তময়ুর সম্প্রদায়ের শৈব সন্ন্যাসী গৃঢ় শিবতত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন। চন্দ্রহী ও গুর্গীর শিলালিপি অনুসারে শৈবাচার্য প্রশান্তশিব কাশীতে ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেন। ইহা

কেবল কবির অতিশয়োক্তি নহে, ইহার কিছু-কিছু প্রমাণও পাওয়া যায়। খৃঃ ১২২০ সনে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় ত্রিবাঙ্কুর হইতে ঈশানশিব-গুরুদেবপদ্ধতি নামক গ্রন্থ (যাহার দ্বিতীয় নাম তন্ত্রপদ্ধতি) প্রকাশ করেন। 'তন্ত্রপদ্ধতি' চারি ভাগে বিভক্ত—'সামান্তপাদ' 'মন্ত্রপাদ', 'ক্রিয়াপাদ' ও 'যোগপাদ'। এই গ্রন্থে ঈশানশিব 'বৌদ্ধায়ন-ধর্মসূত্র' 'গৌতমসূত্র' ভোজরাজকৃত তন্ত্রসার টীকা এবং মন্ত্রময়ুর সন্ন্যাসী ব্রহ্মশঙ্কর রচিত শিবাগমদীপিকার উল্লেখ করা হইয়াছে। ভোজরাজের উল্লেখ থাকাতে মনে হয় যে,

তিনি মালবরাজ ১ম ভোজরাজের পরবর্তী ছিলেন, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর পর তাঁহার জন্ম হয়। ঈশানশিব প্রণীত তন্ত্রপদ্ধতি আগমশাস্ত্রে স্বনামবিখ্যাত গ্রন্থ। বর্তমানে তান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের কোন ক্রিয়াই তন্ত্রপদ্ধতির সাহায্য ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না।

ভারতবর্ষে এখনও শৈব বৈষ্ণবদি অনেক প্রকার সন্ন্যাসী আছেন, কিন্তু অতি বিদ্বান্ ও প্রভূত শক্তিশালী মন্ত্রময়ুর সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের চিহ্ন—মাত্র দুই-একটি প্রস্তরখণ্ড ও প্রাচীন গ্রন্থ ছাড়া অন্য কোথাও নাই।



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
শিল্পী—শ্রীনরেন্দ্রকেশরী রায়

মেঘদূত

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

এ কাহিনীটি বোধ হয় নিতান্তই কবি-কল্পনা,— এর সংজ্ঞা দেখিয়া গোড়াতেই এইরূপ একটা ভুল ধারণা আসিয়া পড়িতে পারে; তাই বলিয়া রাখি—এর যক্ষরাজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র শ্রীমান্ অভয়পদ, যক্ষবধু, শ্রীমতী অণিমা রায় এবং এর মেঘদূত—থাক্, আপাতত একটু অন্তরালেই থাকুন।

অভয়পদের বৈমাত্র ভাই শ্রামাপদের বয়স চুয়াল্লিশ-পয়তাল্লিশের কাছাকাছি হইবে, অর্থাৎ তিনি তাহার চেয়ে ন্যূনকল্পে পঁচিশ বৎসরের বড়। বড় রাশভারী পুরুষ। পিতা অবশ্য আরও ঢের বড় ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন বড় ঢিলাঢালা, অতিরিক্ত স্নেহপ্রবণ মানুষটি। তাঁহার বর্তমানে দাদার কড়া শাসনটাকে একটু পাশ কাটাইয়া আসিতে হইত বলিয়া অনেকটা বাঁচিয়া ছিল,—মানে, তবু কিছু স্বাধীনতা পাওয়া যাইত; এখন তাঁহার মৃত্যুতে সেটুকুও লোপ পাইতে বসিয়াছে।

শ্রামাপদ বলেন—সংসারটা পরীক্ষাগার, হাসিঠাট্টার জায়গা নয়। তাই, সবার হাসিঠাট্টার পথে কড়া চোখের পাহারা বসাইয়া তিনি নিজের অধীনের জীবগুলিকে পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত করিয়া তুলিতে গভীর ভাবে মোতায়ন হইয়া গেছেন। মন লইয়াই আসল কথা, কিন্তু বিপদ এই, সে-মনের গূঢ়তত্ত্বগুলি খোদ মানুষের নিকট হইতে সব সময় ভাল করিয়া আদায় করা যায় না। তাহার কারণ, হয় মানুষকে সব সময় ইচ্ছানুরূপ অবস্থায় ফেলা যায় না, না হয়, ফেলিতে পারিলেও, আত্মগোপনশীল মানুষের চতুরালি ছিন্ন করিয়া তদ্ব্যবস্থার উদ্ধার করাও সময় সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই গুরু সমস্যা সমাধানের জন্য শ্রামাপদ বাড়ির একধারে নিরিবিলি দেখিয়া একটি ল্যাবরেটরী অর্থাৎ বীক্ষাগার তৈয়ারী করিয়াছেন। সেখানে ব্যাং, টিক্‌টিক্‌, গিনিপিগ্‌, খরগোস, বিলাতী ইঁদুর প্রভৃতি যে-সব প্রাণীর সঙ্গে মানুষের খুব ঘনিষ্ঠ সংসর্গ, তাহাদের খাঁচাবন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহাদের প্রয়োজনীয় অবস্থায় ফেলিয়া, এবং প্রয়োজন গুরুতর হইলে চিড়িঝাঁকিডিয়াও শ্রামাপদ মানবমনের তদ্ব্যবস্থার সংগ্রহ করিয়া থাকেন। সেগুলি যথাবিধি নোটবুকে জমা হইয়া ওঠে, তাহার পর মানুষের উপর প্রয়োগ করিয়া তাহাদের যাচাই হয়। শ্রামাপদের বেশীর ভাগ সময়ই এই বীক্ষাগারে কাটে।

পিতার মৃত্যুর পর কনিষ্ঠের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া শ্রামাপদ

নিরতিশয় চিন্তিত হইয়া উঠিলেন।—কেমন যেন একটা মনমরা ভাব, কিছুতে স্পৃহা নাই, পরীক্ষায় ফেল করিল, অত্যন্ত বাধ্য ও সত্যবাদী হইয়া পড়িয়াছে। অনেক পুস্তক উলটাইয়া এ অবস্থার একটা নামও বাহির হইল—Loss of individuality অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের বিলোপ।—জ্যেষ্ঠ একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিলেন।

গবেষণাগারে পরীক্ষা চলিতে লাগিল, কিন্তু কোন হৃদিস্ পাওয়া গেল না। একটা গিনিপিগের খাঁচা হইতে ধাড়ী ছটাকে সরাইয়া দেখা গেল ছানাগুলার তাহাতে মোটেই কোন দুঃখ নাই, বরং খাদ্যের দুইটা বড় বড় অংশীদার স্থানান্তরিত হওয়ার এবং খাঁচার মধ্যেও চলাফেরা করার খানিকটা সুবিধা হওয়ার তাহাদের ব্যক্তিত্ব বেশ বাড়িয়া গেল বলিয়াই বোধ হইল।—মাথা ঘামাইয়া আরও যে-সব গবেষণা করা গেল তাহাতেও এই ধরণের উল্টা ফলই হইতে লাগিল। তখন খাঁচাবন্দীদের নিকট হতাশ হইয়া শ্রামাপদ গৃহবন্দিনীর দ্বারস্থ হইলেন।—শ্রী হৈমবতী বিনা চিন্তা এবং গবেষণাতেই বলিলেন—“ঠাকুরের কালাশৌচটা গেলে ওর বিষে দিয়ে দাও।”

শ্রামাপদ ইঁা করিয়া শ্রীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

শ্রী বলিলেন—“ওরকম করে চেয়ে রইলে যে ?.. তুমি তো এই চাও যে ঠাকুরপো একটু অন্তমনস্ক হোক, মনে একটু ফুর্তি আসুক ?”

শ্রামাপদ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ঘরের মধ্যে খানিকটা পায়চারি করিলেন। একটা শোকার হাতলের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—“কিন্তু বিষে হলে ভাবনা বাড়ারই কথা তো ?...কি হয় ঠিক যে মনে পড়চে না।”

শ্রী বলিলেন—“আচ্ছা তো ! ঠিক না মনে পড়লে আমার ভাবনার কথা যে ! তা অত বেশী তোমায় এগুতে হবে না, আমিই কিছু কিছু মনে করিয়ে দিচ্ছি—বার সের ওজন বেড়ে গিয়েছিলে,—আমায় নিয়ে আসবার সময় ইষ্টিশানে তৌল হয়ে এসে আমায় জানালে—মনে পড়চে ?”

শ্রামাপদ বলিলেন—“হ্যাঁ, আর তুমি বললে—‘থাক্, ইষ্টিশানের লোকেদের ওজন বেড়ে যাওয়ার কথা জানিয়ে কাজ নেই...আমায় পাটের গাঁটরি, কি চালের বোরা ভেবেছিলে, কে জানে।’”

হৈমবতী হাসিয়া বলিলেন—“হ্যাঁ, ভুল হয়েছিল,—চালের বোরার মধ্যে তবুও একটা বস্ত থাকে। তারপরে

নৈহাটি ইষ্টিশানে সেই বুড়ী ভিকিরীটাকে গলার মাকলারটা খুলে দিয়ে দিলে। জিজ্ঞাসা করতে বললে...”

শ্যামাপদ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—“হ্যা, হ্যা, মনে পড়চে...”

—“হুঁড়ির চোটে চলন্ত গাড়ী থেকে নামতে গিয়ে পা মুচকে...”

শ্যামাপদ লজ্জিত হইয়া আর অগ্রসর হইতে দিলেন না। অভয়পদের বিবাহ দেওয়াই সিদ্ধান্ত হইল।

২

অভয়পদ ষে-দিন বধু লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল, সেই দিন বিকালে শ্যামাপদ টেরিটিবাজার হইতে এক জোড়া হাড়গিলা কিনিয়া আনিয়া নিজের ল্যাবরেটারিসাৎ করিলেন। হৈমবতী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিলেন—“এ আবার কি সখ? কি হবে এ-দুটো; চেরাফাঁড়া করবে তারও তো মাংস দেখিচি না এদের মধ্যে।”

শ্যামাপদ একটু আমতা আমতা করিয়া বলিলেন—“চকাচকাই কেনবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তা পাওয়া গেল না, তাই, প্রায় একই জাত ব’লে এই দুটো...”

হৈমবতী আরও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“কেন চকাচকাই বা কি হ’ত?”

—“কি যে বলে—ওদের দাম্পত্যজীবনটা আদর্শ কি-না... এ-কথা আমি একাই বলিচি না গো, তোমাদের কালিদাসও স্বীকার করে গেছেন—চক্রবাক, চক্রবাকী”...

—“করুন, তারপর?”

—“তাই মনে করলাম—অভয়টার বিয়ে হ’ল—এখন কি-ভাবে চললে ওদের দাম্পত্যজীবনটা আদর্শ হয়ে ওঠে—একে অস্ত্রের জীবনটাকে ভালভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারে, সে সম্বন্ধে একটু গবেষণা করা দরকার, তাই...”

হৈমবতী গালে তর্জনী স্পর্শ করিয়া, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, বলিলেন—“তাই বাজার থেকে এক জোড়া হাড়গিলা কিনে নিয়ে এলে! অবাক করলে তুমি; অমন সোনার চাঁদ ভাই—ভাদ্রবৌ ঐ ল্যাংপ্যাং-এ হাড়গিলের সামিল হ’ল! বাট, বাট, ম্যাগ্যা, একটা আন্ত বাং গিলে ফেললে! দূর...হ”

শ্যামাপদ বিপর্যস্ত হইয়া বলিলেন—“কি অবুঝ দেখ ত! আরে সামিল হবে কেন? কথা হচ্ছে—মনটা উভয় ক্ষেত্রে একই ভাবে কাজ করে, পালক, রোঁয়া—এ-সবের মধ্যেই হোক, আর সেমিজকামিজের মধ্যেই হোক;—যেমন ধর, বধী গরুটাকে ছুইবার সময় সে তার বাছুরটার অন্তে খানিকটা দুধ চুরি ক’রে রাখে; সেটা যে-কারণে হয় ঠিক সেই কারণেই তুমিও খাবার পর খুঁকীর অন্তে তোমার ভাগ থেকে খানিকটা...”

হৈমবতী ধমক দিয়া উঠিলেন—“আচ্ছা, খামো বাপু; সখ থাকে তোমার ভাইকে হাড়গিলে কর গিয়ে, আমায় বধীর সঙ্গে তুলনা দিতে হবে না..”

বিবাহের পর প্রত্যাশিত ভাবাস্তরটুকু বেশ পাওয়া গেল। অভয়পদের মনের প্রফুল্লতা স্ত্রে আসলে ফিরিয়া আসিয়াছে, ওজনও বাড়িয়াছে ভালরকমই; কিন্তু পাঠা-জীবনের উপর প্রতিক্রিয়াটা কেমন যেন সন্দেহজনক বলিয়া বোধ হইতেছে এবং সত্যবাদী ভাই যে সেটা গোপন করিবার জন্ত ধীরে ধীরে উৎকট মিথ্যাবাদী হইয়া উঠিতেছে, মাঝে মাঝে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। হাড়গিলাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতে হয় না বলিয়া তাহার নিকট হইতে এ-বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হইয়া উঠিতে লাগিল। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে হাতুড়ি-পেটার কল্যাণে অভয়পদের এক দিন মাথা-ব্যথা কিংবা পেট-কামড়ানির কোন বালাই ছিল না, এখন ক্রমে ক্রমে এই রোগ দুটির আবির্ভাব হইতে লাগিল। শ্যামাপদ রোগের জন্ত মোটেই চিন্তিত হইলেন না,—হুশ্চিন্তার কারণ এই যে, অস্থখ ঠিক দশটা হইতে চারটা পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং তাহার চেয়েও অধিক হুশ্চিন্তার বিষয় এই যে, কোন রকম ঔষধপত্র সেবন না করিয়া স্ত্রু নব-বধুর সেবার অর্থাৎ উপস্থিতির গুণই আরোগ্য লাভ হইয়া যায়। ওদিকে তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষার সময় হইয়া আসিতেছে; ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এ একটা সঙ্কট। শ্যামাপদ মহাকাঙ্ক্ষের পড়িলেন এবং অবশেষে এক দিন নেহাৎ অনন্তোপায় হইয়া কনিষ্ঠকে নিজের ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন ও কথাটা কি ভাবে পাড়িবেন সে-বিষয়ে মনে মনে একটা খসড়া তৈয়ার করিতে লাগিলেন।

অভয়পদ প্রবেশ করিলে শ্যামাপদ বলিলেন—“তেমন কিছু কথা নয়,—ওদিকে কয়েকটা কাজে বাস্ত ছিলাম ব’লে তোমার পড়াশুনার কথাটা অনেক দিন একেবারেই ভাবতে পারিনি। হ্যা, কেমন প্রিপ্যারেশন হচ্ছে?”

অভয়পদ হাতের আংটিটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে ধীরে ধীরে বলিল—“ভালই।”

—“খার্ড ইয়ারের পরীক্ষাটা আবার এসে পড়েচে কি-না, তাই জিজ্ঞাসা করিচি।”

অভয়পদ চুপ করিয়া রহিল।

—“এই পরীক্ষাটা বড় শক্ত কি-না, এটা পেরিয়ে গেলেই আবার দু-বছর নিশ্চিন্দী।”

অভয়পদ চুপ করিয়া রহিল; দাদাও একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন—“ইয়ে, কথা হচ্ছে, কোন রকম ডিস্টারবেল হচ্ছে না তো?”

অভয়পদ বলিল—“আজ্ঞে না, ঘরটা বেশ নিরিবিলা থাকে।” শ্যামাপদ মনে মনে বলিলেন—“সেই তো সর্বনাশের

মূল।” একটু মৌন থাকিয়া কহিলেন—“হ্যা, ঐটিই এখন দরকার।—মানে হচ্ছে—যদি এ সঙ্কেও মনে কর যে এক-আধ জনকে বাইরে সরিয়ে দিয়ে বাড়িটা আরও হালকা, আরও নিরিবিলি করা দরকার, তো সে ব্যবস্থাও না হয় করা যায়।”

কথাটা জলের মত সহজ; কিন্তু অভিলষিত ফল পাওয়া গেল না। অভয়পদ শ্রেণ বুদ্ধিতেই পারিল না, কিন্তু পারিয়াও বুদ্ধি না বলা শক্ত। যেন খুব গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া উত্তর করিল—“আজ্ঞে না, পিসীমা পড়ার ঘরে এসে একটু গজর গজর করতেন, তা তিনি তো চলেই গেছেন কালী।...”

শ্যামাপদ উত্থাপ্ত হইয়া মনে মনে বলিলেন—“বাঁচিয়েচেন তোমাদের দু-জনকে।” প্রকাশতঃ এ-প্রসঙ্গটা আর চালাইতে পারিলেন না। ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন—“তা যেন হ’ল; কিন্তু তোমার শরীরটার দিকে একটু লক্ষ্য রেখ। তোমার বৌদি বলছিলেন—আজকাল নাকি প্রায় মাথা-ব্যথা করচে? ওটা ঠিক নয় তো!”

অভয়পদ এ আক্রমণে একটু খতমত খাইয়া গেল, কিন্তু সরলঅস্তঃকরণ দাদা নিশ্চয় দাম্পত্যশাস্ত্রের প্যাচোয়া কথা অতশত বোঝে না এই সিদ্ধান্ত করিয়া সহজভাবেই বলিল—“হ্যা, ওদিকে পড়াশোনার একটু চাপ পড়েছিল, তাই দু-এক দিন রাত জেগে...”

শ্যামাপদ অসন্তোষের ভাব দেখাইয়া কহিলেন—“ঐটি তোমাদের বড় অন্যায্য। রাত জেগে পড়াশোনা করাটা...” দৃষ্টি নত করিয়া কহিলেন—“তোমার গিয়ে, যে-কোন কারণেই রাত জাগাটা স্বাস্থ্যের পক্ষে বড়ই ক্ষতিকর। আচ্ছা, যাও তা হলে; এই সব জিজ্ঞাসা করবার জন্তেই ডেকেছিলাম। না, রাত-টাত জাগার আর ধার দিয়েও যেও না—”

৩

ভাইকে সোজা ভাবে বাগমানান গেল না। দাদা কোন বক্ররীতি অবলম্বন করিলেন কি-না বলা যায় না, তবে হঠাৎ এক দিন দেখা গেল, হাড়গিলা দুইটা পৃথক পৃথক পিঁজরায় বন্দী হইয়া অত্যন্ত চেষ্টামেচি লাগাইয়াছে—এবং আশ্চর্য্য যোগাযোগ—ইহার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অভয়পদর খুঁড়খুঁড় আসিয়া বলিলেন তাঁহার দাদার শরীর খারাপ, দিনকতকের অন্ত কস্তাকে দেখিতে চান।

হৈমবতীর আপত্তি সঙ্কেও শ্যামাপদ ভ্রাতৃজ্ঞানকে পিঁজরায় পাঠাইয়া দিলেন।

দিনপনের সতর্ক পর্যবেক্ষণের দ্বারা জানা গেল—এই বিচ্ছেদের ফলে শুধু গভর্ণমেন্টের ডাকবিভাগ দুই হাতে পক্ষসা লুটিতেছে মাত্র। রোজ একখানি করিয়া ব্যাটরা পোষ্ট-আপিসের ছাপমারা ক্ষীণতমর লেকাফা ত্রীমান্ অভয়-পদ চট্টোপাধ্যায়ের নামে হাজির হয়—প্রায়ই একখানি টিকিটে

তাহার ভাড়া কুলার না। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, সে-সব পত্রের আধাআধি ওজনেরও জবাব প্রত্যহ ব্যাটরা অভিমুখে যাত্রা করে, তাহা হইলে পাটীগণিতের সোজা হিসাবে অতি সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে ভায়ের কলেজ, পরীক্ষা, এ-সব দিকে মন দিবার আর একটুও অবসর থাকিই থাকে না। আর একটি উপসর্গ জুটিয়াছে,—এতদিন অভয়পদর মাথা-ব্যথা পেট-কামড়ানি ছিল, এখন—কি বিধানে বলা যায় না—সে-সব উপদ্রব বধুর শরীরে গিয়া জুটিয়াছে। তিন দিন তো এমন অবস্থা গিয়াছে,—কলেজে গাড়ী পাঠাইয়া অভয়পদকে বধুর শয্যাপার্শ্বে হাজির করিতে হইয়াছে। স্বথের বিষয় উগ্রতাটা বেশীকণ থাকে না, তবে দাদার তরফ থেকে চিন্তার বিষয় এই যে, স্বয়ং ভাইকে এ-অবস্থায় সমস্ত দিনরাত ব্যাটরায় থাকিয়া যাইতে হয়।

এর উপর সে-দিন সকালে দেখা গেল সে হাড়গিলা-দম্পতি পিঁজরার বাহিরে গলা বাড়াইয়া অর্ধমৃত অবস্থায় নীরবে পড়িয়া আছে, সে-দিন শ্যামাপদ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বৈকালেই গিয়া ভ্রাতৃবধুকে গৃহে লইয়া আসিলেন এবং পুকুরঘাটে নির্জনে বসিয়া ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে গভীর-ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দারুণ সমস্যা—কাছে থাকিলেও বিপদ, দূরে থাকিলে বিপদের উপর বিপদ। ওদিকে পরীক্ষার মাত্র আর তিন সপ্তাহ বাকী। অস্ততঃ বধুটি যদি একটু বুদ্ধিত তো একটা সুরাহা হইতে পারিত। বুদ্ধি আছে, তবে সন্দেহে সেটা এখন যোলআনাই অকাজে লাগিতেছে। মুঞ্চিল এই যে, কিছু বলিতে যাওয়াও সম্বন্ধবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। তবুও কনিষ্ঠের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এবং সে ভবিষ্যতের সহিত ভ্রাতৃবধুর ভবিষ্যৎ অজ্ঞানভাবে জড়িত বলিয়া, শ্যামাপদ আর অত অগ্রপশ্চাত্ত ভাবিলেন না, দু-দিন পরে একবার ভ্রাতৃবধুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্তা হইল—

“আজকাল কেমন আছ মা?”

“ভাল আছি।”

শ্যামাপদ মনে মনে বলিলেন—“তা জানি।”

“হ্যা, ব্যাটরাতে বড় সংসারে ছেলেপিলের গোলমাল বেশী, তাই আমি ভাবলাম শরীরটা যখন এত উপরিউপরি খারাপ হচ্ছে একটু নিরিবিলিতে থাকাই ভাল। এখানে কোন রকম গোলমাল হচ্ছে না তো?”

“না।”

“হলেও তুমি এড়িয়ে চলবে, অভয়টার মতন তো আর নও। দেখ না; সামনে এগজামিন, একটু চাড় নেই; খেলা, কুকুর, এ-ও-তা—এই সব নিয়েই ব্যস্ত।”

বধু একটু মাথা নীচু করিল; বোধ হয় অনিশ্চিত এ-ও-তার মধ্যে নির্দিষ্ট কাহাকেও স্পষ্ট দেখিতে পাইল।

শ্রামাপদ বলিলেন—“এগুজামিনের আর মোটে তিন সপ্তাহ কি-না।” একটু খামিয়া বলিলেন—“আর তিন সপ্তাহই বা কোথায়?—এদিকে এই এগারটা দিন, ওদিকে সাতটা দিন, এই আঠারটা দিন কুলে আছে। তার মধ্যে আগেশেষে দুটো দিন তো বাদই দিতে হয়, নয় কি?”

“হঁ।”

“আর কিছু নয়, এটা ওর খার্ডইয়ার কি-না, তাই একটু সাবধান হওয়া; তা তুমি আমি সাবধান হলে কি হবে মা?—ওটার কি আর নিজের ঠাক আছে!—দেখতে পাও কি!”

বধু মুখ নীচু করিয়া ভাইনে বাঁমে মাথা নাড়িল—না, কোন ঠাক দেখিতে পায় না।

বিষয়টির গুরুত্ব ভাল করিয়া মাথায় অল্পবিষ্ট করাইয়া দিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া শ্রামাপদ বলিলেন—“তা হলে যাও মা তুমি, শরীরটা কেমন আছে তাই জিগোস করতে ডেকেছিলাম। অল্পকুলডাক্তার বললে—এখন স্নেফ্ বিশ্রাম আর ঘুম,—ঘুমটা একটা মস্তবড় দরকারী জিনিষ কি-না ...যাও মা।”

তিন-চার দিনের পর শ্রামাপদ খবর লইয়া দেখিলেন—ঘুমটা যে অত দরকারী জিনিষ তাহা তাহারও জানা ছিল না।—ব্রাহ্মবধু সমস্ত দিনটাই ঢুলিয়া ঢুলিয়া, অথচ স্বযোগ পাইলে গভীর নিদ্রায়ই কাটাইতেছে। এদিকে বধু আসার পর থেকেই অভয়পদ মারাত্মক রকম নিরিবিলির ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সকালে সন্ধ্যায় সমস্ত দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া অমন একমনে পাঠাভ্যাস যে তাহার কোষ্ঠিতে লেখা ছিল এ-কথ: পূর্বে কেহ জানিত না। এরকম নিষ্ঠা, শাস্তি, নীরবতা দেখা যায় এক শুধু যোগাভ্যাসে অথবা নিদ্রায়।

শ্রামাপদ স্ত্রী হৈমবতীকে ডাকিয়া বলিলেন—“হ্যাঁগা, এতো বড় ফ্যাসাদেই পড়া গেল এদের নিয়ে,—সমস্ত রাত দুটোতে জেগে কাটাতে আর সমস্ত দিন ঘুমোবে।”

হৈমবতী যুহু তিরস্কার করিয়া বলিলেন—“চূপ কর! তোমার কি গুরুকম করে বলা মানায়?”

শ্রামাপদ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—“কি গেরো! মানায় না বলে চূপ করে থাকতে হবে? বেশ আমার না মানায় তো তুমিই না হয় বল না কেন?”

—“ইস্, আমি হস্তারক হ’তে গেলাম বলে। তা ভিন্ন আমার লাগে ভাল।”—বলিয়া, বোধ হয় একটু হাসিয়া ঘুরিয়া চলিয়া গেলেন।

“ও!”—বলিয়া শ্রামাপদ খানিকটা একভাবে টাড়াইয়া রহিলেন।—ভাবটা—বুঝেচি, তুমিও এই চক্রান্তের মধ্যে।

এক নূতনতর বন্দোবস্ত করিয়া দেখা স্থির হইল। বাগানের মধ্যে, বীক্ষণাগার হইতে খানিকটা দূরে, বাড়ি হইতে বিচ্ছিন্ন একটা ছোট ঘর ছিল, প্রয়োজনের অভাবে তাহাতে

কাঠকুটা ভাঙা আসবাবপত্র রাখা থাকিত। সেই ঘরটি পরিষ্কার করাইয়া, চূণ কিরাইয়া অভয়পদের পড়িবার এবং শয়ন করিবার ঘর নির্দিষ্ট হইল।

শ্রামাপদ বলিলেন—“আমি বুঝতে পারছিলাম তোমার বাড়ির ভেতর সব বিষয়ে অল্পবিধে হচে, অথচ তুমি মুখ ফুটে বলতেও পারচ না। এ বাগানের মধ্যে একটেরের দিব্যি হ’ল না?”

অভয়পদ মুখটা গৌজ করিয়া বলিল—“হঁ।”

“এখানে তোমাকে দোর-জানালা কিছু বন্ধ করতে হবে না; বরং পড়তে পড়তে ক্লাস্তি বোধ করলে, খানিকটা বাগানে এদিক-ওদিক বেড়িয়ে এলে। ফুল তুমি ভালওবাস, আর ওর চেয়ে মন প্রফুল্ল রাখবার মত কি-ই বা আছে?”

অভয়পদ মুখটা আরও গৌজ করিয়া, আরও অল্পনাসিক সুরে বলিল—“হঁ।”

ভাই যেমন সর্বদা বইয়ে-মুখে এক হইয়া বসিয়া থাকে তাহাতে মনে হয় ব্যবস্থাটা খুব লাগসই হইয়াছে। হইবার কথাই কি-না,—নীরব নিখর জায়গাটি যেন কথ মুনির আশ্রম। দাদা নিশ্চিন্ত হইয়া অনেকদিন পরে বীক্ষণাগারে একটু ভাল করিয়া মন দিতে পারিয়াছেন। হাড়গিলা দুটারও অল্পরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। পরীক্ষায় পরীক্ষায় পরিশ্রান্ত হওয়ার দরুণই হোক কিংবা, অদর্শনের হেতু বিস্মৃতির জন্মই হোক তাহার আর ততটা গোলযোগ করে না। দিব্য খায় দায়, যদি নেহাৎই তেমন তেমন হইল তো হৃদ তাবের জ্বালের উপর চঞ্চু দ্বারা গোটাকতক ছোবল মারে। এ-সব যথার্থীতি নোটবইয়ে লিপিবদ্ধ হইতেছে। শ্রামাপদ *Love that defied scienc* নাম দিয়া মনস্তত্ত্বমূলক একটি নিবন্ধ লিখিতেছেন, কোন বিলাতী কংগ্রেসে দিবেন। নূতন প্রেম বৈজ্ঞানিকের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত কিরূপে নিয়ন্ত্রিত হইল তাহারই গবেষণাপূর্ণ ইতিহাস। বিজ্ঞানজগৎকে চমৎকৃত করিয়া দিবে বলিয়া আশা করেন।

পড়িবার ঘর থেকে বাড়িটা দেখা যায়, কিন্তু বাড়ির কাহাকেও দেখা যায় না। সেই জন্ত কেবলই মনে হয় দুইটি টানা টানা ব্যাকুল চোখ এই দিকে অনিমেষ চাহিয়া আছে, বই থেকে মুখ তুলিলেই যেন কণিকের জন্ত চোখোচোখি হইবে।

ওদিকে টানা চোখ দুটিও সর্বদা যেন একটু সজল, তারা যেন দেখিতে পায় পাষণের মত কঠিন বইয়ের গাদার ওপর কোথাও একজন মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকে; তাহাকে ওঠায়, একটু ‘আহা’ বলে, জিহংগারে এমন কেহই নাই।

—কল্পনাদেবী এইটুকু মধ্যস্থতা করেন।

আর একটু মধ্যস্থতা করে জিহি।—তেতলার ঘরে বসিয়া

নীচের বিচিত্রতার শৃঙ্খতা দেখিতেছে, কিংবা আকাশের মহাশৃঙ্খতার কত বিচিত্রতার ছবি আঁকিতেছে—সিঁড়ি ভাঙিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিমি আসিয়া উপস্থিত হইল। অগ্নিমা তাড়াতাড়ি সোকা কিংবা চেয়ার হইতে নামিয়া তাহার বিকৃতিকে কৌকড়া লোমেভরা গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া আকুলভাবে প্রশ্ন করে—“কোথায় ছিলি এতক্ষণ, পোড়ারমুখী?”

জিমি উত্তর দিতে পারে না বলিয়াই তাহার বক্তব্য সম্বন্ধে অগ্নিমার কোন দ্বিধা সন্দেহ থাকে না; বলে—“বুঝেচি তুই কার কাছে ছিলি—তোয় চাইবার ভঙ্গিতেই বুঝেচি। কি করচে রে?—খুব পড়চে, না?...তুমি বলবে এগজামিন, তুমি বলবে ঘুমটা দরকার...ছাই এগজামিন, ছাই ঘুম, ওসব কিছু দরকার নেই; তুই যা, বেয়ো।”

একটু থাকি দিয়া আবার কোমরটা সঙ্গে সঙ্গে জড়াইয়া ধরে, বলে—“কি দেখলি লা? খুব বুঝি পড়চে?”

জিমি প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে এই সোহাগটুকু পাইয়া প্রবলবেগে লাজ আর মাথাটা নাড়িতে থাকে। অগ্নিমা উল্লসিত হইয়া তাহাকে বৃকে জড়াইয়া ধরে, বলে—“পড়চে না, না?—সে আমি জানি; আমায় ছেড়ে থাকলে ওর নাকি আবার পড়া হয়। যখন ফেল ক’রে বসবে তখন বড়াকুরের চাক হবে।”

জিমির সামনের হাত দুটা তুলিয়া ধরিয়া প্রশ্ন করে—“কি বলিস?”

জিমি জিভ বাহির করিয়া প্রবলবেগে মাথা ছুলায়। অগ্নিমা তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলে—“না, তখনও হবে না?—আচ্ছা যা, তোকে আর দৈবজ্ঞগিরি ফলাতে হবে না, কালামুখী কোথাকার।”

অভয়পদের ঘরে গাদা-করা বই খাতার সোঁদা গন্ধ হঠাৎ চাপা পড়িয়া নববধূর জামা কাপড়ের পরিচিত এসেন্সের বাসী গন্ধর ঘরটা ভরিয়া ওঠে; মুখ ফিরাইয়া চাপা উল্লাসের সহিত বলে—“জিমি বুঝি?” কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

কোথায় এতক্ষণ যে ছিল তাহা জানে বলিয়াই আর উভয়ের প্রয়োজন হয় না; ‘আয়’—বলিয়া তাহার গলাটা জড়াইয়া কাছে টানিয়া লয়। বধূর মত অত আবলতাবল বকে না, মুখের পানে আবেগময় দৃষ্টিতে চাহিয়া ধীরে ধীরে কপালটিতে হাত বুলায়। ওর সমস্ত শরীরটাতে অগ্নিমার স্পর্শ মাখান আছে, সর্কাজ দিয়া যেন সেটা মুছিয়া লইতে থাকে।

আবলতাবল অত বেশী বকে না বটে, তবু এক-আধটা কথা বাহির হইয়াই পড়ে, প্রকৃতিস্থ লোকের মুখ দিয়া যাহা বাহির হইতেই পারে না। বলে—“কথা কইতে তুই শিখবি নি জিমি?—দুটা কথাও যদি আমার অগ্নিমার কাছে পৌঁছে দিতে পারিস্...”

একটু থামিয়া বলে—“দেখ না, তোদের দেশে কুকুরেরা

কত বড় বড় কাজ করচে; কত খুনী আসামী ধরিয়ে দিচ্ছে, কত খবর পৌঁছে দিচ্ছে, কত...”

এই ধরণের প্রাত্যহিক কথাবার্তার মধ্যে অভয়পদ এক দিন একটু বেশীক্ষণ থামিয়া কি একটা ভাবিল, তাহার পর বইয়ের গাদা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল, টেবিলের উপর একটা শক্ত নীল সূতার বাণ্ডিল ছিল, তাহার খানিকটা ছিঁড়িয়া লইয়া, তাহার মাঝখানে একটা কাগজের টুকরা বাঁধিল, তাহার পর সূতাটি জিমির বৃকের চারিদিকে বেড় দিয়া বাঁধিয়া, সূতাটি ও তৎসংলগ্ন কাগজটি তাহার স্তনীয় কেশরাশির মধ্যে সম্বর্ণনে ঢাকিয়া দিল।

দাদার ভাই প্রতি-গবেষণা লাগাইয়াছে।

কিন্তু হায়, সাফল্য-লক্ষী নিতান্তই বিমুখ।—পাঁজরার চারিদিকে হঠাৎ এ-এক নূতন উপদ্রবে জিমি ঘোর আপত্তি লাগাইয়া দিল। উঠিয়া, পড়িয়া, গড়াইয়া এক মহামারি কাণ্ড বাধাইয়া দিল, এবং শেষে ছিঁড়িবার চেষ্টায় সূতাটার মধ্যে সামনের একটা পা আটকাইয়া যাওয়ায়, তিন পায়ে সমস্ত ঘরটা ছুটাছুটি করিতে করিতে পরিভ্রমি চীৎকার শুরু করিয়া দিল।

দাদা বুঝি আসিয়া পড়ে! সমস্ত ঘরটার একটা ছুরি কি কাঁচি নাই। অবশেষে নিরুপায় হইয়া অভয়পদ জিমিকে এক হাতে জড়াইয়া ধরিয়া, সূতাটা সাধ্যমত একটু টানিয়া ধরিয়া, দাঁত দিয়াই ছেদন করিয়া দিল। মুক্তির আনন্দে এবং কতকটা বোধ হয় প্রভুর এই হঠাৎ ভাবপরিবর্তনে অনেকটা সঙ্কীর্ণচিত্ত হইয়াও, জিমি আর কালবিলম্ব না করিয়া তীরবেগে বাহির হইয়া গেল।

নিরাশ হইয়া অভয়পদ একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল;—অস্ফুট স্বরে নিজেকেই বালিল—“একটু ট্রেনিং দিতে পারলে ঠিক চিঠিটা পৌঁছে দিতে পারত, কেউ টেরও পেত না; কিন্তু যা হলো শুরু ক’রে দিলে!” একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

কিন্তু হাজার হোক প্রেমিকের মন, তায় আবার বিরহ-শানিত একটি বিকলতাতেই তাহার উদ্ভাবনীশক্তি লোপ পায় না।

এদিকে একটু সুরাহাও হইল।—

সমস্ত দিন তর্কে তর্কে থাকিয়া খবর পাওয়া গেল খর-গোসের জোড়া ভাঙিয়া একটি পঞ্চপ্রাপ্ত হইয়াছে, দাদা কাল সকালে টেরিটিবারে যাইবেন। অভয়পদ আন্দাজ করিল অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক লাগিবে। আহা, বেচারী খরগোস! তা ভাল হইয়াছে; দাদার হাত থেকে ভো পরিভ্রাণ পাইয়াছে।

শ্রাম্যপদের মোটরের আওয়াজ যখন দূরে মিলাইয়া গেল, অভয়পদ ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে পা বাড়াইল। ছুয়ারের কাছেই ছোট ভাইপোর সঙ্গে দেখা হওয়ায় প্রশ্ন করিল—“দাদা কোথায় রে ধলু? তাঁকে আজ সকাল থেকে দেখছি না যে?”

ধলু প্রত্যাশিত উত্তরই দিল—“জানি না তো।”

—“তবে তোর মা জানে নিশ্চয়, তাঁকেই জিগ্যেস করে আসি। কোথায় আছে বল দিকিন তোর মা?”

“বড় ঘরে।”

ভ্রাতৃজ্ঞানার সন্ধানে অভয়পদ ভিতরে প্রবেশ করিল, এবং যাহাতে তিনি সন্ধান না পান সেই উদ্দেশ্যে বড় ঘরের দিকের রাস্তাটা বাদ দিয়া একেবারে অগ্নিমার ঘরে প্রবেশ করিল। অগ্নিমা ছিল।

কোয়ার্টার তিনেক পরে বিদায় লইয়া অলঙ্কিতে বাহিরে আসিবে, হৈমবতীর একেবারে সামনাসামনি হইয়া গেল। বলিল—“এই যে। দাদা কোথায় জিগ্যেস করব বলে, তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছি সেই থেকে..”

হাসির ভাব দেখিয়া খামিয়া গেল। এমন সময় মোটরের পরিচিত হর্নের আওয়াজ হইল। ভ্রাতৃজ্ঞানার হাসিটাকে গাঙ্গীর্ষ্যে প্রচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া প্রশ্ন করিল—“ওঁকে খুঁজিলে বললে; যদি জিগ্যেস করেন—কেন—কি বলব?”

অভয়পদ ক্রিপ্রগতিতে সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতেই ঘুরিয়া শাসন ও মিনতির ভঙ্গিতে বলিল—“না, খবরদার।... তোমার পায়ে পড়ি বৌদি যাও...”

দাদা আসিয়া দেখিলেন ভাই পড়িবার ঘরে; একবার ডাকিলেন কিন্তু উত্তর না পাওয়ায় একাগ্রতায় আর বাধা না দিয়া, পা টিপিয়া টিপিয়া ল্যাবরেটরীর পানে চলিয়া গেলেন।

তিন কোয়ার্টার ব্যাপী কনফারেন্সে কিছু একটা সাব্যস্ত হইয়াছিল নিশ্চয়। সে-দিন কলেজ হইতে ফিরিবার সময় অভয়পদ বেশ একটি ডাগর দেখিয়া পিতলের ঘুড়ুর কিনিয়া আনিয়া জিমির গলার ব্যাণ্ডে ঝুলাইয়া দিল; তরল ঝুমুর ঝুমুর আওয়াজে জিমি সমস্ত বাড়িটা মুখরিত করিয়া তুলিল। শ্যামাপদ অভিনবত্বটুকু অহুমোদন করিলেন, বলিলেন—“মন্দ করনি অভয়, ওদের মিউজিক্যাল সেক্টরটা যদি ফুটিয়ে তোলা হয় তো মানসিক কোন পরিবর্তন হয় কি-না পরখ করে দেখবার বিষয়। এ্যানিম্যাল সাইকোলজিতে আমরা একটু নতুন তথ্য দান করতে পারি।

নোটবুকে আঁকিবার চুক্তি লইলেন এবং খুব সূক্ষ্মভাবে জিমির গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। নোটবইটি মস্তব্যে মস্তব্যে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

৫

বেলা আন্দাজ নয়টা হইবে। ল্যাবরেটরিতে বিশেষ কোন কাজ নাই, তাহা ভিন্ন ভাই এত সুবোধ হইয়া উঠিতেছে যে তাহাকে চোখে চোখে রাখিবার জগুও আর গবেষণার অছিলায় বিছামিছি বাগানে বসিয়া থাকিতে হয় না। শ্যামাপদ সাক্ষ্যের জগু বেশ একটি নিবিড় আশ্রয়প্রসাদ উপভোগ করিতেছেন এবং আপাততঃ উপরের বড় ঘরটিতে নিরালায়

তাঁহার *Love that defied science* প্রবন্ধটির উপসংহার লেখায় ব্যাপৃত আছেন।

সামনের বারান্দা দিয়া জিমি নিতান্ত ব্যস্তসমস্তভাবে নীচের দিক হইতে আসিয়া ওদিকে অগ্নিমার ঘরের পানে চলিয়া গেল। তাহার যাওয়ার ভাবেই মনে হইল সে বিশেষ একটা কাজে লাগিয়া রহিয়াছে—এদিক-ওদিক চাহিবার ফুরসৎ নাই।

শ্যামাপদ কলমটা তুলিয়া লইয়া একটু অগ্নমনস্ক ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন—সঙ্গীতে এই একাগ্রতাত্মক আনিয়া দিয়াছে... তাহা হইলে দেখা যাইতেছে সঙ্গীত মাহুকের মনে যে ঐকান্তিকতা জন্মায় পশুর মনেও ঠিক সেই রকমই..

হঠাৎ তাঁহার মনে হইল ঘুড়ুর শব্দটা যেন ছিল না! তিনি কি রচনায় এতই লিপ্ত ছিলেন যে শব্দটা তাঁহার কানে গেল না,—না; শ্যামাপদ ঘুড়ুরটা খুলিয়া রাখিয়াছে? কেন, খুলিতে গেল কেন? বোধ হয় তাহার পড়াশুনার ব্যাঘাত জন্মায়—ব্যাঘাত আর উহাতে কতটুকু হইবে? তবু, যখন খুলিয়া দিয়াছেই তখন না হয় আপাততঃ থাক, পরীক্ষাটা হইয়া গেলে আবার পরাইয়া দিলেই চলিবে।... দেখ ব্যাপার!—বৈজ্ঞানিক মেথড জিনিষটাই এই রকম—ঐ অভয়পদের মন বই কেতাব থেকে কি রকম উঠিয়া গিয়াছিল, আর আজ বই আর নিজের মাঝখানে একটা ঘুড়ুরের মিহি আওয়াজও আসিতে দিতে সে রাজী নয়।

এই সময় কুকুরটাকে সেই রকম হস্তমস্ত হইয়া ওদিক হইতে নীচের দিকে চলিয়া যাইতে দেখা গেল। গলার নজর পড়িতেই দেখিলেন—না, ঘুড়ুর তো ঠিকই রহিয়াছে!

শিষ্টি দিয়া ডাকিতে জিমি বারান্দাতেই ছম্বরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং ব্যস্ততার মধ্যে প্রভুর মন রাখিবার জগু, সমস্ত শরীরটাকে দশ বারো সেকেণ্ড খুব একচোট নাড়া দিয়া শাঁ করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

শ্যামাপদ বলিলেন—“বাবু! আর এত ব্যস্তই বা কেন?”

ধলু ওপরে আসিয়াছিল, একটু ঢাকিয়া বলিলেন—“দেখ তো; কুকুরটার গলার ঘুড়ুরের মটরটা বুঝি কি করে আটকে গেছে, বাজচে না; ধরে ঠিক করে দাও তো।”

আবার লিখিয়া যাইতে লাগিলেন। ধলু খানিকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—“কই, তাকে তো বাড়িতে দেখতেই পেলাম না।”

—“ঘুড়ুর থাকলে এও একটা সুবিধে—সহজে স্পট করতে পারা যায়...তোমার কাকার পড়বার ঘরে দেখেচ? বোধ হয়..” এমন সময় জিমি সিঁড়ি ডাঙিয়া ওপরে আসিল—সেই ব্যস্তবাগীশ ভাব। শ্যামাপদ বলিলেন—“ধরতো, আবার ডাকলে আসে না, আ মর! দেখ তো কি হয়েছে ঘুড়ুরটাকে।”

জিমি ধরা দিতে কিছু আপত্তি করিল, ঘুড়ুর স্পর্শ

করিতে দিতে আরও আপত্তি করিল।...মটর আটকানো নয়; ঘুঙুরের মধ্যে কি একটা সোঁদিয়া গিয়াছে। এমনি বাহির করা ছুঁকর হইয়া উঠিল। ধলু শেষে ঘুঙুরটাই ব্যাণ্ড হইতে বাহির করিয়া লইল।

ভেতরে আধময়লাপানা একটা কি,—শ্রাকড়া বলিয়া যেন বোধ হয়। বাহির করা মুস্তিল; নিব দিয়া টানিয়া বাহির করা গেল না। ধলু বলিল—“দাঁড়াও, কাকীয়ার কাছ থেকে মাথার কাঁটা নিয়ে আসি।”—বলিয়া চলিয়া গেল।

শ্রামাপদ চেষ্টা করিতে করিতে একটা কোণ ধরিলেন, তাহার পর অতি সম্ভরণে সমস্তটা টানিয়া বাহির করিলেন;—মিহি পার্চমেন্ট কাগজের ভাঁজ করা ছোট্ট একটি বাণ্ডিল। ভাবিলেন—ব্যাপারখানা কি!

আস্তে আস্তে ভাঁজ খুলিয়া দেখা গেল একটা চিঠি। বেশ দীর্ঘ চিঠি। কাগজটা দীর্ঘ নয় বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা মালমসলায় আগাপান্তলা ঠাসা। শ্রামাপদ চসমাটা ভাল করিয়া নাকে বসাইয়া প্রথমেই “প্রাণেশ...” পর্যন্ত পড়িয়াই অর্ধপথে থামিয়া গিয়া ‘ছি-ছি’ করিয়া সামলাইয়া লইলেন। তাহার পর ওটুকু বাদ দিয়া চোখ বুলাইয়া যাইতে লাগিলেন।

“মধুমাথা চিঠি পেলাম। আর যে পারি না—পারি না—পারি না। পড়ার বন্দীশালায়, পুস্তকপ্রহরীর মধ্যে

আমি বন্দী—ইন্সট্রুমেন্টগুলা যেন তাদের নির্ধম অস্ত্র। প্রিয়ে, কি অপরাধে দাদা আমার এ রকম করে ‘স্বাধিকার প্রমত্তঃ’ করলেন? আমি তো বেশ ছিলাম,—কই আমি তো তাঁর কাছে তোমা-নিধি চাই-নি; দাদা-বিধি যদি দিলেনই ত এমন করে বঞ্চিত করলেন কেন?—কি সে আমার দোষ? বোধ হয় আমার ভাল করাই তাঁর উদ্দেশ্য; কিন্তু ওগো আমার অন্তরের অন্তর, প্রাণের প্রাণ, তোমায় এই শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করেই কি তিনি ভাল করার...”

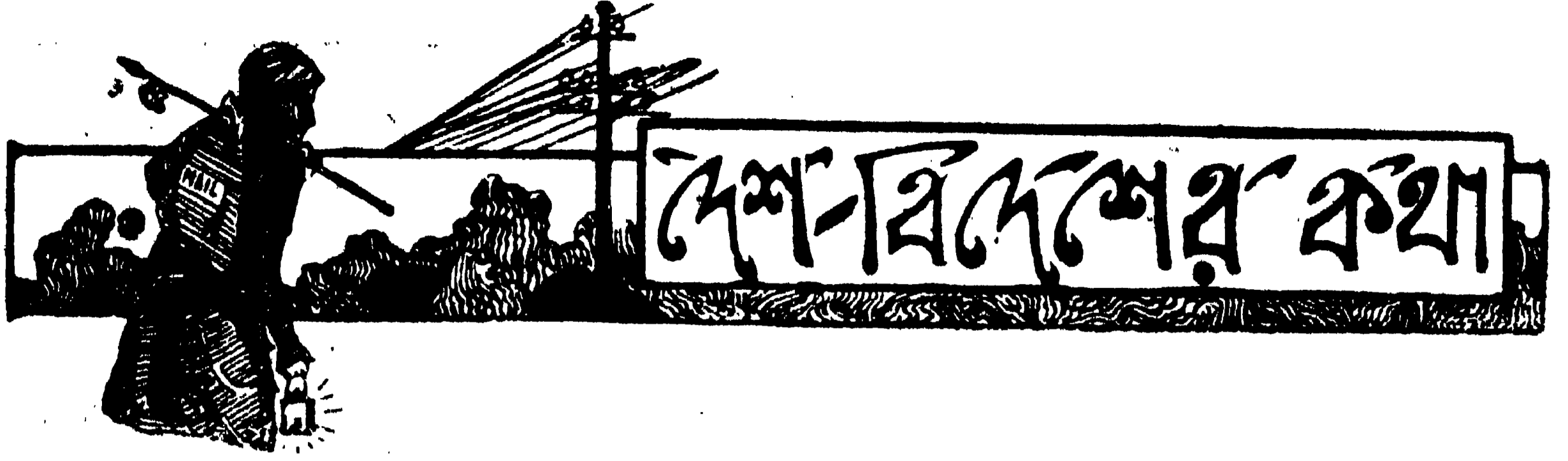
ধলু আসিয়া নালিশের স্বরে বলিল—“বাবা, কাকীমা কোনমতেই মাথার কাঁটা কি একটা সেক্সটিপিন্ দিলেন না; কি সে জিদে লোক!...”

শ্রামাপদ কাগজটা মুঠার মধ্যে মুড়িয়া লইয়া অশ্রুমনস্কভাবে প্রশ্ন করিলেন—“কেন দিলেন না?”—সঙ্গে সঙ্গে যেন হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া—বলিলেন—“তা হোক, তোমার মাকে শীগগির একবার ডেকে দাও দিকিন।”

তাহার পর হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন—“আর দেখ,—ঐ ফুকুরটাকে ভাল করে ডবল চেন দিয়ে বেঁধে সে—ই ওদিককার রেলিঙে আটকে রেখে এস; যেন এ দি—ক না মাড়াতে পারে। তাই তো বলি—এদিক যায় না, ওদিক যায় না, দুদিন থেকে খালি ওপর আর নীচে,—করে কি? ...পাজি, মেঘদূত হয়েচেন—মেঘদূত!—বার করচি তোমার মেঘদূত হওয়া এবার আমি...”!



বাংলার পরী
শিল্পী—শ্রীনরেন্দ্রকেশরী রায়



রবার নিয়ন্ত্রণ-চুক্তি—

রবারের উৎপাদন ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের উৎপাদক ও ব্যবসায়ীগণ দীর্ঘ আলোচনার পর একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন। এই চুক্তি আগামী ১লা জুন হইতে ১৯৩৮ সনের ৩১এ ডিসেম্বর পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। চুক্তির প্রধান সর্ভগুলি সংক্ষেপতঃ এইরূপ—

(ক) ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদক দেশের রপ্তানি নিম্নলিখিত ভাবে সীমাবদ্ধ থাকিবে। সংখ্যাগুলি হাজার টন হিসাবে।

দেশ..	১৯৩৪	১৯৩৫	১৯৩৬	১৯৩৭	১৯৩৮
মালয়	৪০৪	৫৩৮	৫৬৯	৫৮৯	৬০৯
ডাচ-ইষ্ট ইণ্ডিজ	৩৫২	৪০০	৪৪৩	৪৬৭	৪৮৫
সিংহল	৭৭	৭৯	৮০	৮১	৮২.৫
উত্তর বর্ণিও	১২	১৩	১৪	১৫.৫	১৬.৫
সারাবাক	২৪	২৮	৩০	৩১.৫	৩২
শ্রাম	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
ভারতবর্ষ	৬.৮৫	৮.২৫	৯	৯	৯.২৫
ব্রহ্ম	৫.১৫	৬.৭৫	৮	৯	৯.২৫

(খ) নূতন আবাদ হইতে পারিবে না—শুধু পরীক্ষার জন্য নূতন আবাদ চলিতে পারিবে কিন্তু তাহাও বর্তমান আবাদের শতকরা $\frac{১}{৫}$ ভাগ অতিক্রম করিবে না; পুনঃ-আবাদ বর্তমান আবাদের শতকরা ২০ ভাগে সীমাবদ্ধ থাকিবে; নূতন আবাদ বাহাতে না হইতে পারে সেই জন্য এই সকল স্থান হইতে আবাদকারী বাবহারযোগ্য কোন বস্তুপাতি সরবরাহ করা হইবে না।

(গ) একটি “আন্তর্জাতিক রবার নিয়ন্ত্রণ পরিষৎ” গঠিত হইবে, চুক্তিতে আবদ্ধ প্রত্যেক দেশের সরকার দুই জন প্রতিনিধি এই পরিষদের জন্য নিযুক্ত করিবেন; প্রত্যেক পরিষদের প্রতি ১০০০ টনে এক “ভোট” হইবে। উৎপাদনের শতকরা কত অংশ রপ্তানি করা হইবে সময় সময় তাহা নির্দেশ করাই এই পরিষদের কার্য হইবে।

(ঘ) এই চুক্তির স্বিকৃতিশালী শাসন তাহার আবাদ বাড়াইয়া ৩১,০০০ একর পর্যন্ত করিতে পারিবে এবং তাহার রপ্তানি প্রতি বৎসরই একটি নির্দিষ্ট সীমার আবদ্ধ থাকিবে।

(ঙ) ইন্দো-চীন হইতে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে যে পরিমাণে রবার রপ্তানি হইয়াছিল, তদ্রূপই তাহার চারিগুণ আমদানি করিয়াছিল, ইন্দো-চীন কি পরিমাণ রপ্তানি করিবে তাহার বৃত্ত বাবস্থা করা হইয়াছে।

(চ) সারাবাক ও শ্রাম—এই দুই দেশ বাতীত চুক্তিবদ্ধ অপরাপর দেশের সরকারকে রপ্তানির উপর সেন্স বসাইয়া গবেষণার বলোবস্ত করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

(ছ) এই চুক্তি ১৯৩৮ সনের ৩১এ ডিসেম্বর শেষ হইবে, তবে নবগঠিত পরিষৎ অন্তরূপ ব্যবস্থা, প্রয়োজন হইলে, সুপারিশ করিতে পারিবেন।

এই চুক্তির সর্ভ বাহাতে সকলেই মানিয়া চলিতে বাধ্য হন, এইজন্য সর্ভানুযায়ী আইন করিতে এই দেশসমূহের সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে রবার অতি অল্পই উৎপন্ন হয়; রপ্তানির যে পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ একত্র হইয়াও সর্বনিম্ন স্থানেই অবস্থান করিতেছে। যুদ্ধের পর বাণিজ্যের দুর্বলতার যত পণ্যের মূল্য কমিয়াছে, বোধ হয়, রবারই তন্মধ্যে প্রধান। যুদ্ধের পূর্বে এক পাউণ্ড রবারের দাম ছিল ১২ $\frac{১}{২}$ শিলিং, ১৯৩২ সনে ১ $\frac{১}{২}$ পেনীতে দর নামিয়া যায়। বিশেষজ্ঞগণ আশা করেন যে, এই চুক্তির ফলে রবার উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীগণ লাভবান হইবেন।

বাংলার পাটের জন্য চুক্তি অসম্ভব হইল।—

বাংলাদেশে রবার উৎপন্ন হয় না, সুতরাং এই রবার নিয়ন্ত্রণে সাক্ষাৎভাবে তাহার কোনই সম্পর্ক নাই, যদিও ভারত-সাম্রাজ্যের অংশরূপে পরোক্ষ সম্পর্ক বোধেই আছে। এই রবার নিয়ন্ত্রণ বাঙালীর পক্ষে বিশেষ আলোচনার যোগ্য এই জন্য যে, রবার ব্যবসায়ীগণ সকলে একরাষ্ট্র ভুক্ত নহেন, এক জাতিরও (nationality) নহেন, তবু তাহারা একমত হইতে পারিয়াছেন। কিন্তু বাংলার পাটের সম্পর্কে এরূপ একমত হওয়া সম্ভবপর হয় নাই। বাংলার কৃষকগণ দরিদ্র, তাহারা রবার উৎপাদকগণের জ্ঞান সম্বন্ধ নহে, সুতরাং তাহারা স্বয়ং প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। কংগ্রেস এক সময়ে বিজ্ঞাপন প্রচার ও বক্তৃতা দ্বারা পাটের চাষ কমাইবার জন্য কৃষকগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন। বাংলা-সরকারও এই পথ অবলম্বন করিয়াছেন—অবশ্য রাজসিকভাবে; উড়োজাহাজ হইতে পল্লীতে পল্লীতে বিজ্ঞাপন বিতরণ করা হইয়াছিল। বর্ণপরিচয়ও যে কৃষকগণের নাই, তাহাদের নিকট মুদ্রিত উপদেশবাণী-বিতরণ নিদারুণ উপহাস।—এই বিজ্ঞাপনপ্রচারের ফল কি হইল তাহা সকলেই জানেন।

পাট রপ্তানির বর্তমান অবস্থা কি?—

পাট অন্য কোন দেশে উৎপন্ন হয় না, অর্থাৎ এই পাটের ব্যবহার পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই অল্পবিস্তর আছে। বাংলা হইতে কোন দেশ কত পাট সংগ্রহ করে নিম্নের তালিকায় তাহা বুঝা যাইবে—

(ক) ছালা (Gunny-bag)

(খ) কাঁচামাল

	১৯৩২	১৯৩৩
	এপ্রিল—নভেম্বর	এপ্রিল—নভেম্বর
গ্রেট ব্রিটেন	৩৩,০১৫,৪৩৭	২৭,৯৭৩,২১৩
রাশিয়া	৫,৮৪৭,৪০০	৬৮৩,৫০০
নরওয়ে	৫৪৯,০০০	৫১৩,০০০
জাপানী	১,৬৩৯,৩০০	১,৪৭৮,২০০
হল্যান্ড	১,২০৩,৮০০	১,০০২,৫০০
বেলজিয়াম	৪,০২৪,২০০	৫,৭২৩,০০০
ফ্রান্স	৫১০,১০২	৪৩৭,১৭৫
গ্রীস	১,৩৭৭,০০০	১,২৭৭,৮০০
তুরস্ক (ইউরোপ)	১,৭১২,৫৪৩	২,৮৫৮,৭৬২
(এশিয়া)	৩,৩১২,৭০৭	৩,৪১২,৮০৬
ইরাক	৫৭৯,৬১৪	৮৬৬,৬০০
সিংহল	৩২৯,০৪৬	৫৩৭,২১৬
স্ট্রটন স্টেটলমেন্ট	৮,৫১৯,৯০০	৯,৩৯১,০১০
যাভা	৬,০২৭,৯০০	৮,০০৬,৪৫০
শ্রীলঙ্কা	৬,৩৪৬,৭০০	৮,১৭৫,৫০০
ইন্দো-চীন	৫,৮০৯,৭০০	৪,৪২০,৬০০
ফিলিপিন	৩,৫৭০,২০০	৪,২৪৭,৬০০
মেলিবিন	৮২০,৩০০	১,৮১৯,০০০
ফরমোসা	৯২১,২০০	৪২০,০০০
হংকং	১৪,৪২০,৫০০	১২,৯১৯,৬০০
চীন	২৭০,০০০	৩৪৬,৫০০
জাপান	৪,৫৭৯,৪০০	৪,৫৬২,৪০০
মিশর	৭,২১৩,১৫০	৯,৮৬৭,৮৫০
দক্ষিণ আফ্রিকা	৪৮৩,০০০	৫১৮,৩০০
ইউনিয়ন অফ দক্ষিণ আফ্রিকা	১৩,৮৮০,৭৫৪	১১,৬৮৯,১৫০
পূর্ব গীজ পূর্ব আফ্রিকা	৮,৩৫০,৮২৬	৭,১০৪,৭৫১
মরিসান	২,৫১৪,০০০	৩,২০৫,৯০০
কেনিয়া, জাম্বিয়ার ও পেশা	৩,৫৮৩,১২৩	৩,০৯৫,৮০০
ব্রিটিশ সূদান	১,২১৫,৬০০	১,০৬৭,১৫০
পূর্ব-আফ্রিকা (অস্থ)	১,৫১৩,১৪৯	২,৮১৫,২২১
কানাডা	১,০৮৬,৬০০	৫,৭৫,৮৫৯
মার্কিন	১০,৬৩৬,৬০০	৬,৫৬৭,০৩৪
কিউবা	৬,২০২,৮০০	৭,৫৫৩,৮১৮
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৬,১১৬,৮৬৭	৬,৯৬১,৮৮৮
আর্জেন্টাইন	৬৮৪,৫৫০	৭,০৭৪,২০০
চিলি	৪,১৩৫,৪০০	৯,০৬৮,৭৪৯
পেরু	৪,১০২,০০২	৫,০১৩,২০৩
অস্ট্রেলিয়া	৮৫,৭৩৮,৯৭৩	৬৪,৩৭৫,৩২৪
নিউজিল্যান্ড	১,৯২০,৯৫৯	৩,১১৩,৪৫০
হাওয়াই	১০,১৯৫,৫৫৩	৯,৬৮২,০০০
অস্ট্রেলিয়া	১৩,১৯৫,৫৫৩	১৬,১৫৫,০০৮
মোট সংখ্যা—	২৮৮,৫২২,৭৫৫	২৮০,৭৫৬,৮৮৭
ওজন—টন	২৮২,৩৩৭	২৭৩,৭৫১

	১৯৩২-৩৩	১৯৩৩-৩৪
	জুলাই—নভেম্বর	জুলাই—নভেম্বর
গ্রেট ব্রিটেন(বেল)	২৮৭,৯৯২	৪৫৭,৮৪৮
জার্মানী	৩৮৯,৯২০	৪৩২,০৪৫
ফ্রান্স	১২৩,৫৫৭	২১৮,৫১৫
বেলজিয়াম	৭৭,৪২৫	৯৭,৩৮৫
ইটালি	৪৮,৭১৭	১৪৫,৮৭০
মার্কিন	৫৭,২০২	১১৫,৭৮৪
স্পেন	৮৬,৯১২	৭৩,৩৪৯
পোর্ট গৈয়ুদ	২৪,৭৪১	১৬,০৬৭
দক্ষিণ আমেরিকা	২৪,৪০৮	৫০,৪৭৩
হল্যান্ড	৪৬,৩০০	৫০,৫১৫
চীন	২১,৬০০	২৭,১৯২
জাপান	৩০,৭৭০	২৯,০২৯
গ্রীস	৩,২১৬	১,২৮৩
অস্ট্রেলিয়া	৩,৫১২	১,৫০৯
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	১,৯৮৪	২,৫৪৪
সুইডেন	৪,৭১৬	১২,৮৩৪
অন্যান্য য়ুরোপীয় বন্দর	১০,০৭৪	২৯,৫২৯
মোট	১,৩০৩,২৫৯	১,৭৯৪,৩৯৬

(গ) চট—

	১৯৩২	১৯৩৩
	এপ্রিল—নভেম্বর	এপ্রিল—নভেম্বর
গ্রেট ব্রিটেন	৩৫,২৬০,২১৮	২৬,৬৩০,৫৮৫
সিংহল	১,৪৩৪,১৭১	১,৩৯০,১৯৮
হংকং	২৬৪,০০০	১,২৫৫,০০০
চীন	২,৪৯৩,০০০	১,০৬৭,০০০
ফিলিপাইন	৯,৮৬৪,০০০	৮,৭৪৭,০০০
মিশর	৪,৪৯৫,৫০০	৭,৭৮১,০০০
দক্ষিণ-আফ্রিকা	৩,৩৬০,৩৫০	৪,৯৮১,০০০
কানাডা	৪৭,৭৮০,০২৯	৫৫,৯৫২,৪৫২
মার্কিন	৩৬২,০৩৯,৬২১	৪৩৮,৮২৪,৪৬৩
উরুগোয়ে	৮,২৫৩,৬৬১	৮,৯৬৫,৫০০
আর্জেন্টাইন	১৮৫,৫১১,০০০	১৩৭,০৮৯,৭৩৩
পেরু	৭৬৩,০০০	১,৮০৮,০০০
অস্ট্রেলিয়া	১৫,৮৭৩,৫১৯	১২,১৪১,১৩৪
নিউজিল্যান্ড	১,৫৯৩,৪০২	২,৭৪৫,৭১৫
অন্যান্য দেশসমূহ	১৪,০৫৭,২২৪	১৭,৬৩৬,০১৯
মোট গজ	৬৯১,০২৭,৬৯৫	৭২৭,৭১৪,৮৯৯

ভবিষ্যতের আশা ও আশঙ্কা কি ?—

উদ্যানশীল জাতি কখন পরমুখাপেক্ষী থাকিতে চাহে না। বাংলার চাষী কিংবা চটকরওয়াল কখনও এরূপ আশা করিতে পারেন না যে, কাঁচা পাট কিংবা চটের অল্প সকল দেশই চিরকাল তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া থাকিবে। আজ নানা দেশে এই সম্পর্কে দুই ভাবে চেষ্টা হইতেছে, প্রথম—পাটের পরিবর্তে অল্প কোন

জিনিষ আবিষ্কার, ও দ্বিতীয়—বাংলা হইতে কাঁচা পাট সংগ্রহ করিয়া চট ইত্যাদি প্রস্তুত।

(ক) ডচ ঈষ্টইন্ডিজ—পাটের ছালার সবচেয়ে বড় খরিদদার ডাচ ঈষ্টইন্ডিজ। এই দেশ হইতে যত চিনি রপ্তানি হয় তাহা ভারতে প্রস্তুত ছালায়ই প্যাক করা হইত। কিন্তু কতিপয় বৎসর যাবৎ পাটের পরিবর্তে অন্য কোন জিনিষে তৈয়ারী ছালা ব্যবহার করা সম্ভবপর কি না সে পরীক্ষা চলিতেছে। প্রথম চেষ্টা অবশ্য ব্যর্থ হইয়াছে; সূতা ভাল হয় না বলিয়া সিনল পরিত্যক্ত হইয়াছে। রোজেলি দ্বারা কাজ চলিবে এইরূপ স্থির হইয়াছে, তবে তাহাতে খরচ বেশী পড়ে—কি করিয়া কম খরচে সূতা বা চট প্রস্তুত করা যায়, তাহারই গবেষণা চলিতেছে। অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে পাটের একজন বড় গ্রাহক হাতছাড়া হইবে।

(খ) নিউজিল্যান্ড—বহুদিনের গবেষণার পর, নিউজিল্যান্ডে একটি সুবৃহৎ কারখানা স্থাপিত হইয়াছে—নিউজিল্যান্ডের তিসি বা মসিনা গাছের আঁশে ছালা প্রস্তুত হইবে। এই ছালা বাজারে বাহির হইলে শুধু নিউজিল্যান্ড নহে, অষ্ট্রেলিয়াও ভারতবর্ষ হইতে পাট বা চট লইবে না। বিদেশের আরও আশঙ্কা এই যে, নিউজিল্যান্ডে এত অধিক তিসি বা মসিনা উৎপন্ন হয় যে, দুনিয়ার বাজারে পাটের এক বড় প্রতিদ্বন্দী উপস্থিত হইল।

(গ) ব্রাজিল—ডাঙী জুট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি বলিয়াছেন যে, ব্রাজিলের সহিত তাহাদের পূর্ব বিবৃত ব্যবসায় ছিল; এখন সে দেশ হইতে মাল সরবরাহ করিবার জন্ত আদেশের বড়ই অভাব। বর্তমানে বাণিজ্যের জগৎ-জোড়া দূরবস্থাই ইহার কারণ নহে, কোন কোন জিনিষের জন্ত কাগজের আবরণই ব্যবহৃত হইতেছে অর্থাৎ কাগজ পাটকে ব্রাজিলের বাজার হইতে তাড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে।

(ঘ) পোলাও—পাটের পরিবর্তে শনের দ্বারা কাজ চলে কি-না সে বিষয়ে পরীক্ষা হইতেছে।

(ঙ) ইটালী—এক সময়ে পাটের বাজার বড়ই মন্দা ছিল, কিন্তু পুনরায় কাজ ভালই হইতেছে—

	নবেম্বর	ডিসেম্বর
মাকু ১৯৩২	৫৫.৭	৫৮.৮
১৯৩৩	৭৩.৪	৮০.৩
উৎপাদন ১৯৩২	৫০.৩	৫১.৪
১৯৩৩	৬২.০	৭০.৪
কাঁচা মাল আমদানি (কুয়িণ্টাল বা হন্দর)		
১৯৩২	১৬,৩১৪	১৯,১১১
১৯৩৩	২৭,৫৭৮	৩০,৯৭৩

(চ) জার্মানী—ভারতবর্ষে তৈরি চটের ছালার আমদানি জার্মানীতে হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৩২ সালে ছিল ৩৭৪ টন, ১৯৩৩ সনে নামিয়া হইল ২৮৪ টন। কিন্তু ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়, জার্মানীতে চটের রপ্তানিই কমিয়াছে, পাটের নহে। বরং কাঁচা পাটের রপ্তানি বাড়িয়াছে। ১৯৩২ সালে ৫০,০০০ হইতে ১৯৩৩ সনে ৮৫,০০০ টাড়াইয়াছে। ভারত হইতে চট ও ছালা না লইলেও হলাও, বেলজিয়াম ও চেকোস্লোভাকিয়ায় প্রস্তুত চটের আমদানি অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। জার্মানীতে একজন ভারতীয় ট্রেড কমিশনার আছেন। তিনি বাঙালী—মিঃ এস গুপ্ত, আই, সি, এস। তাহার এবং অপরাপর বিশেষজ্ঞদের মত এই যে—

১। জার্মানীতে সকল ছালাই “Veredlungsvorkehr” অপরিণত মাল বলিয়া গণ্য হুতরাং তাহার উপর কোন শুল্ক বসাই হয় না। হলাও, বেলজিয়াম ও চেকোস্লোভাকিয়াতে বহু কৃষিজ জবা জার্মানী হইতে রপ্তানি করা হয়। ইহা প্রমাণ করা কঠিন হইবে, এই সকল দেশ হইতে আমদানী ছালাতেই এই সব দেশের রপ্তানির মাল প্যাক করা হইয়া থাকে।

২। বিনা শুল্কে ছালা বাইতে পারে বলিয়াই, জার্মানী হইতে দেশ চিনি, ময়দা ও সার (fertilizer) রপ্তানির জন্ত এ সকল বৈদেশিক ক্রেতাই নিজ নিজ দেশ হইতে ছালা প্রেরণ করেন। জার্মানী হইতে ভারতবর্ষে বীট (Beet sugar) আমদানী হইত এবং তাহার জন্ত ভারতীয় ছালাই ব্যবহার করা হইত, এ জার্মানী হইতে বীটের রপ্তানি একপ্রকার বন্ধ, হুতরাং ভারতে ছালার ব্যবহারও নাই।

৩। জার্মানী হইতে অধিক মাত্রায় কৃষিজাত ও শিল্পজাত জ আমদানি করা হয় বলিয়া, হলাও, বেলজিয়াম ও চেকোস্লোভাকিয়া সহিত ব্যাঙ্কের মারফৎ লেনদেনের পূর্ব সুবিধা; হলাও ও জার্মানী মধ্যে “ক্লোরিং সিস্টেম” (clearing system) প্রবর্তিত হওয়ার পর হলাও হইতে ছালা আমদানী বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(ছ) জাপান—চট নির্মাণে জাপান নূতন ব্রতী। সস্তায় মাল বিক্রিতে জাপানীরা ওস্তাদ, ভারতবর্ষ হইতে তুলা কিনিয়াই ইহা ভারতে অতি সস্তা দরের কাপড় উপস্থিত করিয়া ভারতীয় কলওয়াল দিগকে সন্ন্যস্ত করিয়াছিল।

সস্তায় কাঁচা মাল পাইবার জন্ত বাংলার চটকলওয়ালারা পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করেন নাই; অথচ চটে ছালার দাম বাড়াইবার জন্ত নিজেরা যুক্তি করিয়া চট নির্মাণ সীমাবদ্ধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহারা দেখিতেছেন যে বাংলা পাট জাপান ও অন্যান্য দেশের কলওয়ালারা সস্তায় কিনিয়া লইতেছেন ও বাংলা দেশে প্রস্তুত চটের চেয়েও সস্তায় চট বিক্রিতে উদ্যত এই বাংলা দেশেই—অল্প স্থানের ত কথাই নাই।

হুতরাং পাটের চাষ ও রপ্তানির নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রথম নূতন করিবার আবার উঠিয়াছে।

কাহার স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন?—

যাহারা কাঁচা মাল উৎপাদন করেন ও যাহারা ঐ কাঁচামাল হইতে নানাবিধ পণ্য তৈরি করেন তাহাদের স্বার্থ এক নহে। ডচ পূর্বভারত, নিউজিল্যান্ড, ব্রাজিল বা পোলাও হইতে যে সংবাদ আনিয়াছে তাহাতে বাংলার কৃষককুলের সমূহ বিদেশের আশঙ্কা, কিন্তু জার্মানী, ইটালী ও জাপানের সংবাদে বাংলার কৃষকের পক্ষে অত্যন্ত আশার কথা। জার্মানীতে ছালার রপ্তানিই কমিয়াছে, কাঁচা পাটের রপ্তানি বাড়িয়াছে। ইটালীতেও সেই অবস্থা, জাপানও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলার পাটের বড় খরিদদার হইয়া উঠিবে অর্থাৎ কাঁচা পাট বিক্রয়ের জন্ত কেবল মাত্র ডাঙীর দিকে চাহিয়া থাকিবার অবস্থা বাঙালী কৃষকের বেশীদিন থাকিবে না। ক্রেতাগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইলেই উৎপাদকের ধনলাভের সুযোগ উপস্থিত হয়—বাংলার কৃষক কি সে সুযোগের সুশুকল লাভ হইতে বঞ্চিত হইবে?

কিন্তু বাংলার চটকলওয়ালাদের স্বার্থে আঘাত পড়িবে; মধ্য ও দক্ষিণ যুরোপ কিংবা জাপানে রপ্তাই মিল স্থাপিত হইবে ততই বাংলার

চাটের চাহিদা কমিবে। তাহাদের স্বার্থ রক্ষার একমাত্র উপায় পাট রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ।

এই চটকলওয়াগণ অধিকাংশই ইংরাজ, ইহাদের ইণ্ডিয়ান (!) [ভারতীয় (?)] জুটমিল এসোসিয়েশন নামক এক সঙ্ঘ আছে। ভারতীয় চটকল সামান্য কয়েকটি, যথা—ইলিয়াস, বিড়লা, হকুমচাঁদ, আদমজী, রাজা জানকীনাথ। সার ডেবিড ইউঙ্গ ইহাদিগকে উপহাস করিয়া বলিতেন—বৈদেশিক (!) কল (foreign mills) ! কিন্তু আজ সত্য সত্যই বৈদেশিক কল দেখা দিয়াছে।

রপ্তানির নিয়ন্ত্রণে কি লাভ হইবে?—

যদি পাটের রপ্তানি নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে পাটের দর কিছু হয় ত সাময়িক ভাবে বাড়িবে। কিন্তু ইহার পরিণাম কি ভাল হইবে? পাটের পরিবর্তে অল্প জিনিষ আবিষ্কারের যে চেষ্টা নানা দেশে চলিতেছে, তাহার মূলে কি ইহা নাই যে পাট তথা চট ও ছালার জন্ত গুব চড়া দাম দিতে এবং সজাবিশেষের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে চাইয়াছিল? দুনিয়ার বাজারে সত্তাদরে পাট ছাড়িয়া দিয়া ঐ আবিষ্কার চেষ্টাকে পরাক্রমভাবে বাধা দেওয়া কি বাংলার কৃষকের পক্ষে স্থায়ী মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন নহে? পাটের দাম কমিয়া গিয়াছে, ইহাই বাংলার কৃষকের দুঃখ নহে; এত কম মূল্যেও সমুদায় পাট বিক্রয় হয় না—ইহাই তাহাদের চরম দুঃখ। যদি বাংলার সমুদায় পাট রপ্তানি হইবার সুযোগ পায় তবে ক্ষতিতেও লাভ দাঁড়াইবে। কমলাভে অধিক বিক্রয় প্রকৃত ব্যবসায়ীর আদর্শ। বাংলা একটি ক্ষুদ্র দেশ, তাহারও সব জেলায় পাট হয় না, কয়েকটি জেলায় মাত্র হয়। এই বিশাল বিশ্বের বিরাট যোগান দিয়াও বাংলার পাট উন্নত থাকিবে—এরূপ আশঙ্কা নাই।

শুনিয়াছি একটি স্বর্ণালঙ্কার সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার সংশ্লিষ্টদের মধ্যে এক বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল; মহাত্মা অলঙ্কার জলে ছুঁড়িলেন—বিতর্ক ধামিমা গেল। আজ পাটের রপ্তানি শুষ্ক লইয়া এমনি বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে, বঙ্গের বিরুদ্ধে বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। যদি এই শুষ্ক সম্পূর্ণরূপে রদ হয়, তবে শুধু যে এই বিতর্কের অবসান এবং ঘেঘ দুই হইবে তাহা নহে, অবাধ গতির সুযোগে দুনিয়ার বাজারে পাটের চাহিদা বাড়িবে, বাংলার কৃষকগণের স্থায়ী মঙ্গল সাধিত হইবে।

বড় বিপদ ও তাহার প্রতিকার কি?—

বাংলার কৃষকের পক্ষে আশঙ্কার কথা এই যে, পাটের পরিবর্তে অল্প জিনিষ আবিষ্কারের চেষ্টা চলিতেছে, ইহাকে উপেক্ষা করা চলে না। পাটের চাষ অথবা রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ ইহার প্রতিকারের উপায় নহে। পাটের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কি কি কাজ হইতে পারে তাহা আবিষ্কার করিয়া চাহিদা বাড়ানোই একমাত্র প্রতিকার। পাটের রপ্তানি-শুল্ক ত ভাগাভাগি হইয়া গেল, কিন্তু চাহিদার বৃদ্ধির চেষ্টা কাহার দ্বারা? যেরূপ জিনিষ থাকিলেই বাজারে চাহিদা হয় না। এই জন্ত চাই চার, চাই গবেষণা ও পরীক্ষা।

পূর্বে যে ডাঙী সভার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে সভাপতি হুগলীদারগণকে আশার বাণী শুনাইয়াছেন যে, রপ্তানি নির্মাণে চটের ব্যবহার চলিবে, আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে ইহার পরীক্ষা সফল হইয়াছে, সেখানেও পরীক্ষা চলিতেছে।—কিন্তু এই পরীক্ষা চলা উচিত ছিল রপ্তানি-শুল্কভোগী ভারত সরকারের রাজধানী নয়। দিল্লীতে, পাটের রপ্তানি বাংলার রাজধানী কলিকাতায়।

সম্প্রতি *Teer and Bitumen* পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে যে, চট রেলপথ নির্মাণে ব্যবহৃত হইতে পারে। ভারতবর্ষের রেলওয়ে বোর্ড হইতে এইরূপ সুসংবাদ পাইলেই শোভন হইত।

পাট আরও কত প্রয়োজনে লাগিবে পরীক্ষা ও গবেষণা দ্বারা তাহা আবিষ্কার করিতে হইবে। দেশের একটি সম্পদকে গলা টিপিয়া মারা জাতির ধনবৃদ্ধির সহায়ক নহে।

বিদেশে কৃত্তী বাঙালী ছাত্র—

মিঃ বি, পি, যোষ বিলাতের লীডন্ বিখ্যাত বিদ্যালয় হইতে



মিঃ বি, পি, যোষ

ইকন-বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা করিয়া পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন। ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই উপাধি লাভ করিয়াছেন।

ওরিয়েন্টাল জীবন-বীমা কোম্পানীর 'ডায়মণ্ড জুবিলী' উৎসব—

গত ৫ই মে বোম্বাইয়ের ওরিয়েন্টাল গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি জীবন-বীমা কোম্পানীর ষাট বৎসর পূর্ণ হওয়ায় 'ডায়মণ্ড জুবিলী' উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে জীবন-বীমা কোম্পানীর ইতিহাসে ওরিয়েন্টালের স্থান অতি উচ্চে। ভারতীয় স্বাধিকারমূলক জীবন-বীমা কোম্পানীগুলির মধ্যে ইহা সর্বপুরাতন। ১৮৭৪ সনে বোম্বাইয়ে ওরিয়েন্টাল কোম্পানী স্থাপিত হয় ও কার্য আরম্ভ করে। এখন ইহার কার্য দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সিংহল, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশেও ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত। পূর্বে বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলি সহজে ভারতবাসীদের জীবন বীমা করিতে চাহিত না। তাহাদের ধারণা—ভারতবাসীদের জীবন বিদেশীদের ন্যায় নিরাপদ নহে। ওরিয়েন্টাল বীমা কোম্পানী এই ষাট বৎসর ধরিয়ৱা কার্য করিয়া ইহার অসারতা প্রমাণিত করিয়াছে। ভারতবর্ষে ভারতবাসীদের দ্বারা পরিচালিত বীমা কোম্পানীর মধ্যে ওরিয়েন্টাল শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার কার্যসম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ১৯৩৩ সনে ইহার ৩৮,১৯১টি জীবন-বীমা বলবৎ ছিল, তাহার পরিমাণ ছিল ৭,০৪,২৬,২০৩ টাকা। ওরিয়েন্টাল জীবন-বীমা কোম্পানীর দ্বারা দেশের শিল্প-বাণিজ্যের বিশেষ সাহায্য হইবে। আমরা ইহার উন্নতি কামনা করি।

প্রবাসী বাঙালীর নববর্ষোৎসব—

বাঙালীরা প্রবাসে থাকিয়াও সামাজিক আমোদ-উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন—ইহা আশা ও আনন্দের কথা। ব্রহ্মদেশের বেসিন শহরে 'বেঙ্গল সোসাল ক্লাবের' সহায়তায় প্রবাসী বাঙালী বালক-বালিকারা গত ১লা বৈশাখ নববর্ষোৎসব পালন করিয়াছে। উৎসবে

বিভিন্ন পর্কের সম্পাদনের ভার দেশী ও বিদেশী লক্ষপ্রতিষ্ঠ সংস্কৃত স্থধীগণের উপর দিয়াছেন। পঞ্জাবের ডক্টর রবুবীর, বিরাটপর্ক প্রাগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভিন্টারনিট্জ স্ত্রাপর্ক সম্পাদ করিতেছেন। একুশ উদাম আমাদের দেশে এই প্রথম, এবং ইহা জাতীয় অনুষ্ঠান বলিলেও অত্যাঙ্কি হইবে না।



বামদিক হইতে—শ্রীমতা খুকুন বসু, শ্রীমতী সুধা দাস, শ্রীমতী করুণাকণা দেব, শ্রীমতী আশা দাস, শ্রীমতী ইন্দু দাস, শ্রীমতী অগ্নিমা. ঘোষ, শ্রীমতী রুবি রায়। সম্মুখে—শ্রীমতী নীলিমা ঘোষ।

আবৃত্তি, সঙ্গীত ও নৃত্য বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সর্বশেষে বালিকারা 'একলব্য' অভিনয় করে। অভিনয় দেখিয়া উপস্থিত জনগণ মুগ্ধ হন।

মহাভারত-সংস্করণে বাঙালী—

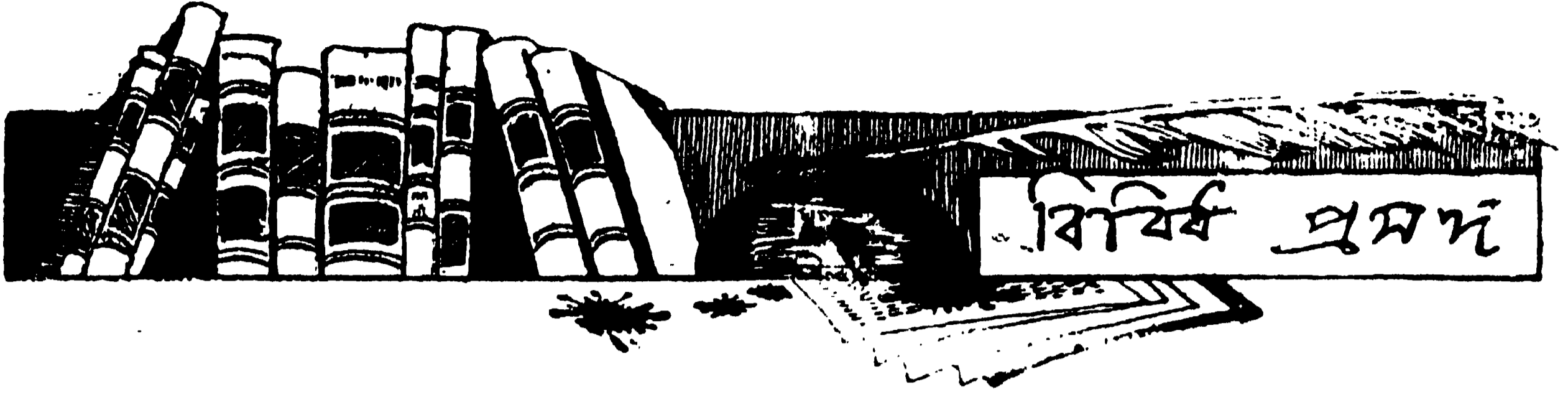
গত যুগের সংস্কৃত সাহিত্যসেবিগণের অগ্রগণ্য স্বর্গীয় শ্রুর রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের নামে প্রতিষ্ঠিত পুনর গবেষণা-প্রতিষ্ঠান (Bhandarkar Oriental Institute) বহুবর্ষ যাবৎ সংস্কৃত মহাভারতের একটি বিস্তৃত সংস্করণ বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে সম্পাদিত করিবার ভার লইয়াছেন। সম্প্রতি এই সংস্করণের আদিপর্ক পুনর ডক্টর বিষ্ণু স্বর্ধ্বকর কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রায় হাজার পৃষ্ঠায় বিরাট আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একটি পর্ক নিখুঁত করিয়া সম্পাদন করিতে ছয় বৎসরের উপর সময় লাগিয়াছে, এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বিভিন্ন পাঠের জন্ত পঞ্চাশখানি পুথি সংগ্রহ করিয়া মিলাইতে হইয়াছে। এই 'বিরাট' অনুষ্ঠান দু-এক জন ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন করা চরম ও বহু সময়সাধা বলিয়া, হুঁউক্ত-প্রতিষ্ঠান-মহাভারতের

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, এই অনুষ্ঠানে বাংলা দেশ হইতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর হুম্মীলকুমার দে মহাশয়কে সম্পাদিত উদোগপর্ক সম্পাদন করিবার জন্ত আহ্বান করা হইয়াছে। ডক্টর দে শীঘ্রই এই কাণ্ডে যোগদান করিবেন।

রবীন্দ্র-পদক—

“রবীন্দ্র-সাহিত্যে বাংলার পল্লীচিত্র” নামক প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় পাটনা ল'কলেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত রাধামোহন ভট্টাচার্য্য কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধটি সর্বোৎকৃষ্ট বিবচিত হওয়ায় তিনিই এ বৎসর “রবীন্দ্র-স্বর্ণপদক” পুরস্কার পাইলেন।

“রবীন্দ্র-জয়ন্তী” উৎসবকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্ত দিল্লী বেঙ্গলী ক্লাব ‘রবীন্দ্র-পদক’ নাম দিয়া প্রতি বৎসর একটি করিয়া স্বর্ণ-পদক পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রবাসের বাঙালী ছাত্র ও ছাত্রীগণের মধ্যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অমুশীলন এই আয়োজনের মুখ্য উদ্দেশ্য।



‘ভারতী’ ঝরণা-কলমের কারখানা

কয়েক দিন পূর্বে আমরা কুমার গোকুলচন্দ্র লাহা এবং কোম্পানীর ‘ভারতী’ ঝরণা-কলমের কারখানা দেখিতে গিয়াছিলাম। ইহাতে নানা দামের ও নানা রকমের ঝরণা-কলম ছাড়া পেন্সিল এবং পেনহোল্ডার ও নিব প্রস্তুত হয়। সোনাএ যে নিবের ডগায় ইরিডিয়াম ধাতুকণা লাগান থাকে, তা ছাড়া ঝরণা-কলমের অন্ত সব অংশই কারখানায় প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়া সুখী ও উৎসাহিত হইলাম। ঐরূপ নিবও প্রস্তুত হইতে পারে; কিন্তু



ভারতী ঝরণা-কলম কারখানায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এখনও ঝরণা-কলমের কার্টি ভারতবর্ষে এত বেশী হয় নাই, যে, তাহাতে বহুমূল্য যন্ত্রপাতি আনাইলেও ঐরূপ নিব বিদেশী নিবের সঙ্গে দামে টক্কর দিতে পারে। পরে উহাও প্রস্তুত হইবে—মূলধনের, যন্ত্রের, কারিগরের অভাব হইবে না; কেবল কার্টি বাড়িলেই সব হইবে। কারিগরের অভাব হইবে না যে বলিতেছি, তাহা বাঙালী কারিগরদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছি। কারণ, এই কারখানায় সামান্য ২১ জন ছাড়া সব কারিগর ও শ্রমিক বাঙালী। তাহাদের মধ্যে ইংরেজী-জানা প্রবেশিকা পর্যন্ত পড়া যুবকও আছে। তাহাদের রোজগার সাধারণ কেমানীদের চেয়ে কম নয়।

এই কারখানায় ঝরণা-কলম ছাড়া পেন্সিল এবং পেনহোল্ডার ও নিব প্রস্তুত হয় বলিয়াছি। তাহার সমুদয় অংশই কারখানায় প্রস্তুত হইতে দেখিলাম। ঝরণা-কলমের কালি এবং ক্লিপও এখানে প্রস্তুত হয়।

এই কারখানার অনেকগুলি যন্ত্রও কারখানাতেই বাঙালী কারিগর দ্বারা নির্মিত। ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা ইহার তত্ত্বাবধায়ক, এবং শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ দত্ত বি-এ ও অন্নদা-প্রসাদ শীল বি-এ ইহার কার্যাব্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কারখানা দেখিতে আসিয়া ফাউণ্টেন পেনের ঝরণা-কলম নাম দিয়াছেন।

সূক্ষ্ম এবং শক্ত রকমের কারিগরীর কাজও বাঙালী কারিগরদের দ্বারা হইতে পারে, এই ধারণা আমাদের আগে হইতেই ছিল। তাহার একটি প্রমাণ এই কারখানায় পাইলাম।

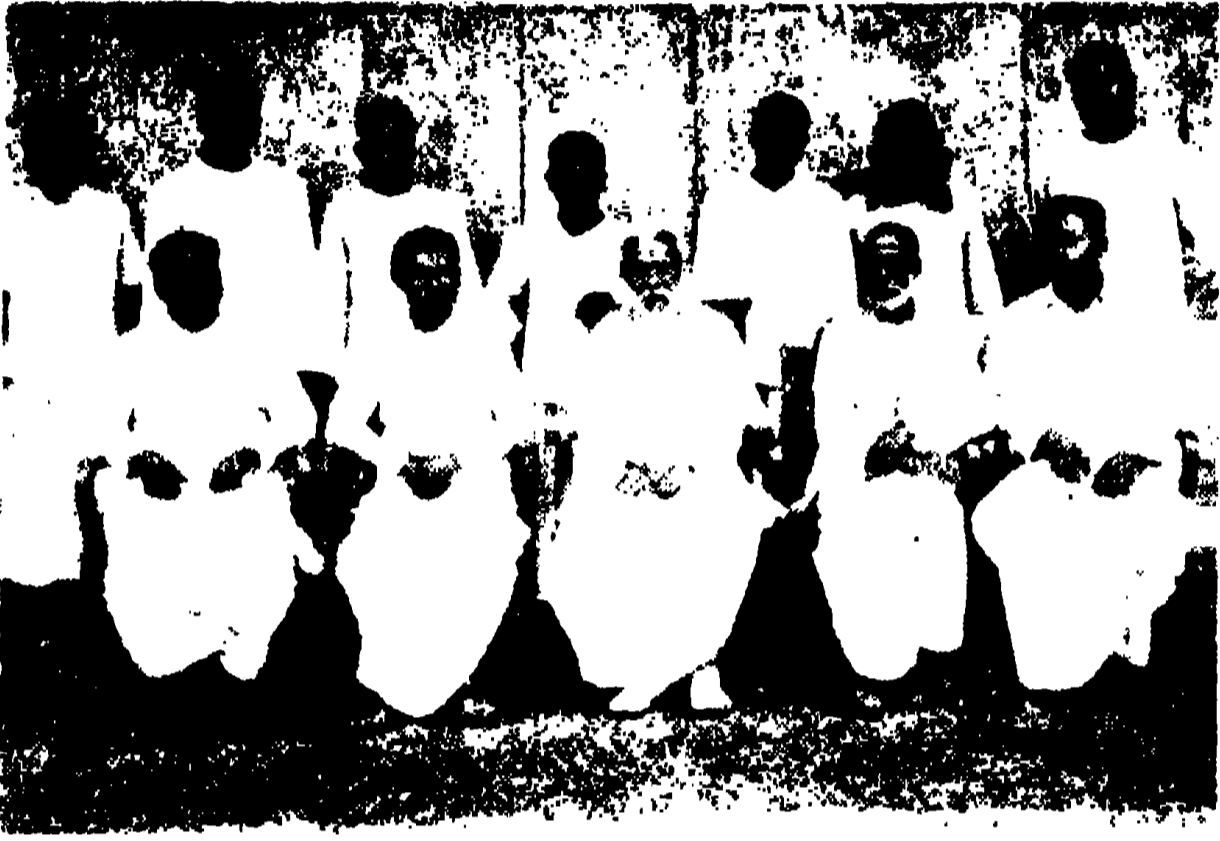
পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দির

কলিকাতার বেলগাছিয়া পল্লীস্থিত এই বিদ্যামন্দিরটি কয়েক দিন পূর্বে আমরা দেখিতে গিয়াছিলাম। ইহা নিজের জমীতে নিজের বাড়িতে অবস্থিত। শিক্ষাবিষয়ে ইহার বিশেষত্ব এই, যে, এখানে সাধারণ কেতাৰী শিক্ষা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষা পর্যন্ত দেওয়া হয়, অধিকন্তু অনেক রকমের পণ্যশিল্প এবং কিছু ললিত-কলা শিখান হয়। যে-সব ছাত্র কেবল কারিগরী শিখিতে চায়, তাহাদিগকে সাধারণ শিক্ষার শ্রেণীতে যাইতে হয় না; কিন্তু যাহারা সাধারণ শিক্ষা পায়, তাহাদিগকে কোন দুটি পণ্যশিল্প শিখিতে হয়। যাহারা কেবল কারিগরী শিখিবে, তাহারা সম্পূর্ণ নিরক্ষর হইলে তাহাদিগকেও লিখনপঠনক্ষম করিয়া দেওয়া ভাল।

এই বিদ্যামন্দিরে কোন ছাত্রকেই বেতন দিতে হয়

না, ইহার ছাত্রবাসেও বারটি ছাত্র বিনাব্যয়ে থাকিতে ও আহার করিতে পারে।

কারিগরী-বিভাগে শিক্ষণীয় বিষয় অনেকগুলি। কর্মকার-বিভাগে ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর, নকন, দা প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে দেখিলাম। জিনিষগুলি ভাল, দামও বেশী নয়। সূত্রধরের কাজ, তন্তুবায়ের কাজ, চর্মকারের কাজ, দর্জির



পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দিরের শিক্ষকগণ ও প্রবাসীর সম্পাদক

কাজ, দপ্তরীর কেতাব বাঁধাইয়ের কাজ, প্রভৃতিও শিখান হয়। সকল বিভাগেই আবশ্যিক যন্ত্রপাতি আছে। বেতের সুন্দর স্ট-কেস, সাজি, বারকোশ, প্রভৃতিও প্রস্তুত হইতেছে। এখানে রেখাকন, চিত্ররঞ্জন ও চিত্রাকন প্রভৃতি এবং ফটোগ্রাফীও শিখান হয়। প্রধান শিক্ষক মহাশয় বলিলেন, যে, এখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক ছাত্র নিজের উপার্জন দ্বারা স্বাবলম্বী হইতে পারিয়াছে। তাহা সন্তোষের বিষয়। স্বাবলম্বী হইতে পারা চাই। যাহাদের পৈতৃক সম্পত্তি আছে, তাহাদেরও নিজে কিছু উপার্জন করিতে পারা আবশ্যিক। তাহাতে মাহুষের নিজের উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা বাড়ে।

কারিগরী দ্বারা রোজগার করিয়া যাহাদিগকে খাইতে হইবে, কারিগরী-শিক্ষা কেবল তাহাদেরই আবশ্যিক, ইহা একটা ভ্রান্ত ধারণা। হাত-পায়ের দ্বারা নানা রকম কাজ করিতে পারিলে তাহাতে বুদ্ধিবিকাশেরও সাহায্য হয়। এই জন্ত কোন-না-কোন রকম কারিগরী শিক্ষা করা সকল বালক-বালিকারই উচিত। শিক্ষার প্রণালী ভাল হইলে

সাধারণ কেতাবী সমুদয় বিষয় শিখিয়াও কিছু কারিগরী শিখিবার সময় তাহাদের যথেষ্ট হইতে পারে।

পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দিরে ম্যাটিকুলেশন পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় বটে, কিন্তু ইহাকে এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তিমোদিত বিদ্যালয়সকলের তালিকাভুক্ত করা হয় নাই। ইহার ছাত্রেরা প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরূপে ম্যাট্রিক দিতে পারে। ইহাতে কিছু অসুবিধা হইতে পারে। কিন্তু সুবিধাও আছে। সকল মাহুষের, সকল বালক-বালিকার, প্রকৃতি, শক্তি, প্রবৃত্তি এক রকম নয়। সুতরাং একই রকমের শিক্ষা সকলের উপযোগী হইতে পারে না। তন্নিম্ন, শিক্ষাপ্রণালীও নানা প্রকার আছে; তাহার মধ্যে কোন্টি সব দিক দিয়া ভাল এবং কোন্টি সব দিক দিয়া মন্দ, এরূপ বলা যায় না। শিক্ষাপ্রণালীর উন্নতি সাধনের জন্ত নানাবিধ পরীক্ষণ (experiment) আবশ্যিক। যদি সব বিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তিমোদন লইতে হয়, তাহা হইলে সবগুলিই এক ধাঁচের, সবগুলার শিক্ষিতব্য বিষয় ও পাঠ্যপুস্তক এক রকম, এবং সবগুলার শিক্ষাপ্রণালী একই প্রকার হয়। তাহা হইলে বালক-বালিকাদের প্রকৃতি, শক্তি ও প্রবৃত্তিভেদে শিক্ষার প্রকারভেদ করা যায় না। শিক্ষাপ্রণালীর উৎকর্ষ সাধনের জন্ত পরীক্ষণও হয় না। এই জন্ত আমাদের বিবেচনায় এমন কতকগুলি বিদ্যালয় থাকা আবশ্যিক যেগুলির পরিচালকগণ শিক্ষাদান বিষয়ে স্বাধীন চিন্তা করেন, কিংবা স্বাধীন চিন্তায় সমর্থ শিক্ষকদের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ। এরূপ বিদ্যালয় ছাত্রদত্ত বেতনে না চলিবার সম্ভাবনা। এই জন্ত তাহার স্বতন্ত্র আয় থাকা আবশ্যিক। পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দিরের তাহা আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তিমোদিত বিদ্যালয় হইতে কোন ভাল ছাত্র বিশেষ পারদর্শিতার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সরকারী বৃত্তি পায়। অন্তিমোদিত বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইলে তাহা পায় না। এই জন্ত বেশ বুদ্ধিমান ছেলেরা অন্তিমোদিত বিদ্যালয়ে ভর্তি না হইতে পারে। কিন্তু এরূপ বিদ্যালয় হইতে বিশেষ পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ ছাত্রদের জন্য কয়েকটা বৃত্তি রাখিলেই ভাল ছাত্র পাওয়া যাইতে পারে। আমরা এই কথা বলায় পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দিরে একটি বৃত্তির ব্যবস্থা হইয়াছে।

এই বিদ্যালয়টি সম্বন্ধে এত কথা বলিবার কারণ এই যে, এইরূপ বিদ্যালয় আরও হওয়া আবশ্যিক। সম্ভবতঃ বাংলা দেশে ইহাই এই শ্রেণীর একমাত্র বিদ্যালয় নহে।

—

মহাত্মা গান্ধীর কলিকাতা আগমন

হিন্দু সমাজের অবনত জাতিসমূহের উন্নতিবিধানার্থ এবং তাহাদিগকে মনুষ্যোচিত সামাজিক মর্যাদা দিয় সমাজদেহের সম্পূর্ণ কার্যক্রম অঙ্গে পরিণত করিবার জন্ত মহাত্মা গান্ধী চেষ্টা করিতেছেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছেন। কলিকাতায় তাঁহার আগমন তাঁহার ভ্রমণের একটি অংশ। প্রবাসী মাসিক কাগজ। দৈনিক কাগজের মত ঠিক তাঁহার আগমনের আগের দিন বা আগমনের দিন তাঁহাকে স্বাগত সন্তাষণ করিবার স্বেচ্ছা আমাদের হইবে না। সেইজন্ত আমরা আগে হইতেই সর্বাস্তঃকরণে তাঁহাকে স্বাগত সন্তাষণ করিতেছি।

হিন্দু সমাজে কয়েক শতাব্দী আগে হইতে যে ভাঙন ধরিয়াছে এবং যাহা এখনও চলিতেছে তাহার একটি প্রধান কারণ অবনতশ্রেণী-সমূহের অবস্থা, তাহাদের নানা মনুষ্যোচিত অধিকার না থাকা, তাহাদের সমুচিত মর্যাদার অভাব, তাহাদের নানা অপমান এবং তাহাদের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন। ভারতীয় যত মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ান আছেন, তাহাদের অধিকাংশ বা তাহাদের পূর্বপুরুষদের অধিকাংশ বিদেশ হইতে আসেন নাই। হিন্দু সমাজের লোকেরা মোহমদীয় ও খ্রীষ্টিয় ধর্ম অবলম্বন করায় এই দুই ধর্মসম্প্রদায়ের

লোক-সংখ্যা বাড়িয়াছে ও বাড়িতেছে। এই বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ হিন্দু সমাজে অবনত শ্রেণীর লোকদের অবস্থা। আমাদের মত যাহারা কোন কোন বিষয়ে সামাজিক বিদ্রোহ করিয়াছেন, তাঁহারা যে একথা বুঝিয়াছেন ও বলিতেছেন তাহা নহে, যাহারা বিদ্রোহ করেন নাই, তাঁহারাও তাহা বুঝিয়াছেন ও বলিতেছেন, এবং অবনত শ্রেণীসকলের উন্নতির জন্ত নানা



মহাত্মা গান্ধী

দিকে চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টা মহাত্মা গান্ধীর ভারতীয় কার্যক্ষেত্রে—বিশেষতঃ সমাজসংস্কারক্ষেত্রে—অবতীর্ণ হইবার অনেক পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে

এই কার্যক্ষেত্রে তিনিই প্রধান পুরুষ, তিনিই প্রধান কর্মী।

তিনি যাহা করিতেছেন, হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিবার জন্ত তাহা একান্ত অবশ্যক। হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিবার প্রয়োজনও আছে। মুসলমানদের ও খ্রীষ্টিয়ানদের সমাজের কতকগুলি উৎকর্ষ আছে বটে, কিন্তু হিন্দু সমাজের হিন্দু সংস্কৃতির এবং হিন্দু প্রকৃতিরও কতকগুলি উৎকর্ষ আছে। হিন্দু সমাজ রক্ষিত না হইলে সেই উৎকর্ষগুলির তিরোভাব হইতে পারে এবং তাহাতে মানবজাতি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এই সব কুফল নিবারণের জন্ত হিন্দু সমাজকে সুস্থ ও জনবহুল এবং শক্তিমান রাখা আবশ্যক।

কিন্তু যদি হিন্দু সমাজকে এইরূপ অবস্থায় উন্নীত করিয়া রক্ষার প্রয়োজন না থাকিত, তাহা হইলেও হিন্দু অবনত জাতি-সমূহের উন্নতি বিধান আবশ্যক হইত। মানবজাতির কোন অংশকেই হীন করিয়া রাখা বা হীন থাকিতে দেওয়া গহিত, অসুচিত, অধর্ম।

এই সব বিষয় বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে, যে, মহাত্মা গান্ধী অতি মহৎ কাজ করিতেছেন। তাঁহার সহিত কোন কোন বিষয়ে আমাদের মতভেদ আছে। তাহা আমরা আমাদের বাংলা ও ইংরেজী মাসিক-পত্র দুটিতে প্রয়োজন-মত জানাইয়াছি, পরেও আবশ্যক হইলে জানাইব। তাঁহার সহিত কচিং কখন যে পত্রব্যবহার হয়, তাহাতেও আমরা এই মতভেদ গোপন করি না। কিন্তু কাহারও সহিত কোন কোন বিষয়ে মতভেদ থাকিলে অল্প যে-সব বিষয়ে ঐক্য আছে, তাহার নিমিত্ত প্রীতি ও শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না, একরূপ মনে করা ভুল।

[এই প্রসঙ্গটি ছাপিতে যাইবার পূর্বে কাগজে দেখিলাম, গান্ধীজী এখন বাংলা দেশে আসিবেন না। ইহা দুঃখের বিষয়। কিন্তু আমাদের স্বাগতসম্ভাষণ স্বগিত রহিল না, বাতিলও হইল না। এ-বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী কিংবা বঙ্গদেশের “গান্ধী অভ্যর্থনাসমিতি” আমাদের উপর হুকুমজারী করিতে অসমর্থ।]

প্রমথনাথ বসু

প্রায় আশী বৎসর বয়সে রাঁচীতে স্থপণ্ডিত ও স্থলেখক, ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রাপ্রণালীর অন্বেষণ

এবং সমর্থক প্রমথনাথ বসু মহাশয় পরলোকযাত্রা করিয়াছেন তাঁহার মৃত্যুতে শুধু ছোটনাগপুর নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। ভারতবর্ষের বাহিরে যাহারা ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরব অন্বেষণ করেন, তাঁহারাও এই ক্ষতি অন্বেষণ করিবেন।

তিনি কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছিলেন নানা বৈজ্ঞানিক বিষয়ে, কিন্তু পবে নিজের চেষ্টায় সাহিত্য



পরলোকগত প্রমথনাথ বসু

ও দর্শনেও জ্ঞানবান ও পারদর্শী হইলেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থাবলী ও নানা প্রবন্ধ দ্বারা স্বদেশবাসীদিগকে সেই জ্ঞানের অংশী করিয়া গিয়াছেন।

তিনি গিলক্রাইস্ট বৃত্তি লইয়া বিলাত যান এবং সেখানে প্রধানতঃ ভূতত্ত্ব এবং তাহার সঙ্গে অল্প কোন কোন বিজ্ঞান শিখিয়া ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ভূতত্ত্ব-বিভাগে চাকরী গ্রহণ করেন। চাকরী তিনি দক্ষতা ও স্বাধীনচিত্ততার সহিত করিয়াছিলেন। তিনি ভারতীয় লোক বলিয়াই তাঁহার অধস্তন একজন ইংরেজ কর্মচারীকে তাঁহাকে ডিঙাইয়া উচ্চপদ দেওয়ার তিনি ১৯০৩

সালে চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। গোকুমহিবানী, বাদামপুর, পাঁচগীর ও কালীমাটিতে তিনি লৌহ আবিষ্কার করেন। তিনিই মিঃ জামশেদজী টাটাকে জামশেদপুরে লোহা ও ইস্পাতের কারখানা স্থাপন করিতে পরামর্শ দেন, এবং তদনুসারে সেইখানে কারখানা স্থাপিত হয়। ইহা এক্ষণে ভারতবর্ষের প্রধান এবং পৃথিবীর অশ্রুতম প্রধান লোহা-ইস্পাতের কারখানা।

সরকারী চাকরী ছাড়িয়া দিবার পর তিনি ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের ভূতত্ত্ববিৎ নিযুক্ত হন এবং তখন গোকুমহিবানীতে লৌহের খনি আবিষ্কার করেন। তাঁহাকে ময়ূরভঞ্জের স্বর্গীয় মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেব এই কার্যে নিযুক্ত করেন। মহারাজা অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায়ের ছাত্র ছিলেন। যোগেশ বাবু একদা তাঁহাকে বলেন, “তোমার রাজ্যে কোথায় কি বহুমূল্য সম্পদ আছে, তাহা তুমি জান না; তুমি কিরূপ মহারাজা?” অতঃপর বসু মহাশয় ভূতত্ত্ববিদের কার্যে নিযুক্ত হন। গবর্নমেন্টের চাকরীতে থাকিবার সময় তিনি জব্বলপুর ও দার্কিলিঙে কয়লা এবং রায়পুর জেলায় গ্র্যানাইট ও অগ্নাশ্রু খনিজ আবিষ্কার করেন।

প্রথমনাথ বসু মহাশয় চরিত্রবান্, বিনয়ী পুরুষ ছিলেন। লোহার খনি আবিষ্কার সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন :—

“Well, to compare small things with great, I discovered them in the sense that Amerigo Vespucci is said to have discovered the continent which is called after him. But, as I have shown in my *Epochs of Civilization*, for many centuries before him it was well known to the Asiatics, and the Chinese and the Japanese had probably small settlements there. All that Amerigo and Columbus a few years before him did was to bring it to the notice of the Europeans. The iron ores of Mayurbhanj had long been worked by the smelters of the State before I came upon them. All that I did was to make them known to the industrial public.”—*Tisco Review*, April 1933, p. 18.

সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য। বড় জিনিষের সঙ্গে ছোট জিনিষের তুলনা করিলে বলা যায়, যে, আমেরিগো ও কোলম্বুস্ বে-অর্থে আমেরিকার আবিষ্কারক, আমিও সেই অর্থে গোকুমহিবানী প্রভৃতি স্থানের লোহার খনির আবিষ্কারক। আমার “সভ্যতার যুগাবলী” যথেষ্ট দেখাইয়াছি, যে, তাঁহাদের অনেক শতাব্দী আগে এশিয়াবাসীরা আমেরিকার অস্তিত্ব অবগত ছিল এবং চৈনিক ও জাপানীদের বোধ হয় সেখানে ছোট ছোট উপনিবেশ ছিল। আমি ময়ূরভঞ্জের লোহার খনিগুলির সন্ধান পাইবার অনেক আগে হইতে সেই রাজ্যের লৌহজীবক ও নংশোধকেরা তথাকার অসংস্কৃত খনিজ হইতে লৌহ প্রস্তুত করিত। আমি কেবল আকরগুলিকে কারখানাশিল্পনেতাদের গোচর করিয়াছিলাম।”

টাটা কোম্পানী জামশেদপুর কারখানার যে প্রস্পেক্টস্ বা অহুষ্ঠানপত্র বাহির করেন, তাহাতে বসু মহাশয়কে আকরগুলির আবিষ্কারক না বলিয়া এইরূপ ধারণা জন্মান হয়, যে, সেগুলি স্বর্গীয় জামশেদজী টাটা মহাশয়ের প্রবর্তিত খনিজ-অহুষ্ঠান চেষ্টাবলীর ফল। যথা—

“...the first prospectus of The Tata Iron and Steel Company created the impression that the discovery was made in the course of the prospecting operations instituted by the late Mr. J. N. Tata.”

ইহা সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়ায় তিনি টাটা কোম্পানীর অশ্রুতম কর্মী মিঃ বি জে পাদশাহকে চিঠি লেখেন। সেই চিঠির নিম্নমুদ্রিত উত্তরে বসু মহাশয়ের কথাই সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। যথা :—

Nausari Buildings, Bombay,
3rd July, 1907.

Dear Mr. Bose,

Your statement of facts is perfectly correct, and I shall bear it in mind when we come to the publishing of a final prospectus. In a commercial document one is not always able to reserve place for giving due credit to every one, but it is perfectly fair that the document should not be so worded as to imply that credit elsewhere than where it is due.

তাৎপর্য। প্রিয় মিঃ বসু, আপনার তথ্যসমূহের বর্ণনা সম্পূর্ণ নিতুল। আমাদের শেষ প্রস্পেক্টস্ বাহির করিবার সময় আমি ইহা মনে রাখিব। ব্যবসায়টিতে দলিলে প্রত্যেককে তাঁহার জ্ঞানপ্রাপ্য প্রশংসা দিবার নিমিত্ত জাগরণ সব সময়ে রাখা যায় না; কিন্তু ইহাও সম্পূর্ণ স্মরণসঙ্গত, যে, দলিলটির বরান এরূপ হওয়া উচিত নয় যাহাতে একজনের প্রাপ্য প্রশংসা অশ্রুত প্রাপ্য বলিয়া বুঝায়।”

টাটা-কোম্পানী শেষ প্রস্পেক্টস্ বাহির করিয়াছিলেন কিনা এবং করিয়া থাকিলে তাহাতে বসু মহাশয়ের কৃতিত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল কিনা, জানি না। কিন্তু ইহা সন্তোষের বিষয় যে সম্প্রতি জামশেদপুরে কারখানার সাধারণ ম্যানেজার কীনান সাহেবের সভাপতিত্বে যে সর্বসাধারণের সভা হয়, তাহাতে প্রথমনাথ বসু মহাশয়ের কীর্তি প্রশংসিত এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। কীনান সাহেব আমেরিকান। ইহাও বক্তব্য, যে, জামশেদপুরের কারখানায় বসু মহাশয়ের পুত্রেরা যথাযোগ্য কর্মে নিযুক্ত আছেন।

আজকাল কেহ বিদ্যালয়, বাণিজ্য বা দেশভ্রমণের জন্য সমুদ্র পার হইয়া বিদেশে গেলে, দেশে ফিরিয়া আসিবার পর তাঁহাকে প্রশংসিত করিতে হয় না। বসু মহাশয় পঞ্চাশ

বৎসরেরও অধিক পূর্বে যখন শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন, তখন কুশদহ সমাজ তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন। তিনি রাজী হন নাই, প্রায়শ্চিত্ত করেন নাই।

দেশে ফিরিয়া আসিবার পর এবং রাজকাৰ্যে নিযুক্ত থাকিবার সময় তাঁহার পোষাক, চালচলন, ও জীবনযাত্রা-প্রণালী ছিল ইংরেজদের মত। কিন্তু পরে তিনি সাহেবিয়ানা বর্জন করিয়া সাবেক বাঙালী ভদ্রলোকদের মত থাকিতেন। স্বাদেশিকতার জন্ত, দেশের লোকদের সহিত সংহতি ও সহায়ত্ব রক্ষার জন্ত, জাতীয় আত্মসম্মান রক্ষার নিমিত্ত, তাহা আবশ্যিক। কিন্তু তাহাতে এদেশে আরামও বেশী পাওয়া যায়, এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ও দীর্ঘজীবন-লাভেরও তাহা উপযোগী।

মহাত্মা গান্ধীর ভ্রমণ-রীতির পরিবর্তন

মহাত্মা গান্ধী রেল, ষ্টীমারে, মোটরকারে - যখন যেখানে আবশ্যিক ও সুবিধা হয়, সেই যানে ভ্রমণ করেন। ইহাতে অল্প সময়ের মধ্যে বহু স্থানে গিয়া তথাকার লোকদের মধ্যে নিজের মত প্রচার করিবার সুবিধা হয়। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক জায়গার কর্মীদেরকে পরামর্শ দেওয়া ও উৎসাহিত করাও এই প্রকারে সম্ভব হয়।

তিনি এখন এই রীতি কতকটা পরিবর্তন করিবেন। তিনি বলিয়াছেন, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে হাঁটিয়া যাইবেন। ইহাতে সময় বেশী লাগিবে এবং পরিশ্রমও অধিক হইবে। কিন্তু ইহার একটি ভাল দিক, সুবিধার দিকও আছে। ইহাতে সাধারণ লোকদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ও ঐক্য, তাঁহার একান্ততা বাড়িবে। তাঁহার সত্য প্রভাব তাহারা বেশী করিয়া অনুভব করিতে পারিবে। ইহা কালসাপেক্ষ বটে। কিন্তু প্রাচীন কালে বুদ্ধদেবের মত উপদেষ্টাকেও প্রধানতঃ পদব্রজেই প্রচারকার্য চলাইতে হইয়াছিল; রেল, ষ্টীমার, মোটরগাড়ী তখন ছিল না। কিন্তু তাহাতে তাঁহার বাণীর ও জীবনের প্রভাব কম অনুভূত হয় নাই।

পদব্রজে ভ্রমণের যে কারণ মহাত্মা গান্ধী নিজে বলিয়াছেন, তাহা দৈনিক কাগজে বাহির হইয়াছে।

“সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারার প্রত্যাশিত ফল”

বঙ্গের ১৯৩২-৩৩ সালের সরকারী শাসনবিবরণীতে বঙ্গের দেশী খবরের কাগজগুলির সাধারণ স্বর সঘনীয় অনুচ্ছেদ এই বলিয়া শেষ করা হইয়াছে :—

“The most noticeable feature of the year was the growing cleavage between the Hindu and Moslem press, and the gradual disappearance of the nationalist section in the latter. The anticipated effects of the Communal Award on the division between the two communities of powers to be transferred by the new constitution mainly contributed to this development.” P. 175.

তাৎপর্য। হিন্দু সংবাদপত্রসমূহ ও মুসলমান সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে ক্রমবর্ধমান মতপার্থক্য বা ছাড়াছাড়ি এবং মুসলমান সংবাদপত্রসমূহের মধ্য হইতে জাতিশাস্ত্রিক কাগজগুলির ক্রমশঃ অন্তর্ধান এই বৎসরের সর্বাঙ্গিক লক্ষিতব্য বিশেষত্ব। নূতন শাসনবিধিয়ারা যে-সব ক্ষমতা দেশের লোককে দেওয়া হইবে, তাহা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কিরূপ ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে, প্রধানতঃ তদ্বিষয়ক “সাম্প্রদায়িক মীমাংসা”র প্রত্যাশিত ফলেই এইরূপ পরিণতি ঘটিয়াছে।

উদ্ধৃত ইংরেজী শেষ বাক্যটিতে আছে “ম্যাগিসিপিটেড্ এক্কেটুস্”। ইংরেজী ম্যাগিসিপিটেড্ শব্দটির মানে পূর্কীবোধ করা, পূর্কসিদ্ধান্ত করা, প্রত্যাশা করা। তাহা হইলে বঙ্গের শাসন-বিবরণীতে বলা হইতেছে, যে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যে সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়াছেন, তাহার ফল কি হইবে, তাহা আগে হইতেই বুঝিতে পারা গিয়াছিল, প্রত্যাশা করা হইয়াছিল। সেই ফল হিন্দু ও মুসলমান সাংবাদিকদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান মতানৈক্য এবং মুসলমান সংবাদপত্র-জগৎ হইতে স্বাভাবিক বা জাতীয়তাবাদী বা ন্যাশন্যালিষ্ট কাগজগুলির ক্রমিক তিরোভাব। এই তিরোভাবের মানে এই হইতে পারে, যে, ন্যাশন্যালিষ্ট মুসলমান কাগজগুলি একটি একটি করিয়া উঠিয়া গিয়াছে, কিংবা যাহারা আগে জাতিশাস্ত্রিক ছিল তাহারা ক্রমে ক্রমে সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত হইয়াছে। মানে যাহাই হউক, শাসনবিবরণী বলিতেছেন, হিন্দু ও মুসলমান সাংবাদিকদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অনৈক্য হইয়াছে, এবং সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারার ফল যে এইরূপ হইবে, তাহা প্রত্যাশা করা গিয়াছিল।

সাধারণতঃ সাংবাদিকরা যে-দলের লোক সেই দলের ভাব, চিন্তা, মত প্রকাশ করেন। সুতরাং সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারার ফলে হিন্দু ও মুসলমান খবরের কাগজগুলি মধ্য ছাড়াছাড়ি হইয়াছে, ইহা বলার মানে, ঐ ভাগবাঁটোয়ারার

ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোআরার ফল যে এইরূপ হইবে, সরকারী রিপোর্টে বলা হইয়াছে, যে, তাহা আগে হইতেই বুঝা গিয়াছিল, প্রত্যাশা করা হইয়াছিল।

“কে বা কাহারো এই প্রত্যাশা করিয়াছিল,” এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠিতেছে। কে ইহার উত্তর দিবে? যখন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী এই ভাগবাঁটোআরা করেন, তখন তিনি কি এই প্রত্যাশা করিয়াছিলেন? তিনি ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন সরকারী কাজ করেন না। সুতরাং সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোআরা ঘোষিত হইবার পূর্বে তিনি তাহাতে ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের সম্মতি পাইয়াছিলেন ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, “ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডল কি প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, যে, সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোআরার ফলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে?” ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ব্যাপারসমূহে ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা সাধারণতঃ ভারতীয় গবর্ণমেন্টের মত জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। এক্ষেত্রে তাহা করা হইয়া থাকিলে প্রশ্ন উঠে, “ভারতীয় গবর্ণমেন্ট কি প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, যে, সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোআরার ফলে হিন্দু-মুসলমানে বিচ্ছেদ ক্রমবর্ধমান হইবে?”

বঙ্গের আলোচ্য শাসনবিবরণীটি হইতে এই সকল প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া যায় না। বরং কোন অস্ববিধাজনক সমালোচনা হইতে আত্মরক্ষার জন্য বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট রিপোর্টটির উপক্রমণিকায় বলিয়া রাখিয়াছেন :—

“The Report is published under the authority and with the approval of the Government of Bengal but this approval does not necessarily extend to every particular expression of opinion.”

তাৎপর্য। “এই রিপোর্টটি বাংলা-গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে ও তদীয় অনুমোদন অনুসারে প্রকাশিত হইল, কিন্তু এই অনুমোদন রিপোর্টে প্রকাশিত প্রত্যেক মত সম্বন্ধে নিশ্চয়ই প্রযোজ্য, এরূপ বুঝা চলিবে না।”

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের এবং ভারতীয় ব্যাপার সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সমালোচকেরা কখন কখন বলিয়া থাকেন, যে, উক্ত দুই গবর্ণমেন্ট কখন কখন ভেদনীতি অবলম্বন করেন। কিন্তু তাঁহারা বরাবরই উত্তর দিয়া আসিয়াছেন, যে, তাঁহারা তাহা করেন না—তাঁহারা সকল সম্প্রদায়ের ঐক্যই চান। এই জন্য, এখন ব্রিটিশ ও ভারতীয় প্রধান রাজপুরুষদের বলা

উচিত, যে, সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোআরার এইরূপ ফল হইবে, আগে হইতেই তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিনা।

বঙ্গের গবর্ণরকে বধ করিবার চেষ্টা

সে দিন দার্জিলিঙে ঘোড়দৌড়ের মাঠে বঙ্গের বর্তমান গবর্ণর শ্রী জন এণ্ডারসনের উপর গুলি নিক্ষেপ হয়। কিন্তু তিনি সৌভাগ্যক্রমে নিহত হনই নাই, আহতও হন নাই। আততায়ী বলিয়া কয়েক জন বালক ও যুবক ধৃত হইয়াছে।

ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে বঙ্গদেশ হইতে সন্ত্রাসন এখনও তিরোহিত হয় নাই।

উচ্চ বা নিম্নপদস্থ সরকারী লোকদিগকে হত্যা ও হত্যার চেষ্টার বিরুদ্ধে আমরা যাহা বলিতে পারি, তাহা বহু বৎসর ধরিয়া বার-বার বলিয়াছি। সেই কারণে পুনরুক্তি অনাবশ্যক। কিন্তু অনাবশ্যক পুনরুক্তিও করিতাম, যদি তাহাতে কোন ফল হইত। কিন্তু অল্প অনেক সম্পাদকের মত আমরা বার-বার নানা কথা বলা সত্ত্বেও দেখা যাইতেছে, যে, বিপ্লবেচ্ছু ও সন্ত্রাসনবাদীদের কোন মতিপরিবর্তন হয় নাই। তাহার কারণ হয়ত এই, যে, আমরা যাহা লিখি তাহা তাহারা পড়ে না, কিংবা পড়িলেও তাহা তাহারা উপেক্ষারই যোগ্য মনে করে।

এরূপ হইবার একটা কারণ সম্ভবতঃ এই, যে, বিপ্লবেচ্ছু ও সন্ত্রাসনবাদীরা যে যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া নিজেদের কাজে প্রবৃত্ত হয়, আমরা সেই যুক্তিমার্গ অবগত না থাকায় তাহা খণ্ডন করিতে পারি না, খণ্ডন করিবার চেষ্টাও করিতে পারি না।

শুধু তর্ক-যুক্তির দ্বারাই যে সন্ত্রাসনবাদীদের মতি পরিবর্তিত করিতে পারা যায় নাই, তাহা নহে, শাস্তি ও ভয়ের দ্বারাও পারা যায় নাই। আমাদের তর্কযুক্তি তাহাদের নিকট না-পৌঁছিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু অনেক সন্ত্রাসকের ফাঁসী বা দ্বীপান্তর বা অল্প গুরুতর শাস্তির সংবাদ তাহাদের নিকট নিশ্চয়ই পৌঁছে; সন্ত্রাসন দমনের জন্য যে কঠোরতম আইন প্রণীত হইয়াছে তাহা তাহারা নিশ্চয়ই জানে; সন্ত্রাসক এবং সন্ত্রাসক বলিয়া সন্দেহভাজন লোকদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত লোক, এবং অপরিচিত প্রতিবেশীরা পর্যন্ত যে সন্ত্রাসকদের কাজের জন্য নানা দুঃখ ও

কতি সঙ্ঘ করিতে বাধ্য হয়, ইহাও সন্ত্রাসকেরা নিশ্চয়ই জানে। কিন্তু ভয়ে বা সন্ত্রাসনকার্যের সহিত সম্পর্কবিহীন ঐ সব লোকদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া দয়াবশতঃ সন্ত্রাসকদের মতি পরিবর্তন হয় নাই, দেখা যাইতেছে।

আমরা যে বার-বার মতিপরিবর্তনের কথা বলিতেছি, তাহার কারণ আছে। গবন্মেণ্ট খুব বেশী টাকা খরচ করিয়া, খুব বেশী গোয়েন্দা পুলিশ এবং সাধারণ রক্ষী পুলিশ নিযুক্ত করিয়া সন্ত্রাসনকার্য (acts of terrorism) খুব কমাইয়া ফেলিতে পারেন, এমন কি অনির্দিষ্ট কালের জন্য একটিও ওরূপ ঘটনা না ঘটিতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সন্ত্রাসকদের মতিপরিবর্তন ও ফলস্বরের পরিবর্তন না হইতেছে ততক্ষণ নিশ্চিত হওয়া চলিবে না; সর্ববিধ সতর্কতার মধ্যেও তাহারা কোন ফাঁক দিয়া কি করিয়া বসিবে, এ উদ্বেগ সর্বদাই থাকিয়া যাইবে।

এই জন্য, এক দিকে যেমন মানুষের চিন্তা ও কল্পনার মধ্যে যাহা আসে এমন সর্ববিধ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে, তেমনি মতিপরিবর্তনের উপায় চিন্তাও করিতে হইবে।

কি উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসকেরা সন্ত্রাসনকার্যে ব্যাপৃত হয়, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা, ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী পরিবর্তন করা যদি তাহাদের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে তাহাদের অহুষ্ঠিত সরকারী লোকদের প্রাণবধ বা বধের চেষ্টার দ্বারা তাহা হইতে পারে না।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্তের “আপীল”

কিছুদিন হইল অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত বঙ্গের পুত্রকন্যাদের উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসন চেষ্টা হইতে সকলকে নিবৃত্ত করিবার জন্য ইংরেজীতে একটি “আপীল” প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি উহা আমাদের কাছে গত মার্চ মাসে দেখান। আমরা তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, যে, আমাদের যদি ওরূপ কিছু লিখিবার ও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা হইত, তাহা হইলে অনেকটা অল্প রকমে লিখিতাম; কিন্তু ও-বিষয়ে কিছু লিখিয়া দেখিয়াছি কোন ফল হয় না, হইবেও না, সুতরাং ওরূপ কিছু লিখিতে চাই না, কেহ লিখিলে তাহাতে দস্তখতও করিতে চাই না। এইরূপ আরও অনেক কথা হইয়াছিল। তাহা লেখা অনাবশ্যক। শেষ কল দাঁড়ায়

এই, যে, তিনি সন্ত্রাসনবাদ নিরসনচেষ্টায় আমার সহায়ত্ব-জ্ঞাপক কিছু লেখা পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় এবং সেরূপ সহায়ত্ব আমি আমার থাকায়, আমি তাঁহাকে গত ২ শে মার্চ লিখিয়া পাঠাই :—

“Though I think the terrorist mentality as well as terrorist policy and actions can disappear mainly, if not only, as the result of political, politico-economic and economic changes of a radical character, yet on principle as a journalist I have argued against terrorism of all descriptions on various occasions, particularly in my Bengali magazine *Prabasi*. But there is nothing to show that terrorists of any kind have either found my arguments convincing to any appreciable extent or have even considered them. I shall, however, be glad indeed, if Mr. J. N. Gupta's appeal succeeds where my arguments have failed.
March 23, 1934. Rumananda Chatterjee.”

সন্ত্রাসনবাদ নিরসনের চেষ্টায় সহিত আমার পূর্ণ সহায়ত্বই আছে। কিন্তু শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত যাহা লিখিয়াছেন, কোন কোন কাগজওয়ালার মনে করিয়াছেন আমি তাহাতে স্বাক্ষর করিয়াছি, কেহ বা লিখিয়াছেন আমি তাহার অস্বীকৃত সমর্থক বা অস্বীকৃত। কিন্তু আসল কথা তাহা নহে। সন্ত্রাসনবাদ নিমূল হয় ইহা আমি সর্বান্তঃকরণে চাই। কিন্তু মিঃ গুপ্ত যাহা কিছু লিখিয়াছেন, যে-যে বুদ্ধিমার্গের অস্বীকরণ করিয়াছেন, সবগুলিরই আমি সমর্থন করি, এরূপ মনে করা ভুল; যাহা কিছু বলা দরকার তিনি সবই বলিয়াছেন, তাহাও আমি মনে করি না। কিন্তু তাঁহার অনেক কথা সত্য।

উপরে বলিয়াছি, সন্ত্রাসনবাদ নিরসনের চেষ্টায় সহিত আমার সহায়ত্বই আছে। গবন্মেণ্টের উহার নিরসনের ইচ্ছারও আমি সমর্থক। কিন্তু তদর্থে গবন্মেণ্টের প্রত্যেকটি চেষ্টা ও উপায়ের সমর্থন করিতে পারি না, কোন কোনটির সমর্থন করি।

সন্ত্রাসক কার্যের তালিকা

রাষ্ট্রীয় পরিষদের গত মাসের এক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাব উত্তরে মিঃ হ্যালিট বলেন, যে, গত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী হইতে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বাংলায় সন্ত্রাসক ঘটনা মোট ২১০টি হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৩১টি খুন, জত্যাচারের চেষ্টা ৩৭টি, ডাকাইতি ৭৬টি, ডাকাইতির উদ্যম ৭টি, লুণ্ঠন ৪৬টি, লুণ্ঠনের চেষ্টা ১৪টি, বোমানিক্কেপ ১০টি, বোমা-ফাটান ৫টি, সশস্ত্র লুণ্ঠন কার্য ১টি ও উপরিউক্ত শ্রেণীভুক্ত নহে এরূপ জত্যাচার ১টি হইয়াছে।

বাংলার রাজপুত্র ও অন্যান্য বাহারা নিহত হইয়াছেন তাহাদের সন্খ্যা ১১৪।

ঐ সময়ের মধ্যে অষ্টাঙ্গ প্রদেশে যে-সব সন্ত্রাসক অত্যাচার হইয়াছে, তাহার মধ্যে মাদ্রাজে ৬, বোম্বাইএ ১৭, বিহার ও উড়িষ্যায় ১৪, আসামে ১৩, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৬, মধ্যপ্রদেশে ৬, ব্রহ্মে শুল্ক, যুক্ত-প্রদেশে ৩৬, পঞ্জাবে ২০ এবং দিল্লীতে ৪—মোট ১২২টি হইয়াছে।

বাংলা ব্যতীত অষ্টাঙ্গ প্রদেশে যত লোক নিহত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৫ জন রাজপুরুষ এবং অষ্টাঙ্গ লোকের মধ্যে ২১ জন। আহতের সংখ্যা রাজপুরুষদের মধ্যে ২২ জন এবং অষ্টাঙ্গ ৩১ জন।

বাংলা দেশে যে এত বেশী নরহত্যা আদি হইতেছে ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। কিন্তু এই দুর্কর্মগুলি যে সমস্তই সন্ত্রাসনবাদীরা করিতেছে বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই এই কাজগুলির সমস্তই করা হইয়াছে, তাহার প্রমাণ নাই। অবশ্য, উদ্দেশ্য যাহাই হউক, এরূপ কাজ যাহারা করে, তাহাদের শাস্তি হওয়া উচিত, এবং যাহাতে এরূপ দুর্কার্য নিবারিত হইতে পারে, তাহারও চেষ্টা হওয়া উচিত।

কিন্তু কি কারণে ও কি উদ্দেশ্যে এই সব অপরাধে মানুষ প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহার অনুসন্ধান অনাবশ্যক নহে। কারণ ও উদ্দেশ্য না জানিলে প্রতিকার হয় না। উদ্দেশ্য ও কারণ প্রধানতঃ রাজনৈতিক হইলে, প্রতিকারও প্রধানতঃ রাজনৈতিক উপায়ে করা দরকার হইতে পারে। আর যদি কারণ ও উদ্দেশ্য প্রধানতঃ আর্থিক হয়, তাহা হইলে প্রতিকারও প্রধানতঃ অর্থনীতির পথে আবিষ্কার করিতে হইবে।

রাষ্ট্রীয় পরিষদে যে সংখ্যাগুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বাংলা দেশেই অধিকাংশ উপদ্রব হইতেছে প্রমাণ হয় বটে, কিন্তু মার্চ মাসে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্যার হ্যারি হেগ যে বলিয়াছিলেন, রাজনৈতিক হত্যা বাংলা দেশের একচেটিয়া, তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ হইতেছে।

এই সব উপদ্রব ভারতবর্ষের অল্প সব অংশের চেয়ে বাংলা দেশে বেশী হওয়ার কারণ সম্ভবতঃ এই, যে, আধুনিক সময়ে বঙ্গের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস অল্প সব প্রদেশ হইতে কতকটা ভিন্ন রকমের এবং বাঙালীর স্বভাবও অল্প প্রদেশের ভারতীয়দের স্বভাব হইতে কিছু পৃথক রকমের।

কিন্তু ব্রিটিশ গবর্নেন্ট ও ভারতীয় নেতারা যদি মনে করিয়া থাকেন, যে, সন্ত্রাসকর্মজাতীয় মনুষ্য কেবল বাংলা দেশেই আছে বা ভারতবর্ষেই আছে, তাহা হইলে ইহা তাঁহাদের একটা মস্ত ভুল। পৃথিবীর অন্য অনেক দেশেও সন্ত্রাসকর্মচারী চলিতেছে। আমাদের ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এ নয়, যে, যেহেতু অন্যান্য দেশেও ইহা হইতেছে অতএব ইহা নির্দোষ

বা মামুলী, সুতরাং ইহার কোন প্রতিকার অনাবশ্যক। আমরা যাহা বলিতে চাই তাহা এই যে, সমস্যাটির সম্মুখীন অল্প অনেক দেশের লোককেও হইতে হইতেছে। অতএব সেই সব দেশের নেতৃস্থানীয় লোকেরা এবং মানবজাতির নেতৃস্থানীয় লোকেরা এই সমস্যার সমাধানকল্পে কি পরামর্শ দেন তাহা জানা দরকার। দুর্কর্ম বন্ধ করিবার ও বন্ধ রাখিবার জন্য শাস্তি ও বলপ্রয়োগ কখন কখন আবশ্যক হইতে পারে,—তাহার আলোচনা এখানে করিতেছি না। কিন্তু দুর্কর্মের প্রবৃত্তি বিনষ্ট করিতে হইলে হৃদয়মনের যে পরিবর্তন আবশ্যক তাহা কেবল শাস্তি ও বলপ্রয়োগ দ্বারা হইতে পারে না। তাহার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, এবং সামাজিক ব্যবস্থাকে ন্যায় ও মানবিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক।

চরিত্রহীনতার জন্ম পদচ্যুতি

সিংহলের ব্যবস্থাপক সভার-সভাপতি কোন ফুলবধুর সর্বনাশ করায় তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হয়। বিচারে তাহাকে পঁচিশ হাজার টাকা খেমারত দিতে হয়। এই ব্যক্তিকে সিংহলবাসীরা সভাপতির পদ হইতে তাড়াইয়াছেন, অধিকন্তু তাঁহাকে রাজনৈতিক সব কাজ হইতে দূর করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

পার্নেলের মত শক্তিমান আইরিশ নেতাকে চরিত্রহীনতার জন্ম রাজনীতিক্ষেত্র হইতে অপমৃত হইতে হইয়াছিল। স্যার চার্লস ডিক্‌ ইংলণ্ডের উদারনৈতিক দলের একজন বড় নেতা ছিলেন। চরিত্রহীনতার জন্ম তাঁহাকেও নেতৃত্ব হারাইতে হইয়াছিল।

বর্তমান সময়ে বাংলা দেশ এ-বিষয়ে কোন সং দৃষ্টান্ত দেখাইবার সাহস ও ক্ষমতা রাখে কি ?

বঙ্গের নারীদের উপর অত্যাচার

আমরা বৈশাখের প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম, যে, বঙ্গের ১৯৩২-৩৩ সালের সরকারী শাসনবিবরণীতে ইহা দেখান উচিত ছিল, যে, ১৯২৬ হইতে ১৯৩১ পর্যন্ত ছয় বৎসরে হিন্দু বদমায়েসদের দ্বারা হিন্দু-মুসলমান উভয়বিধ কত নারীর উপর অত্যাচার হইয়াছে এবং মুসলমানদের দ্বারাই বা উভয়বিধ কত নারীর উপর অত্যাচার হইয়াছে।

কিন্তু রিপোর্টে কেবল লেখা আছে মুসলমানরা কত হিন্দু নারীর উপর অত্যাচার করিয়াছে এবং হিন্দুরা কত হিন্দু-নারীর উপর অত্যাচার করিয়াছে। যাহা হউক, রিপোর্টে যাহা নাই, তাহা মাননীয় রীড সাহেব বন্দী ব্যবস্থাপক সভার একটি প্রস্তাবের উত্তরে একবার বলিয়াছিলেন। সেই উত্তর হইতে গত ১২ই এপ্রিলের 'সঞ্জীবনী'তে সংখ্যাগুলি সকলন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নীচে তাহা উদ্ধৃত হইল।

মুসলমান বদমাসের দ্বারা অত্যাচারিতা নারীদের সংখ্যা।

বৎসর।	হিন্দু নারী।	মুসলমান নারী।	মোট
১৯২৬	১১৩	৪৮১	৫৯৪
১৯২৭	১২২	৫৭৬	৬৯৮
১৯২৮	১০৪	৪৬০	৫৬৪
১৯২৯	১১৪	৬৭৬	৭৯০
১৯৩০	১০৪	৫৩১	৬৩৫
১৯৩১	১২৫	৫৭৩	৬৯৮

হিন্দু বদমাসের দ্বারা অত্যাচারিতা নারীদের সংখ্যা।

বৎসর।	হিন্দু নারী।	মুসলমান নারী।	মোট
১৯২৬	১৯৪	৯	২০৩
১৯২৭	২০১	৩	২০৪
১৯২৮	১৯৮	১০	২০৮
১৯২৯	২৩৬	৮	২৪৪
১৯৩০	২৩৪	৬	২৪০
১৯৩১	১৯৭	৩	২০০

মুসলমানদের কাগজ ও মুসলমান নেতাদের দ্বারা এইরূপ কথা প্রকাশিত হইয়া থাকে, যে, হিন্দুনারীহরণাদির এত যে অভিযোগ হয়, তাহার জন্য হিন্দু সমাজের চিরবৈধব্যাদি প্রথাই দায়ী। হিন্দু সমাজের যাহা দোষ ছিল ও আছে, তাহা সংশোধনের জন্য রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সময় হইতে এ-পর্যন্ত চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু মুসলমান সমাজে যে বদমাসের সংখ্যা বেশী এবং তাহারা যে অধিকতর সংখ্যক নারীর উপর অত্যাচার করে, এদিকে মুসলমান সম্পাদক ও নেতাদের দৃষ্টি পড়িলে এবং তাহারা সামাজিক ও ব্যক্তিগত চারিত্রিক দোষ সংশোধনের চেষ্টা করিলে শুধু মুসলমান সমাজ নহে, অন্য সব সমাজও উপকৃত হইবে। কেবল হিন্দুর উপর সব দোষ চাপাইয়া চলিলে সাম্প্রদায়িক উন্নতি হইবে না, অবনতিই হইবে।

নারীর উপর অত্যাচার কি বাড়িতেছে না ?

১৯৩২-৩ সালের বন্দী শাসনবিবরণীতে লেখা হইয়াছে, যে, বঙ্গে নারীর উপর অত্যাচার বাড়িতেছে না। কিন্তু আমরা

এ রিপোর্টেই মুদ্রিত সংখ্যাগুলি হইতে বৈশাখের 'প্রবাসী'তে দেখাইয়াছি, যে, ঐরূপ অত্যাচার বাড়িতেছে। তা ছাড়া, ঐরূপ অত্যাচার যে বাড়িতেছে, তাহা অন্য একটি সরকারী রিপোর্টে স্পষ্টাকুরে স্বীকৃত হইয়াছে, এবং সেই রিপোর্টটিও আধুনিক—তাহার পর ঐ বিভাগের কোন রিপোর্ট এ পর্যন্ত বাহির হয় নাই। তাহা বন্দী পুলিশ বিভাগের আধুনিকতম রিপোর্ট। তাহাতে ২৩ পৃষ্ঠায় লিখিত

"The increase of 94 cases under this head is most noticeable, Burdwan, Nadia and Hooghly being the worst contributors with increases of 21, 20 and 17 cases, respectively."

পুলিস-বিভাগের এই রিপোর্টের উপর বাংলা-গবন্মেণ্টের মন্তব্য ("Resolution" এ) লিখিত হইয়াছে :—

"His Excellency in Council notes that cases of offence committed against women under sections 361 and 354, Indian Penal Code, showed an increase of 94 over the figures of the previous year—Burdwan, Nadia and Hooghly being the main contributors." P.

ম্যাডেম মেরিয়া মণ্টেসরীকে আহ্বান

ধবরের কাগজে দেখিলাম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতা মিউনিসিপালিটি শিশুদের শিক্ষার অভিন প্রণালী সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য ম্যাডেম মেরিয়া মণ্টেসরীকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। তাহার নিকট হইতে কোন কো মহিলা যদি সাক্ষাৎভাবে এই প্রণালী শিখিয়া লয়েন, তাহ হইলে ভালই হইবে।

তবে, ইহা সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে, যে, কো দেশের শিক্ষাপ্রণালী ও শিক্ষার সরঞ্জাম অন্য কো দেশে ছবছ নকল করিলে তাহা সফলদায়ক হয় না দেশকালপাত্রভেদে সব প্রণালী ও সরঞ্জামেরই আবশ্যিক মত পরিবর্তন করিয়া লইতে হয়।

ইহাও মনে রাখা দরকার, যে, যেমন বিজ্ঞানে আধুনিক কালে আমরা প্রথম প্রথম কেবল পাশ্চাত্য জাতিদের ছাড়া ছিলাম, পরে আমরাও নূতন কিছু আবিষ্কার করিয়া জগৎ জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতে পারিয়াছি, শিক্ষাবিজ্ঞানে এ শিক্ষাদান-বিদ্যাতেও তেমনি আমাদের শুধু ছাত্র সঙ্কট না থাকিয়া গবেষণা দ্বারা নূতন কিছু আবিষ্কার উদ্ভাবনও করিতে হইবে।

প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, যে, ইংরেজ-রাজত্বকালেও ইংরেজরা ভারতবর্ষ হইতে শিক্ষাপ্রণালীর একটি জিনিষ শিখিয়া নিজেদের দেশে চালাইয়াছিল। ষ্ট্রট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে ১৮১৪ সালের ৩রা জুন লণ্ডনের কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ বন্ধের সর্কোল্ড গবর্নর জেনার্যালকে যে চিঠি লেখেন, তাহাতে আমাদের দেশের শিক্ষকেরা যে প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দিতেন তাহার উল্লেখ আছে। তাহার পর ঐ চিঠিতে লিখিত হয় :—

“The mode of instruction that from time immemorial has been practised under these masters has received the highest tribute of praise by its adoption in this country under the direction of the Reverend Dr. Bell, formerly chaplain at Madras ; and it is now become the mode by which education is conducted in our national establishments, from a conviction of the facility it affords in the acquisition of language by simplifying the process of instruction.”

তাৎপর্য। “অরণ্যভীত কাল হইতে এই শিক্ষকেরা যে শিক্ষা-প্রণালীর অনুসরণ করিতেন, তাহা রেভারেন্ড ডক্টর বেলের উপদেশ অনুসারে এই দেশে (অর্থাৎ বিলাতে) প্রবর্তিত হওয়ায় কাৰ্য্যতঃ ঐ প্রণালীর উচ্চতম প্রশংসা করা হইয়াছে; ঐ প্রণালী অনুসারে আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে এখন শিক্ষা দেওয়া হয়—এই বিশ্বাসে যে তদ্বারা ভাষাশিক্ষা সহজ হয়।”

সমস্ত চিঠিটি মেজর বামনদাস বসু প্রণীত “কোম্পানীর আমলে ভারতবর্ষে শিক্ষার ইতিহাস” (*History of Education in India under the Rule of the East India Company*) নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ভারতের জ্ঞানগৌরবের দিন যখন অতীত হইয়া গিয়াছিল, তখনও ভারতবর্ষ শিক্ষাপ্রণালীতে পাশ্চাত্য একটি দেশকে নূতন কিছু দিয়াছিল। এখন আমরা অনেক বিষয়ে উন্নতি করিতেছি। এখন আমরা চেষ্টা করিলে কেবল প্রতীচ্যের ছাত্র না থাকিয়া হস্ত শিক্ককও হইতে পারি। আদান ও প্রদান দুই-ই চলিলে তবে অন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বমানবিকতা দুই-ই সম্ভব হইতে পারে।

অনুন্নত জাতিদের শিক্ষা ও শুর

রাজেশ্বরনাথ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টা

“বঙ্গ ও আসামের অনুন্নত জাতিদের উন্নতিবিধায়িনী সমিতি” প্রায় ২৫ বৎসর ধরিয়া অনেক জেলায় কাজ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ ইহার কাজের প্রশংসা করিয়াছেন।

অনেক জেলায় ইহার বিদ্যালয় আছে। বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৪৪টি—২টি হাই স্কুল, ৭টি মধ্যইংরেজী, ২৯৮টি বালকদের প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১২৩টি বালিকাদের প্রাথমিক স্কুল এবং ১৪টি নৈশ বিদ্যালয়। তা ছাড়া, ইহার পুস্তকাগার, ম্যাজিক লর্গন সহযোগে বক্তৃতা, বয়স্কাউট, সেবা-সমিতি প্রভৃতি আছে। বর্তমানে শুর রাজেশ্বরনাথ মুখোপাধ্যায় ইহার সভাপতি। সমিতির আয় এখন কমিয়া যাওয়ার গত মাসে তিনি একটি কনফারেন্স ডাকেন এবং তাঁহার নির্দিষ্ট টাকা ও দান ছাড়া হাজার টাকা দিয়া তাহার কাজ আরম্ভ করেন। সমিতির আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্ত মহারাজা শুর প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের সভাপতিত্বে ঐ কনফারেন্সে একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। কনফারেন্সের সময় অমৃত সমাজের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত হরিদাস মজুমদার দুই শত টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন।

শুর রাজেশ্বরনাথ এই সমিতির জন্ত যাহা করেন এবং সেই সংশ্রবে তাঁহার হৃদয় ও মতামতের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাৎক্ষণিক সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ সেন উহার কার্যালয় ৪০ নং কারবালা ট্যাক লেন (কলিকাতা) হইতে আমাদিগকে লিখিয়াছেন :—

ছয় বৎসর পূর্বে দার্জিলিং শহরে উক্ত সমিতির পক্ষ হইতে শুর রাজেশ্বরনাথের সহিত আমি প্রথম সাক্ষাৎ করি। সমিতির কার্যবিবরণ তিনি প্রথমে হস্ত পরলোকগত লর্ড সিংহের নিকট কিছু শুনিয়াছিলেন। সচরাচর তাঁহার নিকট নানা প্রকার সমিতি অর্থসাহায্যের জন্যই উপস্থিত হয়। আমিও তাঁহার নিকট অর্থসাহায্যের প্রার্থী হইয়াই উপস্থিত হইয়াছিলাম, কিন্তু আমার অন্তরে এই ইচ্ছাই ছিল, কি করিয়া শুর রাজেশ্বরনাথের মত দেশবিগ্যাত স্বনামধন্য ব্যক্তিকে সমিতির কার্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করিব। প্রথম সাক্ষাতের পরেই আমার সেই হৃদয় উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথমেই, তিনি আমাকে কোন অর্থসাহায্য করিতে পারিবেন না এই কথাই জানাইলেন। এই কথাই উত্তরে আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, ঐ মুহূর্ত্তেই আমি তাঁহার নিকট অর্থসাহায্যের প্রত্যাশী হইয়া আসি নাই, সমিতির রিপোর্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র যাহা আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম তাহা তাঁহাকে পাঠ করিতে অনুরোধ করিলাম। কার্যবিবরণী ভাল করিয়া পাঠ করিলে পর তিনি যদি সন্তুষ্ট হন তবে সাহায্যাদি সম্বন্ধে আমি তাঁহার সঙ্গে পরে কথা বলিব, ইহাই জানাইয়াছিলাম।

ইহার পর তিনি আমাকে কলিকাতায় দেখা করিতে বলিলেন। কলিকাতা করিয়া দুই সপ্তাহ পর তাঁহার সঙ্গে পুনরায় দেখা করিতে যাই। দেখা করিয়াই বুঝিতে পারিলাম সমিতির কার্যবিবরণী ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র আদ্যোপান্ত তিনি পাঠ করিয়াছেন। দেখা হওয়া মাত্র তিনি খুব আদর করিয়া তাঁহার নিকট বসাইলেন এবং সমিতি অতি অল্প ব্যয়ে কি করিয়া এত বেশী কাজ করেন তাহা জানিতে চাহিলেন। যখন শুনিলেন যে এই সমিতি যে-সমস্ত গ্রামে স্কুল স্থাপন করিয়াছেন সেই সকল গ্রাম হইতেই

খাম পাট সৃষ্টিশীল প্রভৃতি দ্বারা সহস্র সহস্র টাকা সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তখনই তিনি উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন, “এই তো কাজ, এই রকম কাজের দ্বারা এই অশিক্ষিত সমাজ শক্তিশালী হইয়া উঠিবে।” পরে ধীরে ধীরে তিনি সমিতির সমস্ত ইতিহাস অর্থাৎ কি করিয়া কাজ আরম্ভ হইল, কার্যক্ষেত্র কি ভাবে ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইল, কত জন কর্মী কাজ করিতেছেন, যাহাদের মধ্যে সমিতি কাজ করেন তাহাদের সঙ্গে সমিতির কিরূপ সম্বন্ধ—এই সমস্ত সংবাদ জানিয়া সমিতিতে নানাভাবে সাহায্য করিবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। আমি সে দিন কোন অর্থ তাঁহার নিকট চাই নাই। কিন্তু তিনি সেদিনই সমিতির আফিসে বার্ষিক চাঁদ স্বরূপ ৫০০ পাঁচ শত টাকার এক খানা চেক পাঠাইয়া দিলেন। ইহার পনের দিন পরেই তিনি পুনরায় ৫,০০০ পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য করেন এবং প্রতিবৎসর তিনি নিয়মিত ভাবে কখনও ৫০০ টাকা, কখনও হাজার টাকা করিয়া দান করিয়া আসিতেছেন। তিনি কেবল ব্যক্তিগত ভাবে অর্থ-সাহায্য করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু এই ছয় বৎসর যাবৎ কি করিয়া সমিতির কার্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইতে পারে এবং অর্থের জন্ত যাহাতে সমিতির কাজের কোন ক্ষতি না হয় সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চিঠিপত্রাদি দ্বারা এবং সময় সময় সভা-সমিতি আহ্বান করিয়া অর্থসংগ্রহেরও বিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তিনি নিয়মিত ভাবে সমিতির কার্যকরী সভায় উপস্থিত হন।

আজকাল অসুস্থতার জন্ত তিনি বাহিরে যাইতে পারেন না বলিয়া সময় সময় তাঁহার আফিসেই কার্যকরী সভা আহ্বান করা হয়। বলিতে কি, তিনি এই সমিতির সভাপতি রূপে ইহাকে নূতন জীবনীশক্তি প্রদান করিতেছেন এবং কর্মীদেরকে নানাভাবে উৎসাহিত করিতেছেন। তাঁহার এই সকল সাহায্যের মধ্য দিয়া আমি তাঁহার অন্তরের যে পরিচয় লাভ করিয়াছি তাহাতে অতিশয় বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছি। সমিতির কার্যোপলক্ষে তাঁহার নিকট আমাকে প্রায়ই যাইতে হয়। হঠাৎ তিনি এক দিন জিজ্ঞাসা করিলেন, সমিতি হইতে আমাকে বৃত্তি স্বরূপ যাহা মাসিক সাহায্য করা হয় তাহাতে পারিবারিক খরচপত্র নির্বাহ হয় কি না—অতি সম্ভ্রমে অথচ সহানুভূতির সঙ্গে এই কথাটী জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন, “It is your first duty to look after your children.” তাঁহার এই উক্তিটির মধ্যে আমি তাঁহার ভিতরের পরিচয় পাইয়াছিলাম। এই সময়েই তাঁহার নিকট জানিতে পারিলাম যে তিনি মহামতি গোখলেকে কুড়ি বৎসর পর্যন্ত মাসিক সাহায্য করিয়াছেন। তিন-চারি বৎসর পূর্বে আমি একবার গুরুতর ব্যাধিতে আক্রান্ত হই। প্রায় ছয় মাস পরে যেদিন তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাই, সেদিনের কথা আমি ভুলিতে পারি না। অত্যন্ত সহানুভূতির সহিত তিনি আমার রোগ সম্বন্ধে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কত উপদেশ দিলেন তাহা এখনও অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিয়া আসিতেছি। এই প্রকারে তাঁহার জীবনের মহানুভবতার পরিচয় কত ভাবে যে পাইয়াছি তাহা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। নানা কারণে তিনি সর্বদা বাস্তব : অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই, আমার মতন দামাচ্য একজন লোক সমিতির কার্যাদির জন্ত যখনই তাঁহার নিকট গিয়াছি তখনই সময় দিয়া অতি মনোযোগের সহিত সব কথা শুনিয়া যথোচিত উপদেশ দিয়াছেন ও দিতেছেন। দীর্ঘ ছয় বৎসরের মধ্যে একদিনও কোন বিরক্তি বা উদ্ভার ভাব প্রকাশ করেন নাই, কেবল সহানুভূতি ও সদাশরতার পরিচয়ই পাইয়াছি। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না করিলে জনসাধারণ শক্তিশালী হইবে না এবং দেশের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে না, বহুবার তিনি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের শিক্ষার যাহাতে বহুল প্রচার হয় তাহার চেষ্টা করিতে তিনি বারংবার বলিয়াছেন।

এখন তিনি বার্ষিক্য ক্রমশঃই দুর্বল হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু ইহার মধ্যেও সমিতির সভাপতিরূপে তাঁহার যে কর্তব্য তাহা করিতে কখনও অবহেলা করেন না। দেশের বর্তমান দুঃস্থতার জন্য সমিতির আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ায় গত ২০শে এপ্রিল তারিখে তিনি কলিকাতা শহরের গণ্যমান্য লোকদিগকে আহ্বান করিয়া একটি কনফারেন্স ডাকিয়াছিলেন। কিন্তু তিন দিন পূর্বেই হঠাৎ প্লানাগারে পড়িয়া গিয়া আঘাত পাইয়া আফিসে আসিতেও পারিতেছিলেন না। কিন্তু কনফারেন্সের দিন এক ঘণ্টা পূর্বেই তিনি আফিসে আসিয়া কনফারেন্সের কার্য নির্বাহ করিয়াছেন এবং এই দিনও সমিতিতে এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষায় বাঙালী ছাত্র

কয়েক বৎসর হইতে ভারতবর্ষীয় সিভিল সার্ভিসের জন্ম প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ভারতবর্ষে হয়, বিলাতেও হয়। তাছাড়া, রাজস্ব-বিভাগের (Finance Department) জন্মও সমগ্রভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ভারতবর্ষে হয়। কয়েক বৎসর হইতে দেখা যাইতেছে, যে বাঙালী ছেলেরা এই সব পরীক্ষায় বেশী উত্তীর্ণ হয় না, দু-এক জন হইলেও উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারে না। এ বৎসর ভারতবর্ষে যে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা হয়, তাহার ফল কতক কতক জানা গিয়াছে বলিয়া খবরের কাগজে দেখিলাম। প্রথম ও চতুর্থ স্থান এলাহাবাদের দু-জন গ্র্যাজুয়েট এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান মাদ্রাজের দু-জন গ্র্যাজুয়েট অধিকার করিয়াছেন। অগ্নদের খবর এখনও কিছু জানা যায় নাই।

বাঙালী ছেলেরা যে এই সব পরীক্ষায় বেশী কৃতিত্ব দেখাইতে পারে না, তাহার কারণ অনুসন্ধান একটি কমিটি করিতেছেন শুনিতে পাই। তাঁহাদের বিস্তারিত রিপোর্ট বাহির হইলে তাঁহাদের মত জানা যাইবে।

বাঙালীদের বিরুদ্ধে প্রতিকূল মনোভাব বশতঃ বাঙালী পরীক্ষার্থীদের প্রতি অবিচার হইতেই পারে না, মনে করি না। কিন্তু এই কারণে অবিচার হইয়াই থাকে, তাহাও ধরিয়া লইতে পারি না। যাহা প্রমাণ করিতে পারা যায় না, এরূপ কিছু কল্পনা বা অনুমান করিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া অসুচিত ও অনিষ্টকর। অনুসন্ধানের পথ ও প্রণালী অল্প রকম হওয়া আবশ্যিক।

এই সকল প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা যাহারা দেয়, তাহারা ইংরেজীতে শিক্ষিত। তাহাদের শিক্ষার আরম্ভ ও ভিত্তিপত্তন সাধারণতঃ বঙ্গের ইংরেজী ইচ্ছলগুলিতে হয়। এই

সকল ইন্সুলের অধিকাংশের আয় কম, শিক্ষকেরা যথেষ্ট বেতন পান না, অনেক শিক্ষককে গৃহশিক্ষকতা ও অন্য উপায়ে আয় বাড়াইতে হয়। সুতরাং তাঁহারা পূর্ণ শক্তি ও মনোযোগ ইন্সুলের কাজে দিতে পারেন না। তা ছাড়া, সাধারণতঃ এই কথাও সত্য, যে, উপযুক্ত বেতন দিতে না পারিলে খুব যোগ্য শিক্ষক পাওয়া যায় না। বঙ্গের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা ভারতবর্ষে ঐ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে দরিদ্রতম বলিলেও চলে। তাঁহারা ইন্সুলে ছেলেদের বেশী বেতন দিতে অসমর্থ, এবং বাংলা-গবর্নেন্টেও অন্য বড় বড় প্রদেশের গবর্নেন্টের চেয়ে শিক্ষার জন্য তের কম টাকা খরচ করেন। বঙ্গে স্কুলসকলের ভাল শিক্ষক না পাওয়ার ও ভাল শিক্ষা না-হওয়ার এইগুলি এক-একটি কারণ।

আর একটি কারণ, বঙ্গের ইন্সুলসমূহে শিক্ষাদান-বিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত অর্থাৎ ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের একান্ত অপ্রাচুর্য। ওকালতী, ডাক্তারী, এঞ্জিনিয়ারী প্রভৃতি অন্য নানা কাজের মত শিক্ষকতাও সাধারণশিক্ষাপ্রাপ্ত সকল লোকের দ্বারা সূচক রূপে নির্বাহিত হয় না। শিক্ষাদানকার্যে ট্রেনিং পান নাই এমন গৃহশিক্ষকের অভাব অবশ্য নাই। কিন্তু ওকালতী, ডাক্তারী ও এঞ্জিনিয়ারিং পাস না করিয়াও আইনঘটিত, চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় এবং ঘরবাড়িনির্মাণসম্বন্ধীয় কাজ অনেকে ভাল করিয়াছে; তাহাতে যেমন প্রমাণ হয় না, যে, ওকালতী, ডাক্তারী ও এঞ্জিনিয়ারী শিখিবার দরকার নাই, তেমনি ট্রেনিং কলেজে না-পড়া ভাল শিক্ষক অনেক থাকার দ্বারা প্রমাণ হয় না, যে, শিক্ষাদানকার্য শিখিবার আবশ্যিক নাই। শিক্ষণ-বিজ্ঞানে আবিষ্ক্রিয়া ও শিক্ষাদান-বিদ্যায় উপায় উদ্ভাবন আধুনিক সময়ে অনেক হইয়াছে, যাহা জানা শিক্ষকদের পক্ষে একান্ত আবশ্যিক। বঙ্গের সহিত মাদ্রাজের তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে, বঙ্গে ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক কত কম। বাংলা দেশের নূতন পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা-রিপোর্টের ৩৭ পৃষ্ঠায় এই তালিকাটি দেওয়া আছে। ইহা ১৯২৬-২৭ সালের। তাহার পর বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নাই।

	বাংলা	মাদ্রাজ
প্রতি স্কুলে গড়ে শিক্ষক-সংখ্যা	১২.৮	২০.১
" " " ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক-সংখ্যা	১.৮	১৫.৬
শতকরা কত শিক্ষক ট্রেনিংপ্রাপ্ত	১৪.২	৭৭.৮

এই তালিকাটি হইতে বুঝা যাইবে, বঙ্গে ট্রেনিংপ্রাপ্ত

শিক্ষক নিতান্তই কম। সুতরাং মাদ্রাজের তুলনায় এখানে ইন্সুলের শিক্ষা যে নিকট হইবে, তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে।

বাংলা দেশে ইন্সুলের শিক্ষা ধারাপ হইবার আর একটি কারণ, গবর্নেন্টের ও সরকারী শিক্ষা-বিভাগের সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব। সবাই জানেন, বঙ্গে মুসলমানরা হিন্দুদের চেয়ে শিক্ষায় খুবই পশ্চাৎপদ। অথচ গবর্নেন্ট ও শিক্ষা-বিভাগ চান, যে, মুসলমানরা মোট লোক-সংখ্যার যত অংশ, শিক্ষা-বিভাগের চাকরীও তাহাদের তত অংশ পাওয়া চাই! যেন নিরক্ষর মুসলমান চাষীরাও সকল রকম স্কুলপরিদর্শক ও শিক্ষক হইবার যোগ্য! ইংরেজী ইন্সুলের সকল শ্রেণীর শিক্ষক এবং সকল রকমের স্কুলপরিদর্শক সবাই গ্র্যাজুয়েট না হউন, অন্ততঃ কলেজে কিছু পড়িয়াছেন এরূপ শিক্ষিত হওয়া আবশ্যিক। বাংলা দেশে যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজে পড়ে, তাহাদের মধ্যে ১৯২১-২২ সালে শতকরা ১২.৮ জন ছিল মুসলমান, ১৯২৬-২৭ সালে ছিল শতকরা ১৪.২ মুসলমান, এবং ১৯৩১-৩২ সালে ছিল শতকরা ১৩.৩ জন মুসলমান। আমাদের প্রথম বক্তব্য এই, যে, অগ্রাণু সরকারী বিভাগের মত শিক্ষা-বিভাগেও কেবল যোগ্যতমদিগকেই কাজ দেওয়া উচিত জাতিধর্মবর্ণনির্দেশে। দ্বিতীয় বক্তব্য এই, যে, যদি একান্তই কোন ধর্মসম্প্রদায়কে অসুগ্রহ দেখাইতে হয়, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রদের মধ্যে তাহাদের ছাত্রেরা শতকরা যত জন, কেবল শতকরা ততটি চাকরীই তাহাদিগকে দেওয়া উচিত। এই হিসাবে মুসলমানরা শিক্ষা-বিভাগে মোটামুটি শতকরা ১৪টি চাকরী পাইতে পারে। কিন্তু পূর্বোক্ত পঞ্চবার্ষিক রিপোর্টে দেখিতেছি বঙ্গের শতকরা ৪৬.৮ জন শিক্ষক মুসলমান এবং শতকরা ৫৪.২ জন পরিদর্শক কর্মচারী (inspecting officer) মুসলমান! ইহার সোজা মানে এই, যে, বিস্তর অপেক্ষাকৃত অযোগ্যতর ও অযোগ্যতম মুসলমানকে মুসলমান বলিয়াই শিক্ষক ও পরিদর্শক করা হইয়াছে এবং বিস্তর অপেক্ষাকৃত যোগ্যতর ও যোগ্যতম হিন্দুকে হিন্দু বলিয়াই কাজ দেওয়া হয় নাই। সুতরাং বঙ্গে যে শিক্ষাদান ভাল করিয়া হয় না, তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। আমরা এক জন প্রাচীন অধ্যাপকের নিকট শুনিয়াছি এবং আগেও জানিতাম, মুসলমান পরিদর্শক কর্মচারীরা স্কুল দেখিতে গিয়া তথায় মুসলমান ছাত্র ও শিক্ষক কম জন ইত্যাদি

সাম্প্রদায়িক বিষয়েই খুব জোর দেন। শিক্ষার উৎকর্ষ বিধান করিবার মত শিক্ষাই তাঁহাদের অধিকাংশের নাই, সুতরাং তাঁহারা সে দিকে কী দৃষ্টি দিবেন ?

সাম্প্রদায়িকতা শুধু সরকারী ইস্কুলে আবদ্ধ নহে।

বঙ্গের অধিকাংশ বেসরকারী বিদ্যালয় হিন্দুদের দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত, কারণ শিক্ষার আগ্রহ তাহাদেরই বেশী। অথচ সরকারীসাহায্যপ্রাপ্ত হিন্দুদের ইস্কুলগুলিতেও মুসলমান শিক্ষক নিয়োগ ও ম্যানেজিং কমিটিতে মুসলমান সভ্য নিয়োগ করাইবার নিমিত্ত শিক্ষা-বিভাগ জেদ করিতেছেন। দ্বাহারা শিক্ষায় বেশী আগ্রহাশ্রিত, শিক্ষার অল্প ভাগস্বীকার বেশী করে, শিক্ষায় বেশী অগ্রসর, তাহাদিগকে জোর করিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে তাহাদের স্তায় স্থান হইতে—শিক্ষকতা হইতে, পরিদর্শকতা হইতে এবং স্কুলপরিচালক সমিতির সভ্যত্ব হইতে—কতকটা বঞ্চিত রাখা হইতেছে। সুতরাং বঙ্গে শিক্ষার অবস্থা ধারাপ হওয়া বিচিত্র নহে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি সহজ করাতেও (প্রমাণ, প্রথম বিভাগেই সবচেয়ে বেশী পাস হয়, যদিও পৃথিবীতে কোন কর্মক্ষেত্রেই প্রথম শ্রেণীর লোক সংখ্যায় বেশী নয়) স্কুল ও কলেজে ভাল শিক্ষা হয় না। আর একটি কারণ প্রধান প্রধান কলেজে ছাত্রবাহুল্য। তাহার দরুন প্রত্যেক ছাত্রের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে মন দেওয়া হয় না।

বাংলা দেশের শত শত ছাত্র ও যুবক বিনা বিচারে বন্দী আছে। তাহাদের মধ্যে বেশ বুদ্ধিমান যুবক অনেক আছে; তাহারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিলে হয়ত উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিত। কিন্তু তাহারা তাহা দিতে পারে না, হয় ত দিতে চায়ও না।

বোধ হয় বাংলা দেশের ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং নেতাদের দ্বারা রাজনৈতিক কাজে ছাত্র ও অল্প যুবকদিগকে নিয়োগ (অবশ্য বিনা বেতনে!) অল্প প্রদেশের চেয়ে বেশী। ইহাও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাঙালী ছাত্রদের প্রায়ই পরাজয়ের একটা কারণ হইতে পারে।

আমি জানি না, এই পরীক্ষাগুলি খাঁটি প্রতিযোগিতামূলক, না, ইহার আগে মনোনিবেশ বা নমিনেশন হয়। যদি মনোনিবেশ

হয়, তাহা হইলে সার্কারনিক কাজে উৎসাহী অর্থাৎ পরিকল্পিত অনেক ভাল ছেলে বোধ হয় পরীক্ষা দিতে পারি না।

আজকাল বাঙালী অনেক ছেলে চাকুরী করিতেই চায় না। সেই কারণেও কতক বুদ্ধিমান ছেলে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দেয় না।

আধুনিক নানাবিধ শিক্ষামাভ ও জ্ঞানমাভ অর্থসাপেক্ষ। বাঙালীদের মধ্যে—বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের মধ্যে—অর্থকষ্ট বেশী হইয়াছে। এই জগত তাহাদের ছেলেরা ভাল ভাল পুস্তক ও মাসিকপত্রাদি কিনিয়া পড়িবার সুযোগ ততটা পায় না, যতটা অল্প প্রদেশের ঐ শ্রেণীর ছেলেরা পায়। এটাও বাঙালী ছেলেরদের অকৃতিত্বের একটি কারণ হইতে পারে।

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাসমূহে ভারতবর্ষের ও সমগ্র জগতের 'চলতি' ঘটনা ও সমস্যা এবং আধুনিক ব্যাপারসকল সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা হয়। মৌখিক পরীক্ষায় এই সব বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। এই সকল বিষয়ে ইংরেজী নানা বহি ও সাময়িক-পত্র পড়া দরকার। বাঙালী ছেলেরা অজ্ঞান্য প্রদেশের—যেমন মাদ্রাজের—ছেলেদের চেয়ে ইংরেজী বহি কম পড়ে—বিশেষতঃ গল্প ও উপন্যাস ছাড়া অল্প বহি যাহা জ্ঞানগর্ভ। গল্পের মাসিক ছাড়া অল্প ইংরেজী মাসিকও, জ্ঞানগর্ভ মাসিকও, বাঙালী ছেলেরা কম পড়ে। মডার্ন রিভিউ বাংলা দেশ হইতেই বাহির হয়। ইহার উৎকর্ষ, পৃথিবীর অজ্ঞান্য সমুদয় মাসিকের তুলনায় উৎকর্ষ, শ্রম মাইকেল শ্রাউসারের মত জ্ঞানী বিদেষ্ট্রী (যিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সভাপতি ছিলেন) স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "It is one of the live periodicals of the world" "ইহা পৃথিবীর জীবন্ত সাময়িক-পত্রগুলির মধ্যে একখানি।" তাহার বহুপূর্বে বিখ্যাত সাংবাদিক ও গ্রন্থকার নেভিলসন সাহেব কলিকাতা-দর্শনকালে ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু আমাকে একবার বলিয়াছিলেন, "তোমার মডার্ন রিভিউ মাদ্রাজীরা গম্পলের মত করিয়া পড়ে।" কিন্তু ইহার পাঠক বাংলা দেশ অপেক্ষা বঙ্গের বাহিরে বেশী, বিশেষতঃ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ও ছাত্রমহলে। সেদিন

কলিকাতার একজন উকীল কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছিলেন, একবার একটি সমগ্রভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মৌখিক তের-চোদ্দটি প্রশ্নের মধ্যে সাত-আটটিই এরূপ ছিল যাহার সম্বন্ধে মডার্ন রিভিউতে প্রবন্ধাদি বাহির হইয়াছিল।

[এ-বিষয়ে আমরা তাঁহার কথা ভুল শুনিয়াছি বা বুঝিয়াছি কিনা তাহা জানিবার জন্ত তাঁহাকে চিঠি লিখি। তিনি গত ১১ই মে উত্তর দিয়াছেন :—“* ইংরেজী ১৯২৯ ও ১৯৩০ সালে ভারতবর্ষে গৃহীত আই সি এস পরীক্ষা দেন। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, যে, viva voce examinationএ অর্ধেকের উপর প্রশ্ন গত মাসের M. R. হইতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; দুইবারই এরূপ প্রশ্ন Modern Review হইতে করা হইয়াছিল; তবে একবার প্রায় সব প্রশ্ন M. R. হইতে answer করা যাইত।” M. R. অর্থাৎ মডার্ন রিভিউ।]

অগ্গাণ্ড প্রদেশের চেয়ে বাংলা দেশে সিনেমা ও থিয়েটারের আধিক্য লক্ষিত হয়। ছাত্রদের মধ্যেও অভিনয়ের ধুম কিছু বেশী। ইহাতে যে কিছু অধিক মাত্রায় চিন্তাচঞ্চল্য উপস্থিত হয় না, এরূপ বলা যায় না।

ছাত্রেরা রাজনীতির বা অগ্গাণ্ড সমসাময়িক ব্যাপারের কোনই খবর রাখিবেন না, ইহা আমরা চাই না, আশাও করি না। কিন্তু ইহা অবশ্যই চাই ও আশা করি, যে, যেহেতু তাঁহারা ছাত্র, তাঁহারা বিদ্যার্থী, সেই জন্ত ছাত্রের প্রধান কর্তব্য যে বিদ্যা অর্জন, জ্ঞানলাভ, তাহাতেই তাঁহারা বেশী মন দিবেন, সময় দিবেন, শক্তি ব্যয় করিবেন। আমরা কংগ্রেসের বা অগ্গাণ্ড কোন রাজনৈতিক কিংবা অগ্গাণ্ড দলের নেতা নহি বলিয়া ছাত্রেরা যদি আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে প্রাগৈতিহাসিক মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহারা আধুনিক ও অতি-আধুনিক নেতাদের দৃষ্টান্ত বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, শ্রীবুদ্ধ স্বভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি নেতারা আগে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া পরে কার্যতঃ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেন। আমরা তাঁহাদের দৃষ্টান্তের প্রতিই অধিক মন দিতে বলিয়াছি, বাক্যের প্রতি তত মন দিতে বলি নাই এই উক্ত, যে, দৃষ্টান্ত বাক্যের চেয়ে বেশী মূল্যবান্

(“Example is more valuable than precept”)।

প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষার বাঙালী ছেলেদের অপেক্ষাকৃত কম কৃতকার্যতা উপলক্ষ্য করিয়া আমরা অনেক কথা লিখিলাম। বাঙালী ছেলেদিগকে চাকরীর উমেদার করা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য নহে, বরং শিক্ষার উন্নতি যাহাতে হয় সেই দিকে সকলে মন দেন ইহাই আমরা চাই। তবে ইহাও বলিতে চাই, যে, যখন দেখিতেছি শত শত হাজার হাজার বাঙালী ছেলে সামান্য বেতনের চাকরীর জন্ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তখন বড় চাকরীগুলিতেই বা বাঙালী ছেলেরা ঢুকিবে না কেন? বেসরকারী সার্বজনিক কর্মীদের সেবার উপর ভারতবর্ষের উন্নতি-অবনতি, হিতাহিত নির্ভর করে বটে; কিন্তু বুদ্ধিমান চাকরোর। যদি স্বদেশহিতৈষী হন, তাহা হইলে তাঁহারাও দেশের হিত অনেকটা করিতে পাবেন। বাঙালী ছেলেদের মধ্যে যাহারা চাকর্যে হইবেন, তাঁহারা যেন ভারতহিতৈষী চাকর্যে হন।

ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ

বৈশাখের ‘প্রবাসী’তে আমরা ইহা লিখিয়াছি, যে, স্বাধীন-চিত্ত লোকেরা ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে প্রবেশ করেন, ইহা বাঞ্ছনীয়। যে-সকল কংগ্রেসপন্থীর কোঙ্গিল প্রবেশে আপত্তি বা বাধা নাই, এবং যাহাদের কোঙ্গিলের কাজ করিবার মত যোগ্যতা আছে, তাঁহারা কোঙ্গিলে প্রবেশ করিলে ভাল হয়। বৈশাখের কাগজেই বলিয়াছি, তাঁহারা কোঙ্গিলে গেলেই যে স্বরাজ লাভ হইবে, এরূপ আশা কম। কিন্তু অগ্গাণ্ড দেশহিত যাহা হইতে পারে, তাহা বৈশাখের ‘প্রবাসী’তে লিখিয়াছি। কিন্তু কোন কংগ্রেসওয়াল। যদি মন্ত্রী বা তদ্রূপ অগ্গাণ্ড কিছু চাকর্যে হইবার মতভাবে কোঙ্গিল প্রবেশ করেন, তাহা হইলে তাহা গর্হিত হইবে। কারণ তিনি যদি খুব দৃঢ়চেতা কংগ্রেসওয়াল। হন, তাহা হইলে তিনি গবর্নেন্ট ও আঙ্গলাতয়ের সহিত মতানৈক্যবশতঃ ইস্তফা দিতে বাধ্য হইবেন; আর যদি দৃঢ়চেতা না হন, তাহা হইলে তাঁহাকে গবর্নেন্টের নীতিরই সর্বোৎসর্গে অঙ্গসরণ করিতে হইবে—তাঁহার কংগ্রেসওয়াল।

*. সময়টি ঠিক দিলাম।—প্রবাসীর সম্পাদক।

টিকিবে না। স্বতরাং কংগ্রেসের বদনামের তিনি কারণ হইবেন এবং কংগ্রেসের মতামতযায়ী দেশহিত তাঁহার দ্বারা হইবে না।

ভারতবর্ষের কম্পটিউশন কংগ্রেসের বা উদারনৈতিক দলের দাবি অমুখ্যায়ী বস্তু দিন না হইতেছে, ততদিন ঐ ঐ দলের স্বাধীনচেতা কাহারও মন্ত্রী বা তজ্জপ কিছু হওয়া উচিত নয়। কংগ্রেসওয়ালারা স্বরাজী হউন, কিংবা গৌড়া অসহযোগী হউন, তাঁহারা কৌন্সিল প্রবেশ করিবেন কি-না, তাহা তাঁহারা ই স্থির করিবেন। সে-বিষয়ে আমাদের কিছু বলা উচিত নয়। আমরা কেবল চাই, যে খুব বেশী-সংখ্যক স্বাধীনচিত্ত ও যোগ্য লোক কৌন্সিলগুলিতে যান।

কংগ্রেসওয়ালাদের মধ্যে কতক লোক যেমন কৌন্সিল-প্রবেশের পক্ষপাতী হইয়াছেন ও স্বরাজ্য দলকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চাহিতেছেন, তেমনি আর এক দল কৌন্সিল প্রবেশের বিরোধীও হইয়াছেন। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে শেষোক্ত দল খুব প্রবল। কংগ্রেসে আর এক দলেরও প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। তাঁহারা সোশ্যালিষ্ট বা সমাজতান্ত্রিক দল। এই ভারতীয় সোশ্যালিষ্টদের সহিত ভারতীয় কমিউনিষ্ট বা সাম্যবাদী দলের কোন পার্থক্য আছে কি-না জানি না।

একাধিক দলের উৎপত্তি ভাল কি মন্দ, এক কথা বলি যায় না। কিন্তু যদি আদর্শ-ভঙ্গ, লক্ষ্যভেদ, মতভেদ জন্মে, তাহা হইলে তাহা চাপা দিয়া জোড়াতাড়া দিয়া বাহ্য একতা রক্ষা করা ভাল নয়; তাহাতে সফল হয় না, বরং অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু মেরুপ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র দল বা উপদল গঠিত হইলেও, যে-যে বিষয়ে আদর্শ ও মতে মিল আছে, সেই সব বিষয়ে একযোগে কাজ করা বাঞ্ছনীয়। তাহাতে কাজ বেশী ও ভাল হয় এবং বিবাদে শক্তিশালী হয় না।

পার্টনার নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটিতে যদি কৌন্সিল-প্রবেশ অমুখ্যায়িত হয়, তাহা হইলে কৌন্সিল-প্রবেশার্থীদের তালিকা কংগ্রেসের স্থানীয় বা প্রাদেশিক বোর্ড প্রস্তুত করিবেন, না, স্বরাজ্য-দলের ঐ ঐ বোর্ড করিবেন, তাহা স্থির করিতে হইবে। নির্বাচনসম্বন্ধ জরী হইয়া থাকিলে কৌন্সিলে প্রবেশ করিতে পারিবেন, কৌন্সিলে তাঁহাদের আদর্শের ও কাজের উপর নজর রাখিবেন এবং প্রয়োজন হইলে তাহার বিচার করিবেন কংগ্রেস কমিটি বা স্বরাজ্য-দলের কমিটি, তাহাও

বিচার্য। রাঁচীতে স্বরাজ্য-দলের কনফারেন্সে যে প্রস্তাব ধার্য হইয়াছে, তদমুখায়ী কার্যতালিকাতে কংগ্রেসের প্রায় সব কাজই আছে। স্বরাজ্য-দল যদি সব কাজই করেন, তাহা হইলে নো-চেঞ্জার বা গৌড়া অসহযোগীরা কি করিবেন?

অনেক কংগ্রেসওয়ালারা কংগ্রেসের একটা পূর্বাধিবেশন চাহিতেছেন। তাঁহারা বলেন পূর্ণার স্বরাজ্য কনফারেন্সের পর কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীযুক্ত মাধব শ্রীহরি আনে ও পরে গ জীভী যে সমষ্টিগত নিরুপদ্রব প্রতিরোধ স্থগিত করেন, এবং পার্টনার ঐ কিতে গাঙ্গীজী যে স্বয়ং একমাত্র সত্যগ্রহী হইয়া উহা “এক-চিটা” করেন, ইহা সঙ্গতই অবৈধ, কংগ্রেস সব বিধিবহির্ভূত। তাঁহাদের মতে কৌন্সিল-প্রবেশও লাহোর কংগ্রেসের স্বাধীনতা ঘোষণার বিরোধী, এবং নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির সভ্যেরা এত পূর্বে নির্বাচিত হইয়া গেলেন এবং তাঁহাদের নির্বাচনের পর এত নূতন প্রস্ন ও সমস্যার আবির্ভাব হইয়াছে, যে, এখন তাঁহাদের মত কংগ্রেসওয়ালাদের বর্তমান মত বলিয়া ও তাঁহাদিগকে এখনকার প্রস্তাবলী সম্বন্ধে কংগ্রেসওয়ালাদের মুখপাত্র বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তাঁহাদের মতে এই এই কারণে পূর্বাধিবেশনের এক অধিবেশন এবং নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির নূতন সভ্য নির্বাচন আবশ্যিক।

পার্টনার নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে উপরিলিখিত সব বিষয়ের আলোচনা হইবার সম্ভাবনা। তাহা হইয়া গেলে আবার সম্পাদকেরা, অত্র সাংবাদিকেরা এবং হরেক রকমের খবর্যো ও সার্বজনিক মনুষ্যেরা (public men) নিজের নিজের মত জাহির করিবেন।

আর একটা বিষয় লইয়া এখন খুব আলোচনা চলিতেছে। তাহা, “শ্বেতপত্র”কে সম্পূর্ণ অস্বীকার কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারা সম্বন্ধে তুষীভাব।

শ্বেতপত্র দুশমন, কিন্তু সাম্প্রদায়িক

বাঁটোআরা—?

নব-স্বরাজীরা বলিতেছেন, তাঁহারা শ্বেতপত্রের পূর্বাধিবেশন নিন্দাও প্রত্যাখ্যান করিবেন, উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবেন—উহা দুশমন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোআরা সম্বন্ধে তাহা বলিতেছেন না। জেরা করিলে বলিতেছেন, শ্বেতপত্র

ত উহাকে ভিত্তি করিয়াই রচিত, উহা খেতপত্রের একটা অঙ্গ, সুতরাং খেতপত্রকে অগ্রাহ্য করিলে উহাকেও অগ্রাহ্য করা হইল। তাই যদি হয়, তাহা হইলে পরিষ্কার ভাষায় বলুন না, যে, সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোআরাও দুশমন, উহাকেও প্রত্যাখ্যান করিলাম। তাহা তাঁহারা বলিতেছেন না। তাহার কারণও আছে। সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোআরাটা মুসলমানদের খুব পিয়রা। তাহাকে দুশমন বলিলে প্রায় সব মুসলমান বাঁকিয়া বসিবে। তাহা হইলে হিন্দু-মুসলমানের মিলন হইবে না। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোআরাটাকে দুশমন না বলিলেই কি ঐ মিলন হইবে? হইবে না। কারণ, অধিকাংশ মুসলমানের দাবি শুধু এ নয়, যে, “ওটাকে দুশমন বলিও না,” তাহারা চায়, বল, যে, “ওটা খুবই গায়া জিনিষ।” অত্যাধিক ওটাকে দুশমন না বলিলে হিন্দুরা, এমন কি বিস্তর কংগ্রেস-ওয়ার্কার হিন্দুও, স্বরাজ্যীদের সহিত একমত হইবে না। বস্তুতঃ, ঐ ভাগবাঁটোআরাটা যে কেবল বঙ্গের ও পঞ্জাবের হিন্দু-দিগকেই লাজ্জিত অপমানিত ও হীনবল করিয়াছে তাহা নহে, উহা সমগ্রভারতের হিন্দুদিগকে পদাঘাত করিয়াছে এবং অধিকতর উহা স্বাভাবিকতা (ন্যাশনালিজম) এবং গণতান্ত্রিকতাকেও (ডিমোক্রাসীকেও) অপমানিত, অগ্রাহ্য ও হীনবল করিয়াছে। সুতরাং কংগ্রেস যদি স্বাভাবিক ও গণতান্ত্রিক বলিয়া নিজের পরিচয় বজায় রাখিতে চান, তাহা হইলে প্রত্যেক হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি কংগ্রেস-ওয়ার্কার ঐ বাঁটোআরাটা প্রত্যাখ্যান ও অগ্রাহ্য করা উচিত।

আর একটা কথা এই, যে, ঐ বাঁটোআরা অনুসারে খেতপত্রের একটা মাত্র অংশ, অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভাপুলাতে কোন ধর্মাবলম্বীরা কত আসন পাইবে তাহার ব্যবস্থা প্রণীত হইয়াছে, বটে। কিন্তু খেতপত্রে তা ছাড়া আরও অনেক জিনিষ আছে; সেগুলাই উহার অধিক অংশ। সেগুলিতে ভারতবর্ষের লোকদিগকে ক্ষমতা দিবার নামে বন্ধন, এবং অধিকার দিবার নামে অনধিকার দেওয়া হইয়াছে। যদি রাজ্যীদের বা অন্তর্ভুক্তি কারও চেষ্টিয় ঐ বন্ধন কমে ও ক্ষমতা বাড়ে, অনধিকার কমে ও অধিকার বাড়ে, কিন্তু যদি সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঁটোআরাটা নাকচ না হইয়া বজায় থাকে, তাহা হইলে ফলটা কিরূপ দাঁড়াইবে? ফল এই হইবে, হিন্দু-কংগ্রেস-মুসলমানেরা আরও ক্ষমতামূলী এবং হিন্দুরা

আরও হীনবল হইবে। হইতে পারে হিন্দুরা দুর্বল, কিন্তু কিসের মানে কি, কিসের ফল কি, তাহারা তাহা বুঝিতে সমর্থ। এই জন্য যখন আগা ধান বলিয়াছিলেন, “এস, ভারতীয় বেরাদরুরা সব, সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোআরাটার এখন আলোচনা না করিয়া খেতপত্রের অন্তর্ভুক্ত দোষগুলো আমাদের সম্মিলিত চেষ্টি দ্বারা শুধরান যাক্.” তখন হিন্দুরা সবাই না হোক অনেকেই তাঁহার মতলবটা বুঝিয়াছিল এবং মুসলমান স্বরাজ্যীদের চা'লও এখন তাহারা বুঝিতেছে।

ভারতবর্ষের সকল ধর্মসম্প্রদায়ের ও সকল জাতির ও শ্রেণীর লোকদের মিলন আমরাও চাই। কিন্তু যত দিন কোন কোন সম্প্রদায়ের, জাতির ও শ্রেণীর আত্মগতোর মূল্য নীলামের সর্বোচ্চ ডাক অনুসারে দিবার ক্ষমতা ইংরেজদের থাকিবে এবং স্বদেশবাসী অন্যান্য সম্প্রদায়ের, জাতির ও শ্রেণীর সহযোগিতা ও দেশের স্বাধীনতার পরিবর্তে, সেই মূল্য লইয়া ইংরেজের আত্মগত স্বীকার করিতে কোন কোন সম্প্রদায় রাজী থাকিবে, তত দিন এই মিলন হইবে না। এবং, সব সম্প্রদায়ের মিলন ভিন্ন স্বরাজ্য পাওয়া যাইবে না, এই বিশ্বাসে বা এই বিশ্বাসের বাহু ভাণে যত দিন আমরা ক্রমাগত সম্প্রদায়বিশেষের দ্বারস্থ হইতে থাকিব, তত দিনও মিলন হইবে না। যখন হিন্দুরা নিজের চেষ্টিয়, মুসলমানরা নিজের চেষ্টিয়, স্বরাজ্যলাভে প্রস্তুত হইবে, অথচ অন্তের সহিত মিলনেও অনিচ্ছুক হইবে না, তখন মিলন হইতে পারে।

মন্ত্রিত্ব ও শাসন-পরিষদের সভ্যত্ব

বঙ্গের অন্ততম মন্ত্রী নাজিমুদ্দিন সাহেব শাসন-পরিষদের সভ্য হইলেন। বোম্বাইয়েও এক জন মন্ত্রী তথাকার শাসন-পরিষদের সভ্য হইয়াছেন। মন্ত্রীদের এইরূপ পদ গ্রহণ বাঞ্ছনীয় নহে। তাঁহারা প্রজাপক্ষের লোক। গবর্নেন্টকে ধুশী রাখিলে তবে শাসন-পরিষদের সভ্য হওয়া যায়। সুতরাং মন্ত্রীদের শাসন-পরিষদের সভ্য হইবার নিয়ম বা রীতি থাকিলে মন্ত্রীর প্রজাহিত অপেক্ষা যথাসাধ্য গবর্নেন্টের মনজোগানতে বেশী মন দিবে। এইরূপ, হাইকোর্টের কিংবা ব্যবস্থাপক সভার সভাপতির শাসন-

মিলওয়ালারাও ত দেখিতেছেন, যে, তাঁহারা শ্রমিকদিগকে কম বেতন দিাও, তাহাদের শিক্ষাভাব ও অসন্তোষ এবং তজ্জনিত অকার্য্যতৎপরতা হেতু, আপানের সঙ্গে টক্কর দিতে পারিতেছেন না। নিজেদের লাভ খুব কম রাখিয়া শ্রমিকদিগকে সন্তুষ্ট, কারিগরীতে শিক্ষিত ও সুস্থ করিয়া দেখুন না তাহাতে বহুশিল্পের শ্রী কিরে কিনা? ফিরিবার খুবই সম্ভাবনা।

দেশব্যাপী ঝড়

আসাম, বাংলা ও বিহারের অনেক স্থানে প্রবল ঝড়ে ও বৃষ্টিতে অনেক গৃহ নষ্ট এবং মনুষ্য ও পশু হত ও আহত হইয়াছে। বিপন্ন ও আর্ন্ত সকলের জগ্ন দুঃখ অনুভব করিতেছি।

শুর চেতুর শঙ্করন্ নায়ার

শুর চেতুর শঙ্করন্ নায়ার মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ও ভারতবর্ষের এক জন কৃতী পুরুষ ছিলেন। সম্প্রতি ৭৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বাল্যে ও যৌবনে মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং পরে বড় উকিল হইয়া হাইকোর্টের জজ, মাদ্রাজের ও ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, বড়লাটের শাসন-পরিষদের সভ্য, প্রভৃতি উচ্চপদে তিনি অধিষ্ঠিত হন। তিনি একবার সাবেক কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন।

স্বাধীনতার দ্বারদেশে

ত্রিশ বৎসরের কিছু অধিক কাল আমেরিকার অধীন থাকিয়া ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ স্বাধীনতা পাটতে ঘাইতেছে। তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিবার আইন আমেরিকার কংগ্রেসে পাস হইয়া গিয়াছে। এখন ফিলিপিনোরা ঐ আইনের কয়েকটা সর্ভে রাজী হইলেই হয়। তাহারা স্বাধীন হইলে বিনাযুদ্ধে স্বাধীন হওয়ার ইহা একটি দৃষ্টান্ত হইবে।

ইংরেজেরই তৈরি আইন ও কন্সটিটিউশ্যনের জোরে ডি ড্যানেরা আয়ারল্যাণ্ডকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করিতেছেন।

নিজেদের সাহসে এবং ইংলণ্ডের ওয়েস্টমিনস্টার স্ট্যাটুট (Westminster Statute) নামক ঐ আইনের অনুসরণ করিয়া এবং তাহা হইতে ইঙ্গিত পাইয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার খেতকারেরা স্বাধীন হইতে বসিয়াছে। কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াও এই পথের পথিক হইবে। ইহারা সব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ডোমিনিয়ন। এইজন্যই কি ইংরেজরা ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন হইতে দিতে চাহিতেছে না?

অধ্যাপক রামনের অবদানপরম্পরা

পাছে প্রস্তাবিত ইণ্ডিয়ান একাডেমী অব সায়েন্সের সদর আফিস কলিকাতায় হয় এইজন্য শুর চন্দ্রশেখর বেকটরামন্ ঐ নাম দিয়া ইতিমধ্যেই একটা বৈজ্ঞানিক সমিতি বাঙ্গালোরে রেষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন! * উদ্যোগী পুরুষ বটে! নইলে বাঙালীকে বোকা বানাইয়া তাহাদেরই কয়েক লক্ষ টাকার যন্ত্রের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিলেন, আর কোন অধ্যাপক বা বাঙালী ছাত্রকে সেগুলি ব্যবহার করিতে দিলেন না, এবং ছুটি লইয়া বাঙ্গালোর ঘাইবার সময় সেগুলি সঙ্গেও লইয়া গেলেন! এখন তিনি দয়া করিয়া বলিয়াছেন, আর কলিকাতায় ফিরিবেন না, যন্ত্রগুলিও ফেরত দিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসক বীরদল তাঁহাকে এই প্রকার আচরণ করিতে দিয়াছেন সম্ভবতঃ এইজন্য, যে, তিনি শুর আন্তোয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক নিষুক্ত হইয়াছিলেন, অতএব তাঁর “সাতখুন মাফ।” বাংলায় যে “কর্তার ভূত” সম্বন্ধে প্রবাদ-বাক্য আছে, তাহা স্বর্ভব্য।

বিহারের আক ও বঙ্গের পাট

আক-চাষীদের সুবিধার জগ্ন ভারত-গবন্মেণ্ট ইফুর দাম বাধিয়া দিবার আইন করিয়াছেন এবং তাহার সাহায্যে

* এই বিষয়ে ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস-কমিটির অর্গানাইজিং সেক্রেটারী ডক্টর মেঘনাদ সাহা ও ডক্টর এস পি আশরকর সংবাদপত্রে একটি দীর্ঘ সংগ্রহ ও সভাধিদিবাক্ষক বৃত্তান্ত বাহির করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠের প্রবাসী ছাপিবার উদ্যোগ করিবার সময় তাহা দেখিতে পাওয়ার উৎসাহ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে পারিলাম না।

বিহার-গবন্মেণ্ট আক-সাবীনের সুবিধা করিয়া দিতেছেন। এখন চিনির কলওয়ালারাকৌশলে চাষীদিগকে খুব কম দরে আক বেচিতে বাধ্য করিতে পারিবে না। বঙ্গের পাটচাষীরা খুব কম দামে পাট বেচিতে বাধ্য হয়। গবন্মেণ্ট পাটের দর বাধিয়া দিবার আইন কিস্ত করেন নাই।

চিনির কল বেশীর ভাগ দেশীলোকদের, চটকল বেশীর ভাগ বিদেশী লোকদের।

সেনহাটীর মহিলাদের পুণ্য কীর্তি

সেনহাটীর পানীয় জলের জন্ত রক্ষিত জলাশয়টি আগাছায় পূর্ণ হওয়াও অব্যবহার্য হইয়া গিয়াছিল। লোক্যান বোর্ডের বাবুদিগকে পুনঃ পুনঃ বলাতেও তাঁহারা আগাছা তুলাইয়া দেন নাই। তখন সেনহাটী মহিলা-সমিতির ৪০ জন মহিলা সভ্য কোমর বাধিয়া ৪ দিনের পরিশ্রমে জলাশয়টি স্বয়ং সাফ করিয়াছেন এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানকে উহার জল বীজাণুমুক্ত করাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ধন্য এই মহিলারা। এখন ইহাদের কৃপায় আশা করি বাবুদের পৌরুষ ও মনুষ্যত্ব উদ্ভূত হইবে।

চিত্র-পরিচয়

সমুদ্র-শাসন

রঘুপতি রামচন্দ্র সীতার উদ্ধারকল্পে সাগরতীরে উপনীত হইয়া বিশাল জনধি কল্পে উস্তীর্ণ হইবেন, তাহা স্মরণ করিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বিভীষণের পরামর্শে উপবাস ক্রিষ্ট রাখিব দীর্ঘকাল ক্ষুণ শয়নে সাগরের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার আগমনে বিলম্ব দেখিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সমুচিত শাস্তি দিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন—

“সাগর শুধিব আজি অগ্নিভ্রাল-বাণে”

উৎসর্গ

জীবন-দেবতার দেউলে মহিলাগণের অর্ঘ্য দিবার প্রথা এদেশে এবং যবদ্বীপ ও বলদ্বীপে অনেক প্রাচীন কাল হইতে

এই মহিলাগুলির চিত্র সেনহাটীর কোন সার্কজনিক প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ‘প্রবাসী’তে তাঁহাদের ছবি ছাপিতে পাইলে প্রবাসীর গৌরব বাড়িবে মনে করি।

মাসিক কাগজের সমালোচনা

কোন কোন বাংলা ও ইংরেজী দৈনিকে কোন কোন বাংলা ও ইংরেজী মাসিকপত্রের পরিচয় বা “সমালোচনা” দেখিতে পাই। অন্যান্য মাসিকের প্রতি নেকুনজর ইহাদের কেন হয় না? খোসামোদ পান না বলিয়া? তাহা হইলে নাচার।

রবীন্দ্রনাথ ও সিংহল

চীন, জাপান, যবদ্বীপ, শ্যামদেশ প্রভৃতির সহিত প্রাচীন কালে ভারতীয় সংস্কৃতির যে যোগ ছিল, আধুনিক সময়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সেই সব দেশে গিয়া তাহা নূতন করিয়া স্থাপন করেন। তাঁহার সিংহলযাত্রা দ্বারাও ভারতবর্ষের সহিত সিংহলের প্রাচীন সংস্কৃতি-যোগ পুনরুজ্জীবিত হইবে।

চলিয়া আসিতেছে। পুষ্প, চন্দন প্রভৃতি উপচার দীপ-গিখা লইয়া, নানা নৃত্য সঙ্ঘরে তাঁহারা দেবতার তুষ্টিবিধানে যত্ববান হইতেন। বর্তমান চিত্র বর্ণ বৈচিত্র্য ও অঙ্কন-পরিপাটো ভাবসম্পদ যথেষ্ট পরিষ্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ এই কথাই বলিয়াছেন—

“সন্ধ্যা হলে, সুরারীদলে, বিজন তব দেউলে,

আলায়ে দিত প্রদীপ যতনে”—

ক্ষুধার্ত্ত

এই চিত্রে বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশে যে অপরূপ বর্ণ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয় তাহা দেখান হইয়াছে। ইহাকে বলে ‘কলার কন্ট্রাস্ট স্কীম’ (colour contrast scheme)। পরিকল্পনায় ক্ষুধিতের ব্যাকুলতাও বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।



বসন্তা
শ্রীঅজিতকৃষ্ণ গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

“নামসাম্বা বলহীনেন লভ্যঃ”

৩৪শ ভাগ }
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩৪১

{ ৩য় সংখ্যা

রূপকার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওরা কি কিছু বোঝে

যাহারা শুধু আনাগোনার পথে

ফেরে কত কী খোঁজে ?

হেলায় ওরা দেখিয়া যায় এসে বাহির দ্বারে,

জীবন-প্রতিমারে

জীবন দিয়ে গড়িছে গুণী স্বপন দিয়ে নহে ।

ওরা তো কথা কহে,

সে সব কথা মূল্যবান জানি,

তবু সে নহে বাণী ॥

রাতের পরে কেটেছে ছুখরাত

দিনের পরে দিন,

দারুণ তপে করেছে তমু ক্ষীণ ।

সৃষ্টিকারী বজ্রপাণি যে বিধি নির্মম,

বহিতুলি সম

কল্পনা সে দখিন হাতে যার,

সব-খোওয়ানো দীক্ষা তারি নিষ্ঠুর সাধনার

নিয়েছে ও যে প্রাণে,

নিজেরে ও কি বাঁচাতে কভু জানে ?

হায় রে রূপকার,
 না হয় কারো করো নি উপকার,
 আপন দায়ে করেছ তুমি নিজেরে অবমান,
 সে লাগি কভু চেয়ো না প্রতিদান ।
 পাঁজর-ভাঙা কঠোর বেদনার
 অংশ নেবে শক্তি হেন বাসনা হেন কার ?
 বিধাতা যবে এসেছে দ্বারে গিয়েছে কর হানি,
 জাগে নি তবু, শোনে নি ডাক যারা,
 সে প্রেম তারা কেমনে দিবে আনি'
 যে প্রেম সব-হারা,
 করুণ চোখে যে প্রেম দেখে ভুল,
 সকল ক্রটি জানে,
 তবু যে অনুকূল,
 শ্রদ্ধা যার তবু না হার মানে ।
 কখনো যারা দেয় নি হাতে হাত,
 মর্শ্বমাঝে করে নি অঁাখি পাত,
 প্রবল প্রেরণায়
 দিল না আপনায়,
 তাহারা কহে কথা,
 ছড়ায় পথে বাধা ও বিফলতা,
 করে না ক্ষমা কভু,
 তুমি তাদের ক্ষমা করিয়ো তবু ।

হায় গো রূপকার,
 ভরিয়া দিয়ো জীবন-উপহার ;
 চুকিয়ে দিয়ো তোমার দেয়,
 রিক্ত হাতে চলিয়া যেয়ো,
 কোরো না দাবী ফলের অধিকার ।
 মনে জানিয়ো চিরজীবন সহায়হীন কাজে
 একটি সাথী আছেন হিয়ামাঝে,
 তাপস তিনি, তিনিও সদা একা,
 তাঁহার কাজ ধ্যানের রূপ বাহিরে মেলে দেখা ॥

পাণিনি-ব্যাকরণ ও সংস্কৃতে প্রাকৃতপ্রভাব

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

বৈদিক ভাষাতেও যে, প্রাকৃতের প্রভাব অনেক আছে, ভাষাতত্ত্ববিদগণের নিকট ইহা সুপ্রসিদ্ধ। লৌকিক সংস্কৃতে তো ইহা খুবই দেখা যায়। পূর্বে (প্র বা সী ও পা লি প্র কা শে) ইহা আলোচনা করিয়াছি। আজ পাণিনির ব্যাকরণ হইতে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে মকারের স্থানে অমুস্বার হয়, ইহা সাধারণ নিয়ম (৮.৩.২৬) ; যেমন, ব ন ম্ হ স তি, এখানে ব ন ম্ হইবে ব ন ঃ। কিন্তু যদি হকারের পর মকার (ক্ষ=হ্+ম) থাকে, তবে তাহার পূর্ববর্তী মকার অমুস্বার হইবে অথবা তাহা অবিকৃত থাকিবে—তাহার কোনো পরিবর্তন হইবে না ; যেমন, কি ম্ ক্ষ ল য তি, এখানে কি ম্ হইবে কিং ; অথবা কি ম্ ইহাই থাকিবে, কোনো পরিবর্তন হইবে না। কিন্তু কেন ? পাণিনির উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তাঁহার সময়ে দেশে অথবা কোনো প্রদেশে ক্ষ এই ধ্বনিটি যথায়ভাবে উচ্চারিত হইত না ; অর্থাৎ এই ধ্বনিতে প্রথমে হকার ও পরে মকার একই অক্ষরে (syllable) উচ্চারণ করা উচিত, কিন্তু তাহা হইত না, বর্ণবিপর্যয় করিয়া প্রথমে মকার ও পরে হকার উচ্চারণ করা হইত, ঠিক যেমন প্রাকৃতে করা হইয়া থাকে ; যথা, সংস্কৃত ত্রা ক্ষ ণ, প্রাকৃত ব ম্ হ ণ, বিহারী বা ম্ হ ণ। এখন পাণিনির পূর্বোক্ত মন্তব্যটির তাৎপর্য সহজেই বুঝা যায় যে, যাহারা ক্ষ ধ্বনিকে যথায়ভাবে (অর্থাৎ হকারের পর মকার রাখিয়া) উচ্চারণ করিতেন, তাঁহাদের নিকট পূর্ববর্তী মকার স্বভাবতই অমুস্বার হইত ; আর যাহারা তাহাকে বিকৃতভাবে অর্থাৎ পূর্বে মকার ও পরে হকার করিয়া উচ্চারণ করিতেন তাঁহাদের নিকট, পরে মকার থাকায় পূর্ববর্তী মকার স্বভাবতই ঐরূপ থাকিয়া যাইত।

বাঙালী পাঠকেরা লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, ত্রা ক্ষ ণ এই শব্দটিকে আমরা যথায়ভাবে ত্রা হ্ ম ণ এইরূপ উচ্চারণ না করিয়া ত্রা ম্ হ ণ এইরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকি। সংস্কৃতেও

আমরা ইহার অগ্রথা করি না। ইহা লক্ষ্য না থাকায় বহু স্থলে সংস্কৃত নাটক বা দৃশ্যকাব্যসমূহের প্রাকৃত অংশে ম্ হি (সংস্কৃত ণ্ম) প্রভৃতি না ছাপিয়া ক্ষি (= হ্ মি) প্রভৃতি ছাপান হয়। ইহা যেমন বাঙালী তেমন অ-বাঙালীদের করা সংস্করণে।

পাণিনির পরবর্তী (৮.৩.২৭) সূত্রে (“নপরে নঃ”) বলা হইয়াছে যে, হকারের পর যদি নকার থাকে তবে সেই হকারের পূর্ববর্তী মকারের স্থানে বিকল্পে নকার হয়, অর্থাৎ অমুস্বারও হইতে পারে, নকারও হইতে পারে ; যথা, কি ম্ হু তে এখানে কি ম্ স্থানে কিং অথবা কি ন্ এই উভয়ই হইতে পারে। এখানে মকার স্থানে নকার হইবার ইহাই একমাত্র কারণ যে, পাণিনির পূর্বে অথবা তাঁহার নিজেরই সময়ে কেহ-কেহ হু (=হ্+ন) ধ্বনিকে ঠিক এইরূপে উচ্চারণ না করিয়া ন্ হ উচ্চারণ করিতেন, অপর কথায় প্রথমে হকার ও পরে নকার উচ্চারণ না করিয়া বর্ণবিপর্যয়হেতু প্রথমে নকার ও পরে হকার উচ্চারণ করিতেন। তাই এইরূপ উচ্চারণকারীদের নিকট কি ম্ হু তে বস্তুত উচ্চারিত হইত কি ম্ ন্ ছ তে। অতএব মকারের পর নকার থাকায় মকার-স্থানে স্বভাবতই নকার হইত। তুলনীয়—সং. চি হু, প্রা. চি ণ্ হ (অপর রূপ চি ক্ষ) ; ও. বাঙ. চি ন্ হ ; সং. ব হি, প্রা. ব ণ্ হি।

কাত্যায়ন নিজের বা স্তিকে এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, যদি হকারের পর যকার, বকার, বা লকার থাকে তবে সেই হকারের পূর্ববর্তী মকারের স্থানে যথাক্রমে বিকল্পে যকার, বকার, ও লকার হয় (“যবলপরে যবলা বা”)। যকার, বকার ও লকার দুই প্রকার, সাহুনাসিক ও নিরহুনাসিক। মকার সাহুনাসিক বলিয়া তাহার স্থানে যে যকারাদি হয় তাহা স্বভাবতই সাহুনাসিক হইবে। তদনুসারে কি ম্ হুঃ এইরূপ স্থলে মকারের স্থানে অমুস্বার ছাড়া য্ ইহাও হইতে পারে। এই প্রকার হকারের পর যকার বা লকার থাকিলে পূর্ববর্তী মকারের

স্থানে যথাক্রমে বিকল্পে ঙ্গ ও ঙ্গ হইবে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, প্রাকৃত ও বর্তমান ভারতীয় আৰ্য্য প্রাদেশিক ভাষাসমূহের জায় সেই সময়েও (১) হ্ উচ্চারিত হইত য্ হ, (২) হ্ হইত য্ হ, এবং (৩) হ্ হইত য্ হ। দ্রষ্টব্য— (১) সং. ঙ্গ হ্, প্রা. ঙ্গ হ্ (< ঙ্গ হ্ < ঙ্গ য্ হ), বাঙ. ঙ্গ হ্, পাঞ্জ. ঙ্গ হ্, সিন্. ঙ্গ হ্, মরা. গ্ হ; সং. ন হ্ তি, প্রা. ন হ্ তি; (২) সং. জি হ্, পা. জি হ্, প্রা. জি ব্ ভা (অন্য রূপ জী হা), বাঙ. জি ব্ ভা (অন্য রূপ জী ভ); (৩) সং. আ হ্ দ, প্রা. অ ল্ হা দ, বাঙ. (উচ্চারণে) আ ল্ হা দ।

পাণিনির প্রদর্শিত প্র + এজতে = প্রে জ তে, প্রৈ জ তে নহে; উপ + ওষতি = উপোষতি, উপোষতি নহে (৬. ১. ৫৪); অদ্য + ওম্ = অদ্যোম্, অদ্যোম্ নহে, অদ্য + ওঢ়া (= আ + উঢ়া) = অদ্যোঢ়া, অদ্যোঢ়া নহে (৬. ১. ৯৫)। এই সমস্ত সন্ধিতে স্পষ্টতই প্রাকৃতের প্রভাব দেখা যায়। পালি ও প্রাকৃতে এইরূপ সন্ধি সুপ্রসিদ্ধ। পাণিনির এই নিয়মের আলোচনা-প্রসঙ্গে কাত্যায়ন আরো কয়েকটি এই জাতীয় সন্ধির স্থল দেখাইয়াছেন; যেমন, যদি নিশ্চয় বা অবধারণ না বুঝায় তবে ই হ্ + এ ব সন্ধিতে হইবে ই হে ব, ই হে ব নহে; এইরূপ অদ্য + এ ব = অদ্যো ব, অদ্যো ব নহে। এই প্রকারই বিষ্ + ওষ্ঠ = বিষ্ণোষ্ঠ, আবার বিষ্ণোষ্ঠ; স্থল + ওতু = স্থলোতু, আবার স্থলোতু। বৈদিক ভাষায় এইরূপ প্রয়োগের জন্য দ্রষ্টব্য তৈত্তিরী য় প্রাতিশাখ্য, ১০-১৪; Macdonell: *Vedic Grammar*, p 64. কাত্যায়ন আরো কতকগুলি এইরূপ সন্ধির স্থল নির্দেশ করিয়াছেন। এই শব্দগুলিকে শক্জু - আদি গণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই গণের অন্তর্গত শব্দগুলি নির্দিষ্ট নাই, প্রয়োগ-অনুসারে ইহা ঠিক করিয়া লইতে হয়। এই সমস্ত শব্দ পালি ও প্রাকৃতের সন্ধির নিয়মে উৎপন্ন। যেমন, সার + অজ = সারাজ নহে, সারজ; শক + অজু = শকজু নহে, শকজু; ইত্যাদি। পালি-প্রাকৃতের কুস + অগ্গ = কুসগ্গ (সং. কুশাগ্), কুশাগ্গ নহে; রাগ + অগ্গি = রাগগ্গি (সং. রা

গাগ্গি), রাগাগ্গি নহে; নিকান স্ স + এব = নিকান স্ সে ব (সং. নিবাণ সৌ ব), নিকান স্ পৈ ব নহে; ইত্যাদি লক্ষণীয়।

প্রাকৃতের য্ শ্চ তি সুপ্রসিদ্ধ।^১ স্থানান্তরে (শাস্তি-নিকেতন পত্রিকা, দ্বিতীয় বৎসর) ইহা আলোচনা করিয়াছি। সং. বদন, প্রা. বঅণ, কিন্তু কখনো-কখনো বয়ণ। প্রাকৃত বঅণ শব্দের মধ্যবর্তী অকারের স্থানে যে য্কার দেখা যাইতেছে, ইহাকেই য্-শ্চ তি বলা হয়। এইরূপ বহু স্থানে। বাঙলায় মাএর না উচ্চারণ করিয়া আমরা মায়ের উচ্চারণ করিয়া থাকি। এইরূপ অনেক। য্-শ্চ তি শব্দের আক্ষরিক অর্থ য্কারের শ্চতি বা শ্চবণ। অর্থাৎ এতাদৃশ স্থলে যে ধ্বনিটি শুনা যায় তাহা সম্পূর্ণ বা যথার্থভাবে উচ্চারিত য্কারের ধ্বনি নহে, তাহার মত শুনা যায় মাত্র। ইহা অতি লঘু প্রযুক্ত উচ্চারিত য্কার। দ্রষ্টব্য হেমচন্দ্র, ৮. ১. ১৮০; লক্ষ্মীধর, ১. ৩. ৩০)।

পাণিনি-অনুসারে (৮. ৩. ১৭) ক : + আশ্বে সন্ধিতে হয় ক য়াশ্বে (= ক য় - আশ্বে)। অর্থাৎ বিসর্গ লোপ হইলে সেখানে যে ফাঁকটা (hiatus) হয় উচ্চারণের সুবিধার জন্য য্কার দ্বারা তাহা পূর্ণ করা হয়। পাণিনি এ সম্বন্ধে এমন কিছু বলেন নাই যে, এই য্কার সম্পূর্ণভাবে উচ্চারিত য্কার নহে। কিন্তু পাণিনির সূত্রে (৮. ৩. ১৮) উক্ত শাকটায়ন ও তৈত্তিরী য় প্রাতিশাখ্যে (১০. ২৩) উক্ত বাৎসপ্রের মতে এই য্কার “লঘুপ্রযুক্তর” অর্থাৎ অতিশয় লঘু প্রযুক্ত উচ্চারিত। কখনো-কখনো (তৈত্তিরী য় প্রাতিশাখ্য, ১০-২৩) এই য্কারকে য্-লে শং বলা হইয়া থাকে। দ্রষ্টব্য Whitney: *Atharvaveda Prātisākhya*, II. 24. বস্তুত ইহা প্রাকৃত ব্যাকরণের য্-শ্চতি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

পূর্বে যাহা উক্ত হইল তাহা হইতে বুঝা যায় যে,

^১ ফরাসীর habiller, উচ্চারণে abije; travailler, উচ্চারণে travailje; ইত্যাদি স্থলে য্-শ্চতিই মনে হয়। এখানে প্রযুক্ত j এর ধ্বনি Association Phonétique Internationale অনুসারে বুঝিতে হইবে।

^২ তৈত্তিরী য় প্রাতিশাখ্যের এক টীকাকার ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন “লঘুবদ্ উচ্চারণম্” অর্থাৎ লঘু য্কারের জায় উচ্চারণ; অপর টীকাকার বলিয়াছেন “একদশো যথোক্তবিধয়ে লুপ্যতে, একদেশঃ ক্রমতঃ” অর্থাৎ য্কারের এক দেশ লুপ্ত হয় আর এক দেশ শুনা যায়।

শাকটায়ন ও বাৎসপ্তের এই আলোচ্য ঙ (অর্থাৎ লঘু প্রযুক্তর ঙ, ঙ-লেশ, বা ঙ-শ্রুতি) পাণিনির সময়ে সম্পূর্ণভাবে উচ্চারিত ঙ ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু শাকল্যের মতে (পাণিনি, ৮. ৩. ১৯) এইরূপ স্থলে সম্পূর্ণভাবে বা লঘুতর প্রযুক্তে উচ্চারিত ঙকারের কোনো ধ্বনি শুনা যাইত না।^৩ গার্গ্য পাণিনির পূর্ববর্তী অথবা একই সময়ের। তিনি বলেন, কোনো-কোনো স্থলে এই ধ্বনি শুনা যায় না। ইহার সহিত প্রাকৃতের সম্পূর্ণ ঐক্য, প্রাকৃতে কোনো-কোনো বিভাষায় এই ঙ-শ্রুতি আছে, কোনো-কোনো বিভাষায় নাই।

এ যেমন ঙ-শ্রুতি সম্বন্ধে, তেমনি ঙ-শ্রুতি সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে।

পূর্বে যাহা আলোচিত হইল তাহা অনুসরণ করিলে

৩ তৈ ত্তি রী য় প্রা তি শা ষ্যে ও (১০. ১৯) এই মত প্রকাশিত হইয়াছে। ত্রৈব্য ঐ, ১০. ২২.

নিম্নলিখিত ও তৎসদৃশ পদগুলির অনান্যসেই সমাধান হয়। দে ঙ শব্দের ৬ষ্ঠী ও ৭মীর দ্বিভবনে দে ব+ও স্ হইতে দে ঙ য়োঃ হয়। এখানে ঙ কার কোথা হইতে আসিল? পূর্ক ব্যাখ্যাত ঙ-শ্রুতি ভিন্ন আর ইহা কিছুই নহে। এইরূপ $\sqrt{দা} + ই ন্ = দা ঙি ন্$; $\sqrt{বা} + উ = বা য়$; ইত্যাদি। $\sqrt{ভু} + আ দ য় = ভু ঙা দ য়$: (পাণিনি, ১. ৩. ১)। এখানে ঙ-শ্রুতি ভিন্ন কিছুই নহে। পাণিনির “ভূবাদয়ঃ ধাতবঃ” এই সূত্রের সোজাহুজি বা স্পষ্ট অর্থ হইতেছে ‘ভূ-প্রভৃতি ধাতু’, কিন্তু ‘ভূবাদয়ঃ’ এই পদটি কিরূপে হইল ইহা লইয়া নানা টীকাকারকে নানারূপ কষ্টকল্পনা করিতে হইয়াছে। কেহ-কেহ বলিয়াছেন যে, ভূ বা দি (যাহার বহুবচনে “ভূবাদয়ঃ”) ভূ+আ দি নহে, ভূ+বা+আ দি। ঙ-শ্রুতির তত্ত্ব অনুসরণ করিলে এই সব কল্পনার স্থান থাকে না।

অম্পৃশ্যতা

শ্রীশশধর রায়

এই শব্দটির অর্থ যাহাই হউক, ইহা স্মৃতিমূলক, বেদমূলক নহে। ঋগ্বেদের পুরুষস্বক্তে পাওয়া যাইতেছে যে,

ত্রাক্ষণোহস্ত মুখমাসীষাঙ্ক রাজস্তুঃ কৃতঃ।

উরু তদস্ত যথেষ্টঃ পত্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥

ঋ ১০।২০।১২

এই মন্ত্র হইতে বুঝা যায় যে, বিরাতপুরুষের মুখ ত্রাক্ষণ ছিল, বাহুকে রাজস্তু করা হইয়াছিল, উরু যাহা ছিল তাহা বৈশ্ব, পদ হইতে শূদ্র জাত হইয়াছিল। স্মৃতরাং দেখা যাইতেছে যে, শূদ্র অম্পৃশ্য হইতে পারে না। বিরাতপুরুষের কোন অঙ্গই অপবিত্র নহে, তিনি “নিত্যশুদ্ধ।” তাঁহার পদদ্বয়ও অপবিত্র নহে। স্মৃতরাং পদ হইতে জাত শূদ্রও অম্পৃশ্য নহে। শূদ্রের জন্মগত অম্পৃশ্যতা নাই, হইতেও পারে না। শূদ্র চারি বর্ণের অগ্রতম। তথাপি স্মৃতিতে সৎ শূদ্র ও অসৎ শূদ্রের উল্লেখ আছে। সে প্রভেদ স্বীকার করিলেও পরে দেখা যাইবে যে, কোন প্রকার শূদ্রই অম্পৃশ্য গণ্য হয় নাই।

স্মৃতি সম্বন্ধে প্রথমেই একটি কথা বলিয়া রাখি। এতদেশে

মনুস্মৃতিই সকল স্মৃতির অপেক্ষা অধিক সমাদর লাভ করিয়াছে। মনু বলিতেছেন,

“কৃষ্ণসারস্তু চরতি যুগো যত্র স্বভাবতঃ।

স জ্ঞেয়ো যজ্ঞয়ো দেশ স্নেচ্ছদেশস্ততঃপরঃ ॥ ২।২৩

অর্থাৎ কৃষ্ণসার যুগ যে দেশে স্বভাবতঃ বিচরণ করে সেই দেশ যজ্ঞীয় দেশ; তন্নিম্ন স্থানকে স্নেচ্ছদেশ বলা যায়। বঙ্গদেশে কোন বনে কি অরণ্যে কৃষ্ণসার যুগ স্বভাবতঃ বিচরণ করিবার শাস্ত্রীয় প্রমাণ কিংবা প্রত্যাঙ্ক প্রমাণ কিছুই পাওয়া যায় না। স্মৃতরাং বঙ্গদেশ যজ্ঞীয় দেশ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অতএব এ দেশ স্নেচ্ছদেশ। ত্রক্ষাবর্ত দেশ, ত্রক্ষর্ষি দেশ, মধ্যদেশ—আর্য্যাবর্তে এই সকল দেশকেই আশ্রয় করা দ্বিজগণের কর্তব্য। পরন্তু শূদ্রগণ জীবিকার নিমিত্ত যে-কোন দেশে বাস করিতে পারেন।* বঙ্গদেশ উল্লিখিত ঐ সকল দেশমধ্যে গণ্য নহে। শূদ্রগণ

* মনু ২।১৭—২৪

এদেশে বাস করিতে পারেন, কিন্তু দ্বিজগণের এদেশে বাস কর্তব্য নহে। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে তীর্থযাত্রা ব্যতীত অল্প কারণে আসিলে দ্বিজগণকে পুনরায় সংস্কার গ্রহণ করিতে হইত।

“অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে সৌরাষ্ট্রে মগধে চ
তীর্থযাত্রা বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥”

এ-সকল হইতে বুঝা যাইতেছে, বঙ্গ অপবিত্র দেশ, স্নেচ্ছ-দেশ। মনুস্মৃতি, ব্যাসস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি প্রভৃতিতে যে-সকল বিধিনিষেধের উল্লেখ আছে তাহা, যে-দেশে কৃষ্ণসার যুগ স্বভাবতঃ বিচরণ করে সেই দেশের জন্ত কথিত হইয়াছে। স্নেচ্ছদেশের জন্ত নহে। স্নেচ্ছদেশের জন্ত স্মৃতি লিখিত হয় নাই। সুতরাং স্মৃতির বিধিনিষেধ বঙ্গদেশে প্রযোজ্য নহে। বাঙালী! এই সকল বিধিনিষেধ মানিবে কেন? যদি মানে সে পৃথক কথা। না মানিলে প্রায়শ্চিত্তই হয় না। বেদ সর্বদেশে সর্বকালের জন্ত বিদ্যমানবের হিতার্থে প্রচারিত হইয়াছে।

যথেষ্ট বাচঃ কল্যাণী মাষদানি জনেভ্যঃ ।
ব্রহ্মরাজস্বাভ্যাং শূদ্রাং চার্ঘ্যায়চস্বায়চারণায় ॥

যজুঃ ২৬ ২

এই হেতু স্মৃতির ব্যবস্থা বেদামুগ হইলে স্নেচ্ছদেশেও মাননীয় হইতে পারে, নচেৎ নহে।

ব্যাস বলিতেছেন, বেদের অবিরোধী হইলেই অর্থাৎ বেদামুগত হইলেই স্মৃতি-পুরাণের প্রামাণিকতা। বেদের বিরোধী হইলে স্মৃতিপুরাণ গ্রহণীয় নহে।

ঋতিস্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে ।
তত্র জ্যোতঃ প্রমাণস্ত তয়োষেধে স্মৃতির্করী ॥

ব্যাস সং ১১৪

কিন্তু মনুর মতে বিরোধী অবিরোধীর কোন কথা নাই। বেদে যাহা নাই তাহাই পরলৌকিক বিষয়ে নিফল; কারণ তাহা পুরুষকৃত এবং অর্কাচীনকালীয়। বেদ অপৌরুষেয়, অল্প শাস্ত্র পুরুষকৃত। বেদ নিত্য, অল্প শাস্ত্র অর্কাচীনকালীয়। বেদ সর্বজ্ঞের উক্তি, অল্প শাস্ত্র অল্পজ্ঞের কৃত। এই সকল হেতুবশতঃ বেদবাহু শাস্ত্রের উক্তি পরলৌকিক বিষয়ে নিফল।

যা বেদ বাহাঃ স্মৃতয়ো যাস্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ ।
সর্কাস্তা নিফলাঃ প্রেত্য তসোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ
উৎপদ্যন্তে চ্যবন্তে চ যাজ্ঞতোহৃদ্যানি কানিচিৎ ।
তাস্তর্কাচীনকালিতয়া নিফলাস্তনুতানি চ ॥

মনু ১২।১৫-১৬

টীকাকার কুল্লুকভট্ট বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, পুরুষকৃত শাস্ত্র পৌরুষেয়ত্বাৎ অর্থাৎ ঐ হেতুতেই এবং অর্কাচীনকালিক বলিয়া অর্থাৎ ইদানীন্তনত্বাৎ উৎপন্ন হইতেছে এবং বিনষ্ট হইতেছে। কারণ উহা অনিত্য, সুতরাং উহা নিফল এবং অনৃত। ইহাতে বেদবাহু শাস্ত্রকে বৃথা এবং মিথ্যা— দুই-ই বলা হইল।

বেদোক্ত ধর্ম প্রকৃত ধর্ম বলিয়া যখন সর্বত্র আচরণ করিবার যোগ্য তখন বঙ্গাদি দেশে অল্প শাস্ত্রসম্মত ধর্ম ও আচরণ প্রচলিত থাকিলে কি হইবে? সে-সকল ত মনুর মতে নিফল ও মিথ্যা। পারলৌকিক বিষয়ে সে-সকল কিছুই নহে। বেদবাহু স্মৃতি পুরাণ মাননীয় নহে।

যদি বা স্বীকার করেন যে স্মৃতিশাস্ত্রের বিধিনিষেধ বঙ্গদেশেও প্রযোজ্য, তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে বঙ্গদেশে অধুনা দ্বিজবর্ণের অথবা ব্রাহ্মণের ‘অত্যস্তাভাব’ হওয়ায় ঐ সকল এদেশে প্রযোজ্য হইতে পারে না। মনু, ব্যাস, বশিষ্ঠ প্রমুখ ঋষিগণকে যদি শ্রদ্ধা ও মাগ্ন করেন তবে অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, এই দেশে ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত গ্রাম সকলেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং শূদ্র বর্ণ। কেহ কেহ বা অসৎ শূদ্রেও পরিণত হইয়াছেন। যেখানে সকলেই শূদ্র, সেখানে অস্পৃশ্যতা কথার অর্থই নাই। মনু বলিতেছেন,
যোহনধীত্য ষিজো বেদানস্তত্র কুরতে শ্রমঃ
স জীবনেন শূদ্রত্বমাণ্ড গচ্ছতি সাধরঃ ॥

মনু ২।১৬৮

বেদ অধ্যয়ন না করিলে সবংশে শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হয়। অধ্যয়ন করা চাই। দুই একটা বেদমন্ত্র আওড়াইলে হইবে না। অর্থ না বুঝিয়া আওড়াইলে ত হইবেই না, মোটামুটি একরকম বুঝিয়া আওড়াইলেও হইবে না। গুরুগৃহে নির্দিষ্ট কাল অধ্যয়ন করিতে হইবে। নচেৎ মনুর মতে শূদ্রত্বপ্রাপ্ত ঘটিবে। কুল্লুকভট্ট বাঙালী ছিলেন, এইরূপ পরলোকগত শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার মৈত্র আমাকে বলিয়াছেন। কুল্লুক বাঙালী থাকুন বা না-থাকুন তিনি তথাকথিত ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখিবার নিমিত্ত বলিতেছেন, মধু অভাবে গুড় দিলেই হইবে অর্থাৎ স্মৃতি অথবা বেদাদি পড়িলেও ব্রাহ্মণত্ব টিকিয়া যাইবে। তিনি শঙ্খলিখিতের প্রমাণও দিয়াছেন। এ-সকল নিঃসন্দেহ সেই সময়ের কথা যে-সময়ে বেদের পঠনপাঠন অনাদৃত হইয়া আসিতেছিল অথবা

সম্পূর্ণ অপ্রচলিত হইয়াছিল। এ-সকল সেই সময়ের কথা যখন চিরপ্রসিদ্ধ চারি বেদের উপর দিয়াও পুরাণকে* পঞ্চম বেদের আসন দেওয়া হইয়াছিল; যখন সেই পুরাণের একটি পর্বে† একাংশকে‡ বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদের আসনে বসাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। সুতরাং সে-সময়ে মনুসংহিতার নির্দেশ যথাযথ পালিত হয় নাই।

বশিষ্ঠ বলিতেছেন,

“অশ্রোত্রিয়া অননুবাচ্যা অনগরো বা শূদ্রস্য সধর্ষিণো ভবন্তি ॥”
বশিষ্ঠ ধং সূ° ৩।৩

ইহার অর্থ এই যে, যিনি বেদ অধ্যয়ন করেন নাই, বেদের অধ্যাপনাও করেন নাই, যিনি অগ্নি আধান করেন না, তিনি শূদ্রধর্মী। সুতরাং শুধু বেদ পড়িলেই হইবে না, পড়াইতেও হইবে। নচেৎ শূদ্রত্বপ্রাপ্তি হইল। এখন প্রায় কোন ব্রাহ্মণই এ-সকল করেন না। ব্রাহ্মণ-বর্ণের নির্দিষ্ট কর্ম কেহই করেন না। প্রায় সকলেই শূদ্রের আচরণ ও শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। সুতরাং কাহার সহিত কাহার অম্পৃশ্যতা? এ-সকল শ্রেণীর অম্পৃশ্যতাপালন জাতীয় কল্যাণের পরিপন্থী না হইলে হাস্যজনক হইত।

ব্রাহ্মণ যদ্যপি ধর্ষাচরণ না করেন তবে তিনি শূদ্র বর্ণত্ব প্রাপ্ত হন। শূদ্র যদি ধর্ষাচরণ করেন তবে তিনিও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন।

ধর্ষচর্যয়া জঘন্যোবর্ণঃ
পূর্ষঃ পূর্বং বর্ণমাপদ্যাতে জাতি পরিবৃত্তৌ।
অধর্ষচর্যয়া পূর্বো বর্ণো জঘন্তঃ বর্ণ
মাপদ্যাতে জাতি পরিবৃত্তৌ ॥

আপস্তম্ব ২।৫।১১

অর্থাৎ ধর্মপালনের দ্বারা নিম্নবর্ণও উচ্চবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় এবং উচ্চবর্ণও অধর্ম আচরণের দ্বারা নিম্নবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। বর্তমান কালে দ্বিজবর্ণগণ শাস্ত্র-নির্দিষ্ট ধর্ম পালন করিতেছেন এমন কথা কেহই বলিতে পারিবেন না। সুতরাং দ্বিজবর্ণ প্রায় সকলেই নিম্নবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। নানা শাস্ত্র হইতে বহু প্রমাণ উদ্ধার করিয়া ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণবর্ণের অত্যন্তাভাব হইয়াছে। প্রায় সকলেই যখন

* মহাভারতকে।
† ভীষ্ম পর্কের।
‡ গীতাকে।

জঘন্ বর্ণে পরিণত হইয়াছেন তখন কেহই কাহাকে অম্পৃশ্য বলিতে পারেন না, ইহা স্থনিশ্চিত।

মহারাজ বজ্রাল সেন ও বিচারপতি হলায়ুধের সময় হইতে মহাপ্রভু গৌরানন্দের সময়ের মধ্য দিয়া রাজা রামমোহন রায়ের এবং অবশেষে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সময় পর্যন্ত বাঙালীকে পুরা আর্ষ্য-ছাঁচে ঢালিয়া লইবার একটা প্রকাণ্ড চেষ্টা হইয়া আসিয়াছে। এ চেষ্টা ভারতীয় কল্যাণের পক্ষে অতীব মঙ্গলজনক সন্দেহ নাই। কিন্তু এই চেষ্টা বেদকে ত্যাগ করিয়া হইতে পারে না। আর্ষ্যধর্ম বেদমূলক। স্মৃতি পুরাণ বেদকেই অনুগমন করিবে। যেখানে অনুগমন করে নাই সেখানেই মনুর ও ব্যাসের মতে স্মৃতি পুরাণ অপ্রামাণিক, এ-বথা পূর্বেই বলিয়াছি। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কাহাকেও আর্ষ্য-ছাঁচে ঢালিতে হইলে বেদকেই আশ্রয় করিতে হয়। পুরাণকে বেদ বলিলেই তাহা বেদ হইয়া যায় না; পুরাণের অংশকেও উপনিষদ বলিলে উহাও বেদান্ত হইয়া যায় না। বেদ বেদই থাকে, পুরাণ পুরাণই থাকে। বেদ পরম-দয়ালু সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের বাক্য। এ আসনে অল্প কোন শাস্ত্রকে বসাইলে বেদের এবং ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়।

বেদে কাহাকেও অম্পৃশ্য করা হয় নাই।

সমানো প্রপা সহ বো অন্নজঃ।
সমানো যোক্তে সহ বো বুনজি।
অধর্ষবেদ। ৬ কা°। ৩০ সূ।

অর্থাৎ তোমাদিগের পানীয় এবং অন্ন এক হউক। এ স্থলে সাংগ ভাষ্য করিতেছেন—

—সহ বোৎসভাগাঃঃ অন্নভাগশ্চ সহ এব ভবতু। পরম্পরানুরাগকশেন একত্রাবস্থিতমন্নপানাদিকং যুগ্মাভিন্নপভূজ্যতামিত্যর্থঃ।

সুতরাং একত্র অবস্থিত হইয়া একস্থানে বসিয়া তোমরা সকলে অন্নপানাদি কর। ব্রহ্ম এই উপদেশ মানবকে দিতেছেন।

শূদ্রবর্ণ বেদে পাই। কিন্তু কাহাকে অসৎ শূদ্র বলে তাহা পাই না। শূদ্র বহু প্রকারে আর্ষ্যসমাজে স্থান পাইয়াছে। যে-প্রকারেই পাইয়া থাকুক, দ্বিজগণ শূদ্রের সেবা করিবেন—এরূপ বিধান কোন শাস্ত্রে দেখা যায় না। সেবা শূদ্রেরই ধর্ম। শূদ্রই দ্বিজগণের সেবা করিবে। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে দেখা যায়

‘আর্ষ্যাধিষ্ঠিতা বা শূদ্রাঃ সংকর্তারঃ স্যাঃ।’ ২।২।২৪

অর্থাৎ আর্ধ্যদিগের গৃহে শূদ্রগণের পরিচর্যা (সংস্কারকার্য) করিবে। ইহাতে সর্বপ্রকার পরিচর্যা-কার্যই বৃদ্ধিতে হইবে। শূদ্র আমাদিগকে রাখিয়া পরিবেশন করিয়া যত্নপূর্বক আহার করাইবে। ব্রাহ্মণবর্গ পাকাদি কার্য করিয়া শূদ্রের সেবা করিবে না। আধুনিক স্মৃতি মানিতে হইলে ব্রাহ্মণের হস্তে পাকাদি সেবা গ্রহণ করা শূদ্রের অসম্ভব। গোরক্ষপুর জেলা নিবাসী আমার একজন বরকন্দাজ আছে; আমি তাহার নিকট শুনিয়াছি যে, তাহার সমাজে (গোয়াল সমাজে) ব্রাহ্মণ পাকাদি করিয়া দিলে তাহারা ভোজন করে না। ইহাই সঙ্গত। বঙ্গদেশে সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবস্থা। ব্রাহ্মণই পাকাদি কার্য করিবে এবং শূদ্রগণ তাহার পাকাদি সেবা গ্রহণ করিবে। মহারাজ বৃষ্টিগিরের রাজস্বয় যজ্ঞে সর্ববর্ণের পাককার্য শবর-জাতীয় ব্যক্তিগণ করিয়াছিলেন। ঋষিরাও তাহা ভোজন করিয়া-ছিলেন। শবর-শবরীগণ অস্বাজ্য জাতি গণ্য হইত, তখন পর্যন্তও অস্বাজ্য-জাতীয় ব্যক্তিগণ অস্পৃশ্য অথবা অনাচরণীয় হয় নাই, কিন্তু হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ভারত-যুদ্ধের সময় হইতেই আর্ধ্য জাতির অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। সে দুঃখের কাহিনী এস্থলে উল্লেখ করা নিম্নয়োজন। যাহা হউক সৎ অসৎ উভয় প্রকার শূদ্রই অস্পৃশ্য হইতে পারে না।

যদি বা বর্তমান শাস্ত্রানুসারে তাঁহাদিগকে অস্পৃশ্য গণ্য করা সঙ্গত বোধ করেন তাহা হইলেও হিন্দু সংগঠন কার্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে কি করিতে হইবে? কলির ধর্মশাস্ত্রকার পরাশরের পদানুসরণ করিতে হইবে। তিনি বলিতেছেন,

চক্ষুরো বা ত্রয়ো বাপি যদক্রমুর্বেদ পারগাঃ ।

স ধর্ম ইতি বিজ্ঞেয়ো নিতরৈশ্চ সহস্রশঃ ॥

পরশর ৮।১৫

ইহা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, তিন অথবা চারি জন বেদপারগ ব্যক্তি যাহা ব্যবস্থা দিবেন তাহাই ধর্ম বলিয়া গণ্য হইবে। ইহাই যখন এ-যুগের ধর্মশাস্ত্রকারের সিদ্ধান্ত তখন অস্পৃশ্যকে স্পৃশ্য করিয়া লইতে এবং অনাচরণীয়কে আচরণীয় করিয়া লইতে অধিক বিলম্বের কোন কারণ দেখা যায় না। পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের পূর্বে হইতে তিন চারি জনের অধিক বেদপারগ ব্রাহ্মণ অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন। চারি শত বৎসর পূর্বে মহাপ্রভু গৌরাজ বহু অনাচরণীয়কে ভেদ দিয়া

আচরণীয় করিয়াছিলেন। সুতরাং পরাশরের এই মত গ্রহণ করিলে অস্পৃশ্যকে আচরণীয় করিয়া লওয়া অতি সহজ কার্য। তারপর, আর এক কথা। দ্বিজবর্গ বাদ দিলেও দেখা যাইতেছে যে, সদস্য শূদ্রবর্গ পরস্পর মধ্যেও অস্পৃশ্যতার নিয়ম পালন করিয়া থাকেন। ইহা ত হইতেই পারে না। তাঁহারা একে অস্ত্রের স্পৃষ্ট অন্ন পানীয় গ্রহণ করেন না। এ কি!

ব্রাহ্মণঃ কজিরো বৈশ্ব ত্রয়োবর্ণা বিজাতয়ঃ ।

চতুর্থ এক জাতিস্ত শূদ্রো নান্তি তু পঞ্চমঃ ।

মমু ১০।৪

দ্বিজবর্গ ব্যতীত অশ্রু সকলেই এক জাতি। তাহাদিগের মধ্যে স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের কথাই উঠিতে পারে না। আর দ্বিজবর্গের পরস্পরের মধ্যে অস্পৃশ্যতা পালন করা এবং দ্বিজ ও শূদ্রবর্গের মধ্যে অস্পৃশ্যতা পালন করা বেদবিরুদ্ধ।

উতমেবা অবহিতং দেবাউল্লম্বা পুনঃ ।

উতাগশ্চক্রৎ দেবা দেবাজীবধাপুনঃ ॥

৪* ১০।১৩৭।১

অর্থাৎ হে বিদ্বান্! যে পতিত হইয়াছে তাহাকে পুনরায় উঠাও। যে পাপ করিয়াছে অথবা যাহাদের জীবন ময়লা হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে পুনরায় জীবন দাও অর্থাৎ উন্নত কর। এই বেদবাক্যে অল্পমত অস্পৃশ্য, অনাচরণীয় জনগণকে কি ঐরূপই রাখিতে আজ্ঞা করিতেছে, না কি তাহাদিগকে যত প্রকারে সম্ভব উন্নত ও স্পৃশ্য করিতে বলিতেছে? এ মহাবাক্য নিশ্চয়ই তাহাদিগকে পুনঃ জীবন দিতে বলিতেছে। তাহাদিগের আচার, ব্যবহার মত ও অনুষ্ঠান পরিবর্তন করিয়া লইয়া তাহাদিগকে যেন নূতন জীবন দান করিতে বলিতেছে। এ চেষ্টা সকলেরই কর্তব্য।

মোটামুটি সংশূদ্র (বর্ন) ও অসৎ শূদ্র (জাতি) চারি প্রকারে গঠিত হইয়াছে।

(১) চতুর্বর্ণের অন্ততম।

(২) কুরুক্ষেত্রের ফলে দ্বিজবর্গের শূদ্রত্বপ্রাপ্তি।

(৩) আর্ধ্যসমাজের বাহির হইতে আনীত ব্যক্তির শূদ্রত্ব।

(৪) অসবর্ণা বিবাহের ফলে শূদ্রত্ব।

এই চারি প্রকার শূদ্রের মধ্যে চতুর্থ প্রকারের সঙ্গেই এ-প্রসঙ্গে আমাদের অধিক সংস্রব। প্রথম শ্রেণী বৈদিক চতুর্থ বর্ন। বেদে অস্পৃশ্যতা নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্বন্ধে এই বলিলেই

যথেষ্ট হইবে যে, শ্রীমহাভাগবতে বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন ধর্ম নির্দেশ করতঃ অবশেষে কথিত হইয়াছে,

“কস্য ব্রহ্মকণঃ শ্রোত্রং পুংসোবর্ণাভিষেকনং।
যদভ্রাজাপি দৃষ্টতে ভক্তনৈব বিনির্দেশেৎ ॥”

অর্থাৎ যে বর্ণের লক্ষণ যাহার দেখা যায় সে সেই বর্ণ। মহাভারতে শাস্তিপর্কে দেখিতে পাই,

“ন বৈ শূদ্র ভবেচ্ছ্রোত্রাক্রাণো ব্রাহ্মণেন চ ॥”

যেন ইহাই বুঝাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত পুনরপি মহাভারতে উক্ত হইয়াছে ;—

‘ন কুলেন ন জাত্যা বা ক্রিমাভি ব্রাহ্মণোভবেৎ ।
চণ্ডালোহপি হি বৃদ্ধহো ব্রাহ্মণঃ স যুধিষ্ঠির ॥’

এ-সকল জন্মগত বর্ণভেদ বা জাতিগত বর্ণভেদকে সমর্থন করে না। গুণকর্মদ্বারাই ঐ সকল ভেদ হইয়া থাকে। সূতরাং উত্তম কর্মে, উত্তম বর্ণ প্রাপ্তি এবং অধম কর্মে অধম বর্ণ প্রাপ্তি হওয়া দেখা যাইতেছে। তৃতীয় বিভাগ সম্বন্ধে মহাভারতের শাস্তিপর্কে বেদান্তগ যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যবন কিরাত, গান্ধার চীন, শবর, বর্কর, শক, কক, পল্লব, মদ্রক, চৌণ্ড, পুলিন্দ, কান্বোজ ইহারা সকলেই আর্ষ্যগণমধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। মহাসংহিতায় ১০।৫ শ্লোকেও এইরূপ দেখা যায় যে ইহারা আর্ষ্যই ; ক্রিমা-লোপহেতু এবং সাক্ষ্যবশতঃ যবনাদিতে পরিণত হইয়াছিল এবং পুনরায় গৃহীত হইয়াছিল। ইহাদিগের সম্বন্ধেও ঋঃ মন্ত্রে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে,

“কৃষস্তো বিশ্বনার্যং”

অর্থাৎ সমস্ত মানবকে আর্ষ্য কর। এ সকল স্থলে স্পৃশ্যা-স্পৃশ্যের কোন কথাই উঠিতে পারে না।

এক্কে অসবর্ণ বিবাহের কথা বলিব। সকলেই জানেন পূর্বে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল। বৃহস্পতি পুরাণে ও আদিত্য পুরাণে কলিতে যে-সকল প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ আছে। কিন্তু ঐ সকল প্রথা পুরাণের পৃষ্ঠায় নিষিদ্ধ হইলেও বস্তুতঃ নিবৃত্ত হয় নাই। আর্ষ্যসমাজ ঐ সকল নিবর্তনের বিধি কখনও পালন করে নাই। মহু বলিতেছেন,

সবর্ণাশ্রে বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি।
কামতস্ত প্রবৃত্তানামিমাঃ স্তঃ ক্রমশোবরাঃ ॥

মহু ৩।৩২

সূতরাং উচ্চবর্ণে নিম্নবর্ণে বিবাহ হইতে পারিত। বৃহস্পতি পুরাণ অথবা আদিত্য পুরাণের নিবেদ দ্বারা মহু-

বিধান প্রতিহত হইতে পারে না। বোধাই হইতে মাধবাচার্য্য কৃত টীকার সহিত যে পরাশর-সংহিতা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার ১৩৭ পৃষ্ঠায় আচার্য্য বলিতেছেন যে,

“ইমান্য পরিভনানি কুত্রচ্যানিতি সম্যক্ ন জ্ঞায়তে... .. যুগ ছু ন কুত্রাপি দৃষ্টতে ॥”

সূতরাং ঐ তথাকথিত নিবেদ-বাক্য সর্বথা অমূলক। যাহা হউক মহুবচনে অসবর্ণ বিবাহ স্থলবিশেষে বিধিসঙ্গত থাকাই জানা যায়। দ্বিজবর্ণের স্ত্রী শূদ্রবর্ণা অথবা শূদ্রজাতীয়া হইলে সেই স্ত্রী অম্পৃশ্যা কিংবা অনাচরগীয়া ছিলেন এমন কথা হইতেই পারে না। স্ত্রীস্পৃষ্ট অন্নপানীয়াদি স্বামী গ্রহণ করিতেন না, ইহা মনে করা যায় না। এ সময় নিশ্চয় অম্পৃশ্যতা বলিয়া কোন কথাই ছিল না। পরাশর-সংহিতায় দেখা যায়,

“দাস নাপিত গোপাল কুলমিত্রাঙ্কসীরিণঃ ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যায় যচ্চান্নানঃ নিবেদয়েৎ ॥

পরাশর ১১।২০

সূতরাং এই সকল শূদ্রদিগের অন্ন দ্বিজগণের ভোজ্য। “কলৌ পরাশর স্মৃতঃ” পরাশর কলির ধর্মশাস্ত্রকার। তিনি বিধি দিতেছেন যে, ঐ সকল শূদ্রায় ভোজ্য। সূতরাং কলিযুগেও অম্পৃশ্যতা থাকিতে পারে না। যাহারা অম্পৃশ্যতা বর্জন করা অসঙ্গত মনে করেন তাঁহারা পরাশর-বচনের অন্ন শব্দের অর্থ করেন, “আমঅন্ন” অর্থাৎ চাউল, পক অন্ন অর্থ করেন না। এক্রূপ করিবার সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিতে গেলেও এক্রূপ অর্থ করা প্রয়োজন হয় না। ঐতিহাসিকভাবে বুঝিতে গেলেও, অন্ন স্মৃতিবচনের সহিত একবাক্যতা রক্ষা করিতে গেলেও এইরূপ অর্থ করিবার প্রয়োজন হয় না। পরাশর-বচনে অন্ন অর্থে আম-অন্ন এবং পক-অন্ন উভয়ই বুঝিবার বাধা হইতে পারে না। ইহা হইতে অম্পৃশ্যতা খণ্ডিত হইতেছে। যদি মহুস্মৃতির ৪।২২৩ শ্লোক এবং তাহার কুলুকভট্টকৃত টীকা মনোযোগ পূর্বক বিবেচনা করা যায় তাহা হইলে প্রতীয়মান হইবে যে শূদ্রের পাকায় বেদস্ত দ্বিজেরও ভোজ্য, যদি সেই শূদ্র প্রাক্কাদি ক্রিমাশীল হয়।

নাদ্যাক্কৃতস্য পকানন্ বিধানশ্রাঙ্ঘিন দ্বিজঃ
আদদীতাম মেঘাস্মাদ বৃন্তাষেক রাজিকং ॥

মহু ৪।২২৩

বেদজ্ঞানহীন দ্বিজের ত কথাই নাই। অশ্রাঙ্ঘিনঃ শব্দে

পঞ্চমহীন বুঝাইতেছে। এখানে শ্রীক পঞ্চমহের অন্ততম, পিতৃযজ্ঞ। আমি অন্তত দেখাইয়াছি যে, পিতৃযজ্ঞ মৃত পিতার শ্রীক নহে, জীবিত পিতাকে শ্রদ্ধাপূর্বক প্রত্যহ অন্নপানীয় পাদ্যগন্ধমালাদি দান। তবেই পিতৃযজ্ঞ শূদ্রের পক্ষীয় বেদজ্ঞ এবং বেদজ্ঞানহীন উভয় প্রকার যজ্ঞেরই ভোজ্য হইতেছে।

কিন্তু যদি অভোজ্য মনে করা যায় তাহা হইলেও দেখিতেছি যে কলির ধর্মশাস্ত্রকার পরাশর ব্যবস্থা দিতেছেন,

মৃতং তৈলং তথা ক্ষীরং শুভং তৈলেন পাচিতং ।

গন্ধা নদীতটে বিপ্রা ভূজীয়াচ্ছত্র ভোজনম্ ॥

পরশর ১১।১৪

—তৈল, মৃত, দুগ্ধ দ্বারা বাহ্য পাক করা যায় তদ্রূপ শূদ্র-ভোজন কলিতে ব্যবস্থা থাকা দেখা যাইতেছে। নদীতটে খাইতে খাইতেই অম্পৃশ্চতা একটু টিল হইয়া পড়ে। পরাশর আর একটি অত্যন্ত সুবিধাজনক ব্যবস্থা দিতেছেন।

দেশ ভঙ্গে প্রবাসে বা ব্যাধিব্যাসনেষপি ।

রন্ধে দেশ অদেহাদি পশ্চাদ্ধর্মঃ সমাচরেৎ ॥

যেন কেন চ ধর্মে ন মুহুনা দারুণেন চ ।

উদ্ধরেন্দীনমাস্তানং সমর্ষো ধর্মসামাচরেৎ ॥

পরশর ৭।৪১।৪২

—যিনি সমর্ষ হইবেন তিনি অম্পৃশ্চতা পালন করুন অথবা না-করুন, যিনি অসমর্ষ হইবেন তিনি কোথাও অম্পৃশ্চতা পালন করিতে বাধ্য নহেন। সমর্ষ ব্যক্তি প্রবাসে, দেশভঙ্গে, পীড়িত অবস্থায়, ব্যসনে প্রথমতঃ শরীররক্ষা করিবে, তৎপরে অম্পৃশ্চতা (ধর্ম হইলে) পালন করিবে। এ সকল বর্তমান সময়ে কঠোর অম্পৃশ্চতাপালনের পোষক বচন নহে। এক স্থানে বা এক অবস্থায় শূদ্র পক্ষীয় খাইতে খাইতে কঠোর বন্ধন নিশ্চয়ই শিথিল হইয়া যায়। ঋষি অবশ্যই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিন্তু গ্রাহ্য করেন নাই।

এই বচনের অর্থ একজন বৃদ্ধ গোঁড়া ব্রাহ্মণপণ্ডিত আমাকে একদিন এইরূপ বলিয়াছিলেন। “প্রাণ যায় যায় সময়ে শূদ্র-ভোজন ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, তৎপূর্বে নহে।” এরূপ ব্যাখ্যা আমি সন্মত হইতে পারি নাই। শকার্থের এরূপ অর্থ হয় না এবং পূর্বাঙ্গ দেখিলেও এরূপ অর্থ হয় না। প্রায় শেষ সময়ে জীবন রক্ষা করা কঠিন হইতে পারে। নিশ্চয়ই এইরূপ অর্থ কদর্থ। সুতরাং বুঝিতে হইতেছে যে, কলিযুগেও অম্পৃশ্চতার বিধি পালন করা বেদের ও বেদান্তগত স্মৃতির ব্যবস্থা নহে।

যদি স্বীকার করাই যায় যে, অম্পৃশ্চতা বেদ ও স্মৃতি সন্মত তাহা হইলেও অম্পৃশ্চকে স্পৃশ্য করিয়া লইলেই হইল। শ্রীমদ্ভাগবত মহাসংহিতার সহিত ঐক্য রাখিয়া বলিতেছেন,*

কিরাতহুগাঙ্ক পুন্নিম পুঙ্কশা

আতীর শুক্লা ববনা ধনাদরঃ ।

যে হস্তে চ পাপা যদুপাশ্রয়শ্রমাঃ

শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিক বেনমঃ ।

২।৪।১৮

সুতরাং সদগুরু-চরণশ্রয় করিলেই ঐ সকল স্নেহ এবং জন্মগত কর্মগত পাপীগণ শুদ্ধ হইতে পারিল। গরুড় পুরাণে আরও সরল ব্যবস্থা আছে,—

শ্রীরাম রাম রামেতি যে বন্দ্যতপি পাপিন ।

পাপ কোটি সহস্রৈভ্যন্তেবাং সন্তরণং ধ্রুবাং ॥

অর্থাৎ রাম নাম তিন বার স্মরণ করিলেই শুদ্ধ হইল। বিষ্ণুপুরাণে গঙ্গার নাম দুইবার বলিলেই শুদ্ধ হওয়ার ব্যবস্থা আছে। ঐ পুরাণে বিধান আছে যে, চাত্তোক্ষণ, কৃচ্ছ ইত্যাদি ষত প্রকার প্রায়শ্চিত্তদ্বারা জন্মগত ও কর্মগত পাপী শুদ্ধ হয় সে-সকল অপেক্ষা বড় হইতেছে কৃষ্ণনাম স্মরণ করা। রাম, গঙ্গা ও কৃষ্ণনাম মুখে স্মরণ করিলেই হইবে না, আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতে হইবে।

এই সকল বিধানের প্রতি দৃষ্টি করিলে বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, অম্পৃশ্চতা রক্ষা করা বাধ্যকর নহে; অন্ততঃ সকলের পক্ষেই সকল অবস্থায় বাধ্যকর নহে এবং বাধ্যকর হইলেও অম্পৃশ্চকে স্পৃশ্য করা অতীব সহজ কার্য। যাহারা এই প্রথা জাতীয় একতার পরিপন্থী বলিয়া মনে করেন তাঁহারা এ নিয়ম কখনও পালন করিবেন না। বেদ স্মৃতি ও পুরাণ তাঁহাদিগকে সমর্ধন করিবে।

অম্পৃশ্চ বা অনাচরণীয় জাতি সম্বন্ধে বঙ্গের সর্বত্র সমান নিয়ম প্রচলিত নাই। কৈবর্তগণ কোন জেলায় অনাচরণীয়, কোন জেলায় নহে। এক শ্রেণীস্থ কৈবর্তগণ সর্বত্রই অনাচরণীয়। সাহাগণ বৈশ্য হইবার পর কোন কোন স্থলে তাহাদিগের স্পৃষ্ট জল চলুতি হইয়াছে। বাকুই জাতি পূর্বে সর্বত্র অচল ছিল, এখন সর্বত্রই আচরণীয় হইয়াছে।

রঙ্গকন্দর্পকারচ নটোবারুড় এব চ ।

কৈবর্ত মেদভিলাশ সগুণতে চান্তলাঃ স্মৃতাঃ ।

এই সপ্ত জাতি ব্যতীত ও অন্ত অনেক জাতি এতদ্দেশে

অনাচরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তাহারা ত অস্বাভাবিক জাতি নহে, সুতরাং তাহারা অনাচরণীয় হওয়া পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। এক্ষণে পূর্কের কথা একটু স্মরণ করাইয়া দিই। যে দেশে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল সে-দেশে কোন ব্রাহ্মণ কি সাহস করিয়া বলিতে পারেন যে তাঁহার রক্তে ক্ষত্রিয় বৈশ্য অথবা শূত্রের রক্ত মিশ্রিত নাই? তিনি কেমন করিয়া শূত্রায় বর্জন করিবেন?

মানবতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ আমাদেরকে বুঝাইয়া দিতেছেন যে, বঙ্গীয় জনগণ প্রায় সকলেই ন্যানাধিক দ্বিবিধ সংমিশ্রণজাত। ককেলীয়, মঙ্গোলীয় ও ড্রাবিড়ীয় সংমিশ্রণে ইহারা উৎপন্ন হইয়াছেন। শাস্ত্রে ইহাদের দেশকে মল্লদেশ বলিয়াছে। শতপথব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণ জাতির আকৃতি বর্ণিত আছে। ঋক্ বেদের ২।২০।৭ ঋক্, ৩।৩।২১ ঋক্, ৪।১।৫।৩ ঋক্ ইত্যাদি পাঠে দ্বিজগণের বর্ণ, নাসিকার উচ্চতা, দেহের দৈর্ঘ্য বুঝিতে পারা যায়। এক্ষণে ব্রাহ্মণের সে গৌরবর্ণ নাই, সে উচ্চ নাসিকা নাই, সে সুদীর্ঘ বপু আর দেখা যায় না। ঈদৃশ পরিবর্তন জলবায়ুর পরিবর্তনে লক্ষ লক্ষ বৎসরে হইলেও হইতে পারে, কিন্তু দুই-চারি দশ হাজার বৎসরে হইতে পারে না। যাহাদিগকে প্রাচীন কালে দহ্মা বলা হইত তাহাদিগের দৈহিক লক্ষণের সহিত বর্তমান সময়ের উপরিউক্ত পরিবর্তনের সাদৃশ্য আছে। সুতরাং বৈজ্ঞানিক কারণেও অনুমান করিতে হয় যে, দ্বিজগণের সহিত অনাধ্য রক্ত অস্ততঃ শূত্র-রক্ত মিশ্রিত হইয়াছে। এই শূত্ররক্ত-মিশ্রিত জাতীয়গণ, অপর শূত্রজাতীয়গণকে অস্পৃশ্ণ অথবা অনাচরণীয় জ্ঞান করিবে ইহার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। ইহা শুধু বেদান্তমত সনাতন আর্ধ্যধর্মের বিরোধী তাহা নহে, বর্তমান সময়ে জাতীয় অমঙ্গলজনক। বিরাট সম্ভবতঃ আর্ধ্যসভ্যতাসেবী সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজকে অস্পৃশ্ণতা দ্বারা এমন টুকুয়া টুকুয়া করিয়া অধোগতির শেবসীমায় আনয়ন করা মহাপাপ। এক ধর্ম, এক আচার-ব্যবহার, একত্র পান-ভোজনের সম্ভাবনা, একত্র বিবাহবন্ধনের উপযোগিতা

থাকিলে, মানবগণ কেমন আশ্চর্যভাবে একতাবদ্ধ হন, তাহা বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইহুদী, মোসলেমগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। আর আমাদের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দিলে কি ভীষণ দৃশ্য নেত্রপথে উদ্ভাসিত হয়! আমাদের সমাজ নাই, আমরা মাংসাশী ইতর জীবের স্তায় ব্যক্তিগত জীবন যাপন করিতেছি। আমরা কেবলমাত্র পুত্র-কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে অল্প ব্যক্তির সহিত সংস্রব করি, অল্প সময় করি না। সমাজতত্ত্ববিদগণ সমাজ শব্দে যাহা বুঝেন আমাদের তাহা ভাঙিয়া গিয়াছে বলিলেও অতুক্তি হয় না। আমাদের ন্যায় অত্যাচ্ছ সভ্যজাতি পুনরায় সমাজবদ্ধ না হইলে কতদিন বাঁচিতে পারিবে? বঙ্গদেশ আর হিন্দুর দেশ নহে। বঙ্গীয় হিন্দু জাতি আর ব্রাহ্মণ কায়স্থের জাতি নহে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ এদেশে এখন শতকরা তেরটি মাত্র। এদেশে নিশ্চয়ই হিন্দু সমাজ এখন তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণের সমাজ হইয়া উঠিয়াছে। এখনও অস্পৃশ্ণতা, এখনও অনাচরণীয়তা? ইহাই কি ভগবান বুদ্ধের, ভগবান চৈতন্যের, গুরু নানকের আদর্শ? এই প্রকারে কি হিন্দুজাতি বড় হইয়াছিল? আজি কৈবর্তার গর্ভজাত ব্যাসদেব, সপত্যার গর্ভজাত ঋষি পরাশর, আমাদের গৃহে প্রবেশ করিলে অন্ন-পানীয় নষ্ট হইয়া যাইত। যে আর্ধ্যগণ পুলিন্দ, পুন্ড্র, হুণ, যবন, ধশ প্রভৃতিকে আর্ধ্যসমাজে গ্রহণকরতঃ স্ব-সমাজের পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহাদের বংশধর হইয়া কেবল বর্জন করিতে শিখিয়াছি। বংশে ও কর্মে অধঃপতিত-গণকে শুদ্ধি করিয়া এক হইতে ভুলিয়া গিয়াছি। শুদ্ধির ব্যবস্থা এত সরল। তথাপি আমরা বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন থাকিতেই যেন কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। ইহা আশ্চর্য্য। পরমাত্মা কবে আমাদের এ সাংঘাতিক প্রবৃত্তি হইতে রক্ষা করিবেন? যত শীঘ্র করেন ততই আমাদের মঙ্গল।

সং গচ্ছকং সর্বদকং সং বো মনাংসিজানতাঃ
দেবাতাগং যথা পূর্কসংজানামা উপাসতে।

ঋবেদ

ইহাই আমার শেষ প্রার্থনা।

দৃষ্টি-প্রদীপ

ঐবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পৌষ মাসের শেষে আমাদের বাড়ি সরগরম হয়ে উঠল—
শুনলাম ঔদের গুরুদেব আসবেন বলে চিঠি লিখেছেন।

এই গুরুদেবের কথা আমি এঁদের বাড়িতে এর আগে
অনেক শুনেছি—জ্যাঠামশায়দের ঘরে তাঁর একটা বড় বাঁধানো
কটোগ্রাফ দেখেছিলাম—গুরুদেব চেয়ারে বসে আছেন,
জ্যাঠামশায় ও জ্যাঠাইমা দু-জন দু-দিকে মাটিতে বসে তাঁর
পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছেন। অনেক দিন থেকে ছবিখানা দেখে
দেখে গুরুদেব সবসময় আমার মনে একটা কৌতুহল হয়েছিল—
কি রকম লোক একবার দেখবার বড় ইচ্ছে হ'ত।

ষ্টেশনে তাঁকে আনতে লোক গিয়েছিল—একটু বেলা
হ'লে দেখি দাদা এক ভারী মোট বয়ে আগে আগে আসচে—
পেছনে ব্যাগ-হাতে জ্যাঠামশায়দের কৃষাণ নিম্ন গোয়াল।
গুরুদেব হেঁটে আসছেন, রং কালো, মাথার সামনের দিকে
টাক—পায়ে চাদর, পায়ে চটি। আমার জ্যাঠাতুতো, খুড়তুতো
ভাইবোনেরা দরজার কাছে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছিল—পায়ের
ধুলো নেওয়ার অস্ত্রে তাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।
আমি এগিয়েও গেলাম না, পায়ের ধুলোও নিলাম না।
জ্যাঠাইমা গুরুদেবের পা নিজের হাতে ধুয়ে আঁচল দিয়ে
মুছিয়ে দিলেন, খুড়ীমা'রা বাতাস করতে লাগলেন—ছেলে-
মেয়েরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল, তিনি মেজখুড়ীমাকে জিজ্ঞেস
করলেন—বৌমা তোমার ছেলের তোতলামিটা সেরেচে?
মেজখুড়ীমাকে বললেন—গোষ্ঠ (মেজকাকার নাম) আঁকাল
কি বাদার কাছারী থেকে পরমের সময় একদম আসে না?...
কতদিন আগে এসেছিল বললে? বাড়ির ছেলেমেয়েদের একে,
শুকে, ডেকে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন—দু-একটা
কথা জিগ্যেসও করলেন—কিন্তু দাদা যে অত বড় ভারী মোট
বয়ে আনলে ষ্টেশন থেকে, সে-ও সেখানেই দাঁড়িয়ে—তাকে
একটা মিষ্টি কথাও বললেন না। আমার রাগ হ'ল, তিনি কি
ভেবেছেন দাদা বাড়ির চাকর? তাও ভাবা অসম্ভব এইজন্তে

যে, ওখানে যতগুলো ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে ভিড় ক'রে আছে,
তাদের মধ্যে দাদার রূপ সকলের আগে চোখে আকৃষ্ট
করে—এ গাঁয়ে দাদার মত রূপবান বালক নেই, শুধু এ বাড়ি
তো দূরের কথা। আশা ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, একটা কথাও
তো বলতে হয় তার সঙ্গে?

গুরুদেবের জন্তে বিকেলে বাড়িতে কত কি খাবার তৈরি
হ'ল—মেজখুড়ীমা, সহর মা, জ্যাঠাইমা—সবাই মিলে কীরের,
নারকোলের, ছানার কি সব গড়লেন। মাকে এ-সব কাজে
ডাক পড়ে না, কিন্তু দেখে একটু অবাক হ'লাম সহর মাকে
ওঁরা এতে ডেকেছেন। মা আর সহর মার ওপর যত উৎস
কাজের ভার এ বাড়ির। সহর মা'র অদৃষ্ট ভাল হয়েচে
দেখিচি।

গুরুদেব সন্ধ্যা আঁকি সেরে বাইরে এলে তাঁকে যখন
খাবার দেওয়া হ'ল তখন সেখানে বাড়ির ছেলেমেয়ে সবাই
ছিল—আমরাও ছিলাম। কিন্তু হিরণ দিদি ও মেজকাকীমা
সকলকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। গুরুদেব বললেন—
কেন ওদের যেতে বলচ বৌমা, থাক না, ছেলেপিলেরা
গোলমাল করেই থাকে—

গুরুদেব তিন-চার দিন রইলেন। তাঁর জন্তে সকালে
বিকলে নিত্য-নতুন কি খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাই যে
হল! পিঠে, পায়ের, সন্দেশ, ছানার পায়ের, কীরের
ছাঁচ, চন্দ্রপুলি, লুচি—তিনি তো অত খেতে পারতেন
না—আমরা বাদে বাড়ির অস্ত্র ছেলেমেয়েরা তাঁর পাতের
প্রসাদ খেত। তিনি জলখাবার খেয়ে উঠলে তাঁর
রেকাবিতে বা খালার যা পড়ে থাকত, কাকীমারা ডেকে
ছেলেমেয়েদের দিতেন—আমরা সে সময় সেখানে থাকতাম
না—কারণ প্রথম দিকে ছেলেমেয়েরা সেখানে থাকলে কাকীমা
বকতেন—তারপর গুরুদেবের খাওয়া হয়ে গেলে যখন তাদের
ডাক পড়ত, তখন বাড়ির ছেলেরা কাছে কাছেই থাকতো
বলে তারাই যেত—আমি কাকর পাতের জিনিষ খেতে

পারিনে, এইজন্য আমি যেতাম না। ওঁরা ডেকেও কোনো খাবার জিনিষ আমাদের কোনো দিন দিলেন না—কিন্তু মনে মনে আমি হতাশ হলাম—আমি একেবারে যে আশা করিনি তা নয়, ভেবেছিলাম গুরুদেব এলে আমরা সবাই ভাল খাওয়ার ভাগ পাব কিছু কিছু।

সন্ধ্যাবেলা। বেশ শীত পড়েছে। গুরুদেব আমলকী-তলায় কাঠের জলচৌকীতে কঘল পেতে বসে আছেন। গায়ে সবুজ পাড় বসানো বালাপোষ—ছেলেমেয়েরা সবাই ঘিরে আছে, যেমন সর্বদাই থাকে; একটু পরে জ্যাঠাইমা মেজ-কাকীমা, সহুর মা, হিরণ দিদি এলেন।

গুরুদেবের খুব কাছে আমি কোনো দিন যাই নি—আমি গোয়ালঘরের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, ছেলেমেয়েরা গল্প শুনতে গুরুদেবের কাছে, আমার কিন্তু গল্পের দিকে মন নেই, আমার জানবার জন্তে ভয়ানক কৌতূহল যে গুরুদেব কি ধরণের লোক, তাঁকে অত খাতির, যত্ন, আদর এরা কেন করে, তাঁর পায়ে জ্যাঠাইমা ও জ্যাঠামশায় পুষ্পাঞ্জলি দেনই বা কেন, তাঁর কটো বাঁধিয়েই বা ঘরে রাখা আছে কেন? এ সবের দরুন গুরুদেব সবচেয়ে আমার মনে এমন একটা অদ্ভুত আগ্রহ ও কৌতূহল জন্মে গিয়েছে, যে, তিনি যেখানেই থাকুন, আমি কাছে কাছে আছি সর্বদাই—অথচ খুব নিকটে যাই নে।

গুরুদেব মুখে মুখে ধর্মের কথা বলতে লাগলেন। আমি আর একটু এগিয়ে গেলাম ভাল করে শোনবার জন্তে। এ-সব কথা শুনতে আমার বড় ভাল লাগে।

একবার কি একটা যোগ উপস্থিত—গঙ্গান্নানে মহাপুণ্য, সকল পাপ ক্ষয় হয়ে যাবে, জ্ঞান করলেই মুক্তি। পার্বতী শিবকে বললেন—আচ্ছা প্রভু, আজ এই যে লক্ষ লক্ষ লোক কান্নিতে জ্ঞান করবে, সকলেই মুক্তি পাবে? শিব বললেন, তা নয় পার্বতী। চলো তোমায় দেখাব।

দু-জনে কান্নিতে এলেন মণিকর্ণিকার ঘাটে। শিব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের শব স্নেহে ঘাটের ধারে পড়ে রইলেন। পার্বতী তাঁর স্ত্রী স্নেহে পাশে বসে কাঁদতে লাগলেন। যারা এল, তাদের বললেন—আমার বৃদ্ধ স্বামী মারা গিয়েছেন, এঁর সৎকার করার ব্যবস্থা আপনারা করুন। কিন্তু একটা মুন্সিল আছে, শব বিনি স্পর্শ করবেন, তাঁর সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হওয়া চাই, নইলে শব-স্পর্শেই যুক্ত্য ঘটবে।

এ-কথা শুনে সাহস করে কেউ এগোয় না। সবাই ভাবে, পাপ তো কতই করেছি। প্রাণ দিতে যাবে কে? সারাদিন কাঁটলো। সন্ধ্যা নামে-নামে। একজন চণ্ডাল ঘাটের ধারে অশ্রুযুধী ব্রাহ্মণপত্নীকে দেখে কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করলে। পার্বতী সকলকে যা বলে এসেছেন, তাকেও তাই বললেন। চণ্ডাল শুনে ভেবে বললে—তার জন্তে ভাবনা কি মা? আজ গঙ্গান্নান করলে তো নিষ্পাপ হবই এত বড় যোগ যখন, এজন্য তো দূরের কথা শত জন্মের পাপ ক্ষয় হয়ে যাবে পাজিতে লিখেছে। তা দাঁড়ান, আমি ডুবটা দিয়ে আসি এবং একটু পরেই ডুব দিয়ে উঠে এসে বললে—মা ধরুন ওদিক, আমি পায়ের দিকটা ধরচি—চলুন নিয়ে যাই।

শিব নিজমুক্তি ধারণ করে চণ্ডালকে বর দিলেন। পার্বতীকে বললেন—পার্বতী, দেখলে? এই লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে এই লোকটি মাত্র আজকার যোগের ফল লাভ করবে। মুক্তি যদি কেউ পায় এই চণ্ডালই পাবে।

গল্পটা আমার ভারি ভাল লাগলো। সে দিনকার চৈতন্য-চরিতামৃত পড়া সেই কথাটা মনে পড়ল—জ্যাঠাইমাকে বলে-ছিলাম, জ্যাঠাইমা বিশ্বাস করেন নি। ওঁদের শাস্ত্রের কথাতেই ওঁর বিশ্বাস নেই। অথচ মুখে হিতুয়ানি তো খুব দেখান? আর আমাকে, মাকে, সীতাকে, দাদাকে বলেন খিরিটান।

“আজকার গুরুদেবের এই গল্পটা কি জ্যাঠাইমা কাকীমারা বুঝতে পারলেন? চণ্ডালের ওপর আমার ভক্তি হ’ল। আমি যেন মনে মনে কান্নী চলে গিয়েছি, আমি যেন মণিকর্ণিকার ঘাটে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী শিব ও ক্রন্দনরতা পার্বতীকে প্রত্যক্ষ করেছি।

ও-বছর বড়দিনের সময় মিশনরী মেমেরা আমাদের রঙীন কার্ড দিয়েছিল, ছোট একখানা ছবিওয়ালো বই দিয়েছিল। তা’তে একটা কথা সোনার জলে বড় বড় করে লেখা আছে মনে পড়ল—তাহারা ধন্য যাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। কারণ তাহারা জীবনমুহূর্ত প্রাপ্ত হইবে।

তার পরদিন সন্ধ্যাবেলাতেও গুরুদেব আমলকীতলায় আসন পেতে বসে গল্প বলছিলেন ছেলেমেয়েদের। একবার উঠে আছিক করতে গেলেন আবার এসে বসলেন। মেয়েরাও এলেন।

কথা বলতে বলতে গুরুদেব হঠাৎ আমার দিকে আঙুল

দিয়ে বললেন—ও ছেলোট কে ? রোজ দেখি দাড়িয়ে থাকে ।
এস, এস বাবা, এদিকে এস ।

প্রথমটা আমার বড় লজ্জা হ'ল কিন্তু কেমন একটা
আনন্দও হ'ল । একটু এগিয়ে গেলাম । জ্যাঠাইমা বললে—
ও আমার এক খুড়তুতো দেওয়ার ছেলে । ওরা এখানে
 থাকতো না, চা-বাগানে ওর বাবা কাজ করতো । এখানে এসে
 অস্থায়ী হয়ে মারা গেল ; আর ত কেউ নেই, ওরা এ বাড়িতেই
 থাকে ।

গুরুদেব বললেন—এস দেখি বাবা, হাতটা দেখি, সরে এস ।

তারপর জ্যাঠাইমাদের দিকে চেয়ে বললেন—খুব লক্ষণযুক্ত
 ছেলে । এর বয়স কত ?

আমার লক্ষণযুক্ত বলাতে—বিশেষতঃ অত ছেলের মাঝ
 থেকে—জ্যাঠাইমা কাকীমারা নিশ্চয়ই খুব খুশী হন নি ।
 জ্যাঠাইমা প্রশংসা করবার চেষ্টা করলেন আমার বয়স নাকি
 পনের বছর—আমি ওঁর ছেলে হাবুর চেয়েও দেড় বছরের
 বড় । আসলে আমার বয়স তেরো—জ্যাঠাইমার বড়
 ছেলে হাবুকে আমরা হাবুদা ব'লে ডাকি, সে আমাদের
 সবার চেয়ে ছু-বছরের বড় । ফুলে তার যা বয়স লেখানো
 আছে, তাই ধরে বলছি ।

তারপর গুরুদেব আমার জিজ্ঞাস্য করলেন—কি পড়
 বাবা ?

আমি কোন্ ক্লাসে পড়ি বললাম ।

ধাতুরূপ কতদূর পড়েচ ? লুণ্ড, লিট বোঝো ? এই শোনো
 একটি শ্লোক—

সোদ্যেষ্ঠ বেদাঙ্গিলা ন যত
 পিতৃমতাপীং সমমতে বন্ধুন্
 ব্যভিষ্ট বড়বর্গমরুৎ নীতো
 সমূলযাতঃ স্তবধীদরীশ্চ ।

হেসে বললেন—কতরকম ধাতুর ব্যবহার দেখেচ ? এ হ'ল
 ভট্টিকাব্যের শ্লোক—

আমার বেশ ভাল লাগলো, গুরুদেবকেও এবং তাঁর
 শ্লোককেও । আমি এর আগে সংস্কৃত শ্লোক বেশী শুনি নি ।
 চা-বাগানে কেউ বলতো না । শ্লোকটা আমি মুখস্ত করে
 নিলাম ।

একদিন তিনি বাড়ির পাশের মাঠে শুকনো পাতা দিয়ে
 আঙুন জ্বলানলেন । আমায় দেখে বললেন—এসো জিতু—

আমি বললাম—কি করবেন আঙুন জ্বলে ?...

—তামাক পোড়াবো—

আমি বললাম আমি পুড়িয়ে দিচ্ছি ।

গুরুদেব অনেক সংস্কৃত শ্লোক আমার শোনালেন ।
 কুবেরের শাপে এক ষক্ষ গৃহ থেকে বহুদূরে কোন্ পর্বতে
 নির্বাসিত হয়েছিল, বাড়ির অশ্বে ভেবে ভেবে তার হাতের
 সোনার বালা ঢল হয়ে গিয়েছিল, তারপর আষাঢ় মাসের
 প্রথম দিনে সেই পাহাড়ের মাথায় বর্ষায় নতুন কাল মেঘ
 নামল এই রকম একটা শ্লোকের মানে । আমি তো সংস্কৃত
 পড়ি মোটে ঋজুপাঠ, কিন্তু আমাকেই তিনি আগ্রহের সঙ্গে
 এমনি ভাল ভাল অনেক শ্লোক শোনাতে লাগলেন—যেন
 আমি কত বুঝি !

এবার মনে হ'ল আমার নিজের কথা—যা কাউকে
 কখনও বলিনি এ-পর্যন্ত—তাঁর কাছে ফুলে বলি, আমার
 মনের সন্দেহ, আমার ঐ সব অদ্ভুত জিনিষ-দেখার ব্যাপার,
 জ্যাঠাইমাদের সঙ্গে আচার-ব্যবহার নিয়ে আমার মত না
 মেলা,—সকলের ওপর ঠাকুরদেবতা সম্বন্ধে আমার অবিশ্বাস
 —এসব ফুলে ব'লে তিনি কি বলেন শুনি । তাঁর ওপর
 এমন একটা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হয়ে গেল আমার !
 যেন মনে হ'ল এঁর কাছে বললে ইনি সব বুঝিয়ে দিতে
 পারবেন আমাকে । এত বড় লোক ইনি, এত পণ্ডিত,
 কত কথা জানেন !

কিন্তু সুবিধে হ'ল না । বলি-বলি করেও বলতে আমার
 কেমন লজ্জা হ'ল । তিন দিন এমনি কেটে গেল, তারপর
 তিনি চলে গেলেন ।

আমার কিন্তু বলতে পারলেই ভাল হ'ত । এক জন
 ভাল লোককে আমার সব কথা বলা দরকার । অথচ
 এখানে তেমন কোনো লোককে আমি বিশ্বাস করিনে—
 কারও ওপর আমার ভক্তি হয় না ।

আমি আজকাল নির্জনে বদলেই অদ্ভুত জিনিষ সব
 দেখি । যখন তখন, তার সময় নেই অসময় নেই, রাত
 নেই, দিন নেই । এই তো সেদিন বসে আছি জ্যাঠাইমাদের
 পুকুরধারের বাগানে একলাটি—হঠাৎ দেখি পুকুর-পাড়ের
 আমগাছগুলোর ওপরকার নীল আকাশে একটা মন্দিরের
 চূড়া—প্রকাণ্ড মন্দির, রোদ লেগে ঝকঝক করচে—সোনা

না, কি দিয়ে বাধানো যেন। মন্দিরের চারিপাশে বাগান, চমৎকার গাছপালা, ফুল ফুটে আছে, কি অপূর্ব দেখতে—ঠিক যেন আমাদের সোনাদা চা-বাগানের ধারে বনের গাছের ডালে ডালে কোটা নীল অর্কিডের ফুল! আর একদিন দেখেছিলাম ঠিক ওই জায়গায় বসেই আকাশ বেয়ে সন্ধ্যার সময় তিনটি হুমুরী মেয়ে, পরনে যেন খেতচমরীর লোমে বোনা সাদা চক্চকে লুটিয়ে-পড়া কাপড়—তারা উড়ে যাচ্ছে এক সারিতে, বোধ হয় পুরো পাঁচ মিনিট ধরে তাদের দেখেছি। তারপর রোদ চক্চক করতে লাগল, আর তাদের স্পষ্ট দেখা গেল না—ওপরের দিকে যেতে যেতে মিলিয়ে গেল। এরকম নতুন নয়, কতবার দেখেছি, প্রায়ই দেখি, দু-পাঁচ দিন অন্তর দেখি, দেখে দেখে আমার সয়ে গিয়েচে, আগের মত ভয় হয় না। কিন্তু এক-একবার ভাবি, এ আমার এক রকম রোগ—না, চোখ খারাপ হয়ে গিয়েচে, না কি?

আমার কারু সঙ্গে মিশতে সাহস হয় না এই জন্তে যে, হয়ত কোন্ সময় আমার অন্তর ভাব এসে যাবে, আর যে সঙ্গে থাকবে সে আমায় ভাববে পাগল। হয়ত হাসবে, হয়ত লোককে ব'লে দেবে। এমনিও এ-বাড়িতে জ্যাঠাইমা, কাকীমা, কাকা, এঁরা আমায় পাগলই ভাবেন। কি করবো। আমি যা দেখি, ওঁরা তা দেখতে পান না, এই আমার অপরাধ। একটা উদাহরণ দি।

শান্তনু মাসে ছোটকাকার মেয়ে পানী অস্থখে পড়ল। একদিন, দু-দিন গেল, অস্থখ আর সারে না। জ্বর লেগেই আছে। সাতদিন কেটে গেল—জ্বর একই ভাব। দশ দিনের দিন অস্থখ এমনি বাড়ল, নৈহাটি থেকে বড় ডাক্তার আনবার কথা হ'ল।

পানীকে আমার এ-বাড়ির ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাল লাগে। তার বয়স বছর সাত আট, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল মাথায়, চোখ কটা, সাহেবদের ছেলেমেয়েদের মত। এ-বাড়ির ছেলেমেয়েদের মুখে যেমন খারাপ কথা আর গালাগালি লেগেই আছে—পানীর কিন্তু তা নয়। তার একটা কারণ, সে এতদিন আমার বাড়িতে তার দিদিমার কাছে ছিল, গল্পার ওপারে উদ্বেশেরে। সে বেশ মেয়ে, বেশ গান করতে পারে, প্রাণে তার দয়ামায় আছে। পানীর অস্থখ

হয়ে পর্যন্ত আমার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল—আমার ইচ্ছা হয়েছিল ওর কাছে গিয়ে বসে গায়ে হাত বুগিয়ে দি—কিন্তু কাকীমা তো আমায় বিছানা ছুঁতে দেবে না, সেই ভয়ে পারতাম না।

পানীর তখন সত্তেরো দিন জ্বর চস্চে—বুড়ো গোবিন্দ ডাক্তার ঘোড়ার গাড়ী ক'রে ষ্টেশন থেকে এল—দালানে বসে মসলার কোটো বার ক'রে মসলা তোলে, ভাঙা মসলার গন্ধে দালান ভুরভুর করতে লাগল—চা ক'রে দেওয়া হ'ল, চা খেলে, তারপর গুধু লিখে দিয়ে ভিজিটের টাকা মেজকাকার হাত থেকে নিয়ে না-দেখেই পকেটে পুরলে—তারপর রোগীকে বার-বার গরম জল খাওয়ানোর কথা ব'লে গাড়ী ক'রে চলে গেল।

একটু একটু অস্থকার হয়েচে কিন্তু এখনও বাড়িতে সন্ধ্যার শাঁক বাজে নি, কি আলো জালা হয় নি—হয়ত ডাক্তার আসবার জন্তে সকলে ব্যস্ত ছিল বলেই। আমি রোগীর ঘরে দোরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, কিন্তু পানীর বিছানায়—পানীর শিয়রে যে বসে আছে তাকে চিনতে পারলাম না। লালপাড় শাড়ী পরনে, আধখোমটা দেওয়া কে একজন, জ্যাঠাইমার মত দেখতে বটে কিন্তু জ্যাঠাইমা তো নয়! ঘরের মধ্যে আর কেউ নেই—এইমাত্র কাকীমা বাইরে গেছেন ডাক্তারে কি ব'লে গেল তাই জানতে ছোটকাকার কাছে। আমি ভাবছি লোকটা কে, এমন সময় তিনি মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে বললেন—জিতু, নির্মলাকে বোলো পানীকে আমি নিয়ে যাব, আমি ওকে ফেলে থাকতে পারবো না—ও আমার কাছে ভাল থাকবে, নির্মলা যেন দুঃখ না করে। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম—কে নির্মলা আমি চিনি নে, যিনি বলচেন তিনিই বা কে, কোথা থেকে এসেচেন, কই এ বাড়িতে তো কোনোদিন দেখিনি তাঁকে, পানীকে তিনি এই অস্থ শরীরে কোথায় নিয়ে যাবেন, এ-সব কথা ভাববার আগেই ছোটকাকীমা ঘরে ঢুকলেন—কিন্তু আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে বিছানার পাশে যিনি বসে আছেন, ছোটকাকীমা যে তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন এমন কোনো ভাব দেখলুম না।

বিছানায় যিনি বসে ছিলেন তিনি আমায় বললেন—জিতু, নির্মলাকে বোলো এইবার—আমি চলে যাচ্ছি। আমি কিছু না ভেবে কলের পুতুলের মত চেয়ে বললাম—নির্মলা কে?

ছোটকাকীমা আমার দিকে কটমট করে চেয়ে বললেন,—
“কেন, সে খোঁজে কি দরকার?” তিনি ভাবলেন তাঁকেই
জিজ্ঞেস করচি। অন্য মহিলাটি বিছানা থেকে নেমে ওদিকের
দরজা দিয়ে বার হয়ে চলে গেলেন, যাবার সময় আমাকে
বললেন—এই তো নির্খলা ঘরে এসেচে।

আমি বললাম—আপনি কেন বলুন না নিজে?...

ততক্ষণ তিনি বার হয়ে চলে গিয়েছেন।

ছোটকাকীমা আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছেন।
বললেন—“কি বক্চিস্ পাগলের মত? ওদিকে চেয়ে কার সঙ্গে
কথা বলচিস? নির্খলা কে সে খোঁজে তোমার কি দরকার
তিনি?”

জ্যাঠাইমা ঘরে ঢুকলেন সেই সময়ই। তিনি বললেন—
“কি হয়েছে, কি বলচে ও?”

ছোটকাকীমা বললেন—আপন-মনে কি বক্চে দ্যাখো না
দিদি—ও এঘর থেকে চলে যাক। আমার ভয় করে, ও
ছেলের মাথার ঠিক নেই—আমার নাম করে কি বলচে।

জ্যাঠাইমা বললেন—“কি বলছিলি কাকীমার নাম করে?”

আমার বিশ্বয় তখনও কাটে নি—আমি তখন কেমন হয়ে
গিয়েচি। ছোটকাকীমার নাম যে নির্খলা আমি তা কখনও
শুনিনি—ওই মেয়েটি যে চলে গেল, আমার সঙ্গে কথা বলে
গেল—ছোটকাকীমা তাঁকে দেখতে পেলেন না, তাঁর কথাও
শুনতে পেলেন না, এই বা কেমন! জ্যাঠাইমার কথার
কোনো জবাব আমার মুখ দিয়ে বেরুলো না, তার পর আমার
মাথা ঘুরে উঠল! তারপর কি যে ঘটল আমি তা
জানি না।

জান হলে দেখি মা আমার মাথা কোলে নিয়ে বসে
কান্দছেন। আমি দালানেই শুয়ে আছি। চারিপাশে বাড়ির
অনেক মেয়ে জড় হয়েছে। সবাই বললে আমার মৃগীরোগ
আছে। ভাবলাম হয়ত হবে, একেই বোধ হয় মৃগীরোগ
বলে। আমার বড় ভয় হ’ল, বাবা মারা গিয়েছেন পাগল
হয়ে, এ-বাড়ির অনেকের মুখে শুনেচি আমরাও পাগল
হ’তে পারি। তার মধ্যে আমার নাকি পাগলের লক্ষণ
আছে অনেক।

সেসময়ের কথা কখনও ভুলব না। জীবনে এত ভয়
আমার কোনদিন হয় নি—এই ভেবে ভয় হ’ল যে আমার

সত্যিই কোনো কঠিন রোগ হয়েছে। কিন্তু কাউকে বল
উপায় নেই রোগটা কি। মৃগীরোগই হয়ত হয়ে
নয় তো বাবার মত পাগলই হয়ে বাব হয়ত—না, কি হবে

যে রাতে বাবা পাগল হয়ে গিয়ে বালিশের ডুলো ছিঁ
ঘরময় ছড়িয়ে দিলেন, কেবোদিনের টেমির বিটখিটে অল্প
আলোর, রাতভূপরে তাঁর সেই অদ্ভুত সারা গায়ে, মুখে, মাথ
ডুলোমাথা মুক্তি বার-বার মনে আসতে লাগল—আমার মা
সে-রাজি, সে-মুক্তি, চিরদিনের জন্য আঁকা হয়ে আছে।
রকম কি আমারও হবে!

মাকে আঁকড়ে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইলাম সারারাত
মনে মনে কতবার আকুল আগ্রহে প্রার্থনা করলাম—প্রা
বীত, তুমি দেবতা, তুমি আমার এ রোগ সারিয়ে দাও, আমা
পাগল হ’তে দিও না। আমায় বাঁচাও।

সকালে একটু বেলা উঠলে পানী মারা গেল!

২

জ্যাঠাইমা সকালে উঠে বৌদের কুটনো কুটবার উপদেশ
দেবেন, কি কি রান্না হবে তা ঠিক করে দেবেন—এ-বাড়িতে
ভায়ে-বৌ ছাড়া কেউ গাই ছুইতে পারে না—এদিকের কাজ
সেরে জ্যাঠাইমা তাকে সঙ্গে নিয়ে গোয়ালে নিজের চোখের
সামনে দুধ দোয়াবেন—সীতা বলে, পাছে ভায়ে-বৌ নিজের
ছেলেমেয়েদের জন্তে কিছু সরিয়ে রাখে বোধ হয় এই ভয়ে—
তারপর তিনি স্নান করে গরদের কাপড় পরে ঠাকুরঘরে
ঢুকবেন—সেখানে আহ্নিক চলবে বেলা এগারোটা পর্যন্ত,
সে-সময়ে ঠাকুরঘরের দোরে কাকর গিয়ে উকি দেবার
পর্যন্ত হুকুম নেই। সবাই বলে জ্যাঠাইমা বড় পুণ্যবতী।
পুণ্যবতীই তো! একদিন যে-ছবি দেখেছিলাম, তুলিনি
কোনোদিন। জ্যাঠাইমা ঠাকুরঘর থেকে বার হয়ে এসে
বারান্দায় দাঁড়িয়েছেন, পরণে গরদের শাড়ী, কপালে সিঁহর,
চন্দনের টিপ, টকটকে চেহারা—এমন সময় আমার মা এক
রাশ বাসি কাপড় নিয়ে গোবরছড়ার বাসন্তি-হাতে পুকুরের
ঘাটে যাচ্ছেন, পরণের ময়লা কাপড়ের জায়গায় জায়গায়
কাদা গোবরের ছাপ, রক্ত চুল; বেলা বারোটার কম নয়;
সকাল থেকে মার মুখে এক ফোঁটা জল পড়েনি—

জ্যাঠাইমা ডেকে বললেন—বৌ, রান্নাঘরের ছোট জালাব

জল কি কাল তুমি তুলেছিলে? আমি না কতবার তোমায় বারণ করেছি ছোট জালায় তুমি জল ঢালবে না? বড় জালায় বেশী না পার তো তিন কলসী করে ঢেলেও তো বেগার শোধ দিলে পার?

ছোট জালায় জল জ্যাঠামশায়, জ্যাঠাইমা বা কাকারা খান। জ্যাঠাইমার একথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, মা গুরুমন্ত্র নেন্ নি, মায়ের হাতে জল অতএব শুদ্ধ নয়, সে-জল গুঁরা খাবেন কি করে?

সত্যিই তো জ্যাঠাইমা পুণ্যবতী। নইলে তিনি ঠাকুর-ঘরে পবিত্র দেহে পবিত্র মনে এতক্ষণ জপ আফিক করছিলেন, আর মা মরছিলেন বেলা বারোটো পর্যন্ত গোয়াল-আঁস্তাকুড় ঘেঁটে—মা নাস্তিক মাতাল কেরাণীর স্ত্রী, তার ওপর আবার মেমের কাছে লেখাপড়া শিখে জাত খুঁয়েছেন, কেন গুঁরা জল খেতে যাবেন মার হাতের?

আমার মনে হ'ল ঠাকুরও শুধু বড় মাহুঘের, পুণ্যও বড় মাহুঘের জন্মে—নইলে মায়ের, ভাগ্নেবোয়ের, ভুবনের মায়ের সময় কোথায় তারা নিশ্চিন্ত মনে, শুচি হয়ে, গরদ প'রে তাঁর পায়ে ফুলতুলসী দেবে?

বোধ হয় এই সব নানা কারণে জ্যাঠাইমাদের বাড়ির গৃহদেবতার প্রতি আমি অনেকটা চেষ্টা করেও কোনো ভক্তি আনতে পারলাম না। এক-একবার ভেবেছি হয়ত সেটা আমারই দোষ, আমার শিক্ষা হয়েছে অগ্রভাবে, অগ্র ধর্মাবলম্বী লোকদের মধ্যে, তাদের কাছে যে দয়া, মমতা পেয়েছি, আর কোথাও তা পাই নি বলেই। ছেলেবেলা থেকে যীশুখুষ্টের কথা পড়ে আস্চি, তাঁর করুণার কথা শুনেছি, তাঁর কত ছবি দেখেছি। আমার কাছে একখানা ছবি আছে খুষ্টের, মেমেরা বড়দিনের সময় আমায় দিয়েছিল—বকের পালকের মত ধপধপে শাদা দীর্ঘ ঢিলে আলখেল্লা-পরা যীশু হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়ে—চারি ধারে তাঁর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভিড় করেছে, একটি ক্ষুদ্র শিশু তাঁর পা ধরে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে, আর তিনি তাকে ধরে তুলতে যাচ্ছেন নীচ হয়ে—মুখে কি অপূর্ণ জ্যোতি, কি স্নন্দর চাঁউনি—আমি এ ছবিখানা বইয়ের ভেতর রেখে দি, রোজ একবার দেখি—এত ভাল লাগে!

কিন্তু যীশুখুষ্টের সম্বন্ধে কোনো ভাল বই পাইনি—

আমার আরও জানবার ইচ্ছে হয় তাঁর কথা—মাকে যে মেমেরা পড়াত চা-বাগানে, তারা একখানা মধি-লিখিত স্মসমাচার ও খানকতক ছাপানো কাগজ বিলি করেছিল, সেইগুলো কতবার পড়া হয়ে গিয়েছে, তা ছাড়া আর কোনো বই নেই। এখানে এসে পর্যন্ত আর কোনো নতুন বই আমার চোখে পড়ে নি।

আমাদের স্কুলে একটা ছেলে নতুন এসে ভর্তি হয়েছে আমাদেরই ক্লাসে। তার নাম বনমালী, জাতে সদগোপ, রং খুব কালো, কিন্তু মুখের চেহারা বেশ, বয়সে আমার চেয়ে কিছু বড়। সে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, এখানে একটা ঘর ভাড়া করে থাকে, বামুনে রাঁধে। অনেক দূরের পাড়াগাঁয়ে তার বাড়ি, সেখানে লেখাপড়া শেখার কোনো সুবিধে নেই, তাই ওকে ওর বাপ-মা এই গাঁয়ে পাঠিয়েছে। কিন্তু লেখাপড়ার দিকে বনমালীর মন নেই, সে বাসার উঠানে এক তুলসীচারী পুঁতে বাঁধিয়েছে, দিনরাত জপ করে, একবেলা খায়, মাছমাংস ছোঁয় না, শ্রীকৃষ্ণ নাম তার সামনে উচ্চারণ করবার যো নেই, তা হ'লেই তার চোখ দিয়ে জল পড়বে। রাত্রে জপের ব্যাঘাত হয় ব'লে বিকেলবেলা স্কুল থেকে গিয়ে খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বামুন-ঠাকুরকে ছুটি দেয়—তার পর ব'সে ব'সে অনেক রাত পর্যন্ত জপ করে, হরিনাম করে। সে সময় কেউ কাছে গেলে সে ভারি চটে। অদ্ভুত ধরণের ছেলে ব'লে তাকে সবাই ভারি খেপায়—স্কুলের ছেলেরা তার সামনে 'কিষ্ট' 'কিষ্ট' ব'লে চেঁচায় তার চোখে জল বেরোয় কি না দেখবার জন্মে, ওই নিয়ে মাষ্টারেরা পর্যন্ত খিঁচুনি দিতে বাকী রাখে না। সেদিন তো এ্যালজেরার আঁক না পারার দরুণ আমাদের সামনে সেকেণ্ড মাষ্টার ওকে বললে—“তুমি তো শুনিচি কেষ্ট নাম শুনেলে কেঁদে ফেল—তা যাও, পয়সা আছে বাপের, মঠ বানাও, মচ্ছব দেও, লেখাপড়া করবার সখ কেন? এ-সব তোমার হবে না বাপু!”

আমি একদিন বনমালীর কাছে সন্ধ্যার সময় গিয়েছি। ও তখন একটা টুলের ওপর ব'সে একমনে দেওয়ালের দিকে চেয়ে বোধ হয় জপ করছে—আমায় দেখে উঠে দোর খুলে দিলে, হেসে বসতে বললে। ওকে অদ্ভুত মনে হয়, সেজন্মেই দেখা করতে গিয়েছিলাম যে তা নয়—আমার মনে হয়েছিল ও ঘে-রকম ছেলে, ও বোধ হয় আমার নিজের

ব্যাপারগুলোর একটা মীমাংসা করে দিতে পারবে। তা ছাড়া ওকে আমার ভাল লাগে খুব, ওকে ভাল মানুষ পেয়ে সবাই খেপায়, অথচ ও প্রতিবাদ করে না, অনেক সময় বোঝে না যে তারা খেপাচ্ছে, এতে আমার বড় মায়া হয় ওর ওপরে।

বনমালীকে জিজ্ঞেস করলাম সে কিছু দেখে কি না। সে আমার কথা বুঝতে পারলে না, বললে—কি দেখবো? তাকে বুঝিয়ে বললাম। না,—সে কিছু দেখে না। তারপর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। ঘরে একখানা ছবি ছিল, আমি সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম—ও-খানা কি তোমার ঠাকুরের ছবি?

বনমালীর গলার স্বর বদলে গেল, চোখের চাউনি অল্প রহস্য হয়ে গেল। সে বললে—ঠিক বলেচ ভাই, আমার ঠাকুরের ছবি, চমৎকার কথা বলেচ ভাই—ওই তো আমার সব, আমার ঠাকুর শুধু কেন, তোমার ঠাকুর, সবারই ঠাকুর—বলতে বলতে দর দর করে তার চোখে জল পড়তে লাগল।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু একটু পরে বনমালীর কান্নার বেগ থামলে গর্কের স্বরে বললাম—খুব গোপনীয় কথা বললাম ওকে—কারও কাছে এ-পর্যন্ত মুখ ফুটে কথাটা বলি নি—বললাম—আমার ঠাকুর অল্প কেউ নয়, আমার ঠাকুর যীশুখৃষ্ট—আমার কাছেও ছবি আছে—

বনমালী হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে রইল—তারপর অপ্রতিভভাবে বললে—ও তোমরা খৃষ্টান?

আমি চূপ করে রইলাম।

বনমালী ভেবে বললে—তঁার কাছে সব সমান—

আমি বললাম—কার কাছে?

—শ্রীহরির কাছে ভাই, আবার কার কাছে? তঁার কাছে কি আর হিন্দু, মোহলমান, খৃষ্টান আছে? তিনি যে পতিত-পাবন - অধমের ঠাকুর—

আমার মনে ব্যথা লাগল এই ভেবে, বনমালী আমাকে অধম মনে করচে। যীশুখৃষ্টকেও ছোট করতে চায়। আমি বললাম—যীশুর কাছেও সব সমান। পাপীদের জন্তে তিনি প্রাণ দিয়েছিলেন—জান? মথি-লিখিত সুসমাচারে লিখেছে, যে তাঁহাতে বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবন—

মথি-লিখিত সুসমাচারের বাহিরে আমার আর কিছু জানা নেই বনমালী কিন্তু সংস্কৃতে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান আবৃত্তি করে আমায় শ্রীকৃষ্ণের রূপ বুঝিয়ে দিলে—আরও অনেক কথা বললে। আমি দু-তিন দিন তার কাছে গেলাম, তার ঠাকুর সত্বকে শুনবার জন্তে। জ্যাঠাইমাদের বাড়ির সকলের চেয়ে ও বেশী জানে ওদের ধর্মসত্বকে—এ আমার মনে হ'ল। কিন্তু বনমালী আমার ধৃষ্টভক্তি ভাল চোখে দেখলে না, বললে—হিন্দু হয়ে ভাই এ তোমার ভারি অদ্ভুত কাণ্ড যে তুমি অপরের দেবতাকে ভক্তি করো। গীতার বলেছে, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মে ভয়াবহঃ—অর্থাৎ নিজের ধর্মে—

আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম হিন্দু আমি কখনই না। আমরা যেখানে যে-অবস্থায় মানুষ হয়েছি সেখানে হিন্দু ধর্মের কথা কিছু শুনি নি কোনো দিন; কেউ বলত না। যা বলত, তাই শুনেছি, তাই বিশ্বাস করেছি—তা মনে লেগেছে। এতে আমার কি কোনো দোষ হয়েছে ভাই?

৩

সেদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের দালানে আমি ব'সে পড়ছি, এমন সময় কার পায়ে শব্দ শুনে চেয়ে দেখে আশ্চর্য হ'য়ে গেলাম, ছোটকাকীমা দাঁড়িয়ে! ছোটকাকীমা বড় মানুষের মেয়ে, তিনি তো কস্মিন্‌কালে আমাদের ভাঙা দালানে পা দেন নি—বিশেষ করে আমাদের দু-চোখে তিনি দেখতে পারেন না কোন কালে—বরং মেজকাকীমা সময়ে অসময়ে নরম হন, কিন্তু ছোটকাকীমার মুখে মিষ্টিকথা কোন দিন শুনিও নি।

আমাদের ঘরে আর কেউ নেই—দাদা এখনও ফেরেনি—সীতা ও মা জ্যাঠাইমাদের অন্তরে। আমি দাঁড়িয়ে উঠে খতমত খেয়ে বললাম—কি কাকীমা?

ছোটকাকীমা এদিক-ওদিক চেয়ে নীচু স্বরে বললেন—তোমার সঙ্গে কথা আছে জিতু।

আমি বললাম—কি বলুন?

কাকীমা বললেন—পানী যে রাতে মারা যায়, সেদিন তুই আমায় কি বলছিলি মনে আছে?

আমার ভয় হ'ল, বললাম—না, কাকীমা।

ছোটকাকীমা হঠাৎ আমার হাত ছুঁতে দু-হাতের মধ্যে

নিরে ফেললেন।—বল্ বাবা জিতু, সেদিন তোর কথা সবাই উড়িয়ে দিয়েছিল, আমি কিন্তু তারপর সব বুঝেছিলাম, কাউকে বলি নি। পানী ছেড়ে গিয়ে আমার পাগল ক'রে রেখে গিয়েচে—তুই বল্ জিতু। আমার মাকে তুই দেখেছিলি সে রাতে, তিনি পানীকে ভালবাসতেন, তাই নিতে এসেছিলেন—মরে গিয়েও তাঁর পানীর কথা—

আমি জানতাম না যে পানীর দিদিমা মারা গিয়েছেন। আমি বিশ্বাসের স্বরে জিজ্ঞেস করলাম—আপনার মা বেঁচে নেই ?

—না, পানী তাঁর কাছ থেকে ফাস্তন মাসে এল, তিনি আঘাট মাসে তো মারা গেলেন। তুই পানীকে দেখতে পাস্ জিতু ? তোকে সেদিন সবাই পাগল বললে, কিন্তু আমি তারপর ভেবে দেখলাম তোর কথার একটুও পাগলামি নয়—সব সত্যি। তুই আমার মাকে দেখতে পেয়েছিলি—সত্যি বল্ না জিতু বাবা, পানীকে দেখিস্ ?

আমার চোখেও জল এল। ছোটকাকীমাকে এত

কাতর দেখিনি কখনও—তা ছাড়া পানীকে আমিও বড় ভালবাসতাম এ বাড়ির ছেলেমেয়ের মধ্যে। বললাম—না কাকীমা, আমি কোনো দিন দেখিনি—আপনার পা ছুঁয়ে বলতে পারি—

ছোটকাকীমা আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন, মেজকাকার গলার স্বর শুনে তিনি পালিয়ে গেলেন। ছোটকাকীমার কথা শুনে আমি কিন্তু আকাশ-পাতাল ভাবতে বসলাম। আমি সেদিন সত্যি সত্যি কাউকে দেখেছিলাম তবে ? সে যেই হোক, পানীর দিদিমাই হোক, মরায় হোক বা জীবন্তই হোক। তা হ'লে আমার রোগ নয় ? আর কেউ তবে দেখে না কেন ?

কিংবা হয়ত ছোটকাকীমা মেয়ের শোকে বুদ্ধি হারিয়েছেন, কি বলছেন না-বলছেন, উনিই জানেন না। ওঁর কথার ওপর বিশ্বাস কি ?

ক্রমশঃ



হর-পার্বতী

শিল্পী—শ্রী পাঁচুগোপাল দাস

লুই পাস্তুর ও তাঁহার গবেষণা

আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীসত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী, ডি-এসসি

২

টীকা দিবার প্রথা এবং তাহার ক্রমোন্নতি ও বিকাশ

পাস্তুরের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে বিভিন্ন রোগ বিভিন্ন প্রকারের জীবাণু দ্বারা সংঘটিত হয়। কি প্রকারে এই ক্ষুদ্র (অর্থাৎ অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে যাহার সত্তা উপলব্ধি হয়) অথচ অমিতপরাক্রমশালী শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, তিনি সর্বদাই সেই চিন্তা করিতেন। এই সময়ে ফরাসী দেশে দুঃস্থ বিস্মৃচিকা রোগে অনেক কুকুটশাবক মারা যাইতোছিল। পাস্তুর সর্বপ্রথমে কুকুটশাবকগুলির বিস্মৃচিকা রোগের জীবাণুর প্রকৃতিনির্ণয়ে মনোনিবেশ করিলেন। বিস্মৃচিকা-পীড়াক্রান্ত কুকুটশাবকগুলির রক্তের মধ্যে অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে কতকগুলি জীবাণু প্রত্যক্ষীভূত করা গিয়াছিল বটে, কিন্তু পাস্তুরের রেশমী পোকা সম্বন্ধে গবেষণা বাহির হইবার পূর্বে তাহাদের যথার্থ প্রকৃতি নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই।

রেশমী পোকায় রোগের জীবাণু সম্পর্কে গবেষণা করিবার সময়ে পাস্তুর অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের উপকারিতা দেখাইয়াছিলেন। অণুবীক্ষণ-যন্ত্র দ্বারা গবেষণা বিষয়ে পাস্তুর যে সকলের অগ্রগামী ছিলেন, তাহা নয়। তাঁহার পূর্বে গেরা মেন্ভল (Guérin-Menneville) রোগাক্রান্ত রেশমী পোকায় শরীরের ভিতরে আণুবীক্ষণিক কণা প্রত্যক্ষীভূত করিয়াছিলেন। এতদ্বিধা ল্যবের্ (Lebert) এবং ফ্রে (Frey) রোগাক্রান্ত মশার রক্তের মধ্যে এবং নানা প্রকার ভিমের মধ্যে উপরিউক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলির অস্তিত্ব দেখাইয়াছিলেন।

যাহারা জীবাণুর প্রকৃতি সম্বন্ধে পরীক্ষাগারে গবেষণা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে গবেষণাকার্য্য নিরবচ্ছিন্ন হওয়া আবশ্যিক। রসায়নবিদের নিকটে অবকাশের সমস্তগুলি তাঁহাদের গবেষণাকার্য্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে

বিশেষ সাহায্য করে। কারণ তাঁহারা সমস্ত সময় একমনে গবেষণাকার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারেন। ইহা ব্যতীত ছুটির সময় রসায়নবিদগণকে পরোক্ষভাবে এক অভিনব উপায়ে সাহায্য করে। অনেক সময়ে পরীক্ষালব্ধ তরল পদার্থ হইতে কঠিন দানা বাহির হইয়া আসা বিশেষ সময়সাপেক্ষ। দীর্ঘ অবকাশের পরে রাসায়নিক পরীক্ষাগারে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সুদীর্ঘ পরিশ্রমলব্ধ দানাগুলির আকৃতি দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হন এবং নূতন উদ্যমে কাজ করিতে পারেন। কিন্তু জীবাণুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের (Bacteriologist) পক্ষে এই হিসাবে অবকাশের সময় বিশেষ অনিষ্টকারী, কারণ হয়ত তাঁহারা মাসের পর মাস ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমসহকারে যে-সকল জীবাণু কাল্চার* করিয়াছেন, দীর্ঘ অবকাশের পরে হয়ত আসিয়া দেখিবেন, যে, তাঁহার কোনও অলস সহকারীর যত্নের অভাবে সেই সকল জীবাণু মৃতপ্রায় এবং মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। সম্ভবতঃ এইরূপ কোনও কারণবশতঃ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে দীর্ঘ অবকাশের পরে পাস্তুর গবেষণা-গৃহে আসিয়া দেখিলেন, যে, অবকাশের পূর্বে তিনি কুকুটশাবকের বিস্মৃচিকা রোগের যে-সকল জীবাণু লইয়া পরীক্ষা করিতে-ছিলেন সেগুলি মৃতপ্রায়। তিনি কোঁতূহলাক্রান্ত হইয়া কতকগুলি পশুপক্ষীর শরীরের ভিতরে এই মন্দীভূত জীবাণু প্রবেশ করাইয়া দিলেন। পাস্তুর আশা করিয়াছিলেন যে, এই জীবাণু মন্দীভূত হইলেও জন্তুগুলি জীবাণুর প্রভাবে পীড়াক্রান্ত হইবে। কিন্তু তিনি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন যে, জন্তুগুলি বেশ স্বচ্ছন্দে, সুস্থ শরীরে তাহাদের পিঞ্জরের ভিতরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তিনি পুনরায় কতকগুলি তীব্র জীবাণু সংগ্রহ করিয়া ঐ প্রাণীগুলির শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। ভাবিলেন, দেখা যাউক, কি হয়। যখন তিনি দেখিলেন যে, প্রাণীগুলির শরীরে এই সকল তীব্র জীবাণু

* কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা

প্রবেশ করান সত্ত্বেও কিছুমাত্র কুফল হইল না, তখন তাঁহার বিশ্বাসের সীমা রহিল না। তীক্ষ্ণবুদ্ধি পাস্তুর বুঝিলেন যে, প্রথমে প্রাণীগুলির শরীরে মন্দীভূত জীবাণু (attenuated virus or vaccine) প্রবেশ করান হইয়াছিল বলিয়াই তাহারা পরে তীব্র জীবাণুর তেজ সহ্য করিতে সমর্থ হইল। পাস্তুর এই ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিলেন এই, যে, মন্দীভূত জীবাণু শরীরের ভিতরে প্রবেশ করাইবার ফলে ঐ সকল প্রাণীর শরীরে কতকগুলি বিরুদ্ধশক্তিসম্পন্ন জীবাণুর সৃষ্টি হয়। শেষোক্ত জীবাণুগুলি, ভবিষ্যতে ঐ রোগের কোনও তীব্র জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিলে, তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া শরীরকে নীরোগ রাখা। কিন্তু পুরাতন ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, লুই পাস্তুরের জন্মের বহু পূর্বে হইতেই প্রায় সকল দেশেই বসন্ত রোগের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত টীকা গ্রহণ করার ব্যবস্থা ছিল। আমাদের দেশের প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাই, সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে বসন্তের বীজ নরদেহে প্রবেশ করাইয়া কৃত্রিমভাবে বসন্ত রোগের সৃষ্টি করা হইত এবং এইভাবে তাহাকে আজীবন এই ব্যাধি হইতে মুক্ত করা হইত। ভারত-গভর্নমেন্টের স্বাস্থ্য-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী এস্, পি, জেম্‌স্ বসন্ত রোগ সম্বন্ধে বিস্তৃত অমুসন্ধান করিয়া উক্ত রোগ ও তাহার প্রতীকার সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি তাঁহার *Small-pox and Vaccination in British India* গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, পুরাকাল হইতে বাংলা দেশে বসন্ত রোগের প্রতীকারস্বরূপ টীকা গ্রহণ করিবার প্রণালী প্রচলিত ছিল। অবশ্য কতকগুলি লোক ধর্মসংস্কারের জন্ত টীকা লইত না, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে তৎকালীন প্রথামুসারে টীকা লইবার পদ্ধতি খুবই প্রচলিত ছিল। উক্ত গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, যে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে প্রত্যেক আটটি বা দশটি পরিবারের জন্ত একটি করিয়া টীকাদার ছিল; তাহারা তৎকালীন দেশীয় প্রথামুসারে লোকদিগের শরীরের মধ্যে বসন্তরোগের বীজ প্রবেশ করাইয়া টীকা দিত। উক্ত বৎসরে কেবলমাত্র কলিকাতা শহরেই আটটি জন টীকাদারের নাম ও ঠিকানা পাওয়া গিয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা যায় যে ঐ সময়ে শতকরা

একশী জন লোক দেশীয় প্রথা অবলম্বন করিয়া বসন্তরোগের প্রতীকারস্বরূপ টীকা গ্রহণ করিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে টীকা লইবার যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে চিত্তাকর্ষক হইবে। হল্‌ওয়েল্ (Holwell)এর ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে লিপিবদ্ধ প্রবন্ধ হইতে ইহা গৃহীত।

তখনকার দিনে একদল ব্রাহ্মণ ছিল, যাহাদের ব্যবসায়ই ছিল লোকদিগকে টীকা দেওয়া। তাহারা তিন-চারি জন একত্র হইয়া এই উদ্দেশ্যে বাহির হইত এবং তাহাদের ভ্রমণের সময় ও স্থান একরূপভাবে নির্বাচন করিত যাহাতে তাহারা তাহাদের গন্তব্য স্থানগুলিতে বসন্তরোগের সংক্রামণ আরম্ভ হইবার কয়েক সপ্তাহ পূর্বে পৌঁছাইতে পারে। বাংলা দেশে তাহারা সাধারণতঃ ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগ হইতেই টীকা দেওয়া আরম্ভ করিত। বাংলা দেশের অধিবাসীরা বুঝিতে পারিত যে কোন্ সময়ে এই সকল টীকাদারের আবির্ভাব হইবে, এবং তজ্জন্ত তাহারা এই সময়ের একমাস পূর্বে হইতেই মৎস্য, ঘৃত ও দুগ্ধ প্রভৃতি জিনিষ আহার্যরূপে গ্রহণ করিত না, কারণ এই সমস্ত নিয়ম পালন না করিলে তাহারা টীকা লইতে পারিত না। যখন টীকাদার ব্রাহ্মণের দল আসিয়া বাড়ি বাড়ি টীকা দিতে আরম্ভ করিত, তাহারা কোনও লোককে টীকা দিবার পূর্বে সে ঐ নিয়মগুলি যথাযথরূপে পালন করিয়াছে কিনা, তদ্বিষয়ে বিশেষ অমুসন্ধান করিত। শিশুদিগকে টীকা দিবার পূর্বে কয়টি গুটি দ্বারা টীকা দিতে হইবে, সে-সম্বন্ধে তাহাদের পিতামাতার সম্মতি লওয়া হইত। যাহারা টীকা লইবে তাহাদের অভিপ্রায়মত শরীরের যে-কোনও স্থানে টীকা দেওয়া হইত বটে, কিন্তু প্রায়ই টীকাদারের অভিপ্রায়-অনুসারে সাধারণতঃ পুরুষের কনুই হইতে হাতের কঙ্গীর মধ্যভাগে যে-কোন জায়গা এবং স্ত্রীলোকের ঘাড়ের উপরিভাগের যে-কোন জায়গা মনোনীত করা হইত। টীকার স্থান ক্ষত করিবার পূর্বে টীকাদার হাতে এক টুকরা পরিষ্কার শুষ্ক কাপড় লইয়া টীকা দিবার স্থান আট-দশ মিনিট ধরিয়া বেশ করিয়া ঘসিয়া দিত এবং তাহার পরে একটি ক্ষুদ্র যন্ত্রদ্বারা একটি রৌপ্যমুদ্রার আকৃতি পরিমাণ স্থান ব্যাপিয়া অনেকবার খুব সামান্য সামান্য আঘাত করিয়া একবিন্দু রক্ত বাহির করিত। তখন

সে তাহার কোমরে-জড়ান একটি কাপড়ের খলি হইতে একটি তুলার গুটি বাহির করিত। এই তুলার গুটিতে গো-বসন্তের বীজ রক্ষিত থাকিত। টীকাদার এই তুলার গুটি অতি যত্নসহকারে দুই-তিন ফোটা গঙ্গার জলে ভিজাইয়া লইয়া ক্ষতস্থানে বসাইয়া দিত। সেই জায়গাটি তখন একটি ছোট কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইত। ছয় ঘণ্টার পরে এই ব্যাণ্ডেজ অপসারিত করা হইত এবং তুলার গুটিটি যতক্ষণ না আপনা হইতে শুকাইয়া পড়িয়া যায় ততক্ষণ উহাকে সেই জায়গায় রাখা হইত। এই সকল তুলার গুটির মধ্যে একবৎসর আগে টীকা লইয়া বসন্তরোগদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে এরূপ লোকের রোগের গুটি রাখা হইত। তখনকার টীকাদারেরা কখনও টাটকা অথবা স্বভাবজাত বসন্তরোগের গুটি দিয়া টীকা দিত না।

দে-দিন টীকা দেওয়া হইত তাহার পরের দিন প্রতুষে ও সন্ধ্যায় রোগীকে দাঁড় করাইয়া তাহার মাথার উপরে চার বালতি ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দেওয়া হইত। এই প্রক্রিয়া তিন-চারি দিন ধরিয়া করিবার আদেশ ছিল, যতক্ষণ না রোগী বেশীরকম জ্বরে আক্রান্ত হয়। ইহার পর দুই-তিন দিন ঠাণ্ডা জল দ্বারা স্নান করান বন্ধ রাখা হইত এবং এই সময়ের মধ্যে রোগীর শরীরে বসন্তরোগের গুটিগুলি বেশ ফুটিয়া উঠিত। তখন জ্বরের মধ্যেই ঠাণ্ডা জল দ্বারা স্নান করান আবার শুরু করা হইত, যতদিন না বসন্তরোগের গুটিগুলি শুকাইয়া পড়িয়া যাইত। গুটিগুলি ভাল করিয়া শুকাইবার পূর্বেই টীকাদারের নির্দেশ থাকিত যে গুটিগুলি খোঁচা দিয়া উঠাইয়া ফেলিতে পারা যায়। রোগীকে মুক্ত বাতাসে বসিতে এবং মুক্ত বাতাসে চলাফেরা করিতে আদেশ দেওয়া হইত এবং ঘরের মধ্যে বন্ধ থাকা একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবার পরে দেবদেবীকে পূজা দিয়া সন্তুষ্ট করিবার প্রণালী প্রচলিত ছিল। টীকাদার তাহার পারিশ্রমিকস্বরূপ একপণ কড়ি লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত।

ইহা ভিন্ন যে-বাড়িতে টীকা দেওয়া হইয়াছে সে-বাড়ির লোকেরা যাহাতে টীকা লইবার পরে একুশ দিনের মধ্যে অগ্নি বাড়িতে না যায় এবং অগ্নি বাড়ির লোকেরা ঐ সময়ের মধ্যে তাহাদের বাড়িতে না আসে—তদ্বিষয়ে কঠিন নিষেধ ছিল। কেহ এই নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ স্নান করিয়া

কাপড় বদলাইতে হইত। ঐ সময়ের মধ্যে কোনও নাপিত সেই বাড়িতে ক্ষৌরকার্য করিতে আসিতে পারিত না। এই সকল সতর্কতাসত্ত্বেও যাহাতে টীকা দ্বারা বসন্তরোগের বিস্তার না হয় সেই জন্য টীকাদারদিগের নিয়ম ছিল যে, কোনও গ্রামে অধিকাংশ লোকেই টীকা গ্রহণ না করিলে—সেই গ্রামে কাহাকেও টীকা দেওয়া হইবে না। আসন্নপ্রসবা স্ত্রীলোক অথবা অন্ত কোনও লোক যাহারা বিশেষ কোনও কারণে টীকা লইতে পারে না, তাহাদিগকে একুশ দিনের অন্ত গ্রাম হইতে সরাইয়া দেওয়া হইত। যাহারা টীকা লইত, রোগমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত পুষ্করিণীতে স্নান করা তাহাদিগের পক্ষে একে-বারেই নিষিদ্ধ ছিল।

হল্‌ওয়েল্ স্বীকার করিয়াছেন যে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশে উপরিউক্ত প্রণালীদ্বারা টীকা গ্রহণ করিয়াছে, এরূপ লোকের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা দুই শতের মধ্যে একজনেরও কম ছিল এবং এই প্রসঙ্গে জেম্‌স্‌ও স্বীকার করিয়াছেন যে, “There can be no doubt that in those comparatively olden times a high degree of knowledge in regard to the procedure necessary for success have been attained”—“এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, সেই অপেক্ষাকৃত প্রাচীনকালেও বসন্তরোগের প্রতিকারের খুব উচ্চতর ফলপ্রদ প্রণালী ভারতীয়গণের জানা ছিল।” জেম্‌স্‌ আরও বলিয়াছেন, “We see then that in olden times when all the rules just enumerated were strictly enforced and when the operation was performed by the professional Brahmin inoculators only, the measure proved a real blessing to the inhabitants of a certain part of India.”—“আমরা দেখিতে পাই যে অতি প্রাচীনকালে, যখন উপরিউক্ত নিয়মাবলী যথাযথরূপে পালন করা হইত এবং যখন টীকা দেওয়ার ভার পেশাদার ব্রাহ্মণ টীকাদারদিগের হস্তে সমর্পিত ছিল, সেই সময়ে ভারতবর্ষের কোন কোনও অংশে তৎকালীন বসন্তচিকিৎসার প্রণালী সত্যসত্যই প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছিল।”

যতদিন শিক্ষিত টীকাদার সম্প্রদায়ের হাতে টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা গুস্ত ছিল, ততদিন ভারতীয় টীকাপ্রণালী পৃথিবীর

মধ্যে যে-কোনও স্থানের টীকাপ্রণালী অপেক্ষা সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ ছিল। কিন্তু ক্রমে অর্থপিপাসু লোকেদের হাতে পড়িয়া ইহা একটি অর্থকরী ব্যবসায় পরিণত হয় এবং টীকার পারিশ্রমিক এক পণ কড়ি হইতে ক্রমে এক, দুই হইতে দশটি রৌপ্যমুদ্রা পর্যন্ত বর্ধিত হইল। কালে নিম্নশ্রেণীর অনভিজ্ঞ হিন্দুরা অর্থোপার্জন করিবার জন্ত এই ব্যবসা আরম্ভ করে। ইহারা যে টীকা দেওয়ার প্রণালী-সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিল, তাহা নয়, কিন্তু পূর্বোক্ত নিলেভি ব্রাঙ্কন-টীকাদারের জ্ঞান ইহাদের জনসাধারণের উপরে প্রভাব না থাকায় টীকাজনিত বসন্তরোগের বিস্তারের বিরুদ্ধে যে-সকল নিয়ম পালন করা আবশ্যিক তাহা যথাযথ পালন করা হইত না, অর্থলোলুপ অশিক্ষিত ব্যক্তির হস্তে পড়িয়া ইহার ফল এই হইল, যে, টীকা দেওয়ার দরুণ অসংখ্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল এবং রোগের প্রসার ক্রমেই বাড়িয়া চলিল।* ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারত-গভর্নমেন্টের বিশেষ আইন অনুসারে দেশী বা বাংলা টীকা নিষিদ্ধ হইয়া যায়।

* এই প্রসঙ্গে লেখকস্যের একজন কঙ্ক প্রণীত *A History of Hindu Chemistry* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১০৫-১০৭ পৃষ্ঠার সারাংশ নিয়ে অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল।

বৈদিক যুগে ঋষি অথবা পুরোহিত সম্প্রদায় সুবিধা ও রুচি অনুসারে বিভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিতেন এবং এক হিসাবে তাহারা এমাসনের মতাবলম্বী ছিলেন—“মানুষের জন্মগত কোন নির্দিষ্ট ব্যবসায় থাকিতে পারে না। প্রত্যেকেরই নিজের ধীশক্তি, ক্ষমতা ও রুচি অনুযায়ী নিজের ব্যবসা বাছিয়া লওয়া উচিত।” কিন্তু বৌদ্ধধর্মের বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পুনরায় ভারতবর্ষে আধিপত্য লাভ করিল, তখন হইতেই ব্যবসায় নির্বাহনে ব্রাহ্মণদিগের উক্ত পদ্ধতি বিলুপ্ত হয় এবং তখন হইতেই ভারতবর্ষে নূতন করিয়া জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত হয়। ‘মুশ্রুত’ অনুসারে শব-ব্যবচ্ছেদ শল্যবিদ্যা শিক্ষার অপরিহার্য এবং এই প্রসিদ্ধ প্রামাণিক গ্রন্থে পরীক্ষামূলক জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাসম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু মনুর বিধানে এক পরবর্তী পুরাণগুলিতে পুরোহিত-সম্প্রদায়ের সর্কারী বিধিগুলির ভূয়সী গরিমা প্রকাশ করা হইয়াছে। মনুর অনুজ্ঞা-অনুসারে মৃতদেহকে স্পর্শ করিলেই ব্রাহ্মণের পবিত্র দেহ কলুষিত হইবে। এই সকল বিধির ফলে শল্যবিদ্যার জন্ত জন্ত স্পর্শ করা নিষিদ্ধ হইল এবং শীঘ্রই শব-ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে লুপ্তপ্রায় হইল। কালে অশিক্ষিত নাপিত সম্প্রদায়ের হস্তে এই গুরুতর জ্ঞান অর্পিত হইল এবং এইরূপে উচ্চাঙ্গের শল্যবিদ্যা ভারত হইতে তিরোহিত হয়।

প্রাচীন ভারতে উচ্চাঙ্গের উদ্ভিদবিদ্যার চর্চা হইত বলিয়াও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু উপরিউক্ত কারণবশতঃই ক্রমে গাছগাছড়া,

ইংলণ্ডে মেরী ওটলি মণ্টেগু ১৭২২ খৃষ্টাব্দে বসন্তরোগের প্রতিকারস্বরূপ টীকা লইবার পদ্ধতির উপকারিতা দেখাইয়া যান। এই চিরস্মরণীয় মহিলা তুর্কীস্থানে কনস্টান্টিনোপল নামক শহরে ইংরেজ রাজদূতের সহধর্মিণী ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে তুর্কীস্থানে বসন্তরোগের প্রকোপ আদৌ নাই এবং ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে, সেখানকার লোকে বসন্তরোগের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত শরীরের কোনও স্থানের শিরা কাটিয়া বসন্ত-রোগের জীবাণু শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়।



মেরী ওটলি মণ্টেগু

ইহাতে তাহারা সাময়িকভাবে অস্থস্থ হয় বটে, কিন্তু বসন্ত-রোগ হইতে অর্জীবন রক্ষা পায়।

তখন ইংলণ্ডে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র লোক বসন্তরোগে

তরুণশ্রমতা সনাস্ত করিবার জ্ঞান বেদে-সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। এইপ্রকারেই সর্কারীচিত্ত পুরোহিত-সম্প্রদায়ের বিধির ফলে শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের কলাবিজ্ঞান অনুশীলনও বন্ধ হইয়া যায়।

বলা বাহুল্য অশিক্ষিত ও অজ্ঞ সম্প্রদায়ের হস্তে প্রাচীন ভারতের প্রায় সকল প্রকার পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানই ক্রমে অধঃপতন হইতে থাকে। এইরূপে বৈজ্ঞানিক অনুপ্রেরণা ও অনুসন্ধান ভারতবর্ষ হইতে কিছুকালের জন্ত তিরোহিত হয়।

মারা যাইত। মেরী ওটলি মণ্টেও স্বদেশে ফিরিয়া সর্বপ্রথমে নিজের কন্যাকে টীকা দেওয়াইলেন। তখন হইতেই ইংলণ্ডে টীকা লইবার পদ্ধতি প্রবর্তন করা হইল; কিন্তু দেখা গেল যে, তদানীন্তন পদ্ধতি দ্বারা টীকা লইবার ফলে যে ব্যক্তি টীকা গ্রহণ করিত সে নিজে বসন্তরোগের আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করিত বটে, কিন্তু আশপাশের লোকদিগের মধ্যে বসন্তরোগ ছড়াইয়া পড়িত। সুতরাং সেই সময়ে টীকা গ্রহণ কারবার পদ্ধতি জনপ্রিয় হয় নাই এবং আরও কার্যকর প্রতিষেধক ঔষধের আবিষ্কার করা আবশ্যিক হইয়া পড়িল। জেনার নামক একজন সাধারণ চিকিৎসক এক অভিনব উপায়ে এই ঔষধের আবিষ্কার করিয়া পৃথিবীতে অমর কীর্তি রাখিয় গিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে জেনারের গবেষণা সম্বন্ধে কিছু বিবরণ দেওয়া অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না।

এডওয়ার্ড জেনারের পিতা একজন ধর্মযাজক এবং তাঁহার মাতা একজন ধর্মযাজকের কন্যা।



এডওয়ার্ড জেনার

জেনারের মাতুল-বংশের সকলেই ধর্মযাজক ছিলেন এবং তাঁহার সকল ভগ্নীরই ধর্মযাজকের সহিত বিবাহ হইয়াছিল; কিন্তু এইরূপ আবহাওয়ার মধ্যে বর্ধিত হইয়াও প্রাকৃতিক-

বিজ্ঞান শিক্ষার জন্ম তাঁহার প্রবল আগ্রহ হয় এবং ব্রিষ্টলের নিকটবর্তী সড্‌বেরী (Sodbury) নামক স্থানে ড্যানিয়েল লাডলো (Daniel Ludlow) এর অধীনে শল্যবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করিতে গমন করেন।

জেনার যখন হাসপাতালে লাডলোর সহকারীরূপে কাজ করিতেছিলেন সেই সময়ে একটি গ্রাম্য বালিকা সেখানে চিকিৎসার জন্ম আসে। যখন বালিকাটিকে শোনান হইল যে হয়ত সে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছে, তখন সে দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিল, “আমার বসন্তরোগ কখনই হইতে পারে না, কারণ ইতিপূর্বে আমার গো-বসন্ত হইয়াছিল।” এই কথা শুনিয়া জেনারের মনে অত্যন্ত কৌতূহলের সৃষ্টি হয়, কারণ তিনি পূর্বেই জানিতেন যে গ্ৰন্থারশায়ারের গোয়লা ও গোয়ালিনীদিগেরও এইরূপ ধারণা ছিল। তখন হইতেই তিনি মনে মনে এই বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

জেনারের মন কিরূপ অসুস্থস্থ ছিল তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে বেশ বোঝা যায়। যখন তিনি সড্‌বেরীতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন তখন এই প্রশ্ন ওঠে যে একটি মোমবাতির অগ্নিশিখার কেন্দ্রস্থলে অথবা উপরিভাগে—কোনস্থানে উত্তাপ অপেক্ষাকৃত কম? অল্পভাষী জেনার বেশী বাদামুবাদ না করিয়া মোমবাতিটিকে আপনার নিকটে টানিয়া লইলেন এবং অগ্নিশিখার কেন্দ্রস্থলে কয়েক মুহূর্তের জন্ম আপনার অঙ্গুলি স্থাপন করিলেন। তৎপরে তিনি অগ্নিশিখার উপরিভাগে অঙ্গুলি স্থাপন করিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ উহা সরাইয়া লইতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে সহজেই উপরিউক্ত প্রশ্নের মীমাংসা হইল।

চিকিৎসা-বিদ্যা সমাপন করিয়া জেনার গ্ৰন্থার-শায়ারে চিকিৎসা-ব্যবসা আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহার সহস্র কাজের মধ্যেও তিনি গো-বসন্তের অদ্ভুত প্রভাবের বিষয় ভুলিতে পারেন নাই এবং অতিশয় আগ্রহসহকারে এই বিষয়ে গোয়লাদিগের গল্প শুনিতে। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া অতিশয় সহিষ্ণুতাসহকারে তিনি এই বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। জেনার লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে গোজাতির মধ্যে বসন্তরোগ অপেক্ষাকৃত কম মারাত্মক। কিন্তু মানুষের মধ্যে এই ব্যাধি মহামারীর

আকার ধারণ করে। সুতরাং জেনার অনুমান করিলেন যে, যদি গো-বসন্তের বীজ মানুষের শরীরে প্রবেশ করান যায়, তাহা হইলে মনুষ্যজাতির মধ্যে বসন্তের প্রকোপ সম্ভবতঃ কম হইবে। জেনার আরও লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, কোন লোকের একবার বসন্তরোগ হইলে পরে সে প্রায়ই দ্বিতীয়বার ঐ রোগে আক্রান্ত হয় না। এই ব্যাপার হইতেও জেনার অনুমান করিলেন যে, গো-বসন্ত সাধারণ বসন্তরোগ অপেক্ষা কম মারাত্মক। সুতরাং গো-বসন্তের বীজ মনুষ্যশরীরে প্রবেশ করাইয়া তাহাকে মারাত্মক বসন্তরোগ হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে।

এ-বিষয়ে পরীক্ষা করিতে গিয়া জেনারকে পদে পদে বাধা পাইতে হইল। তিনি দেখিলেন যে বসন্ত-রোগাক্রান্ত গরুর শরীরের কোন কোন গুটির জীবাণু মানুষকে বসন্তরোগ হইতে রক্ষা করে বটে, কিন্তু ইহাও দেখিলেন, যে, একই গরুর অগ্নাগ্ন গুটির জীবাণু মানুষকে বসন্তরোগ হইতে রক্ষা করিতে পারে না, উপরন্তু ঐ জীবাণু মনুষ্যশরীরে প্রবেশ করাইবার ফলে সে মারাত্মক বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়। ইহার কারণ বুঝিতে না পারায় জেনার কিছু বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং এই উপলক্ষে বিরুদ্ধবাদীরা তাঁহার প্রতি অসংখ্য বিক্রমবাণ বর্ষণ করিতে ক্রটি করিল না। কিন্তু অসামান্য সহিষ্ণুতা-সহকারে জেনার এই প্রবন্ধের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং শীঘ্রই তাঁহার পরিশ্রম সফল হইল। তিনি দেখাইলেন যে, আসল গো-বসন্তের জীবাণুগুলি ধীরে ধীরে মন্দীভূত হইতে থাকে এবং পরিশেষে উহা খুবই মন্দীভূত হইয়া পড়ে। কেবলমাত্র এই অবস্থাতেই জীবাণুগুলি মনুষ্য-শরীরকে বসন্তরোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারে। এই সময়ে জেনার একটি চিকিৎসা-সমিতির সভ্য ছিলেন। তিনি সেই চিকিৎসা-সমিতির একটি আবেশনে দৃঢ়ভাবে এই মত প্রকাশ করিলেন যে, মানুষকে বসন্তরোগ হইতে রক্ষা করিবার জন্য গো-বসন্তের জীবাণু ব্যবহার করিলে সফল পাওয়া যাইবে। সমিতির অগ্নাগ্ন সভ্যগণ ইহাতে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে সমিতি হইতে বহিষ্কৃত করিবার ভয় দেখায়।

জেনারের গবেষণার প্রকৃত উপকারিতা ও তাৎপর্য বুঝিতে হইলে সেই সময়ে বসন্তরোগ যে মহামারীর সৃষ্টি করিত তাহার বিবরণ জানা দরকার। মানুষ তখন সমস্ত

ব্যাধির মধ্যে বসন্তরোগকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভয় করিত। যাহার একবার বসন্তরোগ হইয়াছে তাহার আর দ্বিতীয় আক্রমণের বিশেষ ভয় থাকিত না। কিন্তু বাহার কখনও বসন্তরোগ হয় নাই, সে সর্বদাই সশঙ্কিত থাকিত। বলা বাহুল্য, বসন্তরোগ এত সংক্রামক যে, মানুষ খুব সাবধানে থাকিয়াও এই ব্যাধির হস্ত হইতে পরিভ্রাণ পাইত না। এক সময়ে মেক্সিকো দেশে কয়েক মাসের মধ্যেই ষাট লক্ষ লোক বসন্তরোগে মারা যায় এবং খুষ্টের জন্মের কয়েক শত বৎসর পূর্বে এই ব্যাধি মহামারীরূপে চীনদেশকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল। ক্রমে এই সংক্রামক ব্যাধির ভয় একরূপ প্রকল হইয়া উঠে যে, সমস্ত বসন্ত-রোগাক্রান্ত হইলে মাতা তাহাকে নিরাশ্রয়ভাবে ফেলিয়া পলায়ন করিত। এমন ঘটনাও শোনা যায় যে, বসন্তের ভীষণ মহামারীর সময়ে পিতা, পরিবারের সকলকে ডাকিয়া বসন্ত-রোগাক্রান্ত মানুষের চেহারা কিরূপ ভীষণ আকৃতি ধারণ করে, তাহা দেখাইলেন এবং এইরূপ ভয়াবহ পরিণামের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য সকলকে আত্মহত্যা করিতে উপদেশ দিয়া নিজে সর্বাগ্রে তাহার পথ দেখাইলেন। এক হিসাবে প্লেগের মহামারীর প্রকোপ অপেক্ষা বসন্ত মহামারীর প্রকোপ আরও ভয়াবহ, কারণ প্লেগের প্রকোপ বহু বৎসর অন্তর একবার করিয়া হয়, কিন্তু বসন্তরোগের প্রকোপ প্রতি বৎসর লাগিয়াই আছে। বানে াল (Bernoulli) হিসাব করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, পৃথিবীতে প্রতি ২৫ বৎসর ১৫,০০০,০০০ লোক বসন্তরোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বসন্তরোগ মনুষ্যজাতির কি ভীষণ ক্ষতি সাধন করে, উপরিউক্ত মৃত্যুসংখ্যা হইতে তাহার একাংশ মাত্র জানা যায়। কারণ বসন্ত-রোগাক্রান্ত হইয়াও যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহাদের মধ্যে কোটি কোটি লোক অন্ধ অথবা অঙ্গহীন হইয়া কালযাপন করে।

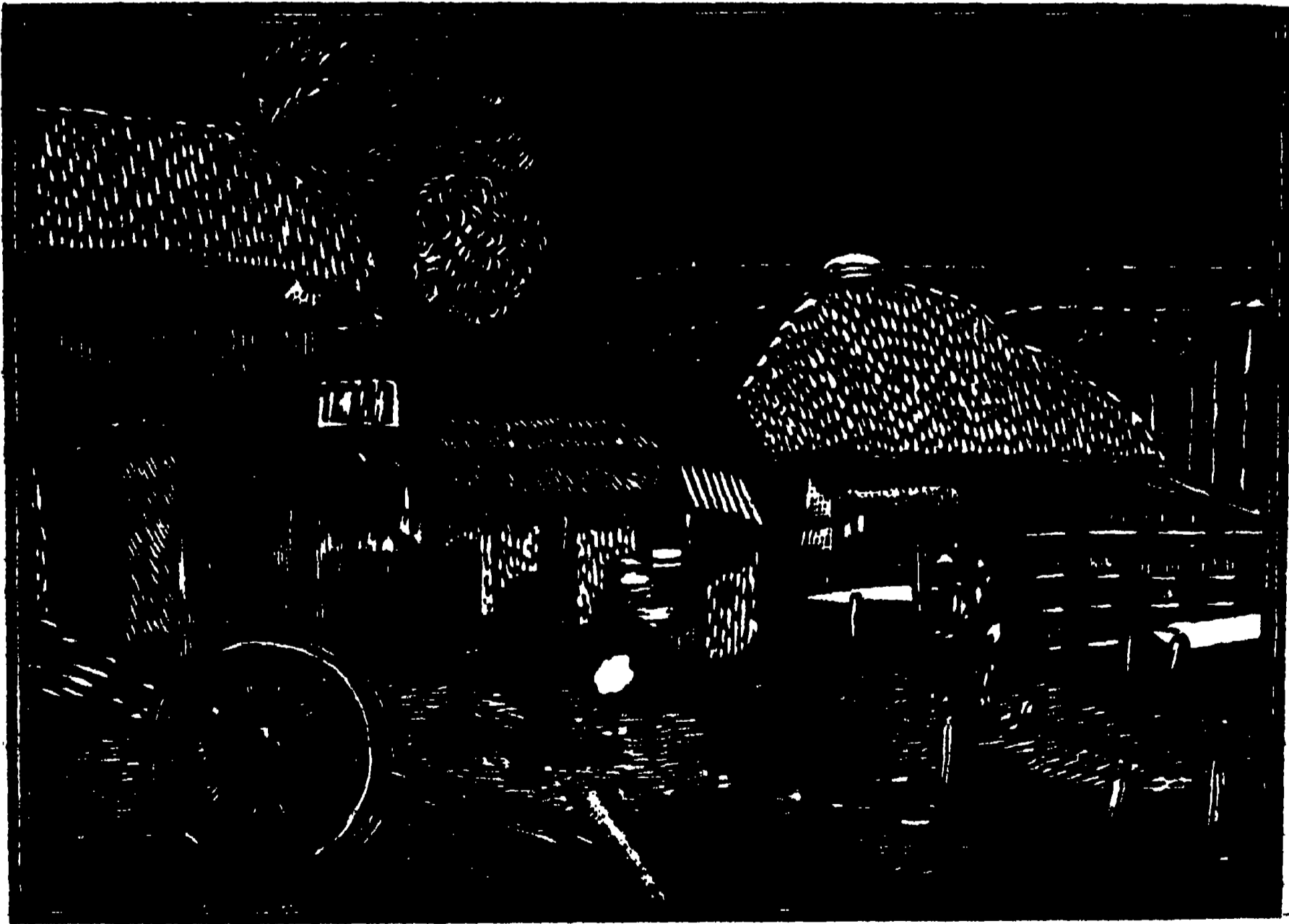
মনুষ্যজাতির এই ভীষণ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য জেনার মনস্থ করিলেন এবং তাঁহার অন্ত হইল একখণ্ড হস্তিনস্তের উপরিভাগে এক তিল জীবাণু। অসংখ্য বিরুদ্ধবাদীর বিক্রম অগ্রাহ করিয়া জেনার তাঁহার পূর্ববর্ণিত মত ও অনুমান সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বহুপরিশ্রম করিলেন।

নারা নেল্‌ম্‌স্ (Sarah Nelmes) নামক এক গোমালিনী গো-বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়। জেনার এই

দ্বীলোকটির হাত হইতে বসন্তরোগের গুটি লইয়া জেম্‌স্‌ ফিপ্প্‌ (James Phipps) নামক একটি আট বছরের স্বাস্থ্যবান বালকের বাহু চিরিয়া প্রবেশ করাইয়া দিলেন। ইহার দুই মাস পরে বালকটির শরীরের মধ্যে বসন্তরোগের তীব্র জীবাণু প্রবেশ করান হইল। বালকটিকে ইতিপূর্বে মন্দীভূত জীবাণু দ্বারা টীকা দেওয়া না হইলে সে কিছুতেই সেই তীব্র জীবাণুর শক্তি সহ্য করিতে পারিত না। কিন্তু এক্ষেপে দেখা গেল যে, বালকটির কোনই অনিষ্ট হইল না। বলা বাহুল্য, এই পরীক্ষায় সকল হওয়ায় জেনারের নাম ও খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। এতদিনে কোটা কোটা লোককে বসন্তরোগের প্রকোপ হইতে রক্ষা করিবার উপায় আবিষ্কৃত হইল।

অবশ্য টীকা লইবার পদ্ধতির বিরুদ্ধবাদী লোকের কখনও অভাব হয় নাই। একজন ধর্মঘাতক দৃঢ়তার সহিত বলিলেন যে, ঈশ্বর ইচ্ছা করিয়া বসন্তরোগ পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন এবং তাঁহারই ইচ্ছা যে মানুষ বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়। মোস্‌লে (Moseley) নামক এক ডাক্তার

আহ্বিত করিলেন যে গরু বা অন্য কোনও নিম্নস্তরের জন্তুর শরীর হইতে কোনও দ্রব্য মানুষের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইলে সেই মানুষও পণ্ডভাবাপন্ন হইবে। কিন্তু বসন্তরোগের মহামারী সকল দেশেই একরূপ ভয়াবহ ছিল, যে, উপরিউক্ত বিরুদ্ধবাদ সত্ত্বেও লোকে দলে দলে আগ্রহ-সহকারে টীকা লইতে লাগিল এবং বলা বাহুল্য, শীঘ্রই ইহার সুফল ফলিল। ক্রমে টীকা লইবার পদ্ধতি পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। লোকে ইহাকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিল এবং দেশে দেশে জেনার ঈশ্বরের দূত বলিয়া অভিনন্দিত ও সম্মানিত হইতে লাগিলেন। যে বিভীষিকাময় বসন্তরোগের প্রকোপে পূর্বে প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ লোক অকালে কালের করালকবলে পতিত হইত, সেই বসন্তরোগ আজকাল একটি সাধারণ রোগের মধ্যে গণ্য হইয়াছে এবং পৃথিবীতে সমস্ত রোগের জন্তু মৃত্যুসংখ্যা গণনা করিলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, অন্যান্য রোগের তুলনায় বসন্তরোগের দরুণ মৃত্যুসংখ্যা নিতান্তই সামান্য।



গল্পী-গৃহ
শিল্পী—শ্রীনরেন্দ্রকেশরী রায়

বিবাগী

শ্রীবন্দনা দেবী

১৩শ্রীপুর গ্রামের একধারে একটি মাটির ঘরে বসিয়া সিদ্ধেশ্বর মাটির বাসন তৈরি করে।

বয়স তাহার প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের উপর হইয়াছে। কিন্তু তাহাকে দেখিলে সত্তর বৎসরের জরাজীর্ণ বৃদ্ধ বলিয়া মনে হয়। মুখ ভাঙিয়া গেছে, বুকের অস্থিগুলো এক-একটি করিয়া গণা যায়। একখানা ভাঙা চশমা চোখে দিয়া সে ধীরে ধীরে আপনার কাজ করিয়া যায়। সারাদিনে কয়েকটি মাত্র বাসন তৈরি হয়।

ভাল কাজ করে বলিয়া পাড়ার লোক তাহাকে অনেক কিছুই ফরমায়েস দিয়া যায়। নির্দিষ্ট দিনে তাহারা আসিয়া যখন জিনিষ চায়, তখন হয়ত অধিকাংশই তৈরি হয় নাই। সে হাতছোড় করিয়া অনেক অল্পনয়-বিনয় করিয়া বলে, “বাবু, হাতে এত কাজ, তাই একা সব ক’রে উঠতে পারিনি।” সকলে বিরক্ত হইয়া চলিয়া যায়।

কথাটা সিদ্ধেশ্বর বাড়াইয়া বলে। আসলে কিন্তু কাজের প্রতি মনোযোগ তাহার সকল সময় থাকে না। সকলে চলিয়া গেলে হয়ত সে চশমাখানি খুলিয়া রাখিয়া বাহিরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। অনেকক্ষণ পরে কেমন যেন চোখ দুইটি তাহার ছলছল করিয়া উঠে। কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছিয়া সে আবার কাজ করিতে থাকে। এমনি অন্তমনস্কতায় তাহার দিন কাটে, কাজের উপর কাজ জমিয়া যায়।

এক একদিন ভোর হইতে আবার এত ব্যস্ততাসহকারে কাজ করিতে থাকে যেন একটু নিঃখাস ফেলিবারও তাহার সময় নাই। স্ত্রী লক্ষ্মী আসিয়া বলে,—“আজ যে নাওয়া-খাওয়া একেবারে ছাড়লে দেখছি। পরের কাজ নিয়ে এত খেটে কি লাভ বল ত? পরস্য ত যা দেয়। শরীরে তোমার ক-খানা হাড় ছাড়া আর কি আছে।” সিদ্ধেশ্বর জবাব দেয় না, নিঃশব্দে কাজ করিতে থাকে।

সিদ্ধেশ্বরের জীবনকাহিনী বলিতে গেলে সেই স্ত্রে তাহার ছোটবেলাকার কথাও আসিয়া পড়ে।

তখনকার দিনে তাহার বাপ বংশীবন্দনই ছিল সেই পল্লীতে একমাত্র লেখাপড়া-জানা লোক। জমিদার-সরকারে সে তহশীলদারের কাজ করিত।

পাড়ায় তাহার বেশ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। কাহাকেও উপদেশ দিয়া, কাহারও ঝগড়-বিবাদ মিটাইয়া দিয়া, কাহাকেও দু-চার টাকা সাহায্য করিয়া সে বেশ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। পাড়ার সকলেই বিপদে-আপদে তাহার নিকট ছুটিত।

পুত্র সিদ্ধেশ্বরকে কিন্তু বংশী কোনদিন পাঠশালায় পাঠাইতে পারে নাই। এমনি ডান্‌পিটে ছেলে ছিল সে। একটি ছিপ হাতে করিয়া কেবল এ-পুকুর হইতে ও-পুকুর ঘুরিয়া বেড়ায়। কোথায় এক ছেলে না-কি তাহার ছিপের আগায় টিল ছুঁড়িয়াছে, ছুটিয়া গিয়া তার গালে এক চড় বসাইয়া দেয়।

বিকালবেলা দেখে, একটি ছেলে ঘুড়ি লইয়া মাঠে যাইতেছে, সে তাড়াতাড়ি আসিয়া বলে,—“ভাই, আমাকে একটু উড়াতে দিবি?” ছেলেটিও আপত্তি করে না।

তারপর মাঠে গিয়া সিদ্ধেশ্বর মনের সুখে ঘুড়ি উড়ায়, ছেলেটিও দেখিয়া বেশ খুশী হয়, ভাবে—নূতন সঙ্গীটি কত উপরে তুলিয়াছে, বাপ রে—সে তো মোটেই পারে না। কিন্তু সিদ্ধেশ্বর কতক্ষণ পরে ঘুড়িটি লইয়া এক দৌড় দেয়। ছেলেটি ত কাঁদিতে কাঁদিতে পিছনে পিছনে ছুটিয়া মরে। সিদ্ধেশ্বর ততক্ষণে বাড়ি পৌঁছিয়া গেছে, ছেলেটি পরে বংশীর নিকট নালিশ করিয়া নাটাই লইয়া যায়।

একদিন টিল ছুঁড়িয়া কাহার একটি ছাগল ত সে মারিয়াই ফেলিয়াছিল, শেষে মালিককে অনেক বুঝাইয়া তবে বংশীর ইজ্জত বাঁচে। বাপ ত তাহার আশা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে, এমন ছেলে মরিলেই বাঁচে। রাতদিন ইহার যত্নগায় ভুগিবে কে। খুশী মত বাড়ি ফেরে, কখন আসিয়া চুপি চুপি ভাত খাইয়া যায়।

কোথাও যাত্রাগান হইতেছে শুনিলেই আর সিধুকে পায়

কে? এমনি তাহার সখ, আহার নিজা তুলিয়া ছুটে। ছেলোটোর ভয়-ভয় বলিয়া যেন কিছু নাই। ভূতপ্রেতের ভয় দেখাইলে বলে—“হঁ, ওসব আমার সাথে খাটে না, আত্মক ত দেখি সাধনে, পিটিয়ে ঠিক করে দেব না।”

একদিন পাড়ার ছেলেরা যুক্তি করিয়া এক জনকে ভূত সাজাইয়া বাঁশঝাড়ের তলায় বসাইয়া দিল। সিদ্ধেশ্বর সেই পথ দিয়া আসিতে এই নকল ভূত একটি বিকৃত শব্দ করিয়া তাহার সামনে পড়িল। সিদ্ধেশ্বর কিন্তু সহজে কাবু হইবার ছেলে নয়। এ সমস্তই যে শয়তানী তাহা তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না। আর কি, হাতের বেতটি দিয়া পিটাইতে পিটাইতে ভূতকে আধ-মরা করিয়া ছাড়ে। ভূত কাঁদিয়া উঠিয়া বলে,— “আমি ভোলা রে, আমি ভোলা।” সিদ্ধেশ্বর হাসিয়া বলে,— “তুই এখানে কেন, আমার ভয় দেখাতে, না?”

যাত্রাগানে একটা কিছু সাজিতে সিদ্ধেশ্বরের অনেক দিন হইতেই সখ। সে ভাবে, রাজ্য সাজিয়া, গান গাহিয়া এতগুলি লোককে খুশী করিতে পারা যেমন-তেমন নয়; সেখানকার ঝকমকে পোষাকগুলি পরিতে তাহার বড়ই ইচ্ছা হয়। তাহার সবচেয়ে ভাল লাগে যুদ্ধের দৃশ্যটা। কি ভয়ানক! চকচকে তলোয়ারগুলি ঠকাঠক শব্দে কাঁপিয়া উঠিতেছে। ঝাড়লঠন, ফাহুস সব এখনই ভাঙিয়া বুঝি একাকার হইয়া যাইবে। সারা দেহ তাহার একেবারে কাঁটা দিয়া উঠে।

তারপর কোন রকমে সে একটি যাত্রাদলে জুটিয়া গেল। কি আনন্দ তাহার! কত বড় বড় জমিদার, রাজার বাড়িতে তাহাদের ডাক পড়ে। একদিন ঐ সব সাজিয়া সে ত সকলকে একেবারে কাঁদাইয়া দিয়াছিল। চারিদিক হইতে অসংখ্য লোকের আবেগধ্বনি শুনিয়া তাহারও চোখে জল আসিয়াছিল। সেদিন সে আর গাহিতে পারে নাই। এ-পর্যন্ত গোটা-পাঁচেক রূপার মেডেল সে পাইয়াছে।

কিন্তু বালক-মন তাহার মা-বাপের জন্ত মাঝে মাঝে গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠে। অধিকারীর যখন-তখন অত্যাচার সে আর সহ্য করিতে পারে না। বাড়ির পুরাণো কথাগুলো মনে পড়ে। কতদিন মা ভাত বাড়িয়া তাহার জন্ত ছুরায়ে ঠেস দিয়া বসিয়া থাকিত, সে না আসিলে খাইত না। বাপের কাছ হইতে খুব মার খাইয়া যখন সে ঘরের পিছনে গিয়া হাঁটুতে মুখ লুকাইয়া কাঁদিত থাকিত, তখন মা আসিয়া চোখ

মুছাইয়া দিয়া তাহাকে সাধনা দিত। আজ সেই মায়ের স্নেহের নিবিড় বন্ধন ছিড়িয়া সে কত অজানা দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, না-জানি তাহার কোমল অন্তরখানি কেমন করিতেছে। নিরালস্য সেই মায়ের কথা ভাবিয়া তাহার বুকের ভিতরটা যেন কাঁপিয়া উঠে, চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসে।

তারপর নানা গোলমালে তাহাদের দল ভাঙিয়া গেল। সিদ্ধেশ্বর জমানো মাহিনার টাকাগুলি লইয়া বাড়ির দিকে রওনা হইল।

সেই তাহাদের গ্রাম চণ্ডীপুর। প্রথমে রৌদ্রে ঐ কদমগাছটির মাথায় বসিয়া কি একটা পাখীর একটানা সুর তাহার মনের তারে কাঁপন তুলিয়া দেয়। দূর হইতে ঝাঁঝিপোকর গুঞ্জন কানে আসিয়া বাজে। সিদ্ধেশ্বর শিষ দিতে দিতে চলো পথের ছু-ধারে বড় বড় বাঁশঝাড়, বেতবন বুঁকিয়া পড়িয়া একটা আলো-অন্ধকারভরা রহস্যের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার ভিতর দিয়া পল্লীলক্ষ্মী যেন তাহাকে ডাকিতেছে - ওরে আম, কিরে আম। গাছে গাছে আম পাকিয়া ঝরিয়া যাইতেছে। তাহা দেখিয়া তাহার ভিতরে অনেক দিন আগেকার ছরস্তুপনা জাগিয়া উঠে। ঐ ধানভরা মাঠ। ইহারই পাশে এক গাছতলায় বসিয়া সে বাঁশী বাজাইত। সেই সুর মাঠের শেষপ্রান্তে যেখানে আকাশ নামিয়া পড়িয়াছে সেইখানে গিয়া ধ্বনিত হইত।

এমনি নানা কথা ভাবিয়া বিশ্বয়পূর্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাইতে তাকাইতে সে প্রায় বাড়ির কাছে আসিয়া পড়িল। হঠাৎ খেয়াল চাপিল, মেডেলগুলি গলায় লুলাইয়া সে সবাইকে বেশ তাক লাগাইয়া দিবে। এখানে ত কেউ কোন দিন মেডেল দেখে নাই। ভোলা পথে সিদ্ধেশ্বরকে দেখিয়া কহিল,—“কি রে সিদ্ধেশ্বর, তুই হঠাৎ কোথেকে এলি? সেই যাত্রাদলে ছিলি এতদিন! বাঃ, তোর গলায় ওগুলো কি রে? একটু দেখতে দে না ভাই?”

সিদ্ধেশ্বর দেখিতে দেয়। ভোলা এপিঠ-ওপিঠ উল্টাইয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করে,—“এ সব কি দিয়ে তৈরি রে?”

সিদ্ধেশ্বর বলে,—“রূপার; বড় দাম এই মেডেলগুলোর। কত বড় বড় লোকেরা এ সব আমার দিয়েছেন আনিস? আমার গান শুনে তাঁরা এত খুশী হতেন।” বিশ্বয়ে ভোলার চোখ এত বড় হইয়া যায়।

বাড়িতে আসিয়া সিদ্ধেশ্বর দেখে, মা আড়িনা ঝাঁট দিতেছে। সর্বাঙ্গে তাঁর বিধবার চিহ্ন,—পরনে সাদা ধান ধুতি।

ছুটিয়া গিয়া সে মায়ের পা দুটি জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠে,—মা! মায়ের হাত হইতে ঝাঁটা খসিয়া যায়। পুত্রকে বুকে টানিয়া লইয়া মা অশ্রুসঞ্ছল চোখে তাহার কপালে চুম্বন দেয়। বলে,—“বুড়ো বাপটাকে আর দেখতে পারলি নে রে সিধু, এমনি পোড়া কপাল তোর।”

সিদ্ধেশ্বরের গৃহত্যাগের কয়েক মাস পরে তাহার বাপের মৃত্যু হয়। যা অল্পকিছু সে রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা ইতি-মধ্যেই ফুরাইয়া গিয়াছে।

সিদ্ধেশ্বরের স্বল্প সঞ্চয় দিয়াই এখন সংসার চলিতে লাগিল।

তারপর হইতে সিদ্ধেশ্বর বাড়িতে থাকিয়া মাটির বাসন তৈরি করে। ছোট ছোট কলসী, খালা বা ভাণ্ডের উপর সে কত সুন্দর ছবি আঁকে; পদ্মফুল, পদ্মপাতা, লক্ষ্মীর পা, এমনি কত কি। পাড়ায় ঘুরিয়া সে এই সব বেচে। মেয়েরা সিদ্ধেশ্বরের হাতের জিনিষ পাইলে খুশী হইয়া কেনে। মাঝে মাঝে মেলা হইলে সে গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মহাদেব, নানা প্রকার জীবজন্তু এবং আরও কত রকমের পুতুল তৈরি করিয়া সেখানে লইয়া যায়। ছেলেরা ভিড় করিয়া তাহার পুতুল দেখিতে আসে, অনেকে কেনেও। এমনি নানা উপায়ে তাহার জীবিকা-সংস্থান হয়।

মা বলে,—“সিধু, এবার একটি বিয়ে কর। বউ দেখে মরি।” সিধু লজ্জিত হইয়া বলে,—“আচ্ছা মা, সে হবে, অত ভাবনা কি?”

সিদ্ধেশ্বরের মনেও অনেকবার সেই কথা জাগিয়াছে। কিন্তু যাহাকে-তাহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা তাহার নাই। একবার মামার বাড়িতে এক বিবাহের নিমন্ত্রণে পাশের গায়ে হরিশ চৌকিদারের মেয়ে লক্ষ্মীকে দেখিয়া তাহার খুবই পছন্দ হইয়াছে। সুন্দর ভাসা-ভাসা চোখদুটো, গায়ের রঙও বেশ সুন্দর। ইহাকেই সে বিবাহ করিবে। মাকে নানা কৌশলে এই কথা সে জানায়। মা খুশী হইয়া ঘটক পাঠায়, শুভদিন দেখিয়া বিবাহের ঠিক হইয়া যায়।

সিদ্ধেশ্বর খুবই ঘটা করিয়া পাড়ার লোকদের নিমন্ত্রণ

করিয়াছে। ভোলা, পাচু, ধনা এদের ত বরযাত্রী বাইতেই হইবে। একখানি ঢাকাই কাপড় ও একটি কোট গায়ে দিয়া সিদ্ধেশ্বর বিবাহ করিতে চলিল। পাড়ার মেয়েরা দেখিয়া বলিল,—বেশ মানাইয়াছে কিন্তু সিদ্ধেশ্বর।

পরদিন নববধূ লক্ষ্মীকে লইয়া সিদ্ধেশ্বর কিরিয়া আসিল। আনন্দে তাহার মুখখানা ভরিয়া উঠিয়াছে। নিমন্ত্রিতগণকে আদর-আপ্যায়ন, নানা কিছুর তত্ত্ব-তালাস করিতে করিতে একটি দিনের ভিতর সে যেন বিশ্রাম করিবার একটু সময়ও পায় না। সকলেই খুশী হইয়া নবদম্পতীকে আশীর্বাদ করিয়া যায়।

বিবাহের আনন্দোৎসব শেষ হইবার কয়েক মাস পরে আবার শোকের আগুন জলিয়া উঠিল। একদিন প্রভাতে মাকে হারাইয়া সিদ্ধেশ্বর অবোধ বালকের মত কাঁদিতে কাঁদিতে বুক ভাসাইয়া দিল। সেই মা, যাহার স্নেহাঙ্কলে তাহার বাল্যজীবনের সমস্ত চঞ্চলতা ঢাকা পড়িয়াছিল, আজ সে তাহাকে ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেছে!

দিনের পর দিন যায়। কত নূতন নূতন সুখ-দুঃখ আসিয়া তাহার মাতাপিতার স্মৃতি ভুলাইয়া দিয়া যায়। এমনি করিয়া সংসার কাটে। কালের গতি-বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধেশ্বরের বয়স বাড়িয়া চলে।

ইতিমধ্যে তাহার দুইটি ছেলে একটি মেয়ে জন্মিয়াছিল। একটি ছেলে জন্মিবার বছরখানেক পরেই মরিয়া গেছে। আর একটি পাগল হইয়া সেই যে বাহির হইয়া গেছে তাহার আর খোজখবরই নাই। মেয়েটিকে গত বৎসর অবস্থাপন্ন ঘর দেখিয়া বিবাহ দিয়াছিল। কিন্তু মেয়ের ভাগ্যে সে-সুখ ঘটিল না, ছয় মাসের ভিতরই বসন্ত-রাগে সে মারা গেল।

এমনি করিয়া তিন-তিনটি আঘাত তাহার বুকে পর-পর তীরের মত বিধিয়াছে। তাই বয়স বেশী না হইলেও তাহার শরীর শীর্ণ হইয়া গেছে, আগের মত শক্তি আর নাই।

সংসারে তাহার ভরসা কেবল লক্ষ্মী। এই বধূর পানে চাহিয়া সে সমস্ত শোকতাপ ভুলিয়া যায়। লক্ষ্মী যেন শাস্তির মূর্তিমতী প্রতিমা। লক্ষ্মী সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত শাস্তচিন্তে গৃহকর্ম করিয়া যায়। সিদ্ধেশ্বর অবসর পাইলে একবার সেই কর্মরতা আদর্শ গৃহিণীকে দেখিয়া লয়। তাহার বেদনাক্লিষ্ট মুখে তৃপ্তি ও আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠে।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় বেলগাছটার তলায় তুলসীমণ্ডপে একটি মাটির প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিয়া লক্ষ্মী গলবস্ত্র হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করে। কতদিন একটি ছেলের অল্প মাতৃহত্যার কত আকুল মিনতি ঠাকুরের পায়ে চোখের জলে ঝরিয়া পড়িয়াছে। লক্ষ্মী প্রার্থনা শেষ করিয়া দেখে, বাতাসে প্রদীপখানি নিবিয়া গেছে।

অনেক দিন পরে লক্ষ্মীর এক ছেলে হইল। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষার ধন—আধার ঘর আলো করিয়া সাত রাজার দৌলত এক মাণিক। সিদ্ধেশ্বর তাহাকে কোথায় রাখিবে ভাবিয়া পায় না।

প্রতিদিন ভোরে উঠিয়া সিদ্ধেশ্বর খোকাকে কোলে তুলিয়া নাচায়। একটি তালপাতার সিপাই সে মেলা হইতে কিনিয়া আনিয়াছে। তাহা নাড়িয়া নাড়িয়া খোকাকে খেলা দেয়। খোকা যখন কাঁদিয়া উঠে তখন সে কত রকমের অজভঙ্গী করিয়া খোকাকে খামাইতে চায়। ব্যাপার দেখিয়া লক্ষ্মী হাসিয়া ঘরখানা কাঁপাইয়া তোলে।

খোকার অন্নপ্রাশনের দিন সিদ্ধেশ্বর কয়েক জন বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিল। গণক-ঠাকুর ছেলের কোষ্ঠী দেখিয়া কহিলেন—ছেলেটি বড় হইলে লেখাপড়া শিখিয়া স্বখে ঘর করিবে,—ছয়ারের পাশ হইতে লক্ষ্মীর বুকখানা আশায় আনন্দে নাচিয়া উঠে। সিদ্ধেশ্বর আকাশের দিকে দু-হাত তুলিয়া প্রার্থনা জানায়, মনে মনে ভাবে, ছোটকালে লেখাপড়া না-শিখিয়া তাহার জীবনটি বৃথাই হইয়াছে। খোকাকে নিশ্চয়ই লেখাপড়া শিখাইতে হইবে। সকলে মিলিয়া ছেলের নাম রাখে মাণিক।

তারপর সন্ধ্যায় বসিয়া এই খোকাকে কেন্দ্র করিয়া তাহার দু-জনে স্বখের নীড় বাঁধিবার কত কল্পনা-অল্পনা করে, লক্ষ্মী বলে,—“এই খোকা বড় হইয়া অজ হইবে।” সিদ্ধেশ্বর তাহা কিছুতেই মানিতে চায় না, সে বলে,—“ছেলে আমার দারোগা হবে যে।” লক্ষ্মী হাসিয়া উঠে, বলে—“দূর পাগল, অজ যে দারোগার চেয়ে অনেক বড়, মাইনেও তার অনেক বেশী।” সিদ্ধেশ্বরের তাহা ভাল লাগে না, বলে,—“না-না, দারোগাই হবে, অত বেশী মাইনে দরকার নেই আমাদের।”

সিদ্ধেশ্বরের এই প্রবল ইচ্ছার কিছু কারণ আছে। তাহার ছোটবেলায় একবার এক দারোগা এক বাড়িতে

চুরির ভদ্র করিতে গিয়াছিল। সে-বেচারি তাহাশা দেখিতে গিয়া অনর্থক দারোগা সাহেবের একটি কানমলা খাইয়াছিল। সেই ঘটনাটি তাহার এখনও মনে আছে। তাই সে অনেক দিন হইতে প্রার্থনা করিয়া আসিতেছে, তাহার একটি ছেলে যেন উত্তরকালে দারোগা হইয়া কারণে-অকারণে মাহু-ঘর কান টানিবার অধিকার পায়। শুনিয়া লক্ষ্মীও ভাবে—ছেলেকে দারোগা হইতে হইবে।

কিন্তু স্বখের নীড় আর বাঁধা হইল না। সিদ্ধেশ্বর যেন দুর্ভাগ্যের জয়লিপি বুকে করিয়াই জন্মিয়াছিল। এতদিন পরে সে তাহার আদরের লক্ষ্মীকেও হারাইল।

মৃত্যুশয্যায় লক্ষ্মীর বেদনাপাতুর মুখখানি দেখিয়া সিদ্ধেশ্বর বন্ধে করাঘাত করিয়া উঠে, উপরের দিকে চাহিয়া ডাকে—“হে ভগবান! আমার সকল কিছুই গ্রহণ করিয়া লক্ষ্মীকে বাঁচাও।” লক্ষ্মীর কপালে হাত দিয়া ভাঙা গলায় বলে—“এর পর থেকে আমার কি ক’রে চলবে, লক্ষ্মী?” লক্ষ্মী শুধু চোখ তুলিয়া তাহার পানে তাকায়, সেই চোখের কোণে জল ছল্‌ছল্ করিয়া উঠে।

মাতৃহারা ছেলোটর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সিদ্ধেশ্বর আকুল হয়। কচি শিশুটি যখন সমন্বিত দুধ না পাইয়া কাঁদিয়া উঠে, সিদ্ধেশ্বর তখন পাগলের মত হইয়া যায়। এমনি করিয়া ত আর চলে না!

একদিন খোকাকে কোলে করিয়া সিদ্ধেশ্বর পাশের বাড়ির এক বৃদ্ধার কাছে গিয়া বলিল,—“সোনাপিসি, এ সংসারে যে আর মন বসে না। লক্ষ্মী ত এমনি যায় নি, আমার বুকখানা যে একেবারে ভেঙে দিবে গেছে। এখন থেকে বাইরে ঘুরে বেড়াব। খোকাকে তোমায় দিয়ে গেলুম, তুমি তাকে মাহুষ ক’রো।” বচিতে বলিতে তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল। সোনাপিসির হাতে খোকাকে আর কতকগুলি টাকাও দিয়া সে সেইদিনই ঘর ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেল কেহই জানিল না।

তারপর অনেক বৎসর কাটিয়া গেছে। সিদ্ধেশ্বর কত তীর্থে তীর্থে যে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে তাহার হিসাব নাই। পরনে একখানা ময়লা ধুতি, গায়ে একটি বিরাট টিলে জামা, হাতে একটি লাঠি। ঐ-পোষাকে সীত গ্রীষ্ম বর্ষা সে কাটাইয়া দেয়। পথে পথে ঘোরে, আপন মনে কত কি

বকিয়া যায়। পথ চলিতে চলিতে ছোট ছেলে দেখিলেই কেমন যেন সিঁদেখর হঠাৎ খামিয়া যায়, একদৃষ্টে তাহাদের পানে চাহিয়া থাকে। ছেলেরা তাহার অদ্ভুত চেহারা ও পোষাক দেখিয়া ভয়ে ছুটিয়া পালায়।

সেই পুরাতন গ্রাম চণ্ডীপুর আবার অনেক বৎসর পরে তাহার বিবাহী ছেলেকে সঙ্গেহে আহ্বান করিল।

সিঁদেখর ঘুরিতে ঘুরিতে গ্রামে গিয়া পড়িল। নূতন, সবই নূতন। কিছুই ত সে চিনিতে পারে না। ঐ না জমিদার-বাড়ির ভাড়া মন্দির? সেই অনেক দিনের পুরানো কাহিনীগুলো চোখের উপর দিয়া ছবির মত একে একে ভাসিয়া যায়। এইটি না সোনাপিসির বাড়ি? এখানে আবার মাটির দালান উঠিল কবে? সমস্ত হৃদয় তাহার বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া উঠে।

সিঁদেখর যখন এই গ্রামে ছিল তখন সোনাপিসির বাড়ির সম্মুখে খানিকটা খালি-জমি সে দেখিয়াছে। সেইখানে এককালে সোনাপিসির বড়ছেলে কত শাক-সজ্জীর ক্ষেত করিয়াছে। তারপর ছেলেটি বিদেশে চাকরি করিতে গিয়া মরিয়া যাওয়ার পর আর কেহই সেখানে ক্ষেত করে নাই। সিঁদেখরের মনে আছে—ছোটকালে পাড়ার ছেলেদের সাথে মিশিয়া সে সেখানে হাড়ডুডু, কাণামাছি খেলিয়াছে। আজ দেখে, সেখানে একটি পুকুর। তাহার চারি পাড়ে স্তপারী, কলা ও নারিকেল গাছ সারি সারি সাজান রহিয়াছে। এতদব গৃহস্থালী করিল কে, সিঁদেখর ভাবিয়াই কুল পায় না।

সে দেখিল, সেই পুকুরের পাড়ে তালগাছের নীচে বসিয়া একটি ছেলে বাঁশী ফুঁকিতেছে। সে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ তাহাকে দেখিল। ছেলেটি হঠাৎ সিঁদেখরকে দেখিয়া ভয়ে চমকিয়া উঠিল। সিঁদেখর ধীরে ধীরে তাহার কাছে গিয়া তাহার পাশে বসিল। ছেলেটি কিছু দূরে সরিয়া গিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। সিঁদেখর হাসিয়া বলিল,— “ও, তুমি বুঝি ভয় পেয়েছ খোকা। আমি ত বড়ো মাহুষ, ভয় কি। এস আমার কাছে। এই নেবে কেমন সুন্দর পুতুল।” বলিয়া সে বলি হইতে একটি হাতভাড়া পুতুল তুলিয়া নেয়। ছেলেটি দূর হইতে সতৃষ্ণমনে সেটির দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর ভয়ে ভয়ে কাছে আসিয়া পুতুলটি

লইল। এদিক-ওদিক দোখিয়া বলিল,—হাত একখানা তো ভাড়া! সিঁদেখর অনেক খুঁজিয়া বলি হইতে একটি টিনের বাঁশী তাহার হাতে দিল। ছেলেটি খুশী হইয়া বাঁশীতে ফুঁ দেয়। সিঁদেখর একদৃষ্টে ছেলেটির আনন্দোজ্জ্বল মুখের পানে চাহিয়া থাকে। এমনি করিয়া কিছুক্ষণের ভিতর তাহাদের উভয়ের বেশ ভাব হইয়া গেল। ছোটখাট করেকটি কথাও হইল। সিঁদেখর জানিতে পারিল, ছেলেটির নাম বিষ্ণু, বাপের নাম মাণিক। নাম শুনিয়া সে হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। এ্যা, তাহার ছেলে মাণিক! সেই ছয় মাসের শিশু মাণিককে সে সোনাপিসির হাতে তুলিয়া দিয়াছিল, তাহার ছেলে হইয়াছে! বহুদিনের স্তম্ভ পিতৃস্নেহ তাহার অন্তরে জাগিয়া উঠিল। আহা, না-জানি তাহার মাণিকের কি রকম চেহারা হইয়াছে। সে বলিল—‘চল খোকা, তোমায় তোমাদের বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিবে আসি।’

বিষ্ণু হঠাৎ এই কথা শুনিয়া ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। কিছুদিন আগেকার একটি ঘটনা তাহার মনে পড়িয়া গেল। তাহাদের পাশের বাড়ির হারান একদিন দুপুরে মাঠের ধারে বসিয়াছিল। কোথাকার একটি অচেনা অদ্ভুত চেহারার লোক নাকি তাহার কাছে আসিয়া অনেকক্ষণ গল্প করিয়া শেষটায় কোথায় যে তাহাকে লইয়া গেল, কেহই জানিতে পারিল না। তার পরদিন অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাহাকে পাওয়া যায়। সেইদিনই সে মায়ের কাছে শুনিয়াছে, ইহার নামকি ছেলেধরা, ছোট ছোট ছেলেকে একলা পাইলে ধরিয়া লইয়া যায়।

বিষ্ণু আর থাকিতে পারিল না। ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে একদৌড়ে একেবারে বাড়িতে আসিয়া ঢুকিল। সিঁদেখর বিস্মিত হইয়া তাহার পানে তাকাইয়া রহিল। শেষে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বিষ্ণুর বাঁশীটি কুড়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে মাণিকের বাড়ির আড়িনায় আসিয়া দাঁড়াইল।

মাণিক ঘরের দাওয়ায় বসিয়া জাল বুনিতোছিল। সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে সে আগন্তকের দিকে চাহিল।

সিঁদেখর অবাধ হইয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। একটি মেয়ে ঘর লেপিতেছিল, সিঁদেখরকে দেখিবামাত্র সে মাটি-মাখা হাতে ঘোমটাখানা মুখের উপর টানিয়া দিল। এইটি তাহার পুত্রবধু হইবে নিশ্চয়ই। সোনাপিসির সাদাশক

ত একেবারে পাওয়া যায় না। নিশ্চয়ই সে মরিয়া গেছে। নতুবা উঠানে পা ছড়াইয়া দিয়া চরকার শব্দে সে এতক্ষণ পাড়া মাতাইয়া তুলিত। তাহার সাধের চরকাটি ঐ ত বেড়ার পাশে পড়িয়া রহিয়াছে।

সিদ্ধেশ্বর নিকটে গিয়া মাণিকের সম্মুখে বাঁশীটি রাখিয়া কল্পিত স্বরে বলিল,—“ছেলেটি পুকুরপাড়ে এটি ফেলে এসেছিল।” আর কিছুই সে বলিতে পারিল না। কামায় তাহার কণ্ঠস্থ হইয়া আসিল, কিন্তু জোর করিয়া সে আপনাকে সংযত করিল। এই তাহার ছেলে মাণিক! কিন্তু হায় সে ত তাহার বাপকে চিনিবে না। ছোটকাল হইতেই যে সে সোনাপিসির হাতে মাহুষ, বাপ যে তাহার আছে একথাও ত সে জানে না। আজ সোনাপিসি থাকিলে হয়ত তাহাকে চিনিত।

লোকটির পাগলের মত হাবভাব দেখিয়া মাণিকের মন করুণায় ভরিয়া উঠিল। সে ভাবিয়াছিল, কোন ভিখারীই হইবে বোধ হয়। হয়ত ক্ষুধার জ্বালায় বিস্তর কাছে কিছু চাহিয়াছিল, তাই বিস্ত ভয় পাইয়াছে।

স্বদীর্ঘ পথ হাটিয়া সিদ্ধেশ্বর পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, তাই মাণিকের নিকট হইতে একঘটি জল চাহিয়া লইল। ছেলের ঘরের এই জল যেন আজ অমৃত—পান করিয়া তৃপ্ত হইয়া তাহার জুড়াইয়া গেল।

বহুদিন আগে তাহার বাগনা ছিল—ছেলেকে মাহুষ করিবে। আজ ছেলে মাহুষ হইয়াছে। স্বখে-শান্তিতে ভরা একটি সোনার সংসার মাণিক গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াই ত তাহার তৃপ্তি। আকাশের পানে চাহিয়া কপালে দুই হাত ঠেকাইয়া সে পরমপিতার প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল।

তারপর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে সে সেখান হইতে চলিয়া আসিল। আজ এই সংসারে পুরাতন পরিচয় তাহার কিছুই নাই। সেই কত বৎসর আগে যে সে ঘর ছাড়িয়াছে, আর ত ঘরে ফিরিবার উপায় নাই। আজ বিশ্বের সীমাহীন পথ তাহার জন্ত মুক্ত।

বাঁশঝাড়, বেতবনের পাশ দিয়া, ধানক্ষেতের উপর দিয়া এই বিবাগী পথিক আবার পথচলা শুরু করিল।

অর্থহীন

শ্রীশুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী

অর্থহীন অভিযোগ কেন বার-বার ?

একবার দেখ ত ভাবিয়া,

অকারণে ব্যথা দেব তোমার পরাণে

এত কি কঠিন মোর হিয়া ?

ভাল তোমা বাসি কি না—বলিয়া কি লাভ ?

অবিশ্বাস করিবে সে কথা ;

কিন্তু এ বিশ্বাস করো—কাহারো পরাণে

ব্যথা দিতে আমি পাই ব্যথা।

বিরাট প্রতিভা নাই, ঐশ্বর্য প্রচুর ;

তবু এক তৃপ্তি আছে চিত্তে—

যাদের পেয়েছি কাছে চেয়েছি সবারে

অকৃপণ ভালবাসা দিতে।

আর তুমি ! নিজ কানে নাইবা শুনিলে

মোর কাছে কি তোমার দাম ;—

আমারে বুঝিয়া তুল ফিরায়েছ মুখ,

আমিও নীরব রহিলাম।

শুধু এই শুনে রাখ, আর দয়া করে

পার যদি করিও প্রত্যয়—

ভালবাসা মিথ্যা যার তাহার আদাত

কোন দিন গুরুতর নয়।

টেলিভিসন

শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এসসি

পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের কথা আমরা বরাবরই শুনে আসছি। বিরাট সৃষ্টির দিক থেকে অথবা অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্য ও কীর্তির দিক থেকে দেখতে গেলে এগুলি দেখে সবাইকে আশ্চর্য হতেই হবে, কিন্তু মানবজাতির উপকারে এরা কতটুকুই বা লেগেছে? চীনের প্রাচীরই হোক আর ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যানই হোক, রোডস্‌ দ্বীপের পিতলের মূর্তিই হোক আর আফ্রিকার পিরামিডই হোক এরা মানুষের বিশেষ কোন বড় উপকারেই লাগেনি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জগতের দিকে একবার তাকালেই আমরা বেশ বুঝতে পারব মানুষের পরম উপকার করছে, এমন নিত্য নূতন কত অদ্ভুত ঘটনাই না ঘটছে। মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে কে কবে ভাবতে পেরেছিল যে নীলাকাশের উপর দিয়ে এমন নিশ্চিত নির্ভর ভেসে যেতে পারবে কিংবা একই স্থানে বসে পৃথিবীর অন্ত দেশের লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারবে? মানুষ আজ ভগবানের দেওয়ান ও চোখ ছাড়া বৈজ্ঞানিক কান ও চোখ তৈরি করে, তাঁর দেওয়া নির্দিষ্ট সীমার বাইরেও দেখতে বা শুনতে পাচ্ছে। শুধু তাই নয়, মানুষ আজ অন্ধকে চক্ষু দিয়েছে, প্রাণহীনে প্রাণসঞ্চার করে তার মুখে ভাষা জুগিয়েছে। এত স্বপ্ন নয়—এত মিথ্যা নয়—এ যে সত্য!

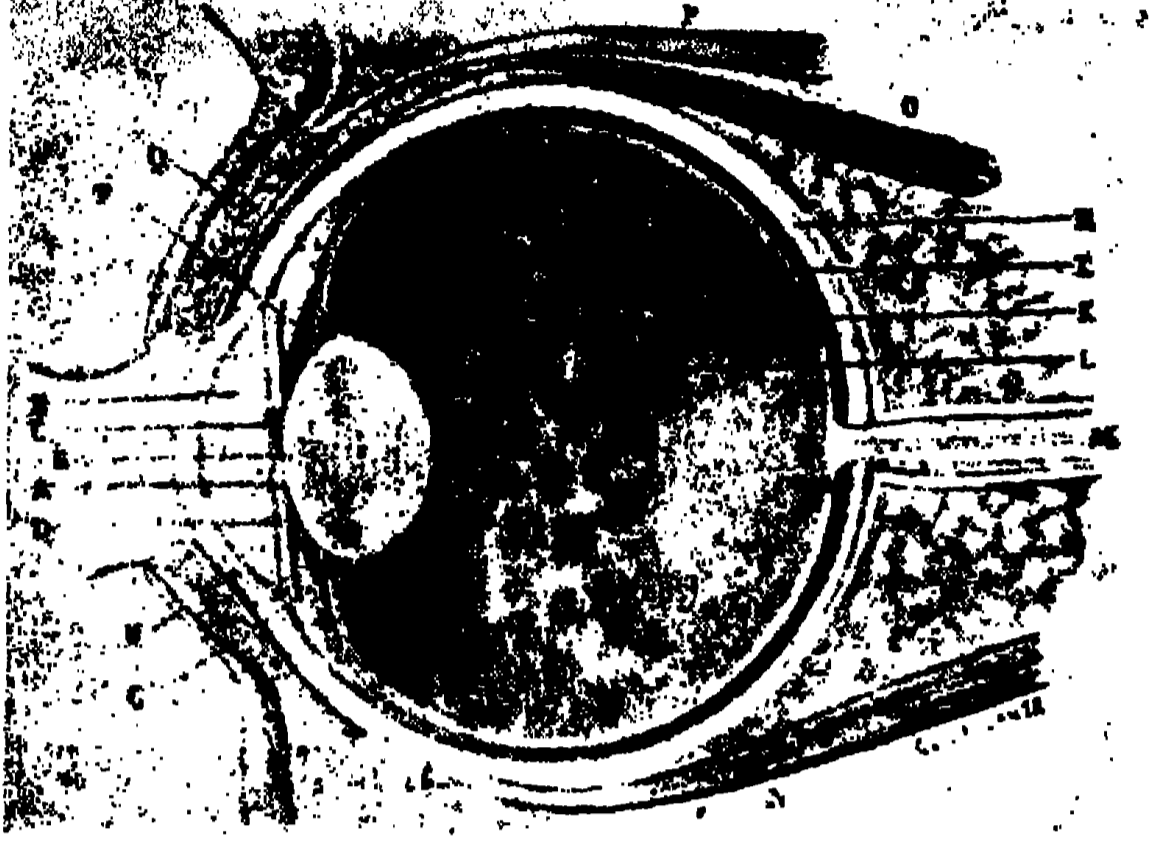
বেতारे যেমন খবর পাঠানো যায় এবং সেই খবর অল্প লোকে জানতে পারে তেমনি আপনারা হয়ত জানেন যে তা দিয়ে আবার ছবিও পাঠানো যায়। আজ পর্যন্ত দু-রকম ভাবে ছবি পাঠানো হয়ে আসছে—হয় কোন জিনিষ বা প্রাণীর ছবি থেকে, না-হয় কোন সচেতন প্রাণীর বা জিনিষের থেকে। মনে করুন, কলকাতার বায়স্কোপ, থিয়েটার দেখে আপনাদের কারুরই আর ভাল লাগছে না। ইচ্ছা হ'ল লণ্ডনের বায়স্কোপ, থিয়েটার দেখার—আর অমনি আপনি দেখতে পাবেন এইখানে বসেই। কিংবা মনে করুন, ইউরোপে তুমুল যুদ্ধ বেধেছে, আপনি চান দেখতে—বেশ! পাবেন দেখতে এইখানে বসেই। কারুর বা ইচ্ছা হ'ল সুইডেনের পার্বত্য

শোভা দেখবার—কোন কষ্ট নেই, এইখানে বসেই সব দেখতে পাবেন। কোন জিনিষের বা প্রাণীর ফটো বা ড্রয়িং থেকে যে-উপায়ে দেশান্তরে তাদের ছবি পাঠানো হয় তার নাম ফোটো-টেলিগ্রাফী (Photo-telegraphy). আর জীবন্ত প্রাণীর চলাফেরা বা গতির ছবি কিংবা কোন দৃশ্যের সজীব ছবি পাঠানোকে ইংরেজীতে টেলিভিসন বলে। ফোটো-টেলিগ্রাফী এবং টেলিভিসনের দুটো ছবি দিলুম, দেখুন পাঠানো ও

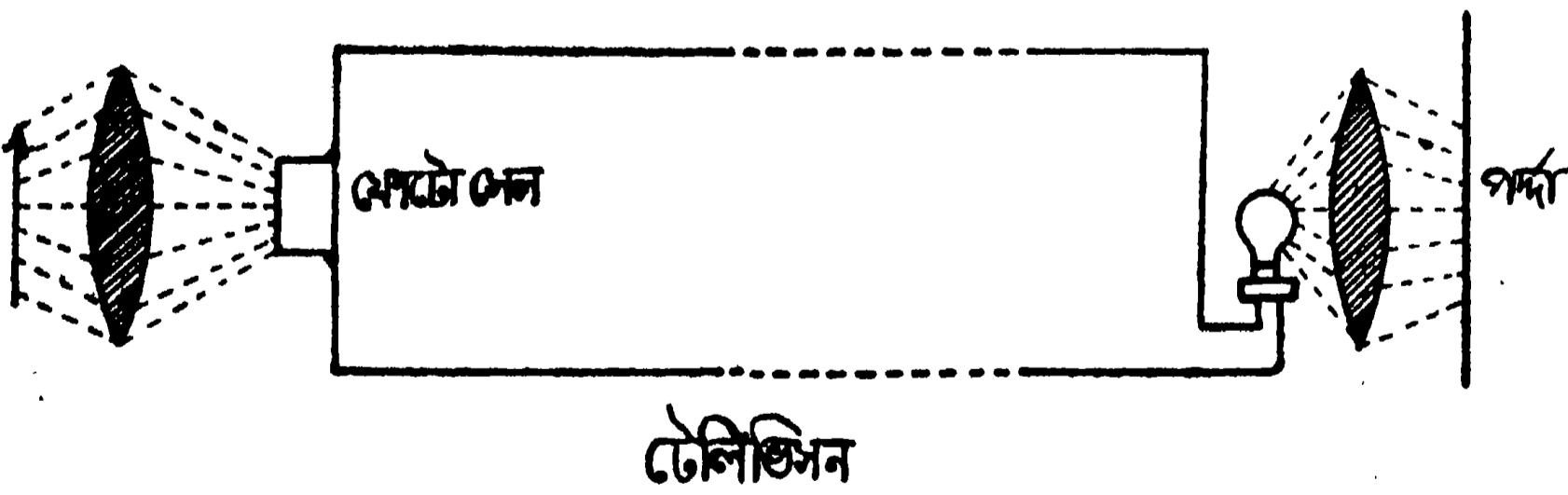
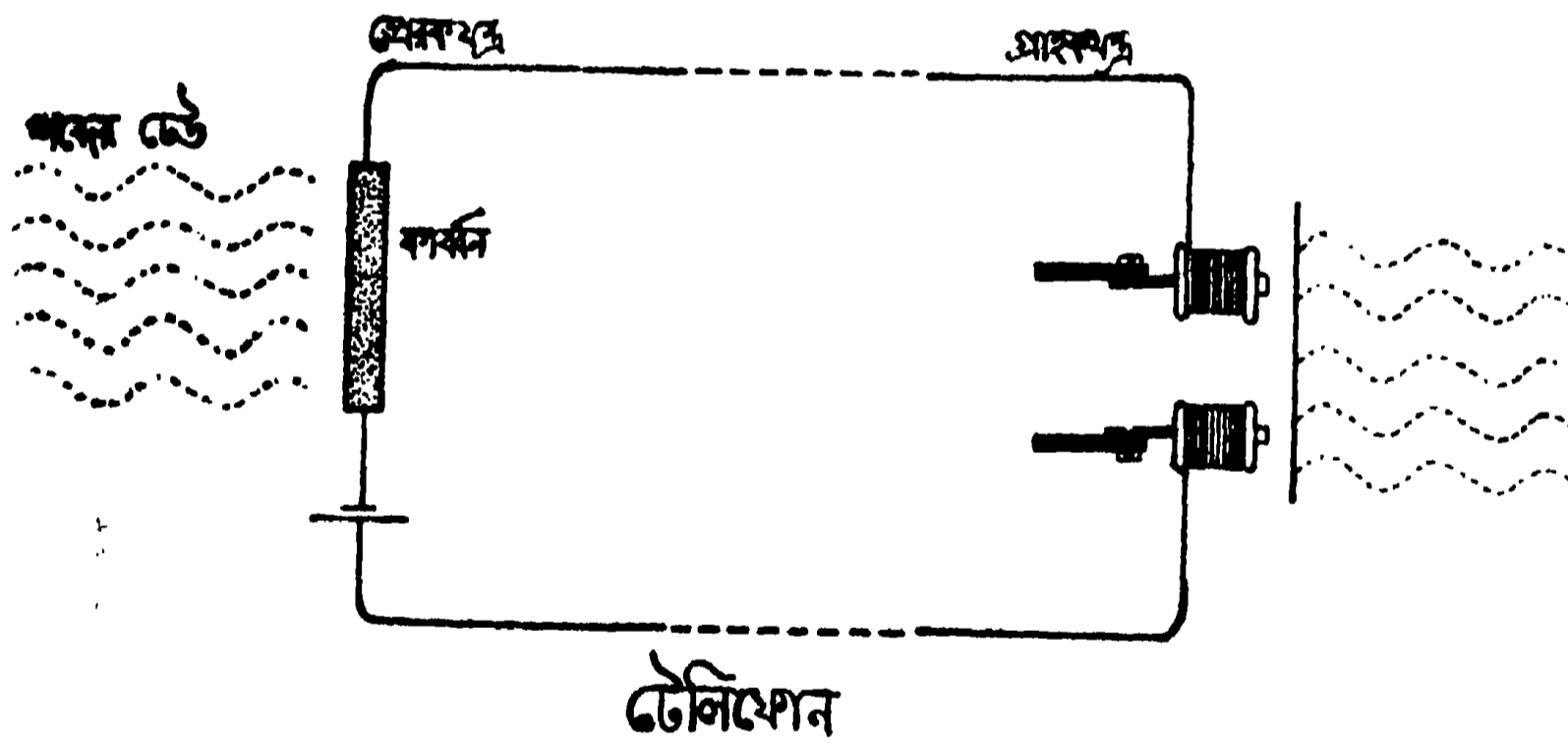


পাওয়া ছবির ভিতর কোন প্রভেদই বুঝতে পারবেন না। এই টেলিভিসন নিয়ে আজ সারা জগতে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। টেলিস্কোপ, টেলিফোন ও এরোগ্রেন প্রভৃতির কেমন করে সৃষ্টি হ'ল অর্থাৎ এদের ভিতরকার আসল কথাটা কি, এই বিষয়ে একটু ভাবলেই বুঝতে পারবেন যে প্রত্যেক আবিষ্কারটিই কোন-না-কোন প্রাকৃতিক জিনিষের অনুকরণে হয়েছে। টেলিস্কোপ হ'ল মানুষের চোখের পরকলার

(lens) অক্ষরণে, টেলিফোন হ'ল কানের সরু পাতলা চামড়ার (diaphragm) অক্ষরণে এবং এরোপ্লেনের যে ওড়ার শক্তি—সে পেল ঐ পাখীর ওড়ার মধ্য থেকে।



ঠিক তেমনি ক'রে সম্ভব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে আজ টেলিভিসন, মানুষের চোখের পর্দার (retina) অক্ষরণ ক'রে। এটাকে সম্পূর্ণ ক'রে তুলতে অবশ্য দরকার হয়েছে ফোটো-টেলিগ্রাফী এবং টেলিফোনের। এই তিনে মিলে গড়ে উঠেছে আধুনিক



টেলিভিসন। ওটা স্পষ্ট ক'রে জানতে হ'লে ঐ তিনটে বিশেষ ক'রে জানা চাই।

টেলিফোনটা কি এবং কেমন ক'রেই বা তার থেকে কথা বের হয় তাই আমাদের প্রথম জানা দরকার। আমরা যখন

ফোনটা মুখের কাছে তুলে ধ'রে কথা বলতে থাকি তখন আমাদের মুখের কথা থেকে শব্দের ঢেউয়ের (sound waves) সৃষ্টি হয় এই ঠাধারে। সেই ঢেউ গিয়ে লাগে একটা পাতলা ষ্টীলের গোল চাকৃতিতে যার তলায় আছে অসংখ্য ছোট ছোট কারবনের গুঁড়ো আরও একটা ঐ রকম পাতলা চাকৃতির ওপর। তার ফলে কি হয়? সেগুলো নাচতে শুরু ক'রে দেয়—কোনটা জোরে কোনটা বা আশ্বে। জোর অবশ্য নির্ভর করছে আমাদের শব্দের মাত্রা উচ্চারণের ওপর। তাতে ক'রে ওর যে প্রতিবন্ধকতা (resistance), সেটাকে বাড়ায় বা কমায়, সুতরাং ওর বৈদ্যুতিক প্রবাহটাও সেই অনুপাতে কমে বা বাড়ে। শব্দটা বেশী দূরে পাঠানো অসম্ভব ব'লে তাই শব্দের ঢেউ থেকে সৃষ্টি হ'ল বৈদ্যুতিক প্রবাহের (current)— যা অনেক দূর পর্য্যন্ত সহজেই পাঠানো যায়। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বিদ্যুৎ-প্রবাহটা না হয় শেষ-পর্য্যন্ত পাঠালুম, কিন্তু তার থেকে আবার শব্দই বা হবে কি ক'রে? তার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, এই যে প্রবাহ এটা তো তারের ভিতর দিয়ে চলল। চলতে চলতে গিয়ে পড়ল সেইখানে যেখানটায় আমরা কান

দিয়ে শুনি। তার মধ্যে আছে কেবল দুটো ছোট লম্বা অথচ গোল নরম লোহার গায়ে জড়ানো খুব সরু নীল তার। ওর ইংরেজী নাম ইলেকট্রো-ম্যাগনেট (যদি কোন বিদ্যুৎ-প্রবাহ এর ভিতর দিয়ে যেতে দেওয়া হয় তবে সেই সময়টুকুর জন্য এটি হয়ে যাবে চুম্বক অর্থাৎ আকর্ষণ করার গুণ পাবে)। তারই ঠিক সামনে আছে একটা ষ্টীলের পাতলা গোল চাকৃতি বিদ্যুৎ যাওয়ার ফলে ঐ পাতলা কাপতে শুরু ক'রে দেয় আশ্বে ও জোরে এবং তারই থেকে আবার সৃষ্টি হয় শব্দের। তখনই আমরা শুনতে পাই। পাশের ছবি দেখলেই বুঝতে পারবেন শব্দের ঢেউ

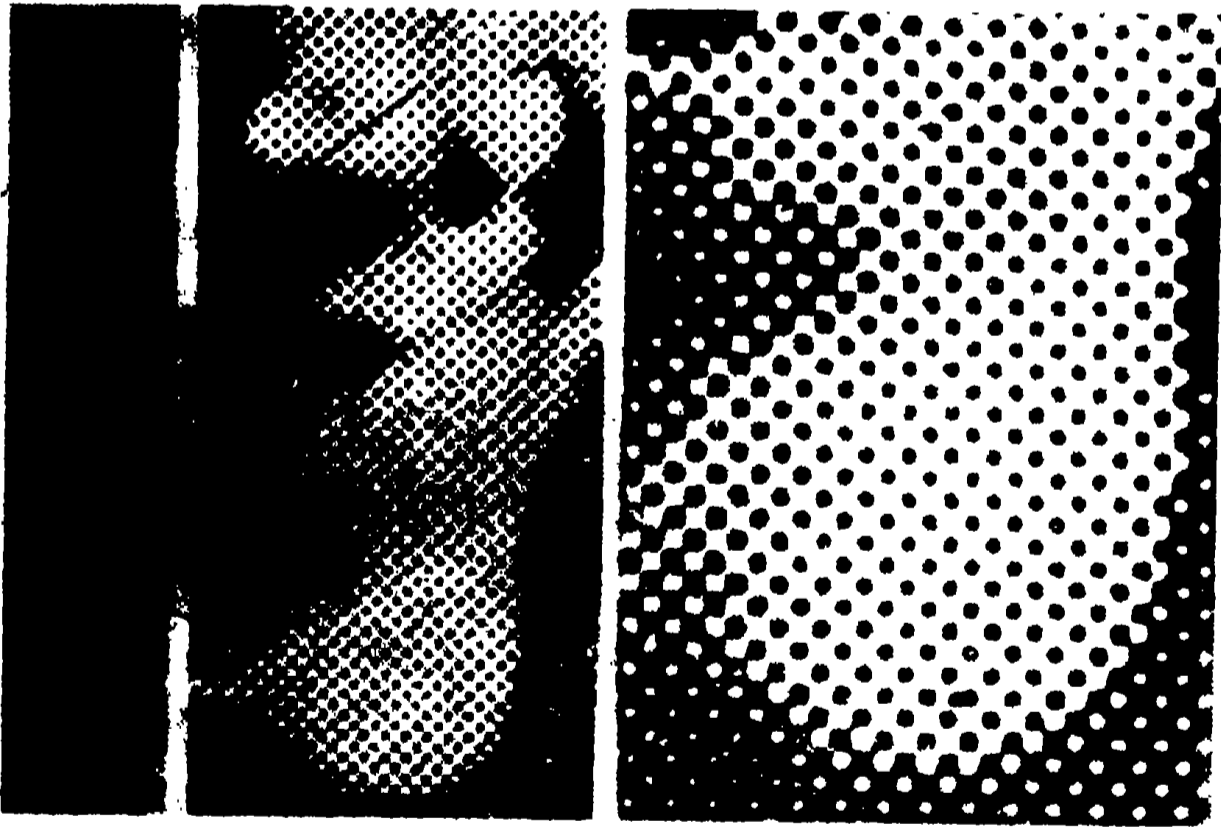
কারবনের উপর প'ড়ে কেমন ক'রে প্রবাহের বেশী-কম করছে আর সেই প্রবাহ গ্রাহক-যন্ত্রে প'ড়ে চাকৃতিটাকে কাঁপিয়ে কেমন ক'রে আবার শব্দের উৎপত্তি করছে।

এ ত গেল টেলিফোনের ব্যাপার। পাশেই যে ছবিটা

দিলুম তার থেকে বুঝতে পারবেন যে টেলিভিসনটা অনেকটা টেলিফোনেরই মত। একটু তফাৎ হচ্ছে এই যে, ওটার বেলায় শব্দের থেকে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়েছিল, এবার কিন্তু আলোর থেকে বিদ্যুৎ-প্রবাহ করা হচ্ছে। শব্দের থেকে বিদ্যুৎ-প্রবাহ যত সহজে হয়েছিল আলোর থেকে তত সহজে হয়নি। কি করে আলু আলোর থেকেও বিদ্যুৎ-প্রবাহ করা যায় তাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক সমস্যার বিষয়। এই প্রশ্নের মীমাংসা হ'ল কিন্তু এক অদ্ভুত উপায়ে। বৈদ্যুতিক প্রতিবন্ধকস্বরূপ আমরা সাধারণতঃ তার তার ব্যবহার করে থাকি। অনেক আগে কিন্তু সেলেনিয়ামের তার ব্যবহার করা হ'ত। এই তারের বিশেষত্ব হচ্ছে যে, অন্ধকারে এর প্রতিবন্ধকতার ক্ষমতা প্রবল থাকে, কিন্তু আলোতে আনলে তার শক্তির হ্রাস হয়। আয়লণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে ভ্যালেন্টিয়া নামে এক গ্রামে আর্টলাটিক কেবল (cable) স্টেশনে এর প্রথম ব্যবহার দেখা যায়। এমনি করে কত দিন কেটে গেল। তারপর ১৮৭১ সালের এক রৌদ্রদীপ্ত দিনে সেই স্টেশন-পরিচালক মে সাহেব হঠাৎ দেখলেন যে, সেলেনিয়াম তারের সঙ্গে যোগ আছে যে যন্ত্রের সূচটির—সেই সূচটি কখনও বা বিক্ষিপ্ত হচ্ছে আবার কখনও বা স্থির থাকছে। প্রথমে এর কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ তিনি খুঁজে পেলেন না। ভাবলেন, হয়ত বা যন্ত্রপাতি নড়ার জগু ওটা নড়ছে। কিন্তু তাতে বড় লাভ হ'ল না। সূচটি আগের মতই ক্রমাগত ন'ড়ে বা থেমেই চলল। অনেক খোঁজের পর তিনি দেখলেন যে কাচের জানলার ভেতর দিয়ে সূর্যের আলো ওর ওপর এসে যখনই পড়ছে তখনই সেই যন্ত্রের সূচটি বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। তবুও কিন্তু তাঁর মন থেকে সন্দেহ গেল না। রাত্রে অন্ধকারে সূচটি ঠিক কোথায় আছে দেখলেন। তারপর হঠাৎ আলো আনতেই দেখলেন যে, সেটা বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। এই বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠার কারণ আর কিছুই নয়। ওর প্রতিবন্ধকতার শক্তি যেই কমে গেল, বৈদ্যুতিক প্রবাহ বেশী করে হ'ল ওর মধ্যে, তাই ওটা চঞ্চল হয়ে উঠল। এই খবরটা যখন বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রচার হয়ে গেল তখন সবাই এই জেবে তৃপ্ত হয়েছিল যে, এইবার ত আলোর থেকে বিদ্যুৎ-

প্রবাহ করা যাবে। বাস্তবিকও হ'ল তাই। এর কয়েক বছর পরে উইলোবি স্মিথ নামে একজন ইউরোপীয় সেলেনিয়াম “সেল” তৈরি করলেন, যা দিয়ে আলোর থেকে বিদ্যুৎ-প্রবাহ হ'ল। বৈদ্যুতিক কান পেয়ে অর্থাৎ টেলিফোন পেয়ে পৃথিবীর লোকে যেমন সন্তুষ্ট হয়েছিল, সেদিন বৈদ্যুতিক চোখ (টেলিভিসন) পেয়েও সারা জগতে তেমনি অভিনব আনন্দের সাড়া প'ড়ে গিয়েছিল। টেলিভিসনের জন্মের সূচনা আমরা এই ঘটনার মধ্যে পাই। কেমন করে আলোর থেকে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হ'ল তা জানতে গেলে আগে আমাদের বুঝতে হবে বেশ করে আমাদেরই চোখের পর্দাটা। এই যে পর্দা এটা লম্বা ও ছ-কোণা অসংখ্য “সেল” দিয়ে তৈরি। আর এর প্রত্যেক সেলটার সঙ্গে অসংখ্য নার্ড ফিলামেন্ট দিয়ে আমাদের মস্তিষ্কের যোগ আছে। যে-কোন জিনিষই আমরা দেখি না কেন তার ওপর সকল জায়গায় সমানভাবে আলো পড়ে না। কোথাও বেশী আলো, কোথাও বা কম আলো। এই যে আলোছায়ার খেলা—এর প্রতিচ্ছবি আমাদের চোখের পর্দাতে পড়ে লেন্সের ভেতর দিয়ে গিয়ে, উন্টো হ'য়ে। আগেই বলেছি সেই পর্দার তলায় আছে লম্বা ও ছ-কোণা সেল। এই সেল-এর ভেতর আছে ‘ভিসুয়াল পারপল’ (visual purple) নামে এক রকম তরল পদার্থ যেটা এই আলোককে বিদ্যুৎ-প্রবাহে পরিবর্তিত করে দেয় একই অল্পপাতে অর্থাৎ যে-যে জায়গায় কম আলো পড়েছে তার থেকে কম প্রবাহের সৃষ্টি হয়, আর যে-যে জায়গায় বেশী আলো পড়েছে তার থেকে বেশী প্রবাহের সৃষ্টি হয়। তারপর এই বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলতে থাকে ফিলামেন্টের ভেতর দিয়ে এবং শেষে হাজির হয় গিয়ে মস্তিষ্কে, তখন আমরা বুঝতে পারি কি দেখছি। এই সেলেনিয়াম সেলগুলোও ঠিক এমনিভাবে তৈরি। তাই আলোর অনুধায়ী তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই যন্ত্রের কতকগুলো দোষ আছে, তাই আর আজকাল বড়-একটা ওর ব্যবহার দেখা যায় না। তার পরিবর্তে আলো-বিদ্যুৎ-পরিবর্তক যন্ত্র (Photo-electric cell) ব্যবহার করা হয়। আলোর থেকে যে বিদ্যুৎ-প্রবাহটা পাওয়া গেল, প্রেরক যন্ত্র (transmitter) থেকে বেতারের চেউয়ের সঙ্গে সেটা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং শেষকালে

গিয়ে পড়ে গ্রাহকযন্ত্রে receiver)। সেখানে ঐ চঞ্চল বৈদ্যুতিক প্রবাহকে জোরাল (amplify) করা হয়। তার পর তাকে যেতে দেওয়া হয় একটা বৈদ্যুতিক দীপাধারের (bulb) ভেতর দিয়ে। সুতরাং বৈদ্যুতিক প্রবাহের হ্রাস-বৃদ্ধির অনুপাতে নিয়ন-গ্যাসে-ভর্তি বাতিটির উজ্জ্বলতারও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। এই বাতির আলোটা দুটো ঘূর্ণায়মান আতসকাচ-বসান চাকতি ও একটা পেঁচাল ছিদ্রযুক্ত চাকতির ভেতর দিয়ে যাওয়াতে প্রেরকযন্ত্র প্রেরিত বস্তু বা ব্যক্তির প্রতিমূর্তির বিভিন্ন অংশ সেলের ওপর যেমনভাবে পড়ে—ঠিক সেইভাবে এর আলো ঘসা-কাচের পর্দার ওপর পড়ে—তখনই আমরা তার ছবি দেখতে পাই। ফোটো-টেলিগ্রাফীর বেলায় যে ছবি আমরা দেখতে পাই, তা নড়ে না কিন্তু টেলিভিসনের বেলায় তার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী ও গতিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠা চাই—তবুই তা আমাদের কাছে সজীব ব'লে মনে হবে। তা হ'তে গেলে কিন্তু আলোককে প্রত্যেক ছবির ওপর দিয়ে বুলিয়ে যেতে হয় খুব শীগগির। কারণ আমরা যা-কিছু দেখি তার ছাপ আমাদের মনে থাকে ১ সেকেন্ডের $\frac{1}{25}$ অংশ। তার মানে অস্তুতঃ প্রতি সেকেন্ডে যদি দশটা করে ছবি আমাদের চোখের সামনে আসতে থাকে তবে সেগুলো সজীব ব'লে মনে হবে—যেমন নাকি বায়স্কোপে হয়ে থাকে, প্রতি সেকেন্ডে বাইশটা করে। প্রত্যেক ছবি



যদি শাদা আর কালো ফুটাক দিয়ে তৈরি হয় (যেমন একটি ছবি দিলাম) তবে আলোর রশ্মিকে সম্পূর্ণ একটা ছবির ওপর বুলিয়ে যেতে কত সময় লাগবে ভাবুন—তার একটি ফুটকিও বাদ দিলে চলবে না। তার ওপর ঐ রকম আরও ন'টা বা দশটা ছবি যদি এক সেকেন্ডের মধ্যে আলোর পরশ

পায় তবেই তা লোকচক্ষে চলতে হয়ে উঠবে। এর থেকে বেশ বুঝতে পারবেন যে কত অল্প সময়ের মধ্যে আলোককে ছবির ওপর দিয়ে দৌড়তে হয়। এত চেষ্টার ফলে তাই আজ টেলিভিসন সম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

টেলিভিসনের সঙ্গে সঙ্গে বেয়ার্ড (Mr. J. L. Baird) সাহেবের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, কারণ তিনিই প্রথম এই যন্ত্রের নির্মাণকর্তা। ১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাসে বেয়ার্ড সাহেব সর্বপ্রথমে রয়াল ইন্সটিটিউশনে টেলিভিসনে ছবি দেখান। নীচে বেয়ার্ড সাহেবের যন্ত্রের একটা নক্সা দিলাম। এর মধ্যে দুটো জিনিষ

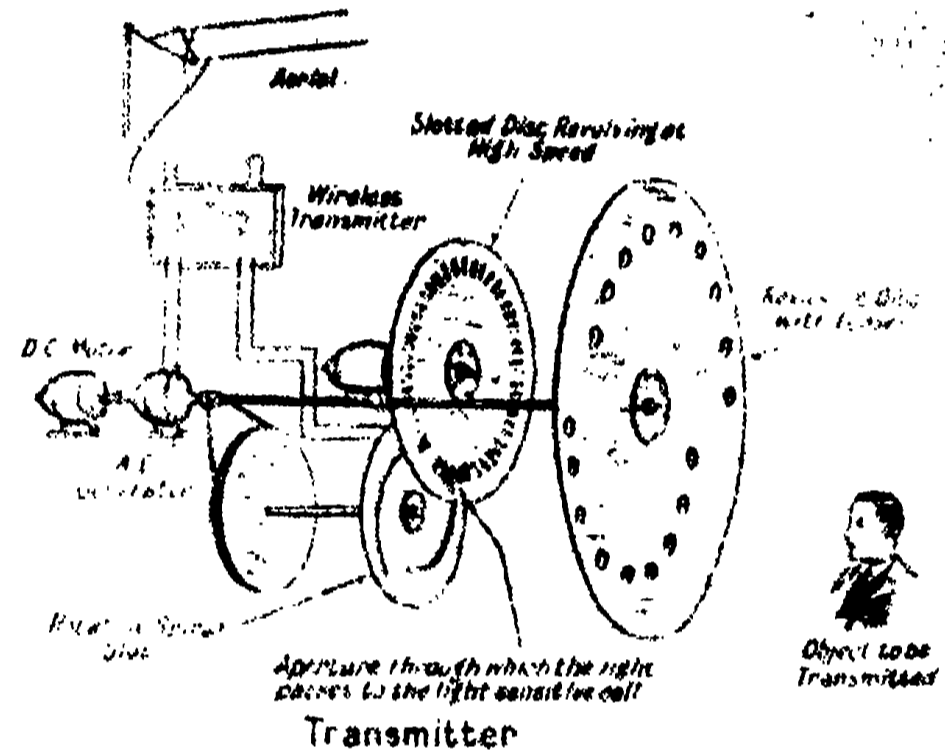
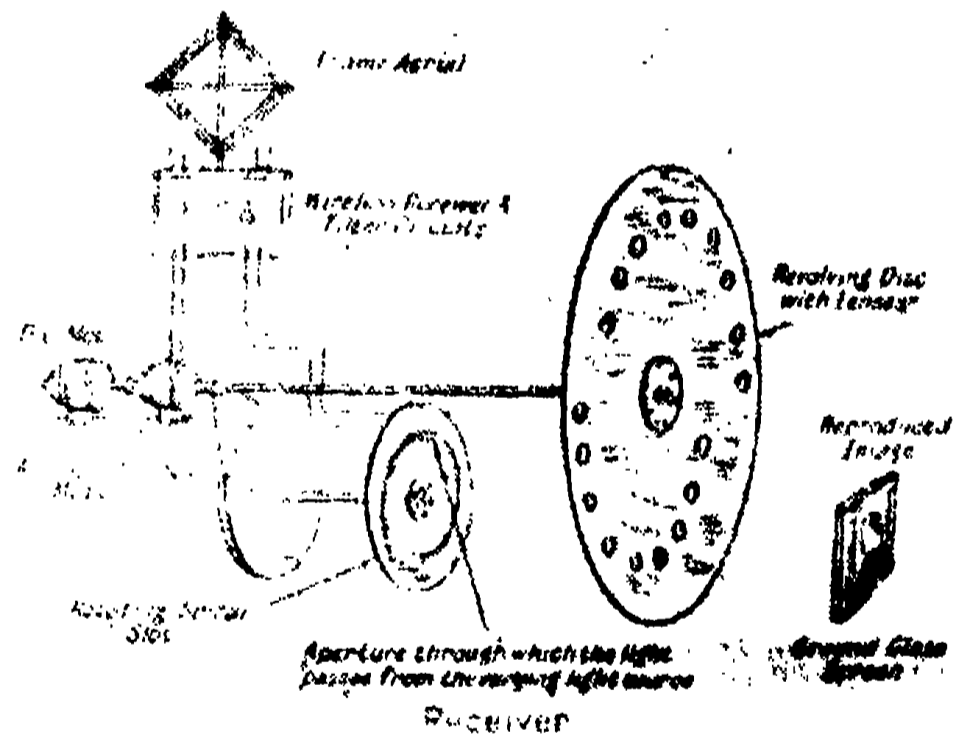


FIG. 1. Mr. Baird's original Transmitting Apparatus.



আছে একটা প্রেরকযন্ত্র, অপরটা গ্রাহকযন্ত্র, ঠিক যেমন বেতারে থাকে। তবে এর বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, যে-ছবি আমরা দেখতে পাব সেটা লম্বা রেখা দিয়ে তৈরি হবে। ছবিটা দেখলেই বেশ বুঝতে পারবেন। কিন্তু কেমন করে এই রেখা হয় তা জানতে গেলে আমাদের আশ্রয় নিতে হবে ঐ নক্সার। ওর ওপরের ছবিটা হচ্ছে প্রেরকযন্ত্রের, আর নীচেরটা গ্রাহকযন্ত্রের। গ্রাহকযন্ত্রটা ঠিক প্রেরকযন্ত্রের মত—একটু তফাৎ এই যা, ওর ফোটো-সেল ও যার ছবি উঠবে তার জায়গায় আছে

একটা প্রদীপ ও পর্দা। দ্বিতীয় চাক্তিটা একেবারে তুলেই দেওয়া হয়েছে। যে-জিনিষটার ছবি পাঠানো হবে তার সামনে আছে তিনটে গোল চাক্তি। প্রথমটায় আছে বক্রিণটা লেন্স, দ্বিতীয়টায় আছে চৌকো-চৌকো ছোট গর্ত আর তৃতীয়টায় আছে স্প্রিংয়ের মত গোল পেঁচাল গর্ত। আর এই শেষ চাক্তিটার পরই আছে সেই বিদ্যুৎ-পরিবর্তক সেল বা যন্ত্র। জিনিষটার গা থেকে আলো এই তিনটে চাক্তির ভেতর দিয়ে গিয়ে পড়ে ঐ যন্ত্রটার ওপর। প্রথম চাক্তিটা মিনিটে ৮০০ বার ও দ্বিতীয়টা ১০০০ বার ঘোরানো হচ্ছে একটা মোটর দিয়ে। তৃতীয়টা কিন্তু স্থির আছে। এই ঘোরানোর ফলে ঠিক যেখানটায়-যেখানটায় গর্ত পায় সেইখান দিয়ে আলোটুকু যেতে পারে আর বাকীটুকু ভ্রাম্যমাণ আলোককে যেতে দেয় না, তাই ছবিটা ঐ চৌকো লম্বা-লম্বা সরু-সরু মোটা রেখায় ভরে ওঠে আলোর বেশী-কম অনুসারে। এই আলো যখন সেলের উপর পড়ে তখন তার প্রবাহটাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে বা কমে। এতক্ষণে আমরা বিদ্যুৎ-প্রবাহ পেলুম। এইটাকে কি করে পাঠানো হয় দেখবার আগে আর একটা জিনিষ আমাদের দেখা দরকার। এই যে ঘোরানোর শক্তি, তা পাওয়া যায় কোথা থেকে? একটা মানুষ ত আর বসে-বসে চাকা ঘোরাতে পারে না, তাই 'ডি. সি. মোটর' (D. C. motor) দিয়ে ওটাকে চালানো হয়। কিন্তু প্রেরকযন্ত্রের মত গ্রাহকযন্ত্রের প্রথম চাক্তিটাও মিনিটে ঠিক আট-শ বার ঘোরানো দরকার, তা না হ'লে আমরা যে ছবি পাব তা আসলের থেকে অনেক তফাৎ হয়ে যাবে। তাই 'এ. সি. জেনারেটর' (A. C. Generator) লাগানো হয়—যার কাজ ওদের একই গতিতে চালানো। এর থেকে যেটুকু বিদ্যুৎ-প্রবাহ পাওয়া যায় সেইটে আর ঐ সেল থেকে তৈরি প্রবাহটা একসঙ্গে মিলিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় ঝাঁকারের চেউয়ের ওপর। এই প্রবাহটা চেউয়ের উপর চড়ে দিগ্বিদিকে ছুটে বেড়ায় আর যেখানেই গ্রাহকযন্ত্র পায় সেইখানে গিয়ে দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। 'অলটারনেটিং'-প্রবাহ (alternating current) টা গিয়ে চালায় সেখানকার এ. সি. জেনারেটরটাকে মিনিটে ৮০০ বার করে, আর সেলের প্রবাহটা গিয়ে জালায় একটা বল্বকে। সেই আলোটা তৃতীয় ও প্রথম চাক্তির ভিতর

দিয়ে পড়ে একটা পর্দার উপর অসংখ্য সরু মোটা রেখাকারে এবং তার থেকে গড়ে ওঠে সেই জিনিষের ছবি।



আপনারা সকলেই হয়ত রঙীন ফিল্ম দেখেছেন। যার যেমন রং ঠিক তেমনটি যখন ফুটে ওঠে ছবির গায়, তখন কি সুন্দরই না দেখায়! এক দেশ থেকে আর এক দেশে রঙীন ছবি পাঠাবার ব্যবস্থাও হয়েছে। কেমন করে তা সম্ভব হয় জানতে গেলে আমাদের প্রথমেই নিতে হবে তিনটে-গর্তওয়ালো একটা গোল চাক্তি। তার একটায় নীল, একটায় লাল এবং অপরটায় সবুজ ফিল্টার দেওয়া হ'ল। তারপর তিনটে ফোটা সেল এমনভাবে সাজানো হ'ল যে প্রত্যেক ফিল্টার থেকে আলো এসে যেন আলাদা ভাবে ঐ তিনটে সেলের উপর পড়ে। তার প্রত্যেকটা থেকে যে প্রবাহ হ'ল তাই পাঠানো হ'ল ঠিক বেতারের মত। চলতে চলতে তারা গিয়ে পড়ল গ্রাহকযন্ত্রে। সেখানে কিন্তু এবার একটা প্রদীপের বদলে দুটো রাখা হয়েছে—একটা নিয়ন (Neon) গ্যাসে-ভর্তি এবং অন্যটা হিলিয়াম (helium) গ্যাস ও পারার বাষ্প (mercury vapour) ভর্তি। লাল ফিল্টারের আলোটা জালাবে নিয়নে-ভর্তি দীপাধারকে এবং নীল ও সবুজ আলোগুলো জালাবে দ্বিতীয়টাকে। কিন্তু এই সব কাজ এমনভাবে চলা চাই যেন একটা অণুটার সঙ্গে মেশবার সুযোগ না পায়, অর্থাৎ যখন নিয়ন-দীপটা জ্বলবে তখন অণুটা জ্বলবে না, আর যখন দ্বিতীয়টা জ্বলবে তখন প্রথমটা নেবানো থাকবে। এমনি করে

পাঠাবার সময় একই জিনিষের তিন-রঙের ছবি পাওয়া যাবে। সেই পাঠাবার হারটা যদি আমরা বাড়িয়ে দিই, অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে যদি আমরা ফুডি-বাইশটা ছবি পাঠাতে থাকি, তবে গ্রাহকযন্ত্রেও আমরা সেই ফুডি-বাইশটা ছবিই পাব। এই তাড়াতাড়ি পাঠানোর ক্ষমতা ঐ তিন রং থেকে বাকি, রংগুলো হয়ে যাবে, কারণ এই তিনটেই আসল রং, যাদের পরস্পরের সংমিশ্রণে তৈরি হয় বাকী আর চারটে রং। তাই পর্দার ওপর যে ছবি পড়ে তা স্বাভাবিক রঙে রঙীন হয়ে সুন্দর হয়ে দেখা দেয়। এরই সংস্কার করতে করতে টেলিভিসন আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে দেখুন। মানুষের আশার আর শেষ নেই। যত পায় ততই সে উন্মুখ হয়ে, ব্যগ্র হয়ে দুটি হাত বাড়িয়ে আরও চায়। এই ছবির সঙ্গে বাকশক্তি যোজনা করা যায় কি-না তাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক আন্দোলনের বিষয়। অনেক চেষ্টার পর তা'ও সম্ভব হয়েছে। গ্রাহক-যন্ত্রের পর্দার ওপর ছবি না ফেলে—তা ফেলা হয় ফিল্মের ওপর। ছবির তলায় খানিকটা ক'রে জায়গা থাকে যেখানে শব্দ বা কথাবার্তার দ্রুত দাগ ওঠে। এই ফিল্ম দেখানোর সময় ছবি ও শব্দ একই সঙ্গে বের হয়। এই যন্ত্রের নাম 'টেলি-টকি।'

যে-কোন একটা জিনিষ এবং তার ফোটা যদি পাশাপাশি রাখা যায় তবে তাদের মধ্যে পার্থক্যটা সবার চোখেই পড়ে। ফোটাটা মনে হবে নেহাতই চেপ্টা ও অগভীর, কিন্তু জিনিষটা যে গভীর বলে মনে হবে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। তার কারণ আমরা বাঁ-চোখ দিয়ে যতটুকু দেখি, ডান-চোখ দিয়ে ঠিক ততটুকু দেখি না—একটু তফাৎ হয়-ই। এই যে তফাৎ তার ফলে গভীরতার ছাপ জেগে ওঠে আমাদের মনে। ষ্টিরিয়োস্কোপ নামে এক যন্ত্রে ঐ রকম ব্যবস্থাই করা হয়। তাই তার নাম ষ্টিরিয়োস্কোপিক টেলিভিসন। একটা বাস্তবের ভিতর দুটো ক্যামেরা আঁটা থাকে। তাই থেকে একই সময়ে একটা জিনিষের দুটো ছবি ওঠে। ক্যামেরার লেন্স দুটো আমাদের চোখের সমান দূরত্বে রাখা হয় (অর্থাৎ ২৩ ইঞ্চি)। তারপর এই ছবি দুটো পাশাপাশি কাগজের গায় লাগিয়ে দিয়ে আড়াই ইঞ্চি তফাৎ দুটো লেন্সের ভেতর দিয়ে দেখা হয়। স্তর ওপর ছবি দুটো যদি রঙীন করা হয় তা হলে তা কবাই নেই। বেয়ার্ড সাহেবও ঠিক তাই করলেন।

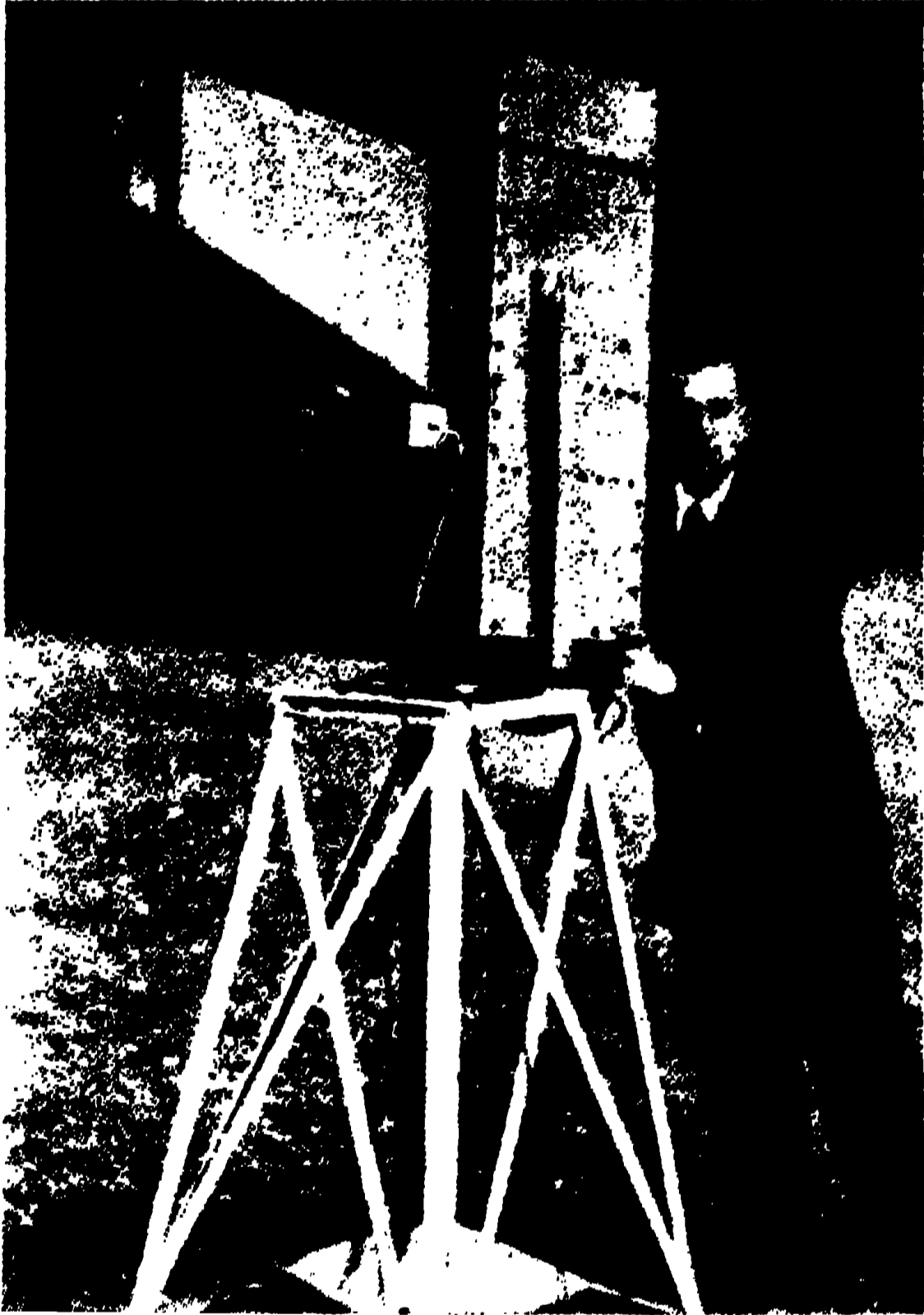
তিনি একটা গোল চাকতি নিলেন। তার ধারের দিকে এক-সারি গর্ত এবং সেগুলো থেকে কেন্দ্রের দিকে ২৩ ইঞ্চি দূরে আরও এক সারি গর্ত। এই চাকতিটাকে জোরে ঘোরানো হয়। ওর এক পাশে আছে দুটো আলো। তার থেকে আলো ঐ দু-সারি গর্তের ভেতর দিয়ে গিয়ে পড়ে সেই জিনিষের গায় যার ছবি পাঠানো হয়। সেই আলো সেলের ওপর পড়ে যে প্রবাহ সৃষ্টি করে তাই পাঠানো হয় চতুর্দিকে। এই বিদ্যুৎ-প্রবাহ আবার গ্রাহকযন্ত্রে ধ'রে তার ছবি পাওয়া যায়।

বেয়ার্ড সাহেব কিন্তু শুধু এই করেই ক্ষান্ত হলেন না। তিনি এর থেকে তৈরি করলেন এক যন্ত্র যা দিয়ে খুব ঘন অন্ধকার বা কুয়াশার মধ্যেও বেশ স্পষ্ট দেখা যায়, অর্থাৎ অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে আছে এমন জিনিষ বা লোকের ছবি উঠে যাবে এই দিয়ে। গত মহাসময়ের সময় এটা অনেক কাজে লেগেছিল। কোথায় কোথায় রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে আছে শত্রু-সৈন্য তার ঠিকানা মিলেছিল এরই সাহায্যে। এ যন্ত্রটা টেলিভিসন যন্ত্রের মতই, কেবল যা এতে বল্বেয় বদলে অদৃশ্য রশ্মি (invisible rays) ব্যবহার করা হয়।

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক নিউটনের নাম আপনারা সবাই শুনেছেন। সূর্যের শাদা আলো যে সাতটা রং দিয়ে তৈরি তা তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। বেগুনী, ঘন নীল, নীল, সবুজ, হলুদে, কমলা ও লাল এই সাতটি রং দিয়ে হয়েছে শাদা আলোর সৃষ্টি। এর দু-দিকে আলো ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তাই তাদের নাম অদৃশ্য রশ্মি। তলার দিকটার নাম 'অল্ট্রাভায়লেট' বা অতি বেগুনিয়া, আর অপরটার নাম 'ইনফ্রা-রেড রে' বা উন-রক্ত। এই যন্ত্রে বেয়ার্ড সাহেব ঐ ইনফ্রা-রেড রে ব্যবহার করেছেন। টেলিভিসনের যে প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র আছে সেই দুটো একই সঙ্গে লাগানো থাকে; কেবলমাত্র গ্রাহকযন্ত্রের বল্বেয় বদলে এই ইনফ্রা-রেড ল্যাম্প বসানো থাকে।

অন্ধকার বলতে সাধারণতঃ আমরা বুঝি আলোর অভাব। সত্যি কিন্তু আলোর অভাব আমাদের একেবারেই হয় না। দিনের বেলায় বাইরে থেকে একটা দরজা-জানালা বন্ধ অন্ধকার ঘরের ভেতর ঢুকলেই কিছুক্ষণের জন্য আমরা

কোন জিনিষই দেখতে পাই না সত্যি, কিন্তু একটু পরেই আবার অস্পষ্টভাবে অনেক জিনিস আমাদের চোখের ওপর ভেসে উঠে। তার কারণ অদৃশ্য রশ্মি রয়েছে অক্ষকারে মিশে। সেই স্বল্প আলোতে লুকায়িত শক্তিস্রোতের চেহারা যতটুকু আলোকিত হয় সেই আলো এসে পড়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় লেন্সের ভেতর দিয়ে আলো-বিদ্যুৎ-পরিবর্তক যন্ত্রে। এমনি করে সব ছবি গ'ড়ে ওঠে পর্দার গায়। এরোপেনে, জাহাজে, সব তাতে আজকাল এর ব্যবহার হচ্ছে। সামনে কোন বিপদ থাকলে এই যন্ত্রটা অমনি জানিয়ে দেয়। রাত্রে এর সাহায্যে দেখতে পাওয়া যায়, তাই এর নাম 'নক্টো-ভিসর'



(Nocto-visor)। (উপরের ছবিতে বের্নার্ড সাহেব ও তাঁর তৈরি যন্ত্রটি দেখুন)।

কেমন করে গ্রামোফোন দিয়ে ছবি পাঠানো যায় এইবার তাই শুনুন। আপনারা হয়ত ভাববেন—এ ত ভারি আশ্চর্য ব্যাপার! সত্যি কিন্তু তা মোটেই না। আমরা দেখেছি কেমন করে সেলের ওপর আলো প'ড়ে, প্রবাহ বাড়ায়-কমায়। আচ্ছা, এই প্রবাহটা যদি টেলিভিসন যন্ত্রের বদলে টেলিফোনে নেওয়া যায় তবে নিশ্চয়ই আমরা শুনতে

পাব একটা শব্দ—তা সে যতই শ্রুতিকটু হোক না কেন। সেই শব্দ থেকে যদি আমরা গ্রামোফোনের রেকর্ডের মত রেকর্ড তৈরি করি, এবং সেই রেকর্ড যখন আবার বাজানো হবে কোন মাইক্রোফোনের সামনে যার সঙ্গে যোগ আছে টেলিভাইসরের বা টেলিভিসন যন্ত্রের, তবে আমরা নিশ্চয়ই ছবি দেখতে পাব। এই কারণে এই যন্ত্রের নাম 'ফোনোভাইসর' (Phonovisor)।

পাঁচ জন বন্ধুবান্ধবের সামনে কোন একটা কথা বলতে গিয়ে অল্প একটা কথা ভুল করে ব'লে ফেলে অপ্রস্তুতে পড়তে হয়েছে অনেককেই। যেমন মনে করুন—'চোখ দিয়ে দেখতে পাও না?' বলতে গিয়ে 'কান দিয়ে দেখতে পাও না?' ব'লে ফেললে যেমনটা হয় আর কি। কিন্তু কানে শুনে পড়া বা কান দিয়ে যে দেখা যায় তার প্রমাণ আজ আমরা পাচ্ছি। আমাদের প্রত্যেকের মুখমণ্ডলের একটা-না-একটা বৈশিষ্ট্য আছে যা দিয়ে আমরা পরস্পরকে চিনে নিই। এতদিন তা আমরা দৃষ্টিশক্তির সাহায্যেই করে এসেছি, এখন কিন্তু চোখে না দেখে শুধু কানে শুনেই ব'লে দিতে পারব, কে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—ঠিক যেমন করে আজকাল অঙ্কুরা মিনিটে ৬০টি কথারও বেশী পড়তে পারছেন। এতদিন ওঁরা স্পর্শশক্তির সাহায্যে করে এসেছেন। এখন কিন্তু এমন একটা যন্ত্র বেরিয়েছে যা দিয়ে A থেকে Z পর্যন্ত এই ছাব্বিশটি অক্ষরের ক একটি স্বতন্ত্র সুর বার করা যায়। এই ক'টা সুর মনে রাখতে পারলেই কানে-শুনে পড়া সম্ভব হবে। সেটা শব্দও নয় তেমন। গানের কত রকম সুর যখন মনে থাকে তখন এটাও কিছুদিন অভ্যাস করলেই সহজে হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে power transmission-এর বিষয় কিছু বললে বোধ হয় অবাস্তব হবে না। যে-কোন বড় নগরে যান, দেখবেন যে সেটা তারের জাল আর লম্বা লম্বা খুঁটি দিয়ে ঘেরা। তা না হ'লে আমাদের ঘরে-ঘরে বিজলী বাতি জ্বলাই দায় হয়ে ওঠে যে। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে এখানকার নগর-মাণ্ডলিকদের নজর পড়েছে এই দিকে। সেটা খুবই সৌভাগ্যের কথা। তাই আজকাল রাস্তার ওপর তার কমে গিয়ে তলায় চলে গেছে। আজকাল কিন্তু কোন তার বা খুঁটির সাহায্য না নিয়েও বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ সম্ভব হয়েছে। একটা স্টেশন থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি

পাঠানো হ'লে যে যার ঘরে ব'সে যখন খুশী আলো জ্বালাতে বা নিবাত্তে পারবেন। তাতে যেমন একদিক থেকে সুবিধা হবে অনেক বটে, কিন্তু অযথা খরচের মাত্রাও বেড়ে যাবে। কারণ যতটুকু শক্তি এই ঙ্গেখারে ছাড়া হবে তার হাঙ্গার ভাগের এক ভাগ হয়ত ঠিকমত ব্যবহৃত হবে।

এই সঙ্গে আরও তিনটে ছবি দিলুম। প্রথমটি হচ্ছে দিনের আলোর উন্মুক্ত আকাশে ছবি পাঠানোর যন্ত্র (Broad daylight transmitter)। এই দিয়ে প্রাকৃতিক



দৃশ্য বা চলন্ত জীবজন্তুর ছবি পাঠানো হয়। দ্বিতীয়টি এটি মহিলার চিত্র যিনি সর্বপ্রথম এই টেলিভিসনে তাঁর ছবি পাঠিয়েছিলেন এবং তৃতীয়টি হচ্ছে বিজ্ঞাপনের। কলকাতায় যেমন এসপ্লানেডের মোড়ে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় সবাইকে দেখাবার জন্তু, টেলিভিসনেও সেইরকম বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়। ৫০টা শ্রেণীর নিম্ন-গ্যাসে-ভর্তি টিউবের ওপর

জলে ওঠে সেই-সেই ছবি যা পাঠানো হয়, আর সব লোকে তাই দেখে ব্যাপারটা বুঝে নেয়।

হিংস্র

শ্রীনির্মলকুমার রায়

নদীর নাম 'শোক'। বহুদূর হইতে দুইটি স্ফিট্রিত তীররেখার মধ্যে প্রবাহিত হইয়া নিশ্চিন্তপুর জঙ্গলের কাছে একটা আকর্ষণের স্ফিট্রি করিয়া পশ্চিম পাড়টি ভাঙিয়া ফেলিয়াছে। সেমিকে উচু কাশবন। তারপরেই জঙ্গল; প্রায় দশ বর্গমাইল ব্যাপী। জঙ্গল ঘনসম্মিষ্ট নয়। বড় গাছের মধ্যে এখানে-সেখানে পলাশ, তেঁতুল, অর্জুন ইত্যাদি। নীচে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র বন্য কুল, আসশেওড়া ও বহুবিধ অজ্ঞাতনামা চারা-গাছ। কোথাও কদাচিৎ দু-একটি সাঁওতাল-পল্লী আছে। সারাদিন সাঁওতাল-বালকেরা গরু চরায় ও বন্য কুল খায়। মাঝে মাঝে পায়ে চলার পথ; কাশবনের মধ্য দিয়া নদীর ধারে শেষ হইয়াছে। এ-জঙ্গল হইতে মহকুমায় যাইতে এ জঙ্গলটার ভিতর দিয়া যাইতে হয়।

এই শোক-নদীর তীরে ও নিশ্চিন্তপুর জঙ্গলের প্রান্তে হঠাৎ একদিন একদল কুলি আসিয়া খানিকটা জায়গা সাফ করিতে লাগিল। তার পর একদিন সেখানে উঠিল একটা 'সুইস্ কটেজ' তাঁবু এবং ভোর হইতে আসিতে আরম্ভ করিল মালপত্র, বড় বড় রকম রকম চামড়ার বাল্ল, খাট, বিছানা, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি। বিকালের দিকে অবশেষে আসিয়া উপস্থিত হইল এক ছোকরা-গোছের 'ম্যাংলো-ইণ্ডিয়ান' সাহেব। সঙ্গে তাহার গোটাভিনেক বন্দুক, দুইটা ফুকুর ও তাহার চেয়ে অন্ততঃ দশ বৎসরের বড় ও এক মণ ওজনে ভারী এক মেম-সাহেব।

দেখিতে দেখিতে রেলের ডাক্তার তাহার ডিসপেন্সারী জাকাইয়া বসিল। ডাক্তার বেলগার্ড এক সময়ে এল-টি-এম পাস করিয়াছিল। তার পর সে চলিয়া যায় যুদ্ধে। সেখান হইতে সে দুটি জিনিষ সঙ্গে করিয়া আনে; একটি পা হইতে হাঁটু পর্যন্ত চামড়ার 'লেগিং' এবং অপরটি রোগীর দেহ ও মনের প্রতি বর্ষের নিষ্ঠুরতা। এ দুটি যে ডাক্তার বেলগার্ডকে ডাক্তারী শাস্ত্রের সর্বোচ্চ শিখরে পৌছাইয়া দিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু নিশ্চিন্তপুর জঙ্গলের প্রান্তদেশে শোক-নদীর

তীরে 'দিনাজপুর কহিয়া' লাইনের ফুলীরা তত উচ্চ পৌছিতে পারিল না। ডাক্তার বেলগার্ড কথায় কথায় বলিতেন কোন কার্যের অন্ন করা ভাল নয়; বিশেষতঃ ডাক্তারের পক্ষে 'অধিকন্তু ন দোষায়' প্রবাদটি মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। কাজের বেলায়ও তিনি কুইনিইন ইনজেকশন দিতেন একবারে ২০ গ্রেণ, জ্বালাপ খাওয়াইতেন অন্ততঃ তিন আউনস্ এবং যদি শুনিতেন কোন ফুলীর কনিষ্ঠ অঙ্গুলির অগ্রভাগে সামান্য আঘাত লাগিয়াছে তিনি কাটিয়া ফেলিতেন অন্ততঃ তাহার কনুই পর্যন্ত। ফলে তাঁহার ডাক্তারী খ্যাতি যতই বাড়িতে লাগিল, রোগীর সংখ্যা ততই কমিতে লাগিল।

দুই বেলা সে এক বন্দুক ও মেম সাহেব লইয়া আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং কাহারও সঙ্গে দেখা হইলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে সে হিংস্রজন্তু শিকারে অসুরক্ত কি-না। অল্পদিনের মধ্যেই লোকেরা বুঝিল যে এ প্রশ্নের কি উত্তর দিতে হইবে।

“সাহেব তুমি কখনও বাঘ মারিয়াছ ?

একটু হাসিয়া বেলগার্ড উত্তর দিত, “বাঘ ঠিক মারি নাই, তবে চিতা জখম করিয়াছি।” তারপর আরম্ভ হইত সেই কোন্ যুগের শিকারের কাহিনী। কেমন করিয়া চিতাবাঘের সঙ্গে সে হাতে লড়াই করিয়াছিল, কেমন করিয়া জন্তুটা তাহার বাম হস্তের কঙ্গী কামড়াইয়া ধরিয়াছিল, কেমন করিয়া কোমরে পিস্তল ও মনে প্রত্যাৎপন্নমতি থাকাতে সে-যাত্রা বাঁচিয়া যায় ইত্যাদি। ইহাতে কান্ত না হইয়া চিতাবাঘের আকৃতি-প্রকৃতি, বাসস্থান ইত্যাদি সম্বন্ধে সে অনর্গল বকিয়া যাইত। তারপর হাতের বন্দুকটি দেখাইয়া বুঝাইয়া দিত যে এটি আসল 'সুপার ম্যাগনাম এল্লপোরা', ২৮" লম্বা ৫৫ নল, তিন শত গজ ইহার পাল্লা, ৭৩০ গ্রেণ ইহার বুলেটের ওজন দেড় হাজার 'ফুট সেকেন্ড' ইহার বুলেটের গতি, তিন হাজার ছয় শত তেতাল্লিশ 'ফুট পাউণ্ড' ইহার বুলেটের শক্তি, ইহার মত অস্ত্র হয় না, অব্যর্থ ইহার লক্ষ্য। এইখানেই

বিবরণ শেষ হইত না। এই বন্দুকটির ইতিবৃত্ত না শুনিয়া কাহারও উপায় ছিল না। কত খুঁটাকে কোন লাটসাহেব কিনেন, তিনি কি-কি শিকার করিয়া একজন চা-বাগানের ম্যানেজার সাহেবকে ইহা বিক্রয় করেন, সেই সাহেবটি কয়টি “রয়েল বেঙ্গল” (সর্বদাই ডাক্তার ‘আর’ ‘বি’ বলিত), কয়টি চিতা, কয়টি গুজার (ডাক্তারের ভাষায় ‘রাইনো’) এমন-কি একটি হাতী শিকার করেন। তখন ডাক্তার বেলগার্ড সে বাগানের ডাক্তার। ম্যানেজারের একমাত্র মেয়েকে শক্ত ব্যারাম হইতে ভাল করে। একদিন ম্যানেজার বলিল, “ডাক্তার বেলগার্ড, তুমি কি হিংস্রজন্তু শিকার ভালবাস ?”

“নিশ্চয়ই।”

ম্যানেজার কৃতজ্ঞতার চিহ্নরূপ বন্দুকটি তাহাকে উপহার দেন। অবশেষে শিকারের খোজ লইয়া আলাপ শেষ হইত। এ-সময়ে তাহার মতামত তাহার ডাক্তারী মতামত হইতেও খাঁটি।

“এদেশে কখনও বাঘ আসিয়াছে ?”

সকলে অবশ্যই বলিত যে তাহারা এ-অঞ্চলে কোন দিন বাঘ দেখে নাই। ডাক্তার উত্তেজিত হইয়া বলিত, “নিশ্চয় আসে। এমন জঙ্গল—এর মধ্যে বাঘ আসে না, তবে আসে কি ? এ-জঙ্গলভরা বাঘ, বাংলা দেশের সর্বত্রই বাঘ, বাংলা দেশে বাঘ ছাড়া আর কিছুই নাই।”

* * * *

মাঘ মাস, জায়গাটা উত্তর বলিয়াই হউক কিংবা বৃষ্টি-সমাকুল বলিয়াই হউক শীত তখন বেশ জমিয়া আছে। তীরের কাশবন অত্যন্ত শুষ্ক ; শোক-নদীর কীর্ণ জলধারা সিকতাময় তলদেশে আশ্রয় করিয়া আঁকিয়া-বাকিয়া চলিয়াছে। চতুর্দিকের গাছপালাকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত দিনই একটা অম্পট কুয়াশার আবরণ লাগিয়া থাকে। ওপারে বস্ত্র ফুলগাছে অজস্র ফুল পাকিয়া উঠিয়াছে। উমেশ কম্পাউণ্ডার কুলি-বন্ধুর দিয়া প্রত্যহই বস্ত্র-বস্ত্র। কুল তাহার দেশস্থিত চতুর্থ পক্ষের জন্ত সংগ্রহ করিয়া আনিতেছিল।

এমন সময় এক দিন দূরের সাঁওতাল-পল্লীর একজন বয় লইয়া আসিল যে বাঘে তাহাদের একটা গরু লইয়া লইয়াছে। উত্তেজনায় ডাক্তার বেলগার্ডের কথা বাহির হইল না। মুহূর্তমধ্যে সে তাহার “ম্যাগনাম এক্সপ্লোরার”

বাহির করিয়া আনিল এবং এইরূপ ভাব দেখাইতে লাগিল যে এখনই অ-দৃষ্ট ব্যাঘ্রগুলকে গুলি করিয়া মারিবে। টোর-বাবু গোপীনাথের শিকারে একটু হাত ছিল। সে বলিল, “সাহেব, ওদের কথায় বিশ্বাস নাই। গরু ছয়ত জঙ্গলে কোথায় চলিয়া গিয়াছে।” ডাক্তার তাহাতে দম্বিবার পাত্র নহে। দু-চার জন কুলী লইয়া গোপীনাথ ও বেলগার্ড সাঁওতাল-পল্লীর দিকে চলিয়া গেল।

চতুর্দিকের জঙ্গল তেমনি সীমাহীন। মাঝে মাঝে এক-প্রকার কাশ কিংবা বেণার ঝোপে সমস্ত তলদেশটা ছাইয়া ফেলিয়াছে। ঘন-সন্নিবিষ্ট জঙ্গলে দৃষ্টি বেশী দূর প্রসারিত হয় না ; আলোক প্রবেশ করে না ; বন্য জন্তুর ভয় সেখানে বেশী ; তবু কিছুক্ষণ চলিতে চলিতে দৃষ্টি অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। দৃষ্টমান স্বল্পপরিসর জায়গাতে কোন ভয়ের কারণ নাই বলিয়া মন যেন একটি মিথ্যা আশ্বাস পায়। কিন্তু এই জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতে সর্বদাই ভয় করে। দৃষ্টি বহুদূর যায় ; কোন জনমানব নাই। কেহ চীৎকার করিলেও শুনিবে না। জঙ্গলটা যে এত বড়, এত নির্জন, এত নিষ্ঠুর তাহা মুহূর্ত মধ্যে যুগপৎ হৃদয়ঙ্গম হয়।

যাইবার সময় উমেশ কম্পাউণ্ডার বলিল, “সাহেব, সাবধান !” কি জানি হঠাৎ কেন তাহার চতুর্থ পক্ষের জীর কথা মনে হইল। একবার অভ্যাসমত হাই তুলিয়া তুড়ি দিয়া বলিল, ‘ঘা করেন মধুসূদন।’ ডাক্তার ও গোপীনাথ যাইয়া দেখিল, ব্যাপারটা মিথ্যা নহে। রক্তের দাগ বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। মাটি শক্ত বলিয়া পায়ের কোন দাগ নাই।

ইহার পরে চারিদিকে একটা ভীতির সঞ্চার হইল। আজ কাহারও গরু গিয়াছে, কাল কাহারও মহিষ ; এক দিন কাহারও ছেলেকে তাড়া করিয়াছে, আর এক দিন কেহ স্বচক্ষে দেখিয়াছে যে আশু মহিষের মত একটা বাঘ, মাথাটা তাহার দশ সের চাল ধরে এমন হাঁড়ির মত। ডাক্তার দিনের পর দিন অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল এবং গোপীনাথকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। গোপীনাথ জানিত, উত্তেজিত হইয়া লাভ নাই। এখানে এমন কোন জঙ্গল নাই যে, দিনের বেলায় বাঘ লুকাইয়া থাকিতে পারে ; যাদু দিলে কাজ হইতে পারে। যেসকল সব খবর পাওয়া যাইতেছে তাহাতে ঠিক বুঝা যাইতেছিল না যে কোন দিকে ছাগল

বাঁধিলে ফল হইতে পারে। উত্তরে দক্ষিণে, দশ-বারো বর্গ-মাইল ব্যাপিয়া এই হিংস্র পশুর দৌরাঙ্গ্য আরম্ভ হইয়াছে। এমন-কি জঙ্গলের বাহিরে বহুদূরবর্তী লোকালয় হইতেও অত্যাচারের খবর আসিতে লাগিল। সকলের চেয়ে বিশ্বয়ের বিষয় যে রাত্রিতে আহত জন্তর কোন চিহ্ন দিনে কোথাও পাওয়া যাইত না।

অবশেষে সত্যই এক দিন সন্ধ্যা আসিল। যে-লোকটা দুধ জোগান দিত, সে আসিয়া খবর দিল যে তাঁবু হইতে প্রায় মাইল চারি দূরে শোক-নদীরই তীরে কাশ ও নল-খাগড়া বনের পাশে সে একটা মৃত মহিষ দেখিয়া আসিয়াছে। জন্তুটা যে বাঘে মারিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ শকুনি, কাক ইত্যাদি কিছুই কাছে নাই। ডাক্তার বেল-গাড়' তৎক্ষণাৎ নিজে "ম্যাগ-নাম এক্সপ্লোরার" লইয়া ও গোপীনাথকে তাহার ১২ বোর বন্দুক দিয়া বেশ কয়েক জন কুলী লইয়া রওনা হইতে চাহিল। গোপীনাথ তাহাকে বুঝাইল যে সত্যই যদি একটা 'মারি' থাকিয়া থাকে, তবে বহু লোক জন লইয়া যাওয়া ঠিক নয়। গুটি দুই-তিন ভাল সাহসী লোক, কিছু দড়ি এবং গোটাকয়েক বাঁশ লইলেই হইবে। দিনের বেলা বাঘ বাহির হইবে না, অতএব বন্দুক না লইলেও চলে।

অবশেষে তাহারা জায়গাতে উপস্থিত হইল। এদিকটা বেশ একটু গভীর জঙ্গল। ঠিক তীরেই গোটাকয়েক পলাশ ও শাল মিলিয়া একটি নিবিড় ছায়ার সৃষ্টি করিয়াছে। খাড়া পাড়ের নীচে দুই ধার ব্যাপিয়া অতি ঘনসন্নিবিষ্ট কাশবন। উচ্চতা এত বেশী যে দুই পাড়ের জঙ্গলে লাগালাগি হইয়া নীচের সামান্য জলরেখাকে প্রায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। গোপীনাথ দেখিল শোকবন্ধব্যাপী এই কাশবন উত্তর দিকে বহুদূর চলিয়া গিয়াছে; চার পাঁচ মাইলের কম নয়। মহিষটাকে দেখিয়া সন্দেহ রহিল না যে কাল শেষরাত্রির দিকে হিংস্র আততায়ীর হাতে এ প্রাণ হারাইয়াছে। বেশী গোলমাল না করিয়া গোপীনাথ অতি সন্তর্পণে কাশবনের ভিতর দিয়া নদীর দিকে গেল। কিছুক্ষণ পরেই ঈষৎ চাপা কণ্ঠে ডাক দিল, "শ্রার"। ডাক্তার হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া তাহার "ম্যাগ-নাম এক্সপ্লোরার" শক্ত করিয়া ধরিল। গোপীনাথ ঈষৎ হাসিয়া তাহাকে ইসারা করিল।

ডাক্তার কাছে গেলে গোপীনাথ তাহাকে অঙ্গুলি দিয়া কি দেখাইল। ডাক্তার সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল নরম বালুকার উপরে বেশ বড় রকম একটি বাঘের পায়ের স্পষ্ট দাগ। উত্তেজনায়, বিশ্বয়ে সে যেন কেমন হইয়া গেল; শুধু অক্ষুট স্বরে বলিল, "আর, বি"। গোপীনাথ তাহার মতের সমর্থন করিল। হঠাৎ ডাক্তার বেলগার্ডের মনটা কেমন করিয়া উঠিল। এই ঘনসন্নিবিষ্ট বহুদূর বিস্তৃত কাশবন; উপরে তীরে ঘন পল্লবিত বৃক্ষশ্রেণীসৃষ্ট নিবিড় অন্ধকার, চতুর্দিকে একটি অসহায় নীরবতা, আর সর্বোপরি এই 'রয়েল বেঙ্গল' ব্যাঙ্কের পদচিহ্ন!

ইতিমধ্যে কুলী তিনজন দড়ি ও বাঁশ লইয়া উপস্থিত হইল। গোপীনাথ দেখিয়া শুনিয়া পলাশ গাছটিকেই উপযুক্ত মনে করিল এবং যথাসম্ভব উচুতে ডালপালা দিয়া লুকাইয়া একটি মাচান তৈরি করাইল।

ঠিক ছিল সন্ধ্যার পূর্বেই মাচানে বসিতে হইবে কারণ অনেক সময় ঠিক সন্ধ্যা হইতে-না-হইতেই বাঘ আসে। গোপীনাথ অল্প-বেতনের কর্মচারী, তথাপি শিকার বিষয়ে অভিজ্ঞতা বেশী। সে ডাক্তারকে বুঝাইল যে নিতান্ত প্রয়োজন না বুঝিলে সে নিজে গুলি করিবে না। মাচান যথেষ্ট উচুতে বাঁধা হইয়াছে, অতএব ভয়ের কোন কারণ নাই। শিকার দেখিয়া ভীত বা উত্তেজিত হইলে চলিবে না, শেষপর্যন্ত সর্বোপেক্ষা ভাল পজিশনের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে, কারণ সন্ধ্যা একবারের বেশী আসে না, যে-অস্ত্র তাহার কাছে আছে তাহা অব্যর্থ ইত্যাদি।

ডাক্তারের সমস্ত দিনটা একটা স্বপ্নের মত কাটিয়া গেল। তাহার জীবনের এই একটা দিন। যদি, যদি সে কোনরকমে একবার মারিতে পারে! চিন্তা নয়, একেবারে 'রয়েল বেঙ্গল'। সঙ্গে-সঙ্গে যত শিকার-কাহিনী সে পড়িয়াছে তাহা মনে করিতে লাগিল। 'নার্ড,' নার্ডই হইল আসল কথা। বন্দুক ত চমৎকার, 'ওয়েস্টলি রিচার্ডের' 'সুপার ম্যাগ-নাম এক্সপ্লোরার', লার্টসাহেবের 'ম্যাগ-নাম এক্সপ্লোরার'—তিন শত গজ ইহার পাল্লা, ৭৩০ গ্রেণ ইহার বুলেট, দেড় হাজার "ফুট সেকেন্ড" বেগে যায় ইহার গুলি, তিন হাজার ছয়-শ তেতাল্লিশ ফুটপাউণ্ড শক্তিতে আঘাত করে—অব্যর্থ ইহার লক্ষ্য—কত 'রয়েল বেঙ্গল', কত চিন্তা, কত গণ্ডার, এমন কি হাতী পর্যন্ত মারিয়াছে এ অস্ত্র!

শীতবস্ত্র, সিগারেট ও বুলেট লইয়া বেলা থাকিতেই ডাক্তার বেলগার্ড ও গোপীনাথ বাহির হইল, এমন সময় কম্পাউণ্ডার উমেশ আসিয়া উপস্থিত হইল, হাতে একটি ছোট শিশি। একবার হাই তুলিয়া, মুখগহ্বর-নির্গত বায়ুপ্রবাহকে অঙ্গুলি-সঞ্চালনে আলোড়িত করিয়া এবং ‘বা করেন মধুসূদন’ বলিয়া সে বলিল, “স্মার, এটি নিয়ে যান।”

“এ কি?”

“ট্রিকনিয়া।”

“ট্রিকনিয়া দিয়া কি হইবে?”

“কি জানি সাহেব, বলা যায় না। গায়ে মাখিয়ে দেবেন মহিষটার। বন্দুক ত হাতে রইলই, অধিকতর ন দোষায়।”

“ভীক কাপুরুষ!”

অনেক তর্কাতর্কির পরে, মেমসাহেবের অস্থুরোধে এবং গোপীনাথের কথায় অবশেষে ট্রিকনিয়া নেওয়া ঠিক হইল। উমেশ কম্পাউণ্ডার ‘বা করেন মধুসূদন’ বলিয়া সরিয়া পড়িলেন। সন্ধ্যার পূর্বে ষথাস্থানে পৌঁছিয়া গোপীনাথ ডাক্তারের নিবেদন সবেমাত্র মহিষটার আশ্রয়-স্থানে ট্রিকনিয়া মাখাইয়া দিল এবং দুইজনে মাচানের উপর উঠিয়া শিকারের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কৃষ্ণপক্ষের মাঝামাঝি কোন একটা তিথি হইবে। চাঁদ দ্বিপ্রহর রাত্রির দিকে উঠিবে। চতুর্দিকের নীরবতা ও নির্জনতা যেন শিকারের প্রতীক্ষায় স্পন্দমান এই দুই মানবের কাছে আরও নিবিড়, আরও জমাট হইয়া উঠিল। অন্ধকারে চারিদিকে বিশেষ কিছু দেখা যাইতেছিল না; শুধু একে অন্নের অতি সান্নিধ্যাহেতু পরস্পরের অস্তিত্ব জানিতেছিল; অথচ শব্দ নাই। দুইটি অশরীরী বৃক্ষাশ্রয়ী ছায়ামূর্তি যেন মুহূর্তে মুহূর্তে একে অন্নের কাছে অপরিচিত রহস্যময় হইয়া উঠিতে লাগিল। একে অন্নের মনে বিশ্বাস উদ্ভগ এমন কি ভীতি জন্মাইতে লাগিল! পাশে যে বসিয়া আছে সে কি মানুষ না প্রেতাছা! বেলগার্ড গোপীনাথের কানে কানে বলিল, “আমি কি ধূমপান করিতে পারি?” গোপীনাথ তাহার মুখে অঙ্গুলিস্থাপন করিয়া কথা বলিতে ও ধূমপান করিতে নিবেদন করিল। বেলগার্ড কতকণ পরে পরেই তাহার উজ্জ্বল হাতঘড়ির কাঁটা দেখিতেছিল। সময় যেন জমিয়া শুক হইয়া গিয়াছে, আর

নাড়িতেছে না। এমন করিয়া যদি সমস্ত রাত্রি মশকদংশন ও মাঘের শীত সহ্য করিতে হয় তবেই হইয়াছে!

রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেল, কোন সাড়া-শব্দ নাই। শীতের রাত্রিতে কোন নিশাচর পাখী পর্যন্ত ডাকিল না। ধীরে ধীরে উত্তরে-বাতাস বহিতে লাগিল এবং প্রায় একই সময়ে পূবদিকে অর্ধবৃত্তাকার চাঁদ উঠিতে লাগিল। শীতশেষের স্নান নিশ্চেষ্ট আকাশ হইতে সেই নাতিপ্রথর কিন্তু যুত-উজ্জ্বল জ্যোৎস্নাশি নিশ্চিন্তপুর জ্বলে ছড়াইয়া পড়িল। শাল-পলাশের পাতার ফাঁক দিয়া দুই শিকারীর গায়ে এবং বৃক্ষপাদমূলে সেই জ্যোৎস্না ডোরা-কাটা আলো-ছায়ার সৃষ্টি করিল। শোকের বৃকে অত্যন্ত ঘন কুম্বাশা জমিয়া নীচের কাশবনকে একেবারে লুকাইয়া ফেলিল। কেবল তীব্র শীতের বাতাসে তাহারা সব সব শব্দে কাঁপিয়া আত্মপরিচয় দিতেছিল।

হঠাৎ সেই কুম্বাশাবৃত কাশবন হইতে একটা ছায়ামূর্তির মত জানোয়ার বাহির হইয়া আসিল। তাহার পিছনে আরও দুটি ছোট-ছোট ছায়া। আন্তে আন্তে উহারা মহিষটার দিকে অগ্রসর হইল। জ্যোৎস্নালোকে ডাক্তার বেলগার্ড ও গোপীনাথ স্পষ্ট দেখিতে পাইল একটা বাঘিনী ও দুটা বাচ্চা। বাঘের চেহারা এমন সুন্দর হইতে পারে তাহা ডাক্তারের জানা ছিল না। বেশ লম্বা, উচ্চতায় অল্প, চারি পায়ে স্বল্প পেশী-শক্তির অপূর্ব পরিচয়। লালুলাগ্রভাগ হইতে নাসিকাস্ত পর্যন্ত একটি লঘু দ্বিপ্র জীবন্ত মসৃণতা। গাত্রচর্মের ডোরাগুলি অনেকটা আলোক-অন্ধকারের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে।

বাঘিনীটা যুত মহিষটার কাছে আসিয়া দু-একবার শুঁকিয়া দেখিল এবং অস্থিরভাবে ঘুরিতে লাগিল। তারপর ধীরে ধীরে যেদিক হইতে আসিয়াছিল সেই দিকেই চলিয়া যাইতে লাগিল। ডাক্তার বেলগার্ড এতক্ষণ বিশ্বাসবিষ্টের মত হইয়াছিল। এতক্ষণে তাহার খেয়াল হইল যে, শিকার হাতছাড়া হইতেছে। বন্দুক উচাইয়া ধরিল; গোপীনাথ কাঁধে হাত দিয়া তাহাকে নিরস্ত করিল।

বাঘিনীটা কিছুদূর গিয়া কিরিয়া তাকাইল; দেখিল, বাচ্চা দুটা আসে নাই। অভিজ্ঞা জননী যাহা সন্দেহে স্পর্শ করে নাই, শিশুশাবক দুটি মনানন্দে তাহাই খাইতেছে বা

খাইবার চেঁচা পাইতেছে। তাহাদের আনন্দ বেশীকণ স্বামী হইল না। ভীত বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইল; উহারা হাত পা ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল এবং কিছুকণ খিঁচুনির লক্ষণ প্রকাশ করিয়া চলিয়া পড়িল। বাঘিনী ফিরিয়া আসিল, একটা বাচ্চার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। গোপীনাথ ডাক্তারকে ইন্ধিত করিল। উত্তেজনায় তাহার হাত কাঁপিতেছিল, নিশানা ঠিক করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িল। কোনরূপে লক্ষ্য স্থির করিয়া 'সেফটি' ও 'ট্রিগার' টানিল কিন্তু ৭৩০ গ্রেণ ওজনের বুলেট ছুটিল না—'ম্যাগনাম এক্সপ্লোরা' গর্জন করিল না। শুধু তাহার পরিবর্তে বন্দুকসংলগ্ন "টর্চ" বাতি হইতে পুচ্ছাকারে নির্গত হইয়া উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোক বাঘিনীর দেহ ও চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান আলোকিত করিল। ডাক্তার 'সেফটি' টিপিতে টর্চের 'সুইচ' টিপিয়াছে।

মূহূর্ত্ত মধ্যে একটা প্রকাণ্ড গর্জন হইল এবং বাঘিনীটা সেই আলোককেন্দ্রের দিকে মাথা উচু করিয়া চাহিল। তাহার মুখ-গহ্বর হইতে নির্গত সেই গর্জন শুনিয়া ডাক্তার, গোপীনাথ, বনভূমি, কাশবন সকলে যেন একসঙ্গে শিহরিয়া

উঠিল। মনে হইল এ যেন নির্জন বনানী-আত্মার অসহায় ক্রুদ্ধ চীৎকার। নিশাচর পশুর চক্ষুতারকা কি অসম্ভব উজ্জ্বল! ডাক্তার বেলগাডের মনে হইল, বাঘিনীর সেই দীপ্ত আধিতারকাতে যেন সম্মোহিনী শক্তি আছে। হিংসা, ক্ষুধা, ক্রোধ, স্নেহ যুগপৎ সেই জ্বলন্ত অগ্নিধণ্ডায় হইতে তাহাকে অতি দুর্নিবার আকর্ষণে টানিতেছে। তাহার হস্তস্থিত বন্দুক অসম্ভব ভাবে কাঁপিতেছিল। সে কেবলই বলিতে লাগিল, "গোপীনাথ আমাকে শক্ত করিয়া ধর।"

বাঘিনীটা মাথা নীচু করিয়া একটা বাচ্চাকে কামড়াইয়া দাঁড় করাইতে চেঁচা করিল। প্রাণহীন শাবক চলিয়া পড়িল। এক প্রকার অশ্রুট শব্দ করিতে করিতে মা বাচ্চাটাকে চাটিতে লাগিল। গোপীনাথ ডাক্তারকে যতই উত্তেজিত করিতেছিল, ততই সে ঘন ঘন বলিতেছিল, "গোপীনাথ, আমাকে শক্ত করিয়া ধর।" অবশেষে হঠাৎ সে অশ্রুটস্থরে বলিয়া উঠিল, "গে—গেল!" হাতের 'ম্যাগনাম এক্সপ্লোরা' মাটিতে পড়িয়া গেল। সেই মূহূর্ত্তেই গোপীনাথের ১২-বোর বন্দুকের দুইনল একসঙ্গে গর্জন করিয়া উঠিল।

আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞান

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, এম্-এ, পিএইচ-ডি

আমাদের দেশের কবিরাঙ্গদের অনেকের ধারণা এই যে, ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্র বিজ্ঞানসম্মত, কিন্তু আয়ুর্বেদ তাহা নহে। আয়ুর্বেদের প্রামাণ্য বেদাদির শ্রায় স্বয়ংসিদ্ধ।

শ্রায়মঞ্জরীতে জয়ন্ত বলিয়াছেন,—

জনোহনস্তত্তাবল্লিরবধিরিহ ব্যাধিনিবহো
ন সংখ্যাতুং শক্যা বহুগুণরসত্রব্যগতয়ঃ ।
বিচিত্রাঃ সংযোগাঃ পরিণতিরপূর্বেতি চ কুতঃ
চিকিৎসাসাঃ পারঃ তরতি যুগলক্ষ্মৈরপি নরঃ ॥

—লোকেরও সীমাসংখ্যা নাই, ব্যাধিরও কোন অবধি নাই। গুণ ও রস ভেদে ত্রব্যের শক্তিরও কোন ইয়ত্তা করা যায় না। নূতন নূতন সংযোগে প্রত্যেক ত্রব্যেরই কত নূতন নূতন গুণ উৎপন্ন হয় তাহারও কোনও ইয়ত্তা করা যায় না। সেইজন্তই লক্ষ লক্ষ যুগেও চিকিৎসাশাস্ত্রের গার পাওয়া যায় না।

শরহুজিস্তা পত্তস্ত জরায় দধি কল্পতে ।
তদেব ভুজং বর্ধায় জরং হস্তি দশান্তরে ॥

ন চোপলক্ষণং কিং চিদান্ত তচ্ছক্তিবেদনে ।

যেইনকত্র গৃহীতাসৌ সর্বত্রাবগতা ভবেৎ ॥

—শরৎকালে পিত্তের বৃদ্ধি হয়, সে সময়ে দধি খাইলে জ্বর হয়, আবার বর্ধাকালে সেই দধিতেই জ্বর দূর হয়। বস্তুর শক্তি বোঝা অতি সুসাধ্য। সেইজন্ত একস্থলে এক বস্তুর শক্তি জানিলেই সর্বত্রই যে সেই বস্তুর সেইরূপ শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে তাহা বলা যায় না।

কো বা জাতু প্রভবতি পুরুষঃ তৎসামর্থ্যং নিরবধিবিসয়ম্ ।

শ্রাং সর্বজ্ঞঃ স ইতি ন বিমতিস্তপ্তন্ন কাথ্যা স্ববচনকথিতৈঃ ॥

—বস্তুর সর্ববিধ শক্তি একমাত্র সর্বজ্ঞ ব্যক্তিই জানিতে পারেন, এইজন্ত আপ্তব্যক্তির দ্বারা লিখিত চিকিৎসাশাস্ত্রে কোনও সম্ভেদ করা যায় না।

কিন্তু আয়ুর্বেদ দৃষ্ট শাস্ত্র। আপ্তোপদেশের দ্বারা যাহা পাওয়া যায় প্রত্যক্ষ ও অহুমান দ্বারা তাহা পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া না লইতে পারিলে আয়ুর্বেদকে বাবহারে আনিতে পারা যায় না। আপ্ত শব্দের দ্বারাও আয়ুর্বেদে কোন

অলৌকিক জ্ঞান বুঝায় না। “আপ্তোহবিতর্কশ্রুতিবিভাগবিদো-
নিপ্রীতুপতাপদর্শিনশ্চ” অর্থাৎ যাহারা রাগদ্বেষবর্জিত ও
নিশ্চিতজ্ঞানসম্পন্ন তাঁহারা এই আপ্ত। চক্রপাণি অলৌকিক
আপ্ত ও লৌকিক আপ্ত এই দুইরূপ আপ্তের নির্দেশ
করিয়াছেন এবং ত্রিশ্রৈষণীয়া অধ্যায়ে রজস্বমোভ্যাং
নির্মুক্ত ইত্যাদি পদে যে আপ্তের লক্ষণ উদ্দিষ্ট
হইয়াছে তাহাকে সহজ আপ্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।
এই সহজ আপ্ত ছাড়া আর একটি লৌকিক আপ্ত আছে।
রাগদ্বেষসহযুক্ত না হইয়া প্রতি বিষয়ে সম্যক জ্ঞানসম্বৃত
যে বুদ্ধি তাহাকেই তিনি লৌকিক আপ্ত বলিয়া নির্দেশ
করিয়াছেন। ইংরেজীতে বলিতে গেলে ইহাকেই scientific
outlook বলা যায়।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে প্রধান ত্রিসূত্র সহজ আপ্তবিষয়ক
হইলেও তাহার মধ্যে অনেকখানি অংশ লৌকিক
আপ্ত জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। ত্রিসূত্রকে
অবলম্বন করিয়া শলা শালাক্য প্রভৃতি অষ্টোক্তের নানা
চিকিৎসা গ্রন্থে উপাদানবৈচিত্র্য ও প্রয়োগবৈচিত্র্য দেখা যায়—
তাহা এই লৌকিক আপ্তবুদ্ধিসম্বৃত। চরক নিজে সহজ
আপ্ত ছাড়া প্রত্যক্ষ, অনুমান ও যুক্তি এই ত্রিবিধ প্রমাণ
স্বীকার করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের কথা
সকলেই জানেন। যুক্তিপ্রমাণট চরকের নিজস্ব।
অনেকগুলি অনুমানকে একত্র গ্রথিত করিয়া একটি স্বতন্ত্র
অনুমান সৃষ্টি করার নাম যুক্তি। এই প্রমাণে স্বতন্ত্র
“দৃষ্টান্ত”কে গ্রহণ করা হয় না বলিয়া চরক ইহাকে
স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অষ্টম শতাব্দীর
শাক্তরক্ষিত তত্ত্বসংগ্রহে ইহারই পুনরুল্লেখ করিতে গিয়া
বলিয়াছেন,

অগ্নিন্ সতি ভবত্যেব ন ভবত্যসতীতি চ।

তন্মাদতো ভবত্যেব যুক্তিরেবাভিধীরতে ॥

প্রমাণান্তরমেবেমিত্যাহ চরকোমুনিঃ।

নানুমানমিহ যস্মাদ্ দৃষ্টান্তোহত্র ন লভ্যতে ॥

—ইহা থাকিলে বা ইহা ঘটিলে ইহা ঘটে, ইহা না থাকিলে বা না
ঘটিলে ইহা ঘটে না, অতএব ইহা হইতেই ইহা হইয়াছে এইরূপ বিচার
করাকে যুক্তি কহে। এই প্রমাণকে চরক মূনি যুক্তি বা যোজনা
বলিয়াছেন। ইহাতে কোন দৃষ্টান্ত দেখান হয় না, এইজন্য তিনি এই
পদ্ধতিকে অনুমান বলিতে চান না।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, লৌকিক আপ্তের জ্ঞান
প্রত্যক্ষ অনুমান ও যুক্তিদ্বারাই উৎপন্ন হয়। চরক-

সংহিতাতে তদ্বিদ্যাসম্ভাষাদিধারা যে নানা তথ্য নিরূপণের
চেষ্টা ও নানা সিদ্ধান্ত স্কৃতির নিদর্শন দেখা যায় তাহার
মূলেও প্রত্যক্ষ অনুমান ও যুক্তি এই ত্রিবিধ প্রমাণের
ব্যবহার দেখা যায়। অস্বাভাবিকের দ্বারা কিংবা একের
পরিবর্তনে অপরের পরিবর্তন দেখিয়া ও অন্য হেতুর
অনুপপত্তিপ্রযুক্ত কার্য-কারণের বা লক্ষ্য-লক্ষণের যে
অব্যভিচারিত ব্যাপ্তি জানা যায় তাহার উপরেই সর্বদেশের
ও সর্বকালের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। আয়ুর্বেদের নিদান,
পূর্বরূপ, রূপ, উপশয়, সম্প্রাপ্তি প্রভৃতি দ্বারা রোগ
নির্ণয়ের ব্যবস্থা দেখা যায়, তাহাতে বিজ্ঞানসম্বৃত উপায় দ্বারাই
ব্যাপ্তিগ্রহ হইয়া থাকে। ত্রিবিধ রোগ বিশেষ বিজ্ঞানীয়
বিমানাধ্যায়ে দেখা যায় “দ্বিবিধা পরীক্ষা জ্ঞানবতাম্ প্রত্যক্ষ-
মনুমানঞ্চ, ত্রিবিধা বা মহাপদেশেন”—জ্ঞানীরা প্রত্যক্ষ ও
অনুমান এই দুই উপায়ে পরীক্ষা করেন এবং আপ্ত ব্যক্তির
উপদেশও গ্রহণ করিয়া থাকেন। রোগীর বর্ণসংস্থান
প্রমাণ ও শরীরপ্রকৃতিবিকৃতি চক্ষু দিয়া পরীক্ষা করিবে।
কান দিয়া তাহার অন্তকুঞ্জনাতি ও স্বরবিকারাদি পরীক্ষা
করিবে, মক্ষিকাাদিধারা তাহার শরীরগত মাধুর্যাদি রস
পরীক্ষা করিবে ও গন্ধ ও স্পর্শ দ্বারা তাহার অন্যান্য বিকৃতি
লক্ষ্য করিবে এবং পরিশেষে নিদানাদি দ্বারা উপশয়ানুপশয় ও
অরিষ্টাদি দ্বারা ব্যাধির প্রকৃতি অনুমান করিবে।

জ্ঞানবুদ্ধিপ্রদীপেন যোনাহবিশতিতত্ত্ববিৎ।

আতুরস্যান্তরান্নানং ন স রোগাংশ্চিকিৎসতি ॥

—যদি তত্ত্ববিদ ভিষক জ্ঞানবুদ্ধিপ্রদীপের দ্বারা রোগীর সম্পূর্ণ
অন্তরান্নাকে প্রত্যক্ষবৎ না দেখিতে পান, তবে তিনি রোগচিকিৎসার
অধিকারী নহেন।

কবিরাজেরা বলেন আয়ুর্বেদে যে সমস্ত রোগ ও রোগের
লক্ষণ সমুদ্ভূত হইয়াছে বর্তমান ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রদ্বারা
তাহা কোন স্থানে অপ্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া জানা
নাই। আয়ুর্বেদের যে-সমস্ত ঔষধাদিধারা যে-সমস্ত রোগ
বা রোগলক্ষণ নির্বাচনের বিধি রহিয়াছে তাহাও
কোনস্থানে ভ্রান্তিমূলক বলিয়া কেহ দেখাইয়াছেন বলিয়া
জানা নাই। পরন্তু আয়ুর্বেদীয় গাছগাছড়ার ঔষধ
অনেক কাল হইতেই ইউরোপীয় ঔষধ-সংগ্রহের
মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে। টপিক্যাল স্কুল অফ মেডিসিন
ও নানা বিজ্ঞানাগারে ভারতীয় ঔষধ নিত্যই পরীক্ষিত

হইতেছে ও ইউরোপীয় ভৈষজ্য-সংগ্রহে গৃহীত হইতেছে শুনিতেছি। এমন কি মকরধ্বজ প্রভৃতি যৌগিক ঔষধগুলিও ডাক্তারেরা ব্যবহার করিতেছেন ও জার্মানী হইতে তাহার আমদানী হইতেছে। ডাক্তারেরা যে ষ্টেথোস্কোপ, থার্মোমিটার প্রভৃতি যন্ত্র ব্যবহার করেন তাহা দ্বারা তাঁহাদের শাস্ত্রের কোন বিশেষ বৈজ্ঞানিকত্ব সিদ্ধ হয় না, কারণ পারীক্ষিক উপায়ে যাহা কানে শোনা যায় বা স্পর্শে পাওয়া যায় বা চক্ষুতে দেখা যায় তাহাই সুগম করিবার জন্য ঐ সমস্ত যন্ত্রাদির ব্যবহার। ইহা দ্বারা ডাক্তারী শাস্ত্রের কোন নবীন প্রকারের বৈজ্ঞানিকত্ব সিদ্ধ হয় না। ঔষধাদি প্রয়োগ সম্বন্ধেও তাহা দিগকেও অধিকাংশ সময়েই ফলের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। কোন ঔষধ কিরূপে কার্য করিল, কোন ঔষধ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কিরূপ জৈব বিকার সম্পাদন করিল তাহা সম্পূর্ণভাবে জানা যাইতে পারে না। শারীর রসায়নের তাদৃশ উন্নতি এখনও সুদূরপর্যন্ত। হয়ত পরীক্ষা দ্বারা একরূপ স্থির করা যায় যে, অমুক ঔষধের ভেদের বা বিড়ালের হৃদয়স্থের উপর এইরূপ প্রক্রিয়া হয়;

সেই ঔষধ দ্বারাই সেই সমস্ত প্রাণীর অন্ত্যন্ত শারীর যন্ত্রের কিরূপ বিকার হয় তাহা হয়ত প্রত্যক্ষ হয় না। জীব-শরীর তাহার সমস্ত যন্ত্রমণ্ডলীর উপর প্রতিষ্ঠিত স্বতন্ত্র জৈব-শক্তি দ্বারা পরিচালিত। এই জৈবশক্তি বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করিলেও তাহাদের মধ্য এমন একটি মূলগত ঐক্য আছে যে, কেবল যন্ত্রবিশেষের উপর প্রভাব দেখিয়া তাহার সমুদায়ের প্রভাব জানা যায় না। যে চিকিৎসক সমস্ত শরীর-পদ্ধতির আলোচনা না করিয়া কেবলমাত্র যন্ত্রবিশেষের উপর প্রভাব পর্যালোচনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করেন তিনি হয়ত সেই যন্ত্রের মঙ্গল করিতে গিয়া অন্ত্র যন্ত্রের অপকার করিয়া বসেন। সমগ্রকে না জানিয়া কেবল অংশবিশেষকে জানিয়া চিকিৎসা চলে না— চিকিৎসককে রোগীর অন্তরাঙ্গাকে সমগ্রভাবে জানিতে হইবে। যখনই কোন পরীক্ষাগারে কোন একটি ঔষধের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তখনই ডাক্তারেরা পূর্বাপর পর্যালোচনা না করিয়া সেই যন্ত্রের রোগ দেখিলে সেই ঔষধ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। ফলে ত্রিশ চতুর্দশ বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণসংহার করিয়া পরিশেষে তাহার দোষ দর্শন

করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হন। ইহা ছাড়া বিড়াল বা বানরের উপর ভৈষজ্যের যে পরীক্ষা হয় নরশরীরেও যে তাহার ফল সেইরূপই হইবে তাহাও বলা অত্যন্ত স্কন্ধিন। এইজন্য ডাক্তারী শাস্ত্রের ভৈষজ্যসম্পদ অতি দরিদ্র। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে সহস্র সহস্র ঔষধ শত শত বৎসর ধরিয়া মনুষ্যশরীরে পরীক্ষিত হইয়া আসিতেছে। অনেক ঔষধ হয়ত সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া পরীক্ষিত হইয়াছে। সেইজন্য আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রয়োগে যে নিশ্চিন্ততা এবং নিশ্চয়তা আছে ডাক্তারী ঔষধ প্রয়োগে সে নিশ্চিন্ততা বা নিশ্চয়তা নাই। ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে শতাধিক বর্ষ ধরিয়া ক্রিমিনিদান নামে স্বতন্ত্র একটি নিদানশাস্ত্র উদ্ভূত হইয়া পরম ব্যাপকতা লাভ করিতেছে। এই নিদানশাস্ত্রের তাৎপর্য এই যে, অধিকাংশ শারীরিক ব্যাধিই নানা প্রাণি-জাতীয় উদ্ভিজ্জাতীয় ক্রিমি দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইজন্য ডাক্তারেরা কান, নাক, চক্ষু, গলরন্ধ্র, নিষ্ঠীবন, রক্ত, উদরাস্ত্র, পুরীষ, মূত্র, পুঞ্জ প্রভৃতি বিবিধ বস্তু পরীক্ষা করিয়া তদন্তঃস্থিত ক্রিমিগুলি অমুখীকরণ প্রভৃতি যন্ত্র দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া সেই ক্রিমিদেহোৎপন্ন বিষের দ্বারা শরীরগত তৎতৎ ক্রিমিবিষের চিকিৎসা করিয়া থাকেন। রোগের সাধারণ লক্ষণ অপেক্ষা তৎতৎ ক্রিমিজন্মস্বাবচ্ছিন্নস্বই তৎ-তৎ রোগের লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত উপায়ে রোগের আরোগ্য হয় না তাহা আমরা বলি না, কিন্তু এই সমস্ত রোগ এবং তৎতৎ কারণীভূত তৎতৎ ক্রিমিগুলি যে ভৈষজ্যসাধ্য নহে ইহাও প্রমাণ করিবার উপায় নাই। ক্রিমিজন্ম পুরস্কারে ব্যাধির যে লক্ষণ দেওয়া হয় তাহা যে উপাধিগ্রস্ত নহে, অর্থাৎ অন্ত্র হেতুৎপন্ন হইয়াও, তৎসহজাতত্ব পুরস্কারে যে ক্রিমিজন্ম হয় নাই তাহাও প্রমাণ করিবার উপায় নাই। ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে প্রাচীন আয়ুর্বেদেও বহু ব্যাধির সহিত ক্রিমিকারণতা অস্থিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। চরক বলিয়াছেন—

“ইহ খল্লিগ্ণবিশ। বিংশতিবিধাঃ ক্রিময়ঃ পূর্বমুদ্দিষ্টা নানাবিধেন

প্রবিত্তাগেনাস্তত্র সহজৈভ্যঃ।

তে পুনঃ প্রকৃতিভিভিদ্যমানাস্ততুর্কিখাস্তদ্যথা—পুরীক্সাঃ সেন্সজাঃ

শোণিতজা মলজাস্তেতি।”

—হে অগ্নিবিশ, মনুষ্যের শরীরে কতকগুলি স্বাভাবিক জীবাণু আছে, তাহা ছাড়া আরও কিশতি প্রকার জীবাণুর কথা পূর্বে বলা হইয়াছে।

ইহারা অনেক জাতীয়। ইহা ছাড়া পুরীষজাত, ঘর্ষ প্রভৃতি শরীর মলস্থিত, স্লেষস্থিত ও শোণিতস্থিত এই প্রকার চারি ভাগেও অনেক জীবাণুর বিভাগ করা যাইতে পারে।

এই সমস্ত ক্রিমির সেই সেই ব্যাধির সহিত সমান-কারণোৎপন্নতাও চরক স্বীকার করিয়াছেন। চরক বলেন— “শোণিতজানাং তু ফুঠৈঃ সমানং সংস্থানম্” কিন্তু ক্রিমি-কারণতা আছে বলিয়াই যে বায়ুপিত্তকফাদিকারণতা নাই তাহাও প্রমাণ করিবার কোনও উপায় নাই। পরন্তু অনেক সময়েই দেখা যায় যে, এই ক্রিমি আবিষ্কার করিতে যে সময় লাগে ও যে শিক্ষাচাতুর্যের প্রয়োজন হয় তাহার অভাবে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রোগ ও রোগের কারণ অবিজ্ঞাত থাকিয়া যায়। সুবিজ্ঞ ডাক্তারেরা যে পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট ক্রিমির সাক্ষ্য না পান সে পর্য্যন্ত চিকিৎসায় হাত দিতে সাহস পান না। ফলে এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, রোগ-লক্ষণের দ্বারা রোগ নিরূপণ করা ডাক্তারদের পক্ষে একরূপ সীমাবহিত হইয়া আসিতেছে। ক্রিমির নিরূপণ হইলেই যে তাহার বিনাশ-সাধন সহজ হয় তাহাও নহে। অনেক সময়ে ক্রিমি দূর হইলেও আবার রোগ যায় না। ক্রিমি যথাকালে আপনা আপনি ধ্বংস হইবে এই আশায় ডাক্তারকে দিন গণিয়া যাইতে হয়। ক্রিমি আবিষ্কার-পদ্ধতিও মফস্বলে ও গ্রামে সম্ভব নয়। ক্রিমির আত্মরস প্রস্তুত করাও কলিকাতা ব্যতীত অত্র দুর্ঘট। পরন্তু রোগের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাহির করিতে রোগীকে যে পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিতে হয় তাহাতে রোগের চিকিৎসার অর্থ থাকে না। অনেক সময়ে পর পর চার-পাঁচ বার পরীক্ষা না করিলে ক্রিমিগুলি আত্মপরিচয় দেয় নাই। এই অবস্থায় আয়ুর্বেদনিদানপদ্ধতিতে রোগনির্ণয় করার মধ্যে অবৈজ্ঞানিকতার কোন কথা উঠিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। আয়ুর্বেদের চিকিৎসার একটা বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেক রোগীর বিশেষ ব্যক্তিগত অবস্থা, প্রকৃতি, দেশ, কাল, ঋতু, আহার, বিহার, পিতৃপুরুষের ইতিহাস, স্বভাব ও রোগের তৎতৎ প্রকৃতিজ বিশেষ বিশেষ লক্ষণ এবং রোগের সাধারণ লক্ষণ এই সমস্তগুলিকে একত্র করিয়া প্রত্যেক মানুষের বিশিষ্টতাকে অনুধ্যানরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার জন্ম দেশ কাল ঋতু প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া ঔষধ নির্বাচন করা। সেই জন্যই চরক বলিয়াছেন,

“সর্বথা সর্বমালোচ্য যথা সম্ভবমর্থবিৎ ।
অধাধ্যবসেৎ তদ্ব্যব কাথ্যে চ তদনন্তরম্ ॥
জ্ঞানবুদ্ধিপ্রদীপেন যো নাহবিশতি তদ্বিৎ ।
আতুরস্যান্তরাধানং ন স রোগাংশ্চিকিৎসতি ॥”

—সমস্ত দিক হইতে সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া কোন লক্ষণের কি তাৎপর্য তাহা যথাযথ নির্ণয় করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তবে চিকিৎসক চিকিৎসাকার্য আরম্ভ করিবেন। অনুভবের দ্বারা এবং যুক্তির দ্বারা যিনি রোগীর রোগমূর্ত্তিকে প্রত্যক্ষবৎ না দেখিতে পান তিনি চিকিৎসা করিবার অধিকারী নহেন।

কুইনাইন জরম্ব বটে, কিন্তু অনেকের শরীরে ইহা বিষের গ্রাঘ কার্য করে। এমিটিন কোন আমাশয়ের উপকারক বটে, কিন্তু অনেকের হৃদপিণ্ডের উপর ইহা অনেক অনিষ্ট সংঘটন করিতে পারে। ডাক্তারী চিকিৎসাবিধিতে দেশ-কাল অবস্থা লইয়া ব্যষ্টি পুরুষের চিকিৎসা না করিয়া সামান্যত্বকভাবে যন্ত্রবিশেষের চিকিৎসা করে বলিয়া সমস্ত যন্ত্র লইয়া যে যন্ত্রটি রহিয়াছে তিনি উপেক্ষিত হন। জড়ধাতু-সমুদয় জীবের উপকারক উপাদান বটে, কিন্তু জড় ছাড়া জীব স্বতন্ত্র। সেইজন্য কেবল জড়বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে কেবল বিচ্ছিন্ন যন্ত্র বা অবয়বের দৃষ্টিতে বা কলকলার অনুকরণ-রীতিতে মানুষের স্চিকিৎসা সম্ভব নয়। পিতৃপুরুষগত ইতিহাস, প্রকৃতি, ধাতু, আহার, বিহার, দেশ, কাল, ঋতু, সমাজ, বিশ্বাস প্রভৃতি লইয়া জীব একটি স্বতন্ত্র বস্তু। যতদিন পর্য্যন্ত ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্র কেবলমাত্র জড়-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বা রসায়নের দৃষ্টিতে চিকিৎসা করিবেন, কিন্তু জীবত্ব হিসাবে, ব্যক্তিত্ব হিসাবে, জীবকে দেখিতে না শিখিবেন ততদিন পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকত্বের মোহে তাঁহাদের দৃষ্টি আবদ্ধ থাকিবে। রোগীর বাহ্যরোগ যেমন দেখিতে হইবে তেমন তাহার মনের অবস্থাও বিচার করিতে হইবে। একদিকে যেমন দেখিতে হইবে,

“অগ্নিং জরগণজ্যা বলং ব্যায়ামশক্ত্যা ।”

—জার্ণ করিবার শক্তি দ্বারা তাহার পাকাশয়ের অগ্নির বল বুঝিবে এবং ব্যায়ামের ক্ষমতার দ্বারা তাহার বল বুঝিবে।

তেমন দেখিতে হইবে,

“বিজ্ঞানং ব্যবসায়েন মোহমবিজ্ঞানেন জোধমভিজ্ঞোহেন ।”

—নিশ্চরায়িকা বুদ্ধির পরিমাণ দ্বারা তাহার বিজ্ঞান, মুঢ়তা দ্বারা মোহ, অপরের অপকার চেষ্টা দ্বারা তাহার জোড়ের পরিমাণ।

“শোকং দৈন্তেন, ক্রীতিং তোষণে, শীলং অনুশীলনে, ধৃতিং অলৌল্যেন...”

—দীনতাদ্বারা তাহার শোক, পরিতোষের দ্বারা ক্রীতি, অনুশীলনের ক্ষমতার দ্বারা চরিত্রবল, অচঞ্চলতাদ্বারা তাহার ধৈর্য জানিতে হইবে।



সারঙ্গী

শি পূর্বচন্দ্র চক্রবর্তী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

রক্ত: ও তমোগুণের বৃদ্ধিতে মানসব্যাদি উৎপন্ন হয় এবং বায়ুপিত্তকফাদির ধাতুবৈষম্যপ্রযুক্ত শারীরব্যাদি উৎপন্ন হয়। সেইজন্য চরক বলিয়াছেন—

“ব্রহ্মশ্রমাণাং ব্যাধীনাং ত্রিবিধো হেতুসংগ্রহঃ”

—শরীর ও মনকে আশ্রয় করিয়া যে ব্যাদি উৎপন্ন হয় তাহার কারণ তিন প্রকার (বায়ু, পিত্ত ও কফ)।

আয়ুর্বেদের দ্বারা অধ্যাত্মবিদগণের, ধর্মস্থাপকদিগের, মাতাপিতা ও বন্ধুজনের বিকার প্রশমনে যখন লোকে চেষ্টিত হয় এবং আয়ুর্বেদাঙ্ক অধ্যাত্ম শাস্ত্র যখন লোকে অল্পাধ্যয়ন করে ও লোককে শিক্ষা দেয় তাহাই আয়ুর্বেদের পরম ধর্ম। আয়ুর্বেদবিদগণের চিকিৎসাদ্বারা অর্থোপার্জন বিধেয় নহে। ধনবানেরা যথাস্থগে যোগ উপহার দেন তাহাতেই বৈদ্যের সন্তুষ্টি থাকা উচিত। বৈদ্য যে রুগ্ন প্রাণীদিগকে আত্মপ্রযত্নে রক্ষা করিতে পারেন ইহাই বৈদ্যের অর্থপ্রাপ্তি। বিধ্বস্তপ্রযুক্ত যশ এবং বৈদ্য যে লোকের আশ্রয়ভূত হইতে পারেন এবং সম্মানলাভ করিতে পারেন এবং লোকের আরোগ্য বিধান করিতে পারেন ইহাই তাহার কামনা পরিপূরক। আয়ুর্বেদ অধ্যাপনের কথা বলিতে গিয়া চরক বলিয়াছেন যে আচার্য্যের আয়ুর্বেদে পূর্ণজ্ঞানসম্পন্ন, দক্ষ, পরিদৃষ্টকর্ম্মা, দাক্ষিণ্যযুক্ত, শুচি, জিতহস্ত, প্রকৃতিজ্ঞ, অনহঙ্কৃত, অনসূয়ক, অকোপন, ক্লেশক্ষম, শিষ্যবৎসল ও জ্ঞাপনসমর্থ প্রভৃতি গুণসম্পন্ন হওয়া আবশ্যিক। আর শিষ্যেরও প্রশান্ত প্রকৃতি, ঋজুচক্ষু, ঋজুনাসা, বিশদজিহ্বা, ধৃতিমান, অনহঙ্কারী, মেধাবী, বিতর্ক-স্বৃতিসম্পন্ন, উদারসত্ত্ব, তত্ত্বাভিনিবেশী, অব্যসনী, অমুচ্ছতবেশ, শীল ও শুদ্ধাচার সম্পন্ন, অনুরাগ ও দাক্ষিণ্যযুক্ত, অধ্যয়নে ও শাস্ত্রার্থজ্ঞানে ও কর্ম্মদর্শনে অনগ্রকার্য্য, অলুপ্ত, অনলস ও সর্বভূতহিতৈষী হওয়া আবশ্যিক। আয়ুর্বেদাধীতী সর্বদা গুরুর অধীন ও তাঁহার পুত্রবৎ, দাসবৎ তাঁহার প্রিয়হিতানুবর্তী হইবেন এবং সমস্ত প্রাণভূৎগণের মঙ্গলকামনা করিয়া কার্য্যে লিপ্ত হইবেন, এবং এই প্রতিজ্ঞা করিয়া জীবন আরম্ভ করিবেন যে তিনি জীবনের সকল অবস্থাতেই রোগীদিগের আরোগ্য-চিন্তায় ও চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিবেন। কেবল যে আচার্য্যই তাঁহার আচার্য্য তাহা নহে, তিনি সকলের নিকট হইতেই জ্ঞানাহরণ করিবেন। “কুৎসোহি লোকো

বুদ্ধিমতাম্ আচার্য্যঃ।” আয়ুর্বেদ শিক্ষা করিতে হইলে অধ্যয়ন অধ্যাপন ও তদবিদ্যাসম্ভাষা (অর্থাৎ জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন, অকোপন ও প্রিয়ভাষী পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রালোচনায়) আপন জ্ঞানবৃদ্ধি করিবেন।

আয়ুর্বেদে শরীরের দ্বিবিধ গুণের কথা উল্লিখিত আছে। একটি শরীরক্ষয়কারক, তাহাকে বলে মল, অপরটি তাহার পোষক তাহাকে বলে প্রসাদ। বায়ু, পিত্ত, কফ হইতেই সর্ববিধ বিকার উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে দোষ কহে। কিন্তু এই বায়ু, পিত্ত, কফ যদি স্বকীয় যথানির্দিষ্ট পরিমাণকে অতিক্রম না করে তাহা হইলে তাহা শরীরকে সংরক্ষণ করে এবং ধাতু বলিয়া পরিগণিত হয়। মলও যদি স্বকীয় মাত্রাকে অতিক্রম না করে তাহা হইলে তাহা শরীরবিধারণ কার্য্যের সহায়তা করে এবং তাহাকে মলধাতু কহে। যখন মলরূপে নিঃসারিত হয় তখন বায়ু পিত্ত কফকেও মল বলা যাইতে পারে। মলধাতু ও অগ্ন্যন্ত প্রসাদ ধাতুর যখন যথানির্দিষ্ট সাম্য রক্ষিত হয় তখনই শরীর নীরোগ থাকে। ধাতু-বৈষম্যই সকল রোগের নিদান। রসরক্তাদিও শরীরের ধারণ-পোষণ করে বলিয়া ধাতু নামে অভিহিত হয়। বাগভট্ট দোষ, ধাতু ও মল তিনটিকে পৃথক গণনা করিয়াছেন এবং ধাতুবৈষম্যকে রোগের কারণ না বলিয়া দোষবৈষম্যকে রোগের কারণ বলেন। তিনি বলেন যে যেমন সাংখ্যীয় ত্রিগুণের দ্বারা বিশ্ব নির্মিত হইয়াছে তেমন এই ত্রিদোষ দ্বারাই সকল ব্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুশ্রুত, বায়ু পিত্ত কফের ত্রায় শোণিতকেও রোগের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সুশ্রুত বলেন যে বায়ু পিত্ত কফ শুক্রশোণিতের সহিত একযোগে কার্য্য করিয়া দেহ গঠন করে। বায়ু পিত্ত কফ প্রভৃতি প্রত্যেকেই শরীরের নানাস্থানে নানাপ্রকার প্রাণক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। চরকসংহিতায় বায়ু পিত্ত কফ কিটু হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিটু শব্দের কি অর্থ তাহা স্থির করিয়া বলা কঠিন, তবে সম্ভবতঃ রক্তরসাদির সংঘটনকালে যাহা অপরিপক হইয়া পড়িয়া থাকে তাহাকেই কিটু বলে। কিটুমূলক হইলেও বায়ু পিত্ত কফ শরীরের সংগঠনে ও বিধ্বংস ব্যাপারে আপনার গুণ্ডি প্রকাশ করিয়া থাকে। সুশ্রুত বায়ু পিত্ত কফের এই কিটুত্বের কথা তেমন করিয়া উল্লেখ

না করিলেও ইহাদের দ্বারাই যে শরীরের সর্ববিধ প্রাণক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহা বলিয়াছেন। চরক বলেন যে গর্ভের আরম্ভ হইতে বায়ু পিত্ত কফ ও মল তাহার সঙ্ঘটন কার্যে ব্যাপ্ত থাকে এবং ইহাদের প্রত্যেকের শক্তিপ্রকাশের নূনাধিক্যবশতঃ কেহবা পিত্তল কেহ বা বতল কেহ বা শ্লেষ্মল হইয়া থাকে। এই দোষ-প্রকৃতি আর ধাতুবৈষম্যজনিত দোষ-বৃদ্ধি একবস্তু নহে, দোষবৃদ্ধি রোগের কারণ হইলেও দোষ-প্রকৃতি রোগের কারণ নহে। একটি প্রাকৃতিক, অপরটি আগন্তুক। কিন্তু বায়ু পিত্ত কফের স্বরূপ কি, বায়ু পিত্ত কফ কি বিবিধ উপদ্রবের একটি সমষ্টাত্মক নাম, না বায়ু পিত্ত কফ নামক কোনও বস্তু আছে? চরক প্রভৃতি গ্রন্থের কোনও কোনও স্থান দেখিলে মনে হয় যে বায়ু পিত্ত কফ কেবলমাত্র কতকগুলি বিকারের সমষ্টিভূত নাম মাত্র। কিন্তু এমন স্থল আছে যেখানে বায়ু পিত্ত কফকে মূর্ত বস্তু বলিয়া মনে করা যায়। মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন মহাশয় তাঁহার সিদ্ধান্তনিদানে স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপে ইহাদের বিভাগ করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রে এইরূপ বিভাগ পরিদৃষ্ট হয় না এবং চিকিৎসায় ইহার যে কোনও উপযোগিতা আছে তাহা মনে হয় না। কোনও দোষ প্রকুপিত হইল বলিলে, সেই দোষের সকল গুণই যে প্রকুপিত হইল ইহা বুঝায় না। কোন দোষের কোন গুণ যে কি পরিমাণে বিকৃতি প্রাপ্ত হইল, অংশাংশ-বিকল্পের দ্বারা তাহার নির্ণয় করা স্তব্দের কার্য। ইহা হইতে এইরূপ মনে করা যাইতে পারে, যে, দোষগুলি শরীরজ কোনও প্রকারের আশ্রাব, এবং এই প্রত্যেক আশ্রাবের মধ্যে নানাজাতীয় পদার্থ সঙ্ঘের নানাজাতীয় গুণ থাকাতে কোনও গুণের প্রকোপপ্রযুক্ত বিশিষ্ট ব্যাধির উৎপত্তি হইতে পারে। এই বায়ু পিত্ত কফের ক্রীড়া মানুষের পূর্বজন্মার্জিত কর্মের উপর নির্ভর করে এবং শরীর ও মন উভয়কে বিকৃত করিয়া তুলিতে পারে। চরকের মতে শরীর ও মন উভয় লইয়াই জীব।

“শরীরমপি সৰ্বমনুবিধীয়তে সৰ্বক শরীরম্।”

—ম.নর উপর শরীর ও শরীরের উপর মন নির্ভর করে।

সেই হেতু বায়ু পিত্ত কফের জন্ম কেবল যে শরীর কার্যে চলে তাহা নহে, ইহাদের দ্বারা মানস কার্যও সম্পন্ন হইয়া থাকে। বর্তমান যুগের প্রাণতত্ত্ববিদেরা শরীর সম্বন্ধে যে-সমস্ত আলোচনা

করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে শরীরের মধ্যে সর্বদা নানাপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে এবং আমরা শরীর বলিতে যাহা বুঝি তাহা কতকগুলি কোষসমষ্টি মাত্র। প্রত্যেক শরীর-বিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কোন-না-কোনও কোষের ধ্বংস হইতেছে এবং কোন-না-কোনও কোষের উৎপত্তি হইতেছে এবং নিরন্তর এই ধ্বংস ও সৃষ্টির লীলা হইতেই সদাসর্বদা শরীরের মধ্যে নানারূপ রাসায়নিক উৎপত্তি হইতেছে। কিন্তু জীবন বলিয়া পদার্থটি কি তাহা কেহই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। কেহ বলেন জীবশক্তি একটা স্বতন্ত্র শক্তি, কেহ বলেন ইহা সমগ্রের একটা মিলিত শক্তি, কেহবা বলেন ইহা তড়িৎশক্তির অনুরূপ একটা শক্তি। কিন্তু সমস্ত শরীর যে-জীবশক্তির দ্বারা উৎপন্ন, তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকদিগের কোনরূপ নিশ্চয়জ্ঞান নাই। কবিরাজেরা ইহাই বলিবেন যে এ-অবস্থায় জীবশক্তিকে একশক্তি না বলিয়া বায়ু পিত্ত কফাত্মক শক্তিত্রিতয়ের দ্বারা জীবশক্তির প্রকাশ হয় এবং তাহাদের বৈষম্যে রোগ উৎপন্ন হয় ইহা স্বীকার করিলে অবৈজ্ঞানিকতা হয়। যে-উপায়ে সমগ্র জীবসমাজ পশু পক্ষী তরু গুল্মলতা প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে, বর্ধিত হইতেছে ও সংহারপ্রাপ্ত হইতেছে, সেই উপায়েই মানুষও উৎপন্ন, বর্ধিত ও সংহারপ্রাপ্ত হয়—

“পুরুষোহয়ং লোকমন্নিতঃ”

—মনুষ্যদেহ সমস্ত বিশ্বব্যাপারের একটি প্রতিচ্ছবিমাত্র। সমস্ত বিপের বা নিয়ম, মনুষ্যের মধ্যেও ঠিক-ঠিক সেই নিয়মগুলিই কাজ করিতেছে।

আধুনিক কালে শরীরের উপর ঔষধের রাসায়নিক ক্রিয়া সম্বন্ধে নানাবিধ বিস্তৃত আলোচনা ও নানা শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীনকালে ঔষধের বায়ু পিত্ত কফ প্রভৃতি প্রশমনের গুণ বিচার করিতে হইলে প্রধানতঃ দেখা হইত যে তাহাতে কটু তিক্ত কষায় অম্ল লবণ মধুর এই ছয় রসের কোন রস আছে। ঔষধের শক্তির পরিচয় তাহার রসের পরিচয় দ্বারা পাওয়া যায় বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন। স্বাদু অম্ল লবণ রসের দ্বারা বায়ু প্রশমিত হয়, তেমনি কষায় স্বাদু তিক্ত দ্বারা পিত্ত এবং কষায় কটু তিক্ত দ্বারা কফ নির্জিত হয়। কটু তিক্ত কষায় দ্বারা বায়ু উৎপন্ন হয়, আর কটু অম্ল ও লবণের দ্বারা পিত্ত উৎপন্ন এবং স্বাদু অম্ল লবণদ্বারা কফ উৎপন্ন হয়। ভিষকেরা

যখন দেখিতেন যে কোনও বস্তুর স্বাদে একরূপ রস হইলেও তাহার ফল অগুরূপ, তখন তাঁহারা বলিতেন যে তাহা জীর্ণ হইলে তাহাতে পাকজ্ঞ অগুরূপ রসের উৎপত্তি হয়। যেমন গুণ্ঠী আন্বাদে তীব্র ও কটু হইলেও বিপাকে মধুর, সেইজন্ম বায়ু প্রশমন করে। আবার কুলথ কটু হইলেও উষ্ণবীর্ষাভ-প্রযুক্ত বায়ু প্রশমন করে। আবার অনেক স্থলে যখন রস বিপাক ও বীর্ষ্যের দ্বারা ঔষধের কল ব্যাখ্যা করিতে পারা যাইত না তখন বলা হইত যে প্রভাব দ্বারা কোন বিশেষ বস্তু কোন বিশেষ ফল উৎপাদন করে। আমলকীকে ত্রিদোষপ্রশমন বলা হয়। রসবীর্ষ্যবিপাকদ্বারা ইহা পাওয়া যায় না। সেইজন্ম প্রভাব বলিয়াই স্বতন্ত্র শক্তি মানিতে হয় যাহার বলে আমলকী ত্রিদোষ হরণ করে। সূক্ষ্ম বস্তুর শক্তি বলিয়া স্বতন্ত্র শক্তি স্বীকার করেন। কিন্তু চরক ও চক্রপাণি স্বতন্ত্র শক্তি স্বীকার করেন না।

শক্তি ই স্বরূপমেব ভাবানাম্ নাতিরিক্তং কিঞ্চিৎ ধর্মাস্তুরং ভাবানাম্।

—শক্তি ও বস্তু অভিন্ন। বস্তু ছাড়া শক্তি বলিয়া কোনও স্বতন্ত্র কিছু নাই। শক্তিই একাদিকে দেখিতে গেলে শক্তি, অপর দিকে দেখিতে গেলে বস্তু।

কোন কোন ঔষধ রসের দ্বারা কায্য করে, কোন কোন ঔষধ বীর্ষ্যদ্বারা কায্য করে, আবার কোন কোন ঔষধ রস ও বীর্ষ্য উভয়দ্বারা কায্য করে। রস ও বীর্ষ্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব হইলে সাধারণতঃ বীর্ষ্যই প্রাধান্য লাভ করে। আবার রস ও বিপাকে দ্বন্দ্ব হইলে বিপাক প্রাধান্য লাভ করে। রস ও বিপাক একত্র হইয়া বীর্ষ্যকে বিফল করিতে পারে, কিন্তু প্রভাব সকলকেই বিফল করিতে পারে আবার কোন কোন স্থলে রসও এমন প্রাধান্য-লাভ করিতে পারে যে তাহা বিপাক ও বীর্ষ্যকে বিফল করিতে পারে, তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে আগে দ্রব্যের গুণ পারীক্ষিক উপায়ে নির্ণীত হইত, পরে রস বীর্ষ্য বিপাক প্রভাবাদি দ্বারা তাহা ব্যাখ্যাত হইত।

চরকের মধ্যে তিন জাতীয় ঔষধের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাণিজ, উদ্ভিজ্জ ও পার্থিব। পার্থিবের মধ্যে সূবর্ণ টিন বা এলু, রক্তত, তাম্র, সীস লোহা, বালুকা, চূণ, মনঃশীলা অলাল বা আর্সেনিক, হরিতাল বা পীত আর্সেনিক, রসায়ন বা এ্যাস্টিমনি, গৈরিক বা লাল চক ও

নানাবিধ মণি ব্যবহারের কথা উল্লিখিত আছে। সূক্ষ্মতের মধ্যে এইগুলি ছাড়া মাস্কিক বা (আয়রণ পাইরাইটস)এর ব্যবহারের কথা দেখা যায়। চরক ও সূক্ষ্মত উভয়ের মধ্যেই সৌবর্চল, সৈন্ধব, বীট, উস্তিদ ও সামুদ্র লবণের ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া নানাবিধ ক্ষারের প্রয়োগও দেখা যায়। চয় রকম শীলাজতুর ব্যবহারও চরক সূক্ষ্মতের মধ্যে দেখা যায়। ইহা ছাড়া সূক্ষ্মতের মধ্যে পারদেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। যে-সমস্ত লৌহাদি ধাতুর কথা উল্লিখিত হইল সেগুলি দিয়া অনেক সময়ে লবণাক্ত করিয়া পোড়াইয়া তাহাদ্বারা অক্সাইড প্রস্তুত করিয়া তাহাও ব্যবহার করা হইত। তৃতীয় বা চতুর্থ শতকে নাবনীতক গ্রন্থে এই সমস্ত ঔষধেরই উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া কাংশ বা পুষ্পাঙ্গন ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইত ইহারও উল্লেখ পাওয়া যায়। সপ্তম শতকে বৃন্দের গ্রন্থেই প্রথম আমরা পর্পটিতাত্রের উল্লেখ পাই। এই পর্পটিতাত্র গন্ধকতাত্র মাস্কিক ও পদ্রদের দ্বারা পুটপাকে প্রস্তুত হইত। বাগ্ভটের মধ্যেও পারদ ও সীসক ও রসায়ন দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী দেখা যায়। তাহা ছাড়া গন্ধক, হরিতাল, সীসা, তাম্র, রসায়ন ও এলু একত্র মিলিত করিয়া অক্ষমূষায় পাক করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। এইরূপ পাক করিবার প্রণালী পরবর্তী তন্ত্রযুগে বিশেষ ভাবে প্রচলিত হয়। চক্রপাণির (১১শ শতাব্দী) পারদ ও গন্ধক দ্বারা কঙ্কলী বা রসপর্পটি প্রণয়নের ব্যবস্থা দেখা যায়। তাম্র এবং গন্ধক পুটপাকে সম্বলিত করার দারুণ উত্তাপে লৌহকে দগ্ধ করিয়া লৌহচূর্ণ করা ও তাহাকে পরিশেষে হরিতকী প্রভৃতির রসের সহিত যুক্ত করিয়া ঔষধার্থ ব্যবহারের বিধিও দেখা যায়। ছাই ও চূণ গর্দভের মূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া ও পরিশেষে সরিষার তেল সংযুক্ত করিয়া একরূপ সাবান প্রস্তুতের প্রণালীও দেখা যায়। রক্ততদ্বারাও রূপ্যমল নামক একরূপ যৌগিক পদার্থ ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইত। ১১শ হইতে আরম্ভ করিয়া তাস্কিক যুগের আরম্ভ। রসার্ণবতন্ত্র এই যুগের অতিপ্রাচীন গ্রন্থ। মাধব তাঁহার সর্বদর্শনসংগ্রহে এই তন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। এই তন্ত্রে পারদ প্রভৃতি নানাবিধ খনিজদ্রব্য নানা প্রকারে পাক করিবার জন্ম কোষ্ঠী, দোলায়ন্ত্র, গর্ভযন্ত্র, হংসপাদযন্ত্র প্রভৃতি নানারূপ যন্ত্রের ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সময়ে মাস্কিক, বিষলা

শীলা, চপলা, রসক, শস্যক ও দরদ প্রভৃতি খনিজ পদার্থ ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। এইগুলিকে মহারস বলিত। মাস্কিক হইতে তাম্র বাহির করিবার প্রণালীও তাঁহারা জানিতেন। ১৩শ শতাব্দী হইতে ১৬শ শতাব্দীর মধ্যে বহু রসগ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছিল। এই সমস্ত গ্রন্থ হইতে আমরা বহু রসনিপুণ পণ্ডিতের নাম শুনিতে পাই; যথা, চন্দ্রসেন, লক্ষ্মণ, বিশারদ, কপালী, মত্ত মাণ্ডব্য, ভাস্কর, সৌরসেনক, রত্নকোষ, শঙ্কু, সাত্বিক নরবাহন, ইন্দ্রদ, গোমুখ, কঞ্চলী, ব্যাড়ি, নাগার্জুন সুরানন্দ, নাগবোধী, যশোধন, খণ্ড, কাপালিক ব্রহ্ম, গোবিন্দ, লম্পক, রসাক্ষয়, ভৈরব, স্বচ্ছন্দভৈরব, নন্দী, মহানভৈরব, কাকচণ্ডীশ্বর, বাসুদেব ঋষ্যশৃঙ্গ রসেন্দ্রতিলক, ভালুকী, মহাদেব, নরেন্দ্র, রত্নাকর, হরীশ্বর, সিংহগুপ্ত ইত্যাদি। এই সমস্ত সময়েও ঔষধার্থে অস্ত্রেরও প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। বৈক্রান্ত নামক একরূপ হীরকভস্মেরও প্রচুর ব্যবহার দেখা যাইত। ইহা ছাড়া ঐ সময়ে দুই প্রকার কাসিস (sulphate of iron) অর্থাৎ বালুকা কাসিস, পুষ্পকাসিস, তুবরী (ফটকিরি) ও ফটকিরি বা ফুলকা, সৌবীরাঞ্জন, রসঞ্জন, শ্রোতোঞ্জন, পুষ্পঞ্জন ও নীলাঞ্জনও ব্যবহৃত হইত। রসও নম্বরকম ব্যবহৃত হইত; যথা, কাম্পিলা, চপলা, গৌরীপাষণ, নবসারক (salomonian), কপর্দক, অগ্নিজার, হিজুল, গিরিসিন্দুর, মুদারশৃঙ্গক। ইহা ছাড়া নানাবিধ মাণ; যথা, বৈক্রান্ত, সূর্যকান্ত হীরক, মৌক্তিক, চন্দ্রকান্ত, রাজাবর্জক গুরুরোধগর প্রভৃতিও ভস্মাকারে ব্যবহৃত হইত। স্কুরক ও মিশ্রক এই দুইবিধ রসও ব্যবহৃত হইত। যুগ, তীক্ষ্ণ ও কান্ত এই ত্রিবিধ লৌহ ব্যবহৃত হইত। বিড়িকা ও কাকতুণ্ডী এই দুই প্রকার পিত্তল ও কাংস্য ব্যবহৃত হইত। কাংস্য, তাম্র, পিত্তল, লৌহ ও সীস দ্বারা বর্জলোহ নামে এক ধাতু প্রস্তুত হইত। দোলাঘন, স্বেদনীঘন, পার্টনাঘন, অধম্পাতনা ঘন, টেকি ঘন, বালুকা ঘন, লবণ ঘন, নালিকাঘন, তীর্থাপাতনা ঘন, বিদ্যাধর ঘন, ধূপ ঘন, প্রভৃতি নানাবিধ ঘনেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। নানাপ্রকার বিষও ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইত।

অতি প্রাচীনকালেও ভারতবর্ষে কোন-না-কোন রকম রসশাস্ত্র প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। পাণিনির অল্প পরবর্ত্তী কালে ব্যাড়ি প্রাচুর্য হন। এই ব্যাড়ি একদিকে যেমন বৈয়াকরণ ছিলেন অপর দিকে তেমনি

রসবিদ ছিলেন। গরুড়পুরাণে ইহার নাম উল্লিখিত আছে এবং বাক্যপদীঘের হেলারাজকৃত টীকাতেও ইহাকে রসবিদ বলিয়া উল্লিখিত করা হইয়াছে। সোমদেব নন্দীকে কোষ্ঠীঘন্ত্রের আবিষ্কারক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর বৃহৎসংহিতাতে বরাহমিহির লৌহ এবং পারদকে ঔষধের মধ্যে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে নাগার্জুনের কথাই প্রথমে মনে পড়ে। একজন নাগার্জুন ছিলেন ১ম শতকে, আর একজন ছিলেন ৪র্থ শতকে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে দ্বিতীয় নাগার্জুন বোধ হয় সূত্রশাস্ত্রের প্রতिसংস্কার করিয়াছিলেন, আর একজন নাগার্জুন ছিলেন ৯ম শতকে। তাঁহার কথাই আলবিরুণী উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইনিই বোধ হয় প্রসিদ্ধ কক্কপুটতন্ত্রের প্রণেতা রাসায়নিক নাগার্জুন। নাগার্জুন কক্কপুটতন্ত্র ছাড়া লৌহশাস্ত্র, রসরত্নাকর, আরোগ্যমঞ্জরী, যোগসার, রসেন্দ্রমত্ত, রতিশাস্ত্র ও রসকক্কপুট প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। প্রাচীন রাসায়নিকদের মধ্যে রত্নকোষ, মাণ্ডব্য, বশিষ্ঠমাণ্ডব্য ও শাকাণ্ডের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাণ্ডব্য ও শাকাণ্ড উভয়েই বোধ হয় নাগার্জুনেরও পূর্বের লোক ছিলেন। আর রত্নকোষ বোধ হয় নাগার্জুনের শিষ্য ছিলেন। যে নাগার্জুনের কথা চক্রপাণি লিখিয়াছিলেন “নাগার্জুনের লিখিত স্তম্ভে পাটলীপুত্রকে” তিনি বোধ হয় দ্বিতীয় নাগার্জুন। কারণ তৃতীয় নাগার্জুনের বাড়ি গুর্জর দেশে ছিল এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। নাগার্জুনের নামে প্রচলিত বহু ঔষধের কথা পরবর্ত্তী কালে পাওয়া যায়। সেগুলি দ্বিতীয় কি তৃতীয় নাগার্জুনের তাহা বলা কঠিন। পূর্বে যে-সমস্ত রসশাস্ত্র প্রণেতার কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা ছাড়াও বহু রসগ্রন্থের প্রণেতা ও বহু রসগ্রন্থের কথা আমরা জানি। তাহাদের নাম উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের এই রসশাস্ত্র যে ভারতবর্ষেই উদ্ভূত হইয়াছিল এবং এখান হইতেই আরব প্রভৃতিতে ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার সম্বন্ধে অনেক যৌক্তিক প্রমাণ দেখান যাইতে পারে।

চরক সূত্রতাদি গ্রন্থে প্রধানতঃ উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ ঔষধেরই ব্যবহার দেখা যায়। সেইজন্য ঔষধ-নির্বাচন ব্যবস্থায় রসবীর্থাবিপাকই ছিল তাঁহাদের প্রধান সম্বল। কিন্তু

একাদশ শতাব্দী হইতে তান্ত্রিক যুগের ধাতুঘটিত নানাবিধ ঔষধের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে রসবীর্ষ্যবিপাক দ্বারা বায়ুপিত্ত কফের চিকিৎসা গোঁগীভূত হইয়া বস্তুপ্রভাব বলে বিভিন্ন ধাতু-ঘটিত ঔষধগুলি বিভিন্ন রোগের বা বিভিন্ন রোগ-লক্ষণের উপশমক বলিয়া ব্যবহৃত হইতে লাগিল। বর্তমান কালের আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসালয়ের মধ্যে একদিকে যেমন বায়ুপিত্ত কফের চিকিৎসা দেখা যায়, অপর দিকে তেমনি যৌগিক পদার্থের প্রভাবগুণে রোগচিকিৎসার ব্যবস্থা দেখা যায়। এই জন্ম মনে হয় যে একাদশ শতাব্দী হইতে চিকিৎসা-রাজ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন আরম্ভ হয়। নাড়ী দেখিয়া রোগ-নির্ণয়ের ব্যবস্থাও আমরা প্রাচীন চরক স্মৃতিতে পাই না। ইহাও সম্ভবতঃ এই পরবর্তী তান্ত্রিক যুগে আবির্ভূত হয়। তান্ত্রিকেরা নাড়ীবিজ্ঞানে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং নানাবিধ নাড়ী-চক্রের সংশোধন দ্বারা তাঁহারা পরমার্থসাধনে ব্যাপৃত ছিলেন। সেই জন্ম তাঁহাদের গ্রন্থে নাড়ীচক্র-সম্বন্ধে নানা নূতন তত্ত্ব দোঁখতে পাওয়া যায়। সেগুলির সহিত প্রাচীন চরক স্মৃতিতাদির নাড়ীবিজ্ঞান যে সকল সময়ে মেলে একথা বলা যায় না। ইহা ছাড়া যৌগিক উপায়ে রোগ আরোগ্য করিবার এই প্রথা যে পরবর্তী কালে কোন এক সময়ে প্রচলিত হইয়াছিল তাহার বহু নিদর্শন আছে। অতি প্রাচীনকাল

হইতেই হঠযোগাদিষ্টারা ও নেতি যৌতি, বাস্ত ও আসন প্রাণায়ামাদি দ্বারা রোগ আরোগ্য হইতে পারে ইহা প্রমাণিত হইয়াছিল। সন্মোহন-বিদ্যাও (Hypnotism) আমাদের দেশে মহাভারতেরও পূর্বকাল হইতে প্রচলিত ছিল এবং ইহাদ্বারাও যে রোগ আরোগ্য হইতে পারে তাহাও লোকের জানা ছিল। যোগানন্দনাথ কৃত ভাষ্য সহিত আয়ুর্বেদের সূত্র পড়িলে দেখা যায় যে প্রাচীন যোগশাস্ত্রের সহিত আয়ুর্বেদের বায়ু পিত্ত কফাদির রোগকারণতা অঙ্গিত করিয়া যোগের দ্বারা বায়ু পিত্ত কফাদির প্রশমনে একটা নূতন আয়ুর্বেদের ধারা প্রবর্তিত হইবার চেষ্টা হইয়াছিল। বীরসিংহাবলোকন গ্রন্থ পড়িলে দেখা যায় যে জ্যোতিঃশাস্ত্রের সহিত অঙ্গিত করিয়া আয়ুর্বেদ-চিকিৎসার আর একটা নূতন ধারা প্রবর্তিত হইয়াছিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে আয়ুর্বেদের শল্যশাস্ত্র বুদ্ধের পরবর্তী কাল হইতেই ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া খৃষ্টীয় ৮ম ৯ম শতাব্দীতে প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল। হ্রত সাধারণ লোকের মধ্যে বা বৈদ্য-বিশেষের মধ্যে বা নাপিতদের মধ্যে ইহার কিছু কিছু প্রচলন ছিল। কিন্তু তাহারা কেহই শাস্ত্রপদবীতে আরোহণ করিতে পারে নাই। এই প্রসঙ্গে চাঁদসীর চিকিৎসকদিগের চিকিৎসা-প্রণালীর কথাও উল্লেখযোগ্য।

মুক্তি

শ্রীআশালতা দেবী

১০

যখন হইতে নির্মলার বিবাহ ঠিক হইয়াছে, চন্দ্রকান্ত আগাগোড়া কেমন আচ্ছন্ন মত ছিলেন। এই যে ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি অনিবার্যরূপে ঘটয়া যাইতেছে, ইহা যেন সম্যক্রূপে ধারণা করা তাঁহার ক্ষমতার বাহিরে।

একদিন বিকালবেলাকার স্নিগ্ধ আলোয় নির্মলার মাথায় হাত রাখিয়া তিনি কহিলেন, “নির্মলা, মা, তোমার কিছু বলবার নেই তো? মনে তো কোন সন্দেহ হচ্ছে না, যে, তোমার জীবনে এই যে একটা প্রকাণ্ড পরিবর্তন হ'তে চলেছে এতে তোমার কোন ক্ষতি হবে?”

নির্মলা একান্ত নির্ভরের ভাবে তাহার ঘনপশ্মস্নিগ্ধ চক্ষু দুইটি পিতার মুখের পানে তুলিয়া ধরিয়া কহিল, “না বাবা, আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। তুমি আমার জন্তে যা করছ তাতে আমার ভালই হবে। এই আমার বিশ্বাস।”

চন্দ্রকান্তের ব্যাকুলতা ইহাতে বাড়িয়াই গেল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, বিধাতার চেয়েও বেশী দায়িত্ব কে যেন তাঁহার মাথার উপর ফেলিয়া দিয়াছে। নির্মলার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ-কেন্দ্রটি তিনি এমন ভাবে একলা ঘিরিয়া লইয়া-ছিলেন, যে, এতদিন সেখানে বিশ্বজগৎ প্রবেশপথ পায় নাই। আজ তাঁহার চিরদিনের সেই আশ্রয় হইতে স্থলিত হইবার দিন

আসিয়াছে। তাঁহার এতদিনের সঙ্গী, তাঁহার ছাত্রী, তাঁহার প্রাণাধিককে তাহার জীবনের সবচেয়ে গভীরতম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর করাইয়া দিবার সময় আসিয়া পৌঁছিল। এত বড় সঙ্কটের মুহূর্ত্তে তিনি কি করবেন, কে তাঁহাকে পথ দেখাইবে? অজানা ভবিষ্যতের পথ চিরিয়া কেমন করিয়া একটা দিবা আলোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে যাহাতে তিনি দেখিতে পাইবেন যে তাঁহার চিরস্নেহময়ী জীবনে কোনদিন কোন বেদনা, কোন মনঃক্ষোভ পাইবে না, কোনও জটিলতার আবর্ত্তে পড়িয়া তাহার শাস্ত্র ললাটের নির্মল আলোটুকু স্নান হইয়া যাইবে না? নির্মলা যদি কোন রকম ভাবে নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা জানাইত, তাহা হইলেও তিনি যেন অনেকটা ছাড়া পাইতেন। এমন কি এখন ঠিক এই মুহূর্ত্তে তিনি কামনা করিতেছিলেন, স্নানীলাও যদি মেয়ের বিবাহ লইয়া দু-কথা বলিতেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার প্রতিও কৃতজ্ঞ হইতেন। মোটের উপর এই কথাটাই তাঁহার মনে জাগিতেছিল যে এই অনন্ত দায়িত্বের ভার একলা বহন করিতে আজ সতাই তাঁহার ভয় হইতেছে। সকলে মিলিয়া নানা দিক হইতে ভাবিয়া-চিন্তিয়া আলোচনা করিয়া যদি সে-ভারটাকে কিঞ্চিৎ লঘু করিয়া দিত, তবে তিনি ঝাঁচিয়া যাইতেন। কিন্তু কেহই কিছু বলিল না। স্নানীলা মেয়ের বিষয়ে চিরকাল যেমন নিরপেক্ষ ছিলেন তেমনি রহিলেন এবং নির্মলা প্রশান্ত ধীরভাবে তাহার প্রতিদিনকার কাজগুলি করিয়া যাইতে লাগিল। তাহার সেতার বাজানো, তাহার কলেজ যাওয়া, এমন কি রোজ সন্ধ্যার সময় তাহার বাবাকে তাঁহার কোন প্রিয় বই হইতে খানিকটা করিয়া পড়িয়া শুনানো—সকল কাজই নিয়মিত ভাবে হইয়া যাইতে লাগিল। এই যে আর কয়েক দিন পরেই তাহার বিবাহ হইতে চলিয়াছে, এত বড় ব্যাপারেও যেন তাহার অতল গভীর স্থির মৌন যৌবনের উপর হইতে একটা পর্দা উঠিয়া যায় নাই। কোন আবেগ কোন চাক্ষুস্যের ঢেউ যেন সেখানে লাগে নাই। তাহার চিরদিনের গৃহকে ছাড়িয়া যাইবার বেদনা ছাপাইয়া কোনো আনন্দের ছায়া তাহার মনে যেন পড়ে নাই।

সেদিন কলেজ যাইবার একটু আগে নির্মলা বাহিরের ঘরে চূপ করিয়া বসিয়া ছিল, চন্দ্রনাথ চোখে চশমা আঁটিয়া কি একটা বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। আজকাল কোন কাজ কোন প্রয়োজন না থাকিলেও নির্মলা যতক্ষণ পারে

তাহার বাবার কাছে থাকে। তাহার মন বলিতেছিল বাবার সঙ্গে এই যে একটা বিচ্ছেদ তাহার ঘটিতে চলিয়াছে এ কেবল তাঁর নিকট হইতে দূর দেশে চলিয়া যাইবার ব্যাপার নয়। পিতার সহিত এতদিন সে যেমন সকল কাজ ভাগ করিয়া লইত, তাঁহার সঙ্গে জ্ঞানের আলোচনায় যোগ দিত, তাঁহার হাসি-তামাশার সঙ্গী হইয়া ও তাঁহার অন্তমনস্ক স্বভাবের সকল ত্রুটি সর্বদা সংশোধন করিয়া চলিত, ইহার পর আর তেমন চলিবে না। এক কথায় তাঁহার জীবনের ছোটবড় সমস্ত কাজ এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত এতদিন সে নিজেকে যে শত লক্ষ বন্ধনে জড়াইয়াছিল আজ সে-সকল হইতে নিজেকে ছাড়াইয়া লইতে হইবে। ইচ্ছা না থাকিলেও কোন নিষ্ঠুর জীবনদেবতা তাহাকে যেন ছোর করিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবে। ঠিক এই সমস্ত কথাই অতিশয় স্পষ্ট করিয়া হয়ত সে বৃথিত না, কিন্তু এমনই ধরণের কোন তীব্র অনুভূতি, এমনই আসন্ন কোন বিদায়ের নিষ্ঠুর আভাস তাহার মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিত। তাই আজকাল সে পিতার নিকট যখন থাকে, কথা বলিতে বলিতে অন্তমনস্ক হইয়া যায়। মাঝে মাঝে কোন শব্দ বইয়ের কোন জায়গা বৃথিয়া লইতে লইতে তাহার মন সেখান হইতে কতই না দূরে সরিয়া যায়।

চন্দ্রকান্ত আত্মভোলা অন্তমনস্ক প্রকৃতির লোক হইলেও মেয়ের এই ভাবান্তর তাঁহার চোখে পড়ে। অন্যসময় হইলে হয়ত পড়িত না, কিন্তু নির্মলা যেমন পিতার সঙ্গকে অত্যন্ত সচেতন হইয়া আছে, তেমনি পিতারও মেয়ের সঙ্গকে সমস্ত চেতনা এবং হৃদয়-মন এমন করিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে যে তাহার সামান্য এতটুকু পরিবর্তনও চক্ষু এড়ায় না। তাঁহারও মন ভারী হইয়া উঠে, চক্ষের পাতায় একটু জলের আভাস দেখা দেয়। তিনি সে-সময়টা মুখ তোলেন না, মুখ নামাইয়া থাকেন। দু-জনে দু-জনের কাছে নানা ছলে আগের চেয়ে অনেক বেশী সময় থাকেন, কিন্তু কথা থামিয়া গিয়াছে। দু-জনেই পরস্পরের কাছে হৃদয়ভার লুকাইতে ব্যস্ত।

সেদিন বেলা দশটার সময় চন্দ্রকান্ত চোখে চশমা দিয়া একটা বই পড়িবার ভাগ করিয়া যখন মুখ নীচু করিয়া বসিয়াছিলেন আর নির্মলা বিনা কারণে আঁচলের পাড় হইতে অনর্থক সূতা টানিয়া টানিয়া বার করিতেছিল, সেই সময়ে

সদর দরজার কাছে একটা ট্যান্ডি দাঁড়াইবার শব্দ পাওয়া গেল এবং পরের মুহূর্তেই যামিনী ছোট-বড়-মাঝারি নানা আকারের এক রাশ মথমলের কেস এবং কার্ড-বোর্ডের বাস্ক লইয়া ঘরে ঢুকিল।

চন্দ্রনাথ আশ্চর্য হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “কি যামিনী, ব্যাপার কি? এ-সব কোথা থেকে আনলে?”

যামিনী তাহার উত্তর এড়াইয়া গিয়া কহিল, “উঃ, সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে একেবারে হয়রান হয়ে গেলুম। মেয়েদের সাজসজ্জায় এত ঙ্গিনিষও লাগে!” পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া সে কপালের স্বেদবিন্দু মুছিল। নিশ্চল উঠিয়া তাহাদের ছোট টেবিল-ফ্যানটা এমন জায়গায় রাখিল যেখান হইতে সেটা ঘুরিলে শ্রান্ত যামিনী প্রচুর হাওয়া পায়। তাহার পরে সেটা প্লাগে লাগাইয়া দিল। যামিনীর সহিত তাহার সম্বন্ধ যেমন দাঁড়াইয়াছে তাহাতে পিতার সম্মুখে তাহার সামনে বসিয়া থাকিতে বা এমন কোন কাজ করিতে অথবা কোন মেয়ে নিশ্চয় লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া যাইত, কিন্তু নিশ্চল কোনরূপ লজ্জা বোধ করিল না। কোন একজন নিকট-আত্মীয় বা অভ্যাগত রোদ্দে ঘুরিয়া ক্লাস্ত হইয়া আসিলে তাহার স্বাচ্ছন্দ্যের জুড়ি ঠিক যতটুকু করা প্রয়োজন ততটুকু করিয়া দিয়া আবার নিজের জায়গায় আসিয়া বসিল।

পর্দার আড়াল হইতে প্রতিমাসুন্দরী ব্যাপারটা দেখিয়া আর কিছুতেই হাসি চাপিতে পারিল না। অবরুদ্ধ হাস্যকে মুক্ত করিয়া দিতে নিজের শয়নঘরে আসিয়া পালকের উপর লুটাইয়া পড়িল। প্রতিমা নিজের দিক হইতে এইটুকু হালফ করিয়া বলিতে পারে, সে যদি ঠিক এমন অবস্থায় পড়িত এবং শেষ অবধি এই কাজই করিত, তবে অন্ততঃ পাখাটা চালাইয়া দিবার সময়েও মুখ নীচু করিয়া একটু হাসিয়া লইত, লজ্জায় তাহার হাত কাঁপিত, প্রতিপদক্ষেপে প্রিয়সেবার স্থখ ধরা পড়িয়া যাইত।

সুশীলা যদিও মেয়ের সম্বন্ধে কোন ঔৎসুক্য দেখাইতেন না—আপন মনে নিজের চিরাচরিত ঘরকন্নার মগ্ন হইয়া থাকিতেন, তবু অন্তঃপুর হইতে আর একটি মেয়ে তাহার স্বাভাবিক প্রাণোচ্ছলতা এবং কৌতুকপ্রবাহ লইয়া আড়ালে থাকিয়াই

সাগ্রহে নিশ্চলার নবজীবনের সূচনাকে নিরীক্ষণ করিত—সে প্রতিমাসুন্দরী। বাহিরে না বাহির হইলেও পর্দার আড়াল হইতে নিশ্চলার নানা বিষয়ে অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া কখনও সে অবাক হইয়া যাইত, কখনও বা হাসি চাপিতে পারিত না। প্রেমসম্বন্ধের যে চিরমধুর চিরপরিচিত একটি রূপ প্রতিমার অভিজ্ঞতায় ছিল তাহার সহিত ইহার অনেকখানিই মিলিত না, অনেকখানি যেন কেমন শুষ্ক বোধ হইত। তথাপি প্রতিমা অদম্য কৌতূহলের বশে দেখিতেও ছাড়িত না। নিশ্চল তাহার মনের কথা প্রতিমাকে বলে না। নিশ্চলার সহিত সখীত্ব পাতাইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার স্বদূর স্বপ্নেরও বাহিরে। প্রথম প্রথম সে চেষ্টা করিতে গিয়া ধাক্কা খাইয়াছে। নিশ্চলকে দোখিয়া দোখিয়া তাহার মনে হয়, ও যেন ঠিক পুরোপুরি মেয়ে নয়। গুর মধ্যে এমন একটা স্থিরতা, এমন একটা কাঠিন্য আছে যাহার তুল্য মর্হিমা মনকে বিশ্বাস-সম্মুখে পূর্ণ কারিয়া তোলে বটে, কিন্তু এই বিশেষত্বের জগুই কিছুতেই দূরত্ব কাটাইয়া মাধুয্যের শ্রোতে তাহাকে হৃদয়ের কাছাকাছি টানা যায় না। কিন্তু দূরত্ব থাকিলেও তরুণ বয়সে পরস্পরের প্রতি যে একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে তাহার জগু নিশ্চল আর যামিনীর ব্যাপার প্রতিমা কৌতূকের সহিত না দেখিয়াও থাকিতে পারিত না। নিরুদ্ধ হাস্যশ্রোতকে মুক্তি দিয়া কিছুকাল পরে আঁচল দিয়া চোখ মুখ বেশ করিয়া মুছিয়া সে আবার দ্বারান্তরালে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল :—

ফ্যান ঘুরিতেছে; যামিনীর চুল, তাহার হাতের রুমাল, গরদের পাঞ্জাবীর টিলা হাতা, সমস্তই বাতাসে উড়িতেছে। সে বলিল, “আচ্ছা, চন্দ্রকান্তবাবু, এইবারে আমি এক-এক করে বাস্কগুলো খুলে ঘাই, আপনারা একটু মনোযোগ করে দেখুন, কোন্টা পছন্দ, কোন্গুলো অপছন্দ!” নানা ধরণের বাস্ক খুলিতেই বাহির হইতে লাগিল হাজার রকমের কাপড়। কোনটার জরিব আঁচলা সোনার মত ঝকঝক করিতেছে, কোনটার রং আকাশের মত নীল, কোনটা অতিশয় শুভ্র নরম রেশমের, কোনটা রক্তের মত লাল টকটকে। চন্দ্রকান্ত কহিলেন, “বাঃ বেশ তো! এসবই কি...কিন্তু এ-সব যে ভয়ানক দামী কাপড় যামিনী!”

“কি আর এমন কাপড়!” যামিনী মুখ নীচু করিয়া

সলজ্জভাবে কহিল, “অনেক ভেবে, অনেক পছন্দ করে কিনেছি, কিন্তু তবুও মনে ভয় রয়ে গেছে হয়ত আমার পছন্দের সঙ্গে আর এক জনের পছন্দ মিলবে না।”

এই জিনিষগুলি একান্তে নির্মলাকে দেখাইতে পাইলেই যামিনীর স্বপ্ন হইত; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এখনও নির্মলার সহিত তাহার তেমন সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে নাই, কাজেই চন্দ্রকান্ত বাবুকে উপলক্ষ্য করিয়াই নির্মলাকে দেখাইতে হইল।

ভাবী স্বপ্নের সঙ্গে গহনা-কাপড় লইয়া আলোচনা করিবার কথা তাহার নহে। কিন্তু নিরুপায় হইয়া লজ্জা ভাগ করিয়াও তাহাকে সেই কাজের ভার লইতে হইল। চন্দ্রকান্ত স্নেহভরে স্মিতহাস্ত করিলেন। আজ হঠাৎ তাঁহার মনে হইল তিনি চিরদিন নির্মলার জন্ত কেবল বই কিনিয়াছেন আর কখনও কিছু কেনেন নাই, কিন্তু এমনি সব চমৎকার কাপড় পরিয়া নির্মলা যদি আসিয়া দাঁড়ায়, তাহাকে কী সুন্দরই না দেখাইবে!

নির্মলা সঙ্কোচহীন কৌতূহলভরে কাছে আসিয়া একটা গাঢ় নীল রঙের কাপড়ের একপ্রান্ত তুলিয়া ধরিয়া কহিল, “ভারী সুন্দর! এটার কত দাম?” “এটার? এটার দাম—” গাত্র-সংলগ্ন টিকিট দেখিয়া যামিনী সসঙ্কোচে কহিল, ‘দু-শ পঁচিশ।’

চন্দ্রকান্ত কহিলেন, “এ-যে তুমি ভয়ানক দাম দিয়া দিয়ে কাপড় কিনেছ, যামিনী।” নির্মলা নীল রঙের কাপড়খানি নাড়াচাড়া করিয়া কহিল, “যতই দাম হোক এর রংটি ভারি চমৎকার।”

যামিনী কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে কাপড়খানার প্রতি চাহিল। তাহার ভাবখানা যেন এমন কাপড় আরও দশ-বিশটা কিনিলে তাহার মনে শান্তি হইত।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ স্পোথিতের মত যেন চমক ভাঙিয়া পার্শ্ব-রাখা মধ্যমলের বাক্সগুলো টানিয়া বলিল, “এগুলো যে দেখলেন না, এ-ক’টাও দেখে নিন্।”

মধ্যমলের কেসগুলি খুলিতেই বাহির হইল একসেট সোনার ও একসেট জড়োয়ার গহনা।

চন্দ্রকান্ত বাবু মুহূঃ আপত্তি করিয়া কহিলেন, “এ তুমি বাড়াবাড়ি করেছ, যামিনী।”

“আপনি আমার কিছু বলবেন না—” যামিনী বলিতে

লাগিল, “যদি কিছু করে আমি মনে তৃপ্তি পাই তাহলে সেজন্য অপরাধ নেবেন না।”

বলিয়া ফেলিয়াই কিন্তু সে ভারি অপ্রতিভ হইয়া পাড়ল। পকেট হইতে ফস্ করিয়া কাগজ এবং পেন্সিল বার করিয়া নির্মলার পায়ের কাছে হাটু গাড়িয়া বসিয়া কহিল, “কিন্তু একটা জরুরি কাজ বাকী রয়ে গেছে। অথচ পায়ের মাপ না-পেলেই বা জুতো কেনা হয় কেমন করে?”

নির্মলা ত্রস্ত হইয়া কহিল, “ও কি! পায়ের মাপ তো আমি নিজেই দিতে পারি। আপনি পায়ের হাত দেবেন কেন?”

তাহার হাত হইতে পেন্সিলটা নির্মলা তাড়াতাড়ি লইতে গেল।

“—থাক না, আমাকেই ভাল করে নিতে দিন। একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলেই অত-দামের জিনিষগুলো সব নষ্ট হয়ে যাবে।” যামিনীও অতি ব্যগ্রতায় বুঝিয়া পড়িল। দু-জনের মাথা ঠুকিয়া গেল। নিরতিশয় লজ্জিত হইয়া দুয়ারের দিকে যাইতে যাইতে যামিনী চন্দ্রকান্তের দিকে চাহিয়া কহিল, “ও-সব আপনি তুলে রাখুন। আমি এবারে যাই। অনেক কাজ, বুঝতে পারছেন তো? এখনই আবার কলেজ স্ট্রীটের জুতোর দোকানগুলো একবার ঘুরে যেতে হবে।” ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া সে বাহির হইয়া গেল।

পর্দার আড়ালে প্রতিমার চোখ অনেকখানি কৌতুকে এবং একটুখানি যেন ঈর্ষাতেও জলিয়া উঠিল।

১১

সেই দিনই বিকালের দিকে যামিনী আসিয়া বলিল, “আজ মাডান্ ভ্যারাইটিজে ভাল ফিল্ম রয়েছে, চলুন না দেখে আসা যাক।”

চন্দ্রকান্তের রাজী হইতে দেরি হইল না। বায়স্কোপের কথাটা কিন্তু যামিনীর একটা উপলক্ষ্য মাত্র। আসলে তাহার ভারি ইচ্ছা হইতেছিল সকালবেলায় যে-সব গহনা এবং কাপড় কিনিয়া আনিয়াছে তাহা পরিয়া নির্মলাকে কেমন দেখায় কোন ছলে তাহাই একবার দেখে। চন্দ্রকান্ত মেয়েকে ডাকাইয়া আনাইয়া বায়স্কোপে যাইবার কথা বলিলেন, “যাও মা, তৈরি হয়ে নাওগে। ছ’টা বাজবার আর তো বেশী দেরি নেই।”

নির্মলা উঠিয়া গেল এবং মিনিট-পাঁচেক পরে তাহার অভ্যস্ত সাদাসিধা একটি শাড়ি ও হাত-ঢাকা ব্লাউস পরিয়া তৈরি হইয়া আসিল। তখন অভ্যস্ত অভিমানে যামিনীর বুকের ভিতরটা ছলিয়া উঠিতে লাগিল। অল্পদিকে চাহিয়া কোনমতে বলিল, 'তাহ'লে আজ সকালে যেগুলো কিনে আনলুম সেগুলো কি হাত দিয়ে কখনও ছোবেন না?'

চন্দ্রকান্ত ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "সত্যি কথা, তাই ত, সে-কথা যে আমাদের মনেই ছিল না। ও-গুলো যে তোমার একবার প'রে দেখা উচিত মা, গায়ে ঠিক ঠিক হ'ল কি-না।

পিতার আদেশমত নির্মলা বেশ পরিবর্তন করিতে চলিয়া গেল। যামিনী খুশী-মনে গলির মোড় হইতে একটা ট্যান্ডি ডাকিতে গেল।

ট্যান্ডি আসিয়া সদর-দরজার কাছে যখন হর্ণ দিতে শুরু করিল তাহার আগেই পিতাপুত্রী গাড়ী-বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সেখানটায় ইলেকটিক আলোর বন্দোবস্ত ছিল না। রাস্তার নরম গ্যাসের আলোতে যামিনী ঠিক বুঝিতে পারিল না নব বেশভূষায় নির্মলাকে কেমন দেখাইতেছে।

ট্যান্ডি আসিয়া ম্যাডান থিয়েটারের সম্মুখে দাঁড়াইল। উজ্জ্বল আলোয় স্থানটা দিবালোকের মত। তখনও ছবি দেখান শুরু হয় নাই। ব্যাণ্ড বাজিতেছে। সেই আলোয় নির্মলার দিকে চাহিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গেল। আজ প্রথম তাহার মনের মধ্যে অভ্যস্ত একটা আবেগ উপস্থিত হইল। ইচ্ছা করিতে লাগিল নির্মলার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলে, 'তুমি আমার।' যেন তাহারই বহু যত্ন করিয়া আহত বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া নির্মলা আজ আরও বেশী করিয়া তাহার নিকটে আসিয়াছে। বায়স্কোপের সমস্ত সময়টা তাহার অভ্যস্ত আবেগময় স্তপে আচ্ছন্নের মত কাটিয়া গেল। ছবি শেষ হইয়া গেলে চন্দ্রকান্তও নির্মলাকে তাঁহাদের বাড়ির গেটের কাছে নামাইয়া দিয়াই সে ফিরিল। চন্দ্রকান্তের অসুরোধ সত্ত্বেও আর নামিল না। আজ আর তাহার সে ইচ্ছা হইল না। মনে কেবল তাহার একটি কামনা জাগিয়াছিল। নিজের নিৰ্জ্জন ঘরে যেখানে মশারি-ফেলা তাহার শুভ্র বিছানার উপরে সামনের খোলা জানালা দিয়া এক টুকরা তাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে, সেইখানে শুইয়া তাহার এই আবেগকে কল্পনার মধ্যে আরও ঘনাইয়া আনিবে। লোভী বালকের মত নবলক্ক আনন্দের অসুভূতিকে রহিয়া-বসিয়া একটু-একটু করিয়া আশ্বাদ করিবে।

বায়স্কোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কি-একটা প্রয়োজনে আলমারী খুলিতে খুলিতে নির্মলার পানে চাহিয়া চন্দ্রকান্ত বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। সে গ্যাসের বাতির তলায় দাঁড়াইয়াছিল, আলো আসিয়া তাহার সর্কাজে পড়িয়াছে। সে

যে দেখিতে এত সুন্দর সে-খবরটা এমন করিয়া তাহার কাছে কোনদিন ধরা পড়ে নাই। তিনি কিছু অন্তমনস্ক হইয়া কহিলেন, "নতুন জিনিস পরেছ, এগুলো খুলে রাখবার আগে একবার তোমার মাকে প্রণাম ক'রে এস।"

নির্মলা খুশী হইয়া মাকে প্রণাম করিতে গেল। কিন্তু মনে মনে কিছু আশ্চর্য্য হইল। মায়ের কথা তাহার বাবাকে বলিতে এই প্রথম শুনিল। মেয়েকে পাঠাইয়া দিয়া চন্দ্রকান্ত নিজের পিছনে-পিছনে ভিতরে আসিয়াছিলেন। ঠিক ইচ্ছা করিয়া নয়। নানা চিন্তায় মনটা ভারাতুর অন্তমনস্ক হইয়াছিল। সুশীলা রেড়ির তেলের প্রদীপের সামনে বসিয়া সুপারি কাটিতেছিলেন। নিকটে একটা ছোট তোলা-উত্থনে গুড়ের রস পাক হইতেছিল। তাহার নাতিটির জন্ত মিঠাই তৈরি করিয়া রাখিখেন। সম্মুখে সেই সকল উপকরণ সজ্জিত। নির্মলা যাইয়া প্রণাম করিল। সুশীলা শশব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "দেখো বাছা, তোমার দামী কাপড়, তেল ঘি চারিদিকে ছড়ান আছে। কিছু লেগে নষ্ট না হয়ে যায়।"

প্রদীপের আলোটা একটু উস্কাইয়া দিতেই নির্মলার সর্কাজে রত্নালঙ্কার ঝলসিয়া উঠিল। সুশীলা কিছু কাল সেই দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া চন্দ্রকান্তকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিলেন, "বলি, কত টাকা লাগল সবসুদ্ধ?"

তাঁহার কণ্ঠস্বরের কঠিনতায় নির্মলা ব্যথিত হইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। আসন্ন বিবাহের যেটুকু আনন্দ মনে জাগিয়াছিল তাহা যেন হঠাৎ নিবিয়া গেল। চন্দ্রকান্ত হত-বুদ্ধির মত চাহিয়া ছিলেন। সুশীলা পুনশ্চ উত্তোজিত হইয়া বলিলেন, "সবসুদ্ধ কত টাকা লাগল? কত ধার করলে? তোমার সেই ব্যাঙ্কের াতাখানায় আর বড় বেশী বাকী ছিলনা তো।"

"আমি কিছুই কিন্তে যাইনি, যামিনী সমস্ত কিনেছে।" চন্দ্রকান্ত যত্নস্বরে বলিলেন, "কিন্তু তোমার ব্যবহারটা কি রকম. নিজের মনেই একটু চিন্তা ক'রে দেখ ত। মেয়েটা এল প্রণাম করতে, তা আশীর্বাদ করা দূরে থাক টাকার খোঁজ নেওয়াটাই তোমার বেশী হ'ল।"

সুশীলা সুপারি-কাটা বন্ধ করিয়া কহিলেন, "আশীর্বাদ করেছি বইকি, মনে মনে হাজার বার বলেছি সুখী হোক, সুখে থাক. ভাল থাক. মেয়ের বিয়ের ঠিক করেছ সে আমি শুনেছি। কোথায়, কার সঙ্গে, কেমন ঘর সে-সকল খবরও নিয়েছি। চুপ করে থাকি বলে মনে করো না আমার মনেও চিন্তা নেই। তোমার কাজে মুখ ফুটে প্রতিবাদ জীবনে কখনও করিনি, কিন্তু আজ একটা প্রশ্ন করব। মেয়েকে ছোট থেকে যেমন ক'রে মানুষ করেছ তাতে এ ব্যবস্থায় মজল হবে কি?"

“কেন তোমার কি মনে হয় এতে ভাল হবে না?” চন্দ্রকান্ত ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিলেন।

“ভালমন্দের কথা ভগবান জানেন। আমি আগে থেকে তার কি বলব? কিন্তু যামিনীর সঙ্গে বিয়ের ঠিক হওয়া অবধি আমি অনেক কথা ভাবছি। এই যে সেদিন যামিনীর বৌদি আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন তাঁর কাছে ভিতরের কথা সব শুনলুম। শুনে অবধি ভাবছি। ভাবনার কোনই কারণ ঘটত না। কিন্তু তুমি যে আমার নির্মলাকে সাধারণ মেয়ের মত ক’রে মানুষ করতে দিলে না। সেই জন্মেই আরও ভাবনা। যামিনীরা পাঁচ ভাই। বাড়িতে মা আছে, বাবা আছে, বোনেরা বৌদিরা আছে। হিঁহু বাড়ি, পাল-পার্কিং, পাড়া-প্রতিবেশী—এ সবই আছে। সে কি এরই মাঝে নিজের জায়গা ক’রে নিতে পারবে? না এ-সবের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে?”

চন্দ্রকান্ত উত্তরে কি বলিবেন ভাবিয়া না পাইয়া অবশেষে কহিলেন, “না, না, তুমি দেখে নিও নির্মলা সবাইকে সুখী করবে। ওর মত লক্ষ্মী শাস্ত মেয়ে ক’জন আছে?”

সুশীলা বলিলেন, “লক্ষ্মী শাস্ত মেয়ের তো কথা হচ্ছে না। ও যে গায়ে পড়ে কৌদল করবে, স্বাধীনতা করবে এমন কথা কখনও আমি বলিনি। জানি, নির্মলা তা কোনদিনই পারবে না। কিন্তু ওকে তুমি কেমন ক’রে মানুষ করেছ সেই কথাটা নিজের মনে একবার ভাব দেখি! আজ আঠারো বছর বয়স পর্য্যন্ত খালি তাকে বই পড়তে শিখিয়েছ আর তোমাদের নিজেদের সমবয়সীদের মধ্যে কুট তর্কাতর্কি শুনিয়েছ। বইপড়া ছাড়াও যে একটা লোকালয় আছে, সেখানকার ভাল-মন্দ, অভাব-অভিযোগ, চাওয়া-পাওয়া আছে; তার কোন খবরই সে আজও জানবার সুযোগ পেনে না। তাই আমি ভাবছি আঠারো বছর বয়স পর্য্যন্ত যে নিজের মধ্যে নিজে আবদ্ধ হয়ে বইয়ের ভিতর ডুব কাটালে আজই সে হঠাৎ কি ক’রে অনেক লোকের ভাল-লাগা মন্দ-লাগা, অনেক লোকের সুখ-দুঃখের মাঝে নিজেকে মানিয়ে নেবে?” চন্দ্রকান্ত বিহ্বলের মত শুনিতোছিলেন। কোন কথাই তাঁহার মুখে আসিতোছিল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুশীলা পুনশ্চ আপন মনেই যেন বলিতে লাগিলেন, “কিন্তু তার জন্মে ওকেই বা আমি দোষ দিই কি ক’রে? এ যে তোমারই দোষ। বাড়িতে যখন রোগ তখন অসুখের সেবা করবার অধিকার বাড়ির মেয়েকে তুমি দাওনি। বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে মোটা মোটা কেতাব

বেঁটে বুঝিয়েছ রাজ্যের রোগের ব্যাধা—কি থেকে কি হয়, কিসের কি লক্ষণ। ওর ছোটভাইরা যখন ইস্কুল-কলেজ থেকে ক্লাস্ট হয়ে মুখ শুকিয়ে বাড়ি এসেছে তখন তাদের দিকে ওকে ফিরে তাকাতে দাওনি, সৌখীন তর্ক শুনিয়েছ। ওর মা যখন অহনিশি ভেবেছে সকলের সুখ-সুবিধা বজায় রেখে এত অল্প আয়ে কি ক’রে সংসার চালান যায়, তখন সেই ভাবনার এতটুকু আঁচ তুমি তোমার মেয়ের গায়ে লাগতে দাওনি। মেয়ে তখন আসরে ব’সে সেতার বাজাচ্ছেন।” নির্মলার সম্বন্ধে সুশীলার মাতৃহৃদয়ের একটি মর্মান্তিক অভিমান ছিল। সুশীলাকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া চন্দ্রকান্ত এতদিন মেয়ের জীবনকে এমন করিয়া আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মনে ক্ষোভ ছিল। সেই এতদিনের চাপা অভিমান ও ক্ষোভ আজ যেন অকস্মাৎ ফাটিয়া পড়িল। নিজের মনে এত ভাবনা কখনও তিনি ভাবিয়াছেন সে-কথা নিজেই তিনি জানেন না। চন্দ্রকান্ত শুরু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার কানে না ঢুকিতেছিল সব কথা, না ভাবিতে পারিতোছিলেন তিনি কিছুই স্থিরভাবে। কেবল তাঁহার বিমূঢ় মনে একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথা উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল। তাঁহার নির্মলা হয়ত জীবনে অসুখী হইতে পারে। কী ভীষণ আবিষ্কার! কী দুঃসহ চিন্তা!

কড়াব রসটা ঠিক পাক হইয়াছে কি-না দেখিবার জন্য সুশীলা উঠিয়া তাহাতে হাতা ডুবাইলেন, এবং হইয়া গিয়াছে বুঝিয়া সেটা নামাইয়া আর একটা পাত্রে ষি চড়াইলেন। বিমূঢ় চন্দ্রকান্তের বিস্মিত বিহ্বল চোখের সম্মুখে এই সকল দৃশ্য ছায়াবাজীর মত ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে তাঁহার বারংবার মনে হইতে লাগিল, এতবড় একটা নিদারুণ কথার পরেও মানুষে নিশ্চিন্ত হইয়া কেমন করিয়া এ-সকল তুচ্ছ কাজে মন দিতে পারে? এত সব ভয়ঙ্কর কথা অধলীলাক্রমে বলিয়া দিয়া তাহারও পরে সুশীলা যে নিরুদ্ধেগে চৌকির উপর বসিয়া ঝাঁঝরাতে করিয়া মিঠাইয়ের জন্য বেসন ভাজিতেছেন, সে-দৃশ্যটা তাঁহার কাছে অস্বাভাবিক রূপে নিরুদ্ধেগ এবং অত্যাশ্চর্য লাগিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মাথার চুলগুলো এক হাতে টানিয়া অ-গো গাল করিতে করিতে তিনি কহিলেন, “কিন্তু যা হয়েছে এখন বোধ হয় আর তা ফেরাবার জো নেই।”

ক্রমশঃ



আলোচনা



“দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতপ্রবাসী”

বিগত ১৩৪০ সালের চৈত্র সংখ্যা প্রবাসীর ৭৪৩ পৃষ্ঠায় “দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারত প্রবাসীর তৃতীয় প্যারায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

“ভারতীয়রা তথায় খেতাদারদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি অবলম্বন করিবেন এই অনন্তর সর্ব ব্যতীত সে-দেশের সরকার তাঁহাদিগকে সে-দেশে থাকিতে দিতে প্রস্তুত নহেন।”

আলোচ্য এই যে, সর্বটা অসম্ভব হইল কিরূপে? যন্মিন্ দেশে যদাচারঃ। পৌর-অধিকার বা নাগরিকত্ব লাভ করিতে হইলে নিঃস্ব বৈশিষ্ট্য কিছু কিছু ছাড়িতেই হয়। বাড়ার সঙ্গে ছাড়ার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। বাড়িতে চাহিলে ছাড়িতেই হইবে। তদুভিন্ন, ভাবে-ভাষায় আদব-কায়দায় একতাপাদন ব্যতীত ‘নেশন’ গঠিত হয় না, একথা সর্বদেশেই বিদিত (অবশ্য আমাদের দেশ ছাড়া)। আমাদের দেশের লোকসমষ্টি ‘নেশন’ নহে (প্রমাণ—রকমারি হরফ, ভাষা, পরিচ্ছদ আচার ও জাত)—কাজেই ঐ সরল ব্যবস্থার নীতিটা ভারতে একেবারেই দুর্কোধ্য। শিশুকে যেমন দাম্পত্যজীবনের মুখ বোঝান যায় না—ঐদেশিক অভিজ্ঞতাশূণ্য ভারতীয়কেও তেমনি নেশন-গঠনের ভিত্তিগত নীতি বোঝান যাইবে না। দক্ষিণের স্থল খুঁট পঞ্জাবের শিখচুড়া গোঁপদাড়ি ও পাগড়ী, মুসলমান ভারতের ফেজক্যাপ, বাঙ্গালীর অর্ধ-উলঙ্গ পোষাক, কিংবা “ধর্মশীল” ভারতীয়ের ছাই-ধূলা-কাদা-বামে-জড়িত জটানাযৌ মলের বোঝা মাথায়-ধরা কলির কৈলাপনাথের বেশ, এবং তৎসহ—ঐ মাংসটা খেলে অধঃপাত হবে আর ওর ছোঁয়া খেলে ঘোরও নরক হবে ইত্যাদি উদ্ভট কিন্তু আনুলি ‘স্বদেশী’ মনোভাবের জন্ত যদি ভারতের বাহিরের মানবগণ আদিগকে অপাণ্ডুস্তেয় বলেন, তবে ঐ সব দৃষ্টিশূল বৈশিষ্ট্যগুলি বর্জন করিয়া তত্ত-স্থানের পৌর-অধিকার লাভে মনোনিবেশ করা কি সর্বোৎক্রে শ্রেয় নহে?

স্পেন দেশ প্রধানতঃ রোমান্ ক্যাথলিক ধর্মভাবাপন্ন। বহুকালাবধি ঐ ধর্মের পাত্রী, প্রচারক ও শিক্ষকগণ বিশিষ্ট কালো পোষাকে যিত হইয়া আসিতেছেন। রিপাবলিক্ স্পেন্ সম্প্রতি আইন জারি করিয়াছে যে অতি উচ্চপদস্থ দু-চার জন ধর্মযাজক (মোহান্ত) ব্যতীত ‘ব্রাদার’ প্রভৃতিকে সাধারণ ভঙ্গলোকের জায়গায় পোষাক পরিতে হইবে। বলা বাহুল্য, উহা একতাপাদনেরই চেষ্টা মাত্র। যাহাদিগ আদৌ আরব দেশের অধিবাসী কিন্তু ইহারা এক্ষণে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছেন এবং ঐ প্রবাসীগণ যে-দেশেই জন্ম লয়ন সেই দেশেরই বাহ্যিক রীতিনীতি কায়দাকানুন মানিয়া লইয়া (সেই সঙ্গে নিজেদের গুহ্য বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া) পুরুষাশুক্রমে গৃহে ও স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নিব্বাহ করেন: মাঝাতার আমলের আরবী কায়দায় ঐ-সব দেশে চলাফেরা করেন না। ব্রাজিল দেশে বসতি করাইবার জন্ত তদ্দেশীয় গভর্নমেন্ট কর্মক্ষম বিদেশীকে কয়েক বৎসর পূর্বে আহ্বান জানাইয়াছিলেন (John O' London's Weekly, p. 208, Nov. 19, 19:7)। পরে অন্ততবাঙ্গার পত্রিকায় ঐ সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা পাঠে জানা যায় যে যদিগাংই তথায় ভারতীয়দের প্রবেশ-অধিকার মঞ্জুর করা হয়, তবে

তাঁহাদিগকে তদ্দেশীয় পরিচ্ছদ ও আদবকায়দা অবলম্বন করিতেই হইবে। “Government does not permit omigrants wearing a turban or Fez to land in the country...The Government said, the object was to assimilate all peoples as Brazilians without discrimination as to caste creed or nationality; hence its request that every one should be dressed in Western style. (A. B. Patrika, 19th May 1930). আমি জাপান হইতে বহু সহস্র নরনারীকে অধুনা ব্রাজিলে বসবাসার্থ গমন করিতে দেখিয়াছি। বলা বাহুল্য, নতুন দেশে নিজেদের পৌর-অধিকার লাভার্থ তাঁহারা যাত্রার প্রাক্কালেই ইউরোপীয় রীতি-নীতি ও ভোজ্য-পরিচ্ছদে পোক্ত হইয়া উঠেন। এ সমস্ত আমাদের অনুধাবনযোগ্য। দক্ষিণ-আফ্রিকা গভর্নমেন্টের যে ক্ষুদ্র সর্বটুকুর উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় আর্ন্তনাদ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে এ অধমের নিকট যে-অর্থ প্রতীয়মান হইল তাহাই সে একপটে ব্যক্ত করিল। আশা, ভারতের ‘নেশন’-গঠন-প্রয়াসী মঙ্গলকামী সুধীগণ ঐরূপ কৈবর্তিক জটিলতায়ুক্ত ভারতীয় প্রসঙ্গের উট্টা ও সোজা—উভয় দিকেরই উত্তম পরীক্ষা করিয়া আমাদের অনুসরণীয় যাহা কল্যাণপথ তাহারই নির্দেশ দিবেন।

হ:-কং, চীন দেশ।

শ্রীঅমরেন্দ্র সাহা

“টান্মা” জাহাজের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক।

“বাংলার প্রথম মাসিক-পত্র”

১৩৪০ সালের মাঘ মাসের ‘প্রবাসী’তে শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় বাংলার প্রথম মাসিক-পত্র ‘দিগ্দর্শন’ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার শেষাংশটুকু লিখিতে ছ, নচেৎ উহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

‘দিগ্দর্শন’ কত সংখ্যা অবধি বাহির হইয়াছিল, সে-সম্বন্ধে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

“দিগ্দর্শন ২৬ সংখ্যা পর্যন্ত বাহির হইয়াছিল। প্রথম খণ্ড—এপ্রিল ১৮১৮ হইতে মার্চ, ১৮১৯; দ্বিতীয় খণ্ড—জানুয়ারি ১৮২০ হইতে ফেব্রুয়ারি ১৮২১।”—‘দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস’—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’, ৩য় সংখ্যা, ১৩৩৮।)

‘দিগ্দর্শন’ের সম্পূর্ণ ফাইল কোথায় পাওয়া যায় :—

রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরী।

ক্রীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রচাঙ্গার।

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী-লেখক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, ‘সম্বাদ কৌমুদী’তে রাজা রামমোহনের লিখিত ‘প্রতিধ্বনি’, ‘অরক্ষণ মণি’, ‘মকর মৎস্যের বিবরণ’, ‘বেগুনের বিবরণ’ ইত্যাদি বাহির হইয়াছিল। কিন্তু ‘সম্বাদ কৌমুদী’ কাগজ কখনও দেখি নাই। ঐ সকল প্রবন্ধ ‘দিগ্দর্শনে’ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা দেখিয়াছি।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যোতিরত্ন

আশা-নিরাশা

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

তাহারে শুভানু যবে, হে দোহর, কহ কহ কথা,
কি এনেছ দুঃসহ বারতা।—

সে কহে, আজিকে আনি
এই আশা-নিরাশার বাণী,

স্বপ্নে তারে দেখিয়াছি আরক্ত নয়নে মুক্তকেশে
রক্তাক্ত দংষ্ট্রায়, জাগরণে ছদ্মবেশে
আত্মার আত্মীয় ব'লে বারম্বার জানিলাম যারে।
যে-বন্ধন শতপাকে বাঁধে তুটি বিধুর হিয়ারে,
তাহারই ফণার শীর্ষে হ্লাহলে জলে বিষবাতি,
মধুর লোভন করে হৃদ্দিনের ঘন অমার্যতি,
অলক্ষ্যে উগারে মৃত্যু দিকে দিকে নিঃশ্বাসের সনে।

অমৃতভাষণে

ডুবায় আর্ন্তের কণ্ঠ মৈত্রীমন্ত্রে কাছে যারে টানে,
কটিতে অপিয়া খড়্গ শিরে দেয় জয়টীকা, দু-বাহু সাজায় ধনুর্কাণে।
মানবে বঞ্চিত করি মানব-যুথের করে বড়,
একতা-বন্ধন ছলে রচিত্য গ্রন্থির মালা বিরোধে সে করে বৃহত্তর।

কালি রাতে হায়,

স্বপ্নে তারে দেখিয়াছি দিশে দিশে প্রাবন বহায়
শোণিত-বাদরে।

যবে সে আপন রূপ ধরে,
অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, মহামারী ছুঁক্কে বহায়
দিকে দিকে হাহাকার, দিকে দিকে প্রচণ্ড অগ্নায়
অরাজক প্রজাহানি, জ্ঞাতি-রণ, নিপীড়নে জাগে।
জাগরণে হেরি সবে সমারোহে হোমধূম-যাগে

তাহারই অর্চনা করে ধূপদীপ-নির্ম্মালা চন্দনে!

মানবে অবজ্ঞা করি মানবের দেবের বন্দনে
দিগন্ত মুখর হয়, ডুবে যায় আর্ন্তকণ্ঠ রব,
স্পর্ধা ভরা অভিমানে বাড়ে যেথা দেবতা-গৌরব
মানবতা লজ্জা পায়।

কালি স্বপ্নে হেরি, মানবের

স্বপ্ন এ ভুবন ভরি অক্ষয় কুবের—

ভাঙার কে রচিয়াছে নানা মণি-রতনের ভারে।
এ নহে কবির স্বপ্ন,—ধনধান্ত গোধূম-নীবারে,
শ্লিষ্ট চন্দ্রিকার দ্যুতি চীনাংগুকে শুক্তি-মুকুতায়,
বৈদূর্য্য-নীলকে গাঁথা মণিহারে, সোনার স্তত্য

বিচিত্র চিত্রণে বোনা উত্তরীয়ে, গজদন্তে-গড়া
চঞ্চল সুখাসনে। কোন কক্ষে ভরা
অনঙ্গ-বাহিত অঙ্গরাগ, রচি মরতে নন্দন,
কর্পূর-কুঙ্কুম-ধূপ, মৃগনাভি-অঙ্কুর-চন্দন।

সুরমাল ফলমূলে ঘুতে দুগ্ধে মধু-শর্করাতে
পবন বিকার ধরে, বিষম্পর্শ লাগে মধুরাতে।
কোথা মাক্ষী গৌড়ী আর বাহুলীক যবন
মরু বালুতলে বহে সুরভি অমৃত-প্রস্রবণ।
জাগরণে হেরি,

সে কুবের-কোষাগার ঘেরি,

তরবারি খরধার কূটবুদ্ধি রাজনীতি-জালে
মানুষ জঞ্জাল রচি অহর্নিশি জালে
হিংসার বাড়বানল। তরবারি, বুদ্ধি, রাজনীতি
ক্ষমতা ধরে না তার নিতে পারে কণা-পরিমিত
নিজ ব্যবহার লাগি।

আজিকে স্বপ্নেই মাঝে পূর্ণ করি জাগি
জানি কে করিবে জয় সে-মহাশত্রুরে, অগৌরবে
অগৌরব হানি কে যে লজ্জা দিবে, ঝঙ্কারে রবে
পলক-পরশে কার খুলি যাবে কুবেরের দ্বার,
পড়ি রবে পথপাশে পুঞ্জ পুঞ্জ অতীত আধার,
তাহারই অঙ্ঘের খুরে উৎক্ষিপ্ত পথের ধূলি সম।

লভি সে জনম

দিনে দিনে ভ্রগসম বাড়ে।

সকল দৃষ্টির পারে

যেথা সর্বমানবের বুক

একখানি বোবা সুরে অহর্নিশি করে ধুক্ ধুক্,
স্বকোমল তার স্নেহ তাপে।

কবে সে কেমন বীরদপে

দেবে দেখা।

ললাটে জ্বলবে তার কোন্ জ্বলেখা,

কোন্ অঙ্গ সঙ্কানিবে শরাসনে, তুলি রণরণি
উচ্চারবে কোন্ মন্ত্রধ্বনি,

—কিছু নাহি জানি।

আমি আনি

এই আশা-নিরাশার বাণী।



মনের খেলা—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। গুপ্ত ফ্রেণ্ড্ এণ্ড কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

ভিয়েনার ডাক্তার সিগমুণ্ড ফ্রয়েড মনোরাজ্যের অনেক গুপ্ততত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই তত্ত্বগুলির পরিচয় দেওয়াই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। গ্রন্থকার ভূমিকার এক স্থানে বলিয়াছেন, “নাইকো-এ্যানালিসিস্ অথবা মনের জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি মোটা মোটা বিষয় লইয়া এখানে আলোচনা করা হইয়াছে।” কিন্তু পুস্তক পড়িয়া মনে হয় যে তিনি তত্ত্বগুলির আলোচনা করেন নাই, সহজ ও সরল ভাষায় বহু উপমার সাহায্যে সেইগুলির বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। বিবরণগুলি মোটের উপর সঠিকই দেওয়া হইয়াছে এবং ষাঁহাদের জন্ত পুস্তকখানি লিখিত তাঁহাদের সহজেই বোধগম্য হইবে বলিয়া মনে হয়। মতামতের আলোচনা যতটুকু করিয়াছেন (৪৬ পৃ.) সে-টুকু না করিলেই ভাল হইত। ভূমিকার অপর এক স্থানে লিখিত হইয়াছে, ‘মনের খেলা তাঁহাদের জন্ত লিখিত হইল ষাঁহারা ইংরেজী জানেন না অথবা ইংরেজী ভাষার সহিত বিশেষভাবে পরিচিত নহেন।’ কিন্তু পুস্তকের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠাতেই গ্রন্থকার রমা রান্না, টলস্টয়, ইবসন কার্পেটার, বার্গাড-শ প্রমুখ লেখকগণের নাম উল্লেখ ও তাঁহাদের লেখার প্রতি নির্দেশ করিয়াছেন। ইহা সঙ্গত হয় নাই।

গ্রন্থকারের ধারণা যে বাংলা ভাষায় মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বিশেষভাবে আলোচনা হয় নাই। তাঁহার এই ধারণা ভুল। কারণ এই বিষয়ে বাংলা ভাষায় সর্বসাধারণের জন্ত লিখিত পুস্তক ও বহু প্রবন্ধাদি পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে।

অনেক স্থলে বানান ভুল দেখা যায়, আশা করি পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি সংশোধিত হইবে।

শ্রীসুহৃৎ চন্দ্র মিত্র

হীরক-হার—মৌলবী ইব্রাহিম খাঁ, এম্-এ. বি-এল. ও মৌলবী মোহম্মদ আহসানুল্লাহ্ প্রণীত। ইতিকথা বুক ডি:পা। ৩৮, কড়েরা রোড, কলিকাতা।

বইখানিতে ইসলামের ইতিহাস হইতে কয়েকটি উপভোগ্য কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। উপাখ্যানগুলি অতীব মনোরম ও শিক্ষাপ্রদ। “নাসিকার মূল্য” (৩৮ পৃ.) নামক বৃত্তান্তটি বর্তমান ভারতবাসী হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের পক্ষেই উপকারী মনে হয়। ঘটনাটি এই :—

মিশর-বিজয়ী মুসলমান সৈন্যেরা সেনাপতির আদেশ অমান্য করিয়া তহৃত্যু খৃষ্টানদের উপাশ্রয় একটি খৃষ্টমূর্তির নাসিকা গোপনে ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। খৃষ্টানেরা ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া সেনাপতি আমর-ইবন-আছের নিকট বিচার প্রার্থনা করে। সেনাপতি তাহাদের ক্ষতিপূরণ করিতে সম্মত হইয়া কহিলেন, “ইছলাম প্রতিমা-নির্মাণ বা প্রতিমা-পূজা সমর্থন করে না সত্য, কিন্তু অশ্বের উপাশ্রয় দেবদেবীর অবমাননাও সমর্থন করে না।” কিন্তু উত্তেজিত খৃষ্টানেরা শুধু আর্থিক ক্ষতিপূরণ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চাহিল না। তাহারা মুসলমানদের

পয়গম্বের প্রতিমূর্তি গঠন করিয়া তাহার নাসিকা ভগ্ন করিয়া প্রতিশোধ লইতে চাহিল।

এরূপ প্রস্তাবেও বিজয়ী সেনাপতি আমরের বৈধব্যচ্যুতি হইল না। তিনি সংযত এবং শাস্তভাবে কহিলেন, যে, প্রাণ থাকিতে মুসলমানের পক্ষে তার পয়গম্বরের এরূপ অপমান বরদাস্ত করা অসম্ভব। তা'ব, নাসিকার বদলে যদি নাসিকাই দিতে হয়, তবে তিনি তাহার নিজের নাসিকা কাটিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন।

বলা বাহুল্য, ততদূর পয্যন্ত তাহা অগ্রসর হইতে হয় নাই। ধর্ম্মাঙ্ক অনেক খ্রীষ্টানই প্রথমতঃ এই প্রতিশোধের লোভ সংবরণ করিতে পারে নাই; কিন্তু যখন দেখিল যে আমর সত্যসত্যই স্থিরপ্রতিজ্ঞ, এবং সমবেত জনতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নিজের তরবারি অগ্রসর করিয়া দিতেছেন, তখন এই দৃঢ়তা, উদারতা এবং ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টান্ত সকলকেই বিচলিত করিল এবং খ্রীষ্টানেরা বিজয়ী সেনাপতিকে ধন্যবাদ দিতে দিতে সন্তুষ্টচিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল।

গ্রন্থকারদের ভাষা ভাল; তবে, মাঝে মাঝে দুই-একট মুসলমান শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা হয়ত সকলে পছন্দ করিবেন না। যেমন, ‘ম্মারশ্,’ ‘পানি,’ ‘কিচ্ছা’ ইত্যাদি। ‘বাপ-গুল’ (৪৮ পৃ.) শব্দটি শিষ্টপ্রয়োগবিষয়ক। ‘অশ্র-সজল,’ (৭০ পৃ.), ‘বিদায়মান,’ ‘শিঃশেবমান’ (১১৮ পৃ.), প্রভৃতি শব্দ ব্যাকরণভ্রষ্ট। ‘পূর্বদিবাগত রাত্রি’ (৩৯ পৃ.) কথাটির মানে কি? ‘অ-আরব’ (৩৭ পৃ.) কেমন শুনায়? ‘বি-পিতা’ (৪৭ পৃ.) step-father শব্দের বাংলা হিসাবে প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িতেছে: ‘বিমাতা’ কথাটির সহিত আমরা পরিচিত বটে; তথাপি ‘বি-পিতা’ যেন কানে ঠেকে! কিন্তু ব্যবহার না করিয়া উপায় আছে কি?

বইখানির উদ্দেশ্য অতি সাধু এবং আমরা উহা পড়িয়া অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়াছি। স্কুল-কলেজের পারিতোষিকরূপে ইহার বহুল প্রচার হইলে দেশের কল্যাণ হইবে।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মজুরী ও মূলধন—কার্ল মার্কস্ প্রণীত ইংরেজী গ্রন্থ শ্রীকনীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত। শ্রীকবীকেশ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ১২নং মণ্ডল স্ট্রীট, উত্তরপাড়া হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

এই পুস্তকখানি কার্ল মার্কস্ প্রণীত বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ “Wage-labour and Capital” এর অনুবাদ। কার্ল মার্কস্ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদগণের যুক্তি খণ্ডন করিয়া যে-ভাবে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এই পুস্তকে মার্কসের আলোচনার সেই ধারাকে সর্বত্র অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থ হইতে মার্কসের অর্থনীতিশাস্ত্রে অন্তত জ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার অপূর্ব যুক্তি ও তর্কনীতির পরিচয় পাইবার সুযোগ পাওয়া যায়। ইহাই এই অনুবাদ-পুস্তকের প্রধান বিশেষত্ব। বসভাষায় অর্থনীতি বিষয়ে পুস্তক এতই অল্প লিখিত হইয়াছে যে, এই পুস্তকখানি অনুবাদ হইলেও বিশেষ সমরোপযোগী হইয়াছে, ইহা নিশ্চিত। ইহাতে মূলগ্রন্থে ফ্রোয়েডরিশ এঞ্জেলস্ কর্তৃক লিখিত ভূমিকাটিরও অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে।

এক পরিশেষে মার্কস-বাদের আলোচনাসহ মার্কস-এর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযুক্ত করা হইয়াছে। মার্কস-এর এই পুস্তকখানি এতই প্রসিদ্ধ যে, ইহার আলোচিত অংশের পুনরুল্লেখ নিম্নয়োজন। অনুবাদ সরল এবং সকলের বোধগম্য করিয়া লিখিবার চেষ্টা হইয়াছে। অনুবাদকের এই চেষ্টা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। আমরা যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

রামচরিতমানসমণি—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত কর্তৃক অনূদিত ও প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান, বিদ্যাশ্রম, বি ৭৬ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯০+৯০+১১৭+১১০। মূল্য ১/০।

তুলসীদাসের রামচরিতমানস (রামায়ণ) হিন্দী ভাষার মহাকাব্য, ভারতবর্ষের হিন্দী ভাষাভাষীগণের একান্ত আদরের ভক্তিগ্রন্থ। ভক্তকবি এই মহাগ্রন্থে শ্রীরামচন্দ্রের কাহিনী বর্ণনা উপলক্ষ্যে বহু অমূল্য রত্নের সমাবেশ করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দীভাষানিভিক্ত বাঙালী পাঠকের পক্ষে তাহাদের পরিচয় লাভ করা কঠিন। গ্রন্থকার তাই তাহা হইতে কতকগুলি মণি আহরণ করিয়া এই রামচরিতমানসমণি রচনা করিয়াছেন। ভক্তের দৃষ্টি হইতেই এই সংগ্রহ করা হইয়াছে। হিন্দী 'রামায়ণের রসগ্রহণেচ্ছু, ভক্তিপিপাসু বাঙালী পাঠকমাত্রেঃ এজন্ত তাহার নিকট স্বীকৃত হইবেন।

গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক রামায়ণের মূলতত্ত্ব ও ভক্তিরহস্য সংক্ষেপে ও সহজ ভাষায় উপভোগ্যভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার পর বিষয়বস্তু ভাগ করিয়া পদগুলির সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলা অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। পরিশেষে গ্রন্থকার তুলসীদাস কর্তৃক ব্যবহৃত ভাষার একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ ও শব্দকোষ দিয়াছেন। তাহার দ্বারা মূলগ্রন্থ পাঠের সহায়তা হইবে।

গ্রন্থের অনুবাদ সুন্দর, ভাষা প্রাঞ্জল, ও ছাপা চমৎকার হইয়াছে। তবে মাঝে মাঝে দু-একটি ছাপার ভুল ও কোথাও-কোথাও অনুবাদের সামান্য ত্রুটি চোখে পড়িল। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে সেগুলি দূর হইবে। বাংলা দেশে হিন্দী পড়িবার আগ্রহ দেখা দিয়াছে, সুতরাং এই গ্রন্থের পাঠকের অভাব না হওয়াই উচিত।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

মাতৃমূর্তি—শ্রীরেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরত্ন প্রণীত। শ্রীপ্রফুল্লকিশোর ভট্টাচার্য্য, বি-এ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। পোঃ তাহিরপুর, রাজসাহী, এই ঠিকানার গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

রেবতীবাবু নূতন লেখক নন; তাঁর 'একটি ফুল,' 'প্রতিমা বিসর্জন,' 'প্রহ্লাদ' প্রভৃতি বই পূর্বেই পড়েছি। তাঁর বর্তমান গ্রন্থখানি নাটক। রেবতীবাবুর ভাষার মাধুর্য্য আছে, চরিত্রঅঙ্কনের কৃতিত্ব আছে। অমর ও স্নেহলতার চরিত্র মনের ওপর ছাপ রেখে যায়।

বইয়ের কাগজ ও ছাপা ভাল।

সোনার খনির সন্ধানে—শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক শ্রীশান্তিবিনু গুপ্ত, বি-এস্‌সি। ২১০৬ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

ছোট ছেলেদের জন্ত লেখা গল্পের বই। লেখক ইতিপূর্বে বালক-পাঠ্য অনেক গল্পের বই লিখেছেন। শিশুদের নিকট তাদের উপযোগী ভাষার গল্প বলতে তিনি অভ্যস্ত। তাঁর 'তাপসী,' 'পূণ্যবতী নারী,' 'ছোটদের বই,' 'ছোটদের গল্প' প্রভৃতি বই শিশুসাহিত্যের আসরে প্রসিদ্ধ। বর্তমান গল্পের বইখানিতেও লেখকের কৃতিত্ব অসুন্দর আছে।

গল্পাংশট অতীব চিত্তাকর্ষক। অনেকগুলি ছবিও আছে। আমাদের বিশ্বাস ছেলেমেয়েরা আগ্রহের সঙ্গে বইখানা পড়বে।

মৃত্যু ও পরলোক তত্ত্ব—শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, বি-এ, বি-এল। প্রকাশক শ্রীরজনীকান্ত নাথ, কুমিল্লা, রাজগঞ্জ। মূল্য ১।০।

বাংলা ভাষায় Spiritualism সম্বন্ধে বই বেশী নেই। মহেন্দ্র বাবু অনেক দিন ধরে পরলোক তত্ত্বের চর্চা করেছেন। তিনি এ-বিষয়ে বঙ্গবার অধিকারী। Spirit-return সম্বন্ধে বহু কৌতূহলপ্রদ ঘটনা এতে লিপিবদ্ধ আছে, গল্প হিসেবেও সেগুলো পড়লে পাঠক আনন্দ পাবেন। লেখক পরলোক সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচার করতে চেয়েছেন বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে, অনেকে হয়ত সে-মতবাদ গ্রহণ না করতেও পারেন, কিন্তু বইয়ের গল্পগুলি সকলেরই ভাল লাগবে আশা করা যায়।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জেনেভা ভ্রমণ—শ্রীদেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। প্রকাশক—শ্রীনিখিলচন্দ্র সর্বাধিকারী ২০ নং সুরী লেন, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

লেখক ভ্রমণোদ্দেশ্যে বা নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্ত বৃদ্ধ বয়সে জেনেভা যাত্রা করেন নাই, ভারত-সরকারী কর্মের গুরুভার ক্ষেত্র লইয়া প্রবাসী হইয়াছিলেন। গ্রন্থখানিতে তাহার কিংকং পরিচয় ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ললাভূমি সুইজারল্যান্ডের মনোজ্ঞ বর্ণনা আছে।—পাঠে আনন্দ ও শিক্ষা উভয়ই লাভ হইবে। ছাপা ও কাগজ ভাল।

গীতি-নির্মাল্য—শ্রীগুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বেদান্তশাস্ত্রী বিরচিত। প্রকাশক—শ্রীসাধনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১৭৬, নবাবপুর রোড, ঢাকা। মূল্য ১।০।

কবিতা-পুস্তক। ইহাতে ছোট, বড় ও মাঝারী তিনটি কবিতা আছে। লেখক ভূমিকায় খেদ করিতেছেন, ভারতে "ব্যাস, বাঙ্গালীক ও সপ্ত কবিকে" লইয়া "কবি মাত্র নয় জন," অমন যে কালিদাস তিনিও কবি ছিলেন না অথচ "এখন তরুণ তরুণী সবাই কবি।"

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

স্মৃতি-রেখা—শ্রীদেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। প্রকাশক শ্রীনিখিল-চন্দ্র সর্বাধিকারী, ২০ নং সুরী লেন, কলিকাতা। পৃ. ১২২, মূল্য ১।০।

বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান অভাব এই যে আমাদের যথেষ্ট স্মৃতিকথার বই নাই। এই অবস্থায় যখন যাহা উল্লেখযোগ্য বই বাহির হয় তাহা আমরা আগ্রহ করিয়া পড়ি। যে-যুগ চলিয়া চায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের স্মৃতিকথার সাহায্য তাহার অনেকটা চিহ্ন থাকতে পারে। স্যর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয় তাহার বাল্য ও পরবর্তী জীবনের বঙ্গমাজের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা ভবিষ্যতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের ইতিহাস লেখকদের কাজে লাগিবে। কলিকাতা ও হুগলী জেলার রাধানগর অঞ্চলের সেকালের নানা বিষয়ের আলোচনা এই গ্রন্থে আছে—সাহিত্য, সমাজ, আনন্দ-উৎসব, রাজনীতি, শিক্ষাদীক্ষা এক বহু বিশিষ্ট ও সাধারণ ব্যক্তির জীবন চিত্র এই গ্রন্থ পাওয়া যাইবে। সে-যুগের সম্বন্ধে লিখিত অস্বাভাবিক কথানা প্রসিদ্ধ স্মৃতিকথার মত এইখানাও বঙ্গীয় শিক্ষিত-সাধারণের আনন্দবর্ধন করিবে ইহাই আমাদের বিশ্বাস। দুঃখের বিষয়, গ্রন্থকার তাহার সুদীর্ঘ জীবনের শেষভাগের কথা কিছু লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন নাই।

শ্রীরমেশ বসু

কমিউনিজম—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। গুপ্ত ফ্রেণ্ডস কোং। ১১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃ. ৯০।

বর্তমান গ্রন্থে লেখক কমিউনিজমের বিষয় আলোচনা করিয়া, গান্ধীবাদের সহিত তাহার কিছু তুলনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানি সুপাঠ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু লেখকের মনে গান্ধীবাদের প্রতি সমধিক অনুরাগ দেখা যায়। তাহার জন্ম কমিউনিজমের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত সত্য রহিয়াছে তাহা তেমন ফুটিয়া ওঠে নাই।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

স্বাস্থ্য-কথা—কবিরাজ শ্রীনবনীপচন্দ্র মল্লিক ও ডাক্তার শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, মূল্য চারি আনা। পৃ. ১০৬।

স্কুলের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্ম লিখিত। কাজে লাগিতে পারে।

শিশুর দিনচর্যা—পণ্ডিত শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত, পৃ. ২৮, মূল্য ৮/০ আনা।

শাস্ত্রমতে শয্যাভ্যাগ, উপাসনা, আহার পোষাক প্রভৃতি সম্বন্ধে বই। বইটি রাশ-ভারি মেজাজে লেখা বলিয়া ছেলেরদের হয়ত ভাল নাও লাগিতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ

কুসুমাজলি—শ্রীবেতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও শ্রীশরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বি-এ প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা।

কবিতাগুলি মামুলি। অবশ্য দুই একটি কবিতা মন্দ নয়। ছন্দ হিসাবে কবিতাগুলি নিতান্ত দুর্বল হইলেও সাঙ্খিকভাবে পরিপূর্ণ, ইহাই বইখানির বৈশিষ্ট্য।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

জীবনীকোষ—ভারতীয় পৌরাণিক। শ্রীশশিভূষণ বিদ্যা লঙ্কার প্রণীত। প্রথম হইতে ২২তম খণ্ড। প্রতি খণ্ডের মূল্য এক টাকা। ২১০-৩-২ কর্ণওয়ালিস্ ট্রাট, কলিকাতা, ঠিকানাঃ গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

এই বৃহৎ জীবনীকোষ চারি ভাগে বিভক্ত, ভারতীয় পৌরাণিক, ভারতীয় ঐতিহাসিক, বিদেশীয় পৌরাণিক, বিদেশীয় ঐতিহাসিক। তাহার মধ্যে ভারতীয় পৌরাণিক অংশ ২২ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছে। গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বিস্ময়কর। তিনি বহু বৎসরব্যাপী পরিশ্রমে ভারতীয় পৌরাণিক জীবনীকোষ সমাপ্ত করিয়াছেন। বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের ষাঁহারা চর্চা করেন, বহু পৌরাণিক নাম তাঁহাদের চোখে পড়ে। এই সমুদয় ব্যক্তির সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকিলে অনেক স্থলে অনেক গ্রন্থের যে-যে অংশে এই সকল ব্যক্তির উল্লেখ আছে, তাহা বুঝা যায় না। সমস্ত সংস্কৃত শাস্ত্র ও কাব্য ষাঁটিয়া ঐরূপ জ্ঞানলাভ করিতে চেষ্টা করা অধিকাংশ পাঠকের পক্ষে অসম্ভব। এইজন্য এইরূপ একটি জীবনীকোষ একান্ত আবশ্যিক ছিল। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় সেই অভাৱ দূর করিয়া বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যয়ন সহজ ও ফলপ্রসূ করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত, এই জীবনীকোষ গ্রন্থখানি নিজেই সুপাঠ্য ও পৌরাণিক জ্ঞানলাভের একটি উপায়। যেমন ধবরের কাগজের কোন-কোন অংশ দু-চার মিনিটে সম্পূর্ণ পড়িয়া অস্তান্ত অংশ পরে পড়িবার জন্ত রাখিয়া দেওয়া যায়,

সেইরূপ এই গ্রন্থে নিবন্ধ এক এক ব্যক্তির সম্বন্ধে লিখিত পরিচয় কোনস্থলে এক মিনিট, কোনস্থলে পাঁচ মিনিট, কোনস্থলে বা পনের মিনিটে পড়া যায়, এবং পড়িয়া গল্প পড়ার সুখ পাওয়া যায়।

ইহা এক-এক জনের লাইব্রেরী, পারিবারিক লাইব্রেরী, সর্বসাধারণের ব্যবহার্য্য লাইব্রেরী, এং স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে রাখিবার যোগ্য ও রাখা উচিত।

রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সাহিত্যপ্রবেশক

প্রথম খণ্ড। সন ১২৬৮—১৩১৮ সাল [১৮৬১—১৯১২]। রচয়িতা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক ও অধ্যাপক। শান্তিনিকেতন। মূল্য ৪, সচিত্র ৫ টাকা। গ্রন্থকারের নিকট এবং ২১০ কর্ণওয়ালিস ট্রাট, কলিকাতা, ঠিকানাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ে পাওয়া যায়। পৃষ্ঠার সংখ্যা ১৬+৫১৯। মজবুত কাপড়ের বঁধাই। প্রত্যেক পৃষ্ঠা ৯ ইঞ্চি লম্বা ৫ ১/২ চৌড়া।

এই বইখানি কোন ইস্কুলমাষ্টারের বা বৈয়াকরণের ভাঙে পড়িলে তাহার পক্ষে ইহাতে বানান ভুল, ব্যাকরণের ভুল, ভাষাগত খুঁৎ ও উচ্চারণ বিকৃতির দৃষ্টান্ত বাহির করা কঠিন হইবে না। একই ঘটনার পরস্পরবিরোধী বর্ণনাও ইহাতে একেবারেই নাই বলা যায় না। যেমন ১০ পৃষ্ঠায় লেখক লিখিয়াছেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহ হয় বার বৎসর বয়সে, ১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন তাহার বিবাহ হয় দশ বৎসর বয়সে। কিন্তু এই সকল খুঁৎ সত্ত্বেও ইহা বলিতেই হইবে, যে, রবীন্দ্রনাথকে ও তাহার সমুদয় পদ্য ও গল্প রচনা বুঝিতে হইলে, তাহার হৃদয়-মনের ও কাব্যকলার ক্রমবিকাশের পরিচয় লাভ করিতে হইলে প্রভাত বাবুর বইখানির সাহায্য লওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। বইখানি সুখপাঠ্য ও সারবান্ এবং বহু অধ্যয়ন, চিন্তা ও পরিশ্রমের ফল। ভবিষ্যতে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ও বৃহত্তর পুস্তক লিখিত হইলে তবে এই পুস্তকখানির প্রয়োজনীয়তা কমিবে, তৎপূর্বে নহে।

কবি বলিয়াছেন বটে, 'কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে': কিন্তু তাহাকে পাইবার নিমিত্ত তাহার সমগ্র গ্রন্থাবলী বুঝিয়া পড়া এক তাহার জীবনচরিতে তাহার জীবনের সব কার্যের, ঘটনার ও মতের বৃত্তান্ত পড়া ভিন্ন সর্বসাধারণ আর কি উপায় অবলম্বন করিতে পারে? এমন কোন মানুষ নাই যিনি সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠ ভাবে শিশু, কিশোর, যুবা, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথকে জানিয়াছেন। তাঁহাকে তাহার পূর্ণ-বোঁবন হইতে জানিয়াছেন এমন লোক এখনও অল্পসংখ্যক হয়ত বাঁচিয়া আছেন, কিন্তু তাহাদেরও তাহার আযৌবন সব বয়সের পরিচয়নৈকট্য সমান নহে। অতএব তাঁহাকে জানিবার জন্ত তাহাদের পক্ষেও তাহার একখানি বিস্তৃত জীবনচরিত আবশ্যিক। প্রভাত বাবুর বইখানি অনেকটা সেইরূপ বই। ইহাতে কবির অধুনা অপ্রাপ্ত বা দুশ্রীপা অনেক বাল্যরচনা উদ্ধৃত হইয়াছে, পুরাতন 'ভারতী' 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকা হইতে অনেক জিনিষ উদ্ধৃত হইয়াছে, কবির সহিতও গ্রন্থকার অনেক তথ্য ও তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। অবশ্য, গ্রন্থলিখিত মতামতের জন্ত লেখকই দায়ী।

গ্রন্থে অনেক জায়গায় "জীবন-স্মৃতি"তে লিখিত কোন কোন তথ্য ও তত্ত্বের উল্লেখমাত্র আছে। কিন্তু নেপথ্য উদ্ধৃত করিয়া দিলে বা তাহার তাৎপর্য্য দিলে ভাল হইত।

বইখানির ছাপা পরিপাটি এবং ছবিগুলিও ভাল।

ডাক্তারের ডায়েরীর দুটো পাতা

শ্রীঅমিয় রায়-চৌধুরী

সকলে তাকে দিদিমা বলত, আমিও তাকে দিদিমা বলেই ডাকতাম। এককালে তাদের অবস্থা ভালই ছিল, কিন্তু আজ হুবহু পড়ে তাকে স্ত্রী-তোলা আর লেস-বোনার কাজ করেই পেট চালাতে হয়। স্বামী তার কিছু নগদ যে রেখে যাননি তা নয়। তবু সে-টাকা সে খরচ করত না, বলত—থাক না টাকা ক'টা। ছেলেটা মানুষ হ'লে কাজে লাগবে। আর খরচ করলেই তো ফুরিয়ে গেল। টাকা ত আর ফেরে না।

বার্ককো সব লোকের যে অবস্থা হয় দিদিমারও তাই হয়েছিল। মুখের চামড়া পড়েছে ঝুলে, শরীরের কাঠামটা গেছে ষণ ধরে, তাই চলতে হয় তাকে কুঁজো হয়ে—আর হাঁপানি ও অস্থির অস্থির ত লেগেই আছে।

তার শিল্প-কুশলতার কথা ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে, তার রেশমী ফুলের কাজ নাকি সকলের ভারি পছন্দ, লেসগুলি তার বেশ দামেই বিক্রয়।

যদিও কারুর সে সত্যিকারের দিদিমা নয়, তবু সবাই তাকে দিদিমাই বলে। অন্য কিছু বলে তাকে ডাকলে কেমন যেন বেমানান শোনাত মনে হয়। লেখাপড়া সে শিখেছিল কিছু, তাই এক কালে সে মেয়ে-পড়িয়েও টাকা জমিয়েছে। এখনই না-হয় বয়স বেশী হয়েছে, তাই আর পারে না। সাধারণ বাঙালী-ঘরের মেয়েদের যে-বয়সে বিয়ে হয়, তার বিয়ে হয়েছিল তার অনেক পরে। পঁচিশ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়েছিল, শুনেছি তিরিশ না যেতেই তার হাতের নোয়া খসে গিয়েছিল। তার একটি মাত্র ছেলে, সে নাকি এখন ডাক্তার।

ছেলেটিকে একবারটি দেখেছিলাম, কিন্তু কেন জানি না প্রথম দৃষ্টিতেই তার প্রতি মন বিরূপ হয়ে উঠেছিল। সে মোটা স্বলারসিপ পেয়েছিল, তাতেই তার পড়ার খরচ চলত কোন রকমে। ছেলেটির সত্যিই পড়াশোনায় ভারি মন ছিল। কিন্তু সংসার চালাবার জন্য মা যে অবিরাম খেটেই চলেছে, সে-খোঁজ সে একেবারেই রাখত না, ইচ্ছাও তার

ছিল না, অবকাশ তো নয়ই। সে যখন হাসপাতালে থাকত বুড়ী লেস-বোনার সঙ্গে সঙ্গে কল্লনারও জাল বুনত—ছেলে তার বিখ্যাত ডাক্তার হবে, তাকে বাকী দিনগুলো স্থখে রাখবে।

* * *

একদিন সে মনের দুঃখ চাপতে না পেরে আমার বলল—ডাক্তার বাবু! বুড়ো বয়সে আর এ হাড়ভাঙা খাটুনি ভাল লাগে না, তা ছেলেটার মুখ চেয়ে সব সহ করি, আর কটা দিন গেলেই সে বড় পাস দেবে, তারপর...। শেষের দিকটা বৃদ্ধার গলার স্বর ভারী হয়ে এল, বললে, সে আমার সব দুঃখ দূর করবে, ভগবান যদি বাঁচিয়ে রাখেন।

ছ-মাস পরে একদিন দিদিমা আমার কাছে কঁাদতে কঁাদতে এসে হাজির, বললে—ডাক্তার বাবু, একটা ব্যবস্থা করুন। চোখ আমার দিনকে দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। দেখতে না পেলে কাজ করব কি ক'রে, আর পেটই বা চালাব কেমন করে?

আমি বললাম, দিদিমা তোমার এখন খাটবার কি দরকার? তোমার ছেলে ত ডাক্তার, শুনেছি দু-পয়সা উপায়ও করে।

দিদিমা বললে—তা অল্পদিনেই বাছার আমার হাত-ঘশ হয়েছে বেশ। ও-পাড়ার মতির মা'র কলেরা হ'ল, সাহেব ডাক্তার হাল ছেড়ে দিলে, কিন্তু অহু আমার তাকে ভাল করলে। আশ্চর্য শিখেছে সব।

বলতে বলতে বৃদ্ধার মুখ সন্তানগর্কে দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। আমি বললাম—“তা অমন ছেলে, সে তোমায় দেয় না কিছু!” জিব কেটে বৃদ্ধা বলল,—আমি কারুর প্রত্যাশা করিনে ডাক্তার বাবু, তার কাছ থেকে নেব কি? বাছাকে টাকার অভাবে গাড়ী কিনে দিতে পারছি না। সত্যিই ত ডাক্তার হ'লে একটা মটর না-হলে চলে না। অহুর আমার বরাত-জোর আছে, পাস করেই হাসপাতালে কাজ পেল। সেখানেও সাহেবের নেকনজরে পড়েছে,

সাহেব বলেছে—আর কটা মাস সবুজ কর অনুপম, একটা স্কলারশিপ জোগাড় ক'রে তোমায় জার্মানীতে পাঠাব। আহা! অমন সাহেব হয় না। বেঁচে থাক সাহেব। ক্লান্ততায় অজ্ঞাতে বৃদ্ধার চোখের জল ঝরে পড়ল দু-ফোঁটা। সে আবার বলল—অনু আমার জার্মানী থেকে ফিরে এলে আমায় আর খাটতে হবে না। ছেলে আমার তেমন নয়।

আমি বললাম—স্কলারশিপের টাকা ছাড়াও যে অনেক টাকার দরকার, বিদেশে যেতে হ'লে। তার কি হবে?

মান হাসি হেসে বৃদ্ধা বলল—তোমাদের আশীর্বাদে, যে দু-দশ টাকা জমিয়েছি তাতেই আমার চলবে আর উনি যে টাকাটা রেখে গেছেন, তা আমি ছুঁইও নি, যদি অনুর কাজে লাগে তো ভালই।

যাই হোক আমি তার চোখ পরীক্ষা ক'রে ছানির সন্ধান পেলাম, বললাম—কাটান ছাড়া উপায় নেই।

বৃদ্ধা শিউরে উঠে বললে—না, ডাক্তারবাবু, কাটাকুটিকে আমি বড় ভয় করি! অপারেশন করলে আমি কখনও বাঁচব না। অনু ফিরে আসা পর্যন্ত আমায় বাঁচতে দিন। যদি বাইরের ওষুধ কিংবা চশমাতে হয়, তাতেই জোড়াতাড়া লাগিয়ে কটা বছর চালিয়ে দেব।

কাজেই একটি ভাল চশমা ঠিক ক'রে দিয়ে বললাম—এতে কিছুদিন চলবে।

তারপর ক-বছর কেটে গেছে, আমি বৃদ্ধার কোন খবর পাই নি এর মধ্যে। হঠাৎ একদিন খবরের কাগজে দেখলাম তার ছেলে বার্লিন থেকে এম-ডি ও লণ্ডন থেকে এম-আর-সি-পি পাস করেছে,—এই দু-দিন হ'ল সে দেশে ফিরেছে। বৃদ্ধার এই আনন্দের দিনে তাকে দেখতে গেলাম, দেখলাম সে তখনও আগের মত পরিশ্রম করছে। বললাম—আর কেন দিদিমা? ছেলে তো জগৎজোড়া নাম কিনে দেশে ফিরল। সে কোথায়? বৃদ্ধা বলল—ই! ডাক্তার বাবু। সে এসে একটা হোটেলে আছে। পাস করেছে, তার পসার আছে, এ গলির মধ্যে থাকলে চলবে কেন? ছেলে পাসও ক'রে এল এদিকে, বিয়েরও ঠিক করেছে, জাহাজে একটি মেয়ের সঙ্গে। দু-মাস বাদেই তাদের বিয়ে;—আহা বাছারা সুখে থাক। এই তাদের বিয়েতে দেব ব'লে, বৌমার জন্তু লেসের জামা কাপড় তৈরি করছি। বিয়ের পরই ছেলে-

বৌ নিয়ে একসঙ্গে থাকব। আমি বললাম, বাঃ বেশ। তা এখন চোখ কি রকম আছে দিদিমা? বৃদ্ধা বলল—বড়-একটা দেখতে পাইনে ডাক্তারবাবু। জানি না এ পোষাকটা শেষ করতে কত দিন লাগবে, আজকাল তো আর আগের মত তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারিনে।

তার দু-চোখের তারা ভাল ক'রে দেখে, আমি স্পষ্টই তাকে বললাম যে এবার অপারেশন না করলে একেবারে অন্ধ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। এক মাসের মধ্যে দৃষ্টিশক্তি লোপ পাবে।

দিদিমা বলল—কিন্তু আমায় যে এ-পোষাকটা শেষ করতেই হবে, অনুর বিয়েতে দেব যে ডাক্তার বাবু।

বৃদ্ধা কেঁদে ফেলল; অবশেষে মরিয়া হয়ে চোখ কাটাতে রাজী হ'ল।

অপারেশনে সফলই পাওয়া গেল। চোখ কাটাবার পর মোটা লেন্সের মধ্য দিয়ে সে দেখতে পেত।

বাড়ি ফিরে এসে তার প্রথম কাজ হ'ল ফ্রেমগুলি বার ক'রে অসমাপ্ত লেন্সের কাজে লেগে যাওয়া। বৃদ্ধো বয়সেও তার এত কর্মতৎপরতা দেখে আশ্চর্য না-হয়ে থাকতে পারলাম না। বৃদ্ধার উৎসাহ দেখে কে! ভাবলাম যাক, কিছু দিন পরেই বৃদ্ধী বৌ-বেটা নিয়ে সুখী হবে।

* * *

বেচারি দিদিমা! চোখ কাটাবার পর পাঁচ বছর হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, তবে তার লেন্সগুলি আগের মতন সূক্ষ্ম হয়-না। বাতে তার আঙুলগুলি স্ফু হয়ে এসেছে। কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে চোখ বেগ্নে তার জল উপছে পড়ে—নিজের অক্ষমতার জন্তু সে দোষ দেবে কাকে?

সে কাজ করে মনে একটা দারুণ তিক্ততা নিয়ে, আগের মত আনন্দে নয়। কাজ সূক্ষ্ম হয় না বলে জিনিষের তার দাম কমে ত গেছেই, খরিদারও কমে গেছে সংখ্যায়।

* * *

আজকাল বাড়িভাড়া জোগাতেও তার কষ্ট হয়, আয় কমে গেছে যে। আগে একটি ঝি ছিল বাজার-হাট করা, খরিদারের বাড়ি যাওয়া ও দেখাশোনার জন্তু—অর্থাভাবে তাকেও ছাড়িয়ে দিতে হয়েছে। এক দিন কতকগুলি লেন্সের

জন্য তার কাছে গেলাম। কেঁদে ফেলে সে বলল,—আমি আর পারছি না ডাক্তার বাবু, মরতে পারলে বাঁচি।

বললাম—কেন তোমার ছেলে কি করে ?

অশ্রুসিক্ত নয়নে একটু হাসির রেখা টেনে সে বলল—সে এখন চৌরঙ্গীতে একটা ফ্ল্যাটে আছে বৌকে নিয়ে। ফ্ল্যাটটা ছোট কিনা, তাই আমাকে কষ্ট করে আরও কিছু

দিন থাকতে হবে। মাস-ছয় পরে সে একটা বড় বাড়ি নেবে, তখন আমি তাদের সঙ্গে গিয়ে থাকব।

বৃদ্ধার শেষ ইচ্ছা-অপূর্ণই রয়ে গিয়েছিল! ছ-মাস হবার অনেক আগেই মাত্র এক সপ্তাহ পরে মৃত্যু তাকে চিরদিনের জন্য নিয়ে গেল। ছ-মাস বাদে কিন্তু অল্পময় সত্যিই বাড়ি বদল করেছিল।

ময়াল সর্প

শ্রীঅশেষচন্দ্র বসু, বি-এ

সামুদ্রিক জীবের মধ্যে যেমন তিমি, চতুষ্পদের মধ্যে যেমন হস্তী, পক্ষীদের মধ্যে ঘেরূপ অষ্ট্রিচ, সর্পের মধ্যে সেইরূপ ময়াল এক অদ্ভুত অতিকায় সৃষ্টি। শঙ্খচূড় বা অহিরাজ অপেক্ষা বোধ হয় ময়াল সর্পই দর্শকের মনে সর্বাপেক্ষা অধিক কৌতূহল উদ্ভিক্ত করিয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় ময়ালের বৈজ্ঞানিক নাম “পাইথন মোলিউরস্”। ইহাদের সাধারণ নাম অজগর।

জীবতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন যে, পুরাকালের এক জাতীয় অতিকায় গোধা ময়ালদের পূর্বপুরুষ ছিল। ক্রম-বিবর্তনের ফলে বহু সহস্র বৎসরের পর ঐ সকল গোধা হইতেই বর্তমান কালের ময়ালেরা উদ্ভূত। এই যুক্তির সমর্থনার্থ তাঁহারা ময়ালদের দেহের পশ্চাদ্ভাগে নখরের মত দুইটি ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ডকে নির্দেশ করিয়া বলেন যে, ঐ অস্থি দুইটিই উহাদের পশ্চাতের লুপ্ত চরণের শেষ নিদর্শন। চরণের কার্য লুপ্ত হওয়ায় এখন ঐ অস্থি ভিন্ন কর্মে নিয়োজিত হইয়া থাকে। সামুদ্রিক পেঙ্গুইন পক্ষীর ক্ষুদ্র পক্ষাংশ দুইটি যেমন এক্ষণে উড্ডয়নের শক্তি হারাইয়া সম্ভরণে উহাদিগকে সহায়তা করিয়া থাকে, ময়ালদের বিলুপ্ত চরণের এই ক্ষুদ্র অস্থি দুইটিও এক্ষণে বৃক্ষাদিতে দোহলায়মান থাকিবার নিমিত্তই উহাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকে। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় যাহারা ময়াল পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাঁহারা বোধ হয় অনেক সময়েই ইহাকে শাখা বা উপরকার তক্তা হইতে বিলম্বিত থাকিতে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

এশিয়া ও আফ্রিকার বনজঙ্গল ময়াল সর্পের বাসস্থান। জঙ্গলের যে-সকল স্থানে জলাশয় থাকে ইহারা তাহারই সন্নিহিত অবস্থান করিতে ভালবাসে এবং শিকারের আশায় জলোপরি বিলম্বিত শাখায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। অষ্ট্রেলিয়ায় যে-সকল ময়াল দেখিতে পাওয়া যায় তাহার পূর্বোক্ত দুই মহাদেশের ময়াল অপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষীয় ময়ালদের নাম পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সুন্দর-বন, হিমালয়ের দক্ষিণে টেরাই জঙ্গল, আসামের নিবিড় অরণ্য, মধ্যভারত, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি স্থানের বনজঙ্গলে বহু ময়াল দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যের অরণ্যের মধ্যে ময়ালদের গমনপথে বহু ‘দাগ’ পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। আলিপুর চিড়িয়াখানায় অধুনা যে বৃহৎ ময়ালটি রক্ষিত হইয়াছে তাহা আসামের জঙ্গল হইতে ধৃত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষ ব্যতীত সিংহল-দ্বীপেও ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ময়াল অপেক্ষা ব্রহ্মদেশ, শাম, ইন্দোচীন ও মালয়-দ্বীপপুঞ্জের ময়ালেরা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হইয়া থাকে। শেষোক্ত স্থানের ময়ালের নাম “পাইথন রেটিকিউলেটস্”। এই ময়ালেরা ত্রিশ ফুট অবধি দীর্ঘ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় ময়ালকে সাধারণতঃ বিশ ফুট অবধি দীর্ঘ হইতে দেখা যায়। আফ্রিকার ময়ালেরা সাধারণতঃ বার হইতে পনের ফুট অবধি দীর্ঘ। সর্পবিদেরা ময়ালকে প্রধানতঃ নয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এই সকল



ময়ালসর্পী প্রসূত অণ্ডকে দেহবেষ্টনের মধ্যে রক্ষা করিয়া অঙ্গতাপ প্রয়োগ করিতেছে
মুকবধির শ্রীমদীনন্দনাথ পাল কর্তৃক অঙ্কিত

শ্রেণীর মধ্যে পূর্বোক্ত “পাইথন রেটিকিউলেটস্” সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং অষ্ট্রেলিয়ার ময়ালরাই আকারে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। আফ্রিকার পশ্চিম অংশ অপেক্ষা পূর্ব-আফ্রিকায় ইহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক।

ময়ালের প্রকৃতি আমেরিকার “বোয়া কন্ট্রিকটর”দের মত শাস্ত নহে। ইহাদের প্রকৃতি অনেকটা উগ্র ভাবের। ইহাদের যে বিষদন্ত নাই তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। ইহাদের মুখের মধ্যে উপর-চোয়ালে দুই সারি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দন্ত ও নিম্ন-চোয়ালে এক সারি দন্ত থাকিতে দেখা যায়। এই সকল দন্ত মুখের ভিতর দিকে বাঁকান। ইহাদের দন্তের উপর কোন খাঁজকাটা থাকে না এবং দন্তগুলি আদৌ শূণ্যগর্ভ অর্থাৎ ফাঁপা নহে। বিষদন্ত না থাকিলেও এই “নিরেট” দন্তগুলির দংশনে বিষাক্ত ক্ষতের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

ময়ালের মেরুদণ্ড চারি শতের অধিক অস্থিখণ্ডে গ্রথিত। ইহাদের পুচ্ছ বা লেজের শক্তি এত অধিক যে উহাকে হস্তীর শুণ্ড বা বনমানুষের হস্তের সহিত

তুলনা করা যাইতে পারে। পুচ্ছান্তকে ইহারা যথেষ্ট ঘুরাইতে পারে। আমেরিকার বানরেরা যেমন লাঙ্গুলের দ্বারা ডালপালা জড়াইয়া ধরিয়া শাখায় বিলম্বিত থাকে ময়ালেরাও সেইরূপ পুচ্ছের শেষাংশ দ্বারা বৃক্ষের শাখা আকর্ষণ করিয়া ঝুলিয়া থাকে। কেবলমাত্র পুচ্ছের শেষাংশটি শাখায় সংলগ্ন করিয়া ইহারা বিরাট দেহটিকে দোহুল্যমান রাখিতে পারে।

ময়ালেরা গোস্কুরাদি সর্পের মত “হিস্ হিস্” শব্দ করিতে পারে। ভীত বা ক্রুদ্ধ হইলে ইহারা কতকটা বাতাস টানিয়া লয়। এই বায়ু নাসারন্ধ্র ও নিম্নোষ্ঠের ফাঁক দিয়া বেগে বাহির হইবার কালে এই প্রকার শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

অগ্ন্যান্ত সর্পের মত ইহারা নির্মোক (খোলস) ত্যাগ করে। সুস্থ থাকিলে ইহারা প্রতি ঋতুতে একবার মাত্র নির্মোক পরিত্যাগ করে। পশুশালায় রক্ষিত ময়ালকে প্রায়ই খণ্ড খণ্ড ভাবে নির্মোক ত্যাগ করিতে দেখা যায়।

নির্মোক সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত না হইলে সর্প অস্থূল হইয়া পড়ে। এই কারণে অনেক সময় ইহাদের দেহ ঈষদুষ্ণ জলে সিক্ত করিয়া এবং বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিয়া দেহসংলগ্ন নির্মোক উঠাইয়া দিতে হয়।

ইহাদের যৌনসম্মিলনের মধ্যে কোনও বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় না। শরৎকালেই ইহাদের যৌনসম্মিলন ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে। এই কালে ইহাদের অঙ্গ হইতে এক প্রকার অস্থূল গন্ধ নিঃসৃত হয়। এই গন্ধের দ্বারাই বোধ হয় ইহারা পরস্পরের নিকট আকৃষ্ট হয়। ইহাদের গর্ভধারণের কাল নিশ্চিত করিয়া বলা কঠিন। কয়েক মাস পূর্বে আলিপুর চিড়িয়াখানায় একটি ময়াল কতকগুলি অণ্ড প্রসব করিয়াছিল। এই ময়ালটি আসামের জঙ্গল হইতে ধৃত হইয়াছিল এবং পশুশালায় আসিবার পর উনচল্লিশটি অণ্ড প্রসব করিয়াছিল। এতগুলি অণ্ডের মধ্যে মাত্র উনিশটি অণ্ড হইতে চারি সপ্তাহ কাল পরে শাবক নির্গত হইয়াছিল। অবশিষ্ট অণ্ডগুলি নষ্ট হইয়া যায়। দক্ষিণ-আফ্রিকার একটি সর্পশালায় ময়াল সর্পকে প্রায়ই ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসেই অণ্ড প্রসব করিতে দেখা গিয়াছিল। অণ্ড হইতে শাবকগুলি সকল ক্ষেত্রে ঠিক এক সময়ে নির্গত হয় নাই। অনেক স্থলে শাবক নির্গত হইতে দুই হইতে তিন মাস অবধি সময় লাগিয়াছিল। লণ্ডন পশুশালায় একবার জুন মাসে আফ্রিকার ময়াল-মিথুনের যৌন-সম্মিলন সংঘটিত হইতে দেখা গিয়াছিল। পর বৎসর জানুয়ারী মাসে স্ত্রী-ময়াল প্রায় একশত অণ্ড প্রসব করিয়াছিল এবং এপ্রেল মাস অবধি সেই সকল অণ্ডের উপর অঙ্গতাপ প্রয়োগ করিয়াছিল। কিন্তু এত অধিক দিন অঙ্গতাপ প্রয়োগ করিবার পরেও অণ্ডগুলি পরিপুষ্ট হয় নাই।

আফ্রিকার জঙ্গলে ময়ালেরা ‘পিপীলিকাভুক’দের পরিত্যক্ত বিবরগুলি অণ্ড প্রসব করিবার জন্য খুঁজিয়া লয়। এতদ্ব্যতীত পাহাড়-পর্বতের গহ্বরে, বৃক্ষমূলের কোর্টরে, ঝোপের মধ্যে, ঝরা লতাপাতার স্তূপের তিতর, ইক্ষুক্ষেত্রে, নদীর ধারে, নলবনে ইহারা অণ্ড প্রসব করিয়া থাকে। অণ্ড হইতে যে-সকল শাবক নিষ্কাশিত হয় তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি আবার গোসাপ, বেঙ্গী, শূগাল ও বৃহৎ মূষিক দ্বারা ভক্ষিত হইয়া থাকে।

ইহাদের অণ্ডগুলি দেখিতে বেশ শুভ্র। এই অণ্ডের আবরণ সাধারণ অণ্ডাবরণের মত কঠিন নহে। ইহার আবরণ কোমল চর্মের মত ও কুঞ্চিত। আবরণ-স্বক এইরূপ হওয়ায় অণ্ডগুলির আকারও প্রায় চোপমান ভাবের হইয়া থাকে। পক্ষীদের অণ্ডের মত ইহাদের অণ্ডের মধ্যে কুস্থম ও অণ্ডালা পৃথকভাবে থাকিতে দেখা যায় না। ওজনে এক একটি অণ্ড ৫ আউন্স হইতে ৫½ আউন্স অবধি হইয়া থাকে।

ময়ালের আকার অনুসারে অণ্ডের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এগার ফুট দীর্ঘ স্ত্রী-ময়ালকে তেইশটি অণ্ড প্রসব করিতে দেখা গিয়াছে এবং তের ফুট দীর্ঘ সর্পী আটত্রিশটি অণ্ড, পনের ফুট দীর্ঘ সর্পী একাশ্রটি হইতে বাষট্টিটি অণ্ড, ষোল ফুট দীর্ঘ সর্পী সাতাশটি এবং সতের ফুট দীর্ঘ সর্পী উনষাটটি অণ্ড প্রসব করিয়াছে।

এই সকল অণ্ডের রক্ষণ ও পরিপালনে স্ত্রী-ময়ালের মধ্যে কতকটা অপত্যস্নেহের আভাস পাওয়া যায়। অণ্ড প্রসব করিবার পর স্ত্রী-ময়াল উহাদিগকে বেষ্টন করিয়া পড়িয়া থাকে। এই সময় ইহাদিগকে আহাৰাদি করিতেও দেখা যায় না। অণ্ড হইতে শাবক নির্গত না-হওয়া অবধি ইহার অণ্ডগুলিকে বেষ্টন করিয়া পড়িয়া থাকে। রক্তের বিশেষ তাপ না থাকিলেও অণ্ড-বেষ্টনের কালে স্ত্রী-ময়ালের অঙ্গের তাপ ৯০ হইতে ৯৬ ডিগ্রি অবধি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অণ্ড হইতে শাবক নির্গত হইলেই ইহাদের রক্তের এই তাপ তিরোহিত হইয়া থাকে। সর্পীর দেহের এই স্বল্পবর্দ্ধিত তাপেই অণ্ডমধ্যস্থ ভ্রূণের পরিপুষ্টি হইয়া থাকে। অনেক সময়ে আবার ইহাদিগকে অণ্ড বেষ্টন করিয়া অঙ্গতাপ প্রয়োগ করিতে বা অণ্ডরক্ষণ বিষয়ে বিশেষ যত্ন লইতে দেখা যায় না। অণ্ড হইতে শাবক নির্গত হইলে ইহারা তাহাদের পালনে আর কোনও যত্ন লয় না। এ-বিষয়ে এদেশের ভীষণ শঙ্খচূড় সর্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই শঙ্খচূড় যে কিরূপ ভয়ঙ্কর বিষধর তাহা অনেকেরই জানা আছে। ইহারা দৈর্ঘ্যে প্রায় দশ-বারো ফুট পর্যন্ত হইয়া থাকে এবং সকল প্রকার সর্প ধরিয়া আহাৰ করে। বর্তমানে আলিপুর পশুশালায় দুইটি বৃহৎ শঙ্খচূড় রক্ষিত হইয়াছে। অণ্ড-সংরক্ষণে ইহারা অপত্যস্নেহের বিশেষ পরিচয় প্রদান করে। বনের মধ্যে

অগভীর গর্ভে তৃণাদির উপর ইহারা অণু প্রসব করে। প্রসবের পর স্ত্রী-শঙ্খচূড় অণুগুলিকে বেঁটন করিয়া অবস্থান করে। অল্পতাপ প্রয়োগ করা অপেক্ষা অণুগুলিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই সর্পী উহাদিগকে বেঁটন করিয়া থাকে। এই কালে উহারা কোনও প্রকার আহারও গ্রহণ করে না। এ-সময়ে উহাদের নিকট গমন করা বিশেষ বিপজ্জনক। পদশব্দ শুনিতে পাইলেই ইহারা একে-বারে ক্ষিপ্তভাবে আক্রমণ করে। এক-বার এক ব্যক্তি বনের মধ্য দিয়া গমন করিতে করিতে ভ্রমবশতঃ একটি শঙ্খ-চূড়ের নীড়ে পদক্ষেপ করে। ঐ বিবরে এক স্ত্রী-শঙ্খচূড় কতকগুলি অণুকে বেঁটন করিয়া পড়িয়া ছিল। পদক্ষেপ মাত্রই সর্পী ঐ ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয় এবং সে ব্যক্তি উর্দ্ধ্বাসে পলায়নপর হইলেও বহুদূর পর্য্যন্ত তাহার অমুসরণে বিরত হয় নাই। এমন কি পথিমধ্যে একটি নদীও সর্পী সম্ভরণে অতিক্রম করিয়াছিল। শেষে ঐ ব্যক্তি মস্তকের উষ্ণীষ সর্পীর সমক্ষে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলে তাহাকেই শত্রু বিবেচনা করিয়া স্ত্রী-শঙ্খচূড় বারংবার দংশন করিতে থাকে এবং এই উপায়ে শেষে পথিক তাহার আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পলায়ন করে। আমেরিকার কুম্বুমি সর্পের মধ্যেও অপত্যস্নেহের কথকিং আভাস পাওয়া যায়। ভয়ের কারণ দেখিলেই এই জাতীয় সর্পীরা মুখব্যাদান করে এবং ভীত শাবকেরা ছুটিয়া মাতার মুখবিবরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আশ্রয় লয়। ভয় অপনোদিত হইলেই সর্পীর গলনলী ও মুখগহ্বরের মধ্য হইতে শাবকেরা পুনরায় নিজ্জাস্ত হয়।

সাধারণ সর্পের যাহা আহার ময়ালেরাও তাহাই উদরস্থ করিয়া থাকে। তবে আহারাঙ্গি সম্বন্ধে সাধারণ সর্পের গায় ইহাদেরও একটি বিশেষ রুচি লক্ষিত হইয়া থাকে। খাঁচার মধ্যে ধূসর, কৃষ্ণ, শ্বেত, পীত, শ্বেত ও কৃষ্ণ বা শ্বেত ও পীত বর্ণের শশক, গিনিপিগ প্রভৃতি ছাড়িয়া দিলে ইহারা কেবলমাত্র ধূসর বর্ণের শশকাদি ধরিয়া ভক্ষণ করে। শ্বেত প্রভৃতি বর্ণের শশকাদি ধরিতে আগ্রহ প্রকাশ করে না। খাঁচার মধ্যে

শ্বেত এবং ধূসর বর্ণের ইন্দুর ফেলিয়া দিলেও ইহারা শ্বেত বর্ণের ইন্দুর না ধরিয়া ধূসর বর্ণের ইন্দুরকেই উদরস্থ করে। হংস ও মোরগাদির বিষয়েও ইহারা এবস্ত্রকার রুচির আভাস দিয়া থাকে। পিঞ্জরের মধ্যে যে-সকল হংস ও মোরগের



সত্যপ্রসূত ময়ালশাবক বাম দিকের অণু হইতে নির্গত হইয়া বিশ্রাম লইতেছে। দক্ষিণ দিকের অণুর মধ্যস্থিত ময়ালশিশু এখনও বাহির হইবার মত পরিপুষ্ট হয় নাই।
মুকর্ষধর শ্রীমণীন্দ্রনাথ পাল কর্তৃক অঙ্কিত

বর্ণ বণ্ড তিত্তির এবং বণ্ড হংসের গায় ধূসর বা কটাবর্ণের, ময়ালেরা তাহাদিগকেই ধরিয়া ভক্ষণ করে। রঙীন ও উজ্জ্বল বর্ণের শিখাপতত্র-শোভিত হংস ও মোরগ পিঞ্জরে পড়িয়া থাকে। ইহাতেই বোধ হয় সর্পেরা বর্ণের দ্বারাই আহার নির্বাচন করিয়া লয়। আত্মসংরক্ষণের নিমিত্ত বণ্ড শশকাদির বর্ণ প্রায়ই ধূসর বা পাটল বর্ণের হইয়া থাকে। অরণ্যে এই প্রকার জীবকে ধৃত-করণে অভ্যস্ত থাকায় ময়ালেরা বন্দী অবস্থাতেও সে স্বভাব পরিবর্তন করিতে পারে না। এই কারণেই ইহারা বহু বর্ণের বা উজ্জ্বল বর্ণের প্রাণীকে ধরিতে বিমুখ হইয়া থাকে।

জঙ্গল হইতে ধরিয়া আনিবার পর ময়ালেরা প্রায়ই কিছুকাল কোনও প্রকার আহার গ্রহণ করিতে চাহে না। এই কারণে অনেক সময় ইহাদিগকে লইয়া বিব্রত হইতে হয়। ধৃত হইবার পর ইহারা কখন-কখন কয়েক মাস অবধি অনাহারে পড়িয়া থাকে। একটি ময়াল তিন বৎসর অবধি অনশনে থাকিয়া মরিয়া গিয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সময়ে ইহাদের ঘরের মধ্যে শশক, ইন্দুর, মোরগ প্রভৃতি দিলেও ইহারা উহাদিগকে ভক্ষণ করিতে চাহে না। এই কারণে অনেক সময়ে ইহাদিগকে কৃত্রিম উপায়ে আহার করান আবশ্যিক হইয়া পড়ে। দীর্ঘকাল

উপবাসী থাকিলে লৌহশলাকায় গোমাংসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড বিচ্ছ করিয়া ইহাদের গলার মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে হয়। এক পক্ষ অন্তর পাঁচ সের মাংস প্রত্যেক ময়ালকে আহার করান আবশ্যিক হইয়া থাকে। শলাকার সাহায্যে খাওয়ানর পর গলদেশের নিম্নে মুছ হস্ত চালনার দ্বারা আহারকে পাকস্থলীর দিকে নামাইয়া দিতে হয়। এরূপ উপায়ে ভক্ষণ করান সুবিধাজনক না হইলে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধে কুক্কটির অণু মিশ্রিত করিয়া এবং তাহা পিচকারীতে পূর্ণ করিয়া গলনলীর মধ্যে ঢালিয়া দিতে হয়। এরূপ আহারের পর ইহার প্রায়ই কৃত্রিম আহার বমন করিয়া ফেলে। এই জন্ত কৃত্রিম আহারের পরেই ইহাদের গলদেশ ও পাকস্থলীর নিম্ন ভাগ রজ্জু দ্বারা দ্বাদশ ঘণ্টা বাঁধিয়া রাখিতে হয়। কৃত্রিম উপায়ে আহার করাইয়া কিন্তু ইহাদিগকে অধিক দিন জীবিত রাখা যায় না। এই প্রকার আহারের ফলে আবার অনেক সময় ইহাদের পাকস্থলী হইতে উপযুক্ত পরিমাণে পাচক রস নিঃসৃত হয় না এবং সেই কারণে আহারও পরিপাক-প্রাপ্ত না হইয়া পচিতে থাকে এবং ইহার ফলে শেষে ইহাদের প্রাণবিয়োগ ঘটিয়া থাকে।

কখনও কখনও কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস উপবাসী থাকিবার পর ধৃত ময়াল যেন সহসা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে এবং পিঞ্জরস্থ মুষিক বা শশককে ধৃত করিয়া অনশনব্রত ভঙ্গ করে। এইরূপে একবার ব্রতের উদ্ঘাপন ঘটিলে ইহারা আর উপবাস করে না।

ময়ালদের পিঞ্জরে সময় সময় আবার বিপরীত ব্যাপার সংঘটিত হইতে দেখা যায়। অনেক সময় ইহারা আবার ইন্দুরের দংশনে জীবলীলা সংবরণ করিয়া থাকে। দক্ষিণ-আফ্রিকার অন্তর্গত নেটাল শহরের জীবনিবাসে সতের ফুট লম্বা ময়ালের ঘরে একটি বৃহৎ ইন্দুরকে সর্পের আহারার্থ ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিন সপ্তাহ কাল পিঞ্জরের মধ্যে থাকিলেও ময়াল ইন্দুরটিকে উদরস্থ করে নাই, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে মুষিকটি ময়ালের পৃষ্ঠের ৯ ইঞ্চি পরিমাণ মাংস ছিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিয়াছিল। আর এক সময় একটি বারো ফুট লম্বা ময়ালের ঘরে বারোটি ইন্দুর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইন্দুরগুলি অজগরকে উহাদের ভক্ষক বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া উহার দেহ হইতে মাংস ছিন্ন

করিয়া ভক্ষণ করিয়াছিল এবং ইহার ফলে ময়ালটি দুই দিনের মধ্যেই মরিয়া গিয়াছিল। ইন্দুরেরা ঐ ময়ালটির দেহের মাংস ছিন্ন করিয়া উনসত্তরটি ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছিল। দেহে এতগুলি ক্ষত হইলেও ময়াল স্থিরভাবে থাকিয়াই মরিয়া গিয়াছিল। ইহাতে বোধ হয় ময়ালদের বেদনা অনুভব করিবার শক্তিটা কিছু কম।

ইহাদের আহার সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত অলীক কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। তজ্জন্ত ইহাদের আহার বিষয়ে কিছু বিবৃত করা আবশ্যিক। ইহারা শশক, গিনিপিগ, কুকুর, বানর, চাগ, ক্ষুদ্র যুগ, বন্য বিড়াল, শৃগাল, বন্য কুক্কট ও হংসাদি ভক্ষণ করে। ইহাপেক্ষা বৃহদাকারের জন্তকে ভক্ষণ করিতে গেলেই শেষে ইহাদের প্রাণবিয়োগ ঘটিয়া থাকে। কয়েক বৎসর পূর্বে দক্ষিণ-আফ্রিকায় একটি ময়াল এক শূকরকে উদরস্থ করিয়া এবং ব্রহ্মদেশের জঙ্গলে একটি ময়াল বৃহৎ শৃঙ্গযুক্ত এক হরিণকে ভক্ষণ করিতে গিয়া মরিয়া গিয়াছিল। বৃহৎ জীবজন্তু হইতে এবং বিধ বিপদ ঘটিলেও ময়ালেরা স্বেযোগ পাইলে দেহবেষ্টনে ইহাদিগকে আকর্ষণ করিতে পরাশ্রয় হয় না। আফ্রিকার জঙ্গলে এক সময় একটি ময়াল এক জেব্রাকে ধরিয়া পিষ্ট করিয়া দিয়াছিল।

শিকারকে মুখে ধরিয়াই নিজের দেহ দ্বারা ময়ালেরা উহার শরীরের চারিদিকে বেষ্টন করিতে থাকে। ইহাদের বেষ্টনের আকর্ষণে শেষে ধৃত প্রাণী খাসরুদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে। এরূপ ক্ষিপ্ততার সহিত ইহারা শিকারকে ধরিয়া দেহের বেষ্টনে আকর্ষণ করে যে, শিকারকে ধরিবার রীতি এবং আকর্ষণের প্রণালী লক্ষ্য করাই কঠিন হইয়া উঠে। শিকার ধরিবার উদ্দেশে ইহারা যে জলাশয়ের তীরে বৃক্ষ-শাখায় স্থির ভাবে বিলম্বিত থাকে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। জীবজন্তু তৃষ্ণার্ত হইয়া জলপান করিতে আসিলে ইহারা অতি ধীরে এবং বিশেষ সন্তর্পণে নামিয়া উহাদিগকে ধরিয়া ফেলে। ইহাদের ধৈর্য্যও অসাধারণ। শিকার ধরিবার নিমিত্ত ইহারা এত অধিকক্ষণ এরূপ স্থিরভাবে অবস্থান করে যে, জীবজন্তুরা ইহাদের উপস্থিতি আদৌ অনুভব করিতে পারে না। গিনি-পিগ, শশক, বন্য কুক্কট প্রভৃতি ধরিয়া ইহারা দেহের একটি পাকে উহাকে বধ করে। হরিণ প্রভৃতি ধরিলে পাঁচ-ছয়টি বেষ্টনে তাহাকে বধ করে। ইহাদের আকর্ষণ এরূপ ভীষণ

যে, ইহার ফলে খুত প্রাণীর দেহের সমস্ত মাংসপেশী এবং অস্থি পর্যন্ত পিষিয়া যায়। একটি বৃহৎ ময়াল একজন পূর্ণ-বয়স্ক শক্তিশালী পুরুষকে দেহবেষ্টনে আকর্ষণ করিয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পিণ্ডবৎ করিয়া দিতে পারে। তখন তাহার দেহে কোনও অস্থি আছে বলিয়া আর বোধ হয় না। হরিণকে ধরিয়া ইহারা বিশ মিনিট হইতে অর্ধঘণ্টা অবধি

একটি পা বাহির হইয়া থাকায় চিতা ঐ পদের নখর দ্বারা সর্পের দেহ চিরিয়া দেয়। সর্প চিতার দেহের উপর আর এক বেষ্টন দিবার উদ্দেশ্যে মস্তক উত্তোলিত করিতেই ব্যাঘ্র তাহার গলদেশ দংশন করিয়া তাহাকে বধ করিয়া ফেলিয়াছিল। সর্পকে বধ করিলেও পশ্চাৎগ একেবারে পিষ্ট হইয়া যাওয়ায় ব্যাঘ্রও পরে মরিয়া গিয়াছিল।



আমেরিকার ময়াল “বোয়া কনট্রিক্টর” বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতেছে

দেহবেষ্টনে আকৃষ্ট করিয়া রাখে। দক্ষিণ-আফ্রিকার জঙ্গলে এক সময় একটি ময়াল একটি ছোট হরিণকে ধরিয়াছিল। প্রায় বিশ মিনিট আকর্ষণ করিবার পর ময়াল মস্তক উত্তোলন করিয়া চতুর্দিক পর্যবেক্ষণ করিয়া লইল। পর্যবেক্ষণের পর হরিণের মুণ্ড হইতে গলাধঃকরণ করিতে আরম্ভ করিয়া দেড় ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত হরিণটিকে উদরস্থ করিয়াছিল। ইহার পরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বনের মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছিল। শৃঙ্গযুক্ত হরিণকে উদরস্থ করিলে ইহাদের পঞ্জর ভেদ করিয়া শৃঙ্গ বাহির হইয়া পড়ে। একবার একটি ময়ালের উদর হইতে একটি অর্ধজীর্ণ হরিণের দুই ইঞ্চি শৃঙ্গ বাহির হইয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল। শেষে অবশ্য ময়ালের উদরের ক্ষত শুকাইয়া গিয়াছিল। আফ্রিকাবাসী অসভ্যেরা শুধু যে ময়ালের মাংস ভক্ষণ করে তাহা নহে, উহাদের উদর হইতে হরিণাদি বাহির করিয়াও তাহা উদরস্থ করিয়া থাকে।

শিকার করিতে গিয়া অনেক সময় আবার ময়ালকেও বিপন্ন হইতে হয়। একবার একটি ময়াল বনের মধ্যে এক চিতাবাঘকে দেখিতে পাইয়া ধরিয়া ফেলে এবং ব্যাঘ্রের পশ্চাৎগ নিজ দেহবেষ্টনে পিষ্ট করিতে থাকে। সম্মুখের

দক্ষিণ-আফ্রিকার পোর্ট এলিজাবেথ মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ ফিট্জ্ সাইমন সাহেবকে একবার সর্পশালায় রক্ষিত একটি ময়াল অত্যন্ত ভাবে আক্রমণ করে ও পুচ্ছপাশে তাঁহার দেহকে বেষ্টিত করিয়া ফেলে। বলপ্রয়োগে সর্পের বেষ্টন হইতে মুক্তিলাভ অসম্ভব বুঝিয়া তিনি সর্পের গলদেশে সজোরে দংশন করেন এবং ছুরিকা দ্বারা উহার মস্তক কর্তিত করিয়া নিজেকে সর্প-কবল হইতে উদ্ধার করেন।

দক্ষিণ ব্রহ্মদেশের খেটন গ্রামে গত বৎসর একটি উনত্রিশ ফুট দীর্ঘ ময়াল মং চিট্ খাইন নামক একটি বর্মী যুবাকে উদরস্থ করিয়াছিল। মং চিট্ খাইন কতকগুলি সঙ্গীর সহিত ঐ গ্রামের জঙ্গলে পক্ষী শিকার করিতে গিয়াছিল। সঙ্গীরা শিকার তাড়না করিয়া আনিবার উদ্দেশ্যে চারিদিকে প্রস্থান করিলে মং চিট্ একটি প্রকাণ্ড ছায়াবহুল মহীরুহের তলে শিকার ধরিবার উদ্দেশ্যে লুকাইয়া থাকে। ঐ বৃক্ষের সন্নিকটে একটি বৃহৎ ময়াল লুকাইয়া ছিল। মং চিট্কে দেখিতে পাইয়া ময়াল পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করে এবং চরণ হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে তাহার সমস্ত দেহ উদরস্থ করিয়া ফেলে। সঙ্গীরা প্রত্যাগত হইয়া মং চিট্‌র বন্দুক, লুঙ্গী ও পাছকা মাত্র পড়িয়া থাকিতে

দেখিয়া বিশেষ সন্নিহ্ন হইয়া পড়ে এবং অহুস্কানের পর বৃক্ষতলে ঘনছায়ার মধ্যে উনত্রিশ ফুট দীর্ঘ ঐ ময়ালকে পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পায়। ময়ালের তখন আর নড়িবার শক্তি ছিল না। তাহারা ময়ালকে বন্ধকের গুলিতে বধ করিয়া এবং গো-শকটে তাহার দেহ বহন করিয়া খেটনের হাসপাতালে লইয়া গিয়াছিল। ঐ স্থানে পরীক্ষার পর ময়ালের উদরমধ্যে মং চিটের যুতদেহ থাকিতে দেখা গিয়াছিল।

ময়ালেরা অনেক সময় কার্যগতিকে স্বভাটিকেও উদরস্থ করিয়া থাকে। লণ্ডন চিড়িয়াখানার সর্পগৃহে একটি কক্ষের মধ্যে



আক্রমণোত্ত “বোয়া কনট্রিক্টর”

দুইটি ময়ালকে রাখা হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একটি ময়াল নয় ফুট এবং অপরটি আঠার-উনিশ ফুট দীর্ঘ ছিল। দুইটি ময়ালই একদিন একটি শশককে উদরস্থ করিবার জন্য একই সময়ে ধরিয়া ফেলে। কিন্তু বৃহৎ ময়ালটির আকর্ষণের শক্তির আধিক্য বশতঃ ক্ষুদ্র ময়াল শিকারের সহিত ধীরে ধীরে বৃহৎ ময়ালের উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। প্রায় আটশ দিন স্থিরভাবে পড়িয়া থাকার পর বৃহৎ ময়ালটি পুনরায় আহার গ্রহণ করিয়াছিল। দুইটি ময়াল একই সময়ে একই শিকার ধরিয়া উদরস্থ করিতে গেলে উহাদের মধ্যে ক্ষুদ্রতর ময়ালের ভাগ্যে অনেক সময় এই অবস্থাই ঘটিয়া থাকে।

পূর্বোক্ত ফিট্জ সাইমন সাহেব ও মং চিট্ট খাইনের

ঘটনা ব্যতীত আরও দুইটি ঘটনায় ময়াল মানুষকে আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া জানিতে পারা যায়। হায়দ্রাবাদ-রাজ্যে পনের বৎসর বয়স্ক একটি বালক ময়ালকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া মারা গিয়াছিল। এই বালকটি কতকগুলি সঙ্গীর সহিত বনের ধারে খেলিতেছিল। খেলার সময়ে বনের মধ্যে লুকাইতে যাওয়ায় একটি পনের ফুট দীর্ঘ ময়াল বালকটিকে সহসা আক্রমণ করে এবং পুচ্ছদ্বারা দেহ আকর্ষণ করিয়া উহাকে বধ করিয়া ফেলে। আর এক সময় এক জন কাক্রি ময়াল-শিকারের কালে এক প্রকাণ্ড ময়ালকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিহত হইয়াছিল।

আফ্রিকায় ময়াল-শিকারের কতকগুলি পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ দেশের অসভ্য অধিবাসীরা সাধারণতঃ নিদ্রিত ময়ালের উপর জাল ফেলিয়া উহাকে ধরিয়া থাকে। কখনও কখনও কয়েকখানি কবল লইয়া কাক্রিরা ময়াল ধরিতে অগ্রসর হয়। ময়াল উত্তেজিত হইয়া দংশন করিতে আসিলেই উহারা কবলখানি সর্পের মুখের সম্মুখে উপস্থিত করে। ক্রুদ্ধ ময়াল কবলকে আততায়ী বোধে দংশন করিলে উহার তিন সারি বক্র দস্ত কবলে বিঁধিয়া যায়। তখন শিকারীরা অপর কবলগুলি দ্বারা উহার মস্তক চাপিয়া ধরে এবং সর্পের গলায় ফাঁস টানিয়া উহাকে বন্দী করিয়া আনে। আহারের পর ময়ালেরা দীর্ঘকাল অলসভাবে নিদ্রা যায়। এই সুযোগেও ইহাদিগকে সহজে ধৃত করা হইয়া থাকে।

ময়ালেরা অল্প বিষাক্ত সর্পের দংশনজনিত বিষ আশ্চর্য্য ভাবে প্রতিরোধ করিতে পারে। আফ্রিকার পফ-ম্যাডার (Puff-adder) অতি ভয়ঙ্কর বিষধর। দক্ষিণ-আফ্রিকার “বুশম্যান”রা এই সর্পের বিষ তীরে মাখাইয়া শত্রু সংহার করিয়া থাকে। এই তীক্ষ্ণ বিষধর প্রায় মানুষের হস্তের মত স্থূল ও চার-পাঁচ ফুট দীর্ঘ হয়। ইহাদের দংশন ময়ালেরা অনায়াসে সহ্য করিতে পারে। সন্ন্যাসপাগারে রক্ষিত একটি ময়ালের দেহে পফ-ম্যাডার দ্বারা পর-পর পঁচিশ বার দংশন করান হইয়াছিল। প্রত্যেক বার দংশনের পর দষ্ট স্থান ক্ষীত হইয়া ফোটকের মত হইয়াছিল। অস্ত্রোপচারের পর ঐ ফোটকগুলি আরোগ্য হইয়া গিয়াছিল। ঘ্যাডারের বিষে ময়ালের দেহে আর কোনও ক্ষতি হইতে দেখা যায় নাই।

ময়ালের দ্বারা বোধ হয় মানুষের অনেক উপকার সাধিত হইয়া থাকে। দক্ষিণ-আফ্রিকার ইক্ষুক্ষেত্রে প্রায়ই ময়াল সর্প দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ক্ষেত্রে বৃহদাকারের এক জাতীয় ইন্দুর বাস করে। ইহারা ইক্ষুচ্ছেদন করিয়া ক্ষেত্রের সর্বনাশ করিয়া থাকে। ইক্ষুভক্ষণে ইহাদের বংশাবলীও অতি শীঘ্র বর্ধিত হইয়া থাকে। ময়ালেরা এই জাতীয় ইন্দুর ভক্ষণ করিতে অত্যন্ত ভালবাসে এবং শিকারের নিমিত্ত সন্ধ্যাপনে ক্ষেত্রমধ্যে আসিয়া লুকাইয়া থাকে। সেগানকার কৃষকেরা ময়ালের এই স্বভাবের বিষয় অবগত থাকায় ক্ষেত্রে অবস্থিত ময়ালকে কখনও বধ করে না, বরং ক্ষেত্রমধ্যে ইহাদিগকে দেখিতে পাইলে আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে। ময়ালশাবকও বহু মূষিক উদরস্থ করিয়া থাকে। এই প্রকারে বহু ইন্দুর নাশ করিয়া ময়ালেরা শুধু যে কৃষকের উপকার করে তাহা নহে, ইন্দুর দ্বারা প্লেগ-বিস্তারের ভয় বিদূরিত করিয়া মানবসমাজের কল্যাণসাধন করিয়া থাকে।

শৃগালেরাও ইক্ষুক্ষেত্রের অল্প ক্ষতি করে না। ময়ালেরা ইহাদিগকেও উদরস্থ করে। দক্ষিণ-আফ্রিকার বেচুয়ানা-ল্যাণ্ডের ক্ষেত্রমধ্যে নিহত একটি ময়ালের উদর বিদীর্ণ

করিয়া একটি বৃহৎ শৃগাল দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। ময়ালটি ক্ষেত্রমধ্যেই শৃগালটিকে উদরস্থ করিয়াছিল। এই সকল কারণে দক্ষিণ-আফ্রিকার কৃষকেরা ক্ষেত্রমধ্যে ময়ালের বাস মঙ্গলজনক বলিয়া মনে করে।

আফ্রিকার এক জাতীয় হরিণ (Duiker bucks) পালে-পালে আসিয়া পঙ্গপালের মত শাকসব্জী ও শস্তাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে। ময়ালেরা এই হরিণকে শিকার করিয়া কৃষকের প্রভূত উপকার করিয়া থাকে। ময়ালদের আহরের মধ্যে শতকরা ৯০টি জীব মানুষের কোনও প্রয়োজনে আসে না।

ময়ালদের জীবনীশক্তি অদ্ভুত। বৃহৎ ময়ালের মস্তক বা হৃৎপিণ্ড বন্দুকের গুলির দ্বারা ছিন্ন করিয়া দিলেও ইহারা তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায় না। এইরূপে আহত হইবার পরেও ইহারা বহুক্ষণ ছটফট করিয়া অদ্ভুত জীবনীশক্তির পরিচয় দিয়া থাকে। পশুশালায় ময়ালকে প্রায় পঁচিশ বৎসর অবধি জীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছে।

আফ্রিকার অসভ্য আদিম অধিবাসীরা ময়াল শিকার করিয়া ভক্ষণ করে, আবার অতি বৃহৎ ময়াল দেখিতে পাইলে তাহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজাও করিয়া থাকে। আমেরিকার “রেড ইণ্ডিয়ানরা” সে-দেশের অজগরকে দেবতাবোধে পূজা করে।

মহিলা-সংবাদ

কুমারী লইতা নজমুদ্দীন পঞ্জাব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিণী মহিলাগণের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি সর্বসমেত ৬৮৯ নম্বর পাইয়াছেন—তাঁহার পূর্বে আর কেহ এত নম্বর পান নাই। তাঁহার বয়স মাত্র চতুর্দশ বৎসর।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বাদশ-বার্ষিক উপাধি-বিতরণী সভায়, দিল্লীর সেন্ট ষ্টিফেন্স কলেজের ছাত্রী শ্রীমতী নীলিমা দত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোৎকৃষ্ট হিন্দু মহিলা-ছাত্রী বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় মাখনলাল স্বর্ণপদক পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।



কুমারী লুইতা নজমুদ্দীন



শ্রীমতী নীলিমা দত্ত

শিক্ষার্থ ছাত্রীদের বিদেশভ্রমণ—

চব্বিশটি ভারতীয় ছাত্রী বিদেশ-ভ্রমণ দ্বারা শিক্ষালাভের
নিমিত্ত সম্রাতি ইউরোপ যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাদের

এস. কে. দত্ত এই ছাত্রীগুলির সঙ্গে আভিভাবিকা হইয়া
গিয়াছেন। ছাত্রীরা বিদেশভ্রমণ দ্বারা অনেক অভিজ্ঞতা
সঞ্চয় ও শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন। যাহারা গিয়াছেন,



ইউরোপ-যাত্রী মহিলাবৃন্দ

কয়েক জনের ছবি দিতেছি। লাহোরের ফরমান ক্রিশ্চিয়ান তাঁহাদের মধ্যে কোন বাঙালী ছাত্রী আছেন বলিয়া আমরা
কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডক্টর এস. কে. দত্তের পত্নী, মিসেস অবগত নাই।

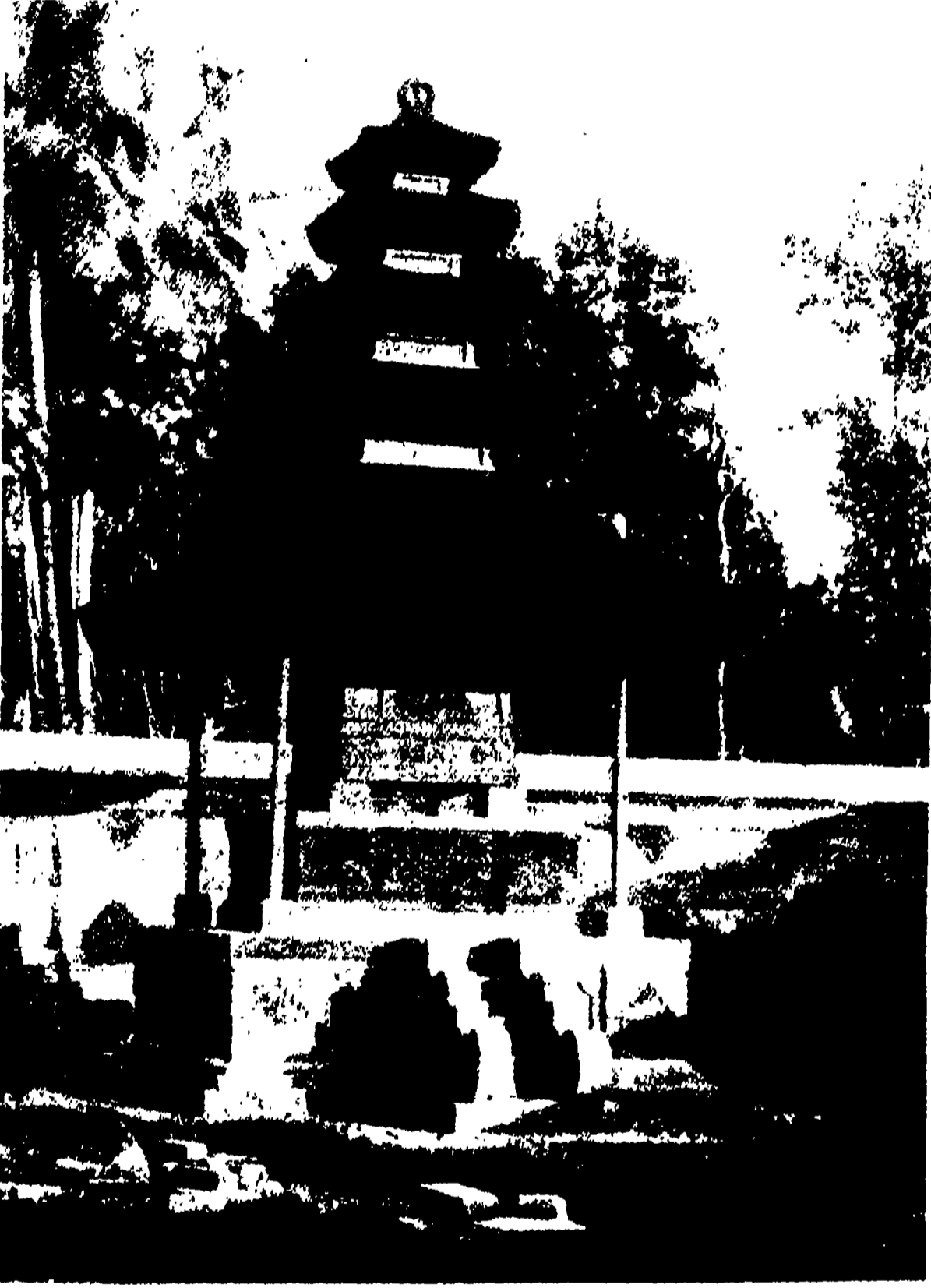
বলী-দ্বীপে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

শ্রীবিমলেন্দু কয়াল, এম-এ

অষ্ট্রােল দেশের ঝাম্ম বলী-দ্বীপেও ধনবান ব্যক্তিগণের মৃতদেহ শবাধারে (coffin) রক্ষিত করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। এই-সব শবাধারের তলদেশে ছিদ্র করা হয়। এই ছিদ্রপথে দেহ-নিঃসৃত যে তরল পদার্থ নির্গত হয় তাহা অধিকাংশ

দ্বারা কিংবা মাছুরে আবৃত করা হয়। রাক্ষসদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে মেঘনাদবধের নবম সর্গে মাইকেল লিখিয়াছেন :—

“নন্দাকিনী-পুত্র জলে ধুইয়া যতনে, শবে
সুকৌমিক বস্ত্র পরাই, খুইল দাহস্থানে রক্ষোবল।”



বলী-দ্বীপের নিগূঢ় পরমাখ্যভাবের প্রতীক—‘মেরু’ বা ‘সাঙ্কেতিক’ পর্বত

সময়েই চীনের কারুকার্যখচিত পুরাতন মৃৎপাত্রে কিংবা স্বর্ণ বা রৌপ্য পাত্রে পরিপূর্ণ করিয়া অবশেষে তাহা সাগরে নিক্ষিপ্ত অথবা ভূগর্ভে নিহিত করা হয়।

মৃতদেহ শবাধারে স্থাপন করিবার পূর্বে মৃত ব্যক্তির পরিবারপরিজনবর্গ সকলে মিলিয়া জলে চাউল-চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা শবদেহ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া দেয়। অতঃপর বিচিত্র স্নগন্ধ কুসুম চূর্ণীকৃত করিয়া মৃতদেহের সর্বাত্মক পুষ্পরেণুর অহুলেশন দেওয়া হইলে তাহা মূল্যবান বস্তাদি



মন্দির-সম্মুখে প্রার্থনারত বৌদ্ধ ভিক্ষুণী

মৃতদেহ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া বিচিত্র স্নগন্ধী তৈল ও পুষ্পমাল্য বিভূষিত করিয়া শবাধারে আবদ্ধ করিবার প্রথা খৃষ্টান সমাজেও বিদ্যমান আছে। কৌম্বিক বস্ত্রের পরিবর্তে তাঁহারা শ্বেতবস্ত্র ব্যবহার করেন। মুসলমানগণও সময়ে মৃতদেহ ধৌত করিয়া নানা গন্ধ-দ্রব্যের অহুলেশন দেয়; তৎপরে শ্বেতবস্ত্রে শবদেহ আবৃত করিয়া কবরস্থানে লইয়া যায়।

বলী-দ্বীপে সাধারণতঃ দেশীয় রাজগুবর্গের স্ত্রী-পুত্র কিংবা

অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ব্যক্তির মৃতদেহ অস্তুতঃ কয়েকদিনের মৃতব্যক্তির আত্মীয়স্বজন মধ্যে মধ্যে এখানে মৃতের উদ্দেশে জগুও সমাহিত করার প্রথা বিদ্যমান রহিয়াছে, এই জগু খাদ্য ও পুষ্পের অর্ঘ্য প্রদান করে।
অস্তুষ্টিক্রিমার অতি সরল প্রথার বিধি-ব্যবস্থা আছে; মৃতদেহ অসজ্জিত কবরের উভয় পার্শ্বেই সচরাচর এক হইতে



অস্তুষ্টিক্রিমার পূর্বদিনের জগু সজ্জিতা শোভাযাত্রাকারিণীগণ

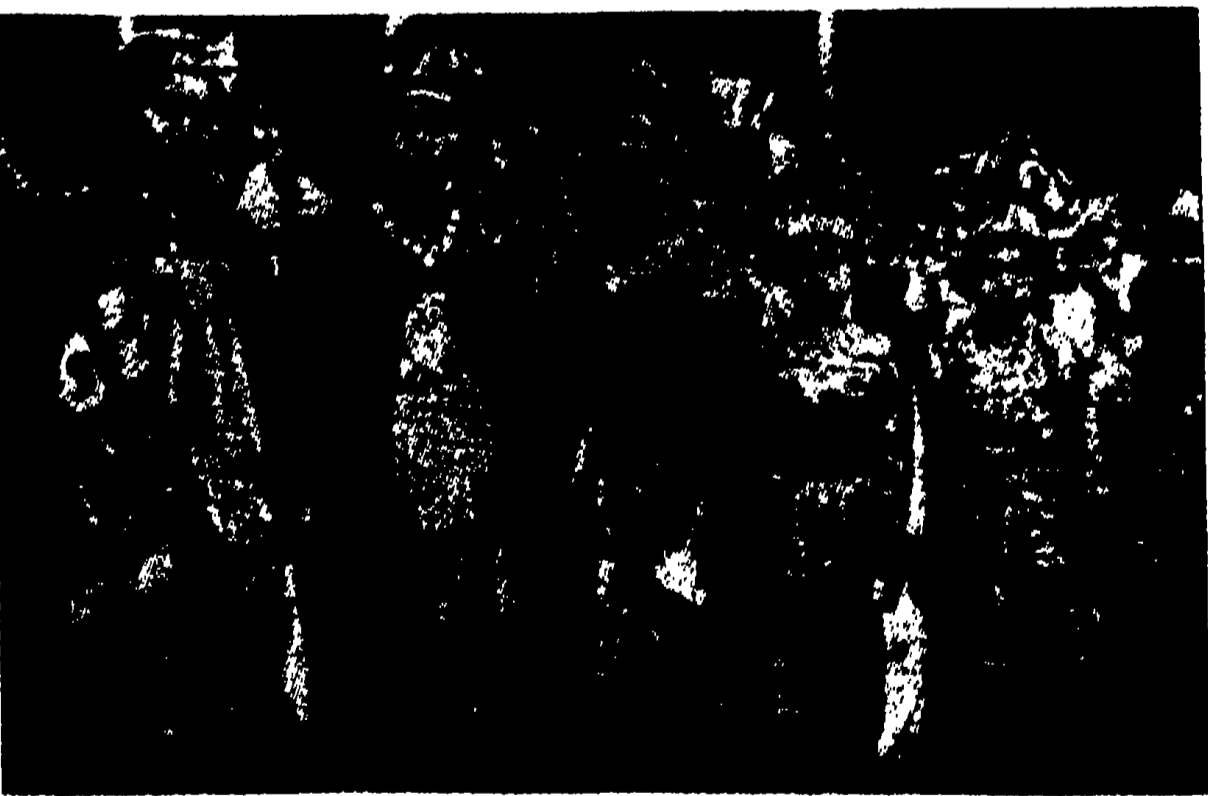
ধৌত করিবার পর পরিষ্কার খেতবস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া তিনটি করিয়া প্রায় ছয়টি বাঁশের নল প্রোথিত থাকে; শ্মশান-ক্ষেত্রে একহস্ত-পরিমিত গভীর কবরের মধ্যে সমাহিত এগুলি প্রায়ই কবরের গভীরতা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। করা হয়। কবরের শীর্ষদেশে মৃতের প্রতি পূজা-অর্ঘ্য প্রভৃতি জনপ্রবাদ যে, দেহ ও ভ্রমণশীল আত্মার মধ্যে চিরপরিচিতের শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য একটি অনতিউচ্চ স্তম্ভ নির্মিত হয়; অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র অপরিমিত রাখিবার জন্যই যেন



শোভাযাত্রাকারিণী মহিলাগণ অর্ঘ্য বহন করিয়া লইয়া বাইতেছেন

এই নলগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাহাতে জীবদেহ শীঘ্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায় তাহার জন্ত এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। এই বিষয়ে হ্লাণ্ডের আম্‌ষ্টারডাম শহর হইতে প্রকাশিত “নেডারল্যান্ডস্ ইণ্ডি অউড এন্ নিউ” (Nederlandsch Indie, Oud En Nieuw) পত্রে ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী সংখ্যায় এক বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

মৃতদেহ দাহ করিবার দিন স্থিরীকৃত হইলে সেই দিন হইতেই মঞ্চগৃহ নির্মাণের আয়োজন হইতে থাকে; একত্র তাঁবু খাটান এবং মৃতের উদ্দেশে বিচিত্র প্রথায় অর্ঘ্যাদি প্রস্তুতের ঘনঘটাও আরম্ভ হয়। সাধারণতঃ মৃত্যুদিবসের একুশ বা চল্লিশ দিন পরে দাহ করিবার দিন স্থিরীকৃত হইয়া থাকে—রাজ-পরিবারের কেহ পরলোকগমন করিলে সংকারের দিন স্থির করিতে সচরাচর কয়েক মাস, এমন-কি কয়েক বৎসরও অতীত হইয়া যায়। মৃতদেহ শ্মশানক্ষেত্রে লইয়া যাইবার জন্ত এই সুসজ্জিত মঞ্চ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দাহ করিবার দুই দিন পূর্বে মৃতদেহ কবরের মধ্য হইতে বাহির করিয়া পূর্বোক্ত

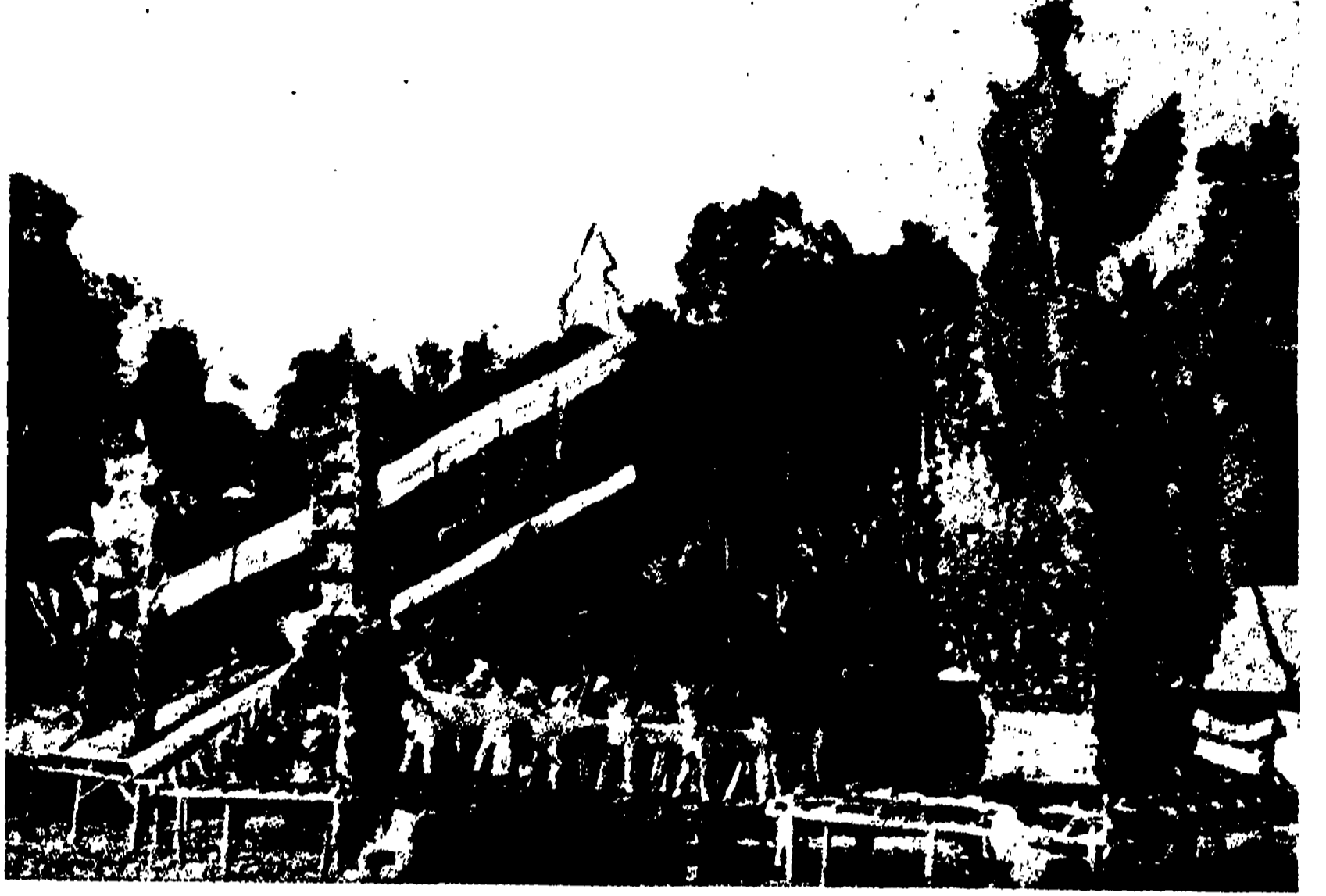


শবদেহবহনকারিগণ

পট্টাবাসে স্থানান্তরিত করা হয়; এই কারণে গ্রামপ্রান্তে তাঁবু সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। এই দুই দিনই মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর গৃহ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের কলরবে

মুখরিত হইয়া উঠে এবং সকলে সমবেত হইয়া নানা প্রকার আনন্দ-ভোজের আয়োজন করিয়া থাকে।

সংকারের পূর্বে অপরাহ্নে মৃতব্যক্তির পরিজনবর্গ, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণ মিলিয়া এক অপূর্বদৃশ্য শোভাযাত্রার



বেদী এবং জীব-জন্তুর আকারে নির্মিত শবাধার

সৃষ্টি করে। তৎপূর্বে তাহাদিগকে মৃতের পবিত্র স্মৃতিকে সম্মানিত করিবার জন্ত এক পুণ্যসলিলা পুষ্করিণীতে অবগাহন করিতে হয়। এই প্রকারের শোভাযাত্রার নাম ‘মেডিং’ (Medeeng) অর্থাৎ ‘ধীর এবং নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে সারিবদ্ধভাবে গমন করা’। বলী-দ্বীপের উত্তর সীমান্তে এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে।

একমাত্র অবিবাহিত যুবক-যুবতী এবং বিবাহিত পুরুষ মৃতদেহ বহন করিতে পারে; এই উৎসব-যজ্ঞে কোনও বিবাহিতা নারীর স্থান নাই। বহনকারিগণকে “ডিং” নামে অভিহিত করা হয়। তাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিবিধ অলঙ্কার ও সাজসজ্জায় বিভূষিত হইয়া অস্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সহায়তা করে; তখন তাহাদিগকে দেখিলে বোধ হয় যেন তাহারা রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা। মহিলাবৃন্দ অপেক্ষাকৃত মনোরম বেশভূষা ও নানা পুষ্প অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া শবাস্থগমন করে। এই প্রথা কাব্যবর্ণিত রাক্ষসদের অস্ত্যেষ্টিপ্রথার কথা স্মরণ করাইয়া দেয় :—

ললাটে সিঁদুর বিন্দু, গলে ফুলমালা,
কঙ্কন মৃগাল ভুঞ্জে...

* * *

প্রফুল্ল কুমারদাস কবিতাপ্রদেণে ।

ধীর ও গভীর পদবিক্ষেপে শব্দেহবহনকারিগণ
বিস্তৃত রাজবস্ত্রে উপনীত হয়, তাহাদের পশ্চাতে অর্ঘ্য-
বহনকারিগণ, অতিথিবৃন্দ ও বাদকদল শব্দস্বরন করে।



গরীব দগের জন্তু নির্মিত শবাধার

গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ এইস্থলে সম্মিলিত হয়। তাহারা বিবিধ
সুসজ্জিত পোষাক-পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া রাজপথের
উভয় পার্শ্বে শোভাযাত্রার অপেক্ষা করিতে থাকে।
কোলাহলমুগ্ধিত জনতার মধ্য দিয়া নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্রের
শব্দে প্রতিধ্বনিত রাজবস্ত্রে শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে অগ্রসর
হইতে থাকে।

প্রাচীন সিংহলের অস্তোষ্টিক্রিয়ার অবতারণাপ্রসঙ্গে
মহাকবি মধুসূদন যে-দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছেন সেই
বিষয়ে লঙ্কাদ্বীপের বহু যোজন দূরবর্তী ভারত-মহাসাগরের
পূর্বপ্রান্তে বহু স্মৃতিবিজড়িত দীপপুঞ্জের কোন অখ্যাত
বিবরণের দ্বারা তাঁহার বোধ হয় অনুপ্রাণিত হওয়া মোটেই
অস্বাভাবিক ও আশ্চর্য্য নহে; তিনিও লিখিয়াছেন—

বাজে ঢাক, বাজে ঢোল কাড়া কড়-কড়ে
বাজে করতাল, বাজে মৃদঙ্গ, তুখকী;
বাজিছে ঝাঁঝরি শব্দ।

মাইকেলের বিবৃতির কতকাংশ যদি সত্য বলিয়া গৃহীত
হয়, তবে ভারত-মহাসাগরের এই উভয় দ্বীপের মধ্যে যথেষ্ট
সাদৃশ্য আছে বলিতে হইবে। আমাদের দেশেও খোল-
করতাল সহযোগে মৃতের অনুগমনবিধি আছে।

শব্দাহ-দিবসের মধ্যাহ্নকালে উৎসবের শেষে মৃতদেহ
বৌদ্ধধর্ম-মন্দির প্যাগোডার অনুরূপে নির্মিত এক সুউন্নত
মঞ্চের উপরে স্থাপন করা হয়। তৎপরে পুনরায় শব্দেহ
সর্বোচ্চ চূড়ায় স্থানান্তরিত করা হয়—ইহাকে 'বেদী' বলে।

প্রায় ৪০০ জন এই মঞ্চ বহন করিয়া লইয়া যায়।
নীচের তিন-তলা ছাড়া মঞ্চ প্রায় এগার-তলা হইয়া
থাকে। পুষ্পমাল্যে ইহা বিভূষিত হইয়া মনোরম আকার
ধারণ করে। মৃতদেহ মঞ্চের সর্বোচ্চ শিখরে মূল্যবান
পেতবস্ত্রের দ্বারা আবৃত থাকে এবং প্রকাণ্ড পাখা নাড়িতে
নাড়িতে অনেকে মৃতদেহ ঘিরিয়া থাকে।

বেদীর সম্মুখভাগে শোভাযাত্রা চলিতে থাকে; প্রথমে
কয়েকটি দল বর্ষা ও বল্লম স্কন্ধে শোভাযাত্রার পুরোভাগে
অবস্থান করে; তাহাদের মধ্য গায়ক ও বাদকগণও থাকে;
তৎপরে বহু নরনারী নানাবিধ অর্ঘ্য, যথা— যুদ্ধের সরঞ্জাম,



শব্দেহ বেদীর উপর স্থাপন করা হইতেছে

মূল্যবান বস্ত্র, সাজসজ্জা, পবিত্র বারি-পরিপূর্ণ স্বর্ণ ও রৌপ্যের
মঙ্গলকলস, 'শ্রী'বরণ ডালা ('Sirih Caskets'), নানাবিধ



বেদী লইয়া যাওয়া হইতেছে

ফলফুল, বিচিত্র বর্ণের পাকান্ন ও মাংসাদি বহন করিয়া লইয়া যায়। মাঠিকেলের মেঘনাদবধে আছে—

বিবিধ ভ্রমণ, বস্ত্র, চন্দন, কপ্তরা
কেশর, কঙ্কন, পুষ্প, বহু রক্ষাধু
স্বর্ণপাত্র, দর্শকস্ত পুত্র অশোরাশ গাজয়...

আমাদের দেশে সধবা স্ত্রীলোক কিংবা বৃদ্ধের শবাস্রসরণের সময় কতকটা এইরূপ প্রথার প্রচলন আছে। খৃষ্টান ও মুসলমানদের শবদেহের অস্রসরণের জন্যও এই প্রকার শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। শেষোক্ত সম্প্রদায় ধূপ, গুগগুল প্রভৃতি প্রজ্জ্বলিত করিয়া মৃতদেহের অস্রগমন করে। খৃষ্টান সম্প্রদায়ও নানা পুষ্পমাল্যে শবাধার সজ্জত করে।

মৃতদেহ ঘে-স্থলে দাহ করা হইবে, মঞ্চটি সেখানে অতিক্রম উপস্থাপিত করা হয়। যখন শোভাযাত্রা কোনও রাস্তার চৌ-মাথায় উপনীত হয় তখন শববহনকারিগণ গগনবিদারী চীৎকার ও উল্লাসধ্বনির মাঝে মঞ্চটি কয়েক বার ভীষণ-ভাবে দোলায়িত করে। সময়ে সময়ে তাহারা গতি স্থগিত রাখিয়া কিছু দূর পশ্চাতেও হটিয়া যায়। তাহাদের ধারণা, আত্মীয়স্বজন ও পার্শ্বিক সম্প্রদায় হইতে চিরবিচ্ছিন্ন মৃতের বিরহকাতরতা লাঘব করিবার জন্যই এইরূপ করা হয়। এদেশেও মৃতদেহ বহন করিবার সময় উর্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম স্মরণ করিবার প্রথা বিদ্যমান আছে।

শোভাযাত্রা কোন্ পথে চালনা করা হইবে শ্রেষ্ঠ-পুরোহিত

‘পাজাণ্ডা’ তাহা নির্দেশ করিয়া দেন। বস্ত্রাচ্ছাদিত কেদারায় পুরোহিত উপবেশন করিয়া থাকেন, বাহকগণ তাহা বহন করিয়া লইয়া যায়; এই কেদারার উপরিভাগে কোনরূপ চন্দ্রাতপ বা অন্য কোনও প্রকারের আচ্ছাদন থাকে না। এই বস্ত্র নানাবর্ণে রঞ্জিত দেখা যায়। বস্ত্রখণ্ডে কালো ও সোনালি রঙের সংমিশ্রণে এক বিশাল অজগরের চিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন করা হয় যে, যেন মৃতব্যক্তি সর্পের দ্বারাই শ্মশানক্ষেত্রের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে; যেন মৃত্যুর অগ্নি কোনও প্রকার আধিদৈবিক, আধিতৌতিক বা অগ্নি কারণ নাই।

শোভাযাত্রা শ্মশানে উপনীত হইলে মৃতদেহ মঞ্চশিখর হইতে নামাইয়া ‘পেমুয়েন’ নামক স্থানে রক্ষিত হয়। এই স্থানে একটি শবাধার রক্ষিত থাকে; ইহা অধিকাংশ সময়ে জীব-জন্তুর আকৃতির অস্ররূপে এবং সচরাচর গরুর আকৃতি-অস্রযায়ী গঠিত হইয়া থাকে। এই শবাধার ‘পেটুলজন’ নামে অভিহিত হয়। মৃতদেহ শবাধারে রক্ষিত হইলে, ইহার শ্বেত আচ্ছাদন-বস্ত্র অপসারিত করা হয়। অতঃপর পুরোহিত মন্তোচ্চারণ করিতে করিতে মৃতদেহের উপর পবিত্র জলধারা বর্ষণ করেন। “পড়িলা গস্তীরে মন্ত্র রক্ষ-পুরোহিত”—শবদেহ দাহ করিবার পূর্বে আমাদের দেশেও মন্তোচ্চারণের প্রথা

প্রচলিত আছে। 'মড়ি-পোড়া' ব্রাহ্মণসম্প্রদায় এই কার্য নিরীহ করিয়া থাকেন।

এই অনুষ্ঠানকার্য নিরীহ হইবার পর শবাধারের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। মঞ্চটিও অগ্নি-সংযোগে ভস্মীভূত করা হইয়া থাকে। মানবের শেষ-চিহ্নটুকুও যখন অগ্নিদাহে ভস্মীভূত হইয়া যায় তখন মহিলাগণ দেহাবশেষ একত্র সঞ্চিত করিয়া লয়। অতঃপর ইহা চূর্ণীকৃত ও নিষ্পেষিত করিয়া সেই ভস্মরাশি নারিকেলের মালায়

পরিপূর্ণ করিয়া সমুদ্রতীরে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে শেষ মন্তোচ্চারণ করিতে করিতে ইহা জলগর্ভে বিসর্জন দেওয়া হয় :—

—পরম যজ্ঞে কুড়াইয়া সবে
ভস্ম, অগ্নিরাশিতলে বিসর্জিতা তাহে।

এই অনুষ্ঠানকে তদেশীয়েরা 'অঙ্গনজুট' বলে। কিন্তু এইখানেই উৎসবের শেষ হইয়া যায় না। ইহার পরেও নানা প্রকার উৎসব-অনুষ্ঠানের রীতি-নীতি পালন করিতে হয়।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

শ্রীরমা প্রসাদ চন্দ

কয়েক বৎসর পূর্বে বাংলার অতিপ্রাচীন বা প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা লক্ষ্য করিয়া একজন বিশিষ্ট পুরাবিদ পণ্ডিত, মহামহোপাধ্যায় ৮৮৭ প্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছিলেন, “বাঙ্গালী একটি আত্মবিশ্বত জাতি।” আজ আমরা যে-স্বনামধন্য মহাপুরুষের স্মৃতিপূজার জন্ম মিলিত হইয়াছি তাহার বহুপূর্বে তিনি পুষ্পাঞ্জলিতে লিখিয়াছিলেন—

“কপিলদেবপ্রিয়া, স্মরণশাস্ত্রপ্রসূতি, তন্ত্রশাস্ত্রজননী বঙ্গমাতা কতকাল আত্মবিশ্বতা হইয়া নীচানুকরণতা থাকিবেন?”

বিশ্বতি আমাদের বোধ হয় স্বভাবগত। “স্বভাবো মূর্খণি বর্জতে।” স্বভাব অতিক্রম করা বড় কঠিন। যে-সকল মহারথ আমাদের অনেকের জীবদ্দশায়, উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে, বাংলা দেশে অনেক স্মরণীয় কীর্তির অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, স্মরণশক্তির সহায়ক নানা প্রকার সরঞ্জাম থাকা সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীর বাঙালী যেন তাঁহাদিগকেও বিশ্বত হইতে বদ্ধপরিকর। এই স্বেচ্ছাকৃত বিশ্বরণের যুগে, চুঁচুড়া-বাসী যে ভূদেবস্মৃতির বার্ষিক পূজার আয়োজন করিয়াছেন, এই জন্ম আপনারা বাঙালী মাত্রেই ধন্যবাদার্থ।

ভূদেব-স্মৃতি-পূজার এই আয়োজন, ভূদেবের দেবলোক-গমনের চল্লিশ বৎসর পরে সংঘটিত হইলেও, বড় সমন্বয়পযোগী হইয়াছে। ১৮৭৫ সাল হইতে ভূদেব বাবু 'এডুকেশন

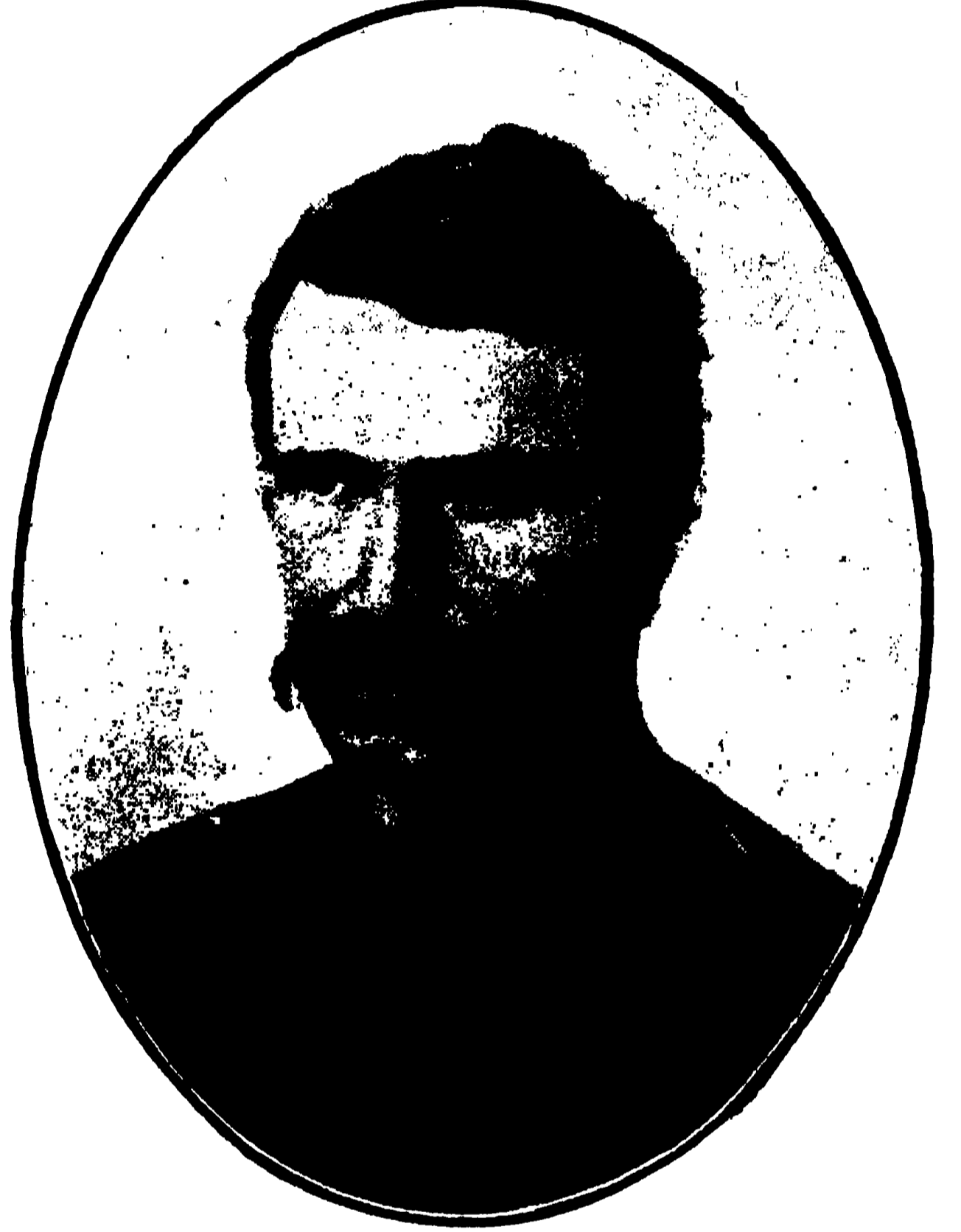
গেজেটে', এবং পরে গ্রন্থাকারে, বাংলার হিন্দুর সমাজনীতি এবং ধর্মনীতি ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করেন। তখন বাঙালীর পারিবারিক জীবনের এক ভিত্তি ছিল বাল্য-বিবাহ, এবং আর এক ভিত্তি ছিল একান্তবর্তী পরিবার বা তাহার অনুকল্প। তখন প্রায় ঘরে ঘরে নিত্যনৈমিত্তিক আচার অনুষ্ঠিত হইত। তখন অধিকাংশ হিন্দুই তান্ত্রিক বিধি অনুসারে কুলগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিত। ভদ্রসমাজের এখন আর সেদিন নাই। সকল দিকেই পরিবর্তন ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে। সর্বাপেক্ষা গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছে বিবাহের ক্ষেত্রে। মাত্র চুয়াল্লিশ বৎসর পূর্বে (১৮৯১ সালে) সহবাস-সম্মতি-বিষয়ক আইনের প্রস্তাবে এদেশে যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ এখন “স্বপ্নলক ইতিহাস” বলিয়া মনে হইবে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেই প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন, ভূদেব বাবু তা ছিলেনই। ইদানীং জীবিকানির্বাহের উপযোগী অর্থোপার্জন দিন-দিন কঠিনতর হওয়ায় শিক্ষিত হিন্দু সমাজে যৌবন-বিবাহ অনিবার্য হইয়াছে, এবং অনেক ক্ষেত্রে বিবাহের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। সহসা এইরূপ পরিবর্তনের আনুযায়িক উচ্ছ্বলতাও দেখা দিতেছে। অনেকে হয়ত এইরূপ পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় মনে করেন, কিন্তু উচ্ছ্বলতার

সমর্থনকারী বিরল। এই উচ্ছৃঙ্খলতা দমনের উপায় কি ? প্রবল কালশ্রোতের প্রতিকূলে চলিয়া ভদ্র হিন্দু সমাজকে এখন “পারিবারিক প্রবন্ধ” রচনার যুগে, বা সহবাস-সম্মতি-বিষয়ক আইন-সম্বন্ধীয় আন্দোলনের যুগে, ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব। অথচ এই শ্রোতে নিশ্চেষ্টভাবে ভাসিতে গেলে তরঙ্গাঘাতে বা পাকে পড়িয়া ভদ্র-শ্রেণীর ডুবিয়া মরিবার সম্ভাবনা খুব বেশী। এই শ্রোতে প্রাণ বাঁচাইয়া চলিতে হইলে সংযত হইয়া সন্তরণ করা আবশ্যিক, এবং সন্তরণ করিয়া কূলে উঠিতে হইলে, সেই উদ্দেশ্যে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করা আবশ্যিক। এই সন্ধিক্ষণে ভূদেব-স্মৃতিপূজার অপেক্ষা অধিকতর কল্যাণকর অর্গঠান কল্পিত হইতে পারে না। কিন্তু শুধু বার্ষিক পূজার ব্যবস্থা করিয়া ক্ষান্ত থাকা কর্তব্য নহে। মৃত্যুপূজার জন্ত “ভূদেব সমিতি” গঠিত করিয়া তাঁহার রচনার এবং তাঁহার প্রদর্শিত পথে সমাজতন্ত্রের এবং ধর্মতন্ত্রের আলোচনা করা কর্তব্য।

১৮২৫ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বিশ্বনাথ তর্কভূষণের এবং তাঁহার পত্নী ব্রহ্মময়ীর একমাত্র পুত্র ভূদেব তাহাদের কলিকাতার হরতকীবাগান লেনের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নবম বৎসর বয়সে ভূদেবকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এখানে দুই বৎসরেরও কিছু অধিক কাল সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া, এবং পিতার অজ্ঞাতসারে সঙ্গে সঙ্গে কিছু ইংরেজী শিখিয়া, বালক-সঙ্কল্প করিলেন, তিনি আর সংস্কৃত কলেজে পড়িবেন না, ইংরেজী স্কুলে রীতিমত ইংরেজী পড়িবেন। পিতা ভূদেবকে প্রথমতঃ ছোট ছোট ইংরেজী স্কুলে পড়াইয়া পরে, ভূদেবের চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময়, হিন্দুকলেজে ভর্তি করিয়া দিলেন। বিশ্বনাথ তর্কভূষণ আশা করিয়াছিলেন, তাঁহার শ্রাম ভূদেবও চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক হইবেন। সে-আশা পূরণ হইল না। বার্ককো উপস্থিত হইয়া ভূদেব বাবু পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘনরূপ পাপের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি চুঁচুড়ায় নিজ বাসভবনে বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছেন, এবং মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া সঞ্চিত ধনের অর্দ্ধাংশ, এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা, গচ্ছিত রাখিয়া চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণের বৃত্তির জ্য একটি স্থায়ী ধন-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দুকলেজে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পুত্র ভূদেব বিপরীত-আচরণশীল যুবকগণের সংসর্গে নিপতিত হইলেন। তখনকার হিন্দুকলেজের সংসর্গ কিরূপ ছিল তাহার সম্বন্ধে ভূদেব বাবুর সমপাঠী ৩/রাজনারায়ণ বাবু লিখিয়াছেন—

তখন হিন্দুকলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন মদ্যপান সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই। আমি এবং আমার কতকগুলি সহচর একত্র হইয়া



যৌবনে ভূদেবচন্দ্র

গোলদীঘিতে বসিয়া মদ খাইতাম। এখন যেখানে সেনেট হাউস হইয়াছে, সেখানে কতকগুলি সিককাবাবের দোকান ছিল। আমরা গোলদীঘির রেল টপকাইয়া (ফটক দিয়া বাহির হইবার বিলম্ব সহিত না) ঐ কাবাব কিনিয়া আনিয়া আহার করিতাম। আমি ও আমার সহচরেরা এইরূপ মাংস এবং জলস্পর্শশূন্য ব্রাহ্মণি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজসংস্কারের পরাকাষ্ঠা বলিয়া মনে করিতাম।

তারপর রাজনারায়ণ বাবু লিখিয়াছেন, ভূদেব এবং “আর দুই এক জনই কেবল সাগরমধ্যস্থিত পর্বতের ন্যায় সেই প্লাবনের মধ্যে অটলভাবে দণ্ডায়মান ছিল।” বাহ্য ব্যবহারে ভূদেব অটল থাকিলেও তাঁহার মন একেবারে অবিচলিত ছিল না। তাঁহার জীবনচরিতকার, তাঁহার পুত্র ৩/মুকুন্দ-দেব মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, এক সময়ে ভূদেবের মনে খৃষ্টধর্মগ্রহণের ইচ্ছাও স্থান পাইয়াছিল। মিশনরিদিগের

উপদেশে ভূদেবের মন এতটা গলিয়াছিল যে তিনি এক দিন বাড়ি আসিয়া রাত্রিতে ঠাকুরের আরতি করিলেন না। পর দিন পিতা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাল রাত্রিতে ঠাকুরের আরতি কর নাই কেন?' পুত্র উত্তর করিয়াছিলেন, 'উহা পৌত্তলিকতা, উহা করিলে পাপ হয়।' এই সকল স্বধর্মবিরোধী ভাব ভূদেবের মনে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই, পিতার সংসর্গে এবং পিতার উপদেশে শীঘ্রই তাঁহার মন হইতে লুপ্ত হইয়াছিল। ভূদেব বাবুর আজীবন স্বধর্মনিষ্ঠার এবং সদাচারনিষ্ঠার কথা এবং সেকালের হিন্দু-কলেজের অন্যান্য ছাত্রগণের জীবনকথা স্মরণ করিলে মনে হয়, ভগবদ্গীতার ষাটাদিগকে যোগভ্রষ্ট বলা হইয়াছে তিনি যেন সেইরূপ একজন যোগভ্রষ্ট পুরুষ ছিলেন; এবং পূর্বজন্মের কর্মফলে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বংশে জন্মগ্রহণ করায় এবং পৌর্বদেহিক বুদ্ধিসংযোগ থাকায়, সংসর্গ দোষ এবং কালধর্ম অতিক্রম করিয়া চিরজীবন ব্রাহ্মণের আচার প্রতিপালন করিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 'এইরূপ অল্পমান না করিলে ভূদেব-চরিত্র সম্যক্রূপে বুঝিতে পারা যায় না।

হিন্দুকলেজে ভূদেবের সহপাঠিগণের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের সহিত এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের ভাবী নেতৃক ৮রাজনারায়ণ বসুর সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। পরে এই তিন বন্ধু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথের পথিক হইলেও চিরজীবন ইহাদের সৌহার্দ অক্ষুণ্ণ ছিল। মধুসূদন তাঁহার শেষ কাব্য 'হেক্টর বধ' ভূদেব বাবুর নামে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। এই উৎসর্গপত্রে তিনি লিখিয়াছেন—

এ বঙ্গদেশে যে তোমার অতি শুভক্ষণে জন্ম, তাহার কোনই সন্দেহ নাই: কেন না তোমার পরিশ্রমে মাতৃভাগ্য দিন দিন উন্নতি হইতেছে। পরমেশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন এই প্রার্থনা করি। যে শিলায় তুমি ভাই, কীর্তিস্তম্ভ নিম্নিতেছ, তাহা কালও বিনষ্ট করিতে অক্ষম।

১৮৭২ সালের ২৮শে মার্চ তারিখের পত্রে এই উৎসর্গের উত্তরে ভূদেব বাবু লিখিয়াছেন—

তুমি ত্রিষমাণ মাতৃভাগ্যক পুনরুজ্জীবিত করিলে, তুমি ইহাকে নূতন অলঙ্কার মালায় ভূষিত করিলে, তুমি ইহাতে সর্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য রচনা করিলে।

* * *

তোমার বাঙ্গলা কাব্যগুলি তোমাকে এতদেশের শিক্ষিত দলের মুখ-স্বরূপ, ষাটাদিগের গৌরবস্বরূপ, এবং তাহাদিগের পথপ্রদর্শক করিয়া স্থাপন করিয়াছে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত্র সকলনে ভূদেব

বাবু ৮যোগীন্দ্রনাথ বসুকে নানা প্রকারে সহায়তা করিয়াছিলেন, এবং ঐ পুস্তকের ছাপার ব্যয়ও কতক পরিমাণে বহন করিয়াছিলেন। ১৮৯৩ সনের ২৫শে আগষ্ট রাজনারায়ণ বসু গৌরদাস বসাককে লিখিতেছেন—

ভূদেবের স্বাস্থ্য এখানে ভাল থাকিল না, তিনি জন্ম চূঁচড়া যাত্রা করিলেন। তাঁহার মতে মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'আমাদের বন্ধু'— যোগীন্দ্রের নহে। এজন্য মাইকেলের জীবনী প্রকাশে যোগীন্দ্রের কিছুমাত্র আর্থিক ক্ষতি হইতে দেওয়া ঠিক নহে। যদি ঐ পুস্তক ছাপানর খরচের টাকা বিক্রীতে বা অন্তরূপে সঙ্কুলান না হয়, তাহা হইলে ভূদেব আরও ১০০ দিনেবন।

ভূদেব বাবু রাজনারায়ণ বসু সম্বন্ধে ১৮৮৪ সালের ২রা ডিসেম্বর ডায়েরীতে লিখিয়াছেন—

রাজনারায়ণ বসু আসিয়াছিলেন। এরূপ লোককে পৈতা দিয়া ব্রাহ্মণ করিয়া লওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে হইল। আদিসমাজ কি উপনয়ন সংস্কার রক্ষা করিবেন? রাজনারায়ণের ওখানে গিয়া রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল।

রাজনারায়ণ সেকা পাঁড়িরাট খাইতেছিলেন। আহা! সম্বন্ধে তিনি সান্ত্বিক নহেন।

এই কয়টি কথায় ভূদেব বাবুর হৃদয়নিহিত উদারতা, বন্ধুপ্রীতি এবং আচারনিষ্ঠা স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

১৮৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৫০ বেতনে কলিকাতা মাদ্রাসার ইংরেজী-বিভাগের দ্বিতীয় শিক্ষকরূপে ভূদেব বাবু সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই ১৫০ বেতনে হাওড়া স্কুলের হেড মাস্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভূদেব বাবু প্রায় সাত বৎসর কাল এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং এই সময়ে "শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব" নামক পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তারপর হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদের জন্য প্রতিযোগী পরীক্ষা হয়। এই পরীক্ষায় ভূদেব বাবুর প্রতিযোগী ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ভূদেব বাবুই চাকুরীটি প্রাপ্ত হইলেন। তারপর ক্রমে স্কুল-বিভাগের এসিষ্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর, বিভাগীয় ইন্সপেক্টর, এবং শেষে পাটনা, ভাগলপুর, বর্ধমান, উড়িষ্যা এই চারি বিভাগের ইন্সপেক্টর হইয়া ১৮৮৩ সালে তিনি চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভূদেব বাবু শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রী আলফ্রেড ক্রফোর্ডের দক্ষিণ-হস্ত ছিলেন, এডুকেশন কমিশনের সদস্য ছিলেন, এবং কমিশনের পক্ষ হইতে প্রাদেশিক রিপোর্টের মুসাবিদা করিয়া বিশেষ সূখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৬৮ সালে গভর্ণমেন্ট ভূদেব বাবুকে 'এডুকেশন গেজেটে'র স্বত্বদান করিয়াছিলেন এবং ঐ পত্রিকা সম্পাদনের এবং পরিচালনার জন্ত মাসিক ৩০০ সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভূদেব বাবুর অধিকাংশ লেখা প্রথমে প্রবন্ধাকারে এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৭৬ সালে ভূদেববাবুর "পুষ্পাঞ্জলি" প্রকাশিত হইয়াছিল। "নবজীবনে" অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়া গিয়াছেন, "ভূদেব ফুটিলেন পুষ্পাঞ্জলিতে।" পুরাণের আদর্শে মার্কণ্ডেয়-ব্যাস-সংবাদের আকারে রচিত পুষ্পাঞ্জলি একখানি চমৎকার গদ্যকাব্য। পিতার নামে উৎসর্গপত্রে গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভূদেব বাবু লিখিয়াছেন—

কিন্তু অতি গুরুতর বিষয়েই হস্তার্পণ করিয়াছি—ধর্মবিধ্বাসের মূলব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হইয়াছি—আনুসঙ্গিক অশ্রান্ত বিবয়ের প্রতিও লক্ষ্য আছে।

আনুসঙ্গিক অন্যান্য অনেক বিষয়ই 'পুষ্পাঞ্জলি'তে আলোচিত হইয়াছে, যেমন—স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, সভ্যতার ইতিহাস, এবং সম্ম-সামগ্রী-হিসাবে সকল বিষয়ই দক্ষতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। আনুসঙ্গিক বিষয়ের মধ্যে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে দেশাতুরাগকে। বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃ-ভূমিকে ভগবতী দশভূজা রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। পরম ভগবতীভক্ত ভূদেব তাহা করেন নাই। তাঁহার জন্মভূমির মূর্ত্তি-বর্ণনা বড় সুন্দর। এখানে কতকটা উদ্ধৃত করিব—

মুনিরাজ! আমি ধ্যানে কি অপূর্ণ মূর্ত্তি দর্শন করিলাম! ঐ মূর্ত্তি চিরকালের জন্ত আমার হৃদয়কন্দরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। পাদপদ্মের কি অনুপম সৌন্দর্য্য—অঙ্গের কি জাহ্নল্যমান প্রভা—মুগ্ধপ্রেরণ কি রুচির কাহ্নি! ইনি পর্বত-রাজপুত্রী পার্বতীর মত সিংহবাহনে আরোহণ নহেন—ত্রিপথগামিনী গঙ্গাদেবীর যাবতীয় শোভা ইহার অঙ্গের এক দেশেই বিদ্যমান—ইহাকে মাধবপ্রিয়া বলিয়াও ভ্রম হয় না: রমা রক্তাশ্রয়া, ইনি হরিষসনা—ব্রহ্মনন্দিনীর স্থায় ইহার স্মিত্তিক সৌম্যভাব বটে, কিন্তু ইনি বীণাপাণি নহেন—আর, অশ্রু সকল দেব-দেবী হইতে ইহার বৈচিত্র্য এই যে, ইনি নিরন্তর অপভ্রংশ লইয়া সকলকে মাতৃভাবে অন্ন পান প্রদান করিতেছেন। মুনিবর! ইনি কোন্ দেবী? ইহার পূজাবিধি কি?

'পুষ্পাঞ্জলি'তে নিবন্ধ ধর্মব্যাখ্যা শক্তিসাধনের ব্যাখ্যা। শক্তিসাধন তন্ত্রশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। ভূদেব বাবু তন্ত্রকে চতুর্থ (কলি) যুগের বেদশাস্ত্র বলিয়াছেন। রাজনারায়ণ বসু তন্ত্রশাস্ত্রের স্বখ্যাতি করেন। এই জন্ত তাঁহার প্রতি অনেকে দোষারোপ করিয়াছিল। ইহাতে ভূদেব বাবু অত্যন্ত বিরক্ত

হইয়াছিলেন এবং (দ্বিতীয় ভাগ 'বিবিধ প্রবন্ধে' প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে) উন্মার সহিত লিখিয়া গিয়াছেন—

তন্ত্রশাস্ত্র জ্ঞান প্রকরণ। 'ন দেয়ং যন্তকশ্চিৎ'। 'শুভ? তবেই মন্দ, যা ভাল তা ত গোপন করিত হয় না।' বটে রে পুঁটে ছেলে!



প্রোফে ভূদেবচন্দ্র

তুই গোপনের ফল কি বুঝিবি? তুই ইংরাজীতে বক্তৃতা কর, গাড্-মাড ফিস্ ফাস্ কর, সাহেবরা তোর মাথায় হাত ব্লাবেন, যদি চাহিস্ ত বড় চাকুরিও দিবেন ইংরাজী কাগজে তোর নামটাও উঠিবে।

ভূদেব বাবু তাঁহার রচনামধ্যে অনেক তর্কসঙ্কুল বিষয়ের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কখনও বিপক্ষের প্রতি কটুক্তি করেন নাই, বা বিপক্ষকে প্রতিবাদের বিশেষ অবকাশ দেন নাই। সুতরাং তন্ত্রনিদ্দুকের প্রতি এই কটুক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় তাঁহার তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি কিরূপ দৃঢ়ভক্তি ছিল। তাই বলিয়া তন্ত্রের ইতিহাস লিখিবার সময় তন্ত্রের প্রাচীনতা প্রমাণ করিবার জন্ত তিনি কোন প্রকারে ইতিহাসের মর্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই। তন্ত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে ভূদেব বাবুর মত, তন্ত্রশাস্ত্র বাংলা দেশে উৎপন্ন এবং মুসলমান রাজাদের আমলে প্রবল হইয়াছিল। দ্বিতীয় ভাগ 'বিবিধ প্রবন্ধে' প্রকাশিত ভূদেব বাবুর তন্ত্র-সম্বন্ধীয়

প্রবন্ধ-সকল বড় মূল্যবান। তন্ত্রশাস্ত্রমূলক শাক্তধর্ম উচ্চ শ্রেণীর বাঙালীর পুরুষ-পরম্পরাগত ধর্ম। সূক্ষ্ম বিচার করিয়া ভূদেব বাবু দেখাইয়াছেন, বাঙালীর বৈষ্ণব ধর্মেও শাক্ত-প্রভাব বিদ্যমান আছে। তিনি লিখিয়াছেন—

বাস্তবিক আখ্যাবর্তের অপর সকল ভাগের অপেক্ষা, বাঙ্গালা দেশেই শক্তির পূজা বিশেষ প্রবল। বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা এবং মধ্যাচারী কৃষ্ণভক্তেরা কেহই সীতা অথবা কোন কৃষ্ণশক্তিকে রাম বা কৃষ্ণ অপেক্ষা প্রাধান্য প্রদান করেন না, কিন্তু বাঙ্গালার নিমাইং বৈষ্ণবেরা শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণের উপরেও প্রাধান্য দিয়া থাকেন। বিশেষতঃ নিমাইং বৈষ্ণবদিগের মতে গৌরানন্দ মহাপ্রভু শ্রীরাধিকা স্মরণ এবং সেই জন্তই একান্ত কৃষ্ণপ্রেমময় শরীর। চৈতন্যচরিতামৃতের আভ্যন্তরীণ ভাব ঐরূপ।

তন্ত্র-প্রসঙ্গে ভূদেব বাবু রাজা রামমোহন রায়ের মতের বিশেষ সমাদর করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

তাত্ত্বিক মতবাদ এই দেশে এবং এই কালে স্ততঃউদ্ভূত স্ততরা উহাই এই দেশের এই কালের উপযোগী হইবে বলিয়া তাঁহার (রাজা রামমোহন রায়ের) বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

ব্রাহ্মগণ ব্রহ্ম পদ্ধতিকে তাত্ত্বিক পদ্ধতি বলিয়া স্বীকার করেন না বলিয়া ভূদেব বাবু অনুযোগ করিয়াছেন। একান্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ভূদেব বাবু শাস্ত্রীয় বিধি ত্যাগের জন্ত বুদ্ধদেব এবং রামমোহন রায় উভয়ের প্রতি অবশ্য দোষারোপ না করিয়া পারেন নাই। 'আচার প্রবন্ধের' উপক্রমণিক-অধ্যায়ে তিনি লিখিয়াছেন -

বুদ্ধদেব বহু কালাবধি শাস্ত্রীয় বিধিসকলের অনুযায়ী তপস্যাপূর্বক তাহার কাঙ্ক্ষিত ফললাভে বশিত হইয়া শাস্ত্রবিধেয়ী হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, রামমোহন রায়ও অনেকানেক পুরশ্চরণ এবং জপাদিধারা সিদ্ধকাম না হওয়াতেই শাস্ত্রাচার পরিত্যাগী হইয়াছিলেন। যাহাই হউক, বুদ্ধদেব এবং রামমোহন রায় উভয়েই যে আপনাপন তপস্যাদির অনুরূপ ফলভাগী হইয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভূদেব বাবু তাত্ত্বিক উপাসনার যেমন পক্ষপাতী ছিলেন, স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত নিত্যানৈমিত্তিক ব্রতপূজারও তেমন পক্ষপাতী ছিলেন। এই সকল ক্রিয়াকলাপের সম্বন্ধে 'আচার প্রবন্ধের' সপ্তম অধ্যায়ে তিনি লিখিয়াছেন—

আজকাল সকলে ধর্মের মতবাদ ও বিচার লইয়াই বাস্তব। কিন্তু ব্রতপালন দ্বারা সংঘম একাগ্রচিত্ততা, পরোকদৃষ্টি, দান প্রভৃতির সদভ্যাস যে ধর্ম-শরীরের একটি প্রধান অঙ্গ তাহা কেহ দেখেন না। হনীতি এবং সদাচারপরায়ণ হইবার এবং ঐ পথে উৎকর্ষ পাইবার জন্ত ব্রতপালনের শিক্ষা মুখ্য উপায়। ব্রত-সদাচারের অভ্যাস—ডিসিপ্লিন।

মাহুষের উদ্ভাবিত যত বিধি-ব্যবস্থা, যত প্রতিষ্ঠান আছে, সকলেরই উদ্দেশ্য স্বৈচ্ছাচারিতা-দমন এবং ডিসিপ্লিন-রক্ষণ। কালের স্রোতে হিন্দুর মধ্যে প্রচলিত ডিসিপ্লিন-রক্ষার অনেক

বিধান ভাসিয়া যাইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, যাহা ভাসিয়া যাইবার মত হালকা তাহাকে লইয়া টানাটানি না করিয়া বিদেশ হইতে নূতন বিধান আমদানী করা উচিত। আবার কেহ কেহ মনে করেন, বিদেশী বিধান দেশ-কাল-পাত্রের উপযোগী হইবে না, স্ততরাং তাহা আমদানী করিবার চেষ্টা না করিয়া দেশীয় বিধানগুলিকে সংস্কার করিয়া রক্ষা করিবার চেষ্টা করাই কর্তব্য। সংস্কারকার্যে ব্রতী হইতে হইলে কোন্ কার্যে ভবিষ্যতে কি ফল ফলিতে পারে তাহা সঠিক অনুমান করিয়া লওয়া আবশ্যিক। এইরূপ অনুমান সকল প্রকার সংস্কারের প্রথম সোপান। কি উপায়ে এইরূপ অনুমান করিতে হইবে তাহার সম্বন্ধে ভূদেব বাবু 'সামাজিক প্রবন্ধের' উপসংহারভাগে লিখিয়াছেন—

বস্তুতঃ ভারত-সমাজের ভাবী অবস্থার অনুমান করিবার জন্ত মুখ্যতঃ ভারতবর্ষীয় ইতিহাস এবং ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা লইয়া বিচার করিতে হইবে অপরপূর্ব দেশের ইতিহাস এবং সমাজতত্ত্ববিহিত গ্রন্থাদি হইতে প্রসঙ্গক্রমে কিছু কিছু সাহায্য পাওয়া যায় মাত্র। ঐ ইতিহাসাদি হইতে ভারতীয় সমাজতন্ত্রের সূত্র গ্রহণ করা অথবা ঐ সমাজের পরিণতির নিয়মানধারণ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

এদেশে যাহারা সাধারণতঃ সংস্কারকার্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তাঁহারা ভারতের কেন, অথবা কোন দেশের সমাজতন্ত্রের সূত্রের বা সমাজের পরিণতির নিয়মের দিকে দৃকপাত করা কর্তব্যবোধ করেন কিনা সন্দেহ। তাহারা কতকগুলি পাশ্চাত্য 'বুলি'কে বেদের মস্তুর মত অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন জ্ঞান করিয়া তাহার আবৃত্তি করিয়া উত্তেজনার সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করেন মাত্র। রাষ্ট্রবিধির সংস্কারকার্যে ব্রতী হইবার পূর্বে কিভাবে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যিক, তাহার সম্বন্ধে সামাজিক প্রবন্ধের 'কর্তব্যনির্ঘণ সূত্র প্রয়োগ' নামক অধ্যায়ে ভূদেব বাবু লিখিয়াছেন—

রাজনৈতিক সভাসকলের অনুষ্ঠান অত্যাবশ্যিক। ঐ সকল সভায় রাজনৈতিক আলোচনা অপেক্ষা রাজনীতির আলোচনাতেই বিশেষ ফল দর্শিবে। কোন্ বিষয়ে কিরূপ ব্যবস্থা হইলে ভাল হয় তাহা অবধারণের পূর্বেই এখন প্রবল আন্দোলনের ঢেউ উঠিতে থাকে। দেশের নানাস্থানে সভা স্থাপিত হইয়া রাজনীতিবিষয়ে পড়াশুনা এবং বিচার ও অনুসন্ধান হইতে থাকিলে বুদ্ধিমান এবং বিশিষ্ট লোক মাত্রেরই রাজনৈতিক বিষয়জ্ঞতা ও দূরদর্শিতা সম্বন্ধিত হইবে এবং কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইলে সে সকল লোক আর ইংরাজী গতে ভুলিবে না এবং হজুকে মাতিবে না—আপনাদের তথ্যজ্ঞানের উপর চলিতে পারিবে।

চুয়াল্লিশ বৎসর পূর্বে এই সকল কথা লিখিত হইয়াছিল। এই চুয়াল্লিশ বৎসরের বাংলার ইতিহাসে তথ্য নির্ধারণ করিয়া,

দেশ-কাল-পাত্র হিসাব করিয়া পথ চিনিয়া লইয়া পরে আন্দোলনে ত্রতী হইবার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভূদেব বাবু যাহাকে ইংরাজী ‘গং’ এবং “হুজুক” বলিয়াছেন, গত চুয়াল্লিশ বৎসরের বাংলার বিবিধ আন্দোলনের ইতিহাসে তাহারই প্রাধান্য দেখা যায়।

ভূদেব বাবুর মহামূল্য গ্রন্থমালার এবং মতামতের অধিক পরিচয় দিবার সময় আজ নাই। এই মহাপুরুষের অস্তিম সময়ের কয়েকটি কথার উল্লেখ করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। ভূদেব বাবুর মত একাধারে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সামাজিক পরিণামবাদে এবং কুলক্রমাগত সমস্ত ধর্মে কঠোর দৃঢ় বিশ্বাসবান্ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান পুরুষ আর কখনও যে বাংলায় আবির্ভূত হইবেন এবং এই দৃশ্যের যে আর কখনও পুনরভিনয় হইবে এরূপ আশা করা যায় না। সুতরাং ভূদেব বাবুর অস্তিম সময়ের ঘটনা বাঙালীর ইতিহাসের একটি স্মরণীয় কাহিনী।

চাকুরী হইতে অবসরগ্রহণের চারি বৎসর পরে, ১৮৮৭ সালের ২২শে মার্চ, তৎকালে জীবিত পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায়কে ভূদেব বাবু লিখিয়াছিলেন :—

তুমি স্থিরবুদ্ধি অতএব তোমার স্থানেই একটি বিষয়ের প্রস্তাব করিয়া তোমার কিরূপ অভিমত হয় তাহা জানিবার ইচ্ছা করিয়াছি। বিষয়টি এই—মনুসংহিতায় আদিষ্ট হইয়াছে—

গৃহস্থস্ত যদা পশ্চেদ্বলী পলিতমান্বনঃ।
অপত্যশ্চৈব চাপত্যঃ তদারণ্য সমাশ্রয়েৎ ॥ (৬১২)

ব্রাহ্মণ-গৃহস্থ যখন আপনার শরীর বয়ঃপ্রভাবে বলীযুক্ত অর্থাৎ লোল হইয়া যাইতেছে দেখিবে অথবা আপনার পুত্রদিগের পুত্রমুগ্ধ দর্শন করিবে, তখন আর গৃহে থাকিবে না।

আমি অতি সৌভাগ্যক্রমে আমার পুত্রদিগের পুত্রমুগ্ধ দর্শন করিতে পাইলাম। আমার শরীরও ক্রমশঃ বলহীন এবং লোল হইতেছে, উহা কোন পীড়াবশতঃ হয় নাই—শুদ্ধ বয়োধর্ম্মেই হইতেছে অতএব আমার গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করাই উচিত। সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে যাহারা বানপ্রস্থাত্মের বিহিত তপস্যায় অপারগ তাহাদিগের জন্ম ঐ মনুসংহিতাতেই আর একটি বিধি আছে যথা—

সংস্থস্ত সর্ব্বকর্মাণি কৰ্ম্মদামানপানুদন্।
নিয়তো বেদমভ্যস্ত পুত্রৈশ্বৰ্য্য স্তথং বশেৎ ॥ (৬১৫)

অর্থাৎ সকল কৰ্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক এবং পূর্ব্বকৃত কৰ্ম্মদাম-সমস্তের প্রায়শ্চিত্ত করতঃ পুত্রদিগের নিযুক্ত বাসভূমি এবং আহার গ্রহণপূর্ব্বক স্থখে থাকিবে।

যদি বানপ্রস্থাত্ম অবলম্বনে নিজেকে অশক্ত জানিয় আমি এই দ্বিতীয় ‘কুটীচর’ পথ অবলম্বন করিতে যাই—তথাপি প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহা করিতে হইলে তোমাদিগের দুই ভাইয়ের প্রদত্ত আবাস এবং আহার

আমাকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং নিজে এখনও এডুকেশন গেজেট ও পেনসন হইতে যাহা পাইতেছি তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহা না করিলে যথার্থ ‘কুটীচর’ ধর্ম্ম অবলম্বন হইবে না।

এই বিষয়ে তোমার মত কি ?

‘পারিবারিক প্রবন্ধ’র শেষ প্রবন্ধে “পঞ্চাশোদ্ধং বনংব্রহ্মেৎ” বিধির যুক্তযুক্ততা এবং প্রয়োজনীয়তা দেখান হইয়াছে। এই পত্র সেই মতেরই অনুযায়ী। সৌভাগ্যক্রমে পিতৃভক্ত গোবিন্দদেব বোধ হয় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন নাই, সুতরাং আরও সাত বৎসর কাল পেনসনের টাকাটা বিশ্বনাথ-ভাণ্ডারের জন্ম জন্মিবার অবকাশ পাইয়াছিল। এই পত্র লিখিবার সাত বৎসর পরে, ১৮৯৪ সালের প্রথম ভাগেই ভূদেব বাবুর অস্তিম রোগ দেখা দিয়াছিল। এই সময়ে এডুকেশন গেজেটের সহকারী সম্পাদক নিবারণ-চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভূদেব বাবুর নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে জীবনচরিতের খসড়া ও সংবাদপত্রাদি পড়িয়া শুনাইতেন। ১৮৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের অবস্থার প্রসঙ্গে নিবারণ বাবু লিখিয়াছেন—

তখন ঠাঁহার একটু একটু ক্ষয় হইত। সেই সময় তাঁহাকে বটুকভৈরব এবং কালানুশীল্যস্তোত্র এবং শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বাণঘৃদ্ধ শুনাইতাম। বাইশ দিনকাল এই স্তবগুলি তাঁহাকে শুনাইয়াছিলাম। একদিন আমার স্তব পড়া শেষ হইলে তিনি আমাকে বলিলেন, ‘নিবারণ! তোমার বাবা ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন, না বিষয়া লোক ছিলেন?’ আমি বলিলাম, ‘তিনি ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন।’ শুনিয়া বলিলেন, ‘আমি তোমার আবৃত্তি হইতেই তাহা বুঝিতে পারিতেছি। বিশুদ্ধ উচ্চারণের সংস্কৃত স্তব পাঠ শুনিতে শরীরে কোনরূপ জ্বালাঘন্ত্রণাই থাকে না।

ভূদেব বাবুর এবং তাঁহার পুত্রগণের সন্ধ্যা-আহ্নিক খেমন অভ্যস্ত ছিল, ডায়েরী-লেখাও তেমন অভ্যস্ত ছিল। ভূদেব বাবুর তৃতীয় পুত্র, ‘ভূদেবচরিতকার’ মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহার ডায়েরীতে লিখিয়াছেন—

৬।৪।৯৪—“স্বর্ঘ্যগ্রহণ। পিতৃদেব আমাকে পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ করিতে বলিলেন। ইহার পূর্ব্বক অনেকবার সমস্ত গ্রহণের সময়টা জপ করিয়াছি, কিন্তু রীতিমত পুরশ্চরণ করি নাই।” ৭।৪।৯৪—“বিধিপূর্ব্বক পুরশ্চরণ আরম্ভ করিলাম।” ৯।৪।৯৪ “পুরশ্চরণ শেষ হইল।”

১৮৯৪ সালের ১৪ই মে তারিখে মুকুন্দবাবু লিখিতেছেন—

রাত্রি ১২।টায় বৃকে কষ্ট হয়, ঈশ্বর কবিরাজ মহাশয় নাড়ী পরীক্ষা করিয়া নীরব রহিলেন নিজেই ‘গঙ্গা গঙ্গা’ বলিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার প্রতিজ্ঞা স্বরণ করাইয়া দেন।”

পূর্ব্বকই ভূদেব বাবু গঙ্গাযাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন—‘গঙ্গা গঙ্গা’ বলা মাত্রই গঙ্গাতীরে নীত হইলেন। মুকুন্দ বাবু লিখিয়াছেন—

“গঙ্গাতীরে গিয়া ‘আমার সবাই এসছে’ বলিয়া সকলের সংবাদ লইলেন এবং চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর ‘গোপাল, গোপাল’ বলিয়া দাদাকে আদর করিলেন। ইষ্টদেবতাকে ঘোড়হাতে প্রণাম করিলেন ও বুকে হাত রাখিয়া জপ করিতে করিতে আমাদের প্রত্যক্ষ দেবতা, আমাদের সংসার অক্ষয় করিয়া রাত্রি ১টার সময় মহাপ্রস্থান করিলেন।”

এই সেই গঙ্গাতীরের বাড়ি যেখানে হইতে এই মহাপুরুষ মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার মত বিশ্বাস, তাঁহার মত নিষ্ঠা এই যুগে স্থলভ নহে। কিন্তু বর্তমান পাশ্চাত্য জগতের কার্যপ্রণালী স্মরণ করিয়া, দেশীয় নৃত্য, সমাজতন্ত্র এবং রাষ্ট্রতন্ত্র বিচার করিয়া, যে-প্রকারে তিনি ভবিষ্যতের

কর্মপন্থা নির্ধারণ করিবার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, আমাদের পক্ষে তাহা অনুসরণ করা অসাধ্য নহে এবং তাহা অনুসরণ করা আমাদের এখন বিশেষ কর্তব্য। সজ্জবদ্ধ হইয়া ভূদেব-স্মৃতির পূজা এবং ভূদেব-সাহিত্যের সম্যক অনুশীলন এই বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারিবে। *

* ভিন্ন ভাগে প্রকাশিত বিস্তৃত “ভূদেবচরিত” হইতে প্রধানতঃ এই প্রবন্ধের উপকরণ সংগৃহীত হইল।

১৯৩৪ সালের ২২এ মে চুচুড়া ভূদেব-স্মৃতি-সভার অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

মরুপথে

শ্রীস্বর্ণলতা চৌধুরী

সোমেন্দ্র তাহার সহযাত্রীটির সম্বন্ধে ক্রমেই বেশী করিয়া সচেতন হইয়া উঠিতেছিল। সে-ব্যক্তি একদৃষ্টে তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। মানুষটি লম্বা-চওড়া, হাতে একটি বক্বকে হীরার আংটি। কোনো ধনী ব্যবসায়ী হইবে বোধ হয়। লোকটিকে দেখিলে মনে হয় দুনিয়ার অনেক স্থানেই ঘুরিয়াছে এবং কোনও অবস্থায়ই বিচলিত হয় না।

পাঞ্জাব মেল হু-হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মধ্য দিয়া। গাড়ীটায় লোক বেশী নাই, সোমেন্দ্র ও তাহার সঙ্গীটি ছাড়া আর দুইজন মাত্র—একটি মহিলা ও একটি পুরুষ। যাত্রী কক্ষটির গ্লানির সীমা নাই, সর্কাজ তাহাদের ধূলায় আচ্ছন্ন; চুলে, দাড়িতে, গৌফে গৈরিক আবীরের মত লাগিয়া আছে। জানালা দিয়া হু-হু করিয়া হাওয়া ছুটিয়া আসিতেছে, সঙ্গে রাশি-রাশি ধূলা, যাত্রীগুলির চেহারাও ক্রমে চারিদিকের অনুর্বর মাটির মতই গেকিয়া রঙে রঞ্জিত হইয়া আসিতেছে। ট্রেন দ্রুতবেগে ছুটিতেছে, মাঠের পর মাঠ, ধ্বংসস্তূপের পর ধ্বংসস্তূপ পার হইয়া ঘাইতেছে। মাঝে মাঝে লাল-ইটে গাঁথা ষ্টেশনের বাড়ি।

গরমে সকলে প্রায় অতিষ্ঠ, লম্বা-চওড়া ভদ্রলোকটি সেই

মহিলার সঙ্গীটির দিকে তাকাইয়া বলিলেন, “মাপ করবেন মশাই” বলিয়া গায়ের পাঞ্জাবীটা খুলিয়া গেঞ্জি গায়ে দিয়াই বসিয়া রহিলেন। তিনি গাড়ীতে উঠিয়া অবধি সোমেন্দ্রের দিকে অত্যন্ত কৌতূহলসহকারে তাকাইতেছিলেন এবং ক্র কঁচকাইয়া কি যেন মনে করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু এ-বাপারে সোমেন্দ্র অভ্যস্ত, সে যেখানেই যায়, মানুষে একদৃষ্টে তাহাকে দেখে। প্রথম প্রথম সে একটু অপ্রস্তুত বোধ করিত, এখন তাহাও করে না। লম্বা-চওড়া লোকটির পর্যবেক্ষণ এতক্ষণে শেষ হইয়া গেল বোধ হয়, তিনি বেকির পিঠে ঠেস দিয়া বসিয়া, ‘বাসন্তী’-গীতিনাটোর একটি সুপ্রসিদ্ধ গান শিস্ দিয়া গাহিতে লাগিলেন। এই গীতিনাট্যখানি লিখিয়াই তাহার তরুণ রচয়িতা রাতারাতি সুপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে প্রায় বারো বৎসর আগের কথা। সোমেন্দ্র এই গানটি সব ভায়গায় শুনিয়াছে, এমন-কি গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানকে পর্যন্ত উহা গাহিতে শুনিয়াছে। সোমেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভেজেন্দ্রের প্রতিভার গণ্ডী পার হইতে সোমেন্দ্র বেচারী কিছুতেই পারে না। ‘বাসন্তী’-খানা যেন সত্যই পৃথিবীর সর্বত্র তাহাকে অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছে। অবশ্য ‘বাসন্তী’ সম্বন্ধে সোমেন্দ্রের

কোন লজ্জা ছিল না। গীতিনাট্যখানা সত্যই চমৎকার, তবে অতি ছেলেমানুষ ভিন্ন এ-রকম জিনিষ কেহই লিখিতে পারে না, সে কথাও ঠিক।

তাহার দীর্ঘকায় সহযাত্রীটির মনের কথা সোমেন্দ্র বুঝিতেই পারিতেছিল। স্তবরাং গাঙ্গীর্ষ্য ত্যাগ করিয়া এতক্ষণে সে ঐ ব্যক্তির দিকে তাকাইয়া একটু হাসিল। লোকটি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আসিয়া সোমেন্দ্রের পাশে বসিয়া পড়িল, রুমাল দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল, “আচ্ছা বুলো যা-হোক মশায়। যা-হোক আমার সঙ্গে গেছে, এ-অঙ্কে বছরদিন ঘোরাঘুরি করছি কি না? আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি বোধ হচ্ছে, কিছুতেই ঠিক করতে পারছি না।”

সোমেন্দ্র হাসিয়া বলিল, “আমার নাম সোমেন্দ্র মৈত্র। আপনি সম্ভবতঃ আমার দাদা তেজেন্দ্রকে দেখেছেন, তাঁর আর আমার চেহারার খুব সাদৃশ্য থাকতে লোকে প্রায়ই একজনকে আর একজন বলে ভুল করে।”

লক্ষ্য লোকটি নিজের হাঁটুতে প্রচণ্ড এক চাপড় মারিয়া বলিল, “ঠিক ধরেছি। এতক্ষণ কেবলই ভাবছিলাম আপনি হয় তেজেন মৈত্র, নয় তার যমজ-ভাই। তাকে দেখেছি বই-কি। যখনই তাঁর কোনো নাটকের অভিনয় হয়েছে আমি ঠিক সেখানে হাজির হয়েছি, তাঁকেও বছরবার থিয়েটারে উপস্থিত দেখেছি। আমাদের ক্লাবে একবার তাঁকে নেমন্তন্ন করা হয়েছিল, তাতে তিনি দয়া করে ‘বাসন্তী’র দু’চারটা গান বাজিয়ে শুনিয়েছিলেন। আগে একখানা দৈনিকে কাজ করতাম, এখন ত নিজে ব্যবসা ফেঁদেছি। যাক আপনি তাহ’লে তেজেন মৈত্রেরই ভাই? আপনার সঙ্গে ট্রেনে বসে শেষে দেখা? ঠিক যেন মাসিকের গল্পের মত শোনাচ্ছে।” ভদ্রলোক হাসিতে হাসিতে একটি সোনার জল-করা সিগারেট কেস খুলিয়া ধরিলে এবং তেজেন্দ্রের বিষয় অনর্গল প্রশ্ন করিয়া চলিল। সোমেন্দ্রের সঙ্গে লোকে খালি এই এক বিষয়েই কথা বলে। কিছুক্ষণ পরে কামরাটা খালি হইয়া গেল। দীর্ঘাকৃতি লোকটি নামিয়া গেল মোগল-সরায়ে, অল্প পুরুষ ও মেয়ে-যাত্রীটিও নামিয়া গেল। সোমেন্দ্র কামরায় একাই বসিয়া রহিল।

এলাহাবাদে গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, ঠিক দুপুরবেলা। সোমেন্দ্র এ-দিকে বিশেষ আসে নাই। কুলীর মাথায় জিনিষ-

পত্র চাপাইয়া বাহিরে আসিয়া সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কোথায় যে সে উঠিবে কিছুই স্থির নাই; একটা হোটেল-গোছের কিছু খুঁজিয়া লইতে হইবে আর কি? এমন সময় কিছু দূরে দণ্ডায়মান একটি ফীটন গাড়ীর দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। গাড়ীতে একটি মেয়ে বসিয়া আছে। মেয়েটির পরিধানে শুভ্র পরিচ্ছদ, শাড়ীটির পাড়ও অভ্যস্ত সরু। পাথরে গড়া প্রতিমার মত ধীর শুদ্ধ তাহার দেহ, কোন এক ভাবনার অতল সাগরে সে যেন নিমজ্জিত। এমন সময় প্লাটফর্ম ত্যাগ করিবার মুখে পাজাব মেলের এঞ্জিনটা তীব্র বংশীধ্বনি করিয়া উঠিল। মেয়েটি চকিতভাবে মুখ তুলিয়া চাহিল, তাহার পর চীৎকার করিয়া উঠিল। ঘোড়াটাও ভয় পাইয়া গিয়াছে দেখিয়া সোমেন্দ্র ছুটিয়া গিয়া সেটার মুখের রাশ চাপিয়া ধরিল। কিন্তু জানে যারটি স্বভাবতঃই শাস্ত, সে বেশী উৎপাত না করিয়া তখনই আবার স্থির হইয়া গেল। মেয়েটি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আবার বসিয়া পড়িল। একটা বইয়ের ষ্টলের কাছে দাঁড়াইয়া একটি মহিলা কিসের যেন দর করিতেছিলেন, তিনিও ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, “কি হয়েছে বোন, অমন করছ কেন?”

সোমেন্দ্র একটু অপ্রস্তুত বোধ করিতে লাগিল। দুইটি অপরিচিতা মহিলার সামনে এ-রকম বোকার মত দাঁড়াইয়া থাকিতে তাহার ইচ্ছা করিল না। সে তাড়াতাড়ি একটা নমস্কার করিয়া সরিয়া পড়িল। মেয়েটিও হয়ত তাহাকে পরিচিত ভাবিয়াছে। এ-রকম ঘটনা সোমেন্দ্রের জীবনে অনেক ঘটিয়াছে, ইহা নূতন কিছু নয়।

ষ্টেশনের কাছেই একটা ছোট হোটেল আছে, কুলীর কাছে খবর পাইয়া সোমেন্দ্র আপাততঃ সেখানেই গিয়া উঠিল। পরে ভাল জায়গা একটা বাছিয়া লওয়া যাইবে।

পরদিন সকালে সে সবে চা খাইতে বসিয়াছে, এমন সময় খানসামাটা বলিল, নীচে এক ভদ্রলোক তাহার জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন। সোমেন্দ্র কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল, এখানে আবার তাহার খোঁজ করে কে? যাহা হউক, চায়ের পেয়ালাটা শেষ করিয়া সে নীচে নামিয়া গেল। বসিবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল যে একটি ভদ্রলোক একটু অসহিষ্ণু-ভাবে পাশচারি করিতেছেন। লোকটি দেখিতে বেশ বলিষ্ঠ, কি কারণে যে এতটা বিচলিত হইয়াছেন, তাহা সোমেন্দ্র

কিছু বুঝিতে পারিল না। লোকটি প্রৌঢ় বয়স্ক, রগের কাছে চুলে পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সোমেন্দ্রকে দেখিয়া তিনি দাঁড়াইয়া গেলেন এবং নমস্কার করিয়া বলিলেন, “আপনার নামটা হঠাৎ হোটেলের রেজেষ্টারির খাতায় দেখে আমি দেখা করতে চেয়েছি। আশা করি আপনার কাজের কোনো ক্ষতি করলাম না। আমার বোনের ব্যবহারে কাল হয়ত আপনি একটু অবাক হয়ে থাকবেন। আমার নাম দীনেন্দ্র সাত্তাল।”

সোমেন্দ্র বলিল, “ও, আপনার বোন বুঝি গাড়ীতে বসে-ছিলেন? আমার হঠাৎ আবির্ভাবে তিনি যদি ভয় পেয়ে থাকেন তাহলে আমারই ত ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। আমি ব্যাপারটা তখন ঠিক বুঝতে পারলাম না।”

ভদ্রলোকের মুখখানা অল্প একটু যেন লাল হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, “আপনার কোনোই দোষ নেই। আমার বোন এক সময় আপনার দাদার কাছে গান শিখতেন। আপনার সঙ্গে তেজেন্দ্র বাবুর সাদৃশ্যটা খুব বেশী, তাই হঠাৎ আপনাকে একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি একটু চমকে গিয়ে থাকবেন।”

সোমেন্দ্র একটু উত্তেজিতভাবে বলিল “ও, শকুন্তলা সাত্তাল বুঝি আপনার বোন? আমি যখন কলেজে পড়ি, তখন তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তিনি এখানে আছেন?”

“হ্যাঁ, বহুদিনই। তার শরীর অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছে, জানেন বোধ হয়?”

সোমেন্দ্র বলিল, “আজ্ঞে না, তাঁর খবর আমি অনেক দিনই পাইনি। তিনি কলকাতায় যখন ছিলেন, বছর দশ আগে, সেই তাঁকে আমি শেষ দেখেছিলাম, তারপর কাল দেখলাম। দাদার সঙ্গে চিঠিপত্র লেখাও আমার বিশেষ চলে না, তাও পারিবারিক বিষয় ছাড়া আর কোনো বিষয়ে আমরা কিছু লিখি না। কিন্তু মিস সাত্তালের অস্থির কথায় শুনে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হলাম।”

দীনেন্দ্র বাবুর ফুঙ্কিত ক্রয়ুগল একটু যেন সমতা প্রাপ্ত হইল। তিনি বলিলেন, “আমি তারই কথায় আপনার কাছে এসেছি সোমেন্দ্র বাবু। সে আপনাকে একবার দেখতে চায়। ভয়ানক জেদ করছে। আমরা শহর থেকে বেশ

কিছু দূরে একটা পাড়াগাঁয়ে থাকি। আমি গাড়ী নিয়েই এসেছি। আপনি যদি অস্থির ক’রে যেতে রাজী হন, তাহলে এখনই নিয়ে যেতে পারি।”

সোমেন্দ্র উঠিয়া পড়িয়া বলিল, “আমি এখনই যাচ্ছি, জিনিষ ক’টা গুছিয়ে নিলেই হয়।”

স্বার্টকেস ও হোল্ডঅল লইয়া কিছু পরেই সোমেন্দ্র নীচে নামিয়া আসিল। দীনেন্দ্র নামিতে নামিতে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “এক-এক দিন আমি নিজেই গাড়ী চালাই, আজ আপনার সঙ্গে একটু কথা বলব বলে কোচম্যানটাকে নিয়ে এসেছি।”

দুই জনে গিয়া গাড়ীতে বসিলেন, জিনিষগুলি পায়ের কাছেই রাখা হইল। গাড়ীটা চাড়াইয়া দিতেই দীনেন্দ্র বলিলেন, “আমার বোনের বিষয় আপনাকে কিছু বলা উচিত, কোথায় ঠিক আরম্ভ করব বুঝতে পারছি না। আপনার দাদার সঙ্গে সে ভারতবর্ষের অনেক জায়গায়ই ঘুরেছে, ইউরোপেও একবার গিয়েছে। ‘বাসন্তী’র গান তারই মুখে লোকে অনেক স্থানেই প্রথমে শুনেছে। আপনি তা’র বিষয় কতটা জানেন, বলতে পারি না—”

সোমেন্দ্র বলিল, “বিশেষ কিছুই জানি না। দাদা বলতেন, উনি তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাশালিনী। আমি যখন তাঁকে দেখেছিলাম, তখন তিনি রূপে গুণে অতুলনীয় ছিলেন, আমরা সকলেই তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলাম।”

দীনেন্দ্র খানিক চুপ করিয়া রহিলেন, অন্তরের দুঃখের ভারেই তিনি যেন শ্রিয়মাণ। তাহার পর বলিতে লাগিলেন, “ঠিকই বলেছেন। তার ভিতর অসামান্য প্রতিভা ছিল। এটা সে পরিবারের কারও কাছে পায়নি, কারণ আমরা অতি সাধারণ লোক। যা-কিছু সে হয়েছে, তাকে নিজের চেষ্টার জোরে হ’তে হয়েছে। পাড়াগাঁয়ের থেকে সে শহরে জোর ক’রে আসে, লেখাপড়া শিখবে বলে। বাবা-মার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এসেছিল, কারণ তাঁরা অল্প মেয়েদের মত সকাল সকাল বিয়ে দিয়ে তার বিষয়েও দায়িত্ব মুক্ত হ’তে চেয়েছিলেন। তারপর আশ্চর্য গান গাইবার শক্তি যখন প্রকাশ পেল, তখন ভাল ক’রে শিক্ষা নেবার জন্যে কলকাতায় এল। তারপর আপনার ভাই আর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ত দেশ-বিদেশ সর্বত্রই বেড়াল। এই সবই তার ভাল লাগত, বাঙালী-ঘরের বন্ধ আবহাওয়া



অভিশপ্ত
শ্রীরামগোপাল বিজয়বর্গীষ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা:

সে সহিতে পারত না। আর এখন সে এই বনগাঁয়ে তিল তিল ক'রে মরছে, যা-কিছু সে ভালবাসত সব-কিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে। আমাদের দলে আর সে মিশে যায় না। অনেক কাল চাড়াছাড়ি হওয়াতে আমাদের ধরণধারণ সব আলাদা রকম হয়ে গিয়েছে, অত্যন্তই আলাদা রকম। বেচারী শকুন্তলা বড়ই অসুখী।”

সোমেন্দ্র বলিল, “আপনার কথা শুনে যে কি রকম দুঃখিত হলাম তা বলতে পারব না।”

দীনেন্দ্র সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, “ওর কাহিনীর ভিতর কতখানি দুঃখ যে লুকান আছে, তা আমি ছাড়া কে বুঝবে? চোখের উপর তার যন্ত্রণা দিনের পর দিন দেখে দেখে জগৎসংসারে আমার অরুচি ধ'রে গেছে। শকুন্তলার নিজের কিছু টাকাও ছিল, কিন্তু স্বাস্থ্যের সন্ধানে পাহাড়ে গিয়ে গিয়ে তাও সে খরচ ক'রে ফেলেছে। তার স্বাস্থ্য হঠাৎ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ল। আমি অবশ্য এখনও তাকে পাগাড়ে পাঠাতে পারি, কিন্তু ডাক্তারেরা বলেন আর পাঠিয়ে কোন লাভ নেই। তার সারবার আর কোনও সম্ভাবনা নেই, এখন দিন-কটা কোনোমতে কাটিয়ে দেওয়া। তার অবস্থা যে এত খারাপ, তা তাকে দেখবার আগে বুঝতেও পারিনি। সে আমায় শুধু লিখেছিল যে, একটু দুর্বল বোধ করছে বলে আমার কাছে আসতে চায়। কিন্তু তার অবস্থা দেখে এখন মনে হয় দুনিয়ার আর যে-কোনো জায়গায় সে এখানকার চেয়ে সুখী থাকত। কিন্তু সে আর এখান থেকে যেতে রাজী নয় বলে এখানে জীবনটাকে আঁকড়ে ধরবার কোনো ইচ্ছা থাকে না। সে যখন ছোট ছিল, তখন আমি শহরে মোটরচালকের কাজ করতাম। সে যা-কিছু চাইত, রোজ সন্ধ্যার সময় নিয়ে যেতাম। ৪০ টাকা মাইনে পেতাম, কিন্তু কোনো দিন তার কোনো সাধ অপূর্ণ রাখিনি। এখন টাকাকড়ি ঢের করেছি, কিন্তু আমার সাধ্য নেই যে তাকে এক মুহূর্তের জন্যে শান্তি দিতে পারি।”

শহর ছাড়াইয়া তাহারা মাইলের পর মাইল চলিয়াছে। সূর্যের উত্তাপ ক্রমেই প্রখর হইয়া উঠিতেছে। সোমেন্দ্র কি ভাবিতেছে কে জানে?

অবশেষে গাড়ীটা আসিয়া দাঁড়াইল একটা গেটের সামনে। প্রকাণ্ড বাগান, পাঁচিল দিয়া ঘেরা, পিছন দিকে মস্তবড় একটা

বাংলাবাড়ি। কাছাকাছি মানুষের বাসের আর কোনো চিহ্ন দেখা যায় না।

দীনেন্দ্র নামিয়া পড়িয়া বলিলেন, “যাক্ এসে পড়া গেছে। আপনি বুদ্ধিমান মানুষ, আপনাকে আর আমি কি বলব?”

গেটের কাছে একটি শীর্ণকৃতি মহিলা অগ্রসর হইয়া আসিলেন, ইহাকেই সোমেন্দ্র ষ্টেশনে দেখিয়াছিল। ভদ্র-মহিলা বিধবা বলিয়া সোমেন্দ্রের বোধ হইল। দীনেন্দ্র পরিচয় করিয়া দিলেন, “আমার বড় বোন, সাবিত্রী।” সোমেন্দ্র তাঁহাকে নমস্কার করিল।

সাবিত্রী বোধ হয় বাগানে কোনো কাজে আসিয়াছিলেন, দীনেন্দ্রের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “এঁকে নিয়ে যাও বসবার ঘরে, শুকু সেইখানে আছে।”

সোমেন্দ্র দীনেন্দ্রের পিছন-পিছন বসিবার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। ঘরখানি খালি, কিন্তু ভিতরে ঢুকিয়াই সে চম্কাইয়া উঠিল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের এক অখ্যাত পাড়াগাঁয়ে এমন ভাবে সাজান ঘর দেখিবার প্রত্যাশা সে করে নাই। ঠিক যেন বালীগঞ্জের কোনো অভিজাত পরিবারের ড্রয়িং-রুম! একবার দরজার পর্দার ফাঁকে সে বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, দিগন্তব্যাপী ধূলিসমাকীর্ণ অহুর্কর প্রান্তর। না, সে কলিকাতায় নাই।

ঘরখানা তাহার বড়ই চেনা-চেনা বোধ হইতে লাগিল। কোথায় সে এ-ঘর দেখিয়াছে? একদিকে মস্তবড় একটা পিয়ানো, তাহার ঠিক উপরেই তেজেন্দ্রের একটি বড় ফোটোগ্রাফ। সোমেন্দ্রের মস্তিষ্কের ভিতরটা অকস্মাৎ পরিষ্কার হইয়া গেল। ঘরখানি অবিকল তেজেন্দ্রের কলিকাতার বাড়ির ড্রয়িং-রুমের নকল। এমন নিখুঁৎ নকল যে, সোমেন্দ্রের মনে হইতে লাগিল এখনই রঙীন রেশমের পর্দা তুলিয়া তেজেন্দ্র ঘরে আসিয়া ঢুকিবে। সমস্ত ঘরখানি তাহার ব্যক্তিত্বে পরিব্যাপ্ত।

ঘরের দেওয়ালে অনেকগুলি ছবি, তাহার ভিতর শকুন্তলারও প্রথম যৌবনের একটি ছবি রহিয়াছে। এই সময়েই সোমেন্দ্র তাহাকে প্রথম দেখিয়াছিল। সেই দিনগুলি তাহার মনে পড়িল। শকুন্তলার চোখের একটি চাহনি, তাহার রঙীন অকলপ্রান্তের একটি হিলোল, তখন তরুণ সোমেন্দ্রকে পাগল করিয়া তুলিত। এতকাল পরেও

ছবিখানার সামনে দাঁড়াইয়া তাহার বৃকের ভিতরটা কাঁপিতে লাগিল। কি অপূর্ব মহিমা তার দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে, তার চোখের দৃষ্টিতে।

সোমেন্দ্র কতক্ষণ যে ছবিখানার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, তাহা সে নিজেই ভুলিয়া গিয়াছিল। দরজা খোলার শব্দে চমকিয়া সে ফিরিয়া চাহিল। পর্দা ঠেলিয়া একটি দীর্ঘাঙ্গী তরুণী ঘরে ঢুকিল, এবং সোমেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল। সোমেন্দ্রকে নমস্কার করিয়া কি যেন বলিতে গেল কিন্তু হঠাৎ কাশিয়া মুখ ফিরাইল। তাহার পর আবার তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, “বেশ পুরো নাটকীয় প্রথায় আমার প্রবেশটা হ’ল। আপনি অল্পগ্রহ করে যে এসেছেন, এতে আমি কত স্তম্ভী তা বলতে পারি নে।”

শকুন্তলা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কথা বলিতেছে বটে, কিন্তু দেখিতেছে যেন অন্য কাহাকেও। নিজেকে এই অবসরে সোমেন্দ্র একটু সামলাইয়া লইল। নিষ্ঠুর ব্যাধি যে সেই অসাধারণ সৌন্দর্যকে এতখানি ধ্বংস করিয়াছে তাহা সে ভাবিতে পারে নাই। শকুন্তলার পরিচ্ছদটি যথেষ্ট আলাগা ও টিলাঢালা, তবু তাহার সর্বাঙ্গের অস্থিপঞ্জর তাহার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেগুলিকে লুকাইবার উপায় নাই। তাহার কমনীয় দেহলতা ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া পড়িয়াছে, প্রতিপদক্ষেপে সে টলিতেছে, বাহু দুইটি যেন অস্বাভাবিক রকম লম্বা, হাত দু-খানি পাথরের মত শাদা ও তুষারশীতল। মুখের পরিবর্তন তত বেশী হয় নাই, মাথাটি তেমনি রাণীর মত গর্ভিত ভাবে উন্নত, চক্ষু দুটি জ্যোতিঃপূর্ণ, গণ্ডদেশে পূর্বেই মত উজ্জ্বল রক্তোচ্ছ্বাস। সবই আছে, অথচ যেন জরা ও ব্যাধির ছায়ায় আচ্ছন্ন।

সে একটি সোফায় বসিয়া কুশনগুলি নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। তাহার পর বলিল, “আমার চেহারা একেবারে বদলে গেছে তা আমি জানি, কিন্তু আপনি সেটা নিয়ে বেশী ভাববেন না, ওটা ধরেই নিন। ও-সব সামান্য বিষয়ে সময় নষ্ট করতে আমরা পারব না। আর আমি যদি অকারণেও বিরক্ত হই তা হ’লেও কিছু মনে করবেন না, ও-টাও রোগের একটা লক্ষণ।”

সোমেন্দ্র বলিল, “আজ যদি আপনার শরীর ভাল না থাকে, ত থাক না? আমি কাল আসব না-হয়?”

শকুন্তলা ব্যস্ত হইয়া বলিল, “আরে না, না, কি যে বলেন! আমি নিরুজ্জনে থেকে-থেকে আর যে লোকগুলোকে চাই না, অবিমিশ্র তাদেরই সঙ্গস্থ উপভোগ করে করে একেবারে হাড়ে জ্বালাতন হয়ে গেছি। এই গ্রামে আবার একটি প্রচারক আছেন, তিনি আজ সকালে এসেছিলেন। তিনি সর্বদা এমন ভাবে কথা বলেন যেন আমার গত জীবনটা পাপে ভরপুর ছিল। কিন্তু তাঁর কথাও থাক। আমাকে একটু কলকাতার কথা বলুন; দাদা বলছেন যে আপনি সোজা কলকাতা থেকেই আসছেন। কলকাতাটা এখন কেমন? ভোরের বেলা গড়ের মাঠে ফুল পাতা আর শিশির-ভেজা ঘাসের যে-গন্ধটা পাওয়া যায়, তা একবার বুকভরে নিঃশ্বাসের সঙ্গে যদি টেনে নিতে পারি তাহ’লে এক-শ বোতল কডলিভার অয়েল খাওয়ার কাজ আমার হয়ে যায়। বালীগঞ্জের মাঠের ধারের সেই যে রাস্তাটা তার গাছগুলি তেমন “সোনালী রূপালি সবুজে সুনীলে” ঝলমল করছে কি, না পাতা ঝরে গেছে? আপনার দাদা সেই যে বাড়িটার থাকতেন, সেটার এখন কে আছে? গানের স্কুলটা আছে কি, না উঠে গেছে? থিয়েটারে এখন কোন্ নাটকটা সবচেয়ে নাম করেছে? কলকাতার খাওয়া পরা প্রভৃতির নূতনতম ফ্যাশান কি? আঃ, সেখানে যদি মরতে পারতাম!” হঠাৎ একটা কাশির ধমক আসিয়া তাহার কথা-বলা বন্ধ হইয়া গেল। তাহার কথার উত্তরে সোমেন্দ্র কলিকাতায় সম্প্রতি কাহাকে কাহাকে দেখিয়াছে, নূতন কি কি গান খুব জনপ্রিয় হইয়াছে, তাহারই গল্প জুড়িয়া দিল। নূতনতম থিয়েটারের ষ্টেজটা কি রকম অদ্ভুত আকারের হইয়াছে তাহা পেন্সিল দিয়া আঁকিয়া দেখাইতে দেখাইতে হঠাৎ এক সময় সোমেন্দ্র বুঝিতে পারিল যে, শকুন্তলা তাহার কথার এক বর্ণও শুনিতেন না, সে শুধু একদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। সোফার কুশনগুলিতে ভর দিয়া সে একটু পিছন হেলিয়া বসিয়া আছে, তাহার চোখ দুটি অর্ধমুদ্রিত। তাহারই ভিতর দিয়া সে সোমেন্দ্রকে দেখিতেছে, যেমন ভাবে চিত্রকর তাহার চিত্রের দিকে তাকায়। সোমেন্দ্র নিজের বর্ণনা হঠাৎ সমাপ্ত করিয়া, পেন্সিলটা পকেটে ঢুকাইয়া রাখিল। শকুন্তলা বলিল, “ভেজেন্দ্র বাবুর সঙ্গে আপনার কি অদ্ভুত সাদৃশ্য!”

সোমেন্দ্র হাসিয়া উঠিল, তাহার দুই চোখের দৃষ্টিতে একটু ঘেন ছেলেমানুষী অহকার ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, “সত্যিই অদ্ভুত। কিন্তু আমি এতে অনেক সুবিধাও পেয়েছি। অনেক বন্ধু আমার জীবনে এক কারণে প্রবেশ করেছেন, আপনাকেও হয়ত আমি বন্ধুরূপে পাব।”

শকুন্তলা তাহার দিকে একটি চকিত অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, “তা আপনি বহু দিন আগেই পেয়েছেন। অল্পবয়সে আপনি কি রকম গর্ভিত আর গম্ভীর ছিলেন আপনার তা মনে আছে? লোকের দিকে কেমন একদৃষ্টে চেয়ে থাকতেন এক তারা ঝিরে তাকালে মুখটা আপনার লাল আর বিরক্ত হয়ে উঠত? সেই যে একদিন সন্ধ্যায় গানের রিহাসলের পর আমাকে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন, আপনার মনে আছে? আমার সঙ্গে সারাপথ একটা কথাও বলেন নি।”

“সে নীরবতার কারণটা যে আমার মঙ্গলমুগ্ধভাব, তা হয়ত আপনি তখনই বুঝেছিলেন?”

শকুন্তলা বলিল, “আমার কিন্তু মনে হয়েছিল আপনি ঢং করছেন, তখনকার ছেলেদের ঐ এক রোগ ছিল। কিন্তু আপনার ঐ রকম ব্যবহারে আমি একটু অবাকও হয়েছিলাম, কারণ নিঃসম্পর্কীয়া মেয়ে আপনি ঢেরই দেখে থাকবেন, আপনার দাদার গানের রিহাসলগুলিতে তাদের সঙ্গে আলাপও ছিল নিশ্চয়।”

সোমেন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিল, “মোটাই না। আমি তাঁদের চোখে দেখতাম মাত্র। দাদা মাঝে-মাঝে আমাকে ডেকে পাঠাতেন গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজাতে, অথবা রিহাসলে কাকুর অনুপস্থিতির ফাঁক ভরাতে। গাড়ীটাড়িও মাঝে মাঝে ডেকে দিতাম, কিন্তু আমার নিয়ে কেউ সময় নষ্ট করত না। দাদার সঙ্গে সাদৃশ্যের কথাটা কেউ কেউ বলত বটে।”

শকুন্তলা বলিল, “আমিও সেটা তখন লক্ষ্য করতাম, কিন্তু আপনার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাদৃশ্যটাও বেড়েছে। এটা একটু আশ্চর্য না? আপনাদের দু-জনের জীবন একেবারে দু-রকম। শুধু পারিবারিক সাদৃশ্য এটা নয়, সত্যিই ঘেন তাঁর ব্যক্তিত্ব এখন আপনার মুখের ভিতর দিয়ে উকি মারে। এটা বাস্তবিক একটু রহস্যময়।”

জানলার লাল পর্দাগুলি হাওয়ায় উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছিল, সোমেন্দ্র তাহার ফাঁকে ফাঁকে বাহিরের রৌদ্রদগ্ধ মরুদৃশ্যের দিকে চাহিয়া ছিল। কিছু পরে সে বলিল, “ছোটবেলায় এই জিনিষটাতে আমার একটু গোপন লজ্জা ছিল। অবশ্য এটা ঘুচে যাক, তাও আমি চাইতাম না। আমার মায়ের সঙ্গে সম্পর্কেও এই সাদৃশ্যের ছায়া গিয়ে পড়েছিল। দাদা খুব অল্প বয়সে একবার বিলাত চলে যায়, মা একেবারে তখন ভেঙে পড়েন। আমাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে কোনো কর্তব্যের ক্রটি তিনি করেন নি, কিন্তু সকলেই জানত যে বড়ছেলেটির জন্মে বাকি ক’টিকে তিনি বানের জলে ভাসিয়ে দিতে পারেন। সন্ধ্যার সময় মাঝে মাঝে তিনি আমাকে কাছে ডেকে আমার মুখখানা তাঁর বুকের উপর চেপে ধরতেন। তখনই বুঝতাম যে তিনি দাদার কথা ভাবছেন।

শকুন্তলা বলিল, “বেচারি আপনি! বাস্তবিক ভেজেন্দ্র বাবু মানুষের ভালবাসা যে-পরিমাণ পেয়েছেন, তা আর কেউ কখনও পাবনি বোধ হয়। তাঁর খবর কি? খবরের কাগজে ছাড়া আর ত তাঁর কোনো খবরই আমি এখন পাই না। মাঝে তিনি আলজিয়ার্সে বেড়াতে গিয়েছিলেন, শুনেছিলাম। বাবা, পৃথিবীর কোন দেশ আর বাকি রাখলেন না।”

সোমেন্দ্র হাসিয়া বলিল, “সত্যি, দাদার নিজের দেশে বাস আর হয়ে উঠে না। দরজী দিয়ে কাপড় করাতে, আর গোটা-কয়েক চেক কার্টতে তাঁকে মধ্যে মধ্যে আসতে হয় বটে।”

শকুন্তলা বলিল, “তিনি ঐ-দেশী স্বরে একটা নৃতন গীতি-নাট্য লিখছেন বলে শুনেছিলাম, এতদিনে সেটা বেরিয়ে গেছে বোধ হয়। শেষ যখন আমাকে চিঠি লেখেন তখন আমার অসুখের খুব বাড়াবাড়ি, সেটার উত্তর দিতে পারি নি। তারপর আর চিঠিপত্র পাই নি।”

সোমেন্দ্র পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া বলিল, “এইটা মাসখানেক আগে লিখেছেন। সময়-মত পড়ে দেখবেন।”

শকুন্তলা চিঠিখানা হাতে করিয়া বলিল, “অনেক ধন্যবাদ, এটা আমার কাছেই থাক। এখন আমার একটা কিছু বাজিয়ে শোনাবেন কি? যা আপনার খুশী। যদি নৃতন কিছু স্বর উঠে থাকে তাই শোনান।”

সোমেন্দ্র গিয়া পিয়ানোর সম্মুখে বসিল। শকুন্তলাও

একখানা চেয়ার টানিয়া আনিয়া নিকটে বসিল, বসিয়া একদৃষ্টে সোমেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ইহার মুখে তেজেন্দ্রের সাদৃশ্য এত কোথায় বোধ হয়? দেহের গঠন ত এক নয়, সোমেন্দ্র তেজেন্দ্রের চেয়ে লম্বা চওড়ায় অনেকখানি বড়, মুখের 'কাট' একই রকম, তবে রং বিভিন্ন। চোখ দু-জনেরই নীল, কিন্তু সোমেন্দ্রের চোখের দৃষ্টি গভীর, চিন্তাকুল, তেজেন্দ্রের চোখ হইতে সারাম্পণ যেন আলো ঠিকরাইয়া পড়ে, সে-চোখে নিতানূতন ভাবের আভাস। গভীর, ধীরস্বভাব, সোমেন্দ্রকে দোঁধিয়া কেন যে চিরতরুণ, উজ্জ্বলপ্রবণ তেজেন্দ্রকে এত বেশী করিয়া মনে পড়ে, তাহা বুঝিতে পারা শক্ত। যদিও তেজেন্দ্র সোমেন্দ্রের চেয়ে দশ বৎসরের বড়, যদিও তাহার চুলে পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে, তবু তাহার মুখ যেন কুড়ি বৎসরের তরুণের মুখ, কথায় মনের ভাব প্রকাশ করিবার আগেই মুখের ভাবেই তাহা ধরা পাড়িয়া যায়।

রাত্রে সকলে খাইয়া শুইতে যাইবার পরেও সোমেন্দ্র অনেকক্ষণ বারান্দায় বসিয়া রহিল। অতীতের কত স্মৃতিই না তাহার মনে জাগিতে লাগিল। শকুন্তলাকে সে হয়ত প্রথম যৌবনে ভালই বাসিয়াছিল। সে বহুদিনের কথা, সে বেদনাও সে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে, তবু কোনো নারীই তাহার জীবনে আর স্থান পায় নাই। সোমেন্দ্রের বোধ হইতে লাগিল সে যেন কত শত বৎসর ধরিয়া বাঁচিয়া আছে, এই না-পাওয়ার ব্যথাও যেন তাহার চিরসার্থী।

শকুন্তলা তখন তেজেন্দ্রের অতি প্রিয় ছাত্রী ছিল, দুই জনের প্রতিভার চরমতম বিকাশ ঘটিয়াছিল পরস্পরের সান্নিধ্যে। তাহাদের সঙ্গীতের মোহিনীশক্তি সমস্ত রাজধানীকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। সোমেন্দ্র বসিয়া বসিয়া দেখিত, শুনিত, তাহার বৃকের ভিতর নিরাশা ক্রমেই জমাট হইয়া আসিত। ষে-দ্বার খুলিবার কোনো আশাই তাহার নাই, সে-দ্বারে আঘাত করা সে অবশেষে ছাড়িয়াই দিল। শকুন্তলার হৃদয়ে সে কখনও স্থান পাইল না।

সোমেন্দ্র স্থির করিয়া আসিয়াছিল যে এখানে এক সপ্তাহ মাত্র থাকিবে, কিন্তু এক সপ্তাহ গড়াইতে গড়াইতে শেষে তিন সপ্তাহে গিয়া ঠেকিল। কি করিয়া যে সে মুক্তি পাইবে তাহা সে ভাবিয়া পায় না। একটা দ্বার আছে বটে,

কিন্তু সেটার কথা ভাবিতে তাহার মন শিহরিয়া ওঠে। রোজই চিঠি এবং টেলিগ্রাম আসিতেছে, তাহার কর্মজীবনের অসংখ্য তাগিদ। কিন্তু সে নড়িবার নাম করে না, নড়িবার তাহার উপায় নাই। সকালবেলাটা সে বেড়াইয়া কাটাইয়া দেয়, মাইলের পর মাইল হাঁটিয়া চলিয়া যায়। দুপুরে খাওয়ার পর হইতে, সে নিজের কঠোর কর্তব্য পালন করিতে বসে। ভাগ্যবিধাতা তাহাকে বেশ এক অদ্ভুত অভিনয়ের ভার দিয়াছেন। জীবনের প্রথম হইতেই সে এই অভিনয় করিয়া আসিতেছে, যদিও স্থান, কাল এবং অন্ত অভিনেতাগুলি বার-বার বদলাইয়াছে। সোমেন্দ্রের একই কাজ, সে অন্তের স্থান পূর্ণ করিবার জন্যই আছে। সকল ক্ষেত্রে, সকল কালে সে তেজেন্দ্রের ছবি মাত্র, সেইরূপেই তাহার একমাত্র মূল্য, সোমেন্দ্র বলিয়া জগতে তাহার কোনো স্থান নাই। তেজেন্দ্রের জীবন বেগবান নদের মত, শত শত ক্ষুদ্র স্রোত তাহাতে বিলীন হইয়া তাহার বিস্তৃতিসাধন করিয়াছে। সোমেন্দ্রের জীবনও সেইরূপ একটি ক্ষুদ্র স্রোত মাত্র। তেজেন্দ্রের জীবনের রথ অতি দ্রুত চলিয়াছে, তাহার চক্রের তলে নিষ্পিষ্ট হইয়াছে কত দুর্বল প্রাণী। সেগুলির ব্যথা মোচনের চেষ্টা সোমেন্দ্র ইতিপূর্বেও করিয়াছে, এই প্রথম বার নয়। সে নিজের মনের ভাব বিশ্লেষণ করিবার কোন চেষ্টা করিল না, কিন্তু এই মেয়েটির পরলোক-প্রয়াণের পথটিকে একটু সহজ, একটু সুগম, করিবার কাজটা সে ভ্রাতার কাজ বলিয়াই গ্রহণ করিল। প্রতিদিনই সে বেশী করিয়া বুঝিতে লাগিল যে তাহার প্রয়োজন শকুন্তলার কাছে বাড়িয়াই চলিয়াছে অথচ প্রয়োজনটা সত্যই তাহার নয়, সোমেন্দ্রের নয়। নিঃস্বতির কি অদ্ভুত খেয়াল! সে শকুন্তলাকে একটুও যে সাহায্য করিতে পারিতেছে, তাহার কারণ যে সে তেজেন্দ্রের ছবি। যতক্ষণ শকুন্তলা তাহার কাছে বসিয়া থাকে, ততক্ষণ সোমেন্দ্রের রূপ, সোমেন্দ্রের কথা, সোমেন্দ্রের হাতমুখ নাড়ার ভঙ্গীর মধ্যে সে তেজেন্দ্রকেই খুঁজিয়া বেড়ায়। যেটুকু পায় তাহা অবলম্বন করিয়াই সে বাঁচিয়া আছে। তাহার মৃত্যুছাড়াই চিন্তা হইতেই অভিজুত, কত সুখের স্বপ্ন, কত বিগত দিনের স্মৃতি তাহার দিনগুলি জুড়িয়া থাকে, রাত্রে সে গভীর ঘুমে অচেতন হইয়া পড়ে। নিঃস্বির মরণের কথা শকুন্তলা আর ভাবিবার অবসর পায় না।

শকুন্তলার সঙ্গে দেখা হইবার কয়েক দিন পরেই সোমেন্দ্র ভ্রাতাকে চিঠি লিখিয়াছিল। বিশেষ কিছু খুলিয়া বলে নাই, শুধু জানাইয়াছিল শকুন্তলা মৃত্যুপথযাত্রিণী, তেজেন্দ্র যেন তাহাকে একটা চিঠি লেখে। সে জানিত তেজেন্দ্র এ-অনুরোধ রক্ষা করিবে, অতি সুন্দর ভাবে করিবে, ইহা তেজেন্দ্রের স্বভাবের একটা বিশেষ গুণ। ঠিক যাহা বলা উচিত তাহা সে বলিবে, অতি মধুর, অতি সমন্বিত, অতি কমনীয় করিয়াই বলিবে। মাঝে মাঝে সে নিয়তির মত নিষ্ঠুর হয় বটে, কিন্তু সাধারণতঃ সে আশেপাশের সকলকে সুখী করিতেই চেষ্টা করে, তাহাদের অসুখী দেখিলে তাহার কবিচিত্ত বিরক্ত হইয়া ওঠে, নিজের ঘরবাড়ি যেমন সে অসুন্দর দেখিতে পারে না তেমনি নিজের চারিদিকে সে আনন্দ ও সৌন্দর্য ভিন্ন আর কিছু চায় না। নিজের ঐশ্বর্যময় চিত্তের সমস্ত সম্পদ ঢালিয়া দিয়া সে সকলকে সম্বোধিত ও আনন্দিত করিয়া রাখে নিজেরই প্রয়োজনে। কিন্তু যে তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়, তাহাকে ভুলিয়া যাইতেও তেজেন্দ্রের বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না।

তেজেন্দ্রকে চিঠি লিখিবার দিন দশ পরে সোমেন্দ্র একদিন বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, শিশুর স্নায় সরল হাসিতে শকুন্তলার মুখ ভরিয়া উঠিয়াছে। সোমেন্দ্র তাহার কাছে আসিবামাত্র সে তাহার হাত ধরিয়া বলিল, “তুমি বোধ হয় জান না যে তোমার মনে যত দয়া, জগতে এতটা কারও নেই?”

সোমেন্দ্র আশ্চর্যে আশ্চর্যে নিজের হাতখানা সরাইয়া লইল। তাহার বোধ হইল আজ প্রথম শকুন্তলা তাহারই দিকে চাহিয়া আছে, তাহার মুখের মধ্যে তেজেন্দ্রের যে ছায়া সেটার দিকে নয়।

শকুন্তলা একখানা বই হাতে করিয়া ছিল, তাহার ভিতর হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া বলিল, “এটা তুমিই তাঁকে দিয়ে লিখিয়েছ না? না হলে তিনি আমার ঠিকানা জানবেন কি করে? আমি যখন দিল্লীতে কিছুদিন ছিলাম, তারপর ত আর তাঁকে চিঠিপত্র কিছুই লিখিনি? তোমার এই কাজটুকু মহাকালের বইয়ের পৃষ্ঠায় লেখা রইল। কিন্তু একটা জিনিষ তোমার দাদা নিজেই করেছেন বোধ হয়, তাঁহার নবতম গীতিনাট্য একখানি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সব কটি গানের স্বরলিপি দেওয়া আছে, তুমি আজ আমার এগুলি বাজিয়ে শোনাবে। চিঠিটা আমি খুলিনি, দেখেছ? তুমি এটা আমার পড়ে শোনাও।”

সোমেন্দ্র একখানি চেয়ার টানিয়া আনিয়া শকুন্তলার সামনে বসিল। চিঠিখানি খুলিয়া দেখিল লম্বা চিঠি, সোমেন্দ্রের মনটা খুশী হইয়া উঠিল। অত্যন্ত সুন্দর, অতি কোমলভাবে লেখা, তেজেন্দ্রের পক্ষেও বাহাদুরীর কাজ বটে। আগ্রায় তাজমহলে বসিয়া চিঠিখানি লেখা, বাতাস যেখানে সৌরভে ভরপুর, আকাশ যেখানে মুক্তার স্নায় স্বচ্ছ আলোকপ্রাণিত, যমুনার কলতান যেখানে চিত্তে অনন্ত সুধারস সিক্ত করিয়া রাখিয়াছে। তাজমহলের ছায়াও হয়ত তেজেন্দ্রের উপর তখন আসিয়া পড়িয়াছিল, কে জানে? চিঠির উপরে পেন্সিল দিয়া তেজেন্দ্র তাজমহলের চূড়ার একটি ছবি আঁকিয়া দিয়াছে। চিঠিতে তাহার নূতন রচনাগুলির অনেক পবন আছে, পুরাতন দিনের স্মৃতিগুলির অনেক উল্লেখ আছে।

চিঠিখানা শেষ করিয়া সোমেন্দ্র মুড়িয়া রাখিয়া দিল। তেজেন্দ্র না বলিতেই বুঝিয়াছে শকুন্তলা কি চায়, তাহাই সে পাঠাইয়াছে। সমস্ত চিঠিখানা তেজেন্দ্রের আশ্চর্য ব্যক্তিত্বে ভরপুর। সোমেন্দ্রের বোধ হইতে লাগিল তাহার ভ্রাতা যেন সম্মুখেই দাঁড়াইয়া আছে। তেজেন্দ্রের ভিতর সত্যই একটা অমানুষিক তেজ, একটা দাহিকাশক্তি আছে, যাহা তাহার সংস্পর্শে আসে তাহাই দগ্ধ হইয়া যায়, সেই তেজও যেন সোমেন্দ্র অনুভব করিতে লাগিল। তাহার পর শকুন্তলার দিকে চাহিয়া দেখিল।

শকুন্তলা বলিল, “ঠিক তাঁর নিজের সুরে লেখা, না? আমি আর এটার উত্তর দেব না, তুমি যখন এর পর তাঁকে দেখবে তখন আমার হয়ে তুমিই উত্তর দিও। তাঁর পরমতম চরমতম বিকাশ যেন হয়, এই মাত্র আমি বলতে চাই। আমি কি বলছি বুঝতে পারছ?”

সোমেন্দ্র বলিল, “পারছি, আশা করি তিনিও পারবেন।”

শকুন্তলা হাতের উপর ভর দিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, “বোকা আর অবুঝ লোকের কাছে নিজেকে তিনি যেন অপব্যয় না করেন। তারা নিজেরা না বোঝে নাই বুঝলে?”

সোমেন্দ্র তাহার উত্তরজনা দেখিয়া ভীত হইয়া বলিল,

“থাকগে ওসব কথা, চল নতুন স্বরলিপিগুলো বাজিয়ে দেখা যাক।”

পিয়ানোর কাছে বসিয়া সোমেন্দ্র বাজাইতে লাগিল। এইবার তেজেন্দ্র কথা কহিতেছে, এই তাহার ষথার্থ ভাষা। ‘বাসন্তী’র ছেলেখেলার স্বর আর নাই, জীবনের গভীরতম রহস্যময় অতলে সে আজ নামিয়া গিয়াছে। সোমেন্দ্রও সমস্ত হৃদয় বাজানায় যেন ঢালিয়া দিল। সে থামিবার পর শকুন্তলা বলিল, “তিনি কত উচুতে উঠে গেছেন দেখেছ? এই শেষের কমটা বছরে তাঁর পূর্ণ পরিণতি হয়েছে। আগে খালি ভালবাসার বেদনার কথাই লিখতেন, কিন্তু এবার লিখেছেন জীবনের বিফলতার বেদনার কথা, মানুষ প্রাণপণে চেষ্টা করছে কিন্তু বিফল হচ্ছে। একেই কবি কীটস্ নরক বলেছিলেন। এই নরকে আজ আমি বাস করছি। সঙ্গে যারা ছিল, তারা দৌড়ে এগিয়ে যাচ্ছে, আমি খালি শুয়ে শুয়ে তাদের পায়ের শব্দ শুন্ছি।”

শকুন্তলা পাশ ফিরিয়া ছুট হাতে নিজের মুখ ঢাকিল। সোমেন্দ্র তাহার পাশে গিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল। এত দিনের মধ্যে আজ প্রথম শকুন্তলা নিজের ব্যর্থ জীবনের বেদনাকে ভাষায় প্রকাশ করিল। ঠাট্টা-ভাষাশা ভিন্ন এ-বিষয়ে সোমেন্দ্র তাহার মুখে কিছুই এতদিন শোনে নাই। তাহার সাহস সোমেন্দ্রকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সে ভয়কণ্ঠে বলিল, “ও-রকম কোরো না, ও-রকম কোরো না। আমি সহ করতে পারছি না।”

শকুন্তলা আবার সোমেন্দ্রের দিকে ফিরিল, তাহার মুখে আবার সেই বিদ্রূপের হাসি, সে-হাসি তার অশ্রুর চেয়েও করুণ। সে বলিল, “থাক্, এ-সব রাত্রে জগু থাক্, তখন ত আর কেউ আমার সঙ্গী থাকবে না। তুমি আবার বাজাও। এই গানগুলি রচনার কথা প্রথম লাহোরে তাঁর মনে আসে, আমি তখন সেখানে ছিলাম। খাবার টেবিলে বসে কেবল গুণ্গুন্ ক’রে স্বর ভাঁজতেন, আর ঠক্ঠক্ ক’রে টেবিল বাজাতেন, তারপর ত কান্দীর চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে ত অস্থখে পড়লেন। বাবা, কি ভীষণ ভুগেছিলেন, তোমার মনে আছে? তাঁর স্ত্রী তখন বোম্বাইয়ে, আমি কলকাতায়। খবর পেয়ে আমিই সবার আগে গিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছলাম। উঃ, সে কি চেহারা! গিয়ে দেখি একটা পুরানো বাড়ির

লাইব্রেরীর মত একটা ঘরে চূপ ক’রে বসে আছেন। আমাকে দেখে অস্থখের কোনো কথা না বলে প্রথমেই বললেন যে, একটা গানে সুন্দর স্বর দিতে পেরেছেন। বাইরে তখন কি ঝড়বৃষ্টি, পুরনো বাড়িটাকে ঠক্ঠক্ ক’রে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। সে রাত্রিটাকে এখনও যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। ঝড়ের মধ্যে আমরা দু-জন শুধু।”

শকুন্তলার মুখে আবার সেই অদ্ভুত রহস্যময় হাসি। সে যেন দূরে দাঁড়াইয়া নিজেকে শুধু বিশ্লেষণ করিতেছে, নিজেকে দেখিয়া হাসিতেছে। এই হাসির উজ্জল বর্ণে সে নিজে কঠিনভাবে আবৃত।

সোমেন্দ্র নিজের হাতের উপর মাথা রাখিয়া বলিল, “তাঁকে তুমি এতখানিই ভালবেসেছিলে?”

শকুন্তলার চোখদুটি মুদ্রিত হইয়া আসিল। সে বলিল, “হাঁ সত্যই ভালবাসতাম। তোমাকে বলতে পেরে আমার বুকের বোবা অনেকখানি হাল্কা হয়ে গেল।”

সোমেন্দ্র ব্যথিতদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, বলিল, “আমাকে এ-কথা জানাতে চাও কি-না, প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি।”

শকুন্তলা বলিল, “দাদার সঙ্গে প্রথম যখন তুমি এলে, তখনই বুঝেছিলাম তোমাকে আমি বলতে পারব। তুমি এত তাঁর মত দেখতে, এ-যেন তাঁকে নিজেকেই বলা। এখন নিশ্চিত হলাম, তিনি কোনদিন-না-কোনদিন জানতে পারবেনই, আর আমাকে করুণা ক’রে অপমান করবেন না।”

সোমেন্দ্র গাঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “কোনদিন যদি না জানতেন, তাহলে কি হ’ত?”

শকুন্তলা বলিল, “এক রকম ক’রে ত তিনি জানেনই? নারীর চোখের ভিতর তাকিয়ে প্রেমোজ্জ্বল দৃষ্টি দেখতে তিনি অভ্যস্ত। যদি কোথাও তা না দেখেন, তাহলে মনে করেন তাঁর নিজের ব্যবহারে কোন ত্রুটি হয়েছে, কোন অভদ্রতা তিনি করেছেন। নারীর সঙ্গ তাঁকে চিরকাল আনন্দ দেয়, সে নারী যদি নির্ঝোঁধ এবং কুৎসিত না হয়। আমিও অল্পদেয় সঙ্গে তাঁর হাসি, তাঁর ঠাট্টা, তাঁর রসাল কথাবার্তা সমানে উপভোগ করেছি। সমস্ত দিনগুলোই যেন এক-একটা উদ্যান-সম্মিলনের মত ছিল, সবাই সেজেগুজে আছে, হাসছে আর মিষ্টি কথা বলছে। তাঁর অসীম সৌজন্যটা সহ্য করাই সব চেয়ে শক্ত ছিল।”

সোমেন্দ্র বলিল, “আর বলো না, তার উপর ঘৃণায় আমার মন যেন ভরে উঠছে।”

শকুন্তলা হাসিয়া খামিয়া গেল, নিজের পাখাখানা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। তাহার পর বলিল, “এতে তাঁর কোনোই দোষ ছিল না। তাঁকে দেখবার আগেই আমি তাঁকে ভালবেসেছিলাম। অনেক চেষ্টায়, অনেক কষ্টে তাঁর কাছে আমি গিয়ে পৌঁছেছিলাম। নিজের মৃত্যুদণ্ড আমি হাসিমুখেই নিয়েছিলাম।”

সোমেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “আমি এইবারে যাই। তোমার এখন একটু চূপচাপ থাকা উচিত, আমিও এখন আর সহ করতে পারছি না।”

শকুন্তলা হাসিমুখে তাহার দিকে একটি হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল, “সত্যি, তিন সপ্তাহ ধরে এই ব্যাপার সহ করা কম কথা নয়। তোমার চেয়ে অনেক বেশী পাপীরও সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত এতে হয়ে যেত।”

সোমেন্দ্র তাহার হাতখানি ধরিয়া চেয়ারের পাশে মাটিতে বসিয়া পড়িল। বলিল, “তোমার কাছে থাকতে চাই, তাই আমি আছি। কলিকাতায় তোমায় যখন প্রথম দেখি, তারপর থেকে কোনো নারীই আমার জীবনে প্রবেশ করতে পারনি। তোমার আমার ভাগ্য একসূত্রেই গাঁথা আছে, ইচ্ছা করলেও তোমাকে আমি ফেলে যেতে পারি না।”

শকুন্তলা সোমেন্দ্রের কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিল, “না, না, ও-কথা বলো না। জীবনে দুঃখবেদনা দেখে দেখে আমার অরুচি ধরে গেছে। ওটা তোমার কিশোর বয়সের একটা ধারণা মাত্র, আমার দুর্দশা দেখে তোমার স্নেহপ্রবণ মনে আবার সেদিনের সুর ভেসে এসেছে এই মাত্র। যে মৃত্যুপথের যাত্রী, তাকে কেউ ওভাবে ভালবাসতে পারে না। আজ যাও এখন, কাল আবার এস।”

তাহার নির্ভীক চোখের দৃষ্টির দিকে চাহিয়া সোমেন্দ্র বাহির হইয়া গেল।

কলিকাতায় যেদিন জেজেন্দ্রের নূতন গীতিনাটোর প্রথম অভিনয়, সেদিন হুদূর উত্তর-পশ্চিমের এক অখ্যাত পল্লীগ্রামে বসিয়া সোমেন্দ্র মানবের দেহের এবং আত্মার শেষ সংগ্রাম দেখিতে লাগিল। এক-এক বার বোধ হইতে লাগিল শকুন্তলার অজ্ঞান আত্মা চিরশান্তির দেশে চলিয়া গিয়াছে,

আবার বোধ হইতে লাগিল—না, তাহা এখনও ঐ অগভীর পিঞ্জরটিকে ত্যাগ করে নাই। শকুন্তলা তখন যেন স্বপ্নের ঘোরে, সে এমন ভাবে কথা বলিতে লাগিল, সে যেন সারিয়া উঠিয়াছে, কলিকাতায় নিজের প্রিয় কাজের ক্ষেত্রে ফিরিয়া চলিয়াছে।

দীনেন্দ্র ঘরে টিকিতে পারিতেছিলেন না, দরজার বাহিরে একখানা খাট টানিয়া লইয়া শুইয়াছিলেন। সোমেন্দ্র এক দৃষ্টিতে মোমবাতির আলোটার দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল, তাহার চোখ যেন ব্যথা করিতেছিল। ক্রমে তাহারও মাথা ঝুঁকিয়া পড়িল, সে চেয়ারে বসিয়া বসিয়াই ঘুমাইতে লাগিল। সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল যেন তেজেন্দ্রের নাটকের অভিনয় দেখিতেছে। দর্শকদের করতালির শব্দ সে শুনিতেছে, রাশি রাশি পুষ্পবৃষ্টি সে দেখিতেছে। ফুলে ঘরের মেঝে পর্যন্ত যেন ঢাকিয়া গেল। সেই ফুলগুলি মাড়াইতে মাড়াইতে তেজেন্দ্র যেন অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। তাহার পাশে সেদিনকার প্রধানা গায়িকা, একটি হরিণনয়না তরুণী।

নাস' আসিয়া তাহার কাঁধে অল্প একটু ঝাঁকুনি দিল, সে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। নাস' হাত দিয়া মোমবাতিটা আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সোমেন্দ্র চাহিয়া দেখিল, শকুন্তলার মোহের ঘোর কাটিয়া গিয়াছে, সে সোমেন্দ্রের দিকেই তাকাইয়া আছে। তাহাকে নিজের বাহুর উপর ভর দিয়া বসাইয়া সোমেন্দ্র ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল। শকুন্তলা উজ্জল চোখে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল, “তেজেন্দ্র, প্রিয়, প্রিয়তম আমার।”

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সোমেন্দ্র তাহাকে শোয়াইয়া দিল, দিয়া দীনেন্দ্রকে ডাকিতে গেল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, শকুন্তলার দুঃখের রাত্রির অবসান হইয়াছে।

দুই দিন পরে এলাহাবাদ ষ্টেশনে সোমেন্দ্র ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। দীনেন্দ্র তাহার পাশে দাঁড়াইয়া, কিন্তু দু-জনেই নীরব।

সোমেন্দ্র অসহিষ্ণুভাবে রেলের লাইনের দিকে কেবলই তাকাইতেছে, পাশে তাহার জিনিষের স্তুপ। দীনেন্দ্রও অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন, এই দুটি মানুষ এখন পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় লইতে পারিলে বাঁচে।

ফ্রেন আসিয়া দাঁড়াইল। দীনেজকে নমস্কার করিয়া
সোমেন্দ্র গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। একদল যাত্রী এখানে
নামিয়া প্রান্তরাশ খাইতে ছুটিয়াছে। কে একজন যেন তাহার
পিছনে বিন্দ্রশুচক চীৎকার করিয়া উঠিল। সোমেন্দ্র কিরিয়া
দেখিল, একটি স্থলকায়ী মহিলা, মূল্যবান পরিচ্ছদপরিহিতা
ও বহু অলঙ্কারে শোভিতা।

মহিলাটি একেবারে তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়া

বলিলেন, “কি আশ্চর্য্য তেজেন বাবু, আপনার সঙ্গে এমন ভাব
দেখা হবে ভাবিনি।”

সোমেন্দ্র বিরস্তুভাবে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “আজ্ঞে
আপনার ভুল হয়েছে, আমি তেজেন্দ্র নই, তার ভাই সোমেন্দ্র।”

বিন্মিতা মহিলাটিকে আর কথা বলিবার অবসর না-দিয়াই
সে একটা কামরায় ঢুকিয়া গেল।*

* Willa Catho হইতে

সরলা

শ্রীশৈলবালা দেবী

ছিলাম মোরা সাতটি বোন,
আমার নাম সরলা।

সাতটি মেয়ে ব'লে মোদের
সবাই ক'রত হেলা।

বাবা আমার ছিলেন না'ক ধনী।

সাতটি মেয়ে চাপল ঘাড়ে শনি।

অতি দুঃখে বর পেলেন বড় দুই জন—

বিদ্বেষেতে পুরল সবার মন।

উঠতে বসতে গালি খাই রাকসী খোকসী,

মায়ের চোখে অশ্রু পড়ে খসি'।

বাবা বলেন, ডুবাবে মোর মাথায় দিয়ে পা,

আমার সাথে বিধাতার এ কি শক্রতা ?

বয়স যখন হ'ল আমার বছর আঠারো,

ঘরের কোণে থাকি ব'সে সামনে না ঘাই কারো।

সেলাই করি উল কুঁচি কাঁথা গাদা গাদা।

আদর ক'রে মাঝে মাঝে বলেন ঠাকুরদাদা,

“হাতের তোদের কি যে গুণপনা,

এক দিন কেউ চেয়েও দেখিল না।

ভাগ্যদোষে জন্মেছিল বাঙালীর মেয়ে,

জীবনটা কাটল রে শুধু অবহেলা পেয়ে।

বিয়ে তোদের হবে না ত রে, ভাই,
শিল্পকাজে নিজের ভার নিতে শেখ তাই।”

আমি ভাবি, কতই না সে হ'ত যে গো ভাল !

ভাগ্য মোদের ঘটতে কি তা দিল ?

এক দিন সে চৈত্র মাসের শেষে,

কাকা বললেন বিদেশ হ'তে এসে,

“সরীর তরে বয়ের খোঁজ পেরোছি মনের মত,

কুলীন ছেলে, চাকরি করে, মাইনে দেড় শত।

ছেলে মেয়ে দু-তিনটি তার ঘরে ;

টাকার অভাব ; দিতে হবে কাজেই দোজবরে।

চল্লিশের বেশী কিন্তু বয়স নয় তার।

বেশী ভাল কোথায় পাব আর ?”

বোশেখ মাসের পয়লা আমার বিয়ে,

বর এসেছেন বরযাত্রী নিয়ে।

চারি দিকে উঠল কানাকানি

বয়ের নাকি অস্থখ বড়,

হ'ল জানাজানি।

কাকা বললেন, “জানি নাই ত এত,
বরের ঘেন ক্ষয়রোগের মত।
ভাল মত বিচার ক’রে দেখ সব কথা,
এর সাথে কি বিয়ে দেওয়া উচিত হবে, দাদা?”

বাবা বললেন, “কপাল ছাড়া পথ ত আর নাই,
কপাল ঠুকে এর হাতেই দিতে হবে, ভাই।
বিয়ের দিনে বর যদি যায় ফিরে
সমাজে মুখ দেখাব কি ক’রে?
এতগুলি মেয়ে ঘরে, উপায় হবে কি?
কপাল ঠুকে এর সাথেই বিয়ে দিয়ে দি।”

বিয়ের পরে গেলাম খসুরবাড়ি,
শুনলাম, তাঁর হয়েছে জ্বর চড়েই রেলের গাড়ী।
বাড়ি গিয়ে ডেকে বললেন ভাঙে,
“আসতে ওকে দিও না মোর কাছে;
দেখলে ওকে জলে আমার দেহ—
মরবার সময় একি গলগ্রহ!”

বৌ-পরিচয়, ফুলশয্যা, হ’ল না বৌভাত,
আদর ক’রে কেউ এসে মোর ধরল না ক হাত।
অবহেলা অনাদরে হইয়ে মলিন
নিরানন্দে গৃহকোণে থাকি নিশিদিন।

দশ দিনের সকালবেলা ব্যাকুল দেখি সবে,
করছে সবাই কানাকানি আজকে কিছু হবে।
সন্ধ্যাবেলা লোকের ভিড় ছিল না তেমন ঘরে,
দেখতে গেলাম কে আমাকে এনেছে বিয়ে ক’রে।
আমায় দেখে রোগী তখন বললেন কীণ স্বরে,
“তুমি কেন এলে আমার ঘরে?
তোমায় দেখে অহুতাপে জলে আমার মন,
জানি না কেন হয়েছিল ছুঁতি এমন!
চিরদুঃখ দিয়ে গেলাম এ-জন্মের তরে,
চিরশত্রু ছিলাম আমি, রেখো মনে ক’রে।”

রাত দশটায় সেদিন সব হয়ে গেল সারা—
বুঝলাম না যে কি পেয়েছি, কি হয়েছি হারা।
থান পরিয়ে সাজিয়ে দিল বিধবার সাজে,
মুছিয়ে দিল সিঁদুরটুকু ছিল সিঁথির মাখে।

হ’য়ে আছি সংসারের সকলের ভার,
অমঙ্গল আসে না কি পরশে আমার।
বাঙালো-ঘরে এমনিতির কতই আছে মেয়ে,
জীবন কাটায় এমনি তারা চিরদুঃখ পেয়ে।
অদৃষ্টকে করে অভিশাপ,
ভাবে মনে জন্মান্তরে করেছি কতই পাপ।



সোভিয়েট রাশিয়ায় নারীর স্থান

শ্রীশশধর সিংহ, পিএইচ-ডি (লণ্ডন)

যাহারা নৃতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, তাহাদের নিকট ইহা অবিদিত নাই যে, মানবসমাজে নারীর হীন অবস্থা চিরকালের নহে। বস্তুতঃ মানবসভ্যতার আদিতে সমাজে স্ত্রী-পুরুষের স্থান ও অধিকার সমতুল্য ছিল। ক্রমে মানবসভ্যতার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নারীর স্থান হীন হইতে হীনতর হইয়া আসিয়াছে। সমাজবিজ্ঞানের এই তথ্যটির পিছনে যে ইতিহাস বর্তমান, তাহা আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে, কেন নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন এ-যাবৎ বিফলতার ম্লান হইয়াছে।

প্রশ্ন ওঠে, তথ্যটি কি? মানবসভ্যতার আদিতে নারীর স্থান পুরুষের সমতুল্য ছিল, কারণ সমাজরক্ষায় নারীর সাহচর্য্য অনিবার্য ছিল। কেবল ঘরকন্মায় নহে, পরিবার ও সমাজের অন্নসংস্থানও নারীর সাহায্য ব্যতীত সম্ভব হইত না। অনেক স্থলেই কৃষিকার্য্য নারীর প্রধান বৃত্তি ছিল। এই হেতু পুরুষ নারীকে সম্মান করিয়াছে ও সামাজিক অধিকারে নারীর সমতা অস্বীকার করিতে পারে নাই। কালে শাস্তি-প্রিয়, স্থিতিশীল কৃষিসভ্যতা অসভ্য যাযাবর জাতিসমূহের দ্বারা অভিভূত হইল। এই দুইয়ের সংঘাত হইতে সমাজে উচ্চ-নীচ ও নারী-পুরুষের ভেদ সৃষ্টি হইল। আর্থিক বৈষম্য সামাজিক ও পারিবারিক বৈষম্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

একগে বুঝা সহজ হইবে, কি হেতু এতকাল নারী-স্বাধীনতা, স্ত্রী-পুরুষের সাম্য প্রভৃতি আদর্শ যুগের কথাতেই পর্য্যবসিত। ইহা সত্য যে, পাশ্চাত্য মহাদেশ বহু কাল হইতে নারীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে নানা সুর্যোগ উপভোগ করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু ইহা হইতে পাশ্চাত্যে স্ত্রীজাতি স্বাধীন বা সমাজে স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার বিদ্যমান, এ-কথা মনে করা নিতান্ত ভুল হইবে। প্রথমতঃ, গত মহাযুদ্ধের প্রাকালে উচ্চশিক্ষা অতি অল্পসংখ্যক অপেক্ষাকৃত ধনী-কন্ডাদের ভাগ্যেই ঘটিত। দ্বিতীয়তঃ, ধনোৎপাদনক্ষেত্রে বা সমাজের অগ্রাণু অধিকাবে পাশ্চাত্য রমণীর সমানাধিকার এখনও স্বীকৃত হয় নাই।

ইহা কাহারও অজানা নাই যে, বুদ্ধাবসানে পাশ্চাত্য-দুহিতা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর অধিকার পাইয়াছে। বর্তমান আলোচনার দিক হইতে ইহার ইতিহাস অতীব জ্ঞানপ্রদ। বৃদ্ধকালে যখন পুরুষ শত্রুনিপাতে ব্যস্ত, তখন সে ধনোৎপাদনে নারীর সাহচর্য্য না চাহিয়া থাকিতে পারে নাই। পাশ্চাত্যে নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উৎস হইল এইখানে। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, কিন্তু নারীর নবলক আর্থিক স্বাধীনতার জের এখনও বিদ্যমান। পাশ্চাত্যে অনেক নারী আজ নিজের ভরণ-পাষণের জগু পুরুষের মুখাপেক্ষী নহেন। বহু যুগের আন্দোলন যাহা দান করিতে সমর্থ হয় নাই, কয়েক বৎসরব্যাপী যুদ্ধ নারীকে তাহা দান করিয়াছে। সুতরাং দেখা গেল যে, পাশ্চাত্যে স্ত্রীজাতির বর্তমান রাজনৈতিক বা অগ্রাণু অধিকারস্বীকার মুখ্যতঃ পুরুষের আদর্শবাদ হেতু নহে, অবস্থার পরিবর্তনকে মানিয়া লওয়া মাত্র।

সোভিয়েটপন্থীদের নিকট নারীর স্বাধীনতা-সংগ্রাম শ্রেণীসংঘর্ষের একপর্যায়ভুক্ত। পূর্বেই দেখা গিয়াছে যে, নৃতত্ত্বের দিক দিয়াও এই মতের সার্থকতা আছে। নারী ও শ্রমিকের স্বাধীনতাহ্রাসের কারণ এক; সুতরাং সমাজে পূর্ণতর সত্তা লাভ করিতে হইলে তাহাদের একই সংগ্রামে নিয়োজিত হইতে হইবে। এই মতের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহা স্ত্রী-পুরুষকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাগ করিবার চেষ্টা করে নাই। নর-নারীর সংগ্রাম মূলতঃ এক; পাশ্চাত্যের— বিশেষতঃ ইংলণ্ডের, স্ত্রীপুরুষের স্বন্দেহ অবাস্তবতা ইহাদের মতবাদে কোন স্থান পায় নাই।

'জারের' আমলে রাশিয়ায় স্ত্রীজাতির অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল। তাহাদের প্রতি সমাজের নানা অগ্রাণু-অবিচারের অবধি ছিল না। রমণীকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখা, তাহার প্রতি পাশবিক আচরণ করা রুশীয় জনসাধারণের নিকট স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইত। স্ত্রীকে প্রহার না করিলে স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা দেখান হয় না—ইহা একটি রুশীয় প্রবাদ। সমাজের চিরন্তন প্রথার বিরুদ্ধে সংস্কারের পথে

বাধার অন্ত ছিল না। তথাপি সোভিয়েট রাশিয়ার স্ত্রী-পুরুষের অধিকারের সম্বন্ধ প্রথম হইতেই স্বীকৃত হইয়াছে। অন্য দেশের সহিত এখানকার প্রভেদ এই যে, বর্তমান রুশীয়-নারীর অধিকার কান্টনিক অধিকার নহে। সোভিয়েট মতবাদ এইরূপ অধিকারে আস্থা রাখে না; কারণ যাহা দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যক্ষ না হইতেছে, তাহা ইহার চক্ষে না থাকার সামিল। এই হেতু, রাশিয়ার নারী-স্বাধীনতার প্রথম সোপান হইয়াছে ধনোৎপাদনে স্ত্রী-পুরুষের সাহচর্য ও সাম্য। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ কেবল যে নারীর কর্মক্ষেত্রের দিক-চক্রবাল প্রসারিত করিয়াছেন তাহা নহে, একই কর্মে নিযুক্ত নারী-পুরুষের আর্থিক সম্ব্যস্তা হুচাইয়াছেন। রাশিয়ার আজ প্রায় এমন কোন ব্যবসায় নাই যাহাতে নারীর স্থান নাই।

অতীতকে মুছিয়া ফেলা সহজ নয়। সুতরাং এ-যাবৎ অধিকাংশ সোভিয়েট নারী অখোপার্জনে পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই অবস্থারও পরিবর্তন ঘটতেছে। রুশীয় নারী ক্রমেই শিল্পনিপুণা হইয়া উঠিতেছে। “পঞ্চ বার্ষিক-সঙ্কল্প” সম্পর্কীয় শক-ব্রিগেড্ (shock-brigade) অর্থাৎ বিশিষ্ট কর্মীদের মধ্যে নারীর স্থান অতি উচ্চে। মার্কিন ইঞ্জিনিয়ারদের মতে শিক্ষায় উৎসাহ ও কর্মকুশলতায় ইহারা অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের অগ্রগামী। অনেক কৃতবিদ্য রমণী ইতিমধ্যেই নানা বিভাগে উচ্চপদ লাভ করিয়াছেন। প্রথমে রাশিয়ার জনসাধারণ নারীর এই নব-প্রতিষ্ঠা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইত। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটয়াছে। দেখা গেল যে, নারীর ব্যক্তিগত হীনতা সম্বন্ধে জনশ্রুতি বহুকালের সংস্কার ছাড়া কিছু নয়।

রবীন্দ্রনাথ “রাশিয়ার চিঠিতে” লিখিয়াছেন, “... ব্যক্তিগত উৎকর্ষই মানবসমাজের স্থায়ী কল্যাণময় প্রাণবান্ আশ্রয়।” অন্য বিষয়ে কিরূপ জানা নাই, কিন্তু নারীর স্বাধীনতা বিষয়ে অন্ততঃ রাশিয়ার নেতৃবৃন্দ ব্যাপ্তিকে সমষ্টির নিকট বলি দিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন নাই। সোভিয়েট রমণীর ব্যক্তিগত উৎকর্ষ ইহাদের প্রধান চিন্তা। যুগের পর যুগ নারী স্বাধীনতা হারাইয়াছে, এক্ষণে তাহা দুই হস্তে ফিরাইয়া দিবার বিপুল প্রয়াস দেখা যাইতেছে। শিক্ষা ও ধনোৎপাদনবিষয়ে সোভিয়েট-নাগরিকা যে অপরিচালিত সুযোগ পাইয়াছে, তাহা

পৃথিবীর অন্য কোথাও অবর্তমান। লক্ষ লক্ষ নারীর দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতার অপচয় দূরীকরণের সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎও সুদৃঢ় হইল, সন্দেহ নাই।

এখানে তর্ক উঠে, বেশ, তা না-হয় হইল, কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে, পরিবারকে বাদ দিয়া সমাজ এক দণ্ড টিকে না। এই তর্কের মীমাংসা সহজে হইবার নয়, কারণ ইহা কেবল যুক্তিসাপেক্ষ নহে। ইহার সহিত আমাদের বহু যুগের সংস্কার জড়িত। সুতরাং যখন রাশিয়ার শত্রুগণ অপবাদ রটাইল যে, সোভিয়েট বিবাহ-বিধিমাতে নারী সমাজের সম্পত্তি এবং রাশিয়ার পরিবার ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে, তখন আমাদের মূঢ় মন ইহা সহজেই বিশ্বাস করিল; সত্যমিথ্যা বিচারের অপেক্ষা রাখিল না। সোভিয়েট-রাষ্ট্রে দাম্পত্য জীবনের ছবি আঁকিতে হইলে প্রথমেই মনে রাখা উচিত যে, সোভিয়েট-মতবাদ কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে চিরকালের বলিয়া স্বীকার করে না। ধনোৎপাদনের বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার রূপ নিঃসৃত বদলাইতেছে; সুতরাং আমরা পরিবার বলিতে যাহা বুঝি তাহা রাশিয়ার চিরস্থায়ী হইবে কি-না কেহ বলিতে পারে না। তথাপি সোভিয়েট কর্তৃপক্ষগণ প্রথম হইতেই পরিবারকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হন নাই। সোভিয়েট বিবাহ-বিধির মূলমন্ত্র হইল সন্তানসম্পত্তি ও সমাজের কল্যাণ। এই হিসাবে রুশীয় বিবাহের আদর্শ অনেকটা আমাদের মত। কিন্তু একটা মস্ত তফাৎ এই যে, ইহা স্ত্রীর স্বাধীন-সত্তাকে উপেক্ষা করে নাই। অন্ত্যাদিকে ইহা পাশ্চাত্যের রোমান্টিক-আদর্শ হইতেও ভিন্ন। যেখানে জীবনযাত্রার স্থায়িত্ব নাই, সেখানে রোমান্স যে কত অলীক, তাহা কাহারও অজানা নাই। সুতরাং রাশিয়ার বিবাহের ভিত্তি পাকা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে অগ্ৰদিক হইতে। এখানে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের আর্থিক-সংস্থান থাকার দক্ষণ ইহাদের সম্বন্ধ সহজ সরল হইয়াছে। অন্য দেশের মত ধন, মান, কুল প্রভৃতি ইহাদের মিলনেচ্ছাকে বিড়ম্বিত করে নাই। প্রথম হইতেই প্রেম, সৌহার্দ ও সাহচর্য ইহাদের জীবনে পরিস্ফুট হইবার সুযোগ পাইল। সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদে স্ত্রী-পুরুষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিতে অস্বাধী বিবাহের পরিসর ক্রমেই ক্ষুদ্র হইয়া আসিয়াছে। এই

কয়েক বছরেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, পরিবার ধ্বংস হওয়া দূরে থাকুক, ইহার ভিত্তি ক্রমেই দৃঢ়তর হইতেছে।

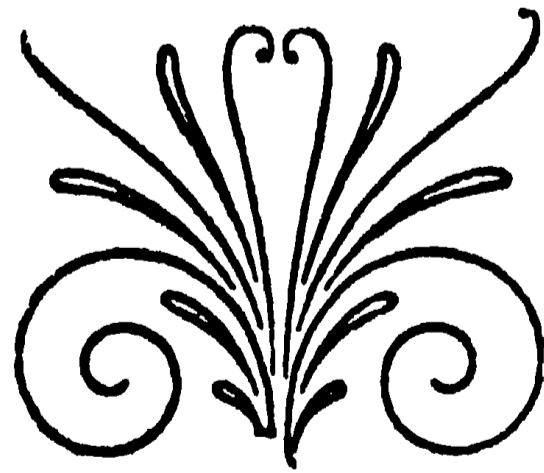
এবার বিবাহের সামাজিক দিকটা দেখা যাক। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট-রাষ্ট্রের চক্ষে বিবাহের প্রধান সার্থকতা সমাজের অর্থাৎ ভবিষ্যৎবংশীয়দের মঙ্গল। এইদিক হইতে এখানে বিবাহ-অবিবাহের কোন কৃত্রিম ভেদ স্বীকার করা হয় না। যেখানেই সম্ভাবনীয় জন্মিয়াছে, সেখানে স্ত্রীপুরুষ বিবাহিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। এইভাবে নবজাত শিশু সমাজের সমক্ষে প্রতিষ্ঠাবান ও উপার্জনকম না-হওয়া পর্যন্ত ভরণপোষণের নিশ্চয়তা লাভ করিল। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ এই উপায়ে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সম্ভানের প্রতি পিতামাতার দায়িত্ব ইহারা কোনপ্রকারে শিথিল হইতে দিবে না। সঙ্গ সঙ্গ ইহাও বলা দরকার, ইহারা বিশ্বাস করেন যে কালে শিশু পরিবারের ক্ষুদ্র বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে এবং বিরাট সমাজের আওতার মানুষ হইবে। এই হইল ইহাদের চরম আদর্শ।

সর্বশেষে আর একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যাইতে পারে। যুগযুগ ধরিয়া পৃথিবীর সর্বত্র সমাজ বারাজনা-বৃত্তি মানিয়া লইয়াছে। কেহ বলিয়াছে, ইহা সমাজের নৈতিক কল্যাণের জন্য অনিবার্য, কেহবা বলিয়াছে ইহা এক শ্রেণীর নারীর স্বভাবসিদ্ধ। সোভিয়েট-মতবাদ প্রথম কারণটিকে একেবারেই মানে না, দ্বিতীয়টি স্বীকৃতও সন্দিহান। বলা বাহুল্য যে, এই মতানুসারে দাসত্বের জায় বারাজনা-বৃত্তিও ধনিক-সভ্যতার সৃষ্টি। ইহার কারণ অপনয়নের সঙ্গে সঙ্গে

সমাজ হইতে ইহা অন্তর্দান করিবে। সমাজের অঙ্গ হিসাবে বারবনিতার কোন স্থান নাই। গত দশ বছর ধরিয়া সোভিয়েট-রাষ্ট্র ইহাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতির জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছে এবং এই প্রবল প্রয়াসের ফলে রাশিয়ার বারাজনার সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। আজ ইহাদের অনেকেই কুলবধু।

সোভিয়েট-মতবাদ জীবনকে ধণ্ডভাবে দেখে নাই। ইহার চক্ষে জাতিতে-জাতিতে, শ্রেণীতে-শ্রেণীতে এবং পুরুষ ও নারীতে বিরোধ মূলতঃ ধনী-নিধনের বিরোধ। ধন ও অধনের প্রভেদ ঘুচাইতে পারিলে সমাজের সর্ববিরোধ অন্তর্হিত হইবে ইহা সোভিয়েটপন্থীরা বিশ্বাস করে এবং ইহারা সেই বিশ্বাসের অনুযায়ী সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহাদের নিকট সমষ্টির স্বার্থ প্রধান হইলেও ইহারা ব্যষ্টিকে সমষ্টির নিকট বলি দিতে উদ্যত হইয়াছে বলিলে ভুল করা হইবে। রাশিয়ার নারী-স্বাধীনতার প্রগতি ইহার প্রমাণ। নারীকে ইহারা কেবল মৌখিক স্বাধীনতা দিয়া তুষ্ট হয় নাই, স্বাধীনতা রক্ষা করিবারও সুযোগ দিয়াছে। এইখানে সোভিয়েট-নীতির বৈশিষ্ট্য। রাশিয়ার নারী বহুযুগ পরে যে-স্বাধীনতা পাইল, তাহাতে ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়েই লাভবান হইবে।*

* এই আলোচনা প্রসঙ্গে পাঠক-পাঠিকাগণ মার্কিন-লেখিকা Ella Winterএর "Red Virtue" (Human Relations in the New Russia), Gollancz, 1933, পাঠ করিলে আনন্দ পাইবেন।



উত্তাপ-প্রয়োগে চিকিৎসা

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল-এম্-এস্

দৈহিক উত্তাপের কথা।—আমরা তুষারমণ্ডিত দেশেই যাই বা মরুভূমির অগ্নিকুণ্ডের মধ্যেই গিয়া পড়ি, আমাদের দৈহিক উত্তাপ সর্বত্র ও সর্বদাই ৯৮ ডিগ্রী (ফারেনহাইট) থাকে। এটি কেমন করিয়া হয়? আমরা যাহা কিছু খাই—বিশেষ করিয়া, স্নেহজাতীয় ও শালীজাতীয় খাদ্য—তাহা হইতে প্রথমে অক্সিজেন মেশার ফলে, দিনরাতই আমাদের দেহে উত্তাপ সৃষ্টি হইতেছে। ঘর্ম, মল, মুত্র, নিঃশ্বাস—এই চারিটির সহিত আমাদের দৈহিক উত্তাপ নিয়তই নির্গত হইতেছে, অর্থাৎ, দেহের মধ্যে উত্তাপ-সৃষ্টি ও উত্তাপ-ত্যাগের ব্যবস্থা আছে। কে বা দেহের কোন্ অংশ নিয়তই এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতেছে? ইহার উত্তর, আমাদের মস্তিষ্কই প্রতিনিয়ত উত্তাপ-সৃষ্টি ও উত্তাপ-ক্ষয় এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতেছে। যখন আমাদের দেহ হিম হয়, বৃষ্টিতে হইবে, হয় উত্তাপ সৃষ্টির অভাব ঘটিয়াছে, নতুবা সামঞ্জস্যবিধানের গোলযোগ ঘটিয়াছে। তেমনি জ্বর হইলে বৃষ্টিতে হইবে, হয় উত্তাপ-সৃষ্টির মাত্রাধিক্য হইয়াছে, নতুবা উত্তাপক্ষয়ের কাণ্ড স্থগিত আছে; নতুবা সামঞ্জস্য-বিধান তাৎকালিক স্তম্ভিত হইয়াছে।

জ্বর হয় কেন?—দেহে উত্তাপবৃদ্ধির কারণত্রয় এইমাত্র আমরা দেখিলাম। কি কি কারণে সামঞ্জস্য-বিধানিনী শক্তির স্তম্ভন বা অকর্মণ্যতা আসে? ইহার উত্তর, প্রধানতঃ জীবাণুঘটিত বিষ যদি যথেষ্টমাত্রায় রক্তে সঞ্চিত হয়, তবে তৎকর্তৃকই এই বিপর্যয় ঘটে। তাহা ছাড়া, মানসিক দুশ্চিন্তা বা উত্তেজনা, যাহার ফলে প্রবলভাবে ও আকস্মিকরূপে স্নায়বিক দৌর্বল্য আসিতে পারে, তাহার ফলেও ঐ সামঞ্জস্য-বিধানিনী শক্তির স্তম্ভন ঘটিতে পারে। মোট কথা, জ্বরটি ব্যারাম নহে, দেহে বিষ-প্রবিষ্ট হইবার বাহ্যিক প্রতিক্রিয়া। অতএব জ্বর ব্যারাম নহে, জ্বর সতর্কতাবানী-প্রচারক মাত্র।

জ্বর কি আমাদের বন্ধু, না শত্রু?—অল্প-স্বল্প পরিমাণে ও কণ্ঠস্থ জ্বর আমাদের শুধু বন্ধু নয়—পরম বন্ধু। কিন্তু

জ্বর যদি খুব তীব্র হয় (১০৫ হইতে ১১০ ডিগ্রী ফাঃ), অথবা অধিকদিন স্থায়ী হয় তবে যক্ষত, মস্তিষ্ক, বৃক্ক, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি অতীব প্রয়োজনীয় যন্ত্রগুলি ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া অকর্মণ্য মৃত্যু আনাইতে পারে। জ্বর আমাদের মিত্র কেন? ইহার উত্তর প্রথমতঃ, দৈহিক বৈকল্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জ্বর আমাদের সতর্ক করে; দ্বিতীয়তঃ, দেহের মধ্যে যে উত্তাপ সৃষ্টি হয়, তদ্বারা জীবাণুরা দক্ষ হয় এবং তৎসহ, তাহাদের বিষও অস্তুতঃ আংশিকভাবে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে—আমাদের বিপদ কাটে; তৃতীয়তঃ, জ্বরে হৃৎপিণ্ডের কাজ দ্রুত হওয়ায় দেহের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশী মাত্রায় অক্সিজেন প্রবেশ করিতে পায় এবং রক্তের শ্বেতকণিকাগুলি উত্যক্ত হইয়া দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট জীবাণুকে ধ্বংস করিতে সচেষ্ট হয়—অর্থাৎ, জ্বরের কারণভূত জীবাণুগুলিকে রীতিমত ভক্ষণ করে (ইহাকেই “ফ্যাগোসাইটোসিস” বা রক্তের বিশিষ্ট জাতীয় শ্বেতকণিকা কর্তৃক রোগবীজাণুভক্ষণক্রিয়া বলে); চতুর্থতঃ, জ্বরে তৃষ্ণা বাড়ায়; তৎপ্রচুর জল পান করিতে হয় বলিয়া ঘর্ম ও প্রস্রাব বাড়ে; অথচ ক্ষুধা নাশ হওয়ায় খাদ্যদ্রব্য সহজে দেহের মধ্যে গৃহীত হইতে পায় না এবং পঞ্চমতঃ, খাদ্যদ্রব্য হইতে একদিকে দৈহিক উত্তাপ ও মল বৃদ্ধি করিবার সম্ভাবনা; অন্যদিকে জীবাণুদের পক্ষে ‘বাড়া-ভাতের’ মত পুষ্টির যোগান বন্ধ হওয়ায় জীবাণুরা না খাইয়া মরে। জ্বরের দ্বারা আমরা এত রকমে উপকৃত হই; অথচ, জনসাধারণ “জ্বর সারাইবার” জন্য চিকিৎসককে উত্যক্ত করেন! প্রকৃত সূচিকিৎসক ইহাতে কর্ণপাত করেন না, তিনি আসল রোগের চিকিৎসায় মনোযোগী হন, কারণ, তিনি জানেন যে, প্রথমতঃ ‘কান টানিলেই মাথা আসে’; এবং দ্বিতীয়তঃ যে বৃদ্ধিমান মাঝি সে ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ না করিয়া নিজ তরীকে নিরাপদে ফুলে ভিড়াইবার জন্যই প্রাণপণ চেষ্টা করে।

জ্বরের উপকারিতা আছে কি?—আছে বইকি। একথা শুনিয়া অনেকে হয়ত শিহরিয়া উঠিবেন। কিন্তু কয়েকটি

হৃদিকিৎস্য ব্যাধিতে ম্যালেরিয়া জীবাণু দেহে প্রবিষ্ট করানোর ফলে রোগী ব্যাধি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়াছে। উপদংশ, উন্মাদ, মৃগী, বৃদ্ধির জড়তা প্রভৃতি অনেক কিছুই একটা তীব্র-জ্বরের আক্রমণের ফলে সারিয়া গিয়াছে। পাগলা-হাসপাতালে সংক্রামক বিসর্প (ইরিসিপেলাস), ম্যালেরিয়া ও এমন কি কলেরা রোগে আক্রান্ত পাগলরা সারিয়া গিয়াছে। উপদংশ-ঘটিত মারাত্মক উন্মাদ-রোগে (General Paralysis of the insane), রোগীর দেহে ম্যালেরিয়া-জীবাণু প্রবিষ্ট করাইয়া এখন সারান হইতেছে। ম্যালেরিয়া-জীবাণুদের প্রয়োজনীয়তা কম; রোগীর দেহে উত্তাপ প্রবেশ করানোই উপকারী। উপযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইলে উপদংশ-ব্যাধির প্রকোপ বন্ধ হইয়া যায়; দক্ষিণ-আমেরিকার রাজ্যগুলিতে একথা বহুবার পরীক্ষিত হইয়াছে। ১৯১২ সালে যুক্তরাজ্যের কার্কস্‌ভিল্‌স্‌ “আমেরিকান্‌ স্কুল অফ্‌ অস্টিওপ্যাথির” একটি ছোট ঘরে মুখ, অঙ্গ প্রভৃতিতে মারাত্মক ক্ষতযুক্ত (“distemper”-গ্রস্ত) চল্লিশটি কুকুরকে বন্ধ করিয়া, সেই ঘরটিকে খুব গরম করা হয়—সেই ঘরের মধ্য দিয়া বাষ্প-গমনাগমনের একাধিক মোটা নল ছিল; সেই নলগুলি এক-একবারে বারো ঘণ্টা বাষ্পপূর্ণ রাখা হইত। শুধু এই চিকিৎসার ফলে, পাঁচ-সাত দিনের পরে এমন কি মরণাপন্ন কুকুরগুলিও একদম সারিয়া গেল।

উত্তাপ ও রোগমুক্তি।—গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই যত ব্যারামের বাড়াবাড়ি; তাহার কারণ, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বায়ু যেমন গরম, তেমনি আর্দ্রতায়ুক্ত এবং তথায় সেই হারে প্রচুর গলিত উদ্ভিদও থাকে। রোগজীবাণুদের বৃদ্ধির অল্পকূল এই অবস্থায়—মধ্যম রকমের উত্তাপ, বায়ুর আর্দ্রতা এবং খাদ্য (গলিত উদ্ভিদ)—গ্রীষ্মপ্রধান দেশে রোগের আধিক্যের হেতু। কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে লোকেরা নগ্নগাজে থাকিতে বাধ্য হয় বলিয়া, সূর্য্যকিরণের কল্যাণে তাহারা অনেকটাই রোগমুক্ত থাকিতে পায়। তৎপরে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকেরা নানা উপায়ে উত্তাপের সাহায্যে রোগ আরোগ্য করিতে শিখে। ব্যারামে সূর্য্যপূজা, সূর্য্যকিরণ সেবন, সূর্য্যপক তৈল ও জল ব্যবহার এদেশে খুবই দেখা যায়—“আরোগ্য ভাস্করাদিচ্ছৎ” কোথাও কোনও রকমের বেদনা উপস্থিত

হইলে আমরা সে স্থানটি রৌদ্রে রাখিয়া এমন ভাবে ঘষিয়া মালিশ করি, যাহাতে সে জায়গাটি খুব উত্তপ্ত হয়। তাহা ছাড়া লবণ-পুটলির সেক, বালির পুটলির সেক, ভিসির বা গমের ভূষির পুলাটিশ, গরম জলের সেক, বাষ্পের স্বেদ এদেশে যখন-তখন দেখা যায়। ইষ্টক বা খোলা উত্তপ্ত করিয়া তাহা হইতে যে উত্তাপ নির্গত হয়, তাহার স্বেদও ব্যবহৃত হয়। তুর্কদেশের, ক্রিমিয়ার ও সুইডেন দেশের গরম জলের বাষ্পের স্বেদ জগৎবিখ্যাত। যেখানে মাটি ফুঁড়িয়া গরম জল বাহির হয়, সেই তপ্ত উৎসের জলে স্নান ও তাহা পান করার প্রথাও অনেক দেশে দেখা যায়। আমেরিকায় আদিম জাতিদের মধ্যে কর্দমস্নানের (mud bath) প্রচলন আছে। এই স্নানের প্রক্রিয়াটি একটু বর্ণনা করিতেছি:—যেখানে এই কর্দমস্নানের ব্যবস্থা আছে তথায় প্রত্যেক সূস্থ ব্যক্তি মাসে অন্ততঃ একবার ইহার আশ্রয় গ্রহণ করে। স্বল্পপরিসর একটি কুটীরে পাথরের শয্যা রচনা করা হয়। তদুপরি স্নানার্থী শয়ন করিলে তাহাকে মোটা কস্মলদ্বারা ঢাকিয়া একটিমাত্র যে দরজা থাকে তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে উপযুক্ত পরি ও ক্রমাগত বড় বড় প্রস্তরখণ্ড সেই ঘরে উত্তপ্ত করা হয় ও জলে ডুবান হয়;—ফলে, সেই ঘরটি গরম ও বাষ্পে ভর্তি হইয়া যায়—এত গরম হয় যে, অনভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে তথায় থাকাও একরকম অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। এই ভাবে প্রায় এক ঘণ্টা থাকাকালীন, দুই জন জোয়ান ব্যক্তি সেই লোকটির সারাদেহ বেশ মর্দন করিতে থাকে। এই ঘর হইতে নিক্রান্ত হইয়া, নিকটস্থ জলাশয়ের কর্দম উঠাইয়া সর্ব্বাঙ্গে ঘষিয়া ঘষিয়া অর্দ্ধঘণ্টা মালিশ করিবার পরে জলাশয়ের শীতল জলে অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান ও সম্ভরণ করা হয়। এইরূপ করার ফলে, চর্ম্ম যেমন মসৃণ তেমনি দৃঢ়, কোমল ও উজ্জ্বল হয়, প্রচুর ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয়, শরীর অতি লঘু, সবল ও নীরোগ হয়। বস্তুতঃ যে-দেশে এই কর্দমস্নানের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে সে-দেশে কোনও ব্যারাম নাই।

উত্তাপ-প্রয়োগের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা।—(১) পূর্বেই ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে এমন রোগীর রক্ত উপদংশঘটিত উন্মাদগ্রস্তের দেহে পিচকারীদ্বারা প্রবিষ্ট করাইয়া, অথবা শেযোক্ত ব্যক্তিকে ম্যালেরিয়া জীবাণুবাহী এনোফিলিস্

মশকীদ্বারা দংশন করাইয়া, তদ্বিষয়ে ম্যালেরিয়া আনাইয়া সেই ব্যক্তির উন্মাদরোগ মুক্তির কথা বলিয়াছি। বলা বাহুল্য যে, ম্যালেরিয়ার জীবাণুদ্বারা রোগী উপকৃত হয় না—জরের দ্বারাই উপকৃত হয়। প্রথম প্রথম যখন উপদংশরোগ-নিরাকরণে সালভাসান বা ৬০৬ সংখ্যক আর্লিকের ঔষধ (Salvarsan বা 606 of Ehrlich) ব্যবহার করা হইত, তখন এক-এক জনের তীব্র জ্বর হইত, সেই জ্বরে যে মারা পড়িত না, সে-ব্যক্তি একদম সারিয়া যাইত। (২) বৈদ্যাতিক উপায়ে দেহের গভীরতম প্রদেশে উত্তাপ প্রেরণ করা Diathermy এখন পাশ্চাত্য চিকিৎসার একটি প্রধান অঙ্গস্বরূপ। বাত, যক্ষণা, প্রদাহ, সন্ধিস্থলের অনড় অবস্থা প্রভৃতি অতি সহজেই এই প্রক্রিয়ায় সারিয়া যাইতেছে। (৩) যে-বৈদ্যাতিক

তরঙ্গ দ্বারা আঙ্গ বেতারবার্তা প্রেরিত হইতেছে, তাহার শর্ট-ওয়েভ বা ক্ষুদ্রায়ত তরঙ্গসাহায্যে রোগী সারাইবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। (৪) কেটারিং (Kettering) নামক একজন বৈজ্ঞানিক বৈদ্যাতিক ষ্টোভের সাহায্যে রোগীর চর্মের চতুর্দিকে যথেষ্টভাবে উত্তাপ প্রয়োগ করিয়া দেহে কৃত্রিম জ্বর আনাইয়া নানা রোগের উপশম ও এমন-কি আরোগ্যও আনাইতেছেন। বিশেষ করিয়া বাতে পঙ্গু হইয়াছেন এমন রোগীদেরকে তিনি এক মাসের মধ্যে ফুটবল খেলিবার মত আরোগ্য করিতেছেন। চক্ষুক্ষত, স্তনের অর্কুদ প্রভৃতিও এই ভাবে আরোগ্য হইতেছে। (৫) যে-রোগীর হাত-পা-পেট ফুলিয়াছে এবং প্রস্রাব ভাল হয় না, তাহাকে ভাল করিয়া কথলাচ্ছাদিত করিয়া কবলের পাটের মধ্যে বাষ্প চালানিলে, প্রচুর ঘর্ম নিঃসরণ হইয়া, সে-রোগীও আরোগ্য লাভ করিতেছে।

চেকের কথা

শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র

এখন মাটির নীচে অর্থ লুকাইয়া রাখা কিংবা পোদ্দারের দোকানে ডিপজিট দিবার প্রথা ক্রমেই দেশ হইতে উঠিয়া যাইতেছে এবং সর্বসাধারণের ব্যাঙ্কের সহিত দেনা-পাওনা বাড়িতেছে। এজন্য ব্যাঙ্কের সহিত চেকের দ্বারা কি করিয়া কাজ-কারবার করিতে হয় সে-বিষয়ে এ-দেশে একটু জ্ঞান বিস্তার হওয়া আবশ্যিক হইয়া পড়িয়াছে।

ব্যাঙ্কের সহিত উহার মক্কেলের সম্পর্ক

এ-বিষয়ে লোকের মনে একটু গোলমালে ধারণা আছে। অনেকে মনে করেন, ব্যাঙ্ক উহার মক্কেলের অর্থ অছি-স্বরূপ গচ্ছিত রাখে মাত্র এবং আবশ্যকমত ঐ অর্থই প্রত্যর্পণ করে, অর্থাৎ যেরূপ মূল্যবান ধাতু কিংবা অপর দ্রব্য নিরাপত্তার জন্ত কোন বিশিষ্ট লোকের বাড়িতে লোকে গচ্ছিত রাখেন এবং আবশ্যকমত ঐ জিনিষ লইয়া আসেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ব্যাঙ্কের সহিত আমানতকারীর সম্পর্ক ঐরূপ নহে। ব্যাঙ্ক আইনবিষয়ে প্রসিদ্ধ লেখক

শুর জন্ প্যাঞ্জেন্ট বলিয়াছেন যে, ব্যাঙ্কের এবং উহার মক্কেলের মধ্যে উত্তমর্গ ও অধমর্গ সম্পর্ক এবং এই সম্পর্কের ভাব তাহাদের পরস্পরের সহিত হিসাবের অবস্থার দ্বারা অবধারিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ টাকা আমানত করা মাত্রই আমানতকারী পাওনাদার ও ব্যাঙ্ক দেনাদার হইয়া পড়ে এবং যাহা ডিপজিট করা হয় উহার সম্পূর্ণ মালিক তৎক্ষণাৎ ব্যাঙ্ক হইয়া থাকে ও ব্যাঙ্ক যথেষ্টভাবে তাহা ব্যবহার করিতে পারে। গচ্ছিত অর্থের উপর আমানতকারীর আর কোন প্রকার স্বত্ত্ব থাকে না এবং ব্যাঙ্ক ঐ গচ্ছিত অর্থ কিভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার কোন নিকাশ দিতে বাধ্য থাকে না। অবশ্য ট্রাষ্টিহিসাবে ব্যাঙ্ক কোন গচ্ছিত অর্থ গ্রহণ করিলে সে স্বতন্ত্র কথা।

এই গচ্ছিত অর্থ ব্যাঙ্ক সুদে খাটাইয়া লাভ করে এবং এজন্য আমানতকারীকে নির্দিষ্ট হারে একটা সুদ দিয়া থাকে। কিন্তু যখন কোন মূল্যবান দ্রব্য ট্রাষ্টিস্বরূপ ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখা হয়, তখন ব্যাঙ্কের উহা ব্যবহার করিবার কোন

অধিকার জন্মে না এবং ঠিক ঐ জিনিষই তাহাকে দরকার-মত ক্ষেত্র দিতে বাধ্য থাকিতে হয়।

ব্যাঙ্কের অধিকার এবং দায়িত্ব

চলতি হিসাবে ডিপজিটের টাকা আমানতকারী চেকের দ্বারা আবশ্যকমতে বাহির করিতে পারেন, কিন্তু এই চেক যে তারিখে 'ইশু' করা হয় তাহার পর উপযুক্ত সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কে দাখিল হওয়া চাই। এই উপযুক্ততা অবস্থার উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ যেখান হইতে চেক ইশু করা হয় সেখান হইতে সাধারণতঃ কত সময়ে উহা ব্যাঙ্কে আসা উচিত, যথেষ্ট অতিরিক্ত সময় দিয়া সে-বিষয় বিবেচনা করা হয়। ব্যাঙ্ক বিনাকারণে কোন চেকের টাকা না দিলে উহাকে আমানতকারীর নিকট ক্ষতিপূরণের জন্ত দায়ী হইতে হয়। সাধারণভাবে মক্কেলের যে-সকল জিনিষ ব্যাঙ্কে জামিনস্বরূপ থাকে, হিসাবের খরচের খাতায় পাওনা হইতে দেনা অধিক হইলে, বিশেষ এগ্রিমেন্ট ভিন্ন ব্যাঙ্কের তাহার উপর দাবির অধিকার থাকে; কিন্তু নিরাপত্তার জন্ত কোন সম্পত্তি ব্যাঙ্কে আমানত রাখিলে, এজন্ত তাহার উপর ব্যাঙ্কের কোন অধিকার জন্মে না। বিশেষ উপযুক্ত স্থল ভিন্ন ব্যাঙ্ক মক্কেলের হিসাবের অবস্থা গোপন রাখিতে বাধ্য, অত্যাধিক উহাকে ক্ষতিপূরণের দায়ী হইতে হয়।

চেক কাহাকে বলে ?

যে ব্যাঙ্কে টাকা আমানত আছে তাহার উপর চাহিবামাত্র (on demand) নিজেকে কিংবা অপরকে কোন নির্দিষ্ট-সংখ্যক টাকা দিবার কোন প্রকার সর্ভবিহীন অর্ডারের নাম চেক। কোন সর্ভযুক্ত অর্ডার কিংবা এক ব্যাঙ্কের অপর ব্যাঙ্কের কিংবা উহার নিজের কোন শাখার উপর অর্ডার চেক নহে। যে অর্ডার চাহিবামাত্র দিবার জন্ত নহে তাহাও চেক নহে। চেকে কোন উপরি দিন (days of grace) নাই। যিনি চেক দেন তিনি চেকদাতা (drawer), তাহার উপর দেওয়া হয় তিনি প্রদানকারী (drawee) এবং যিনি টাকা লইবেন তিনি গ্রহীতা (payee)। চেক-দাতা নিজের গ্রহীতা হইতে পারেন। চেকের অনেক স্বেচছা আছে। নগদ টাকা এক স্থান হইতে অন্য দূরবর্তী স্থানে পাঠাইতে

নানারূপ অসুবিধা ইহাতে দূর করে এবং এজন্ত অনেক খরচ কমিয়া যায়। দুই দিক হইতেই ব্যবসায়ীদিগের যখন টাকা পাঠানোর আবশ্যক হয় তখন পরস্পর চেক পাঠাইলেই ঐ চেক ব্যাঙ্কে গিয়া নগদ টাকা ব্যবহৃত না হইয়াই দেনা-পাওনার হিসাব মিটিয়া যায়। টাকা পাঠানো অপেক্ষা চেক পাঠানো নিরাপদও বটে।

চেক বাহককে প্রদেয় (bearer) কিংবা অর্ডারে প্রদেয় হইতে পারে। যখন চেকের টাকা কোন বিশেষ ব্যক্তিকে কিংবা বাহককে দিতে অথবা কোন ব্যক্তির নাম না করিয়া কেবল বাহককেই দিতে বলা হয় তখন উহা 'বাহক চেক'। আবার যখন অর্ডার চেকের পিঠের শেষ দস্তখতে কোন গ্রহীতার নাম সংযুক্ত না থাকে (blank) তখনও উহা 'বাহক চেক' হইয়া যায়। একবার বাহক চেক ইশু করিলে আর কোন দস্তখত দ্বারাই উহা 'অর্ডার চেক' করা যায় না। এই নিয়মই বরাবর ছিল, কিন্তু বোম্বাই হাইকোর্টের একটি বিচারের ফলে এই নিয়ম বাতিল হইয়াছে।

চেকে দস্তখত

যখন কোন ব্যক্তিবিশেষের অর্ডারে টাকা দিবার জন্ত চেক ইশু করা হয়, তখন চেকের পূর্বে ঐ ব্যক্তির সহি ভিন্ন টাকা পাওয়া যায় না। যখন 'অর্ডার' না লিখিয়া কোন ব্যক্তির নামে চেক দেওয়া হয় তখন তিনি টাকা পাইতে পারেন, কিংবা তিনি উহার পিঠে সহি করিয়া উহা অর্ডার চেকে পরিণত করিতে পারেন। অর্ডার চেকের পূর্বে কেবলমাত্র নিজ নাম দস্তখত করিলে উহাকে 'সাদা' সহি (blank endorsement) বলে। এইরূপ চেকের পূর্বে আর কোন সহি হইয়াও যতবার ইচ্ছা হস্তান্তর হইতে পারে। 'সাদা' সহি না হইয়া কোন ব্যক্তিবিশেষকে দিবার জন্তও চেকের পূর্বে সহি হইতে পারে। এরূপ কোন নাম দিলে তাহাকে 'বিশেষ সহি' (special endorsement) বলে এবং সেস্থলে ঐ ব্যক্তির সহি না হইলে উহা হস্তান্তর হইতে পারে না। যখন কোন চেক বিশেষভাবে কেবল কোন বিশেষ ব্যক্তিকেই গ্রহীতা করিয়া দেওয়া হয়, তখন ঐ বিশেষ ব্যক্তি ভিন্ন অপর কেহই

টাকা পাইতে পারেন না। একবার চেকের পূর্বে সহি করিয়া দিলেই উহা ঐ চেকের মূল্যপ্রাপ্তির প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হয়।

যুক্ত এবং যে-কোন গ্রহীতাকে টাকা দিবার চেক

একের অধিক ব্যক্তিকে কিংবা তাঁহাদের মধ্যে যে-কোন ব্যক্তিকে টাকা দিবার জন্ম চেক দেওয়া চলে। প্রথম স্থলে ঐ সমস্ত ব্যক্তিকেই চেকের পূর্বে সহি করিতে হয়। কেবল ব্যবসায়ের অংশীদার কিংবা এন্ট্রের একজিকিউটর হইলে যে-কোন অংশীদার কিংবা একজিকিউটর অপর সকলের পক্ষে সহি করিতে পারেন। দ্বিতীয় স্থলে যে-কোন একজন সহি করিলেই চলে। যখন কোন ট্রাষ্টিদের নামে চেক ইস্যু হয় তখন সমস্ত ট্রাষ্টিকেই দস্তখত করিতে হয়, কারণ কোন ট্রাষ্টিরই আইনতঃ তাঁহার ক্ষমতা অপরকে দিবার অধিকার নাই।

চেক-সহির উদাহরণ

উপরিউক্ত কারণসমূহের জন্ম সাধারণের মধ্যে এই চেক-সহির ব্যাপারে অনেক সময়ে গোলমাল ঘটিয়া থাকে। নিম্নের উদাহরণ কয়েকটি সর্বসাধারণকে এ-বিষয়ে সাহায্য করিবে :—

গ্রহীতার সহি

(Endorsement by the payee)

- (ক) বি, সি, গুপ্ত।
- (খ) এস, এন, রায়ের অর্ডারে দাও।
বি, সি, গুপ্ত।
- (গ) কেবল এস, এন, রায়কে দাও।
বি, সি, গুপ্ত।
- (ঘ) রায় মার্টিন কোম্পানী কিংবা অর্ডারে দাও
বি, সি গুপ্ত
- (ঙ) রায় মার্টিন কোম্পানীর পক্ষে
বি, সি, গুপ্ত, ম্যানেজার।
- (চ) বি, সি, গুপ্ত, যুক্ত বি, সি, রায়ের একজিকিউটর।
- (ছ) যুক্ত বি, সি, রায়ের একজিকিউটরদিগের, নিজ এক অন্ত্যস্ত পক্ষে
বি, সি, গুপ্ত।
- (জ) বি, কে, যোগ ; এস, কে, সরকার ; আর, এন, চাটার্জি
ট্রাষ্টিস
- (ঝ) শ্রীমতী সরলা দাসী
সাক্ষী কে, বি, বহু ২১১ সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সহির অর্থ

(Significance of endorsement)

- (ক) সাদা দস্তখত, বাহককে প্রদেয়।
- (খ) বিশেষ সহি।
- (গ) সীমান্বদেশক সহি। (restrictive endorsement)
- (ঘ) যে-কোন অংশীদারের সহিতেই চলিবে।
- (ঙ) অপরের পক্ষে সহি।
- (চ) একজিকিউটরের সহি। (একজন একজিকিউটর হইলে)
- (ছ) একজন একজিকিউটরের সহিতেই সকলে বাধ্য।
- (জ) সমস্ত ট্রাষ্টিদিগের সহি আবশ্যক।
- (ঝ) লেখা পড়া না-জানা গ্রহীতার সহি।

দস্তখত ঠিক মত না হইলে অবশ্য ব্যাঙ্ক টাকা দিবে না। “রায় মার্টিন কোং” দেয় চেকের পূর্বে যদি “মিসেস্ এ, রায়” সহি করা হয় অথবা “রায় মার্টিন কোং” কিংবা অর্ডার চেকে যদি “রায় মার্টিন কোং লিমিটেড” লেখা হয় তবে টাকা দেওয়া চলে না। সুতরাং ঠিক যে নামে এবং বানানে চেক দেওয়া হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ নামে এবং বানানে দস্তখত হওয়া চাই।

চেক-লিখন

চেক ইস্যু করার বেলায়ও সতর্ক হইতে হইবে। গ্রহীতার নাম ঠিকভাবে না লিখিলে গোলমাল উপস্থিত হয়। ফার্মের কিংবা ব্যক্তির ষথার্থ নাম এবং বানানের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। “রায় মার্টিন কোং”কে “রায় মার্টিন এণ্ড কোং লিমিটেড” লিখিলে চলিবে না এবং “বি. কে. চাটার্জি”কে “বি. কে. চট্টোপাধ্যায়” লিখিলেও গোলমালের উদ্ভব হইবে। এই সকল স্থলে নাম শুদ্ধভাবে দস্তখত করিলে টাকা পাওয়া যাইবে না। কিন্তু লিখিত অন্ত্যস্ত নাম দস্তখত করিয়া তার পরে শুদ্ধ নাম দস্তখত করিলে এবং ব্যাঙ্কের কোন সন্দেহের কারণ না থাকিলে টাকা পাওয়া যাইবে। টাকার পরিমাণ অন্যের ও অঙ্কে মিল থাকা চাই, নতুবা ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ অন্যের লেখার টাকাই দিবে কিংবা চেক কেবল দিবে। চেক কোন প্রকারে পরিবর্তিত না হইতে পারে, সে-বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে। এজন্য এক প্রকারের যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। উহার দ্বারা “...টাকার উপর নহে” সচ্ছন্দে অন্যের চেকের উপর লিখিত হইয়া থাকে।

চেক হস্তান্তর করা এবং তজ্জনিত নানা অবস্থার উদ্ভব

‘বাহক চেক’ হইলে বাহাকে ইচ্ছা প্রদান করিয়াই এবং ‘অর্ডার চেক’ হইলে দস্তখত করিয়া প্রদান করিলেই চেকের স্বয়ং হস্তান্তর করা যায়। সত্ত্বে কারণ ভিন্ন ব্যাঙ্ক কোন চেকের টাকা দিতে অস্বীকার করিলে, চেকদাতার কোন ক্ষতি না হইয়া থাকিলেও, ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে নালিশের কারণ হইয়া থাকে। কোন ব্যবসায়ের দেনা-পাওয়ার চেক হইলে ঐ ব্যবসায়ের প্রচলিত রীতি অনুসারে উপযুক্ত সময়ের মধ্যে চেক ব্যাঙ্কে দাখিল করিতে হয়।

চেক-দাতা উহা প্রত্যাহার করিয়া ব্যাঙ্কে জানাইলে, ব্যাঙ্ক চেক-দাতার মৃত্যু কিংবা দেউলিয়া হইবার সংবাদ পাইলে, কিংবা কোর্ট হইতে হিসাবের টাকার উপর দায়বদ্ধ কোন হুকুম পাইলে, ব্যাঙ্ক চেকের টাকা দেওয়া বন্ধ করিতে বাধ্য। জাল সহির কোন চেক কেহ ভাঙাইয়া লইলে সেজন্য ব্যাঙ্ক দায়ী, কিন্তু চেকদাতা যদি তাঁহার ব্যবহারের দ্বারা ব্যাঙ্কে কোনরূপে বিশ্বাস করিতে দেন যে, তাঁহার দস্তখত জাল নহে, তবে ব্যাঙ্কের এ-বিষয়ে দায়িত্ব থাকে না। চেক একবার অন্য ব্যক্তিকে দেওয়া হইলে ঐ ব্যক্তির সহি-জালের জন্ত ব্যাঙ্ক দায়ী নহে। কারণ ব্যাঙ্ক এরূপ অবস্থায় পাওনাদারের কোন সনাক্ত দাবি করিতে বাধ্য নহে।

যখন হিসাবে আবশ্যিক টাকা নাই, কিংবা যখন চেকে কোন ভুল থাকে কিংবা যখন উহা উপযুক্ত সময়ের মধ্যে দাখিল করা না হয়, তখন ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিলে চেকের টাকা না দিতে পারে। টাকা না দিলে উহার কারণযুক্ত স্লিপসহ চেক ফেরত দেওয়া হয়। এ-অবস্থায় গ্রহীতা দাতার নিকট টাকা আদায়ের জন্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। সাধারণতঃ দেশের চেক হইলে ছয় মাস এবং বিদেশী চেক হইলে বার মাসের অধিককাল এই উপযুক্ত সময় বলিয়া পরিগণিত হয় না। ব্যাঙ্ক এইরূপ পুরাতন চেকের টাকা না দিলেও তাহাতে চেকদাতার দায়িত্ব যায় না এবং গ্রহীতা, দাবি সাধারণ আইনে তাহাদি হইয়া বাইবার পূর্বে, যে-কোন সময়ে উহা আদায়ের ব্যবস্থা করিতে পারেন। এই বিলম্বের সময়ের মধ্যে যদি ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে, তাহা হইলে এই বিলম্ব-জনিত তাঁহার যথার্থ ক্ষতির টাকা তিনি রেহাই পান।

চেক কোনরূপে হারাইয়া গেলে তৎক্ষণাৎ উহার টাকা দেওয়া বন্ধ করিয়া ব্যাঙ্কে চিঠি দেওয়া দরকার, কারণ একবার চেক ভাঙান হইলেই ব্যাঙ্কের এ-বিষয়ে দায়িত্ব চলিয়া যায়। কিন্তু উপরিউক্ত পত্র পাওয়ার পরও টাকা দিলে ব্যাঙ্কে দায়ী হইতে হয়।

পরবর্তী তারিখ দিয়া চেক দিলে (post-dated cheque) উহা সেই তারিখের পূর্বে ভাঙান যায় না। এই প্রকারের চেক বিশেষ কারণ ব্যতীত দিলে খুব সতর্কতার সহিত গ্রহণ করা উচিত; কারণ সাধারণতঃ ব্যাঙ্কে উপযুক্ত পরিমাণ টাকার অভাবই এরূপ চেকের আবশ্যিকতা আনয়ন করে।

চেকের ক্রসিং (Crossing of Cheques)

বাহক চেক কিংবা অর্ডারী চেক উভয়কেই “খোলা” চেক বলা যায়, কিন্তু চেক ক্রস (cross) করিয়া দিলে উহাকে ‘বন্ধ চেক’ নাম করা যাইতে পারে। আইন অনুসারে (Sec. 126 of the Negotiable Instruments Act) যখন কোন চেক সাধারণ ভাবে ক্রস করা হয় তখন উহা কোন ব্যাঙ্কের হাত দিয়া ভিন্ন এবং যখন উহা বিশেষ ভাবে ক্রস করা হয়, তখন যে-ব্যাঙ্কের নামে ক্রস করা হয়, উহার হাত কিংবা উহার এজেন্টের হাত দিয়া ভিন্ন ভাঙানো যায় না। যে-ব্যাঙ্কের নামে বিশেষ ভাবে ক্রস করা হয়, ইচ্ছা করিলে ঐ ব্যাঙ্কে উহা ভাঙাইবার জন্ত পুনর্বার অন্য ব্যাঙ্কের নামে বিশেষ ভাবে ক্রস করিয়া দিতে পারে, কিংবা আদায়ের জন্ত প্রেরিত কোন ক্রস-বিহীন চেক কিংবা সাধারণ ভাবে ক্রস-করা চেক উহার নিজ নামে বিশেষ ভাবে ক্রস করিতে পারে। সুতরাং এইরূপ চেকের সমস্ত ভবিষ্যৎ গতিবিধি আবশ্যিক হইলে সহজেই নির্ধারণ করা যায়।

হস্তান্তরের সর্ভবিহীন (Not Negotiable) চেক

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে চেক হস্তান্তর করা চলে। ইচ্ছা করিলে ক্রস করার সহিত “not negotiable” অর্থাৎ হস্তান্তরের সর্ভবিহীন লিখিয়া দিলে এই সর্ভ স্বীকৃত হয়, অর্থাৎ সাধারণতঃ উহা আর হস্তান্তর করা চলে না। এ-বিষয়ে একটু কথা আছে। উপরিউক্ত আইন অনুসারে

কোন negotiable instrument অর্থাৎ হস্তান্তর করা চলে এরূপ 'বিল অব এক্সচেঞ্জ,' প্রমিসরী নোট প্রভৃতি উপযুক্ত মূল্যে সরল বিশ্বাসে কেহ খরিদ করিলে বিক্রেতার স্বত্ব অপেক্ষা ক্রেতার স্বত্ব উৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে এবং বিক্রেতার উহা প্রাপ্তিবিশয়ে যে-কোন প্রকার গলদ থাক না কেন ক্রেতার স্বত্ব সর্বদাই অব্যাহত থাকে। হস্তান্তর-করণের সর্ভবিহীন (not negotiable) চেকও হস্তান্তর করা চলে, কিন্তু সেক্ষেত্রে ক্রেতার সেই উৎকৃষ্টতর অধিকার উহাতে জন্মে না; অর্থাৎ যদি ঐ হস্তান্তর-করণের সর্ভবিহীন (not negotiable) চেক পরে চোরা-মাল বলিয়া প্রমাণিত হয় তবে ক্রেতা উহা সরল বিশ্বাসে উপযুক্ত মূল্যে খরিদ করিয়া থাকিলেও আসল মালিক উহার টাকা উহার নিকট আদায় করিয়া লইতে পারেন; তাহাতে ক্রেতার ঐ ক্রয়মূল্য লোকসান হইয়া যায়। সাধারণ কিংবা বিশেষ ক্রস্ করার বেলায়ই চেক হস্তান্তর-করণের সর্ভবিহীন (not negotiable) করা চলে; অল্প বেলায় উহা হয় না।

সাধারণ এবং বিশেষ চেরা কাটা

চেকের উপর দুইটি সমান্তরাল রেখা টানিয়া ক্রস করিতে হয়। উহার ভিতর সাধারণতঃ "&c. Co" কিংবা "&c. Company" কথা লেখা প্রচলিত আছে, কিন্তু উহা না লিখিলেও চলে। সাধারণ এবং বিশেষ ক্রস্ করার অর্থ এবং ফলাফলের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। চেকদাতা চেক ক্রস্ না করিলে যে-কোন মধ্যবর্তী ক্রেতা উহা সাধারণ কিংবা বিশেষ ভাবে ক্রস্ করিতে পারেন। আবার সাধারণ ক্রস্ করাকেও ঐ প্রকারে বিশেষ ক্রস্ করা চলে। পাঠকের সুবিধার জন্তু নিম্নে কয়েকটি সাধারণ ও বিশেষ ক্রস্ করার উদাহরণ দিতেছি :-

সাধারণ ক্রস্ করা

- ১। _____
- ২। &c. কোং।
- ৩। &c. কোং, Not Negotiable.
- ৪। Not Negotiable.
- ৫। কোং, গ্রহীতার হিসাবে মাত্র।

বিশেষ ক্রস্ করা

- ১। শ্রীশ্রীশ্রী ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, লিমিটেড।
- ২। শ্রীশ্রীশ্রী ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, লিমিটেড।
- ৩। শ্রীশ্রীশ্রী ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, লিমিটেড।
Not Negotiable.
- ৪। শ্রীশ্রীশ্রী ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, লিমিটেড।
গ্রহীতার হিসাবে মাত্র।
- ৫। শ্রীশ্রীশ্রী ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, লিমিটেড।
রায় মার্টিন কোম্পানীর হিসাবে জমা করিতে হইবে।
- ৬। শ্রীশ্রীশ্রী ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, লিমিটেড কর্তৃক আদায়ের জন্তু
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের নিকট প্রেরিত।

অল্প প্রকারেও ক্রস্ করা চলে। উপরের উদাহরণগুলি-দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে যে, বিশেষ ক্রস্ করার বেলায় সমান্তরাল দুইটি রেখা না টানিলেও দোষ হয় না।

ক্রস্-করা চেকের অতি আবশ্যিক অংশ, সুতরাং ব্যাঙ্ক এ-বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে বাধ্য। ক্রস্-করার নির্দেশের বিরুদ্ধে কোন টাকা ব্যাঙ্ক দিলে চেকের মালিকের নিকট উহাকে দায়ী হইতে হয়। কোন চেক সাধারণ কিংবা বিশেষ ভাবে ব্যাঙ্কে ক্রস্ করিয়া দেওয়া হইয়া থাকিলে, ঐ ব্যাঙ্ক যদি উহার মঙ্কেলের হিসাবে উহা ভাঙাইয়া থাকে, এবং পরে ঐ চেকের স্বত্ববিশয়ে কোন গোলমাল উপস্থিত হয়, তবে ব্যাঙ্ক চেকের মালিকের নিকট ঐ চেকের জন্তু দায়ী হয় না।

কলঙ্ক-মোচন

শ্রীবসন্তকুমার দাস

১

প্রিয়নাথ বাবু তাঁহার পুত্র নিক্রম ও অম্বুপমের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সেরকম উচ্চাভিলাষ প্রকাশ করিতেন, সঙ্গতিপন্ন পিতা-মাতা মাত্রেই সম্ভানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হৃদয়ে সে-রকম আশা পোষণ করিয়া থাকেন। প্রিয়নাথ বাবুর পত্নী একটু বেশী বয়সে সম্ভান প্রসব করিয়াছিলেন। প্রথমে সকলেই মনে করিয়াছিল তাঁহার কোন সম্ভান জন্মিবে না। বন্ধুগণের অনেকে প্রিয়নাথ বাবুকে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহণে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু তিনি গৃহিণীর জন্ত একটি সপত্নী আনিয়া জেনানা-যুদ্ধের কুরুক্ষেত্র বাধাইতে ইচ্ছা করিলেন না। উপায়ান্তর না দেখিয়া ধর্মপরায়ণ বন্ধুরা পিণ্ডলোপের ভয় দেখাইয়া প্রিয়নাথ বাবুকে পোষাপুত্রগ্রহণের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তাহাতে কল উন্টা হইল, প্রিয়নাথ বাবু উইল করিয়া ধন-সম্পত্তি সমস্তই অনাথাশ্রমে দান করিবেন ইচ্ছা করিলেন, কাজেই পোষাপুত্র গ্রহণও হইল না। এমন সময় অকস্মাৎ ত্রিশ বৎসর বয়সে প্রিয়নাথ-গৃহিণী বৃগলতনয় প্রসব করিলেন। কিন্তু শিশু দুইটি দুই বৎসরে পড়িতেই মাতৃহীন হইল। অগত্যা বিপত্তীক প্রিয়নাথ বাবুই এই পুত্র দুইটির— নিক্রম ও অম্বুপমের তত্ত্বাবধানে প্রবৃত্ত হইলেন। সংসারে একটি বিধবা ভগিনী ছাড়া আর কোনও পোষা ছিল না। ভগ্নী প্রিয়নাথ বাবুকে পুনরায় বিবাহ করিতে অনেক অম্বুপম-বিনয় করিলেন, বন্ধুহলের তরফ হইতেও অনেক অম্বুরোধ-উপরোধ আসিল, কিন্তু প্রিয়নাথ বাবুর পিণ্ডলোপের ভয় আর নাই, স্তত্রাং শত পীড়াপীড়ির মধ্যেও তিনি অচল ও অটল রহিলেন।

নিক্র ও অম্বুর লালনপালনকার্বে প্রিয়নাথ বাবুকে সাহায্য করিবার জন্ত দুই জন ভৃত্য ও দুই জন দাসী স্বতন্ত্র নিযুক্ত হইল। শিশু দুটিকে তাহাদের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া প্রিয়নাথ বাবু এক মুহূর্তও স্থির থাকিতে পারিতেন না। একে বধন হইয়াছে তাহাতে আবার বিপত্তীক, কাজেই

প্রিয়নাথ বাবু সকল বিষয়েই একটু বাড়াবাড়ি করিতেন। শৈত্যভীতি তাঁহার একটি স্বাভাবিক দুর্বলতা ছিল। কোন সময়ে কোন ছিদ্রপথে সর্দি নামক প্রবল শত্রু তাঁহার জীর্ণ দেহদুর্গটি অধিকার করিয়া বসে, এই ভয়ে প্রিয়নাথ বাবু শীত গ্রীষ্ম বার মাস জ্ঞানেলের জামা পরিধান করিতেন এবং পদযুগল পশমী মোজায় আবৃত রাখিতেন। রাত্রিবেলা শয়নঘরের দরজা জানালা প্রভৃতি এমন ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন যে, বায়ুপ্রবেশেরও কোন পথ থাকিত না। নিক্র ও অম্বুর সম্বন্ধেও তিনি নিজেরই মত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভৃত্যদিগের প্রতি কড়া আদেশ ছিল শিশুদের গাত্র সর্বদা আবৃত রাখিতে হইবে এবং কোন সময়েই তাহাদিগকে শুধু মাটিতে উপবেশন করিতে দেওয়া হইবে না। অপরাহ্নে শিশু দুটিকে গাড়ীতে করিয়া রাজপথে বাহির করা হইত। এক দিন প্রিয়নাথ বাবু দেখিতে পাইলেন শিশু দুটিকে মাটিতে বসাইয়া দাসীরা বৃক্ষতলে স্ত্রুধুঃখের কথা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সেই দিন হইতে নিক্র ও অম্বুর বায়ুসেবন নিষিদ্ধ। তাহারা চিরদিনের মত ঘরে বন্দী হইল। দাসীদেরও যে সেই দিনই পদচ্যুতি হইয়াছিল, একথা বলা নিস্প্রয়োজন। শীতপ্রধান দেশের ধনী লোকেরা যেমন কাচের ঘরে গরম বাতাস পূরিয়া গ্রীষ্মপ্রধান দেশীয় ফল-ফুলের চারাগাছ রক্ষা করেন, প্রিয়নাথ বাবুও তেমনি নানা উপায় অবলম্বন করিয়া এই মাতৃহীন শাপভ্রষ্ট শিশুদেবতাদের বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন।

স্তম্ভহৃৎপানে বর্দ্ধিত বলিয়া শিশুদের জন্ত বিলাতী টিনের খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ হইত। নানা জাতীয় ফুড, টনিক, সিরাপ প্রভৃতি পরিপাণ করিয়া, এবং ডাক্তারী ঔষধের স্বাদ কতদূর তিক্ত ও কষায় হইতে পারে তাহা পরীক্ষা করিয়া নিক্র ও অম্বু ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিল। তাহাদের জন্ত গৃহশিক্ষকের আবশ্যিক হইল। পুত্রদ্বয়ের সুশিক্ষার জন্ত প্রিয়নাথ বাবু এক শিক্ষকদম্পতি নিযুক্ত করিলেন। বিদ্যালয়ে দশ

জনের ছেলের সঙ্গে একত্র পাঠ করিতে দেওয়া প্রিয়নাথ বাবুর মনঃপূত হইল না। ভবিষ্যৎ জীবনে নিরু ও অন্ন দুই জনেই সিভিলিয়ান কিংবা অন্ততঃ ব্যারিষ্টার হইবে প্রিয়নাথ বাবু তাহাদের অনাবধিই এই সঙ্কল্প করিয়া আসিতেছেন। এজন্য ছেলেদের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে তিনি ক্রটি করিলেন না।

প্রিয়নাথ বাবুর মনঃ বিশ্বাস ছিল উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চপদস্থ পরিবারের পুত্রকন্যাগণের সহিত সর্বদা মেলামেশা না করিলে নিরু ও অন্নর ভবিষ্যৎ উন্নতি হইয়া অসম্ভব। ভাবিয়া তিনি পুঁটু, কালু, হিরু প্রভৃতি নিরু ও অন্নর সমবয়স্ক গরিব ভদ্রসন্তানদের সঙ্গে নিজের পুত্রদের খেলাধুলা বন্ধ করিয়া দিলেন। যদি হঠাৎ কখনও নিরু ও অন্ন কোনও প্রতিবেশী বাড়িতে প্রবেশ করিত, অথবা সমবয়সী ছেলেদের সহিত ছুটাছুটি করিত, তাহা হইলে সেদিন দাসদাসী, এমন-কি শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরও নিস্তার ছিল না। প্রতিবেশী মহিলাবৃন্দ আদর করিয়া নিরু ও অন্নকে কোন দ্রব্য খাইতে দিয়াছেন, একথা প্রিয়নাথ বাবু জানিতে পারিলে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইতেন। এই ভয়ে মাতৃহীন শিশুদুটিকে কেহ একটু আদর করিতেও সাহস করিত না। একদিন প্রিয়নাথের ভগিনী শ্যামাসুন্দরী ব্রতপুত্রদের গঙ্গাস্নানে লইয়া গিয়াছিলেন, ঘাটে জিলিপি দেখিয়া ছেলেদের নিতান্ত পীড়াপীড়িতে পিসিমা তাহাদের চারি পয়সার জিলিপি কিনিয়া দিয়াছিলেন। প্রিয়নাথ বাবু একথা জানিতে পারিয়া নিরু ও অন্নর জন্ম দুই আউল 'ক্যাষ্টার অয়েলে'র ব্যবস্থা করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই।

নিরু ও অন্ন দশ বৎসরের হইলেই স্বদেশী শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর কার্যকলাপ শেষ হইল। এইবার তাহাদের শিক্ষার জন্ম ইংরেজ শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। এ-ব্যাপারে প্রিয়নাথ বাবু যে নিতান্ত সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। নূতন শিক্ষক বালকদের শিক্ষাভার গ্রহণ করিয়াই সর্বপ্রথমে তাহাদের স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগী হইলেন। দেশীয় শিক্ষকের উপর প্রিয়নাথ বাবু যতপনি কর্তৃত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষেত্রে তাহার সিকিও হইল না। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সম্বন্ধে দেশীয় শিক্ষক যে একেবারেই অনভিজ্ঞ ছিলেন তাহা নয়, কিন্তু প্রিয়নাথ বাবুর উপরে কথা

বলেন তাঁহার এত ক্ষমতা ছিল না। মিঃ রিচার্ডস আসিয়াই প্রিয়নাথ বাবুকে বুঝাইয়া দিলেন তাঁহার চাতুর্যের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক ত্রিবিধ উন্নতির জন্ম তিনি যাহা সম্ভব বোধ করেন, তাহাতে কোনরূপ প্রতিবাদ করিলে তিনি কাঁধা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। সুতরাং মিঃ রিচার্ডসের কথাই মানিতে হইল। তিনি বালকদের শয়নঘরের দরজা জানালা প্রভৃতি চাবিশ ঘণ্টা মুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। স্বয়ং নিরু ও অন্নকে লইয়া মুক্ত বাতাসে অর্ধানাবৃত শরীরে ফুটবল খেলা আরম্ভ করিলেন। টেবিলের উপর হইতে টানক, ফুড, সিরাপের লাল নীল ও সবুজ বর্ণের কাচের শিশিগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। বালক দুটি ওজনে বৃদ্ধি পাইল এবং কয়েক মাসের মধ্যেই বেশ সুশ্রী এবং হাসি-খুশী হইয়া উঠিল। স্বাস্থ্যের লক্ষণগুলি যেন তাহাদের মুখে চোখে সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া প্রিয়নাথ বাবুও আশ্চর্যম্বিত হইয়া গেলেন। ক্রমে নিরু ও অন্ন ঘোড়ায় চড়া ও নৌকা বাওয়া প্রভৃতি আরম্ভ করিল।

ভবিষ্যতে যাহারা জঙ্গ ম্যাজিষ্ট্রেট কিংবা ব্যারিষ্টার হইবে, তাহাদের শিক্ষার ভার শিশুকাল হইতেই যোগ্য ব্যক্তির হাতে তুলিয়া দিতে হয়। প্রিয়নাথ বাবুও তাহাই করিয়াছিলেন। পিতা ও শিক্ষক উভয়েই শিশুদের সঙ্গী-নির্ব্বাচনের প্রতি তীব্রদৃষ্টি রাখিতেন। কিন্তু ইহার ফলে শিশুকাল হইতেই ছেলেরা বিদেশীভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। তাহারা সমবয়স্ক বাঙালী সন্তানের সহিত মিশিতে সুযোগ পাইল না। তাহাদের শিক্ষক মহাশয় স্বয়ং বিবাহ করেন নাই। স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার একটা স্বাভাবিক বিদ্বেষ ছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে ছাত্রগণের নিকট এরূপ সব মস্তব্য প্রকাশ করিতেন, যাহার সহজ অর্থ এই—“তোমাদের মা যে মরিয়া গিয়াছেন, বেশ ভাল হইয়াছে। তোমাদের মা বাঁচিয়া থাকিলে তোমাদের অমঙ্গল হইত। আদর করিয়া তোমাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিয়া ফেলিতেন।” স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে ছেলেদের মনও ক্রমে গুরু মতই বিরূপ হইয়া উঠিল।

যথাসময়ে অন্ন ও নিরু বিলাতযাত্রা করিল। প্রিয়নাথ বাবু স্বয়ং পুত্রদ্বয়কে বোম্বাই বন্দরে জাহাজে তুলিয়া দিয়া আসিলেন। পি-এণ্ড-ও কোম্পানীর সুবৃহৎ লাইনার 'গুডলাক' ডাক, যাত্রী ও মাল লইয়া এপলো বন্দর হইতে ধুম উদগীরণ

আরম্ভ করিল। তাঁরে প্রিয়নাথ বাবু যষ্টিহস্তে দণ্ডায়মান। প্রথম শ্রেণীর কেবিনের জানালা খুলিয়া নিরু ও অরু পিতাকে দর্শন করিতেছে। দেখিতে দেখিতে উর্শ্বমালা ভেদ করিয়া 'শুভলাক' অদৃশ হইয়া গেল। শূন্যে উখিত ধূমরাশি ব্যতীত তাহার আর কোন চিহ্ন লক্ষিত হইল না। মাতৃহারা পুত্রদ্বয়কে বিদায় দিয়া পিতা বিষণ্ণ মনে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

পাঁচটি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। নিরু ও অরুর দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় হইল। পিতার মনে আশা, উভয় পুত্রই ব্যারিষ্টার এবং সিভিলিয়ান দুই হইয়া আসিবে। প্রতিসপ্তাহের লগুন মেলে তাহাদের পত্র আসিতেছে। যথাসময়ে বিলাতী সংবাদপত্রে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষার ফল বাহির হইল। 'রয়টারে'র তার পাইয়া এদেশের সংবাদপত্রগুলিও উহা মুদ্রিত করিল। কিন্তু প্রিয়নাথ-তনয় নিরুপম ও অরুপম দু-জনের কাহারও নামই সে তালিকায় পাওয়া গেল না। প্রিয়নাথ বাবু নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। পুত্রদ্বয়ের নিকট হইতে পূর্বেই তিনি পত্র পাইয়াছিলেন যে, এবার তাহারা কৃতকার্যতা লাভ করিতে পারিবে না। প্রিয়নাথ বাবু মনে ভাবিলেন পুত্রদ্বয় হয়ত সিভিল সার্কিসের প্রতিই অধিকতর মনোযোগী হইয়াছে। সুতরাং এ-যাত্রা তাহারা উক্ত পরীক্ষার জগু প্রস্তুত হইয়াছে। ক্রমে সিভিল সার্কিস পরীক্ষার ফলও প্রকাশিত হইল। নিরু ও অরুর নাম সে তালিকায়ও পাওয়া গেল না।

প্রিয়তম সন্তানদ্বয়ের অকৃতকার্যতার বার্তা শ্রবণ করিয়া প্রিয়নাথ বাবু নিতান্ত মর্মান্বিত হইলেন। আজ বিশ বৎসর যাবৎ তিনি মনে মনে যে উচ্চ আশা পোষণ করিয়া আসিতেছেন, নিমেষমধ্যে তাহা বিনষ্ট হইয়া গেল। এই উচ্চাভিলাষী পিতাটি আজ ছিন্নমূল লতার স্তায় শিথিল হইয়া পড়িলেন। নিরু ও অরুর পত্র পাইলে হয়ত কতকটা শান্ত হইতে পারিবে ভাবিয়া বিলাতী মেলের অপেক্ষায় উদ্গ্রীব হইয়া রহিলেন। যথাসময়ে নিরু ও অরুর পত্র আসিল কিন্তু তাহাতে সিভিল সার্কিস পরীক্ষার ত কোন উল্লেখ নাই! এবার প্রিয়নাথ বাবু আর ধৈর্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। কালবিলম্ব না করিয়া একখানা টেলিগ্রাম করিলেন। পাঁচ দিন পরে নিরুর উত্তর আসিল।

জ্যেষ্ঠপুত্র পিতাকে তার করিয়াছে, "এবার সিভিল সার্কিসের জগু প্রস্তুত হই নাই, ভবিষ্যতেও হইব কি-না সন্দেহ।"

আর-এস-এন্ কোম্পানীর আসামঘাতী ডেস্পাচ ষ্টীমার পদ্মানদীর বন্ধ দিয়া চলিয়া গেলে বারিরাশি যেরূপ কম্পিত হইয়া উঠে, এই সংবাদ পাইয়া প্রিয়নাথ বাবুর হৃদয়তন্ত্রীটি ততোধিক কম্পিত ও সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। পুত্রদ্বয়কে মিঃ আর. সি. দত্ত, অথবা মিঃ ডব্লিউ. সি. বোনার্জির আসনে উপবিষ্ট দেখিবেন বলিয়া তিনি যে আশা করিয়া ছিলেন। একটি একটি করিয়া সে আশালতার মূল ছিন্ন হইয়া গেল। বিলাত-প্রত্যাগত পুত্রদ্বয়কে বরণ করিয়া লইবেন ভাবিয়া প্রিয়নাথ বাবু এ-বৃদ্ধবয়সে সাহেব সাজিয়াছেন; আবাস-বাটাটি ইউরোপীয় আসবাবে সুসজ্জিত করিয়াছেন। পুত্রদ্বয়ের অকৃতকার্যতার সংবাদ পাইয়া তিনি আর আরুসীর দিকে নেত্রপাত করিতে পারিলেন না। নিজের স্বেচ্ছাকাঙ্ক্ষা দাড়ি, সাহেববাড়ির হাই-কলার এবং রেশমী গলাবন্ধ যেন তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল। দেশীয় মিত্রীর দোকানের চতুর্গুণ মূল্যের বিলাতী কুশন চেয়ারগুলি তিনি আবৃত করিয়া রাখিলেন; চিরপরিচিত তৈলাসক্ত কাঠের চেয়ার দুটি যেন তাঁহার পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন, কালবিলম্ব না করিয়া স্বয়ং বিলাতযাত্রা করিবেন এবং সেখানে গিয়া পুত্রদ্বয়ের অধঃপতনের কারণ স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়া আসিবেন।

দেশ হইতে এত দূরে অপরিণতবয়স্ক অভিভাবকহীন যুবকগণের নৈতিক অবনতি অবশ্যস্বাবী ভাবিয়া তিনি অনেক মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। এত সাবধান হওয়া সত্ত্বেও একথা কেন আগে ভাবেন নাই বলিয়া নিজেকে দিক্কার দিলেন। এতদিন অকাতরে অল্পশ্রম অর্থ প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার পরিণতি এই হইল ভাবিয়া তিনি বাস্তবিকই অশ্রুস্রবণ করিলেন। যখন তাঁহার মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, নৈতিক অধঃপতন ভিন্ন আর কোনও কারণে পুত্রদ্বয়ের এই দুর্ঘটি ঘটে নাই, তখন নিজের বিলাতযাত্রাও স্থগিত করিলেন, কারণ প্রাপসম পুত্রদ্বয়ের কলঙ্ককালিমা তিনি এ-বৃদ্ধবয়সে দেখিতে পারিবেন না। সে-দৃশ্য নিতান্ত পাবাণ-দৃশ্যেরও মর্মান্বীড়াদায়ক হইবে। ক্রোধে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া তিনি পুত্রদ্বয়কে লিখিলেন তাহাদের ব্যয় তিনি আর বহন

করিতে পারিবেন না, উভয়েই যেন অবিলম্বে দেশে ফিরিয়া আসে। পত্র পাইয়া নিক টেলিগ্রাম করিল তাহাদের দেশে ফিরিতে অন্তত আরও পাঁচ মাস লাগিবে। এই টেলিগ্রাম পাইয়া প্রিয়নাথ বাবুর যে কি অবস্থা হইল তাহা বোধ হয় আর বলিয়া দিতে হইবে না।

উপায়ান্তর না দেখিয়া নিক ও অন্নু বিলাতে যে-ভদ্রলোকের বাড়িতে বাস করিত প্রিয়নাথ বাবু তাঁহার নিকট এক বিস্তৃত পত্র লিখিয়া পুত্রদ্বয়ের বর্তমান সংবাদ জানিতে চাহিলেন। নিক ও অন্নুর গৃহস্থামী ব্যারিষ্টার মিঃ জে. ওয়ার্টনের পত্র আসিতে দেরি হইল না। তিনি অতি সংক্ষিপ্ত ভাষায় প্রিয়নাথ বাবুকে লিখিয়াছেন—“আপনার পুত্রদ্বয়ের বিস্তৃত সংবাদ লিখিয়া দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব, সময়াভাব, ক্ষমা করিবেন। এতৎ সঙ্কে বিগত মে মাসের এক সংখ্যা ‘ফাইন আর্ট ম্যাগাজিন’ প্রেরিত হইল, ইহার পৃষ্ঠাতেই মনাস দাস ত্রাদাসের পরিচয় পাইবেন।” প্রিয়নাথ বাবু নিতান্ত বিরক্তির সহিত পত্রখানা রাখিয়া ম্যাগাজিনের মোড়ক খুলিতে লাগিলেন। বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠা কয়টিতে একটু দৃষ্টিনিষ্কোপ না করিয়াই তিনি একবারে ভিতরকার প্রথম পৃষ্ঠাটি খুলিয়া ফেলিলেন।

ইংরেজী ভাষায় বড় বড় হরফে পত্রিকার নাম লিখিত রহিয়াছে। ঠিক নীচেই মাসের ও সনের নাম এবং রোমান অঙ্কে পত্রিকার সংখ্যা লিখিত। তারপর প্রবন্ধের শিরোনাম—“ভারতীয় কুস্তকার এবং তাহার নির্মিত দ্রব্যনিচয়।” প্রিয়নাথ বাবু প্রবন্ধটি একটু পাঠ না করিয়াই দ্বিতীয় পৃষ্ঠা খুলিলেন। খুলিবামাত্র দুইটি ছবি তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিল। ছবির উপরে লিখিত রহিয়াছে—“ভারতের উদীয়মান কুস্তকার ও ভাস্করদ্বয়।” ছবির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই প্রিয়নাথ বাবু বুঝিতে পারিলেন এই উদীয়মান ভারতীয় কুস্তকার ও ভাস্করদ্বয় আর কেহ নয়, তাঁহারই প্রিয়পুত্র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থী নিক আর অন্নু। নাসিকার উপরিস্থিত স্বর্ণ-ফ্রেমবদ্ধ উপনেত্রদ্বয় ভাল করিয়া ক্রমালে ঘষিয়া লইয়া প্রিয়নাথ বাবু দেখিতে পাইলেন একটি ছবির এক কোণে লিখিত রহিয়াছে—মিঃ নিকপম দাস ও অপরিষ্কার এক কোণে মিঃ অন্নুপম দাস। বিস্ময়বিফারিতনেত্রে প্রিয়নাথ বাবু ছবি-দুইটির পানে তাকাইয়া রহিলেন।

এতকণে প্রবন্ধটি পাঠ করিবার ভয় তাঁহার মনে আগ্রহ জন্মিল। প্রবন্ধের লেখক বিলাতের রয়াল একাডেমীর একজন বিশিষ্ট সভ্য। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও কুস্তনগরে নির্মিত মৃগয় দ্রব্যাদির আলোচনা করিয়া প্রবন্ধকার লিখিয়াছেন—“ভারতের সৌভাগ্য বালিতে হইবে যে দুই জন ভারতবর্ষীয় উচ্চশিক্ষিত ভদ্রসন্তান ভারতে পাশ্চাত্য প্রণালীতে মৃগয় ও প্রস্তর মূর্তি প্রস্তুত হইতে পারে না বলিয়া যে গানি আছে তাহা মোচন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। বাস্তবিক, ভারতের ভদ্রসন্তানগণ উচ্চশিক্ষিত হইয়া যখন কণ্ঠকার, কুস্তকার, তন্তুবায় প্রভৃতি শিল্পীর ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে প্রয়াস পাইবেন, তখনই ভারতে নূতন যুগ আসিবে।” নিক ও অন্নু ব্যারিষ্টারী ও সিভিল সার্ভিস পরিত্যাগ করিয়া কেন যে কুস্তকার ও ভাস্করের কার্যে ব্রতী হইল, এ-সমস্যার যথোপযুক্ত উত্তর পাইবার জন্য প্রিয়নাথ বাবু বাস্ত হইয়া প্রবন্ধটি পাঠ করিতে লাগিলেন। পত্রিকার সপ্তম পৃষ্ঠায় প্রবন্ধকার নিক ও অন্নুর কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। এ-সম্বন্ধে প্রবন্ধকার ও নিকপমের সহিত যে কথোপকথন হইয়াছিল প্রবন্ধে অবিকল তাহাই উদ্ধৃত হইয়াছে।

প্রবন্ধকার লিখিয়াছেন—“জ্যেষ্ঠ মিঃ দাসের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে আমি দুই ভ্রাতার জীবনী বলিতে অল্পরোধ করিয়াছিলাম। পাঠকপাঠিকার অবগতির জন্য এস্থলে মিঃ দাসের কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

মিঃ দাস বলিয়াছেন, ‘আমি ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অল্পম একত্র ব্যারিষ্টারী ও সিভিল সার্ভিস পাস করিব মনে করিয়া লণ্ডনে আসিয়াছিলাম। কিন্তু কি কারণে আমরা উভয় উদ্দেশ্যই পরিত্যাগ করিয়া কুস্তকার ও ভাস্করের কার্যে শিগিতেছি, তাহা একটু রহস্যজনক। আমাদের পিতা দেশে থাকিয়া আমাদের পরীক্ষার ফলাফল জানিবার জন্য হয়ত খুব ব্যস্ততা প্রকাশ করিতেছেন। আমাদের কাছে এই নূতন কার্যে ব্রতী দেখিয়া তিনি যে অত্যন্ত নিরাশ ও মর্মান্বিত হইবেন, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। শুধু এই ভয় করিয়াই এ-পর্যন্ত তাঁহাকে কিছুই লিখিতে সাহসী হই নাই। আমরা মনে করিয়াছি দেশে ফিরিয়া তাঁহাকে সকল বিষয় জানাইব এবং আমাদের এই ধৃষ্টতা, এই স্বাধীনতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব। আমাদের পিতা খুব দয়ালু, এবং

স্নেহপরায়ণ; আশা করি তিনি অবোধ সন্তানদ্বয়কে কমা করিবেন।

‘ঘে-রহস্য’ আমাদের গন্তব্যপথ হইতে বিচলিত করিয়াছে তাহা বলিতেছি। আমাদের জন্মাবধিই পিতা আমাদের উবিধ্যৎ সম্বন্ধে খুব উচ্চাভিলাষ পোষণ করিয়াছিলেন। শৈশবকাল হইতেই আমরা পাশ্চাত্য রীতিনীতিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ি। বলা বাহুল্য যে, দেশে থাকিয়াও আমরা প্রবাসীর মত দিন কাটাইয়াছি। আমাদের খেলাধুলা, আহার-বিহার, আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সব বিষয়েই আমরা দেশীয় ভাব বর্জন করিয়াছিলাম। আমাদেরও ধারণা ছিল আমরা সমবয়স্ক অন্যান্য বাঙালী বালক হইতে অতি উচ্চশ্রেণীর জীব। ভগবানের আশীর্ব্বাদে পিতার অর্থের অভাব ছিল না। আমরা জীবনে কখনও কোন অভাব জানিতে পারি নাই। যেদিন আমরা প্রথম শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করিয়া কলিকাতা হইতে বোম্বাই আসিলাম, সেদিন ষ্টেশনের অনেকেই আমাদেরকে কোন ভারতীয় রাজা বা মহারাজার সন্তান ভাবিয়াছিলেন। জাহাজেও ফাষ্ট ক্লাসের কেবিনে আমরা আসিয়াছিলাম।

‘আমাদের ‘গুডলাক’ জাহাজে আরও অনেক বিলাতযাত্রী ভারতীয় ছাত্র ছিলেন। অধিকাংশই দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী ছিলেন, কেবলমাত্র একটি খুব সাধারণ ডেকযাত্রী-স্বরূপ বিলাতযাত্রী করিয়াছিলেন। বিলাতযাত্রী ছাত্রগণের অধিকাংশই ব্যারিষ্টারী, দু-চার জন সিভিল সার্কিস এবং ডাক্তারী ও ইঞ্জিনিয়ারী শিক্ষার্থী ছিলেন। সাধারণ ডেকের যাত্রীটি ছিলেন একজন মারাঠী ব্রাহ্মণ। তাঁহার আকৃতি ও প্রকৃতিতে দেশীয় ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। যখন শুনিতে পাইলাম তিনি বোম্বাই ইউনিভার্সিটির এক জন কৃতবিদ্যা ছাত্র, বিজ্ঞান ও রসায়ন উভয় শাস্ত্রেই এম-এ পাস করিয়াছেন এবং বয়স ও রক্তন শিল্প শিকার জন্ত বিলাত হাইভেছেন, তখন তাঁহার প্রতি আমাদের বড়ই মহানুভূতি জন্মিল। মাতৃদেহের উবিধ্যৎ সম্বন্ধে যে এমন কাণ্ডজ্ঞান-হীন হইতে পারে, তাহা আমাদের জানা ছিল না। বাস্তবিক তাঁহাকে আমরা উপহাস করিতেও ছাড়িলাম না। এম-এ পাস করিয়া তাঁতির কাজ শিখিতে চলিয়াছে, এমন লোক যে পৃথিবীতে থাকিতে পারে তাহা আমাদের বিশ্বাস ছিল না।

আমরা জানিতাম যাহারা বিলাতযাত্রী করেন তাঁহারা সকলেই সিভিলিয়ান, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। ঐ মারাঠী ব্রাহ্মণের মাথায় পাগড়ী, গায়ে দেশী লম্বা কোট ও পায়ের দিল্লীর জুতা দেখিয়া আমরা সকলে তাঁহাকে ‘নেটিভ’ বলিয়া কত উপহাস করিয়াছি।

‘যথাসময়ে লণ্ডনে পৌঁছিয়া আমাদের নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলাম। আমাদের বাসস্থান হইল বিলাতের ব্যারিষ্টার মিঃ জে. ওয়ার্টনের গৃহে। তিনি আমাদের স্থানীয় অভিভাবক হইলেন। আমরাও তাঁহার পরিবারভুক্ত হইলাম। ইতিমধ্যে দুইটি বৎসর চলিয়া গেল।

‘ডিসেম্বর মাস। বড়দিনের বেশী বাকী নাই। জনৈক বিলাত-প্রবাসী কৃতবিদ্যা ভারতীয় ছাত্রের অভিনন্দনের জন্ত বিরাট আয়োজন আরম্ভ হইল। গ্রেটব্রিটেন-প্রবাসী সমস্ত ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণের নিমন্ত্রণ হইল। লণ্ডনের এক বিখ্যাত হোটেলে এই অভিনন্দন-ব্যাপার সম্পন্ন হইবে। নির্দিষ্ট দিনে উৎকৃষ্ট পোষাক-পরিচ্ছদ পরিয়া আমরা যথাসময়ে ঐ হোটেল অভিমুখে যাত্রা করিলাম। নানা জাতীয় যানবাহনে হোটেলের সম্মুখস্থ প্রশস্ত পথটি এক প্রকার রুদ্ধ হইয়াছে। ক্রমে জনতা ভেদ করিয়া আমাদের গাড়ী তথায় উপস্থিত হইল। অভিনন্দন-কমিটির সভ্যগণের সহিত করমর্দন করিয়া আমরা নির্দিষ্ট স্থানে উল্বেশন করিলাম। যাহার অভিনন্দনের জন্ত এই সভা আহূত হইয়াছে, নির্দিষ্ট সময়ে তিনি সভ্যমণ্ডলে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত ভ্রম-মণ্ডলীর সমবেত করক্ষণির মধ্যে তিনি এক বিশেষ আসন অধিকার করিয়া বসিলেন। ম্যাঞ্চেস্টারের কয়েক জন প্রসিদ্ধ কারখানার অধিকারী ও লণ্ডনের বহুসংখ্যক বণিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তি সভ্যমণ্ডলে উপস্থিত ছিলেন। ইং-ও-প্রবাসী ভারত-বাসীর জাগ্যে একরূপ সম্মান খুব অল্পই ঘটে। আমরা বিস্মিত নেত্রে সেই সম্মানিত অতিথিকে দেখিতেছিলাম। তিনি আর কেহ নন, আমাদেরই সেই ডেকযাত্রী মারাঠী ব্রাহ্মণ। সেদিনও দেশীয় রীতিতে পরিচ্ছদ পরিয়াছেন—লম্বাটে অর্ধচন্দ্রাকার চন্দনের ফোঁটা প্রভাস্ত-সূর্যের স্থায় বকবক করিতেছে। ম্যাঞ্চেস্টারের জনৈক প্রসিদ্ধ ক্রোরপতি ও ভূতপূর্ব লর্ডমেয়র সর্বপ্রথমে সভ্যমণ্ডলে

দায়মান হইয়া “সাত্ৰাজীর স্বাস্থ্য” পান করিলেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, “অদ্যকার সম্মানিত অতিথি এই ভারতীয় যুবক রজনশিল্প সম্বন্ধে কয়েকটি মৌলিক গবেষণা করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টান্তে ভারতের মুখোজ্জ্বল হইয়াছে সন্দেহ নাই, আর বয়ন-শিল্প সম্বন্ধে তিনি একরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন যে, আমরা যে-কোন কারখানার অধিকারী তাঁহাকে ম্যানেজার করিতে সম্মত আছি।” উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী ঘন ঘন করতালি প্রদান করিয়া বক্তার কথায় আনন্দ ও সম্মতি প্রকাশ করিলেন। বক্তৃতান্তে রসনাভুঙ্গির খাদ্য ও পানীয়ের ব্যস্থা হইল। সেই মারাঠী ব্রাহ্মণের প্রশংসায় আজ আমরা ভারতবাসী সকলেই নিতান্ত পীত ও সত্য কথা বলিতে কি গর্ভিত হইলাম।

‘আমাদের গৃহস্থামী মিঃ ওয়ার্টনও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি আমাকে বলিলেন, ‘মিঃ দাস, আপনারা আমাদের দেশে আগমন করেন শুধু পরীক্ষা পাস করিতে এবং দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাশি রাশি অর্থ উপার্জন করিতে। শিল্প-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে কোন উৎসাহ দেখিতে পাই না। আমার এক ভারত-প্রবাসী বন্ধু কলিকাতা ইউনিভার্সিটির সভ্য। তিনি আমাকে বলিয়াছেন আপনাদের ইউনিভার্সিটিগুলি শুধু পরীক্ষা লইয়াই বাস্তব থাকে। ছাত্রদিগকে শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থা ইউনিভার্সিটিতে নাই। তিনি আমাকে আরও বলিয়াছেন যে, আপনাদের দেশে বিজ্ঞানের গাজুয়েটগণও কেরানিগরি করে এবং বিজ্ঞানের এম-এসসি পাস করিয়া আইন ব্যবসায়ী হয়, কিংবা প্রাদেশিক বিচার-বিশেষকর্তার অনুসন্ধান করে। কিন্তু ইহাতে দেশের ক উপকার হয়? সর্বসাধারণের অর্থাগমের কি সুবিধা হয়? আজ আপনাদের দেশীয় একটি যুবক ইংরেজ সমাজে য সম্মান লাভ করিলেন, কয়জন ভারতবাসীর ভাগ্যে একরূপ টিয়া থাকে?’

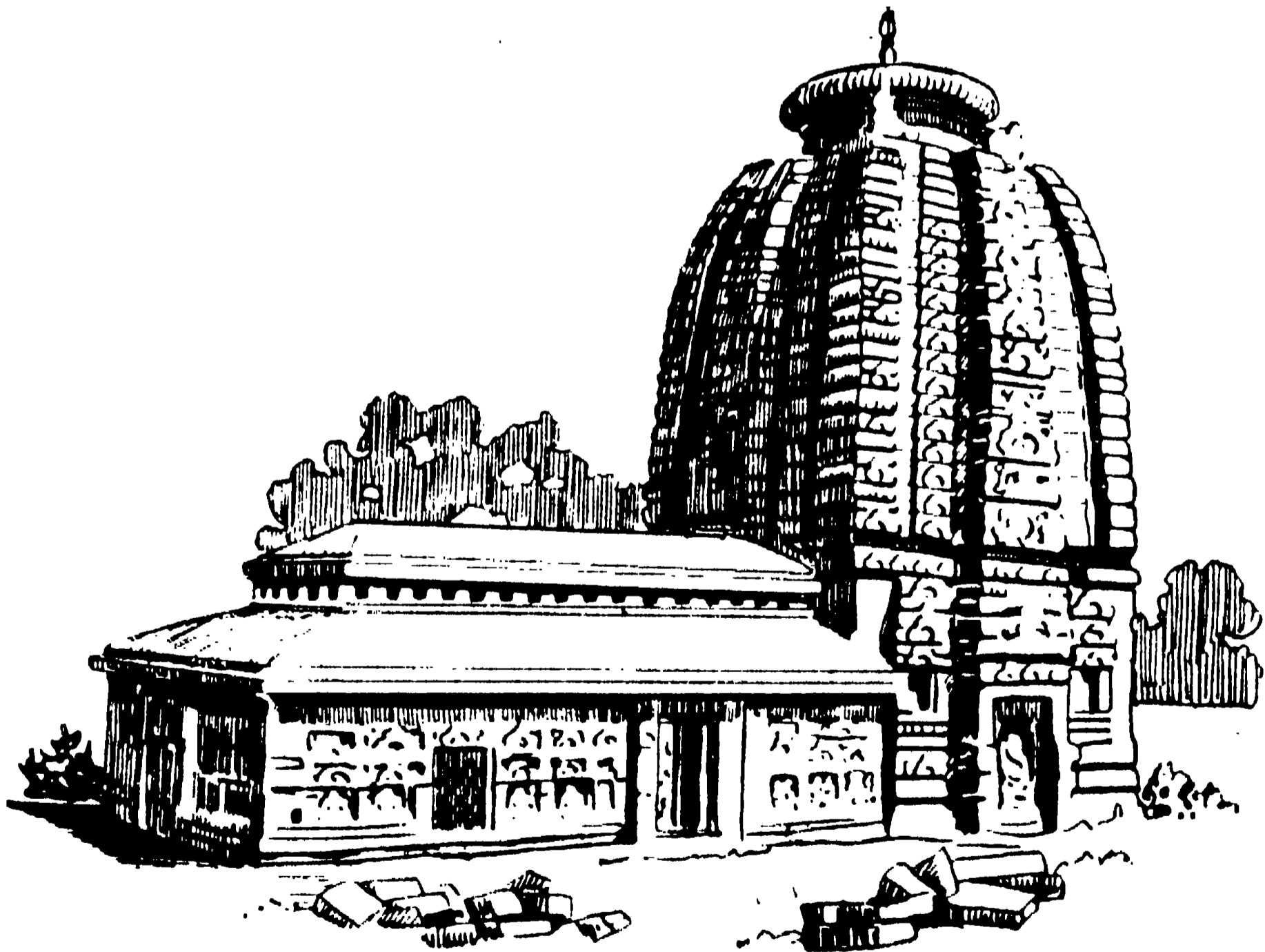
‘মিঃ ওয়ার্টন আরও বলিলেন, “মিঃ দাস, শিল্পবিজ্ঞান ভিন্ন দেশের উন্নতি হয় না। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত হইয়া ইহা বুঝাইয়া দিতেছি।” মিষ্টার ওয়ার্টনের বক্তৃতা শেষ করিয়া কয়েকটি কালীঘাটের পট ও কৃষ্ণনগরের পুতুল

ছিল। তিনি সেগুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া বলিলেন, “দেখুন এগুলি আপনাদের দেশীয় শিল্পীর তৈরি জিনিষ। এই শিল্পীরা পিতৃপিতামহ প্রচলিত পদ্ধতি মতে কাজ করিয়া আসিতেছে। ইহাদের প্রস্তুত দ্রব্য নিতান্ত এৰেঘেয়ে রকমের। ইহারা যদি এদেশে আসিয়া উন্নত প্রণালীর চিত্রাঙ্কন অথবা মৃগায়কার্য শিক্ষা করিত, তাহা হইলে ইহাদের প্রস্তুত দ্রব্য ইউরোপীয় যে-কোন দেশে প্রস্তুত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া জগতের ঘরে ঘরে স্থানলাভ করিত। আমরা ভারতীয় দ্রব্য বৈঠকখানায় রাখি শুধু কৌতুকের বশবর্তী হইয়া, কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্মিত ভারতীয় ছবি খেলনা ও পুতুল আমাদেরও গৃহসজ্জার উপকরণ হইতে পারে।” মিঃ ওয়ার্টন পট ও পুতুলগুলির দুই চারিটি খুঁটিনাটি ও অস্বাভাবিকতা প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, “মিঃ দাস, আমি যদি ভারতবাসী হইতাম, তাহা হইলে এই সকল ক্রটি দূর করিয়া উৎকৃষ্ট মূর্তি প্রস্তুত করিতাম। ইহা শিক্ষা করিবার জন্ত আমি ইংলণ্ড কেন পৃথিবীর যে-কোন স্থানে যাইতে প্রস্তুত হইতাম। আমরা দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিতে যত্নকেও বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত। অর্থকরী ব্যবসায় শিক্ষা করিলে সুখস্বাস্থ্যে দিনপাত করা যায় সত্য, কিন্তু পলিসি যথাসর্ব্বদা দাহ করিয়াও এনামেলের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন।” ইহার পর হইতেই আমরা দুই ভ্রাতা শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ি। আমরা তিন বৎসর যাবৎ মূর্তি নির্মাণ ও ভাস্করবিদ্যা শিক্ষা করিতেছি। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিব একরূপ সম্ভবনা আর নাই।”

এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া প্রিয়নাথ বাবু কি মনে করিলেন তাহা তাঁহার মলিন মুখই বলিয়া দিতে লাগিল। তিনি পুত্রদ্বয়কে সিভিলিয়ান মিঃ আর. সি. দত্ত, অথবা ব্যারিষ্টার মিঃ ডব্লিউ. সি. বোনার্জির আসনে উপবিষ্ট দেখিতে চাহিয়া-ছিলেন, কিন্তু তাহারা সামান্য কুস্তকার ও খোদাইকারে পরিণত হইল দেখিয়া ক্ষোভে ও ঘৃণায় নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি পুত্রদ্বয়কে দেশে ফিরিতে পুনঃ পুনঃ চিঠি লিখিলেন। কিন্তু নিক্রম ও অনুরূপ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এসসি পাস করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিল।

মিঃ নিরুপম দাস, বি-এসসি ও মিঃ অনুরূপ দাস, বি-এসসি ছ-জনের দেশে ফিরিবার দিন উপস্থিত হইল। ছাটকোট পরিয়া পূর্ণমাত্রায় সাহেব সাজিয়া প্রিয়নাথ বাবু পুত্রগণের আগমন-প্রতীক্ষায় হাবড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। ছয় বৎসর পূর্বে এমনই একদিন সাহেব সাজিয়া তিনি পুত্র-দ্বয়কে বোম্বাই এপলো বন্দরে পৌছাইয়া দিয়াছিলেন। ছাটকোট পরিয়া ঠিক ইংরেজ যুবকের ন্যায় নিরুপম ও অনুরূপম জাহাজে উঠিয়াছিল, সেই যুগলমুর্তি প্রিয়নাথ বাবুর মানসনেত্রে সর্বক্ষণ ভাসিয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে অসংখ্য ইংরেজ, মারাঠী, পাঞ্জাবী, বিহারী, বাঙালী, উড়িয়া প্রভৃতি যাত্রী এবং বিছানা, বাকস, ট্রাক, মেলব্যাগ প্রভৃতি লইয়া বোম্বাই মেল প্লার্টফর্মে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রিয়নাথ বাবু রেশমী রুমালে চশমা পরিষ্কার করিয়া লইয়া পুত্রদ্বয়ের অনুসন্ধান প্রথম শ্রেণীর কামরাগুলির সম্মুখে

ঘুরিতে লাগিলেন। কত বিলাতী সাহেব, বিলাতফের বাঙালী সাহেব, বিলাত না-ঘাইয়া সাহেব, প্রভৃতি যাত্রীগ চুরুট-মুখে, ছড়ি-হস্তে নামিয়া পড়িল, কিন্তু নিরুপম ও অনুরূপমের কোন সন্ধান মিলিল না। ক্রমে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাগুলিও অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু প্রিয়নাথ বাবু পুত্রদ্বয় উহাতেও নাই। প্রিয়নাথ বাবু একটু হতাশ হইয়া যেন প্লার্টফর্মের এক কোণে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এমন সময় একটি মধ্যশ্রেণীর গাড়ী হইতে ধুতি-চাদর-পরিহিত দুই বাঙালী যুবক ব্যাগ-হস্তে অবতরণ করিয়া প্রিয়নাথ বাবুর নিকটে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। সবিম্বয়ে প্রিয়নাথ বাবু দেখিতে পাইলেন তাঁহারই আত্মজ শ্রীমান নিরুপম ও অনুরূপম তাঁহার বিলাতী বুটের ধূলি মাথায় লইতেছে। ছয় বৎসর পূর্বে যাহারা দেশে থাকিয়া বিদেশী সাজিয়াছিলেন, আজ তাঁহারাই বিদেশ হইতে বাঙালী হইয়া আসিয়াছেন।





ভারতবর্ষ

লক্ষ্মী বৈশাখী-সম্মিলনী—

'লক্ষ্মী বৈশাখী-সম্মিলনী' হয়ত আমাদের ক'জনের কল্পলোকেই থেকে যেত, যদি-না আমরা শ্রদ্ধেয় কবি-বারিষ্টার শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়ের আন্তরিক উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা পেতুম। তার পর লক্ষ্মী-প্রবাসী ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীনিখিলকুমার সিদ্ধান্ত, শ্রীঅসিতকুমার

নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করা যায় নেজস্তু এ-প্রকার উৎসব অত্যন্ত আবশ্যিক। সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের পর ছোট ছেলে-মেয়েদের ও তরুণবয়স্কদের আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা হয়। তার পর নানা ধরনের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হয়েছিল, যেমন গানবাজনা, মাজিক, রঙ্গকৌতুক, বায়াম, অভিনয় ইত্যাদি। শ্রীমুনীল ঘোষের মাজিক ও স্বরানুকৃতি-কৌশল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীরমেন্দ্র চৌধুরা রঙ্গাভিনয় দ্বারা শ্রোতৃবর্গকে পরিতৃপ্ত করেন। অবশেষে ছাত্রগণ কর্তৃক 'চিতোর গোরব' দক্ষতার সহিত অভিনীত হয়।



সম্মিলনের কক্ষদ্বন্দ

হালদার, ডক্টর নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমুখ মাননীয় স্থবীরগণের সহায়ত্বিত যখন সহজেই পাওয়া গেল, তখন বৈশাখী-সম্মিলনীর স্থষ্টি যে গৌরবান্বিত হবে, তা বলাই বাহুল্য। সম্মিলনার তরুণ উদ্যোগীদের চেষ্টা লক্ষ্মী প্রবাসী বাঙালী স্নেহের চক্ষে দেখলেন ও সেই সঙ্গে যথোচিত সাহায্য করলেন ও অদাবি করলেন।

এ-বৎসর সম্মিলনীর অধিবেশন হয় এপ্রেল ২১শে ও ২২শে। প্রথম দিন অধ্যাপক শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর চিন্তাশীল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ তাঁর উপযুক্তই হয়েছিল। প্রবাসী বাঙালীর পক্ষে একরূপ উৎসব, সামাজিকতা ও কৃষ্টির দিক দিয়ে যে কতদূর প্রয়োজনীয় তা তিনি তাঁর বিশিষ্ট ভঙ্গীতে প্রাঞ্জলরূপে বুঝিয়ে দেন, সেই সঙ্গে এ-কথাও বলেন যে বাংলার মনোময় রূপের ও ভাবধারার সহিত সংযোগ রাখা একরূপ সাহিত্যসম্মিলনীর দ্বারাই সম্ভব। প্রবাস-জীবনের প্রতিকূল আবেষ্টনের মাঝে ষাতে বাঙালীর

দ্বিতীয় দিন সভাপতি হয়েছিলেন প্রসিদ্ধ শিল্পী ও স্থানীয় সরকারী আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীঅসিতকুমার হালদার। তাঁর মনোজ্ঞ অভিভাষণের বিষয়বস্তু ছিল—সাহিত্য ও শিল্পের পারস্পরিক সম্বন্ধ-বিচার। শিল্পকলার নিগূঢ় আবেদন জীবনে ও সাহিত্যে যে কতখানি সার্থকতা এনে দেয় তা তিনি সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করেন। তার পর মেয়েদের গানের প্রতিযোগিতা হয়। ছোট ছোট বাঙালী মেয়েদের সম্মতপ্রতিভা দেখে সেদিন অনেকেই মুগ্ধ হন। সঙ্গীত-বিশারদ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রতিযোগিতার বিচার ক'রে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। লক্ষ্মীর জনপ্রিয় প্রসিদ্ধ অবৈতনিক অভিনেতা শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ আদিতা, শ্রীহরিনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকরণাময় মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচিত দৃশ্য অভিনয় ক'রে তাঁদের কলাতনপূণ্য প্রদর্শন করেন। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ আদিতোর "চাণক্য" ও

শ্রীকমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রঘুবীর" প্রভূত প্রশংসা পেয়েছিল।
শ্রীঅধীরকুমার মিত্র ব্যায়াম ও মাংসপেশী-সংযমনের দ্বারা সকলকে



রক্তকরবীর রঙ্গমঞ্চ

বিস্মিত করেন, সেই সঙ্গে শ্রীরমেন্দ্র চৌধুরী ব্যায়াম সম্বন্ধে একটি
নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

এদিনকার উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল প্রবন্ধ ও কবিতা প্রতি-



রক্তকরবীর রঙ্গমঞ্চে জনকয়েক অভিনেতা।

যোগিতার পারিতোষিক বিতরণ। প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার
বিবরণ করা হয়েছিল, "প্রবাসী বাঙালীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ
অন্নসমস্যা"। প্রবাসী বাঙালীর মধ্যে বেকার-সমস্যা কিরূপ
শোচনীয় হয়ে উঠছে সেই সম্বন্ধে লোকমত উদ্ঘাটন করার

জনাই গভীরগতিক সাহিত্যসংক্রান্ত আলোচনা বাদ দিয়ে
উল্লিখিত বিষয় স্থিরীকৃত হয়। সন্মিলনের আর একটি
উল্লেখযোগ্য জিনিষ ছিল—"কারুশিল্প প্রদর্শনী"। স্থানীয় বাঙালী
শিল্পীদের নানাবিধ হাতের কাজ প্রদর্শনীর জন্য আনীত হয়, তার
মধ্যে শ্রীসরল ভট্টাচার্যের পারিতোষিক প্রাপ্ত স্থচিশিল্প সকলের
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' অভিনয় করা হয়।
বাংলার বাইরে সখের অভিনয় বা সচরাচর হ'য়ে থাকে তা
অধিকাংশই কলিকাতার পেশাদারী থিয়েটারে অভিনীত
নাটকের চর্কিত-চর্কণ। উচ্চশ্রেণীর প্রকৃত নাটকের অভিনয় করা
হয় না, যে-হেতু সাধারণ দর্শকশ্রেণী সস্তা বাকচাতুরীপূর্ণ, উচ্ছ্বাসবহুল
নাটকই পছন্দ করে। তা সত্ত্বেও যে আমরা রবীন্দ্রনাথের নাটিকা-
ভিনয়ের বাবস্থা করেছিলাম গত বৎসর ও এ-বৎসর, তা অনেকেই
দুঃসাহনিকতা বলে মনে করেছিলেন, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেল
গত বৎসর 'ডাকঘরের' অভিনয় আশাতীতরূপে প্রশংসিত হ'ল—



রঙ্গমঞ্চে সন্মিলনের বালক স্বেচ্ছাসেবকগণ

তাই এ-বৎসর 'রক্তকরবী'র মত জটিল রূপক-নাট্য অভিনয়ের
জনা গৃহীত হয়। আনন্দের বিষয়, অভিনেতারা প্রাণপণে
পরিশ্রম করে তাঁদের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করেছিলেন। উদীয়মান
চিত্রশিল্পী শ্রীকিরণ ধরের পরিচালনায় অভিনয়ের সমস্ত আয়োজন এক
দৃশ্যপটের ও রূপসজ্জার নিপুণ পরিকল্পনা করা সম্ভব হয়। তা ছাড়া
তিনি নিজে "নন্দিনী"র ভূমিকা সুন্দর অভিনয় করে সকলকে আনন্দ
দান করেন। অন্যান্য ভূমিকা—যথা, শ্রীকমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের
"অধ্যাপক," শ্রীমান্ প্রণয়রঞ্জনের "রাজা," ও শ্রীমান্ রামেশ্বরের
"বিশ্ব" কৃতিত্বের সহিত অভিনীত হয়েছিল। মোটের উপর
নাট্যমোদীগণ সেদিন রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য রসসৃষ্টি সমাক্ষ উপভোগ
করতে পেয়েছিলেন।

আমার শেষ নিবেদন, কার্যাকরী সমিতির অধ্যক্ষতার দায়িত্ব
গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হ'ত যদি না শ্রীকমলাকান্ত

বন্দোপাধ্যায়, শ্রীকিরণ ধর, শ্রীজ্যোতি লাহিড়ী, শ্রীমণীন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কর্মসচিবগণের ও শ্রীকালীপদ বন্দোপাধ্যায়ের মত অল্পসংখ্য কর্মীদের সহযোগিতা পেতুম। লক্ষ্মী-প্রবাসী বাঙালী তরুণরা যে অভিনব বার্ষিক উৎসবের প্রচলন করেছে তা প্রতি বৎসর উন্নততর হোক ও সকলকে অবিমিশ্র আনন্দ ও তৃপ্তি দিক, সর্বাস্তুরূপে এই প্রার্থনাই করি।

শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায়

এলাহাবাদ মিউনিসিপাল মিউজিয়ামে কণিক-লেখ :—

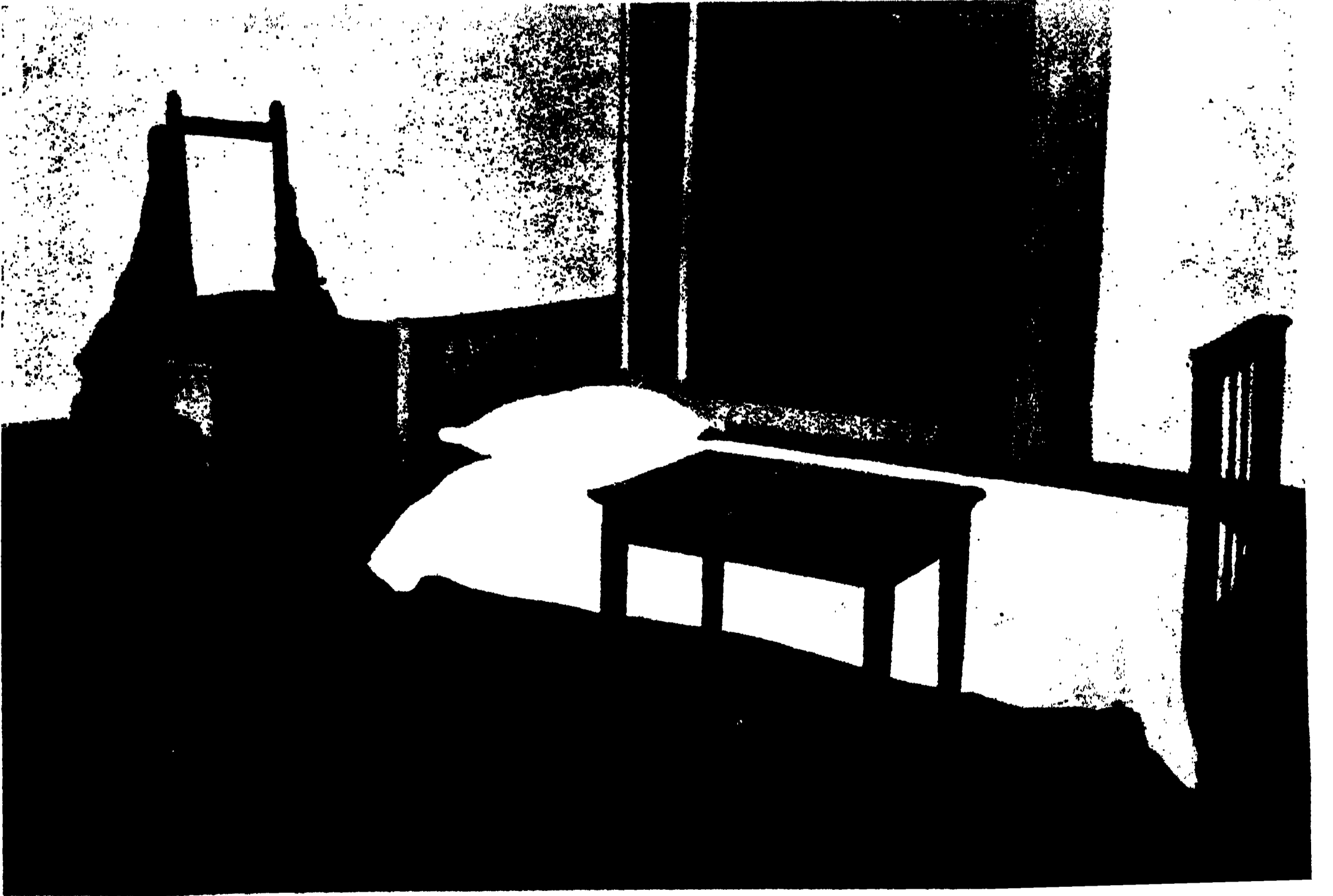
এলাহাবাদ মিউনিসিপাল মিউজিয়ামে রক্ষিত প্রস্তরনির্মিত এক বৃহৎ বোধিসত্ত্বমূর্ত্তির তলদেশে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্রাজুয়েট ফেলো, শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ গোস্বামী কৃষ্ণাণ-সম্রাট কণিকের সময়ের এক লেখ (inscription) আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা মহারাজ কণিকের দ্বিতীয় রাজ্য সংবৎসরের বলিয়া অনুমান হয়। এ-গাবৎ কণিকের যত লেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে ইহাই প্রাচীনতম বলিয়া মনে হয়। ইহাতে লেখা আছে মহারাজ কণিকের ২য় সংবৎস্রে ভিক্ষুণী বুদ্ধমিত্রা ভগবান্ বুদ্ধের চংক্রমণ [সর্বদা যাতায়াত] স্থানে এই বোধিসত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিলেন।

বাংলা

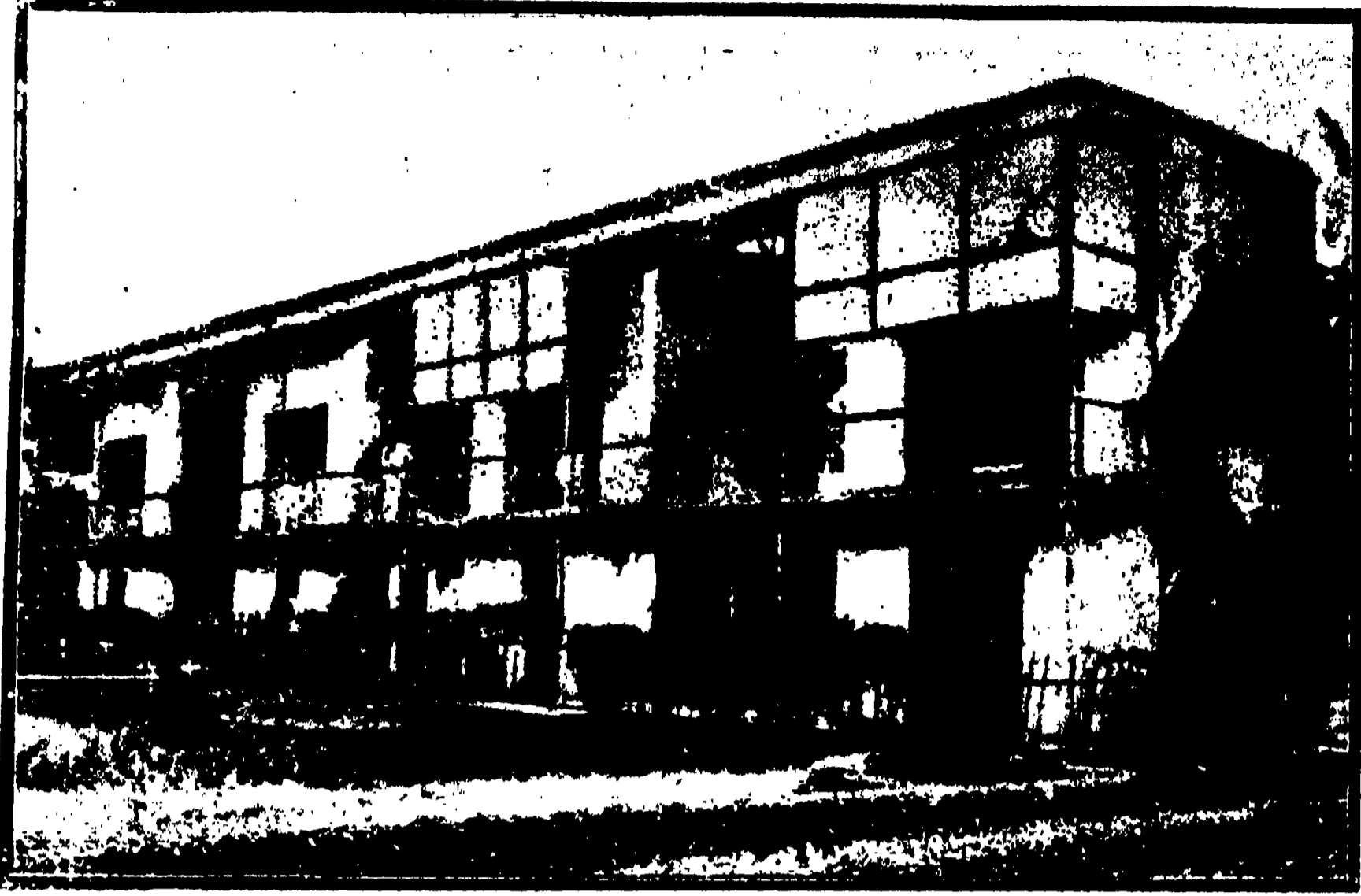
যাদবপুর যক্ষ্মা-চিকিৎসালয়—

কলিকাতা হইতে ছয় মাইল দক্ষিণে যাদবপুরের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে প্রায় সাড়ে আটাশ বিঘা জমির উপর এই চিকিৎসালয় অবস্থিত। ডাক্তার শ্রীচন্দ্রমাধব ঘোষের একমাত্র পুত্র শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হওয়ায় এই দেশে এইরূপ একটি চিকিৎসা-কেন্দ্রের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করেন। তাঁহার প্রায় দুই লক্ষ টাকার মূল্যের সম্পত্তি এই যক্ষ্মাচিকিৎসা-কেন্দ্রের নির্মাণকল্পে এক সমিতির হস্তে অর্পিত হয়। এই সমিতিই “কলিকাতা মেডিক্যাল এন্ড ও রিসার্চ সোসাইটি” নামে বিখ্যাত। ১৯২৩ সালে যখন ইহা প্রথম নির্মিত হয় তখন ইহাতে মাত্র চারিজন রোগীর আসনের ব্যবস্থা ছিল। অনন্তর বাংলা-সরকার, কলিকাতা কর্পোরেশন ও অন্যান্য সাধারণ প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ও ব্যক্তিগতভাবে অর্থসাহায্য পাইয়া প্রতিষ্ঠানটি ক্রমশঃই উন্নতির পথে চলিয়াছে।

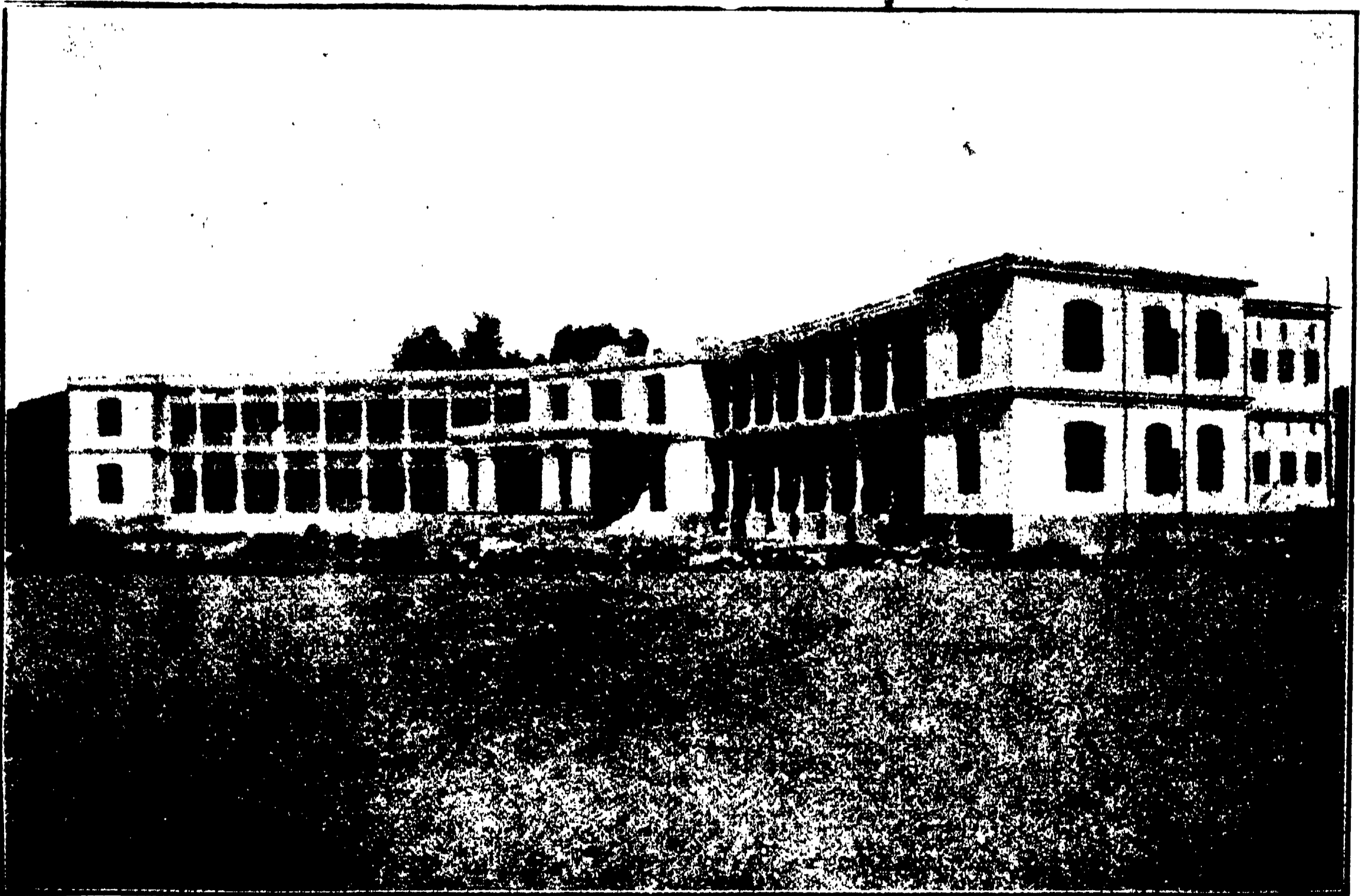
চিকিৎসালয়টি কলিকাতার অতি সন্নিকটে অবস্থিত বলিয়া শহরের বিস্তৃত চিকিৎসকগণের অবৈতনিক সাহায্যলাভ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। দিন দিন নূতন রোগীর আবেদনপত্র এতই বাড়িয়া চলিয়াছে যে কর্তৃপক্ষের পক্ষে স্থানসঙ্কুলান করা বর্তমান আস্থায় অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। গতবর্ষে (১৯৩৩) ছয় জন অতিরিক্ত রোগীকে অস্থায়ী ভাবে



যাদবপুর যক্ষ্মা-চিকিৎসালয় রোগীর কক্ষ



ডাক্তারদের বাসস্থান



যাদবপুর হাসপাতাল-চিকিৎসালয়

তীব্র ফেলিয়া স্থান দেওয়া হইয়াছিল এবং সমস্ত বৎসরে মোট এক শত ছাব্বিশটি রোগীকে ভর্তি করা হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে পঁচানব্বইটি পুরুষ ও একত্রিশটি স্ত্রীলোক। ইহাদের মধ্যে মোট একশত বাইশটি ছাড়পত্র পাইয়াছে।

প্রতিদিন গড়ে কতগুলি রোগী চিকিৎসিত হয় তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—পুরুষ ৫০.৩, স্ত্রী ১৫.২, মোট সংখ্যা ৬৫.৫।

জাতিধর্মনির্বিশেষে বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশের রোগীরা এই প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসার জন্য আসিয়া থাকে। গত বৎসরে কলিকাতায় ৫৯টি



ইংরেজীভাষী রোগীদের বাসগৃহ

রোগী ব্যতীত প্রেসিডেন্সী বিভাগ হইতে ১৫ জন, ঢাকা হইতে ২২ জন, বর্ধমান হইতে ১৪ জন, চট্টগ্রাম হইতে ৭ জন, রাজশাহী হইতে ৬ জন, চন্দননগর হইতে ১ জন এবং বঙ্গের বহিঃপ্রদেশ হইতেও ১ জন রোগী এই চিকিৎসা-কেন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

এই চিকিৎসা-কেন্দ্রের যক্ষ্মারোগগ্রস্তদিগের মধ্যে অনুসন্ধানের লে জানা গিয়াছে যে সাধারণত ছাত্র, শ্রমশীলা গৃহকরী, বাবদায়ী কেরানিদিগের মধ্যেই এই রোগ অধিক পরিমাণে দেখা দিয়াছে। গতবর্ষে চিকিৎসিত রোগীদিগের মধ্যে কত জন কোন সম্প্রদায়ের গৃহস্থের একটি একটি তালিকা দেওয়া গেল—

সম্প্রদায়	পুরুষ	স্ত্রী	মোট সংখ্যা
হিন্দু	৬৩	২২	৮৫
মাড়োয়ারী (জৈন)	১৪	৩	১৭
আংলো-ইণ্ডিয়ান	১২	৩	১৫
ভারতীয় খৃষ্টান	৩	৩	৬
মুসলমান	৩	০	৩
বৌদ্ধ	১	০	১

রোগীদিগকে পুষ্টিকর দুগ্ধাদি সরবরাহ করিবার জন্ত ‘আলিপুর ডায়ারি ফার্ম’ পার্শ্ববর্তী প্রায় দুই বিঘা জমির উপর গবাদি পশুর দল বাসস্থান ও বিচরণস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছে। কর্তৃপক্ষগণ রোগীদিগের বস্ত্রাদি বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ধোত করিবার জন্ত সম্প্রতি

একটি ‘প্রক্ষালন যন্ত্র’ (laundry plant) আনয়ন করিয়াছেন। ইহার জন্য দশ হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। নানাবিধ আনুসঙ্গিক অস্থানের এখনও অভাব থাকায় এই স্বাস্থ্যনিবাসের পক্ষে অর্থসংগ্রহ করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। অতএব সাধারণ রোগীদিগের জন্য এই প্রতিষ্ঠানে যে দৈনিক দুই টাকা মাত্র চিকিৎসা ও পথ্যের জন্য লওয়া হয় তাহাতে বলিবার কিছুই থাকিতে পারে না। কলিকাতা কর্পোরেশনের অর্থবায়ে যে-২০টি আসনের বন্দোবস্ত আছে তাহার জন্য কিছু লওয়া হয় না। মাননীয় সভাপতি শ্রী নীলরতন সরকার মহাশয়ের স্বেচ্ছায় তদ্ব্যবধানে ও কর্তৃপক্ষের ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়ের আশ্রয় চেষ্টায় এমন একটি অত্যাবশ্যক স্বাস্থ্য-নিবাস উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বঙ্গীয় যক্ষ্মা-সমিতি —

বাংলায় যক্ষ্মারোগের প্রশমনের উপায় নির্ধারণের জন্ত “দি টিউবরকুলেসিন্ এন্ড সোসিয়েশন অব বেঙ্গল” নামে একটি সমিতি আছে। ইহার পৃষ্ঠপোষক বাংলার গবর্নর বাহাদুর। সরকারী সাহায্য ব্যতীত এই সমিতি কলিকাতা কর্পোরেশন ও রেড ক্রস সোসাইটির সাহায্য পাইয়া থাকে। স্বর্গীয় সার রমেশচন্দ্র মিত্র স্মৃতি-রক্ষা সমিতির উদ্বৃত্ত টাকা দ্বারা ইহার একটি স্থায়ী তহবিল স্থাপিত হইয়াছে। রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিরক্ষাসভার উদ্বৃত্ত অর্থও এই রমেশচন্দ্র

তহবিলে দেওয়া হইয়াছে। স্বর্গীয় সার বিনোদ মিত্রের স্মৃতিরক্ষার্থ এইরূপ একটি স্থায়ী তহবিল প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত বাংলার গবর্ণরের নিকট পাঁচ হাজার টাকার এক প্রতিশ্রুতি আসিয়াছে।

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় —

গত ১লা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার অপরেশচন্দ্র লোকান্তরিত হইয়াছেন। সাজসজ্জা ও দৃশ্যপটাদির নূতন নূতন পরিকল্পনার অপরেশচন্দ্র



অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

রঙ্গালয়ের বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। তিনি অভিনয়ে নূতন ধারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন, নূতন নূতন নাটক লিখিয়া নাট্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। অপরেশচন্দ্র একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন। অভিনয়-শিক্ষাদানে তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। তিনি রঙ্গালয়ের সুদক্ষ অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার অভাবে বঙ্গ-রঙ্গালয়ের ও নাট্যসাহিত্যের যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূর্ণ হইবে না।

বিধব-বিবাহ—

কুমিল্লা বিধব-বিবাহসহায়ক সমিতির চেষ্টায় ১৯৪০ সালের বৈশাখ হইতে ফাল্গুন মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত বিবাহগুলি জাতি-হিসাবে সম্পাদিত হইয়াছে—

কায়স্থ ১৫, মালাকর ১, কৈবর্ত ২, শীল ১২, ভূইয়ালী ১, রুদ্রপাল ১, কর্মকার ২, নাথ ৫, গঙ্গবণিক ৩, কত্রিয় ৩, মল্লবর্ষণ ১৫, বারুই লতা বৈদ্য ১, ধূপী ২, সাহা ১, স্ত্রীধর ২, ১৩৪০ বাং মোট ৬৬। পূর্ব পূর্ব বৎসরের বিবাহ-সংখ্যা ৩৬৫, সর্বমোট ৪৩১টি।

শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠের নূতন উপাধি—

সম্প্রতি খ্যাতনামা সাহিত্যিক বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় ফরাসী গভর্ণমেন্ট কর্তৃক ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সম্মান 'লেজিয়ে দনার' (Chevalier de la Legion d' Honneur) উপাধি ভূষিত হইয়াছেন।

প্রবাসী বাঙালীর কৃতিত্ব—

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রমোহন দাস এ-বৎসর লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে



শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রমোহন দাস

প্রাণিতত্ত্ব-বিজ্ঞানে 'ডক্টর অফ সায়েন্স' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রাণিতত্ত্ব-বিজ্ঞানে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনিই প্রথম এই উপাধি লাভ করিলেন।

বিদেশ

চীনদেশে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়—

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, এম্-এ, (Wis.) আমেরিকার নিউইয়র্ক নগরস্থ রকফেলার ইন্টারন্যাশনাল হাউসের সহকারী ডিরেক্টরের পদ অধিষ্ঠিত থাকাকালে ১৯৩৩ সালের জুলাই মাসের শেষভাগে আমেরিকা হইতে রওনা হইয়া হনোলুলু এবং জাপান হইয়া চীনে আসিয়া সম্প্রতি পেইপিঙে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, চীনদেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে নিজে সেখান-শুনিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করা। তিনি সেখানে কয়েক মাস থাকিবেন। তাঁহার তথাকার বর্তমান কাজ সম্বন্ধে তাঁহার গত ২৮শে জানুয়ারীর পত্র হইতে খানিকটা উদ্ধৃত করিলাম—“I have been rather busy giving lectures in various universities and clubs here

on India, International Houses, and general topics of a cultural nature. I have more to give I am surprised to learn of the deep interest the Chinese people take in the culture of India—China is heavily borrowing from our experiences with the co-operative credit organizations in India.”

অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ

ওটাওয়া চুক্তির ফল—

দোকানদারগণ বলেন—থন্দের লক্ষ্যে, ওদের চটাইতে নেই। কিন্তু ভারতবর্ষ ক্রেতাগণের মধ্যে এক দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইতে যাওয়া অপূর্ণ (এবং সংখ্যায় বৃহত্তর) দলকে চটাইয়া ফেলিয়াছে। অবশ্য এই বাপারে ভারতবর্ষের কৃষক ও শিল্পীগণের কোনই হাত নাই। স্বাধিকারহীন ভারতবর্ষ ওটাওয়া চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন “কর্তার ইচ্ছায়”, নিজের স্বার্থ স্বাধানভাবে পরীক্ষা করিয়া লইবার ক্ষমতা তাহার নাই। কিন্তু যখন উক্ত ক্রেতাগণ প্রতি-আঘাত করিতে উদ্বৃত হয় তখন বিপন্ন হইয়া পড়ে ভারতবর্ষের দরিদ্র কৃষক ও শিল্পী।

(ক) জার্মানী—গত ২৩শে মার্চ এক রাজির বৈঠকেই জার্মান সরকার ১৩টি আকস্মিক আইন (Emergency law) বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটির সর্ভ এইরূপ—(১) পশম, তুলা, পাট, শণ ও তিসি বা মসিনা প্রভৃতি কাচামালের আমদানি নিয়ন্ত্রিত করা হইবে, (২) এই নিয়ন্ত্রণের সামান্য নিষ্কারের জন্ত একটি কমিটি বসিবে এবং (৩) এই কমিটি কোন নিষ্কার করিবার পূর্বে পর্যাপ্ত উল্লিখিত মাল-সমূহের আমদানি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখা হইবে।

ওটাওয়া চুক্তিতে আবদ্ধ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন দেশসমূহকে আঘাত করিবার উদ্দেশ্যেই যে এই আইন করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই; কারণ অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতবর্ষ হইতেই উল্লিখিত কাচা মাল সংগৃহীত হইত।

জার্মানী বাংলার পাটের প্রধান খরিদার, তথায় কাচা পাটের চাহিদা বাড়িয়া চলিতেছিল—এ সময় আমদানি বন্ধ করিয়া জার্মানী বাংলার কৃষকগণের ভাষণ ক্ষতি করিয়াছে।

(খ) ইটালি ‘ভারতবর্ষ ইটালি হইতে যত শিল্পজবা ক্রয় করে, তাহার বিপণন মূল্যের তৈলবীজ, পাট, তুলা ও রবার বিক্রয় করে। এই অবস্থার শেষ করিতে হইবে।’ ইটালির রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রক মুসোলিনি এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে আমদানি নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্ত একটি কমিটি বসিবে এবং যে সকল দেশ সন্তোষজনক পরিমাণে ইটালী হইতে পণ্যক্রয় ক্রয় করিবে, সেই সকল দেশ হইতেই মাল আমদানির অনুমতি এই কমিটি দিবে।

ইটালিও বাংলার পাটের ও অস্ত্রান্ত্র জবোর বড় খরিদার। ইটালিতে চটকল আছে, তাহাদের কাজ ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে কাচা পাটের চাহিদাও বাড়িতেছিল।

ইটালির কতিপয় বস্ত্রের উপর আমদানি-শুল্ক হ্রাস করিয়া দিতে ইটালি-সরকার ভারত-সরকারকে অহুরোব করিয়াছেন। ভারত-সরকার এ-সম্পর্কে কি মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, তাহা প্রকাশিত হয় নাই।

যৌথ সমবায়—

ব্রিটিশ ভারতবর্ষ ও হায়দরাবাদ, বরোদা, গোয়ালিয়র, ইন্দোর ও ত্রিবাঙ্কুর—এই ছয়টি দেশীয় রাজ্যের যৌথ সমবায়ের ১৯৩০-১৯৩১

সনের সরকারী বিবৃতি সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। যৌথ সমবায়ের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিতেছিল—অকস্মাৎ আলোচ্য বর্ষে ভীষণভাবে কমিয়া গিয়াছে।

বৎসর	সংখ্যা	স্বীকৃত মূলধন (হাজার টাকা)	আদায়ী মূলধন
১৯২৪-২৫	৪১৬	২১,২৩,২৫	৮৬,০৬
১৯২৫-২৬	৪৭২	৩০,০৬,০৮	৫৭,৪৬
১৯২৬-২৭	৫২৯	১৯,৩৯,০৯	৪৪,৩২
১৯২৭-২৮	৬২৬	১৭,৫৭,০৪	৮৬,৩৫
১৯২৮-২৯	৭২৬	২৭,৩৮,৩১	৭৭,৯৪
১৯২৯-৩০	৮৩৯	৬২,৫৫,১৮	২,৩৮,৮৩
১৯৩০-৩১	৭৩১	২১,৫৫,৬২	৮২,৭১

যৌথ-মণ্ডলী ‘রেজিস্টারী’ করিবার আইন হইবার পর ১৯৩০-৩১ সন পর্য্যন্ত মোট ১৬,১০০ যৌথমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৭,৩২৮টি কোম্পানী (অর্থাৎ অর্ধেকেরও কম, শতকরা ৪৫.৫) এই সময়ের শেষ পর্য্যন্ত কার্য করিয়াছিল।

বৎসর	সংখ্যা	স্বীকৃত মূলধন (হাজার টাকা)	আদায়ী মূলধন
১৯২৮-২৯	৬,৩৩০	৬,৪১,৪০,১০	৬,৬১,৯৮,০০
১৯২৯-৩০	৬১১০	৬,৬২,৯৮,০০	২,৮৬,৩৩,৫৮
১৯৩০-৩১	৭,৩২৮	৬,৫৮,৬৩,৩০	২,৮২,৫৮,২৭

বাংলায় সবচেয়ে অধিক যৌথ-মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে—

প্রদেশ	সংখ্যা	আদায়ী মূলধন (হাজার টাকা)
বাংলা	৩৬৫২	১,১১,৫২,১৮
বোম্বাই	৯৫৯	৯৭,৭৪,২৬
মাল্লাজ	৮০০	১৪,৯৮,৩৩
ত্রিবাঙ্কুর	৪০৩	১,৬৫,৫৫
ব্রহ্ম	২৮৮	২৬,৫৫,৪৯
পঞ্জাব	২৮৫	৩,৯৭,৩২
যুক্তপ্রদেশ	২২৪	১১,৪৭,৭৬
আসাম	১৬৬	৯৭,১৬
মহীশূর	১২১	১,৪৮,৩৬
দিল্লী	১০৮	১,০৬,৬২
বিহার-উড়িষ্যা	৯৭	১,৫৫,০০
মধ্যপ্রদেশ	৫৪	১,০৫,৯০
বরোদা	৪২	১,৫২,৪১
হায়দরাবাদ	৫০	১,৭৫,২৮
গোয়ালিয়র	৩৬	৩,১০,৮৯
আজমীর-মারবারা	২২	৩৬,১৬
ইন্দোর	১১	১,৪৭,১৪
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	৬	১০,৪৬
বাল্জালোর	৮	১২,২৬
কুর্গ	৫	৩,৬৪
বেলুচিস্তান	১	...
	৭৩২৮	২,৮২,৬৮,৪৭

যদিও বাংলা দেশেই কোম্পানীর সংখ্যা প্রায় অর্ধেক তথাপি ইহা

মনে করিবার কোনই কারণ নাই যে বাংলা দেশের সব কোম্পানীট বাঙালীর মূলধনে গঠিত কিংবা তাহাদের কার্যপনিসর বাংলা দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ইহাও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে বাংলায় কোম্পানীর সংখ্যার অল্পশ্রুতে আদায়ী মূলধন বেশী নহে। এ-হিসাবে ইন্ডোর-প্রথম, ভারপর বোম্বাই, ব্রহ্ম, গোল্লালিয়ব, যুক্তপ্রদেশ, হারিদবাবাদ ও ববোদাব পরে বাংলাব স্থান।

বৈদেশিক কোম্পানী—

আলোচ্য বর্ষে ভারতবর্ষে ৮৯৭ বৈদেশিক কোম্পানী ছিল। তাহাদের মূলধন পাউণ্ড ৭৪২,৩৪৮,০০০। তদুপরি ডিবেঞ্চার পাউণ্ড ১৩৪,২৫৩,০০০। এই মূলধন বা ডিবেঞ্চারের বাবতীর অর্থট বৈদেশিক কোম্পানীর নিম্নোক্তিত তাহা নহে, ভারতের বাহিরেও ইহাদের বিস্তীর্ণ কার্যক্ষেত্র, সুতরাং ভারতবর্ষে এই বৈদেশিকগণের কত টাকা খাতে তাহা নির্ণয় কবিবার উপায় নাই। দক্ষিণ-ভারতে সোনার খনি, রেলপথ, ট্রামপথ ও চা-বাগানেই বৈদেশিকগণের অর্থ বেশী।

চিনির উপর আবগারী শুল্ক—

সম্প্রতি ভারতবর্ষে প্রস্তুত চিনির উপর আবগারী শুল্ক বাধা হইয়াছে। ১৯৩২ সনে চিনি সংরক্ষণ আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে চিনি উৎপাদনের চেষ্টা বৃদ্ধি পাইতেছিল, শুরুধার্যের ফলে সে চেষ্টায় আঘাত পড়িবে। কতিপয় বৎসর বাবৎ চিনির কারখানার সংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছে।

কারখানার সংখ্যা

প্রদেশ	১৯৩০-৩১	১৯৩১-৩২	১৯৩২-৩৩	১৯৩৩-৩৪
যুক্ত প্রদেশ	১২	১৪	৩৩	৭০
বিহার-উড়িষ্যা	১২	১২	১৯	৩৪
পঞ্জাব	১	১	১	৯
মাল্লাজ	২	২	২	৯
মহীশূর	×	×	×	১
ত্রিবাঙ্গুর	×	×	×	১
বোম্বাই	১	১	১	৭
কাথিরাবাদ	×	×	×	১
ব্রহ্ম	১	১	১	১
বাংলা	×	×	×	২
	২৯	৩১	৫৭	১৩৩

আধুনিক প্রথামতে স্থাপিত কারখানাই এই তালিকাভুক্ত হইয়াছে, প্রাচীন পদ্ধতিতে যে সকল স্থানে চিনি প্রস্তুত হয় তাহা ধরা হয় নাই।

সংরক্ষণ নীতির ফলে চিনির কারখানার সংখ্যা হ্রাসেরও বেশী হইল। ১৯৩৪-৩৫ সনে আরও নূতন কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। চিনির কারখানার কলকল্প কত আমদানি হইয়াছে তাহা দেখিলেই বুঝা যাইবে।

(হাজার টাকা)

বৎসর	গ্রেট ব্রিটেন	মোট
১৯২৯-৩০	৮৪৯	৯২১
১৯৩০-৩১	১০৮২	১৩৩৮
১৯৩১-৩২	২৬২২	৩০১৪
১৯৩২-৩৩	৯১৪৮	১৫৩১১
১৯৩৩-৩৪	১৯৫৭৭	৩৩৬৩৮

পৃথিবীতে কত চিনি উৎপন্ন হয়—হাজার মেট্রিক টন

	১৯৩০-৩১	১৯৩১-৩২	১৯৩২-৩৩
যুরোপ	১০৬৬৫	৭৫১৪	৬৫২৭
এসিয়া	৮৬৮৪	৯৭২১	৯৫২১
আফ্রিকা	৮২৬	৭৮০	৯৩১
উত্তর আমেরিকা	৭৪০৫	৭১০১	৬৫০৬
দক্ষিণ আমেরিকা	১৯৩৬	১৯২৬	১৮৮০
অষ্ট্রেলিয়া, ফিজি প্রভৃতি	৬৪২	৬৮৯	৬৯৮
মোট	৩০২০৮	২৭৭৩১	২৬০৬৩

নিয়ন্ত্রণ চুক্তির ফলেই উৎপাদনে এই হ্রাস। ১৯৩০ সালেই এই মে কিউবা, জাভা, চেকোস্লোভাকিয়া, জাপানী, পোলাণ্ড, বেলজিয়ান, হাঙ্গারী—এই নব্বটি চিনি উৎপাদক দেশ এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে তাহারা (১) পাঁচ বৎসরে তাহাদের উৎপাদিত চিনি বিক্রয় করিয়া ফোলাবে এবং (২) এই সময়ে উৎপাদন এমন সীমাবদ্ধ করিবে যেন উৎপাদন না থাকে। ভারতবর্ষ এই চুক্তিতে আবদ্ধ নহে।

বিদেশ হইতে কত চিনি আসে

	টন	টাকা (লক্ষ)
১৯২৬—২৭	৮২৬৯০০	১৮৩৬
১৯২৭—২৮	৭২৫৮০০	১৪৫০
১৯২৮—২৯	৮৬৮৮০০	১৫৮৬
১৯২৯—৩০	৯৩৯৬০০	১৫৫১
১৯৩০—৩১	৯০১২০০	১০৫৪
১৯৩১—৩২	৫১৬১০০	৬০১
১৯৩২—৩৩	৩৬৯৫০০	৪১২
১৯৩৩—৩৪	২৬১০০০	২৭০

১৯৩০—৩১ সন হইতে চিনির আমদানির হ্রাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে ভারতবর্ষে প্রস্তুত চিনির পরিমাণ বাড়িয়া চলিতেছে।

	ইক্ষু হইতে	গুড় হইতে	খাঁড়সারি (আনুমানিক)	মোট
১৯২৬—২৭	৬২১৪১	৫৮০৮৫	২০০০০০	৩২১০২৬
১৯২৭—২৮	৬৭৬৮৪	৫২০৫৫	২০০০০০	৩১৯৭৩৯
১৯২৮—২৯	৬৮০৫০	৩১০৬৮	২০০০০০	২৯৯১৮৮
১৯২৯—৩০	৮৯৭৬৮	২১১৫০	২০০০০০	৩১০৯৮৮
১৯৩০—৩১	১১৯৮৫৯	৩১৭৯১	২০০০০০	৩৫১৬৫০
১৯৩১—৩২	১৫৮৫৮১	৬৯৫৩৯	২৫০০০০	৪৭৮১২০
১৯৩২—৩৩	২৯০০০০	৯১০০০	২৭৫০০০	৬৫৬০০০

(এষ্টেমেট)
(বিহারে ভূমিকম্পের জন্ত ১৯৩৩—৩৪ সালে চিনির পরিমাণ হ্রাস পাইবে এরূপ আশঙ্কা আছে।)

ভারতবর্ষে কি পরিমাণ চিনি ব্যবহৃত হয় তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে—

বৎসর	টন
১৯২৩—২৪	৬৭৮, ০৮১
১৯২৪—২৫	৮৫২, ০৫৭
১৯২৫—২৬	১, ০১১, ৪৮৮
১৯২৬—২৭	৯৯৯, ৩০২
১৯২৭—২৮	১, ১০১, ৫২৪

বৎসর	টন
১৯২৮—২৯	১, ১৬৪, ৮০৫
১৯২৯—৩০	১, ৩২৪, ৯২৩
১৯৩০—৩১	১, ২১৫, ৫৮৫
১৯৩১—৩২	৯৮২, ৫৪০
১৯৩২—৩৩	৯২৮, ০৯৫

ভারত সরকারের চিনি বিশেষজ্ঞ (Sugar Technologist) শ্রীযুক্ত শ্রীবাস্তব অনুমান করেন যে এই বৎসর (১৯৩৪-১৯৩৫) ভারতে চিনির চাহিদা ৯৫০, ০০০ টন হইবে। সুতরাং তিনি এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন যে, যে-ক্রমগতিতে চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা নিয়ন্ত্রিত না করিলে চিনিরও পাটের ও রবারের মত অধিকা দাড়াইবে। চিনির উপর আবগারী শুল্ক ধাঘোর সমর্থন জগু সার জঙ্ক স্টোরও এইরূপ কথাই বলিয়াছেন।

সতাই ভারতবর্ষে চিনির অতি-উৎপাদন হইতেছে? শ্রীযুক্ত শ্রীবাস্তব ভারতে চিনির চাহিদার যে পরিমাণ নির্দেশ করিয়াছেন গাং অতিক্রম করিয়া চাহিদা যে বাড়িবে না, এমন কোন কথা নাই। ১৯২৫-হইতে ১৯৩২ পর্যন্ত চিনির ব্যবহার বেশী হইয়াছে। এই চাহিদা চিনির মূল্যের উপর নির্ভর করে; যাহা চিনির দর যখন কলিকাতায় ১০।৮০ (১৯২৭-২৮) তখন চাহিদা ১,১০১, ৫২৫ টন। দর যখন ৯ টাকায় নামিল চাহিদাও তখন ১,৩২৪, ৯২৩ টনে উঠিল (১৯২৯-৩০)। ভারতে জনপ্রতি চিনির ব্যবহার অতি অল্প। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় দাঁড়াইতেই পারে না—

দেশ	পাউণ্ড (১৯১০—৩১)
ডেনমার্ক	১১৯.৩
হাউগাই	১১৫.৫
যুক্তরাষ্ট্র	১০৮.৫
মার্কিন	১০৭.১
ভারতবর্ষ	২২.৫

চিনি ক্রয় করিবার সামর্থ্য থাকিলে চিনির ব্যবহার যে বাড়িবে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এখনো বিদেশ হইতে যথেষ্ট পরিমাণ চিনি আনে, ভারতীয় চিনি বৈদেশিক চিনির আনদানি সম্পূর্ণরূপে রোধ করিতে পারে নাই।

ভারতে চিনির উৎপাদন যে উৎসাহ পাইয়াছিল এই শুল্কের ফলে তাহা কি হ্রাস পাইবে না?

এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী—

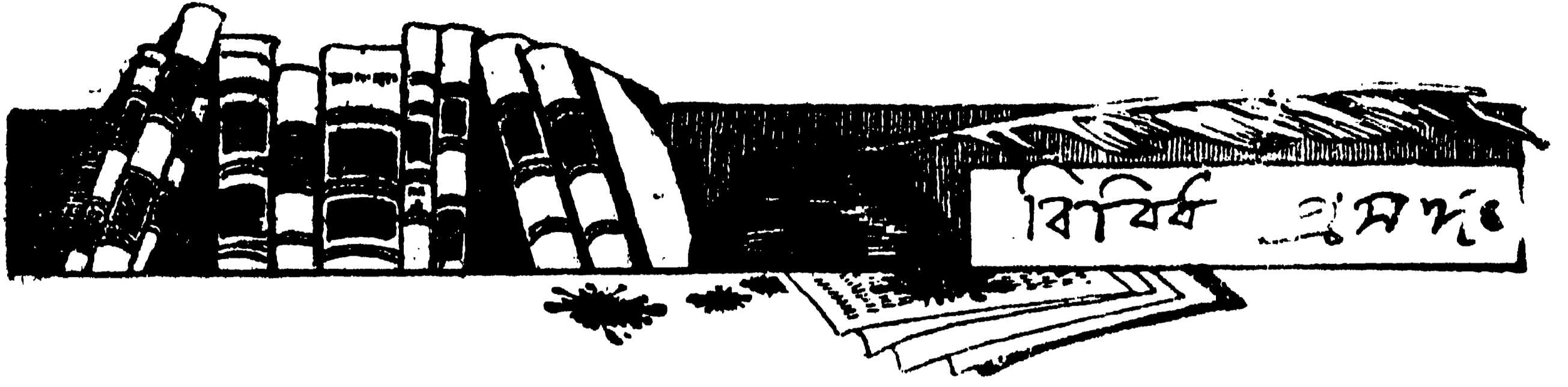
জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানে পাঁচি ভারতীয় পরিচালনার সাফল্যের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতে হইলে এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর নাম করিতে হয়। গত ২৮ ফেব্রুয়ারী কোম্পানীর ২৫তম বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। এই বৎসরের যে উৎকর্ষ-পত্র প্রকাশিত

হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ, যে কোম্পানীর ৭,৬০২ নূতন বীমা হইয়াছে—বীমার পরিমাণ ১,৩৮,৩৪,৫৭৪। ইহাতে মোট পলিসির সংখ্যা ৫৭,৬৩৯ ও বীমার পরিমাণ ১১,১৬,৬৪,৮৫৫ দাঁড়াইয়াছে। বীমার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে এম্পায়ার বড়ই সতর্ক। এ-প্রসঙ্গে বাৎসরিক সভার সভাপতি বলিয়াছেন—“ব্যয়সম্পর্কে উদাসীন থাকিয়া বৃহৎ পরিমাণে কার্য সংগ্রহ করিতে কোম্পানী ব্যগ্র নহে। * * আমরা এমন কোন পন্থা অবলম্বন করি না যাহাতে পরিণামে কোম্পানীর ক্ষতি হইতে পারে ও ফলে পলিসিওয়ালাদিগের বোনাস কমাইয়া দিবার আবশ্যিকতা উপস্থিত হইতে পারে।” কোম্পানীর ব্যয়ের হার “প্রিমিয়াম” আয়ের শতকরা ২২.১ মাত্র। কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৪,৩৭,৫১,৬১৩, তন্মধ্যে জীবনবীমা তহবিল ৪,২৯,৮২,১৪০। কোম্পানী টাকা খাটানো ব্যাপারে নিরাপদ পন্থাই অবলম্বন করেন। নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধনীয় গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি, পোর্টট্রাষ্ট, মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার ইত্যাদিতেই কোম্পানীর তহবিল লগ্নী করা হইয়া থাকে।

শস্ত্র-চাষ-পরিবর্তন বৈঠক—

বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি লইয়া সম্মেলন সম্ভ্রান্তি কে “ক্রপ প্লানিং কন্ফারেন্স” বসিয়াছিল তাহাতে নিম্নলিখিত সুপারিশ প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে—

- (১) মাল্ভাজে—
- (ক) কাছোড়িয়া তুলার চাষ ৫০,০০০ একর বাড়াইতে হইবে।
- (খ) ইক্ষুর চাষ তিন-চারি বৎসরে ৫০,০০০ একর বাড়াইতে হইবে যেন চিনি সম্পর্কে বাহিরের উপর নির্ভর না করিতে হয়।
- (গ) ফলের চাষ বাড়াইতে হইবে, যদি রেল কোম্পানী মাল চলাচলের অধিকতর সুযোগ দেয় (যদিও সম্ভ্রান্তি চাষ শতকরা ১৪ বাড়িয়াছে)।
- (২) বোম্বাই—ইক্ষু, আম, কলা ও আনারসের চাষ বাড়াইতে হইবে।
- (৩) বাংলা—ইক্ষুর চাষ বাড়াইবার সুযোগ আছে, পশুর খাদ্য (fodder crops) বাড়ানো উচিত।
- (৪) যুক্ত-প্রদেশ—উচ্চশ্রেণীর বালিঁর (মন্টের উপযোগী) চাষ বাড়াইবার সুযোগ আছে, তিসির চাষ বাড়ানো উচিত।
- (৫) পঞ্জাব—সোয়াবীন চাষ করা যাইতে পারে। পরীক্ষার জন্য এক চালান সোয়াবীন ইংলণ্ডে প্রেরণ করা যাইতে পারে।
- (৬) ব্রহ্ম—ইক্ষুই এক মাত্র (ধানের) বদলি চাষ—এক লক্ষ একর পর্যন্ত ইহা বাড়ানো উচিত।
- (৭) বিহার-উড়িষ্যা—ইক্ষু, তিসি, চিনা-বাদাম ও তিলের চাষ বাড়ানো উচিত।
- (৮) সিন্ধু—তুলা, ধনে ও তিসি চাষ বাড়ানো যাইতে পারে।
- (৯) আসাম—তিসি ও ইক্ষু চাষের সুযোগ আছে।



প্রবাসীর চতুঃশততম সংখ্যা

বঙ্গে বিবিধবিষয়ক সাধারণ মাসিকপত্র এখন যতগুলি আছে, তাহাদের মধ্যে এবং সচিত্র মাসিক পত্রগুলির মধ্যে 'প্রবাসী' প্রাচীনতম। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রাচীনতর মাসিক পত্র, কিন্তু তাহা প্রধানতঃ ধর্মবিষয়ক। 'প্রবাসী'র আগামী প্রাবণ সংখ্যা চতুঃশততম সংখ্যা হইবে। ইহা সাধারণ সংখ্যা হইতে বৃহৎ হইবে। ইহার বিচিত্রতা ও বিশিষ্টতা সাধনের জন্যও চেষ্টা করা হইবে।

কংগ্রেস ও কৌন্সিল প্রবেশ

রাঁচীতে নব-স্বরাজ্যদল-গঠনপ্রয়াসীদের যে কনফারেন্স হয় তাহাতে স্থির হইয়াছিল, যে, ভাবী নূতন স্বরাজ্যদল কংগ্রেসের একটি উপদল হইবে এবং এই উপদলের সভ্যদের মধ্যে যথেষ্টসংখ্যক ব্যক্তি ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিবেন। এই কনফারেন্সের পর পার্টনার সমগ্র-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির একটি অধিবেশন হয়। উপস্থিত সভ্যদের অধিকাংশের মতে স্থির হয়, যে, ঐহারা কৌন্সিল-প্রবেশ দ্বারা দেশের উপকার হইবে মনে করেন তাঁহাদিগকে তাহা করিবার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। তদনুসারে স্থির হয়, যে, কংগ্রেসেরই একটি বোর্ড গঠিত হইবে যাহা সব প্রদেশের কৌন্সিল-প্রবেশার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করিবে। তদনুসারে পার্টনার এই অধিবেশনেই ২৫ জন সভ্যের একটি বোর্ড গঠিত হয় এবং ডাক্তার আলমারী ইহার সভাপতি মনোনীত হন। তাঁহার বিলাত প্রবাস কালে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়া* সভাপতির কাজ করিবেন।

পার্টনার সমগ্রভারতীয় কংগ্রেস কমিটির উপস্থিত সভ্যদের মধ্যে ঐহারা কৌন্সিল-প্রবেশের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন,

তাঁহারা বলেন, কৌন্সিলের মধ্যে যে কাজ করা যায়, তাহার দ্বারা স্বরাজ লব্ধ হইতে পারে না। এই মত আমরাও আগে প্রকাশ করিয়াছি বটে। কিন্তু কৌন্সিল-প্রবেশ না-করিবার পক্ষে ইহা যথেষ্ট কারণ নহে। যাহা সাক্ষাৎভাবে স্বরাজ-লাভের উপায় নহে, তাহা পরোক্ষ উপায় হইতে পারে। স্বরাজলাভ অবশ্য ভারতবর্ষের প্রধান রাষ্ট্রীয় কর্তব্য ও চেষ্টা হওয়া উচিত; তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐহারা কৌন্সিল-প্রবেশের বিরোধী এবং কৌন্সিল-প্রবেশ না-করিয় কৌন্সিলের বাহিরে দেশের মধ্যে "গঠনমূলক" নানা কাজ করিবেন, তাঁহাদের কোন এক রকম বা সব কাজের সমষ্টিও ত সাক্ষাৎভাবে স্বরাজলাভের উপায় বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। সেগুলি পরোক্ষ উপায় বটে। সেই সকল পরোক্ষ উপায়ের পারিপোষক ও সমর্থক কাজ কৌন্সিলে হইয়াছে ও হইতে পারে। যাহা হইয়াছে তাহার একটি দৃষ্টান্ত শ্রীযুক্ত গম্মাপ্রসাদ সিংহের চেষ্টায় প্রণীত খদ্দের সংজ্ঞা-নির্দেশক আইন। খদ্দের প্রস্তুতি ও বিক্রয় কংগ্রেসের একটি গঠনমূলক কার্য। খদ্দের বলিতে বরাবরই প্রকৃতপক্ষে বুঝাইত চরখায় কাটা সূতা হইতে হাতের তাঁতে বোনা কাপড়। কিন্তু বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলওয়ালারা মিলের মোটা সূতায় মিলের তাঁতে বোনা মোটা কাপড় খদ্দের বলিয়া চালাইত। তাহাতে প্রকৃত খদ্দেরের প্রস্তুতি ও কাটুতিতে বাধা জন্মিত। খদ্দেরের সংজ্ঞা-নির্দেশক আইন দ্বারা এই বাধা দূরীভূত হইবার আশা আছে; কারণ ইহার দ্বারা মিলে প্রস্তুত কোন প্রকার কাপড়কে খদ্দের নাম দেওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। 'হরিজন'দের অল্পশ্রুতা দূরী-করণ এবং তাহাদিগকে সর্বসাধারণের রাস্তায় চলাফেরা, জলাশয় ব্যবহার, সভায় আসন গ্রহণ ও সভার কার্যে যোগদান, হাটবাজারের সুবিধা ভোগ, বিদ্যামন্দিরের সুযোগপ্রাপ্তি ইত্যাদি অধিকার লাভে সমর্থ করা কংগ্রেস-

* "মালব্য" নহে।

পন্থীদের অন্ত একটি গঠনমূলক কার্য। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় হরিজনদের মন্দিরপ্রবেশে অমুমতি প্রদান এবং তাহাদের অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্ত যে-যে আইনের খসড়া ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হইয়াছে, সেইগুলি বা তদ্রূপ অন্ত কোন কোন বিল আইনে পরিণত হইলে কংগ্রেসের হরিজনসম্বন্ধীয় গঠনমূলক কার্যের সহায়তা হইবে। এইরূপ আরও কোন কোন দিকে কৌশলে কংগ্রেসের কাজের পরিপোষক কাজ হইতে পারে। অবশ্য, কংগ্রেসওয়ালারা বলিতে পারেন, “তাহারা কৌশলে যান, তাহারা এই সব কাজ করেন; আমরা কৌশলগুলাকে অশুচি মনে করি; সেখানে আমরা যাইব না।” অর্থাৎ কিনা, তাহারা যেন কলিষুগের রাষ্ট্রনৈতিক ব্রাহ্মণ (“Political Brahmins”), এবং কৌশলগুলা রাষ্ট্রনৈতিক পায়খানা। এই রাষ্ট্রনৈতিক পায়খানার কাজ করা আবশ্যিক বটে, কিন্তু তাহা রাষ্ট্রনৈতিক মেথরেরা করিবে, রাষ্ট্রনৈতিক ব্রাহ্মণরা করিবেন না।

সব কংগ্রেসওয়ালার মনের ভাব সত্য সত্যই এইরূপ, তাহা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু যদি তাহাদের মধ্যে এমন কেহ কেহ থাকেন তাহারা কৌশলে কৃত কোন কোন কাজের স্ববিধাটুকু চান অথচ অস্পৃশ্যবোধে কৌশলের চৌকাঠ মাড়াইতে চান না, তাহাদিগকে পরিহাস করিলে তাহা অমার্জনীয় না হইতে পারে।

নিরুপদ্রব বা অহিংস আইনলঙ্ঘন, ও কংগ্রেস

সমগ্রভারতীয় কংগ্রেস কমিটি গান্ধীজীর পূর্ব পরামর্শ অনুসারে নিরুপদ্রব বা অহিংস আইনলঙ্ঘন হইতে বিরত থাকিতে রাজী হওয়ায় উদারনৈতিক অর্থাৎ মডারেট দলের লোকদের ভারী স্তুতি দেখা যাইতেছে। তাহাদের কেহ কেহ বলিতেছেন, “এখন পথে এস, বাপু। আমরা ত আগেই বলেছিলাম, আইন অমান্য-টমান্য করে কিছু হবে না।” উত্তরে কংগ্রেসওয়ালারা বলিতে পারেন, “অসহযোগ প্রচেষ্টার দ্বারা যে স্বরাজ লঙ্ঘ হয় নাই, তার কারণ এ নয় যে অসহযোগ পন্থাটাই ধারাপ; তার কারণ এই যে, মহাশয়েরা এবং মহাশয়দের মত ‘চাচা আপনাবাসী’ (“safety first”) নীতির অনুবর্তক লোকেরা কংগ্রেসের পথের অনুসরণ করেন

নাই, পরন্তু অনেকে কংগ্রেসের বিরোধিতা করিয়াছিলেন।” উদারনৈতিক নেতা শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বলিয়াছেন, অসহযোগ প্রচেষ্টা ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক গতিবেগ দিয়াছিল। আমাদের বিবেচনায়, অন্ততঃ কৃতজ্ঞতার খাতিরে মডারেটদের কংগ্রেসকে আক্রমণ না-করা উচিত। কারণ কংগ্রেসেরই কল্যাণে তাহারা গোলটেবিল বৈঠকে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষের প্রতিনিধি সাজিতে পারিয়াছিলেন।

বস্তুতঃ সমগ্রভারতীয় কংগ্রেস কমিটি গান্ধীজী ছাড়া আর সকল কংগ্রেসওয়ালাকে আইনলঙ্ঘন হইতে বিরত থাকিতে বলিয়াছেন বটে, এবং গান্ধীজীও বলিয়াছেন বটে, যে, তিনি এরূপ ভাবে চলিবেন যাহাতে আইন অমান্য করিবার প্রয়োজন না-হয়, কিন্তু কমিটি বা গান্ধীজী একথা বলেন নাই, যে, অসহযোগ বা আইনলঙ্ঘন নীতিটাই ধারাপ। বরং গান্ধীজী প্রয়োজনমত নিরুপদ্রব ও অহিংসভাবে আইন অমান্য করিবার জন্ত নিজের স্বাধীনতা এবং অজ্ঞদিগকে তাহা করিতে পরামর্শ দিবার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। অর্থাৎ স্বরাজ-সংগ্রাম পরিত্যক্ত হয় নাই; তাহা স্থগিত আছে, এবং রণকৌশল (strategy) পরিবর্তিত হইয়াছে ও হইবে। মডারেটদের অবলম্বিত যে-সব উপায় জাতীয় আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া কংগ্রেসওয়ালারা অবলম্বন করিতে পারেন, তাহা তাহারা করিবেন; অধিকন্তু নিরুপদ্রব ও অহিংস আরও কিছু করিবার স্বাধীনতা গান্ধীজী নিজের ও নিজের দলের জন্ত জিয়াইয়া রাখিয়াছেন।

কংগ্রেসের পালেমেন্টারী বোর্ড

কংগ্রেসের যে বোর্ড সব প্রদেশ হইতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশার্থী কংগ্রেসওয়ালাদিগকে মনোনীত করিয়া তাহাদের কৌশল-প্রবেশচেষ্টার সহায়তা করিবেন, সেই বোর্ডের নাম দেওয়া হইয়াছে পালেমেন্টারী বোর্ড। নামে বিশেষ কিছু আসে যায় না যদি তাহার দ্বারা ভ্রান্ত ধারণা না-জন্মে। ব্রিটেনের পক্ষে ব্রিটিশ পালেমেন্ট যেমন, ভারতবর্ষের পক্ষে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাও তেমনি, এই ভ্রান্ত ধারণাটা যাহাতে ‘পালেমেন্টারী’ বোর্ড নাম দ্বারা না-জন্মে, তদ্বিষয়ে সাবধান থাকিলেই হইল। বস্তুতঃ বাংলা যে প্রবাদ আছে, “খৈও জলপান, আরনুলাও পাখী” ইত্যাদি,

তদ্রূপ যদি কালক্রমে এই প্রবচনের সৃষ্টি না হয়, যে, “ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাও প্যালেমেন্ট!”, তাহা হইলেই আমরা যথেষ্ট খুশী হইব এবং এরূপ প্রবচনের সৃষ্টি হইবে না, যদি বাস্তবিক ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক সকল দলের চেষ্ঠায় স্বরাজ লব্ধ হয় এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা সেইরূপ সমৃদ্ধ ক্ষমতা ও অধিকার লাভ করে যাহা স্বাধীন দেশসমূহের প্যালেমেন্ট-গুলির আছে।

কংগ্রেসের প্যালেমেন্টারী বোর্ড পাটনায় তাড়াতাড়ি গঠিত হইয়াছিল। এই জন্ত, এক দিকে দেখা যাইতেছে, যে, ইহার পঁচিশ জন সভ্যের মধ্যে পাঁচ জন আগ্রা-অযোধ্যার লোক, অন্য দিকে দেখা যাইতেছে, যে, আগাম, ব্রহ্মদেশ, উৎকল, মরাঠাভাষী মধ্যপ্রদেশ, সিন্ধুদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও রাজপুতানার কোন প্রতিনিধি ইহাতে নাই, শিখদের কোন প্রতিনিধিও ইহাতে নাই। বোর্ড অবশ্য প্রত্যেক প্রদেশের কৌন্সিল-প্রবেশার্থী মনোনীত করিবার সময় সেই প্রদেশের কংগ্রেস-নেতাদের সহযোগিতা অক্ষুণ্ণে তাহা করিবেন। সুতরাং প্রত্যেক প্রদেশের প্রতিনিধি বোডে থাকা একান্ত আবশ্যিক নহে। তথাপি, যত দূর সম্ভব সব প্রদেশ হইতে এক জন করিয়া সভ্য বোডে লইলে ভাল হয়। এক জন শিখ প্রতিনিধি ত নিশ্চয়ই লওয়া উচিত।

আগ্রা-অযোধ্যার শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ ইস্তফা দিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার জায়গায় উল্লিখিত প্রদেশগুলির কোনটি হইতে কাহাকেও লওয়া যাইতে পারে ও লইলে ভাল হয়। পঞ্জাবের ডাঃ সত্যপাল এই সর্বোচ্চ ইস্তফা দিতে রাজী হইয়াছেন, যে, তাঁহার জায়গায় পঞ্জাবের কোন শিখ বা মুসলমানকে লওয়া হইবে।

বোর্ড স্থির করিয়াছেন, যে, তাঁহারা ৮১ জন উমেদার খাড়া করিবেন। তাঁহারা ভরসা রাখেন, যে, ইহাদের অধিকাংশই, অন্ততঃ ৬৭ জন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হইবেন। হইলেই ভাল।

নব-স্বরাজ্যদল ও প্যালেমেন্টারী বোর্ড

আমাদের বরাবর এই আগ্রহই ছিল, যে, স্বরাজ-সংগ্রামে কৌন্সিলেও স্বরাজ্যসেনা যেন এক দল থাকে। তাহা থাকিবার সম্ভাবনা হওয়ায় আমরা কিঞ্চিৎ সন্তোষ লাভ করিয়াছি।

সন্তোষের আর একটি কারণ এই, যে, নব-স্বরাজ্যদল গঠিত না হইয়া কংগ্রেসেরই প্যালেমেন্টারী বোর্ড গঠিত হইয়াছে। নব-স্বরাজ্যদল বা তাহার নেতাদের প্রতি বিরাগ-বশতঃ আমরা এ কথা বলিতেছি না। দল ও উপদলের আতিশয্যে ভারতবর্ষ বিপর্য। তাহার উপর যে আরও একটা উপদল বাড়িল না, অথচ সেই হবু-উপদলের অভিপ্রেত কাজ হইবে, ইহাই আমাদের সন্তোষের কারণ।

মুন্সী ঈশ্বরশরণ

মুন্সী ঈশ্বরশরণ আগ্রা-অযোধ্যার একজন নেতা। বাড়ি গোরখপুর। দলহিসাবে ইনি মডারেট; কিন্তু তাই বলিলেই ইহার ঠিক রাষ্ট্রনৈতিক পরিচয় দেওয়া হয় না। তিনি পূর্বে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন, কিন্তু ভারত-গবন্মেণ্টের দমননীতির প্রতিবাদ স্বরূপ সদস্য-পদে ইস্তফা দেন, এবং পরে গত সাধারণ নির্বাচনে আর কৌন্সিল-প্রবেশার্থী হন নাই। এখন তিনি আবার গোরখপুর ও কাশী জেলার প্রতিনিধি হইতে চান। দেশসেবার যোগ্যতা ও ইচ্ছা হিসাবে তাঁহার প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়াও উচিত। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন, যে, তিনি প্রবেশার্থী হইবেন যদি কংগ্রেস প্যালেমেন্টারী বোর্ড তাঁহাকে তাঁহাদের তালিকাভুক্ত করেন, কিংবা তিনি স্বাধীন ভাবেও প্রবেশার্থী হইতে পারেন যদি কংগ্রেস উক্ত দুই জেলার জন্ত অন্য কাহাকেও প্রবেশার্থী খাড়া না করেন। তাঁহার এইরূপ সঙ্কল্পের কারণ এই, যে, তিনি বিশ্বাস করেন, আগামী সাধারণ নির্বাচনে (general electionএ) কংগ্রেসদলের প্রবেশার্থীদিগকে সফলকাম করিবার জন্ত প্রত্যেক প্রকৃত স্বদেশহিতৈষীর যথাসাধ্য চেষ্ঠা করা কর্তব্য—তদ্বারাই দেশের স্বার্থ রক্ষিত ও কল্যাণ সাধিত হইবে।

মুন্সী ঈশ্বরশরণ স্বয়ং মডারেট হইয়াও এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং এইরূপ কথা বলিয়াছেন বলিয়া এবং আমরা এ-বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত বলিয়া এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করিলাম। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে তিনি যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, অন্য সব প্রদেশেও কংগ্রেসের বাহিরের অন্ততঃ কোন কোন রাষ্ট্রনৈতিক কর্মী ও কৌন্সিল-প্রবেশার্থী সেইরূপ সঙ্কল্প

করিলে ভাল হয়। আমাদের এই মন্তব্যের অর্থ ইহা নহে, যে, প্রত্যেক কংগ্রেসওয়ালার কৌশল-প্রবেশার্থী খাটি স্বদেশহিতৈষী এবং অগ্ন্যন্ত দলের প্রত্যেক কৌশল-প্রবেশার্থী অপেক্ষা যোগ্যতর। আমাদের মন্তব্যের কারণ এই, যে, দল-হিসাবে কংগ্রেস দলের স্বরাজ-সংগ্রাম চালাইবার যোগ্যতা অধিকতম এবং এই দলে উৎসাহ, কর্ষিততা, শৃঙ্খলা, নিয়মানুগতা, সাহস ও স্বার্থত্যাগ অধিক দেখা গিয়াছে। সরকারী রিপোর্টে পর্যাপ্ত তাহার কিছু প্রমাণ আছে। সম্প্রতি প্রকাশিত আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের ১৯৩২-৩৩ সালের সরকারী শাসন-বিবরণীতে কংগ্রেস সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

“Any account of the political events of the year must, for practical purposes, be little more than an account of the activities of the Congress party, for it alone, among the shifting and overlapping interests of Indian politics, possessed for a short time a single policy and programme and an organization with some effective hold over large numbers of its followers. Outside the Congress and its offshoots there was less than the usual political enthusiasm, for most classes and communities were too absorbed in their own domestic difficulties to do more than record their reactions to the proposals for reform.”

এইরূপ মন্তব্য অত্র অনেক প্রদেশ সম্বন্ধে করিলেও অসত্য হয় না।

গণতন্ত্র ও প্রেসের স্বাধীনতা

সম্প্রতি লণ্ডনে সংবাদপত্র সভার (নিউসপেপার সোসাইটির) ২৪তম বার্ষিক ভোজে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডনাল্ড বলেন :—

“আমি স্বাধীন প্রেসের পক্ষে এবং আমি যদি মেথুসেলার মত দীর্ঘজীবী হই তাহা হইলেও এই বিশ্বাস বাইবে না। স্বাধীন প্রেস স্বাধীন গণতন্ত্রের একটি সর্ভ এবং স্বাধীন গণতন্ত্র স্বাধীন প্রেসের একটি সর্ভ।”

“প্রেস” বলিতে ইংরেজীতে সংবাদপত্রসমূহের সমষ্টিকে বুঝায়। ভারতবর্ষে অনুসৃত ব্রিটিশ রাজনীতির সহিত ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর উক্তির কোন অসামঞ্জস্য নাই। কারণ, তাঁহার মতে যখন কোথাও স্বাধীন গণতন্ত্র থাকিলে তবে সেখানে স্বাধীন প্রেস থাকিবে, তখন ভারতে স্বাধীন প্রেস থাকা উচিত নয়; কারণ এখানে স্বাধীন গণতন্ত্র নাই। তাঁহার কথাটার মানে ইহাও বটে, যে, স্বাধীন প্রেস কোথাও থাকিলেই স্বাধীন গণতন্ত্রও সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে

স্বাধীন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যখন ব্রিটিশ-গবর্নেন্ট চান না, তখন এদেশের প্রেসকে স্বাধীনতা না-দেওয়াই ত সম্ভব।

শ্রুর সামুয়েল হোরের উপভোগ্য কল্পিত

বিলাতের চেলসী শহরের রক্ষণশীল দলের মহিলাদিগের এক সভায় ভারতসচিব শ্রুর সামুয়েল হোর সম্প্রতি বলিয়াছেন :—

“মিঃ চার্চিল এবং লর্ড লয়েডের কোন কোন বক্তৃতা পড়িলে আপনারা মনে করিবেন, ভারতীয়দের পক্ষে তাহাদের দেশের শাসনকার্যে অধিকতর অংশ চাওয়া একটা গর্হিত অপরাধ। এটা যদি অপরাধ হয়, তাহা হইলে স্বায়ত্তশাসন না-পাওয়া পর্যাপ্ত সময় বড় ডোমিনিয়নগুলি সর্বদা এই অপরাধে অপরাধী হইয়াছে। ব্রিটিশ গবর্নেন্টের সাক্ষাৎভাবে অধীন প্রত্যেক ক্রাউন-উপনিবেশ এই অপরাধে অপরাধী। আমরা নিজে সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এই অপরাধ করিতে আমাদের সমনাগরিকদিগকে উত্তেজিত করিয়াছি। চরমপন্থী বা পশ্চাদগমনোন্মুখ রাষ্ট্রনীতি (“extreme or reactionary policy”) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে চূর্ণ করিবার এক অপ্রতি-বিধেয়রূপে ব্রিটেনের বাণিজ্য ও পণ্যশিল্পকে নষ্ট করিবার নিশ্চিততম উপায়।”

চার্চিল ও লয়েডের বক্তৃতা পড়িয়া কি মনে হয় জানি না, কিন্তু ভারতবর্ষের অর্ডিন্যান্সগুলো এবং অর্ডিন্যান্সবৎ আইনগুলো পড়িলে এবং বিনা-বিচারে বন্দীদের সত্যকাহিনী পড়িলে মনে হইতে পারে বটে, যে, স্বায়ত্তশাসনের জন্য চেষ্টা করাটা এদেশে অপরাধ।

কোন বুদ্ধিমান ভারতীয় ভারতসচিবের এই কথাগুলি হইতে নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন না, যে, তিনি ভারতীয়দিগকে ভারতবর্ষের শাসনকার্যে অংশীদার করিবার আশা দিয়াছেন বা অঙ্গীকার করিয়াছেন। তিনি কেবল ইহাই বলিয়াছেন, যে, স্বদেশের শাসনকার্যে অংশ চাওয়াটা অপরাধ নহে। কিন্তু তাহা অধিক হইতে অধিকতর রূপে চাহিতে চাহিতে ও পাইতে পাইতে ভারতবর্ষ ডোমিনিয়নগুলির মত স্বশাসক হইয়া উঠুক, ইহা যে তাঁহার অভিপ্রেত নহে, তাহা ত খেতপত্র হইতেই বুঝা যায়। ঐ খেতপত্রে ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়নত্ব দিবার বা ডোমিনিয়নত্বের দিকে অগ্রসর করিবার কোন আভাসমাত্রও ত নাই-ই, ডোমিনিয়ন বা ডোমিনিয়ন স্টেটস কথাগুলি পর্যাপ্ত উহাতে ব্যবহৃত হয় নাই। তাঁহার বক্তৃতায় তিনি যেন চোখ টিপিয়া চেলসীর মহিলাদিগকে বলিতেছেন, “ভারতীয়েরা স্বায়ত্তশাসন চাক না, তাতে কতি কি? আমরা না দিলেই হ’ল।”

তিনি যে চরমপন্থী পঞ্চাঙ্গমনোমুখ নীতির নিন্দা করিয়াছেন, তাহার সহিত তাঁহার নিজের রাষ্ট্রনীতির প্রভেদ কি, তাহা তিনি ব্যাখ্যা করেন নাই।

শুর সামুয়েল হোর ভারতীয়দের রাষ্ট্রনৈতিক দাবি কম করিয়া বলিয়াছেন। অনেক আগে এবং কংগ্রেসের প্রথম অবস্থায় ভারতীয়েরা ইংরেজদের একচেটিয়া বড় চাকরীগুলার কিছু ভাগ চাহিত। তাহার পর দেশের শাসনকার্যের কিয়দংশ তাহারাও চালাইবার দাবি করিত। বর্তমান দাবি, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় সকল রকম কাজে ব্রিটিশের পরিবর্তে ভারতীয় প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা। ভারতসচিব এই দাবির কথা অবগত আছেন। ইহা যে ভারতের বৃহত্তম প্রতিনিধিসভা কংগ্রেসের দাবি, তাহাও তিনি জানেন। একরূপ দাবি করা যে অপরাধ নহে, তাহা তিনি চার্চিল, লঙ্কেড প্রভৃতিকে এবং চেলসীর মহিলাদিগকে বলিবার সাহস রাখেন কি ?

যুদ্ধ “খ্রীষ্টধর্মসঙ্গত” এবং “সভ্যতাপাদক”

বার্মিংহামের অন্ততম পাত্রি মিঃ ট্রেডেনিক্ সম্প্রতি একটি উপদেশে বলিয়াছেন—

“অধিকাংশ যুদ্ধই অনৈষ্ঠ (honost) যুদ্ধ, এবং সেগুলি যে কেবল খ্রীষ্টধর্মসঙ্গত ছিল তাহা নহে, কিন্তু আর্মি বিশ্বাস করি যে তদ্বারা মঙ্গল হইয়াছে, সভ্যতা উৎপন্ন হইয়াছে এবং খ্রীষ্টধর্মের প্ৰগতি হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমেরিকার যুদ্ধ দাসদের দাসত্ব মোচন করিয়াছে এবং নিউজিল্যান্ডকে নরখাদকদের দেশ হইতে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী জাতিতে পরিণত করিয়াছে। ভারতবর্ষবিক্রম তাহাকে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এক মহামারী হইতে রক্ষা করিয়াছে।”

পৃথিবীতে যে অসংখ্য যুদ্ধ হইয়াছে, তাহার মধ্যে দু-একটা বাছিয়া লইয়া অধিকাংশ যুদ্ধের প্রশংসা করা স্মায়শাজাহুমোদিত বটে!

খ্রীষ্টীয় মিশনরীরা বলিয়া থাকেন খ্রীষ্টধর্ম অহিংসাব ধর্ম। মিঃ ট্রেডেনিকের সহিত তর্ক তাঁহারা বরন, আমাদের তাহা করিবার প্রয়োজন নাই।

ভারতবর্ষ-জয় সম্বন্ধে বার্মিংহামের পাত্রি মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, শুধিবয়ে আমাদের বক্তব্য এই, যে, ব্রিটিশ রাজত্বকালের দেড় শত বা পৌনে দুই শত বৎসরে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং প্রেগ ইনফ্লুয়েঞ্জা ম্যালেরিয়া আদি রোগে যত লক্ষ্য মরিয়াছে, তাহার সহিত তিনি ব্রিটিশ রাজত্বকালের পূর্ববর্তী কোন দেড় বা পৌনে দুই শত বৎসরে

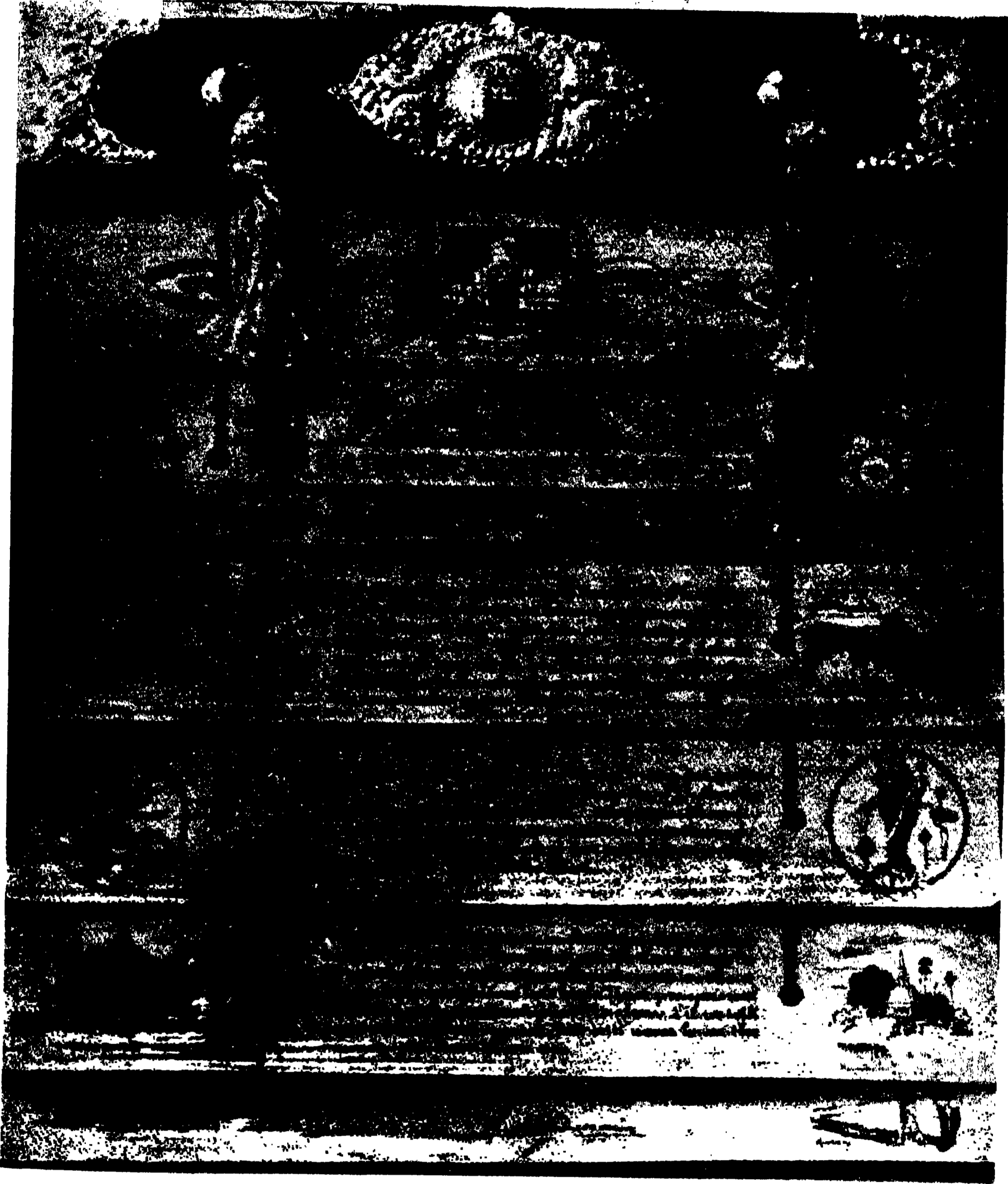
ঐ ঐ কারণে যুদ্ধের সংখ্যার তুলনা করিয়া ও সংখ্যাগুলি দিয়া তিনি আবার উপদেশ দিলে তখন তাঁহার কথা আলোচনার যোগ্য হইবে। তাহা না করিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার কোন মূল্য নাই।

বিনা-বিচারে বন্দীদের শিক্ষা

বিনাবিচারে বন্দী বাঙালী ছেলেদিগকে (কয়েকটি মেয়েকেও) নানা জেলে ও আটক-শিবিরে রাখা হইয়াছে। তাহার মধ্যে যাহাদিগকে বহরমপুরে রাখা হইয়াছে বাংলা-গবর্নমেন্ট তাহাদিগকে টাইপলিখন (typewriting), রেখাকরলিখন (shorthand) এবং হিসাবের খাতা লিখন (book-keeping) শিখাইতে মনস্ত করিয়াছেন। এই সকল ভাল। ইহাতে বন্দীরা এক-একটা বিদ্যা শিখিয়া রাখিতে পারিবে। তাহারা যাহা শিখিবে তাহার দ্বারা বোজগার হটক বা না-হটক, যত দিন শিখিবে তত দিন তাহারা আলসো কল্পনাজল্পনার কাল না কাটাইয়া একটা কিছু করিবার কাজ পাইবে।

আসল প্রশ্ন কিন্তু হইতেছে এই, যে, তাহারা যাহা শিখিবে তাহা ত বোজগারের জন্য। কিন্তু তাহারা যদি জেলে বন্দী হইয়াই থাকে, তাহা হইলে বোজগার করিবে কোথায়? সুতরাং গবর্নমেন্টের ইহাও স্থির করা উচিত, যে, যাহারা দশ মাস বা এক বৎসর ঐ তিনটি বিদ্যার কোন একটি আয়ত্ত করিবে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন। ছাড়িয়া না-দিলে বন্দীদের শিক্ষালাভটা ব্যর্থ হইবে, কারণ তাহারা জেলের ভিতর থাকিয়া কোন রকম বোজগার করিতে পারিবে না। যদি বলেন, ভবিষ্যতে যে-কোন সময়ে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হটক তখনই বিদ্যাটা তাহাদের কাছে লাগিবে, তাহা হইলে বলিতে হয়, যে-তিনটি বিদ্যা শিখান হইবে চর্চা না রাখিলে তাহার কোনটিতেই মাহুষের দক্ষতা অক্ষুণ্ণ থাকে না—বিশ্বস্তি ঘটে, মরিচা ধরে। অতএব, আমাদের বিবেচনার গবর্নমেন্ট যখন যাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া স্থির করিবেন, তাহার বৎসর-খানেক আগে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে যেন আরম্ভ করেন। তাহা হইলে শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পরই তাহার খালাস পাইয়া বোজগারের চেষ্টা করিতে পারিবে।

সিংহলে
রবীন্দ্রনাথ



তালপত্রে মানপত্র
সিংহলস্থ ভারতীয়
বণিকসভা কর্তৃক
প্রদত্ত—১১ই মে



রোটারি ক্লাবে
১০ই মে



ଇନଟାକା ଆହାଜେ
କଲୋଷୋତେ ଆଗୟନ—୨୫ ଯେ ୧୯୭୫

শিল্পপ্রদর্শনীর উদ্বোধন

চিফ সেক্রেটারী স্যর গ্রেন্ টাইরেল্ দ্বারা উদ্বাটন করেন—১১ই মে ১৯৩৪



রয়েল থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে 'শাপমোচন'—১২ই মে ১৯৩৪



শান্তিনিকেতন চিত্র প্রদর্শনীতে
নন্দলাল বসু



ভারতীয় বণিক সভার সঞ্চয়নায়ে
আগমন

আর একটা কথা। টাইপ-লিখনটা কাজে লাগে ব্যবসা-বাণিজ্যের আফিসে, সরকারী আফিসে, খবরের কাগজের আফিসে। সরকারী আফিসে বন্দীদেরকে কাজ দেওয়া হইবে কি? ব্যবসা-বাণিজ্যের আফিসে কাজ আরও অধিকসংখ্যক যুবক পাইতে পারে যদি ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃতি হয়। সেই বিস্তৃতির চেষ্টা গবন্মেণ্ট কী করিতেছেন? বুক-কৌপিন্ অর্থাৎ হিসাবের খাতা লেখাটাও ব্যবসা-বাণিজ্য-ঘটিত ব্যাপার। ব্যবসা-বাণিজ্য না বাড়িলে হিসাবরক্ষকের সংখ্যা বাড়ান নিরর্থক। সংক্ষিপ্ত লেখকদের একটা প্রধান কাৰ্যক্ষেত্র খবরের কাগজের জন্ত সভাসমিতির রিপোর্ট-লিখন, সংবাদ-সংগ্রহ ইত্যাদি। কিন্তু আজকাল বিপ্লববাদ সন্ত্রাসনবাদ ইত্যাদি দমন উপলক্ষ্যে সংবাদপত্রসকলের স্বাধীনতা ও নানা অধিকার এবং সর্বসাধারণের সভা করিবার ও তাহাতে মত প্রকাশ করিবার অধিকার খুব সীমাবদ্ধ হইয়াছে। এই জন্ত দৈনিক কাগজগুলি আরও অধিকসংখ্যক রিপোর্টার রাখা দূরে থাক, উপস্থিত যত রিপোর্টার আছেন, তাহাদেরই সেবা গ্রহণ করিবার সুযোগ পান না। সুতরাং সংক্ষিপ্ত লেখকের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ও সর্বসাধারণের সভা করিয়া মতপ্রকাশের অধিকারের সংকোচন, এই উভয়ের মধ্য সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে না।

এই সকল কারণে আমাদের মনে হয়, গবন্মেণ্ট বন্দীদেরকে হয় এমন বিদ্যা শিখান যাহার সাহায্যে তাহারা জেলে বসিয়া ও খালাস পাইবার পর বাড়িতে রোজগার করিতে পারে, কিংবা যে-তিনটি বিদ্যা শিখাইতে চাহিতেছেন তাহা শিখিলেই তাহাদেরকে খালাস দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তার এবং প্রেসের স্বাধীনতা ও সভাসমিতিতে মত-প্রকাশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করুন।

সরকারী শিল্প-বিভাগ হইতে যে শিক্ষক দল কেন্দ্রে কেন্দ্রে ঘুরিয়া ছুরী কাঁচি ইত্যাদি নিষ্কাশন, সাবান প্রস্তুতি প্রভৃতি শিক্ষা দেন, তাহা বিনা-বিচারে বন্দীদেরকেও তা শিখাইলে হয়। তাহারা জেলে থাকিয়া এই সব জিনিষ যাহা প্রস্তুত করিবে, গবন্মেণ্ট তাহা বিক্রার ব্যবস্থা করিলে তাহাদের রোজগার হইবে। তাহাদের যাহাকে যখন গবন্মেণ্ট খালাস দিবেন, তখন তাহাকে তাহার শেখা শিল্পকাৰ্য্যটি

চালাইবার মত কিছু পুঁজি দিলে আরও ভাল হয়। তাহা হইলে তাহারা বেকার হইবে না, রোজগারী হইবে এবং আলস্যজাত অপরাধপ্রবণতা তাহাদের ঘটিবে না।

বিনা-বিচারে বন্দী বুদ্ধিমান যুবকবৃন্দ

বিনা-বিচারে বন্দী অনেক যুবককে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা দিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, গবন্মেণ্টও তাহাতে আপত্তি করেন নাই। অনেকগুলি ছেলে পাস হইয়াছে—কয়েক জন প্রথম বিভাগে। একটি মেয়েও পাস হইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্বে এই কথাগুলি লিখিত হইতেছে।

জেলের ও আটকখানার মধ্যে থাকিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার মত জ্ঞানলাভ করা কঠিন। মুক্ত অবস্থায় ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদের, অগ্র জ্ঞানী গুরুজন ও প্রতিবেশীদের অপেক্ষাকৃত অধিক জ্ঞানবান্ সঙ্গীদের, এবং নানাবিধ অভিধান, অর্থপুস্তক ও অন্যান্য গ্রন্থের সাহায্য পাইতে পারে। বন্দী অবস্থায় তাহা পারে না। সুতরাং সেই অবস্থায় পরীক্ষা দিয়া তৃতীয় বিভাগে পাস হওয়াও মুক্ত অবস্থায় পাস হওয়া অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানানুরাগের পরিচায়ক। যদি কোন বন্দী প্রথম বিভাগে পাস হয়, তাহা হইলে তাহার কৃতিত্ব আরও প্রশংসনীয়।

এই প্রকার মেধাবী অনেক বালক ও যুবককে যে বিনা-বিচারে অনির্দিষ্ট কালের জন্ত বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে, ইহা বঙ্গ অসন্তোষের একটি কারণ।

সমগ্রভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যে কয়েক বৎসর হইতে বাঙালী ছেলেরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেছে না, তাহার কারণাবলী অনুমান করিতে গিয়া আমরা লিখিয়াছিলাম, যে, বিনা-বিচারে বন্দী ছাত্রদের মধ্যে এমন যুবক থাকিতে পারে, যাহারা এই সব পরীক্ষা দিবার সুযোগ পাইলে হয়ত প্রতিযোগীদের মধ্যে উচ্চস্থান লাভ করিতে পারিত। এরূপ অনুমান যে সম্পূর্ণ অমূলক নহে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি পরীক্ষায় কতকগুলি বন্দী ছাত্রের বিশেষ কৃতিত্ব হইতে তাহা বুঝা যায়।

জেলাবিশেষে চাষী জাতিদের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা

কোনও আচারনিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ বর্ষীয়ান হিন্দু ভদ্রলোক 'প্রবাসী'র সম্পাদককে কিছুকাল পূর্বে একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ। তিনি খবরের কাগজে ছাপাইবার জন্য চিঠি লেখেন নাই। কিন্তু পত্রখানির কোন কোন অংশ প্রকাশিত হইবে, তাহা তাঁহাকে জানান হইয়াছিল। তাহাতে তিনি আপত্তি করেন নাই। নামধাম গোপন রাখিয়া তাঁহার চিঠির কোন কোন অংশ নীচে মুদ্রিত করিতেছি।

"স্পেশাল ম্যারেজ ম্যাক্ট বিবাহের বিশেষ আইন" মতে বিবাহ রেজিষ্টারি করিবার জন্য যাহাতে প্রত্যেক ইউনিয়ন কোর্ট ও বেঙ্গল প্রেসিডেন্ট রেজিষ্টারের ক্ষমতা পায়, তজ্জন্ম এক দরখাস্ত গবন্মেণ্টের নিকট পাঠাইবার জন্য আজ এক মাস হইল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে দিয়াছি।...আমি এই জেলার ব্রাহ্মণসভার প্রেসিডেন্ট। এজন্য আমাকে জেলার নানাস্থানে যাইতে হয়। আমার ধারণা হইয়াছে, স্পেশাল ম্যারেজ ম্যাক্ট মতে অবিবাহিত ও বিপত্রীক হিন্দু চাষীদের বিধবার সহিত বিবাহ না দিলে আর অল্পদিন মধ্যে এই জেলার সংস্কৃত বংশ লোপ পাইয়া যাইবে। এই জেলার অনেক চাষী উপপত্নীসহ বাস করে এবং সম্ভান বাহাতে না হয় বা গর্ভ হইলে তাহা নষ্ট হয় তাহার চেষ্টা করিয়া থাকে। আমার জানা দুই-তিনটি বিধবা স্ত্রী এক সম্ভান রাখিয়াছে। কিন্তু তাহাদের ভরণপোষণের বড় কষ্ট। আমাদের সমিতি এই সকল স্ত্রীপুরুষের স্পেশাল ম্যারেজ ম্যাক্ট মতে বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে মহানির্ঝরাতন্ত্র মতে পঞ্চবর্ষের মধ্যে রাখিবার অনুমতি আমাকে দিয়াছে। সেইজন্য আমি রেজিষ্টার হইবার চেষ্টা করি। সমাজের জাতিভেদ সংস্কার সকলের যাইবে মনে হয় না। এজন্য আমাদের সমিতিকে 'ব্রাহ্মণ্য সমাজ সংস্কার সমিতি' নাম দিয়া, যাহারা মেয়ের পণ দিয়া দুই তিন বৎসরের মেয়ে বিবাহ করিয়া অল্পদিন মধ্যে বিবাহের দেনার জন্য সমস্ত জমিজমা ঘুচাইয়া একটি যুবতী বিবাহ রাখিয়া মরিতেছে, বা বিবাহ করিতে না পারিয়া বা ঐরূপ দেনা করিয়া বিবাহ করিয়া পরে বিপত্রীক হইয়া অল্প জাতির বিধবা উপপত্নী রাখিয়া নিজের বংশ লোপ করিয়া মরিতেছে, তাহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ এক ইন্টারকাস্ট্র অসবর্ণ বিবাহ করিতে উপদেশ দিয়া রেজিষ্টারি করাইয়া লইতে না পারিলে একাদশ তেলি, সদগোপ, উগ্রকত্রিয়, নাপিত, ধোপা, কাশার কুমার প্রভৃতির দরিদ্র বংশগুলি লুপ্ত হইবে। রাজা রামমোহন রায়ের শতবার্ষিকী বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে আমার এই মনে হইতেছে, এক শত বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ দেশে কতদূর কার্যো পরিণত হইয়াছে? ব্রাহ্মসমাজ শহরে আবদ্ধ, গৌরনিতাইয়ের অনুবর্তী সম্প্রদায় গ্রামে গ্রামে জাতিনির্করণে নামগানে দেশ মাতাইয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ কেবল শহরে থাকিয়া গেলেন। উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান দেশে অল্পসংখ্যক লোকই বুঝিয়া লাভ করিতে পারেন। শহরেও জাতিভেদ ত্যাগ কত জন করিয়াছেন? দেহের সুখ লইয়াই ব্যস্ত আত্মার আনন্দ খুঁজে কয় জন? আমার শেষজীবনের এই কাজ ব্রাহ্মবংশতঃ কি ঠিক-মত হইতেছে, কৃপা করিয়া জানাইবেন এবং যাহাতে আমি স্পেশাল ম্যারেজ রেজিষ্টার হইতে পারি, তাহার উপায় লিখিয়া দিবেন। হইলেই আমি—থানা এবং—থানার মধ্যে নয়-দশটি বিবাহ দিয়া দিব।"

এই বর্ষীয়ান স্ত্রীসংক্রমণের পত্রখানিতে বেঙ্গল একটি

জেলার যে সামাজিক সমস্যা বর্ণিত হইয়াছে, আমরা যত দূর জানি সেই সমস্যা বেঙ্গল অল্প অনেক বা সব জেলাতেই আছে। সমস্যাটির প্রতি আমরা হিন্দুহিতৈষী মাত্রেরই মনোযোগ প্রার্থনা করিতেছি। বিশেষ করিয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভা ও হিন্দুমিশনের দৃষ্টি ইহার প্রতি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা অবহিত হইলে সমস্যাটির অন্তত আংশিক সমাধান হইবে।

সন্ত্রাসনবাদের বিরুদ্ধে সরকারী অভিযান

খবরের কাগজে দেখিতেছি, বাংলা-গবন্মেণ্ট বক্তৃত্তা সিনেমা, পুস্তিকা, রেডিও প্রভৃতি দ্বারা এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সাহায্য লইয়া সন্ত্রাসনবাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবেন। ইহা করা গবন্মেণ্টের কর্তব্য। আমরাও চাই, যে, আমাদের দেশের কতকগুলি বালক-বালিকা ও যুবক-যুবতীর জীবন ও শক্তি ব্যর্থ না হয়। এই জন্য আমাদের ইচ্ছা, সরকারী অভিযান যেন সৃষ্টিস্থিত ভাবে সুপরিচালিত হয়।

সাধারণতঃ সরকারী পুস্তিকা যতই বিতরিত হউক, সরকারপক্ষীয় লোকেরা সাধারণ ভাবে বা রেডিও সাহায্যে যাহাই বলুন, এবং সিনেমার সাহায্যে তাঁহারা যাহাই বুঝাইতেন চান, তাহাতে কেহ বুঝিতে না পারিলে বা বিশ্বাসবান্ না হইলে প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত বা সন্দেহ ভঞ্জনার্থ কিছু বলিবে না। কারণ, যে প্রতিবাদ করিবে বা সন্দেহের মীমাংসা চাহিবে, সে যদিও তদ্বারা সন্ত্রাসনবাদের পরোক্ষ ভাবে সমর্থন নিশ্চয়ই করিবে না, সে কেবল তখন সরকারপক্ষীয় যুক্তির দুর্বলতা দেখাইতে চাহিবে বা সরকারপক্ষীয় লোকদের উক্ত কোন তথ্য বা বর্ণনার অযথার্থতা দেখাইতে যাইবে, তথাপি তাহাকে সরকারপক্ষীয় লোকেরা সন্ত্রাসনবাদের সমর্থক মনে করিতে পারে বলিয়া সকলেই চূপ করিয়া বক্তৃত্তা রেডিও পুস্তিকা সিনেমা গুনিবে পড়িবে দেখিবে। তাহাতে সরকারী মতে মানুষের আন্তরিক বিশ্বাস উৎপাদন হিসাবে যথেষ্ট ফললাভ না হইলেও কাহারও বিপদের সম্ভাবনা ঘটিবে না। যথেষ্ট ফললাভ কাহাকে বলি, তাহা বলা আবশ্যিক। সন্ত্রাসনবাদ যে ধারাপ তাহা গবন্মেণ্ট বলেন এবং আমরাও বলি।

কিন্তু উহা যে খারাপ, তাহা বুঝাইবার জন্য সরকারপক্ষীয় লোকেরা যে-কোন যুক্তি, যে-কোন তথ্য, যে-কোন বর্ণনা উপস্থিত করিবেন, তাহাই সারবান ও নিভুল না-হইতে পারে। যদি তাঁহাদের সব যুক্তি, তথ্য ও বর্ণনার যথার্থ্য পরীক্ষিত হইবার সুযোগ থাকে, এবং যদি সেই সুযোগে দুর্বল যুক্তির এবং অপ্রকৃত বা ভ্রমসঙ্কুল তথ্য ও বর্ণনার পরিবর্তে সরকারপক্ষ সংশোধিত প্রবল যুক্তি ও খাটি-তথ্য ও বর্ণনা উপস্থিত করিতে পারেন, তাহা হইলে লোকে কেবল যে বুঝিবে, যে, সম্মানবাদ খারাপ তাহা নহে, অধিকন্তু তাহারা ইহাও বুঝিবে যে গবর্নেন্ট যে-যে কারণে সম্মানবাদ খারাপ বলেন, সে কারণগুলোও ঠিক। যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলেই আমরা মনে করিব, যে, অভিযান যথেষ্ট ফলপ্রদ হইয়াছে।

সভাসমিতি সম্বন্ধে, প্রেস সম্বন্ধে এবং ভারতীয়দের ও বাঙালীদের সাধারণ মানবিক ও পৌরজ্ঞানপদ অধিকার (civic rights) সম্বন্ধে আইনের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে সরকারী যুক্তি তথ্য আদির পরীক্ষার সুযোগ হইবে বলিয়া মনে করি না। কিন্তু তাহাতে আমরা নিজেদের উত্তম এবং প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের জন্য চিন্তিত নহি। চিন্তা ছাত্র ও অন্য অল্পবয়স্ক লোকদের জন্য। ছাত্রদের কথাই একটু বলি।

সংশিক্ষক মাত্রেই ছাত্রদিগকে প্রশ্ন করিতে উৎসাহ দিয়া থাকেন। ইহাতে তাহাদের জ্ঞানস্পৃহা বাড়ে এবং সন্দেহ দূর হইয়া বিশ্বাসের দৃঢ়তা উৎপন্ন হয়। কিন্তু শিক্ষকগণ সম্মানবাদের বিরুদ্ধে যাহা বলিবেন, সেই কথিত যুক্তিতথ্য আদির যথার্থতা সম্বন্ধে কোন ছাত্র যদি সন্দেহান হইয়া প্রশ্ন করে, তাহা হইলে তাহাকে ভীক বা অবিজ্ঞ শিক্ষক সম্মানবাদের সমর্থক বলিয়া হয়ত শাস্তি দিতে পারেন। খবরের কাগজে দেখিয়াছি, এইরূপ কারণে কোন একটি ইন্সুলের একজন ছাত্রের নাম কাটা গিয়াছে। ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। অগ্রাণ্ড সরকারী চাকুরিয়ার মত সরকারী ইন্সুলসমূহের শিক্ষকদের উপরও সম্ভবতঃ ছকুম আছে, যে, তাঁহারা কাহাকেও সম্মানবাদী বলিয়া সন্দেহ করিলে তাহার নাম গবর্নেন্টকে জানাইবেন। এরূপ ছকুম থাকিলে শিক্ষকদের পক্ষে উভয়সঙ্কট। কতকটা গোয়েন্দার মত কাজ করিতে হইলে শিক্ষককে অপ্রকৃত হইতেই হয়। সন্দেহ কতটুকু

হইলে তবে তাহা গবর্নেন্টের গোচর করা উচিত; তাহা স্থির করা শিক্ষকদের পক্ষে সহজ নয়। ছাত্রদের দোষত্রুটি বাস্তবিক থাকিলে তাহা নিজেদের জ্ঞান, উপদেশ ও চারিত্রিক প্রভাবে সংশোধন করাই শিক্ষকদের ধর্ম। তাঁহারা গোয়েন্দা-গিরি করিবেন, না, শিক্ষক-ধর্ম পালন করিবেন?

আমরা শুনিয়াছি, সম্মানবাদের বিরুদ্ধে সরকারী আফিসবিশেষ হইতে প্রেরিত প্রবন্ধ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বলিয়া ছাপিবার অনুরোধ নাকি স্থানবিশেষে আসিয়াছিল। এরূপ ঘটনা থাকিলে সরকারী কর্মচারীবিশেষের বিবেচনার ভুল হইয়াছিল। আমাদের যাহা আন্তরিক বিশ্বাস, সম্মানবাদের বিরুদ্ধে আমাদের কাছে তাহা বলিতে দিলে তাহাতে ফল ভাল হইবার সম্ভাবনা। সম্মানবাদের দিকে যাহাদের মনের প্রবণতা আছে বা জন্মিতে পারে, সম্পাদকদের আন্তরিক ও নিভুল যুক্তিরই প্রভাব তাহারা অনুভব করিবে। যদি তাহাদের এই ধারণা জন্মে, যে, আমরা সরকারী কর্মচারী-বিশেষের গ্রামোফোন, তাহা হইলে আমাদের কথা কে শুনিবে? এমনই ত সম্মানবাদীরা কাহারও কথা শুনে না, মানে না।

সম্মানবাদের বিরুদ্ধে যাহারা অভিযান চালাইবেন, তাঁহাদের কাছে একটা নিবেদন আছে। তাঁহারা ব্রিটিশ রাজত্ব ও ব্রিটিশ শাসন সম্পূর্ণ নিপুণ, ও সম্পূর্ণ সুফলপ্রদ হইয়াছে, এ-কথা যেন না বলেন, কিংবা ইহাও যেন না বলেন, যে, পাঠান ও মোগল রাজত্ব ও হিন্দু বৌদ্ধ রাজত্ব সর্ব্বাংশে ব্রিটিশ রাজত্ব অপেক্ষা খারাপ ছিল। কারণ এরূপ উক্তির ভ্রমপ্রদর্শন অত্যন্ত সহজ। ব্রিটিশ এবং তৎপূর্ব্ববর্তী শাসন-কালসমূহের আলোচনা যদি করিতেই হয়, তাহা হইলে সকল রাজত্বের ভাল মন্দ দুই দিকই দেখান উচিত। এই কাজ নিরপেক্ষভাবে করা বড় কঠিন। ইহার জন্য আবশ্যিক কঠোর সত্যপ্রিয়তা, নিষ্কম্প পক্ষপাতশূন্যতা, পূর্ণ সাহস এবং যথেষ্ট জ্ঞান কম লোকেরই আছে। সরকারী অভিযান যাহারা চালাইবেন, তাঁহাদের এই সকল গুণ ও যোগ্যতা থাকিবে কি? যদি না থাকে, তাহা হইলে কেহ তাঁহাদের প্রতিবাদ করিতে বা ভুল দেখাইতে অগ্রসর না-হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের কথার প্রতি মনে মনে অনাস্থা পোষণ তাঁহারা নিবারণ করিতে পারিবেন না।

জেলাবিশেষে চাষী জাতিদের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা

কোনও আচারনিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ বর্ষীয়ান্ হিন্দু ভ্রমলোক 'প্রবাসী'র সম্পাদককে কিছুকাল পূর্বে একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ। তিনি খবরের কাগজে ছাপাইবার জন্য চিঠি লেখেন নাই। কিন্তু পত্রখানির কোন কোন অংশ প্রকাশিত হইবে, তাহা তাঁহাকে জানান হইয়াছিল। তাহাতে তিনি আপত্তি করেন নাই। নামধাম গোপন রাখিয়া তাঁহার চিঠির কোন কোন অংশ নীচে মুদ্রিত করিতেছি।

"স্পেশাল্ ম্যারেজ্ ম্যাক্ট [বিবাহের বিশেষ আইন] মতে বিবাহ রেজিষ্ট্রারি করিবার জন্য যাহাতে প্রত্যেক ইউনিয়ন কোর্ট ও বেঙ্কের প্রেসিডেন্ট রেজিষ্ট্রারের ক্ষমতা পায়, তজ্জন্ম এক দরখাস্ত গবন্মেণ্টের নিকট পাঠাইবার জন্য আজ এক মাস হইল ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে দিয়াছি।...আমি এই জেলার ব্রাহ্মণসভার প্রেসিডেন্ট। এজন্য আমাকে জেলার নানা স্থানে ঘাইতে হয়। আমার ধারণা হইয়াছে, স্পেশাল্ ম্যারেজ্ ম্যাক্ট মতে অবিবাহিত ও বিপত্তীক হিন্দু চাষীদের বিধবার সহিত বিবাহ না দিলে আর অল্পদিন মধ্যে এই জেলার সংশূদ্র বংশ লোপ পাইয়া যাইবে। এই জেলার অনেক চাষী উপপত্তীসহ বাস করে এবং সম্ভান বাহাতে না হয় বা গর্ভ হইলে তাহা নষ্ট হয় তাহার চেষ্টা করিয়া থাকে। আমার জানা দুই-তিনটি বিধবা স্ত্রী এক সম্ভান রাখিয়াছে। কিন্তু তাহাদের ভরণপোষণের বড় কষ্ট। আমাদের সমিতি এই সকল স্ত্রীপুরুষের স্পেশাল্ ম্যারেজ্ ম্যাক্ট মতে বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে মহানির্বাণতন্ত্র মতে পঞ্চবর্ণের মধ্যে রাখিবার অহুমতি আমাকে দিয়াছে। সেইজন্য আমি রেজিষ্ট্রার হইবার চেষ্টায় আছি। সমাজের জাতিভেদ সংস্কার সকলের যাইবে মনে হয় না। এজন্য আমাদের সমিতিকে 'ব্রাহ্মণ্য সমাজ সংস্কার সমিতি' নাম দিয়া, যাহারা মেয়ের পণ দিয়া দুই তিন বৎসরের মেয়ে বিবাহ করিয়া অল্পদিন মধ্যে বিবাহের বেনার জন্য সমস্ত জমিজমা ঘুচাইয়া একটু যুবতী বিবাহ রাখিয়া মরিতেছে, বা বিবাহ করিতে না পারিয়া বা ঐরূপ দেনা করিয়া বিবাহ করিয়া পরে বিপত্তীক হইয়া অল্প জাতির বিধবা উপপত্তী রাখিয়া নিজের বংশ লোপ করিয়া মরিতেছে, তাহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ এক ইন্টারকাস্ট [অসবর্ণ] বিবাহ করিতে উপদেশ দিয়া রেজিষ্ট্রারি করাইয়া লইতে না পারিলে একাদশ তেল, সদগোপ, উগ্রকত্রিয়, নাপিত, ধোপা, কামার কুমার প্রভৃতির দরিদ্র বংশগুলি লুপ্ত হইবে। রাজা রামমোহন রায়ের শতবার্ষিকী বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে আমার এই মনে হইতেছে, এক শত বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ দেশে কতদূর কার্যে পরিণত হইয়াছে? ব্রাহ্মসমাজ শহরে আবদ্ধ, গৌরনিতাইয়ের অনুবর্তী সম্প্রদায় গ্রামে গ্রামে জাতিনির্বাণে নামগানে দেশ মাতাইয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ কেবল শহরে থাকিয়া গেলেন। উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান দেশে অল্পসংখ্যক লোকই বুঝিয়া লাভ করিতে পারেন। শহরেও জাতিভেদ ভাগ কত জন করিয়াছেন? দেহের সুখ লইয়াই ব্যস্ত আশ্বাসে আনন্দ খুঁজে কয় জন? আমার শেষজীবনের এই কাজ ব্রাহ্মবংশতঃ কি ঠিক-মত হইতেছে, কৃপা করিয়া জানাইবেন এবং যাহাতে আমি স্পেশাল্ ম্যারেজ্ রেজিষ্ট্রার হইতে পারি, তাহার উপায় লিখিয়া দিবেন। হইলেই আমি—থানা এবং—থানার মধ্যে নয়-দশটি বিবাহ দিয়া দিব।"

এই বর্ষীয়ান্ স্ত্রীরাষ্ট্রের পত্রখানিতে বন্ধের একটি

জেলার যে সামাজিক সমস্যা বর্ণিত হইয়াছে, আমরা যত দূর জানি সেই সমস্যা বন্ধের জন্য অনেক বা সব জেলাতেই আছে। সমস্যাটির প্রতি আমরা হিন্দুহিতৈষী মাত্রেই মনোযোগ প্রার্থনা করিতেছি। বিশেষ করিয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভা ও হিন্দুমিশনের দৃষ্টি ইহার প্রতি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা অবহিত হইলে সমস্যাটির অন্ততঃ আংশিক সমাধান হইবে।

সন্ত্রাসনবাদের বিরুদ্ধে সরকারী অভিযান

খবরের কাগজে দেখিতেছি, বাংলা-গবন্মেণ্ট বক্তৃতা সিনেমা, পুস্তিকা, রেডিও প্রভৃতি দ্বারা এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সাহায্য লইয়া সন্ত্রাসনবাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবেন। ইহা করা গবন্মেণ্টের কর্তব্য। আমরাও চাই, যে, আমাদের দেশের কতকগুলি বালক-বালিকা ও যুবক-যুবতীর জীবন ও শক্তি ব্যর্থ না হয়। এই জন্য আমাদের ইচ্ছা, সরকারী অভিযান যেন সৃষ্টিস্বিত ভাবে সুপরিচালিত হয়।

সাধারণতঃ সরকারী পুস্তিকা যতই বিতরিত হউক, সরকারপক্ষীয় লোকেরা সাধারণ ভাবে বা রেডিওর সাহায্যে যাহাই বলুন, এবং সিনেমার সাহায্যে তাঁহারা যাহাই বুঝাইতে চান, তাহাতে কেহ বুঝিতে না পারিলে বা বিশ্বাসবান্ না হইলে প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত বা সন্দেহ ভঞ্জনার্থ কিছু বলিবে না। কারণ, যে প্রতিবাদ করিবে বা সন্দেহের মীমাংসা চাহিবে, সে যদিও তদ্বারা সন্ত্রাসনবাদের পরোক্ষ ভাবে সমর্থন নিশ্চয়ই করিবে না, সে কেবল শ্রুত সরকারপক্ষীয় যুক্তির দুর্বলতা দেখাইতে চাহিবে বা সরকারপক্ষীয় লোকদের উক্ত কোন তথ্য বা বর্ণনার অযথার্থতা দেখাইতে যাইবে, তথাপি তাহাকে সরকারপক্ষীয় লোকেরা সন্ত্রাসনবাদের সমর্থক মনে করিতে পারে। বলিয়া সকলেই চূপ করিয়া বক্তৃতা রেডিও পুস্তিকা সিনেমা গুলিবে পড়িবে দেখিবে। তাহাতে সরকারী মতে মানুষের আন্তরিক বিশ্বাস উৎপাদন হিসাবে যথেষ্ট ফললাভ না হইলেও, কাহারও বিপদের সম্ভাবনা ঘটিবে না। যথেষ্ট ফললাভ কাহাকে বলি, তাহা বলা আবশ্যিক। সন্ত্রাসনবাদ যে ধারণা তাহা গবন্মেণ্ট বলেন এবং আমরাও বলি।

কিন্তু উহা যে খারাপ, তাহা বুঝাইবার জন্য সরকারপক্ষীয় লোকেরা যে-কোন যুক্তি, যে-কোন তথ্য, যে-কোন বর্ণনা উপস্থিত করিবেন, তাহাই সারবান ও নিভুল না-হইতে পারে। যদি তাঁহাদের সব যুক্তি, তথ্য ও বর্ণনার যথার্থ্য পরীক্ষিত হইবার সুযোগ থাকে, এবং যদি সেই সুযোগে দুর্বল যুক্তির এবং অপ্রকৃত বা ভ্রমসঙ্কুল তথ্য ও বর্ণনার পরিবর্তে সরকারপক্ষ সংশোধিত প্রবল যুক্তি ও খাটি-তথ্য ও বর্ণনা উপস্থিত করিতে পারেন, তাহা হইলে লোকে কেবল যে বুঝিবে, যে, সন্ত্রাসনবাদ খারাপ তাহা নহে, অধিকন্তু তাহারা ইহাও বুঝিবে যে গবর্নেন্ট যে-যে কারণে সন্ত্রাসনবাদ খারাপ বলেন, সে কারণগুলো ঠিক। যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলেই আমরা মনে করিব, যে, অভিযান যথেষ্ট ফলপ্রদ হইয়াছে।

সভাসমিতি সম্বন্ধে, প্রেস সম্বন্ধে এবং ভারতীয়দের ও বাঙালীদের সাধারণ মানবিক ও পৌরজানপদ অধিকার (civic rights) সম্বন্ধে আইনের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে সরকারী যুক্তি তথ্য আদির পরীক্ষার সুযোগ হইবে বলিয়া মনে করি না। কিন্তু তাহাতে আমরা নিজেদের উত্তম এবং প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের জন্য চিন্তিত নহি। চিন্তা ছাত্র ও অন্তর অন্তর লোকদের জন্য। ছাত্রদের কথাই একটু বলি।

সংশিক্ষক মাত্রেই ছাত্রদিগকে প্রশ্ন করিতে উৎসাহ দিয়া থাকেন। ইহাতে তাহাদের জ্ঞানস্পৃহা বাড়ে এবং সন্দেহ দূর হইয়া বিশ্বাসের দৃঢ়তা উৎপন্ন হয়। কিন্তু শিক্ষকগণ সন্ত্রাসনবাদের বিরুদ্ধে যাহা বলিবেন, সেই কথিত যুক্তিতথ্য আদির যথার্থতা সম্বন্ধে কোন ছাত্র যদি সন্দেহান হইয়া প্রশ্ন করে, তাহা হইলে তাহাকে ভীক বা অবিজ্ঞ শিক্ষক সন্ত্রাসনবাদের সমর্থক বলিয়া হয়ত শাস্তি দিতে পারেন। খবরের কাগজে দেখিয়াছি, এইরূপ কারণে কোন একটি ইন্সুলের একজন ছাত্রের নাম কাটা গিয়াছে। ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। অগ্ন্যাগ্ন সরকারী চাকুরিয়ার মত সরকারী ইন্সুলসমূহের শিক্ষকদের উপরও সম্ভবতঃ হুকুম আছে, যে, তাঁহারা কাহাকেও সন্ত্রাসনবাদী বলিয়া সন্দেহ করিলে তাহার নাম গবর্নেন্টকে জানাইবেন। এরূপ হুকুম থাকিলে শিক্ষকদের পক্ষে উভয়সঙ্কট। কতকটা গোয়েন্দার মত কাজ করিতে হইলে শিক্ষককে অশ্রদ্ধেয় হইতেই হয়। সন্দেহ কতটুকু

হইলে তবে তাহা গবর্নেন্টের গোচর করা উচিত; তাহা স্থির করা শিক্ষকদের পক্ষে সহজ নয়। ছাত্রদের দোষত্রুটি বাস্তবিক থাকিলে তাহা নিজেদের জ্ঞান, উপদেশ ও চারিত্রিক প্রভাবে সংশোধন করাই শিক্ষকদের ধর্ম। তাঁহারা গোয়েন্দা-গিরি করিবেন, না, শিক্ষক-ধর্ম পালন করিবেন?

আমরা শুনিয়াছি, সন্ত্রাসনবাদের বিরুদ্ধে সরকারী আফিসবিশেষ হইতে প্রেরিত প্রবন্ধ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বলিয়া ছাপিবার অনুরোধ নাকি স্থাননিশেবে আসিয়াছিল। এরূপ ঘটনা থাকিলে সরকারী কর্মচারীবিশেষের বিবেচনার ভুল হইয়াছিল। আমাদের যাহা আন্তরিক বিশ্বাস, সন্ত্রাসনবাদের বিরুদ্ধে আমাদের যাহা বলিতে দিলে তাহাতে ফল ভাল হইবার সম্ভাবনা। সন্ত্রাসনবাদের দিকে যাহাদের মনের প্রবণতা আছে বা জন্মিতে পারে, সম্পাদকদের আন্তরিক ও নিভুল যুক্তিরই প্রভাব তাহারা অনুভব করিবে। যদি তাহাদের এই ধারণা জন্মে, যে, আমরা সরকারী কর্মচারী-বিশেষের গ্রামোফোন, তাহা হইলে আমাদের কথা কে শুনিবে? এমনই ত সন্ত্রাসনবাদীরা কাহারও কথা শুনে না, মানে না।

সন্ত্রাসনবাদের বিরুদ্ধে যাহারা অভিযান চালাইবেন, তাঁহাদের কাছে একটা নিবেদন আছে। তাঁহারা ব্রিটিশ রাজত্ব ও ব্রিটিশ শাসন সম্পূর্ণ নিগূত, ও সম্পূর্ণ সফলপ্রদ হইয়াছে, এ-কথা যেন না বলেন, কিংবা ইহাও যেন না বলেন, যে, পাঠান ও মোগল রাজত্ব ও হিন্দু বৌদ্ধ রাজত্ব সর্ব্বাংশে ব্রিটিশ রাজত্ব অপেক্ষা খারাপ ছিল। কারণ এরূপ উক্তির ভ্রমপ্রদর্শন অত্যন্ত সহজ। ব্রিটিশ এবং তৎপূর্ব্ববর্তী শাসন-কালসমূহের আলোচনা যদি করিতেই হয়, তাহা হইলে সকল রাজত্বের ভাল মন্দ দুই দিকই দেখান উচিত। এই কাজ নিরপেক্ষভাবে করা বড় কঠিন। ইহার জন্য আবশ্যিক কঠোর সত্যপ্রিয়তা, নিঃস্বম পক্ষপাতশূন্যতা, পূর্ণ সাহস এবং যথেষ্ট জ্ঞান কম লোকেরই আছে। সরকারী অভিযান যাহারা চালাইবেন, তাঁহাদের এই সকল গুণ ও যোগ্যতা থাকিবে কি? যদি না থাকে, তাহা হইলে কেহ তাঁহাদের প্রতিবাদ করিতে বা ভুল দেখাইতে অগ্রসর না-হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের কথার প্রতি মনে মনে অনাস্থা পোষণ তাঁহারা নিবারণ করিতে পারিবেন না।

শেষে আর একটি কথা বলিবার আছে। সন্ত্রাসবাদীরা সন্ত্রাসক কার্য কি উদ্দেশ্যে করে, তাহা আমরা অবগত নহি। যেন সন্ত্রাসকের সহিত আমাদের পরিচয় না- থাকায় ও তাহাদের কাহারও সহিত আমাদের এ-বিষয়ে আলোচনা না-হওয়ায় এ-বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা দূর হয় নাই। এ-বিষয়ে পুলিশ ও জজ ম্যাজিস্ট্রেটদের মারফৎ লক্ষ গবর্নেন্টের জ্ঞান হয়ত ঠিক। বঙ্গের বর্তমান গবর্নর ঢাকায় পুলিশ প্যারেডে একদা যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে মনে হয় তাঁহার মতে সন্ত্রাসকেরা দেশের শাসন-প্রণালী পরিবর্তন ও শাসক পরিবর্তন দ্বারা দেশকে স্বাধীন দেশ-সকলের মত করিবার নিমিত্ত সন্ত্রাসক কার্য করিয়া থাকে। এই ধারণা বা অনুমান যদি ঠিক হয় তাহা হইলে সরকারী অভিযান পরিচালকদিগকে এক দিকে যেমন দেখাইতে হইবে, যে, সন্ত্রাসন দ্বারা সন্ত্রাসকদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না (যাহা জগতের ইতিহাস হইতে ও যুক্তি দ্বারা দেখান সহজ), অন্য দিকে তাঁহাদিগকে তেমনই উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়ও নির্দেশ করিতে হইবে। অবশ্য সরকারপক্ষের নিকট হইতে কেহই এ-আশা করিতে পারে না, করে না, যে, তাঁহারা ব্রিটিশ রাজত্বের পরিবর্তে ভারতীয় রাজত্ব অর্থাৎ পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার পন্থা বাংলাইয়া দিবে। কিন্তু তাঁহারা ভারতবর্ষের অন্ততঃ ডোমিনিয়নত্ব লাভের উপায় না বলিয়া দিলে তাঁহাদেরই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। কারণ মানুষের মন শুধু “নেতি” “নেতি” (‘এটা নয়, এটা নয়’) এরূপ উক্তিভেদে সঙ্কষ্ট থাকিতে পারে না। কি বটে, মানুষের মন তাহাও জানিতে চায়। পাশ্চাত্য যে-সব দেশে স্বরাপাননিবারিণী সভাসকলের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, তাহারা এক দিকে যেমন নানাবিধ স্বরার ও স্বরাপানের দোষ কীর্তন করিয়াছে এবং মদের দোকান বন্ধ করাইয়াছে, অন্য দিকে তাহাদিগকে তেমনই চা, কফি, কোকো প্রভৃতি অ-মাদক পানীয়ের ব্যবস্থা করাইতে হইয়াছে। তদ্রূপ, কি করিলে ভারতবর্ষ নিজ লক্ষ্যস্থলে যাইতে পারিবে না তা বলাই যথেষ্ট নহে, কি করিলে যাইতে পারিবে তাহাও জ্ঞান আবশ্যিক।

সরকারপক্ষকে ডোমিনিয়নত্বলাভের পথ বলিয়া দিতে অনুরোধ এই জ্ঞান করিতেছি, যে, স্বয়ং সন্ত্রাস পঞ্চম জর্জ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রধান মন্ত্রী, রাজপ্রতিনিধি বড়লাট, ইত্যাদি

বহু ব্রিটিশ ব্যক্তি ডোমিনিয়নত্বকে ভারতবর্ষের গম্য ও অধিগম্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠাভূমি ও লক্ষ্যস্থল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কালক্রমে ব্রিটিশ জাতির মর্জি অনুসারে ভারতবর্ষ ডোমিনিয়নত্ব পাইবে বলিলে কিছুই বলা হইল না। যে অঙ্গীকার পালনের মিয়াদ নাই, সেটা অঙ্গীকারই নয়। যে ঋণশোধের মিয়াদ নাই, সে-ঋণের দলিল আদালতে গ্রাহ্য হয় কি?

সন্ত্রাসবাদ বিনাশের উপায়.

ইহা সচরাচর ধরিয়া লওয়া হয়, যে, সন্ত্রাসবাদ বাঙালী হিন্দুদের একচেটিয়া সম্পত্তি, যদিও তাই সত্য নহে। এইরূপ অনুমান করিয়া লওয়ায় বাংলা-গবর্নেন্ট সন্ত্রাসবাদ বিনাশের উপায় সম্বন্ধে বাঙালী হিন্দুদের পরামর্শ ও প্রস্তাবে বড়-একটা কান দেন না। সেই জন্ত আমরা অন্ত লোকদের এই বিষয়ে কিছু মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি। ১৯৩২-৩৩ সালের আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের সরকারী শাসন-বিবরণীতে আছে :—

“Newspapers of all shades of opinion condemned the terrorist outrages in Bengal but considered that the measures adopted by the Bengal Government for the suppression of terrorism would merely aggravate the evil, which could only be eradicated by the removal of the root causes of political and economic unrest.”

তাৎপর্য। “সকল প্রকার মতের কাগজ বঙ্গের সন্ত্রাসক উপদ্রবগুলার নিন্দা করিয়াছিল, কিন্তু বলিয়াছিল, যে, সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্ত বাংলা-গবর্নেন্ট কর্তৃক অবলম্বিত উপায়গুলি দ্বারা ঐ অমঙ্গল বৃদ্ধি পাইবে। তাহাদের মতে কেবল রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক অশান্তির মূলভূত কারণগুলির অগমারণ দ্বারাই সন্ত্রাসবাদ নিমূল করা যাইতে পারে।”

কিন্তু ইহাও ভারতীয় লোকদের মত বলিয়া গবর্নেন্ট অগ্রাহ্য করিতে পারেন। তজ্জন্ত এক জন অভিজ্ঞ বয়োবৃদ্ধ ইংরেজ সিভিলিয়ানের মত উদ্ধৃত করিতেছি। ইনি দিল্লীর ভূতপূর্ব চীফ কমিশনার স্যর জন টমসন্। অল্পদিন হইল তিনি বিলাতে এ-বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। রয়টার তাহার এই সংক্ষিপ্তসার দিয়াছেন—

“Congratulating the Bengal Governor and his daughter on their fortunate escape, he added that unhappily it was impossible to suggest that legislation in accordance with the White Paper policy would result in the disappearance of terrorism from India. It would almost certainly persist, whatever type of constitution was secured, though it would inevitably diminish as the Indians were increasingly entrusted with their own affairs. Then he uttered a timely warning and expressed his firm conviction that it would increase if reactionaries in England succeeded and their view prevailed that there should be no constitutional advance until terrorism disappeared.”

তাৎপর্য। “বঙ্গের গবর্ণর ও তাহার কণ্ঠা সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পাওয়ার ঠাহাদিগকে অভিনন্দিত করিয়া তিনি বলেন, দুঃখের বিষয় ইহা বলা যায় না যে, হোআইট পেপার নীতি অনুযায়ী বিধিপ্রণয়নের ফলে সন্ত্রাসনবাদ ভারতবর্ষ হইতে তিরোহিত হইবে। ভারতের মূল শাসনবিধি যাহাই হউক, ইহা প্রায় নিশ্চয়ই চলিতে থাকিবে, যদিও যেমন যেমন ভারতীয়েরা তাহাদের নিজের দেশের রাষ্ট্রীয় কাজের ভার অধিকতর পরিমাণে পাইতে থাকিবে তেমনি ইহাও অবশ্যস্বাভাবিকরূপে কমিতে থাকিবে। তাহার পর বক্তা একটি সময়োচিত সাবধানতার বাণী উচ্চারণ করিয়া নিজের এই দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেন, যে, ইহা বাড়িবে যদি ইংলণ্ডে পশ্চাদগতিশীল ব্যক্তির সফলকাম হয় এবং তাহাদের এই মতই জয়যুক্ত হয়, যে, সন্ত্রাসনবাদ তিরোহৃত হইবার পূর্বে মূল শাসনবিধির কোন উন্নতি প্রগতি হওয়া উচিত নহে।”

আমাদেরও এই জ্ঞান মত এই, যে, সন্ত্রাসনবাদের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত ভারতবর্ষকে নিশ্চিত ও অনিবার্যরূপে শাসনবিধির উন্নতি প্রগতির পথে স্থাপিত ও চালিত করা।

বঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা ও সরকারী ব্যবস্থা

বাংলা দেশে যদি কিয়ৎপরিমাণে সন্ত্রাসনবাদের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত না হইত, তাহা হইলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা গবন্মেণ্টের কর্তব্য হইত। কিন্তু বঙ্গে সন্ত্রাসক কার্য মধ্যে মধ্যে হওয়ায় এবং বেকার যুবকদের মধ্য হইতে নতুন কর্মী পাইবার সকল চেষ্টা সন্ত্রাসকেরা করে বলিয়া গবন্মেণ্টের ধারণা হওয়ায় বেকার-সমস্যা সমাধানের দিকে সরকারের দৃষ্টি পড়িয়াছে বলিয়া সংবাদপত্রে দেখা যাইতেছে। এই সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে সরকার আরও কয়েকটি প্রশ্নে মন দিবেন বা দিতেছেন বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। গবন্মেণ্টের সমস্ত চেষ্টাটিকে খবরের কাগজ-ওয়ালারা ‘বঙ্গে পল্লীসংগঠন পরিকল্পনা’ বলিতেছেন। ভারতবর্ষ ও বাংলা দেশ গ্রামপ্রধান বটে, কিন্তু শহরেও বেকার-সমস্যা আছে, ঋণী চাষী লোক আছে, নিরক্ষর লোক আছে, অসুস্থ চিকিৎসার সাহায্যবিহীন রোগী আছে, ইত্যাদি। সুতরাং পল্লীসংগঠন করিলেই বঙ্গের সমুদয় অর্থনৈতিক বাধাবিঘ্ন দূরীভূত হইবে না। যাহা হউক, নাম লইয়া ঝগড়া করিবার প্রয়োজন নাই।

বাংলা-সরকার যাহা যাহা করিবেন, তাহার প্রধান তিনটি কাজ পল্লীবাসীদের ঋণশোধের ব্যবস্থা, মধ্যবিত্ত বেকারদের রোজগারের ব্যবস্থা ও কুটীর-শিল্পের পুনঃপ্রবর্তন। এই কাজগুলি করিবার জন্ত সমবায় প্রচেষ্টা দৃঢ়ীকরণ, জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন এবং পল্লীবাসীদের ঋণ হইতে অব্যাহতিলাভের ও ঋণ-পরিশোধের সহজ নিয়মাবলী প্রবর্তন গবন্মেণ্ট করিবেন। চাষের উন্নত প্রণালী প্রদর্শন, ভাল বীজ ও চারা সরবরাহ, পাটচাষের নিয়ন্ত্রণ, গবাদি পশুর সংখ্যা ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি, রাস্তার উন্নতিসাধন, স্বাস্থ্যোন্নতি, জলসেচন, এবং শিক্ষা-বিদ্যায় সরকার মনোযোগ করিবেন।

ইতিপূর্বে কৃষি ও পণ্য শিল্পের ক্ষেত্রে যে-সব গবেষণা হইয়াছে, জনমতকে তাহার ফলের অনুকূল করিবার অভিপ্রায়ে আলোকচিত্র সহযোগে বক্তৃতা প্রদর্শনী প্রভৃতির সাহায্যে বিস্তৃতভাবে প্রচারকার্য চালান হইতেছে। ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী-গাড়ী বর্ধমান-বিভাগের চারিটি জেলায় ভ্রমণ শেষ করিয়াছে।

সরকারী পরিকল্পনাটির বিস্তারিত বিবরণ দৈনিক কাগজ-সমূহে বাহির হইয়াছে। তজ্জন্ত আমরা সংক্ষেপে কেবল তাহার আভাস দিলাম। অনেক বৎসর হইতে সরকারী জাতিগঠন বিভাগগুলি (‘nation building’ departments) যে-সব কাজ করিতেছেন, পরিকল্পনাটিতে তাহার অতিরিক্ত বিশেষ কিছু দেখিতেছি না। যে-কয়টি জমীবন্ধকী ব্যাঙ্ক দু-একটি জেলায় স্থাপিত হইয়াছে, তাহা নতুন বটে, কিন্তু বঙ্গের প্রত্যেক জেলায় এরূপ ব্যাঙ্ক ও শাখা ব্যাঙ্ক কয়েকটি করিয়া স্থাপিত হওয়া আবশ্যিক। পল্লীবাসীদের ঋণদায় হইতে অব্যাহতিলাভের ও ঋণপরিশোধের সহজ নিয়মাবলী গবন্মেণ্ট প্রবর্তিত করিলে তাহা নতুন হইবে বটে। রাস্তার উন্নতিসাধন জন্ত পাঁচ বৎসরের কার্যপদ্ধতি প্রস্তুত হইয়াছে। তদনুসারে অল্প কাজও যদি হয়, তাহা নতুন হইবে বটে, কিন্তু তাহার দ্বারা মধ্যবিত্ত বেকারদের উপার্জনের কোন উপায় হইবে না। মাটা কাটিতে অনভ্যস্ত কৃষিজীবীদেরও অল্পসংস্থান তাহার দ্বারা হইবে না। ইহা অবশ্য ঠিক, যে, বঙ্গের পল্লী-অঞ্চলে যেখানে যেখানে আবশ্যিক পাকা রাস্তা সর্বত্রই নির্মিত হইলে এই প্রদেশে বিভিন্ন স্থানে মাল ও চিঠিপত্র পাঠাইবার সুবিধা বাড়িবে এবং তাহার দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রদেশটির আর্থিক উন্নতি সহজতর হইবে।

সরকারী পরিকল্পনাটিতে যে-সব কাজ ও চেষ্টার বিবরণ ও উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহার অধিকাংশই পুরাতন বলিয়াই আমরা সেগুলি তুচ্ছ বলিতেছি না। সরকারী বেসরকারী যে-কোন চেষ্টার দ্বারা দেশের সামান্য উপকারও হয় তাহা প্রশংসনীয়। কিন্তু সেইগুলির লক্ষ্যচোড়া বর্ণনার দ্বারাই বঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হইতে পারে না। বঙ্গের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ ও বঙ্গীয় দুঃস্থাপন্ন জনগণের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি দ্বারা চালিত হইয়া সাহসপূর্বক সরকারী প্রভূত ঋণ করিয়াও সকল ‘জাতিগঠন’ বিভাগে বিস্তারিত সৃষ্টিস্তৃত কাজ চালাইলে ফল পাওয়া যাইতে পারে, নতুবা নহে।

সরকারী পরিকল্পনার অনুযায়ী অধিকাংশ কাজ ত কয়েক বৎসর হইল চলিতেছে। তাহার ফলে অবস্থার উন্নতি কিছু হইয়াছে বলিয়া ত মনে হয় না। বরং অবনতি যে তাহা সন্দেহও হইয়াছে তাহার প্রমাণ আছে। তাহার দু-একটির উল্লেখ করিতেছি।

১৯২০-২১ সালে বঙ্গে বপিত এক শত একরু চাষের জমিপ্রতি ১৮৬ জন অধিবাসী ছিল, ১৯৩১ সালে হইয়াছে

২১৪; অর্থাৎ চাষে জমি বাড়ে নাই, কিন্তু লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে—যদিও চাষের উপযোগী অকুট জমি এখনও বন্ধে বিস্তর আছে। ১৯২১ সালে উপার্জকদের অকর্ম্মা পোষা ছিল শতকরা ৬৫ জন. ১৯৩১ সালে হইয়াছে ৭১ জন। সমগ্রভারতে উপার্জকদের অকর্ম্মা পোষা শতকরা ৫৬ জন, বন্ধে শতকরা ৭১ জন।

প্রকৃত সহানুভূতি, অনুরাগ, উৎসাহ ও সাহস ব্যতিরেকে কোন বড় কাজ হয় না। কয়েক কোটি টাকা সরকারী ঋণ করিয়া বঙ্গের সর্বত্র যথেষ্টসংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপনপূর্বক শিক্ষা আবশ্যিক অবৈতনিক ও সার্বজনিক (compulsory, free and universal) করিয়া দিলে পাঁচ বৎসরে না হউক দশ বৎসরে বন্ধে নিরক্ষরতা দূরীভূত হইতে পারে। তাহা হইলে অল্প সব সমস্যার সমাধান সহজতর হয়। বেকার-সমস্যার একটা বড় প্রতিকার ত সদ্য সদ্য হয়—প্রবেশিকা ও তদূর্ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে ত সদ্য সদ্যই কাজ দেওয়া যায়। কিন্তু একরূপ কাজ করিবার মত বঙ্গের প্রতি সহানুভূতি, বঙ্গজনহিতৈষণা ও সাহস ভারত-গবন্মেণ্টের ও বাংলা-গবন্মেণ্টের আছে কি?

জাপানকে অস্ত্রসরবরাহ

লণ্ডনের ডেলী হেরাল্ড সংবাদ দিয়াছেন, পাছে বেশী জানাজানি হয় সেই ভয়ে ব্রিটিশ ও অল্প কোন জাতির ভারতবর্ষে যুদ্ধসরঞ্জাম প্রস্তুত করাইয়া জাপানকে চীনজয়ের জন্ত বিক্রী করিতেছেন। সংবাদ সত্য হইলে ইহা অবশ্য ভারত-গবন্মেণ্টের জ্ঞাতসারে করা হইতেছে। কিন্তু ইহা কি সত্য?

এই ইউরোপীয় জাতিদের উদ্দেশ্য কি কেবল অর্থাগম, না, জাপান চীন জয় করিলে চীনের এক-একটা টুকরা তাঁহারা পাইবেন?

পূর্ণ স্বাধীনতা ও ডোমিনিয়ন স্টেটাস

বোম্বাইয়ের কোন কোন উদারনৈতিক (মডারেট) নেতা কংগ্রেসকে এই বলিয়া বিক্রপ করিয়াছেন, যে, পূর্ণ স্বাধীনতা চাওয়া শিশুদের আকাশের চাঁদের জন্ত কামার মত। কিন্তু ওয়েস্টমিনস্টার স্ট্যাটুট (Westminster Statute) পাস হওয়ার পর পূর্ণ স্বাধীনতা এবং মডারেটদের প্রার্থিত ডোমিনিয়ন স্টেট সে সারতঃ প্রভেদ কোথায়?

উদারনৈতিক ও কংগ্রেসওয়ালারা

কংগ্রেসওয়ালারা উদারনৈতিকদিগকে উপহাস পরিহাস করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষে রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে জাগরণ এবং রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত বর্তমানে উদারনৈতিক

বলিয়া অভিহিত দলের দ্বারাই হইয়াছিল। ক্ষুদ্র কংগ্রেস-ওয়ালারা এ-কথা বিশ্বাস হইলেও বা ইহার উল্লেখ না করিলেও পণ্ডিত জওআহরলাল নেহরুর মত শক্তিমান নেতা লাহোর কংগ্রেসের সভাপতিরূপে তাঁহার অভিভাষণের গোড়ার দিকেই পূর্বতন উদারনৈতিক নেতাদের নিকট ঋণ স্বীকার করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা সম্বন্ধে অমূলক গুজব

কলিকাতার ও কলিকাতার বাহিরের কোন কোন কাগজে খবর বাহির হইয়াছিল, যে, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের স্তর তারকনাথ পালিত অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আসিতেছেন। একরূপ সংবাদ যে ভিত্তিহীন, সংবাদ-প্রকাশকালে তাহা এই কার্য-সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটি জ্ঞাত থাকিবার কথা। সে যাহাই হউক, গুজবটি অমূলক। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা মত বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কৃতী ও উৎসাহী ব্যক্তিকে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় আনিতে পারিলেন না, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

পালিত পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদটির জন্ত দরখাস্ত আহ্বান করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ৩১শে মে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। আমরা অবগত হইয়াছি, যে, ডক্টর সাহা দরখাস্ত করেন নাই। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপকতা কেন চান না, তাহা বুঝা আবশ্যিক এবং বুঝা কঠিন নহে।

সাহারাই বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উৎসাহী ও কৃতী, তাহারাই একরূপ কোন কাজ লইতে ও একরূপ কোন অবস্থায় পড়িতে চান না যাহাতে গবেষণা বন্ধ হইতে বা তাহার অস্ববিধা ঘটিতে পারে। ইহা সংবাদপত্রপাঠকেরা অবগত আছেন, যে, ভূতপূর্ব পালিত অধ্যাপক স্তর চন্দ্রশেখর বেকট রামন্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিত অধ্যাপকের জন্ত অভিপ্রেত ও ক্রীত বহুমূল্য অনেক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সভায় লইয়া গিয়া এবং সেগুলি সেখানে খাটাইয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিতেন। আমরা যত দূর জানি, সেগুলি এখনও বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রত্যর্পিত হয় নাই। সুতরাং এখন যিনি পালিত অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন, তিনি পালিত অধ্যাপকের জন্ত ক্রীত ঐ যন্ত্রগুলির সাহায্যে গবেষণা করিতে পারিবেন না। প্রশ্ন হইতে পারে, যে, অধ্যাপক রামন্ ত বিজ্ঞান-সভায় গিয়া ঐ যন্ত্রগুলির সাহায্যে গবেষণা করিতেন, নূতন পালিত অধ্যাপক কেন তাহা করিতে পারিবেন না? তাহার উত্তর এই, যে, অধ্যাপক রামন্ নিজের উদ্যোগিতায় বিজ্ঞান-সভার সম্পাদক এবং কর্তা হইয়াছিলেন। তাঁহার পর ডক্টর কৃষ্ণন নামক এক জন মাদ্রাজী অধ্যাপক তাঁহারই চেষ্ঠায় এই সভার

পাদক ত হইয়াছেনই, অধিকন্তু উহার বেতনভোগী পদার্থ-
ছান অধ্যাপকও হইয়াছেন। সুতরাং অধ্যাপক রামনের
মলে বিজ্ঞান-সভায় যাহা তিনি করিতেন, ভবিষ্যৎ পালিত
পাপক তাহা করিতে পারিবেন না। ইহা জানা কথা, যে,
এই মেঘনাদ সাহা সম্ভবতঃ পালিত অধ্যাপক হইতে রাজী
হইতেন যদি ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান-সভার সম্পাদক
প বা অধ্যাপক রূপে তাঁহার তথায় প্রতিষ্ঠিত যন্ত্রগুলির
দ্বায়ে গবেষণা করিবার সুযোগের সম্ভাবনা থাকিত।
কিন্তু এই সম্ভাবনা কি প্রকারে লুপ্ত হইয়াছে, তাহা উপরে
বর্ণিত হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, বিজ্ঞান-সভায় প্রতিষ্ঠিত
গুলি ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের, সেগুলি ফেরত
দিলেই ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজে সেই-
গুলির সাহায্যে পালিত অধ্যাপক গবেষণা করিতে পারিবেন,
সুতরাং তাঁহার গবেষণা-কার্য বন্ধ বা বিলম্বিত হইবে কেন?

মনে রাখিতে হইবে, যে, যখন অধ্যাপক রামন পনের
দুই চুটি লইয়া বাঙ্গালার যান, তখন তিনি
সেগুলি ফেরত দিয়া যান নাই, যখন তিনি ঐ চুটির শেষে
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে ইস্তফা দেন, তখনও
সেগুলি ফেরত দেন নাই, সেগুলি ঠিক কার্যোপযোগী অবস্থায়
আছে কিনা জানা নাই, এবং কোথায় আছে ও কখন
ফেরত পাওয়া যাইবে, তাহাও জানা নাই। যদি কার্যোপযোগী
অবস্থায় পরে কখনও সবগুলি ফেরত পাওয়া যায়, তাহা
লেও সেগুলির জন্ম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান-
কলেজের হাতায় নূতন গৃহ নির্মাণ করিয়া সেগুলির সব
শ সংযোজিত ও স্থাপিত করিয়া কাজ আরম্ভ করিতে দুই
বৎসর সময় লাগিবে।

এলাহাবাদে ডক্টর সাহা গবেষণাগারের জন্ম যন্ত্রপাতি
নিবার টাকা গবন্মেণ্টের নিকট হইতে পাইয়াছেন,
এই গবেষণা চলিতেছে, বেতনও তিনি ১২৫০ পান,
স্বয়ং বাসগৃহ নির্মাণ করিয়াছেন। এ সকল ছাড়িয়া তিনি
গবেষণার যথেষ্ট সুযোগবিহীন কাজে যদি যাইতে না-চান,
তাহা হইলে তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। অবস্থাসমাবেশে
তিনি অ-বাঙালী পালিত অধ্যাপক নিযুক্ত হইলে তাহাও
আশ্চর্যের বিষয় হইবে না।

কৈলাস পর্বত আরোহণ

বাঙালী যুবকদের মধ্যে বাইসিকুলে বা পদব্রজে দেশ-
ভ্রমণ, এমন কি পৃথিবীভ্রমণ ব্রত ইতিপূর্বে কেহ কেহ
প্রবর্তন করিয়াছেন। শুনা যায়, একালে রামমোহন রায় তিব্বত
গিয়াছিলেন। প্রথম শতাব্দীতে চট্টগ্রামের রায় শরৎচন্দ্র
রায় বাহাদুরের তিব্বতযাত্রা সুবিদিত। অপেক্ষাকৃত

আধুনিক সময়ে তীর্থযাত্রা উপলক্ষ্যে কোন কোন বাঙালী
কৈলাস পর্বত ও মানসসরোবর দর্শন করিয়াছেন। সম্প্রতি
পরলোকগত শ্রী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র
শ্রীযুক্ত উমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত
স্ববীরকুমার চট্টোপাধ্যায় যে কৈলাসযাত্রা করিয়াছেন, তাহা
অন্য প্রকারের কাজ। ইহা দ্বারা প্রধানতঃ সাহসিকতা ও
কষ্টসহিষ্ণুতার দ্বারা নূতন ভৌগোলিক ও অণুবিদ্য জ্ঞান
সঞ্চিত হইবে এবং বাঙালী ছেলেরা যে এরূপ সাহসের ও
শ্রমের কাজ এখনও করিতে পারে, তাহা প্রমাণিত হইবে।
উক্ত দুই যুবকের সঙ্গে আরও চারি জন জুটিবেন। তাঁহারা
সকলে সফলকাম হইবেন বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু
এরূপ যুবকদের কৈলাস দেখিয়া আসিয়াই নিবৃত্ত হওয়া উচিত
নয়। তাঁহারা সুইজারল্যান্ডের ও অণুত্র স্থিত আল্পসের উচ্চতম
শৃঙ্গে ইউরোপীয় পর্বতারোহীরা কি প্রকারে উঠে তাহা
তাহাদের নিকট হইতে শিখিয়া আসুন। তাহার পর
তাঁহারা হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গসকলে আরোহণের চেষ্টা
করিবেন। কৈলাস-আরোহণ শিক্ষানবীসীমাত্র।

হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গসকলে আমাদের যুবকদিগকে
উপযুক্ত শিক্ষানুষ্ঠান আরোহণে প্রবৃত্ত করাইবার জন্ম
সমুদয় ব্যয়নির্বাহার্থ শ্রী রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে
একটি ফণ্ড খোলা উচিত।

তুর্কনারীদিগের প্রগতি

তুরস্কে বহুবিবাহ লুপ্ত হইয়াছে, নারীরা অবরোধমুক্ত
হইয়াছেন, বালিকাদের শিক্ষা অবশুদেয় করা হইয়াছে এবং
আফিসে, কারখানায়, হোটেলে, দোকানে নারীদিগকে কাজ
করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। নারীরা ব্যবস্থাপক সভা
আদির নির্বাচনে যোগ দিতে পারেন কিনা—নির্বাচক ও
নির্বাচিত হইতে পারেন কিনা—তাহা স্থির করিবার জন্ম
তুরস্ক-গবন্মেণ্ট একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই
কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন, যে, নারীদিগকে পুরুষদের সহিত
সমান সত্তে এই অধিকার দেওয়া উচিত।

তুরস্ক তুর্কদের জন্ম

তুরস্কে সরকারী বড় চাকরী ত বিদেশীরা পায়ই না,
অধিকন্তু কতকগুলি পেশা কেবল তুর্কদের জন্ম আইন দ্বারা
রক্ষিত হইয়াছে। তদনুসারে গত মে মাসে বিদেশী মোটর-
ড্রাইভার, নার্সিং, মুচি, সেয়ারের বাজারের কেরানী
এবং গায়ক বাদকদের কাজ গিয়াছে, এবং তিন হইতে বার
মাসের মধ্যে বিদেশী সাধারণ শ্রমিক, হোটেলের চাকর,
অভিনেতা-অভিনেত্রী, ছাপাখানার প্রিন্টার, রাসায়নিক দ্রব্য-
বিক্রেতা, সরকারী চাকর্যে প্রভৃতির কাজ যাইবে।

ইউরোপে স্ত্রীভাষচন্দ্র বসু

তুরস্কের রাজধানী আধোরায় গিয়া বক্তৃতা করিবার এবং তথায় একটি তুর্ক-ভারতীয় সভা স্থাপন করিবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত



ড্রেসডেনে শ্রীযুক্ত স্ত্রীভাষচন্দ্র বসু ও অস্থায়ী ভারতীয়

স্ত্রীভাষচন্দ্র বসু বহু নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন। তাহার পূর্বে তিনি ভারতবর্ষ ও ইউরোপের নানা দেশের সহিত সংস্কৃতিমূলক সংস্পর্শ বৃদ্ধির জন্তু অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা, চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা, সভাস্থাপন ইত্যাদি করিয়াছেন। কিছু দিন পূর্বে তিনি স্ত্রীভাষচন্দ্রের প্রাচীন রাজধানী ড্রেসডেন গিয়া তথাকার ভারতীয়দিগের সহিত মিলিত হন এবং মেয়র কর্তৃক সংবর্দ্ধিত হন। তথায় ভারতীয়দিগের সহিত তাঁহার একটি ফোটোগ্রাফ তোলা হয়।

স্মার বিপিনবিহারী ঘোষ

আইনবেত্তা বলিয়া এবং শিক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন বলিয়া স্মার বিপিনবিহারী ঘোষ সুবিখ্যাত। তাঁহার ভ্রাতা স্মার বিপিনবিহারী ঘোষের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি এম-এ ও বি-এল পাস করার পর হাইকোর্টের উকিল ও পরে জজ হইলেন। জজপদে দক্ষতা প্রদর্শনের পর পেন্সান গ্রহণ করেন। তাহার পর তিনি বঙ্গীয় ও ভারতীয় শাসন-পরিষদের অন্যতম সভ্যরূপে কয়েক বার কাজ করিয়াছিলেন। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার

যোগ ছিল। সৌজন্য, অমায়িক ব্যবহার ও নির্মল চরিত্রের জন্য তিনি শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

বালিকাদিগকে সঁতার শিক্ষা দেওয়া

কলিকাতার হেহুয়া পুষ্করিণীতে বালিকাদিগকে সঁতার শিখাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। একটি মহিলা কমিটির উদ্যোগে এই শিক্ষা দেওয়া হইবে। শ্রীযুক্ত ব্রহ্মকুমারী রায় ইহার অধ্যক্ষ, এবং শ্রীযুক্তা রমা বসু এম্-এ ও শ্রীযুক্তা বিজয়া সেনগুপ্তা বি-এ ইহার যুগ্ম সম্পাদিকা। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি মহিলাদের সঁতারের ব্যবস্থা ও উহার পরিচালনের ভার মহিলা-ক্লাব ও এই কমিটির হাতে দিয়াছেন। কমিটি শিক্ষয়িত্রী-নিয়োগের, পদ্যের এবং অল্প সব বিয়ের বন্দোবস্ত করিবেন।

উপযুক্ত পদ্য এবং যোগ্য শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে সর্বত্র এইরূপ বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যিক।

ভূদেব স্মৃতিসভা

মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর চল্লিশ বৎসর পরে গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ চুঁচুড়ায় তাঁহার গঙ্গাতীরস্থ বৈঠকখানা বাটীতে তাঁহার প্রথম স্মৃতিসভার অধিবেশন



ড্রেসডেনে ভারতীয়দিগের প্রীতিভোজে শ্রীযুক্ত স্ত্রীভাষচন্দ্র বসু

বামদিক হইতে :—শ্রীযুক্ত জে. গিরি, বি. এস. শর্মা, কে. পি. ঝা, স্ত্রীভাষচন্দ্র বসু, এস. সি. রায়, এন. সি. চাটার্জি এবং এস. এ. আলি

হয়। ঐ বাড়ীতে এখন হুগলী কলিজিয়েট স্কুল বসে, গবর্নেন্ট ভাড়া দেন। স্মৃতিসভা যে এতদিন পরেও হইয়াছে, তাহা মনের ভাল, কিন্তু এত বৎসরে যে পূর্বে একবারও হয়

নাই ইহা ভূদেব বাবুর বংশধরদের ও বাঙালীদের প্রশংসার বিষয় নহে।

এই সভার সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহা অত্র সংক্ষিপ্ত আকারে মুদ্রিত হইল। স্মৃতিসভার উদ্যোক্তাদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ এবং অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এক একটি প্রবন্ধ পড়েন। কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় এবং অত্র কেহ কেহ কিছু বলেন। আমরাও কিছু বলিয়াছিলাম। সে-সব কথা পরে হস্ত লিখিতে পারি।

দেখিয়া বড় দুঃখ হইল। যে, ভূদেব বাবুর বসতবাড়ীটি একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। বাড়ীটি যখন ভগ্নপ্রায় বা ভগ্ন হইয়াছিল তখন তাঁহার বংশধরেরা তাহা মেরামত দ্বারা রক্ষা করিতে পারিতেন—তাঁহারা সকলেই নিঃস্ব নহেন। ভূদেব বাবু যে দাতব্য কবিরাজী ও হোমিওপ্যাথী ঔষধালয়ের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা চলিতেছে। কিন্তু যে ধ্বংসোন্মুখ বে-মেরামত গৃহে ঔষধালয় দুটি আছে তাহা দেখিলে হর্ষোৎফুল্ল হওয়া যায় না। তিনি চুঁচুড়ার চতুষ্পাঠী চালাইবার জন্ত এবং বঙ্গের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকদিগকে বৃত্তি দিবার জন্ত বিস্তর টাকা রাখিয়া যান। সুনীলাম, এখন মূলধন প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা হইয়াছে। চতুষ্পাঠীটি চলিতেছে, কিন্তু যে-গৃহে চলে তাহার বাহির ও ভিতর দেখিলে মনে হয় না, যে, কেহ সংস্কৃত বিদ্যাকে শ্রদ্ধা করে। বৃত্তি অনেক অধ্যাপককে দেওয়া হয়। শুধু এই সংবাদে আমরা তৃপ্ত হইতে পারি না। সংস্কৃতের চর্চা বাড়িতেছে কি না, গভীর পাণ্ডিত্য জন্মিতেছে কি না, শাস্ত্রশ্রেষ্ঠ শ্রুতির আদর বাড়িতেছে কি না, প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র দর্শন বিজ্ঞান কাব্যাদি সম্বন্ধীয় গবেষণা হইতেছে কি না, ইত্যাদি সংবাদ বোধ করি হিন্দু ভারতীয়েরা ও বাঙালীরা পাইলে তৃপ্ত হইবে।

রাজনারায়ণ বসুর দেওঘরস্থিত বাটী

রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বাংলা সাহিত্যের জন্ত, স্বদেশী দ্রব্যে অনুরাগ বৃদ্ধির জন্ত, রাষ্ট্রনীতির আলোচনার জন্ত, বিস্তৃত ধর্মমত প্রচারের জন্ত, সমাজসংস্কারের জন্ত, এবং অত্র নানা দিকে দেশের মঙ্গলের জন্ত যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার জীবনচরিতজেরা অবগত আছেন। তাঁহার বন্ধু ভূদেব বাবু হিন্দুআচারনিষ্ঠ ছিলেন, তিনি তাহা ছিলেন না। অথচ তিনি এরূপ সাধু সাত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন, যে, ভূদেব বাবু তাঁহার আচারনিষ্ঠার অভাব উল্লেখ করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই লিখিয়াছিলেন, যে, রাজনারায়ণকে উপবীত দেওয়া উচিত; অর্থাৎ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ করিয়া লওয়া উচিত।

রাজনারায়ণ বাবুর শেষজীবন দেওঘরে ঘাপিত হয়।

তাঁহার বাড়ীটি ঋণের দায়ে বিক্রী হইতে যাইতেছে। এটিকে ঋণমুক্ত করিয়া তাহাতে লাইব্রেরী পাঠাগারাদি স্থাপন করিয়া তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ ইহা রক্ষা করা বাঙালীদের কর্তব্য। এই স্মৃতিপ্রায়ে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। তাহার বৃত্তান্ত পাঠকগণকে বিজ্ঞাপনসমূহের মধ্যে মুদ্রিত আবেদনে পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

কাশীরাম দাসের স্মৃতিসভা

কাটোয়ার নিকটস্থ সিদ্ধি গ্রামে মহাভারতকার কাশীরাম দাস জন্ম গ্রহণ করেন। এই গ্রামে গত মাসে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ সভার অধিবেশন হয়।

কলিকাতা হইতে এবং সিঙ্গুর চতুষ্পাঠী গ্রামসমূহ হইতে অনেক লোক এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। গ্রামের নানাস্থানে রাস্তার উপর তোরণ নির্মিত হইয়াছিল এবং সেই সকল তোরণ পত্র-পুষ্প দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে :—

(১) কাশীরাম দাসের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া একটি অস্থায়ী কার্যানির্বাহক সমিতি গঠন করা হউক। এই সমিতি আবশ্যিক হইলে আরও তিন জন সদস্য নির্বাচিত করিতে পারিবেন। এই সমিতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রভৃতি নিখিলবঙ্গীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সহায়তায় একটি নিখিলবঙ্গ সমিতি গঠন করিবেন। এই দ্বিতীয় সমিতিই স্থায়ী কার্যকরী হইবে। ইতিমধ্যে এই সমিতি কলিকাতায় সভাসমিতি করিয়া সাধারণের মনোযোগ ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিবেন এবং অর্থ সংগ্রহ করিবেন।

সভ্যের তালিকা :—অধ্যাপক মন্থনাথ মুখুজ্যে, প্রমথনাথ মুখুজ্যে, অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, ডাঃ গুণীন্দ্রনাথ মুখুজ্যে, শ্রীযুক্ত কমলাপতি চৌধুরী, ছকড়িলাল চাটুজ্যে, বিজ্ঞানস ভট্টাচার্য্য, ক্ষিতীশচন্দ্র চাটুজ্যে, গতিরাম চাটুজ্যে, মিঃ সি. এ. নরোনা, এস. ডি. ও—কাটোয়া, রাজেন্দ্রনাথ বাঁড়ুজ্যে, নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য, সত্যীপ্রসন্ন বাঁড়ুজ্যে, বিখনাথ বাঁড়ুজ্যে, দ্বিজপদ কুণ্ডু, রাসবিহারী মিত্র, সচ্চিদানন্দ চন্দ, রমণীমোহন চাটুজ্যে, এবং ফণীন্দ্রচন্দ্র বস্তু।

(২) কাশীরাম দাস স্মৃতিমন্দির নামে একটি ইষ্টকনির্মিত গৃহ নির্মিত করিতে হইবে। ইহাতে অন্ততঃপক্ষে একটি বড় হলঘর ও দুই পার্শ্বে দুইটি কক্ষ থাকবে। হলটি পাঠাগার ও সভাসমিতির জন্ত ব্যবহৃত হইবে এবং কক্ষ দুইটিতে পুস্তক ও অগ্রান্ত সরঞ্জাম থাকিবে।

(ক) পল্লীগ্রামের বালক-বালিকাদিগের জন্ত কোন শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। সুতরাং সম্ভবপর হইলে এই মহাত্মার নামে একটি উচ্চপ্রাথমিক বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প রহিল।

(৩) প্রতি বৎসর কাশীরাম দাসের জীবনী ও তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা হইবে। এই প্রতিযোগিতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক পরিচালিত হইবে এবং যাহার প্রবন্ধ সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে তাঁহাকে 'কাশীরাম দাস স্মরণপদক' প্রদত্ত হইবে।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চাটুজ্যে বলেন, সাত বৎসর পূর্বে ১৩৩৩ সালে কয়েক জন বালক স্বর্গীয় কাশীরাম দাসের স্মৃতিরক্ষার সঙ্কল্প করেন এবং তদুদ্দেশ্যে কয়েকখানি পুস্তক সংগ্রহ করিয়া 'কাশীরাম দাস স্মৃতিপুস্তকালয়'

স্থাপন করেন। বর্তমানে এই সমস্ত উদ্যম গুটিকয়েক বালক এক যুথকের উদ্যম। তাহাতে আমাদের চেষ্টা ফলবতী হয়, তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য আমি আপনাদিগের নিকট কাতর নিবেদন করিতেছি।

এই উদ্যম ও চেষ্টা যে প্রশংসনীয়, তাহা বলাই বাহুল্য, ইহাও বলা উচিত, যে, এই চেষ্টা যে ইতিপূর্বে হয় না, তাহা আমাদের বাঙালীদের পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে।

যাত্রাওয়ালী মুকুন্দ দাস

যাত্রা ও গানের ভিতর দিয়া স্বদেশপ্ৰীতি ও স্বদেশ-হিতৈষণা প্রচারের জন্য বিখ্যাত বরিশালের মুকুন্দ দাসের পরলোকগমনে বাংলা দেশ তাঁহার যাত্রা হইতে আনন্দ ও অশুপ্রাণনা আর সাক্ষাৎভাবে পাইবে না। তাঁহার পিতৃ-মাতৃদত্ত নাম ছিল যজ্ঞেশ্বর দে। তাঁহার গুরু অশ্বিনীকুমার দত্ত তাঁহাকে মুকুন্দ দাস নাম দিয়াছিলেন। তাঁহার যাত্রার জন্য তাঁহাকে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হইয়াছিল।

অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র রায়

নাগপুরের মরিস কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র রায়ের নাম বাংলা দেশে কম লোকই জানেন। যখন মধ্যপ্রদেশে উচ্চশিক্ষার কোন সুবিধা ছিল না, তখন যাহারা তথায় তাহা বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম। যখন ১৮৮৫ সালে নাগপুর মরিস কলেজ স্থাপিত হয়, তখন তিনি ও অন্য দু-জন গ্রাজুয়েট উহার অধ্যাপক হন। তথায় তিনি ৩৬ বৎসর দর্শনের অধ্যাপকতা করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল এবং তিনি তাহার নানা কমিটি, বোর্ড ও সব-কমিটির সভ্য ছিলেন। তিনি নাগপুর দার্শনিক সভার প্রথম সভাপতি এবং ২৫ বৎসর দীননাথ বালকবিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন। প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

সম্রাসনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা

সম্রাসনবাদ উচ্ছেদের নিমিত্ত কর্তব্যনিরূপণের জন্য সম্প্রতি কলিকাতায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে প্রধানতঃ জমীদারদের একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বক্তৃতা-গুলিতে যাহা বলা হইয়াছিল, তাহার প্রায় সব কথাই আগে আগে বলা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত চাকচন্দ্র বিশ্বাস বলেন, বাগ্মিতার দ্বারা যদি সম্রাসনবাদের উচ্ছেদ সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে উহা অনেক আগেই হইয়া যাইত। একাধিক বক্তা সম্রাসনবাদের উদ্ভবের জন্য প্রেসকে ও কংগ্রেসকে খুব দোষ দেন। কোন বক্তাই এতাবৎপ্রচলিত শাসনপ্রণালীকে ও শাসনকর্তাদের কৃত কোন কার্য ও অবহেলাকে সম্রাসকদের

উৎপত্তির জন্য বিন্দুমাত্রও দায়ী করেন নাই। মিঃ আবু হালিম গজনবী বলেন, সম্রাসন-প্রচেষ্টা লুপ্ত না হইলে বাংলা দেশে “আইন ও শৃঙ্খলা” (law and order) মন্ত্রীদের হাতে হস্তান্তরিত করা উচিত নহে। তাহাতে স্টেটসম্যানের বাবু প্রিয়নাথ গুহ বলেন, ওরূপ বলা অর্যোক্তিক; গবন্মেণ্ট সম্রাসক প্রচেষ্টা নিমূল করিতে পারেন নাই বলিয়াই উহার ভার দেশী মন্ত্রীদের হাতে দেওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সংবাদপত্র-সকলের তিত্ত ও কটু ভাষাকে কতকটা দায়ী করেন। তিত্ত ও কটু ভাষার সাফাই গাওয়া আমাদের পেশা নহে। কিন্তু ইংলণ্ডের বহু সংবাদপত্রে তথাকার গবন্মেণ্টকে যেরূপ তিত্ত কটু ও তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা ও গালাগালি দেওয়া হয়, ভারতবর্ষের কোন কাগজে অনেক বৎসর হইল তাহা করা হয় নাই; তথাপি এদেশে সম্রাসন আছে ও বিলাতে নাই কেন তাহার অসুসঙ্কান করা দরকার।

জমীদাররা বিদ্যালয়াদি স্থাপন দ্বারা অনেক বেকার লোককে কাজ দিতে পারেন, কিন্তু তাহা করিবেন বলিয়া কেহ বলেন নাই। দেখা যাক তাঁহাদের কমিটি কি উপায় নির্ধারণ করেন।

সামুয়েল সগুর্সের লক্ষ টাকা দান

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে পরলোকগত মিঃ সামুয়েল সগুর্স অনেক টাকা দান করিয়া যান। দানের সূত্রে অনেক জটিলতা ছিল। হাইকোর্ট দ্বারা তাহার মীমাংসার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এক লক্ষ টাকা পাইয়াছেন। এই টাকার আয় হইতে ইংরেজ স্কচ বা আইরিশ বংশজাত এংলো-ইণ্ডিয়ান বা ইউরেশিয়ান বালক-বালিকারা কয়েক জন আই-এ বা আই-এস-সি পাসের পর আইন, চিকিৎসা বা এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য বৃত্তি পাইবে। দাতার নাতিনী ও তাহার পিতামাতার মৃত্যুর পর টাকাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে আসিবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজের এই প্রথম দান। তাহা হইতে উপকার হিন্দু মুসলমান দেশী খ্রীষ্টিয়ানরা পাইবে না বটে, তথাপি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে এংলো-ইণ্ডিয়ানদের যে দৃষ্টি পড়িবে, ইহাও ভাল।

মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কম্মী সম্মেলন

অসহযোগ আন্দোলনের সময় মেদিনীপুর জেলার লোকদের কশ্মিষ্ঠতা, ত্যাগ, দুঃখবরণ ও দুঃখভোগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেই জন্য অসহযোগ-আন্দোলন এইরূপে স্বগিত হওয়ার পর ইহার কশ্মিসম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি অবধানযোগ্য। সম্মেলনে গৃহীত বোলটি প্রস্তাবের মধ্যে আমরা তিনটি নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

(৮) মেদিনীপুর জেলার এই কৰ্ম্মী-সম্মেলন দৃঢ়ভাবে এই মত প্রকাশ ও প্রচার করিতেছে যে, মেদিনীপুরের তিন জন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে পর পর হত্যায় জন্ম মেদিনীপুর জেলায় অহিংসক আইন আন্দোলনের সর্বনাশ হইয়াছে। এই সম্মেলন সর্বাস্তঃকরণে বিশ্বাস করে যে, মেদিনীপুর তথা বাংলা বা ভারতের স্বরাজলাভ উক্তরূপ সম্মাসবাদ (টেটোরিজম) দ্বারা কোনরূপে সম্ভব হইতে পারে না। তবে সম্মাসবাদ দমন উদ্দেশ্যের অজুহাতে মেদিনীপুর জেলার কংগ্রেস কৰ্ম্মী ও কংগ্রেস মতাবলম্বিগণের উপর মেদিনীপুর জেলার কর্তৃপক্ষ যেরূপভাবে দমননীতি প্রয়োগ করিয়াছেন তদ্বারা অহিংস মাতর প্রচার ও প্রসার কার্যে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটয়াছে। এই সম্মেলন হত্যার প্রতিবাদ ও নিন্দা করিতেছে এবং ইহার প্রতিকারকল্পে এই সম্মেলন ওয়ার্কিং কমিটি ও মহাত্মা গান্ধীজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

(১১) গুজরাটের গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকগণের কিয়ৎপরিমাণে ক্ষতি-পূরণের জন্ম ডাক্তার দেশাই যেভাবে চেষ্টা করিতেছেন এবং মহাত্মা গান্ধী যত্নে অর্থসংগ্রহের জন্ম অনুরোধ করিতেছেন, এই সম্মেলন তাহাতে বিশেষ আশঙ্কিত। এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, অবিলম্বে মেদিনীপুর জেলায় আইন-অমান্য-আন্দোলনে গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহস্থগণের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে কিয়ৎপরিমাণে ক্ষতিপূরণের জন্ম সমগ্র দেশবাসীকে অনুরোধ করা হউক এবং মেদিনীপুরের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্ম ডেপুটেশনের দ্বারা মহাত্মা গান্ধীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হউক।

(১৪) গত ১৯৩০ সাল হইতে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত মেদিনীপুরের বহু মহিলা আইন-অমান্য-আন্দোলনে লাঞ্ছনাভোগ ও ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন। নারী জাগরণ বাঙালী জাতীয় উন্নতি অসম্ভব, এজন্য এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, এই জেলার মহিলা কৰ্ম্মীগণ পুনরায় গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করুন।

কলিকাতার নর্দামার নিঃসারণস্থান

কলিকাতার নর্দামাসকলের জল ও ময়লা কোথায় পড়িবে তাহা লইয়া দীর্ঘকাল গবর্নেন্ট দীর্ঘমুত্রিতা করিতেছিলেন। সমস্তাবের বিষয় যে, এক্ষণে তাঁহারা মিউনিসিপালিটির প্রধান এঞ্জিনিয়ার ডক্টর বীরেন্দ্রনাথ দের স্বীমটি গ্রহণ করিয়াছেন। শীঘ্র এতদনুসারে কাজ সমাপ্ত হইলে কলিকাতার স্বাস্থ্যের অবনতির একটি কারণ দূরীভূত হইবে।

কলিকাতার মেয়র নির্বাচন

কলিকাতার মেয়র নির্বাচন এখনও (২৫শে জ্যৈষ্ঠ) হয় নাই। কোন ব্যক্তির নির্বাচন হউক বা না-হউক, নির্বাচন উপলক্ষ্যে যে-সব লজ্জাকর, অনিষ্টকর ও শোচনীয় ব্যাপার দু-বার ঘটয়াছে, সেরূপ আর কিছু ঘেন না হয়।

মাদ্রাজ শহরে ঘনবসতি ; কলিকাতায় ?

মিউনিসিপালিটির গৃহীত মাদ্রাজ শহরের সেন্সসে জানা যায়, যে, তথাকার ৪৪৭০টি গৃহ ও কুঁড়েঘরে ৭১৩৮০ জন লোক থাকে, ২৫৮৮টি গৃহে জলের কল নাই, ২২৫৬টিতে পাখানা নাই; মৈলাপুরের ২৩টি গৃহে ২৭৭১ জন মানুষ

বাস করে। এই সব তথ্যের উপর মন্তব্য করিতে গিয়া “মাদ্রাস মেল” কাগজ বলিতেছেন, আত্যন্তিক ঘন বসতি (overcrowding) দণ্ডনীয় অপরাধ হওয়া উচিত।

কলিকাতার এইরূপ একটি সেন্সস আবশ্যিক।

হরিজন বস্তি সংক্ষেপে ‘দলিত সুধার সমিতি’র পত্র

কলিকাতার “হরিজন” ও অপর হরিজ লোকদের বস্তি-গুলি সংক্ষেপে “দলিত সুধার সমিতি”র সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তলাল মুরারকার নিকট হইতে ঐ বস্তিগুলির অস্বাস্থ্য-করতা ও দুর্বস্থা সংক্ষেপে অনেকগুলি চিঠি পাইয়াছি। স্থানাভাবে সেগুলি ছাপিতে পারিলাম না। বস্তিগুলিতে কলের জলের, আলোর, পাখ্যানার এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বন্দোবস্ত নাই, বা কোথাও কোথাও নামমাত্র আছে। অধিকন্তু মিউনিসিপালিটির মেথর ডোম প্রভৃতি ও অগ্র গরিব লোকেরা কাবুলীদের কাছে ঋণগ্রস্ত। তাহারা লাঠির জোরে অতিরিক্ত হারে স্তদ আদায় করে, আসল শোধ প্রায় হয়ই না। বস্তি ও তাহার অধিবাসীদের এইরূপ অবস্থা সমস্ত নগরবাসীর ও মিউনিসিপালিটির লজ্জার বিষয়, এবং বিপদের কারণও যে-কোন সময়ে হইতে পারে। বস্তিগুলিতে যথেষ্ট জলের কল বা নলকূপ, আলো, পাখানা, অল্পলাভে খাদ্যাদি বিক্রীর দোকান, এবং ব্যাঙ্কের বা তদপেক্ষাও কম স্তদে টাকা ধার দিবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। গত বৎসর আমরা ইংরেজী ‘হরিজন’ কাগজ হইতে শ্রীযুক্ত সীতারাম সেকসারিয়া প্রভৃতির হরিজন কল্যাণচেষ্টার যে বৃত্তান্ত সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, সেইরূপ চেষ্টা কলিকাতার সব বস্তিতে হওয়া আবশ্যিক।

মৈথিলী সাহিত্য-পরিষৎ

বিহারের এক-তৃতীয়াংশ লোকের মাতৃভাষা মৈথিলী। ইহা কথোপকথনে ব্যবহৃত হয় এবং ইহার পুরাতন ও নূতন সাহিত্য আছে। মৈথিলীভাষীরা চান, যে, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিহারের শিক্ষা-বিভাগ ইহাকে একটি স্বাধীন ভাষা বলিয়া কার্যতঃ স্বীকার করেন। কলিকাতা ও বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় তাহা করিয়াছেন। অগ্র অনেকের মত মৈথিলীভাষীরাও চান, যে, হিন্দী সমগ্র ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা হয়; কিন্তু যেহেতু মৈথিলীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, ইহা হিন্দী নহে, এবং ইহার লিপিও স্বতন্ত্র (বাংলার মত), সেই জন্ম তাঁহারা ইহার স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা চান। মৈথিলী সাহিত্য-পরিষদের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে। দ্বারবন্ধের মহারাজাধিরাজ ইহার উদ্বোধন করেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ডাইস্‌চ্যান্সেলার মহামহোপাধ্যায় গজানাথ বা, এম্-এ, ডি-লিট, মহোদয়ের

সভাপতি হইবার কথা ছিল। তিনি হঠাৎ পীড়িত হওয়ায় আলোআর রাজ্যের প্রধান বিচারপতি পণ্ডিত রামভদ্র বা, এম-এ, এলএল-বি, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

বেকার অবস্থা ও সন্ত্রাসনবাদ

বেকার অবস্থা সন্ত্রাসনবাদের একমাত্র বা অন্যতম মুখ্য কারণ নহে। যে-সব স্কুল-কলেজের ছাত্র সন্ত্রাসক বলিয়া পুলিশ কর্তৃক ধৃত হয়, তাহারা উপার্জনক বা বেকার কোন শ্রেণীরই অন্তর্গত নহে। বেকার অবস্থাকে সন্ত্রাসনবাদের একমাত্র বা প্রধান কারণ বলিলে, যাহা প্রধান কারণ তাহা হইতে চোখ ফিরাইয়া লওয়া হয়। দেশের অপেক্ষাকৃত হীন রাষ্ট্রীয় অবস্থা এবং তাহার উন্নতির উপায় ও সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে নৈরাশ্র বা আশার অল্পতা সন্ত্রাসনবাদের অন্ততঃ একটি প্রধান কারণ বলিয়া আমাদের মনে হয়। যে-সকল অবস্থার অস্তিত্বে সন্ত্রাসক দলের কিছু বাড়িবার সম্ভাবনা ঘটে বেকার অবস্থা সম্ভবতঃ তাহার অন্যতম।

সন্ত্রাসক কার্য রাষ্ট্রীয় হীন দশা বা বেকার অবস্থা কিছুরই প্রতিকার নহে।

পার্লমেন্টারী বোর্ডে নারীর অল্পতা

পঞ্জাবের একটি কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ মহিলা মিসেস্ এল্ আর্ জুংঘী (জ্যোতিষী) অভিযোগ করিয়াছেন, যে, মহিলা কংগ্রেস কর্মীরা জেলে যাইবার ও অগ্ন্যন্ত লাঞ্ছনা ভোগ করিবার যোগ্য বিবেচিত হন, কিন্তু কংগ্রেসের পার্লমেন্টারী বোর্ডে মোটে এক জন মহিলাকে—শ্রীমতী সরোজনী নাইডুকে—লওয়া হইয়াছে। তিনি ঐ বোর্ডে আরও মহিলা-সদস্য চান। দাবিটি সঙ্গত।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় ছদ্মবেশী শ্বেত স্বার্থপরতা

দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতদের দুটা রাজনৈতিক দল আছে ; একটার নেতা মিঃ হার্টজগ ; অন্যটার সেনাপতি স্মার্টস। তাঁহারা উভয় দলকে সম্মিলিত করিয়া বলিতেছেন, যে, দক্ষিণ-আফ্রিকায় এশিয়াটিক্ (অর্থাৎ প্রধানতঃ ভারতীয়) দিগের বিরুদ্ধে শ্বেত ও রঙীন (coloured) অর্থাৎ নিগ্রো প্রভৃতি আফ্রিকাবাসীদিগের রক্ষা করিবার চেষ্টা তাঁহারা করিবেন! নিগ্রোরা ভারতীয়দিগের হাত হইতে রক্ষিত হইতে কখনও চায় নাই, কারণ ভারতীয়রা তাহাদের প্রতিদ্বন্দী নহে, উৎপীড়কও নহে। তাহারা শ্বেতদের হাত হইতে রক্ষা চায়। শ্বেতরা তাহাদিগকে মনুষ্যোচিত অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে, কাষাতঃ দাস করিয়া রাখিয়াছে। ব্যক্সাবানিজ্যক্ষেত্রে ভারতীয়েরা শ্বেতদের প্রতিযোগী। এই জন্য শ্বেতরা তাহাদিগকে তাড়াইতে চায়। তাহাই অশেষঃ নিগ্রোরক্ষার ছলে করিতে হইবে।

গবন্মেণ্ট ও কংগ্রেস

কংগ্রেস-সম্পৃক্ত যে-সব সমিতি কমিটি বেআইনী বলিয়া গবন্মেণ্ট তাহাদের ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহারা আর বে-আইনী বিবেচিত হইবে না, গবন্মেণ্ট এইরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন। তবে, তাহারা আবার কোন বে-আইনী কাজে লিপ্ত হইলে তাহাদের উপর নিষেধ বর্তিবে। অবশ্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লাল কোর্টা (red shirts) দলকে কিন্তু সরকার বে-আইনীই রাখিয়াছেন, কারণ তাহারা “বিপ্লবী,” কিন্তু কংগ্রেসও ত বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টায় ছিল। লাল কোর্টার কংগ্রেসেরই মত অহিংসপন্থী ছিল ; কংগ্রেসেরই মত তাহাদেরও আইন লঙ্ঘন চেষ্টা থামিয়া গিয়াছে। তাহারা নামে না হইলেও কাজে কংগ্রেসেরই অঙ্গীভূত ছিল। সুতরাং কংগ্রেস ও লাল কোর্টায় প্রভেদ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। অবশ্য, ইহা একটা ঐতিহাসিক তথ্য বটে, যে, রণকুশল ও রণপ্রিয় পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বরাবরই দমননীতির প্রকোপ বেশী। যদি সেই তথ্যের সহিত সঙ্গতি রক্ষার্থ লাল কোর্টার সঙ্গক্ষে ব্যবস্থা আলাদা রকম হইয়া থাকে, তবে তাহার অর্থ বুঝা যায়।

কংগ্রেসের সম্পত্তি সম্বন্ধে দু রকম ব্যবস্থা হইয়াছে। যাহা গবন্মেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন তাহা ফিরাইয়া দিবেন না, যাহা কেবল দখল করিয়াছেন তাহা ফিরাইয়া দিবেন। ইহা অনেকটা কথার মারপেচ মাত্র। ইহার তারিফ করিতে পারিলাম না। ইহা অবশ্য সত্য বটে, যে, গবন্মেণ্ট কর্তৃক দখলীকৃত কংগ্রেসের ঘরবাড়ি ইত্যাদি ফেরত দেওয়া সোজা, কারণ সেগুলো মশরীরে বিদ্যমান আছে ; কিন্তু বাজেয়াপ্ত কংগ্রেসের টাকাকড়ি ফেরত দেওয়া কঠিন, কারণ তাহা অল্প সরকারী টাকাকড়ির সঙ্গে মিশিয়া গিয়া খরচ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাও ফেরত দেওয়া গবন্মেণ্টের পক্ষে অসাধ্য ত নহেই, দুঃসাধ্য নহে। অতএব, দখলীকৃত ও বাজেয়াপ্তী দু-রকম কংগ্রেস সম্পত্তিই সরকার ফেরত দিলে ভাল হয়।

আইন-অমান্যকারী কংগ্রেসওয়ালারা আর ১২০০ মাত্র এখন জেলে আছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাহারা বলিবেন, খালাস হইয়া আর আইন অমান্য করিব না, গবন্মেণ্ট তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন। যত কশ্মিষ্ঠ কংগ্রেসওয়ালারা জেলের বাহিরে আছেন এবং যাহারা পার্টনার সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা ত কেহই আইনলঙ্ঘনপ্রচেষ্টার পুনরারম্ভের পক্ষে মত প্রকাশ করেন নাই—তাঁহারা প্রায় সকলেই জেলেও গিয়াছিলেন। সুতরাং যে-সব কংগ্রেসওয়ালারা আইনলঙ্ঘক জেলে আছেন, তাঁহারাও খালাস পাইয়া আর আইন অমান্য করিবেন না, ইহা ধরিয়া লইয়া গবন্মেণ্ট তাঁহাদিগকে খালাস দিতে পারিতেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের কাছে প্রতিশ্রুতি লইবার ইচ্ছা মহামুভবতার

৪। রাজনীতিকুশলতার পরিচায়ক মনে হইতেছে না। ট্যাক্সদাতাদের পয়সায় ১২০০ মানুষকে জেলে খাইতে-পারিতে দেওয়াটা গ্রাফ বা আবশ্যিক ব্যয়ও মনে হইতেছে না। খান্ আবদুল গফ্ফর খান্, বল্লভভাই পটেল, জওআহরলাল নেহরুর মত কয়েদীরাও কংগ্রেসের অভিপ্রেত কাজ করিতে বা কথা বলাতেই কারারুদ্ধ হইয়াছেন। অতএব তাঁহাদিগকেও ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।

আমরা যদি কংগ্রেসপন্থী হইতাম, তাহা হইলে এ সব যত্নব্য করিতাম না। কংগ্রেস ও গবন্মেণ্ট বিরোধী পক্ষ। এক পক্ষে অন্তের প্রতি সদয় বা সদাশয় কেন হইলেন না, বিরোধী কাহারও মুখে এরূপ প্রশ্ন বা তদনুযায়ী দাবি শোভা পায় না।

ভোলানাথ দত্তের কাগজের ব্যবসা

ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্সের কাগজের ব্যবসার প্রতিষ্ঠাতা পরলোকগত ভোলানাথ দত্তের দৃষ্টান্ত বাঙালী বাণিজ্যার্থীদের পক্ষে উৎসাহজনক। তিনি অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া একটি কাগজের দোকানে সামান্য বেতনে চাকরীতে ঢোকেন। পরে তাহাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া মাতামহের নিকট হইতে প্রাপ্ত সম্পত্তি আট শত টাকায় বিক্রী করিয়া ঐ সামান্য পুঁজি লইয়া কাগজের ব্যবসাতে প্রবৃত্ত হন। পরিশ্রম ও ব্যবসা-বুদ্ধির জোরে তিনি ব্যবসাতিকে বৃহৎ কারবারে পরিণত করিয়া রাখিয়া যান। তাঁহার পুত্রেরা উহার আরও শ্রীবৃদ্ধি করিয়া চীনাবাজারে নিজস্ব বাড়িতে উহা গত মাসে লইয়া গিয়াছেন। ভোলানাথ দত্তের মত উদ্যোগী লোকের যদি ৮০০ টাকা পুঁজি না জুটিত, তাহা হইলেও ব্যবসার প্রতিষ্ঠা হইতে পারিত। উন্নতিকামী সেইরূপ প্রকৃতির লোকেরা সামান্য বেতন হইতেও টাকা বাঁচাইয়া তাহার দ্বারাই ব্যবসা চলাইয়া ধনী হইয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বাঙালীদের মধ্যেও আছে।

নোসেনাপতি টোগো

নোসেনাপতি টোগো আধুনিক জাপানের একজন প্রধান পুরুষ। রুশজাপান-যুদ্ধে তাঁহারই রণদক্ষতায় বৃহৎ রুশ রণতরী-সমষ্টি বিনষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে সমুদয় জাপানী জাতি শোকে মগ্ন হইয়াছে। টোগোর রণদক্ষতা রুশজাপান-যুদ্ধের সময় অনেক বাঙালীর এমন ভাল লাগিয়াছিল, যে, কোন কোন বাঙালী শিশুর আদরের নাম হইয়াছিল টোগো।

স্থলযুদ্ধ ও আকাশযুদ্ধ শিক্ষার্থী

ডেরাডুনের সমর-বিদ্যালয়ে ও ইংলণ্ডের ক্র্যানওয়েলের আকাশযুদ্ধ-বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থীদের যে পরীক্ষা কিছুদিন পূর্বে গৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে উত্তীর্ণ ভারতীয় যুবকদের মধ্যে এক জনও বাঙালী নাই।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আয়ুর্দ্ধি ?

গুজব রটিয়াছে, যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এক বৎসর বা অহারও বেশী সময় আয়ুর্দ্ধি বাড়াইবে। তাহা হইলে মালশীদেরও আয়ুর্দ্ধি হইবে—যদিও আয়ুর্দ্ধি হইবে না। কিন্তু তাঁহাদের অনেকের যাতায়াত-ব্যয় ও ভাতাদিতে যত খরচ হইবে, তাহাতে শত শত চাষী ও শ্রমিকের অন্নের সংস্থান হইতে পারিত। কারণ, দেখিতেছি : ২৩৩ সালে তাঁহাদের ৬ জনের মধ্যে ৩৫ জন হাজার টাকার কম, ৩০ জন হাজারের উপর কিন্তু দুই হাজারের কম এবং তিন জন দুই হাজারের উপর টাকা ভাতা আদায় করিয়াছেন। যাতায়াত-ব্যয় ও ভাতার আধিক্য অনুসারে তাঁহাদের কয়েক জনের নাম দিতেছি। চট্টগ্রামের হাজী বাদী আহমেদ চৌধুরী ২২৪৭৯/০, নদীয়া কৃষ্ণনগরের খান বাহাদুর আজিজুল হক ২২০৮১/২১০, বর্ধমান যুসুফার খান বাহাদুর মুহম্মদ আবদুল মোমিন ২০৮০৮/০, যশোরের বাবু অমলাধন রায় ১২৩৭৮৮/১০, চট্টগ্রামের মৌলবী নূরুল আবসর চৌধুরী ১৮২৫১/০।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আয়ুর্দ্ধি বাড়াইলে কেবল যে মালশীদেরই সুবিধা হইবে তাহা নয়, সরকার বাহাদুরও নিজের আবশ্যিকমত আরও আইন করাইয়া লইতে পারিবেন।

বুদ্ধদেবের স্মারক সভা

বুদ্ধদেবের স্মারক সভা যত জাগরণ যত হওয়া উচিত, তত না হইলেও এবার কয়েক জাগরণ হইয়াছিল। কলিকাতার একটি সভায় মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বলেন, পৃথিবীতে মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই; বুদ্ধদেব মানুষকে নিজের বুদ্ধির উপর—শাস্ত্রের উপর নহে—নির্ভর করিতে শিক্ষা দিয়া তাহাকে দাসমনোভাব হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার মহত্তম কীর্তি।

“আমরা কথা রাখিয়াছি”

বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব গবর্নর স্যার ফ্রেডরিক সাইক্‌স বিলাতে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, “I feel we have kept faith with India. We may accordingly ask that India keeps faith with us.” আমি অনুভব করি, যে, আমরা ভারতবর্ষের সহিত বিশ্বাস রক্ষা করিয়াছি (অর্থাৎ বিশ্বাসভঙ্গ অঙ্গীকারভঙ্গ করি নাই)। তদনুসারে আমরা চাহিতে পারি, যে, ভারতবর্ষও আমাদের সহিত বিশ্বাস রক্ষা করুক (অর্থাৎ অঙ্গীকার পালন করুক)।” হংকংয়ের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, সম্রাজ্ঞী ও সম্রাট হইতে আরম্ভ করিয়া বড়ছোট লোট প্রভৃতি পর্যন্ত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহা করিবার এবং ভারতীয়দিগকে যাহা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন,

তাহা পালিত হইয়াছে কি না, তাহার আলোচনা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। ইতিহাসে ও খবরের কাগজে তাহা লেখা আছে, কিন্তু ভারতবর্ষ ও ভারতীয়েরা ব্রিটেন ও ব্রিটেনিয়দিগকে কি দিতে চাহিয়াছিল এবং কিরূপ ব্যবহার তাহাদের প্রতি করিতে চাহিয়াছিল, তাহা গবেষণার বিষয় বটে। বিনা গবেষণাতেই কিন্তু একটা তথ্য আমাদের স্কুলের ছেলেমেয়েরাও জানিয়া থাকে। ব্রিটেন আমাদের অঙ্গীকারের বা দানশীলতার অপেক্ষা রাখেন নাই, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই যাহা-কিছু গ্রহণযোগ্য তাহা গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং অধীন আমরা, প্রভু তাঁহাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিলে তাঁহারা খুশী হন, তাহা আমাদের দ্বারা করাইয়া আসিতেছেন। আর কি চাই? আমরা বিগড়িয়া গিয়া চিরাচরিত প্রথার বিপরীত মনোভাব পোষণ বা তদনুরূপ আচরণ যাহাতে না করি, তাহাই বোধ হয় ভূতপূর্ব বোম্বাই লার্ট চান।

আমেরিকার প্রতি দেনদার ব্রিটেন

গত মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটেন ও অন্তর অনেক দেশ আমেরিকার কাছে কোটি কোটি টাকা ধার করিয়াছিল। এখনও সব শোধ হয় নাই। ব্রিটেন আমেরিকার কাছে এখনও মোট কত ধারে, জানি না। কিন্তু যে তিন কিস্তী বাকী পড়িয়াছে তাহারই সমষ্টি ২৬২ কোটি ডলার অর্থাৎ প্রায় ৭৮৬ কোটি টাকা! ব্রিটেন আমেরিকাকে বলিতেছেন, “দেখ, এত অর্থ সোনায় বা ডলারে তোমাকে দিলে পোঁতে ডলারে বিনিময়ের হারে বড় একটা ঝড় বহিবে, পৃথিবীময় একটা যুদ্ধবিলাট ঘটিবে। তা ছাড়া, আমরা যাদের কাছে টাকা পাইব, তারা ত আমাদের টাকা দেয় নাই। বুঝিলে কি না? আমাদের বজেটে ১৫ বৎসর পরে কিছু উদ্ভূত হইয়াছে বটে। তাহার দ্বারা তোমাদের ঋণশোধ না করিয়া যদি ইংরেজ ট্যান্সদাতাদের কিছু সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে তোমাদের আপত্তি করা উচিত নয়। কিন্তু মনে করিও না, যে, তোমাদের ঋণ অস্বীকার করিতেছি।” উত্তমর্গের প্রতি অধমর্গের এমন তোফা বাক্য ইতিপূর্বে শোনা যায় নাই!

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও তাহার মিউজিয়াম রমেশভবনের জন্ম এবং বঙ্গের স্বদেশী ব্রত পালনের জন্ম যাহা করিয়াছেন, তাহা চিরস্মরণীয়। তাঁহার উদার সরল মনুষ্যত্ব চিরস্মরণীয়। ইহাও মনে রাখিবার যোগ্য, যে, তিনি প্রধানতঃ বাংলা ভাষার সাহায্যে কলেজে রসায়নী-বিদ্যা শিখাইতেন।

শ্রুত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্মারকসভা

শ্রুত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে নানা বিদ্যা ও বিজ্ঞানের উচ্চতর ও উচ্চতম শিক্ষা ও গবেষণার প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার নিমিত্ত প্রভূত দান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই সকল বিদ্যা ও বিজ্ঞানের কি কি বিষয়ের কি ভাবে অনুশীলন করিতে ও করাইতে হইবে, সে-বিষয়েও তাঁহার ও তাঁহার সহযোগীদের বৃহৎ পরিকল্পনা ছিল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে গবর্নমেন্টের ও ইংরেজদের অধীনতা হইতে যথাসম্ভব মুক্ত রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। উচ্চতম বিদ্যা ও বিজ্ঞানের অনুশীলন ভারতীয়দের দ্বারাই হউক, ভারতীয়দের টাকায় ইংরেজ-পোষণ যথাসম্ভব না-হউক, এবং বিদ্যালয়নির্মে ভারতীয়দের দাসমনোভাব না-জন্মুক, ইহাও তাঁহার অভিপ্রেত ছিল মনে হয়। তাঁহার এই সব কার্য্য, চেষ্টা ও অভিপ্রায়ের জন্ম তিনি সম্মানার্থে। কিন্তু তিনি নিজের মংলব সিদ্ধি ও প্রভুত্ব রক্ষার জন্ম যাহা কিছু করিতেন, যে-কোন কৌশল অবলম্বন করিতেন, তাহাই সমর্থনযোগ্য ও শ্রদ্ধেয় বিবেচিত হইতে পারে না। সঙ্গীত-শিক্ষার্থীরা ওস্তাদদের মুদ্রাদোষের অনুকরণ করিয়া ওস্তাদ হইতে পারে না। শ্রুত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়েরও কেবল ফন্দী ও ফিকিরগুলির অনুসরণ দ্বারা শ্রুত আশুতোষ হওয়া যায় না। শ্রুত আশুতোষের মত বড় কাজ করিলে—অস্বতঃ করিবার চেষ্টা করিলে, তবে তাঁহার মত হওয়া যায়, এবং তাঁহার সম্মান রক্ষিত হয়।

হরিদাস হালদার

কালীঘাটের শ্রীযুক্ত হরিদাস হালদার ৭০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে তিনি অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্রামসুন্দর চক্রবর্তীর সহচর ছিলেন। অসহযোগ প্রচেষ্টায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহচর ও অনুচর ছিলেন। তিনি “কর্মের পথে” ও “গোবর গণেশের গবেষণা” নামক দুইখানি পুস্তকের লেখক।

নাবালকদের ধূমপান নিবারণ

অল্পবয়স্ক বালকদের (দুঃখের বিষয়, বলিতে হইতেছে বালিকাদেরও) ধূমপান নিবারণের জন্য আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে একটি আইন হইতেছে। সব প্রদেশেই এইরূপ আইন হওয়া উচিত।

“ইণ্ডিয়ান একাডেমী অব্ সায়েন্সেস্”

বিলাতের রয়্যাল সোসাইটির মত ভারতবর্ষে একটি “ইণ্ডিয়ান একাডেমী অব্ সায়েন্সেস্” (ভারতীয় বিজ্ঞান-পরিষৎ) স্থাপনার্থ তাহার একটি কমিটিটউপস্থান মুম্বাই

করিবার জন্ত ইণ্ডিয়ান সোসাইটি কংগ্রেস এসোসিয়েশন একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। অধ্যাপক রামন্ ও তাহার সভ্য। ইতিমধ্যে অধ্যাপক রামন্ বাঙ্গালোরে একটি ইণ্ডিয়ান একাডেমী অব সায়েন্সেস্ স্থাপন করিয়া তাহা রেজিষ্টারি করিয়া ফেলিয়াছেন। এই ব্যাপারটি লইয়া খবরের কাগজে অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছে। কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত একটি সব-কমিটি এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে সমুদয় প্রকৃত তথ্য বিবৃত করিয়া ও ডাক্তার রামনের কার্যের নিয়ম-বিরোধিতা প্রদর্শন করিয়া একটি পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহা ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক-দিগকে এবং খবরের কাগজের সম্পাদকদিগকে প্রোরত হইয়াছে। এই সব-কমিটির সভ্য ডক্টর বাইনী প্রসাদ, ডক্টর এম্ এন্স কৃষ্ণন, অধ্যাপক ডক্টর এন্স পি আঘরকর এবং অধ্যাপক ডক্টর জে এন্স মুখোজ্যে।

শ্রীমতী শকুন্তলা দেবীর বৃত্তিলাভ

বিদ্যার্থীদিগকে বিদেশে গিয়া উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয়শীলনে সমর্থ করিবার জন্ত কয়েকটি ঘোষ ভ্রমণ-বৃত্তি (Ghose Travelling Fellowships) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দিয়া থাকেন। এই বৎসর প্রথম একটি মহিলাকে এই বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। তিনি কুমারী শকুন্তলা রাও। শ্রীমতী শকুন্তলার জন্ম অন্ধ্রদেশে এবং তিনি বংশতঃ অন্ধ্রদেশীয়া। কিন্তু শৈশব হইতে তিনি বঙ্গে লালিতা পালিতা বলিয়া সর্বাংশে বাঙালীর মেয়ে। তাঁহার ভাষা, শিক্ষা, পরিচ্ছদ, সংস্কৃতি সবই বঙ্গদেশের। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর ভগ্নী স্বর্গীয়া শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা সরকার ও তাঁহার স্বামী স্বর্গীয় ডক্টর হেমচন্দ্র সরকার কল্যাণীয়া শকুন্তলাকে মানুষ করেন। শকুন্তলার পিতৃম তৃত্তিক্তি ও বহু বৎসর ধরিয়া পীড়িত পিতার সেবা যিনি দেখিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছেন। শকুন্তলা ইংরেজীতে ও সংস্কৃতে কৃতিত্বের সহিত এম্-এ পাস করিয়াছেন এবং সংস্কৃত উপাধিপরীক্ষা দিয়া “বেদতীর্থ” উপাধি পাইয়াছেন। “শাক্তী” উপাধি পাইবার জন্ত তিনি একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইউরোপে বিদ্যালয়শীলন করিয়া আসিলে তাঁহার যোগ্যতা আরও বাড়বে। তিনি তাঁহার পিতা মাতা শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ও ডক্টর হেমচন্দ্র সরকারের গ্রন্থাবলী বহু ব্যয়ে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি কেবল বিদ্বা নহেন, গৃহকর্মেও বিশেষ নিপুণ।

সিংহলে রবীন্দ্রনাথ

ধর্ম্ম সভ্যতার সংস্কৃতিতে ভারতবর্ষের সহিত সিংহলের যোগ বহু প্রাচীন। রবীন্দ্রনাথের সিংহলভ্রমণ সেই যোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিল। এই কাহাটি তাঁহার দ্বারা যে-প্রকারে হওয়া সম্ভব অল্প কোন এক ব্যক্তি দ্বারা তাহা হইতে

পারে না। তিনি কোথাও ধর্ম্মোপদেশটা হইয়া যান না এবং বঙ্গেও ধর্ম্মোপদেশটা বলিয়া নিজের পরিচয় দেন না, কিন্তু তাঁহার বহু গানে, ব্যাখ্যান, কবিতায়, বক্তৃতায় এবং বাংলা ও ইংরেজী কোন কোন বহিতে ধর্ম্মের গভীরতম বাণী উচ্চারিত হইয়াছে। ধর্ম্মতত্ত্বে, শিক্ষাতত্ত্বে ও দর্শনে তাঁহার অস্তুদৃষ্টি মনীষীদের দ্বারা প্রশংসিত হইয়াছে। রাষ্ট্রনীতিকক্ষেত্রে তিনি কর্ম্মী না হইলেও তাঁহার চিন্তার প্রসার ও গভীরতা কম নহে। নাগরিক জীবন ও পল্লীজীবনের বিরোধভঞ্জন ও সামঞ্জস্যসাধন তাঁহার পরিকল্পিত পৌরজ্ঞানপদ সমাজ-সংগঠন ব্যবস্থা দ্বারা হইতে পারে। অল্প দিকে, অভিনয়ে সংগীতে নৃত্যে চিত্রকলায় তাঁহার প্রতিভা দ্বারা সংস্কৃতির সৌন্দর্য্যমুগ্ধতা ও আনন্দের দিকটি উদ্ভাসিত হইয়াছে।

এই সকল নানা গুণের সমাবেশ একই ব্যক্তিতে থাকায় রবীন্দ্রনাথ সিংহলবাসীদিগকে যেমন আনন্দ দিতে পারিয়াছেন ও তাঁহাদের মধ্যে যে নবজাগরণ আনিয়াছেন, তাহা পূর্বে তথায় সংসাধিত হয় নাই।

পঞ্জাবে ও বঙ্গে প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থীর সংখ্যা

অনেকে বলিয়া থাকেন, বঙ্গে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা বড় বেশী এবং প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয় বড় অধিক-সংখ্যক ছাত্রছাত্রী, কিন্তু বঙ্গের লোকসংখ্যা পঞ্জাবের দুই গুণেরও বেশী; অথচ পঞ্জাবে এ-বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিল কুড়ি হাজারের বেশী, বঙ্গে দিয়াছিল মোটামুটি তেইশ হাজার। তথাপি বঙ্গের সরকারী শিক্ষাহিতৈষীরা এগার শত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় কমাইয়া চারি শত করিতে চান।

আগ্রা-অযোধ্যায় আবশ্বিক শিক্ষা

আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবশ্যদেয় করিবার সূত্রপাত করণার্থ এক লক্ষ টাকা সরকারী বরাদ্দ হইয়াছে। বঙ্গে — ?

ভিন্ন ভিন্ন জাতির (raceএর) সংখ্যাবৃদ্ধি

১৯১৩ সালে অধ্যাপক চার্লস্ রিচেট্ (Prof. Charles Richet) চিকিৎসা-বিজ্ঞানে গবেষণার দ্বারা নোবেল প্রাইজ পান। তিনি একজন জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। তিনি পৃথিবীর শ্বেত-অশ্বেত নানা জাতির সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যালোচনা করিয়া বলিয়াছেন—(১) পীত, চীনা জাপানী ইত্যাদি) ও মিশ্রজাতির। শ্বেতদের পাঁচ-ছয় গুণ দ্রুত বাড়িতেছে; (২) শ্বেতদের মধ্যে ইউরোপীয়রা সকলের চেয়ে কম বাড়িতেছে; (৩) ইউরোপীয়দের মধ্যে সভ্যতম জাতির। সকলের চেয়ে কম বাড়িতেছে। আগামী দশ বৎসরে এশিয়াবাসীরা চৌদ্দ কোটি, আমেরিকানরা সাড়ে তিন কোটি এবং ইউরোপীয়রা দু-কোটি বাড়িবার সম্ভাবনা। গত দশ

বৎসরে শাহাইয়ে হাজারে ৫৫, টোকিওতে ৪৪ ও নিউইয়র্কে ১২ বাড়িয়াছে, কিন্তু লণ্ডনে ও প্যারিসে বাড়ে নাই। অধ্যাপক রিচের্টের অনুমানে ১২৪৪ সালে নিউইয়র্ক পৃথিবীর বৃহত্তম এবং টোকিও দ্বিতীয় স্থানীয় শহর হইবে; ১২৫৫ সালে টোকিও বৃহত্তম হইবে। পৃথিবীর সভ্য জাতিদের মধ্যে লোকসংখ্যা কম-বাড়ার একটা কারণ কৃত্রিম উপায়ে জন্ম-নিরোধ। সন্ন্যাসীদের বাহুল্য, বালিকা বিধবাদের চিরবৈধব্য এবং কন্যাপণ বরণ আগে হইতেই হিন্দুসমাজের উপযুক্তরূপ লোকসংখ্যাবৃদ্ধিতে বাধা জন্মাইয়া আসিতেছে। তাহার উপর জন্মনিরোধ-প্রথা আর একটা উপসর্গ হইয়া বসিতেছে।

শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তি

এক সময় ছিল যখন আসামীরা শ্রীহট্টকে বঙ্গের সহিত যুক্ত হইতে দিতে নারাজ ছিলেন। এখন তাঁহারা ভারত-গবর্নেন্টকে অনুরোধ করিয়াছেন, যে, শ্রীহট্টকে বঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করা হউক। শ্রীহট্ট, গোয়ালপাড়া, কাছাড় প্রভৃতি বঙ্গের অংশ বটে। কিন্তু আমরা ঐ জেলাগুলিকে বঙ্গের সহিত জুড়িয়া দিবার পক্ষপাতী নহি। কিন্তু যদি দিতেই হয়, তাহা হইলে আসামের সব বঙ্গভাবী অঞ্চলকে বঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত, শুধু শ্রীহট্টকে নহে। তেমনই মানভূম, ধলভূম প্রভৃতিও বঙ্গের সহিত যুক্ত হওয়া উচিত।

বুলগেরিয়ায় রক্তপাতহীন বিপ্লব

বুলগেরিয়ায় রক্তপাতহীন বিপ্লবের সব খবর এখনও পাওয়া যায় নাই। একটা সুখবর এই, যে, ঐ স্বাধীন দেশের মন্ত্রীরা বৎসরে ৫৭৩৩ টাকার কাছাকাছি বেতন পাইবেন। আমাদের পরাধীন দেশের প্রাদেশিক মন্ত্রীরা বৎসরে পান ৬৪,০০০ টাকা! করেন কি?

যক্ষ্মানিবারক সভায় রমেশ মিত্র স্মারক

ফণ্ডের দান

বঙ্গীয় যক্ষ্মানিবারক সভা গত পাঁচ বৎসর যক্ষ্মানিবারক কল্পে অনেক কাজ করিয়াছেন। শ্রী রমেশচন্দ্র মিত্র স্মারক সভায় হস্তে স্থিত উদ্বৃত্ত এগার হাজারের উপর টাকা যক্ষ্মানিবারক সভাকে দেওয়া হইয়াছে। এই প্রকার আরও দান পাইলে এই সভায় দ্বারা আরও বেশী কাজ হইতে পারিবে। বঙ্গ কঙ্গরোগ ধেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে এইরূপ সভায় বিশেষ আবশ্যক।

কংগ্রেস, প্রেস ও সন্ন্যাসনবাদ

সন্ন্যাসনবাদের বিরুদ্ধে জমীদারদের সভায় একজন বক্তা প্রেসকে সন্ন্যাসনবাদের জন্ত দায়ী করিবার জন্ত কিছু পুরাতন

ইতিহাসের আবৃত্তি করেন। তিনি কংগ্রেসকেও দায়ী করিতে ছাড়েন নাই। অথচ তিনি বলেন, যে, সন্ন্যাসনবাদের ঔষধ স্বাস্থ্যশাসন—যাহার জন্ত দেশী প্রেস ও কংগ্রেস বরাবর লড়িয়া আসিতেছেন। অর্থাৎ বক্তার মতে প্রেস ও কংগ্রেস দুটি পরস্পর-বিরোধী জিনিষের জন্ত—ব্যাধির জন্ত এবং ঔষধের ব্যবস্থার জন্ত—দায়ী!

শ্রী নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের বক্তৃতাবলী

অনেক মুসলমান নেতা এবং কোন কোন বোম্বাইয়া মডারেট নেতা এবং মাদ্রাজী ন-ব্রাহ্মণ নেতা এই বাজে কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াই চলিতেছেন, যে, প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারা সালিসী নিষ্পত্তি, বিলাতে (তথাকথিত) গোলটেবিল বৈঠকের সব ভারতীয় দলের (তথাকথিত) প্রতিনিধিরা তাঁহাকে সালিস মানিয়াছিল, অতএব তাঁহার নিষ্পত্তি ভারতীয়েরা সবাই মানিয়া লইতে বাধ্য—ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রধান মন্ত্রীকে যে-সব দল সালিস মানে নাই, তাঁহার নিষ্পত্তি যে সালিসী নিষ্পত্তি নহে, সুতরাং তাহা মানিতে যে আমরা বাধ্য নহি, ইহা শ্রী নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের সদাঃ-প্রকাশিত বক্তৃতা পুস্তিকাদির সংগ্রহ হইতে পরিষ্কার বুঝা যায়। এই সংগ্রহ-পুস্তিকে পুনঃ-চুক্তিব প্রকৃত রূপ, শ্বেতপত্রে হিন্দুদের প্রতি ঘোরতর অবিচার প্রভৃতিও বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

তিব্বতে বিপ্লব না আর কিছু?

তিব্বতের ভূতপূর্ব প্রধান সেনাপতি লুংশারের গ্রেপ্তার, চক্ষুক্ষুপাটন ও হত্যা প্রভৃতির মূল কারণ এখনও ভাল করিয়া বুঝা যায় নাই। তিনি কি জনসাধারণের অধিকার বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, না, ইংরেজ-প্রভাব বাড়াইতে চাহিয়াছিলেন, না আর কিছু?

লাইব্রেরী পরিচালন বিদ্যা

কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় প্রমুখ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিরা বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পুস্তকালয়ের সংশ্রবে লাইব্রেরী রক্ষা ও পরিচালনবিদ্যা শিখাইবার যে-চেষ্টা করিতেছেন, তাহা সম্মোচিত, আবশ্যক ও প্রশংসনীয়। এইরূপ চেষ্টা বঙ্গের সর্বত্র হওয়া উচিত।

ভ্রম-সংশোধন

সিহলের রাষ্ট্রপরিষদের (State Councilএর) সভাপতিকে (Speakerকে) চরিত্রদোষের জন্ত পদচ্যুত করা হইয়াছে বলিয়া জ্যেষ্ঠের 'প্রবাসী'তে যে সংবাদ মুদ্রিত করা হইয়াছিল, অবগত হইলাম যে তাহা ঠিক নহে! ঐ ব্যক্তিকে পুরাবেতনে ছয় মাসের ছুটি দেওয়া হইয়াছে! তাহাকে সার্বজনিক সব ব্যাপায় হইতে তাড়াইবার চেষ্টার সংবাদও ঠিক নহে। আমরা উক্ত দুই সংবাদ কলিকাতায় একখানি কাগজ হইতে লইয়াছিলাম।



যক্ষপত্নী
শ্রীমণীন্দ্রকুমার গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

“সতাম্ শিবম্ সুন্দরম্”

“নায়মায়্যা বলহীনেন লভাঃ”

৩৪শ ভাগ

১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৪১

৪র্থ সংখ্যা

পাঠিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বহিছে হাওয়া উতল বেগে
আকাশ ঢাকা সজল মেঘে
ধ্বনিয়া উঠে কেকা ।

করি নি কাজ পরি নি বেশ—
গিয়েছে বেলা বাঁধি নি কেশ,
পড়ি তোমারি লেখা ।

ওগো আমারি কবি,—
তোমারে আমি জানি নে কভু,—
তোমার বাণী আঁকিছে তবু
অলস মনে অজানা তব ছবি ।
বাদলছায়া হয় গো মরি
বেদনা দিয়ে তুলেছ ভরি’,
নয়ন মম করিছে ছলছল ।
হিয়ার মাঝে কী কথা তুমি বলো !

কোথায় কবে আছিলে জাগি,
বিরহ তব কাহার লাগি
কোন্ সে তব প্রিয়া ।
ইন্দ্র তুমি, তোমার শচী,
জানি তাহারে তুলেছ রচি’
আপন মায়্যা দিয়া ।

ওগো আমার কবি,—
ছন্দ বুকে যতই বাজে

ততই সেই মূর্তিমাবে
জানি না কেন আমারে আমি লভি ।
নারীহৃদয় যমুনাতীরে
চিরদিনের সোহাগিনীরে
চিরকালের শুনাও স্তবগান ।
বিনা কারণে ছলিয়া ওঠে প্রাণ ॥

নাই বা তার শুনিলু নাম
কভু তাহারে না দেখিলাম
কিসের ক্ষতি তায় ।
প্রিয়ারে তব যে নাহি জানে
জানে সে তারে তোমার গানে
আপন চেতনায় ।

ওগো আমার কবি,—
সুদূর তব ফাগুন রাতি
রক্তে মোর উঠিল মাতি'
চিন্তে মোর উঠিছে পল্লবি' ।
জেনেছ যারে তাহারো মাঝে
অজানা যেই সেই বিরাজে
আমিও সেই অজানাদের দলে
তোমার মালা এলো আমার গলে ।

বৃষ্টিভেজা যে ফুলহার
শ্রাবণ সন্ধ্যা তব প্রিয়ার
বেণীটি ছিল ঘেরি'—
গন্ধ তারি স্বপ্ন সম
লাগিছে মনে, যেন সে মম
বিগত জনমেরি ।

ও গো আমার কবি,—
জানো না তুমি মৃত্ত কী তানে
আমারি এই লতাবিতানে
শুনায়েছিলে করুণ ভৈরবী ।
ঘটেনি যাহা আজো কপালে
ঘটেছে যেন সে কোন্ কালে,
আপনভোলা যেন তোমার গীতি
বহিছে তারি গভীর বিস্মৃতি ॥

পুরাণে প্রাকৃতিক বিপর্যয়

শ্রীগিরীশ্রশেখর বসু

অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির ধারণা যে, পুরাণগুলি রূপকথার
নায় নামাপ্রকার অবাস্তব, অসম্ভব ও অতিপ্রাকৃত ঘটনার
বিবরণে পূর্ণ; পুরাণে বিশ্বাসযোগ্য কোন কাণ্ডের উল্লেখ
প্রায় নাই বলিলেই হয়; যদি বা কিছু থাকে তবে তাহা এত
অতিরিক্ত যে তাহা হইতে সার উদ্ধার করা দুঃসাধ্য।
এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই যুক্তিবাদী আধুনিক
পণ্ডিতগণ পুরাণে মনোনিবেশ করেন নাই।

অষ্টাদশ মূল পুরাণ ও বহু উপপুরাণ লিখিত হইয়াছে।
সকল পুরাণ এক সময়ের নহে। কোনটি প্রাচীন,
কোনটি নিতান্ত অর্কাচীন। একই পুরাণে প্রাচীন ও
অর্কাচীন অংশ আছে। অধুন-প্রচলিত পুরাণগুলির
মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ ও বায়ুপুরাণ সর্বাধিক প্রামাণিক ও প্রাচীন
বলিয়া স্মৃতিগণ বিবেচনা করেন। পুরাণে কি কি
বিষয়ের আলোচনা থাকে, তাহা বায়ুপুরাণের ৪।১০ শ্লোকে
দেখা যাইবে; যথা,

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥

অর্থাৎ, সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিবরণ, মন্বন্তরের বিবরণ,
বিভিন্ন রাজবংশের বিবরণ ও সেই সকল বংশজাত
ব্যক্তিগণের বিবরণ পুরাণে থাকিবেই। এতদ্ব্যতীত বিশেষ
বিশেষ ঘটনার বিবরণ ও বর্ণাশ্রমধর্ম ও মোক্ষ-প্রতিপাদক
আধ্যাত্মিক পুরাণে দেখা যায়। সূত নামক বিশেষ
সম্প্রদায়গত ব্যক্তিগণ পুরাণ-বন্ধা ছিলেন। বায়ুপুরাণে
আছে, “প্রাচীন পণ্ডিতগণ নির্দেশ করিয়াছেন যে,
অমিততেজা দেবতা, ঋষি, রাজা ও অন্যান্য মহাত্মাদিগের
বংশবৃত্তান্ত জানিয়া রাখাই সূতের স্বধর্ম।” ॥ বায়ু ৩।৩১, ৩২ ॥
সূতকে বহুস্থানে সত্যব্রতপরায়ণ বিশেষণে অভিহিত করা
হইয়াছে।

পুরাকালে ভারতবর্ষ বহু খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল।
প্রত্যেক রাজ্যের সভায় এক জন করিয়া মাগধ থাকিতেন।

মাগধগণ নিজ নিজ প্রভু রাজার বংশ-বিবরণ ও কীর্তিকলাপ
জানিয়া রাখিতেন। ষ্টেট হিষ্টোরিয়ন (State Historian)
বলিলে আমরা যাহা বুঝি, মাগধ তাহাই। পূর্ববর্ণিত
সূতগণ বিভিন্ন দেশের মাগধগণের নিকট হইতে সমসাময়িক
‘হিষ্টরি’ সংগ্রহ করিতেন। কোন মাগধ স্বীয় প্রভু সম্বন্ধে
কোন অতুক্তি করিয়া থাকিলে বা প্রভুর কোনও দোষ
গোপন করিয়া থাকিলে সূতগণ তাহা সংশোধন করিতেন।
এইজন্যই সূতগণকে সত্যব্রতপরায়ণ বলা হইয়াছে।
সূতগণ সকল রাজারই বংশবিবরণাদি জানিতেন।
পুরাকালে রাজা ও ঋষিগণ প্রায়ই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেন।
যজ্ঞে নানা দেশ হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ও বিদ্বান ঋষিগণ
নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেন। যজ্ঞে সূতগণ আগমন
করিয়া নিজ নিজ সংগৃহীত বিবরণ পাঠ করিতেন। এই
সূতগণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা এক শ্রেণীর
ঋষির কার্য ছিল। পরম্পরাপ্রাপ্ত সূত-কাহিনী ঋষিগণ
কর্তৃক গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়া পুরাণ নামে পরিচিত
হইয়াছিল। পুরাণ-সংগ্রহ বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত
আছে। পুরাণকর্তা ঋষিগণ বিভিন্ন কালে পুরাণকে
পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন ও বিশেষ বিশেষ ঘটনার মন্বন্তর
নির্দেশ করিয়াছেন। মন্বন্তর নির্দেশ ও কাল নির্দেশ একই
কথা। মন্বন্তরের সঙ্কেত অন্তর্ভুক্ত আলোচনা করিয়াছি।
পুরাণকার ঋষিগণের মতে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়
বার-বার আবর্তিত হইতেছে। অতি অতি দীর্ঘকালে
এইরূপ একটি আবর্তন সম্পন্ন হয়। পুরাণকার ঋষি
সৃষ্টির আদি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রলয়কাল পর্যন্ত
বিভিন্ন জাগতিক ঘটনার বিবরণ কাল-নির্দেশ সহকারে
লিপিবদ্ধ করিতে চাহেন। এইজন্যই তিনি পুরাণে
সৃষ্টি ও প্রলয়কালের অবস্থা আলোচনা করিয়াছেন।
পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ বিচার করিলে পুরাণকে হিষ্টরি বলিতে
কোন বাধা থাকিবে না। পুরাণকার চাহেন যে, তাঁহার

এই ক্রমশঃ নূতন নূতন ঘটনার বিবরণ দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া প্রায়কাল পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকুক। কালের কবল হইতে পুরাণকে রক্ষা করিবার জন্য পুরাণকার এক অভিনব উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি হিষ্টরি রক্ষার জন্য শিলালিপি, তাম্রলিপি, লোহার সিঙ্ক, ইম্পিরিয়ল রেকর্ডস ডিপার্টমেন্ট প্রভৃতি কিছুই আশ্রয় লন নাই। তিনি জানিতেন, রাষ্ট্রবিপর্যায় ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এ সমস্তই ধ্বংস হইয়া যায়। পুরাণকার পুরাণ-রক্ষার জন্য এক অবিনাশী আশ্রয় খুঁজিয়াছেন। পুরাণকার ঋষি দেখিলেন যে মানবের ধর্মবুদ্ধি চিরন্তন। যতদিন পৃথিবীতে মানুষ থাকিবে ততদিন সে কোন-না-কোনও ধর্ম আশ্রয় করিবে। সাধারণের ধর্মবুদ্ধি যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত নহে। ধর্মের মূল অলৌকিক। পুরাণকার ঋষি পৌরাণিক বিবরণকে সহজ ভাবে প্রকাশনা করিয়া তাহার কাহিনীর ধর্মবুদ্ধিগ্রাহ্য রূপ দিলেন। ফলে পুরাণে অতিরঞ্জিত ও অতিপ্রাকৃত প্রস্তাব আসিল এবং পুরাণ ধর্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইল। পুরাণ শ্রবণ, পঠন, লিখন, মুদ্রণ ও ব্রাহ্মণকে পুরাণদান এখনও সাধারণে মহাপুণ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। সরলভাবে লিখিত হিষ্টরি রক্ষার জন্য কেবল বিশেষজ্ঞ হিষ্টরিয়নই যত্নবান হইতে পারেন। সমাজে এইরূপ হিষ্টরিয়নদের সংখ্যা নগণ্য। অপর পক্ষে, জনসাধারণের মধ্যে সহস্র সহস্র ব্যক্তি পৌরাণিক ভঙ্গীতে লিখিত হিষ্টরি-রূপ ধর্মশাস্ত্র রক্ষার জন্য সমুৎসুক। পুরাণ এখনও বহু প্রচলিত, কিন্তু অনেক জ্যোতিষ প্রভৃতি পুরাতন বিজ্ঞানগ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে। পুরাণকার ঋষির অভ্যুক্তিগুলির প্রকৃত অর্থ সহজেই ধরা পড়ে। পুরাণার্থ-বিচক্ষণ হিষ্টরিয়নের কাছে পুরাণ প্রকৃত হিষ্টরি এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য পুরাবৃত্ত বলিয়াই বিবেচিত হইবে। পুরাণের প্রামাণিকতা অন্তর্জ আলোচনা করিয়াছি।

আধুনিক হিষ্টরিতে কেবল রাজ্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বংশ ও বংশানুচরিতই থাকে এমন নহে। সকল প্রকার প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক ঘটনার বিবরণও হিষ্টরিতে পাওয়া যায়। পুরাণকারও তদ্রূপ অনেক নৈসর্গিক ঘটনার বিবরণ পুরাণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুরাণে উল্লিখিত আছে,

চাক্ষুষ মনুষ্যের শেষ হইল ভীষণ জলপ্লাবন হইয়াছিল। মৎস্তা২।১৩ ॥ এই জলপ্লাবনের কথা বহু দেশের কিংবদন্তীতে প্রচলিত আছে। পুরাকালে কবে লোক-ক্ষয়কর ভূমিকম্প হইয়াছিল পুরাণে তাহাও লিখিত আছে।

প্রাকৃতিক ঘটনা বর্ণনা করিবার জন্য পুরাণের একটি নিজস্ব ভঙ্গী আছে। এই সূত্র জানা না-থাকিলে বর্ণনা অতিপ্রাকৃত মনে হইবে। পুরাণ সর্বত্র হিন্দুশাস্ত্রানুগামী। বিশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়তত্ত্ব হিন্দুদর্শনকার বিচার করিয়াছেন। পুরাণ সেই দার্শনিক তত্ত্ব ভিত্তি করিয়া নৈসর্গিক ঘটনাসমূহ বিবৃত করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্র-মতে ব্রহ্মের শক্তিতে উদ্ভাসিত না হইলে জড়জগৎ প্রকাশিত হয় না। জড় ও চৈতন্য বিরুদ্ধধর্মী। চৈতন্যই ব্রহ্ম। জড়ে চৈতন্যশক্তি না থাকিলে জড়জগৎ মানুষের চৈতন্যে প্রতিভাসিত হইতে পারে না। এজন্য প্রত্যেক জড়পদার্থে চৈতন্যশক্তি বিরাজ করিতেছে স্বীকার করিতে হয়। আধুনিক মনোবিদ্যার ভাষায় ইহা এক প্রকার 'প্যান-সাইকিজম' (panpsychism)। বহু মনোবিৎ বলেন, জড়ে (material) ও চৈতন্যে (mental) প্রকৃতিগত পার্থক্য বর্তমান। অগত্যা ইহাদের মধ্যে একে যে অন্যকে প্রভাবিত করিতে পারে এরূপ কল্পনা করিতে পারা যায় না। শরীর খারাপ হইলে মন খারাপ হয় ও মন খারাপ হইলে শরীর খারাপ হয়—এই যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি ইহা জড় ও চৈতন্যের পরস্পরাশ্রয় প্রমাণিত করে না। ইহাদের মতে জড়প্রকৃতিজাত শরীর নিজ নিয়মে স্বাধীনভাবে চলিতেছে ও তাহার সহিত চৈতন্যোদ্ভাসিত মনও নিজ পথে চলিয়াছে; ইহাদের পরস্পরের এক সাহচর্য্য বাতীত অন্য কোন সম্বন্ধ নাই। একটি লাল ও একটি কাল বলকে যদি একত্রে গড়াইয়া দেওয়া যায় তবে তাহারা উভয়ে পাশাপাশি চলিবে, কিন্তু একের গতি অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এমন কথা বলি চলিবে না। শরীর ও মনও সেইরূপ পাশাপাশি চলিতেছে, কিন্তু একের দ্বারা অন্তে বাস্তবিক প্রভাবিত হইতেছে না। শরীর ও মন পরস্পরে আশ্রিত এই অনুভূতি ভ্রমাত্মক; ইহা মায়ামাত্র (illusion)। এই মত মনোবিদগণের মধ্যে মনোদৈহিক সহচারবাদ (psychophysical parallelism) নামে পরিচিত। পূর্বপক্ষ

বলিবো, মদ জড়পদার্থ, কিন্তু মদ খাইলে মনে ক্ষুধা হয় এবং না-খাইলে সে ক্ষুধা হয় না অতএব অম্ম-ব্যাতিরেক জ্ঞানানুযায়ী জড় ও চৈতন্য বাপাশ্রিত মানিতেই হইবে। অগত্যা যদি জড় ও চৈতন্যের পরস্পরের প্রভাব কল্পনাতীত মনে করি, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে জড়পদার্থ মদেও চৈতন্যশক্তি আছে এবং এই জড়াশ্রিত চৈতন্যশক্তিই মনকে প্রভাবিত করিতেছে। প্রত্যেক জড়পদার্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়ার সমস্ত জড়ে চৈতন্যশক্তি মানিতে হইতেছে। চৈতন্যশক্তি আছে বলিয়াই জড় চৈতন্য প্রতিভাসিত হয়। এতএব জড়াশ্রিত চৈতন্যই জড়কে দ্যোতনশীল করিয়াছে। যাহা দ্যোতন করে তাহাই দেবতা। অতএব প্রত্যেক জড়পদার্থে তাহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা আছে বলা অস্বাভাবিক নহে। ইন্দ্রিয়গণও দ্যোতন-শক্তিবিশিষ্ট বলিয়া শাস্ত্রে তাগাদিগকেও দেবতা বলা হইয়াছে। ঘটে, পটে দেবতা মানিলেও হিন্দুশাস্ত্রকারগণ এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার নামকরণ করেন নাই, কিন্তু সমস্ত প্রধান প্রধান জড়পদার্থের ও প্রাকৃতিক শক্তির দেবতা কল্পিত হইয়াছে। বজ্র ও বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র, প্বনের বায়ু, সূর্য্যের বিবস্বান, চন্দ্রের সোম ইত্যাদি। সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্ম, স্থিতির বিষ্ণু ও লয়ের রুদ্র। ইহারা সকলেই ব্রহ্মশক্তি; ইহাদের প্রত্যেকের প্রকারভেদ আছে।

শাস্ত্রমতে এই বিশ্ব প্রথমে অতি সূক্ষ্ম 'আকাশ'ময় ছিল; ক্রমে তাহা ঘনীভূত হইতে লাগিল। আকাশময় আবরণের মধ্যে সূক্ষ্মতর 'বায়ু' সৃষ্ট হইল, তন্মধ্যে 'তেজ'রূপী পদার্থ জন্মিল, তাহার অভ্যন্তরে 'জল' হইল ও জলে সূক্ষ্মতম 'ক্ষিতি' পদার্থ উৎপন্ন হইল। এইরূপে এক বিরাট অণু জন্মিল। এই অণুর উপাদান ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূত আমাদের পরিচিত মৃত্তিক, জল ইত্যাদি নহে, তবে গুণতারতম্যানুসারে এই সকল পরিচিত প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের নামানুযায়ী পঞ্চ মহাভূতের নামকরণ হইয়াছে। পঞ্চমহাভূতজাত অণু প্রথমে সূর্য্যের জ্যোতিঃসম্পন্ন ছিল। এই অণুর অধিষ্ঠাতৃ দেবতার নাম হিরণ্যগর্ভ। জ্যোতিঃময় অণু হইতে ক্রমে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সূক্ষ্ম পদার্থসমূহ প্রকাশ পাইতে লাগিল ও অণু মধ্যে সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ, তারকা ও আমাদের

পৃথিবী সৃষ্ট হইল। মহাভূতগুলি যেরূপ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেইরূপ তাহাদের পঞ্চীকৃত সংমিশ্রণে উৎপন্ন প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকাশ প্রভৃতি জড়দ্রব্য সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর রূপ ধারণ করিল। ক্রমশঃ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও সর্বশেষে জলমধ্যে পৃথিবী উৎপন্ন হইল। বিশাল জলরাশির মধ্যে পৃথিবী বহুকাল যাবৎ নিমজ্জিত ছিল। এই জলের অধিষ্ঠাতৃ দেবতার নাম নারায়ণ। মৎস্য জলের সুপরিচিত প্রাণী, এজন্য ভগবানের প্রথম অবতার মৎস্য-রূপী নারায়ণ। জলমগ্ন পৃথিবী বিপুল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে জল হইতে উথিত হইল। বিষ্ণুপুরাণে এই বিপর্যয়ের বিবরণ আছে। ॥বিষ্ণু ১।৪।২৫॥ যে-শক্তি পৃথিবীকে জল হইতে উদ্ধার করিয়াছিল, তাহার অধিষ্ঠাতৃ দেবতার নাম বরাহ-রূপী বিষ্ণু। কন্দমলিপ্ত জলোপ্ত মহাকায় বরাহের ন্যায় পৃথিবী দেখিতে হইয়াছিল বলিয়া বরাহ অবতার কল্পন। এই উত্থানের সময় জলরাশি চতুর্দিকে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল, মহাবায়ু প্রবাহিত হইয়াছিল, পৃথিবী ঘন ঘন কম্পিত হইয়াছিল এবং যোর শব্দে জলসমূহ ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইয়াছিল। তখন ভূপৃষ্ঠে পর্বতাদি বিভাগদৃষ্টিগোচর হইল।

বরাহাবতার কর্তৃক পৃথিবীর উদ্ধারের বিবরণ পড়িলে মনে হয় প্রাচীন পুরাণকারগণ এরূপ কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা ব্যাপক ভাবে আদি সৃষ্টিকালে আরোপ করিয়াছিলেন। তদ্রূপ জল-প্লাবন, আগ্নেয় উৎপাত, ভূমিকম্প, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রত্যক্ষদৃষ্ট ধ্বংসকর প্রাকৃতিক বিপর্যয় হইতে তাঁহারা প্রলয়কালীন অবস্থা অনুমান করিয়াছেন। প্রলয়কাল ব্রহ্মার শয়নকাল। ব্রহ্মাই সৃষ্টির দেবতা। পুরাণে বলা হইয়াছে সে সত্য প্রভৃতি মহর্ষি মহর্লোকে অবস্থিত হইয়া বর্তমান কল্পের পূর্ববর্তী প্রলয়াবস্থা দেখিয়াছিলেন। প্রলয়ে মহর্লোক নষ্ট হয় নাই। মহর্লোক আদিতে ভৌম ছিল।

এবং ব্রাহ্মীধু রাজীধু হতীতাহ সহস্রশঃ ।

দৃষ্টবস্ত্তস্তথা হস্তে স্থপংকালং মহর্ষয়ঃ ॥ বা । ৭।৭৬ ॥

অর্থাৎ এইরূপ সহস্র সহস্র ব্রাহ্মরাত্রি অতীত হইয়াছে। অন্য মহর্ষিগণ সেই সময় কালকে স্থপাবস্থায়

দেখিয়েছেন। বিষ্ণুপুরাণও বলিয়েছেন যে, প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে মহর্ষিগণ পলাইয়া জনলোক প্রভৃতিতে আশ্রয় লন। অনেকের মতে জনলোক চীনদেশের প্রাচীন নাম।

পুরাণে প্রলয়কালের বর্ণনা আছে। দৈবমানের চতুর্যুগ-সহস্র অতীত হইলে নৈমিত্তিক ব্রাহ্ম প্রলয় উপস্থিত হয়। প্রথমে অত্যন্ত উগ্র শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হয়। রুদ্র-রূপী ভগবান সূর্য্যারশ্মিতে অবস্থানপূর্ব্বক পৃথিবীস্থ যাবতীয় জল পান করিয়া নিঃশেষ করেন। সূর্য্যের সপ্তরশ্মি সপ্তসূর্য্যরূপ ধারণ করে ও ভূমণ্ডল অশেষরূপে দক্ষ হইতে থাকে। যাবতীয় পদার্থ বিগুণ হইয়া বহুধা কুস্মপৃষ্ঠবৎ প্রতীয়মান হয়। তৎপরে পাতালবাসী সঙ্কর্ষণাত্মক রুদ্র পাতাল হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীতল ভস্মসাৎ করেন। স্বর্গ প্রভৃতি লোকও দক্ষ হইয়া যায়। অখিল ভূমণ্ডল এক বৃহৎ ভর্জন কটাহে পরিণত হয়। তৎপরে রুদ্রমুখনিঃশ্বাস হইতে বিহ্বল ও বজ্রধ্বনিবিশিষ্ট ভীষণাকার বিভিন্ন বর্ণের সংবর্তক মেঘসমূহ উৎপন্ন হয় ও অবিশ্রান্ত জলধারা শতবর্ষেরও অধিক কাল বর্ষিত হইতে থাকে। অগ্নি নির্ক্ষাপিত হইলে ভূমণ্ডল জলপ্লাবিত হইয়া যায়। তখন শতবর্ষব্যাপী প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে ও ভগবান নারায়ণরূপে নাগশয্যায় শয়ন করেন। এই অবস্থা সহস্র চারি-যুগকাল বর্তমান থাকে। ইহাই ব্রাহ্মরাত্রি। রাত্রি-শেষে ব্রহ্মা জাগরিত হইয়া পুনরায় সৃষ্টি আরম্ভ করেন। বরাহ অবতার তখন জল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। পৃথিবীর পর্ব্বতাদি বিভাগ পরিস্ফুট হয় ও ব্রহ্মার বৈকারিক সৃষ্টি বা বিসর্গ আরম্ভ হয়। প্রথমে উদ্ভিদ, তৎপরে কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশু প্রভৃতি তির্য্যাকযোনি, তৎপরে অম্বর, তৎপরে দেবতা ও সর্ব্বশেষে মনু-বংশীয় মানব সৃষ্ট হয়। ইহাই পুরাণোক্ত সৃষ্টিক্রম। সৃষ্টিব্যাপার পূর্ব্বকল্পানুযায়ী প্রবর্তিত হয়।

প্রতিদিন অনুক্ষণ যে জীবাদি সৃষ্ট হইতেছে তাহার নাম নিত্যসর্গ। জীবের যে স্থিতি বৃদ্ধি তাহা নিত্যস্থিতি, তদ্রূপ জীবের মৃত্যুতে নিত্য লয় সংঘটিত হইতেছে ॥ বিষ্ণু ১।২২।৩৬ ॥ শ্লোকগুলিতে কথিত আছে এক প্রাণী হইতে অপর প্রাণী সৃষ্ট হইলে জনাদাতা প্রাণীকে

সৃষ্টিবিষয়ে হরির অবতার বলিয়া জানিবে, সেইরূপ যদি এক প্রাণী অপর প্রাণীকে বধ করে, তবে বধকর্ত্তা প্রাণীকে রুদ্রের অবতার বলিয়া জানিও। মনুষ্যের যে যে নিত্য প্রবৃত্তির বশে জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সাধিত হয় সেই সকলে সৃষ্টি লয়াদির কর্ত্ত্ব আরোপিত হইয়াছে। এজন্য ইহাদিগকে ব্রহ্মার নররূপী মানসসন্তান বলা হয়। দক্ষ, মনু প্রভৃতি ব্রহ্মার মানস-পুত্র। কারণ, এই সকল নামধারী প্রকৃত মনুষ্য হইতে এককালে মানব-বংশ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। মনুষ্য দক্ষ হইতে বংশ বিস্তার হইয়াছিল বলিয়া দক্ষ প্রজনন শক্তির দেবতা কল্পিত হইয়াছেন। এজন্য দক্ষ ব্রহ্মার এক মানস-পুত্র। প্রজাসৃষ্টি করেন বলিয়া ইহার প্রজাপতি। এখনও বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র প্রজাপতিকে প্রণাম জ্ঞাপন করা হয়। মানবী দক্ষকন্যা-গণের নামানুসারে নক্ষত্রের নামকরণ হইয়াছিল এজন্য নক্ষত্রেরাও দক্ষ-সন্তান।

পৌরাণিক অধিষ্ঠাতৃ বা অভিমানিদেবতা এবং অবতার-কল্পনার সূত্র মনে রাখিলে পুরাণ-বর্ণিত সৃষ্টি স্থিতি লয় ব্যাপারকে একেবারেই অতিরঞ্জিত বা কাল্পনিক মনে হইবে না বরং দেখা যাইবে যে সেগুলি অনেক স্থলেই বিজ্ঞান-অনুমোদিত। বার-বার সৃষ্টি স্থিতি ও লয় সংঘটিত হইতেছে কি-না আধুনিক বিজ্ঞানী বলিতে পারেন না। কিন্তু পুরাণবর্ণিত সৃষ্টিব্যাপারকে বিজ্ঞান অনুমোদন করিবেন। অন্যত্র ইহার বিশদ আলোচনা করিয়াছি।

সঙ্কর্ষণাত্মক রুদ্র সম্বন্ধে পুরাণ যে-সকল কথা বলিয়েছেন, পূর্ব্বোক্ত সূত্রানুযায়ী ব্যাখ্যা করিলে তাহাদের প্রকৃত অর্থ ধরা পড়িবে। সঙ্কর্ষণ রুদ্র পাতালবাসী। পাতাল অর্থে ভূ-বিবর বা ভূগর্ভ ও দক্ষিণ দেশ উভয়ই বুঝায়। সাপ পাতালে থাকে, অর্থাৎ সাপ মাটির মধ্যে গর্ত্তে থাকে। মাটির নীচে হইতে যে-জল শুষ্কবর্ণের ছায় নির্গত হয় তাহা পাতালগঙ্গা। অপর পক্ষে পুরাণ বলেন, পাতালে বহু সুন্দর নগর ও উপবন প্রভৃতি আছে; পুরাকালে পাতালে বলি রাজা ছিলেন। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি বলির রাজ্য। বিদ্যাচলের দক্ষিণে পাতাল। পুরাণের বর্ণনার এক আশ্চর্য্য সূত্র এই যে, কোন শব্দের দুই প্রকার অর্থ থাকিলে উভয় অর্থই গ্রহণীয় এবং দেখা যাইবে যে

উভয়ই সত্য। পাতালে নাগগণ থাকে—ইহার এক অর্থ মাটির নীচে সাপ থাকে, অপর অর্থ দাক্ষিণাত্য প্রদেশে নাগ-জাতির বাস। নাগজাতীয় রাজা সর্পের রাজা বলিয়া পরিচিত। বাসুকি এক জন নাগ-রাজা ছিলেন। ইতিহাসে বাসুকি সর্প বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সর্পের সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছে :—

পাতালসমূহের অধোভাগে বিষ্ণুর যে শেষনাম। তামসী মূর্ত্তি আছে, ষাঁহার গুণাবলী দৈত্য দানবেরাও বর্ণন করিতে পারেন নহে, যিনি অনন্ত নামে সিদ্ধগণ কর্তৃক স্তুত হন, যিনি দেব ও দেবর্ষিগণ পূজিত, তিনি সহস্রশির ও নিম্নল স্বস্তিক ভূষণে শোভিত। তিনি ফণামণিসহস্রদ্বারা দিকসমূহ উদ্ভাসিত করিয়া আছেন। জগৎ হিতের জন্য তিনি সমস্ত অসুরদের নির্বীৰ্য্য করেন। তিনি মদাঘূর্ণিত-লোচন ও সদ এক কুণ্ডল ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি কিরীট ও মালা ধারণ করিয়া অগ্নিযুক্ত শ্বেত পর্কতের ত্রায় শোভা পাইতেছেন। তাঁহার পরিধানে নীলবাস, তিনি মদোন্মত্ত হইয়া শ্বেতহার ধারণ করায় অদ্র ও গঙ্গাপ্রবাহ দ্বারা অলঙ্কৃত উন্নত কৈলাসগিরির ত্রায় শোভমান হইয়াছেন। তাঁহার এক হস্তে লাক্সল ও অপর হস্তে উত্তম মূল রহিয়াছে। কান্তি ও মদিরা দেবী বক্রণী মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। কল্পান্তে তাঁহার মুখসমূহ হইতে উজ্জ্বল বিধানল শিখাযুক্ত সর্পের নামা রুদ্ধ নির্গত হইয়া জগৎত্রয় ভক্ষণ করেন ও তিনি অশেষ ক্ষিতিমণ্ডল মস্তকে ধারণ করিয়া পাতাল-মূলে অশেষ সুরগণকর্তৃক অর্চিত হইয়া শেষরূপে অবস্থান করিতেছেন। দেবতাগণও তাঁহার বীৰ্য্য, প্রভাব, স্বরূপ এবং রূপ বর্ণনা করিতে বা জানিতে পারেন না। সমস্ত পৃথিবী ষাঁহার ফণামণিশিখায় অরুণ বর্ণ হইয়া কুসুমমালার স্তায় (মস্তকে) ধৃত আছে, তাঁহার বীৰ্য্য কে বর্ণনা করিতে সমর্থ? অনন্ত যখন মদাঘূর্ণিত-লোচনে জুস্তা পরিত্যাগ করেন তখন সমুদ্র সলিল ও কাননসমূহের সহিত এই ভূমি কম্পিত হয়। গন্ধর্ভ, অম্বর, সিদ্ধ, কিন্নর, উরগ ও চারণগণ ইহার গুণের অন্ত পান না, সেই হেতু ইহাকে মবায় ও অনন্ত বলা হয়। ষাঁহার গাত্রস্থিত নাগবধূগণ কর্তৃক লিপ্ত হরিচন্দন ঋসবায়ুর দ্বারা উৎক্লিষ্ট হইয়া

দিকসকল সুবাসিত করে, ষাঁহাকে আরাধনা করিয়া পুরাণর্ষি গর্গ জ্যোতিঃতত্ত্ব ও সকল নিমিত্ততত্ত্ব (শুভাশুভজ্ঞাপক লক্ষণসমূহ) অবগত হইয়াছিলেন সেই নাগবরের দ্বারা মস্তকে বিধৃত হইয়া পৃথিবী দেবাসুর মাহুষ সমন্বিত লোকসমূহের মালা ধারণ করিতেছে।
॥বিষ্ণু ২।৫।১৩—২৭ ॥

বিষ্ণুর তামসী তনু হইতে সর্পের উৎপন্ন হন। প্রলয়কারী বলিয়া এই তনু তামসী। ইহাকে শেষ বলা হয়, কারণ প্রলয়কালে ইনি জগৎত্রয় শেষ করেন। ইনি নাগবর কারণ ইনি পাতালসমূহেরও নিলে থাকেন, ইনি অতিবীৰ্য্যশালী, ইহার গুণের অন্ত নাই এজন্য ইনি অনন্ত। ইহার অগ্নিময়ী সহস্র ফণা। সেই ফণামণির জ্যোতিতে ইনি পৃথিবীতল অরুণালোকে উদ্ভাসিত করিয়া আছেন। ইহার ভীষণ ও চঞ্চল সৌন্দর্য্য; কান্তি ও মদিরা দেবী ইহার উপাসিকাধর। ইনি নীলবাসা ও মদাঘূর্ণিত-লোচন। ইনি স্বস্তিক বা বজ্র, লাক্সল ও মুঘল ধারণ করেন। এই সকল বিশেষণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে সর্পের ভূগর্ভস্থ অগ্নি। ভূগর্ভের দিকে দিকে ইহা ফণাবিস্তার করিয়া আছে। ঋষিগণ বহুস্থানে ভূগর্ভস্থ অগ্নি-উৎপাত দেখিয়া এই কল্পনা করিয়াছিলেন মনে হয়। তাঁহাদের মতে এই অগ্নিজাত শক্তিই পৃথিবীর উপরিভাগস্থ কঠিনস্তর ধারণ করিয়া আছে। পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ অগ্নির জ্বলনে অর্থাৎ ফণার সঙ্কোচন প্রসারণে ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির উৎপাত উভয়ই হয়—ইহাই পৌরাণিক মত। বাসুকি নাগের দ্বারা পৃথিবী ধৃত হওয়ার ও তাঁহার ফণাকম্পনে ভূমিকম্প হওয়ার ইহাই প্রকৃত অর্থ। আগ্নেয়গিরির উৎপাতে যে ভস্মরাশি নির্গত হইয়া চতুর্দিকে বিস্তৃত হয় ঋষিগণ তাহা জানিতেন। ভস্মরাশিকে সুবাসিত হরিদ্রা বা কপিল বর্ণের হরিচন্দনের রেণুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। পদ্মরেণুর নামও হরিচন্দন। ভূকম্প ও অগ্নি-উৎপাতের আনুষঙ্গিক বজ্রধ্বনি সর্পের স্বস্তিক-চিহ্নদ্বারা উপলক্ষিত হইয়াছে; মৃত্তিকা-বিদারণ ও ধ্বংসশক্তি লাক্সল ও মুঘল দ্বারা ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, ভারতের ঋষিগণ আগ্নেয়গিরির

উৎপাত কোথায় দেখিয়াছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, পুরাণের কোন কথার একাধিক অর্থ থাকিলে তাহার সকলগুলিই গ্রহণীয়। পৌরাণিক বলিয়াছেন, পাতাল-সকলেরও নীচে সঙ্কর্ষণ আছে। সপ্ত পাতালের নিম্নতম প্রদেশের নামও পাতাল। ইহা ভারতবর্ষের সর্বদক্ষিণ অংশ। ইহারও দক্ষিণে ঋষিগণ আগ্নেয়গিরি দেখিয়াছিলেন। অনুমান হয়, বহু পুরাকাল হইতেই মলয়, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান জানা ছিল। এই সকল প্রদেশে আগ্নেয়গিরি আছে। বায়ুপুরাণের ৪৮ম অধ্যায়ে ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৫২ম অধ্যায়ে বোর্ণিও, মলয় প্রভৃতি দ্বীপের অতি কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ আছে। বর্হিণ দ্বীপবর্ষের অন্তর্গত বহু দ্বীপ আছে বলা হইয়াছে। অঙ্গদ্বীপ, মলয়দ্বীপ, শঙ্খদ্বীপ, কুশদ্বীপ, বরাহদ্বীপ প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। এই সকল দ্বীপে স্লেচ্ছ প্রভৃতি জাতি বাস করে। আরও বলা হইয়াছে, তত্রস্থ প্রজা

দীর্ঘশ্রদ্ধা স্বানো নীলা মেঘসমপ্রভাঃ ।

জাতমাত্রাঃ প্রজাস্তত্র অশীতি পরমাযুধঃ ॥

শাখামৃগ সধর্ম্মাণঃ ফলমূলানিনস্তথা ॥

গোধর্ম্মাণো হনির্দ্দিষ্টাঃ শৌচাচারবিবর্জিতাঃ ॥

বায়ু । ৪৮ । ৮,৯ ॥

অর্থাৎ তথায় প্রজা জন্মিবামাত্র দীর্ঘশ্রদ্ধারী, নীলমেঘ-কাস্তি ও অশীতিবর্ষ পরমাযুধীল হয়। তাহারা বানরের ন্যায় ফলমূলভোজী, গোধর্ম্মী—অর্থাৎ গম্যাগম্য বিচারহীন ও তাহাদের শৌচাচার বা নির্দ্দিষ্ট আচার-ব্যবহার নাই। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও অনুরূপ শ্লোক আছে। কেবল ‘জাতমাত্রাঃ’ স্থানে ‘জানুমাত্রাঃ’ শব্দ আছে। জানুমাত্রাঃ অর্থে যাহাদের দেহ-পরিমাণ একজানু মাত্র। এই বিবরণ যে সূমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপের ওরাংউটাং সম্বন্ধে লিখিত সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্হিণ দ্বীপপুঞ্জকে রত্নের ও চন্দনাদির আকর বলা হইয়াছে।

এখন যেমন বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন পুরাকালেও বিভিন্ন ঋষি সেইরূপ বিভিন্ন বিজ্ঞান আলোচনা ও পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান আহরণ করিতেন। গর্গ সঙ্কর্ষণের আরাধনা করিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্র ও নিমিত্তবিজ্ঞা অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পূর্বলক্ষণ সমূহের জ্ঞানলাভ করেন। আধুনিক ভাষায়

বলা যায়, গর্গ ভূকম্পবিৎ (seismologist) ছিলেন। পুরাকালে ভারতে নানা বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোচিত হইত তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

সঙ্কর্ষণ ধ্বংস-শক্তি বলিয়া রুদ্র বা রুদ্রের অবতার। পুরাণে সঙ্কর্ষণেরও অবতার কল্পিত হইয়াছে। ধুকু নামক অসুর সঙ্কর্ষণের প্রথম অবতার ও কুম্ভভ্রাতা বলদেব, বলরাম বা বলভদ্র সঙ্কর্ষণের দ্বিতীয় অবতার। ধুকু শব্দ ধুম হইতে নিস্পন্ন। ধু ধাতুর অর্থ কম্পন। সঙ্কর্ষণের অবতারের সহিত ধুম ও কম্পনের সম্বন্ধ বিচিত্র নহে। বলরাম ধ্বংসকারী প্রবল যোদ্ধা ছিলেন, হল বা লালস তাঁহার অস্ত্র ছিল। কীর্ত্তি সাদৃশ্বে হলধর বলরাম, হলধর সঙ্কর্ষণের অবতার হইলেন। বলরামের পরবর্ত্তীকালে যে সকল ভূমিকম্প হইয়াছে তাহাও বলরামের কীর্ত্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে। বলরামের বহুকাল পূর্বে এক ভূমিকম্প হয়। ইহার উল্লেখ পুরাণে আছে; এই ভূমিকম্প ধুকুর কীর্ত্তি।

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থাংশ দ্বিতীয় অধ্যায় ত্রয়োদশ শ্লোকে বালিতেছেন, ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বৃহদশ্বের পুত্র কুবলয়াম্ব মহর্ষি উত্কের উপকারার্থে একবিংশতি সহস্র পুত্রে পরিবৃত হইয়া বৈষ্ণব তেজপ্রভাবে ধুকু নামক অসুরকে বধ করিয়া ধুকুমার নাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার সমস্ত পুত্রগণ ধুকু-মুখনিঃশ্বাসজনিত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হন কেবল তিন পুত্র অবশিষ্ট থাকে। বিষ্ণুপুরাণের বিবরণ পড়িয়া সন্দেহ হয় যে কুবলয়াম্বের ২১০০০ প্রজা বা সেনা ভূমিকম্পে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বায়ুপুরাণে এই ঘটনার বিশদ বিবরণ আছে। বায়ুর অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে, বৃহদশ্ব বাণপ্রস্থ অবলম্বনে উদ্যত হইলে মহর্ষি উত্ক তাঁহাকে বলিলেন “হে ভূপতে, আমার আশ্রমের সমীপে এক বালুকাপূর্ণ সমুদ্র অর্থাৎ মরুভূমি আছে; সেখানে দেবতাদিগেরও অবধ্য মহাকায় মহাবল জরুর ধুকু নামক মনুতনয় শত শত লোক বিনাশের জন্ত অন্তর্ভূমিগত হইয়া অর্থাৎ মৃত্তিকানিয়ে বালুকায় অন্তর্হিত থাকিয়া সূদারুণ তপ করিতেছে। সম্বৎসর শেষে সে যখন নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, তখন সকাননা মহী কম্পিত হয় ও মহান রজ উখিত হইয়া আদিত্য পথ অবরোধ করে, তখন

পুত্রকালব্যাপী ভূমিকম্প হইতে থাকে ও প্রাদীপ্ত অগ্নি-
কুলিঙ্গসহ দারুণ ধূম নির্গত হয়।” ধুকুর অত্যাচার
নিবারণের জন্য বৃহদশ্ব স্বীয় তনয় কুবলয়াশ্বকে আজ্ঞা
দিলেন। কুবলয়াশ্ব ২১০০০ পুত্রসহ তথায় বাইরা বালুকর্ণব
গমন করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু পশ্চিমদিকাপ্রান্ত
দুর্গর মুখ হইতে আল নির্গত হইয়া সকলকে উন্মত্তিয়া
ফলিতে লাগিল এবং মহোদধি চন্দ্রোদয়ে যেরূপ চঞ্চল
হয়, তদ্রূপ প্লবমান জলরাশি প্রবাহিত হইল। তিন জন
সতীত সমস্ত কুবলয়াশ্ব সম্ভ্রাম ধুকু কঙ্কক বিাষ্ট হইয়া গেল।
তখন কুবলয়াশ্ব যোগবলে সেই জলদারা অগ্নি নির্দাপিত
করিয়া সমস্ত জল পান করিয়া ফেলিলেন এবং ধুকুকে
বিস্তৃত করিলেন। অনুমান হয়, কুবলয়াশ্ব ২১০০০ লোক
সহিত ভূকম্প-পীড়িত স্থানে উদ্ধারকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন।
এইজন্যই তিনি বালুকর্ণব গমন করিতেছিলেন। সেই
সময় পুনরায় ভূকম্প ও তৎফলিত জলপ্লাবনে সমুদায় ব্যক্তি
মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গত বিস্ময়ের ভূমিকম্পের মত এই
ভূমিকম্পও জলরাশি উথিত হইয়াছিল, অধিকন্তু মৃত্তিকা-
গর্ভ হইতে ধূম ও অগ্নি নির্গত হইয়াছিল। পুরাণ পাঠ
করিলে অনুমান হয় যে উত্কলের আশ্রম সিদ্ধদেশে ছিল।
সিদ্ধদেশে অনেক বার পলয়ঙ্গর ভূমিকম্প হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের
মৃত্যুর কিছুকাল পরে নিকটবর্তী দ্বারক নগরী সমুদ্রগর্ভে
চলিয়া যায়। ইং ও ভূমিকম্পের ফল বলিয়া মনে হয়।
১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কচ্ছ প্রদেশের ২০০০ বর্গমাইল পরিমিত
স্থান সমুদ্রগর্ভে লুপ্ত হয় ও প্রায় ৫০ মাইল দীর্ঘ ও দশ
মাইল প্রস্থভূমি দশ ফুট উচ্ছ্রিত হয়। সিদ্ধপ্রদেশ
ভূমিকম্পপ্রবণ। উত্কল বলিয়াছিলেন, সংবৎসরান্তে
ধুকু অত্যাচার করে। কুবলয়াশ্বের রাজত্বকাল* ৩৬০০ খ্রীঃ-
পূঃ। অন্তত্ন তারিখের প্রমাণ আলোচনা করিয়াছি।
ইহার পূর্বের কোন ভূমিকম্পের প্রামাণিক লিখিত
বিবরণ পাওয়া যায় না।

পুরাণে কথিত হইয়াছে, একদা বলরাম বৃন্দাবনে

* এই প্রবন্ধে পুরাণোক্ত প্রাচীন ঘটনার যে সকল তারিখ
দিয়াছি তাহার একটিও কাঙ্ক্ষনিক নহে। পুরাণে মন্বন্তর নির্দেশ
অর্থাৎ কাল-নির্দেশ আছে। এই নির্দেশ সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য।
অন্তত্ন মন্বন্তর-রহস্য প্রমাণ সহকারে বিচার করিয়াছি।

মদিরাপানে বিহ্বল ও ঘর্ম্মাক্ত হইয়া স্নান করিতে
ইচ্ছুক হইলেন। তিনি যমুনার উদ্দেশে বলিলেন, ‘হে
যমুনে, তুমি এই স্থলে আগমন কর’, কিন্তু বলভদ্রের
মন্তব্যপ্রসূত বাক্যের অবমাননা করিয়া নদী যমুনা সেই
স্থানে পাইলেন না। তখন লাঙ্গলী ক্রুদ্ধ হইয়া লাঙ্গল
গ্রহণ করিলেন এবং তদ্বারা যমুনাকে আকর্ষণ করিতে
করিতে বলিলেন—“রে পাপে, তুমি আসিবে না, আসিবে
না বটে? এখন নিজ ইচ্ছায় গমন কর দেখি।” বলভদ্র
কঙ্কক আকৃষ্ট হইয়া নদী বলভদ্র যে-বনে ছিলেন তাহা
প্লাবিত করিল। তখন যমুনা মূর্ত্তিমতী হইয়া বলিলেন,
“হে মুগ্ধাযুধ, আমাকে পরিত্যাগ কর।” বলভদ্র তাহাকে
ছাড়িয়া দিলেন। অনন্তর কান্তিদেবী বলভদ্রকে
অবতংসোৎপল এক কুণ্ডল ও দুইটি নীল বস্ত্র দিলেন। তখন
কৃত্তাবতংস চারুকুণ্ডলভূষিত, নীলাশ্বর ও মালাধারী
বলভদ্র কান্তিযুক্ত হইয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥
বিষ্ণু ৫। ২৫ ॥ বলভদ্র পূর্ব্ববর্ণিত সঙ্কর্ষণের ত্রায় নীলবাস,
এক কুণ্ডল, মালা, মুঘল ও হলধারী। তিনিও মদ্যবর্ণিত-
লোচন। পাছে কেহ বলভদ্রের কাঙ্ক্ষিনীর প্রকৃত অর্থ না
বুঝিতে পারে এই জন্য পুরাণকার এই-সকল ইঙ্গিত
করিলেন। অন্তত্ন পুরাণে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে
বলভদ্র সঙ্কর্ষণের অবতার। বৃষ্ণা বাইতেছে ভূমিকম্পের
ফলে যমুনার গতি পরিবর্তিত হইয়াছিল। এই ভূমিকম্পের
পূর্ব্বে বৃন্দাবন যমুনা হইতে বহুদূরে অবস্থিত ছিল।
বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চমাংশ অষ্টাদশ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে
যে কংস কঙ্কক প্রেরিত হইয়া অক্রুর বৃন্দাবন হইতে কৃষ্ণ ও
বলরামকে সঙ্গে লইয়া মথুরায় গিয়াছিলেন। বিমল প্রভাতে
অক্রুর, কৃষ্ণ ও বলরাম অতি বেগবান অশ্বসম্বন্ধু
রথারোহণে যাত্রা করিলেন। মধ্যাহ্ন-সময়ে তাঁহার
যমুনাতটে উপস্থিত হইলেন। তথায় স্নানাদি সারিয়া
পুনরায় রথারোহণ করিলেন। অক্রুর বায়ুবেগবান অশ্বগণকে
অতি দ্রুত চালাইতে লাগিলেন। অতিসায়াকে অর্থাৎ
সায়াক্ষ অতীত হইলে তাঁহার মথুরা পৌঁছিলেন।
বেগবান অশ্বযুক্ত রথ ঘণ্টায় সাত আট মাইল বাইতে
পারে। এই হিসাবে বৃন্দাবন হইতে যমুনার দূরত্ব
চল্লিশ মাইল আন্দাজ হয়। মথুরা আরও চল্লিশ

মাইল দূরে। এখন টাঙ্গায় এক ঘণ্টার মধ্যেই মথুরা হইতে বৃন্দাবন যাওয়া যায়। অতএব আধুনিক বৃন্দাবন প্রাচীন বৃন্দাবন নহে। যমুনার গতি পরিবর্তিত হওয়ায় প্রাচীন বৃন্দাবন যমুনাগর্ভে গিয়াছিল অনুমান হয়। মথুরার নিকটে নূতন বৃন্দাবন স্থাপিত হয়। কবে বৃন্দাবন জলপ্লাবিত হইয়াছিল ঠিক বলা যায় না। বলরামের জন্মকাল আনুমানিক ১৪৬০ খ্রীঃ-পূঃ। এই ভূমিকম্প বলরামের জীবিতকালে হইয়াছিল কিনা তাহাও নিশ্চিত বলিবার উপায় নাই, কারণ পরবর্তী কালের ভূমিকম্পও সঙ্কর্ষণাবতার বলরামের কীর্ত্তি বলিয়াই কথিত হইবে। বলরামের কীর্ত্তি-স্বরূপ আরও একটি ভূমিকম্পের কথা পুরাণে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চমাংশ পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ে লিখিত আছে, “পরশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয় অনন্ত, অপ্রমের ধরণীধারী শেষের কীর্ত্তি বলিতেছি শ্রবণ কর।” কৃষ্ণতনয় জাম্ববতী-পুত্র কীর শাস্ত্র ছুর্যোধন-কন্যাকে বলপূর্বক হরণ করেন। তাহাতে কর্ণ ছুর্যোধন ও অপর কুরুবীরগণ শাস্ত্রকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন। বলভদ্র ছুর্যোধন প্রভৃতিকে শাস্ত্রকে ফিরাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলে তাঁহারা বলভদ্রকে কটুবাক্যে অপমানিত করেন। তখন হলায়ুধ কোপে মত্ত ও আঘূর্ণিত হইয়া পার্শ্ব ভাগ (গোড়ালি) দ্বারা বহুখা তাড়িত করিলেন। মহাশয় বলভদ্রের পদতল-প্রহারে পৃথ্বী বিদারিত হইল। সকল দিক শব্দে পূরিত করিয়া বলভদ্র বাহ্বাস্ফোটন করিলেন। মদলোলাকুল কণ্ঠে বলরাম বলিলেন, “কুরুকুলাধীশ হস্তিনা-নগরীকে কুরুগণের সহিত উৎপাটিত করিয়া ভাগীরথীমধ্যে নিক্ষেপ করিব।” মুঘলায়ুধ বলরাম কর্ণধামুখ লাজল হস্তিনাপুরীর প্রাকারে বিস্তৃত করিয়া নগরীকে আকর্ষণ করিলেন। অনন্তর সেই নগরী সহসা আঘূর্ণিত হইতেছে দেখিয়া কৌরবগণ রাম রাম কমা কর কমা কর, বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কৌরবগণ শাস্ত্রকে স্বীয় পত্নীর সহিত প্রতাপর্পণ করিলে বলরাম ক্ষান্ত হইলেন। পরশর বলিলেন, “হে দ্বিজ এই কারণে হস্তিনাপুর অদ্যাপি আঘূর্ণিতাকারে লক্ষিত হইয়া থাকে। বলরামের বল ও শৌর্য্যউপলক্ষণে এই প্রবাদ।”

গত ভূমিকম্পের ফলে বিহারের মতিহারি নামক নগর বিপর্যাস্ত হয়। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সংবাদপত্রে লিখিয়া ছিলেন, মতিহারি শহর ‘twisted’ হইয়া গিয়াছে। পৌরাণিক ভাষায় ইহাই আঘূর্ণিত হওয়া। বলভদ্র হস্তিনাপুরীকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন। বাস্তবিকই যুধিষ্ঠিরের সাত পুত্রের পরে নিচকুর রাজ্যকালে হস্তিনাপুরী গঙ্গাগর্ভে চলিয়া যায় ॥ বিষ্ণু ৪।২১।৩ ॥ নিচকুর রাজধানী কোশাঘীত লঙ্কায়ান। নিচকুর কাল আনুমানিক ১২৫১ খ্রীঃ-পূঃ। পূর্ববর্তী ভূমিকম্পের ফলে পরবর্তীকালে গঙ্গার গতি পরিবর্তিত হইয়া হস্তিনাপুরী ধ্বংস হয় কিনা বলা যায় না। পরিক্ষিতের কালে হস্তিনাপুরী আঘূর্ণিত আকারে দৃষ্ট হইত। ভূমিকম্প খ্রীঃ-পূঃ ১৪১৬ অব্দের পূর্বে ঘটিয়াছিল। ১৪১৬ খ্রীঃ-পূঃ পরিক্ষিত-জন্মকাল। কৃষ্ণজন্মের শত বৎসরের কিঞ্চিদধিক কাল পরে দ্বারকা-নগরী সমুদ্রদ্বারা প্লাবিত হয়। বিষ্ণু ৫।৩৭।১৭, ৫৪ ॥ শ্রীমদভূত শুকবচন মতে উল্লিখিত শ্লোকোক্ত কাল কৃষ্ণজন্মের ১২৫ বৎসর পরে অর্থাৎ আনুমানিক ১৩৩৩ খ্রীঃ-পূঃ। গঙ্গা ও যমুনার গতি-পরিবর্তন ও দ্বারকা-প্লাবন বিভিন্নকালের হইলেও এত একই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে ঘটিয়াছিল। এ-বিষয়ে কিছুই নিশ্চিত বলা যায় না।

চাকুব মন্বন্তরের পর বে বিপুল জলপ্লাবন হয়, তাহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। মৎশ-পুরাণে কথিত হইয়াছে বহুবৎসর অনাবৃষ্টির পর অতিবৃষ্টি হইয়া এই প্লাবন ঘটে। নন্দাতীর প্লাবিত হয় নাই। মনু ও মার্কণ্ডেয় নৌক-রোহণে রক্ষা পান। চাকুব মন্বন্তর ৩৮১৪ খ্রীঃ-পূর্বাব্দে শেষ হয়। তাহার কিছুকাল পরে এই প্লাবন। অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভূবিদ্যার (geology) অধ্যাপক ডাক্তার সোলাস-এর (Dr. W. J. Sollas) মতে নোদার সময়কার প্লাবন সত্য ঘটনা। অধ্যাপক স্টিফেন ল্যান্ডন (Prof. Stephen Landon) প্রত্নতাত্ত্বিক খনন দ্বারা ইহার প্রমাণ পাইয়াছেন। সোলাসের মতে মহাপ্লাবন (deluge) ৩২০০ খ্রীঃ-পূঃ পূর্ববর্তী ঘটন। (Quotation from “The Statesman.” June 30, 1929 by Kumud Ranjan Ray—Evolution of Gita, p. 14.)

বায়ুরাণে আছে সত্য প্রভৃতি ঋষি কালকে স্থপ্তাবস্থায়
পরিগ্রহাছিলেন ॥ বায়ু ৭। ৭৫ ॥ কালের স্থপ্তাবস্থা ব্রাহ্মরাত্রি।
এই সময় পৃথিবী জলপ্লাবিত থাকে। বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয়
অংশের প্রথম অধ্যায়ে আছে, সত্য ঔত্তমি মন্বন্তরে ছিলেন।
ঔত্তমি মন্বকাল ৫২৪২ খ্রীঃ-পূঃ হইতে ৪৮৮৫ খ্রীঃ-পূঃ

এই কালের মধ্যেও একবার মহাপ্লাবন ঘটিয়াছিল পুরাণ
তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

পুরাণে বহু প্রকৃত পুরাবৃত্ত ধৃত হইয়াছে। মনোযোগ-
সহকারে পুরাণগুলি পাঠ করিলে ভারতের প্রাচীন হিষ্টরি
উদ্ধার হইবে।

লেখকের বিচার

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

অবনী 'ললিত-লাবণ্য' কথা, সিতাংশুর 'বালীগঞ্জে
হুতুড়ে বাড়ি' ও সতীশের 'অনন্ত তৃষ্ণা' গল্পগুলির পর
আমার গল্প তোমাদের তেমন ভাল লাগবে না। আমি
যে বলব তা গল্প নয়, আমার দৃষ্টিবিশ্বাস, এ-ঘটনা ঘটেছিল,
অথাৎ ঘটনা উচিত ছিল।

গত মাসে সতীশ চৌধুরীর বাড়িতে ডিনার-খাওয়া
তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে। চৌধুরীর কোন ডিনার
আমি ভুলতে পারি না, ও লোকটা খাওয়ার আর্ট ওস্তাদের
মত আয়ত্ত করেছে। যেমন বর্ণ ও রেখা-ছন্দের সামঞ্জস্যে
চিত্রের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয়; যেমন বেহালার সঙ্গে
পিয়ানোর বা শরদের সঙ্গে বাঁয়াতবলার যথাযথ সঙ্গতে
শুরের সমন্বয়ে জলসা জমে ওঠে, তেমনি আহাৰ্য্যের সঙ্গে
পানীয়ের যথোচিত সম্মিলনেই আহাৰ্য্যের আনন্দ সৃষ্টি
হয়; ভোজ্য প্রচুর ও বিচিত্র হলেই হয় না; আহাৰ্য্য
নির্দ্বারনে চাই সংযম, এবং ডিনারের প্রতি কোর্সের
খাদ্যের সঙ্গ পানীয় নির্বাচনে চাই পান-বিলাসীর সূক্ষ্ম
আভিজাতিক রুচি; চৌধুরীর প্রতি ডিনারে আহাৰ্য্য ও
পানীয়ের শুধু বৈচিত্র্য নয়, আনন্দময় ক্রম্য পাওয়া যায়
বলেই তার ডিনারগুলি এমন উপভোগ্য।

ডিনার খেয়ে যখন বাড়ি ফিরলুম রাত বারটা বেজে
গেছে, কে আমায় মোটরে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল,
অবনী তুমিই বোধ হয়, হাসছ কেন,—বুঝেছি, তুমি
ফলতে চাও, মোটরে বাড়ি পৌঁছে না দিয়ে গেলে, একা

বাড়ি ফেরবার মত অবস্থা আমার ছিল না, তা হয়ত
সত্যি।

আমার ড্রয়িং-রুম তোমরা দেখেছ, বাড়ির একতলার প্রায়
সমস্ত অংশ জুড়ে, তার পাশে বারান্দা, তারপর দোতলাতে
ওঠবার সিঁড়ি। সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে দেখি, ড্রয়িং-রুমে
আলো জ্বলছে, এত রাত্রে ড্রয়িং-রুমে কে আলো জ্বালাল!

খোলা দরজার পর্দা সরিয়ে দেখি, ঘর লোক-ভর', সব
অজানা অদ্ভুত মূর্তি! এত রাত্রে এত লোক আমার জন্ম
প্রতীক্ষা করছে আর গেট খোলবার সময় দরওয়ান
একটা কথাও বললে না? ঘরের আলো বড় অপূর্ক লাগল,
এ-আলো কলিকাতা ইলেক্ট্রিক কোম্পানীর বৈদ্যুতিক
আলো নয়, এ সূর্য্যের বা চন্দ্রের আলোও নয়, এ কোন
অতীন্দ্রিয় লোকের আলো।

ঘরে প্রবেশ করতেই একটা সোরগোল পড়ে গেল।

—এই যে এতক্ষণে এসেছেন।

—খাওয়া বেশ ভালই হয়েছে দেখছি।

—পান ততোধিক, আমরা এদিকে এক ঘণ্টা ব'সে।

বিস্মিত ভাবে বললুম, ক্ষম! করবেন, আমি কাউকে
ঠিক চিনতে পারছি না, কোন জরুরী কেস নাকি, পুলিশ
কেস?

সোফাতে একটি মোটা লোক বসেছিল, সার্কাসের
ক্লাউনের মত হা, হা, ক'রে সে অদ্ভুত হেসে উঠল,—
ওহে আমাদের চিনতে পারছে না।

সামনের 'সেটি'তে এক মধ্যবয়স্ক নারী ব'সে, শুষ্ক মুখ, শীর্ণ দেহ, চোখ দুটি অস্বাভাবিক জ্বলজ্বল করছে। কোণে গদিখাঁটা চেয়ারে এক তরুণ যুবক, কালো কোঁকড়ান চুল, কবির মত স্বপ্নভরা চোখ। রজনীগন্ধা-ভরা ফুলদানির পাশে দোলানো-চেয়ারে এক তরুণী, বর্ধাস্নাত শ্বেতকরবীর মত করুণ সুন্দর। অপর দিকে এক কিশোরী মত রঙের শাড়ী প'রে শ্রাবণ-জ্যোৎস্নায় অপরাজিতা লতার মত মধুর উদাস। আরও অনেক বিচিত্রবেণী বিভিন্ন বয়সের নরনারী। মনে হ'ল, তাদের যেন কোন স্বপ্নে দেখেছি, চেনা হয়েছিল, কিন্তু জানা হয় নি, সব ভুলে গেছি। মোটা লোকটি পরিহাসের সুরে হেসে উঠল,—ভয় নেই, চেয়ারটার ব'স, 'ভারতী'তে 'ক্লাউন' ব'লে একটি গল্প লিখেছিলে মনে পড়ে ?

—হ্যাঁ, সে ত তিন বছর আগে হবে।

—আমি সেই ক্লাউন, আমার কথাই তুমি লিখে নাম করেছিলে। আমার আসার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এ'রা, বিশেষ ক'রে ইনি, কিছুতেই ছাড়লেন না।

রঙ্গভরা চোখ নাচিয়ে সে শীর্ণ নারীটির দিকে চাইল।

ক্লাউন বলতে লাগল, 'মা' গল্পটা মনে পড়ে, ইনি সেই মা ; তোমার গল্পে এ'র সাত বছরের ছেলে টাইফয়েডে মারা যায়, চার বছর ধ'রে ইনি মৃত ছেলের জন্য শোক করছেন, প্রতীক্ষা করছেন, এখন এসেছেন তোমার কাছে, তাঁর প্রতি কেন এ অবিচার, কেন তাঁর ছেলে মারা যাবে, তুমি ত তাঁর ছেলেকে বাচিয়ে দিতে পারতে। আর এ'রা সব তোমার গল্প উপস্থাসের নায়ক-নায়িকার।—ওই হচ্ছে বিণ্ডু পাগল কোণে গুম হয়ে ব'সে আছে, ওই তোমার তরুণ কবি রেবন্ত, ওই মাধবী কেশে শ্বেতকরবীর মালা জড়িয়েছে, ওই চিরবিরহিণী অপরাজিতা।—এ'রা এসেছেন তোমার বিচার করতে, তুমি তোমার খুশীমত তাঁদের জীবন গড়েছ, ভেঙেছ, কেন তাঁরা এত দুঃখ পাবেন চিরদিন, তুমি কি ওঁদের সুখী করতে পারতে না ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার বড় মুন্সিলে পড়েছ, লেখক।

বাক্সের সুরে সে উচ্চস্বরে হেসে উঠল, যেন জীবনটা একটা অটুহাস।

ধীরে বললুম,—আমি লেখক মাত্র, মানব-সংসারে যদি

দুঃখ, মৃত্যু, বিচ্ছেদ না থাকত আমিও সে-কথা লিখতুম না, আমার কি অপরাধ ?

শীর্ণ নারী বাখিত স্বরে ব'লে উঠল, কার কি অপরাধ আমি জানি না, বুঝি না, আমি চাই আমার ছেলেকে, আমার মাণিককে ফিরিয়ে দাও।

—আমি চাই আমার স্বামীকে, কেন তিনি আমার ত্যাগ ক'রে চলে যাবেন এক স্মৃতি নারীর সঙ্গে।

—আমি চাই আমার প্রেমিক, আমার অজিতকে, সে ত সত্যি আমায় ভালবাসত, আমায় বিবাহ করার বলেছিল, তুমি কি আমার সুখ-মিলন কথা লিখে তোমার উপন্যাস শেষ করতে পারতে না ? কেন তুমি আনলে ইন্দ্রাণীকে, অজিত তার রূপ দেখে ভুলে গেল, আমাকে ত্যাগ ক'রে চলে গেল—আমাদের প্রেম-মিলনপথে তুমি কেন আনলে ইন্দ্রাণীকে ?

—আর আমি ? গৈমন্তীকে আমার মত কে ভালবাসত, কে ভালবাসে, নিজ হাতে তাকে আমি খুন করলুম, গৈমন্তী শরৎ-শেকালির মত পবিত্র নিষ্পাপ, তাকে আমি সন্দেহ করলুম ; কেন তুমি শরতকে আনলে আমাদের জীবনে, সে শুধু আমার মনে সন্দেহ জাগাত, নিজ স্ত্রীকে ভাবলুম, অবিখ্যাসিনী, তুমি লেখক শরতের চরিত্র এ'কে পেলে বাত্ব, আমি হলুম স্ত্রী-হত্যাকারী !

বললুম,—দেখ তোমরা যদি একে একে তোমাদের কথা বল তাহলে তোমাদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করতে পারি।

শীর্ণ নারী ব'লে উঠলেন, আগে আমার উত্তর দাও, কেন আমার ছেলে মরবে, টাইফয়েড রোগ থেকে ত কত ছেলে সেরে ওঠে, তুমি কি গল্পে লিখতে পারতে না, আমার ছেলে সেরে উঠল ?

বললুম, মা, তুমি কি ভাবো, তোমার ছেলের মৃত্যুতে আমার অন্তরের ব্যথা, তোমার ব্যথার চেয়ে কিছু কম ; তুমি জানো, আমিও তোমারই মত তোমার রুগ্নশিশুর শিবার রাতের পর রাত ভয়ব্যাকুল চক্ষে জেগেছি ; তুমি জানো, আমিও তোমারই মত তার রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করেছি। মনে পড়ে, যে-রাত্তে তোমার ছেলের মৃত্যু হল—সন্ধ্যায় ডাক্তার ব'লে গেল, খোকা অনেকটা ভাল আছে, সেই

আশ্বাসবাণী শুনে তুমি ভাবলে রাতে একটু ঘুমোবে, শ্রান্তিতে তুমি তার শয্যাপার্শ্বে ঘুমিয়ে পড়লে, আমি কিন্তু বিনিদ্র নয়নে জেগে রইলুম। শ্রাবণের মধ্যরাতে আকাশের সব তারা নিবিয়ে রুষ্টি এল, দ্বারে দেখলুম কার করাল রূক্ষ ছায়া, সে যম। দ্বার রোধ ক'রে দাঁড়ালুম, বললুম, নিদ্রিত মায়ের কোল থেকে রুগ্ন পুত্রকে তুমি নিতে পারবে না, আমি যাকে জাগিয়ে দেব। যম বললে,—তুমি বাধা দিও না, সৃষ্টির সত্যকে তুমি লঙ্ঘন করতে চাও; আমি যম, আমি অমোঘ শাস্ত নিয়ম, আমি আঞ্জা-বহনকারী ভূতা মাত্র, আমার কাছে প্রার্থনা করা বৃথা; যিনি জন্মমৃত্যুর অধিপতি তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, কিন্তু সে প্রার্থনাও বৃথা হবে, সৃষ্টিকর্তা নিজ নিয়ম-জালে আপনি বাঁধা পড়েছেন। পারলুম না যমকে বাধা দিতে, নিশাথ রাত্রে তোমার ঘর থেকে সে তোমার ছেলেকে নিয়ে গেল, তুমি মিদ্রিতা ছিলে, ঝঙ্কাঙ্কু শ্রাবণ নিশাথাকাশের মত আমার চোখে অশ্রুর বগা উথল উঠেছিল। ত যদি না হ'ত তা হ'লে পারতুম কি তোমায় সৃষ্টি করতে, তোমার কথা লিখতে কি পারতুম? তোমার মনের বেদনা আমার রেখাঙ্কিত ললাটে, আমার শার্ণ কপোলে; তোমার আশাহীন কালো চোখের দিকে চেয়ে বিশ্বস্রষ্টাকে আমিও রাতের পর রাত প্রশ্ন করেছি; উত্তর পেলুম না, কিন্তু শোকাতুরা মাতার দিবা মূর্ত্তি দেখলুম; তুমি ছিলে চঞ্চলা বালিকা, নিজ স্বার্থকামিনী, সুখাবেষণী, তুমি বদলে গেলে, নিজ সুখ-সম্পদের দিকে চাইলে না, তুমি হ'লে সেবিকা, পৃথিবীর সব মা-হারা সন্তানদের তুমি বুকে টেনে নিলে; তোমার দুঃখ বেদনা যদি না-জানতুম, তোমার কথা কি লিখতে পারতুম এমন ক'রে।

পুত্র-মৃত্যুপীড়িতা মাতা কোন উত্তর দিল না, দীপ্ত নয়ন দুটি অশ্রুতে অন্ধ হয়ে গেছে।

বিরহিণী অপরাজিতা বললে, অজিতকে ত মৃত্যুতে নিয়ে যাগনি, নিয়ে গেল এক ডাইনী, সে মায়াবিনীকে তুমিই ত আমাদের জীবনে আনলে, তোমার গল্প হয়ত বেশ জমল, কিন্তু আমার জীবন হ'ল বার্থ, শূন্য। তুমি তোমার উপন্যাসের একটা উপসংহার লেখ—অজিত বুঝতে পেরেছে

ইন্দ্রাণী মেকী, তার ক্লগিক রূপের মোহ ভেঙে গেছে, অজিত বুঝবে আমার প্রেম কত সত্য, আমি তার জন্য প্রতীক্ষা করছি, সে আমার কাছে ফিরে আসুক, তোমার উপন্যাসের কি সুন্দর শেষ হবে বল দেখি। বললুম,—আমার সমস্ত দেখছ না, অজিতকে তোমরা দু-জনেই ভালবাস, আমি কার সঙ্গে তার মিলন ঘটাই? অজিত যাকে ভালবাসবে, তার সঙ্গে মিলন হ'ওয়া ভাল নয় কি? তোমার সঙ্গে যদি অজিতের বিবাহ দিতুম আজ ইন্দ্রাণী এসে আমার প্রশ্ন করত, আমাদের মিলন কেন হবে না, আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসি? হয়ত তোমাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হয়ে যেত।

—মিথ্যা কথা, ইন্দ্রাণী কি অজিতকে আমার মত ভালবাসে! ও অজিতের টাকায় ভুলেছে।

—মানলুম, কিন্তু জীবনের বিপুল পথে মানব-দেহ-মনের লোভ মোহ ক্ষুধা বাসনা কামনা জ্বালাকে তুমি কোন নিয়মে নিয়ন্ত্রিত করতে পার? আমি দিতে পারি অজিতকে তোমার হাতে, কিন্তু তুমি রাখতে পারবে কি? দীর্ঘ বিচিত্র জীবনপথে কত নবীন ইন্দ্রাণী অজিতের হৃদয়-দ্বারে আঘাত করবে, অজিতের হৃদয় উদাস হবে, তার পায়ে শৃঙ্খল দিয়ে রাখতে পার, কিন্তু তার প্রেম পাবে কি? চাও তুমি তোমার বার্থ প্রেমের কাগারে তার অশান্ত বুড়ু দেহ-মনকে বন্দী ক'রে রাখতে?

—কেন সে আমার ভালবাসবে না? তুমি ত উপন্যাসে লিখতে পার, সে আমার মাপ্রাণ দিয়ে ভালবাসল, তুমি ত তাকে তেরনি ক'রে সৃষ্টি করতে পার।

—অজিতকে আমি তোমার প্রেমিকরূপেই সৃষ্টি করতে চেয়েছিলুম, আমি লিখতে চেয়েছিলুম, সত্যিকার প্রেমিক আজীবন অনুরক্ত স্বামীর কথা, আঁকতে চেয়েছিলুম আদর্শ গার্হস্থ্য-জীবন। কিন্তু মানুষের মন ত আমার হাতের পুতুল নয়, সে সজীব, সক্রিয়, অগ্নিগর্ভ, পর্কতগুহাবতীর্ণ! নদীধারার মত সে যে কোন্ পথে যাবে পুরানো পাড় ভাঙবে, নূতন তীর গড়বে, তার পথের নির্দেশ কে করতে পারে! সজীব মানুষ যখন আমার উপন্যাসে আসে তাকে ত শৃঙ্খলিত সামাজিক অনুশাসন-পীড়িত ক'রে আপন ইচ্ছা আদর্শ মত চালাতে পারি না,

সব বাধা শৃঙ্খল ভেঙে সে তার নিজ যাত্রাপথ ক'রে চলে, আমি তার পথচলার কাহিনী লিখি।

দোলানো-চেয়ার থেকে দীর্ঘ কক্ষ অক্ষিপন্ন কাঁপিয়ে মাধবী আমার দিকে চাইল। বললুম, মুর্ত্তিমতী বেদনার মত তুমি মুক বসে আছ, মাধবী, তুমি ত কিছু বলছ না, আমার আত্মার স্নগভীর বেদনা দিয়ে তোমায় সৃষ্টি করেছি, তুমি আমার প্রেমের কাহিনী জান। শোন, তোমরা আমার গল্প শোন :

আমি যখন কিশোর ছিলাম, এক কিশোরীকে ভালবেসেছিলাম, সে ছিল আমার জীবন-রূপকথার রাজকন্যা, তাকে ঘিরে রচতুম যৌবনস্বপ্ন, জীবন-মায়াজাল। কিন্তু সে স্নন্দরীর মন ছিল অন্তমনা, সে ভালবাসত আর এক যুবককে, আনমনা হয়ে সে বসে থাকত আমার পাশে। জিদ হ'ল জয় করব ওই কিশোরী-চিত্তকে। আমার প্রেমের সাধনায় সে মুগ্ধা হ'ল, তাকে জয় করলুম; যৌবনে তাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পেলুম। তারপর বাহির হলাম পৃথিবীর বিশপিতে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার লুটে আনতে হবে প্রিয়ার পদপ্রাপ্তে; সেখানে স্বর্ণের জন্ত হানাহানি, কাড়াকাড়ি, স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত, অর্থ-আহরণের প্রবল সংগ্রামে মেতে গেলুম। প্রথম যৌবনের প্রেম-বিহ্বল দিনগুলি স্বপ্ন হয়ে গেল, প্রিয়া যখন গান গায় আমার এশ্রাজ বাজাবার সময় হয় না, প্রিয়া যখন ছবি আঁকে, আমার রং গুলে দেবার অবসর কোথায়।

বাণিজ্য ক'রে আনলুম স্বর্ণ, বাণ্ডে তহবিল উঠল উপুছে। প্রিয়াকে সাজালুম, কর্ণে মুক্তার ছল, কর্ণে হীরার মালা, অঙ্গুলিতে নীলার অঙ্গুরীয়, কটিতে স্বর্ণময় কাঞ্চী, পদে মণির নুপুর।

গঙ্গাতীরে তৈরি করলুম বিচিত্র প্রাসাদ প্রিয়ার জন্ত। জার্মান দেশ হ'তে এল স্থপতি, ইতালী হ'তে এল বিচিত্র বর্ণের মর্ম্মরপ্রস্তর, চৈনিক কারিগর তৈরি করল গবাক্ষ, পারসিক রীতিতে নিশ্চিত হ'ল স্নানাগার।

প্রাসাদের চারিদিকে রমণীয় উদ্যান, পূর্বদ্বারে অশোক-বীথিকা, পশ্চিমে তালতমালশ্রেণী, উত্তরে পদ্মদীঘি, দক্ষিণে নীপবন, করবীকুঞ্জ।

কিন্তু প্রিয়ার মন রইল অনামনা, আনমনা হয়ে সে সুদূরে চেয়ে থাকে, প্রেমতৃষিত।

সেদিন সন্ধ্যায় পশ্চিমাকাশের বর্ণোৎসবে পৃথিবী রঙীন, হেনা-হাল্লাহানাকুঞ্জের গন্ধোচ্ছ্বাসে বাতাস মাতাল, নদীর জল কূলে কূলে ভরা। বিশপি থেকে গৃহে ফিরলুম; চন্দন-কার্ণের দ্বার খুলে পারদা কার্পেটমণ্ডিত অধিরোহনী অতিক্রম ক'রে প্রিয়ার কক্ষের দিকে গেলুম। সে সন্ধ্যায় প্রিয়া প'রেছিল মাধবী-রঙের শাড়ী, কর্ণে ছিল রজনীগন্ধার মালা; আমাকে দেখে প্রিয়া স্মিতমুখে, চকিত পদে এগিয়ে এল, শ্বেতপ্রস্তরের গৃহতল দর্পণের মত দীপ্তিময়, পদঙ্গুল ফুটে উঠল রক্তকমলের মত, কিন্তু প্রিয়ার মন ছিল আনমনা, কাচের মত মসৃণ মেজেতে পা গেল পিছলে, সে মুচ্ছিতা হয়ে পড়ল, শুভ্র মর্ম্মরে রক্তপদ্মের পীপড়ি ছড়িয়ে লুটিয়ে পড়ল; সে মুচ্ছী ভাঙল না, অন্তমনা হয়ে আমার গৃহে চলতে চলতে প্রিয়ার চরণ স্থলিত হ'ল, মৃত্যু এল।

পশ্চিমাকাশের বর্ণোৎসব শেষ হয়ে অন্ধকার এল, আমার অগণিত অশ্রুবিদু অনন্ত আকাশ ভ'রে জলে উঠল। সে-রাতে বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাকে যদি পেলুম, কেন তার ভালবাসা পেলুম না, তাকে এমন ক'রে কেন তুমি আমার কাছ থেকে নিয়ে গেলে? বোবা আকাশ কোন উত্তর দিল না।

উন্মাদ হয়ে প্রাসাদ ভেঙে দিলুম, প্রিয়ামৃত্যুবেদনা অহ্নিশি অন্তরে বহন ক'রে মহা উন্মাদনায় দেশ হ'তে দেশান্তরে যুরেছি। জীবনের সেই অপরিদ্রা়্য বেদনা-সমুদ্রে মগ্নন ক'রে তুমি এলে মাধবী, তুমি এলে তরুণ কবি রেবন্ত; তোমরা আনলে নবদৃষ্টি, নববাণী মানবজীবনে, সংসারের সুখছংখ, পৃথিবীর সৌন্দর্য্য নূতন চোখে গভীর ভাবে দেখলুম। আগে যাদের হৃদয়ের ব্যথা বুঝিনি, যাদের তুচ্ছ অবহেলা করেছি, তাদের বীরত্ব, তাদের মহত্ব দেখলুম, আত্মার নবজন্ম হ'ল। তুমি খনী, তুমি স্মৃতিতা, তুমি পাগল, তুমি ক্লাউন, তোমাদের সঙ্গে অন্তরের পরিচয় হ'ল, তোমাদের সমবথী হলুম। তোমাদের দুঃখের কথা লিখেছি, তোমার আত্মার সংগ্রাম বেদনার কাহিনী। প্রিয়াবিরহকাতর আমার অন্তর দিয়ে যা অনুভব করেছি তাই লিখেছি, আমি কথাশিল্পী,

তোমা দর ছুঁখে সমবেদনার কাঁদতে পারি, আমি দার্শনিক নই, মানবজীবনে ছুঁখের অর্থ কেমন ক'রে বলব? আমি শুধু বুঝেছি, অপরূপ এই পৃথিবী, মহান এই মানবজীবন।

আমি চুপ করলুম। ঘর-ভরা স্তব্ধতা কাঁপতে লাগল তেল-ফুরিয়ে-বাওয়া প্রদীপের শিখার মত। সঙ্গী বিশে-পাগল হাততালি দিয়ে চৈচিয়ে ব'লে উঠল—আমি পারি, আমি পারি বলতে, এস আমার সঙ্গ।

বিশে-পাগল পূর্বদিকের সবুজ পর্দা সরিয়ে আমার লাইব্রেরীতে যাবার দরজা খুলে দিলে। সবাই চমকে দাঁড়ালুম। লাইব্রেরীতে নটরাজ শিবের একটি মূর্তি আছে দেখেছ, বিশু মূর্তিটির দিকে ছুটে গেল, হাতজোড় ক'রে নতজান্ন হয়ে মূর্তির সামনে বসল।

চোখে চমক লাগল। মনে হ'ল, এ আমার লাইব্রেরী নয়, ভারতীয় কোন গুহামন্দিরের গর্ভগৃহের সম্মুখে আমি দাঁড়িয়ে, গর্ভগৃহের অন্ধকারে অগ্নিকাস্তি নটরাজ বিগ্রহ। গৃহের দ্বার শঙ্খপদ্মক্ষেপিত কারুকর্মাময় প্রস্তর-নির্মিত; দ্বারের দক্ষিণে গঙ্গা ও বামে যমুনার লাবণ্যময়ী মূর্তি উৎকীর্ণ, অমৃতনিধানিনী রূপ কঠিন প্রস্তর ভেদ ক'রে পদ্মের মত কুটে উঠতে চায়—জ্যোৎস্নাশুভ্র গঙ্গা তরুচ্ছায় মকরের ওপর বঙ্কিম ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে, এক হস্তে পূর্ণ জল-কুম্ভ, অপর হস্তে প্রফুটিত পদ্ম; নীলোৎপলবর্ণী যমুনা কুম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে, তার এক হস্তে চামর, অপর হস্তে নীলোৎপল।

গর্ভগৃহে দশদিকে ষোড়শ হস্ত প্রসারিত ক'রে অপরূপ নটরাজমূর্তি—দক্ষিণ হস্তগুলিতে ডমরু বজ্র শূল পাশ টঙ্ক

দণ্ড সর্প ও অভয়মুদ্রা; বাম হস্তগুলিতে অগ্নি খেটক ঘণ্টা কপাল খড়া পতাকা শুচিমুদ্রা ও গজহস্তভঙ্গী; পিঙ্গল জটাভারে অর্ক ধুতুরা পুষ্প, চন্দ্র, গঙ্গামূর্তি; কর্ণে মুক্তার হার, সর্প-হার, বকুলের মালা; বামস্বক্কে ব্যাঘ্রচর্ম্ম; কর্ণে কুণ্ডল; হস্তে পদে মণিমাণিক্যবিজড়িত বলয়; অগ্নি-শিখাবেষ্টিত পদ্মের ওপর দক্ষিণ পদ; নৃত্যচঞ্চল বামপদ শূণ্ণে স্থাপিত।

বিশে-পাগল অট্টমস্ত করলে—হাঃ হাঃ! পদ্ম-পীট ধিরে অগ্নিশিখা নেচে উঠল। চারিদিক অন্ধকার হয়ে এল। নটরাজ নৃত্য শুরু করলেন। নৃত্যের তালে তালে হস্তের নানা অস্ত্র দিকে দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগলেন। পরম বিশ্বয়ে দেখলুম নানা অস্ত্রের বদলে আমার গল্প-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার। তাঁর অগণিত হস্তে গুলিকার মত শোভিত। নটরাজ তাঁর ডমরু ছুঁড়ে ফেলে দিলেন আমার দিকে, যেন তিনি বললেন, আমার ডমরু তুমি বাজাও, আমি তোমার সৃষ্ট নরনারীদের নিয়ে নৃত্য মাতি। দেখলুম পুত্রশোকাতুর মাতা, চিরবিরহিণী প্রেমিকা, জীবনের হলাহলপায়ী পাগল, সবাই মেতেছে তাঁর হস্তে জন্মমৃত্যু স্মৃতিস্মরণের নৃত্যের উন্মাদনায়।

আকাশের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত বিসর্পিল গতিতে বিছাৎ চমকে গেল। অশনি-গর্জনে চমকে জেগে দেখি সিঁড়ির পাশে বারান্দায় বেতের লম্বা চেয়ারে শুয়ে আছি, আমার চোখে মুখে বৃষ্টির জল অঝোরে ঝরে পড়ছে, বাতাসে অন্ধকার আকাশ হা হা ক'রে উঠল।

তোমরা কি আমায় সে-রাত্রে মোটর থেকে ওই বারান্দায় চেয়ারে শুইয়ে দিয়ে গিয়েছিলে?

হুলিয়া সমাজ

শ্রীনির্মলকুমার বসু

পুরী হইতে দক্ষিণে যেখানে গোদাবরী নদী সমুদ্রের সঙ্গে মিশিয়াছে, সেইখান পর্যন্ত হুলিয়াদের বাস। উড়িয়া ভাষায় ইহাদের হুলিয়া বলিলেও ইহাদের প্রকৃত নাম ভিন্ন। ইহাদের মধ্যে একটি জাতির নাম ওয়াডা-বালিজি, অপরের নাম জালারি। আরও দক্ষিণে যে-সকল হুলিয়ার মত জাতি বাস করে তাহাদের নাম কালিজী। ওয়াডা-বালিজি এবং জালারিগণের মধ্যে ওয়াডা-বালিজিগণই অপেক্ষাকৃত ধনী। জালারিগণ অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও কৃশকায়। ওয়াডা-বালিজিগণ আগে সমুদ্রে জাহাজের কাজ করিত, এখন দেশী জাহাজের বাবসায় উড়িয়া গিয়াছে বলিয়া তাহারা অপরের মত মাছ ধর এবং তাহাদের মেয়েরা শহরে মজুরের কাজ করে। ওয়াডা-বালিজিদের জাতির মধ্যে সর্বপ্রধান ব্যক্তি হইলেন মান্দাসার রাজা মাইলিপিলি নারায়ণ স্বামী। তিনিও ওয়াডা-বালিজি জাতির লোক, এবং তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে সমস্ত প্রধান ওয়াডা-বালিজি গ্রামে গিয়া গ্রামের কয়েক বৎসরের জমা ঝগড়া-বিবাদ অথবা সামাজিক গণ্ডগোল মিটাইয়া আসিতে হয়। ওয়াডা-বালিজিদের পক্ষে মান্দাসার রাজাই সুপ্রীম কোর্ট বলা যাইতে পারে, তাঁহার উপরে আর আপীল নাই।

ওয়াডা-বালিজি অথবা হুলিয়াদের বসতির মধ্যে গঞ্জাম জেলায় গোপালপুরের মত পুরীও একটি প্রধান জায়গা। এখানে প্রায় ৫০০ ঘর হুলিয়ার বাস; তাহা ছাড়া জালারি হুলিয়াও কিছু আছে। হুলিয়াদের মধ্যে একটি বংশের বিশেষ আদর আছে। তাহাদের নাম অঙ্ক। এই বংশের লোকের নাম এইরূপ হয়—অঙ্ক করলান্দা, অঙ্ক রামাইয়া ইত্যাদি। হুলিয়াদের গ্রামে অঙ্ক পলান্দা প্রধান দেবী। সেই দেবী নাকি অঙ্ক-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য অঙ্ক-বংশের পুরীতে এত সম্মান আছে।

পুরীর হুলিয়-বস্তির শাসনভার গ্রামের একজন অগ্রণীর হাতে আছে; তাহাকে “উর-পেডা” বলা হয়। তাঁহার একজন কার্যাধক্ষ বা “কারিজি” আছে এবং তত্পরি একজন চাপরাসীও আছে, তাহার নাম “সান্সিটোডু”। অঙ্ক-বংশের লোকেরা একটি বিশেষ পরিবার হইতে ‘উর-পেডা’কে নির্বাচন করেন। নির্বাচন সিদ্ধ হইলে উর-পেডা মান্দাসার রাজার নিকট হইতে একটি সম্মতিপত্র পান। অঙ্ক-বংশের লোকেরা যদি কোন উর-পেডা নির্বাচন করিতে না পারে, তাহা হইলে গ্রামের লোকসাধারণ নির্বাচনের সে ভার গ্রহণ করিয়া থাকে। উর-পেডা যদি নিজের কাজ ঠিকমত না করেন, তাহা হইলে গ্রামের লোক তাঁহাকে সরাইয়া সেই পদে নূতন লোক বাহাল করিতে পারে; তবে নূতন লোকটি উরপেডার বংশের লোক হওয়া চাই। একবার পুরীতে হইয়াছিলও তাই। শেষে মান্দাসার রাজা পুরীতে আসিলে তাঁহার কাছে অনেক কারুটি-মিনতি করিয়া, সাধারণের কাছে ক্ষমা চাহিবার পর তবে পুরাতন উর-পেডাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল।

উর-পেডার কাজ আগে হয়ত অনেক বেশী ছিল। কিন্তু অনেকাংশে এখন দণ্ডের ভার ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের হাতে চলিয়া যাওয়ায় তাহার কাজ অনেক কমিয়া গিয়াছে। বিবাহ, সামাজিক ক্রিয়াকর্ম, যথা—গ্রামদেবতার পূজা প্রভৃতিতে যোগ দেওয়াই এখন তাহার প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উর-পেডা, কারিজি এবং সান্সিটোডুর কাজ আজীবন থাকে। তাহারা মারা গেলে লোকে পুনরায় তাহাদের পদে লোক নির্বাচন করিয়া দেয়।

হুলিয়াদের গ্রামে যে ষাট শত ঘরের কথা বলা হইয়াছে গ্রামের সাধারণ কাজে তাহাদের একত্র হইতে দেখা গেলেও বিবাহ সম্পর্কে এই ৫০০ ঘরের মধ্যে একটি বিচিত্র ভাগ দেখা যায়। হুলিয়াদের বাড়িগুলি ছোট।

সচরাচর তাহাতে দু-তিয়টি বর থাকে। একটি বরে স্বামী-স্ত্রী এবং ছোট ছেলেমেয়েরা শোয়, অপরটিতে সংসারের কাজকর্ম এবং রান্নাবান্না হয়। আর একটি অন্ধকার কুটুরীর মধ্যে দেবতা ও পূর্বপুরুষদের বেদী থাকে এবং তাহা ছাড়া জাল ও অন্যান্য আবশ্যিক জিনিষপত্রও রাখা হয়। বড় ছেলেরা বাড়ির বাড়িরে বারান্দায় শুইয়া থাকে। একটু বড় হইলেই মেয়েদের বিবাহ হইয়া যায়, তাহারা স্বতন্ত্র ঘর করিয়া থাকে। বাপ মারা গেলে সকল ভাই বাড়িতে অধিকার পায় বটে, কিন্তু বাড়ি এত ছোট যে, তাহাকে ত ভাগ করা চলে না। তখন বড় ভাই সেই বাড়ি অধিকার করিয়া অন্য ভাইদের অন্যত্র বাড়ি তৈয়ারী করিয়া দেয় বা যথাসাধ্য তাহাদের জন্য খরচ জোগাইয়া থাকে।

বাপ হইক, গ্রামের মধ্যে বিভিন্ন ভাগের কথা বলিতেছিলাম।

পূর্বীর হুলিয়া-বসতিটি সামাজিক ক্রিয়া-কর্মের জন্য তেরটি ভাগে বিভক্ত। এই সকল বিভাগকে বিরিসি বলে। বিরিসির নিয়ম হইল যে বিরিসির মধ্যে যেকোন ঘরে যদি একটি বিবাহ হয় তাহা হইলে বিরিসির যেন সকলকে সেই বাড়িতে খাটিয়া দিতে হয়। বিরিসির অধিবাসিগণ একান্নবর্তী পরিবার। বিবাহের করদিন বিবাহ-বাড়িতেই তাহারা খায়দায়, কাজ করে এবং আনন্দ করে।

হুলিয়াদের মধ্যে বিবাহ সচরাচর অল্প বয়সে হয়। বরের বয়স সতের-আঠার এবং কনের বার-তের; ইহাই সাধারণ নিয়ম। তবে কদাচিৎ পাঁচ-ছয় বৎসরের ছেলের সহিত তিন-চার বৎসরের মেয়ের বিবাহ হয়। উপর পক্ষে বরের আঠার-উনিশ এবং কনের পনের-ষোলর বেশী বয়স বাড়িতে দেখিয়া হয় না।

বরের পিতাই প্রথমে কথা পাড়েন। যদি কন্যাপক্ষ রাজি হয় তখন বাগদানের অনুষ্ঠান হয়। সেই দিন কয়েক জন ভদ্রলোককে লইয়া বরের পিতা কনেকে

গহনা পরাইতে যান। কনের বাড়িতে সকলে বসিলে কনের বাপ তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সে বিবাহে রাজি আছে কি-না। মেয়ে যতই ছোট হউক না কেন, তাহার অনুমতি না লইয়া বাগদান কিছুতেই নিষ্পন্ন



অধিকৃণের চারিদিকে ঘুরিয়া নৃত্য

হইতে পারে না। যদি সে রাজি না হয়, তাহা হইলে কনের পিতা বরপক্ষের কাছে মাপ চান, আর একদিন আসিতে বলেন এবং ইতিমধ্যে কনেকে যথাসাধ্য বুঝাইয়া রাজি করিতে চেষ্টা করেন। ইহা হুলিয়া সমাজের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। স্ত্রীলোকদের আসন আমাদের সমাজের চেয়ে সেখানে আরও উচ্চ, সেইজন্য স্ত্রীলোকের অনুমতি বিনা বিবাহ নিষ্পন্ন হয় না। যদি অনুমতি ব্যতিক্রম করিয়া কোন পিতা বিবাহ দেন তাহা হইলেও শেষে সে বিবাহ ভাঙিয়া দেওয়া যাইতে পারে, এমনও দেখা গিয়াছে। কিন্তু সে কথা পরে হইবে।

যাহা হউক, কন্যা রাজি হইলে সমবেত ভদ্রলোকদের সম্মুখে বরের পিতা তাহাকে সম্পূর্ণ দানের গহনা পরাইয়া দেন, এবং তখন কনের মা সমবেত ভদ্রলোকদের হাত-পা জল দিয়া ধুইয়া দেন। ইহাই হইল বাগদানের পর্ব বরকর্তা তখন সমবেত ভদ্রলোকদের তিন টাকা করিয়া ও কন্যাকর্তা দুই টাকা করিয়া প্রণামী দেন। তাহার পর



দুই জন তুলিয়া

বরকর্তা মেয়ে লওয়ার খেসারৎ-স্বরূপ কন্তাকর্তাকে নয় টাকা দিয়া থাকেন। বাড়ির একজন কাজের লোক চলিয়া বাইতেছে, ইহারই খেসারৎ নয় টাকা; সে টাকাকে কন্তাবিক্রয়ের মূল্য বলিয়া ধরিবার কোন কারণ নাই।

বাগ্দানের পর নান্যেক অর্থাৎ জ্যোতিষীর সাহায্যে তিথি, লগ্ন ইত্যাদি ঠিক করিয়া বিবাহের দিন ধার্য হয়। বিবাহের তিন দিন বরের বাড়িতে বিরিসির সমস্ত লোক এবং উর-পেড়া, কারিজি ও সান্নিটোডুর পাত পড়ে। বিবাহ বরের বাড়িতে হয়, কনের বাড়িতে হয় না। কনের বাড়িতে তাহার বিরিসির লোকের জন্ত পাত মাত্র একদিন পড়ে, তাহার বেশী নয়।

দে-রাত্রি বিবাহের কাণ্ড আরম্ভ হয় সেদিন উর-পেড়া বরের কাছিতে একটি হলুদ ও একটি পান মৃত্যু দিয়া বাঁধিয়া দেন। তাহার পরদিন তাহ সঙ্গ করিয়া বিরিসির একটি মেয়ে হলুদ বাটা, হলুদ কাপড়, তিলের তেল, কুঙ্কুম, নারিকেল, দর্পণ প্রভৃতি লইয়া সান্নিটোডু বা গ্রানের চাপরাসীকে সঙ্গ করিয়া কনেকে বাপের বাড়ি হইতে আনিতে যায়। কন্তা শ্বশুরবাড়ির কুঙ্কুম ও কাপড় পরিয়া, গায়ে হলুদ মাখিয়া বরের বাড়িতে পহুঁচায়। বাড়ি হইতে আসিবার সময়ে সে আঁচলে কিছু চাল এবং একটি আঁস্ত নারিকেল লইয়া আসে। এই অবস্থায় সে বরের বাড়িতে সম্মুখের দরজা দিয়া না চুকিয়া খিড়কি দরজা দিয়া প্রবেশ করে।

এইবার বরকর্তার কামান এবং স্নানের জন্ত মেয়েরা

দূরে কোনও পুষ্করিণী বা নূরা হইতে জল আনিতে যায়। জল আসিলে বর ও কনেকে নারিকেলপাতা-ছাওয়া শামিয়ানার তলার পিঁড়িতে বসাইয়া নাপিত নখ কাটি চান করাইয়া দেয়। বর ও কনের বিরিসির মেয়ে উভয়ের গায়ে তেল, হলুদ এবং বিরি কলাই বাটা মাখাইয়া তাহাদের স্নান করাইয়া দেয়। বরকনের সম্মুখে ধান ও উজ্বল রাখা হয় এবং ভবিষ্যতে কনেকে যে ধান ভাঙি সংসার চালাইতে হইবে এখানে তাহারই ইঙ্গিত করা হয়।

ইহার পর ব্রাহ্মণ আসে। তুলিয়াদের কাজকর্ম শুধু এইখানেই ব্রাহ্মণকে দেখা যায়। মৃতুর পর তাহাদের মধ্যে বৈষ্ণব আসে, ব্রাহ্মণ আসে না। কিন্তু ব্রাহ্মণ না হইলে বিবাহ নিষ্পন্ন হয় না। ব্রাহ্মণ বর কনেকে পাশাপাশি বসাইয়া একবার বরের হাত কনের হাতের উপর রাখিয়া মন্ত্র পড়ে, আবার কনের হাত বরের হাতের উপর রাখিয়া মন্ত্র পড়ে। তাহার পর উর-পেড়া অর্থাৎ গ্রামের অগ্রণী বরের মাথায় একটি পাগড়ী বাঁধিয়া দেয় এবং ব্রাহ্মণ বর এবং কনে দুজনের গলায় দুইটি পৈতা পরাইয়া দেয়। পৈতা হয় এইভাবে কিছুক্ষণের জন্য বরকনেকে ব্রাহ্মণা ধরে অভিবিক্ত করা হয়।

পৈতার পর ব্রাহ্মণ কুশ দিয়া উভয়ের হাত বাঁধিয়া দেয়। সন্ধ্যা ও পূজাদির পর বরের কাপড় ছাড়াইয়া ধোড়ায় চড়াইয়া উভয়কে গ্রামের মধ্যে একবার ঘুরাইয়া আনা হয়। কনে সামনে বসে, বর পিছনে। কিন্তু কনে বড় হইলে সচরাচর বরের সঙ্গে হাঁটিয়া যায়। উভয়ে খুরিয়া আসি-

মারিকেলমণ্ডপে উভয়কে বসাইয়া গাঁটছড়া বাঁধা হয়। তাহার মধ্যে দুইটি সুপারি ও দুইটি পয়সা থাকে। তাহার পর বর ও কনে উভয়ে আঁচলে চাল লইয়া পরস্পরের মাথার উপর তাহা ছড়াইয়া দেয়।

এইবার বরকনে দেখিবার পাল। উভয় পক্ষের বন্ধু-বান্ধব বরকনের মুখ দর্শন করিয়া কেহ এক টাকা, কেহ দুই টাকা, কেহ তিন টাকা দিয়া আশীর্বাদ করিয়া যায়। ইহাতে এত টাকা জমে যে, সাপাগোড়া বিবাহের খরচ ইহাতেই উঠিয়া যায়। কিন্তু সমাজের নিয়ম অনুসারে কে কত দিল তাহার একটু হিসাব রাখিতে হয়। তাহার পর তাহার বাড়িতে আবার বিবাহের সময় ঠিক তত টাকা দিয়া সেখানে আশীর্বাদ করিয়া আসিতে হয়। এইভাবে একজন লোক হয়ত দশ

বাড়িতে দশ বৎসরের মধ্যে একশত টাকা দিয়াছে। তাহার সুবিধা হইলে, সে আবার নিজের বাড়ির কাজের সময়ে সেই টাকা এবং হয়ত কিছু বেশী টাকা ফেরৎ পায়। লৌকিকতার এই প্রথাটি কতকটা বিবাহ ইনসিওরেন্সের মত ব্যাপার। ইহার ফলে বিবাহের খরচটা মুলিয়াদের কোন দিন গায়ে লাগে না। কেবল দানের গণনাপত্রের খরচটা বরপক্ষকে অল্প ভাবে সোগাইতে হয়।

যাহা হউক, বিবাহের পরদিন খুব ঘটনা করিয়া বরকনেকে শহর ঘুরান হয়। ফিরিয়া আসিলে বরের ছোটভাই দাদার ও বৌদির পথ আগলাইয়া দাঁড়ায়। সে নানারকম আপত্তি করে, ঠাট্টা করে, শেষে দাদার কাছে বিবাহ দেওয়াইবার প্রতিজ্ঞা পাইলে দ্বার ছাড়িয়া দেয়। ঘরে ঢুকিয়া বরকনেকে একটি ঘড়ার মধ্য হইতে সোনার ও রূপার আংটি খুঁজিতে দেওয়া হয়। যে সোনারটি পাইবে তাহার বরাত ভাল, এবং যে রূপার পাইবে তাহার অপেক্ষাকৃত মন্দ বলিয়া মুলিয়াদের বিশ্বাস।

বিবাহের তিনদিন বাদ দিয়া একটি ভাল যোগলগ

দেখিয়া বর খণ্ডরবাড়িতে যার এবং সেখানে তাহার স্ত্রীকে রাখিয়া চলিয়া আসে। কিছু কাল পরে তাহার স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহের সংস্কার হইলে তবে সে তাহাকে ঘরে আনিয়া সংসার করে।

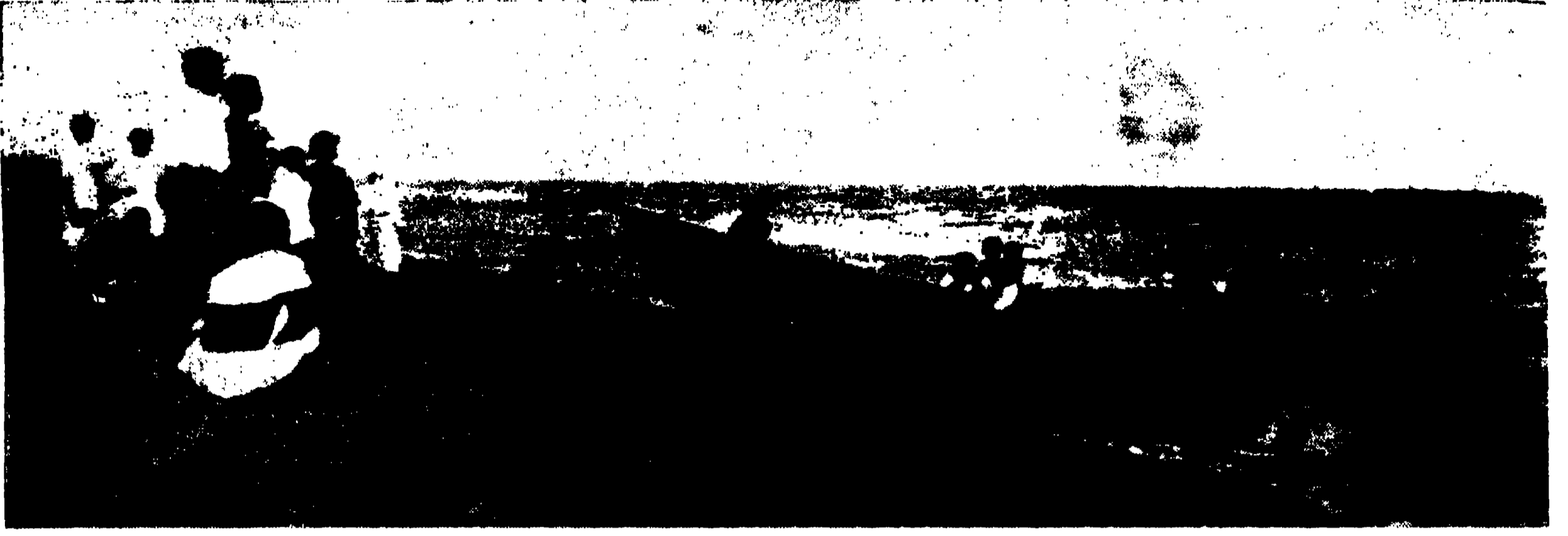
ইহাই হইল মুলিয়াদের বিবাহের সাধারণ নিয়ম।



সমুদ্রে বড় জাল ফেলার আগে পোতা

কিন্তু বিধব অথবা তাল্লা স্ত্রীর সঙ্গিত যখন বিবাহ হয়, তখন এত ঘটনা কোনদিনই করা হয় না। তখন শুধু কয়েকজন ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া কুকুম, বস্তাদি লইয়া বরকনাকে তাহার পিত্রালয় হইতে লইয়া আসেন, তাহাতেই বিবাহ সিদ্ধ হয়।

মুলিয়াদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ আছে। বিচ্ছেদের জন্য ক্রীশ্চান আইনের মত কোনও দোষ দেখাইবার দরকার হয় না। পরস্পরের মনের মিল নাট, এমন কারণেও বিবাহবিচ্ছেদ হইয়া থাকে। কিন্তু কোন পক্ষ বিচ্ছেদ চাহিলে পক্ষায়েৎ ডাকিয়া পক্ষায়েতের ফি পনের টাকা দিতে হয়, এবং সে পক্ষ বিচ্ছেদ চায় তাহাকে আরও পঞ্চাশ টাকা অপর পক্ষকে খেসারৎ-স্বরূপ দান করিতে হয়। কিন্তু যদি পক্ষায়েতের বিবেচনায় বিচ্ছেদের যথেষ্ট কারণ থাকে, তাহা হইলে কোনও টাকা নাও লওয়া যাইতে পারে। ধরা যাউক, স্ত্রী স্বামীর মারধর সঙ্গিতে না পারিয়া বিচ্ছেদ চাহিতেছে। তখন হয়ত তাহার সমস্ত জরিমানা মাপ করা হয়। এমন কি তাহার পয়সা না থাকিলে পক্ষায়তী পাওনা পনের টাকা পর্যন্ত মকুব করিয়া দেওয়া হয়।



শীতকালে ব্যবহৃত বড় নৌকা

যে সকল ক্ষেত্রে জরিমানা হয়, সেখানেও এককালীন টাকা দিতে হইবে এমন কোনও কথা নাই। অনেক ক্ষেত্রে কিস্তিবন্দীতে টাকা দিবার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই সকল সুবিধা থাকার জন্য পুরীর হুলিয়া-বস্তিতে প্রতি বৎসর চার-পাঁচটি করিয়া বিবাহবিচ্ছেদ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার ফলে তাগদের বিবাহিত জীবন যে অসুখী তাহা বলা যায় না। বরং তাহারা মোটের উপর বর্ণহিন্দুদের চেয়ে সুখে সংসার করে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

হুলিয়াদের মধ্যে বিধব-বিবাহও প্রচলিত আছে। বিধবা স্বাধীনভাবে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে স্বামীর পুত্রকন্যা ছাড়িয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে হয় এবং যাইবার সময়ে সে পিতৃগৃহে গইতে যে গহনা আনিয়াছিল, শুধু তাহাই লইয়া যাইতে পায়। পুত্র স্বামীর, স্ত্রীর নহে। এই জন্য স্বামী বর্তমানে যদি কোনও স্ত্রীলোক বিবাহবিচ্ছেদ ঘটায় তাহা হইলে তাহাকেও পুত্রকন্যা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়। তবে শিশু থাকিলে সে তাহাকে সঙ্গে লইয়া যায়, এবং যতদিন না শিশু বড় হয়, ততদিন নিজের কাছে রাখিতে পারে। বড় হইলে তাগকে পূর্বস্বামীর গৃহে পাঠাইয়া দিতে হয় এবং তখন সে পুত্রের পিতার নিকট এতদিনের ভরণ-পোষণের ভাষা মূল্য গ্রহণ করিয়া থাকে।

বিবাহবিচ্ছেদ হইলে বা বিধবা অন্তত্বে বিবাহ

করিলে তাহার স্বামীর সম্পত্তির উপর সকল অধিকার চলিয়া যায়। বিধবা কিন্তু ইচ্ছা করিলে দেবরের সহিত স্ত্রীরূপে বাস করিতে পারে। একরূপ বিবাহ সমাজে সিদ্ধ হইলেও তাহার যে খুব প্রচলন আছে তাহা মন প্রয়ো না। দেবরের বিধবা ভ্রাতৃবধুর উপর কোনও দাবি নাই। অপরে তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে দেবর যে কিছু খেসারৎ পাইবে তেমন কোনও নিয়ম নাই। যাহা হউক, একরূপ বিবাহ যে হুলিয়াসমাজে প্রচলিত আছে, ইহা দেখানই আমাদের উদ্দেশ্য।

বিধবাবিবাহের মত বহুবিবাহের নিয়মও হুলিয়াসমাজে বর্তমান আছে। প্রথম স্ত্রীর সন্তান না হইলে আইনতঃ হুলিয়ারা দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে বটে, কিন্তু তৃতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে না। তখন একজনের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাইয়া তবে সে অপর স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে। এক সঙ্গে দুই জনের বেশী স্ত্রী থাকিতে পারে না, কিন্তু তাহাও ঘটনাক্ষেত্রে খুব বিরল বলা যাইতে পারে। কেবল একটি ক্ষেত্রে পুরীতে এইরূপ বিবাহ হইয়াছিল, তাহারই কথা বলিতেছি। তাহা হইতে হুলিয়াসমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থার অনেকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ঘটনাটি বেশী দিনের নয় এবং তাহার নায়কেরা সকলেই আমার সুপরিচিত। সেইজন্য প্রকৃত নাম গোপন রাখিয়া ঘটনাটি বিবৃত করিতেছি। পলাশা নামী কোনও

একটি বালিকা রামাইয়া নামক এক ব্যক্তিকে বিবাহ করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া উঠে। রামাইয়ার বিবাহ পূর্বেই হইয়া গিয়াছিল এবং সে স্ত্রী লইয়া সুখেই সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতেছিল। উভয় পরিবারের কর্তাদের মধ্যে কিছু সন্দেহ ছিল না, এমন কি যথেষ্ট মনোমালিন্য ছিল বলা যাইতে পারে। পলান্দ্রা সুন্দরী এবং ধনী সন্তান, সুতরাং তাহার পাত্রের অভাব হয় নাই। কিন্তু সেই যে সে রামাইয়াকে বিবাহ করিবে বলিয়া খরিয়া বলিল, তাহাকে আর কিছুতেই টলান গেল না। তাহার পিতা তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন, অনেক তপস্বী করিলেন, শেষে মারধরও করিলেন, কিন্তু কিছুতেই ফল হইল না।

অবশেষে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া কস্তার অসম্মতি সত্ত্বেও তাহার অনাত্র বিবাহ দিলেন। কিন্তু পলান্দ্রা কিছুতেই স্বামীর বাড়ি যাইতে না। অবশেষে পঞ্চায়েৎ সে-বিবাহ ভাঙিয়া দিতে বাধ্য হইল, পলান্দ্রার পিতা বরপক্ষকে দাবতীয় দানের সামগ্রী ফিরাইয়া দিলেন।

এদিকে পলান্দ্রা যাহাতে রামাইয়ার সঙ্গে দেখা করিতে না পারে, তাহার জন্য তিনি সতত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহাকে অন্য গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু সে রহিল না। তখন তিনি রাত্রে, বিশেষ করিয়া আমোদ-উৎসবের রাত্রে, বাড়ির চারিদিকে লাঠি লইয়া পাহারা দিতেন। এমনি ভাবে কিছু দিন গেল। কিন্তু পলান্দ্রা রামাইয়ার বাড়িতে খবর পাঠাইল যে, যদি তাহার বিবাহ না দেওয়া হয় তবে সে জোর করিয়া সেখানে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিবে, তাহাতে লোকে যাই বলে বলুক না কেন। গ্রামের লোক অবশেষে রামাইয়ার পিতার দ্বারা বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইল। পলান্দ্রার পিতা ত প্রস্তাব গুলিলেনই না, উপরন্তু ভদ্রলোকদের অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

ইহাতেও কিছু হইল না। ইতিমধ্যে রামাইয়ার পুত্র স্বীয় কন্যার ছুঃখের দিন আসিতেছে ভাবিয়া তাহাকে নিজের কাছে লইয়া গেলেন, আর পাঠাইল না। রামাইয়া বহু চেষ্টাতেও স্ত্রীকে আনিতে না পারিয়া শেষে একদিন সবাঞ্চবে খণ্ডরের বাড়ি হইল। খণ্ডর তাহার নির্দোষিতা গুলিয়াও কিছুতেই

কন্যাকে পাঠাইতে স্বীকৃত হইলেন না। উপরন্তু পঞ্চায়েৎ ডাকিয়া বিবাহবিচ্ছেদের প্রস্তাব করিলেন।

রামাইয়ারও ইচ্ছা নাই, তাহার স্ত্রীরও সম্পূর্ণ আপত্তি ;



তেপাকাটি বা ভেলা

তবু কিছু শেষ পর্য্যন্ত পূরা টাকা দিয়া অনেক করিয়া রামাইয়ার মুখ দিয়া বাহির করা হইল যে সে বিবাহ ভাঙিয়া দিতে প্রস্তুত আছে। বিবাহ ভাঙিয়া গেল, রামাইয়া যথেষ্ট টাকা পাইল, কিন্তু সে সে-সকল কিছু না লইয়া তাহার স্ত্রীকে দান করিয়া চলিয়া গেল। পুরী যাইতেছে বলিয়া গেল, কিন্তু শেষে তাহার এক বন্ধুর পরামর্শে পান্ডবর্তী গ্রামে গিয়া সে কয়েকদিন বাস করিল। সেইখানে থাকিতে থাকিতে অবশেষে একদিন তাহার স্ত্রীর সহিত গোপনে চরের সাহায্যে যড়যন্ত্র করিল। তাহার স্ত্রী পিতামাতার কাছে শাস্তিশিষ্ট ভাবে কয়েকদিন থাকিয়া একদিন ভিন্ন গ্রামে হাটে যাইবার অহুমতি চাহিল। হাটে অবশ্য গেল, কিন্তু হাট হইতে সে স্বামীর সহিত পলায়ন করিল এবং তাহার পর হইতে আর পিত্রালয়ের দিকে যায় নাই।

রামাইয়ার স্ত্রী পলান্দ্রার প্রেমের কথা সবই জানিত, কিন্তু তাহাতেও তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। এদিকে পলান্দ্রার হ্রিদ ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। শেষে বাস্তবিকই একদিন সে রামাইয়ার বাড়ি আসিয়া বাসা বাঁধিবে যখন এমন ভয় দেখাইল, এবং গ্রামের লোকজনও তাহাকে ধরাধরি করিতে লাগিল, তখন বাধ্য হইয়া তাহার পিতা বিবাহে স্বীকৃত হইলেন।

রামাইয়ার পিতা লোকজন পাঠাইয়া নুতন স্ত্রীকে গ্রহণ করিলেন এবং সেই অবধি উভয়ে একত্র বাস করিতেছে। যতদূর জানি উভয়ের মধ্যে কোন কলহ নাই এবং উভয়ে সুখে বাস করিতেছে।

এরূপ ঘটনা হুলিয়ার সমাজে বিরল হইলেও উহা হইতে সে সমাজে নারীর স্থান অনেকাংশ বুঝা যায়। পিতামাতার যেমন জোর করিয়া বিবাহ দিবার অধিকার আছে, নারীরও তেমনই সে অধিকার ভাবিবার ক্ষমতা আছে। সমাজের মর্যাদা রক্ষার দিক পিতামাতার যেমন দৃষ্টি আছে, সামাজিক ঠাঁট বসায় রাখিবার জন্ত তাহাদের যেমন চেষ্টা আছে, মানুষকে সুখী করিবার, তাহার স্বাধীনতাকে স্বীকার করিবারও তেমনই একটা ইচ্ছা সমাজের দিকেও

বর্তমান রহিয়াছে। ইহাতে নারীকে যেমন মর্যাদা দিয়াছে, তেমনই তাহার চরিত্রকে স্বাভাবিক ভাবে পুষ্ট হইবার আরও সুযোগ দিয়াছে।

ইহার সাক্ষাৎ কারণ আবিষ্কার করা বোধ হয় খুব কঠিন নয়। হুলিয়ারা মাছ ধরিয়া বাহা রোজগার করে তাহা মদ খাইতে, মাথের জিনিষপত্র কিনিতে ও মহাজনের পাওনা মিটাইতে খরচ হইয়া যায়। বাস্তবিক সংসার চালান মেদেরো। তাহারা মজুরি করে, ইট বহিষ্ণ, বালি বহিষ্ণ করে পরসাদা আনে এবং সেই পরসাদা সংসারের খরচপত্র চলে। অল্পের জন্ত তাহারা স্বামী উপর নির্ভর করেন। এরূপ ক্ষেত্রে তাহাদের স্বাধীনতা সমাজেও যে স্বীকৃত হইবে ইহাতে বিচিত্র কি?

এই কালো মেঘ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

এই কালো মেঘ ডেকেছিল মোরে
নগরের গৃহপথে ;
ভাল করে চোখে চিনিবার আগে
ফিরে গেছে দ্বার হাতে !
সঙ্গীসাপীরা ধূলায় ধোঁয়ায়
ধিরে রেখেছিল তারে,—
সহজ কণ্ঠে শুনিতে দেয়নি
বিচিত্র চীৎকারে ।

সেই মেঘ ফিরে এসেছে আমার এ
পল্লীর আঙিনায়,
উর্ধ্ব আকাশে সেই পরিচিত
ধ্বনিখানি শোনা যায় ;
এপার-ওপার একশা করিয়া
নীলা নদীটির কূলে
শ্রামল রূপের ছায়াখানি কাঁপে
এলায়িত কালো চূলে !

বেগুন-শিরে সজল সমীরে
ঝিমায় দিনের আলো,
কালো ফলে-ভরা জামের শাখায়
ঘনায় দ্বিগুণ কালো ;
বেতসের গায়ে জাগে রোমাঞ্চ
ছল ছল নদীতীরে,
দর্দুরদল করে কোলাহল
তুণপবন ধিরে ।

সেই চেনা হৃদ শ্রবণে পশিরা
মাতায়ে তুলিল মন,
সেই চেনা রূপ জানাল আবার
রসের নিমন্ত্রণ !
নিমেষের মাঝে পরবাসী হয়ে
ধরবাসী এই মনে
নিয়ে যেতে চায় অন্ন-পাথর
অমরার নন্দনে !

পরাণদোসর ওগো বারিধর,
মিনতি তোমায় প্রিয়,
নয়নের সাথে পরাণের পাতে
বিছাও উত্তরীয় ।
ছুটাও হরৎ-রস-কদম্ব
ছুটাও গো পরিমল,
ডধরু স্বরে চিত্তকুহরে
ভূলাও নাগিনী দল ।

চলচঞ্চল বলাকার দল—
—শতদলে গাঁথা মালা—
ঐ কালো বুকে হারায় যেমন
ভুলে বন্ধন-জ্বালা,
তেমনি এ মন ও রস-সায়রে
ডুবিয়া মরিতে চায়,—
ডুবাও তাহারে—বাঁচাও তাহারে—
মিনতি তোমার পায়

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম-তারিখ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাইকেল মধুসূদন দত্তের যে-ছবিগানি উৎকৃষ্ট জীবনী আছে, সে-ছবিগানিই বহু তথ্যে পরিপূর্ণ। স্মরণে রাখার সম্বন্ধে নূতন কোথাও কথা শুধাইবার ভরসা রাখা অপেক্ষার মতই শোনায়। তবু আমার মনে এর মাইকেলের জীবনের খুঁটিমাটি বিষয়ে নূতন আলোকপাত করা এখনও অসম্ভব নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আজ একটি প্রশ্নের উত্থাপন করিব। সে প্রশ্ন—মাইকেলের জন্ম-তারিখ কি?

সকলেই বলেন, মাইকেলের জন্মের তারিখ—২৫ জানুয়ারি ১৮২৪ (১২ই মাঘ ১২৩০, শনিবার)। শোনা যায়, এই তারিখ তাঁহার কোষ্ঠী হইতে পাওয়া। কিন্তু চরিত্রকারদের কেহ এই কোষ্ঠী স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন কিনা তাহা আমাদের জানা নাই। মাইকেলের এই জন্ম-তারিখ যে মিথ্যুল নহে তাহার দুইটি প্রমাণ দিতেছি।—

(১) মাইকেলের প্রচলিত জন্ম-তারিখ—“২৫ জানুয়ারি ১৮২৪ (১২ মাঘ ১২৩০, শনিবার)।” কিন্তু ২৫ জানুয়ারি হইলে বাংলা তারিখ ১২ই মাঘ শনিবার নয় না;—সে ১৩ই মাঘ রবিবার। ইংরেজী ও বাংলা তারিখের সামঞ্জস্য নাই, স্মরণে এই জন্ম-তারিখের কোথাও-যা-কোথাও একটা ভুল আছে।

(২) মাইকেল ১৮৩৭ সনে হিন্দু-কলেজের জুনিয়র স্কুলে প্রবেশ করেন—ইহাই সকলের জানা আছে। ১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে মাইকেলের জন্ম হইয়া থাকিলে, ১৮৩৭ সনে হিন্দু-কলেজে প্রবেশকালে তাঁহার বয়সক্রম অন্ততঃ ১৩ বৎসর ছিল। কিন্তু ১৩ বৎসর বয়সে মধুসূদন হিন্দু-কলেজের জুনিয়র স্কুলে প্রবেশ করিতে পারেন না; কারণ এই বিভাগে ৮ বৎসরের কম এবং ১২ বৎসরের বেশী বয়স্ক ছেলেকে প্রবেশ করিতে দিবার নিয়ম ছিল না।—

“The [Hindu] college is divided into a junior and

senior school. In the former, boys not less than eight, and not more than twelve, are admitted...”(Asiatic Journal for Sept. Dec. 1832. Asiatic Intelligence—Calcutta, pp. 114-115.)

তাহা হইলে মাইকেল নিশ্চয়ই ১৮৩৭ সনের পূর্বে হিন্দু-কলেজের জুনিয়র স্কুলে প্রবেশ করিয়াছিলেন।



মাইকেল মধুসূদন দত্ত

তবে মাইকেলের জন্ম-সন কি, এবং কোন্ সনেই বা তিনি সর্বপ্রথম হিন্দু-কলেজে প্রবেশ করেন? এই দুইটি বিষয়ে আমার বক্তব্য নিবেদন করিতেছি।—

(১) মাইকেলের জন্ম-সন ১৮২৪ নহে,—আমার মনে হয় ১৮২৩ হইবে। তিনি ১৮৪৪ সনের নভেম্বর মাসে বিশপ্‌স্ কলেজে প্রবেশ করেন। এই সময় তাঁহার বয়স ২১ বৎসর ছিল। পাদরি লং তাঁহার *Hand-Book*

of Bengal Missions etc (1848) পুস্তকের ৪৫৭ পৃষ্ঠায়—
খুব সম্ভব বিশপ্‌স্ কলেজ রেজিষ্টার হইতে—নিম্নাংশ উদ্ধৃত
করিয়াছেন :—

List of the Students connected with Bishop's
Collojo in 1846.

Name.	Date of Admission.	Age. yrs. m's.	On what Endowment.
Mudhu Suden Dut	Nov. 1844	21	Lay Student.

স্পষ্ট জানা যাইতেছে, ১৮৪৪ সনের নভেম্বর মাসে
বিশপ্‌স্ কলেজে প্রবেশকালে মাইকেলের বয়স ছিল ২১
বৎসর। ইহা দ্বারা তাঁহার জন্ম-সন ১৮২৩ পাওয়া যাইতেছে।
তাঁহার সমাধি-স্তম্ভেও এই জন্ম-বৎসর খোদিত আছে।

উদ্ধৃত অংশ হইতে আরও একটি সঠিক তারিখ পাওয়া
গেল। আমরা এখা জানিতে পারিলাম যে মাইকেল
বিশপ্‌স্ কলেজে প্রবেশ করেন ১৮৪৪ সনের নভেম্বর মাসে—
১৮৪৩ সনে নহে।

(২) প্রচলিত জীবনচরিতগুলির মতে, মাইকেল
১৮৩৭ সনে হিন্দু-কলেজের জুনিয়ার স্কুলে প্রবেশ করেন।
কিন্তু মাইকেল যে ইহার অন্ততঃ চার বৎসর পূর্বে হিন্দু-

কলেজে শিক্ষার্থী ছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। ১৮৩৪
সনের ৭ই মার্চ কলিকাতার টাউন-হলে হিন্দু কলেজের
ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ হয়। এই উপলক্ষে মাইকেল
একটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন। এই পুরস্কার-বিতরণী
সভার বিবরণ সেকালের সাপ্তাহিক পত্র 'সমাচার দর্পণে'
পাওয়া যায়। ১৮৩৪ সনের ১২ই মার্চ তারিখের
'সমাচার দর্পণে' পাইতেছি :—

ষষ্ঠ হেনরি ও গাষ্টর			
ষষ্ঠ হেনরি।	ঈশ্বরচন্দ্র খোমাল।
গাষ্টর।	মধুসূদন দত্ত।

জানা গেল, ১৮৩৪ সনের মার্চ মাসে মাইকেল হিন্দু
কলেজে শিক্ষার্থী রূপে ছিলেন। ইহার পূর্বেই—সম্ভবতঃ
১৮৩৩ সনে, তিনি হিন্দু-কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন।
পূর্বেই দেখাইয়াছি, মাইকেলের জন্ম-সন ১৮২৩ হওয়া
উচিত। তাহা হইলে তিনি হিন্দু কলেজের জুনিয়ার
স্কুলে আনুমানিক ১০ বৎসর বয়সে প্রবেশ করিয়াছিলেন,
প্রচলিত জীবনীগুলিতে যে ১৩ বৎসর বয়সের কথা আছে
তখন নয়।*

* ১৩৪১/১৪ই আষাঢ় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাইকেল
মধুসূদন দত্তের স্মৃতিসভায় পঠিত।

শ্যামল-রাণী

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

মিত্রিরদের মেয়ে সুধা আজ বছর দুই পরে বাপের বাড়ি
আসিল। গিয়াছিল যখন—একা। আজ পাল্কি হইতে
নামিল—কোলে নদীর পুতুলের মত একটি শিশু। সাত
বছরের ছোট বোন শৈল আফ্লাদের চোটে হাততালি
দিয়া উঠিল, বলিল,—“দিদিকে ঠিক ওপর-বরের পটের
গণেশ-জন্মদীর মত দেখতে হয় নি মা?—যেটা নতুন
টাঙান হয়েছে?...না-গো বৌদি?”

সুধা মাকে আর ভাজকে প্রণাম করিয়া হাসিয়া
বলিল—“গণেশ-জন্মদীর মা তবুও বছরের শেষে একবার
ক'রে তাঁর মেয়েকে.....”

—গলা ভারী হইয়া গেল, চোখ ডবডব করিয়া উঠিল,
ঠোটে হাসিটা কিন্তু লাগিয়াই রহিল। বাপের বাড়ি
আসার মিশ্র অনুভূতি,—একটুতেই হাসি ধৌত করিয়া
অশ্রু উছলিয়া ওঠে।

খোকাকে বুকে লইয়া, চুমা খাইয়া, মা আঁচলে চেপে
দুইটা মুছিয়া বলিলেন—“মা'র কি অসাধ বাছা?...মা সাত-
সমুদ্র-তের-নদীর-পারে দিয়েচি...তারপর—ভালছিলি সুধা?
ওমা, এটা কি চমৎকার হয়েছে গো! ছেলেবেলাতে তুই
ঠিক এই রকমটি ছিলি,—বেশ মনে আছে কি-না...”

মেয়ের আদারের সঙ্গে নতুন মায়ের গরবের স্বর

মিশাইয়া সুধা বলিল—“তুমি ত বলবেই। আমি কিন্তু অমন দস্তি ছিলাম না বাপু, কক্ষনই না। আমায় ত নাজেহাল ক’রে দিয়েচে। সামলান কি সোজা?”

ভাজ ততক্ষণ খোকাকে লইয়াছে। একটু একান্তে ঠোট টিপিয়া বলিল—“একটিতেই?”

ননদ-ভাজের মধ্যে এক ধরণের চোখোচোখি হইয়া গেল। শৈল খোকার দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল—“দাঁও আমার কোলে বৌদি, আমি ত মাসী হই?”

খোকাকে দিয়া বৌদিদি হাসিয়া বলিল—“হ্যাঁ, ক্ষুদে-মাসী।”

সুধাও হাসিয়া উঠিল। ছোট ভাই-পো মস্ত মার পেছনে, আঁচল টানিয়া দিয়া অপ্রতিভ ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, আর পিসীর সহিত পটের গণেশ-জননীরা সাদৃশ খুঁজিয়া হয়রাণ হইতেছিল; সুধা তাহাকে কোলে লইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—“হ্যারে খোকা, পিসীকে ভুলে গেলি? ...দেখচ মা ছেলের বেইমানি?—আর এই পিসি এক দণ্ড না হ’লে চলত না।”

মস্ত ছুটিয়া পলাইয়া শৈলের পাশে গিয়া দাঁড়াইল এবং যাইতে যাইতে শিশুর দিকে চাহিয়া, নিজের মনোগত সমস্তার একটা মীমাংসা করিয়া লইয়া বলিল—“খোকা ঠিক পটের গণেশের মত মোটা হয়েছে, না মেজপিসী?”

খোকার মাসী চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, মার পানে চাহিয়া ভীতস্বরে বলিয়া উঠিল—“শুনলে মা?—খোকা নাকি গণেশের মত মোটা হয়েছে!...এই বেঙ্গতিবারের বারবেলা ছেলেটাকে খুঁড়লে!—বাট, বাট...”

তাহার রকমখানা দেখিয়া মা, সুধা, বৌদিদি, তিন জনেই হাসিয়া উঠিল।

সুধা বলিল—“রোববারের সকাল একেবারে বেঙ্গতি বারের বারবেলা হ’য়ে গেল! ঠিক সেইরকম গিন্নী আছে শৈলী, না মা?—বরং আরও বেড়েচে।”

বৌদিদি হাসিয়া বলিল—“তোমার জায়গা দখল করেছে; বাড়িতে একটি থাকা চাই ত, নইলে গরু, বেরাল, পায়রা—এদের সংসার কে দেখবে বল?”

হুই বৎসর পূর্বে পর্য্যন্ত সেই ব্যাপারই ছিল। আজ সে-কথার উল্লেখে একটু লজ্জা করিয়া আসিল বটে, কিন্তু

সুধা আগ্রহটাও দমন করিতে পারিল না; দ্বিজ্ঞাসা করিল—“পায়রাগুলো বিদেয় ক’রে দিলেচ নাকি মা? পুসীটার এবারে ক’টা ছানা হ’ল? আর শ্যামলী?—তার বাছুরটা কেমন হ’ল?...যাক, একটা সাধ মিটবে এবার, শ্যামলীর দুধ খেয়ে যাব। ভাবতেও কি রকম হয়, না মা?—এই সেদিনকার শ্যামলী, এতটুকু বাছুর, বাড়ি এল—সিঁহুর, হনুদ দিয়ে গোয়ালে তোলা হ’ল, আর আজ তার নিজেরই বাছুর!...”

বৌদিদি যেন ওৎ পাতিয়া ননদের কথাগুলি শুনিতো-ছিল, এই পর্য্যন্ত আসিলে একটু অর্থপূর্ণ হাস্তের সহিত সংক্ষেপে বলিল—“ওই রকমই ত হয়।”

বাড়িতে আসিয়া পড়িয়াছে। প্রবেশ করিতে করিতে সুধা আকারে-নালিশের সুরে বলিল—“দেখচো মা বৌদিকে?”

অল্পক্ষণ পরেই স্বস্তরবাড়ির বউমানুষের ভাব আর মাতৃহের গাঙ্গীর্ষা যাহ একটু লাগিয়া ছিল, সুধার দেহ-মন থেকে একেবারে অপসৃত হইয়া গেল। জামা কাপড় ছাড়া, বাক্সপত্তর গোছান সব তুলিয়া সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুসীটাকে প্রথমে তল্লাস করিয়া বাহির করিল, এক আঁজলা চাল উঠানের মাঝখানে ছড়াইয়া দিতেই পায়রাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে নামিয়া বকবকম আওয়াজ করিয়া ভোজের মধ্যে সংস্কৃত-উদগারী পণ্ডিতদের মত এক মহাসমারোহ লাগাইয়া দিল। সুধা তাহাদের সামনে রকে পা ছড়াইয়া বসিয়া পুসীকে কোলে চাপড়াইতে চাপড়াইতে সুর করিয়া ছড়া কাটিতেছিল—

‘সারা ভারত বাড়ি বাড়ি ঘণ্টাঠাকুর ব’য়ে
একেবারেই হ’ল পুসীর সাতটি ছেলেমেয়ে,
বর দাঁড়াল শাপে গিয়ে, অন্ন দেওয়া ভার...

এমন সময় বোনপোকে পাড়ায় একটু টহল দেওয়াইয়া শৈল আসিয়া উপস্থিত হইল, পেছনে পেছনে দুটি বেরালছানা। সুধার কাছে পরিচয় করাইয়া দিল—“পুসীর ছানা; একটি শেয়ালের পেটে গেছে; তবুও কি একবার ঘুরে দেখে? যুয়ে আগুন মায়ের, ওকে আর আদর ক’রো না, দু-চক্ষের বিষ। মা-ঘণ্টা কি দেখে যে ওকে দেন অতগুলি ক’রে।...হ্যাঁ দিদি, এই ছেলে হ’ল তোমার ছেঁটু?”

খোকান মাখাটা নিজের কাঁধে চাপিয়া চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিল—“এমন ঠাণ্ডা ছেলে এ-তল্লাটে দেখাক-দিকিন কেউ ! বাছা আমার মাসী বলতে অজ্ঞান।”

মা, বৌদিদি, সুধা তিন জনেই হাসিয়া উঠিল। সুধা বলিল—“আচ্ছা মা, পাঁচ মাসের একটা শিশু,—সে ওকে কখন মাসী বললে বল দিকিন ?—আবার বলতে অজ্ঞান হয়ে গেল।”

মা বলিলেন—“মাসী হ’য়ে ও-ই জ্ঞানরহিত হয়েছে—কি যে করবে, কি বলবে...”

শৈল তাহার মাসীত্ব লইয়া এমন ‘ব্যাখ্যানায়’ অপ্রস্তুত হইয়া খোকাকে রকে বসাইয়া হুড়-হুড় করিয়া পলাইতে-ছিল। ছয়ারের নিকট হইতে হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া সঙ্গুস্তভাবে বলিল—“ও দিদি ! শীপ্পির পুসীকে নামিয়ে খোকাকে কোলে নিয়ে ভবাসবি হ’য়ে ব’স ;—তোমার সই, সই-মা, ও-পাড়ার সতী-পিসি—একপাল সব দেখতে আসচে তোমায়—দাও নামিয়ে—দিলে ?...”

সুধা ধীরেহুস্বে বাটি থেকে একমুঠা চাল উঠানে পায়রার ঝাঁকের উপর ছড়াইয়া দিয়া বলিল—“বয়ে গেচে আমার ; শ্বশুরবাড়ির ক’নে বউ নাকি ?”

গাড়ীতে সমস্ত রাত্রি জাগার জের,—বিকাল হইয়া গেলেও সুধা অঘোরে নিদ্রা দিতেছিল। শৈল আসিয়া হস্তদস্ত হইয়া তাহাকে ঠেলিয়া উঠাইল—“ও দিদি, শামুলী ফিরে এসেচে, তার বাছুর দেখ’সে ; কি চমৎকার যে হয়েছে, এ-তল্লাটে এমন বাছুর কেউ যদি...”

মা ধমক দিয়া উঠিলেন—“না, এ-তল্লাটে যা-কিছু এক তোদেরই আছে।...দেখ’দিকিন, সমস্ত রাত ঘুমোয় নি মেয়েটা, মিচিমিচি এসে তুললে !”

শৈলের মনে দিদির আর খোকান আসার সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে একটা তোড় নামিয়া গিয়াছে ; কিন্তু সেটা যেন নিজের বেগেই সব জায়গায় ধাক্কা খাইয়া মরিতেছে। উৎসাহের মুখে মার নিকট ধমক খাইয়া বেচারি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল, দিদির কথায় আবার সামলাইয়া উঠিল।—উঠিতে উঠিতে সুধা হাসিয়া বলিল—“ভাগিয়াস্

শৈলী তুললে মা !—স্বপ্ন দেখছিলাম—খোকাকে না দেখে শ্বশুরের যেন ভীমরতি দাঁড়িয়ে গেচে ; এসে বলচেন—‘এক বছর হ’য়ে গেল বৌমাকে পাঠিয়েচি, কতদিন আর রাখা চলে?’...যাবেনই নিয়ে...তোমরা হাতে ধ’রে কাকুতিমিনতি ক’রে বলচ—‘এই ত মোটে আজ সকালে এসেচে বেইমশাই...কে শোনে ?...সেজেগুজে কাঁদতে কাঁদতে বেরুচ্চি—এমন সময় শৈলী...’

শৈল চোখ দুটো বড় বড় করিয়া একেবারে তদগত হইয়া গুণিতেছিল ; উল্লাসে হাততালি দিয়া নাচিয়া উঠিল—“দেখ, কেমন আমি দিদিকে বাঁচিয়ে দিয়েচি ; যদি না...”

তাহার পর সবার হাসিতে নিজের তুলটা বুঝিতে পারিয়া, একেবারে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া দিদির কোলে মিশিয়া গেল।

সুধা বলিল—“চল, ও’, দেখিগে।”

নামিতেই খোকা জাগিয়া উঠিল। “দেখেচ ? ওর টনক নড়ে, কোথাও যদি এক-পা যাবার জো আছে।”—বলিতে বলিতে খোকাকে তুলিয়া লইল, ভাজের দিকে চাহিয়া বলিল—“বৌদি তুমিও এস ভাই।”

“হাতের পাট-টা সেরে আসচি, তুমি এগোও।”—বলিয়া সে পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

শামুলী গোয়াল ঘরে তৃপ্তির গাঢ় নিঃশ্বাসের সঙ্গে জাব্বনা খাইতেছিল, আর মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া সামনের খোলা জায়গায় চঞ্চল, উৎক্লিপ্যমান বৎসটির পানে চাহিয়া এক-একটা হৃদয় অথচ গভীর আওয়াজ করিয়া নিজের বাৎসল্য-স্নেহ প্রকাশ করিতেছিল। সুধা সামনে আসিয়া বলিল—“কি লা শামুলী, চিনতে পারিস ?...ওমা, কত বড়টা হয়ে গেচে গরুটা !”

শামুলী নাদা হইতে ঘাড়টা বাহির করিয়া জাব্বনা চিবাইতে চিবাইতে প্রশ্নকর্ত্রীর পানে একটু চাহিল, তাহার পর হঠাৎ মুখনাড়া বন্ধ করিয়া দু-পা আগাইয়া আসিয়া সুধার ডান হাতটা সুদীর্ঘ টানের সঙ্গে চাটিতে আরম্ভ করিয়া দিল। বুকের নিকট হইতে একটা অবাস্ত, ভরাট আওয়াজ বাহির হইয়া আসিতে লাগিল এবং

প্রবল নিঃশ্বাসে মুখের ওপরের জাব্‌নার কুটাকাটিগুলো সুধার শাড়ীর উপর উড়িয়া সাঁটিয়া যাইতে লাগিল।

খানিকক্ষণ জিবের আঁচড় সহ করিয়া সুধা হুড়হুড়িতে ঘাড়টা কুঞ্চিত করিয়া বলিল—“ওরে থাম্, বাছুর চেটে তোর যা জিব হয়েছে, আমার এক পরদা চামড়া উঠে গেল...দেখ কাণ্ড, আবার খোকাকে চাটতে যায়!”

হাসিয়া হু-পা পিছাইয়া গেল। শ্যামলী বাগ্‌ভাবে একবার দড়িতে টান দিয়া ঘাড়টা নাড়িয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে বাছুরটার উপর নঙ্গর পড়ায় “স্তা!” করিয়া ডাক দিয়া উঠিল এবং বাছুরটা ছুটিয়া আসিলে কিছুক্ষণ আগন্তুকদের ভুলিয়া, সপ্রেমে তাহার গা-টা ঘন ঘন একচোট চাটিয়া দিয়া আবার স্থস্থির হইয়া দাঁড়াইল।

সুধা চোখমুখ কৌতুকে বোঝাই করিয়া বাছুরের সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যান করিতে যাইতেছিল, হু-একটা কথা বলিয়া দিদির দিকে চাহিতেই থমকিয়া গেল। দিদি ডানহাতের তর্জ্জনীটা গালে চাপিয়া, নিতান্ত বিষ্ময়ে ঘাড় কাৎ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; বলিল—“দেখলি শৈলী, কাণ্ডটা!”

শৈল এমন কিছু কাণ্ড দেখিতে পায় নাই যাহাতে দিদির এতটা ভাবান্তর হইতে পারে। প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল, তাহার পূর্বেই সুধা শুরু করিয়া দিল—“দেখলি না ঠেকারটা?—চাটতে দিলাম না তাই স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে—তোমার খোকা আছে, আমার নেই? এই দেখ...কেমন ডাকলে, কেমন কোলে টেনে নিয়ে চাটতে লাগল!...হ্যাঁ! শ্যামলী, গেরস্তকে এতদিনেও একটা নই-বাছুর দেওয়ার মুরোদ হ'ল না, উণ্টে আমার সঙ্গে টেকা দিতে এলি! মুয়ে আগ্গুন, ব্যাটা-বাছুরের আবার গুমোর কি লা?—কি কাজে লাগবে? কদিনই বা কাছে ধ'রে রাখতে পারবি? আমার এই সোনার টাদের সঙ্গে তুলনা হ'ল কিনা...”

বৌদিদি আর মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৌদিদি হাসিয়া বলিল—“কি কথা হচ্ছে গো পুরনো সইয়ের সঙ্গে?”

দিদির কথাবার্তা শুনিবার পর শৈল শ্যামলীর ব্যবহারে দিদির চেয়েও ক্ষুব্ধ ও বিষ্ময়ান্বিত হইয়া গিয়াছিল, বড় বড় চোখ করিয়া আরম্ভ করিল—“ব'ললে পেত্যায় যাবে

না মা, দিদির কোলে খোকাকে দেখে শ্যামলী ঠেকার ক'রে...”

কোন ফাঁকতালে হঠাৎ ছেলেবেলার সুধা আসিয়া তাহার মুক সখীর সঙ্গে মুখের আলাপ জমাইয়া তুলিয়াছিল, সরমের স্পর্শে আবার অন্তর্হিত হইয়া গেল। নদীর মধ্যে হঠাৎ যেন ঝরণার উচ্ছলতা আসিয়া পড়িয়াছিল।... শৈলকে ধমক দিয়া সুধা বলিল—“হ্যাঁঃ, গরুর নাকি আবার ঠেকার হয়!—পাগলের মত যা তা ব'কিস্ নি শৈলী।”

শ্যামলীর কাণ্ডর চেয়ে দিদির কাণ্ড আরও হুর্কোথা বলিয়া বোধ হইল; শৈল অপ্রতিভ হইয়া হ'ল করিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুধা মাকে কহিল—“বলছিলাম মা, শ্যামলীর শেষে ব্যাটা-বাছুর হ'ল? ‘নই’ হ'লে নিয়ে যেতাম আমি। খণ্ডর কি ভাল একটা নাকি ওষুধ জানেন, খাওয়ালে নাকি নই-বাছুর হ'তেই হবে...হাস্চ বৌদি, কিন্তু একেবারে নাকি পরীক্ষিত, নড়চড় হবার জো নেই।”

মাও না হাসিয়া পারিলেন না, বলিলেন—“তিন বার ত ‘নাকি’ বললি, অথচ নড়চড়ও হবার জো নেই; খণ্ডর তোর ভারি গুণী ত!”

সুধা লজ্জায় ‘যাও’—বলিয়া মুখ ফিরাইল।

ভাজ বলিল—“তার চেয়ে তুমি শ্যামলীকে নিয়ে যাও না ঠাকুরঝি, ঠাকুর-জামায়েরও পণ রক্ষা হয়.....”

সুধা ঘাড় নীচু করিয়া বাড়ির দিকে পা বাড়াইয়া বলিল—“না বাবু, আমি চললাম, খাণ্ডী-বউয়ে এক-জোট হ'য়ে আমার পেছনে লাগলেন সব।”

সে একটা আলাদা কাহিনী, বিবাহের সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়ান। যতই বড় হইতেছে তাহার লজ্জাটা সুধাকে ততই যেন অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে।

শর্দীর বিবাহ-সংক্রান্ত বিল লইয়া সারা দেশটায় সামাল সামাল রব পড়িয়া গেল; লোকে বলিল—কালাপাহাড় এবার কলম হাতে করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে। সে আজ প্রায় চার-পাঁচ বৎসরের

কথা ; সুধা আট পারাইয়া ন'য়ে পড়িবে। ছপরে সরকারদের চণ্ডীমণ্ডপে যখন গ্রামের মাতঙ্গরদের মধ্যে আসন্ন ধর্মবিপ্লব লইয়া সূচ্যগ্র আলোচনা চলিতে থাকে, সে তখন তাহাদের নূতন গোয়াল-বরের পিছনে লিচুগাছের ছায়ায় খেলাঘর পাতিয়া জীবনের মাঝখানে বিচরণ করিতে থাকে। হালদারদের নিমাই হয় কর্তা, সে হয় গিন্নী, ছ-বছরের শিশু শৈল হয় মেয়ে। পুসী বেরালটা তখন বাচ্চা, চারখানা ইটের একটা ছোট্ট ঘরে কাপড়ের পাড়ে বাধা থাকিয়া অসহায় ভাবে বসিয়া থাকে। 'মিউ মিউ' করিয়া শব্দ করিলে সুধা বিব্রত হইয়া বলে—“ওদিকে গরুটা ডেকে ডেকে সারা হ'য়ে গেল, কোন্ দিকটা যে সামলাই...”

সই বউমা হয়। নিমাইয়ের ভাই ননী প্রায়ই অস্থিত ভোগে, যেদিন আসিতে পারিল সেদিন সে হয় বাড়ির ছেলে, সই-বৌমার বর। দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকিলে সইকে নূতনদের খাতিরে বিধবা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়।

আসন্ন সংসারে যে-সব কথা হয় নকলে তাহার প্রতিধ্বনি ওঠে।—সুধা রান্না করিতে করিতে কড়ায় খস্তির ছই তিনটা ঘা দেয়, উনানের মধ্যে কাঠটা একটু ঠেলিয়া দিয়া ঘুরিয়া বসে এবং হাটু ছইটা মুড়িয়া ডাকে—“বলি হাগা, শুনচ?”

নিমাই আসিয়া উপস্থিত হয়, জিজ্ঞাসা করে—“কথাটা কি?”

সুধা তাহার গাফিলতিতে তেলে-বেগুনে জলিয়া যায় ; নিজের গৃহিণীত্ব ভুলিয়া বলিয়া ওঠে—“নাঃ, তোমায় শিথিয়ে শিথিয়ে পেয়ে উঠলাম না নিমুদা ;—বাবার মত হাতে ছ'কো কই?”

ছেলেটা বড় ভুলো-মন, খুঁজিয়া-পাতিয়া ছ'কাটা লইয়া আসে। একটা পেপের ডাঁটার নীচের দিকটা একটু ছেঁদা-করা, মাথায় একটা কলুকে-ফুল বসান। একখানা ইট পাতিয়া তাহার উপর বসিয়া প্রশ্ন করে—“কি বলছিলে?”

“বলিলাম আমার মাথা আর মুণ্ড ;—নাকে তেল দিয়ে সব ঘুমুচ, সরকার বাহাদুর যে এদিকে জাতকুল নিয়ে টানাটানি লাগিয়েচে—হিঁছয়ানি যে যেতে বসল।

শুনচি নাকি মেয়েদের আর বাইশ বছরের কমে বিয়ে দিতে দেবে না?”

কর্তা নিমু বলে—“বাইশ না আঠার?”

“বড় তফাৎ! আজ আঠার, কাল পালটে বাইশ ক'রে দেবে। বলি সুধীটার কথা ভাবচ?”

“আট বছরের শিশু, ওর কথা আর কি ভাববো? শুনচি জেলায় এই নিয়ে একটা মিটনি হবে; গ্রাম থেকে ডালঘেঁটে পাঠাবার জন্তে তারণ খুড়োর কাছে লোক এসেছিল...”

সুধা আরও গভীর হইয়া বাধা দিয়া বলে—“বাইরের লোক তোমার জাত বাঁচাবে সেই ভরসায় আছ? তোমাদের ঘটে কি একটুও বুদ্ধি...”

তাহার কড়া চোখ দেখিয়া নিমাই একটু থতমত খাইয়া যায় ; তাহা ভিন্ন নিজে একটু হাঁদা বলিয়া কথাটা তাহাকে সাক্ষাৎভাবে আঘাতও করে। আমতা আমতা করিয়া একটু নীচু হইয়া বলে—“হাঁঃ, বুদ্ধি নেই কে বললে?—খালি ঐ কথা।”

রাগের চোটে সুধা পিড়া ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলে—“তোমার দ্বারা হবে না নিমুদা, তুমি বাড়ি যাও। ‘যে মেয়েমানুষের দশ হাত কাপড়ে কাছা ছোটে না, সে আবার বুদ্ধির খোঁটা দেয়’—রেগে এইখানে এই কথাটা বলতে হবে না? শুনলে না সেদিন বাবা মাকে বললেন?”

সুধার মুক্তি দেখিয়া নিমাইয়ের নিজেরই কাছাকোঁটার ঠিক থাকে না। কোন রকমে কাপড়টা সামলাইয়া লইয়া বলে—“আচ্ছা আচ্ছা, বলচি, বোস ; তোর মা কিন্তু ও-রকম রেগে কই হয়ে ওঠে না সুধী, তা বলে দিচ্চি ; তোকে নিয়ে ঘর করা বড় শক্ত।”

এই সময় একদিন সুধার বাপ রামরতন বাবমারীর হাট থেকে শ্রামসীকে কিনিয়া আনিলেন। ইহাতে যে শুধু পুসী বেরালটা গাভী হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ব'লিল তাহাই নয়, খেলাঘরের ঘরকরণার পদ্ধতিতেও অনেক পরিবর্তন ঘটিল।

রান্নাবান্না, ঘর ঝাট দেওয়া, জল তোলা—এসবের

পাট উঠিয়া গিয়াছে ; এখন কঠা গিন্নী, ছেলে বউ সকলে শ্যামলীর পিছনে হররাণ ;—কোথায় নধর ঘাস জন্মাইয়াছে, কোঁচড় ভরিয়া তুলিয়া আনা ; কে কোথায় গাছ কি ডাল কাটিয়াছে, পাতা সংগ্রহ করা ; ওদিকে গ্রামে সবার বাগানে যে কি হইয়াছে,—নেউল তাড়ানো চুনদাগা হাড়িতে আর কাজ হয় না। নিমাই ত সুধাকে তুষ্ট করিবার এমন সুবর্ণ সুবোগ পাইয়া একেবারে মাতিয়া উঠিয়াছে ; এতদিন স্থলে যে সময়টা নষ্ট হইত তাহারও বহলাংশ এখন শ্যামলী-পরিচর্যায় সাধক হইয়া উঠিতেছে। এই সব করিয়া যে সময়টুকু উর্বৃত্ত হয় তাহাতে সুধা সকলকে গো-তরু শিক্ষা দেয়।

বলে—“তোমরা যে মনে কর মশাই, ওরা আসল গরু, বুদ্ধিহীন নেই—তা নয়। সব বোঝে—দেখ না কি রকম করে আমাদের কথা শুনে?...সত্য যুগে ওরা কথাও কহিত...”

ননী বলে—“ওরা ত ভগবতী !”

বাংলার মহাহাশের সহিত সুধা বলে—“হ্যা ভগবতী, তা বলে কি লক্ষী-সুস্বতীর মা ভগবতী?—তাঃ নয় ; ও অস্তরকম ভগবতী। হ্যা, কি বে বলছিলাম—সত্য যুগে ওর কথাও বসত, তার পর কোন মুণির শাপে বোবা হয়ে যায়। অনেক কালেকাটির পর মুণি বলেন—“আচ্ছা বা, তোদের কোন কষ্ট হবে না—তোদের বুদ্ধি একটু মাহুকের মাথায় সঁদ করিয়ে দিচ্ছি—তোদের নিজের জাত যেমন তোদের ইসারা বুঝবে, মাহুকেও সেইরকম বুঝতে পারবে। কাছে গেলে শ্যামলী যখন তোমার হাত চাটে তখন তোমার ও বুঝতে বাকী থাকে না যে ঘাস-পাত তুলে আনতে বলে—সে কেমন করে বোঝা মশাই? যখন...”

ভক্তিমান ননী বলে—“আর গরু ত স্বর্গ, ওদের গায়ে তেত্রিশ কোটি দেবতা থাকেন।”

সুধা বলে—“থাকেনই ত ; মুখে বেঙ্গা থাকেন, মাথায় জগন্নাথ থাকেন, স্নাজে কার্তিক থাকেন...”

সই করুণাপরবশ হইয়া বলে—“আহ, কান্তিকের বড় কষ্টভাই ; সন্মদ স্নাজ ধরে ঝুলতে হয়...”

সুধা বলে—“চুপ, বলেতে নেই।” তাহার পর নিমাইয়ের পানে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হানিয়া বলে—“আর অত্যা দেবতা থাকেন বলেই ত গরুর জন্তে চুরিচুরি করলে কোন

দোষ হয় না, বরং পুণ্যই হয়। এই দেখ না, একটা পিপড়ে মারলেও কত পাপ হয় ত?—কিন্তু মা-কালীর সামনে পাঠা-বলি দিলে কোন দোষ হয় কি?”

যুক্তিটা অকাটা ; ইঙ্গিতটাও অস্পষ্ট নয়,—ফলে নিমাইদের গোয়াল হইতে কোঁচড় ভরা খোল কুঁড়ো, কলাই হাজির হইয়া শ্যামলীর উদরে প্রবেশ করে। সইও সাধ্যমত পুণ্যসঙ্কে মনোবোগী হইয়া ওঠে।

এদিককার খবর সংক্ষেপত এই—

জেলায় মিটিং হইয়াছিল ; হরবিলাস শর্দাকে যথাযোগ্য গালাগালির পর ছেলেদের বিবাহযোগ্য বয়স যোল এবং মেয়েদের বারো ধার্য্য করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সরকারদের চণ্ডীমণ্ডপে এর তুমুল আলোচনা হইয়াছিল, তাহাতে হরবিলাস শর্দা এবং জেলার উকিল ও অস্তান্ত উদ্যোক্তাদের যথাযোগ্য গালাগালির পর ছেলেদের নূনতম বয়স চোদ্দ এবং মেয়েদের দশ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ও-পাড়ার তিনকড়ি-খুড়ীর বাড়িতে উৎকট রকমের এক মেয়ে-মিটিং বসিয়াছিল, তাহাতে হরবিলাস শর্দা, গবর্ণমেন্ট বাহাদুর, জেলার উকিল এবং সরকারদের চণ্ডীমণ্ডপে যাহারা তামাক পোড়ায় সকলকেই একশাটে ‘ভাগাড়ে’ দেওয়া হইয়াছে। গ্রামের নানারূপ কেছাকাহিনী আলোচনার পর সকলের মনের বোঝা হাক্সা হইলে ধার্য্য হইয়াছে যে, ইহাদের পূরাপূরি মতিচ্ছন্ন হইবার পূর্বেই বয়স-নির্কির্শেষে গ্রামের সমস্ত অনুচ্চা কস্তাকে পাত্রস্থা করিয়া জাতকুল বাঁচাইতেই হইবে ;—‘তা বর কানা হোক, ধোঁড়া হোক, নুলো হোক, কুঁজো হোক, মস্তুরটা কোনরকমে আউড়ে দিতে পারলেই হ’ল...’

বিবিবাবস্থার বখেট অভাব থাকিলেও ছপুরের এই মহিলা-মজলিসই সাধারণত জাতির ভাগা নিয়ন্ত্রিত করে ; বিশেষ করিয়া মজলিসের কর্ণধার যদি তিনকড়ি-খুড়ীর মত কেহ থাকেন। পাড়ায় পাড়ায় কস্তা-মহামারী পড়িয়া গেল।

কয়েক দিন পরের কথা। বিকালে সুধা বাগানের এক

কোণে শ্রামলীর গলা জড়াইয়া আদর করিতেছিল—
“শামলী শুধলী শ্রামলরাণী, তুমি আর কারুর নয়
সোনামণি...”

শ্রামলী তাহার সমস্ত পিঠখানি চাটিয়া-চাটিয়া বোধ
হয় জানাইতেছিল—না, আমি আর কাহারই নয়, একান্ত
তোমারই...

এমন সময় মা আসিয়া বলিয়া উঠিলেন...“দেখ
কাণ্ডখানা! সমস্ত পাড়া তোলপাড় ক’রে ম’রচি, আর
মেয়ে কিনা পাদাড়ের মধ্যে গরুর সঙ্গে সোহাগে বাস্তু!...
তোকে না আজকে দেখতে আসবে, সুধী?...গা মাজতে
হবে না, চুল বাঁধতে হবে না?...চ’লে আয় শীগির।”

দেখিতে আসিলেন মায়ের পাড়ার দাব-রেজিষ্টারবাবু,
নাম জগবন্ধু রায়। বিদেশী লোক, মেদিনীপুরে বাড়ি,
কার্যোপলক্ষে বদলি হইয়া এখানে বছর দুই-তিন আছেন।
ছেলেটি এখানে থার্ড ক্লাসে পড়ে; বছর তেরো বয়স হইবে।
জগবন্ধুবাবু একটু বাহিরের খবরাখবর রাখেন এবং প্রত্যেক
বিষয়ই বৃদ্ধিতর্কের শেষ সীমানা পর্যাস্ত ঠেলিয়া তুলিয়া
অনুধাবন করেন। ছেলে তাঁহার একটু ছেলেমানুষ,
কিন্তু এর পরেই ত সেই আঠার। অনেক জায়গায়
আবার মিটিং করিয়া হাঁকাহাঁকি করিতেছে—ছেলেদের
বয়স করা হোক বাইশ চব্বিশ...এক মিস্ মেয়ো আসিয়াই
এই ব্যাপার;...ইতিমধ্যে যদি আর একটি আসিয়া পড়ে ত
চক্ষুস্থির! ছেলেদের বয়স যে কোথায় গিয়া ঠেকিবে
কে জানে? বিবাহ জিনিষটাই থাকিলে হয়; বোধ হয়
বৈদিক বিবাহপদ্ধতি উঠিয়া গিয়া সিভিল ম্যারেজের ধুম
পড়িয়া যাইবে। শেষকালে চল্লিশ বছরের বুড়ো ছেলে
ল্যভ্ করিয়া কোর্টে বিবাহ রেজেষ্টারীক রিয়! কাহাকে ঘরে
তুলিবে কে বলিতে পারে? এখন একটু ভুলের জন্ত
শেষকালে জাতকুল সব থাক্ আর কি...

মেয়ে খুব পছন্দ। আশীর্বাদও হইয়া গেল এবং খুব
কাছাকাছি একটা দিন স্থির করিয়া জোগাড়-মন্ত্র আরম্ভ
হইয়া গেল।

সুখার মনটা ভাল নাই। যতদূর জানা আছে বিবাহ
জিনিষটা মন্দ নয়, কিন্তু ভাবনার কথা এই যে,
শ্রামলীকে ছাড়িয়া যাইতেই হইবে। আশীর্বাদের পরদিন

সকালবেলা সই আসিয়াছিল; সুখার মেজাজের জন্ত
খেলা জমে নাই। যাওয়ার সময় মুখ ভার করিয়া
বলিয়া গেছে—“আচ্ছা লো, আমারও একদিন বিয়ে
হবে, তখন দেখে নেব।”

সুখা শ্রামলীর জন্ত মনমরা হইয়া বাস হিঁড়িতেছিল,
নিমাই আসিয়া বলিল—“ওগো গুনচ?”

ঘাড় বাঁকাইয়া শাসনের ভঙ্গীতে সুখা বলিল—
“তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি ক’বে হবে নিমুদা!”

নিমাই ভড়কাইয়া গিয়া প্রশ্ন করিল—“কেন রা।।...
আমায় আর ওরকম করে ডাকা চলে তোমার?”

নিমাই সব কথা শুনিল; শেষের দিকে পাত্রের পরিচয়
পাইয়া উৎকুল হইয়া বলিয়া উঠিল—“চমৎকার হবে...
সে ত হরিহর, আমাদের স্কুলে থার্ড ক্লাসে পড়ে।
আমি খুব জানি তাকে। মাইরি বলচি বেশ হবে ভাই।”

সুখা মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল—“তোমাদের ত
খুব ফুর্টি; আমার মনে যে কি হচ্ছে.....”

নিমাই কোন রোমান্সের গন্ধ পাইল কি-না সেই
জানে, মাধুধানেই বাস্তবাবে জিজ্ঞাসা করিল—“কেন
রা, সুধী?”

“বাহুরটার কথা ভাবছ? আমি শামলীকে ছেড়ে
থাকতে পারব? আর আমায় ছেড়ে শামলীই বাচবে?”
—কথাটা বলিয়া ছুলালের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে
চাহিতেই ঠোঁট দুটি কাঁপিয়া উঠিল, চক্ষুর কুল ছাপিয়া
দু-ফোঁটা জল জমিয়া উঠিল। নিমাই হাত দিয়া
মুছাইয়া দিয়া বলিল—“কঁদিসু নি সুধী; খুড়ীমাকে
ব’লব আমি।”

এর পর শাস্তভাবে চিন্তা করিয়া দেখা গেল—খুড়ীমাকে
বলাও চলে না, আর ওসব উপায়ে কাজও হইবে না।
ক্রমাগতই দু-জনে পরামর্শ হইতে লাগিল।—বাগানের
ঝোপঝাড়ের মধ্যে বসিয়া, গোয়াল ঘরের কোণে,
সন্ধ্যার সময় পুকুরবাটের ভাঙা রাণার নীচে।.....
খেলা হয় না; ননী, সই আমল পায় না; সই যাইবার
সময় নাক কুঁচকাইয়া বলে—“বিয়ের ক’নের অত বেটা-
ছেলে-বেঁস। হওয়া ভাল নয় লো,—এই শাস্তবাক্য
ব’লে দিলাম.....”

বিস্ময় রাত। পাশাপাশি ছই গ্রামের বরক'নে, বরপক্ষ কটাপক্ষের লোকজনে বাড়িটা গমগম করিতেছে। উঠানে বিবাহের সরঞ্জাম, চারিদিকে গোল করিয়া বিবাহ-দভা রচনা করা হইয়াছে, ছেলেবুড়ো ঠাসাঠাসি হইয়া বিবাহ দেখিতেছে।

অনুষ্ঠানের মধ্যে পুরোহিত সুধার বাপকে বলিলেন—
“এইবার তুমি মেয়ের ডান হাতটি তুলে ধর, সম্প্রদান করিতে হবে...তুমি হাত পাত ত বাবা, শ্বশুরের দান নেবে...কই গো, হাতে জড়াবার মালাগাছটা?...”

সুধার বাপ সুধার হাতটা একটু তুলিয়া বাড়াইয়া ধরিলেন।

বর কিন্তু একটা কাণ্ড করিয়া বসিল।—তাহার হাতটা এতক্ষণ বাহিরেই ছিল, হঠাৎ কাপড়ের মধ্যে টানিয়া দিয়া গৌজ হইয়া বসিল! সকলে বেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। পুরোহিত পাকা লোক, হাসিয়া বলিলেন—
“হাত বের করো বাবা, লজ্জা কি?—বড় ছেলেমানুষ কি না।...”

সভার মধ্যে থেকেও অনুরোধ, উপরোধ, হুকুম, ধমক কিছুই বাকী রহিল না। বর কিন্তু ক্রমাগতই হাতটা কড়া করিয়া নিজের কোলের মধ্যে চাপিয়া ধরিতে লাগিল। মুখটা রাঙা হইয়া গিয়াছে, ঘাড়টা গুঁজুড়াইয়া বুকের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

“বর বেঁকে ব'সেচে, বর বেঁকে ব'সেচে”—বলিয়া একটা ব চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বাড়ির ভীড় চাপ বাঁধিয়া উঠিল। জগবন্ধু আগস্কদের দেখাশুনায় বাহিরে বাস্তু হইলেন। ভীড় ঠেলিয়া আসিয়া হাজির হইলেন, কড়া লায় বলিলেন—
“ব্যাপার কি রে হ'রে? হাত বের কর। পাড় ক্লাসে প'ড়ে স্বাধীনচেতা তরুণ হয়েচ?—বটে!...”

পুরোহিত উঠিয়া তাঁহার পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় দিয়া বলিলেন—
“আপনি একটু ঠাণ্ডা হন—রাগবার সময় য়। ব্যাপার আমি বুঝেচি, সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।”

বরের নিকট আসিয়া কানের কাছে মুখ আনিয়া প্রশ্ন করিলেন—
“কি চাই তোমার বাবা, বল দিকিন মামায়?”

কোন উত্তর হইল না। আর একটু অপেক্ষা করিয়া

বলিলেন—
“বল, শ্বশুরের কাছে ত চাইবেই। আমরাও এই রকম পণ ক'রে বসেছিলাম, এতে লজ্জা কি?... সাইকেল চাই?—নগদ টাকা?—হাওয়াই বন্দুক?...”

বর জড়িত কণ্ঠে কি একটা বলিল।—বেশ ভালরকম বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত ভাবে বলিলেন—
“স্পষ্ট ক'রে বল, কিচ্ছু লজ্জা নেই।”

বাড়ির মধ্যে একটা খড়্কে পড়লে আওয়াজটা শোনা যায়। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে পুরোহিত-ঠাকুর এক রকম চীৎকার করিয়াই বলিয়া উঠিলেন—
“আঁ, কি ব'ললে—শামলী বাছুর!!”

নিস্তব্ধতা সেই রকমই রহিল, কেহ বেন কথাটা শব্দযজ্ঞ করিতে পারে নাই। একটা মুহূর্ত,—তাহার পর জগবন্ধু অগ্রসর হইয়া নাকমুখ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—
“হারামজাদ! মানুষের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দোব ব'লে নিয়ে এলাম, আর তদরলোক তোকে এখন নই-বাছুর সম্প্রদান করবেন?...বের কর হাত, নয়ত তুই আছিন কি আমি আছি—করলি বের?”

হরিহর আস্তে আস্তে হাতটা বাহির করিল, মুষ্টিবদ্ধ অবস্থাতেই রহিয়াছে, একটু একটু কাঁপিতেছে। সুধার বাপ ব্যাপারটার আকস্মিকতায় এতক্ষণ বিমুঢ়ভাবে বসিয়াছিলেন, এইবার একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া, বাম হাতটা হরিহরের পিঠে রাখিয়া স্নেহে কহিলেন—
“ওতো ছোট বাছুর বাবা, তোমায় আমি ভাল একজোড়া বিলিণী গাই-বাছুর কিনে দোব এই হাটেই। নাও হাত খোল, লক্ষ্মী আমার।...”

জগবন্ধু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন “না, না, ওরকম আঙ্কারা দেবো না বেইমশাই, ওতে আমার বদনাম, ছেলে পণ ক'রে ছব খাবার জন্তে গাইবাছুর নিয়ে যাবে, লোকে ব'লবে...”

বরপক্ষের একজন রসিক বৃদ্ধ কথাটা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন—
“লোকে বলবে বাপ-বেটায় মিলে শ্বশুরকে ছইচে।”

বাহারা বুকিল তাহাদের মধ্যে হাসি পড়িয়া গেল। সুধার বাপ একটু লজ্জিত হইলেন। জগবন্ধুর মাথায় তাঁহার নিজস্ব পদ্ধতিতে তর্ক জাগিয়া উঠিতেছিল; বলিলেন—

“একটু থামুন পুরুতমশাই, এর গোড়া এইখানেই মেরে দিতে হবে। দিবি এক মতলব বের ক’রেচে ত!— আজ বিয়ে করতে ব’সে পণ, এর পর ঋগুরবাড়ি আহারে ব’সে পণ, তারপর বৌমাকে বাড়ি নিয়ে আসবার সময় পণ, প্রত্যেক বারেই ঋগুর-শাশুড়ীর মাথায় হাত বুলিয়ে এটা-ওটা-সেটা হাতান! আমি কোথায় শর্দ-আইন বাঁচাতে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে গেলাম, হেলে আমার ভাবছেন—বাঃ, এত খাস! এক রোজগারের পথ বের হ’ল!—কোন মুখা আর লেখাপড়া করে, এই বাবসাই চালান যাক্!...বলি, তোকে কে এ হৃদিস রাৎলে দিলে রা? তুই শামলী বাছুরের নামই বা জানলি কেমন ক’রে? বল, তোর বাবসার গোড়াপত্তনেই আমি গণেশ ওল্টাব...”

বাপের মুঠার মধ্যে সুধার হাতখানিও কাঁপিয়া উঠিল। এই অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে কচি বরবধুর প্রতি দয়া-পরবশ হইয়া সুধার বাপ বলিলেন,—খাক বেইমশাই; ছেলেমানুষ একটা কথা ব’লে ফেলেচে...”

জগবন্ধু কড়া-ধাতের লোক, নিরস্ত করা গেল না। অনেক বকাবকি জেদাজেদির পর হরিহর মাথা তুলিয়া একবার পুরোহিতের পানে আড়ে চাহিল। তিনি উদ্দেশ্যটা বুঝিতে পারিয়া তাহার মুখের কাছে কান লইয়া গেলেন, তাহার পর বিশ্বয়ের ঝোঁকে প্রায় হাতখানেক সরিয়া আসিয়া বলিয়া উঠিলেন—“সে কি!—ক’নে ব’লেচে!!...নিমাই কি করেছিল?—চিঠি দিয়ে এসেছিল?”

আরও ধমক-ধামক করার পর চিঠিটার সন্ধান পাওয়া গেল। তিনি ষে ছেলেকে টিপিয়া এই পণ করান নাই সর্বসমক্ষে এটা নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণ করাইবার জন্য জগবন্ধু তখনই বাড়িতে লোক ছুটাইলেন। হরিহরের নির্দেশ-মত সে তাহার ভূগোলের পাতার মধ্য হইতে দলিলখানি সংগ্রহ করিয়া আনিল। লেখা আছে—

প্রণামা বহব নিবেদন মিনঃ কার্যকাগে। তোমার সহিত আমার বিয়ে ঠিক হইয়াছে। আমি খুব ভাগ্যবান, কিন্তু শামল রাণীকে ছাড়িয়া থাকতে পারব না। অতএব মহাশয় বিয়ের সময় শামলী চাই বলিয়া বেকে বসবেন। না হইলে আমি আপিম খাইয়া মরিব। আপিম আমার সারির আঁচলেই বহিত থাকিবে মোটা গেরো। তুমি দেখিতে পাইবে। এতে দোস হয় না। নেতাপিসিদের বরও সেদিন একটা ঝার লালঠেম চাই ব’লে বেকে বসেছিল। নিয়ে ছাড়িল। মা বলেন জিই পুরুতম লক্ষন। এ নিমাই। নিমাই আমার প্রাণের চেয়েও ভালবাসে। এ চিঠি লিখে দিয়েচে। আমি অবলা নারি লেখাপড়া জানি না শামলী ছাড়া হইয়া থাকিতে হইত। নিমাই ভয়ঙ্কর বিদ্যান আর খুব ভাল ছেলে তোমাদের ইস্কুলে 6th Class পড়ে। প্রণাম জানিহ।

ইতি

অভাগিনি

Sudha

সুধাময়ী দাসী

‘ভয়ঙ্কর বিদ্যান’টির, হাজার খোঁজাখুঁজি করিয়াও সে-রাত্রে বিয়ে-বাড়িতে কোন সন্ধানই মিলিল না। শাড়ীতে একটি বড়গোছের গেরো পাওয়া গেল বটে, কিন্তু সুখের বিষয় তাহাতে একটি বড় মার্কেল ভিন্ন অন্য কিছু ‘বন্ধিত’ ছিল না।

ভারি জল

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম্-এ

শতবর্ষেরও কিছু আগেকার কথা।

রাসায়নিক পঞ্চাশ-ষাটটি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন—হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, তামা, সোনা, সীসা পারদ প্রভৃতি। তিনি দেখিলেন বস্তুমাত্রই হয় এই মৌলিক পদার্থ—না-হয় দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের মিলনে উদ্ভূত; একটি মৌলিক পদার্থকে যদি ক্রমাগত ভাঙিতে থাকে যায় ত শেষ অবধি উহা এমন অবস্থায় পৌঁছায় যখন আর উহাকে ভাঙা চলে না; দৃষ্টির অগোচর অবিভাজ্য এই পদার্থ-কণিকার নাম দিলেন 'এটম'; মৌলিক পদার্থের এটম-রা প্রায়ই দুইটা করিয়া জোট বাঁধিয়া থাকে, তাহাদের নাম দেওয়া হইল 'মলিকিউল'; একটি হাইড্রোজেন এটম সর্বাপেক্ষা হালকা, তাহার তুলনায় অগাঢ় এটমের ওজন নিরূপিত হইতে লাগিল; হাইড্রোজেনকে এক ধরিলে একটি কার্বন এটমের ওজন দাঁড়াইল ১২, অক্সিজেনের ১৬, এই রকম সব।

চিরদিনই মানবের মন বছর মধ্যে একের সঙ্কানে ছুটিয়াছে। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রাউট এই সময় বলিলেন যে পৃথিবীর মূলে আছে একটি এবং কেবল মাত্র একটি মৌলিক পদার্থ, সে হইল এই হাইড্রোজেন; ঐ যে কার্বন এটম, হাইড্রোজেন এটমের তুলনায় যাহা ১২ গুণ ভারি, তাহা আর কিছু নয় ১২টি হাইড্রোজেন এটম জোট পাঁকিয়া ঐ একটি কার্বন এটমে দাঁড়াইয়াছে; সেই রূপ অক্সিজেন এটম প্রভৃতি। কিন্তু গোল বাধিল ঐ প্রভৃতিদের লইয়া; কার্বন, অক্সিজেন সম্বন্ধে এ-কথা না-হয় মানিয়া লওয়া গেল, কিন্তু দেখা গেল একটি ক্লোরিন এটমের ওজন হাইড্রোজেন এটমের ঠিক পঁয়ত্রিশ গুণও নয়, ছত্রিশ গুণও নয়, ইহাদের মাঝামাঝি। প্রাউট তখন একটু ঢোক গিলিয়া বলিলেন যে এই ব্রহ্মাণ্ডের মূল হইল একটি পূরা নয়, আধখানা হাইড্রোজেন এটম। কিন্তু সমস্যার সমাধান হইল না। রাসায়নিকের পরীক্ষা সূক্ষ্মতর হইতে লাগিল;

দেখা গেল একটি ক্লোরিন এটমের ওজন ঠিক সাড়ে পঁয়ত্রিশ নয়, পঁয়ত্রিশ আর এটি জটিল ভগ্নাংশ। আরও অনেক মৌলিক পদার্থের আণবিক ওজনে বড় বড় ভগ্নাংশ দেখা দিল; প্রাউট খামিয়া গেলেন।

এই সময়ই সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাল্টন এটম সম্বন্ধে কতকগুলি সিদ্ধান্ত করিলেন। একটি মৌলিক পদার্থ ভাঙিয়া যে কোটি কোটি এটম পাওয়া যায় তাহারা হুবহু এক—আকারে, ওজনে, গুণাবলীতে; কিন্তু এক মৌলিক পদার্থের এটম আর এক মৌলিক পদার্থের এটম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; রাসায়নিক সংযোগ যখন ঘটে তখন এই এটমদের মধোই ঘটয়া থাকে। প্রাউটের মত পরিত্যক্ত হইল, কিন্তু শতবর্ষ চলিয়া গেল, ডাল্টনের এই সিদ্ধান্ত অটল ও অটুট রহিল; দেখা গেল, এমন কোন রাসায়নিক মিলন ঘটে না যাহাতে ডাল্টনের এই সব সিদ্ধান্ত ভাঙিয়া পড়ে। ইতিমধ্যে এই এটম সম্বন্ধে আরও অনেক খবর জানা গেল; খানিকটা মৌলিক পদার্থে কতগুলি এটম আছে, উহাদের প্রত্যেকের ওজন কত এ-সব নির্ণীত হইল।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব অবধি এটম সম্বন্ধে এই ছিল শেষ কথা। কিন্তু গত শতাব্দীর শেষের দিকে পদার্থের গঠন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের পূর্ব ধারণা যে ভীষণ ধাক্কা খাইল তাহা এক ফরাসী বৈজ্ঞানিকের কথায় বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। অধ্যাপক জে, জে, টমসন রয়াল সোসাইটির বক্তৃতাগৃহে পদার্থের গঠন সম্বন্ধে নূতন তথ্যের কথা বলিতেছিলেন। বক্তৃতাশেষে সভায় উপস্থিত ঐ ফরাসী বৈজ্ঞানিক তাহার কোন বন্ধুকে বলেন—ভায়া হে, বিজ্ঞান জান না ব'লে তোমার অবস্থা আমার চেয়ে ঢের ভাল, কারণ তুমি যদি বিজ্ঞান শিখতে চাও ত গোড়া থেকে আরম্ভ করলেই চলবে; কিন্তু আমাকে একেবারে ঢেলে সাজতে হবে; এক দফায় বা জানি তা ভুলতে হবে, তার পর নতুন করে আরম্ভ।

যে ঘটনাবলী দ্বারা বৈজ্ঞানিকের পূর্ব ধারণার আশ্রয় পরিবর্তন হইল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—

একটি কাঁচের গোলক প্রায় বায়ুশূণ্য করিয়া তাহার মধ্যে তড়িৎ চালাইয়া জে, জে, টমসন ঐ গোলকমধ্যে কতকগুলি ক্ষুদ্র কণিকার সন্ধান পাইলেন যাহারা এটম অপেক্ষাও ছোট; এই ক্ষুদ্র কণিকার নাম দেওয়া হইল 'ইলেকট্রন'। বিভিন্ন পরীক্ষা হইতে এই ইলেকট্রনের ওজন মাপা হইল; দেখা গেল এই ইলেকট্রনের ওজন, সব-চেয়ে হালকা যে হাইড্রোজেন এটম, সেই হাইড্রোজেন এটমের ১৮৪০ ভাগের এক ভাগ মাত্র। একটি সোনার এটম একটি সীসার এটম হইতে পৃথক, কিন্তু দেখা গেল যে এই ইলেকট্রন—তা সে সোনা, সীসা বা যে-কোন পদার্থ হইতে আসুক না কেন—ইহারা ছবছ এক। এই ইলেকট্রন সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা চলিতে লাগিল, জানা গেল যে প্রতি ইলেকট্রন তড়িৎযুক্ত এবং সেই তড়িৎ বিয়োগ-তড়িৎ। আরও দেখা গেল যে নানান প্রক্রিয়ায় পদার্থ হইতে ইলেকট্রন বাহির করা যায়; খুব বেশী কিছু নয়, খানিকটা গরম করিলেই পদার্থ হইতে ইলেকট্রন বাহির হইতে থাকে।

সুতরাং দাঁড়াইল এই, পদার্থকে ভাঙিতে ভাঙিতে এটমে পৌঁছান যায়, কিন্তু এটমকে ভাঙা যায় না—ডালটনের এ মত আর টিকিল না; এটম হইতে পাওয়া গেল ইলেকট্রন, এটমের তুলনায় খুব ছোট ও হালকা; তাহার পর যে-রকমের বাড়ি হউক না কেন ভাঙিলে যেমন পাওয়া যায় একই রকমের কতকগুলি ইট, তেমনি যে-এটমই হউক না কেন, তাকে ভাঙিলে পাওয়া যাইবে একই রকমের ইলেকট্রন। একটা বাড়ি আর একটা বাড়ি হইতে অবশ্য তফাৎ, কারণ ইটের সংখ্যা সমান নয় আর সাজানোর ধারাও পৃথক; সেই রকম একটা এটম আর একটা এটম হইতে পৃথক, কারণ উভয়ের ইলেকট্রনগুলির সংখ্যা ও সাজান সমান নয়। কিন্তু একটা পোলের কথা দাঁড়াইল। এটম-রা তড়িৎশূণ্য অথচ এটমের উপাদান ইলেকট্রন হইল বিয়োগ-তড়িৎযুক্ত। অতএব এটমের মধ্যে আছে আরও কিছু যাহাতে আছে সমপরিমাণ সংযোগ-তড়িৎ। কোথায় কি ভাবে আছে এই সংযোগ-তড়িৎ? জে, জে, টমসন বলিলেন, একখানা কেকের মধ্যে যেমন কিসমিস ছড়াইয়া থাকে সেই রকম

খানিকটা সংযোগ-তড়িৎের মধ্যে বিয়োগ-তড়িৎযুক্ত ইলেকট্রনরা ছড়াইয়া আছে। জে, জে, টমসনের এ-মত কিন্তু টিকিল না; শেষ অবধি জয়যুক্ত হইল রদারফোর্ডের সিদ্ধান্ত। রদারফোর্ড বলিলেন যে এই এটম একটি ক্ষুদ্র সৌরজগৎসদৃশ; সূর্যকে বেষ্টিত করিয়া যেমন পৃথিবী আদি গ্রহগণ ঘুরিতেছে, তেমনি কেন্দ্রস্থিত সংযোগ-তড়িৎকে বেষ্টিত করিয়া ইলেকট্রনরা ঘুরিতেছে। সংযোগ-তড়িৎযুক্ত এই কেন্দ্রীয় অংশের নাম দেওয়া হইল প্রোটন। রদারফোর্ডের এই তথ্য নানান দিক দিয়া নানান রকমে যাচাই হইতে লাগিল এবং সব পরীক্ষা হইতে রদারফোর্ডের মতই প্রতিষ্ঠিত হইল। চোখে দেখা যায় না যে ক্ষুদ্র একটি এটম সেই এটমের ভিতরের অনেক খবর বিজ্ঞান টানিয়া বাহির করিতে লাগিল। সে-সব কথা যাক; এখন বিভিন্ন এটমের গঠন এইরূপ দাঁড়াইল। প্রত্যেক এটমে যতগুলি ইলেকট্রন আছে—নিশ্চয় ততগুলিই প্রোটন আছে, যেহেতু এটম-রা তড়িৎশূণ্য। হাইড্রোজেনে আছে এক জোড় ইলেকট্রন-প্রোটন, হিলিয়মে চারি জোড়, অক্সিজেনে ষোল জোড়, এবং সব চেয়ে ভারি যে ইউরেনিয়াম এটম তাহাতে ২৩৮ জোড়। এইরূপ হিসাব যদি হয় ত ঘুরিয়া ফিরিয়া শতাধিক বর্ষের পূর্বের প্রাউটের কথাই ত আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে এই দাঁড়ায় যে হাইড্রোজেন এটমের ওজন এক ধরিলে অল্প কোন এটমের আণবিক ওজনে কোন ভগ্নাংশ থাকিতে পারে না। থাকিতে পারে না, কিন্তু আছে যে! আগেকার ক্লোরিণের কথাই ধরা যাউক। ক্লোরিণে আছে ৩৫ জোড় ইলেকট্রন-প্রোটন, না-হয় ৩৬ জোড়, সাড়ে ৩৫ বা পোনে ৩৬ বা কোন ভাঙাচোরা জোড় ত হইতে পারে না; এখন ৩৫ জোড় যদি থাকে ত উহার আণবিক ওজন হইবে ৩৫, আর ৩৬ জোড় থাকিলে ওজন হইবে ৩৬; কিন্তু রাসায়নিক দেখিয়াছেন উহা ৩৫ও নয়, ৩৬ও নয়, ৩৫ আর একটি জটিল ভগ্নাংশ। প্রাউট যাহার মীমাংসা করিতে পারেন নাই এখন সেই সমস্যাই ত অমীমাংসিত ভাবে উপস্থিত। কিন্তু এবার একটা মীমাংসা হইল, সুনিশ্চিত ভাবেই হইল। ব্যাপারটা দাঁড়াল এইরূপ।

মনে করা যাউক একটি কাঁচের গেলেকে খুব অল্প পরিমাণ একটু গ্যাস আছে; সে গ্যাসটার নাম আমরা জানি না।

তবে তাহার প্রতি এটম ৩৫ জোড় ইলেকট্রন-প্রোটন লইয়া গঠিত ; এই গোলকের মাঝখান হইতে একদিকে খুব বেশী ভোল্টের তড়িৎ পাঠান হইতে লাগিল ; গোলকস্থিত ঐ গ্যাসের একটি এটমের কথা ভাবা যাউক ; উহা হইতে একটি ইলেকট্রন খসিল এবং খসিয়া গোলকের একদিকে ছুটিতে লাগিল। বিয়োগ-তড়িৎযুক্ত একটি ইলেকট্রন খসিয়া যাওয়ায় ঐ ভাঙা এটম এখন সংযোগ-তড়িৎযুক্ত হইল এবং ইহাও ছুটিতে লাগিল, বিয়োগ-তড়িৎযুক্ত ইলেকট্রন যে-পথে যাইতেছিল তাহার ঠিক উল্টা পথে ; এই পথের ধারে রাখা হইল প্রভূত শক্তি-সম্পন্ন একটি চুম্বক এবং তড়িৎমণ্ডিত একটি শলাকা। সংযোগ-তড়িৎযুক্ত এটমটি ঝাঁকিয়া গিয়া একখানা আলোকচিত্র কাঁচের উপর পড়িয়া একটি রেখা অঙ্কিত করিল। এই এটমটি যাইতে যাইতে যে ঝাঁকিল সেই ঝাঁকার পরিমাণ নির্ভর করে ঐ চুম্বক এবং তড়িতের শক্তির উপর—তা ছাড়া ঐ এটমটির গুরুত্বের উপরও ; স্মরণ করিয়া রাখা যাউক এই এটমটি একটি ইলেকট্রনবিহীন ৩৫ জোড় ইলেকট্রন-প্রোটনের সমষ্টি। এইবার ঐ গোলকমধ্যে দেখা হইল আর একটি গ্যাস যাহার প্রতি এটমে আছে ৩৬ জোড় ইলেকট্রন-প্রোটন। এর প্রতি এটমও এক-একটি ইলেকট্রন হারাইয়া ইলেকট্রনের বিপরীত পথে ছুটিতে লাগিল, ছুটিয়া পৃষ্ঠকার ঐ চুম্বক ও তড়িতের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে ঝাঁকিল এবং আলোকচিত্র কাঁচের উপর রেখা আঁকিল—কিন্তু ঠিক আগেকার জায়গায় নয়, একটু তফাতে ; কারণ আমাদের মনে রাখিতে হইবে এই ঝাঁকা নির্ভর করে গুরুত্বের উপরে, আর এই এটম গুরুত্ব আগেকার এটম অপেক্ষা ভারি এক জোড়ে। এইবার যদি ঐ গোলকের মধ্যে ৩৫ জোড়ওয়াল ও ৩৬ জোড়ওয়াল এই দুই রকমের এটম মিশাইয়া দিয়া পরীক্ষাটা করা যায় তাহা হইলে ঐ আলোকচিত্রে আমরা পাইব দুইটি রেখা, একটি ঐ ৩৫এর জন্য অপরটি ৩৬এর জন্য। রেখা দুইটির কালিমা যদি সমান হয় ত বুঝিতে হইবে ঐ দুই রকমের এটম গোলক-মধ্যে সমপরিমাণে ছিল। কালিমা যদি সমান না হয় ত উহার বিভিন্নতা হইতে উহাদের আপেক্ষিক পরিমাণ ঠিক করা যাইতে পারে।

এখন ঐ গোলকমধ্যে বিসুদ্ধ ক্লোরিন গ্যাস দিয়া দেখা

গেল আলোকচিত্রে দাগ পড়িয়াছে একটি নয়, দুইটি—একটি ৩৫এর জায়গায় এবং অপরটি ৩৬এর জায়গায়। তাহা হইলে ত বলিতে হইবে ঐ বিসুদ্ধ ক্লোরিন গ্যাস, ডালটনের সময় হইতে যাহার এটমগুলিকে ছবছ এক বলিয়া আসিতে-ছিলাম, বাস্তবিক তাহারা ত ছবছ এক নয় ; রাসায়নিক গুণাবলী তাহাদের সমান হইতে পারে, কিন্তু আপেক্ষিক গুরুত্ব, গঠনে তাহারা ত একেবারে সমান নয়। একদল আছে তাহারা ৩৫ জোড় ইলেকট্রন-প্রোটনের সমষ্টি আর একদল ৩৬ জোড়ের। ক্লোরিন একটি মৌলিক পদার্থ, কিন্তু দেখিতেছি মৌলিক পদার্থ হইলেই ত তাহার সব এটম সর্ববিষয়ে সমান নয়। আলোকচিত্রে রেখাঘরের কালিমার তারতম্য অনুসারে কি অনুপাতে এই দুই জাতীয় এটম আছে তাহার হিসাব করা হইল এবং এই হিসাব হইতে সমস্ত গ্যাসটার যে গড় আণবিক ওজন নিরূপিত হইল, তাহা রাসায়নিকের সূক্ষ্ম নিরূপণের সহিত একেবারে মিলিয়া গেল। বহুকালের একটি সমস্যার সমাধান হইল। যে বিভিন্ন দলের এটমকে রাসায়নিক তাহার গুণাবলী দেখিয়া ছবছ এক বলিতেছিলেন পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে তাহাদিগকে পৃথক করিয়া ফেলা হইল এবং দেখা গেল রাসায়নিক ধর্ম তাহাদের সমান হইলেও গুরুত্ব তাহারা এক নয়। অন্যান্য মৌলিক পদার্থের উপরও এই পরীক্ষা চলিতে লাগিল, জানা গেল বহু মৌলিক পদার্থ আছে যাহারা দুই বা ততোধিক বিভিন্ন প্রকারের এটম লইয়া গঠিত। পারদের আণবিক ওজন হইল ২০০.৬ ; দেখা গেল পারদে আছে ৬ রকমের বিভিন্ন এটম, তাহাদের ওজন যথাক্রমে ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০২ এবং ২০৪, যদিও রাসায়নিক গুণাবলীতে তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

বিভিন্ন ওজনের এটম বাছাই করা এই যে যন্ত্র, বৈজ্ঞানিক এস্টনের হাতে দিন-দিন এই যন্ত্রের উন্নতি সাধিত হইতে লাগিল ; এখন উহা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে ১০০০০ হাজারের এক রকম ও আর এক রকমের এক—এই অনুপাতেও যদি দুই রকমের এটম থাকে ত তাহাদের পৃথক অস্তিত্ব এই যন্ত্রে ধরা পড়ে। এই সূক্ষ্ম যন্ত্রে পরীক্ষা করিতে করিতে দেখা গেল যে অক্সিজেনেরও দুই জুড়িদার আছে ; ১৬

অক্সিজেনের সঙ্গে আছে ১৭ ও ১৮ ওয়াল অক্সিজেন, ৮০০০ হাজারটি ১৬ অক্সিজেনের সহিত মিশিয়া আছে ২টি ১৭ ও ১৮ অক্সিজেন এই অল্পপাতে।

অক্সিজেনের আণবিক ওজন ১৬ ধরিলে হাইড্রোজেনের দাঁড়ায় ১.০০৭৭। অক্সিজেন ঠিক ১৬ গুণ না হইয়া এই যে সামান্য একটু তফাৎ হয় তাহার যথাযথ কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। সে কথা যাক, এখন অক্সিজেনের ১৭, ১৮ জুড়িদার বাহির হওয়ায় হাইড্রোজেনের কোন সঙ্গী আছে কিনা খোঁজ পড়িল। খোঁজ মিলিল। দেখা গেল সাধারণ হাইড্রোজেনের সঙ্গে আছে আর এক রকমের হাইড্রোজেন যাহার আণবিক ওজন হইল ২.০১৩৬ এবং ইহার আছে সাড়ে ছয় হাজারে এক, এই অল্পপাতে। একটি হাইড্রোজেন মলিকিউল অপেক্ষা এই নূতন হাইড্রোজেন ওজনে অল্প কিছু কম। ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিকেরা বলিলেন যে নবজাত শিশুর নামকরণ তাহার জনকই করিয়া থাকেন, সুতরাং ইহার আবিষ্কারক, আমেরিকার বৈজ্ঞানিকেরাই ইহার নাম দিন। তাঁহারা বলিলেন ইহা এখন সমস্ত বৈজ্ঞানিকের সম্পত্তি - তাঁহারা সকলে মিলিয়া ইহার নাম ঠিক করুন। বিভিন্ন নাম আসিতে লাগিল, দেখা যাইতেছে 'নাসৌ মুনির্ঘসা মতং ন ভিন্নম্।' যত দিন চূড়ান্ত ভাবে কিছু নিষ্পত্তি না হয় তত দিন ইহা 'ভারি হাইড্রোজেন' নামে আখ্যাত হইতেছে।

সমস্ত জিনিষটার অন্য দিক দিয়া যাচাই হইল। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের বর্ণচ্ছত্র বিভিন্ন; এই বর্ণচ্ছত্র দিয়া অনেক সময় অনেক অজ্ঞাত পদার্থকে চেনা গিয়াছে। আচ্ছা, ৩৫ ক্লোরিন আর ৩৬ ক্লোরিন ইহার ত সত্য সত্যই বিভিন্ন পদার্থ, সুতরাং ইহাদের বর্ণচ্ছত্র ত বিভিন্ন হওয়া উচিত; উচিত ত বটে, কিন্তু এই বিভিন্নতা এত অল্প যে বর্ণচ্ছত্র মাপিবার যন্ত্রে ধরা পড়িবার কথা নয়। কিন্তু এই কয়েক বৎসরে এই যন্ত্র এত উন্নতি লাভ করিয়াছে যে ইহাতে অতি অল্প তফাৎও ধরা পড়িতেছে। এই যন্ত্রসাহায্যে ঐ হাইড্রোজেনের জুড়িদারেরও সন্ধান হইল; সাক্ষাৎ মিলিল এবং এই উপায়ে তাহার যে আণবিক ওজন নিরূপিত হইল তাহা পূর্বফলের সঙ্গে ছবছ মিলিয়া গেল।

দেখা যখন মিলিল তখন বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া

দ্বারা ঐ ভারি হাইড্রোজেনকে তফাৎ করিয়া ফেলিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল; তরল হাইড্রোজেন লইয়া পরীক্ষা হইতে লাগিল এবং শেষ অবধি সফলতা আসিল। এই ভারি হাইড্রোজেনকে অক্সিজেনের সহিত মিশাইয়া পাওয়া গেল যে জল, সাধারণ জলের সঙ্গে তাহা মিলিল না, আর মিলিবার কথাও নয়। দেখা গেল এই ভারি জল জমে সেটিগ্রিডের ০°তে নয় - ৩.৮এ, বাষ্প পরিণত হয় ১০১.৪২এ এবং ইহার গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী হয় ৪এ নয় ১১.৬এ। আমেরিকার বৈজ্ঞানিকদিগের চেষ্টায় এই 'ভারি জল' এখন এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে যে ইহা লইয়া এখন সহজেই বিভিন্ন রাসায়নিক ও অণুবিধ পরীক্ষা করিবার উপায় হইয়াছে; প্রচুর মানে অবশ্য ঘড়া ঘড়া নয়, একসঙ্গে ২০১২৫ সি, সি, সংগৃহীত হইতেছে। উদ্ভিদংদেহে ও প্রাণী-দেহে এই ভারি জলের ক্রিয়া কিরূপ তাহা লইয়া নানাবিধ গবেষণা চলিতেছে এবং সাধারণ হাইড্রোজেনযুক্ত যৌগিক পদার্থে এই ভারি হাইড্রোজেন আসিলে তাহাদের গঠন গুণাবলী কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা লইয়া আলোচনা সুরু হইয়াছে। রসায়নশাস্ত্রে এই ভারি হাইড্রোজেন এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে।

পদার্থবিজ্ঞানেও ইহা এক অমূল্য সম্পদরূপে দেখা দিয়াছে। কিছু দিন হইতে এটমকে ভাঙিবার চেষ্টা চলিতেছে। প্রায় ১৫ বৎসর পূর্বে রদারফোর্ড প্রথম নাইট্রোজেন এটমকে ভাঙিলেন; ভাঙিলেন রেডিয়ম হইতে নির্গত আল্ফা-রশ্মির সাহায্যে। কিন্তু পৃথিবীতে রেডিয়ম আছেই বা কতটুকু এবং তাহা হইতে আল্ফা-রশ্মি বাহির হইতেছেই বা কি পরিমাণে? সুতরাং পদার্থকে ভাঙিতে হইলে যদি শুধু আল্ফা রশ্মির উপর নির্ভর করিতে হয় ত এই ভাঙার পরিমাণ কতটুকুই বা হইবে! আল্ফা-রশ্মি ব্যতীত অণু কোন প্রচণ্ড শক্তি দিয়া এই ভাঙনক্রিয়া সম্পাদন করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। দুই বৎসর পূর্বে ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরিতে ককক্রফট ও ওয়ালটন প্রোটনকে খুব বেশী ভোল্টের তড়িৎ দ্বারা শক্তিশালী করিয়া লিথিয়ামকে ভাঙিলেন। এর পর প্রোটন ছাড়িয়া লাগান হইল নিউট্রন; শেষ অবধি দেখা গেল যে এই ভারি হাইড্রোজেন সর্বাপেক্ষা বেশী কার্যকরী, আর এই ভারি হাইড্রোজেন সুপ্রাপ্য না

হইলেও একেবারে তুস্প্রাপ্য নয়। স্বতরাং পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষাগারেও এই ভারি হাইড্রোজেনের গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

সূর্যের অভ্যন্তরে হিলিয়ম নামক একটি নতুন গ্যাসের যখন সন্ধান পাওয়া যায় তখন কি কেহ ভাবিয়াছিল যে এই হিলিয়মই উড়োজাহাজকে নিরাপদ করিবে? পোলাণ্ডবাসী একটি মহিলা যখন রেডিয়মের অন্বেষণে বাহির হন তখন এই রেডিয়ম যে ক্যানসারের চিকিৎসায় লাগিতে পারে এ-কথা কি কাহারও মনে আসিয়াছিল? রয়াল ইন্সটিটিউশনে রাসায়নিক বিশ্লেষণ লইয়া যখন ডেভি পরীক্ষা করিতেছিলেন তখন কেহ কল্পনাও আনেন নাই যে এই পরীক্ষাই প্রচুর পরিমাণে সস্তায় বিভিন্ন ধাতু পাইবার সূচনা করিয়া দিতেছে। ব্যাঙ লইয়া গ্যালভানির পরীক্ষা ত জগতে তড়িৎপ্রবাহ আনয়ন করিতেছে। আজ রেডিও যে জগৎ জুড়িয়া নিজের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, ম্যাক্সওয়েলের কতকগুলি 'ইকোয়েশন' ত তাহার মূলে! হয়ত একদিন এই ভারি হাইড্রোজেন, ভারি জল ব্যবহারিক বিজ্ঞানের এক অজ্ঞাত দিকের রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দিয়া মানবের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবে।

কিন্তু এ-সব কিছুই যদি না-ও করে তাহাতেই বা কি? মিলিক্যান যখন বার-বার আলোকের বেগ মাপিতেছিলেন তখন তাঁহার এক বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন ইহাতে লাভটা কি? মিলিক্যান বলেন আমি ইহাতে বড়ই আনন্দ পাই। নব

আবিষ্কারের এই আনন্দই বৈজ্ঞানিকের পরম ঈর্ষিত—এই তাহার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। এই আবিষ্কার যদি জগৎবাসীর কাজে আসে ভালই, না আসিলে বৈজ্ঞানিক মুহূর্তমান হইয়া পড়ে না। কিন্তু ইহাতে কি শুধু আবিষ্কারকেরই আনন্দ? এ-আনন্দে জগৎবাসীও যে যোগদান করে! আজ যদি বৈজ্ঞানিক জানিতে পারেন যে চন্দ্রে প্রচুর পরিমাণে পেট্রোলিয়ম আছে তাহা হইলে পৃথিবীতে নিশ্চয় পেট্রোলিয়মের দাম কমিবে না, কিন্তু জনসাধারণের অবগতির জন্ম, তাহার শিক্ষার জন্ম, তাহার আনন্দের জন্ম, সংবাদপত্র বড় বড় অক্ষরে এ-সংবাদ ছাপিবে। আইনষ্টাইন যখন বলিলেন যে এই আকাশ সমাকার নয়, বক্রাকার তখন পৃথিবীর অল্প লোকই ইহার মানে বুঝিল, ইহাতে বাজারে কোম্পানীর কাগজের দর এবং শেয়ারের ভিভিডেও যেমন ছিল তেমনি রহিল কিন্তু জগৎবাসীর মন আলোড়িত হইল। অট্টালিকার প্রকৃতি তরঙ্গ না কণিকা এ-কথা অবৈজ্ঞানিকও জানিতে চাহে, অথচ কাহার কি আসিয়া যায় এই তথ্য লাভে?

কোন এক মনীষী শিক্ষা কথাটার এই সংজ্ঞা দিয়াছেন। শৈশবে যে কৌতূহল জাগরুক হয় তাহার ক্রমপরিণতি ও তাহার অন্তর্শীলন হইল শিক্ষা। এই কৌতূহল যত দিন মানবজাতির চিত্তে জাগরুক রহিবে তত দিন বিজ্ঞানের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং সভ্যতার পথে মানব দিন-দিন অগ্রসর হইবে।



দৃষ্টি-প্রদীপ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১

জ্যাঠামশায়দের বাড়ি আরও বছর দুই কেটে গেল এই ভাবেই। যত বছর কেটে যায়, এদের এখানে থাকা আমার পক্ষে বেশী কঠিন হয়ে পড়তে লাগল। আমার বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে অনেক জিনিষ আমি বুঝতে পারি আজকাল, আগে আগে অত বুঝতাম না। এ-বাড়িতে থাকা আমার পক্ষে আরও কঠিন হয়ে উঠছিল এই জন্যে যে, আমি চেষ্টা করেও জ্যাঠাইমাদের ধর্ম ও আচারের সঙ্গে নিজেকে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পেরে উঠলাম না।

এঁরা খুব ঘটা করে যেটা ধর্ম বলে আচরণ করেন, আমার মনের সঙ্গে সেটা ত আদৌ মেলে না— আমি মনে যা বলে, বাইরে তাই করি—কিন্তু গুঁরা তাতে চটেন। গুঁদের ধর্মের যেটা আমার ভাল লাগে—সেটাকে গুঁরা ধর্ম বলেন না।

কিন্তু একটা ব্যাপার হয়েছে এই, আগে ভাবতাম শুধু জ্যাঠাইমাদের বাড়িতেই বৃষ্টি এই রকম, এখন বয়স বাড়বার সঙ্গে বুঝতে পেরেছি—এ গ্রামের অধিকাংশই এই রকম—জ্যাঠাইমায়েরা একটু বেশী মাত্র।

এতেই আমার সন্দেহ হ'ল বোধহয় আমার মধ্যেই কোন দোষ আছে, যার ফলে আমি এঁদের শিক্ষা নিতে পারছি নে। ভাবলাম আমার যে ভাল লাগে না, সে বোধ হয় আমি বুঝতে পারিনি বলেই—হয়ত চা-বাগানে থাকার দরুন গুঁদের ধর্ম আমরা শেখবার সুযোগ পাই নি, যে আবহাওয়ার মধ্যে ছেলেবেলা থেকে মানুষ হয়েছে, সেটাই এখন ভাল লাগে।

ম্যাট্রিক পাস করে শ্রীরামপুর কলেজে ভর্তি হলাম। জ্যাঠামশায়দের গ্রাম আটঘরার নবীন চৌধুরী—যার বড় ছেলে ননী ভাল ফুটবল খেলত এবং যে প্রায়শ্চিত্তের বাধাবিঘ্ন

না মেনে বাবার সংস্কারের সময়ে দলবল জুটিয়ে এনেছিল— তারই ভগ্নীপতির বাড়ি অর্থাৎ নবীন চৌধুরীর বড় মেয়ে শৈলবালার খশুরবাড়ি শ্রীরামপুরে। ননীর জোগাড়যন্ত্রে তাদের খশুরবাড়িতে আমার থাকবার ব্যবস্থা হ'ল।

এসে দেগি এদেরও বেশ বড় সংসার, অনেক লোক। শৈলদিদির স্বামীরা ছ' ভাই, তার মধ্যে চার ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে, আর একটি আমার বয়সী, ফাষ্ট ইয়ারেই ভর্তি হ'ল আমার সঙ্গে। সকলের ছোট ভাই স্কুলে পড়ে। শৈলদিদি বাড়ির বড়বো, আমি তাঁর দেশের লোক, সবাই আমাকে খুব আদরঘর করলে। এখানে কিছুদিন থাকবার পরে বুঝলাম যে, সংসারে সবাই জ্যাঠামশায়দের বাড়ির ছাঁচে গড়া নয়। চা-বাগান থেকে এসে বাংলা দেশ সম্বন্ধে যে একটা হীন ধারণা আমার হয়েছিল, সেটা এখানে দু-চার মাস থাকতে থাকতে চলে গেল। আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম যে এ-বাড়ির মেয়েরা কেউ কারও বড় একটা অধীন নয়। কোন এক জনকে সকলের ভয় করে চলতে হয় না বা কোন এক জনের কথায় সকলকে উঠতে বসতে হয় না।

আমি থাকি বাইরের একটা ঘরে, কিন্তু অল্পদিনেই আমি বাড়ির ছেলে হয়ে পড়লাম। শৈলদিদি খুব ভাল, আমাকে ভাইয়ের মত দেখে। কিন্তু এত বড় সংসারের কাজকর্ম নিয়ে সে বড় ব্যস্ত থাকে—সব সময় দেখাশুনো করতে পারে না। শৈলদিদির বয়স আমার মেজকাকীমার চেয়ে কিছু ছোট হবে—তিন-চারটি ছেলেমেয়ের মা। আটঘরায় থাকতে খুব বেশী আলাপ ছিল না, দু-একবার জ্যাঠামশায়দের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে মায়ের সঙ্গে আলাপ করে এসেছিল, তারপর ননী কথাটা পাড়তেই তখনি রাজী হয়ে যায় আমায় এখানে রাখবার সম্বন্ধে। শৈলদিদির স্বামী তার কোন কথা ফেলতে পারে না।

বাড়ির সকলের সঙ্গে খুব আলাপ হয়ে গেল। বাড়ির মধ্যে সর্বত্র ঘাই—জ্যাঠামশায়দের বাড়ির মত এটা ছুঁয়ো না,

ওটা ছুঁয়ো না কেউ করে না। সব ঘরে যাই, সব বিছানাতেই বসি—সবাই আদরঘড় করে, পছন্দ করে। এখন বয়েস হয়েছে বুঝতে পেরেছি আটঘরায় যতটা বাঁধাবাঁধি, এসব শহর-বাজারে অত নেই এদের। কষ্ট হয় মার জন্তে, সীতার জন্তে—তারা এখনও জ্যাঠাইমার কঠিন শাসনের বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে ক্রীতদাসীর মত উদয়াস্ত খাটচে। দাদার জন্তেও কষ্ট হয়। সে লেখাপড়া শিখলে না—চাকুরী করবে সংসারের দুঃখ ঘুগোবে বলে—কিন্তু চাকুরী পায় না, ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আজ বারো টাকা মাইনের চাকুরী করে, কাল জবাব হয়ে যায়, আবার আর এক জায়গায় ষোল টাকা মাইনের চাকরি জোটায়ে। এত সামান্য মাইনেতে বিদেশে খেতে পড়ে কোন মাসে পাঁচ টাকা, কোন মাসে তিন টাকার বেশী মাকে পাঠাতে পারে না, তাতে কি দুঃখ ঘুচবে? অথচ না শিখলে লেখাপড়া, না করতে পারলে কিছু।

কলেজের ছুটির পরে গঙ্গার ধারে একখানা বেঞ্চির ওপর বসে এইসব কথাই ভাবছিলাম। মাঝে মাঝে ভয়ানক ইচ্ছে হয় আবার একবার চা-বাগানের দিকে যাই, আর একবার হিমালয় দেখি। কতকাল রডোড্রেণ্ড ফুল দেখি নি, পাইন-বন দেখি নি, কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখি নি—সে রকম শীত আর পাইনি কোনদিন,—এদের সবাইকে দেখাতে ইচ্ছে হয় সে দেশ। স্কুলে যখন প্রবন্ধ লিখতে দিত, আমি হিমালয় নিয়ে লিখতাম—আমার লেখা সকলের চেয়ে ভাল হ’ত—কারণ বাল্যের স্বপ্ন-মাখানো সে ওক পাইনের বন, বর্ণা, তুষারমণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘা, কুয়াসা, মেঘ আমার কাছে পুরনো হবে না কোন দিন, তাদের কথা লিখতে গেলে নতুনতর ভাব ও ভাষা কোথা থেকে এসে জোটে, মনে হয় আরও লিখি, এখনও সব বলা হয় নি। লেখা অপরে ভাল বললেও আমার মন তৃপ্ত হ’ত না, মনে হ’ত যা দেখেছি তার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও আঁকতে পারলাম না—অপরে ভাল বললে কি হবে, তারা ত আর দেখেনি?

ওপারে বারাকপুরের সাদা বাড়িগুলো যেন সবুজের সমুদ্রে ডুবে আছে। ঠিক যেন চা-ঝোপের আড়ালে ম্যানেজার সাহেবের ফুঠা—লাল টালির ছাদ থাকলেই একেবারে চা-বাগান। ওই দিকে চেয়েই ত রোজ বিকেলে আমার মনে হয় বাল্যের চা-বাগানের সেই দিনগুলো।

বাড়ি ফিরে গেলাম সন্ধ্যার পরে। চাকরকে ডেকে বললাম, “লুলু আলো দিয়ে যা।” আলো দেওয়ার পরে হঠাৎ আমার নজরে পড়ল দেওয়ালের গায়ের আমার দুটো প্রিয় ছবি, পর্কতে উপদেশদানরত খৃষ্ট, আর একটা সাধু জন,—নোনা ধ’রে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ছবি দুটো সরিয়ে পুঁতচি এমন সময়ে ভবেশ এল। ভবেশ সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে, খুব বুদ্ধিমান ছেলে, স্কলারসিপ নিয়ে পাস করেছে—প্রথম দিনেই কলেজে এর সঙ্গে আলাপ হয়। ভবেশ এসেই বললে—ও কি হচ্ছে? নোনা ধ’রে যাচ্ছিল? ভালই হচ্ছিল—ও-সব ছবি রেখে লাভ ঘরে?

ভবেশের দৈনন্দিন কাজ রোজ এসে আমার কাছে খৃষ্টান ধর্মের নিন্দা করা। আমাকে ও খৃষ্টান ধর্মের কবল থেকে উদ্ধার ক’রে নাকি হিন্দু করবেই। আজও সে আরম্ভ করলে, বাইবেলটা নিতান্ত বাজে, আজগুবি গল্প। খৃষ্টান ইউরোপ এই সেদিনও রক্তে সারা দুনিয়া ভ’সিয়ে দিলে গ্রেট ওয়ারে। কিসে তুমি ভুলেচ? রোজ যাও পিকারিং সাহেবের কাছে ধর্মের উপদেশ নিতে। ওরা ত তোমাকে খৃষ্টান করতে পারলে বাঁচে। তা ছাড়া আজ হিন্দুদের বলবুদ্ধি করা আমাদের সব’রই কর্তব্য—এটা কি তোমার মনে হয় না?

আমি বললাম—তুমি ভুল বুঝেচ ভবেশ, তোমাকে এক দিনও বোঝাতে পারলাম না যে আমি খৃষ্টান নই; খৃষ্টান ধর্ম কি জিনিস আমি জানি নে—জানবার কৌতূহল হয় তাই পিকারিং সাহেবের কাছে জানতে যাই। আমি ধীশুখৃষ্টের ভক্ত, তাঁকে আমি মহাপুরুষ বলে মনে করি। তাঁর কথা আমার গুনতে ভাল লাগে। তাঁর জীবন আমাকে মুগ্ধ করে। এতে দোষ কিসের আমি ত বুঝি নে।

—ও বটে! বুদ্ধ, চৈতন্য, কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ এরা সব ভেসে গেলেন—ধীশুখৃষ্ট হ’ল তোমার দেবতা! এরা কিসে ছোট তোমার ধীশুর কাছে জিজ্ঞেস করি?

—কে বলেচে তাঁরা ছোট? ছোট কি বড় সে কথা উঠে ত না এখানে? আমি তাঁদের কথা বেশী জানি নে। যতটুকু জানি তাতে তাঁদের শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এও ত হয় কেউ এক জনকে বেশী ভালবাসে, আর এক জনকে কম ভালবাসে?

—তুমি যতই বোঝাও জিতেন, আমার ও ভাল লাগে না।

দেশের মাটির সঙ্গে যোগ নেই ওর। তোমার মত চমৎকার ছেলে যে কেন বিপথে পা দিলে, ভেবে ঠিক করতে পারি নে। তোমার লজ্জা করে না একথা বলতে যে, তুমি রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্যের কথা কিছু জান না, তাঁদের কথা জানতে আগ্রহও দেখাও না, অথচ রোজ যাও যীশুখৃষ্টের বিষয় শুনতে? একশো বার বলবো তুমি বিপথে পা দিয়ে দাঁড়িয়েচ। কই, একদিন গীতা পড়েচ? অথচ গস্পেল পড়তে যাও পিকারিঙের কাছে—তোমাকে বন্ধু বলি তাই কষ্ট হয়, নইলে তুমি উচ্ছন্ন যাও না, আমি বলতে যাব কেন?

ভবেশ চলে গেলে আমার মনে হ'ল ও যা ব'লে গেল তা জ্যাঠাইমা আমাকে যা বলতেন তার সঙ্গে মূলতঃ এক। ভবেশ আমাকে স্নেহ করে ব'লে হৃদয়হীন ভাষায় বলে নি জ্যাঠাইমার মত। কিন্তু আমি যা করছি তা যে খুব ভাল কাজ নয় একথা ভবেশ বলেচে।

অনেক রাত পর্যন্ত কথাটা ভাবলাম। হিন্দুর ছেলের পক্ষে যীশুখৃষ্টকে ভক্তি করাও পাপ। শ্রীরামপুরে এসে আমার একটা স্মৃতি হ'য়েচে এখানে খৃষ্টধর্মের অনেক বই আছে, থিওলজির কলেজ রয়েছে, পিকারিঙের কাছে যাই ও-সব সম্বন্ধে জানতে। পিকারিং আমাকে খৃষ্টান হ'তে বলেচে। কিন্তু খৃষ্টান ধর্মের অনুষ্ঠানের দিকটা এখানে এসে দেখেছি, তার দিকে আমার মন আকৃষ্ট হয় নি। কিন্তু খৃষ্টকে আমি ভক্তি করি, খৃষ্টের কথা বলতে ভাল লাগে, শুনতে ভাল লাগে। এতে দোষ আছে কিছু? মহাপুরুষের কি দেশ-বিদেশ আছে?

রাত্রে বাড়ির মধ্যে খেতে গিয়ে দেখি আর সকলের খাওয়া হয়ে গিয়েচে—ছোট বউ অর্থাৎ শৈলদিদির ছোট জায়ের রান্নার পালা ছিল এবেলা—তিনি হাঁড়িকুড়ি নিয়ে বসে আছেন। আমি খেতে বসলাম কিন্তু কেমন অস্থিস্তি বোধ হ'তে লাগল—শৈলদিদির এই ছোট-জাকে আমি কি জানি কেন পছন্দ করিনে। মেজ বউ, সেজ বউকে যেমন মেজদি, সেজদি ব'লে ডাকি—ছোটবউকে আমি এপর্যন্ত কোন কিছু ব'লে ডাকি নি। অথচ তিনি আমার সামনে বেরোন বা আমার সঙ্গে কথা বলেন। ছোটবউয়ের বহুস আমার সমান হবে, এই সতেরো আঠারো - আমি যদিও 'আপনি' ব'লে কথা বলি। বাড়ির সব মেয়েরা ও বোয়েরা জানে যে ছোটবোয়ের সঙ্গে আমার তেমন সন্তাব নেই।

কেন আমি তাঁকে ছোটদিদি ব'লে ডাকি নে, শৈলদি আমায় এ নিয়ে কতবার বলেচে। কিন্তু আমার যা ভাল লাগে না, তা আমি কখনও করিনে।

সেদিন এক বাপার হ'য়েচে। খেয়ে উঠে অভ্যাসমত পান চেয়েছি—কাউকে বিশেষ ক'রে সম্বোধন ক'রে নয়, যেন দেয়ালকে বলছি এই ভাবে। ছোটবউ আধ-ঘোমটা দিয়ে এসে পান আমার হাতে দিতে গেলেন—আমার কেমন একটা অস্থিস্তি বোধ হ'ল, কেন জানি নে, অল্প কারুর বেলা আমার ত এমন অস্থিস্তি বোধ হয় না? পান দেবার সময় তাঁর আঙ্গুলটা আমার হাতে সামান্য ঠেকে গেল—আমি তাড়াতাড়ি হাত টেনে নিলাম। আমার সারা গা কেমন শিউরে উঠল, লজ্জা ও অস্থিস্তিতে মনে হ'ল পান আর কখনও এমন ভাবে চাইব না। মেজদি কি শৈলদির কাছে গিয়ে চেয়ে নেবো।

সেই দিন থেকে ছোট বউকে আমি এড়িয়ে চলি।

২

মাস-কয়েক কেটে গেল। শীত পড়ে গিয়েচে।

আমি দোতলার ছাদে একটা নিরিবিলি জাম্বগায় বোদে পিঠ দিয়ে বসে জ্যামিতির আঁক ক'র্চি।

সেজদি হাসতে হাসতে ছাদে এসে বললেন—জিত্ত এস তোমায় ওরা ডাকছে। আমি বললুম—কে ডাকচে সেজদি? সেজদির মুখ দেখে মনে হ'ল একটা কি মজা আছে। উৎসাহ ও কৌতূহলের সঙ্গে পেছনে পেছনে গেলাম। দোতলার ওদিকের বারান্দাতে সব মেয়েরা জড়ো হয়ে হাসাহাসি করচে। আমায় সবাই এসে ঘিরে দাঁড়াল, বললে—এস ঘরের মধ্যে। তাদের পেছনে ঘরে ঢুকতেই সেজদি বিছানার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—ওই লেপটা তোলা ত দেখি কেমন বাহাতুরি? বিছানাটার উপর আগাগোড়া লেপ-ঢাকা কে এক জন শুয়ে আছে লেপ মুড়ি দিয়ে। সবাই বললে—তোলা ত লেপটা!

আমিও হাসিমুখে বললাম—কি বলুন না সেজদি, কি হ'য়েচে কি?

ভাবলুম বোধ হয় শৈলদির ছোট দেওর অজ্ঞকে এরা একটা কিছু সাজিয়েচে বা ঐ রকম কিছু। তাড়াতাড়ি লেপটা টেনে নিয়েই চমকে উঠলাম। লেপের তলায় ছোট বোঁঠাকরণ মুখে হাসি টিপে চোখ বুজে শুয়ে!

সবাই খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। আমি লজ্জায় লাল হয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের বার হয়ে গেলাম। বা রে, এ কি কাণ্ড ওদের? কেন আমায় নিয়ে এ রকম করা? তা ছাড়া—ছিঃ—না ওকি কাণ্ড? ছোট বৌঠাকরুণ স্বৈচ্ছায় এ ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন নিশ্চয়। আমার আরও রাগ হ'ল তাঁর ওপরে।

এর দিন দুই পরে আমি আমার নিজের ঘরে একা বসে আছি, এমন সময় হঠাৎ ছোট বৌঠাকরুণকে দোরের কাছে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। তিনি আমার ঘরে কখনও আসেন নি এ-পর্যন্ত। কিন্তু তিনি যেমনি এলেন, তেমনি চলে গেলেন, একটুও দাঁড়ালেন না। যাবার আগে ঘরের মধ্যে কি একটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেলেন।

আমি বিস্মিত হয়ে তুলে দেখলাম একখানা ভাঁজকরা ছোট কাগজ—একখানা চিঠি! ছোট চিঠি, দু-কথায়—

সেদিন যা ক'রে ফেলেছি সেজ্ঞ আপনার কাছে মাপ চাই। আমি নিজের ইচ্ছেতে কিছু করি নি। দলে পড়ে করেছি। কদিন ধরে ভাবছি আপনার কাছে মাপ চাইব—কিন্তু লজ্জায় পারি নি। আমি জানি আপনার মন অনেক বড়, আপনি ক্ষমা করবেন।

পত্র কোনো নাম নেই। আমি সেখানা বার-বার পড়লাম—তারপর টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললাম—কিন্তু টুকরোগুলো ফেলে দিতে গিয়ে কি ভেবে আমার একটা ছোট মণিব্যাগ ছিল, তার মধ্যে রেখে দিলাম।

সেদিন থেকে আমার কি হ'ল, আমি একা থাকলেই ছোট বৌঠাকরুণের কথা ভাবি। কিছুতেই মন থেকে আমি তার চিন্তা তাড়াতে পারি নে। দু-পাঁচ দিন ক'রে সপ্তাহখানেক কেটে গেল। আমি বাড়ির মধ্যে তেমন আর যাই নে—অত্যন্ত ভয়, পাছে একা আছি এমন অবস্থায় ছোট বৌঠাকরুণের সঙ্গে দেখা হয়ে পড়ে। ছোটবৌয়ের রান্নার পালার দিন আমি সকাল সকাল খেয়ে নি, যখন অনেক লোক রান্নাঘরে থাকে। বা যখন দরকার হয়, শৈলদি কি সেজদির কাছে চাই—ওদের গলা না শুন্তে পেলো বাড়ির মধ্যে যেতে সাহস হয় না।

সেজদি একদিন বল্চেন—জিতু, তুমি কলেজ থেকে এসে খাবার খাওয়া ছেড়ে দিলে নাকি? বিকেলে ত বাড়ির মধ্যে থাকই না, আসই না। কোথা থেকে খেয়ে আসবু? আমি জানি বিকেলের চা খাবার প্রায়ই ছোটবৌ

তৈরি করেন—আর সে সময় বড়-একটা কেউ সেখানে থাকে না। যে যার খেয়ে চলে যায়। ইচ্ছা ক'রেই বিকেলে চা খেতে যাই নে।

পয়সা যেদিন থাকে, ষ্টেশনের দোকান থেকে খেয়ে আসি।

শীত কেটে গেল, বসন্ত যাম-যায়। আমার ঘরে জানালার ধারে বসে পড়ছি, হঠাৎ জানালার পাশের দরজা দিয়ে ছোট বৌঠাকরুণ কোথা থেকে বেড়িয়ে এসে বাড়ি ঢুকছেন, সঙ্গে শৈলদির ছেলে কালো। তিনি আমায় দেখতে পাননি। আমি অপলকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে। তাঁকে যেন নূতনরূপে দেখলাম—আরও কত বার দেখেছি, কিন্তু আজ দেখে মনে হ'ল এ চোখে আর কখনও দেখিনি তাঁকে। তাঁর কপালের অমন সুন্দর গড়ন, পাশের দিক থেকে তাঁর মুখ যে সুশ্রী দেখায়, ভুরু ও চোখের অমন ভঙ্গি—এ সব আগে ত লক্ষ্য করি নি? যখন কেউ দেখে না, তখন তাঁর মুখের কি অদ্ভুত ধরণের ভাব হয়! তিনি বাড়ির মধ্যে ঢুকে যেতেই আমার চমক ভাঙলো। বই খুলে রেখে দিলাম—পড়ায় আর মন বসল না, সম্পূর্ণ অশ্রমস্ক হয়ে গেলাম। কি একটা কষ্ট হ'তে লাগল বুকের মধ্যে—যেন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস আটকে আসচে। মনে হ'ল আর চুপ ক'রে বসে থাকতে পারব না, এফুনি ছুটে মুক্ত বাতাসে বেরুতে হবে। সেই রাত্রে আমি তাকে চিঠি লিখতে বসলাম—চিঠি লিখে ছিঁড়ে ফেললাম, আবার লিখে আবার ছিঁড়লাম। সেইদিন থেকে তাঁকে উদ্দেশ্য ক'রে চিঠি লেখা যেন আমার কলেজের টাস্কের সামিল হয়ে দাঁড়ালো—কিন্তু লিখি আর ছিঁড়ে ফেলি। দিন-পনের পরে ঠিক করলাম, আজ চিঠি দেবই। সেদিন বেলা দেড়টার মধ্যে কলেজ থেকে ফিরে এলাম—গ্রীষ্মের দুপুর, বাড়ির সবাই ঘুমুচ্ছে। আমি বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম, সিঁড়ির পাশেই দোতলায় তাঁর ঘর, তিনি ঘরে বসে সেলাই করছিলেন—আমি সাহস ক'রে ঘরে ঢুকে চিঠি দিতে পারলাম না, চলে আসছিলাম, এমন সময় তিনি মুখ তুলেই আমায় দেখতে পেলেন, আমি লজ্জায় ও ভয়ে অভিভূত হয়ে সেখান থেকে সরে গেলাম, ছুটে নীচে চলে এলাম—পত্র দেওয়া হ'ল না, সাহসই হ'ল না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে পথে উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়লাম লক্ষ্যহীন ভাবে। সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে অনেক রাত্রে বাড়ি যখন ফিরি, রাত

তখন বারোটা। বাড়িতে আবার সেদিন লক্ষ্মীপূজা ছিল। খেতে গিয়ে দেখি রান্নাঘরের সামনের বারান্দায় আমার খাবার টাকা আছে, শৈলদি তুলুচেন রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে। মনে মনে অনুতাপ হ'ল, সারা বিকেল খাটুনির পরে শৈলদি বেচারী কোথায় একটু ঘুমবে, আর আমি কি-না এ-ভাবে বসিয়ে রেখেছি!

আমায় দেখে শৈলদি বললে—বেশ, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

কথার উত্তর দিতে গেলে মুষ্কিল, চূপচাপ খেতে বসলাম। শৈলদি বললে—না খেয়ে ঢন্ ঢন্ ক'রে বেড়িয়ে বেড়িয়ে কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে গিয়েচে। চা খেতেও আসিস নে বাড়ির মধ্যে, কালোকে দিয়ে বাইরের ঘরে খাবার পাঠিয়ে দিলেও পাওয়া যায় না—থাকিস্ কোথায়?

খানিকক্ষণ পরে পাতের দিকে চেয়ে বললে—ও কি ভাল ক'রে ভাত মাখ। ঐ ক'টি খেয়ে মানুষ বাঁচে ত? তোরা এখন ছেলেমানুষ, খাবার বয়েস। লুচি আছে ভোগের, দোবো? পায়ের তুই ভালবাসিস্, এক বাটি পায়ের আলাদা করা আছে। কই মাছের মুড়ো ফেল্‌লি কেন, চুষে চুষে খা। আহা, কি ছিরি হচ্ছে চেহারার!

পরদিন কিসের ছুটি। আমি দোতলার ছাদে কালোকে ডাকতে গিয়েছি তার প্রাইভেট টিউটার নীচে পড়াতে এসেচে ব'লে। সন্ধ্যার অন্ধকার হয়েছে। ও-ঘরে উঠেই আমি একে বারে ছোটবোঁঠাক্করণের সামনে পড়ে গেলাম। তাঁর কোলে মেজদির দেড় বছরের খুকী মিস্ট্রী—সে খুব ফুটফুটে ফর্সা ব'লে বাড়ির সকলের প্রিয়, সবাই তাকে কোলে পাবার জগ্গে ব্যগ্র। ছোটবোঁঠাক্করণ হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন খুকীকে কোলে ক'রে। আমি বিস্মিত হ'লাম, কপালে ঘাম দেখা দিল। খুকী আমায় চেনে, সে আমার কোলে বাঁপিয়ে আসতে চায়। ছোটবোঁঠাক্করণ আমার আরও কাছে এগিয়ে এসে, দাঁড়ালেন—খুকীকে আমার কোলে দিলেন। তাঁর পায়ের আঙুল আমার পায়ের আঙুলে ঠেকল। আমি তখন লাল হয়ে উঠেছি, শরীর যেন বিম্ব বিম্ব করচে। কেউ কোন দিকে নেই।

ছোটবোঁঠাক্করণ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে স্বর নীচু

ক'রে বললেন—আপনি আর বাড়ির মধ্যে আসেন না কেন আজকাল? আমার ওপর রাগ এখনও যায় নি?

আমি অতি কষ্টে বললাম—রাগ করব কেন?

—তবে সেদিন ও-ঘরে এলেন, আমার সঙ্গে কথা বললেন না ত? চলে গেলেন কেন? মরীয়া হ'য়ে বললাম—আপনাকে সেদিন চিঠি দোবো ব'লে এসেছিলাম, কিন্তু পাছে কিছু মনে করেন, সেজগ্গে দেওয়া হয় নি। পাছে কিছু মনে করেন ভেবেই বাড়ির মধ্যে আসি নি। তিনি খানিকক্ষণ চূপ ক'রে রইলেন। তারপর মৃহস্বরে বললেন—মাথা ঠাণ্ডা ক'রে লেখাপড়া করুন। কেন ও-রকম করেন? আর বাড়ির মধ্যে আসেন না কেন? ওতে আমার মনে ভারি কষ্ট হয়। যেমন আসতেন, তেমনি আসবেন বলুন? আমায় ভাবনার মধ্যে ফেলবেন না ওরকম।

আমার শরীরে যেন নতুন ধরণের অনুভূতির বিদ্যুৎ খেলে গেল। সেখানে আর দাঁড়াতে পারলাম না—মুখে যা এল, একটা জবাব দিখে নীচে নেমে এলাম। সারারাত ঘুমতে আর পারিনি। আমার জগ্গে এক জন ভাবে—এ চিন্তার বাস্তবতা আমার জীবনে একেবারে নতুন! নতুন! নতুন! নেশার মত এ অনুভূতি আমার সারা দেহ-মন অভিভূত ক'রে তুললে।

কি অপূর্ণ ধরণের আনন্দ-বেদনায় মাথানো দিন, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস! দিন রাতে সব সময়ই আমার ওই এক চিন্তা। নিরুজ্জনে কাটাই, কিছু ভাল লাগে না, অথচ ধীর চিন্তা শয়নেশ্বপনে সর্বদাই করি, তাঁর সামনে পাছে পড়ি এই ভয়ে সতর্ক হয়ে চলাফেরা করি। লেখাপড়া, খাওয়া, ঘুম সব গেল।

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি ছোট বোঁঠাক্করণের হ'ল অসুখ। অসুখ ক্রমে বাড়াবাড়ি ধরণের হ'ল। চাতরা থেকে যত ডাক্তার দেখতে এল। তাঁর বাপের বাড়ি থেকে লোকজন এসে পড়ল—বাড়িসুদ্ধ লোকের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। আমি ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা, এসব করি বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে, কিন্তু একদিনও রোগীর ঘরে যেতে পারলাম না—কিছুতেই না। একদিন ঘরের দোরের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম—কিন্তু চৌকাঠের ওপারে যাই নি।

ক্রমে তিনি সেয়ে উঠলেন। একদিন আমার 'চয়নিকা' খানা তিনি চেয়ে পাঠালেন—দিন দুই পরে কালো বই ফিরিয়ে দিয়ে গেল। চার-পাঁচ দিন পরে 'চয়নিকা' খানা কি জন্তে খুলতে গিয়েছি, তার মধ্যে একখানা চিঠি, ছোটবোঁঠাক্করণের হাতের লেখা।

নাম নেই কারুর। লেখা আছে—

আমার অস্থখের সময় সবাই এল, আপনি এলেন না কেন? আমি কত আশা করেছিলাম যে আপনি দেখতে আসবেন, জানেন তা? আমার মরে যাওয়াই ভাল ছিল। কেন যে আবার সেয়ে উঠলাম! অস্থখ থেকে উঠে মন ও শরীর ভেঙে গেছে। কালোর মুখে শুনেছি, আপনি আপনার দেবতার ছবি ঘরে টাঙিয়ে রেখেছেন, শুনেছি যীশুখৃষ্টের ছবি, তিনি হিন্দুর দেবতা নন—কিন্তু আপনি যাকে ভক্তি করেন—আমি তাঁকে অবতলা করতে পারি নে। আমার জন্তে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবেন! আর একটা কথা—একটিবার দেখতে কি আসবেন না।

যীশুখৃষ্টের ছবির দিকে চাইলাম। সম্প্রতি একখানা বুদ্ধের ছবি, আর একখানা চৈতন্যের ছবিও এনে টাঙিয়ে ছিলাম। রোগশীর্ণা পত্রলেখিকার করুণ আকৃতি গুঁদের চরণে পৌঁছে দেবার ভার আমার ওপর পড়েছে। কিন্তু আমি কি পারব? অনুকম্পায় মমতায় আমার মন তখন ভরে উঠেছে। যে প্রার্থনা গুঁদের কাছে জানালাম, তা ভাষাহীন, বাক্যহীন। আমি এ-ছাড়া আর কিছু করতে পারি নে। সামনে হঠাৎ যেতে পারব না তাঁর। এ-বাড়িতেও আর বেশীদিন থাকা হবে না আমার। চলে যাব এখান থেকে।

টেঁট পরীক্ষা দিয়েই আটঘরার পালাবো, ঠিক করলাম। সেখানে যাইনি অনেক দিন। মা চিঠি লিখেছেন, দেখবার জন্তে ব্যস্ত হয়েছেন। আমার সেখানে যেতে ইচ্ছে হয় না শুধু জ্যাঠাইমাদের ব্যবহারের জন্তে। গেলেই মায়ের দুঃখ দেখতে হবে। দাদা এক বাতাসার কারখানায় চাকরি পেয়েছে, মাসে কিছু টাকা অতিকষ্টে পাঠায়। সীতা বড় হয়ে উঠল—তারই বা কি করা যায়? দাদা একাই বা কি করবে!

পিকারিং সাহেব আমার হাতে গীতা দেখে একদিন বললে—তুমি এ-সব পড় নাকি? বাইবেল কি তোমার সকল আধ্যাত্মিক অভাব পূর্ণ করে না?

আমি বললাম—পড়ে দেখতে দোষ আছে সাহেব? তা ছাড়া আমি ত খৃষ্টান নই, আমি এখনও হিন্দু।

—হু-নোকোতে পা দেওয়া যায় না, মাই বয়। তুমি খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হও—নয়তো তুমি বাইবেল পড় কেন?

—সাহেব, যদি বলি ইংরিজী ভাষা ভাল করে শেখবার জন্যে?

পিকারিং সাহেব হো হো করে হেসে উঠল। বললে—তোমার আত্মার পরিভ্রাণ তার চেয়েও বেশী দরকারী। যীশুতে বিশ্বাস না করলে আত্মার ভ্রাণ নেই। তিনি আমাদের সকলের পাপের ভার নিজে নিজে ক্রুশের নিষ্ঠুর মৃত্যু বরণ করেছিলেন। যীশুর ধর্মে দীক্ষিত হও, তোমার পাপ তাঁর রক্তে ধুয়ে যাবে। এস, আমার সঙ্গে গান কর।

তারপর সাহেব নিজেই গান ধরল—

Nothing but the Blood of Jesus
Oh, Precious is the flow,
That can make me white as snow,
No other Fount I know,
Nothing but the Blood of Jesus.

পিকারিং সাহেবকে আমার খুব ভাল লাগে। খুব সরল, ধর্মপ্রাণ লোক। স্ত্রী মারা গিয়েছে আজ দশ-বারো বছর, আর বিয়ে করেনি,—টেবিলের ওপর নিকেলের ফ্রেমে বাঁধানো স্ত্রীর ফটো সর্বদা থাকে। মাঝে মাঝে আমায় জিগ্যেস করে—আমার স্ত্রী দেখতে কেমন ছিল, ভাল না? ফটো দেখে মিসেস পিকারিংকে সুন্দরী মনে হয়নি আমার, তবুও বলি খুব চমৎকার।

পিকারিং সাহেবের ধর্মমত আমার কাছে কিন্তু অমুদার ঠেকে—কিছুদিন এদের সঙ্গে থেকে আমার মনে হয়েছে জ্যাঠাইমারা যেমন গোঁড়া হিন্দু—খৃষ্টানদের মধ্যেও তেমনি গোঁড়া খৃষ্টান আছে। এরা নিজের ধর্মটি ছাড়া আর কারুর ধর্ম ভাল দেখে না। এদেরও সমাজে সংকীর্ণতা আছে—এদেরও আচার আছে—বিশেষতঃ একটি নির্দিষ্ট ধরণে ঈশ্বরের উপাসনা না করলে উপাসনা ব্যর্থ হ'ল এদের মতে। একখানা কি বইয়ে একবার অনন্ত নরকের গল্প পড়লাম। শেষবিচারের দিন পর্যন্ত পাপীরা সেই অনন্ত নরকের অনন্ত আগুনের মধ্যে জ্বলে পুড়বে, খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হবার আগেই যদি কোন শিশু মারা যায়—তাদের আত্মাও যাবে অনন্ত নরকে। এসব কথা প্রথমে যেদিন শুনেছিলাম, আমাকে ভয়ানক ভাবিয়ে তুলেছিল। তারপর মনে হ'ল কেন যীশু কি এতই নিষ্ঠুর? তিনি পরিভ্রাণের দেবতা, তিনি সকল পাপীকেই কেন পরিভ্রাণ করবেন না? যে তাঁকে জানে, যে তাঁকে না-জানে—সবাইকে

সমান চোখে তিনি কেন না দেখবেন ? তাঁর কাছে খুঁটান ও
খুঁটানে প্রভেদ থাকবে কেন ? বরং যে অজ্ঞানকে তাঁর প্রতি
তাঁর অল্পকম্পা বেশী হবে—আমার মনের সঙ্গে এই
খুঁটের ছবি খাপ খায়। তিনি প্রেমময় মুক্ত মহাপুরুষ, তাঁর
কাছেও ধর্মের দলাদলি থাকে কখনও ? যে দেশের, যে ধর্মের,
যে জাতির হোক, তিনি সবারই—যে তাঁকে জানে, তিনি তার,
যে না-জানে, তিনি তারও।

এক দিন গঙ্গার ধারে বেঙ্কির ওপর বসে জনকতক লোক
গল্প করচে শুনলাম বরানগরে কুঠিঘাটের কাছে একটা বাগান-
বাড়িতে এক জন বড় সাধু এসেছেন, সবাই দেখতে যাচ্ছে।
দু-এক দিনের মধ্যে একটা ছুটি পড়ল, বেলুড় নেমে গঙ্গাপার
হয়ে কুঠিঘাটের বাগান-বাড়িতে খোঁজ ক'রে বার করলাম।
বাগান-বাড়িতে লোকে লোকারণ্য, সকলেই সাধুজীর শিষ্য,
মেয়েরাও আছে। ফটকের কাছে একজন দাড়িওয়াল লোক
দাঁড়িয়ে ছিল, আমি ফটকের কাছে গিয়ে আমার আসার
উদ্দেশ্য বলতেই লোকটা দু-হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে
বললে—ভাই, এস এস, তোমাকে নেওয়ার জন্যই আমি এখানে
যে দাঁড়িয়ে আছি ! আমি পছন্দ করিনে যে কেউ আমার
গলা জড়িয়ে ধ'রে—আমি ভদ্রভাবে গলা ছাড়িয়ে নিলাম।
লোকটা আমার বাগানের মধ্যে নিয়ে গেল। আমি কৌতূহল
ও আগ্রহের সঙ্গে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। বাঁ-দিকের
রোয়াকে একদল মেয়ে ব'সে একরাশ তরকারী কুটছে—একটা
বড় গামলায় প্রায় দশ সের ময়দা মাখা হচ্ছে,—যেদিকে
চাই, খাওয়ার আয়োজন।

—সাধুর দেখা পাবো এখন ?

—তিনি এখন ধ্যান করছেন। তাঁর প্রধান শিষ্য
জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী ও-ঘরে আছেন, চল ভাই তোমায়
নিয়ে যাই।

কথা বলচি এমন সময় এক জন ভদ্রলোক এলেন, সঙ্গে
একটি মাহলা—ফটকের কাছে তাঁরা মোটর থেকে নামলেন।
এক জন বালক-শিষ্যকে ভদ্রলোকটি কি জিগোস করলেন—
সে তাঁদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে এল আমার সঙ্গে দাড়িওয়াল
লোকটির কাছে। ভদ্রলোকটি তাকে বললেন—স্বামিজীর
সঙ্গে দেখা করতে এসেচি, তিনি কোথায় ?

—কোথা থেকে আসছেন আপনারা ?

—ভবানীপুর, এল্‌গিন রোড থেকে। আমার নাম
বিনয়ভূষণ মল্লিক—

দাড়িওয়াল লোকটির শরীরের ইচ্ছুপ কজা যেন সব টিলে
হয়ে গেল হঠাৎ—সে তিন ভাগে ভেঙে হাত কচলে বললে—
আজ্ঞে আসুন, আসুন, বুঝতে পেরেচি, আসুন। এই সিঁড়ি
দিয়ে আসুন—আসুন মালম্বী—

আমি বিস্মিত হ'লাম। এই যে বললে সাধুজী ধ্যানে
বসেছেন—তবে গুঁরা গেলেন যে ! লোকটি গুঁদের ওপরে দিয়ে
আবার নেমে এল। আমার একটা হৃদয়ের নিয়ে গেল।
সেখানে জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে
দিলে। জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারীর পরনে গেকুয়া আলখেল্লা, রং
ফর্সা—আমার সঙ্গে বেশ ব্যবহার করলেন। তিনি
আপিসের কাজে দেড়শো টাকা মাইনে পেতেন—ছেড়ে
স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। স্বামিজী বলেছেন
তিনি তিনটে মহাদেশ উদ্ধার করবেন, সাধনায় সিদ্ধিলাভ
করলেই বেরিয়ে পড়বেন সে উদ্দেশ্যে। স্বামিজীর দেওয়া
মন্ত্রজপ ক'রে তিনি অদ্ভুত ফল পেয়েছেন নিজে—এই সব
গল্প সমবেত দর্শকদের কাছে করছিলেন। আমি কৌতূহলের
সঙ্গে জিগোস করলাম—কি ফল পেয়েছেন মন্ত্রের ? তিনি
বললেন—মন্ত্র জপ করতে করতে মনে হয় যেন কোথায়
পাহাড়ের উপরে বসে আছি। স্বামিজী বলেন এ-একটা
উচ্চ অবস্থা। আমি আরও আগ্রহের স্বরে বললাম—আর
কিছু দেখেন ? তিনি বললেন জ্যোতিঃদর্শন হয় মাঝে মাঝে।

—সে কি রকম ?

—দুই ভুরুর মাঝখানে একটা আগুনের শিখার মত
দীপ্তি দেখতে পাই।

আমি হতাশ হ'লাম। আমি নিজেকে ত কত কি
দেখি ! এরা ত সে-সব কিছু দেখে ব'লে মনে হয় না !
এরা আর কতটুকু দেখে ত হ'লে ? পাহাড়ের ওপর
বসে আছি এই দেখলেই বা কি হ'ল ? ভুরুর মধ্যে
আগুনের শিখা দেখলেই বা কি ?

শুনলাম বেলা ছ'টার পরে স্বামিজীর দেখা পাওয়া যাবে।
পাশের একটা ঘরে বসে রইলাম খানিকক্ষণ। আরও এক জন
বৃদ্ধ সেখানে ছিলেন। কথায় কথায় তিনি বললেন—দেখ
ত বাবা—এই তোমরাও ত ছেলে। আর আমার

হতচ্ছাড়া ছেলেটা পালিয়ে এসে বাড়ি থেকে এই সন্নিসির দলে যোগ দিয়েছে। এখানে ত এই খাওয়া, এই থাকা। যাত্রার দলের মত এক ঘরে একশো লোক শোয়। ছেলেটা হাঁড়ির হাল হয়েছে—আগে একবার ফিরিয়ে নিতে এসেছিলাম—তা যায় নি। এবার আমি আসচি শুনে কোথায় পালিয়েছে হতভাগা। আহা, কোথায় যাচ্ছে, কি হচ্ছে—ওদিকে বাড়িতে ওর মা অন্নজন ছেড়েছে। ওই সন্নিসির দলই তাকে সরিয়ে রেখেছে কোথায়। আজ তিন দিন এখানে বসে আছি—তা ছোঁড়া এল না। এরা তলায় তলায় তাকে খবর দিচ্ছে। আবার আমার ওপর এদের রাগ কি? বলচে—ছেলে তোমার মুক্তির পথে গিয়েছে, বিষয়ের কীট হয়ে আছ তুমি, আবার ছেলেটাকে কেন তার মধ্যে ঢোকাবে? শোন কথা। ওদের এখানে বিনি পয়সায় চাকর হাতছাড়া হয়ে যায় তা হ'লে যে! আমরা এই মারে ত এই মারে। দু-বেলা অপমান করছে।

—কোথা থেকে আপনার ছেলে এদের দলে এল?

—এই সন্নিসির দল গেছিল আমাদের মাদারিপুর্বে। খুব কীর্জন করে, ভিক্ষে করে, শিষ্য-সেবক তৈরি করে বেড়ালে কদিন! সেগান থেকে ছেলেটাকে ফুসলে নিয়ে এসেছে। পয়সা হাতে থাকত আমার ত ব্যাটারী খাতির করত। এখানে খেতে দেয় না; ওই বাজারের হোটেল থেকে খেয়ে আসি। একটু এই দালানটাতে রাত্রে শুয়ে থাকি, তাও দু-বেলা বলচে—বেরো এখান থেকে। ছোঁড়াটা ফিরে আসবে, সেই আশায় আছি।

স্বামিজীর সঙ্গে দেখা হ'ল না।

সন্ধ্যার পরে স্ত্রীমারে পার হয়ে বেলুড়ে এলাম; মনে কত গাশা নিয়ে গিয়েছিলাম ওবেলা। মাহুঘের সঙ্গে মাহুঘের ব্যবহার যেখানে ভাল নয়, সেই জ্যাঠাইমাদের বাড়ির গাঙ্গীনাথ জিউএর পূজোর সময় যা দেখেছি, হীরু ঠাকুরের প্রতি তাদের ব্যবহার যা দেখেছি—সেই সব একই যেন।

দিন দুই পরে ছোট বউঠাকুরের বাপের বাড়ি থেকে

বড় ভাই তাঁকে নিতে এল। আমার সঙ্গে দশ-পনের দিন দেখা হয়নি, ভাবলুম যাবার সময় একবার দেখা করবই। দুপুরের পরে ঘোড়ার গাড়ীতে জিনিষপত্র ঠানো হচ্ছে, আমি নিজের ঘরে জানলা দিয়ে দেখছি আর ভাবছি ঠাওয়ার সময় গাড়ীর কাছে গিয়ে দাঁড়াব, না ওপরে গিয়ে দেখা করে আসব?

পায়ের শব্দে পেছনে চেয়ে দেখি ছোটবৌঠাকুরের দোরের কাছে দাঁড়িয়ে, রোগশীর্ণ মুখ, হাতায় লাল পাড়-বসানো ব্লাউজ গায়ে, পরণে লালপাড় শাড়ী। আমি খতমত খেয়ে বললাম—আপনি! আহুন, এই টুলটাতে—

তিনি মূহু, সহজ সুরে বললেন—খুব ত এলেন দেখা করতে।

—আমি এখনি যাচ্ছিলাম, আপনি এলেন, তাই নইলে—

ছোটবৌঠাকুরের ম্লান হেসে বললেন—না, নিজেই এলাম। আব আপনার সঙ্গে কি দেখা হবে? আপনি ত পরীক্ষা দিয়ে চলে যাবেন। বি-এ পড়বেন না?

আমি একটু ইতস্ততঃ করে বললাম—ঠিক নেই, এখানে হয়ত আর আসব না।

তিনি বললেন—কেন আর এখানে আসবেন না?

আমি কোন কথা বললাম না। দু-জনেই খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর তিনি আমার কাছে এগিয়ে এসে মূহু অমুযোগের সুরে বললেন—আপনার মত ছেলে যদি কখনও দেখেছি! আগে যদি জানতাম তবে সেবার আপনাকে নিয়ে যে ওরা ঠাট্টা করেছিল, আমি তার মধ্যে ঘাই? এখন সে-কথা মনে হ'লে লজ্জায় ইচ্ছে হয় গলায় বঁটি দিয়ে মরি।

তারপর গভীর স্নেহের সুরে বললেন—না, ওসব পাগলামি করে না, আসবেন এখানে, কেন আসবেন না, ছিঃ—

দরজার কাছে গিয়ে বললেন—না এলে বুঝবো আমরা খুব ঘেমা করেন, তাই এলেন না। (ক্রমশঃ)

সাহিত্য ও সমাজ

শ্রীঅনুরূপা দেবী

সাহিত্য-বিষয়ক যে সমস্যাগুলি নিয়ে আজকাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্মৃতিসমাজের মধ্যে তর্ক জমে উঠেছে, তার ভিতরকার সবচেয়ে বড় কয়েকটি প্রশ্ন এই—

(১) সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের কোনরূপে সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত কি না? উচিত হ'লে সে যোগ সাহিত্যকে সমাজের মুখাপেক্ষী করবে অথবা সমাজকে সাহিত্যের মুখাপেক্ষী ক'রে রাখবে? সাহিত্য সমাজের অগ্রগামী না অন্তর্গামী?

(২) নিছক আনন্দ পাওয়া ও দেওয়ার কাজে নিযুক্ত আর্ট বা ললিতকলা হিসাবে সাহিত্যের পার্থিব প্রয়োজন-নিরপেক্ষ কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও নিজস্ব মানদণ্ড থাকা সম্ভব এবং উচিত কিনা? সম্ভব বা উচিত হ'লে সে অস্তিত্ব ও তার মানদণ্ডের স্বরূপ কি?

(৩) সাহিত্যের দ্বারা সমাজের কল্যাণ-বৃদ্ধিকে জাগ্রত ক'রে অকল্যাণ-বৃদ্ধিকে ঠেকাবার চেষ্টা করলে তাতে সাহিত্যের প্রতি অবিচার করা হয় কি না?

(৪) সাহিত্যশ্রষ্টার পক্ষে সংসাহিত্য সৃষ্টির জন্য কোন পথে সাধনার প্রয়োজন?

এই প্রশ্নগুলির মীমাংসা খুব সহজ নয় এবং অল্প কথায় সম্ভবও নয়। বড় বড় পণ্ডিত কবি এবং সাহিত্যিক এই সমস্যাগুলির সমাধান করতে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পক্ষ অবলম্বন ক'রে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েছেন। আমার বুদ্ধিতে আমি এই প্রশ্নগুলির যেকোন সমাধান করতে পেরেছি কেবল সেইটুকুই বলব।

প্রথম প্রশ্ন, সাহিত্য ও সমাজের কোনরূপ যোগ আছে বা থাকা উচিত কি না এবং থাকলে সে যোগের স্বরূপ কি? সাহিত্য এবং সমাজ সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় সত্য এই যে, এরা সর্বদেশকালেই পরস্পর পরস্পরের মুখাপেক্ষী, আবার উভয়ের স্বাভাবিক চিরদিনই স্পষ্ট। সাহিত্য যেমন মানুষকে কেবল যেন-তেন-প্রকারেণ আনন্দ পরিবেশনের যন্ত্র নয়, তেমনই সে কেবল সমাজের কল্যাণ অকল্যাণ

নিয়ন্ত্রণের জন্ত রচিত কঠোর নীতি-উপদেশের সমষ্টিও নয়। সাহিত্যের মধ্যে এই দুই দিকই আছে, আবার সাহিত্য এই দুইয়েরই উপরে। এক কথায় সাহিত্যের বহিরঙ্গ হচ্ছে সুন্দর এবং তার অন্তরঙ্গ হচ্ছে সত্য ও কল্যাণ। “সত্যঃ শিবঃ সুন্দরঃ” কথাটি যেমন ব্রহ্মের সম্বন্ধে খাটে তেমনই সাহিত্য সম্বন্ধেও খাটে। সাহিত্য সমাজকে আনন্দ দেবে, তার কল্যাণ করবে, তার নিজের কাছে নিজেকে সত্য হ'তে শেখাবে, যেন সে তার দেশের বিশিষ্ট ধারা রক্ষা করে, কালের উপযোগী সংস্কারকে গ্রহণ ক'রে সুন্দর ও সুখী হয়ে উঠতে পারে। ইহাই সাহিত্যের চিরন্তন ধর্ম। সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের এই যোগ থাকার প্রধান এবং প্রথম কারণ মানুষই সাহিত্য সৃষ্টি করে এবং মানুষ সামাজিক জীব। বিভিন্ন দেশের মানুষের সমাজে বিভিন্ন সংস্কার ও বিভিন্ন রীতিনীতি আছে, সুতরাং তার প্রভাব বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের বহিমুর্তিতে পরস্পর থেকে কিছু-না-কিছু পার্থক্য এনে দিয়েছে। এই জন্ত সাহিত্যের বহিরঙ্গের কোন শাখত রূপ বা শাখত মানদণ্ডও থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু এক অথও মানবজাতির হৃদয় থেকে বিভিন্ন দেশের সাহিত্য উদ্ভূত হওয়াতে পরস্পরের মধ্যে একটা মূলগত ঐক্য আছে। প্রত্যেক দেশের রসপিপাসু মানুষই অন্য দেশের মানুষের সৃষ্ট সাহিত্য উপভোগ করতে পারে এবং পারবে, বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের অন্তরগত সাদৃশ্যই তার কারণ। সাহিত্য-শ্রষ্টা যে কেমন ক'রে দেশকালের ব্যবধান ছাড়িয়ে জগতে আনন্দ পরিবেশন ক'রে বেড়ান, তার সাক্ষী ভারতের স্মৃতিসমাজে সেক্সপীয়ার, শেলি, গ্যোটে, রোম্যা রলা প্রভৃতির সমাদর এবং ইউরোপ আমেরিকার স্মৃতিসমাজে কালিদাস রবীন্দ্রনাথের পূজা। এর কারণ প্রতিভাশালী কবি সর্বদেশের মানবাত্মাকে আনন্দ দিতে সমর্থ এবং সাহিত্যের এমন একটা শাখত আন্তররূপ তাঁর রচনায় ফুটিয়ে তুলেছেন যেটা দেশকাল এমন কি পাত্রেরও অতীত।

বিজ্ঞানের সাহায্যে বিভিন্ন দেশের মানুষ আজ যতই ক্রমশঃ পরস্পরের নিকটবর্তী হচ্ছে, যতই তাদের মেলামেশার ফলে সামাজিক রীতিনীতি অনেকটা এক ছাঁচে ঢালাই হয়ে আসছে ততই সাহিত্যের আন্তর ও বহিমূর্ত্তির একটা শাস্ত্র রূপ স্থির করার চেষ্টা বিভিন্ন দেশে চলছে। বিভিন্ন দেশের বাহ্য রূপ কোন দিন একটা বাঁধাধরা নিয়মে বিচাৰ্য্য হবে কি না বলা শক্ত, কিন্তু তার আন্তর রূপ সর্বদেশে সর্বকালে একই ছিল, আছে এবং পৃথিবীর মানুষ যদি আত্মধাতী হ'তে প্রস্তুত না হয় তাহলে থাকবে—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই আন্তর রূপ হচ্ছে মানুষের বৃহত্তর সত্তার প্রতি প্রত্যেক মানুষের ক্ষুদ্রতর সত্তার কল্যাণবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সূক্ষ্ম রসাত্মকভূতি। তাই বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের বহিঃপ্রকাশের ভাষা সাহিত্যিকের রুচি ও রচনাপ্রণালী ভেদে বাহ্যতঃ বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত হলেও আন্তরিক তাদের অনৈক্য নেই। তাদের সমাজনিরপেক্ষ নিজস্ব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকলেও তাদের উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচারের একটা শাস্ত্র মানদণ্ড আছে। সাহিত্য একদিক দিয়ে সমাজের প্রতিচ্ছবি হলেও সে তার ছবছ নকল বা ফটোগ্রাফ নয়। অত্যান্ত ললিতকলার মত সে প্রকৃতির সঙ্গে অষ্টা মানুষের মনকে মিলিয়ে দক্ষ শিল্পীর হাতের আঁকা ছবি, যাহাতে বহির্জগৎ বা এক্ষেত্রে সমাজের প্রতিচ্ছবিটার উপরে সাহিত্যশ্রষ্টার শিক্ষা দীক্ষা রুচি প্রবৃত্তি এমন কি তাঁর দেশকালের প্রভাবও খুব সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে আছে।

একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য দশ জনের চোখে ঠিক একরকম হয়ে প্রতিভাত হয় না। একই বিষয়বস্তু নিয়ে যেমন পাঁচ জন শিল্পী পাঁচ রকম বিভিন্ন ছবি আঁকতে পারেন, তেমনই একটি সামাজিক চিত্রই বিভিন্ন সাহিত্য-শ্রষ্টার হাতে বিভিন্ন রূপ পেয়ে থাকে। এ-সম্বন্ধে বাঁধাধরা কোন নিয়ম করা যায় না এবং প্রয়োজনও নেই; কারণ কোন সুকুমার শিল্পই একঘেয়ে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কেবল একটি গোড়ার কথা মনে রাখা দরকার। সাহিত্যিক সমাজবদ্ধ মানুষের জন্ম যে আনন্দ-লোক সৃজন করবেন, তাহা যেন যুগপৎ তাদের পক্ষে কল্যাণ-লোক এবং সত্যলোক হয়। কবির নিরঙ্কুশ হবার অধিকার যুগে যুগে দাবি করেছেন এবং পেয়েছেন, কিন্তু কেবল তাঁদেরই দাবি সমাজ মেনেছে, যারা কাব্য সৃষ্টি করতে গিয়ে সমাজের

কল্যাণকে বিসর্জন দেননি, যারা সমাজকে মেনে নিয়ে সুপথে পরিচালনা করেছেন। সংঘের দ্বারাই স্বাধীনতার অধিকার লাভ করা যায়। সমস্ত তর্ক বিচারের উপরে আমাদেরও একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, মানুষ তার সৃষ্ট সাহিত্যের চেয়ে বড়। যে কল্পনার বিলাস মানুষকে তার প্রতিদিনের হীনতার দীনতার ক্লেশবর্ধক থেকে, তার স্বার্থসংঘাতের নিশ্চয় রণক্ষেত্র থেকে উদ্ধৃত্ত তুলে নিয়ে বিমলতা দান করে, শাস্ত্রসিদ্ধ সরস করে, তার মূল্য খুব বেশী; কিন্তু তা ব'লে সে-আনন্দ যদি মাতালের মত্ততাগ্রসৃত সুখমাত্র হয়, সাহিত্য যদি সমাজের মাথায় ব'সে তারই মূলচ্ছেদের জন্য কুঠারাঘাত করতে চেষ্টা করে—মানুষকে তার সুপরিচালনায় বড় না করে, তার স্বাভাবিক পশুত্বকে জাগিয়ে তুলে নৈতিক অধঃপাতের পথে তাকে ঠেলে দেয়, তবে তাকে বাধা দেওয়ার এবং নিয়ন্ত্রিত করার অধিকার সমাজের থাকা উচিত। নিরঙ্কুশ কবি বনের পাখীর মত মনুষ্যসমাজের বহির্ভাগে বাস করলে বোধ হয় কিছু বলবার থাকে না; কিন্তু তাঁর রচনার প্রভাব যদি কুপ্রভাব হয় তবে নিরাজনবাস থেকে জনপদে এসে দেশকালের ব্যবধান ছাড়িয়ে সে যে সমাজের ক্ষতি করবে না এমন কথা জোর ক'রে বলা শক্ত।

এর পর প্রশ্ন আছে, সাহিত্যের দ্বারা সমাজের কল্যাণ অকল্যাণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা সাহিত্যের প্রতি অবিচার কি না? সাহিত্যিক যদি তাঁর রচনার সৌন্দর্যের হানি না ক'রে সমাজের অকল্যাণ-বুদ্ধিকে রোধ করার এবং কল্যাণবুদ্ধিকে উজ্জীবিত করার প্রয়াস করেন এবং সেই কার্যে সফল হন, তবে তাঁর রচনা সর্বাদমুন্দর এবং সার্থক হয়। সাহিত্য যে-রসলোক সৃজন করবে তাতে সকল রসেরই স্থান আছে; কিন্তু যথোপযুক্ত স্থানে প্রত্যেক রসকে স্থান দিতে হবে। রসসৃষ্টির উৎসবকে সাহিত্যিকের মন যেন বীভৎস রসকে শাস্ত বা করুণ রসের উদ্ধৃত্ত স্থান না দেয়, আদি রসের আদিম বর্ধরতা যেন তার মাধুর্যকে অতিক্রম ক'রে অশোভন না হয়ে ওঠে। আমরা যখন বাসগৃহের পরিকল্পনা করি তখন ময়লা-ফেলার জায়গাগুলিকে যতটা সম্ভব লোকলোচনের অন্তরালে রাখবার ও ফুলবাগানটিকে যতটা সম্ভব লোকচক্ষের সামনে ধরবার ব্যবস্থা করি। তার কারণ এই যে, জীবনের যে-সব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে

মানুষ অন্যান্য জীবজন্তুর সঙ্গে সমান, মানুষের সহজাত সুরূচির জ্ঞান ব্যবহারিক জগতেও সেই সব প্রয়োজনের ক্ষেত্রগুলিকে অন্য মানুষের চোখে পড়তে দিতে কুণ্ঠিত হয়। সুতরাং শিল্প বা সাহিত্যের উর্দ্ধতর লোকে সেগুলির অবিকল প্রতিরূপ খুব স্পষ্ট করে তুলতে মানুষের কুণ্ঠিত হওয়াই স্বাভাবিক। পূর্বেই বলেছি, সাহিত্য সমাজের একটা অবিকল প্রতিচ্ছবি নহে, তাহা বিভিন্ন শিল্পীর বিভিন্ন আদর্শ অনুযায়ী রচিত সমাজের সংস্কৃত এবং সুসমঞ্জস রূপমূর্তি। তাই সাহিত্য সমাজকে ছবছ নকল করার চেষ্টায় বার-বার পথভ্রান্ত হয়েছে। এক শ্রেণীর সাহিত্যিক জোরগলায় বলছেন, সাহিত্য সমাজের অবিকল প্রতিরূপ, সমাজে ভালমন্দ যেখানে যা যেমন ঘটে সাহিত্যেও ঠিক তেমনই তার প্রতিচ্ছবি না থাকলে সাহিত্য একদেশদর্শী হয়ে ওঠে। তার সৌন্দর্যের ক্রটি এবং বিস্তারে বাধা থেকে যায়। এক্ষেত্রে বলবার কথা এই যে, আদিযুগ থেকে আজ পর্যন্ত সর্বদেশের সাহিত্যিকই নিজ নিজ দেশের সাহিত্যে সমাজের ভালমন্দ দুটো দিকের ছবিই দেখিয়েছেন, তবে তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই অবশ্য শেষপর্যন্ত ভালটাকে উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করে গেছেন। ভারতীয় সাহিত্যের আদিকবি বাণীকি উচ্ছৃঙ্খলতার যে-চিত্র রাবণের ভিতর দিয়ে দেখিয়েছেন। তা কোন দেশের কোনও বাস্তব উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের চাইতে উচ্ছৃঙ্খলতায় বিশেষ কম যায় না। কিন্তু রামায়ণ পড়ে বাণীকির রাবণ-চরিত্র জীবনে অনুকরণ করতে বোধ হয় কেহই ইচ্ছুক হয় না, কারণ শিল্পীর রচনা-কৌশলে রামায়ণে কল্যাণের রূপ অকল্যাণের রূপকে পরাভূত করে ফুটে উঠেছে।

আর একটা কথা, সমাজের ছবছ নকল সাহিত্যে অঙ্কন করার শক্তিই বা ক-জন সাহিত্যিকের থাকতে পারে বা আছে। সমস্ত সমাজের সর্বোচ্চ একই সময়ে চোখ রেখে সাহিত্যসৃষ্টি করাই কি সহজ কথা! অল্পজ্ঞ অক্ষম শিল্পীরা অঙ্কদের হস্তিদর্শনের মত সমাজের বিভিন্ন অঙ্গের রূপ দেখে অন্যান্য অঙ্গের সঙ্গে সমস্ত দেহটার সঙ্গে তাদের সংযুক্ত না জেনে (অঙ্করা যেমন তর্ক তুলেছিল হস্তি দড়ির মত, না ধামের মত, না কুলার মত, তেমনই) একই সমাজের বাস্তব চিত্র আঁকতে গিয়ে কেহ তাকে নীরস নীতিকথার সাহিত্য, আবার কেহ বা তাকে বস্তি-সাহিত্য করে

তোলেন। দক্ষ শিল্পী চক্ষুস্থান ব্যক্তির মত এককালে সমাজের সর্বোচ্চ দেখতে পান এবং সেই জগুই তাঁর হাত দিয়ে সমাজের যে-রূপ সাহিত্যে ফুটে ওঠে তার মধ্যে রাম রাবণ সীতা সুর্পনখা সকলেরই স্থান আছে। অধিকন্তু সামগ্রিক রক্ষার জগু কবির সৌন্দর্যজ্ঞান ও কল্যাণবুদ্ধির স্পর্শ আছে। এইখানেই বড় সাহিত্যিকের ও ছোট সাহিত্যিকের রচনার প্রভেদ।

এর পর সাহিত্যসাধনার পথ সম্বন্ধে দু-এক কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। রবীন্দ্রনাথ এই পথের নির্দেশ দিতে গিয়ে শিল্প-সাধনার অন্তরের কথা বলেছেন, ‘দেখ, দেখ, দেখ’—প্রকৃতি ও সমাজকে সত্যদৃষ্টি দিয়ে দেখতে চেষ্টা করা সাহিত্যিকের প্রথম প্রয়োজন, তার বর্ণশিক্ষা “ব্যাকরণ-জ্ঞান না-থাকলে সে যেমন বাহিরের দিক দিয়ে সাহিত্যসৃষ্টি করতে কোন দিনই সক্ষম হবে না, তেমনই অন্তরের দিক দিয়ে যে নিজে দেখেনি সে পরকে দেখাতে কোন দিনই সক্ষম হবে না। এক্ষেত্রে আরও একটা কথা জানবার আছে, আমরা যে কেবল বর্তমানকে দেখব ও নয়, আমরা অতীত ও বর্তমানকে এককালে দেখবার সাধনা করব। অতীতের সাহিত্যস্রষ্টারা যা রেখে গেছেন তা আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি, আমাদের যাত্রাপথের অবশ্যপ্রয়োজনীয় পাথেয়—তা যেন আমরা ভুলে না যাই। এ-কথা যেন মুহূর্তের জগুও না তুলি যে মানুষের শিক্ষা ও সভ্যতা সম্ভব হয়েছে মানুষ জন্মমাত্র তার পূর্বপুরুষদের যুগযুগ-সঞ্চিত জ্ঞান অতীতের উত্তরাধিকার-স্বরূপ পেয়েছে বলে। নূতনত্বের মোহে আমরা তুচ্ছ জিনিষটাকে নিয়ে মাতামাতি করতে গিয়ে বড় জিনিষটাকে ভুলে যাই, কবির ভাষায় মাথাটা সহজাত বলে তার মূল্য বুঝি না, পাগড়ীটা সংগৃহীত বলে এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে তাকে সম্মান দিই। কিন্তু চিরদিন ঘরে বসে পৈত্রিক সম্পত্তি খরচ করলে যেমন দৈগু আসে এবং বিনাশ আসে, তেমনই চিরদিন পূর্বতন লেখকদের ভাব ও ভাষার চর্কিতচর্কণ করলেও সাহিত্যের দৈগু ও অধঃপতন অনিবার্য। পৈত্রিক সম্পত্তিকে কারবারে খাটাতে হবে, বর্তমানের সঙ্গে অতীতের যোগসাধন করতে হবে। এই নিজের উপার্জন প্রকৃতিকে এবং সমাজকে ভালবেসে নিজের চোখে দেখে তার কাছ থেকে রূপ রসের



নিবেদন
শ্রীদেবীপ্রসাদ বাহুবলী
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

দৈনন্দিন সংগ্রহ। এই সংগ্রহের অভাবে রাজার ঐশ্বর্যও পরিষ্কারে যায়, অতীতের সাহিত্যিক মহিমা বর্তমানের সাহিত্যকে সচিব্যে রাখতে কোনমতেই সক্ষম হয় না। সাহিত্যের বাইরের দিকটার কথা বলতে গিয়ে বর্তমান যুগের কোন বিখ্যাত শিল্পাচার্য্যের শিল্প সম্বন্ধে ব্যবহৃত একটি উপমা দিই। অন্ততম সুকুমার শিল্পহিসাবে সাহিত্য সম্বন্ধেও তাঁহার কথাটি খাটে। “সাহিত্য একটি সাত ঘোড়ার রথ, রথী যদি দক্ষ সারথির হাতে রাখ দিতে পারেন, তবে ঘোড়াগুলি পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে নির্দিষ্ট পথে রথকে নিয়ে যায়।” সুসমঞ্জস পরিকল্পনা, ভাবের ঐশ্বর্য্য, রচনার সৌষ্ঠব, শব্দ-নির্বাচনে সুসমার জ্ঞান, ব্যাকরণবোধ, উপযুক্ত স্থানে চলবার এবং থামবার মাত্রাজ্ঞান এবং সমস্ত রচনাকে উজ্জীবিত করার উপযোগী রসবোধ এই ধরনের সাতটি ঘোড়া যে-সাহিত্যিক সংযম-রশ্মির দ্বারা আয়ত্তের মধ্যে রেখে চালাতে পারেন, তিনিই উচ্চদের সাহিত্যস্রষ্টা। না হলে অক্ষম।

সারথির হাতে পড়ে বিজ্রোহী ঘোড়াগুলি যেমন রথটাকে শেষে খানায় ফেলে বা বিপথে নিয়ে যায়, তেমনই অক্ষম সাহিত্যিকের হাতে ও রচনার মধ্যে পরিকল্পনায় অসামঞ্জস্যের সঙ্গে ভাষার ঐশ্বর্য্য, ব্যাকরণজ্ঞানের আধিক্যের সঙ্গে রসবোধের অভাব, ভাবের গভীরতার সঙ্গে ভাষার দৈন্ত অনবরত বিরোধ করতে থাকে এবং শেষপর্য্যন্ত সুসাহিত্য সৃষ্টি হয়। সাহিত্যরথীর লক্ষ্য হবে এই সাত ঘোড়ার রথকে সমাজের প্রতি কল্যাণবুদ্ধি রূপ দক্ষ সারথির দ্বারা চালনা করানো। প্রত্যেক সংসাহিত্যস্রষ্টার ভিতরের এবং বাইরের দিক দিয়ে ইহাই সাধনার আদর্শ। এই আদর্শ ঠিক থাকলে সাহিত্যিকের ক্ষমতা অমুযায়ী সাহিত্যে ক্রটি-বিচ্যুতির আধিক্য বা অল্পতা থাকলেও এবং সাহিত্য সর্বক্ষেত্রে সর্বাকসুন্দর হ'তে না পারলেও তাহা সুসাহিত্য হবে এবং পথভ্রষ্ট না হওয়ায় তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা করার কারণ থাকবে।

আফ্রিকার নিগ্রো শিল্প

শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

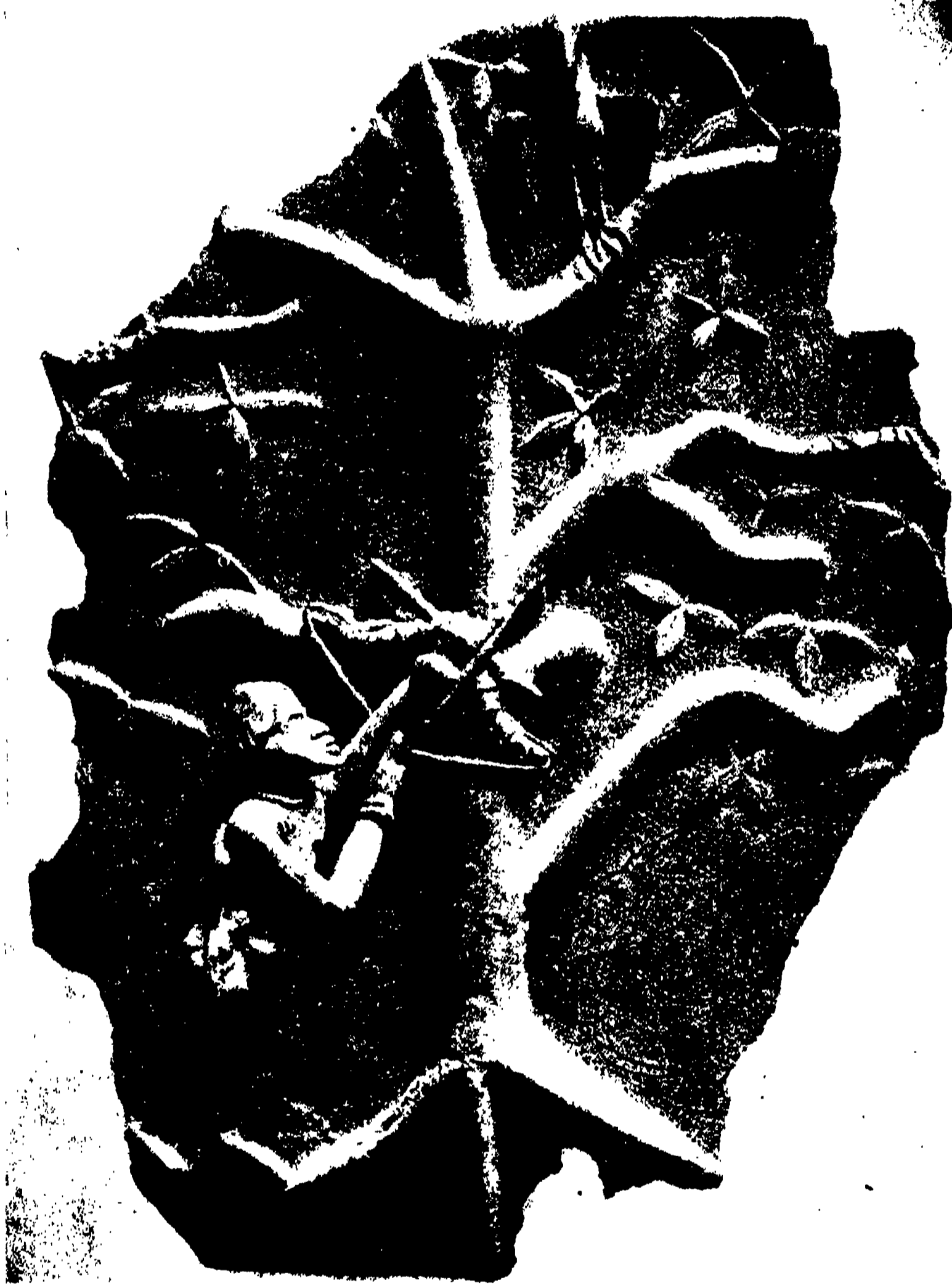
[১]

একটা ব্যক্তিগত কথা দিয়া প্রসঙ্গ আরম্ভ করিতেছি। ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২৯শে তারিখে বিলাতে পদার্পণ করি, জাহাজ হইতে নামিয়া ঐ দিন লণ্ডনে পহুছি। ২রা অক্টোবর প্রথম ব্রিটিশ-মিউজিয়ম দেখিতে যাই, সেদিন কিন্তু ভাল করিয়া দেখা হয় নাই। তারপরে দুই একবার মিউজিয়মে গিয়াছিলাম—মিউজিয়মে রক্ষিত কতকগুলি বিশ্ব-বিশ্রুত শিল্প-দ্রব্য দেখিয়া আসি—যেমন, Elgin Marbles নামে সুপরিচিত অথেন্স-নগরীর পার্থেনন্ মন্দিরের খোদিত চিত্র ও মূর্তির ভাস্কর্য; আমাদের ভারতবর্ষের অমরাবতীর ভাস্কর্য; প্রাচীন মিসর ও আসিরিয়ার ভাস্কর্য; ইত্যাদি। তার পরে ১৪ই তারিখে ২৪শে অক্টোবর ব্রিটিশ-মিউজিয়মে যাই; ঐ দিনটা আমার কাছে একটা স্মরণীয় দিন বলিয়া মনে হয়। ইউরোপে অবস্থানকালে

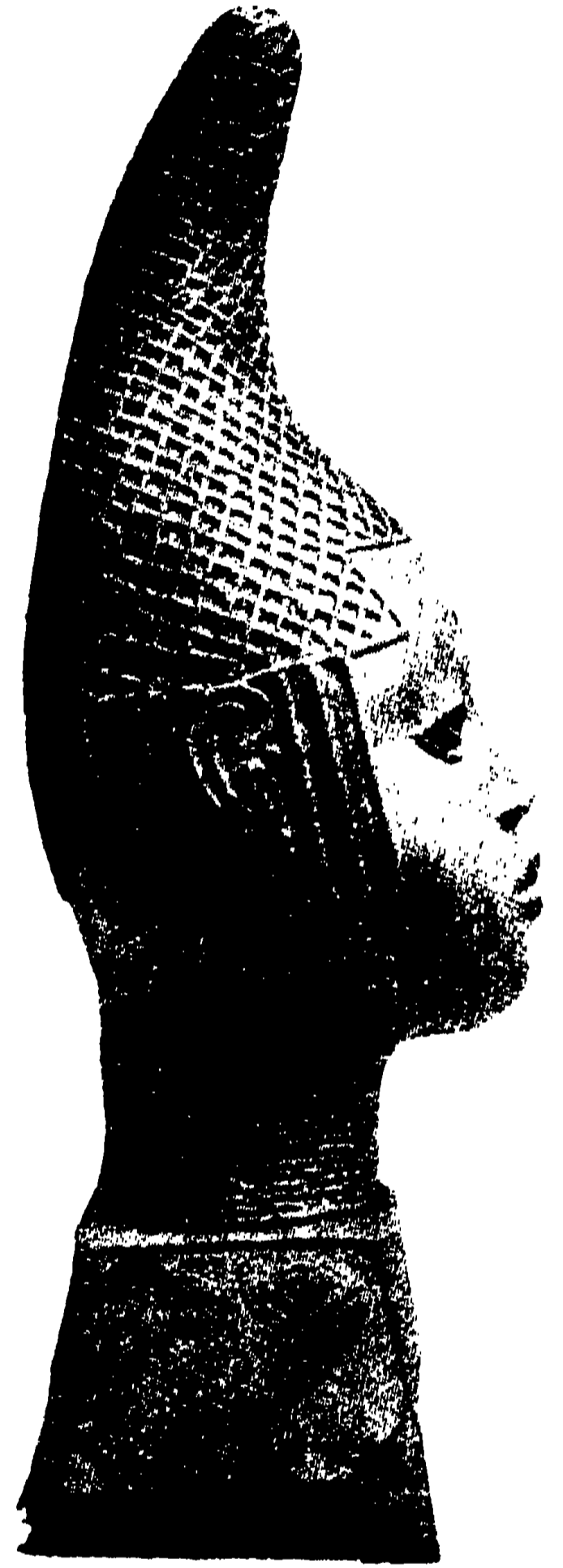
কতকগুলি বিভিন্ন দেশ ও কালের শিল্প সম্বন্ধে, কেবল বার-বার দেখার ফলেই, আমার মন সচেত হইয়া উঠে; আগে যে জিনিসের কথা জানিতাম না, আমার নিকট যাহার কোনও মূল্য ছিল না, কেবল ভূয়োভূয় দর্শনের ফলে সেই সব জিনিস আমার কাছে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—মানবের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির বিচিত্রতা ও দেশ-কাল-পাত্র বশে এই বিচিত্র সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির অবশুজ্ঞাবিতা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। এই সব জিনিসের মধ্যে উল্লেখ করিতে পারা যায়—গ্রীসের সুপ্রাচীন হেলেনীয় যুগের ভাস্কর্য ও ঘট-চিত্র; বিজাস্তীনিয় ভাস্কর্য ও mosaic অর্থাৎ রঙ্গীন কাচের টুকরা সাজাইয়া তৈয়ারী ভিত্তি-চিত্র; “গথিক” ভাস্কর্য; ইতালীর প্রাগ-রাফাএল যুগের চিত্রকলা; প্রাচীন চীনা ভাস্কর্য; ইত্যাদি। ১৪ই অক্টোবর ব্রিটিশ-মিউজিয়মের Ethnological Gallery

অর্থাৎ আদিম-সংস্কৃতি-তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় কক্ষগুলিতে ঘুরিতে ঘুরিতে, বড় বড় কাচের আলমারীর মধ্যে রক্ষিত নানা বর্ষের ও অর্ধ-বর্ষের জাতির আদিম উচ্ছৃঙ্খল কল্পনা ও তাহাদের অশিক্ষিত-পটু হস্ত হইতে উদ্ভূত অদ্ভুত ও কিস্তৃতকিমাকার বস্তু দেখিতে

বা অতিপ্রাকৃতিক ভঙ্গি মুখটিতে আসিয়া গিয়াছে, কখন দুইটি যে ভাবে গঠিত হইয়াছে তাহা হইতে উহা স্পষ্ট বুঝা যায়। মাথায় একটা চূড়াকৃতি শিরস্ত্রাণ পরিহিত—খুব সম্ভব সেটা বেতের তৈয়ারী অথবা প্রবাল-নির্মিত টুপী; গলায়



১০। পক্ষী-শিকার
বেলিন্—ব্রঞ্জ ঢালা পাটা



২। বেলিন্ হইতে আনীত ব্রঞ্জ ঢালা কক্ষের
মুখ বেলিন্, আদিম-সংস্কৃতি-তত্ত্ব
সম্পর্কীয় সংগ্রহ-শালা।

দেখিতে, পশ্চিম-আফ্রিকা হইতে আনীত নিগ্রো-সংস্কৃতি জাত ভ্রব্য-সম্ভারের মধ্যে, হঠাৎ একটা ধাতুতে-ঢালা নিগ্রো মেয়ের মুখ দেখিয়া থমকিয় দাঁড়াইলাম। (চিত্র [১] ও [২])।

মুখখানা প্রতিমার মুখের ধাঁজে, নুমুণ্ডের মত চারিদিকে ঢালা, চিত্রাকার নহে। আকারে স্বাভাবিক মানুষের মাথার মত হইবে। শিল্পী পুরাপুরি স্বাভাবিক অমুকৃতি করে নাই, বা করিতে পারে নাই,—কতকটা অপ্রাকৃতিক

প্রবালের কণ্ঠী। কণ্ঠেই মুণ্ডটির পরিসমাপ্তি। আজকালকার শিল্পীদের পাকা হাতের তুলনায়, এই রূপ-কর্মটিতে একটা ভাবুকতার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু এই অশিক্ষিত-পটুত্বকে, মূর্তিটির গঠনের ভঙ্গিতে, প্রকৃতিকে ঘোল আন রকম অমুকরণের অভাবকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে—ইহাদের সম্পূর্ণতা দিয়া মূর্তিটিকে শ্রেষ্ঠ শিল্পের আসনে উন্নীত করিয়াছে,—সার্থকভাবে ও সরলভাবে মূর্তিটিকে

নিগ্রোর জাতিগত বৈশিষ্ট্যটুকুকে শিল্পী-কর্ষক ফুটাইয়া তুলে। ইহাতে শিল্পীর সত্যদর্শন এবং সত্য বস্তুর প্রদর্শন উভয়ই প্রমাণিত হয়। তদতিরিক্ত, শিল্পী যে প্রকারে একটি ঈষদ-বিষাদ-মণ্ডিত ভাব মুখমণ্ডলে আনিতে পারিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ভাবুকতা এবং ভাবপ্রকাশে ক্ষমতা দেখা যায়—তিনি মুখ-



১। বেনিন্ হইতে আনীত ব্রঞ্জ ঢালা
নিগ্রো কণ্ঠার মুখ
ব্রিটিশ-মিউজিয়াম

খানিতে এমন একটা কিছু আনিয়া দিয়াছেন, যাহার দ্বারা আমাদের আদর্শ-মতে মুখটা সুন্দর না হইলেও ইহাতে একটা আকর্ষণী শক্তি আসিয়া গিয়াছে।

এই ধাতু-মুণ্ডটা দেখিয়াই চমকিত হইলাম—এ জিনিস পশ্চিম-আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে কি করিয়া আসিল? বিবরণী হইতে জানিলাম, ইহা “বেনিন্ হইতে আনীত ব্রঞ্জ-ধাতুতে প্রস্তুত তরুণীর



১৩। বেনিন্—হাতীর দাঁতের কোটা
উপরে কণ্ঠা-মূর্তি, নীচে সর্প ও স্বাপদ

মুণ্ড।” আশে-পাশে আরও দুই তিনটি অমূরুপ মুণ্ড ও অণ্ড মূর্তি আছে। বেনিন্ কোথায়, তাহা তখন জানিতাম না—পশ্চিম-আফ্রিকার কোথাও, এইটুকু মাত্র মিউজিয়মের লেবেল হইতেই বুঝিলাম। অণ্ড আলমারীতে দেখিলাম, এই বেনিন্ হইতে আনীত অণ্ড বহু শিল্প-দ্রব্য সজ্জিত রহিয়াছে। ঢালাই-করা ব্রঞ্জের পাটা বা ফলকের গায়ে নানা bas-relief বা নীচু কারিয়া গড়া চিত্র—নিগ্রো যোদ্ধা, অমূচর-পরিবৃত নিগ্রো রাজা, ঘোড়সওয়ার, কত্তা, এবং কুমীর ও মাছ প্রভৃতি জন্তু; বড় বড় অখণ্ড হাতীর দাঁত, তাহার গায়ে নক্সায় কাটা নানা যোদ্ধার ছবি, শিকারীর ছবি খোদাই করা; ছোট ছোট হাতীর দাঁতের পুতুল; ব্রঞ্জের ঢালাই করা মুণ্ডের আকারে বড় বড় অলঙ্কারময়

এই শিল্প-সম্ভার দেখিয়া, আফ্রিকার—বিশেষতঃ পশ্চিম-আফ্রিকার নিগ্রোদের সম্বন্ধে আমার চোখ যেন খুলিয়া গেল আফ্রিকার অণ্ড অঞ্চলের শিল্পেরও নিদর্শন কিছু কিছু দেখিলাম—সব চেয়ে ভাল লাগিল কতকগুলি কাঠের মূর্তি।



৭। অখণ্ড বেনিন-রাজ



৮। বেনিন্ যোদ্ধা

বেনিন্ শিল্প—ব্রঞ্জ ঢালা পাটা



৪। নিগ্রো মেয়ে—আমেরিকার সংযুক্ত-রাষ্ট্র

পায়, সেগুলির উপরে খোদাই-করা অখণ্ড হাতীর দাঁত খাড়া করিয়া রাখা হইত; কাঠে খোদাই মূর্তি; মোড়ার মত কাঠে তৈয়ারী খোদাই করা বসিবার আসন।

ব্রিটিশ-মিউজিয়মের দোতালায় Ethnological Gallery, একতালায় ব্রিটিশ-মিউজিয়ম গ্রন্থশালার পাঠাগার। নীচে পাঠাগারে আসিয়া, প্রথমেই মিউজিয়মের পুস্তক-প্রকাশ বিভাগ হইতে প্রকাশিত বেনিন্ হইতে আনীত সংগ্রহের বিবরণ গ্রন্থখানি আনাঃইয়া লইয়া পড়িতে লাগিলাম। পরে ক্রমে ক্রমে এ-বই ও-বই ঘাঁটিয়া আফ্রিকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে, বিশেষতঃ নিগ্রোদের একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লওয়া গেল।

এই ভাবে ভাস্কর্য-শিল্পের—রূপ-কর্মের—নারফৎ আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের সম্বন্ধে পরিচয়ের সূত্রপাত হইল, আফ্রিকার কালো-মানুষদের সম্বন্ধে মনে মনে একটা আকর্ষণ, একটা অমূকম্পা, এমন কি একটা প্রীতির ভাবও অমূভব করিতে লাগিলাম। “বহুধৈব কুটুম্বকম্”—শিল্পের প্রসাদে এই ভাব জাগরিত হইয়া, আফ্রিকার কালো-মানুষদের সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসু করিয়া দিল; ইহা একটা খুব বড় লাভ বলিয়াই আমি মনে করি।

যে দুই বৎসর লগুনে কাটাই, তাহার মধ্যে চার মাস বাদে বাকী সমস্ত সময় ৩২ নং বেডফোর্ড প্লেস্-এ, ব্রিটিশ-

মিউজিয়ামের খুব কাছে, এক ওয়াই-এম-সী-এ ছাত্রাবাসে বাস করি। এই ছাত্রাবাসটিতে পঞ্চাশ জন ছেলে ছিল, তাহাদের মধ্যে আমি আর পরে একটি তামিল ছেলে, মাত্র আমরা দুই জন ভারতীয় ছিলাম; বাকী আটচল্লিশ জনের মধ্যে তিরিশ জন ব্রিটিশ, অর্থাৎ ইংরেজ, স্কট, ওয়েলশ, আইরিশ ছিল, এবং আঠার জন ছিল ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ছেলে। এই ছাত্রাবাসটি বেশ আন্তর্জাতিক স্থান হইয়া



১০। ফরাদী শিল্পী এভারিস্ত-বাঁ শেয়ার রচিত নিগ্রো যুবকের মূখ—ব্রহ্মে ঢালা কাসের বেদীর উপর

উঠিয়াছিল। কাছেই গিল্ডফোর্ড ষ্ট্রাট-এ অমুরূপ আর একটি ওয়াই-এম-সী-এ ছাত্রাবাস ছিল—সেখানে দুই এক জন নিগ্রো ছাত্র বাস করিত। এইরূপ একটি নিগ্রো ছাত্রের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। আমাদের বেডফোর্ড প্রেস্-এর ছাত্রাবাস, আর গিল্ডফোর্ড ষ্ট্রাট-এর ছাত্রাবাস, উভয় স্থান হইতে জন ছয় মিলিয়া :২২০ সালের গ্রীষ্মকালে আমরা একবার লণ্ডনের বাহিরে সারা দিনের জন্ত পল্লীভ্রমণে গিয়াছিলাম। ছয় জনের মধ্যে তিন জন ইংরেজ, এক জন সুইস, এক জন নিগ্রো, এবং আমি ভারতবাসী। নিগ্রো শিল্পের বিষয়ে ও নিগ্রোদের

সংস্কৃতি বিষয়ে জানিবার-তনিবার ও পড়া-শুনা করিবার কোঁক হইয়াছে,—সুতরাং এই নিগ্রোটির সঙ্গে পরিচিত হওয়াতে আমার বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। কিন্তু দুই চারিটা বিষয় ছাড়া



১২। বেনিন—হাতীর দাঁতের কোটা
(ঢাকনীর মাথায় ইউরোপীয় জাহাজ, পাশায় ইউরোপীয় সিপাহী)

ইহার নিকট হইতে ইহাদের জাতির ইতিহাস ও সভ্যতা সম্বন্ধে কিছু খবর পাইলাম না।

ছেলেটির বাড়ী পশ্চিম-আফ্রিকার Nigeria নাই-

গিনিয়া দেশের বন্দর ও অল্পতম প্রধান নগর Lagos লেগস্-এ। জাতি ও ভাষায় Yoruba য়োরুবা-জাতীয় নিগ্রো। লেগস্-এর পূর্বে, সমুদ্রতীর হইতে একটু অভ্যন্তরে, বেনিন্-নগরী। বেনিন্-এর লোকেদের Bini বিনি বলে, ইহার

তাহাদের এক দেবতা আছে, সেই দেবতার প্রতি সম্মান-জ্ঞাপক এই নাম—ইহার অর্থ “ইফে বা ইফার দান।” সে আমাকে আরও জানাইল, যে য়োরুবা জাতির মধ্যে প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ এখন মুসলমান, তিন ভাগের এক ভাগ



৫। পূর্ব-আফ্রিকার কিকুয়ু-জাতীয়া কণ্ঠা
ইংরেজ শিল্পী শ্রীমতী ডোরা ক্লাক রচিত ব্রঞ্জ মুখ



১৪। য়োরুবা-দেশ—ইফে নগরীতে প্রাপ্ত মৃন্ময় মুখ

য়োরুবা হইতে পৃথক্ ভাষা বলে, তবে ইহার ও য়োরুবারা অনেকটা একই জাতির শাখা। এই কথা শুনিয়া ইহার নিকট হইতে ইহার স্বজাতীয় লোকেদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানিতে বড়ই ইচ্ছা হয়। আমার নিগ্রো বন্ধুটির নামটা ছিল N. A. Fadipe—এন্, এ—এই দুইটা অক্ষর কোন্ কোন্ নামের আদ্য অক্ষর তাহা ভুলিয়া গিয়াছি, তবে যতদূর মনে হইতেছে, এ দুইটা ইউরোপীয় বা খ্রীষ্টান নাম। Fadipe ফাডিপে ধর্ম্মে খ্রীষ্টান, তাই সে বড়-একটা নিজের জাতির পূর্ব-কথা সম্বন্ধে খোঁজ রাখিত না। য়োরুবারা সংখ্যায় কত, বেনিন্-এর লোকেদের সম্বন্ধে তাহাদের পার্থক্যই বা কোথা, সে সব কথা কিছুই বলিতে পারিল না। তাহার নাম “ফাডিপে” শব্দের অর্থ কি তাহা জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল যে এই নামটা একটা heathen বা তাহাদের আদিম ধর্ম্মের অল্পমোদিত নাম—Ife ইফে বা Ifa ইফা নামে

খ্রীষ্টান এবং অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ heathen বা আদিম-ধর্ম্মাবলম্বী। এই ধর্ম্মের দেবতাদের জন্তু বিভিন্ন গ্রামে রীতিমত সাকুর-ঘর আছে, পুরোহিত আছে, পূজা হয়। ইংরেজী-শিক্ষিত হইয়াও অনেকে পৈত্রিক ধর্ম্ম ত্যাগ করে নাই।

ইহার অধিক ফাডিপের কাছে জানিতে পারি নাই। ইফে দেবতা কে, তাহার শক্তি কি, সে বিষয়ে ফাডিপে ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিল না। পরে John Wyndham সঙ্কলিত Myths of Ife (প্রকাশক Erskine Macdonald Ltd., London, 1921) নামক বই হইতে য়োরুবাদের দেবতাবাদ সম্বন্ধে কিছু খবর পাই, এবং এই বিষয়ে অল্প বই দেখিবারও সুযোগ হয়। ফাডিপের বয়স কম, তাহার উপর মিশ-কালো চেহারার নিগ্রো বলিয়া, একটু কিস্ত-কিস্ত করিয়া তাহাকে চলিতে হইত—আমায় অতি করুণ ভাবে সে বলিয়াছিল,

আপনারা সভ্য জাতি, গায়ের রঙও আপনাদের ফসী,
আমাদের অস্ববিধা ও অপমান আপনারা বুঝিবেন না।”

ইহার পরে আর একজন য়োরুবা ভদ্রলোকের সঙ্গে
আলাপ হয়, তাঁহার নিকট হইতে য়োরুবা এবং পশ্চিম-
আফ্রিকার নিগ্রোদের সংস্কৃতি ও মনোভাব, সামাজিক
তিনীতি ও রাজনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক
জানি পাই। তাহাতে এই জাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি
আমার আরও অনেক গুণ বাড়িয়া যায়। সে প্রসঙ্গ পরে
আমি যাইতে পারি।

মোটের উপরে, ব্রিটিশ-মিউজিয়মে বেনিন্ এর শিল্প-দ্রব্য
জানার পরে, এবং এই দুই জন য়োরুবা ও পরে এক জন
মুজাভীয় আফ্রিকানের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের পরে,
নিগ্রো জাতির সম্বন্ধে যে কৌতূহলের উদ্রেক হয়, তাহার
ফল পৃথিবীর এক বিশাল ভূভাগ যে জাতিদ্বারা অধ্যুষিত,
সেই বিষয়ে যে জাতির স্বাতন্ত্র্য আছে, সেই নিগ্রো জাতিকে



৬। বেনিন্—নিগ্রো যুবকের মুখ
ব্রঞ্জের ঢালা

বিচার স্বযোগ ঘটানোছিল, তাহাদের শিল্প ও অস্ত্র কৃতিত্বের
বস্তু তাহাদের প্রাপ্য মর্যাদা দিয়া, মনে মনে আমি বিশেষ
মানন্দ উপলব্ধি করিয়াছি।

[২]

আফ্রিকার নিগ্রো শিল্প আজকাল ইউরোপ ও আমেরিকার
রূপ-রসিকগণের নিকটে একটা craze—যেন একটা
পাগল-করা বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইউরোপ ও



৭। বেনিন্—নিগ্রো হইতে আনীত—কাঠের মূর্তির অংশ

আমেরিকার অনেক কৃতী শিল্পী ও শিল্প-রসিক,
তাহারা প্রাচীন মিসরী, গ্রীক, রোমান, গথিক, রেনেসাঁস
প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের এবং যুগের শ্রেষ্ঠ রূপ-রচনার
গুণাগুণের সহিত নথ-দর্পণবৎ পরিচিত, হালের ইউরোপীয়
শিল্পে যাহা তাঁহারা পাইতেছেন না এমন একটা উপভোগ্য
বস্তু তাহারা নিগ্রো শিল্পে পাইতেছেন। ইউরোপের আধুনিক
শিল্প, মুখ্যতঃ গ্রীক ও রেনেসাঁস-যুগে পুনরুজ্জীবিত গ্রীক
শিল্পের আধারের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সব বিষয়ে ইউরোপে
উন্নতি হইতেছে, কিন্তু সেদিন পর্যন্ত ইউরোপ শিল্প-বিষয়ে গ্রীক

রোমান ও ইতালিয়ান, বড় জোর বিজ্ঞানীনিয় ও গথিক যুগের কথাকে চরম কথা বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল; গ্রীক-রোমান-ইতালিয়ান চোখ ছাড়া অন্য চোখেও যে রূপময় জগৎকে দেখা যায়, অন্য হাতেও যে তুলি টানা যায় বা ছেনী দিয়া কাটা



১১। ষোড়শ শতকের পোন্ডাকে
ইউরোপীয় যোদ্ধা
ব্রঞ্জ পাটা—বেনিন

যায়, সে ধারণা ইউরোপের ছিল না। অথচ শিল্প-বিষয়ে ক্রমিক গ্রীক-রোমান-রেনেসাঁস যুগের পিষ্ট-পেষণ ও অন্ধ অমুকরণের ফলে, ভিতরে ভিতরে ইউরোপের আত্মা গুমরিয়া মরিতেছিল। উনবিংশ-শতকের মধ্য-ভাগ হইতেই গ্রীক-রেনেসাঁস শিল্প-ধারার বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রতিক্রিয়া আসিতে আরম্ভ করিল—ফ্রান্স-দেশে। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়াও গ্রীক-রেনেসাঁস শিল্পের জাতি বাঁচাইয়াই হইয়াছিল। ইতিমধ্যে ইউরোপের বাহিরের জগতের শিল্পের খবর ইউরোপের কাছে পৌঁছিল—উনবিংশ শতকের শেষ পাদের মাঝামাঝি জাপানী শিল্পের সৌন্দর্য্য ইউরোপের শিল্প-রসিকদের মোহিত করিয়া দিল, এবং পরে চীনা ও মুসলমান শিল্পের (ও কিছু পরে চীনা সাহিত্যের) বাণীও ইউরোপের চোখে (ও কানে) পৌঁছিল; এবং বিংশ-শতকের প্রথম দশক হইতেই ভারতের তথা বৃহত্তর-ভারতের শিল্পের সার্থকতা ও সৌন্দর্য্য, ইহার গভীরতা ও অসম্মুখিতা ইউরোপকে আকৃষ্ট করিল।

এই-সব শিল্প-জগৎ কিন্তু সুসভ্য মানবের শিল্প-জগৎ। এই সব জগতের শিল্পের পিছনে শত শত বর্ষের চিন্তা ও সাধনা এবং চর্যা ও পটুতা আছে। এগুলি আসিয়া ইউরোপের চিন্তকে মথিত করিল বটে, কিন্তু তাহাকে মূলোৎপাত করিল না—কারণ এইসকল শিল্প-জগতের সহিত ইউরোপের বিভিন্ন শিল্প-ধারার একটা স্বাজাত্য, একটা সাধর্ম্ম আছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের চীনা বুদ্ধমূর্তি, গথিক যুগের ইউরোপীয় খ্রীষ্টান দেবমূর্তিকে স্মরণ করাইয়া দেয়; মহাবলিপুত্রের ভাস্কর্যের স্মৃতি ও শক্তিবাজক সৌন্দর্য্য দেখিয়া মিসর ও গ্রীসের শ্রেষ্ঠ শিল্পের কথা মনে আসে; অজন্টার ছবি ও প্রাচীন ইতালিয়ান ভিত্তি-চিত্র—উভয়কে মিলাইয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়।

ব্যর্থ অমুকরণ ও গতানুগতিকতায় গাহারা অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন এমন বহু ইউরোপীয় শিল্পী, বাহিরের



১২। তিন কণ্ঠা
ব্রঞ্জ পাটা—বেনিন

শিল্পের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের অধুনাতন মৃতপ্রায় গ্রীক-রেনেসাঁস শিল্প-ধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। প্রাচীন মনোভাব এবং প্রাচীন পদ্ধতিকে ভূমিসাৎ করিয়া দিয়া, গোড়া হইতে নতন-ভাবে শিল্প-গঠনের প্রয়াস করিলেন।

ইহারই ফলে আধুনিক শিল্পে Futurism, Cubism প্রভৃতি নতন তত্ত্বের ও ধারার প্রবর্তন। এই ভাঙ্গনের ও নতন সৃষ্টির কার্যে তাঁহারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সাহস ও অনুপ্রাণনা পাইলেন, আফ্রিকার নিগ্রোদের (তথা ওশেনিয়ার দ্বীপপুঞ্জের এবং আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের) মৌলিক ও আদিম শিল্প হইতে;—বিশেষ করিয়া আফ্রিকার ভাস্কর্য শিল্প হইতে—মধ্য আফ্রিকার ও পশ্চিম-আফ্রিকার কাঠের মূর্তি ও মুগস হইতে এবং পশ্চিম-আফ্রিকার ধাতুমূর্তি ও অস্ত্র শিল্প হইতে।

এই শিল্পে যে জগতের বাণী ইউরোপের কাছে আসিল, যে ভাব-ধারার সন্ধান ইউরোপ পাইল, তাহা একেবারে নতন, এবং প্রচলিত সমস্ত শিল্প-সংস্কারের মূলোচ্ছেদকারী। কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে এই শিল্প-জগতের সহিত ইউরোপীয় শিল্প-জগতের এবং ইউরোপ কর্তৃক নবাবিষ্কৃত এশিয়ার সুসভ্য জাতিগণের শিল্প-জগতের সাদৃশ্য নাই। তীব্র আঘাতে এই শিল্প ইউরোপের শ্রান্ত ও নিদ্রাতুর শিল্প-চেতনাকে যেন উজ্জীবিত করিতে চাহিতেছে। এই নবীন সজ্জাতের ফলে, আধুনিক ইউরোপীয় তথা সার্কভৌম শিল্প কোন্ পথে চলিবে, কি ভাবে প্রভাবান্বিত হইবে, তাহার বিচার করার সময় এখনও আসে নাই।

নিগ্রো শিল্প হইতে ইউরোপ একটা কিছু পাইয়াছে, নিশ্চয়ই; তাহা না হইলে, ইহার এতটা আলোচনা হইত না, নিগ্রো শিল্পের চিত্র ও ইহার পরিচয় লইয়া এত বই প্রকাশিত হইত না। এই সব বইয়ের উদ্দেশ্য মাত্র ethnological বা আদিম-সংস্কৃতি-তত্ত্ব লইয়া নহে—ইহাদের উদ্দেশ্য, সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব বিষয়ক। এখন, নিগ্রো শিল্পে ইউরোপ কি পাইয়াছে, বা ইহা হইতে কি পাইবার প্রয়াস করিতেছে—ইহা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে।

এই শিল্পে ইউরোপ পাইয়াছে, সভ্যতার সহস্র কৃত্রিমতা হইতে মুক্ত আদিম মনের পরিচয়। আধুনিক ইউরোপ সংস্কারের দাস;—বিশেষ করিয়া আধুনিক ইউরোপীয় শিল্প। একটা বিশেষ ধর্ম-বিশ্বাস লইয়া নিগ্রো প্রতিমা-নির্মাতা অপটু স্ত্রে তাহার মনের মধ্যে নিহিত আদর্শ বা ভাবকে ফুটাইয়া দিবার চেষ্টা করিল। শিক্ষা বা পরম্পরাগত রীতির স্থান ঠিক পাইল না;—মানসনেত্রে দেখা কল্পনা, এবং কতকটা নিয়ন্ত্রিত

ও কতকটা অনিয়ন্ত্রিত হাতের গতি—এই দুইয়ে মিলিয়া রূপ-সৃষ্টি করিল। কোন কোন স্থলে এই দুইয়ে ঠিক তাল রাখিয়া চলিতে পারে নাই; যেখানে পারিয়াছে, সেখানেই যথার্থ শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। পারক আর নাই পারক, মোট কথা, এই শিল্প রচনার প্রথম বৈশিষ্ট্য হইতেছে, সারল্য ও নিষ্কপটতা। এখানে চটক দেখাইবার প্রয়াস মোটেই নাই, অথবা যাহার প্রতি সত্যকার দরদ নাই তাহাকে রূপ দিয়া তাহার প্রতি দরদ দেখাইবার ভাণ নাই। এই নিষ্কপটতা-গুণই বোধ হয় আধুনিক ইউরোপের শিল্পে বিশেষ ভাবে অপেক্ষিত; এবং সেই জগুই এই আদিম ও শিশুচিত্র নিষ্কপটতা ইহার একটা প্রধান আকর্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, এই শিল্পে ইউরোপ যে plastic quality বা রূপ দ্যোতনার ভঙ্গি পাইতেছে, তাহা সম্পূর্ণ-রূপে নতন,—ইউরোপের শিল্প-চেতনায় তাহা অপূর্ব। নিগ্রো শিল্প মুখ্যতঃ মূর্তির শিল্প, ইহা চিত্রের শিল্প নহে। ছুতার ও কুমার, কামার ও কাঁসারী,—ইহারাই হইল ইহার শিল্পী, পটুয়ার স্থান ইহাতে নাই। নিগ্রো শিল্প-রীতিতে রচিত মূর্তির পরিকল্পনার এবং গঠনের আধার বা প্রাণ হইতেছে—ইহার নিরেট বস্তুত্ব। ইউরোপীয় ভাস্কর্য্য-মতে রচিত মূর্তির পরিকল্পনার আধার এই যে, ইহাকে সামনে হইতে চিত্রবৎ দেখিতে হইবে। এইরূপ একটা উদ্দেশ্য সুসভ্য জাতিগণের মধ্যে সৃষ্ট মূর্তি-শিল্পে যেন অস্তনিহিত আছে—ভাস্কর্য্য সমতল ক্ষেত্রের পটভূমিকার সমক্ষে চিত্রবৎ দণ্ডায়মান। সুসভ্য জাতিসমূহের মধ্যে ভাস্কর্য্য যে ভাবে সৃষ্ট ও পুষ্ট হয়, তাহার জন্যই এই প্রকার চিত্রণ-রীতিই হইয়াছিল ভাস্কর্য্যের আদিম আধার বা প্রেরণা। দেবমূর্তিকে মন্দিরের দেওয়ালের দিকে পিছন করিয়া রাখা হইত—দেওয়াল যেন background বা পটভূমিকা, মূর্তি চিত্রবৎ স্থাপিত। মিসরীয়, গ্রীক, ভারতীয়, গথিক প্রভৃতি ভাস্কর্য্যে in the round মূর্তি পরে গঠিত হইলেও, এই বিভিন্ন সভ্য দেশের ও কালের ভাস্কর্য্য-রীতির একই মূল প্রেরণা—ভিত্তি-গাত্রে স্থাপিত করিয়া রাখিবার জগুই মূর্তি-নির্মাণ। নিগ্রো শিল্প এ বিষয়ে, মূর্তি বা বস্তুর বাস্তব অবস্থান সম্বন্ধে, আরও অনেকটা বেশী সচেতন। সত্যকার মূর্তি বা বস্তু যেমন in the round থাকে, অর্থাৎ ঘুরিয়া চারি দিক হইতে দেখিবার

জন্ম যেমন ইহার অবস্থান, নিগ্রো শিল্প তদনুসারে সৃষ্ট। দুই-চারিটা রেখা টানিয়া মানুষের ধড়ের বা মুণ্ডের ছবি আঁকা যায়, সেই ছবির মধ্যেই ভাস্কর্যের বা প্রতিমা-শিল্পের বীজ উপস্থ থাকে। আবার একটা বড় ফল বা গোলক, গাছের গুঁড়ি অথবা cylinder অর্থাৎ সমবর্ত্তুল বস্তু দ্বারাও মানুষের মুণ্ডের বা দেহের দ্যোতনা হইতে পারে। দ্বিতীয় পদ্ধতি নিগ্রো ভাস্কর্যের অন্তর্নিহিত পদ্ধতি। এই solid, in the round অর্থাৎ যাহাকে প্রদক্ষিণ করিতে পারা যায় এমন plastic quality অর্থাৎ রূপ-দ্যোতনার গুণ থাকায়, নিগ্রো ভাস্কর্যের জাতি, সভ্য জাতির ভাস্কর্যের জাতি হইতে স্বতন্ত্র। ইউরোপীয় শিল্পবিদগণ এইখানে একটা নতন জিনিস পাইয়াছেন, এবং ইহাকে আশ্রয় করিয়া, নতন ভাবে রূপ-সৃষ্টিতে, প্রতিমা-গঠনে লাগিয়া গিয়াছেন।

নিগ্রো ভাস্কর্যের তৃতীয় লক্ষণীয় গুণ—ইহার ছন্দোময়ত্ব। মানব-দেহের আদর্শ কল্পনা করিয়া, মানবদেহানুকায়ী অতিমানব মূর্তি অথবা দেবমূর্তি সৃষ্টি করা যায়; সুসভ্য জাতিগুলির প্রতিমা-ভাস্কর্য এই লক্ষণাক্রান্ত। আবার অতিমানব বা দেবতার কল্পনা বর্জন করিয়া, কেবল মানব-দেহের যথার্থ অনুকরণ করিয়াও প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করা যায়; সুসভ্য জাতির ভাস্কর্যে এইরূপ realistic বা বাস্তবানুকায়ী রীতিও সাধারণ। এতদ্ভিন্ন, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের লোচন-গ্রাহ্য রূপের উচ্চাভ্যন্তকে আশ্রয় করিয়া একটা যে ছন্দ আছে, মাত্র সেই ছন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, সেই ছন্দকেই প্রাধান্য দিয়া, মূর্তি সজ্জন করা যায়। নিগ্রো শিল্পে প্রাকৃতিক বস্তুর যথার্থ অনুকরণের চেষ্টাও আছে। তবে মুখ্যতঃ ইহার প্রেরণা—বস্তুর বাহ্য বা রূপ-গত ছন্দকে আকারে ধরিবার চেষ্টা,—প্রতিকৃতিকে নহে; অথবা, প্রতিকৃতিকে আধার করিয়া কল্পিত আদর্শকে রূপের দ্বারা ধরিবার চেষ্টার মধ্যে ইহার রসসৃষ্টির উৎস নিহিত নহে; বরঞ্চ, বাহ্য সৌন্দর্য ও ছন্দোগতিকেই প্রাধান্য দিয়া, সেই সৌন্দর্যকেই দৃষ্টি-গোচর করাইয়া ইহার অন্তর্নিহিত ছন্দটিকে রূপে প্রকট করা এই শিল্পের উদ্দেশ্য। অতএব, বাস্তবের আধারেরই উপরে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর দর্শন স্পর্শনের উপরে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত প্রাচীন সুসভ্য জাতির শিল্পের মত, নিগ্রো শিল্প কল্পনাত্মক অথবা কল্পনাবাহী বস্তু-অনুকৃতি নহে।

নিগ্রো ভাস্কর্য নিগ্রো জাতির প্রাচীন ধর্ম ও দেবতা-বাদের বাহন—অতএব ইহা উদ্দেশ্যমূলক শিল্প; এই জন্ম অনেকের কাছে ইহার একটা বিশেষ সার্থকতা ও মূল্য আছে—যে সার্থকতা বা মূল্য আমাদের আজকালকার বহু উদ্দেশ্যহীন শিল্প-প্রচেষ্টার মধ্যে নাই। দেব-মূর্তি বা দেব-প্রতীক, মৃতের মূর্তি, মূগ্ধ, মাতৃ-মূর্তি বা কুমারী-মূর্তি—এ সমস্তই বাস্তব রূপের অন্তর্নিহিত ছন্দকে প্রকট করিয়া দেয়, এগুলিকে আধ্যাত্মিক জগতের প্রতীক-স্বরূপে ব্যবহার করিবার চেষ্টা মাত্র।

নিগ্রো শিল্প সম্বন্ধে আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। ইহা আদিম অরণ্যবাসী জাতির শিল্প। সুসভ্য নগরবাসী জাতির শিল্পে যে-সকল বিরাট জিনিস পাই, সেসকল জিনিস ইহাতে নাই। উচ্চকোটির বাস্তব-শিল্প নিগ্রোদের মধ্যে উদ্ভূত হয় নাই—বিরাট বিশাল দেবায়তন ও অল্প ইমারত ইহাদের মধ্যে নাই। রাজারাও মাটির বা কাঠের দেওয়াল, খড়ে বা পাতায় ছাওয়া চালা ঘরে বাস করিত। একমাত্র দক্ষিণ-আফ্রিকায় Rhodesia-তে Zimbabwe জিথাবোএ ও অন্তর্গত পাথরের বিশাল দেওয়াল ও অল্প ইমারত পাওয়া যায়, সেগুলি হয় তো অতি প্রাচীন কালে বাণ্টু-জাতীয় নিগ্রোরা তৈয়ারী করিয়াছিল; কিন্তু নিগ্রো বাস্তব-শিল্পে Zimbabwe ও তদ্রূপ সন্নিকটবর্তী অল্প দুই-একটা জায়গার বাস্তব-রীতি একক ও অদ্বিতীয় বস্তু। ছবি আঁকার রীতিও ইহাদের মধ্যে জন্মলাভ করে নাই। বড় বড় মূর্তিও অজ্ঞাত। যে প্রকারের শিল্প ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়, তাহাকে Major Arts অর্থাৎ উচ্চকোটির শিল্প বলা চলে না, তাহা Minor Arts and Crafts অর্থাৎ লঘুশিল্প ও কারুশিল্পের পর্যায়েরই পড়ে। ভাস্কর্যে আবার নিগ্রোদের মধ্যে পাথর ব্যবহার হইত না—অথবা খুব কম হইত, মাত্র দুই-চারিটা প্রাচীন পাথরের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে; কাঠ, ধাতু, মাটি, হাতীর দাঁত—এইগুলিই প্রধান উপাদান ছিল।

নিগ্রো শিল্পের বহু নিদর্শন ও চিত্র দেখিয়াছি। ইহার মধ্যে সবগুলিই আমার ভাল লাগে না; অনেকগুলি বুঝি না, পারাপাই লাগে—দুই-চারিটা প্রবন্ধ বা বই পড়িয়াও এইরূপ কতকগুলি মূর্তি বা মুখের মধ্যে রসের কোনও হৃদিস পাই না। তবে মোটামুটি, ইহার একটা আকর্ষণ অনুভব করি। প্রাচীন মিসরীয় ভাস্কর্য, খ্রীষ্ট-পূর্ব পঞ্চম শতকের গ্রীক ভাস্কর্য,

মহাবলিপুুরের ভাস্কর্য, চীনা প্রাকৃতিক দৃশ্য, প্রাচীন চীনা ও জাপানী বৌদ্ধমূর্তি, রাজপুত চিত্রকলা, মিসরের ও সিরিয়ার মসজিদ, বিজ্ঞানসৌন্দর্য ও গাথিক গির্জা—এ সব প্রাণের সঙ্গে ভালবাসি; সঙ্গে সঙ্গে নিগ্রো ভাস্কর্যকেও ফেলিতে পারি না; এবং নিগ্রো শিল্পের কতকগুলি মূর্তিকে অন্য জাতির শ্রেষ্ঠ শিল্পের পাশে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হইব না। তবে সাধারণতঃ আমার নিজের কাছে নিগ্রো জাতির—নিগ্রো সংস্কৃতির—নিগ্রোদের মধ্যে উদ্ভূত ভাব-জগতের—নিগ্রোদের জীকনের মধ্যে বিদ্যমান স্বপ্ন ও দুঃখের, প্রেম ও বিরোধের, ভয় ও আনন্দের প্রতীক হিসাবেই নিগ্রো শিল্প ভাল লাগে—ইহার আভ্যন্তরীণ শিল্প-প্রেরণা এবং গঠন-রীতি সব সময়ে আমার রস-গ্রহণের কারণ হয় না; ইহার মানবিকতাই আমার কাছে ইহার প্রধান গুণ বলিয়া লাগে।

[৩]

নিগ্রো শিল্প সম্বন্ধে উপদেশ দিবার যোগ্যতা আমার নাই—শিল্প-সমালোচক নহি, কেবল ভাল লাগে বলিয়াই একটু দিগ্‌দর্শন করাইবার দুঃসাহস করিতেছি। কতকগুলি আপাত-রমণীয় মূর্তির চিত্র দেখাইব মাত্র; ইহাদের সৌন্দর্য বুঝাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে বেশী টীকা-টিপ্পনী অনাবশ্যক। যে সকল মূর্তি দেখিলেই সাধারণ শিল্প-রসিক ব্যক্তিমাত্রকেই আকৃষ্ট করিবে, এই প্রকারের সহজবোধ্য ভাস্কর্য ও অন্তঃশিল্প-দ্রব্যের সঙ্গে প্রথম পরিচয় আবশ্যক; প্রথম দর্শনেই যাহা কিছু ত-কিমাকার বা কুংসিত মনে হইবে, যাহা অত্যন্ত প্রচণ্ডভাবে আমাদের শিল্প-চেতনা ও রুচিতে আঘাত দিবে (কিন্তু যাহার মধ্যে সত্যসত্যই গুণ আছে)—এইরূপ শিল্প-দ্রব্য, প্রথম সহানুভূতি উদ্ভেকের পরে দেখাই শ্রেয়ঃ; আলোচ্য শিল্প-রীতিতে একটু প্রবেশলাভ হইলে, পরে এইরূপ নিদর্শন বুঝবার চেষ্টা করা উচিত।

যে যে দেশ-কাল-পাত্র ধরিয়া নিগ্রোদের মধ্যে কতকগুলি বিশিষ্ট সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং উঠিতেছিল, সেই সেই দেশ-কাল-পাত্র সম্বন্ধে কতকগুলি অবশ্য-জ্ঞাতব্য কথা বলিব।

সমগ্র আফ্রিকা-খণ্ডে মোটামুটি পাঁচটা মূল জাতির বাস ছিল, ইহাদেরই মিশ্রণে আজকালকার আফ্রিকার নানা জাতির উদ্ভব। এই পাঁচটা মূল জাতি হইতেছে—

১। হামীয় জাতি (Hamites)।

২। শেমীয় জাতি (Semites)।

৩। নিগ্রো—[ক] বিস্তৃত নিগ্রো বা সূদানী; [খ] বান্টু (Bantu) নিগ্রো।

৪। নিগ্রোবটু (Negrito) বা বামন জাতি (Pygmies)।

৫। বুশমান (Bushman) ও হট্টেন্টট্ (Hottentot) জাতি।

হামীয় জাতি অতি প্রাচীন কাল হইতে উত্তর-আফ্রিকায় ও পূর্ব-আফ্রিকায় বসবাস করিয়া আসিতেছে। ইহারা শ্বেত জাতিরই শাখা—নিগ্রো হইতে ইহারা একেবারে পৃথক—ইহারা দীর্ঘ নাসিকাগুক্ত, লম্বকেশ, নিগ্রোদের অপেক্ষা অধিকতর সভ্য ও সুব্যবস্থ। প্রাচীন মিসরের সুসভ্য অধিবাসিগণ এই হামীয় জাতিরই শাখা। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে হামীয়গণ উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকায় অবস্থিত অ্যুপনাদের আদিম বাসভূমি হইতে মধ্য- ও দক্ষিণ-আফ্রিকায় নামিয়া আসিয়াছে, এবং মধ্য- ও দক্ষিণ-আফ্রিকার নিগ্রোদের জয় করিয়া তাহাদের উপরে রাজ্য হইয়া বসিয়াছে, রক্তের সংমিশ্রণ করিয়া বহু স্থানে নূতন নূতন হামীয়-নিগ্রো মিশ্র জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। ইহারা নিজেরা এখন শেমীয় জাতির (আরবদের) চাপে বিপন্ন। মুসলমান ধর্ম-প্রচারের ফলে আরবেরা একতাবদ্ধ হইল, এবং দিগ্বিজয় করিতে বাহির হইল। মুসলমান আরবেরা মিসরের প্রাচীন ও সুসভ্য জাতিকে জয় করিল—অতি শীঘ্র সমস্ত উত্তর-আফ্রিকা জয় করিয়া ফেলিল। শেমীয়দের ভাষা ও হামীয়দের ভাষার মধ্যে যথেষ্ট সাম্য আছে—পণ্ডিতদের মতে, উভয় শ্রেণীর ভাষার মূল এক। শেমীয় জাতি শ্বেত জাতির অন্তর্ভুক্ত, ইহারা প্রাচীন জাতি, বাবিলন আসিরিয়া সিরিয়া প্রভৃতি দেশে ইহারা বড় বড় সভ্যতার পত্তন করে। কিছু পরিমাণ শেমীয়, দেড় হাজার বৎসরের অধিক হইল, আরব দেশ হইতে আসিয়া আফ্রিকার আবিসিনিয়া অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হয়;—এইরূপে আফ্রিকায় শেমীয়দের প্রথম প্রতিষ্ঠা ঘটে। ইতিপূর্বে সিরিয়া হইতে শেমীয়েরা আসিয়া মিসর আক্রমণ করিত, মিসরে উপনিবেশ স্থাপন করিত, কিন্তু ইহারা প্রাচীন কালে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই; আফ্রিকায় আসিয়া শেমীয়েরা নিগ্রোদের ভাষা ভুলিয়া যাইত, হামীয়দের সঙ্গে মিশিয়া

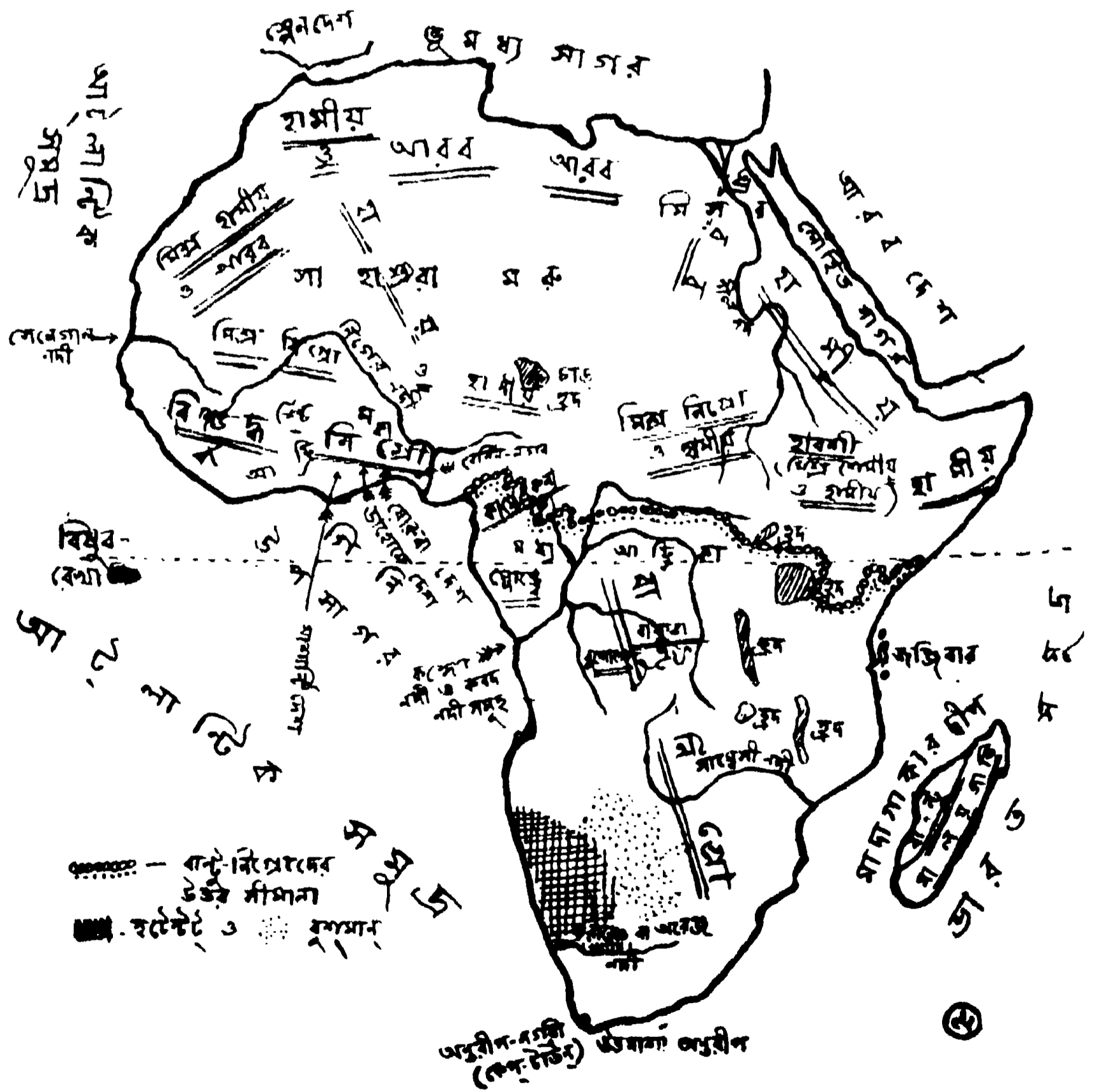
যাইত। পরে উত্তর-আফ্রিকার হামীয় জাতি আরবদের অধীন হইল, মুসলমান হইল,—হামীয় ভাষাও ধীরে ধীরে আরব ভাষার চাপে পড়িয়া বিলুপ্ত হইতে লাগিল। এখন মিসরের লোকেরা প্রায় সব আরব-ভাষী হইয়া গিয়াছে। আরবেরা দাস-ব্যবসায়ে রত ছিল, ইহারা ক্রীতদাস ধরিয়া আনিবার জন্ত মধ্য-আফ্রিকা পর্য্যন্ত ধাওয়া করিত। ইহাদের দ্বারা নিগ্রোদের মধ্যেও ইসলাম ধর্মের প্রচার হইয়াছে। মোটের উপর, শেমীয় আরবদের আফ্রিকায় আগমন হাজার বারশ' বছরের অধিক নহে, এবং এই শেমীয় জাতির আগমনে হামীয়দের ও নিগ্রোদের জাতীয় সংস্কৃতি প্রায় সর্বত্রই বিশেষভাবে সঙ্কুচিত ও খর্ব হইয়াছে।

নিগ্রো জাতিই আফ্রিকার বিশিষ্ট জাতি। পূর্বেই বলা হইয়াছে, হামীয়দের সঙ্গে নিগ্রোদের বহুস্থলে খুবই মিশ্রণ ঘটিয়াছিল; ফলে সেই সব স্থলে নূতন মিশ্র জাতির উদ্ভব হইয়াছে—এই সকল জাতিতে এখন নিগ্রো বৈশিষ্ট্য কম বিদ্যমান। ফরাসী অধিকৃত সূদানের Pul, F'ul, Peul (পুল, ফুল বা পোল) জাতি এই রূপ একটা মিশ্র জাতি। ইহাদিগকে পৃথক ধরা উচিত।

নিগ্রোরা দুইটা বগে বা শ্রেণীতে পড়ে [ক] বিসুদ্ধ নিগ্রো; ইহাদের বাস পশ্চিম-আফ্রিকায়—আটলান্টিক-সমুদ্রের অংশ গিনি-উপসাগরের উত্তরে ও সাহারা মরুর দক্ষিণে যে ভূভাগ, সেই ভূভাগে; মোটামুটি—Senegal সেনেগাল, Gambia গাম্বিয়া ও Niger নিগের বা নাইগার—এই তিনটা নদীর দ্বারা ঘোত দেশে, এবং উত্তর-মধ্য-আফ্রিকার কতক অংশে। বিসুদ্ধ নিগ্রোদের মধ্যে আদি নিগ্রো রূপটুকু অবিমিশ্র ভাবে বিদ্যমান। নানা ভাষা ইহাদের মধ্যে প্রচলিত, কিন্তু এই-সব ভাষার মধ্যে একটা প্রকৃতি-গত মিল আছে। [খ] আফ্রিকার উপদ্বীপীয় অংশে, আটলান্টিক-সমুদ্রের পূর্বে ও ভারত-সমুদ্রের পশ্চিমে লক্ষ্যমান যে

অংশ, সেই অংশে বাণ্টু-নিগ্রোদের বাস। এই বাণ্টু-নিগ্রোদের ভাষা, সূদানী বা বিসুদ্ধ নিগ্রোদের ভাষা হইতে পৃথক, ইহাদের সংস্কৃতিও পৃথক; ইহারা বিসুদ্ধ নিগ্রোর সহিত অতি প্রাচীনকালে সংঘটিত অল্প-বিস্তর হামীয়দের মিশ্রণের ফল। বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া মধ্য-আফ্রিকায় হামীয়েরা ধীরে ধীরে নিগ্রোদের সঙ্গে রক্ত-মিশ্রণ করিতেছিল; তাহার ফলে দুই জাতির লক্ষণাক্রান্ত, রক্তে নিগ্রোর প্রাধান্যযুক্ত কিন্তু সংস্কৃতিতে বেশীর ভাগ হামীয় প্রভাব পুষ্ট, একটা বিশিষ্ট মিশ্র হামীয় নিগ্রো জাতির সৃষ্টি হয়। মধ্য-আফ্রিকায় এই হামীয় মিশ্রণের ফলে, নিগ্রোর প্রকৃতি ও বাহ্যরূপ আমূল পরিবর্তিত হইল না, অনেকটা বজায় রহিল,—ইহারা একেবারে নূতন একটা মিশ্রজাতি হইল না, কিন্তু বিকৃত হইয়া একটু অল্প ধরণের নিগ্রো হইল; এইরূপ হামীয় প্রভাবে বিকৃত, ভাষায় পৃথককৃত নিগ্রোদের “বাণ্টু” খাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

নিগ্রোবটু (Negrito) জাতি বামন আকারের, ইহাদের উল্লেখযোগ্য কোনও সংস্কৃতি নাই। বৃশমান ও হট্টেটগণ



একই মূল জাতির দুই বিভিন্ন শাখা, ইহারা পীতকায়, নিগ্রোদিগের হইতে ইহারা সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। প্রাচীনকালে বৃশমান ও হট্টেন্ট জাতি পর্বতগুহার গায়ে মানুষ ও নানা পশুর বেশ প্রাণবন্ত চিত্র আঁকিত; উপস্থিতকালে ইহারা ক্ষয়িক্ত, ধবংসোন্মুখ জাতি; এখন ইহাদের কোনও শিল্প নাই।

নিগ্রো শিল্প মুখ্যতঃ বিস্তৃত নিগ্রোদের মধ্যে এবং বাণ্টু-নিগ্রোদের কতকগুলি শাখার মধ্যে—যে সব শাখা বিস্তৃত নিগ্রোদের সান্নিধ্যে বাস করে,—বেলজিয়ান কঙ্গো, ফরাসী বিদ্যুৎ-বৃত্তাধিকৃত আফ্রিকায় (French Equatorial Africa) ও কামেরুনে, সেই সব শাখার মধ্যে—উদ্ধৃত হইয়াছিল। বাণ্টু-নিগ্রোরা তিনটি প্রধান বিভাগে পড়ে—(১) পশ্চিমী—ইহার মধ্যে কঙ্গো দেশের বাণ্টু উপজাতিরা পড়ে, ইহারাই প্রধান শিল্পশ্রষ্টা; (২) পূর্বী—ইহাদের মধ্যে “বাগাণ্ডা” ও “সুআহিলিন” জাতিদ্বয় প্রধান, শিল্প-বিষয়ে ইহাদের তেমন কৃতিত্ব নাই; এবং (৩) দক্ষিণী—জুলু, বেচুয়ানা, সোআঙ্গী প্রভৃতি জাতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত; শিল্প বিষয়ে ইহারাও বিশেষ কৃতি নহে। মোটামুটি, গিনি-উপসাগরের উত্তরে ও পূর্বে আফ্রিকার যে অংশ পড়ে, সেই অংশেই নিগ্রো শিল্পের চরম বিকাশ হইয়াছিল; Ivory Coast (Cote d’Ivoire), Gold Coast, Togoland, Dahomey, Southern Nigeria, Camerun, Spanish Rio Muni, French Equatorial Africa-র দক্ষিণ ভাগ ও Belgian Congo - মোটামুটি এই য দেশের নিগ্রোরাই (বিস্তৃত নিগ্রো ও বাণ্টু) সত্যকার শিল্প সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে; অন্য স্থানের নিগ্রোগণ—যা, ইংরেজাধিকৃত সুদান, উগাণ্ডা, কেনিয়া (Kenia), মোসাম্বিক পোর্তুগীস পূর্ব-আফ্রিকা, তাঙ্গানিকা (Tanganyika), ডেইসিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকার সংযুক্ত রাষ্ট্র, ডামারানা ও ওয়াকোয়ানালাও এবং আঙ্গোলা বা পোর্তুগীস পশ্চিম-আফ্রিকার টু-নিগ্রোগণ তথা বৃশমান ও হট্টেন্টগণ—ইহারা কোনও মূল্যবোধ শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। গিনি-উপসাগরের উত্তরে সমুদ্রতীরবর্তী যে কয়েকটি দেশের নাম হইল—Ivory Coast, Gold Coast, Togoland, Dahomey ও Nigeria-র দক্ষিণ অঞ্চল—সে কয়টি দেশেই গ্রা সংস্কৃতি সর্বাঙ্গীণ বিস্তৃতি ও স্বাভাবিক রক্ষা করিয়া

আদিতে পারিয়াছে—সেখানে উত্তর হইতে মুসলমান প্রভাব ততটা আসিতে পারে নাই। গিনি-উপসাগরের তটবর্তী ঐ কয়টি দেশের উত্তরে যে নিগ্রোরা থাকে—French Upper Soudan-এ, Senegal ও Niger Colony তে এবং British Northern Nigeria-তে—তাহারা বিশেষভাবে হামীয় ও আরব মুসলমানদের প্রভাবে পড়িয়াছে, কাজেই তাহাদের উল্লেখযোগ্য জাতীয় শিল্প আর কিছুই নাই।

যে যে স্থলে নিগ্রোদের মধ্যে শিল্পের উদ্ভব হইয়াছে, সেই স্থলগুলি অরণ্য-সঙ্কুল। আদিম অরণ্যের মধ্যে খানিকট করিয়া জমি সাফ করিয়া ছোট বড় বহু গ্রাম; অধিবাসীরা অল্প-স্বল্প চাষ করে—কলা, সীম জাতীয় কড়াই, নারিকেল, চীনাবাদাম, এবং তাল-জাতীয় একপ্রকার গাছ, যাহার ফল হইতে খাদ্য-তৈল বাহির করে; এবং পোর্তুগীসদের দ্বারা আমদানী করা ফসল—ভুট্টা, yam বা চুপড়ী আলু ও manioc বা সাগু-জাতীয় শ্বেতসার; এবং ইহারা জঙ্গলে শিকার করে। ইহারা যাযাবর বা গোপালক জাতি নহে, স্থিতিশীল কৃষক ও শিকারী জাতি। এই স্থিতিশীলতা—এক জায়গার মাটি ধরিয়া বসিয়া থাকা—শিল্প-বিষয়ে ইহাদের সাফল্যের অন্যতম কারণ বলিয়া মনে হয়।

বিস্তৃত নিগ্রোদের ও তাহাদের প্রতিবেশী কতকগুলি বাণ্টুদের রূপ-শিল্পেরই জয়জয়কার; শিল্পমধ্যে, অন্তত নিগ্রোরা কেবল দেবতা-বাদে বা আমাদের হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্র মত পশুবিষয়ক উপাখ্যান-রচনায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।

সামাজিক বা রাজনৈতিক জীবনকে সূনিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখা বিষয়ে, এবং সব রকমের শিল্প বিষয়ে, বিস্তৃত নিগ্রোরাই অগ্রণী। আফ্রিকা হইতে যে সব নিগ্রো ক্রীতদাস আমেরিকায় নীত হয়, তাহারা প্রায় সকলেই বিস্তৃত নিগ্রো বংশীয় ছিল; গিনি-উপসাগরের উত্তরের দেশ হইতেই তাহারা গৃহীত হয়। আমেরিকায় উহারা ইংরেজী (অথবা স্পেনী বা ফরাসী) ভাষী হইয়া পড়িয়াছে। আমেরিকার সংযুক্ত-রাষ্ট্রের নিগ্রোদের মধ্যে এখন সাহিত্য (অবশ্য ইংরেজী ভাষায়) গড়িয়া উঠিতেছে; হেটি-দ্বীপের কতক অংশে নিগ্রোরা ফরাসী বলে, ফরাসীতেও তাহারা সাহিত্য রচনা করিতেছে। সঙ্গীতে এই নিগ্রোরা আধুনিক সভ্য জগৎকে দুই একটা নূতন জিনিস দান করিয়াছে—Jazz Music-কে

যতই নিন্দা করা যাউক, উহার একটা আকর্ষণী শক্তি স্মৃতি ইউরোপকে স্বীকার করিতে হইয়াছে, এবং এই Jazz বাদ্য, আমেরিকায় নতন অবস্থা-গতিকে পরিবর্তিত নিগ্রোদেরই সৃষ্টি। আফ্রিকায় নিগ্রোদের বাদ্যের মধ্যে ছিল কেবলমাত্র কাঠের ড্রাম ফাঁপা করিয়া তৈয়ারী ঢোল; এই ঢোল খালি নাচের জন্ত বাজান হইত; --দূরে সংবাদ পাঠাইবার জন্তও ঢোল বাজাইত, ঢোলের বিভিন্ন বুলি টেলিগ্রাফের টকা-টরের মত কাজ করিত। Jazz band-এর মুখ্য প্রয়োগও নচের জন্ত। নিগ্রোদের চরিত্রে একটা গভীর বিশ্বাসের ও আত্মসমর্পণের এবং সেই সঙ্গে বিষাদের ভাবও দেখা যায়। আমেরিকায় এই ধর্ম-বিশ্বাস ও বিষাদময়

সেই ভাবটী, কৃতদাস অবস্থায় বহু অত্যাচার সহ করার নিগ্রোদের মধ্যে পুষ্টিলাভ করিয়াছে। আমেরিকার নিগ্রোরা খ্রীষ্টান হইয়াছে, ধর্ম-সঙ্গীতে ও করুণরসায়নক সঙ্গীতেও কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, আফ্রিকা হইতে যে সকল পশু-বিষয়ক আখ্যান উহারা লইয়া গিয়াছিল, সেগুলি আমেরিকায় সংগৃহীত হইয়া, "নিগ্রোদের হিতোপদেশ বা পঞ্চতন্ত্র" গ্রন্থ-স্বরূপ বিদ্যমান। এই সব বিষয়, বিশুদ্ধ নিগ্রোদের প্রকৃতিত ব: স্পষ্ট মানসিক উৎকর্ষের পরিচায়ক।*

* আগামী সংখ্যায় সমাপ্য। এই সংখ্যায় প্রকাশিত চিত্রাবলীর বর্ণনা আগামী সংখ্যায় প্রকাশ্য অংশে থাকবে।

ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা বলিতে হইলে নানা কথারই আলোচনা আসিয়া পড়ে, ব্যাপারও বিরাট হইয়া উঠে। প্রাসঙ্গিক বহু বিষয়ের অবতারণা না করিলে বিষয়টিও পরিষ্কৃত হয় না। কাজেই সর্বপ্রথমে দিগদর্শন হিসাবে বর্তমান প্রবন্ধে কয়েকটা কথা বলিব। পরে মূল বিষয়ের সূচনা করিব।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই যে মানবজাতি বিভক্ত হইয়া গিয়াছে তাহা সকলেই মানিয়া লইয়াছেন। আযা, নিগ্রো, মঙ্গোলিয়ান প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিভাগের পশ্চাতে নৃতত্ত্বও বিশেষ কোন সংবাদ দিতে পারে না। কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের সংস্কৃতি (culture) ও সভ্যতার (civilization) বৈশিষ্ট্যও অস্বীকার করা যায় না। ভৌগোলিক সংস্থানের ফলে দীর্ঘ যুগ যাপন করিয়া বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড মানব-সমাজে এক একটি সংস্কৃতি—তথা সভ্যতা বিশিষ্ট সভ্য বা ব্যক্তিত্ব লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। সেই মানব-সমাজের আকৃতির বৈশিষ্ট্য যেমন অস্বীকার করা সম্ভব নয়, তেমনি তাহার প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যও অবশ্য স্বীকার্য।

আবার সকল মনুষ্যের মধ্যে এমন একটি সাধারণ বস্তু আছে যাহা মানুষকে অন্য সকল জীব হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে; তাহা মানব-মনের সর্বসাধারণত্ব। আর ইহাই বিশ্বমানবতার নিদানভূত।

একটা জাতিকে সাধারণ মনুষ্যজাতি হইতে পৃথক্ করিয়া বিশেষ নামে যে অভিহিত করি তাহার নীতি হইতেছে এই যে, সকল মনুষ্যসমাজ হইতে এক একটি বিশেষ অংশ সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে নির্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ খণ্ডে প্রাচীন কাল হইতে বাস করিয়া আসিতেছে। ফলে, এক একটি বিশেষ অংশের অনুষ্ঠান ও ধর্মের স্বাতন্ত্র্য গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাই এক একটি জাতির ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য বা সংস্কৃতি। এই বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও বহু ব্যাপারে ইহাদের মধ্যে পরস্পরের ঐক্য ও সাধারণত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়া গিয়াছে। এক জাতি যাহা ভাবিয়াছে, অন্য জাতিও হয়তো সেই একই ভাবনা করিয়াছে; এক জাতির সমস্তা হয়তো অন্য জাতির সমস্তার সঙ্গে অনেকাংশে মিলে, তাহার সমাধানেও হয়তো অদ্বিতীয়ত্ব নাই; কিন্তু একটি জাতির চিন্তার ধারা এবং সমাধানের ধারায় অপূর্বত্ব

থাকবেই। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সকল দেশেই আছে, অথচ তচ্ছন্দ্য পরিচ্ছদ, আবাস, আহার ইত্যাদি পৃথিবী জুড়িয়া এক নয়। ইহাদের পার্থক্য অসামান্য। দেশ-কাল-পাত্রে এই সমস্তার রূপের বিশেষ হের-ফের হইয়াছে। চিন্তার ক্ষেত্রে ইহা আরও বেশী সত্য। বিভিন্ন দেশের প্রশ্ন হইয়াছে বিভিন্ন—সমাধানও বিভিন্ন। বাহু জীবনের বৈচিত্র্য অপেক্ষা অস্ত্রজীবনের বৈষম্য এত অধিক তীব্র যে কল্পনাট কবা যায় না, তাই অস্ত্রজীবনের এই বৈষম্য বা ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই একটি বিশেষ জাতির বিশিষ্ট সংস্কৃতি টিকিয়া থাকিতে পারে।

পৃথিবীর সকল প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। অধুনা প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা নতুন সভ্যতার মধ্যে প্রাচীন সভ্যতার কোন কোন রেশ আবিষ্কার করিতেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের নিকট তাহার প্রাত্যহিক জীবনে ইজিপ্ট, বাবিলোনিয়া, আসিরিয়া বা মায়া-সভ্যতা মৃত। এমন কি গ্রীস-রোমও যেন প্রভাগারে স্থান পাইয়াছে। ইহাদের সভ্যতা মানুষের প্রতিদিনকার জীবনে মরিয়া গিয়াছে। আজ অতীতের বক্ষের কঙ্কাল—পঙ্কর দেখি, দেখিয়া বিস্মিত হই, উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করি—সে-প্রশংসা এমন কি কাবের অ'কারও পাইতে পারে, তাহা কোন শিল্পীর অনুপ্রেরণাও যোগাইতে পারে, কিন্তু মানুষের জীবনে তাহার স্থান ও সার্থকতা কোথায়?

সকল প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে মাত্র একটি বাঁচিয়া আছে। সেই অদ্বিতীয় গৌরবের স্থান ভারতীয় সভ্যতার। (চৈনিক সভ্যতা বলিতে যাহা বুঝি তাহা ভারতীয় সভ্যতার একটি বিশিষ্ট পরিণতি, অন্য দেশ, অন্য জাতির সংমিশ্রণে এক বিচিত্র রূপ।)

অন্য দেশে অন্য যে সভ্যতা উদ্ভূত হইয়াছিল তন্মধ্যে এমন প্রেরণা ছিল না, এমন গভীরতা ছিল না যাহার ব্যাপকতা এত বেশী। সে-সকল সভ্যতার সমস্তা ছিল সাময়িক, তাহাদের চিন্তা বর্তমানকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। সেখানে পরের সভ্যতা নূতন কথা লইয়া আসিয়াছে, পরের চিন্তা নূতন আলোক লইয়া আসিয়াছে, সেই নূতন বাণীকে বাধা দিবার মত শক্তি পুরাতনের ছিল না। সে সমস্ত পুরাতন সভ্যতা ছিল মাত্র পাথরের—ইটের সভ্যতা—সেনাবাহিনীর

সভ্যতা। বাহু জীবনের বহু প্রয়োজনের, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের, আরামের বন্দোবস্ত তাঁহারা করিয়াছেন, কিন্তু অস্ত্রজীবনের গৃঢ় সমস্তার—সত্যকার জীবন-সমস্তার কোন বাণী সে সকল সভ্যতায় নাই। প্রাণহীন এ-রকম বস্তু-সভ্যতা ঠাচিতে পারে না। ভারতীয় সভ্যতার প্রাণস্পন্দন ছিল বলিয়াই সে বাঁচিয়াছে। ইহাকে 'আধ্যাত্মিক' বলিয়া কোন বিজ্ঞ পণ্ডিত অধরপ্রান্তে একটি বিদ্রূপের হাসি হাসিয়াছেন। ইহার বস্তু-সভ্যতার অংশ কতটা তাহা এখানে বিচার্য নয়। কিন্তু এ-টুকু বুঝিতে হইবে যে, ইহা বিশেষ করিয়া আধ্যাত্মিক বলিয়াই বাঁচিয়াছে। মাত্র এই সভ্যতারই আত্মা আছে—তাই সে মরে নাই।

ভারতের চিন্তা পৃথিবীর বস্তুতেই নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। বস্তুর আশ্রয় যাহা, বস্তুর অতীত যাহা তাহারই সন্ধান সে পাইয়াছে। ভারত রূপের মধ্যে অরূপের সাধনা করিয়াছে। নশ্বর ভঙ্গুরকে অতিক্রম করিয়া ভারতের সাধনা হইতেছে শাস্ত্র নিতোর। এই জগতের প্রাণের সন্ধান তাহার যাত্রা। অমৃতের পথ পাইয়া সে চলিয়াছে। ভারতে জীবন অতি দীর্ঘ সাধনা—অবিদ্যা হইতে মুক্তির সাধনা, বিদ্যার আবির্ভাবের সাধনা।

ভারতবর্ষে লেখা-পড়া ও সংস্কৃতি কোন দিন এক বস্তু বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। সংস্কৃতি ভারতের অস্তরের বস্তু, অক্ষর-পরিচয়ে সাহিত্য-জ্ঞান কোন দিন তাহার জ্ঞাপক ছিল না। এ-দেশে বিদ্যা কখনও academic ব্যাপার বলিয়া গৃহীত হয় নাই। বিদ্যা তাহার অস্তরের সামগ্রী। দর্শনও কোনদিন বুদ্ধির পরিচয়জ্ঞাপক মাত্র হয় নাই—ইহা ছিল ভারতবাসীর প্রাণস্বরূপ। দর্শন ও ধর্ম কোন সময়ে এদেশে দুটি পৃথক বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ধর্মের গোড়ার কথাটি হইয়াছে সর্ববস্তুর মধ্যে একটি অখণ্ড যোগ; সর্ববস্তু একটি অখণ্ড পূর্ণত্বের প্রকাশ মাত্র। তাহার macrocosm ও microcosm সর্ববিদ্যাই ধর্মের মধ্যে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। চতুষষ্টি শিল্পকলাও ধর্মের বাহন হইয়াছে। শিল্পকলা গ্রন্থেরও তাই নাম হইয়াছে—শাস্ত্র। ধর্মের মত ব্যাপক শব্দ ভারতীয় ভাষায় আর নাই। ধর্ম সকলের মধ্যে অনুসৃত রহিয়াছে সকলকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে বলিয়া এ-দেশে কোন বিদ্যা watertight compartment-এর মত হয় নাই। সর্ববিদ্যার শেষবাণী ধর্ম; তাহাদের মধ্যে

কোন বিঘ্ন ঘটবে না। প্রাচীন যুগে ধর্ম ভিন্ন তাই এদেশে কাব্য হয় নাই, স্থাপত্য হয় নাই, শিল্প-সৃষ্টি হয় নাই। আমাদের শিল্পে বিদেশীরা বস্তুতন্ত্রের অভাব বোধ করেন। সত্য বটে, বাস্তবের সঙ্গে আমাদের শিল্প মেলে না। কিন্তু সাধনার দিক্ দিয়া দেখিলে কোন গোলযোগ থাকে না। ভারতের সাধনা concrete-এর মধ্য দিয়া abstract-এর; রূপের মধ্য দিয়া অরূপের। লিঙ্গপূজার মধ্যে আমরা ইহারই সাক্ষাৎ পাই; মূর্তিপূজায় অবিকল নিছক মনুষ্যমূর্তি যে দেখি না তাহারও ব্যাখ্যা ইহাই। এখানে abstractকে মূর্তি দিবার প্রচেষ্টা হইয়াছে, তাহা concrete-এর ছব্ব নকল হইতে পারে না।

অতি প্রাচীন যুগেই আমরা পরিত্রাজকদের কথা শুনিতে পাই। চির-পথিক তাঁহারা; দেশদেশান্তরে বিরামহীন যাত্রার ব্রত তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহাদের সাধনার ফল তাঁহারা প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন। দরিদ্রতম রুগ্নের কুটীরেও তাঁহাদের গতি—রাজ-অতিথিও তাঁহারা। তাই প্রাচীন যুগে গ্রামে গ্রামে এই পরিত্রাজকদের জন্ম কুটাহনশালার অস্তিত্ব। গ্রামবাসীরাও কুটাহনশালার গর্বে গৌরব বোধ করিয়াছে। যেখানে তাঁহাদের বিচার-সভা বসিত সেখানে ইহারা গ্রামবাসীদের উপদেশ দিতেন। রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিতে কি সাহায্য করিয়াছে তাহা আজও নিরূপিত হয় নাই। প্রতি-ভারতবাসীর মধ্যে ইহারা প্রাণসঞ্চার করিয়াছে। ভারতের অষ্টাদশ পুরাণ-কথা ভারতের মর্ম-কথা হইয়াছে।

অতি প্রাচীন যুগে আমরা যাত্রা ও কথকতার পরিচয় পাই। এ-গুলি যে কত বড় শিক্ষার বাহন তাহা আজও ঠিক বোঝা হয় নাই। নিরক্ষর রুগ্নের মুখে কত অজানা সাধক কবির যে-গান আজও শুনা যায় তাহা দর্শনের গভীরতম মূল তত্ত্বের ব্যাখ্যা। চর্যাচর্যা, দেহতত্ত্ব, বাউল, ভাসান, মঙ্গল-গান প্রভৃতি সঙ্গীত এ-যুগেও কত শত বৎসর ধরিয়া নিরক্ষরদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। ভারতের বারব্রতও সেই প্রাচীন সংস্কৃতি বহন করিয়া আসিয়াছে। শিক্ষা ও লেখা-পড়া এক বস্তু নয়—এ-কথাটা যদি একবার উপলব্ধি করিতে পারি তাহা হইলে বুঝিতে পারিব আমাদের নিরক্ষর গ্রাম-বাসীদের মত শিক্ষিত গ্রামবাসী পৃথিবীতে আর নাই।

ভারতবর্ষে আর্ষাদের কেমন করিয়া দেখা পাওয়া গেল সে-প্রশ্নের সম্পূর্ণ সম্ভাবজনক মীমাংসা আজও হয় নাই। তবে আদিম যুগের কয়েকটি আর্ষ দেবতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় সুদূর বোঘাসকুই-শিলালিপিতে, তেল-এল-অমরনার পত্রাবলীতে এবং বাবিলনের কাসাইটদের দলীলপত্রে। কাসাইটরা হিমালয়ের (সিমলিয়ার) উল্লেখ করিয়াছে। মিতানীদের সহিতও আর্ষাদের সম্পর্ক ভারতবর্ষে আর্ষা-গমনের পূর্বে হইয়াছিল, একথা এখন আর বলা চলে না। তেল-এল-অমরনার পত্রাবলীতে সংস্কৃত নাম অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বোঘাসকুই-লিপিতে সংস্কৃত সংখ্যা আছে, বৈদিক শব্দের সহিত ইহার শব্দের মিল আছে। ভারতবর্ষের সহিত এশিয়া-মাইনরের সাক্ষাৎ সম্পর্ক। এই দূরদেশে হিন্দু দেবতার শাস্তি-দেবতারূপে দেখা দিয়াছেন। শাস্তির বণী লইয়াই ভারতবর্ষের প্রথম আন্তর্জাতিক পরিচয়। শাস্তিই ভারতের সনাতন বাণী—শাস্তিই ভারতীয় সংস্কৃতির যথার্থ প্রতীক। সে-যুগের অপর সকল সভ্যতার আন্তর্জাতিক পরিচয় গ্রহণ করিতে গিয়া দেখিতে পাই—সে-পরিচয় তাহাদের লুপ্তনে। সে-লুপ্তন হয় ব্যবসায়িক, নয় প্রকাশ্য সৈন্যবলে। সে-দিনও ইজিপ্ট তৃতীয় খৃষ্টমোসিসের বিশ্বজয়ের জয়গীতি হুন্দুভিদ্ধারা ঘোষণা করিতেছিল, এথেনিয়নের ক্রীট দখল করিতেছিল এবং ফিনীসিয়রা এই প্রাচীন যুগে বাণিজ্যক্ষেত্রে পৃথিবী লুপ্তন করিয়া প্রথম আসিবিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। আসিরিয়ার অস্তরের জাগিতেছিল।

মোহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পায় যে সভ্যতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহার সহিত সূমেরীয় সভ্যতার একটা সহজ ঐক্য ও সামঞ্জস্য আছে। মার্শাল (A.S.I., A.R. 1923-24) বলিয়াছেন, সিন্ধু-উপত্যকায় যে-সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহার উৎপত্তি, অতিবৃদ্ধি ও পরিণতি ঐ-স্থানেই হইয়াছে। নীলনদীর তীরে ফারওয়াদের সভ্যতার মত উহা ঐস্থানের একান্ত সম্পত্তি। আর মেসোপটেমিয়ায় সূমেরীয় সভ্যতার যে-পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইতে বেশ ধারণা করিতে পারা যায় যে, ভারতবর্ষের অক্ষপ্রদেশই ঐ সভ্যতার আদি ভূমি, এবং বাবিলন, আসিরিয়া ও পশ্চিম-এশিয়ার সাধারণ সংস্কৃতি পরে সেখানে ছড়াইয়া পড়িয়া বহুমূল হইয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির দ্রাবিড়ীয় অংশের

ইতিহাস অজ্ঞে লিখিত হয় নাই; কিন্তু ইহা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার তাহা অস্বীকার করা যায় না। দ্রাবিড়ী রক্তের মত সেই সংস্কৃতি আর্যসংস্কৃতির সহিত বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে। লিঙ্গপূজা, নাগপূজা, বৃক্ষপূজা, মাতৃকাপূজা প্রভৃতি দ্রাবিড়ী ভিন্ন অন্য ব্যাখ্যায় এই সংস্কৃতিতে স্থান পাইতে পারে না। যজ্ঞস্থলে প্রতিমাপূজার ব্যাখ্যা দ্রাবিড়ী বলিয়া সম্ভব হয়।

বেলুচিস্তানের দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মই ভাষা অনেক ব্যাপারেরই সূচনা করে। আবার দ্রাবিড়ীরও পূর্বে নেগ্রিটো-সম্পর্কও প্রমাণিত হইতেছে।

বৈদিক যুগ হইতেই ইরানের সহিত ভারতের সন্ধ। অশোকের সময় ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইরান-সম্পর্কের অকাটা নিদর্শন পাওয়া যায়। মৈত্রী-বাণী-প্রচারক এই অশোক প্রথম প্রচার করিলেন—পৃথিবীবাসী সকলেই ভ্রাতা। ইহাপেক্ষা বৃহত্তর অস্বর্জাতিক বাণী আর নাই। তিনি পৃথিবী-বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন মাত্র এই বাণী পৌছাইয়া দিবার জ্ঞ। তাই সেই বিজয়ের তিনি নাম দিয়াছিলেন 'ধর্মবিজয়'। তিনি চাহিয়াছিলেন বিশ্বের কল্যাণ। তিনি বলিয়াছিলেন—ধর্মের দ্বারা মানুষের অন্তঃকরণ জয়ই একমাত্র জয়।

আর এই যুগেই রোম পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় রোমক সভ্যতার পরিচয় দিতেছিল।

খৃষ্টপূর্ব শতকে প্রবলপ্রতাপ মেনেন্দরকে একাগ্র ও ঐকান্তিক বৌদ্ধরূপে দেখি, বৈষ্ণব ভাগবতরূপে হেলিওডোরসের পরিচয় পাই। চীনে বৌদ্ধ-প্রচারক মেলে, আর তথাকথিত গান্ধার শিল্পে গ্রীক সংস্কৃতির নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এই যুগের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়—ভারতবর্ষ সকলকে গ্রহণ করিয়াছে; কত

অজানাকে স্থান দিয়াছে। এমন সময় গিয়াছে যখন ভারতে পর-সংস্কৃতির একটা রাসায়নিক সংমিশ্রণ চলিয়াছিল। ইজিপ্ট, এশিয়া-মাইনর, পারস্য সকলের সহিতই ভারতের কোলাকুলি। তারপর পরের যুগে দলে দলে অসভ্য বর্ষের আসিয়া ভারতের দুয়ারে হানা দিয়াছে। তাহাদের ফিরিয়া যাইতে হয় নাই। ভারতবর্ষ শক, হন, মোঙ্গল, পহ্লব, চীন সকলকেই গ্রহণ করিল। ভারতের অপূর্ণ সবল সংস্কৃতিকে ইহারা মট করিতে পারে নাই, ভারতের আশ্রয় প্রভাবে তাহারা গর্কিত হিন্দু হইয়া গেল। ভারতবর্ষের গৌরবময় ইতিহাসের এক বিশিষ্ট অংশ ইহাদেরই কীর্তি—রাজপুত্ররূপে। দ্রাবিড়ী অক্ষুস্মাত্র গোতমীপুত্র শাতকর্ণি নিজেকে এক-ব্রাহ্মণ বলিয়া গর্ব করিলেন, চতুর্ভুজের সংমিশ্রণ বন্ধ করিয়াছেন বলিয়া শিলালিপিতে অঙ্কিত করিলেন; শক উসভদাত, রুদ্রদামা হিন্দুধর্মের প্রতিপালক হইলেন। সংস্কৃতির এমন বিরাট রাসায়নিক সংমিশ্রণ পৃথিবীর ইতিহাসে বড় ঘটে নাই। ভারতের উদারনীতিতে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের সন্ধ সকল দেশেরই হইয়াছে। আর ইহার পরেই ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ঐতিহাসিক উপকরণ জুটতে আরম্ভ হইল। বৃহত্তর ভারতের সূচনা দেখা গেল। চীনে তো বহু পূর্বেই বৌদ্ধ ভিক্ষু গিয়াছিল। এখন তাহাদের সংখ্যা বেজায় বাড়িয়া উঠিল। ভারতীয় নাবিকে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ছাইয়া গেল। বৌদ্ধ ভিক্ষু পৌছিল, ব্রাহ্মণও পৌছিল। এ-সব ঘটিল খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষে। অফগানিস্তান পার হইয়া বৌদ্ধ ভিক্ষু মধ্য-এশিয়া ছাইয়া ফেলিল। চীন পার হইয়া তাহারা আপানে দেখা দিল। ভারতের প্রতিবেশী তিব্বত, সেও বৌদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইল।

সাধনা

শ্রীসতীশ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, বি-এ

কলিকাতা হইতে তার আসিল, পাটের দর কিছু চড়িয়াছে এবং আরও কিছু চড়িবারই সম্ভাবনা। হাজার-তিরিশেক মণ 'গড়সড়ে' তাড়াতাড়ি কিনিয়া রাখা আবশ্যিক।

তার পাইয়া রতিরাম পেরিওয়াল গৌফে একবার আরাম-সূচক 'তা' দিয়া লইল। মনের আনন্দ চোখ ও মুখের কোণে ফুটিয়া উঠিল।

সত্য কথা বলিতে কি, এবারের বাজার বড় মন্দা যাইতেছে। শুধু এবারই বা কেন, গত আড়াই-তিন বৎসর যাবৎ পাটে লোকসান ছাড়া আর লাভ নাই;—কাহারও নাই; না চাষার, না ব্যাপারীর। হালের খবরে দেখা যাইতেছে, আমেরিকা আবার কিছু মাল খরিদ করিতেছে; কলিকাতার মিলের অবস্থা ঠিক কিছু বুঝা যাইতেছে না বটে, তবে সে খবরও ভালর দিকেই। আর 'ফাটকা'র শেষ খবরও আশাপ্রদ।

রতিরাম ঘড়ির দিকে চাহিল। পাঁচটা বাজিতে পাঁচ মিনিট বাকি। কাল বদরগঞ্জের হাট। বদরগঞ্জ এখন হইতে ত্রিশ মাইল; ছোট লাইনের গাড়ীতে বুলাকিনগর স্টেশনে নামিয়া তিন মাইল গরুর গাড়ীতে যাইতে হয়। বদরগঞ্জ এদিকের মধ্যে বিখ্যাত পাটের বাজার; আমদানী অনেক। আর যাওয়-আসা সেখানে ত নিত্যই আছে।

পাঁচটা বিশ মিনিটে ছোট লাইনের একখানা গাড়ী ছাড়ে, আর বুলাকিনগর পৌঁছায় রাত্রি নয়টার। সেখানে গরুর গাড়ী অনেক—প্রায় সবই রতিরামের জানাশুনা। আর বদরগঞ্জে থাকিবার জায়গারও অভাব নাই; চূড়ামণ্ডীর ওখানে বন্দোবস্ত সবই ভাল; একই দেশের—নোহর রিয়াসতের লোক ত!

রতিরাম ঠিক করিল, সন্ধ্যার গাড়ীতে যাওয়াই শ্রেয়। কলিকাতার টাটকা খবর সকাল সাতটার পূর্বে বদরগঞ্জে না পৌঁছিবারই সম্ভাবনা। সকাল-সকাল সওদা করিয়া ফেলিতে পারিলেই ভাল। ছিয়ানকই ওজনে চারি টাকায়

কিনিতে পারিলে লাভ অনিবার্য; তিরানকইতে আর দুই পয়সা নয় কমাইয়া দিবে। তবে সঙ্গে কিছু খুচরা টাকা থাকিবে আর সময় রাত্রিকাল। তা ওখানকার পথঘাট ত সবই জানাশুনা আর গাড়োয়ানও সব পরিচিত। অত ভয়-ভাবনা করিলে কি কাজ-কারবার চলে?

খাইবার সময় আর বড় নাই, তবে এ-লাইনের গাড়ী সর্বদাই বিলম্ব করিয়া আসে ও ছাড়ে এই যা ভরসা। সকালের বাসি পুরি ছিল—তাড়াতাড়ি সে তাহারই দুইটা অর্ধশতাব্দী-রক্ষিত আচারের সহযোগে গলাধঃকরণ করিয়া একলোটা জল ঢকঢক করিয়া গিলিয়া ফেলিল। তাহার পর ছোট একটুকু বিছানা ও দুইখানা কাপড় বগলদাবা করিয়া স্টেশনের দিকে অগ্রসর হইল। তখনও গাড়ী ছাড়িতে পাঁচ মিনিট বাকি।

রতিরামের মনিব কলিকাতায় থাকে। পূর্বে সে এই মনিবের চাকরি করিত; সম্প্রতি বছর-চারেক যাবৎ মনিব তাহাকে হিসায় লইয়াছে। মূলধন তাহার কিছুই নাই—সে খাটিয়া মূলধন জোগায়।

রতিরামের বয়স বিয়াল্লিশ। পরনের কাপড়খানা সম্ভবতঃ মাস-দুই যাবৎ সাক্ষ করিবার ফুরসৎ হয় নাই; সেখানার রং এখন ধূসর গৈরিক হইতে তামাটে কালো হইয়া গিয়াছে। পায়ে জাপান-নির্মিত পাঁচ সিকা দামের রবারের জুতা—গায়ে লম্বা গরম কোট। মাথার পাগড়ীটি গাঢ় কমলা রঙের। দাড়ি আজ দিন-পাঁচেক যাবৎ কাটা হয় নাই, কিন্তু পাট কেনাবেচার বাজারে তাহাতে কিছু আসে যায় না।

গাড়ী যথারীতি দেরি করিয়া ছাড়িল। রতিরাম তৃতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় বসিয়া বিড়ি ধরাইয়া ধূমপানের ফাঁকে ফাঁকে গুণ্ণু করিয়া গান করিতে আরম্ভ করিল।

পাশে বসিয়া একজন বাঙালী ভদ্রলোক খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। রতিরামের মনটা আজ অত্যন্ত প্রফুল্ল; সহযাত্রীর সহিত কথা বলিবার জন্ম সে উৎসুক হইয়া উঠিল।

ভদ্রলোক একমনে পড়িয়া যাইতেছিলেন। বিধাতরে রতিরাম খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—সমাচারমে কোই খবর আছে বাবুজী ?

রতিরাম বাংলা বলে।

ভদ্রলোক মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিলেন—কিসের খবর ? রতিরাম বিশেষ কোন খবরের প্রত্যাশায় ছিল না, আর এক পাটের খবর ছাড়া বহির্জগতের কোনো কথাও তাহার জানা ছিল না ; বলিল—পাটুয়াকা কেয়া হাল ?

ভদ্রলোকটি আশ্চর্য্য হইলেন কি-না বুঝা গেল না, তবে আশ্চর্য্য হইবার কোন লক্ষণ তাঁহার মুখেচোখে দেখা গেল না বটে। হয়ত এ-শ্রেণীর জীব হইতে এই প্রশ্ন ছাড়া অণু কিছু প্রত্যাশা তিনি করেন নাই। বলিলেন—পাটের খবর ত কিছু জানি না, তবে পঞ্জাবের দিকে খুব বেশী ভূমিকম্প হইয়াছে।

রতিরাম বলিল—ভূইডোলা ? কাঁহা হোয়েছে ?

—পঞ্জাবের দিকে ; সব খবর ত এখনও বাহির হয় নাই।

রতিরাম বলিল—হামারা তো খবর মিলে নাই।

ভদ্রলোকটি বলিলেন—আজই খবর বাহির হইয়াছে ; আজিকার কাগজ পড়িয়াছেন ?

রতিরাম মাথা নাড়িয়া বলিল—নেহি।

শুধু আজিকার কেন, কোনোও দিনের কাগজই সে পড়ে না ; তাহার ঘরের পাশে বাঙালী পানওয়ালার নিকট হইতে সে শুধু পাটের বাজারের খবরটুকু পড়াইয়া নেয়। খবরের কাগজওয়ালার সহিত তাহার বন্দোবস্ত আছে ; এজন্ত তাহাকে সে মাসে চারি আনা পয়সা দেয়—অবশ্য কাগজখানা তাহাকে তখনই ফিরাইয়া দিতে হয়।

রতিরাম খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল—কেৎনা লোকসান হোয়েছে ? কয়টো আদমী মরা ?

—সে খবর ত এখনও বাহির হয় নাই।

ভদ্রলোক আবার কাগজে মন দিলেন। মিনিট-দুই পরে আবার রতিরামের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন সে অর্থহীন দৃষ্টিতে তাঁহারই দিকে চাহিয়া আছে। বলিলেন—আপনার ঘর কোথায় ?

—নোহর বিকানীর রিহাসৎ।

—বালবাচ্চা কোথায় আছে ?

—ঘরমে—ওতো পাঞ্জাবকা নজদিগই আছে।

—তা চিঠিপত্র পান ত ?

—হাঁ, মাহিনামে একটো। রূপেয়া ভেজ দেই, আওর কুপনমে সমাচার লিখ্ দিই—আজ চার বছর ঘর নেহি গিয়া। ভদ্রলোক কথা বলিলেন না। রতিরামও চুপ করিয়া জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিল।

লাইনের দুই ধারে বন ; শিশু, শাল, আম ও বাঁশ—ঘনায়মান সন্ধ্যার আবছায়া গায়ে মাখিয়া একান্তে দাঁড়াইয়া আছে। মাঠ হইতে রাখালেরা গরু লইয়া গিয়াছে—দুই একটি এখনও দলছাড়া হইয়া এ-দিকে ও-দিকে বোপের পাশে খাদ্যসংগ্রহে ব্যস্ত। মাঠের মাঝে মাঝে ছোট ছোট কুটীর ; বাঁশ ও বাথারির আক্র-দেওয়া অঙ্গন ; সে বেড়ার উপরে লতার ঝাড় ; কি লতা তা বুঝা যায় না।

গাড়ী ষ্টেশনে দাঁড়াইল। ছোট ষ্টেশন। ষ্টেশন-ঘরের পাশেই ছোট ছোট ঘর—বোধ হয় কুলীদের। রতিরাম চাহিয়া রহিল। একটা ঘরের কোণে বাহিরে দাঁড়াইয়া একটি মেয়ে—বছর-কুড়ির ; কোলে তাহার বছরখানেকের একটি শিশু—বোধ হয় তাহারই মেয়ে। ষ্টেশনের আলো আসিয়া তাহাদের মুখে পড়িয়াছে। রতিরামের মনে হইল, শিশুটি যেন দেখিতে অনেকটা তাহার নিজের মেয়েরই মত। তাহাকে বছরখানেকের দেখিয়া সে ঘর হইতে আসিয়াছে—তখন তাহাকে সে ‘বুড়ী’ বলিয়া ডাকিত। আজ চারি বৎসর সে তাহাকে দেখে নাই।

রতিরামের মনে পড়িল, মেয়েটার চুল ছিল কঁকড়ানো, রংটা বেশ ফর্সা ; বেশ গোলগাল মাংসল চেহারা। নরম নরম দুটি গাল—চুমো খাইলেই ফিক করিয়া হাসিয়া উঠিত আর কোলে আসিতে চাহিত।

ঘর হইতে কে ভারি গলায় ডাকিল,—মুয়ি। মা বা মেয়ে কেহই উত্তর দিল না। কালো রঙের কাপড় ও সেই রঙেরই কোর্টা গায় দিয়া দীর্ঘাবয়ব এক মুষ্টি বাহির হইয়া আসিল। মা হাসিয়া মেয়ের মুখের দিকে চাহিল—মেয়ে নবাগতের দিকে হাত বাড়াইয়া দিল।

গাড়ী আবার চলিল।

মাঘের শুক্লাচতুর্থী। চন্দ্র উঠিয়া পড়িয়াছে। ধোঁয়া

ও কুশাশার মিলিয়া চারিদিকে ত্রিশছুর স্বর্গ রচনা করিয়াছে। দূরের বাশের ঝাড়কে চন্দ্রালোকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই। পাশেই একটা মেঠো রাস্তার উপরে একসারি গরুর গাড়ী—হয়ত ঘণ্টা বাজাইয়া চলিয়াছে। শব্দটা শোনা যায় না। একটু দূরের এক গৃহ-অঙ্গনে জীর্ণ-কল্লাবৃত্তা কে একজন খড়ের আলানি দিয়া খাদ্য প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছে। সে আলোকে তাহার দেহ ও খাদ্যসামগ্রী স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

রতিরামের মন এই গাঢ় কুয়াশা ও দূরত্ব উপেক্ষা করিয়া স্বদূর বিকানীর রিয়ারসতে চলিয়া গিয়াছে।

দারুণ এ অর্থনেশা। বছর-দশেক পূর্বে তাহার অর্থ ছিল না সত্য, কিন্তু তৃপ্তি ছিল। মনিবের চাকরি করিত, সারাদিন কাজ করিয়া রাত্রি দশটায় ঘরে ফিরিয়া আসিত; জীর আদরে সমস্ত দিবসের ক্লাস্তি মুছিয়া যাইত। ছেলে-পিলে ছোট ছোট—কেহ পায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইত, কেহ কোলে উঠিতে চেষ্টা পাইত। দিবসের শত-শত্ৰু চিন্তা যেন তাহার একটি নিমেষেই অস্তর্হিত হইয়া যাইত।

আর আজ? কোথায় সে, আর কোথায় তাহার সেই স্নেহের ধনগুলি? অর্থের মোহ তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে; এই চারি বৎসরের মধ্যে অল্প কোনও চিন্তা তাহার মাথায় আসে নাই। ভাবিতে গেলেই মাথায় গোল পাকাইয়া উঠে, ‘ব্যাজ’ ‘ফাটকা’ ‘শাকুরা’, ‘রকম’। অর্থ কিছু হইয়াছে সত্য, কিন্তু শাস্তি কি সে পাইয়াছে?

এই চারি বৎসরের মধ্যে এক মুহূর্তও সেই সুখের দিনগুলির কথা মনে হয় নাই। একবারও ভাল করিয়া ছেলে, মেয়ে বা তাহাদের মায়ের কথা সে মনে করে নাই। দিন গিয়াছে, রাত্রি আসিয়াছে—সে করিয়াছে পাটের হিসাব—সে স্বপ্ন দেখিয়াছে বাজারের খারদ-বিক্রীর ইতিহাস। মাসের শেষে জীর নামে টাকা পাঠাইয়াছে—কুপনে খরচের হিসাব লিখিয়া জীরকে বার-বার হিসাবী হইবার জন্য সাবধান করিয়াছে;—মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর। সেটা একটা একঘেয়ে ইতিহাস মাত্র।

একবার তাহার জ্বর হইয়াছিল। ম্যালেরিয়া—ভুগিয়াছিল সে আট দিন। রোগশয্যা পড়িয়া বহুবার তাহার জীর কথা মনে হইয়াছিল। মাথার ব্যথায় অস্থির

হইয়া মনে হইত, কেহ যদি মাথাটা একটু টিপিয়া দিত। কিন্তু একটা জরুরি খবর ছিল; ভাল করিয়া সারিয়া উঠিতে না-উঠিতেই তাহাকে বাহিরে যাইতে হয়। হাঁ, লাভ হইয়াছিল বটে—তিনশো টাকা। এ-সব দুর্ভাগ্য থাকিলে কি কাজকারবার চলে?

রতিরাম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

দীর্ঘনিঃশ্বাসটি বোধ হয় একটু জোরেই পড়িয়াছিল। বাঙালী সহযাত্রীটি একটু চমকিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, ভূমিকম্পের খবর শুনিয়া হয়ত বেচারী একটু ঘাবড়াইয়া গিয়া থাকিবে—হাজার হউক মানুষের মন ত। বলিলেন—আপনার কোনো ভয় নাই, আপনাদের দেশে ত কিছু হয় নাই।

রতিরাম ভূমিকম্পের কথা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল। বলিল, নেহি—ডর কোই নেই আছে।

ভূমিকম্প তাহাকে চঞ্চল করে নাই—করিয়াছিল দুইটি প্রসারিত ক্ষুদ্র স্বপ্নের স্বপ্ন। কিন্তু রতিরাম স্বপ্ন দেখিলেও বেশীকণ দেখে না—স্বপ্নের মূল্য তাহার কাছে নাই; থাকিলে কি আর কাজকারবার চলে?

ঘুরিয়া বসিয়া সে প্রশ্ন করিল—ও কেতাব মে কেয়া লেখা আছে বাবুজী?

ভদ্রলোক তখন একখানা মোটা বই পড়িতেছিলেন। বলিলেন—এটা কবিতার বই।

রতিরাম তাহার স্বভাবস্বলভ উচ্চারণে বলিল—ক্যা?
—কবিতার বই, রামায়ণ পড়িয়াছেন? রামায়ণের মত।

—পড়েনছে ক্যা হোতা হায়?

—কি আর হইবে? দিলু আচ্ছা লাগে।

রতিরাম বলিল—হঁ। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, ইস্কা কিম্বৎ কতো আছে?

—তিন টাকা।

—বুটমুট—ফজুল। আপনি তো বড়া লিখাপড়াওয়াল। আদমি আছেন। আপনি কেৎনা রুপেয়াকা আলেম নিয়াছেন?

ভদ্রলোক হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন—লেখাপড়া কি আর টাকার দরে মাপা যায়?

—কেন হোবে না? বি-এ পাস হোনেছে—চৌদ্দ বরষ; পড়তা মাহিনা বিশো রুপেয়া করকে—সাড়ে তিন হাজার!

ভদ্রলোক আবার হাসিলেন।

রতিরাম দমিল না। বলিল—আপ কেৎনা কামাতা এক মাহিনামে?

ভদ্রলোক বলিলেন, তিনি এখন প্রায় বেকার। অর্থোপার্জন এখন পর্য্যন্তও বিশেষ কিছু ঘটয়া উঠে নাই।

রতিরাম আবার গোঁফে আরামসূচক তা দিয়া লইল। বলিল, আমার আলেম তো দেড় রুপেয়াকা—চার মাহিনা পাঠশালমে গয়া—ব্যস খতম। মাড়োয়ারীকা লেড়কা—মাহিনামে শো রুপেয়া তো কামাতেই হোবে।

এ-দৃশ্যের যবনিকা পড়িল। পরের ষ্টেশনে ভদ্রলোক কেতাব-হস্তে নামিয়া গেলেন। রতিরাম তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া একটা আত্মস্তরিতার নিঃশ্বাস ফেলিল। ভারি ত বাবু, কেতাবে কি লেখা থাকিবে? দিল্ আচ্ছা লাগে? খাইতে জোটে না দিল্ আচ্ছা করিয়া কি হইবে? স্বপ্ন দেখিলে চলে না—স্বপ্ন দুর্বলতা মাত্র। তাহার মোহে পড়িলে রতিরামকে এতদিন পথে বসিতে হইত। সে সাধনায় বসিয়াছে—বিল্ ত আছেই। তাহাতে ভুলিলে আর সিদ্ধিলাভ ঘটিবে না। ষাউক না দেশ উৎসন্ন,—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মহামারী, জলপ্রাবন, ভূমিকম্প—সকলে মিলিয়া চারিদিক হইতে জগতকে গ্রাস করুক না—কি আসে যায়? শুধু পাটের বাজারে হরুজা না পৌঁছিলেই হয়।

তথাপি মাঝে মাঝে মনটা যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। দূরাস্তের স্বপ্নের মত চোখের সম্মুখে দুইটি ক্ষুদ্র নিটোল শিশুহস্ত আসিয়া দেখা দেয়, কি গভীর সে আহ্বান—কি শক্তিমান তাহার আকর্ষণ, রতিরামকেও কখনও কখনও অশ্রুমনস্ক করিয়া তোলে!

যথারীতি বিলম্ব করিয়া রাত্রি সাড়ে নয়টার সময়ে গাড়ী বুলাকিনগর পৌঁছিল। শীতাত্মক রাত্রি সহসা ষ্টেশনের হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকিতে যেন প্রাণবান হইয়া উঠিল। রতিরাম তাহার বিছানার পুঁটলি-হস্তে নামিয়া আসিল।

বদরগঞ্জ যাইবার জন্ত গরুর গাড়ী এখানে সর্বদাই মিলে সত্য, কিন্তু এত রাত্রি পর্য্যন্ত আর কোনো গাড়োয়ান বসিয়া

নাই। রতিরাম জানিত, পাশেই সব গাড়োয়ানদের বাড়ি—সে হাঁকাহাঁকি আরম্ভ করিল।

গাড়ীর জোগাড় হইয়াছে। চেনা গাড়োয়ান ভেকারামের গাড়ী, কিন্তু ভেকারামের জ্বর আসিয়াছে—যাইবে তাহার ষোল বৎসরের পুত্র বিষণ। রতিরাম প্রস্তুত হইল।

নিশ্চিন্তি রাত্রি! চারিদিকে নিস্তরতা—সেই অখণ্ড নিস্তরতা ভঙ্গ করিয়া একটা অব্যক্ত শব্দ করিতে করিতে গাড়ী চলিয়াছে। দুই পাশে কৃষকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর। চন্দ্র চলিয়া পড়িয়াছে। বাঁশের ঝাড়ের ফাঁক দিয়া চন্দ্রের সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন মুক্তি দেখা যাইতেছে। কোথাও ঘরের পার্শ্বে দুই-একটি কুকুর এদিক হইতে ওদিকে যাতায়াত করিতেছে। পথের পার্শ্বে ঝোপ, তাহার ওধারে শস্যক্ষেত্র; কি শস্য বুঝা যায় না।

রতিরামের কেমন ভয়-ভয় করিতে লাগিল। সঙ্গে কিছু টাকা আছে; মাইলখানেক ত বস্তির মধ্য দিয়া চলিতে পারা যাইবে, তারপরই ত মাঠ—প্রায় দেড় মাইল বাপী। তারপর মেচি নদী, তারও ওপারে বদরগঞ্জ। রতিরাম ভাবিল, ভাগিয়া থাকিতে হইবে।

গাড়ী চলিয়াছে। বিষণ মাঝে মাঝে গরুর ল্যাজ নাড়িয়া দিয়া তাহার সহিত যে পশুটির অত্যন্ত নিকট-সম্বন্ধ আছে তাহা ভাষায় প্রকাশ করিয়া জানাইতেছে। আর মাঝে মাঝে দুই-একটা গানের পদ অস্পষ্ট ভাষায় আবৃত্তি করিতেছে।

রতিরাম কথা কহিল। বলিল, কি রে বিষণা তোর সাদি হইয়াছে?

বিষণ বলিল—না, মহাজন। সকল মাড়োয়ারীকেই তাহারা মহাজন বলিয়া কথা বলে।

—তব্ রুপেয়াছে কেয়া কোরবি?

বিষণ বলিল—সে টাকা পাইলে বাপকে একটা কঞ্চল কিনিয়া দিবে; বেচারী শীতে বড় কাঁপে। আর বাকি কিছু থাকিলে তাহার ছোট ভাই ‘মনিয়া’র জন্ত একটা ছোট আরশি কিনিয়া দিবে—যেমনটি সে-বার সে বদরগঞ্জের মেলায় দেখিয়া আসিয়াছে।

রতিরামের মনে পড়িল, তাহার ছোটছেলেটি একবার একখানা ছোট আরশি কিনিবার জন্ত জেদ ধরিয়াছিল। সে

কিনিতে দেয় নাই; বলিয়াছিল, ফজুল। এ সবেয় দরকার নাই। আজ আবার তাহার কথা মনে পড়িল, সকল ছোট ছেলেরই কি আরশি কিনিবার সখ হয়? ভাবিল, শীতের রাতে বিষণ চলিয়াছে; গাড়ী আট আনায় ঠিক হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভালয় ভালয় পৌছিতে পারিলে সে তাহাকে আরও দু-পয়সা বকশিস্ দিবে—ভাবিতে ভাবিতে রতীরাম উদার হইয়া উঠিল।

মনটা আবার একফাঁকে বিকানীর রিয়ারসতে চলিয়া গিয়াছে। এমনই করিয়াই কি চলিবে? চলিবে বইকি? তাহার চোখের সম্মুখেই ত ঘনশ্যামদাস দশ বৎসরের মধ্যে লাখো রুপের উপার্জন করিয়া ফেলিয়াছে—একটা ধর্মশালাও করিয়া দিয়াছে। গভর্ণমেণ্টের খেতাব পাইয়াছে রায়-বাহাদুর। লক্ষী মতলব করিলে কি না হয়? তাহারও কি হইবে না? আসিবে—তাহারও আসিবে—সবই ভাগের খেলা। নসিবে থাকিলে লাগিয়া যাইবে; শুধু ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে হয়।

আর কতদিন? নসিব একবার খুলিয়া গেলেই রতীরাম একদম গদীমান হইয়া বসিবে। লোকে বলিবে, রতীরাম পেরিওয়াল লাখপতি। না-হয়, কিছু দানধর্মও করা যাইবে। তাহার কাছে কোথায় তুচ্ছ ছেলেপেলে লইয়া সংসার করা; কুটির পয়সা জুটিলে, শাকচচ্ড়ির পয়সা জোটে না।

ভাবিতে ভাবিতে রতীরামের তন্দ্রা আসিয়া পড়িল। স্বপ্নে সে দেখিতে থাকিল, স্বয়ং লছমীজী তাহাকে দর্শন দিয়াছেন। তিনি তাহাকে বর মাগিতে বলিতেছেন। সে এই বর প্রার্থনা করিতেছে যেন বদরগঞ্জের বাজারে পাট খরিদ করিবার পরই কলিকাতার বাজার-দর মণ-প্রতি তিন টাকা বাড়িয়া যায়।

সহসা তন্দ্রা টুটিয়া আসে। জাগিয়া বসিয়া রতীরাম ভাবিল, সে কি বেফুব। এই সামান্ত বর সে প্রার্থনা করে? ভাবিতে ভাবিতে আবার তন্দ্রা আসিয়া পড়িল।

বস্তি ছাড়িয়া গাড়ী মাঠে পড়িয়াছে। প্রকৃতি যেন শীতান্ত; নিস্তর হইয়া রহিয়াছে। উত্তরের বাতাস মাঝে মাঝে কম্পন আনিয়া দিতেছে—চারিদিকে উন্মুক্ত শস্যক্ষেত্র। রাস্তার পাশে পাশে কোথাও বাঁশের কোথাও আমের ঝাড়;

তাহার মধ্য হইতে কখনও দুই একটা বাতুড় কিচমিচ করিয়া উঠিতেছে—কখনও দুই-একটা শিয়াল পাশ কাটাইয়া খোপের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িতেছে। চন্দ্র ম্লান চোখে নিম্নের কুয়াশার পানে তাকাইয়া বিনয়-বেদনা জানাইতেছে। এই নিস্ততি রাতে শুধু দুইটি শীতান্ত ভাষাহীন প্রাণীর বোঝার পরিসমাপ্তি নাই। তাহারা চলিয়াছে—কতদূর যাইতে হইবে জানে না—নিরুদ্দেশে—অসহায়, ক্লান্ত।

ক্রমে গাড়ী নদীর ধারে আসিয়া পড়িল। নদীর নাম 'মেচি'—ব্রিটিশ-ভারত ও নেপালের সীমারেখা। এদিকে বিহার প্রদেশ, অগ্নিদিকে মোরং। 'মেচি' স্বাধীনতা ও পরাধীনতার যোগসূত্র রচনা করিয়া গড়াইয়া চলিয়াছে।

শীতের পাহাড়ী নদী; স্থানে স্থানে শুষ্ক শ্রোতাবেগবিক্ষিপ্ত—জল তাহার হিমশীতল। গাড়ী কতদূর তাহার শুষ্ক বক্ষদেশের পাশ দিয়া চলিল। সিক্ত বালুকা; জলের বক্ষ ঈষৎ আন্দোলিত হইলে যে-আকার ধারণ করে বালুর বক্ষও সেই আকার ধারণ করিয়া আছে। কোথাও অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে আধপ্রতিফলিত বালুকণা চিক্ চিক্ করিয়া উঠিতেছে। ওপাড়ের বন দেখা যাইতেছে—কুয়াশার গাত্রাবাস পরিয়া স্তব্ধ, নিশ্চল। আকাশে তারা অগণ্য, তবে অমাবস্তার আকাশে যত দেখা যায় তত নয়।

বালুতটের পাশ কাটাইয়া গাড়ী নদীর বুকে পড়িল। জল বেশী নয়, কোথাও হাঁটু, কোথাও কোমর। ওপাড়ের কাছ ঘেঁষিয়া শুধু কোমরজল। বালুর বুকের উপর দিয়া তরতর করিয়া জলের শ্রোত চলিয়াছে; হিমশীতল তাহার স্পর্শ; স্পর্শমাত্র অবশ করিয়া আনে। শ্রোত অসম্ভব রকমের। জল অগভীর কিন্তু অত্যন্ত স্বচ্ছ। বালুর বুক পরিষ্কার রূপে দেখা যায়।

চলিতে চলিতে সহসা গরু দুটি দাঁড়াইয়া গেল। বিষণ তাহার সনাতন পন্থা অনুসরণ করিয়া দেখিল তাহার পর ষষ্টির দ্বারা আঘাতের পর আঘাত করিতে লাগিল, কিন্তু তথাপি বলদবৃগল একান্ত অনড় অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। অগ্রসর হইবার জন্য তাহারা আপ্রাণ চেষ্টা করিল সত্য, কিন্তু তাহাতে কোনো ফলোদয় হইল না।

বিষণ জলে নামিয়া পড়িল। হিমশীতল জলের স্পর্শ তাহাকে অবশ করিয়া ফেলিল তথাপি হাতড়াইয়া দেখিল,

সর্বনাশ উপস্থিত। বলদঘরের পা ক্রমশঃ বালুতে ডুবিয়া যাইতেছে—গাড়ীর চাকা ক্রমশঃ বসিয়া যাইতেছে। জল সেখানে বেশী নয়, মাত্র হাঁটুর উপরে কিন্তু যেরূপ দ্রুত গতিতে গাড়ী ও বলদ বসিয়া যাইতেছে তাহাতে কিছুক্ষণ একরূপ ভাবে থাকিলে যে উভয়েরই একেবারে বালুকা-সমাধি হইয়া যাইবে তাহাতে আর কোনো সন্দেহ নাই। চাহিয়া দেখিল, সে 'লিক্' ভুলিয়া ভুলপথে জলের বুকে নামিয়াছে। বিষণ প্রমাদ গণিল।

সে চোঁচাইয়া উঠিল,—মহাজন, ও মহাজন। রতিরাম স্বপ্ন দেখিতেছিল। সহসা বিষণের চীৎকারে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়াই তাহার সমস্ত কথাটা মনে পড়িয়া গেল। মনে পড়িয়া গেল, সে রাত্রিকালে একক রওনা হইয়াছে আর সঙ্গে আছে চুই শত টাকা বিছানার বাগুলে বাঁধা। সঙ্গে সঙ্গে বাগুলে তাহার হাত পড়িল তাহার মনে কোনো সন্দেহই হইল না যে সত্য সত্যই সে এবার ডাকাতের হাতে পড়িয়াছে।

তড়াক করিয়া উঠিয়া বিছানার বাগুল বগলে লইয়া সে জলে নামিয়া দৌড়াইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু নামিবার পর আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না। রতিরাম ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। একে শীতের নিদারুণ বাতাস, তাহার উপর এহেন অবস্থা; রতিরাম কাঁপিতেছিল। বিষণ প্রায় কাছে আসিয়া বলিল—এ কি মহাজন তুমিও কি ধ্বসনায় পড়িয়া গেলে নাকি ?

রতিরাম আকুল হইয়াছিল বটে, কিন্তু বুদ্ধি একেবারে হারায় নাই। ধ্বসনায় পড়ার অর্থ সে জানিত, এখনও তাহার যথেষ্ট বোধগম্য হইল। এই সর্বগ্রাসী পাহাড়ী নদীর বালুকা-সমাধির কথা তাহার অবদিত ছিল না—ক্ষুধিত বালুকা, চিরন্তন ছলশ্রোতে তাহার তৃষ্ণা মিটে না—রক্তের তৃষ্ণা তাহার অপরিসীম, অনন্ত।

রতিরাম কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল—বাবা বিষণ, সব কুছ দে দেয়গা—রক্ষা করো বাবা।

বিষণ অধিস্থি জানিত। বলিল—দাঁড়াও মহাজন, দেখি কি করা যায়।

রতিরামের পায়ের চারিদিকে ক্রমশঃ বালু জমিয়া উঠিতেছে; অসহ্য শৈত্যে পায়ের চেতনা একেবারে লুপ্ত

হইতে চলিয়াছে। রতিরাম ডুকরিয়া কাঁদিয়া বলিল,—বিষণা, দো হাজার রুপেরা দেগা। অসহ্য শৈত্যে তাহার আসন্ন বিপদকেও ছাপাইয়া উঠিতেছিল।

বিষণ সাহায্য করিল। ব্যাপার বিশেষ কিছু নয়; চুই-চারি মিনিট ধস্তাধস্তির পর রতিরাম বালুকাগর্ভ হইতে মুক্তিলাভ করিল।

বিষণ বলিল—মহাজন, বলদ ধরিয়া টানিয়া তুলিতে হইবে, নহিলে উহাদের মরণ অনিবার্য।

রতিরাম বলিল—সে কি ক'রে হোবে, দু আদমীতে কি হোবে? অণ্ডর আদমী দেখি। বলিয়া সে আস্তে আস্তে এপারের দিকে অগ্রসর হইল।

বিষণ আবার চাকা ধরিয়া রথকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বলদঘুগলের গাত্রে আঘাতের পর আঘাত পড়িতে লাগিল—সহস্র প্রকার ভাষায় সে পশুঘুগলকে উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সমস্তই বৃথা। আর্ন্ত পশুঘুগল একবার করুণ নেত্রে বিষণের দিকে চাহিয়া পরক্ষণেই ওপারের দিকে চাহিতেছিল। শক্তিহীন, শীতর্ন্ত পশু, ভাষাহীন মুখে আপনার অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে দেখিয়া যেন ক্রমশঃ ভীত হইয়া পড়িতেছিল।

এই সংজ্ঞাহীন রজনীর অধঃ নিস্তরতা, এই অনন্ত বিস্তৃত মাঠের অস্পষ্ট চন্দ্রালোকের অবিচ্ছিন্ন রূপ কুয়াশার আবরণ পড়িয়া ক্ষণে ক্ষণে বিষণকে বিহ্বল করিয়া তুলিতেছিল। বিষণ জোর করিয়া ভাবিতেছিল, রতিরাম এই আসিল বলিয়া। ভয় কি ?

বিষণ শুরু হইয়া গিয়াছিল। পশুঘুগলের ভীত, চকিত দৃষ্টি, নিম্নে বরফ-শীতল জলের স্পর্শ, পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ক্রমে তাহার পা অবশ হইয়া আসিতে লাগিল; বালুকাগর্ভ হইতে পা তুলিতে রীতিমত কষ্ট বোধ হইতে লাগিল—সে গাড়ীর উপর বসিল। বসিয়া বলদঘুগলের গায়ে তাহার স্নেহহস্ত বুলাইয়া দিতে লাগিল। ভাষাহীন পশু তাহাদের আসন্ন বিপদের কথা বুঝিতে পারিয়াছে; আর্ন্তদৃষ্টিতে নিম্নত মালিকের দিকে চাহিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে—বিষণ কাঁদিয়া ফেলিল। ক্রমশঃ গাড়ী আরও নীচে ধসিয়া গেল; বলদঘরের পৃষ্ঠদেশ পর্যন্ত আসিয়া প্রায় জল ছুঁইল, শীতর্ন্ত পশুর কম্পন লাগিয়া

গেল। বিষণ ভাবিতে লাগিল, লোকজন লইয়া রতিরাম এখনও আসিয়া পড়িল না, নিশ্চয় শীঘ্র আসিবে।

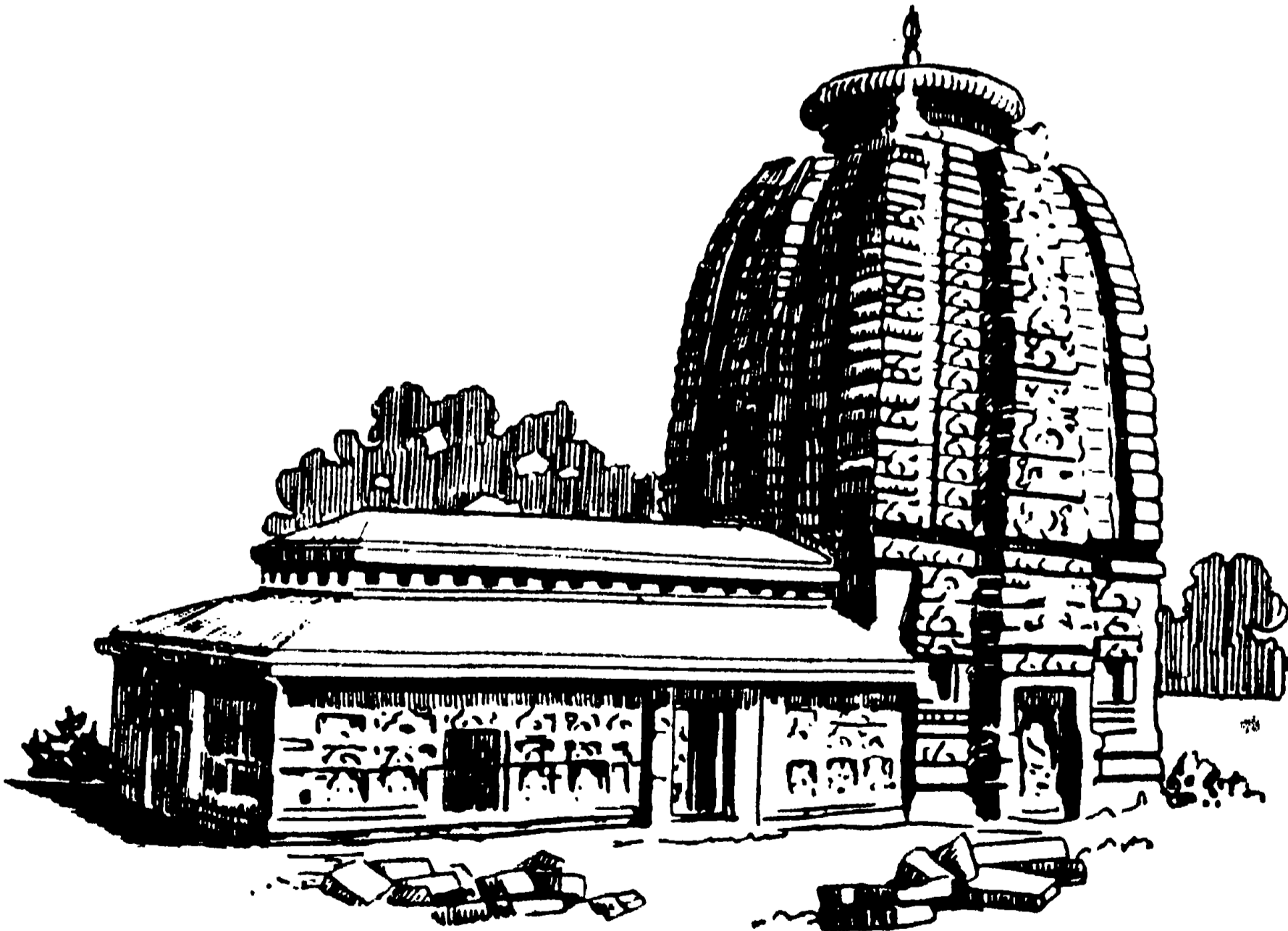
রতিরাম তীরে উঠিয়া একটা বিড়ি ধরাইল। ভাবিল, ভারি ত বলদ—বিশ রূপেয়াতে তিন জোড়া মিলে—তাহার জন্ত কি দুই শত টাকা ফেলিয়া দৌড়াইয়া যাওয়া যায়? দৌড়াইয়া গেলে লোকজন সংগ্রহ করিয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসা যায় বটে, কিন্তু টাকাটা কোথায় রাখা যায়—খুচরা টাকা ও পয়সা; বাণ্ডুলটা আধ মণ ভারি হইয়াছে যে! আশ্বে আশ্বে যাওয়াই ভাল—আর এত রাতে লোকজনই বা কোথায়?

অর্ধ মণ ভার বহিয়া রতিরাম যখন ধীরে ধীরে পল্লীর দিকে চলিতেছিল তখন মেচির গর্ভের বালুকারাশি ভেদ করিয়া দুইটি আর্ন্ত পশু ক্রমশঃ অনন্তের পথে অগ্রসর হইতেছিল। গাড়ীর উপর আর বসা যায় না—বিষণ গাড়ী ছাড়িয়া রতিরামের পথ চাহিয়া জলে দাঁড়াইয়া! বলদ দুটি মাত্র নাক জাগাইয়া রহিয়াছে—এখনও আসিতে পারিলে হয়!

বিষণ শুক হইয়াই ছিল, এখন নিশ্চল নিম্পন্দ হইয়া গিয়াছে—কখনও বলদের দিকে, কখনও রতিরামের পথের দিকে চাহিতেছে। মেচির শ্রোত বহিয়া চলিয়াছে—খরধার, শব্দ নাই, স্পর্শ তাহার হিমশীতল। স্বচ্ছ জলের মধ্য দিয়া সর্বগ্রাসী বালুকা দেখা যাইতেছে। চন্দ্র ডুবিয়া যাইতেছে; এ-পারের ক্ষেত ও ও-পারের বন যেন সমস্ত একাকার হইয়া আসিতেছে।

ক্রমে আরও নীচে—আর্ন্ত পশু এবার উর্দ্ধনেত্রে আকাশমুখী হইয়া রহিয়াছে। বিষণ রতিরামের পথ চাহিয়া; হঠাৎ দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল, চতুর্থীর চন্দ্র কখন লাল হইয়া একটা একচক্ষু বিরাট দৈত্যের মত দেখা দিয়াছে—এ-পারের একটা পত্রহীন বৃক্ষ যেন খলখল করিয়া হাসিতেছে, ও-পারের বন যেন ক্রকুটি করিয়া বিশ্বকে গিলিতে আসিতেছে।

বিষণ আবার চন্দ্রের দিকে চাহিল; একচক্ষু দানব তাহার সর্বগ্রাসী চিরক্ষুধিত রক্তবর্ণ চক্ষু মেলিয়া যেন নিম্নের আর্ন্ত পশুদ্বয়কে গ্রাস করিতেছে—সমস্ত জলটা রাঙিয়া গিয়াছে। এমন কুৎসিত ও বীভৎস দৃশ্য সে জীবনে দেখে নাই!



শব্দপ্রসঙ্গ

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

আমাদের দেশের প্রাচীন শব্দশাস্ত্রের তুলনা নাই। তথাপি উহার রচনার পর বর্তমান কাল পর্যন্ত দেশ-বিদেশে যে-সব আলোচনা হইয়াছে তদনুসারে আমাদের প্রাচীন শব্দ নির্মাচন-পদ্ধতির সংস্কার যে নিতান্ত আবশ্যিক হইয়াছে, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। পরবর্ত্তী কয় পঙ্ক্তিতে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব।

আমাদের বৈয়াকরণদের মধ্যে যদি কোনো অতি বিচক্ষণকেও জিজ্ঞাসা করা যায় যে, √দৃ শ্ ধাতুর বর্ত্তমান কালে প্রথম পুরুষের এক বচনে রূপ কি, তবে তিনি সঙ্কে-সঙ্কেই উত্তর দিবেন প শ্চ তি। কিন্তু ইহা কি সঙ্গত উত্তর? √দৃ শ্ ধাতুর দকার-স্থানে পকার কিরূপে হইল? সহস্র নৈরুক্ত সমবেত হইলেও ইহার উত্তর দিতে পারিবেন না। এখানে প শ্চ তি বস্তুত √দৃ শ্ ধাতুর রূপ নহে, ইহা দর্শন অর্থেই প্রযুক্ত √স্প শ্ ধাতুর রূপ। ইহা হইতেই স্প ষ্ঠ, স্প শ ('চর'), ও প স্প শা ('ব্যাকরণ মহাভাষ্যের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আঙ্কিকের নাম') এই তিনটি শব্দ লৌকিক সংস্কৃতে দেখা যায়। প স্প শে, প স্প শান, ইত্যাদি বহু রূপ বৈদিক সংস্কৃতে পাওয়া যায়। উল্লিখিত কতকগুলি রূপে স্প শ্ ধাতুর সকার লোপের কারণ বাহুল্য-ভয়ে এখানে আলোচনা করিলাম না। তুলনীয়—স্পৃ ধ্ ধাতু হইতে প স্প ধে।

√স্থা ধাতু হইতে তি ষ্ঠ তি, ভ্রা ধাতু হইতে জি ভ্র তি, √পা ধাতু হইতে পি ব তি। কিন্তু কিরূপে এই সব হইল? ব্যাকরণে বলা হইয়াছে √স্থা-প্রভৃতির স্থানে তি ষ্ঠ্ প্রভৃতি আদেশ হয়। ইহা ঠিক উত্তর নহে। কিরূপে ইহা হইল তাহা ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ইহার উত্তর খুবই সোজা, তথাপি সমগ্র পাণিনি পড়িলেও ছাত্রেরা সাধারণত বলিতে পারিবেন না যে, √স্থা প্রভৃতির অভ্যাস বা দ্বিত্ব হওয়ায় ঐরূপ পদ হইয়াছে। তুলনীয়—√স্থা হইতে সনস্তে তি ষ্ঠা স তি, √ভ্রা হইতে জি ভ্রা স তি, ইত্যাদি।

এই পদ্ধতিতেই √জ ক্, √জা গ্, √দ রি ত্রা, √চ কা স্ এই কয়টি মূল ধাতু নহে, কিন্তু যথাক্রমে √ঘ স্, √গ্, √দ্রা, ও √কা স্ এই কয়টি ধাতুর অভ্যাস রূপ।

√বৃ ধ্, √ঝ ধ্, ও √এ ধ্ এই তিনটি ধাতু পরস্পর ভিন্ন বলিয়া ব্যাকরণে গৃহীত হইলেও বস্তুত একই √বৃ ধ্ ধাতু √ঝ ধ্ ও √এ ধ্ এই দুই আকার ধারণ করিয়াছে। বর্ণোতি ও উর্ণোতি একই বৃ ধাতুর রূপ। বৃ ষ ভ শব্দেরই রূপান্তর ঝ ষ ভ।

শাব্দিকেরা আমাদেরকে পড়াইয়া থাকেন, অ প র শব্দ স্থানে প শ্চ আদেশ হয়, তাহার পর আ ৎ (আ তি) প্রত্যয় করিয়া প শ্চা ৎ হয়। কিন্তু প শ্চা ঙ্গ হয় কিরূপে? তাঁহারা বলেন, প শ্চা ৎ স্থানে প শ্চ আদেশ, প শ্চ+অ ঙ্গ = প শ্চা ঙ্গ। এত কষ্টকল্পনা নিরর্থক। বস্তুত প শ্চ ইহাই একটি মূল শব্দ, ইহারই পঞ্চমীর এক বচনে প শ্চা ৎ। ইহাকে অব্যয় বলিয়া গণ্য করিবার উপযুক্ত কারণ নাই। বৈদিক ভাষায় এই প শ্চ হইতেই তৃতীয়ার এক বচনে প শ্চা হয়। প শ্চ হইতেই অতিশয়ন অর্থে প্রযুক্ত ম-প্রত্যয়ের যোগে প শ্চিম, প শ্চা ৎ হইতে ইহা হয় নাই। অতএব “অগ্রপশ্চাড্ ডিমচ্” এইরূপ সূত্র নিশ্চয়মুজেন।

বৃ হ্ স্প তি শব্দ প্রসিদ্ধ। শাব্দিকেরা বলেন, বৃ হ্ ৎ শব্দের ত কারের লোপে ও সকারের আগমে বৃ হ্ ৎ-প তি হইতে ইহা হইয়াছে। কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। ব্র হ্ ঙ স্প তি, বা চ স্প তি, দি ব স্প তি, ইত্যাদি স্থানে যেমন যথাক্রমে ব্র হ্ ঙ : (স), বা চ : (স), দি ব : (স), ইত্যাদি ষষ্ঠ্যন্ত পদ, প্রকৃত স্থলেও সেইরূপ বৃ হ্ : (স) হইতেছে বৃ হ্ শব্দের ষষ্ঠ্যন্ত পদ, তাহার পর প তি শব্দ থাকায় বৃ হ্ স্প তি।

বৈদিক ভাষায় চ নি শ্চ দ ৎ ইত্যাদি ক্রিয়াপদ, এবং পুর শ্চ দ্, স্ শ্চ দ্, বি ষ্ শ্চ দ্, ইত্যাদি শব্দ পাওয়া

যায়। এইরূপ হ্রি শ্চ দ্র শব্দ বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতে আছে। এই সমস্ত পদই মূল √শ্চ ন্ হইতে উৎপন্ন। ইহারই শকার-লোপে পরে √চ ন্ হইয়াছে। কিন্তু বৈয়াকরণেরা হ্রি চ দ্র হইতে হ্রি শ্চ দ্র হইয়াছে বলিয়া উভয় শব্দের মধ্যে শকার-আগমের বিধান করিয়াছেন। ইহা করিবার আবশ্যিকতা ছিল না। মূলতঃ শ্চ দ্র হইতেই আমাদের চ দ্র হইয়াছে।

প্রসঙ্গত একটা কথা এখানে আলোচনা করা যাইতে পারে। চ দ্র মাঃ (চ দ্র ম স্) ও চ দ্র পর্যায় শব্দ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু বস্তুতঃ ইহাদের অর্থে কিছু ভেদ আছে। চ দ্র শব্দের যৌগিক বা আক্ষরিক অর্থ 'উজ্জল', 'দীপ্তিমান'; কারণ শ্চ ন্ অথবা চ ন্ ধাতুর অর্থ 'দীপ্তি পাওয়া'। উহার 'আহ্লাদিত করা' অর্থ গৌণ। মাঃ (ম স্) শব্দের অর্থ 'চন্দ্র, চাঁদ'। পূর্বে চন্দ্রের প্রত্যক্ষ উদয়াস্ত দেখিয়া কাল মাপা হইত বলিয়া উহার নাম হইয়াছিল মাঃ (ম স্, √ম স্ অথবা √মা ধাতু হইতে), অতএব চ দ্র মাঃ শব্দের পূর্বে মূল অর্থ ছিল 'উজ্জল চ দ্র'। পরে বিশেষণবাচক শব্দের অর্থটি লুপ্ত হওয়ায় কেবল 'চাঁদ' মাত্র বুঝাইতে ঐ শব্দটির প্রয়োগ হইয়াছে। মাঃ অর্থাৎ চন্দ্রের সহিত সম্বন্ধ থাকায় চৈত্রাদি মাসকে মা স বলা হয়।

শাস্ত্রিকেরা তদ্ধিত প্রত্যয়-প্রকরণে বলিয়াছেন যে, ই ষ্ঠ প্রভৃতি প্রত্যয়ের যোগে প্র শ স্য স্থানে শ্র, বৃ হ্ম স্থানে জা, ষ্ণ ব ন্ ও অ ঙ্গ স্থানে ক ন, স্থ ল স্থানে স্থ ব, দূ র স্থানে দ ব, ইত্যাদি আদেশ হইয়া থাকে, এবং এইরূপে যথাক্রমে এই সমস্ত পদ হয় :— শ্রে ষ্ঠ, জ্যে ষ্ঠ, ক নি ষ্ঠ, স্থ বি ষ্ঠ, দ বি ষ্ঠ, ইত্যাদি। কিন্তু কিরূপে ইহা সম্ভব হয়? কি প্রকারে প্র শ স্য প্রভৃতির স্থানে শ্র-প্রভৃতি হইতে পারে? বস্তুতঃ ই ষ্ঠ প্রভৃতি তদ্ধিত প্রত্যয় নহে, ক্রুৎ প্রত্যয়; আর শ্র-প্রভৃতিও প্র শ স্য-প্রভৃতি হইতে নহে, √শ্রি-প্রভৃতি ধাতু হইতেই ঐ সমস্ত পদ হইয়াছে। √শ্রি হইতে শ্রে ষ্ঠ, √জ্যা হইতে জ্যে ষ্ঠ, √ক ন্ (যাহা হইতে ক ন্) ক নি ষ্ঠ, √স্থ (যাহা হইতে স্থ ল, স্থ বি র) হইতে স্থ বি ষ্ঠ, √দূ ধাতু (যাহা হইতে দূ র, দূ ত) হইতে দ বি ষ্ঠ; ইত্যাদি।

উ চ্চ ও নী চ শব্দ সুপ্রসিদ্ধ। ইহাদের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হইয়া থাকে "উচ্চম্ উচ্চিনোতেঃ, 'অন্যোভ্যোঃ পীতি' (পাণিনি, ৩. ২. ১০১) অ প্রত্যয়ঃ", অর্থাৎ উৎ উপসর্গ পূর্বক √চি ধাতুর উত্তর অ প্রত্যয়ের যোগে উ. চ্চ শব্দ হইয়াছে। আর নী চ শব্দের নির্বচন দেখান হইয়াছে— "নিকৃষ্টাম্ ক্রং লক্ষ্মীং চিনোতি;" অর্থাৎ যে নিকৃষ্ট লক্ষ্মীকে সঞ্চয় করে সে নী চ। ইহার ব্যুৎপত্তি নি (= নিকৃষ্ট) + দ্র (= লক্ষ্মী) + চি + অ। এই নির্বচন অতিকষ্টকল্পিত। এইরূপ কত শত আছে বলিয়া শেষ করা যায় না। উগাদি প্রত্যয়ের মধ্যে প্রদর্শিত ব্যুৎপত্তিসমূহের অনেকগুলি এইরূপ অত্যন্ত কষ্টকল্পিত। পালিতেও এইরূপ নির্বচন অত্যন্ত বেশী। যাহাই হউক, আলোচ্য শব্দ দুইটি কিরূপে হইয়াছে আমরা আলোচনা করিয়া দেখি। সংস্কৃতে অ ব চ শব্দ আছে, যেমন উ চ্চা ব চ শব্দের মধ্যে। অ ব চ ও নী চ অর্থতঃ একই। অ ব অর্থাৎ অধোদিকে যাহা গমন করে (√অ চ্ অথবা √অ ঙ্ ধাতু)^১ তাহা অ ব চ। অ চ্ ধাতুর আকারের লোপ হওয়ায় (কেন লোপ হইয়াছে পরে একটু বলিতে চেষ্টা করিব) অ বা চ না হইয়া অ ব চ। 'দক্ষিণ দিক' অর্থে অ বা চ্, ও অ বা চী শব্দও আছে। যেমন অ ব উপসর্গ-পূর্বক অ চ্ ধাতু হইতে অ ব চ, ঠিক তেমনি উৎ উপসর্গ-পূর্বক √অ চ্ ধাতু প্রথমে উ দ চ (স্মরণীয় উ দ চ্, উ দী চী 'উত্তর দিক'), তাহার পর অ চ্ ধাতুর আকারের লোপ হওয়ায় উ চ্চ। ইহার আক্ষরিক অর্থ 'যাহা উপরের দিকে যায়।' সংস্কৃত উ চ্চা ব চ শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'উচ্চ-নীচ', গৌণভাবে 'বিবিধ' অর্থে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

যেমন অ ব-পূর্বক √অ চ্ ধাতু হইতে অ ব চ, সেইরূপ নি-পূর্বক √অ চ্ হইতে নী চ। স্মরণীয় ন্য ক্। নি + অ চ্ হইতে অকারের লোপে নি চ ইহাই হইবার কথা, মনে হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা না হইয়া নী চ ইহাই হইবে। কারণ মূলতঃ নি অ চ্ এখানে তিনটি অক্ষর (syllable) থাকে। তিনটি অক্ষরে তিনটি মাত্রা। এখন অকারের লোপ হইলে

১। "উচ্চৈষ্মগ্যত্র বা 'অর্শাদিভ্যোচ্'" (পা. ৫. ২. ১২৭। ইহাও চমৎকার!

২। অর্থাৎ অধো বা অধস্তীতি অ ব চ ম্।

মধ্যের একটি মাত্রা কমিয়া যায়, কিন্তু ভাষার প্রকৃতি (genius) ঐ মাত্রাটিকে যে-কোনোরূপে হউক বজায় রাখিতে চাহে। তাই আলোচ্য স্থলে নি উপসর্গের ইকারকে দীর্ঘ করিয়া অর্থাৎ নি-কে নী করিয়া দিয়া তাহা রক্ষা করা হইয়াছে; নি অ এখানে দুই মাত্রা ছিল, নী এখানেও সেই দুই মাত্রা থাকিল। উ দ চ হইতে উ চ হইয়াছে বলিয়াছি। উ দ চ শব্দেও মূলত তিন অক্ষরে তিন মাত্রা ছিল, পরে অকারটা লোপ হওয়ায় একটি মাত্রারও লোপ হইল, পদটি হইয়া গেল উ চ। এখানে পরে সংযুক্ত বর্ণ থাকায়, পূর্ববর্তী উকারে প্রথমে মূলত এক মাত্রা থাকিলেও এখন গুরু বলিয়া তাহাতে দুই মাত্রা হইয়া গেল, এবং মোটের উপর মধ্যের দুই মাত্রা রক্ষিত হইল। মাত্রাকে ঠিক রাখিতে হইয়াছে বলিয়াই দি+অ প হইতে দ্বী প, প্র তি+অ প হইতে প্র তী প, অ নু+অ প হইতে অ নু প, ইত্যাদি অনেক; সর্বত্রই ব্রহ্ম হইয়াছে দীর্ঘ।

পূর্বনির্দিষ্ট অকারের লোপ সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলি। √ অ স্ হইতে অ স্তি, স্তঃ, স স্তি এই সব পদ হয়। এখানে দেখা যাইতেছে প্রথম পদটিতে ধাতুর অকার আছে, কিন্তু শেষের দুইটিতে ইহা নাই। কেন এরূপ হয়, ইহার কারণ কি? ইহাই কারণ যে, উদাত্ত ও অনুদাত্ত এই দুই স্বরের মধ্যে উদাত্ত অনুদাত্ত হইতে প্রবল। বহু স্থলেই প্রবল দুর্বলকে পরাভব করিয়া থাকে, ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। প্রবল স্বরও এইরূপ দুর্বল স্বরকে পরাভব করে। পরাভূত স্বর টিকিতে না পারিয়া তিরোহিত হইয়া যায়। আলোচ্য স্থলে অ স্-তি এই পদে ধাতুর স্বর অর্থাৎ অ সে র অকার উদাত্ত, আর প্রত্যয়ের স্বর অর্থাৎ তি, ইহার ইকার অনুদাত্ত। ধাতুস্বর অকার উদাত্ত এবং এই জগুই প্রবল হওয়ায় ইহা ঠিক রহিয়াছে, লুপ্ত হয় নাই। কিন্তু স্তঃ ও স স্তি এই দুই পদে প্রত্যয়ের অর্থাৎ ত স্ ইহার অকার, ও অ স্তি ইহারও অকার উদাত্ত, এই জগু ইহারাই প্রবল। ইহারাই প্রবল হওয়ায় অনুদাত্ত ধাতুস্বর অর্থাৎ অ সে র অকার দুর্বল, এবং এই দৌর্বল্য হেতু তাহা তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট সকারটি উপাস্তর না থাকায় প্রত্যয়-স্বরকে আশ্রয় করিয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, সাধারণত একটি পদে একটিমাত্র স্বর উদাত্ত হয়। এই √ অ স্ ধাতুর উত্তর অৎ (শত্) প্রত্যয়ে সৎ

পদ হয়। এখানেও প্রত্যয়-স্বর অর্থাৎ অ তে র অকার উদাত্ত, তাই ইহাই প্রবল, এবং ধাতু-স্বর অ সে র অকার অনুদাত্ত, এবং তজ্জগু দুর্বল, দৌর্বল্য হেতু পরাভূত হইয়া ইহা লুপ্ত হইয়াছে।

√ হ ন্ হইতে হ স্তি। এই পদে ধাতুর অর্থাৎ হ নে র অকার উদাত্ত, তাই ইহা ঠিক আছে। কিন্তু উহারই অপূর্ণ রূপ (প্রথম পুরুষ, বহু বচনে) হ স্তি। এখানে প্রত্যয়-স্বর অ স্তি র অকার উদাত্ত, তাই তাহা প্রবল বলিয়া ঠিক আছে, কিন্তু ধাতুস্বর হ নে র অকার অনুদাত্ত বলিয়া দুর্বল হওয়ায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। হ ন্ ধাতুর পূর্বরূপ ছিল ঘ ন্, প্রথম পুরুষের বহু বচনে সেই জগুই হ স্তি না দেখিয়া আমরা হ স্তি দেখিতে পাই। হ ন্ ধাতু হইতে জ ঘা ন প্রভৃতি হওয়ারও ইহাই কারণ। এই সব পদে হ নে র পূর্ব রূপ দেখা যাইতেছে। পরে ঘ স্থানে হ হইয়াছে।

√ চিৎ হইতে চে ত তি পদ হয়, কিন্তু √ তু দ্ হইতে হয় তু দ তি, তো দ তি নহে। ইহার একমাত্র ইহাই কারণ যে, ভূদিগণীয় ধাতুর এইরূপ স্থলে ধাতুস্বর উদাত্ত এবং তজ্জগুই তাহার গুণ হয়; আর তুদিগণীয় ধাতুর বিকরণ স্বর উদাত্ত হয়, এবং সেই জগুই ধাতুস্বরের গুণ হইবার কারণ থাকে না। তুদিগণের বিকরণ স্বর হইতেছে অকার (তু দ্ - অ—তি, এখানে অকার বিকরণ)। অকারের গুণ হয় না। উদাত্তাদি স্বর হেতু রূপভেদ থাকাতাই ভূ দি ও তু দা দি নামে দুইটি গণ করিতে হইয়াছে।

√ ব চ্ ধাতু হইতে ব চ স্ ও উ ক্ত এই দুই পদই আমরা পাই, কিন্তু একটিতে বকার ঠিকই আছে, অপূর্ণটিতে তাহা উকাররূপে পরিণত হইয়াছে। এখানেও সেই একই কারণ, ব চ্—অ স্ এখানে ধাতুস্বর ব চে র অকার উদাত্ত, তাই তাহার প্রাবল্য হেতু বকার অবিকৃত ভাবেই আছে। কিন্তু ব চ্—ত=উ ক্ত, এখানে প্রত্যয়-স্বর তকারের অকার উদাত্ত, এবং তজ্জগু প্রবল, আর ধাতুস্বর ব চে র অকার অনুদাত্ত বলিয়া দুর্বল, তাহাতেই তদাশ্রিত বকার বিকৃত হইয়া উকার হইয়া পড়িয়াছে।

দে বী শব্দের প্রথমার এক বচনে দে বী, ইহার অন্ত্য স্বরটি উ দাত্ত, তাই তাহা ঠিকই আছে। কিন্তু সম্বোধনের এক বচনের রূপ দে বি, শেষের স্বর দীর্ঘ না থাকিয়া ব্রহ্ম

হইয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ, সম্বোধনে শব্দটির প্রথম স্বর, এখানে একার, উদাত্ত হয়, শেষের স্বরটি হয় অমুদাত্ত। তাই প্রথম স্বরটি অবিকল থাকে, কিন্তু শেষের স্বরটি বিকল হইয়া, হ্রস্ব হইয়া পড়ে।

সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত মধুরতর। অমুভবই ইহার পরম প্রমাণ। রাজশেখর বলিয়াছেন, সংস্কৃতবন্ধ কঠোর, প্রাকৃত-বন্ধ স্কুমার; পুরুষ ও মহিলার মধ্যে যে ভেদ, সংস্কৃত ও প্রাকৃতেও মধ্যে সেই ভেদ। বাকপতি বলিয়াছেন, নব-নব অর্থের দর্শন, আর সন্নিবেশশিশির বন্ধনসম্পদ এই সব সৃষ্টিকাল হইতে নিবিড়ভাবে প্রাকৃতেই পাওয়া যায়। তা যাহাই হউক, এই জগুই যে সংস্কৃত-অমুশীলনকারীকে প্রাকৃত আলোচনা করিতে হইবে তাহা এখানে বলা হইতেছে না। ইহাও বলা হইতেছে না যে, বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য আলোচনার জগু পালি-প্রাকৃত পড়িতে হইবে। পালি-প্রাকৃত না জানিলে সংস্কৃতে প্রযুক্ত অনেক কথারই অর্থ পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় না। এবং সেই জগু অনেক স্থানে বিকৃত বা ভুল অর্থ করিয়া ফেলা হয়। সেই জগু উহা আলোচনা করা আবশ্যিক। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাউক :-

পূর্বে প শব্দ শব্দের কথা তুলিয়াছি। উহাই লইয়া আর একটু আলোচনা করি। 'লেজ' অর্থে পু চ্ছ শব্দ বৈদিক ভাষাতেও চলিত আছে। ইহার ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনে পণ্ডিতগণকে ব্যাকুল হইতে দেখা যায়। কিন্তু একটু প্রাকৃতেও জ্ঞান থাকিলে সহজেই বুঝা যায় যে, ইহা প্রাকৃতেও ধ্বনিতত্ত্ব-অমুসারে প শব্দ হইতে হইয়াছে। সংস্কৃত প শি ম প্রাকৃতে বা ভাষায় প চ্ছি ম। এখানে শ্চ যেমন চ্ছ হইয়াছে, আলোচ্য স্থলেও সেইরূপ বৃষ্টিতে হইবে। বলা হইয়াছে—

“পুচ্ছঃ পশ্চাৎপ্রদেশঃ স্মাল্ লাজুলে পুচ্ছমিচ্ছতে।”

অর্থাৎ পুংলিঙ্গে পু চ্ছ শব্দের অর্থ 'পশ্চাৎ প্রদেশ,' আর ক্রীবলিঙ্গে তাহার অর্থ 'লেজ'। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, পু চ্ছ শব্দের অর্থ প্রথমে 'পশ্চাৎ প্রদেশ' হইল, পরে পশ্চাৎ প্রদেশে স্থিত 'লেজ' অর্থ হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, প শব্দ শব্দের পকারে অকার, কিন্তু পু চ্ছ শব্দের পকারে উকার, কিরূপে ইহা হইতে পারে? ইহার উত্তর এইরূপে দিতে পারা যায়। আলোচ্য স্থলে পকার ওষ্ঠ্য

বলিয়া তৎসংলগ্ন স্বর কণ্ঠ্য হইলেও ওষ্ঠ্যরূপে পরিণত হইয়াছে, অর্থাৎ পকারের প্রভাবে অকার উকার হইয়াছে। যেমন √ শ্ব ধাতু হইতে শ্ব শ্বা, √ পৃ ধাতু হইতে পৃ ণ; এখানে মকার ও পকার ওষ্ঠ্য বলিয়া ঋকার বা ঌকারের স্থানে ওষ্ঠ্য স্বর উকার বা উকার হইয়াছে। আবার কৃ ধাতু হইতে চি কী ষা, এখানে চকার তালব্য বলিয়া তৎসংলগ্ন ঋকার তালব্য স্বর অর্থাৎ ইকার হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, পূর্ববর্তী ধ্বনি যেমন কখনো কখনো পরবর্তী ধ্বনিকে প্রভাবিত করে, সেইরূপ পরবর্তীও ধ্বনি কখনো কখনো পূর্ববর্তী ধ্বনিকে প্রভাবিত করে।

'শিখণ্ড' অর্থে সংস্কৃতে পি চ্ছ শব্দের প্রয়োগ আছে। কিন্তু বস্তুত ইহা সংস্কৃত নহে, প্রাকৃত। ইহা প কৃ শব্দ হইতে হইয়াছে। সংস্কৃতেও প্রাকৃতে তিন আকারে দেখা যায়; (১) খ (অথবা কৃথ), যথা, সং. ভ কৃ ণ, প্রা. ভ কৃ ণ; (২) ছ (অথবা চ্ছ), যথা, সং. কৃ ণি, প্রা. কৃ চ্ছি; (৩) ঝ (অথবা জ্ঝ), যথা, সং. কৃ ম, প্রা. ঝা ম। এই নিয়মে প কৃ শব্দের প্রাকৃতে দুইটি রূপ দেখা যায়, প চ্ছ ও প কৃ ঝ। প চ্ছ হইতে পি চ্ছ। পরবর্তী চ্ছ তালব্য হওয়ায় তাহার পূর্ববর্তী অকার কণ্ঠ্য হইলেও তালব্য ইকারের রূপে পরিণত হইয়াছে। আবার পি চ্ছ হইতে প্রাকৃতে যা দৃ চ্ছি ক সা হু না সি কী ক র ণে র (Spontaneous Nazalization) নিয়মে (পরে দেখুন) পি ং চ্ছ (অথবা পি ঙ্গ) শব্দও হইয়া থাকে। আর প কৃ ঝ হইতে পূর্বোক্ত নিয়মে পু ং ঝ অথবা পু ঙ্গ হয় এবং ইহাও সংস্কৃতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা (রঘুবংশ, ২.৩১)—

“সক্তাজুলিঃ সায়ক পু ঙ্গ এষ

চিত্তার্পিতারস্ত ইবাব ত স্বে।”

ইত্যাদি অনেক। ইহা হইতে ভা গ ব তে ও বাঙ্ লায় সাধারণত প্রচলিত পু ঙ্গা হু পু ঙ্গ শব্দের অর্থ বস্তুত কি তাহা বুঝা যাইবে। উক্ত সংস্কৃত বাক্যটিতে প্রযুক্ত 'সায়ক-পু ঙ্গ' শব্দটির অর্থ বাণের নীচের দিকে বা মূলে বাধা পাখীর পালক। একটি পালকের পর আর একটি পালক, তাহার পর আর একটি পালক, এইরূপে যেমন পালকগুলি বাধা হয়, তেমনি একটির পর একটি, তাহার পর আর একটি এইরূপ ধারাবাহিক ভাবে কোনো বস্তুর বিভিন্ন অবস্থাকে অমুসরণ

করিয়া বিচার করাকে আমরা পুঙ্খা হু পুঙ্খ রূপে বিচার করা বলি।

পূর্বে যা দৃচ্ছিক সাহু না সিকী করণের কথা উল্লেখ করিয়াছি। ভাষার প্রকৃতি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সংযুক্ত বর্ণ-স্থলে যদি পূর্বের বর্ণটির লোপ হয় তবে বহু স্থলে ঐ লুপ্ত বর্ণের পূর্ববর্তী স্বরটি সাহুনাসিক হইয়া যায়। কেন হয় ইহা বলা শক্ত। এই সাহুনাসিক করাকেই যা দৃচ্ছিক সাহু না সিকী করণ বলা হয়। সং. অ ক্খি, প্রা. অ ক্খি। এখানে ককারের লোপ ও তাহার পূর্ববর্তী অকার (যাহা নিজের গুরুমাত্রাকে অব্যাহত রাখিবার জন্ত আকার হইয়া যায় তাহা) সাহুনাসিক হওয়ায় বাংলায় অ ক্খি হইতে আঁখি হইয়াছে। এই নিয়মেই মূল লক্ষণ হইতে প্রা. লচ্চণ, ইহা হইতে লাঙ্কন। কিন্তু ইহা সংস্কৃতে খুবই চলে; যেমন, মৃগ লাঙ্কন 'চন্দ্র'। এইরূপ মার্জন হইতে মঙ্কন, এবং তাহা হইতে মঞ্জন। কবিরাজ মহাশয়দের দস্ত মঞ্জনের মঞ্জন সংস্কৃত নহে। এইরূপেই ক্রমশ সং. গর্জন > প্রা. গঞ্জন; সং. কর্তক > প্রা. কটক; ইত্যাদি অনেক, অনেক।

সংস্কৃতে বিকট শব্দের প্রয়োগ ঋগ্বেদ হইতেই দেখা যায়। কিন্তু ইহা একেবারে খাটি সংস্কৃত নহে। মূল বিকৃত হইতে প্রাকৃতের প্রভাবে বিকট এই শব্দ হইয়াছে। এখানে ঋকার মূর্ছন্য বলিয়া তাহার সংসর্গ ও প্রভাবে দন্ত্য তকার মূর্ছন্য টকারে পরিণত হইয়াছে। ঋগ্বেদে বিকৃত ও বিকট এই দুই পদই পাওয়া যায়। পরবর্তী শাক্তিকেরা বিকট পদের যথার্থ সমাধান করিতে না পারায় এবং স কট, উৎকট ইত্যাদি বহু পদ দেখিয়া স্বতন্ত্র √কট্ ধাতু কল্পনা করিয়াছেন। এইরূপেই বস্তুত মূল সংস্কৃত ভূত (√ভূ+ত) হইতে ভট, আর বস্তুত উদ্ভূত হইতেছে উদ্ভট। উদ্ভূত শব্দের অর্থ 'উদ্ধৃত' (√ভূ ধাতুর অর্থ 'ধারণ' ও 'পোষণ', এখানে 'ধারণ')। তাই উদ্ভট কবিতার আসল অর্থ 'উদ্ধৃত (quoted) কবিতা' ব্যাকরণে √ভট নামে একটি স্বতন্ত্র ধাতু কল্পিত হইয়াছে।

√পত্ ধাতুই তকার স্থানে টকার হওয়ায় পট্ আকার ধারণ করিয়াছে। উৎপাতয়তি আর উৎপাটয়তি বস্তুত একই।

√পিষ্ + ত হইতে পিষ্ট, প্রা. পিট্ঠ, ইহা হইতে ক্রমশ পীড়। ইহাই নামধাতুরূপে গৃহীত হয়। তাহা হইতে পীড়য়তি, পীড়ক, পীড়িত প্রভৃতি পদ হইয়াছে।

সংস্কৃতে মনোরথ শব্দ খুবই প্রচলিত। কিন্তু ইহার ব্যুৎপত্তি কি? শাক্তিকেরা বলিবেন "মন এব রথোহত্র। মনোরথ ইব বা।" এখানে যেমন-তেমন করিয়া শব্দ-সম্মিশ্রণটা দেখান হইয়াছে, যথাভূত অর্থের দিকে কোনো লক্ষ্য রাখা হয় নাই। মূলত প্রথমে ছিল মনোর্থ (= মনো২র্থ)। ইহার আক্ষরিক অর্থ মনের প্রার্থনীয় বিষয়। যেমন, দর্শন হইতে দর্শন, তর্পণ হইতে তর্পণ, ইত্যাদি স্বরভক্তি হেতু বিপ্রকরণে উৎপন্ন, সেইরূপ মনোর্থ হইতে মনোরথ শব্দও উৎপন্ন হইয়াছে।

গেহ শব্দ সংস্কৃতে আছে, বৈদিক ভাষাতেও ইহার প্রয়োগ আছে। কিন্তু বস্তুত ইহা প্রাকৃত। √গ্রহ (< মূল √গ্রভ্) হইতে গ্রহ > *গ্রেহ > গেহ। ঋকখণ্ডে-কখনো-কখনো রে হইয়া উচ্চারিত হয়। যজুর্বেদের এক শিফার অনুসরণে ক্রমোহসি উচ্চারিত হয় ক্রেমোহসি। পালি-প্রাকৃতেও এইরূপ আছে। এই নিয়মে গ্রহ হয় *গ্রেহ। পরে প্রাকৃতে রফলার লোপ হয় বলিয়া গ্রেহ হইতে গেহ।

সংস্কৃতে কদম্ব, কদর্ধ, কদুষ্ক ইত্যাদি শব্দ আছে। বৈয়াকরণেরা বলিবেন, এই সকল স্থলে কু শব্দ স্থানে কদ্ আদেশ হইয়াছে (পাণিনি ৬. ৩. ১০১)। কিন্তু ইহার কোনো প্রমাণ নাই। এইরূপ কাপুরুষ, কাপথ, ইত্যাদি স্থলে তাঁহাদের মতে কু শব্দ স্থানে কা আদেশ হইয়াছে। কিন্তু ইহাও কল্পনামাত্র।

যেমন যদ্, তদ্, এতদ্, অণুদ্ (তুলনীয় অণুদীয়, ক্লীবলিঙ্গের এক বচনে অণুদ্), মদ্ (তুলনীয় মদীয়), ত্বদ্ (তুলনীয় ত্বদীয়), ভবদ্, ইত্যাদি সর্বনাম দকারান্ত, তেমনি প্রসিদ্ধ কিম্ শব্দেরই অর্থে দকারান্ত কদ্ শব্দ।

'সে কি কথা?' ইহা বলিলে অনেক সময়ে আমরা বুঝি যে, সে কুংসিত বা নিন্দিত কথা। এখানে কি শব্দে (বা সংস্কৃত কিম্ শব্দে) নিন্দা প্রকাশ পায়। বলা বাহুল্য, সংস্কৃতে এরূপ প্রয়োগ অনেক; যেমন, ভারবি লিখিয়াছেন—

“স কিংসখা সাধু ন শান্তি যোহধিপং

হিতাম যঃ সংশৃণুতে স কিংপ্রভুঃ।”

কুংসিত বা নিন্দিত অর্থে প্রযুক্ত এই ক দ্ শব্দের পর অ ম প্রভৃতি শব্দ যোগ করিয়া ক দ ম প্রভৃতি হইয়াছে।

য দ্ + দ্ শ হইতে যা দ্ শ, ত দ্ + দ্ শ হইতে তা দ্ শ, ম দ্ + দ্ শ হইতে মা দ্ শ, ইত্যাদি। এই সমস্ত স্থলে য দ্ প্রভৃতির দকারের লোপে যা প্রভৃতি। সেইরূপ ক দ্ + পু রু য, ক দ্ + প থ, ইত্যাদি স্থলেও দকারের লোপে ক দ্ স্থলে কা হয়, এবং এইরূপে কা পু রু য, কা প থ, ইত্যাদি শব্দ হইয়াছে।

ক দা শব্দ সুপ্রসিদ্ধ। ইহা এই ক দ্ হইতেই তৃতীয়ার এক বচনে হইয়াছে, যেমন ত দ্ হইতে ত দা, য দ্ হইতে য দা, ইত্যাদি।

নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে সংস্কৃতে ক চিৎ শব্দের প্রয়োগ হয়। “কচিৎ কামপ্রবেদনে”। যেমন, কালিদাস মে ঘ দ্ তে লিখিয়াছেন—“কচ্চিদ্ ভর্তুঃ স্মরসি রসিকে,” ‘হে রসিকে, তুমি স্বামীকে স্মরণ করিতেছ তো?’ এই ক চিৎ শব্দও ক দ্ + চিৎ হইতে। কি ম্ শব্দের উত্তর চিৎ ও চ ন প্রত্যয় সুপ্রসিদ্ধ, যেমন, কি ঙ্গিৎ, কি ঙ্গ ন ইত্যাদি।

য দ্, ত দ্ ইত্যাদি সর্কনাম হইতে য স্মৈ, য স্মাৎ, য স্ম, ইত্যাদি, ও ত স্মৈ, ত স্মাৎ, ত স্ম ইত্যাদি পদ হয়। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে য দ্ ও ত দ্ ইহাদের দকারটি লুপ্ত হয়, আর কেবল যথাক্রমে য ও ত অবশিষ্ট থাকে। এইরূপে স্থানে-স্থানে ক দ্ শব্দের দকারের লোপে কেবল মাত্র ক থাকে। এবং এইরূপেই ‘ঈষদ্ উষ্ণ’ অর্থে কো ষ পদ হইয়াছে, ক (<ক দ্) + উষ্ণ। পূর্বের স্মায় এখানেও ক দ্ শব্দ নিন্দা প্রকাশ করে। কো ষ শব্দের মূল অর্থ ‘কুংসিত উষ্ণ’, ‘এটা কি উষ্ণ? অর্থাৎ খারাপ উষ্ণ’। ইহা হইতেই ক্রমশ ‘ঈষদ্ উষ্ণ’ অর্থে উহার প্রয়োগ হইয়াছে।

সংস্কৃতে ই দ ম্ এই রূপটি সাধারণত ক্লীবলিঙ্গে প্রথমার এক বচনে দেখা যায়। অল্পত ইহার মূল রূপ অ; যেমন, অ-স্মৈ, অ-স্মাৎ, অ-স্ম, ইত্যাদি। পূর্বে যেরূপ দকারাস্ত সর্কনামের

কথা বলা হইয়াছে ও আলোচনা করা হইয়াছে তদনুসারে এখানেও স্পষ্টত সর্কনামটি মূলে হইতেছে য দ্ এবং ইহা হইতেই অ। এই অ দ্ হইতেই ধা প্রত্যয়ের যোগে অ দ্বা এই পদটি সংস্কৃতে দেখা যায়। ইহার বহু প্রয়োগ আছে। ইহার মূল অর্থ ‘এই প্রকারে’, পরে ‘নিশ্চিত’ অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে।

সংস্কৃতে দ ত্ত পদ √ দা + ত হইতে, এখানে √ দা ধাতুর দ্বিত্ব হয়, অর্থাৎ দ দ্ + ত হইয়া দ ত্ত হয়। আ উপসর্গ থাকিলে ইহা হইতে যেমন আ দ ত্ত, তেমনি আ ত্ত এই পদও হয়। এইরূপে প্র দ ত্ত, প্র ত্ত; অ ব দ ত্ত, অ ব ত্ত; ইত্যাদি। আ ত্ত, প্র ত্ত, অ ব ত্ত, ইত্যাদি পদ নিষ্পন্ন করিবার জন্ত ব্যাকরণে বলা হয় (পাণিনি, ৭. ৪. ৪৭) যে, √ দা-স্থানে ত হয়। ইহা কিরূপে হয় তাহা বলা হয় নাই। বস্তুত প্র দ ত্ত হইতেই প্রাকৃতের প্রভাবে প্র ত্ত হইয়াছে। প্রাকৃতে পদের মধ্যে দুই স্বরের মধ্যবর্তী ক, গ, চ, জ, ত, দ ইত্যাদির লোপ হয়। পূর্বে ইহা একটু উল্লেখ করিয়াছি। এই নিয়মে প্র দ ত্ত > প্র অ ত্ত > প্র ত্ত। এখানে মধ্যবর্তী অকারের লোপ প্রাকৃতের সন্ধি অনুসারে। অল্প পদগুলিও এইরূপে হইয়াছে। দুই স্বরের মধ্যবর্তী ককারাদির লোপের জন্ত তুলনীয় বৈদিক প্রয়োগ প্র উ গ < প্র যু গ।

সংস্কৃতে আ য় ত্ত শব্দ সকলেরই জানা। ইহা কিরূপে হইল? বৈয়াকরণেরা বলেন আ + √ যৎ + ত হইতে। কিন্তু ইহাতে কোনো প্রকারে শব্দটির সমাধান হয়, তাহার অর্থ হয় কি? উপসর্গের যোগে ধাতুর অর্থ ভিন্ন হইয়া যায়, ইহা এরূপ স্থলে অতিদুর্কল যুক্তি। বস্তুত মূল আ দ ত্ত হইতে প্রাকৃতের প্রভাবে ইহা হইয়াছে; আ দ ত্ত > আ অ ত্ত > আ য় ত্ত। শেষোক্ত পদটিতে যকার হইয়াছে য-শ্রুতি অনুসারে। এ সম্বন্ধে পূর্বেই কিছু বলিয়াছি। এইরূপে আ য় ত্ত শব্দের আক্ষরিক অর্থ ‘গৃহীত’ অর্থাৎ যাহাকে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা হইতেই ক্রমশ তাহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে ‘অধীন’। প রা য় ত্ত বলিতে যে পরের দ্বারা গৃহীত, ‘পরে যেমন চালায় তেমনি চলে’।

৩। দ্রষ্টব্য শান্তি নিকে ত ন প ত্রিকা, দ্বিতীয় বৎসর, প্র বা সী, ১৩৪১, আঘাট (পাণিনি ব্যাকরণ ও সংস্কৃতে প্রাকৃত প্রভা ব)।

পূজারিণী

শ্রীম্বর্ণলতা চৌধুরী

বহু বৎসর পূর্বে, একটি তরুণ জাপানী চিত্রকর পদব্রজে ক্রিয়োটো হাতে ইয়োডো যাইতেছিল। পথটি অতি বন্ধুর, সমস্তটাই পর্বতের উপর দিয়া যাইতে হয়। তখনকার দিনে পথঘাট অধিকাংশই এত বিপৎসঙ্কুল ছিল যে জাপানে একটা প্রবাদের উদ্ভব হইয়াছিল “আতুরে ছেলেকে শিক্ষা দিতে হইলে তাহাকে ভ্রমণে পাঠাও।” কিন্তু পথ যেমনই হউক, দেশটার চেহারা এখনকার মতই ছিল। এখনকার মতই বড় বড় সিডার ও ঝাউগাছের বন ও বাঁশের ঝাড় ছিল, খড়ের ছাউনি দেওয়া ছোট ছোট বাড়ি ছিল, ধানের ক্ষেতে এখনকার মতই খড়ের টুপী পরিয়া কৃষকেরা কাদায় দাঁড়াইয়া কাজ করিত। পথের ধারে বনের মধ্যে, এখনকার মতই বড় বড় বুদ্ধমূর্তির প্রশাস্ত হাসি দেখা যাইত এবং নদীর ঘাটে, উলঙ্গ গ্রাম্য শিশু একইভাবে নৃত্য করিত।

এই চিত্রকরটি কিন্তু আতুরে ছেলে ছিল না, সে ইহারই ভিতর বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছে এবং পথ চলার সব রকম কষ্ট সহ্য করিতেই সে ভাল ভাবে অভ্যস্ত। কিন্তু এইবার ভ্রমণে বাহির হইয়া, এক দিন সন্ধ্যার সময় সে এমন এক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, যেখানে রাত্রে আশ্রয় বা আহার সংগ্রহ করিবার কোনো সম্ভাবনা দেখা গেল না। স্থানটি একেবারে বনভূমি, মনুষ্যের বাসের চিহ্নমাত্র নাই। যুবক বৃষ্টিতে পারিল, পথ সংক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া সে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

সে-দিন আবার কৃষ্ণপঙ্কের রাত্রি, চারিদিকের ঝাউবনের ঘন ছায়া অন্ধকারকে গভীরতর করিয়া তুলিয়াছে। ঝাউবনের ভিতর বাতাসের মর্ম্মরধ্বনি ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যায় না। চিত্রকর শ্রান্তদেহে চলিতে লাগিল, যদি কোনো নদী দেখিতে পায় এই আশায়। তাহার তীর ধরিয়া চলিলে কোন-না-কোন গ্রামে সে পৌঁছিতে পারিবে। পথে একটা নদী সে দেখিল বটে, কিন্তু উহাও

কিছুদূর গিয়া একটা জলপ্রপাতে পরিণত হইয়া খাদের ভিতর নামিয়া যাইতেছে দেখা গেল। যুবক বাধ্য হইয়া আবার ফিরিল। চারিদিক ভাল করিয়া দেখিবার জন্য একটা চূড়ায় আরোহণ করিল, যদি সেখান হইতে মনুষ্যের বাসের কোনো চিহ্ন দেখা যায়। কিন্তু চতুর্দিকে উত্তম পর্বত-শ্রেণী ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইল না।

রাত্রিটা তাহাকে উন্মুক্ত আকাশের তলায়ই কাটাইতে হইবে বলিয়া সে যখন স্থির করিয়াছে, তখন হঠাৎ পাহাড়ের একপাশে, নীচের দিকে তাকাইয়া দেখিল, ক্ষীণ একটি আলোর রেখা দেখা যাইতেছে। বোধ হয় কোনো মনুষ্যের বাসভূমি হইতেই ঐ আলো আসিতেছে, ভাবিয়া যুবক তাড়াতাড়ি সেই দিকটায় নামিতে আরম্ভ করিল এবং কিছুদূর যাইবার পরই ছোট একটি কুটারের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। কুটারের দ্বার রুদ্ধ, কিন্তু কপাটের একটি ফাটলের ভিতর দিয়া ঐ আলোকরশ্মি বাহিরে বিকীর্ণ হইতেছিল। যুবক ধীরে ধীরে দরজায় আঘাত করিল।

প্রথমবার আঘাতের ফলে কোনই উত্তর পাওয়া গেল না। যুবক বাধ্য হইয়া বার বার ডাকিতে লাগিল এবং দরজায় আঘাত করিতে লাগিল। অবশেষে ভিতর হইতে নারীকণ্ঠে কে একজন প্রশ্ন করিল যে আগন্তুক কি চায়। কণ্ঠস্বরটি অতি মধুর এবং যুবক আশ্চর্য হইল এই শুনিয়া যে, নারীটি রাজধানীর শুদ্ধভাষায় কথা বলিতেছে। উত্তরে সে বলিল সে একজন ছাত্র, ইয়োডো যাইতে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। সে রাত্রে কিছু খাদ্য ও নিদ্রা যাইবার একটু স্থান প্রার্থনা করিতেছে। আর এখানে তাহা লাভ করা যদি একেবারেই অসম্ভব হয়, তাহা হইলে নিকটবর্তী কোনো গ্রামের পথ যেন তাহাকে বলিয়া দেওয়া হয়। তাহার সঙ্গে টাকা আছে, সে পথপ্রদর্শককে বেতনও দিতে পারিবে।

ভিতর হইতে নারীটি তাহাকে আরও কতকগুলি প্রশ্ন করিল; এমন স্থানেও যে কোনো পথিক আসিয়া

জুটিতে পারে, তাহাতে মহিলাটি যেন অভ্যস্তই বিস্মিত হইয়াছিল। যুবকের সরল উত্তর শুনিয়া গৃহস্বামিনীর সন্দেহ দূর হইল বোধ হয়, সে বলিল, “আপনি অপেক্ষা করুন, আমি দরজা খুলিতেছি, এই ভীষণ রাত্রে আপনার পক্ষে কোনো গ্রাম খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব। পথও অতিশয় বিপৎসঙ্কুল।”

কিছু পরেই দরজাটা খুলিয়া গেল এবং একটা কাগজের লঠন হাতে করিয়া একটি নারীমূর্তি দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। লঠনটা সে এমন ভাবে উঁচু করিয়া ধরিয়াছিল যাহাতে সব আলোটা যুবকের মুখে পড়ে এবং তাহার নিজের মুখখানা অন্ধকারেই থাকিয়া যায়। নীরবে কয়েক মুহূর্ত চিত্রকরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া রমণী বলিল, “আপনি অপেক্ষা করুন, আমি জল লইয়া আসিতেছি।” সে তৎক্ষণাৎ ঘরের ভিতর হইতে জলের পাত্র ও তোয়ালে লইয়া আসিয়া যুবককে পায়ের ধূলামাটি ধুইয়া ফেলিতে অমুরোধ করিল। যুবক নিজের পায়ের জুতা খুলিয়া পা ধুইল এবং তাহার পর গৃহস্বামিনীর সঙ্গে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। একখানিই মাত্র ঘর, পিছন দিকে শুধু একটি ছোট রান্নাঘর আছে। তরুণী তাহাকে বসিবার জায় আসন পাতিয়া দিল এবং হাত পা গরম করিবার জন্য অগ্নিপাত্র লইয়া আসিল।

চিত্রকর এইবার গৃহস্বামিনীর দিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিল। তাহার আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া যুবক একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল। তরুণী তাহার চেয়ে দুই-চার বৎসরের বড় হইতে পারে, কিন্তু তখনও সে পূর্ণযৌবনা। সে যে কৃষকের কন্যা নয় তাহা তাহার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায়। তরুণী অতি স্নমধুর কণ্ঠে বলিল, “আমি এখন একলাই আছি এবং এখানে অতিথি-অভ্যাগতকে কখনও নিমন্ত্রণ করি না। কিন্তু এই অন্ধকার রাত্রে পথ চলিতে চেষ্টা করিলে আপনি বিপদে পড়িবেন। কিছু দূরে কয়েক ঘর কৃষক বাস করে, কিন্তু কেহ দেখাইয়া না দিলে আপনি কখনও তাহাদের ঘর খুঁজিয়া পাইবেন না। এইখানেই ভোর হওয়া পর্য্যন্ত থাকুন। আপনার হয়ত অসুবিধা হইবে, কিন্তু উপায় নাই। আপনাকে ঘুমাইবার জন্য বিছানা দিতে পারিব এবং খাদ্যও কিছু দিব, কারণ

আপনি নিশ্চয়ই ক্ষুধাও হইয়াছেন। ঘরে চাল এবং সামান্য শাকসব্জী ভিন্ন কিছু নাই, আপনি কিছু মনে করিবেন না।”

যুবকের তখন ক্ষুধায় প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে, যাহা হউক, কিছু পাইলেই সে বাঁচিয়া যায়। তরুণী ভিতরে গিয়া উত্তন জালিয়া, অল্প সময়ের মধ্যে ই ভাত এবং কিছু শাক-সব্জীর তরকারি প্রস্তুত করিয়া আনিল এবং সমস্ত তাহাকে পরিবেশন করিল। যুবক যতক্ষণ আহার করিল, ততক্ষণ সে প্রায় নীরবেই বসিয়া রহিল। যুবকও কয়েকবার প্রশ্ন করিয়া যখন ‘হাঁ’ বা ‘না’ ভিন্ন অন্য কোনো উত্তর পাইল না, তখন অপ্রস্তুত হইয়া চুপ করিয়া গেল।

সে বসিয়া বসিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ঘরখানি পরিষ্কার তক্ তক্ করিতেছে, যে-সকল বাসনে তাহাকে খাইতে দেওয়া হইয়াছিল, সেগুলিও ঝকঝকে। ঘরখানিতে মূল্যবান আসবাব কিছু নাই, কিন্তু যা দুই-একটি সামান্য জিনিষ আছে তাহা দেখিতে অতি সুন্দর। দেওয়ালের গায়ে কাপড়চোপড় রাখিবার ও জিনিষ-পত্র রাখিবার যে আলমারীগুলি রহিয়াছে তাহার সম্মুখের পর্দাগুলি শাদা কাগজ মাত্র দিয়া প্রস্তুত। কিন্তু সেই কাগজের উপর আশ্চর্য্য সুন্দর ভাবে ফুল, পাতা, পর্বত, নদী, আকাশ, তারকা প্রভৃতির ছবি আঁকা। ঘরের এক কোণে একটি নীচু বেদী, তাহার উপর একটি ‘ব্যুৎসুদান’। উহার গালার কাজ করা ছোট দরজা দুটি খোলা, ভিতরে একটি স্মৃতিফলক দেখা যায়, উহার দুই ধারে পুষ্পের অর্ঘ্য এবং সম্মুখে একটি প্রদীপ জলিতেছে। এই বেদীটির উপরের দেওয়ালে একটি অপূর্ণ সুন্দর চিত্র ঝোলান : চিত্রটি দয়াদেবীর, তাহার মাথায় চন্দ্রকলা, মুকুটের মত শোভা পাইতেছে।

যুবকের খাওয়া শেষ হইতেই তরুণী বলিল, “আমি আপনাকে আরামদায়ক শয্যা দিতে পারিব না এবং মশারীটাও কাগজের তৈরি, তবু এই দুইটিই গ্রহণ করিয়া আপনি বিশ্রাম করুন। শয্যাটা আমারই, কিন্তু আজ রাত্রে আমার অনেক কাজ আছে, ঘুমাইবার সময় আমি পাইব না।”

যুবক বুঝিল যে, এই অপূর্ণ সুন্দরী তরুণী কোনো অজ্ঞাত কারণে একাকী এই বনে বাস করিতেছে। সে ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজের শয্যাটি অতিথিকে দান করিতেছে, রাত্রে কাজ থাকার কথাটা ছুতামাত্র। যুবক প্রবল আপত্তি করিয়া

যে তরুণীর এতখানি স্বার্থভাগ করিবার কোনোই প্রয়োজন নাই, তাহাকে মাটিতে বিছানা করিয়া দিলে সে স্বচ্ছন্দে ঘুমাইতে পারিবে, এবং দুই-চারিটা মশায় কামড়াইলে তাহার কিছুই আসিয়া যাইবে না। কিন্তু তরুণী বড় বোনের মত জেদ করিতে লাগিল, যুবককে তাহার কথা শুনিতেই হইবে। তাহার বাস্তবিকই রাত্রে কাজ আছে এবং যথাসম্ভব শীঘ্র সে সে-টি করিবার জন্ত ছুটি চায়। যুবককে অগত্যা হাল ছাড়িয়া দিতে হইল। ঘর মাত্র একখানি। তরুণী বিছানা করিয়া, কাগজের মশারীটি টাঙাইয়া দিল এবং একটি কাঠের বালিশ আনিয়া দিল। তাহার পর পাতলা কাঠের একটি লম্বা দাঁড়-করান পর্দা আনিয়া সে বেদীর সম্মুখে রাখিয়া বেদীটি আড়াল করিয়া দিল। যুবক বুঝিল যে, তরুণী এখন একাকী থাকিতে চায়। অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে শয়ন করিতে যাইতে হইল। তরুণীকে এতখানি কষ্ট দিতে যে সে বাধ্য হইল, ইহাতে তাহার মনটা ভারী হইয়া রহিল।

কিন্তু মন ভারী থাকা সত্ত্বেও খানিক পরে সে ঘুমাইয়া পড়িল, বিছানাটি এমনই আরামদায়ক ছিল। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরে সে হঠাৎ চমকাইয়া জাগিয়া উঠিল। ভারি একটা অদ্ভুত শব্দ হইতেছে। উহা মানুষের পায়েরই শব্দ। একস্থ পায়ে হাঁটিলে যে-রকম শব্দ হয়, সে-রকম নয়। উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া, অত্যন্ত দ্রুততালে কেহ যদি পা ফেলে তাহা হইলে যে-প্রকার শব্দ হয়, ইহাও সেইরূপ। যুবকের ভয় হইল, হয়ত বা ঘরে চোর প্রবেশ করিয়াছে। ভয়টা নিজের জন্ত নয়, কারণ তাহার কাছে এমন কিছুই ছিল না যাহা চোরে চুরি করিতে পারে। কিন্তু দয়াবতী তরুণীর জন্ত তাহার ভয় করিতে লাগিল। কাগজের মশারীটার দুই ধারে দুটুকরা নেট জানালার মত করিয়া বসান, যুবক তাহার ভিতর দিয়া দেখিতে চেষ্টা করিল কিন্তু কাঠের পর্দাটা মাঝে পড়াতে ওপাশে যে কি হইতেছে তাহা সে একেবারেই দেখিতে পাইল না। একবার ভাবিল যে, চাঁৎকার করিয়া উঠিবে, কিন্তু পরে ভাবিয়া দেখিল ব্যাপারটা আসলে কি তাহা না জানিয়া, নিজের উপস্থিতিটা জানাইয়া কোনো লাভ হইবে না। শব্দটা একই ভাবে চলিতেছে ক্রমেই যেন বেশী করিয়া রহস্যময় হইয়া উঠিতেছে। যুবক স্থির করিল

তরুণীকে রক্ষা করিবার চেষ্টা সে করিবেই, তাহাতে প্রাণ যায়, সেও স্বীকার। কাপড়চোপড় আটমা বাঁধিয়া সে ধীরে ধীরে কাগজের মশারীটা তুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কাঠের পর্দার পাশে গিয়া সে উকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। যে-দৃশ্য তাহার চোখে পড়িল, তাহাতে তাহার বিশ্বাসের সীমা রহিল না।

সেই বেদীর সামনে উজ্জল মহার্ঘ বস্ত্রে সজ্জিতা হইয়া তরুণী একাকী নৃত্য করিতেছে। তাহার পোষাকটি মন্দিরের নর্তকীর পোষাক, যদিও এত মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিতে যুবক কোনো নর্তকীকে দেখে নাই। এই সুন্দর সাজে সজ্জিতা হইয়া তাহাকে অলৌকিক সৌন্দর্যশালিনী বলিয়া বোধ হইতেছিল, কিন্তু যুবককে তাহার নৃত্য যেন তাহার রূপ অপেক্ষাও অধিক অভিভূত করিয়া ফেলিল। প্রথম কয়েক মুহূর্ত তাহার মনে একটা ভয়ের ভাব জাগিয়া উঠিল। কে এই যুবতী? ডাকিনী বা কুহকিনী নয় ত? কিন্তু দয়াদেবীর চিত্র, আর যে বৌরূপভাবের সন্মুখে তরুণী নৃত্য করিতেছিল, এই দুইটি জিনিষ যুবকের সন্দেহ দূর করিয়া দিল, এমন কি এরূপ সন্দেহ করার জন্তই তাহার রীতিমত লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। তরুণীর এই নৃত্য কেহ দেখে তাহা যে তাহার অভিপ্রেত ছিল না, তাহাও যুবক বুঝিতে পারিল। সে তরুণীর গৃহে অতিথি, তাহার উচিত এখনই মশারীর ভিতরে ফিরিয়া যাওয়া, কিন্তু সে যেন মত্তমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। যুবক বিশ্বাসের সহিত অমুভব করিতে লাগিল যে, এরূপ অপূর্ব নৃত্য ইতিপূর্বে সে কখনও দেখে নাই। যতই দেখিতে লাগিল, তরুণীর নৃত্যলীলা তাহাকে ততই মোহিত করিয়া ফেলিতে লাগিল। হঠাৎ তরুণী থামিয়া গেল এবং নর্তকীর পরিচ্ছদ উন্মোচন করিবার জন্ত ফিরিতেই যুবককে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত চমকাইয়া উঠিল।

যুবক নিজের ক্রটির জন্ত ক্ষমাভিক্ষা করিতে লাগিল। সে বলিল, পায়ের শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিয়া যাওয়ায় সে ভয় পাইয়া উঠিয়া পড়িয়াছে। ভয় নিজের জন্ত নয়, এই নির্জন বনবাসিনী তরুণীর জন্তই। যাহা সে দেখিয়াছে তাহা যে কি বিশ্বাসকর তাহাও সে বলিতে ভুলিল না। সে বলিল, “আপনি আমার কৌতূহল মার্জন্য করিবেন, কিন্তু আমি জানিতে চাই যে আপনি কে এবং কিরূপে আপনি

এই আশ্চর্য নৃত্যপদ্ধতি শিখিয়েছেন। আমি রাজধানীর সকল বিখ্যাত নটীদেরই দেখিয়েছি, কিন্তু আপনার মত নৃত্য করিতে তাহাদের মধ্যে একজনও পারে না। একবার আপনার দিকে চোখ পড়ার পর, আমি আর চোখ ফিরাইতে পারি নাই।”

প্রথমে তরুণীকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ বোধ হইতেছিল, কিন্তু যুবকের কথা শুনিতে শুনিতে ক্রমে তাহার মুখের ভাব বদলাইয়া গেল। ঈষৎ হাসিয়া সে যুবকের সম্মুখে বসিয়া পড়িল। তাহার পর বলিল, “আমি আপনার উপর রাগ করি নাই। কিন্তু আপনি যে আমার নৃত্য দেখিয়া ফেলিলেন, ইহাতে আমি দুঃখিত। একাকিনী ঐ ভাবে আমাকে নাচিতে দেখিয়া হস্ত আপনি আমাকে পাগল মনে করিয়াছেন, আমাকে এখন নিজের পরিচয় আপনার কাছে দিতেই হইবে।”

তরুণী আপনার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। যুবক কিশোর বয়সে এই যুবতীর নাম শুনিয়াছে বলিয়া এখন তাহার মনে পড়িল। সে তখন রাজধানীর সর্বশ্রেষ্ঠা নর্তকী, তাহার পায়ে রাজার ঐশ্বর্য্য গড়াগড়ি যাইত, তাহার রূপেরও তুলনা ছিল না। কিন্তু হঠাৎ একদিন এই সকলের মায়া কাটাইয়া সে কোথায় যে অদৃশ হইয়া গেল, কেহ আর তাহার সন্ধান পাইল না। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি যুবকও অদৃশ হইল সে তাহার প্রণয়ী। যুবকের ধনসম্পত্তি কিছু ছিল না, তরুণীর যাহা সঙ্গে ছিল তাহাই সম্বল করিয়া তাহারা পর্ব্বতের উপরে পর্ণকুটীরে স্থখে বাস করিতে লাগিল। দু-জনে দু-জনকে ভিন্ন আর কিছু জানিত না। যুবক তরুণীকে সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিত। তাহার নৃত্য দেখাই যুবকের জীবনের সবচেয়ে গভীর আনন্দের বিষয় ছিল। সন্ধ্যা হইলেই সে নিজে কোন একটি প্রিয় সুর বাজাইতে বসিত, আর যুবতী এই সুরের তালে নৃত্য করিত। কিন্তু হঠাৎ শীতকালে অসুস্থ হইয়া পড়িয়া যুবক মারা গেল, তাহার প্রণয়িনীর প্রাণঢালা সেবাও তাহাকে ধরিয়৷ রাখিতে পারিল না। তখন হইতে তাহার স্মৃতি অবলম্বন করিয়া, তাহারই পূজা করিয়া তরুণী বাঁচিয়া আছে। দিনের বেলা তাহার স্মৃতিফলের সম্মুখে সে পুষ্প ও দীপের অর্ঘ্য সাজায়, রাত্রে তাহার সম্মুখে পূর্ব্বের মতই নৃত্য করে। শ্রান্ত অতিথিকে জাগাইয়া দেওয়ার তাহার কোনই ইচ্ছা ছিল না,

সেই জন্ত সে যথাসম্ভব দেরি করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু অতি লঘু ভাবে পদক্ষেপ করাতেও যে যুবক চিত্রকরের ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে, তাহার জন্ত তরুণী ক্ষমাভিক্ষা করিল।

তাহার পর তরুণী চা প্রস্তুত করিয়া আনিল। যুবক তাহার সহিত চা পান করিবার পর, তরুণীর অল্পনয়-বিনয়ে বাধ্য হইয়া আবার শয্যা ফিরিয়া গেল এবং অবিলম্বেই আবার নিদ্রিত হইয়া পড়িল। সকালে উঠিয়া তাহার ক্ষুব্ধবোধ হইতে লাগিল। তরুণীও তাহার জন্ত খাবার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। খাবার রাত্রেই মত অতি সাধারণ। ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও যুবকের পেট ভরিয়া খাইতে সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল, সে ভাবিল হস্ত তরুণী নিজের জন্ত কিছুই রাখে নাই। যাত্রা করিবার সময় সে তরুণীকে আহাৰ্য্যের মূল্যস্বরূপ কিছু অর্থ দিতে গেল, কিন্তু তরুণী কোনমতেই তাহা লইতে সম্মত হইল না। সে বলিল, “আমি আপনাকে যাহা খাইতে দিয়াছি, তাহা এত সামান্য যে, তাহার মূল্য বলিতে কিছু নাই এবং অর্থলোভের আশায় আমি উহা দিই নাই, আতিথ্যধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্তই দিয়াছি। আপনার যাহা অভাব-অসুবিধা হইয়াছে, তাহা ভুলিয়া গিয়া শুধু আমার সেবার আগ্রহটুকু যদি মনে রাখেন তাহা হইলেই আমি ধন হইব।”

অর্থ দিবার জন্য যুবক আর একবার চেষ্টা করিল; কিন্তু বার-বার এ-বিষয়ে জেদ করাতে তরুণী ক্রেশ পাইতেছে দেখিয়া সে নিরস্ত হইল, এবং মুখের কথায় যথাসম্ভব নিজের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, তাহার কাছে বিদায় লইয়া সে আবার পথে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার মন যেন এখানেই আটক পড়িয়াছিল, পা নড়িতে চাহিতেছিল না, কারণ যুবতীর রূপ ও গুণ সত্যই তাহাকে অতিশয় মোহিত করিয়াছিল। তাহাকে কোন্ পথে যাইতে হইবে, তরুণী তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিয়া দিল, এবং যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল দাঁড়াইয়া দেখিল। ঘণ্টাখানেক হাঁটিয়া, যুবক একটি সুপরিচিত পথে আসিয়া পৌঁছিল। তখন হঠাৎ তাহার মনে পড়িল যুবতীকে সে নিজের নামটাও বলিয়া আসে নাই। পরক্ষণেই ভাবিল “বলিয়াই বা কি হইত? চিরকালই হস্ত আমি এইরূপ দরিদ্র থাকিব।”

বহু বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কত নিয়ম-কানুনের পরিবর্তন হইয়াছে, চিত্রকরও এখন বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু শুধু বৃদ্ধই হন নাই, অতিশয় খ্যাতিপ্রাপ্তিও লাভ করিয়াছেন। তাঁহার আশ্চর্য্য অকনকশলতায় মোহিত হইয়া বহু রাজপুরুষ তাঁহাকে যাচিয়া অর্থ-সম্পত্তি দান করিয়াছেন। চিত্রকর এখন ধনী ব্যক্তি, রাজধানীর একটি অতি সুন্দর অটালিকায় তিনি বাস করেন। জাপানের নানা অংশ হইতে দলে দলে তরুণ চিত্রকর আসিয়া তাঁহার কাছে শিক্ষালাভ করিতেছে। তাহারা তাঁহার সঙ্গেই বাস করে, সর্ব বিষয়ে তাহার পরিচর্যা করে। চিত্রকরের নাম দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

একদিন একটি বৃদ্ধা নারী তাঁহার গৃহের সম্মুখে আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিল। ভৃত্যেরা তাহার হীন বেশভূষা এবং দীন ভাব দেখিয়া তাহাকে সাধারণ ভিক্ষুক বলিয়া স্থির করিল এবং অতি কর্কশভাবে তাহাকে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। স্ত্রীলোকটি বলিল, “আমি কেন আসিয়াছি, গৃহ কেবলমাত্র তোমাদের প্রভুর নিকটে বলিতে পারি।” ততগণ ভাবিল স্ত্রীলোকটি পাগল, সুতরাং চিত্রকর এখানে হই, কবে ফিরিবেন জানি না, বলিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিল।

কিন্তু স্ত্রীলোকটি রোজই আসিতে লাগিল, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়া চলিল, তবু তাহার আসার বিরাম নাই। ভৃত্যেরা প্রতিবারেই তাহাকে এক একটা মিথ্যা কথা বলিয়া বিদায় দেয়, “আজ চিত্রকর অস্থস্থ,” বা “আজ তিনি বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।” তবু স্ত্রীলোকটি রোজই আসে, ছেঁড়া কাপড়ে জড়ান একটি পুটলি সর্বদা তাহার সঙ্গে থাকে।

চিত্রকরের পরিচারকগণ অবশেষে ক্লান্ত হইয়া স্থির করিল, প্রভুর কাছে ইহার কথা বলিয়া দেওয়াই ভাল। তাহারা তাঁহার নিকটে গিয়া বলিল, “বাহিরের দরজার সামনে একটি বৃদ্ধা অপেক্ষা করিতেছে, তাহাকে দেখিলে ভিখারিণী বলিয়াই বোধ হয়। সে প্রায় দুই মাস ধরিয়া সমানে আসিতেছে এবং আসিবার কারণ আপনাকে ভিন্ন আর কাহাকেও বলিতে সে অনিচ্ছুক। আমরা তাহাকে পাগল

মনে করিয়া বহুবার ফিরাইয়া দিয়াছি। তবুও সে আসে দেখিয়া এ-কথা আপনাকে জানাইলাম। উহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহা অল্পগ্রহ করিয়া জানাইবেন।”

চিত্রকর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “এ-কথা আমাকে পূর্বে জানাও নাই কেন?” এই বলিয়া তিনি নিজেই বাহির হইয়া গিয়া অতি সদয়ভাবে সেই স্ত্রীলোকটিকে সম্বাষণ করিলেন। তিনি নিজেও যে এককালে অতি দরিদ্র ছিলেন, সে-কথা ভুলিয়া যান নাই। তিনি স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন সে তাঁহার নিকট কি ভিক্ষা চায়।

স্ত্রীলোকটি বলিল, তাহার খাদ্য বা অর্থের কোনো প্রয়োজন নাই, চিত্রকরের নিকট তাহার শুধু এই ভিক্ষা যে, তিনি যেন তাহার জন্ম একটি ছবি আঁকিয়া দেন। চিত্রকর কিছু বিস্মিত হইলেন। যাহা হউক, তিনি স্ত্রীলোকটিকে তাঁহার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে বলিলেন। সে তাঁহার পিছন পিছন আসিল এবং ঘরের ভিতর নতজাতু হইয়া বসিয়া সজ্জের পুটলিটি খুলিতে আরম্ভ করিল। খোলা হইবার পর চিত্রকর দেখিলেন ভিতরে একটি পুরাতন নর্তকীর পোষাক রহিয়াছে, উহা এখন ছিন্ন ও বিবর্ণ বটে, কিন্তু দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এককালে উহা খুবই উজ্জ্বল ও সুন্দর ছিল।

বৃদ্ধা যখন এক-একটি করিয়া পোষাকের অংশগুলি বাহির করিতেছিল, চিত্রকরের মনের ভিতর তখন একটা আন্দোলন চলিতেছিল। কি যেন তিনি মনে করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, অথচ পারিতেছিলেন না। হঠাৎ তাঁহার সব কথা মনে পড়িল। তিনি মানসচক্ষে সেই পর্কতের উপরের ক্ষুদ্র কুটারটি দেখিতে পাইলেন, যেখানে তিনি অতি সাদর অভ্যর্থনা পাইয়াছিলেন। সেই ছোট ঘরখানি, সেই কাগজের মশারী, সেই পূজার বেদী, সেই গভীর রাত্রে তরুণীর একাকী নৃত্য, সকলই তাঁহার মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠিল। তিনি বিস্মিতা বৃদ্ধার সম্মুখে আভূমি নত হইয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, “আপনাকে যে আমি এক মুহূর্তের জন্মও ভুলিয়াছিলাম, আমার সে অপরাধ আপনি ক্ষমা করিবেন। কিন্তু প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল আপনাকে আমাতে দেখা, তাই একরূপ ভুল সম্ভব হইয়াছে। এখন আপনাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিয়াছি। আপনি

নিজের গৃহে আমাকে অতি সাদরে স্থান দিয়াছিলেন, নিজের শয্যাটি পর্যন্ত আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আপনার নৃত্য আমি দেখিয়াছিলাম, আপনার কাহিনীও শুনিয়াছিলাম। আপনার নামটি আমি ভুলি নাই।”

তাঁহার কথায় বৃদ্ধা অতিশয় বিস্মিতা ও সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িল। সে প্রথমে কিছুতেই উত্তর দিতে পারিল না, কারণ বার্ককা ও দুঃখ-দারিদ্র্যের পীড়নে তাহার স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু চিত্রকর সদয়কণ্ঠে আরও অনেক কথা বলাতে, এবং তাহার পূর্ব বাসস্থানের বর্ণনা দেওয়াতে, তাহারও বিগত দিনের সকল কথা মনে পড়িল এবং সে সজল চক্ষে বলিল, “ভগবানই আমাকে পথ দেখাইয়া এখানে আনিয়াছেন। কিন্তু আপনার পবিত্র পদধূলি যখন আমার ক্ষুদ্র কুটারে পড়িয়াছিল, তখন আমি এখনকার মত ছিলাম না। প্রভু বুদ্ধের রূপাতেই কেবল আপনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন।”

তাহার পর সে নিজের দুঃখের কাহিনী বলিতে লাগিল। চিত্রকর চলিয়া যাইবার পর, কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়ে এবং বাধা হইয়া কুটার-খানি বিক্রয় করিয়া, তাহাকে আবার রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতে হয়। রাজধানীতে তাহার নাম পর্যন্ত সকলে ভুলিয়া গিয়াছিল। নিজের কুটারটি ছাড়িয়া আসিতে তাহার মনে অত্যন্তই ব্যথা লাগিয়াছিল, কিন্তু বার্ককা ও দুর্বলতাবশতঃ সে যখন বেদীর সম্মুখে নৃত্য করিবার ক্ষমতাও হারাইয়া বসিল, তখন তাহার আর মনে বেদনার সীমা রহিল না। প্রিয়তমের আত্মার সহিত তাহার যেন, নৃতন করিয়া বিচ্ছেদ ঘটিল। সে এখন নর্তকীর বেশে এবং নৃত্যের ভঙ্গীতে নিজের একটি চিত্র অঙ্কিত করাইতে চায়, উহা সে বেদীর সম্মুখে ঝুলাইয়া রাখিবে। যাহাতে তাহার এই ইচ্ছা পূর্ণ হয়, তাহার জন্ত সে ক্রমাগত প্রার্থনা করিয়াছে। সে সাধারণ কোনো চিত্রকরের নিকট না গিয়া স্বয়ং চিত্রকররাজের নিকট এই কারণেই আসিয়াছে যেন চিত্রটি অতি সুন্দর হয়। নিজের নর্তকীর পোষাকটিও সে লইয়া আসিয়াছে এই আশায় যে, তিনি ইহার সাহায্যে ছবিটি আঁকিতে পারিবেন।

চিত্রকর তাহার কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, “আপনি

যে রূপ চিত্র চান, তাহা আমি অতি আনন্দের সহিতই আঁকিয়া দিব। আজ আমি বাস্তব, একটি কাজ আমাকে অদ্যকার মধ্যে অবশ্যই শেষ করিতে হইবে। কিন্তু কাল যদি আপনি আসেন, আমার সাধ্যমত যত্ন করিয়া আমি ছবিখানা আঁকিয়া দিব।”

স্ত্রীলোকটি বলিল, “কিন্তু একটা প্রয়োজনীয় কথা আপনাকে বলা উচিত, বলিতে আমার অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হইতেছে। আপনার পরিশ্রমের আমি কোনো মূল্য দিতে পারিব না, কারণ এই নর্তকীর পোষাকটি ভিন্ন আমার নিকটে আর কিছু নাই। এইটি মাত্র আপনাকে আমি দিতে পারি। এখন ছিন্ন ও বিবর্ণ, যদিও এককালে উহা অতি মূল্যবান ছিল। তবুও আশা করি, মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এটি গ্রহণ করিবেন, কারণ পুরাণ জিনিষ হিসাবে ইহার একটা মূল্য আছে। আজকালকার নর্তকীরা এই ধরনের পোষাক আর পরে না।”

চিত্রকর বলিলেন, “এ-বিষয়ে আপনার কিছুমাত্র ভাবিবার প্রয়োজন নাই। আপনার ঋণের অল্পমাত্রও যে শোধ করিতে পারিব, ইহাতেই আমি অত্যন্ত স্তুপী। কাল আমি অবশ্যই আপনার চিত্র আঁকিতে আরম্ভ করিব।”

স্ত্রীলোকটি তিন বার তাঁহার সম্মুখে আভূমি প্রণতা হইয়া বলিল, “আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমার আরও কিছু বলিবার আছে। আমাকে এখন যে রূপ দেখিতেছেন এই ভাবেই অঙ্কিত করিবেন, ইহা আমি চাই না। আপনি প্রথম আমাকে যে রূপ দেখিয়াছিলেন, সেই ভাবেই অঙ্কিত করিবেন, ইহাই আমি চাই।”

চিত্রকর বলিলেন, “আমার স্মরণ আছে, আপনি অপূর্ণ সুন্দরী ছিলেন।”

স্ত্রীলোকটি ধন্যবাদ জ্ঞাপনার্থে আর একবার চিত্রকরকে প্রণাম করিল, তাহার পর বলিল, “আমি যাহা কিছু জন্ত প্রার্থনা করিয়াছিলাম, সবই তাহা হইলে হইতে পারিবে। আপনার যখন আমার পূর্বকালের আকৃতি স্মরণ আছে, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সেই ভাবেই অঙ্কিত করিবেন। দয়া করিয়া আমাকে আবার তারুণ্য ও সৌন্দর্য ফিরাইয়া দিবেন, তাহা হইলেই আমি সেই পরলোকবাসী আত্মাকে আনন্দ দিতে পারিব। তাঁহারই জন্ত আমি ইহা ভিক্ষা

করিতেছি। তিনি আপনার অঙ্কিত চিত্র দেখিয়া আমার সকল ক্রটি মার্জনা করিবেন।”

চিত্রকর তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “আপনার কোন চিন্তা নাই, আপনি কাল আসিবেন। আপনাকে তরুণী সুন্দরী নর্তকীরূপেই আমি-চিত্রিত করিব। দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনীর চিত্র আঁকিতে হইলে আমি যতখানি যত্ন সহকারে আঁকি এই চিত্রখানি তাহা অপেক্ষাও যত্নে আঁকিব। আপনি কোনো দ্বিধা না করিয়া কাল আসিবেন।”

বৃদ্ধা তাহার পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শুভ্র কোমল রেশমের উপর চিত্রকর তাহার ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিলেন। চিত্রকরের ছাত্ররা বৃদ্ধার যে মূর্তি দেখিতেছিল, চিত্রে কিন্তু সে মূর্তি ফুটিল না। ছবিতে যাহার আকৃতি, সে পক্ষিণীর মত উজ্জ্বলনয়নী, দেহের গঠন তাহার পল্লবিনী লতার মত, স্বর্ণখচিত পরিচ্ছদে সে অপরীর মত মোহিনী। চিত্রকরের মায়াতুলির স্পর্শে তাহার লুপ্ত রূপযৌবন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। ছবিখানি শেষ হইবার পর চিত্রকর উহাতে নিজের নাম মোহর করিয়া দিলেন এবং পুরু রেশমের উপর ছবিখানিকে বসাইয়া, উপরে ও নীচে সিঁতার কাঠ ও হস্তিদন্ত যুক্ত করিয়া দিলেন। টাঙাইবার জন্য পাকান রেশমের দড়ি লাগাইয়া দিতেও ভুলিলেন না। একটি শাদা কাঠের বাক্স করিয়া ছবিখানি তিনি বৃদ্ধাকে উপহার দিলেন। তাহাকে কিছু অর্থ দিবারও ইচ্ছা তাঁহার ছিল, কিন্তু অনেক অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও বৃদ্ধা অর্থ লইতে সম্মত হইল না। সে সজলচক্ষে কেবলই বলিতে লাগিল, “আপনি বিশ্বাস করুন, অর্থে আমার কিছুই প্রয়োজন নাই। এই ছবিখানির জগুই শুধু এতদিন আমি দেবতার কাছে প্রার্থনা করিয়াছি। আমার প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে, এ-জীবনে আমার আর কোনো কামনা নাই। এইরূপ নিষ্কামচিত্রে আমি যদি মরিতে পারি, তাহা হইলে নির্বাণ লাভ করা আমার পক্ষে সহজ হইবে। শুধু এই ভাবিয়াই আমি দুঃখিত হইতেছি যে, এই ছিন্ন পোষাকটি ভিন্ন আমার আর আপনাকে দিবার কিছুই নাই। আপনি অনুরোধ করিয়া এইটিই গ্রহণ করুন। আপনার ভবিষ্যৎ জীবন যাহাতে নিরবচ্ছিন্ন সুখের হয়, তাহার জগু আমি প্রভুর নিকট

নিত্য প্রার্থনা করিব। আপনি যে দয়া করিলেন, তাহার তুলনা নাই।”

চিত্রকর হাস্ত করিয়া বলিলেন, “আমি কিই বা করিতে পারিয়াছি? কিছুই নয়। তবে এই পোষাকটি গ্রহণ করিলে আপনি যদি তুষ্ট হন, তাহা হইলে আমি উহা গ্রহণ করিতেছি। ইহাতে পূর্বকালের অনেক মধুর স্মৃতি আমার মনে পুনর্বার জাগরুক হইবে। আপনি কোথায় বাস করেন, আমাকে বলুন। তাহা হইলে আমি গিয়া ছবিটি টাঙান হইলে দেখিয়া আসিতে পারি।” চিত্রকরের একথা জিজ্ঞাসা করিবার ভিতর উদ্দেশ্য ছিল, বৃদ্ধার বাসস্থান জানিতে পারিলে তাহাকে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করিতে পারিতেন।

বৃদ্ধা কিন্তু কোনোক্রমেই নিজের বাসস্থানের সন্ধান দিল না। বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সে শুধু বলিল যে, তাহার বাসস্থান অতি দীনহীন। চিত্রকরের গ্রাম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সেখানে পদবুলি দেওয়া উচিত নয়। তাহার পর তাহাকে আরও নানাভাবে ধন্যবাদ দিয়া স্ত্রীলোকটি চিত্রখানি লইয়া চলিয়া গেল।

চিত্রকর নিজের একজন ছাত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, “তুমি উহার অনুসরণ কর, এবং সে কোথায় বাস করে তাহা আমাকে আসিয়া জানাও। তুমি এমনভাবে যাইবে যে, বৃদ্ধা যেন জানিতে না পারে।” ছাত্রটি তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল।

বহুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া সে বলিল, “মহাশয়, আমি ঐ স্ত্রীলোকটির পিছন পিছন যাইতে যাইতে শহর অতিক্রম করিয়া নদীর ধারে উপস্থিত হইলাম। যেখানে অপরাধীদিগকে বধ করা হয়, সেই মশানের নিকট এক অতি ভগ্ন জীর্ণ কুটারে ঐ স্ত্রীলোক বাস করে। স্থানটি অতি জঘন্য, ডাকিনীর বাসস্থান হইবার উপযুক্ত।”

চিত্রকর বলিলেন, “স্থানটি যত জঘন্যই হউক, তুমি কাল আমাকে ঐ স্থানে লইয়া যাইবে, কারণ আমি বাঁচিয়া থাকিতে ঐ স্ত্রীলোকটির অন্ন-বস্ত্রের অভাব যাহাতে না ঘটে তাহা আমাকে দেখিতে হইবে।”

সকলে বিস্মিত হইতেছে দেখিয়া চিত্রকর সেই তরুণী

নর্তকীর কাহিনী বিবৃত করিলেন। তখন সকলেই বুঝিল যে, তাঁহার আচরণ কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

তাঁহার পর দিন সূর্যোদয়ের কিছু পূর্বে, চিত্রকর ও তাঁহার ছাত্র নগর ছাড়িয়া সেই নদীর ধারের ভয়াবহ স্থানটিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহা সমাজত্যাগিতদিগের বাসভূমি।

কুটারের দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া, তাঁহারা বারকয়েক দরজার উপর টোকা মারিয়া সঙ্কেত করিলেন। কোনো সাড়া না পাইয়া দরজা ঠেলিতেই ভিতর হইতে উহা খুলিয়া গেল। তাঁহারা ভিতরে প্রবেশ করাই স্থির করিলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার মনে বহুদিন পূর্বেকার কুটার-প্রবেশের দৃশ্যটি অতি উজ্জ্বলভাবে ভাসিয়া উঠিল।

ভিতরে ঢুকিয়া তিনি দেখিলেন বৃদ্ধার জীর্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত দেহ মাটির উপর পড়িয়া আছে। কাঠের একটা তাকের উপর তাঁহার পূর্বদৃষ্ট 'ব্যংসুদান'টি বিরাজ করিতেছে, তাহার ভিতর সেই স্মৃতিফলকটি এখনও বিদ্যমান।

তখনকার মত এখনও সেটির সম্মুখে প্রদীপ জলিতেছে। কিন্তু দয়াদেবীর ছবিটি আর নাই, তাহার পরিবর্তে তাঁহার অঙ্কিত নর্তকীর চিত্রটি দেওয়ালের গায়ে টাঙান। ঘরখানির ভিতর আর বিশেষ কিছু নাই, শুধু একটি সন্ন্যাসিনীর পরিচ্ছদ, দণ্ড ও ভিক্ষাপাত্র।

চিত্রকর দুই-তিন বার নর্তকীর নাম ধরিয়া ডাকিলেন, কিন্তু কোনো সাড়া পাইলেন না।

হঠাৎ তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, বৃদ্ধা বাঁচিয়া নাই। তাহার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া তাঁহার বোধ হইল, বৃদ্ধার মুখে যেন পূর্বেকর সৌন্দর্য্য ও তাকগোর আভাস ফিরিয়া আসিয়াছে, মুখে জরার ও দারিদ্র্যের বলিরেখাগুলি অনেকটাই যেন মুছিয়া গিয়াছে। তাঁহার অপেক্ষাও মহান কোনো চিত্রকরের তুলির গুণে ইহা ঘটিয়াছে বুঝিয়া তিনি সসন্ত্রমে মস্তক নত করিলেন।*

* লাক্কাডিও হান্ হইতে।



অমিতাভ বুদ্ধ
শিল্পী—শ্রীআণ্ড বানার্জী

ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালী

অধ্যাপক শ্রীদেবব্রত চক্রবর্তী, এম্-এ

১

প্রধানতঃ উদরার্নের সংস্থানের জন্ম বাঙালী বহু পূর্বে হইতেই জন্মভূমির শ্রামল ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া দেশ-দেশান্তরে গমন করিয়া আসিতেছেন। বর্তমান কালে পশ্চিমে বেলুচিস্তান, পূর্বে ব্রহ্মদেশ, উত্তরে কাশ্মীর এবং দক্ষিণে ত্রিবাকুড়, এই সীমানার মধ্যে প্রায় সকল স্থানেই বাঙালী দেখিতে পাওয়া যায়। সংখ্যার ন্যূনাধিকাই একমাত্র পার্থক্য। বঙ্গদেশ হইতে গিয়া পশ্চিমোত্তর ভারতে যাহারা অবস্থান করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে নানারূপ সংবাদাদি সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তন্মিহ্ন, স্বাস্থ্যলাভ, তীর্থদর্শন প্রভৃতি ব্যপদেশে প্রতিবৎসর বহুসংখ্যক বাঙালী এ-সকল প্রদেশে গমনাগমন করিয়া থাকেন। এই কারণে ঐ সকল স্থানের বাঙালীদের সম্বন্ধে জ্ঞান বঙ্গদেশবাসী বাঙালীদের ভালই আছে। কিন্তু বঙ্গোপসাগরের অপর প্রান্তস্থিত বিস্তৃত ভূখণ্ডে যে কত বঙ্গসন্তান গমন করিয়াছেন, তাহার সঠিক সংবাদ কয় জন রাখিয়া থাকেন? অথচ ব্রহ্মদেশ-বাসী বাঙালীদের সম্বন্ধে এত বিষয় জানিবার আছে যে, তাহা স্বদেশে অবস্থান করিয়া সহজে কেহ অনুমান করিতে পারেন না।

প্রধানতঃ চাকুরী লইয়াই শিক্ষিত ভদ্রসন্তানগণ ঐ প্রদেশে গমন করিয়াছেন। কিন্তু অ-শিক্ষিত অথবা অল্পশিক্ষিত বহু বাঙালী (হিন্দু ও মুসলমান)ও যে অর্থোপার্জন করিবার জন্ম গমন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যে ঐ দেশেই ভূমির অধিকারী হইয়া স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতেছেন, এ-সকল বিষয় অনেকেই অবগত নহেন। ব্রহ্মদেশে বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানগণ যে কত বিভিন্ন রূপ কার্যদ্বারা অর্থোপার্জন করিতেছেন, তাহা সম্যক্রূপে অবগত হইলে সকলেই বিস্মিত হইবেন। প্রত্যুত বঙ্গদেশের বাহিরে অত্র যে-সকল স্থানে বাঙালী গমন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে আর কোন একস্থানে এত অধিকসংখ্যক বাঙালী

এত অধিক প্রকারের কার্যদ্বারা জীবিকা অর্জন করিতেছেন বলিয়া জানা নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ-সম্বন্ধে এ যাবৎ বিস্তারিত ও সুশৃঙ্খলভাবে কোন আলোচনা হয় নাই। মধ্য মধ্য মাসিক পত্রিকাদিতে দুই-একজন ভ্রমণকারীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা আদৌ যথেষ্ট নহে অথচ এখন হইতেই যদি বিশেষ ভাবে তথ্য সংগ্রহ ও তাহা রক্ষা করার চেষ্টা না হয়, তবে বঙ্গের বাহিরে বাঙালীদের কর্মপ্রচেষ্টার ইতিহাস সম্পূর্ণ হইবে না। এই কার্য কোন এক জনের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। তবে এইটুকুমাত্র ভরসা, যে, বিংশতি বর্ষের অধিক কাল ব্রহ্মদেশে বাস করিয়া যে-সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা দ্বারা কার্য আরম্ভ করিলে আরও অনেকে উৎসাহান্বিত হইয়া কার্যে অগ্রসর হইতে পারেন।

ব্রহ্মদেশে শিক্ষিত, অ-শিক্ষিত, হিন্দু ও মুসলমান ভেদে বাঙালীগণ যে কতপ্রকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্য করিতেছেন, তাহা বাস্তবিকই কৌতূহলোদ্দীপক। উচ্চ স্তরে হাইকোর্টের বিচারপতি হইতে নিম্ন স্তরে সাধারণ নৌকার নাবি, ধোবা, নাপিত প্রভৃতি সকল প্রকার লোকই ব্রহ্মদেশের বাঙালীদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। চাকুরী, ওকালতী, চিকিৎসা, ঠিকাদারী কাজ, সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সকল প্রকার কাজই বাঙালীরা যথেষ্ট পরিমাণে করিতেছেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নহে। তজ্জন্ম এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ সাধারণভাবে বাঙালীরা কি কি কার্য দ্বারা কিভাবে অর্থোপার্জন করিতেছেন, তাহারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

প্রথমে চাকুরীজীবী বাঙালীদের কথাই বলা যাক—কারণ বাঙালীর ঐটিই প্রধান উপজীবিকা। ব্রহ্মদেশবাসী বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে সাড়ে পনের আনাই চাকুরীজীবী। সরকারী ও বেসরকারী চাকুরীতে একাধিক সহস্র বাঙালী ব্রহ্মদেশের

নানাস্থানে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই রেঙ্গুন হইতে অতি দূরবর্তী স্থানে আত্মীয়বন্ধুস্বজনবিহীন অবস্থায় বাস করিতে হয়। এমন অনেক স্থানও আছে যেখানে যাইতে হইলে রেঙ্গুন হইতেও চারি-পাঁচ দিন সময় লাগে। সেই সকল স্থানের অর্ধ-সভ্য অধিবাসীরাই প্রধানতঃ তাঁহাদের প্রতিবেশী। খুব বেশী হইলে তথায় ভারতবর্ষেরই অল্প প্রদেশবাসী দু-একটি লোক হয়ত পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বাঙালীর মুখ-দর্শনই অতি দুর্লভ। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত স্ত্রীপুত্র-পরিবার লইয়াও বাস করেন। এই সকল স্তূদূর পার্শ্বতা অথবা অরণ্যসঙ্কুলস্থাননিবাসী বঙ্গসন্তানদের বিষয় কয় জন অবগত আছেন? তাঁহাদিগকে যেরূপ স্থানে ও অবস্থায় বাস করিতে হয় তাহা সকলেরই সহানুভূতি উদ্রেক করে। বস্তুতঃ ব্রহ্মদেশের এমন একটিও বিশিষ্ট শহর নাই যেখানে অস্তুতঃ এক জন বাঙালীও নাই। সরকারী কার্যে নিযুক্ত বাঙালীদের মধ্যে অনেকে খুব উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছেন। ইদানীংও রেঙ্গুনে সরকারী দপ্তরখানায় এতদধিক বাঙালী খুব উচ্চপদে নিযুক্ত রহিয়াছেন। গত দুই বৎসরের মধ্যে এইরূপ অনেক বাঙালী বিভিন্ন ক্ষেত্রে খুব যোগ্যতার সহিত কার্য করিয়া রাজসম্মান লাভান্তে অবসংগ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমানেও চিকিৎসা-বিভাগে সিভিল-সার্জনের পদে, পূর্ত্ত-বিভাগে এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের পদে, শিক্ষা-বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ অধ্যাপক-পদে অনেকে যোগ্যতার সহিত কার্য করিতেছেন। তন্মিন্ন অপেক্ষাকৃত নিম্নপদেও বহু বাঙালী ব্রহ্মদেশের নানাস্থানে নিযুক্ত রহিয়াছেন। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু। শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে উচ্চপদস্থ ব্যক্তি খুব বেশী নাই। চাকুরীক্ষেত্রে মুসলমানরা অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ হইলেও অগ্ৰাণ্য বিষয়ে, বিশেষতঃ ব্যবসাবাগিজ্যক্ষেত্রে, তাঁহাদের অবস্থা হিন্দুদের অপেক্ষা ভাল। শিক্ষা-বিভাগে পূর্বোক্ত কয়েক জন অধ্যাপক ভিন্ন বহু বাঙালী উচ্চবিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের কার্য করিতেছেন। পূর্বে এইরূপ শিক্ষকের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। বর্তমানে নূতন কার্যে বাঙালী নিযুক্ত হওয়া বন্ধ হইয়াছে বলিলেই হয়। পুরাতন যাহারা রহিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেরও অনেকের ভবিষ্যৎ আশঙ্কাসূত্র নহে। দুইটি উচ্চবিদ্যালয়ে মাত্র দুই জন বাঙালী প্রধান শিক্ষকের পদে

অধিষ্ঠিত আছেন। ব্রহ্মদেশের কোন উচ্চবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদলাভ বাঙালীর পক্ষে একান্তই দুর্লভ বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। তৎসঙ্গেও যে দুই জন মাত্র ঐরূপ দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন তজ্জগৎ বাঙালী মাত্রই আনন্দিত হইবেন। রেঙ্গুন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজগুলিতে পূর্বে অনেক বাঙালী অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত ছিলেন। ক্রমে তাঁহাদের অনেককেই চলিয়া আসিতে হইয়াছে এবং একাধিক ব্যক্তিকে অন্যায়রূপে কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছে। বর্তমানে যাহারা আছেন তাঁহাদের ভবিষ্যৎও যে বিপদশূন্য তাহা জোরের সহিত বলা যায় না।

সকল প্রকার চাকুরীতেই ভারতবাসীদের, বিশেষভাবে বাঙালীর, প্রবেশলাভ দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে। রেঙ্গুনে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে পূর্ত্ত ও চিকিৎসা বিভাগে স্থায়ী ভাবে সহজে কোন বাঙালীকে লওয়া হয় না। সাধারণ কেরণীর কার্যে যাহারা নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের পুত্রেরা যে ভবিষ্যতে ঐদেশে কোনরূপ কার্যলাভ করিতে সমর্থ হইবে তাহা বলা কঠিন। বস্তুতঃ এখন হইতেই ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালীদের সন্তানগণের ভবিষ্যৎ গুরুতর চিন্তার কারণ হইয়া উঠিতেছে।

চাকুরী ভিন্ন অপর এক ক্ষেত্রে বাঙালীরা ব্রহ্মদেশের সর্বত্রই বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তাহা আইন-ব্যবসায়। ব্রহ্মদেশে প্রায় প্রত্যেক জেলার সদরে অথবা মহকুমায় বাঙালী ব্যবহারজীবী আছেন। রেঙ্গুন শহরেই প্রায় এক শত বাঙালী ব্যবহারজীবী রহিয়াছেন। সর্বত্রই ইহারা নিজ ক্ষমতাবলে এই কার্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন। মফস্বলের অধিকাংশ স্থলে বাঙালী ব্যবহার-জীবীরাই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জন সরকারী উকীলের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। বস্তুতঃ বাঙালী আইনব্যবসায়ীরা ব্রহ্মদেশে সর্বত্র—বিশেষভাবে মফস্বলে—আইন-ব্যবসায়ের একটি উচ্চ মান (standard) স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই বিষয়ে ভারতবর্ষের অগ্ৰাণ্য প্রদেশের লোকেরা বাঙালীদের বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছেন। এই সকল আইনজীবীর অনেকেই প্রথমে ব্রহ্মদেশের

নানা স্থানে অতি সামান্য বেতনে চাকুরী করিতেন। কিন্তু অধাবসায় বলে ব্রহ্মদেশের বিশেষ বিশেষ আইনবিষয়ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এবং ততোধিক কঠিন ব্রহ্মভাষা শিক্ষা করিয়া ও তৎসংস্থ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং নিজ নিজ ক্ষমতাবলে অতি উচ্চস্থান অধিকার করেন। অনেক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীই এই আইনব্যবসায়ী বাঙালীদের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমানে রেঙ্গুন হাইকোর্টে এক জন বাঙালী বিচারপতি আছেন। পূর্বে এই আইনব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইলে পূর্বোক্ত পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হইলেই চলিত। কিন্তু বর্তমানে বিদেশী—অর্থাৎ ভারতবাসী-ব্যবহারজীবীদের অব্যাহত গতিরোধ করিবার জন্য এই নিয়ম করা হইয়াছে, যে, ব্যবসায়-প্রার্থীকে তদ্দেশের বাসিন্দারূপে (domiciled) পরিগণিত হইতে হইবে। ইহার জন্য কারণ দর্শাইয়া আবেদন করা আবশ্যিক। চিকিৎসা-বিভাগে যে-সকল বাঙালী স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করিতেছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই রেঙ্গুনে অবস্থান করেন। মফস্বলে বেশী বাঙালী চিকিৎসক এখনও গমন করেন নাই।

এই সকল ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দুরাই অগ্রবর্তী। বাঙালী মুসলমান ব্যবহারজীবী বা চিকিৎসকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। কিন্তু অন্যান্য সাধারণ ব্যবসা ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে মুসলমানরা হিন্দুদিগের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে অগ্রবর্তী। রেঙ্গুন শহরে স্বর্গীয় শশিভূষণ নিরোগী মহাশয়ই একমাত্র প্রাতিষ্ঠাপক হিন্দুব্যবসায়ী ছিলেন। ঢাকানিবাসী স্বর্গীয় জয়চন্দ্র দত্ত মহাশয় এককালে টিকাদারী কাজ করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। তদ্বিন্ন স্বর্গীয় শিবপদ দাস প্রমুখ আরও অনেক বাঙালী হিন্দু ব্রহ্মদেশের নানা স্থানে ঐ শ্রেণীর কাজ করিয়া বহু অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু ব্যাপকভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় বাঙালী হিন্দুদিগের অপেক্ষা মুসলমানরাই বেশী অগ্রবর্তী। দরজার কাজ, দপ্তরীর কাজ প্রভৃতি মুসলমানদের একচেটিয়া কারবারগুলি ছাড়াও নানারূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় বহু মুসলমান নিযুক্ত আছেন। ইরাবতী ফ্লোটিল কোম্পানীর জাহাজের খালাসী প্রায় সকলেই বাংলার মুসলমান। তদ্বিন্ন রেঙ্গুনে এবং অন্যান্য দু-তিন জায়গায় খেয়-মারির কাজেও চট্টগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী জিলাগুলির মুসলমানরাই প্রধানতঃ নিযুক্ত আছেন। কারিগর, মিস্ত্রী প্রভৃতির কাজেও বাঙালী মুসলমানই বেশী। তদ্বিন্ন প্রতিবৎসর ধানকাটার সময়ে বাংলা দেশ হইতে বহু লোক, প্রধানতঃ মুসলমান, ব্রহ্মদেশে গমন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস মাত্র ঐ দেশে অবস্থান করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জনাশ্বে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এইরূপ কার্যের জন্য অবশ্য

মাদ্রাজ ও উড়িষ্যা হইতেও অনেক লোক গমন করিয়া থাকেন। পূর্বে দুধ-বিক্রীর কাজ প্রধানতঃ বাঙালীদের হাতেই ছিল। এই সকল দুধব্যবসায়ী যে সকলেই জাতিতে গোপ ছিলেন, তাহা নহে। কিন্তু ক্রমে এই ব্যবসায়টি বাঙালীদের হস্ত হইতে হিন্দুস্থানীদের হস্তে গিয়া পড়িয়াছে। তবে এক বিষয়ে বাঙালী হিন্দুরা এখনও ব্রহ্মদেশের প্রায় সর্বত্রই বিশেষ তৎপরতার সহিত কারবার চালাইতেছেন—তাহা নাপিতের ব্যবসায়। ব্রহ্মদেশের প্রায় সর্বত্রই যথেষ্টসংখ্যক বাঙালী নাপিত দেখিতে পাওয়া যায়। রেঙ্গুন শহরে বাঙালী নাপিতরাই কুলীন। মফস্বলের অনেক স্থলে তাহারা চুল কাটিবার দোকান করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করে। এই সকল ক্ষৌরকার প্রধানতঃ চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলারই অধিবাসী এবং সকলেই জাতিতে পরামানিক নহে।

মফস্বলের অনেক স্থলে নিম্নশ্রেণীর বাঙালীরা—হিন্দু ও মুসলমান—কৃষিকার্য করিয়া বিশেষ সচ্ছলতার সহিত বসবাস করিতেছেন। ইহারা একরূপ ব্রহ্মদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাদের মধ্যেও হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের সংখ্যাই বেশী। হিন্দু কৃষিজীবীরা সাধারণতঃ নিম্নব্রহ্মের ইরাবতী নদীর ব-দ্বীপে কয়েকটি জেলাতেই বাস করে। মুসলমানেরা বহুদূরবর্তী পার্শ্বস্থ স্থানেও বসতি স্থাপন করিয়াছে। এই সকল কৃষক প্রধানতঃ চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ত্রিপুরা এবং ময়মনসিং জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধিবাসী। মুসলমানদিগের অনেকেরই ব্রহ্মদেশীয়া নারীর সহিত বিবাহ হইয়াছে।

গত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনা অনুসারে ব্রহ্মদেশে ৩৭৮,০০০ জন বাঙালী ছিল। এই লোক-গণনা ব্যাপারে একটি অদ্ভুত বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। বাঙালী ভিন্ন চট্টগ্রামবাসী (Chittagonians) বলিয়া একটি ভিন্ন শ্রেণীর বরাবরই উল্লেখ করা হইয়া থাকে। উপরে যে সংখ্যা দেওয়া হইল তাহা ব্রহ্মভাষাভাষীর সংখ্যা। কিন্তু ঐ লোক-গণনার বিভিন্ন স্থানে হিসাবে বাঙালী ও চট্টগ্রামবাসী বলিয়া দুইটি পৃথক শ্রেণীর উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যিক এবং ভবিষ্যতে যাহাতে আর এইরূপ অদ্ভুত শ্রেণী-বিভাগ না হয় তাহার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করা আবশ্যিক। এই বিষয়ে চট্টগ্রামবাসীদিগেরই প্রধান ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। তবে এই সংক্রমে একটি কথা বলা আবশ্যিক হইবে না। ব্রহ্মদেশের সর্বত্রই বাঙালী ভিন্ন অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা চট্টগ্রামী বলিয়া একটি বিশেষ শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে। চট্টগ্রামীরা যে অন্য বাঙালী হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে পারে না, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াও সাফল্যলাভে সমর্থ হই নাই।

প্রাচীন ভারতে বাসগৃহের দিও নির্বাচন ও সংস্থাপন ব্যবস্থা

অধ্যাপক শ্রী প্রসন্নকুমার আচার্য, এম্-এ, পিএইচ-ডি (লাইডেন), ডি-লিট (লণ্ডন), আই-ই-এস

কোর্টলীয় অর্থশাস্ত্রের গ্রন্থকর্তা চাণক্যের নামে বাসগৃহের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে একটি প্রয়োজনীয় কথা প্রচলিত আছে। ধনী, শ্রোত্রিয়, রাজা, নদী ও বৈদ্য যে-স্থানে জলভি সে-স্থানে বাসগৃহ নির্মাণ করা অমুচিত। সেরূপ স্থান যে লোকবসতির অমুপযুক্ত তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ গ্রাম বা নগর এরূপ স্থানেই প্রায় সর্বত্র ও সর্বকালে নির্মিত হইয়াছে যেখানে এই পঞ্চবিধ সুবিধা ন্যূনাদিক পরিমাণে বর্তমান ছিল। ধনী লোকের অভাবে গ্রাম বা নগর সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারে না। ধর্মযাজক না থাকিলে লোকের ধর্মাচরণ অসম্ভব হয়। রাজা বা রাজপ্রতিনিধি না থাকিলে লোকের শান্তিরক্ষাদির ব্যবস্থা হইতে পারে না। নদীর দ্বারা পানীয় জলের ব্যবস্থা, ভূমির উর্বরতা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধিতে হইবে। নদীমাতৃক দেশ বা স্থান এই সকল কারণেই সভ্য লোক মাত্রেই অভিপ্সিত। বৈদ্য বা চিকিৎসকের বর্তমানে ঔষধপথ্যাদি দ্বারা রোগাদির উপশম ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা বৃদ্ধিতে হইবে।

মৌর্য-বংশের সংস্থাপক মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের প্রধান মন্ত্রী ও দক্ষিণ-হস্ত রূপে চাণক্য পণ্ডিত পরিচিত। মৌর্য-সাম্রাজ্য ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক ঘটনা যাহা মহাবীর আলেকজান্ডার ও সেলেউকাস্ নিকটোর প্রভৃতির বিবরণ দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু চাণক্য পণ্ডিতই যে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে গ্রাম নগর সংস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা নহে। বৈদিক যুগেও সমৃদ্ধ গ্রাম নগর ছিল তাহারও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে। তাহারও সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে সিন্ধুদেশের মহেঞ্জোদাড়োতে এবং পঞ্জাবের হরপ্পা নামক স্থানে প্রসিদ্ধ গ্রাম নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং এই বিষয়ে বৌদ্ধ যুগ বা রামায়ণ মহাভারতের কাল বা পৌরাণিক কালের উল্লেখ করা নিশ্চয়োজন।

বাসস্থান-বিষয়ে অর্থশাস্ত্রের ব্যবস্থা হইতেও বিশদ ও বিস্তারিত বিবরণ মানসারাদি শিল্পশাস্ত্রের মূলগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা এস্থলে আলোচ্য বিষয় নহে। এই পঞ্চবিধ সুবিধা লোকবসতির পক্ষে অপরিহার্য। বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ অন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থারও বিবেচনা করা হইত। বৌদ্ধগ্রন্থ চুল্লবঙ্গের (৬, ৪, ৮) ব্যবস্থা অনুসারে আরাম বা বিশ্রামাগার এমন স্থানে নির্মিত হইত যাহা কোলাহলপূর্ণ নগর হইতে বেশী দূরেও নহে, বেশী নিকটেও নহে। তাহা নগর নগরীর এরূপ উপকণ্ঠে হওয়া চাই যেখানে

সহজে যাতায়াতের সুবিধা আছে অথচ দিনের বেলায় জন-সমূহপূর্ণ নহে এবং রাত্রিতে লোকের কোলাহলে শান্তি ও বিশ্রামের ব্যাঘাত হয় না, অথবা নির্জনতাতে কখন ভয়ের কারণ থাকে না।

চুল্লবঙ্গ (৬, ৪, ১০) ও মহাবঙ্গের (৩, ৫, ৯) বর্ণনা অনুসারে সাধারণ বাসগৃহে এবং উপাসকের আশ্রমাগারে নানা প্রকারের প্রকোষ্ঠ থাকিত। সাধারণ বাসগৃহে প্রয়োজনানুরূপ শয়নাগার, বিশ্রামাগার, ভোজনাগার, অগ্নিস্থানযুক্ত আস্তানাগার, দ্রব্যসংস্থাপনাগার, স্নানাগার, বস্ত্রপরিবর্তনগৃহ, পুরীষগৃহ, কূপগৃহ, পুষ্করিণী ও খোলা মণ্ডপ থাকা প্রয়োজন। তথাকথিত আশ্রমাগারেও যথাযথ শয়ন-কক্ষ, অর্থশালা, শিখরযুক্ত গৃহ, ভূগর্ভস্থ গৃহ, উপাসনা-মন্দির, দ্রব্যাগার, ভোজনাগার, বিপনি, উচ্চকক্ষ, পাকগৃহ, উত্তাপ প্রাপ্তির জন্য অগ্নিগৃহ, পুরীষগৃহ, ভ্রমণাগার, কূপগৃহ, শীতোষ্ণ স্নানের জন্য যন্ত্রগৃহ, পদ্মযুক্ত পুষ্করিণী ও মণ্ডপাদি থাকিত।

শিল্পশাস্ত্র, পৌরাণ এবং আগমাদি শাস্ত্র হইতে কোন্ প্রয়োজনের কোন্ কোন্ গৃহ বাস্তুভিটার কোন্ কোন্ স্থানে থাকা প্রয়োজন তাহার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

মধ্যবিত্ত গৃহস্থপরিবারের জন্য চতুঃসাল ষোড়শকক্ষযুক্ত গৃহ অর্কাচীন কালের বাস্তুশাস্ত্রের যুগে নির্দিষ্ট হইয়াছে। বাস্তুতত্ত্ব (পৃ. ১) নামক এক ক্ষুদ্র পুস্তিকা কোন্ প্রাচীন গ্রন্থ হইতে এই ষোড়শ কক্ষের সংস্থাপন বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে ঈশান বা উত্তর-পূর্বে কোণে (১) দেবগৃহ ; পূর্বে (২) সর্ববস্ত্র গৃহ, (৩) স্নানগৃহ (৪) দক্ষিণমুখ গৃহ; অগ্নি বা দক্ষিণ-পূর্বে কোণে (৫) রন্ধনগৃহ; দক্ষিণে (৬) বৃতসগৃহ, (৭) শৈলগৃহ ও (৮) পুরীষগৃহ; নৈঋত বা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে (৯) শাস্ত্রগৃহ; পশ্চিমে (১০) বিদ্যাভ্যাস-গৃহ, (১১) ভোজনগৃহ ও (১২) রোদনগৃহ; বায়ু বা পশ্চিম-উত্তর কোণে (১৩) ধান্যগৃহ; উত্তরে (১৪) সংভোগ-গৃহ, (১৫) দ্রব্যগৃহ ও (১৬) ঔষধগৃহ থাকিবে। গৃহবাস্তুপ্রদীপ নামক অপার পুস্তিকাও সংক্ষেপে এই ষোড়শকক্ষযুক্ত বাস্তুগৃহের বর্ণনা করিয়াছে। *

এই বিবরণ হইতে ইহা সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, এই প্রাচীন গৃহ উত্তরমুখী, কেননা পূর্ব-দক্ষিণ ও পূর্বে যে-

* বিস্তারিত বিবরণের জন্য লেখকের 'শিল্পশাস্ত্রীয় অভিধান' পৃ. ৬১২-৬১৪ এবং মানসার শিল্পশাস্ত্রের মূল পৃ. ৩২-৫৬, ২৭৪-২৭৯ এক ইংরেজী অনুবাদ পৃ. ৬৩-৯৮, ৪২৩-৪৩১ দ্রষ্টব্য।

সকল কক্ষ অবস্থিত তাহার সাধারণ বাসগৃহ নহে। উত্তরমুখী গৃহ উত্তর-ভারতের পক্ষে উপযোগী যেখানে উত্তরস্থ হিমালয় পর্বত হইতে স্বাস্থ্যকর বায়ু প্রবাহিত হয়।

বাস্তুপ্রবন্ধ (২, ২৫, ২৬) নামক অষ্ট এক পুস্তিকার ব্যবস্থা অনুসারে পূর্বে (১) স্নানগৃহ ; অগ্নিকোণে (২) পচনালয় ; দক্ষিণে (৩) শয়নাগার ; নৈঋতে (৪) শাস্ত্র-মন্দির ; পশ্চিমে (৫) ভোজনাগার ; বায়ুকোণে (৬) পশু-মন্দির ; উত্তরে (৭) ভাণ্ডকোষ ; এবং ঈশানকোণে (৮) দেবমন্দির থাকা উচিত।

এই রীতির গৃহ ক্ষুদ্র পরিবারের উপযোগী, সম্ভবতঃ দক্ষিণমুখী এবং দক্ষিণ বা পূর্ব ভারতের যে যে স্থলে দক্ষিণ হইতে মলয়ম রুত বা সমুদ্রের হাওয়া প্রবাহিত হয় সে-সকল স্থলের পক্ষে স্বাস্থ্যকর।

শিল্পশাস্ত্র-সারসংগ্রহ (৯, ২৪-২৮) নামক অপর এক সংগ্রহকের নামহীন ক্ষুদ্র পুস্তিকার নির্দেশ অনুসারে ঈশান কোণে (১) দেবতাগৃহ ; পূর্বে (২) স্নানমন্দির ; অগ্নিকোণে (৩) পাকসদন ; উত্তরে (৪) দ্রব্যাগার ; অগ্নিকোণ ও পূর্বদিকের মধ্যে (৫) দধিমন্দির-মন্দির ; অগ্নিকোণ ও দক্ষিণ দিকের মধ্যে (৬) আজ্যগৃহ ; দক্ষিণ ও নৈঋত কোণের মধ্যে (৭) পুরীষত্যাগ-মন্দির ; নৈঋত কোণ ও পশ্চিম দিকের মধ্যে (৮) বিদ্যাভ্যাস-মন্দির ; পশ্চিম ও বায়ুকোণের মধ্যে (৯) রোদনগৃহ ; বায়ুকোণ ও উত্তর দিকের মধ্যে (১০) রতি (শয়ন) গৃহ ; উত্তর ও ঈশান কোণের মধ্যে (১১) ঔষধার্থ-গৃহ, এবং নৃপতির জন্য বিশেষভাবে নৈঋত কোণে (১২) স্মৃতিকাগৃহ নির্মাণ করা উচিত।

এই সংগ্রহ-পুস্তকের নিয়মানুসারে বাসগৃহের কক্ষ-সংখ্যা এমন কি নৃপতির পক্ষেও, দ্বাদশমাত্র হইলেই চলিতে পারে। মূলগ্রন্থসমূহের নাম উল্লেখ নাই বলিয়া এই সংগ্রহ-পুস্তিকার প্রামাণ্যের অভাব। ইহারও ব্যবস্থা উত্তরমুখী বাসগৃহের এবং সম্ভবতঃ উত্তর-ভারতবর্ষের স্থানবিশেষের উপযোগী।

মৎস্যপুরাণের (অধ্যায় ২৫৬, শ্লোক ৩৩-৩৬) ব্যবস্থা অনুসারেও ঈশান কোণে (১) দেবতাগার ; ও (২) শাস্তিগৃহ ; অগ্নিকোণে (৩) মহানস এবং তাহার উত্তরপার্শ্বে (৪) জলস্থান ; নৈঋত কোণে (৫) গৃহোপস্করণ স্থাপনের কক্ষ ; গৃহগণ্ডীর বাহিরে (৬) বন্ধ (বা বধ) কক্ষ ও (৭) স্নানমণ্ডপ ; বায়ুকোণে (৮) ধনধাণ্ডগৃহ ; এবং তাহারই বহির্দেশে (৯) কর্মশালা হওয়া উচিত। এই পুঁথির ব্যবস্থা অনুসারে এরূপ বাস্তব-বিশেষ গৃহভর্তার শুভাবহন করে।

এই ক্ষুদ্র বাসগৃহের 'শাস্তিগৃহ' সম্ভবতঃ 'শয়নাগার' অর্থে বুঝিতে হইবে, যেহেতু তাদৃশ অপরিহার্য কক্ষের উল্লেখ অন্তর্ভুক্ত নাই। সম্ভবতঃ পাঠের ত্রুটিবশতঃ শয়নাগার উত্তর দিকে স্থাপিত এই কথাই স্পষ্ট উল্লেখ নাই। বস্তুতঃ প্রধান চতুর্দিকস্থ কক্ষগুলি এই তালিকায় বাদ পড়িয়া গিয়াছে।

এই অসম্পূর্ণ তালিকা হইতেও বাস্তবগৃহ উত্তরমুখী বলিয়াই মনে হয়।

অগ্নিপুঁথি (অধ্যায় ১০৬, শ্লোক ১-১২, ১৮-২০) বিশেষ-ভাবে নগরস্থ বাসগৃহ এবং চতুঃসাল, ত্রিসাল, দ্বিসাল ও একসাল গৃহের উল্লেখ করিয়াছে। নগরে স্থানসঙ্কোচবশতঃ সর্বত্র মধো প্রাক্‌গয়ুক্ত চতুর্দিক আবৃত কক্ষসমূহের ব্যবস্থা অসম্ভব বা অনভীপিত বলিয়া আলোক ও বায়ুপ্রবাহের সুবিধার জন্ত এক দিক, দুই দিক, এমন কি চারি দিক খোলা বাসগৃহেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই পুঁথির নির্দেশ অনুসারে পূর্বে (১) শ্রীগৃহ, অগ্নিকোণে (২) মহানস, দক্ষিণে (৩) শয়নাগার, নৈঋতকোণে (৪) আয়ুধ-আশ্রয়, পশ্চিমে (৫) ভোজনাগার, বায়ুকোণে (৬) ধাণ্ডাগার, উত্তরে (৭) দ্রব্যসংস্থানকক্ষ, এবং ঈশানকোণে (৮) দেবতাগৃহ নির্মাণ করা উচিত।

এই ব্যবস্থাও ক্ষুদ্র পরিবারেরই উপযোগী। এই পুঁথিও দক্ষিণ বা পূর্ব ভারতের কোন স্থান লক্ষ্য করিয়া এরূপ ব্যবস্থা দিয়াছে যে, স্থলবিশেষে দক্ষিণের বায়ু দক্ষিণমুখী গৃহের দক্ষিণ দিকস্থ শয়নাগার প্রভৃতির পক্ষে স্বাস্থ্যকর ও সুবিধাজনক।

কামিকাগমের (অধ্যায় ৩৫, শ্লোক ১৭৭-১৯১) নির্দেশ অনুসারে পূর্বে (১) ভোজনস্থান, অগ্নিকোণে (২) মহানস, দক্ষিণে (৩) শয়নস্থান, নৈঋত কোণে (৪) আয়ুধালয়, তাহারই নিকটে (৫) মৈত্রস্থান, পশ্চিমে (৬) উদকালয়, বায়ু কোণে (৭) গোষ্ঠাগার, উত্তরে (৮) ধনালয়, ঈশান কোণে (৯) নিত্যনৈমিত্তিক পূজার জন্ত যাগমণ্ডপ, প্রাগ-উদক দিকে (১০) কাঞ্জি ও লবণের স্থান, অন্তরীক্ষ ও সবিত'কোষ্ঠে + যথাক্রমে (১১) চুল্লী ও (১২) উলুখলী স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু অন্নপ্রাশন বা ভোজনাগার আর্ঘ্য, ইন্দ্র, অগ্নি বা সবিত' কোষ্ঠেও হইতে পারে। বিবস্বত কোষ্ঠে (১৩) শ্রবণাগার ; মৈত্রকোষ্ঠে (১৪) বিবাদকক্ষ ; ইন্দ্রজয়, বায়ু কিংবা সোমকোষ্ঠে (১৫) ক্ষৌদ্র(র) আগার ; বিতথ, উপালয় হ), পিতৃ, দৌবারিক, সূগ্রীব বা পুষ্পদন্ত কোষ্ঠে (১৬) প্রসূতিগৃহ ; অপবৎসকোষ্ঠ (১৭) কোষাগার ; আপকক্ষে (১৮) কুণ্ড ; মহেন্দ্রকোষ্ঠে (১৯) অক(ক)ন ; মহধির কোষ্ঠে (২০) পেষণী ; সেই সেই স্থানে (২১) অরিষ্টাগার এবং (২২) উপস্ব'রভূমিও হইতে পারে ; দ্বারের দক্ষিণে (২৩) বাহনাগার ; বক্ষণকক্ষে (২৪) স্নানশালা, অস্বকক্ষে (২৫) ধাণ্ডাবাস ; ইন্দ্ররাজকোষ্ঠে (২৬) ঔষধালয়।

+ সাধারণতঃ অষ্ট দিক সুপরিচিত হইলেও গ্রাম নগরে গৃহবিশেষের এবং বাসগৃহের কক্ষবিশেষের যথাযথ স্থানে সংস্থাপনার জন্ত নির্বাচিত স্থান দ্বাত্রিংশ নক্সার এবং নক্সারি মধ্যস্থ জমি ১০২৪ পদ বা প্রকোষ্ঠে বিভক্ত হইত যাহা ইন্দ্র সবিত' প্রভৃতি দিকপাল বা দেবতাবিশেষের নামে প্রচলিত। বিস্তারিত বিবরণের জন্ত লেখকের সম্পাদিত ও ইংরেজীতে অনূদিত মানসার শিল্পশাস্ত্রের পদবিস্তার নামক সপ্তম অধ্যায় এবং তন্ত্ৰ চিত্রসমূহ মানসার শিল্পশাস্ত্রের পঞ্চম খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

পক্ষান্তরে মিত্রাবাস মিত্রকোষ্ঠে, এবং উলুখলস্থান রোগকোষ্ঠে, কোশগেহ ভূধরকোষ্ঠে, ঘৃত (দধিমস্থন) ও ঔষধালয় নাগকোষ্ঠে হইতে পারে।

ক্রমাগ্রে জয়ন্ত, অপবৎস, পর্জন্য বা শিবকোষ্ঠে (২৭) বিষের প্রভৌষধিস্থান, (২৮) কৃপ ও (২৯) দেবগৃহ, এবং ঋক্ষ, ভল্লাট, বা সোমকক্ষে (৩০) আস্থানমণ্ডপ হওয়া উচিত।

উত্তর-ভারতের পুৰাণসমূহের অনুরোধে রচিত দক্ষিণ-ভারতের আগমসমূহ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সংগ্রহ-পুস্তক। পুরাণের ন্যায় আগমেও তাৎকালীন লোকের জ্ঞানের বিষয়ীভূত প্রায় সকল বিষয়ের অল্পবিস্তর বর্ণনা আছে। বস্তুতঃ এই কামিকাগমের ৭৫ অধ্যায়ের মধ্যে ৬০ অধ্যায়ই বাস্তববিবরণ ও মূর্তিনির্মাণ-ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ। স্থানান্তরে বিস্তারিত ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, পৌরাণিক, আগমিক ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বিত্রিশত সংখ্যক বাস্তববিষয়ক গ্রন্থ শিল্পশাস্ত্রের মূলগ্রন্থ মানসার-মূলক।* এই সকল সংগ্রহ-গ্রন্থের বিবরণের অল্পবিস্তর বিভিন্নতা স্থানীয় প্রয়োজনজনিত। মূলগ্রন্থ মানসার শিল্প-শাস্ত্রে সর্ব প্রদেশ ও স্থানের উপযোগী হয় এরূপ সমালোচনা ও নির্দেশ প্রায় সকল প্রস্তুত বিষয়েরই করা হইয়াছে। সকল বিষয়ের উল্লেখ এস্থলে অসম্ভব ও নিস্প্রয়োজন। কামিকাগম চতুর্দিক ও চতুষ্কোণের অতিরিক্ত যে সকল দিকপালের কোষ্ঠের ঘটনাক্রমে এখানে উল্লেখ করিয়াছে তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ 'পদবিণ্যাস' নামক মানসার শিল্প-শাস্ত্রের এক স্বরূপ অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে।† তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। সংক্ষেপে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে নগর, গ্রাম ও গৃহাদির জন্ম নানা পরীক্ষার দ্বারা কোন স্থান মনোনীত হইলে তাহা প্রয়োজন অনুসারে একপদ হইতে আরম্ভ করিয়া ১০২৪ পদ বা প্রকোষ্ঠে বিভাগ করা যাইতে পারে। এই প্রকোষ্ঠসমূহ দিকপাল-সংজ্ঞক দেবতার নামে পরিচিত। মনোনীত স্থানের বিশেষ কোন স্থান যেখানে বিশেষ কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নির্দিষ্ট হইতে পারে তাহা দিকপালের প্রকোষ্ঠের উল্লেখ করিয়া সঠিকভাবে নির্দেশ করা যাইতে পারে।

কামিকাগমের নির্দেশ অনুসারে একাধিক প্রকোষ্ঠেও বিশেষ কোন কক্ষ স্থাপিত হইতে পারে। বস্তুতঃ মূলগ্রন্থ মানসার শিল্পশাস্ত্র হইতেই সাক্ষাৎভাবে অনুরোধ করিবার ফলে কামিকাগম ও উপরিউক্ত বাস্তবশাস্ত্রের পুস্তকসমূহের মধ্যে এই প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে। এই সকল ক্ষুদ্র পুস্তিকা বিশেষ কোন স্থানের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্ম রচিত হইয়াছিল। সেজন্ম এ-সকল পুস্তক একাধিক স্থানে বিশেষ কোন

কক্ষ নির্মাণ করিবার ব্যবস্থা প্রদান করা হয় নাই। আগম নামক গ্রন্থসমূহ পুৰাণের ন্যায় অধিকতর প্রামাণিক হওয়ার অভিপ্রায়ে মানসার শিল্পশাস্ত্রের অনুরোধে একাধিক স্থানে একই কক্ষ নির্দেশ করিয়াছে। কিন্তু মানসার শিল্পশাস্ত্রে উদাহরণস্বরূপ যাহা যাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহারই আংশিক বিবরণ কামিকাদি আগম প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। বস্তুতঃ রাজহর্ম্যের যে সাধারণ বিবরণ মানসার শিল্পশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় তাহার উল্লেখ আগম পুরাণ বা ক্ষুদ্রতর বাস্তবশাস্ত্রসমূহে নাই।

রাজহর্ম্য নয় শ্রেণীর রাজার উপযোগী। এই নববিধ রাজহর্ম্য সংস্থাপনে পরস্পরের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ আছে। সম্রাটাদির অভিকর্ষিত অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে নিয়ে উক্ত রাজহর্ম্যের সাধারণ সংস্থাপন পরিবর্তন করিয়া লওয়া যাইতে পারে তাহা মানসার শিল্পশাস্ত্রে (অধ্যায় ৪০, শ্লোক ১৫৫) বিশেষ ভাবে বারংবার বলা হইয়াছে।

সার্বভৌম বা চক্রবর্তী, মহারাজ, নরেন্দ্র, পাঞ্চিক, পট্টধর, মণ্ডলেশ, পট্টভাজ, প্রাহারক ও অন্তর্গাহ এই নয় শ্রেণীর রাজবর্গের বাসোপযোগী নববিধ রাজহর্ম্য এক হইতে সপ্ত প্রকার বা পরিবেষ্টনীতে বিভক্ত। এই প্রত্যেক গণ্ডী প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং অন্তর্মণ্ডল, অন্তর্নিহার, মধ্যমহার, প্রাকার ও মহামর্ঘাদাদি নামে পরিচিত। এই সকল মণ্ডলের সিংহদ্বার বা গোপুর যথাক্রমে দ্বারশোভা, দ্বারশালা, দ্বারপ্রাসাদ, দ্বারহর্ম্য, ও মহাগোপুর নামে বর্ণিত এবং এক হইতে সপ্তদশতলযুক্ত।* এই মণ্ডলের প্রত্যেকটিতে এক হইতে দ্বাদশতলযুক্ত গৃহ সাধারণতঃ মধ্যে চতুঃসাল প্রণালীতে সংস্থাপিত হইলে এক হইতে দশশালা নামক শ্রেণীতে বিভিন্ন আকারে সুসজ্জিত হইতে পারে।† রাজহর্ম্যের মণ্ডল, শালা ও তলসংখ্যা রাজবর্গের শ্রেণী অনুযায়ী। সাধারণতঃ মধ্যভাগে ব্রহ্মপীঠে রাজমন্দির-নির্মাণের ব্যবস্থা আছে। প্রধান রাজহর্ম্য ইন্দ্র, বরুণ, যম বা পুষ্পদন্তাদি প্রকোষ্ঠে নির্মাণ করা উচিত। এই প্রধান হর্ম্যের চতুঃপার্শ্বে রাজমহিষী, রাজকুমারী, প্রভৃতির জন্ম গৃহনির্মাণের ব্যবস্থা আছে। স্নানাগার, বস্ত্রপরিবর্তন-গৃহ, শয়নকক্ষ, আস্থানমণ্ডপ, ভোজনগৃহ রন্ধনশালা প্রভৃতি এবং পরিচারক, পরিচারিকাদির বাসস্থান ও পুষ্করিণী ও উদ্যানাদি সুবিধামত সংস্থাপন করিতে হয়। অন্তঃপুরের পরস্ব মণ্ডলীতে রাজকুমার, রাজপুরোহিত, রাজমন্ত্রী প্রভৃতির জন্ম যথোপযুক্ত প্রাসাদ

* বিস্তারিত বিবরণের জন্ম পূর্বেক্ত 'ভারতীয় বাস্তবশাস্ত্রের পৃ. ৫১-৫৩ এবং মানসার শিল্পশাস্ত্রের মূল ও ইংরেজী অনুবাদের অধ্যায় ৩১, ৩৩, এবং পঞ্চম খণ্ডস্থ চিত্রাবলী দ্রষ্টব্য।

† বিস্তারিত বিবরণের জন্ম মানসার শিল্পশাস্ত্রের অধ্যায় ৩৫ এবং চিত্রাবলী (পঞ্চম খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

* লেখকের 'ভারতীয় বাস্তবশাস্ত্র' নামক গ্রন্থের পৃ. ৪৯-১০৯, ১১০-১৩৩, ১৬১-১৭৪ দ্রষ্টব্য।

+ টীকা ২ দ্রষ্টব্য।

নির্মিত করা উচিত। তৎপরস্থ মণ্ডলীতে রাজপরিষৎ, পরিষদের সভা ও কর্মচারীসমূহের গৃহনির্মিত হওয়া উচিত। চতুর্থ মণ্ডলীতে যুদ্ধবিগ্রহাদি কার্যনির্বাহের জন্ত যথোপযুক্ত প্রাসাদাদি সংস্থাপিত হওয়া উচিত। প্রমোদোদ্যান, পুষ্পোদ্যান, কুঞ্জ ও দীর্ঘিকাди যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা উচিত।

উদাহরণস্বরূপ মানসার শিল্পশাস্ত্র (অধ্যায় ৪০, পং ১১৭-২২১) হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে যে, আস্থানমণ্ডপ, রাজদর্শনপ্রাসাদ যম, সোম, বায়ু বা নৈঋতি প্রকোষ্ঠে নির্মাণ করা উচিত। বায়ুকোণে পুষ্করিণী, নাগপ্রকোষ্ঠের বামভাগের দক্ষিণে আরামদেশ বা বিশ্রামাগার নির্মাণ করা উচিত। সেই আরাম দশ হইতেই আরম্ভ করিয়া মুখ্য ও ভল্লট প্রকোষ্ঠে পুষ্পোদ্যান স্থাপন করা হয়। তৎসংলগ্ন প্রদেশ হইতেই নৃত্যাগার ও নৃত্যাদনার বাসস্থান নির্মাণ করা হয়। তৃতীয় মণ্ডলের বাঁধির অংশবিশেষে রহস্যাবাসমণ্ডপ করিতে হয় এবং ঈশ বা বিতথ প্রকোষ্ঠে রঙ্গমণ্ডপের স্থান হওয়া উচিত (পং ১৪৭, ১৫২)। বহির্মণ্ডলের সিংহদ্বার পার্শ্বের দক্ষিণ দিকে ব্যাভ্রাদি জন্তুর আলায় এবং দৌবারিক পদে ময়ূবালয় করিতে হয় (পং ১৪৪-১৪৫)। তৎপার্শ্বে মেঘশালা, এবং সত্যক-প্রকোষ্ঠে বানরালয়, সোম-প্রকোষ্ঠে (উত্তর) হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশান কোণ পর্যন্ত প্রদেশে বাজিশালা, যম (দক্ষিণ) হইতে অগ্নিকোণ পর্যন্ত প্রদেশে গজশালা, তথা হইতে নৈঋতাস্ত প্রদেশে কুক্কটালয় এবং বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া মুখ্য প্রকোষ্ঠান্ত প্রদেশে হরিণ ও যুগ বা অগ্ন পশুর জন্ত বাসস্থান নির্মাণ করা যাইতে পারে (পং ১২৮ ১৩২)। কৃত্রিম যুদ্ধ পরিদর্শন করিবার জন্ত দ্বারপার্শ্ব উচ্চ মঞ্চ নির্মাণ করা উচিত (পং ১৪৮-১৫০)। দ্বারসম্মিকটস্থ কোন সর্কজনদর্শনযোগ্য স্থানে প্রাণদণ্ডের জন্ত শূলকম্প স্থান নির্মাণ করিবার ব্যবস্থা আছে। প্রাচীরের দূরদেশে ভূশ বা অন্তরীক্ষ প্রকোষ্ঠে কারাগার স্থান। বহির্মণ্ডলের দূরদেশে শ্মশান ও সমাধি প্রভৃতির স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। তত্ত্বৎ প্রদেশে দেবতা-বিশেষের মন্দিরও স্থাপন করা উচিত।

নানাবিধ রাজপ্রাসাদের সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য ও

সংস্থাপন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রভৃতির যথাযথ ব্যাখ্যা বিশদভাবে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সমালোচিত হইবার স্থান ও অবসর নাই। ক্ষুদ্র পরিবারাগার, মধ্যবস্ত গৃহস্থের আবাস এবং ধনশালী ব্যক্তি ও রাজগণবর্গের প্রাসাদ-নির্মাণে প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রকার আলোক, বায়ুমঞ্চালন ও অপর স্বাস্থ্যরক্ষা উপযোগী বিষয়সমূহ সমভাবেই রক্ষার ব্যবস্থা দিয়াছেন। বর্তমান নগর, নগরী, পুর, বন্দর ও পত্তনাদি, এমন কি গ্রামস্থ গৃহাদির সংস্থাপন দেখিয়া কাহারও পক্ষে বহুনা করাও সম্ভব নয় যে, ভারতবর্ষে হিন্দুরাজত্বের সময় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাসগৃহ সংস্থাপনের ব্যবস্থা ছিল যাহার ফলে লোকের স্বখ সুবিধা ও স্বাস্থ্য রক্ষিত হইতে পারিত। হিন্দুরাজত্বের নাশ ও তৎসঙ্গে-সঙ্গে হিন্দুর শাস্ত্রাদির নির্দেশ গ্রীসীয়, শকীয় ও তুর্গাদির আক্রমণ হইতে আরম্ভ করিয়া পাঠান, মোগল ও বর্তমান ইউরোপীয়, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ দির ভারতবর্ষে রাজ্যস্থাপনের ফলে বিজিত হিন্দু একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন দেশীয় বিজ্ঞতার স্থানীয় রীতিনীতি ও শাস্ত্রাদির নির্দেশ ভারতবর্ষে গৃহাদি নির্মাণ বিষয়ে সংমিশ্রিত হওয়ার ফলে আমাদের বর্তমান বাসগৃহ কোন দেশ বা আবহাওয়ারই উপযোগী নহে। গ্রীসপ্রধান মিশর বা গ্রীসদেশীয় গৃহ-প্রণালীর উপর শীতপ্রধান মধ্য-এশিয়ার শকীয়াদি রীতি ভারতের নগর ও গ্রামস্থ গৃহ নির্মাণে প্রযুক্ত হইয়াছিল। তাহারই উপর পাঠান ও মোগলদিগের স্ব-স্ব দেশীয় পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছিল। পিণ্ডের উপরে বিস্ফোটকের মত পাঠান ও মোগলের ঈর্দূশ পরিবর্তিত ভারতীয় নগর, গ্রাম ও গৃহাদিতে পূর্ব, দক্ষিণ, মধ্য, উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপের বিজ্ঞেতাদিগের স্থানীয় পদ্ধতির সংমিশ্রণবশতঃ কোন দেশেরই বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় না। উদাহরণস্বরূপ, বম্বে, লঙ্কৌ, কাশী, কলিকাতা, কটক, পুরী ও মাদ্রাজ প্রভৃতি নগরের গৃহাদির সংস্থাপন-ব্যবস্থা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বোম্বাইয়ের স্থলবিশেষের গৃহ সম্পূর্ণ ইউরোপীয় সমুদ্রতীরস্থ গৃহের পদ্ধতি ধারণ করে, যদিও আবহাওয়া শীতগ্রীষ্মাদিভেদে বোম্বাই ও ইউরোপীয় নগরের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ রহিয়াছে। দিল্লী, মিরাত, আগ্রা, লঙ্কৌ, এমন কি কাশী ও কলিকাতারই স্থানবিশেষ, যে কেবলই 'মোগলপুরা' বা 'পাঠান-

পল্লী' নামে পরিচিত তাহা নহে। সম্পূর্ণ ভিন্ন দেশ ও অবস্থা সত্ত্বেও সে-সে স্থানে আজ পর্যন্ত পাঠান ও মোগল দেশ ও সভ্যতারই উপযোগী গৃহাদি দেখিতে পাওয়া যায়।

বিভিন্নদেশীয় পদ্ধতির দ্বারা ভারতবর্ষে নির্মিত গৃহাদি আমাদের পক্ষে নানা বিষয়ে অনিষ্টকর। তাহার সম্যক সমালোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়। একটিমাত্র বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা হইবে। দিও নির্ণয় বা বাসগৃহের সম্মুখ ভাগের যথোপযুক্ত দিক-নির্বাচন বাসগৃহের স্বাস্থ্যের পক্ষে অপরিহার্য। রোমক শিল্পী বিট্‌ভিয়াস খৃষ্ট-পূর্ব প্রথম শতাব্দীতে ইতালীয় নগরাদির দিও নির্ণয়-বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে প্রথমতঃ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কেন না, পাশ্চাত্য প্রমাণ না পাইলে আমরা আমাদের শাস্ত্রাদির ব্যবস্থায় আস্থা স্থাপন করিতে পারি না।

'সমুদ্রতীরস্থ নগর ও গ্রামাদি দক্ষিণমুখী বা পশ্চিমমুখী হইলে লোকের স্বাস্থ্যের হানি হইবে, কেননা এরূপ স্থান গ্রীষ্মকালের প্রাতঃকালেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে এবং মধ্যাহ্নকালে এরূপ উত্তপ্ত হইবে যে, লোকের দেহ দক্ষ হইয়া যাইতে পারে। পশ্চিমমুখী নগরী সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে, মধ্যাহ্নে ভীষণ উষ্ণ হইবে এবং অপরাহ্নে উত্তাপাধিক্যে দক্ষ প্রায় হইবে। সে জন্ত এরূপ ক্রমবর্দ্ধিত ও অত্যধিক উষ্ণ বায়ু পরিবর্তন বশতঃ সে-সকল স্থানের অধিবাসীদিগের স্বাস্থ্যহানি হইবে।'

ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানের নগর উপকণ্ঠে অবস্থিত দক্ষিণ ও পশ্চিমমুখী বাংলা নামক গৃহবাসীদের দুর্দশা স্মরণ করিয়াই যেন বিট্‌ভিয়াস এরূপ নির্দেশ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

বিট্‌ভিয়াস নগর ও গৃহাদির দিও নির্ণয়-বিষয়ে চিকিৎসক প্রভৃতির মতও উদ্ধৃত করিয়াছেন। উত্তরমুখী, দক্ষিণমুখী ও পূর্বমুখী গ্রাম, নগর ও গৃহাদি স্থলবিশেষে সাঁাৎ-সাঁাতে স্থানেও নির্মাণ করিবার ব্যবস্থা তিনি দিয়াছেন। কেন-না জলনিষ্কাশণ প্রভৃতি উপায়ে এরূপ স্থলস্থ গ্রাম-নগরাদির স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্ভব, কিন্তু দিও নির্বাচনের ক্ষতি কোন প্রকারেরই প্রতিকারসাপেক্ষ নহে। গৃহাদির সংস্থাপন বিষয়েও বিট্‌ভিয়াস ব্যবস্থা দিয়াছেন।

'সমুদ্রতীরস্থ গ্রাম নগরাদির বিপণিস্থান বন্দরসংলগ্ন হওয়া আবশ্যক। কিন্তু যে-সকল গ্রাম নগর ভূমধ্যস্থ তাহাদের বিপণিস্থান কেন্দ্রস্থলেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জুপিটার, জুনো ও মিনার্তা প্রভৃতির মন্দির নগরাদির সর্বস্থান হইতে দৃষ্ট হইতে পারে এরূপ প্রসিদ্ধ উচ্চস্থানে করিতে হয়। মার্করীর মন্দির বিপণি-

মধ্যস্থ। ইসিস্ ও সেরাপিস্ মন্দির সর্বসাধারণের সম্মেলনোপযোগী উদ্যানাদিতে, এবং আপলো, ও বেকাসের মন্দির রজমকের সন্নিকটস্থ হওয়া উচিত। মক বা ক্রীড়াস্থান যে-সকল গ্রাম নগরে নাই সেই সেই স্থানে হারকিউলিসের মন্দির সার্কাস বা মণ্ডলীর নিকটে করিতে হয়। ভিনাসের মন্দির সিংহদ্বার নিকটস্থ এবং মাসের মন্দির নগরাদির বহির্ভাগের উপকণ্ঠ প্রদেশে করিতে হয়। সিরিসের মন্দির নগরের বহির্ভাগস্থ এরূপ নির্জন স্থানে হওয়া আবশ্যক যেখানে লোক সাধারণতঃ পূজা বাতীত অশ্রু কারণে গমনাগমন করে না।'

মানসার শিল্পশাস্ত্রের ব্যবস্থা অনুসারেও শ্বশানকালিকা, বসন্তরোগ-উপশমকারিণী শীতলাদেবী প্রভৃতির মন্দির নগর ও গ্রাম প্রভৃতির বহির্ভাগে দূরস্থ নির্জন স্থানে নির্মাণ করিতে হয়।

বিট্‌ভিয়াসের ব্যবস্থা অনুসারেও চাণক্যের উপদেশরূপে পরিচিত পঞ্চলক্ষণহীন স্থান গ্রামনগরাদি বাসস্থানের উপযোগী নহে। গ্রাম নগরাদি সংস্থাপনের পূর্বে মনোনীত স্থানের বায়ুর বিশুদ্ধতা, খাদ্যসামগ্রীর প্রচুর সরবরাহ, নদী, সমুদ্র ও পথাদি দ্বারা যাতায়াতের ও বাণিজ্যাদির সুবিধা এবং ধনী ও রাজপুরুষাদির উপস্থিতি দ্বারা সংরক্ষণের ব্যবস্থা বিট্‌ভিয়াসও দিয়াছেন।*

এরূপ পাশ্চাত্য প্রমাণ দ্বারা যদিও আমাদের শাস্ত্রাদির অনুশাসন সপ্রমাণ করিতে পারা যায়, তথাপি লোকের আর্থিক অবস্থা এবং মিউনিসিপালিটি প্রভৃতি কর্তৃপক্ষের অজ্ঞতা ও কুশাসনের ফলে নগরাদির পল্লীসংস্থাপনে এমন কি বিনা ব্যয়ের বায়ুর বিশুদ্ধতার দিকেও লক্ষ্য রাখা হয় না। অত্যন্ত পরিহাস ও দুর্ভাগ্যের বিষয় যে বড় বড় প্রাচীন নগর-নগরীর টাউন ইমপ্রুভমেন্ট (নগরসংস্কারক) নামক শাসক-মণ্ডলী দ্বারাই এলাহাবাদ প্রভৃতি নগরে শহরের আবর্জনা ও পুরীষাদির দ্বারা পরিপূরিত গর্ভসমূহকে সমতল করিয়া তাহারই উপর নূতন পল্লী সংস্থাপিত হইতেছে। বলা বাহুল্য, তাদৃশ পল্লীতে বায়ুর বিশুদ্ধতা কখনও হইতে পারে না, ঔষধাদির সংমিশ্রণে ও কালক্রমে ময়লা মাটির সহিত মিশিয়া গেলেও তত্রস্থ স্থানের বায়ু সদাসর্বদাই পুতিগন্ধ-মিশ্রিত হইয়া অধিবাসীদিগের স্বাস্থ্যের হানি অজ্ঞাতভাবে

* বিশেষ বিবরণের জন্য বিট্‌ভিয়াস প্রভৃতি হইতে উদ্ধৃত ব্যবস্থার সমালোচনা দেখকের 'ভারতীয় বাস্তবশাস্ত্র' নামক গ্রন্থের অধ্যায় ৪, পৃ. ১৪২-১৪৩, ১৪৬-১৪৭, এবং অধ্যায় ২, পৃ. ৩৬-৪০ দেখিয়া।

মানসার শিল্পশাস্ত্রের অধ্যায় ৩, ৪, ৫, ৭, ৯, ১০, ৪০, মূল পৃ. ৬-২৫, ৩২-৫৬, ২৭৪-২৭৯ এবং ইংরেজী অনুবাদ পৃ. ১১-৫৭, ৬৩-৯৮, ৪২৩-৪৩১ দেখিয়া।

করিতে থাকিবে। আমাদের তথাকথিত ট্রাষ্ট বা বিশ্বাস-ভাজনতা এবং মিউনিসিপাল বোর্ড দ্বারা নগর-রক্ষকতা বস্তুতঃ একরূপ ভাবেই সম্পাদিত হইয়া গিয়া যমুনা সরস্বতী সঙ্গমস্থ ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্যকর প্রাচীন তীর্থরাজ প্রয়াগ নগরের মোগলদিগের দ্বারা পরিবর্তিত ফকিরাবাদ বা এলাহাবাদের ইমপ্রুভমেন্ট বা উন্নতি জগতে সুসভ্য ব্রিটিশ আমলেও নির্বিক্রমে হইয়া আসিতেছে। আমাদের বর্তমান রাজশক্তি যে নগর-সংস্থাপন বা তাহাদের প্রকৃত সংস্কার বা উন্নতিবিধান না বুঝিতে পারে তাহা নহে। কিন্তু স্থানীয় লোকের প্রকৃত স্বাস্থ্যবিধান অর্থক্লান্ততার দোহাই দিয়া হইতে পারে না। 'রাজকর্মচারী'সমূহ ও 'ধনিক' লোকেরা তাদৃশ পূতিগন্ধময় স্থানে বাস করে না। তাহাদের জন্ত সিভিল লাইন, মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর পল্লী-সমূহ রিজার্ভ থাকে। এমন কি নগর-নগরীর তত্ত্বপল্লী-সমূহের বিপণি প্রভৃতিতে পর্যুষিত খাদ্যাদ্যমগ্রীর সরবরাহ পর্যন্ত হইতে পারে না। কুষ্ঠাদি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত লোকে সরুপ পল্লীর নিজগৃহেও স্থলবিশেষে বাস করিবার অন্তর্গতি পায় না। নগরশাসক ও সংস্কারকদিগের একরূপ বিশ্বাসভাজনতা রক্ষার ফলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের নগরস্থ বাসগৃহের স্বাস্থ্যহীনতা অবশ্যভাবী। লোকগণনায় দেখা গিয়াছে যে, কলিকাতা বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় শহরে শিশুর মৃত্যুসংখ্যা হাজারে পাঁচ-ছয় শত। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গণনা করিয়া হিসাব রক্ষা করিলে খুব সম্ভব দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, নগরের অধিকতর স্বাস্থ্যকর পল্লীসমূহের অধিবাসীদিগের বা তাহাদের শিশুসন্তানগণের অকাল মৃত্যুর সংখ্যা তাদৃশ অধিক নহে।

বিস্তারিতভাবে সমালোচনার অবসর অভাবেও সম্ভবতঃ পাঠকের পক্ষে এই কথা বুঝা শক্ত হইবে না যে, নগর-সংস্থাপনে, নগরস্থ পল্লী, বীথিকাদি ও বাসগৃহ নিষ্কাণে বৈজ্ঞানিক রীতি ও শাস্ত্রের অনুশাসন প্রায় কোথাও প্রতিপালিত হইতে পারে নাই এবং তাহার ফলে নগর ও গ্রামের অধিবাসীদেরও স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে পারিতেছে না। বাসগৃহের কক্ষসমূহের সংস্থাপনে ও সরঞ্জামাদির মৌলিক বিবেচনায় আমরা কিরূপে ধ্বংসের পথে দিনের পর দিন হ্রাস হইতেছি তাহা হয়ত অনেকের বোধগম্য নহে।

গ্রাম, নগর ও বাসগৃহের সম্মুখ ভাগ নির্বাচন বিষয়ে বায়ু ও উত্তাপাদির উপযোগিতা সম্বন্ধে পূর্বেই সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। বাসগৃহের যে-সকল কক্ষে অধিবাসীরা অধিকাংশ সময় যাপন করে সে-সকল কক্ষে যাহাতে বিস্তৃত বায়ু, সূর্যের কিরণ, আলোক ও উত্তাপ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চালিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা মানসারাদি শিল্পশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। শয়ন-মন্দিরের কোন্ দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলে নিদ্রিতাবস্থায়ও বিস্তৃত বায়ু প্রভৃতির উপকারিতা পাওয়া যাইতে পারে তাহারও ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে। সেজন্ত বাসগৃহের দ্বার, গবাক্ষ ও অলিন্দ বিষয়ে মানসার শিল্পশাস্ত্র বিশেষভাবে ব্যবস্থা করিয়াছে।* এমন কি রন্ধনশালার ধূম, মলমূত্র ত্যাগের স্থানের পূতিগন্ধ যাহাতে বাসকক্ষসমূহে প্রবেশ করিতে না পারে সে বন্দোবস্ত মানসার শিল্পশাস্ত্রের অনুশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল প্রকার বাসগৃহেই দ্রব্যাগার ও গৃহপালিত পশু পক্ষীর স্থানও এমন ভাবে করা হইয়াছে যাহাতে অধিবাসী-দিগের বিশ্রামাদির ব্যাঘাত না হয়। উপরিউক্ত বাসগৃহের কক্ষসমূহেব তালিকা হইতে ইহাও লক্ষিত হইয়া থাকিবে যে পারিবারিক দেবতা-গৃহ বা নিত্যনৈমিত্তিক উপাসনার মন্দির গৃহের সর্বোৎকৃষ্ট কক্ষে স্থাপিত হইত। ইহা ধর্মপ্রাণ হিন্দুর পক্ষে স্বাভাবিক। উদরসর্বস্ব পাশ্চাত্য লোকের বাস-গৃহের সর্বোৎকৃষ্ট কক্ষে ভোজনাগার স্থাপিত হয়, তাহাও স্বাভাবিক।

এই স্বাস্থ্যানুকূল শাস্ত্রীয় অনুশাসন দ্বারা আমাদের বর্তমান বাসগৃহের কক্ষসমূহের সংস্থাপন-রীতি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বস্তুতঃ সন্ত্রাস উপস্থিত হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, নগর, গ্রাম ও গৃহাদির দিও নির্বাচন বা সম্মুখ ভাগ নির্দেশ বিষয়ে রাজনৈতিক কারণ বা বিভিন্নদেশীয় বিজ্ঞেতাদের রাজ্য ও কুষ্টি বিজিতদের উপর দৃঢ়ভাবে সংস্থাপনের অভিপ্রায়ে শাস্ত্রীয় ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বিত হইতে পারে নাই। তাহার পর মুসলমানাদির রাজত্বকালে ধনসম্পত্তি ও যুবতী রূপসী স্ত্রীলোকের রক্ষার জন্ত দ্বার,

* পূর্বেই মানসার শিল্পশাস্ত্রের অধ্যায় ৩৩, ৩৮, ৩৯ : মূল পৃ. ২১৯-২২০, ২৬৫-২৭০, অনুবাদ পৃ. ৩৩৬-৩৩৭, ৪১০-৪২২, এবং শিল্প-শাস্ত্রীয় অভিধানের দ্বার ও গবাক্ষ দ্রষ্টব্য।

গবাক্ষ ও প্রাচীরাদি বিষয়ে অসুধাম্পশ্য করিয়া বাসগৃহ কেবল শহরে নহে গ্রামেও নির্মিত হইয়াছে। বস্তুতঃ উত্তর-পশ্চিম ভারতের যে-সকল স্থানে মুসলমান রাজপুরুষদের ষাভায়াত অধিক পরিমাণে ছিল, সে-সকল স্থানের গ্রামসমূহ কারাগার-বিশেষ, গ্রাম ও নগর পল্লীস্থ বাসগৃহসমূহে দ্বার, গবাক্ষ ও অলিন্দাদির একান্ত অভাব। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সংস্থাপনের পর ধনসম্পত্তি ও স্ত্রীলোকের রক্ষা অনেক পরিমাণে উন্নতিলাভ করিয়া থাকিলেও বিশ্বত শাস্ত্রানুশাসন, বহু শতাব্দীর অভ্যাস, লোকের অর্থের অনটন এবং অন্ধভাবে পাশ্চাত্য রীতিনীতি অনুকরণবশতঃ বাসগৃহের সংস্কার বা কোনরূপ উন্নতিবিধানের আবশ্যিকতাবোধ বা চেষ্টা করা হয় নাই। অন্ধ পাশ্চাত্য অনুকরণের একটা উদাহরণ অনেকের পক্ষে রুচিকর না হইলেও এখানে দেওয়া প্রয়োজন। 'কমোড' নামক পাথরখানা ব্যতীত আমাদের 'আপার' সংজ্ঞক শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে অনেকের মলত্যাগ করা অসম্ভব বা অসুবিধাজনক। কিন্তু 'কমোড' প্রথমতঃ জাহাজাদিতে ব্যবহৃত 'ওয়াটার-ক্লোজেন্ট' নামক নির্দোষ যন্ত্রবিশেষের অনিষ্টকর অনুকরণ। জলপ্রাবন হেতু 'ওয়াটার-ক্লোজেন্ট' হইতে বায়ু দূষিত না করিয়া ত্যাগমাত্রই ময়লা দূরীকৃত হয়। শুধু 'কমোড' হইতে সেরূপ হইতে পারে না। পাশ্চাত্য নগর-নগরীর যে-যে স্থানে ফ্লাশিং বা জলপ্রবাহদ্বারা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই ময়লা দূরীকৃত হইয়া যায়, সে-সকল স্থানেই 'ওয়াটার-ক্লোজেন্ট' ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অভ্যাসবশতঃ পাশ্চাত্য রাজপুরুষেরা জলসঞ্চালনহীন ভারতের নগর গ্রামেও কমোডের প্রচলন আরম্ভ করিয়া দুর্ভাগা লোকদ্বারা মলমূত্র দূরীকরণের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের অনুকরণে আমাদের 'আপার' সংজ্ঞক লোকদের মধ্যে অনেকেই শয়নাগারের সম্মিহিত একই কক্ষে স্নানাগার ও ঈদৃশ মলমূত্র ত্যাগের 'কমোড' সংস্থাপন করে, যাহাতে অনটন বা বায়ু-সঙ্কোচের ইচ্ছাবশতঃ মেথরের বিরল আগমন হেতু

পয়ুষিত সঞ্চীকৃত মলমূত্রের উপরেই বারংবার মলমূত্রত্যাগ করা হয় এবং স্নানকার্য্য সমাপ্ত করিয়া দেহের আন্তরিক ও বাহ্যিক মল দূর করা হয়। তদ্বারা কেবল শয়নমন্দির নহে, অপর কক্ষসমূহ এবং সমগ্র বাসগৃহেরই বায়ু দূষিত করিয়া, আমাদের অনুকরণ-তফার পরিতৃপ্তি করা হয়। হিউমিডিটি বা বায়ুতে জলকণার ত্রায় ঈদৃশ বাসগৃহের বায়ুর মলকণা মাপিবার যন্ত্র থাকিলে বুঝিতে পারা যাইত মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নিঃশ্বাসের সহিত কি পরিমাণ মলমূত্র আমরা প্রকৃতপক্ষে গলাধঃকরণ করি।

আহার ও পরিধেয়াদি বিষয়েও আমাদের ঈদৃশ মূঢ়তার উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় বাসগৃহের দিগ্‌নির্নয় ও সংস্থাপন বিষয়ে প্রথমতঃ আমাদের অজ্ঞতা দূর করিতে না পারিলে যে-যে স্থানে বা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সম্ভব সে-সে স্থলেও কোনরূপ সংস্কার বা উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না। আর্থিক কারণে আমাদের যথোপযুক্ত অন্তঃস্থাদির সংস্থান হইতে পারিতেছে না। অজ্ঞতাংশতঃ বাসগৃহ সম্বন্ধে কোনরূপে মাথা গুঁজিবার স্থান ব্যতীত অধিক কিছুই আকাঙ্ক্ষ্যমাত্রই আমাদের নাই। বিস্তৃত জল আলোক ও বাতাস যাহা আমাদের অজ্ঞতা না থাকিলে একরূপ বিনাব্যয়েই পাওয়া যাইতে পারে তাহাও পাওয়া যাইতেছে না। এই অজ্ঞতা, অলসতা বা অনিচ্ছার অবশ্যস্তাবী ফল লোকের স্বাস্থ্য ও বলহীনতা।

এরূপ অজ্ঞতা দূর করিবার অভিপ্রায়ে ইতালীর মিলান প্রভৃতি নগরে প্রাতিবৎসরই বিভিন্ন দর্শীয় বাসগৃহ-সমূহের অধুনিক উৎকর্ষ সম্বলিত প্রদর্শনী হয় এবং অধিবাসীদিগকে উৎকৃষ্ট প্রণালীর বাসগৃহ-নির্মাণে সরকারী সাহায্য ও পরিতোষিক প্রভৃতির দ্বারা প্রলুব্ধ করা হয়। এই বিষয়ে আমাদের দেশনায়ক ও শাসনকর্ত্তৃদিগের মনোযোগ সকাতির প্রার্থনা করা যাইতেছে।



निशीथे
शूल चित्र इत्यादि।
श्रीकालिकरत्न योग्य नृदिनर

श्रवामो (अम. कलिकावा)

রবীন্দ্রনাথের পত্র

Buttorton Vicarage,
Newcastle,
Staffordshire.

ও

কল্যাণীয়েষু,

লণ্ডনের গোলমালের পর কিছুদিনের জন্তে পাড়াগায়ে একজন পাদ্রির বাড়িতে আতিথা গ্রহণ করেছি। জায়গাটি সুন্দর। চারিদিকে পৃথিবীর হৃদয় যেন একেবারে শ্রামলতার উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠেছে—এমন ঘন সবুজ আমি কখনো দেখিনি—এ যেন অতলস্পর্শ বর্ণের গভীরতা—চোখ যেন ডুবে গিয়ে কোথাও আর থই পায় না।

যাদের বাড়িতে আতিথা গ্রহণ করেছি তাঁরা মানুষ যেমন ভালো তেমনই তাদের গৃহস্থালীটি মধুর—চারিদিকের লোকের সঙ্গে এবং প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সম্বন্ধটি কল্যাণে ভরা। বস্তু থেকে আরম্ভ করে পশু এবং মানুষ পর্যন্ত কোথাও তাদের নিরলস যত্নের লেশমাত্র বিচ্ছেদ নেই। এই যে নিজের জীবনকে এবং জীবনের চারিদিকে একান্ত সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করা এটা আমার ভারি ভাল লাগে। কারণ পৃথিবীতে ছোট বড় যারই সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ঘটে তার কোনোটিকেই উপেক্ষা করা নিজেরই আত্মাকে উপেক্ষা করা, নিজের শক্তিকে অপমান করা। নিজের প্রতি অশ্রদ্ধার দ্বারাই আমরা পৃথিবীর সর্বত্র অশ্রদ্ধা বিস্তার ক'রে সমস্তকে শ্রীহীন করে তুলি এবং নিজেকে ভোলাবার জন্যে মনে করি এটাই আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ। আমাদের বোলপুর আশ্রমে ঘরে বাহিরে যে অযত্ন পরিদৃশ্যমান হয়ে আছে, তার দ্বারা আমাদের যে গভীর একটা তামসিকতা প্রকাশ পাচ্ছে সে কথা মনে পড়লে বার বার আমার নিজের প্রতি বিকার জন্মে—আবিঃ যখন আমাদের জীবনের মধ্যে আবিভূত হবেন তখন আমাদের ঘরজন্য়ার আসন বসন সমস্তই তাঁর সংবাদ জানাতে থাকবে—কোথাও কিছুমাত্র কুশ্রীতা থাকবে না।

রোটেনষ্টাইনের যে একটি চিঠি পেয়েছি সেটি এই সঙ্গে পাঠাই। এর থেকে বুঝতে পারবে আমার লেখাগুলিকে এঁরা সাহিত্যের বিষয় করে রাখেন নি, জীবনের বিষয় করে গ্রহণ করেছেন—সেইটেই আমার পক্ষে সকলের চেয়ে আনন্দের কারণ হয়ে উঠেছে। চিঠিখানি হারিয়ে না

৬৯—১৩

যেমন আদরের সঙ্গে তিনি এটি লিখেছেন তেমনই আদরের সঙ্গে আমি এটিকে রক্ষা করতে ইচ্ছে করি।* ইতি ৬ই আগষ্ট ১৯১২

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

কল্যাণীয়েষু,

অজিত, মনে করেছিলুম এ-সপ্তাহে তোমাদের কিছু লিখে পাঠাব কিন্তু এখানকার লোকের ভিড়ের মাঝখানে কলম চালানো দুঃসাধ্য। সময়ের অভাব ব'লে নয় কিন্তু মনটা বেশ স্থির হয়ে বসতে চাচ্ছে না। বত্রিশ সিংহাসনে না চড়ে আমি সামান্য কিছুও লিখতে পারিনি—সেখান থেকে নামলেই আমার রাখালী ধরা পড়ে। আমার ভিতরকার একটা মন আছে তারই হাতে যখন সম্পূর্ণ হাল ছেড়ে দিয়ে বসি তখনই আমার লেখা এগোয়—আমার বাইরেরকার মানুষটা একেবারে কোন কাজের নয়। সে কিছু বোঝেও না, কিছু বলতেও পারে না—সে একটা অশিক্ষিত অক্ষম অজ্ঞ মানুষ—সে সামান্য বা কিছু শিখে সে কেবলমাত্র সেই অন্য মানুষটার সঙ্গে থেকে। সেই জন্যই কোনো কাজের মত কাজ করতে গেলে আমার এত অবকাশের দরকার হয়। আমি এক এক বার ভাবি কবিমাত্রকেই কি এমনি জুড়ি হাঁকিয়ে চলতে হয়—না, এই সার্কাসের কসরৎ কেবল আমারই ভাগ্যে ঘটেছে? মোটের উপর দেখা যায় সব দেবতারই বাহনগুলো জন্তু—কারো বা গরু, কারো বা মোষ, কারো বা মেঘ—আমার ভিতরকার দেবতারও বাহনটা একটা চতুষ্পদ বিশেষ—সে কেবল গুঁতো খেয়ে চলে এবং শব্দ করে গর্জন করে—না পারে বুঝতে, না পারে বোঝাতে। আমার মনে হয় অস্ত্রিজেনের সঙ্গে নাইট্রোজেনের মত বোঝের সঙ্গে অবোধতার, দেবতার সঙ্গে পশুর জুড়ি মেলানোয় প্রয়োজন আছে—ওতে আক্ষেপ করবার কারণ নেই। দুঃখের বিষয় দেবতার দর্শন পেতে সাধনার দরকার হয় আর বাহনটা আপনি-ই চার পা তুলে দেখা দেয়। ইতি ১৪ই আঘাট ১৩৩৯

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* চিঠিখানি কোথাও হস্ত রক্ষিত আছে কিন্তু আপাতত অজ্ঞাত-বাসে। রবীন্দ্রনাথ

মীনাবাজার

শ্রীকালিকারঞ্জন কামুনগো, এম-এ, পিএইচ-ডি

ষাহারা আগ্রা-হুর্গ দেখিরাছেন মুসলমান পাণ্ডারা নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে আকবর বাদশার মীনাবাজারে না লইয়া গিয়া ছাড়ে না ; সম্ভবতঃ ঐ বাজার সম্বন্ধে সত্য-মিথ্যা নানারকম সরস গল্পও শুাইয়া থাকে। আমিও ঐ জায়গা অন্ততঃ পাঁচ-ছয় বার দেখিরাছি। ঐ স্থানে দাঁড়াইলেই টড-বর্ণিত খুশরোজের কথা স্বতঃই মনে পড়ে। যমুনা-তীরে যোগলের নব-বৃন্দাবা এই অগ্রবা হুর্গেই নওরোজের উৎসবে রূপের হাট বসিত ;—যেখানে দিল্লীর ছিলো পার্শ্ববর্তী অপর্যায় বস্তুর একমাত্র ক্রেতা—আমদিত রাজপুত নারীর সতীত্বপহারক] স্মৃতিত দৃশ্য। এই মীনাবাজার হইতে একদিন বিকানীর-রাজ রায়সিংহর পত্নী সম্রাট-প্রদত্ত হীরাজহরতের কলঙ্ক-পসরা মাথায় লইয়া ফিরিয়াছিলেন। এইখানেই রায়সিংহর কমিষ্ঠ ভ্রাতা বীর ও কবি পৃথ্বীরাজের স্ত্রীর প্রতি লালসালোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া আকবর একবার বিদে পড়িয়াছিলো। সেদিন বিধ্বংসী সম্রাটের স্বদয় সতীর তেজোদৃশু চাহনি ও শানিত ছুরিকার সম্মুখে আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। তিনি শপথ করিলেন কোন শিশোদিয়া রাজপুতীর উপর ভবিষ্যতে কুদৃষ্টি করিবো না। ষাহারা পরাজিত হইয়া সম্রাটের বগুতা স্বীকার করিতেন, তাঁহাদিগকে নাকি এই মীনাবাজারে কুলস্তুী পাঠাইতে হইত। এজন্য বৃন্দীপতি রাও সুরজন এবং সম্রাট আকবরের মধ্যে যে সন্ধি হইয়াছিল, উহাতে অন্যান্য সর্তের মধ্যে ইহাও লিখিত ছিল, হাড়-বংশীয়েরা কোন দিন যোগলকে কন্যাদান করিবে না, কিংবা নওরোজের উৎসবে স্ত্রীলোকদিগকে পাঠাইবে না।*

আকবর বাদশা ব্রজভাষায় কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার নামের ভণিতায়ুক্ত, কয়েক ছত্র হিন্দী কবিতা পাওয়া গিয়াছে। সংগ্রহকার—“মিশ্রবন্ধু”—টিপ্পনী

* Tod's Rajasthan, i. 318, 319 ; ii. 452. Vamsa-bhaskar in Hindi, p. 2264.

করিয়াছেন ঐগুলি “সম্ভবতঃ” মীনাবাজারে বলাৎ গৃহীত কোন সুন্দরীর অবস্থা-বিশেষের বর্ণনা।* শুনিয়াছি বৃন্দাবনে গেলে নাকি ভক্ত বৈষ্ণব অশ্রু-নদী প্রবাহিত করিয়া মাটিতে গড়াগড়ি দেয়। ষাহাদের ইতিহাসের বাতীক আছে, প্রথমবার দিল্লী, আগ্রা, সারনাথ, তক্ষশীলা গেলে তাঁহাদের ঠিক ঐ দশা না হইলেও কিঞ্চিৎ ভাবান্তর উপস্থিত হয় সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিক কবি হইয়া উঠে, অর্থাৎ তাঁহার বিচার-বুদ্ধি লোপ পায় ; যুগ-যুগান্ত ধরিয়া প্রবহমান স্মৃতির উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস প্রাণ আকুল করিয়া তোলে ; ভাবের উদ্বেল তরঙ্গ জ্ঞানের বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া অধীত বিদ্যাকে মুহূর্তের জন্য তৃণের মত ভাসাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু আগ্রা-হুর্গের ঐ নিতান্ত অপরিমিত স্থানে বোধ হয় মীনাবাজারে বসিত না ; বসিলেও উহার মধ্যে এতখানি কাব্য কিংবা রোমাঞ্চের অবকাশ ছিল না। † পুরাতন বিদ্যা বিচারের কষ্টপাথরে ‡ শাণাইতে গিয়া জ্ঞান হইল জনশ্রুতি-প্রতারিত মহাত্মা টউ ইতিহাসের মরুপ্রান্তরে অজ্ঞাতসারে বে-সমস্ত মনোরম মৃগতৃষ্ণিকার সৃষ্টি করিয়াছেন, খুশরোজের বাজার বা মীনাবাজার উহারই অন্যতম।

প্রথম কথা, মীনাবাজার নামটির উৎপত্তি কোথায় † আকবরের ‡ সমসাময়িক ঐতিহাসিক বদায়ুনী নওরোজের উৎসবকে নওরোজ-ই-জলালী † এবং বাজারকে দোকানা-ই-ই-নওরাজী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; কোথাও মীনাবাজারের নামগন্ধ নাই। দরবারি ঐতিহাসিক নিজাম-উদ্দীন আহমদের ‘তবকাৎ-ই-আকবরী’ ‡ গ্রন্থে নওরোজকে নওরোজ-ই-মুলতানী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে ; মীনাবাজার শব্দটি কোন স্থানে ব্যবহার হয় নাই। আবুল-

* Misrabandhu Vinode in Hindi, i. 284.

† Badayuni, Pers. text, ii. 321, 338, 342, 356, 365, 390.

‡ Tabaqat-i-Akbari, Pers. text, Nowalkisho Press, pp. 353, 354, 365, 371.

ফজলের 'আকবরনামা'তেও* মীনাবাজারের কোন উল্লেখ নাই। জেহুইট পাদ্রীরা এবং কয়েক জন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী আকবরের সময় এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও মীনাবাজার কিংবা তৎসম্বন্ধে কোন বাজারী গল্প লিখিয়া যান নাই। আবুল-ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'র স্যর সৈয়দ আহমদ কৃত সংস্করণে† আইন-ই-খুশরোজের পাশে ছোট অক্ষরে লেখা আছে—ইয়ানে মীনাবাজার। ব্রকম্যান সাহেবও 'আইন-ই-আকবরী'র ইংরেজী অনুবাদে লিখিয়াছেন—“Khushroz, or Day of Fancy Bazar.”‡ কিন্তু যেখানে মূলগ্রন্থে 'মীনাবাজার' শব্দ নাই সে-স্থলেও তিনি অনুবাদে 'Fancy Bazar' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। শুধু এ-স্থানে নয়; বদায়ুনী হইতে উদ্ধৃতাংশের অনুবাদে—যেখানে মূলে দোকানাহা-ই-নওরোজী লেখা আছে, তাহার অনুবাদ করিয়াছেন “Stalls of the Fancy Bazar.”** ইহাতে সন্দেহ হয়, 'আইন-ই-আকবরী'র মূল পাঠে মীনাবাজার শব্দ ছিল না এবং আকবরের সময় খুশরোজের বাজারকে মীনাবাজার বলা হইত না। আগ্রা-ভূর্গের অমরসিং দরওয়াজা ও ফতে-খুর-সিক্রির যোদ্ধাঈ-মহলের মত ইহাও লোকপ্রচলিত মিথ্যে নাম। যাহা হইক মীনাবাজার শব্দটি আকবরের সময় অপ্রচলিত ছিল প্রমাণিত হইলও বাদশার কলঙ্ক ভঞ্জন হয় না। টড্ সাহেব আকবর-চরিতের উপর যে কুৎসার মীনাকারী করিয়াছেন, তাহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা বিচার করা যাক। রাঠোর রায়সিংহের § পত্নীর সহিত বাদশার কাভিচার ও পৃথ্বীরাজের স্ত্রীকে কবলিত করিবার চেষ্টা

সম্পূর্ণ কাল্পনিক জনশ্রুতি; মহারাণা প্রতাপের কাছে লিখিত পৃথ্বীরাজের উদ্দীপনাময়ী কবিতা-লিপির ত্রায় সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। 'মিশ্রবন্ধু-বিনোদ' গ্রন্থে উদ্ধৃত পদগুলি আকবরের রচনা হইতেই পারে না।

সাহি অকবর বালকী বাহ অচিস্ত গহী
চলি ভীতর ভোনে;
হুমরি দ্বারহি দীঠি লগায়কে ভাগিবে কে,
ভ্রম পাবত গোণে।

কেননা “সাহি অকবর” শব্দকে ভণিতা ধরিলে 'গ্রহণ করা' ক্রিয়ার কর্তাই থাকে না। “অকবর শাহ হ্যাং ললনার বাহ গ্রহণ করিয়া ভিতর ভবন, অর্থাৎ অন্তঃপুরাভিমুখে চলিলেন। সুন্দরী দ্বারদেশে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া পলায়নের চিন্তা করিল; কিন্তু তখন সময় ছিল না।”

অবিকৃত চিত্তে স্বকৃত ছন্দ লিপিবদ্ধ করা সম্প্রতি ফ্যাশন হইয়াছে। আধুনিক তরুণের সাহস আকবর বাদশার নিশ্চয়ই ছিল না।

মীনাবাজার সম্পর্কে টডের দ্বিতীয় প্রমাণ—রাও খুরজন হাড়ার সহিত আকবরের সন্ধি—যাহাতে অন্যান্য সূত্রে মধ্যে ছিল মীনাবাজারে তিনি ও তাঁহার বংশধরেরা পুরস্কীর্ণকে পাঠাইবেন না। এই সন্ধি হইয়াছিল, ১৭৬ হিজরীতে* যখন খুরজন রনখাতোর দুর্গ সমর্পণ করিয়া আকবরের বশত স্বীকার করেন। কিন্তু নওরোজ-উৎসব আরম্ভ হইয়াছিল ১৯০ হিজরীতে। অর্থাৎ নওরোজ আরম্ভ হইবার ১৪ বৎসর পূর্বে রাও খুরজন কি মীনাবাজারের কেলেহারী দিবদৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়া! এই সূত্র আকবরের নিকট হইতে লিখাইয়া লইয়াছিলেন?

আকবরের সপক্ষে ওকালতী করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তিনি যে জিতেন্দ্রিয় নিধলঙ্ক চরিত্র ছিলেন এ-কথা আবুল-ফজল ছাড়া আর কেহ বলিতে পারে কিনা সন্দেহ। আকবর বাদশারও বয়সকালে চরিত্র-দোষ ছিল। তাঁহার চরেরা দিল্লী ও আগ্রার সম্রাস্ত মুসলমান পরিবারের সুন্দরী স্ত্রী-কন্যাদের খবর আনিত। আগ্রায় তিনি এক শেখডীর (বদাহ্) এক সুন্দরী স্ত্রী পুত্রবধূকে

* *Akbar nama*, Eng. trans. Beveridge, pp. 557, 589, 644, 739, 789, 807, 871, 929, 1177.

† Text, p. 159.

‡ *Ain-i-Akbari*, Eng. trans. p. 276.

** *Ibid.*, *Ain-i-Akbari*, p. 104.

§ আকবর রায়সিংহের ভগ্নীকে (১৭৮ হিঃ) বিবাহ করিয়া ছিলেন। রায়সিংহ তাঁহার অধীন লোকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ চাপা দেওয়ার দরুণ তিনি সম্রাটের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পর্যন্ত তাঁহার দরবারে প্রবেশ নিষেধ ছিল। (Beveridge's *Akbar nama*, pp. 1068-69.

* Badayuni, Eng. trans., Lowe, ii. 111.

আকাজ্জা করিয়াছিলেন। বেচার। স্বামী বিবির আঁচলে তিন তালুক বাঁধিয়া দিয়া মনের দুঃখে বিদ্যাচল পার হইয়া গেল। সামাজিক নিন্দা ও অপবাদের ভয়ে শেখজী নীলকর্ণ শৃগালের স্তায় অন্তান্ত লোকেরও নাক-কান কাটাইবার জন্ত বাদশাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যেন তিনি দিল্লীতেও নাগরিকদিগের সহিত বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করেন। একদিন দিল্লীর বাহিরে বেগম-সাহেবার মাদ্রাসার কাছে বেড়াইবার সময় আকবর গুপ্তঘাতকের হাত হইতে * ভাগ্যক্রমে রক্ষা পাইয়াছিলেন। অবস্থা বুঝিয়া তিনি সেদিন হইতে বদ-খেরাল ছাড়িলেন। আকবর নাকি তাঁহার পীর সলীম চিশতীর অন্তরমহলে সরাসরি ঢুকিয়া পড়িতেন। ইহাতে শেখজীর পুত্রের। বাদশার কাছে নালিশ করিয়াছিল, বাদশা এভাবে বাতায়াত করাতে স্ত্রীরা তাহাদের প্রতি উদাসীন হইয়াছে। কিন্তু একবার কোন ব্যক্তি চুরি করিয়াছিল বলিয়া দ্বিতীয় বার তাহার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ হইলে যদি বিনাবিচারে সোজা তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তবে আইনের মর্যাদা রক্ষা হয় না। পাকা ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ মীনাবাজার সম্পর্কে মৌনাবলম্বন করিয়া আকবরের প্রতি সুরিচার না করুন, অন্ততঃ টডের মত অবিচার করেন নাই। যে-সময় আকবর দীন-ই-ইলাহী ও নওরোজ উৎসব প্রচার করেন তখন তাঁহার ধর্ম্যে মতি হইয়াছিল, বৎসরের পরিমাপে তিনি তখন বিগতযৌবন, সুতরাং শেষ-বয়সে তিনি সুন্দরী ধরিবার জন্ত মীনাবাজারের মত যে একটি বাদশাহী ফাঁদ পাতিয়াছিলেন, এ-কথা সহজে বিশ্বাস হয় না। তবে অবশ্য রাজচক্রিত্র স্ত্রীচরিত্রের স্তায় দুঃখের। বয়সের অজুহাত রাজা-বাদশার পক্ষে খাটে না; কেননা কালিদাস বলিয়াছেন, “বিস্ত্রশাণাং ন থলু বয়ঃ যৌবনা-দৃঢ়দস্তি।”

আকবর বাদশার মীনাবাজার আগ্রা কিংবা ফতেপুর-সিক্রির বাদশাহী মহলের কোন অংশে বসিত, ইহা সাব্যস্ত করিতে যাওয়া যে কথা, গড়মান্দারণের মাঠে কোন ভগ্ন শিব-মন্দিরে জগৎসিংহের সহিত তিলোত্তমার

প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করার চেষ্টাও সেইরূপ। নওরোজ সম্বন্ধে সমসাময়িক ইতিহাসে বাস পাওয়া যায় তাহাতে আকবরের চরিত্রের প্রতি কোন ইঙ্গিত নাই। আকবরের কুৎসা-রটনায় পঞ্চমুখ মোল্লা বদায়ুনীও টড-বর্ণিত খুশরোজের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব; ভয়ে নয়, সত্যের খাতিরে।

এইবার নওরোজ অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করিব।

সম্রাট আকবর ও আবুল-ফজল প্রমুখ সংস্কারপন্থী মুসলমানগণের স্বতঃসিদ্ধ ধারণা ছিল, হজরত রহুল-আল্লার প্রতিষ্ঠিত ইন্লাম ধর্মের পরমায়ু হাজার বৎসর পূর্ণ হইলেই, হয় উহা বাতিল হইবে, না-হয় যুগান্তযায়ী নূতন রূপ ধারণ করিবে।

কোরাণ-শরীফ অবতীর্ণ [নাজেল] হওয়ার তারিখ হইতে এই এক হাজার বৎসর শেষ হইয়াছিল ৯৯০ হিজরীতে। ঐ বৎসরেই নব যুগের ও নব ধর্মের “জগৎগুরু” আকবর বাদশা তাঁহার দীন-ই-ইলাহী প্রচার করেন। প্রাকৃতজনের পক্ষে পরব্রহ্ম বা অল-হকের উপাসনা ও উপলব্ধি প্রায় অসম্ভব। এজন্য তিনি তেজোব্রহ্মের প্রতীক সূর্য্য ও অগ্নির উপাসনাই দীন-ই-ইলাহীর বহিরঙ্গ বা কর্মকাণ্ড রূপে প্রবর্তিত করিলেন। দীন-ই-ইলাহী বস্তুতপক্ষে প্রাত্যহিক ধর্ম্যে ও সমাজে সমস্ত বৎসরের বহুমূল সেমেটিক প্রাধান্যের বিরুদ্ধে সনাতন আর্ষ্য ও ইরাণীয় সভ্যতার প্রথম প্রতিক্রিয়া—যাহা নূতন মূর্ত্তিতে পারশ্ব ও তুরকে সম্প্রতি দেখা দিয়াছে। ৯৯০ হিজরীর পরে ইন্লাম হিন্দুস্থানের একমাত্র রাজকীয় ধর্ম্য রহিল না। ইহার সঙ্গে ইন্লামী চান্দ্রমাস, হিজরী সাল রাজানুশাসনে অপ্রচলিত হইয়া গেল। ইহার পরিবর্তে আসিল সৌর মাস, ইলাহি সাল এবং দুই মুসলমানী জন্মের পরিবর্তে প্রাচীন পারস্যের বার মাসের তের জন্ম।

মেঘরাশিতে সূর্য্যের সংক্রমণের দিন ছিল ইলাহি বৎসরের নওরোজ বা New Year's Day. নওরোজ হইতে আরম্ভ হইয়া উনিশ দিন পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যে সার্বজনীন অখণ্ড মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইত। প্রথম মাসের প্রথম দিনে নওরোজ এবং উনিশ তারিখেই—যেদিন দিবারাত্রি

* Lowo, ii. 59-60.

সমান হইয়া সূর্যের উত্তরায়ণ (vernal equinox) আরম্ভ হইত অর্থাৎ (রোজ-ই-শরফ)—এই দুই দিনে সর্ষাপেক্ষা বেণী জঁকজমক হইত।

১১০ হিজরীর নওরোজ (১১ই মার্চ, ১৫৮২ খৃঃ) উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল আকবরের নবনির্মিত রাজধানী কতেপুর-সিক্রিতে। আগ্রা-তুর্গে কোন বৎসর খুশরোজের বাজার আদৌ বসিয়াছিল কিনা সন্দেহ। কোন ইতিহাসে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। তবে আজকাল নূতন ও পুরাতন দিল্লীর মত আগ্রা ও কতেপুর আকবরের সময় প্রায় এক শহর ছিল। নওরোজের সময় আগ্রা ও কতেপুর শহরের দোকানপাট উৎসবের সন্ধ্যায় ও রাত্রে নানা বর্ণের আলোকমালায় সুশোভিত হইত।

প্রথম বৎসর ১৮ দিন বাপী (১১ই মার্চ ১৫৮২—২৯ শে মার্চ ১৫৮২) নওরোজের উৎসব-মণ্ডপ নিশ্চিত হইয়াছিল কতেপুর-সিক্রির দেওয়ান-ই-আমের ময়দানের চতুর্পার্শ্বস্থ দুর্গপ্রাচীর-সংলগ্ন ১২০টি বারান্দায়। সম্রাট উৎসব-মণ্ডপের সাজসজ্জা ও তহাবধানের ভার আমীরগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। সম্রাট এক-এক দিন এক-এক জন আমীরের 'ঠলে' অতিথি হইতেন। সেদিনকার বাদশাহী ভোজের ভার পড়িত সেই আমীরের উপর। নওরোজের বাজার মণ্ডপে একদিন সর্ষাধারণের জন্ত খেলা থাকিত।

স্ত্রীলোকেরা নওরোজের উৎসব-মণ্ডপে প্রথমবার আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন দুই বৎসর পরে তৃতীয় নওরোজের সময়। এইবার কতেপুর-সিক্রি হইতে চার মাইল দূরে হামিদা বানুর উদানে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উৎসবের প্রথম কয়দিন নওরোজের বাজার সর্ষাধারণের জন্ত খেলা ছিল। তাহার পরে পুরুষদের যাওয়া-আসা নিষিদ্ধ হইল। [মদুম-রা মানা আমদ] সম্রাটের মা হামিদা বানু, পিসি গুলবদন বেগম ও বাদশাহী মহলের অন্যান্য বেগম ও আমীরদের পরিবার উৎসব-মণ্ডপে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাহাদিগকে প্রায় এক লক্ষ টাকার নজর ও খেলাও দেওয়া হইয়াছিল। বদায়ুনী বলেন, এই সময় বেগমেরা তাহাদের ছেলেমেয়ের সন্ধ্যা স্থির করিতেন।

নওরোজের প্রথম তিন চারি বৎসরের মোটামুটি বিবরণ আমরা সমনাময়িক ইতিহাসে দেখিতে পাই। ইহার পরে

শুধু নওরোজের উল্লেখমাত্র আছে। কিন্তু খুশরোজ কিংবা মীনাবাজার সম্বন্ধে কোথাও কোন উল্লেখ দেখা যায় না। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে “মিহির জান” নামক এক উৎসবের কথা একোয়াভাইভা (Rudolfo Aquaviva) নামক জেসুইট পাদ্রী লিখিয়া গিয়াছেন, যথা—

“A new Easter has been introduced called *Merjan* on which it is commanded that chiefs be dressed out in state and listen to music and dances. The Muhammadans were very much scandalized and would not imitate the observers of the feast.”*

মীনাবাজার বা খুশরোজের বাজার কখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ঠিক বলা যায় না।

মীনাবাজার বা খুশরোজের বাজার নওরোজ উৎসবের তৃতীয় দিন এবং প্রত্যেক মাসিক ঈদের তৃতীয় দিনে বসিত। ঐ সম্বন্ধে একমাত্র সমসাময়িক বিবরণ পাওয়া যায় আবুল-ফজলের ‘আইন-ই-আকবরী’ গ্রন্থে। উহার ব্রহ্মমান কৃত ইংরেজী অনুবাদের কিয়দংশ—

“On the third feast-day of every month, His Majesty holds a large assembly for the purpose of enquiring into many wonderful things in this world. The *merchants of the age* are eager to attend and lay out articles from all countries. The people of His Majesty's harem come, and the women of other men also are invited, and buying and selling is quite general. His Majesty uses such days to select any articles he wishes to buy, or to fix prices of things..... After the Fancy-bazar for women bazars for men are held. His Majesty watches transactions,....bazar people on such occasions, may lay their grievances before His Majesty without being prevented by the mace-bearers...”†

উল্লিখিত অনুবাদে কোন স্ত্রী-দোকানদার বা দোকানদারের স্ত্রীর কথা নাই। তবে কি অসূর্য্যাম্পশা বেগমেরা বেপদা হইয়া পুরুষ-দোকানদারগণের নিকট হইতে জিনিষ কিনিতেন? ইহা অতি অসম্ভব বাপার।

ভাবরাজ্যে আকবর বাদশাহী সেকালের তুলনায়

* *J. A. S. B.*, 1896 ; paper by E. D. Maclagan, p. 57.

† ব্রহ্মমান সাহেবের অনুবাদে ভুল ধরা আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা হইলেও এখানে কিঞ্চিৎ গোলমাল হইয়াছে। ‘আইন-ই-আকবরী’র লক্ষ্য-সংস্করণে আছে,—*Saudagar-i-zaman bar faraz-i-garam bazari nashinad*. ইহার প্রকৃত অর্থ, ‘জমান’র (সময়ের) বাজার গরম হইয়া উঠে। যদি ক্রিয়াপদে একবচন না থাকিয়া বহুবচন থাকিত তবে ব্রহ্মমান সাহেবের অর্থ হয়ত কোন রকমে টকিত। এ স্থলে স্ত্রীর সৈয়দ আহমদ কৃত সংস্করণের পাঠই শুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। উক্ত পাঠে ক্রিয়া ও বহুবচন আছে। তাহার পাঠ *Saudagar-zanan* অর্থাৎ স্ত্রী-ব্যবসায়ীরা। গ্লাউউইন সাহেবের অনুবাদ “সওদাগরগণের” স্ত্রীগণ—যাহা টুড গ্রহণ করিয়াছেন—শুদ্ধ নয়।

কামাল পাশা কিংবা আমানুল্লাহর মত অতি-আধুনিক হইলেও স্ত্রীলোকের পর্দা ও স্বাধীনতা বিষয়ে তিনি ছিলেন সত্যতঃপন্থী মুসলমান। তাহা না হইলে স্ত্রী-পুরুষের জন্ত বিভিন্ন সময়ে মেলার ব্যবস্থা থাকিত না। তবে এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, আকবরের ফতেপুর-সিক্রি তদারজিলিং কিংবা স্ত্রী-রাজ্য ছিল না; স্ত্রী-দোকানদার হ্যাং আমদানী হইত কোথা হইতে? শুনিয়াছি রামপুর-রাজ্যের ভূতপূর্ব নবাব বাহাদুর রামপুর প্রাসাদে মীনাবাজার বসাইতেন। সমস্ত ভারতবর্ষের সওদাগর ঐ বাজারে মাল পাঠাইত। প্রত্যেক জিনিষের সহিত দাম লেখা থাকিত। সওদাগরেরা বড়ী স্ত্রীলোকদিগকে

নিজেদের টাল প্রতিনিধি রূপে বসাইয়া দিত। বস্ত্রের মীনাবাজারে বাসন্তী রং কিংবা যে ঋতুতে বাজার বসিত সে ঋতুর অস্থায়ী গোলাপী বা জাফরাণী রঙের কাপড় পরিয়া সকলকে ঐ বাজারে যাইতে হইত। রাজা পিতৃস্থানীয়—হুতরাং রাজার কাছে পর্দার আবশ্যক নাই। সেজন্য নবাব বাহাদুর ছাড়া অন্য পুরুষ মেয়েদের মেলায় যাইতে পারিত না। হয়ত আকবরী মীনাবাজারে রামপুরের মীনাবাজারের মত ব্যবস্থাই ছিল। আকবরের মীনাবাজার সম্বন্ধে কুৎসার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি না থাকিলেও মন্থ্য-চরিত্র একটি ব্যাপারে অপরিবর্তিত রহিয়াছে—“বখা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুভ্য দুর্জনো জনঃ।”

বিধবার সজ্জা

শ্রীশাস্তা দেবী

শমীন্দ্র বলিল,—“সংসারের এত খরচপত্র সামলে ওঠাই দায়। এর উপর নূতন একটা ভার ঝড়ে পড়লে কি ক’রে পেরে উঠব বুঝতে পারছি না।”

উন্মিল্লা হাটু নাড়া দিয়া কোলের খোকাকে ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে বলিল, “বে কাজ করতেই হবে, তা খুসী মনে করাই ভাল; তা নিয়ে অত মনমরা হয়ে থাকলে ত চলবে না। এ তোমারই কাজ, সকলের আগে তোমাকেই এগিয়ে যেতে হবে।”

লম্বা চিঠিখানা আগাগোড়া আর একবার পড়িয়া ক্রুদ্ধিত করিয়া শমীন্দ্র বলিল, “বাপের বাড়িতেই বরং কিছুদিন থাকুন। আমার এখানেও খরচ, সেখানেও খরচ, তোমার হ্যান্ডামা না বাড়িয়ে আমি তেল-টাকাটাই না-হয় সেখানে পাঠিয়ে দেব।”

নক্সাকাটা কাঁথার তলায় দুই পাশে দুইটা পাশ-বালিশ গুঁজিয়া দিয়া ছেলেকে ধীরে ধীরে কাৎ করিয়া শোয়াইয়া উন্মিল্লা চাপা গলতেই বলিল, “না, না, না, ও-সব কাজ যাই। টানাটানির সংসার থেকে আমরা

অতগুলো করুকরে টাকা বার ক’রে পাঠাব আর সাত-ভূতে খেয়ে উড়িয়ে দেবে, সে আমি কিছুতেই সহ্যে পারব না। তুমি কি মনে কর কেবি ছবির পেটে অর্ধেকও যাবে? সব ওই হা-বরে হাঙ্গরের গুটির ভোগে লাগবে। বাপ-মাই যখন নেই, তখন আবার বাপের বাড়ি কিসের? এ আমরা দুটিতে ছেলেকিলে মিয়ে বেশ থাকব। তোমাকে তার জন্ত কিছু ভাবতে হবে না।”

অসমাপ্ত দিবানিদ্রা ফেলিয়া চিঠিখানা হাত করিয়া উঠিয়া শমীন্দ্র বলিল—“বাই-তবে, তাই লিখে দিগিয়ে। কিছু দিন ত থাক, তারপর যেমন দাঁড়ায় অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।”

উন্মিল্লাও বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। শরৎকালের অপরাহ্নে; অর্ধেক আকাশ জুড়িয়া রৌদ্র ঝলমল করিতেছে, কিন্তু পূর্ব কোণে বর্ষগামুখ ধূমল মেঘ-ছলিয়া ছলিয়া উঠিত ছ, বেন উন্মিল্লারই অশ্রু-হানিভরা মনের ছয়া। তাহার একলার সংসারে

এতদিন পরে বাল্যসখী আসিয়া তাহারই সুখদুঃখের সাগী হইবে, মনের কোণে সঞ্চিত যত কথা তাহার কানে ঢালিয়া দিয়া কি আনন্দে দুই জনে তাহার রস-উপভোগ করিবে ভাবিয়া উন্মিলার সঙ্গীহীন মন আপনি হাসিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু মনের একটা কোণে অশ্রু যে স্রোত হইয়া আছে আজ দুই মাস ধরিয়া। সখীকে দেখিয়া সে-অশ্রু কি উন্মিলা সংবরণ করিতে পারিবে ?

সাঁওতাল পরগণার জলসীন বাতটে শৈশবে যখন তাহারা দুই সখীতে খেলা করিত, শুষ্ক বায়ুময় নদীগর্ভ পার হইয়া ওপারে শালবন, ধানক্ষেত ও কাঁকুরে ঢিপি পাহাড়ে প্রজাপতির মত লঘু মন লইয়া চঞ্চল চরণে ছুটিয়া বেড়াইত, তখনকার অনাবিল ভালবাসা লোকে বলে সংসারে টিকে না। কিন্তু দৈবগুণে কিশোর বয়সে সে যখন বাল্যসখী জয়ন্তীরই দেবরের বধু হইয়া আসিয়া আবার এক-বাড়িতেই উঠিল তখনও সখীতে সখীতে গলাগলি ভাব ও পার্কত ঝগড়ার মত উচ্চল কলহাসি কিছুমাত্র কমিল না। শ্রমবাসাদিত্ত প্রণয়ের গল্প তাহাদের সখোর ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করিয়া তুলিল। দু-জনে দু-জনকে মাজাইয়া তৃপ্তি পাইত না, পরদিন প্রসাধনের প্রশংসা গুনিয়া গুনিয়া পুরাতন হইতে চাহিত না।

ভায়র লক্ষ্মী চলিয়া গেলেন চাকরি লইয়া, কাছেই জয়ন্তীকও উন্মিলার আশ ছাড়িতে হইল। তারপর জয়ন্তীর দুটি ছেলেমেয়ে কেবি আর ছবি, উন্মিলার দুটি ছেলে রুণু ও দীন হইয়াছে। ছেলেমেয়ে ও সংসারের ঝগড়াতে সখীদের প্রত্যাহ দীর্ঘ পত্রবিনিময় ক্রমে মাসে একখানায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, মান অভিমান ভালবাসার গল্পের স্থান জুড়িয়াছে ছেলেমেয়ের সর্দি কাশি হাঁচি। দীর্ঘ অদর্শনের জন্ত বিলাপও কখন অকস্মাৎ থাকিয়া গিয়াছে ; কিন্তু উন্মিলা মনের ভিতর চাহিয়া দেখিল ভালবাসার উচ্ছ্বাস না থাকিলেও টান তেমনি সজোর আছে।

আজ এতদিন পরে সখী আসিবে, কিন্তু এ যে তাহার সে স্বামিসোহাগিনী গরবিনী সখী নয়, এ সর্বভ্যাগিনী ভিখারিণী। দুই মাস হইল তাহার পার্থিব জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ শেষ হইয়া গিয়াছে, অশ্রুর সাগরে আজ তাহাদের দীর্ঘ

প্রতীকার অবসান হইবে। উন্মিলা কিন্তু দুঃখের ভিতরেও সুখের মধুর স্পর্শটুকুর আশা ছাড়িতে পারিতেছে না। তাহাদের ভালবাসা ত এক দিনের নয়। এই সম্পর্ক হইবার পূর্বে তাহারা দু-জনে ত শুধু পরস্পরের ছিল। জীবনে এতবড় রূপান্তরের পরেও জয়ন্তীর কঠোর ব্রহ্মচারিণী মূর্তির অন্তরালে শৈশবের সেই মেহ-উৎস আবার খুঁজিয়া পাইবে উন্মিলার মন বার-বার এই কথা বলিতেছিল।

পুরানো একটা বাগানের মাঝখানে ছোট দুইতলা বাড়ি। একতলায় রান্না ভাড়ার চাকর-বাকর ইত্যাদির স্থান সংকুলান করিয়া বাকী আছে শুধু একটি কাজলা-গোছের বৈকথানা। উপরের তিনখানি ঘরেই সংসারের আর সমস্ত দাবি মিটাইতে হয়। সাত বৎসর আগে পূর্ব-দক্ষিণ দুই দিক খোলা যে-ঘরখানিতে বড়বৌ থাকিতেন, তিনি বিদেশে চলিয়া যাইবার পরও উন্মিলা তাহা দখল করেনি, সে আপনার পশ্চিম দিকের ঘরেই এত কাল ছিল। তবে সংসার বাড়িয়াছে, কাছেই ছেলেদের দুধের ডুলী, স্নানের গামলা, ষ্টোভ, বেলাগাড়ী, দেলনা ইত্যাদি একে একে সেই ঘরে ভীড় করিয়া পড়িয়াছে। মাঝের ঘরখানা ভিতর হইতে বন্ধ হয় না ; কাছেই তাহা উন্মিলা পাড়ার মেয়েদের বসিবার জন্ত সাজাইয়া রাখিয়াছিল। নিজের হাতের গদি, তাকিয়া, পদ্ম, ঢাকা ইত্যাদিতে তাহার সৌন্দর্য যথাসম্ভব বাড়াইবার চেষ্টায় গৃহকর্তীর বিন্দুমাত্র ত্রুটি ছিল না। অতি-প্রয়োজনীয় কোনো নিতাস্ত গদ্যময় জিনিসকে সে সহজে এ-ঘরের ত্রিসীমানায় আসিত দিত না। এমন কি মেহগনির বুক-বেসটাও সে পাশের ঘরেই রাখিয়া দিয়াছিল। কিন্তু জয়ন্তী যে তাহার পূর্ব নিবাসে ফিরিয়া আসিতেছে, এখন আর অন্য কথা ভাবিলে চলিবে না।

পরদিন সকালেই ভোলা ও মোক্ষদা মিলিয়া ঘরের জিনিসপত্র সরাইতে লাগিয়া গেল। শমীকর আপিসে যাইবার আগে গলার টাইটা বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল— “পূর্ব দিকের ঘরখানা বদলে নিলে হ’ত না? দিনরাত্তির এদিক বন্ধ থাকবে, পূর্বের আলো হাওয়া আর তোমার কপালে জুটবে না।”

উষ্মিলা জয়ন্তীর খাটের উপর হইতে ছেলেদের ছোট তোয়ক ও ছেঁড়া লেপের বোঝা সরাইতেছিল। সে বলিল—“তা হোক, আট বছর পশ্চিমের ঘরে যদি বেঁচে থাকি ত পরেও টিকে থাকব।”

মোকদ্দা বি ঘোমটার ভিতর হইতে বলিল,—“গা, গরম কাপড়ের বাক্স-টাক্সগুলো এই ঘরেই থাক না ; ও ত আর রাত-দিন নাড়ানাড়ি হবে না। তোমার ঘরে রাখলে মিথ্যে ঘর-জোড়া হয়ে থাকবে।”

উষ্মিলা বিরক্ত মুখে বলিল—“দেখ, তিনি বাড়ির বড়বোঁ, আমার চেয়ে তাঁর মান বেশী, সৰ্কদা একথা বুঝে চলবি।”

উষ্মিলার সাধের ড্রইং-রুম অসংখ্য জিনিয়ে বোঝাই হইয়া উঠিল। দক্ষিণের বারান্দায় দুই দিকে পরদা দিয়া কয়েকটা চেয়ার ও টেবিল গোল করিয়া আপাততঃ সেইখানেই সাজাইয়া রাখা হইল। শমীন্দ্র বলিয়াছে, পরে বারান্দায় কাচ লাগাইয়া দিলে দামী জিনিয়েপত্রও অনায়াসে রাখা চলিবে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে জয়ন্তীর গাড়ী আসিয়া বাগানের দুই সারি নারিকেল গাছের ভিতর ঢুকিল। উষ্মিলা ছুটিয়া নীচে নামিয়া আসিল ছেলেমেয়েদের কোলে তুলিয়া লইতে। সাত ও পাঁচ বছরের ছবি ও কেবি দুইটি আধফোটা গোলাপের মত মুখ জানালার কাছে বাড়াইয়া বসিয়াছিল। এ-ঘরবাড়ি সবই তাহাদের অজানা, তাহাদের বড় বড় চোখে বিশ্বয়ের সীমা ছিল না। উষ্মিলা দুই হাতে দুই জনকে জড়াইয়া ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইয়া লইল। জয়ন্তীর দিকে তাকাইয়া তাহার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। চোখ মুছিয়া প্রণাম করিয়া দেখিল শুভ্র অবগুণ্ঠনে জয়ন্তীর মুখ ঢাকা, চোখের পাতা পর্য্যন্ত দেখা যায় না। উষ্মিলা বুঝিতে পারিতেছিল না, সাহস করিয়া তাহার হাতখানা ধরিবে কি-না। কত দিনের পর দিন যে হাতে হাত দিয়া অফুরন্ত আনন্দের শ্রোতে তাহারা ভাসিয়াছে, এ যেন সেই চিরপরিচিত স্নেহস্পর্শমাখা হাত নয়। একটা মানুষ সংসার হইতে বিদায় লইয়াছে, তাহাতে আর একটা মানুষ যে এমন আগাশোড়া বদলাইয়া যাইতে পারে কে জানিত? উষ্মিলা ভীতভাবে বলিল,—“দিদি,

মুখ তুলে চাও। আমাদের দিকেও কি তাকাবে না?” জয়ন্তী মুখের ঘোমটা সরাইয়া উষ্মিলার মুখের দিকে চাহিল। উষ্মিলা কখন প্রণাম করিয়াছে, এতক্ষণে জয়ন্তী তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া শিরশ্চুম্বন করিল। টপ্, টপ্, করিয়া দুই ফোঁটা জল উষ্মিলার কপালের উপর পড়িল।

কিন্তু শুধু হাত ছুখানা নয়, এ সমস্ত মানুষটাই যেন নূতন। আট বৎসর আগে যে ক্ষীণকায়্য কিশোরী বধু বাল্যলীলার মাঝখানেই সবে যৌবন স্বপ্ন দেখিতে শুরু করিয়াছিল তাহার কৈশোর যেন আজ ইতিহাসের কথা। ঝিনুকের বুকের মত কোমল গোলাপী রঙের মুখখানি আজ প্রথর যৌবন দীপ্তিতে জল্ জল্ করিতেছে, যেন বিজলী প্রদীপের উপরের শুভ্র কাচের ফানুস। ক্ষীণ দেহ নিটোল হইয়া ভরিয়া উঠিয়াছে, কোথাও এতটুকু অপূর্ণতা নাই। বিগত দিনের সে আনন্দ-উজ্জ্বল চপল চোখের দৃষ্টি বেদনায় গভীর হইয়া উঠিয়াছে। অশ্রুজলে ধুইয়া আঁথিপল্লব ঘনকৃষ্ণ কাজলের মত দেখায়, চোখের কোণের চিন্তারেখাগুলি চোখ দুটিকে যেন আরও আয়ত করিয়া তুলিয়াছে। মন্মরশুভ্র রেখাহীন ললাটের উপর অন্ধকার-সমুদ্রের চেউয়ের মত ঘনকৃষ্ণিত কালো চুল। পশ্চিমে থাকিয়া লম্বাতেও যেন সে মাথাঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে। কে বলিবে ব্রাহ্মণের ঘরের সুন্দরী বধু জয়ন্তী এ, এ যেন লক্ষ্মীএর কোন্ নবাবের বেগম রডীন পেশোয়ার, জরির কাঁচুলি, আশমানি ওড়না ও সুন্দা আতর মেহেদির রং ছাড়িয়া অকস্মাৎ বাঙালীর বিধবা সাজিয়া আসিয়াছে। অধুনিক উপমা দিলে বলিতে হয় য়ালা-বাষ্টারের ভিনাস মূর্তির ভিতর কে যেন বিহ্বাতের আলো জালিয়া দিয়া উপরে শুভ্র ওড়না জড়াইয়া দিয়াছে। বেশ-পরিবর্তনের সময় বাঁ-হাতের বড় নীলার আংটিটা কেবল সে খুলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। বিধবা বড়বোঁয়ের অঙ্গে একমাত্র অলঙ্কার ঐটি। ছেলেপিলের ম', কিন্তু তবু গলায় একছড়া সৰু হারও নাই। সাদা সেমিটের উপর ফরাসডাক্সার সাদা ধুতি পরিয়া সে যখন বাড়ির বারান্দায় নামিয়া দাঁড়াইল, সমস্ত বাড়িটা যেন তাহার রূপে আলো হইয়া উঠিল।

মান্থানেক না যাইতেই জয়ন্তী তাহার গাভীঘোর

পোলসটা ফেলিয়া দিল। উন্মিলা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সমস্ত দিন হাসিমুখে কাটানোই তাহার আজন্মের অভ্যাস, জয়ন্তীর ভয়ে এই ক'দিন সে একবারও হাসে নাই। চিরকালের অনেক অভ্যাস তাহার ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। বিকালবেলা চুল বাঁধিয়া গা ধুইয়া রঙীন শাড়ী ও কুকুমের টিপ পরা তাহার অনেক দিনের সখের অভ্যাস। কিন্তু জয়ন্তী আসিয়া পর্যন্ত সকালের মোটা কাপড়েরই সে সারা দিন কাটাইতেছে। জয়ন্তী বলিল—“হ্যাঁ রে উন্মি, চুল বাঁধ নেই, কাপড় ছাড়া নেই, এট বরসে ও'কি সং হয়ে উঠেছিল?”

উন্মিলা বলিল—“তোমার ভাই এত রূপ, তুমি অমনি স্মাগিনী হয়ে থাকবে আর আমি কি ব'লে পেঁচামুখের আবার বাহার ক'রে বেড়াব?”

জয়ন্তী তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—“আ গেল না, আগাতে আর তোতে! আমার পোড়া রূপে ত এখন শুড়ে জ্বলে দিলেই সব শাস্তি হয়। তোকে তাই ব'লে অমনি খণ্ডের মত ঘুরতে দিলাম আর কি? যা শীগির দ্বিত কাটা নিয়ে আয়, আমি বেঁধে দিচ্ছি চুল।”

জয়ন্তী নিজহাতে উন্মিলাকে সাজাইয়া ওড়াইয়া কপালে কুকুমের টিপ দিয়া দিল। উন্মিলা হাসিয়া বলিল—“তোমার মতন এমন ক'রে সাজাতে চুল বাধতে আমি আর কাউকে দেখিনি ভাই। ভগবান কি-না তোমারই সাজায় বাদ যাবলেন। তোমার ছুটি হাতে ধরি ভাই এমন কালো বেশের মত চুলগুলোর অমত্ব করো না, আমি একটু বেঁধে দি। দেখে আমার চোখ দুটো সার্থক হোক, তাতে হ' কোনো পাপ নেই।”

জয়ন্তী হাসিয়া মাথার কাপড়টা খুলিয়া দিল, কিন্তু কখনও কোনো জবাব দিল না। উন্মিলা সেই সুদীর্ঘ কালে চুলে অনভ্যাস হাতে বথাসাধ্য পরিপাটি করিয়া বর্ণী বাধিয়া ঘাড়ের কাছে শিথিল কবরী ছুলাইয়া দিল। গগন হইতে চারিটি রজনীগন্ধা ফুল আনিয়া খোঁপায় হাঁজিয়া দিতেই জয়ন্তী “দূর লক্ষীছাড়ী” বলিয়া তাহার পৃষ্ঠে একটা প্রচণ্ড চড় দিল। উন্মিলা তাহার ছুই হাত বিয়া বলিল—“মার আর ধর, ফুল কিন্তু ফেলতে দেব না। বিস্মতীর মত রূপে সাদা ফুল কেমন দেখায় জান না ত?”

শমীন্দ্র আপিসের কাজ সারিয়া সবে বাড়ি ফিরিতেছিল। ঘরে পা দিয়াই এমন প্রসাধনের ঘট দেখিয়া বলিল—“বাবা, কার মন ভোলাতে তোমাদের এত সাজসজ্জা লেগে গেছে?”

জয়ন্তী বলিল—“কার আবার? তুমি খেটেখুটে আপিস থেকে এসে দেখবে বৌ রান্নাঘরের কালী মেখে বেড়াচ্ছে, তাই তোমার সুন্দরী বৌকে একটু সাজিয়ে দিচ্ছিলাম। মাথেরদের হাড়িমুখের পর এই সুন্দর মুখখানা কেমন লাগছে?”

উন্মিলা অত্যন্ত আপত্তি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল—“আহা সুন্দরী না বান্দরী! দিদি যেন কি? হ্যাঁগা, সত্টি ক'রে বল দেখি, দিদি আমার চেয়ে হাজারগুণে সুন্দরী নয়! চুলটা একটু বেঁধে দিতেই মনে হচ্ছে যেন নূরজাহান বেগম।”

শমীন্দ্র একটু হাসিয়া বলিল, “ও-সব তুলনামূলক সমালোচনা করবার আমার সাহস নেই বাপু! শেষকালে কোন্ ব্রাহ্মণীর কোপানলে পড়ব কে জানে?”

মুখে যাহাই বলুক শমীন্দ্রের সপ্রশংস রূপমুগ্ধ দৃষ্টি জয়ন্তীর মুখের উপর চকিতের মত স্থির হইয়া দাঁড়াইল। বধু-বেশে জয়ন্তীকে প্রতিদিনই সে দেখিয়াছে, কিন্তু জয়ন্তীর অঙ্গে অঙ্গে যে এমন অগ্নিশিখার মত রূপ বিচ্ছুরিত হইয়া পড়ে তাহা ত সে কোনো দিন দেখে নাই। রাত্রে উন্মিলাকে শমীন্দ্র বলিল—“বৌদি ছেলেবেলা ত এত সুন্দর ছিল না। বিধবা হয়ে সত্টিই রূপ হয়েছে যেন নূরজাহান বেগম। কিন্তু বেচারীর ভাগ্যলিপি বিধাতা এমন লিখলেন যে কেন?”

পরের দিন বিকালে চুল বাঁধবার সময় উন্মিলা জয়ন্তীর হাত ছুখানা ধরিয়া বলিল—“আমি ত ভাই ঘরের লোক, আমার কাছে ভয় করবার কিছু নেই। এমন হাত ছুখানায় হু-গাছা চুড়ি পরলে কি হয়? পর না ভাই লক্ষীটি, কে আর দেখতে আসছে?”

জয়ন্তী বলিল—“হাজার লোকের হাথার কথা শুন্তে হবে ত? হু-গাছা চুড়ির জন্তে অত সইতে পারব না।”

উন্মিলা বলিল—“আর কোন লোক কিছু বলবে না। শুধু তোমার দেওর বলবে। কাল বলছিল নূরজাহান

বেগম; এর পর উর্ধ্বশী কি তিলোত্তমা কিছু একটা বলবে। চল না একবারটি তাকে দেখিয়ে আনি।”

জয়ন্তী তাহার গালে একটা চড় দিয়া বলিল, “চুপ কর পোড়ারমুখী, বিধবা মানুষের ওসব ঠাট্টাতামাসা শুনতে নেই।”

উর্ধ্বশী কিছু বলিল না, শুধু নিজের হাত হইতে দুইগাছা চুড়ি খুলিয়া জয়ন্তীকে পরাইয়া দিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে উর্ধ্বশীর হাত ধরিয়া টানিয়া জয়ন্তী বলিল, “একটা জিনিষ দেখবি আয়।”

আপনার ঘরে গিয়া একটা মোড়ার উপর বসিয়া বড় ষ্টিল ট্রাঙ্কটা খুলিতে খুলিতে জয়ন্তী বলিল, “গত বছর ঠুর পঞ্চাশ টাকা মাইনে বেড়েছিল, আর ছেল-মেয়েদুটো একটু বড় হয়েছে বলে দাইটাকে জবাব দিয়েছিলাম। আগে মোটে কিছু বাঁচাতে পরতাম না সংসারের গ্রাস থেকে। গত বছর তাই সাত শ’ টাকা বাঁচিয়েছিলাম। ছেলবেলা ত দেখছিই ভাই, ভাল গয়না শাড়ী কখনও পরিনি। কিন্তু মনে মনে সখটা চিরকালই ছিল। মনে করেছিলাম এর পর ফি-বছরে কিছু কিছু করাব।”

জয়ন্তী বাক্সের ডালটা তুলিয়া পাতলা কাপড় জড়ানো একটা পুলিন্দা এবং ছোট একটা পিতলের চৌকো কোঁটা বাহির করিল। পাতলা কাপড়খানা সরাইয়া বাহির করিল ঘননীল রেশমের উপর ছোট ছোট জরির চৌখুপি করা একখানি শাড়ী, আর লাল ও সোনালী রেশমে টানা-পড়েন দেওয়া বলমলে একখানা বেমারসী, শাড়ীটা নাড়িতে নাড়িতে দুইদিক হইতে দুইটা রং ঠিকরিয়া পড়ে।

উর্ধ্বশী হাতে করিয়া সযত্নে কাপড় দুখানা তুলিয়া মুখ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, “বাঃ কিঃ চমৎকার!” জয়ন্তী বলিল “দুশো টাকা দিয়ে দুখানা কিঃ নেছিলাম, কিন্তু একদিনও পরি নি।”

উর্ধ্বশীর মুখে উত্তর যোগাইল না। খানিক ভাবিয়া বলিল, “বড় হয়ে ছবি পরবে এখন। মার কাপড় ত মেয়েই পর।”

জয়ন্তী বলিল, “তাই ত রেখে দিলাম। নইলে সবাই যেদিন কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে থান পরিয়ে দিলে সেদিন

ইচ্ছা করছিল সবগুলো আগুনের মধ্যে ফেলে দি। মাসখা শুড়ী বলেছিলেন চুলগুলোও কেটে ফেলতে।”

উর্ধ্বশী নীরবে পিতলের কোঁটাটা নাড়িতে লাগিল। জয়ন্তী খুলিয়া দেখাইল দশগাছা মুক্তা-বসানো চুড়ি। “চার-শ’ টাকা দিয়ে গড়িয়েছিলাম। প্রত্যেকটি মুক্তা সমান দেখেছি।”

উর্ধ্বশী বলিল, “হ্যাঁ, চমৎকার, এমন মিটোল ঘেন জলে টলটল করছে।”

জয়ন্তী বলিল, “আমার চোখের জলের ফোঁটা। স্যাকরাবাড়ি থেকে চুড়িগুলো যখন এল তরকারি কুটছিলাম। উনি পরিয়ে দিতে চাইলেন তখন পরি নি। তারপর সেই যে অস্থখে পড়লেন আর ওকথা ভাববারও সময় রইল না। এখন এগুলো দেখলে চোখ জ্বাল করে।”

জয়ন্তী চুড়িগুলি নীল কাগজে জড়াইয়া কোঁটার বন্ধ করিয়া রাখিল। উর্ধ্বশী আর একবার বলিল, “তোমার মেয়ে রয়েছে, দুঃখ কি ভাই? মেয়েকে পরিয়ে সাধ দিও।”

জয়ন্তী ঝাৎ করিয়া বাক্সটা বন্ধ করিয়া দিয়া জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার দুই চোখ দি মুক্তার মত জলবিদু গড়াইয়া পড়িল।

শমীন্দ্র ও উর্ধ্বশী অল্প পাড়ায় বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়াছিল। বাঙালীর বাড়ির ব্যাপার, খাওয়া-দাওয়া সারিতেই রাত বারোটা বাজিয়া গিয়াছিল, ফিরিতে ফিরিতে প্রায় একটা হইল। বাড়িতে ঢুকিবার পথে বাগানের নারিকেল গাছের পাতার ফাঁক দিয়া জয়ন্তীর ঘরের আলো দেখা যাইতেছিল। উর্ধ্বশী বিস্মিত হইয়া বলিল, “বাঃ এত রাত্রে দিদির ঘরে আলো কেন? ছেলেপিলের অস্থখ-বিস্থখ হ’ল না কি?”

দু-জনে তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া আসিল। ঘরের ভিতর হাঁটা-চলার শব্দ স্পষ্ট পাওয়া যাইতেছিল।

শমীন্দ্র বলিল, “দেখ না ঘরে গিয়ে কি হয়েছে।” উর্ধ্বশী দরজার কাছে গিয়া দেখিল দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। সে কি ভাবিয়া খড়খড়ির একটা পাখী তুলিয়া ধরিল। বিস্ময়ে তাহার চোখ ঠিকরাইয়া পড়িতে

ছিল। সে দেখিল জয়ন্তী তাহার বাক্স-প্যাটার সমস্ত খুলিয়া ঘরময় ছড়াইয়াছে, নানা রকম রঙের সুন্দর কাপড় ও গহনা বিছানার উপর ছড়ান। জয়ন্তী নিজে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার পরণে সেই জরির চৌখুপি বমননীল রেশমের শাড়ী, দুই হাতে দশ গাছা মুক্তার চূড়ি, গলায় বিবাহের সাতলহরী। সখা অবস্থায় ছোটখাট দ্বার বা দুই-চারিটা অলঙ্কার সে পরিত, সমস্তই আজ আবার পরিয়াছে। মুগ্ধবিশ্বয়ে সে নিজের প্রতিবিশ্বের দিক তাকাইয়া আছে, তাহার অধরে স্মিতশাস্ত্রের পিছনে বেদনার রেখা ফুটিয়াছে।

শমীন্দ্র বলিল, “কি হয়েছে? একেবারে যে জমে গেলে! নড়ছ না কেন, পায়ে কি শিকড় গজিয়েছে?”

উর্শ্বিলা চোখ ফিরাইয়া স্বামীকে ইসারা করিয়া ডাকিল, “দেখে যাও।” শমীন্দ্র দুই পা অগ্রসর হইয়া আসিল। কিন্তু শমীন্দ্রর গলার আওয়াজ পাইয়াই জয়ন্তী খুট করিয়া ঘরের বাতি নিবাইয়া দিল।

শমীন্দ্র ও উর্শ্বিলা নিজেদের ঘরে চলিয়া গেল।

উর্শ্বিলা গায়ের গহনাগুলো খুলিয়া খুলিয়া ডেসিং টেবিলের উপর রাখিতে রাখিতে বলিল, “কি ব্যাপার বল ত! কিছু বুঝতে পারছি না। ছপুর রাত্রে গয়না কাপড় পরে আয়নার সামনে এত সাজগোজ করবার যানে কি?”

শমীন্দ্র বলিল, “মানেটা ঠিক বুঝতে পারছি না আমিও। কিন্তু রূপ যদি কারুর থাকে ত সে তোমার দিদির। অস্পরীরা কি এর চেয়েও সুন্দরী হয়?”

উর্শ্বিলা স্বামীকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, “অস্পরীদের সঙ্গে ত আমার কারবার নেই, কি ক’রে বলব বল! তবে তুমি ত দেখছি একেবারে প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ।”

শমীন্দ্র তাহার নাকের ডগাটা ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া বলিল, “তাই বুঝি ভয়ে এক সেকেণ্ডের বেশী দেখতে দিল না।”

উর্শ্বিলা বলিল, “আহ, দিদিই ত আলো নিবিয় দিল। যাই বল, দিদি কিন্তু বড় অদ্ভুত মানুষ। স্বামীর নাম শুনেই তার দু-চোখ জল ভরে ওঠে অথচ এই সামান্য গয়না কাপড়গুলোর ওপরে কি ক’রে ওর এত

লোভ? কাল আমাকে নতুন কাপড় গয়নাগুলো খুলে দেখাচ্ছিল, বলল যে একদিনও সেগুলো পরিনি। হয়ত খুব পরতে ইচ্ছে করে তাই লুকিয়ে পরে। কি ক’রে পারল কে জানে?”

শমীন্দ্র বলিল, “কেন, তোমার সুখ-দিদি ত সর্বদা এক-গা গয়না পরে বেড়ান। তাঁর কি শোক নেই বলতে চাও?”

উর্শ্বিলা স্বামীর মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল—“ছিঃ, কি যে তুমি? না মুখে আসবে তাই বলবে। সুখাদি এয়োস্ত্রী মানুষ, ভগবান ছেলেপিলে কেড়ে নিয়েছেন, কি করবে বল?”

শমীন্দ্র বলিল—“স্বামীকে কি তোমরা সন্তানের চেয়ে বেশী ভালবাস?”

উর্শ্বিলা হাসিয়া বলিল—“তোমার বুঝি শোন্বার মত হয়েছে? তা যতই বড়শি ফেল, তোমাকে বাবু রুগু দীনুর চাইতে বেশী ভালবাসতে পারব না। কিন্তু তবুও ত স্বামীই স্ত্রীলোকের সব।”

শমীন্দ্র উর্শ্বিলার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—“উঃ কি নিদারুণ যুক্তি!”

শমীন্দ্র ঘুমাইয়া পড়িলেও উর্শ্বিলার চোখে ঘুম আসিল না। সারারাত্রিই তাহার জয়ন্তীর কথা ভাবিয়া কাটিয়া গেল। জয়ন্তীকে কোন্ সুদূর শৈশব হইতে সে চেনে। তাহাকে ত এমন মনে হয় নাই। সে হিন্দুবরের মেয়ে, আজন্ম হিন্দুবরের মত চালচলনে অভ্যস্ত; তারপর বিবাহের পর স্বামীকেও ত সে কম ভালবাসিত না। তাহার মনে পড়ে জয়ন্তীর বিবাহের পর উর্শ্বিলা জয়ন্তীর স্বামীর উপর কি বিধম চটা ছিল। কতদিন দুই সখীতে এই লইয়া তুমুল কলহ হইয়া যাইত। কিশোরী উর্শ্বিলা বলিত—“ওঃ ভারি ত তোমার দু-দিনের বর, তার জন্তে চিরকালের বন্ধুকেও ভুলে গেলে। দু-দণ্ড কথা বলবার সময় পাও না।” জয়ন্তী বিজ্ঞের মত হাসিয়া উর্শ্বিলাকে ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু দুই-দশ মিনিট পরেই ছল করিয়া স্বামীর সন্ধানে পলায়ন করিত। আর এতদিন পরেই বা কোন্ কম ছিল? এই ত আট বৎসরের মধ্যে উর্শ্বিলা

কতবার লিখিয়াছে একবারটি তাহার কাছে আসিতে, কিন্তু জয়ন্তীর এক জবাব—না ভাই, ওক একলা ফেলে যেতে পারব না।’ বাপের বাড়িও এত দিনের ভিতর মাত্র একবার গিয়াছিল। আজকালকার সাহেবী চালে বিধবাও সধবার মত সাজসজ্জা করিয়া বেড়ায় বটে, কিন্তু তাই যদি হইবে তবে সে সর্বদা ধুতি পাড়ের কাপড়ও পরে না কেন একথানা? সামান্য ঠাট্টা-তামাসাতেও চটিয়া অস্থির হয় কেন? এ এক হেয়ালী।

উশ্বিলী সকালবেলাই জয়ন্তীকে জিজ্ঞাসা করিল, “হ্যাঁ ভাই, তোমার কাছে বড়ঠাকুরের ছবি নেই?” জয়ন্তী বিস্মিত হইয়া বলিল—“থাকবে না কেন? নিশ্চয়ই আছে।”

উশ্বিলী বলিল—“কই দাও না দেখি একথানা, বড় ক’রে বাঁধিয়ে আনব। তোমার ঘরে টাঙিয়ে রাখবে এখন।”

জয়ন্তী কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—“কি হবে আর ঘরে টাঙিয়ে, ওসব আমার ভাল লাগবে না।”

উশ্বিলী এরকম উত্তর মোটেই আশা করে নাই, সে একেবারেই হতভম্ব হইয়া গেল। কোন কথা না বলিয়া সেথান হইতে পলাইল। তাহার বুদ্ধিতে কুলাইতেছিল না। জয়ন্তীর হইল কি? গভীর রাত্রে নির্জন গৃহে বাসক সজ্জার মত সাজসজ্জা আবার স্বামীর ছবির প্রতি এমন ওদাসীত্ত্ব! এই সবে দুই-তিন মাস বিধবা হইয়াছে, এখনও সিঁথির সিঁতুরের চিহ্ন, হাতের লোহার কলঙ্ক মিলাইয়া যায় নাই বলিলেই চলে, ইহারই মধ্যে কি সে স্বামীকে এমন করিয়া ভুলিতে চাহে যে তাহার একটা ছবিও ঘরে রাখিবে না? কি জানি? মানুষ হয়ত মানুষকে কোনোদিনই চিনিবে না। বিধাতা প্রতি মানুষের মনের সম্মুখে যে পদা বুলাইয়া দিয়াছেন গভীর প্রীতির অন্তর্দৃষ্টি তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে বলিয়া তাহার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু দেখা গেল তাহাও মিথ্যা। জয়ন্তীকে সে ভুল বুঝিয়াছে। এই সদা ব্রহ্মচারিণীর মন চঞ্চল হইয়াছে। কি জানি কবে সে আবার কি করিয়া বসিবে? বেদনায় উশ্বিলীর বুকের ভিতরটা টন্ টন্ করিয়া উঠিল। জয়ন্তীকে সে আবার প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছে, তাহাকে যদি

কোনো কলঙ্ক স্পর্শ করে তবে তাহা দেখিবার আগে উশ্বিলীর মরণই মঙ্গল। উশ্বিলী ছেপেমাছুসের মত মনে মনে যত জাগ্রত দেবতার নিকট মানসিক করিতে লাগিল, “ঠাকুর, ইহার শুভমতি দাও, আমি ষোড়শোপচারে তোমার পূজা দিব।”

জয়ন্তীকে চোখে চোখে রাখাই উশ্বিলীর কাজ হইয়া উঠিল। তাহার চালচলনে বিশেষ যে কোনো পরিবর্তন ধরা যায় তাহা নয়। আগেরই মতন নিজের ও উশ্বিলীর ছেলেমেয়েদের সেবায়ত্নে তাহার দিন কাটিয়া যায়। বিকালে শমীন্দ্র আসিলে তাহাকে আদরবত্ন করিয়া খাওয়ানো, তাহার সহিত হাসিগল্প করা, ইহাও তাহার নিত্য কর্মপদ্ধতির ভিতর। এই বৈঠকে উশ্বিলীও প্রত্যহই যোগ দেয়। কিন্তু এক একদিন গল্প যখন খুব জমিয়া উঠিয়াছে, শমীন্দ্রের কথায় জয়ন্তী হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে তখন উশ্বিলী অকস্মাৎ ভীষণ গম্ভীর হইয়া উঠে। আনন্দ-সঙ্গীতে তাল কাটিয়া যায়, শমীন্দ্র অন্য কথা পাড়িয়া আবার গল্প ফাঁদিতে চেষ্টা করে। উশ্বিলী রাগ করিয়া বল—“বুড়ে বয়সে স রাক্ষণ হাহা গিগি আমার ভাল লাগে না।” জয়ন্তী হয়ত বলে—“চল ভাইউশ্বিলী আমরা বাগানের গাছে জল দিই গে।” বাগানের গাছে জল পড়ে বটে, কিন্তু দুই সখীর এক জনেরও মুখ ফোটে না। তাহারা আগাগোড়াই নীরবে কাজ করিয়া আবার নীরবে আপন আপন ঘরে ফিরিয়া যায়। জয়ন্তী সাজি ভরিয়া কুল তুলিয়া অনেক উশ্বিলীকে দেয় অনেক নিজে রাখে। উশ্বিলী হাত পাতিয়া কুল গ্রহণ করে বটে, কিন্তু আগের মত সে মিষ্ট হাসির পুরস্কার দিতে পারে না। তাহাদের দুই জনের মাঝখানে যে অফুরন্ত হাসি ও কথার স্রোত এতদিন বহিতেছিল, পরস্পরের চোখে চোখ পড়িতেই বিদ্বাৎপ্রবাহের মত বাহা গতিশীল হইয়া উঠিত, আজ তাহার মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা পাথরের মত বাধা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিছুতেই তাহাকে দুই সখী অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। জয়ন্তীও সেই রাত্রি হইতে উশ্বিলীর মনের নূতন ধারা চিনিয়া লইয়াছে, কাজেই সে ও কোনো কথা পাড়িতে সাহস করে না।

গভীর রাত্রে উশ্বিলীর ঘুম ভাঙিয়া যায়, কতদিন সে তন্দ্রালস চক্ষে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া শুনিয়াছে জয়ন্তীর

ঘর হইতে খুটখাট আওয়াজ আসিতেছে। একবার জালা জ্বল আবার নিবিয়া যায়। অন্ধকারে পা টিপিয়া টিপিয়া দুই-এক দিন সে দেখিয়া আসিয়াছে জয়ন্তী আপনার দেবজন্ম রূপকে প্রসাধনে অপরূপ করিয়া তুলিতেছে, তাহার বিপুল কবরীতে পুষ্পমালা, বর্ষাস্নাত তরুর মত তাহার সতেজ সুন্দর দেহমণ্ডি বেড়িয়া বিচিত্র বর্ণের সুরভিত শাড়ী। কিন্তু ভাল করিয়া দেখিবার উপায় ছিল না, ঘরের আলো নিমেষে নিবিয়া যাইত। নিজের ঘরে কিরিয়া গিয়া শমীন্দ্রের ঘুম ভাঙাইবার ভয়ে তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িতে হইত; কারণ এই লুকাইয়া দেখাশোনার ব্যাপার শমীন্দ্র মোটেই ভালবাসিত না। উন্মিলা কিছু বলিতে গেলেই সে বিরক্ত হইয়া উঠিত।

তবু একদিন সাহস করিয়া উন্মিলা বলিল, “দেখ, দিদির মতিগতি ভাল বলে বোধ হচ্ছে না। এর একটা উপায় ত করতে হবে। শেষকালে কোথা থেকে কোথায় গড়াবে কে বলতে পারে? তার চাইতে বরং একটা বিয়ের ব্যবস্থা কর ভাল।”

শমীন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিল, “কি যে বল তুমি তার ঠিক নেই। তোমার সম্পর্কে বড়, বয়সে বড় তাও কি ভুলে গেলে? জুটো জুটো ছেলে মেয়ের মা সে, সেটাও ত ভাবতে হবে। গোয়েন্দাগিরি রেখে রাত্রে ঘুমের দিকে মন দিও ত। আমি না-হয় গুর অল্পত্র থাকবার ব্যবস্থা করব।”

উন্মিলা বলিল, “অত আর দরদ দেখাতে হবে না তোমাকে। আমার চেয়েও কি তুমি ওর বেশী দ্বিতীয়ী নাকি?”

কথাটা বলিয়াই উন্মিলার মনে হইল কি জানি হয়ত ইহার ভিতরও কিছু অর্থ আছে। হয়ত শমীন্দ্রই জয়ন্তীকে এখন বেশী ভালবাসে। যে-শমীন্দ্রের মন তাহার নিকট কাচের মত স্বচ্ছ ছিল সেও কি মনের গহনে কোনো অন্তরাল রচনা করিতে শুরু করিয়াছে? সংসারে সকল অসম্ভবই সম্ভব হয়। জয়ন্তীর ভূবনমোহন সৌন্দর্যে শমীন্দ্রের আত্মবিশ্বাস হওয়া কি এতই অসম্ভব? একথা কল্পনা করিতেও উন্মিলার মস্তিষ্কের শিরাগুলো ছিঁড়িয়া আসিতেছিল, হৃৎপিণ্ডের গতি যেন খামিয়া যাইতে-

ছিল। তবু তাহার মনে হইল, কি জানি নাটকে-নভেলে এতদিন যাহা পড়িয়া নানা মত প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে, আজ হয়ত তাহার ছুরদৃষ্টে তাহাই জীবন্তরূপে দেখা দিল; যে স্বামী প্রেম তাহার কাছে নিঃস্বাস-বায়ুর মত সহজ সত্য ও প্রয়োজনীয় ছিল তাহার সম্বন্ধে এমন সন্দেহ যে সে কোনোদিন করিতে পারিবে, এ-কথাই সে ইতিপূর্বে কখনও ভাবে নাই। আবার অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে, সংসারে এত মানুষ থাকিতে জয়ন্তীই নাগিকার ভূমিকায় দেখা দিল। মরিবার দিন একমাত্র তাহার হাতে ধন মান সকল সঁপিয়া নিশ্চিত হইয়া মরিতে পারিবে এতদিন ভাবিয়া আসিয়াছিল, সেই কি-না বাচিয়া থাকিতেই সকলের আগে তাহার সকল ধন মান হরণ করিতে বসিল। না, না, উন্মিলা কিছুতেই এ-সন্দেহকে মনে স্থান দিবে না। একি? সে কি পাগল হইতে বসিয়াছে যে এমন সব অসম্ভব স্বপ্নকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেছে। এ-কথা লইয়া শমীন্দ্রের সহিত আর কোনো কথা তুলিবে না ভাবিয়া উন্মিলা সেখান হইতে চলিয়া গেল।

রাত্রি অনেক হইয়াছে। একটু আগে আশ্বিনের পাগলা ঝোড়ো বাতাস বাগানের সারি সারি নারিকেল গাছের পাতার ঝুঁটি প্রচণ্ড বেগে নাড়িয়া ঝুঁক গর্জন করিতে করিতে নীরব হইয়া গিয়াছে। ঘন ধূলার অবগুণ্ঠন খসিয়া নিশ্চল নীল আকাশ দেখা দিয়াছে। উন্মিলা জানালা দিয়া পথের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এমন প্রচণ্ড ঝড়ের সময় শমীন্দ্র না-জানি কোথায় ছিল! এখনও ত তাহার দেখা নাই। উন্মিলার ব্যাকুল মন অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত বাড়ি কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ জয়ন্তীর জানালা দিয়া এক ঝলক বৈজ্ঞানিক আলো বাগানের পথের উপর পড়িল। উন্মিলা সেদিকে চাহিয়া দেখিতে না দেখিতে আলোটা নিবিয়া গেল। কিন্তু কার যেন মুছ গলার আওয়াজ। কে যেন ঘরের ভিতর কথা কহিতেছে। উন্মিলা কান পাতিয়া শুনিла, জয়ন্তীর গলারই ত স্বর। এত রাত্রে কাহার সহিত সে কথা কহিতেছে? ছেলেরা ত কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এত ছেলেভুলানো কথা নয়। উন্মিলা আপনার ঘর

ছাড়িয়া মাঝের ঘরের শেষ দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ঐ ত জয়ন্তীর সুস্পষ্ট সানন্দ কণ্ঠস্বর বীণার মত শোনা যাইতেছে। জয়ন্তী বলিতেছে, “এত কাছে তুমি রয়েছ তবু তোমাকে তেমন ক’রে কাছে পাবার ত যো নেই। সব জায়গাতেই যে নিষেধ। সেই রাত্রির গভীর অন্ধকারে ছাড়া তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলবার যো নেই। কিন্তু তোমার কাছে মনের সব কথা না ব’লে আমি কি বাচতে পারি?” জয়ন্তীর কণ্ঠস্বর অশ্রুতে রুদ্ধ হইয়া আসিল। উন্মিলা শিহরিয়া উঠিল। কে সে যে এত কাছে থাকিয়াও কাছে নাই! উন্মিলা আর ভাবিতে পারে না। আর সে শুনিতে চাহে না কোনো কথা।

আবার জয়ন্তীর কণ্ঠস্বরে আনন্দ জাগিয়া উঠিল, “তুমি না বলছিলে নীল শাড়ী আর মুক্তার চুড়িতে আমাকে অপসরীর মত দেখায়, এখন দেখ দিকি এই আগুন রঙের শাড়ী আর লাল ছল দুটিতে কেমন মানিয়েছে? না, তুমি দেখবে না, কথা বলবে না? কেন কিসের ভয় এত?”

কিসের ভয় তাহা উন্মিলা জানে। কথা कहিলেই ত উন্মিলা চিনিয়া ফেলিবে তাহার সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর। না কথা কহে ত ভালই, সন্দেহ এমন পরিপূর্ণ রূপে সত্যে পরিণত হইলে উন্মিলা বাঁচিবে কি লইয়া? উন্মিলা ঘরে ফিরিয়া যাইতে গেল, কিন্তু তাহার পা নড়িল না। সে শুনিল জয়ন্তী আবার বলিতেছে, “দিনের বেল: মানুষ জগতের যে নিয়ম আমাকে পালন করায়, তা আমাকে মেনে চলতেই হয়। কিন্তু সে যে কত বড় মিথ্যা তা আমি জানি আর তুমি জান। তাই রাত্রে আমার এ-সংসার আমি নিজের মত ক’রে সত্যরূপে গড়ে তুলি। তুমি যে মধুর হাসিতে বর আলো ক’রে তোলা ওতেই আমার সকল দুঃখবেদনা ধুল হয়ে ওঠে।”

উন্মিলা ছুটিয়া গেল জয়ন্তীর দরজার কাছে, দরজা খালা দিয়া সে দেখিবে কার এত মধুর হাসি। কিন্তু তাহার সম্মুখে শিক্ষায় বাধিল। এ-কাজ সে কি করিয়া করিবে? অবশেষে কাঁদিয়া আপনার ঘরে গিয়া লুটাইয়া পড়িল। কতক্ষণ যে সে পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিয়াছিল মনে নাই। চোখ ভুলিয়া যখন চাহিল দেখিল সম্মুখে দাঁড়াইয়া শমীন্দ্র।

শমীন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিল, “কি হয়েছে উন্মি, কাঁদছ কেন?”

উন্মিলা চোখের অশ্রু মুছিয়া বলিল, “তোমাকেও তা বলে দিতে হবে? তুমি এত বড় দুঃখ আমাকে দেবার আগে কেন আমায় এখান থেকে বিদায় দিলে না? আমি অনায়াসে চলে যেতাম, কোনো কথা বলতাম না। স্বামী হয়ে আমার এ মর্যাদাটুকু তুমি রাখতে পারলে না? শমীন্দ্রের চোখমুখ আগুনের মত লাল হইয়া উঠিল। সে বলিল, “উন্মিলা, তুমি কি বলছ তা তোমার হ’ল আছে কি? তুমি পাগল?”

উন্মিলা বলিল, “হ্যা, পাগল ত আমাকে এখন হতেই হবে। আমি নিজের কানে সব শুনেছি তোমাদের কথা।”

শমীন্দ্র গজ্জিয়া উঠিল, “আমাকে কি কথা তুমি বলতে শুনেছ, বা তোমার সামনে আমি না বলতে পারি?”

উন্মিলা বলিল, “তোমাকে বলতে শুনব কেন? তুমি যে কত বড় বুদ্ধিমান তা কি আমি জানি না। যে পাগল হয়ে বুদ্ধিশুদ্ধি হারিয়েছে একেবারে তাকেই বলতে শুনেছি।”

শমীন্দ্র গায়ের চাদর জামা রাখিয়া শয়নের আয়োজন করিতে যাইতেছিল, উন্মিলার কথায় ধর ছাড়িয়া ছিটকাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। অন্ধকার রাত্রিতে বরবাড়ি ছাড়িয়া সে বাহির হইয়া গেল কি-না উন্মিলা তাহাও দেখিল না। আসিবার সময় শমীন্দ্র নিঃশব্দে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়াছিল, যাইবার বেল: রুদ্ধ পবনের মত বেগে দু-পাশে দুইটা দরজা ঠেলিয়া বাহির হইয়া গেল। সমস্ত বাড়িটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। জয়ন্তী ভীতমুগ্ধ ভাবে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। তাহার পরণে লাল কালো ফুলতোলা ঢাকাই গুলবাহার শাড়ী। সে কথা ভুলিয়াই সে উন্মিলার খোলা দরজার ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। উন্মিলা তখন জানালার ধারে একটা টুলে বসিয়া আছে, জানালার ফ্রেমের উপর হাতে মাথা রাখিয়া। জাগিয়া কি ঘুমাইয়া বোঝা যায় না। তখনও যে বিহানায় কেহ শোয় নাই ঘরে ঢুকিলেই বোঝা যায়। জয়ন্তী ডাকিল, “উন্মি, এত রাত্রে এখানে চুপ ক’রে বসে যে?”

ঠাকুরপো কোথায় গেল? তোর আজ যুমুবি না? কি একটা আওয়াজ পেয়ে আমি ছুটে এলাম।” উন্মিল। মুখ তুলিয়া একবার শূন্যদৃষ্টিতে জয়ন্তীর মুখের দিকে তাকাইল।

জয়ন্তী বলিল, “কি হয়েছে? বলবি না?”

উন্মিলার দৃষ্টি হঠাৎ কঠোর হইয়া উঠিল, সে বলিল— “নিজের দিক তাকিয়ে বুঝতে পারছ না, কি হয়েছে? কেমন যে ও-বেশ ছেড়ে বেরোবার কথাও ভুলে গিয়েছ তাকি আমি জানি না? তোমাদের সব কথা আমি শুনেছি। আমার কাছে আর ও-মুখ দেখিও না।”

উন্মিলা কাঁদিয়া ফেলিল। জয়ন্তীও চোখের জল সম্বরণ করিতে পারিল না। সে কি বলিতে গিয়া চুপ করিয়া গেল। উন্মিলা বলিল, “তোমাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসতাম বলে তোমার ও সর্কহারি চেহারার দিকে তাকাতে না পেরে ছোটো চুড়ি পরিয়ে দিতে কি চুলটা বেঁধে দিতে যেতাম বলে এমনি ক’রে তার শোধ নিচ্ছ? চিরকালের সম্বন্ধকে এমনি ক’রে শেষ করছ?”

সামান্যনে জয়ন্তী বলিল,— “উন্মি, তোর মুখে এ-কথা আমায় শুনতে হ’ল শেষে! তোকে আমি এর উত্তর কি দেব, ভগবান করুন, এ-কথা তোকে যেন কখনও বুঝতে না হয়।”

পরদিন অনেক বেলায় ঘরের বাহির হইয়া উন্মিলা দেখিল জয়ন্তী বাড়ি নাই।

বাপের বাড়ি হইতে জয়ন্তী উন্মিলাকে চিঠি লিখিয়াছে—

“উন্মি, তোকে যদি প্রথম দিন থেকে মার পেটের বোনের মত না দেখতাম, সম্বন্ধের মত না ভালবাসতাম, তাহলে আজ আর তোকে এ-কয় ছত্র লিখতে পারতাম না।

তোকে আমার বড় ছুঃখের দিনে বহুদিন পরে পেয়ে বুকাটা জুড়িয়ে গিয়েছিল। যাকে হারিয়ে আমি পৃথিবীটাকে সৃষ্টির বাইরে বিধাতার একটা উপহাস মনে করতাম, তাকে ফিরে পাবার পথ তুই আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলি, কিন্তু তুই জান্তিস না। এ বিধবার তপস্কার পথ নয়, বললে কেউ বিশ্বাসও হয়ত করবে না। কিন্তু তুই করবি মনে ক’রে তোকেই একদিন বলব ভেবে রেখেছিলাম। কিন্তু আমার কপাল মন্দ, সে সুখের বলা আজ আমার অপমানের কৈফিয়ৎ হয়ে দাঁড়াল।

স্বামী ত চলে গেলেন। তারপর যখন হিতৈষীরা সবাই মিলে আমার সিঁথির সিঁহর মুছে, শাড়ীর পাড় ছিঁড়ে, হাতের চুড়ি ভেঙে আমাকে ভিখারী সাজিয়ে ছেড়ে দিলে তখন আমার জ্ঞান ছিল না। কিন্তু চৈতন্য হ’ল ক’দিন পরে নিজের দিক তাকিয়ে মনে হ’ল এত আমি নয়। কোথায় গেল সেই জয়ন্তী বার প্রতিটি শাড়ীর পাড় তার স্বামীর রুচি অঁকা ছিল, যার প্রত্যেক অলঙ্কার ছিল স্বামীর জমাট ভালবাসা, যার সিঁথির সিঁহর কতদিন স্বামী স্বহস্তে এঁকে দিয়েছে? সে মরে গেছে হারিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার সে স্বামী যেন একবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গঙ্গার থেকে মুছে গেছে।

তোর কাছে যখন এলাম তখন পাথর হয়ে গিয়েছি। কিন্তু তুই ত পাথরে প্রাণ জাগিয়ে দিলি। বে-চুলের গোছা মাস-শাওড়ী মুড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন তাকে তুই আবার যত্ন ক’রে বেঁধে ফুল দিয়ে দিয়েছিলি মনে আছে? মনে প’ড়ে গেল ছ-মাণ আগে এলোখোঁপায় ফুল কে দিয়ে দিয়েছিল। আবার যেন ঠিক তোর পাশে এসে দাঁড়িয়ে সে-ই হেসে উঠল। আচারে নিয়মে নিষেধে যাকে একবারে হারিয়ে ফেলেছিলাম, ঐ ছুটি ফুলের স্মৃতির মধ্যে সে জীবন্ত হয়ে উঠল।

আমার এ-হাত দুখানাকে আমি ত চিন্তেই পারতাম না। তুই তোর সোনার চুড়ি পরিয়ে চিনিয়ে দিলি। এই হাতেই বারো বৎসর স্বামীর সেবা করেছি। চুড়ি ছ-গাছা প’রে তারা যেন খুঁজে আনলে তাদের এত কালের পরিচিত বন্ধকে।

ফুলের সঙ্গে যে দেখা দিয়েছিল ক্রমে সে প্রত্যাহের সাথী হয়ে উঠল, আমার সকল অপূর্ণ সাধ-আহ্লাদ, আমার সকল কল্পনার সুখ ষা.ক বেঠন ক’রে পূর্ণ হয়ে উঠতে চেয়েছিল একদিন, তাকেই ধরে আবার তারা পূর্ণ হয়ে উঠল এবার। আমার গাজে সজ্জায় প্রসাধনে সেই যে আমার শরীর মন পূর্ণ করে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল তাকি তুই বিশ্বাস করবি?

স্বামীকে ত ভালবাসিন, ভেবে দেখ, দিকি, তোর কোন সাধ-আহ্লাদ, কোন সুখ-সৌভাগ্যটা তাকে ধরে নেই? সবতেই ত তোর সে গিশে রয়েছে।

সে কি শুধু তার শরীরটুকু? তোর সমস্ত জীবন জোড়া হয়ে উঠছে সে, আপনার শরীরের চেয়ে সে অনেক বড়।

আমার এতদিনের যে অভ্যস্ত জীবন তাকে নিশ্চুল ক'রে বাদ দিয়ে নূতন একটা জড় ছবি আর মাল। মস্তের মধ্যে তাকে কোথাও খুঁজে পাই না। ছবি কেবল মনে পড়িয়ে দেয় সে হারিয়ে গেছে। আমি যে সেই হারানটাই ভুলে

থাকতে চাই। আমার সকল স্মৃতি সকল আবেষ্টনে যদি সে জীবন্ত হয়ে থাকে তবে আমার আচারের ক্রটি হ'লে কি আমাকে পরে পাগল মনে করলেও গ্রাহ্য করব না।

আর কি লিখব? ঠাকুরপোকে স্মৃতি করিস্। তুহ সুখে থাক।

তোর দিদি জয়ন্তী

জার্মানীর একটি বিদ্যালয়

শ্রীঅনাথনাথ বসু

জার্মানীর বিখ্যাত ব্ল্যাক ফরেস্ট (Schwarzwald)-এর উত্তরাংশ ওডেনভাল্ড (Odenwald) বা ওডেনের বন নামে পরিচিত। এই অঞ্চলটি ব্ল্যাক ফরেস্টেরই মত নয়নাভিরাম। রাইন উপত্যকার পূর্বদিকে ছোট বড় পাহাড়ের শ্রেণী উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। তাহারই পারের কাছে সমতলক্ষেত্রের উপর দিয়া রাইন নদী বহিয়া গিয়াছে। পাহাড়ের দেহ ও চূড়াগুলি ওক বীচ ও পাইনে ঢাকা। হেমন্তে যখন গাছের পাতাগুলিতে রং ফেরে তখন সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় মনোরম হয় আবার শীতকালে যখন বরফ পড়িয়া চারিদিক সাদা হইয়া যায় তখন সে সৌন্দর্য্য আর এক রূপ ধারণ করে। পাহাড়ের পারের কাছে ও গায়ের উপর গাছের আড়ালে ছোটবড় গ্রাম। জার্মানীর গ্রাম অঞ্চলে বাড়িগুলি প্রায়ই লাল টালি দিয়া তৈয়ারি; সবুজ পাতার ফাঁকে দূর হইতে সেগুলি বড় সুন্দর দেখায়।

এইখানেই একটি পাহাড়ের গায়ে যুরোপের শিক্ষাক্ষেত্রে সুপরিচিত ওডেনভাল্ড স্কুল (Odenwaldschule) প্রতিষ্ঠিত। এরূপ সুন্দর প্রাকৃতিক অবস্থান আমি খুব কম বিদ্যালয়েরই দেখিয়াছি। কয়েক বৎসর পূর্বে এই বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষয়িত্রী যখন শাস্তিনিকেতনে আসেন তখন তাহার কাছে ইহার কথা শুনি ও ছবি

দেখি। তখন হইতেই বিদ্যালয়টি দেখিবার আগ্রহ ছিল। যুরোপে গিয়া সেই আগ্রহ মিটাইবার সুযোগ পাইলাম। ১৯৩১ সালে আমি প্রথম ওডেনভাল্ড স্কুলে যাই। তাহার পর দুই বৎসরে কয়েকবার সেখানে গিয়াছি এবং বিদ্যালয়টি ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি।

প্রায় চব্বিশ বৎসর পূর্বে, ১৯১০ সালে পল গেভের তাহার পত্নীর সহায়তায় ও সহযোগিতায় ওডেনভাল্ড বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। যুরোপে শিক্ষাক্ষেত্রে এই বিদ্যালয়ের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে এবং ইহার প্রতিষ্ঠার সহিত সেখানকার শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে যে অভিনব আন্দোলন দেখা দিয়াছে তাহার ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে। সুতরাং সেই আন্দোলনের কথা সংক্ষেপে বলি; তাহা হইলে এই বিদ্যালয়ের আদর্শ ও কার্যক্রম বোঝা সহজ হইবে।

এই আন্দোলন নিউ স্কুল মুভমেন্ট (New School Movement) নামে পরিচিত। ১৮৮৯ সালে সেসিল রেডি (Cecil Reddie) ইহার প্রবর্তন করেন। প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর প্রতিবাদ করিয়া অভিনব শিক্ষাপ্রণালী সৃষ্টি করাই ইহার উদ্দেশ্য। তখন ইংলণ্ডে যে শিক্ষাপদ্ধতি চলিতেছিল, আমাদের দেশে আজও তাহার একটি অনুকরণ চলিয়া আসিতেছে; সুতরাং একহিসাবে তাহার

সহিত আমাদের কিছু পরিচয় আছে। সেজন্য তাহার পরে এই আদর্শে পরিচালিত আরও কয়েকটি বিদ্যালয়
ক্রটিগুলি আলোচনা না করিলেও চলিতে পারে। শিক্ষার জার্মানীতে স্থাপিত হয়।

এই নবীন আদর্শের মধ্যে কয়েকটি মূলকথা আছে : হীরে হীরে লিংসের লান্ড-এরৎসিহৎসহাইমের আদর্শও
(১) শিশুর স্বাধীনতা, (২) ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর কিছুপরিমাণ রূপান্তর গ্রহণ করে এবং তাহার ফলে

বিকাশ; (৩) মানুষের বিচিত্র
চিন্তাবৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ অনুশীলনের জন্য
সমগ্রতর শিক্ষার পরিকল্পনা। ব্যক্তিত্বের
সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য স্বাধীনতার
প্রয়োজন; এবং সেজন্য মানসিক
বৃত্তিগুলির সর্বাঙ্গীন অনুশীলন দর-
কার। প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীতে
ব্যক্তিত্বের বিকাশের বিশেষ আয়োজন
ছিল না। সেখানে লেখাপড়ার উপরেই
বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষার
এই নূতন আদর্শ অবলম্বনে ১৮৮৯
খৃষ্টাব্দে আবটসহোম (Abbots-
holme) নামক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা
করেন। অল্পদিনেই তাহার কথা
চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই আদর্শ
দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ডেমোলিয়া
(Eduard Demolins) ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে



খোলা জায়গায় অভিনয়ের দৃশ্য

প্যারিসের অনতিদূরে একোল দে রোস্ (Ecole des
Roches) নামক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। জার্মানীতেও
এই আন্দোলনের চেউঁ আসিয়া পৌঁছায়। সেখানে এই
আন্দোলনের প্রথম প্রবর্তক হারমান্ লিৎস্ (Hermann
Lietz)। তিনি কিছুকাল আবটসহোমে রেডির সঙ্গে
কাজ করিয়াছিলেন। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি
যে-শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করেন
সেগুলি লান্ডএরৎসিহৎসহাইমে (Land-Erziehungs-
heime) নামে পরিচিত। এই শব্দটির অর্থ পল্লীঅঞ্চলে
স্থিত শিক্ষানিকেতন। নামটির মধ্যেই বিদ্যালয়ের দুইটি
আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে; ইহা বিদ্যালয় নহে নিকেতন
(Heim); এবং পল্লীঅঞ্চলের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ যোগ
আছে। লিৎস ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ইন্সেনবার্গে প্রথম
লান্ড-এরৎসিহৎসহাইমে প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার

জার্মানীতে আর এক শ্রেণীর বিদ্যালয় দেখা দেয়।
এগুলি ফ্রাই হ্যাল গেমাইণ্ডে (Freie Schulgemeinden)
অর্থাৎ স্বনিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয়-সমাজ নামে পরিচিত। এই
নূতন আদর্শের প্রচারক ছিলেন গুস্তাভ ভিনেকেন
(Gustav Wyneken) ও পল গেহেব (Paul Geheeb)।
গেহেব কিছুদিন লিংসের সহকারী ছিলেন; কিন্তু কয়েকটি
कारणे তাঁহার সহিত মতভেদ হওয়ায় গেহেবকে লিংসের
বিদ্যালয় ছাড়িতে হয়। তখন তিনি ও ভিনেকেন মিলিয়া
ভিকার্সডর্ফে (Wickersdorf) প্রথম ফ্রাই হ্যাল গেমাইণ্ডে
প্রতিষ্ঠা করেন।

রেডির মূল আদর্শে বিদ্যালয়ের সামাজিক দিকটা বিশেষ
ছুটিয়া ওঠে নাই। লান্ড-এরৎসিহৎসহাইমের আদর্শে
সেই ভাবটি প্রথম দেখা দেয়, কিন্তু ফ্রাই হ্যাল গেমাইণ্ডের
আদর্শেই তাহার পূর্ণ বিকাশ হয়। বিদ্যালয় যে শুধু

বিদ্যালয়েরই কেন্দ্র নহে, ইহা যে একটি বিশেষভাবে সমাজ, বাহিরের বৃহত্তর সমাজের ক্ষুদ্রতর সংস্কৃত প্রতিচ্ছবি এইটাই স্থান গেমাইণ্ডের কেন্দ্রীভূত তত্ত্ব। ভিনেকেন এই তত্ত্বটি স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ফলে বিদ্যালয়ের



রবীন্দ্রনাথ ও পল গেহেব

যে আমূল রূপান্তর দরকার ছিল, ততদূর পর্যাস্ত করিতে তিনি সক্ষম ছিলেন না। গেহেব মনে করিতেন যে বিদ্যালয়সমাজকে ঠিক সমাজেই পরিণত করিতে হইলে সেখানে সহশিক্ষার প্রবর্তন করা একান্ত আবশ্যিক। কিন্তু ভিনেকেন সহশিক্ষায় বিশ্বাস করিতেন না। তাহা ছাড়া ফ্রাই স্থান গেমাইণ্ডে বলিতে যতখানি স্বাধীনতা বোঝায় তিনি ছেলেদের ততখানি স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই সকল কারণে গেহেবকে শেষে ডিকার্সডর্ফ ছাড়িয়া অন্তত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে হইল।

তাহার ফলে ১৯১০ সালে ওডেনভাল্ড স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইল। আকারে-প্রকারে সেটা সাধারণ বিদ্যালয় হইতে এতই স্বতন্ত্র যে, প্রথম দেখিলে সেটাকে বিদ্যালয় বলিয়া মনে করা শক্ত হয়। এ যেন একটা বৃহৎ পরিবার, পাহাড়ের গায়ে কুটির রচনা করিয়া বাস করিতেছে। সাধারণতঃ বিদ্যালয় বলিতে আমরা একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকার কথা ভাবি; এখানে সেবকম কিছুই নাই। ছেলেমেয়েরা সতী বিভিন্ন বাড়িতে অধ্যাপকদের সহিত



ছেলেমেয়েদের অভিনয়ের একটি দৃশ্য

বাস করে। অদূরে উপত্যকায় গ্রামের গৃহগুলি যেমন এগুলিও তেমনি, তবে অপেক্ষাকৃত বড়। প্রত্যেক গৃহেরই এক একটি নাম আছে; যে-সকল মনীষীর চিন্তার ধারা বিদ্যালয়ের আদর্শের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাঁহাদের নামে গৃহগুলির নামকরণ করা হইয়াছে। প্লেটো, গোটো,

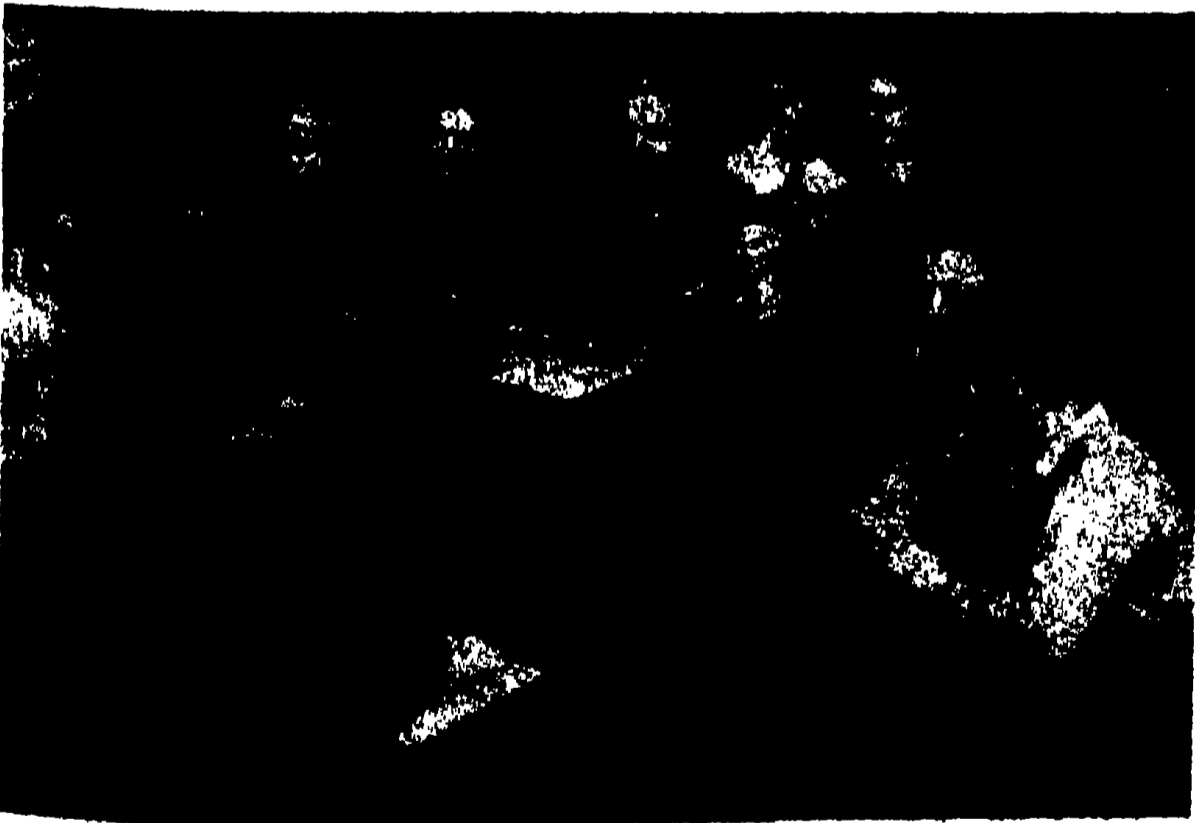
শালার, হার্ডার, হুম্বোল্ট ও পেটালৎসি এই কয়জনের নামে বিভিন্ন গৃহগুলি পরিচিত।

শিক্ষার জন্ত স্বতন্ত্র কোন বিদ্যালয়গৃহ নাই; যেখানে ছেলেমেয়েরা বাস করে সেইখানেই কয়েকটি ঘর আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছে; সেইখানেই পড়ান হয়। ঘরগুলির আসবাবপত্রও সাধারণ বিদ্যালয়ের মত নহে। দেখিলে মনে হয় কোন গৃহস্থের লেখাপড়া করিবার ঘর।

বিদ্যালয়ের তিন হইতে কুড়ি-একুশ পর্য্যন্ত সকল বয়সের ছেলেমেয়েই দেখিলাম।

বিদ্যালয়ের সকল কার্যেই ছেলেমেয়েরা সাহায্য করে। ঘর পরিষ্কার করা, পথঘাটগুলি ঠিক রাখা, রক্ষণ করা, বাসন যাজা, কাপড় কাচা প্রভৃতি সকল কাজেই ছেলেমেয়েরা

নিয়মিতভাবে যোগ দেয়। এগুলিকে 'তাহারা' বিদ্যালয় শিক্ষকই অঙ্গ বলিয়া মনে করে। বিদ্যালয়ের বাগানে



অধ্যাপনারত পল গেহেব

ছেলেমেয়ে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী সকলেই কাজ করেন। একস্থানে পাহাড়ের উপরে অনেকখানি মাটি সমতল করিয়া খেলার অঙ্গন তৈয়ারি করা হইয়াছে। শুনিলাম

ছেলেমেয়েরা মিলিয়াই এটি করিয়াছে। আমি যখন সেখানে ছিলাম তখন ছেলেমেয়েরা উন্মুক্ত স্থানে একটি রঙ্গমঞ্চ (open-air stage) তৈয়ার করিতেছে। মাঝে মাঝে আমিও তাহাদের কাজে যোগ দিতাম। ছেলে-

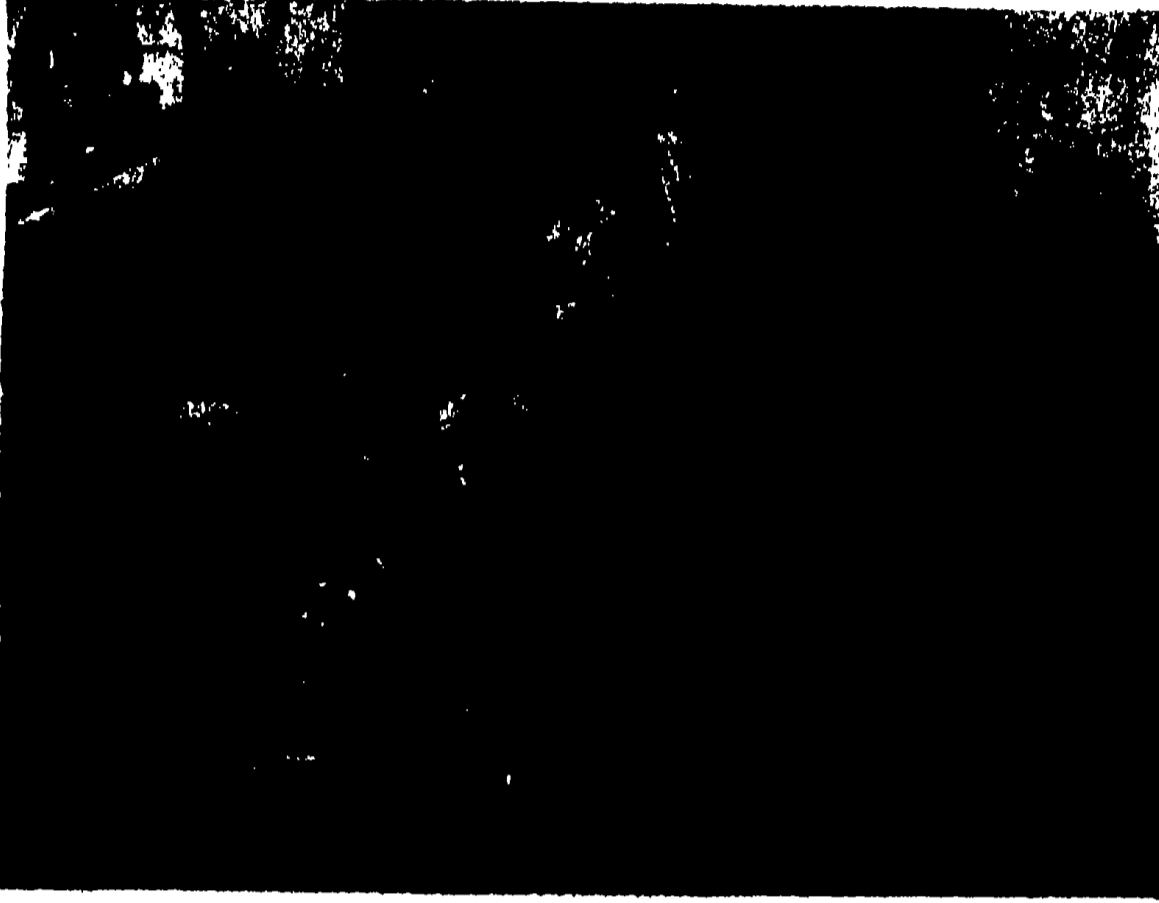


পাহাড় ও অঙ্গল কাটিয়া ছাত্রেরা খেলার জায়গা করিতেছে

মেয়েরা শিক্ষকদের সহিত কাজ করিতে অভ্যস্ত; তাহারা সহজেই আমাকে তাহাদের দলে লইয়াছিল এই প্রসঙ্গে মনে পড়িয়া গেল ওডেনভাল্ড বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ মিটারবেটার (mitarbeiter) অর্থাৎ সহকর্মী নামে পরিচিত। এ নামের সার্থকতা সেখানে সর্বত্র দেখিয়াছি। শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে সেখানে যেরূপ হৃদয়তার সম্পর্ক দেখিলাম অন্তত সে রূপ জুলভ। মোটের উপর এখানে শিক্ষায়, কর্মে, চেষ্টায়, আচারে, ব্যবহারে সর্বত্রই বিদ্যালয়ের সমাজ-রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

যুরোপে ও আমেরিকায় অনেক বিদ্যালয়ে সশিক্ষা দেখিয়াছিলাম। কিন্তু এখানে সে আদর্শ যতদূর আচরিত হইয়াছে অল্প কোথাও ততখানি দেখি নাই। ছেলেমেয়েরা একই গৃহে পাশাপাশি কক্ষে বাস করিতেছে, একসঙ্গে লেখাপড়া কাজকর্ম আনন্দ উৎসব করিতেছে, একত্রে বেড়াইতে বাইতেছে, অবাধে মেলামেশা করিতেছে; তাহাদের মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা কুণ্ঠার ভাব নাই;

শিক্ষকেরাও এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদার। ছাত্রছাত্রীদের উপর তাঁহাদের, বিশেষ করিয়া গেহেবের, অগাধ বিশ্বাস। সহ-শিক্ষার ব্যাপারে অনেক সময়ে দুইটি জিনিষ দেখা যায়; কর্তৃপক্ষগণ হয়ত বাহ্যতঃ সহ-শিক্ষার প্রবর্তন করিয়াছেন



যন্ত্রাগারে একটি বালক কাজ করিতেছে

কিন্তু তাঁহাদের মনে এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস নথাকাইয়া তাঁহারা অত্যধিক মাত্রায় ছেলেমেয়েদের উপর নজর রাখেন।

ফলে ছেলেমেয়েদের মনেও বিশ্বাস ও সাহসের অভাব হয়; তাহারা ভাবে, হয়ত ইহার মধ্যে জুগুপ্সার কিছু আছে। এই ভাবে এমন একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় যেখানে সহ-শিক্ষা চলিতে পারে না। এটিকে যদি সহজ ভাবে লওয়া যায় তাহা হইলেই ব্যাপারটাও সহজ হইয়া ওঠে। অবশ্য আমি নজর রাখার আপত্তি করি না; কিন্তু সে চেষ্টা প্রচ্ছন্ন রাখিতে হইবে, তাহাকে সীমা লঙ্ঘন করিতে

দিলে মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সহ-শিক্ষা সম্বন্ধে আর একটি ব্যাপারও ঘটে। অনেক সময়ে একত্রে লেখাপড়া করাকেই সহ-শিক্ষা বলা হয়। কিন্তু শিক্ষা শুধু লেখা-

পড়ারই মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, মূলতঃ তাহার সম্পর্ক আচারের সঙ্গে; বিদ্যা সেই আচারনিয়ন্ত্রণের সাধন মাত্র; সেইজন্য উদারতা অর্থে বিদ্যালয়ে চলাফেরা, আনন্দ উৎসব করা, নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করা সকলই শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। সহ-শিক্ষায় যদি তাহার আয়োজন না থাকে তাহা হইলে সেরূপ শিক্ষাকে সহ-শিক্ষা নামে অভিহিত করা অন্তায়।

সহ-শিক্ষার সহিত স্বাধীনতার বনিষ্ঠ যোগ আছে। ওডেনভাল্ড বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাধীনতা-বিকাশের যথেষ্ট আয়োজন আছে। স্বাধীনতার মূল কথা দায়িত্ব ও অধিকার; যে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে শিখিল না, তাহার পক্ষে স্বাধীনতার কোন মূল্য নাই; অধিকার দায়িত্বেরই অন্তরূপ। অধিকার পাইতে হইলে দায়িত্ব স্বীকার করিতে হয় এবং দায়িত্বগ্রহণ করিলেই তবে অধিকার লাভ করা যায়। ওডেনভাল্ড বিদ্যালয়ের কার্যপরিচালনায় ছেলেমেয়েরা কতখানি দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া লইয়াছে তাহার কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই সকল কার্য সুচারু-



ওডেনভাল্ড বিদ্যালয়

রূপে সম্পন্ন করিবার জন্ত ছেলেদের মণ্ডলী আছে; তাহা স্ক্যাল গেমাইণ্ডে নামে অভিহিত; ছাত্রছাত্রীরাই তাহার একজন নেতা নির্বাচন করে। সেই মণ্ডলীর নিয়মিত

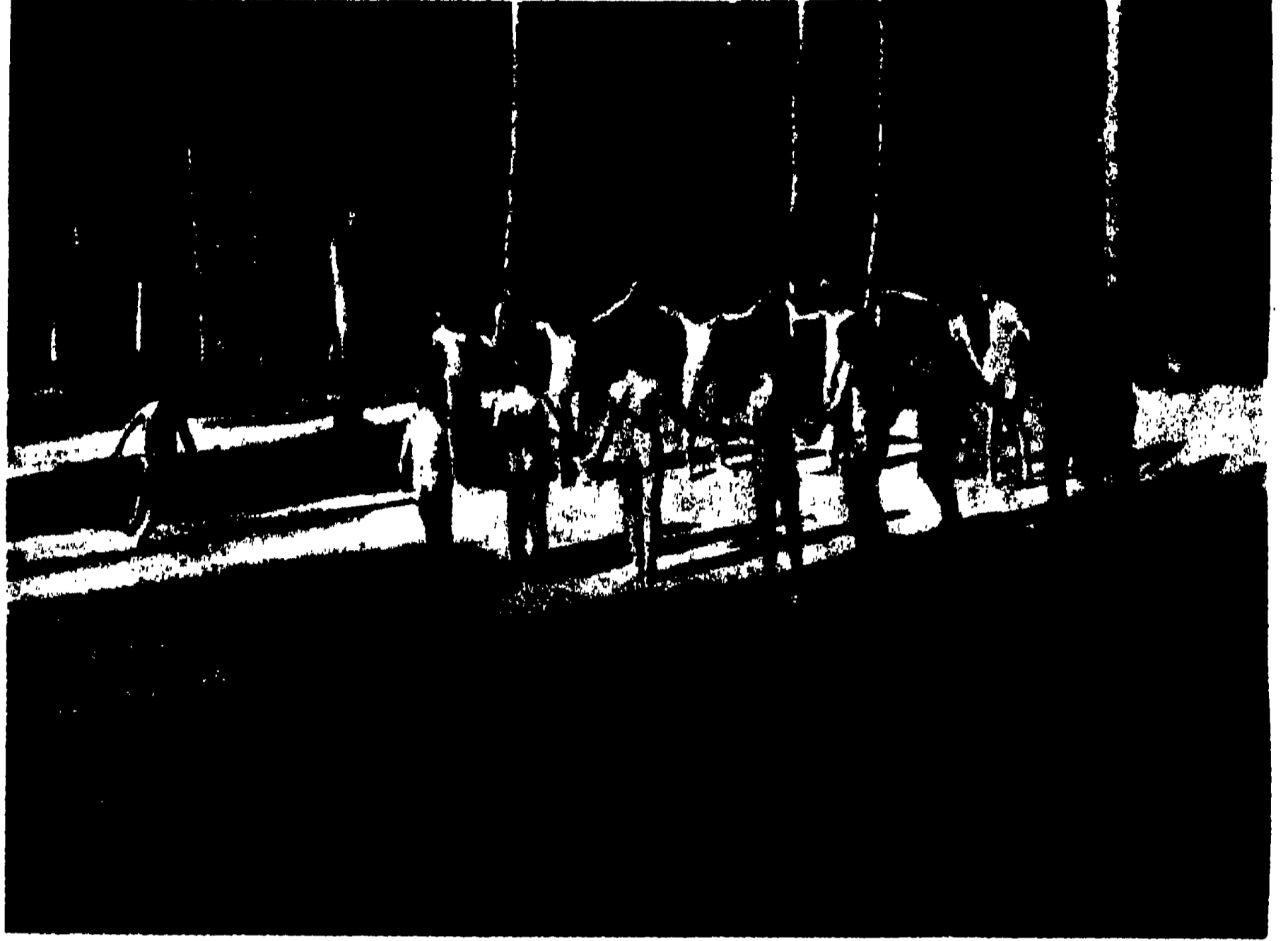
বৈঠক হয়, সেখানে সকলেই উপস্থিত থাকেন। বিদ্যালয়-সম্বন্ধীয় সকল কথাই সেখানে আলোচিত হয়।

তাহা ছাড়া প্রত্যেক গৃহে কয়েক জন বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক রূপে থাকে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কিছুদিন আগে পর্যন্ত অধ্যাপকগণ ছাত্র-ছাত্রীদের ভার লইয়া বিভিন্ন গৃহে তাহাদের মধ্যে বাস করিতো। কিন্তু কিছুকাল পূর্বে গেহেবের মনে হয় যে, সর্বক্ষণ শিক্ষকগণের এরূপ তত্ত্বাবধান ছেলে মেয়েদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে এবং ফলে তাহাদের দায়িত্ব-বোধ কমিয়া যায়, সুতরাং শিক্ষকগণকে দূরে থাকিতে হইবে। তাহার পর ঐহতে যদিচ শিক্ষকগণ ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে বাস করিতেছেন তবু তাঁহারা তাহাদের জীবন-যাত্রা-প্রণালীতে সাক্ষাৎ ভাবে

কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন না। সে-ভার সম্পূর্ণরূপে স্থান গেমাইণ্ডে এবং ছাত্র-অভিভাবক-গণের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ছাত্র-অভিভাবকগণ প্রায়ই একত্র হইয়া তাহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সে আলোচনায় পরামর্শদাতা রূপে গেহেব বা তাঁহার স্ত্রী উপস্থিত থাকেন এবং কার্যপরিচালনায় সহায়তা করেন।

গেহেব শুধু বিদ্যালয়ের সামাজিক জীবনে স্বনিয়ন্ত্রণ নীতি প্রবর্তন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, লেখাপড়ার ক্ষেত্রেও তিনি এই নীতি অনুসরণ করিয়াছেন। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারেও যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। ওডেনভাল্ড বিদ্যালয়ে শিক্ষার এক নূতন প্রণালীর পরিচয় পাইলাম। মাসে মাসে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে এক একটা কোর্সের ব্যবস্থা আছে; শিক্ষকগণ সে মাসে নির্দিষ্টকতকগুলি বিষয় লইয়া আলোচনা করেন। ছেলে-

মেয়েরা তাহাদের প্রয়োজন ও ইচ্ছা অনুযায়ী তাহারই মধ্যে কয়েকটা বিষয় বাছিয়া লয়। তাহাদের নির্বাচনে শিক্ষকগণ সহায়তা করেন কিন্তু এ-বিষয়ে ছাত্রের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। উদাহরণ দিই; মনে করুন অক্টোবর মাসে



ছেলেদের ব্যায়াম ও খেলা

জীববিজ্ঞান, অঙ্ক, ইংরেজী ও ইতিহাস এই চারিটি বিষয়ে পড়ান হইবে। একজন ছাত্র হয়ত ইতিহাসের পাঠ্য অনেকখানি শেষ করিয়াছে; সে এরূপ ব্যবস্থায় এ মাসে ইতিহাস না পড়িয়া সে-সময়ে অল্প কিছু আলোচনা করিতে পারে। এই কোর্সগুলি এমন ভাবে ব্যবস্থা করা হয় যে, সারা বৎসরেই সকল বিষয়ে যতটুকু পড়ান প্রয়োজন, ততখানি বিভিন্ন বিভিন্ন সময়ে পড়াইয়া শেষ করা হয়। একটানা ভাবে সারা বৎসর ধরিয়া কোন বিষয় পড়ান হয় না। ফলে একজন ছাত্র রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিষয় বাছিয়া পড়িতে পড়িতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত পড়াই শেষ করে কিন্তু কোন সময়ে বাহিরে শিক্ষকের চাপ বোধ করে না।

এই বিদ্যালয়ে নানারূপ হাতের কাজকে শিক্ষার অঙ্গীভূত করা হইয়াছে। ছুতারের কাজ, লোহার কাজ, বস্ত্রের কাজ, চিত্রাঙ্কন, মাটির কাজ, বই বাধাই প্রভৃতি

নানা রকম ব্যবস্থা আছে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে যাহার যেমন রুচি সে তেমন কাজ শিখিয়া লয়। বিদ্যালয়ের নিজস্ব ছাপাখানায় ছেলেমেয়েরাই কাজ করে। তাহাদের একটি মাসিক পত্র আছে; তাহা পরিচালনার ভারও ছেলেমেয়েদেরই উপর। বাগানের কথা পূর্বেই বলিয়াছি; যুরোপের সকল দেশেই দেখিয়াছি, সেখানকার



বিদ্যালয়ের তিনটি শিশু

লোক ফুল ভালবাসে। অতি দরিদ্র কৃষকও বাড়ির পাশে ছুটি ফুলগাছ রাখে। ওডেনভাল্ড বিদ্যালয়ের বাগানে ছেলেমেয়েরা নানারকম ফুলের চাষ করে; তাহা ছাড়া তরিতরকারি শাকসব্জী চাষের ব্যবস্থাও আছে। বিদ্যালয়ের নিজস্ব ফলবাগানে প্রচুর ফল হয়। সে-গুলির রক্ষণাবেক্ষণের (এবং তাহার চেয়ে বেশী ভক্ষণের) ভারও ছেলেমেয়েরা কিছু পরিমাণে লইয়াছে।

মানুষ সৃষ্টি করিতে চায়; অতি ছোট শিশুর মধ্যেও এই আকাঙ্ক্ষা আত্মপ্রকাশ করে। সাধারণ বিদ্যালয়ে মানুষের সেই স্বাভাবিক সৃজনীবৃত্তির বিকাশের কোন আয়োজনই নাই। লেখাপড়ার মধ্যে অন্ততঃ বিদ্যালয়-জীবনে কতটুকুই আত্মপ্রকাশ করা চলে। সেইজন্যই বাহাতে এই বৃত্তির বিকাশের সহায়তা হয়, এরূপ প্রচুর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। গেহেব ও তাঁহার সহকর্মীগণ শিক্ষার এই তত্ত্বটি উপলব্ধি করিয়া তাহা কার্যে পরিণত করিয়াছেন।

শিক্ষাকে সমগ্রভাবে দেখিলে তাহার মধ্যে খেলার ও আনন্দ-উৎসবের আয়োজন রাখিতে হয়। ওডেনভাল্ড বিদ্যালয়ে খেলার ব্যবস্থা যথেষ্ট আছে; কিন্তু ইংলণ্ডে

যেমন সে ব্যবস্থা অনেক সময়ে মাত্রা ছাড়াইয়া যায়, এখানে তেমন হয় নাই। বাগানে, রঙ্গমঞ্চনির্মাণে, ও অন্যান্য ভাবে ছেলেমেয়েরা একত্রে মিলিয়া যে-সকল কাজ করে, সেগুলিকেও খেলার অঙ্গীভূত করা হইয়াছে। এরূপ কাজের মধ্যেও খেলার ভাবটি আসিয়া পড়িয়াছে। ফলে ছেলেমেয়েরা আপনার আনন্দে কাজ করে।

বিদ্যালয়ে নানারূপ আনন্দ-উৎসবের আয়োজন আছে। বৎসরের মধ্যে একটি বিশেষ দিন আছে যখন বিদ্যালয়ের সকলে নানারূপ ছদ্মবেশ করিয়া নিশ্চল আমোদ-কৌতুক করে। তাহা ছাড়া মাঝে মাঝে অভিনয়ের ব্যবস্থাও আছে। কখনও বা তাহার স্তম্ভ গৃহের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করা হয়, কখনও প্রকৃতির সুন্দর বক্ষে উন্মুক্ত স্থানে অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। আমি থাকিতে ছেলেমেয়েরা একদিন এইভাবে শেক্সপীয়ারের একটি নাট্য অভিনয় করিল। খৃষ্ট-জন্মোৎসবের সময় প্রতিবৎসর ওডেনভাল্ড বিদ্যালয়ে সকলে মিলিয়া খৃষ্টের জন্মকাহিনীর বা জীবনের কোন ঘটনা অবলম্বন করিয়া অভিনয় করেন। গত বৎসরের অভিনয়ের একটি ছবি এই প্রবন্ধে দেওয়া হইল।

জার্মান জাতি গান ভালবাসে। বিদ্যালয়ে প্রায়ই গানের মজলিস বসে ও সকলেই তাহাতে যোগদান করে। যুরোপে দুই রকম গান প্রচলিত আছে, এক রকম ক্লাসিক গান, অপর অপেক্ষাকৃত তরলপ্রকৃতির সাধারণ চলিত গান। জার্মানীতে ক্লাসিক সঙ্গীতেরই আদর বেশী। এই বিদ্যালয়েও সেই শ্রেণীর গানেরই ব্যবস্থা আছে।

বিদ্যালয়ের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার প্রণালী একান্ত সহজ ও সরল। ছেলেমেয়েরা ও শিক্ষকগণ সকলেই খুব সাধারণ পোষাক পরিয়া থাকেন। দিনের অধিকাংশ সময়েই তাঁহারা খোলা হাওয়ায় কাটান। তাহাদের খেলাধুলা, ব্যায়াম, এমন কি পড়াশুনাও অনেক সময়েই উন্মুক্ত স্থানেই চলে। বিদ্যালয়ের চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব সুন্দর। প্রকৃতির সঙ্গে ছেলেমেয়েদের প্রতিমুহূর্তেই পরিচয় হইতেছে। জীবন গঠনের দিক দিয়া এরূপ পরিচয়ের মুলা কম নহে।

জার্মান ছেলেমেয়েরা বেড়াইতে খুব ভালবাসে। সে-

দেশের ভাণ্ডারফোগেল (wandervogel)-এর কথা অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। ছুটির সময় ছেলেমেয়েরা দল বাধিয়া বাহির হইয়া পড়ে, সঙ্গে হয়ত কিছু আহাৰ্যা সংগ্রহ করিয়া লয়; তাহার পর কয়েক দিন গান গাহিয়া, খেলা করিয়া, পল্লীঅঞ্চলে বা পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া কাজে মন দেয়। ইহাকে সেখানে ভাণ্ডারুং (wanderung) বলা হয়। ওডেনভাল্ড বিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে এইরূপ ভাণ্ডারুঙের ব্যবস্থা আছে। একবার প্রায় ত্রিশ জন ছেলেমেয়ের সঙ্গে নিকটস্থ পাহাড় অঞ্চলে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। আমাদের দলে নয় বৎসরের বালিকা হইতে প্রবীণ বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই ছিল। সকলের পিঠে একটি কুক্‌শাক্ বা ঝুলি; তাহাতে

কয়েকটি কাপড় জামা, কিছু খাবার ও রাত্রে শুইবার জন্তু থলি। যেখানে বেড়াইতে যাইতেছিলাম সেখানে মাঝে মাঝে চটি আছে; রাত্রে সেইখানেই আশ্রয় লইতে হয়। বিছানা ত সব সময়ে পাওয়া যায় না, তাই এইরূপ শুইবার থলির ব্যবস্থা। কয়েক দিন পাহাড়ে পাহাড়ে খুব ঘুরিলাম; ছেলেমেয়েরা যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করিল; কিন্তু শ্রমও কম হয় নাই। ফিরিয়া দুই-এক দিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইতে হইল। আমরা যখন ভাণ্ডারুঙে গেলাম তখন বিদ্যালয়ের আর এক দল অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছেলেমেয়ে, দূরে গ্রামে কৃষকদের আঙুরের ফসল কাটিবার সাহায্য করিতে গেল। চাষীরা এরূপ সাহায্য সাগ্রহে লয়। ছেলেমেয়েরা তাহাদের সঙ্গে মাঠে একত্রে পরিশ্রম করে; কোন কোন দিন দশ-বার ঘণ্টা পর্য্যন্ত খাটিতে হয়। কিন্তু তাহাতেই তাহাদের আনন্দ। এই সময়ে যখন সকলে দলে দলে ভাণ্ডারুঙে বাহির হয়, দু-এক দল ছেলে এইভাবে কোন পল্লীতে গিয়া কাজ করে।

জাতীয় জীবন ও চরিত্রগঠনে এরূপ ব্যবস্থার মূল্য কতখানি তাহা উল্লেখ না করিলেও চলিতে পারে।

এখানে একটি সুন্দর ব্যবস্থা দেখিলাম। বিদ্যালয়ের সকলেই একত্রে ভোজন করে। ভোজনের পূর্বে কিছু-



একটি ক্লাস

ক্ষণের জন্য শিক্ষকগণ একত্র সমবেত হইয়া ছাত্রদের সম্বন্ধে আলোচ্য কিছু থাকিলে আলোচনা করেন। ভোজনের পরেও সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সকলকে পাঁচ মিনিট কাল উপস্থিত থাকিতে হয়। ভোজনোরস্তের পূর্বে পাওলাস্ কোন গ্রন্থ হইতে দু-এক লাইন পড়িয়া শোনান। খৃষ্টানদের মধ্যে এই সময়ে নিবেদন করিবার বা গ্রেস্ (grace) বলিবার প্রথা আছে। এখানে সেই প্রথাই এই রূপ ধারণ করিয়াছে। ভোজনের ব্যবস্থা খুবই সাধারণ, কিন্তু পুষ্টিকর। অন্যান্য বিদ্যালয়ে যে রূপ আড়ম্বর আছে এখানে তাহার কিছুই দেখিলাম না।

এখানকার আর একটি ব্যবস্থা আমার বড় ভাল লাগিল। প্রতি রবিবার প্রাতে সেখানে উপাসনার ব্যবস্থা আছে। এই উপাসনা আন্ডাক্ট (andacht) নামে অভিহিত হয়। ইহার প্রণালী সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। যাহারা সাধারণভাবে উপাসনা করিতে চাহে তাহারা নিকটস্থ গ্রামের ভজনালয়ে যায়, কিন্তু এরূপ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা

কম। অধিকাংশই আনুষ্ঠানিক যোগ দেয়। সেখানে উপাসনার কোন ধরাবাঁধা পদ্ধতিই নাই, এমন কি গোড়া মতে সেটাকে উপাসনা বলা চলে কি-না সন্দেহ। কোনদিন হয়ত সেখানে শুধু সঙ্গীতই হইল, কোনদিন গেহেব (তিনি বিদ্যালয়ে পাওলাস্ (Paulus) নামে পরিচিত) কোন পুস্তক হইতে কিছু পড়িয়া শোনাইলেন। একরূপ গ্রন্থ সকল সময়ে যে ধর্মগ্রন্থ হয় তাহা নহে। একদিন দেখি, তিনি টেলটায়ের তেইশটি গল্পের একটি গল্প পড়িতেছেন। আর একদিন দেখিলাম, তিনি ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের প্রাণীদের একটি গল্প পড়িয়া শোনাইলেন।

গেহেব আদর্শবাদী, বিশ্বপ্রেমিক। তিনি শাস্তিবাদী, যুদ্ধে বিশ্বাস করেন ন। ভারতীয় সভ্যতার প্রতি,

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা। গেহেব মনে করেন বিশ্বের ছুঃখ দূর করিতে হইলে সমাজকে নূতন ভাবে নূতন আদর্শে গড়িয়া তুলিতে হইবে; সেই সমাজগঠনের মূলকথা স্বাধীনতা ও সহযোগিতা। ভাবীকালের উপযোগী স্বাধীনচিত্ত, চলিষ্কমন, বলিষ্ঠদেহ মানুষ গড়িয়া তুলিতে হইলে শিক্ষার নূতন আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। শিক্ষার সেই আদর্শকেই তিনি ওডেনভাল্ড বিদ্যালয়ে রূপ দিতে চেষ্টা করিতেছেন।

সংবাদ পাইলাম জার্মানীর বর্তমান গবর্নমেন্টের সৃষ্টি মতের মিল না হওয়ায় পল গেহেবকে ওডেনভাল্ডও ছাড়িতে হইয়াছে।

তন্ত্রের সাধনা

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, এম-এ

মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি ষট্‌কর্ম ও মদ্য মাংস মৎস্য প্রভৃতি পঞ্চ 'ম'কার—এই সকলের জন্য তান্ত্রিক-ধর্ম আধুনিক যুগে দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতসমাজে বিশেষ ভাবে উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত হইয়া আসিতেছে। বর্তমান কালে ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা জাগরণের ফলে ভারতের প্রাচীন সর্কবিধ সাহিত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হইলেও তন্ত্রসাহিত্যের অনুশীলন নিরতিশয় মন্দীভূত। তাহার কারণ একদিকে এই উপেক্ষা ও অবজ্ঞা, অন্যদিকে তন্ত্রশাস্ত্রের স্বাভাবিক দুর্কোধ্যতা। বস্তুতঃ কিছুদিন পূর্বেও তন্ত্রশাস্ত্র আলোচনা করা যেন একটা লজ্জার বিষয় ও কুরুচির পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হইত। তন্ত্রশাস্ত্র ও তান্ত্রিক আচারের বিলোপ অনেক চিন্তাশীল মনীষীরও কাম্য ছিল। তন্ত্রশাস্ত্রের নিন্দায় অনেকে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তন্ত্র ছদ্মবেশী কামশাস্ত্র—হুর্নীতি প্রচারের জন্যই এই শাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছিল—এইরূপ নানা কথা তন্ত্র সম্বন্ধে অবাধে প্রচার করা হইত।

সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্র সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়া কেহ এই জাতীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন একরূপ বলিতে পারা যায় না। বিশাল তন্ত্রশাস্ত্রের আংশিক আলোচনা এবং কতকগুলি তান্ত্রিক আচারের আপাতদৃষ্টিতে বিচারের ফলেই এই সব মতবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। একদেশদর্শী না হইয়া এবং পূর্ক হইতেই কোন বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ না করিয়া যে-কেহ ধৈর্য্যসহকারে তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা করিলেই পূর্কোন্নিখিত মতবাদের অসারতা, অন্ততঃ অতিরঞ্জন, স্বতঃই প্রতিপন্ন হইবে বলিয়া মনে হয়। অবশ্য তন্ত্র নামে যাহা কিছু চলিতেছে এবং তন্ত্রের নামে যে-কোনরূপ আচারই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, তাহা সকলই ভাল—তন্ত্রের অতিবড় পৃষ্ঠপোষকগণও একরূপ কথা বলিবেন না। তন্ত্র নামে প্রচলিত সমস্ত গ্রন্থেরই প্রামাণিকতা কোনও তান্ত্রিক আচার্য্যই স্বীকার করেন না। তন্ত্রের নাম দিয়া অনেকে নানা সময়ে যে-সমস্ত কুৎসিত আচরণ করিয়া থাকেন তাহারও কেহ প্রশংসা করেন

না। প্রামাণিক গ্রন্থের মধ্যেও কালক্রমে অনেক অপ্রামাণিক অংশ প্রবেশলাভ করিয়াছে তাহাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না। তাহা ছাড়া হিন্দুর সর্বপ্রকার অনুষ্ঠানের ন্যায় তান্ত্রিক অনুষ্ঠানেরও অধিকারভেদ নির্দিষ্ট আছে। সকল আচার সকলের পক্ষে বিহিত নহে। অসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান কোনও আচার সম্প্রদায়-বিশেষের জন্য বিহিত হইলে তাহারই জন্য সমস্ত শাস্ত্রকে অসঙ্গত বলা চলে না। তৎ আলোচনার সময় এই সমস্ত গোড়ার কথা ভুলিলে চলিবে না। এই সমস্ত বিষয়ে দৃষ্টি না দিয়া তৎ আলোচনা করিলে পদে পদে বিভ্রাট জাগিতে পারে—ভালনন্দের বিচিত্র সমাবেশ দেখিয়া চিত্ত সংশয়াকুল হইয়া উঠিতে পারে।

অবশ্য তত্ত্বগ্রন্থের প্রামাণ্য সম্বন্ধে তান্ত্রিকাচার্যগণের মধ্যে যে প্রবল মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অনেক সময় সাধারণ পাঠকের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তোলে। এক সম্প্রদায়ের অনুবর্তী লোক আর এক সম্প্রদায়ের গ্রন্থকে অপ্রামাণিক ও ভুল প্রতাপন করিবার জন্য চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। একই গ্রন্থ এইরূপে এক দলের মতে প্রামাণিক ও বিশুদ্ধ এবং অন্য দলের মতে অপ্রামাণিক ও ভুল।^১ তবে প্রকৃতপক্ষে ও সর্বসম্মতি-ক্রমে অপ্রামাণিক গ্রন্থগুলিকে বাছিয়া পৃথক্ করিয়া লওয়াও একেবারে অসম্ভব নয়—একটু অনুশীলন করিলেই তাহা সম্ভবপর হইতে পারে।

এইরূপে তত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তত্ত্বের কতকগুলি এমন বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা আদৌ উপেক্ষার বিষয় নহে। তত্ত্বোক্ত উপাসনা-পদ্ধতি দার্শনিকতার দ্বারা অনুপ্রাণিত। উপাস্য ও উপাসকের—ব্রহ্ম ও জীবের ঐক্যানুভূতির সহায়তা করা এই উপাসনাপদ্ধতির অগ্রতম প্রধান লক্ষ্য। এই বিশ্বজগৎ ভগবানের অভিব্যক্তিমাত্র—এই জগতের সমস্ত পদার্থ, বিশেষতঃ মানব-শরীর, দৈবী শক্তিতে পরিপূর্ণ এইরূপ ধারণা উপাসকের হৃদয়ে বদ্ধমূল

করিবার জন্যই তান্ত্রিক উপাসনায় ন্যাস ও অন্তর্যাগাদির বিধান করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। নিরর্থক শব্দ-সমষ্টি বলিয়া যে তান্ত্রিক মন্ত্রগুলিকে আধুনিক পণ্ডিতগণ উপহাস করিয়া থাকেন সেই মন্ত্রগুলিরও এইরূপ দার্শনিক ব্যাখ্যা তান্ত্রিকসমাজে প্রচলিত আছে। সার্থক হউক বা নিরর্থক হউক, শব্দরাশিকে তান্ত্রিকগণ বড় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। শব্দই দেবতার স্বরূপ—শব্দই ব্রহ্ম—এই তাঁহাদের মত। বস্তুতঃ তান্ত্রিক উপাসনার প্রতি অঙ্গের এইরূপ দার্শনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তান্ত্রিক দর্শনও একটি স্বতন্ত্র দার্শনিক সম্প্রদায়। সংখ্যাদি দর্শনে মেরুপ কতকগুলি তত্ত্ব আছে, তান্ত্রিক দর্শনেও সেইরূপ বিবিধ তত্ত্বের আলোচনা আছে। বেদান্তাদি দর্শনের সহিত ইহার সম্পর্কও বিভিন্ন গ্রন্থে অলোচিত হইয়াছে। মনে হয়, বেদান্তের সহিতই ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; বেদান্তের অদ্বৈতবাদ তত্ত্ব প্রতাপনে শ্রদ্ধার সহিত স্বীকৃত হইয়াছে। এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভবপর হইবে না। পৃথক্ প্রবন্ধে স্বতন্ত্রভাবে সে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

তত্ত্বের উপর সাধারণের যে বিরূপ উদ্ভা তত্ত্বোপাসনার উল্লিখিত বা তজ্জাতীয় বিধানসমূহের জন্য নহে। জনসাধারণের রুচিবিরহিত কতকগুলি এরূপ আচার তত্ত্বের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যেগুলি আপাতদৃষ্টিতে সর্বসম্মত নীতিমার্গের পরিপন্থী বলিয়া মনে হওয়া মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। যে-শাস্ত্রে পঞ্চ 'ম'কারের নির্বাধ উপভোগের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়—যে-শাস্ত্রে মারণ উচ্চাটন বশাকরণ প্রভৃতি পরের অনিষ্টসাধক ঘটকন্মের বিধান রহিয়াছে, সে শাস্ত্রের প্রতি সাধারণের একটা অবজ্ঞার ভাব উৎপন্ন হওয়া আদৌ বিচিত্র নহে। তবে এরূপ অবজ্ঞা পোষণ করার পূর্বে এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাগুলি ধীরভাবে পর্যালোচনা করা দরকার। এইরূপ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই সমস্ত আচারের যতই দোষ থাকুক না কেন, এ-সম্বন্ধে নানা গ্রন্থে যে-সকল বিধি-ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা দুর্নীতির পরিপোষক নহে, জনসাধারণকে অসৎপথে পরিচালিত করাও তাহাদের উদ্দেশ্য নহে। পক্ষান্তরে, এইগুলির মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিক

১। এ সম্বন্ধে 'হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা'য় প্রকাশিত মল্লিগিত 'তত্ত্বের প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা ছিল শাস্ত্রকারদিগের প্রধান লক্ষ্য। অবশ্য এই জাতীয় আচারের মধ্য দিয়া সাধনার পথে একটুও অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর কিনা সে বিষয়ে মনে স্বতই সংশয় জাগরিত হয়। অথচ, ঈদৃশ আচার কেবল তন্ত্রশাস্ত্রেই যে বিহিত তাহা নহে। বিভিন্ন দেশে আদিম ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ বা ইতোহধিক ত্রকার-জনক আচারের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য দেশের কথা জানি না তবে তন্ত্রের এই জুগুপ্সিত আচারের অনুবর্তী প্রকৃত সাধকও একান্ত ছলভ নহেন। বামা-ক্ষেপা সর্কানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষের মহত্ব সম্বন্ধে কেহ সন্দেহান নহেন—অথচ তাঁহারা এই সমস্ত আচারের মধ্যে অন্ততঃ কোন কোনটির অনুসরণ করিতেন। শক্তির উপাসক ষাঁহারা, তাঁহারা ভোগের মধ্য দিয়াই মোক্ষের পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন—একথাও তন্ত্রশাস্ত্রে স্পষ্টতই পাওয়া যায় (উমাপদাশ্চোজযুগার্চনে তু ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্ব এব)। তাই বলা হইয়াছে, ‘যৈরেব পতনং দ্রবৌমুক্তি-স্তুরেব সাধনৈঃ’ অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ সাধারণতঃ মানুষের অধঃপতন আনয়ন করে, তন্ত্রশাস্ত্রের মতে, তাহারাই (স্থলবিশেষে) মুক্তি প্রদান করে। অতএব, তন্ত্রের এই পথের রহস্য যোগীদিগেরও অগম্য (কৌলো মার্গঃ পরমগমনো যোগিনামপাগম্যঃ।)

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিত হার্ট-ল্যান্ড (Hertland) তাঁহার Sex-worship নামক প্রবন্ধে (Encyclopaedia of Religion and Ethics গ্রন্থে প্রকাশিত) এই বিষয়গুলিকে উপেক্ষা না করিয়া ইহাদের সশ্রদ্ধ আলোচনার যে একটা প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যে যাহাই বলুন না কেন, আমাদের সন্দেহ মিটিতে চাহে না—বুঝিয়া উঠিতে পারি না, কি করিয়া অন্ততঃ সর্কসম্মতিক্রমে স্বণিত বলিয়া পরিচিত এই সমস্ত আচার মানুষের কোনরূপ উন্নতি সাধন করিতে পারে।

তবে এই আচারগুলি যে অসদুদ্দেশ্যে প্রচারিত হয় হয় নাই তাহার ইঙ্গিত তন্ত্রের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান রহিয়াছে। ভোগবহুল এই সমস্ত তান্ত্রিক আচারের অবশ্যস্বাভাবী পরিণতি উচ্ছৃঙ্খলতায় এবং বাসনে,

তান্ত্রিক আচার্যাগণ একথা বিশেষভাবেই বুঝিতেন। তাই এ পরিণতি বাহাতে উপস্থিত না হয় এজন্য তাঁহারা যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। অসংসম বা উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশলাভ করিলে এই আচারগুলি উন্নতির দিকে না লইয়া অবনতির পথে নামাটির দেয় এ-কথা তাঁহারা স্পষ্ট উল্লেখ করিতে অনুমাত্র ক্রটি করেন নাই। অর্থলোভে, কামবশতঃ অথবা সুখলোভে যে-সকল লোক এই সমস্ত আচারের যোগদান করেন তাঁহাদিগকে রৌরব নরকে গমন করিতে হয়।^১ শুদ্ধমাত্র ভোগলিপ্সায় যিনি মত্তপান করিবেন তাঁহার জন্ম কঠোর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। উত্তপ্ত মস্তকের দ্বারা যদি তাঁহার মুখ দগ্ধ করিয়া দেওয়া হয় তবেই তিনি শুদ্ধ হইবেন, অন্যথা নহে।^২ ভাগবতপুরাণকার বলিয়াছেন—মদ্যাদি-বাবহারের প্রবৃত্তি লোকের মধ্যে স্বতই বর্তমান। ধর্মলাভের জন্ম নির্রিষ্ট সময়ে নিয়মিতভাবে এই সমস্ত দ্রবোর বাবহারের বিধান করিয়া শাস্ত্রকারেরা সেই উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিকে কতকটা নিয়মিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।^৩

কিন্তু এ-কথাও স্থির যে, যে-উদ্দেশ্যেই ভোগমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করা হউক না কেন, ভোগলালসা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেই থাকে এবং ইহা মানুষকে সমস্ত উচ্চ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট করে। তাই তান্ত্রিক আচার্যাগণ সাধারণ সাধকের জন্ম এই ভোগমার্গের বিধান করেন নাই, চরম সাধকের জন্মই এই চরম মার্গের বিধান। বোধ হয় চরম সাধক লোভমোহাদি রিপুর হস্ত হইতে কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারেন তাহারই পরীক্ষার জন্ম—

১। অর্থাৎ কামতো বাপি সৌখ্যাদপি চ যো নরঃ।
লিঙ্গযোনিরতো মস্তী রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥

—তন্ত্রসার (কুলাচার-প্রকরণ)

এই প্রসঙ্গে গন্ধর্বতন্ত্রের ৩৭শ পটলের উক্তিগুলিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য

২। হুরাপানে কামকৃতে জ্বলন্তীং তাং বিনিষ্কিপেৎ।
মুখে তয়া বিনির্দক্ষে ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥

—কুলার্ণব ২/১২২

৩। লোকে ব্যাবাস্যামিষমদ্যসেবা নিত্যান্ত জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞহরাত্ৰৈরান্ন নিবৃত্তিরিষ্টা ॥

—ভাগবতপুরাণ ১১/৫১১

সর্বপ্রকার বিকারের মধ্যেও যিনি আবিষ্কৃত তিনিই প্রকৃত সাধক—প্রকৃত বীর—এই সত্য প্রতিপন্ন করিবার জন্ত এইরূপ বীভৎস সাধনপ্রণালীর ব্যবস্থা হইয়াছিল। যিনি এই সাধনপদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে সাহস করিতেন, তাঁহাকে বলা হইত বীর; কারণ, অনন্তসাধারণ শক্তির অধিকারী না হইলে কেহ এ-পথের পথিক হইতে পারে না। যে মদ্য দেবতাগণেরও মত্ততা আনয়ন করে সেই মদ্য যাহাকে বিষ্কৃত করে না তিনিই প্রকৃত তান্ত্রিক।^১ এ-পথে যে প্রতি পদে বিপদ ও পতনের সম্ভাবনা, সূত্রাং সাধারণের পক্ষে এ-পথ অবলম্বন করা যে শ্রেয়স্কর নহে সেদিকে তান্ত্রিক আচার্যাগণ বিশেষ করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে কুষ্ঠিত হন না। প্রকৃত অধিকারী ছাড়া—কুলমার্গের অনুবর্তীগণ বাস্তব আর কেহই এ পথ অবলম্বন করিবেন না—ইহাই হইল সাধারণ নির্দেশ। উপযুক্ত গুরুর নিকট হইতে এই সাধনপদ্ধতির গূঢ় রহস্য ও ক্রম না জানিয়া যে-ব্যক্তি নিজে নিজেই ইহার সাহায্যে সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে রুতকার্য্যতা লাভ করিতে ত পারেই না, পক্ষান্তরে শুধু তাতে সঁতার দিয়া অপার সমুদ্র পার হইতে গেলে যে রূপ উপহাসাম্পদ হইতে হয় সেইরূপ হাস্যাম্পদ হইয়া থাকে।^২ খড়্গধারার উপর দিয়া গমন করা, বাঘের গলা ভড়াইয়া ধরা, সাপ ধরিয়া রাখা প্রভৃতি সমস্ত দুষ্কর কার্য্য অপেক্ষা দুষ্কর—একরূপ অসাধ্য—এই সাধনপথ।^৩ সূত্রাং সাধারণের পক্ষে এ-পথ অবলম্বন করা আদৌ বিধেয় নহে। শাস্ত্রের এই সকল স্পষ্ট উক্তি অনুধাবন করিলে কাহারও মনে কি এরূপ সন্দেহ জাগিতে পারে যে সাধারণকে অসংপথে প্ররোচিত করিবার জন্তই তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তি?

তারপর, তন্ত্রের এই সমস্ত আপত্তিজনক আচার সকল

সম্প্রদায়ের জন্ত বিহিত নহে এবং কোন কোন সম্প্রদায় এই সমস্ত আচারের রূপক ও আধ্যাত্মিক অর্থ কল্পনা করিয়া ইহাদের বিরুদ্ধে সকল আপত্তির মূল উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পুরশ্চর্য্যাবাদি গ্রন্থের মতে এই সমস্ত আচার ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের স্বাভাবিক নৈতিক উৎকর্ষই বোধ হয় এইরূপ নিষেধের নিদান। বিভিন্ন নিম্নজাতির নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের জন্তই বোধ হয় মূলতঃ এই সব আচারের ব্যবস্থা হইয়াছিল। নানা দেবতার মধ্যে তারার উপাসনায় এই জাতীয় আচার বা বামাচার অবশ্য-পালনীয় এইরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু নিজ গাত্রের ক্রোধ দান প্রভৃতি কাৰ্য্য আবার এই উপাসনায়ও এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে। যে শাক্তদিগের মধ্যে এই সকল আচারের একচ্ছত্র আধিপত্য, তাহাদেরও সকল সম্প্রদায় ইহাদিগকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না। কাপালিক, ক্ষপণক, দিগম্বর প্রভৃতি কোল সম্প্রদায়ের আচার তান্ত্রিকাচার্যা লক্ষ্মীধর তাঁহার আনন্দলহরীর টীকায় বিশেষভাবে নিন্দা করিয়াছেন। তিনি সময়চারের অনুবর্তী। সময়মতে এবং পূর্বকোল-মতে আন্তর যাগ বা মানসপূজারই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোনরূপ স্তম্ভাকারজনক আচার তাহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। অনেক স্থলে এই সমস্ত আচারের রূপক অর্থ তাঁহার গ্রহণ করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। সময়মতে তান্ত্রিক পূজার বাহ্যিক অনুষ্ঠান একেবারেই আদৃত হয় নাই। লক্ষ্মীধর বলিয়াছেন—সময়মতে মন্ত্রের পুরশ্চরণ নাই, জপ নাই, বাহু হোম নাই, বাহু পূজা নাই; এই মতে হংকমল-মধ্যেই সমস্ত পূজার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে, মানস ধ্যানই এই পূজার প্রধান অঙ্গ এবং ইহা যে অতি উচ্চ অঙ্গের উপাসনা ও সকল উপাসনার আদর্শভূত তাহা সর্ববাদিসম্মত। তন্ত্রের অনতিপরিচিত পরানন্দমতাবলম্বীগণের সাধনপদ্ধতির মধ্যেও অনেক উচ্চস্তরের বস্তুর উল্লেখ পাওয়া যায়। তান্ত্রিক উপাসনা হইলেও ইহাতে হিংসা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। ভবিষ্যতে এই সম্প্রদায়ের মতবাদগুলি বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

১। অহো পীতং সুরাজব্যং মোহয়েত্রিদশনপি ।
তন্ত্রাচ্চ কৌলিকঃ পীত্বা বিকারং নাপ্নু যান্তু যঃ ।
মজ্জানৈক পরো ভূয়াৎ স ভক্তঃ স চ কৌলিকঃ ॥
পরানন্দমত (বরোদা) পৃঃ ১৬।

২। কুলধর্ম্মজানন যঃ সংসারান্মোক্ষমিচ্ছতি ।
পারাবারমপারং সঃ পাণিভ্যাং তর্জু মিচ্ছতি—

কুলার্ণব ২।৪৭

৩। কৃপাধারাগমনাদ্ ব্যাত্তকঠাবলম্বনাৎ ।

ভূজধারগান্নু নমশক্যং কুলবর্জনম্ ॥

—কুলার্ণব ২।

তান্ত্রিক আচারের যে আধ্যাত্মিক অর্থ পরিকল্পিত হইয়াছে তাহাও উল্লিখিত উৎকৃষ্ট সাধনপদ্ধতির প্রতিকূল নহে। মৎস্য, মাংস প্রভৃতি পঞ্চ 'ম'কারেরই এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে। তবে এক এক শব্দের নানারূপ অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। নির্বিকার, নিরঞ্জন যে পরমব্রহ্ম তাঁহার পূর্ণানন্দময় জ্ঞানকেই মৎস্য বলে।^১ যে কন্ম দ্বারা সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা হয় তাহারই নাম মাংস।^২ ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যস্থিত বাকাকে ঘিনি নিরুদ্ধ করিতে পারেন তিনিই মৎস্যসাধক।^৩ এই সমস্ত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অসাধু পদার্থকে সাধুভাবে দেখাইবার একটা ব্যর্থ চেষ্টামাত্র মনে হইতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে—এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার মধ্যে জ্ঞান ও যোগমার্গের যে উল্লিখিত রহিয়াছে তাহা তদ্বিরোধী নহে। সূফী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যেও এইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু শাস্ত্রের নির্দেশ যাহাই হউক না কেন, অনেকেই সেই নির্দেশ অনুসারে কার্য্য করিতেন না বা করিতে পারিতেন না। তান্ত্রিক আচারের অনুষ্ঠানসঙ্গে বা এই অনুষ্ঠানের ব্যপদেশে অনেকে উচ্ছৃঙ্খল হইতেন—মদ্য-মাংসাদির অথবা বহুল বাবজারে লিপ্ত হইতেন এবং জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ না করিয়া বিরক্তির ভাজন হইতেন। তারপর, অনেক তন্ত্রগ্রন্থে নানারূপ অতিকুৎসিত অনুষ্ঠানের উচ্ছৃঙ্খিত প্রশংসা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য নহে—উহা যে অর্থবাদমাত্র; ঐ সব অনুষ্ঠানেই যে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নাই, অনভিজ্ঞ সাধারণে তাহা বুঝিতে পারিত না। লোকে ভাবিত—মন্তাদিসেবন তান্ত্রিক উপাসনার একটা

অপরিহার্য্য অঙ্গ। এক দল অসাধু চরিত্রের লোক এইরূপ মতবাদ যে প্রচার করে নাই তাহাও বলা যায় না। প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থের মধ্যে এই জাতীয় কথা প্রক্ষিপ্ত করা অথবা ঐ সব মতবাদ তদ্বাকারে রচিত গ্রন্থের মধ্যে দিয়া প্রচার করা খুবই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় এবং অনেকে এরূপ করিতেন বলিয়াও আশঙ্কা হয়। বস্তুত, কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে এ-জাতীয় ব্যাপারের উল্লেখও যে না-পাওয়া যায় এমন নহে। কুলার্গবে বলা হইয়াছে—সম্প্রদায়বর্জিত ও গুরুপদেশরহিত অনেকে নিছবুদ্দি অনুসারে কৌলধর্ম্মের কল্পনা করিয়া থাকেন।^১

সামুনাচায়া তাঁহার আগমপ্রামাণ্য নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন^২—আজও পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ কেহ তান্ত্রিকতার ভাণ করিয়া তদ্বিরোধী বস্তুসমূহ প্রচার করিয়া থাকেন। এই সব কারণেই বোধ হয় তৎ উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে অতি নীচ ও কুৎসিত বিষয়সমূহের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে, লক্ষ্মীধর ভাস্করাচায়া প্রমুখ শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিকাচার্যাগণকর্তৃক একবাক্যে নিশ্চিত এই সমস্ত বিষয়ের জন্ত সমস্ত তন্ত্রশাস্ত্রকে দেবী সাব্যস্ত না করিয়া তন্ত্রের প্রকৃত রহস্য উদঘাটনের জন্ত তন্ত্রসাহিত্যের বহুল প্রচার ও সুনিয়ন্ত্রিত, সহানুভূতিপূর্ণ সমালোচনা হওয়া দরকার। এই সমালোচনার ফলে প্রতিগ্রন্থের প্রকৃত স্বরূপ ও সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে ইহার আপেক্ষিক অবস্থান নির্ণীত হইবে—তন্ত্রের নিগূঢ় তথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। কিন্তু তন্ত্রসাহিত্য বিশাল—ব্যাপকভাবে সম্ভবদ্র প্রচেষ্টা ব্যতীত এ-কার্য্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। আশার বিষয়, কোন কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান-বিশেষের দৃষ্টি এ-দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং অপাংক্তেয় তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে।

১। যদুত্তং পরমং ব্রহ্ম নির্বিকারং নিরঞ্জনম্।

তস্মিন্ প্রমদনং জ্ঞানং তন্মজং পরিকীর্তিতম্ ॥ (বিজয়তন্ত্র)

২। মাং সনোতি হি যৎ কন্ম তন্মাংসং পরিকীর্তিতম্।

ন চ কায়প্রতীকস্ত যোগিভির্মাংসমুচ্যতে ॥ (বিজয়তন্ত্র)

৩। গঙ্গাযমুনয়োমধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।

তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যন্ত স ভবেন্নমৎস্য সাধকঃ ॥ (আগমসার)

১। বহবঃ কৌলিকং ধর্ম্মং মিথ্যাজ্ঞানবিড়ম্বকাঃ।

স্ববুদ্ধ্যা কল্পয়ন্তীথং পারস্পর্য্যবিবর্জিতাঃ ॥ কুলার্গব ১১১

২। অদৃড়েহপি হি দৃগুন্তে কেচিদাগমিকচ্ছলাৎ।

অনাগমিকমেবার্থং ব্যাচক্ষাণঃ বিচক্ষণাঃ ॥ (প্.

মুক্তি

শ্রীআশালতা দেবী

(১১)

“ন যা হয়েছে তা ফেরাবার যো নেই বটে—” চন্দ্রকান্ত দেখিলেন ঘি়ের পাত্রে উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সুশীলা অনায়াসে বলিয়া যাইতেছেন, “এখন নেই, কিন্তু এখন হাত ছিল তখন এ-সব কথা তোমার আগাগোড়া একবার ভেবে দেখা উচিত ছিল বইকি। আশীর্বাদ হয়ে গেছে, এখন আর কি করবে? তাই বলে মন খারাপ করে থেকেও কোন লাভ নেই। হয়ত আমরা যা মনে কবছি তা হবে না, ভালই হবে। অদৃষ্টের কথা কে বলতে পারে? আর মেয়েমানুষের সমস্তটাই যে অদৃষ্টের কাছে বাধা দেওয়া। তুমি আমি ভেবে আর কি করতে পারি বল?”

সুশীলা কোন এক সুদূরবর্তী অজানা অদৃষ্টের হাতে সকল ভার সঁপিয়া দিয়া শান্ত মনে গৃহস্থালীর কাজ করিয়া বসিতে লাগিলেন। কিন্তু চন্দ্রকান্ত পারিলেন না মনকে শান্ত করিতে। তখন তাহার চিন্তায় তাঁহার মন ভরিয়াছিল, তাঁহার অধীর হৃদয়, উৎসুক দৃষ্টি তাহাকেই পেন খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল। নিশ্চল নিকটে কোথাও ছিল না, বাহিরের ঘরেও তাহার দেখা মিলিল না। রাত অনেক হইয়াছে, সে তবে বোধ হয় শয়ন করিয়াছে মনে করিয়া চন্দ্রকান্ত একটা চেয়ারে বসিয়া চুপচাপ নিজের মনে সুশীলার কথাগুলি আর একবার উন্টাইয়া-পাটাইয়া দেখিতে লাগিলেন। কার্তিকের মাঝামাঝি, তেমন সময়েও বন্ধঘরে তাঁহার কেমন গরম গরম করিতে লাগিল। ছাদের খোলা হাওয়ায় শয়নের আগে প্রত্যেক দিন তিনি খানিকটা করিয়া বেড়ান। আজ ছাদে আসিয়া দেখিতে পাইলেন ছাদের একপ্রান্তে আলিসায় তর দিয়া সাদা শাল গায়ে জড়াইয়া নিশ্চল অস্পষ্ট জোৎস্নায় দাঁড়াইয়া আছে। চন্দ্রকান্ত নিশ্চক্রে তাহার পিছনে গিয়া তাহার মাথায় একটি হাত রাখিলেন।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত দু-জনেই চুপ করিয়া থাকিলেন। তাহার পরে নিশ্চল আস্তে আস্তে কহিল, “আমি বুঝতে পারছি কয়েক দিন থেকে তুমি মনে মনে কি যেন ভাবচ। মনে তোমার একটা ভার লেগেই রয়েছে। তুমি কিছুতেই স্থস্থির হ’তে পারছ না। কিন্তু কেন তোমার এ ভাবনা বাবা? তুমি ভাল বুঝে আমার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করবে তাতেই আমার ভাল হবে। আমার তাকে কোন মন্দ হ’তে পারে না। কেন একি তুমি বিশ্বাস কর না? কিন্তু আমি যে খুব বিশ্বাস করি। আমি ত এ র চেয়ে অন্য রকম ভাবতেই পারিনে।” চন্দ্রকান্তের মনের ভার এক মুহূর্তে লঘু হইয়া গেল। চুপি চুপি কহিলেন, “এ কি তুমি ঠিক বুঝতে পেরেছ মা?”

নিশ্চল বলিল, “তাই ত আমার বিশ্বাস।”

(১২)

বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পরের দিন নিশ্চল কলিকাতা হইতে স্বামীর সঙ্গে শঙ্করবাড়ি আসিয়াছে। বিবাহ সম্বন্ধে কোন কথা কখনও না ভাবিয়া, এ-বিষয়ের কোন আলোচনাতেও কখনও না যোগ দিয়া একবারেই সে বিবাহ করিয়াছে। এ নূতন জীবন তাহার সম্পূর্ণ অজানা।

আজ ফুলসজ্জা।

ঘরের মধ্যে আলো জ্বলিতেছে, বাগিনীর বৌদিদিরা পালঙ্কের গায়ে মল্লিকা খুঁই গোলাপের মালা গাঁথিয়া দোলাইয়া দিয়াছেন। টেবিলে ফুল, বিছানায় ফুল, টিপায়ে ফুলদানিতে করিয়া ফুল। সমস্ত ঘর সুন্দর, সুসজ্জিত, সুরভিত। পালঙ্কের উপর বিছানাতে একটি রূপার রেকাবিতে করিয়া দুই গাছি বেলফুলের গ’ড়ে মালা রাখিয়াছে।

আলোকে উজ্জ্বল এবং ফুলভারে আচ্ছন্ন এই কক্ষে একটি মথমল-মোড়া চেয়ারে নিম্নলিখিত বসিয়া আছে। ঘরে আপাততঃ কেহ নাই। একটুক্ষণ পূর্বেও যামিনীর বোন এবং বৌদিদিরা ছিলেন, এখন তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন যামিনীকে ডাকিয়া দিতে।

নিম্নলিখিত একা বসিয়া খোলা জানালা দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছে। জানালা দিয়া যামিনীদের সুবিস্তৃত বাগানের একপ্রান্তে গাছপালার অন্তরালে শীত-শীর্ণ গঙ্গার একটুখানি রক্তধারা দেখা যাইতেছে। আকাশে সবেমাত্র দু-একটি তারা উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে। সন্ধ্যার বাতাস মশারির একপ্রান্তে কাঁপাইয়া বহিয়া যাইতেছে। নিম্নলিখিত সন্ধ্যার ঠিক এই সূচনাটিতে অন্তমনা হইয়া গিয়াছে। বাহিরে বাগানের ছায়াঙ্কিত জ্যোৎস্না, শীর্ণ নদীরেখা—এ-সমস্তই কোন্ মন্ত্রমুগ্ধ অপরিচিত জগৎ হইতে চোখের সম্মুখে সারি বাধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা সুন্দর কিন্তু হৃদয়ে প্রবেশপথ পায় নাই। তাহার নবজীবনের ঠিক আরম্ভেই সে কেমন একরকম শিথিল ক্লান্ত অবসাদ অনুভব করিতেছে। কিন্তু কেন? সে প্রশ্নও সে নিজেকে অনেকবার করিয়াছে, উত্তর পায় নাই। এই ত সেদিন সে বাবাকে বলিয়াছিল, তিনি যাহা করিতেছেন তাহাতে তাহার ভালই হইবে। সেদিন মনের মধ্যে যে আশ্বাস যে পরম নির্ভর সে পাইয়াছিল সে কি ইহারই মধ্যে ফুরাইয়া গেল? কিন্তু আসলে এ অবসাদের কারণ বাহিরের কোন ঘটনায় ছিল না, ছিল তাহার মনে। কাব্য উপন্যাসে প্রেমের কথা সে অনেক পড়িয়াছিল; জীবনে প্রেমের উন্মেষ হয় নাই বলিয়া প্রেম যে সে একেবারেই বৃদ্ধিত না তাহা নহে। কিন্তু তাহার বিকাশোন্মুখ মন বিবাহের একেবারে অজানা রাজ্যে আসিয়া পড়িয়া এক মুহূর্তে স্বামী ও দাম্পত্যধর্ম বৃদ্ধিয়া লইবার মত প্রস্তুত ছিল না। যে যামিনী বহু দিনের পূর্বরাগের সাধনায় তাহার প্রিয়তম হইয়া উঠিতে পারিত সে একেবারে স্বামী হইয়া আসিয়া নিম্নলিখিত প্রেমকে কুসুম-সুরভির মত ধীরে ধীরে জাগিবার সময় দিল না। সংসার ও স্বামীর প্রতি কর্তব্যই তাহার মনে প্রথম দেখা দিল। কর্তব্যের বোধ ও ভয় মনকে অবসন্ন করিয়া তুলিল।

খণ্ডরবাড়িতে আসিয়া নিম্নলিখিত দেখিল মস্তবড় বাড়ি আর তাহার চেয়েও বড় পরিবার। জায়েরা, ননদেরা তাঁহাদের ছেলেপিলে, দাসীপরিজন, আশ্রিত-আশ্রিত, কুটুম্ব সমস্ত মিলাইয়া একটা বিরাট সংসার। খণ্ডরবাড়িতে তাহার সমাদরের কোন অভাব ঘটিল না। যদিচ বয়স তাহার আঠারো, কিন্তু গঠনে অত্যন্ত রুশ এক তন্বী হওয়ায় তাহাকে বয়সের চেয়ে ছোট দেখাইত। আর তাহার মুখে ছিল এমন একটি সুকুমার কচি লাবণ্য—যাহা তরুণীর নয়—একান্তই বালিকার। শাশুড়ীর মনে ধরিয়াছে তাহার রূপ, আর তাহার চেয়েও বেশ মনে ধরিয়াছে তাহার বাবার দেওয়া একরাশি দামী জামা কাপড় এবং একরাশ অলঙ্কার। অবশ্য সে সমস্ত অলঙ্কার চন্দ্রকান্ত দেয় নাই। যামিনী কিনিয়া তাঁহার কাছে ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছিল, তিনি কল্পার সঙ্গে দিয়াছেন মাত্র। কিন্তু এত কথ এবাড়ির কেহ জানে না। সে সকল বধূর পিতার দেওয়া বলিয়াই লোকে জানে।

সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া নিম্নলিখিত শাশুড়ী প্রীত হইয়াছেন। মুখে না হউক মনে-মনেও তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে তাঁহার অন্ত সব বধূদের বেলায় তিনি এত পান নাই।

আরও যে-সব জা-নন্দ আছে তাঁহারা এই সুন্দরী তন্বী তরুণী বধূকে দেখিয়া খুশী হইয়া হাসি তামাসা করিতেছেন। তাঁহারাও খুশী, কারণ কলেজে-পড়া বিদ্যুৎ বড় মেয়ে হইলেও নিম্নলিখিত অত্যন্ত বাধ্য। তাঁহারা মনে করিয়া ছিলেন আই-এ পাস-করা খার্ড ইয়ারে পড়িতে পড়িতে বিয়ে হওয়া মেয়ে বোধ করি যোমটা খুলিয়া বিহুনের নীচে লম্বা রেশমের ফুল ঝুলাইয়া পায়ে স্নিপার পরিয়া কট্ কট্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে, হাতের ভ্যানিটি বাগ হইতে ক্ষণ ক্ষণে এক পৌচ পাউডার মাথিবে, চট্ করিয়া ছোট আয়নাটা বাহির করিয়া হাত দিয়া সামনের চুল কান ঢাকিয়া নামাইয়া লইবে। কিন্তু তাঁহাদের সে মনগড়া মেয়ের সহিত নিম্নলিখিত এতটুকু সাদৃশ্য ছিল না। সে বড় লক্ষ্মীমেয়ে। বড়বৌদিদি পাতা কাটিয়া চুলগুলি নামাইয়া যেমন করিয়া কাঁপটাখানি পরাইয়া দিয়াছিলেন তেমনি পরিয়া আছে। মুখ ফুটিয়া কিছু আপত্তি করে নাই। কিন্তু একটু মনে

বেশ শাস্ত। নিশ্চলার মধ্যে কেমন যেন একটা প্রাণহীন কড়ত। কলের পুতুলের মত যে যা বলিতেছে তাই করিতেছে, কিন্তু তাহার মন যেন এ-সবের মধ্যে নাই। এই দাশ্যিক জগৎ তাহার একেবারে অনভ্যস্ত। এই সকল দাশ্যিক কথাবার্তা, সহজ আনন্দ, তুচ্ছ বিষয় লইয়া আমোদ-আহ্লাদ, মাতামাতি, এ-সবেতে সে কিছুতেই যোগ দিতে পারিতেছে না। ছোট নন্দ মালতী যখন তাহার চুলের গোছা ধরিয় টানিয়া দিয়া আদর করিয়া কহিল, “বল না বৌ ভাই, কথা বল না। ... নাঃ, আমাদের বৌ বড় চালাক। একেবারে গিঝুমের মত বসে রয়েছে, কিছুই ফাঁস করবে না, এই ওর পণ। নয় লো, ঠিক ধরেছি কি-না বল।” তাহার পরই দু-হাতে কণ্ঠ বেঠেন করিয়া কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ফিস ফিস করিয়া কহিল, “বল না ভাই, তোর বর কাল রাত্রিতে তোকে কি বলেছিল? আমার মাথা খসে বল। আমি কারুকে বলব না।” জীবনের যে-বাসের সহিত আপনাকে খাপ খাওয়াতেই তাহার সময় নাগিতছিল, তাহা লইয়া এই কৌতূহল ও হাশ্বপরিহাস দ্বারা নিশ্চল হঠাৎ প্রবল বিতৃষ্ণায় শিহরিয়া উঠিল। এমনি একটা তরল রসে গদ গদ আবহাওয়ার স্পর্শে তাহার সমস্ত চিন্তা সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। যাহাদের বুকের কোন প্রকার অসুখ থাকে তাহাদের উঁচু পাহাড়ে জায়গার পওয়ারে নিঃশ্বাস লইতে কষ্ট বোধ হয়, অস্বস্তি লাগে। নিশ্চল এতদিন পর্যন্ত আপনার নিঃসঙ্গ মন লইয়া জ্ঞানের এবং ভাবরাজ্যের যে সুভূর্গম গিরিশিখরে বাস করিত সেখান হইতে হঠাৎ নিজেকে সংসারের সাধারণ মনের দ্বিতী কোমল পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বিচ্যুত দেখিয়া ক্লিষ্ট হইয়া উঠিতেছিল।

দুয়ার বন্ধ করিবার শব্দ হইল। যামিনী ঘরে ঢুকিয়া রজা বন্ধ করিয়া পালঙ্কের বাজু ধরিয়া দাঁড়াইল। নিশ্চল নিজের চিন্তায় এত তন্ময় যে দরজা খোলা এবং বন্ধের সহটুকু শব্দ শুনিতে পাইল না। তাহার স্তব্ধ অন্তমনস্ক মুখের দিকে যামিনী একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিল। সে-মুখের দ্বিকারিণী এখন কোথায় কতদূরে কোন্ জগতে চলিয়া গিয়াছে, সে-জগতে কি যামিনীর স্থান নাই? চাহিয়া গিয়া তাহার একটা নিঃশ্বাস পড়িল। সামনে যে বসিয়া

আছে, এতদিন কেবল কাটিয়াছে তাহাকে কি করিয়া পাইবে, কেমন করিয়া জগতের সকল বাধাকে কাটাইয়া তাহাকে একেবারে আপনার করিয়া নিজের জীবনের সংলগ্ন করিয়া লইবে সেই চিন্তায়। আজ প্রথম সেই অবসর আসিল যখন বাহিরের বাধার কথা আর ভাবিতে হইবে না—যখন কেবল দুর্ভতমাকে মৌনতার অবগুণ্ঠন হইতে বাহির করিয়া তাহার হৃদয়স্পর্শ পাওয়ার অপেক্ষা।

যামিনী একটা ছোট চৌকি তাহার কাছে টানিয়া আনিয়া বসিল। তাহার একটি হাত আপন হাতে তুলিয়া লইয়া উদ্বেল কণ্ঠে ডাকিল, “নিশ্চল!”

নিশ্চলার মন একটু নরম হইল। যামিনীর কণ্ঠস্বরে কিছু একটা তাহার ভাল লাগিতেছিল। সে মুখ তুলিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া মুখ নামাইয়া লইল। যামিনী অধীর হইয়া আবার ডাকিল, “নিশ্চল!”

নিশ্চলার ভাল লাগা যামিনীর অর্ধেক আঁহত হইয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সে বলিল, “কেন ডাকচেন? কিছু বলবেন?”

কিন্তু কিছু বলিবার জন্ম তে যামিনী ডাকে নাই। প্রেমের যে অকারণ চাকলো নাম ধরিয়া ডাকিবার আবেগ সেই আবেগেই সে ডাকিয়াছিল, কোন প্রয়োজনে নয়। ভাবিয়াছিল সাড়া পাইবে, যেমন করিয়া বসন্ত আসিয়া কানে কানে ডাকিলে তরুপল্লব সাড়া দেয়, অকারণ আনন্দে নবকিশলয়ে মন্মথরশ্মি জাগিয়া উঠে—তেমনি করিয়া কাহারও কাছে সাড়া পাইবে ভাবিয়াছিল। নিশ্চলার মনে যে রং ধরিবার উপক্রম হইতেছিল আপনার অধীর আগ্রহে যামিনী তাহা দেখিবার অবসর পায় নাই। কিন্তু নিশ্চল যখন প্রশ্ন করিয়া বসিল, “কেন ডাকচেন?” তখন তাহার একটা উত্তর দেওয়া চাই। তাই তাহার আঙুলগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিল,— “তুমি কেবলই বাবার কথা ভাব, আমার কথা একবারও ভাব না, নয় নীলা?”

“না। তা কেন?” নিশ্চলার বাবার প্রতি ভাল-বাসার মূল্য যে বোঝে না, তাহার কাছে আপনার মনঃ-কষ্ট স্বীকার করিতে সে চাহিল না।

“কিন্তু আমি মনে করেছিলুম বাবার জন্মে প্রথম

প্রথম তোমার ভারি কষ্ট হবে। পরের বাড়ি মন ত কেমন করবেই।”

যামিনী নিম্মলার মুখে একটা অস্তুতঃ সাগাণ্ড ভালবাসার কথাও শুনিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু বাবার প্রতি ভালবাসার খোঁটা বার-বার শুনিয়া অভিমানভরে নিম্মলা বলিল,—“না, আমি কষ্ট হ’তে দেব না।”

“কেমন গো? নিজের উপর এত জুলুম কেন?” যামিনী স্নেহে একটু ঠাট্টা করিয়া কহিল।

“না না, কষ্ট হ’লে চলবে কেন? এখান থেকে আপনাদের সঙ্গেই যে আমাকে থাকতে হবে। যত ধাক্কাই খাই, তার জন্তে মনে মনে আমাকে প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে।”

খুব কর্তব্যের কথা, স্থিরবুদ্ধির কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু তখন হইতে যামিনী যাহা আশা করিয়া ফিরিতেছিল তাহা কিছুতেই পাইতেছে না। যেখানে যে সুরটি আসিয়া লাগিলে সমস্তই অনির্বচনীয় সমস্তই মধুর হইয়া উঠে, তাহা যেন কিছুতেই ঠিক জায়গায় লাগিতেছে না। নিম্মলা যদি তাহার কথার উত্তরে বলিত, “হ্যাঁ, আমার বাবার জন্তে খুব মন কেমন করছে, সর্বদাই তাঁকে মনে পড়ে মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে,” তাহা হইলে যামিনী সেই শোক-কাতরাকে আপনার বিশাল বক্ষে টানিয়া লইত, যেমন করিয়া পারে নিজের সমস্ত শক্তি দিয়া তাহাকে প্রকুল্লিত, আনন্দিত করিয়া তুলিত। যাহাকে ভালবাসে তাহার বেদনা দূর করিবার চেষ্টায় যে আনন্দ সেই বিপুল আনন্দ সে পাইত, তাহার বাথায় বাথিত হইয়া সে নিম্মলার আরও কাছাকাছি আসিত। কিন্তু তেমন কোন হাওয়া বহিল না। নিম্মলা যে বাবার প্রতি ভালবাসার উল্লেখটা খোঁটা মনে করিল তাহাও সে বুঝিল না। কতদিন হইতে সে ভাবিতেছে কবে নিম্মলাকে পাইবে, এই পাওয়ার পথে যত বাধা, সে-সব বাধার সহিত কতদিন ধরিয়া সে যুদ্ধ করিয়াছে। কত বিনিদ্র রাত্রি মশারির ভিতর এ-পাশ ও-পাশ করিয়া কাটাইয়াছে এই বাধা দূর করিবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে। এখন সে-সমস্ত ভাবনা-চিন্তা উপায় নির্দ্ধারণের পাল্লা শেষ হইয়াছে। অকস্মাৎ একটা প্রকাণ্ড চেষ্টা, একটা উগ্র কামনার নিবৃত্তির পর

মনে যেটুকু অবসাদ আসে সেইটুকু লইয়া সে নিম্মলার কাছে আসিয়াছিল। মনে আশা ছিল স্নেহময়ী মাদুলামহী নারী এমন করিয়া নিজেকে ধরা দিবে যোগ্যে বসন্তের এক হিল্লোলে যেমন সমস্ত তরুপল্লব মশ্মরিত মুখরিত হইয়া উঠে, তাহার রসপিপাসু হৃদয় তেমনি ঝঙ্কত হইয়া উঠিবে। কিন্তু নিম্মলা যে এখনও ঘুমাইয়া আছে; তাহাকে রূপকথার রাজকন্য়ার মত সোনার কাঠির অতি মৃদু স্পর্শে জাগাইতে হইবে—একথা যামিনী বুঝিত না।

নিম্মলার আরও কাছে সরিয়া গিয়া সে তাহার খোঁপায় জড়ান মালতী ফুলের মালাটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। চারিদিক হইতে নাড়িয়া চাড়িয়া, আদব করিয়া, উচ্ছ্বসিত প্রেমে আচ্ছন্ন করিয়া এই শুভ্র ফুলের ক্ষুদ্র হৃদয়টিকে একান্ত তাহার বলিয়া কাছে টানিয়া লইয়া সে একেবারে অধীর হইয়া উঠিল। কিন্তু নিম্মলা চুপ করিয়া আকাশের তারার দিকে চাহিয়া আছে। তাহার মন সাড়া দিতে চায়, কি যেন তাহার ভাল লাগে। কিন্তু কোথায় যেন একটা ভয়, একটা বিতৃষ্ণা তাহাকে কঠোর করিয়া তুলিতেছিল। সন্ধ্যার আলো জন্মঃ নিবিড় অন্ধকারে ঢাকিয়া আসিল। যামিনী উঠিয়া ইলেকট্রিক আলোটা নিবাইয়া দিতেই জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া নিঃশব্দ নারীমূর্তির উপর পড়িল। নিম্মলা দৃষ্টি ফিরাইয়া যামিনীর দিকে চাহিল। সেই ছুটি চোখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে যামিনী এক সময়ে হঠাৎ নিম্মলা হাতখানি টানিয়া লইয়া তাহাতেই মুখ লুকাইয়া রুদ্ধস্বরে ডাকিল, “নিম্মলা, নিম্মলা, নিম্মলা...”

(১৩)

নিম্মলা যদি সহজেই ধরা দিত, হয়ত যামিনী এই অশাস্ত, এত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত না। সাধারণ স্বামীস্ত্রীর মত বিবাহের পর প্রথম প্রথম দাম্পত্যনীতির সংঘর্ষ-সীমা সঙ্ঘর্ষে কিছু বাড়াবাড়ি করিয়া তাহার পরে স্বভাবের সহজ নিয়মে আপনি থামিয়া যাইত। কিন্তু নিম্মলা মনে যে একটি অনাসক্তির সুর, একটা বিচ্ছিন্নতার ভাব রহিয়াছে, তাহাতেই বাধা পাইয়া যামিনীর প্রতিঃ আবেগ দ্বিগুণ বেগে তাহার দিকে ধাবিত হইল।



দুই সোন
শ্রীদারেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ

প্রবাসী সোস. কলিকাতা

তাহার শেষ ল' পরীক্ষার আর মোটে মাস দুই দেরি। তাহার মা তাই একদিন মৃদু ভৎসনা করিয়া বলিলেন,— “হ্যারে যামিনী, বড়বোমায়ের কাছে গুনতে পাই তুই আজকাল মোটেই মন দিয়ে পড়াশোনা করিস নে। এবারে ত বিয়ের গোলযোগ চুকেছে, এবারে কলকাতায় ফিরে যা। গিয়ে পড়াশোনায় মন দে।”

যামিনী নতমুখে নিরুত্তরে ছিল। তেমনি করিয়াই থাকিল। কিছু বলিল না। তাহার মা আরও দুই-একবার জিদ করিয়া বলায় অবশেষে কহিল, “আচ্ছা, সে-দেখা যাবে।”

বড়বৌদিদিকে ডাকিয়া কহিল, “তুমি বুঝি আমার নামে মা'র কাছে লাগিয়েছ?”

বৌদিদি অবাক হইয়া গালে হাত রাখিয়া কহিলেন, “ওমা, সে কি কথা ঠাকুরপো! তবে তোমার দাদা কাল আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, যে, তোমার পরীক্ষা এগিয়ে এল, তুমিকবে কলকাতা যাবে আমাদের কাছে কিছু বলেছ কিনা? তার উত্তরে আমি বললুম, সে এখন কলকাতা যাবে কি, বৌ নিয়ে যে মহা ব্যস্ত। এই ত ব্যাপার।”

যামিনী রাগ করিয়া কহিল, “আমার বৌকে নিয়ে আমি যদি ব্যস্ত হই, তোমাদের তাতে কিএসে যায়?”

বৌদিদি মুচকি হাসিয়া কহিলেন, “হ্যাঁ, তোমারই স্বী বইকি ভাই। ভয় নেই, সে-সম্বন্ধে কেউ কোনো আপত্তি করবে না।”

যামিনী আরও রাগিয়া কহিল, “তা না ককক, কিন্তু আমি যদি কলকাতা যাই, জেন বৌকে সুন্দর নিয়ে যাব সঙ্গে ক'রে। একলা যাব না।”

“ঠাকুরপো, তুমি হাসালে দেখচি। বেশ তো দু-জনেই একসঙ্গে য়ো, একসঙ্গে কলেজে পড়বে।” বৌদিদি মুখে অঞ্চল দিয়া হস্ত নিবারণ করিতে করিতে দ্রুত প্রস্থান করিলেন। যথাসময়ে কথাটা সালঙ্কারে যথাস্থানে ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু তখনই তখনই যামিনী ছাদের উপর উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করিতে করিতে আলিসায় বু'কিয়া ডাকিল, “বৌদি, ও বৌদি, আর একবার গুনতে যাও।” ডাক-হাকে ব্যস্ত হইয়া তিনি আবার ছাদে আসিলেন।

“কি?”

“একবার নিশ্চলকে আমার কাছে ডেকে দাও।”

“কখন?”

“এখনই।”

“মাপ কর ভাই, এখন সে আমি পারব না। সেখানে মা ব'সে আছেন, সেজবৌ ঠাকুরের খাবার করছে, নিশ্চল সেইখানে ব'সে লুচি বেলে দিচ্ছে। সেখানে গিয়ে আমি কি ক'রে বেহায়ার মত বলি,—ওলো, তোর বর ডাকচে শীগ'গীর। ছুটে যা।”

“দেখ বৌদি, তোমাদের এই সেকলে রসিকতাগুলো কিছুতেই আমি সহ করতে পারিনে। আমার এক এক সময় ভয় হয় তোমাদের সংস্পর্শে নিশ্চলার নিশ্চয় দস্তর-মত কষ্ট হচ্ছে।”

বৌদিদি কুন্দদন্তে অধর দংশন করিলেন। রাগে, অপমানে, ঈর্ষায় তাঁহার চক্ষু জ্বলিতে লাগিল। তথাপি সে-ভাব গোপন করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া কহিলেন, “তা তোমার সন্দেহ হয় ত মিছে নয় ঠাকুরপো। আমরা মুর্থ, লেখাপড়া জানিনে, ইতর স্বভাবের। আমাদের সঙ্গে থাকতে গুঁর কষ্ট হবে বইকি।”

যামিনী জোর দিয়া বলিল,—“না বৌদি, তুমি ওকে ডেকে দাও। স্বামী তার নিজের স্ত্রীকে ডাকচে, এর মধ্যে লজ্জা পাবার বিষয়টা আছে কোন্খানে? তা ছাড়া তোমরা ওকে দিয়ে কাজই বা করাও কেন? তোমরা জান না ও তার বাবার কাছে এতদিন কি নিশ্চল আবেষ্টনের মাঝে কত স্বাচ্ছন্দ্য মানুষ হয়েছে। ও কি পারবে সহিতে তোমাদের এই সংস্পর্শ, এই-সব কথাবার্তা।”

বৌদিদি আর সহিতে না পারিয়া দ্রুতপদে পাশের দরজা দিয়া চলিয়া গেলেন। যামিনী ছাদে অনেকক্ষণ অবধি অপেক্ষা করিয়াও আর না পাইল তাঁহার দেখা, না পাইল নিশ্চলার। তখন সে বিরক্ত হইয়া অধীর চিত্তে নিজেই নীচে নামিয়া গেল। অন্তরের আঙিনায় তখন মেয়েদের বৈকালিক কাজের লীড় লাগিয়াছে। খণ্ডর কাছারি হইতে ফিরিয়াছেন। বধুরা ক্ষিপ্ৰহস্তে জলখাবার সাজাইতেছে, কেহ চা করিতেছে। তাঁহার হাতে-পায়ে জল দিয়া তোয়ালে দিয়া মুছিয়া লইয়া মেজবৌ একটি হাত-

পাখা দিয়া তাঁহাকে মুহু মুহু বাতাস করিতেছে। নিশ্চল নতমুখে বসিয়া লুচি বেলিতেছিল। অনভ্যস্ত হাতে কিছুই পরিপাটি করিয়া হইতেছে না। তবু নিঃশব্দে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল। কলিকাতায় এ-সময়টা সে ছাদে পায়চারি করিয়া বেড়াইত, স্পেস্কার কিংবা বার্গসেঁ লইয়া পড়িত। যেখানটা বুঝিতে পারিত না পিতা আসিয়া বলিয়া দিতেন। কলিকাতার অনুজ্জ্বল স্নান সূর্যাস্তের সময় নির্জন আকাশের তলায় পিতাপুত্রীর মাঝে একটি অথও ভাবলোক সৃজিত হইয়া উঠিত। আজও হয়ত তেমনি নিঃশব্দ দীপ্তির সমারোহে সূর্যাস্ত হইতেছে, ঘোমটার আড়াল হইতে নিশ্চল চাহিয়া দেখিল দিবসের শেষ রক্তিম ছটা আঙ্গিনার প্রান্তে সজিনা গাছটার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। এমন সময়ে বরকন্নার এই বাঁধনের মাঝে এই হট্টগোল কোলাহলের মধ্যে অবগুণ্ঠনে বদ্ধ হইয়া থাকিতে তাহার কষ্ট হইতেছিল। কিন্তু কষ্টের কথা মনেই চাপিয়া রাখিয়াছে, কাহাকেও বলে নাই। কাহাকে বলিবে? সবাই তাহার অপরিচিত। যামিনীও এখন তাহার কাছে অপরিচিত।

অস্তঃপুরের এই বরকন্নার কাজের মাধ্যমে যেখানে টুকরা টুকরা হাসি গল্প নিন্দা ঠোঁট-বাঁকান, হাতের চুড়ি-বালার রিনি ঠিনি আওয়াজ সব মিলিয়া জড়াইয়া সৃষ্ট হইয়াছে একটা মৃদুমধুর দৃশ্য, সেখানে যামিনী হঠাৎ ঝড়ের মত অপ্রত্যাশিত রূপে গিয়া হাজির হইল। একেবারে কন্ঠনিরতা নিশ্চল হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “ছাদে চল। কথা আছে।”

নিশ্চলার মাথা হইতে অবগুণ্ঠন খুলিয়া গেল। বিস্মিত দৃষ্টিতে যামিনীর দিকে চাহিয়া সেই একঘর গুরুজনের সামনেই সে প্রশ্ন করিল, “কেন?”

নির্কোষ তরুণীর এই অসঙ্কোচ প্রশ্নের পরিবর্তে তখনই সজায় মরিয়া গিয়া মাথায় আবার অবগুণ্ঠন তুলিয়া দিবার কথাটাও মনে রহিল না। জায়েরা মুখ টেপাটিপ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। যামিনী পুনর্বার প্রবল বেগে তাহার হস্ত আকর্ষণ করিয়া কহিল, “চল, বিশেষ দরকার আছে।”

চাকী বেলুন পড়িয়া রহিল। হাতের কাজ ফেলিয়া

বধু উঠিয়া উপরে গেল। শাওড়ী মুখ গম্ভীর করিয়া থাকিলেন। অনেকে ঠোঁট বাঁকাইয়া আড়ালে একটু হাসিয়া লইল।

উপরে যামিনীর শয়নঘর-সংলগ্ন ছাদে সামনা-সামনি দু-খানি চেয়ার পাতা ছিল। চারিপাশে টব সাজান। চাকরে পাশে একটি ছোট টেবিল রাখিয়া তাহার উপর শুভ্র আস্তরণ বিছাইয়া দিয়া গিয়াছে। মালী আসিয়া প্রকাণ্ড দুইটা গোলাপ ও ক্রীসান্থীমামের তোড়া রাখিয়া গেল। আয়োজন সুসম্পূর্ণ। সন্ধ্যার রক্তরাগ পশ্চিম দিগন্তে তখনও একেবারে মিলাইয়া যায় নাই। নিশ্চলকে ছাদে আনিয়া যামিনী চেয়ারে বসাইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নিশ্চল বলিল, “আমাকে ডেকেছ কেন?”

কেন ডাকিয়াছে আজও তাহার উত্তর যামিনী জানা নাই। তাই প্রত্যুত্তরে সে কেবল ভাষাহীন নীরব ব্যাকুলতায় নিশ্চলার বাঁ-হাতখানি নিজের হাতে টানিয়া লইল। ময়দা মাথিতে গিয়া নিশ্চলার নীলার আংটির পাথরের খাঁজে ময়দা লাগিয়াছিল, কুসুমসুকুমার হাতখানি নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া ঐটুকুতে নজর পড়িতেই যামিনীর সমস্ত মন বাথায় ভরিয়া উঠিল। কিছুই না, এইটুকু মাত্র একটুখানি ব্যাপার, কিন্তু তাহাতেই যেন খোঁচ খাইয়া তাহার বক্ষের সমস্ত স্নেহ এবং করুণা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে মনে মনে উচ্ছ্বসিত হইয়া ভাবিতেছিল, একে? ইহাকে আমি কোথা হইতে আনিলাম? এমন সুন্দর সুকোমল হৃদয়খানি, ইহাকে আমি কেমন করিয়া রক্ষা করিব? সংসারের স্থূল হস্তাবলেপ হইতে তাহাকে যেমন করিয়া পারি আমি দূরে সরাইয়া রাখিবই। সে যেন কোনদিন মন না করে যে তাহার স্নিগ্ধ জীবনক্ষেত্র হইতে আমি তাহাকে লোভের বশে তুলিয়া আনিয়াছি। যামিনীর সমস্ত মন নিশ্চলার জন্ত কিছু একটা করিতে, কোন একটা দুঃসহ ত্যাগস্বীকার, কোন একটা কঠিনতম পণ করিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

নিশ্চল বিমনা হইয়া ফুলের তোড়ার দিকে তাকাইয়া ছিল। তাহার স্বামী তোড়াটা খুলিয়া সে-সমস্ত ফুল অঞ্জলি ভরিয়া তাহার আঁচলের উপর রাশীকৃত

করিয়। :চালিয়া। দিল। তাহার পর কহিল, “এ সময়ে তুমি কলকাতায় কি করতে নীলা? আমি প্রায়ই দেখেছি এ সময়টাতে তুমি আর তোমার বাবা দু-জনে মিলে কোন একটি বই পড়তে কিংবা সেই বই সম্বন্ধে আলোচনা করতে। এখানেও তাই কর না কেন? তোমার সঙ্গে মিলে পড়তে আমারও ভাল লাগবে। ভাল বই কি একলা পড়ে মুখ হয়?” যামিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘর হইতে বসীন্দ্রনাথের পুরবী আর মহয়া লইয়া আসিল। ফিরিয়া আসিয়া বইয়ের পাতা উন্টাইত উন্টাইতে কহিল, “কিন্তু একটা কথা সে ভুলে গেছি, নিশ্চল। তুমি ত বিকোলে বরাবর চা খাও। এখন নীচে নিশ্চলই খেয়ে আসনি। বৌদিরা খান না ব’লে নীচে তোমারও বোধ হয় খাওয়া হয়নি। আগে চা খাও, তার পর পড়ব।”

চাকরকে ডাকিয়া যামিনী দু-পেয়লা চা আনিতে মিলিল।

চা আসিল। ফুলের গন্ধ ছুটিতে লাগিল। মহয়া ড় চলিতে লাগিল, পশ্চিম আকাশ হইতে সোনালী রঙ আসিয়া নিশ্চলার চুলে, সোনার হার পড়িয়া ক্রমিক করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই মিল্লীর মন ভরিল না। সে যাহা চায় কিছুতেই তাহার ধরাছোঁয়া পাইল না। এত করিয়াও নিশ্চলার যাকে সে ঠিকমত স্পর্শ করিতে পারিতেছে না, তাহার মনি বোধ হইতে লাগিল। সে পাগল হইয়া যাইবে! ফট! রুদ্ধ লোগার দরজার সামনে দাঁড়াইয়া সে তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও যেন তাহা খুলিতে পারিতেছে না এমনি একটা পরাভবের গ্লানি, নিরাশার ভজন। ভিতরে ভিতরে তাহাকে অস্থির করিয়া মিলিল।

ঠাৎ এক সময়ে পড়া থামাইয়া বলিল, “কই, গ শুনচ না ত নিশ্চল? তোমার ভাল লাগছে না?” নিশ্চল চমকিয়া উঠিল, “কেন শুনছি বইকি।

বেশ ত। কিন্তু তাহার সেই চমকটা এতই সুস্পষ্ট যে যামিনী একটু রুদ্ধ স্বরে বলিল, “না, শুনছ না। মনও দিচ্ছ না। তোমার একেবারেই ভাল লাগছে না। কিন্তু কেন? আমি তোমার বাবার মত পড়ি না ব’লে? আর এটা ক’লকাতা নয় ব’লে?” বই ফেলিয়া দিয়া চটিছুতা ফট্ ফট্ করিতে করিতে সে সেখান হইতে চলিয়া গেল। আবার তখনই ফিরিয়া আসিয়া পিছন হইতে নিশ্চলার কাঁধে হাত রাখিয়া কহিল, “আমার উপর রাগ করলে?”

“না।” কিন্তু নিশ্চলার চোখে জল আসিয়া গিয়াছিল।

“ভাল ক’রে কথা বল নিশ্চল। আমাকে ব’কো ঝকো, আমার উপর রাগ কর, অভিমান কর। আমাকে কটু কথা ব’ল, কিন্তু শুধু ‘হু’ আর ‘না’ দিয়ে কথা সেরে দিও না—” বলিতে বলিতে তাহার একটা হাত টানিয়া লইয়া বুকের উপর রাখিয়া কহিল, “না, না, ও জিনিষ আমার সহ্য হয় না। দেখতে পাচ্ছ না, বুঝতে পারছ না নিশ্চল, ওতে বুক আমার ভেঙে যাচ্ছে। তার চেয়ে তুমি আমাকে কাঁদাও, খুব গভীর বাথা দাও, কিন্তু নিষ্ঠুর, অমন ক’রে নিঃশব্দ ঘণা দিও না।”

নিশ্চলা অবাক হইয়া গেল। একবার হাতটা ছাড়াইয়া লইবারও চেষ্টা করিল, পারিল না। যামিনী আরও দৃঢ় বলে তাহা চাপিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু একটা অদ্ভুত বিতৃষ্ণায় তাহার সমস্ত মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল। এই দুর্দমনীয় আবেগে, তাহার স্বামীর এই গদ গদ তরলতায় সে যেন মরমে মরিয়া গেল। সমস্ত ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও তাহার ঐশ্বর্যশালিনী নারী-প্রকৃতি এই ধূলায় লুটাইয়া পড়া আতুরের প্রেম-নিবেদনে মরমে মরিয়া গিয়া সসন্ত্রমে অন্তদিকে মুখ ফিরাইল। কিন্তু হায়, এ যে তাহার প্রেমেরই জাগরণ তাহা যামিনী বুঝিল না। নিশ্চলা আপনার অজ্ঞাতসারে আজ কল্প-লোকের প্রেমের অনুসন্ধানে ফিরিতে আরম্ভ করিতেছে।

(ক্রমশঃ)

ম্যাডাম কুরী

আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীসত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী, ডি-এসসি

ম্যাডাম কুরীর নাম বিজ্ঞানজগতে সকলেরই সুপরিচিত। সাধারণতঃ বিজ্ঞান-বিভাগে নারীর দান সামান্য। বুদ্ধি-বৃত্তির অপকর্ষতাই যে ইহার কারণ, এমত নহে—সামাজিক আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়া তাঁহারা বিজ্ঞানচর্চার সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পান না। সুযোগ ও সুবিধা ঘটিলে মহিলারাও যে কত কষ্ট স্বীকার করিতে পারেন, ম্যাডাম কুরীর জীবনী আলোচনা করিলে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কুরী তাঁহার জীবনকালের অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই বিজ্ঞানজগতে এক অভিনব আবিষ্কার করিয়া এক নূতন দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন।

পোলাণ্ড দেশের ওয়ার্স নগরে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর ম্যাডাম কুরীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ডক্টর সক্রোডাউস্কী অধ্যাপকের কার্যা করিতেন। অল্প বয়সে মাতার মৃত্যু হওয়ায় কুরী তাঁহার পিতার তত্ত্বাবধানে বাল্যকালে প্রতিপালিত হন। একটু বয়স হইলে তিনি তাঁহার পিতার ল্যাবরেটরীতে কাজ শিখিতে থাকেন। বলা বাহুল্য, বাল্যকালে ম্যাডাম কুরী* তাঁহার পিতার নিকটে যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির মূল কারণ হইয়াছিল।

পোলাণ্ড দেশের যে-অংশে ডক্টর সক্রোডাউস্কী বাস করিতেন তাহা রুশিয়া দেশের অন্তর্গত ছিল। রুশিয়ার জারের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া অনেকে জারের প্রতি বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিত এবং ম্যাডাম কুরী দেশ-প্রেমিক পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এই শ্রেণী-ভুক্ত হন। শীঘ্রই একটি বিপ্লবীর দল গড়িয়া উঠিল। কিন্তু হুর্ভাগ্যক্রমে রুশিয়ার পুলিশ এই রাষ্ট্রবিপ্লব-পন্থীদের সন্ধান পায়। এই ঘটনার পরে মেরী

সক্রোডাউস্কার পক্ষে পোলাণ্ডে নিরাপদে কালযাপন করা বিপজ্জনক হইয়া উঠিল। তিনি একাকী রিক্তহস্তে প্যারীতে আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে তাঁহার পরিচিত ব্যক্তির সংখ্যা কম ছিল এবং অর্থের অনটনহেতু মেরী সক্রোডাউস্কা নিতান্ত দরিদ্র ভাবে কালযাপন করিতে থাকেন। অল্পসময়া তখন তাঁহার প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল এবং দৈনিক খরচ দশ সেন্ট যোগাড় করিবার জন্য তাঁহাকে সোর্বনের ল্যাবরেটরীতে শিশি বোতল প্রভৃতি পরিষ্কার করার কার্যা করিতে হইত। ঘরে আশুন দিবার জন্য অর্থাভাবে তাঁহাকে নিজের কয়লা বহন করিতে হইত এবং দিনের পর দিন তিনি কেবল রুটি ও দুধ খাইয়াই জীবননিরীক্ষা করিতেন। মাংস ব্রাণ্ডী প্রভৃতির স্বাদ প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিলেন।

এই সময়ে সোর্বনের ল্যাবরেটরীর পদার্থবিজ্ঞান-বিভাগের অধ্যক্ষ গেব্রিয়েল লিপম্যান এবং হেনরী পোয়াকারের সহিত তাঁহার বিশেষ আলাপ হয়। তাঁহার অবস্থা শুনিয়া এবং কার্যকুশলতা দেখিয়া লিপম্যান ও পোয়াকারে তাঁহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হন এবং পেরী কুরী নামক একটি মেধাবী ছাত্রের সহকর্মী রূপে কার্যা করিবার আদেশ দেন। একত্র কার্যা করিবার ফলে পেরী কুরী এবং মেরী সক্রোডাউস্কা উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। উভয়েই বিজ্ঞান-দেবতার একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন এবং আজীবন পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন।

এই সময়ে পরমাশ্চর্য্য ব্যাপারসকল পরিলক্ষিত হইতেছিল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম কুক্স দেখাইলেন যে শূন্য কাচনলের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালাইলে ঋণাত্মক বৈদ্যুতিক দ্বার হইতে (negative pole

* বাল্যকালে তাঁহার নাম ছিল মেরী সক্রোডাউস্কা।

একপ্রকার আশ্চর্য্য রশ্মি বাহির হয়। তিনি উহার নাম দিলেন বিয়োগ-রশ্মি (cathode rays.)

এই নূতন রশ্মির প্রকৃতি নির্ণয় করিবার জন্ত বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে নানা প্রকার পরীক্ষা ও তর্কবিতর্ক হইতে লাগিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বনামধন্য ইংরেজ বৈজ্ঞানিক শ্রু জে. জে. টম্‌সন্ এই সমস্যার সমাধান করিলেন। তিনি দেখাইলেন যে, এই রশ্মিগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণতাত্ত্বিত কণার সমষ্টিমাত্র। এই ঋণতাত্ত্বিত কণা অথবা ইলেকট্রনের ওজন একটি হাইড্রোজেনের পরমাণুর দুই সহস্র ভাগের একাংশ মাত্র। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক উইল্‌হেল্ম রণ্টজেনের এক্স-রে আবিষ্কারের কথা আসিয়া পড়ে। তিনি দেখাইলেন যে, বিয়োগ-রশ্মি কোনও বস্তুর উপর পতিত হইলে ঐ বস্তু হইতে এক অপূর্ণ রশ্মি নির্গত হয়। এই রশ্মি ধাতু, পাথর কিংবা কাঠের আবরণ অনায়াসে ভেদ করিতে পারে। এই রশ্মি মনুষ্য চর্ম ও মাংস ভেদ করিয়া অস্থিতে বাধা পায়। সুতরাং এই রশ্মির সাহায্যে ফটোগ্রাফ তুলিলে মনুষ্যের শরীরের অস্থিতে কোথাও কোন বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইয়াছে কি-না সহজেই ধরিতে পারা যায়।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক বেকেরল্ (Becquerel) এক নূতন রশ্মি আবিষ্কার করিলেন। নানা প্রকার প্রস্ফুরণশীল (Phosphorescent) পদার্থের প্রকৃতি পরীক্ষাকালীন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, ইউরেনিয়ম এবং উহার যৌগিক পদার্থসমূহ হইতে এক প্রকার রশ্মি নির্গত হয়, যাহা রঞ্জনরশ্মির অথবা এক্স-রে'র সমগুণবিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। তিনি আরও লক্ষ্য করিলেন যে, এই সকল রশ্মি বায়ু অথবা অন্ত কোনও বাষ্পের ভিতর প্রবেশ করিলে উক্ত বাষ্পকে তড়িৎ-পরিবাহক করে। আবিষ্কার নাম অনুসারে এই নূতন রশ্মির নাম হইল বেকেরল্ রশ্মি।

বেকেরলের প্রণালী অনুসরণ করিয়া ম্যাডাম কুরী এই নূতন রশ্মি সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। তিনি দেখিলেন যে, ইউরেনিয়ম ব্যতীত অন্ত এক প্রকার পদার্থ হইতেও উক্ত প্রকার রশ্মি নির্গত হয়। ম্যাডাম কুরী এই নূতন পদার্থের নাম দিলেন থোরিয়ম্। এই সকল

গবেষণা-প্রসঙ্গে ম্যাডাম কুরী লক্ষ্য করিলেন যে, পিচব্লেন্ড নামক ইউরেনিয়মসংযুক্ত খনিজ পদার্থ হইতে যে-রশ্মি নির্গত হয় তাহা বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ম হইতে নির্গত রশ্মি অপেক্ষা চার-পাঁচ গুণ অধিক শক্তিশালী। ম্যাডাম কুরী অনুমান করিলেন যে পিচব্লেন্ডের মধ্যে



ম্যাডাম কুরী

ইউরেনিয়ম ব্যতীত নিশ্চয়ই এমন অন্ত জিনিষ আছে যাহা ইউরেনিয়ম হইতে অধিকতর শক্তিশালী রশ্মি নির্গত করিতে পারে। এ-পর্যন্ত ম্যাডাম কুরীর কোনও সহকর্মী ছিল না। এক্ষণে তাঁহার স্বামী অধ্যাপক পেরী কুরী তাঁহার সঙ্গে একত্রে এই অজ্ঞাত বস্তুর অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রধান অন্তরায় হইল যে, পিচব্লেন্ডের মধ্যে এই অজ্ঞাত বস্তুর পরিমাণ অত্যন্ত কম। কাজেই তাঁহাদিগকে প্রচুর পরিমাণ পিচব্লেন্ড লইয়া কার্য আরম্ভ করিতে হইল। এই কার্যের জন্ত অষ্ট্রীয় গবর্নমেন্ট বোহেমিয়া দেশের অন্তর্গত ইউরেনিয়মের খনি হইতে কুরীদ্বয়কে এক টন পিচব্লেন্ড উপহার দিলেন। সাধারণতঃ পিচব্লেন্ডের মধ্যে নানারূপ পদার্থ মিশ্রিত থাকে। সুতরাং উহা হইতে

ঠাহাদের অভীপ্সিত বস্তুর সন্ধান পাওয়া অতীব আয়াস-সাধা ব্যাপার। এক টন অর্থাৎ ২৭ মণ পিচব্লেণ্ড হইতে ১ গ্রাম ওজনের ৬০০ শত ভাগের এক ভাগ অতি শক্তিশালী স্বতঃজ্যোতির্ময় পদার্থ পাওয়া যায়। ম্যাডাম কুরী



পেরী-কুরী

ইহার নাম দিলেন রেডিয়াম। দীর্ঘ বারো বৎসরব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমসহকারে পরীক্ষা করিবার পর তিনি ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বিশুদ্ধ রেডিয়াম ধাতু প্রাপ্ত হইলেন। এখানে বলা আবশ্যিক যে, রেডিয়াম আবিষ্কার করিবার পূর্বে তিনি স্বতঃজ্যোতির্ময় আরও একটি মৌলিক পদার্থের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। স্বদেশের স্মৃতিরক্ষার্থ উক্ত বস্তুর নাম দিয়াছিলেন,—পোলোনিয়াম।

এই প্রসঙ্গে রেডিয়াম সম্বন্ধে কিছু বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না। ক্যান্সার ও কতকগুলি চর্মরোগ হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায় রেডিয়াম-চিকিৎসা। রেডিয়াম একটি তীব্র শক্তিশালী জ্যোতির্ময় পদার্থ। সূর্য হইতে আলোক বিচ্ছুরিত হয় বলিয়াই এই জগত আমাদের দৃশ্যমান হয়। রেডিয়াম হইতে যে

আলোক বিকীর্ণ হয় আমাদের চক্ষে তাহা ধরা পড়ে না। অথচ এই আলোক সূর্যের আলোক অপেক্ষা বহুগুণ শক্তিশালী। সূর্যের আলোক আমাদের চামড়া ভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু রেডিয়াম হইতে নির্গত আলোকের সম্মুখে দাঁড়াইলে শরীরের অন্তঃস্থিত প্রত্যেকটি অংশ-বিশেষ স্পষ্টভাবে দেখা যায়। রণ্টজেন কর্তৃক আবিষ্কৃত এক্স-রে'র বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। এই রেডিয়াম হইতে যে আলোক বিকীর্ণ হ় তাহা এক্স-রে'রই অনুরূপ। মাত্র এক গ্রাম ওজনের রেডিয়াম হইতে এই জ্যোতিরূপে যে শক্তি নির্গত হয় তাহা এক গ্রাম ওজনের কয়লা হইতে প্রাপ্ত তাপশক্তির দশ লক্ষ গুণেরও অধিক।

রেডিয়াম যে কেবল মানুষের উপকারে আসিবে, এমন নহে। বিজ্ঞানজগতে ইহা যে কত গভীর রহস্যের উদঘাটন করিয়াছে, তাহার ইতিহাস নাই।

বলা বাহুল্য, ম্যাডাম কুরীর আবিষ্কার বিজ্ঞান-জগতের একটি নূতন দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। ম্যাডাম কুরীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অসংখ্য দেশে বহু প্রশিক্ষিত বৈজ্ঞানিক এই স্বতঃজ্যোতির্ময় (Radioactive) পদার্থসমূহ সম্বন্ধে গবেষণা করিতে আরম্ভ করিলেন। তন্মধ্যে রাদারফোর্ড, সডি, র্যাম্ফ্র্ড ও বোল্টউড-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর চতুর্দিক হইতে ম্যাডাম কুরী অভিনন্দিত হইতে লাগিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে কুরীস্বরূপ ও বেকেরল একত্রে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্মান 'নোবেল প্রাইজ' প্রাপ্ত হন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ম্যাডাম কুরী অতি উচ্চ সম্মানের সহিত প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর-অফ-সাইন্স উপাধি প্রাপ্ত হন। বোধ হয় জগতের ইতিহাসে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর-অফ-সাইন্স উপাধির জন্ম যে-সকল মৌলিক গবেষণা দাখিল হইয়াছে ম্যাডাম কুরীর গবেষণা তাহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আরেনিয়াস কৃত দ্রবীভূত পদার্থের তাড়িত বিশ্লেষণ সম্বন্ধীয় গবেষণা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বলা যাইতে পারে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দেই ম্যাডাম কুরী ও ঠাহার স্বামী লর্ড কেলভিনের আমন্ত্রণে লণ্ডনে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে পেরী কুরী রয়াল ইন্সটিটিউশনে

রেডিয়াম সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন এবং কুরীস্বরূপ রয়াল সোসাইটির ডেভি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। পর-বৎসর ম্যাডাম কুরী সোর্বনের ল্যাবরেটরীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন।

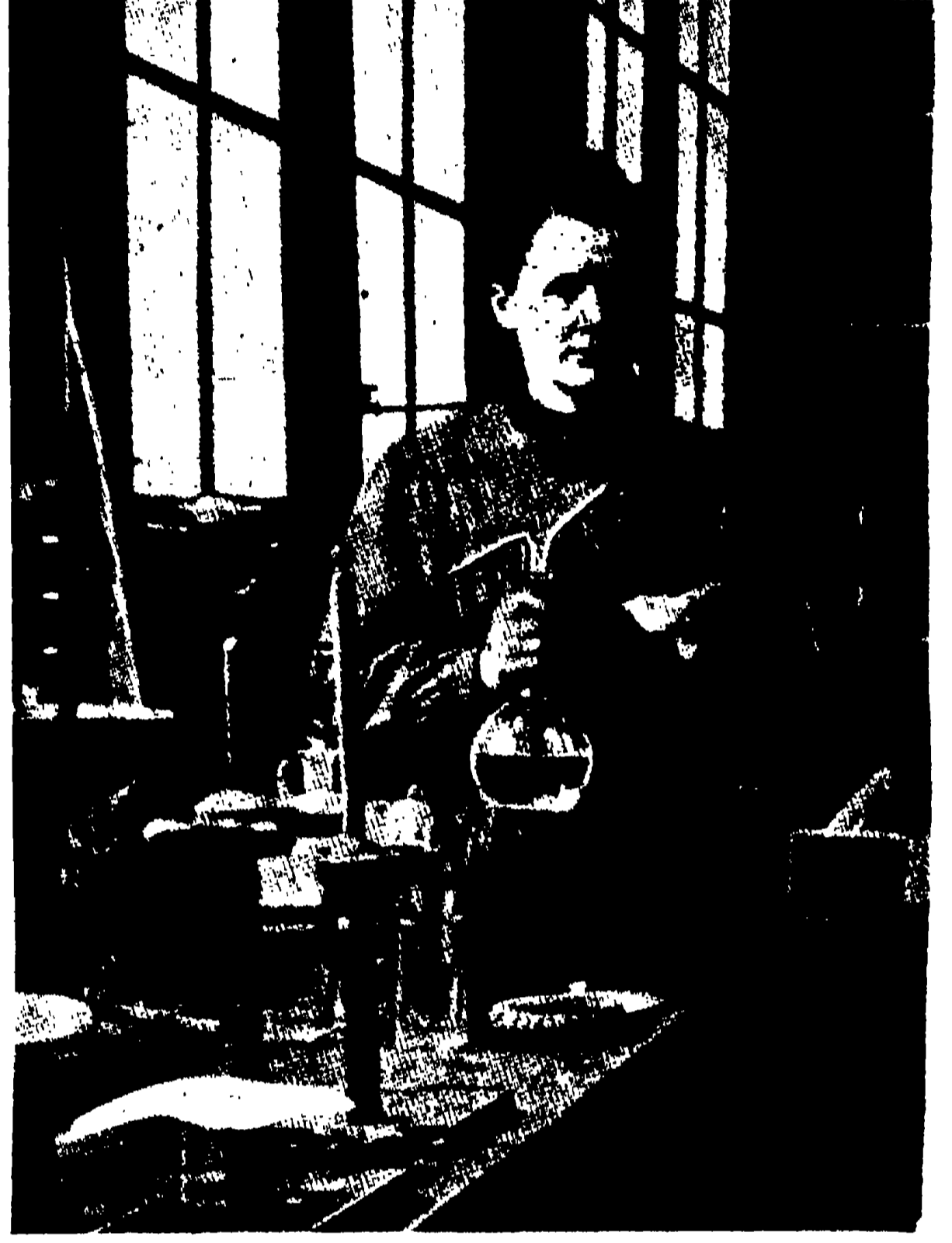
১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এক মোটর-দুর্ঘটনায় অধ্যাপক পেরী কুরী মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই আকস্মিক বিপদে ম্যাডাম কুরী অত্যন্ত শোকাভিভূতা হইয়া পড়েন এবং তাঁহার স্বাস্থ্য এতদূর খারাপ হইয়া পড়ে যে তাঁহার আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবর্গ তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে তিনি দীর্ঘকাল অসুস্থতার পর ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করেন। স্বাস্থ্যলাভ করিবার পর তিনি পুনরায় বিজ্ঞানের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে ম্যাডাম কুরী দ্বিতীয়বার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। বিজ্ঞানজগতের ইতিহাসে একই বার্ষিকি ইহার পূর্বে আর কখনও দুইবার নোবেল পুরস্কার পান নাই। ম্যাডাম কুরীর পরে অধ্যাপক আইনস্টাইন দুইবার নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ যে বৎসর ম্যাডাম কুরী দ্বিতীয়বার নোবেল পুরস্কার পাইলেন সেই বৎসর ফ্রেঞ্চ ইনস্টিটিউটের সভ্য তালিকা ভুক্ত করিতে ম্যাডাম কুরীর নাম উত্থাপিত হয়। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, উক্ত সভার ধুরন্ধর সভেরা ম্যাডাম কুরীর নাম সভ্য-তালিকাভুক্ত করিয়া লইতে রাজি হইলেন না। তাঁহারা এই যুক্তি দেখাইলেন যে এ-পর্যন্ত কোনও স্ত্রীলোক এ-সভার সভ্য হয় নাই এবং এ-নিয়ম এখনও ব্যতিক্রম হইবে না। বলা বাহুল্য, ইহাতে ম্যাডাম কুরীর সম্মানের কোনও হ্রাস হয় নাই—পক্ষান্তরে ফ্রেঞ্চ ইনস্টিটিউটেরই সম্মানের লাঘব হইয়াছে।

পেরী কুরীর আকস্মিক মৃত্যুর পর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ম্যাডাম কুরী সোর্বনের বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। এই বৎসর তিনি পোলেনিয়াম সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন তাহা শুনিবার জন্য লণ্ডন হইতে লর্ড কেলভিন, শ্রু উইলিয়ম্ রাম্জে, শ্রু অলিভার লজ প্রমুখ প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ প্যারীতে উপস্থিত হইলেন। বিগত মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছু পূর্বে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয় স্বতঃজ্যোতির্শাস্ত্র পদার্থসমূহের গবেষণার জন্য 'রেডিয়াম

ইনস্টিটিউট' নামে একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ম্যাডাম কুরী ফরাসী গবর্নমেন্ট কর্তৃক উহার অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এই গবেষণাগার দুই ভাগে বিভক্ত। ইহার একটি অংশের নাম 'কুরী ল্যাবরেটরী', অপর



পরীক্ষাগারে ম্যাডাম কুরী

অংশের নাম 'পাস্তুর ল্যাবরেটরী'। কুরী ল্যাবরেটরীতে স্বতঃজ্যোতির্শাস্ত্র পদার্থসমূহ সম্বন্ধে গবেষণা হয় এবং পাস্তুর ল্যাবরেটরীতে এই পদার্থগুলি কি উপায়ে চিকিৎসাকার্যে ব্যবহৃত হইতে পারে তদ্বিষয়ে গবেষণা হয়। ফরাসী সামরিক হাসপাতাল বলিতে রেডিয়াম সম্বন্ধীয় যাবতীয় চিকিৎসা ব্যাপারে উক্ত গবেষণাগার হইতে সাহায্য আসে। মৃত্যুকাল পর্যন্ত ম্যাডাম কুরী এই ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সূচাঙ্করূপে কার্য নিৰ্বাহ করিয়া গিয়াছেন।

আইরিন্ (Irene) ও ইভ (Eve) নামে ম্যাডাম কুরীর দুই কন্যা বর্তমান। ম্যাডাম কুরী তাঁহার সহস্র কাজের মধ্যেও কন্যাদিগের প্রতি যত্ন লইতে ক্রটি করিতেন না। কন্যাদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও আহাৰাদি

নিজে তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি নিজে আজীবন সাদাসিদা পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন। বিলাসিতা কখনও তাঁহাকে ভিলমাত্র আকৃষ্ট করিতে পারে নাই।

এই মহীয়সী মহিলার মৃত্যুতে বিজ্ঞান-জগতের— বিশেষতঃ ফরাসী জাতির যে বিরাট ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরণ হইবে না।

মাদাম ক্যুরি

ডক্টর শ্রীশিখিরকুমার মিত্র, ডি-এসসি

১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আমরা কয়েক জন প্যারিসে রয়েছি। প্যারিসের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়—সর্বনে (Sorbonne) নোটিস দেখা গেল যে, মাদাম ক্যুরি ‘আইসোটোপ’ (isotope) সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা দিবেন। অনেক দিন হইতেই এই মনিষিণী মহিলাকে দেখার ইচ্ছা ছিল, সুতরাং নির্দিষ্ট দিনে বক্তৃতা-কক্ষ ফিজিক্স ম্যাঞ্চিথিয়েটারে উপস্থিত হওয়া গেল। গ্যালারি শ্রোতার পূর্ণ। পুরুষ ও মহিলা ছাত্রছাত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ও অনেক সম্ভ্রান্ত নরনারী বক্তৃতায় যোগ দিতে উপস্থিত হয়েছেন। মাদাম ক্যুরি কক্ষে প্রবেশ করিতেই শ্রোতৃমণ্ডলী দণ্ডায়মান হয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা করলেন। বক্তৃতা শুরু হ’ল। প্রতিপক্ষার ও প্রাঞ্জল ভাষায় মাদাম ক্যুরি তাঁর বক্তব্য বলতে লাগলেন। তাঁর কাছে তাঁর কন্যা ইরেন (Irene) দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আবশুকমত মাতাকে পরীক্ষণে সাহায্য করছেন, ও ব্ল্যাকবোর্ড তুলে নামিয়ে বা পরিষ্কার ক’রে দিচ্ছেন। কর্মজীবনের অবসানের মুখে কন্মরুস্তু শ্রোতা মাতার সাহায্যে মাতৃভক্ত এই যুবতী কন্যার সমাগম আমাদের কাছে বড় প্রীতিকর লাগল।

প্রায় এক বৎসর পরে মাদাম ক্যুরির সঙ্গে আর একটু ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়েছিল। প্রায় তিন মাস তাঁর গবেষণাগার এঁাস্তিত্ব ছাড়াডিয়মে (Institut du Radium) গবেষণা করার জন্য প্রবেশ করেছিলাম। মাদাম ক্যুরির অতুলনীয় বৈজ্ঞানিক কীর্তি

—রেডিয়ামের আবিষ্কারের—স্মরণার্থে এই গবেষণাগার ফরাসী গবর্নমেন্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে রেডিয়াম সম্বন্ধে নানা রূপ গবেষণা হয়। দেশ-বিদেশ হ’তে বহু গবেষণাকারী ছাত্রছাত্রী এখানে সমবেত হয়েছেন। একটা বিশেষত্ব এই যে, প্যারিসের অন্ত্যন্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের চাইতে এখানে মহিলা কর্মীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী। সম্প্রতি এই গবেষণাগার হ’তে মাদাম ক্যুরির কন্যা ইরেন ও তাঁহার স্বামী জোলিও (Joliot) নিউট্রন (Neutron) আবিষ্কার ক’রে যশস্বী হয়েছেন। সূক্ষ্ম জড়কণাদের মধ্যে নিউট্রন অত্যন্তম; পাথকা এই যে, অন্ত্যন্ত সূক্ষ্ম জড়কণা—যেমন বিদ্যুতিন্ (electron), পজিট্রন (positron) বা প্রোটন (proton)—প্রত্যেকটিই ধন- বা ঋণ-বিদ্যুতাপ্রিত; নিউট্রন সেরকম বিদ্যুতাপ্রিত নয়। ফলে নিউট্রন কঠিন জিনিষের মধ্য দিয়ে অনেক দূর ছুটে যেতে পারে।

ক্যুরি-দম্পতি কর্তৃক ১৮৯৮ সালে রেডিয়াম ও পোলোনিয়াম ধাতুর আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক জগতের এক যুগান্তরকারী ঘটনা। কি অধ্যবসায়ের ফলে পিচব্লেন্ড হ’তে ইঁহারা রেডিয়াম নিষ্কাশন করতে সমর্থ হয়েছিলেন তা সাধারণকে বোঝান শক্ত। রেডিয়ামের এক আশ্চর্য্য গুণ এই যে, এর থেকে অনবরত তেজ বিকীরণ হচ্ছে,— রেডিয়ামের মধ্যে যেন অফুরন্ত তেজের ভাণ্ডার আছে,— কুবেরের ধন,—দান করলেও ক্ষয় নাই। কোন উত্তপ্ত বস্তু তেজ বিকীরণ ক’রে শীতল হয়—তার তেজের ভাণ্ডার নিঃস্ব হয়ে যায়, কিন্তু রেডিয়ামে যেন তা হয় না। এক

ক্যা রেডিয়াম থেকে এত তেজ বের হয় যে চল্লিশ মিনিটের মধ্যে সেই তেজ রেডিয়াম-কণার সমান পরিমাণ জলকে কুটস্থ অবস্থায় আনতে পারে। অথচ আপাতদৃষ্টিতে তাপবিকীরণের জন্ত রেডিয়ামের কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। এই তেজের উৎস কোথায়? বৈজ্ঞানিক বলালে, রেডিয়ামের এক একটা পরমাণু মাঝে মাঝে বিদীর্ণ হচ্ছে—কেন হচ্ছে তার কারণ জানা নাই। আর, এইভাবে বিদীর্ণ হওয়ার উপর মানুষের কোনও হাত নাই। মানুষ তার আয়ত্তাধীন কোনও শক্তির প্রয়োগে এই বিদীর্ণ হওয়া নিবারণ করতে বা বাড়াতে পারে না। রেডিয়াম ধাতুর পরমাণু এই রূপে বিদীর্ণ হয়ে অল্প ধাতুর পরমাণুতে পরিণত হয় আর সঙ্গে সঙ্গে পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তি তেজরূপে বিকীর্ণ হয়। রেডিয়াম থেকে যে-তেজ বের হয় তা তিন জাতীয়। প্রথম—আলফা কণা (বিলিয়ন পরমাণুর বাসিরের বৈজ্ঞানিক আবরণ বাদ দিলে তিতের যে-অংশ থাকে তাকে আলফা কণা বলে), দ্বিতীয়—বিদ্যুতিন বা electron, তৃতীয়—গামা রশ্মি (ই-এক্সরে জাতীয়)। এক কণা রেডিয়ামে অসংখ্য পরমাণু

আছে, সুতরাং মাঝে মাঝে এক একটা পরমাণু ভাঙলেও রেডিয়াম-কণার আভ্যন্তরীণ শক্তির অপচয় অতি ধীরে ধীরে হয়। তেজবিকীরণ শক্তি অর্ধেক হ'তে প্রায় দেড় হাজার বৎসর লাগে।

প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্বে রেডিয়াম আবিষ্কারের পর রেডিও যাকটিভ গুণ বিশিষ্ট আরও কয়েকটি ধাতু আবিষ্কৃত হয়েছে। এইগুলির গুণ অনুশীলন করতে গিয়ে অণু পরমাণুর গঠনের অনেক রহস্য আমরা জানতে পেরেছি। এমন কি, ইচ্ছামত একটা পরমাণুকে ভেঙে আর একটা পরমাণুতে রূপান্তরিত কর—তাও এই রেডিও যাকটিভ জাতীয় ধাতুর সাহায্যে হয়েছে। পারাকে সোনাতে পরিণত করার চেষ্টা আদিম যুগ হ'তে মানুষ করছে—কখনও সফলকাম হয়নি। কিন্তু উপরোক্ত ভাবে পরমাণু ভাঙা-গড়ার কথা ভাবলে মনে হয় যে পারাকে সোনা করা বৃষ্টি অসম্ভব নয়। মানুষ যে শ্রেণীর কাজ করলে “অমর” আশা লাভ করার যোগ্য হয় মাদাম ক্যুরির বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সেই শ্রেণীর। বৈজ্ঞানিক জগতে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের জাতীয়তা-প্রীতি

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

দরিদ্র কৃষিজীবীর কুটীরে জন্মগ্রহণ করিয়াও, নানা সঙ্কটের বলেই স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ধনে-মান-জ্ঞানে দেশের ও সমাজের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব পরিণত হইয়াছিলেন। তাঁসর মত সত্যানুরাগ, সাহস, দৃঢ়চিত্তত, জ্ঞানানুরাগ ও দেশাত্মবোধ বঙ্গদেশে ছলভ। আন্তরিকতায়, সচ্ছিত্তায় ও একাগ্রতায় ডাক্তার সরকার সকলের আদর্শ ছিলেন। অসাধারণ প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও উদ্যমশীলতায় তিনি বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা মহেন্দ্রলালের অতুলনীয় কীর্তি। তিনিই ভারত সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চার

প্রথম পথপ্রদর্শক। অসামান্য ত্যাগ স্বীকার করিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে ডাক্তার সরকারই এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। একজন্ম লোকে তাঁহাকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ভারতীয় অবতার বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। মহেন্দ্রলালের কীর্তি ও গুণাবলির কথা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। এখানে কেবল বেষত্বমায় জাতীয়তা রক্ষার একান্ত পক্ষপাতী মহেন্দ্রলালের সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিব।

স্বদেশী আন্দোলনের কল্যাণে ও মহাত্মা গান্ধীর ত্যাগের প্রভাবে, পাশ্চাত্য বেষত্বমায় মোহ শিক্ষিত ভারতবাসীর

মধ্যে অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু সত্তর-পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে দেশের অবস্থা একেবারে অল্পরূপ ছিল। তখন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত দেশবাসী পাশ্চাত্য বেশভূষাকেই আদর্শ মনে করিতেন। অনেক স্থলে এদেশবাসীর বেশভূষা সভাজনোচিত বলিয়াই বিবচিত হইত না। মহেন্দ্র লাল তখনকার দিনের সর্বোচ্চ সাধারণ শিক্ষা লাভ করিয়া, বিজ্ঞান-শিক্ষার্থে মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ লাভ করেন। পরে তথা হইতে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিদ্যায় উচ্চতম উপাধি—এম-ডি লাভ করিয়া কক্ষ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। কালে তিনি সর্বপ্রধান চিকিৎসকরূপে গণ্য হইয়াছিলেন। অল্প ক্ষেত্রে বাতিক্রম থাকিলেও, ইউরোপীয় পোষাকই চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর সাধারণ পোষাক ছিল, এখনও তাই আছে। কিন্তু মহেন্দ্রলাল গোড়া হইতেই নিজের জাতীয় পোষাকে অনুরক্ত ছিলেন। খান ধুতি, সাদা জামা ও সাদা চাদর এবং চট্টিভূতা—এই তাঁহার বেশভূষা ছিল। পোষাকে আড়ম্বর তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। বিদগ্ধের পোষাক পরিধান তিনি জাতীয়তার পরিপন্থী বলিয়াই মনে করিতেন। তাঁহার জীবনের অজস্র ঘটনা হইতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

মহেন্দ্রলাল ১৮৭০ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৭৩ অব্দে নব-নির্মিত বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে যখন 'কনভোকেশন' হয়, তখন সাধারণ পোষাক ছাড়িয়া কিছুতকিমাকার গাউন ইত্যাদি পরিতে অনিচ্ছুক থাকায়, তাহাতে যোগদান করেন নাই। এ-সম্বন্ধে তাঁহার ডায়েরীতে (১২ই মার্চ ১৮৭৩) লিখিয়াছেন—

Convocation day of the Calcutta University at the

new University building. Lord Northbrook presides. No mind to attend. Can't put on fantastic dress.

"নবনির্মিত বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনের দিন। লর্ড নর্থব্রুক সভাপতিত্ব করিবেন। যোগ দিতে ইচ্ছা নাই। কিছুতকিমাকার পোষাক পরিতে পারি না।"

1873 21 Days

10 WEDNESDAY 1873

March

Honoured the d. Governor with my company on board the Rhoda in the afternoon! In the first time I appeared before Governor, having all along resisted the temptation of becoming a great man of that description on the ground of dress. I put on trousers and Chapkan of a pair & thus my resolution of years - of a whole life time broke down at last and I have lost my caste as it were. It appeared from the conversation we had with the d. Governor that I could appear with any ordinary dress, even with my slippers. What an opportunity I have thus lost, at the importance of friends, of passing my simple dress. Photo of. resisted me much for changing my dress.

ডাক্তার সরকারের ডায়েরির এক পৃষ্ঠা

পর বৎসরেও তিনি ঐ কারণে 'কনভোকেশনে' যোগদান করেন নাই। তাঁহার ডায়েরীতে (২০শে মার্চ ১৮৭৪) লিখিত রহিয়াছে—

To-morrow is the Convocation of the Senate of the Calcutta University. Vice-Chancellor E. C. Bayley will preside. Sent a copy of my pamphlet on the Science Association with a letter to Mr. Bayley.

"আগামী কল্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের কনভোকেশনে ভাইস-চ্যান্সেলর ই.সি.বেলি সভাপতিত্ব করিবেন। সায়েন্স এসোসিয়েশনের সম্বন্ধে আমার লিখিত পুস্তিকা একখণ্ড ও একখানি পত্র মিষ্টার বেলেবর নিকট পাঠাইয়াছি।"

তিনি যে কনভোকেশনে যান নাই, তাহা পরের তারিখেই ডায়েরীতে লেখা আছে।

মহেন্দ্রলাল ১৮৬০ অব্দে এল-এম-এস পাস করিয়াই চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৮৭৩ অব্দে এম-ডি পাস করায় তাঁহার খ্যাতি বিশেষ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তিনি ১৮৭৫ অব্দের পূর্বে কখনও ধুতিচাদর পরিত্যাগ করিয়া অন্ত পোষাক পরিধান করেন নাই, ছোট লাটসাহেবের একটি পার্টিতে যোগদান করিতে, ১৮৭৫ অব্দে ১০ই মার্চ তারিখে নিজের সাধারণ পোষাক পরিত্যাগ করিয়া মহেন্দ্রলাল সর্বপ্রথম পায়জামা ও চাপকান পরিধান করেন। এজন্য তিনি বিশেষ ক্রোধ হইয়াছিলেন। মহেন্দ্রলাল তাঁহার এই প্রথম বেশপরিবর্তনের বিবরণটি কৌতুকের সহিত আরম্ভ করিয়া অনুশোচনার শেষ করিয়াছেন। তিনি ডায়েরীতে (১০ই মার্চ ১৮৭৫) লিখিয়াছেন—

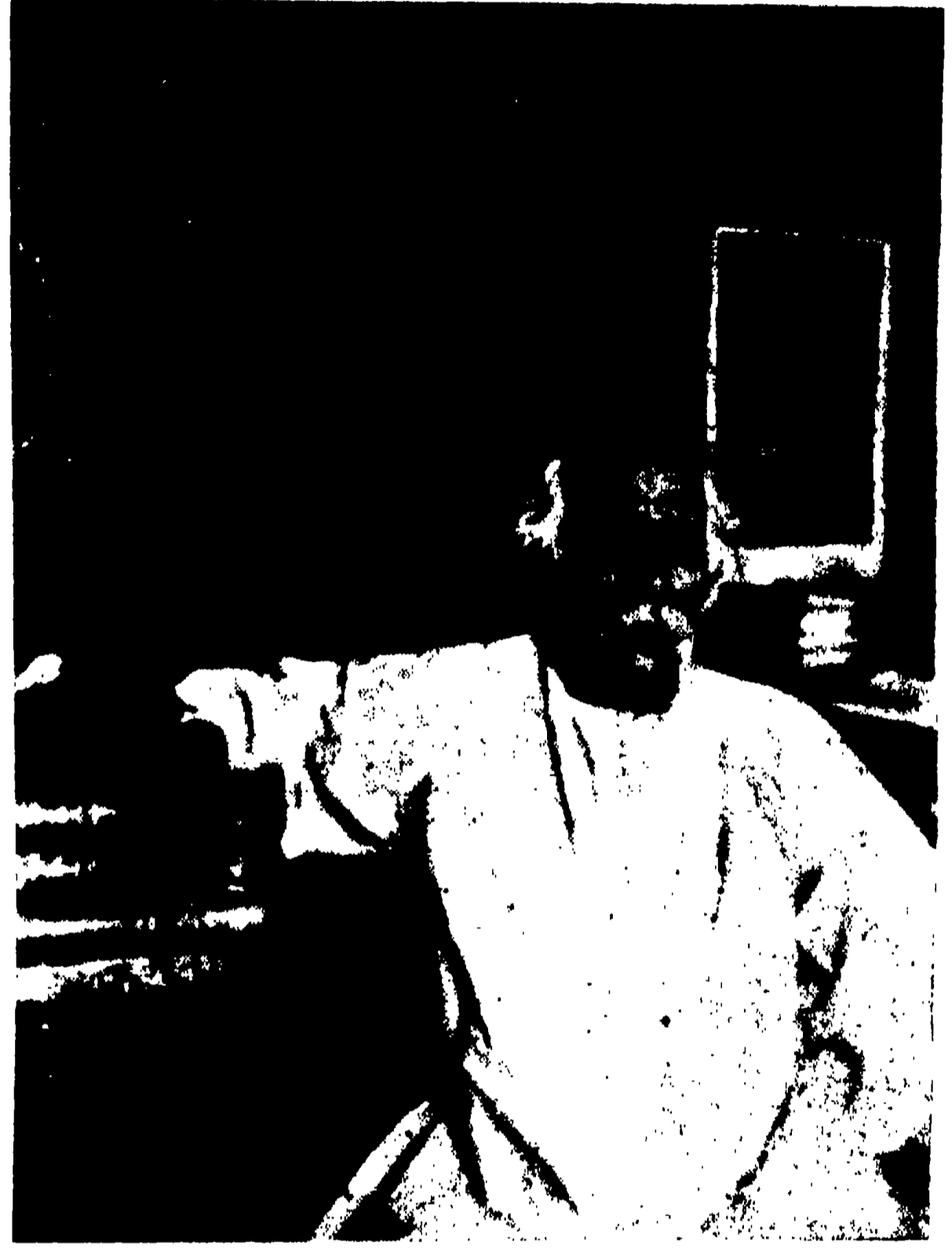
Honored the Lt.-Governor with my company on board the Rhotas in the afternoon ! This is the first time I appeared before our Governor, having all along resisted the temptation of becoming a great man of that description on the ground of dress. I put on trousers and chapkan & a pagri & thus my resolution of years—of a whole lifetime broke down at last and I have lost my caste as it were. It appeared from the conversation we had with the Lt.-Governor that I could appear with my ordinary dress, even with my slippers. What an opportunity. I have thus lost, at the importunity of friends, of passing my simple dress. Kristo Dass rebuked me much for changing my dress.

“অপরাজে ‘রোটার’ উপর আমার সম্মান করিয়া ছোটলাট সাহেবকে সম্মানিত করিয়াছি! পোষাক-পরিচ্ছদের কারণেই তথাকথিত বড়লোক হওয়ার প্রলোভন এতদিন সম্বরণ করিয়া, আমাদের লাটসাহেবের সম্মুখে আমি এই প্রথম উপস্থিত হইয়াছি। আমি পায়জামা, চাপকান ও একটি পাগড়ী পরিয়া, আমার বহু বৎসরের—জীবনব্যাপী দৃঢ়তা পরিশেষে ভঙ্গ করিয়াছি এবং মনে হইতেছে আমি যেন জাতিচ্যুত হইয়াছি। ছোটলাট সাহেবের সঙ্গে আমাদের যে কথাবার্তা হইয়াছে, তাহাতে বুদ্ধিতে পারিয়াছি যে, আমি সাধারণ পোষাকে, এমন কি চটি জুতা পরিয়াও হাজির হইতে পারি। কতদূর স্বযোগ। বন্ধুবান্ধবদের আগ্রহাতিশয্যে আমার সাদাসিদা পোষাক পরিবর্তনে, এইরূপে আমার পরাজয় ঘটিল। আমার পোষাক পরিবর্তনের জন্ত কৃকদাস আমায় বিশেষ উৎসাহ করিয়াছেন।”

উপরি উক্ত লেখা হইতেই ডাক্তার সরকারের মনের ভাব স্পষ্ট বুঝা যায়।

পরে মহেন্দ্রলালকে কর্তব্যসাধনের জন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গুলবিশেষে পায়জামা ও চোগা-চাপকান পরিধান করিতে হইয়াছে। তিনি ১৮৭৭ অব্দে কলিকাতার অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং জীবনের

প্রায় শেষ সময় পর্যন্ত অতি নির্ভর সহিত বিচারকার্য সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। মহেন্দ্রলাল ১৮৮৭ অব্দে প্রথম বেঙ্গল কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হন এবং ১৮৯৩ অব্দে চতুর্থ বার পুনর্নির্বাচিত হওয়ার পর ঐ পদ পরিত্যাগ করেন। বিচার-বিভাগে ও বাবস্থাপক সভা



স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, এম-ডি, ডি-এল, সি-আই-ই

প্রভৃতির কার্যে তিনি বেশ পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু কখনও স্বার্থসিদ্ধি বা অর্থলোভে নিজ জাতীয়তা বলি দিতে স্বীকৃত হন নাই। এ-বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

তখনকার দিনে অবস্থাপন্ন লোকেরা অনেক সময় বাৎসরিক বৃত্তি দিয়া পারিবারিক চিকিৎসক নিযুক্ত করিতেন। দেশীয় ও ইউরোপীয় উভয় শ্রেণীর মধ্যেই এই প্রথা প্রচলিত ছিল। ভারত-গভর্নমেন্টের তাৎকালিক এক জন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী পারিবারিক চিকিৎসক রূপে ডাক্তার সরকারকে নিযুক্ত করিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি যে উপযুক্ত বৃত্তি দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তাহাতে মহেন্দ্রলাল কার্যগ্রহণে সম্মত ছিলেন। সাহেবের এক জন প্রতিনিধি আসিয়া মহেন্দ্রলালকে অনুরোধ জানান যে, ডাক্তার যেন ধুতির পরিবর্তে ইচ্ছার পরিয়া তাঁহার আবাসে গমন করেন। মহেন্দ্রলাল

* “রোটার”—রোটার স্ট্রীমার। ছোটলাট—সার হিচার্ড স্টেম্পল।

† কৃকদাস—হুপ্রসিদ্ধ কৃকদাস পাল।

এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ মুখের উপর উত্তর দেন, "Not on those terms even if you give me Rupees twenty thousand a year"—“আমাকে বৎসরে বিশ হাজার টাকা দিলেও ঐ সর্ত্তে রাজি নহি।” বাঙালীর যাহা-কিছু জাতীয়তা অবশিষ্ট রহিয়াছে ধুতি চাদরে। যেদিন বাঙালী ধুতিচাদর পরিত্যাগ করিবে, সেদিন বাঙালীর জাতীয়তাও অন্তর্হিত

হইবে। ডাক্তার সরকারের অনুমান বোধ হয় এইরূপ ছিল।

বাঙালীত্বের পরিচায়ক সমস্ত বিষয়ে সর্বতোভাবে আসক্তিই বাঙালীর স্বদেশপীতি ও স্বজাতিপীতি। মহেন্দ্রলাল নিজ জীবনে জাতীয়ত রক্ষা করিবার যেটুকু অবসর পাইয়াছিলেন, তাহা অতি সম্মানসহকারে ও প্রাণপণ যত্নে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

মহিলা-সংবাদ

গত ২রা জুন শ্রীমতী প্রকৃতি দেবী পরলোকগমন করিয়াছেন। চিত্রশিল্প, গালার কাজ, জেসো পেটিং, সূচীশিল্প, ময়ূরার কাজ, চামড়ার উপর অলঙ্করণ শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা

ও আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এবারকার উৎসবের সম্বন্ধ-প্রতিযোগিতায় শ্রীমতী বিশিষ্টা জাগাসিয়া উচ্চস্থান অধিকার করিয়া একটি কাপ লাভ করিয়াছেন। শ্রীমতী জাগাসিয়ার বয়স মাত্র বার বৎসর।



শ্রীমতী প্রকৃতি দেবী

অর্জন করিয়াছিলেন। 'প্রবাসী' ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ পত্রিকায় তাঁহার চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল-সমিতি, রাজবালা-নারী-মঙ্গল সমিতি, নারী-শিক্ষা-সমিতি প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। শ্রীমতী প্রকৃতি দেবী আইন-বাবসায়ী শ্রীযুক্ত মহীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী।

কবিসম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে করাচীর নাট্য ও সাহিত্য সমিতি প্রতিবৎসর নৃত্য গীত



শ্রীমতী বিশিষ্টা জাগাসিয়া

খুলনার অন্তর্গত সেনহাটী গ্রামের পানীয় জলের উৎস রক্ষিত জলাশয়টি আগাছায় পূর্ণ হওয়ায় লোকের অব্যবহার হইয়াছিল। লোকাল বোর্ডে আবেদন করা সত্ত্বেও ইহার আগাছা তুলিয়া লওয়া হয় নাই। উক্ত গ্রামের প্রায় চল্লিশ জন মহিলা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পুষ্করিণীর আগাছা পরিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা আমাদের নমস্কার।

যশোহরের স্বাস্থ্য-কর্মচারী ডাক্তার সুবোধচন্দ্র সেনের পত্নী শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী সেন যশোহর মিউনিসিপালিটির



সেনহাটাব মহিলা-সমিতির সাংগঠন পুস্তক পৰিষদ বর্ষিক সভা

এক দল কমিশনার মানোনীত হইয়াছেন। গবর্নমেন্টের
এক মনোনয়ন উত্তম হইয়াছে। সাধারণ নিরক্ষর
একটি বাব উকীল মৌলবী আবদুস সালামের পত্নী শ্রামতী
একজন খাতুন এক জা কমিশনার নিরক্ষরিত হন। এখন
এক জন মহিলা কমিশনার হওয়ার উভয়ে মিলি
এক ভাল কাজ করিতে পারিবেন। শ্রামতী
একটি 'সেন হুই বৎসবের জন্ত যশোহর জেলের
বন্দকাবী পবিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বাড়িতে
এই-এ বৎসব আই-এ পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে
উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার ছুটি কন্তা আছে। বয়স
একটি পচিশ বৎসব।

দিল্লীর ডাক্তার জ্ঞানদাকান্ত সেন মহাশয়ের দৌত্ৰী
একটি কল্যাণী দেবী আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার
বিবাহিতা হন। তাঁহার পবও তিনি কিছু বিদ্যার্জন
দিয়া দেন নাই। তিনি এই বৎসব দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে
একটি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং

উত্তীর্ণ চারদিক দ্বারা দ্বিতীয় স্থানীয়া হইয়াছেন। প্রথম
একটি একে উত্তীর্ণ হন নাও



বিলাত-প্রবাসিনী বামপুত্র নবাবের
বেগম সাতের। উহার বিষয়
বিবিধ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

বহির্জগৎ

জার্মানীর নাৎসি-দলে অন্তর্বিপ্লব

হিটলার এবদা দস্ত করে বলেছিলেন যে নাৎসি-রাষ্ট্র এক হাজার বছর স্থায়ী হবে। কিন্তু অদৃষ্টের কি পরিহাস, গত ৩০এ জুন রাত্রি দুটার সময় তাঁকে ওয়েস্টফ্যালিয়ার এক লেবার ক্যাম্প থেকে ছুটে যেতে হয় নাৎসিদের প্রধান অ্যাড্ডা মুনিকে তাঁর ক্ষমতা নষ্ট করবার জন্য ষড়যন্ত্র দমন করতে। দৈনিক খবরের কাগজ-



ডক্টর পল গোয়েবলস্

গুলিতে হিটলারের এই নূতনতর হত্যাকাণ্ডের বাস্তব লীলার কথা অনেকেই পড়েছেন। এই ষড়যন্ত্রের পিছনে কি কারণ বর্তমান সে সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন।

যাঁরা জার্মানীর আভ্যন্তরিক অবস্থা অনুধাবন করেছেন তাঁরা এইরূপ গোলমালের সম্ভাবনা আশা করছিলেন। হিটলার-পাপেন-হগেনবুর্গ মন্ত্রিমণ্ডলে এত ভিন্ন প্রকার মতামত সন্নিবিষ্ট হয়েছিল যে, ইহা ভেঙে যাওয়া অবশ্যস্বাভাবী। গত বৎসর জুন মাসে হগেনবুর্গ বিদায় নেন। এবার পাপেনের ও আরও অনেকের পাল। গত জুনের শেষাংশেই ভাইস-চান্সেলার ফন্ পাপেন মারবুর্গে এক জোর বক্তৃতায় নাৎসি উগ্রপন্থীদের সমালোচনা করেন। বলা বাহুল্য, ডক্টর পল গোয়েবলস্ এই বক্তৃতা প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা দেন। শুধু তাই নয়, পাপেন কোনও ষড়যন্ত্রে সংশ্লিষ্ট কিনা তাহারও অনুসন্ধান লওয়া হয়। এতে বোঝা যায়, হিটলার ও তাঁর অনুচররা নিজেদের বিরুদ্ধে কোনও ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়েছিলেন। তারপর ৩০এ জুন হিটলার ষটিকা-বাহিনীর নায়ক ক্যাপ্টেন রোয়েমের শয়নকক্ষে হানা দেন। রোয়েম তাঁর নিজস্ব কর্মচারীবৃন্দ সমেত ধৃত হন। সেই সময়েই জার্মানীর ভূতপূর্ব চান্সেলার জেনারাল কুর্ট ফন্ শ্লাইসার সপত্নীক নিহত হন এবং বার্লিন ও ব্রীমেনে ষটিকা-বাহিনীর অন্ত্যায় অনেক নেতা গ্রেপ্তার

হন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হের হাইনেজ ও হের আর্নস্ট (দুইজনই তাঁদের দলপতি) এবং হের থ্রেগর ট্রাসের। এঁরা সকলেই পরে নিহত



হিটলার, হিগেনবুর্গ ও গোয়েরিং



গোয়েরিং



হয়েছেন। এই ঘটনায় মোট দুই শত সাতাশ জনের প্রাণ গেছে জার্মানী তথা জগত এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডে স্তম্ভিত হয়েছে।

এই ঘটনার সম্যক আলোচনা করতে হলে নাৎসি আন্দোলনের কথা বলতে হয়। নাৎসি আন্দোলন গরু যুদ্ধের একটি বিশেষ ফল। যার যুদ্ধে সাধারণ সেনানীরূপে প্রাণ দিয়েছিল ও ট্রেঞ্চে যাদের অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল তাদের এই দুঃখ-ভোগের জন্ত দায়ী ছিলেন জার্মানীর বৃহৎ কারখানাওয়ালারা—যারা অতি লাভের আশায় দেশের অনেক অনিষ্ট সাধন করেছিলেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন ইহুদীরা। ইহাদের জন্ম হয় এই ধনী সম্প্রদায়কে অবস্বাচ্যত করবার জন্ত ও জার্মানীর জাতীয় গৌরব ফিরিয়ে আনবার জন্য। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের মধ্যে ছিল দুটি জিনিস—প্রথম, ভ্রাতৃত্ব; দ্বিতীয়, নিয়মানুগতা—যাহা নেতৃত্বের প্রধান অবলম্বন। নাৎসিদের মধ্যেও প্রধান লক্ষ্য করবার জিনিস এই দুটি। হিটলার উন্নতির পথে চলতে গিয়ে নেতৃত্বের (যা তাঁর কাছে শুধু ব্যক্তিগত অলম্বন নয়, প্রভুত্বও) মূল অবলম্বনটি খুব ভাল করে মনে রেখেছেন, কিন্তু যে-কথাটি সামান্যতমূলক তা ক্রমশঃ তুলতে বাসেছেন। অবশ্য এর কারণ আছে। নাৎসি দল গড়ে তুলবার জন্ত এ পর্যন্ত অনেক টাকার দরকার হয়েছে, আর সে ব্যয়ভার বহন করেছেন প্রধানতঃ ধনী কলকারখানাওয়ালারা। নার্সম্পত্তীদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে অনেক মধ্যবিত্ত লোককে দলভুক্ত করতে হয়েছে। ফলে নাৎসিদের ভিতরে দুই দলের সৃষ্টি হয়েছে। একটি জাতীয় সোসিয়ালিষ্ট কর্মিসংঘ (National Socialist Workers' Party of Germany) ; ইহার সমাজতন্ত্রের মতবাদগুলির ওপর বেশী জোর দেয়, অল্পদল এইগুলি অপ্রিয় চক্ষে দেখে। তবুও এই নিয়ে হিটলার শাসনকর্তা হবার পর খুব বেশী বিরোধের সৃষ্টি হয়নি, কারণ

নাৎসি দলের কাব্যক্রম অপরিবর্তনীয়। কিন্তু হিটলার ১৯৩৩, ৩০এ জানুয়ারী ভাগেনবুর্গ ও পাপেন প্রমুখ নজরবিদ্রোহী লোকদের



বিদ্রোহন সভায় নাৎসি-দলের নেতৃত্ব। হিটলার, পাপেন, গোয়েরিং, ডক্টর ফ্রিক প্রভৃতি সম্মুখে উপবিষ্ট

নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করা অবধি নাৎসিদলভুক্ত সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর ভাল রেখে চলি শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। আসলে তখন থেকে হিটলার প্রকৃতপক্ষে দোটারায় পড়েছেন। একদিকে, থাইসেন প্রমুখ ধনীদেব কাছে তিনি অঙ্গীকারবদ্ধ টাকা নিয়ে, এবং হিউন-বুর্গ ও পাপেন প্রভৃতির সংসর্গে পড়ে তাঁর কার্যের স্বাধীনতা পল্লিত, অপর দিকে বিশাল ঝটিকা-বাহিনীর উৎসাহ-উদ্দীপনায় বাধা দিতে নারাজ। এখানে বলা দরকার, ঝটিকা-বাহিনীর যারা কর্ণধার তাঁরা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক-শিক্ষিত, নয় মজুরদল হইতে উদ্ভূত। এই ঝটিকা-বাহিনীর উৎসাহে হিটলার মাঝে মাঝে অরণ্য বাধা দিয়ে এসেছেন, এবং এজগত ইহাদের ভিতরে প্রভূত ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কিন্তু যখন অল্পদিন আগে তাঁরা খবর পেল যে, হিটলার ফ্রান্সের সঙ্গে নিরস্ত্রকরণ সমস্যার মীমাংসা করতে গিয়ে তাদের দল ভেঙে ফেলতে স্বীকার করেছেন তখন অসন্তোষ চেপে রাখা শক্ত হ'ল, কাজেই ষড়যন্ত্র শুরু হ'ল হিটলারের অপ্রতীহত ক্ষমতা নাশ করবার জগ্গে। ফন্ গ্লাইসার একজন জবরদস্ত লোক। সেনানীমণ্ডলে এর প্রভূত প্রভাব। নাৎসি ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁর সাহায্য নেন। এমন কি শোন' যাচ্ছে একটি বিদেশী শক্তির সঙ্গেও

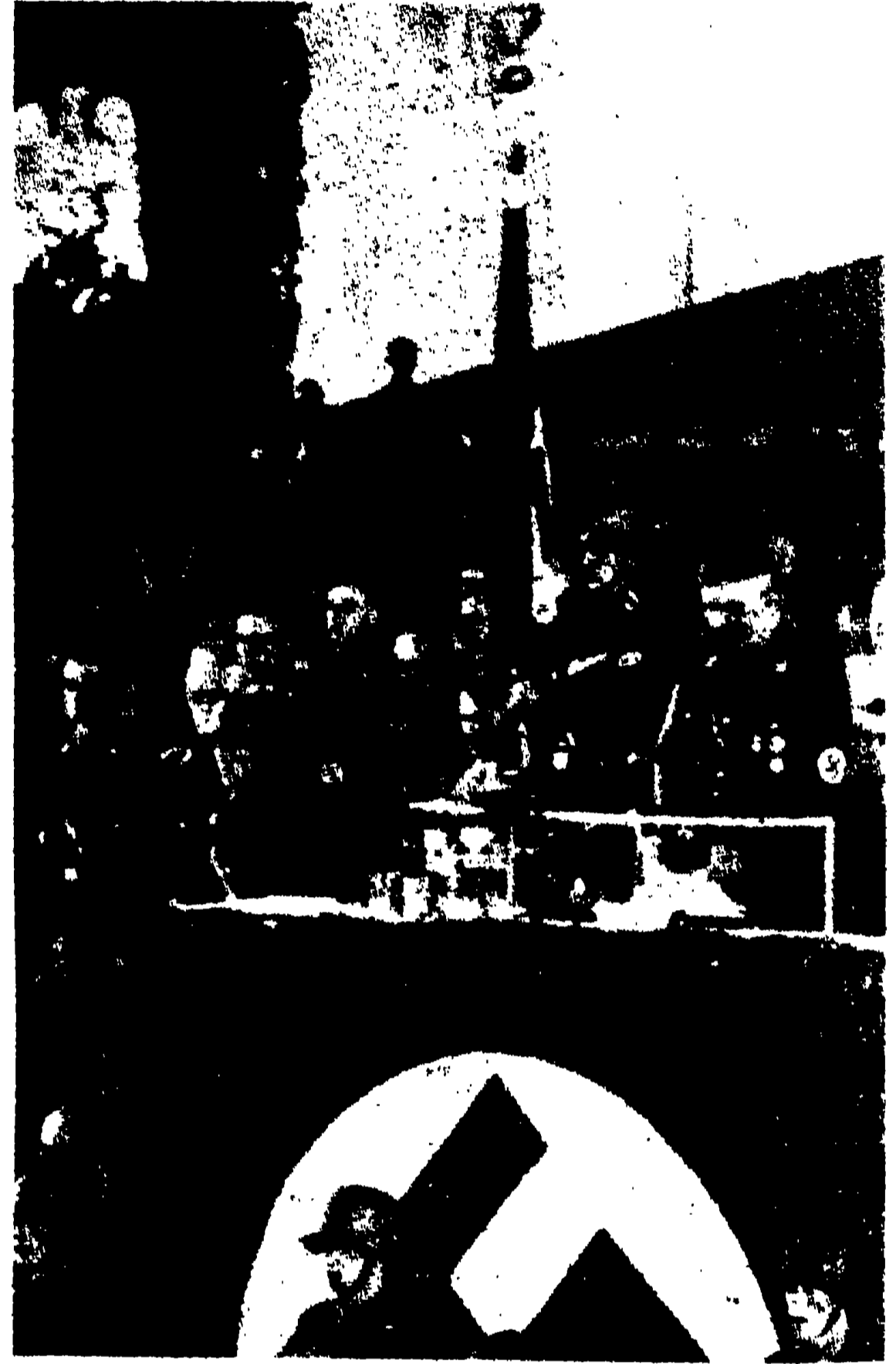
হোক বা হিউনবুর্গের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়েই হোক তাঁকে প্রাণে মারেন নি। পাপেন অপমানিত হয়ে আর মন্ত্রিসভায় থাকার ন্য বলেই মনে হয়।

এই বাাপানের এইখানেই যবনিকাপাত হ'ল মনে করা ভাল হবে। লণ্ডন ডেলি টেলিগ্রাফের বালিদস্ত প্রতিনিধি বলেছেন তিনি ঝটিকা-



ডক্টর গোয়েবলস্ বক্তৃতা করিতেছেন

এই ষড়যন্ত্রকারী দলের যোগসাধন হয়েছিল। যা হোক, হিটলার খুব জোর করেই বিদ্রোহ দমন করেছেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক পুরাতন শত্রু নাশ করেছেন; যথা, হের কার—যিনি ব্যাভেরিয়ার প্রধান মন্ত্রীরূপে ১৯২৩ সনে হিটলারের প্রথম উদ্যম দমন করেন; গ্রেগর ষ্ট্রাসের—যিনি ১৯৩২ সালের শেষে গ্লাইসারের সঙ্গে সন্ধি করে হিটলারকে অতিক্রম করতে উদ্যত হয়েছিলেন। অনেকে মনে করেন, ফন্ পাপেনও এই বাপানে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু তা ভুল বলেই মনে হয়। তাঁর মারবুর্গের বক্তৃতা তাঁর পুরাতন মতবাদেরই পরিচয় দেয়, তাঁর মধ্যে হিটলারের বিরুদ্ধে কোন আক্রোশ ছিল না। সে যা হোক, হিটলার ব্যক্তিগত ঋণ মনে রেখেই



জার্মান জাতীয়তাবাদীদের সভার উদ্বোধন।
হিটলার সভার উদ্বোধন করিতেছেন

বাহিনী বৈপ্রবিক কমিটি দ্বারা প্রকাশিত এক অবৈধ কাগজ দেখাছেন। তাতে এই মর্মে লিখিত হয়েছে, “আমাদের নেতারা হত হইলেও বিপ্লবের কার্য পুরাদমে চলছে। মৃত নেতারা ঝটিকা-বাহিনীর আদর্শ সম্বন্ধে উপলব্ধি করেছিলেন। হিটলার শ্রমিকসংস্কার ধনিকদের ক্রীড়নক হয়ে পড়েছেন।”

ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে বলা কঠিন। ডক্টর গোয়েবলস্ বলেছেন—অস্ত্রবিপ্লব পুরাপুরি দমিত হয়েছে। রয়টারের সংবাদদাতা কিন্তু বলেন,—বাহির হ'তে জার্মানীর অবস্থা খুবই শান্ত বলে বোধ হবে, কিন্তু জনসাধারণের মনে একটা অশান্তি হাওয়া বইছে। এর প্রধান কারণ—ঝটিকা-বাহিনীর তিন লাখ সশস্ত্র সেনানীর ভেতরে অস্ত্রতঃ আধাআধিও এক মাসের ছুটির পর সৈন্য দলে ফিরে যাবে না।

এরা যদি পূর্ণোচ্চমে হিটলারের ক্ষমতা নষ্ট করবার চেষ্টা করে ষ্টাল হেল্ম দলের (অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক ও অল্প কর্মচারীদের দ্বারা গঠিত) অনেকেই এই আন্দোলনে যোগদান করবে, আর কমুনিষ্ট ও সোশ্যালিস্টরা

কি এ সুযোগ অগ্রাহ্য করবে? হিটলারের গেছনে তাঁর ব্ল্যাক শার্টস দল ও জার্মান সেনাদল আছে। এখানে প্রশ্ন শুধু এই যে, সমগ্র জাঙ্গানীতে দেড় বছরের এই অমানুষিক অত্যাচারের পরও কি কারও হিটলারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি আছে? তবে আব্রাহাম লিঙ্কলনের কথাও কেউ অস্বীকার করবে না যে "Public sentiment is everything. With public sentiment, nothing can fail. Without it, nothing can succeed." অর্থাৎ জনসাধারণের আন্তরিক ইচ্ছায় সকল কার্য সাধিত হয়ে থাকে। সাধারণের ইচ্ছায় সকলই সফল হয়, বিনা ইচ্ছায় সকলই বিফল হয়।

শ্রীকরণা মিত্র

কৃষি-বিপ্লব

কৃষি ও কৃষকের দুর্দশা এখন জগদ্ব্যাপ্ত। আমাদের দেশে পাট ও ধানের দর কি রকম নেমে গিয়েছে সে কথা সকলেই জানেন, কেননা তার ফলে এই কৃষিপ্রধান দেশের প্রত্যেক লোকেরই ভোগ করতে হচ্ছে। এ অবস্থা এখন সকল দেশেরই। তবে অন্য দেশে প্রতিকারের প্রবল চেষ্টা চলেছে, এদেশে মুখের কথায় এবং হা-ভত্যাশে যতটা হয়, তাই হচ্ছে:

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গম এবং কার্পাস চাষীর প্রধান আয়কর ফসল। গমের অবস্থা প্রায় তিন-চার বৎসর যাবৎ অত্যন্তই সঙ্গীন হয়ে আছে। যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র ক্যান্সাস প্রদেশেই প্রায় কুড়ি কোটি মণ গম জন্মায়। এই ফসলের বোনা ও কাটার জন্য ১৯৩১ সালেই ২৮,০০০ হার্ভেস্টার, যন্ত্র এবং ৬০,০০০ ট্র্যাক্টর মোটর ব্যবহার করা হয়।

শস্ত্র দিয়ে শূকরকে খাওয়ান চলেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে গম মাঠের মধ্যে ঢেলে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

সাধারণ হিসাবে যুক্তরাজ্যের গমের ফসল ৭৫ কোটি মণের



ফিলিপাইন দ্বীপে পাহাড়ের গায়ে ধানের ক্ষেত

কাছাকাছি দাঁড়াত। নূতন যন্ত্রপাতি এবং নূতন জমির আবাদের ফলে সেই ফসল ৯০ কোটি মণের উপর চলে গিয়েছে। এদিকে পৃথিবীর যে-সব দেশে যথেষ্ট শস্ত জন্মায় না, সেই দেশগুলিতে



আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিবিলাট। ৪০০০ মণ গম চাহিদার অভাবে মাঠে ফেলে দেওয়া হয়েছে

এদেশে চাষীর ক্ষেত বিশাল, অর্থবলও বেশী, সেইজন্য লাজল চালান থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত প্রায় প্রতি পদেই যন্ত্রের ব্যবহার চলে। কিন্তু এই বিরাট আয়োজন বৃথা হয়ে গেছে চাহিদার অভাবে, কেননা গমের দামে চাষের খরচ পোষায় না। ফলে সে দেশে মানুষের খাদ্য-

বাণিজ্যের ষাটতির ফলে অর্থাভাব হয়েছে। কাজেই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, রুশ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ইত্যাদি গম রপ্তানিকারক দেশে খরিদার ও চাহিদার অভাব চলেছে।

কার্পাসের ব্যাপারও একই প্রকার। ফসল ১ কোটি ২০ লক্ষ গাঁট

থেকে বেড়ে ১ কোটি ৬০ লক্ষ গাট পার হয়ে গেছে (১৯৩১)। ফলে দাম ক্রমে নেমে গিয়ে ১৯০৫ সালের দামের কাছে (৬.৭৫ সেন্ট প্রতি পাউণ্ড) গিয়েছে।

আমাদের দেশে, পাট, গম, চাউল, চা, তৈলবীজ, এসকলেই

যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমে রাষ্ট্রের তরফ থেকে অতিরিক্ত ফসল নির্দিষ্ট দামে কেনার ব্যবস্থা হয় এবং সেই ফসল বিদেশে বেচার ব্যবস্থাও হয়। কিন্তু ইহার ফলে চাষীর উপকার ক্ষণিকমাত্র হয়েছিল। কেননা একটা ফসল রাষ্ট্রকে বেচ কিছু লাভ করে পরের ফসল বেচ



সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে নূতন প্রণায় বস্ত্র সাহায্যে গম কাটা

বিদেশের অর্থাভাবের ছায়া পড়েছে। এই ফসলগুলির মধ্যে একমাত্র চা বোধ হয় অতিমাত্রায় জন্মান হচ্ছে। অন্যগুলিতে বিদেশের চাহিদার অভাব চলছে।

সময় রাষ্ট্রই প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং ফসলের পরিমাণ আগে থেকে নির্দেশ করে দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় থাকেনা। কিন্তু নির্দেশ করা এক কথা এবং অসংখ্য চাষীকে সে-নির্দেশ মানিয়ে



সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে। "নূতন" চাষীর দল মাঠে চলেছে

মালয় দেশের রবার, জাভায় ইক্ষু ও চা, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে গম ও তিসি--সবই এইরকমে চাহিদার অভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হচ্ছে।

প্রতিকারের জন্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এবং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে সমস্ত রাষ্ট্রশক্তিই কেনা-বেচার পিছনে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকার

লণ্ডয়ান, আর এক কথা। কাষাতঃ ওদেশের কৃষিসমস্যার সমাধান এখনও হয় নাই।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ঐ ব্যবস্থাই হয়েছে, এবং সেখানে সাফল্যের সম্ভাবনা বেশী। কেননা এখন ওখানে আবাদ করা জমি প্রায় সমস্তই

বহির্জগৎ অধিকারচ্যুত হয়ে রাষ্ট্র-অধিকারভুক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। রাষ্ট্রের
জমি রাষ্ট্রের নির্দেশমত চাষ করা হচ্ছে; ফসলও রাষ্ট্রেরই অধিকার,
কাজেই কেনাবেচাও রাষ্ট্রই করছে। এই ব্যবস্থার ফলে চাষী এখন
পেটভাতা হিসাবেই খাটছে। তবে তার যেমন নিজস্ব বলতেও

সালের পূর্বে ওখানকার সমস্ত জমিই এদেশের মত ছোট ছোট
অংশে প্রজাবহুত্ব ছিল। কুড়ি-পঁচিশ থেকে আশী-নব্বই বিঘা
প্রমাণের ছোটবড় ক্ষেত্রই সমস্ত দেশের ফসল জন্মাত। ভূতপূর্ব
কৃষ সাম্রাজ্যের আমলের বিরাট জমিদারী সবই কৃষাণদের, ভূমি-



জাপানে ধান কাট

বিশেষ কিছুই থাকছে না, তেমনি ধার বলতেও কিছুই নাই বল! চলে।
এবং আধুনিক জগতের যে-প্রকার অবস্থা তাতে সোভিয়েটের

ভূখণ্ডের ফলে টুকরা টুকরা করে বিলি হয়ে গিয়েছিল। এইরকম
পণ্ড পণ্ড আলবীধা জমিতে না চলে নূন প্রথায় যত্নে চাষ, না হয়



সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র। যন্ত্রে গম আছড়িয়ে ছাড়ান (নূতন প্রথা)



ঐ-অধিকারবদ্ধ চাষীকেই সুখী বলতে হবে—কেননা এখন কৃষক
কর অর্থ দাঁড়িয়েছে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি।

সোভিয়েটের এই নূতন ব্যবস্থায় চাষেরও সুব্যবস্থা হয়েছে। ১৯২৮

যথানগ ভাবে উপযুক্ত ফসল জন্মান। সুরতরাং চাষী নিজের ইচ্ছা
ও বিচার মত ভালমন্দ সব জমিতেই আয়কর ফসলের চেষ্ঠা দেখত
এবং শস্যের দাম খরচ-পোয়ান না হ'লে ক্ষতিগ্রস্ত বা ঋণগ্রস্ত



সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র। কৃষকের কাজে উটের ব্যবহার

হয়ে পড়ত। চাষও হ'ত ঘোড়া, বলদ, বা উটের সাহায্যে, নিড়ান ও কাটা হ'ত হাতে। এই কারণে যথাসময়ে ফলন ও সংগ্রহ না হওয়াতেও ক্ষতি হ'ত।

এখন পঞ্চাশ-ষাট হাজার হতে ছয়-সাত লক্ষ বিঘা প্রমাণ



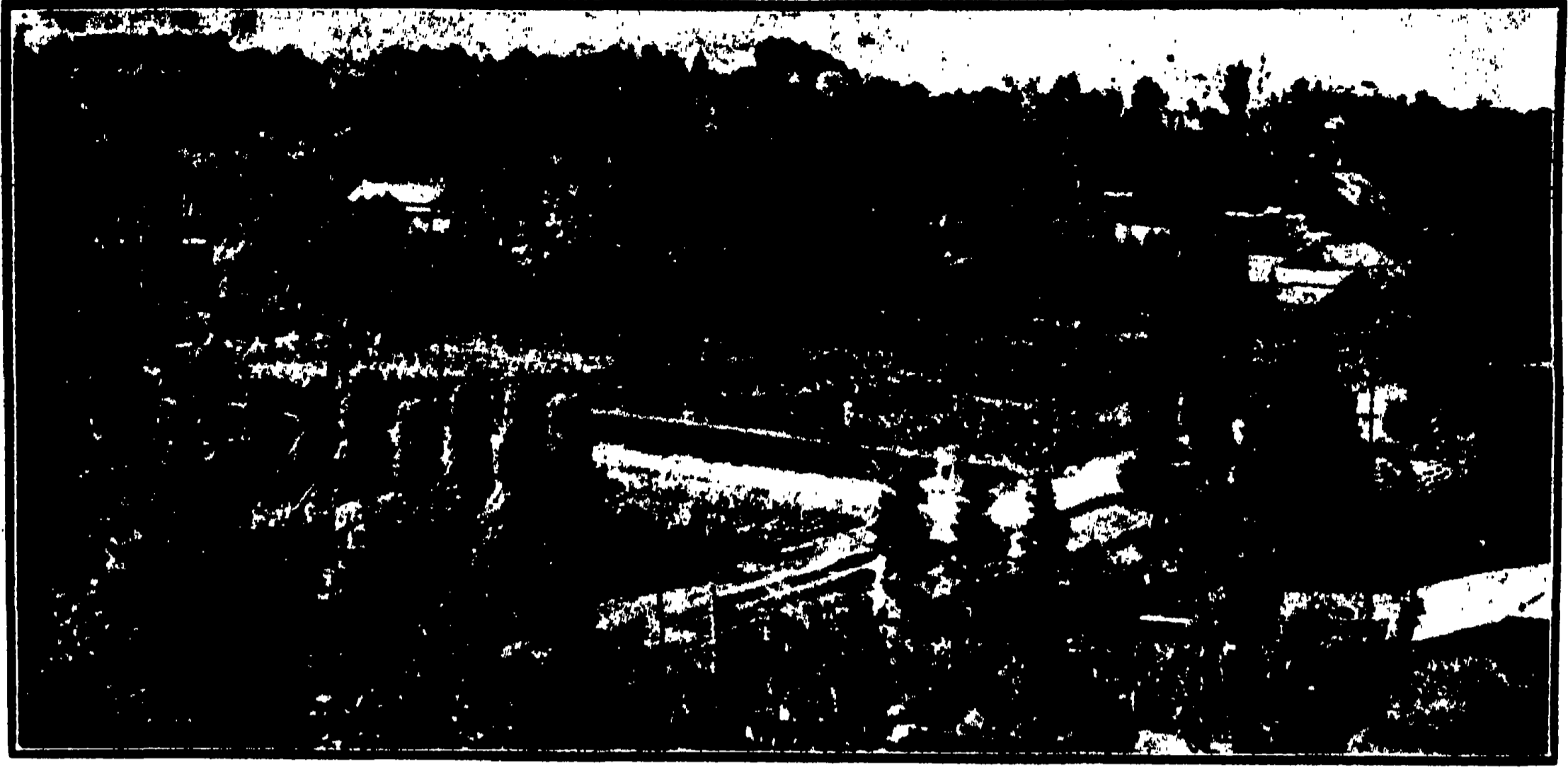
জাপান। শাকসব্জীর ক্ষেত



সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র। ঘোড়ার দ্বারা চাষ।



সোভিয়েট রাষ্ট্রের উজ্বেগিস্তানে কার্পাসের কসল তোলা



জাপান। শাকসজ্জীর ক্ষেত।

এক একটি বিশাল ক্ষেতে, হাজার হাজার ট্র্যাক্টর, হার্ভেস্টার ইত্যাদি যন্ত্রে (সর্বশুদ্ধ প্রায় দু-লক্ষ ট্র্যাক্টর এই কাজে এখন নিযুক্ত) চাষ, নিড়ান ও কাটা ইত্যাদি চলেছে। যে-জমিতে যে-ফসলের যতটা জন্মালে লাভ হওয়া সম্ভব তাই হচ্ছে। কৃষকও এখন অন্ততঃপক্ষে ঋণের ভাবনা থেকে মুক্ত।

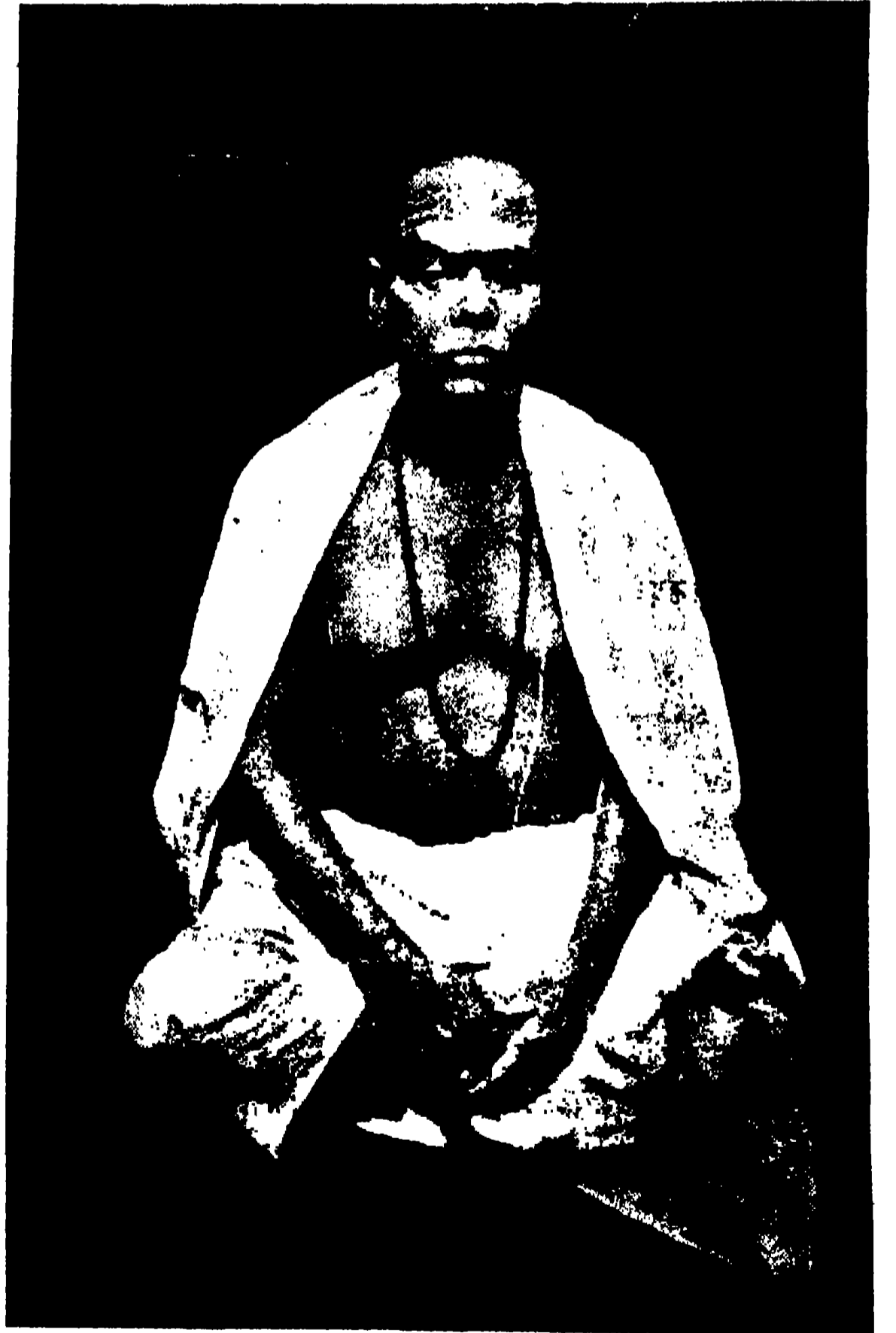
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এই ব্যাপারের প্রতিকারের প্রধান চেষ্টা চলেছে “পরপরের কাপড় কাটা” প্রথায়। অর্থাৎ সাম্রাজ্যের কৃষিপ্রধান অংশগুলি যাতে বাণিজ্যপ্রধান অংশগুলি থেকেই পণ্যদ্রব্য নেয় এবং বিনিময়ে শস্ত দেয় এইরূপ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করে বিদেশীর প্রতিযোগিতা বাধা করার চেষ্টা চলেছে। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ বা সামান্য কৃষিকার্য চলে, তাকে বাঁচিয়ে রাখাও বিশেষ দরকার, কেননা যুদ্ধ, অবরোধ ইত্যাদিতে ধরের কসলই একমাত্র সহায়। সুতরাং সেগানকার কৃষকদের প্রধান খাদ্য ফসলের জন্তু নির্দিষ্ট অনুপাতে “বোনাস” দেওয়াও হচ্ছে।

বিনা যন্ত্রে প্রাচীন প্রথায় চাষ আধুনিক দেশ সকলের মধ্যে একমাত্র জাপানেই ভাল চলেছে। তাহার কারণ জাপানী কৃষকের অসাধারণ নৈপুণ্য এবং পরিশ্রমের ক্ষমতা। পণ্য উৎপাদনে জাপানী কলকারখানা যেকোন দক্ষ, চাষে ওখানকার কৃষকও সেইরূপ হিসাবী ও কুশলী। বস্তুতঃ জাপানী চাষী ঐ অল্পবয়স্ক দেশ যেটুকু উর্বর জমি আছে তার কাছ থেকে শেষ ছটাক পর্যন্ত শস্ত ও শাকসজ্জী আদায় করে স্বদেশকে খাদ্যশস্ত্রের বিষয়ে অনেকটা স্বাধীন করে রেখেছে।

আমাদের এ-দেশের ব্যবস্থার কথা? এখন পর্যন্ত প্রধানতঃ কথা-মাত্রই হয়ে গেছে।

কবিরাজশিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি

কবিরাজ শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় সম্প্রতি পরলোক-গমন করিয়াছেন। তাঁহার মহিমময় জীবনের কাথাবলীর আলোচনা ‘বিবিধ প্রসঙ্গে’ দ্রষ্টব্য।



পরলোকগত কবিরাজশিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি



বাংলা

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের চত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন—

গত ১৬ই আষাঢ়, রবিবার, অপরাহ্ন ৬।০ টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তাঁহার অভিভাষণে বঙ্গভাষায় শব্দ-দৈগ্ধের কথা উল্লেখ পূর্বক অধুনা অপ্রচলিত প্রাচীন বাংলা পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সকলনের বিষয়ে পরিষদকে উদ্যোগী হইতে অনুরোধ করেন। তৎপরে তিনি স্বর্গীয় হরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের তৈলচিত্র, স্বর্গীয় সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্রোমাইড চিত্র, এবং স্বর্গীয় অপারেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্রোমাইড চিত্র প্রতিষ্ঠা করেন, এবং চিত্র-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ইহার পর বিজ্ঞাপিত হয় যে, শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় প্রত্যেকে ২৫০০ দান করিয়া পরিষদের আজীবন সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। নিম্নোক্ত সদস্যগণ একচত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছেন,—

সভাপতি—আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়

সহকারী সভাপতিগণ (কলিকাতার পক্ষে)—১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২। কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি, ৩। শ্রীযুক্ত অমলাচরণ বিদ্যাকৃষ্ণ, ৪। রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর। (মফঃস্বলের পক্ষে)—১। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ২। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ঘোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, ৩। শ্রীযুক্ত যতুনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত অনুরূপা দেবী।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু।

সহকারী সম্পাদকগণ—ডাক্টর শ্রীযুক্ত হুম্মাররঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত চিত্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র সেন-গুপ্ত।

পত্রিকাধ্যক্ষ—ডাক্টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত।

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কোষাধ্যক্ষ—ডাক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা।

ছাত্রাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ।

আয়ব্যয়-পরীক্ষকগণ—শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ কুণ্ডু ও শ্রীযুক্ত দেবীবর ঘোষ।

* সম্মতি কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের পরলোকগমনে তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সর্বসম্মতিক্রমে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডাক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন এবং শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

লীগ-খেলায় মুসলমানদের জয়লাভ—

কলিকাতার ফুটবল খেলার ইতিহাসে এক অভিনব ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে।

‘মহমেডান স্পোর্টিং’ দল এবার লীগ খেলায় শাফাফান অধিকার



মহমেডান স্পোর্টিং দল

করিয়াছেন। তাঁহার জয়লাভ করিয়া ভারতীয় দলের সম্মান বদ্ধিত করিয়াছেন; ইহাই ভারতীয় দলের প্রথম লীগ-বিজয়।

ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের নূতন দোকান প্রতিষ্ঠা—

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দী কলিকাতা চৌরঙ্গী রোডে ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের নূতন দোকান প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে নন্দী মহাশয় ইতিমধ্যেই গুণাম অর্জন করিয়াছেন। গহনা-শিল্পে বঙ্গদেশ এক সময় খুব উন্নত ছিল। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নূতন নূতন পরিকল্পনা দ্বারা এই শিল্পের উন্নতি-সাধনে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। এজন্য তিনি বাঙালীমাত্রেই ধন্যবাদার্থ। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দী ১৯২৪ সনে লণ্ডনের ব্রিটিশ এম্পায়ার প্রদর্শনীতে ও ১৯৩১ সনে প্যারিস আন্তর্জাতিক উপনিবেশিক প্রদর্শনীতে তাঁহার ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের তৈরি গহনার নমুনা স্বয়ং প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার কার্যের উন্নতি কামনা করি।

মেয়র-পদে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার—

গত ৪ঠা জুলাই শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ১৯৩৪-৩৫ সনের জন্ম কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র-পদে নির্বাচিত হইয়াছেন।



মেয়র শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার।

নির্বাচন প্রতি বৎসর এপ্রিল মাসে হইয়া থাকে। এবারকার বাতিক্রমের কারণ, কর্পোরেশনের সদস্যদের মধ্যে মেয়র-নির্বাচন সম্পর্কে ঘোরতর গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছিল। এক দলের ইচ্ছা, এবার একজন মুসলমান মেয়র পদে অধিষ্ঠিত হন। অপর দল শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারকেই মেয়র করিতে বন্ধপরিষ্কার ছিলেন। সে যাহা হউক, সর্বশেষে সরকার-মহাশয়ই এ-বৎসরের জন্য মেয়র নির্বাচিত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। সরকার-মহাশয় একজন কুর্তী পুরুষ। অতি সামান্য অবস্থ হইতে স্বীয় কর্মশক্তি বলে লক্ষপতি হইয়াছেন। বোমা-বাবসায় সাফল্য লাভ করিয়া তিনি বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। তিনি ইতিপূর্বে নিখিল-ভারত বাবসায়-সমিতি-মণ্ডলীর (Indian Federation of Chambers of Commerce) সভাপতি পদেও বৃত্ত হইয়াছিলেন।

বাঙালী ভূপর্ষাটক—

বাঙালী সাইকেল ভূপর্ষাটক শ্রীযুক্ত রামনাথ বিশ্বাস ভূপর্ষাটকের

উদ্দেশ্যে ১৯৩১ সনের ৭ই জুলাই সিঙ্গাপুর হইতে রওয়ানা হইয়া যথাক্রমে মালয়, শাম, ইন্দোচীন, চীন, কোরিয়া, ও জাপান যান। তথা হইতে কানাডায় যান। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে যথেষ্ট অর্থ না থাকায় কানাডা গবর্নমেন্ট তাঁহাকে অবতরণ করিতে না দিয়া পুনরায় সাংহাই এ ফেরত পাঠান; এইরূপে তিনি সাংহাই হইতে ফিলিপাইন, বালী, জাভা ও সুমাত্রা হইয়া আবার সিঙ্গাপুরে প্রত্যাবর্তন করেন, এবং সেপান হইতে বর্মা হইয়া মণিপুর ও আসামের দুর্গম পার্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া বঙ্গদেশে উপনীত হইয়াছেন। রেঙ্গুন হইতে শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ দে নামক এক অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক এপর্ষাটক তাঁহার সঙ্গী হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বাস সর্বমুহুর্তে এ পর্ষাটক প্রায় ত্রিশ সহস্র মাইল পর্যটন করিয়াছেন। এখান হইতে তিনি ক্রমশঃ পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইয়া ইউরোপ যাইবেন, এবং সেখানে লণ্ডন হইতে আমেরিকা ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া বৎসর-তিনেকের মধ্যে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবেন।



শ্রীরামনাথ বিশ্বাস ও শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দে

বিদেশ

দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড় দল—

ভারতবাসী এবং দক্ষিণ-আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতবাসীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বজায় রাখিতে হইলে উভয়কেই উভয় দেশ দর্শন ও ভ্রমণ করিয়া নানাবিধ তথ্য আহরণ করিয়া শিক্ষালাভ করা উচিত। বার-চৌদ্দ বৎসর পূর্বে দক্ষিণ-আফ্রিকায় খেলোয়াড় দল ভারত দর্শন করিয়া ছিলেন। স্মৃতি ভারতীয় খেলোয়াড় দল দক্ষিণ-আফ্রিকা যাত্রা করিয়া ৬ই জুন ডারবান বন্দরে উপনীত হন। সেইদিন প্রাতে বহু ভারতবাসী তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিবার জগু তীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বন্দরের কর্তৃপক্ষ পূর্ব হইতেই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে দর্শকগণকে তীরে অবতরণ করিতে দিবার জগু যে-সকল সাধারণ আইন-কানুন আছে, ভারতীয় খেলোয়াড় দলের উপর সেই সাধারণ নিয়ম প্রযুক্ত হইবে না। তদনুসারে তীরস্থিত ভারতবাসীগণ ভাবিয়াছিলেন যে, বোধ হয় এই বিশিষ্ট দর্শকদলকে তখনি অবতরণ করিতে দেওয়া হইবে। বন্দরের হেল্থ অফিসার আদেশ দিবা মাত্রই তীরস্থিত ইউরোপীয়গণ তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত জাহাজের দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু ভারতীয়গণ 'রিলিজ অর্ডার' (Release order) পাইলেন না, তাঁহারা তীরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। 'পাশ' না পাইলে অতিথি-অভ্যাগতগণকে আপায়িত করিবার জগু ভারতীয়গণের জাহাজে উঠিবার কোনও অধিকার নাই। এই পাশ দেওয়া-না-দেওয়া ইমিগ্রেশন অফিসারের উপর নির্ভর করে। সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে 'দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় ফুটবল সমিতি'র



দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড় দল

অন্ততঃ বিশিষ্ট কয়েক জন সভ্যকে জাহাজে অতিথিগণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত উঠিতে দেওয়া হইবে। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারত সরকারের এজেন্টের সেক্রেটারী মিঃ বজমানকে জাহাজের দিকে গমন করিতে দেখিয়া সকলে ক্ষণিকের জন্ত উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন—কিন্তু শীঘ্র তাঁহাদের সে ভাব দূরীভূত হইল। তাঁহারা পুন্দের ছায় উদ্ভিগ চিত্তে তাঁদের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইউরোপীয়ানগণ ধীরে ধীরে জাহাজ হইতে নামিয়া গেলেন; তখন ভারতীয় ও দেশীয় মজুরগণকে জাহাজে যাইতে দেওয়া হইল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মিঃ এ. ক্রিষ্টোফার (দক্ষিণ আফ্রিকার ফুটবল ক্লাবের সভাপতি), মিঃ ফকির ইহুই (অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি), মিঃ সিং (ক্লাবের ম্যানেজার) এবং মহারাজার পুত্র মিঃ এম. গান্ধী ('ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' পত্রের সম্পাদক) প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জাহাজে উঠিতে দেওয়া হইল না। ইহারা লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ভারতীয় পর্যটকদল এ-দৃশ্যে 'বিচলিত না হইয়া সহাস্তে বরণ করিয়া লইলেন। কেননা ইহা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। স্বদেশবাসিগণের এই ঘোরতর দুর্দশা স্বচক্ষে দেখিবার পর আর কোনও জ্ঞানবান ব্যক্তির পক্ষে স্থির থাকি সম্ভবপর নয়—তাই তাঁহারা এই ব্যাপারকে তুচ্ছ করিবার জন্ত হস্তরসের অবতারণা করিয়া কেহ বলিলেন, 'যদি আমার একটি মজুরের বাজ থাকতো'! কেহ বলিলেন, 'যদি আমার চামড়া সাদা হ'ত' ইত্যাদি। দীর্ঘকাল পরে তাঁহারা তাঁদের অবতরণ করিলেন; তখনও তাঁহাদের লগেজ পরীক্ষা করা হয় নাই। ম্যানেজার একা শুষ্ক আপিসের কর্তৃপক্ষের সহিত দেখা করিতে গেলেন; কিন্তু তাহাতে কিছু ফল হইল না। ভারতীয় খেলোয়াড় দলের সকলকে শুষ্ক আপিসে যাইতে হইল। অতঃপর প্রত্যেক লগেজ খুলিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করিবার পর প্রায় ৫পূর বেলা এই কার্য সম্পন্ন হইল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বন্দরের কর্তৃপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকার এই বিশিষ্ট অতিথি-বৃন্দের জন্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও কোনও প্রকার সুযোগ-সুবিধা দান করেন নাই। ইহা নিতান্ত যুগা ও লজ্জার কথা; ইহা খেলোয়াড় দলের স্বভাবজাত উদার ব্যবহারের সম্পূর্ণ বিপরীত। ভারতীয় ফুটবল এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা এ বিষয়ের কোনও প্রতীকার করিবার ব্যবস্থা কি করিতে পারেন না?

অতঃপর হাপসন গ্রোভে মিঃ পি, আর, পাণথারের গৃহে তাঁহাদিগকে মহা সমাদরে লইয়া যাওয়া হয়। এই সম্মানীয় অতিথি-বৃন্দকে আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয়দের মুগপত্র 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' ১৫ জুন সম্পাদকীয় স্বস্তে তাঁহাদিগকে সাদর সম্বাষণ জানাইয়াছেন,—

"We extend to our distinguished visitors a very cordial welcome on behalf of Indians in South Africa and wish that their visit to this country will not mean the more playing of soccer but that it will draw the minds of their brethren living in this far off land more towards their motherland and her great ancient culture and thus act as a silken cord that will bind S. A. and India in mutual love and affection."

অর্থাৎ "দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতবাসিগণের পক্ষে আমরা আপনাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতেছি; শুধু ক্রীড়াই এই পর্যটনের মূল উদ্দেশ্য নহে—ইহা দ্বারা দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রবাসী ভারতবাসিগণের হৃদয় তাঁহাদের জন্মভূমি ও জন্মভূমির আবহমানকালের প্রাচীন কৃষ্টির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, সাগর-বিচ্ছিন্ন দুই মহাদেশের অধিবাসিগণকে সৌহার্দ্যের সুকুমার সূত্রে আবদ্ধ করুক।"

১৫ জুন শনিবার তিনটা পনের মিনিটের সময় ডারবানে 'কিউরিস ফাউন্টেনে' নাটাল সম্মিলিত দলের সহিত প্রথম খেলা হয়। নাটাল, ট্রান্সভাল, ইষ্টলণ্ডন, পোর্ট এলিজাবেথ, কেপটাউন, কিম্বালী দলের সহিত এবং দক্ষিণ-আফ্রিকার সম্মিলিত দলের সহিত (Test Match) তিনটি খেলা হইবে। তাহার একটি যোহানসবার্গে ও অপর দুইটি ডারবানে হইবে স্থিরীকৃত হয়। নিম্নলিখিত ভঙ্গমহাদয়গণ দলে যোগদান করিয়াছেন—

প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায় (ম্যানেজার), শিরীষ চক্রবর্তী, নরেন্দ্র গুহ, অমিয় গাঙ্গুলী, সত্য মজুমদার, সতী চৌধুরী, মন্থন দত্ত (ক্যাপ্টেন), করুণা ভট্টাচার্য্য, প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিল আমেদ, নাসিম, মীর হোসেন, মহম্মদ হোসেন, রমনা, লক্ষ্মীনারায়ণ এবং মিঃ এন. মোষ। নিম্নে সংক্ষেপে ১০ই জুলাই পর্য্যন্ত মোট খেলার ফলাফল দেওয়া হইল—ভারতীয় দলের সহিত

- ১। নাটাল দলের খেলায়—৬ গোলে জয় (ডারবানে)
- ২। " " " " —২ " পরাজয় (মেরিটনবার্গে)
- ৩। ট্রান্সভাল " " —৬ " জয় (যোহানসবার্গে)
- ৪। " " " " —৫ " " (প্রিটোরিয়ায়)
- ৫। দক্ষিণ-আফ্রিকার মিলিত দলের
অর্থাৎ প্রথম টেস্ট ম্যাচে—২ গোলে " (যোহানসবার্গ)
- ৬। ইষ্টলণ্ডন দলের খেলায়—৯ " " (কেপটাউনে)
- ৭। পূর্বপ্রাদেশিক দলের খেলায়—৫ " " (পোর্টএলিজাবেথে)
- ৮। পশ্চিম " " " " —২ " " (কেপটাউনে)
- ৯। দক্ষিণ আফ্রিকার দলের " " —৩ " " (")

মীরা কহে বিনা প্রেম সে...

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ

নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য যে-সময়ে প্রেমধর্ম প্রচার করিলেন, প্রায় ঠিক সেই সময়ে মীরাবাই মেবারে গাহিলেন, 'বিনা প্রেম সে না মিলে নন্দলাল'। মহাপ্রভুর সে প্রেম-বস্ত্রায় 'শান্তিপুত্র ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।' মীরার মধুর কীর্তনেও মেবারে এক অভূতপূর্ব আনন্দের তুফান বহিয়াছিল। রাজপুতেরা প্রায় সকলেই শৈব-ধর্মাবলম্বী। ভগবান একলিঙ্গজী রাজপুতানার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। উদয়পুরের মহারাণা পৃথিবীতে একলিঙ্গজীর প্রতিনিধি। তাঁহার প্রাসাদের নাম কোনটি শিবনিবাস, কোনটি শঙ্কুনিবাস। বলিগণ যখন মহারাণার জয়গান করে, তখন তাহা শিবস্তোত্রের স্থায় শোনার। এক সময়ে রাজপুতেরা যে ঘোর বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিল, ইহা ইতিহাস হইতে জানা যায়। সময়ে সময়ে তাহারা শ্রীবৃন্দাবনের নিরীহ বৈষ্ণবগণকে অত্যন্ত নির্যাতন করিত। বৈষ্ণবেরা বহুদিন প্রতিবেশিগণের এই অত্যাচার সহ্য করিয়া যাইত। একবার তাহারাও মাঠিশেঁটা লইয়া যখন রাজপুতদের তাড়া করিল, সেই হইতে রাজপুতেরা কিছু ঠাণ্ডা হইল। কিন্তু ইহা পরবর্তী ঘটনা। মীরাবাই যখন মধুর হরিনামে রাজপুতানার উষর ভূমিতে প্রেমের চেউ বহাইতেছিলেন, তাহার হয়ত কিছু পূর্বে শ্রীরূপ সনাতন বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিয়াছিলেন, সুতরাং ইহাদিগকে সমদাময়িক বলা যাইতে পারে। শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত মীরাবাইয়ের সাক্ষাতের কিংবদন্তী অবিশ্বাস করিবার হেতু নাই। অথচ মীরাবাই যে কৃষ্ণপ্রেম ইহাদের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন এরূপও মনে হয় না। প্রবাদ হইতে যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহাতে উভয়ের মিলনে রূপগোস্বামীই নাকি অধিকতর উপকৃত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনে আসিবার পূর্বেই মীরার হৃদয়-কমল ভগবৎ প্রেমারুণরাগে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল।* বস্তুতঃ এই অলৌকিক ভগবৎ-প্রেমই তাঁহার রাজপুতানার বাস ত্যাগ করিবার কারণ। মীরা সদাই কৃষ্ণপ্রেমে ডুবিয়া থাকিতেন, বৈষ্ণব সাধু প্রভৃতির সহিত তন্ময় হইয়া কীর্তন গাহিতেন, ইহাই তাঁহার অপরাধ। এই অপরাধে তিনি চিতোরের রাজপ্রাসাদ হইতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। এ অপরাধ সামান্য হউক বা গুরুতর হউক, ঘটনাটি যে অতি বিচিত্র সে-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

* গানশক্তি অসম্ভব অমৃত নিন্দিত।
যাথে প্রবীড়িত হইল শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত ॥—ভক্তমাল।

মীরা মেবর্তা-রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্যে আকৃষ্ট হইয়া কত শত রাজকুমার তাঁহাকে লাভ করিবার জন্ত লালিয়াইত হইয়াছিলেন। পরিশেষে চিতোরের রাণা কুন্ত তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ।† এই প্রবাদ অবশ্য সত্য নহে। মীরার সুমধুর সঙ্গীতের খ্যাতি শুনিয়া আকবর বাদশাহ তানসেনকে লইয়া বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন এবং দশ লক্ষ টাকার মোতী মাল্য তাঁহার ঠাকুরের গলায় দিয়াছিলেন, এ-প্রবাদও সত্য হইতে পারে না।‡ প্রথমতঃ, রাণা কুন্ত ১৪১৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার ও আকবরের মধ্যে প্রায় ১৩০ বৎসরের ব্যবধান। সুতরাং মীরা রাণা কুন্তের মহিষী হইলে আকবরের সময় পর্যন্ত তাঁহার বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীরূপগোস্বামীর সঙ্গে যদি মীরার সাক্ষাৎকার সম্বন্ধীয় প্রবাদ সত্য বলিয়া ধরা যায়,§ তাহা হইলে রাণা কুন্তের সহিত তাঁহার বিবাহ হওয়া বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। রূপগোস্বামী চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের কয়েক বৎসর পরে বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন। চৈতন্য চব্বিশ বৎসরে অর্থাৎ ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পরে তিনি যখন গোড়ে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন রাগকলিতে তাঁহার সহিত রূপ-সনাতনের সাক্ষাৎ হয় এবং তাহারও কিছুকাল পরে রূপ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রয়াগে আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। রাণা কুন্তের মৃত্যু হয় ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দে পঞ্চাশ বৎসর রাজত্বের পর। সে সময়ে মীরার বয়স পঞ্চাশ বৎসর ধরিলে, রূপের সহিত বৃন্দাবনে তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভবপর নহে। রূপগোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎকালে মীরা যে অতি বৃদ্ধা ছিলেন, এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং মনে হয় মীরাবাই সে সময়ে রূপলাবণ্য ও সুকণ্ঠের অবিকারিণী ছিলেন।

† Todd's *Annals of Rajasthan*, p. 230.

‡ বাইজীর গানশক্তি আকবর শাহ।

পাতসা শুনিতে মনে করিল উৎসাহ ॥

তানসেন সঙ্গে করি বৈষ্ণবের বেশে।

বাইজীর গৃহে গেলা হইয়া উল্লাসে ॥—ভক্তমাল।

§ বৃন্দাবনে গিয়া বাই আনন্দে মগন।

বাঞ্ছা হইল শ্রীরূপ-গোস্বামী-দর্শন ॥—ভক্তমাল।

মীরা রাণী কুস্তের পত্নী না-হইলেও তিনি যে চিতোরের কোনও রাজকুমারের বধু হইয়াছিলেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং রাজার ললনা, রাজার কুলবধু, রাজস্থানের ললামভূতা মীরা অকস্মাৎ কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন, ইহা অসাধারণ ঘটনা। রাজস্থানের বীর রাজপুতেরা শৈব ছিলেন ; শিব যুদ্ধের দেবতা ; ডমরু তাঁহার বাদ্য, ডমরুর সেই বোর বাদ্যরবে শূলপাণি শস্ত্র সংহার করিতে বাস্ত, এই মূর্ত্তিই তাঁহার ধ্যান করিতেন। হঠাৎ শান্তিপ্ৰিয় প্রেমের দেবতা কিশোর রাখাল বালক রণছোড়ঙ্গী কেমন করিয়া এই রাজপুতবালার হৃদয়-সিংহাসনে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহা ভাবিবার বিষয় বটে।* মীরার দেবতার নাম রণছোড় অর্থাৎ যুদ্ধ হইতে যিনি পলায়নপর। রাজপুতানার সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা সংস্কার এই পলায়নপর দেবতাটির বিরুদ্ধে। তথাপি এই রণছোড়ঙ্গী রাজপুতের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া স্বর্গ হইতে প্রেমের মন্দাকিনী আনিয়া রাজস্থানের মরুভূমিতে বহাইয়াছিলেন মীরা। একদিন মেবারের রাজপথে, আরাবল্লীর পার্বত্য-শিখরে, ভীমা নদীর কূলে কূলে মীরার সঙ্গীতের লহরী ছুটিয়াছিল। তাহা না হইলে মীরার রণছোড়ঙ্গীর মন্দির চিতোরের দুর্গাভ্যন্তরে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না। মীরা যে চিতোরের কোনও রাজকুমারের অঙ্গলক্ষ্মী হইয়াছিলেন, তাহাও এই ঘটনা হইতে অনুমান করিতে পারা যায়। আজিও চিতোরের গিরিজুর্গে রণছোড়ঙ্গীর মন্দির বিরাজ করিতেছে। আজিও সেই মন্দিরে রণছোড়ঙ্গীর সঙ্গ মীরার মূর্ত্তিও পূজিত হইয়া আসিতেছেন। কতখানি আবেশ থাকিলে ভক্তির পাত্রকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য অর্চনা করা যায়, তাহা আমরা চিন্তা করিলে বিস্মিত হই। রাজপুত বীরেরা এই প্রেমধর্ম-প্রচারিণী রমণীর পদতলে আত্মসর্পণ করিতে দ্বিধা করে নাই। বহুদিন পূর্বে একদিন অপরাহ্নে রণছোড়ঙ্গীর মন্দির-সোপানে দাঁড়াইয়া এই কথাই ভাবিতেছিলাম। যখন-মিছরি প্রসাদ ভক্তিতরে গ্রহণ করিয়া এই চিন্তাই করিতেছিলাম যে বিধাতার কি রহস্যময় বিধানে রাজপুতানার কঠোর কর্কশ ক্ষেত্রে এই প্রেমময়ীর আবির্ভাব হইল !

প্রেম নহিলে যে ভগবানকে লাভ করা যায় না ইহা ভারতবর্ষে নূতন কথা নহে।

* The religion of the martial Rajpoot, and the rites of Har, the god of battle, are little analogous to those of the meek Hindus, the followers of the pastoral divinity, the worshippers of kine, and feeders on fruits, herbs and water. The Rajpoot delights in blood : his offerings to the god of battle are sanguinary, blood and wine. Todd, Vol. I, page 57.

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা ॥*
শ্রীমদ্ভাগবত—একাদশ।

কিন্তু বাংলার প্রেমের ঠাকুর মহাপ্রভু যেমন করিয়া এই তত্ত্ব একদিন বাঙালীকে বুঝাইয়াছিলেন, এমন করিয়া আর কেহ বুঝায় নাই। মীরাবাইও রাজস্থানে এই বাণী যেমন করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, এমন সুন্দর এমন মধুর করিয়া আর কেহ বলে নাই। মীরার গানে এই প্রেমের বাণী বড় সুন্দর ফুটিয়াছে—

নিত নাহেনে সে হরি মিলে ত
জলজন্তু হোই ।
ফল মূল থাকে হরি মিলে ত
বাতুড় বাদরাই ॥
তিরণ-ভগ্নকে হরি মিলে ত
বহৎ মুগী অজা ।
শ্রী ছোড়কে হরি মিলে ত
বহৎ রহে জায় খোজা ॥
দুধ পিকে হরি মিলে ত
বহৎ বৎস বালা ।
মীরা কহে বিনা প্রেম সে
না মিলে নন্দলালা ॥

মীরার অনেক কবিতায় এই একই ভণিতা আছে। সব কবিতার মধ্যেই একটি স্বচ্ছ প্রেমের প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। উপরের কবিতাটিতে প্রচলিত সংস্কারগুলি সরাইয়া তাহার স্থলে প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টাই দেখিতে পাওয়া যায় ; কাহারও উপর কটাক্ষ আছে বলিয়া মনে হয় না। এই ভাবের একটি দোহাও চলিত আছে—

তুলসী পি ধনে হরি মিলে ত
ম্যায় পি ধে কুঁদা আউর ঝাডু ।
পাখল পূজনে হরি মিলে ত
ম্যায় পূজে পাহাড় ॥

এই দোহাটি কবীরের বলিয়া কথিত আছে। মীরার কবিতাটির সঙ্গে সরোজবজ্রের একটি দোহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। দোহাকোষ প্রায় হাজার বছরের প্রাচীন গ্রন্থ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, “শ্রীষ্টীয় ৮। ৯। ১০। ১১। ১২ শতে এই সকল বহি লেখা হইয়াছিল বলি যায়।” (বৌদ্ধগান ও দোহা)। যদি তাহা হয়, তবে মীরার বহুপূর্বে সরোজবজ্র ইহার আভাস দিয়া গিয়াছেন। সরোজবজ্র বলিতেছেন যে বৌদ্ধ সাধু-সন্ন্যাসীরা নগ্ন হইয়া বেড়ায়, কেহ কেহ তাহাদিগকে দেখিয়া মনে করে যে তাহারা মুক্ত পুরুষ।

* জ্ঞানধর্মে যোগধর্মে নহে কৃষ্ণ বশ ॥
কৃষ্ণ বশ হেতু এক প্রেমভক্তিরস ॥—চৈতন্য চরিতামৃত
—আদিলীলা।

জই গথা বিঅ হোই মুক্তি তা ইতি
(যদি নগদিগের মুক্তি হয়, তাহা হইলে)

তা শুনহ শিআলহ ইতি

(কুকুর শৃগালের মুক্তি হয় না কেন ?)

পিচ্ছী গহণে দিঠ্ঠি মোকথ ইতি

(ময়ূরপুচ্ছ গ্রহণ করিলে যদি মুক্তি হইত--যেমন কপণকের
অর্থাৎ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা করে--)

তা করিঅ তুরঙ্গহ ইতি

(তাহা হইলে ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা যে সকল হস্তী অথ সাজাইয়া
দেওয়া হয়, তাহাদের মুক্তি হইবে না কেন ?)

উবভে ভোঅণে হোই জাণ ইতি

(উল্লিত ভোজন করিলে যদি জ্ঞান হইত, তাহা হইলে হস্তী,
অথ ইত্যাদিরও হইত; কারণ তাহারাও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের স্নায়
শস্তাদি খুঁটিয়া খাইয়া জীবন ধারণ করে)

সরোকহপাদ ধর্মের বহিরাবরণ অর্থাৎ আচার প্রক্রিয়া
প্রভৃতির প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ
সন্ন্যাসী বা কপণকদিগকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি বলিয়াছেন।
কিন্তু সহজপন্থীরা সহজ-মত বাতীত অল্প কোনও ধর্ম-
মতকেই মুক্তির উপায় বলিয়া স্বীকার করিত না।
সেইজন্য সহজায়পঞ্জিকায় সরোকহপাদ শ্লোকের সহিত
বলিতেছেন যে, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব অমূলক। কেননা
প্রথমে যদি বা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মার মুখ হইতে হইয়া থাকেন
তবে তখনই না-হয় তাঁহাকে প্রধান বলিয়া মান্য করা
যাইত। এখন ব্রাহ্মণও যে ভাবে হয়, অল্প লোকও ত
সেই ভাবেই হয়। সংস্কারে বা বেদপাঠে যদি ব্রাহ্মণ হয়,
তবে অল্প লোকের সংস্কার হইলে এবং সে বেদ পাঠ
করিলে ব্রাহ্মণ হইবে না কেন? হোম করিলে যদি ব্রাহ্মণ
হয়, তবে অল্প লোকে হোম করুক না! কিন্তু অগ্নিতে ঘি
ঢালিলে কেবল ধোঁয়ায় চক্ষুর পীড়া জন্মে মাত্র! অনেকে
গায়ে ছাই মাখে, মাথায় জটা রাখে, প্রদীপ জালিয়া বসিয়া
থাকে, ঘরের ঈশান কোণে বসিয়া ঘণ্টা বাজায়, চোখ
মিটমিট করে, কানে ফিস ফিস করে (কয়েকি খুসখুসাই
জনবন্ধী) অর্থাৎ পরচর্চা করে—এই সকল লোক কেবল
লোককে ফাঁকি দেয়। (লোকস্ত কুহনয়া)

মীরার উদ্দেশ্য ছিল প্রেমের প্রাধান্য স্থাপন করা।
প্রেমকে বড় করিতে হইলে আর সকল পদার্থকেই উপেক্ষা
করিতে হইবে। কবিরাজ গোস্বামীও এই কথাই
বলিয়াছেন :—

কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ।

যার আগে-তৃণতুলা চারি পুরুষার্থ ॥

পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমামন্দামৃত-সিদ্ধি।

মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥

কৃষ্ণপ্রেমের নিকট মোক্ষও তুচ্ছ। প্রেমিক মোক্ষ
কামনা করে না। দীর্ঘমানঃ (মোক্ষঃ) ন গৃহ্ণন্তি বিনা
মৎসেবনং জনাঃ। কিন্তু প্রেমের এই উচ্চ ধারণা
মীরা কোথা হইতে পাইয়াছিলেন, তাহা অনুসন্ধানযোগ্য।
মহাপ্রভুর পূর্বে চণ্ডীদাস প্রেমের বিজয়-বৈজয়ন্তী
বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের
অমর কাব্যমুখা পান করিয়া মহাপ্রভু প্রেমের মন
প্রচার করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু মীরা কি চণ্ডীদাসের
কোনও সংবাদ রাখিতেন?

পূর্বে সহজিয়াদের দোহার সহিত মীরার সঙ্গীতের
যে মিল দেখা গেল, তাহা কি আকস্মিক? একই
রকমের ভাব বিভিন্ন কবির মধ্যে প্রস্ফুরিত হইতে দেখা
যায়। তাহা হইতে এক জন যে অপরের নিকট ঋণী
এরূপ সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হয় না। কিন্তু একটা বিষয়
লক্ষ্য করিবার আছে এই যে মীরাকে সহজিয়ার
তাহাদের নিজ দলের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দাবি করে।
'মীরা বাইয়ের করচা' বলিয়া বটতলায় যে গুপ্তিক
পাওয়া যায়, তাহা সহজিয়াদের দ্বারা প্রচারিত বলিয়া
মনে হয়। ঐ করচায় রূপগোস্বামী মীরার নিকট শিক্ষা-
লাভ করিতেছেন এই কথা আছে। ঐ করচার আধুনিক
গ্রন্থকর্তা মীরার নামে এই যে বইখানি চালাইয়াছেন,
তাহাতে 'নিত্ নাহনে হরি মিলে' কবিতাটি উদ্ধার করিতে
ভুলেন নাই।

যাহা হউক, প্রেমের যে বীজ বঙ্গদেশে উদ্ভূত হইয়াছিল,
তাহা বঙ্গের বাহিরে কি করিয়া ছড়াইয়া পড়িল ইহা
ভাবিবার বিষয়। সুরদাস গোকুলে বসিয়া এই প্রেমের
কবিতা লিখিয়া পুঁথি ভরিয়াছিলেন। রাজপুতানার
মক্কাভূমিতে বাঙ্গলার পদ্মকুল কেমন করিয়া ফুটিল?
ইহাদেরও পূর্বে বিদ্যাপতি মিথিলায় বসিয়া বাঙ্গালীর
অনুরাগ-রঙে তুলি ডুবাইয়া প্রেমের চিত্র অঙ্কন করিয়া
ছিলেন নয় কি?



ভারতে রাষ্ট্রনীতি

ভারতবর্ষের লোকেরা যে পরিমাণে জাগিয়া উঠিতেছে এবং, মানুষ যতটা নিজের ভাগ্যানিয়ন্তা হইতে পারে ততটা, নিজেদের দেশে নিজেদের ভাগ্যানিয়ন্তা হইতে চাহিতেছে, সেই পরিমাণে তাহাদের স্বারাজ্যলাভচেষ্টায় ব্যাঘাতেরও সৃষ্টি হইতেছে। ইংরেজ জাতির প্রভুত্বে যত দিন সমষ্টিগত ভাবে আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই, যত দিন উহার শ্রাঘাতা, অন্ততঃ মৌখিক, অস্বীকৃত হয় নাই, তত দিন ইংরেজের নিরপেক্ষ থাকা সম্ভবপর ও সহজ ছিল। কিন্তু উহাতে আপত্তি যত প্রবল হইতেছে, স্বারাজ্যলাভের ইচ্ছা যত বাড়িতেছে, ইংরেজের ততই এমন কতকগুলি লোকের প্রয়োজন বাড়িতেছে যাহারা নানাবিধ সুবিধার বিনিময়ে ইংরেজের প্রভুত্ব মানিয়া লইবে, ইংরেজের প্রভুত্বে আপত্তিকারীদের দলে যোগ দিবে না, এবং আগে যোগ দিয়া থাকিলে তাহা ছাড়িয়া দিবে। এই জন্ত, কোনও সভ্যদেশের আধুনিক মূল শাসনবিধিব্যবস্থায় যেরূপ শ্রেণীগত সম্প্রদায়গত স্বার্থের পার্থক্য স্বীকৃত বা সৃষ্ট হয় নাই, ভারতবর্ষে তাহা হইতেছে। অন্ততঃ কতকগুলি লোককে হাতে রাখিবার প্রয়োজন ইহার কারণ।

আমরা যতই এক হইতে চাহিব, ততই অনৈক্যের কারণ ঘটিতে থাকিবে, ইহা বড় অবসাদজনক বটে; কিন্তু ইহাতে নিরুৎসাহ, নিরাশ বা অবসন্ন হওয়া উচিত নহে। ইহা যে ঘটিবেই, তাহা আমাদের জানা উচিত ছিল এবং এখনও উচিত। যত বাধাই ঘটুক, স্বারাজ্যলাভচেষ্টা আমরা ছাড়িব না। কিন্তু সেই চেষ্টার অঙ্গ ও আয়োজন স্বরূপ, “একতা চাই,” “একতা চাই” মুখে বলিলে এবং জোড়াতাড়ি দিয়া একতা স্থাপনের চেষ্টা করিলে, ইংরেজ শ্রেণীবিশেষ ও সম্প্রদায়বিশেষকে যে-যে রকম সুবিধা দিতেছে আমরা তদপেক্ষা বেশী দিবার অস্বীকার

করিলে, একতা আসিবে না, স্বারাজ্যও আসিবে না। সাম্প্রদায়িকতা আমরা ইংরেজের দেখাদেখি যতই মানিয়া লইব, উহা ততই বাড়িয়া চলিবে। আগুনে ঘী ঢালিলে যেমন উহার শিখা বাড়ে, সাম্প্রদায়িকতাতে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ সাহায্য দিলেও বা উহাকে প্রশ্রয় দিলেও উহা তত বাড়ে। যেমন, সরকার মুসলমানদিগের জন্ত শতকরা ২৫টা চাকরীর নিশ্চিত বরাদ্দ করায় শ্রম মুহম্মদ ইক্বাল বলিতেছেন, মুসলমানদিগকে নিশ্চিত শতকরা ৩৩টা দেওয়া উচিত এবং অধিকন্তু মুসলমান চাকরীদের পদোন্নতি হওয়া উচিত, অর্থাৎ অমুসলমান বৈশীদিনের চাকরোদিগকে ডিঙাইয়া মুসলমান অল্পদিনের চাকরোদের বেতনবৃদ্ধি ও পদোন্নতি হওয়া চাই! এই কারণে সাম্প্রদায়িকতা বরাবর সম্পূর্ণ অস্বীকার করা আবশ্যিক। অন্ততঃ খুব ছোট একটি দলও যদি থাকে যাহার সভোরা কোন প্রকার শ্রেণীগত ও সম্প্রদায়গত আলাদা স্বার্থ সুবিধার ব্যবস্থা চাহিবে না মানিবে না, তাহা দেশের পক্ষে কল্যাণকর।

সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধির চেষ্টা যতই হউক না কেন, প্রকৃত দেশহিতবৈশীদিগকে এরূপ নানা হিতকর অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে, যাহার উপকার সকল ধর্মের ও সকল শ্রেণীর লোক পাইতে পারে। ইহার মানে এ নয় যে, ধর্মসম্প্রদায়বিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের জন্তই অভিপ্রেত কোন মঙ্গলকার্য্য করিতে হইবে না। তাহাও করিতে হইবে। কারণ, এমন অনেক অনিষ্টকর প্রথা আছে, এমন কুসংস্কার আছে, এমন অকল্যাণ আছে, যাহা সম্প্রদায়বিশেষ বা শ্রেণীবিশেষে আবদ্ধ। তৎসমুদয়েরও বিনাশ আবশ্যিক।

যাহারা অন্যায়রূপে অনুগ্রহীত হইতেছে মনে হইবে,

তাহাদের প্রতি ঈর্ষ্যা ও অস্বাভাব মনে উঠিতে দেওয়া উচিত নয়—উঠিলে তাহা দমন করা কর্তব্য।

ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতি প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে সকল ধর্ম জাতি ও শ্রেণীরই প্রতিনিধি বলিয়া প্রত্যেক সভা মনোনীত হন না বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যাহারা দেশহিতৈষী—এবং দেশহিতৈষী সকলেরই হওয়া উচিত—তাঁহাদিগকে অনুভব করিতে হইবে, যে, তাঁহারা সকল সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি। হিন্দুকে হিন্দু অহিন্দু সকলের জন্ত, মুসলমানকে মুসলমান অমুসলমান সকলের জন্ত, খ্রীষ্টিয়ানকে খ্রীষ্টিয়ান অ-খ্রীষ্টিয়ান সকলের জন্ত, শিখকে শিখ অশিখ সকলের জন্ত খাটিতে হইবে। প্রদেশ হিসাবেও কোনও প্রদেশের প্রতিনিধিদিগকে কেবল নিজ প্রদেশের জন্ত খাটিতে চলিবে না, সকল প্রদেশের জন্ত খাটিতে হইবে। অবশ্য প্রত্যেকের নিজ শ্রেণী সম্প্রদায় ও প্রদেশের জ্ঞান যত বেশী অল্প সকলের তত বেশী হইবার কথা নয়। কিন্তু সকলেই সব প্রদেশাদির হিতসাধনচেষ্টায় সহযোগিতা করিতে পারেন।

জাতীয় ঐক্যস্থাপনের ইহাই একটি প্রকৃত ও প্রধান পন্থা।

সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব

ইংরেজ মুসলমান ভারতীয়দের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-সিদ্ধির সুবিধা করিয়া দেওয়ায় এবং একবার সাম্প্রদায়িক সুবিধার স্বাদ পাইয়া তাহার জন্ত তাহাদের লালসা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলায়, অমুসলমানেরা মুসলমানদিগকেই অনেক সময় প্রধানতঃ দায়ী করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা ভুল। তাহা বৃথাইবার জন্ত অদূর অতীতের কিছু ইতিহাসের উল্লেখ আবশ্যিক।

যে-সব দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় উপসম্প্রদায় আছে, তাহাদের মধ্যে সর্বত্রই সদ্ভাব অসদ্ভাব আছে। ভারতবর্ষেও ছিল ও আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এখন রাষ্ট্রনীতি ও তৎসংশ্লিষ্ট সব ব্যাপারে যে-ধরণের সাম্প্রদায়িকতা দেখা যায়, তাহার উদ্ভব হয় লর্ড মিন্টোর আমলে। ঐ বড়লাটের কাছে আগা খাঁ প্রমুখ মুসলমানেরা স্বতন্ত্র ও বিশেষ সুবিধা দাবী

করিতে গিয়াছিলেন বটে; কিন্তু গিয়াছিলেন সরকারী হুকুমে বা ইঙ্গিতে। সরকারী হুকুমে বা ইঙ্গিতে তাঁহারা গিয়াছিলেন বলিয়াই যে তাঁহাদের কোন দোষ ছিল না, এমন নয়। তাঁহাদের এই দোষ ছিল, যে, তাঁহারা সমগ্র নেগনের অর্থাৎ মহাজাতির পক্ষে অনিষ্টকর এবং পরিণামে নিজেদের পক্ষেও অনিষ্টকর দাবী সম্প্রদায়গত স্বার্থাসিদ্ধির জন্ত করিয়াছিলেন। যে প্রলুব্ধ করে ও যে প্রলুব্ধ হয়, উভয় পক্ষই দোষী।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের পর প্রবল আন্দোলন হয়। তজ্জনিত অসন্তোষ বাংলা দেশেই আবদ্ধ ছিল না। এই অসন্তোষ মন্দীভূত করিবার জন্ত, গবর্নেন্ট দেশের লোকদিগকে কিছু অধিকার দিতেছেন এইরূপ যাহাতে মনে হয় এরূপ কিছু করা আবশ্যিক মনে করেন। যে ব্যবস্থা হয় তাহা মর্লীমিণ্টো শাসনবিধিসংস্কার (Morley-Minto Reforms) নামে পরিচিত। এই সময় মিন্টো ভেদনীতি প্রয়োগ করেন। অল্প সব সভ্য দেশে যেমন সকল ধর্মের ও শ্রেণীর লোকদের সাধারণ প্রতিনিধিদের নির্বাচন একত্র হয় এবং তদ্বারা জাতীয়তা পুষ্ট হয়, তিনি সেরূপ কিছু হইতে না দিয়া মুসলমানদিগকে বিশেষ কিছু স্বতন্ত্র কিছু চাহিতে পরোক্ষ ভাবে উৎসাহিত করেন। তাহারই ফলে আগা খাঁ প্রমুখ মুসলমানেরা তাঁহার কাছে যান। এই জন্ত মোলানা মোহাম্মদ আলী কংগ্রেসের সভাপতি রূপে তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, যে, আগা খাঁ এই যে দরবার করিয়াছিলেন, তাহা কমান্ড ও পারফরম্যান্স (“command performance”) অর্থাৎ উহা উপর-ওয়ালাদের হুকুমে করা হইয়াছিল। ভারতসচিব লর্ড মর্লীর জীবনস্মৃতির দ্বিতীয় ভল্যুমে ৩২৫ পৃষ্ঠা হইতে নীচে উদ্ধৃত বাক্য ছুটি মোলানা সাহেবের উক্তি সমর্থন করে।

“I won't follow you again into our Mahometan dispute. Only I respectfully remind you once more that it was your early speech about their extra claims that first started the M. (Mahometan) hare.”

তাৎপর্য। “আমাদের মুসলমান সম্বন্ধীয় ঝগড়ায় আমি পুনরায় আপনার অনুসরণ করিব না। আমি কেবল আপনাকে সম্মানসহকারে আর এক বার স্মরণ করাইয়া দিতেছি, যে, মুসলমানদের অতিরিক্ত দাবী সম্বন্ধে আপনার পূর্বাভিষ্টিক বক্তৃতাই মুসলমান ধর্মগোষ্ঠীকে সজাগ ও সচেতন করে।”

ভারত-গবর্নেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত একটি সরকারী রিপোর্টেও ইহার প্রমাণ আছে। যথা, ইণ্ডিয়ান সেন্ট্রাল কমিটির রিপোর্টের (*Report of the Indian Central Committee*) ১১৩ পৃষ্ঠায় আছে—

“58. It was at the time of the Morley-Minto Reforms that the claim for communal electorates was advanced by the Muhammadans, inspired by certain officials.”

তাৎপৰ্য্য। “মর্লী-মিণ্টো শাসনবিধি সংস্কারের সময়েই সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলীর জন্ম দাবী, কোন কোন সরকারী কর্মচারীর প্ররোচনায়, মুসলমানেরা করিয়াছিল।”

এ রিপোর্টের ১১৭ পৃষ্ঠায় আছে—

“It is often said that we must adhere to the promise made by Lord Minto's Government to the Muhammadan Deputation that waited on him in 1907-08. We will not bring forward the fact, which is now established beyond doubt, that there was no spontaneous demand by the Muslims at that time for separate electorates, but it was only put forward by them at the instigation of an official whose name is now well known.

তাৎপৰ্য্য। “কখন কখন বলা হয়, যে, ১৯০৭-৮ সালে যে মুসলমান প্রতিনিধিসমষ্টি লর্ড মিণ্টোর নিকট দরবার করে, তাহাদিগকে তৎকালীন গবর্নেন্ট যে অঙ্গীকার করেন, তাহা রক্ষা করিতে হইবে। আমরা বর্তমানে নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিষ্ঠিত এই তথ্যটি উপস্থাপিত করিতে চাই না, যে, তৎকালে স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর জন্ম কোন দাবী মুসলমানেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করেন নাই, কিন্তু তাহারা অধুনা হবিদিত এক জন রাজপুস্তকের প্ররোচনায় এই দাবী করিয়াছিলেন।”

লর্ড মিণ্টোর গবর্নেন্টের এই “অঙ্গীকার” (“promise”)

সম্বন্ধে এ রিপোর্টেরই ১১৭ পৃষ্ঠায় আছে—

“The promise made by the Government *ex parte* without having heard what the Hindus had to say cannot be pressed against the Hindus if it works injustice and for various reasons is not in the public interest but is harmful in its results.”

তাৎপৰ্য্য। “হিন্দুদের কি বলিবার ছিল তাহা না শুনিয়া গবর্নেন্ট যে একতরফা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহাতে যদি হিন্দুদের প্রতি অবিচার হয় এবং নানা কারণে যদি তাহা সর্বসাধারণের হিতকর না হইয়া কুফলজনক হয়, তাহা হইলে তাহা হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না।”

অনেক আগেকার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-পত্রে অঙ্গীকার ছিল, যে, ধর্ম বা জাতির জন্ত কাহাকেও অহিংসীত, নিগৃহীত বা অসুবিধাগ্রস্ত করা হইবে না। সে অঙ্গীকারটার কি হইল ?

মুসলমানেরা যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্বাচন আদি চান নাই, তাহার আরও প্রমাণ আছে। পঞ্জাবের বাবস্থাপক সভার অন্ততম সভ্য থাকা কালে রাজা নরেন্দ্রনাথের একটি প্রস্তাব

উত্তরে তথাকার অন্ততম মন্ত্রী মাননীয় মালিক ফেরোজ খান নূন বলেন—

“But it is not possible to trace any single representation of any particular organized body of Muslims as being the main factor responsible for the introduction of the particular constitution (separate electorates) eventually decided on.”

তাৎপৰ্য্য। “বিশেষ কোন একটিও মুসলমানসমষ্টি বা সমিতির কোনও একটি আবেদনের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নহে যাহা পরিণামে-নির্ধারিত বিধিব্যবস্থার (অর্থাৎ স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর) প্রবর্তনের জন্ম প্রধানতঃ দায়ী।”

স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্বাচনের নিন্দা কোন কোন সরকারী রিপোর্টে পর্যাস্ত, যেমন মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড রিপোর্টে, আছে। কিন্তু তাহা থাকিলে কি হয়? কর্তাদের সিদ্ধান্ত কার্যতঃ উহারই পক্ষে হইয়া আসিতেছে। কারণ তাহারা নাকি “অঙ্গীকার” করিয়া ফেলিয়াছেন! মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-পত্রটা—যাহাতে সকল প্রজার প্রতি সমান ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি আছে এবং যে প্রতিশ্রুতির ব্যাপদেশে ভারতীয়দিগের শত্রু ডোগানিয়নগুনার ঔপনিবেশিকদিগকে পর্যাস্ত ভারতে ভারতীয়দের সমান অধিকার দিতে ভারতসচিব মনে করেন ব্রিটিশ গবর্নেন্ট বাধ্য—সেই ঘোষণা-পত্রটা অঙ্গীকার নয়?

সরকারী রিপোর্টে সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলীর নিন্দা থাকা সত্ত্বেও যখন উহা কার্যময় আছে, তখন ইংরেজের লেখা ইতিহাসেও তাহা আছে বলিয়া যে উহা উঠিয়া যাইবে এমন আশা করা ছুরাশা। তথাপি মাস দুই আগে প্রকাশিত ইংরেজের লেখা ও ম্যাকমিলন কোম্পানী দ্বারা প্রকাশিত একখানা ভারতইতিহাসে কি আছে দেখুন :—

“The Muslims specifically demanded separate electorates, and the Hindu leaders conceded the principle in the ‘Lucknow Pact’ of 1916. Their effect was wholly bad. It is not only that they have led Indians to organise along sectarian lines, for this was probably inevitable and caste grouping occurs even within the Hindu constituencies, but the system throws up the worst type of pugnacious fanatic, who loves ‘to prove his doctrines orthodox by apostolic blows and knocks.’ The feeling that great changes were going to take place and the prospect of some actual transfer of responsibility and control over appointments, have combined to rouse all the meaner political passions, especially in those provinces, like Bengal and the Punjab, where the two communities are nearly equal in number. Middle class unemployment and a family system which elevates nepotism into something like a virtue, have also helped to embitter the politico-religious struggle. A further and very grave disadvantage of the communal electorate is

that an alteration in the parties can only occur through wholesale proselytism or through differences in the birth-rate. And both are stirred to new missionary enterprise, when the reward is not only a soul but also a permanent addition to one's voting strength. The activities of the Arya Samaj amongst the poor Muslims and of the various Mohammedan bodies amongst the lower caste Hindus, have caused the greatest bitterness. The politicians get all the support they need from an irresponsible press, while ill-feeling amongst the educated classes is kept alive by scurrilities like the *Rangita Rasul*. —*Rise and Fulfilment of British Rule in India*: by Edward Thompson and C. T. Garratt.

তাত্পর্য্য: “মুসলমানেরা বিশিষ্ট নির্দেশ দ্বারা স্বতন্ত্র নির্বাচক-মণ্ডলী চাহিয়াছিলেন, এবং হিন্দুনেতারা ১৯১৬ সালের ‘লক্ষ্মী চুক্তি’ দ্বারা স্বতন্ত্রনির্বাচন নীতি মানিয়া লয়েন। [‘লক্ষ্মী চুক্তি’তে স্বতন্ত্র নির্বাচন ছিল বটে, কিন্তু শাসনবিধি সম্বন্ধে হিন্দুমুসলমানের সম্মিলিত একটি দাবীও ছিল। সেই দাবী গবন্মেণ্ট স্বীকার করিলে ভারতীয়দের হাতে কিছু প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আসিত। কিন্তু গবন্মেণ্ট সেই দাবী সম্বলিত সমুদয় ‘চুক্তি’ গ্রহণ না করিয়া কেবল নিজেদের পক্ষে সুবিধাজনক স্বতন্ত্র নির্বাচনবিষয়ক অংশটিই লইয়াছেন। তাহার সপক্ষে, যাহা হউক, অন্ততঃ এইটুকু বলিবার আছে, যে, তাহা হিন্দুমুসলমান উভয়েরই স্বীকৃত চুক্তি, কিন্তু ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত উভয় সম্প্রদায়ের স্বীকৃত সিদ্ধান্ত নহে। হিন্দুরা ও শিখরা উহার বিরোধী এবং স্বাভাটিক (“nationalist”) মুসলমানেরা উহার নিন্দা করিয়াছেন। যাহার বিরোধী সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে, এরূপ সিদ্ধান্ত হিন্দুমুসলমানের স্বীকৃত চুক্তির স্থান স্থায়তঃ অধিকার করিতে পারে না। এইজন্য পুনর্বার হিন্দু-মুসলমানের স্বীকৃত কোন চুক্তি না-হওয়া পর্য্যন্ত লক্ষ্মী চুক্তিই বজায় থাকুক। কিন্তু ক্ষমতামালী লোকেরা নিজেদের সুবিধার বিরোধী যুক্তি কবে উনিয়াছে? প্রবাসীর সম্পাদক।]

“স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর ফল সম্পূর্ণ মন্দ হইয়াছে। ইহা যে ভারতীয়দিগকে কেবল ধর্মসম্প্রদায় অনুসারে দলবদ্ধ করাইয়াছে তাহা নহে—ইহা হয়ত অনিবার্য ছিল, কারণ কোন কোন হিন্দু নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যেই এক একটা জাতি (caste) আলাদা দল বাঁধে—কিন্তু এই প্রকার প্রভাবে এরূপ অধমতম লড়াইবাজ ধর্ম্মাঙ্ক লোক প্রাধান্য পায় যাহারা নিজেদের মতকে অধর্ম্মাঙ্কসারী প্রমাণ করিবার জন্য বিপক্ষে ‘শাস্ত্রবিহিত’ প্রহার দিতে ভালবাসে। নানা বৃহৎ পরিবর্তন হইতে যাইতেছে এইরূপ অসুভূতি এবং কিছু দায়িত্ব এবং চাকরিতে নিয়োগের উপর কর্তৃত্ব দেশের লোকদের হাতে আসিবার সম্ভাবনা, এই দুইয়ে মিলিত হইয়া যত সব রাজনৈতিক নীচ প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিয়াছে—বিশেষতঃ সেই সব প্রদেশে যেখানে পঞ্জাব ও বঙ্গের মত দুটি সম্প্রদায় সংখ্যায় প্রায় সমান সমান। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বেকার অবস্থা এবং যে পারিবারিক প্রথা স্বজনপোষণকে প্রায় একটা সদৃশের মত উচ্চ আসন দিয়াছে তাহা ধার্মিক ও রাজনৈতিক দৃষ্ট্যকে আরও তিক্ত-করিয়া তুলিয়াছে। সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলীর আর একটা এবং গুরুত্ব অস্বীকার্য এই, যে, দলগুলির জনসংখ্যায় পরিবর্তন কেবল দলকে দল ধর্ম্মান্তর গ্রহণ বা জন্মের হারের পার্থক্য দ্বারাই ঘটতে পারে এবং উভয় পক্ষই নিজ নিজ ধর্মে অন্য দলের লোককে দীক্ষিত করিতে নূতন উদ্যমে উত্তেজিত হইতেছে, যেহেতু তাহার পুরস্কার নিজ দলে কেবল এক একটি আঙ্গুর যোগ নহে অধিকন্তু নিজেদের ভোট-বলও স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি। গরীব মুসলমানদের মধ্যে আর্বাসমাজের

এবং নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে নানা মুসলমান সমিতির কার্যকলাপে খুব বেশী তিক্ততার উদ্ভব হইয়াছে। দায়িত্বহীন সংবাদপত্রসমূহ হইতে রাজনৈতিক পাণ্ডারা যত আবশ্যক তত সমর্থন লাভ করে, এবং ‘রঞ্জিতা রহুল’-এর মত কুরুচিপূর্ণ বহির দ্বারা শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ জাগ্রত থাকে।”

বাংলা, পঞ্জাব, সিন্ধুদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যে হিন্দুনারী অপহরণ এবং শেষোক্ত তিন প্রদেশে যে হিন্দু বালকও অপহৃত হয়, তাহারও উদ্দেশ্য অংশত অনেক স্থলে নিজ দলের সংখ্যা বৃদ্ধি।

ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহই দায়িত্বহীনতা একচেটিয়া করিয়াছে কি না, অযোগ্য স্বজনদিগের পোষণ ভারতীয় লোক-মাত্রেরই কিংবা কেবল ভারতীয়েরাই করে কি না, ‘রঞ্জিতা রহুল’-এর লেখক ও সমাজই এক মাত্র দোষী কি না, তাহার আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। কিন্তু আধুনিকতম ভারতীয়-ইতিহাস-লেখক ডু-জন ইংরেজ সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধির স্বতন্ত্র নির্বাচনের যে-যে দোষ দেখাইয়াছেন, তাহার সত্যতা স্বীকার করিতেই হইবে।

কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা

বোম্বাইয়ে কংগ্রেস কার্যানির্বাহক কমিটি গোয়াইট পেপার বা খেতপত্র অগ্রাহ্য করিয়াছেন, কিন্তু ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা গ্রহণও করেন নাই, বর্জনও করেন নাই। কমিটির যে প্রস্তাবটি হইতে এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার কোন কোন অংশের সহিত অন্ত কোন কোন অংশের সঙ্গতি নাই, বরং বিরোধ আছে।

সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা যে স্বাভাটিকতার ও গণতান্ত্রিকতার সম্পূর্ণ বিপরীত ইহা সুবিদিত। কমিটির প্রস্তাবটিতেও ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। তথাপি যে কমিটি তাহা বর্জন করেন নাই, তাহার উদ্দেশ্য অবশ্য ভাল। অধিকাংশ মুসলমান ভোটদাতা ঐ সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের পক্ষে। সুতরাং কংগ্রেস ঐ সিদ্ধান্তের বিপক্ষে মত দিলে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশার্থী কংগ্রেসদলভুক্ত মুসলমানের ভোট খুবই কম পাইবেন, ফলে ব্যবস্থাপক সভায় ঢুকিতে পারিবেন না। তাহা হইলে ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস-পক্ষীয় সভ্যের সংখ্যা যথেষ্ট বেশী হইবে না। সুতরাং

ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস পক্ষের মত জয়যুক্ত না হইয়া সরকারী আমলাতন্ত্রের অনুমোদিত মতেরই জয় হইবার সম্ভাবনা বাড়িবে।

কিন্তু কমিটি সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তটা সম্বন্ধে যেরূপ “নিরপেক্ষ” ভাব অবলম্বা করিয়াছেন, তাহাতেই কি মুসলমান ভোটদাতারা কংগ্রেসওয়াল মুসলমানদিগকে ভোট দিবেন? আমাদের তাহা বোধ হয় না। মুসলমান ভোটদাতারা চান, সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারার সম্পূর্ণ সমর্থন। কংগ্রেস যখন তাহা করিতে পারেন নাই, তখন আমাদের অনুমান এই, যে, তাঁহারা সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমান প্রার্থীদিগকেই ভোট দিবেন, কংগ্রেসওয়াল প্রার্থীদিগকে দিবেন না। যদি আমাদের অনুমান মিথ্যা হয়, তাহা হইলে কমিটির আশা পূর্ণ হইবে।

কিন্তু এই একদিকে যেমন কমিটির আশা পূর্ণ হইলেও হইতে পারে, অন্য দিকে তেমনি ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসওয়াল সভ্যের সংখ্যা আশার অনুরূপ না হইবার সম্ভাবনাও আছে। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাতে হিন্দুদের উপর অত্যন্ত অবিচার হওয়ায় হিন্দুরা বিরক্ত আছেন। কংগ্রেস আপাততঃ সেই বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধ আচরণ না করায় বিস্তর হিন্দু কংগ্রেসের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। ফলে, এই অসন্তুষ্ট হিন্দুদের পক্ষ হইতে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদপ্রার্থী অনেকগুলি দাঁড় করান হইতে পারে। তাহারা যে সবাই নির্বাচিত হইবেন, ইহা যেমন বলা যায় না, কেহই নির্বাচিত হইবেন না, ইহাও তেমনি বলা যায় না। যে কয় জন নির্বাচিত হইবেন, কংগ্রেস-পক্ষীয় সভ্য তত জন কম নির্বাচিত হইবেন। তাহার পর, শিখরাও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে কংগ্রেস-কমিটির নির্দ্বারগে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারাও নিজেদের ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশপ্রার্থী জন-কয়েক দাঁড় করাইতে পারেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নির্বাচিতও হইতে পারেন। যে কয় জন নির্বাচিত হইবেন, কংগ্রেসপক্ষীয় তত জন হইতে পারিতেন কিন্তু হইবেন না।

অতএব দেখা যাইতেছে, যে, ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশার্থী মুসলমান কয়েক জনের সুবিধা করিবার নিমিত্ত এক দিকে কংগ্রেস-কমিটি যেমন মুসলমানদিগকে সন্তুষ্ট করিবার

চেষ্টা করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি কমিটি, অনভিপ্রেত ভাবে, শিখদিগকে এবং বিস্তর হিন্দুকে অসন্তুষ্ট করায় কংগ্রেসওয়াল কতকগুলি হিন্দু ও শিখের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হওয়ার ব্যাঘাত জন্মাইয়াছেন। সুতরাং ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসপক্ষের দল পুরু না হইয়া পাতলা হইবার সম্ভাবনা আছে।

এটা গেল লাভলোকসানের কথা। কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠানকে নিজের শক্তি, গৌরব, মর্যাদা ও সম্মান বজায় রাখিতে হইলে, লোকের তাহার প্রতি অনুরাগ অটুট রাখিতে হইলে এবং বাহিরের লোকদিগকে অনুরক্ত ও আকৃষ্ট করিতে হইলে, ক্ষতিলাভ গণনার দ্বারা তাহার চালিত হওয়া অকর্তব্য; কোনও একটি আদর্শ, কোনও একটি উচ্চ নীতি মানিয়া চলা কর্তব্য। কংগ্রেসভুক্ত যাহারা নহে, তাহারাও কংগ্রেসকে এই জন্ত সম্মান করিত, যে, ইহা সাম্প্রদায়িকবিশেষের প্রতিষ্ঠান নহে, সমগ্রভারতীয় জাতির ইহা প্রতিনিধিস্থানীয়; কোন সাম্প্রদায়িকের প্রতি অবিচার ইহা সহ করে না; এবং ইহা গণতান্ত্রিক। কিন্তু কংগ্রেস-কমিটির আলোচ্য নির্দ্বারগা ইহাকে সেই উচ্চ আদর্শ হইতে বিচ্যুত করিয়াছে। ইহা হিন্দুদের অপমান ও তাহাদের প্রতি অবিচার সহ করিতেছে। শুধু তাই নয়, ইংরেজ প্রধান মন্ত্রীর যে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সমগ্রভারতীয় জাতিকে নানা টুকরায় ভাগ করিয়া, জাতীয় একতা আরও বাড়িতে দেওয়া দূরে থাক, তাহা যতটুকু জন্মিয়াছে তাহাও বিনষ্ট করিতে চাহিতেছে, কংগ্রেস-কমিটি তাহার প্রতিবাদ কার্যতঃ না করিয়া কার্যতঃ তাহাকে মানিয়াই লইতেছে। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা যে ধর্মাবলম্বীই হউন, তাঁহাদের নির্বাচন সমুদয় ধর্মের ভোটদাতা সম্মিলিত ভাবে করিবেন, ইহা গণতান্ত্রিকতার এবং শ্রাশ্রমালিজমের একান্ত আবশ্যিক অংশ, অন্ততঃ এইটুকু না থাকিলে কংগ্রেসের নাম যে “ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস,” তাহা বিক্রমে পরিণত হয়—তাহার শ্রাশ্রমালিজম থাকে না।

আগে আগে ডাক্তার আল্লারী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি বড় বড় স্বাভাভিক মুসলমান

সুস্পষ্ট ভাবে মিঃ ম্যাকডোনােল্ডের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের নিন্দা ও দোষোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। এখন কার্যতঃ সবাই সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের দলে ভিড়িয়া গিয়াছেন।

ইংরেজ প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তে প্রথমে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল যে, অবনত শ্রেণীর হিন্দুরা তাহাদের প্রতিনিধি নিজেদের মধ্য হইতে নিজেরা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের হইতে স্বতন্ত্র ভাবে নির্বাচন করিবেন। মহাত্মা গান্ধী হিন্দু সমাজকে এইরূপ দ্বিখণ্ডিত হইতে দিতে অনিচ্ছুক হওয়ার উপবাসের দ্বারা মৃত্যুকে বরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। অবনতশ্রেণীসমূহের অবনতশ্রেণীভুক্ত প্রতিনিধিদিগকে সকল শ্রেণীর হিন্দু ভোটারেরা একত্র নির্বাচন করিবেন, এইরূপ দাবী ব্রিটিশ গবর্নেন্ট স্বীকার করায় তবে তিনি উপবাস ত্যাগ করেন। সেই মহাত্মা গান্ধী কিন্তু সমগ্র ভারতীয় মহাজাতিকে, দ্বিখণ্ডিত নহে, বহুখণ্ডিত করিতেছে যে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত তাহাকে কার্যতঃ অনির্দিষ্ট কালের জন্য মানিয়া লইতেছেন! ইহা ইতিহাসের, অদৃষ্টের, না আর কাহারও পরিহাস?

কংগ্রেসের কার্যানির্বাহক সমিতির প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, যে, প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের কুফল-সমূহ নিবারণের একমাত্র উপায় হইতেছে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সর্বদলসম্মত একটি সমাধানে উপনীত হইবার পন্থা অনুসন্ধান। কথাগুলি শুনিতে ভাল। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী নিজেই তা বলিয়াছিলেন, “তোমরা যদি সকল দলের অসম্মত একটা কোন সিদ্ধান্ত হাজির করিতে পার, তাহা হইলে আমার সিদ্ধান্তের বদলে তাহা গ্রহণ করিব।” প্রধান মন্ত্রী উত্তম রূপেই জানিতেন ও জানেন, যে, সর্বদলসম্মত সিদ্ধান্ত হইতে পারিবে না! কংগ্রেসও জানিয়া রাখুন, সর্বদলসম্মত সমাধানের জন্য অপেক্ষা করিতে হইলে সত্যযুগের পুনরাগমনের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে; কেন-না, এই বোর কলিধুগে দলগুলির মধ্যে অসৈনিক্য জন্মাইবার উপায়-জানা। লোকের এবং উপায়ের অভাব কখনও হইবে না। বর্তমান দলগুলির মধ্যে যদি দৈবাৎ একটা ঘটনাই

যায়, তাহা হইলে গররাজী দলের সৃষ্টি হইতে বা ঘটাইতে কত ক্ষণ?

অতএব, আমাদের সম্মান নিবেদন, কংগ্রেস সকলের মনস্তপ্তির, সংখ্যালঘু প্রধান সম্প্রদায়ের সকলের মনস্তপ্তির, আশা ছাড়িয়া দিয়া, ঠিক স্বাভাবিকতার ও গণতান্ত্রিকতার আদর্শ ধরিয়া চলুন।

“যে থাকে থাক, যে যায় যাক, শুনে চলি তোমারি ডাক।”

আগামী নির্বাচনে স্বাভাবিকদের জয় চাই

কেবলমাত্র কংগ্রেসওয়ালারাই যে ন্যাশনালিষ্ট বা স্বাভাবিক তাহা নহে। কেহ যদি কংগ্রেসভুক্ত না হইয়াও পূর্ণস্বরাজ, অন্ততঃপক্ষে ওয়েষ্টমিনস্টার স্ট্যাটুট অনুযায়ী ডোমীনিয়নস্ব, চান এবং যদি তিনি সরকারী দমননীতি ও দমনার্থ আইনসমূহের, হোয়াইট পেপারের, সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের এবং সাম্প্রদায়িক চাকরী-ভাগের বিরোধী হন, তাহা হইলে তিনিও নিশ্চয়ই ন্যাশনালিষ্ট। কেবল এইরূপ ন্যাশনালিষ্ট-দিগেরই কংগ্রেসের, হিন্দুসভার বা উদারনৈতিক দলের পক্ষ হইতে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্য কোন রকম লোক নির্বাচিত হইলে তাহা দেশের পক্ষে অনিষ্টকর হইবে।

মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান ও শিখ সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতেও এইরূপ ন্যাশনালিষ্টমতাবলম্বী লোকের নির্বাচন বাঞ্ছনীয়।

এংলোইণ্ডিয়ানদের নেতা কর্ণেল গিড্‌নী তাহাদিগকে অস্বস্তি করিয়াছেন ভারতবর্ষকে স্বদেশ ও মাতৃভূমি মনে করিতে, যাহা বাস্তবিকই তাহাদের স্বদেশ। অতএব তাহাদের মধ্য হইতেও পূরা ন্যাশনালিষ্টের আবির্ভাব আশা করা যাইতে পারে।

কবিরাজ-শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি

কবিরাজ-শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গদেশ—শুধু বঙ্গদেশ কেন সমগ্র ভারতবর্ষ—এক জন সংস্কৃত সাহিত্য ও আয়ুর্বেদে সুপণ্ডিত সূচিকিৎসক ও

পরহিতকর্মী ব্যক্তির সেবা হইতে বঞ্চিত হইল। তাঁহার বংশ বাংলা দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, বঙ্গের সীমা অতিক্রম করিয়া ভারতব্যাপী হইয়াছিল। ধনী বা দরিদ্র কেহ চিকিৎসায় জটিল রোগে আক্রান্ত হইলে তাঁহার চিকিৎসায় ফল পাইবেন এই আশা করিতেন।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স সত্তর বৎসর হইয়াছিল। তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি ছিলেন এবং আগামী বৎসরের জন্মও নির্ধারিত হইয়াছিলেন। তিনি কয়েক বার নিখিল ভারতীয় আয়ুর্বেদিক মহাসম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন। বাংলা দেশের ঐরূপ মহাসভারও তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

তিনি স্বকৃতপুরুষ, সামান্য অবস্থা হইতে বিখ্যাত ও সঙ্গতিপন্ন হইয়াছিলেন। অল্প বয়সে কাহারও নিকট উপকার পাইয়া থাকিলে কখনও তাহা বিস্মৃত হইতেন না, পরন্তু বহুগুণ প্রত্যুপকার দ্বারা সেই ধন কৃতজ্ঞচিত্তে পরিশোধ করিতেন। তিনি স্বর্ষ্য হিন্দুধর্মে দৃঢ়বিশ্বাসী এবং অন্য ধর্ম সম্বন্ধে উদার ছিলেন।

আয়ুর্বেদ শিক্ষাদান ও আয়ুর্বেদের প্রচার কল্পে তিনি বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ স্থাপন করেন। ইহা তাঁহার একটি প্রধান কীর্তি। ইহাতে ছাত্রেরা আয়ুর্বেদ শিখিবার এবং রোগীর আয়ুর্বেদ অনুসারে চিকিৎসিত হইবার সুযোগ পাইয়া আসিতেছে। ইহার জন্ম তিনি আপনার সাকুলার রোডে জমী পাইয়াছিলেন। তাহাতে বিদ্যালয় ও হাসপাতাল নিৰ্ম্মাণ করিবার তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয়ের দ্বারা বাচস্পতি মহাশয়ের অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ হইবে বলিয়া সকলে আশা করিবেন। সর্বসাধারণেও এই কার্যে সহযোগিতা করিলে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় হইবে।

পুরুলিয়ার হরিপদ দাঁ

পুরুলিয়ার হরিপদ দাঁ মহাশয় বিখ্যাত লোক ছিলেন না, বিদ্বান ছিলেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন বা উচ্চ কোন উপাধিধারী ছিলেন না, সরকারের ‘জানিত’ লোক ছিলেন না, বিশেষ ধনী ছিলেন না; কিন্তু তিনি খাঁটি জনহিতৈষী দেশহিতৈষী হৃদয়বান বড় নজরের লোক ছিলেন। তাঁহার

মৃত্যুতে পুরুলিয়ার উজ্জ্বল রত্নের, বঙ্গের একটি উজ্জ্বল রত্নের তিরোধান হইয়াছে। পাঁচ বৎসরের কিছু অধিক পূর্বে ১৩৩৬ সালের বৈশাখ মাসে পুরুলিয়ার অবৈতনিক পাঠাগার সম্বলিত হরিপদ সাহিত্যমন্দিরের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে আমি ঐস্থানে গাই ও তথায় উহার প্রতিষ্ঠাতা হরিপদ বাবুর সহিত পরিচিত হই। তখন সেখানকার কাজ শেষ করিয়া আসিয়া আমি ১৩৩৬ সালের আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে লিখিয়াছিলাম—

“পুরুলিয়ার সাহিত্যমন্দিরটির নাম রাখা হইয়াছে শ্রীযুক্ত হরিপদ দাঁ মহাশয়ের নাম অনুসারে। তিনি ইহা নিৰ্ম্মাণের ব্যয় নিৰ্ব্বাহ করিয়াছেন। স্বর্ণ ও রৌপ্য পদকাদির ব্যয়সমেত উৎসবের ব্যয়ও প্রধানতঃ (বা সমস্ত ?) তিনি নিৰ্ব্বাহ করিয়াছিলেন। পুরুলিয়ার থাকিতে অনিয়াছিলাম, উৎসবের কয়েক দিন মঞ্চস্থল হইতে আগত দুই তিন শত লোক তাঁহার বাড়ীতে আহাৰ করিতেন। সাহিত্য-মন্দির ছাড়া পুরুলিয়ায় তাঁহার অল্প কার্দিও আছে। অগচ তাঁহাকে ধনী লোক বলিলে ঠিক বলা হইবে না। তাঁহার পরিচ্ছদ দেখিলে ত সে সন্দেহ হইবেই না।”

হরিপদ বাবুর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় গত করাচী কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়। সেই অনাড়ম্বর মানুষটিকে চিনিতে আমার কোন বিলম্ব হয় নাহ।

তাঁহার সম্বন্ধে অনেক তথ্য বিলম্বে হস্তগত হওয়ায় এবার ছাপিবার স্থান ও সময় পাইলাম না। আগামী মাসে তাহা মুদ্রিত হইবে।

ছোট ছোট শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষক

উপরে হরিপদ সাহিত্য-মন্দিরের উৎসব উপলক্ষ্যে পুরস্কারস্বরূপ প্রদত্ত স্বর্ণ ও রৌপ্যের পদকের উল্লেখ করিয়াছি। বক্তৃতার ও আবৃত্তির জন্ম, চরকায় হতা কাটার জন্ম, ব্যায়াম, লাঠিখেলা ছোরা-খেলা ও জুজুৎসুর জন্ম, এবং বিবাহে পণগ্রহণ প্রথা নিবারণ সম্বন্ধে প্রবন্ধের জন্ম পুরস্কার প্রদত্ত হইয়াছিল। অনেকগুলি পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল। এই সকলের উল্লেখ বাতীত আমি ১৩৩৬ সালের আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে লিখিয়াছিলাম :—

“একটি প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার নূতন রকমের হইয়াছিল। এইরূপ স্থির হয়, যে, যে-সব বালকবালিকা প্রত্যেকে দশ জন বালক-বালিকাকে লিখিতে পড়িতে শিখাইয়া দিবে, তাহাদিগকে একটি করিয়া স্বর্ণপদক দেওয়া হইবে। অনেকগুলি বালক তাহা করিয়া স্বর্ণপদক পাইল। দুটি বালিকা উভয়ে মিলিয়া একত্র চৌদ্দ জনকে শিখাইয়াছিল। তাহারা একটি করিয়া রৌপ্যপদক পাইল। তাহাদিগকেও স্বর্ণপদক দিলে মন্দ হইত না। তাহারা স্বর্ণপদক

পাইরাছিল, তাহাদের মধ্যে একটি ছেলের কৃতিত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহার নাম ভুলিয়া গিয়াছি। ছেলেটি চাষী 'মাহাত' জাতীয়। মাসিক চারি টাকা বৃত্তি পায়, তাহাতে তাহার ও তাহার মাতার জীবিকা-নির্বাহের উপায় হয়। স্কুলে ক্লাসের পরীক্ষায় সে প্রথমস্থানীয়। স্কুল হইতে তাহার বাড়ী চারি মাইল দূরে। প্রত্যহ আট মাইল যাতায়াত করিয়া সে লেখাপড়া শিখে। নিজে সূতা কাটিয়া কাপড় বুনিয়া তাহার ধুতি ও পিরাণ সে পরে। 'গ্রামের জলকষ্ট নিবারণের জন্ত আশ্বনির্ভরশীল লোকদের স্বহস্তে কৃপখনন কর্তব্য,' স্কুলে শিক্ষকের মুখে এই উপদেশ শুনিয়া ছেলেটি স্বয়ং কয়েক হাত কৃষা কাটিয়াছে। উহা আরও কিছু গভীর করিলে জল পাওয়া যাইবে।"

লেখ-পড়া-জানা ছোট ছোট বালকবালিকাদের দ্বারা নিরক্ষর বালকবালিকাদিগকে লিখিতে পড়িতে শিখাইবার চেষ্টা পুর্কলিয়ায় এখনও হইতেছে কিনা, জানি না। কিন্তু এই উপায়ে, এবং অন্ত্র উপায়েও, আমাদের এই নিরক্ষর দেশে সর্বত্র শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা হওয়া আবশ্যিক। ছোট ছোট শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদিগকে যেখানে সম্ভব কোন প্রকার পুরস্কার দেওয়া উচিত, যেখানে টাকা উঠিবে না সেখানে সুন্দর মানপত্র দেওয়া উচিত।

বেগম সাহেবার নথ

পাশ্চাত্য দেশে আমাদের দেশের মহিলাদের কোন কোন অলঙ্কার সম্বন্ধে দেখিতেছি বেশ মজার ধারণা আছে। পায়ের মলকে পাশ্চাত্যেরা ভারতীয় মহিলাদিগকে শৃঙ্খলিত ব্যাধিবার জন্ত বেড়ী মনে করে কিনা, জানি না, কিন্তু নথ সম্বন্ধে বিলাতী ডেলী এক্সপ্রেস কাগজে একটা কৌতুকবহু কথা বাহির হইয়াছে। ঐ কাগজে অধুনা বিলাতপ্রবাসিনী রামপুরের নবাবের বেগম সাহেবা সম্বন্ধে এক সংবাদদাত্রীর লিখিত এই কথাগুলি বাহির হইয়াছে—

She seems to have stepped straight from the fairy-tale print of the Peris with liquid brown eyes like moons, the skin of a rose, and hair more blue than black.

She writes poetry, but may not talk much in front of the Nawab.

"I visit the Maternity Hospital in Rampur," she told me, "and I started the child welfare there. Sometimes the Nawab's Ministers and his elderly intimate friends call on me, but I never appear with him in public. My rooms are in a wing of the palace facing a little garden."

She has stepped out of that garden for the first time without her veil. She has gone all over Europe during the last two months. Seen Berlin, Vienna, Prague, Rome, Paris; been in theatres, restaurants, shops, and aeroplanes, and enjoyed all with such demure unconcern that no one has guessed she only knew shuttered rooms before.

She meekly follows her husband's lead and laughs happily with a diamond set and twinkling in her nose. If she were in Rampur City that diamond would be

replaced by a gold loop, which all married women obediently wear for their husbands to pull them by the nose.

In England the Nawab does not do it because there it is said the S. P. C. A. is much more efficient than in India!

তাৎপর্য। মনে হয় তিনি যেন উপকথার পরীদের চিত্র থেকে সজ সজ সোজা পা বাড়িয়ে বেরিয়ে এসেছেন চলচলে চক্রাকৃতি পিঙ্গল চোখ গোলাপ-পাপড়ির মত কোমল গোলাপী রঙের ডুক এবং কৃষ্ণাভ সুনীল কেশদাম নিয়ে।

তিনি কবিতা লেখেন, কিন্তু নবাবের সম্মুখে তাঁর বেশী কথা কইতে নেই।

তিনি আমাকে বললেন, "আমি রামপুরে প্রসূতি-আগার পরিদর্শন করি, এবং সেখানকার শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানও আমি স্থাপিত করেছি। কখন কখন নবাবের মন্ত্রীরা এবং তাঁহার প্রবীণ অন্তরঙ্গ বন্ধুরা আমার সঙ্গে দেখা করেন, কিন্তু আমি তাঁর সঙ্গে প্রকাশ্যে কখনও বেরোই না। আমার কক্ষগুলি প্রাসাদের একটি পার্শ্ব একটি ছোট বাগানের সামনে।"

তিনি বিনা অবগুণ্ঠনে এই প্রথম সেই বাগান থেকে বের হয়েছেন। গত দু-মাসে তিনি ইউরোপের সর্বত্র বেড়িয়েছেন। বার্লিন, ভিয়েনা, প্রাগ, রোম, প্যারিস দেখেছেন, থিয়েটারে রোস্টারাত দোকানে গেছেন, এরোপ্লেনে চড়েছেন; এবং সবই এমন গম্ভীর অব্যগ্রতার সঙ্গে উপভোগ করেছেন, যে, কেউ ভাবতেও পারে না, যে, তিনি এর আগে কেবল খড়খড়ি ঝিলমিলি লাগান কামরার মধ্যে পরিচিত ছিলেন।

তিনি বিনম্র ভাবে তাঁর স্বামীর পিছনে পিছনে চলেন এবং আনন্দে হাস্য করেন—নাকে বসানো হীরকখণ্ড ঝিক্‌ঝিক্‌ করতে থাকে। [এটি বোধ হয় বেগম সাহেবের হীরার নাকছাবির উল্লেখ। প্রবাসীর সম্পাদক।] তিনি যদি রামপুর শহরে থাকতেন, তা হলে ঐ হীরটির পরিবর্তে একটি সোনার "লুপ" [অর্থাৎ নথ] পরাতেন—যা সব বিবাহিতা মহিলারা বশতীর সহিত পরেন, তাঁদের স্বামীদের তাঁদের নাক ধরে টান দেবার সুবিধার জন্তে।

ইংলণ্ডে নবাব এরকম টান দেন না, কেন না, লোকে বলে, ইংলণ্ডে পশুক্লেশনিবারিণী সভা ভারতবর্ষের চেয়ে বেশী কার্যক্ষম!

বিলাতী ডেলী এক্সপ্রেসের সংবাদদাত্রী বেগম সাহেবার যেরূপ বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে, শুধু রূপসী নহে, বেশ গুণশালিনী ও বুদ্ধিমতী বলিয়াই মনে হয়। এরূপ মহিলার নাকের নথ ধরিয়া টান দিবার দরকার নবাব সাহেবের হইতেও পারে, ইহা সংবাদদাত্রীর উৎকট কল্পনা বটে!

ফিরিঙ্গীদের ও মুসলমানদের চাকরীর বখরা

আমরা এবারকার বিবিধ প্রসঙ্গের গোড়াতে বলিয়াছি, যত দিন যাইবে এবং ভারতীয়দের রাষ্ট্রনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বারাজ্যলাভের ইচ্ছা ও তাহার উপায়স্বরূপ জাতীয় একতা সাধনের চেষ্টা বাড়িবে,

অনেকা জন্মাইবার ও বাড়াইবার উপায় তত বাড়িতে থাকিবে। সদ্য সদ্য তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সরকার সংখ্যালঘু কতকগুলি সম্প্রদায়কে সরকারী চাকরীর শতকরা মোটামুটি ৪২.৬টি দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, মুসলমানদিগকে ২৫, ফিরিঙ্গীদিগকে ৯ (রেল, ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ প্রভৃতি বিভাগে) এবং ভারতীয় অন্তঃস্থ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহকে ৮.৬। ইহা মোটামুটি হিসাব; আরও যে-সব জটিল দুর্কোথা ভাগবাটোআরা আছে তাহা লিখিলাম না। তাহারা যে কেবল এই শতকরা ৪২.৬ সংখ্যক চাকরীই পাইবে তাহা নহে। যদি প্রকাশ্য প্রতিযোগিতাতে তাহারা কতকগুলি চাকরী পায়, তাহা হইলেও তাহার উপর বরাদ্দ অনুযায়ী ঐ শতকরা ৪২.৬টি পাইবে অর্থাৎ মোটের উপর ৪২.৬এর অনেক বেশী পাইবে। সমগ্রভারতে হিন্দুরা সংখ্যায় গরিষ্ঠ। তাহারা যে ১০০—৪২.৬ অর্থাৎ ৫৭.৬ নিশ্চয়ই পাইবে, তাহা নয়, যদিও তাহা পাইলেও তাহাদের উপর অবিচার হয়; কারণ তাহারা সংখ্যায় শতকরা ৬০ এরও বেশী। সংখ্যালঘুরা নিশ্চয়ই যাহা পাইবে তাহার সংখ্যা নিশ্চিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা বাদে তাহারা প্রতিযোগিতা দ্বারা বাকী সমস্ত চাকরীগুলি পাইতে পারিবে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু নূনকল্পে নিশ্চয়ই কতকগুলি চাকরী পাইবে, একটুকু পাইবে কিনা, তাহার উল্লেখ মাত্র নাই। খ্রীষ্টিয়ান, শিখ, আদিম নিবাসী প্রভৃতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত বা তাহাদের স্বতন্ত্র উল্লেখ নাই।

আমরা এইরূপ ধরিয়া লইয়া উপরের একটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি, যে, যে-সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা যত, চাকরীর শতকরা তত অংশ তাহাদের পাওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবিক এরূপ নিয়ম বা ব্যবস্থা অসম্ভব ও অসঙ্গত, এবং পৃথিবীর কোন দেশে এরূপ নিয়ম ও ব্যবস্থা নাই। যোগ্যতম ব্যক্তির ধর্মজাতিবর্ণনির্বিশেষে চাকরী পাইবে, ইহাই সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত নিয়ম। কিন্তু যদি মানিয়া লওয়া যায়, যে, চাকরীর ভাগ সম্প্রদায় অনুসারে হওয়া উচিত, তাহা হইলে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাহাদের সংখ্যা অনুসারে

উহা হওয়া উচিত? ভারতবর্ষে অধিকাংশ স্থলে পুরুষেরাই সরকারী চাকরী করে, এবং যাহারা লিখনপঠনক্ষম তাহারা, পাহারাওয়ালাগিরির মত দু-একটা চাকরী ছাড়া, অন্য সব চাকরী করে। সুতরাং যে-সব চাকরী (অর্থাৎ অধিকাংশ চাকরী) লিখনপঠনক্ষমেরা করে, তাহার সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোআরা হওয়া উচিত প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লিখনপঠনক্ষমের সংখ্যা অনুসারে। আবার, অনেক চাকরীতেই ইংরেজী জানা দরকার। সুতরাং সেগুলির ভাগবাটোআরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ইংরেজী-জানা লোকদের সংখ্যা অনুসারে হওয়া চাই। আরও একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। প্রাপ্তবয়স্ক লোকদিগকে অর্থাৎ সাবেকদিগকেই চাকরী দেওয়া হয়। সুতরাং চাকরীর সাম্প্রদায়িক ভাগ করিতে হইলে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সাবেক লিখনপঠনক্ষম ও ইংরেজী-জানা লোকদের সংখ্যা-অনুসারে তাহা করা চাই।

এরূপ করিলে দেখা যাইবে, যে, মুসলমানরা শতকরা ২৫, ফিরিঙ্গীর রেল প্রভৃতি বিভাগে শতকরা ৯ এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুরা শতকরা ৮.৬ পায় না।

কিন্তু যদি আবালবৃদ্ধবনিতা নিরক্ষর ও লিখনপঠনক্ষম সকলেরই মোট সংখ্যা অনুসারে চাকরী ভাগ হয়, তাহা হইলেও সরকারী বরাদ্দ ঠিক নহে। কারণ, মুসলমানরা মোট অধিবাসীর সংখ্যার দিকি নয়, অন্তঃস্থ সংখ্যালঘুরা শতকরা ৮.৬ নয়, এবং ফিরিঙ্গীর শতকরা ৯ নহে। ব্রিটিশ-ভারতের মোট লোকসংখ্যা ২৭,১৫,২৬,৯৩৮। ফিরিঙ্গীর যদি ইহার শতকরা এক জন হইত, তাহা হইলে তাহাদের সংখ্যা হইত ২৭,১৫,২৬৯। কিন্তু তাহারা দুই লক্ষও নহে। অথচ তাহারা পাইবে শতকরা ৯টি চাকরী—তা সে যে-যে বিভাগেই হউক!

ফিরিঙ্গীদের নীচেই মুসলমানদিগকে বিশেষ কৃপা করা হইয়াছে। কারণ, তাহারা অবাধ প্রতিযোগিতায় যত চাকরী দখল করিতে পারে, তাহা পাইবে, তাহার উপর শতকরা ২৫টা পাইবে, এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের জন্য বরাদ্দ চাকরীগুলির মধ্যে যতগুলির জন্য ঐ সংখ্যালঘুদের মধ্য হইতে নূনতম যোগ্যতা (minimum qualification)-বিশিষ্ট লোক পাওয়া যাইবে না,

সেগুলোতেও মুসলমান নিযুক্ত হইবে—অমুসলমান নহে। অর্থাৎ যখনই কর্তাদের মুসলমানদিগকে শতকরা ২৫টার বেশী চাকরী দিবার ইচ্ছা হইবে—এবং তাহা প্রায়ই হইবে—তখনই তাঁহারা বলিবেন, “অল্প সংখ্যালঘুদের মধ্যে যোগ্য লোক পাওয়া গেল না।” ফলে মুসলমানের সাধারণতঃ শতকরা ২৫এর অধিক চাকরী সরকারী অঙ্গুগ্রহে পাইবে। কোন কোন চাকরীর জন্য ন্যূনতম যোগ্যতাবিশিষ্ট মুসলমানও না পাওয়া গেলে কে তাহাতে নিযুক্ত হইবে, তাহা কোথাও লেখা নাই!

এই নবীনতম সরকারী ক্ষতোহাতে হিন্দুদের মধোকর অবনত শ্রেণীর লোকদের উল্লেখ অবশ্যই আছে। কিন্তু তাহাদের জন্য চাকরীর শতকরা কোন একটা অংশ—এমন কি শতকরা আধখানাও—নির্দিষ্ট করা হয় নাই! বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যোগ্য লোক বাহাতে চাকরী হইতে বঞ্চিত না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা হইবে! তাহাদের স্বয়ংনিযুক্ত নেতা ডাঃ আশ্বেদকর মুসলমানদের সঙ্গে মিলিয়া অল্প হিন্দুদের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদিগের চুক্তিতে (minorities pact)এ যোগ দিয়াছিলেন। তাহার আক্কেলসলাসি পাইলেন!

“পেটে খেলে পিঠে সয়”

যোগ্যতার জোরে কিছু না পাইয়া অপরের অঙ্গুগ্রহ-বশাৎ কিছু পাইলে মানুষ আত্মপ্রসাদের পরিবর্তে ভিতরে ভিতরে অপমান অনুভব করে। এ-ক্ষেত্রেও তাহা ঘটাই উচিত। কিন্তু “পেটে খেলে পিঠে সয়।”

চাকরী বাঁটোআরার কারণ

অনেকে ভাবিতেছেন, চাকরী বাঁটোআরাটা কেন করা হইল? এই ‘কেন’র উত্তর দেওয়া কঠিন; বেহেতু, কারণ যিনি বাহা বলিবেন সবই আনুমানিক। একটা কারণের আভাস আমরা আগেই দিয়াছি—জাতীয় একতাবৃদ্ধির উপায় অন্বেষণ আমরা যত করিব, তাহার ব্যাঘাত উদ্ভবও সেই পরিমাণে হইবে। আর একটা কারণ এই হইতে পারে, যে, জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটি হয়ত হোয়াইট পেপারটার যে-সব পরিবর্তন করিয়াছেন, তাহাতে জিনিষটা ভারতীয়দের

গ্রহণের অধিকতর অযোগ্য হইয়াছে। এই কারণে, অন্ততঃ কতকগুলি ভারতীয়কে ও ফিরিঙ্গীদিগকে হাতে রাখিবার জন্য তাহাদের প্রতি সরকার বিশেষ অঙ্গুগ্রহ দেখাইতেছেন। তৃতীয় আর একটা কারণ থাকিতে পারে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সোজামুজি অগ্রাহ্য না-করায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এইরূপ ধারণা হইয়া থাকিতে পারে, যে, কংগ্রেস মুসলমানদিগকে হাত করিবার চেষ্টা করিতেছে। সেই কারণে ব্রিটিশ পক্ষ হয়ত এইরূপ অনুভব করিতেছেন, যে, মুসলমানদিগকে ইংরেজের অনুকূল রাখিবার জন্য আরও কিছু অঙ্গুগ্রহ দেখান দরকার। অবশ্য, কংগ্রেস পক্ষ যেমন প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত প্রায় হজম করিয়াছেন, চাকরীবিধয়ক সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তও যদি সেইরূপ হজম করিতে পারেন, তাহা হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদিগকে আরও নূতন কিছু ফন্দী উদ্ভাবন করিতে হইবে।

অবশ্য, এমনও হইতে পারে, যে, চাকরী বাঁটোআরাটা প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের একটা অঙ্গরূপ আগে হইতেই ঠিক ছিল, এবং তাহার আরও কোন কোন অঙ্গ হয়ত আছে; “ক্রমশঃ প্রকাশ্য” হিসাবে ক্রমে ক্রমে এক একটির আবির্ভাব হইতেছে।

চাকরী-বাঁটোআরার ওজুহাত

গবর্নেন্ট বলিতেছেন, সরকারী চাকরীসমূহে সাম্প্রদায়িক অসাম্য দূর করিবার জন্য এই বাঁটোআরা করা হইয়াছে। ভাল কথা। তাহা হইলে সামরিক সব বিভাগের চাকরী-গুলোতেও অসাম্য দূর করুন না? যে-যে প্রদেশের, যে-যে ধর্মের, যে-যে জাতির লোকেরা সৈন্তদলে প্রায় নাই, তাহাদিগকে তাহাদের লোকসংখ্যা অনুসারে তাহাতে চাকরী দেওয়া হউক। তাহা হইলে বুঝা যাইবে, নিছক শ্রায়নিষ্ঠার দ্বারা চালিত হইয়া সরকার আলোচ্য চাকরী-বাঁটোআরা করিয়াছেন।

সৈনিক-বিভাগে সকল প্রদেশের সকল ধর্মসম্প্রদায়ের সকল জাতির সকল শ্রেণীর লোকদের মধ্য হইতে লোক লইবার কথা উঠিলেই সরকারপক্ষের লোকেরা বলে ও বলিবে,

সবাই ওরকম কাজের যোগ্য নহে, সেই জন্ত সকলের মধ্য হইতে লোক লওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু অল্প কোন দেশেই এক-একটা ভূখণ্ড, এক একটা ধর্মসম্প্রদায়, এক-একটা জাতি, এক-একটা শ্রেণীকে সৈনিক হইবার যোগ্য বা অযোগ্য বলা হয় না, ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক মানুষের যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার হয়। ভারতেও অসামরিক বলিয়া অভিহিত প্রত্যেক প্রদেশ, সম্প্রদায় ও জাতির মধ্যে যুদ্ধক্ষম লোক আছে। যাহা হউক, এ-বিষয়ের আলোচনা এখন করিতে চাই না। এখন জিজ্ঞাসা করি, অসামরিক যত রকম কাজ ও চাকরী আছে, কেরাণী হিসাবরক্ষক শিক্ষক অধ্যাপক বিচারক প্রভৃতি যত রকমের অ-সামরিক চাকরী আছে, তাহাদের কাজ করিবার যোগ্যতা সকল শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের সকল লোকেরই কি আছে, সকলেরই কি সমভাবে আছে? মানিয়া লইলাম, যে, সৈন্তদলে যোগ্যতম লোকদিগকেই লওয়া হয়। তাহা হইলে অসামরিক কাজেও যোগ্যতমদিগকেই কেন লওয়া হইবে না?

চাকরী-বাঁটোআরা ও মহারাণীর ঘোষণাপত্র

আমরা শ্রায় ও যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া সব বিষয়ের আলোচনা করিতে চেষ্টা করি। শাসকদিগের মধ্যে কে কবে কি কথা দিয়াছেন, তাহা যখন তাঁহারা ই মানিয়া চলেন না, তখন তাহার দোহাই দি না, দিতে চাই না। তবে যে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রের কথা এখানে তুলিতেছি, তাহার কারণ দুটি—ঐ ঘোষণাপত্রের ভিত্তিগত নীতি শ্রায়সঙ্গত এবং রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক, এবং রাজপুরুষেরা তাঁহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্ত আবশ্যক হইলে মহারাণীর ঘোষণাপত্রের দোহাই দিয়া থাকেন।

ধর্ম জাতি বা বর্ণের জন্ত কেহ অনুগ্রহীত বা নিগ্রহীত হইবে না, এই নিয়ম রাষ্ট্রে সমস্তোষ শান্তি ও স্থায়িত্বের অনুকূল। এই জন্ত মহারাণীর এই নিয়ম ঘোষণা ঠিক হইয়াছিল। এই নিয়ম পালিত না হওয়ায় অশান্তি অসন্তোষ ও বিদ্রোহ হইয়াছে। অতঃপর নিয়মভঙ্গ আরও বেশী করিয়া হইতে যাইতেছে—ফল ভবিষ্যতের গর্ভে।

কর্তারা নিজেদের মংলব সিদ্ধির জন্ত যে মহারাণীর ঘোষণাপত্রের দোহাই দেন, তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী পরিবর্তিত করিয়া নূতন শাসনবিধি (constitution) রচনা করিবার জন্ত কয়েক বৎসর ধরিয়া কর্তৃপক্ষ আলোচনা করিতেছেন। আলোচনার শেষ ফল হোয়াইট পেপার বা স্বেতপত্র। তাহাও আবার জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটি আলোচনা করিতেছেন। ভারতবর্ষে ইংরেজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে ইংরেজরা শুধু চাকরীতে নয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, জাহাজ-চালান, প্রভৃতি নানা বিষয়ে অতিরিক্ত বিশেষ সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছে। কোন স্বশাসিত দেশে কোন বিদেশীরা একরূপ অতিরিক্ত সুবিধা পায় না, এমন কি দেশীদের সমান সুবিধাও পায় না। ভারতীয়দের দাবী এই, যে, ভারতবর্ষকে স্বশাসক করিতে হইবে এবং স্বশাসিত ভারতে ইংরেজ বা অন্য কোন বিদেশীরা সব বিষয়ে ভারতীয়দের সমান বা তাহাদের চেয়ে বেশী সুবিধা পাইবে না। ভারতসচিব শ্রয় সামুয়েল হোর প্রমুখ ইংরেজরা কিন্তু মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রের দোহাই দিয়া বলিয়াছেন, যে, ভারতে সব ব্রিটিশ প্রজা সমান অধিকার ভোগ করিবে, অর্থাৎ শুধু গ্রেট ব্রিটেনের ইংরেজ স্বেচ আইরিশ নহে, কানাডা দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতির যে স্বেত উপনিবেশিকেরা ভারতীয়দিগকে নানা প্রকারে অপমান করে ও নানা অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখে, তাহারাও ভারতবর্ষে ভারতীয়দের সমান সুবিধা ভোগ করিবে। সমানের মানে অবশ্য এখন এদেশে স্বেতরা যে-সব অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করে তাহাই! মহারাণীর ঘোষণার বৎসর ১৮৫৮ সালে কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভুক্ত ছিল না! স্বেত বিদেশীদের সুবিধার জন্ত মহারাণীর ঘোষণাপত্রের প্রতি শ্রয় সামুয়েল হোর প্রভৃতির এইরূপ অচলা ভক্তি। হিন্দুদের বেলায় কিন্তু উহার প্রতি অশ্রদ্ধা। যদি ১০০টা চাকরী খালি থাকে এবং তাহার জন্ত (কম করিয়া বলিতেছি) ৪০০ খুব যোগ্য হিন্দু প্রার্থী থাকে, তাহাদের মধ্যে খুব বেশী হইলে ৫৭ জন হিন্দু কাজ পাইবে, ৩৪৩ জন খুব যোগ্য হিন্দু কাজ

পাইবে না, কিন্তু এই যোগ্য ৩৪৩ জন হিন্দুকে ডিঙাইয়া কম যোগ্য অথবা নূনতম যোগ্যতাবিশিষ্ট বা অযোগ্য ২৫ জন মুসলমান চাকরী পাইতে পারিবে।

ইংরেজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে যোগ্যতর ভারতীয়দিগকে ডিঙাইয়া অযোগ্যতর ইংরেজ ফিরঙ্গী কাজ পাইয়া আসিতেছিল। এই অবিচার প্রধানতঃ উচ্চ ও মাঝারি রকমের চাকরী সম্বন্ধে হইয়া আসিতেছিল। এখন হইতে খুব কম বেতনের কাজেও যোগ্যতর অমুসলমানকে বঞ্চিত করিয়া অনেক স্থলে অযোগ্যতর মুসলমানকে চাকরী দেওয়া হইবে। সুতরাং অসন্তোষ ও অশান্তির ক্ষেত্র খুব বিস্তৃত হইতে চলিল। প্রতিযোগিতাতে যোগ্যতা দেখাইয়া যে-সব মুসলমান চাকরী পাইয়াছেন, পাইয়া আসিতেছেন ও ভবিষ্যতে পাইবেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে উক্ত মন্তব্য করা হইতেছে না। যোগ্যতর বলে মুসলমানরা বা অন্ত সংখ্যালঘুরা যত বেশী চাকরীই পান না কেন তাহা অন্তায় হইবে না, অসন্তোষের কারণও হইবে না। অসন্তোষের কারণ এই, যে, অনেক স্থলে যোগ্যতর ব্যক্তি মুসলমান নহে বলিয়াই কাজ পাইবে না এবং অযোগ্যতর ব্যক্তি মুসলমান বলিয়াই কাজ পাইবে।

চাকরী-বাঁটোআরার হেতুবাদ

চাকরী-বাঁটোআরার হেতুবাদটিতে (preamble) গবর্নেন্ট বলিতেছেন, যে, তাঁহার সরকারী চাকরীসমূহে সাম্প্রদায়িক অসাম্য দূর করিবার জন্ত ১৯২৫ সাল হইতে শতকরা কতকগুলি চাকরী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়-সমূহের জন্ত রাখিয়া তাহাতে একাধিক তাহাদের মধ্য হইতে লোকনিয়োগের নীতি অনুসরণ করিতেছিলেন। ইহার ফলাফল তাঁহার সম্প্রতি সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিয়াছেন। গবর্নেন্টের নিকট ইহা নিবেদিত হইয়াছে (“It has been represented”), যে, যদিও এই নীতি প্রধানতঃ মুসলমানদিগকে বেশী চাকরী দিবার জন্ত অবলম্বিত হইয়াছিল (“adopted mainly with the object of securing increased representation for the Muslims in the public services,” ইহার দ্বারা চাকরীগুলির যথাযোগ্য ভাগ তাহারা পায় নাই। সেইজন্য

গবর্নেন্ট শতকরা একটা নির্দিষ্ট অংশ মুসলমানদের জন্ত বরাদ্দ করিতেছেন। সুতরাং সব সংখ্যালঘু ভারতীয় সম্প্রদায়ের জন্ত সরকার ততটা মাথা ঘামান নাই যতটা মুসলমানদের জন্ত। ফিরঙ্গী ও ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা বংশতঃ কতকটা বা সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ ইউরোপীয়দের জন্তও অবশ্য সরকারী মাথা খুব ব্যথিত হইয়াছে। সে-বিষয়ে পরে আরও কিছু বলিব।

গবর্নেন্ট বলিতেছেন, ১৯২৫ সাল হইতে যে নীতি অনুসৃত হইতেছে তাহার ফলে মুসলমানরা চাকরী-গুলার যথাযোগ্য অংশ পায় নাই? ভারত-গবর্নেন্ট নয় বৎসর ধরিয়া ব্রিটিশ ভারতের ৬৭ নিযুক্ত মুসলমানকে ভুলিয়া ছিলেন, এমন নয়; নূনতমযোগ্যতাবিশিষ্ট মুসলমানও যথেষ্টসংখ্যক পান নাই বলিয়াই তাঁহার তাঁহাদের শ্রমবুদ্ধি অনুযায়ী যথাযোগ্য অংশ মুসলমান-দিগকে দিতে পারেন নাই। আমরা মডার্ন রিভিউ ও প্রবাসীতে আগে আগে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সরকারী কার্যবিবরণ এবং অন্ত সরকারী রিপোর্ট হইতে আবশ্যিক অংশ উদ্ধৃত করিয়া ইহা প্রমাণ করিয়াছি বলিয়া আর সে-সব কথা পুনরুক্তি করিলাম না। দরকার হইলেই করিতে পারিব।

ফিরঙ্গী ও স্থায়ী বাসিন্দা ইউরোপীয়দের জন্ত চাকরীর বন্ধ্যা

রেল ডাক প্রভৃতি বিভাগে ফিরঙ্গী এবং ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা (domiciled) ইউরোপীয়দের জন্ত শতকরা কতকগুলি চাকরী বরাদ্দ করিবার কারণ সরকার এই বলেন, যে, এই দুই সম্প্রদায় বহু বৎসর হইতে এই সব বিভাগের চাকরীর উপর নির্ভর করিয়া আসিতেছে; এই জন্ত এমন কিছু করা উচিত নয় যাহাতে উহাদের সমাজের অর্থনৈতিক গড়নে প্রবল ধাক্কা লাগে বা ভাঙচুর ঘটে (“which might occasion a violent dislocation of the economic structure of the community”)। ইহা গেল ঐ দুই সম্প্রদায়ের পক্ষে ওকালতী। অন্তদিকে ইহা বক্তব্য, যে, বরাবরই সমান যোগ্য বা যোগ্যতর খাঁটি ভারতীয়দের দাবী উপেক্ষা

করিয়া ইঙ্গ-ভারতীয়দিগকে চাকরী দেওরাতেই রেল প্রভৃতি বিভাগে তাহাদের এত বাহুল্য ঘটিয়াছে। সরকারী যে অবিচারে তাহা ঘটিয়াছে সরকার সেই অবিচারের ফলকেই হেতু করিয়া অবিচারটা স্থায়ী করিতে চাহিতেছেন!

সরকারী ওকালতীর ঠিক সমতুল্য একটা যুক্তি আমরা দেখাইতেছি। সরকারী অধিকাংশ বিভাগে হিন্দু ভদ্রলোকরা অধিকাংশ চাকরী করিয়া আসিতেছে। এমন বিস্তর হিন্দু পরিবার আছে যাহারা পুরুষাত্মকমে সরকারীচাকরীজীবী। অযোগ্যতার জন্য তাহাদের বংশধরেরা যদি চাকরী না পায়, তাহাতে দুঃখ নাই— তাহা ত হওয়াই উচিত। কিন্তু যোগ্যতা থাকিতেও তাহারা হিন্দু বলিয়াই শতকরা প্রায় অর্ধেক চাকরী হইতে নিশ্চিত বঞ্চিত হইবে, ইহাতে কি “ভায়োলেন্ট ডিসমোকেশান্ অব দি ইকনমিক্ ষ্ট্রাকচার অব দি কমুনিটি” অর্থাৎ তাহাদের সমাজের অর্থনৈতিক প্রচণ্ড ভাঙচুর ঘটিবে না?

চাকরীর সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরায় সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষতি

কতকগুলি চাকরী বিশেষ কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের বা বংশের লোককে দিতেই হইবে, এরকম ব্যবস্থায় যোগ্যতরের পরিবর্তে অযোগ্যতার অনেক লোকের কাজ পাওয়া অনিবার্য, ইহা অতি সহজবোধ্য। ইহাতে যে দেশে অসন্তোষ অশান্তি বাড়িবে, জাতীয় একতা বিনষ্ট হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য, কিন্তু অল্প গুরুতর ক্ষতিও আছে।

যোগ্যতম লোকদের কাজ পাইবার দাবী সর্বাগ্রে বিবেচিত ও গ্রাহ্য হইবে, এইরূপ নিয়ম অনুসৃত হইলে দেশের সকল সম্প্রদায় ও শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বিদ্যার চর্চা বাড়ে, নানাবিধ নৈপুণ্য লাভ করিবার চেষ্টা বাড়ে, দৈহিক ও মানসিক শক্তি বাড়াইবার প্রয়াস বৃদ্ধি পায়। তাহাতে সমগ্র জাতি (nation) উপকৃত হয়। ইহার বিপরীত নীতি অনুসৃত হইলে উক্ত উপকার ত হয়ই না, নানাদিকে ঔদাসীন্য আলস্য আদি দোষ বাড়িতে থাকে।

রাষ্ট্রের ক্ষতিও খুব হয়। সম্প্রদায় ও বংশ অনুসারে অনুগ্রহের রীতির অবশুস্ভাবী ফলে অনেক অযোগ্য লোক রাজকার্যে নিযুক্ত হইলে রাষ্ট্রের কোন বিভাগেরই কাজ ভাল করিয়া চলিবে না। তাহাতে বিশৃঙ্খলা, অপরাধ-বৃদ্ধি, রোগবৃদ্ধি, কৃষি শিল্পবাণিজ্যের ক্ষতি এবং রাজস্বহ্রাস ঘটিবে।

অনুগ্রহীত সম্প্রদায়ের ক্ষতিলাভ

সামরিক সব চাকরী ছাড়িয়া দিয়া (কারণ সরকারী বাঁটোআরা অসামরিক চাকরী সম্পর্কেই হইয়াছে) ব্রিটিশ-ভারতে পুলিশের কাজ করে ২২৪৯৯৬ জন এবং অন্ত সরকারী চাকরী (“service of the State”) করে ৩৫২৫৬৩ জন—মোট ৫৭৭৫৫৯ জন সরকারী চাকরী করে। সরকারী চাকরীর যে বাঁটোআরা বাহির হইয়াছে, তাহা ভারত-গবন্মেণ্টের অধীনস্থ চাকরীসমূহ মধ্যদে, প্রাদেশিক গবন্মেণ্ট সমূহের অধীনস্থ চাকরী-সমূহ মধ্যদে নহে। আমরা উপরে যে সংখ্যা দিলাম, তাহা ভারত ও প্রাদেশিক গবন্মেণ্ট-সমূহের সব চাকরীর সমষ্টি। শুধু ভারত-গবন্মেণ্টের হস্তস্থিত চাকরী-সকলের আলাদা সংখ্যা পাই নাই। ভারত-গবন্মেণ্ট যেরূপ নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন, প্রাদেশিক সব গবন্মেণ্টও নিশ্চয়ই অচিরে সেই রূপ কিছু করিবেন। সুতরাং আমরা সেঙ্গস রিপোর্ট হইতে উপরে যে সংখ্যা দিয়াছি, তাহাকে ভিত্তি করিয়াই কিছু আলোচনা করি।

৫৭৭৫৫৯টি চাকরীর সিকি মুসলমানেরা পাইলে ১৪৪৩৮৯টি চাকরী তাহারা সমুদয় ব্রিটিশ-ভারতে পাইবেন। সেঙ্গস রিপোর্টে পুলিশের লোকদের পরিবারের গড় বৃহৎ ৩.৭ জন এবং অন্ত চাকরীদের ৩.৯ জন দেওয়া হইয়াছে, গড় ৩.৮। প্রত্যেক মুসলমান সরকারী চাকরীর পরিবারে, চাকরীকেও ধরিয়া, ৪+১=৫ জন গানুষ আছে ধরা যাউক। তাহা হইলে ১৪৪৩৮৯টি চাকরীতে আবালবৃদ্ধবনিতা ৭২১৯৪৫ জন মুসলমান সাক্ষাৎভাবে প্রতিপালিত ও লাভ-বান্ হইবে। ব্রিটিশ-ভারতে মোট মুসলমান লোকসংখ্যা ৬,৭০,২০,৪৪৩। ইহা হইতে ৯৭,২১,৯৪৫ জন বাদ দিলে যে ৬,৬২,৯৮,৪৯৮ মুসলমান বাকী থাকে, তাহারা গবন্মেণ্টের

নূতন চাকরী-বাঁটোআরা হইতে সাক্ষাৎ ভাবে লাভবান হইবে না। কিন্তু সরকারী কার্যে সানুগ্রহমিয়োগনীতি প্রবর্তিত হওয়ার রাষ্ট্রের শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি শিল্পবাণিজ্য বিচার শাসন রেল ডাক টেলিগ্রাফ আদি সব বিভাগের কাজ যে নিকৃষ্টভাবে পরিচালিত হইবে এবং সমাজে দৈহিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টায় যে ভাঁটা পড়িবে, তাহার দরুন ঐ মুসলমান ভারতীয়দেরই মত অকল্যাণ ও ক্ষতির ভাগী ঐ প্রায় সাত কোটি মুসলমানও হইবে।

বলিয়াছি, যে, অধিকাংশ মুসলমান সাক্ষাৎভাবে গবর্নেন্টের চাকরী-বাঁটোআরা দ্বারা লাভবান হইবে না। পরোক্ষভাবে লাভবান হইবে কি? বাংলা দেশের অভিজ্ঞতা অন্ত সব প্রদেশে খাটে কিনা জানি না। কিন্তু অন্ততঃ বাংলা দেশে দেখিতেছি, লোকসংখ্যা ও সম্পত্তির তুলনায় বঙ্গের মুসলমানের, সকল সম্প্রদায়ের জন্ত দূরে থাক, নিজ সম্প্রদায়ের জন্তও বিদ্যালয় কলেজ খুব কম স্থাপন করিয়াছেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে খুব সামান্য বৃত্তি পুরস্কার পদক দিয়াছেন, অত্রবিধ কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা কার্য সম্পাদন খুব সামান্যই করিয়াছেন এবং ছুর্ভিক্ষজলপ্লাবনাদিতে বিপন্ন মুসলমানদেরও সাহায্যার্থ অর্থ, শক্তি ও সময় সামান্যই দিয়াছেন। সুতরাং ইহা বলিলে অত্যন্ত হইবে না, যে, গবর্নেন্টের এই নূতন বাঁটোআরা অন্ত সব সম্প্রদায়ের মত বিরাট মুসলমান সমাজেরও প্রভূত অকল্যাণ ও ক্ষতিই করিবে। উহার দ্বারা বিশাল মুসলমান সমষ্টির তুলনায় অল্পসংখ্যক মুসলমানেরই আর্থিক সুবিধা হইবে। তাহারা ও তাহাদের সমশ্রণীস্থ চাকরীর উমেদার ও মসীজীবী হইতে অভিলাষী মুসলমানেরা মুখর হইয়া বাঁটোআরাটার প্রশংসা করিতেছে। কিন্তু বিরাট মুসলমান জনগণ যদি ব্যাপারটা ঠিক বুদ্ধিতে পারিত এবং যদি তাহাদের প্রকৃত প্রতিনিধিসভা ও ধবরের কাগজ থাকিত, তাহা হইলে তাহারা আনন্দিত হইত না, বরং জাতীয় একতা ও স্বরাজস্বত্বের পথে এই নূতন কণ্টক রোপিত হওয়ায় তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া ইহার প্রতিবাদই করিত।

মুসলমানদের মধ্যেই প্রতিযোগিতা চাই

শতকরা ২৫টি চাকরী মুসলমানদিগকে দিবার জন্ত যদি

গবর্নেন্ট মুসলমানদেরই মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা সেগুলি যোগ্যতম মুসলমানদিগকে দেন, তাহা হইলে মনের ভাল হইবে, কেবলমাত্র “জোছকুম”-গিরিতে যোগ্যতম মুসলমানেরাই তাহা পাইবে না।

চাকরী-বাঁটোআরা ও স্বাভাবিকদের কর্তব্য

যাহারা আগে হইতেই নিজেদের আদর্শ অনুসারে সরকারী চাকরী হইতে নিবৃত্ত আছেন বা থাকিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহাদিগকে এখন নূতন করিয়া কিছু বলিবার নাই। কিন্তু যাহাদের আদর্শ সরকারী চাকরী করার বিষয়ীত নহে, চাকরী-বাঁটোআরার দরুন তাহাদের সরকারী চাকরীতে প্রতি বিমুখ হইবার কোন কারণ নাই, গবর্নেন্ট যাহাদিগকে অনুগ্রহ করিতেছেন তাহাদের প্রতি ঈর্ষ্যা বা অসন্তোষ পোষণ করিবারও কোন কারণ নাই।

সরকারী চাকরীর দুটা দিক আছে। এক উর্জ্জন-দ্বিতীয় দেশের হিত; কারণ আদর্শ অনুসারে কাজ করিতে পারিলে সরকারী সকল বিভাগের চাকরীর দ্বারা দেশের হিত করা যায়—অবশ্য দেশকে স্বাধীন করিবার সাক্ষাৎ চেষ্টা ছাড়া অন্তবিধ হিত। এই জন্ত সরকারী চাকরীর অবিরোধী হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি চাকরীপ্রার্থীর প্রতিযোগিতায় উৎকর্ষ প্রদর্শন দ্বারা এবং কেবল সেই উপায়েই চাকরী পাইবার চেষ্টা করিতে পারেন।

দেশসেবার ও ধনোপার্জনের প্রকৃষ্ট উপায় ও ক্ষেত্র কৃষিশিল্পবাণিজ্যাদি স্বাধীন বৃত্তিত সকলের জন্ত পড়িয়াই আছে।

চাকরী-বাঁটোআরা ও শিক্ষার উন্নতি

সমুদয় সরকারী উচ্চ কাজেও কেবল ভারতীয়দিগকেই নিযুক্ত করা হউক, ভারতীয় নেতাদের এই সঙ্গত দাবী উত্তরে গবর্নেন্ট বহুবার বলিয়াছেন, সেরূপ সব কাজে জন্ত যথেষ্টসংখ্যক যথেষ্ট যোগ্য ভারতীয় পাওয়া যায় না। ইহার সরল অর্থ এই, যে, ভারতীয়েরা শিক্ষায় আরও বেশী উন্নত ও অগ্রসর হইলে ঐ সব কাজ সমস্তই পাইবে জিজ্ঞাস্য এই, চাকরী-বাঁটোআরা কি শিক্ষাবিষয়ে ঐ উন্নতি ও অগ্রতির অনুকূল না প্রতিকূল? নিশ্চয়ই প্রতিকূল। কারণ, এই বাঁটোআরা মুসলমানদিগকে

বলিতেছি, “শিক্ষায় তোমরা যত অনুরতই হও না কেন, শতকরা ২৫টি কাজ তোমরা পাইবেই”; হিন্দুদিগকে ইহা বলিতেছে, “তোমরা শিক্ষায় যত উন্নতই হও না কেন, চাকরীর সমুদয় বা কতকগুলি বিভাগে শতকরা ৪২½ টি চাকরী তোমরা পাইবেই না।”

চাকরী-বাঁটোআরা করা এখন ভারত- গবন্মেণ্টের অধিকার-বহির্ভূত

প্রথম তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠকে নিযুক্ত একটি সব-কমিটির উপর ভবিষ্যৎ শাসনবিধি অনুসারে সব রকম চাকরীতে নিয়োগাদি বিষয় আলোচনা করিবার ভার দেওয়া হয়। সেই সব-কমিটি সুপারিশ করেন, যে, কার্যানির্বাহের উৎকর্ষের ক্ষতি না করিয়া এবং আবশ্যিক যোগ্যতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যাহাতে সব সম্প্রদায়ের লোক যথাযোগ্য রূপে চাকরী পায় তাহার ব্যবস্থা পব্লিক সার্ভিস কমিশন-সমূহ দ্বারা করাইতে হইবে। এই সুপারিশ এখন পাল্‌মেণ্টের জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির বিচারাধীন আছে। উক্ত কমিটি রিপোর্ট করিলে তাহা পাল্‌মেণ্টে বিবেচিত হইবে। পাল্‌মেণ্টের রায় বাহির হইলে তবে গবন্মেণ্ট কিছু করিতে অধিকারী। পাল্‌মেণ্টের কোন কমিটির বিচারাধীন কোন বিষয় সম্বন্ধে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত করিবার অধিকার ভারতসচিব ও ভারত-গবন্মেণ্টের আছে কি? নিশ্চয়ই নাই।

পুনায় মহাত্মাজীর প্রতি (?) বোমা নিক্ষেপ

মহাত্মা গান্ধী পুনায় যখন অভিনন্দন-সভায় যাইতেছিলেন, তখন তিনি নির্দিষ্ট ভবনে পৌঁছবার আগে তথায় একটি মোটরকে লক্ষ্য করিয়া একটা বোমা নিক্ষেপ হয়। এই মোটরে তিনি ছিলেন না। অল্প ঝাঁহারা ছিলেন তাঁহার আহত হন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কেহ মারা পড়েন নাই। প্রথমেই খবর রটে, যে, গান্ধীজীকে লক্ষ্য করিয়া বোমা ছোঁড়া হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার চেহারা এত সুপরিচিত যে ভ্রম করিয়া অল্প গাড়ীত বোমা নিক্ষেপ সম্ভবপর নহে বলিয়া বোমা তাঁহারই উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ হইয়াছিল কি-না সে বিষয়ে পরে সন্দেহ প্রকাশিত হইয়াছে।

তথাকথিত সনাতনীরা মহাত্মাজীর বিরোধিতা করিতেছে, বৈদ্যনাথে তাহার তাঁহার গাড়ীর উপর বাঁট মারিয়াছিল, অন্তত তাঁহাকে কৃষ্ণ-তাকা দেখাইয়া স্মানিত করিতেছে, ইত্যাদি কারণে সন্দেহ হইয়াছে,

যে, পুনায় বোমা কোন সনাতনী বা সনাতনীদেব নিযুক্ত কোন চর ছুঁড়িয়াছিল। কিন্তু যত ক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত দোষী ধরা না পড়িতেছে, ও তাহার দোষ নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত না হইতেছে, তত ক্ষণ পর্যন্ত কাহারও বা কোন দলের উপর দোষ আরোপ করা ন্যায়সঙ্গত হইবে না। এমনও ত হইতে পারে, যে, সনাতনীদেব গান্ধীবিরোধী প্রচেষ্টার সুযোগে, লোকে তাহাদিগকেই দোষী করিবে ভাবিয়া, অল্প কোন কুচক্রী পক্ষ এই কান্ড করাইয়াছে।

যাহা হউক, যে বা যাহারাই এই দুর্কার্য করিয়া থাকুক, সাধারণ ভাবে দুই-একটি কথা বলা যাইতে পারে।

হিন্দু শাস্ত্রে, বৌদ্ধ শাস্ত্রে এবং খ্রীষ্টিয়ান শাস্ত্রে এই উপদেশ আছে, যে, ক্রোধকে অক্রোধ দ্বারা, ঘেৰকে প্রীতির দ্বারা, অকল্যাণকে কল্যাণ দ্বারা জয় করিতে হইবে। সুতরাং মহাত্মাজী যদি ক্রোধমূলক বিদ্বেষমূলক বলপ্রয়োগসাপেক্ষ কিছু করিতেন, তাহা হইলেও তাহার বিপরীত সার্বিক অহিংস উপায়েই তাহার বিরোধিতা করা উচিত হইত। কিন্তু তিনি অহিংস উপায়ই অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে অহিংস উপায়ই অবলম্বন আরও যুক্তিযুক্ত। তাঁহার সহিত ঝাঁহারা যুদ্ধ করিতে চান, তাঁহারা তর্ক-যুদ্ধ করুন এবং তদতিরিক্ত সেবা-যুদ্ধ করুন। তিনি হরিজনদিগের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। সনাতনীরা যে-সকল শাস্ত্র মানেন, তাহাতেও সকল জীবের কল্যাণ করিবার উপদেশ আছে। অতএব সনাতনীরা হরিজনকল্যাণকর্মে মহাত্মাজীকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা করুন।

মহাত্মাজী বঙ্গে স্বাগত

মহাত্মাজীর বাংলা দেশে আগমন উপলক্ষ্যে তাঁহাকে আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানাইতেছি। তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্ত ও হরিজনদিগের মানবোচিত সকল অধিকার ও সুবিধা লাভের জন্ত যে দুই প্রচেষ্টা প্রবর্তিত করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের সম্পূর্ণ সায় আছে।

গান্ধীজীর আবার উপবাসের সঙ্কল্প

আজমীরে পণ্ডিত লালনাথ নামক একজন সনাতনীরা দেহে হস্তক্ষেপ আঘাত আদি হওয়ায় মহাত্মাজী মনে করিয়াছেন, যে, হরিজন আন্দোলনের মধ্যে হিংসার ভাব আসিয়াছে। তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্ত তিনি সাত দিন উপবাস করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

ইহা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও ইহাতে আমাদের দুঃখবোধ ও আশঙ্কা হইতেছে।

পণ্ডিত লালনাথের অভিযোগ সত্য বলিয়া মনে করিয়া গান্ধীজী এই সঙ্কল্প করিয়াছেন। কিন্তু রাজপুতানা হরিজন-বোর্ডের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ চৌধুরী তদন্তের ফলে এই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে, ঐ অভিযোগ মিথ্যা।

কলিকাতার মেয়র নির্বাচন

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের কলিকাতার মেয়র নির্বাচিত হওয়ার দ্বারা মেয়রনির্বাচনঘটিত অশোভন স্বন্দ ও প্রহসনের যবনিকাপাতে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। মেয়র অসীম ক্ষমতাসালী একাধিপতি (dictator) নহেন। সুতরাং তিনি ইচ্ছা করিলেও বেশী কিছু করিতে পারেন না। তাহার উপর নলিনীরঞ্জন বাবু কৃতিত্ব দেখাইবার জন্ত এক বৎসরের পরিবর্তে কেবল নয় মাস সময় পাইবেন। তথাপি তাঁহার মত কন্ঠ ও আর্থিক আয়ব্যয়সম্পৃক্ত-ব্যাপার পরিচালনে সুদক্ষ ব্যক্তি হইত নয় মাসেও কিছু সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে এবং কলিকাতা মিউনিসিপালিটির আদর্শকে কিয়ৎপরিমাণে আরও অধিক বাস্তবে পরিণত করিতে পারিবেন। তাহা পারিলে তাঁহার নির্বাচন ঠিক হইয়াছে প্রমাণিত হইবে। তবে যদি আইন মেয়রকে কোন কার্যকরী ক্ষমতা না দিয়া থাকে, তাহা হইলে কোন মেয়রের কাছেই কিছু প্রত্যাশা করা উচিত নয়।

বিচারপতি মন্থনাথ মুখোপাধ্যায়ের অস্থায়ী পদোন্নতি

বিচারপতি মন্থনাথ মুখোপাধ্যায় যে অল্প সময়ের জন্তও কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহা কিঞ্চিৎ সন্তোষের বিষয়। কিন্তু তাঁহার মত সুযোগ্য ব্যক্তি যে স্থায়ী প্রধান বিচারপতি হইতে পারিলেন না, ইহা তদপেক্ষা অসন্তোষের বিষয়।

প্রাচীন ভারতে বাসস্থান নির্মাণ পদ্ধতি

এই মাসের প্রবাসীতে প্রাচীন ভারতে বাসস্থান নির্মাণ বিষয়ে অধ্যাপক প্রসন্নকুমার আচার্য্য যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা পড়িলে বুঝা যায়, পুরাকালে এদেশে রাজারাজড় ও সাধারণ লোকদের প্রাত্যহিক জীবনে কিরূপ বৈচিত্র্য ছিল এবং তাহাদের বাসগৃহ তাহার কিরূপ উপযোগী ছিল। এই রূপ বৈচিত্র্য সভ্যতার একটি লক্ষণ।

প্রাচীন ভারতীয় স্থপতির বিজ্ঞানানুযায়িত ভাবে কত দিকে দৃষ্টি রাখিতেন, তাহারও কিছু পরিচয় এই প্রবন্ধে আছে।

কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যের বিশেষ পরিচয় পাইতে হইলে ছই-চারিটা “নব্য-প্রাচীন” দরজা জানালা ও কীর্তিমুখ দেখা যথেষ্ট নহে। আচার্য্য মহাশয়ের টীকা ভূমিকা ও ইংরেজী অনুবাদ সম্বলিত “মানসারে”র পাঁচ ভল্যুমে সমাপ্ত মূল্যবান সচিত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন করা আবশ্যিক। তাহা অক্সফোর্ড যুনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

আসামে ও বঙ্গে জলপ্লাবন

আসামে ও বঙ্গে অনেক জেলায় বৃষ্টি হওয়ার বহু লক্ষ লোক বিপন্ন ও নিরাশ্রয় হইয়াছে। অনেক শত লোকের প্রাণ গিয়াছে। গবাদি পশু এবং অন্ত সস্তুতির নাশও প্রভূত হইয়াছে। যে-সকল সভা সমিতি বিপন্নদের দুঃখ মোচন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সর্বসাধারণের নিকট হইতে সর্ববিধ সাহায্য পাইলে তাঁহাদের চেষ্টা কিয়ৎপরিমাণে সফল হইবে।

আমরা শোকাক্ত ও বিপন্নদের স্তু বাঞ্ছিত।

বিদেশভ্রমণ দ্বারা শিক্ষার্থী

বিদেশভ্রমণ দ্বারা শিক্ষালাভার্থ একদল ভারতীয় ছাত্র পূর্বে বিদেশ যাত্রা করিয়াছিল। তাহার পর এক দল ভারতীয় ছাত্রী গিয়াছে। গত ১১ই জুন দ্বিতীয় দল ছাত্র ইউরোপ গিয়াছে। এই সমুদয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বাঙালী কেহ নাই। সম্ভবতঃ আর্থিক অভাব ইহার একটি কারণ। যে-সকল বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীর টাকায় কুলাইবে, তাঁহাদের কিন্তু বিদেশ দেখিয়া আসা উচিত।

হিন্দু বিধবাদের প্রতি সমাজের কর্তব্য

বোম্বাইয়ের অগ্রতম হিন্দু নেতা শ্রীযুক্ত মুকুন্দ রাও জয়াকর সম্প্রতি বলিয়াছেন, যে, তিনি যতদূর তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে,

“ভারতে প্রত্যহ গড়ে ত্রিশ জন হিন্দু বিধবা মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইতেছে। গত পনের দিনে বোম্বাই প্রদেশের ১১ জন হিন্দু মহিলার অপহরণ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই অবস্থার বিধবাদের জন্ত বহু আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা অত্যাশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।”

হিন্দু বিধবারা ধর্মাস্তর গ্রহণ করুন বা না-করুন, তাঁহাদের অবস্থার উন্নতি একান্ত আবশ্যিক। আশ্রম স্থাপন, শিক্ষার দ্বারা তাঁহাদিগকে স্বাবলম্বী করা, এ সবই আংশিক উপায় বটে; কিন্তু প্রধান উপায় তাঁহাদিগের সংপাত্তের সহিত

বিবাহ দেওয়া। বালবিধবাদের বিবাহ দেওয়া মহা পুণ্যের কাজ। ইহা খুব উৎসাহের সহিত চালান উচিত। অনেক অন্তঃপুরে সধবা ও বিধবার উপর জঘন্য অত্যাচার হয়। ইহার দমন ও নিবারণ চাই।

কাগজে দেখিলাম, কলিকাতার বিধবাবিবাহসহায়ক সমিতি ১৯২৫ সাল হইতে ১৯৩৩ পর্য্যন্ত কয় বৎসরে ৪২৯৬টি বিধবার বিবাহ দিয়াছেন। ইহা ভাল, কিন্তু ইহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক বিধবার বিবাহ হওয়া আবশ্যিক। বর্তমানে সমিতির সন্ধানে ৩৫০ জন পাত্র ও ১৭০ জন বিধবা পাত্রী আছে।

নারীহরণ সম্বন্ধে ভাই পরমানন্দ

সম্প্রতি ভাই পরমানন্দ বলিয়াছেন—

“যে পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত না হয় এবং যে-পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজ গুণ্ডার কবল হইতে হিন্দু বালিকাদিগকে রক্ষা করিবার মত শক্তি অর্জন না করে, তত দিন হিন্দু বালিকাদিগকে পরদার আড়ালে রাখা ও অশিক্ষিত রাখা উচিত।”

ভাই পরমানন্দের উদ্দেশ্য ভাল, কিন্তু তাঁহার পরামর্শ গ্রহণীয় নহে। যে-সকল পুরুষ নারীরক্ষার জন্য প্রাণপণ করে না, তাহার মানুষ নামের যোগ্য নয়। সে-সকল পুরুষের দরজা ভাঙিয়া বাড়ির ভিতর হইতেও গুণ্ডারা নারীহরণ করিতে পারে এবং কোন কোন স্থলে করেও অবশ্য, অপহৃত প্রত্যেক নারীর আত্মীয়েরাই যে কাপুরুষ তাহা নহে। অনেক সময় তাঁহাদের অনুপস্থিতির সময় নারী অপহৃত হন এবং কখন কখন তাঁহাদিগকে আঘাত দ্বারা অসমর্থ করিয়া নারী হরণ করা হয়।

নারীহরণ অধিকাংশ স্থলে পল্লীগামে হয়। পল্লীগামে কি মেয়েদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা সম্ভব?

পুরুষদের পৌরুষ জাগ্রত করা এবং তাঁহাদের দেহমনের শক্তি বৃদ্ধি করা যেমন আবশ্যিক, নারীদেরও দেহমনের শক্তি বৃদ্ধি সেইরূপ আবশ্যিক। তাঁহারা ত জড়সম্পত্তিবৎ কিছু নহেন। তাঁহাদেরও আত্মরক্ষার সামর্থ্য জন্মান ও বাড়ান দরকার। ইহা নৈতিক, মানসিক ও দৈহিক শিক্ষা-সাপেক্ষ। বালিকা ও নারীদিগকে অশিক্ষিত রাখিলে নারীহরণ কমিবে, এ বড় অস্বুত কথা। যত বালিকা ও নারী অপহৃত হন, তাহার সমস্ত বা অধিকাংশ কি শিক্ষিত?

বঙ্গীয় মহিলাদের কোঙ্গিল

বঙ্গীয় মহিলাদের কোঙ্গিল বঙ্গীয় অল্লীল সিনেমাচিত্র ও সিনেমার অল্লীল বিজ্ঞাপন বন্ধ করিবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের সাফল্য কামনা করি।

বেথুন কলেজ ও বঙ্গে নারীশিক্ষা

বাংলা দেশে নারীদিগকে কতকটা উচ্চশিক্ষা দিবার ইচ্ছা যে ক্রমশঃ বাড়িতেছে, তাহা ছেলেদের অনেক কলেজে ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে বুঝা যায়। অথচ গবন্মেণ্ট নারীশিক্ষায় কোন উৎসাহ দেখাইতেছেন না, ইহা বড় পরিতাপের বিষয়—যদিও আশ্চর্যের বিষয় নহে। আমেরিকার মত দেশে, যেখানে অবরোধপ্রথা নাই, সেখানেও মেয়েদের জন্য আলাদা কলেজ অনেক আছে, আবার ছাত্রছাত্রীর একই প্রতিষ্ঠানে পড়িবার ব্যবস্থাও বহু স্থানে আছে। তাহার কারণ, মেয়েদের কোন কোন প্রকার শিক্ষা কেবলমাত্র ছাত্রীদের জন্যই অভিপ্রেত কলেজেই হইতে পারে। আমাদের দেশে ত শুধু মেয়েদের জন্য অভিপ্রেত বিদ্যামন্দির আরও দরকার। সেই জন্য, ছেলেদের কলেজে মেয়েদের শিক্ষালাভের বিন্দুমাত্রও বিরোধিতা না করিয়া, আমরা গবন্মেণ্টকে এবং দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে বেথুন কলেজের উপযোগিতা ও উপকারিতা অধিক পরিমাণে বাড়াইতে অনুরোধ করিতেছি।

ঢাকাতে যে সামান্য বন্দোবস্ত আছে, তাহা ছাড়িয়া দিলে, বেথুন কলেজ বঙ্গের একমাত্র সরকারী মহিলা-কলেজ। অথচ ছুঃখের বিষয়, আমরা গুনিলাম, ইহার ছাত্রী-নিবাসে ১ম ও ৩য় বার্ষিক ছাত্রীদের জন্য মোটে ৮ জনের জায়গা আছে। কলেজের ক্লাস-কক্ষাদির ব্যবস্থাও নিকৃষ্ট ও অপ্রচুর। বেথুন কলেজের সম্মিহিত ক্রাইষ্ট চার্চ স্কুলের জায়গা ও বাড়ি গবন্মেণ্ট অনেক বৎসর হইল তিন লক্ষ টাকা দিয়া কিনিয়া রাখিয়াছেন—তাহার প্রকাশিত উদ্দেশ্য বেথুন কলেজের বিস্তৃতিসাধন। কিন্তু এ-পর্য্যন্ত ত কিছুই করা হইল না। তবে কি পাদ্রি সাহেবদিগকে তিন লাখ টাকা পাওয়াইয়া দিবার জন্য উহা কেনা হইয়াছিল? কলেজের পশ্চাৎ দিকেও ত বড় একটা খালি জায়গা কলেজের আছে। তাহাতেই বা ঘরবাড়ী নির্মিত কেন হইতেছে না?

সেনহাটা মহিলা-সমিতির সংকার্য

সেনহাটার মহিলা-সমিতির একটি পুকুর পরিষ্কার করিবার যে ছবি অন্তর্ভুক্ত প্রকাশিত হইল, তাহার জন্য আমরা উহার সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা লীলা দাসগুপ্তার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

নিখিল ভারত নারীসম্মেলনের কলিকাতা শাখা

নিখিল ভারত নারীসম্মেলনের কলিকাতা শাখার ছটি প্রস্তাব বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। প্রথমটি সভানেত্রী শ্রীযুক্তা মণিকা মহলানবীশ উদ্ভাপিত করেন। যথা—

নিখিল ভারত নারী-সম্মেলনের কলিকাতা শাখা তাঁহাদের এলাকার মধ্যে হিন্দুনারীর উত্তরাধিকার আইন সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তারের চেষ্টা করিবেন; এবং সে-বিষয়ে একটি বেসরকারী কমিশন বসাইবার জন্ত আবেদন-আন্দোলন করিবেন, যাহাতে সে আইন ক্রম সংশোধিত হইয়া শ্রায়সঙ্গত ও সমদর্শী হয়, সে-বিষয়ে যত্নবান হইবেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, সমর্থন করেন শ্রীমতী হেমলতা মিত্র ও পোষকতা করেন শ্রীমতী কুমুদিনী বসু। তাহা এই

নারীহরণের পাপ বাংলা দেশময় ব্যাপ্ত হওয়ায় এই লজ্জাকর কলঙ্ক অপনোদনের নিমিত্ত নিখিল-ভারত নারীসম্মেলনের কলিকাতা শাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্তব্য।

জাপানে, ভারতবর্ষে ও রুশিয়ায় শিক্ষাবিস্তার

ভারতবর্ষের উচ্চবেতনভোগী ইংরেজ শিক্ষাকর্মচারীরা বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক রিপোর্ট লিখিয়া লোকের বিশ্বয় উৎপাদনের চেষ্টা করেন। বিশ্বয় হয় বটে, কিন্তু সেটা উল্টা রকমের। আমরা ভাবি, এই যে অকিঞ্চিৎকর কৃতিত্ব এবং অতিবিশাল অকৃতিত্ব, ইহা তাঁহারা কোন্ লজ্জায় লোকচক্ষুর গোচর করেন!

আমরা কিছুদিন আগে দেখাইয়াছিলাম, জাপানে শুধু প্রাথমিক শিক্ষাই পাইতেছে মোট লোকসংখ্যার শতকরা কুড়ি জন এবং তথাকার শতকরা প্রায় ৯৯ জন লিখনপঠনক্ষম। ভারতবর্ষে সর্ববিধ শিক্ষা মোট লোকসংখ্যার শতকরা কত জন কোন্ প্রদেশে পাইতেছে দেখুন। সংখ্যাগুলি সম্প্রতি প্রকাশিত ভারত-গবর্নমেন্টের শিক্ষা-কমিশনার শ্রী জর্জ এণ্ডারসনের লেখা ১৯২৭-৩২ পঞ্চবার্ষিক রিপোর্ট হইতে গৃহীত। মাদ্রাজ ৬.২৫, বোম্বাই ৬.১১, বাংলা ৫.৫৫, আগ্রা-অযোধ্যা ৩.১৩, পঞ্জাব ৫.৬১, ব্রহ্মদেশ ৪.২৮, বিহার-উড়িষ্যা ২.৯০, মধ্যপ্রদেশ ২.৯৬, আসাম ৪.৩২, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ৩.৬০। ভারতবর্ষে লিখনপঠনক্ষম শতকরা আট জন এবং নিরক্ষর শতকরা ৯২ বিরানব্বই জন!

রুশিয়া ও ভারতবর্ষে শিক্ষার বিস্তার কিরূপ হইতেছে দেখুন।

বর্তমান বৎসরে প্রকাশিত জোসেফ ষ্টালিন প্রণীত সোভিয়েট ইউনিয়নের অবস্থা ("The State of the Soviet Union") নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, যে, ১৯৩০ সালের শেষে শতকরা ৬৭ জন লিখনপঠনক্ষম ছিল, ১৯৩৩ সালের শেষে হইয়াছে শতকরা ৯০ জন। ১৯২৯ সালে সকল রকম স্কুলে শিক্ষা পাইত ১৪৩৫৮০০০ জন ছাত্রছাত্রী, ১৯৩৩ সালে পাইত ২৬৪১৯০০০। তা ছাড়া, স্কুলে যাইবার আগেকার শিক্ষা ("Pre-school education") ১৯২৯ সালে ৮,৩৮,০০০টি শিশু পাইত, ১৯৩৩ সালে পাইত ৫৯,১৭,০০০টি শিশু! ভারতবর্ষে

উহার তুলনায় শিক্ষার "দ্রুত" গতি কিরূপ দেখুন। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ হইতে পাঠশালা পর্যন্ত সর্ববিধ বিদ্যালয়বিধে ব্রিটিশ-ভারতে ১৯২৭ সালে পড়িত ১১১৫৭৪৯৬ এবং ১৯৩২ সালে পড়িত ১২৭৬৬৫৩৭। মনে রাখিতে হইবে, সোভিয়েট রুশিয়ার লোকসংখ্যা ১৬১০০৬২০০, ও উহার বিস্তর জাতির নিজের কোন বর্ণমালা ও সাহিত্য এ-যাবৎ ছিল না; এবং সুসভ্য বহুবিধুতসাহিত্য-বিশিষ্ট ব্রিটিশ-ভারতের লোকসংখ্যা ২৭১৫২৬৯৩৩। অর্থাৎ ব্রিটিশ-ভারতের লোকসংখ্যা রুশিয়ার প্রায় দ্বিগুণ, কিন্তু রুশিয়ার শুধু স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর ও বয়সের সব ছাত্রছাত্রীর দ্বিগুণের অনেক বেশী।

জার্মেনীতে অশান্তি ও হত্যাকাণ্ড

জার্মেনীর অনিয়ন্ত্রিতক্ষমতাবিশিষ্ট একাধিপতি হিটলারের বিরুদ্ধে ভিতর ভিতরে অসন্তোষ বাড়িতে-ছিল এবং তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার জন্ত গোপনে যড়যন্ত্র চলিতছিল, বোধ হয়। সেই জন্ত তিনি তাঁহার বিরোধী বিস্তর লোককে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহাদের প্রাণবধ করিয়াছেন! এরূপ রক্তাপ্ত ভিত্তির উপর কোন দেশের স্বাধীনতা ও শ্রী প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না। এবং বস্তুতঃ এখন জার্মেনী বিদেশী কোন জাতি বা ব্যক্তির অধীন না হইলেও স্বাধীনও নহে, কিন্তু একজন যথোচ্ছাচারীর অধীন।

চীনা তুর্কিস্থানে চীনাধিকার পুনঃস্থাপিত

সংবাদ আসিয়াছে, যে, কাশ্মীর আফগানিস্থান ও রুশিয়ার সীমা পর্যন্ত কাশগড় ও ইয়ারকন্দ প্রভৃতি চীনা তুর্কিস্থানের সব অঞ্চল তুঙ্গানের পুনরায় দখল করিয়াছে। অসামরিক চীনা গবর্নরের সাহায্যে তাহার ইহা করিতে পারিয়াছে। এই প্রকারে চীনা তুর্কিস্থানের অধিকাংশ চীন-গবর্নমেন্ট পুনরায় দখল করিয়াছেন এবং বিদ্রোহী মুসলমানেরা পলায়ন করিয়াছে। চীনকে টুকরা টুকরা করিবার চেষ্টা এক দিকে যেমন জাপান করিতে ছ, অন্য দিকে তেমনি মুসলমান অধিবাসীদিগকে বিদ্রোহী করিয়া ও যুদ্ধসরঞ্জাম জোগাইয়া একটি ইউরোপীয় শক্তি চীনা তুর্কিস্থানকে চীন হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে।

গুজরাটের ও মেদিনীপুরের কৃষক

অহিংস আইনলঙ্ঘন আন্দোলন প্রচেষ্টায় যোগ দেওয়ায় কয় বৎসরে গুজরাটের কৃষকদের খুব ক্ষতি হইয় থাকায় টাক তুলিয়া তাহাদের ক্ষতিপূরণ করিবার চেষ্টা বোম্বাইয়ে হইতছে। মহাত্মা গান্ধী এই চেষ্টার পূর্ণপোষকতা করিতেছেন। মেদিনীপুরের কৃষকেরাও সমতুল্য কারণে

সমধিক ঙ্খ ভোগ করিয়াছে ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহাদের ক্ষতিপূরণের কোন চেষ্টা হইতেছে বলিয়া অবগত নহি।

ভারতবর্ষ বিদেশী চাল

ধানের জমী ভারতবর্ষে অনেক আছে, চালও অনেক হয়। তথাপি শ্যাম ও ইণ্ডোচীন হইতে খুব সস্তা দরে ভারতে চাল আমদানী হইতেছে। জাপানী চালও কিছু দিন খুব সস্তা দরে এদেশ বিক্রী হইতেছিল। এখন হয় কি ম জানি না। ভারতের বাজার দখল করিবার জন্য হইতে এই সব দেশের রাজশক্তির সাহায্যে তথাকার চাল এদেশ সস্তার নীত ও বিক্রীত হয়। ভারত-গবর্নেন্ট প্রতিকারের চিন্তা করিতেছেন। হইতে বিদেশী চালের উপর শুল্ক বসিবে। কিন্তু শুধু এই উপায়ের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। ভারতের সব ধানচাষের জমীর উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইয়া এখানেই অধিকতর ধান উৎপন্ন করিয়া চাল খুব সস্তা করা যাইতে পারে।

বিনা বিচারে স্থায়ী ভাবে বন্দী রাখিবার ফন্দি

যে অস্থায়ী আইনের বলে বিনা বিচারে বন্দী অনেক বাঙালী যুবককে আজমীরের দেওলী জেলে চালান দিয়া আটক রাখা হইতেছে, তাহাকে স্থায়ী আইনে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে স্বরাষ্ট্রসচিব ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে একটি বিল পেশ করিবেন। আইনটা যখন হইয়াছিল, তখন তিন বৎসরের জন্য করা হইতেছে বলা হইয়াছিল। সে-কথা কোথায় রহিল? অবশ্য, গবর্নেন্টের পক্ষে ইহা বলা হইতে পারে, যে, গবর্নেন্ট দেখিলেন, যে, তিন বৎসরে বাংলা দেশ ঠাণ্ডা হইল না, এবং ভবিষ্যতেও হইবার আশা নাই, তাই স্থায়ী আইন চাই। তাহা সত্য হইলে, এতাদৃশ একটি স্থায়ী আইন প্রণয়নের চেষ্টা করিয়া গবর্নেন্ট ব্রিটিশ শাসনকে খুব উচ্চ মার্টিফিকেট দিতেছেন।

সারদা আইনকে ফাঁকি দেওয়া

বঙ্গের যাহার সারদা আইনকে ফাঁকি দিয়া ১৪ বছরের কম বয়সের মেয়ের বিবাহ দিতে চায়, তাহারা ফরাসী চন্দননগরে গিয়া বিবাহ দেয়। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কোকানাডা শহরের নিকটবর্তী য়ানাম নামক ফরাসী অধিকৃত স্থানে সারদা-আইনকে ফাঁকি দিয়া গত ১লা জুলাই ৫ হইতে ১০ বৎসরের মেয়েদের সহিত ১৫ হইতে ১৮ বৎসরের ছেলেদের ২০ টা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। অনেকে রাজপুতানায় গিয়া এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বাল্যবিবাহপ্রিয় লোকেরা নিজামের রাজ্যে গিয়া বাল্য-বিবাহ দেয়। সারদা আইন সংশোধন করিয়া এইরূপ পব বিবাহও দণ্ডনীয় করা উচিত।

বঙ্গে অবাঙালী এঞ্জিনীয়ার

কর্মপ্রার্থী খুব যোগ্য বাঙালী এঞ্জিনীয়ার অনেক থাকা সত্ত্বেও আগ বরিশালে মুসলমানপ্রধান ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড একজন পঞ্জাবী মুসলমান এঞ্জিনীয়ারকে চাকরী দিয়াছিলেন। সম্প্রতি পাবনার মুসলমানপ্রধান ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডও ঠিক সেই অবস্থায় আর এক জন পঞ্জাবী মুসলমানকে চাকরী দিয়াছেন। এই সকল মুসলমান বাঙালীর বঙ্গপ্রীতি ত নাই-ই, অধিকন্তু মুসলমান বাঙালীদের সমষ্টগত স্বার্থও তাঁগর ভুলিয়া যান। মুসলমান বাঙালীর ঙ্খমোচনে অল্প বাঙালীরাই অগ্রসর হয়, পাঞ্জাবী মুসলমানরা হয় না।

কলিকাতায় মাছ যোগান

কলিকাতার মৎস্যশী লোকদের জন্য বৎসরে ১১,২০,০০০ মণ মাছের দরকার। কিন্তু ইহার অর্ধেক মাছও কলিকাতায় আসে না, এবং যাহা আসে তাহার অধিকাংশ আমদানি হয় বাংলার বাহির হইতে। মধ্য পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে মাছের অভাব নাই, প্রাচুর্য্যই আছে। বাঙালী যুবকেরা দল বাধিয়া তাহা আমদানি করুন না? অবশ্য তাঁহারা বর্তমান মাছ-বিক্রীর বাজার-গুলিতে আমল পাইবেন না—সেগুলি সেই সব পাইকারদের দখলে যাহারা মাছের ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া ধনী হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু যুবকেরা উদ্যোগী হইলে বাড়িতে বাড়িতে মাছ সরবরাহ করিতে পারেন।

জমীদারদের সভা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বেকার যুবকদের জন্য কিছু করিবেন ভাবিতেছেন, শুনা যায়। তাঁহাদের অনেকের জমীদারী মৎস্যবহুল নান অঞ্চলে। তাঁহারা এই ব্যবসাতে যুবকদিগকে প্রবৃত্ত করিয়া সাহায্য করুন না?

কায়স্থদের ভাল প্রস্তাবগুলির অনুযায়ী কাজ চাই

সম্প্রতি কলিকাতায় নিখিল বঙ্গ কায়স্থসম্মেলনের অধিবেশনে অনেকগুলি ভাল প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে। কিন্তু তদনুযায়ী কাজ না হইলে সেগুলির কোন মূল্য নাই। বরং ভাল কথা বার-বার বলিয়া কাজে কিছু না করিলে তাহাতে ক্ষতিই হয়। যে-যে বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, নীচে তাহার কয়েকটি উল্লিখিত হইল।

বিবাহে পণপ্রথার উচ্ছেদসাধন এবং পূজাপার্কণ ও বিবাহাদিতে ব্যয়বাহুল্য নিবারণ।

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, বিধবাবিবাহ, স্বদেশী শিল্পস্রবা ব্যবহার, ব্যায়াম ও বিভিন্নপ্রদেশীয় নানাশ্রেণীর কায়স্থের মধ্যে বিবাহ প্রচলন।

দুর্বৃত্তদের দ্বারা নিপীড়িতা হিন্দু নারীদের পুনরায় সমাজে গ্রহণ করা। নারীনিগ্রহ নিবারণ করে পল্লীগামে কায়স্থদের দ্বারা কমিটি গঠন।

কায়স্থ যুবকদের সমর বিভাগে প্রবেশ করিবার জন্ত উৎসাহিত করা এবং শ্রীলোকদের ব্যায়াম চর্চার জন্ত বন্দোবস্ত করা।

উপনিবেশস্থাপন না দ্বীপচালান ?

দক্ষিণ-আফ্রিকার চুক্তিবদ্ধ দাসকল্প ভারতীয় শ্রমিক-দিগকে খাটাইয়া তথাকার শ্বেতকারেরা নিজেদের কাজ উদ্ধার করিয়াছে। ভারতীয়েরা এখন সেখানে বাণিজ্যাদি ক্ষেত্রে শ্বেতকারদের সহিত প্রতিযোগিতা করে। এই জন্ত তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া দরকার। তাহাদের সামাজিক নানা লাঞ্ছনা সেখানে আছে, আইন করিয়া তাহাদিগকে নানা অসুবিধায় ফেলা হইয়াছে, যাহারা ভারতবর্ষে আসিতে চায় তাহাদিগকে আসিতে ও এখানে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করিতে আর্থিক সাহায্যের বন্দোবস্তও শ্বেতদের গবর্নেন্ট করিয়াছে। তথাপি ভারতীয়দের অধিকাংশ (দক্ষিণ-আফ্রিকাই যাহাদের জন্মভূমি) সে দেশ ছাড়িয়া আসিতে চায় না। তাই তথাকার ভারতীয়দের জন্ত—এবং এদেশের ভারতীয়দের জন্তও বটে—দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতরা “দয়া” করিয়া ভারতীয়দিগকে উপনিবেশ স্থাপনের সন্ধান দিতেছেন। বোর্নিও দ্বীপের ব্রিটিশাধিকৃত অংশ, ব্রিটিশ গিয়ানা এবং নিউ-গিনিতে ভারতীয়দিগকে উপনিবেশ স্থাপনা করিতে বলা হইতেছে। যেমন আইনানুসারে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে জোর করিয়া আশ্রয়ানে পাঠান হয়, জোর করিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দিগকেও পরে ঐ তিনটি ভূখণ্ডে সেইরূপ পাঠান হইবে কি না বলা যায় না। কিন্তু জায়গাগুলি স্বাস্থ্যকর ও বসবাসের জন্ত লোভনীয় নহে—তাহা হইলে ত ইউরোপীয়েরাই তথায় বসবাস করিত। ভারতীয়েরা যদি স্বাধীন হইত এবং নিজ শক্তিতে নিজেদের উপনিবেশ স্থাপন পূর্বক তাহা নিজ অধিকারে রাখিতে পারিত, তাহা হইলে উপনিবেশ নামটা ব্যবহার করা সার্থক হইত। কিন্তু এখন যে-যে দেশকে ভারতীয় উপনিবেশ বলা ও করা হইবে, তাহা তাহারা নিজেদের শ্রম, নৈপুণ্য ও প্রাণ দিয়া সভ্য জনের বাসোপযোগী করিবার পর শ্বেতকারেরা আবার তাহাদিগকে যে সেখান হইতে তাড়াইয়া দিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? বরং ইহাই খুব সম্ভব, যে, তাড়াইয়া দিবে।

অতএব, প্রস্তাবটা বাস্তবিক উপনিবেশ স্থাপনের নহে, দ্বীপচালান বা দ্বীপান্তর করিবার ষড়যন্ত্র।

আসামে জন্মের হার ও জন্মনিরোধ

সম্প্রতি আসামের ব্যবস্থাপক সভায় এক জন সভ্য প্রশ্ন করেন, আসামের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে জন্মের হার বড় বাড়িয়াছে, অতএব গবর্নেন্ট জন্মনিরোধের ব্যবস্থা করিবেন কি না। সরকারপক্ষ হইতে ইহার উত্তরে বলা হয়, ভারতবর্ষের নয়টি প্রদেশের

মধ্যে জন্মের হারে আসাম সপ্তমস্থানীয়, সুতরাং অতিরিক্ত জন্মহার এখনও আসামের সমস্যা হইয়া দাঁড়ায় নাই; তাহা হইলেও, গবর্নেন্ট আইন দ্বারা জন্মনিরোধ না করিয়া প্রচার-কার্য দ্বারা তাহা করিবেন।

কিন্তু আসামে তাহারই বা কি প্রয়োজন? সেখানে বহুবিধৃত ভূমি পড়িয়া আছে, আরণ্য ও খনিজ সম্পত্তিতে আসাম ঐশ্বর্যশালী। গবর্নেন্ট চাষবাস ও নানা শিল্পকার্য দ্বারা আসামের লোকদিগকে সঙ্গতিপন্ন হইবার সাঙ্গাফা করুন না? জন্মের হার কমাইবার চেষ্টা না করিয়া মৃত্যুর হার কমাইবার চেষ্টা করুন। আসামে এখনও লক্ষ লক্ষ লোকের স্থান স্বচ্ছন্দে হইতে পারে। বসতির ঘনতা বঙ্গে প্রতি বর্গমাইলে ৬৪৬, বিহার-উড়িষ্যায় ৪৫৪, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে ১৭৭, মাদ্রাজে ৩২৮, পঞ্জাবে ২৩৮, আগ্রা-অযোধ্যায় ৪৫৬, কিন্তু আসামে ১৫৭।

কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের আমরা পক্ষপাতী নহি। কেন, তাহার আলোচনার স্থান ইহা নহে। “সভা” জগৎও এ-বিষয়ে একমত নহে। ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব ইকনমিক্সের এপ্রিল সংখ্যায় অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের প্রবন্ধের ৫৮৭-৫৯৮ পৃষ্ঠা এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। তাহাতে পাঠক লোকসংখ্যাবৃদ্ধির সমর্থকদের কিছু উল্লেখ দেখিতে পাইবেন।

বহুসন্তানবতী নারীদের উদ্দেশে অত্যাধুনিক মহিলার নাক সিঁটকাইতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বহু সস্ত্র সন্তানের জননী বাহারা তাঁহারা সন্তানেরই যোগা।

সুভাষচন্দ্র বসুর নূতন পুস্তক

সুভাষ বাবু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজীতে একটি পুস্তক লিখিতেছেন। তাহা শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। তাহার আমেরিকান ও ফরাসী সংস্করণও বাহির হইবে। ভারতবর্ষে প্রকাশিত বহিতে অনেক সত্য কথা সন্নিবেশ আইন-বিরুদ্ধ। ইংলণ্ডে প্রকাশিত বহিতে সত্যের প্রকাশে তত বেশী বাধা না থাকিলেও, মনে রাখিতে হইবে, যে, উক্তর সাঙাল্যাণ্ডের ইণ্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজ তথায় প্রকাশিত হইবার বন্দোবস্ত হইবার পর তাহা বন্ধ হইয়া যায়। আমেরিকায় ও ফ্রান্সে প্রকাশিত সংস্করণে সত্য কথা বাদ দিবার প্রয়োজন না হইতে পারে।

চট্টগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা

চট্টগ্রাম মিউনিসিপালিটিতে অবৈতনিক আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার পঞ্চবার্ষিক রিপোর্টে দেখিয়া প্রীত হইলাম, যে, ছাত্রছাত্রীর মোট সংখ্যা এবং উপরের ক্লাসগুলিতে সংখ্যা বাড়িতেছে। বালকদের সংখ্যা ১৯০০, ১৯২৭, এবং ১৯৩২ সালে যথাক্রমে ২৮৪, ১৬৬৩, এবং ২৬৬৬ ছিল। বালিকাদের সংখ্যা ১৯১০ সালে ২১ হইতে ১৯৩২ সালে ১৩৮৭ হইয়াছিল। সংখ্যাগুলি মিউনিসিপালিটির প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রছাত্রীদের।



পদ্ম-পুষ্কর পুস্তক
শ্রীমতী প্রমদা বসুচৌধুরী

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”

৩৪শ ভাগ

১ম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩৪১

৫ম সংখ্যা

জীবনবাণী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কোন বাণী মোর জাগল, যাহা
রাখবে স্মরণে,—
পলে পলে দলিত সে কালের চরণে ।
যায় সে কেবল ভেঙেচূরে,
ছড়িয়ে পড়ে কাছে দূরে ;
জীবনবাণীর অখণ্ড রূপ
মিলবে মরণে ॥

ক্ষণে ক্ষণে পাগল হাওয়ায়
ঘূর্ণি ধূলিতে
প্রাণের দোলে এলোমেলো
রয় সে ছলিতে ।
বৈতরণীর অগাধ নদী
পেরিয়ে আবার ফেরে যদি
উল্টো শ্রোতের সে দান, ডালায়
পারবে তুলিতে ॥

কোন বাণী মোর জাগল, যাহা
রাখবে স্মরণে,
টিঁ করে যাহা নিমেষগুলির
পূরণ হরণে ।
তারে নিয়ে সারা বেলা
চলেছে হার জিতের খেলা,
খেলার শেষে বাঁচল যা তাই
বাঁচবে মরণে ॥

রাতের দান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পথের শেষে নিবিয়া আসে আলো,
গানের বেলা আজ ফুরালো ।
কী নিয়ে তবে কাটিবে তব সন্ধ্যা ?

রাত্রি নহে বক্ষ্যা,
অন্ধকারে না-দেখা ফুল ফুটায় তোলৈ সে যে —
দিনের অতি নিষ্ঠুর খর তেজে
যে-ফুল ফুটিল না,
যাহার মধুকণা
বনফুমির প্রত্যাশাতে গোপনে ছিল ব'লে
গিয়েছে কবে আকাশপথে চ'লে
তোমার উপবনের মৌমাছি
কুপণ বনবীথিকাতলে বৃথা করুণা যাচি' ॥

আধারে-ফোটা সে-ফুল নহে ঘরেতে আনিবার,
সে-ফুলদলে গাঁথিবে না তো হার :
সে শুধু বৃকে আনে
গন্ধে-ঢাকা নিভৃত অনুমানে
দিনের ঘন জনতামাঝে হারানো আঁখিখানি,
মৌনে-ডোবা বাণী ;
সে শুধু আনে পাইনি যারে তাহারি পরিচিতি,
ঘটেনি যাহা ব্যাকুল তারি স্মৃতি ।

স্বপনে-ঘেরা সুদূর তারা নিশার ডালি-ভরা
দিয়েছে দেখা, দেয় নি তবু ধরা ;
রাতের ফুল দূরের ধ্যানে তেমনি কথা ক'বে,
অনধিগত সার্থকতা বুঝাবে অমুভবে,
না জানা সেই না-ছোঁওয়া সেই পথের শেষ দান
বিদায়বেলা ভরিবে তব প্রাণ ।

সাহিত্যের তাৎপর্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উদ্ভিদের দুই শ্রেণী, ওষধি আর বনস্পতি। ওষধি ক্ষণকালের ফসল ফলাতে ফলাতে ক্ষণে জন্মায় ক্ষণে মরে। বনস্পতির জায় দীর্ঘ, তার দেহ বিচিত্র রূপে আকৃতিবান, শাখায়িত তার বিস্তার।

ভাবার ক্ষেত্রেও প্রকাশ দুই শ্রেণীর। একটাতে প্রতিদিনের প্রয়োজন সিদ্ধ হ'তে হ'তে তা লুপ্ত হয়ে যায়, ক্ষণিক ব্যবহারের সংবাদ বহনে তার সমাপ্তি। আর একটাতে প্রকাশের পরিণাম তার নিচের মধ্যেই। সে দৈনিক আশু প্রয়োজনের ক্ষুদ্র সীমায় নিঃশেষিত হ'তে হ'তে মিলিয়ে যায় না। সে শাল তমালেরই মতো; তার কাছ থেকে দ্রুত ফসল ফলিয়ে নিয়ে তাকে বরখাস্ত করা হয় না। অর্থাৎ বিচিত্র কুলে ফলে পল্লবে শাখায় কাণ্ডে ভাবের এক রূপের সমবায় সমগ্রতায় সে আপনার অস্তিত্বেরই চরম গৌরব ঘোষণা করতে থাকে স্থায়ী কালের বৃহৎ ক্ষেত্রে। এ'কেই আমরা বলে থাকি সাহিত্য।

ভাবার যোগে আমরা পরস্পরকে তথ্যগত সংবাদ জানাচ্ছি, তা ছাড়া জানাচ্ছি ব্যক্তিগত মনোভাব। ভালো লাগচে মন্দ লাগচে রাগ করছি ভালোবাসছি এটা বখাস্তানে ব্যক্ত না করে থাকতে পারিনে। মুক পশু-পাখীরও আছে অপরিণত ভাষা, তাতে কিছু আছে ধ্বনি কিছু আছে ভঙ্গী—এই ভাষায় তারা পরস্পরের কাছে কিছু খবরও জানায় কিছু ভাবও জানায়। মানুষের ভাষা তার এই প্রয়োগসীমা অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেছে। দক্ষিণ ও যুক্তির জোরে তথ্যগত সংবাদ পরিণত হয়েছে বিজ্ঞানে। হবামাত্র তার প্রাত্যহিক ব্যক্তিগত বন্ধন মুছে গেল। যে ভগৎটা “আমি আছি” এইমাত্র বলে আপনাকে জানান দিয়েছে মানুষ তাকে নিয়ে বিরাট জ্ঞানের জগৎ রচনা করলে। বিশ্বজগতে মানুষের যে যোগটা ছিল ইন্দ্রিয়বোধের দেখাশোনায়, সেইটেকে জ্ঞানের যোগে বিশেষভাবে অধিকার করে নিলে সকল দেশের সকল কালের মানুষের বুদ্ধি।

ভাবপ্রকাশের দিকেও মানুষের সেই দশা ঘটল। তার খুসি, তার দুঃখ, তার রাগ, তার ভালোবাসাকে মানুষ কেবলমাত্র প্রকাশ করল তা নয়, তাকে প্রকাশের উৎকর্ষ দিতে লাগল, তাতে সে আশু উদ্বেগের প্রবর্তনা ছাড়িয়ে গেল, তাতে মানুষ লাগালে ছন্দ, লাগালে যুর, ব্যক্তিগত বেদনাকে দিলে বিশ্বজনীন রূপ। তার আপন ভালোমন্দ লাগার জগৎকে অন্তরঙ্গ ভাবে সকল মানুষের সাহিত্য-জগৎ করে নিলে।

সাহিত্য শব্দটার কোন ধাতুগত অর্থ বাখ্যা কোনো অলঙ্কার-শাস্ত্রে আছে কি না জানি না। ঐ শব্দটার যখন প্রথম উদ্ভবন হয়েছিল তখন ঠিক কী বুঝে হয়েছিল তা নিশ্চিত বলবার মতো বিদ্যা আমার নেই। কিন্তু আমি যাকে সাহিত্য ব'লে থাকি তার সঙ্গে ঐ শব্দটার অর্থের মিল করে যদি দেখাই তবে তাতে বোধ করি দোষ হবে না।

সাহিত্যের সহজ অর্থ বা ঐকি সে হচ্ছে নৈকটা, অর্থাৎ সঞ্জিলন। মানুষকে মিলতে হয় নানা প্রয়োজনে, আবার মানুষকে মিলতে হয় কেবল মেলবারই জন্তে, অর্থাৎ সাহিত্যেরই উদ্দেশ্যে। শাকসব্জির ক্ষেতের সঙ্গে মানুষের যোগ ফসল ফলানোর যোগ। ফুলের বাগানের সঙ্গে যোগ সম্পূর্ণ পৃথক জাতের। সব্জি-ক্ষেতের শেষ উদ্দেশ্য ক্ষেতের বাইরে, সে হচ্ছে ভোজ্য সংগ্রহ। ফুলের বাগানের বে উদ্দেশ্য তাকে এক হিসাবে সাহিত্য বলা যেতে পারে। অর্থাৎ মন তার সঙ্গে মিলতে চায়—সেখানে গিয়ে বসি, সেখানে বেড়াই, সেখানকার সঙ্গে যোগে মন খুসি হয়।

এর থেকে বুঝতে পারি ভাষার ক্ষেত্রে সাহিত্য শব্দের তাৎপর্য কী। তার কাজ হচ্ছে হৃদয়ের যোগ ঘটানো যেখানে যোগটাই শেষ লক্ষ্য।

ব্যবসাদার গোলাপজলের কারখানা করে, শহরের হাটে বিক্রি করতে পাঠায় ফুল। সেখানে ফুলের সৌন্দর্য-

মহিমা গৌণ, তার বাজারদরের হিসাবটাই মুখ্য। বলা বাহুল্য, এই হিসাবটাতে আগ্রহ থাকতে পারে কিন্তু রস নেই। ফুলের সঙ্গে অইতুক মিলনে এই হিসাবের চিত্রাটা আড়াল তুলে দেয়। গোলাপজলের কারখানাটা সাহিত্যের সামগ্রী হ'ল না। হাতেও পারে কবির হাতে, কিন্তু মালেকের হাতে নয়।

সে অনেক দিনের কথা, বোটে চলেছি পদ্মায়। শরৎ কালের সন্ধ্যা; সূর্য মেঘস্তবকের মধ্যে তাঁর শেষ ঐশ্বর্যের সর্বস্ব-দান পণ করে সদা অস্ত গেলেন। আকাশের নীরবতা অনির্কচনীয় শাস্ত রসে কানায় কানায় পূর্ণ; ভরা নদীতে কোথাও একটু চাঞ্চল্য নেই; স্তব্ধ চিত্রণ জলের উপর সন্ধ্যাত্তের নানা বর্ণের দীপ্তিচ্ছায়া স্নান হয়ে মিলিয়ে আসছে। পশ্চিম দিকের তীরে দিগন্তপ্রসারিত জনশূন্য বালুচর প্রাচীন যুগান্তরের অতিকায় সরীসৃপের মতো পড়ে আছে। বোট চলেচে অল্প পারের প্রান্ত বেয়ে, ভাঙন-ধরা খাড়া পাড়ির তলা দিয়ে দিয়ে; পাড়ির গায়ে শত শত গর্তে গাঙশালিখের বাসা; হ্যাং একটা বড় মাছ জলার তলা থেকে ক্ষণিক কলশকে লাফ দিয়ে উঠে বঙ্কিম ভঙ্গীতে তখন তলিয়ে গেল। আমাকে চকিত আভাসে জানিয়ে দিয়ে গেল এই জল-যবনিকার অন্তরালে নিঃশব্দ জীবলোকে মৃত্যুপর প্রাণের আনন্দের কথা, আর সে যেন নমস্কার নিবেদন করে গেল বিলীয়মান দিনান্তের কাছে। সেই মুহূর্তেই তপসি মাঝি চাপা আক্ষেপের সুরে সনিঃশ্বাসে বলে উঠল, ওঃ মস্ত মাছটা! মাছটা ধরা পড়েছে আর সেটা তৈরি হচ্ছে রান্নার জন্তে, এই ছবিটাই তার মনে জেগে উঠল, চারদিকের অল্প ছবিটা খণ্ডিত হয়ে দূরে গেল স'রে। বলা যেতে পারে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তার সাহিত্য গেল নষ্ট হয়ে। আহা! তার আসক্তি তাকে আপন ঋতুরগহ্বরের কেন্দ্রে টেনে রাখল। আপনাকে না ভুললে মিলন হয় না।

মানুষের নানা চাওয়া আছে, সেই চাওয়ার মধ্যে একটি হচ্ছে খাবার জন্তে এই মাছকে চাওয়া। কিন্তু তার চেয়ে তার বড় চাওয়া, বিশ্বের সঙ্গে সাহিত্য অর্থাৎ সন্মিলন চাওয়া,—নদীতীরে সেই সূর্যাস্ত-আলোকে মহিমাশিত্ত স্নানাসনকে সমস্ত মনের সঙ্গে মিলিত করতে

চাওয়া। এই চাওয়া আপনার অবরোধের মধ্য থেকে আপনাকে বাইরে আনতে চাওয়া। বক দাঁড়িয়ে আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বনের প্রান্তে সরোবরের তটে, সূর্য উঠে আকাশে, আরক্ত রশ্মির স্পর্শপাতে জল উঠে ঝলমল ক'রে—এই দৃশ্যের সঙ্গে নিবিড় ভাবে সন্মিলিত আপনার মনটিকে ঐ বক কি চাইতে জানে? এই আশ্চর্য চাওয়ার প্রকাশ মানুষের সাহিত্যে। তাই ভরুহরি বলেছেন, যে-মানুষ সাহিত্যসঙ্গীতকলাবিহীন সে পশু, কেবল তার পুচ্ছবিয়োগ নেই এই মাত্র প্রভেদ। পশু-পক্ষীর চৈতন্য প্রধানত আপন জীবিকার মধ্যেই বন্ধ—মানুষের চৈতন্য বিশ্বে মুক্তির পথ তৈরি করছে, বিশ্বে প্রসারিত করছে নিজেকে—সাহিত্য তারি একটি বড় পথ।

আমি যে-টোবিলে বসে লিখছি তার একধারে এক পুষ্পপাত্রে আছে রজনীগন্ধার গুচ্ছ, আর একটাতে আছে ঘন সবুজ পাতার কাঁকে কাঁকে সদা গন্ধরাজ। লেখবার কাজে এর প্রয়োজন নেই। এটি অপ্রয়োজনের আয়োজনে আমার একটা আত্মসম্মানের ঘোষণা আছে মাত্র। ঐটেতে আমার একটা কথা নীরবে রয়ে গেছে; সে এই যে, জীবনযাত্রার প্রয়োজন আমার চারদিকে আপন নীরব প্রাচীর তুলে আমাকে আটক করে নি। আমার মুক্ত স্বরূপ আপনাকে প্রমাণ করছে ঐ ফুলের পাত্রে। চৈতন্য বার বন্দী, বিশ্বের সঙ্গে যথার্থ সাহিত্যলাভের মাঝখানে তার বাধা আছে—তার রিপু, তার দুর্বলতা, তার কল্পনাদৃষ্টির অন্ধতা। আমি বন্দী নই, আমার হার খোলা, তার প্রমাণ দেবে ঐ অনাবগ্ধক ফুল; ওর সঙ্গে যোগ বিশ্বের সঙ্গে যোগেরই একটি মুক্ত বাতায়ন। ওকে চেয়েচি সেই অইতুক চাওয়ায় মানুষ যাতে মুক্ত হয় একান্ত আবশ্যিকতা থেকে। এই আপন নিষ্কাম সৎস্রটি স্বীকার করবার জন্তে মানুষের কত উদ্যোগ তার সংখ্যা নেই। এই কথাটাই ভালো করে প্রকাশ করবার জন্তে মানবসমাজে রয়েছে কত কবি, কত শিল্পী।

সদ্যঃতরি নতুন মন্দির, চুনকাম করা। তার চারদিকে গাছপালা। মন্দিরটা তার আপন শ্রামল পরিবেশের

সঙ্গে মিলতে না। সে আছে উদ্ধত হয়ে স্বতন্ত্র হয়ে। তার উপর দিয়ে কালের প্রবাহ বইতে থাকে, বৎসরের পর বৎসর এগিয়ে চলে। বর্ষার জলধারায় প্রকৃতি তার অভিব্যক্তি করুক, রৌদ্রের তাপে তার বাণীর বাধন কিছু কিছু ধসতে থাকে, অদৃশ্য শৈবালের বীজ লাগুক তার গায়ে এসে,— তখন ধীরে ধীরে বনপ্রকৃতির রং লাগবে এর সর্বক্ষে, চারিদিকের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ হ'তে থাকবে। বিষয়ী লোক আপনার চারদিকের সঙ্গে মেলে না; সে আপনাকে আপনি পৃথক, এমন কি জ্ঞানী লোকও মেলে না, সে স্বতন্ত্র, মেলে ভাবুক লোক। সে আপন ভাবরসে বিশ্বের দেহে আপন রং লাগায়, মানুষের রং। স্বভাবত বিশ্বজগৎ আমাদের কাছে তার বিস্তৃত প্রাকৃতিকতার প্রকাশ পায়। কিন্তু মানুষ তো কেবল প্রাকৃতিক নয়, সে মানসিক। মানুষ তাই বিশ্বের উপর অহরহ আপন মন প্রয়োগ করতে থাকে। বস্তুবিশ্বের সঙ্গে মনের সামঞ্জস্য খটিয়ে তোলে। জগৎটা মানুষের ভাবানুসঙ্গে অর্থাৎ তার এসোসিয়েশনে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির মানবিক পরিণতির পরিবর্তন পরিবর্তন ঘটে। আদিযুগের মানুষের কাছে বিশ্বপ্রকৃতি যা ছিল আমাদের কাছে তা নয়। প্রকৃতিকে আমাদের মানবতাবের বতই অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছি আমাদের মনের পরিণতিও ততই বিস্তার ও বিশেষত্ব লাভ করেছে।

আমাদের জাহাজ এসে লাগচে জাপান বন্দরে। চেয়ে দেখুন দেশটার দিকে—নতুন লাগল, সুন্দর লাগল। জাপানী এসে দাঁড়ালে ডেকের রেলিং ধরে। সে কেবল সুন্দর দেশ দেখলে না, সে দেখলে যে-জাপানের গাছপালা নদী পর্বত যুগে যুগে মানব-মনের সংস্পর্শে বিশেষ রসের রূপ নিয়েছে, সেটা প্রকৃতির নয় সেটা মানুষের। এই রসরূপটি মানুষই প্রকৃতিকে দিয়েছে, দিয়ে তার সঙ্গে মানবজীবনের একান্ত সাহিত্য খটিয়েছে। মানুষের দেশ যেমন কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নয় তা মানবিক, সেই ক্ষেত্রে দেশ তাকে বিশেষ আনন্দ দেয়—তেমনি করেই মানুষ সমস্ত জগৎকে হৃদয়রসের বোঁগে আপন মানবিকতার আবৃত করচে, অধিকার করচে, তার সাহিত্য ঘটচে সর্বত্রই। মানুষেরা সর্বমেবা-বিগম্ভি।

বাহিরের তথ্য বা ঘটনা যখন ভাবের সামগ্ৰী হয়ে

আমাদের মনের সঙ্গে রসের প্রভাবে মিলে যায় তখন মানুষ স্বভাবতই ইচ্ছা করে সেই মিলনকে সর্বকালের সর্বজন্মের অঙ্গীকারভুক্ত করতে। কেননা রসের অনুভূতি প্রবল হ'লে সে ছাপিয়ে যায় আমাদের মনকে। তখন তাকে প্রকাশ করতে চাই নিতাকালের ভাষায়; কবি সেই ভাষাকে মানুষের অনুভূতির ভাষা করে তোলে; অর্থাৎ জ্ঞানের ভাষা নয় হৃদয়ের ভাষা, কল্পনার ভাষা। আমরা যখন বিশ্বের সে কোনো বস্তুকে বা ব্যাপারকে ভাবের চক্ষে দেখি তখন সে আর যদের দেখা পাকে না, ফোটোগ্রাফিক লেন্সের যে যথার্থ দেখা তার থেকে তার স্বতন্ত্র প্রভেদ ঘটে। সেই প্রভেদটাকে অবিকল বর্ণনার ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মায়ের চোখে দেখা খোকায় পায়ে ছোট্টো লাল জুতোকে জুতো বললে তাকে যথার্থ করে বলাই হয় না। মাকে তাই বলতে হ'ল “খোকা যাবে নায়ে লাল জুতুয়া পায়ে।” অভিধানের কোথাও এ শব্দ নেই। বৈষ্ণব পদাবলীতে যে মিশ্রিত ভাষা চলে গেছে সেটা যে কেবলমাত্র হিন্দী ভাষার অপভ্রংশ তা নয়, সেটাকে পদকর্তারা ইচ্ছা করেই রক্ষা করেছেন, কেননা অনুভূতির অসাধারণতা ব্যক্ত করবার পক্ষে সাধারণ ভাষা সহজ নয়। ভাবের সাহিত্য মাত্রই এমন একটা ভাষার সৃষ্টি হয় যে-ভাষা কিছুবা বলে কিছুবা গোপন করে, কিছু যার অর্থ আছে, কিছু আছে মূর। এই ভাষাকে কিছু আড় করে বাকা করে, এর সঙ্গে রূপক মিশিয়ে, এর অর্থক উলট-পালট করে তবেই বস্তুবিশ্বের প্রতিবর্তে মানুষের মধ্যে যে ভাবের বিশ্ব সৃষ্টি হ'তে থাকে তাকে সে প্রকাশ করতে পারে। নইলে কবি বলবে কেন, “দেখিবারে আঁধি পাখী ধায়।” দেখবার আগ্রহ একটা সাধারণ ঘটনা মাত্র। সেই ঘটনাকে বাইরের জিনিষ ক'রে না রেখে তাকে মনের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হ'ল যখন কবি একটা অদ্ভুত কথা বললে, “দেখিবারে আঁধি পাখী ধায়।” আগ্রহ যে পাখীর মতন ধায় এটা মনের সৃষ্টি ভাষা, বিবরণের ভাষা নয়।

গোধূলি বেলায় অন্ধকারে রূপসী মন্দির থেকে বাইরে এল, এ ঘটনাটা বাহ্য ঘটনা এবং অত্যন্ত সাধারণ। কবি বললেন, নব বর্ষার মেঘ বিহ্যতের রেখা যেন হৃদয় প্রসারিত করে দিলে গেল। এই উপমাটির বোঁগে বাহিরের ঘটনা

আপন চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেল আমাদের অন্তরে। মন এঁকে
স্বপ্নের বিষয় করে কুলে আপন করে নিলে।

কোনো এক অজ্ঞাতনামা গ্রীক কবির লিখিত কোনো
একটি শ্লোকের গদ্য অনুবাদ দিচ্ছি :—(ইংরেজী তর্জমার
থেকে)—“আপেল গাছের ডালের কাঁকে কাঁকে বুরু বুরু
বইছে শরতের হাওয়া। থরু থরু করে কেঁপে-ওঠা পাতার
মধ্যে থেকে ঘুম আসছে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীর দিকে—
ছড়িয়ে পড়ছে নদীর ধারার মতো।” এই যে কম্পমান
ডালপালার মধ্যে মর্মরমুখর স্নিগ্ধ হাওয়ায় নিঃশব্দ নদীর
মতো ব্যাপ্ত হয়ে পড়া ঘুমের রাত্রি এ আমাদের মনের
রাত্রি। এই রাত্রিকে আমরা আপন করে তুলে তবেই
স্বপ্ন ভাবে উপভোগ করতে পারি।

কোনো চীন দেশীয় কবি বলছেন :—

পাহাড় একটানা উঠে গেছে বহুশত হাত উচ্ছে ;

সরোবর চলে গেছে শত মাইল,

কোথাও তার ঢেউ নেই ;

বাঁশি ধুঁ ধুঁ করছে নিঃশব্দ শব্দ ;

শীতে গ্রীষ্মে সমান অক্ষুণ্ণ সবুজ দেওদার বন ;

নদীর ধারা চলেইছে, বিরাম নেই তার ;

গাছগুলো বিশ হাজার বছর

আপন পণ সমান রক্ষা করে এসেছে—

হঠাৎ এরা একটি পখিকের মন থেকে

জুড়িয়ে দিল সব দুঃখ বেদনা,

একটি নতুন গান বাঁবার জন্তে

চালিয়ে দিল তার লেখনীকে ॥

মানুষের দুঃখ জুড়িয়ে দিলো নদী পর্বত সরোবর।
সম্ভব হয় কী করে? নদীপর্বতের অনেক প্রাকৃতিক গুণ
আছে কিন্তু মানুষের মানসিক গুণ তো নেই। মানুষের
আপন মন তার মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে নিজের সাক্ষ্য সৃষ্টি করে।
যা বস্তুগত জিনিষ তা মানুষের মনের স্পর্শে তারই মনের
জিনিষ হয়ে ওঠে। সেই মনের বিশ্বের সন্মিলনে মানুষের
মনের দুঃখ জুড়িয়ে যায়, তখন সেই সাহিত্য থেকেই
সাহিত্য জাগে।

বিশ্বের সঙ্গে এই মিলনটি সম্পূর্ণ অনুভব করার এক
উপভোগ করার ক্ষমতা সকলের সমান নয়। কারণ যে

শক্তির দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের মিলনটা কেবলমাত্র
ইঞ্জিয়ের মিলন না হয়ে মনের মিলন হয়ে ওঠে সে
শক্তি হচ্ছে কল্পনাশক্তি; এই কল্পনাশক্তিতে মিলনের
পথকে আমাদের অন্তরের পথ করে তোলে, যা কিছু
আমাদের থেকে পৃথক এই কল্পনার সাহায্যেই তাদের
সঙ্গে আমাদের একাত্মতার বোধ সম্ভবপর হয়, যা আমাদের
মনের জিনিষ নয় তার মধ্যেও মন প্রবেশ করে তাকে
মনোময় করে তুলতে পারে। এই লীলা মানুষের,
এই লীলার তার অনিন্দ। যখন মানুষ বলে “কোথায়
পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে” তখন বুঝতে
হবে যে-মানুষকে মন দিয়ে নিজেরই ভাবরসে আপন
করে তুলতে হয় তাকেই আপন করা হয় নি—সেইজন্তে
“হারিয়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে দেশ-বিদেশে বেড়াই
ঘুরে।” মন তাকে মনের করে নিতে পারে নি বলেই
বাইরে বাইরে ঘুরচে। মানুষের বিশ্ব মানুষের মনের বাইরে
বদি থাকে সেটাই নিরানন্দের কারণ হয়। মন যখন তাকে
আপন করে নেয় তখনই তার ভাবায় শুরু হয় সাহিত্য,
তার লেখনী বিচলিত হয় নতুন গানের বেদনায়।

মানুষও বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গত। নানা অবস্থার দ্বারা
প্রতিঘাতে বিশ্ব জুড়ে মানবলোকে হৃদয়বেগের ঢেউখেলা
চলেছে। সমগ্র করে একান্ত করে স্পষ্ট করে তাকে
দেখার দুটি মস্ত বাধাত আছে। পর্বত বা সরোবর
বিরাজ করে অক্রিয় অর্থাৎ প্যাসিভ ভাবে, আমাদের
সঙ্গে তাদের যে ব্যবহার সেটা প্রাকৃতিক, তার মধ্যে
মানসিক কিছু নেই, এই জন্তে মন তাকে সম্পূর্ণ অধিকার
করে আপনভাবে ভাবিত করতে পারে সহজেই। কিন্তু
মানবসংসারের বাস্তব ঘটনাবলীর সঙ্গে আমাদের মনের
যে সম্পর্ক ঘটে সেটা সক্রিয়। দুঃশাসনের হাতে কোরব-
সভায় দ্রৌপদীর যে অসম্মান ঘটেছিল তদনুরূপ ঘটনা
বদি পাড়ায় ঘটে তাহলে তাকে আমরা মানব-ভাগ্যের
বিরাট শোকাবহ লীলার অঙ্গরূপে বড় করে দেখতে
পারি নে। নিত্য ঘটনাবলীর ক্ষুদ্র সীমায় বিচ্ছিন্ন একটা
অন্তায় ব্যাপার বলেই তাকে জানি, সে একটা পুন্ডিক
কেন্দ্ররূপেই আমাদের চোখে পড়ে,—যুগের সঙ্গে দ্বিধার
সঙ্গে প্রাত্যহিক সংবাদ-আবর্তনার মধ্যে তাকে কোঁটিয়ে

ফেলি। মহাত্মার তের খাণ্ডবন্দনা হ বাস্তবতার একান্ত নৈকটা থেকে বহু দূরে গেছে—সেই দূরত্ববশত সে অকর্ষক হয়ে উঠেছে। মন তাকে তেমনি করেই সম্ভোগদৃষ্টিতে দেখতে পারে যেমন ক'রে সে দেখে পর্কতকে সরোবরকে। কিন্তু যদি খবর পাই অগ্নিগিরিশ্রাবে শত শত লোকালয় শসাক্ষত্র পুড়ে ছাই হয়ে বাজে, দহ হছে শত শত মানুষ পশুপক্ষী তবে সেটা আমাদের কল্পনা অধিকার ক'রে চিত্তকে পীড়িত করে। ঘটনা যখন বাস্তবের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কল্পনার বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে উত্তীর্ণ হয় তখন আমাদের মনের কাছে তার সাহিত্য হয় বিগুণ ও বাধাহীন।

মানব ঘটনাকে সুস্পষ্ট ক'রে দেখবার আর একটি ব্যাধাত আছে। সংসারে অধিকাংশ স্থলেই ঘটনামূলি সুসংলগ্ন হয় না, তার সমগ্রতা দেখতে পাইন। আমাদের কল্পনার দৃষ্টি ঐক্যকে সন্ধান করে এবং ঐক্যস্থাপন করে। পাড়ায় কোনো জংশাসনের দৌরাত্ম্য হয়তো জেনেচি বা খবরের কাগজে পড়েচি। কিন্তু এই ঘটনাটি তার পূর্ববর্তী পরবর্তী দূর শাখাপ্রশাখাবর্তী একটা প্রকাণ্ড টাজেডিকে অধিকার ক'রে হয়তো রয়েছে,—আমাদের সামনে সেই ভূমিকাটি নেই—এই ঘটনাটি হয়তো সমস্ত বংশের মধ্যে পিতামাতা চরিত্রের ভিতর দিয়ে অতীতের মধ্যেও প্রসারিত, কিন্তু সে আমাদের কাছে অগোচর। আমরা তাকে দেখি টুকুরো টুকুরো ক'রে, মাঝখানে বহু অবাস্তুর বিঘ্ন ও ব্যাপারের দ্বারা সে পরিচ্ছিন্ন, সমস্ত ঘটনাটির সম্পূর্ণতার পক্ষে তাদের কোনগুলি সার্থক, কোনগুলি নিরর্থক তা আমরা বাছাই করে নিতে পারি নে। এই ক্ষেত্রে তার বৃহৎ তাৎপর্য ধরা পড়ে না। যাকে বলছি বৃহৎ তাৎপর্য তাকে যখন সমগ্র ক'রে দেখি তখন সাহিত্যের দেখা সম্ভব হয়। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় প্রতিদিন যে-সকল খণ্ড খণ্ড ঘটনা ঘটছিল সেদিন তাদের চরম অর্থ কেই বা দেখতে পেয়েচে, কার্ল হিল তাদের বাছাই করে নিয়ে আপনার কল্পনার পটে সাজিয়ে একটি সমগ্রতার ভূমিকায় যখন দেখালেন, তখন আমাদের মন এই সকল বিচ্ছিন্নকে নিরবচ্ছিন্নরূপে অধিকার করতে পেরে নিকটে পেলে। ঐটি ইতিহাসের পক্ষ থেকে তাঁর বাছাইয়ে অনেক দোষ

থাকতে পারে, অনেক অতুক্তি অনেক উল্লেখ হয়তো আছে এর মধ্যে; বিগুণ তথ্যবিচারের পক্ষে কেমন দৃষ্টান্ত অত্যাধিক তার হয়তো অনেক বাদ পড়ে গেছে। কিন্তু কার্ল হিলের রচনায় যে সুনিবিড় সমগ্রতার ছবি আঁকা হয়েছে তার উপরে আমাদের মন অব্যবহিতভাবে যুক্ত ও বাস্তব হ'তে বাধ্য পায় না, এই ক্ষেত্রে ইতিহাসের দিক থেকে যদি বা সে অসম্পূর্ণ হয় তবু সাহিত্যের দিক থেকে সে পরিপূর্ণ।

এই বর্তমান কালেই আমাদের দেশে চারদিকে খণ্ড খণ্ড ভাবে রাষ্ট্রিক উদ্যোগের নানা প্রয়াস নানা ঘটনায় উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। ফৌজদারী শাসনতন্ত্রের বিশেষ বিশেষ আইনের কোঠায় তাদের বিবরণ শুন্ছি সংবাদপত্রের নানাজাতীয় আন্তর্জাতীয় মন্ত্রধর্মনির মধ্যে। ভারতবর্ষের এ যুগের সমগ্র রাষ্ট্ররূপের মধ্যে তাদের পূর্ণভাবে দেখবার সুযোগ হয় নি—যখন হবে তখন তারা মানুষের সমস্ত বীর্ষ্য সমস্ত বেদনা সমস্ত ব্যর্থতা বা সার্থকতা সমস্ত ভুলত্রুটি নিয়ে সংবাদপত্রের ছায়ালোক থেকে উঠবে সাহিত্যের জ্যোতিষ্কলোকে। তখন জজ ম্যাজিস্ট্রেট আইনের বই পুলিশের বই সমস্ত হবে গোণ, তখন আজকের দিনের ছিন্নবিচ্ছিন্ন ছোট বড় স্ব-স্ব-বিরোধ একটা বৃহৎ ভূমিকায় ঐক্য লাভ করে নিত্যকালের মানব-মনে বিরাট মূর্তিতে প্রত্যক্ষ হবার অধিকারী হবে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের নানাবিধ সম্বন্ধ ও সংঘাত নিয়ে পৃথিবী জুড়ে আমাদের অভিজ্ঞতা বিচিত্র হয়ে চলেচে। সে একটা মানস জগৎ, বহু যুগের রচনা। তাকে আমরা নৃতত্ত্বের দিক থেকে মনস্তত্ত্বের দিক থেকে ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার ক'রে মানুষের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারি। সে হ'ল তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ। কিন্তু এই অভিজ্ঞতার জগতে আমরা প্রকাশ-বৈচিত্র্যবান মানুষের নৈকটা কামনা করি। এই চাওয়াটা আমাদের মনে অত্যন্ত গভীর ও প্রবল। শিশুকাল থেকে মানুষ বলেচে গল্প বলো, সেই গল্প তথ্যের প্রদর্শনী নয়, কোনো একটা মানব পরিচয়ের সমগ্র ছবি, আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা দানা বেঁধেচে তার মধ্যে। রূপের মোহিনী শক্তি, বিশদের পথে বীরত্বের অধ্যবসায়, ছলভের সন্ধান

ছন্দাঙ্ক উদ্যম, মনের সঙ্গে ভালোর লড়াই, ভালোবাসার সাধনা, জন্মায় তার বিষ, এ সমস্ত জন্মবোধ নানা অবস্থায় নানা আকারে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে আছে, এর কোনোটা সুখের কোনোটা দুঃখের, এদের মাজিয়ে গল্পের ছবিতে রূপ দিয়ে রূপকথায় ছেলেদের সঙ্গে জোগানো হচ্ছে আদিকাল থেকে। এর মধ্যে অলৌকিক জীবের কথাও আছে কিন্তু তারা মানুষেরই প্রতীক। আছে দৈত্য-দানব; বস্তুত তারা মানুষ, ব্যাকমা-বেঙ্গমি, তারাও তাই। এই সব গল্পে মানুষের বাস্তব জগৎ কল্পনায় রূপান্তরিত হয়ে শিশুমনের জগৎরূপে দেখা দেয়, শিশু আনন্দিত হয়ে ওঠে। মানুষ যে স্বভাবত সৃষ্টিকর্তা, তাই সে সব-কিছুকে আপন সৃষ্টিতে পরিণত করে তাতে বাসা বাধে; নিছক বিধাতার সৃষ্টিতে তাকে কুলোয় না। মানুষ আপন হাতে আপনাকে, আপন সংসারকে তৈরি করে,—সেই সংসারের ছবি বানায় আপন হাতে, তাতে তাকে নিবিড় আনন্দ দেয়, কেননা সেই ছবি তার মনের নিত্যস্তু কাছে আসে। যে শকুন্তলার ঘটনা মানব সংসারে ঘটতে পারে তাকেই কবি আমাদের মনের কাছে নিবিড়তর সত্য করে দেখিয়ে দেন। রামায়ণ রচিত হ'ল, রচিত হ'ল মহাভারত। রামকে পেলুম, সে তো একজন মানুষের রূপ নয়, অনেক কাল থেকে অনেক মানুষের মধ্যে যে-সকল বিশেষ গুণের ক্ষণে ক্ষণে কিছু কিছু স্বাদ পাওয়া গেছে কবির মনে সে সমস্তই দানা বেধে উঠল রামচন্দ্রের মূর্তিতে। রামচন্দ্র হয়ে উঠলেন আমাদের মনের মানুষ। বাস্তব সংসারে অনেক বিক্ষিপ্ত ভালো লোকের চেয়ে রামচন্দ্র আমাদের মনের কাছে সত্য মানুষ হয়ে ওঠেন। মন তাঁকে যেমন করে স্বীকার করে প্রত্যক্ষ হাজার হাজার লোককে তেমন করে স্বীকার করে না। মনের মানুষ বলতে যে বুঝতে হবে আদর্শ ভালো লোক তা নয়। সংসারে মন্দ লোকও আছে ছড়িয়ে, নানা কিছুর সঙ্গে মিশিয়ে, আমাদের পাচ-মিশোলি অভিজ্ঞতার মধ্যে তাদের মন্দত্ব অসংলগ্ন হয়েই দেখা দেয়। সেই বহুলোকের বহুবিধ মন্দত্বের খণ্ড খণ্ড পরিচয় সংসারে আমাদের কাছে ক্ষণে ক্ষণে এসে পড়ে, তারা আসে তারা যায়, তারা আঘাত করে, নানা ঘটনায় চাপা পড়ে তারা অগোচর

হ'তে থাকে। সাহিত্যে তারা সংহত আকারে এক লাভ ক'রে আমাদের নিত্যমনের সামগ্রী হয়ে ওঠে, তখন তাদের আর ভুলতে পারি নে। শেক্সপীরের রচিত ফলস্টাফ, একটি বিশিষ্ট মানুষ সন্দেহ নেই। তবু বলতে হবে আমাদের অভিজ্ঞতার অনেক মানুষের কিছু কিছু আভাস আছে, শেক্সপীরের প্রতিভার গুণে তাদের সমবায় খনীভূত হয়েছে ফলস্টাফ, চরিত্রে। জোড়া লাগিয়ে তৈরি নয়, কল্পনার রসে জারিত ক'রে তার সৃষ্টি, তার সঙ্গে আমাদের মনের মিল খুব সহজ, এইজন্যে তাতে আমাদের আনন্দ।

এমন কথা মনে হ'তে পারে সাবেক কালের কাব্য-নাটকে আমরা বাদের দেখতে পাই তারা এক-একটা টাইপ, তারা শ্রেণীগত, তাই তারা একই জাতীয় অনেকগুলি মানুষের ভাঙাচোরা উপকরণ নিয়ে তৈরি। কিন্তু আধুনিক কালে সাহিত্যে আমরা বে-চরিত্র দেখি তা ব্যক্তিগত।

প্রথম কথা এই যে ব্যক্তিগত মানুষেরও শ্রেণীগত ভিত্তি আছে, একান্ত শ্রেণীবিচ্ছিন্ন মানুষ নেই। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে বহু মানুষ, আর সেই সঙ্গেই জড়িত হয়ে আছে সেই এক মানুষ, যে বিশেষ। চরিত্রসৃষ্টিতে শ্রেণীকে লঘু করে ব্যক্তিকেই যদিবা প্রাধান্য দিই তবু সেই ব্যক্তিকে আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ অধিগম্য করতে হ'লে তাতে আর্টিষ্টের হাত পড়া চাই। এই আর্টিষ্টের সৃষ্টি প্রকৃতির সৃষ্টির ধারা অনুসরণ করে না। এই সৃষ্টিতে যে মানুষকে দেখি, প্রকৃতির হাতে যদি সে তৈরি হ'ত তা হ'লে তার মধ্যে অনেক বাহুল্য থাকত, সে বাস্তব যদি হ'ত, তবু সত্য হ'ত না, অর্থাৎ আমাদের জন্ম তাকে নিঃসংশয় প্রামাণিক ব'লে মানত না। তার মধ্যে অনেক ফাঁক থাকত, অনেক কিছু থাকত যা নিরর্থক, আগে-পিছের ওজন ঠিক থাকত না। তার এক্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হ'ত না। শতদল পদ্মে যে এক্য দেখে আমরা তাকে মুহূর্তেই বলি হুন্দর তা সহজ—তার সঙ্গীর্ণ বৈচিত্র্যের মধ্যে কোথাও পরস্পর বন্দ নেই, এমন কিছু নেই যা অবধা; আমাদের জন্ম তাকে অধিকার করতে পারে অন্যায়সে, কোথাও বাধা পায়

না। মানুষের সংসারে স্বন্দবহল বৈচিত্র্য আমাদের উদ্ভাস্ত করে দেয়। যদি তার কোনো একটি প্রকাশকে স্পষ্টরূপে হৃদয়গম্য করতে হয় তা হ'লে আর্টিষ্টের সূনিপুণ কল্পনা চাই। অর্থাৎ বাস্তবে যা আছে বাইরে, তাকে পরিণত করে তুলতে হবে মনের জিনিষ করে। আর্টিষ্টের সামনে উপকরণ আছে বিস্তর—সেগুলির মধ্যে গ্রহণ বর্জন করতে হবে কল্পনার নির্দেশ মতো। তার কোনোটাকে বাড়াতে হবে, কোনোটাকে কমাতে, কোনোটাকে সামনে রাখতে হবে, কোনোটাকে পিছনে। বাস্তবে যা বাহ্যিকের মধ্যে বিক্ষিপ্ত তাকে এমন ক'রে সংহত করতে হবে যাতে আমাদের মন তাকে সহজে গ্রহণ ক'রে তার সঙ্গে যুক্ত হ'তে পারে। প্রকৃতির সৃষ্টির দূরত্ব থেকে মানুষের ভাষায় সেতু বেঁধে তাকে মর্মান্বয় নৈকটা দিতে হবে, সেই নৈকটা ঘটায় ব'লেই সাহিত্যকে আমরা সাহিত্য বলি।

মানুষ যে-বিশ্বে জন্মেছে তাকে দুই দিক থেকে কেবলি আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করছে। ব্যবহারের দিক থেকে আর ভাবের দিক থেকে। আগুন যেখানে প্রচ্ছন্ন সেখানে মানুষ আল্প আগুন নিজের হাতে, আকাশের আলো যেখানে অগোচর, সেখানে সে বৈজ্ঞানিক আলোককে প্রকাশ করলে নিজের কৌশলে, প্রকৃতি আপনি যে ফলমূল ফসল বরাদ্দ করে দিয়েছে তার অনিশ্চয়তা ও অস্বচ্ছলতা সে দূর করেছে নিজের লাঙলের চাষে; পর্বতে অরণ্যে গুহাগহ্বরে সে বাস করতে পারত, করে নি; সে নিজের সুবিধা ও কৃতি অনুসারে আপন বাসা আপনি নির্মাণ করেছে। পৃথিবীকে সে অযাচিত পেয়েছিল। কিন্তু সে পৃথিবী তার ইচ্ছার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশ খায় নি, তাই আদিকাল থেকেই প্রাকৃতিক পৃথিবীকে মানব বুদ্ধিকৌশলে আপন ইচ্ছানুগত মানবিক পৃথিবী করে তুলেছে—সে জন্তে তার কত কলবল, কত নির্মাণ-নৈপুণ্য। এখানকার জলেশ্বলে আকাশে পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ আপন ইচ্ছাকে প্রসারিত করে দিচ্ছে। উপকরণ পাচ্ছে সেই পৃথিবীরই কাছ থেকে, শক্তি ধার করছে তারই গুপ্ত ভাঙারে প্রবেশ করে। সেগুলিকে আপন পথে আপন মতে চালনা করে পৃথিবীর রূপান্তর ঘটায়

দিচ্ছে। মানুষের নগর-পল্লী শস্তক্ষেত্র উদ্যান হাট-বাট যাতায়াতের পথ প্রকৃতির সহজ অবস্থাকে ছাপিয়ে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর নানা দেশে ছড়ানো ধনকে মানুষ এক করেছে, নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত শক্তিকে সে সংহত করেছে, এমনি ক'রে দেশ-দেশান্তরে পৃথিবী ক্রমশই অভিত্ত হয়ে আত্মসমর্পণ ক'রে আসছে মানুষের কাছে। মানুষের বিশ্বজয়ের এই একটা পাল্লা বস্তুজগতে; ভাবের জগতে তার আছে আর একটা পাল্লা। ব্যবহারিক বিজ্ঞানে একদিকে তার জয়সুপ্ত, আর একদিকে শিল্পে সাহিত্যে।

যেদিন থেকে মানুষের হাত পেয়েছে নৈপুণ্য, তার ভাষা পেয়েছে অর্থ, সেইদিন থেকেই মানুষ তার ইন্দ্রিয়বোধগম্য জগৎ থেকে নানা উপাদানে উদ্ভাবিত করছে তার ভাবগম্য জগৎকে। তার স্বরচিত ব্যবহারিক জগতে যেমন এখানেও তেমনি; অর্থাৎ তার চারদিকে যা তা যেমন-তেমন ভাবে রয়েছে তাকেই সে অগত্যা স্বীকার করে নেয় নি। কল্পনা দিয়ে তাকে এমন রূপ দিয়েছে হৃদয় দিয়ে তাতে এমন রস দিয়েছে যাতে সে মানুষের মনের জিনিষ হয়ে তাকে দিতে পারে আনন্দ।

ভাবের জগৎ বলতে আমরা কী বুঝি? হৃদয় থাকে উপলব্ধি করে বিশেষ রসের যোগে: অনতিলক্ষ্য বহু অবিশেষের মধ্য থেকে কল্পনার দৃষ্টিতে থাকে আমরা বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করি, সেই উপলব্ধি করা সেই লক্ষ্য করাটাই যেখানে চরম বিষয়।—দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলছি জ্যোৎস্না-রাত্রি। সে রাত্রির বিশেষ একটি রস আছে মনকে তা অধিকার করে। শুধু রস নয়, রূপ আছে তার, দেখি তা কল্পনার চোখে। গাছের ডালে, বনের পথে, বাড়ির ছাদে, পুকুরের জলে নানা ভঙ্গীতে তার আলোছায়ার কোলাকুলি, সেই সঙ্গে নানা ধ্বনির মিলন, পাখীর বাসায় হঠাৎ পাখা-ঝাড়ার শব্দ, বাতাসে বাঁশপাতার ঝরঝরাণি, অন্ধকারে আচ্ছন্ন ঝোপের মধ্য থেকে উঠে ঝিল্লিধ্বনি, নদী থেকে শোনা যায় ডিঙি চলেতে তারি দাঁড়ের ঝপঝপ, দূরে কোন্ বাড়িতে কুকুরের ডাক, বাতাসে অদেখা অজানা ফুলের মৃদু গন্ধ যেন পা টিপে টিপে চলেতে, কখনো তারই মাঝে মাঝে নিঃশব্দিত হয়ে উঠে জানা ফুলের পরিচয়, বহু প্রকারের স্পষ্ট ও অস্পষ্টকে এক ক'রে নিয়ে জ্যোৎস্না-রাত্রির একটা স্বরূপ

দেখতে পারি আমাদের কল্পনার দৃষ্টি। এই কল্পনাদৃষ্টিতে বিশেষ করে সমগ্র করে দেখার জ্যোৎস্না-রাত্রি মানুষের কল্পনের খুব কাছাকাছি জমিষ। তাকে নিয়ে মানুষের সেই অত্যন্ত কাছে পাওয়ার মিলে যাওয়ার আনন্দ।

গোলাপ ফুল অসামান্য, সে আপন সৌন্দর্য্যেই আমাদের কাছে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে, সে স্বতই আমাদের মনের সামগ্রী। কিন্তু যা সামান্য যা অসুন্দর তাকে আমাদের মন কল্পনার ক্রোড়দৃষ্টিতে বিশিষ্ট করে দেখাতে পারে বাইরে থেকে তাকে আতিথা দিতে পারে ভিতরের মহলে। জঙ্গলে আবিষ্ট ভাঙা মেটে পাঁচিলের গা থেকে বাগ্দি বুড়ি বিকেলের পড়ন্ত রোদে ঘুঁটে সংগ্রহ করে আপন ঝড়িতে তুলচে, আর পিছনে পিছনে তার পোষা নেড়ি কুকুরটা লাফালাফি করে বিরক্ত করচে, এই ব্যাপারটি যদি বিশিষ্ট স্বরূপ নিয়ে আমাদের চোখে পড়ে, একে যদি তথ্যমাত্রের সামান্যতা থেকে পৃথক করে এর নিজের অস্তিত্ব-গৌরবে দেখি তা হলে এও জায়গা নেবে ভাবের নিত্য জগতে।

বস্তুত আর্টিষ্টরা বিশেষ আনন্দ পায় এই রকম সৃষ্টিতেই। যা সহজেই সাধারণের চোখ ভোলায় তাতে তার নিজের সৃষ্টির গৌরব জোর পায় না। যা আপনিই ডাক দেয় না তার মুখে সে আমন্ত্রণ জাগিয়ে তোলে; বিধাতার হাতের পাসপোর্ট নেই যার কাছে তাকে সে উত্তীর্ণ করে দেয় মনোলোকে। অনেক সময় বড় আর্টিষ্ট অবজ্ঞা করে সহজ মনোহরকে আপন সৃষ্টিতে ব্যবহার করতে। মানুষ বস্তুজগতের উপর আপন বুদ্ধিকৌশল বিস্তার করে নিজের জীবনযাত্রার একান্ত অনুগত একটি ব্যবহারিক জগৎ সর্বদাই তৈরি করতে লেগেচে। তেমনি মানুষ আপন ইঞ্জিয়বোধের জগৎকে পরিবাস্ত ক'রে বিচিত্র কলাকৌশলে আপন ভাবরসভোগের জগৎ সৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত। সেই তার সাহিত্য। ব্যবহারিক বুদ্ধিনৈপুণ্যে মানুষ কলে বলে কৌশলে বিশ্বকে আপন হাতে পায়, আর কলানৈপুণ্যে কল্পনাক্রমে বিশ্বকে সে আপন কাছে পায়। প্রয়োজনসাধনে এর মূল্য নয়, এর মূল্য আত্মীয়তাসাধনে, সাহিত্যসাধনে।

একবার সেকালের দিকে তাকিয়ে দেখা যাক। সাহিত্য-সাধনা সম্বন্ধে তখনকার দিনের মনোভাবের পরিচয় আছে

একটি কাহিনীতে, সেটা আলোচনার যোগ্য। ক্রোড়-মিথুনের মধ্যে একটিকে বাধ যখন হত্যা করলে তখন ঘুগার আবেগে কবির কণ্ঠ থেকে অনুষ্টুভ ছন্দ সহসা উচ্চারিত হ'ল।

কল্পনা করা যাক বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টিকর্তার ধ্যানে সহসা জ্যোতি উঠল ছেগে। এই জ্যোতির আছে অকুরান বেগ, আছে প্রকাশশক্তি। স্বতই প্রশ্ন উঠল অনন্তের মধ্যে এই জ্যোতি নিয়ে কী করা যাবে? তারই উত্তরে জ্যোতিরায়ক অণুপরমাণুর সংখ্য নিত্য অভিব্যক্ত বিচিত্র রূপ ধরে আকাশে আকাশে আবর্তিত হয়ে চলল, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহিমা সেই আদি জ্যোতিরই উপযুক্ত।

কবিধর্ম্মির মনে যখন সহসা সেই বেগবান শক্তিমান ছন্দের আবির্ভাব হ'ল তখন স্বতই প্রশ্ন জাগল, এরই উপযুক্ত সৃষ্টি হওয়া চাই। তারই উত্তরে রচিত হ'ল রামচরিত। অর্থাৎ এমন কিছু যা নিত্যতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হবার যোগ্য। যার সান্নিধ্য অর্থাৎ যার সাহিত্য মানুষের কাছে আদরণীয়।

মানুষের নিষ্কাশনশক্তি বলশালী, আশ্চর্য্য তার নৈপুণ্য। এই শক্তি এই নৈপুণ্য নিয়ে সে বড় বড় নগর নিষ্কাশন করেছে। এই নগরের মূর্ত্তি যেন মানুষের গৌরব করবার যোগ্য হয় এ কথা সেই জাতির মানুষ না ইচ্ছা ক'রে থাকতে পারে নি, যাদের শক্তি আছে যাদের আত্মসম্মান বোধ আছে, যারা সত্য। সাধারণত সেই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নানা রিপু এসে ব্যাঘাত ঘটায়—মুন্ফা করবার লোভ আছে, শস্যায় কাজ সারবার কুপণতা আছে, দরিদ্রের প্রতি ধনী কর্তৃপক্ষের ওদাসীত্ব আছে, অশিক্ষিত বিকৃতক্রটি বন্ধরতাও এসে পড়ে এর মধ্যে, তাই নির্লজ্জ নির্মমতায় কুৎসিত পাটকল উঠে দাঁড়ায় গঙ্গাতীরের পবিত্র শ্যামলতাকে পদদলিত ক'রে, তাই প্রাসাদশ্রেণীর অন্তরালে নানাজাতীয় দুর্দৃশ্য বসতি পাড়া অস্বাস্থ্য ও অশোভনতাকে পালন করতে থাকে আপন কলুষিত আশ্রয়ে, যেমন-তেমন কদর্য্যভাবে যেখানে-সেখানে ঘরবাড়ি, তেলকল, নোংরা দোকান, গলিঘুঁজি চোখের ও মনের পীড়া বিস্তারপূর্ব্বক দেশে ও কালে আপন স্বাধিকার পাকা করতে থাকে। কিন্তু রিপুর প্রবলতা ও

অক্ষমতার নিদর্শন স্বরূপে এই সমস্ত বাতায়কে স্বীকার করে তবুও মোটের উপরে এ-কথা মানতে হবে, যে, সমস্ত শহরটা শহরবাসীর গৌরব করবার উপযুক্ত যাতে হয় এই ইচ্ছাটাই সত্য। কেউ বলবে না শহরের সত্য তার কদর্যা বিকৃতিগুলো। কেননা শহরের সঙ্গে শহরবাসীর অত্যন্ত নিকটের যোগ, সে-যোগ স্থায়ী যোগ, সে-যোগ আত্মীয়তার যোগ, এমন যোগ নয় যাতে তার আত্মনির্মাননা।

সাহিত্য সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলা চলে। তার মধ্যে রিপূর আক্রমণ এসে পড়ে, ভিতরে ভিতরে দুর্বলতার নানা চিহ্ন দেখা দিতে থাকে, মলিনতার কলঙ্ক লাগতে থাকে যেখানে-সেখানে, কিন্তু তবু সকল হীনতা দীনতাকে ছাড়িয়ে উঠে যে সাহিত্যে সমগ্রভাবে মানুষের মহিমা প্রকাশ না হয় তাকে নিয়ে গৌরব করা চলবে না, কেননা সাহিত্যে মানুষ আপনারই সঙ্গকে, আপনার

সাহিত্যকে প্রকাশ করে স্থায়িত্বের উপাদানে। কেননা চিরকালের মানুষ বাস্তব নয়, চিরকালের মানুষ ভাবুক; চিরকালের মানুষের মনে যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে কাজ করেছে তা অভ্রভেদী, তা স্বর্গাভিমুখী, তা অপরাহত পৌরুষের তেজে স্ফোতির্ময়। সাহিত্যে সেই পরিচয়ের ক্ষীণতা যদি কোনো ইতিহাসে দেখা যায় তা হ'লে লজ্জা পেতে হবে, কেননা সাহিত্যে মানুষ নিজেরই অন্তরতম পরিচয় দেয় নিজের অগেচরে, যেমন পরিচয় দেয় ফুল তার গন্ধে, তারা তার আলোকে। এই পরিচয় সমস্ত জাতির জীবনযন্ত্রে জ্বালিয়ে তোলা অগ্নিশিখার মতো, তারি থেকে জ্বলে তার ভাবীকালের পথের মশাল, তার ভাবীকালের গৃহের প্রদীপ।*

শান্তিনিকেতন

১৯৭১. ৭. ৩৪.

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত।

দৃষ্টি-প্রদীপ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

২

দাদা কালীগঞ্জে একটা বাতাসার কারখানায় কাজ করে। অনেক দিন তার সঙ্গে দেখা হয় নি, কিছু টাকার দরকারও ছিল, কারণ কলেজের কিছু বাকী মাইনে ও পরীক্ষার ফি-এর টাকার অভাব হওয়াতে শৈলদি লুকিয়ে যোগটা টাকা দিয়েছিল। যাবার আগে সে-টাকাটা তাকে দিয়ে যাওয়া দরকার, যদিও সে চায় নি। বাশবেড়ের ঘাটে গঙ্গা পার হয়ে ওপারে যাব, খেয়ার নৌকা আসতে দেরি হচ্ছে, আমি প্রকাণ্ড একটা পুরোনো বাঁধাঘাটের সিঁড়িতে বসে অপেক্ষা করছি। ঘাটের ওপরে একটা জীর্ণ প্রাচীন শিবমন্দির, তার ফাটলে ফাটলে বট অশ্বখের গাছ, মন্দিরের চূড়ার ত্রিশূলটা

পশ্চিমে হেলে-পড়া সন্ধ্যার সূর্যের আলোয় মনে হচ্ছে যেন সোনার। তারি ভাল লাগছিল মন্দিরটা, আর এই জনবিরল বাঁধাঘাট। ওই মন্দিরে যদি আরতি হ'ত, এই সন্ধ্যায় বন্দনারত নরনারীর দল ওই ভাঙা চাতালে দাঁড়িয়ে রইত—তবে আমার আরও ভাল লাগত। কথাটা ভাবছি, এমন সময়ে আমার শরীরটা বেন কেমন ক'রে উঠল, কানের পাশটা শিরশির করতে লাগলো। হঠাৎ আমার মনে হ'ল এই ঘাটের এই মন্দিরে খুব বড় একজন সাধুপুরুষ আছেন, তাঁর দীর্ঘ চেহারা, মাথায় বড় বড় চুল, প্রসন্ন হাসিমাখানো মুখ। আমি তাঁকে দেখতে পেলাম না। কিন্তু তাঁর উপস্থিতি অনুভব করলাম। তিনি এখানে অনেক দিন আছেন, ভাঙা ঘাটের রানায় ব'সে ওপারের

উদিতমান পূর্ণচন্দ্রের দিকে চেয়ে এই সন্ধ্যার তিনি উপাসনা করেন—এবং তিনি কারও ওপর রাগেন না। কত লোক না-বুঝে ঘাটের নির্জনতা ভঙ্গ করে, তিনি সদাই প্রসন্ন, সকলের ওপরে সদাই মেহশীল।

এরকম যখন হয়, তখন আমার শরীর যেন আমার নিজের থাকে না—নয়ত আমার সাধারণ অবস্থা থাকলে জিগ্যেস করতুম অনেক কথাই তাঁকে। একটু পরে খেঁয়া নৌকো এল—অনিচ্ছার সঙ্গে ঘাট ছেড়ে নৌকোতে উঠলাম। জায়গাটা পবিত্র প্রভাবে ভরা—এমন একটা প্রভাব, যা সে-দিন বরানগরের বাগান-বাড়ির সেই সাধুর কাছে গিয়ে অনুভব করি নি।

দাদা আমার দেখে খুব খুশী হ'ল। ওর চেহারা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছে, ছেলেবেলাকার দুখে-আলতা রঙের সেই সুশ্রী বালককে দাদার মধ্যে আর চিনে নেওয়া যায় না। একে লেখাপড়া শিখলে না, তার ওপরে এই সব পাড়াগাঁয়ে চাকুরি ক'রে বেড়ায়—চেহারায়, বেশভূষায়, কথাবার্তায়, দাদা হয়ে গিয়েচে যেন কেমন। তেমনি ধরণের লোকের সমাজে সর্বদা চলে ফেরে।

রাত তখন প্রায় ন'টা, দাদা পাখানা থেকে ফিরে এসে রান্না চড়ালে। কি বিস্মী জায়গাতেই থাকে। বাতাসার কারখানাটা একটা প্রকাণ্ড লম্বা চালাঘর—ছ-সাতটা বড় বড় উলুনে দিনরাত গনগনে আঙুন—বড় বড় কড়ায় গুড়ের রস আর চিনির রস তৈরি হচ্ছে। এই কারখানার অত আঙুনের তাতে থাকা কি দাদার অভ্যাস আছে কোনকালে!

দাদা নিজেই রান্না চড়ালে। আমার বললে—খিচুড়ী খাবি জিতু? বেশ ভাল মুগের ডাল আছে—ভাঙে দেখি ঘি আছে বোধ হয় একটু—

দাদার বাসা ছোট একখানা চালাঘর। মেঝের ওপর শায়, বিহানা পাতাই থাকে, কোনকালে তোলা হয় না, তবে খুব ময়লা নয়—আমরা ক' ভাইবোন রান্না জিনিষপত্র মোটেই ব্যবহার করতে পারি নে, ছেলেবেলা থেকেই অভ্যাস। বিহানার ওপরকার কুলুঙ্গিতে পুরোনো খবরের

কাগজ পাতা, একখানা ভাঙা পারা-বার-হওয়া আর্মি, আর একখানা শিঙের চিকণী।

দাদা ছিল আমাদের মধ্যে সব চেয়ে ছেলেমানুষ, সব চেয়ে আনাড়ি, তাকে এখন নিজে রান্না ক'রে খেতে হচ্ছে! অথচ কি-ই বা জানে ও সংসারের, কি কাজই বা পারে?

রান্না চড়িয়ে দাদা বললে—ভাল কথা, দাঁড়া জিতু, তোর জন্তে একখানা ইংরিজি বই রেখে দিইচি—বের করে দি—

টিনের ছোট তোরঙ্গ খুলে একখানা মোটা ইংরিজি বই আমার হাতে দিয়ে বললে—এখানে সাতু বাবু কণ্টাক্টর আসে বাতাসা নিতে, সে ফেলে গিয়েছিল আর ফিরে আসে নি। আমি তুলে রেখে দিইচি, ভাবলাম জিতু পড়বে—

পাতা উন্টে দেখি একটা বিলিতি ষ্টল কোম্পানীর মূল্যতালিকা—খুব চমৎকার পাতা, চমৎকার ছাপা, বাড়িঘর, রেলের পুল, কড়িবরগার ছবিতে ভর্তি। দাদার ওপর দুঃখ হ'ল, বেচারী এ সব পড়তে পারে না, বুঝতেও পারে না—ভেবেচে কি অপূর্ব বই-ই না জানি।

আমি কিছু না ব'লে বইখানা আমার পুঁটুলিতে বেধে নিলাম। দাদা ততক্ষণে তোরঙ্গ হাতড়ে আর একখানা ছোট ছেলেদের গল্পের বই বার ক'রে বললে—আর এই দ্যাখ একখানা বই, ভারি মজার মজার গল্প—আমি খেয়ে দেয়ে রোজ একটুখানি করে পড়ি—‘খেঁড়া শিকারী’র গল্পটা পড়ছিলাম, পড় দেখি শুনি?

এ-সব গল্প ইংরিজিতে কতবার পড়িচি, আমার কাছে এর নতুনকি নেই কোথায়ও। তবুও দাদাকে পড়ে পড়ে শোনাতে লাগলাম, দাদা মাঝে মাঝে খিচুড়ীতে কাটি দিয়ে দেখে, আর হাঁটু-হুটো ছ-হাতে জড়িয়ে একটুখানি পেছনে হেলান দিয়ে ব'লে আমার মুখের দিকে আগ্রহের সঙ্গে চেয়ে চেয়ে শোনে। আমার এমন কষ্ট হ'ল! এ-সব গল্প যে ইংরিজি স্কুলের নীচের ক্লাসের ছেলেরাও জানে! আহা, দাদা বড় অভাগা, অল্প বয়সে সংসারের চাপ ঘাড়ে পড়ে সারাক্ষীকনটা ওর নষ্ট হয়ে গেল।

টাকার কথাটা দাদাকে বলতে যেন চাইল না। ওর

কত কষ্টে রোজগার করা পরসী ; একটা-আধটা নর, ঘোষটা টাকা—এগারো টাকা মাসে মাইনে পার—ওর দেড় মাসের রোজগার কোথা থেকে দেবে ও ? শৈলদির টাকা আমি এর পরে যে ক'রে হয় শোধ দেবো ।

দাদা নিজেই বললে—বাড়ি বাবি তো জিতু, গোটা-দশেক টাকা নিয়ে যা । আমার বড্ড ইচ্ছে, সীতাকে একছড়া হার গড়িয়ে দি—কিন্তু টাকাই জমে না হাতে । তোর টাকার যদি দরকার থাকে, তবে আলাদা-করা হারের জন্তে কুড়িটা টাকা তোলা আছে—তাই থেকে নিয়ে যা দেবো এখন । হার এর পরে দেখব—সাতপাঁচ ভেবে টাকা নেওয়াই ঠিক করলাম । শৈলদির ওপর বড় জুলুম করা হয়, নইলে শৈলদিকে মনে হয় না যে সে পর । এত আপনার মত ক'জন আপনার লোকই বা দেখে ? মায়ের পরেই শৈলদিকে ভক্তি করি । সে লুকিয়ে টাকা দিয়েচে—তাকে আর বিপন্ন ক'রবো না ।

যে দাদা সকাল আটটার কমে বিছানা থেকে উঠত না, তাকে ভোর পাঁচটার সময় উঠে কারখানার গিরে কাজে লাগতে হয় । আমিও দাদার সঙ্গে গেলাম । কারখানার মালিকের নাম মতিলাল দাস, বয়েস পঞ্চাশের ওপর, তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী আছে সংসারে, আর দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে-মেয়ে । দাদা মতিলালের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীকে মাসীমা ব'লে ডাকে । মতিলাল আমায় দেখে বললে—তুমি নিতাই ঠাকুরের ভাই ? বেশ, বেশ । আজকাল কি বই পড়ায় তোমাদের ?

তার প্রশ্ন শুনে আমার হাসি পেল । আমি জবাব দেবার আগেই মতিলাল বললে—আমাদের সময়ে যে-সব বই পড়ানো হ'ত, আজকাল কি আর সে-সব আছে ? এই ধর পদ্যপাঠ, তৃতীয় ভাগ, যত্নবুর । আহা !

কুজপুঁঠ হুজুদেহ উষ্ট্র সারি সারি

কি আশ্চর্য্য শোভাময় যাই বলিহারি

কি সব শব্দ লাগিয়েচে দেখেচ একবার ? ভাষার জ্ঞান হ'ত কত পড়লে ? বলো দিকি, হুজুদেহ মানে কি ? আমাদের হরিশ পণ্ডিত পড়াত কালনার স্কুলে, আমি তখন ছাত্রবৃত্তি পড়ি । তখন ছাত্রবৃত্তি পড়লে মোস্তার হ'ত, দারোগা হ'ত । এখন হয়েছে তো সব ছেলেখেলা ।

আমি এসেচি শুনে মতিলালের স্ত্রী ছপুর্নে যেতে বললে ।

আমায় দেখে বললে—এস বাবা, তুমি নিতাইয়ের ভাই ? তুমিও মাসীমা ব'লে ডেকে । কাছে দাঁড়িয়ে থেকে মাসীমা দাদাকে রান্না দেখিয়ে দিতে লাগল, কারণ আমরা খেতে চাইলেও ওরা রে'খে আমাদের খেতে দেবে কেন ?

মাসীমা সংসারে নিতাস্ত একা । মতিলালের ও-পক্ষের ছেলেমেয়েরা বাপের তৃতীয় পক্ষের পরিবারকে ছ-চোখ পেড়ে দেখতে পারে না, বা এখানে থাকেও না কেউ । অথচ মাসীমার ইচ্ছে তাদের নিয়ে মিলে-মিশে সংসার করা । আমরা খেতে বসলে কত দুঃখ করতে লাগল ।

—এই দ্যাখো বাবা, কেষ্টকে বলি, বৌমাকে নিয়ে এখানে এস, এসে দিবি থাক । বৌমাটি বড় চমৎকার হয়েছে । তা যদি আসে ! সেই নিয়ে রেখেচে খত্তরবাড়ি, কালনার কাছে দাঁইহাট—সেখানেই থাকে । আমার নিজের পেটের হ'ল না কিছু, ওরাই আমার সব—তা এ মুখে হয় না কেউ । বড় মেয়ে দুটি খত্তরবাড়ি আছে, আনতে পাঠালে বলে, সংমায়ের আর অত আতিশয়ো দেখাতে হবে না । শোন কথা । আমায় মা ব'লে কেউ ডাকেও না । ডাকলে তাঁদের মান যাবে ।

মাসীমাকে খুশী করবার জন্তে আমি কারণে-অকারণে খুব 'মাসীমা' 'মাসীমা' ব'লে ডাকতে লাগলাম । আমাদের পাতে আবার মাসীমা খেতে বসলেন, বললেন—ব্রাহ্মণের পেরসাদ পাবো, ওতে কি আর ছোটবড় আছে বাবা ?

আমার মনে অস্বস্তি হ'ল : আমি ত এঁদের এসব মানি নে, ব্রাহ্মণের ধর্ম পালন করি নে, সে কথা ত ইনি জানেন না । অথচ খুলে বললে মাসীমার মনে কষ্ট হওয়া হবে হয়ত ।

দাদার কাছ থেকে আটঘরায় এলাম । আশ্চর্য্য সব সীতার জন্তে ভাল সাবান কিনে নিয়ে এলাম, বই পড়তে ভালবাসে ব'লে ছ-তিনখানা বাংলা বইও আনলাম । সীতা বড় হয়ে উঠেচে—মাথায় খুব লম্বা হয়েছে, দেখতে সুন্দর হয়েছে আরও ।

আমার হাত থেকে সাবান নিয়ে হেসে বললে—দেখি দাদা কেমন সাবান...আমার একখানাও আন্ত সাবান ছিল না । একখানা সান্‌লাইট সাবান আনিরেছিলুম বাবার থেকে—সে আখখানা হয়ে গিয়েচে ।

সীতার সে পুরোনো অভোস এখনও আছে, কথা বলতে বলতে হঠাৎ খোঁপার হাত দিয়ে দেখে ঠিক আছে কি-না। লম্বা চেঙা, চওড়া নক্সা-পাড় কাপড় পরনে, খোঁপার ধরণও আজকাল শহরে দেখে এসেছি ও-রকম খোঁপা উঠে গিয়েছে। ও-ধরণের কাপড় পরলে সেখানে লোকে হাসবে, বেচারী সীতা! লেখাপড়া শিখবার, বই পড়বার ওর কত আগ্রহ! অথচ এই পাড়াগাঁয়ে পরের বাড়ি দাসীযুক্তি ক'রেই ওর জীবন কাটল। না হ'ল লেখাপড়া শেখা, না মিটল কোনো সাধ। অথচ ওর বুদ্ধি ছিল এত চমৎকার, মিশনরী মেমেরা কত প্রশংসা করত, ওকে কি ভালই বাসত মিস্ নটন। কিন্তু কি হ'ল ওর? এখনও সেই কতকাল আগেকার পুরোনো বইগুলোই পড়তে, কিছুই শেখেনি, কিছুই দেখেনি।

সীতা বললে—দাদা পাস করেচ?

—পাসের খবর এখনও বেরোয় নি। পাস করবো ঠিকই।

—পাস হ'লে আমার জানিও দাদা। আমি তোমাকে একটা জিনিষ প্রাইজ্ দেবো!

—কি জিনিষ রে?

—একটা মনিষাগ বুনচি লাল উলের। তোমার জন্তে একটা, বড়দার জন্তে একটা। তোমাদের নাম লিখে দেবো। মিস্ নটন আমাদের দিত কত কি প্রাইজ্—না?

—মিস্ নটনকে তোর মনে আছে সীতা? তুই তো তখন খুব ছোট।

—খুব মনে আছে, তার দেওয়া জিনিষ আমার বাক্সে এখনও রয়েছে। দেখলেই তাদের কথা মনে পড়ে।

জ্যাঠামশায় আমার ডেকে বললেন—জিতু শোনো। এখন তুমি বড় হয়েচ, তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কাজ করাই ভাল। সীতার বিয়ে না দিলে নয়। ওর পনের-ষোল বছর বয়েস হ'ল, আর ঘরে রাখা যায় না। কিন্তু এদিকে টাকাকড়ি খরচ করবে কে? হাজার টাকার কমে আজকাল উদ্ভলোকের ঘরের বিয়ের কথাই তোলা যায় না। দেখে এসেচ ত শহরবাজারে? তা আমি এক জায়গায় ঠিক করেচি; পাত্রটির বাপ আমার এখানে এসেছিল। জমিদার

আছে, চাষী গেরস্ত, খেতে-পরতে কষ্ট পাবে না। আধের চাষই আছে অমন বিশ-বাইশ বিঘে। পাত্রটি চাষবাস দেখে, রং একটু কালো—তা হোক পুরুষ মাহুঘের রঙে কি আসে যায়, তবে বংশ ভাল, কামদেব পণ্ডিতের সন্তান সবে তিন পুরুষে ভঙ্গ, আমাদেরই স্বঘর।

আমি বললাম—লেখাপড়া কতদূর করেছে?

—লেখাপড়া কি আর এম.এ-বি.এ পাস করেছে? তবে বাংলা ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়েছে; দিবা হাতের লেখা। হ্যাঁ একটা কথা ভুলে যাচ্ছি,—অল্পদিন হ'ল পাত্রটির প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা গিয়েছে—তবে সে কিছু নয়, বয়েস কমই। একটি বুদ্ধি ছেলে আছে ও-পক্ষের।

ছাত্রবৃত্তির কথায় আমার মতিলালের উটের কবিতাটি মনে পড়ল। আমি বললাম—আচ্ছা আমি ভেবে বলব জ্যাঠামশাই। লেখাপড়া জানে না আর তাতে দোজবরে, এতে বিয়ে দেওয়া আমার মন সরে না। সীতার মত মেয়ে আপনিই বলুন না জ্যাঠামশাই?

জ্যাঠামশায় নিজের কথার প্রতিবাদ সহ্য করতে পারেন না—তিনি এ-অঞ্চলের মানী ব্যক্তি, আগের চেয়ে বিষয়-আশয় টাকাকড়ি এখন তাঁর আরও বেশী, এদিকের সব লোক তাঁকে খাতির ক'রে চলে, কেন বা তিনি প্রতিবাদ সহ্য করবেন? সে জানি এ গাঁয়ের রাম বাঁড়ুঘোর ব্যাপারে। রাম বাঁড়ুঘো কি জন্তে রাত্রে আফিম খেয়ে শুয়েছিল—সকালে উঠে খবর পেয়ে জ্যাঠামশাই গেলেন। রাম বাঁড়ুঘো ছিল জ্যাঠামশাইয়ের খাতক। জ্যাঠামশায় গিয়ে কড়া সুরে বললেন—কি হয়েছে রাম? রাম বাঁড়ুঘো তখন কথা বলতে পারচে না—জ্যাঠামশায়ের কথার উত্তর সে দিতে পারলে না। জ্যাঠামশায় ভাবলেন, রাম বাঁড়ুঘো তাঁর প্রতি অসম্মান দেখিয়ে ইচ্ছা করেই কথার উত্তর দিচ্ছে না। বললেন—ভাল ক'রে কথার উত্তর দাও—কার সামনে কথা বলচ জান না? সজ্জের সব লোক বললে—হ্যাঁ, কর্তা যা বলচেন, জবাব দাও স্তর কথার। কিন্তু রাম বাঁড়ুঘো জ্যাঠামশায়ের চোখ-রাঙানির চৌহদ্দি পার হয়ে চলে গেল ঘণ্টা-দুইয়ের মধ্যেই—কি জন্তে সে আফিম খেয়েছিল কেউ জানে না—তার মৃত্যুর পরে জ্যাঠামশায় তার ভিটেমাটি বিক্রী ক'রে নিয়ে নিলেন—তার বিধবা স্ত্রী নাবালক একটি মাত্র মেয়ের হাত ধরে

ভাইদের দোরে গিয়ে পড়লো। আমি দেবার মাটুকু দিই, সে বছরের কথা।

আমার কথার উত্তরে জ্যাঠামশায় আমায় অনেকগুলো কথা শুনিতে দিলেন। আমাদের এদিক নেই, ওদিক আছে। রাজামহারাজাদের ঘরে বোনের বিয়ে দেবার ইচ্ছে থাকলেই ত হয় না, পয়সা চাই। পনের-বোল বছরের মেয়ে গ্রামে সমাজের মধ্যে বাস করতে গেলে আর ঘরে রাখা চলে না। তা ছাড়া তিনি কথা দিয়ে ফেলেছেন—তঁার কথার মূল্য আছে ইত্যাদি।

জ্যাঠামশায়দের বাড়ির জীবনযাত্রার ধারা সেই পুরোনো দিনের মতই চলেছে। এখানে এলেই বুঝি এদের মন নানাদিক থেকে কতভাবে শৃঙ্খলিত। বাড়িতে এতটা জমি রয়েছে, ঠাকুরপূজার উপযোগী ছোট্ট একখানা গাঁদা ও করবী ফুলের বাগান ছাড়া আর কোথাও একটা ফুলের গাছ নেই। উঠানের কোন জায়গায় এরা কোথাও একটু সবুজ ঘাস রাখবে না—মেজকাকার কাজই হচ্ছে এতটুকু কোথাও ঘাস গজালে তখনি নিজের হাতে নিড়েন ধরে উঠিয়ে ফেলা—প্রকাণ্ড উঠোন টাচাছোলা, সাদা মাটি বার করা, সবুজের লেশ নেই। ব'লে দেখেচি এরা তা বোঝেই না। সামনের উঠোনটা লাউ-মাচা, পুঁই-মাচায় ভরা—প্রত্যেক জায়গাটুকুতে তরকারী লাগিয়েছে, নয়ত মান-কচুর ঝাড়।

একদিন জ্যাঠামশায়ের ছেলে হারুদাকে বললাম—আমি স্ত্রীরামপুর থেকে ভাল মরহুমী ফুলের বীজ এনে দেবো আর এক রকম লতা আছে আমাদের কলেজে, চমৎকার নীল ফুল ফোটে। বাড়ির সামনেটা বাগান করো আর চণ্ডীমণ্ডপের চালে সেই লতা উঠিয়ে দাও—

হারুদা বললে—তোমার যেমন বুদ্ধি, ফুলগাছে কি দুধ :দেবে শুনি? মিছিমিছি জায়গা জোড়া—চণ্ডীমণ্ডপের চালে ফি-বছর ত্রিশ-চল্লিশখানা চালকুমড়া হয় জানিস্ তা?

অর্থাৎ আহারের আয়োজন হ'লেই হ'ল, আর কিছু দরকার নেই এদের।

মেজকাকার ঘরে একদিন শুয়েছিলাম, কাকীমা এখানে নেই—মেজকাকার আবার একলা শুতে ভয়

করে, তাই আমাকে শুতে বলেছিলেন। সারাদিন গরমের পরে অনেক রাতে এক পসলা বৃষ্টি হ'ল—কি সুন্দর ভিজেরমাটির গন্ধ আসতে লাগল—মেজকাকা দেখি উঠে তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করছেন। আমি বললাম—বন্ধ করছেন কেন মেজকাকা, বেশ ভিজে হাওয়া আসচে—

মেজকাকা বললে—উহু, উহু—ঠাণ্ডা লাগবে—শেষ-রাতের বিষ্টির হাওয়া বড় খারাপ, কাল সন্ধি ধরবে—আমার ধাতই একে সন্ধির।

হুপুরে সীতার সম্বন্ধে মাকে বললাম। মায়ের ইচ্ছে নয় ওখানে সীতার বিয়ে দেওয়া, তবে মা নিরুপায়, এ ব্যক্তিতে তাঁর কোনো কথা খাটে না। আমি বললাম—আমি কোথাও চাকরি খুঁজে নি মা। সীতার বিয়ে নিজে থেকে দেবো।

মা বললেন—শোন কথা ছেলের। তুই লেখা-পড়া ছেড়ে এখন করবি কি? তোদের মুখের দিকে চেয়ে এখানে কষ্ট করেও পড়ে থাকি। নিতুর ত কিছু হ'ল না, তুই বি-এ টা পাস কর। সীতার কপালে বা থাকে হবে। তুই এখন চাকরিতে কত টাকা পাবি বে সীতার বিয়ে দিবি নিজে? মাঝে পড়ে তোর পড়াটা হবে না। আর শোন, এ নিয়ে কোনো কথা যেন বলিস্ নে কারুর সঙ্গে। তোর জ্যাঠাইমা শুন্তে পেলে রক্ষে রাখবে না।

মা এত ভয় করেও চলেন ওদের! প্রথম জীবনে কোন কষ্ট পান নি, তারপর চা-বাগান থেকে এসে দুঃখের মধ্যে পড়ে গিয়ে এমন ভীতু হয়ে উঠেছেন! সদাই গুর ভয় থাকে জ্যাঠাইমা ওদের হু-জনকে এ-বাড়িতে জায়গা দিতে না চাইলে আমার লেখা-পড়া না হয়। সীতার বিয়ে নিয়ে দাদা জড়িয়ে পড়ে—এই সব।

সীতাকে জলে ফেলে দিতে পারব না, মা যাই বলুন।

জ্যাঠামশায়দের বাড়িতে বেশীক্ষণ থাকলে আমার হাপ লাগে। গাঁয়ের বাইরে নিৰ্জন মাঠে গিয়ে বসে ভাবি সীতার সম্বন্ধে কি করা যায়। কিন্তু হঠাৎ কেমন ক'রে অন্ত চিন্তা এসে পড়ে। এই রৌদ্রালোকিত হুপুরে একা বসলেই তাঁর কথা আমার মনে পড়ে। মন থেকে

দূর করতে পারি নে। প্যাঁটেটাইনের উষ্ম, পর্কাত্মর স্বদেশের রৌদ্র—সারা গায়ে ঘাম ঝরচে তাঁর, রোদে মুখ রাঙা, নিজের ভারী কুশটা নিজেই বয়ে চলেচেন ব্যা-ভূমিতে। পিছনের অন্ধজনতা জানে না যে ঝড়ে গ্যাংলিঙ্গির সমুদ্রের নোনা জলে ছুকুল ছাপিয়ে মাঝে মাঝে যে ভরজ ওঠায়, তাও তুচ্ছ হয়ে যাবে সে বৃহত্তর তুফানের কাছে, আজকার দিনটি জগতে যে তুকান তুলবে। তারা জানে না যে মানুষের মনে ব্যথা না দেওয়ার চেয়ে বড় আচার নেই, প্রেমের চেয়ে বড় ধর্ম নেই। তাঁর আবির্ভাব কে ব্যর্থ করবে? ঐ বজ্র-বিহ্বাতের মত শক্তিমান তাঁর বাণী। বিষ্ণুর সুদর্শন যে শক্তির প্রতীক। নিত্যকালের দেবতা তাঁরা, দেশের অতীত, কালের অতীত, সকল দেশের, সকল অবতারের স্বগোত্র।

তারপর আমি যেন কোথায় চলে গিয়েছি। যেখানে নদী, মাঠ, বন সবই আছে, কিন্তু সবই যেন ঝড়-লগ্ননের কাঁচের পরকলার মধ্যে দিয়ে দেখছি। রাত কি দিন বুঝতে পারলাম না, মাথার ওপরকার আকাশে তারা নেই। অথচ সূর্যও দেখলাম না আকাশে। আমি যেন সেখানে বেশ সহজ অবস্থাতেই আছি। একটু পরেই মনে হ'ল সে জায়গাটাতে আমি অনেক বার গিয়েছি, নতুন নয়, ছেলেবেলা থেকে কতবার গিয়েছি। একটা বাড়ি আছে সেখানে, বাড়িতে যারা আছে তারা আমার সঙ্গে গল্প করে, কত কথা বলে—স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে যেন মনে হয় তারা আমার খুব পরিচিত। কত বার তাদের দেখেছি। সেখানে গেলেই আমার মনে পড়ে যায় সেখানকার পথ-ঘাট, ওইখানে মাঠের মধ্যে একটা পুরোনো বাড়ি আছে ওর ওপাশে সেই বনটা। সেখানে যেমনি যাই, মজা এই যে অমনি মনে হয় এ তো নতুন নয়, সেই যে একবার ছেলেবেলার চা-বাগানে থাকতে এসেছিলাম! কিন্তু সে দেশটা যেন অল্প রকম, যখন সেখানে থাকি তখন স্বাভাবিক মনে হ'লেও, পরে মনে হয় সেটা ওই পৃথিবীর মত নয়।

সেখানে আমি কতক্ষণ ছিলাম জানি না—উঠে দেখি পাঁচ ঠেস দিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু এত ঘুম ঘুমিয়েছি—উঠে চোখ মুছে চারিদিকে চেয়ে দেখি

প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। কেবল এইটুকু আমার মনে ছিল স্বপ্নের দেশে কাকে যেন জিগোস করেছিলুম—বটগাছের একটা সুন্দর ঠাকুর আছেন, শুনেছি বিষ্ণুর্ভূক্তি, আমার বড় ভাল লাগে—জ্যাঠাইমারা পূজা করেন না কেন? ঘুম কি সত্যি কিছুই বুঝতে পারলুম না। মনের সে আনন্দটা কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে ছিল।

জ্যাঠাইমাইরা কি-একটা মোকদ্দমার সাক্ষীসাবুদ দু-তিন দিন ধরে চণ্ডীমণ্ডপে তালিম দিয়ে শেখালেন। যে কেউ শুনলে বুঝতে পারতো যে এরা সে-সব জায়গায় যায় নি, কশ্মিরকালেও—সে-সব ঘটনা দেখেও নি—এঁদের খামার-সংক্রান্ত কি-একটা দখলের মামলা। একদিন শুনলাম মামলায় এঁরা জিতেচেন—আবার সেই ব্যাপার দেখলুম বাড়িতে। গৃহদেবতার প্রতি ভক্তিতে আশ্রিত হয়ে উঠলেন সবাই—মহাসমারোহে পূজা হ'ল, সপক্ষের যারা সাক্ষী ছিল, তাদের পরম যত্নে তোয়াত ক'রে খাওয়ালেন। পাওয়ান তাতে ক্ষতি নেই—কিন্তু দেবতাকে এর মধ্যে জড়ানো কেন?

এঁরা ভাবেন কি যে দেবতা তাঁদেরই বাধা, হাতধরা—ওদের মিথ্যাকে, অবিচারকেও সমর্থন করবেন তিনি ভোগ ও নৈবেদ্যের লোভে?

জ্যাঠাইমা যখন বাস্তব হ'য়ে গরদের শাড়ি প'রে পূজার আয়োজনে ছুটোছুটি করছিলেন, তখন আমার ভারি রাগ হ'ল—আজকাল এসব মূঢ়তা আমার আদৌ সহ্য হয় না ছেলেবেলার মত ভয়ও করিনে আর জ্যাঠাইমাকে—ভাবলুম এ নিয়ে খুব তর্ক করি, দু-কথা শুনিয়ে দেবো, তাতে ওঁদের উপকারই হবে—দেবতাকে নিয়ে ছেলেবেলা বন্ধ হবে—কিন্তু সীতা ও মায়ের কথা ভেবে চূপ ক'রে রইলুম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১

মাস দুই হ'ল চাকুরি পেয়েছি কলকাতায়। এ চাকুরি পাওয়ার জন্তেও আমি শৈলদির কাছে কৃতজ্ঞ। শৈলদির স্বামীর এক বন্ধুর যোগাযোগে এটা ঘটেচে। বাদ্যের বাড়ি চাকুরি করি, এঁরা বেশ বড় লোক।

বাড়ির কর্তা নীলাধর রায় হাওড়া জেলার কি একটা

গ্রামের জমিদার এবং সেখানকার তাঁদেরই পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত এক মঠের বর্তমান মালিক—এঁদের মঠের অধীনে একটা ধর্মসম্প্রদায় গড়ে উঠেছে গত যাট-সত্তর বছরে এবং এঁরাই সেই সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু। বর্তমান, বাঁকুড়া, বীরভূম এই তিন জেলাতে এই সম্প্রদায়ের লোক যত বেশী, অল্প জেলাতে তত নয়। ওঁদের কাগজপত্র ও দেশের নায়েবের সঙ্গে ওঁদের যে চিঠিপত্র লেখালেখি হয়েছে—তা থেকেই আমি এ-সব সংবাদ জানতে পারলাম অল্পদিনের মধ্যেই। এঁদের প্রধান আয় বৈশাখ মাসে মঠবাড়ির মহোৎসব থেকে—নানা অঞ্চল থেকে শিষ্যসেবকের দল জড় হয়ে সেই সময় বার্ষিক প্রণামী, পূজা, মানত শোধ দেয়—তা ছাড়া বিবাহ ও অন্তপ্রাশনের সময়ও মঠের গদিতে প্রত্যেক শিষ্যের কিছু প্রণামী পাঠিয়ে দেওয়া নিয়ম।

নীলাক্ষর বাবুর তিন ছেলেই বোর সৌখীন ও উগ্র ধরণের শহুরে বাবু। বড়ছেলে অজয়বাবু এঞ্জিনিয়ারিং পড়েছিলেন কিন্তু পাস করেন নি—মেজছেলে নবীনবাবু এম্. এ. পাস, ছোটছেলে অমরনাথ এখনও ছাত্র—প্রেসিডেন্সি কলেজে থাউ-ইয়ারে পড়ে। অজয়বাবুর বয়স পঞ্চাশের কম নয়, কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদে কুড়ি বছরের ছোকরাও হার মানেন তাঁর সৌখীনতার কাছে—নবীনবাবুর বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ, লম্বা, ফর্সা, সুপুরুষ—পেছনের ঘাড় একদম গুর দিয়ে সাদা-বার-করা, চোখে চশমা—প্রায়ই পরনে সাহেবী পোষাক থাকে। বাঙালী পোষাক পরলে পরেন হাত ঢিলে-করা মিহি আঙ্গুর পাঞ্জাবী ও কোঁচানো কাঁচি ধুতি, পায়ে কালো এাল্‌বার্ট জুতো।

কর্তা নীলাক্ষর রায়কে আমি বেশা দেখিনি। তিনি তাঁর তাকিয়া বালিস, গড়গড়া, পিকদানী নিয়ে দোতলাতে থাকেন। কালেভদ্রে তাঁর কাছে আমার যাওয়ার দরকার হয়। বড়ছেলে অজয়বাবুই কাজকর্ম দেখাশুনা করেন—তাঁর সঙ্গেই আমার পরিচয় বেশী। অজয়বাবু লোক মন্দ নয়—কিন্তু নবীনবাবু ও অমরনাথের মুখে আমি প্রথম দিনেই একটা উগ্র দাস্তিকতার ছাপ লক্ষ্য করলুম। আমি এ-ধরণের লোকের সংস্পর্শে জীবনে এ-পর্যন্ত আসি নি—কি জানি আমার কোন্ বাবহারে এরা কি দোষ ধরে ফেলে—সেই চিন্তা আমার সর্বদা সঙ্গত ক'রে তুললে।

ওদের বাড়ি হরি ঘোষের ষ্ট্রীটে; বাড়িটার পূর্ব দিকে একটা ছোট গলি—কিন্তু সেই দিকেই বাড়ির সদর। হরি ঘোষের ষ্ট্রীটের দিকটা রেলিং-বসানো লম্বা বারান্দা—বারান্দায় উঠবার সিঁড়ি নেই সেদিকে। রাস্তার ওপরের ছোট ধরটাতেই আমার থাকবার জায়গা নির্দিষ্ট হ'ল। এই বরে আমি যে একলা থাকি তা নয়, পাশাপাশি নীচু চার-পাঁচটা তক্তপোষের ওপর ঢালা ফরাস পাতা, তার ওপর রাত্রে যেকত লোক শোয়, তার হিসেব রাখা শক্ত। এদের দেশের কাছারীর নায়েব কুঞ্জ বহু প্রায়ই আসে কলকাতায়, সে আমার পাশেই বিছানা পাতে, তার সঙ্গে এক জন মুহুরি আসে, সে নায়েবের পাশে শোয়। বাড়ির দু-জন চাকর শোয় ওদিকটাতে। ওস্তাদজী বলে এক জন গানের মাষ্টার বাড়ির ছেলেমেয়েদের গান ও হারমোনিয়ম বাজাতে শেখায়—সে আর তার এক জন ভাইপো শোয় চাকরদের ও আমাদের মধ্যে। এতগুলো অপরিচিত লোকের সঙ্গে একসঙ্গে শোয়া কখনো অভ্যাস নেই—প্রথম দিনেই এদের গল্পগুজব, হাসি-কাশি, তামাকের ধোঁয়া আমাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুললে। সীতার মুখ মনে ক'রে সব অসুবিধাকে সহ্য করবার জন্তে প্রস্তুত হই।

একদিন আমি সেরেস্টা-ঘরে বসে কাজ করছি—হঠাৎ দেখি মেজবাবু ঘরে ঢুকেচেন। আমি মেজবাবুকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালুম। মেজবাবু চারিদিকের দেওয়ালের দিকে চোখ তুলে চেয়ে চেয়ে বললেন—এ ঘরের এই ছবিগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তুমি নজর রাখো না?

মেজবাবুর সামুনাসামুনি হওয়া এই আমার প্রথম। আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করতে আমি মনে আঘাত পেলাম এবং আমার ভয়ও হ'ল। তা ছাড়া ছবি নষ্ট হওয়ার কৈফিয়ৎ আমি কি দেবো বুঝতে না পেরে চুপ ক'রে আছি, এমন সময় মেজবাবু বাজখাঁই আওয়াজে ডাকলেন—দৈতারি—

দৈতারি সেরেস্টার কালির বোতল গুণে গুণে আলুমারীতে ফুলছিল পাশের ঘরে, সে ঘরের বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে বললে—হজুর—

—এই উল্ক, তুমি দেখতে পাও না ঘরের ছবিগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

দৈতারি ঘরের দেওয়ালের দিকে বিপন্ন মুখে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মেজবাবু হঠাৎ আমার ডেস্ক থেকে রুলটা তুলে নিয়ে তাকে হাতে, পিঠে ঘা-কতক বসিয়ে দিয়ে বললেন—ষ্টুপিড পাজি, বসে বসে, শুধু মাইনে খাবে? এক ডজন চাকর বাড়িতে মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছে শুধু ফাঁকি দেবার জন্তে? পাড়ো ছবিগুলো এক-একখানা ক'রে—পাড়ো আমার সামনে—

দৈতারির সে রুলের ঘা যেন আমার পিঠেই পড়ল। আমি ভয়ে ভয়ে দৈতারিকে ছবি পাড়তে সাহায্য করতে লাগলুম—আমি সামান্য মাইনের চাকুরি করি। মেজবাবু আমাকেও যেন ঠেস দিয়ে কথাটা বললেন। তারপর আধঘণ্টা তিনি ঘরে দাঁড়িয়ে রইলেন—আমি ও দৈতারি তাঁর সামনে সমস্ত ছবিগুলো একে একে পেড়ে পরিষ্কার করলাম। সাহস ক'রে যেন মাথা তুলে চাইতেই পারলাম না, যেন আমি নিজেই ছবির তদারক না ক'রে প্রকাণ্ড অপরাধ ক'রে ফেলেছি।

সেইদিন প্রথম বুঝলাম আমার মত সামান্য মাইনের লোকের কি খাতির—আর কি মান এদের কাছে। সীতার বিয়ের যদি একটা বন্দোবস্ত করতে পারি তবে আবার পড়বো। ছোটবোঁঠাকুরের কথা এই সময় মনে হ'ল—শৈলদির কথাও মনে পড়ল। কত ধরণের মানুষই আছে সংসারে। অমরনাথ বাবুর বৈঠকখানা আমাদের ঘরের সামনে। খুব সৌখীন জিনিষপত্র সাজানো এবং প্রত্যেক দিনই কোন-না-কোন সৌখীন জিনিষ কেনা লেগেই আছে। সে-ঘরে রোজ সন্ধ্যার পরে বন্ধুবান্ধবেরা এসে গানের আড্ডা বসায়—কেউ ডুগী-তবলা কেউ হার্মোনিয়াম বাজায়—গান-বাজনায় অমরনাথ বাবুর খুব ঝোঁক। সে-দিন আড়াইশো টাকায় একটা গানের যন্ত্র রাখবার কাঁচের আলমারী কেনা হ'ল। তিনি কলেজের ছাত্র বটে, কিন্তু আমি পড়াশুনো করতে একদিনও দেখিনি তাঁকে। একদিন বেলা দশটার সময় অমরনাথ বাবু ঘরে ঢুকে বললেন—ওহে, পাঁচটা টাকা দাও তো, আছে তোমার কাছে?

আমি প্রথমটা অবাক হয়ে গেলাম। আমার কাছে

টাকা চাইতে এসেছেন ছোটবাবু! ব্যস্তভাবে আমার বাস্কাটা খুলে টাকা বার ক'রে সসন্ত্রমে তাঁর হাতে দিলাম। দিনকতক কেটে গেল, আর একদিন ছোটবাবু আবার তিনটে টাকা চাইলেন। মাইনের টাকা সব এখনও পাইনি—দশটা টাকা মোটে পেয়েছিলাম—তা থেকে দিয়ে দিলুম আট টাকা। দু-তিন মাসে ছোটবাবু আমার কাছে পঁচিশটা টাকা নিলেন—বাড়ির ও আমার খুচরো হাতখরচ বাদে যা-কিছু বাড়তি ছিল, সবই তাঁর হাতে তুলে দিলাম।

একদিন দাদা চিঠি লিখলে—তার বিশেষ দরকার পনেরটা টাকা যেন আমি পাঠিয়ে দিই। আমার হাতে তখন মোটেই টাকা নেই। ভাবলুম, ছোটবাবুর টাকাটা দেওয়ার তো কথা এতদিনে—দিচ্ছেন না কেন? বড়মানুষের ছেলে, সামান্য টাকা খুচরো কিছু-কিছু ক'রে নেওয়া, সে তাঁর মনেই নেই বোধ হয়। লজ্জায় চাইতেও পারলাম না। অগত্যা বারোটা টাকা আগাম পাওয়ার জন্তে একটা দরখাস্ত করলুম। সে-দিন আপিসে আবার বসেচেন মেজবাবু। দরখাস্ত পড়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন—কি হবে তোমার আগাম টাকা?

মেজবাবুকে আমার বড় ভয় হয়। বললুম—দাদা চেয়ে পাঠিয়েছেন, হাতে আমার কিছু নেই তাই। মেজবাবু বললেন—তুমি কতদিন সেরেস্তায় কাজ করচ? চার মাস মোটে? না এত কম দিনের লোককে এ্যাডভান্স দেওয়া ষ্টেটের নিয়ম নেই—তা ছাড়া তুমি তো এখনও পাকা বাহাল হওনি—এখনও প্রোবেশনে আছ।

কই, চাকুরিতে চোকবার সময় সে-কথা তো কেউ বলেনি যে আমি প্রোবেশনে বাহাল হচ্ছি বা কিছু। যাই হোক, দরখাস্ত ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। দাদাকে টাকা পাঠানো হ'লই না, এদিকে ছোটবাবুও টাকা দিলেন না, ভুলেই গিয়েছেন দেখছি সে-কথা। প্রথমে এখানে আসবার সময় ভেবেছিলাম এঁরা কোন দেবস্থানের সেবারেত, সাধু-মোহান্ত মানুষ হবেন—ধর্মের একটা দিক এঁদের কাছে জানা যাবে—কিন্তু এঁরা যোর বিলাসী ও বিঘরী, এখন তা বুঝি। মেজবাবু এই চার মাসের মধ্যে এটর্গির বাড়ি পাঠিয়েছেন আমায় যে কতদিন, কোথায় জমি নিয়ে

ইম্প্রভমেন্ট ট্রাষ্টের সঙ্গে প্রকাণ্ড মোকদ্দমা চলচে—এ বাদে কুঞ্জ নায়েব তো প্রায়ই দেশ থেকে আপীলের কেস্ অন্তেই। মেজবাবু মামলা-মোকদ্দমা নাকি খুব ভাল বোঝেন, কুঞ্জ নায়েব সেদিন বলছিলেন।

২

অপরে কি ক'রে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তারা কি মানে, কি বিশ্বাস করে, এ-সব দেখে বেড়াতে আমার বড় ভাল লাগে।

একদিন হাওড়া পুলের ওপারে হেঁটে অনেক দূর বেড়াতে গেলুম। একজায়গায় একটা ছোট মন্দির, জায়গাটা পাড়াগাঁ মত, অনেক মেয়েরা জড় হয়েছে, কি পূজা হচ্ছে। আমি মন্দির দেখে সেখানে দাঁড়িয়ে গেলাম—দেবতার স্থান, পূজা-অর্চনা হ'তে দেখলে আমার বড় কৌতূহল হয় দেখবার ও জানবার জন্তে। একটা বড় বটগাছের তলায় ছোট মন্দিরটা বটের ঝরি ও শেকড়ের দৃঢ়বন্ধনে আষ্টেপুষ্টে বাঁধা—মন্দিরের মধ্যে সিঁড়র-মাথানো গোল গোল পাথর, ছোট একটা পেতলের মূর্তিও আছে। শুনলাম যক্ষীদেবীর মূর্তি। বাড়ি থেকে মেয়েরা নৈবিদ্যা সাজিয়ে এনেচে, পুরুত-ঠাকুর পূজা ক'রে সকলকে ফুলবেলপাতা নিশালা দিলেন—ছেলেমেয়েদের মাথায় শান্তিজল ছিটিয়ে দিলেন। সবাই সাধানুসারে কিছু কিছু দক্ষিণা দিলে পুরুত-ঠাকুরকে, তারপর নিজের নিজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে নৈবিদ্যার, খালি খালি হাতে সবাই বাড়ি চলে গেল। কাছেই একটা পুকুর, পুরুত-ঠাকুর আমার হাতেও দুখানা বাতাসা ও ফুলবেলপাতা দিয়েছিলেন—বাতাসা দুখানা খেয়ে পুকুরে জল খেলাম—ফুলবেলপাতা পকেটে রেখে দিলাম। ছোট গ্রামখানা—দূরে রেলের লাইন, ভাঙা পুকুরের ঘাটটা নির্জন, চারিধারেই বড় বড় গাছে ঘেরা—শান্ত, স্তব্ধ অপরাহ্ন—অনেক দিন পরে এই পূজোর ব্যাপারটা, বিশেষ ক'রে মেয়েদের মুখে একটা ভক্তির ভাব, পূজোর মধ্যে একটা অনাড়ম্বর সারল্য আমার ভাল লাগল।

হাওড়া-পুল পার হয়েচি, এক জায়গায় এক জন ভিখারিণী আধ-অন্ধকারের মধ্যে চেঁচিয়ে কার সঙ্গে ঝগড়া করচে আর কাঁদচে। কাছে গিয়ে দেখলাম ভিখারিণী অন্ধ, বেশ ফর্সা রং, হিন্দুস্থানী—

বুঝা না হ'লেও শ্রোতা বটে। তার সামনে একখানা ময়লা ন্যাকড়া পাতা—সেটাতে একটা পয়সাও নেই—গোটা-দুই টিনের ভাল তোবড়া মগ, একটা ময়লা পুঁটুলি, একটা ভাঁড়—এই নিয়ে তার কারবার। সে একটা সাত-আট বছরের মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করচে—হিন্দীতে বলচে—তুই অমন ক'রে মারলি কেন? তোকে আমি ভিক্ষে ক'রে খাইয়ে এত বড়টা করলাম আর তুই আমাকেই মার দিতে শুরু করলি—আমার কপাল পোড়া, নইলে নিজেই পেটের সন্তান এমন বদ হবে কেন? দাখ দিকি কি দিয়ে মারলি, কপালটা কেটে গেছে—মেয়েটা হি হি ক'রে হাসচে এবং কৌতুকের সঙ্গে রাস্তা থেকে ধুলোবালি খোয়া কুড়িয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মাকে মারছে।

আমি মেয়েটাকে একটা কড়া ধমক দিয়ে বললাম—ফের মাকে যদি অমন করবি, তবে পুলিশে ধরিয়ে দেবো। পকেটে হাত দিয়ে দেখি, আনা-সাতেক পয়সা আছে—সেগুলো সব তার ময়লা নেকড়াথানায় রেখে দিয়ে বললুম—তুমি কেনো না বাছা—আমি আবার কাল এসে তোমায় আরও পয়সা দেবো। তোমার মেয়ে আর মারবে না। যদি মারে তো বলে দিও, কাল আমি দেখে নেবো—এমন ছন্নছাড়া করুণ ছরবস্থার রূপ জীবনে কোনদিন দেখিনি। পরদিন হাওড়াপুলে গিয়েছিলাম কিন্তু সেদিন বা আর কোনদিন সেই অন্ধ ভিখারিণীর দেখা পাইনি। তাকে কত খুঁজেছি, ভগবান জানেন। প্রতিদিন শোবার আগে তার কথা আমার মনে হয়।

মনে মনে বলি, আটঘরার বটতলায় তোমায় প্রথম দেখেছিলুম ঠাকুর, তোমার মুখে অত করুণা মাথানো, মানুষকে এত কষ্ট দাও কেন? তা হবে না, তার ভাল করতেই হবে তোমায়, তোমার আশীর্বাদে পুণ্যধারায় তার সকল দুঃখ ধুয়ে ফেলতে হবে তোমাকে।

এর মধ্যে একদিন কালীঘাটের মন্দিরে গেলুম।

সেদিন বেজায় ভিড়—কি একটা তিথি উপলক্ষে মেলা যাত্রী এসেচে। মেয়েরা পিষে যাচ্ছে ভিড়ের মধ্যে অথচ কেউ ওদের সুবিধে-অসুবিধে দেখবার নেই। আমার সামনেই একটা তরুণী বধু হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল—আমি এক জন শ্রোতা বিধবাকে বললাম—গেল, গেল, ও মেয়েটির

হাত ধরে তুলুন—। কাদামাথা কাপড়ে বধুটি দিশাহারা ভাবে উঠে দাঁড়াল, আমি তার সঙ্গে লোকদের গৌজ নিয়ে ভিড়ের ভেতর থেকে অতি কষ্টে খুঁজে বার করলাম— ভিড়ের দ্বারা চালিত হয়ে তারা অনেক দূর গিয়ে পড়েছিল। এত করেও অনেকেরই দেবদর্শন ঘটল না, পাণ্ডারা সকলকে মন্দিরে ঢুকতে দিচ্ছে না গুনলুম, কেন তা জানিনে। মেয়েদের ভ্রূৎ দেখে আমার নিজের ঠাকুর দেখার ইচ্ছে আর রইল না।

আঘাট মাসের শেষ দিন। বৈকালের দিকটা মেজবাবু মোটরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, বেলা পাঁচটার সময়ে ফিরে এসে আমার হিসাবের খাতা দেখাতে ডেকে পাঠালেন। রোজ তিনি ছপুরের পরে আপিসে বসে খাতা সই করেন, আজ তিনি ছিলেন না। মেজবাবুকে খাতা দেখানো বড় মুস্তিলের ব্যাপার, একে মেজবাবুকে আমার একটু ভয় হয়, তার ওপরে তিনি প্রত্যেক খরচের খুঁটিনাটি কৈফিয়ৎ চাইবেন। খাতা দেখতে দেখতে মুখ না তুলেই বললেন—তামাক-ওয়ালার ভাউচার কোথায়?

আমি বললাম—তামাকওয়ালার ভাউচার দেয়নি। খুচরো দোকান—ওরা ভাউচার রাখে না—

মেজবাবু কুঁচকে বললেন—কেন নবীন মুহুরী তো ভাউচার আনতো?

তার মুখ দেখে মনে হ'ল তিনি আমায় অবিশ্বাস করছেন। আমি জানি নবীন মুহুরী যেখানে ভাউচার মেলে না—মনিবকে বুঝিয়ে দেবার জন্তে সেখানে ভাউচার নিজেই বানাতে। আমি সে মিথ্যের আশ্রয় নিই না। বললাম—আপনি জেনে দেখবেন ওরা ভাউচার কখনো দেয় না। আমি এসে পর্যন্ত তো দেখছি—

আমি যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, তার সামনেই বড় জানালা—তার ঠিক ওপার—মেজবাবুর আপিসঘরের সামনা-সামনি একটা শানবাধানো চাতাল। অন্তরমহলের একটা দোর দিয়ে চাতালটার আসা যায় ব'লে জানালায় প্রায়ই পরদা টাঙানো থাকে। আজ সেটা গোটানো ছিল।

আমি একবার মুখ তুলতেই জানালা দিয়ে নজর পড়ল অন্তরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কাদের ছোট্ট একটা

থোকা, নিতাস্ত ছোট, বছর দুই বয়েস হবে। বোধ হ'ল যেন দরজা খোলা না পেয়ে চুপ ক'রে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ভাবছি বেশ থোকাটি তো, কাদের থোকা? এ বাড়িতে যতদূর জানি অত ছোট ছেলে কারুর তো নেই? ওখানে এল কার সঙ্গে?

মেজবাবু বললেন—এদিকে মন দাও, ওদিকে কি দেখচ?

আমি বললাম—কাদের থোকা দাঁড়িয়ে রয়েছে ওখানে—আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম—ওই যে দাঁড়িয়ে রয়েছে চাতালের দরজায়, বাড়িতে ঢুকতে পাচ্ছে না বোধ হয়।

মেজবাবু সেদিকে চেয়ে বললেন—কই? কোথায় কে?

ঠিক সেই সময় অন্তরের দরজা খুলে মেজবাবুর স্ত্রী (তাকে অনেকবার মোটরে উত্তে-নামতে দেখেছি) বার হয়ে এলেন এবং থোকাকে কোলে তুলে নিলেন। আমি চোখ নামিয়ে নিলাম। মেজবাবু বললেন—কোথায় তোমার থোকা না কি?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম—বারে, ওই তো উনি থোকাকে কোলে নিলেন?

চোখ তুলে চাতালের দিকে চেয়ে মেজবাবুর স্ত্রীকে আর দেখতে পেলাম না, অন্তরের দরজাও বন্ধ, নিয়ে বোধ হয় বাড়ির মধ্যে চলে গিয়েছেন। মেজবাবু বললেন—কে নিয়ে গেলেন? উনি মানে কি? কি বক্চ পাগলের মত?...

মেজবাবু আমার দিকে কেমন এক ধরণে চেয়ে রয়েছেন দেখলাম। আমি তাঁর সে দৃষ্টির সামনে থতমত খেয়ে গেলাম—আমার মনে হ'ল মেজবাবু সন্দেহ করছেন আমার মাথা খারাপ আছে না কি? সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিত হ'লুম একথা ভেবে যে, এই গুঁর স্ত্রী দরজা খুলে এলেন, থোকাকে কোলে তুলে নিলেন, এই তো দিনমানে আর এই ত্রিশ হাতের মধ্যে চাতাল, এ উনি দেখতে পেলেন না কেন? পরক্ষণেই চট ক'রে আমার সন্দেহ হ'ল আমার সেই পুরোনো রোগের ব্যাপার এর মধ্যে কিছু আছে নাকি? এত সাধারণ ও স্বাভাবিক ঘটনার মধ্যে যে অল্প কিছু আছে বা হ'তে পারে, এ এতক্ষণ আমার মনেই ওঠেনি। তা হ'লে কোনো কথা

কি বলতাম? এফুনি চাকুরি থেকে ছাড়িয়ে দিতে পারে। বন্ধুতেই পারে, এর মাথা খারাপ, একে দিয়ে চলবে না।

কিন্তু আমার বড় কৌতূহল হ'ল। সন্ধ্যার সময় মোহিনী ঝি আমার বারান্দার সামনে দিয়ে যাচ্ছে, তাকে জিগোস করলুম—শোন, আচ্ছা বাড়িতে দেড়-বছর ছু-বছরের খোকা কার আছে বল তো? ঝি বললে—অত ছোট খোকা তো কারুর নেই?

সেইদিন রাত বারোটায় খুব হৈ চৈ। মেজবাবুর স্ত্রীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, লোক ছুটল ডাক্তার আনতে। মেজবাবুর স্ত্রী যে অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন বা

সন্ধ্যার পর থেকে পাস-করা ধাত্রী এসে বসে আছে, এ-সব কথা তখন আমি শুনলাম। কারণ সবাই বলাবলি করচে। শেষরাত্রে শুনলাম তাঁর একটি পুত্রসন্তান হয়েছে।

মনে মনে বিস্মিত হ'লেও কারও কাছে এ নিয়ে আর কোন কথা বললাম না। নিজেই দেখি, অথচ নিজেই বুঝি নে এ-সবের মানে কি। চুপচাপ থাকাই আমার পক্ষে ভাল।

(ক্রমশঃ)

আফ্রিকার নিগ্রো শিল্প

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

[৪]

ধর্ম, সামাজিক সংস্থান, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা,—এ সকলের সঙ্গে নিগ্রো শিল্পের যোগ বিচার করিয়া পুজানুপুজ আলোচনার প্রয়াস করিব না। নিগ্রো শিল্প মুখ্যতঃ ধর্ম ও সামাজিক আবশ্যকতাকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া, শুদ্ধ শিল্প, যাহা কেবল আনন্দ-দানের নিমিত্ত, যাহার কোনও ধার্মিক বা অশুবিধ প্রেরণা নাই, আছে কেবল সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির প্রেরণা, সেইরূপ শুদ্ধ শিল্পও নিগ্রোদের মধ্যে যে গড়িয়া উঠে নাই, তাহা নহে।

দৈব বা ভৌতিক অনুষ্ঠান আদিম কালের জীবনের অঙ্গ। এই অনুষ্ঠানের জন্ত বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের আবশ্যক। মূর্তি ও মুখস তাহাদের মধ্যে অগ্ৰতম। মূর্তি দেবতার প্রতীক, মূর্তি পিতৃপুরুষের বা মৃতের প্রতীক; তাই সর্বত্র মূর্তি, মাটিতে গড়া বা কাঠে (অথবা হাতীর দাঁতে) কাটা বা ধাতুতে ঢালা হইয়াছে। মুখসও দৈব বা ভৌতিক অনুষ্ঠানে আবশ্যক—কাঠের বা পোড়া মাটির অথবা ধাতুতে ঢালা মুখসও তৈয়ারী হয়। রাজার

সিংহাসন-স্বরূপ আস্ত গাছের গুঁড়ি খুদিয়া তৈয়ারী আসন, এই আসনে কত রকমের মূর্তি ও নকশার বাহার, এই মূর্তি ও নকশারও একটা দৈব উদ্দেশ্য আছে। রাজার দণ্ড বানাইতে হইবে—তাহার নকশা বা তাহাতে খোদাই করা মূর্তিও তদ্রূপ। কিন্তু এ সব ছাড়া, দৈনন্দিন ব্যবহারের তৈজসপত্রে, কাঠের বাটীতে, চুবড়ী ও বুড়ীতে, গায়ের গহনায়, শিল্প পাওয়া যায়; পিতলের, কাঠের ও হাতীর দাঁতের ছোট ছোট মূর্তিতে, ব্রঞ্জ ঢালা মূর্তিতে, ঢালাই-করা চিত্রে যে শিল্প পাই, তাহা মুখ্যতঃ সৌন্দর্য্য-বোধের পরিচায়ক, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির প্রেরণায় তাহার উদ্ভব। এই রূপ শুদ্ধ সৌন্দর্য্য-বোধের দ্বারা প্রণোদন—ধর্মের বা অনুরূপ অশু উদ্দেশ্যের নিগড় হইতে মুক্ত শিল্প সৃষ্ণের চেষ্টা,—বিশুদ্ধ নিগ্রোদের কতকগুলি উপজাতির মধ্যেই দেখা যায়। এক্ষেত্রে ইহা সুসভ্য ইউরোপীয়দের প্রভাবেই কতকটা হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। উদাহরণ-স্বরূপ, বেনিন্-এর মূর্তি বা চিত্রময় ধ তুপট্ট, এবং ডাহোমে-রাজ্যে প্রস্তুত পিতলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে। মধ্য-আফ্রিকার বাণ্টুরা অলঙ্করণ-

চিত্রে অদ্বিতীয় ছিল—এই অলঙ্করণ-প্রিয়তা ইহাদের স্বাভাবিক সঙ্গুণ।

গভীরভাবে আলোচনা করিতে গেলে, নিগ্রো ধর্ম ও সংস্কৃতির সহিত মিলাইয়া নিগ্রো শিল্পের চর্চা করা উচিত।



[১৬] ডাহোমে রাজা—পিতল মূর্তি

সে বাণিজ্য এখন সম্ভব হইবে না। পশ্চিম-আফ্রিকা ও মধ্য- ও পশ্চিম-মধ্য-আফ্রিকা—এই দুইটি শিল্প-মণ্ডল—ইহাদের অধিবাসী বিস্তৃত নিগ্রো ও বাণ্টু-নিগ্রো, জাতিতে যেমন পরস্পর হইতে কতকটা পৃথক, ইহাদের ভাব-জগৎ ও সংস্কৃতিও তেমনি কতকটা পৃথক। মোটামুটি, পশ্চিম-

আফ্রিকার লোকেরা ধাতুর কাজে পাকা, মধ্য-আফ্রিকার লোকেরা কাঠের কাজে। পশ্চিম-আফ্রিকার নিগ্রোরা বাণ্টুদের সহিত তুলনায় অপেক্ষাকৃত সুবাসস্থ, ইহাদের সজ্জ-শক্তি অপেক্ষাকৃত দৃঢ়। নর-বলির প্রথা পশ্চিম-আফ্রিকায় বিশেষ প্রচলিত ছিল; বেনিন, ডাহোমে, আশাণ্টি প্রভৃতি রাজ্যে অত্যধিক নর-বলি দেওয়ার রীতিই ছিল ইহাদের প্রধান কলঙ্ক। নরমাংস-ভোজন পশ্চিম-আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে সাধারণ ছিল না, ছই একটি উপজাতির



[১৭] কঙ্গো দেশ—বাকুবা জাতির রাজার মূর্তি (কাঠময়)

মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। মধ্য-আফ্রিকায়ও নর-বলির রীতি প্রচলিত ছিল, কিন্তু মধ্য-আফ্রিকার—বিশেষতঃ কঙ্গো দেশের কতকগুলি উপজাতির মধ্যে নরমাংস-ভোজন অতিশয় সাধারণ বাণিজ্য ছিল। ইহাই হইল ইহাদের ধর্মের ও জীবন-যাত্রার প্রধান কলঙ্ক। কিন্তু এতদ্বিন্ন বহু বিষয়ে ইহাদের রীতিনীতি খুবই প্রশংসার যোগ্য ছিল।

ইউরোপীয় খ্রীষ্টান, এবং হামীয় ও আরব মুসলমানদের প্রভাবে পড়িয়া, নিগ্রোদের বাহ ও মনোজগতের বিস্তৃতি আর থাকিতেছে না; সঙ্গে সঙ্গে নিগ্রো শিল্পেও ভাঙ্গন ধরিয়াছে। কতকগুলি লক্ষণীয় শিল্প-দ্রব্য প্রস্তুত করিবার পর, নিগ্রো জাতি এখন আর নূতন কিছু দিতে পারিতেছে না।

এখন ইহাদের কাঠের ও ধাতুর কারিগরেরা বাহা বানাইতেছে, তাহাতে আদিম নিগ্রো জগতের সে সৃষ্টি নাই, তাহার সে আনুষ্ঠানিক উদ্দেশ্য, তাহার বর্ধর শক্তি ও তেজ নাই—এখন বাহা তৈয়ারী হইতেছে, তাহা যেন ইউরোপীয় শিল্প-বিলাসীদের মন যোগাইবার জন্যই তৈয়ারী হইতেছে। কিন্তু এই ভাঙ্গনের দশায় পড়িলেও, উপস্থিত কালেও নিগ্রো শিল্পের যেটুকু পাওয়া যায়, সেটুকু উপেক্ষণীয় নহে।

[৫]

বিশুদ্ধ নিগ্রোদের শিল্প কতকগুলি বিষয়ে সমগ্র নিগ্রো-জাতির শিল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য। এই শিল্প কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য আবশ্যিক প্রতিমাতেই পর্যাবসিত হয় নাই; ইহার মধ্যে রস-সৃজনের সম্ভাৱন চেষ্টা আছে; যে শিল্প বিশুদ্ধ নিগ্রোর প্রস্তুত করিয়াছে, তাহা মানবিকতার ভরপুর। অধিকন্তু তাহা তাহাদের সংস্কৃতির প্রতীক-স্বরূপ; তাহা তাহাদের জীবনের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত।

পশ্চিম-আফ্রিকার সমুদ্রোপকূলবাসী এই কয়টি উপজাতিকে বিশুদ্ধ নিগ্রোদের প্রতিভা-স্বরূপ ধরা যাইতে পারে—আশাণ্টি, ডাহোমে, য়োরুবা, বিনি বা বেনিন্ নগরবাসী, এবং ইবো। ইহাদের মধ্যে শিল্প-বিষয়ে বিনিদের সমকক্ষ আর কোনও নিগ্রো জাতি নাই। বিনিদের শিল্পের ইতিহাস, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতক পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছায়। ঐ সময়ের শিল্পের নিদর্শন ইহাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে। পোর্তুগীস ও অন্ত ইউরোপীয় জাতির লোকে পশ্চিম-আফ্রিকায় খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতক হইতে যাওয়া-আসা করিতে থাকে। অসম্ভব হয় যে পিতল ও অন্ত ধাতুর মূর্তি ঢালাই করা পশ্চিম-আফ্রিকার লোকেরা ইউরোপীয়দের কাছ হইতে শিখিয়া লয়,—তবে ইহারা এই শিল্পটিকে আত্মসাৎ

করিয়া লইয়াছে। বিনি-জাতীয় লোকেরা খুব বেশী করিয়া নর-বলি দিত। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে অন্তের-সহিত কতকগুলি ইংরেজ বাণিজ্যদূতকে হত্যা করায়, ঐ বৎসর ইংরেজেরা বেনিন্-নগর সর্বসত্তা আক্রমণ করিয়া দখল করে। বেনিন্



[১৮] মাতৃ-মূর্তি (কাঠনির্মিত, কঙ্গো দেশ)

হইতে দুই হিসাবে শত শত ব্রঞ্জ প্লাক (Bronze Plaque) বা ঢালাই-করা চিত্রযুক্ত ধাতুকলক মূর্তি, হাতীর দাঁতের কাজ, কাঠের কাজ প্রভৃতি ইংরেজ সেনানীগণ সংগ্রহ করিয়া ইংলণ্ডে আনয়ন করেন—এই জিনিসগুলি এখন ব্রিটিশ-মিউজিয়মে স্থান পাইয়াছে। বেনিনের শিল্প-সম্ভারের বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ দেখিয়া নিগ্রো জাতির অন্তর্নিহিত শিল্প-সাধনার সম্বন্ধে ইউরোপের কলাবিদগণের চোখ ফুটে, এবং সেই সময় হইতেই এ বিষয়ে ইউরোপে অল্প-স্বল্প সাড়া পড়িয়া যায়। পশ্চিম-আফ্রিকার দেশগুলি ক্রমে ক্রমে একটী পর একটী করিয়া ইংরেজ, ফরাসী ও জার্মান কর্তৃক উনবিংশ শতকের শেষে ও বিংশ শতকের প্রারম্ভে দখল করা হয়। ইউরোপে এই শিল্পের আদর যখন আরম্ভ হইল, তখন অধীনতাপাশ-বদ্ধ আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্য হইতে ইহার উচ্ছেদ ঘটতে থাকে।

বেনিন-এর সুবিখ্যাত নিগ্রো-কৃত্তার মুখটির উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি। (চিত্র [১] ও [২])। কেহ কেহ এই মূর্তীকে নিগ্রো-জাতির মধ্যে উদ্ভূত সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প-সৃষ্টি বলিয়া মনে করেন। এই মূর্তীটির দুইটি প্রতি বিদ্যমান, একটি

ক্রার্ক-এর (Dora Clarke) কৃতি, পূর্ব-আফ্রিকার কিকুয়ু-জাতীয়া কৃত্তার মুখের ব্রঞ্জময় মূর্তির ছবিও (চিত্র [৫]) এই সঙ্গে দেওয়া হইল।

অনুরূপ একটি পুরুষ-মুণ্ডের চিত্র (চিত্র [৬]) প্রদর্শিত হইল। ইহাও বেনিন-এর শিল্পীদের রচিত—ইহার মধ্যে যথেষ্ট সৌন্দর্য আছে।

বেনিন-এর ব্রঞ্জের পাটায় ঢালা চিত্রের নমুনা তিনটি প্রদর্শিত হইতেছে। মোমের পিণ্ড লইয়া জমী করিয়া ভাস্কর্য্য-চিত্রটি প্রথম প্রস্তুত করা হয়, তাহর পরে মোমের চিত্র বা মূর্তির চারিদিকে একটি মাটির ছাঁচ গড়া হয়, তদনন্তর গলা ধাতু ছাঁচের ভিতর ঢালিয়া দেওয়া হয়, তাপে মোম গলিয়া ছিঁড়ের ভিতর দিয়া বাহিরে আসে, ছাঁচের ভিতরে শিল্পীর তৈয়ারী মোমের চিত্র বা মূর্তির স্থান গলিত ধাতু পূরণ করে—এইরূপে ধাতুর চিত্র বা মূর্তি



[১৯] চিন্তাময় (কঙ্গো দেশের কাঠমূর্তি)

(চিত্র [১]) লণ্ডনের ব্রিটিশ-মিউজিয়মে, অল্পটি বেলিনের এথনোলজিক্যাল অর্থাৎ আদিম-সংস্কৃতি-সম্বন্ধীয় সংগ্রহ-শালায় রক্ষিত আছে (চিত্র [২])। এই মুখটিতে, এবং মধ্য-আফ্রিকার লোআঙ্গো (কঙ্গো নদীর মোহানার উত্তরের একটি স্থান) হইতে প্রাপ্ত নিগ্রো-কৃত্তার দারুময় মূর্তিতে (চিত্র [৩]) নিগ্রো-জাতির নারী-রূপের বৈশিষ্ট্য কি সুন্দরভাবে কুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা পাশাপাশি প্রদত্ত একটি নিগ্রো-তরুণীর মুখের আলোক-চিত্রের (চিত্র [৪]) সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে; এই নিগ্রো-তরুণীটি আমেরিকায় উপনিবিষ্ট নিগ্রো বরের মেয়ে; নিগ্রো মুখাবয়বের মধ্যেও শ্রী ও সৌন্দর্য্য কতকটা থাকিতে পারে তাহা এই সব মুখ হইতে অনুমান করা যায়। ইউরোপীয়ের হাতে নিগ্রো-মেয়ের মুখের বিষাদাভাসযুক্ত শ্রী কেমনভাবে ধরা পড়িয়াছে, বেনিন-এর ও লোআঙ্গোর মূর্তিদের সঙ্গে তুলনা করিবার জন্য ইংরেজ মহিলা শিল্পী শ্রীমতী ডোরা

গঠিত হয়। এই ব্রঞ্জ প্লাক্ বা পাটা বেনিনের শিল্পের বৈশিষ্ট্য। চিত্র [৭]-এ অল্পপৃষ্ঠে বেনিন-এর রাজার মূর্তি, দুই পার্শ্বে সশস্ত্র অনুচর। চিত্র [৮]-এ রণসাজে সজ্জিত, হাতে বন্দুক ও ঢাল, মাথায় শিরস্ত্রাণ, গায়ে সাঁজোয়া-পরা বেনিন্ বোদ্ধা। চিত্র [৯]-এ তিনটি কৃত্তার মূর্তি। [১০]-সংখ্যক চিত্রে ধনুর্ধার-হাতে এক শিকারী গাছের উপরিস্থিত পাখীর প্রতি লক্ষ্য করিতেছে, সমস্ত রচনাটি, মায় শিকারীর ভঙ্গি, অতি উচ্চদের কলা-কুশলতার পরিচায়ক;—এইরূপ পাটায় বেনিন-এর জীবন-যাত্রার ও 'বর্ষের সভ্যতা'র চিত্রময় টীকা পাওয়া যায়। চিত্র [১১]-এ প্রদর্শিত পাটাটি অত্যন্ত পুরাতন, ইহাতে ষোড়শ শতকের পোষাক পরা একজন ইউরোপীয় বোদ্ধা ও তাহার সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার দুই জন অনুচরের মূর্তি ঢালাই করা হইয়াছে। এটি পোর্্তুগীস প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল।

আফ্রিকা ভারতের মতই হাতীর দেশ, আফ্রিকার হাতীর দাঁত নাকি ভারতের হাতীর দাঁতের চেয়েও উৎকৃষ্ট। অত্যন্ত কঠিন হওয়া সত্ত্বেও হাতীর দাঁতের লক্ষণীয় শিল্প-দ্রব্য নিগ্গোরা তৈয়ারী করিয়াছে। বেনিনেও হাতীর দাঁতের খুব সুন্দর কাজ হইত। বেনিনের এই প্রকার প্রাচীন কাজের দুইটি নিদর্শন প্রদত্ত হইল। দুইটিই গোলকাকার কোটা—চাকরীর উপরে নকশা ও মর্দি, এবং কোটার নীচের দিকের পায়াতেও মর্দি বা অলঙ্করণ। চিত্র [১৩]-তে কোটার চাকরীর মাথায় পোড়ুগীস জাহাজের চিত্র—জাহাজের পেরেক-আঁটা খোল, মাস্তুল, দড়াদড়ি ও মাস্তুলের উপরে ঝোড়ার মত বসিয়া দেখিবার জায়গায় pilot বা দিশাকর মর্দি—এই সব নিগ্রো শিল্পীর চোখে যেমন ঠেকিয়াছে সে ভেমনি খুদিয়াছে। কোটার পায়া

সপ্তদশ শতকের মর্দি হইবে, অধুনা ব্রিটিশ-মিউজিয়মে রক্ষিত। অল্পরূপ আর একটি কোটা বেনিনের আদিম-সংস্কৃতি-সম্বন্ধীয় সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে (চিত্র [১৩]): এটির চাকরীর মাথায় অতি সুন্দরভাবে খোদিত একটি



[১৩] শূন্য দেবতার কাঠময় মূরস (বাবুর জাতি—কঙ্গো)



[২০] বুদ্ধা (কঙ্গো—বাবুর জাতির বৃহৎ কাঠমর্দি)

হিসাবে আছে চারিটি ইউরোপীয় সৈনিকের মর্দি, টুপি মাথায়, টুপিটিতে পালক লাগানো; গলায় মালা হইতে ক্রম ঝুলিতেছে; ডান হাতে বর্ধা, বা হাতে কোমরে-বাধা তরওয়ালের মুখ ধরিয়া আছে। এটি খ্রীষ্টীয়

মেয়ের মর্দি আছে; পৃথিবীর যে কোন দেশের হাতীর দাঁতে তৈয়ারী মর্দির সম্বিত এই মর্দি তুলিত হইতে পারে। কোটার তলদেশে নিপুণভাবে চারিটি সাপ ও কোন শাপদ খোদিত;—এ-অংশটুকুও সুন্দর।

বেনিনের পূর্বে য়োকুবা নিগ্রোদের দেশ। য়োকুবারা আগে পোড়া মাটির চমৎকার মর্দি গড়িত—আজকাল ইহাদের কাঠের মর্দিই লক্ষণীয়। ইহাদের আধুনিক কালের কাজ একটু মোটা রকমের—শক্তিশালী, কিন্তু সুকুমার নহে, সহজে সাধারণের মনোহরণ করিতে পারিবে না। ইহাদের প্রাচীন কাজের একটি নমুনা দেওয়া গেল—য়োকুবাদের এক প্রধান দেবস্থান ইফে (Ife) নগরীতে প্রাপ্ত, পোড়া মাটিতে প্রস্তুত একটি নিগ্রো যুবকের মুখ (চিত্র [১৪])। বাশের বা কাঠের পাতলা কালীর

সাহায্যে মাটির তালে এই মনোহর মুখখানি গড়া হইয়াছে। শিল্প-বিষয়ে ইহার সার্থকতা ও সত্য-দর্শন সকলেই স্বীকার করিবেন। নিগ্রো চেহারাও যে সুন্দর হইতে পারে তাহা এই সব মূর্তিতে মনোহরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।



[২২] কাঠময় দেবতার মূপস (বাপোলে জাতি)

এই মুখটিকে গ্রীক ভাস্কর্যের, ভারতীয় ও চীনা ভাস্কর্যের, তথা গথিক ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ মুখগুলির পাশে স্থান দেওয়া চলে। ইহার সঙ্গে তুলনা করিবার জন্য আধুনিক ফরাসী ভাস্কর এভারিস্ত্, ঝঁশেয়ার-এর (Evariste Jonchere) কৃত, কতকগুলি নিগ্রো মুখের অনুলকরণ করিয়া রচিত কাঠের বেদীর উপরে স্থাপিত ব্রঞ্জের ঢালা নিগ্রো যুবকের মুখের চিত্র প্রদত্ত হইল (চিত্র [১৫])।—ফরাসী শিল্পীর রচিত নিগ্রো যুবকের মূর্তিটি এত সুন্দর ও এত স্বাভাবিক যে ইহাকে “আপোল্লো নিগের” (Apollo Niger) বা “আপোল্লো আফ্রিকানুস্” (Apollo Africanus) অর্থাৎ “আফ্রিকার নিগ্রো বা আপোল্লো” অখ্যা দেওয়া চলে; ইহার সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে, ইফে-

নগরীতে প্রাপ্ত মাটিতে গড়া নিগ্রো যুবকের মুখখানিতে যে একটা কমনীয়তা, একটা আত্মভোলা ভাব আসিয়া গিয়াছে, তাহা যেন ফরাসী শিল্পীর কৃত দৃশ্য মুখে অজ্ঞাত।

বেনিনের ব্রঞ্জের পরে, ডাহোমে-রাজ্যের কাঁসারীদের তৈয়ারী পিতলের ঢালাই ছোট ছোট মূর্তি বিশেষ লক্ষণীয়। ডাহোমের এই শিল্প বিশেষ প্রাচীন নহে। বেনিনের ব্রঞ্জ-শিল্পের সঙ্গে ডাহোমের পিতল-শিল্পের কোনও যোগ নাই। ডাহোমেতে প্রথমে পিতলের কাজ হইত না, কংগো এবং কচিং লোহার মূর্তি হইত। ঊনবিংশ-শতকের প্রারম্ভে, পোন্তুগীসদের নিকট হইতে ডাহোমের লোকেরা পিতলের ব্যবহার শিখে, এবং ডাহোমে-বাজার কামারেরা নিজে হইতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্তি গড়িতে থাকে। এইসব পিতলের মূর্তির সঙ্গে ধর্মের কোনও যোগ নাই—পূজার জন্য প্রস্তুত দেবমূর্তি, হয় কাঠের না-হয় লোহারই হইত; এইসব পিতলের মূর্তি ডাহোমেদিগের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের পাত্র-পাত্রী ও আচার-অনুষ্ঠান অবলম্বন করিয়া হইত। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ডাহোমে-রাজ্যের পতনের পরেও এই শিল্প বিনষ্ট হয় নাই—পিতলের এই মূর্তি-শিল্প এখনও বেশ চলিতেছে—ইউরোপীয়দের আগ্রহ ও উৎসাহের ফলে ইহা এখনও বিনষ্ট হইয়া যায় নাই। ডাহোমে-রাজ্য প্রধান নগর আবোমে (Abomey) এই শিল্পের কেন্দ্র; নিয়াসুনু (Niassunu) নামে একজন কারিগর এই শিল্পের প্রধান ওস্তাদ ছিল, তাহারই শিষ্যেরা এখন এই কার্য চালায়। ১৯২২ সালে মাসেইল্ নগরে যে ফরাসী ঔপনিবেশিক প্রদর্শনী হয়, তাহাতে ডাহোমের শিল্পীদের আনা হইয়াছিল, তাহাদের হাতের ঢালাই কাজ প্রদর্শনীতে তৈয়ারী হইতেছিল, ও এইসব পিতলের মূর্তি দর্শকদের বিক্রয়ও করিতেছিল—মাসেইল্ নগরে আমি এই প্রদর্শন দেখি, কিন্তু এইরূপ দুই চারিটা মূর্তি সংগ্রহ করিয়া আনি নাই বলিয়া এখন আমার বিশেষ আপসোস হয়। ডাহোমের পিতলের মূর্তিগুলিতে স্থানীয় নিগ্রো-জীবনের চিত্র পাওয়া যায়।—সাধারণতঃ একটা পাদ-পীঠের উপরে এক বা একাধিক মূর্তি উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান; কোনও মূর্তি—মাথায় কলস বা বুড়ী লইয়া গ্রামের মেয়ে জল বা অন্ত কিছু আনিতেছে (চিত্র [১৬]) ;

কোনটি যোদ্ধার, কোনটি মোড়ার আকারের কাঠের সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজার ; মেয়েরা মুখল হাতে উদুথলের চারিদিকে দাঁড়াইয়া চুবড়ী-আধু (yam) পিষিতেছে ; অহুচর-পরিবেষ্টিত রাজা যাইতেছেন, রাজার মাথায় ছাতা ধরিয়াছে ; তালগাছের উপরে লোক উঠিতেছে ; অপরাধীর মুণ্ডচ্ছেদ হইতেছে ; কোদাল দিয়া মাটি কাটিতেছে ; ইত্যাদি ; এতদ্ভিন্ন নানা পশু ও পক্ষীর মূর্তি । এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্তির ভঙ্গি অতি সুন্দর । নাগরিক সভ্যতার বহু দূরে, এই আদিম জাতি যে-ভাবে চলাফেরা করে, বসে, শয়ন করে, সে-সব অতি নিপুণতার সহিত চিরকালের জন্য পিতলের মূর্তিতে ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে ।

এই কয়টি শিল্প-জীবের চিত্র হইতে পশ্চিম-আফ্রিকার বিগুদ্র নিগ্রোদের শিল্পের কতকটা ধারণা করা যাইবে ।

[৬]

মধ্য-আফ্রিকার অরণ্যের অধিবাসী, কৃষিকার্যে নিযুক্ত বাণ্টু-নিগ্রোদের কাঠের কাঠের কয়েকটি নিদর্শনের চিত্র এইবার দেওয়া যাইতেছে । কঙ্গো-নদীর আশে-পাশে যে-সকল উপজাতি আছে, সেই জাতিগুলি রাজনৈতিক সংহতি-শক্তিতে শূন্য, কিন্তু শিল্প-শক্তিতে লক্ষণীয় । কামেফুন-এর কতকগুলি জাতি, গাবোন অঞ্চলের ম্পাঙে (Mpongwe) জাতি, এবং কঙ্গো-নদীর মোহানার দক্ষিণ-পূর্বে বাকুবা, বৃশোসো জাতি, ও কঙ্গো-দেশের অন্তর্গত কতকগুলি উপজাতি—ইহার কাঠের মূর্তি, কাঠের মুখ বা মুখস, এবং চিত্রিত কাঠের পাত্রাদির জন্য বিখ্যাত । লোআঙ্গো অঞ্চলের শিল্পীর তৈয়ারী নিগ্রো-কণ্ঠাটীর মূর্তির কথা ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে (চিত্র [৩]) । বাকুবা ও বৃশোসো জাতির রাজাদের উপবিষ্ট প্রতিকৃতি প্রস্তুত করার রীতি ছিল । এইরূপ একটি কাঠময় প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল, (চিত্র [১১] পার্শ্ব ও সম্মুখ দৃশ্য) । রাজার মাথায় ছোট মুকুটের মত অলঙ্কার ; গলায় পলার বা পুঁতির মালা, হাতে কড়ীর তাবিজ, কোমরে কড়ীর গহনা, বা হাতে তলওয়ারের মুঠ ধরা, সামনে একটা পাত্র ছিল । এ-ধরনের অনেকগুলি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে । সাধারণতঃ এই ধরনের নিগ্রো-

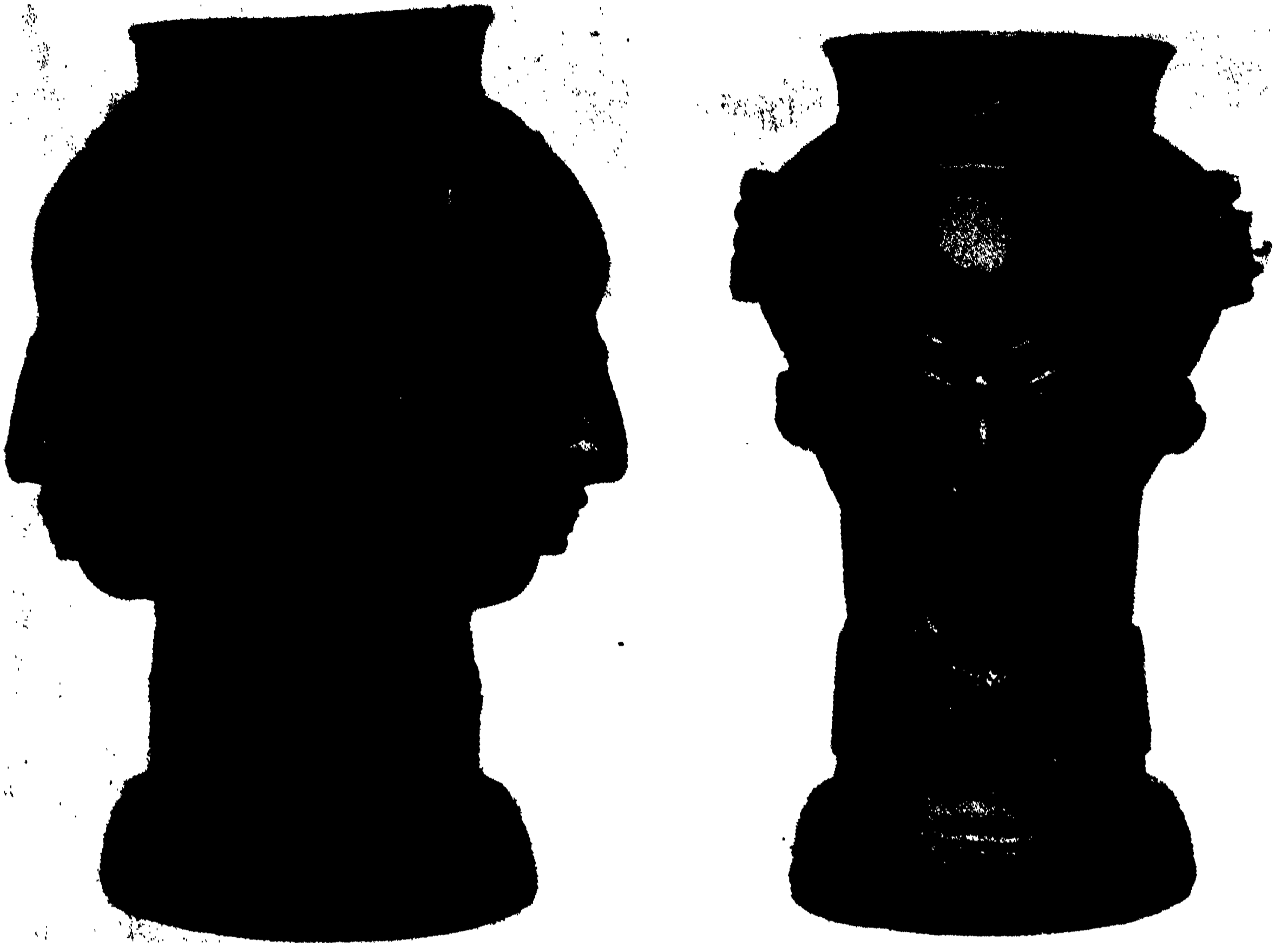
মূর্তিতে দেহের অনুপাতে মাথাটি একটু বড় করা হয়—ইহা ইহাদের প্রাচীন রীতি । আদিম-শিল্পের নিদর্শন হিসাবে এ-মূর্তি নগণ্য নহে । এই ধরনের আরও দুইটি মূর্তির ছবি দেওয়া হইতেছে—কঙ্গোর বিভিন্ন উপজাতি কর্তৃক সৃষ্ট ।



[২০] কাঠময় দেবী বা স্ত্রী মূর্তি (মুখস) ম্পাঙে জাতি

চিত্র [১৮]-তে একটি মাতৃমূর্তি প্রদর্শিত, এবং চিত্র [১৯]-তে একটি উপবিষ্ট চিন্তাশীল পুরুষের মূর্তি । মূর্তি দুইটির গায়ে নিগ্রোদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত এক ধরনের উল্কি চিহ্ন প্রদর্শিত হইয়াছে । ইংরেজীতে এই উল্কিকে “সিক্যাট্রিস্” (cicatrice) বলে । এই উল্কিতে গা কাটিয়া চামড়ার ভিতরে রঙ্গীন মাটি বা অন্ত বস্তু পুরিয়া দেওয়া হয় ; তাহাতে উল্কির নকশার রেখা অনুসারে গায়ের চামড়া উঁচু হইয়া থাকে ; অন্ত নাম না পাওয়ায়, বাঙ্গালায় ইহাকে “টীকা উল্কি” বা “চিবি উল্কি” বলিতেছি । এই মূর্তিগুলির একটা বেশ সরল সৌন্দর্য আছে । চিত্র [২০]-তে প্রদর্শিত মূর্তিটি বালুবা জাতির কৃত—হাটু গাড়িয়া উপবিষ্ট বৃদ্ধার মুখ ।

মধ্য-আফ্রিকার গুটিকয়েক কাঠের মুখসের চিত্র দিয়া



[২৪] কাঠময় পানপাত্র (বাকুবা জাতি কঙ্গো দেশ)

এই প্রবন্ধের সমাপ্তি করিতেছি। চিত্র [২১]—বালুবা মুখস—শৃঙ্গী দেবতা। চিত্র [২২]—বাপেন্দে (Bapende) জাতির মুখস—দেবতা মূর্তি। চিত্র [২৩]—ম্পাঙে (Mpongwe) জাতির মুখস—দেবী-মূর্তি, অথবা স্ত্রী-মূর্তি। চিত্র [২৪]—বাকুবা জাতির কাঠময় পানপাত্র—ছুই-মুখা দেবতার আকারে (সম্মুখের ও পাশের দৃশ্য)। এই সকল মুখস ও পাত্র আবলুস প্রভৃতি অতি কঠিন কাষ্ঠে নিশ্চিত হয়। এই শ্রেণীর কাজে সকলেই একটা জিনিস লক্ষ্য করিবেন—ইহার রেখার সারল্য ও শক্তি। এতখানেক নিগো-শিল্পীর কৃতিত্ব খুব বেশী।

নিগো শিল্পের এই সরল, আদিম শক্তিটুকু এখন

ইউরোপের অতি-সভ্য শিল্পের কামা শুষ্ক দাঁড়াইয়াছে। তাই এই শিল্পের এত আদর,—ইহা লইয়া এত আলোচনা (জার্মানে ও ফরাসীতে এ-সম্বন্ধে বড় বড় চিত্রময় বই বাহির হইয়াছে, ইংরেজীতেও সচিত্র প্রবন্ধ ছুই দশটা বাহির হইয়াছে), এবং প্রায় সর্বত্র ইহার প্রদর্শনী হইতেছে। আজকাল ইউরোপে অতি-আধুনিক শিল্প-রসিকদের গৃহে গ্রীক মূর্তির পরিবর্তে নিগো কাজের মূর্তি বা মুখস রাখা বিরল নহে। ইহার নিদর্শনের জন্য চাহিদা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। এই শিল্প বৃদ্ধিতে পারিলে, বা ইহা হইতে রস পাইতে সমর্থ হইলে, সভ্য মানবের মনের বা আত্মার প্রসার বাড়িবে বই কমিবে না।

কাশেয়ার যাত্রী

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ছাপরা জেলার নগনা মহকুমা গোপালগঞ্জ নগরীটি মেন পৃথিবীর শেনপ্রান্তে পড়িয়া আছে। বি. এন্. ডব্লিউ. আর-এর, মেন লাইন হইতে বহুদূরে,—যে-কোন একটা বড় শহর হইতও বহুদূরে এই ভায়াগাটি সভ্যতার আঁচ থেকে অতি মনুষ্প্রাণে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এক-একবার একটু অস্বস্তি বোধ হয় বটে:—দেশপ্রিয় বর্তীন্দ্রমোহন মারা গেলেন, চার দিনের পর খবর পাওয়া গেল; কিন্তু আবার এও মনে হয়,—মন্দ কি, তাঁহাকে চার দিন বেলা পাওয়া গেল, আমরাও লাভে রহিলাম।

আট-দশ ঘর বাড়ালী, বেশ মিল—সম্ভবতঃ বারোয়ারির দুর্গাকালী এবং পাঁচাবলির অভাবেই এখন পর্যন্ত বজায় রহিয়াছে। একটি বা উঠিলেই সমস্বরে সাড়া ওঠে, ছোটবড় ভেদ নাই। সব কাজেই—কুছ পরোয়া নেই, লেগে পড়—প্রবটা এইরকম। প্রথমবার ডাক্তারবাবুর মোটরে ঘুরিয়া আসিয়া যখন কাশেয়ার মহাপরিবিন্দ্রাণস্থূপের কথা বলিলাম, একপার থেকে সব মতিয়া উঠিলেন, নিশ্চয়ই যাইতে হইবে, আর দেরি করা নয়। সামনের রবিবারটিকে সবাই কাজকর্ম ছাটিয়া-ছুটিয়া পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গেলেন।

টিকিট হিসাবে সাড়ে-এগার জনের একটি দল হইল। এগার জন গোটা মদ, একটি আদ্রা চাকর, সে আমাদের সামলাইবে। চিন্তার কথা হইল খাওয়া-দাওয়ার কি করা যাইবে। নানা রুকম প্রস্তাব উঠিল। কেহ বলিল—লুচি তৈয়ার করিয়া লইয়া যাওয়া হোক, কেহ বলিল—কিছু পাউরুটি, বিস্কুট, ফলমূল। ভোলাবাবু বলিলেন—তার চেয়ে ডেকচি খন্তিটন্তি নিয়ে চল, আর একটা ষ্টোভ, দুটি চাল কুটিয়ে নেওয়া যাবে'খন, দুটি ভাত না হ'লে বড় কষ্ট হবে,—কথায় বলে—অন্নগত-প্রাণ বাঙালী।

সুখাংশু তাহার গলার জোরে এবং হাত-পা নাড়ার চোটে সব ছিন্নভিন্ন করিয়া আসর দখল করে। বলিল—“ভগবান বুদ্ধ একদিন সারা রাজ্যটা ত্যাগ করে নেংটি পরে

বেরিয়ে গিয়েছিলেন; পিঠে একটা তৈরি হোটেল কি আস্ত রান্নাবর বেবে তাঁর নিরানস্থূপ দেখতে যেতে লজ্জা করবে না?”

সুখাংশু ভয়েই হোক কিংবা বুদ্ধদেবের খাতিরেই হোক, সবার একটু লজ্জা করিল। ঠিক হইল কিছুই লওয়া হইবে না; সেখানে যা জোটে। খালি বসবার জন্ত খানছয়েক সতরঞ্চি যাইবে।

উদ্যোগপক্ষটা নিরুদ্বেগ হইল।

কাশেয়া (পুরাতন কুশীনগর) যুক্তপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার একটি ছোট মহকুমা। বি. এন্. ডব্লিউ-র মেন লাইন হইয়া গেলে তহশিল দেউড়িয়ায় নামিতে হয়, সেখান হইতে ২০ মাইল মোটরসার্ভিস আছে। আরও একটি রাস্তা আছে। মেন লাইনের সেওয়ান ষ্টেশন হইতে একটি ব্রাঞ্চ নেপাল তরাইয়ের কোল ঘোঁষিয়া গিয়া আবার গোরক্ষপুরে মেন লাইনে গিয়া যুক্ত হইয়াছে; এই লাইনের পাড্রাওনা ষ্টেশন হইতে নামিয়াও যাওয়া চলে। কাছে পড়ে এইদিক হইতেই, এগার-বারা মাতল পথ; তবে মোটরের ভাড়া একই রকম। শুনিলাম, তাহার কারণ ওদিককার পথটা বরাবরই নাকি ভাল। পাড্রাওনা হইতে রোড-বোডের রাস্তাটি খানিকটা ভাল হইলেও অধিকাংশ শোচনীয়, বিশেষ করিয়া বধাকালে। আগাগোড়া নানারকম এক্সপেরিমেন্টের ধাক্কা সমস্ত রাস্তাটি কাবু করিয়া ফেলিয়াছে।

আমাদের ষ্টেশন হারখুয়া হইতে ভোর ৪।০ টার সময় গাড়ী। এদিকে প্রায় মাসাবধি বৃষ্টির নামগন্ধ ছিল না, কিন্তু দিন বৃষ্টিয়া সেদিন চারিদিক অন্ধকার করিয়া উপপ্রান্তে বৃষ্টি নামিয়া প্রভাতের মেঘডম্বর শান্তবাকা অবহেলা করিয়া এমন ফাসাদ বাধাইবে কেহ ভাবিতেই পারে নাই। বাদলের শৈত্যে সবার উৎসাহের তাপ কমিয়া আসিতে লাগিল।

কতদূর কি হইত বলা যায় না, কিন্তু এই সময় বরাবর গাড়ীটা সবেগে স্টেশনে আসিয়া প্রবেশ করায় আমাদের সবার মনেও একটা গতিশীলতার ছোঁয়াচ লাগিল। আর অগ্রপশ্চাৎ না-ভাবিয়া হুড়মুড় করিয়া উঠিয়া পড়া গেল।

চাকরবিভ্রাট! গাড়ী ছাড়িলে টের পাওয়া গেল



কাশেয়ার মহাপরিনির্দেহ-স্তূপ

ত্রিবেনিয়া নিকৃদ্দেশ! অথচ তাহার কাছে যে সতরঞ্চির পৌঁটলাটা ছিল তাহা সামনেই বেঞ্চির তলায় রহিয়াছে।

পরের স্টেশনে গাড়ী বদলি; কুলির মাথা হইতে সতরঞ্চি সমেত ত্রিবেনিয়া নামিল। চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে প্রশ্ন করিল—“কোনা ইষ্টিশন বা?”

“হারামজাদাকে আজ পুন করব”—বলিয়া সুধাংশু অগ্রসর হইতেই সকলে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। হরিবাবু বলিলেন—“থাক!...দেখ ত, সাতটা সতরঞ্চিই ঠিক জড়িয়েছিল ত গায়ে? গাড়ী ছাড়ে, এইবেলা গুণে দেখ!...খুঁজে পেতে খুব সামলাবার লোক বের ক'রেচ, সুধাংশু।”

গাড়ী ছাড়িল। আমাদের সহযাত্রী মেঘটা পঞ্চম কি ষষ্ঠ স্টেশন পর্যন্ত আমাদের সহিত পাল্লা দিয়া ছুটিয়া নিরন্ত হইল। তাহার পরে দেখিলাম হাল্কা হাল্কা

থণ্ড মেঘ, ছ-খারের দিগন্তবিস্তৃত সবুজ ক্ষেত্রের উপর রোদ ও ছায়ার যুগললীলা চলিয়াছে। আমরা যুক্তপ্রদেশের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। বেহারের ছাপরা জেলার তুলনায় জমির উর্বরতা কম; কিন্তু তাহা হইলেও মাঝ-বর্ষায় আর সেটা চোখে পড়ে না। নানা রকম শস্তে, সবুজে সবুজে সমস্ত জমিটা ঢাকা; যদি এতটুকু কোথাও

সাদা জমি থাকে ত তাহাও চখা—মই দেওয়া, তক্তকে বরবারে,—বেশ বোঝা যায় শস্তসম্ভবা, ছ-দিন পরেই শিশু শস্তে পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

আথের চাবটা এদিকে খুব বেশী। মাটি-পয়ষটি মাইলের মধ্যেই ছাপরা জেলা লইয়া গোটা-ছয়েক চিনির কল। বেহার যুক্তপ্রদেশে আধাআধি করিয়া ধরিলে গড়ে প্রতি দশ মাইলে একটা কল পড়ে। আরও গোটা দুই উঠিবে, সরঞ্জাম হাজির। অনেকে বলিতেছেন একটা হুজুগ আসিয়াছে,—স্পেকুলেশন-সাগরের এই বৃদ্ধদণ্ডলা

আপোণের মধ্যেই ধাক্কাধাক্কি করিয়া মরিবে। বাক, ওসব বড় কথা বঝি না। শান্ত, শ্রামল ক্ষেত্রের মাঝে মাঝে লোকের অগাঁকাঙ্কার প্রতীক এই সব অনুষ্ঠানগুলো দেখিলে মনে হয় লোকগুলো কন্সের মধ্যে বেশ স্পষ্টভাবে বাঁচিয়া আছে, লাভ-লোকসানের চেউ খাইতে খাইতে! বাংলা কোণায়?

চারখানি খাড ক্লাস গাড়ি লইয়া আমাদের টেনথানা ইঞ্জিনটা লঘুতার আনন্দে যেন উন্মত্ত হইয়া ছুটিয়াছে। আটটা কুড়িতে আমরা পাড়রাওনার আসিয়া নামিলাম।

জায়গাটি আবার একটি রাজধানী, স্টেশন থেকে প্রায় মাইল-দেড়েকের মধ্যে রাজবাটা। শহরটা ছোট, আর অত্যন্ত নোংরা, যেন একটা বড় শহরের স্নায়ুসঙ্গত ময়লা এইটুকু চৌহদ্দির মধ্যে কোনরকমে গাদাগাদি করিয়া আত্মরক্ষা করিয়া আছে। রাজা, প্রাসাদের বিজলী

শহর পর্যন্ত চাড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহার অনুগ্রহ নিশ্চয়ই; কিন্তু না হইলে লোকেরা দিনের দৃষ্টিগুলা রাতে ভুলিয়া থাকিতে পারিত। এ স্থানের চেয়ে সে স্থান বোধ হয় ছিল ভাল।

মোটর-বাসে প্রায় পোনে ন'টার সময় পাড়রাওনা চাড়িয়া আমরা এগার-বার মাইল পথ অতিক্রম করিয়া সাড়ে ন'টার কাছাকাছি কাশের আসিয়া পৌঁছিলাম। শহর বলা মোটেই চলে না। আমরা সে-রাস্তাটা হঠাৎ আসিলাম, এবং সেটা সেটা ত্রুশিল-দেউড়িয়া গিয়াছে, তাহারই উপর শ-দেড়েক ঘরের বসি। চোখে তেকে আদালত বাড়িটা, মুন্সেফ আর ডেপুটি বাবুদের কোয়ার্টার্স, দু-এক ঘর উকিল-মোক্তারের বাড়ি, একটা ইনস্পেকশন বাংলো, থানা, বাস। আরও আগাইয়া গিয়া একটি হাসপাতাল ও একটি পশুচিকিৎসালয় আছে শোনা

গেল। রাস্তাটি উত্তর-দক্ষিণে। আদালত-বাড়ির কাছ দিয়া একটা রাস্তা পূর্বে-পশ্চিমে এই রাস্তাটি ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে,—ছাপরা-গোরক্ষপুরের যোজক। পশ্চিমে মোড় থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে, মহাপরিনির্লান-স্থূপ, এই রাস্তা দিয়াই যাইতে হইবে। স্থানটিকে এখানে মাতাকুঁয়ার বলে।

মোড় ফিরিয়া গাছের ছায়ায় আমাদের বাস্টি দাঁড় করান হইল। এইখানে আহাৰাদির একটা বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হইবে, কারণ মাতাকুঁয়ারে কিছু পাওয়া যায় না। রোদ বেশ চড়চড়ে হইয়া উঠিয়াছে, মোটরেও কেহ বেশ আরামে আসে নাই, পুরীর (স্থানীয় লুচি) কথা মনে হইলেই অর আসে। রবিবার, আদালত-প্রাঙ্গণে লোক বিরল, তবুও মোটর ঘিরিয়া কয়েক জন দাঁড়াইল। গাড়ীতে বসিয়াই জিজ্ঞাসাবাদ চলিতেছে,—তুটি ভাত পাইবার কোন উপায় হইতে পারে কিনা। এদিককার রান্না তরকারি ত মুখে দেওয়া যাইবে না; যদি ফিরিয়া আসিয়া একটু মাছ কিংবা মাংসের ঝোল হয় ত তবুও কোনরকমে বুড়া আঙুলের

য়েলা দিয়া ছুঁয়ে ভাত পেটে চালান দেওয়া যায়। আমি বলিলাম—“তা কি রকম ক'রে হবে? রাধু এরা মাংস খায়ই না, এদিকে হরিবাবু ত একেবারে উগ্র বৈষ্ণব, মাছ-মাংস শুনেছি বাড়ির ত্রিসীমানার মধ্যে আনলে খুন পর্যন্ত করতে...”



দাহ-স্থূপ—কাশের

এমন সময়—“হা! কালিয়া মিল্তা হায়! কোন চিজ্কা কালিয়া?”—ইত্যাকার নিরতিশয় আগ্রহপূর্ণ প্রশ্ন বাহিরে শোনা গেল। মুখ বাহির করিয়া দেখিলাম—একটি ছোটখাট ভীড়ের মাঝখানে হরিবাবু, কখন নামিয়া গেছেন টেরও পাই নাই। আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন—“ওহে, এরা বলচে মাংসের কালিয়াও দিতে পারে, তব আর ভাবনাটা কি?”

আমি নূতন লোক, বিমূঢ় ভাবে একবার বোগেশ বাবুর দিকে চাহিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন—“জানেন না বুঝি? ঐ ত্রিসীমানার বাইরে হরি বাণী ছেড়ে অসি ধরেন—একবারে ঘোর শাক্ত।”

কাণ্ডকারগানা দেখিয়া খুব একচোট হাসি চলিল। হরি বাবু গোপালগঞ্জের ‘হরিদা’, গোপালগঞ্জের বারো আনা জীবন তাঁহাকে লইয়া,—শ্রদ্ধায়, প্রীতিতে, রহস্যে তাহা প্রতি-নয়তই প্রকাশ পায়। সুধাংশু বলিল—“এইবার গিয়ে বৌদিদিকে বলব,—দোহাই অন্ততঃ সপ্তায় এক দিন ক'রে

হরিদার জন্তে মাছ-মাংস বরাদ্দ কর, নইলে তাঁকে নিয়ে তীর্থধর্ম করা দিন দিন বিড়ম্বনা হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে।”

জন-ছুয়েক হোটেলের সন্মানে বাজারের দিকে চলিলাম। পাছে কালিয়া বাদ দিয়া আসি, বোধ হয় এই ভয়ে হরিবাবুও সঙ্গ লইলেন। সর জমিনে গিয়া দেখা গেল—হোটেল বলিয়া কোন বস্তু নাই। একটি ছোট্ট গোলার ঘরের নোংরা বারান্দায় তে-বাসটে একখানি কাপড় পরিয়া নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন একটা লোক রান্না করিতেছে। এগার জন বাঙ্গালী খন্দের পাইয়া সে সব রকম কষ্ট এবং অসুবিধাই স্বীকার করিতে রাজী হইল,—বারান্দা, উনান পরিষ্কার করিতে, রান্নাবার তৈজস-পত্র মাজিয়া লইত, কাপড় ছাড়িত, এমন কি নিজের বরাস্কের উপর একবার ভিজা গামছাটা বুলাইয়া লইতেও।

হরিবাবু বলিলেন—“বলিস্ কি! গায়ে গামছা ছোঁয়াবি?... অত্যা, বুদ্ধদেবের নিকরানভূমি, তাগধর্ম ওদের একচেটে।”

রান্না দিবে ভাত, কলাইয়ের দাল, একটা তরকারি, পটলভাঙা ও কালিয়া। কথায় কথায় বোঝা গেল এখানে ‘কালিয়া’ মানেই মাংস, রান্নার একটা বিশেষ বিধির নাম নয়।

ফিরিলাম। তুম্বায় ছাতি কাটিয়া যাইত, একটু জল আনাইলে হইত। চাকরটাকে উঠাইতে ছই-তিন বার গলদবর্ম হইয়া যাইতে হরিবাবু বলিলেন—“শরীরে যা সামান্য একটু জল পুঁজি আছে, তাও পুইয়ে আর কাজ নেই, এইটুকু চলে যাবে।... সুধাংশু এই এন্ডিওরেন্স স্লীপার (endurance sleeper) টাকে ঘুমের জন্তে কত ক'রে মাসহারা গুণতে হয় ছা!”

সুধাংশু দাঁত দাঁত দিয়া চাকরটার ঘুমন্ত চোখ ছটার পানে চাতিয়া বলিল,—“চল বেটা বাড়ি তুই, দেখ'বো...”

হরিবাবু বলিলেন—“আগে যাতে বাড়ি গিয়ে পৌঁছোয় সেইট দেখো!... কোথায় একটা কাপড়ের পুঁটুলির মত পড়ে থাকবে, কেউ দেখলেও বলবে না, ভাববে—বাবুরা বাক, আঙে আঙে সিন্দুকে তুলে খোব।”

মোটর ছুটিল। এই রাস্তাটুকু অতি চমৎকার, একটুও হ্যাচকানি লাগে না। হ্যাচকানির অভাবে, কে কবে কোথায়

হাড়ভাঙা হ্যাচকানি খাইয়াছে সেই গল্প শুরু হইল, এবং এই লইয়া অভিজ্ঞেরা ভালরকম তাতিয়া উঠিবার পূর্বেই কয়েক জনের মুখে সমস্বরে একটা আনন্দ-কলরব উঠিল—
“ঐ দেখা দিয়েচে!”

দূর, বামদিক বর্ষাপৃষ্ঠ শ্রামবৃক্ষরাজি ভেদ করিয়া মহাপরিনিকরান-স্তূপের স্বর্ণাভ বিশাল গম্বুজ, শীর্ষে উপর্যুপরি তিনটি স্বর্ণছত্র, যেন একটা বিরাট নিরঞ্জন অগ্নিশিখা। এক অপূর্ক দৃশ্য। সবার মাথা সম্মুখে লুইয়া আসিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা নথাস্থানে আসিয়া পড়িলম। বেলা তখন সাড়ে-দশটা।

স্তূপের এবং তৎসংলগ্ন বিহারের ভগ্নাবশেষের পাশেই একটি ধর্মশালা। আমরা পাশেই একটি আমবাগানে নামিলাম। সুধাংশুর চাকরটাকে নামাইয়া দাঁড় করাইয়া ছ-এক জন পানিক ক্ষণ পরিয়া রহিল। তাহার চাকরটি একটু কাটিলে আমরা ভিতর প্রবেশ করিলাম।

বাড়িটি একতলা। তিনদিক প্রায় পানদশক বার প্রশস্ত উঠানের মাঝখানে একটি কুপ, আশপাশে কলা আর কিছু কিছু ফুলের গাছ। যাত্রীদের সুবিধার জন্ত খী-জা-রী নামে আরাকান নিবাসী কোন এক ধনকরের বাড়িটি পনের হাজার টাকা ব্যয়ে নিশ্চয় করাইয়া দিয়াছেন। তাহার একটি প্রতিক্রতি বারান্দায় টাঙ্গান। বাড়িটির নিশ্চয়ের তারিখ সংবৎ ১৯৯৮।

আমরা সে-সময় গেলাম সে-সময় চার-পাঁচ জন ভিক্ষু বহুমান ছিলেন; একজন সিংহলী, বাকী সব বর্মী। এদক্ষ মিনি তাঁহার বদস হইয়াছে, অতি অমানিক এবং বুদ্ধশাস্ত্র সুপণ্ডিত লোক। আমাদের সহিত অনেক ক্ষণ নানাবিধায় আলাচনা করিলেন। হরিবাবু পূর্বে যখন আসিয়াছিলাম, বুদ্ধের মৃত্যু-সম্পর্কে শূকর-মাংসের কথাটা পাড়িয়াছিলাম। বলিলেন—“হ্যা; কথা একটা ঐ রকম চলিয়া আসিতেছে বটে, তবে মতভেদ আছে এ-বিষয়ে, আর তিনি যে শূকর-মাংস খাইয়াছিলেন এ-কথা বিশ্বাস করাও যায় না। কথাট হইতেছে ‘শূকর অথবা শূকর মর্দাব’। যদি দস্তা সকার ধরা যায় তাহা হইলে ‘শু’ অর্থাৎ কল্যাণ করে এমন কোন মূহু দ্রব্য (মূহুর ভাব ইতি মর্দাব) তাঁহাকে তাঁহার ভক্ত

সেবন করিতে দিয়া থাকিবে। এইটাই সম্ভব; কারণ তাহার পূর্বে তিনি বৈশালীতে প্রিয় শিষ্য আনন্দকে এই বলিয়া কুশীনগরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন যে তাঁহার নিকরীণ সন্নিকট। সেজন্য ভক্ত যে উৎকর্ষার বশ কোন আরোগাজনক রসান বা ঐ জাতীয় কোন দ্রব্য দিবে তাহাই নাক্তিসঙ্গত।”

তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া আমরা উঠিলাম। মহাপরিনির্করীণ-স্তূপটিকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বিঘার উপর শ্রমণদিগের জন্ম বিহার-গৃহ ছিল। বর্তমানে সবগুলিরই উপরকার ছাত পড়িয়া গিয়াছে, শুধু জায়গায় জায়গায় কোন কোন গৃহের আদলটা বজায় আছে। ঠিক স্তূপের সামনেই গেটা, সেটা সব চেয়ে বড় এবং প্রায় বুক পর্য্যন্ত দেওয়ালে তাহার আদলটা বজায় আছেও সব চেয়ে বেশী। বাড়িটা চতুষ্কোণ, চারিদিকে ছোট ছোট প্রায় আটশটি ঘর ছিল বলিয়া বোধ হয়। ঘরগুলার সামনে ভিতর দিকে বারান্দা, মাঝখানটিতে একটি প্রশস্ত উঠান। দেওয়ালগুলো উপরে প্রায় চার-পাঁচ ফুট করিয়া চওড়া। ইটগুলো আজকালকার ইটের চেয়ে ছোট, কিন্তু বেশ সুগঠিত। যে চত্বরটির উপর মহানিকরীণ-স্তূপ দাঁড়াইয়া—তাঁহার কাণিসে অনেকগুলি নানারকম কাজ-করা সুদৃশ্য ইট। গাঁথুনিও বেশ চমৎকার, জায়গায় জায়গায় ইটগুলো বেন মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে,—কি মশলা দিয়া গাঁথা ধরা যায় না। জমি হইতে গাঁথুনি লক্ষ্য করিয়া আসিলে দুই-তিনটি যুগের নিশানা পাওয়া যায় বলিয়া বোধ হয়, অর্থাৎ পুনর্গঠন এই প্রথম নয়, এর পূর্বেও কয়েক বার হইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে এক-একটা কূপ, প্রায়ই বুজিয়া গিয়াছে, এ-ছাড়া মাঝে মাঝে শ্রমণদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাধি-স্তূপও বর্তমান।

আড়াই হাজার বৎসর পূর্বেকার কীর্তির মহাশ্মশানে দাঁড়াইয়া আমরা মাঝে মাঝে অতীতের মধ্যে নিজেদের হারাইয়া ফেলিতেছিলাম। বিশ্বের হিতে সমস্ত ভীকন ব্যয়িত করিয়া জরা-কবলিত, রোগক্রিয় তথাগত মল্ল-রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। বৈশাখী পূর্ণিমার সন্ধ্যা। ঐ স্তূপটি যেখানে তাহার সামনে, দুইটি শালবৃক্ষের মাঝখানে, শোককম্পিত হস্তে শিষ্যবৃন্দ শয়ন করাইল। তাহার পর

মহানিকরীণ! পৃথিবী বেন মুহূর্তেই নিশ্চল হইয়া গেল।... মহাকালের নিরবচ্ছিন্ন স্রোত বহিয়াই চলিয়াছে। ক্রমে এই মহাশ্মশান আশ্রয় করিয়া যুগের পর যুগ ব্যাপিয়া বিরাট ভাবের উচ্ছ্বাস স্তূপে, চৈতে, বিহারে মূর্ত হইয়া উঠিল। কত মহাপ্রাণতার অলিখিত কাহিনী যে হেথায় বিদ্যমান, কে বলিবে?

মাথার উপর সেই সব মহিমময় কীর্তির শাশ্বত সাক্ষী সূর্য্যদেব, পায়ের নীচে ধ্বংসাবশেষ আর চারি দিকের দৃশ্যের বিরাট শূন্যতা—বাহাতে বর্তমানের কোন বিশিষ্টতার ছাপই পড়ে নাই,—এই-সব মিলাইয়া অতীতের সঙ্গে বেন একটা অদ্ভুত রকম আত্মীয়তা অনুভব করিতেছিলাম।

এই প্রধান বিহারটির পূর্বে, গা বেঁধিয়া স্তূপের চত্বরটা; এর সামনের দিকটা একটি লম্বা-গোছের নাতি-উচ্চ মন্দির। তাহার মধ্যে প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ ফুট দীর্ঘ বুদ্ধদেবের একটি শয়ানমূর্তি, লাল পাথরে তৈরি, সমস্তটা সোনালী রং মাথান। মন্দিরগাত্রসংলগ্ন একখানি ধাতু-ফলকে উৎকীর্ণ আছে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেন্টের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ডিরেক্টর এ. সি. কারলাইল সাহেব এই মূর্তিটিকে পুরানো মন্দিরের ভগ্নস্তূপের মধ্যে শতখণ্ডিত অবস্থায় আবিষ্কার করেন। এইরূপ ভনশ্রুতি যে, যেখানে আজকাল মূর্তিটি শয়ান, সেইখানেই দুইটি শালগাছের মাঝখানে বুদ্ধদেবের মহানিকরীণলাভ হয়। সে-সময় সমস্ত স্থানটি একটি শালবন ছিল এবং ইহারই কোল বেঁধিয়া হিরণ্যবতী নদী প্রবাহিত হইত। নদীটি একটা সোঁতার আকারে আজও বিদ্যমান, তবে প্রায় মাইল-দেড়েক পূর্বে সরিয়া গিয়াছে। স্থানীয় ভাষায় এর নাম এখন ‘রামাতার’।

বৌদ্ধযাত্রী ও এখানকার শ্রমণেরা এই মূর্তিটিরই পূজা করেন। মন্দিরটি ব্রহ্ম, চীন, জাপানদেশীয় নানাবিধ পতাকা ও পূজার উপচৌকনে পূর্ণ। বস্মশালার একটি কক্ষে আরও চারিটি মূর্তি রক্ষিত আছে; তিনটি খেত-পাথরের, একটি পিতলের। এত সুন্দর বুদ্ধমূর্তি খুব কমই দেখিয়াছি।

ছোট মন্দিরটির গায়েই মহাপরিনির্করীণ-স্তূপ। স্তূপটি বহুদিন যাবৎ ভগ্ন, হতশ্রী হইয়া পড়িয়া ছিল। বিগত নবেম্বর ১৯২৬ সালে য়ু-পো-কিও নামক কোন এক ব্রহ্মদেশীয়

ভক্তের অর্থে, গবর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানে স্তূপটি আবার নতুন করিয়া গড়িয়া তোলা হয়। দেখিলাম ঠাঁহার এই মহাশ্মশানে নতুন করিয়া বুদ্ধদেবের পূণ্যস্মৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ঠাঁহার। সকলেই ব্রহ্মদেশীয় এবং এইজন্যই ব্রহ্মীদের আধিপত্য এখানে বেশী।

স্তূপটির উচ্চতা এক শত ফুটের উপর হইবে, বেড়ও শ-খানেক ফুটের কাছাকাছি। প্রায় দুই-মানুষ উচ্চতা পর্য্যন্ত সিমেন্টের প্লাষ্টার, তাহার পর সমস্তটা সোনালী রং দিয়া মাজা, মনে হয় যেন সোনার পাত দিয়া মোড়া। এখানকার সংরক্ষক বলিল,—শুধু এই টুকুতেই ৭৫০০০ টাকা লাগিয়াছিল। লোকটা অল্পস্বল্পের দিকে যায় না, ওর কথাগুলোও সোনালী পাত দিয়া মোড়া,—সচরাচর প্রদর্শক বা সংরক্ষকদের যেমন হইয়া থাকে।

ধননকার্যের সময় স্তূপের মধ্যে বুদ্ধদেবের কতকগুলি অস্থি ও অস্ত্রাণ্ড কয়েকটি কি দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল, তাহার কতকাংশ ন-কি এখন লক্ষ্মো-মিউজিয়ামে।

মহানির্বাণ-স্তূপ ছাড়িয়া আমরা মাতাকুঁয়ারের দিকে চলিলাম। স্থানীয় লোকেরা সমস্ত নির্বাণ-ভূমিটাকেই মাতাকুঁয়ার বলিলেও, আসল মাতাকুঁয়ার একটু দূরে। এখানে নবনির্মিত একটি চতুষ্কোণ গৃহে কাল পাথরে নির্মিত প্রায় ছয় হাত উচ্চ একটি অমিতাভ বুদ্ধমূর্তি রহিয়াছে। চারিদিকে একটি চালচিত্রের মত, তাহাতে সূক্ষ্ম কাজের ছোটবড় নানা রকম মূর্তি। সমস্ত মহানির্বাণভূমিতে এই মূর্তিটি পুরাকালীন ভাস্কর্যে শ্রেষ্ঠ। অবশ্য গঠনসুন্দর পূর্ববর্ণিত ধর্মশালার মূর্তিত্রয় আরও চমৎকার, তবে সেগুলো ঢের এদিককার তৈরি। এই মূর্তিটিও ভগ্নস্তূপের মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল। এখানে-ওখানে সিমেন্ট দিয়া মেরামত করা।

এদিককার দেখাশুনা শেষ করিয়া আমরা দাহ-স্তূপ (cremation stupa) দেখিতে চলিলাম। সেটি এই স্থান হইতে পূর্বে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। বেলা বারটা হইয়া গিয়াছে। মুক্ত প্রান্তরের অসহ্য গরম, তবে মাঝে মাঝে খণ্ড খণ্ড মেঘে সূর্য্যদেবকে আবৃত করিয়া একটু-আধটু কষ্ট লাঘব করিতেছিল। রাস্তা নাই, দু-ধারে আখের ক্ষেত চিরিয়া এক ফালি

চলা-পথ, তাহাও মাঝে মাঝে লুপ্ত। প্রায় মিনিট-কুড়ি হাঁটিয়া আমরা স্তূপের পাদদেশে উপস্থিত হইলাম।

এই স্তূপটির এখনও সংস্কার ত হয়-ই নাই, বরং এর গায়ে কালের আঁচড় মানুষ আরও গভীর করিয়া দিয়াছে। চিপটি বেষ উঁচু, নানাবিধ গাছ ও আগাছায় ভরিয়া গিয়াছে। দ্রষ্টব্য এমন কিছু না থাকিলেও এখানে যে-একজন চীনা ভিক্ষু থাকেন তাহার কাহিনীটা বেশ একটু অভিনব। স্তূপের শীর্ষে একটি বটবৃক্ষ আছে : সন্ন্যাসী তারই গোড়ায়, একটি গছবরের চারিদিকে বাশের বাতার বেড়া দিয়া ঘর বাধিয়া থাকেন। নিতান্তই একা, মাইল-দেড়েকের মধ্যে বসতি নাই।

বৃক্ষের উপরেও তাহার এই রকম গোছের একটি কুর্টার আছে, সমস্ত দিনমানটা প্রায় সেইখানেই কাটান। কাশেয়া নগরীটিতে ইনি বেশ প্রসিদ্ধ। প্রথমে প্রথমে নগরে আসিয়া ভিক্ষালব্ধ বাহা পাইতেন তাহাই আহাৰ করিতেন, এই জন্য তাহার নাম পাও'হারী বাবা থাকিয়া গিয়াছে। এদিকে বৎসর দুই বাবৎ আর মোটেই আস্তানা ছাড়েন না, কেহ কিছু আহাৰ করিতেও দেখে নাই : বিশ্বাসীদের মতে তিনি এখন পূরাপূরি অনাহারী। আর যাহা হউক ইহার আশ্চর্য্য সহশক্তির একটি কথা শুনিলাম এবং তাহার নিদর্শনও প্রত্যক্ষ করিলাম। ইনি মাঝে মাঝে দেহের কোন কোন স্থানে, বিশেষ করিয়া হাতের উপর, মোমবাতি জালিয়া ধানে বসেন। মোমবাতি জালিয়া, গলিয়া দেহের সেই স্থানটি পুড়াইয়া নিবিয়া যায়, তিনি অবিচলিত ভাবেই ধ্যানস্থ থাকেন। পরে উঠিয়া কি একরকম পাতার রসের প্রলপ দিয়া আরোগ্য হন।

ভিক্ষু মৌনী। আমরা যখন পৌঁছিলাম, তখন নীচেই ছিলেন। খুব সবল, দীপ্তশ্রী, গৌরবর্ণ পুরুষ, বয়স চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হইবে, গায়ে হাতে অনেকগুলি বড় বড় ফোঙ্কার চিহ্ন। আমরা বাইতে দুইটি করিয়া লবঙ্গ ফুঁ দিয়া প্রত্যেকের হাতে প্রসাদ দিলেন, মাটিতে দেবনাগরীতে লিখিয়া আমাদের বাড়ি কোথায় প্রশ্ন করিলেন। বলিলাম, 'কলিকাতা।' বৃষ্টিতে পারিয়াছেন—শিরশ্চালনে এইটুকু জানাইয়া দিলেন, তারপর বটবৃক্ষের ঝুরি ধরিয়া এবং

কোথাও বা একটা বাশের গাঁঠে গাঁঠে পা দিয়া ক্ষিপ্ৰগতিতে উপরে উঠিয়া গিয়া ভিতর হইতে ছয়ার বন্ধ করিয়া দিলেন। শেষের দিকটা গেন একটু দেখানোর ভাব ছিল, কিন্তু তাহা হইলেও সর্বসাকল্যে সন্ন্যাসী আপাতত আমাদের সবার মন বিস্ময়ে এবং শ্রদ্ধায় অভিভূত করিয়াই দিলেন এবং এ-কথা অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁহার আহা, নির্জনপ্রিয়তা এবং রুচুসাদানের মধ্যে একটি অসাধারণত্ব আছেই।

উপর থেকে চারিদিককার দৃশ্য অতি মনোরম। চক্রবাল পর্যন্ত বিস্তৃত চারিদিক সর্বত্র সমারোহ। স্তূপের প্রায় পাদমূল ধৌত করিয়া অতীতের ক্ষীণ স্মৃতির মত শীর্ণকায়্য তিরণাবতী,—অঁকিয়া-বাকিয়া, দূরে সরিয়া আবার কাছে আসিয়া পড়িয়া সমস্ত জায়গাটিকে অনেক দূর পর্যন্ত ঘিরিয়া

রহিয়াছে। পূর্বে—মাইলখানেক দূরে মল্লরাজদের কুশী-নগরের আধুনিক সংস্করণ কাশেরা, বাড়িগুলি দেখায় যেন সবুজের গায়ে গোটাকতক শাদা ছোপ। আরও দূরে—দিকচক্রের কোল যে'ঘিয়া কচিৎ এক-আধটা গ্রাম—নেহাৎ কয়েকখানি কুটীরের সমষ্টি। পশ্চিম দিকে, এই সমস্ত দৃশ্যের সামান্ত্যতার মাঝে নিজের বিরাট ঐশ্বর্য্য-মহিমায় দাঁড়াইয়া মহাপরিনির্বাণ-স্তূপ—মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রথর কিরণে তাহার বিপুল অঙ্গর চারিদিক থেকে একটা স্বর্ণাভ জ্বালা কাঁপিয়া কাঁপিয়া বিচ্ছুরিত হইয়া উঠিতেছে।

দাহ-স্তূপের বটচ্ছায়ায় খানিকটা বিশ্রাম করিয়া আমরা ধীরে ধীরে নামিয়া পড়িলাম। বর্তমানের সবচেয়ে বড় পেয়াদা জঠরাগ্নির তখন জোর তাগাদা চলিয়াছে।

পুরুষস্মৃতি ভাগ্যম্

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

স্থান মামুদপুর; কালের কথা পরে বলিব, পাত্র কালী ডাক্তার—তাই পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের একটিও নাই। প্রথমটি প্রথম যৌবনে কোন অজ্ঞাত কারণে পরিত্যক্ত হ'ন; দ্বিতীয়টি অবাবহিতা হইলেও বৎসর দুই পরে স্মৃতিকাগারেই প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু কন্যাসন্তানটি বাচিয়া থাকে। তাহার পর হইতে কালী ডাক্তার বিপত্নীক! এই দীর্ঘ ষোড়শ বৎসরকাল তিনি পত্নীগ্রহণে আর মনোযোগ দেন নাই। অনুমান করিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নীস্থানে রাহ বর্তমান; নভস্থিত নীরস কঠিন চন্দ্রাপেক্ষা গৃহস্থিত মুখচন্দ্রমার প্রতি তাহার লোভ অধিক। এ কারণ গৃহশূন্য রাখিয়া ভাণ্ডার পূরণের দিকে মনোযোগ দেওয়াই সমীচীন ও কর্তব্য এবং কর্তব্যটি তিনি অনন্যমনে পালন করিয়া আসিতেছিলেন।

কলে চতুর্দিকে তাঁহার প্রশস্ত খ্যাতি, প্রচুর পসার, প্রভূত বিস্ত। গ্রামের ঠিক মধ্যস্থানে তাঁহার দোতলা দালান, আম-কাঁঠালের সুবৃহৎ বাগান, মৎস্যপূর্ণ পুকুরিণী, ধানের মরাই প্রভৃতি। গ্রামের বাহিরেও জায়গা-জমি অনেক। গৃহে

দোল-ভূর্গোৎসব হয় না বটে, দান-ধানও বিশেষ নাই, কিন্তু পোদা অনেকগুলি। তাহারা নানাস্থান হইতে, নানা সূত্রে আসিয়া জুটিয়াছে। তাহাদের জন্ত অবশ্য কোন ঝঞ্জাট নাই, সকলে নিজেদের মত খায়, পরে, থাকে; আর, ডাক্তার-কন্ডার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বর্ধনে মনোযোগ দিয়া দৈনিক বরাদ্দটি পাকা করিয়া রাখে।

কন্ডাটিও বেশ। দেখিতে শুনিতে বয়সে পূর্ণচন্দ্রমার মত হইয়া উঠিয়াছে। গ্রাম জায়গা, সেজন্ত অনেক দিন হইতেই চন্দ্রমার সুধার পরিবর্তে তাহার পিতৃসঙ্কিত মধুলোভে প্রজাপতি আনাগোনা করিতেছিল। কেননা, সুধা অযাচিত বর্ধিত হইয়া থাকে, শ্রম ব্যতিরেকে মধুসংগ্রহ হয় না। কালী ডাক্তার পাকা লোক, সবগুলিকেই বিতাড়িত করেন। এত বাস্ততার কারণ কি? তিনি কন্ডাকে বিংশতিবর্ষীয়া করিয়া বিবাহ দিবেন। করিতেছিলেনও তাই, কিন্তু সহসা এক বিপর্যায় ঘটয়া গেল।

একদিন রূপোর মা ঔষধ লইতে আসিয়া ডাক্তারবাবুকে বলিল যে, সে 'কেষ্টপুরের ইষ্টিশনে' তাঁহার পুত্রকে দেখিয়া

আসিয়াছে। প্রথমে চিনিতে পারে নাই; চিনিবেই বা কি করিয়া? বিশ বৎসর পরে দেখা। এখন 'দশমই' শরীর, ধব্ ধব্ করিতেছে রং—ওখানকার টিকিট-বাবু। মা-ঠাকরুণকেই সে আগে দেখিয়াছে, খোকাবাবুর বাসায়। সেইদিক দিয়া সে আসিতেছিল। “আহা সে ছিри আর—”

কালী ডাক্তার ধমক দিয়া উঠিলেন—“থাম্। আমার কেউ নয়—”

রূপোর মা চুপ করিল। কিন্তু স্বভাবতুল্য বাচালতার ফলে ঔষধ লইয়া গৃহে ফিরিবার পথে বলিতে বলিতে চলিল—“নিজের বউ-ছেলেকে পর ক'রে দিলে গো—”

ডাক্তার বিচলিত হইয়া উঠিলেন। সংবাদটি শুভ নয়। রূপপুরে তাঁহাকে প্রায়ই যাইতে হয়। জায়গাটা সেখান হইতে চার ক্রোশ দূর। ওখান দিয়া রেলপথ গিয়াছে। জেলাশহর হইতে মামুদপুরে আসিতে রূপপুরে নামিতে হয়। সেখান হইতে জেলাবোর্ডের কাঁচাপাকা রাস্তা ধরিয়া বরাবর দক্ষিণে চলিলে চার ক্রোশের মাথায় মামুদপুর। দূর হইতে গ্রামখানিকে মনে হয় সবুজপাথারে একটি দ্বীপ।

কালী ডাক্তার মনে মনে হিসাব করিলেন, ছোঁড়াটার বয়স এখন বাইশ বৎসর হইবে। কিন্তু এতদিন ছিল কোথায়? এখানে আসিল কেন, বিয়ের লোভে? ছুরাশ! তবে দেহবদ্ধ বিকল হইতে বিলম্ব হয় না। তিনি সহসা মরিলে—অধিক দূর চিন্তা করিলেন না। স্বগতোক্তি করিলেন—“একটু সবুর কর। দু-বেটাকেই জব্দ করব—”

দ্বিতীয়টি এক নবীন চিকিৎসক। প্রায় বৎসরখানেক হইল মামুদপুরে আসিয়া বসিয়াছে। তাহার অভিজ্ঞতা নাই, বিদ্যা আছে; উপাধিও কালী ডাক্তারের উপাধির উচ্চে। সকলে ত কালী ডাক্তার নয়; উপাধির মোহ অধিকাংশকেই আচ্ছন্ন করে। এই রিপুটি চতুর্থ স্তরে অবস্থান করিলেও সময়ে ইহা প্রবল বেগে প্রথম স্তরে উঠিয়া বিপর্যয় ঘটায়। ইহার ফলে আজকাল অনেকে উহাকে ডাকিতেছে। ছোঁড়াটা জমাইতেছেও বেশ। কালী ডাক্তারের অবস্থাটা হইয়া উঠিয়াছে ছিদ্রযুক্ত বে-নুনের মত, উঠিবার শক্তি নাই, একটু একটু নামিয়া পড়িতেছেন। ছিদ্রটিকে যদি কোনমতে বন্ধ করা যায়, তাহা হইলে

তাঁহার পক্ষে পুনরায় আকাশমার্গের উর্ধ্ব—উর্ধ্বতর—এমন কি উর্ধ্বতম স্তরেও উড্ডীন হওয়া অসম্ভব নয়; কিন্তু কি উপায়ে যে তাহা সম্ভব বুঝিতে পারিলেন না। ছিদ্র হইয়াছে একেবারে সেই শীর্ষভাগে। তবে তাঁহার গতি নিম্নমুখী হইলেও জলে বা কঠিন ধরায় পড়িবেন না, লক্ষ্মীর বরে—শূন্তেরই কোন এক স্তরে অবস্থান করিবেন। উহাকে পরে দেখা যাইবে; আগে ঐ টিকিট-বাবু!

অশ্বিনী বোস উকিলের মুহুরী ছিল, কিন্তু জমাইতে পারে নাই। এখন গ্রামেই থাকে—জমি-জমা কিছু আছে। কিছুদিন হইতে সে সখের ঘটকালি করিতেছিল। সে আসিতেই কালী ডাক্তার তাহাকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন—“পাত্রের কথা এখন থাক। বেশ বয়স্হা পাত্রীর সন্ধান রাখ!”

অশ্বিনী প্রথমে বিস্মিত হইল। পরেও প্রশ্নটির অর্থ কতক বুঝিল, কতক বুঝিল না, জিজ্ঞাসা করিল—“কেন?”

“বুঝ্ছ না, কষ্টের পয়সাগুলো পরে লুটে-পুটে খাবে, একটা ছেলে থাকলে—”

“ছেলেও যা মেয়েও তাই ডাক্তারবাবু। মেয়েকেই—”
“দালালী রাখ, বাপু। কাজের কথাটা হোক। পাত্রী আছে?”

“তা—তা আর থাকবে না? কিন্তু আপনি—”

“হঁা আমিই। বয়সটা দেখে ভয় পাচ্ছ? কিন্তু তুমি ত আর আমায় বিয়ে করবে না—”

“হেঁ-হেঁ তা নয়। আপনার বয়স আর এমন কি বেশী? স্বাস্থ্যও বেশ আছে। দেখলে কেউ বলবে না, পঞ্চাশ। বয়স পয়তাল্লিশ বছরে আমরাই বুড়ো হয়ে পড়েছি। মাথার চুল সব একেবারে সাদা—”

“যাক, কবে খবর দেবে? শ্রাবণ চলতে, এই মাসেই কাজটা হয়ে গেলে ভাল ছিল। নাহ'লে সে—ই অপ্রাণ—”

“তা একটু সময় চাই বইকি। শুভ-কর্ম! তার ওপর পাত্রীও থাকে অনেক দূরে। চিঠি লিখে জানাতে হবে।”

“কে? তোমার কেউ?”

“আমারই মাসতুতো শালী—” বলিয়া অশ্বিনী মুহূর্ত হাস্য করিল।

“ব—টে! তাহোক। মেয়ে দেখতে শুন্তে ভাল আর বয়স্হা হ’লে আপত্তির কি? জানই ত আগের ৫ পক্ষ—” বলিতে বলিতে ডাক্তার উঠিয়া পড়িলেন।

অশ্বিনীও পুলকিত অন্তরে বাহির হইল। ডাক্তার; তাহার উপর বড়লোক—কুটুম্বিতা ভাগ্যের কথা। বাইবার-কালে বলিল—“সপ্তাহখানেক পরে পাকা খবর দেব।”

চাদরখানা কাঁধে ফেলিতে ফেলিতে ডাক্তার বলিলেন—“হু—”

বাহিরে শিবিকা প্রস্তুত ছিল। তিনি তাহাতে গিয়া উঠিলেন।

বিবাহের মত বিরাট ব্যাপারে, সাত দিন কিছুই নয়। কিন্তু ঐ সাত দিন না কাটিতেই গ্রামের সকলে শুনিল, কালী-ডাক্তারের গৃহে সানাই বাজিতেছে। বার্তাটি অতিমাত্রায় চমকপ্রদ। সকলে আরও শুনিল, জেলাশহর হইতে বাদাভাও আসিতেছে, কৃষ্ণপুর প্রভৃতি গ্রামে দধি-মিষ্টান্ন ও আতসবাজীর ফরমাস গিয়াছে। এরূপ সমারোহ-ব্যাপার মামুদপুরে বহুদিন যাবৎ হয় নাই।

অশ্বিনী গিয়াছিল জেলাশহরে। গ্রামে ফিরিয়া সংবাদ-প্রাপ্তি মাত্র ডাক্তারের গৃহে ছুটিয়া আসিল, কিন্তু শুনিয়া আশ্চর্য হইল, বিবাহ ডাক্তারের নয়, তাহার কন্যার। পাত্র ঐ মামুদপুর ফান্সেসীর ডাক্তার—নবীন ছোকরাটি। অশ্বিনী জানিত কালী ডাক্তার ছোকরাটিকে দেখিতে পারে না, ব্যবসায় তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া তাহার প্রতি বিরক্ত। কিন্তু ভাগ্যের কথা কে বলিতে পারে? ছোকরাটি যথার্থ ভাগ্যবান। হুন্দরী পত্নী লাভ করিতেছে, তাহার উপর কালী-ডাক্তারের বাবতীয় সম্পত্তিও তাহার! আবার মনে মনে তারিফ করিল, কালী ডাক্তারের বুদ্ধিকে। তিনি সর্প বধ করিলেন অথচ তাহার বস্তুখানি কেমন অটুট ও নিটোল রহিল।

শ্রাবণ মাস। সেদিন আবার দুর্যোগ। পুষ্করিণী ও ডোবা কয়টি ভাসিয়া গ্রাম্যপথ তলাইয়া গেল। বৃষ্টি ও

বাতাসের তাড়নায় অমন শুভকস্মটিও পণ্ড হইবার উপক্রম। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বিবাহ হইল, নিমন্ত্রিত-অভ্যাগতগণ আকণ্ঠ পুরিয়া আহার করিল, বিস্তর অপচয় ঘটাইল এবং আহারান্তে কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া গৃহে লইয়া গেল। বরবধুও পরদিন সজ্জল মেঘসমাচ্ছন্ন আকাশকে সানাইয়ের ক্রন্দনরোলে আরও উতলা করিয়া গ্রাম্যপথে বাহির হইয়া নূতন ডাক্তারের নূতন গৃহোদ্দেশে যাত্রা করিল।

কালী-ডাক্তার কন্যার জন্ত অশ্রু মুছিলেন কি না জানি না, কিন্তু পরদিন অশ্বিনীকে নিভৃত্তে লইয়া বলিলেন—“কতদূর? খবর এল? না হয় অশ্রু—”

“ব্যস্ত হবেন না। পাত্রীটি পরমা হুন্দরী থাকে সেই ডিক্রগড়। ওদিকটা আবার ভেসে গেছে চিঠি আসতে একটু সময় নেবে বই কি।”

“ওটা ছেড়েই দাও, অশ্বিনী। আমি একটির সন্ধান পেয়েছি। আজ আর কথাবার্তার সময় নেই, এগুনি কেঁটপুর বেতে হবে। কাল এস। খবরাখবর তোমাকেই নিতে হবে—”

কালী-ডাক্তার রওনা হইলেন।

কয়দিনের পরিশ্রমে শরীর ভাল ছিল না, মনও মুসড়িয়া পড়িয়াছে। একবার মনে হইল যাইবেন না; কিন্তু মোটা ফি, এদিকে বেহারারাও গ্রামপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সামনে মুচিপাড়া—তাহার পরই খোলা রাস্তা। বেহারারা তাহার মধ্য দিয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িল।

হুন্দরী পথ আঁকিয়া-বাকিয়া চলিয়া গিয়াছে। দুই পাশে ঘন ঝোপজঙ্গল, তাহার ওধারে বর্ষার জলপূর্ণ খাল। খালের পর মতদূর দেখা যায় ধান ও পাটক্ষেত। স্থানে স্থানে ধান ও পাট গাছগুলি অর্ধমগ্ন। খালের জলে কলম্বী, হেলঞ্চ ও ধন শালুক বন। শালুককুল এখনও ফুটে নাই, কলিকাগুলি মাথা তুলিয়াছে মাত্র। এক জায়গায় কয়েকটি পানকৌটি ডুব দিয়া খাদ্যসংগ্রহ করিতেছিল। বামে ঘন বাঁশবন। তাহার এক শীর্ণ শাখায় একটি মাছরাঙা জলের দিকে তাকাইয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছে। বহুদূরে কয়েকটি গরু ক্ষেত পার হইতেছিল।

এপথে কালী-ডাক্তার বহু বৎসর ধরিয়া বহুবার যাতায়াত

করিতেছেন। ইহার দুই পার্শ্বের বিরাট শূন্যতা, গাঢ় শ্যামলিমা বা ঔদার্য্য কোনদিন তাঁহাকে আকৃষ্ট মুগ্ধ করিতে পারে নাই। কিন্তু আঙ্গিকার সজল দৃষ্টি তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিল। তিনি উপরের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, বর্ষণক্ষান্ত মেঘ স্থানে স্থানে সঙ্কুচিত, তরল ও ছিন্ন। তাহার কাঁকে কাঁকে সুকোমল নীলাকাশের প্রশান্তি পরিস্ফুট, আর, বহুদূরে ক্ষেত্র-পাথার তটে তরুশিরে সূর্য্য নিঃশব্দে অস্ত যাইতেছে। তাহার স্বর্ণালোকে সজলকক্ষ মেঘকোল রঞ্জিত।

কালী-ডাক্তার নিজেকে নিতান্ত নিঃসঙ্গ, দুর্বল ও অসহায় মনে করিতে লাগিলেন। মনে হইল, জীবনের দিনগুলি আর অগণিত নয়। কিন্তু পরক্ষণেই এই অকারণ দুর্বলতা হইতে মুক্ত হইবার প্রয়াস পাইলেন। তথাপি ইহা দূর হইল না, মনের উপর আরও চাপিয়া বসিতে লাগিল।

বেহারারা সাবধানে চলিতেছে। রাত্তা কন্দমাক্ত ও স্থানে স্থানে ভগ্ন; তাহার উপর দিয়া জলস্রোত বহিতেছে। এদিকে সন্ধ্যার বিলম্ব নাই; তাহার পরই রাত্রি। তবে এক সুবিধা আছে, গুরুপক্ষ। কৃষ্ণপুর তখনও দূর, কিন্তু রেল-পথের ধারে তাহার সিগ্নাল দেখা যাইতেছে। ডাক্তারবাবু আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন, যাইবেন কিনা।

কিন্তু শেষ অবধি ফিরিতে পারিলেন না এবং বখন পৌঁছিলেন সন্ধ্যা উতরাইয়া গিয়াছে। রোগীর গৃহ রেল-লাইনের ওপার। ষ্টেশনের উপর দিয়া বাওয়ানী সুবিধা। তিনিও বেহারাদের সেই পথ ধরিতে বলিলেন।

সে-সময় কোন ট্রেন নাই। ষ্টেশনের বাবু, গ্রামেরও দুই একজন খোলা প্ল্যাটফর্মের উপর চেয়ার পাতিয়া বসিয়া গল্প করিতেছেন। পার্শ্বস্থিত ঘরের আলো স্থানটিকে কিঞ্চিৎ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। সেইখান দিয়া যাইবার কালে কালী-ডাক্তার বাবু-কয়টিকে একবার স্মৃতিস্কন্দনয়নে দেখিয়া লইলেন। কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু সকলের মধ্যখানে ঐ ফর্সা ছোকরা বাবুটি—কালী-ডাক্তারের পুরাতন হৃদপিণ্ডটা সহসা তাঁহার বক্ষপঞ্জরে সজোরে আঘাত করিল, আনন্দে কি আতঙ্কে তিনিই জানেন। কিন্তু পরক্ষণেই ছমকি দিলেন—“পা চালিয়ে চল।”

বাহুকগণ অবশ্য জোরেই চলিতেছিল।

রাত্রিটা রোগীর গৃহেই কাটিল। পরদিন গ্রামে ফিরিয়াই তিনি অশ্বিনীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অশ্বিনী লোকটি বড় ছঁসিয়ার। সে আসিতেই ডাক্তার বলিলেন—“শুনেছ খবর?”

“কিসের?”

“নবা ছোঁড়া নাকি কেষ্টপুর ষ্টেশনে টিকিটমাস্টারী করে—”

“নবা? কে নবা? আমি ত—”

“আরে সেই যে, দেখ নি? নবা—নবা। আমারই ছেলে—”

“তাই নাকি? আপনাকে কে বললে?”

“রূপোর মা। কাল আমিও যেন দেখলাম। যাই হোক, খবরটা জানতে তোমাকেই একবার কেষ্টপুর যেতে হবে। আজ গেলেই ভাল হ’ত। তা এখন বেলা হয়ে গেছে—কালই ভোরে উঠে চলে বেও—”

অশ্বিনী শঙ্কাকম্পিত বক্ষে বলিল—“ছঁ—” এক পরদিন একটু ফর্সা হইতেই কৃষ্ণপুর রওনা হইল, ফিরিল সন্ধ্যায়।

ডাক্তার তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

অশ্বিনী বলিল—“কোন ভুল নেই। সে-ই। বৌঠাকরুণের সঙ্গে অনেক গল্পগুজব করেছি। তিনি অনেক কথা গিজ্ঞাসা করলেন। ওবেলার আহারটা হয়েছে ওখানেই—”

“ছঁ—”

“তা এতে আর হয়েছে কি? আপনি ত স্ত্রী-পুত্র তাগই করেছেন।”

ডাক্তার ক্লান্তদৃষ্টিতে একবার অশ্বিনীর মুখের দিকে তাকাইলেন।

অশ্বিনী বলিল—“আর নবাটাও শীগ্গির চলে যাবে—”

কালী-ডাক্তার অকারণে চোখমুখ রাঙা করিয়া হৃকার দিয়া উঠিলেন—“কোথা যাবে?”

বোধ করি নিজের দুর্বলতায় লজ্জিত হইয়া ক্ষণিক চূপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, “সে-সব আমার জানবার দরকার নেই। এই অঘ্রাণেই শেষ করব। ওদের এক

আধলাও দেব না—দেব না। যাও তুমি সুস্থ হও
গে—” বলিয়া ঘন ঘন তামাক টানিতে লাগিলেন।

অশ্বিনী আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া গেল।

তারপর মাস দুই কাটিয়াছে। পাত্রী উপস্থিত,
বিবাহের সব স্থির। কিন্তু অগ্রহায়ণের তখনও দেবী।
কালী-ডাক্তার সহসা কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া এক দিন
স্বর্গারোহণ করিলেন! কন্যা-জামাতার সক্রম জন্মন,
অশ্বিনীর কাতরোক্তি তাঁহাকে ফিরাইতে পারিল না, তিনি
চলিয়া গেলেন।

তিনি গেলেন সকালে, তাঁহার জামাতা-বাবাজী
লৌহসিঙ্কু খুলিয়া উইলপত্র বাহির করিল বিকালে। গ্রামের

পাঁচজন মাতব্বরও তখন সেখানে উপস্থিত। উইলপাঠ
সুরু হইল; জামাতা বাবাজীর নয়নযুগল অশ্রুভারাক্রান্ত।
কিন্তু পড়িতে পড়িতে সে সহসা চমকিত হইল। তাবিল
অশ্রুধারা দৃষ্টিবিন্দম বটাইতেছে। চোখ দুটি উত্তমরূপে
মার্জন করিয়া দেখিল—না, ঠিকই ত; বেশ স্পষ্টাক্ষরে
লেখা রহিয়াছে। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীও আগ্রহ সহকারে
অগ্রসর হইয়া একে একে উইলখানি দেখিলেন—না,
কোন ভুল নাই, কালী-ডাক্তার সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় তাঁহার
বাবতীয় স্বাবর-অস্বাবর সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন—
রুকমপুরের টিকিটবাবু, তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত
পুত্র শ্রীগান নবকুমার বোষকে, ইহার উপর তাঁহার
কন্যাজামাতার কোন অধিকার নাই।

রুচিরা

শ্রীবজয়চন্দ্র মজুমদার

ধসিয়ে ভাঙ্গা

ঘোরে ও কে!—

জীবন-ব্রতে

রক্তে রাঙ্গা

নদীর পাড়ে

গুরু শোকের

বোঝা বাড়ে।

যাত্রাপথে

রাত্রি ঘনায়—

তাকায় তারা

শ্রান্ত দাঁড়ায়;

সবুর, সবুর!

পলক-নাড়া

কিরণ-কণায়

উর্ধ্বে বাড়ায়

হাত দুখানি।

ফুটল প্রভুর

বিধান-বাণী

অশ্বিনীর আদি

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

পাঁজি কাল-নিরূপক গ্রন্থ, চন্দ্র-সূর্য কাল-প্রবোধক বঙ্গ। এই যে এখন লিখিতে বসিয়াছি, সে কখন? যখন চন্দ্র আকাশের অমুক স্থানে, কিম্বা সূর্য অমুক স্থানে ছিল। অমুক স্থানে। কোন্ স্থানে? সে স্থান, অশ্বিনী-নক্ষত্রের আদি হইতে এত দূরে। অশ্বিনী-নক্ষত্রের আরম্ভ কোথায় হইয়াছে, সে আরম্ভ না জানিলে চন্দ্র-সূর্যের স্থান জানা যাইবে না। কালও জানা যাইবে না।

রবি-পথ একটা বৃহৎ বৃত্ত। বৃত্তমাত্রেই ৩৬০ ভাগে বা অংশে বিভক্ত কল্পনা করা হয়। এক অংশে ৬০ কলা। পূর্বকালে এই অংশ-কল্পনা ছিল না। তখন রবি-পথ ২৭ সমান ভাগে বিভক্ত কল্পনা করা হইত। এক এক ভাগের নাম নক্ষত্র। প্রথম ভাগ, অশ্বিনী-নক্ষত্র, দ্বিতীয় ভাগ ভরণী-নক্ষত্র, তৃতীয় ভাগ কৃত্তিকা-নক্ষত্র, ইত্যাদি। অতএব অশ্বিনী-নক্ষত্র, প্রথম ১৩°২০'; ভরণী-নক্ষত্র ১৩°২০' হইতে ২৬°৪০' পরিমিত পথ; কৃত্তিকা-নক্ষত্র ২৬°৪০' হইতে ৪০°০' পরিমিত পথ, ইত্যাদি। প্রথম নক্ষত্রভাগের মধ্যে অশ্বিনী নামক তারা আছে, সে তারার নামে নক্ষত্রভাগের নাম হইয়াছে। এইরূপ অন্যান্য নক্ষত্রভাগের নাম হইয়াছে।

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর অশ্বিনী-নক্ষত্র প্রথম নক্ষত্র হইয়াছে। পূর্বে কৃত্তিকা-নক্ষত্র প্রথম ভাগ ধরা হইত। সে সাড়ে চারি হাজার বৎসর পূর্বে আরম্ভ হইয়াছিল। তৎপূর্বে রোহিণী প্রথম ভাগ ধরা হইত। সে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বের কথা। তৎপূর্বে কি ছিল, তাহা অজ্ঞাত।

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি নামে কিছু আসে যায় না। আসে যায়, নক্ষত্রের সীমায়। আদি ও অন্তে সীমা। আদি জানিলে অন্তও জানা যায়। কারণ আদি হইতে ১৩°২০' দূরে অন্ত। আরও বুঝিতেছি, যদি একটা নক্ষত্রের আদি জানিতে পারি, অন্যান্য নক্ষত্রেরও

আদি জানিতে পারা যায়। কারণ প্রত্যেকের পরিমাণ ১৩°২০'।

এখন জিজ্ঞাস্য, নক্ষত্রভাগ চিরকাল একই ছিল কি? চিরকাল,—যত কালের পুরাতন জানিতে পারা গিয়াছে। রবি-পথের পার্শ্বে তারা না থাকিলে এই প্রশ্নের উত্তর-প্রাপ্তি অসম্ভব হইত। পথপার্শ্বের বৃক্ষ দেখিয়া আমরা পথের নিদর্শন পাই, পথও মাপিতে পারি, রবি-পথের পার্শ্বের তারা দেখিয়া রবি-পথ চিনিতে ও মাপিতে পারি। অশ্বিনী-নক্ষত্র, এই নাম হইতে বুঝিতেছি, অশ্বিনী-তারা এই ভাগে আছে। কিন্তু সে ভাগের আদিতে আছে, কি অন্তে আছে, কি মধ্যে কোন্ স্থানে আছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। মঘা-নক্ষত্রভাগে মঘা-তারা আছে, কিন্তু সে ভাগের কোন্ স্থানে আছে, তাহা নাম হইতে জানিবার উপায় নাই। মনে করি, মঘা-তারা হইতে মঘা-নক্ষত্রভাগ হইয়াছিল। চিরকালই কি মঘা-নক্ষত্রের আরম্ভ মঘা-তারায় ধরা হইত? এই প্রশ্নের উত্তর কি উপায়ে পাওয়া যাইতে পারে?

অতিপুরাকালের কথা ছাড়িয়া দিই। উপস্থিত আলোচনায় তাহার প্রয়োজন নাই। বৃহৎসংহিতায় বরাহমিহির বৃদ্ধ গর্গের মতে লিখিয়াছেন, শকাব্দে ২৫২৬ যোগ করিলে যুধিষ্ঠিরাক পাওয়া যায়। অর্থাৎ শকারম্ভের ২৫২৬ বৎসর পূর্বে যুধিষ্ঠিরাকের আরম্ভ। ইংরেজী সালে, ২৪৪৯ খ্রিষ্ট-পূর্বে। অর্থাৎ কেন প্রসিদ্ধ হইয়াছিল? যুধিষ্ঠিরের নাম যোগ হেতু মনে হয়, খ্রি-পূ. ২৪৪৯ অব্দে তিনি অপহৃত রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যার সমর্থক একটা উক্তিও পাওয়া যায় না। পুরাণ-রূপ পুরাতন এই অব্দের উল্লেখ নাই। বৃদ্ধ গর্গ জ্যোতিষী ছিলেন। কেবল তিনিই যুধিষ্ঠিরের নাম করিয়া গিয়াছেন। তিনিই কি যুধিষ্ঠিরাকের প্রবর্তক? তাহাও সম্ভাবনা করিতে পারা যায় না। অর্থাৎ কেন স্মরণীয় হইয়াছিল? এই প্রশ্ন আমার



শীল ফুল

শিল্পী—শ্রী বিবরণ ধর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

পুনঃ পুনঃ পীড়িত করিয়াছে। পরে উক্ত অক্ষের পাজি গণিয়া এক অজ্ঞাত-পূর্ব ইতিবৃত্ত পাইয়াছি। এখানে তৎসমুদয়ের উল্লেখ করিব না, করিলে মূলগ্রন্থ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে। ইতিবৃত্তটি সংক্ষেপে এই। কৃষ্ণ-বজ্রবেদে ২৭ তারাময় নক্ষত্রের নাম আছে, কিন্তু প্রথম নক্ষত্র, কৃত্তিকা। কোন্ তিথিতে কোন্ নক্ষত্রে সত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে, তাহারও বিচার আছে। এই দুই উক্তি সম্বন্ধে অনেক তর্ক হইয়া গিয়াছে। খ্রি-পূ ২৪৪২ অক্ষের দুই চারি বিশেষ দিনের জ্যোতিষিক ইতিবৃত্ত অবলোকন করিলে প্রতীতি হইবে, কৃষ্ণবজ্রবেদ এই কালে রচিত। আরও জানা যায়, কৃত্তিকা-তারা কৃত্তিকানক্ষত্রভাগের আদিতে ছিল।

এখানে একটু বুঝিবার আছে। রবি-পথ নক্ষত্র-ভাগে বিভক্ত করিয়া করা হইয়াছে। কিন্তু কৃত্তিকা-তারা রবি-পথে অবস্থিত নয়। রবি-পথের কিছু উত্তরে কৃত্তিকা-তারা। সে তারা হইতে সূত্র ধরিলে সে সূত্র রবি-পথের যে-স্থান স্পর্শ করিবে, সে-স্থান কৃত্তিকা-তারার। যেমন, পথের দশ পনর হাত দূরে একটা তালগাছ আছে। তালগাছ হইতে একটা সূত্র পথের এক স্থান স্পর্শ করিল। পথের সে স্থানে তালগাছ বলা যাইতে পারে। ইহা সোজা কথা। কিন্তু অনেক সময় সোজা কথা সোজা বলিয়া আমরা ভেদাভেদ করি না। প্রথম মনে হইবে, তালগাছ হইতে পথে লম্বরেখা করা উচিত। উচিত; ইহার অন্তথা ভাবিতে পারি না। সেই রূপ, আকাশেও কৃত্তিকা-তারা হইতে রবি-পথে লম্বরেখা করিতে হইবে। ইংরেজী জ্যোতিষে ইহাই বিধি। কিন্তু বাহা যুক্তি-সঙ্গত, এবং বাহা পশ্চিমদেশে প্রচলিত, তাহাই একমাত্র বিধি না হইতেও পারে। জ্যোতিষচর্চা একদিন হঠাৎ আরম্ভ হয় নাই। প্রথমে স্থলজ্ঞান, পরে পরে তাহা স্থল হইয়াছে। প্রথম দৃষ্টিতে, চন্দ্র-সূর্য-তারা প্রত্যহ একে প্রদক্ষিণ করিতেছে। প্রাচীনেরা মনে করিতেন, মনে করায় ভুলও নাই, চন্দ্র-সূর্য-তারা একে একে হইয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এক মেধি-স্বরূপ। ধান মাড়িবার সময় যেমন গোকুল মেই-কাঠে রজ্জ্ববদ্ধ হইয়া মধ্যস্থিত সে কাঠের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে, চন্দ্র-সূর্য-তারাও তেমন একে বেষ্টিত করিতেছে। ইহা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেছি।

প্রাচীনেরাও প্রত্যক্ষ করিতেন। তাহার এক-সূত্র করিয়া করিতেন। যত জ্যোতিষ তত সূত্র একে বদ্ধ আছে। অর্থাৎ এক হইতে কৃত্তিকা-তারা দিয়া রেখা করিলে সে-রেখা রবি-পথের যে স্থান স্পর্শ করে, তাহাটি সে-স্থানে আছে।

এই সামান্য কথা বিস্তার করিবার হেতু আছে। বোম্বাইর প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী (একগুণে কৈলাসবাসী) বেঙ্কটেশ কেতকর বহুকাল হইতে প্রচার করিতেছিলেন, চিত্রা-তারার ১৮০° অংশ পশ্চিমে অশ্বিনী-নক্ষত্রভাগের আদি। প্রায় দশ বৎসর হইল তিনি তাহার যুক্তি-পরম্পরাসহ মরাঠী ভাষায় লিখিত এক প্রবন্ধ আমার সমালোচনার নিমিত্ত পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমি তখন তাহার মতে হাঁ কিম্বা না বলিতে পারি নাই। ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসের 'ভারতবর্ষে' 'পঞ্জিকা-সংস্কার' নামে সে প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম। প্রবন্ধের উপরে কেতকরের নাম থাকিলেও অনেকে মনে করিয়াছিলেন, আমি কেতকরের মতের পক্ষে। অর্থাৎ চিত্রা-তারা ১৮০° অংশে অবস্থিত। বস্তুতঃ আমি তাহার পক্ষে যেমন, বিপক্ষেও তেমন। কথাটা এই। চিত্রা-তারা রবি-পথে অবস্থিত নয়। রবি-পথের প্রায় ২° অংশ দক্ষিণে অবস্থিত। কেতকর বলেন, চিত্রা-তারা হইতে রবি-পথে লম্বরেখা করিতে হইবে। আমি বলি, এক-রেখা করিতে হইবে। ফলে চিত্রার স্থানে কিঞ্চিদূর ১° অংশের অন্তর পড়িবে, এবং সে অন্তর অশ্বিনী-নক্ষত্রের আদি স্থানেও পড়িবে। সম্ভ্রতি সে অন্তর প্রায় ৫০' কলা। সূর্যসিদ্ধান্তে ও শাকল্য-সংহিতায় চিত্রা-তারার স্থান ১৮০°, কিন্তু ইহা যে এক-সূত্রীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি কেতকর মানেন নাই। আমার আংশিক প্রতিবাদ তাহার প্রীতিকর হয় নাই, আমিও আর অগ্রসর না হইয়া আমার আলোচনা ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। প্রায় এক বৎসর হইল সেটা সম্পূর্ণ করিয়া প্রবন্ধ আকারে লিখিয়াছি, এবং সম্ভ্রতি 'প্রবাসী' প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি ইংরেজীতে লিখিত, নাম The First Point of Asvini. ইংরেজী-ভাষায় পাঠক পড়িতে পারেন। এখানে চমক করিতেছি।

খ্রি-পূ ২৪৪৯ অব্দে কৃত্তিকা-নক্ষত্রভাগের প্রথম পাদান্তে মহাবিশুবসম্পাত হইয়াছিল। কৃত্তিকা-তারা হইতে সম্পাত-বিন্দু এক নক্ষত্র-পাদ অর্থাৎ ৩°২০' অন্তরে ছিল। বিষুব-দিনে পূর্ণিমা হইয়াছিল। সেটি বৈশাখী পূর্ণিমা। ইংরেজী তারিখ, ১২ই এপ্রিল। এই সময়ে এবং ইহার কয়েক শত বৎসর পরেও চিত্রা-তারার ১৮০° অংশ দূরে অশ্বিনী-নক্ষত্রের আদি ছিল না।

বিষুব ও অয়নদ্বয় তারা হইতে পিছাইতে লাগিল। কিন্তু জ্যোতিষীরা বৈশাখী পূর্ণিমায় মহাবিশুবদিন স্বীকার করিতে লাগিলেন। যাহা চলিতে থাকে, সহজে তাহার পরিবর্তন হয় না। প্রায় খ্রি-পূ ১৮৫০ অব্দে মঘা-তারা হইতে দক্ষিণায়নবিদু অর্ধনক্ষত্রভাগ পিছাইয়া গিয়াছিল। অর্থাৎ তখন মঘা-তারার স্থান ৯৬°৪০', কিন্তু মঘা-নক্ষত্রভাগের আরম্ভ ৯০° অংশে পূর্ববৎ রহিয়া গেল। এই সময়ে চিত্রা-তারার ১৮০° অংশ দূরে অশ্বিনী-নক্ষত্রের আদি ঘটিয়াছিল। গণিতদ্বারা এই ইতিবৃত্ত জানিতেছি। কেতকর মৈত্রায়ণি-উপনিষদের এক উক্তি হইতে চিত্রা-তারা ও অশ্বিনী-নক্ষত্রের আদিবিদুর এই সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। গণিতদ্বারা লিখিত উক্তি সমর্থিত হইতেছে। প্রায় দুই সহস্র বৎসর এই নক্ষত্রভাগ চলিয়া আসিয়াছিল। যতদূর জানা যায়, আর্যভট নক্ষত্র-চক্রের আদিবিদু অর্থাৎ অশ্বিনী-নক্ষত্রের আদিবিদু পূর্বস্থান হইতে ২°৩০' পশ্চিমে সরাইয়া দিয়াছিলেন। কারণ তাহার কালে সে স্থানে মহাবিশুবসম্পাত হইত। বর্তমান সূর্য-সিদ্ধান্ত আর্যভটের মত গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল মৈত্রায়ণি-উপনিষদ নয়, বায়ু ও বিষ্ণুপুরাণে বৈশাখী পূর্ণিমায় মহাবিশুবের বর্ণনা আছে। গণিতদ্বারা জানা যায়, খ্রি-পূ ১৮৩৮ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখের ঘটনা। মৈত্রায়ণি-উপনিষদ এই কালের উল্লেখ করিয়াছেন, পরবর্তী বেদান্ত-জ্যোতিষের কালের উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে মনে হয়, উপনিষদখানি এই দুই কালের মধ্যে প্রণীত হইয়াছিল।

বেদের ছয় অব্দের মধ্যে জ্যোতিষ এক অঙ্গ। আমরা ঋগ্-যজুর্বেদের কালের জ্যোতিষ পাই নাই। পরবর্তী কালের সংশোধিত জ্যোতিষ পাইয়াছি। এখন ইহাই

বেদান্ত-জ্যোতিষ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহার প্রাকাল নানা জনে নানাবিধ অনুমান করিয়াছিলেন। এখন নির্ভয়ে বলিতে পারি, বর্তমান বেদান্ত-জ্যোতিষ খ্রি-পূ ১৩৭২ অব্দে প্রণীত হইয়াছিল। উক্ত অব্দের ২রা জানুআরি উত্তরায়ণ হইয়াছিল এবং সেদিন ধনিষ্ঠা-তারা ধনিষ্ঠা-নক্ষত্রভাগের আদিতে ছিল। ইহা হইতেও চিত্রা-তারা ও অশ্বিনী-নক্ষত্রের আদির সম্বন্ধ পাওয়া যায়। বস্তুতঃ কেতকর তাহার গবেষণায় ধনিষ্ঠার উপর নির্ভর করিয়াছিলেন।

বেদান্ত-জ্যোতিষে এক যুগ পঞ্চবর্ষীয়ক। পাঁচ বর্ষের এই যুগ প্রাচীন। অন্ততঃ যজুর্বেদের কাল হইতে চলিতেছিল। নানা পুরাণে এই যুগের বর্ণনা আছে। মহাত্মারতে বিরাট পর্বে ভীষ্ম পঞ্চবর্ষীয়ক যুগ ধরিয়া পাণ্ডবগণের প্রতিজ্ঞাত ত্রয়োদশ বর্ষ গণিয়াছিলেন। পাঁচ বর্ষের পাঁচ নাম ছিল। প্রথম বর্ষের নাম সংবৎসর। উত্তরকালে যে ক্রম সংবৎ প্রচলিত হইয়াছিল, ষোড়শ সংবৎসর শব্দের সংক্ষেপে সংবৎ নাম।

বেদান্ত-জ্যোতিষের ধনিষ্ঠার স্থান হইতে খ্রি-পূ ৭৮ ও ৩১৯ অব্দের এক এক বিখ্যাত জ্যোতিষিক ঘটনা পাওয়া যায়। প্রথমটিতে শকারম্ভ, দ্বিতীয়টিতে গুপ্তাদ-আরম্ভ। এই ক্রম আশ্চর্যজনক। মনে হয় উহাদের মূল জ্যোতিষিক।

খ্রি-পূ ৩১৯ = শক ২৪১। ৪২১ শকে আর্যভট। এই ১৮০ বৎসরের মধ্যে প্রণীত পাজি কিম্বা জ্যোতিষগ্রন্থ অজ্ঞাত। বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকাগ্রন্থ আছে বটে, কিন্তু তদ্বারা আমাদের উপস্থিত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। পঞ্চসিদ্ধান্তিকার অন্তর্গত সূর্যসিদ্ধান্তে সাতটি তারার ঋবস্থান আছে, কিন্তু সুধাকর দ্বিবেদী ও ডক্টর থিবো যে পাঠ তুলিয়াছেন, তাহাতে সম্বন্ধের কারণ আছে। স্থূল পরিমাণেও এত ভুল অসম্ভব। পুষ্যা ও অশ্লেষা তারাদ্বয়ও বর্তমান সূর্যসিদ্ধান্তের তারা নয়। মঘা ও চিত্রা-তারার ঋবস্থানের ভুল স্পষ্ট। কেতকর নেপাল হইতে এক পুথী পাইয়াছিলেন, তাহাতে মঘা-তারা ১২৬°, চিত্রা-তারা ১৮০° আছে। এইটি শুদ্ধ মনে হয়। খ্রি-পূ ৩১৯ অব্দে চিত্রা-তারার স্বাভাবিক স্থান প্রায়

১৮০০ অংশ হইয়াছিল। দুই-ই ঋবস্থান। কেতকর স্বমত পরিপোষণ নিমিত্ত অন্য অর্থ করিয়াছেন। যে মত পঞ্চাশ বৎসর প্রচার করিয়াছিলেন, যে মতে নানা গ্রহ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি মমতা স্বাভাবিক। চিত্রা-তারা হইতে রবি-পথে লম্বপাত করিলে পাজি-গণনায় সুবিধা আছে। তিনি আমার সহিত পত্র-ব্যবহারে একথা মানেন নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, সে সুবিধা মন হইতে সরাইতে পারেন নাই। আমার ইংরেজী পুস্তিকায় তাহার সমুদয় যুক্তি অক্লেশে খণ্ডিত হইয়াছে।

অশ্বিনীর আদিতে মেঘরাশির আদি। অশ্বিনীর আদি স্থির। কিন্তু বিষুববিন্দু অ-স্থির। ২৪১ শকে (খ্রি-প ৩১৯ অব্দে) অশ্বিনীর আদিতে বিষুববিন্দু আসিয়াছিল। তদনন্তর বিষুববিন্দু পিছাইয়া গিয়াছে। এই দুয়ের অন্তরের নাম অয়নাংশ। বাহারা প্রচলিত পঞ্জিকার সংস্কার বাঞ্ছা করেন, তাহারা অয়নাংশ-বিচারও করিয়া থাকেন। কারণ অয়নাংশ জানিলে অশ্বিনাদি-নির্ণয় সুসাধ্য। কিন্তু ইহাই একমাত্র উপায় নহে। তারা দ্বারাও সুসাধ্য। সে বিন্দু অমুক তারা হইতে এত দূরে,—সে একই কথা। রবি মেঘাদি সংক্রমণ করিলেই নূতন বর্ষের আরম্ভ। গুপ্তপ্রেস পাজিতে দেখিতেছি, ১৩ই এপ্রিল শুক্রবার অপরাহ্ন ৫টা ৬ মিনিটের সময় রবি মেঘরাশিতে প্রবেশ করিয়াছে, সে সময় হইতে নূতন বৎসর আরম্ভ হইয়াছে। এই লিখন সত্য কি? আজ ১৪ই শ্রাবণ ৩১শে জুলাই। সত্য কি? ইংরেজী বৎসর ও এক এক মাস গণনা অতি সহজ, রবি-সোমাদি বার যেমন একের পর এক চলিয়া আসিতেছে,

বৎসর ও মাসও তেমন। জনসাধারণের পক্ষে সুবিধা-জনক বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক নয়। আমাদের গণনা বৈজ্ঞানিক, এবং সেই হেতু ইহার পরীক্ষাও আবশ্যিক।

মঘা-তারা রবি-পথের অতিনিকটে অবস্থিত। যদি চিরকাল রবি-পথে থাকিত, তাহা হইলে সে তারা হইতে মেঘাদিবিন্দু একবার জানিতে পারিলে চিরদিন জানা থাকিত। চিত্রা-তারা আরও দূরে। কালান্তরে, কালান্তর অল্প নয়, প্রায় ৩৮০০ বৎসর, চিত্রার ঋবস্থান হইতে বর্তমান অয়নাংশ-নির্ণয় সূক্ষ্ম হইবে না। কিন্তু যদি স্বীকার করি ২৪১ শকে অয়নাংশ ছিল না, তাহা হইলে ১৮৫০ শকে অয়নাংশ ২২°২৩' দাঁড়াইয়াছিল।

কিন্তু এইখানে প্রশ্নের চরম নিষ্পত্তি হইল না। কি কারণে কে জানে, আমাদের বর্ষপরিমাণ প্রায় ৩ মিনিট অধিক ধরা হইয়াছে। বর্ষে বর্ষে ৩ মিনিট যোগ হইয়া এখন প্রায় ৩১০ দিন হইয়াছে। অর্থাৎ এই বৃদ্ধি না ঘটিলে প্রায় ৩১০ দিন পূর্বে নূতন বর্ষপ্রবেশ হইত। কালান্তরে মধ্যরবি ও স্কুটরবির পরমাস্তর হ্রাস পাইয়াছে। এই কারণেও অয়নাংশ নির্ণয় কঠিন হইয়াছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্য ধরিয়া থাকিলে সংসারযাত্রা ছুঁকর হয়। আমার সামান্ত বিবেচনায় ২২°২৩' অয়নাংশে ২২' কলা শুদ্ধি-স্বরূপ যোগ না করিলে গতাস্তর নাই। অর্থাৎ ১৮৫০ শকের অয়নাংশ ২২°৪৫'। কেতকরের মতে ২২°৫১'। ২২' কলার ভুল স্বীকার করিতে পারিলে আরও ৬' কলার ভুল স্বীকার পীড়া-দায়ক না হইতে পারে। অর্থাৎ কেতকরের মত গ্রহণ করিলে বোঝার উপর শাগের আটি মাত্র হইবে। আমরা কত রকম শাগের কত আটি বহিতেছি, পাজি তাহার প্রমাণ।

আমাদের শিক্ষা ও অন্ন-সমস্যা

ডক্টর শ্রীযোগীশচন্দ্র সিংহ

বাংলা দেশে প্রতীচ্য শিক্ষার প্রকৃত গোড়াপত্তন হ'ল ১৮৩৫ সালে। ঐ সময় থেকে প্রায় এক-শ বছর ধরে এই শিক্ষার ধারা অপ্রতিহতভাবে চ'লেছে। প্রথমে এল স্কুল-কলেজ, তার পরে স্থাপিত হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার সুযোগ পেলাম, আর সেই বিদ্যার জোরেই ডাক্তারী, ওকালতী, ইঞ্জিনিয়ারীং এবং নানা রকমের উপার্জনের পথগুলি আমাদের পক্ষে উন্মুক্ত হ'ল। লেখা-পড়ার আসল উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন, এ-কথা খুব কম লোকের পক্ষেই খাটে; বেশীর ভাগ লোকেই অর্থোপার্জনের আশায় এই নতুন শিক্ষা এতদিন পেয়ে এসেছেন।

আজ কিন্তু এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেকের মনেই সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। যে-বিদ্যায় অন্নবস্ত্রের সংস্থান হয় না, সে-বিদ্যার বোঝা বহন ক'রে লাভ কি? অর্থনৈতিকগণ ধারা টাকার মাপকাঠি দিয়ে সমস্ত জিনিষের পরিমাপ ক'রে থাকেন তাঁদের মতে বি-এ অথবা বি-এসসি ডিগ্রী পেতে আজকাল যত খরচ পড়ে সেই টাকাটাও একজন সাধারণ গ্রাজুয়েট অনেক সময়ে সমস্ত জীবন ধ'রে রোজগার করতে পারেন না। শুধু টাকার দিক দিয়ে কেন, অস্তান্ত দিক দিয়েও বর্তমান যুবকদের সামান্য রোজগার অথবা বেকার অবস্থার বিবময় ফল বড় কম নয়। শিক্ষিত যুবকদের বেকার-সমস্যা এই বিপ্লবী অনাচারেরও একটি মূল কারণ এ-কথা অনেকেই আজকাল স্বীকার ক'রে থাকেন। তাই এই বেকার-সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে নানা আলোচনা সুরু হয়েছে।

কিন্তু এই সমস্যার প্রসার এবং গুরুত্ব সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ১৯৩১ সালের আদমশুমারি অনুসারে বাংলা দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা মাত্র ৩৫২১। পাঁচ কোটি লোকের তুলনায় এই সংখ্যা নগণ্য। এমন কি এ-দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অনুসারেও সাড়ে তিন হাজার

বেকার বেশী নয়, কিন্তু শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কি সত্য সত্যই এত কম? বেকারের বীমা ব'লে কোন ব্যবস্থা আমাদের দেশে নেই সেইজন্য তাদের সংখ্যা নিভুল ভাবে নির্ণয় করা কঠিন। “আমি বেকার” এ-কথা বললে যদি চাকরি না মেলে তবে কোনও বেকার লোকই সে-কথা স্বীকার করবেন না—এটাই স্বাভাবিক। আজকাল অনেক উকিল ও অস্তান্ত ব্যবসায়ীও যে প্রকৃত প্রস্তাবে বেকার এ-কথা আদমশুমারির সুপারিশে গুণ্ট সাহেব লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না; কিন্তু তিনি বেকারের যে সংখ্যাটা দিয়েছেন, সেটা যে ঠিক এ-বিষয়ে তাঁর নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ আছে। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা সাড়ে তিন হাজারের চেয়ে অনেক বেশী বলেই অনুমান হয়, যদিও ঠিক কত বেশী তা বলা সম্ভবপর নয়।

একটা উপায়ে এ-সম্বন্ধে কিছু নতুন তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। ধারা অন্ততঃ সাত বছর আগে গ্রাজুয়েট হয়েছেন তাঁদের বাংলার মালুসী সভ্য-নির্বাচনের ভোট আছে। এই সব গ্রাজুয়েটের একটা তালিকাও তৈরি হয়েছে। ঐ তালিকাভুক্ত কত জন লোক আয়কর টেক্স দেন এই খবরটা সংগ্রহ করা খুব শক্ত নয়। এর থেকে সহজেই বোঝা যেতে পারে যে বি-এ, বি-এসসি ডিগ্রী পাওয়ার সাত বছর পরেও শতকরা কয় জন গ্রাজুয়েটের আয় ৯৯৯র বেশী নয় এবং শিক্ষিত সমাজের অন্ন-সমস্যা কিরূপ কঠিন। সকলেই জানেন যে কুবিলক আয় ছাড়া অন্য যে-কোন আয় বছরে এক হাজার টাকা কিংবা তার চেয়ে বেশী হ'লেই আয়কর দিতে হয়।

শিক্ষার দিক দিয়ে এই অন্ন-সমস্যার কোন সমাধান হ'তে পারে কি না সেই সম্বন্ধেই আজ দুই-চারটি কথা বলতে চাই। কারুর কারুর মত একটা খুব সহজ উপায় হ'ছে স্কুল-কলেজ সব বন্ধ ক'রে দেওয়া। তা হ'লেই

সমস্ত আপদ চুকে যাবে। বর্তমান শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি প্রকাণ্ডভাবে বন্ধ করা যদি সম্ভবপর না হয়, তবে এই সব বিজ্ঞান চান যে পড়াশুনার খরচ অত্যধিক বাড়িয়ে দেওয়া হোক, যাতে গরিব এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা— পড়াশুনা না করতে পারে। দেশের ভবিষ্যৎ যাদের হাতে, তাদের অশিক্ষিত রাখা যে সমস্যার সমাধান হ'তেই পারে না, এটা সহজেই অনুমেয়। পরন্তু এত যে সামাজিক এবং রাজনৈতিক অনাচার বেড়ে যাবে এ-কথাও ঠিক।

তাই অনেকে বলেন যে এই পুণ্ডিত বিদ্যার ভিত্তিপাণ্ডালা ভেঙে দিয়ে অর্থকরী বিদ্যা শেখানোর ব্যবস্থা করা হোক। কিন্তু এই অর্থকরী বিদ্যাটা কি? অর্থকরী বিদ্যা এমন কোন বস্তু হ'তে পারে না যাতে পয়সা ফেললে সুস্থান চকলেটের মত ভাল ভাল চাকরি বেরিয়ে আসবে। এরূপ বিদ্যামন্ত্র কোনও দেশে আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি এবং ভবিষ্যতে হ'তে পারে বৈজ্ঞানিকেরা এরূপ কোন আশ্বাসও দেন না।

অনেকের মতে শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে শিক্ষাই হ'চ্ছে আজকাল অর্থকরী বিদ্যা। তাই সাধারণ শিক্ষার কলেজগুলির বদলে শিল্পশিক্ষার কলেজ তৈরির উপদেশ অনেকেই দিয়ে থাকেন। কিন্তু শিল্পশিক্ষার কলেজ করলেই কি আমাদের অন্ন-সমস্যার সমাধান হবে? পাশ্চাত্য দেশে শিল্পের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পশিক্ষা পরিপুষ্টি লাভ করেছে কিন্তু আমাদের এই কৃষিপ্রধান দেশে শিল্পের প্রভাব অর্থনৈতিক জীবনের ওপর খুবই কম। আবার শিল্প-বাণিজ্যের অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানই অবাঙালীর হাতে। সুতরাং আমাদের দেশের শিল্পশিক্ষাগারগুলির এরূপভাবে বিস্তার হওয়া উচিত যাতে বাংলার শিল্পের প্রগতির সঙ্গে তাদের সামঞ্জস্য থাকে। কারণ কোন প্রতিষ্ঠানই কার্যকরী হ'তে পারে না, যদি-না পারিপার্শ্বিক অবস্থা তার অনুকূল হয়। বোঁকের মাথায় অনেকগুলো শিল্পশিক্ষাগার প্রতিষ্ঠা করলেই দেশের ব্যবসায় ও শিল্পের উন্নতি হবে না, শুধু নূতন এক শ্রেণীর বেকারের দল সৃষ্টি হবে মাত্র। ইউরোপ ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ শিল্পশিক্ষাগার থেকে যোগ্য শিক্ষা লাভ করেও অনেক বাঙালী যুবক আজকাল অন্নসংস্থান করতে পারছেন না।

এই শ্রেণীর বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধিই কি অর্থকরী বিদ্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য?

শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে যা বলা হ'ল, বাণিজ্যশিক্ষা ও কৃষিবিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে তা মোটামুটি প্রযোজ্য। এ-কথাও সত্য যে আজকালকার দারুণ প্রতিযোগিতার ফলে ইউরোপীয় ব্যবসাদার খরচ কমানোর আশায় বেশী মাইনের ইউরোপীয় কর্মচারীর বদলে বাংলা শিক্ষিত ও যোগ্য বাঙালী রাখতে বাধ্য হ'বন, কিন্তু এখন পর্যন্ত এই সব ব্যবস্থা ঘটে ওঠে নি। বি-কম ডিগ্রীরূপ মূলধন নিয়ে আমাদের ছাত্রেরা যে নিজেরাই ব্যবসা করতে পারেন সে-আশাও কম; সুতরাং সাধারণ উচ্চশিক্ষার কলেজগুলি বাণিজ্য-শিক্ষার কলেজ পরিণত করলে বেকার বি-এ, বি-এসসির পরিবর্তে বেকার বি-কমের সংখ্যাই বেড়ে যাবে।

কেউ কেউ মনে করেন যে, এই কৃষিপ্রধান দেশে সাধারণ উচ্চশিক্ষার কলেজের বদলে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার কলেজ স্থাপন করলেই আমাদের অর্থায়নের পথ সুপ্রশস্ত হ'বে; কিন্তু এদেশের জমিস্বত্ব এতই ভীষণ এবং কৃষিকার্যে এত লোকই নিযুক্ত আছে যে, উন্নতভাবে কতকটা আমেরিকার প্রথাতে চাষ-আবাদ চালানো খুবই কঠিন এবং যদি তা সম্ভবও হয় তবু অনেক চাষীর ভাত মারা যাবে এবং তাদের বেকার-সমস্যা এমন ভীষণ হবে যে, তাতে সমাজবিপ্লব পর্যন্ত হ'তে পারে।

কৃষিকলেজ থেকে উত্তীর্ণ যুবকরা সাধারণ চাষীর মত অন্ন জমি নিয়ে চাষবাস করে তাঁদের অন্নসংস্থান করবেন এ ভরসাও কম। এ-কথা সত্য যে কলিকাতার উপকণ্ঠে শাকসব্জী কিংবা মাছের চাষ করে কেউ কেউ কেমনী-গিরির চেয়ে বেশী রোজগার করেন, কিন্তু এরূপ ব্যবসায়ের সুযোগ কম এবং এর প্রধান মুস্কিল হ'চ্ছে ঠিকভাবে বেচবার। অনেক স্থলেই ব্যাপারীরা সমস্ত লাভ খেয়ে ফেলে এবং উৎপাদকের ভাগ্যে বিশেষ কিছুই থাকে না। “নিকিরির কানে সোনা জেলের পরণে টানা” এ-কথাটা আপনারা সকলেই শুনে থাকবেন।

যদিও কৃষি, শিল্প অথবা বাণিজ্য সম্বন্ধীয় উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ, উচ্চ এবং মধ্য ইংরেজী স্কুলের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি ও শিল্প শিক্ষার যথেষ্ট

প্রয়োজনীয়তা আছে। এটি কিন্তু আমি অর্থোপার্জননের সুবিধা হবে বলে বলছি না। শিক্ষা যাতে প্রকৃত শিক্ষা হয়, শিক্ষাতে যাতে মানুষ তৈরি হয় এই ভেবে এ-কথাটা বলছি।

ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে যখন স্কুলকলেজ স্থাপিত হয় নি তখন প্রত্যেক চাকরির উমেদারেরই এক একখানি প্রকাণ্ড খাতা ছিল স্তন্যে পাই। ষাঁর খাতায় যত বেশী ইংরেজী কথার মানে থাকতো তাঁর মাইনে হ'ত তত বেশী। লেখাপড়ার সেই ধারা আজ পর্যন্ত চলেচে। আমাদের দেশে শিক্ষা মানে হ'ছে কতকগুলো খবর মুখস্থ ক'রে পরীক্ষায় পাস করা। এই 'তোতাপাখী'র শিক্ষাই কি প্রকৃত শিক্ষা? এতে কি হাতের বা চোখের কোন শিক্ষা হয়? জ্ঞানাগমের দ্বার উন্মুক্ত না হ'লে জ্ঞানলাভ হবে কি ক'রে এ-কথা অনেকই ভেবে দেখেন না। অপর দিকে এই শিক্ষার ফলে হাতের কাজের ওপর ছাত্রছাত্রীদের একটা বিতৃষ্ণা জন্মায় এবং সব জিনিষেই একটা ভাসা-ভাসা ভাব থাকে। সাধারণ বাঙালী পরিবারে নিয়মানুবর্তিতার অভাবও এর জন্ম কতকটা দায়ী। অনেক সময় দেখেছি যে বি-এ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে যে-সব গ্রন্থকারের নাম অথবা অন্য কোন কথা লেখা আছে, প্রশ্নপত্রখানা চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও অনেক পরীক্ষার্থী সেই বানানগুলোও ঠিক-ক'রে লিখতে পারেন না। এই তালকাণা ভাব অনেকটা কেটে যেতে পারে, যদি ছেলেবেলায় স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সাধারণ লেখাপড়ার সঙ্গে কিছু কিছু হাতের কাজ শেখানোর বন্দোবস্ত করা যায়।

কোন কোন পাশ্চাত্য দেশে হাতের কাজ সমস্ত স্কুলের ছাত্রদেরই করতে বাধ্য করা হয়ে থাকে। গত ত্রিশ বৎসর ধ'রে বিলাতের অনেক স্কুলেই পেট্রবোর্ডের জিনিষ, ঝুড়ি তৈয়ারী, বই বাধাই, কাঠের জিনিষ ইত্যাদি এক একটা হাতের কাজ শেখানোর বন্দোবস্ত হয়েছে। ছাত্রীদের জন্ম হাতের কাজ অবশ্য ভিন্ন রকমের, যেমন সেলাই, রান্না ইত্যাদি। পাঁচ বৎসর হ'ল ইংলণ্ডে শতকরা আশিটি স্কুলে এগার বছরের বেশী বয়সের ছেলেমেয়েদের একটা-না-একটা হাতের কাজ শেখানো হ'ছে। এই প্রণালীতে ছেলেমেয়েদের আত্মনির্ভরশীলতা বাড়ে এবং

হাতের ও চোখের শিক্ষাটাও ভাল হয়। এর আর একটা সুবিধা হ'ছে এই যে, ছেলেমেয়েদের অবসর-বিনোদনের একটা ভাল উপায় হয়। যখন লোকে কাজকর্মের ব্যস্ত থাকে সে সময়টা ভাল ভাবে কাটানো খুব শক্ত নয়, কিন্তু অবসর সময় ভাল ভাবে কাটানোই কঠিন। পরচর্চা করেই আমরা অনেকে অবসর সময় কাট্টয়ে থাকি। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীক পণ্ডিত অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, বে-বিষয় শিখলে আমরা সৎভাবে অবসর সময় কাটাতে পারি তা শিক্ষার একটি শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। এ-কথাটা আজও অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

আমাদের দেশে ছেলেদের অধিকাংশ স্কুলেই ড্রয়িং ছাড়া আর কোন হাতের কাজ শেখানোর ব্যবস্থা নেই। বীরভূম জেলায় সুলতানপুরের উচ্চ ইংরেজী স্কুলে সুতোকাটা, কাপড় বোনা, কাপড় রং করা, কাঠের জিনিষ, কামারের কাজ, সাবান তৈরি প্রভৃতি হাতের কাজ শেখানো হয়, কিন্তু এরূপ স্কুলের সংখ্যা খুবই কম। মেয়েদের অনেক স্কুলেই আজকাল সেলাই, রান্না ইত্যাদি শেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে কিন্তু হাতের কাজের ওপর যতটা জোর দেওয়া উচিত তা দেওয়া হয় না। প্রায়ই দেখতে পাই যে অন্তান্ত পড়াশুনার পরে শেষ ঘণ্টাতে, যখন ছেলেমেয়েদের কাজে কোন উৎসাহ থাকে না, তখনই এই-সব শেখানো হয়। সেও আবার সপ্তাহে দু-এক ঘণ্টা মাত্র। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের স্কুলের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকেই এক-একটা হাতের কাজ শেখানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা করা উচিত। অবশ্য কি কি জিনিষ শেখানো হবে সেটা পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর নির্ভব করবে। যেমন পল্লীগ্রামের স্কুলে কৃষিবিদ্যা কিংবা বাগানের কাজ শেখানোই সহজসাধ্য হবে। চার বছর আগে কার্যোপলক্ষে যখন গোসাবায় যাই, তখন সেখানকার গ্রাম্য স্কুলগুলিতে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁত-বোনা ও কৃষিশিক্ষার বন্দোবস্ত দেখেছি।

এতেই যে শিক্ষার সমস্ত সমস্তা মিটে যাবে এ-কথা বলা চলে না। যত দিন শিক্ষাতে মানুষ তৈরি না হবে ততদিন শিক্ষার গলদ আছে বুঝতে হবে। যদি শিক্ষার ফলে ছাত্রছাত্রীদের মানসিক বৃত্তিগুলি পরিপুষ্ট লাভ করে

এবং তাদের মন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সুসম্বন্ধ হয়, তবেই শিক্ষা ঠিক-মত হচ্ছে ব্যতীত হবে। ইতিহাস পড়ানো হ'ল, কি গণিত পড়ানো হ'ল—কৃষি শেখানো হ'ল, কি শিল্প শেখানো হ'ল এইটেই সব থেকে বড় কথা নয়। এই প্রসঙ্গ আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে। সেটা হচ্ছে এই যে শিক্ষা যদি সুশিক্ষাই হয়, শিক্ষার ফলে যদি মানুষ গড়েই ওঠে তবে যে বর্তমান অন্ন-সমস্যা একবারে মিটে যাবে এ ভরসা করা যায় না; কারণ অন্ন-সমস্যার সমাধান দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ওপরই

অনেকটা নির্ভর করে। দেশে যদি উৎপাদন যথেষ্ট হয় এবং সেই উৎপাদনের বণ্টনও ঠিকভাবে চলে তবে আজকালকার শিক্ষা বা অশিক্ষা সবও বর্তমান অন্ন-সমস্যার আংশিক সমাধান হতে পারে। অবশ্য এ-কথাটা বলা উচিত যে, সুশিক্ষার ফলে উৎপাদন ও বণ্টন প্রকৃষ্টভাবে হতে পারে, আর এর ফলে দেশে ধনবৃদ্ধি হলে সুশিক্ষার ব্যবস্থা সম্ভবপর হবে; অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নতি ও সুশিক্ষার বিস্তার একটি অন্তঃসংক্রমণের ওপর নির্ভর করে। একচক্ষু হরিণের মত একদেশদর্শী হয়ে লাভ নেই।

“স্পোর্টস্‌ম্যান”

শ্রীনির্মলকুমার রায়

গোপীনাথ কন্ঠাক্ষণ আপিসে পদার্পণ করিয়াই সকলকে জানাইল যে সে এক জন “স্পোর্টস্‌ম্যান”। কিন্তু সমস্ত শহর ছাড়িয়া যখন সে তাহার একবিংশবর্ষীয়া স্ত্রী ও তিন বৎসরের কন্যা জানকীকে লইয়া রায়-সাহেবের আম-বাগানে বহু দিনের পরিত্যক্ত বাড়ির একটা অংশে বসানিল, তখন আপিসের বাবুরা একবাক্যে বলিল, ‘লোকটার মাথায় ছিট আছে।’ এক ত বহুসংখ্যক আমগাছের নিবিড় পত্রাচ্ছাদনে চতুর্দিক একটা সাঁৎসেঁতে অন্ধকার দিনরাত্রি বাপিয়া বিরাজ করিত, তাহার উপর দেয়ালের পাশে প্রকাণ্ড একটা অশ্বখগাছ উঠিয়া এককালের এই সখের দালানের উপর শুষ্কপত্র ও সংগৃহীত বৃষ্টিজল অবিশ্রান্ত ভাবে বর্ষণ করিত। মেরামতের অভাবে, শুষ্ক পত্রের পচনে এবং সকলের উপর অশ্বখমূলের শতধা নিবিড় নিপীড়নে বাড়িটা খসিয়া খসিয়া পড়িতেছিল। গোপীনাথকে যখনই বাবুরা ভয় দেখাইয়া বলিত যে অচিরেই অশরীরী জীববিশেষ তাহার বেহারী রক্তপানে তুষ্ট হইবে, তখনই সে অত্যন্ত নির্ভীকভাবে উত্তর দিত, “কায়া ডর? স্পোর্টস্‌ম্যান ভূতের ভয় করে না।”

গোপীনাথ লোকটির বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। ছাপরা জেলায় বাড়ি, কিন্তু দেশে সে কখনও যায় নাই। রেলের

সাহেবদের কোন ক্লাবের ‘বয়’-এর পুত্র সে। জন্মাবধি বাংলা দেশ এবং শৈশবাবধি সাহেবদের সংস্পর্শে মানুষ হওয়াতে তাহার মন কালা বাঙালী ও সদা সাহেব-এ-হুয়ের প্রীতি এক সাথে জন্মাইয়াছিল। সে বলিত বাঙালী-মস্তিষ্কের তুলা মস্তিষ্ক ছিল। সে ইহার কারণ-স্বরূপ বাঙালীর মৎশ-প্রীতির উল্লেখ করিত। মৎশের মধ্যে ‘ফসফরাস’ নামক পদার্থ থাকে। ইহার প্রভাবেই বাঙালীর বুদ্ধি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হয়। আচার-ব্যবহারে চালচলনে সে সর্বদাই বাঙালীদের মত থাকিতে চেষ্টা করিত। তাহার কথাতে একটু টান ছাড়া হিন্দুস্থানীর কোন আভাস পাওয়া যাইত না।

সাহেবদের সে শ্রদ্ধা করিত এই বলিয়া যে তাহাদের মত “স্পোর্টস্‌ম্যান” জগতে আর নাই। সে নিজে টেনিস খেলিত ভাল; বিলিয়ার্ডের সে ‘মার্কার’ ছিল বহুদিন; ঘোড়ায় চড়িত সে চমৎকার; নিজের এক-নলা গাদা বন্দুক দিয়া সে বহুবার ‘হামারলেস্’ ‘ডাবল্ ব্যারেল’ ‘ইজেক্টার’ বন্দুকধারী সাহেবদিগকে বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে। তাহার গায়ের ‘পুল-ওভার’, পায়ের বুট জুতা, হাতের টেনিস বাট কোন-না-কোন স্পোর্টস্‌ম্যান সাহেবের দেওয়া। শিশুকাল হইতে একটা ধারণা তাহার

মনে বন্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে পৃথিবীটা একটা খেলার মাঠ। হার-জিৎ এখানে লাগিয়াই আছে; অতএব সমস্ত অবস্থা-বিপর্যয়কে খেলায়াদের মত লওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সে যত্নতত্র একথা বলিয়া বেড়াইত।

অল্পকাল মধ্যেই ‘কনট্রাকশন’ আপিসের প্রথম বুদ্ধিমান, অত্যন্ত অলস, বাহিরে আপিস ও ভিতরে পরিবার ভিন্ন পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ে অনাসক্ত বাঙালী বাবুরা গোপীনাথের এই দুর্বলতা বুঝিয়া লইল। কোনরূপ কষ্টসাধ্য, কোন রকম বিপজ্জনক কাল উপস্থিত হইল তাহারা গিয়া গোপীনাথকে বলিত,—গোপীনাথ, এইরূপ বিপদে পড়িয়াছি; তুমি ত একজন স্পোর্টস্‌ম্যান, এ বিপদে রক্ষা না করিলে চলিবে না। গোপীনাথ তৎক্ষণাৎ বলিত, ‘নিশ্চয়ই’। বাবুরা ভাবিত, ‘বেটা ছাতুখোর বেহারী, কোন বুদ্ধি-গুদ্ধি নাই।’ সে ভাবিত, আমি ‘স্পোর্টস্‌ম্যান’ বলিয়াই না আমার কাছে আসে! এইরূপে রসিক ক্যাশিয়ারের ক্যাশ-ভাঙা টাকা নিজের স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়া ভর্তি করিয়া, মস্তপ ‘ডেস্‌পাচ’-বাবু সঞ্জয়ের হারাইয়া-যাওয়া চিঠি দশ ক্রোশ দূরে পায়ে হাটিয়া বিলি করিয়া, অকস্মণ্য টাইপ-বাবুর রাশি রাশি চিঠি হাতে নকল করিয়া গোপীনাথ নিজের ‘স্পোর্টস্‌ম্যান’-গিরির পরিচয় দিতে লাগিল।

বাহির হইতে দেখিলে মনে হইত তাহার কোন ভাবনা-চিন্তা নাই। মাহিনা সে সকলের চেয়ে কম পাইত, থাকিত সে সকলের চেয়ে খারাপ বাড়িতে, তবু সে দিনের পর দিন একই ভাবে বুট পায়ে দিয়া ‘হাফপ্যাণ্ট’ ও ‘পুল-ওভার’ পরিয়া, টেনিস ব্যাট হাতে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। বাঙালী বাবুদের শত অত্যাচারেও যখন সে দমিল না, বরঞ্চ দিনের পর দিন তাহার ‘স্পোর্টস্‌ম্যান’-গিরি দেখাইবার সুযোগ পাইয়া তাহাদের উপর ক্রতজ্ঞ হইতে লাগিল, তখন তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,—ব্যাটা নিকোঁধ, কাণ্ডমাণ্ড জ্ঞানহীন। একমাত্র নিকরুদ্ভির কবচকুণ্ডল আশ্রয় করিয়া যেন মানুষ সংসারের তাড়নাকে সহ্য করিতে পারে!

গোপীনাথের স্ত্রী নিজকে স্বভাবতই এরূপ স্বামীর অযোগ্য মনে করিত। তথাপি মাঝে মাঝে সে বলিত যে, এ ঠিক হইতেছে না। এভাবে চলাফেরা করিলে

চলিবে না। বিশেষতঃ জান্‌কী যখন হইয়াছে তখন একটু বুঝিয়া চলা উচিত। লোকে তাহাকে বোকা পাইয়া ঠকাইতেছে। গোপীনাথ উত্তর দিত না; কেবলই ভাবিত জান্‌কী তাহার মেয়ে না হইয়া ছেলে হইলে বড় ভাল হইত। তবে তাহাকে সে এমন করিয়া মানুষ করিত যে সে যেন এক জন খাঁটি ‘স্পোর্টস্‌ম্যান’ হয়। এক-এক বার সে ভাবিত হোক না সে মেয়ে। সে জান্‌কীর বিয়ে দিবে না। তাহাকে সাথে সাথে রাখিয়া মানুষ করিবে; বন্দুক ছোঁড়া, বোড়ায় চড়া শিখাইবে। কল্পনার আবেগে সে কখন-বা স্ত্রীকে একথা বলিয়া ফেলিত। তাহার স্ত্রীও বাঙালী বাবুদের মত ভাবিত গোপীনাথের বুদ্ধি একটু কম; তবে আহা বড় ভালমানুষ! যে কল্পা এক দিন, অবশ্যই কোন দিন ছাপরা জেলার কোন চাপরাশি ‘বয়’ কিংবা বড়-জোর কোন ছুতার, কামার, বা লাইন মিস্ত্রীর ঘরনী হইয়া নিয়মিত ভাবে ঘরটু পেদণও সম্ভান প্রতিপালন করিবে সে নাকি ঘোড়ায় চড়িবে, বন্দুক ছুঁড়িবে!

যে-বটনা উপলক্ষ্য করিয়া গোপীনাথ হঠাৎ একদিন নিজকে সত্যি এক জন ‘স্পোর্টস্‌ম্যান’ বলিয়া মনে করিল এবং বাঙালী বাবুরা তাহার সম্বন্ধ একেবারে হতাশ হইল তাহা সংক্ষেপে এই।

ডাক্তার বেল্‌গাড ও গোপীনাথ একদিন পাখী শিকার করিতে গিয়াছিল। ডাক্তার বেল্‌গাড কড়া ছকুম দিয়াছিল গোপীনাথ যখন-তখন গুলি করিয়া যেন তাহার শিকার নষ্ট না করে। দিনের শেষে শ-হুই ‘কারটিজ’ খরচ করিয়া যখন বেল্‌গাড পদ্মবিলের মধ্যে দুইটি পান-কোড়ি-শিশু নিপাতিত করিল, তখন গোপীনাথকে বধা হইয়া অতিকষ্টে উহাদিগকে আনিতে হইল। ডাক্তার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মত প্রকাশ করিল যে অত কম কারটিজ ও অত ছোট পাল্লার বন্দুক লইয়া শিকার করিতে আসা নিতান্ত মুর্থতা। গোপীনাথকে ইহা স্বীকার করিতে হইল এবং দুই জনে ক্ষুণ্ণমনে শহরে ফিরিয়া আসিল।

গোপীনাথের কেয়ানী বন্ধুরা প্রস্তুত হইয়াই ছিল। সুবক্তা বলিয়া রসিক ক্যাশিয়ার বলিতে লাগিল, ওহ স্পোর্টস্‌ম্যান, এদিকে ত সমস্ত দিন ধরে পানকোড়ি শিকার করেচ, এদিকে যে ঘরেই মস্ত বড় শিকার হয়েছে।

গোপীনাথ ব্যাকুলিত হইয়া বলিল, ‘কি ব্যাপার কাশিয়ার বাবু?’

ডাক্তার বেলগার্ড অত্যন্ত উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে রসিক কাশিয়ারের মুখের দিকে চাহিতেই সে বলিল, ‘শুধু, মোটর যাকসিডেন্ট; জান্‌কী ‘রান ওভার’। ডাক্তার হাতের বন্দুকটাকে জোরে ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, ‘হ্যাট, জান্‌কী কোন হায়?’

গোপীনাথ প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, ‘সার আমর মেয়ে, একমাত্র মেয়ে।’

রসিক কাশিয়ার বলিল যে, জান্‌কীকে সরকারী হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এতক্ষণে কি হইয়াছে বলা যায় না। এ-কথাও সে বারংবার জানাইল যে দয়ার শরীর বাট সাহেবের ধীর মোটরের নীচে পড়িয়াছিল। কন্ট্রোলর একেই বলে। হোক না জেলার ম্যাজিস্ট্রেট, আর হাজারি বাবুর মেয়ে, সাহেব নিজ হাতে তাহাকে মোটরে তুলিয়া লইয়া হাসপাতালে গিয়াছে। ইহার পর এই সব কি কি কারণে সাহেবেরা এত বড় রাজত্বের অধীশ্বর হইয়াছেন এবং এতদূর অবস্থায় হারামজাদা বাঙালী হইল কি করিত ইত্যাদি অনেক বিষয় তাহার বলিবার ছিল, কিন্তু ডাক্তার বেলগার্ড ও গোপীনাথ ততক্ষণে চলিয়া গিয়াছিল।

রাস্তায় বাইতে বাইতে গোপীনাথ কেবলই ভাবিত লাগিল জান্‌কী কি এখনও বাঁচিয়া আছে? ডাক্তার বেলগার্ড তাহাকে বারংবার আশ্বাস দিত লাগিল যে যদি এখনও সে বাঁচিয়া থাকে তবে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। আর যদি বিপদ ঘটিয়াই থাকে তবেও ধাবড়াইয়া লাভ নাই। বিপদকে সহজভাবে লওয়াই মানুষের কাজ।

সরকারী হাসপাতালে উপস্থিত হইয়া তাহারা দেখিল জান্‌কী তখনও মরে নাই। জেলার ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট প্রোমশনপ্রাপ্ত বাঙালী সিভিল সার্জনের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছেন। ডাক্তার বেলগার্ড গাত্রাচ্ছাদন খুলিয়া দেখিল ডান-পাটি একেবারে অকম্পনা হইয়া গিয়াছে, অবিলম্বে অস্ত্র করা দরকার। সরকারী ডাক্তার এ-বিষয়ে ইতস্ততঃ করিতছিলেন। অপরিচিত লোক হইলে তিনি এতক্ষণে এদিক-সেদিক করিয়া ফেলিতেন, কিন্তু জেলার ম্যাজিস্ট্রেট

ইহার মধ্যে থাকতে ব্যাপারটা একটু অল্প রকম দাঁড়াইয়াছিল। ডাক্তার বেলগার্ড অল্প ধরণের মানুষ। সে আসিয়াই সিভিল সার্জনের প্রশ্নবাণে জর্জরিত করিয়া তুলিল, এতক্ষণ কেন অস্ত্র করা হয় নাই, ‘টিটেনাস্’ ‘গ্রেংগ্রিন’ প্রভৃতি কত কি হইত পারে এবং হইলে সেজন্ত দায়ী কে হইবে ইত্যাদি কৈফিয়ৎ পাত্রাপাত্র তুলিয়া তলব করিল। সরকারী ডাক্তার অবিলম্বে অস্ত্র না করিলে যে সে নিজেই করিতে বাধ্য হইবে এ-কথাও তাহাকে জানাইল।

গোপীনাথ স্তব্ধ হইয়া ছিল; তাহার বলিবার কিছু ছিল না। অতটুকু শিশুর সর্বাঙ্গ অতবড় দুঃখের যে পরিচয় পরিষ্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল তাহা দেখিয়া তাহার পিতৃহৃদয় কক্‌গায় গলিয়া পড়িতেছিল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, ‘বাবু, আমি অত্যন্ত দুঃখিত, চেষ্টার ত্রুটি হবে না।’

ডাক্তার বেলগার্ড একরকম জোর করিয়াই গোপীনাথকে তাহার স্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দিল এবং বাইবার সময় তাহাকে জানাইল যে যেমন করিয়া হোক তাহার মেয়েকে সে বাচাইবে। সেদিন রায়সাহেবের বাগানে ফিরিয়া আসিতে গোপীনাথের প্রথম মনে হইল যে জায়গাটা বাস্তবিকই বড় অন্ধকার। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আমগাছ জ্যোৎস্নালোকে যে ছায়া নিঃস্পন্দ করিয়াছে তাহার ফাঁকে ফাঁকে যেন অশব্দীরা জীবেরা লুকাইয়া আছে। প্রকাণ্ড বাড়ি, অনেক ঘর, অথচ লোক নাই। অশ্বখগাছের নীচে প্রেতের মত দাঁড়াইয়া আছে। স্ত্রীর সহিত সে ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিল না। এ-দুর্ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহার মনে যে-সব চিন্তা উঠিতে লাগিল তাহা যেমনই অসম্ভব তেমনি অর্থহীন।

জান্‌কী তো মরিয়া বাইবে। তারপর সাহেব নিশ্চয়ই তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইবে; বলিবে, ‘গোপীনাথ, আমি অত্যন্ত দুঃখিত; তোমার কথঞ্চিৎ ক্ষতিপূরণ করিতে চাই।’ সে কি করিবে? সে কি প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করিবে? সে কি সাহেবের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিবে? না—কিছুতেই নয়, সাহেব হয়ত অসাবধান হইয়াছিল কিন্তু এ তো তাহার ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়। সে কি

সাহেবকে বাগে পাইয়া বিপদে ফেলিবে কিংবা তাহার নিকট হইতে সুবিধা আদায় করিবে? হোক না সে নিজে একজন সামান্য কেরানী—সে একজন স্পোর্টস্‌ম্যান ত বটে, সে সাহেবের কাছে উপস্থিত হইয়া নির্ভীক ভাবে বলিবে, ‘থ্যাঙ্ক্, ইউ সাহেব, এ দুর্ঘটনা, এর জন্য কেউ দায়ী নয়।’ এই বলিয়া সে চলিয়া আসিবে।

গোপীনাথের পক্ষে ঘরে থাকা অসম্ভব হইল। তাহার স্ত্রী তাহাকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া জানকীর কথা যতই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল ততই সে অস্থির ও উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিল। বহুদিন সে ভাবিয়াছে যে জীবনে এমন একটা কাজ করিবে যাহাতে বিশ্বের ষাবতীয় লোক একবাক্যে বলিবে ‘হ্যাঁ, স্পোর্টস্‌ম্যান বটে গোপীনাথ।’ জীবনে মহৎ কাজ করিবার সুযোগ কত কম আসে! যদি বঙ্গাপসাগরে নিমজ্জমান ব্যক্তিকে ব্যাদিতমুখ হাঙ্গরের দল উপেক্ষা করিয়া বাচাইতে পারিত, যদি বরফস্তূপের আঘাতে বিদগ্ধ জাহাজের তার-বরে বসিয়া শেষ পর্য্যন্ত ‘এস্ ও এস্’ পাঠাইতে পারিত, যদি নিজের জীবন উপেক্ষা করিয়া জলস্ত বাড়ির ত্রিতল হইতে কুকুর-শাবককে রক্ষা করিতে পারিত, যদি বুদ্ধক্ষেত্রে মৃতকল্প শত্রুকে নিজের পিপাসার বারি দান করিয়া নাটকীয় ভাবে বলিতে পারিত ‘তোমার প্রয়োজন আমার চেয়ে বেশী’, তবে বুদ্ধি জীবন সার্থক হইত। জানকী মরুক—কিন্তু তাহার মৃত্যুর ভিতর দিয়া যেন সে পৃথিবীকে দেখাইতে পারে যে সে একজন ‘স্পোর্টস্‌ম্যান’।

জানকী কিন্তু মারল না। সে জানুপর্য্যন্ত এক পা হারাইয়া হাসপাতালের শয্যা হইতে বাপ-মায়ের কোলে ফিরিয়া আসিল। গোপীনাথ ডাক্তার বেল্‌গার্ডের পদস্পর্শ করিয়া কহিল, ‘শুধু, আপনি আমার জীবন দান করিয়াছেন।’ বেল্‌গার্ড হাসিয়া উত্তর দিল, ‘কিছু না, অত্যন্ত সৌন্দর্য্য অপারেশন; কিছুদিন পরে কৃত্রিম পা লাগাইতে হইবে।’

একদিন সত্যই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব গোপীনাথকে তলব করিলেন। অত্যন্ত দয়াদ্র'স্বরে কহিলেন, বাবু, তোমার কৃত্যর যে ক্ষতি আমি অনিচ্ছাস: করিয়াছি, তাহার পূরণ হইবে না। ইহার চেয়ে তাহার মৃত্যু ভাল ছিল। কিন্তু উপায় নাই, সবই ভগবানের হাত। তুমি এই

পাঁচ-শ টাকার চেকখানি লও। ইহাতে আমার বিবেক কিছু শাস্তি পাইবে।

গোপীনাথ গম্ভীর ভাবে বলিল, ‘সাহেব, এ অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনার সুযোগ লইয়া আমি অর্থোপার্জন করিতে চাই না। আমি দরিদ্র কিন্তু লে'ভী নই।’

সাহেব বুদ্ধিল লোকট। এখনও মনস্থির করিতে পারে নাই। তাই বলিলেন, ‘তুমি ভাবিয়া কাল বলিও।’

কথাটা রাষ্ট্র হইতে বেশী দেরি হইল না। ‘ডেস্‌পাচার’ সঞ্জয় পরামর্শ দিল, ‘দে শালার নামে এক নম্বর টিকে।’ রসিক কাশিয়ার স্পষ্টই বলিল সে কখনও এরূপ মহানুভবতা দেখে নাই, ইংরেজ বলিয়া এরূপ সম্ভব। একটি পায়ের মূল্য পাঁচ শত টাকা হইতে পারে এ-কথা সে আগে জানিত না। কেহবা পরামর্শ দিল যে নগদ টাকা দু-দিনেই খরচ হইয়া যাইবে। সাহেবকে ধরিয়া একটি পাকা চাকরি করিয়া লওয়াই ঠিক।

পরদিন গোপীনাথ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিল এবং পূর্বদিনের মতই জানাইল যে টাকা সে লইবে না, কারণ সে এক জন ‘স্পোর্টস্‌ম্যান’। সাহেব এবার একটু বিস্মিত হইলেন এবং তাহাকে বলিলেন, ‘বাবু আর কোন প্রকারে তোমার উপকার করিতে পারি?’ একটু ইতস্ততঃ করিয়া গোপীনাথ উত্তর দিল, ‘শুধু, আমাকে একটা রিভল্‌ভার যদি দেন তবে বড় কৃতজ্ঞ হইব।’ সাহেব খুব খুশী হইয়া বলিলেন, ‘বেশ, কালই দরখাস্ত করিও; আমি নিজের রিভল্‌ভার তোমাকে উপহার দিব।’

কিছুকাল মধ্যাহ্ন বাহিরে কোমরবন্ধে লটকান রিভল্‌ভার ও ভিতরে একপদহীন কণ্ঠ্য সমেত গোপীনাথের স্পোর্টস্‌ম্যান-গিরির খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু এদিকে দিন যতই যাইতে লাগিল পিতামাতার জীবনে জানকী একটা ভারী বোঝার মত হইয়া দাঁড়াইল। অজাত সন্তানের কামনায় জনকজননী মন বুড়ু হইয়া উঠে; মৃত সন্তানের মমতায় তাঁহারা কাঁদিয়া আকুল হন, কিন্তু দিনের পর দিন অজ্ঞহীন সন্তানের তাড়না বৃদ্ধি স্নেহমমতাকে ছাপাইয়া উঠে। বিশেষতঃ ক্রমশঃ এই ক্ষুদ্র শিশুকণ্ঠ্য যেন শত ছলকলায় মাতাপিতার স্নেহ আকর্ষণ করিতে শিথিল। সে বেড়া ধরিয়া ধরিয়া লাফাইয়া হাটিত; হঠাৎ পড়িয়া

গিয়া 'মা' 'মা' বলিয়া চীৎকার করিত এবং মা ছুটিয়া আসিলে হাসিয়া লুটোপুটি খাইত ও তাহাকে বারংবার কাটা পা-খানি দেখাইত। সুযোগ পাইলেই সে গোপীনাথের গলা জড়াইয়া চুমো খাইত এবং নানাবিধ অনাবশ্যক প্রশ্ন করিত। কখন-বা পরম বিজ্ঞতার সহিত কহিত, বাবুজি, আর মোটরগাড়ীর পাছ যাব না, বড় ভুগ লাগে।

গোপীনাথ যতই ভাবিতে লাগিল যে জানুকীর কথা সে মোটেই ভাবিবে না ততই তাহার ভবিষ্য জীবনের চিন্তা তাহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল, মেয়ে যদি মরিয়া যাইত তবে হয়ত ভুগ আরও বেশী হইত, কিন্তু তাহা সাময়িক। সে ভুগের তীব্রতা যতই বেশী হোক তার ব্যাপকতা কম। মৃত পিতৃজনের কথা স্মরণ করিয়া কখন-বা তাহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা বাৎসরিকী করিয়া, কবিতা বা গান রচনা করিয়া তৃপ্তি পাওয়া যায়, কিন্তু যে চিরকাল জীবনমৃত হইয়া সমস্ত কার্যের ক্ষেত্রমূলে পায়ানের মত চাপিয়া থাকে এবং পারিপার্শ্বিক সমস্ত জীবনকে মুহুমুহু নিরানন্দের অতল গহ্বরে টানিতে থাকে তাহাকে সহ্য করা বড় কঠিন। ক্রমে এমন অবস্থা হইল যে গোপীনাথের মত 'স্পোর্টস্‌ম্যান' বাপও নিজের অজ্ঞাতসারে কস্তার মৃত্যু-কামনা করিতে লাগিল। সে জানিত ঘোড়দৌড়ের মাঠে কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে লোকে আহত অথকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলে, মানুষকে কি তেমন করা যায় না?

জানুকী দিনে দিনে অপুষ্টিকর আহাৰ ও পানীয় এবং বন্ধ আলোক ও বাতাস হইতে অত্যন্ত প্রবল আকর্ষণে জীবন-শক্তি সংগ্রহ করিয়া যুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু গোপীনাথের স্ত্রী এ-অঞ্চলের বিখ্যাত ম্যালেরিয়া জ্বরে শয্যাশায়ী হইল। ইহাতেও শেব হইল না; জ্বরটা ক্রমশঃ টাইফয়েডের মত হইয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার বেল্‌গার্ড প্রথম যেমন সহজ ভাবে বলিয়াছিল যে ব্যাপারটা কিছু নয়—ম্যালেরিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে কুইনিন দিলেই মারিয়া যাইবে, তেমন সহজ নির্বিকার ভাবে বলিল, বোধ হয় টাইফয়েড; তবে ভাবনার কোন কারণ নাই; টাইফয়েডের চিকিৎসা নাই। গোপীনাথ তেমন নির্বিকার ভাবে কথাটা গ্রহণ করিতে পারিল না।

প্রথমটা সে ভাবিল যে ব্যাপারটা এমন কিছু গুরুতর নয়। ব্যারাম হইয়াছে, চিকিৎসা চলিতেছে, ভাল হইবে। কিন্তু যদি ভাল না হয়? যদি মরিয়া যায়? তা হইলেই বা সে কি করিবে? লোক ত সবই মরে। মৃত্যুকে নিতান্ত খেলাচ্ছলে গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু জানুকী, তার এই অঙ্গহীন কস্তা, এর উপায় কি? একে কে দেখিবে? অবশেষে সে ডাক্তার বেল্‌গার্ডের বাংলোয় গেল। ডাক্তার তখন ছইস্কির কাঁকে কাঁকে বন্দী-চুরট টানিতেছিল এবং 'ব্রিচেস্‌বুট লেগিং'-শোভিত পদদ্বয় সম্মুখে টেবিলের উপর স্থাপন করিয়া ডি.টেক্টিভ উপন্যাস পড়িতেছিল। বিমর্ষ গোপীনাথকে দেখিয়া বলিল,—হালো গোপীনাথ, ব্যাপার কি? শরীর ভাল ত?

গোপীনাথ একবার ইতস্ততঃ করিল। কথাটা তুলিবে কি? অস্থখ কি কারও হয় না? বিশেষতঃ সে জানিত যে খাঁটি স্পোর্টস্‌ম্যানরা সূর্যাস্তের পরে 'হোয়াইট লেবেল' ও 'ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট'র আঙ্গাদের তারতম্য, 'কনট্রাক্ট' ও 'অকশন' ব্রিজ খেলার ইতরবিশেষ, সাত বৎসর পূর্বের আহত কিন্তু হত নয় 'মাগারে'র দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মাপ হইতে গত শনিবার 'গল্‌ফ কোর্সে'র ত্রয়োদশ 'টি'তে কি ঘুঘটনা হইয়াছিল তাহার বিবরণ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া অন্য আলোচনা করে না। সে কি-না এই সময়ে তাহার স্ত্রীর সামান্য টাইফয়েডের বিবরণ দ্বারা ডাক্তার বেল্‌গার্ডের মত এক জন পুরাপুরি 'স্পোর্টস্‌ম্যান'কে বিরক্ত করিতে আসিয়াছে। কিন্তু সে না বলিয়া পারিল না।

—স্বর, আমার স্ত্রীর জ্বরটা—

—একেবারে খাঁটি টাইফয়েড এবং অত্যন্ত খারাপ 'টাইপে'র, আমি কিছুদিন আগেই সন্দেহ করিয়াছিলাম, চেপ্টার ক্রটি হইবে না।

তা নিশ্চয়ই, তবে সকলেই বলে টাইফয়েডের এলোপ্যাথি মতে কোন চিকিৎসা নাই। যদি একবার হোমিওপ্যাথি—

ডাক্তার বেল্‌গার্ড হঠাৎ টেবিলের উপর হইতে পদদ্বয় টানিয়া লইল এবং এক চুমুকে কাচের গ্লাসস্থিত অবশিষ্ট ছইস্কিটুকু নিঃশেষ করিয়া গর্জন করিয়া উঠিল, হ্যাট—

হোমিওপ্যাথি? গোপীনাথ আমার বিশ্বাস ছিল তুমি এক জন 'স্পোর্টসম্যান'।'

গোপীনাথ সঙ্কুচিত হইল, বেহারী হিন্দু সে; হোমিওপ্যাথি হইতে জলপড়া, স্বপাদ্য মাতুলি সবই তার মনের মধ্যে বিশ্বাস জন্মায়। বিশেষতঃ 'স্পোর্টসম্যান'-গিরির সংক্রমে হোমিওপ্যাথির যে কি অহি-নকুল সম্বন্ধ তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

রোগ বিধিব্যবস্থামত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রথমে সকালবেলা ১০১ ডিগ্রি এবং সন্ধ্যাবেলা ১০৪ ডিগ্রি জ্বর উঠিল। নাড়ীর স্পন্দন বাড়িল। কয়েক দিন পরে জ্বর একটু কমিল, কিন্তু আবার ১০৩ ডিগ্রি হইতে আরম্ভ হইল। জিহ্বায় সাদা আবরণ পড়িল, ক্ষুধা কমিয়া গেল। কিছু খাইলে তলপেট কাঁপিয়া বেদনা হইল। দ্বিতীয় সপ্তাহে তলপেটে পিছুর কামড়ের মত লাল দাগ পড়িল; জিহ্বা ও ওষ্ঠে কাল মামুড়ি পড়িল। অঙ্গ হইতে অঙ্গ অঙ্গ রক্তস্রাব হইতে লাগিল। মোটের উপর ডাক্তারী-শাস্ত্রে লিখিত সমস্ত লক্ষণগুলি অশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ করিয়া, কিন্তু ডাক্তার বেল্গার্ডের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া গোপীনাথের স্ত্রী এক সন্ধ্যায় প্রাণত্যাগ করিল।

সকলে মিলিয়া মহাসমারোহে মৃতদেহ সংস্কার করিতে লইয়া গেল। গোপীনাথকে ডাক্তার সতাই ভালবাসিত; তাই সেও নিজে সঙ্গে গেল।

গোপীনাথ জান্‌কীকে কোলে লইয়া মৃতদেহের অনুসরণ করিতেছিল। ডাক্তার বেল্গার্ড তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া চুপি চুপি বলিল, 'গোপীনাথ, দমিও না। খেলাতে হারজিৎ আছেই। মনে রাখিও তুমি এক জন 'স্পোর্টসম্যান'!'

কাঞ্চন-নদীর তীরের শহরের শ্মশানবাট। বর্ষা তখনও আরম্ভ হয় নাই। নদীতে জল নাই বলিলেই চলে। বহুদূরবিস্তৃত বালুরেখার মধ্য দিয়া ক্ষীণ জলরেখাগুলি আঁকিয়া-বাকিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। নদীর এদিকটা অন্ধকার। দূর হইতে তারকার স্তিমিতালোকে বালুরাশিকে সহসা জ্বল বলিয়া ভ্রম হয়, মনে হয় নদীটা কত প্রশস্ত; কিন্তু নিকটে আসিলে দেখা যায়, এ নদী নয়, নদীর কঙ্কাল মাত্র; কিছু দূরে উঁচু পাড়ে বেড়াহীন একখানা শূন্য টিনের ঘর; শ্মশানবাটীদের বিশ্বাসের জন্ত। তার নীচেই

পাতলা কাশবন। তারপর বালুচর, এখানে-সেখানে ভাঙা কলসী, অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড কিংবা মনুষ্যাস্থি দেখিয়া মনে হয় একটি শ্মশান। চারিদিকের নির্জনতা, ঘনায়মান অন্ধকার, দূরে রায়-সাহেবের ভূতের বাড়ি ও প্রকাণ্ড অশ্বখগাছ, শ্মশানোচিত একটু ভয়ও সৃষ্টি করে।

গোপীনাথের স্ত্রীকে চিতায় তুলিয়া দেওয়া হইল; জান্‌কী মুখে আগুন দিল এবং সকলে মিলিয়া মহা উৎসাহে মড়া পোড়াইতে লাগিল। গোপীনাথ নির্দীক হইয়া সব দেখিল। চুল পুড়িয়া গেল; দগ্ধচর্ম্মের জুর্গন্ধে শ্মশানের বাতাস বিষাক্ত হইয়া উঠিল। সে জান্‌কীকে লইয়া দূরে অন্ধকারের মধ্যে গেল।

কাঞ্চনের সিকতাময় বক্ষের উপর দিয়া তাহার দৃষ্টি বহুদূর প্রসারিত হইল। সে ভাবিল, তাই ত, নদীর এই খালি বুকটা একটা প্রকাণ্ড খেলার মাঠ। এখানে ভূত-প্রেতেরা মড়ার মাথার খুলি ও হাড় লইয়া ডাণ্ডাগুলি খেলে! হঠাৎ অদূরে পুলের উপর দিয়া একটা টেন 'সার্চ লাইট' ছড়াইয়া হুস্ হুস্ করিয়া চলিয়া গেল। দূর ছাই! সে কি ভাবিতেছে!

গোপীনাথ উপরের দিকে চাহিল। অসংখ্য তারকা এখানে-সেখানে ছড়াইয়া আছে। আকাশটাও কি একটা খেলার মাঠ? তারকাগুলি কি খেলিবার গুলি? সেই সীমাহীন ময়দানে বসিয়া বিধাতাপুরুষ একটাতে আর একটা হুকিয়া খেলা করে! একটা উল্কা ভীষণ বেগে ছুটিতে ছুটিতে জলিয়া ছাই হইয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল।

সে ক্রমশঃ চঞ্চল হইয়া উঠিল। নিঃশ্বাস জোরে জোরে পড়িতে লাগিল। সে ঘন ঘন পায়চারি করিতে লাগিল। যত রকমের খেলার কথা তাহার মাথায় আসিতে লাগিল; কখন-বা জান্‌কীকে ছড়াইয়া ধরিয়া চুমো খাইল। মেয়ে বাপের এই অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া ভীত হইয়া বলিল,— বাবুজি, মার কাছে চল।

ডাক্তার বেল্গার্ড ঠিকই বলিয়াছে জীবনটা একটা খেলার মাঠ। মানুষ এক দল কিন্তু আর এক দল কে? সে এবার খেলায় হারিয়াছে—নিতান্তই হারিয়াছে। কি হারকে সে খেলোয়াড়ের মত লইতে জানে। কিন্তু ভগবানে একি বিচার! না-হয় তিনি খেলোয়াড় ভাল, না-হয়

এ-বাত্রা গোপীনাথের 'ফর্ম' একটু খারাপ। কিন্তু তাই বলিয়া কি এমন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা বসাইতে হয়? অঙ্গহীন কন্তাই কি বখেষ্ট নয়—তার উপর মৃত্যু স্ত্রী? একি ঠিক সাম্না-সাম্নি খেলা? এ কেমন রীতি পেছন হইতে 'ট্রিপ করা'; গর্ভে ফেলিয়া পদাঘাত করা।

জানকীকে সে কোল হইতে নামাইয়া বসাইয়া দিল। দুই হাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া কোমরবন্ধ হইতে রিভলভারটা খুলিল। মেয়ের বুকে লাগাইয়া অত্যন্ত বীভৎস দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইল। জানকী কাঁদিয়া উঠিল, “বাবুজি, আমার ডর লাগছে, আমাকে তুমি গুলি মারবে?” গোপীনাথ লজ্জিত হইয়া জানকীকে কোলে তুলিয়া চুম্বা খাইল। হাসিয়া বলিল, “দূর পাগলী, তামাশা করছিলাম।”

গোপীনাথ স্থির হইয়া ভাবিতে চেষ্টা করিল। যে-প্রতিপক্ষ হারিয়া গেলেও রেহাই দেয় না তাহার সঙ্গে

খেলিতেই হইবে এমন কি কথা? বে কাপুরুষ, যে পরাজিত শত্রুর উপরও অত্যাচার করে, তার সঙ্গে কেন সে খেলিবে? সমস্ত জীবন অঙ্গহীন কন্তার জন্ত করুণা ভিক্ষা করিয়া পত্নীহীন নিজের জন্ত সহানুভূতি যাচ্চা করিয়া সে কি অদৃশ্য প্রতিপক্ষের মুখে হাসি জোগাইবে? নিশ্চয়ই না।

হঠাৎ জানকীকে মাটিতে ফেলিয়া গোপীনাথ ক্ষুধার্ত হিংস্র পশুর মত রিভলভারের নল শিশুকন্তার মস্তকে লাগাইয়া উপরূপরি দুইবার ট্রিগার টানিল। তারপর সেই রিভলভারই নিজের বামবক্ষে ইঞ্চি-দেড়েক নীচে ও বামে লাগাইয়া আবার 'ট্রিগার' টানিল।

তিন-চার বার বন্দুকের শব্দ শুনিয়া শশানবাত্রীরা ছুটিয়া আসিল। গোপীনাথ ও তাহার একপদহীনা কন্তার মৃতদেহ কাঞ্চনের বালুশস্যার উপর পাশাপাশি পড়িয়া ছিল। ডাক্তার বেলগার্ড বলিল, এক জন প্রথম শ্রেণীর স্পোর্টস-মান ছিল ব.ট।

উর্শ্বিনা

শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্তী

বাল্মীকির অনাদৃতা সতীত্বের খনি,
চতুর্দশ বর্ষ হয়,—দিন গণি গণি
কাটাইলে।

যৌবনের প্রথম প্রভাত,
বসন্তের পাখী-ডাকা, মুকুলিত-রাত,
নিঃসঙ্গ বহিয়া গেল।

স্বপ্নের আশা,
সলজ্জ অস্তুর ঘেরা—কামনার ভাষা
রেখেছিলে সন্তর্পণে, হে মহিমময়ি!
বাহিরিতে চাহিত কি কভু রহি রহি,
সে সকল?

কিষ্ণা দেবী নয়নাশ্রু রয়ে
ঝরিত বেদনান্নান ও-কপোল বয়ে?
যৌবন-আবেশ দোলা তরঙ্গের দল
আবাত হানিত প্রাণে; করিত চঞ্চল
তোমার অস্তুর দেবী? অশ্রময়-বাণী
দয়িত হৃদয়মাঝে পৌঁছিত কি রাণী?

শয়নে স্বপন হেরি উঠিতে কি জাগি?
ভিজাতে কি উপাধান নিতি তার লাগি?
প্রভাত-তারকাসমা না মেলিতে আঁখি,
সরম-নমিত তনু দিয়ে গেল ঢাকি
বিরহ বেদন আসি।

যোর ব্যবধান,
রচিল দৌহার মাঝে, ও-কোমল প্রাণ
অযোধ্যার রাজপুরে কোন্ কক্ষতলে,
বৃন্তচ্যুত পুষ্পপ্রায় পড়েছিল ঢলে
বেদনার দোলা লাগি।

হে দেবি উর্শ্বিনা!
হৃদয়মাঝে লুটাইয়া কত না কাঁন্দিল।
তবুও জনক-কন্তা সীতার কল্যাণে,
মম্ব হ'তে ছিঁড়ে দিলে সাধনার ধনে,
বাল্মীকির অনাদৃতা, তুমি অহরহ,
নিঃশব্দে সহিয়া গেলে বেদনা বিরহ,
অন্নান বদনে, দেবি! কেহ জ্ঞানিল না,
হুঃখে কেহ ঢালিল না অশ্র এক কণা।



—১ম খণ্ড, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সামন্তাল—
প্রকাশক ডাক্তার শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ; ২৩-বি, বেধুন রো,
কলিকাতা, ৪৪৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩।

এই পুস্তকে গীতার যৌগিক, রূপক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়া
হইয়াছে। ষাঁহার যোগমার্গের সাধক, তাঁহাদের নিকট গ্রন্থকারের
মত আদৃত হইতে পারে কিন্তু নিরপেক্ষ পাঠকের কাছে শ্লোকগুলির
ব্যাখ্যা অপব্যথা বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। গ্রন্থে উক্কাসের আধিক্য
পাঠকের ঐর্ষ্যচ্যুতি করে। মাত্র শ্রীধরকৃত টীকা ও তাহার বঙ্গানুবাদই
উপভোগ্য।

শ্রীগীতা—শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ, বি-এ সম্পাদিত, (২য়
সংস্করণ) প্রকাশক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম-এ, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী,
ঢাকা। দাম ২৮ টাকা, ৬৮২ পৃষ্ঠা।

পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণই গ্রন্থের গুণের পরিচায়ক। শ্রীযুক্ত ঘোষ
মহাশয়ের গীতা উপায়ে হইয়াছে। নানা জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থকার
পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। গীতাধারীর নিকট পুস্তকখানি
আদৃত হইবে, সন্দেহ নাই। গীতার সাধারণ প্রচলিত সংস্করণগুলিতে
যে-সকল অপব্যথা দেয়া যায়, এই পুস্তকে তাহার কিছুই নাই।

শ্রীগিরীশশেখর বসু

বাঙ্গলার প্রাণ—শ্রীঅনিলকান্ত গুপ্ত। আর্থা পাবলিশিং
কোং, ২৬ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকা চারি আনা।

বাঙ্গলার প্রাণশক্তির বৈশিষ্ট্য কোথায় এবং সে বৈশিষ্ট্য বাঙ্গলার
সাধকদের সাধনায় কত বিচিত্রভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, লেখক সে-সম্বন্ধে
ভিন্ন ভিন্ন সাময়িক পত্র যাহা লিখিয়াছিলেন সে-সকল প্রবন্ধ একত্র
করিয়া এই পুস্তক লিখিত। বাংলা সাহিত্যের সম্পর্কে লেখক অনেক
ভাবিব্যাক্য কথ্য বলিয়াছেন; জগদীশ, শ্যামাকান্ত প্রমুখ মনোবী
নানাদিকে বাঙালীর শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদের আলোচনা
গ্রন্থের চিন্তাধারার সহিত হ্রস্বত হইয়াছে। নলিনীবাবুর বিশ্লেষণ-
শক্তি স্মরণ, ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক।

ইতালিতে বারকয়েক—শ্রীবিনয়কুমার সরকার। সিটি বুক
সোসাইটি, ৪৪, কৈলাস বঙ্গ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১।০ নেড় টাকা।

বহু জ্ঞাতব্য তথ্য পরিপূর্ণ ভ্রমণবৃত্তান্ত। ইতালির বিভিন্ন অংশে
পর্যটন করিয়া লেখক যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা চারিটি
মনেটে (?) মুখবন্ধ করিয়া বাঙালী পাঠকের নিকট তিনি তুলিয়া
ধরিয়াছেন। অধ্যাপক সরকার বহু বিষয়ে অভিনিবেশের সঙ্গে সঙ্গে
বাংলা ভ্রমণ-সাহিত্যের পৃষ্টি বিষয়ে মন দিয়া আসিতেছেন, এবং
তিনি ভ্রমণ-সাহিত্যের কতদূর কি এ যাবৎ করিয়াছেন তাহার
একটি অতি উপভোগ্য ও সংক্ষিপ্ত বিবৃতি পুস্তকের শেষভাগে
দিয়াছেন। কোতূহলী পাঠকের চিত্ত ইহাতে আকৃষ্ট হইবে।
কয়েক বৎসর পূর্বে “বর্তমান জগৎ” লইয়া ষাঁহার সূচনা হইয়াছিল,

এই বিবরণে তাহার অবসান ঘটিল, ব্রত উদযাপিত হইল। পাঠক-
সমাজে এরূপ পুস্তকের আদর হইবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে
পারা যায়।

বৃত্তান্তের সঙ্গে সঙ্গে ইতালির অস্তিত্ব একটি মানচিত্র থাকিলেও,
ভৌগোলিক ব্যাপারে নিতান্ত অল্প আমাদের সুবিধা হইত।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

কক্ষহারা—শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস
চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য ১।০।

শ্রীযুক্ত কুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ‘কক্ষহারা’ উপন্যাসখানি
পড়িলাম, ষাঁহার সমাজ-সংস্কারের প্রয়াসী, তাঁহার এই বইখানি ভাল
করিয়া পড়িলে তাঁহাদের প্রচেষ্টার দায়িত্ব ও গুরুত্ব বুঝিতে পারিবেন;
যে-সকল সত্য দিবালোকের মত স্পষ্ট তাহাও বুঝাইতে গেলে কত বিরত,
কত প্রতিকূলতা ও জটিল অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়, উপন্যাস খানিতে
তাহা সূচিত হইয়াছে। লেখকের ভাষা সহজ ও সরল, চরিত্রাঙ্কনে
তিনি স্বচ্ছন্দে লিপিকৌশল দেখাইয়াছেন; সমাজের বহু তথ্য
তিনি চিন্তা করিয়াছেন ও চারিদিকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সমস্তাটিকে
সমাধান করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন; এখনকার দিনে উপন্যাসে
প্রায় রসের অতিরিক্ত মাত্রায় বাহলা থাকে, তাহা ময়রার পক্ষে
সন্দেহের আশ্বাদের স্রায় অনেক সময় অক্লটিকর হয়, বিশেষ যৌন সম্বন্ধের
প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায় ও শীলতার অভাবের দর্শন সেই সকল গল্পকথ্য
সামাজিক দোহে দৃষ্ট বীজাণুর মত অপকার করে। লেখক বর্তমান
কালের এই সব রসবাদীদের সহজ পন্থা হইতে মুক্ত থাকিয়া দেশের জগ্ন
ভাবিয়াছেন ও সমাজের অন্তর্নিহিত দুর্দলতাপুলি লক্ষ্য করিয়াছেন।
যে-সকল দুর্বৃত্তায় পড়িয়া হিন্দুসমাজ বিপন্ন, তাহা জগতের অগ্রগণ্য
বিরল নহে—কত পাক ঠেলিয়া, কত কীট ও মলিন জিনিষের মধ্যে
থাকিয়া সনাতন সত্য হুনির্মূল শতদল হইয়া ফুটিয়া উঠে, তাহা
এই গল্পটিতে লেখক নিপুণ শিল্পীর স্রাব দেখাইয়াছেন। গল্পের প্রবাহ
কোথাও এতটুকু থামে নাই, প্রতিপত্র কোতূহল উদ্বেক করিবার
যথেষ্ট উপাদান আছে—তথাপি পুস্তকখানি গল্প হিসাবে যত বড়, তাহা
অপেক্ষাও সামাজিক শিক্ষার উপযোগী হিতকর একখানি তথ্যবহুল
নিবন্ধ হিসাবে আরও বড়। অনেক পাঠকের ইহা পড়িয়া নূতন নূতন
দিকে চক্ষু ফুটিবে। আমরা লেখকের সংযম, চিন্তাশীলতা ও মৌলিকতাই
প্রীত হইয়াছি।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

সরলা—“৬৭ নং হরিশ চাটুযো স্ট্রীট, ভবানীপুর (কলিকাতা)
হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত ও ব্যাঙ্গাদিবাদ তিন আনা লইয়া
বিতরিত।” গ্রন্থকারের নাম অপ্রকাশিত, তবে গ্রন্থখানি আগাগোড়া
পাঠ করিলে তাঁর পরিচয় মিলিবে।

ইহা উপন্যাস নহে, লেখকের স্ত্রীর জীবনী এবং সেই সঙ্গে তাঁর
নিজের পারিবারিক জীবনের ইতিহাস। মধ্যবিত্ত বাঙালী-পরিবারের
মামুলী কাহিনী ইহাতে রহিয়াছে। আর অল্প, বায় বহু, সাহায্য-

প্রাণী আত্মীয়ের অন্ত নাই—তার উপর, আজ এটার কলেরা, কাল ওটার টাইফয়েড—ইত্যাদি লাগিয়াই আছে। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহের ব্যয় বহন করিতে করিতেই গৃহস্থামীর প্রাণান্ত। কাহিনীটি মনোরম না হইলেও করুণ বটে। লেখকের আত্মীয়-স্বজনেরা পড়িয়া তৃপ্তি পাইবেন।

সামান্য আয় দ্বারা গ্রন্থকার তাঁর জীবনে এত সব ব্যয় বহন করিয়াছেন যে ভাবিলে আশ্চর্য্যাম্বিত হইতে হয়। ইহাতে তাঁহার মিতব্যয়িতা ও সঙ্কল্পশীলতার পরিচয় ত পাওয়াই যায়, তা ছাড়া তাঁর অমটন-খটন-পটীয়াসী বুদ্ধিরও পরিচয় মিলে।

লেখকের ভাষা নির্দোষ নহে। যেখানে-সেখানে ভাববাচ ও কল্পবাচ্যের প্রয়োগ,—যেমন ‘থাকা হয়’ [৭ পৃ.], ‘শুনান হয়’ ‘করান হয়’ [১২ পৃ.] ইত্যাদি—মোটেশ্ব শুনিতে ভাল নয়। গ্রন্থকারের মতে লোকে আছাড় ‘পরে’ এবং তাহাতে ‘হাড়’ না ভাঙ্গিয়া ‘হার’ ভাঙ্গে [২৮-২৯ পৃ.]। তবে, সময়ে ডাক্তার ডাকিলে সে ‘হার’ আবার ঠিক হয়। আর একটি নতুন সংবাদ এই যে, পাঠওরিয়া নামক একটি ঔষধ [!] ব্যবহার করিয়া লেখকের শ্রীর দাঁতের ব্যাধি একবার ভাল হইয়াছিল। [৮০ পৃ.]

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের আদর্শ—প্রথম খণ্ড। পরমতত্ত্ব ও কল্পতত্ত্ব। শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কিশোরগঞ্জ (ময়মনসিংহ) হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃ. ১০—১১০ + ১—২০৪। মূল্য দুই টাকা।

তিন খণ্ডে সমাপ্ত এই গ্রন্থের আলোচ্যমান প্রথম খণ্ডে ‘পরমতত্ত্ব ও কল্পতত্ত্বের বিষয় আধ্যাত্মিকগণের শাস্ত্রাদির সূক্ষ্মতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া বর্তমান যুগের অহিংসা ও অজ্ঞান অন্ধকার দূরীভূত করিবার মানসে কল্পের এবং জীবদেহের মূলস্বরূপ’ (ভূমিকা পৃ. ১০) দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। ‘গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আধ্যাত্মিকগণের ভক্তির স্বরূপ যাহা ছিল এবং ভক্তিবলে তাহারা দয়াময় ভগবানের অচিন্তনীয়-শক্তির অধ্যায়তত্ত্ব কি ভাবে অমৃতভূতিকে উপলব্ধি করিয়া ভক্তির মহাত্ম্য জগতে এক পরিপূর্ণ ভগবৎ-সত্তার ভাব বিস্তার করিয়াছিলেন’ (ভূমিকা পৃ. ১০) তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ‘তৃতীয় খণ্ডে জ্ঞানতত্ত্ব ও বিশ্বপুঞ্জ কবীন্দ্রের আধ্যাত্মিকগণিত অসামান্য বিচার-জ্ঞান-উৎপাদক বিবেকবুদ্ধির অসাধারণ সম্প্রসারণ দেখান হইয়াছে।’ (পৃ. ১০) এই গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সমালোচনা নহে—কল্প, জ্ঞান ও ভক্তি মার্গের প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গ গ্রন্থকার সেই আদর্শানুবর্তী-সাধক বলিয়া রবীন্দ্র চরিত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন; স্থানে স্থানে তাহার কাব্যের সাধারণ আলোচনা করিয়াছেন। মাত্র দুই-এক স্থানে রবীন্দ্রনাথের দুই-একটি কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সাধু। এ জাতীয় গ্রন্থ আদৃত হইলে দেশের উপকার হয় সন্দেহ নাই। স্থানে স্থানে ভাষার জড়তা, বর্ণনীয় বিষয়ের অধবা বিস্তৃতি এবং বর্ণশুদ্ধির বাস্তব্য গ্রন্থখানিকে দোষদুষ্ট করিয়াছে। যে-সকল গুরুতর বর্ণাশুদ্ধি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে অথচ চারি পৃষ্ঠাব্যাপী শুদ্ধিপত্রেরও যেগুলি উল্লিখিত হয় নাই এরূপ কয়েকটি বর্ণাশুদ্ধি এখানে নির্দিষ্ট হইল :—নিধিধাসন (পৃ. ৮৬), অভ্যাচার্য্য (পৃ. ১৭৫), কুৎ সিত (পৃ. ১৮৩), খটিত (পৃ. ১৮৫)।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

নন্দী কাঁথার মাঠ—জসীম উদ্দিন। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সঙ্গ কর্তৃক প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

একদা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যে কাহিনী-কবিতারই বিশেষ চলন ছিল। গদ্যে ছোটগল্পের আবির্ভাবে ছন্দোবদ্ধ কাহিনীর রেওয়াজ কতকটা উঠিয়া গেছে। মুখে মুখে প্রচলিত গ্রাম্য গানে ও ছড়ায়—এমনি ধারা কাহিনীর সাক্ষাৎ মেলে। গীতিকাব্যের যুগে কাহিনী-কাব্য রচনা করা কঠিন। আধুনিক কবির রচনা হইলেও ‘নন্দী-কাঁথার মাঠ’ গ্রাম্য কাহিনীর স্মৃষ্টি করুণ ধারাটি বজায় আছে। জীবনযাত্রাপ্রণালী ভিন্ন হইলেও মানুষের মৌলিক প্রকৃতি এক; চাষার ছেলে, চাষার মেয়ে সাজু ও রূপাইয়ের কাহিনী মানব-সাধারণ প্রেম ও বিরহের কাব্য। এই করুণ কাহিনী ফুটাইয়া তুলিবার জন্ত পল্লীজীবনের যে সূক্ষ্ম ছবিটি অঙ্কিত হইয়াছে তাহার অকল্পিততা আমাদের মনকে মুগ্ধ করে। গ্রাম্য ভঙ্গীতে পল্লীকথার বর্ণনা করিয়া আকৃষ্ট করা সাধারণ ক্ষমতার কাজ নয়। ‘নন্দী কাঁথার কাঁথি এই দুর্লভ কাব্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। বিবাহ ও কাজিয়ার বর্ণনায় সমান শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে।

বাজে বাঁশী বাজে, তারি সাথে-সাথে তুলিছে সাংসার আলো ;
নাচ তালে তালে জোনাকীর হারে কালে মেঘে রাত-কালে।
বাজাইল বাঁশী ভাটিয়ালী হুরে বাজাল উদাস হুরে—
হুর হ’তে হুরে বাঁথা তার যেন চ’লে যায় কোন্ দূরে :
—তারি মিষ্ট।

পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। গ্রাম্য জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ অভিনব উপকরণে সমৃদ্ধ এই কাব্য যে সমাদর লাভ করিয়াছে, ইহা তাহারই প্রমাণ।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

ওকার ও গায়ত্রীতত্ত্ব—রায় বাহাদুর শ্রীহরেশচন্দ্র সিংহ রায়, বিভাগ্যব, এম-এ, প্রণীত। মূল্য ১০ আনা।

রায় বাহাদুর গায়ত্রীমন্ত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্কর দর্শনের যেরূপ সরল ও সহজভাবে আলোচনা করিয়াছেন, সচরাচর সেরূপ দেখা যায় না।

বাংলার নট-নটী—গ্রন্থকার বহু প্রণীত। মূল্য ২০ টাকা।

প্রাচীন ও নবীন নট-নটীদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এইরূপ একখানি বহির আবশ্যকতা ছিল। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—“নাট্যানন্দী জনসাধারণ, অভিনেতা, বিশেষতঃ অভিনেত্রীদের, বয়স জানিতে অত্যন্ত উৎসুক বলিয়া আমি যতটা সম্ভব চেষ্টা করিয়া তাহাদের অনুমান বয়স দিয়াছি।” না লিপিলেই স্মৃতির পরিচয় দেওয়া হইত।

শ্রী শ্রী কৃষ্ণসীলামৃত—শ্রীমতী অম্বুজাম্বরী দেবী প্রণীত। মূল্য তিন টাকা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইতে লোলাবসান পর্যন্ত সমস্ত কাহিনী সুললিত কাব্যে রচিত হইয়া ২৩৮ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। বর্তমান মহিলা কবিদের মধ্যে শ্রীমতী অম্বুজাম্বরী স্রেষ্ঠ আসন পাইবার অধিকারিণী। তাহার দান বাংলা সাহিত্য-ভাণ্ডারে অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ

চাষীর ফসল—শ্রীঅমরনাথ রায়। মূল্য ১।০ টাকা।

এই পুস্তকে লেখক তাঁহার ‘বাংলার সজা’ ও ‘সরল পোস্ট-পালনে’ যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহা বজায় রাখিতে পারেন নাই। অনেক বিষয়ে লেখকের নিজ অভিজ্ঞতা না থাকায় লেখা ভাষা-ভাষা হইয়াছে। স্থানে স্থানে ভুল আছে, যথা—১০৪ পৃ. ওলট-কম্বলের ‘পাতা হুলপায়ের অনুরূপ’। তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য, পুস্তকখানিতে অনেক জ্ঞাতবা বিষয় আছে। একপ পুস্তকের প্রচার কামনা করি।

শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আকাশবাণী—গোধুলিয়া, বেনারস সিটি, এংলোইণ্ডিয়ান প্রেস হইতে শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত। গ্রন্থে লেখিকার নাম নাই। বইয়ের ধরণ দেখিয়া মনে হয় গ্রন্থকর্তা আত্মপ্রকাশে উদাসীনা। বইখানির প্রত্যেক কবিতা স্বর্গীয় স্বামীদেবতার স্মৃতিতর্পণোদ্দেশ্যে রচিত। গ্রন্থকর্তা যিনিই হউন, তাঁহার উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে।

মুসাফির—শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত। প্রকাশক—লেখ্যবাসর, ৩৬।১ ক্যানেল ওয়েস্ট রোড, কলিকাতা। দাম ১।০ আনা।

প্রথমেই গ্রন্থকারের কিশোর বয়স্ক ছবি। বয়সোপযোগী ভোগ-বিলাসের খোরাক অনেকগুলি কবিতার মধ্যেই আছে। লেখকের কবিতাগুলির রচনারীতির মধ্যে একটা ‘ফ্যাশান’ বর্তমান। ‘ফ্যাশানে’র মোহ পড়িয়া একটি কবিতার হেডিংকে লেখক ‘নগ্ন’ স্থানে ‘নগ্ন’ করিয়াছেন। লেখকের নিকটে ইহা ‘ফ্যাশান’ বলিয়া গণ্য হইলেও কবিতার শিরোনামায় ইহা অচল। সমগ্র কবিতার মধ্য দিয়া ভোগতৃষ্ণা মালায় মত্ত গাঁথা। অবশ্য ভোগতৃষ্ণা নিন্দার বস্তু নয়। ভোগতৃষ্ণা অনেক সময় উর্দ্ধমুখী হইয়া মানবমনকে অমৃতের সন্ধান দেয়। কিন্তু সে ভোগতৃষ্ণার কবিতা পৃথক; তরুণ গ্রন্থকার ইহা মনে রাখিবেন যে, কবিতা মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কলা এবং যে-কলা সত্য-শিব-সুন্দরের সঙ্গে যুক্ত না হয় সে কাব্যকলা রূপে অনিন্দ্য হইলেও তাহা জগতের কোনও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে স্থায়ী হয় না।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার মহত্ব—(শতবার্ষিকী তর্পণ) শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগ। গ্রন্থকার কর্তৃক উয়ারী, ঢাকা হইতে প্রকাশিত। পৃ. ১৮২, মূল্য এক টাকা।

গত বৎসর রামমোহন শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁহার বহুমুখীন প্রতিভার উদ্দেশ্যে তর্পণ করিবার অভিপ্রায়ে এই পুস্তকখানা লিপিত হইয়াছে। ইহা পাঠে রামমোহনের বিরাট ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধে সাধারণ বাঙালীদের মনে ধারণা দৃঢ় হইবে। গ্রন্থের নানা স্থানে রামমোহনের গ্রন্থগুলি হইতে স্থানবিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে এবং বিশিষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তিদের রামমোহন সম্বন্ধে নানা মতামত আলোচিত হইয়াছে।

রাজর্ষি রামমোহন—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন রায় সঙ্কলিত। প্রকাশক—শ্রীকরালীকুমার কুণ্ডু, বাণীবন (হাওড়া)। পৃ. ৫৮, মূল্য ১।০ আনা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় দেশের ও বিদেশের নানা মনস্বী ব্যক্তি রামমোহন সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে কোন কোন অংশ সঙ্কলিত হইয়াছে। বিদেশী লেখকদের লেখার বাংলা অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীরমেশ বসু

খাদ্য ও স্বাস্থ্য—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বর্দন। ১৭ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা। পৃ. ১১২+১৬।

খাদ্য ও স্বাস্থ্যতত্ত্বের সম্বন্ধে বর্তমান বইখানি বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। বিদেশে এ-সম্বন্ধে যে-সকল গবেষণা হইতেছে, গ্রন্থকার তাহার সন্ধান রাখেন দেখা যায়, মিসেস্ মেলানবির উল্লেখ তাহার প্রমাণ। সহজ অনাড়ম্বর ভাষায়, অল্পের মধ্যে অনেক সংবাদ দেওয়ার কাজেও তিনি দক্ষ। এজন্ম বইখানি সাধারণ অল্পসঙ্কিত পাঠকের বিশেষ কাজে লাগিবে বলিয়া আমরা আশা করি।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ

আগামীবারে সমাপ্য—মোহাম্মদ কাসেম প্রণীত। এম্পায়ার বুক হাউস, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা উপস্থাস।

ডাউন দিল্লী এক্সপ্রেস—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক বেঙ্গল বুক সোসাইটি। ১৮৩, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম চার আনা। বড় গল্প।

গলার কাঁটা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা দশ আনা। উপস্থাস।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

পাতালে পাঁচ বছর—শ্রীপ্রমোদ মিত্র। প্রকাশক এম্-সি-সরকার এণ্ড সন্স, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম ১।০০

দুঃসাহসপূর্ণ কাহিনিক ঘটনা লইয়া এই বইখানি ছেলেদের জন্য লিপিত। গল্পটি আগাগোড়া এমনই রহস্যময় যে, ছেলেরা নিবন্ধক বিন্ময়ে ইহা পড়িয়া শেষ করিবে। ভূত-প্রেতের গল্পের চেয়ে, ছেলেদিগকে দুঃসাহসের কাহিনী শোনানোর সার্থকতা আছে। কারণ এই ধরণের গল্প ছেলেদের মনকে সতেজ ও সবল করিবে এবং তাদের কল্পনাশক্তিকেও বাড়াইয়া তুলিবে।

বইখানির কাগজ, ছাপা ও বাঁধানে সুন্দর। অনেকগুলি ছবিও বইখানিতে দেওয়া হইয়াছে। মলাটের ছবিটি বেশ চিত্তাকর্ষক।

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

কুরল বা তিরুবল্লুরের নীতি

শ্রীমলিনীমোহন সাত্তাল, এম-এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন

আমাদের উত্তর-ভারতের অনেক শিক্ষিত লোকেরও হয়ত জানা নাই যে, দক্ষিণ-ভারতে 'কুরল' নামে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে। যেমন বেহারে, যুক্তপ্রদেশে ও মধ্য-ভারতে প্রতি গৃহস্থের বাড়িতে তুলসীদাসের রামায়ণ রক্ষিত ও নিত্য পঠিত হয়, তেমনি মাদ্রাস প্রদেশের দক্ষিণ অংশে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়িতে 'কুরল' গ্রন্থ অদৃষ্ট ও পঠিত হয়।

'কুরল' তামিল ভাষায় লিখিত একখানি উপদেশপূর্ণ উপাদেয় কাব্যগ্রন্থ। সম্ভবতঃ উহা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে লেখা হইয়াছিল। লেখকের নাম তিরুবল্লুর। তাহার জন্ম সম্ভবতঃ কোন অস্পৃশ্য জাতির মধ্যে হইয়াছিল এবং তিনি তন্তুবায়ের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। লোকমুখে শুনা যায় যে, তিনি মাদ্রাসের নিকট ময়লাপুর (মলয়াপুর) নামে কোন গ্রামে বাস করিতেন। সেখানে এলেলা শিঙ্গন নামে কোন ধনী ব্যবসায়ীর সহিত তাহার বন্ধুত্ব ছিল। প্রাচীন কালে তামিল দেশে তিনটি বিখ্যাত রাজ্য ছিল—পাণ্ডা, চের ও চোল। পালি ভাষায় লিখিত মহাবংশ নামে সিংহলের ইতিহাসে এক চোল-দেশীয় রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়, যিনি ২৯৬০ কলাকে সিংহল বিজয় করিয়াছিলেন। এলেলা শিঙ্গন ঐ রাজ্য হইতে বহু পুরুষে জন্মগ্রহণ করেন। ইহা হইতে এই সম্ভান পাওয়া যায় যে, কলাক ৩২ শতকে বা খৃষ্টীয় প্রথম শতকে বা তন্ত্রিকটবর্তী সময়ে তিরুবল্লুর জীবিত ছিলেন। জনশ্রুতি হইতে জানা যায় যে পাণ্ডা রাজ্য উগ্রপ্লেকবলদীর রাজ্যকালে মাদুরার কবিসমাজে 'কুরল' প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়ারের পাণ্ডিত্যপূর্ণ তামিল আলোচনায় এই রাজ্যের রাজ্যভিষেক-কাল ১২৫ খৃঃ অঃ অনুমিত হইয়াছে। তামিল ভাষার "শিলপাধিকারম্" ও "মনি মেথলই" নামক দুইখানি মহাকাব্যে 'কুরলে'র ৫৫ সংখ্যক কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।* প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, এই দুইখানি মহাকাব্য খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকের নিকটবর্তী সময়ে রচিত হইয়াছিল। অতএব যদি 'কুরলে'র রচনাকাল খৃষ্টীয় প্রথম ও

তৃতীয় শতকের মধ্যবর্তী কোনাে সময় ধরা যায়, তাহা হইলে অযৌক্তিক হইবে না। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাঘব আয়ারের অনুমান করেন যে, উপরি উক্ত দুইখানি কাব্যগ্রন্থ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, 'কুরলে'র রচনাকাল ঐ দুইখানি কাব্যগ্রন্থের পূর্ববর্তী। অতএব 'কুরলে'র যে কাল উপরে নির্দেশ করা হইয়াছে তাহাতে আপত্তি হইতে পারে না।

যদিও তিরুবল্লুর নীচবংশোদ্ভূত ছিলেন, তথাপি তাহার গ্রন্থ (কুরল) বেদের সম্মান লাভ করিয়াছে—ব্রাহ্মণেরাও উহাকে মস্তকে ধারণ করেন। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারিটিকে শাস্ত্রে চতুর্ভুজ বলে এবং এই চারিটিই মনুষ্য-জীবনের চারিটি অঙ্গীষ্ট বস্তু। অর্থ—ধন-বৈভব, এবং কাম (স্ত্রী ইত্যাদি বাসনার বস্তু) এই দুইটির জন্ত সকল মনুষ্যই লালায়িত। একটু উচ্চস্তরের মনুষ্যেরা ধর্ম (সাধুমাগে চলিতে) ও (জীবনান্তে) মোক্ষ (পরমাত্মাকে পাইতে) চাহেন। 'কুরলে' কেবল প্রথমোক্ত তিনটি অঙ্গীষ্টের আলোচনা অতিনিপুণতার সহিত ও অতিমধুরভাবে করা হইয়াছে। মোক্ষের পৃথক আলোচনা ইহাতে নাই। কিন্তু গ্রন্থের প্রথম (ধর্ম) অংশ, বিশেষতঃ উহার তপস্বী-জীবনাত্মক খণ্ডের শিক্ষার মধ্যে, চরম আনন্দ পাইবার মূল সাধন আত্মানুভূতির কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই স্থানে বলিয়া রাখা আবশ্যিক যে, 'কুরলে' 'ধর্ম' বলিতে গৃহস্থ ও তপস্বী জীবন বুঝায়, 'অর্থ' বলিতে রাজনীতি বুঝায় এবং 'কাম' বলিতে দাম্পত্য প্রেম বুঝায়।

এই গ্রন্থে ১৩৩টি পরিচ্ছেদ আছে। প্রথম চারিটি পরিচ্ছেদ উপক্রমণিকা-স্বরূপ। তাহাদের পরের চৌত্রিশটি পরিচ্ছেদে গৃহস্থ ও তপস্বী জীবনের, সম্ভবতঃ পরিচ্ছেদে রাজনীতির, এবং অবশিষ্ট ষাটটি পরিচ্ছেদে দাম্পত্য প্রেমের আলোচনা আছে। প্রত্যেক পরিচ্ছেদে দশটি করিয়া কবিতা যুক্ত হইয়াছে। অতএব সমগ্র গ্রন্থে ১৩৩০টি সূত্র আছে। এক-একটি অংশ দুই বা তিন খণ্ডে বিভক্ত। ধর্ম-শীর্ষক অংশের দুই খণ্ডের নাম (১) গৃহস্থ জীবন ও (২) তপস্বী জীবন। অর্থ-শীর্ষক অংশের তিন খণ্ডের নাম (১) রাজ্য (২) রাজতন্ত্রের অংশ-সমূহ ও (৩) বিবিধ। কাম-শীর্ষক দুই খণ্ডের নাম (১) গুপ্ত বিবাহ ও (২) পতিপরায়ণতা।

* ইহার বাংলা অনূবাদ এই—দেখ, যে নারী শয্যাভাগ করিবামাত্র অস্ত্র দেকতাদের পূজা না করিয়া স্বীয় পতি-দেবতার পূজায় নিযুক্ত হয়, জলপূর্ণ মেঘও তাহার আঁজা পালন করে।

১। ধর্ম (গৃহস্থ ও তপস্বীর কর্তব্য)

ধর্ম-শীর্ষক অংশের গৃহস্থ-জীবনায়ক প্রথম খণ্ডে উত্তম পত্নী, উত্তম পিতা, উত্তম প্রতিবেশী এবং উত্তম মনুষ্য হইবার জন্য যে-সকল গুণ অবশ্যক তাহঁর শিক্ষা উনিশটি পরিচ্ছেদ দেওয়া হইয়াছে, এবং তৎপরবর্তী চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ দেখান হইয়াছে—মনুষ্য যশের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রাণ দিত হইয়া কি প্রকার ভাল কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে। তাহঁর পর তপস্বীদের কি কি গুণের অভ্যাস করা উচিত তাহঁর উল্লখ তেরটি পরিচ্ছেদ আছে। এই খণ্ডের শেষ অষ্ট-ত্রিংশ পরিচ্ছেদে ভাগ্য সম্বন্ধে কতিপয় মন্তব্য আছে।

[জড় বিজ্ঞানে দুই প্রকারের শক্তির উল্লেখ আছে— (১) সঞ্চিত বা অব্যক্ত (Potential) এবং (২) ক্রিয়ামূল বা ব্যক্ত (Kinetic or active) শক্তি। ক্রিয়ামূল শক্তির উদাহরণ পাওয়া যায়, বায়ু, জল ইত্যাদি প্রাকৃতিক পদার্থের গতিতে, মাধ্যাকর্ষণজনিত গতিতে, রাসায়নিক ক্রিয়াতে, শব্দে, উত্তাপে, আলোকে, তড়িৎ-প্রবাহে, চুম্বকের আকর্ষণে ইত্যাদি। এই সকল প্রতীয়মান শক্তি ব্যতীত কতকগুলি এমন শক্তি আছে যাহাদের কার্য এখন প্রতীয়মান নহে, কিন্তু ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনা আছে, যেমন—বক্রন, ইলেকট্রিক ব্যাটারী, সলফিউরিক অ্যাসিড, কার্বন, তেল, তুলা, দেশলাই ইত্যাদি। সামান্তমাত্র উত্তেজনা পাইলেই ইহাদের অব্যক্ত শক্তি ব্যক্ত হইয়া পড়ে। রাশিকৃত বক্রদের একস্থানে সামান্তমাত্র অগ্নির স্পর্শ পাইলেই সমস্ত স্তূপটি জলিয়া উঠিবে।]

মনুষ্যের কার্যাবলীতে আমরা শক্তির ব্যক্ত অবস্থা দেখিতে পাই। কিন্তু ব্যক্ত শক্তি ব্যতীত মনুষ্যে বহু পরিমাণে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শক্তি সঞ্চিত বা অব্যক্ত ভাবে আছে, যাহা উপযুক্ত উত্তেজনা পাইলেই ব্যক্ত হইয়া পড়ে, যেমন ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য, দয়া, সহানুভূতি, সেবা, যোগ, স্বদেশ-প্ৰীতি, হরি-ভক্তি ইত্যাদির প্রবৃত্তি। এই সঞ্চিত প্রবৃত্তিগুলি জীবকে ভাল-মন্দ কাজ করিতে চালিত করে। জন্ম-জন্মান্তর-ভীষ যে-সকল ভাল-মন্দ কাজ করিয়াছে, ভাল-মন্দ চিন্তাকে মনে স্থান দিয়াছে এবং এই জন্মে যে-সকল ভাল-মন্দ কাজ ও চিন্তায় নিযুক্ত আছে, তাহাদের একটি সমষ্টি প্রত্যেক মুহূর্তে নিশ্চিত হইতেছে এবং ইহাই ঐ সময়ে ঐ জীবের চরিত্র। উহঁর কিয়দংশ এ-জন্মে ব্যক্তরূপ ধারণ করিতেছে, এবং অবশিষ্ট অংশ অব্যক্ত বা সঞ্চিত থাকিতেছে। এই জীবনের শেষে কর্মফল যে-পরিমাণে অব্যক্ত থাকিবে, উহাই ভবিষ্যৎ জীবনে জীব সঙ্গে লইয়া যাইবে এবং উহাই ঐ

জীবনের প্রারম্ভ বা প্রাক্তন কর্মফল বা ভবিতব্যতা বা ভাগ্য। অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদের উক্তিগুলি এই চিন্তাধারা-প্রসূত বলিয়া অনুমিত হয়। এই পরিচ্ছেদের সার মর্ম এই যে, ভবিতব্যতার গতি অপ্ৰতিহত এবং ভবিতব্যতার (অর্থাৎ নিম্ন কর্মফলের) হাত হইতে কেহ পরিভ্রাণ পাইতে পারে না। তথাপি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে, অনাসক্ত পুণ্য কর্ম ও গুরু চিন্তা দ্বারা, এই জন্মেই হউক বা ভবিষ্যৎ অনেক জন্মেই হউক, সঞ্চিত পাপরাশির অনেক পরিমাণে ক্ষয়সাধন করিতে পারা যায়। নতুবা তিরুবল্লভের এত উপদেশ বৃথা হইয়া যায়। তাঁহঁর মতও বোধ হয় ইহাই। সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে তাঁদের প্রভাব বর্ণিত হইয়াছে। কৃচ্ছসাধন, অর্থাৎ শারীরিক বা মানসিক আঘাত সহ্য করিতে পারিলেই কর্মবন্ধন শিথিল হইতে পারে এবং মনুষ্য নিজেই মুক্ত করিতে পারে। ত্রিবিষ্টম পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, দৃঢ়সঙ্কল্প দ্বারা সে মন্দ ভাগ্যকে পরাজয় করিতে পারে। দ্বিবিষ্টম পরিচ্ছেদের নবম ও দশম স্ত্রেও উদ্যমের মহত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

কুরলের ধর্ম-শীর্ষক অংশে অনেকগুলি উচ্চভাব-পূর্ণ উক্তি পাওয়া যায়, যথা—

১। যাহারা বল যে কেবল ধার্মিক লোকেরই প্রেম অধিকার আছে, তাহারা মুর্থ; কেননা, মন্দ লোকের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইলেও প্রেমই মনুষ্যের একমাত্র সহায়। (৮৬)

২। শুভ ও অশুভ সকল লোকের ভাগ্যই বটে, কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের নিকট জায়নিঃ চিন্তাই গৌরবের বস্তু। (১২.৫)

৩। যদি তোমার একটি কথা দ্বারা কাহারও পীড়া জন্ম, তাহা হইলে তোমার সমস্ত সাধুতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে মনে করিও। (১৩.৮)

৪। প্রতিশোধের আনন্দ একদিন মাত্র স্থায়ী, কিন্তু ক্ষমার গৌরব চিরস্থায়ী। (১৬.৬)

৫। অতঃপূর্বে শত্রু হইতে পরিভ্রাণ আছে, কিন্তু পাপকর্মের কদাপি বিনাশ নাই। উহা পানীকে অন্তঃসরণ করতঃ তাহাকে নষ্ট না করিয়া ছাড়ে না। (২১.৭)

৬। যেমন ধন-বৈভব-গুণ মনুষ্যের মৃত্যু ইহলোক নয়, তেমনই দয়াশূন্য মনুষ্যের জন্ম পরলোক নয়। (২৫.৭)

৭। যাহারা কোনো ব্যক্তির অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা দূর শান্তিবিধান সে ব্যক্তি কি প্রকারে করিবে? উপকার করিয়া সে তাহাদিগকে ক্ষমায় লজ্জা দিবে। (৩২.৪)

৮। কোনো ব্যক্তি কোনো বস্তু পরিত্যাগ করিয়াছে। ঐ বস্তু হইতে বেচুঃখ উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা হইতে সে মুক্ত হইয়াছে। (৩৫.১)

৯। কাম, ক্রোধ ও মোহকে যে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়াছে তাহার সকল কষ্ট নষ্ট হইয়া গিয়াছে। (৩৬.১০)

১০। নিষ্কমনা হইতে শ্রেষ্ঠতর সম্পদ মর্ত্যলোকে আর নাই। যদি তুমি স্বর্গেও যাও, সেখানে এমন কোনো মূল্যবান বস্তু পাইব না যাহা ইহার সমকক্ষতা করিতে পারে। (৩৭.৩)

মানবজীবন সম্বন্ধে আশাপূর্ণ ভাবই কুরলের প্রথম অংশের বিশিষ্টতা। কবি বলিতেছেন, “মুসন্মানিত পবিত্র গৃহ মনুষ্যজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বর এবং গুণশালী সন্ততি তাহার মহৎস্বর পরাকর্ষণ।” তাঁহার বাৎসল্য ভাব কি মধুর! “শিশুদের স্পর্শে শরীরের সুখ এবং কথায় কর্ণের তৃপ্তি। যাহারা শিশুগণের কাকলি শুন নাই, তাহারা ই সেতার এবং বংশীর ধ্বনির প্রতি আকৃষ্ট হয়।” কবি বলেন যে, মানবপ্রীতি ও অতিথি-সৎকার মনুষ্যের প্রধান কর্তব্য এবং মধুর সন্তান তাহার ভূষণ-স্বরূপ। কৃতজ্ঞতা, গায়নিষ্ঠা, আত্ম-সংবন্দম, ক্ষমা, দান ও পরোপকার তাহার অমূল্য গুণ; কিন্তু পরদার, ঈর্ষ্যা, লোভ, বৃথাভাবণ, অনিষ্ট-চিন্তা ইত্যাদি ভয়ঙ্কর দোষ।

কিন্তু যাহাকে লোকে মৃত্যু বলে, উহা ত কেবল জীবের শরীরের বিনাশ। উহাতে ত জীবের সম্পূর্ণ লোপ হয় না। উহার একটি ভবিষ্যৎ জীবনও আছে। যখন মনুষ্য হিতকর ও সাধু জীবন যাপন করিয়া এবং এই অনন্ত জীবন-নাটকে স্বীয় স্থান অধিকার করিবার জন্য পুত্রোৎপাদন করিয়া সমাজের প্রতি তাহার যে কর্তব্য ছিল তাহা পালন করিয়াছে, তখন ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য তাহার প্রস্তুত হওয়া আবশ্যিক।

এখন গৃহস্থ নিজ সাধু আচরণের ফল-স্বরূপ জীবন-সোপানের কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করিয়াছে। এই উচ্চতর স্থান প্রাপ্ত হইবার ফলে একটি উচ্চতর সাধুতার ক্ষেত্র তাহার সম্মুখে প্রসারিত দেখিতে পাইতেছে এবং ঐ স্তরের উপযুক্ত হইবার জন্য আপনাকে অধিকতর শাসনাধীন রাখা উচিত বিবেচনা করিতেছে। সেই উদ্দেশ্যে এখন সে সর্বভূতে দয়া, নিরামিষ-আহার, আত্ম-নিগ্রহ ও ধ্যান-যোগের অভ্যাস করিয়া এবং (এই উপায়ে অধিকতর আধ্যাত্মিক বল ও দৃষ্টি-শক্তি সঞ্চিত হইলে) প্রতারণা, অসত্য, ক্রোধ, হিংসা, পরপীড়ন হইতে নিবৃত্ত হইয়া, মনকে বিশুদ্ধ করিবার চেষ্টা করে। এই প্রকার আত্মশাসন দ্বারা অবিদ্যার নানা কোষ স্থলিত হওয়াতে তপস্বীর চক্ষু খুলিয়া যায় এবং সে স্বীয় অন্তরে অহুত্ব করে যে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ স্বপ্নবৎ মিথ্যা—আজ আছে, কাল অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। এই হেতু সাংসারিক বস্তুতে তাহার পূর্ববৎ আসক্তি নষ্ট হইয়া যায়, এবং তাহার মনশুদ্ধির সম্মুখে সত্যের যথার্থ মূর্তি প্রতিভাত হয়। কিন্তু

বাসনা এখনও তাহার মনের নিকট বিদায়গ্রহণ করে নাই। উহা নানা বর্ণ ও নানা আকারে তাহার মনকে কলুষিত করিতে থাকে। বড় বড় ধর্ম্মাঙ্গণও তাহার ছলনা হইতে অব্যাহতি পান না এবং যে-পর্যন্ত তাহার সম্পূর্ণ বিনাশ না হয়, সে-পর্যন্ত আত্মা বিশুদ্ধ আনন্দের অধিকারী হইতে পারে না। সেই জন্য গ্রন্থকর্তা এই অংশের উপসংহারে বলিতেছেন,—বাসনা কখনও তৃপ্ত হয় না, কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি বাসনা ত্যাগ করিত সমর্থ হয়, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাতঃ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। (৩৭.১০)

২। অর্থ (রাজনীতি)

গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে কবি রাজনীতির আলোচনা করিয়াছেন। তিনটি অংশের মধ্যে ইহাই সর্বাধিক বড়। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, জীবনের পরিকল্পনায় কবি রাজনীতিকে কিরূপ স্থান দিয়াছেন। এই অংশটির নাম দিতে গিয়া কবি বোধ হয় কোটিল্যের অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে কেবল রাজনীতির গুসঙ্গই আছে, কারণ রাজ্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত শাসনাধীন না থাকিলে নিকরপদ্রব ধনের সঞ্চয় বা উপভোগ করা যায় না। কবি বলেন যে, অত্যাচারী রাজার শাসনে দরিদ্রের অবস্থাপেক্ষা ধনীরা অবস্থা অধিক সঙ্কটাপন্ন। (৫.৬৮) রাজাকে যে-সকল উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা ধনীর উপরও প্রযোজ্য।

প্রথম অংশ পড়িয়া আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, এই কাব্যের লেখক একজন গার্হস্থ্য-নীতি-বিশারদ। যে-অংশের আলোচনা এখন আরম্ভ হইতেছে, তাহা হইতে প্রমাণিত হইবে যে, তিনি একজন অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞ এবং সাংসারিক জ্ঞানে পূর্ণমাত্রায় অভিজ্ঞ। রাজনীতির এমন কোনো অংশ নাই যাহা তাঁহার সুপরিচিত ছিল না। রাজ্য-শাসনব্যাপারের মৌলিক তত্ত্বগুলি ধরিবার বিশেষ ক্ষমতা তাঁহার ছিল বলিয়া বুঝা যায়। কোনো স্থানে অস্পষ্টতা, যদৃচ্ছা-কল্পনা বা শব্দ-বাহুল্য দৃষ্ট হয় না। প্রত্যেক বিষয় যথাস্থানে ও উচিত পরিমাণে সন্নিবেশিত দেখিতে পাওয়া যায়। রাজনীতি-বিষয়ক সমগ্র ক্ষেত্র তাঁহার সুযুক্তি-কিরণে সমুজ্জ্বল।

কি উপায়ে সুনিপুণ ভাবে রাজ্য-শাসন-কার্য সম্পন্ন হইতে পারে তাহার পথপ্রদর্শন করাই এই অংশের উদ্দেশ্য। এই অংশের প্রথম খণ্ডে মুখ্যতঃ রাজাকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, কারণ তিনিই রাজ্যের শাসন-কর্তা। কতকগুলি উপদেশ সাধারণ লোকদিগকে দেওয়া হইলেও, তাহা রাজার প্রতিও প্রযোজ্য। আবার কতকগুলি রাজাকে সংোধন করিয়া বলা হইলেও, তাহা হইতে সাধারণ লোকও উপকার পাইতে পারে, যেমন—“আত্মপ্রসাদ

হইতে যে অনবধানতার উৎপত্তি হয়, তাহা অতি-ক্রোধ অপেক্ষাও দুর্ষণীয়” (৫৪.১)। “যে-রাজা গুণবান ব্যক্তিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া কোনো কার্যে হস্তক্ষেপ করে, তাহার পক্ষে এমন কোনো কাজ নাই যাহা অসম্ভব।” (৪৩.২)

রাজ্যে শৃঙ্খলা ও সুশাসন থাকা অত্যাবশ্যক। কুশাসন ও অরাজকতা হইতে অনেক অনর্থ উৎপন্ন হয়। রাজার পক্ষে নিজে রাজ্যের শাসন-নীতির উল্লঙ্ঘন করা উচিত নয়। তাহার ত্রায়-নিষ্ঠ ও পক্ষপাত-শূন্য হওয়া কর্তব্য। (৫৫ পরি.) রাজার অত্রায় কার্যের সমালোচনা করিবার অধিকার মন্ত্রীদিগের ও সকল প্রজার থাকা প্রয়োজন (৩৯.৯, ৪৫.৭, ৪৫.৮)। রাজার বিলাসী হওয়া অসুচিত। তাহার এই সকল গুণ থাকা আবশ্যক—(১) সে প্রজা-মাত্রকেই তাহার নিকট প্রবেশের অধিকার দিবে। (২) সে স্ত্রী ব্যক্তিগণের উপদেশ গ্রহণ করিবে, (৩) সে গুণবান ব্যক্তিদের সহিত বন্ধুত্ব করিবে, (৪) সে কুসঙ্গ হইতে দূরে থাকিবে, (৫) সে বিশেষ চিন্তাপূর্বক কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে, (৬) সে বিশ্বস্ত কর্মচারী নিয়োগ করিবে, (৭) সে আলস্য ত্যাগ করিবে, (৮) সে নির্ভীক ও পরিশ্রমী হইবে, (৯) সে প্রজাপীড়ন করিবে না, (১০) সে শাস্তি ও বিগ্রহের নিয়ম ও কৌশলে অভিজ্ঞ হইবে, (১১) সে নিজে সকল কার্যের পর্যবেক্ষণ করিবে, (১২) সে দৃঢ়সঙ্কল্প ও সাহসী হইবে, (১৩) সে রাজনীতিতে পারদর্শী হইবে এবং (১৪) সে চর নিয়োগে নিপুণ হইবে।

এই অংশের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম দশ পরিচ্ছেদ মন্ত্রীদের বিষয়ে লিখিত। মন্ত্রীরা কর্মঠ, চতুর, দৃঢ়সঙ্কল্প, প্রত্যুৎপন্নমতি, এবং অপরের মনোভাব অনুমান করিতে সমর্থ হইবে। তাহারা রাজসভাসদের সর্বোচ্চগুণসম্পন্ন এবং যথাসময়ে মৌনাবলম্বনে সক্ষম হইবে। যদি কখনও বিদেশী রাজ-সভায় দৌত্য করিতে যাইতে হয়, তখন তাহারা সেথানকার রাজার প্রতি বথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিবে, এবং রাজ-কর্মচারীদিগের সহিত মেলা-মেশা করিবে এবং তাহাদের সংসর্গে শিষ্টাচার দেখাইবে। কিন্তু তাহারা নিষ্কলঙ্ক থাকিবে এবং সর্বদা তাহাদের দৃষ্টি স্বীয় রাজার হিতের ও গৌরবের প্রতি থাকিবে। এতদ্ব্যতীত তাহাদের আত্ম-প্রত্যয় ও জন-মণ্ডলীর সম্মুখে বাক-পটুতা দেখাইবার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক।

ভারতীয় অর্থ-শাস্ত্র-বিদগণেরা সমগ্র রাজ-তন্ত্রকে ছয় অঙ্গে বিভক্ত করিয়াছেন এবং তিরুবল্লুরও তাহাদের অনুসরণ করিয়াছেন। ছয়টি অঙ্গের মধ্যে মন্ত্রী-সমাজ একটি। অবশিষ্ট অঙ্গগুলির নাম—সেনা, প্রজা, ধন, মিত্র-রাজত্ববর্গ এবং দুর্গ। (৩৯.১) ছাব্বিশটি পরিচ্ছেদে এই সকল বিষয়ের প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি বিবৃত হইয়াছে। ইহাদের

পরে কয়েকটি পরিচ্ছেদ নানা প্রকার দোষের এবং বিরুদ্ধাচারীদের বর্ণনা করা হইয়াছে। শেষ পরিচ্ছেদে ঔষধ এবং চিকিৎসকদের কথা আছে।

তৃতীয় খণ্ডের তেরটি পরিচ্ছেদে বিবিধ বিষয়ের বিচার আছে। ঐগুলির মধ্যে ‘সম্মান’ ও ‘বোগ্যতা’-বিষয়ক পরিচ্ছেদ দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশিষ্ট পরিচ্ছেদগুলির বিষয় এই—কুলীনতা, মহত্ব, শিষ্টাচার, কৃষি, শিক্ষাবৃত্তি, অধঃপতিত জীবন।

৩। কাম (দাম্পত্য প্রেম)

গৃহস্থ জীবন ও রাজনীতির আলোচনা শেষ করিয়া কবি তৎপরে জীবনের তৃতীয় লক্ষ্য “প্রেমের” একখানি অপূর্ব আলোচনা আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিতেছেন। ‘কুরলের’ প্রধান প্রধান ভাষাকারের মতে এই অংশটি কোন বাস্তব প্রেমের চিত্র—কোনো বিশেষ প্রণয়ী-গুণের প্রেম-গাথা। নায়ক-নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎকার হইতে তাহাদের মিলন পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার ইতিহাস আশ্চর্য্য নিপুণতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনার ধরণ দেখিয়া বাস্তবিকতার অনুমান করা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু এই কবিতাগুলি সাধারণ প্রেমিক-প্রেমিকার কাব্যকলাপ ও মনোভাবের বর্ণনা বলিয়াও ধরা যাইতে পারে। এই কবিতা-সমূহে প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়ের অসংখ্য পরিবর্তন বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হইয়াছে। টেনিসনের লক্ষ্মী-হলে বর্ণিত নায়িকার সহস্র হৃদয়াবেগ তাহাদের পরিচিত, তাহারা তিরুবল্লুরের বর্ণনাগুলি পড়িয়া স্বীকার করিবেন যে, এই প্রাচীন তামিল কবি এ-বিষয়ে টেনিসন অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য।

এই কল্পনাজ্বল বৃত্তান্তের আরম্ভ এই প্রকারে করা হইয়াছে—এক নির্জন বনে কোনো সময়ে নায়িকা হঠাৎ নায়কের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। প্রথম সাক্ষাতেই উভয়ের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি প্রেমের সঞ্চার হইল। যুবতীর রূপের মোহে যুবক আত্মহারা হইল। যুবতীর লাগণ্যে বিশাল যুগলনেত্র, নয়নের হৃদয়ভদ্রী চঞ্চলদৃষ্টি, উন্নত উরস্থল তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল। পরে তরুণী আরও দুই-একবার যুবকের সম্মুখে পড়িল, কিন্তু ভাব গোপন করিয়া সে যুবকের সহিত অপরিচিতার ত্রায় ব্যবহার করিল। নায়ক ভাবিতে থাকে—“সে আমাকে জানিতে দেয় না বটে যে, সে আমাকে দেখিয়াছে, কিন্তু যখন অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে দেখিয়া, না দেখিবার ভাণ করে, তখন আমি বুঝিতে পারি যে সত্য সত্যই তাহার হৃদয় আনন্দে নাচিতে থাকে এবং তাহার মুখমণ্ডলে অক্ষুট হাস্যের রেখা দেখা দেয়। প্রত্যাখ্যানের অভিনয় করিলে কি হইবে, হৃদয়ে সে আমার প্রতি

গভীর ভালবাসা পোষণ করে।” সতাই নায়িকা হৃদয় হারাইয়াছে। সে মনে মনে বলিতেছে, “আমার প্রিয়তম অহরহঃ আমার নয়নের মধ্যে বাস করিতেছেন, আমি নয়নে কঙ্কল লেপন করিতেও ভয় পাই, পাছে মুহূর্তের জন্যও তিনি আমার নেত্র ছাড়িয়া যান।” (১১৩.৭) একদিন সে নায়কের অনুনয়-বাঞ্ছক মুখ দেখিয়া গিয়া গিয়া মূঢ় হস্ত করিল। নায়ক ভাবিল “হৃদয়, ফুল দেখিয়া তুমি আত্মহারা হও। তোমার কি ভ্রম! যে-সকল কুসুম সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহারা কি প্রিয়ার চক্ষুর সমতা করিতে পারে?” (১১৩.৩) বারাস্তরে তাহার চোখের চাহনীতেই সন্মতি বাক্ত হইল। তখন তাহারা চিরদিন পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত থাকিবে বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল এবং তাহাদের গুপ্ত বিবাহ হইল। এরূপ বিবাহ প্রাচীন তামিল সমাজে প্রচলিত ছিল এবং ইহা অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্রোক্ত গন্ধর্ব বিবাহের অনুরূপ। এখন তরুণ-তরুণী পরস্পরের বাহুপাশে আবদ্ধ হইল। যে রমণী এ-পর্য্যন্ত নায়কের হৃদয়ে বাধা দিয়া আসিতেছিল, সে-ই সে-বাধার উৎস হইল। এখন উভয়ের আলিঙ্গনাবদ্ধ শরীরের মধ্যে সমীরণের প্রবেশও বিয়োগ-বাধা উৎপন্ন করে।

বিবাহ গোপনে হইল—তরুণীর পিতা মাতা বা আত্মীয় স্বজন কেহ জানিতে পারিল না। প্রেমিকদ্বয় একটি অকুল সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল যখন এই ঘটনা সহজে সমাজে প্রকাশ করা যাইতে পারিবে। কিন্তু দুই-চারি দিন অতীত হইতে না হইতেই যুবক মিলনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয় উঠিল। কবে রহস্য-ভেদের উপযুক্ত সময় আসিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। যুবকের অধীরতা অধিক অপেক্ষা করা অসম্ভব করিয়া তুলিল।

অতি প্রাচীন কালে তামিল দেশে প্রেমিকদের এইরূপ সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইবার একটি কৌশলের উদ্ভাবন করা হইয়াছিল। কিন্তু উপায়টি অবলম্বন করা নিতান্ত সহজ ছিল না—প্রেমিক যুবককে দারুণ শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিতে ও অশেষ লজ্জাহীনতা দেখাইতে হইত। উদ্দেশ্য এই ছিল যে যুবকের এই ক্লেশ অবস্থা দেখিয়া যুবতীর পিতামাতা ও সমাজের লোকেরা তাহার প্রতি সদয় হইয়া তাহার গুপ্ততা ক্ষমা করিবে এবং যে-বিবাহ গোপনে হইয়াছে তাহাতে সন্মতি দিয়া তাহার হস্তে তাহার প্রণয়িনীকে সমর্পণ করিবে।

উপায়টিকে বর্বরোচিত মূল উপায় ভিন্ন আর কি বলা উলে? কতকগুলি সর্বস্ত তালপত্র কাটিয়া আনিয়া দড়ি দিয়া ঈষৎ লম্বা একটি মোটা গোল বোঝার আকারে বাধা হইত। প্রেমিক যুবক সেই বোঝার উপর দুই দিক পা বুলাইয়া বোড়-সওয়ারের মত বসিত এবং সেই অবস্থাতেই তাহার কয়েক জন বন্ধু আবেগময় প্রেমসঙ্গীত গান করিতে

করিতে তাহাকে বহন করিয়া গ্রামের ভিতরে লইয়া যাইত। সেই সময়ে তালপত্রের ধারবিশিষ্ট অগ্রভাগ ও পার্শ্বদেশের সম্বর্ধে ঐ প্রেম-যাত্রার পথিক-মহাশয়ের শরীরের অংশ-বিশেষের কিরূপ দশা হইত তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। তাহার উপর গ্রামের বত বালক ও যুবক ঐ প্রেম-বিস্মল অশ্বারোহী বীরবরকে বিরিয়া তাহাকে উপহাস ও বাকাবাণে জর্জর করিতে করিতে এবং সম্ভবতঃ তাহার প্রণয়িনীর নাম উচ্চঃস্বরে উচ্চারণ করিতে করিতে, তাহার অধীনস্থ সেনা-বাহিনীর শ্রায়, তাহার অনুসরণ করিত। (১১৪ পরিচ্ছেদ) এই কোলাহলের শব্দ যুবতীর পিতামাতা ও বন্ধুবর্গের কর্ণগোচর হইত এবং তখন তাহারা যুবতীর অপকীর্তির কথা প্রথম জানিতে পারিত। বলা বাহুল্য যে, তাহার তিরস্কারের সীমা থাকিত না। কিন্তু এখন তিরস্কার করিলে যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা ত ফিরিবে না। এই সংবাদ সমস্ত গ্রামে প্রচারিত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং বাধা হইয়া পিতামাতাকে বিবাহে সন্মতি দিতে হইত। তখন প্রেমিক-যুগলের হৃদয়ের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া সূখ-সূর্য্যের উদয় হইত।

আলোচ্য গ্রন্থের নায়কও গতাস্তর না দেখিয়া ভাবিল, “প্রিয়া হইতে যে-সকল প্রণয়ী বিচ্ছিন্ন হইয়া বিরহের তুর্ধানলে দগ্ধ হইতেছে, ক্রুদ্ধ-জ্ঞাপক তীক্ষ্ণ-ধার তালপত্রের উপর আরোহণ করা ছাড়া তাহাদের অন্য উপায় নাই।” (১১৪.১) এই উপায়ে সে তাহার প্রণয়িনীর সহিত মিলিত হইল। কিছুকাল পর্যা্যন্ত নবীন দম্পতি পরস্পরের মধুময় সাহচর্য্য উপভোগ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। কিন্তু বিশুদ্ধ প্রেমের ধারা সহজগতিতে প্রবাহিত হয় না। নিরানন্দের কালমেঘ আসিয়া তাহাদের প্রেমের নির্মল নভোমণ্ডল অচ্ছন্ন করিল। শীঘ্রই যুবকের নিকট সৈনিকবেশে যুদ্ধে যাইবার ডাক আসিল। উহার হৃদয় কাটিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু কতবোর অনুরোধে হৃদয় পাবাণ করিতে হইল। আহা, বিদায়-দৃশ্য কি করুণ! যুবক তাহার তরুণ পত্নীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে, সে শীঘ্রই গৌরব লাভ করিয়া ও ধন-সঞ্চয় করিয়া যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে। কিন্তু যুবতী কিছুতেই প্রবোধ মানিতে চাহে না—বিয়োগের চিন্তামাত্রই তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। বলিল, “তুমি আমাকে ছাড়িয়া গেলে আমার মৃত্যু নিশ্চিত। ফিরিবার কথা ছাড়া যদি আর কিছু বলিবার থাকে ত বল—তোমার আশু প্রত্যাগমনের কথা তাহাকেই বলিলে ভাল হয় যে ততদিন পর্যা্যন্ত জীবিত থাকার আশা করে” (১৩৬.১)। যুবক বারংবার বিদায়-ভিক্ষা করিয়াও অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে বিষন্ন মনে বাহির হইয়া পড়িল।

কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহ নবীনা রমণীদের আত্মাধীন নয় এবং

তাহাদের সুবিধানুসারে সমাপ্ত হয় না। প্রত্যাবর্তনের নির্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গেল, কিন্তু যুবক ব.টী ফিরিল না। যুবতী এ পর্যন্ত কোনো প্রকারে ধৈর্য্য-ধারণ করিয়াছিল। এখন ব্যাকুল হইল—বিরহ-বেদনা অসহ হইয়া পড়িল। তরুণীর বিরহ-বাতনার বিবরণ এগারটি পরিচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে। প্রেম প্রথমাবস্থায় রূপ-জনিত মোহমাত্র—দৈহিক উপভোগের স্পৃহা—যেন সাগরের বহিঃ-পৃষ্ঠের উর্মিমালার উচ্ছ্বাস; কিন্তু ক্রমশঃ উহা ঘনীভূত হইয়া হৃদয়ের অন্তঃস্থল অধিকার করে—তখন উহার বাহ্য প্রকাশ বিরল—উহা যেন সাগরের গভীর দেশস্থ শ্রোতের স্থিরগতি—বাহ্য-দৃষ্টির অগোচর। বিরহেই প্রেমের গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিরহের বর্ণনাতেই কবির যথার্থ কবিত্বশক্তি প্রকাশিত হয়। নায়িকার দুঃসহ-যন্ত্রণা-জনিত সহস্র তীব্র আবেগময় ভাব পাঠককে আনন্দে পরিপ্লুত করে। তিরুবল্লুর এই সকল ভাবের সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণে অসাধারণ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন।

নায়িকা বলিতেছে, “সাধারণের নিন্দা-রূপ সার এবং মাতার গণনা-রূপ জল-সেক দ্বারা পুষ্ট ও বর্ধিত হইয়া আমার বিরহ-দীক্ষা হৃদয়ের বেদনা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। (১১৫.৭) অগ্নিকে স্পর্শ করিলে তবে সে দগ্ন করে, কিন্তু সুদূর হইতে দগ্ন করে প্রেম (১১৬.৯)। এখনও আমি আমার অন্তরের অসীম দুঃখের কণ্ঠরোধ করিয়া রাখিয়াছি; কিন্তু নির্ঝরের জলধারা যেমন অবিরাম শোষণেও নিঃশেষিত হয় না, সেইরূপ আমার শোকাশ্র-নির্ঝর শত প্রয়াস সত্ত্বেও পুনঃ পুনঃ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে (১১৭.১)। আমার প্রাণ-যষ্টির দুই প্রান্তে অনুরাগ ও সঙ্কোচের বোঝা বাধিয়া আমি বহন করিয়া দাঁড়াইতেছি, সেই কারণে আমার আর্ত ও অসহায় দেহ দুঃসহ (দুঃখের) ভারে সততঃ ভাঙিয়া পড়িতেছে (১১৭.৩)। যামিনীর মায়া-দণ্ডের স্পর্শে নিখিল জগৎ নিদ্রায় অচেতন, কেবল আমিই জাগ্রত থাকিয়া তাহার সাহচর্য্য করিতেছি (১১৭.৯)। আমার হৃদয়ের মত আমার চক্ষুও যদি দৌড়াইয়া বাহ্যিতের কাছে পৌঁছিতে পারিত, তবে তাহাকে (চক্ষুকে) আজ অশ্রু-সাগরে সঁতার দিতে হইত না (১১৭.১০)। হে আমার চক্ষুর্ধর, আজ আমার নিকট অভিযোগ করিতেছ কেন? তোমাদেরই নিমিত্ত আমি সাধনার অতীত এই সস্তাপ ভোগ করিতেছি; কারণ তোমরাই আমার বল্লভকে দেখাইয়া আমাকে তাহার হৃদয়-তীর্থের বাত্রী করিয়াছ (১১৮.১)। তাহার বিরহ-সম্বৃত্ত বলিয়াই আমার বিবর্ণতা স্পর্ধা পাইয়াছে, তাই সে রঙ্গে আমার সর্বাঙ্গে লীলা করিতেছে (১১৯.২)। সেই তরুর আমার ব্রীড়া ও কমনীয়তা সকলই হরণ করিয়া লইয়াছেন; বিনিময়ে দিয়াছেন সুধু অসহ বিরহ ও পাণ্ডুর বর্ণ (১১৯.৩)। প্রেমের প্রতিদান

না পাইয়াও পাবাণ দেবতার চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া যে-নারী জীবিত থাকে, তাহা অপেক্ষা কঠিন-প্রাণ ভীষ পৃথিবীতে আর কে আছে? (১২০.৮) তাহার স্মৃতি-পট হইতে তিনি সবাত্ত্ব আমার ছবিখানি মুছিয়া ফেলিয়াছেন। আমার মানসপটে আপনাকে এইরূপ প্রকাশ করিতে কি তিনি কিছুমাত্র লজ্জিত নহেন? (১২১.৫) যে জন আমাকে বলিয়াছিলেন, ‘আমরা অভিনায়্যা, দুটি অংশে গঠিত একটি পূর্ণজীবন,’ তাহার নির্মমতার কথা যখন চিন্তা করি, তখন দেহ হইতে প্রাণ যেন লুকাইয়া যায় (১২১.৯)। আজও বে বাঁচিয়া আছি, তাহার কারণ, জাগরণে যাহাকে কখনও পাই না, স্বপ্নের সন্মোহে মাঝে মাঝে তাহার দর্শন পাই (১২২.৩)। এই বেদনাময় জাগরণের অবস্থা যদি না থাকিত, তাহা হইলে শাস্বত স্বপ্ন-লোকে প্রিয়তমের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনের অঙ্গুয় আনন্দ অনুভব করিয়া ধন্ত হইতাম (১২২.৬)। শিশির-সিক্তা সন্ধ্যা-বধু একদা বেষথু ও দীর্ঘশ্বাস সহকারে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইত। আজ সে সাহসিকার ভ্রায় উপস্থিত হইয়া আমার বক্ষে বেদনা ও নৈরাশ্রের হাহাকার তুলিয়া দেয় (১২৩.৩)। আমার এই বেদনা প্রভাতে কোরকের মত হৃদয়-বৃন্তে দেখা দেয়, সারাদিন ধরিয়া সে তাহার দলগুলি বিস্তার করিতে থাকে. এবং সন্ধ্যার সময় পূর্ণ প্রস্ফুটিত অবস্থায় বিরাজ করে (১২৩.৭)। বিবাহের দিন যে পেলব বাহুদয় স্ফীত হইয়াছিল, আজ তাহাদের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, তাহারা প্রিয়তমের নিকট হইতে বিদায় লইবার বার্তা ঘোষণা করিবে (১২৪.৩)। হে হৃদয়, আশ্রয়সন্মানে তুমি জলাঞ্জলি দিয়াছ, যেহেতু নির্মম-চিন্তে যে তোমাকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছে সে আসিল না বলিয়া তুমি হাহাকার করিতেছ এবং তাহারই পথ চাহিয়া বসিয়া আছ (১২৫.৮)। অগ্নিতে স্নাতের ভ্রায় বাহাদের চিত্ত প্রেমের উত্তাপে দ্রবীভূত হইয়াছে, তাহারা কি প্রিয়তমের সহিত মনোবাদ পোষণ করিয়া বাঁচিতে পারে? (১২৬.১০) হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে পদদলিত করিয়া তিনি আমার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছেন। তথাপি অচিরেই তিনি আবার আসিবেন এই চিন্তায় আমার হৃদয় আনন্দে অসীর হইয়া উঠে (১২৭.৪)। আমার নয়ন-মণি হৃদয়-দেবতা যখন ফিরিয়া আসিবেন, আমি কি তখন দীর্ঘ অদর্শনের জন্ত মানভরে বসিয়া থাকিব? না তাহাকে প্রেমালিঙ্গনে বাঁধিব? অথবা একে একে দুয়েই অনুষ্ঠান করিব?” (১২৭.৭)

নায়ক ঘরে ফিরিবার পূর্বে, তাহার উপেক্ষার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া মর্মাহত হইয়া নায়িকা কতই বিলাপ করিতেছে। তাহার মনে সহস্র বিচিত্র ভাবের উদয় হইতেছে। কখনও সে নায়ককে অতি নিষ্ঠুর, কখনও তাহার সমস্ত দুর্দশার কারণ, কখনও সমাজে নিম্ননীর হওয়ার

হেতু বলিতেছে; কখনও নিজ হৃদয়কে খিঙ্কার দিতেছে যে এত উপেক্ষা ও অনাদর সবেও সে প্রিয়ের প্রতি ধাবিত হয়, তাহাকে দেখিবার জন্ত লালসিত হয় ও মিলনের জন্ত অধীর হয়। “তিনি কবে ফিরিবেন—কবে তাঁহার রূপ-সুধা পান করিয়া আমার উপোষিত নেত্র তৃপ্ত হইবে—আমার শীর্ণ বাহুর বিবর্ণতা দূর হইবে?”

ওদিকে বাড়ি ফিরিবার জন্ত নায়ক ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। সে চায় যে আজই যুদ্ধের অবসান হউক—আজই সন্ধ্যার সময় বটী পৌছিয়া প্রিয়ার সহিত আলিঙ্গনাবদ্ধ হই। তাহার প্রিয়তমার অবস্থার কথা ভাবিয়া যে কাতর ও ভীত হইতেছে—আমার ফিরিবার আগেই যদি তাহার কুসুম-পেলব হৃদয়খানি ভাঙ্গিয়া গিয়া পাকে, তবে ধরে ফিরিয়া কি হইবে? (১২৭-৮.১০)

আজ কাতরা অবলার হৃদয়-দেবতা ধরে পৌছিলেন। “এ কি এ? প্রিয়া দৌড়িয়া আসিয়া কণ্ঠলগ্ন হইল না কেন? ও হো, মান করিয়া বসিয়া আছেন?” পরিণীত জীবনে মান কি মধুর ও উপভোগ্য! মিলিত হইবার আগ্রহ কত বৃদ্ধি পায়! ক্রোধের মধ্যে প্রেমের কিরূপ আয়প্রকাশ হয়! শেষের পাঁচটি পরিচ্ছেদে কবি পাঠকগণকে মান-লীলা-মধুর্য্যের আশ্বাসন করাইয়াছেন। এই পরিচ্ছেদ কয়টি পড়িয়া আমরা একখানি ক্ষুদ্র নাটিকা পড়ার আনন্দ পাই। রস-পুষ্টির জন্ত এক তৃতীয় ব্যক্তির পরিবেশ করা হইয়াছে—এই পাত্রীটি নায়িকার সখী। মনের অবস্থায়, ইহাকে সম্বোধন করিয়া নায়ক ও নায়িকা নিজ নিজ মনোভাব বাক্য করিয়াছে এবং সখীও সময়মত নিজের বক্তব্য বলিয়াছে।

নায়ক বলিতেছে, “হে প্রিয়া, তুমি গোপন করিবার চেষ্টা করিলেও, তোমার নয়নের চঞ্চলতা বলিয়া দিতেছে যে তোমার স্পন্দমান বক্ষ কোন বিচিত্র চিত্তা তরঙ্গিত হইতেছে।” (১২৮.১)

(নায়িকা নীরব; সখীকে সম্বোধন করিয়া নায়ক)

আহা, আমার সরলা বনিতার বাক-সংগম ললনা-কুলের মধ্যেও অতুলনীয়। তাহার সৌন্দর্য্য আমার নয়নের আনন্দ; তাহার বংশ-সদৃশ সুগোল ও সুগঠিত ভুজদ্বয় কি মনোহর (১২৮.২)। অক্ষুট কোরকের সৌরভের মত আমার ছলনাসীনা প্রিয়ার অক্ষুট হাশ্বের মধ্যেও একটি প্রচ্ছন্ন অর্থ নিহিত আছে (১২৮.৪)।

(নায়িকার প্রশ্ন; সখীর প্রতি জনাস্তিকে নায়িকা)

উঁহার চিত্তের উদাসীনতা আমা অপেক্ষা আমার শনিবন্ধুত কঙ্কণ অগ্রে অনুভব করিয়াছে (কারণ প্রিয়-বিরহের চিন্তামাত্রই তাহা প্রকোষ্ঠ-ব্রষ্ট হইয়াছে) (১২৮.৭)

(নায়ককে সম্বোধন করিয়া জনাস্তিকে সখী)

সখী একবার কঙ্কণের দিকে, পরে তাহার সুকুমার

বাহুর দিকে এবং শেষে স্বীয় চরণের দিকে তাকাইল। মাত্র এই কয়টি সঙ্কেত সে আমাকে করিয়াছে। (১২৮.৯)

(সখীকে নায়ক)

প্রিয়া সঙ্কেতে বিরহ-বেদনার তীব্রতার কথা বলিয়াছে এবং সহগামিনী হইবার অনুমতি চাহিয়াছে। কেবল নয়নের ভাষা দিয়া তাহার মনোভাব প্রকাশ করিয়া সে মাধুর্য্য গুণে রমণী মাত্রকেই অতিক্রম করিয়াছে। (১২৮.১০)

(জনাস্তিকে সখীর প্রতি নায়িকা)

সখি, মনে করিয়াছিলাম, মানভরে চলিয়া যাইব, কিন্তু আমার হৃদয় সে কথা ভুলিয়া গেল, এবং প্রিয়-সঙ্গমের জন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিল। যেমন চিত্রণ-কালে চক্ষু তুলিকার কৃষ্ণত্ব দেখিতে পায় না, তেমনি দ্রবিত নিঃকণ্ঠে থাকিলে তাঁহার কোনো দোষই আমার চোখে ধরা পড়ে না। (১২৯-৪.৫)

(স্বগত নায়ক)

কুসুম অপেক্ষাও কোমল এই প্রেম। কিন্তু অতি অল্প লোকেই জানে ইহা কত সুকুমার এবং কত নড়ে ইহাকে লালন করিতে হয়। (১২৯.৯)

(স্বগত নায়িকা)

উঁহার হৃদয় উঁহার ইচ্ছার সম্পূর্ণ অনুবর্তন করে। হৃদয়, তুমি আমার ইচ্ছার অনুসরণ করিয়া চল না কেন? উঁহার সহস্রব্যো আনন্দ প্রকাশ করিবার পূর্বে, একটু অভিমান দেখাইতেও তুমি অস্বীকৃত কেন? এই সকল ব্যাপারে আর কে তোমাকে বিশ্বাস করিবে? হয়ত উঁহাকে পাইব না, অথবা পাইয়াও হারাইব, এইরূপ বেদনাময় চেতনায় আমার চিত্ত নিয়ত চঞ্চল! (১৩০-৩.৪.৫)

(নায়ক)

যখন আমার হৃদয়ই আমার পক্ষ ত্যাগ করিয়া অভিমানিনী প্রিয়ার পক্ষ গ্রহণ করিতেছে, তখন অপরে (অর্থাৎ প্রিয়া) যে আমাকে উপেক্ষা করিব, তাহা আর বিচিত্র কি? (১৩০.১০)

(নায়িকার প্রতি জনাস্তিকে সখী)

হে সখি, উঁহাকে আলিঙ্গন করিও না, ক্রোধের ভাণ করিয়া বসিয়া থাকিও। দেখা যাক, এই ব্যাপারে উনি কিরূপে বিব্রত হন। মানই প্রেমের লবণ, কিন্তু মন রাখিও, দীর্ঘকাল মান ধরিয়া থাকিলে, খাদ্যে অতিরিক্ত লবণ সংযোগের স্রায়, উহা অপ্রীতিকর হইবে। (১৩১-১.২)

(নায়ক অল্প কোনো নারীর প্রতি আসক্ত—এই দন্দেহে

ঈর্ষ্যার ভাব দেখাইয়া নায়কের প্রতি নায়িকা)

যাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, তাহাকে আশ্রয়

না করিয়া আসা, আহতকে পুনরাবাত করার মতই অকরণ হইয়া পড়ে। (১৩১.৩১)

(নায়িকার প্রতি নায়ক)

বিশুদ্ধ-চরিত্র পুরুষের নিকটও প্রিয়তার অভিমানের মাধুর্য্য নিতান্ত অল্প নহে। প্রিয়তার মধ্যে ক্রকুটি ও অভিমানের লীলা যদি না থাকিত, তাহা হইলে প্রেম তাহার পরিণত ও অর্ধ-পরিণত ফলগুলি হইতে বঞ্চিত হইত। কিন্তু অভিমানের একটি বেদনাময় অনুভূতি আছে, কারণ প্রতি ক্ষণেই মনোমধ্যে এই প্রশ্ন জাগ্রত হয়—“মিলন নিকটে, না এখনও অনেক দূরে?” (১৩১-৫.৬.৭)

(নায়িকাকে শুনাইয়া অর্ধ-স্বগতভাবে নায়ক)

শোক করিয়া ফল কি? কারণ, এমন কেহ নিকটে নাই যে আনাকে ভালবাসে, ও আমি যে দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতেছি তাহা বুঝিতে পারে। ছায়া-বহল-নিকুঞ্জেই (সুপেয়) বারি তৃপ্তি-দায়ক, এবং যে প্রাণ দিয়া ভালবাসে, তাহারই পক্ষে মান সুশোভন। আমার হৃদয় যদি এখনও তাহাকেই আকাঙ্ক্ষা করে যে আমার তৃপ্তি-বিধান করে না, তবে ইহা তাহার বৃথা কামনা। (১৩১-৮.৯.১০)

(নায়িকা)

হে কপট রসিক, রমণী মাত্রেই দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে গ্রাস (তোমার মনোহরণ) করে। তোমার আলিঙ্গনে আমার প্রয়োজন নাই (১৩২.১)।

(নায়ক) (১৩২—৩ হইতে ১০)

আমি যদি কখনও মাল্য পরিধান করি, তবে “অল্প কোনো তরুণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য সজ্জিত হইয়াছি,” এই বলিয়া সে রোবভরে চলিয়া যায়। আমি তাহাকে বলিলাম, “প্রিয়ে আমি জগতে সবচেয়ে তোমাকে ভালবাসি,” সে ক্রকুটি করিয়া কহিল, “কারণে বল ত।” আমি কহিলাম, “এ-জীবনে আমরা কখনও বিচ্ছিন্ন হইব না।” হয়, হয়, শ্রবণ মাত্র তাহার চক্ষু দিয়া অশ্রুর ঝারি ঝরিয়া গেল (পর জীবনে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা আছে, এই কল্পনা করিয়া)। আমি তাহাকে বলিলাম, “প্রিয়ে, প্রবাসে আমি তোমাকে নিতা স্মরণ করিতাম,” অমনি উদাত আলিঙ্গন সংবরণ করিয়া মানভরে সে এই বলিয়া চলিয়া গেল, “তবে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে (কোন দিন) ভুলিয়াছিলে।” আমি হাঁচিলাম, এবং সে আমার আয়ুষ্কামনা করিল।” পরক্ষণেই সেই শুভেচ্ছা প্রত্যাহার করিয়া সাক্ষনেত্রে বলিল, “এখন তোমাকে কে স্মরণ করিতেছে যে তুমি হাঁচিতেছ?” আমি আমার হাঁচি দমন করিলাম। তথাপি সে

বাস্পপূর্ণ নয়নে কহিল, “কেহ যে তোমাকে স্মরণ করিতেছে, সে-কথা তুমি আমার নিকট গোপন করিতে চাহ।” তাহাকে সাস্বনা দিবার অশেষ চেষ্টা করিলেও সে অধিকতর ক্রটি করিয়া বলে, “অপরের মান-ভঙ্গ করিয়া করিয়া এ-বিষয়ে তুমি বেশ অভ্যস্ত হইয়াছ বটে।” তাহার মঞ্জুমুষ্টির প্রতি আবেশময় দৃষ্টিক্ষেপ করিলে সে তিরস্কার করিয়া কহে, “কাহার রূপের সহিত আমার অবয়বের তুলনা করিতেছ?”

(নায়িকা) (১৩৩—১ হইতে ৪)

উনি দোষশূন্য হইলেও এই অভিমানই আমাদের উহার মনোরঞ্জন-পটুত্ব-মাধুর্য্যের আনন্দ দেয়। যদিও এই কোমল গুণ প্রকাশ করিবার অবকাশ পাইতে প্রিয়তমকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়, তথাপি অভিমান দেখাইতে আমাদের যে সামান্য বেদনার অনুভব হয়, তাহারও একটি নিজস্ব মাধুর্য্য আছে। প্রবহমান বারি-ধারার সহিত উহার সংশ্লিষ্ট-ভূমির যেক্রম সম্বন্ধ, প্রেমিক-প্রেমিকার সম্বন্ধও যদি সেইক্রম নিবিড় ও নিগূঢ় হয়, তাহা হইলে, অভিমানাপেক্ষা উচ্চতর স্বর্গ (আনন্দ) আর কোথায় আছে? প্রিয়তমের সহিত আমার কলহের মধ্যে সেই অমোঘ শক্তি নিহিত আছে বাহা আমার অন্তরের অবরোধ বলপূর্ব্বক উল্লঙ্ঘন করে।

(নায়ক) (১৩৩—৫ হইতে ১০)

সম্পূর্ণ নিরপরাধ বাক্তির দৃঢ়বদ্ধ আলিঙ্গন হইতে যখন প্রিয়তার বাহুল্যতা অপসারিত হয়, তখন উহা হইতে এক অননুভূতপূর্ব্ব হর্ষ-শিহরণ জাগিয়া উঠে। ভোজনাপেক্ষা অধিকতর সুখকর তাহার পরিপাক; সেই প্রকার আল্পেযাপেক্ষা অধিকতর মধুর প্রেম-কলহ প্রেম-কলহে অগ্রে যে নতি স্বীকার করে, তাহারই জয়; মিলনকালে ইহার সত্যতা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ক্ষণকালের জন্য কলহের ভাণ করিয়া প্রিয়া কি আমাদের আলিঙ্গনে অধিকতর সরসতার সঞ্চার করিতে চাহেন? আহা, মানময়ীর কৃষ্ণিত ললাট ও রোয-স্ফুরিত অধরের শোভা যেন আরও কিছুক্ষণ উপভোগ করিতে পারি। কেবল আমার প্রার্থনায় বামিনী যেন আরও কিছু কাল দীর্ঘ হয়। প্রেমের মাধুর্য্য অভিমানে, এবং অভিমানের চরম সার্থকতা পরবর্তী নিবিড় মধুর আলিঙ্গনে।

এই বিবরণটি এক সাধ্বী তরুণীর মনোভাবের কার্যাবলীর সজীব চিত্র। ইহাতে অসংযম, উদামতা প্রগল্ভতা বা অপবিত্রতার নামগন্ধ নাই। ইহা রূকার জনক অবৈধ পরকীয়া প্রেম হইতে সহস্র বোজন দূরে ইহাতে তাহার ইঙ্গিত মাত্র নাই, এবং অশ্লীলতার ছায়া স্পর্শও হয় নাই। ইহা কল্পনা-স্বর্গের পারিজাতের পরিমল

বাহী। অবচ্ছিন্ন (abstract) উপদেশ ব্যর্থ হয় জানিয়া কবি দুটি তরুণ-তরুণীকে পাঠকগণের সম্মুখে রাখিয়া তাহাদের চিন্তাধারা ও কার্য-পরম্পরা প্রদর্শন করার ছলে প্রেম-রাজ্যের রহস্যের বাস্তব স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন, এবং যাহাতে প্রেম-ব্যাপার যথোচিত ভাবে নির্বাহিত হইতে পারে তাহার একটি পথ-প্রদর্শক আদর্শ যুবক-যুবতীদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন।

অলঙ্কারশাস্ত্রে মানের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতের নাট্য-শাস্ত্র, ও ভাসের নাট্যকাবলী অতি প্রাচীন বলিয়া কথিত হয়, কিন্তু তিরুবল্লুবরের সময়ের পূর্বে কোনো অলঙ্কারগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল কিনা তাহা জানিতে পারা যায় নাই। তাঁহার বার শত বৎসর পরে বৈষ্ণব কবিরা পরকীয়া নাট্যকার মানের উত্তম বিশ্লেষণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এত প্রাচীন সময়েও এই তামিল কবি স্বকীয়া নাট্যকার মানলীলা বর্ণনে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা বিশ্বয়কর। রামায়ণে কৈকেয়ীর মানের বিবরণ আছে। মান কালিদাসের শকুন্তলা বা সেকস্পীরের টেম্পেস্টের বিষয়ীভূত নহে, তথাপি তিরুবল্লুবরের নাট্যকাতে নিভৃত-নিবাসিনী শকুন্তলা ও মিরাগুর সরল অকপট প্রেম স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রেমিক-প্রেমিকার কম্পাস্থিত হৃদয়ের আবেগের বর্ণনায় তিরুবল্লুবর যেন তাহাদের অন্তস্তল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

উপসংহার

মনুষ্যের নৈতিক, পারিবারিক বা নাগরিক জীবনের যে দিগদর্শন কবি স্বীয় গ্রন্থে করাইয়াছেন তাহা অমূল্য। গ্রন্থে মানব-মনের প্রত্যেক দেশের বিশাল অভিজ্ঞতার নিদর্শন পাওয়া যায়। মলয়পুরের এই দরিদ্র অস্পৃশ্য তাঁতির প্রতিভা অসামান্য। তিনি ভীষ্ম, কোটিল্য, বাৎসায়ন, কামন্দক ইত্যাদি নীতি-ব্যাখ্যাতাদের সঙ্গে আসন পাইবার যোগ্য। কবিত্ব-শক্তিও তাঁহার নিতান্ত সামান্য ছিল না। তিনিই কবি, যাহার কল্পনা উচ্চ, যিনি উপযুক্ত ভাষায় নিজ ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন এবং যাহার উক্তি হৃদয়কে স্পর্শ করে। তিরুবল্লুবরের

রচনায় এই সকল গুণ বর্তমান। তাঁহার গ্রন্থ পড়িয়া এই ধারণা পাঠকের মনে বদ্ধমূল হয় যে সংসার একেবারে উপেক্ষার বস্তু নয়, ইহার কিছু বাস্তব সত্তা ও মাধুর্য্যও আছে, ইহাতে যেমন দুঃখ আছে তেমনি সুখও আছে, সুখ-দুঃখে জড়িত এই সংসারের কর্তব্য অনেক। সেগুলি যথাশক্তি পালন করিতে হইবে। সাধুতা, আত্ম-সম্মান ও পৌরুষের মত গুণ নাই, এবং অনৃত, ও নীচতা হয় ও অবশ্য-বর্জনীয়। বিশ্ব-সাহিত্যে “কুরল” তিরুবল্লুবরের এক অমূল্য দান।

রাজনীতি বিষয়ক দ্বিতীয় অংশের নীতিতে এক-আধ স্থানে অসামঞ্জস্যের সন্দেহ উপস্থিত হয় (যথা ৮৩.১০এ); কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে ব্যক্তিগত নীতি হইতে রাজনীতি ভিন্ন। গৃহস্থ-জীবনে ক্ষমার সমান গুণ নাই, কিন্তু রাজনীতি-ক্ষেত্রে ছুষ্টের দমন আবশ্যিক—রাষ্ট্র-শত্রু ক্ষমার্ক নয়।

পরিমলেকর “কুরলের” প্রধান ভাষ্যকার। তাঁহার পূর্বের ৯ জন টীকাকার গ্রন্থের যথাযথ ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই, কেবল পরিমলেকরই গ্রন্থকারের অভিপ্রায় বুঝিতে এবং মূলের চিন্তাধারা ও সৌন্দর্য্য বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছেন। তাহার ভাষ্য না পাইলে এখনকার দিনে মূলের তাৎপর্য্য বুঝিতে কেহই সমর্থ হইত না। এই গ্রন্থ লাতিন, জার্মান, ফ্রেঞ্চ ও ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। হিন্দী ও তেলুগু ভাষাতেও ইহার কিয়দংশের অনুবাদ হইয়াছে। ইংরেজী অনুবাদকগণের নাম F. W. Ellis, W. H. Drew, E. J. Robinson, J. Lazarus, Rev. G. U. Pope এবং V. V. Srinivas Aiyar. শেষোক্ত অনুবাদক প্রধানতঃ পরিমলেকরকে অনুসরণ করিতে তাঁহার অনুবাদটি শুদ্ধ ও সুন্দর হইয়াছে। আমি ল্যাজারাস-এর অনুবাদও দেখিয়াছি। অনেক স্থলে আয়ার-এর অনুবাদের সহিত তাঁহার অনুবাদের মিল নাই—উভয়ের অভিপ্রায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আমি আয়ার মহোদয়ের অনুবাদের অনুসরণ করিয়াছি। এজন্য আমি তাঁহার নিকট ঋণী।

ডুএল্

ডক্টর শ্রীকানাইলাল গাঙ্গুলী

ডুএল ল'ড়ে ক'জন অজহীন, ক'জন প্রাণহীন এমন কি ক'জন বিকৃত-মস্তিষ্ক হয়েছে, তারই লক্ষ্য ফর্দ যখন হের কুন অস্মানবদনে দিয়ে গেল, আমি ব্যথিত চিন্তে বললুম, “এতে কি বাহাহুরী?” সে হেসে উত্তর দিলে, “এ না করেও যে উপায় নেই।”

“কেন?”

“এর চিহ্ন, দু-একটা তরোয়ালের খোঁচা, গালে চিরস্থায়ী না ক'রে নিলে যে প্রেয়সীর মন পাওয়া দায়।”

“সত্যি নাকি?” এমন অস্তুত কথায় আমার হাসি পেল।

“সত্যি মশায়, সত্যি! ওরা যে জার্মান মেয়ে, ওদেরই বুকের দুধ খেয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৈনিক তৈরি হয়!”

এ-কথাটা কেমন কেমন লাগল। অহিংসার দেশের লোক আমি, একটু শ্লেষ না করেও থাকতে পারলুম না, “তা হ'লে আপনাদেরই সৃষ্টি ক্রয়ডিয়েন্-তত্ত্বের কোন্ পর্যায়ের এই মনোবৃত্তিটা পড়ে?”

কুন রইল নিরুত্তর। গম্ভীর ভাবে ক-এক ঢোক বিয়ার পান করলে মাত্র। আমি আবার বললুম, “না সত্যি, যাতে দেশের আশা-ভরসার আকর তরুণদেরই এত ক্ষতি হয় সে-জিনিষ কোমল-প্রাণা তরুণীরা ভালবাসেন! এটা কি?”

“ক্ষতি ত দু'বের কথা এতে আমাদের অশেষ মঙ্গল হয়— জার্মান স্রাতির ভিত্তি গড়ে!”

আমি ত অবাক! সে বুক কুলিয়ে ব'লে গেল, “আমাদের তরুণরা ঘূর্ণিত অসির সামনে মাথা খাড়া রাখতে শেখে ব'লেই সমস্ত পৃথিবীর আক্রমণে জার্মানী ভেঙে গেছে তবু হারে নি!”

আমি তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে নিলুম, “কিন্তু মশায়, আপনার গালে ত একটা দাগও নেই, তবু শ্রীমতী এলিসাবেথ শ্রোডার আপনাকে কম ভালবাসেন ব'লে ত

একটুও মনে হয় না!” এ-কথা বাহুমস্ত্রের মত কাজ করলো। উচ্চ হেসে সে বললে, “তার কারণ, আমি যে ইতিমধ্যেই বার-দুয়েক ডুএল্ লড়েছি, তার মধ্যে তিনবার লড়েছি তার জন্তে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমার অঙ্গে কেউ অস্ত্রাঘাত করতে পারে নি।”

“সেটা ভারি দুর্ভাগ্যের কথা বটে! কিন্তু আর তিনবার লড়লেন কার জন্তে?”

“সেও আমার পূর্বেকার তিন বাকুবীর জন্তে—”

“তিন—তিন জন?—”

“শুধু তিন জন কি বলচেন মশায়, আরও কত ছিল!”

“সত্যি নাকি?—কুমারী শ্রোডার তা জানেন?”

“আরে চিহ্ন তা কি কখনও বলে? তবে আপনি পুরুষ, তার বন্ধুলোক, আপনাকে বলতে আমার আপত্তি নেই।” আমি উৎসুক হ'লুম শোনবার জন্তে। এমন সময়ে সভাপতি মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে দিলেন আদেশ “সিলেনৎসিউম্! [চুপ কর]” এবং টেবিলের ওপর তাঁর তিনবার তরোয়াল-ঠোকার প্রচণ্ড আওয়াজ সভাস্থল প্রতিধ্বনিত করলে।

গ্রীষ্মকাল, রাত্রি তখন তিনটা। স্থান এক বিয়ার-রেস্তোরার বৃহৎ হল-ঘর। সেখানে হাইডেল্‌বের্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক “ফের্‌বিণ্ডুং”*-এর বাৎসরিক সভা বসেচে। ষাট্ বৎসর ঐ “ফের্‌বিণ্ডুং”-এর বয়স এবং ঐ ষাট্ বৎসর ঐ একই হলে এর বাৎসরিক সভা ব'সে এসেচে। সভা আরম্ভ হয়েছিল সন্ধ্যা আটটার, এক ঘণ্টার মধ্যেই বৎসরের হিসাব-পরীক্ষা, আগামী বৎসরের কর্মকর্তা-নিয়োগ ইত্যাদি সব কাজই শেষ হয়ে গিয়েচে। সভায় কএক জন পুরাতন সভ্যও উপস্থিত। তাঁহাদের মধ্যে কেউ হয়ত নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত অধ্যাপক, কেউ বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসক, কেউ-বা স্বনাম-ধন্য মন্ত্রী! তাঁরাও প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা দ্বারা নবীনদের স্বদেশ-প্রেমের উপদেশ দিয়েছেন। তারপর রাত্রি ৯টা থেকে আরম্ভ

* Verbindung :—এক শ্রেণীর ছাত্রসভা।

ক'রে এই ৩টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধ ও বালকে মিলে সমানে করেছে বিয়ার-পান, উচ্চ হস্ত-পরিহাস ও ভীষণ কোলাহল! মাঝে মাঝে হয়েছে ঐ আদেশ “সিলেনৎসিউম!” টেবিলে সজোরে তরোয়াল-চোকর আওয়াজ ও সম্মুখে ছাত্র-সঙ্গীত।* এখন সভা ভঙ্গ হবে, তাই সভাপতি মহাশয়ের শেষ বক্তৃতা আরম্ভ হ'ল। বক্তৃতার শেষে তিনি উচ্চকণ্ঠে ব'লে উঠলেন, “ফাটেল্যান্ট্ হোথ্”† [যেমন আমাদের বন্দেমাতরম্] আর তাঁর পরিপূর্ণ এক-সেরি বিয়ার পাত্রটি শূন্যে তুললেন, সঙ্গে সঙ্গে সকল সভা দাঁড়িয়ে উঠে অবিকল তাই করলে, একই সময়ে—একই ভাবে। তার পরই হুকুম হ'ল, “এক, দুই, তিন—মারো চুমুক!” অমনি সকলে একই কায়দায় বিয়ার-পাত্র মুখে ঠেকিয়ে, ঠিক একই ধরণে কনুই ঝেকিয়ে, এক চুমুকে এক-এক সের বিয়ার নিঃশেষে পান করলে এবং ঠিক একই প্রণালীতে শূন্য পাত্র টেবিলে রাখলে ও পুনরায় “ফাটেল্যান্ট্ হোথ্” চীৎকার ক'রলে—এবং এই ভাবে সভা ভঙ্গ হ'ল।

২

বাস্তায় যখন আমরা বার হ'লুম, তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। শহরে ঢুকে যখন এক প্রসিদ্ধ রেস্টোরান্টের কাছে এলুম, তখন সকাল হয়ে গিয়েছে। হের কুন প্রস্তাব করলে, “আহ্ন, এইখানে কিছু খাওয়া যাক,—বড় খিদে পেয়েছে।” আমার তাতে কোন আপত্তি ছিল না, কারণ আহ্নারের প্রয়োজন আমারও প্রবল এবং কূনের প্রণয়-কাহিনী শোনার ঔৎসুক্য আরও প্রবল। উভয়ে এক টেবিলে ব'সে সবে আহ্নারের ফরমাইস দিয়েছি, এমন সময়ে

* ছাত্র-সঙ্গীত, জার্মান ভাষায় বলে, “Studenten-lied!” তার নমুনা :

(১) Herr Gott der Eisen wachsen liess,
Er wollte keine Knechte!

লোহার স্বজন, করলে যে জন,
সে ভগবান চায় নি দাস!

(২) Burschon herans!...তরুণ এসো ঘরের বার!—

(৩) In Heidelberg ist mein Herz verloren

হৃদয় আমার হারিয়ে গেছে,
হাইডেলবের্গের শহরে রে!

ইত্যাদি

† Vaterland hoch :—পিতৃভূমির জয়!

পাশেরই এক টেবিলে এক ব্যক্তির শেষ কথা কানে গেল, “এলিসাবেথ!” হের কুন মনোযোগী হ'ল। আর এক ব্যক্তি ডিজ্ঞাসা করলে, “কোন এলিসাবেথ?—এলিসাবেথ শ্রোডার?—যে স্কন্দরী ঐ ‘ফেরবিৎ?’-এর সেই ভীষণ তলোয়ার-খেলিয়ের বান্ধবী?”

“হ্যারে—হ্যা! সেই ব্যাপিকাটা!

“নাঃ, তাহ'লে কিন্তু সাবধান!”

“ওঃ ভারি তলোয়ার-খেলিয়ে! এক দান আমার সঙ্গে হোক না, মজাটা টের পাবে। আর ‘লিসি’র ত তার জন্তে ভারি দরদ! এক দিন তাকে শুধু একটা ভাল হোটেল ডিনারে নিমন্ত্রণ করা! বাস, তারপর—” তার পর আর তার কথা ফুরাল না—তার গালে এক চড় বসেচে—বলাই বাতলা, হের কুন সেটি সজোরে বসিয়েচেন!

জানানীতে এর যা অবশ্যস্বাবী ফল তাই হ'ল। অর্থাৎ উভয়ে উভয়কে পরিচয়-পত্র-বিনিময় দ্বারা ডুএলে আহ্বান করলে, না-হ'ল কলহ চীৎকার বা বৃথা আক্ষালন, না-হ'ল কুৎসিত গালির বিনিময়! কিন্তু যার সঙ্গে এই কাণ্ড বাধলো তাকে দেখে আমার মনে করুণার উদ্রেক হ'ল। সে বেচারি বালক! বয়স বড়-জোর উনিশ কিংবা কুড়ি। সেও ছাত্র এবং এক বুর্শেন-কোরের* সভ্য। বাড়ি-ফেরার পথে ক্রমাগত তার কচি মুখ মনে পড়ে আর জাগে অহুকম্পা, “আহা, এত অল্প বয়সে বেচারির হ'ল এই বিপদ! কূনের সঙ্গে ডুএল্!!” কূনকে শেষে না ব'লে থাকতে পারলুম না, “ছোকরা বেজায় ডে'পো—কিন্তু অতি ছেলেমানুষ! আপনি ত বয়সে ওর দেড়া, তার দুর্দর্ষ খেলোয়াড়, চড়টাও বড় আন্তে মারেন নি—আর কেন? বেচারিকে ক্ষমা ক'রে ফেলুন!”

“আমি ক্ষমা করলে কি হয়, ও তা নেবে কেন?”

“মৃত্যু তার অবধারিত, এ জেনেও নয়?”

“নিশ্চয় নয়!—ও যে জার্মান! কিল খেয়ে কিল হজম ক'রে আজীবন মরে থাকার চেয়ে বীরের মতন একবার মরা ও সহস্রগুণ শ্রেয়ঃ মনে করবে। আমাদের দেশে এর পরও ডুএল্ না-লড়ার অর্থ কি জানেন?”

* Burschen-korps :—ছাত্রসঙ্ঘ-বিশেষ।

“না !”

“ওকে কলঙ্কের বোঝা মাথায় ক’রে আপন বার্শেন্-কোর থেকে লাখি খেয়ে বার হ’তে ত হবেই, তার পর ও কোথাও স্থান পাবে না। ও না-পাবে সৈনিক হ’তে, না-পাবে সরকারী চাকুরি, এমন কি, কোন জার্মান ব্যবসাতেও ওর স্থান হবে না। তাকে আশ্রয় নিতে হবে হয় বিদেশে, নয় ইহুদীর কাছে। এই কাপুরুষতার ঢীকা ওকে আজীবন অনুসরণ করবে! জানেন, যার আছে তলোয়ারের ভয়, তার নাই জার্মান জাতির জীবনে ঠাই!”

পরের রবিবার সকাল আটটায় ‘ডুএল’। একটা বৃহৎ হল-ঘরে গোপনে এর অনুষ্ঠান হবে—গোপনতার প্রয়োজন, কারণ আইনতঃ ডুএল নিষিদ্ধ। কুন-কে নিয়ে উপস্থিত হ’ল তার ফেরবিগুং-এর কর্মকর্তারা আর তার বন্ধুবান্ধব, তার মধ্যে ছিলুম আমিও। তার সেই শুকুমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিয়ে হাজির হ’ল তার ‘বার্শেন্-কোরের’ কর্মকর্তার দল ও তার বন্ধুগণ। আর এল ডাক্তার, তার অস্ত্রচিকিৎসার ষড়পাতি ও একটা জখমীকে নিয়ে যাবার ‘স্ট্রেচার’ সঙ্গে নিয়ে।

সর্বোচ্চ লৌহবর্ষে আবৃত ক’রে শুধু মুখ খালি রেখে দুই ঘোড়া পরস্পরের সামনাসামনি দাঁড়াল। তাদের মাঝে দাঁড়ালেন বিচারক—তিনি এক তৃতীয় ছাত্র-সভ্যের সভাপতি। তাঁর পরিধানে নিখুঁত ‘ড্রেস-সুট’, হ’তে সাদা দস্তানা। যোদ্ধৃষয়ের পাশে দাঁড়াল তাদের আপন আপন সভ্যের সভাপতি—সেই সভ্যের সরকারী পোষাকে ভূষিত হয়ে মাথায় রংচঙে টুপি প’রে। প্রথমেই আরম্ভ হ’ল উভয় সভ্যপতি কর্তৃক যোদ্ধৃষয়ের পরিচয়-প্রদান। হের আডল্ফ, কুন, হাইডেল্বের্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, অমুক ‘ফেরবিগুং’-এর সভ্য; পিতার নাম অমুক, ঐ ‘ফেরবিগুং’-এরই পুরাতন সভ্য উচ্চ রাজকর্মচারী; পিতামহ স্বনামখ্যাত ক্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের বীর পরলোকগত জেনারেল অমুক, ঐ ফেরবিগুং-এরই এক জন প্রতিষ্ঠাতা; ইত্যাদি। সেই বালকের পরিচয়ও বড় কম গেল না। তখন বিচারক-মহাশয় নির্দেশ দিলেন, “হ্যা, উভয়ের কৌলিঙ্গ সমতুল্য—‘ডুএল’ চলতে পারে। তার পরই তিনি উভয়ের তলোয়ার শূন্যে তুলে, অগ্রভাগ স্পর্শ

করিয়ে দিলেন [এবং হুকুম দিলেন, “মেন্‌সুর? ত্‌স্‌!” [mensur?—zu!—অর্থাৎ ব্যবধান ঠিক?—লাগাও।]

আরম্ভ হ’ল ক্ষিপ্ত অসি-চালনা,—শব্দ উঠলো, ঝনা-ঝন্, ঝনা-ঝন্! শাণিত কুপাণের ঘর্ষণে ছোট্ট অধি-ক্ষুলিঙ্গ, দুই যুবকের বিক্ষারিত নেত্র হ’তে বিচ্ছুরিত হ’ল জ্যোতিঃ। একের দৃষ্টি অপরকে যেন গ্রাস করেছে—একে চায় অপরকে সামান্য অসাবধানতার মুহূর্ত্তে অসি-বিদ্ধ করতে—উভয়ের মুষ্টিচালনা এত ক্ষিপ্ত যে, তা আর দৃষ্টিগোচর হয় না। ঝনা-ঝন্, ঝনা-ঝন্, ঝনা-ঝন্—অবিরাম ঝঙ্কত হয় অসি-ঘর্ষণের ঝঙ্কার!

মিনিট-দুয়েক পরেই সেই বালকের মুখে লাগল কয়েকটি আঘাত—নির্গত হ’ল রুধির। কিন্তু অসি-চালনার বিরাম নেই—সমানে তরবারি চলে ঝনা-ঝন্—ঝনা-ঝন্—ঝনা-ঝন্! বালকের মুখে লাগে আরও কয়েকটি আঘাত—তবু তার শ্রান্তি নেই, সমান বেগে অসি চলে—ঝনা-ঝন্—ঝনা-ঝন্—ঝনা-ঝন্! ঠিক চার মিনিট অস্ত্রে বিচারকের নির্দেশে উভয়ে ক্ষান্ত হ’ল—বিশ্রামের সময়।

বালকের বন্ধুরা ও সভ্যপতি তাকে হাওয়া ক’রে, উৎসাহের কথা ব’লে, নানা প্রকারে উপদেশ দিয়ে পুনরায় যুদ্ধের জন্তে তৈরি করলে। বেচারী হের কুনের ভাগ্যে এখনও একটা অস্ত্রাঘাত হ’ল না। আমার কাছে এসে দুঃখ প্রকাশ করলে, “এই দেখ আমার বরাত! এবারও আমার গালে একটা আঘাত লাগবে না!” কয়েক মিনিট পরে বিচারকের নির্দেশে যোদ্ধৃষয় পুনরায় অসিহস্তে পরস্পরের সম্মুখীন হ’ল। পুনরায় তাদের অসির অগ্রভাগ স্পর্শ করিয়ে দিয়ে তিনি আদেশ দিলেন, “মেন্‌সুর? ত্‌স্‌!”

আবার আরম্ভ হ’ল, ঝনা-ঝন্—ঝনা-ঝন্—ঝনা-ঝন্! এবার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তরুণের মুখে লাগল কএকটি গুরুতর আঘাত—প্রবাহিত হ’ল রুধিরের ধারা! কিন্তু তার না-কাঁপে হাত, না-নড়ে মাথা, না-পেছোয় পা!! সমানে তার অসি চলে, ঝনা-ঝন্,—ঝনা-ঝন্—ঝনা-ঝন্! আবার লাগে কয়েকটা গভীর আঘাত—এবার শোণিত

ছোট্টে দরবিগলিত ধারায়—তার সর্কাজ সেই তপ্ত রক্তে
আবৃত হ'ল, এমন কি উভয়ের অসি ও মুষ্টি হ'ল রক্তবর্ণ!
তবু সে সুকুমার তরুণ অবিচলিত! সমান বেগে চলে
তার অসি—ঝনা-ঝন্ ঝনা-ঝন্ ঝনা-ঝন্! উপস্থিত সকলের

মনে জেগেচে উৎকর্ষা, কিন্তু সে উন্নতশির, নির্ভীক বালকের
মুষ্টি সমান বেগে অসি চালায়—ঝনা-ঝন্, ঝনা-ঝন্, ঝনা-ঝন্!
তার মুখে বিঁধলো আর একটা সাংঘাতিক আঘাত, বালক
ভূপতিত হ'ল।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা

শ্রীশশধর সিংহ, পিএইচ-ডি (লণ্ডন)

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা লইয়া আমাদের নেতৃবৃন্দ অনেক কাল
হইতে মাথা ঘামাইতেছেন। তাহাদের ভাবনার এখনও
শেষ হয় নাই। এমত অবস্থায় নূতন কিছু বলিতে যাওয়া
শুভতা মাত্র। নূতন কিছু বলিবারও নাই—কারণ, ভারতের
রাজনৈতিক জগতে আজ যাহা সমস্যার আকার ধারণ
করিয়াছে, তাহার মূলের কথাগুলি অতি পুরাতন।
ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে অনেক সময় কতকগুলি প্রশ্ন
এমন উদ্ভূত হইয়া ওঠে যে, ইহার তুলনায় অন্ত সব কথা
অতি তুচ্ছ মনে হয়। হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন ইহার অন্ততম।
এই কয়েক বছরেই দেখা গিয়াছে যে, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ
আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে ক্ষতবিক্ষত
করিতে বসিয়াছে। যতই দিন গিয়াছে, ততই ইহা জটিলতর
হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের শাসকগণ সাম্প্রদায়িক কলহ
সৃষ্টি করিয়া আমাদের রাজনৈতিক প্রশ্নসমূহকে যে বহুল
পরিমাণে বাধা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এ-কথা না মানিয়া
উপায় নাই। সর্কাপেক্ষা আশঙ্কার বিষয় এই যে, আমরাও
ইহাকে চিরস্তন বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি। তাহা
না হইলে হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকে আমরা এত বড় করিয়া
দেখিব কেন? ফল হইয়াছে এই যে, ভারতের রাজনৈতিক
সংগ্রামের মুখ্য উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া আমরা কতকগুলি
ছোটখাট বিষয় লইয়া দরকষাকষি করিয়া মরিতেছি।
জিজ্ঞাস্য, আইন-পরিষদে কমবেশী আসন বা কমবেশী
সরকারী চাকুরিতে স্বরাজ আগাইয়া আসিবে কি? হিন্দু
ও মুসলমান সম্প্রদায়ের যাহারা না-পাইল পরিষদে আসন,
না-পাইল সরকারী চাকুরি, তাহাদের কি হইবে গতি?

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের প্রধান কথা হইতেছে,
পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস। ইংরেজের ইতিহাস শিখাইয়াছে
যে এই দুই সম্প্রদায়ের মিলন অসম্ভব এবং আমরাও এই
বিশ্বাসে অটল হইয়া বসিয়া আছি। আমাদের রাজনৈতিক
পাণ্ডারা এই বিশ্বাসের ঐতিহাসিক ভিত্তি খতাইয়া দেখিবার
চেষ্টা করিয়াছেন কি? অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেনের
“ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা” ও ডাঃ হুসেনের ফরাসী
গ্রন্থ “ল'আদ মিস্তীক”* হইতে দেখিতে পাই যে,
হিন্দু ও মুসলমান, যাহাদের গায়ে আমরা নিঃশ্রেণীর
টিকিট লাগাইয়া দিয়াছি, যাহাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার
প্রতি বিন্দুমাত্র লোভ নাই, তাহারা যুগ যুগ ধরিয়া ধর্মের
ভিত্তিতে পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার প্রয়াস পাইয়াছে,
আজও এই প্রচেষ্টার শেষ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়
বলিতে গেলে, এইখানেই ভারতের স্বকীয় সাধনা ও
প্রাণবান ইতিহাস। ভারত-ইতিহাসের এই মর্মকথা
কালে হিন্দুস্থানের শাসকরাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন।
হিন্দু-মুসলমান ধর্মের সমন্বয়ের চেষ্টায় আকবর নিঃফল
হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ইতিহাসের দিক দিয়া এই
বিফলতারও দাম তুচ্ছ নহে। ইতিহাসের ধারা কোন্ দিকে
বহিতেছে, ইহা তাহার জাজ্জ্বল্যমান সাক্ষ্য। ইহা হইতে
এই প্রমাণিত হয় যে, বিভিন্ন ধর্মী অথচ জাতিতে এক,
এইরূপ দুই বা ততোধিক সম্প্রদায় চিরকাল বিরোধী হইয়া
থাকিতে পারে না; ইহাতে কাহারও কল্যাণ হয় না।

* L'Indo Mystique Au Moyen Age (Librarie
d' Amerique et d' Orient, Paris, 1929.)

† ক্ষিতিবাবুর পুস্তকের রবীন্দ্রনাথ-লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

দেখা গেল যে, বহু শতাব্দীর একত্র-বাসের ফলে হিন্দু-মুসলমানের আদি বিরোধ ক্রমে মিলনেচ্ছায় রূপান্তরিত হইল। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য এই যে ইংরেজের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কালের এই জয়যাত্রার পথে আর এক নূতন বাধার সৃষ্টি হইল। তৃতীয় পক্ষ বর্তমানে হিন্দু-মুসলমানের সহজ সম্বন্ধ কি ভাবে পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার ইতিহাস কাহারও অজানা নাই।

ইংরেজী শিক্ষার প্রসারে হিন্দুরা অগ্রণী। ইহাতে হিন্দু কেবল যে ব্যক্তিগত ভাবে লাভবান হইল তাহা নহে, ইংরেজও দেশ-শাসনের জন্য স্বল্প খরচে এক বিপুল আমলা-বাহিনী সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইল। জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি হইল ইহার অপর ফল। শিক্ষার ধন্যই এই। “কেবল ক্রটি খাইয়াই মানুষ বাঁচে না” এই প্রবচন শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। পরের গোলামী নতই আপাত-সুখকর হউক, দীর্ঘকাল মানুষ ইহাতে তুষ্ট থাকিতে পারে না। মানুষের অধ্যাত্ম-জীবন চায় আত্মকর্জ—স্বরাজ। ইংরেজ বাহাদুরী লইয়া নতই বনুক না কেন যে, ভারতের স্বরাজ-আন্দোলন ইংরেজী শিক্ষার দান—এ-কথা নির্ঝিবাদে মানিয়া লওয়া চলিবে না। কারণ, ইংরেজী শিক্ষার এই ফল ভারতের শাসকগণ প্রত্যাশা করেন নাই। বলা বাহুল্য, ইহা ইংরেজের প্রীতির উদ্দেক করে নাই। শিক্ষার ফলাফল যাচাই করিতে গিয়া বাহারা শিক্ষা পাইল, তাহাদের ভুলিলে চলিবে না। এই ক্ষেত্রে ‘হিউম্যান এলিমেন্ট’ অর্থাৎ মানুষই হইল বড় কথা।

মুসলমান সম্প্রদায় বহুকাল ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিমুখ ছিল। ক্রমে যখন এ-বিষয়ে ইহাদের চৈতন্য হইল, তখন দেখা গেল, হিন্দুরা সব বিষয়ে মুসলমানকে পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান সমস্যার উৎস হইল এইখানে। মুসলমানদের অনগ্রসরতার দোহাই দিয়া ইংরেজ প্রথমে শিক্ষায় এবং ক্রমশঃ অন্যান্য বিষয়ে ভেদ-নীতির সূত্রপাত করিল। এই কঁকিতে কেহই ভুলিল না। সকলেই বুঝিল যে, হিন্দু-মুসলমানকে পৃথক করিয়া জাতীয় আন্দোলনের শিরদাঁড়া ভাঙিবার এই চেষ্টা।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে আলিগড়ে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র

কলেজ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতার জের বাড়িয়া চলিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহার প্রথম ফল দেখা গেল মর্লে-মিণ্টো সংস্কার-ব্যবস্থায়। মর্লের আত্মজীবনী হইতে বুঝা যায় যে, রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার অবতারণা তিনি সমর্থন করিতে পারেন নাই।* লর্ড মিণ্টো আগেই মুসলমান-সম্প্রদায়ের নেতা আগা খাঁকে এ-বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। মর্লের ইহা না-মানিয়া উপায় ছিল না। “স্বদেশ আন্দোলন” সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া আগা খাঁ বড়লাটকে ব্লাইলেন যে, হিন্দুদের সহিত তাড়াতাড়িতে কোন রাজনৈতিক রক্ষা করা সমীচীন নহে, কারণ ইহাতে ব্রিটিশ-রাজের স্থায়িত্ব ও সংখ্যায় হীন রাজভক্ত মুসলমানদের স্বার্থের অর্থাৎ উভয়েরই অনিষ্ট সাধিত হইবে।† মর্লের মত আরও অনেক ব্রিটিশ রাষ্ট্র-পুরুষ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কতই না লড়াই লড়াই কথা বলিলেন! কিন্তু কাজের বেলা সবাই নির্ঝিবাদে একই নীতি অনুমোদন করিয়া বসিলেন। বলিলেন, বৃষ্টি ইহাতে স্বরাজ-শাসনের ভিত্তি পাকা হইতে পারে না, কিন্তু কথা দিয়াছি, এখন কথা খেলাপ করি কি করিয়া?‡ সাম্প্রদায়িক নীতির অর্থ আর বাহা হউক, ইহা মুসলমান-প্রীতি বলিয়া কেহ যেন ভুল না করেন

* Morley : *Recollections*, vol. 2, p. 225 দ্রষ্টব্য।

† “...lost political concessions should be hastily made to the Hindus which would pave the way for the ascendancy of a Hindu majority equally dangerous to the stability of British rule and to the interests of the Mahomedan minority whose loyalty was beyond dispute.” (Valentino Chirol : *India Old and New* (1921), p. 136.

‡ “We regard any system of communal electorates, therefore, as a very serious hindrance to the development of the self-governing principle. The evils of any extension of the system are plain...At the same time we must face the hard facts. The Muhammadans were given special representation with separate electorates in 1909...”

...But apart from a pledge which we must honour until we are released from it, we are bound to see that the community secures proper representation in the new councils. How can we say to them that we regard the decision of 1909 as mistaken, that its retention is incompatible with progress towards responsible government, that its reversal will eventually be to their benefit; and that for these reasons we have decided to go back on it.” (Montagu-Chelmsford Report, Reprint, 1928, p. 149),

আগা খাঁ বলিলেন, সংখ্যায় গরিষ্ঠ হিন্দুদের কথায় কান দিও না, কারণ ইহাতে মুসলমানেরও ক্ষতি, ব্রিটিশ-রাজেরও স্থায়িত্ব নষ্ট হইবে। শেষ কথাটাই ঠিক, প্রথম কথাটা ভুল। আজ যে সাম্প্রদায়িক কলহ দেশকে বিধ্বস্ত করিতেছে তাহার মূলে রহিয়াছে সাম্প্রদায়িক মতবাদের রেখারেখি। মুসলমান কয়েকটা কমবেশী চাকুরি পাইলে মুসলমান সম্প্রদায়ের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে কি? হিন্দুদের দিক দিয়াও একই কথা। দেশের অশিক্ষা, কুশিক্ষা, দারিদ্র্য কখনই ঘুচিবে না, যতদিন না-পাইব আমরা আত্মকর্ষন। দেশকে শতধা বিভক্ত করিবার যে আত্মঘাতী প্রস্তাব আজ উঠিয়াছে, তাহার কারণ আমরা নিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থকে বড় বলিয়া জানিয়াছি। দেশের বৃহত্তর স্বার্থকে ভুলিতে বসিয়াছি। কেবল আশার কথা এই যে, সাম্প্রদায়িক বিরোধেরও শেষ আছে। ব্রিটিশ-রাজের যে অনগ্রসর দৃষ্টি আজ মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর পড়িয়াছে, তাহাতে মুসলমান-শিক্ষার দ্রুত প্রসার হইবে, সন্দেহ নাই।

ইহাতে এক দিকে যেমন হিন্দু-মুসলমানের কৃষ্টির বৈষম্য দূরীভূত হইবে, তেমনি অন্য দিকে মুসলমানদের মধ্যেও সেই সব সমস্তা উপস্থিত হইবে, বাহা আজ হিন্দুদের ভ্রাতৃদের কারণ হইয়াছে। শিক্ষিত মুসলমানেরা অচিরেই বুঝিতে শিখিবেন যে, দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ছাড়া তাঁহাদের নাস্ত গতি। সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে যতই আপাতলাভজনক হউক, ইহাতে হিন্দু, মুসলমান, কোন সম্প্রদায়েরই কল্যাণ হইতে পারে না। ভারতবাসী সর্বসম্প্রদায়ের স্বার্থ এক। ছনিয়া জুড়িয়া আজ যে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা এই প্রমাণ করে যে, সমষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া ব্যক্তিগত পুষ্টি চিরস্থায়ী হয় না। ইংরেজও জানে যে, হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্য চিরকালের নহে। সাম্প্রদায়িক ভেদ সৃষ্টি করিয়া যত দিন ভারতের স্বরাজ-দাবি ঢেকাইয়া রাখা যায়, এই রহিল কথা।

লণ্ডন
আষাঢ়, ১৩৪১

গীতা ও গীতাঞ্জলি

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

“সই, না কহ ও সব কথা।

কালার পীরতি কাহার লাগিল
জনম হইল কথা।”—চণ্ডীদাস

যত দিন নরের হাসি ও বাঁশি লইয়া ছিলাম, তত দিন ত এই
বাণী জাগে নাই। সুখময় নীড়ে পার্থী ঘুমাইয়াছিল;
নাগর-পারের ডাক তাহাকে উতলা করে নাই।

“এতদিন তো ছিল না মোর
কোনো বাণী,
সকল অঙ্গে মাথা ছিল
মলিনতা।”

কিছু আমি যে যাত্রী। আমাকে আরাম-শয়নে ঘুম
পাড়াইয়া রাখিবে কে? ‘সুদূর দিগন্তের সক্রমণ সঙ্গীত’

আমাকে যে কেবলই কাঁদাইতেছে! কে যেন আমাকে
দূরের পানে কেবলই ডাকিতেছে।

“আকাশ আমায় ডাকে দূরের পানে,
ভাষা-বিহীন অজানিতের গানে,
সকাল সন্ধ্যায় পরাণ মম টানে
কাহার বাঁশী এমন গভীর স্বরে।”

তাহার বাঁশি শুনিয়াই ত পথে বাহির হইয়াছি! কোন্
ভোরে যে বাহির হইয়াছি তাহা আমি নিজেই জানি না!
শুধু জানি, পথের প্রান্তে হুইটি স্মিথ নয়ন অনাদি কাল
ধরিয়া আমার প্রতীক্ষায় চাহিয়া আছে।

“যাত্রী আমি ওরে
কোন্ দিনান্তে পৌছাবো কোন স্বরে।

কোন তায়কা দীপ ছালে সেই খানে,
বাতাস কাঁদে কোন কুহুমের জাগে,
কে গো! সেখায় নিশ্চয় ছু-নয়ানে
অনাদি কাল চাহে আমার তরে।”

কত জগজগন্মান্তর আগে আমার প্রাণ প্রিয়তমের বাঁশির
সুরে মজিয়াছিল! ষাঁহাকে চোখে দেখা যায় না তাঁহাকে
ভালবাসিয়াছিল! তিনি তো আমাকে পথের ধূলায়
বসিয়া থাকিতে দিবেন না।

“তুমি ব’সে থাকতে দেবে না যে,
দিবানিশি তাই তো বাজে
পরান মাঝে এমন কঠিন সুর।
তোমার খোঁজা খোঁজায় মোরে,
তোমার বেদন কাঁদায় ওরে,
আরাম যত করে কোথায় দূর।”

কত যুগ-যুগান্তরের খেয়া বাহিয়া, কত লোক-লোকান্তর পর্যটন
করিয়া আমি চলিয়াছি বধুর বেশে আমার চির-প্রিয়তমের
গলায় বরণমালা পরাইয়া দিবার জন্ত!

“তোমায় আমায় মিলন হবে বলে’
যুগে যুগে বিশ্ব-ভুবন-তলে
পরান আমার বধুর বেশে চলে
চির-স্বয়ংস্বরা ॥”

কবি মনের মধ্যে, বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের দেবতাকে
খুঁজিয়া ফিরিতেছেন। এই খোঁজাই তাঁহার গানের মধ্যে
রূপ লইয়াছে। এই খোঁজাই তাঁহার গানগুলিকে অন্-
প্রাণিত করিয়াছে।

“গান দিয়ে যে তোমায় খুঁজি
বাহিরে মনে
চির-দিবস মোর জীবনে।”

এই খোঁজার শেষ নাই! এই জীবন শেষ হইয়া যাইবে,
কিন্তু খোঁজার শেষ হইবে না। পরজীবনে আবার
অন্বেষণ আরম্ভ হইবে।

“তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর,
যবে আমার জনম হবে ভোর।
চ’লে যাবো নব-জীবন-লোকে,
নূতন দেখা জাগবে আমার চোখে,
নবীন হ’য়ে নূতন সে আলোকে
প’রব তব নব মিলন ডোর
তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর ॥”

মানুষের যাত্রা কোথাও চিরতরে থামিয়া যাইতেছে না,
তাঁহার গানও কোথাও নিঃশেষে ফুরাইতেছে না।

“কী নিরখি আজি, এ কী অফুরাণ লীলা,
এ কি নবীনতা বহে অন্তঃশীলা।
পুরাতন ভাষা ম’রে এলো যবে মুখে
নব গান হ’য়ে শুমরি উঠিল বৃকে,
পুরাতন পথ শেষ হ’য়ে গেল যেথা
সেখায় আমারে আনিলে নূতন দেশে।”

একদিন আসিবে যেদিন জীবনের তরণীখানি বহু
সাগরের ঝড়ঝঞ্ঝা অতিক্রম করিয়া বন্দরে আনিয়া
ভিড়িবে। সেদিন মিলনের অপরিসীম আনন্দে প্রিয়তমের
বক্ষে আমি চলিয়া পড়িব। গীতাঞ্জলির মধ্যে বার-বার ফুটিয়া
উঠিয়াছে প্রিয়তমের সঙ্গলাভের জন্ত এই ব্যাকুলতার সুর।

“ডাকো, ডাকো, ডাকো আমারে
তোমায় নিশ্চয় শীতল গভীর
পবিত্র আঁধারে!”

‘সারাক্ষণের বাক্যমনের সহস্র বিকারে’ মলিন ক্ষুদ্র আয়া
কাঁদিতেছে একটি শুভ্র-কোলের জন্ত যাহার স্পর্শে তাহার
সমস্ত মালিন্য নিমেঘে ধুইয়া যাইবে।

“আজ ঐ শুভ্র কোলের তরে
ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে,
দিয়ে না গো দিয়ে না আর
ধূলার শুভে।”

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকাজ্জক পিছনে ছুটিয়া ছুটিয়া জীবন ক্লাস্ত হইয়া
পড়িয়াছে; রিক্ত-তপ্ত প্রাণ আর পথে-প্রান্তরে ঘুরিতে
পারে না। সে শুধু শুনিতে চায় তোমার বাণী।

“কি আবেশে কিসের কথায়
কিরেছি হে যথায় তথায়
পথে প্রান্তরে,
এবার বৃকের কাছে ওমুখ স্নেখে
তোমায় আপন বাণী কহ ॥”

ফাঙ্কন আসিয়াছে। বনে বনে পল্লবে পল্লবে এ কি
মৌন বেদনা! ব্যাকুল বহুধরা, কে আসিবে বলিয়া, যেন
দিগন্তের পানে চাহিয়া সাজিয়া-শুজিয়া বসিয়া আছে।
কিন্তু প্রতীক্ষার বেদনা শুধু বসন্তের প্রকৃতির মধ্যে নহে;
কবির মনের মধ্যেও সেই একই বেদনার সুর বাজিতেছে!

“আজি ক্ষুদ্র নীলাশ্বর মাঝে
এ কী চঞ্চল ক্রন্দন বাজে।
হৃদয় দিগন্তের সকল সঙ্গীত
লাগে মোর চিন্তায় কাজে।
আজি খুঁজি কারে অন্তরে মনে
গন্ধবিধুর সমীরণে ॥”

বসন্তের গন্ধ-বিধুর সমীরণ কবির মনে যে বিচ্ছেদ

বেদনা অনিয়া দিয়াছে, আঘাতের ছরস্তু বাতাসে সেই একই
বেদনায় কবির প্রাণ কাঁদিয়া বেড়াইতেছে।

“তুমি যদি না দেখা দাও,
করো আমায় হেলা,
কেমন ক’রে কাটে আমার
এমন বাদল বেলা।
দূরের পানে মেলে আখি
কেবল আমি চেয়ে থাকি,
পরায় আমার কেঁদে বেড়ায়
ছরস্তু বাতাসে ॥

কবির বর্ষা-কবিতাগুলির মধ্যে ছড়াইয়া আছে এমনি
একটা বিচ্ছেদের বেদনার সুর। নিঃসঙ্গ প্রাণের নিবিড়
বাণায় বর্ষার অধিকাংশ কবিতা ভরিয়া আছে! যে কাল্পনা
প্রাণের মেঘাচ্ছন্ন আকাশে, আঘাতের গৃহ-হারী সজল
বাতাসে সেই কাল্পনা কবির অন্তরে! ঝড়ের রাতে কবির
চোখে ঘুম নাই। প্রাণ-মেঘের রূপে চড়িয়া ঐ বৃষ্টি
প্রিয়তম আসিতেছেন!

“আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরায়-সখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশ মম,
নাই যে ঘুম নয়ন মম,
ছয়ার খুলি হে প্রিয়তম,
চাই যে বারে বার
পরায়-সখা বন্ধু হে আমার ॥”

পথচারী শিশু যেমন করিয়া মাকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া খুঁজিয়া
বেড়ায় কবির প্রাণ তেমনি করিয়া বর্ষার রাতে
কাঁদাকে যেন খুঁজিয়া বেড়াইতেছে! বাহিরে বর্ষা দতট
ঘনাইয়া আসিতেছে অন্তরের হাহাকার ততই তীব্র হইতে
তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে! বাহ্যিক জন্তু এই ক্রন্দন তাঁহাকে
তিনি কখনও বলিয়াছেন ‘জননী’, কখনও ‘রাজন’, কখনও
‘পরায়-সখা বন্ধু’, কখনও ‘অন্তরতর’, কখনও ‘কাণ্ডারী’,
কখনও ‘ভগবান’, কখনও ‘প্রিয়তম,’ কখনও ‘প্রভু’। যিনি
জীবনের শান্তি, প্রাণের আরাম, সর্বভূতের হৃদয়, যিনি
অরূপ, অসীম, অযুক্ত, তাঁহাকে সখারূপে, জননীরূপে,
পিতারূপে, প্রভুরূপে অতিনিকটে পাইবার জন্তু কবির প্রাণ
বাকুল হইয়া উঠিয়াছে। প্রিয়তমকে না পাওয়ার বেদনা
কবির সমস্ত জীবনকে উদাস করিয়া দিয়াছে। ‘গীতাঞ্জলি’র
মধ্যে এই বাথার সুর বিশেষ করিয়া আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ
করে।

“সকল জীবন উদাস করিয়া,
কত গানে সুরে গলিয়া ঝরিয়া
তোমার বিরহ উঠিছে ভরিয়া
আমার হিয়ার মাঝে হে ॥”

ভগবানকে পাওয়ার জন্তু এই যে অনুরাগ—এই অনুরাগ
অথবা ভক্তিকেই গীতা সর্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন।
জ্ঞানের দিককে উহা একেবারে অস্বীকার করে নাই; উহা
ভগবানকে পাওয়ার পথে আমাদের কিছু দূর আগাইয়া
দিতে পারে; কিন্তু তাঁহার শান্তল-করা চরণকমলে
পৌছাইতে হইলে জ্ঞানের সঙ্গে চাই সকল-ডোবানো প্রেম।
এদেশে ভক্তিমার্গের পথিক বাহারা তাঁহার জ্ঞানের
পথকে নিন্দা করিয়া থাকেন। গীতা জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তিকে
মিলাইয়া দিয়াছে, জ্ঞানকে ছোট করে নাই, কারণ গীতা
বলিয়াছে, ভগবানকে যখন আমরা অন্তরের গভীর অনুভূতি
দিয়া সমগ্রভাবে জানি তখন সেই জ্ঞানের অবশ্যস্বামী
পরিণাম প্রেম। সেই প্রেম আমাদের অসীমের
আনন্দের মধ্যে ডুবাইয়া দেয়। বস্তুতঃ সমগ্রভাবে ভগবানকে
আমরা বতর্কণ না জানিতে পারি ততর্কণ আত্ম-
সমর্পণ সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না। ‘বাহুদেবঃ সর্বমিতি’
এই বোধ চাই। তিনি পিতারূপে সংসারকে পালন
করিতেছেন, মাতারূপে আমাদের বক্ষে ধরিয়া আছেন,
প্রভুরূপে নিখিল জগতকে নিয়মের মধ্যে বাধিয়া
রাখিয়াছেন; তিনি অগ্নিতে তেজ, সূর্য্যে দীর্ঘাণু; তাঁহা
হইতে সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে—সমস্ত জগত তাঁহাতেই
বির্লীন হইয়া বাইতেছে; বাহা কিছু হইয়াছে এবং
হইতেছে তাহাও তিনি; বাহা কিছু এখনও হয় নাই
তাহাও তিনি। সূর্য্যে তিনি, তারায় তিনি, ফুলে তিনি;
সব-কিছুকে বাপিয়া আছেন তিনি, একমাত্র তিনি।
সমস্ত হৃদয় দিয়া এই পরম সত্যকে জীবনে উপলব্ধি
করিবার জন্তু কবির প্রাণ বাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

ভগবান সব-কিছুর মধ্যেই রহিয়াছেন—এই উপলব্ধিকে
কবি ‘গীতাঞ্জলি’র বহু কবিতার মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।
তিনি সর্বত্র আছেন এই উপলব্ধি যখন জাগিল তখন
তুখে বলিয়া আর কিছু রহিল না; সব-কিছু আনন্দের মধ্যে
রূপান্তরিত হইয়া গেল।

“আলোয় আলোকময় ক’রে হে
এলে আলোর আলো! ।
আমার নয়ন হ’তে অঁধার,
মিলালে! মিলালে! ।
সকল আকাশ সকল ধর!
আনন্দে হাসিতে ভরা,
যেদিক পানে নয়ন মেলি
ভালো সবি ভালো!।”

এমনি করিয়া জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে—সর্বত্র ভগবানকে আমরা যখন অনুভব করি তখন হৃদয় শুধু জানিয়াই তৃপ্তিলাভ করে না, জানা প্রেমের ও আনন্দের আলোক শিখায় জ্বলিয়া উঠে। গীতাঞ্জলিতে কবি গুনিয়েছেন তাঁহার পদধ্বনি যিনি অসীম, যাহার মৃত্যু নাই, যাহা হইতে সমস্ত-কিছুর সৃষ্টি হইয়াছে, যিনি সমস্ত-কিছুর মধ্যে রহিয়াছেন এবং যাহার মধ্যে সমস্ত-কিছু অনন্তকাল ধরিয়া অবস্থান করিতেছে। জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তের উপর রহিয়াছে দেবতার চরণচিহ্ন। এই অনুভূতি হইতেই কবি লিখিলেন—

“তোরা গুনিস নি কি গুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি
ঐ যে আসে, আসে, আসে ।
যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী
সে যে আসে, আসে, আসে।”

কেবল সুখের মধ্যে নয়, দুঃখের মধ্যেও বাহুদেব। সফলতায়, বিফলতায় আলোকে অঁধারে—সর্বত্র তিনি। কেবল নিশ্চলচরিত্র সাধকের মুখে নহে, পতিতা এবং তস্করের মুখেও লুকাইয়া থাকিয়া ভগবান বলিতেছেন ‘এখানে আমি’ ‘এখানে আমি।’

এই অনুভূতি মনের মধ্যে জাগিলে জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষণ আনন্দগানে ভরিয়া উঠে। তখন ভয় থাকে না, উদ্বেগ থাকে না। একটি চেতনা তখন সমস্ত সত্তাকে সর্বক্ষণের জন্ত ভরিয়া থাকে।

“বাহুদেবঃ সর্বমিদং” এই বোধ যখন জাগে নাই তখন অর্জুন গাণ্ডীব ধরিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, জগতে এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়া থাকে যাহার সহিত ভগবানের কোন সম্পর্ক নাই! যুদ্ধ, রক্তপাত, ইত্যাদি এগুলি ভগবানের ইচ্ছায় কখনও সংঘটিত হইতে পারে না। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধকে ভগবান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার ফলেই অর্জুনের মনে ভয় এবং

কর্তব্য সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিয়াছিল। ভগবান তখন অর্জুনকে নূতন দৃষ্টি দান করিলেন। সেই দিবা দৃষ্টি লা করিয়া অর্জুন দেখিলেন, মহাকালরূপে ধ্বংস করিতেছে আর কেহ নয়, স্বয়ং ভগবান। কিন্তু ধ্বংসই তাঁহা একমাত্র কাজ নহে—নব নব সৃষ্টির মধ্যেও তাঁহার প্রকাশ তিনি অসীম; অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে আপনাকে তিনি অহর প্রকাশ করিতেছেন। অনন্ত মৃত্যুর মধ্যেও তাঁহারই ইচ্ছা কার্য্য করিতেছে। যাহা আছে তাহাও তিনি, যাহা আ নাই বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে তাহাও তিনি; যাহা ঘটিবে তাহাও তিনি, যাহা ঘটিয়া বিলুপ্ত হইয়া যাইবে তাহাও তিনি। মরণ-স্থানে ডুবাইয়া বিশ্বকে নিমিষে নিমিষে তিনিই শুচি ও নূতন করিয়া তুলিতেছেন। জীবন মৃত্যুর এই অবিরাম লীলা-শ্রোতের উপরে যিনি সব-কিছু মিলাইয়া জাগিতেছেন তাঁহার মধ্যে কাহারও ক্ষয় নাই যাহা-কিছু মৃত্যুর অঙ্ককারে হারাইয়া যাইতেছে সব-কিছুই সেখানে অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজ করিতেছে।

অর্জুন দেখিলেন, মৃত্যুর মাঝে হাসিতেছেন অমৃতের দেবতা, জীবনের দেবতা; কালীর মুখে রহিয়াছে জগজ্জননী স্বপ্নসম্ম হাসি; বজ্রের মধ্যে বাজিতেছে ভগবানের বাণি; ছুংগের বিগুল কৃষ্ণমেঘজালের বুক হইতে বিকীরিত হইতেছে স্বর্গের আলোকচ্ছটা। যে দিবা অনুভূতি অর্জুনের সমস্ত সন্দেহকে অপসারিত করিয়াছে, সমস্ত বিরোধ-কোলাহলের মধ্যে ভগবানের গভীর বাণী শুনাইয়াছে, সেই অনুভূতির ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াই গীতাঞ্জলির মহাকবি গাহিয়াছেন,

বজ্রে তোমার বাজে বাণি,
সে কি সহজ গান ?
সেই হুয়েতে জাগবো আমি
নাও মোরে সেই কান ।

ভুলবো না আর সহজেতে,
সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে—
মৃত্যুমারের ঢাকা আছে
যে অন্তহীন প্রাণ ॥

ভগবানকে সর্বতোভাবে জানার সঙ্গে সঙ্গে কবির চিত্ত বাকুল হইয়া উঠিয়াছে ভগবানের চরণে আপনাকে নিঃশেষে নিবেদন করিবার জন্ত। গীতাঞ্জলির বহু কবিতার মধ্যে এই আত্মসমর্পণের নিবিড় ইচ্ছা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

গীতায় যে-ভক্তির কথা বলা হইয়াছে সেই ভক্তিও এই আত্মনিবেদন। ভগবানের কাছে যে-মুহুর্তে নিঃশেষে আপনাকে নিবেদন করিলাম সেই মুহুর্তে জীবনের সমস্ত কর্ম অপক্লপ রঙে রঙীন হইয়া উঠিল। কর্মের বিপুল ভার একেবারে হালকা হইয়া গেল। ক্ষুদ্র আমিটাকে লইয়াই যত গণ্ডগোল ছিল। সেই ক্ষুদ্র আমি যখন ভগবানের মধ্যে সরিয়া গেল তখন আর উদ্বেগ নাই, ভয় নাই। সফলতার জন্ত উৎকর্ষা নাই, কাজ বিফল হইবে বলিয়া দুশ্চিন্তা নাই। কর্ম এবং ফল তো ভগবানকে সমর্পণ করিয়াছি। আমার ইচ্ছা এখন আর আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছা নহে, আমার বুদ্ধি আর আমার স্বতন্ত্র বুদ্ধি নহে। আমার ক্ষুদ্র সত্তা অসীমের হাতের মধ্যে পরিণত হইয়াছে। এমনি করিয়া আমরা যখন অসীমের চরণমূলে আমাদের মতো নিঃশেষে সঁপিয়া দিই তখন ভগবান স্বয়ং আমাদের মধ্যে অবতরণ করেন; তাঁহার করুণার পরশমণি আমাদের প্রাণে ছোঁয়াইয়া দেন। সেই ছোঁয়া লাগিয়া আমাদের সমস্ত কালিমা ধুইয়া যায়; আমরা নবজন্ম লাভ করি। অজ্ঞানকে তিনি প্রতিভার আলোক দান করেন, দুর্বলকে দেন দুর্জয় ইচ্ছাশক্তি, পাপীর সমস্ত কালিমা পুণের আলোকচ্ছটারে শুদ্ধ করিয়া তোলেন, দুঃখীর হৃদয়কে অপূর্ব আনন্দে ভরিয়া দেন। তাই গীতায় ভক্তির পথকে জ্ঞানের পথ অপেক্ষা প্রশস্ত বলা হইয়াছে। জ্ঞানের পথ ক্রেশের পথ। জ্ঞানী জগতকে অস্বীকার করে, আপনার ইন্দ্রিয়ের পথগুলিকে রুদ্ধ করে; প্রকৃতির দাবীকে ক্রমাগত অস্বীকার করিতে করিতে আপনার সহিত নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়া তাহাকে চলিতে হয়। জ্ঞানের পথে কঠোর তপশ্চা, অধিরাম আত্মনিগ্রহ। সে পথও ভগবানের চরণে পৌছাইয়া দেয়, কিন্তু নিগুণ পুরুষ পথিককে পরিত্যক্ত হইতে সাহায্য করে না। পথিককে সেখানে নিজের চেষ্টায়, নিজের জোরে নিজেরই উপর একান্ত নির্ভর করিয়া সাধনার পথে চলিতে হয়।

প্রেমের পথ কিন্তু সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। এখানে ভগবান মানুষের একান্তই আপনার ধন। তিনি তাঁহার সিংহাসনের আসন হইতে নামিয়া আসিয়া মানুষের ঘরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। একান্ত প্রিয়জনের মত। ঐহাকে ধরা যায়

না, বুঝিতে পারা যায় না, যিনি অত্যন্ত দূরের, তিনি পিতা হইয়া, সখা হইয়া, জননী হইয়া, ছোট হইয়া ভক্তের ক্ষুদ্র আলয়ে আসিয়াছেন, জলে স্থলে কত আকার লইয়া ধরা দিয়াছেন!

“দয় ক’রে ইচ্ছা ক’রে আপনি ছোট হ’য়ে
এসে! তুমি এ ক্ষুদ্র আলয়ে।
তাই তোমার মাধুর্য-সুখা
বুচায় আমার অখির সুখা,
জলে স্থলে দাও হে ধরা
কত আকার ল’য়ে।”

এতদিন ভগবানকে বিশ্ব-প্রকৃতি এবং মানবপ্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিয়াছি। দিনরাত দুয়ার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, যে আসিতে চাহিয়াছে তাহাকে সন্দেহ করিয়া দূরে তাড়াইয়া দিয়াছি। বিশ্ব তাহার সমস্ত আনন্দ লইয়া বাহিরে খেলা করিয়াছে—আমার প্রাণের উপর কোন মাধুর্যই বিকীর্ণ করে নাই। তোমাকেও সেই সঙ্গে ফিরাইয়া দিয়াছে।

“আছি রাজি দিবস ধরে
দুয়ার আমার বন্ধ ক’রে
আসতে যে চায় সন্দেহে তার
তাড়াই বাঁধে বার ॥
তাই তে! কারো হয় না আসা
আমার একা ঘরে।
আনন্দময় ভুবন তোমার
বাহিরে খেলা করে ॥”

কিন্তু ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক প্রেম যখন জাগিল তখন সেই প্রেমের দৃষ্টিতে দেখিলাম, যিনি অরূপ অসংখ্য রূপের মধ্য দিয়া তিনি কেবলই আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন, যিনি অসীম তিনি সীমার মাঝে আপনার সুর বাজাইতেছেন।

“সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর ॥”

বৈদান্তিকেরা ঐহাকে অসীম, অক্ষর, অব্যক্ত, নিগুণ পুরুষ বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন ভক্তের কাছে তিনি প্রেমের মধ্যে ধরা দিয়াছেন। মানুষকে না হইলে ভগবানের চলে না; সূর্য্য-তারার সমস্তই নিষ্ফল হইয়া যায়!

“আমায় দেখবে ব’লে তোমার অসীম কৌতুহল।
নইলে ত’ এই সূর্য্যতারার সকলি নিষ্ফল ॥”

আমি ভগবানের হাতে পানপাত্র। আমার এই দেহ, আমার এই প্রাণ ভরিয়া প্রিয়তম আনন্দের অমৃত পান করিতেছেন! আমার চোখে প্রতি প্রভাতে তাঁহার সূর্যোদয় সফল হইতেছে! আমরা যেমন দর্পণে নিজেদের প্রতিচ্ছবি উপভোগ করি ভগবান তেমনি আপনাকে আশ্বাদন করিতেছেন আমার মাঝে নিজেকে দান করিয়া।

“হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ

কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান?

আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি,
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি

শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান।”

কিন্তু আমার মধ্যে যতক্ষণ আমিহের জঞ্জাল রহিয়াছে ততক্ষণ ভগবানকে আমার জীবনের মধ্য দিয়া আমি প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। সব না ছাড়িলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। যতক্ষণ অহঙ্কার আছে ততক্ষণ ভগবান দূরে রহিয়াছেন। ততক্ষণ আমার ইচ্ছাশক্তি দুর্বল থাকিয়া বাইতেছে; যে বাধা আমাকে জড়াইয়া আছে তাহাকে ভাঙ করিতে পারিতেছি না। কিন্তু যখনই নিজের ক্ষুদ্র শক্তির উপর নির্ভর না করিয়া ভগবানের চরণে জীবনখানি উজাড় করিয়া সঁপিয়া দিলাম, নতজানু হইয়া তাঁহার নিকট শক্তি ভিক্ষা করিলাম তখন সমস্ত বাধা নিমিষে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

এইজন্যই গীতাঞ্জলির মধ্যে আমরা বার-বার যে সুরটি শুনিতে পাই তাহা প্রিয়তমের কাছে আপনাকে নিঃশেষে সঁপিয়া দেওয়ার সুর। একটি পরিপূর্ণ নমস্কারে কবি আপনাকে ভগবানের মধ্যে একেবারে ডুবাইয়া দিতে চাহিয়াছেন।

“আমার মাথ' নত ক'রে দাও হে তোমার

চরণধুলার তলে।

সকল অহঙ্কার হে আমার

ডুবাও চোখের জলে।”

“আমার বলিয়া কিছু নাই একেবারে,

এ সত্য যেথ! নাহি ঢাকে আপনারে,

সেখায় দাড়ায়ে নিলাজ দৈন্ত মম

ভরিয়া লইব তাঁহার পরম দানে।”

নিজেকে যদি দীন হইতে দীন করিতে পারি, নিরহঙ্কার হইয়া ভগবানের পায়ে ধরা দিতে পারি, জীবন-বাশি অপূর্ক সুরে তিনি ভরিয়া দিবেন।

“তোমার কাছে খাটে না মোর কবির গম্ব করা,
মহাকবি, তোমার পায়ে দিতে চাই যে ধরা।

জীবন লয়ে যতন করি

যদি সরল বাশি গড়ি,

আপন সুরে দিবে ভরি

সকল ছিদ্র তার।”

ভগবানের কাছে আপনার সব কিছু নিঃশেষে নিবেদন করিতে পারিলে তবেই যে চরম শান্তি লাভ করিতে পারা যায়, এ-কথা কবি অনুভব করিতে পারিয়াছেন—কিন্তু অহঙ্কার যে মরিতে চাহে না!

“ছাড়িতে পারিনি অহঙ্কারে,

সুরে মরি শিরে বহিয়া তারে,

ছাড়িতে পারিলে বাচি যে হয়

তুমি জানো, মন তোমারে চায়।”

সব দুর্বলতা চলিয়া যায়—কিন্তু নামের মোহ মরিয়াও মরিতে চাহে না!

কবি তাই অহমিকার কাবাগার হইতে মুক্ত হইবার জন্য বার-বার প্রার্থনা করিয়াছেন,

“নামাও নামাও আমায় তোমার

চরণতলে;

গলাও হে মন, ভাসাও জীবন

নয়নজলে।

একা আমি অহঙ্কারের

উচ্চ অচলে,

পাষণ আসন ধুলায় লুটাও

ভাঙে সবলে।

নামাও নামাও আমায় তোমার

চরণতলে।”

এমনি করিয়া গীতাঞ্জলির আদি-অন্ত পড়িলে গীতার দুইটি কথাই আমাদের বারে বারে মনে হয়। একটি কথা হইতেছে “বাহুদেবঃ সর্কমিদং” অর্থাৎ সব-কিছুই বাহুদেব। যাহা দেখিতেছি এবং যাহা দেখিতেছি না, যাহা আছে এবং যাহা এখনও হয় নাই সব-কিছু তিনি। জীবন আনন্দের, জগত আনন্দের—কারণ জগত ও জীবনের যিনি স্বামী, জগত ও জীবনকে যিনি ওতঃপ্রোতভাবে বাপিয়া আছেন তিনি এক, অদ্বিতীয়, অসীম—তিনি আনন্দ।

শুধু বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে নহে, বিশ্বমানব এবং বিশ্বমানবের অঙ্গস্ব কর্মধারার মধ্যেও বাহুদেব। সেইজন্য কবি ভগবানকে কেবল নিজের ধ্যানের মধ্যে নহে, কেবল কর্মহীন বিজন

সাধনার মধ্যে নহে, সকল মানুষের সঙ্গে বিপুল কর্মক্ষেত্রে
প্রীতির মিলনের মধ্যে পূজা করিতে চাহিয়াছেন।

“বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারে
সেখানে যোগ তোমার সাথে আমারে।
নয়কো বনে, নয় বিজনে,
নয়কো আমার আপন মনে,
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারে।”

ভগবানকে দেখা তখনই সম্পূর্ণ হইয়া উঠে যখন নয়ন
সকল মানুষের মধ্যে তাঁহাকে দর্শন করে। তাই কবি
মানুষের হাতে তাঁহার সঙ্গে মিলন-প্রার্থনা করিয়াছেন।

“ভেবেছিলাম বিজন ছায়ায়
নাই যেখানে আনাগোনা
সন্ধ্যাবেলায় তোমায় আমার
সেথায় হবে জানাশোনা ॥
অন্ধকারে এক একা
সে দেখা যে স্বপ্ন দেখা,
ডাকে তোমার হাটের মাঝে
চলছে যেথায় বেচাকেনা ॥”

গীতার দ্বিতীয় যে-সুরটি গীতাঞ্জলির মধ্যে ধ্বনিত
হইয়াছে সে হইতেছে সকল-ডোবানো, সকল-ভুলানো
প্রেমের মধ্যে ভগবানের কাছে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে
নিবেদন করা।

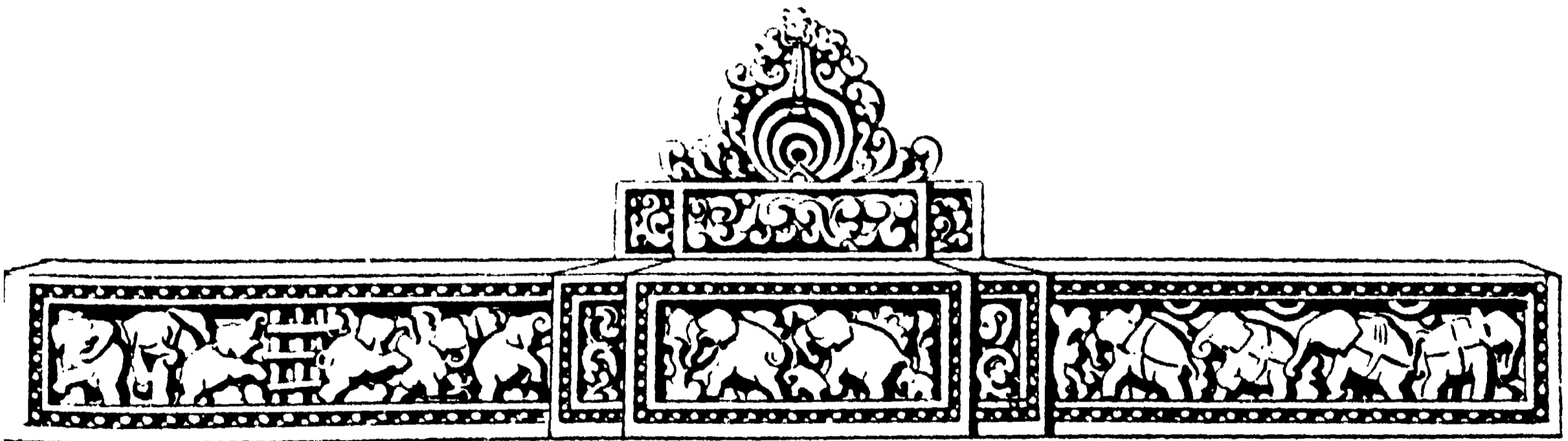
“আর আমার আমি নিজের শিরে
বইবো না।

আর নিজের দ্বারে কাঙাল হ'য়ে
বইবো না।

এই গোরা তোমার পায়ে ফেলে
বেরিয়ে পড়বো অবহেলে,
কোন খবর রাখবো না ওর
কোন কথাই কইবো না!
আমায় আমি নিজের শিরে
বইবো না।”

গীতার মধ্যে জীবনের যে চরম সত্যের প্রকাশ দেখিতে
পাই, গীতাঞ্জলির মধ্যেও তাই। ইহা কবির আধ্যাত্মিক
জীবনের সাধনার ইতিহাস। ইহার মধ্যে খুঁজিয়া পাই
মানুষের অত্মের চিরকালের বাণী। ভগবানকে খোঁজা
এবং ভগবানকে পাওয়া—উভয়ের সুরই গীতাঞ্জলির মধ্যে
মিলাইয়া আছে। যুগে যুগে মানুষের অতৃপ্ত আত্মা
অমৃতের জন্ত যে কঁাদন কঁাদিয়াছে সেই কাল্লার সুর
গীতাঞ্জলিতে। যুগে যুগে মানুষের প্রাণ অন্তরতম দেবতার
স্পর্শ পাইয়া যে আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছে সেই আনন্দের
সুরও গীতাঞ্জলিতে। ইহার মধ্যে বিরহের বেদনা, মিলনের
আনন্দ, আপনার সঙ্গে আপনার সংগ্রামের গান—সমস্ত-কিছু
মিলিয়া গিয়া এক বিচিত্র সুরের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু
সকল সুরকে ছাপাইয়া যে সুর উঠিয়াছে সেই সুর হইতেছে
আত্মসমর্পণের সুর।

“যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দ্ব্যসি যৎ ।
যৎ তপস্বসি কোন্তেয় ! তৎ কুরুষ মদর্পণম ॥”



আলোচনা

“ভদ্রলোকের কর্তব্য”

শ্রীযুক্ত মোহিনামোহন দাস ঢাকা হইতে লিখিয়াছেন :—মাঝ মাসের প্রবাসের প্রথম প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহাতে উপেক্ষিত সমাজ বেদনা পাইতে পারেন এবং উহা দ্বারা অকল্যাণ হইতে পারে ইহা হয়ত তিনি চিন্তাও করেন নাই। উপেক্ষিত সমাজের দাবি আদায়ের জন্ত যতখানি শিক্ষা সংস্কার ও সম্ভবত্বতা আবণ্ডক তাহা উপেক্ষিত সমাজ সংগ্রহ করে নাই এবং কল্যাণকে প্রতিষ্ঠিত করিতে তথাকথিত উচ্চজাতির যতখানি শিক্ষা ও উদারতা আবণ্ডক তাহাও উহাদের মধ্যে অনেকেরই দেখা যায় না। এক জনের মহাপুণ্ডবতায় আর এক জন উন্নত হইলে তাহার মধ্যেও একটা দৈন্ত থাকিবে ইহা স্বাভাবিক, কিন্তু রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের প্রবন্ধের মধ্য দিয়া যে ভাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা যে উন্নত প্রকারের সাম্প্রদায়িকতা এবং উপেক্ষিত সমাজের প্রতিমতাহীনতা তাহা বলার প্রয়োজন হইয়াছে চন্দ মহাশয় নিজকে “ভদ্র জাতি” মনে করিয়াই “ভদ্রলোকের কর্তব্য” লিখিয়াছেন—তা তিনি লিখিতে পারেন। কিন্তু সেই উপলক্ষে—“ইতর বা হরিজন” তিনি লিখিলেন কেন? “ইতর” অর্থ কি? ইতরের প্রচলিত অর্থ চন্দ মহাশয় জানেন? ইতর এবং হরিজন কি এক? “ভদ্র” কি কোন জাতির মধ্যে সামাবদ্ধ হইতে পারে? তিনি বলিয়াছেন, “আমাদের মনে হয় না কোন শিক্ষিত নমঃশূদ্র এম-এল-সি স্বজাতীয়কে চামারের জল খাইতে অমুরোধ করিবে।” কিন্তু তিনি জানেন না বাংলা দেশে উপেক্ষিত সমাজের একরূপ একটা সভাও হয় না যেখানে উপেক্ষিত সমাজের বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভেদ বিদূরিত করিবার জন্ত মন্তব্য গ্রহণ করা হয় না। উপেক্ষিত সমাজের মধ্যে বিরোধও “ভদ্র”দের অমুকরণ ও আদর্শেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

চন্দ মহাশয় উপদেশ দিয়াছেন সকলকে বৈশা হইতে। যে-জাতির মাথা পায়ের জুতার নাচে তাহার কি বাণিজ্য সম্ভব? আমাদের দেশের বস্ত্রশিল্প, পাট, চা ধানের অবস্থা কি? একটি কলমের খোচায় যে একটা শিল্প ও বাণিজ্য নিপাত হইয়া যাইতে পারে। আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র থাকিবে না এমন একটা সমাজ কি হয়? আমরা জাতিভেদ মানি না—আমরা জগদশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, মেঘনাদ ও মাস্তুলারকে ব্রাহ্মণ মানি এবং বহু বৃক্ক ধারী দেশের জন্ত আত্মসর্গ করিয়াছেন, উহাদের ক্ষত্রিয় বলিয়া মন করি। প্রতিভা ও ক্ষমতাশক্তিবর্জিত জাতির বৈশা হওয়ায় কি লাভ?

চন্দ মহাশয় উহার প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন এদেশের জাতিসকল কেবল যে নিজকে উন্নত জাতি বল তাহা নহে, অথকে ছোট করিতে চায়। “অস্পৃশ্যতা যে কেবল হিন্দুর মাথাই দেখা যায় এবং কতকগুলি হিন্দুই যে বাঞ্ছনীয় মন করে এমন কথা বলা যায় না। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ অংশ নিগ্রোদিগের সম্বন্ধে race segregation ব্যবস্থা আছে এবং ট্রেনে নিগ্রো দর জন্ত স্বতন্ত্র কামরা নির্দিষ্ট আছে।” ডাক্তার আইকমান নাকি বিধি দিয়াছেন “কঠিন হইলেও বিভিন্ন

‘রেসে’র লোকদিগকে যে-কোন প্রকারে পৃথক করিয়া রাখাই কর্তব্য।” চন্দ মহাশয় কি মনে করেন আমেরিকার নিগ্রো এবং বাংলার উপেক্ষিতদের প্রশ্ন এক? একটা অগ্রায় দ্বারা কি আর একটা অগ্রায় সমর্থন করা যায়? এদেশ সমাজে উন্নতির একটা ক্রম বর্তমান ছিল। উপেক্ষিত সমাজ হইতে কত জাতি অবস্থার উন্নতি করিয়া উন্নত জাতি হইয়া গিয়াছে নতুবা চন্দ মহাশয়ের প্রবন্ধের মত প্রবন্ধের প্রতিবাদের জন্ত চন্দ মহাশয়কেই হয়ত সর্বাগ্রে কলম ধরিতে হইত। চন্দ মহাশয় মনে করেন—“এই শোণিত-মিশ্রণই খুব সম্ভব হিন্দুজাতির অধঃপতনের অশ্রুতম কারণ”। ইংরাজ, ফরাসি, রোমিও, রাজপুত সকলেই মিশ্র জাতি। ইহুদী বোধ হয় তাহাদের রক্তের পবিত্রতা বেশী রক্ষা করিয়াছে এবং তাহারাই বোধ হয় জগতে সর্বাপেক্ষা বেশী লাঞ্চিত হইয়াছে—আজ তাহারা গৃহহারা। চূড়ার উপর ময়ূর পাখা দিয়া ছন্দ মহাশয় মুন্সীগঞ্জের কালোবাড়ির দৃষ্টান্ত দিয়া। তিনি লিখিয়াছেন—“ঢাকা জেলার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জের কালোবাড়িতে অস্পৃশ্যগণ বলপূর্বক প্রবেশ করিয়াছিল”। বাস্তব এবং প্রত্নতত্ত্ব যে কতটা পৃথক বস্তু তাহা এই উক্তি দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। ঢাকায় প্রাদেশিক হিন্দুসভার অধিবেশনে অস্পৃশ্যতা দূর করার প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর স্বামী সত্যানন্দ অসাম উৎসাহে মুন্সীগঞ্জে গমন করেন এবং সেখানে “ভদ্র” লোক লইয়া কালোবাড়িতে একটা সভা করিয়া উক্ত মন্দিরে সত্যগ্রহ আরম্ভ করেন। এখন অস্পৃশ্যদের উদ্ধার করিতে হইলে অস্পৃশ্যদের কিছু লোক আবণ্ডক হয়—এজন্ত পরে অস্পৃশ্যদের আহ্বান করেন, কিন্তু যে-কয়েকটি আত্মত্যাগী যুবকের প্রায়োপবেশনের ফলে মুন্সীগঞ্জের নারসমাজ বিচলিত হইয়া মন্দির-দ্বার সাধারণের জন্ত উন্মুক্ত করেন, সেই পাঁচ জন যুবকের কেহই অস্পৃশ্য নহে। চন্দ মহাশয় বলপূর্বক প্রবেশের সংবাদ কোথায় পাইলেন?

“রাষ্ট্রবিধির পরিবর্তনের ফলে অনাচরণীয় জাতির অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এম-এল-সি রূপে বা সরকারী চাকুরী পাইয়া শান্তই শহরে আসিয়া বাস করিবেন” “ভদ্রসমাজে গৃহীত হইবেন এবং ব্রাহ্মণ কায়স্থ আদির সহিত আহার আদি করিবেন” ইত্যাদি “সুতরাং সমাজ-সংস্কার লইয়া বেশী হৈ-চৈ না করিয়া ভদ্রবংশগুলি যাহাতে রক্ষা পায় তজ্জন্ত এখন ভদ্রলোকদিগের সম্মিলিত ভাবে চেষ্টা করা কর্তব্য”। সাধু! আচ্ছা রাষ্ট্রবিধি পরিবর্তনের পূর্বেই ভদ্রলোকদের আইনসভায় প্রাধিকার থাকিতে ইংরাজ মুকবিবে ধরিয়া একটা আইন পাস করিয়া এই অনাচরণীয়দিগকে শহরে প্রবেশ বন্ধ করা এবং রেলগাড়াতে উহাদের জন্ত স্বতন্ত্র কামরা করিয়া রাখা যায় না?

সম্পাদকের মন্তব্য।—এই প্রতিবাদ অল্প কাগজপত্রের সঙ্গে মিশিয়া যাওয়ায় অনেক বিলম্ব, সম্প্রতি, আমার চোখে পড়িয়াছে। এখন চন্দ মহাশয় বিদেশে আছেন। তথাপি, আর বিলম্ব উচিত হইবে না বলিয়া ইহা ছাপিলাম। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিবার পর ইচ্ছা করিলে ইহার উত্তর দিতে পারিবেন। আমি কেবল লেখক মহাশয়ের শেষ প্যারাট্রাফট সম্বন্ধে বলিতে চাই, যে, তিনি রমাপ্রসাদ

বাবুর কথাগুলির যে উদ্দেশ্য আরোপ করিয়াছেন, তাহা হয়ত ঠিক হয় নাই। তিনি কোন প্রকার রাষ্ট্রবিধিতে বা সামাজিক পরিবর্তনে বাধা দিতে চান নাই। এখন চেষ্টা না করিলেও সমাজ-সংস্কার হইবেই ধরিয়া লইয়াছেন; সেইজন্য সমাজ-সংস্কারে শক্তি নিয়োগ না করিয়া “ভদ্রবংশগুলি” রক্ষার চেষ্টা করিতে বলিয়াছেন। তাহার অন্ত কোন কোন প্রবন্ধ হইতে জানা যায়, যে, তিনি শিক্ষিত যুবক ও যুবতীদের মধ্যে অনেকে অবিবাহিত থাকিতেছেন বলিয়া একরূপ আশঙ্কা করেন, যে, “ভদ্রবংশগুলি”র কালক্রমে লোপ বা হ্রাস হইতে পারে। তাহার নিবারণ চেষ্টা করিতে তিনি বলিয়াছেন।

আমি সব বিষয়ে তাহার সহিত একমত নহি, এবং এমনও হইতে পারে, যে, আমিও তাহার কথা ঠিক বুঝি নাই।

“চেকের কথা”

আষাঢ় মাসের ‘প্রবাসী’তে শ্রীযুক্ত বোগেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় ‘চেকের কথা’ প্রসঙ্গে ‘not negotiable’ চেকের বাংলা প্রতিশব্দরূপে ‘হস্তান্তরের সর্ববিহীন চেক’ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু এই অনুবাদ স্বাকার করিয়া লইতে অসুবিধা বোধ করিতেছি। যে-চেকে ‘not transferable’ এই কথাগুলি লেখা থাকিলে এমন চেকেই আমরা ‘হস্তান্তরের সর্ববিহীন চেক’ বলিব। বস্তুতঃ কেবল ‘not negotiable’ লেখা থাকিলে চেকের হস্তান্তরিত হইবার গুণ কিছুমান খর্বীকৃত হয় না। আমার মনে হয় ‘not negotiable’ কথাগুলির বাংলা প্রতিশব্দ ‘অবাধ ক্রয়বিক্রয়ের অযোগ্য’ করা যাইতে পারে।

শ্রীবোধায়ন

মুক্তি

শ্রীআশালতা দেবী

১৪

নিশ্চল মুখ ফিরাইল বলিয়াই যামিনীরও আবেগের আর অবধি থাকিল না। কোথায় রহিল তাহার পড়াশোনা, কোথায়ই বা থাকিল তাহার পরীক্ষার তাড়া! এত বড় পৃথিবীটা সঙ্কুচিত হইয়া তাহার শয়ন-ঘর এবং সন্মুখের ছাদটুকুর মধ্যেই পর্যাবসিত হইল। জীবনের উপর তাহার সমস্ত দায়িত্ব সমস্ত দাবিকে সে মুছিয়া ফেলিল। নিশ্চলকে সারাদিনের মধ্যে প্রায় সে নীচে নামিতে দেয় না। চাকরে উপরে চা তৈয়ারী করিয়া দেয়, যামিনীর জন্য যে টোষ্ট্, এবং ডিমের ওম্লেট্ আনে জোর করিয়া সে তাহা নিশ্চলার মুখে গুঁজিয়া দেয়। বেশী শীত পড়িয়াছে বলিয়া বাহিরের বাতাসের ঠাণ্ডা জলে তাহাকে হাত ধুইতে দেয় না। চাকরকে দিয়া ঘরের মধ্যে ‘বোল’ এবং গরম জল আনায়। তাহার পরে নিশ্চলার পায়ের তলা অবধি একটা পশমের শালে ঢাকিয়া ছু-খানা চেয়ারে ছু-জনে মুখোমুখি বসে।

বাহিরে বেলা বাড়িয়া চলে। স্বপ্নায়ু শীতের দিনের ছোট সকালবেলাটায় সংসারে শত সহস্র কাজ। দশটা দেখিতে দেখিতে বাজিয়া যায়। বাবুদের কাছারি ঘাইবার আপিস ঘাইবার তাড়া, ছেলেমেয়েদের

ইঞ্চল-কলেস ঘাইবার তাড়াতাড়ি। সংসারে সবাই যখন বাস্তব, সক্রিয়, কর্মরত, তখন কাচের সার্দি-আঁটা এই ঘরটায় কেবল উদ্ভাস্ত যামিনীর উন্মত্ত প্রেমলীলার দৃশ্যটা বিসদৃশ হইয়া সংসারে সকলের চোখে পড়ে, এবং সবচেয়ে বাহ্যিক তাহা বেধে সে ওই নতমুখী ক্লিষ্ট মেয়েটি। যামিনীর এত আদরবহু নিশ্চলার মনে প্দেরাগের সঞ্চার করিতে সবে শুরু করিয়াছিল। পূর্বাংশের নূতন আলোর মত প্রেম জীবনে ধীরে ধীরে যেমন করিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, কাব্য পড়িয়া নিশ্চলার ধারণা ছিল, এ তাহা নয় বটে। এ যেন কতকটা রূপান্তরিত রুতজ্ঞতা। যামিনী যদি স্বামীত্বের দাবির জোরে এতখানি পাগলামি না করিত, হয়ত এই রুতজ্ঞতার ভালবাসাই ক্রমে নিশ্চলার কাব্যের প্রেম হইতে পারিত। কিন্তু যামিনীর বে সে ধৈর্য্য নাই। তাই যামিনীর ব্যবহারে নিশ্চলা আনন্দের চেয়ে ব্যথাই পাইত বেশী।

যদিচ নিশ্চলা কোনদিন হিন্দু আচার-আচরণের মধ্যে মানুষ হয় নাই, স্নান-আঙ্কিক না সারিয়া মুখে জলটুকু দিবে না এ-সকল সংস্কারও কোনদিন তাহার মনে স্থান পায় নাই, তথাপি এক ধরণের আন্তরিক শুচিতা এবং নিশ্চলতার সে চিরকাল অভ্যস্ত। খুব ভোরবেলায় যখন অন্ধকারের

পাতলা আবরণ একটি স্বচ্ছ শুভ্র আবেষ্টনের মত পৃথিবীর গায়ে লাগিয়া থাকিত, বিশ্বের দিগ্ধতা এবং শাস্তি বহন করিয়া ভোরের বাতাস বহিতে শুরু করিত, তখন সে শব্দ ছাড়িয়া তাহাদের কলিকাতার বাড়ির ছাদে ঘুরিয়া বেড়াইত। নিশ্চয় ধরণী এবং সুগভীর মৌন আকাশ হইতে একটি পবিত্র শাস্তির ভাব দেবতার আশীর্বাদের মত তাহার মনকে স্পর্শ করিয়া নাইত। কোনদিন ছাদের উপরেই ছোট এক টুকরা কার্পেট বিছাইয়া সে সেতার বাজাইত। তখন মনে হইত ভোরের আকাশ বেন আনত দৃষ্টিতে সেই হুরের উপর অনিমেঘে চোখ মেলিয়া আছে।

ছোটবেলা হইতেই সংসারের বাস্তব দিকটা হইতে অনেক দূরে থাকিয়া নিশ্চল সংসারের কুশ্রীতার সংস্পর্শ একেবারে আসে নাই। সেখানে তাহার বাবা ছাড়া এমন সঙ্গীও ছিল না আর কেহ, যে কেবল জ্ঞানের কথা আর ভাবের কথা ছাড়াও অল্প কোন বাস্তব পৌছাইয়া দেয় তাহার মনে। এমনি একক নিঃসঙ্গতায় বাস করিয়া নিশ্চল ক্রটিতে, প্রকৃতিতে দেহে মনে একান্ত শুচিমতী শান্ত সংবত হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল।

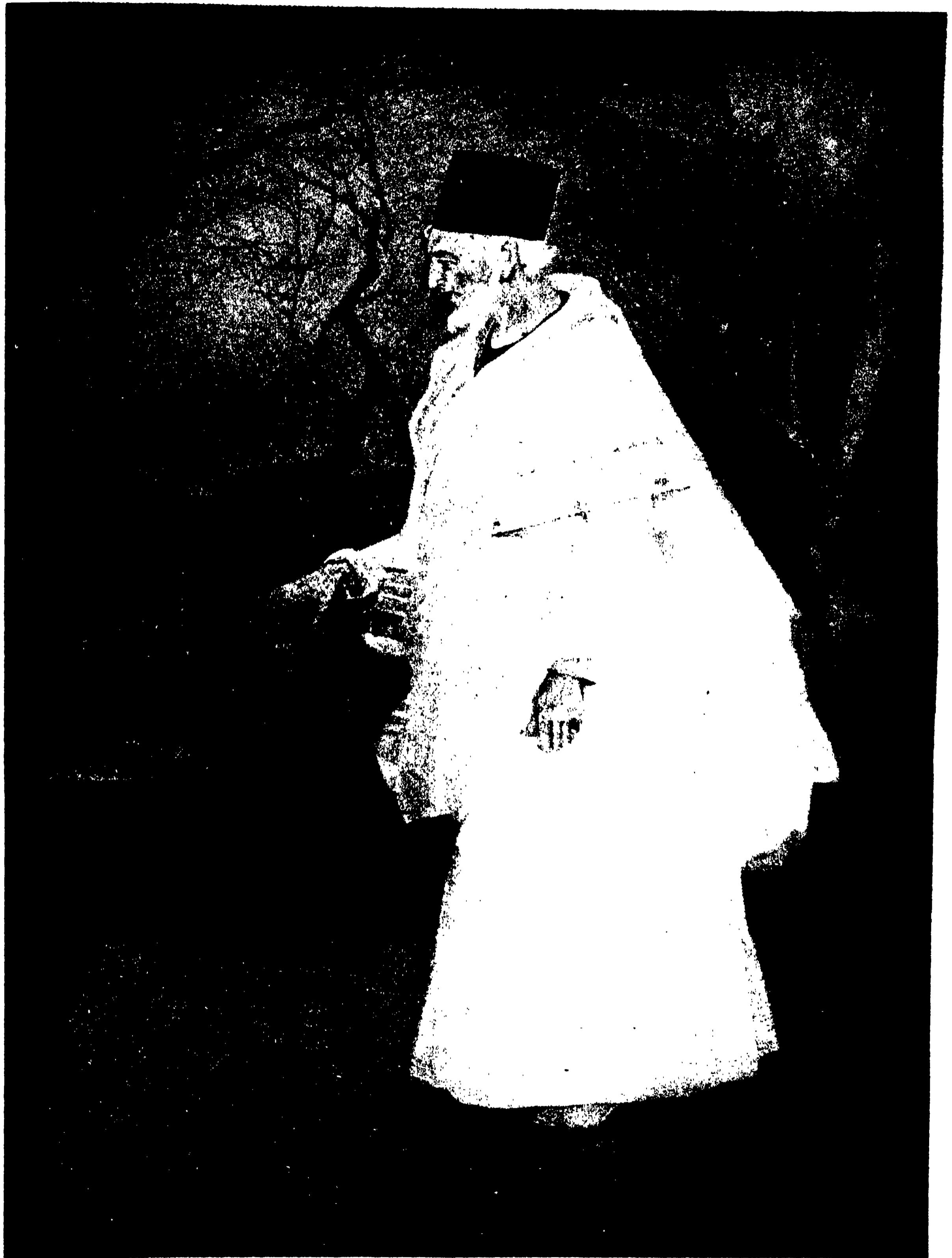
সেই তাহাকেই এখন বেলা আটটা অবধি রাত্রির বাসি বিছানায় শুইয়া থাকিতে হয়। ঠাণ্ডা লাগিবে এই অজুহাতে বামিনী তাহাকে কিছুতেই ঘরের বাহিরে আসিতে দেয় না। কাপড় ছাড়িয়া মুখ হাত ধুইয়া ভালমতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া লইবার পূর্বেই ডিম এবং খাবার কাড়াকাড়ি করিয়া জোর করিয়া খাওয়াইয়া দেয়। খাওয়া হইলে জল দিয়া মুখ না ধুইতে দিয়া তোয়ালেতে মুছিয়া দেয়। না করিতে চাহিলে সকালবেলায় সেই বন্ধ বরে মান-অভিমানের পালা শুরু করিয়া দেয়। এই সমস্ত ভেদাজেদি মান-অভিमानে নিশ্চলার মনে অত্যন্ত সঙ্কোচ উপস্থিত হয়। বাহাতে সে আন্তরিক অন্তর্দ্বন্দ্ব বোধ করে, বামিনী অভিমানের জোরে তাহাকে তাহা করাইয়া লয়, ইহাতে বামিনীর প্রতি নবজাত আকর্ষণটুকু বেন একেবারে শুকাইয়া যায়। তাহার সমস্ত মন ব্যাকুল হইয়া ফিরিয়া নাইতে চায় তাহার সেই নিশ্চল দিগ্ধ সুন্দর পূর্ব জীবনে। অথচ ভিতরে ভিতরে বুঝিতে পারে কোন একটা জায়গায় আটকাইয়া গিয়াছে, অনেক চেষ্টা

করিলেও সে-জট আর খুলিবে না। তাই সমস্ত ইচ্ছাকে দমন করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া থাকে। মনে মনে এক এক বার ভাবে কোন অলৌকিক উপায়ে বামিনীর সহিত যুক্ত জীবন কি তাহার হৃদয় হইয়া উঠিতে পারে না? সে তা বামিনীকে জীবন হইতে ছাঁটিয়া ফেলিতে ঠিক চাহে না। তবে কেন এ ভাল ও মন্দ লাগার জালে সে এমন করিয়া জড়াইয়া গেল?

কথা বেশী বলিতে নিশ্চল শিখে নাই। তাহার সকল চিন্তা নীরবতার অন্তরালেই রহিয়া যায়। সেই নীরবতার সম্মুখে বামিনীর আবেগ ক্রমশঃ ভিতরে বাহিরে দুর্বীর হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার প্রকৃতিতে একটা দুর্দমনীয় বেগ ছিল। যখন বাহার দিকে যাইত তখন পথের সমস্ত বাধা ভাঙিয়া-চুরিয়া পদদলিত করিয়া তাহার কাছে বাইবার জন্ত হুমুদ হইয়া উঠিত।

নিশ্চল যদি সহজেই ধরা দিত, বিবাহের মন্ত্র পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি তাহাকে একান্ত ভাবে পাওয়া যাইত তবে হয়ত এ-আবেগ তাহার আপনা-আপনি একদিন শান্ত হইয়া আসিত। সংসারের মাঝে কষ্ট এবং দায়িত্বের সহিত মিশিয়া তাহার প্রেম সংবত সামঞ্জস্যময় হইয়া উঠিত। কিন্তু নিশ্চলকে শত সহস্র ভাবে নাড়াচাড়া করিয়াও কিছুতেই তাহার মন তৃপ্তি মানিতেছে না। মনে হইতেছে কোথায় বাধা রহিয়া গেল। সেই অদৃশ্য অপ্রতিবিধের বাধাকে ভাঙিয়া খান-খান করিতে ইচ্ছা করে। বাথায় সমস্ত মনটা টন্-টন্ করিয়া উঠে। কিন্তু এ-বাথার কথা কাহারও কাছে বলিবার নয়। বলিতে গেলেও কেহ বুঝিবে না। এই প্রত্যহ-সঞ্চিত পুণ্ডীভূত ক্রেশের সঙ্গে লড়াই করিতে গিয়া তাহার চরিত্রের স্বাভাবিক স্বেচছা চলিয়া গেল।

বামিনীর স্বভাব আগে খুব মিষ্ট ছিল, চাকর-বাকরকে কখনও সে কড়া কথা কহিত না। কিন্তু আজকাল তাহার স্বভাবে এমনি অস্থিরতা আসিয়াছে যে সামান্য কারণেই ধৈর্য হারায়। অনর্থক বকাবকি করে। কাহারও সঙ্গে কথা বলিবার সময় অকারণে শব্দ কথা বলিয়া তাহার মনে ক্রেশ দেয়। নিজের উপর, বিশ্বজগতের উপর তাহার রাগ ধরিয়া গিয়াছে। কিন্তু বাহির হইতে



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

श्रीगुरुभ्यो नमः

श्रीगुरुभ्यो नमः

তাহার মনের এ-সকল স্মৃতিস্বপ্ন পরিবর্তনের খবর কেহ জ্ঞান না। তাহারা দেখে নববিবাহিত বামিনী ক্রমশঃ প্রকাশ্য স্পন্দায় সংসারের সকল নিয়ম সংকম ভাঙিয়া দাম্পত্য নীতির সীমানা লঙ্ঘন করিয়া গাইতেছে। সমস্ত সংসার হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া আনিয়া নিশ্চলাকে সে নিজে একলা বিরিয়া রাখিয়াছে। দিনের বেশির ভাগ সময় তাহার সহিত মুখোমুখি হইয়া কাটায়। তাহাকে এক দণ্ড চোখের আড়াল করিতে গেলে মনে হয় বুঝি-বা সে এখনই হারাইয়া গাইবে।

১৫

বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছে। শতের দিনের বাদল, হাতাতে বর্ষার সমারোহ নাই, প্রকৃতির উৎসাহ নাই। সে কেবল মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখে। সন্ধ্যার অনেক আগেই ঘরের মধ্যে অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে এতটুকু আলো নাই, গাঢ় কালিমা। ঘরের ভিতর ইহারই মধ্যে আলো জ্বলিতেছে। বামিনী রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' হইতে কবিতা পড়িতেছে,

“এ মুখের পানে চাহিয়া রয়েছ

কেন গো অমন ক'রে ?

তুমি চিনিতে নারিবে বুঝিতে নারিবে মোরে

আনি কেনেছি হেসেছি ভালো যে বেসেছি

এসেছি যেতেছি সরে

কি জানি কিসের মোরে !

কোথা হ'তে এত বেদনা বহিয়

এসেছে পরাণ মন,

বিধাতার এক অর্থ-বিহান

প্রলাপ বচন সম !

শুধু একটি মুখের এক অনেমোর

একটি মধুর কথা,

তারি তরে বহি চিরদিবসের

চির মনোবাকুলতা !

কালের কাননে নিমেষ লুটিয়া

কে জানে চলেছি কোথা !

ওগো মিট না তাহাতে মিট না প্রাণের বাধা !

অধিক সময় নাই !

ঝড়ের জীবন ছুট চল' যায়

শুধু কেঁদে “চাই” “চাই” !

যা'র কাছে আসি, তা'র কাছে শুধু

হাহাকার রেখে যাই !

৮৯—১১

নিশ্চল একটা সোফায় বসিয়া চোখের উপর একটা হাত দিয়া আলোটা আড়াল করিয়া শুনিতেছিল।

পড়া বন্ধ করিয়া বামিনী তাহার কাছে সরিয়া গেল।

“তোমার ভাল লাগল ?”

“হ্যাঁ, খুব ভাল লাগছিল। একে ত রবীন্দ্রনাথের কবিতা, তার উপর তুমি খুব আন্তরিকতার সঙ্গে পড়ছিলে। পড়তে পড়তে তোমার গলার স্বর কাঁপছিল।”

“কেন কাঁপছিল, নিশ্চল ?”

“পড়ার মধ্যে তুমি তন্ময় হয়ে গিয়েছিলে।”

“না না, কবির এই কবিতাকে উপলক্ষ্য করে আমার মনের বেদনাকে তোমার কাছে পৌঁচে দিতে চাইছিলুম। তুমি কি তা বুঝলে না? বল নিশ্চল, কথার জবাব দাও।”

বেদনা নিশ্চলার মনেও ছিল : কিন্তু সে বুঝিত যে বামিনী তাহা বুঝবে না। তাই নিজের কষ্টের কথা না বলিয়া সে শুধু বলিল, “কিসের কষ্ট?”

নিশ্চল তা বামিনীর কোনো ইচ্ছায় জ্ঞানত বাধা দেয় নাই, তবে কেন কষ্ট? বাহিরে তখন সন্ধ্যার শব্দ বাজিয়া উঠিল। তুলসীমঞ্চের কাছে নিশ্চয় সন্ধ্যা দিবার সময় হইয়া আসিয়াছে।

সন্ধ্যার এই পরিপূর্ণ শান্তির মাঝখানে অশান্ত বামিনী ব্যাকুল হইয়া কহিল, “কিসের কষ্ট তা'ও কি তুমি বোঝ না, নিশ্চল? যদি কিছুই না বুঝবে, কিছুই না চাইবে তবে এখন সময় ছিল তখন কেন বল নি? তখন কেন আমার সামনে এসেছিলে?” বামিনী উত্তেজিত ভাবে তাহার হাতটা ধরিয়া নাড়া দিল।

“কিছুতেই কি কথার জবাব দেবে না। এত গর্ব?”

মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া নিশ্চলার দুই চক্ষু দিয়া অজস্র জল পড়িতে লাগিল। তাহার চিন্তার সমস্ত অবসাদ, সমস্ত বিতৃষ্ণা, সব পুঞ্জীভূত গ্লানি চোখের জলে ঝরিয়া পড়িতে চাইল। নিশ্চলার মনেও কি স্বপ্নলোকের সাধ ছিল না? কিন্তু এ দুল জগতে কে তাহার মূল্য বুঝবে?

“ক'দচ কেন? মনে কি খুব কষ্ট হচ্ছে যে আমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে জীবনব্যাপী একটা ভুল হয়ে

গেল? সে ভুলের হাত থেকে আর নিস্তার নাই? না না, ভুল নয় নিশ্চল, ভুল নয়। আর যদিও ভুল হয়, এই ভুলকেই আমি গলায় হার ক'রে রাখব। চোখের জল ফেল না নিশ্চল। কাঁদছ কেন? কঠিন কথা বলেছি বলে? আর কখনও বলব না।”

নিশ্চল শান্ত হইয়া চোখের জল মুছিল। আজ প্রথম তাহার মনে নিজের ক্রটির কথা জাগিল। মনে হইল, যামিনী যেমন তাহাকে বোঝে না, সেও হয়ত যামিনীকে তেমনি ভুল বোঝে। যামিনীর অনুরাগ আন্তরিক, এ-কথা বুঝিতে তাহারও ভুল হয় না। যামিনীর সব-কিছুই তাহার মনের মত না হইলেও নিশ্চল চেষ্টা করিবে যামিনীর মনের মত হইতে।

১৬

বড়বোদির মনের জালা আর খামিতে চায় না। অনেক মেয়ের মনে প্রতিদ্বন্দিতার ভাব অতি প্রবল। বড়বোদি তাহারও শ্রেষ্ঠ সহ্য করিতে পারিতেন না। এতদিন অবধি তিনিই এ-বাড়ির আদর্শ ছিলেন। বিবাহের আগে তিনি সেকেণ্ড ক্লাস অবধি পড়িয়াছিলেন। তাঁহার হাতের সাজা পান মিষ্ট এবং রন্ধনে তাঁহার লবণ বেণী হয় না। মিষ্ট পরিহাস করিতে, সকলের আদার রাখিতে, ধর-হরার ঝাড়িতে, কাজকর্ম করিতে সব বিষয়েই তিনি সমান পটু। এত দিন দেবরেরা কথায় কথায় তাঁহার আদর্শের উল্লেখ করিয়া স্ত্রীদের কহিতেন, “বড়বোদির মত হ'তে পার না?” শুনিয়া বড়বোদি স্নেহে লজ্জায় গর্বে গলিয়া যাইতেন। জা এবং দেবরের প্রতি তাঁহার স্নেহ আরও উখলিয়া উঠিত।

এমনিতে লোকও তিনি মন্দ নহেন। কিন্তু গর্বে আঘাত লাগিলে তাঁহার স্নেহের উৎস নিমেষে শুকাইয়া যায়। যামিনী তাঁহার এই গর্বে বার-বার খা দিল। লজ্জা বিসর্জন দিয়া স্ত্রীর হইয়া তাঁহার সহিত ঝগড়া করিল। সদর্পে জানাইয়া দিল যে তাহার স্ত্রী এ-পরিবারের অন্ত সমস্ত স্ত্রীলোক হইতে অনেক উর্ধ্বে। সে কুসুম-সুকুমার, সে কবির কাব্যের মত রমণীয়। বড়বোদির মত স্থূল প্রকৃতির রমণীদের সংস্পর্শে তাহার থাকিতে অত্যন্ত

কষ্ট হয়। এই-সব কথা শুনিয়া তিনি অপমানে অধীর হইয়া উঠিলেন। আর যামিনী যে সমস্ত সংসারকে উপেক্ষা করিয়া তাহার স্ত্রীকে লইয়া অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিতে লাগিল তাহাতেও তাঁহার চিত্ত ঈর্ষাকুল হইয়া উঠিল। তাঁহাদেরও ত এক সময়ে নূতন বিবাহ হইয়াছিল এবং তাঁহারও বয়সকালে কিছু কম সুন্দরী ছিলেন না, কিন্তু কই তাঁহাদের স্বামীরা ত তাঁদের লইয়া এমন কিছু বাড়াবাড়ি করেন নাই। ঠাকুরপো, যে আগে মিষ্ট কথা ছাড়া কথা বলিত না, তাঁদের কত মাত্র শ্রদ্ধা করিয়া চলিত, সে হঠাৎ এই কয়েক মাসে আগাগোড়া একেবারে নূতন মানুষ হইয়া উঠিল। তাহার কারণটা কি? এ-সব নিশ্চয়ই ঐ নিশ্চলার কারসাজি। এত চালাক মেয়ে, সর্বদা চুপ করিয়া থাকে, কিন্তু তলায় তলায় এত!

মনে মনে একটা অদমা জিদ জাগিয়া উঠিল বড়বোদির, যেমন করিয়া পারেন এই মেয়েটির সমস্ত সুখ সকল গরু ভাঙিয়া দিতে হইবে। নানা দিক হইতে নানা ছলে তিনি তাহারই অসুস্থকান করিয়া ফিরিতে লাগিলেন।

এমনি করিয়া নিঃশব্দ নিশ্চলকে সকলেই ভুল বুঝিতে লাগিল। তাহার স্বামীর যে অতিরিক্ত আসক্তি তাহাকে আনন্দ না দিয়া বরঞ্চ তাহাকে দেহে মনে শ্রান্ত পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল তাহাকেই ভুল বুঝিয়া অনেকে তাহার প্রতি ঈর্ষাসমাকুল হইয়া উঠিল। যখন সে প্রথম বধু হইয়া এ সংসারে ঢুকিয়াছিল তখন তাহার নম্র নিশব্দতা, সকল বিষয়ে বধ্যতা এ-পরিবারের সকলকেই তাহার প্রতি অসুস্থকান করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু যামিনীর আচরণ লজ্জার সীমা এমন করিয়া বিদীর্ণ করিতে লাগিল, তাহার বাড়াবাড়ি এত বেশী হইয়া পড়িল যে, না-জানিয়া না-বুঝিয়া সকলে নিশ্চলকেই ইহার জন্ত দোষী করিতে লাগিল। মন্তব্য উঠিতে লাগিল, “...কলোঁড়ে-পড়া বিবি-বউ, তাই সারাদিন স্বামীর সঙ্গে ফুস-ফুস গল্পগুজব করিয়া কাটান। অশিক্ষিতা মেয়েদের উপর তাঁর স্নেহ, সেইজন্য নিজের ঘর ছাড়িয়া একবারও বাহিরে আসিয়া শাশুড়ীর যত্ন সেবা করিতে কি জা-ননদের সঙ্গে ছুটো গল্প করিতে মন ওঠে না।...”

বড়বৌদি এক দিন শাওড়ীর কাছে গিয়া একথা সেকথার পর কহিলেন, “মা, ঠাকুরপো আইন পরীক্ষা বোধ হয় এবারেও দেব না।”

যামিনীর আইনের শেষ পরীক্ষা গত বছরেই দিবার কথা ছিল, পরীক্ষার ঠিক সময়ে শক্ত করিয়া ইন্সুয়েঞ্জার পড়ায় দেওয়া হয় নাই। লেকচার সমস্ত ঘ্যাটেও করা ছিল এবং পাসে/টেজের সংখ্যা ঠিকই ছিল। তাই এবারে সে খুশীমত কামাই করিয়া ফিরিতেছে। কেহ বলিতে গেলেই উত্তর দেয়, “পরীক্ষার ভাবনা কি?...সে ত সমস্তই তৈরি রয়েছে। কেবল গিয়ে দিয়ে দেওয়া।” বড়বৌয়ের কথা শুনিয়া মা উদ্বিগ্ন হইলেন। যামিনীর খামখেয়াল তাঁহার অজানা নাই। তাই উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, “কেন তোমাকে কিছু বলেচে না কি?”

“প্রায় বলাই একরকম বইকি। বৌয়ের কাছে না থাকলে তার মন ভাল থাকে না। আর পরীক্ষার ত মোটে পনেরটি দিন বাকী!”

নিশ্বলার নাম উল্লেখ শুনিয়াই তাঁহার মুখ আরও গম্ভীর হইয়া উঠিল। ইদানীং বধূর প্রতি তিনি অত্যন্ত অপ্রসন্ন ছিলেন।

বড়বৌ হেঁমুখে চুড়ি বালা খুঁটিতে খুঁটিতে কহিলেন, “মা, তাহলে কি করবেন? হাজার হোক আপনি মা, আপনি যদি একবার ঠাকুরপোকে ডেকে বুঝিয়ে বলেন, আপনার কথা সে কখনও ঠেলতে পারবে না। (একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া) আমাদের মনে কত আশা ছিল ঠাকুরপো এবারে উকীল হয়ে বেরিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে একত্রে আদালত যাবে। সে আশা বুঝি পূর্ণ হবে না। আর ওরই বা দোষ কি? (একটা উদগত নিঃশ্বাস চাপিয়া লইয়া) আমরা সেই কালেই জানতুম...যাক্ গে সে-সব কথা। একবার আপনি বলবেন, মা। আমরা ব’লে ব’লে হার মেনেছি।”

বিকালে যামিনীর ঘরের বারান্দায় মায়ের ভারি পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। বিছানার উপর তখন নিশ্বলা শুইয়াছিল, আর যামিনী একটা কাচের প্লেটে একগুচ্ছ আঙুর লইয়া একটা একটা করিয়া ছাড়াইয়া তাহার মুখে তুলিয়া দিতেছিল এবং সেই সঙ্গে তাহাকে কি-একটা বই পড়িয়া শোনাইতেছিল। চ-জনেরই মন আজ প্রসন্ন,

যেন তাহারা পরস্পরকে চিনিতে আরম্ভ করিয়াছে। এমন সময় ঘরের কাছে দাঁড়াইয়া মা ডাকিলেন, “যামিনী!”

বধু মাথায় কাপড় তুলিয়া দিয়া উঠিয়া বসিল। হঠাৎ যামিনী শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। তাহার হাত হইতে কাচের প্লেটটা পড়িয়া গিয়া ঝন্ ঝন্ শব্দে ভাঙিয়া গেল।

সবহুদু যেন একটা কাণ্ড ঘটয়া গেল।

মা বলিলেন, “যামিনী, তুই কাল সকালের টেনে ক’লকাতা যাবি। আমি সরকার-মশায়কে ব’লে দিয়েছি সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক ক’রে রাখবেন।” বধুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তোমার কি এখানে থাকতে বড় কষ্ট হচ্ছে বাছা? তা যদি হয়ও, তবু কষ্ট ক’রে আর একটা মাস থাক। যামিনীর পরীক্ষা হ’লে তোমাকে বাপের বাড়িতে রেখে আসবে।”

আর দ্বিতীয় কথা না কহিয়া, প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা মাত্র না করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

পরের দিন অনিচ্ছাসত্ত্বেও যামিনী কলিকাতা গেল। এবং পরীক্ষাটা চুকিয়া গেলেই মাসখানেকের মধ্যে বাড়ি ফিরিয়া আসিল। সে যে-কয়েকটা দিন কলিকাতায় ছিল নিশ্বলার নামে তাহার রোজ দুই তিনখানা করিয়া চিঠি আসিত এবং যেদিন সে ফিরিয়া আসিল সঙ্গে আসিল গৃহসজ্জার বিবিধ উপকরণ। আয়না-দেওয়া মেহগনির পালক, মার্বেলের ডেসিং টেবল, জেজির কাজ করা টিপয়। বিবাহের আগে নিশ্বলার জন্ত গহনা কাপড় কিনিবার পরেও সেই দশ হাজার টাকার কয়েক শত টাকা অবশিষ্ট ছিল। সেই টাকাটা সে এই কাজে খাটাইল। বাড়ির ছ-জন বেয়ারাই ঝাড়ন-হাতে যামিনীর ঘরে এই সকল নূতন নূতন কক্ষ-সজ্জার উপকরণ ঝাড়িয়া মুছিয়া তুলিতে এবং সাজাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বড়বৌদির বিকল চিত্ত ঈর্ষায় আরও বিকল হইয়া গেল।

দিন-কতক পরে।

বাড়িতে একটা উৎসব ছিল। মেজবৌয়ের ছেলের

আজ অন্নপ্রাশন। শহরহুঙ্ক বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরা এবং তাঁদের পরিবারবর্গও আমন্ত্রিত হইয়াছেন।

নির্মলার শাশুড়ী তাহাকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন, “ছোটবোমা, আজও যেন সন্ধ্যা অবধি ঘরে থিল দিয়ে বইয়ে মুখ গুঁজে বসে থেকে না, বাছা। তাহলে ত'নিদের আর কিছু বাকী থাকবে না। বাড়িতে আজ লোকজন আসবে। সবাই এসে নূতনবো দেখতে চাইবে। ভাল করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে নাও গে।”

বড়বোকে ডাকিয়া বলিলেন, “আয়রণ চেষ্ট খুলে ছোট বোকে গয়নাগাঁটি বার করে সব পরিয়ে দাও গে।”

বড়বোদি আদেশ পাইয়া যন্ত্রচালিতের মত আয়রণ চেষ্ট খুলিলেন। তাহার পরে একটা চেয়ারে বসিয়া নির্মলাকে গহনা পরাইতে আরম্ভ করিলেন। বাড়ির অপরাপর মেয়েরা ভীড় করিয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। বড়বোদি শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “তোমরা স'রে যাও ভাই, স'রে যাও। বোয়ের কষ্ট হবে।”

সেজবো নির্মলার নেক্লেসটি তুলিয়া লইয়া সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে কহিলেন, “ছোট, তোর বাবা কলকাতায় কোন্ দোকান থেকে গয়না কেনে রে? আমাদের ঠিকানা ব'লে দে না। এতবার এত গয়না কিনি, কিন্তু তোর মত জিনিষ কখনও কেউ এনে দিলে না।”

“এ-সব গয়না একটাও বাবা কেনেন নি।”

“তবে, তোদের কোন আত্মীয় কিনেচে বুঝি?”

“না, এ সমস্তই উনি কিনেচেন।”

সেজবোদি মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন, “বিয়ের আগে থেকেই বুঝি ঠাকুরপো নিজের পছন্দ খাটিয়েচে। তা যে-ই কিম্বুক, তুই দোকানের নাম ত জানিস।...আহা হা, এই আম'লেটটি কি সুন্দর। আগাগোড়া ওপ্যালের। নাঃ, খুব দামী জিনিষ নিশ্চয়। তোর বাবার যে উ'চু নজর সে-কথা মানতেই হবে।”

নির্মলা বলিল, “ওর একটাও আমার বাবার কেনা নয় সেজদি। তাঁর নজর কেমন জানি নে, কিন্তু এ-সবের টাকাও তিনি দেন নি। কোন্ দোকান থেকে কেনা, কত দাম, সে-সবও আমি জানিনে। এ-সমস্ত উনি নিজে টাকা দিয়ে কিনেচেন। বেশ ত, তোমার যদি এত পছন্দ হয়

তবে আম'লেটটা তুমি নাও না সেজদি। আমার গয়না পরতে এত ভালও লাগে না।” কি ব্যাপার কেহই বুঝিতে পারিল না। বিষয়ে হতবাক হইয়া কেবল এ উহার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

শুধু বড়বোদি কঠিন কণ্ঠে কহিলেন, “ছোটবো, এ-সব গয়না একটাও তোমার বাবা দেন নি, তুমি ঠিক জান?”

“ঠিক জানি দিদি।”

তিনি আর কিছু না বলিয়া অর্ধসমাপ্ত কাছের মাঝখানেই সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

তারপর মায়ের ঘরে একটা হলহুল বাধিল। তিনি বড়ছেলে বিনোদকে বহির্কাটি হইতে ডাকিয়া পাঠাইয়া কহিলেন, “ডেকে নিয়ে আর যামিনীকে। আমি নিজের মুখে তাকে সব জিজ্ঞেস করি। এত গয়না কেনবার টাকা পেলে সে কোথায়? আমার সেই দশ হাজারের বে খাতাটা ওর নামে ছিল সেইটে ভেঙেচে? তার এত বড় বাড় কেমন করে হয়েছে সেই কথাটাই আজ তাকে মুখোমুখি জিজ্ঞেস করি!”

কনিষ্ঠ সন্তান বলিয়া যামিনী বরাবর মায়ের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিল। কিন্তু আজ মা তাহার উপর মন্থাস্তিক রাগিয়াছেন।

যামিনী আসিল।

বিনোদবাবু কহিলেন, “যামিনী, তুমি এত টাকা নষ্ট করতে গেলে কেন? যদি তোমার ওই মেয়েটাকে বিয়ে করবার এত ইচ্ছা হয়েছিল, স্পষ্ট ভাষায় সে-কথা আমাদের জানালেই পারতে। বাড়ির টাকা নষ্ট করে সেই টাকাতাই যুব দিয়ে তুমি আমাদের চোখ-কান বন্ধ করতে চেয়েছিলে?”

যামিনীর মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, কপালের শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল। বলিল, “আপনি আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে সম্বন্ধ করে কথা বলতে শিখুন। আমি সাবধান করে দিচ্ছি আমার স্ত্রীকে অসম্বন্ধ করে কথা বলবার অধিকার কারও নেই। টাকার জবাবদিহি আমি পরে করছি।”

বিনোদবাবুও অত্যন্ত রাগিয়া গিয়া রাগের মাথায় কহিলেন, “যে জোচ্ছোর আমাদের ঠকিয়েচে, তার মেয়ের

সম্বন্ধে আমরা কেন সন্দেহ ক'রে কথা বলব? বিয়ের সময় ভদ্রলোক গদগদ হয়ে বলেছিলেন, আমার যা সাধ সর্বস্ব দেব। তাঁর সর্বস্বের নমুনাটার খবর দু-দিন আগে কেন আমাদের জানান নি?”

যামিনী বলিল, “আপনি চুপ করুন। আপনাদের যে টাকা খরচ করেছি, সে ঋণ আমার। কড়ায়-গণ্ডায় তা শোধ ক'রে দেব।”

বিনোদ বলিলেন, “তা দিও। কিন্তু ভায়া কবে যে শোধ করবে তা-ই ভাবি। কবে, কোন্ জন্মে তুমি উকিল হবে, আর...এই বে দশ হাজার টাকা এক কথায় ফটু ক'রে খরচ ক'রে দিয়ে বসলে, এই টাকাটা নিজে উপার্জন ক'রে ক্ষমিয়ে তুলতে কত দিন লাগে সেই কথাটাই একবার মনে মনে চিন্তা ক'রো।”

“আপনার উপদেশের জন্ত ধন্যবাদ। চিন্তা করব বইকি। কিন্তু আমার বেশী দিন লাগবে না।”

তাহার কথার সুরে বিনোদবাবু আবার রাগিয়া কহিলেন, “তবে আরও যে একটা খবর আছে বলি শোন। সিঙিকিটের মেস্বর আমারবন্ধু নির্মলবাবু কি কাজে

এখানে এসছেন। তাঁর কাছে শুনে এলুম তুমি পরীক্ষায় ফেল করেচ।”

আর কোন কথা না বলিয়া যামিনী ঝড়ের বেগে সেখান হইতে চলিয়া গেল। তাহার সুগভীর লজ্জায় এই পলায়ন দেখিয়া বিনোদের মনে কষ্ট হইল। তিনি মায়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “ওসব নিয়ে আর হাঙ্গাম ক'রো না মা। টাকা গেচে, তেমনি সে টাকার গয়নাগুলো তো ঘরের বোয়েরই গায়ে আছে। আমার কথা যদি শোন তবে ওসব নিয়ে গোলমাল না ক'রে যামিনীকে মন দিয়ে পড়তে দাও। হাতে এবারে পরীক্ষাটা দিতে পারে। বার-বার বাধা পড়চে। ওর কপালে উকীল হওয়া আর ঘটে উঠল না দেখি।”

বড়বৌদি মহা পুলকিত হইলেন। কেবল তাহার একটা ক্ষোভ রহিল, নিশ্চল্য এত সব ব্যাপারের কিছুই জানিতে পারিল না। কিন্তু তাকে জানাইবারও তিনি অল্প উপায় করিলেন।

(ক্রমশঃ)

বিরহী

শ্রীশাস্তি পাল

ওগো বিরহ বিধুর পাখী,
কেন কুহরিছ থাকি থাকি
ওই পাতার আড়াল থেকে
কি বে কহিছ আমারে ডাকি।
কভু অশথ বটের ছায়ে
ডাক প্রভাত সন্ধ্যার বায়ে
এই শ্রামল স্নিগ্ধ গ'য়ে
কোন বনের গন্ধ মাখি ॥
তুমি ফাগুনের মাঝে এসে
কেন যাও বরষার শেষে

কোন সুদূর অজানা দেশে
মরি মরম বিদারী ডাকি।
আজি গোখুলির রাঙা-রাঙে
মোর পরাণ কি যেন মাগে
বুঝি মিলনের অহুরাঙে
মম ভাঁখি ছুটি আসে ঢাকি।
আজি অন্তরে থাকি থাকি
আমি তোমারে নিয়ত ডাকি,
সেই স্মৃতির আথর টানি
আহা প্রিয়ার ছবিটি আঁকি।

কোকস্ অভিযান

শ্রীবিমলেন্দু কয়াল, এম-এ

সম্প্রতি লগুন হইতে এক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অভিযানের উদ্যোগ হইয়াছে। এই যাত্রার লক্ষ্য লোকালয় হইতে ছয় শত মাইল দূরে অবস্থিত প্রশান্ত-মহাসাগরের মধ্যবর্তী কোকস্ নামক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। জানা গিয়াছে পৃথিবীর এই ক্ষুদ্র স্থানে বিরাট ধনসম্পত্তি স্পেন-দেশীয় জলদস্যুগণ প্রোথিত রাখিয়া গিয়াছে। এই অভিযান আধুনিক নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও তেত্রিশ জন খ্যাতনামা আবিষ্কারক লইয়া গঠিত। বাত্রীদল গত মার্চ মাসে পানামা যোজক হইতে তাঁহাদের যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন। এতাবৎ কালের মধ্যে সংবাদপত্রে এ-বিষয়ের কোনও বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হয় নাই; কেন-না এই অনির্দেশ যাত্রার আয়োজন ও উদ্যোগপর্ক অতি সংগোপনে: অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

বহু পরিমাণে স্বর্ণরৌপ্য মণিমুক্তা ও অন্যান্য মূল্যবান প্রস্তরাদি এই দ্বীপের কোন গহন গহ্বরে লুকায়িত আছে। সেই গুপ্ত ধনের রহস্যময় কাহিনী বাহাতে অতি অনায়াসে সাধারণো প্রকাশ না পায়, বোধ হয় সেইজন্যই এই অভিযানের কার্যাবলীর বিবরণ সাধারণের নিকট হইতে যথাসাধ্য গোপন রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে। তবে এই অভিযানের প্রধান উদ্যোগী বর্তমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্ততম পোতাধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ওরস্লির (Worsley) নিকট হইতে যতটুকু জানা গিয়াছে তাহারই মোটামুটি বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। যে শেকলটন্ অভিযান (Shackleton Expedition) দক্ষিণ-মেরু আবিষ্কারের জন্য যাত্রা করিয়াছিল, তাঁহাদের 'ইন্ডিয়োরেন্স' নামক জাহাজের ইনিই পরিচালক ছিলেন। বর্তমান যুগে অভিযানকারীগণের মধ্যে ইনিই অগ্রণী।

জলদস্যু ও তাহাদের ধনরত্ন

পূর্বকালে জলদস্যুগণ সচরাচর তাহাদের লুণ্ঠিত ধনরত্ন পুঁতিয়া রাখিত। এই ভাবে অধরাশি

লুকায়িত রাখিবার তাহাদের যথেষ্ট কারণও ছিল। ধৃত হইবার ভয় ও জাহাজডুবি প্রভৃতি দুর্ঘটনা তাহাদের ভাগ্যে নিত্যই ঘটত, সুতরাং এই সকল ধনরত্ন তাহারা স্বদেশে লইয়া যাইতে সমর্থ ও সাহসী হইত না। জাহাজের দস্যুসর্দার এই অসীম ধনরত্ন জাহাজের কোষাগারে রাখিবার বিপদ সম্যক উপলব্ধি করিত; কারণ কে-কোন মুহূর্তে জাহাজের লোকেরা তাহাকে হত্যা করিয়া ধনরত্ন আত্মসাৎ করিতে বিদ্মুদ্র কৃষ্ণিত হইবে না। বস্তুতঃ এই বিরাট সম্পদ কিরূপে রক্ষা করা যাইতে পারে তাহা সর্দারের বিশেষ চিন্তার কারণ হইত; তাই, যত শীঘ্র পারিত, সর্দার সেগুলিকে কোন গুপ্ত স্থানে সরাইয়া ফেলিত। যদি কখন দুর্ভাগ্যবশতঃ সর্দার ও তাহার দলের লোকেরা ধরা পড়িত অথবা সর্দার মৃত্যুমুখে পতিত হইত, তাহা হইলে এই বিরাট ধনরাশি অনুচরগণের তথা সাধারণের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকিত। তবে অনুচরগণ মাঝে মাঝে এই সকল অর্থ উদ্ধারের যথেষ্ট চেষ্টা করিত, কিন্তু সে-পথে তাহাদের বিলম্ব বাধাবিঘ্ন ছিল। কেন-না, এই ধনরাশি উদ্ধার করিতে হইলে প্রথমে একটি জাহাজের প্রয়োজন হয় কিন্তু তখনকার দিনে এরূপ একটি বিরাট ভলয়ান সংগ্রহ করা দুর্লভ ও কঠিন ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইত; কখনও কখনও তাহারা অন্ত দস্যুসর্দারের নিকট কথা পাড়িত বটে, তবে বিশেষ আস্থা না পাইলে তাহারা গুপ্ত ধনের সন্ধান কাহারও নিকট প্রকাশ করিত না। তাহাদের দুর্ভাগ্যের অন্ততম কারণ কুসংস্কার এবং এই দুর্ভাগ্যের সুযোগ লইয়া দলপতির তাহাদিগকে ধনরাশি হইতে বঞ্চিত করিত। সুতরাং এই বিভ্রম দ্বীপের জলদস্যুগণ প্রাণের বিনিময়েও কাহাকেও তাহাদের এই গুপ্ত ধনের কথা প্রকাশ করিত না। এই ভূগর্ভনিহিত বিরাট ধনরাশির কথা অনেকটা রূপকথার আখ্যায়িকার মত প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে যে প্রভূত সত্য নিহিত আছে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

জলদস্যুদের ধনসম্পত্তির বিষয় আলোচনা ও পরিমাণ

নির্ধারণ করিবার পূর্বে স্পেন কর্তৃক পেরু অধিকারের ইতিহাস কিঞ্চিৎ অনুশীলন করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে। পেরুর অধিবাসীরা সূর্য-উপাসক ছিলেন; তাঁহাদের বাসস্থান সাধারণের নিকট স্বর্ণলক্ষা বলিয়া অভিহিত হইত। প্রকৃতপক্ষে এই আধ্যাতিক ভিত্তিহীন ছিল না। স্পেনীয় গুপ্তচরগণ যখন এ-দেশে প্রথম বসবাস আরম্ভ করিল তখন তাহারা সত্যই এ-দেশের প্রাকৃতিক ও ধাতব সমৃদ্ধিতে বিস্মিত হইয়া পড়িল। এ যেন আলাদিনের বাজু-প্রদীপ অপেক্ষাও বিস্ময়কর। চারি দিকে কেবল স্বর্ণ-কাঞ্চনের অপূর্ব সমারোহ!

সূর্য-উপাসক 'ইনকা'দের (Inca) এই দেশে ব্যবহারিক মূল্য অপেক্ষা উজ্জ্বলতার জন্যই স্বর্ণের বিশেষ সমাদর ছিল। স্বর্ণ-নির্মিত বিশাল দেউলে হেমময় দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইত। স্বর্ণ দেবতা দিনকরের প্রতীকস্বরূপ ব্যবহৃত হইত এবং স্বর্ণরশ্মি প্রচণ্ড মর্ত্যের কিরণ-ধারা বলিয়া অনুমিত হইত। 'ইনকা'দের দেবতা বে-পাত্রে ভোজন ও স্নান করিতেন তাহাও স্বর্ণময় ও মণিমণিকা খচিত ছিল এবং বে-পাত্রে তিনি একবার মুখস্পর্শ করিতেন তাহা অপর দ্বিতীয় বার ব্যবহারের জন্য অনীত হইত না,—মন্দিরের ধনভাণ্ডারে রক্ষিত হইত। ঐতিহাসিকগণ বলেন "কোরিকাঞ্চা"র (Coricancha) সূর্য-মন্দিরের যাবতীয় সামগ্রী, এমন কি উদ্যান-খননের গোদাল-কাস্তে পর্যন্ত স্বর্ণনির্মিত ছিল। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রকাণ্ড দালানের পূর্ব-পশ্চিম ব্যাপিয়া বিরাট স্বর্ণময় সূর্যমূর্তি শোভা পাইত।

পেরুর প্রাচীন ইতিহাসলেখক সিঙ্জা-দা লি'য়ো (Gieza de Leon) এক প্রমোদ-কাননের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সেই কাননের রোশাশাখা-বিস্তৃত স্বর্ণ-পুষ্প-সুশোভিত হেমময় বৃক্ষের প্রত্যেক শাখায় স্বর্ণপক্ষী শোভা পাইত। ঐ স্বর্ণ-পুষ্পের মধ্যে কোনটি-বা সাদৃশ্য যুক্তি কোনটি বা পূর্ণ প্রফুল্লিত! তাহাদের কারু-নৈপুণ্য সত্যই খুব প্রশংসনীয় ছিল। লি'য়ো ঠিক এই প্রকারের আর একটি উদ্যানের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। সেখানে স্বর্ণময় শাখা-পত্র সুশোভিত ভূট্টা বৃক্ষ শোভা পাইত। এই কৃত্রিম স্বর্ণোদ্যানে প্রায় কুড়িটি স্বর্ণময়

মেঘ তাহাদের নিজ নিজ শাবকের সহিত বিচরণ করিতেছে ও স্বর্ণময় মেঘপালকের দল তাহাদের পাহারা দিতেছে!

ঐতিহাসিক ফ্রান্সিসকো লোপেজ (Francisco Lopez) বলিয়াছেন যে ঐ দেশের এমন কোন দ্রব্য ছিল না, যাহাতে কিছু-না-কিছু স্বর্ণের আভাস না থাকিত! স্পেনীয়গণের আবিষ্কারের সমসাময়িক যুগে পেরু এইরূপ ছিল। ইহাকে দ্বিতীয় স্বর্ণলক্ষা বলা যাইতে পারে। স্বর্ণসঞ্চয়ের আশায় দলে দলে স্পেনীয়গণ এদেশে আগমন করিতে লাগিল। তাহারা পেরুর মণিমুক্তাখচিত মন্দিরের যাবতীয় ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া জাহাজ-বোঝাই স্বর্ণ স্বদেশে চালান দিতে লাগিল। দেশে হাহাকার পড়িয়া গেল, স্পেনীয়গণ দেণীয়গণকে (Indians) ধনিত্তে নিযুক্ত করিল এবং অবর্ণনীয় অত্যাচার আরম্ভ করিল; পঁচিশ বৎসরে ইনকার আট লক্ষ প্রজা ধ্বংস হইয়া গেল। এইরূপে অনাহারে ও অধ্বংসে দেশের অধিকাংশ (১/৩ ভাগ) লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কথিত আছে দেশের যিনি নেতা তাঁহাকে স্পেনীয়রা বন্দী করিয়াছিল এবং তাঁহার মুক্তির সর্ত্তে ঠিক হইল যে দেশের লোকেরা তাঁহার উদ্ধারের জন্য স্পেনীয়দিগকে প্রচুর স্বর্ণ উপঢৌকনস্বরূপ দিবে। প্রায় এগার জন লীমা এই স্বর্ণ বহন করিয়া লইয়া চলিল কিন্তু কোন ক্রমে দেশের লোকেরা অবগত হইল যে স্পেনীয়গণ তাহাদের দলপতিকে নিহত করিয়াছে; সুতরাং তাহারা তাড়াতাড়ি সমুদয় স্বর্ণ জৌজার (Jauja) নিকটবর্তী একটি স্থানে লুকায়িত রাখিল। অধুনা এই বিপুল ধনরাজি উদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে। স্পেনীয়গণের অমানুষিক অত্যাচারের ফলে পেরুর অধিবাসীরা বৃষ্টিতে পারিল যে স্বর্ণই তাহাদের সমস্ত হৃদয়-কারণ, সেইজন্যই দেবতার পূজা-উপচারে তাহারা আর স্বর্ণের সমারোহ করিত না। এই জন্য সকলে নিজ নিজ ধনরত্ন একত্র করিয়া মৃত্তিকাগর্ভে পাহাড়ের গহন গুহায় নিহিত রাখিল; দেবতাকে শোভিত করিবার জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করিতে তাহারা সাহস পাইল না।

আমরা যে-সময়ের কথা বলিতেছি, তখন স্পেনীয়গণ অত্যন্ত জাঁকজমকপ্রিয় ছিল। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে এক স্পেনীয়

রাজপ্রতিনিধিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য পেরুর রাজধানী লীমার রাজপথ রৌপ্যমণ্ডিত হইয়াছিল। স্পেনীয়গণ অভিযানের জন্য যে জাহাজ ব্যবহার করিত তাহারও গঠন ছিল অত্যন্ত উন্নত প্রকারের; ইহা কারুকার্যখচিত ও বিশাল দুর্গের আকৃতিবিশিষ্ট; সুতরাং তাহার গতিশক্তি ছিল অতিশয় মন্থর। পক্ষান্তরে স্পেনীয় জলদস্যুগণ যে জাহাজে বিচরণ করিত তাহা অত্যন্ত হালকা এবং তীব্র গতিশক্তি সম্পন্ন; সুতরাং ঐ সকল স্বর্ণভারে-মন্থরগতি স্পেনীয় জাহাজ লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করা তাহাদের পক্ষে দুর্লভ ছিল না। উপরন্তু স্পেনীয় জাহাজ লুণ্ঠন করা তখনকার কালে (সপ্তদশ শতাব্দীতে) ভূদ্রলোকের বৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। বিশিষ্ট ব্যক্তির। এই কার্যে যথেষ্ট শ্রমী বোধ করিতেন। সার ক্রাফিস ডেক এই শ্রেণীর দৃষ্টা ছিলেন; তিনি যে জাহাজটি লইয়া প্রশান্ত-মহাসাগরের গমন-পথ অবরোধ করিয়া থাকিতেন তাহার নাম “গোল্ডেন হিন্দ”, ইহার পতাকা ও দণ্ড রৌপ্যনির্মিত ছিল। প্রায় বাটটি জাহাজ তাহার অধীনে কাঙ্গ করিত। এই জলদস্যুগণ তাহাদের লুণ্ঠিত অর্থ স্বদেশে লইয়া যাইত না; প্রশান্ত মহাসাগরের কোন দ্বীপে অথবা সমুদ্র-উপকূলে লুকায়িত রাখিত। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে এই দ্বীপই বর্তমান প্রবন্ধে বর্ণিত কোকস দ্বীপ।

‘ইনকা’ যুগের বহু পূর্বে পেরু দেশে এক জাতির লোক বসবাস করিত, ইহারা সমুদ্র-উপাসক ছিল। স্বর্ণনির্মিত একটি প্রকাণ্ড মকরমূর্তি সেখানে পাওয়া গিয়াছে; প্রায় তিন কোটি ডলার মূল্যে উহাকে বিক্রয় করা হইয়াছে।

কোকস দ্বীপে লুকায়িত পেরুর ধনরাশি

কোকস দ্বীপ জলদস্যুদের গুপ্ত ভাণ্ডারের অন্ততম স্থান। এই গুপ্ত ভাণ্ডারের কথা ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দ হইতে নাবিকগণের জ্ঞাত ছিল। এই সময় তিন জন বিখ্যাত নৌ-অধ্যক্ষ—কুক, ডেভিস এবং ডাম্পিয়ার এই গুপ্ত রত্ন উদ্ধারের আশায় বহির্গত হন; কিন্তু গুপ্ত ধনভাণ্ডার আবিষ্কারের পূর্বেই ক্যাপ্টেন কুক মৃত্যুমুখে পতিত হন; সুতরাং আবিষ্কারের ভার ডেভিসের হস্তে গুপ্ত হয়। ইহার জাহাজের নাম ছিল “ব্যাচিলরস্ ডিলাইট”।

পূর্বেই বলা হইয়াছে ‘ইনকা’দের সময় মুদ্রাহিসাবে স্বর্ণ ব্যবহৃত হইত না। উহার উজ্জ্বল্যই সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত এবং ইহা হইতেই ‘ইনকা’গণের জ্যোতিষ্ময় সূর্য্যদেবতার মূর্তি ও মন্দিরের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ‘ইনকা’দের এই রীতিনীতি পেরুর স্পেনীয়গণও কিয়ৎ পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছিল এবং তদনুসারে তাহাদের উপাসনা-মন্দিরের স্বর্ণবেদী নির্মিত হইত। পেরুর রাজধানী লীমা নগরীর একটি পূর্ণ পরিমাপের ম্যাডোনা ও খ্রীষ্টের দ্বাদশ জন শিবোর হৈমমূর্তি ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

টমসনের কাহিনী

সাধারণের বিশ্বাস, এই মূর্তিগুলি ও তৎসঙ্গে বহু পরিমাণ ধনরত্ন, মণিমুক্তা ও স্বর্ণ কোকস দ্বীপের কোনও গুপ্ত গহ্বরে নিহিত আছে। লীমা নগরীর যেখানে এই মূর্তিগুলি প্রতিষ্ঠিত ছিল এখনও তাহার চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। যে-সকল ব্যক্তি এই ধনভাণ্ডার অপহরণ করিয়া অন্ত্র স্থানান্তরিত করিয়াছিল তাহাদেরও বিচার ও প্রাণ-দণ্ডের যাবতীয় ইতিবৃত্ত রাজধানীর সেরেস্তাখানায় অদ্যাপি রক্ষিত আছে। এক শত কুড়ি বৎসর পূর্বে যখন এই সকল ঘটনা সংঘটিত হয় ও যখন স্পেনীয় আমেরিকানগণ স্বদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধযোষণা করে তখন বোলিভার নামক এক ব্যক্তি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে; আমেরিকাবাসী এই স্পেনীয় নিজেকে দেশের ত্রাণকর্তা বলিয়া ঘোষণা করেন; এমন কি ইনি কলম্বিয়া ও ভেনিজুয়েলায় দুইটি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাতে নগরের কর্তৃপক্ষগণ বিশেষ ভীত ও বিচলিত হইয়া পড়িল; তদনুসারে দেশের অধিবাসিহীন একটি সভা আহূত করিয়া অনতিবিলম্বে বিভিন্ন দেবমন্দিরের স্বর্ণরৌপ্য ও মণিমুক্তা এবং রাজ্যের কোষাগারে রক্ষিত যাবতীয় ধনরত্ন আট মাইল দূরবর্তী কালাও (Callao) দুর্গে স্থানান্তরিত করিতে মনস্থ করিল। নগরের সাধারণ অধিবাসিগণ তখন তাহাদের নিজস্ব অর্থাপিও এই সঙ্গে উক্ত নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। এই সময়ে কালাও বন্দরে টমসন নামক এক জন ব্রিটিশ

নৌ-সেনাপতি 'মেরী ডায়ার' নামক জাহাজ লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। উক্ত বন্দরের কোনও গুপ্ত স্থানে ধনসম্পত্তি নিহিত রাখা নিরাপদ নয় ভাবিয়া তাহারা টমসনকে বিশ্বাস করিয়া তাহাদের সমুদয় ধনরত্ন জাহাজে পাঠাইয়া দিল। টমসন এত ধনের লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। রাত্রিকালে সমস্ত লোকজনকে নিহত করিয়া এই বিরাট ধনসম্পদ দূরবর্তী জনবিরল কোকস্ দ্বীপে, জলরেখা হইতে মাত্র ৪০ গজ দূরে, একটি গুহায় স্থানান্তরিত করিয়া লুকায়িত রাখিলেন। এই ধনের পরিমাণের কথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়; গিজ্জা হইতে ২০ লক্ষ পাউণ্ড-স্টার্লিং মূল্যের স্বর্ণ, মেরী ও তাহার পুত্রের পূর্ণ পরিমাপের দুইটি স্বর্ণমন্দি, সাত

দুই লক্ষ ২৭৩টি স্বর্ণময় দীপদান, তিন হাজার হীরকখণ্ড, প্রস্তরখচিত তরবারি এবং অসংখ্য বহু প্রকারের অমূল্য জহরৎ, পান্না ও মণিমুক্তা প্রভৃতি এবং স্পেনীয় অধিবাসিগণের ১০ লক্ষ পাউণ্ড-স্টার্লিং মূল্যের স্বর্ণালঙ্কার ও অসংখ্য বহুমূল্য ধাতু টমসনের জাহাজে প্রেরিত হয়। এতদ্ব্যতীত গভর্ণমেণ্টের অর্গশালার বহু মদ্রাও ছিল। তাহার পরিমাণ অদ্যাপি নিদ্ধারিত হয় নাই।

এই ঘটনার কিছু পরে পেরুর নৌ-সেনাদল কতক 'মেরী ডায়ার' গুহা হয় এবং বিচারে ইহার সমস্ত নাবিক প্রাণদণ্ড প্রাপ্ত হয়; কিন্তু বাহাতে তাহার নিকট হইতে গুপ্ত ধনভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে, তজ্জন্ত টমসনকে প্রাণে অবাচ্যতা দেওয়া হয়। তাহাকে বন্দী অবস্থায় কোকস্ দ্বীপে আনয়ন করা হইল কিন্তু কোনওক্রমে তিনি তাহাদের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া ধনবৃক্ষবহুল গিরিগুহার অভ্যন্তরে আয়গোপন করিলেন। অন্যাহারে তিনি প্রায় মৃত্যু অবস্থায় উপনীত হইলেন; তখন সৌভাগ্যক্রমে একটি মৎস্য-শিকারী নৌকার সাহায্যে কোনক্রমে তিনি পুন্টারেনাস্ (Puntarenas) নামক একটি ক্ষুদ্রপরিসর স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং

আপনাকে ক্যাপ্টেন ক্যাম্পবেল নামে পরিচয় দিলেন। কয়েক বৎসর পরে যখন তিনি পুনরায় কোকস্ দ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্ত একটি জাহাজের পুনঃসংস্কার করিতে ব্যাপৃত ছিলেন তখন সহসা নিউফাউন্ডল্যান্ডের অন্তর্গত সেন্ট জন



ওয়েফার উপসাগর। তাহারই উপকূল জলদস্যুগণ শিবির সন্নিবেশ করিত

নামক স্থানে যত্নমুখে পতিত হন। এইরূপে বিভিন্ন জলদস্যুদের ধনরত্ন দ্বীপের নানা স্থানে জনসাধারণের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

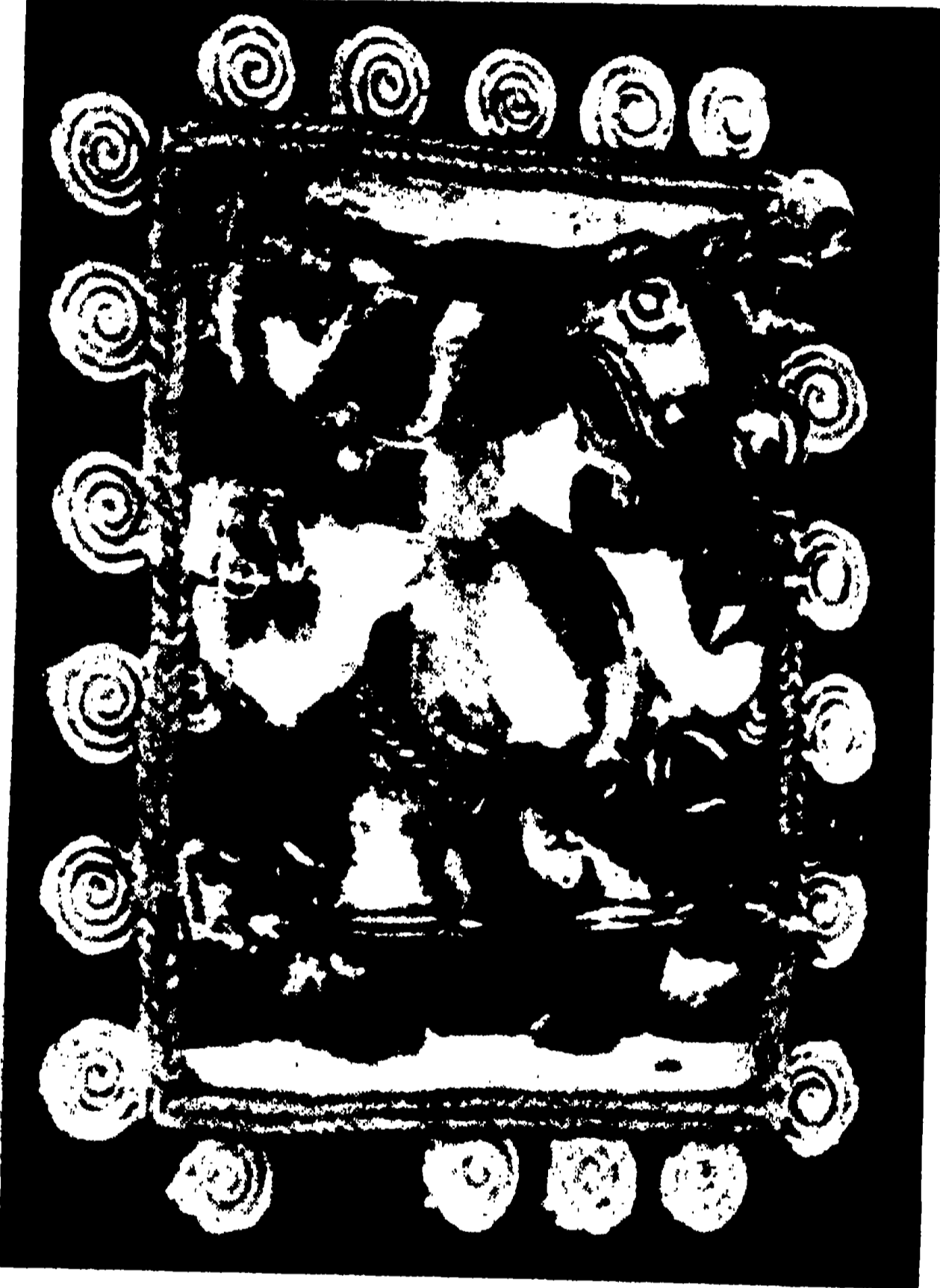
এই স্থানে টমসনের একটু অনতিবিস্মৃত বিবরণ শুদান



ওয়েফার উপসাগরের উপকূলভাগ। বর্তমান অভিযান এতখানেক অবহরণ করিবার সম্ভব করিয়াছেন

করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। টমসন এই বিরাট ধনসম্পদ ওয়েফার উপসাগরের কূলে কোন গিরিগহ্বরে স্থানান্তরিত করিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন না। গুহামুখে লতাগুল্মের আচ্ছাদন দিয়া তিনি এই গুপ্ত স্থানের একটি

মানচিত্র রচনা করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার নিকট কাগজ ও কালি ছিল না—শুধু একটি কলম ছিল। সুতরাং কোনও একটি পুস্তকের আবরণপত্র ছিন্ন করিয়া, এক অজানা বৃক্ষনিঃসৃত রসে তিনি এই গোপনতম গিরি-গুহার একটি মানচিত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কিছু মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এই মানচিত্র তিনি সদাসর্বদাই আপনার নিকট রাখিতেন।



কোন উনুকা কারিকারের পোদিত এই সর্গমূর্তি
কোকস দ্বীপে নিহিত আছে

মুম্বু অবস্থায় কোকস দ্বীপ হইতে পলায়ন করিয়া কিছুদিন পরে তিনি সেন্ট্ জন নামক স্থানে আগমন করেন। তখন তাঁহার নাম ক্যাপ্টেন ক্যাম্পবেল। স্থানীয় একটি আবিষ্কারক দলকে তিনি কোকস দ্বীপের গুপ্ত স্থানের কথা লোকমুখে শুনিয়াছেন বলিয়া এক মিথ্যা বিবৃতি প্রদান করেন; তিনি এই দলকে আরও বলিয়াছিলেন যে স্বয়ং তিনি এখনটনা একেবারেই বিশ্বাস করেন না। টমসন উক্ত আবিষ্কারক দলকে একটি মিথ্যা মানচিত্রও প্রদান করেন, তাহাতে লিখিত আছে—

‘Walk up the little creek into the stream forty paces above high-water mark. From the turn off to a westerly direction as far as big dome-shaped boulder. This boulder blocks the entrance to a cave in which the treasure is hidden. At the top of the boulder is a small square hole, big enough to admit of a man’s thumb. In this hole, insert an iron bar and exert pressure when the stone will turn upon pivots and expose the treasures.’

অর্থাৎ, নদীর পাশ্চাত্য ছোট সরু রাস্তাটি ধরিয়া চল্লিশ পা অগ্রসর হইয়া পশ্চিম দিকে চলিতে থাকিলে একটি বৃহৎ অর্ধগোলাক পর্বত-শিলা দেখিতে পাউবে। ইহা গুপ্ত গুহার দ্বার অবস্থিত। শিলার উপরে একটি চতুষ্কোণ সরু ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র পাশে এক লৌহ প্রবেশ করাইয়া চাপ দিলেই এই প্রস্তরশিলাখানি গিলানের উৎসূরিয়া গিয়া গুপ্ত ধনভাণ্ডারের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দিবে। টমসনের এই মিথ্যা মানচিত্র গত এক শত বর্ষ ধরিয়া শত সহস্র আবিষ্কারক-দলকে পথভ্রান্ত করিয়া দিতেছে!

যাহা হউক, আসল মানচিত্রখানি কোনও নিরাপত্তা স্থানে লুক্কায়িত রাখিবার জন্য টমসন বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তাঁহার পুস্তকাধারে তিনি এই মহা মূল্যবান মানচিত্রের স্থান নির্দেশ করিলেন। নৌ-বিদ্যার সম্বন্ধে তাঁহার একখানি পুস্তক ছিল। তাহা মলাট খুব পুরু ছিল; তাহাতে ছুরির অগ্রভাগের দ্বারা একটু ফাঁক করিয়া তিনি একটি খল প্রস্তুত করিয়া তাহা মধ্যে এই মানচিত্র লুক্কায়িত রাখিলেন এবং তৎপরে তাহার মুখ জুড়িয়া দিলেন।

ইতিমধ্যে টমসন অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং গভীর দারিদ্র্যানিবন্ধন গৃহকর্ত্রীকে বাড়ি-ভাড়া প্রদান করিতে সমর্থ না হওয়ায় মহিলাটি টমসনের যাবতীয় সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া লইল। টমসন করুণ ক্রন্দনের সহিত গৃহকর্ত্রীর নিকট অনেক নিবেদন জানাইলেন কিন্তু তিনি টাকা পাইলেই সমস্ত টমসনকে ফিরাইয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। ধীরে ধীরে টমসনের শেষ মুহূর্ত বনাইয়া আসিতে লাগিল। আসন্ন মৃত্যুর ছায়া দেখিয়া বনীভূত হইয়া আসিল তখন তিনি নিজেকে ‘মেরী ডায়ারে’র ছদ্মস্ত পরিচালক নাবিকশ্রেষ্ঠ টমসন বলিয়া পরিচয় দিলেন এবং রূপাপরবশ হইয়া রক্তক্ষততার চিকিৎসার ততোধিক দরিদ্র গৃহকর্ত্রীকে তাঁহার প্রিয়তম কোকস দ্বীপের গুপ্ত গুহার মানচিত্রের কথা বিবৃত করিলেন। সবিম্বয়ে গৃহকর্ত্রী পুস্তক অন্বেষণে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

কিন্তু দৈব প্রতিকূল; দারিদ্র্যের নিষেধে তিনি বহু পূর্বেই সেই পুস্তক কোন অজানা ভাগ্যবানের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন!

বহুদিন অতীত হইয়া গিয়াছে। যদি ধ্বংস হইয়া না যায়, তবে ক্যাপ্টেন টমসনের প্রাণাধিক প্রিয়তম মানচিত্র আজ কোন ভাগ্যবানের অপরিষর গ্রন্থাগারের নিষ্কল কোণে সম্পূর্ণ লোকচক্ষুর অগোচরে লুকায়িত রহিয়াছে!

অত্যাচল গুপ্তধন

কেবল যে লীমার ধনভাণ্ডারই এই দ্বীপে নিহিত আছে তাহা নহে। অত্যাচল চতুর্পার্শ্বস্থ অনেক স্থানের অতুলনীয় ধনরাজি এখানে গুপ্ত ভাবে রক্ষিত আছে বলিয়া যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। একরূপ ধনরত্ন এখানে যাহারা লুকাইয়া রাখিয়াছেন তাহাদের মধ্যে ক্যাপ্টেন ডেভিসের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। ক্যাপ্টেন কুকের মৃত্যুর পর ডেভিস “বাচিলরস্ ডিলাইট” নামক জাহাজ লইয়া প্রশান্ত-মহাসাগরে লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতেন। এখানে ক্যাপ্টেন সোয়ান তাহার “মিগনেট” নামক জাহাজটি লইয়া ডেভিসের সহিত যোগদান করেন এবং পানামা উপ-সাগরে উভয়ে মিলিয়া আপনাদের গণনবৃত্তি চরিতার্থ করিতেন। জলদস্যু হিসাবে তিনি একরূপ বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন যে আরও আটটি দস্যুদল তাহাদের জাহাজসমেত তাহার সহিত যোগদান করিল। ডেভিস এই বিশাল জলদস্যুদলের শক্তিমান নেতার পদে উন্নীত হইলেন। এইরূপে তাহার অল্লেক্ষযোগ্য ও নিপুণ লুণ্ঠন-প্রণালীর বার্তা দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাহার লিয়ো (Leon) ও গোয়াকুয়িল

(Guayaquil) শহর লুণ্ঠনই সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় ও ভ্রূসাত্বসের পরিচায়ক। এই লুণ্ঠনের যাবতীয় বস্তু তিনি কোকস্ দ্বীপে স্থানান্তরিত করেন। মে-উপসাগরের কূলে উন্নত গিরিশৃঙ্গে ডেভিস তাহার সেনাশিবির সন্নিবিষ্ট



পুকের এক অভিযাত্রাদল এখানে ভ্রূস ধনের অন্বেষণ করিতেছে

করিতেন, বিখ্যাত জলদস্যুদের ইতিহাস-লেখক লিয়োনেল ওয়েফার (Leonel Wafer) স্বকীয় নামানুসারে তাহার নামকরণ করিয়াছেন. “ওয়েফার বে”।

ডেভিসের সমসময়ে প্রশান্ত-মহাসাগরে আর একজন

ভূকর্ষ জলদস্যুর আবির্ভাব হয়, তাঁহার নাম বেনিতো (Benito)। “রক্তপিপাসু বনিতো” (Bonito of the Bloody Sword) নামেই তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন ; তাঁহার আসল নাম ছিল বেনেট গ্রেহাম। ভূভাগক্রমে তিনি



সোনার ঢাল। ইহা কোকস দ্বীপে পাওয়া গিয়াছে

তাঁহার একছত্র আধিপত্য অধিক কাল অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হন নাই। ব্রিটিশ নৌ-সেনাদল ‘এস্পিগল্’ (Espiegle) নামক জাহাজের সাহায্যে তাঁহাকে ধৃত করেন। ইনিও তাঁহার সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য কোকস দ্বীপে লুকায়িত রাখিতেন। অত্যাণ্ড ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তিও এ-স্থানে সময় সময় প্রোথিত রাখা হইত।

ধনের পরিমাণ

সরকার কর্তৃক মুদ্রিত কয়েকটি তথ্যপুস্তক (Foreign Office Handbooks, no. 141 and 142) পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, ১৮১৮ সাল হইতে কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রায় এগার লক্ষ ডলার মূল্যের স্বর্ণ ও রৌপ্য ঐ দ্বীপে বেনিতো কর্তৃক প্রোথিত হয়। কথিত আছে, শুধু পেরুর কয়েকটি গির্জা লুণ্ঠন করিয়া বেনিতো এই বিরাট ধনসম্পত্তি অপহরণ করেন। ঐ সমস্ত পুস্তক পাঠে আরও অবগত হওয়া যায় যে, টমসন্ কর্তৃক প্রায় ১০ লক্ষ ডলার

মূল্যের স্বর্ণও ঐ স্থানে লুকায়িত রাখা হইয়াছে। এই বিশাল ধনসম্পত্তিও পেরুর দেবমন্দিরাদি ধ্বংস করিয়া অপহরণ করা হয়। ভূদ্বীপ দস্যুসদ্বীর বেনিতো কোকস দ্বীপে যে-ধন লুকায়িত রাখিয়াছেন তাহার পরিমাণ প্রায় ৩৫০ টন হইবে। এই সমস্ত ধন নিম্ন-ক্যালিফোর্নিয়া, মেক্সিকো ও পেরু হইতে সংগৃহীত হয়। ডেভিস্ বে-সম্পদ কোকস দ্বীপে রাখিয়াছিলেন তন্মধ্যে মোট রৌপ্যের ওজনই প্রায় তিন শত হাজার পাউণ্ড, স্বর্ণদণ্ডের সংখ্যা সাত শত ত্রিশটি। তৎসঙ্গে আরও সাতটি খলিপূর্ণ স্বর্ণমুদ্রাও আছে। ইহা বাতীত অত্যাণ্ড জলদস্যুগণ যে-সমস্ত অর্থ এখানে লুকায়িত রাখিয়া গিয়াছে তাহাও ক্রমশঃ অভিযানকারীদের নিকট হইতে প্রকাশিত হইবে। দুই বৎসর হইল মেক্সিকো দেশে একরূপ একটি গুপ্ত ধনভাণ্ডার আবিষ্কৃত হইয়াছে ঐ আবিষ্কৃত ধনরাশির মূল্য প্রায় ছাদশ লক্ষ ডলার।

ধনভাণ্ডারের অনুসন্ধান

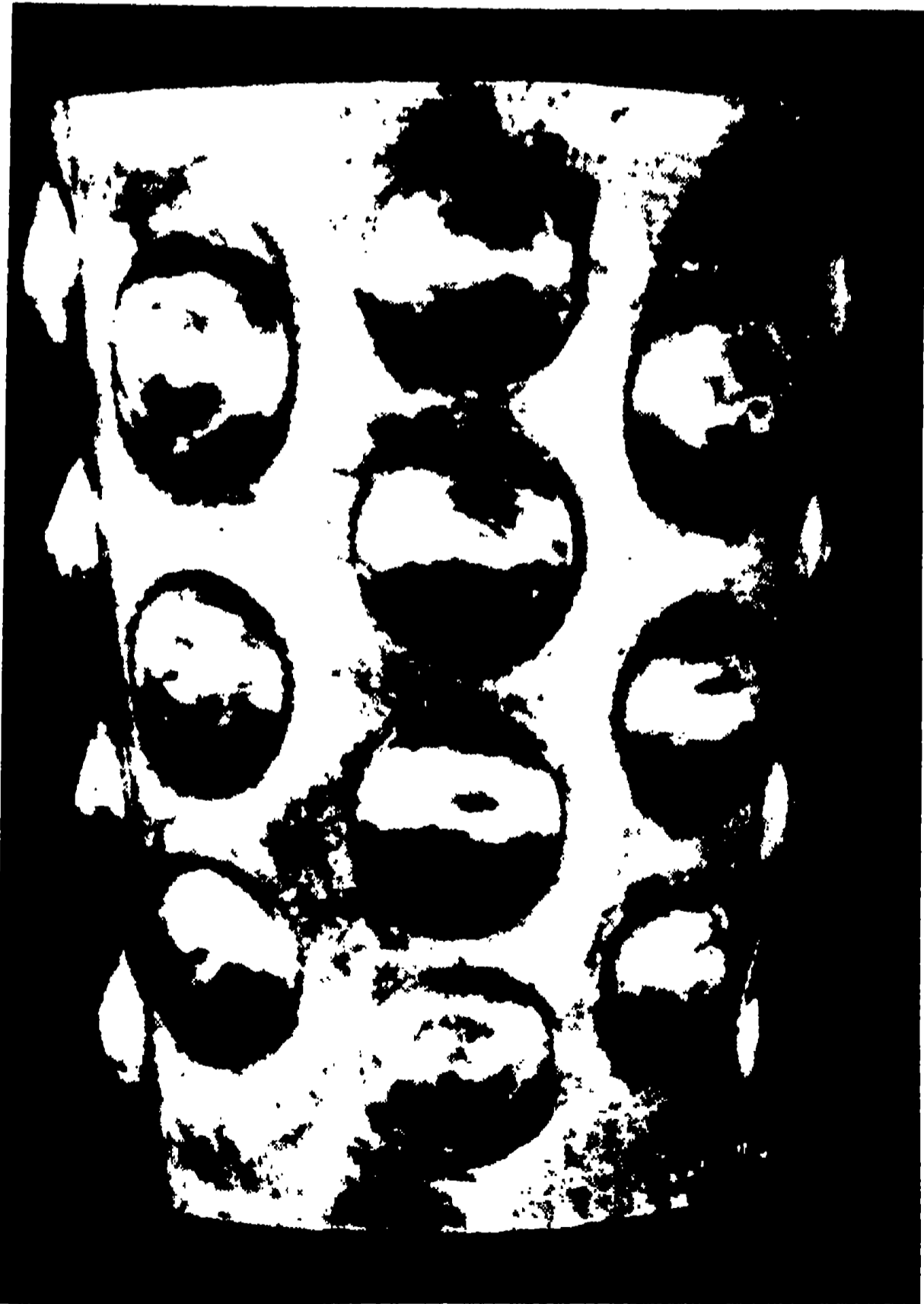
বর্তমান অভিযানের মলে থাকিবে আধুনিক সুউন্নত নানা বৈজ্ঞানিক প্রণালী ; ইহার সাহায্যে লুকায়িত ধনসম্পত্তি বাহির করিতে বিশেষ অত্নবিধা হইবে না। এই অভিযানে বাহারা লিপ্ত থাকিবেন তাঁহারা সকলেই বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশেষ অভিজ্ঞ। যে-সকল স্থানে গুপ্ত ধন লুকায়িত থাকিবার সম্ভাবনা আছে তাহা স্থিরীকৃত করিবার জন্য সুশৃঙ্খল বৈজ্ঞানিক আকর্ষণ শক্তির (Electromagnetic methods) সহায়তা গ্রহণ করা হইবে। এই কার্যের সফলতার জন্ম নানাপ্রকার বস্তুপাতি সংগৃহীত হইয়াছে ও প্রায় নয় প্রকার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করা হইবে। ইহার দ্বারা কোন ধাতু কোন স্থানে কি প্রকারে অবস্থান করিতেছে অনাগ্রাসে তাহা উপলব্ধি করা বাইতে পারা যায়। বিশিষ্ট উচ্চশক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎপ্রবাহও (Ultra-high frequency current) এই অভিযানের সফলতার জন্ম নিয়োজিত করা হইয়াছে।

কোকসদ্বীপ জলদস্যুদিগের গুপ্ত ধনের প্রধান আড্ডা। এ-কথার উল্লেখ আমরা পূর্বেই করিয়াছি। রক্তপিপাসু দস্যুসদ্বীর বেনিতো ধৃত হইবার পর ব্রিটিশ রণপোত

“এম্পিগ্ল” ও পরে ১৮৯৭ সালে “ইম্পিরিয়ুস” নামক আর একটি যুদ্ধজাহাজ এই গুপ্ত ধনের উদ্ধারের জন্ত প্রেরিত হইয়াছিল। বহুদিন হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই গুপ্ত ধনভাণ্ডারের উদ্ধারের জন্ত সবিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। কয়েকটি বিখ্যাত ব্যক্তির নাম এই সূত্রে দেওয়া হইল। ১। নৌ-সেনাপক্ষ পালিসার (Admiral Palliser), ২। মেজর ডি মণ্টমোরেন্সি, ৩। লড ফিটসউইলিয়াম, ৪। স্মর মেলকলন্ কাম্পবেল প্রভৃতি। ইহাদের আবিষ্কার-কাহিনী নৌ-বিভাগের দপ্তরখানায় পাওয়া যাইবে। ইহার কোন-না-কোনটির উপর ভিত্তি করিয়া বর্তমান অভিযান অগ্রসর হইতেছে। ইহাদের সফলতা কয়েক জন গনিপণ মহাপাক্ষ ও দূরদর্শী বিচক্ষণ নাবিকের বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করিতেছে।

কোকস দ্বীপ

দ্বীপটি দৈর্ঘ্যে সাড়ে চার মাইল ও পরিধিতে চতুর্দশ মাইল। উক্ত দ্বীপটি কোষ্টারিকার অন্তর্গত



কোকস দ্বীপে প্রাপ্ত ইনুকারের একটি স্বর্ণময় পাত্র

পুর্টারেনাস নামক স্থান হইতে তিন শত মাইল ও পানামা-যোজক হইতে পাঁচ শত মাইল দূরে পূর্ব-প্রশান্ত-মহাসাগরে অবস্থিত। সমস্ত স্থানটি বন বৃক্ষলতাদিদ্বারা আচ্ছাদিত ও পর্বতসঙ্কুল। চতুর্দশ পর্বতমালা অতল সমুদ্রগর্ভ হইতে



কমান্ডার উরস্লে। ইনিই কোকল্টনের দক্ষিণ-মেরু অভিযানের পরিচালক ছিলেন। বর্তমান অভিযানেরও তিনি পরিচালক

উস্থিত হইয়া এক ভূভেদ প্রাচীর সৃষ্টি করিয়া দ্বীপটিকে রক্ষা করিতেছে—যেন প্রকৃতিদেবীর এই নির্জজন লীলা-নিকেতন সভ্যতা-দৃশ্য মানবের পদস্পর্শে কলুষিত হইয়া না যায়! উক্ত প্রান্তে চাথাম ও ওয়েকার নামক দুইটি উপসাগর দ্বীপের অভ্যন্তর-প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। চারি পার্শ্ব হইতে বিশাল প্রশান্ত-মহাসাগরের বিপুলকায় তরঙ্গমালা এই ক্ষুদ্র স্থলভাগটিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিবার জন্ত আশ্রয় চেষ্টা করিতেছে; সেইজন্য সাধারণ জলযানের পক্ষে ইহার উপকূলভাগে গমন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই পর্বতপ্রমাণ সাগরতরঙ্গ অনতিক্রমা বলিলেই চলে। একটি বিপুলকায় জলযান যে-কোন

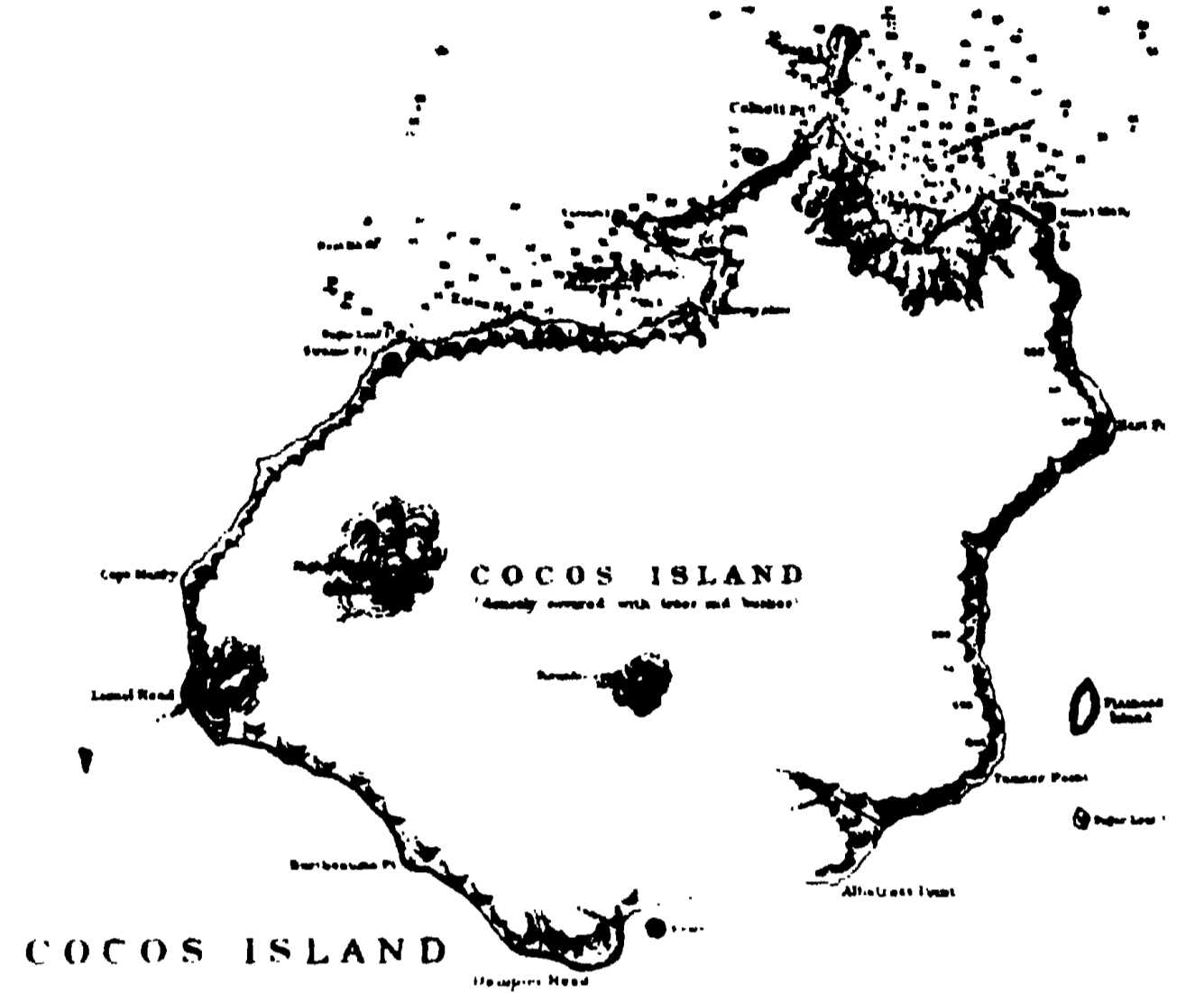
মুহুর্তে তরঙ্গাঘাতে চূর্ণীকৃত হইয়া সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়া যাইতে পারে। এই কারণে বর্তমান অভিযানের জন্য কয়েকটি বিশিষ্ট পোত নিৰ্মিত হইয়াছে; ইহা সহজে জলমগ্ন হইবার কোন আশঙ্কা নাই। ইহার উপর দ্বীপটি আবার সম্পূর্ণ জনবিরল। চাথাম উপসাগরের তীরস্থিত পর্বতরাজি সমুদ্রত নহে বলিয়া এই দিক দিয়া প্রবেশের কতকটা সুবিধা আছে। জাহাজ নঙ্গর করিবার ইহাই একমাত্র প্রশস্ত স্থান। এইরূপ নানা কারণ বশতঃ জলদস্যুগণ তাহাদের লুণ্ঠিত ধন গুপ্ত রাখিবার ইহাই একমাত্র নিরাপদ স্থান বলিয়া নিরূপণ করিয়াছিল।

চাথাম ও ওয়েফার উপসাগর একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ডদ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। কিন্তু শেখোক্ত স্থানে সমুদ্রের তরঙ্গক্ষীতি এতই প্রবল যে এখানে কোনও জাহাজ নঙ্গর করা একেবারেই চূঃসাধ্য। সুতরাং ইহা হইতে অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে, এইস্থানে দস্যুগণ কিচুতেই তাহাদের লুণ্ঠনদ্রব্য-পরিপূর্ণ জাহাজ লইয়া অগ্রসর হইতে সাহস করিত না, কেন-না এখানে জাহাজ জলমগ্ন হইবার সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল। এই সকল কারণে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দস্যুগণ চাথাম উপসাগরের কূলেই তাহাদের জাহাজ নঙ্গর করিত।

আমরা যে-সময়ের কথা বলিতেছি তখন কোকস্ দ্বীপের সম্বন্ধ অতি অল্প লোকেরই জ্ঞাত ছিল। সেইজন্য এখানে লুণ্ঠিত দ্রব্য লুকাইয়া রাখিবার জন্য দস্যুগণ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিত না। তাহারা এমন স্থানে ঐ ধনরত্ন প্রোথিত করিয়া রাখিত যেখান হইতে প্রয়োজন অনুসারে ঐ ধন অল্পস্থানে অনায়াসে স্থানান্তরিত করিতে পারা তাহাদের পক্ষে মোটেই কঠিন হইত না। 'মেরী ডায়ার' নামক জাহাজখানি যে ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে তাহা চাথাম উপসাগরের কূলে একটি গিরিগর্ভের ও বেনিতোর লুণ্ঠিত সম্পদ ওয়েফার উপসাগরের কূলে নিহিত আছে বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন।

কোকস্ দ্বীপটি আণ্বেয়গিরিবহুল হইলেও গত তিন

শত বৎসরের মধ্যে এখানে বিশেষ কোনও ভৌগোলিক তাণ্ডব-লীলা সংঘটিত হয় নাই। দ্বীপের তীরস্থিত পর্বতমালারও কোনও ভৌগোলিক পরিবর্তন অস্তাপি লক্ষিত হয় নাই। এখানকার জলবায়ু কখনও বিপুল নহে :



কোকস দ্বীপের মানচিত্র

সেকড় যে-কোনও মুহুর্তে এখানে বধণোন্মুখ মেঘরাজি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তাহার নিমিত্ত ক্ষুদ্র দ্বীপটি সর্বদা কুরাসাচ্ছন্ন থাকে। মধ্যে মধ্যে আবহাওয়ার সমূহ পরিবর্তনে ও তীব্র বারিপাতের জন্য পাহাড়ের গায়ে কতকগুলি প্রকাণ্ড গহ্বর সৃষ্টি হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ এই সকল গহ্বরে প্রচুর ধনরত্ন গুপ্তভাবে রক্ষিত আছে। দ্বীপের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড দ্রাক্ষালতার দ্বারা আচ্ছাদিত এবং এ-কারণ গুপ্ত স্থানগুলি আবিষ্কার করার পক্ষে যথেষ্ট বাধা আছে। এইজন্যই পূর্বের কতকগুলি অসংস্কৃত চেষ্টা বিফল হইয়াছে। কিন্তু আশা করা যায় যে, বর্তমান বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্যে এই চূঃসাধ্য কন্ড অনেকটা সহজসাধ্য হইয়া উঠিবে এবং এই সাগর-মেথলাময় অনাবিষ্কৃত ক্ষুদ্র দ্বীপটির অগুনিহিত নিগূঢ় রত্নরাজির রহস্যবন গোপনীয় কাহিনী বিশ্বলোকে অচিরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।

দুশ্মন

শ্রী অমিয়কুমার ঘোষ

মাইবার সময় ঘনাইয়া আসিল।

দয়াময়ী সদর পর্যাস্ত আসিয়া বধুকে বিদায় দিয়া যাইবন। বধু প্রশংসা করিয়া তাঁহার পদগুলি গ্রহণ করিল। তিনি বলিলেন—দেখ মা, যেন পত্নের দিতে দেরি ক'রো না। তপ্তায় একখানি ক'রে পত্নের পাঠ যেন। আর ছুঁঠায়ে ছুঁজন হয়ে গেলেই লোক পাঠিও, মাড়লি নিয়ে যাবে—বাবা নকুলেশ্বরের মাড়লি! মানত আছে আমার—ছেলের গলায় বাঁধতে হয়।—

একটু চুপ করিয়া তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন— না বাপু, সুরেনটাকে নিয়ে আর পারা গেল না। আক্কেল যা হোক ছেলের আমার! পঠি-পঠি ক'রে বলে দিলুম ত ডাত্তাডি পাক্কি নিয়ে আস্তে—বারবেলা পড়ে যাবে কিন্তু ছেলের এখনও দেখা নেই! সদর রাস্তায় যেতে যেতেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

যাক্, এবার তিনি আশ্বস্ত হইলেন। দূরেই দেখা যাইতেছিল পুত্র সুরেন পাক্কি লইয়া শন্থ-শন্থ করিয়া আসিতেছে।

পাক্কি আসিয়া গেল। দয়াময়ী বধুকে পাক্কিতে তুলিয়া দিলেন। পোঁটলা-পুঁটলিগুলিও উঠিল। তিনি পুনরায় ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া পুত্র ও পুত্রবধুকে শীর্ষাদ করিলেন।

পাক্কি চলিতে আরম্ভ করিল। দয়াময়ীর মতদূর দৃষ্টি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন—তাহার পর আপনার কন্ঠে চলিয়া গেলেন।

সুরেন পাক্কির পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল। নি ভাবে ক্রোশখানেক পথ চলিবার পর তবে সদর পথে। সদর রাস্তায় পাক্কি ছাড়িয়া গরুর গাড়ী মিলিবে। গাড়ীওয়ালাদের বায়না দেওয়া আছে। তাহারা মনে অপেক্ষা করিবে। গরুর গাড়ী করিয়া বলুহাটির সাত ক্রোশ যাইতে হইবে।...এমনি ভাবে পাক্কি

চড়িয়া মাইবার স্ত্রে তাহার এক দিনের ঘটনা মনে পড়িল ঘটনাটা বছর-পাঁচ-ছয়ক পূর্বেকার। সুরেন সেদিন বিবাহ করিয়া বধু লইয়া ফিরিতেছিল। কমলার তখন বয়স কতই বা? দশ কি এগার। কমলার আত্মীয়-স্বজনেরা তাহাকে বোমটা দিয়া বেশ বধু সাজাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু খানিক দূর যাইতে-না-যাইতেই সে টানিয়া বোমটা খুলিয়া ফেলিয়াছিল। এবং তাহার পর আতুড় মাথায় পাক্কির দরজা খুলিয়া এদিক-ওদিক তাকাইতেছিল। যাইতে যাইতে সে বহুবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—মৌরীয়া এখনও কদরু?—পাক্কি গ্রামে চুকিলে সে এদিক-ওদিক দেখিয়া বলিয়াছিল—তোমাদের গাঁথানা তো মন্দ নয়? বোধেদের দীঘি দেখিয়া বলিয়াছিল—ওমা এটা কি? কত বড় পুকুর? নদী নাকি গো? শেষ নেই দে! তাহার খানিক পরে রথ-তলার পাশ দিয়া যখন পাক্কি চলিতেছিল তখন সে একধারে টিনের চালায় রক্ষিত প্রকাণ্ড রথগুলি দেখিয়া বলিয়াছিল—এ কি, তোমাদের এখানেও রথ হয় নাকি? মেলা বসে? আচ্ছা বলতে পার সাদা সাদা পুতুল—কেষ্ট রথ—পাওয়া যায়? মাটির নয় গো, মাটির নয়! তুমি জান না। সুরাদের বাড়ি প্রশংসা দেখি। সে বিষ্ণুপুরের রথ-তলার মেলা থেকে কিনে এনেছিল! পাওয়া যায়? বল না?—

কিন্তু সুরেনের বিপদ হইয়াছিল কমলার মুখ বন্ধ করিতে। অনর্গল সে বকিয়া চলিয়াছিল। তাহার মনে পড়ে, তাহাদের গ্রামের আর দুটি বরবধু কি করে, অতটা পথ, তাই আসিবার সময় পাক্কিতে গল্প করিতে করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু গ্রামে আসিয়া পাক্কি বেহারারা সে কথাটা সবার নিকট ফাঁস করিয়া দিয়াছিল। তাহার পর তাহাদের আর গ্রামে কান পাতিবার জো ছিল না।

বিপদ হইয়াছিল সুরেনের—

কিন্তু সুরেন আজ কমলার ব্যাপারটি বেশ উপভোগ

করিতেছে। সে পাকিতে উঠিয়া তাহার দিকে একবার ফিরিয়া তাকান দূরে থাকুক, মুহূর্তে পাকির দরজা ছুটি টানিয়া বন্ধ করিয়া দিল। বাপারটা সে বুঝিতে পারিল। বাঙালী-বরের বউ বিবাহের পর পাঁচ বছর কেন পাঁচ দিনেই এ-সমস্ত জিনিষ শিথিয়া নেয়। কিন্তু থাক সে কথা।—পাকি এবার পাড়ার পথ ছাড়িয়া পথে নামিল।

ছ-পাশে ধানের ক্ষেত। ধান অবশ্য অনেক দিন কাটিয়া লওয়া হইয়া গিয়াছে। শুকনো মাঠখানি বিধবার সীমস্ত-লেখার মত শূণ্যতায় হা হা করিতেছে। ক্ষেতের আলের উপর দিয়া তাহারা চলিতেছিল। আলের পাশে যেখানে একটু-আধটু স্থান আছে সেখানেই রাশি রাশি বেঁটুকুল ফুটিয়া আছে। মাসটা ফাল্গুন।

আরও কিছুক্ষণ চলিবার পর দূরে উঁচু রাঙার উপর ছখানি গরুর গাড়ী দেখা গেল। তাহা হইলে গাড়ী এর মধ্যেই আসিয়া গিয়াছে! বাহকরা তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিল। সুরেন একটু পিছাইয়া পড়িয়াছিল।

প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে! পাকি গরুর গাড়ীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রথম গাড়ীটির ছইয়ের ভিতর একটি বধুকে দেখা গেল। ছইয়ের ভিতর বিচালি বিছাইয়া তাহার উপর সতরঞ্চি পাতিয়া বধুটি বসিয়াছিল। কমলাকে পোটলা-পুঁটলি সমেত এই গাড়ীটিতেই উঠিতে হইল। সুরেন আসিয়া পিছনের গাড়ীটির ছইয়ের ভিতর ঢুকিল। এটির ভিতর গুটিকতক পুরুষ-মহুয বসিয়া জটলা করিতেছিল।—এইবার গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাছপাতার ফাঁকে এর মধ্যেই বেশ ঘন হইয়া উঠিয়াছে। রাস্তার পাশে বাগদীদের ছেলেরা মাটি কোপাইতেছিল। সন্ধ্যার দূসর আকাশের দিকে তাকাইয়া তাহারা কোদাল ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। শকট ছুটি ঘনায়মান অন্ধকারে কাঁচ-কাঁচ করিতে করিতে চলিতেছিল। বিলের ধারগুলি জলহীন। মেছুনীরা আর পাঁক ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া মাছের সন্ধানে ফিরিতেছে না।...কাহারা ডোঙা বাড়ে করিয়া ছকাকলিকা হাতে লইয়া ফিরিতেছিল। তাহারা শকটচালকের সহিত ছ-একটা কথাবার্তা বলিয়া চলিয়া গেল। পথের পাশে কটিকারীর ফাঁকে দলে দলে মশা কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছে।

কমলা এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে শকটে চড়িয়া চলিতেছিল। তাহার মনে পড়িল কালই তো সে এই সময় গৃহকন্য় সারিয়া সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতেছিল না? হা কালই তো! আর আজ সন্ধ্যায় সে সেখান হইতে কতদূরে চলিয়া আসিয়াছে! এখন হয়ত তাহার শাশুড়ী তাহার কথা মনে করিতে করিতে তাহার কাজগুলি করিতেছেন কমলার চোখে ছুই কোঁটা অশ্রু জমিয়া উঠিল। বাপের বাড়ি যাইতেছে—আনন্দের কথা, কিন্তু কি জানি, তবুও তাহার শশুরবাড়ির কথা মনে পড়িয়া মনটা বিম্ব হইয়া উঠিল।...

এইবার তাহার পাশ হইতে তাহার যাত্রা-সহচরী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—হা বউ, তোমরা কোথায় যাবে?

কমলার এইবার আত্মনিবিষ্ট ভাব কাটিয়া গেল। সে তাহার দিকে বেশ করিয়া তাকাইয়া দেখিল।

দেখিল তাহারই মত একটি বধু—কিন্তু বয়স হইয়াছে! বোধ হয় বছর-পয়ত্রিশেক। লম্বা সিঁথিটিতে সিন্দূরের রেখা জ্বল-জ্বল করিতেছে। চোখ দুটিতে অপরিসীম ক্লান্তি ছইয়ের ভিতর বতটুকু স্থান ছিল তাহার মধ্যেই পা বিছাইয়া ক্লান্ত চোখে বধুটি তাহার দিকে তাকাইয়া আছে।

বধুটি আবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—তোমরা যাবে কদুর?

কমলা বলিল—বলুহাটি।

বধুটি একবার আপন মনে বলিল—‘বলুহাটি’—তাহার পর চুপ করিয়া গেল। বলিবার মত আর কিছু ছিল না হয়ত।

আবার গাড়ীর চাকার কাঁচ-কাঁচ শব্দ তাহার কানে বাজিতে লাগিল। কমলা আবার ছইয়ের ফাঁক দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল। চারি দিক বেশ দৃষ্ট-ঘুটে অন্ধকার—নিস্তর। পিছনের গাড়ী হইতে পুরুষদের কথাবার্তার একটু-আধটু হাওয়ায় ভাসিয়া আসিতেছিল। বাহিরের দিকে তাকাইয়া, চাকার নিরন্তর কাঁচ-কাঁচ, কোঁ-কোঁ ধ্বনি শুনিতে শুনিতে তাহার চোখে একটু তন্দ্রা নামিয়াছিল বুঝি! কিন্তু তাহা কতক্ষণের জন্ত? বধুটি আবার নিস্তরতা ভঙ্গ করিয়া বলিল—বাপের বাড়ি পাঠে গালাস হ’তে বুঝি?

কমলা একটু বিস্মিত হইল। নিমিষে আপনার বসনকে একটু শাসন করিয়া সে লজ্জা-কম্পিত স্বরে বলিল—হ্যাঁ।

বধূটি বলিল—আর ছেলেপুলে হয় নি ?

সে বলিল—না।

কথাটা শুনিয়া বউটি আপনিই বলিতে লাগিল—তা তো ঠিক। আর কি ক'বে হবে। তুমি তো একদম ছেলেমানুষ। আহা! তা বেশ! বেশ! সত্যি তুমি ভাগিমানী।

তাহার পর সে অকস্মাৎ থামিয়া গেল। থামিয়া গিয়া অতি সন্তপ্ণে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। কমলা বেশ শুনিতে পাইল সেহ দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ। কি করণ, কি মন্ত্রমুগ্ধ সেই শব্দের সঞ্চার! বউটির বুকের পাঁজরাগুলি যেন ঝড়ের মুখে গাছেব শুকনো ডালপালার মত খাঁ-খাঁ করিয়া উঠিল। ওর ছুটি চোখে বেদনার একটি লেলিহান শিখা কণা তুলিয়া ধরিল।...

ছইয়ের সম্মুখে, শকট-ঢালকেব পিছনে ব'থারির সহিত দড়ি বাধিয়া একটি লণ্ঠন টাঙান ছিল। লণ্ঠনটি ধলি ও ধোঁয়য় মলিন। তাহ হইতে কয়েকটি অঁকা-বাকা আলোকরশ্মি আসিয়া বধূটির মুখের উপর পড়িয়াছিল। কিন্তু গাড়ীর ঝাঁকুনিতে একবার আলো ও একবার ছায়া সম্পাতে বধূটির মুখখানি কেমন যেন রহস্যময়, ভয়াবহ বলিয়া মনে হইতেছিল।

বউটি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল তাহার পর গা মোড়া দিয়া বসিয়া বলিতে লাগিল—আমাদের এক পোড়া কপাল বউ। আচ্ছা ভাগি নিয়ে এসেছিলুম কিন্তু। ছেলে হবার জন্তে কত দেবতার দোর ধরলুম,—পোড়া কপালে কিছুই মিলল না। সবাই বললে—বাবা পঞ্চানন অমন জাগ্রত দেবতা—গিয়ে হতো দিলুম—ওষুধও পেলুম, কিন্তু কিছুই হ'ল না। সত্যি কথা বলতে কি বউ, আমার আর ওসব দেবতার ভক্তি চটে বাজে! তা নইলে গ্রামের ছেলে-গুলোর বাড়ি দেখ দিকিনি। পালখানেক ছেলে। খেতে পায় না—পরতে পায় না, তবু পোড়া ছেলের ওখানেই যাওয়া চাই। আমাদের কাছে আসবে কেন? এখানে মুখে থাকবে যে।—

কথামতো বলিয়া বউটি হঠাৎ হাঁপাইতে লাগিল যেন! তাহার মুখখানিতে কেমন অশ্রুতি ও অহুসতার ভাব

ফুটিয়া উঠিল। ব্যাকুল দৃষ্টিতে সে চোখ বড় বড় করিয়া এদিকে-ওদিকে তাকাইতে লাগিল। কি যেন খুঁজিতেছে সে। তাহার পর মুখে অক্ষুট গৌ-গৌ শব্দ করিতে করিতে সে অর্ধমর্চ্চিত অবস্থায় কমলার গায়ে ঢলিয়া পড়িল।

কমলা ভাবিল একি বিপদ হইল! কে এই বধূটি? কোন ডাইনী? উপদেবী? না অস্ত কিছু? তাহার গা থব্ থব্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে ভাবিল চীৎকার করিয়া গাড়ীর চালককে ব্যাপারটা জানাইয়া দিবে না কি? না না, তা কি হয়? সে বধু যে। চীৎকার তো তাহার হারা করা বাইবে না। তবে? তবে, কি করিবে সে? বউটি কানের জায় হাত-পা সিটাইয়া পড়িয়া থাকিয়া কি সব বিড়্-বিড়্ করিয়া হৃস্কোধ্য কথা বলিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত কমলা সাহস করিয়া তাহাকে ঝাঁকুনি দিয়া ডাকিতে লাগিল—“দিদি! ও দিদি!” কিছুক্ষণ এমনি করিবার পর বউটি—“উঃ কি বলছ?” বলিয়া স্বপ্নোচ্ছিতের জায় উঠিয়া বসিল। কমলা বাচিল!

উঠিয়া অঁচল দিয়া চোখমুখ একবার মুছিয়া লইয়া সে বলিল—বউ ভয় পেয়ে গিয়েছিলে না? ভয় পাবার কিছু নেই! হাতে শকুরের মাজুলী ধারণ করিচি কিনা, তাই মাঝে মাঝে ওরকম ঠাকুরের ভয় হয়।...

কমলা কিছু বুঝিল না। সমস্তই তাহার নিকট রহস্যময় রহিয়া গেল। বধূটি কিন্তু আবার তেমনি ভাবে ছইয়ে ঠেস্ দিয়া বসিয়া রহিল। অস্তরের তীব্র তিক্ততার অস্তিম একটি আবেগ তাহার মুখে নিঃসীম এক শূন্যতা আনিয়া দিয়াছিল। দারুণ শ্রান্তিতে তাহার মুখে শ্বেদ-বিন্দু ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

কমলা দেখিতেছিল অস্তবিশ্রবে তাহার ঠোঁট ছুটি মাঝে মাঝে কাঁপিয়া উঠিতোঁছিল। কমলা ভাবিল আবার সে তেমনি গৌ-গৌ করিয়া উঠিবে নাকি? কিন্তু কি ভাগি, তাহা সে করিল না। বেশ শান্তভাবে বসিয়া থাকিয়া চোখ বুজিল।

কমলা আবার বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল। অল্প দূরে বেশ খানিকটা আলো এবং লোকের কলকাকলি শুনা যাইতেছিল। বোধ হয় সেইখানটা বাজার দোকান

হইবে।...তাহাদের গরুর গাড়ী ছুটি কাঁচ-কাঁচ করিতে করিতে আসিয়া সেইখানে থামিয়া গেল।

একজন পুরুষমানুষ আসিয়া বলিল—শুনছ ? ও গো শুনছ ? আমরা এসে গেছি !

বউটি এইবার ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—এসে গেচি ! দাঁড়াও যাচ্চি।

তাহার পর কাপড়ের ছোট পোটলাটি লইয়া সে নামিয়া পড়িল। নামিবার সময় বলিয়া গেল—আসি ভাই !

বউটি চলিয়া যাইবার পর সুরেন আসিয়া তাহার জিনিষপত্র লইয়া সেই গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। বলিল—বলুহাটি পর্য্যন্ত যাবার আর যাত্রী নেই—শুধু আমরা দু-জন, কাজেই একখানা গাড়ী যাবে।

ইহার পর আবার গাড়ী চলিতে লাগিল। সুরেন একবার কমলাকে জিজ্ঞাসা করিল কোন অসুবিধে হয় নি তো ?

কমলা ছোট একটি উত্তর দিয়াছিল—না।

তাহার পর দু-জনার মাঝখানে বেশ একটু নিস্তরুতা ঘনাইয়া উঠিল। বাহিরে নিবিড় অন্ধকার। ঝোপে ঝাড়ে অশ্রান্ত ঝিঁঝিঁর ডাক কাতর কান্নার মত কানে বাজিতেছে। কিছুক্ষণ কাটিতে-না-কাটিতে ভেঁস-ভেঁস করিয়া সুরেনের নাক ডাকিতে আরম্ভ করিল। কমলা বাহিরের অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া রহিল। অল্প কিছুক্ষণ পরে তাহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। কিন্তু তন্দ্রার মধ্যে তাহার মনে হইল যেন আবার সেই বধূটি তাহার পাশে কথা বলিতে বলিতে মুচ্ছিত হইয়া তাহার গায়ে ঢলিয়া পড়িল। বেশ মনে হইল তাহার যেন স্পর্শ পাইল সে। কিন্তু চোখ খুলিয়াই কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তাহার গা-টা কেমন ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। অন্ধকারের আড়ালে নক্ষত্রের নির্লিপ্ত চাহনির পশ্চাৎ হইতে একখানি অতৃপ্ত মুখের ছবি তাহার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল যেন সেই পুত্রসন্তানবনামেঘী বধূটি তাহাদের গাড়ীর পশ্চাতে আর্তনাদ করিতে করিতে ক্ষুধার্ত চোখে ছুটিয়া আসিতেছে। ভয়ে কমলা মুখে কাপড় চাপা দিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

২

আজ ক'দিন হইল কমলা বাপের বাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছে। সুরেন তাহাকে রাখিয়া তার পর দিনই বাড়ি চলিয়া গিয়াছিল।

ছোট ভাই ভগ্নীগুলির কমলাকে পাইয়া আর আনন্দ ধরে না। দিবারাত্র তাহাদের মধ্যে তর্ক হইতে থাকে দিদির খোকা হইলে কে কখন তাহাকে কোলে লইয়া বেড়াইবে তাহা লইয়া। কমলার ছোট বোন চাকু বলিতে থাকে—আমি কিন্তু ভাই, সকালবেলা খোকাকে নিয়ে বেড়াব। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে কোঁচড়ে মুড়ি নিয়ে খোকাকে কোলে ক'রে বেড়াতে চলে যাব। কালিতলার পাশ দিয়ে, বাগদীপাড়া ছাড়িয়ে গিয়ে একেবারে মাঠ পর্য্যন্ত চলে যাব। মাঠে গিয়ে খোকাকে হাওয়া খাইয়ে নিয়ে আসব।...এ-কথাটা বোধ হয় তাহার ছোট ভাই হারুর পছন্দ হয় না। সে বলিল—ও বুঝতে পেরেচি। তুমি পাঠশালা পালাবে, না ? খোকাকে সকালে কোলে নিয়ে বেরিয়ে তুমি বেলা ক'রে ফিরবে—আর পাঠশালা যেতে হবে না, না ? তা হচ্চে না।...

এইবার রঙ্গক্ষেত্রে কমলা আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তাহাদের কথায় বিশেষ কান দিল না। সে চাকুর খেলাঘরটি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে দেখিতে হঠাৎ তাহা হইতে দু-একটি মাটির ছোট ছোট খুরী তুলিয়া লইয়া বলিল—দেখবি চাকু, একটা মজা দেখবি ? এই দ্বাধ।...

এই বলিয়া সে সেই খুরীগুলি হাতে ভাঙিয়া কুটকুট করিয়া চিবাইয়া খাইয়া ফেলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ বাইতে-না-বাইতে সে অমন তিন চারিখানি খুরী খাইয়া ফেলিল। দিদির কাণ্ডকারখানা দেখিয়া চাকু অবাক হইয়া গিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত সে—‘ওমা দেখবে এস দিদি কি’—বলিয়া সবাইকে ডাকিয়া আনিতেন, কিন্তু কমলা তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছিল। সে বলিল—লক্ষী চাকু, বলিস্ না কাকেও। তোকে আমার আলমারি খুলে বড় পুতুলটা দেব। বলতে নেই, ছিঃ।

যাক এইভাবে ব্যাপারটা চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু সর্বসময়েই সবাই তাহাকে পুতু-পুতু করিয়া রাখিতেছে যেন ! সন্ধ্যাবেলায় উঠানে যেখানে একটি বাতাবি লেবুর

গাছ আছে সেখানটায় বসিয়া যদি ছোট ভাইগুলির সহিত একটু খেলাধুলায় যোগদান করে তো অমনি মা আসিয়া বলিতে থাকেন—ওমা কমলি! ওখানটায় ভরসন্ধ্যাবেলা বসিস নি মা! আয় এখানটায় আয়—এই রান্নাবরের দাওয়াটায় বসবি আয়। পোয়াতী মেয়ে, ভর সন্ধ্যাবেলায় ছেঁচতলায় বসতে নেই!—

অথচ কমলার বেশ মনে পড়ে ঐ বাতাবি লেবুর গাছটির তলায় সন্ধ্যাবেলায় পূর্বে কত কি-ই করিয়াছে সে। আর হঠাৎ আজ তাহাই বর্জনীয় হইয়া গেল। আজ যেন ওখানে কি আছে! কোন অলক্ষণ উপদেবী যেন গাছ হইতে নামিয়া আসিয়া তাহার ঘাড় মটকাইয়া ধরিবে। গাড়ীর সেই বধুটির মত গৌ-গৌ করিবে কি? ভয়ে কমলা শিহরিয়া উঠে।

বাঁধান ঘাটটির সিঁড়ি দিয়া যদি সে একটু তাড়াতাড়িই নামে তো অমনি পিসিয়া আসিয়া বলিতে থাকেন—ওমা অত তাড়াতাড়ি নামিস নে মা, নামিস নে—শেষকালে পড়ে-টেড়ে গিয়ে এক কাণ্ড করবি!

দিনে-রাতে এইরূপ কত শত সহস্র নিষেধ-বাক্য তাহাকে মানিতে হয় তাহার ঠিকানা নাই। এত নিষেধে তাহার বৃকে ভয় যেন পাথরের মত ভারী হইয়া কায়েমী বাসা বাঁধিয়াছে। আর এ-সব জিনিষের একটু আধিক্যভারও কারণ আছে।

কমলা যে বাড়ি আসিয়া সবার নিকট সেই বক্যা বউটির গল্প করিয়া বসিয়াছিল। গল্পটা তাহাকে আর সবিস্তারে বলিতে হয় নাট। একটু বলিতে-না-বলিতেই সবাই বুঝিয়া লইল।—দোষটা কিন্তু সবাই কমলার ঘাড়ে দিল। বড়-দিদি বলিলেন—ওমা! কমলি তোর আচ্ছা আকৈল তো? তুই অত বড় মেয়ে তুই জানিস না, অমন অলক্ষণে বাজা মেয়েমানুষ গায়ে চলে পড়লে কি হয় জানিস না। না বাপু, হাসালি তোরা।

কমলা সত্যই এ-সমস্ত জিনিষ কিছুই জানিত না। একটি বক্যা নারী যদি মুচ্ছিত অবস্থায় তাহার গায়ে চলিয়া পড়ে তো এমন কি ক্ষতি হইতে পারে। সত্যই সে একটু হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল।

যাই হোক, ইহার পরে আর কেহ তাহার সম্মুখে এ-সমস্ত ব্যাপার উত্থাপন করে নাই—মা'র বারণ ছিল।

কমলা গৃহকর্ম করে, বসিয়া থাকে, বই পড়ে, কিন্তু সর্বসময়েই তাহার মনের ভিতর কিসের একটা মাদকতা তাহাকে ভুলাইয়া রাখে। তাহারই দেহ হইতে একটি ছোট্ট সুকুমার শিশু ছানামুক্ত শর্শালেখাটির মত একদিন ফুটিয়া উঠিবে—সেই কামনা তাহাকে যেন উতলা করিয়া তোলে। আকাশ হইতে, পৃথিবীর আলো বাতাস হইতে, তুচ্ছ গৃহকর্মের খুঁটিনাটির পশ্চাৎ হইতে, যেন একটি শিশু নিরন্তর ছোট ছোট বাহু বাড়াইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরে।

৩

মাসটা বৈশাখ।

মাঝ-রাত পার হইয়া গিয়াছে। বালুহাটির চৌধুরীদের বাড়ির সব কয়টি ঘরেই আজ আলো জলিতেছে। প্রকাণ্ড ছ-মহল বাড়ি। সাবেক কালে কর্তারা তৈয়ারী করিয়া গিয়াছেন। তাহা না হইলে লোকে বলে অমন বাড়ি আর এ-বাজারে ছেলেদের তৈয়ারী করিতে হইত না। কিন্তু বাড়িতে আজ যেন কিসের উদ্বেগ, উৎকর্ষার ভাব দেখা যাইতেছে। একটি ঘরের ভিতর উজ্জ্বল আলো জলিতেছে—ঘরের ভিতর বাড়ির স্বীলোকেরা যেন তাড়িয়া পড়িয়াছে। দালানে দরজার চৌকাঠে ঠেস দিয়া স্থানয়না বসিয়াছিলেন। হঠাৎ সদর-বাড়ির দিক হইতে চটির চট্-চট্ শব্দ হইতেই তিনি মাথায় কাপড় টানিয়া দিলেন। বিশ্বস্তর ঘরটির দরজার নিকট আসিয়া বলিলেন—শুনচ দাই-বউ! শুনচ গা?

ভিতর হইতে উত্তর আসিল—যাচ্ছি বাবু। যাই আমি।

দাই-বউ ঘরের বাহিরে আসিতে তিনি বলিলেন—কি হ'ল? বাচান গেল না?

দাই-বউ মাথা নীচু করিয়া বলিল—না বাবু!

বিশ্বস্তর বলিলেন—যাক! কিন্তু আমার কথা রেখো। আমার মেয়েকে বাচান চাই কিন্তু।

সে বলিল—হ্যা, খুকীর তো বেশ গিয়ান আছে বাবু! তার জন্তে ভাবতে হবে না।

বিশ্বস্তর চলিয়া গেলেন।

ঘরের ভিতর মাটিতে চ্যাটাই বিছাইয়া কমলাকে

শোয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। মাথার কাছে কাকীমা বসিয়া পাখা করিতেছেন। কে আসিয়া মাথার জল ছিটাইয়া মুছিয়া দিয়া গেল। দাই বলিল—একটা বালিস দাও না গো দিদি-মুনিকে! মাথাটা ভুঁয়ে পড়ে থাকবে?

বালিস আসিল। কাকীমা তাহার মাথাটা বালিসের উপর ঠিক করিয়া দিলেন। কমলা সেই অবচেতনার মধ্যে থাকিয়া কিন্তু স্বপ্ন দেখিতে লাগিল :—

আবার সেই বউটির সহিত দেখা। এইবার কিন্তু বনুহাটি হইতে মৌরীগ্রামে ফিরিয়া যাইবার পথে। কথা কহিতে কহিতে কমলা বলিল—ওমা খোকা কোথায় গেল? খোকা? আমার খোকা? এই যে এইমাত্র আমার কোলে ছিল? আপনি খোকাকে লুকিয়েছেন, না দিদি? বনুন না, সত্যি? আমি বখন বাইরে রাস্তার দিকে তাকিয়েছিলুম তখন আপনি ধপ্ করে তাকে আমার কোল থেকে তুলে নিয়েছেন, না? মাগো, আপনি কি শেয়না?

কিন্তু তবুও বউটি কিছু বলিতে চায় না। আপন মনে টিপি টিপি হাসিতে থাকে।

কমলা ক্রমশঃ অধীর হইয়া উঠিল। সে আবার বলিতে লাগিল—সত্যি দিদি, ঠাট্টা করবেন না। আপনার পায়ে পড়ি। আপনি খোকাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন বনুন না! কাপড় ঢাকা দিয়ে? ওমা ওরকম ভাবে রাখবেন না, রাখবেন না? খোকার আমার দম বন্ধ হয়ে যাবে।... কমলা ব্যস্তভাবে তাহার কোলের কাপড়ের ভিতর খুঁজিতে যায়, কিন্তু বধূটি মুচকাইয়া হাসিতে হাসিতে তাহার হাত ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়। কমলা ক্রমশঃ আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অত্যন্ত ক্রোধ কর্তে সে বলিতে লাগিল—ও দিদি, অনেক ক্ষণ হয়ে গেল : খোকাকে এবার দিয়ে দাও। খোকার এতক্ষণ গলা শুকিয়ে গেছে, দুঃখ থাকবে।...কিন্তু তবুও বউটি তাহার কথায় কান দেয় না। তেমনি নির্লিপ্তভাবে হাসিতে থাকে। শেষে কমলা কর্কশ স্বরে চীৎকার করিয়া ওঠে—ওদিদি খোকাকে দিয়ে দিন—শীগ্গির দিয়ে দিন—দিয়ে দিন বলচি!—

স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে অত্যধিক মানসিক উত্তেজনার ফলে হঠাৎ সে চাহিয়া ফেলে। চোখ চাহিয়া অকস্মাৎ কাকীমাকে সম্মুখে দেখিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চীৎকার

করিয়া বলিতে থাকে—শীগ্গির খোকাকে দিয়ে দিন! দিয়ে দিন বলচি—ভাল হবে না কিন্তু।

পিসিমা ছোট একটি বালিস তাহার দিকে আগাইয়া দিয়া বলেন—এই যে, এই তো তোর খোকা রয়েছে।

সে চোখ বুজিয়া সেইটাকেই বুকে চাপিয়া চুপ করিয়া গেল।

8

দেখিতে দেখিতে কয়েক দিন কাটিয়া গিয়াছে। কমলা অনেকটা সারিয়া উঠিয়াছে। সে এখন ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বসিতে পারে।

খোকাকে সে চোখে দেখে নাই। মৃত শিশুটিকে সে প্রসব করিয়া অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার রংই বা কিরূপ হইয়াছিল, হাত-পাগুলিইবা কেমন, তাহা কিছুই সে দেখিতে পায় নাই। কিন্তু মা বলিয়াছেন খোকা মরিয়া গিয়া এখন শত্রু হইয়াছে। যে পুষ্পকলির মত খোকার পথ চাহিয়া সে ছিল, সে খোকা আর খোকা নয়! সে এখন দুঃশমন। তাহার মনে হয় খোকা যেন দৈত্যের আকার বিরাট চেহারা লইয়া সারা বাড়িময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সুবিধা পাইলেই তাহার গলা টিপিয়া ধরিবে। কোথাও যদি 'খুট' করিয়া একটু শব্দ হয়—ঝড়ে যদি জানালাগুলো একটু নড়িয়া ওঠে তো কমলা অঁৎকাইয়া ওঠে। ওই বুঝি খোকা আসিল! খোকার পদভারে সারা বাড়িটি জুলিয়া উঠিল! খোকা! যে খোকা একদিন তাহার দেহের ভিতর কুঁড়ির মত সুপ্ত ছিল, সেই খোকা আজ কত বড় ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। কমলা খোকার সেই অত্যাচ বিরাট চেহারার কথা কল্পনা করিতে গিয়া মনে মনে ভীষণ ভয় খাইয়া যায়।...খোকার হাতগুলো কড়িকাঠের মত মোটা—মাথায় ঝাঁকড়ান চুল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।...

ঘরে প্রদীপ জালিয়া কমলার ছোট বোন চারু পড়িতেছিল। কমলার শরীরটা সেদিন ভাল ছিল না বলিয়া সে বিছানায় শুইয়া ছিল। ঘরের সম্মুখের প্রকাণ্ড দালানটির খানিকটা ঘরের ভিতর হইতে বেশ দেখা যায়। দালানে কেহ

নাই! এক কোণে একটি প্রদীপ জলিতেছিল। দালানটি
ঈষৎ অন্ধকার—সেই দিকে চাহিয়া কমলার বুদ্ধি কেমন
গা-টা ছম্-ছম্ করিতেছিল। সে বলিল—ও চাক্র!
দরজাটা বন্ধ ক'রে দে না। দালানে কেউ নেই বুদ্ধি?—

চাক্র দরজাটি বন্ধ করিয়া দিয়া আসিয়া আবার পড়িতে
বসিল।

এমনি ভাবে কিছুক্ষণ কটিল। কমলা চোক বুজিয়া
বিছানায় শুইয়া ছিল। অল্প ক্ষণ পরে হঠাৎ তাহার মনে
হইল কোথায় যেন কিসের শব্দ হইতেছে। কিসের শব্দ?
কমলা কান পাতিয়া রহিল। সে বেশ বুদ্ধিতে পারিল কে
যেন সদর-বাড়ির দালান হইতে ভিতর-বাড়ির দালানের
দিকে চলিয়া আসিতেছে। কমলা বলিয়া উঠিল—ও
চাক্র! চাক্র! শুনতে পাচ্চিস নে?

চাক্র বলিল—কি দিদি, কি শুনতে পাচ্চি না?

—ওই যে, ওই শব্দ! পাচ্চিস না শুনতে?

চাক্র অবাক হইয়া বলিল—পাচ্চি দিদি, কে
আসচে হয়ত!

‘কে আসচে!’ কমলা ভাবিল—নাঃ, চাক্রকে বোঝান
গেল না, কে আসচে! সে কি জানে না ক-দিন ধরে
খোকার অত্যাচারে বাড়িতে তাহার আর টিকিবার
উপায় নাই!...কিন্তু ওকি? শব্দ যে ক্রমশঃ তাহার
ঘরের দিকে আগাইয়া আসিতেছে।

—চাক্র একবার দেখ, দরজাটা ঠিক বন্ধ আছে তো?

কিন্তু শব্দ ক্রমশঃ নিকটে—আরও নিকটে আসিয়া
পড়িল। কমলা বেশ শুনতে পাইল শব্দ ক্রমশঃ
আগাইয়া তাহার দরজার নিকটে আসিয়া থামিয়া গেল।
দরজাটি এইবার নড়িয়া উঠিল। কমলার বুক কাঁপিয়া

উঠিল। বাঃ! তাহা হইলে খোকা আসিয়া গিয়াছে!
বিরাট দানবাকার খোকা তাহা হইলে সত্য সত্যই
দরজা ভাঙিয়া আসিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিবে!
মুহুর্তে তাহার আর বাঁচিয়া থাকিবার উপায় থাকিবে না।
কিন্তু ও কি? চাক্র কাহার সহিত কথা বলিল? আবার
হাসিয়া দরজা খুলিয়া দিতে বাইতেছে না? কমলা
চীৎকার করিয়া তাহাকে বারণ করিতে গেল, কিন্তু
তাহার ভাষা-স্কুরণ হইল না। ভয়ে সে চক্ষু বুজিয়া
কাঠের মত শব্দ হইয়া পড়িল। খোকা শেবে সত্য সত্যই
তাহাকে মারিয়া ফেলিল।

চোক বুজিয়া সে বেশ বুদ্ধিতে পারিল চাক্র ‘ঘটাং’
করিয়া দরজার ছড়কা খুলিয়া দিল। খোকা আসিয়া
ঘরে ঢুকিল। কমলা যেন দেখিতে পাইল খোকার
মাথায় মস্ত পাগড়ী বাধা। হাতে লাঠি। লাঠির মাথায়
পুঁটলী ঝোলান। ছু-পায়ের জুতা ধূলায় ঢাকিয়া গিয়াছে।
তবে খোকা কি অনেক দূরদেশ হইতে আসিতেছে?
...খোকা যেন চাক্রকে কি বলিল। কিন্তু এ তো
খোকার কণ্ঠস্বর হইতে পারে না। এ কণ্ঠস্বর যে কমলার
পরিচিত—বিশেষ পরিচিত বলিয়া মনে হইল। তবে—
তবে কি—

কমলা সাহস করিয়া চোখ খুলিয়া ফেলিল। দেখিল
স্বরেন মোরীগ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। চাক্র তাহার
সহিত হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতেছে।

কমলা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—ওঃ তুমি এলে!
আমি, আমি ভেবেছিলুম বুদ্ধি খোকা!!

স্বরেন করুণ হাসি হাসিয়া কমলার ঘরের দিকে
তাকাইল।

মণিপুরী নৃত্য-উৎসবের চিত্র

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

রবীন্দ্রনাথ আন্দাজ বার-তের বছর আগে যখন সিলেটে আসেন তখন উক্ত শহরের উপকণ্ঠস্থ মাছিমপুর নামক স্থানের মণিপুরী কুমারীদের নাচ দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে নাকি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। শাস্ত্রিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের মণিপুরী নাচ শেখাবার মতলবে কবিগুরু ১৩২৬ সন থেকে ১৩৩৬ সন, এই দশ বছরের মধ্যে তিন-তিন বারে সবুজ ছয় জন মণিপুরী নৃত্য-শিক্ষককে শাস্ত্রিনিকেতনে আনিয়েছিলেন। ছাত্রীরা যে সুষ্ঠুভাবেই মণিপুরী নৃত্য আয়ত্ত করতে সমর্থ হয়েছেন তার পরিচয় দিয়েছেন তাঁরা নটরাজের নৃত্যাভিনয়ে।

বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় “সতর বৎসর” নামে ‘প্রবাসী’তে প্রকাশিত তাঁর আত্মচরিতের এক জায়গায় প্রসঙ্গক্রমে মণিপুরী নৃত্য সম্বন্ধে লিখেছেন—

“দেশ-বিদেশে অনেক নাচ দেখিয়াছি কিন্তু এই মণিপুরী নাচের মতন এমন সুন্দর এমন নির্মল এমন নিপুণ নৃত্যকলা কোথাও দেখি নাই।”

রবীন্দ্রনাথ এবং বিপিনচন্দ্রের মত সমঝদারদের ভূয়সী-প্রশংসাপ্রাপ্ত এই অপূর্ণ মনোহর নৃত্যকলা স্বচক্ষে দেখবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রবন্ধ-লেখকের বহুদিন ধরেই ছিল। গেল বছর, বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে সেই অভিলাষ পূর্ণ হওয়ার সুযোগ ঘটেছিল।

নৃত্য-নিপুণা হওয়া মণিপুরী মেয়েদের গৌরবলাভের অন্ততম উপায়। সে-জন্মে খুব ছোটবেলা থেকেই তারা নৃত্য-চর্চায় রত হয়, সময়-সময় এক এক জন ওস্তাদের সঙ্গে ভ্রাম্যমান পেশাদার নাচওয়ালীরা আসামের নানা শহরে মুজরা ক’রে অর্থ ও যশ দুই-ই অর্জন করতে পারগ হয়। মণিপুরীরা বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী। হিন্দুদের ছোট-বড় অনেকগুলো উৎসবই এঁরা উদযাপন করেন। তন্মধ্যে ঝুলন এবং রাস-যাত্রায় খুব ধুমধাম হয়। এই দুটি পর্কেই ‘লৈছাবী’ বা কুমারীদের বিশিষ্ট জমকালো পোষাক

প’রে নৃত্য-গীত করতে হয়। ঝুলন এবং রাস-পর্বের প্রধান অঙ্গই হচ্ছে কুমারী-নৃত্য।

প্রত্যেক মণিপুরী-পাড়ায় অন্ততঃ একটি ক’রে দেবায়তন এবং তার লাগাও একটি নাটমন্দির আছে। মন্দিরভাস্করে প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি বিগ্রহের নিত্য পূজা-অর্চনা হয়; নৃত্যাদি অহুষ্ঠিত হয় দেবমন্দির-সংলগ্ন মণ্ডপে। শ্রাবণ মাসে ঝুলন-যাত্রার দিনকতক আগে থেকে, রোজ বিকেলে প্রত্যেক মহল্লার মেয়েরা মন্দির-প্রাঙ্গণে জমায়েৎ হয়ে নৃত্যাভিনয়ের মহলা দেয়; আর যুবকেরা বাশের খুঁটি এবং বাথারি দিয়ে একটি বেটনী নিশ্যাণে ব্যাপৃত হয়।

উৎসব-রজনীতে সুশোভিত নৃত্যমণ্ডপে চোকবানার মণিপুরীদের সৌন্দর্যাবোধের পরিচয় পেয়ে চিত্ত গুস্ত হয়ে ওঠে। ভিতরকার নবনির্মিত বেটনীটি কাগজ-কাটা ফুল-লতা-পাতা দিয়ে ঘেরা, ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপিত একটি ফোয়ারার মুখ দিয়ে ফটিকের টুকরোর মত স্বচ্ছ, শুভ্র জলকণা উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। দেবালয়ের দোর-গোড়ায় একটি জলচৌকীতে সাদ্রানো গুটিকতক আনকোরা চক্চকে ঝক্‌ঝকে তৈজসপত্র। মেঝেয় পাতা একটি শপে আসন-পিঁড়ি হয়ে পাশাপাশি উপবিষ্ট তিনটি আধাবয়সী মহিলা বাই তালে তালে মন্দির বাজিয়ে গান ধরেন অমনি বিচিত্র-বেশা সালকারা নর্তকীরা বেটনীটির প্রবেশ-পথের মুখে জোড় বেধে সাত-আট সারিতে বিভক্ত হয়ে থাড়া হয়। তাদের পরিচ্ছদের বর্ণচ্ছটায় এবং অলঙ্কারের জলুসে চোখ ঝলসে যায়। তাদের মাথার চুল অবিকল খাম্বতি নামক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী আদিম জাতির বিবাহিতা মেয়েদের চণ্ডে চূড়া-আকারে বাধা। সেই উঁচু খোঁপার উপরকার কালো কাপড়ের ঢাকনিগুলোতে নানান রজত অলঙ্কার গোঁজা, মুখের উপর জালের মত পাতলা বসনের আবরণ (মাইখুম)। সর্বাঙ্গ নানা আভরণে ভূষিত। গলায়

কয়েক ছড়া স্বর্ণহার, কানে ইয়ারিং, বাহুতে বাজুবন্ধ, মণিবন্ধ কয়েক স্ট সোনার চুড়ি। গায়ে লাল, কালো ইত্যাদি হরেক রঙের মখমলের আঁটসাঁট জ্যাকেট। এক একটি ধপধপে শাদা কাপড় বন্ধের উপর থেকে কটিতট অবধি খুব আঁট করে জড়ানো। কেশচূড়াগ্র থেকে প্রসঞ্চিত কয়েক ছড়া পুঁতির মালা বক্ষাবরণ বস্ত্রটিতে তির্যাক্ ভাবে গাঁথা। পরণের বন সবুজ এবং রগরগে লাল মখমলের ঝলমলে বসনগুলোর (পলয়, জমির মাঝখানে অজস্র চুম্বকি এবং নিম্নপ্রান্তে পিতলের তবক-মোড়া এক একটি গোলাকার আরশি সমান্তরভাবে বসানো। পলয়ের ওপরে পরিহিত হাঁটু পর্যন্ত ফিন্ফিনে শাদা ঘাঘরাসমূহের নাম পছুয়াল। পছুয়ালগুলো লম্বালম্বি সারি সারি জরীতে একেবারে টাসবোনা। 'পলয়' এবং 'পছুয়াল', একটি মখমলের কোমরবন্ধের সাহায্যে কটিতে সম্বন্ধ। বাঁ-কাঁধের উপর থেকে ঝোলান, নিম্নভাগে সোনালী, ও রূপালী জরীর নক্সা কাটা গোল, চৌকা এবং অর্ধচন্দ্রাকার কাচে খচিত একটি মখমলের ফালি প্রত্যেকেরই ডান উরুর ওপরে দোতলামান। এগুলোর উপরিভাগ সুরু কিন্তু নিম্নাংশ বেশ চওড়া। এই নয়নাভিরাম জঁকালো পরিচ্ছদ মহার্ঘ বলে সকলের পক্ষে কেনা সম্ভবপর হয় না। কতকগুলো মণিপুরী স্ত্রীলোকের একমাত্র পেশাই হচ্ছে এ-সমস্ত পোষাক তৈরি করা, দরকার মত এগুলো তাদের কাছ থেকে ভাড়া করে আনা হয়।

সঙ্গীতকারিণীদের গান সমাপন হবার পর লৈছবীরা নমতালে পদক্ষেপ করতে করতে বেষ্টনীটির ভিতরে প্রবেশ করে। প্রথমে, কিছু সময় তারা হাতে হাত ধরে গান গাইতে গাইতে নৃত্য করে। তার পর পরস্পরের হাত ছেড়ে দিয়ে আঙুল দ্বারা নানা আকারের মুদ্রা সৃজন করে লঘু ললিতনৃত্যে চক্রাকারে বেষ্টনীটি পরিক্রমা শুরু করে। তাদের দোলায়মান বসনে বসানো চুম্বকি এবং আরশি এবং জরীতে উজ্জ্বল দীপালোক প্রতিফলিত হয়ে ঝকঝক করতে থাকে। দর্শকমণ্ডলীর বিস্মিত, বিমুগ্ধ দৃষ্টির সামনে আচম্ভক্য বন এক অপূর্ণ রূপলোকের সৃষ্টি হয়! বস্তৃতঃ, অলোক-বন্দর এই শোভন, সংঘত এবং সুকৃতিপূর্ণ নৃত্যকলা, ঠকীদের সুন্দর গতিভঙ্গী এবং পাঁচ আঙুলের খেলা

দেখে বিমোহিত না-হয়ে থাকা যায় না। অবশেষে যখন তারা সুকুমার বাহুগুলি নৃত্যচ্ছন্দে লীলায়িত করে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমার পানে ফুলদল ছুঁড়ে দিতে থাকে তখন মনে হয় যুগান্তরে বৃন্দাবনে শ্রীমতীর সখীরা এমনিধারাই বৃষ্টি উৎসবানন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠত। ঝলন-উৎসবে মণিপুরী মেয়েরা তাদের জাতীয় নৃত্য-পরিচ্ছদ পরিধান করে ব্রজ-গোপীদের নৃত্য-লীলারই অভিনয় করে।

মণিপুরীদের মধ্যে আর এক শ্রেণীর নাচের প্রচলন আছে যা ধর্ম্মানুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ নয় এবং সেই জন্তে বিবাহিতা রমণীরাও তাদের আঁটপোরে কাপড়-চোপড় পরে তাতে যোগ দিয়ে থাকেন। ঐ ধরনের নাচ দেখবার সুযোগও একদা রাধীপূর্ণিমার রাত্রে বর্তমান লেখকের হয়েছিল।

নির্দিষ্ট সময়ে কয়েকটি পূর্ণযৌবনা নারী জনকতক অনুচরী তরুণী এবং বালিকাসহ নাচঘরে এসে আবৃত্তিটির ভিতরে বৃত্তাকারে দাঁড়ালেন। বিবাহিতা রমণীদের মাথার পেছন দিকে ফাঁপানো কবরী, মুখে অলকাতিলাক। পরনে, বকের কাছে গোঁরা-বাঁধা পাঁচটে আসমানী, সবুজ এবং খয়ের রঙের আঁজি-কাটা চওড়া ফুলপাড় সূতী কিংবা চিকণ রেশমী বস্ত্র (ফানেক)। শাদা উত্তরীয় (ইনাফি) দ্বারা দেহের উত্তরাদ্ব আচ্ছাদিত এবং মস্তক অবশুষ্টিত। বিবাহিতা মণিপুরী নারীদের মাথায় ঘোমটা দেওয়ার দস্তুর নেই, কিন্তু এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম দেখা গেল।

বয়স্কা কুমারীদের মাথার সামনের দিকের চুলগুলো খুব ছোট করে অর্ধবৃত্তাকারে ছাঁটা এবং কপালের ওপর আঁচড়ানো, দুই পার্শ্বে দুই গোছা আগা-ছাঁটা অলক কর্ণমূল বেষ্টন করে লম্বমান। পশ্চাৎ দিকে স্তূপাকার খোলা চুল পিঠে ছড়ানো, নাকে চন্দনের তিলক, গায়ে অত্যন্ত খাটো হাতাযুক্ত নীল কালো এবং সবুজ সাটিনের ঢিলা জামা। পরিধানে কটিদেশে গ্রন্থিবন্ধ, পাটল, পীত, জরদা এবং ফিকে লাল জমির পরে চওড়ার দিকে কালো ডোরা-কাটা নক্সা-পেড়ে ফানেক। সকলেরই উদরের নিম্নাংশ অনাচ্ছাদিত এবং গায়ে একটি একটি মিহি ওড়না জড়ানো, ওড়নার সুন্দর আবরণ বিদীর্ণ করে তাদের মর্ম্মর-মর্ম্মণ সুগোল বাহুগুলির পীত-গৌর আভা যেন ফুটে

বেকচে। ছোট ছোট বালিকাদের মাথার মাঝখানে সিঁতিকাটা। নর্তকীদের প্রত্যেকেরই হাতে পাকানো লাল সূতোর স্তবক-লাগানো এক-এক জোড়া মন্দিরা। দলের মধ্যে একটি তরুণী বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রথমে গানের একটি কলি গায়, শেষে আর সবাই তাদের নিটোল দেহকে একবার ডাইনে একবার বায়ে ঝেং আনমিত ক'রে শুভ্র সূডোল বাহুগুলি শোভন ভঙ্গীতে সঞ্চালনপূর্বক তালে তালে মন্দিরা বাজাতে বাজাতে ধুয়ো ধার।

কখনও ধীরমধুর গতিতে কখনও বা দ্রুত তালে এম্নিতর নানা ছাঁদে, বহুক্ষণ পূরা মরসুমে নাচ চলবার পর সকলে হাঁটু গেড়ে বসল এবং মূল গায়ের মেয়েটি শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ ক'রে একলা নৃত্যগীত আরম্ভ করলে। এই তরুণীটি পরমাশুন্দরী। অন্তান্ত মেয়েদের সঙ্গে তার মুখের আদল আদৌ আসে না। মণিপুরী মেয়েদের মধ্যে অধিকাংশেরই নাক খেবড়া এবং চেহারা মোঙ্গলীয় ছাঁচে গড়া। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন অনেক মেয়েও দেখতে পাওয়া যায়, যাদের বলা চলে নিখুঁত সুন্দরী। উপরন্তু, অটুট স্বাস্থ্যের দরুণ মণিপুরী মেয়েরা এমনি একটা অপূর্ণ লাভণ্যশ্রীতে মণ্ডিত, বা বাঙালী মেয়েদের মধ্যে একান্তই দুর্লভ। স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে সমুজ্বল সেই নৃত্যশীলা তরুণীটির অনিন্দ্য দেহসৌন্দর্য এবং অসুপম নৃত্য সেদিন সবাইকে বাস্তবিকই অভিভূত ক'রে ফেলেছিল। মণিপুরী মেয়ে-পুরুষ মাত্রেই অতিরিক্ত মাত্রায় ভাবপ্রবণ, অহেতুক কৃষ্ণপ্রেম হয় তাদের একেবারে টাইটুস্বর। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তার অন্তরের গভীর আনুরক্তিই যেন রূপায়িত হয়ে উঠল এ নৃত্যপরা তরুণীটির অনুভবে, তার আকুল কর্ণস্বরে এবং তার অর্কনির্মীলিত ভাবাবিষ্ট ছুটি চোখের করুণ দৃষ্টিতে। এ-যেন মথারথই 'সঙ্গীতে' ও 'ভঙ্গীতে' জীবন-দেবতার চরণমূলে আত্মনিবেদন। সার্থক এই নিম্মল নৃত্যকলা, দর্শকদের মনকে বা অতীন্দ্রিয় জগতের পানে টেনে নিয়ে যায়। রস-পিপাসু মণিপুরী জাতির মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের রসের দিকটা বিশেষ ভাবেই অনুশীলিত হয়েছে; এদের নিজস্ব-নৃত্যকলার সঙ্গে-রাধাকৃষ্ণের লীলা মিশ্রিত হয়ে একে একে অনির্কচনীয় মাধুর্য্যে মণ্ডিত ক'রে তুলেচে।

কার্তিকী পূর্ণিমা-রাত্রে 'রাস'-নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। বিপিনচন্দ্র লিখছেন—যারা রাসে নাচে তাদের মধ্যে একটি ক'রে কৃষ্ণ এবং তার দু-পাশে দুটি ক'রে রাধা সেজে থাকে। এই তথ্য কিছু ভুল আছে। কৃষ্ণ সঙ্গে একটি ছেলে আর একটি মাত্র ছোট মেয়ে রাধা সেজে রাসমণ্ডলের মধ্যে দাঁড়িয়ে নৃত্য করে। অন্তান্ত মেয়েরা সবাই গোপিনী সেজে থাকে। বাসন্তী-পূর্ণিমার রাত্রে 'বসন্ত-রাস' নামে আর একটি রাধাকৃষ্ণের লীলানৃত্য হয়। এ-ছাড়া মণিপুরীদের মধ্যে 'মারিগ-জাগই' এবং 'খুবাক-ইসাই' নামে আরও দুই প্রকার নাচের চলন আছে। প্রথমোক্তটিতে চার জন মাত্র নর্তকীর প্রয়োজন; শেষোক্তটিতে মেয়েরা গানের সঙ্গে সঙ্গে সজোরে হাত-তালি দিয়ে নৃত্য করে। কখনও কখনও নৃত্য-অন্তে মেয়েপুরুষ উভয়ে মিলে সংকীর্তন করে। বারকতক দেবমন্দির প্রদক্ষিণ ক'রে পুরুষ এবং মেয়েরা দুই সারিতে বিভক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। পুরুষরা বাম্বরে বড় বড় করতাল আর মেয়েরা করতালি দিতে দিতে কীর্তন গায়।

মণিপুরী নৃত্য-উৎসবকালে নাটমন্দিরের অপরূপ সাজসজ্জা, নর্তকীদের বেশভূষার বাহার এবং বর্ণবৈচিত্র্য, অলঙ্কারের দ্যুতি এবং তাহাদের সলীল ও সাবলীল নৃত্য যেমন নয়নের পরিতৃপ্তি সাধন করে তেমনি তাদের কর্ণনিঃসৃত চণ্ডীদাস-প্রমুখ বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলী-সঙ্গীতও নিরতিশয় সুশ্রাব্য হয়। কিন্তু তারা যখন খুব উঁচু পর্দায়, নাকিসুরে মারাত্মক কম্পনযুক্ত তাদের জাতীয় সঙ্গীত জুড়ে দেয় তখন বিরক্তির অবধি থাকে না। তার উপর খোল বাজিয়েরা আবার প্রাণপণ শক্তিতে খোল বাজিয়ে কানে তাল ধরিয়ে দেয়। এই বেহুরো চীৎকার এবং আকাশ-কাটা খোলের আওয়াজ রসোপলব্ধি-পক্ষে বিশেষ বাধাৎ জন্মায়।

ছেলেদের নৃত্য বা 'রাখাল-নৃত্য'র নাম সঞ্জইবা। রাসপূর্ণিমার দিন অপরাহ্নকালে ছেলেরা শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার অভিনয় করে। এতে একটি যুবতীকে যশোদার অংশ অভিনয় - করতে হয়। যে-সময় - ছেলে এই নৃত্যভিনয়ের সামিল হয় তাদের মধ্যে দু-জনকে সাজতে হয়



মধ্যস্থল দণ্ডায়মান 'ফানক'-পরা অবস্থিতিস্থ মহিল্য: ছাট বিবাহিত্র। ছবিৰ না-দিক দাঁড়া ন
তৃত্যে বমারাটি এবং মাৰখান উপৰিষ্ট ছোট মেয়াট ছাট আৰু সবাই হাদেৰ জাতীয়
পাতাল পৰিচ্ছদে সজিত। হাদেৰ নুখাবরণগুলি সৰিয়ে ছদি শোকা হুফট।

কুম্ভ ও বলরাম আৰু সবাই সাজে ব্ৰজের রাখাল। নাচিয়েদের মাথায় কাধ পযাস্ত ঝোলা নেউ-খেলানো পরচুলোর উপর ময়ূরপুচ্ছে শোভিত জরীদার আবরণী, গলায় পুঁতি এবং ভেল মুক্তোর কায়ক নর মালা, কর্ণে কুণ্ডল, বাহুতে কেশুর এবং পায়ে নুপুর, সকলেরই গা আঁড়। পরনে নক্সাদার পেটি দিয়ে কোমরে আটকানো স্জ এবং লাল রঙে ছোপানো মালকোটা-মাৰা রেশমী কাপড়, ছোটো চিত্ৰবিচিত্ৰ মথমলী ফলি ছই পায়ে দোলাগিত। কুম্ভের পরিধেয়, পীতধরা, তার এক হাতে মুরলী অপর হাতে পাচনি। কুম্ভ ও বলরামের অংশ অভিনেতারা যত ক্ষণ গান গেয়ে বশোদার কাছে গোড়ে বাবার অনুমতি মাগে কুম্ভসখারা তত ক্ষণ রংচঙে কাগজ-জড়ানো পাচনবাড়িগুলো ফিরিয়ে ঘুরিয়ে নানান্ ভঙ্গিমায় নতুন করে। তার পর বশোদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তারা অনতিদূরে একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে পৌছয়। সেখানে প্রকাণ্ড ভিড়, লোক গিস্গিস্ করে। পূৰ্বাছেই পুঁতে-রাখা একটা কলাগাছে কুম্ভ বলরাম ঠেঠান দিয়ে দাঁড়ায় আৰু নাচিয়েরা বলয়াকারে ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে। কিয়ৎক্ষণ পরে গালে চূণ-কালি-

মাখা এক ব্যক্তি ছোটো দইয়ের তিজেল বাকে করে এসে ছেলেদের সঙ্গে রঙ্গরস হুড়ে দেয়। ছেলেরা দধিভাণ্ড ছোটো উগাড় করে ফেলে। তার পর শাদাটে মুখোস-পরা ছোটো লোক এসে লক্ষবান্ধ করে দুকুমার বাধিয়ে তোলে। ছেলেদের পাচনির পিটনির চোটে কিন্তু শীঘ্ৰই হাদেৰ চম্পট দিতে হয়। সবশেষে কাৰ্গজের তৈরি একটি নিরাটি আকাবের বক বহন করে এক ব্যক্তি সেখানে এসে হাজির হয়, এটি বকাহুরের প্রতীক। বাহকটির মাথা পাখীটার পেটের প্রকাণ্ড ফুটোর ভেতর দিয়ে গলানো। রাখাল-ছেলেবা এই বাহমান বকের উপর আচ্ছা করে পাচন-বাড়ির খা লাগাতে থাকে, অবশ্য বাহকটির মাথা বাচিয়ে। অকস্মাৎ লোকটি হুড়ুং করে পাখীটার ভিতরে সেঁধিয়ে সজোরে হাত-পা ছুঁড়তে থাকে, এটা নাকি বকাহুরের মৃত্যুর পৃব্বলক্ষণ। তখন কয়েক জনে পাখীহুদ্ব তাকে বয়ে নিয়ে যায়।

বকাহুর-বধের পালা সারা হবার পর গীতবাদ্যের আরাবে হেমন্তের আব্ছা জোৎস্নাপ্লাবিত মেঠো পথ অহুরণিত করে সকলে ঘরে ফিরে আসে। নাচিয়েরা এক-উঠান সুবেশা

পুরনারীর ভিড়ের ফাঁকে দারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আর্জিনায় প্রোথিত একটি কলাগাছের চারা এবং সপত্র বেণু-প্রশাধার নিকটে মঙ্গলঘট মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে একটি লাবণ্যময়ী গৌরাঙ্গী কিশোরী। যশোদার অংশ অভিনয়-কারিণী তরুণীটি ছেলেদের মাথায় তুলসীপাতা ছিটিয়ে দেয় এবং একটি কাঁসিতে অনেকগুলো ধূপকাঠি জ্বালিয়ে হস্ত দুটি ছন্দায়িত করে গোপালের নীরাজনা করে, আর তার পাশেই দণ্ডায়মান একটি যুবতী সুবলিত হস্তে চামর বীভন করে। সর্বশেষে এরা দু-জনে ছেলেদের প্রসাদ খাট্টিয়ে দেয়।

এই অভিনয়ের মধ্যে আন্তরিকতার ভাবটি হৃদয়কে

বিশেষভাবে স্পর্শ করে। গোষ্ঠে যাবার জন্তে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণসখাদের অধীরতা, গোপালকে গোচারণে যেতে দিতে অনিচ্ছুক মাতা যশোমতীর জেহাতুর মাতৃহৃদয়ের আকুলতা এবং গোপালের প্রতি তার অপরিসীম বাৎসল্য ইত্যাদির 'সুস্থ' অভিব্যক্তি দেখে স্থানকাল ভুলে যেতে হয়। এই অভিনয় মনকে টেনে নিয়ে যায় সেই কল্পলোকে যেখানে অনন্তকাল ধরে চলচে বৃন্দাবনের সেই চিরকিশোরের চিরসুন্দরী লীলা। সৌন্দর্য-উপাসক ভক্তিপ্রাণ মণিপুরীদের মধ্যে মহাপ্রভুর প্রেমধনু-প্রচার যে সার্থক হয়েছে, তাদের নৃত্য-উৎসব দেখলে সে-বিষয়ে আর অণুমাত্রও সংশয় থাকে না।

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী সীতাবাঈ মোরে বোম্বাই শহরে লাঠিখেলা ও



শ্রীমতী সীতাবাঈ মোরে

অসিচালনায় কৃতিত্বের জন্ত বহু পারিতোষিক লাভ করিয়াছেন।

গত শীতকাল কলিকাতার চিত্রপ্রদর্শনীগুলিতে যে-সকল মহিলার চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাঁহাদের কয়েক

জনের নাম গত চৈত্রের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ তালিকার দ্বিতীয় নামটি প্রভাময়ী মিত্র। ইনি তের-বৎসর বয়সে বিবাহিতা হইলেও বহু বাধার মধ্যে দিয়া, কোন প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষকের সাহায্য না লইয়া, নিজ চেষ্টায় মৌল বৎসর বয়স হইতে অঙ্কন ও নানাপ্রকার শিল্পে নৈপুণ্য লাভ করেন। বর্ণচিত্র, রেখাচিত্র, আলোকচিত্র,



শ্রীমতী প্রভাময়ী মিত্র

শ্রীশিল্প, ও আল্পনা-চিত্রে ইহার বিশেষ দক্ষতা। আল্পনার পুরাতন আদর্শ ভিন্ন ইনি অনেক নূতন আদর্শে অঙ্কন করেন। বহু পরিশ্রম করিয়া অনেক মহিলা ও বালিকাকে নানা প্রকার শিল্প শিক্ষা দিয়াছেন। ইহার রচিত কবিতা বহু সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

বোম্বাই-নিবাসী শ্রীমতী অমৃত কাউর আসামের প্রাবনে বিকস্তু অঞ্চলের সাহায্যকল্পে জনসাধারণকে উদ্বোধিত করিবার জন্য মৃত্যুপণ করিয়া উপবাস আরম্ভ করিয়া-ছিলেন। সম্প্রতি তথাকার নেতৃবৃন্দের অনুরোধে তিনি এই পণ হইতে নিরপ্ত হইয়াছেন। তিনি ইতিমধ্যেই সাত হাজার নূতন শাড়ী, এক হাজার পরানো কাপড় এবং নগদ তিন হাজার টাকা পাইয়াছেন। চারি হাজার শাড়ী আসামে প্রেরিত হইয়াছে। তিনি শায়ই নগদ বিশ হাজার টাকা পাইবার আশা করেন।

শ্রীমতী জয়শ্রী নৈবাদ রায়চী রেজিস্ট্রার প্রাক্কুরেট



শ্রীমতী জয়শ্রী নৈবাদ রায়চী

শ্রীমতী অমৃত কাউর

কনষ্টিটিউয়েন্সী হইতে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।



পুনাস্থিত ভারতীয় মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন উৎসব

বাম পাশ্বে হইতে চেয়ারে উপবিষ্ট—অধ্যাপক ডি, কে, কার্ভের পুনবধু এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার শ্রীমতী ইরাবতা কার্ভে, বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত পাটকর, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ডি, কে, কার্ভে। মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এবারকার জি-এ (গ্রাজুয়েট অব্ আর্টস) উপাধিপ্রাপ্ত কয়েকটি ছাত্রী পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান ও সমুখভাগে উপবিষ্ট



বাংলা

পদব্রজে লক্ষ্মী-ভ্রমণ—

বিগত ৩০এ অক্টোবর শান্তিনিকেতন হইতে শ্রীমান্ মহাসরঞ্জন দে ও শ্রীমান্ সমরেন্দ্রকিশোর দত্তরায় পদব্রজে লক্ষ্মী যাত্রা করেন।



শ্রীমান্ মহাসরঞ্জন দে ও শ্রীমান্ সমরেন্দ্রকিশোর দত্তরায়

তাহারা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়া অগ্নির হস্তরাছিলেন। তাহারা প্রতিদিন বিশ মাইল ঠাঁটতেন। রাস্তায় তাহারা হাজারিবাগ, রাঁচি, পুকলিয়া, বুদ্ধগয়া ও গয়া হইয়া গিয়াছিলেন। ইহারা শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ছাত্র। প্রত্যেক জায়গায় চার-পাঁচ দিন থাকিয়া নানা ছবি আঁকিতেন। ইহারা সম্প্রতি ফিরিয়াছেন।

জগৎপুরাশ্রম টোল—

চট্টগ্রামস্থ জগৎপুরাশ্রম টোল হইতে এই বৎসর গভর্নমেন্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় শ্রীমতা জ্যোতির্ণয়া বক্ষচারিণী ও শ্রীমতা বাসন্তী বক্ষচারিণী সাংখ্যদর্শনের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তৎসঙ্গে শ্রীমতা বাণাপাণি ও শ্রীমতা বাণামাধুরী যথাক্রমে ব্যাকরণের মধ্য ও অষ্ট পরীক্ষা ও অষ্ট ছুটি মেয়ে সারস্বত আড়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

গত বৎসর গভর্নমেন্ট শিক্ষা-বিভাগ (Ministry of Education) শ্রীমতা জ্যোতির্ণয়াকে সাংখ্যের আড়া ও মধ্য পরীক্ষার জন্ত এবং শ্রীমতা বাসন্তীকে বেদান্ত-দর্শনের মধ্য পরীক্ষার জন্ত বিশেষ পুরস্কার দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। শ্রীমতা দেয় ইতিপূর্বে ঢাকা কলেজকেশনে মহামাশ্রু বাংলার গভর্নর বাহাদুর কর্তৃক স্বর্ণপদকে ভূষিতা হইয়াছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে এই টোল ভারতবাসে মহিলাদের মধ্যে সংস্কৃত দর্শনাদি শিক্ষার প্রচার করিয়া প্রাচীন ভারতের অর্গ্য-যুগের স্মৃতি সমুজ্জ্বল রাখিয়াছে। সাধারণতঃ চট্টগ্রাম-বিভাগের অন্যান্য

টোল হইতে কাব্য ব্যাকরণের পরীক্ষাই দেওয়া হয়। দর্শনশাস্ত্রের বিশেষতঃ নব্যশাস্ত্রশাস্ত্রের, পরীক্ষার্থী কেবলমাত্র এই টোল হইতে উপস্থিত হইয়া থাকে।

—পাকভাষা

মহিলার দান—

কলিকাতা গিরিদপুর-নিবাসী অতিরিক্ত সেনানী জজ স্বর্গীয় রায়-বাহাদুর অঘোরচন্দ্র হাজারি বিধবা পত্নী শ্রীমতী রাধারানী দাসা মৃত্যুকালে রোগকিষ্ট নরনারীর সেবার জন্ত যাদবপুর মঞ্চা-ভাসপাতালের তহবিলে চৌদ্দ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

পবলোকে কুচবিহারের দর্ভীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত—

গত ১১ই জুলাই কুচবিহার স্টেটের জনপ্রিয় দেওয়ান মহীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত মহাশয় পবলোকগমন করিয়াছেন।

তিনি সামান্য কাহনগার কামো নিবৃত্ত হইয়া কুচবিহারে আসিয়া কয়েক দিনে প্রতিভাবল গত ১৯৩২ সনে স্টেটের সর্বোচ্চ রাজকর্মচারীর



মহীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

পদ লাভ করেন। এই সময় প্রায় সকল স্টেটেরই আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। অসাধারণ বুদ্ধিবলে তিনি কুচবিহার স্টেট প্রভূত উন্নতি করেন। স্টেটের উন্নতি ও প্রজার কল্যাণ তাহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

তিনি একাধারে উদার, মজৎ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন।

পায়ের তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। কচবিহার স্টেটে মালক-বালিকাদের জন্ত তিনি বহু উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। একটি নৈশবিদ্যালয়ও তাঁহার চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরলোকে পুরুলিয়ার হরিপদ দাঁ—

পুরুলিয়া হইতে শ্রীবৃন্দ বসন্তকমার দাঁ লিখিয়াছেন—

পুরুলিয়া-নিবাসী হরিপদ দাঁ মহাশয় ১৯৮৯ সালে বাঁকড়া জেলার নানামণী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বাবসায় উপলক্ষ



পরলোকগত হরিপদ দাঁ

পুরুলিয়াতে বাস করিতেন। পঞ্চদশ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হইলে পিতৃকণ ও মাতা একত্রানি দিনকরাটি সম্বন্ধে হইয়া হরিপদ দাঁ মহাশয় সংসার প্রবণ হন।

দাঁ-মহাশয়র বিদ্যাশিক্ষা পাঠশালায় গণ্ডা অতিক্রম করে নাহি, কিন্তু তিনি নিজ চেষ্টায় বহু বাংলা গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজী সামান্য বুদ্ধিতে পারিতেন। প্রথমে ইংটির বাবসায় ও পরে ঠিকাদারী করিয়া তিনি অদম্য গদাবসায় ও অলোক্য পরিশ্রমে গুণ নিজ অবস্থার উন্নতি করেন। তিনি বহু অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন এবং অকাতরে দান করিয়া গিয়াছেন।

দাঁ-মহাশয় বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তিনি পুরুলিয়ার সাধারণ পুস্তকাগারের গৃহ নিৰ্মাণ করিয়া দেন। সেইজন্য দাঁ-মহাশয়র নামানুসারে পুস্তকাগারের “হরিপদ সাহিত্য-মন্দির ও সাধারণ পাঠাগার” নামকরণ হয়।

মানভূম জেলায় নিরক্ষরের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারকল্পে ১৯৩৫ সালে দাঁ-মহাশয় মানভূম জেলার সর্বত্র ঘোষণা করেন যে, পাঠশালায় যে-কোন ছাত্র কিংবা ছাত্রী অগ্রানস্থ দশ জন নিরক্ষর লোককে প্রথম শ্রেণী বা দ্বিতীয় ভাগে বর্ণপরিচয় পর্যন্ত পড়াইয়া দিবেন, তাহাকে তিনি সর্গপদক ও রৌপ্যপদক পুরস্কার দিবেন। ১৯৩৬ সালে ‘প্রবাসী’

সম্পাদক শ্রীবৃন্দ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে যে বার্ষিক উৎসব ও সভা হয় তিনি তাহাতে উক্তরূপ বহু পুরস্কার ও পদকাদি বিতরণ করেন। হরিপদ সাহিত্য-মন্দিরের বার্ষিক সভায় তিনি শিক্ষা, শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্যচর্চা, প্রবন্ধরচনা, শারীরিক ব্যায়ামচর্চা প্রভৃতি



হরিপদ সাহিত্য-মন্দির ও সাধারণ পাঠাগার

বিষয়ে উন্নতির জন্ত নানাবিধ পুরস্কার ও পদক বিতরণ করিতেন। সাহিত্য বিস্তারের প্রবল আগ্রহে নিজ বিপুল ধনগ্রন্থ হইয়াও মাতৃভক্ত দাঁ-মহাশয় নিজ বাসে বর্তমান বালিকা-বিদ্যালয়ের স্থপতিস্বরূপ



শাক্তময়ী মহল-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয়

গৃহটি নিৰ্মাণ করিয়া দেন। তাঁহারই জননীর নামানুসারে উক্ত গৃহে “শাক্তময়ী মহল-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয়” প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

গত সত্ৰাগ্রহ আন্দোলনের সময় মানভূমের বিখ্যাত জননেতা শ্রদ্ধেয় নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত, অতুলচন্দ্র বোস প্রভৃতি কংগ্রেসের কর্মীবৃন্দ যখন সপরিবারে নিরাশ্রয় হইয়াছিলেন সেই সময় দাঁ-মহাশয় নিজের স্ববৃত্ত উদ্যানবাটীতে বাসোপযোগী রন্ধন গৃহাদি নিৰ্মাণ করিয়া তাহাদিগকে আশ্রয় দান করেন।

পুরুলিয়ার শ্মশান-বিশ্রামাগার সাধারণের চাঁদায় নিয়িত হইলেও দাঁ-মহাশয় উক্ত গৃহনিৰ্মাণে কার্যিক ও আর্থিক সাহায্য করিয়াছিলেন।

গত ৩রা আষাঢ় মাসে একান্ত বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন।

বাংলাবেড়িয়া গ্রন্থাগারিক শিক্ষাকেন্দ্র—

যে-সকল প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় জাতীয় উন্নতিসাধন সম্ভব গ্রন্থাগার তাহাদের মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। গ্রন্থাগারের কার্য-কারিতা প্রধানতঃ গ্রন্থাগারিকের উপর নির্ভর করে। সেজন্য আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে গ্রন্থাগারিকের কার্য শিক্ষা দিবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ভারতবর্ষেও পঞ্জাব প্রভৃতি কয়েক স্থানে গ্রন্থাগার-পরিচালন-বিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলা দেশে এক্ষণে কোন ব্যবস্থা নাই। সম্প্রতি ভগলী জেলা গ্রন্থাগার সমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সমিতির সভাপতি এবং নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সমিতির সহকারী সভাপতি কুমার মুনসুরদেব রায় মহাশয়ের উদ্যোগে এবং শ্রীতিনকড়ি দত্ত প্রমুখ কৃষ্ণিগণের চেষ্টায় গত জুন মাসে ভগলী জেলা সমিতির অধীনে ভগলী জেলার বাংলাবেড়িয়া গ্রামে মাত্র পনের দিনের জন্ত একটি অস্থায়ী গ্রন্থাগারিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ও বারাদা হইতে গ্রন্থাগার পরিচালন-বিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বসু নামক জনৈক যুবক কেন্দ্রটির কাযভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক মিঃ কে. এম. আসাদুল্লাহ উহার অবৈতনিক পরিচালকরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাংলা দেশে গ্রন্থাগার-পরিচালন-বিদ্যা শিক্ষা দিবার ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা। তথাপি কেন্দ্রের কার্য বিষয় সন্তোষজনক হইয়াছে। শিক্ষার্থিগণ গ্রন্থাগার-পরিচালন-বিদ্যা শিক্ষার জন্ত বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

এক্ষণে গ্রন্থাগার পরিচালন-বিদ্যা শিক্ষা দিবার একটি স্থায়ী ব্যবস্থা করা বিশেষ আবশ্যিক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকের কার্য শিক্ষা দিবার জন্ত সিঙিকের এক প্রস্তাব গবর্ণমেন্টের বিবেচনাধীন আছে। ঐ প্রস্তাব সফল কার্যে পরিণত করিবার জন্ত গবর্ণমেন্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় উভয়েরই অনতিবিলম্বে অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে 'রবীন্দ্র-সংগ্রহ'—

গত ৮ই শ্রাবণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবস রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় বাংলা পুস্তক, তাঁহার পুস্তকর বিভিন্ন সংস্করণ, তাঁহার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনার পাণ্ডুলিপি, কবির নানা বয়সের আলেখ্য ও চিত্রাদি, কবির বাবস্ত্র দ্রব্যাদি, কবির প্রাপ্ত উপহারাদি, কবির লিখিত পত্রাদি, কবির সহস্র অঙ্কিত চিত্র, কবির পুস্তকর বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া স্থায়ী ভাবে রাখিবার জন্ত একটি 'রবীন্দ্র-সংগ্রহ'র উদ্বোধন হয়। পরিষদের সহ-সভানেত্রী শ্রীমতী অনুরূপা দেবী তাঁহার উদ্বোধন করেন। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী পাণ্ডুলিপি, শ্রীমতী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পত্রাদি, শ্রীমতী সরলা দেবী চিত্রাদি, শ্রীমতী অমল হোম জয়ন্তী-সম্পর্কীয় নানা দ্রব্য ও কবির অল্প বয়সের আলেখ্য, শ্রীমতী রথোজনাথ ঠাকুর কবির বাবস্ত্র দ্রব্য, উপহার, বিভিন্ন বয়সের আলেখ্য ও কবির স্বয়ং তাঁহার স্বহস্ত অঙ্কিত চিত্র প্রদান করিয়াছেন।

এই সংগ্রহ-কার্য পরিপূর্ণ করিবার জন্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ শ্রীপ্রশান্ত মহালানবীশ, শ্রীঅমল হোম, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীসুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র ঘোষকে লইয়া একটি সমিতি

গঠিত করিয়া দিয়াছেন। কবির সম্পর্কীয় নানা লেখা, পত্র, দ্রব্যাদি নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তাহা একত্র সংগৃহীত হইয় পরিষদ-মন্দিরে রক্ষিত হইলে কবির রচনার আলোচনা ও তাঁহার জীবনীর উপাদান সংগ্রহের কার্যে অনেকের বিশেষ সহায়তা হইবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বাঙালী জাতির এই অমূল্য সম্পদগুলি রক্ষা করিবার কার্যে সকলকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন এবং তাহাদের নিকট কবির সম্পর্কীয় লেখা ও দ্রব্যাদি আছে পরিষদে রক্ষা করিবার জন্ত সে-সব প্রদান করিতে, তাঁহাদিগকে অহরোধ করিতেছেন।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন, দ্বাদশ অধিবেশন, কলিকাতা—

বিগত ২২এ শ্রাবণ (৭ই আগষ্ট) মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টার সময় এলবার্ট হল কমিটী-রুম শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের অর্থাধিবেশন সমিতির চতুর্থ অধিবেশন হয়। সভায় সকলসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত বাক্তিবর্গকে লইয়া উহার কার্যসম্পদ গঠিত হইয়াছে।

অর্থাধিবেশন সমিতির সভাপতি— শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

সহকারী সভাপতি— শ্রীযুক্ত অনিলকুমার দে, শ্রীযুক্ত অনুরূপা দেবী, মোহাম্মদ আব্দুর রহমান খান, পান-বাহাদুর আহশান উল্লাহ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, রায় গণেশচন্দ্র মিত্র বাহাদুর, রায় জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ, ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত নলিন্দারঞ্জন সরকার, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মানকুমারী বসু, শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়, শ্রীযুক্ত মুগালকান্তি বসু, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীযুক্ত সরলা দেবী চৌধুরাণী।

সাধারণ সম্পাদক— ডাঃ নরেশচন্দ্র রায়।

সহ-সম্পাদক— শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ।

কোষাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

স্বাগত-কোষাধ্যক্ষ— কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতর্থা।

কাব্যকর সমিতির সাধারণ সভা— শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দ, পান-বাহাদুর আমানুল্লাহ, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক, প্রদর্শন-বিভাগ, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র প্রামাণিক সম্পাদক— সভাপতি ও প্রচার-আমদ-প্রসাদ বিভাগ, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র রায় সম্পাদক রক্ষণশালী বিভাগ, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন সম্পাদক সাহিত্য-বিভাগ, শ্রীযুক্ত রথোজনাথ ভট্ট সম্পাদক— স্বেচ্ছা সর্বক বিভাগ, শ্রীযুক্ত মুগালকান্তি বসু, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি চৌধুরী সম্পাদক প্রচার বিভাগ, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদক— সম্বন্ধন বিভাগ, শ্রীযুক্ত রথোজনাথ নিয়োগী সম্পাদক— অর্থ-বিভাগ, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বিদেশে বাঙালী বালকের কৃতিত্ব—

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের উপযোগী করিবার জন্ত বিলাত কতকগুলি বিদ্যালয় আছে। এগুলি 'পাবলিক স্কুল' নামে খ্যাত। শ্রীমান পুষ্পবরণ ঘোষ ডেভনশায়ারের 'ব্রাউল স্কুল' নামে এইরূপ একটি বিদ্যালয়ের ছাত্র। এই বিদ্যালয়গুলির ছাত্রদের মধ্যে একটি কঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় শ্রীমান পুষ্পবরণ সর্বপ্রথম হইয়া বার্ষিক চল্লিশ পাউণ্ড পরিমিত চারি বৎসরের জন্ত খর্চন পাই



শ্যাম প্রসন্ন মুখার্জী

পাঠ করিয়াছেন। ইতার বয়স মাত্র ৩৩ বৎসর। শ্যাম প্রসন্ন মুখার্জী
মহাশয়ের পুত্র। এ. এম. মোস মহাশয়ের পুত্র।
ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন



শ্রীকৃষ্ণ অমলাকুমার ভৌমিক

শ্রীকৃষ্ণ অমলাকুমার ভৌমিক বিলাতে বিদ্যুৎ ও কারিগরি বিষয়ক
ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন নামের
দেলে আগমন করিয়াছেন। এখন তিনি স্বাধীন বাবসায় আরম্ভ করিলে
দেশবাসীর কল্যাণসাধন করিতে পারিবেন।

বিদেশ

কমানিয়ার ভারতীয় কনেল—

প্রিয়না হইতে শ্রীকৃষ্ণ অমলাকুমার মহাশয় কনেল নরসিংহ
মূলগন্দ নামক কমানিয়া-প্রবাসী এক জন ভারতীয়ের সংক্ষিপ্ত জীবন-



কনেল নরসিংহ মূলগন্দ

কাহিনী আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। মূল প্রবন্ধটি 'মডার্ন
রিভিউ'র সেপ্টেম্বর সংখ্যায় মুদ্রিত হইবে। এখানে প্রবন্ধটির চূড়ক
দেওয়া হইল।

কনেল নরসিংহ মূলগন্দ হায়দ্রাবাদ (দাক্ষিণাত্য) শহর হইতে ষাট
মাইল দূরে ভুবনগিরি জেলায় এক মরাঠা-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।
বোম্বাই হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি উচ্চ শিক্ষা
লাভার্থ কলিকাতায় আগমন করেন। সেখানে একই সময়ে স্কটিশ
চার্চেস্ কলেজ ও ডাক্তার এস কে মল্লিকের স্কল মেডিক্যাল
কলেজে অধ্যয়ন করিয়া যথাক্রমে এক-এ ও এম-সি-পি-এস
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পর ১৯১০ সনে লণ্ডনে গিয়া সেখানকার এম-
আর-সি-এস ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন। বঙ্গ-বৃদ্ধের সময় মূলগন্দ

মহাশয় রেড ক্রোসেন্ট মিশনের স্বৈচ্ছাসেবকরূপে তুরস্কে গমন করেন। তিনি তুরস্কের সৈন্যদলে সাটালজায় চিকিৎসকের কার্য করেন। তুরস্ক-সরকার তাঁহার কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'অডার অব কম্যান্ডার অব মার্জিডিয়া' উপাধিতে ভূষিত করেন। পরে যখন রুমানিয়া



বাস দিক হইতে--মূলগন্দ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ কন্যা, সহধর্মিণী ও কন্যাদের জনৈক বন্ধু : সপ্তমে মূলগন্দ মহাশয়ের কনিষ্ঠ কন্যা

বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শোষণ করে তখন তিনি রুমানিয়ায় গমন করেন। সেখানে তিনি জিমনিকার বুদ্ধাক্ষেবে ডাক্তার হইয়া যান। তখন রুমানীয় সৈন্যদলে কলেরা রোগের প্রকোপ হইলে তিনি সমস্ত চিকিৎসা করেন ও সেবা-শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করেন। তাঁহার কৃতিত্বে যুদ্ধ হইয়া রুমানীয় সরকার তাঁহাকে 'অডার অব মিলিটারি ভারচু' উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার অল্পদিন পরে তিনি রুমানিয়ার অধিবাসীরূপে গণ্য হইয়াছেন। বিগত মহাযুদ্ধে রুমানীয় জাঙ্গানার বিরুদ্ধে অগ্রদারণ করিলে তিনি তাঁহার সৈন্যদলে প্রথমে লেফটেন্যান্ট রূপে যোগদান করেন ও পরে ক্যাপটেন হন। পরে উদ্যোগে তিনি কনেস পদ লাভ করিয়াছেন।

মূলগন্দ-মহাশয় এক রুমানীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার দুইটি কন্যা : তাহাদের চিত্র এখানে দেওয়া হইল।

মূলগন্দ মহাশয় রুমানিয়া-প্রবাসী হইলেও ভারতীয় সংস্কৃতির সত্যক পোষকতা করেন। মাতৃভাষা মরাঠী ছাড়া সংস্কৃত, হিন্দী ইত্যাদিও তিনি বিশেষ চর্চা করেন।

অর্থনৈতিক প্রদর্শ

ভারতীয় কাপড়ের কলের কাজ—

গত এক বৎসরে (এপ্রিল ১৯৩৩-মার্চ ১৯৩৪) ভারতের কল-সমূহে যে সূতা কাটা ও কাপড় বোনা হইয়াছে, তাহা অশ্রান্ত বৎসরক তুলনায় অভ্যন্ত কম, যথা—

(হাজার পাউণ্ড)	১৯৩১-১৯৩২	১৯৩২-৩৩	১৯৩৩-৩৪
সূতা	৯,৬৬,৩৭৩	১,১৬,৪২২	৭,২১,০৫১
কাপড়	৫,৭২,২৫৮	৫,৯২,৯০১	৬,৪৫,৭১৮
মোট	১৬,৩৮,৬৩১	১,৭১,৩২৩	১৩,৬৬,৭৬৯

এই আলোচ্য বৎসর সূতা অনেক কম আমদানি হইয়াছে। যথা—

	(হাজার পাউণ্ড)		আমদানি	
	উৎপন্ন		১৯৩২-৩৩	১৯৩৩-৩৪
সূতা—সূতা	৭,৭৬,৭৯৯	৬,৮৫,৭৬২	১,২১২	৪৩৬
সূতা—সূতা	১,৯৭,৩৫৪	১,৯১,৩০৫	১১,৬৬৪	১২,৭৯৯
সূতা—উল	৩৬,৫৯৬	৩৭,৩৯৮	৫,৯০৯	৫,৭৭৯
মোট	১০,১০,৭৫১	৯,১৪,৪৬৫	১৯,৩৮৫	২১,২১৪

ভারতবর্ষে হইতে সমুদ্রপথে কিছু সূতা বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। আলোচ্য বৎসর তাহার পরিমাণ বাড়িয়াছে, যথা—

বৎসর	লক্ষ পাউণ্ড
১৯৩১-৩২	২২০
১৯৩২-৩৩	১০০
১৯৩৩-৩৪	১৬০

আলোচ্য বৎসর পুরু বৎসর 'আপনারা' বয়স কম হইয়াছে। যথা—

	(হাজার গজ)	
	১৯৩২-৩৩	১৯৩৩-৩৪
কোরা ও শাদা চিট ও লেগুপ	৭৫৮,৭৫১	৫০৫,৫৮১
টি কাপড় প্রভৃতি	১,৩৩,৬৯২	১,৩৮,৫৫৮
বুট	১,০৯৬,৮০৭	৯৯৮,৫২০
চাদর	৫৮,৬২৭	৫৬,১০৫
খাদি	১,১৫,২৯৯	১১,১০০
মোট	৪,৪১৩,৯৩৬	৩,৮০,৩৬৪

আলোচ্য বৎসর বিদেশ হইতে বস্ত্র আমদানি হ্রাস পাইয়াছে। যথা—

	(হাজার গজ)		আমদানি	
	উৎপন্ন		১৯৩২-৩৩	১৯৩৩-৩৪
কোরা ও শাদা	৩,৪২২,৯৯৮	১,১৬৪,৯৯৫	৭৬৮,৭৬৪	৯৯২,৩০০
বস্ত্র	৭৪৬,৯০১	৬৮০,৭৫৭	৪২৪,৭৯৬	২৬৮,৭১৬

সম্প্রতি একটি আইন হইয়াছে যে হাতে-বোনা কাপড় ছাড়া কিছুই খন্দর বা খাদি নামে পরিচিত হইতে পারিবে না।

সূতা ও কাপড় বিদেশ হইতে কম আমদানি হইতেছে, মিলে কম প্রস্তুত হইতেছে, ইহাতে কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে হাতে-বোনা কাপড় অর্থাৎ খন্দরের ব্যবহার বাড়িতেছে। যদি খন্দরের একট বৎসরিক হিসাব পাওয়া যাইত তবেই বুঝা যাইত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কাপড়ের চাহিদা বাড়িতেছে

কি ভারতবাসীর ক্রয়-শক্তি হ্রাস পাউতেছে ও উচ্চতর কাপড়ের চাহিদা কমিতেছে।

সম্প্রতি বাংলা দেশ একটি কলওয়াল সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।—কিন্তু বাংলা দেশের সবগুলি কলই বাঙালীর মূলধনে গঠিত নহে।

পাটের 'ফটকা' বাজার রহিয়া গেল—

বাংলা সরকার (বাণিজ্য বিভাগ) পাটের ফটকা বাজার সম্পর্কে হস্তক্ষেপ না করিবার নীতি অবলম্বন করিতে সক্ষম করিয়াছেন। ফটকা বাজার উঠাইয়া দিবার জন্ত প্রার্থনা করিয়া গত মার্চ মাস পাট বাবসায়ী লিখিত কতিপয় সঙ্ঘ বাংলার গবর্নরের নিকট প্রথম আবেদন করেন, তৎপর ঐষ্ট ইণ্ডিয়ান জুট এসোসিয়েশন একটি আবেদন উপস্থিত করিলে প্রথম আবেদনকারীগণ, উহাতে উপস্থাপিত যুক্তির উত্তরস্বরূপ মাসে দ্বিতীয় এক আবেদন করেন। এই আবেদনকারীগণ গবর্নর বাহাদুরের সাফাতি উপস্থিত হইয়া নিজ বক্তব্য প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাউয়াছিলেন।

সরকার বলেন পাট বাবসায়ীর বিভিন্ন শাখায় যাহার বর্তমান সমস্যার সমাধান তাহাদিগকেই করিতে হইবে; সদিচ্ছা দ্বারা একরূপ সমাধান খুঁড়ি মস্তবপর ১৯৩০ সালে যেকরূপ একটি বৈতক হইয়াছিল, বর্তমানেও একরূপ একটি বৈতকে আলোচনায় সমস্যার সমাধান হইতে পারে। যদি আলোচনায় স্থির হয় যে ফটকা বাজার অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে, তবে লিবারপুল কটন একচেঞ্জ (তুলার ফটকা বাজার) সম্পর্কে অভিজ্ঞ একব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইতে পারে। পাটের ফটকা বাজার সম্পর্কে তিনি নতুন পরিকল্পনা উপস্থিত করিবেন। পাটের বাবসায়ী লিখিত নতুন খণ্ডস্থানায় অবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞ হইতে হইবে তিনজন ব্যক্তিকে তাহার সহকারীরূপে নিযুক্ত করা হইতে পারে। যদি এই প্রস্তাবাবল্যায় কাব্য করা হয় তবে বাংলা সরকার যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। এসিয়ান ফটকা বাজার সম্পর্কে আবেদন পর মসুহ সম্যক বিবৃতি দেওয়া হয় নাই, যদি এই সম্পর্কে কোন কাব্য আবশ্যিক মনে হয়, তবে আবেদনকারীগণ স্বতন্ত্রভাবে সরকারের নিকট আবেদন করিতে পারেন।

পাটের ফটকা বাজার সম্পর্কে পাটবাবসায়ীগণের মধ্যে মতভেদ অত্যন্ত প্রবল, পাট হৃদস্ত কমিটিও মস্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, গাছন দ্বারা ফটকা বাজার উঠাইয়া দিলে কোন বিশেষ উপকার হইবে না। প্রতিকার পাটবাবসায়ীদের হস্তেই, তাহার তাহার সংস্কার সাধন করিতে পারেন। স্বতরাং সরকার বলেন—পাটচাষী ও বাবসায়ীগণের সফলনাশ হইতেছে, একরূপ বিশ্বাস না হইলে সরকারের পক্ষে ফটকা বাজার বন্ধ করিবার আইন করা অসম্ভব। যদিও ফটকা বাজারের প্রকৃত কাব্য হৃদস্তরূপে সম্পাদন করিতে ঐষ্ট ইণ্ডিয়ান জুট এসোসিয়েশন পাট বাবসায়ীগণের উপযুক্ত সহায়তা লাভ করিতে পারে নাই, তথাপি সরকার ইহা বিশ্বাস করিতে পরিতোছেন না যে তুলা বা গমের বেলা যেমন হয়, পাটের বেলাও চাষী ও অস্ত্রাশ্র বাবসায়ীর উপকারের জন্ত ফটকা বাজার পরিচালিত হইতে পারে না। আবেদনকারী ও প্রতিবাদকারী যে ভাবে পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে, সংস্কার অত্যন্ত আবশ্যিক, কিন্তু সরকারের এই বিশ্বাস জন্মে নাই যে, পাট চাষী ও বাবসায়ীর স্বার্থ গমন বিপদাপন্ন যে, এই মুহূর্তেই ফটকা বাজার তুলিয়া দেওয়া প্রয়োজন।

এই ফটকা বাজারের সংস্কার সাধনের জন্ত ঐষ্ট ইণ্ডিয়ান জুট এসোসিয়েশন সম্প্রতি কলিকাতা বেলেড জুট এসোসিয়েশনের সহযোগিতা আহ্বান করিয়াছেন।

পাটের রপ্তানি শুধুকে তারতম্য—

লণ্ডনের ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বাহিরে যে পাট রপ্তানি হয়, তাহার উপর অতিরিক্ত শুল্ক বসাইবার জন্ত ইংলণ্ডের ও ভারতের সরকারকে প্ররোচিত করিতে ডাঙীর পাট বাবসায়ীগণ কলিকাতার পাট বাবসায়ীদের সহযোগিতা চাহিতেছেন। তাহাদের বৃষ্টি এই যে, পাট সাম্রাজ্যের পণ্য স্বতরাং সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ পক্ষপাত ব্যবহার পাইবার অধিকারী। কলিকাতা ও ডাঙী উভয়স্থলেই পাট বাবসায়ের অবস্থা অত্যন্ত পারাপ—ইহা হইতে একরূপ সহযোগিতার প্রস্তাব উঠিয়াছে।

কিছুদিন পূর্বে বাংলা দেশ পাট রপ্তানি ও পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ত এক শ্রেণীর বাবসায়ীগণ চীৎকার তুলিয়াছিলেন। বর্তমান প্রস্তাব তাহারই প্রতিধ্বনি মাত্র। পাটের চাহিদা কম, পাটের অতি-উৎপাদন হইতেছে স্বতরাং পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ অত্যাশঙ্কক—এইরূপ পরামর্শ বাংলার চাষী যখন গ্রহণ করিল না, তখন এই সকল বাবসায়ী নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্ত পাটের উপর অতিরিক্ত রপ্তানি শুল্ক দাব্য করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে বাজার হইতে বাহির করিতে চেষ্টা পাউতেছে।

একই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ডাঙী যে দাবি উপস্থিত করিয়াছে রাজনৈতিক ভাবপ্রবণতার তাহার একটা মূলা থাকিতে পারে, কিন্তু অর্থনৈতিক হিসাবে তাহার কোনই মূলা নাই। একই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ডাঙী বা ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া বা কানাডা প্রভৃতি বাংলা পাটের শ্রেষ্ঠ ক্রেতা নহে। নিম্নের তালিকা হইতে বেশ পরিষ্কার দেখা যায় পাটের বড় পরিদদার কে—

দেশ	বৃদ্ধির যুদ্ধের		বৃদ্ধির ১৯৩০-৩১		১৯৩১-৩২	
	পুল গড়	কাল গড়	পুল গড়	কাল গড়	পুল গড়	কাল গড়
মোট ব্রিটিশ সাম্রাজ্য	১৬৯৫	১৩০৩	৯৫৭	৬১১	৮৮৫	৮৮৫
মার্কিন	৫৩৫	৫২৩	৪৮৩	২৯৭	২৭৫	২৭৫
ফ্রান্স	৪২৮	১২৮	৩৫৭	৫০০	২৯০	২৯০
ইটালি	৩১৩	৩১৫	১৮০	২৩৬	২৪৭	২৪৭
বাজিল	১৫	৬৬	৭৯	৮৫	৮৮	৮৮
জাপান	১৭	৩০	৬০	৩৩	৫৬	৫৬
বেলজিয়াম		১	১৭৪	২৬৮	২৪৪	২৪৪
স্পেন	১২২	১৭২	১৩২	১৮৫	১৯৯	১৯৯
জার্মানি	৯২০	৩৩	৫৮৬	৯৪৬	৭৩৩	৭৩৩
অস্ত্রাশ্র দেশ	৩৩৬	৫৭	৯৪	৩০৮	২৫৫	২৫৫
সাম্রাজ্য বাহিরে						
মোট	২,৫৮৬	১২৯৬	২,১৪৫	২,৮৫৫	২,৪০০	২,৪০০

(গ) ছালা (লক্ষ সংখ্যা)	১৯০০-০১	১৯০১-০২
বৃহত্তরাজ্য	৪০১	৪৭৫
অষ্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড	২৯৯	৭৪২
দক্ষিণ-আফ্রিকা (রোডেসিয়া সহ)	২০০	১৮২
মিশর	১৭০	১৪০
পূর্ব আফ্রিকা (মরিসস সহ)	২৪৩	২০১
য়ুরুপ (বৃহত্তরাজ্য বাতীত)	২৮৭	৩০৩
যাৰ্বা	৪১৬	২২৬
জাপান	৫১	৪৬
পূর্ব দেশ সমূহ (জাভা ও জাপান বাদ)	২৭৮	১১৭
মধ্য আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৩৫৭	২৭৪
অন্তান্ত দেশ	৪১৬	৪৫১
	৪,৩৪০	৩,৮৮৫

ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ভারত হইতে ছালার আমদানি কমশই কমিয়া যাইতেছে, যথা—বৃহত্তর পূর্বে ৩৯৯১, বৃহৎকালে গড় ৬৬৭৬, বৃহত্তর পর ৪০৪৩, ১৯০০-০১ সালে ৪,৩৪০, ১৯০১-০২ সালে ৩,৮৮৫ লক্ষ মাত্র।

(গ) চট (লক্ষ গড়)	১৯০০-০১	১৯০১-০২
বৃহত্তরাজ্য	৪০০	৬০০
কানাডা	৭৩১	৬৩৩
অষ্ট্রেলিয়া	১৮৩	১৯৯
মার্কিন	৮,৫৩৮	৬,৯২৪
আর্জেন্টিন	২,০৮৬	১,০৪৯
অন্তান্ত দেশ	৭৭০	৭৮৪

মোট ১২,৭১০ ১০,২১১

যে পরিদদার বেশী কয় করেন, বিক্রিতা তাহারই নানাপ্রকার সুবিধা করিয়া দেন। পাটের বাজারে কোন ক্রেতার সুবিধা করিয়া দেওয়া ভারতবর্ষের কর্তব্য।

ওটোআ চুক্তিতে ভারতবর্ষ কি লাভবান ?—

সম্প্রতি ভারতগবর্ণমেন্টের কমার্শিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও স্ট্যাটিস্টিকস বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেল ডাঃ মিক ওটোআ চুক্তির ফলে ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যের কি অবস্থা দাড়াইয়াছে তাহা এক বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রারম্ভেই বলিতেছেন যে এই বিবৃতিতে যে সকল মত বা সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই গবর্ণমেন্টের চরম মত বা সিদ্ধান্ত বলিয়া যেন গ্রহণ না করা হয়।

গম—প্রতি কোয়াটারে ২ মিলিং “প্রফারেন্স” বা সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ইহা ভারতবর্ষের কোনই কাজে আসে না; আগামী কয়েক বৎসরও আসিবে কি না তাহা সন্দেহের বিষয়। ভারতবর্ষ হইতে ১৯০০-০১ সনে মোট ২০০০ টন মাত্র গম রপ্তানি হইয়াছে। তৎপূর্ব বৎসর প্রায় ঐ পরিমাণই।

চাউল—প্রতি পাউণ্ড এক পেনী সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ভারতবর্ষ হইতে মোট রপ্তানির পরিমাণ ১৯০২-০৩ সালে ১,৭৮৯,০০০ টন এবং ১৯০৩-০৪ সালে ১,৬৩৯,০০০ টন তন্মধ্যে ইংলণ্ডে যথাক্রমে ৪১,০০০ টন ও ৯০,০০০ টন। ছাটাই চাউল পূর্ব হিসাবে ধরা হয় নাই—তাহা ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে যায় ১৯০২-০৩ সনে ৫২৭,০০০ হন্দর ও ১৯০৩-০৪ সনে ৬৪৪,০০০ হন্দর।

উদ্ভিজ্জ তৈল—ভারতবর্ষ হইতে মোট রপ্তানির পরিমাণ ১৯০১-০৩ সনে ১,৯০০,০০০ গ্যালন, ইহা বাড়িয়া ১৯০২-০৩ সনে ২,৯৪৪,০০০ গ্যালন ও ১৯০৩-০৪ সনে ২,৯১৫,০০০ গ্যালনে দাঁড়ায়। যে সব দেশ এই পণ্যকে সুবিধা দেওয়া হইয়াছে তথায়ও ইহার চাহিদা বাড়িয়াছে যথা—১৯০১-০২ সনে ১,১১৬,০০০ গ্যালন, ১৯০২-০৩ সনে ১,৬১৬,০০০ গ্যালন ও ১৯০৩-০৪ সনে ১,৭৯৫,০০০ গ্যালন। বৃহত্তরাজ্যে মূল্যানুসারে প্রথমে শতকরা ১০ পরে ১৯০৩ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে শতকরা ১৫ এবং তৎপর ১লা মে হইতে প্রতি টন তিন পাউণ্ড দশ সিলিং সুবিধা দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়।

চা—ভারতবর্ষ হইতে মোট রপ্তানির পরিমাণ ১৯০২-০৩ সনে ৩৭৯০ লক্ষ পাউণ্ড ও ১৯০৩-০৪ সনে ৩১৮০ লক্ষ পাউণ্ড। তন্মধ্যে বৃহত্তরাজ্য গ্রহণ করে যথাক্রমে ৩৩১০ লক্ষ ও ২৭৬০ লক্ষ পাউণ্ড।

কার্পাস সূতা—ভারতবর্ষের মোট রপ্তানি ১৯০১-০২ সনে ২২০ পাউণ্ড। তন্মধ্যে বৃহত্তরাজ্য কয় করে ১৯০৩-০৩ সনে ১৯৮,০০০ ও ১৯০৩-০৪ সনে ৪৪০,০০০ পাউণ্ড।

চামড়া—ভারতের মোট রপ্তানি ১৯০১-০২ সনে হইতে তিন বৎসর মধ্যকালে ২০৬,০০০ হন্দর, ১৮১,০০০ ও ২৬৩,০০০ হন্দর তন্মধ্যে বৃহত্তরাজ্যের অংশ ২৬০,০০০ ; ১৭৭,০০০ ও ২০০,০০০ হন্দর।

পাটের দ্রব্য—ভারতবর্ষের মোট রপ্তানির অষ্ট-শতকংশ মাত্র বৃহত্তরাজ্য কয় করে। যথা ১৯০২-০৩ সনে ৩৫০,০০০ হন্দর ও ১৯০৩-০৪ সনে ২৯০,০০০ টন।

কার্পাস (কাঁচা)—ভারতবর্ষ হইতে বৃহত্তরাজ্য ১৯০৩-০৪ সনে মোট ৬১,০০০ টন কয় করেন।

লৌহ ও ইস্পাত বিনা শুল্ক বৃহত্তরাজ্যে প্রবেশ করিত দেওয়া হইত। ভারতবর্ষের মোট রপ্তানি ১৯০২-০৩ সনে ২১৮,০০০ টন ও ১৯০৩-০৪ সনে ৩৭৭,০০০ টন। তন্মধ্যে বৃহত্তরাজ্যের কয় যথাক্রমে ৭৬ ও ৯৩ হাজার টন। আরও কতিপয় পণ্য সুবিধার বন্দোবস্ত আছে। তাহা হইলে ভারতবর্ষ উন্নয়নযোগ্য কোন সুযোগ গ্রহণ করিত না পারিলেও অথঃ তাহারই বলে বাজার রক্ষা করিত পারিয়াছে।

ভারতবর্ষ ১৯০৩-১৯০৪ সনে বৃহত্তরাজ্য হইতে যত পণ্য দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছে তাহার মধ্যে কার্পাস বস্ত্র, লৌহ ও ইস্পাতই এক চতুর্থাংশ। তবে অন্তান্ত দেশ বিশেষতঃ জাপানের সঙ্গে প্রবল প্রতিযোগিতায় অবস্থা এমন বিসম হইয়া দাড়াইয়াছিল যে বৃহত্তরাজ্যকে যে সুবিধা দেওয়া হইয়াছে তাহা অব্যাহত রাখিয়া শুল্কের ভারতমা সাধন করিতে হইয়াছে। ইমারৎ ইত্যাদি প্রস্তুতের দ্রব্য (কাঁচ ও লৌহ বাতীত) ভারতবর্ষ ১৯০২-০৩ সনে ৫০,০০ হাজার ও তৎপর বৎসর ৪২,০০ হাজার টন কার্পাস মূল্যে কয় করে।

ওটোআ চুক্তির ফলে বৃহত্তরাজ্য সোডিয়াম কার্বোনেট, কপ্টিকোসাইড অন্তান্ত ঔষধ ও তৎসংক্রান্ত দ্রব্যাদি ও পশমের দ্রব্যাদিতে বিশেষ লাভবান হইয়াছে। জাপানের তীব্র প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও মৃতপাত ও চীনবাসনাদি বৃহত্তরাজ্য হইতেই ভারতবর্ষে বেশী আসিয়াছে।

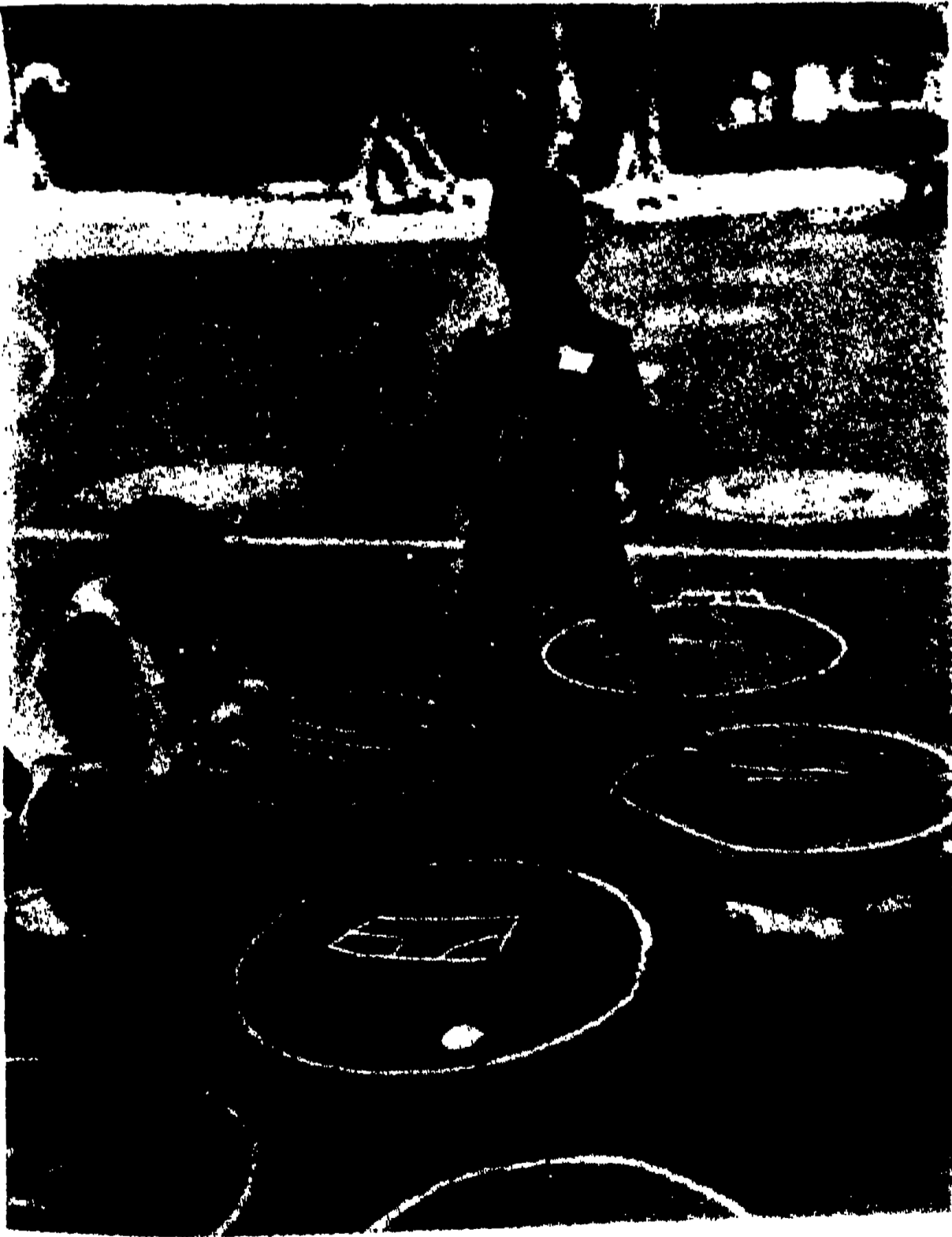
কেহ কেহ একপ দোহারোপ করেন যে ওটোআ চুক্তির ফলে এলুমিনিয়াম শিল্পের অনিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এই রিপোর্টে বোঝাইর এই বিভাগেরই ডিরেক্টর জেনারেলের বিবৃতি হইতে এই মত উদ্ধৃত হইয়াছে যে বাণিজ্যের দুর্বস্থা, কাঁচার বাসনের স্থলভতা ও এলুমিনিয়াম শিল্পীদের মধ্যে প্রতিযোগিতাই এ শিল্পের দুর্বস্থার কারণ।

বহির্জগৎ

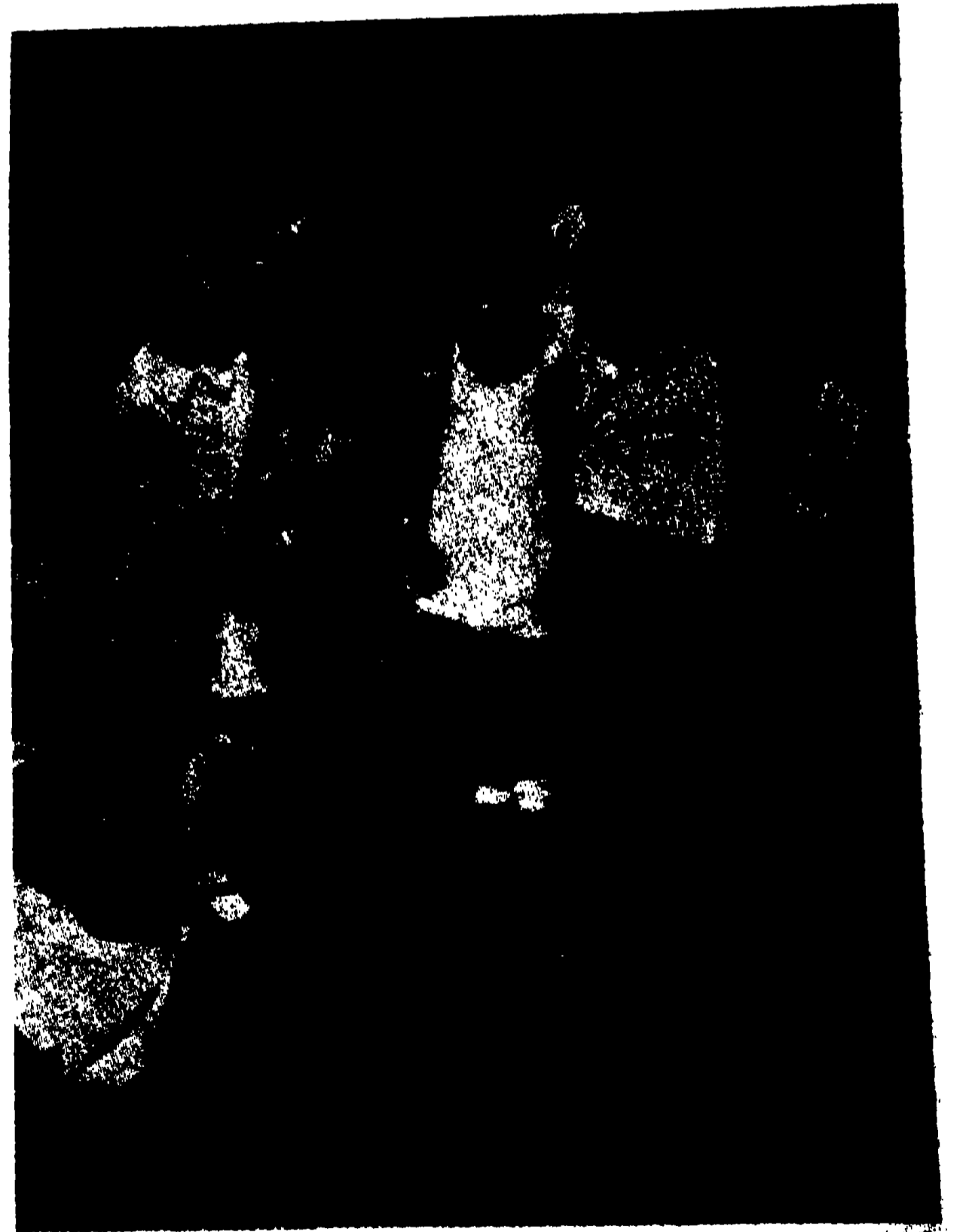
জাপান ও অন্যান্য দেশের ক্রীড়া-কৌতুক



জাপানী মঙ্গদের শক্তিপরীক্ষার আরম্ভ। বিরাট সভায় মঙ্গদের আয়োজন হইয়াছে, প্রথমেই মধ্যস্থ, পুরোহিত ও ভরবারির সম্মুখে স্মায়বুদ্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়া শপথ গ্রহণ করিতে হয়।



বিলাতি "হপ স্কেট" জাপানী প্রতিকল্প। এটিও প্রাচীন খেলা—
আমাদের দেশেও এই জাতীয় খেলার প্রচলন আছে।



জাপানী প্রথায় 'ঘুটিম' খেলা। এই খেলা ছোট ছেলেদের কুলে খুব চলে।



জাপানী প্রথায় তরবারি-যুদ্ধ



একটি “জুদো” শিক্কা-প্রতিষ্ঠান। ব্যায়াম ও ক্রীড়ায় জাপানের উৎসাহ ও আয়োজনের পরিমাণ ইহা হইতে জানা যায়। এইরূপ শত শত প্রতিষ্ঠান ওদেশে চলিতেছে।



আমাদের দেশ এখন শরীর ও মনের উন্নতির জন্তু পেলাধূল। ব্যায়াম-কৌতুকের দিকে লোকের দৃষ্টি ক্রমেই বেশী পড়চে। বিদেশে এ ব্যাপারে লোকের মনোযোগ আগেও ছিল সম্প্রতি আরও বেড়েছে। জাপানে এ-বিষয়ে খুবই চেষ্টা চলচে। যার ফলে জাপান এখন কারবারের ক্ষেত্রে মত ক্রীড়া ব্যায়ামের ক্ষেত্রেও প্রাধান্যের চেষ্টা করচে। টেনিসে শিমিডজু, সাটোহ্ ইত্যাদি খেলোয়াড়ের নাম এদেশেও সুপরিচিত। বিদেশে ওলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এবং অন্যান্য ব্যাপারে জাপান এখন ইউরোপ ও আমেরিকার প্রবল প্রতিযোগী।

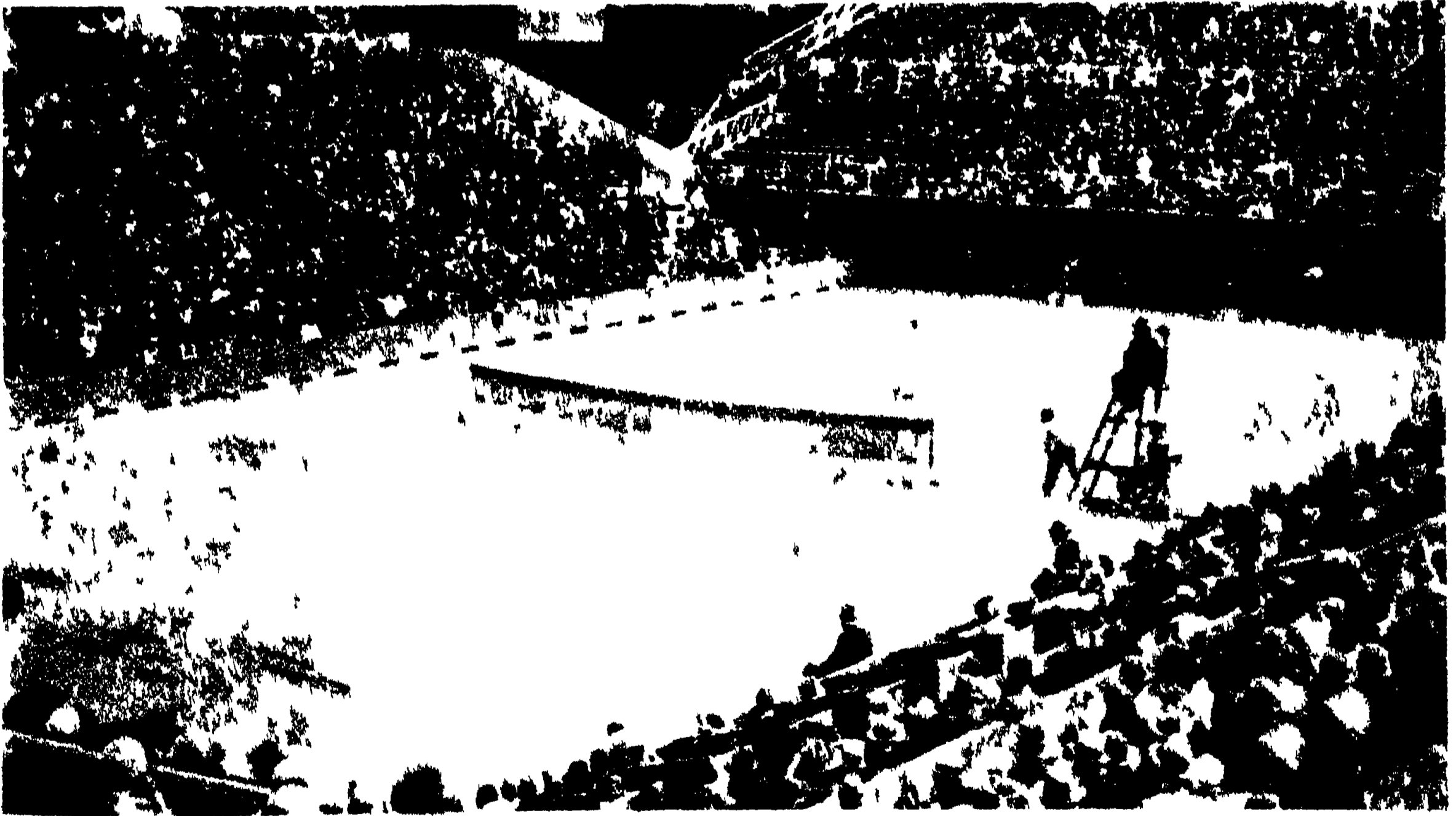
কিন্তু বৈদেশিক ক্রীড়া ও ব্যায়াম অভ্যাস করার দরুণ জাপানের জাতীয় ব্যায়াম-প্রথাগুলি লোপ পায় নাই। বরঞ্চ এখন কুস্তি জুদো (জুজুৎসু) ইত্যাদিতে তরুণ জাপানের উৎসাহ ক্রমেই বেড়ে চলচে। কুস্তি ও জুদোর বিরাট প্রতিযোগিতা, যেখানে এক-এক বারের বহু শত মনের ও ছাত্তের কৌশল পরীক্ষা হয়—এরকম অনুষ্ঠানের বিবরণ জাপানী সংবাদপত্রে প্রায়ই পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন প্রথায় তলওয়ার খেলা, ছোটছেলেদের পুরানো ক্রীড়াকৌতুক শিখানো, এ-সবই চলচে। এক কথায় জাপান নূতন যা-কিছু সবই শিখতে প্রস্তুত—



জাপানী বাম্বিবা দল 'ও'র শিক্ষক জাপান
* * * জাপানী বাম্বিবা দল 'ও'র শিক্ষক



জাপানী বাম্বিবা দল 'ও'র শিক্ষক জাপান
* * * জাপানী বাম্বিবা দল 'ও'র শিক্ষক



ইয়োবোপে (ফাস্ট) কবাসা খেলায়াড় বনাম জাপানী খেলায়াড়। দর্শক ভীড় জাপানী খেলায়াড়ব টেনিসে দক্ষতাব পরিচায়ক।

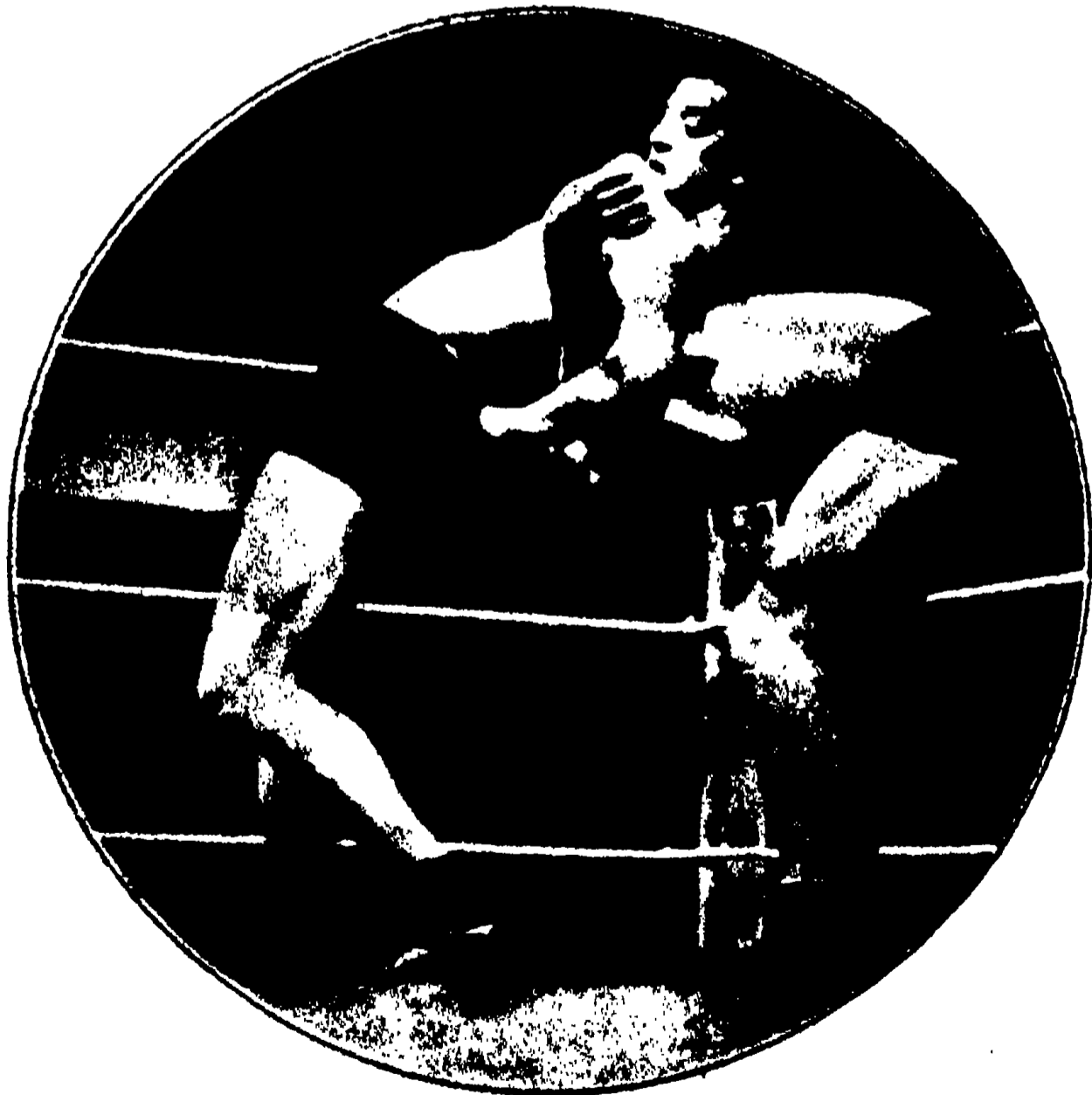
বরফের উপর "আইস-হকি" খেলার জন্তু স্থান 'স্টেডিয়াম' সবে টোকিওর কাছ তৈরি হয়েছে কিন্তু সেট কাব'ণ পুরানো সব-কিছু ভুলতে বাজা নয়। এখন সেট' চলেচে সেগুলিকে মার্জিত রূপ দিয়া সুদৃশ্য ক'বে পুনরুত্থ প্রতিষ্ঠিত করার

জন্তু। বিদেশী খেলাধুলার মধ্যে এক কিকেট ও পোলা ওখানে ভাল চলেনি আৰ সবই চলেচে। এৰ মধ্যে ক্রিকেট সময়সাপেক্ষ এবং দর্শকের পক্ষে যথেষ্ট তত্ত্বজক নয়, এই কারণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইবে বিশেষ প্রচলিত নয়।



জার্মানীতে ছেলেনমেয়েদের একসঙ্গে জলের মধ্যে খেলা ।

জার্মানীতে এখন যুদ্ধের ছায়া না থাকিলে লোকের খেলাধুলার উৎসাহ থাকে না । কৃষ্টি (“গ্রীকো-রোমান” প্রথায়), অথারোহণ, জলক্রীড়ায় দক্ষতাপ্রস্তুতি, ডালকুস্তার খরগোস মারার প্রতিযোগিতা, এই সবই এখন ওখানে পূর্ব চলতি । ছেলেনমেয়ে সকলের মধ্যেই একটা “গৃহদেহি” ভাব আসার এই ফল ।



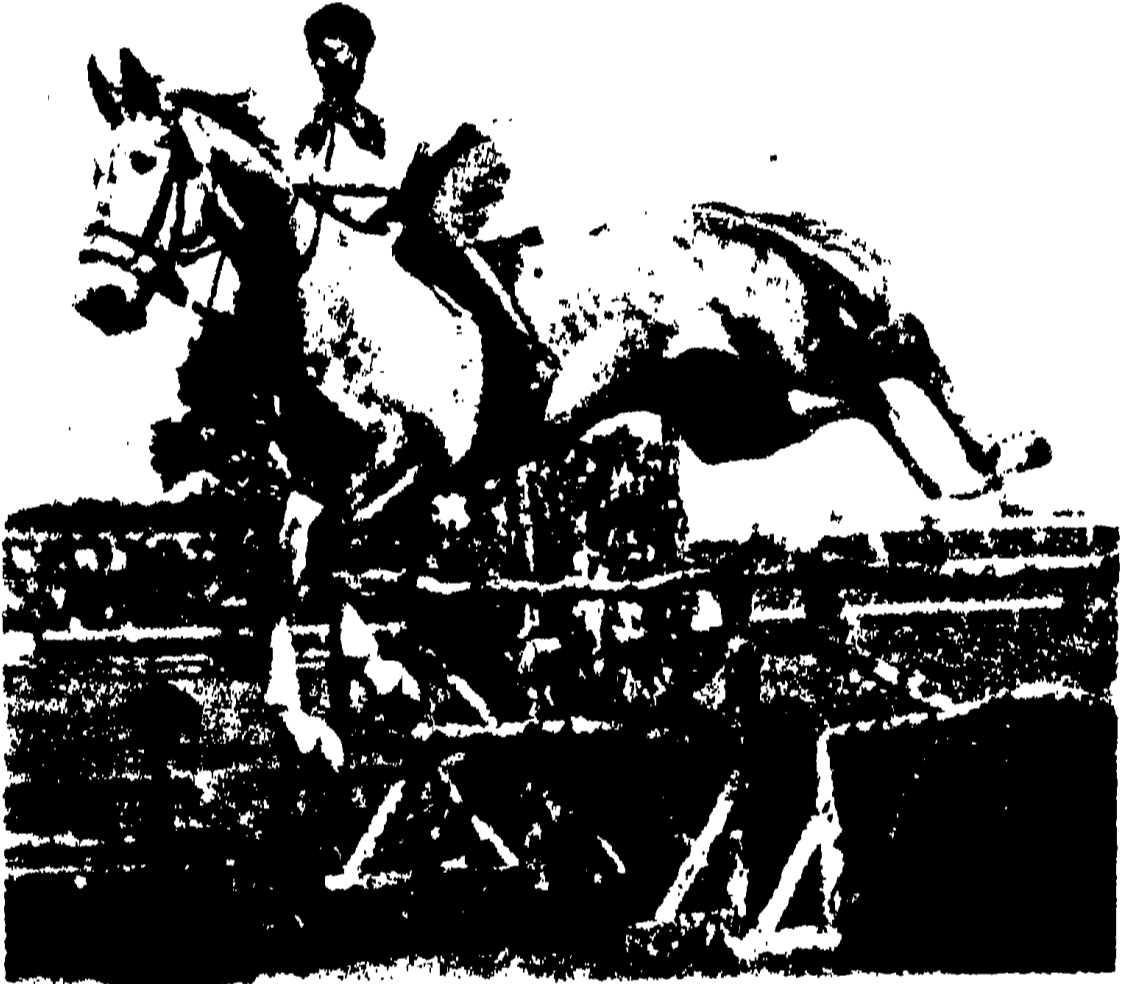
জার্মানীতে স্থলে গ্রীকো-রোমান প্রথায় মনযুদ্ধের প্রতিযোগিতা ।



জার্মান মেয়ের অথারোহণ



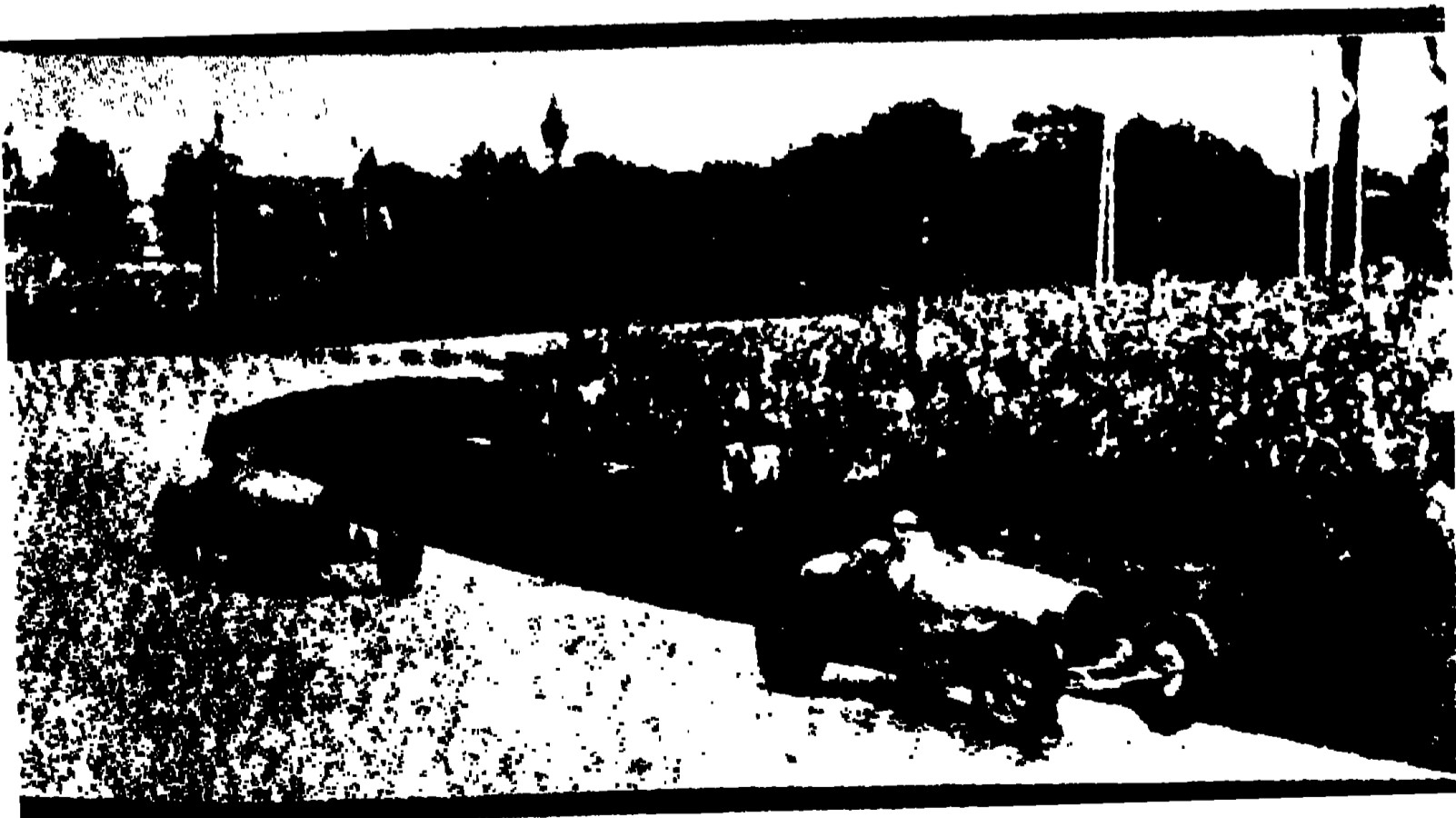
জার্মানিতে ডালকুত্তার খরগোস মারার প্রতিযোগিতা। এটি ব্রিটিশ আমোদ, ওদেশে গিয়াছে



জার্মান মেয়ের অঙ্গারোহণ



জার্মানিতে ছাত্রদের সাময়িক প্রথায় গোল পটনে চড়ে নদীপার হওয়া



ফ্রান্সে মোটর-প্রতিযোগিতা

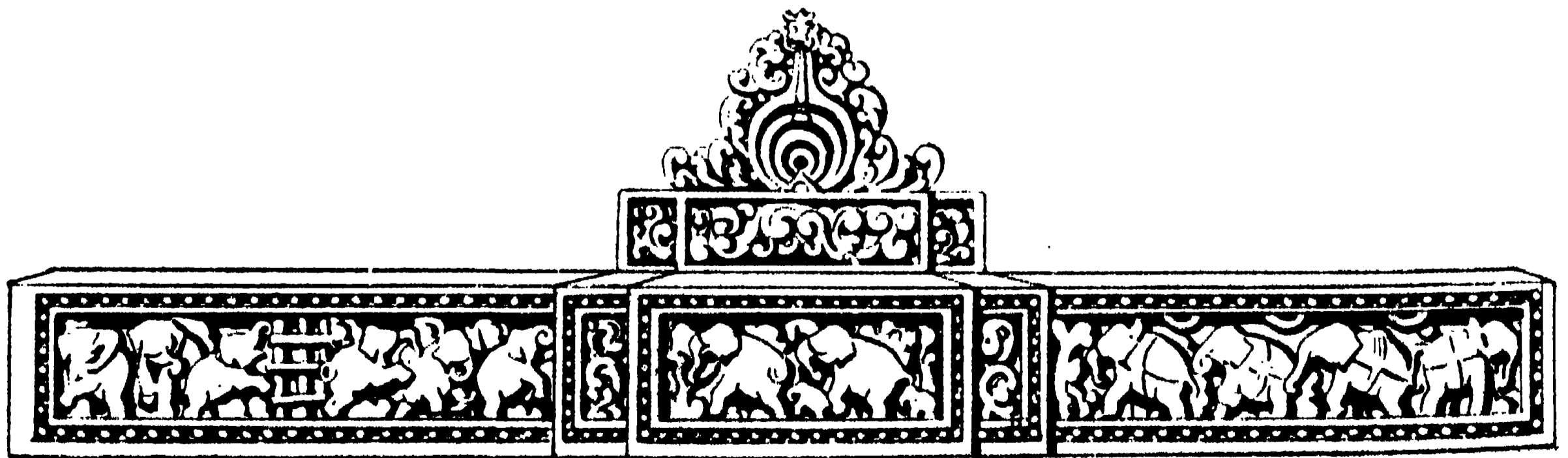




নেপাল ব্যাঘ্রশিকারের আয়োজন

ক্রাস্ট টেনিসে ভূবনবিজয়ী। রাগবি ফুটবল ও বক্সিং-এও ফান্সের নাম পুবই উপরে। তবে সকলের চেয়ে ফান্সেরই মোটর-প্রতিযোগিতার প্যাতি বেশ। এখনও ওদেশের নাম ক্রাডাজগতে প্রসিদ্ধ। আনাদের দেশের বিশেষত্ব অনেক দিকেই ছিল। বস্তু এখন

অপাংক্রিয় হয়ে আছে। কিন্তু জাপানের মত তাকে উদ্বুদ্ধ করে নিজে এখনও ক্রাডাজগতে ভারতের মূখ উজ্জ্বল হতে পারে। বিদেশে এখন এখানকার রাজারাজড়ার ব্যাঘ্রশিকারই ভারতের শ্রেষ্ঠ (এবং এক দেশ অপ্রাপ্য) ক্রাডা বলে পরিচিত।



সাহিত্যে প্রাদেশিকতা

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার

সাহিত্যে প্রাদেশিকতার স্থান কি, এই সমস্যা অতি পুরাতন। এক দলের মত এই যে, প্রাদেশিক শব্দ ও বাক্যরীতির বহুল প্রয়োগে সাহিত্যের মর্যাদা নষ্ট হইবে। আর এক দলের মত এই সেদিনও ময়মনসিংহে “বঙ্গীয় জন-সাহিত্য-সম্মিলনে” জোরের সহিত প্রচারিত হইয়াছে। ইঁহারা বলেন যে, প্রাদেশিক শব্দ ও বাক্যরীতি লিখিত সাহিত্যে প্রবেশ করাইলে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। এই দুই বিরুদ্ধ মতের সারবত্তা বাহাই হউক, একটি বিষয়ে প্রাদেশিকতার স্থান সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বহু প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার গল্প ও নাটকাদিতে কথাবার্তার সময়ে গ্রন্থোক্ত ব্যক্তিগণের মুখে দেশের কোন কোন অঞ্চলের কথা ভাষার ব্যবহার প্রচলিত করিয়াছেন এবং তাহাতে রসবোধ কুণ্ণ না হইয়া বরং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ সকল ব্যক্তি বাস্তবিকই নিজ নিজ প্রাদেশিক ভাষার কথাবার্তা কহিয়া থাকেন। কাজেই, এই স্বাভাবিকত্ব রক্ষিত হওয়াতে, ঐ সকল স্থলে ভাষার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কিন্তু এই বিষয়েও একটি প্রশ্নের বিচার আবশ্যিক হইয়া পড়িয়াছে। স্থলবিশেষে গ্রন্থোক্ত ব্যক্তিগণের মুখে এই প্রকার প্রাদেশিক ভাষার যে প্রয়োগ সাহিত্যে দেখা যাইতেছে তাহা নানা রকমের। দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণে’ তোরাপ প্রভৃতির মুখে প্রাদেশিক ভাষার নিতুল ব্যবহার দেখা যায়। বাস্তবের সহিত সঙ্গতি রক্ষিত হওয়াতে এরূপ প্রাদেশিকতার প্রচলনে কোন রসভঙ্গ ঘটে না, বরঞ্চ অভিনবত্বের আশ্বাদনজনিত একটা নূতন রসের অনুভব হয়।

কিন্তু বহু অপ্রসিদ্ধ এবং অমৃতলাল বহু মহাশয়ের দ্বারা বহু প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের রচনায় ব্যক্তি-বিশেষের কথা-বার্তায় আর এক রকমের প্রাদেশিকতা দেখা যায়। এই সকল স্থলে যে-ভাষার ব্যবহার হইয়াছে, তাহা কোন অঞ্চলের প্রচলিত ভাষা নহে, অতএব স্বাভাবিক নহে।

ইহার ফলে কিরূপ রসের আবির্ভাব হয়? ঐ সকল ব্যক্তি যে অঞ্চলের লোক, তত্রত্য চলিত ভাষার সহিত অপরিচিত লোকের মনে হস্তরসের আবির্ভাব হইতে পারে। কিন্তু এই ভাষার সহিত পরিচিত অথবা এই ভাষায় কথাবার্তা কহেন এরূপ লোকের মনে ক্রোধের উদ্রেক হওয়াও বিচিত্র নহে। অতএব প্রাদেশিক ভাষার এরূপ প্রয়োগ অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক বলিয়া সাহিত্যের সার্বভৌম গৌরবের হানি করে এবং লেখককেও অপ্রশংসার পাত্র করিয়া তুলিতে পারে।

‘নীলদর্পণ’ প্রভৃতির প্রাদেশিক ভাষা স্বাভাবিকত্ব শুধু লেখকের প্রশংসার কারণ হইয়াছে। সম্প্রতি নরেশচন্দ্রের “শেষপাণে” ঢাকা ও ময়মনসিংহের এক অঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষার স্বাভাবিকত্বও অনুরূপ দাবি করিতে পারে। কিন্তু বর্তমান কালের আর একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের নামে একটি লেখায়* যে অস্বাভাবিক প্রাদেশিকতা দেখা দিয়াছে, উহার তাৎপর্য্য কি? “কুমিল্লানিবাসী তারক তরফদারের” মুখে যে ভাষা দেওয়া হইয়াছে তাহা বাংলা দেশের কোন অঞ্চলেরই প্রচলিত ভাষা নহে। “জ্যেইষ্টটি ‘ল’ পাশ করলো, হাজারিবাগে বিয়ে দিলুম। শ্বশুর বর উকিল, তাঁর তালিমেই মানুষ করবার লাগি দিলাম। বিটা কিন্তু বপুর তালিম স্বীকার কইরে কছ খাইয়ে গেল, ফিরলেক নাই।” ইত্যাদি, কোন অঞ্চলের ভদ্র সমাজের প্রচলিত ভাষা জানি না। অভিজ্ঞ লোকের নিকট ইহা অতি বীভৎস বোধ হইবে। ইহার অস্বাভাবিকত্ব যদি অনিচ্ছাকৃত হয়, অর্থাৎ লেখকের অজ্ঞতাপ্রসূত হয়, তবে এরূপ প্রাদেশিকতা প্রয়োগের বৃথা চেষ্টা প্রশংসনীয় নহে। যদি ইচ্ছাকৃত হয়, অর্থাৎ তরফদার লোকটির অস্বাভাবিকত্ব ভাষার

* ‘ছোট গল্প’ শারদীয় সংখ্যা—“রকমফের”—শ্রীকেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অস্বাভাবিকত্বে প্রতিবিম্বিত করিয়া স্বাভাবিকত্ব কলাইবার চেষ্টার দরুণ হইয়া থাকে, তবে তরফদারকে “কুমিল্লা” নিবাসী করা হইল কেন? কেদার বাবু এক জন প্রসিদ্ধ ভাষাশিল্পী এবং তাঁহার রচনা প্রায়শঃ নির্দোষ হস্তরসে সমৃদ্ধ। কুমিল্লাদি অঞ্চলেই অস্বাভাবিকত্ব আছে, একরূপ বেরসিকের মত তিনি পোষণ করিবেন, ইহা মনে হয় না। যদি করেন, তবে উহাও লেখকের পক্ষে আর এক দিক দিয়া বিশেষ অপ্রশংসার কথা। অতএব আমাদের বোধ হয় যে প্রাদেশিকতার এই খিচুড়ী-পরিবেশন লেখকের অজ্ঞতার ফল, এবং প্রাদেশিকতার প্রয়োগে বাস্তবিকতা রক্ষিত না হইলে কিরূপ অনর্থ ঘটে তাহার অলস্ত দৃষ্টান্ত।

এই বাস্তবিকতা রক্ষা করা কত দূর কঠিন, তাহার আর একটি উদাহরণ দিয়াই আলোচনা শেষ করিব। একটি সদ্যঃপ্রকাশিত গল্পে* যে প্রাদেশিক ভাষার প্রয়োগ করা হইয়াছে, বাহিরের দৃষ্টিতে পূর্বাঞ্চলের ভাষার মত হইলেও বাস্তবিক তাহাও জগাখিচুড়ী।

*“প্রাগৈতিহাসিক”—পূর্বাংশ, আশ্বিন ১৩৪০, ত্রিমাণিক কল্যাণাধ্যায়

“বা’টি সারলে তর আর ভিক্ মাগতি অইবো না,—
জানস্” “পায়ের পরনি ‘পা’টি দিয়া গাঁট হইয়া বইয়া থাকবি। না করস্ তুই কিয়ের লেগে?” “তোর লাইগা হা কইরা বইসা আছি, ভাবছস্ তুই, বটে? আমি উই উয়ার সাথে রইছি” “পালাইয়া বা,” “ঘায়েল কইরা দিবার পার্তাম। তখন পইপই কইরা কইলাম, মিয়াবাই ঘোড়া ডিকাইয়া বাস খাইবার লারবা গো”... শুইনে মিয়া বাইর অইল গোসা! কয় কিনা, পিঠ চেঁচা দিমু।...“কণা ক” “গাড়হাবাইতা মাইয়া” “আলোয় আলোর পথটুকু পারহমু” “স্কার মদি তুইকা থাকুম,” “পা চালাইয়া চ’ পাচী।”

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইবে যে পূর্ব অঞ্চলের কথা ভাষায় ব্যবহৃত হয় না একরূপ বহু বিভক্তি ও অব্যয়াদির অপপ্রয়োগ করা হইয়াছে, ঐ অঞ্চলে অব্যবহৃত বিশেষ্য বিশেষণ ও ক্রিয়াপদাদির প্রয়োগ হইয়াছে, দূরবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার একত্র সমাবেশ করা হইয়াছে। কোন বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত ভাষা ইহাতে নাই। অতএব পূর্বাঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহারের এই চেষ্টা প্রশংসার যোগ্য নহে এবং সফল হয় নাই।





দেওলী কায়েম হইল

অর্থাৎ কি না, এই নম্বর জগতে প্রভূতশক্তিসম্পন্ন মানুষ কোন প্রতিষ্ঠান ঘরবাড়ি ছুঁর্গ বা আইনকানুনকে চিরস্থায়ী বতটা করিতে পারে, দেওলী সেই পরিমাণে কায়েম হইল।

বাংলা দেশে জমির খাজনার বন্দোবস্ত প্রথমে দশ বৎসরের জন্য হয়, তাহার পর এই দশসালী বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হইয়াছে। সরকার বিনা বিচারে বাহাদিগকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী রাখিতে চান, আজমীরের নির্জন ছুঁর্গ দেওলী তাহাদের জন্য প্রথমতঃ কয়েক বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট হয়। যে আইনের দ্বারা বঙ্গের এই বন্দীদিগকে বঙ্গের বাহিরে চালান করিবার ক্ষমতা গবর্নেন্ট গ্রহণ করেন, তাহা হইয়াছিল তিন-সালী আইন, এখন স্থিরস্থায়ী হইল।

জমির খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও দেওলীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নাই। কারণ জমিদাররা সম্মানিত ব্যক্তি, কিন্তু বিচার ব্যতিরেকে বন্দীরা অ-সম্মানিত লাঞ্চিত ব্যক্তি। বাহ কিছু সাদৃশ্য আছে বটে। জমিদাররা প্রায় সকলে, দলকে-দল, বিনা পরিশ্রমে থাকিতে পরিতে পান, দেওলীর বন্দীরাও তাই। জমিদাররা সকলে, প্রায় দলকে-দল, গবর্নেন্টবিরোধী আন্দোলনে যোগ দিতে, কার্যতঃ, অসমর্থ, দেওলীর বন্দীরাও তাই।

গবর্নেন্ট যে দেওলীর জেল স্থায়ী করিলেন তাহা ভাবিয়া নহ, যে, তদ্বারা বঙ্গের সন্ত্রাসনবাদ নিমূল হইবে। স্বরাষ্ট্রসচিব শ্রী হেনরী ক্রেক তা বলিয়াই দিয়াছেন, যে, বন্দীদিগকে দেওলী-প্রেরণের আইন স্থায়ী করার ফল তাহা হইবে না। তবে, আইনটাকে পাকা করা হইল কেন? সরকারপক্ষীয় বক্তৃতা হইতে ছুটা পরিণ সংগ্রহ করা যায়। সরকারপক্ষ বলেন, সন্ত্রাসনবাদীরা

ভাবিত, যে, কয়েকটা বৎসর কাটিয়া গেলেই তাহারা দেওলী হইতে খালাস পাইয়া নিজেদের বেআইনী কাজে আবার লাগিবে। আইনটা স্থায়ী করায় তাহাদের সে আশা নষ্ট হইবে, এবং তাহারা হয়ত নিজেদের জীবনকে অল্পপণে চালিত করিতে প্রস্তুত হইবে। কিন্তু আমাদের মনে হয় না, যে, দেওলীর বন্দীরা এমন নির্বোধ যে কখনও এমন আশা করিত, যে, দেওলী না-থাকিলেই তাহারা মুক্তি পাইবে, এবং সরকার তাহাদের হেফাজতের আর কোন বন্দোবস্ত করিবেন না, এবং তাহারা যদি দৈবাৎ জেলের বাহিরে আসিতে পায়ও, তাহা হইলে পুলিশ তাহাদের পেছনে লাগিয়া থাকিবে না। সরকারপক্ষ এই আর একটা কথা বলিয়াছেন, যে, দেওলীতে বন্দীরা আবদ্ধ থাকিলে বাহিরের লোকদের সহিত সংবাদ আদানপ্রদান ও ষড়যন্ত্র করিতে পারিবে না। তাহা হইলে, বাংলা দেশের জেলে তাহাদিগকে রাখিলে তাহারা এই রূপ বেআইনী কাজ করিতে পার ও করে, ইহা স্বীকার করা হইতেছে। তাহার মানে, বঙ্গের জেল-বিভাগে কিংবা কোন একটা জেলেও এমন কতকগুলি ইংরেজ ফিরিঙ্গী ও দেশী কর্মচারী নাই, যাহারা এই রূপ বেআইনী কাজ নিবারণ করিতে সমর্থ। ইহা কি সত্য? সত্য হইলে, ইহা গবর্নেন্টের গৌরবের বিষয় নহে। ইহাও জিজ্ঞাস্য, যে, বহির্জগতের সঙ্গে কয় জন বন্দী এরূপ আদানপ্রদান ও ষড়যন্ত্র করিয়াছিল? দু-এক জন বা দু-চার জন করিয়া থাকিলে সেই জন্ত শত শত খুবকের দেওলীতে নির্বাসন গ্রাসঙ্গত নহে।

স্বরাষ্ট্রসচিব বলিয়াছেন, আইনটা চিরস্থায়ী হইল বটে, কিন্তু তাহার মানে এ-নয় যে উহা কোন কালেই উঠিয়া যাইবে না;—সন্ত্রাসনবাদ লুপ্ত হইলেই উহা রদ হইবে। আইনের মধ্যে বাহা লেখা থাকে তাহাই বলবৎ, কোন রাত পুরুষেরই কথার কোন ক্ষোর নাই; বড়লাটের বা ভারতসচিবের

কথারও নাই। আইনটাতে কোথাও লেখা নাই, যে, উহা কোনকালে উঠিয়া যাইবে। আমাদের মনে হয়, নামে ও কাজে—অন্ততঃ কাজে—কখনও স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে উহা রদ হইতে পারে, ইংরেজপ্রভৃৎ থাকিতে রদ হইবে না। তাহার নক্ষীর আছে। একটা নক্ষীরের উল্লেখ করিতেছি।

১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশ্যনের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ-ভারতের বাহিরের রাষ্ট্র হইতে আগত লোকদের দ্বারা ষড়যন্ত্রের ফলে যাহাতে উহার সহিত বাহিরের রাষ্ট্রের গোলযোগ না বাধে তাহার ব্যবস্থা করা। এরূপ গোলযোগ নিবারণই যে উহার উদ্দেশ্য ছিল, তাহা দেওলীতে নির্বাসন-বিষয়ক আইন সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভায় বৈদেশিক সেক্রেটারী মিঃ মেটকালও বলিয়াছেন। কিন্তু এরূপ গোলযোগের সম্ভাবনা দীর্ঘকাল লুপ্ত হইয়াছে। অথচ রেগুলেশ্যনটা ঠিক বজায় আছে। আধুনিক কালে যত লোককে ঐ ৩ নং রেগুলেশ্যনের জোরে নির্বাসিত করা হইয়াছিল—এখনও যাহারা উহার প্রয়োগে বন্দী আছেন, তাঁহাদের কাহারও বিরুদ্ধে ওরূপ অভিযোগ দেশের লোকদের কাছে দায়িত্বহীন আমাদের গবর্নেন্ট পর্য্যন্ত করেন নাই। তাঁহাদের সকলেরই বন্দীদশার যে যে কারণ বলা হইয়াছে তাহা অত্ৰবিধ। প্রকৃত কথা এই, যে, গবর্নেন্ট কোন ক্ষমতা, কোন অস্ত্র, ত্যাগ করিতে চান না। যে-কারণে যে-অবস্থায় যে-উদ্দেশ্যে ক্ষমতা লওয়া হয়, প্রয়োগও যে বরাবর তদনুযায়ী হইবে, এমন কি বাধ্যবাধকতা আছে? সেই জন্ত মনে হয়, সম্বাসনবাদ লুপ্ত হইলেও গবর্নেন্ট দেওলীনির্বাসন আইনটা সোশ্যালিষ্ট (সমাজতত্ত্ববাদী) ও কমুনিষ্টদের (সাম্যবাদীদের) হিতকল্পে বজায় রাখিবেন। কমুনিষ্ট দলকে ত গবর্নেন্ট ইতিমধ্যেই বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

রণনীতিজ্ঞ লোকদের মধ্যে একটা কথা চলিত আছে, যে, স্বপক্ষ রক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়, আক্রমণ করিবার সুযোগ অত্র পক্ষকে না দিয়া—অত্র পক্ষ আক্রমণ করিবার আগেই, স্বয়ং তাহাকে আঘাত করা। বাংলা-গবর্নেন্ট সম্বাসনবাদ সম্বন্ধে বোধ হয় এই নীতি অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন। যত যুবকের পক্ষে সম্বাসক হওয়া সম্ভব বলিয়া পুলিশের মনে হয়, সকলকে আগে হইতেই গ্রেপ্তার

ও বন্দী করিয়া কাবু করা হয়। কমুনিষ্টদের সম্বন্ধেও বোধ হয় এই নীতি অবলম্বিত হইয়াছে।

সম্বাসনবাদের উদ্ভবের কারণ ও প্রতিকার

স্বরাজ্যসচিব শ্রী হেনরী ক্রেক বলেন, যে, শুধু দেওলীতে নির্বাসন দ্বারা সম্বাসনবাদ বিনষ্ট হইবে না—উহার মূলীভূত যে-সব সামাজিক ও আর্থিক সমস্যা আছে তাহার সমাধান চাই। সরকারপক্ষের লোকেরা সন্দেহই এই ধরনের কথাই বলেন, সম্বাসনবাদের রাজনৈতিক কোন কারণ আছে কিনা, তাহা প্রায় এড়াইয়া চলেন। অথচ সম্বাসন-প্রচেষ্টার সহিত যে রাজনীতির সম্পর্ক আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সরকারপক্ষ সামাজিক কি কারণ স্থির করিয়াছেন জানি না, সুতরাং তাহাদের অনুমানের বিচার করা চলিবে না। কিন্তু সরকারপক্ষ এবং অনেক বেসরকারী লোকও মনে করেন, বিস্তর যুবকের বেকার অবস্থা সম্বাসনবাদের কারণ। তাহাদের কথা প্রমাণ তাহাদের দেওয়া উচিত। সম্বাসক কাজের জন্ত যাহাদের কাঁসী, নির্বাসন বা কারাদণ্ড হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটি একটি করিয়া তাহারা দেখান, যে, তাহারা চাকরির উমেদার ছিল, তাহাদের বাড়িতে খাইবার পরিবার সঙ্গতি ছিল না, তাহারা স্কুল বা কলেজে ছাত্ররূপে পড়িতেছিল না। তাহা হইলে তাহাদের কথা প্রমাণিত হইবে। স্কুল বা কলেজের ছাত্রদিগকে বেকার বলা চলে না, কারণ পঠদশা উপার্জনের সময় নহে—যদিও পড়িবার পরচ চালাইবার জন্ত কেহ কেহ গৃহশিক্ষকতা করে। বিনা বিচারে যে বহুশত যুবক বন্দী আছে, তাহাদের কত জন চাকরীর উমেদার ছিল, তাহাদের পারিবারিক অবস্থা কিরূপ ছিল, ইত্যাদি বিষয়েও অনুসন্ধান হওয়া উচিত।

দেশের বিস্তর লোকের বেকার অবস্থা সম্বাসকদের মত প্রচারের একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে পারে বটে, কিন্তু সম্বাসনবাদের মূল কারণ যে রাজনৈতিক, ইহা শুধু পেশাদার সাংবাদিক বা আন্দোলকদের কথা নহে, ধনিকশ্রেণীর বেসরকারী লোকেরাও এরূপ কথা বলেন।

জমিদার-সভা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশ্যনের উদ্যোগে বঙ্গে সম্বাসনবাদের উচ্ছেদ সাধনার্থ একটি কমিটি

গঠিত হইয়াছে। ঐ কমিটির গত ২৬শে জুলাইয়ের অধিবেশনে মিঃ জে এন্ বসু বলেন, যে, তাঁহার পরিষ্কার মত এই, যে, সম্মান-প্রচেষ্টা একটি অবিমিশ্র রাজনৈতিক প্রচেষ্টা, ইহা সারতঃ অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা নহে, বৈদেশিক শাসন দূর করিবার নিমিত্ত তরুণদের মনকে প্ররোচিত ও প্রস্তুত করা হয়। (“Mr. Basu was clearly of opinion that terrorism was purely a political movement. It was not essentially an economic one. The minds of youths are worked up to get rid of foreign rule.”) “কুমার এইচ কে মিত্র এই মত প্রকাশ করেন, যে, বেকার-সমস্যার সহিত এই প্রচেষ্টার কোন সম্পর্ক নাই, কারণ যে-সব তরুণ-বয়স্ক ব্যক্তি সম্মানবাদীদের কাঁদে পড়, তাহারা শিক্ষা সমাপ্ত করে নাই এবং রোজগারের কাজ খুজিবার যোগ্য হয় নাই” (“Kumar H. K. Mitter was of opinion that the question of unemployment had nothing to do with the movement, as the youths who are victims to the terrorists' seduction had not completed their education and were not qualified to seek employment.”)

সম্মানবাদের সহিত রাজনীতির এই যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলিয়া অনেকে বলেন, ইহা সত্য কিনা গবর্নেন্টের অনুসন্ধান করা উচিত। যদি সত্য হয়, তাহা হইলে গবর্নেন্টে প্রতিকারচেষ্টা কিরূপ করিত চান, বলা উচিত। কিন্তু যদি গবর্নেন্টের বিবেচনার ইহা সত্য না হয়, তাহা হইলে ইহা সত্য মনে না করিবার কারণগুলিও গবর্নেন্টের বলা উচিত।

রাজপুরুষেরা ক্রমাগত বলিয়া চলিতেছেন, যে, লোকমত সম্মানবাদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ভাবে না দাঁড়াইলে উহার বিনাশ হইবে না। গবর্নেন্ট যে লোকমতকে এত মূল্যবান মনে করেন, তাহা আগে জানা ছিল না, এবং অত্যাগত বিঘ্নে গবর্নেন্টে লোকমতকে গ্রাহ করেন বলিয়া অবগত নহি। যাহা হউক, এ-বিষয়ে লোকমত ত খুবই পরিষ্কার। কংগ্রেস সম্মানবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী, ভারতীয় জাতীয় উদারনৈতিক সঙ্ঘ

(Indian National Liberal Federation) অর্থাৎ মডারেট দল ইহার বিপক্ষে, হিন্দু মহাসভা ইহার বিপক্ষে, এবং সমগ্র মুসলমান সমাজকে ত গবর্নর স্বয়ং এই বলিয়া বেকমুর খালাস দিয়াছেন, যে, এই প্রচেষ্টা সারতঃ হিন্দু প্রচেষ্টা (“essentially a Hindu movement”)। তাহার পর অগণিত সভায় ইহার গর্হিতত্ব ঘোষিত হইয়াছে, এমন কোন দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক কাগজ নাই যাহা ইহার বিরুদ্ধে স্পষ্ট মত ব্যক্ত করে নাই। এই রূপে লোকমত প্রকাশিত হইয়াছে। সরকারপক্ষ অবশ্য ইহা বলিতে পারেন, “তোমরা সবাই কপটাচারী, মুখে যাহা বল তাহা বিশ্বাস কর না”। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে গবর্নেন্ট জনমতের অকপটতার কিরূপ প্রমাণ চান, তাহা বলিয়া দেওয়া উচিত। যাহারা বর্তমানে বস্তুতঃ সম্মানবাদীদের সকলকে এবং ভবিষ্যতে যাহাদের সম্মানবাদ হইবার সম্ভাবনা আছে তাহাদেরও সকলকে যদি বাঙালী জাতি গ্রেপ্তার করিয়া গবর্নেন্টের হাতে সমর্পণ করিতে পারিত, তাহা হইলে অবশ্য গবর্নেন্ট নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু ইহা করা বাঙালী বা অন্য যে-কোন জাতির সাধ্যাতীত।

বেসরকারী যে-সব লোক মনে করেন, যে, সম্মান-প্রচেষ্টার সহিত রাজনীতির সম্পর্ক আছে—মনে করেন, যে, সম্মানবাদের উদ্দেশ্য স্বরাজ-স্থাপন, তাহাদের প্রথম কর্তব্য, সম্মানবাদীগকে বুঝাইয়া দেওয়া, যে, সম্মান দ্বারা স্বরাজ লব্ধ হইবে না, এবং তাহার পর তাহাদের দ্বিতীয় কর্তব্য প্রমাণ ও নজীরসহ তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া, কি উপায়ে স্বরাজ লব্ধ হইতে পারে, ও সেই উপায় স্বয়ং অবলম্বন।

আমাদের (অর্থাৎ প্রবাসীর সম্পাদকের) এই মত বহুবার প্রকাশিত হইয়াছে, যে, স্বরাজস্থাপন যদি সম্মানবাদীদের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাহারা যে-সব কাজ করিয়াছে বলিয়া পুলিশ বল, সেইরূপ কাজের দ্বারা স্বরাজ কখনই স্থাপিত হইতে পারে না। ঠিক কি উপায়ে হইতে পারে, তাহা বলিতে আমরা অসমর্থ। অল্পস্বল্প যে-আলোক পাই, তাহা ‘মডার্ন রিভিউ’ ও ‘প্রবাসী’তে প্রকাশ পায়।

আমরা আগে বলিয়াছি, যে, গবর্নেন্ট অনুসন্ধানান্তর

যদি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন, যে, সন্ত্রাসন-প্রচেষ্টার সহিত রাজনীতির সম্পর্ক আছে, তাহা হইলে গবন্মেণ্ট কিরূপে ইহার প্রতিকার করিতে চান, জানান উচিত। স্বরাজ-স্থাপন ইহার একটা প্রতিকার, বেসরকারী অনেক লোকের এরূপ মনে হইতে পারে বটে। কিন্তু গবন্মেণ্ট কি মনে করেন, জানি না। রাজপুরুষদেরও অনেকের মনে ঐ রূপ চিন্তা আসিয়া থাকিতে পারে এবং তাঁহারা হয়ত ভারতবর্ষের লোকদিগকে ইহাই বিশ্বাস করাইতে চান, যে, হোয়াইট পেপারটিতেই স্বরাজ আছে। কিন্তু লোকেরা তাহা বুঝিতেছে না। অথবা অনেক রাজপুরুষ এরূপও ভাবিতে পারেন, যে, সন্ত্রাসকরা এমন সামান্ত দল, যে, তাহাদের উচ্ছেদসাধনার্থ স্বরাজের মত এত বড় একটা জিনিষ দিয়া ফেলা মশা মারিবার জন্ত কামান দাগিবার মত। ইহাও প্রভাবশালী বহু রাজপুরুষের প্রকৃত বিশ্বাস হওয়া অসম্ভব নহে, যে, শুধু কড়া আইন ও তাহার প্রয়োগের দ্বারা সন্ত্রাসন-প্রচেষ্টাকে দমন করিতে বা সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারা যাইবে, স্বরাজ-দানের মত কিছু করা অনাবশ্যক। এ-সবই অবশ্য অসম্ভব।

বেকার-অবস্থাকেই যদি গবন্মেণ্ট বাস্তবিক সন্ত্রাসনবাদের উদ্ভবের কারণ মনে করেন, তাহা হইলেও সরকারপক্ষকে ভাবিতে হইবে, ইংলণ্ডে বেকার-সমস্যা আছে অথচ সন্ত্রাসক-প্রচেষ্টা নাই কেন। এ-চিন্তা গবন্মেণ্ট না-হয় নাই করিলেন। কিন্তু বেকার-সমস্যার সমাধানের চেষ্টাও ত ঘোষণা হওয়া চাই। তাহা কই হইতেছে? স্নান কতক ছোকরাক সাবান বা ছুরি কাঁচি তৈরি করিতে শিখাইয়া বা বিয়া পনর করিয়া জমি দিয়া চাষে লাগাইয়া বঙ্গের বিরাট বেকার-সমস্যার সমাধানচেষ্টা সমুদ্রে ছাত্তু নিক্ষেপের মত। তথাপি, গবন্মেণ্ট বাহা করিতেছেন, তাহা ভালই। কিন্তু তাহাতেই সরকারী কর্তব্য করা হইতেছে মনে করিলে আত্মপ্রতারণা হইবে মাত্র।

তাহার পর আর একটা কথাও গবন্মেণ্টকে ভাবিতে হইবে। তাঁহারা হিন্দুসমাজকে, তাহার অন্তর্গত “শিক্ষিত” বেকারদিগকে, সন্ত্রাসন-প্রচেষ্টার জন্ত দায়ী করিতেছেন, এবং বলিতেছেন, যে, তাঁহারা ঐ বেকারদের সংখ্যা কমাইতে

চান। বেশ কথা। কিন্তু “শিক্ষিত” মধ্যবিত্ত হিন্দুরা অনেকটা চাকরিজীবী। মুসলমানরা হিন্দুদের চেয়ে কোন কোন চাকরির কম যোগা হইলেও শতকরা কতকগুলি চাকরি তাহারা পাইবেই, যোগাতর হিন্দু থাকিলেও তাহারা ঐগুলি পাইবে না, এই নিয়মে শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বাড়িবে না কি? হিন্দু উমেদারদের সমান যোগ্য বা তাহাদের চেয়ে যোগাতর, ও যোগাতম মুসলমানদের চাকরি অবশ্যই হওয়া চাই। কিন্তু গবন্মেণ্ট এক দিকে বলিবেন, আমরা “শিক্ষিত” হিন্দু বেকারের সংখ্যা কমাইতে চাই, অন্য দিকে যোগাতর হিন্দু থাকিতে কম যোগা মুসলমানকে চাকরি দিবার নিয়ম করিবেন—এ-দুটার মধ্যে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য কোথায়?

যাহারা সন্ত্রাসনবাদ নিবারণার্থ কমিটি করিয়াছেন, তাঁহারা যদি সত্য সত্যই কাজ করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে হয় প্রাণের সহিত স্বরাজলাভের চেষ্টা করিয়া সন্ত্রাসনবাদ-প্রবণ কিশোর ও যুবকদিগকে পথ ও দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে, নয় সাধমত বেকারদিগের উপার্জনের উপায় করিয়া দিতে হইবে, কিংবা দুই রকম কাজই তাঁহাদিগকে করিতে হইবে। কারণ, দেখিতেছি কমিটিতে কতক সভ্যের মতে সন্ত্রাসনবাদের কারণ রাজনৈতিক, অন্য দর মতে উহা অর্থনৈতিক। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশ্যনে ও কমিটিতে ধনী লোক অনেক আছেন। তাঁহারা পাঠশালা বিদ্যালয় কারখানা দোকান স্থাপন করিয়া তাহাতে শিক্ষিত বেকারদিগকে নিযুক্ত করুন। মহ'লক্ষী কটন মিলের ম্যানজিং এজেন্ট সে দিন আমাদিগকে বলিতেছিলেন, ঐ মিলে কয়েক জন শিক্ষিত ছোকরা সাধারণ শ্রমিক ও কারিগরের কাজ করেন। ভারতী ফাউন্টেন পেনের কারখানাতেও এরূপ দেখিয়াছি। আমাদের ক্ষুদ্র সামান্ত কারবার, তথাপি আমাদের কাছে এরূপ শিক্ষিত যুবক দর চিঠি নিতান্ত কম আসে না যাহারা কোন প্রকারে খাইতে পাইলেই যে-কোন কাজ করিত প্রস্তুত। কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে কাজ দিতে পারি না—কেননা আমাদের কারবার ছোট, বাড়াইবারও ক্ষমতা নাই।

বেকার-সমস্যা ও শিক্ষা-সঙ্কোচন

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ইংরেজ-রাজত্ব একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু গড়ে দেড় শত বৎসর আগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিলে ভুল হয় না। এই দেড় শত বৎসরের আগে ভারতবর্ষ বর্ণমালাহীন সাহিত্যহীন দেশ ছিল, ইহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলেও এই দীর্ঘ দেড় শত বৎসরে নিত্যশু শিশু ছাড়া ইহার সব মানুষকে লিখনপঠনক্ষম করা নাইত। তাহা যে করা হয় নাই, তাহাতেই বুঝা যাইবে, যে, শিক্ষাবিস্তারের দিকে গবর্নেন্টের ঝোক নাই। সেই কারণে, যখন কয়েক মাস আগ সরকারী চেষ্টায় উৎপন্ন কনফারেন্সে কথা উঠে, যে, বঙ্গের ১২০০ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়কে ৪০০তে পরিণত করিতে হইবে, তখন মনে হইয়াছিল, শিক্ষার উৎকর্ষসাধন ইহার উদ্দেশ্যে ততটা নয় যতটা শিক্ষার সঙ্কোচসাধন।

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। বঙ্গ মাটিকুলেশন পরীক্ষা দেয় বাইশ-তেইশ হাজার ছাত্রছাত্রী। ইহাতেই অনেকে মনে করেন, বঙ্গে উচ্চ ইংরেজী স্কুলের শিক্ষা অতি-বিস্তার লাভ করিয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ ভুল ও সত্যের বিপরীত। তাহা নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

প্রদেশ	লোকসংখ্যা	মাটিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা
বোম্বাই	২,১৯,৩০,৬০১	১৯,০০০
পঞ্জাব	২,৩৫,৮০,৮৫০	২০,০০০
বাংলা	৫,০১,১৪,০০২	২৩,০০০

বঙ্গের লোকসংখ্যা বোম্বাই ও পঞ্জাবের প্রত্যেকের দ্বিগুণের অনেক বেশী। সুতরাং বঙ্গ যদি ২৩,০০০ মাটিক পরীক্ষার্থীর জায়গায় ৫০,০০০ হইত, তাহা হইলেও অনুপাতে বোম্বাই বা পঞ্জাবের চেয়ে বেশী হইত না। ইহা অবশ্য সত্য, যে, বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার মাধ্যমিক (secondary) শিক্ষার তুলনায় কম হইয়াছে। কিন্তু এই অসামঞ্জস্য প্রাথমিক শিক্ষার অধিকতর বিস্তার দ্বারা দূর করিতে হইবে, মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্কোচন দ্বারা নহে।

মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্কোচসাধন করিলেই কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র কমিবে এবং উচ্চ শিক্ষার সঙ্কোচও সাধিত হইবে। এই বিষয়ে কিছু বলিতে চাই।

শুনা যায়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার সঙ্কোচসাধন দ্বারা সরকার বেকার-সমস্যার সমাধান করিতে চান। ইহা অবশ্য ঠিক, যে, শিক্ষার বিস্তার কমিলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কমিবে। কিন্তু তাহাতে বেকারের মোট সংখ্যা কমিবে কি? যাহারা শিক্ষিত অবস্থায় বেকার, তাহারা যদি শিক্ষিত না হইত, তাহা হইলেই কি তাহাদের কাজ জুটিত? শুনিতে পাই, সরকারপক্ষ নাকি মনে করেন, শিক্ষার বিস্তার কমিলেই বেকারের মোট সংখ্যা কমিবে। তাহারা নাকি বলেন, এখন সবাই একটা ছুটা বা তিনটা চারটা পাস করিয়া কেরানীগিরি বা অন্ত চাকরির উমেদার হয়, কৌলিক বৃত্তির অনুসরণ করিতে চায় না; শিক্ষার সঙ্কোচসাধন করিলে অনেকে চাকরিপ্রার্থী হইতে পারিবে না; কৌলিক বৃত্তি অবলম্বন করিবে। কথাটা শুনিতে বেশ, কিন্তু বস্তুতঃ অসার। কারণ, বৃহৎ বৃহৎ অনেক বিদেশী ও কিছু দেশী কারখানার প্রতিযোগিতায় পণ্যশিল্পীদের অধিকাংশের শিল্পকার্য্য নষ্ট হইয়াছে ও অন্ত মারা গিয়াছে।

যাহারা জাতিতে তন্তুবায়, তাঁহাদের সকলের বা অধিকাংশের তাঁত চালাইয়া দিন গুজরান হইতে পারে না। যাহারা জাতিতে কাম্বকার, লোহার, স্বর্ণকার, সুবর্ণ-বণিক, কাংশুবণিক, শঙ্খবণিক, কুম্ভকার, সূত্রধর, নৌকা ও জাহাজ নিষ্পাতা, নৌচালক ইত্যাদি, তাঁহাদের সকলের এখন কৌলিক বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ভাহ হওয়া অসম্ভব। এই কারণেই নানা জাতির অনেক লোক অগত্যা চাষী হইয়াছে, এবং তাহার ফলে বঙ্গে গড়ে এক এক চাষীর অংশে যত কম জমি পড়িয়াছে, ভারতবর্ষের অন্ত কোন প্রদেশে তত কম নয়।

যে-পরিবারের কৌলিক বৃত্তি আগে যাহাই থাকুক-না কেন, এখন সেই পরিবারভুক্ত প্রত্যেক মানুষের তাহাই অবলম্বন করা কার্য্যতঃ চলিবে না। কেহ তাহা করিতে পারে, কেহ বা অন্ত কিছু করিতে পারে। প্রাচীন কালে, অতীতে, লোকে প্রধানতঃ কৌলিক বৃত্তি অবলম্বন করিত বটে; কিন্তু তাহা সকল স্থলে অনতিক্রান্ত ও অনতিক্রমণীয় নিয়ম ছিল না। ইতিহাসে শূদ্র ও ব্রাহ্মণ ঘোড়া ও রাজ্যসাম্রাজ্যস্থাপকের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

আবার বাহা ব্রাহ্মণের কাজ বলিয়া নির্দিষ্ট, তাহা প্রাচীন কালে অন্ত জাতির লোককেও করিতে দেখা গিয়াছে।

মানুষ বংশানুক্রমে কৌলিক বৃত্তির উপযোগী গুণ ও দক্ষতা পায় কিনা, তাহার আলোচনা এখানে করিতে চাই না। কিন্তু ইহা নিশ্চয়, যে, মানুষ শৈশব হইতে বাহা করিতে দেখে, তাহা করিলে তাহাতে তাহার নৈপুণ্য জন্মিতে পারে। কৌলিক বৃত্তি অবলম্বনের পক্ষে ইহা বলা যায়। অন্ত দিকে, এক-একটা বৃত্তি এক-এক জাতির লোকের মধ্যে আবদ্ধ রাখিলে গতানুগতিকতা বাড়িবার বৃত্ত সম্ভবনা হয়, উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগে নূতন নূতন প্রণালী প্রক্রিয়া পরিকল্পনা প্রবর্তনের সম্ভাবনা তত হয় না। এই ক্ষেত্রে কেবল জাতি অনুসারে নয়, অধিকন্তু ক্রটি, প্রবৃত্তি, প্রতিভার কোঁক অনুসারেও মানুষকে নিজের নিজের কাজ বাছিয়া লইতে দেওয়া উচিত। তাহাতে, বাহা কিছু মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্তর্গত, সমুদয়েরই উৎকর্ষ ও উন্নতি সাধিত হয়।

কোন বৃত্তিই হয় নয় (চৌর্যাআদি 'বৃত্তি'র কথা এখানে হইতেছে না)। কিন্তু কেহ কি মনে করেন, অধ্যাপক ব্রজেননাথ শীল বা অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার মত লোকেরাও কৌলিক বৃত্তি অবলম্বন করিলে মানুষের অধিকতর কল্যাণ হইত?

বেকার অবস্থাটা ভাল নয়। কিন্তু যদি কতক লোকের বেকার থাকা অনিবার্য হয় (তাহা অনিবার্য নহে), তাহা হইলে বেকারদেরও শিক্ষিত হওয়াই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। কারণ, শিক্ষিত বেকার বেকারত্ব দূরীকরণের নানা উপায় ভাবিতে পারে, এবং ধন-উৎপাদন, উৎপাদিত ধনের বিভাগ, বেকারত্ব নিবারণের ক্ষমতা সমাজের গঠন পরিবর্তন প্রভৃতি নানা বিষয়ে চিন্তা করিতে পারে।

রাষ্ট্রের উপর প্রভুত্বশক্তি বাহাদির আছে, তাঁহারা এ-সবের আগে এবং এ-সবের চেয়ে বেশী চান রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব। এই স্থায়িত্বের প্রতিকূল কোন পরিবর্তন তাঁহারা চান না—বিপ্লবনামধেয় দ্রুত পরিবর্তন ত তাঁহারা চানই না, আমূল সংস্কারের দিকে বাহা গতি একরূপ জন্মপরিবর্তনও তাঁহারা চান না। কিন্তু পরিবর্তন জগতের নিয়ম; অতি ক্ষমতামালী মানুষও ইহা নিবারণ করিতে পারে না।

ইতিহাসে বার-বার দেখা গিয়াছে, পরিবর্তন বন্ধ করিবার চেষ্টার ফল হইয়াছে অতিক্রমত আমূল পরিবর্তন, বাহাকে এক কথায় বলে বিপ্লব। ইহাও দেখা গিয়াছে, যে, ক্রমশঃ পরিবর্তন করিতে ও হইতে বাধা না দেওয়ায় বিপ্লব নিবারিত হইয়াছে। যেমন ইংলণ্ড স্কটল্যাণ্ডে।

শিক্ষার বিস্তার বন্ধ করিলে, শিক্ষার সঙ্কোচসাধন করিলে, বিপ্লব নিবারিত হয় না, বিপ্লবকে ডাকিয়া আনা হয়। ইতিহাসে তাহারও দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

শাসনকর্তাদেব মনে হয়ত এই ধারণা আছে, যে, আধুনিক শিক্ষার, পাশ্চাত্য রীতি অনুযায়ী শিক্ষার প্রভাব মানুষের স্বাধীনতালিপ্সা জন্মিয়াছে ও বাড়িয়াছে। ইহাতে সত্য আছে। কিন্তু মানুষের মনে বাহা ছিল না, আধুনিক শিক্ষা তাহা আনিয়া দিয়াছে, ইহা সত্য নহে। সত্য এই, যে, মানুষের মনে বাহা ছিল কিন্তু সুপ্ত ছিল, অন্ধকার আকারে ছিল, শিক্ষা তাহাকে জাগাইয়াছে, তাহাকে বাড়াইয়াছে। আধুনিক শিক্ষা, পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারতে স্বাধীনতালিপ্সার সৃষ্টিকর্তা নহে; ইহা তাহাকে জাগাইয়াছে, বিকশিত করিয়াছে বটে। ইহা তাহা না করিলে আর কোন শক্তি বা অন্ত কিছুই প্রভাব—তাহার নাম যুগপ্রাণ, যুগধর্ম বা অন্ত বাহা কিছুই দেওয়া হইত—তাহা করিত, যেমন জাপান চীন পারস্য তুরস্ক গ্রাম দেশে করিয়াছে। এখন বাহাকে আধুনিক শিক্ষা, পাশ্চাত্য শিক্ষা বলা হয়, অতীত কালে তাহা ভারতবর্ষে যেমন ছিল না, ইউরোপেও তেমনি ছিল না। অথচ অতীত নানা যুগে ইউরোপের নানা দেশ বার-বার যেমন পরপদানত হইয়াছে, তেমনই বিদ্রোহ করিয়া আবার স্বাধীনও হইয়াছে। ভারতবর্ষ ও তাহার নানা অঞ্চলও অতীত কালে বার-বার পরাধীন ও তাহার পর স্বাধীন হইয়াছে। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যে-সব পাশ্চাত্য লেখকদের পুস্তক স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা প্রবল করে, তাঁহারা তখন জন্মগ্রহণ করেন নাই।

স্বাধীনতালিপ্সা মানব-মনের একটা আদিম অংশ। শিক্ষা বন্ধ করিয়া বা কমাইয়া ইহা নষ্ট করা যায় না। সুশিক্ষা বন্ধ করিলে বরং এই ইচ্ছা বিপথচালিত হইতে পারে। অতএব শিক্ষা বন্ধ না করিয়া, শিক্ষা না কমাইয়া, এমন

শিক্ষা বাড়ানই শিক্ষা-বিভাগের এবং সমুদয় দেশহিতৈষী ব্যক্তির কর্তব্য বাহাতে ছাত্রছাত্রীদের মন জ্ঞানোজ্জ্বল হয়, এবং অধিকন্তু তাহারা শান্তির পথে স্বাধীনতা লাভের উপায় খুঁজিয়া পায়। এমন কিছু করা শিক্ষা-বিভাগের সম্পূর্ণ অকর্তব্য বাহা পরোক্ষভাবেও ভারতীয়দিগের মনে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিকূল ভাব জন্মাইতে পারে। কোন জাতির প্রতিই কোন জাতির শত্রুভাব থাকা উচিত নয়। ইংলণ্ডের কথা বিশেষ করিয়া বলিলাম এই জন্য, যে, ইংলণ্ড এখন ভারতের প্রভু, এবং ভারতবর্ষ স্বাধীন হউক, এরূপ ইচ্ছা অধিক ইংরেজ না-করিতে পারেন।

বঙ্গে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার অবশেষে বিস্তার

গত ৩১শে জুলাইয়ের তারিখযুক্ত বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধীয় একটি সরকারী জ্ঞাপন-পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহাতে এক জায়গায় লিখিত আছে—

“Taking the figures of the total population of Bengal, about half the number of boys and one-seventh of the number of girls of school-going age are *already* at school.” (Italics ours. Ed., Pr.)

তাৎপর্য্য “বঙ্গের মোট লোকসংখ্যা গ্রহণ করিলে স্কুলে যাইবার বয়সের বালকদের প্রায় অর্ধেক এবং ঐ বয়সের বালিকাদের প্রায় সপ্তমাংশ ইতিমধ্যেই বিদ্যালয়ে পড়িতেছে।”

ইহাতে সরকারী-সন্তোষ প্রকাশিত হইয়াছে। যদি স্কুলে যাইবার বয়সের বালক-বালিকাদের সত্য সত্যই যথাক্রমে অর্ধেক ও সপ্তমাংশ এখন বিদ্যালয়ে যায়, তাহা হইলেও তাহা সন্তোষের বিষয় না হইয়া অসন্তোষ এবং ক্রোধের বিষয়ই হওয়া উচিত। “ইতিমধ্যেই” (“already”) বলাত মনে হইতে পারে, যে, বঙ্গদেশে বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবার রীতি সবে-মাত্র দু-চার বৎসর হইল প্রবর্তিত হইয়াছে, এবং ইতিমধ্যেই এত বেশী ছেলেমেয়ে স্কুলে যাইতেছে। বাস্তবিক কিন্তু এদেশে শিক্ষা প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, এবং কোম্পানীর আমলের আরম্ভের সময় পর্য্যন্ত এদেশে প্রতি গ্রামে শিক্ষালয় ছিল। এডাম সাহেবের রিপোর্টে দেখা যায়, যে, প্রতি চারি শত

অধিবাসীর জন্ত বঙ্গে একটি করিয়া শিক্ষালয় ছিল। এখন (১৯৩৩ সালে) বঙ্গের ৫,০১,১৪,০০২ জন অধিবাসীর জন্ত বিশ্ববিদ্যালয়, সব রকম কলেজ ও সব রকম স্কুলের সংখ্যা ৭০,৩২৭। অর্থাৎ প্রত্যেক ৭১২ জনের জন্ত একটি করিয়া শিক্ষালয় আছে।

অতীতের কথা ছাড়িয়া দিয়া সরকারী জ্ঞাপন-পত্রের মন্তব্যের আলোচনা করি। স্কুলে যাইবার বয়স কোন বৎসর হইতে কোন বৎসর এবং মোট অধিবাসীর শতকরা কত জন স্কুলে যাইবার বয়সের, তাহা ঐ জ্ঞাপন-পত্রে লেখা নাই। এই জন্য ঠিক বিচার করা যায় না। আমরা ‘প্রবাসী’র গত একটি সংখ্যায় জাপান মাগাজিন হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, যে, জাপানে মোট অধিবাসী-সংখ্যার শতকরা কুড়ি জন অর্থাৎ এক-পঞ্চমাংশ স্কুলে যায়। বঙ্গে পুরুষদের সংখ্যা ২,৬০,৪১,৬৯৮। তাহার এক-পঞ্চমাংশ ৫২,০৮,৩৩৯। অতএব বঙ্গে ৫২,০৮,৩৩৯ জন বালকের ইচ্ছা বাওয়া উচিত। কিন্তু সরকারের চেনা (recognized) সব রকম ইচ্ছা বায় মোট ২২,৭৫,৪৯৬ জন বালক। ইহা ৫২,০৮,৩৩৯-এর অর্ধেকের অনেক কম। যদি সরকারের অচেনা (unrecognized) প্রতিষ্ঠান-সমূহের ৫৪,৩২৭ জন ছাত্রও ধরা যায়, তাহা হইলেও মোট সংখ্যা যে ২৩,২৯,৮২৩ হয়, তাহাও ৫২,০৮,৩৩৯-এর অর্ধেকের অনেক কম থাকে।

বঙ্গে নারীর মোট সংখ্যা ২,৪০,৭২,৩০৪। ইহার পঞ্চমাংশ ৪৮,১৪,৪৬০। অতএব বঙ্গে ৪৮,১৪,৪৬০ জন বালিকার ইচ্ছা বাওয়া উচিত। কিন্তু সরকারের চেনা সব বিদ্যালয়ে পড়ে ৪,৯৪,০৭৬টি বালিকা। ইহা ৪৮,১৪,৪৬০-এর সপ্তমাংশের চেয়ে চের কম। সরকারের অ-চেনা প্রতিষ্ঠান-সকলের ১১,৩৭৭ জন বালিকা যোগ দিলে সমষ্টি হয় ৫,০৫,৪৫১। তাহাও ৪৮,১৪,৪৬০-এর এক-সপ্তমাংশের অনেক কম।

আমরা আগেই বলিয়াছি, সরকারী জ্ঞাপন-পত্রের মন্তব্য সত্য হইলেও, তাহা সন্তোষের বিষয় হইত না, অগৌরবের বিষয়ই হইত। কিন্তু উহাতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। স্কুলে যাইবার বয়সের ৫২ লক্ষ ছেলের মধ্যে ২৮ লক্ষের উপর ছেলে স্কুলে যায় না, এবং

স্কুলে বাইবার বয়সের ৪৮ লক্ষ মেয়ের মধ্যে ৪৩ লক্ষ ইহুলে যায় না।

সরকারী জ্ঞাপন-পত্রে বলা হইয়াছে, বঙ্গের গ্রামসমূহের অর্ধেকের উপর পল্লী (hamlets) মাত্র, এবং বঙ্গের অধিবাসীদের রকম বার আনা এরূপ সব পল্লীতে বাস করে, যাহাদের প্রত্যেকের লোকসংখ্যা ৫০০র বেশী নয়। ইহা সত্য হইতে পারে। কিন্তু যে পল্লীগ্রামে ৫০০ মানুষ থাকে, তাহাতে স্কুলে বাইবার বয়সের ১০০ ছেলে ময়ে আছে। তাহাদের জন্য অন্ততঃ একটি বালকবালিকা-বিদ্যালয় থাকা উচিত। যদি সেই গ্রামের লোকেরা ছোট ছোট মেয়ে ও ছেলেদেরও একত্র শিক্ষার বিরোধী হয়, তাহা হইলে একটি পাঠশালা ছেলেদের ও একটি মেয়েদের জন্য চালান উচিত।

শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে দেশের লোকদের কর্তব্য

ভারতবর্ষে ও বাংলা দেশে শিক্ষাবিস্তার এ-পর্যন্ত যাহা হইয়াছে, তাহা সাতিশয় অসন্তোষকর। ভবিষ্যতে সরকারী চেষ্টায় যে ইহা অপেক্ষা দ্রুতবেগে শিক্ষাবিস্তার হইবে, তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না—অন্ততঃ বঙ্গদেশে ত নহে। সুতরাং দেশবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে শিক্ষাবিস্তার-কার্যে লাগিতে হইবে। শিক্ষার উৎকর্ষসাধন ও বিস্তারসাধন দুই একসঙ্গে হইতে পারে—বহু দেশে হইয়াছে ও হইতেছে। অতএব, উৎকর্ষসাধনের ওজুহাতে বিস্তার স্থগিত রাখা বা সঙ্কোচন নিন্দনীয়।

এ-কথা অনেক বার বলা হইয়াছে, যে, শিক্ষার জন্য অন্যান্য প্রদেশে গবর্নেন্ট যত ব্যয় করেন, বঙ্গে তত করেন না। তাহার একটা দৃষ্টান্ত সরকারী রিপোর্ট হইতে পুনর্বীর দিতেছি। ছেলেদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রপ্রতি বার্ষিক যত খরচ পড়ে, গবর্নেন্ট ১৯৩১-৩২ সালে তাহার মধ্যে দিয়াছিলেন মাত্রাজে ১০.২ টাকা, বোম্বাইয়ে ১৬.৫, বঙ্গে ৪.৯, আগ্রা-অযোধ্যায় ৩৪.৬, পঞ্জাবে ১৩.৯, ব্রহ্মে ৩১.১, বিহার-উড়িষ্যায় ৭.১, মধ্যপ্রদেশে ২৪.৯, আসামে ১৫.৮, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ২৪.৩।

প্রাথমিক বিদ্যালয়-সকলে ছাত্রপ্রতি ১৯৩১-৩২ সালে গবর্নেন্ট খরচ করিয়াছিলেন মাত্রাজে ৪.৭৭, বোম্বাইয়ে ১০.৪৩, বঙ্গে ১.৩, আগ্রা-অযোধ্যায় ৫.২৭, পঞ্জাবে ৬.৪২,

আসামে ৩.১, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ১০.৮৯ টাকা।

ভবিষ্যতে যে গবর্নেন্ট বঙ্গে বেশী খরচ করিবেন, তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। বলিতেছেন বটে, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ট্যাক্স সংগৃহীত হইতে আরম্ভ হইলে আরও প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হইবে। অর্থাৎ বাংলা দেশে যত ট্যাক্স আদায় হয়, তাহার অধিকাংশ ভারত-গবর্নেন্ট গ্রহণ করেন, শিক্ষার জন্য বঙ্গে যথেষ্ট ব্যয় হয় না, যথেষ্ট ব্যয় করিতে হইলে বঙ্গের লোকদিগকে নূতন করিয়া ট্যাক্স দিতে হইবে! কিন্তু এই শিক্ষা-ট্যাক্স দিলেও যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার সত্য সত্যই হইবে সে-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। কারণ, সে-জ্ঞাপন-পত্রে বলা হইয়াছে, যে, শিক্ষা-ট্যাক্স আদায় হইলেই নূতন নূতন পাঠশালা খোলা হইবে, তাহারই একটি প্যারাগ্রাফে বলা হইয়াছে (এবং প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে), যে, “It can be claimed that there are in Bengal at present nearly as many school units for boys as are needed,” “এই দাবি করা যাইতে পারে, যে, বর্তমানে বঙ্গে যতগুলি বিদ্যালয়-একক আবশ্যিক, প্রায় তত গুলি আছে।” যদি তাহাই থাকে, তাহা হইলে নূতন বিদ্যালয়ের স্থান অতি সামান্যই আছে! এ জ্ঞাপন-পত্রে বলা হইয়াছে, বঙ্গে ছেলেদের জন্য ৪৪,৬০০ এবং মেয়েদের জন্য ১৮,০০০ পাঠশালা আছে—মোট ৬২,৬০০। আগে কত ছিল দেখা যাক। বিলাতী প্যারলিমেন্টের সভ্য পরলোকগত মিঃ কেয়ার হার্ভি তাঁহার “ইণ্ডিয়া” নামক পুস্তকের পঞ্চম পৃষ্ঠায় লিখিয়া গিয়াছেন:—

“MaxMuller, on the strength of official documents and a missionary report concerning education in Bengal prior to the British occupation, asserts that there were then 80,000 native schools in Bengal, or one for every 400 of the population. Ludlow, in his History of British India, says ‘that in every Hindoo village which has retained its old form I am assured that the children generally are able to read, write and cipher, but where we have swept away the village system, as in Bengal, there the village school has also disappeared.’”

তাৎপর্য। “সরকারী দলিলপত্র এবং ব্রিটিশ অধিকার স্থাপনের পূর্বে বঙ্গে শিক্ষা সম্বন্ধে একটি মিশনারী রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া ম্যাক্সমুল্লর বলেন, যে, তখন বঙ্গে আশী হাজার দেশী স্কুল ছিল, অর্থাৎ লোকসমষ্টির প্রত্যেক চারি শতের জন্য একটি বিদ্যালয়।

লাডলো তাঁহার ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে বলেন, যে, ‘আমি নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়াছি, যে, যে-সব হিন্দু গ্রাম তাহাদের পুরাতন রূপ রক্ষা করিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটিতে বালকবালিকারা সাধারণতঃ পড়িতে লিখিতে ও হিসাব করিতে পারে, কিন্তু যেখানে গ্রামের গ্রামের পুরাতন ব্যবস্থা কাঁটাইয়া ফেলিয়াছে—যেমন বঙ্গে—সেখানে গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলিও অন্তর্হিত হইয়াছে।’ [ইংরেজী, বাক্যগুলি মেজর বি ডি বণ্ড প্রণীত *History of Education in India under the Rule of the East India Company* নামক তথ্যপূর্ণ পুস্তকের ১৬ পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত। প্রবাসীর সম্পাদক]

উপরের উদ্ধৃত বাক্যগুলি হইতে দেখা যাইতেছে, যে, বঙ্গের লোকসংখ্যা যখন তিন কোটি কুড়ি লক্ষ ছিল তখন ইহাতে আশী হাজার বিদ্যালয় (বোধ হয় পাঠশালা ও টোল) ছিল। এখন ইহার লোক-সংখ্যা পাঁচ কোটির উপর, এবং এখন ইহাতে ৬২,৬০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। অথচ সরকারী জ্ঞাপন-পত্রের একটি পরিচ্ছেদের আখ্যা দেওয়া হইয়াছে—“Adequacy of the number of Primary schools, etc.”) “প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সংখ্যার যথেষ্টতা” ইত্যাদি!

মিঃ এডওয়ার্ড টমসন ভারতীয়দের কোন কৃতিত্ব সহজে স্বীকার করিতে চান না। কিন্তু তিনিও তাঁহার ১৯৩০ সালে প্রকাশিত “ভারতের পুনর্গঠন” (“Reconstruction of India”) নামক পুস্তকের ২৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

“...there was more literacy, if of a low kind, than until within the last ten years”

তাৎপৰ্য্য। “গত দশ বৎসরের মধ্যে ভারতে লোকদের যতটা লিখনপঠনক্ষমতা জন্মিয়াছে, তাহার আগে ব্রিটিশ রাজত্বে উহা যে পরিমাণ ছিল, অতীত কালে তাহা অপেক্ষা বেশী লিখনপঠনক্ষমতা ছিল, যদিও তাহা নীচ রকমের।”

‘নীচ রকমের’ অর্থাৎ শুধু লিখিতে পড়িতে ও হিসাব করিতে পারিবার মত। কিন্তু তাহাও যে এখনও (দশ বৎসর আগে নয়) ব্রিটিশপূর্ব যুগ অপেক্ষা কম।

বাহ্য হউক, শিক্ষাবিষয়ে বাংলা দেশ অন্যান্য প্রধান প্রদেশগুলি অপেক্ষা গবর্নমেন্ট কর্তৃক বেণী অবহেলিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা বাঙালীরা প্রধানতঃ নিজেদের চেষ্টায় ও টাকায় কিয়ৎপরিমাণে ও কতকগুলি লোক শিক্ষা পাইয়াছি। এখন সেই চেষ্টা নূতন উদ্যম করিতে হইবে। যিনি অল্প লেখাপড়া জানেন, তিনিও অন্ততঃ জনকতক লোককে লিখিতে পড়িতে শিখাইয়া দিউন। আমরা যাহা ইচ্ছা কলেজ পড়িয়া পাস করিয়াছি তাঁহারাও, অন্ততঃ

আংশিকভাবে, দেশের লোকদের টাকায় শিক্ষা পাইয়াছি, নিজেরা নিজেদের শিক্ষার সব ব্যয় দিইনাই। গবর্নমেন্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত শিক্ষা-বিস্তারের জন্য যত টাকা দেন, তাহা দেশের অধিকাংশ নিরক্ষর লোকের ও কিছু শিক্ষিত লোকের দেওয়া টাকায় হইতে দেন। নিরক্ষর লোকেরা আমাদেরকে শিক্ষিত করিবার জন্য যত টাকা টাকায় আকারে ধার দিয়াছে, তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া আমাদের তাহা শোধ করা উচিত। সব রকম কলেজের হিসাব পাওয়া যায় না। কিন্তু সরকারী কলেজগুলির যে হিসাব বঙ্গের ১৯৩২-৩৩ সালের শিক্ষা-রিপোর্টে বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যাইবে, গবর্নমেন্ট দেশের লোকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত টাকায় হইতে ঐ বৎসর কত টাকা ছাত্রদের শিক্ষার জন্য দিয়া সরকারী কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদিগকে দেশের লোকদের কাছে ঋণজালে আবদ্ধ করিয়াছেন। হিসাবটার কিয়দংশ নীচে দিলাম।

কলেজের নাম	সরকারী ব্যয়
প্রেসিডেন্সী	২,৫৩,১৬২
ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট	১,১০,৬৭৪
ভূগলী	১,১১,৯৬৩
সংস্কৃত	৩৯,৯৮৮
কৃষ্ণনগর	৬৮,৭৭৯
চট্টগ্রাম	৯১,১১৫
রাজসাহী	১,২২,২০৮
ইসলামিয়া	৭৮,৯৪৩

আমাদের সকলেরই দেশের লোকদের শিক্ষার জন্য সময় শক্তি ও অর্থ তিনই দেওয়া উচিত। তিনই না পারিলে যিনি বাহা পারেন, দেওয়া উচিত। কিছুই না-দিলে মানুষ নামের অযোগ্য হইতে হয়।

পুরুলিয়ার স্বর্ণীয় হরিপদ দাঁ মহাশয় বে-বে বালকবালিকা বৎসরে ন্যূনকল্পে দশ জন লোককে লিখনপঠনক্ষম করিয়াছিল, তাহাদিগকে স্বর্ণপদক দিয়াছিলেন। সব গ্রামে নগরে সোনার পদক দিবার মত লোক না-থাকিতে পারে। কিন্তু রূপার পদক, অন্ততঃ সুন্দরিত সুন্দর প্রশংসাপত্র অবৈতনিক ছোট এবং প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীদিগকে সভা করিয়া দিবার ব্যবস্থা সব শহরে ও গ্রামে হওয়া উচিত ও হইতে পারে।

কৃষিকার কোন কোন রাষ্ট্রে এইরূপ আইন আছে, যে, বাহারা সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছে, তাহাদিগকে বৎসরে ২০০ ঘণ্টা ছুই বৎসর বিনা বেতনে অল্প লোকদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। না দিলে তাঁহারা নাগরিকের অধিকার (citizens' rights) হইতে বঞ্চিত হইবেন। আমরা স্বশাসক নহি—আমাদের দেশে এরূপ আইন হইবে না। আমরা নিজেরা সব জেলায় শহর গ্রামে সমিতি গঠন করিয়া এইরূপ নিয়মে আপনাদিগকে আবদ্ধ করিতে পারি।

এইরূপ নানা উপায় অবলম্বন না করিলে আমাদের দেশ হইতে নিরক্ষরতা কখনও দূরীভূত হইবে না। নিরক্ষরতা দূর করিবার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য নানাবিধ অর্থকরী বৃত্তিও শিক্ষা দিতে হইবে।

—

বঙ্গের রাজস্ব ভারত-সরকারের সিংহের ভাগ

আমরা আগের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়াছি, বঙ্গ সংগৃহীত রাজস্বের অধিকাংশ ভারত-গবর্নমেন্ট গ্রহণ করেন। ইহার হিসাব আগে আগে আমরা অনেক বার সরকারী রিপোর্ট আদি হইতে দিয়াছি। এ-বিষয়ে আরও কিছু বলা আবশ্যিক।

কলিকাতায় ইংরেজ বণিকদের 'ক্যাপিটাল' নামক এক খানি নামজাদা কাগজ আছে। তাহার ভূতপূর্ব সম্পাদক মিঃ আর ডব্লিউ ব্রুক লণ্ডনের ত্রৈমাসিক এশিয়াটিক রিভিউর বর্তমান জুলাই সংখ্যায় লিখিয়াছেন :—

".....under the Montagu-Chelmsford Constitution the Bengal Government was allotted, for all purposes, a smaller sum than the London County Council spends on education alone. In effect under the Meston Settlement all the expanding revenues—such as Customs duties and income tax—were retained by the Government of India, while most of the Departments calling for larger expenditure were assigned to the provincial governments, and, in particular, to the Indian Ministers, such as health, education, agricultural improvements, etc. It was peculiarly unfortunate that in Bengal the ministers were left to face the Legislature with empty pockets: a position not conducive either to political popularity or constructive achievement. Provincial taxation in Bengal was extended to the limits of tolerance and productivity; but of the total revenue collected in the province from all sources, about two-thirds were taken by the Central Government, whose expenditure is mainly incurred outside the province, leaving the Provincial Administration only the exiguous income already mentioned." Pp. 532-3.

তাৎপর্য। 'মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনবিধি অনুসারে বাংলা গবর্নমেন্টকে তাহার সকল রকম কাজ চালাইবার জন্ত, লণ্ডন কাউন্সিল কোঙ্গিল (অর্থাৎ লণ্ডন জেলার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড) কেবল শিক্ষার জন্ত যত ব্যয় করেন, তার চেয়ে কম টাকা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কাষতঃ, মেট্রো বাবুয়ায় বাণিজ্য-শুল্ক, ইনকম ট্যাক্স প্রভৃতি ক্রমবর্ধমান রাজস্ব-গুলি ভারত-সরকার লইয়াছেন, যে-সব বিভাগে অধিকতর ব্যয় আবশ্যিক সেগুলি প্রাদেশিক গবর্নমেন্টের খাড়ে চাপান হইয়াছে—বিশেষ করিয়া দেশী মন্ত্রীদের খাড়ে, যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষির উন্নতি, ইত্যাদি। এটা বিশেষ রকম দুর্ভাগ্যের বিষয়, যে, বঙ্গ মন্ত্রাদিগকে শুল্ক পকেটে ব্যবস্থাপক সভার সম্মুখীন হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়—এরূপ অবস্থা রাজনৈতিক লোকপ্রিয়তা বা গঠনমূলক কৃতিত্বের অনুকূল নহে; বঙ্গ প্রজাদের সহন-শক্তি ও ট্যাঙ্কদান-শক্তির সামান্য পথান্ত ট্যাঙ্ক বাড়ান হইয়াছে; কিন্তু সকল রকম ট্যাঙ্ক কর শুল্ক খাজনা হইতে সংগৃহীত মোট টাকার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ভারত-সরকার গ্রহণ করেন এবং তাহা ব্যয় করেন প্রধানতঃ বঙ্গের বাহিরে প্রাদেশিক গবর্নমেন্টের জন্ত রাগিয়া দেন পূর্ববর্ণিত কিছু সামান্য জায়।"

মিঃ ব্রুক তাহার পর পাটরপ্তানী শুল্কের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, যে, পাট বেশীর ভাগ বঙ্গই জন্মে এবং ইহার উন্নতি বঙ্গের কৃষি-বিভাগের দ্বারা হইয়াছে। কিন্তু গত দশ বৎসরে ভারত-সরকার পাটশুল্ক হইতে তিন হইতে চারি কোটি পৌণ্ড সংগ্রহ করিয়াছেন (এক পৌণ্ড=১০৩ টাকা), কিন্তু বঙ্গের কৃষি-বিভাগ চালাইতে হইয়াছে বাংলা-সরকারকে তাঁহার সামান্য প্রাদেশিক আয় হইতে! মিঃ ব্রুক আরও লিখিতে পারিতেন, যে, পাটপচা জলের দুর্গন্ধ ও অস্বাস্থ্যকরতার ফলভোগ বাঙালীর একচেটিয়া।

প্রবাসীর শারদীয় সংখ্যা দ্বয়

আশ্বিন মাসের ও কার্তিক মাসের 'প্রবাসী' দুখানি ইহার শারদীয় সংখ্যা হইবে। আশ্বিনের প্রবাসী ২৪শে ভাদ্র এবং কার্তিকের প্রবাসী ১৬ই আশ্বিন প্রকাশিত হইবে। বিজ্ঞাপনদাতারা সময় থাকিতে এই দুই সংখ্যার বিজ্ঞাপন পাঠাইয়া দিলে বাধিত হইবে। মফস্বলের ও কলিকাতার এজেন্টগণ এই দুই সংখ্যা তাঁহাদের প্রয়োজন মত যথাসময়ে লইলে বাধিত হইবে।

মহাত্মা গান্ধীর উপবাস শেষ

মহাত্মা গান্ধীর সাত দিনের উপবাস নির্বিঘ্নে শেষ হওয়ার আমরা আশ্বাসিত হইয়াছি। তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া ভারতবাসীর ও মানবজাতির কল্যাণসাধনে ব্রতী থাকুন, সর্কাস্তঃকরণে এই প্রার্থনা করিতেছি।

বিশ্বভারতীর বর্ষা-উৎসব

খবরের কাগজে দেখিলাম, গত অনেক বৎসরের মত এই বৎসরও বিশ্বভারতীর বর্ষা-উৎসব হইয়াছিল। ২৭শে শ্রাবণ রবিবার এই উৎসব হয়। ইউনাইটেড প্রেস্‌ ত হার নিম্নমুদ্রিত সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

আজ প্রাতে এখানে বৃক্ষরোপণ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সারি দিকে আশ্রয়িত জনতার দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া খোলা মাঠের একধারে কবি উৎসবের পুরোধারূপে বসিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্রীরা গান গাহিতে গাহিতে, হাতে মাল্লিকি জবাাদি লইয়া শোভন ভঙ্গিতে উৎসবক্ষেত্রে আসিল। ভারতের প্রাচীন রীতি অনুসারে উৎসবের কাব্য সম্পন্ন হইল। শেষে কবি তাঁহার স্বাভাবিক বাচনপটুতা সহকারে প্রকৃতির আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য কতকগুলি গাথা আবৃত্তি করিলেন। উৎসবের গাঙ্গায়া ও সৌন্দর্য্য দৃশ্যকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। উৎসবান্তে এক পশলা বৃষ্টিও হইয়া গেল। ইহাতে সকলে প্রীত হইয়াছিলেন।

বিশ্বভারতীয় পল্লী-সংস্কার বিভাগ শ্রীনিকেতনে বিকালবেলা হলকর্ষণ উৎসব সম্পন্ন হইল। যাহাতে প্রাণের পোষক প্রচুর স্নান উৎপন্ন হয়, উৎসবের ইহাই অর্থ। বিশ্বভারতীর সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভূমিতে হলসংযোগ করেন। এই উপলক্ষে কবি যে গানটি রচনা করেন, তাহাতে গ্রামের সহজ জীবনযাত্রার মধ্যে ফিরিয়া যাইবার জন্ত একটি গভীর আবেদন ছিল। নিকটবর্তী গ্রামের সমবায়সমিতিসমূহের বহু কৃষক তাহাদের ভাল বন্দ ও লাঙ্গল প্রদর্শন করিবার জন্ত গানিয়াছিল।

অতঃপর বিশ্বভারতীর উদ্যোগে বিভিন্ন পল্লীসংস্কার-সমিতির সদস্যগণের একটি সভা হয়। সমবায়-সমিতি-সমূহের রেজিষ্টার খান-বাহাদুর আরসাদ আলী সভাপতি হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ ও নেপালচন্দ্র রায় এই সভায় বক্তৃতা করেন।

সন্ধ্যার পর শান্তিনিকেতনে কবির নূতন নাটক “শ্রাবণধারা” অভিনীত হয়। কবি নিজে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নৃত্য ও সঙ্গীত এবং আলোক ও বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশে অভিনয় চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। গানের সহিত যোগ হইয়াছিল শ্রবণের, আবার তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিল সঙ্গীতার্থবাহক নৃত্য। আকাশ হইতে তুষাহারা নামিয়া আসুক—সঙ্গীত ও নৃত্য এক সুরে এই প্রার্থনা গানাইয়াছিল।

নানাস্থান হইতে বহু অতিথি উৎসব উপলক্ষে সমাগত হইয়াছিলেন।

পৃথিবীর নানা দেশের অনেক উৎসব আদিতে ঋতু-উৎসব ছিল। আমাদের দেশের অনেক উৎসবও তাই। নানা দেশে এই সব উৎসবের অনেকগুলি এখনও অনুষ্ঠিত হয়। অনেক স্থলে লোকে তাহার উৎপত্তির কারণ ভুলিয়া গিয়াছে, কেবল নিয়মরক্ষা ও আমোদপ্রমোদের জন্ত অনেক স্থলে ঐ উৎসবগুলি হয়। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ঋতুর বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি ও ভাব এবং তাহা হইতে

লব্ধ আনন্দ ও অনুপ্রাণনা লোকে সে-সব স্থলে অনুভব করে না। বিশ্বভারতীর বর্ষা-উৎসব নূতন প্রবর্তিত, এবং এক জন মনীষী ও কবির দ্বারা প্রবর্তিত। ইহা তাঁহার পৌরোহিত্য ও নেতৃত্ব তাঁহার রচিত গান ও নাটকাদি এবং তাঁহার উদ্ভাবিত নৃত্যের সাহায্যে অনুষ্ঠিত হয়। এই জন্ত ইহার কল্পী, দর্শক ও শ্রোতারা, রসানুভূতি ও আত্মিক যোগ্যতা থাকিলে, কবির উপলব্ধ সময়োচিত ভাব, আনন্দ ও অনুপ্রাণনা লাভ করিয়া থাকেন।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী

মৈমনসিংহ জেলার মুন্সীগাঁছার জমিদার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে বঙ্গদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। নানা সদনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। নির্যাতিতা নারীদের তিনি হৃদয়ের সহিত এবং কার্যতঃ কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিতেন। দেশ গণতান্ত্রিক স্বরাজ লাভ করে, তিনি ইহা চাহিতেন। তাঁহার সৌজন্য তাঁহাকে জনপ্রিয় করিয়াছিল। তিনি বেশ বাংলা লিখিতে পারিতেন। তাঁহার শিকার-কাহিনী তাহার পরিচায়ক।

রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

পরলোকগত রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক জন কৃতী এতর্নী ছিলেন। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনাদির সহিত তাঁহার প্রকাশ্য যোগ ছিল না বটে, কিন্তু অনেক হিতকর প্রচেষ্টার সহিত তাঁহার আন্তরিক যোগ ছিল। বিলাতে স্তর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাটোয়ারার, পূনা-চুক্তির, এবং প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত দ্বারা ভারতীয় হিন্দুদের, বিশেষতঃ বাঙালী হিন্দুদের প্রতি যে অবিচার হইয়াছে, তাহার, যে প্রতিকার-চেষ্টা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা কতকটা রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অপ্রকাশিত সহযোগিতায় পারিষ্কার ছিলেন।

প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের দোষ

বিলাতী প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডনাল্ড যে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত দ্বারা ব্যবস্থাপক সভা-সমূহের আসনগুলি নানা শ্রেণী ও

সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে ভারত-বর্ষের অধিকতম অধিবাসী হিন্দুদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার হইয়াছে বলিয়া অনেক হিন্দু এই অবিচারের প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা উহার একমাত্র দোষ নহে।

ভারতবর্ষে যত ধর্মসম্প্রদায় আছে, জাতি (race) আছে, বৃত্তিগত শ্রেণী আছে, সকলকে তাহাদের লোকসংখ্যা অনুসারে বা শিক্ষাদি যোগ্যতা অনুসারে ব্যবস্থাপক সভায় ঠিক গায়সঙ্গত ভাবে আসন বাটিয়া দেওয়া কখনও সম্ভবপর নহে। কিন্তু যদি প্রধান মন্ত্রী এই অসাধাসাধন করিতে পারিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত আপত্তিজনক হইত, গ্রহণযোগ্য হইত না। তাহার কারণ, একটা মহাজাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় স্বার্থ আলাদা নহে। পৃথিবীর কোন সভ্য দেশের মূল শাসনবিধিত রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে এই প্রকার টুকরা টুকরা করিয়া দেখা হয় নাই। যে যে-শ্রেণীর বা ধর্মেরই লোক হউক না কেন, রাষ্ট্রের কাছে সে এক জন রাষ্ট্রসভ্য (citizen) মাত্র।

ভারতীয়েরা যে সকলে এক মহাজাতির, এক দেশের, অঙ্গ, এই বোধ তাহাদের মধ্যে প্রবল হইতেছিল। বড়লাট মিণ্টো মুসলমানদের কতকগুলি লোকদের মুখ দিয়া স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের দাবি নিজের কাছে উপস্থাপিত করাইয়া এই ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবোধ বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। মিণ্টো-মর্লী শাসনবিধি ভারতীয়দিগকে যত ভাগে ভাগ করিয়াছিল, প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডনাল্ড তাহাদিগকে তার চেয়ে আরও বেশী ভাগে ভাগ করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্তের প্রথম দোষ এই ভাগ-করা, এই বিভাজন। হিন্দুদের প্রতি বা অল্প কোন শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের প্রতি, নারীদের প্রতি, ব্রিটিশ-ভারতের প্রতি, দেশী রাজ্যের প্রজাদের প্রতি, অবিচার তাহার পরবর্তী দোষ।

অতএব, হিন্দুরা ভারতবর্ষের লোকসমষ্টির যত অংশ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আসন সংখ্যার তত অংশ যদি প্রধান মন্ত্রী হিন্দুদিগকে দিতেন, কিংবা আরও বেশী দিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার সিদ্ধান্ত দুষ্ট, আপত্তিজনক ও গ্রহণের অযোগ্য হইত, তাহা হইলেও

আমরা তাহা গর্হিত বলিতাম। যে-কোন সিদ্ধান্ত স্বাভাবিকতার (গাণ্ডালিজমের) ও গণতান্ত্রিকতার বিপরীত আমরা তাহাই গর্হিত মনে করি ও বলি।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নির্দ্বারগ

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রধান মন্ত্রীর সিদ্ধান্তের নিন্দা করিয়াছেন, অথচ তাহা গ্রহণও করেন নাই অগ্রাহ্যও করেন নাই। ইহাও বলিতেছেন, যে, হোয়াইট পেপারটাকে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে, সেটা গেলেই সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তটাও বাইবে।

এই প্রকার কথা ঠিক পরস্পরসঙ্গতিবিশিষ্ট ও গায়-শাস্ত্রসঙ্গত (logical) নহে। তাহা তাঁহারাও স্বীকার করিবেন। ডাঃ আব্দারী, মোলানা আবুল কালাম আভাদি প্রভৃতি যে-সব স্বাভাবিক মুসলমান কিছুদিন আগেও প্রকাশ্যভাবে প্রধান মন্ত্রীর সিদ্ধান্তের অবিমিশ্র নিন্দা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও এখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নির্দ্বারগের সমর্থক হইয়াছেন—বস্তুতঃ তাঁহাদের পরামর্শে ও জেদে কমিটি এইরূপ নির্দ্বারগ করিয়াছেন।

এই সব মুসলমান নেতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্ত, মুসলমান সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করিবার জন্ত, মুসলমান ভোটদাতাদের ভোটের সাহায্যে স্বাভাবিক মুসলমানদের ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্বাচিত হইবার সুযোগ করিয়া দিবার জন্ত, ওয়ার্কিং কমিটি এইরূপ নির্দ্বারগ করিয়াছেন। কংগ্রেস ভারতের সব সম্প্রদায় ও শ্রেণীর প্রতিনিধিসভা। সুতরাং কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করিবার ও তাহার সহযোগিতা লাভ করিবার চেষ্টা করা ইহার পক্ষে অনাবশ্যক ও অভ্যর্থন নহে। কিন্তু এক সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া অল্প কোন সম্প্রদায়কে বা তাহার একটা অনল্প অংশকে অসন্তুষ্ট করা উচিত কিনা বা সমীচীন কিনা, তাহাও কংগ্রেসের বিবেচ্য। এমন হইতে পারে, যে, যে-হেতু হিন্দুরা ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং কংগ্রেসেও সংখ্যায় ও কর্মিষ্ঠতায় প্রধান, সেই জন্ত, নিজেদের প্রতি অবিচার ও উপেক্ষা সহ্য করিয়াও হিন্দুদের পক্ষে মুসলমানদিগকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করা উচিত—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এইরূপ মনে

করিয়াছেন। এরূপ মনোভাব নিন্দনীয় নহে। একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারের কঠীকে কখন কখন নিজের পুত্রকন্যাদের বঞ্চিত করিয়াও ভ্রাতৃপুত্রভ্রাতৃপুত্রীদিগকে সম্বৃত্ত করিতে এবং তদ্বারা নিজের জায়গায়গতায় বিশ্বাসবান করিতে হয়।

এইরূপ বিচারমার্গের অবলম্বন সমর্থন করিতে হইলে শেষ কষ্টপাথর দাঁড়ায় এই প্রশ্নটি—মুসলমানেরা সম্বৃত্ত হইয়াছে কি? মুসলমান ভোটদাতারা সকলে বা তাহাদের বড় একটা অংশ কংগ্রেসওয়ালার স্বাভাবিক মুসলমানদিগকে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইবার জন্য ভোট দিবে কি?

আমরা নানা মুসলমান নেতার প্রকাশিত মত খবরের কাগজে যাহা পড়িয়াছি, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, মুসলমান সম্প্রদায় সম্বৃত্ত হয় নাই। এক এক জনের নাম করিয়া মুসলমান নেতাদের মত ছাপিবার আবশ্যিক নাই, তাহা খবরের কাগজে সকলে দেখিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, কংগ্রেস অনেক দূর আসিয়াছেন, আর একটু অগ্রসর হইলেই আমাদের মনের মত নির্ধারণ হয়। কেহ বা বলিয়াছেন, কংগ্রেস কমিটি ত সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই, বরং উহার নিন্দাই করিয়াছেন এবং হোয়াইট পেপার অগ্রহণ দ্বারা উহা অগ্রাহ হইবে এই আশা করিয়াছেন; কঙ্গটিউয়েন্ট এসেমব্লী দ্বারা উহা অগ্রাহ হইবে, এই আশাও করিয়াছেন; সুতরাং কমিটির নির্ধারণ মুসলমানদের পক্ষে সন্তোষজনক নহে। সমগ্র-ভারত মুসলিম কনফারেন্সের অধিবেশনেও সম্প্রতি ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদপ্রার্থী কেবল সেই সকল মুসলমানকে ভোট দিতে বলা হইয়াছে যাহারা সাম্প্রদায়িকতাবাদী।

এই সব কারণে আমাদের মনে হয়, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত স্পষ্টতঃ গ্রহণ করিলে এবং নিজেদের নির্ধারণ হইতে উহার নিন্দাবাদ একেবারে তুলিয়া দিলে, মুসলমান সম্প্রদায়ের সন্তোষ জন্মিতে পারে। উহা অগ্রাহ না করিয়া কমিটি ত কার্যতঃ উহাতে সায় দিয়াছেনই। স্পষ্ট ভাষায় সায় দিলে একটা বড় পরীক্ষা হইয়া যাইবে—বুঝা যাইবে, যে, সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তটার মত এত বড় একটা অবিচার মানিয়া লইলেও

এবং স্বাভাবিকতার প্রতি এত বড় একটা আঘাত মাথা পাতিয়া লইলেও মুসলমানেরা কংগ্রেসে যোগ দিব কি না। যদি যোগ দেয়, ভাল। যদি যোগ না দেয়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে, যে, স্বরাজ্যভের জন্ত, বৈদেশিক প্রভুত্বের জায়গায় দেশীয় প্রভুত্ব স্থাপনের জন্ত, মুসলমানেরা অস্ত্রাস্ত্র দলের সহিত এক যোগে কাজ করিবে না।

আমরা কংগ্রেসের দলের বা অন্য কোন দলের লোক নহি। উপরে যাহা লিখিলাম, তাহা আমাদের মত বা পরামর্শ নহে। কংগ্রেস মুসলমানদিগকে সম্বৃত্ত করিতে এবং তাহার দ্বারা কংগ্রেসওয়ালার মুসলমানদিগকে দলে রাখিতে, অন্য মুসলমানদিগকে দলে টানিতে, ও ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসওয়ালার স্বাভাবিক মুসলমান সদস্যপদপ্রার্থীদের নিরীকনের সম্ভাবনা বাড়াইতে চান। এই চেষ্টা কিরূপে করিলে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সিদ্ধির অধিকতর সম্ভাবনা ঘটিতে পারে, অন্ততঃ একটা বড় রকম পরীক্ষা হইয়া যাইতে পারে, উপরে তাহারই একটা দিক-প্রদর্শন আমরা করিয়াছি। আমাদের নিজের মত 'মডার্ণ রিভিউ'তে বিস্তারিত ভাবে এবং তাহা অপেক্ষা সংক্ষেপে 'প্রবাসী'র গত সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছি। এখন কিঞ্চিৎ আবার বলিতেছি।

বাল্যকালে ইংরেজ কবি গে'র লিখিত কথামালায় (Gay's Fablesএ) এক জন চিত্রকরের বিবয় পড়িয়াছিলাম যিনি সকলকে সম্বৃত্ত করিতে গিয়া কাহাকেও সম্বৃত্ত করিতে পারেন নাই। চিত্রকর নিজের আঁকা একখানি ছবি প্রদর্শনীতে রাখিয়া দর্শকদিগকে বলিলেন, যাহার যে জায়গাটা ভাল লাগে না তিনি সে জায়গাটা চিহ্নিত করিয়া দিবেন, আমি চিহ্নিত জায়গাগুলো সংশোধন করিয়া ছবিখানিকে সর্বজন-মনোহর করিয়া দিব। তাহাতে ফল এই হইল, যে, সমস্ত ছবিটি মসীমলিন হইয়া গেল—তাহার এমন একটি জায়গাও দেখা গেল না যাহা কাহারও-না-কাহারও মতে মন্দ বলিয়া চিহ্নিত হয় নাই।

কংগ্রেসের একটি আদর্শ আছে। তাহা স্বাভাবিক ও গণতান্ত্রিক। কোন সম্প্রদায়, শ্রেণী, বা ব্যক্তি খুশী হইবেন না-হইবেন, তাহা চিন্তা না করিয়া কংগ্রেসের সেই আদর্শ অনুসারে চলা ও তদনুসারে প্রধান মন্ত্রীর

সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করা উচিত ছিল। কারণ, এই সিদ্ধান্ত ভারতীয় মহাজাতির একতার পরিপন্থী, অগণতান্ত্রিক, সকল পৌর ও জানপদবর্গের দ্বারা (citizenদের দ্বারা) সম্মিলিত ভাবে প্রতিনিধি নির্বাচনের বিরোধী, এবং কাহারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব কাহারও প্রতি বা অবিচার করিয়া সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব বাড়াইয়াছে ও চিরজাগরুক রাবি বার ব্যবস্থা করিয়াছে। কংগ্রেস যদি এই প্রকারে ঠিক নিজের আদর্শ অনুসারে চলিতেন, তাহা হইলে প্রত্যেক সম্প্রদায় ও শ্রেণীর অনেক লোকের সমর্থন পাইতেন। কোন সম্প্রদায় বা শ্রেণীর শতকরা কত জনের সমর্থন পাইতেন বলা সম্ভবপর নহে। কিন্তু ইহা নিশ্চিত, যে, মুসলমানদের মধ্যেও কংগ্রেসের এই প্রকার আদর্শানুগ আচরণের কিছু সমর্থক পাওয়া যাইত। ইহা কেবল অনুমান করিয়া বলিতেছি না। লাহোরের ট্রিবিউন কাগজে অধ্যাপক আবদুল মজিদ এইরূপ আদর্শের সমর্থন করিয়া চিঠি লিখিয়াছেন। কলিকাতার 'গ্যাড্‌ভান্স' কাগজেও বর্তমানের এক জন মুসলমান ভদ্রলোকের এইরূপ চিঠি পড়িয়াছি। আমাদের চোখে পড়ে নাই, এইরূপ আরও চিঠি খবরের কাগজে বাহির হইয়া থাকিতে পারে।

দলে কত লোক পাওয়া যাইবে তাহা না-ভাবিয়া বাহা সত্য ও সত্যের অনুধায়ী তাহার অনুসরণ করা কর্তব্য। সত্য ও সত্য যে-কোন মানুষ ও যে-কোন দলের চেয়ে বড়।

প্রস্তাবিত স্বাভাটিক দল

সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোআরা সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়া কংগ্রেস প্যালেমেন্টারী বোর্ডের এক শ্রীযুক্ত মাধব শ্রীহরি আণে কংগ্রেস প্যালেমেন্টারী বোর্ড ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ যিনি যে-সমিতির কোনও মূল মত ও কার্যা-প্রণালীতে বিশ্বাস করেন না, তাঁহার তাহাতে থাকা উচিত নয়। উক্ত দুই নেতা যদি কেবল ইন্তফা দিয়াই কান্সত থাকিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহারা সাম্প্রদায়িক

ভাগবাটোআরা সম্বন্ধে কমিটির নির্ধারণের সমর্থন করেন, তাঁহারাও তাঁহাদিগকে দোষ দিতেন না। কিন্তু তাঁহারা নূতন দল গড়িবার চেষ্টা করায় উক্ত সমর্থকেরা তাঁহাদের সমালোচনা করিতেছেন।

মালবীয়া ও আণে মহাশয়দিগের মতামতের সমালোচনা অবশ্যই হইতে পারে। নূতন দল গড়া তাঁহাদের উচিত নয়, এই মতও ব্যক্ত হইতে পারে।

তাঁহারা যে নূতন দল গড়িতে যাইতেছেন, তাহার মত নিয়ম কার্যা-প্রণালী প্রভৃতি স্থির করিবার ক্ষমতা আগামী ১লা ও ২রা ভাদ্র কলিকাতায় কনফারেন্স হইবে। এই কনফারেন্সের কাজ শেষ না-হওয়া পর্যন্ত প্রস্তাবিত নূতন দলের আদর্শ ও কার্যা-প্রণালী সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু বলা চলিবে না। তাঁহার যে আভাস পাওয়া গিয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া ইহা বলিতে পারি, যে, নূতন দল জাতিবর্ণনির্বিশেষে উহার সমর্থক সকল লোককে লওয়া হইবে, একরূপ নিয়ম খুবই বাঞ্ছনীয়। কারণ একরূপ খাঁটি স্বাভাটিক (nationalist) ও গণতান্ত্রিকমতাবলম্বী ব্যক্তি সকল সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে আছেন তাঁহারা সম্মিলিত নির্বাচন চান, মহাজাটিকে টুকরা টুকরা করা এবং কাহারও প্রতি অগ্রহ ও কাহারও প্রতি উপেক্ষা চান না। নূতন দল যে শুধু হিন্দুর দল হইবে না, অ-হিন্দুরাও ইহার মধ্যে স্থান যাইতে পারিবেন, ইহা খুব ভাল। কারণ মালবীয়া ও আণে মহাশয়েরা হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে নূতন দল গড়িতেছেন না, কংগ্রেসের চিরাগত আদর্শের মূলীভূত নীতি অনুসারে গড়িতেছেন।

কাগজে বাহির হইয়াছে, যে, নূতন দলের একটি মত এই হইবে, যে, ইহা গবন্মেণ্ট কর্তৃক ব্যবস্থাপক সভার সহযোগে ধর্মসম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে আইন করিতে পারিবেন না। একরূপ ব্যাপক একটি মত দলের আদর্শের মধ্যে নিবিষ্ট হওয়ার আমরা বিরোধী। গোড়া মুসলমানদের সকলে বা অনেকে এবং সনাতনী হিন্দুরা গবন্মেণ্টের ক্ষমতা ও কর্তব্য এই প্রকারে সীমাবদ্ধ করিতে চাহিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাহা চাই না; বোধ হয় অল্প অনেক হিন্দুও তাহা চান না।

ইহার মানে এ নয় যে আমরা চাই, ব্যবস্থাপক সভা

সাকার ও নিরাকার উপাসনা, বৈষ্ণব মত ও শাক্ত মত, বহুদেববাদ ও একেশ্বরবাদ, অবতারবাদ ও গুরুবাদ, ঈশ্বরের একত্ব ও ত্ৰিত্ব, তীর্থদর্শন ও হজ-করণ, প্রভৃতি সম্বন্ধে আইন করুন। তাহা আমরা চাই না। ধর্মের অর্থ সম্বন্ধে লৌকিক ধারণা নানা প্রকার। অনেক সামাজিক প্রথা ও রীতি ধর্মের সহিত জড়িত হইয়া গিয়াছে। তাহার কোনটি যদি জরুরী ও নিষ্ঠুরতার পরিপোষক হয়, যদি কোনটির ফলে সমাজ দুর্বল হইতে থাকে বা লোকস্থিতির ব্যাঘাত জন্মে, এবং যদি সংস্কারকদের আন্দোলনে তাহা রহিত না হয়, তাহা হইলেও আইনের দ্বারা তাহার বিনাশ সাধনের চেষ্টা করিতে পারা যাইবে না, এক্ষণে নিয়মের আমরা পক্ষপাতী নহি। যেক্ষণ মতের ও নিয়মের সমর্থন আমরা করিতেছি না, নূতন দলের কোন লোকই তাহা মানিতে বা প্রচার করিতে পারিবেন না, এক্ষণে নিয়ম করিতেও আমরা বলিতেছি না। আমরা বলিতেছি, এ-বিষয়ে সভাদের স্বাধীনতা থাকুক।

লোকে সাধারণতঃ ধর্ম কথাটি যেক্ষণ ব্যাপক অর্থে বুঝে এবং যেক্ষণ নানা কারণে ধর্ম গেল বলিয়া রব উঠে, তাহাতে, ধর্মবিষয়ক কোন আইনই হইতে পারিবে না, এক্ষণে একটা নিয়ম থাকিলে, সহমরণ ও সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে, ঠগীর বিরুদ্ধে, গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জনের বিরুদ্ধে, নির্দিষ্ট অল্প একটা বয়সের চেয়ে ছোট স্ত্রীর সহিত সহবাসের বিরুদ্ধে, বাধ্যবিবাহের বিরুদ্ধে, আইন হইতে পারিত না, এবং হিন্দু বিধবাদের বিবাহের বৈধতাঘোষক আইনও হইতে পারিত না। এই সকল আইনের সম্বন্ধে কোন আলোচনা এখানে করিতেছি না। কিন্তু এগুলির ধাতোকটিই ধারাপ, বা প্রণয়নকালে অসাময়িক হইয়াছিল অনাবশ্যক ছিল, ইহা কেহ বলেন কি না জানি না।

এখন নূতন দল গঠনের জাযাতা ও অধিকার সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই।

কোন দলের কেহ যদি দেখেন ও মনে করেন, যে, 'দলের মতে ও আদর্শে ভ্রম, খুঁৎ, বা অসম্পূর্ণতা আছে,

দূর করিবার চেষ্টা করা তাঁহার উচিত এবং তাহা করিবার অধিকারও তাঁহার আছে। দলস্থ কোন লোক

যদি দলের আদর্শের ও মতের চেয়ে উৎকৃষ্ট আদর্শ ও মত অধ্যয়ন শ্রবণ ও চিন্তার দ্বারা পান, দলের লোককে সেই আদর্শের ও মতের অনুগামী করিবার চেষ্টা করিতে তিনি অধিকারী। এবং তাহা করা তাঁহার কর্তব্য। কিন্তু যদি দলের লোকেরা চলিত আদর্শের ও মতের সংস্কারে বাধা দেন কিংবা নূতন মত ও আদর্শ গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে সংস্কারপ্রার্থীকে বা নূতন আদর্শ ও মত স্থাপনাভিলাষীকে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে হইবে। এমন কোন কথা নাই।

এ-রকম স্থলেও নূতন দল স্থাপনের আবশ্যকতা ও অধিকার মানুষের আছে।

কিন্তু মালবীয় ও আগে মহাশয়েরা এক্ষণে কিছুই করিতেছেন না। তাঁহারা চাহিয়াছিলেন, যে, কংগ্রেস বরাবর যে স্বাভাষিক ও গণতান্ত্রিক আদর্শ মানিয়া আসিয়াছেন, যে সম্মিলিত নির্বাচনের সমর্থন এবং পৃথক সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের বিরোধিতা কংগ্রেস বরাবর, ও সেদিন পর্য্যন্তও স্বাভাষিক মুসলমান নেতারা, করিয়াছেন, এখনও সেই রূপই করুন। যে-আদর্শ হইতে কংগ্রেস সরিয়া পড়িতেছেন, তাঁহারা সেই আদর্শকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। কংগ্রেসের সহিত যুক্ত থাকিয়া তাঁহারা এখন তাহা করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহাদের মত নেতৃস্থানীয় লোকেরা উৎকৃষ্ট একটি আদর্শকে বসিয়া বসিয়া বিনষ্ট হইতে দেখিতে পারেন না। তাহাকে বিনষ্ট হইতে দিলে দেশের অনিষ্ট হইবে।

আমরা কংগ্রেসওয়ালারা না হইলেও কংগ্রেসকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়া আসিয়াছি। কংগ্রেসের কার্যে ও প্রভাবে দেশে নূতন জাগরণ, নূতন সাহস, নূতন আত্মোৎসর্গ, নূতন সহিষ্ণুতা আসিয়াছে। এক্ষণে প্রতিষ্ঠানের অথগুহ, বিশালত্ব, শক্তি দলাদলির দ্বারা নষ্ট না হয়, ইহা আমরা সর্বান্তঃকরণে চাই। কিন্তু কংগ্রেস নামটির চেয়ে, কংগ্রেস যে-আদর্শের প্রতীক, সেই আদর্শটিকে বড় মনে করি। সেই আদর্শটি কংগ্রেসকে বড় করিয়াছে, শক্তি দিয়াছে। কংগ্রেস যদি সেই আদর্শকে ত্যাগ করেন, তাহা হইলে আদর্শটি নূতন দেহ ও নাম নিশ্চয়ই ধারণ করিবে।

দলাদলির পক্ষপাতী আমরা মোটেই নহি। কেহ যদি

হাম্বড়ামি করিয়া ভেদ ঘটায় ও নূতন দল বাধিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে অবশ্যই দোষ দেওয়া উচিত। কিন্তু পণ্ডিত মদনমোহন মালবীর যৌবনকাল হইতে দেশের সেবা করিতেছেন, তদুপযুক্ত প্রভাবও তাঁহার জন্মিয়াছে। হাম্বড়ামি তিনি করিতেছেন না, করিবার দরকার নাই।

এমনও নহে, যে, কংগ্রেস এখন আইনের অবাধ্যতা স্থগিত করায় এবং রাজনৈতিক আন্দোলন সহজতর হওয়ায় তিনি ঘটা করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি পুরাতন কংগ্রেসওয়ালারা, যদিও অসহযোগ মত পুরাপুরি গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু তাহা জেলে যাইবার ভয়ে নহে। কারণ তিনি স্বমতে দৃঢ় থাকায় বৃদ্ধ বয়সে একাধিক বার জেল খাটিয়াছেন। আগে মহাশয় অসহযোগী কংগ্রেসওয়ালারূপে জেল খাটিয়াছেন।

আমরা ইহাদের কাহারও দলভুক্ত নহি এবং সকল বিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমতও নহি। আমাদের মতে, তাঁহাদের যাহা করিবার অধিকার আছে, কেবল তাহাই বলিলাম।

প্রশ্ন উঠিয়াছে, যে, তাহারা কি কেবল কংগ্রেসওয়ালারা-দিগকে নূতন দলে লইবেন? কেবল কংগ্রেসওয়ালাদিগকে নিজ দলের পক্ষ হইতে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদপ্রার্থী মনোনীত করিবেন? প্রথম প্রশ্নটির উত্তর সোজা। এখন যাহারা কংগ্রেসওয়ালারা আছেন, তা ছাড়া আরও অনেক লোককে কংগ্রেসের সভ্য করিবার চেষ্টা হইতেছে ও হওয়া বঞ্জনীয়। অতএব, কংগ্রেস যদি অ-কংগ্রেসওয়ালাদিগকে কংগ্রেসী মতে দীক্ষিত করিতে অধিকারী, তাহা হইলে নূতন দলও অ-কংগ্রেসওয়ালাদিগকে নিজ মতে ও আদর্শে দীক্ষিত করিতে অধিকারী। দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর এই, যে, যাহাদের আদর্শ ও মত নূতন দলের অনুযায়ী, ব্যবস্থাপক সভার কাজ করিবার মত যোগ্যতা (অ-জোছকুমত, সাহস, বুদ্ধি, জ্ঞান, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, তর্কশক্তি, বাক্পটুতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি) তাঁহাদের থাকিলে, তাহারা কংগ্রেসওয়ালারা না হইলেও তাঁহাদিগকে সদস্যপদপ্রার্থী মনোনীত করায় কোন বাধা দেখিতেছি না; তবে যোগ্য কংগ্রেসওয়ালারা হইলে আরও ভাল। যাহাদিগকে সদস্যপদপ্রার্থী মনোনীত করা হইবে, তাঁহাদের আগেকার মত ও আচরণ ভাল করিয়া

বিবেচনা করিতে হইবে। আগে যাহারা সাহস, স্বাধীন-চিত্ততা, দেশহিতার্থ শ্রমশীলতা ও স্বার্থত্যাগ এবং প্রকৃত স্বরাজ্যলাভের জন্ত আকাঙ্ক্ষার আচরণগত পরিচয় দেন নাই, এখন তাহারা ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের সুবিধার জন্ত স্বাজাতিক সাজিলে তাঁহাদের আবেদন গ্রাহ্য হওয়া উচিত নয়। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, জেলে যাওয়াই কংগ্রেস-ওয়ালাদের একমাত্র কৃতিত্ব ও কর্তব্য নহে, অন্য বকমেও অনেকে কংগ্রেসের সেবা করিয়াছেন। ঠিক কথা। কিন্তু যাহারা কংগ্রেসওয়ালারা হইয়াও জেলে না-যাইতে যথাসাধ্য কৌশল অবলম্বন ও চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের, অ-কংগ্রেস-ওয়ালাদের, এবং যে-সব কংগ্রেসওয়ালারা কংগ্রেসের আদর্শ অনুসরণ করিতে গিয়া জেলে গিয়াছেন, তাঁহাদের ব্যবস্থাপক সভার কাজ করিবার যোগ্যতা যদি সমান হয়, তাহা হইলে শেষোক্ত ব্যক্তিদিগকেই সদস্যপদপ্রার্থী মনোনীত করা সঙ্গত।

টিক্‌টিকি পুলিশের নির্ভরযোগ্যতা

বঙ্গের বিনা বিচারে বন্দীদিগকে দেওলীতে নিব্বাসনা সম্বন্ধে আইন চিরস্থায়ী করিবার সময় যে তর্কবিতর্ক হয়, তাহার মধ্যে, ঐ সব বন্দী যে প্রায় সবাই নিশ্চয়ই দেখি। তাহা বুঝাইবার জন্ত সরাষ্ট্রসচিব শ্রী হেনরী ক্রেক বলেন, যে, টিক্‌টিকি পুলিশের বর্ণনার শতকরা ৯৫ অংশ নির্ভর বলিয়া অনুসন্ধান দেখা গিয়াছে—

"The Home Member assured the Assembly that 95 per cent of the statements made by the C. I. D. was found to be correct."

কে অনুসন্ধান করিয়া সেগুলোকে নির্ভুল দেখিয়াছে তা না-হয় জিজ্ঞাসা নাই করিলাম! কিন্তু অন্য বকমে ত-একটা কথা বলিতে চাই। যাহারা বিনা বিচারে বন্দীকৃত হয়, পুলিশের দ্বারা তাহাদের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত প্রমাণ বন্দীদের উকীল ও ব্যারিষ্টারদের দ্বারা পরীক্ষিত হইবে না, তাহার উপর কোন জেরা হইবে না, তাহা বিরুদ্ধে বন্দীদের সমর্থক সাক্ষীদের সাক্ষ্য লওয়া হইবে না— ইহা পুলিশ জানে। অতীত দিকে, যে-সব আসামীর প্রকাশ আদালতে বিচার হয়, তাহাদের বিরুদ্ধে যত প্রমাণ ও সাক্ষ্য উপস্থিত করা হয়, তাহার বিরুদ্ধে আসামীদের উকীল

ব্যারিষ্টারেরা তর্ক করেন, জেরা করেন, সাফাই সাক্ষী হাজির করেন, ইত্যাদি। অতএব, এই সিদ্ধান্ত করা অসম্ভব নহে, যে, যাহাদের বিচার হয় না তাহাদের বিরুদ্ধে পুলিশ যতটা সাবধানে প্রমাণ সংগ্রহ ও উপস্থিত করে, তার চেয়ে বেশী সাবধানে ও যত্ন করিয়া প্রকাশ্য ভাবে বিচারিত আসামীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ ও উপস্থিত করে। কিন্তু শেষোক্ত মোকদ্দমাগুলোতেও শতকরা ৯৫টা আসামী দণ্ডিত হয় না। ১৯৩২ সালের (১৯৩৩-এর এখনও পাই নাই) বঙ্গীয় পুলিশ রিপোর্টের ১৫ পৃষ্ঠা হইতে প্রমাণ দিতেছি।

১ হইতে ৫ শ্রেণীর মোকদ্দমা (Offences against the State, public tranquillity, safety and justice) গুলি প্রায় সবই রাজনৈতিক—

“Of the total number of cases instituted, 28425 or 40.7 per cent were tried in court, against 27493 or 28 per cent in 1931, and convictions were obtained in 15.9 per cent against 15.2 per cent.”

কতগুলি মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কেবল শতকরা ১৫.২টিতে আসামীদের শাস্তি হইয়াছিল!

“The number of persons brought to trial was 58,053 against 54,986 in 1931, of whom 23,637, or 40.7 per cent were convicted, against 21,572 or 39.2 per cent in the previous year.”

আসামীদের মধ্যে ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালে যথাক্রমে শতকরা ৩৯.২ ও ৪০.৭ জন দণ্ডিত হইয়াছিল! অতএব, ইহা খুব জোরের সহিত বলিতে পারা যায়, যে, বিনা বিচারে বন্দীদের প্রকাশ্য বিচার হইলে অনূন শতকরা ১০ জন খালাস পাইত, অর্থাৎ আইনের চক্ষে নিরপরাধ অনূন শতকরা ৬০ জন মানুষ স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

এক জন জো-হুকুমের উক্তি

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় কাপ্তেন লালচাঁদ নামক এক জন সরকার-নিযুক্ত (nominated) সদস্য আছেন। তিনি সে-দিন সভায় শ্রীযুক্ত অমরনাথ দত্তকে বলেন, যে, অমরনাথবাবু ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশন রদ করিবার জন্য বিল পেশ করিয়া, পরবর্তী সভায় নির্বাচিত হইবার চেষ্টা করিতেছেন।

বীরপুঙ্গব লালচাঁদ ঐ রেগুলেশনের স্থায়িত্ব সমর্থন করিয়া ও অমরনাথবাবুকে বিক্রম করিয়া পরবর্তী সভায় গবন্মেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইবার চেষ্টা অবশ্যই করিতেছেন না!

দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে ফুটবল-দলের প্রত্যাবর্তন

দে ভারতীয় ফুটবল-দল দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে ফুটবল খেলিতে গিয়াছিলেন, তাহারা নির্বিঘ্নে ও গৌরবের সহিত ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাহারা ১৬ বার খেলিয়াছিলেন, তার মধ্যে ১৫ বার জিতিয়াছিলেন। যদি তাহাদের আট বার জিত ও আট বার হার হইত, তাহা হইলে হয়ত আরও সমস্যার বিষয় হইত: কারণ তাহারা দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের সঙ্গেই খেলিয়াছিলেন।

বিমানচালক চাওলা

পঞ্জাবী যুবক চাওলা মুদক্ষ ও সাহসী বিমানচালক। তিনি একা এরেপ্লেনে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইয়াছেন। ডাক্তার মুঞ্জের উদ্যোগে তাহার এই কার্যের জন্য অর্থ সংগৃহীত হয়। কোন এক জন ইংরেজ যুবক ভারতে একরূপ কাজে প্রবৃত্ত হইলে তাহাকে বিদায় দিবার জন্য ভারতপ্রবাসী ইংরেজরা দল বাঁধিয়া উপস্থিত হইতেন। কিন্তু পঞ্জাবী যুবকটি যখন দিল্লী হইতে রওনা হন, তখন সরকারী বিমান-বিভাগের কোন ইংরেজ বা অন্য কোন ইংরেজ তাহাকে বিদায় দিতে আসেন নাই।

গবন্মেণ্ট যে-সব জাতির লোককে সমরদক্ষ বলিয়া অভিহিত করেন, চাওলা তাহা নহেন—পঞ্জাবী-মুসলমান, শিখ, জাট, রাজপুত, ডোগরা, কিছুই নহেন। অথচ তিনি অসাধারণ সাহসের কাজ আগেও করিয়াছিলেন, আবার করিতেছেন। ইহা বিদ্মাত্ৰও আশ্চর্যের বিষয় নহে। বাঙালীকে ত তাঁর বলিয়া অবজ্ঞা করিবার ভাণ ইংরেজরা করেন। কিন্তু মনে মনে কি ভাবেন?

মেদিনীপুরে সিপাহী প্রভৃতির বিরুদ্ধে অভিযোগ

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র মিত্র ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় মেদিনীপুর জেলায় মোতামেন কতকগুলি সিপাহীর বিরুদ্ধে

এবং তথাকার অত্র কোন কোন সরকারী লোকের বিরুদ্ধে কতকগুলি গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করেন এবং তাহার সমর্থক চিঠিপত্রও পড়েন। তাহার কয়েক মাস পরে ঐ সভায় সরকারপক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, যে, অনুসন্ধান করিয়া দেখা হইয়াছে, যে, সমস্ত অভিযোগই মিথ্যা। ইহাতে আমরা একটুও বিস্মিত হই নাই। যদি কাহারও বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আসে, এবং তাহাকে বা তাহার ব্যবহারের জন্ত দায়ী তাহার উপর-ওয়ালাকে গোপনে জিজ্ঞাসা করা হয়, “কথাটা কি সত্যি?” তাহা হইলে যদি কেহ আশা করেন, যে, উত্তর হইবে, “হ্যাঁ হজুর, সম্পূর্ণ সত্য”, তাহা হইলে তাঁহার বুদ্ধির তারিফ অবশ্যই করিতে হয়। অনুসন্ধানের ফল সর্বসাধারণ বিশ্বাস স্থাপন করে ইহা যদি গবর্নেন্ট চান, তাহা হইলে অনুসন্ধান প্রকাশ্য হওয়া উচিত এবং অভিযোগকারীদের ও সর্বসাধারণের পক্ষ হইতে সাক্ষী ও উকীল-ব্যারিষ্টার উপস্থিত করিবার সুযোগ দেওয়া উচিত—যেমন হিজলীর তদন্তে হইয়াছিল।

সরকার-পক্ষ হইতে বলা হয়, যে, এক জন মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছিল বলিয়া তাহার নামে মোকদ্দমা রুদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার নামে মোকদ্দমাটাই যে হাকিমের বিচারে মিথ্যা ধর্যা হইয়াছে, সে-কথাটা ব্যবস্থাপক সভায় সরকারপক্ষ হইতে এখনও বলিতে রাকী আছে।

“সরকারী কর্মচারীরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

বাধান না”

স্বরাষ্ট্রসচিব সম্প্রতি এক দিন ব্যবস্থাপক সভায় তর্ক-বিতর্কের সময় উক্তজন্যের সহিত বলেন, “সরকারী কর্মচারীরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধান, ইহা একটা হুবৃত্ততা-প্রসূত ও বিদ্বৈজাত মিথ্যা কথা। স্বরাষ্ট্রসচিব বুধা উয়ার অপব্যয় করিয়াছেন। ইহা কেহই বলে না, যে, সরকারী কর্মচারীরা, অর্থাৎ তাহারা সবাই বা সমষ্টিগত ভাবে এইরূপ হুমুশ্য করে। কিন্তু ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে এইরূপ একটা ধারণা আছে, যে, কোন কোন সরকারী কর্মচারী ইহা করে, এবং কোন

কোন বেপরোয়া ভারতীয় লোক স্থলবিশেষে ও সময়-বিশেষে তাহা বলিয়াছেনও। যেমন স্বর্গীয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত চট্টগ্রামে হিন্দুদের উপর আক্রমণ ও তাহাদের বরবাড়ি লুটের পর এ-কথা প্রকাশে পুনঃপুনঃ বলিয়া-ছিলেন। তাঁহাকে তাহার জন্ত ফৌজদারী সোপান করা হয় নাই। সুতরাং তাঁহার কথার অসত্যতা বা সত্যতা প্রকাশ্যভাবে প্রমাণিত হয় নাই। চট্টগ্রামের হাজামার সরকারী তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ করা হউক, জনসাধারণের পক্ষ হইতে এরূপ দাবি পুনঃপুনঃ করা হয়। কিন্তু রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নাই, বিলম্বে সংক্ষেপে তাহার একটা ফিকে আভাস মাত্র দেওয়া হইয়াছিল। ঢাকার হাজামা সম্বন্ধে কোন গোপনীয় রিপোর্ট থাকিলে তাহাও দ্রষ্টব্য। ঢাকা ও চট্টগ্রাম উভয় স্থানের ব্যাপারের উল্লেখ ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাষ্ট্রসচিবের বক্তৃতা উপলক্ষে করা হইয়াছিল।

সুনামগঞ্জের কয়েকটি ছাত্রের দুঃখ

সুনামগঞ্জের কয়েকটি ছাত্র ইস্থলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করায় নানা দুঃখ পায়। যাহা হউক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদের নিকট হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফী গ্রহণ করেন এবং তাহাদিগকে পরীক্ষা দিতে দেন। কিন্তু তাহাদের পরীক্ষার ফল প্রকাশ করিতেছেন না। কাগজে দেখিলাম, আসাম-গবর্নেন্ট স্বীয় শিক্ষামন্ত্রীর মারফৎ বাধা দিতেছেন। এই শিক্ষামন্ত্রী এক সময়ে বিলাফতী ও অসহযোগী ছিলেন। তাহাতেও তিনি যে মন্ত্রী হইতে পারিয়াছেন, তাহা বিশ্বয়ের বিষয় নহে। কারণ, জেল খাটিয়াছেন এরূপ লোকও মন্ত্রী হইয়াছেন। যাহা হউক, ছাত্রগুলির সম্বন্ধে বক্তব্য এই, যে, জাতীয় পতাকা উত্তোলন হাইকোর্টের মতে দণ্ডনীয় অপরাধ নহে, এবং যদি তাহা হয়ও, তাহা হইলেও যখন জেলের বিনা বিচারে রাজবন্দী অনেককে বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা দিতে দিয়াছেন এবং তাহাদের পরীক্ষার ফলও বাহির করিয়াছেন, তখন সুনামগঞ্জের ছাত্রগুলির ফলও বাহির করুন।

সুবিখ্যাত স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার। তিনি পিতার অনেক গুণ পাইয়াছেন। সাহস ও দৃঢ়তা পান নাই বলিয়া শুনি নাই। তাঁহার পিতার সাহস ও দৃঢ়তার খ্যাতি শ্রুর ব্যামফীল্ড ফুলারের পদত্যাগের কারণীভূত হইয়াছিল। বঙ্গ-বিভাগের পর একটি সরকারী হুকুম জারি হয়, যে, ছাত্রেরা বয়কট প্রচেষ্টায় যোগ দিতে পারিবে না, এবং কোন ইন্সকুল এই নিষেধ অমান্য করিলে ঐ ইন্সকুলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কচ্যুত করিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হইবে। ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পূর্ববঙ্গ গবর্নেন্ট ঐ-নিষেধ-অমান্যকারী ছুটি ইন্সকুলকে ঐ প্রকারে দণ্ডিত করিতে বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেন। এই অবস্থায় ভারত-গবর্নেন্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ রক্ষা করিতে জেদের সহিত কিছু না-বলিতে পূর্ববঙ্গ গবর্নেন্টকে লেখেন। মিঃ বাকান (Mr. Buchan) লিখিত “লর্ড মিণ্টো” নামক গ্রন্থের ২৩৮ পৃষ্ঠায় আছে :—

“Now, at that moment such action would have been dangerous, for Lord Curzon's University Act was not yet in full working order, Calcutta University was in process of reorganization, and if the disaffiliation request had been pressed forthwith, it might have been refused, with the most awkward consequences. Accordingly, the Home Department of the Government of India suggested semi-officially to the Lieutenant-Governor the advisability of withdrawing the request on the ground that 'the political objections to pressing the application to the Syndicate outweigh the educational advantages which might be supposed to attach to a withdrawal of recognition from the schools.'”

ইহার মুনশিয়ানাটুকু রক্ষা করিয়া বাংলা অনুবাদ করা সহজ নহে বলিয়া সে চেষ্টা করিলাম না। কিন্তু ইন্সকুল দুটিকে ডিস্যাফিলিয়েট করিতেই হইবে, পূর্ববঙ্গ গবর্নেন্ট এরূপ জেদ করিলে সে অনুরোধ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রক্ষা না-করিতেও পারে, ভারত-গবর্নেন্ট কেন এমন মনে করিলেন, পাঠকেরা তাহা অনুমান করুন। সব কথা ইতিহাসে খুলিয়া লেখা থাকে না। এরূপ মনে করিবার কারণ, ভারত-গবর্নেন্ট শ্রুর আশুতোষকে চিনিতেন।

এই বৃত্তান্ত মেজর বি ডি বহু প্রণীত ‘ইণ্ডিয়া আণ্ডার দি ব্রিটিশ ক্রাউন’ গ্রন্থের ৪২২-৪২৩ পৃষ্ঠা হইতে সঙ্কলিত।

আমরা শ্যামাপ্রসাদ বাবুকে এমন কিছু করার কথা মোটেই বলিতেছি না, যাহাতে আসামের মন্ত্রী বা গবর্নর ইত্তফা দেন! দেশকালপাত্র এখন ঠিক তাহার মত নয়। আমরা কেবল বেচারী ছাত্রগুলির প্রতি সুবিচার চাহিতেছি।

শ্রীমতী কমলা নেহরুর কঠিন পীড়া

শ্রীমতী কমলা নেহরুর কঠিন পীড়া জনসাধারণের উদ্বেগের কারণ হইয়াছে। তাঁহার জন্ম উদ্বেগ, তিনি পণ্ডিত জওআহরলাল নেহরুর পত্নী, কেবল এইজন্য নহে; পরন্তু এইজন্যও বটে, যে, তিনি তাঁহার স্বামীর সহঃশ্রমিকরূপে তাঁহার জীবনের ব্রতকে নিজের জীবনেরও ব্রত রূপে গ্রহণ করিয়া অদমা উৎসাহে অক্লান্তভাবে তদনুযায়ী কাজ সাহসের সহিত করিয়া আসিতেছেন। অথচ তিনি অনেক বৎসর হইতে অসুস্থ। ১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন আমি লীগ অব নেশশ্বের নিমন্ত্রণে জেনিভায় ছিলাম, তখন পণ্ডিত জওআহরলাল তাঁহার পত্নীর চিকিৎসার্থে সেখানে ছিলেন। তাঁহারা একটি কু্যাটে ছিলেন, সঙ্গে ভগিনী কৃষ্ণা ও কন্যা ইন্দিরা ছিলেন। যে-দিন নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহাদের বাসায় যাই, সে-দিন শ্রীমতী কমলাকে ভাল দেখিয়াছিলাম, কিন্তু যে-দিন আমি হোটেলের তাঁহাদিগকে জলযোগের নিমন্ত্রণ করিলাম, সেদিন কেবল পণ্ডিতজী ও তাঁহার ভগিনী শ্রীমতী কৃষ্ণা আসিলেন, শ্রীমতী কমলা অসুস্থ ছিলেন। এই রূপ অনেক বৎসর ধরিয়া তিনি কখনও কিছু ভাল, কখনও বা বিশেষ অসুস্থ আছেন। তিনি শীঘ্র নিরাময় হইলে এবং পণ্ডিত জওআহরলালকে গবর্নেন্ট বিনা সর্তে মুক্তি দিলে সন্তোষের বিষয় হইবে। এখন কেবল শ্রীমতী কমলার পীড়ার জন্ম কয়েক দিনের নিমিত্ত পণ্ডিতজীকে ছুটি দেওয়া হইয়াছে।

মোদক জাতির সেন্সস নাই

বঙ্গীয় মোদক জাতির লোকসংখ্যা ১৯২১ সালে ১,২১,৫০৪ ছিল। ১৯৩১ সালের সেন্সসে তাঁহাদের সংখ্যা দেওয়া হয় নাই, যেমন সুবর্ণবণিকদেরও দেওয়া হয় নাই। বলা হইয়াছে, যে, যে-সব জাতির লোকসংখ্যা ১৯২১ সালে বঙ্গের মোট অবিবাসীসংখ্যার অনূন হাজারকরা ৪ ছিল, তাহাদেরই সংখ্যা রিপোর্টের জন্ম গণিত ও মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু রাজপুত্র ও মালি এবং “অবনত” শ্রেণীর লোকদের বেলায় ইহার ব্যতিক্রম করা হইয়াছে। কেন? বঙ্গের অবনত শ্রেণী-সকলের লোকসংখ্যা হইতে যাহাতে এক জনও বাদ না পড়ে তাহা করিয়া ব্যবস্থাপক সভার আসনসমূহে অবনত জাতিদের দাবি যথাসম্ভব কম দেখাইবার জন্ম?

মোদক জাতির “অগ্রদূত” নামক একটি ছোট কাগজ হাতে পড়ায় এই-সব কথা মনে পড়িল। তাঁহারা নিজের জাতির উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, ইহা ভাল। কিন্তু সমুদয় বাঙালীসমষ্টি ও ভারতীয়সমষ্টির হিতকর প্রচেষ্টাসমূহেও তাঁহাদের যোগ থাকা বাঞ্ছনীয় এবং সম্ভবতঃ আছেও।

নূতন সেন্সস রিপোর্টে তাঁহাদের সংখ্যা দেওয়া না থাকিলেও তাঁহারা যে আছেন, তাহা ত প্রত্যক্ষ দেখিতেছি ; এবং সন্দেশ রসগোল্লা খাইবার সময় কোন বাঙালী তাহা ভুলিতে পারিবে না। কিন্তু সেন্সসের কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁহাদের জানিয়া লওয়া উচিত, যে, এখন তাঁহাদের সংখ্যা কত। তাহা হইলে তাঁহারা বৃদ্ধিতে পারিবেন, যে, তাঁহারা বাড়িতেছেন, কমিতেছেন, না আগেকার সমান আছেন। ১৯২১ সালের সেন্সসে লেখা হইয়াছিল, যে, তাঁহারা ১৯১১র চেয়ে শতকরা ৩.৮ এবং ১৯০১ এর চেয়ে শতকরা ৫.১ কমিয়াছেন। হ্রাসের কারণ দুটি বলা হইয়াছে। (১) অধিকাংশ মোদক পশ্চিম-বঙ্গে থাকেন, যাহার লোকসংখ্যা ১৯১১-১৯২১ দশকে কমিয়াছিল; (২) অনেক মোদক হয়ত আপনাদের কার্যস্থ বঙ্গিয়া পরিচয় লিখাইয়াছেন, কারণ তাঁহারা “কার্যস্থ কুরী” নাম দাবি করেন। ইহা সেন্সস রিপোর্টের কথা, আমাদের নয়।

যাহা হউক, এখনও যদি হ্রাস চলিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিকার-চেষ্টা মোদক-নেতাদের করা কর্তব্য।

মোদকেরা অন্ত সব জাতির মত সব রকম বৃত্তি অবলম্বন করিতে অবশ্যই অধিকারী, তাহা অনেকে করিতেছেনও। কিন্তু তাঁহাদের কৌলিক বৃত্তি লাভজনক এবং বিন্দুমাত্রও হেয় বা স্বর্ণা-উৎপাদক নহে। অতএব, তাহাতেও লাগিয়া থাকা এবং তাহার উন্নতি করা আবশ্যিক। বাঙালীকে যেন বিদেশী লঞ্জেঞ্জস, ললিপপ, টফি, চকলেট ও কেকের উপর নির্ভর করিতে না-হয়। বরং উদ্যোগী হইয়া বাঙালী মোদকেরা দেশী মিষ্ট দ্রব্য যেমন প্রস্তুত করেন, তেমনি বিদেশী লঞ্জেঞ্জস প্রভৃতিও প্রস্তুত করিয়া তাহাও বিক্রী করিতে থাকুন।

করাচীর হরিজনদের বাসগৃহ ও সমবায়-সমিতি

করাচীর মেয়র শ্রীযুক্ত জমশেদ মেহতা এক জন শ্রেষ্ঠ আদর্শবান ও কর্মিষ্ঠ পুরুষ। তিনি শহরটির সাধারণ পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্যকরতায় দৃষ্টি ত দেনই, হরিজনদের থাকিবার জন্য যে ২৫০ গৃহ নিৰ্মাণ করিয়াছেন ও আরও ৭৫০ করাইবেন এবং তাহাদেরই দ্বারা চালিত বে-সব সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা অন্ত সব শহরের অনুকরণযোগ্য, কলিকাতার অনুকরণযোগ্য। কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সব সদস্য ও কর্মীরা করাচী দেখিয়া আশ্চর্য।

বিলাতের বার্মিংহাম শহরের যে মুন্সের বার্ষিক বৃত্তান্ত-পুস্তক পাইয়াছি, তাহা দেখিয়া বার্মিংহামের সব কাজ প্রত্যক্ষ করিতে ও অপরকে তাহা করিতে বলিতেও ইচ্ছা

হইয়াছিল। কিন্তু ঐ বিলাতী শহর বহু দূরবর্তী এবং প্রভূতধনশালী। তাই শুধু দেশী করাচীর কথাই বলিলাম।

দেওলী কাহাদের ভোটে কায়েম হইল

ঘে-আইনের জোরে বাংলা-গবর্নেন্ট বরাবর বিনা বিচারে বন্দী বাঙালীদিগকে বঙ্গের বাহিরে দেওলী বা অন্ত কোথাও নির্বাসিত করিতে পারিবেন, তাহা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সদস্যের ভোটে স্থায়ী হইয়াছে বটে, কিন্তু এই অধিকাংশের মধ্যে নির্বাসিত সদস্যদের অধিকাংশ ছিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে ৩৪ জন বিলটার বিরুদ্ধে ভোট দেন, কেবল ১০ জন, যাহারা প্রায় সবাই গবর্নেন্টের পক্ষে ভোট দিতে অভ্যস্ত, বিলটার পক্ষে ভোট দেন। সুতরাং সরকার বাহাজুর এই দাবি করিতে পারেন না, যে, বিলটা নির্বাসিত অধিকাংশ সদস্যদের ভোটে আইনে পরিণত হইয়াছে। এমন কি, যে মুসলমান সম্প্রদায়কে হাতে রাখিবার জন্য গবর্নেন্ট ক্রমাগত অনুগ্রহ-বৃষ্টি করিতেছেন, তাহার প্রতিনিধিদের মধ্যে সাত জন গবর্নেন্টের বিপক্ষে এবং কেবল চারি জন সপক্ষে ভোট দেন।

যাহারা বিলটার বিপক্ষে ভোট দিয়াছেন, তাহাদের কর্তব্য কিন্তু ঐখানেই শেষ হয় নাই। স্বরাজ্যলাভের জন্য প্রবল অহিংস-প্রচেষ্টা দমন করিয়া সরকার পরোক্ষ ভাবে ও অনভিপ্রেত রূপে হিংস্র প্রচেষ্টার আয়ু বাড়াইয়াছেন। অতএব স্বরাজ্যলাভ প্রচেষ্টা আবার জোরের সহিত চালাইতে হইবে। সঙ্গাসনবাদের বিরুদ্ধে ইহা একটি শ্রেষ্ঠ দ্রব্য।

ইম্পীরিয়্যাল কেমিক্যাল কোম্পানী

ভারতবর্ষে খনিজ ও অন্যান্য দ্রব্যের সাহায্যে রাসায়নিক নানা পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ধনশালী হইবার জন্য একটি খুব বড় কোম্পানী ইংরেজরা গঠন করিয়াছেন। ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড রেডিং তাহার চেয়ারম্যান। ইহা গোপনে গোপনে স্থাপিত হইয়াছে। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উড়িয়ার অন্ততম প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত ভবানন্দ দাস প্রথম খবরটা পান ও প্রকাশ করেন। পরে ব্যবস্থাপক সভায় এ-বিষয়ে প্রশ্নোত্তর ও কথা-কাটাকাটিও হইয়াছে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। স্বরাজ্য না-থাকায় ভারতীয়েরা ভারতের ধন অন্নের দ্বারা অধিকৃত হওয়ার বাধা দিতে পারে না। ভারতীয় মূলধনে ভারতীয়দের কর্তৃত্বে ও ভারতীয় শ্রমে উৎপন্ন জিনিষের সাহায্যেই যথাসাধ্য জীবন যাপন করিব, এইরূপ ভারতীয় জিনিষের প্রতিদ্বন্দী বিদেশী কিনিব না—এই প্রকার প্রতিজ্ঞা ভারতীয়েরা করিয়া তাহা রক্ষা করিলে, কেবল তাহার দ্বারাই কতকটা প্রতিকার বর্তমান অবস্থায় হইতে পারে।

সরকারপক্ষ হইতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বলা হইয়াছে, যে, এ-পর্যন্ত যদিও এ কোম্পানীতে কোন ভারতীয়ের অংশ নাই, কিন্তু ভারতীয়দের ইহার অংশ কিনিতে বাধা নাই। সুতরাং “পিত্তিরক্ষা”-নীতি অনুসারে ইহার সামান্য কিছু অংশ ভারতীয়দিগকে কিনিতে দেওয়া হইতেও পারে। ইহা ভারতবর্ষে রেজিষ্টরী হইয়াছে, এবং হয়ত এক জন পোষ-মানা ভারতীয় ডিরেক্টরও রাখা হইবে। কিন্তু ইহা প্রকৃত ভারতীয় কোম্পানী কোন প্রকারেই হইবে না। ভারতীয় রাসায়নিকগণ সব রকম রাসায়নিক দ্রব্য ভারতে প্রস্তুত করিতে যদিও সমর্থ, তথাপি এই কোম্পানীর মারফৎ প্রভূত ভারতীয় ধন বিদেশে চলিয়া যাইবে। শুধু তাই নয়। এই কোম্পানী ভারতীয় রাসায়নিক কোম্পানীগুলির লোপ-প্রাপ্তির কারণও হইতে পারে।

পঞ্জাবে আপাততঃ ইহার কাজ আরম্ভ হইবে। ঝিলাম জেলায় লবণ ও চূণ ভূগর্ভ হইতে উত্তোলনের একচেটিয়া অধিকার ইহাকে পঞ্চাশ বৎসরের জন্য দেওয়া হইবে, এইরূপ কথা হইয়াছে। ভারত-গবর্নেন্ট জাতীয় গবর্নেন্ট হইলে ভারতের কোথায় কি প্রাকৃতিক পদার্থ হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দেশ সমৃদ্ধ হইতে পারে, তাহার খবর সর্বসাধারণকে স্বভাবতই আগে দিতেঃ এবং দেশী লোকদের দ্বারা এই কাজ করাইবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু এমন কোন আইন নাই যাহা বর্তমান গবর্নেন্টকে দেশের লোককে এরূপ সুবিধা দিতে বাধা করিতে পারে। কিন্তু লাট বড়লাট ও অন্যান্য রাজপুরুষেরা তাঁহাদের কর্মসূত্রে অনেক খবর পান, এবং সুযোগ, প্রভাব ও ক্ষমতা থাকায় অনেক খবর সংগ্রহও করিতে পারেন। তাহা পরে কাজে লাগান, যেমন লর্ড রেডিং লাগাইতেছেন। লর্ড কার্জন যে বলিয়াছিলেন, গ্যাডমিনিষ্ট্রেশান ও এক্সপ্লয়টেশ্যান একই জিনিষের দুটা দিক, তাহা তিনি যে-অর্থেই বলিয়া থাকুন, তাহা লর্ড রেডিঙের বেলায় সহজ অর্থেই কিছু বিলম্ব মত বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে।

হিঙেনবর্গ

হিঙেনবর্গের মৃত্যুতে জার্মানীর প্রসিদ্ধতম এক জন যোদ্ধা ও রাজনীতিজ্ঞের তিরোভাব হইল। তাহাতে জার্মানীর কি পরিমাণ ক্ষতি কোন দিকে হইল তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। তিনি বাঁচিয়া থাকিতেও হিটলারই মর্কেসর্কা ছিলেন।

নারীর উপর অত্যাচার বৃদ্ধি

১৯৩২-৩৩ সালের বঙ্গীয় সরকারী শাসন-রিপোর্টে দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছিল, যে, নারীদের উপর অত্যাচার-মূলক অপরাধ বাড়িতেছে না, যদিও ১৯৩২ সালের বঙ্গীয়

পুলিস রিপোর্টে তাহার বিপরীত কথা ছিল। তাহা আমরা প্রবাসীতে উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। ১৯৩৩ সালের পুলিস রিপোর্টের উপর গত ৮ই আগষ্টের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত গবর্নেন্টের রিজলুশনে বলা হইতেছে, নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ আবার বাড়িয়াছে, অর্থাৎ আগে আগেও বাড়িতেছিল।

গবর্নেন্ট বলিতেছেন, যে, এইরূপ অপরাধীদের বেত্রাঘাত দণ্ড প্রবর্তিত করা হইবে কি না, বিবেচিত হইতেছে। আমরা সাধারণতঃ বেত্রাঘাত দণ্ডের পক্ষপাতী নহি। তবে ঐ দণ্ডটা বজায় থাকিলে এই রকম অপরাধীরাই বোধ হয় তাহার ষোগ্যতম।

দলবদ্ধভাবে নারীহরণ ও ধর্ষণের জন্য ব্যবসায়িক নিরীক্ষণ, হত্যা নারীদিগকে খুঁজিয়া না-পাওয়া গেলে অপরাধীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, যাহারা হত্যা নারীকে লুকাইয়া রাখিতে সাহায্য করে, তাহাদেরও বাধাযোগ্য শাস্তি—এই সব ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

প্রতুলচন্দ্র সোম

প্রতুলচন্দ্র সোম মহাশয় বিখ্যাত লোক ছিলেন না, কিন্তু তিনি ‘ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার’ের সম্পাদকরূপে ভারতবর্ষের, বঙ্গের, ব্রাহ্মসমাজের এক জন নির্ভাবানু সেবক ছিলেন। তিনি উত্তম বাংলা ইংরেজী লিখিতে পারিতেন। দর্শনের ধর্মতাত্ত্বিক অংশের, রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্র সেনের ধর্মমত বিষয়ে এবং ব্রাহ্মসমাজের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে তাঁহার প্রশংসনীয় জ্ঞান ছিল। তিনি ভক্ত সাধক ছিলেন। বত দিন সুস্থ শরীরে সম্পাদকীয় কর্তব্য করিতে পারিয়া-ছিলেন, তত দিন চিন্তাশীলতা ও স্বাধীনচিন্তার সহিত নিজের কাজ করিয়া গিয়াছেন।

ভারতীয় সামরিক অফিসারদের ক্ষমতা

ভারতীয় সেনাদল সম্বন্ধে একটা নূতন আইন হইতেছে। তাহার একটা ধারার সংশোধনে শ্রম আবহুর রহিম এট প্রস্তাব আনিয়াছেন, যে, ঐ আইন অনুসারে যে সামরিক অফিসারেরা নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদের পদমর্যাদা ক্ষমতা অধিকার পদোন্নতি প্রভৃতি ব্রিটিশ অফিসারদের সমান হইবে। গবর্নেন্ট প্রথমতঃ এরূপ সংশোধন প্রস্তাব আসিতে পারে না বলেন, কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি বলেন, আসিতে পারে। সুতরাং উহার আলোচনা হইবে। ফল কি হয়, দেখা যাক। শ্রম আবহুর রহিমের প্রস্তাবটি খুব ভাল হইয়াছে। সভাপতিও খুব নিরপেক্ষ ন্যায়সঙ্গত মত দিয়াছেন।

লেখক-লেখিকাগণের প্রতি সম্মান অনুরোধ

১। 'প্রবাসী'তে ছাপিবার জন্য বাহারা দয়া করিয়া পত্র ও গত্র রচনা পাঠান, তাঁহারা তাহা স্পষ্ট অক্ষরে কাগজের এক পিঠে কঁক কঁক করিয়া লিখিয়া পাঠাইলে বাধিত হইব।

২। যাহা কাগজের দু-পিঠে লেখা, অত্যন্ত ঘন লেখা, যাহাতে অনেক কাটকুট আছে, বা যাহা অল্প কোন কারণে পড়া কঠিন, তাহা পঠিত ও বিবেচিত না-হইবার খুব সম্ভাবনা আছে।

৩। 'প্রবাসী' বাংলা কাগজ। বাংলা বাক্যের মধ্যে ইউরোপীয় শব্দ বা ব্যক্তি বা ভৌগোলিক নাম ইংরেজী অক্ষরে দয়া করিয়া লিখিবেন না। কোন ইউরোপীয় শব্দের প্রতিশব্দ বাংলা ভাষায় না থাকিলে তাহা বাংলা অক্ষরে লিখিয়া দিবেন। সমুদয় নাম বাংলা অক্ষরে লিখিবেন।

৪। রচনার মধ্যে বাংলা ছাড়া অল্প যে-কোন ভাষার কোন বাক্য বা বাক্যসমষ্টি উদ্ধৃত হইবে, তাহার বাংলা অনুবাদ বা তাৎপর্য দয়া করিয়া দিবেন।

৫। প্রবন্ধে তিন হাজার এবং গল্পে সাড়ে তিন হাজারের বেশী শব্দ না থাকিলে তাহা মনোনীত ও অপেক্ষাকৃত শীঘ্র প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা অধিক। রচনা আরও ছোট হইলে আরও ভাল।

৬। কোন উপস্থাপন, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদির আংশিক হস্তলিপি প্রেরিত হইলে তাহা পঠিত হয় না।

৭। কোন রচনা কখন প্রকাশিত হইবে, সে-বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া কঠিন। কেহ যদি মনে করেন তাঁহার লেখা ছাপিতে বেশী বিলম্ব হইতেছে, তাহা হইলে তিনি চিঠি লিখিলে এবং ডাকমাণ্ডল প্রেরিত হইলে তাহা অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হইবে।

৮। প্রাপ্ত সমুদয় রচনা যত্ন করিয়া রাখা হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কোন লেখা হারাইয়া গেলে আমরা দায়ী হইব না, ইহা বুঝিয়া লেখক-লেখিকাগণ রচনা পাঠাইবেন।

৯। লেখার সহিত লেখকের নাম ও ঠিকানা এবং ফেরত দিবার জন্য যথেষ্ট ডাকমাণ্ডল দেওয়া থাকিলে অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হইবে। লেখা পাঠাইবার সময় উহা রেজিষ্টারী করিয়া পাঠান উচিত। তাহা হইলে উহা আমাদের নিকট না-পৌঁছিবার সম্ভাবনা খুব কম হয়, এবং আমরা দিগকেও উহা পৌঁছা না-পৌঁছা সম্বন্ধে চিঠি লেখালেখি করিতে হয় না। ডাকমাণ্ডল দেওয়া না থাকিলে আমরা প্রবন্ধ পৌঁছা না-পৌঁছা সম্বন্ধে এরূপ পত্রব্যবহার করিতে অসমর্থ।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়,

সম্পাদক



বিহারী

শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্তী

এবং পেস, কলিকতা

প্রবাসী

“সতাম্ শিবম্ হৃদরম্”

“নারায়ণা বলহীনেন লভাঃ”

৩৪শ ভাগ
১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৪১

৬ষ্ঠ সংখ্যা

যক্ষ

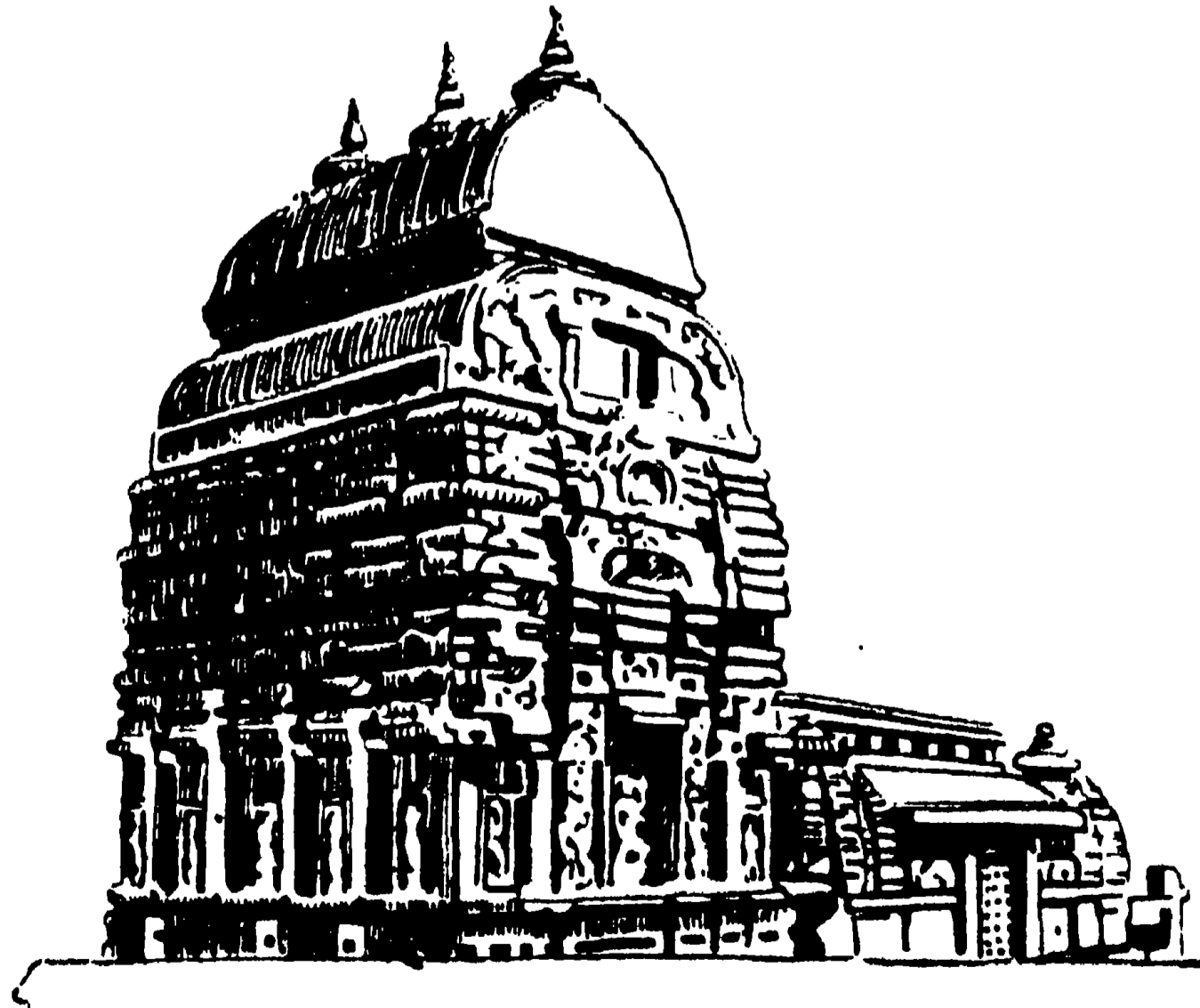
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে যক্ষ তোমার প্রেম ছিল বন্ধ কোরকের মতো,
একান্তে প্রেয়সী তব সঙ্গে যবে ছিল অনিয়ত
সঙ্কীর্ণ ঘরের কোণে, আপন বেষ্টনে তুমি যবে
রুদ্ধ রেখেছিলে তারে দু-জনের নির্জর্ন উৎসবে
সংসারের নিভৃত সীমায়, শ্রাবণের মেঘজাল
কৃপণের মতো যথা শশাঙ্কের রচে অন্তরাল,
আপনার আলিঙ্গনে আপনি হারিয়ে ফেলে তারে,
সম্পূর্ণ মহিমা তার দেখিতে পায় না একেবারে
অন্ধ মোহাবেশে। বর তুমি পেলে যবে প্রভুশাপে,
সামীপ্যের বন্ধ ছিন্ন হ'ল, বিরহের ছুখতাপে
প্রেম হ'ল পূর্ণ বিকশিত : জানিল সে আপনারে
বিশ্বধরিত্রীর মাঝে। নির্বাণে তাহার চারিধারে
সাক্ষ্য-অঘ্য করে দান বৃষ্টিজলে সিক্ত বনযুধী
গন্ধের অঞ্জলি ; নীপনিকুঞ্জের জানালো আকৃতি
রেণুভারে মছর পবন। উঠে গেল যবনিকা
আত্মবিস্মৃতির, দেখা দিল দিকে দিগন্তরে লিখা

উদার বর্ষার বাণী, যাত্রামন্ত্র বিশ্বপথিকের
 মেঘধ্বজে আঁকা, দিগ্ধ-প্রাক্ষণ হ'তে নির্ভীকের
 শূণ্যপথে অভিসার। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
 দীক্ষা পেলে অশ্রুধৌত সৌম্য বিবাদের ; নিত্য রসে
 আপনি করিলে সৃষ্টি রূপসীর অপূর্ব মুরতি
 অস্বহীন গরিমায় কাঙ্ক্ষিময়ী। এক দিন ছিল সেই সতী
 গৃহের সঙ্গিনী, তারে বসাইলে ছন্দশঙ্করবে
 অলোক-আলোকদীপ্ত অলকার অমর গৌরবে
 অনন্তের আনন্দ-মন্দিরে। প্রেম তব ছিল বাকাহীন,
 আজ সে পেয়েছে তার ভাষা, আজ তার রাত্রিদিন
 সঙ্গীত-তরঙ্গে আন্দোলিত। তুমি আজ হ'লে কবি,
 মুক্ত তব দৃষ্টিপটে উদ্বারিত নিখিলের ছবি
 শ্যামমেঘে স্নিগ্ধছায়া। বন্ধ ছাড়ি' মর্মে অধ্যাসীনা
 প্রিয়া তব ধ্যানোদ্ভবা লয়ে তার বিরহের বীণা।
 অপরূপ রূপে রচি বিচ্ছেদের উন্মুক্ত প্রাক্ষণে
 তোমার প্রেমের সৃষ্টি উৎসর্গ করিলে বিশ্বজনে ॥

দার্জিলিং

১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০



ঝাড়খণ্ডে কবীর ও চৈতন্যদেব প্রভৃতির প্রভাব

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

কবীর সারাঙ্গীবনের বাণীতে ও সাধনায় আঘাত করিয়া গিয়াছেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। সাম্প্রদায়িকতার অর্থ ধর্মের নামে দল বাধিয়া মানুষের সঙ্গে মানুষের চিরন্তন ভেদ ও বিরোধ চালাইয়া যাওয়া। ইহা ছিল কবীরের অসহ। কিন্তু মানুষের এমনই ছুরদৃষ্ট যে যখনই কোনো মহাপুরুষ এই ভেদ দূর করিতে গিয়াছেন তখনই তাঁহার নামেই পরে এত সাম্প্রদায়িকতা আরও কঠিন হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

কবীরের মৃত্যুর পর একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহার ভক্ত শিখারা আসিয়া ধরিলেন কবীরের পুত্র কমালকে। কমাল কহিলেন, আমার পিতা চিরদিন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেই গেলেন যুদ্ধ করিয়া। তাঁহার নামেই যদি সম্প্রদায় স্থাপন করি তবে তা আমার পক্ষে পিতৃহত্যাট করা হইবে। তাই কবীরের ভক্তের দল কহিলেন—“কমালই কবীরের বংশ ডুবাইল!”

ধর্মের সব সফীর্ণ দলাদলি না মানিলেও কবীর মানিতেন যে মানবচিত্তের ভাব, হৃদয় হইতে হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। চিন্তে হইতে চিন্তে ভাবের রং লাগে।

জড়জগতে দেখা যায় প্রত্যেক দ্রব্যই থাকে তাহার আপন আপন বিশেষ স্থান ছুড়িয়া। তাহার মধ্যে অন্য দ্রব্যের সীমাই হওয়া অসম্ভব। কিন্তু ভাব-জগতে দেখা যায় ইহার বিপরীত। যে-চিন্তে দত্ত বেশী ভাবের স্থান, সেখানেই তত সহজে নূতন নূতন ভাবের বটে সমাগম। তাই দাত্ত বলিয়াছেন—

রসহী মৈ রস বরষিহৈ ধারা কোটি অনন্ত।

(পরচা অংশ, ১:১০)

—রসের মধ্যেই রসের বর্ষণ হয় অনন্ত কোটি ধারায়।

প্রেম ও ভাবের ক্ষেত্রে এই কথা সত্য হইলেও অনেক সময়ে দেখা যায় জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই কথা খাটে না। জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষ দর্শনাদি সব শাস্ত্রের কঠিন প্রাচীর এমন করিয়া গড়িয়া তোলে যে সেখানে নূতন জ্ঞানের প্রবেশ প্রায় হুঃসাধ্য হইয়া উঠে। জ্ঞানের জগতেও কি জড়-

জগতের মত যেকাইয়া রাখাই বিধি? ভাব-জগতের মত সেখানে কি সহজে স্বীকার করার কোন উপায় নাই? তাই যেন বড় ছুঃখে কবীর কহিলেন—

কারী কমড়িয়া পর রঙ্গ নাহি চটে।

—কালো কব্বলের উপর আর নূতন রং ধরে না।

কথিত আছে মৃত্যুর পূর্বে কবীর কাশী ত্যাগ করিয়া মগহরে গিয়া বাস করেন। কে নাকি তাঁহাকে বলিয়াছিল, “কাশী মুক্তি-ক্ষেত্র। বাহাই কর না কেন, এখানে মরিলে মুক্তি হইবেই। তাই তুমি নির্ভয়ে ধর্মের বিরুদ্ধতা করিতেছ।” কবীর বলিলেন, “এই রূপ মুক্তি আমি বিশ্বাস করি না। আমি আমার ইচ্ছামত কোথাও গিয়া আপন সাধনায় মুক্তি অর্জন করিব।” ইহাই কবীরের মগহর-যাত্রার কারণ। কিন্তু কাশীর জ্ঞানী ও শাস্ত্রপন্থীদের বিরুদ্ধতার সঙ্গে কি ইহার কিছুই সম্পর্ক নাই?

কাশীতে জ্ঞানই প্রধান কথা হইলেও সেখানে ভাব যে একেবারে ছিল না এ-কথা অসম্ভব। তাই কাশীর চিন্তেও ক্রমেই কবীরের ভাবের রং ধরিতেছিল; যদিও পণ্ডিতেরা শাস্ত্র ও দর্শনাদির কঠিন প্রাচীর তুলিয়া সর্বভাবে সাবধান ছিলেন, যেন এই রং না লাগে।

কবীরের তিরোধানের পর কমাল যখন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিতে অসম্মত হইলেন, তখন প্রধানতঃ তাঁহার ছই শিষ্য তাঁহার ভাবকে আশ্রয় করিয়া সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিলেন। সুরত গোপাল বসিলেন কাশীতে কবীর চৌড়ায়, বর্ষদাস গেলেন ঝাড়খণ্ডে।

সুরত গোপাল কাশীতে প্রভাব যতটা বিস্তার করিলেন তাহার অপেক্ষা বেশী নিজেই প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িলেন। কাশীর কালো কব্বলের উপর নূতন রং ধরিতে চাহিল না, বরং দেখা গেল যে বড়দর্শনাদির সঙ্গে কবীর চিরদিন যুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, ক্রমে তাহারই পতাকাতে সুরত গোপালী দল আশ্রয় খুঁজিতেছে। গুরুর বাহা ছিল

নিম্নিত, অনুবর্তীগণের তাহাই হইয়া উঠিল বন্দিত ! কালো কপালের রংই বরং চাহিল ফিরিয়া লাগিতে !

যাক, ধর্মদাস এই বিপদ এড়াইলেন ঝাড়খণ্ডে গিয়া । তাই আজ দেখা যায় সুরত গোপালী সম্প্রদায়ে ভক্ত-সংখ্যা খুবই কম,—এক লক্ষের বেশী হইবে না । কিন্তু ধর্মদাসী শাখায় ভক্ত-সংখ্যা নাকি ৪০ লক্ষ ।

ধর্মদাস ছিলেন জাতিতে বাণিয়া, বাধোগড় নগরে তাঁহার বাস । তাঁহার পিতা ছিলেন এক জন মহাধনী, অষ্টাদশ লক্ষপতি । বালককাল হইতেই ধর্মদাস ধন্যপ্রাণ ও সদাচারী । যদিও তিনি পণ্ডিতদের তর্ক ও যুক্তির স্বল্প জ্ঞান ভাল করিয়া বুঝিতেন না, তবু তিনি সনাতন পথেরই পথিক ছিলেন । তিনি কবীরের প্রাণস্পর্শী সরল প্রবল বাণী শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন ও তাঁহার কাছে দীক্ষা চাহিলেন । কবীর কহিলেন, “প্রতীক্ষা কর ।” উভয়ের আবার মথুরাতে দেখা হইলে ধর্মদাস তাঁহাকে অন্তরের কয়েকটি গভীর সংশয়ের কথা বলিলেন । কবীর তাহা খণ্ডন করিলে ধর্মদাস আবার দীক্ষা চাহিলেন । তবু কবীর কহিলেন, “প্রতীক্ষা কর ।” আবার উভয়ের দেখা হইল কাশীতে এবং বাধোগড়ে ।

ধর্মদাসের স্ত্রীর নাম ছিল আমিন । তাহার ভয় ছিল সাধুর শিষ্য হইলে হয়ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আর সম্পর্ক থাকিবে না । কিন্তু তিনিও যখন দেখিলেন কবীর গৃহস্থ হইয়াই সাধনার পক্ষপাতী তখন তিনিও কবীরের উপদেশে আকৃষ্ট হইলেন । আমিনের সঙ্গে কবীরের পত্নী লোইর বিশেষ প্রীতি ও যোগ বটিয়াছিল ।

কাশীতে রহিলেন সুরত গোপাল । তাঁহার অনুবর্তীরা কাশীর অন্তান্ত সম্প্রদায়ী সাধুর মত থাকেন অবিবাহিত । গুরু তিরোধানের পর শিষ্যদের মধ্যে কেহ গুরুর গদীতে বসেন । ধর্মদাসের ধারাতে ব্যবস্থা অল্প রকম । তাঁহার ধারাতে ইহাই নিয়ম যে, গুরুকে বিবাহ করিতেই হইবে এবং তাঁহার পুত্রই পিতার আসনে বসিবেন । তাই এই গদীকে বলে “বংশ গদী ।” কবীর নাকি আশীর্বাদ করিয়াছিলেন এইভাবে বিয়াল্লিশ জন গুরু হইবার পর এই ধারার অবসান হইবে । এই মর্মে “আগম সংদেশ” একখানি গ্রন্থ ভারত-পথিক যুগলানন্দদ্বী প্রকাশও করিয়াছেন । কারণ কয়েক

বৎসর পূর্বে ইহাদের শেখ গুরু দয়ানাম সাহেব অপূর্ণক অবস্থায় মারা যান । যুগলানন্দের নাকি ইচ্ছা ছিল তিনি গুরু হন । কিন্তু বংশ-গুরু ছাড়া গুরু হয় না বলিয়া তাঁহার ইচ্ছা সকল হয় নাই । “আগম সংদেশ” গ্রন্থখানি সকলে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকারও করেন না ।

অনেকেই মনে করেন ধর্মদাসজী বাধোগড়ের এক ঐশ্বর্যাশালী বণিকের ঘরে ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দের কাচাকাছি জন্মগ্রহণ করেন, আর ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের কাচাকাছি পরলোক-গমন করেন । মৃত্যুকালে ধর্মদাস রীতিমত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন । কিওয়ারী রাজগৃহে যে বীজক আছে তাহা নাকি ১৪৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মদাসকর্তৃক লিখিত ।

বাল্যকালে ও যৌবনে ধর্মদাস দেবদ্বিজে শাস্ত্রে পুরোহিতে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন । গভীর শ্রদ্ধার সত্যক তিনি মুষ্টি শিলা প্রভৃতি পূজা করিতেন । ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতের দলে তিনি অহনিশি পরিবৃত থাকিতেন ।

ক্রমে তিনি কবীরের দেখা পাইলেন ও তাহার বাণী শুনিলেন । তাঁহার অন্তরের মধ্যে কবীরের উপদেশ এমন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল যে, তখনই তিনি কবীরের কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন । পূর্বেই বলা হইয়াছে, কবীর তিন বার তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া পরে তাহাকে দীক্ষা দিতে বাধ্য হইলেন ।

“অমরসুখনিধান” গ্রন্থে কবীর ও ধর্মদাসের কথাবাতা চমৎকার ভাবে লিখিত আছে ।

“ধর্মদাস ছিলেন রাম ও কৃষ্ণের স্মরণে নিরন্তর, তীর্থব্রজে দৃঢ়চর-মথুরায় যখন তিনি তীর্থপ্রসঙ্গে গেলেন তখন হইল তাঁহার কবীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ।”

রাম কৃষ্ণ কো স্মরিরে, তীর্থ বরত দৃঢ় চেট ।

মথুরা পরসত জব গয়ে শুে কবীর সো ভেট ।”

কবীর কহিলেন,—

ধর্মদাস তুম হৌ বড় জ্ঞানী ।
পরম ভক্ত ভক্তি মৈ জানী ॥
তুম স! ভক্ত ন দেখৌ আন! ।
ধর্ম তুম্‌হার্য করন স্থান! ।
করন দিসা সে তুম চলি আয়ে ।
জৈহৌ কহী কহী মন লায়ে ॥
কাকী ভক্তি করৌ চিত লাঈ ।
সো কিত বসৈ কোন সে ঠাঁঈ ॥
পূহত মন মে দুধ জনি মানৌ ।
করতা জাদি পুরুষ পহিচানৌ ॥

কা ভে নাল্য তিলক কে দীনে ।
কা ভে তারথ বরত কে কীনে ।
কা ভে স্ননত ভাগরত গীতা ।
চিন্তা মিটা ন মন কে জাতা ॥

জেহি কর্তা সে উপজে, সো বসে কোনে দেস ।
তাহি চিন্ত পরিচয় করে, ছোড় সকল ভ্রম ভেস ॥

“হে ধর্মদাস, তুমি মহাজ্ঞানী, তুমি পরম ভক্ত : তোমার ভক্তি আমি বুঝি। তোমার মত ভক্ত আর ত দেখি না। কিন্তু তোমার ধর্মের আশ্রয়স্থান কোথায়? কোন্ দিক হইতে তুমি আসিয়াছ চলিয়া? যাইবেই বা তুমি কোথায়? কোথায় লইয়া গেলে তোমার মন? চিত্ত দিয়া কাঁহাকে তুমি কর ভক্তি? তিনি কোথায় করেন বাস, কোথায় তাহার ঠাই?”

এই সব যে পুছলাম তাহাতে খেন মানর মধ্যে ত্রুপ করিও না, আদি পুরুষ আদি কহাকে লও চিনিয়া। তিলকমালা ধারণ করিলেই বা কি, তীর্থব্রত আচরণ করিলেই বা কি, ভাগবত গীতা শুনিলেই বা কি? মনকে জয় না করিলে চিন্তা কেন মিটিবে?

যে কর্তা হইতে উপজিলে তিনি করেন কোথায় অবস্থিতি? তাহাকে চিনিয়া তাহার সঙ্গে কর পরিচয়, ছাড়িয়া দেও সকল ভ্রম সকল ভেগ।”

শুন ধর্মদাস অচংভো ভয়উ ।
কসো বচন কাহি না কহেউ ॥

“এই কথা শুনিয়া ধর্মদাস স্তম্ভিত হইয়া গেলেন : এমন কথা আর কেহই ত কহেন নাই।”

ধর্মদাস কহিলেন,—

পারব্রহ্ম সেরেই চিত্ত লাভ
সীতা রাম জপেই সুখ দাষ্ট ।
বিরথা বচন ন শুনোই না কহেউ ।
প্রেম ভক্তি মে নিস দিন রহেউ ।
মোরে সংকা কিছু নাহি, সেরেই শি রঘুনাথ ।
ক্রপহলাদ জিন উপারিয়া সো হরি মেরে সাথ ॥

“চিত্ত একাধ করিয়া পরব্রহ্মের করি সেবা, পরব্রহ্ম সাতারানের নামই করি জপ। বৃথা বচন আসি ন শুনি ন বলি, প্রেমভক্তির মধ্যে নিশিদিন করি বাস।

আমার ত কোন শঙ্কা নাহি : শায়ঘনাথকে করি সেবা। ক্রপ প্রসাদকে যিনি করিলেন উদ্ধার, সেই হরি আমার সাথ সাথে।”

কবীর কহিলেন,

ধর্মদাস স্তম্ভ বচন তমার ।
তুম জনি হোহ কাল কে চার ।
কাহে ন সুরতি করে শট মাহ ।
চীনহ চানহ, বড়ো ভর মাহ ।

“হে ধর্মদাস, বচন আমার শোনো, তুমি যেন কখনও কালের কবলিত না হও; অন্তরের মধ্যেই কেন না প্রেম কর? (সার সত্য) চিনিয়া লও, চিনিয়া লও; ভবসাগরে যে ডুবিতে বসিয়াছ!”

কবীর আবার কহিলেন,—

জ্ঞান দৃষ্টি সে চিহুউ বাণী ।
পাখণ্ডে পাইন পাখণ্ড পানী ॥
করতা পাখণ্ড কবহ ন হোয় ।
যহ সংসয়সব দুর্গ বিগায় ॥

“জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা বাণী (সার সত্য) লও চিনিয়া। এই যে পূজা কর পাখণ্ড তাহা বুঠা। পূজা কর যে তার্থের জল তাহা ঝুঠা। কহ কি কখনও ঝুঠা হইতে পারেন? এই ঘোঁকায়েই সকল তনিয়া দিল সব গৌয়াইয়া।”

ধর্মদাস এই সব শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন—
ধর্মদাস মসৃটি রহে ।

“আবশ্য সেই মহাপুরুষের কথার কোনো উত্তর ধর্মদাস দিলেন না।”
জিহদ উত্তর নহি দানহ ।

তুপে ধর্মদাস আহার নিদ্রা ভাগ করিলেন। তখন কবীর প্রবর্তিয়া কহিলেন—

হরি না মিলে অন্নকে ছাড়ে ।
হরি না মিলে ভগরহা মাড়ে ।
হরি না মিলে ঘরবার তিয়াগে ।
হরি না মিলে নিশ বাসর জাগে ॥

“অন্ন ছাড়িলেই কিছু হরি মেলে না, কোনো একটা বিশেষ পদ্য গ্রাহ্য করিয়া চলিলেই হরি মেলে না, ঘর-ভরার ত্যাগ করিলেই হরি মেলে না, নিশি-বাসর জাগিলেই হরি মেলে না।”

দয় ধরম জই বসে সরীরা ।
তই খোজিলে কই কবীর ।

“সেখানে মানবের মধ্যে দয় ধরম বাস করে সেখানে কর গেজ। হে কথাই কতন কবীর।”

ধর্মদাস সেখানে সকল সম্প্রদায়ের সাধুদের নিমন্ত্রণ করিয়া মহোৎসব করিলেন। মন তৃপ্ত হইল না। কাশী আসিয়া পণ্ডিত জ্ঞানী সকলের কাছে আশ্রয় খুঁজিলেন। কোথাও যেন আশ্রয় মিলিল না। তখন আবার কাশীতে কবীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। দেখিলেন অতলম্পর্শ কবীরের উপদেশবাণী। কেহই তাহার তল পায় না।—

পাও কবার কা কোই নহি পায়ে ।

ধর্মদাস মনে মনে কহিলেন, “প্রথম ত ইহাকে মথুরাতেই দেখিয়াছিলাম, তখন ত অনেক তর্কই করিয়াছিলাম। বাহা উনি বলিয়াছেন সবই ত সত্য সত্য উপদেশ, তাহাতেই ত মন আমার ইনি লইলেন হরিয়া।”

পিরথম মোহি মথুরা মিলে বড় বাদ হম কীনহ ।

সাঁচ সাঁচ সব উন কহা মন হমার হর লীনহ ॥

ধর্মদাস ও কবীরের মধ্যে এই সব আলাপ চমৎকার। “অমরুথনিধানে” তাহা সবিস্তারে বর্ণিত আছে।

কবীরের সঙ্গে ধর্মদাসের সাক্ষাতে যে পরমানন্দ তাহা ধর্মদাসের নিজের ভাবাতেই দেখা বাউক—

আজ মেরে সতসুর আয়ে মিহমান ।

তন মন জিরর করেই কুরবান ॥ (বিরহ এন অংগ)

“আজ সদসুর আসিয়াছেন অতিথি। তন মন জাবন আজ করিলাম উৎসর্গ।”

আজ ঘড়া আনংধকা

সদসুর আয়ে মোর ধাম হো ।

দিয়ে দরসন মন লুভায়ো

কুপ্তো বচন অমোল হো ।

অটল পংখ কবীর দান্দ্য

ধর্মদাস লথায় হো ।

(সদগুর মহিমা অংগ)

“আজ আমার মন্দিরে সদগুরু আসিয়াছেন, আজ আনন্দের মুহূর্ত উপস্থিত । দয়শন দিয়া তিনি মন মুগ্ধ করিলেন, অমূল্য বচন আজ অনিলাম । অটল পংখ দিয়াছেন কবার ধর্মদাসকে দেখাইয়া ।”

হংস উবারন সদগুর

জগ মে আউয়া ।

প্রগট ভয়ে কাসা মে

দাস কহাইয়া ।

বাম্হন ঔ সন্মাসী

গো ঠাসী কান্দিয়া ।

কাসী মগহর আয়ে

কোঈ নশ্টি চান্দিয়া ।

হিংত তরক প্রবোধি কে

পংখ চলাউয়া ।

(সদগুর মহিমা অংগ)

‘জীব-উদ্ধারণ সদগুরু আসিলেন জগতে, প্রকট হইলেন কাশীতে, আপনাকে কহাইলেন দাস । ব্রাহ্মণ আর সন্মাসীর দল তে! করিল উপহাস ! কাশী হইতে তিনি চলিয়া আসিলেন মগহরে, তবু কেহই চিনিল না তাঁহাকে । হিন্দু মুসলমান উভয়কে প্রবুদ্ধ করিয়া চালাইলেন তিনি পথ ।’

রাহ চলত মোহি মিলি গয়ে সতগুর

সো স্তথ বরনি ন জাঈ ।

“পংখ চলিতে চলিতে আমার মিলিয়া গেলেন সদগুরু, অবগনায় সে আনন্দ ।”

গুরু মোহি সজোরন মুর দস্ত ।

দিন দিন ওগুণ ছুটন লাগে

বাচন লাগী প্রতি নষ্ট ।

“গুরু আমায় দিলেন সঞ্জীবনের মূল । এখন দিন দিন অবগুণ আমার লাগিল ছুটতে, নব নব প্রতি চলিল বাড়িয়া ।”

অষ্টাদশ লক্ষ মুদ্রার অধিপতি ধর্মদাস । এই প্রার্থ্যা এক মহা বাধা । প্রেমের নবজীবন যখন পাইলেন তখন তাহার পরিচয়-স্বরূপে ধর্মদাস তাঁহার সমস্ত ধনদৌলত নানা সংকার্যে ব্যয় করিয়া তাঁহার নুতন জন্মকে স্বীকার করিয়া লইলেন । পূর্ব কায়া ত্যাগ না করিলে নুতন কায়া গ্রহণ করা যে কঠিন ।

কায় তজে বিন কায় ন হোয় ।

ধর্মদাস স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়া ধর্মসাধনা করিতে যখন চাহিলেন তখন কবীর কহিলেন, “যে ধন পাইয়াছ তাহাতে কেন ইহাদের বঞ্চিত কর ?” তাই ধর্মদাস ভক্তিমতী পত্নী আমিন ও পুত্রদের লইয়া ধর্মসাধনায় বসিলেন । তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র চূড়ামণি দাস পরে এক জন উচ্চ অঙ্গের সাধক হন ।

কাশীর কালো কন্মলে যে নবজীবনের রং ধরিবে না ইহা ধর্মদাস ভালই বুঝিলেন ; তাই তিনি এমন কোন একটি

সহজ দেশের কথা ভাবিলেন যেখ নে মানুষ কোন মিথ্যা ধর্ম আচারের ভারে নষ্ট হইয়া যায় নাই । এমন দেশ মিলিবে কোথায় ? ভারতের উত্তরে এক রকমের ধর্মসাধনা, দক্ষিণে আর এক রকমের ধর্মসাধনা । মাঝখানে বিরাট এক অরণ্যভূমি, ইহাই ঝাড়খণ্ড । এখানে মানুষ কোন প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠানাদির দ্বারা ভারগ্রস্ত নহে । তাই ধর্মদাস বিলাসপুরের পশ্চিমে সাতপুরা পর্বতের পাদমূলে একটি সাধনা-স্থান পছন্দ করিয়া লইলেন । সেখানকার রাজা ছিলেন গোণ্ড-জাতীয় । এখন তাঁহার রাজ্যকেই বলে “কবরধা” অর্থাৎ কবীরধাম । কবীরের সাধনা হইতেই সেই রাজ্যের আজ পরিচয় । কবরধা এখন এই রাজ্যের রাজধানী । বেঙ্গল নাগপুর রেলের তিলদা স্টেশন হইতে ইহা ৫৪ মাইল দূরে ।

এখানকার লোকেরা ছিল নিষ্কপট সত্যপরায়ণ । ধর্মের কোনো ভণ্ডামী তাহারা জানিত না । তাহারা মাংসাহারী হইলেও পশুপক্ষীদের প্রতি দয়াপরায়ণ । মোট কথা, তাহারা সহজ মানুষ । তাই ধর্মদাসও এখানে আসিয়া কবীরের উপদিষ্ট সহজ ভাবে জীবন যাপন করিয়া সাধনা করিতে লাগিলেন । তাই তাঁহার পরে সকল গুরুই বিবাহ করিয়া গৃহী হইয়াছেন । তখনই না-কি কবীরের আশীর্বাদ হইয়াছিল তাঁহার এই বংশে বিয়াল্লিশ জন “বংশগুরু” হইবেন । বাণিয়া হইলেও এই গুরুরা অজ্ঞাত বর্ণে বিবাহ করেন ।

ধর্মদাসী শাখাতে ব্রাহ্মণ ভগতও আছেন । তাহারা গুরুর সঙ্গে আপন কল্যার বিবাহ দিতে পারিলে নিজেদের ধন মনে করেন ।

গুরু উগ্রনাম সাহেবের পিতা যৌবনে এক পাণিকার নারীকে ভালবাসেন ও পরে তাঁহাকেই বিবাহ করেন । পাণিকারা খুব ছোট জাতি । তাই উগ্রনামের গদীপ্রাপ্তি সম্বন্ধে একটু বিরুদ্ধ মত ওঠে । কিন্তু সেই বিরুদ্ধতা টিকে নাই ।

উগ্রনামের পুত্র দয়ানাম সাহেবের সন্তান না হওয়ায় তিনি একাদিক বিবাহ করেন । তবু তাঁহার আর সন্তান হইলই না । কিছু দিন আগে নিঃসন্তান অবস্থায় দয়ানাম পরলোকগমন করায় বড় সমস্যা কঠিন হইল । গুরু হইবেন কে ? অথবা কি ব্যবস্থা হইবে ?

তখন বিলাসপুরের বাঘুলা গ্রামের কবীরপত্নী ভক্ত জুলারে সহায় ও তাঁহার পরিবার, খড়সিয়াবাসী ঠাণ্ডারাম মালগুজার প্রভৃতি বড় বড় কবীরপত্নী গৃহস্থ মহা সমগ্রাণি পড়িয়া গেলেন । অবশেষে বিহার রসড়া মঠের মহন্ত কাশীদাস প্রভৃতি সকলে মিলিয়া একটি কমিটির হাতে সব ভার সমর্পণ করিয়া এই চল্লিশ লক্ষ লোকের বিশাল পণ্ড চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন । পরলোকগত দয়ানামের

ছোট পত্নী ইহাতে রাজী থাকিলেও বড় পত্নী বিশেষ বিরুদ্ধ। দেখা যাউক, ইহার ফল কেমন হয়।

কবরধা কুদরমালের মঠ মানুষের চলাচলের পথ হইতে বহু দূরে হওয়ার উগ্রনাম সাহেব ইহাদের প্রধান স্থান। দামাখেড়ায় লইয়া আসেন। সেখানে চাপা বা বড়জুরার দুই স্টেশন হইতেই বাওয়া সহজ।

প্রধান গুরুর অধীনে ভারতে নানা স্থানে এই ধর্মদাসীদের মঠ। সে-সব স্থানে অনেকানেক মহন্ত আছেন। তাহা ছাড়া গুরুদের দেওয়া পান বা পাঞ্জা লইয়া অনেক গৃহস্থ ও সাধু ধর্ম প্রচার করিয়া বেড়ান। পাণ্ডিকা-জাতীয় অনেক উপদেশক পার্শ্বতা ও বনবাসী সাধারণ লোকের মধ্যে এই ধর্মমত আশ্চর্যরূপে বিস্তৃত করিয়াছেন। মুণ্ডা ও ওরাওঁ প্রভৃতি অনেক ঝাড়খণ্ডী জাতি এই ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। জীবহত্যা তাগ করিলেও তাহারা তাহাদের সামাজিক রীতিনীতি ব্যবহার এই ধর্মের মধ্যে আসিয়াও পূর্বের মত চালাইয়া আসিতেছে। কবীরপন্থের মূল আদর্শ হইতে সেই সব আচারের বিশেষ বিরোধ নাই। কবীরপন্থীদের মত ইহারাও “চৌকা”র অনুষ্ঠান করে। সে-সব ওরাওঁ গীষ্টান হইয়াছেন তাঁহারাও তাহাদের প্রাচীন সামাজিক অনেক রীতিনীতি তাগ করেন নাই। খ্রীষ্টীয় মিশনারীরাও সেই সব রীতিনীতি মানিতে আপত্তি করিতে পারেন নাই। খ্রীষ্টীয় ওরাওঁরাও, বিবাহে, বব শশু ও ফল উৎসর্গে, গ্রামোৎসবের নৃত্যে যোগদান করে। মদ-মাংস তাহারা খাইতে পারে,—কবীরপন্থীরা পারে না।

কবরধা হইতে এই ধর্ম উত্তর-দক্ষিণ এই দুই পথে রাঁচী প্রভৃতি জেলায় বিস্তৃত হয়। দক্ষিণ ধারার সঙ্গে উড়িষ্যার কবীরপন্থীদের যোগ বটে। চতুর্ভূজ দাস ছিলেন সেই ধারার আদি গুরু। গুরু বলদেবদাস ও নারায়ণদাসের চালনাতে সেই যুক্ত ধারা সম্বলপুর জেলা হইয়া ঝাড়খণ্ডের দিকে বিস্তৃত হয়।

তবু অনেক দিন এই মত মুণ্ডা ওরাওঁ প্রভৃতিদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। দূর হইতে তাহারা ইহার প্রভাবের অধীনে আসিলেও সর্বভাবে এই ধর্ম গ্রহণ করে নাই। মহন্ত ব্রজদাস প্রথমে উদার চিন্তে ওরাওঁ-জাতীয় চোলা ভগতকে দীক্ষা দেন। চোলার পৌত্রের নাম ছিল

ফাগু। ফাগুর পুত্রেরও এখন বয়স পঞ্চাশের উপর। সিসাই থানায় জোড়িয়া গ্রামে ইহাদের বাস।

প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে রাঁচী জেলায় তেলি-জাতীয় ইচ্ছা ভগত নামে এক গুরু কবীরের ধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। গুলমা মহকুমায় তাঁহার অনেক ওরাওঁ শিষ্য আছেন। ইচ্ছা গুরু দীক্ষা লইয়াছিলেন কুদরমালে। সেখানকার গুরুদের পান অর্থাৎ প্রচারের অহমতি পাইয়া তিনি রাঁচীর কাছাকাছি প্রচারে নিযুক্ত হন। তাঁহার তৈয়ারী ভূমিতে পরে খ্রীষ্টীয় প্রচারকরা প্রচার চালাইতে প্রবৃত্ত হন।

বিহার হইতে কবীরপন্থের এক শাখা পূর্ব-ঝাড়খণ্ডে মানভূম হাজারীবাগ প্রভৃতি স্থানে বিস্তীর্ণ হয়। সেখান হইতে কিষ্ট দাস নামে এক গুরু আসিয়া অল্প দিন হইল খুঁটি মহকুমার ওরাওঁদের কতক লোককে দীক্ষিত করিয়াছেন।

জীরনদাস, দালদাস, কাশীদাস, বিহারীদাস প্রভৃতি গুরুও ঝাড়খণ্ড এই ধর্মের বথেষ্ট প্রচার করিয়াছেন।

ওরাওঁ ভক্তরা সাধারণতঃ মহন্ত হইতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, “লোকের পূজা গ্রহণ করা ভাল নয়। তার চেয়ে অচ্যুকে ভক্তি করা ভাল, কিন্তু অযোগ্য হইয়া ভক্তি গ্রহণ করিলে দোষ হয়।” তবু ওরাওঁদের মধ্যে মহন্ত রামুদাস, মহন্ত প্রসাদদাস প্রভৃতি দুই-এক জন গুরু আছেন। রামুদাসের সহচর আছেন কৈলা ভগত। কৈলার বাড়ি বীর পরগণার কিরিয়া গ্রামে। অনেক হিন্দু-স্বাভীয় কবীরপন্থী গুরুও এই সব ওরাওঁদের মধ্যে ধর্ম প্রচার করেন। বসিয়া থানাতে ওকিয়া গ্রামে ভগত সোহাগ দাস, ফুলঝারটোলিতে ভগত মুটরু দাস, বানাগুটুতে ভগত লালুদাস, গুলমা থানায় বিরিন্দা গ্রামের মহন্ত প্রসাদ দাস এইরূপ প্রচারক। রাঁচী জেলার এখনকার এই কয় জন কবীরপন্থী ভক্ত ও গুরুর বিষয় আমি রাঁচীর প্রখ্যাত নৃত্যবিদ রায় শরৎ চন্দ্র রায় মহাশয়ের নিকট জানিয়াছি। কাজেই আমি তাঁহার নিকট স্বীকী।

কবীরপন্থী ওরাওঁরা জীবহত্যা করেন না, মদ্যপান করেন না, মৃতদেহ দাহ করেন না, মৃতদের জন্ত প্রচলিত শ্রাদ্ধাদি করেন না। তবে মৃতদের সমাধিস্থানে দীপদান

করেন ও “চৌকা” প্রভৃতি ধর্মাস্থানে মৃতদের প্রতি কর্তব্য পূর্ণ করেন। কবীরপন্থী ওরাওঁরা নিজেদের সম্প্রদায়ের বাহিরের ওরাওঁদের সঙ্গেও বিবাহাদি সম্বন্ধ করেন। ইহারা তাঁহাদের “মজরা” অর্থাৎ মদ্যপ ওরাওঁ বলেন। মজরা-বরের কলা আসিলে তাহাকে দীক্ষিত করিয়া লন। সে কলা তখন শুদ্ধাচার মানিয়া চলেন। মজরা-বরে কলাকে দিলে পিতামাতা তাঁহার হাতে খান না।

এই কবীরপন্থের প্রভাবে ঝাড়খণ্ডে এই সব জাতির মধ্যে এমন একটি নৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে যে পরে মুণ্ডাদের মধ্যে বীরশা ভগত ও ওরাওঁদের মধ্যে বিখ্যাত টানা ভগতের উপদেশ সম্ভব হইয়াছে। রাঁচী জেলায় বাঘরা থানার বাটকরী গ্রামে এক নারীও ধর্মগুরু স্থান গ্রহণ করিয়াছেন।

টানা ভক্তদের কথা অতিশয় চমৎকার। এ বিষয়ে শ্রদ্ধের শরৎ চন্দ্র রায় মহাশয় বিস্তৃত ভাবে লিখিয়াছেন। ষাঁহাদের জানিবার ইচ্ছা তাঁহারা তাঁহার ওরাওঁ ধর্ম ও সামাজিক প্রথা (*Oraon Religion and Customs*) নামক ইংরেজী গ্রন্থখানির মধ্যে তাহা পাইবেন।

এই ঝাড়খণ্ডে যে শৈব ও বৈষ্ণব ভক্তদের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে তাঁহারও মূলে কতকটা কবীরপন্থী প্রভাব।

মোট কথা, দেখা যাইতেছে ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম ভাগে বিলাসপুরেরও পশ্চিমে কবীরের আদর্শ ও ধর্ম লইয়া ধর্মদাস সাধনা ও প্রচার করিতে থাকেন। সেখান হইতে তাহা ক্রমে পূর্ব দিকে প্রসারিত হইতে থাকে।

ইহার প্রায় ৫০ বৎসর পর অর্থাৎ ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি মহাপ্রভু চৈতন্যের সংস্পর্শে রাঁচীর দক্ষিণ-পশ্চিমে বৃন্দু প্রভৃতি মঠ স্থাপিত হয়। পরে মানভূম প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া গোড়ীয় বৈষ্ণবেরা ঝাড়খণ্ডে ভক্তিসাধনা প্রচার করিতে থাকেন। তাই ঝাড়খণ্ডে রাঁচীর কাছাকাছি এখনও সেখানকার আদিম অধিবাসী ভক্তদের মুখে বাংলা কীর্তন শুনা যায়। প্রথমে মনে হয় গানগুলি বৃষ্টি সেই দেশীয় ভাষায়। একটু স্থির হইয়া শুনিলে ক্রমে বুঝা যায় সেই সব গানের পদ বাংলা।

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি নারায়ণ ও জানকীদাসের

অনুবর্তী রামানন্দী বৈরাগীর দল ঝাড়খণ্ডে আসিয়া মঠ ও আখড়া স্থাপন করেন। রামানন্দীরা প্রায়ই গয়া ও পালামৌ পথে আসেন। শেরশাহী রাজত্বের দুই দিকে চটি বা অতিথিশালার ভার লইয়া অনেক বৈরাগী ঝাড়খণ্ডের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়েন। ইহারা অনেকে রাম উপাসনা প্রচার করেন।

১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর কাশী হইতে শৈব-সাধুরা হুই-এক জন করিয়া ঝাড়খণ্ডে আসিতে থাকেন। তাঁহারা কতকগুলি নিয়ম দিয়া ঝাড়খণ্ডের সরল অধিবাসীদের মধ্যে প্রচার আরম্ভ করেন। সেই সমস্ত শিষ্যদের নাম “নেমহা” অর্থাৎ নিয়মধারী।

কাশী হইতে আগত শৈব-সাধুদের মধ্যে ত্রিশোচন ও ভীমদেব ছিলেন তান্ত্রিক সাধনাতেও প্রবীণ। তাঁহাদের পরে আসেন বীরভদ্র ও বামদেব। তাঁহাদের শিষ্যরা অনেকে ঝাড়খণ্ডে বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি এক জন স্থানীয় অধিবাসীকে তাঁহাদের শৈবমতে দীক্ষা দেন। তে ওরাওঁ শিষ্যের নাম গুরু রাখিলেন, “ভৈরব”। এই ভৈরব ভগতের বাড়ি রাঁচী থানার গধীন তুষাপরী গ্রামে ভৈরবের পুত্র রুক্ষ ভগতও শৈব ও তান্ত্রিক সাধনায় প্রবীণ হইয়া উঠিলেন। ক্রমে ভৈরব ও রুক্ষ ভগতের সম্মান এমন বিস্তৃত হইল যে, ছোটনাগপুরের রাজা দেওনাগ শাহী ও তাঁহার পত্নী ইহাদের শরণাগত হইলেন। ইহাদের শিষ্যরা এখন অনেক স্থানে সমস্ত লিঙ্গ নামে শিবলিলা পূজা করেন। সেই শিবকে এখানে ভুঁইফোঁড় শিব বলে। ভুঁইফোঁড় ভগতরা জটা রাখেন ও অনেক নিয়ম পালন করেন। তাঁহাদের অলৌকিক শক্তিও হয়।

উত্তর-পশ্চিম গোকুলের ও বৃন্দাবনের গোসাইঁরাও কেহ কেহ এই ঝাড়খণ্ডে রুক্ষভক্তি প্রচার করিয়াছেন। যে-সব ওরাওঁ ইহাদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য। গোসাইঁরা মাংসাহারী ওরাওঁদের গো-দান করাইয়া শুদ্ধ করিয়া তবে দীক্ষা দেন। এই সব দীক্ষিত বৈষ্ণবেরা রথযাত্রা জন্মাষ্টমী প্রভৃতি তিথি পালন করেন। তাঁহারা ওরাওঁ ভাষাতে ভক্তি ও প্রেমের গানও করেন।

নারায়ণী

শ্রীশাস্তা দেবী

১

পিতামহের কন্যা নারায়ণী সাধাবণ গৃহস্থগরে জন্মিয়াছিল। মা'র কোলে উপরি-উপরি তিন কন্যার শুভাগমনের পর এই চতুর্থীর আবির্ভাব হওয়াতে নারায়ণীর অদৃষ্টে আদর-যত্ন বিশেষ জোটে নাই। তিন বোনের ছাড়া ছেঁড়া জামা-কাপড় তালি দিয়া পরিয়াই তাহার শৈশবটা কাটিয়া গিয়াছিল। নূতন শাড়ী জামা দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সে চোখে দেখে নাট। এমন কি পূজার সময়েও তাহাকে একখানা নূতন কাপড় বাবা কিনিয়া দিতে পারিতেন না। মা ধবিয়া বসিলে বলিতেন, “সেজ্জীর গতবারের জবিপেড়ে কাপড়খানা যে ছোট হয়ে যাচ্ছে, ওটা পববে কে শুনি? ওখানা কি পয়সা দিয়ে কিনতে হয় নি? বছর বছর যে মেয়ে বিয়োচ্ছ ত তার আগাগোড়াটাই কি লোকসানের মামলা? একটা কিছু খরচ বাচাও। ছেলে হ'লে ধুতি ত কিনে দিতেই হ'ত। মেয়েই যখন হ'ল, ওই এক কাপড়ে পর-পর চার জনের চালাতে হবে, বত দিন না ছিঁড়ে যায়।”

মা চোখের জল মুছিয়া বছরের পর বছর মেয়েকে পুরানো কাপড়ই পরাইতেন। কেবল বিজয়া দশমীর দিন চাহিয়া-চিন্তিয়া জায়েদের কাছ হইতে একখানা নূতন কাপড় আনিয়া নারায়ণীকে একবারটি পরাইতেন। মা হইয়া মেয়েকে এই শুভদিনে পুরানো কাপড় কি করিয়া পরাইবেন? কিন্তু নারায়ণীর চিরদিন মনে ছিল যে ভাসানের পর যখন ঘুমে কাতর হইয়া সে শয্যা গ্রহণ করিতে আসিত, মা তখন ধীরে ধীরে নূতন কাপড়খানি খুলিয়া দিয়া সবড়ে পাট করিয়া বাক্সে তুলিতেন। পরদিন আর স কাপড় দেখা বাইত না। আবার সেই দিদিদের পরিত্যক্ত ছ'ড়া কাপড়।

কাপড়ে না হয় হিসাব করিয়া চলা সহজ; কিন্তু পটের ক্ষুধায় ত হিসাব চলে না। তবু নারায়ণী বড় ইবার পর তাহার বাবা ছুধের খরচ কি মাছের খরচ

বাড়াইতে রাজি হইলেন না। যেদিন নারায়ণী মাতৃস্বস্ত ছাড়িয়া গরুর দুধ খাইতে শুরু করিল সেই দিন হইতেই তাহার বালিকা সেজ্জীর ছুধের পাট উঠিয়া গেল, যদিও সে বেচারীর বয়স তখন মাত্র দুই বৎসর। সেজ্জী খুকী আশ্রমণি খাইত মাড় ভাত—নারায়ণী পাইল তাহার ছুধের অংশ। মেয়েরা আর একটু বড় হইল, কিন্তু সেজ্জী খুকী কি নারায়ণী কাহার জগুই মাছ বরাদ্দ হইল না: কাজেই তাহারা মাছ খাইবার সঙ্গে সঙ্গেই মাকে মাছ ছাড়িতে হইল। মা'র দুই বেলা দুইখানা মাছ মেয়েবা দুই জনে একবেলা খাইত। মা স্বামীর অমঙ্গলের ভয়ে মাছের তেল ও কাঁটা দিয়া আধুর খোসার চচ্চড়ি রাঁধিয়া ভাত খাইবার ব্যবস্থা করিতেন।

শিশু বালিকা মাত্রেই পুতুলখেলার সখ আছে; নারায়ণীর যে ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কে তাহাকে পুতুল কিনিয়া দিবে? মা ছেঁড়া কাপড়কে সলিতার মত পাকাইয়া তাহাই দুই পাট করিয়া মেয়েদের পুতুল গড়িয়া দিতেন। কালি দিয়া ন্যাকড়ার গায়ে চোখ-মুখ আঁকিয়া দিলে মেয়েদের আনন্দ ধরিত না।

যদি চিরকালই এই ভাবে কাটিয়া বাইত, হয়ত নারায়ণী বড় বয়সে আপনার শৈশবের লাঞ্ছনার কথা ভুলিয়া বাইত; হয়ত মনে করিত তিন সন্তানের পরে জন্মাইলে কোনো শিশুর ভাগ্যই আদর-অভ্যর্থনা বিধাতা লিখেন না। কিন্তু তাহা হইল না। নারায়ণীকে চেতনা দিতে বিধাতা তাহার মাতার কোলে আবার আর একটি শিশু পাঠাইয়া দিলেন। এবার আর কন্যা নয়, পিতামাতার বহুকালের কামনার ধন বংশধর পুত্র। চারি সন্তানের পর জন্মাইলেও তাহার অভ্যর্থনা হইল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। বাড়িতে ছলছুল পড়িয়া গেল, শাঁকের শব্দে কোনোদিকে কান পাতা যায় না। আত্মীয়-স্বজন দাসদাসী সকলের মুখে হাসি। সকলেই বলিতেছে, “এত দিনে বিধাতা মুখতুলে চাইলেন।” এমন কি অনাদৃত্য নারায়ণীকেও আজ পাঁচ জনে

কোলে করিয়া আদর করিয়া বলিতেছে, “বাক, নারায়ণী তোর পর ভাল। তুই ত খোকা ভাইকে ডেকে আনলি।”

নারায়ণী আদর পাইয়া খুশী হইল বটে; কিন্তু তাহার তখন পাঁচ বৎসর বয়স; এই আদরের কারণ বুদ্ধিতে তাহার বেশী দিন দেরি হইল না, এবং আদরটা যে কত ক্ষণ স্থায়ী তাহাও সে অচিরেই বুঝিয়া গেল।

এবার পূজায় খোকায় নূতন জুতা জামা কাপড় আসিল। নারায়ণী বলিল, “মা, আমাকে ত তুমি কতখানো একটা নূতন কাপড় দাও না। ঐ একরকমি ছেলের কাপড়ই কোনো দিন পরে না, ওকে দিতে পার নূতন ধুতি, আর আমার বেলা সব ছেঁড়া! আমি আর তোমায় ভালবাসব না, যাও!”

হাসিয়া মা বলিলেন, “ও ব্যাটাছেলে কি না, মেয়েদের শাড়ি ত আর ও পরবে না, তাই ধুতি দিতে হ’ল।”

অবিশ্বাসের সুরে নারায়ণী বলিল, “আহা, ধুতি কই আবার? ও ত লাল কাপড়। অমন ত সেজ্জদির ছিল, ওকে কেন দিলে না সেটা?”

মা বলিলেন, “সরুপাড় হ’লে ধুতি বলে।”

নারায়ণী মুখ নীচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু মার কথা বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করিল না। সেই দিন হইতেই সে লক্ষ্য করিতে শুরু করিল যে, খোকা চাহিতে শিখিবার আগেই অযাচিত ভাবে কত খেলনা কাপড় পাইতেছে এবং সে হাজার চাহিয়াও বড়বোনদের ভিক্ষার দান হেঁড়া কাপড় ও ভাঙা খেলনা লইয়াই দিন কাটাইতে বাধ্য হইতেছে।

তাহার বড় ছই বোনের গলায় সরু এক-একটা সোনার হার ছিল বলিয়া সে ও সেজখুকী আন্না প্রায়ই এক ছড়া হারের জন্ত কান্নাকাটি করিত; কত দিন দিদিদের সঙ্গে ওই হার লইয়া মারামারি হইয়া গিয়াছে; পরস্পরের নথের আঁচড়ে চার বোনের মুখ একেবারে রক্তারক্তি হইয়া বাইত। কিন্তু তবু তাহাদের ছোট ছই বোনকে মা কোনোদিন হার গড়াইয়া দিলেন না, অর্থাৎ বাবা টাকা বাহির করিলেন না।

কিন্তু এদিকে খোকায় অন্নপ্রাশন পড়িল পূজার পরেই। আগের দিন সন্ধ্যায় খেলা করিতে করিতে

নারায়ণী দেখিল শাকরা নীল কাগজে মোড়া এক ছড়া বিছেহার ও এক জোড়া জু-পাকের বালা বৈঠকখানা ঘরে বাবার হাতে দিয়া গেল। বাবা খুলিয়া দেখিয়া আবার মুড়িয়া-মুড়িয়া মাকে গিয়া দিলেন।

সেজখুকী আন্নামণি ও নারায়ণী মহানন্দে কলরব করিয়া ছুটিয়া মার কাছে গেল, এই বুদ্ধি এতদিন পরে তাহাদের জন্ত গহনা আসিল। মা ত বলিয়াছিলেন, “আর একটু বড় হ’লে পাবি।” এখন ত তাহারা মস্তবড় হইয়াছে! আন্না বলিল, “মা, আমি হারটা নেব, বালাটা নারায়ণীকে দিও।”

নারায়ণী আন্নাকে ঠেলিয়া মার কোল হইতে সরাইয়া দিয়া বলিল—“হ্যা, তা বইকি? আমি এত দিন ধরে হার হার করে আস্টি আর আজকে উনি এলেন বালাটা নারায়ণীকে দিতে! কিছুতেই আমি বালা নেব না।”

তাহাদের থামাইয়া মা বলিলেন, “কাল খোকায় ভাতটা হয়ে বাক তারপর দিন তোদের হার বালা ভাগ করে দেব এখন। আজ মিথ্যে ঝগড়া করিস নে বাছা!” নারায়ণী তাহার ক্ষুদ্র হাতের তর্জনী নাড়িয়া বলিল—“ও বুঝেচি, ওগুলো খোকায়ই রইল, আমাদের শুধু একটু পরতে দেবে। আমি সব বুঝতে পারি।”

আন্না বলিল, “আমি জানি গো জানি, ভজু বলেচে—তোরা মেয়ের উপর মেয়ে, তোদের আবার গহনা কাপড় কেন? ব্যাটাছেলেদেরই গহনা দিতে হয়, না মা?”

নারায়ণী মাকে-সুদ একটা ধাক্কা দিয়া বলিল, “মা, তুমি কি ছুট্টু! ছেলেরা গহনা চায় না, পরে না, খোকা ত গহনা দেখলেই চিবোয়, তবু তুমি ছেলেকেই গহনা দেবে। আর মেয়েরা গহনা পরে ব’লে তুমি হিংসে ক’রে আমাদের দেবে না। আমরা তোমার কেউ নই বুদ্ধি?”

মা বলিলেন—“মা গো মা, কোথায় বাব গো, ছ-বছর মেয়ের এমন পাকা পাকা কথা।”

পিতা পীতাম্বর বলিলেন—“হবে না? হাজার হোক মেয়েমানুষ ত! কথার জোরেই ছনিয়া জয় করতে হ’বে। স্বীকৃতির অশিক্ষিত পটুয়ের কথা সংস্কৃত কবিরাজ ব’লে গেছেন।”

নারায়ণী পিতার গুরুগম্ভীর কথার একটাও অর্থ

বুঝিল না। কিন্তু এ-কথা বেশ বুঝিল যে, তাহার ন্যায্য দাবিটা পিতামাতার কাছে অত্যন্ত আবদার ছাড়া আর কোনো নামই পাইবে না। খোকাই সংসারের সব।

খোকায় অন্নপ্রাশন হইয়া গেল। কাকা, জ্যাঠা মাসি, পিসি সকলেই নারায়ণীর লোলুপ দৃষ্টির সম্মুখে খোকাকে সোনারূপার অলঙ্কার পরাইলেন। নারায়ণী আজ আর কাঁদিলও না, চাহিলও না কিছু। পরদিন মা যখন খোকায় পায়ের মল ও গলার হার খুলিয়া লইয়া আদর করিয়া তাহাকে পরাইতে আসিলেন, নারায়ণী রাগ করিয়া হুইটা গহনাই ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তাহার টানের চোটে হারটা ছিঁড়িয়া হইল তুই টুকরা, আর আছাড় খাইয়া মলের চারটা ঘুঙুর গেল ছিটকাইয়া পড়িয়া। মা রাগের মাথায় তাহাকে ধরিয়া খুব তুই-চার ঘা দিলেন। পিঠে তাহার মায়ের পাঁচ আঙুলের দাগ লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিল। তবু নারায়ণীর চোখে জল দেখা গেল না। সে কেবল বলিল, “খোকায় বেলা গয়না, আর আমার বেলা মেরে মেরে হাড়ভাঙা। তুমি নিশ্চয় আমার সংমা।” সারা দিনরাত্রি নারায়ণীর মুখে কেহ অন্ন তুলিতে পারিল না। সে মুখ গুঁজিয়া নীরবে শুইয়া রহিল।

শিশু নারায়ণী সত্যগ্রহ করে নাই, কাজেই ক্ষুধার তাড়নায় দ্বিতীয় দিন মা-বানের পাত-কুড়ানো অন্ন তাহাকে গ্রহণ করিতেই হইল। ক্ষুদ্র শিশুর অভিমানের কোনো মূল্য কেহ দিল না। খোকায় আদর ও খুকীদের অনাদরে কোনোই পরিবর্তন হইল না।

২

সে পুরাকালের কথা, তখন দশ বৎসরের পরে কন্তা সম্প্রদান বড় কেউ করিত না। সুতরাং চতুর্থী কন্তা হইলেও নারায়ণীর বিবাহের সম্বন্ধ খুঁজিতে পীতাম্বরকে অত্যন্ত পিতার মতই আদাজল খাইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি শুরু করিতে হইল। যত বার বিফল হইয়া বাবা ঘরে ফিরেন, তত বারই মা মেয়েকে খোঁটা দিয়া বলেন, “কেন এসেছিলি বাছা, তিন মেয়ের পিঠে গরিবের ঘরে জন্মাতে? ঘুরে ঘুরে পায়ের ধিল ধরে গেল, ভেবে ভেবে মাথার চুল সব সাদা হলে গেল, তবু মেয়ের বর জুটল না।”

নারায়ণীর মুখের জোর এখনও ছেলেবেলার মতই ছিল। তাছাড়া সত্য কথা বলিতে কি, দশ বৎসর বয়সে ত আর তাহার শৈশব ফুরাইয়া যায় নাই? সে রাগিয়া বলিত, “কে বলেছিল তোমাদের আমার বিয়ের ভাবনা ভাবতে? আঁতুড়-বরে নুন খাইয়ে মেরে ফেলতে পার নি?”

মা গালে হাত দিয়া বলিলেন—“ধন্তি পাকা মেয়ে বাছা তুই! দেখিস্ পরের ঘরে গিয়ে অমনি কট্‌কট্‌ ক’রে কথার ছল ফোটাস্ নে, তাহ’লে শাশুড়ী-ননদ উনুন-কাঁদায় মুখ ঘষে দেবে।”

নারায়ণী ঠোঁট উল্টাইয়া তুড়ি দিয়া বলিল, “তোমরা বড় আদরে রেখেচ, তার আবার শাশুড়ী-ননদের ভয় দেখাচ্চ! এখানেও পরের পাত কুড়িয়ে খাই, ছেঁড়া কাপড় পরি, সেখানেও তাই করব।”

মা বলিলেন, “তুংখী মায়ের পেটে জন্মেছিস্ বাছা, তুংখটাই কেবল বুঝলি। মায়ের প্রাণটা ত দেখতে শিখলি না। যে থেকে তোরা খেতে শিখেচিস নিজেদের মুখের গ্রাস যে তোদের মুখে ছু-বেলা তুলে দিচ্চি, তা আজ বুঝবি না, মেয়ের মা হ’লে বুঝবি। আশীর্বাদ করি ধন-দৌলতে তোর ঘর ভরে যাক্, তবু মেয়ের মা হ’লে বুঝবি মায়ের ভালবাসাটা কি।”

মায়ের প্রথম আশীর্বাদ শীঘ্রই ফলিল; তিন মেয়ের চেয়ে নারায়ণীর সম্বন্ধই ভাল আসিল। খুড়ী জ্যেষ্ঠা বলিলেন, “বাই বল, পোড়া বিধাতারও ত কিছু দয়ামায়া আছে। মেয়ের এমন রঙের চটক, এমন মুখের কাট, গরিবের ঘরে জন্মেচে তাই না গোবর-কালি মেখেই দিন কাট্‌চে। এতদিনে বিধাতা মুখ তুলে চাইলেন, এবার দেখো, খেয়ে মেখে মেয়ে আমাদের পদ্মফুলের মত ঘর আলো ক’রে থাকবে।”

মা বলিলেন, “তোমরা তাই আশীর্বাদ কর ভাই। নারায়ণী আমার বড় তুংখের ধন, একটি দিনের জন্ত বাছাকে আমার হাতে তুলে কিছু দিতে পারি নি, মা কোনো আদর-সোহাগ করি নি। নিজের ঘরে মা যত্নে রাগী হয়ে থাক, দেখেই আমার চোখ জুড়াবে।”

বড় ঘরে মেয়ে বাইতেছে, তাহারা কিছুই দাবি করে নাই। তবু আজ আর পীতাম্বর তাহার চতুর্থী

কন্যা হইয়া জন্মানোর অপরাধ লইলেন না। আজ মেয়ের স্তন্য নূতন রাঙা চেলি, সোনার চুড়ি, আবালোর ঙ্গামিত হার, সিঁথিপাটি, মল, কুম্ভকো—নানা গহনা আসিল। গৃহস্থের ঘরের মতই অল্পস্বল্প হাক্সা অলঙ্কার, তবু নারায়ণীর চক্ষে ইহাই ত আলাদিনের ঐশ্বর্য। জীবনে এত অলঙ্কার সে স্পর্শ করে নাই কোনোদিন।

এত দিনের অভিমান ভুলিয়া আজ নারায়ণীর কচি মুখে মধুর হাসি ফুটিয়াছে। রক্তাশ্বরে দেবীপ্রতিমার মত সাজিয়া মায়ের কোল হইতে নারায়ণী শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল। যে-গৃহে দুঃখের অন্ন খাইয়া সে মানুষ হইয়াছিল, সেখান হইতে পরগৃহে বাইতে এই শিশুর বয়সেও যে বৃকের প্রত্যেকটি শিরায় টান পড়িবে বিবাহের সময় বস্ত্র-অলঙ্কার পাইবার আনন্দে নারায়ণী তাহা ভাবে নাই। কিন্তু কন্যা-বিদায়ের বেলা আশীর্বাদ করিয়া বাপ জ্যাঠা মা সকলে যখন বরের হাতে তাহার পুষ্পকলির মত ক্ষুদ্র হাতখানি বার-বার সঁপিয়া দিলেন, মা আগতপ্রায় অশ্রু কোনোপ্রকারে সামলাইয়া বলিলেন, “বাবা, দুঃখিনীর মেয়ে তোমাকেই চিরকালের মত সঁপে দিলাম। দুধের বাছা ও, কোনো অপরাধ যদি করে, তোমার আপনার ব’লে ক্ষমা ক’রো। আদর কখনও পায় নি জীবনে, আদরে যত্নে বশ ক’রে মায়ের দুঃখ ভুলিয়ে দিও বাছাকে।”

তখন নারায়ণী মায়ের বৃকের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া ক্ষুদ্র শিশুর মত কাঁদিতে শুরু করিল। এই চিরঅনাদতা বালিকাও অজানার ভয়ে মার কোলের আশ্রয়টুকু বার-বার আঁকড়াইয়া ধরিতে লাগিল। তাহার এই একটি দিনের সুখের হাসি আজই চোখের জলে ম্লান হইয়া গেল। নূতন গহনা-কাপড়গুলো খুলিয়া দিলে যদি আর শ্বশুর-বাড়ি না-বাইতে হইত, তাহা হইলে বিনা বাক্যব্যয়ে এখনই সে সমস্ত খুলিয়া ফিরাইয়া দিতে পারিত। কিন্তু সে গাঁটছড়ায় বাঁধা পড়িয়াছে, আর যে উপায় নাই, তাহা এই কচি বয়সেও বুঝিয়াছিল। মার অন্তরের ভালবাসা ও বাহিরের অনাদরের স্বাতিটুকু সম্বল করিয়া গরিবের মেয়ে নারায়ণী খনীর ঘরের বধু হইয়া চলিয়া গেল। সংসারে শাওড়ী নাই, দুই দিন না-বাইতেই নারায়ণী আপন গৃহ-সংসার বুঝিয়া লইল।

৩

দশ বৎসর বয়সেই নারায়ণীর প্রতি পিতৃকর্তব্য পীতাম্বর শেষ করিয়া ফেলিলেন। বিবাহের সময়ের শ-পাঁচ টাকা এবং জন্মিবার সময় গোটা-দশ এই হইল নারায়ণীর দশ বৎসরব্যাপী জীবনে তাহার পিতার মোট খরচ। কারণ তখনকার কালে কন্যার বিবাহে পণ এখনকার মত হাজারের নাম্তা পড়িত না, কুড়ির নাম্তা পড়াই রেওয়াজ ছিল। মেয়েদের বিবাহে গায়ে ইউরোপীয় প্রথায় হীরার কিংবা অভাবপক্ষে মুক্তার গহনা দেওয়ার তখন প্রয়োজন হইত না, আটপোরে রূপার এবং পোষাকী দুই-একখানা সোনার গহনা হইলেই পরিবারের মানসম্মত অনায়াসে বজায় থাকিত। নকল হীরা ও নকল মুক্তার ব্যবসা করিয়া অবাঙালী ব্যবসাদারেরা বাঙালীর কষ্টার্জিত টাকাগুলি লুঠ করিতেও পারিত না।

সে যাহাই হউক, পীতাম্বরের কুলপাবন পুত্র কিন্তু তাঁহাকে এত অল্পে নিস্তার দিল না। সে পুরুষেলে, তাহার কাপড়, জামা, জুতা, মোজা, ছাতা, বই, খাতা সকল কিছুর খরচ ত ছিলই, তত্পরি পাঠশালা সাজ হইতেই আসিল জেলা-স্কুলের খরচ। একমাত্র পুত্রকে মর্গ করিয়া রাখা ত চলে না?

পুত্র বিষ্ণুচরণ সেকালের এন্ট্রান্স পাস করিতেই পীতাম্বর বলিলেন, “জমিদারী সেরেস্তার একটা কাজ খালি আছে; বাবু বলছিলেন, বারো টাকা মাইনে, বিষ্ণুকে বসিয়ে দিতে।”

চটিয়া বিষ্ণু মাথা নাড়া দিয়া বলিল, “হ্যাঁ, বারো টাকা মাইনের কাজ করব বইকি! তোমাদের মতন চিরকাল হুন আর লক্ষাগোলা দিয়ে ভাত খাবার সখ আমার নেই। বেঁচে যদি থাকতে হয় মানুষের মত খেয়ে-প’রে বাঁচব, নয়ত যেদিকে দুঃখ যায় চলে যাব।”

মা বলিলেন, “ঘাট ঘাট, অমন কথা বলে না। বাবা, তুমি আমার আঁধার ঘরের মাণিক, বাপ-মায়ের কোল-জোড়া ক’রে থাক, তোমাকে বারো টাকা মাইনের কাজ করতে হবে না।”

গাল ফুলাইয়া আঁধার ঘরের মাণিক বলিলেন, “বাপ-মায়ের কোলে বসে থাকলে ত আর চারটে হাত-পা বেরোবে

না। আমায় ক'রে খেতে হবে, আমাকে কলকাতার কলেজে ভর্তি ক'রে দাও।”

পীতাম্বর মহাবিপদে পড়িলেন। তাঁহার সামান্য আয়। বাড়িটা গরুবাছুর, ধানচাল আছে বলিয়া আর বাগানের তরকারি ও পুকুরের মাছে ভাত খাওয়া চলিয়া যায় বলিয়া ধরকর্জ করিতে হয় না। কিন্তু যদি প্রতি মাসে ছেলের কলেজের মাইনে ও বাসা-খরচ জোগাইতে হয়, তাহা হইলে সেইখানেই ত মাসে অন্তত পঁচিশ-ত্রিশ টাকা খরচ। এমন করিলে ঘরের ঘটবাটিও যে বাধা পড়িয়া যাইবে।

পীতাম্বর বলিলেন—“ও সব বাপু, তোমার এ গরিব বাপের দ্বারা হবে না। গাঁয়ে থেকে কিছু করতে হয় কর, নয়ত আমাকে আর দ্বিতীয় কথাটি ব'লো না।”

বিষ্ণু বলিল—“বেশ তাই হবে। এর পর তোমাদের যদি কোনো কারণে আপশোষ করতে হয় ত তার জন্তে আমাকে দায়ী ক'রো না।”

মা বিষ্ণুচরণকে ছুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া কঁাদিতে কঁাদিত বলিলেন—“বাছা, ছুঃখিনী মাকে অমন ক'রে কথার দাগা কেন দিচ্চিস মিথো? তুই আমার সাতটা নয় পঁচটা নয়, অনেক দেবতার দোর-ধরা একটা মাত্র ছেলে : তোমার বাবা যদি তোকে কলেজের খরচা নাই দেয়, আমিই আমার গয়নাগাটি বেচে খরচ যোগাব। তুই মা পড়তে চাস পড়, ওর জন্তে মনে কোনো ছুঃখ রাখিস নে।”

ছেলেরই হাতে মা গলার হার খুলিয়া দিলেন। বিক্রী করিয়া দেড় শত টাকা বিষ্ণুচরণ মাকে আনিয়া দিল। মা বলিলেন, “হা রে, হার ত গড়াতেই দেড়-শ টাকা লেগেছিল কি না মনে পড়ে না। বেচতেও কি অত কখনও পাওয়া যায়?”

বিষ্ণুচরণ হাত নাড়িয়া বলিল, “কি জানি মা, সোনার দর বোধ হয় তখনকার চেয়ে এখন বেশী। তাছাড়া তোমার জিনিষটা এত ভাল আছে, যে, ঘরোয়া খন্দের দেখেই লুফে নিয়েচে, নিজি কোন্ দিকে বুকেচে তা অত দেখেনি।”

মা বলিলেন, “তুই লোকের কাছ থেকে ঠকিয়ে টাকা

নিস্ নি ত, বাবা? তাহ'লে কিন্তু বড় অধর্ম হবে। অধর্মের টাকা কখনও ফল দেয় না, সে টাকায় কেনা বিদ্যা সব বৃথা যায়।”

বিষ্ণুচরণ বিরক্ত হইয়া বলিল, “না, না, তোমার অত ভাবতে হবে না, আমি ঠিক টাকাই এনেচি।”

মা বলিলেন, “তোমার মুখের কথাই সত্যি হোক বাবা। এখন এই টাকাতে কিন্তু তোকে অন্তত ছ-মাস চালাতে হবে। তার মধ্যে আমি আর কিছু দিতে পারব না।”

ছ-মাস পরে গৃহিণীর হাতের কঙ্কণজোড়াও বিষ্ণুর হাত দিয়াই বিক্রী হইয়া গেল। বৎসর দুই ধরিয়া গৃহিণী এমনি করিয়া খরচ চালাইয়া একেবারে নিঃশ্ব হইয়া পড়িলেন। বিষ্ণু কিন্তু পরীক্ষায় ভাল পাস করিল, এই একটা মস্ত সাফল্য।

গৃহিণী স্বামীর হাতে ধরিয়া বলিলেন, “দেখ, যে-বয়সে মানুষ স্বামীর কাছে পঁচটা গয়না কাপড় আবদার ক'রে চায়, সেই ছেলেবয়সে তোমার কাছে কখনও কিছু চাই নি; আজ বুড়ো বয়সে একটা জিনিষ চাইব, তুমি কিন্তু না বলতে পাবে না।”

পীতাম্বর বিস্মিত দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকাইলেন, শেষে কি গৃহিণী পাগল হইয়া গেলেন? নাতি-নাত্নীর দিদিমা হইয়া এত দিনে আবার নূতন কি সখ প্রাণে জাগিল? ভয়ে ভয়ে বলিলেন—“কি চাই বল। যদি সাধো কুলোয়, না বলব না। তোমার সব গয়নাই ছেলেটা খেয়েচে জানি, কিন্তু সে-সব দিতে ত আমি বার-বার বারণ করেছিলাম।”

গৃহিণী বলিলেন, “গয়না আমি চাই না। কিন্তু ছেলেটা ভাল পাস করেছে, তুমি ওকে পড়াবে আর ক-বছর, আমার মাথায় হাত দিয়ে এই কথা বল। ছেলে ডাক্তার হ'তে চায়।”

পীতাম্বর আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন, “মাথায় হাত-টাত আবার কেন? আচ্ছা, আমি চেষ্টা করব ওকে পড়াতে। সেজন্তে বেশী ভেবো না। তবে ডাক্তারী পড়ার খরচ একটা ভালুক কেনার সমান এ বুঝে রেখো।”

পীতাম্বর চেষ্টা করিবেন বলিলেন, কিন্তু নিজের রোজগারের সামান্য কয়টা টাকা হইতে পড়ার খরচ জোগাইবার ইচ্ছা কিংবা শক্তি কোনটাই তাঁহার ছিলনা।

নানা ভাবনায় চিন্তায় তিনি বড় কাতর হইয়া পড়িলেন। ডাক্তারী পড়াইবার খরচ ত সামান্য নয়, তাহার উপর সর্বকনিষ্ঠা কন্তা কাত্যায়নীৰ এখনও বিবাহ হয় নাই। আর সব মেয়েদের দশ বৎসরের মধ্যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এ-মেয়ের তের বৎসর চলিতেছে, তবু আজ পর্য্যন্ত বিবাহের কোনো জোগাড়ই হইল না।

সকাল-সন্ধ্যা তিনি হুঁকা-হাতে অন্তমনস্ক ভাবে দাওয়ায় বসিয়া থাকেন, কলিকার আশুন নিবিয়া যায়, তবু তাঁহার হুঁস থাকে না। কোনো রকমে একবার দুপুর বেলা জমিদারী কাছারীতে হাজির দিয়া আসেন। দিন-পনের এমনি একটানা চিন্তাতেই কাটিয়া গেল।

গৃহিণী চিন্তিত মুখ করিয়া বলেন, “হ্যাঁ গা, ভেবে ভেবে কি পাগল হ'ব নাকি?”

কর্তা বলেন, “কি করি বল? এ ত একটা বোঝা নয়, এ যে দুটো বোঝা। মেয়েটাকে বাড়ি থেকে না নামিয়ে ছেলের জন্তে ত কিছুই করতে পারব না দেখুটি।”

৪

কাত্যায়নীৰ বিবাহ দূর গ্রামে ঠিক হইয়াছে। পীতাম্বর বলিলেন, “তিন দিনের মধ্যে মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেলতে হবে। বেশী আয়োজন করবার সময় নেই। এর বিয়েটা হয়ে গেলে তবে ছেলের পড়াশুনার ভাবনা শুরু করব। তাড়াতাড়ি না সেরে ফেললে কলেজ খুলে যাবে।”

মা বলিলেন, “এত তাড়াতাড়ি ছড়োছড়ির মধ্যে জিনিষপত্র কখনও হয়? গয়না কাপড় করতেও ত দু-দিন সময় লাগবে।”

পীতাম্বর বলিলেন, “ও-সব, কিছু দিতে হবে না। তাদের অবস্থা ভাল, গরিব মানুষের গলা টিপে তারা কিছু নিতে চায় না। শুধু শাঁখা শাড়ী পরিয়ে মেয়েটি দান করলেই হবে।”

বাবার কথা শুনিয়া কাত্যায়নীৰ মুখ একেবারে অন্ধকার হইয়া গেল। তাহার তের বৎসর বয়স হইয়াছে, কাজেই সঙ্গী সাথী সকলেরই তাহার আগে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। যাব যেমনই অবস্থা হউক, বিবাহের দিনে মেয়েকে লাকে বস্ত্র-অলঙ্কারে যথাসাধ্য সাজাইয়া দেয়, চিরকাল

কাত্যায়নী তাহা দেখিয়া আসিয়াছে। আর তাহার বিবাহের বেলা তাহার এত দিনের সকল সাধ অপূর্ণ রাখিয়া বাবা শুধু শাঁখা পরাইয়া তাহার বিবাহ দিবেন?

কাত্যায়নী মাকে কিছু বলিতে পারিল না, দিদিকে গিয়া বলিল—“দিদি ভাই, তুমি মাকে গিয়ে বল, আমার বিয়ের কাজ নেই। আমি অমনি থাকুব, বাপের বাড়ির দাসীগিরি করেই দিন কাটিয়ে দেব।”

নারায়ণী তাহার ফোলা গালছুটি টিপিয়া দিয়া বলিল, “কেন রে কাতু, বিয়ের নামেই এমন যৌবনে যোগিনী সাজবার ইচ্ছে হ'ল কেন তোর? কার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে, কে কি বলেচে তোকে?”

কাত্যায়নী ঠোঁট কুলাইয়া মুখ ভার করিয়া বলিল, “বলবে আবার কে? দাদার পড়ার বেলা মা গায়ের সব গয়না বেচতে পারলেন, আর আমার বিয়ের বেলা শুধু শাঁখা শাড়ী! কেন, এত হেনস্থা কিসের জন্তে? বাবা কি মেয়ের জন্তে দু-শ টাকাও খরচ করতে পারেন না? ধান ভেনে চাল ঝেড়ে বাসন মেছে বাবার যা খরচ বাচিয়েচি এত বছর, তাতেও দু-শ টাকার গয়না হয়।”

নারায়ণী বলিল, “কাকে আর শোনাচ্চিস্ ভাই? ওসব আমি তোর চেয়ে অনেক আগেই জেনেচি। ছেলেবেলা বাপ-মায়ের ‘ছেলে ছেলে’ বাতকের চোটে মনে একটি দিন সুখ পাই নি। তবে তোর মতন একেবারে ত্যাড়াবোচা ক'রে আমার বিয়ে হয় নি, এটা সত্য! তা কি আর করবি দিদি? আমি ছিলাম চার নম্বর, তুই যে আবার পাঁচ নম্বর। এখন ও নিয়ে রাগারাগি করিস নে, তোর হাতের চুড়ি আমি দেব এখন। গড়াবার সময় হবে না, আমারই চুড়ি পরিয়ে দেব, দেখিস্ বেশ নতুন। তা ছাড়া বর ত শুন্ছি টাকাওয়ালী, বিয়ের পর বাড়ি নিয়ে গিয়ে গা ভরে গয়না দেবে বল্চে।”

কাত্যায়নী আর কিছু বলিল না, কিন্তু নারায়ণী মাকে গিয়া বলিল, “মা, বরের যদি টাকা-পয়সা আছে, তবে গায়ে-হলুদের তত্ত্বেও ত দু-একখানা গয়না দিতে পারত, তাহ'লে আর কাতিটার অমন ছিরি ক'রে বিয়ে দিতে হ'ত না! শুধু কানে ফুল আর পায়ে মল দিয়ে মেয়ের বিয়ে হয়, এ বাপু কখনও দেখি নি।”

মা চোখে আঁচল দিয়া বলিলেন, “কি করব বল মা, সবই আমার কপাল! নইলে আমার গয়নাগুলো বিক্রিয়ে যায়? ছেলে যে শহরে বাবু হবেন, মেয়ের জন্তে কিছু রাখব আমার সাধি কি? তবু ত উনি শাখা শাড়ী দিয়ে সারছিলেন, আমি ফুল আর মল না দিয়ে ছাড়লাম না। সোনা-রূপো না হলে কখনও কস্তাদান শুদ্ধ হয়? বিয়েই অশুদ্ধ থেকে যাবে যে। আর বরের বাড়ির ত সবই আজগুবি। দু-দিনের মধ্যে বিয়ে চাই, নিজেদের সব আছে, অগচ তাঁদের নাকি বিয়ের আগে কনেকে কিছু দেওয়া বারণ। ওদের কি না-কি দোষ হয়।”

নারায়ণী তুড়ি দিয়া বলিল, “দোষ না কচু! যা বৃষ্টি, তাদের আধ পয়সাবও মুরোদ নেই। বাবাকে ফাঁকি দিয়ে মেয়েটি নিয়ে যাচ্ছে। বাবাও ভাবচেন—নিগরচায় মেয়ের বিয়ে, এমন বর পেলে ছাড়ব কেন? আর সবাইকে যা ভোক করে দু-তিন-শ টাকারও জিনিষ দিতে হয়েছিল। অবিশি কিছু না দিতে পাবেন, না দিন, কিন্তু একেবারে ভিগ্বী কি আকাট মথুথব সঙ্গে যেন মেয়েটার বিয়ে না দেন, এ-কথা এখনও বাবাকে বৃষ্টিয়ে বোলো। সে সময় আছে।”

নারায়ণীর কথা শুনিয়া পীতাম্বর বলিলেন, “না গো না, তুমি মেয়েদের বৃষ্টিয়ে ব'লো সে ছেলের বাড়ির বাগান ধান চাল সব আছে। তা ছাড়া বাপ-পিতামহ টাকাকড়িও কিছু রেখে গেছেন। হাব'রের ঘরে আমি মেয়ে দিচ্ছি না। তোমা দর ভয় নেই।”

বিবাহের আয়োজন বাড়ির মেয়েরা যেমন কবিয়া পারে নিজরাই করিতে লাগিল। পীতাম্বর কানের দুল ও পায়ের মল ছাড়া নগদ পয়সা দিয়া কিছু কিনিলেন না। বড়বোন রাধারাণী পাড়ার গৃহস্থের বধ, কোনোরকম একখানা নূতন চেলির কাপড় আনিল। মেজবোন বিনোদিনী বলিল, “একা গয়না দিতে পারি এমন ক্ষমতা ত ভাই আমার নেই। তবে আমি, তুই যদি ভাই কিছু দিস, আর মাও কিছু বার করে, তবে তিন জনে মিলে তিন ভরি দিয়ে একটা সুরু দড়ি হার করানো যেতে পারে।”

আনামণি সেজবোন; সে লুকাইয়া-চুরাইয়া ধান বিক্রী করিয়া গোটাকতক টাকা করিয়াছিল, তাহা হইতেই

এক ভরি সোনার দাম দিল। মা'র কানে এক ভরির দুটা ফুল ছিল, তাহাই খুলিয়া দিলেন। সুরু ফিন্ফিনে এক গাছা দড়ি হার হইল। সেকালে মেয়েদের চক্ষে এত সুরু হার যেন অলঙ্কারের নামে পরিহাস। তবু কি করা যায়? একেবারে শুধু গলায় মেয়েকে বাহির করিতে মানবোন কাহারও ইচ্ছা করিল না।

বাড়িতে রতুনচৌকি বসিল না, আলোর মালা হুলিল না, উগানে ভিয়ান বসিল না, পাড়ায় পাড়ায় নিমন্ত্রণ হইল না, শুধু পাড়ার দুই-চার জন ভাল রাখিয়ে মেয়েকে যোগাড় করিয়া নমঃ নমঃ কবিয়া বরবাত্রীর আহ্বারের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। ময়রা-বাড়ি হইতে এক বাক দই ও এক বাক বোদ আনাইয়া মিষ্টানের কাজ সারা হইল।

সন্ধ্যাবেলা উঠানে গ্রামের বারোয়ারীর তালি-দেওয়া একটা লাল চাদোয়া টাঙাইয়া এবং একটা ময়লা সতরঞ্চি পাতিয়া বিবাহ-সভা সাজানো হইল। তাহারই উপর কে একটা পুরানো গালিচাব আসন পতিয়া দিল বরের বসিবার জন্ত।

সামান্য অলঙ্কার ও চেলী পরিয়া একটা দুই আনা দামের কাঁজলতা হাতে করিয়া কাত্যায়নী পিড়ির উপর বসিয়া বিমাইতেছিল। বিয়ে-বাড়িতে এতটা গোলমালও নাই যে, তাহার ঘুমের বাধাত ঘটাইতে পারে। হঠাৎ পাড়ার ছেলেরা ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল, “বরের পাকী দেখা যাচ্ছে রে, আলো ধর, আলো ধর; এখুনি বর এসে পড়বে।” দুটো তেল-শ্রাকড়ার মশাল ও দুটো-তিনটে লণ্ঠন আনিয়া সভার সম্মুখে খুঁটি পুঁতিয়া উঁচু করিয়া রাখা হইল, মেয়েরা তিন-চারটা শাঁক একসঙ্গে বাজাইয়া কোনোরকমে বিয়ে-বাড়ির মান রাখিতে চেষ্টা করিল। কস্তাপক্ষের পোষাক-পরিচ্ছদের ঘটর মধ্যে নারায়ণীর ছয় বৎসরের পুত্র নিরঞ্জনের সাটিনের পোষাক এবং তিন বৎসরের শিশুকন্তা কল্যাণীর এক গা গহনা। তাহাদের দুই জনকে সভা জাঁকাইতে সকলের আগে বসানো হইল।

মাত্র জন-পঁচিশ-ত্রিশ বরবাত্রী লইয়া বর আসিয়া পড়িল। অল্প হইলেও বিয়ে-বাড়িতে যত মেয়ে পুরুষ ছিল সকলেই বর দেখিতে ভীড় করিয়া ছুটিয়া আসিল। ভিন্ন গ্রামের অচেনা বর, না-জানি কেমন চেহারা, কেমন

ধরণ-ধারণ! ছোট মেয়েরা পুরুষদেরও ঠেলিয়া আগে গিয়া হাজির হইল।

বরের মামা, মেসো প্রভৃতি দুই-তিন জন ভদ্রলোক একসঙ্গে বরকে নামাইতে অগ্রসর হইলেন। কতাপক্ষের লোকেরা ব্যস্ত হইয়া বলিল, “ওকি মশায়, আপনারা কেন? আমাদের বাড়ি বর এসেচে, আমরা নামিয়ে নিচ্ছি, আপনারা সক্রম।”

বরের মামা বলিলেন, “না না, অত লোক-লৌকিকতার দরকার কি? আপনারাও যা, আমরাও তা, নিলামই বা আমরা নামিয়ে! ওতে কিছু দোষ নেই।”

বিকুচরণ বলিল, “না দেখুন, বিয়ের একটা নিয়ম ত আছে। যা চিরকাল হয়ে আস্চে, আজ তার অন্তথা কেন হবে? আমাদের কাজ আমাদের করতে দিন।”

বিকুরা সদলে অগ্রসর হইতেই বরের মামা শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “দেখো, দেখো, রাতে-ভিত্তি অন্ধকারে ছেলেটাকে যেন ফেলে দিও না। সাবধানে নামিও।”

বিকু বলিল, “কেন মশাই, আমরা কি কানা না খোঁড়া যে বরকে ফেলে দেব?”

অগত্যা মামা চুপ করিলেন। বর নামাইতে গিয়া একটা ছেল চীৎকার করিয়া উঠিল, “ওরে, তোদের বরই যে খোঁড়া দেখছি, পা এগোতে পারে না।”

পীতাম্বর বলিলেন, “চুপ কর। অন্তথা বেয়াদপি ক'রো না।”

কিন্তু সত্য সত্যই বরকে অনেক কষ্ট করিয়া নামাইত হইল। সকলেই দারুণ কৌতূহলের সঙ্গে প্রশ্ন করিত লাগিল, “কি হয়েছে, কি হয়েছে? বর পা বাড়াতে ভয় পায় কেন? কোনো চোট্ লেগেচে কি?”

রাগিয়া মামা বলিলেন, “কিছু না, কিছু না, পা ঠিক আছে। ক-দিন আগে চোখ উঠেছিল, তাই অন্ধকারে ভাল ঠাহর করতে পারচে না। তোমাদের ত এমন বিয়ে-বাড়ি যে একটু জোর আলোও নেই!”

মেয়েমহলে মহা চাঞ্চল্য পড়িয়া গেল, “আলো আবার নেই! বর কি সস্তর বছরের যে এই আলোতে দেখতে পায় না!”

নারায়ণী বিরক্ত মুখ করিয়া মাকে বলিল, “মা ও চোখ-

ওটা-টোটা কিছু নয়। আমি বল্চি নিশ্চয় বরের চোখ কানা, নইলে আগে থেকে মামা অত ব্যস্ত হয়ে ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় করত না। আমি নিজে যাব, সামনে গিয়ে দেখে আসব, বর চোখে দেখতে পায় কি না।”

মা চোখে আঁচল দিয়া কান্না শুরু করিলেন, “ওরে আমার কাতু, তোর কপালে মা শেষে এই ছিল!”

নারায়ণী গলা উঁচু করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, “কানা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে কত লাখ টাকা বাঁচালে, বাবা? নিজের মেয়ের উপরও একটু মায়্যা হ'ল না? ওই ত তোমার শেষ, আর ত কেউ জ্বালাবে না।”

মা বলিলেন, “ওরে বাছা, খাম্ আর গোলমাল বাধাস্ নে। মেয়েটার অদৃষ্টে বা আছে তা ত হবেই। এর পর আর লগ্নভ্রষ্ট ক'রে জাতজন্ম খোঁয়াস্ নে।”

নারায়ণী বলিল, “অদৃষ্ট অদৃষ্ট ক'রো না মা। বেশ জান যে তোমরাই ওর অদৃষ্ট। কই—বাবা, বলুন দেখি জেনে-শুনে কানা ছেলের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেন নি।”

পীতাম্বর অত্যন্ত মিহি-সুরে বলিলেন, “হ্যাঁ, চোখ একটু খারাপ তা শুনেইছিলাম, কিন্তু তখন ত দেখে বুঝতে পারি নি যে একেবারে এত কম দেখে।”

পীতাম্বর কি বলিলেন না-শুনিতে পাইলেও বরের মামা আন্দাজে বলিলেন, “আপনি মশায় সমস্তই জানতেন। জেনে-শুনেই মেয়ে দিতে রাজি হয়েছিলেন; আমরা কাউকে ঠকাই নি। এখন এরকম বলা অত্যন্ত অন্তায়।”

নারায়ণী স্ত্রীজাতির লজ্জাধর্ম ভুলিয়া পিতার হইয়া জবাব দিল, “ঠকান বা নাই ঠকান, ওছেলের সঙ্গে বিয়ে আমরা দেব না। আপনারা বর তুলে নিয়ে যান। বিয়ে আমরা ভেঙে দিলাম। স্তায়-অস্তায় বুঝি না।”

মা ছুটিয়া তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিলেন, “ওরে কি বল্তে কি বল্চিস্, কিছু কি হ'স নেই তোর? বর তুলে নিয়ে গেলে জাত যাবে কি ওদের, না আমাদের? ও পোড়াকপালীকে নিয়ে তখন আমি কি করব?”

নারায়ণী বলিল, “তোমাদের ধোপা-নাপিত সব কি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল যে অন্ধের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে না দিয়ে পারছিলে না!”

বরযাত্রীর দলের একটা ছেলে চীৎকার করিয়া বলিল, “ধোপা-নাপিত বন্ধ হবে কেন, রান্নাবরে হাঁড়ি চড়া বোধ হয় বন্ধ হয়েছিল। হাজার টাকায় রক্ষা হয়েছে, তা বৃষ্টি কড়া বাড়ি এসে বলেন নি! আগাম পাচ-শ এখনও টাকাকে হাত দিলে দেখা যায়। এখন বিয়ে দেব না বললে শুধু কি জাত যাবে, মাথাও যাবে সঙ্গে সঙ্গে।”

সভা জুড়িয়া হুড়াহুড়ি চেঁচামেচি পড়িয়া গেল।

লগনের আলোঙলা কাহারো আছাড় দিয়া ভাঙিয়া দিল। অন্ধকারে অন্ধ-বর ও ঘরের ভিতর অশ্রুমুখী ক’নে নীরবে বসিয়া রহিল। বাকী স্ত্রীপুরুষ যে যেখানে ছিল সকলেই উত্তেজিত হইয়া চেঁচামেচি করিতে লাগিল। অস্পষ্ট আলোতে মুখ দেখা যায় না বলিয়া গলার স্বর সকলেরই সপ্তম চড়িতে লাগিল। কল্পাপক্ষীরেও এখন পীতাম্বরকে দিক্কার দিতে ছাড়িল না, “শেষে টাকার লোভে মেয়ে বেচা, ছিঃ!”

বরের মামা আশ্ফালন করিতেছেন, “আমাদের টাকা ফিরিয়ে দিন, আমরা বর তুলে নিয়ে যাই। কনের বাড়ি এসে এমন অপমান আমরা সহ্য করব না।”

নারায়ণী তখন একেবারে সভার মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছে। ছেলেদের ডাকিয়া সে বলিতেছে, “তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ নেই ভাই, যে, আমার বোনটার জাত রক্ষা করতে পারে?”

কেহ জবাব দিল না, কেহ কাছে আসিল না।

নারায়ণী বলিল, “আমি যত দিন খেতে পাব, কাতু আর কাতুর বরের তত দিন অল্পের অভাব হবে না, এ আমি ধর্ম-সাক্ষী ক’রে বল্চি, তবু কি আমার বোনের বিয়ে আজ হবে না? দেখ আমি ছেলেপিলের মা, মিথ্যা বড়াই করবার সাহস আমার নেই।”

গ্রামের একটি দরিদ্র পিতৃমাতৃহীন বালক আসিয়া নারায়ণীর সম্মুখে দাঁড়াইল। নারায়ণী তাহার হাত ধরিয়া

বসাইয়া অস্ত্রপুরে কাত্যায়নীকে আনিতে চলিল। অশ্রুধারায় কাত্যায়ণীর বুক তখন ভাসিয়া যাইতেছে।

অন্ধ বরের দলবলেরা এদিকে বিপুল কোলাহল করিয়া ফিরিবার উজ্জোগ করিতেছে। পীতাম্বর কম্পিত হস্তে বরের মামার হাতে টাকা গণিয়া দিতেছেন। আর সকলে চীৎকার করিতেছে, “ওরে ছোটলোকের বাড়ি বিয়ের সম্বন্ধ ক’রে মানসম্মত সব গেল।” কেহ বলিতেছে, “মেয়েবেচা বামুনের আবার জাঁক দেখ। পদ্মলোচন বর চাই।” কেহ বলিতেছে, “একেবারে জোচ্ছোর, সব জেনে-শুনে টাকা নিয়ে এখন আবার সাধু সাজা হচ্ছে।”

অন্ধ অন্ধকারে ভাঙা সভায় মহা কলরবের মধ্যে সজ্জনয়না কাত্যায়ণীর বিবাহ হইয়া গেল।

পীতাম্বর নারায়ণীর হাত ধরিয়া বলিলেন, “কাতুর গতি ত মা, তুমিই করলে, এখন ছেলেটারও একটা ব্যবস্থা তুমি ছাড়া আর কে করবে? তোমাদের বিরক্ত করব না ব’লেই এ-সম্বন্ধটা করেছিলাম, ছেলেটার খরচ ওরাই চালিয়ে দিত। তা আমার কপালে সবই মন্দ হ’ল। এখন তুমি ছাড়া আর কার ভরসা করব মা?”

নারায়ণী বলিল, “বাবা ছেলের জন্ত মেয়েটাকে বলি দিচ্ছিলে—আর এখন ও-ছেলের কথা তুলো না।”

পীতাম্বর বলিলেন, “তোরও ত মা ছেলেমেয়ে আছে। দেখ্‌বি বড় হ’লে নিরঞ্জনের আগে কল্যাণীকে বসাতে পারবি না। মেয়েসন্তান হাজারই হোক পর বইত নয়। তার লাখ টাকা থাকলেও বাপ ভিথিরী। নিজের মেয়ে হতেই এ-জ্ঞান তোঁর হবে এই আশীর্বাদ আমি করচি।”

নারায়ণী বলিল, “আমিও বাবা, তোমার পায়ে হাত দিয়ে বল্চি আমার ছেলেতে মেয়েতে কোন প্রভেদ নেই এ আমি তোমাদের দেখাব।”

সে বলিতে পারিল না, “তোমার ছেলের জন্তে মুখে কালি মাখ্ছিলে, ভাগিস্ এই মেয়ে ছিল তাই রক্ষা করল।”

বিষ্ণু শুধু মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, “বাবা, মার গয়না-গুলো বেশী দাম দিয়ে ছোটদিই কিনেছিল। নইলে ও মরা-সোনা কে অত দাম দিয়ে নিত?”

বাংলা-সাহিত্যে 'মহাকাব্য'

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, এম-এ

১

আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে লইয়া যাঁহারা আলোচনা করেন, মাঝে মাঝে তাঁহাদের নিকটে একটা মস্তবা শোনা যায়,— বাংলা-সাহিত্যে মহাকাব্য রচিত হইল না, ইহা নিতান্তই দুর্ভাগ্যের কথা ও অক্ষমতার পরিচয়। গীতিকাব্যে খণ্ডকাব্যে কবিত্বপ্রবণ বাঙালী জগতের দরবারে নিজের একটা বিশেষ স্থান গড়িয়া লইয়াছে, এবং বাঙালীর এই স্বাভাবিক কবিত্বপ্রাণতা তাহাকে ভারতীয় অন্যান্য জাতির নিকট দোষ ও গুণের অদ্ভুত সংমিশ্রণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে; কিন্তু কাব্য ছাড়াইয়া মহাকাব্য পর্য্যন্ত সে উঠিতে পারে নাই, বাঙালী সমাজেও এইরূপ অভিযোগের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব বাংলার উপর যথেষ্ট পড়িয়াছে, সাহিত্যের রূপের উপর, ভাবের উপর একটা দাগ রাখিয়াছে, তাহা সহজে মুছিবার নয়। গীতিকাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব অবিসম্বাদিত; বর্তমান যুগের ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে সাক্ষাৎভাবে পাশ্চাত্য প্রভাব বক্ষে ধারণ করিতেছে। “কিন্তু সে সব লঘুসাহিত্য, খানিকটা চাপল্যামাত্র-প্রণোদিত; মহাকাব্যের মহাভাব তাহাতে কোথাও নাই।” পাশ্চাত্য ‘এপিক’ কি তবে সমঝদার সুরসিক কবিত্বদয় বাঙালী লেখকের কোনও কাজে আসে নাই? পাশ্চাত্য প্রভাবে পুষ্ট বাংলা-সাহিত্যে মহাকাব্যের বা পাশ্চাত্য এপিকের ছাপ কই?

২

আমাদের দেশে প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা মহাকাব্যের গঠন সম্বন্ধে খানিকটা ধরা-বাধা নিয়ম রচনা করিয়া গিয়াছেন। অষ্টাদশ-ভাষা-বারবিলাসিনী-ভৃঙ্গঙ্গ সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে—

সর্গবন্ধো মহাকাব্যঃ তত্রৈকো নায়কঃ স্তনঃ ।

সংস্রঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি ধীরোদাত্তগুণাধিতঃ ॥

একবংশতয়! ভূপা! কুলজা বহুবোহপি বা ।
শৃঙ্গারবীরশাস্ত্রানামেকোহঙ্গী রস ইবাতে ॥
অঙ্গানি সর্বোহপি রসাঃ সর্বো নাটকসঙ্করঃ ।
ইতিহাসোদ্ভবঃ বৃত্তমন্ত্রঃ সঙ্কনাশ্রয়ম্ ।
চত্বারস্তম্ভ বর্গাঃ স্ত্য স্ত্যেধেকং চ ফলং ভবেৎ ॥
আদৌ নমস্ক্রিয়াশীর্ষা বস্তুনির্দেশ এব বা ॥
কচিল্লিন্দ! থলাদীনাং সত্রাং চ গুণবর্ণনম্ ।
একবৃত্তময়ে: পট্টোরবসানে হস্তবৃত্তকৈঃ ॥
নাতিস্বল্পা নাতিদীঘাঃ সর্গা অষ্টাধিকা ইহ ।
নানাবৃত্তময়ঃ কাপি সর্গঃ কশ্চন দৃশ্যতে ॥
সর্গান্তে ভাবিসর্গসা কথায়াঃ সূচনং ভবেৎ ।
সঙ্কাস্থ্যেযান্দুরজনীপ্রদোষধ্বাস্তবাসরাঃ ।
সম্ভোগবিপ্রলম্বো চ মুনিম্বর্গপুরাধ্বরাঃ ।
রণপ্রয়াণো পঘন-মন্ত্র-পুরোদায়াদয়ঃ ।
বর্ণনীয়া যথাযোগ্যং সাক্ষোপাস্ত্র! অমী দশ ॥
কবেবু ভূসা বা নাম! নায়কস্তোত্রসা বা ।
নামাসা সর্গোপাদেয়কথয়া সর্গনাম তু ॥

বহু সর্গ লইয়া মহাকাব্য রচিত হয়, তাহার মধ্যে প্রধান এবং দেবতাস্বভাব নায়ক থাকিবেন এক জন, তিনি সঙ্গশস্যভূত, ক্ষত্রিয়, এবং ধীরোদাত্তগুণযুক্ত। কাব্যের নায়ক হইবেন প্রধান কোন বংশের রাজা, অথবা সংকুলোৎপন্ন বহু ভূপাল; এবং অঙ্গী বা প্রধান রস হইবে শৃঙ্গার, বীর, শাস্ত্র ইহাদের মধ্যে একটি রস, অন্য সকল রস হইবে তাহার অঙ্গ মাত্র। ইহার মধ্যে নাটকের পঞ্চসঙ্কি বিরাজিত থাকিবে, এবং ইতিহাসের, অথবা সঙ্কন লইয়া, কোনও ব্যাপার আশ্রয় করিয়া ইহার রচনা হইবে। ইহার সামনে থাকিবে চতুর্ভুগ এবং কাব্য তাহার একটি ফল প্রসব করিবে। নমস্কার, আশীর্ষক বা মঙ্গলাচরণ—ইহাদের মধ্যে কোন একটি দিয়া ইহার আরম্ভ হইবে; কোথাও থাকিবে খলের নিন্দা কোথাও বা সঙ্কনের গুণবর্ণনা। এক এক সর্গে একই বৃত্ত থাকিবে, শুধু সর্গান্তে ছন্দ-পরিবর্তন ঘটিবে। সর্গগুলি খুব ছোটও হইবে না, খুব বড়ও হইবে না, সংখ্যায় আটটির বেশী হইবে। কোথাও কোথাও এক সর্গের মধ্যেই নানা বৃত্তের অবতারণা।

এক সর্গের শেষে পর সর্গের কথা নির্দেশ করিয়া দিতে হইবে। সন্ধ্যা, সূর্য্য, চন্দ্র, রজনী, প্রদোষ, অন্ধকার, দিন, সন্ধ্যা, বিপ্রলম্ব, মূনি, স্বর্গ, নগর, অক্ষর, রণপ্রয়াণ, বিবাহ, মঙ্গ, পুত্রের জন্ম—এই সকল সবিস্তরে বর্ণনা করিতে হইবে। সর্গের নামকরণ হইবে কবি, তাঁহার চন্দ্র, তাঁহার নায়ক বা অন্য কাহারও নামে, অথবা সর্গস্থিত কোন উপাদেয় কথা অনুসারে সর্গের নাম হইবে।

কোন বিশেষ সাহিত্যকে সংজ্ঞা দিয়া বর্ণনা করিয়া ঠিক বোঝান যায় না, সাহিত্যের রস তো নিত্যান্তই সন্দেহবেদ্য, তবু ভিন্ন ভিন্ন রীতির পার্থক্য বুঝিতে গেলে এইরূপ সংজ্ঞা বা বর্ণনা ভিন্ন উপায় নাই। অবশ্য কার্যতঃ এই সংজ্ঞা সর্বত্র রক্ষিত হইত না। বিবয়-গৌরবে শ্রীজয়-দেবের গীতগোবিন্দও মহাকাব্য। যাহা হউক, কৌতূহলী পাঠক অধীত পাশ্চাত্য মহাকাব্যের সহিত ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের নির্দেশ মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

৩

ইউরোপীয় 'এপিক্' কথাটার মূলেও 'বৃত্ত' বা 'কাব্য' রহিয়াছে; উপাখ্যান এরূপ কাব্যের প্রাণ। 'ইপ্‌স্' শব্দটার অর্থ গল্প, এপিক কথাটার অর্থ 'গল্প-সম্বন্ধীয়'। গম্ভীরভাবে গুছাইয়া যে-কোন উপাখ্যান গল্প করা হয় তাহারই নাম এপিক। ইহার পিছনে যে শুধু বীর-রসের ভাব রহিয়াছে তাহা নয়, প্রাচীন গ্রীসে ব্যক্তিগত অবদানের সঙ্গে সঙ্গে নীতি ও ধর্মের অনুযায়ী আদর্শও প্রচুর ছিল। হোমারের পূর্বেও গ্রীসে এপিক ছিল, তবে সেই সকল এপিক-রচয়িতা কবিদের নাম পাওয়া যায় না। খ্রীঃ-পূঃ সপ্তম শতকে এক জন স্ত্রী মহাকবি ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়া থাকেন। তিনি কবিপ্রতিভায় হোমারের সমকক্ষ ছিলেন এরূপ মন্তব্যও শুনিতে পাওয়া যায়। ভার্জিল খ্রীঃ-পূঃ ৩০ অব্দে তাঁহার মহাকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের সকলেরই মধ্যে মূলগত এপিক-প্রবৃত্তি বা মহাকাব্যের প্রেরণা ছিল। মধ্যযুগে এই প্রবৃত্তি কমিয়া গিয়াছিল; কিন্তু লুইগি পুর্চি, বইয়ার্দো, অ্যারিওষ্টো ও ট্যাসো প্রভৃতি কবিগণ মূল এপিক আদর্শে কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের পরে খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে

ইংরেজ কবি মিল্টনের আবির্ভাব। হোমার-ভার্জিলের মত মিল্টনের মনেও এপিকের গম্ভীর মূর্ত্তি বিদ্যমান ছিল; অনন্ত আকাশ, মহাশূন্য, অপরিসীম ব্যোম,—তাঁহার কল্পনার রঙ্গভূমি। এপিকের উদার আদর্শ লেখকের সম্মুখে জাজ্জ্বল্যমান থাকা উচিত: নতুবা গুরুগম্ভীর শব্দ বা শব্দের কারণভূত ভাব কি করিয়া স্ফূর্ত্ত হইবে?

ইউরোপীয় এপিকের মধ্যে মোটামুটি তিনটি উপাদান লক্ষ্য করিতে পারা যায়। তাহার ভাবাধার, তাহার শব্দ-সম্পদ, তাহার শব্দের বাধুণী। এপিকের পক্ষে তিনটিই অপরিহার্য, একটিকেও বাদ দিলে চলে না। প্রথমতঃ, এপিকের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকা চাই, নাটকের প্রাণ যে ঘটনা তাহা থাকা চাই; আরিস্ততল বলিয়া গিয়াছেন, নাটকীয় গুণ সঙ্গে সঙ্গে না থাকিলে এপিক উৎকৃষ্ট হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, কথার বাধুণী থাকা চাই, বাছিয়া বাছিয়া শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহাতে ধ্বনিতেই মনের মধ্যে একটা গম্ভীর উদাত্ত ভাব জাগিতে পারে; কীট্‌স্ যেমন শব্দ-বন্ধনকে প্রেমিকের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, এপিক কবিও তেমনি দেখেন। কাব্য ত শুধু ভাবের সমষ্টিমাত্র নহে, ভাব না-হয় তাহার প্রাণ হইল, কিন্তু সে প্রাণের উপযুক্ত দেহ করিতে হইবে, এমন দেহ করিতে হইবে যাহাতে প্রাণের সুষমা, শক্তি, মাধুর্য্য সকলই অভিব্যক্ত হয়। এইরূপে ভাবাধার, শব্দসম্পদ ও শব্দবিভাস—এই তিনটির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কবির মহাকাব্য রচনা করেন। এই তিনটির প্রতি দৃষ্টি রাখিলে চরিত্র-চিত্রণ প্রভৃতি আপনিই উন্নত হইবে।

৪

বর্তমান যুগে বাংলা-সাহিত্যে যে-সব কাব্য বিরচিত হইয়াছে তাহাদের উপর প্রাচীন ইউরোপ ও প্রাচীন ভারত উভয়েরই প্রভাব কাজ করিয়াছে, এ-কথা বলা যায়। ইংরেজী ১৮৬৩ সালে পয়ার ছন্দে ইলিয়াডের বাংলা অনুবাদ হয়। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এই কবিত্রিতয় বাংলা-সাহিত্যে এপিকের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। যথাক্রমে ইহাদের কাব্যরচনারীতির আলোচনা করিব।

মধুসূদন তাঁহার বাংলা কাব্যের মধ্যে 'তিলোত্তমাসম্ভব'ই

সর্বপ্রথমে রচনা করেন। এই কাব্যের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা, উহা ঠিক ঠিক এপিক নয়, তবু বাংলা ভাষায় প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'খণ্ড এপিক'। তাহার পরে মেঘনাদবধ; এখানে রাম-রাবণ ও ইন্দ্রজিতের চরিত্রই ছিল তাঁহার প্রধান উপজীব্য; ইহাকেও তিনি খণ্ড এপিক বা epicling বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।*

পৌরাণিক চরিত্র আশ্রয় করিয়া ইউরোপীয় এপিকের আদর্শে তিনি সেই চরিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইউরোপীয় মহাকাব্যেদের মধ্যে তাঁহার আদর্শ ছিলেন মিল্টন, হোমার নহেন। তাই বলিয়া কি তিনি অন্য কাহারও নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করেন নাই? মেঘনাদবধের দ্বিতীয় সর্গে “কোন্ দেব মোহের শৃঙ্খলে” ইত্যাদি কথা মেঘের কথা ইলিয়াড চতুর্দশ ভাগ হইতে, রতির পরিকল্পনা অ্যাক্রোদিতে হইতে, প্রমীলা-চরিত্র টাসোর মহাকাব্য যেক্সালেম-উদ্ধারের চতুর্থ সর্গ হইতে, দশরথের নরকদর্শন ভর্জিলের মহাকাব্য হইতে অল্পবিস্তর গৃহীত। তিলোত্তমা-সম্ভব লিখিতে গিয়া কবির মনে বিদ্রোহভাব তেমনধারা জাগে নাই, কিন্তু মেঘনাদবধ আরম্ভ করিয়া তিনি যেন প্রাচীন ভারতীয় কাব্যাদর্শ হইতে নিজের দূরত্ব বোধ করিতে লাগিলেন। যে-দেশে সাহিত্য-রচনার নিয়ম বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে,—“রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যম্, ন তু রাবণাদিবৎ”—সেখানে বঙ্গুর নিকট সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন, Ravan inspires me with enthusiasm; he is a Grand Fellow; মধুসূদন নিজে যেমন বিদ্রোহী ছিলেন, তেমন বিদ্রোহকে ভাল করিয়া বুঝিতেও পারিতেন।

মেঘনাদবধের পর মধুসূদন খণ্ডকাব্যাদি লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মনে বরাবরই এপিক লিখিবার একটা আগ্রহ ছিল, মেঘনাদবধ ত তাঁহার শুধু হাত পাকাইবার উপায় মাত্র। অবশেষে যে সনেট বা খণ্ডকাব্য লিখিয়া তাঁহাকে দিন কাটাইতে হইবে, সে-চিন্তা তাঁহার অসহ ছিল। তাঁহার বন্ধু রাজনারায়ণ বাবু সিংহল-বিজয় লইয়া মহাকাব্য রচনা করিবার জন্ত পূর্বেই তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন;

* “Let me write a few Epiclings and thus acquire a pucca fist.”—যোগীন্দ্রনাথ বসু-কৃত জীবনী, ৫ম সংস্করণ, ৩১৩ পৃ:।

কারণ মেঘনাদবধের ভিত্তি ছিল রামায়ণ-কথা, তাহা পৌরাণিক কাহিনী, সুতরাং রাজনারায়ণ বাবুর মতে তাহার ঐতিহাসিকতা কিছুই ছিল না। সিংহল-বিজয় মহাকাব্যে বাঙালীর জাতীয়তার ক্ষুধা মিটিবে, ঘটনাও বাঙালীর অতীত জাতীয় গৌরবের নিদর্শন, এবং তাহার ঐতিহাসিক ভিত্তিও আছে,—অন্ততঃ রাজনারায়ণ বাবু তাহাই মনে করিয়াছিলেন; মধুসূদনও পরে এক সময়ে সিংহল-বিজয় লইয়া মহাকাব্য রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মহাকালের আহ্বানে তাঁহাকে সংসারের কর্ম হইতে অসময়ে অবসর লইতে হইল।

রঙ্গলাল (১৮২৬-৮৭) কিন্তু মাইকেলের মত মিল্টনের মহাকাব্যে আকৃষ্ট হন নাই। তিনি বাংলা-সাহিত্যের উন্নতি বিষয়ে আস্থাবান ছিলেন; বাংলা কাব্য যে নিত্যমু অকিঞ্চিৎকর নহে তাঁহার Defence of Bengali Poetry তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পদ্মিনী উপাখ্যান রচিত হয়; তাহাতে “আধুনিক রুচি” মানিয়া চলিবার ইচ্ছা স্বীকার করা হইয়াছে। বিশুদ্ধ ইংরেজী রুচিকে তিনি বাঙ্গা করেন নাই, বরং কন্দর্ভদেবীতে (১৮৬২) স্কটের Lay of the Last Minstrel-এর ছায়া পড়িয়াছে। শূরেন্দ্ররীতেও (১৮৬৮) স্কট-বাইরণের প্রভাব দেখা যায়। সাত সর্গে সমাপ্ত কাঞ্চীকাবেরী শুধু ‘ঐতিহাসিক কাব্য’, কিন্তু কুমারসম্ভব ‘মহাকাব্যে’র সাত সর্গ তিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট অংশ হইতে বাছাই করিয়া কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ করেন, তাহা পরিশিষ্টে স্থান পাইয়াছে। পুরাণ ত্যাগ করিয়া আধুনিক ইতিহাস হইতে উপাখ্যান কেন তিনি গ্রহণ করিলেন, তাহার কৈফিয়ৎ তিনি পদ্মিনী উপাখ্যানের ভূমিকাতেই দিয়াছেন।* প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শ

* “পুরাণেতিহাসে বর্ণিত বিবিধ আখ্যান ভারতবর্ষীয় সকল লোকের কণ্ঠস্থ বলিলেই হয়, বিশেষতঃ ঐ সকল উপাখ্যান মধ্যে অনেক অলৌকিক বর্ণনা থাকিতে অধুনাতন কৃতবিদ্যা যুবকদিগের তত্ত্বাবৎ শঙ্কাই নহে এবং এতদ্দেশীয় জনসমাজে বিদ্যা-বৃদ্ধির বাস্তব মহানুভবদিগের মতে তদ্রূপ অদ্ভুত-রসাপ্রিত কাব্যপ্রবাহে ভারতবর্ষীয় যুবকদিগের অত্যাধিক চিত্তক্ষেত্র প্রাবিত করা কর্তব্য নহে।...ঈশ্বরের লোকের গরিমাপ্রতিপাদ্য পদ্মপাঠে লোকের আশু চিত্তাকর্ষণ এবং তদৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধান হয়, এই বিবেচনায় উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রোতিহাস অবলম্বন পূর্বক মৎ কর্তৃক রচিত হইল।”

ঠাহার মধ্যে যুগপৎ মিলিয়াছে ; এক দিকে তিনি লৌকিক সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রাচীন ও মধ্য যুগের ধর্মসাহিত্য নয়, অন্য দিকে আবার তিনি প্রাচীনকালস্থলভ অনুপ্রাসের বহুল প্রয়োগ করিয়াছেন, যেমন—“দিল্লীর দৌর্দণ্ড দর্প-দীপ্ত দশ দিশি।” রঙ্গলাল মহাকাব্য রচনা করেন নাই, কিন্তু ঠাহার কবিতা পাশ্চাত্য আদর্শের অনুসরণ করিয়াছে, এবং তিনি মহাকাব্য-রচনার পথে চলিয়াছেন, ইতিহাসের ঘটনা ও সজ্জনের জীবনকথা আশ্রয় করিয়া বাছিয়া বাছিয়া শব্দপ্রয়োগ করিয়া কাব্য লিখিয়াছেন, ঠাহার রচনার সংক্ষিপ্ত আকার ভুলিয়া গেলে মহাকবিদের সঙ্গে এক পর্যায়ে ঠাহাকে ফেলা যাইত।

মাইকেলের পর হেমচন্দ্র (১৮৩৮-১৯০৩) মহাকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। হেমচন্দ্র ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বৃত্তসংহারের প্রথম ভাগ প্রকাশিত করেন। দুই ভাগে ইহার সর্গ-সংখ্যা চব্বিশ। কাব্যকে কবি যে রূপ দিয়াছেন তাহা পাশ্চাত্য-বেঁয়া, সন্দেহ নাই। সর্গের সংখ্যা অর্থাৎ কাব্যের দৈর্ঘ্য লইয়া আলোচনা করিলে তাহা বুঝা যাইবে। প্রথম সর্গে বর্ণিত অমুর-মন্ত্রণাসভা মিল্টনের অমুর-সভারই অনুরূপ ; দ্বাদশে সরস্বতীর আহ্বান,—ইহাতে হেমচন্দ্র মিল্টনের ও তদনুগামী মাইকেলের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন ; ত্রয়োদশে, যে সোনার আপেল স্বর্গের দেবীদের মধ্যেও স্বন্দের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার অবতারণা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া শচীহরণ, টাসোর কাব্যে সফোনিয়াকে অপহরণ করার ভাব লইয়াই লিখিত, এবং হেমচন্দ্রের নিয়তিদেবী গ্রীক “ফেট”-এর প্রতিচ্ছায়া। বৃত্তসংহারের অন্তর্নিহিত ভাবও অতি গভীর ;—বীরবাহু, ছায়াময়ী, আশাকানন,—ইহারা মৌলিক হটুক আর অনুবাদ হটুক, কাব্য মাত্র, কিন্তু বৃত্তসংহার, মহাকাব্য।

যে বৎসর বৃত্তসংহারের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়, সেই ১৮৭৫ অব্দেই নবীনচন্দ্র (১৮৪৬-১৯০৯) পলাশার যুদ্ধ রচনা করেন। জুলিয়াস সীজার, রিচার্ড দি থার্ড ও প্যারাদাইজ লষ্ট, চাইল্ড হারল্ড,—শেক্সপীয়ার, মিল্টন, বাইরন,—ইহাদের ছায়া পলাশার যুদ্ধে রহিয়া গিয়াছে। তাহা ভিন্ন নবীনচন্দ্র রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস এই তিন ভাগে কৃষ্ণচরিত্র অবলম্বন করিয়া হিন্দু জাতীয়তার

যে কাব্যময় ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতে রসিক বাঙালী পাঠকের এপিক পাঠ করিবার স্পৃহা চরিতার্থ হইবার কথা ছিল। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য লীলা যথাক্রমে ইহাদের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্যত্রিতয়ের সমাবেশে আর্য্য-অনার্য্য-সম্বর্ষের এক মহান ইতিহাস, ব্রাহ্মণ-দ্রাবিড় সভ্যতার বিরোধের বার্তা নিহিত রহিয়াছে ; সে ইতিহাসের গভী স্মৃহৎ, তাহার দৃষ্টি উদার। ইউরোপীয় মহাকাব্যে যে বিশালতার ভাব রহিয়াছে সেই বিশালতা, কাব্যত্রিতয়ে সম্পূর্ণ এই মহাকাব্যে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইবে। ভারতীয় সভ্যতার এক অত্যাঙ্কল যুগের আনন্দ, সঙ্কট ও গুণ কবি মনশ্চক্ষে দেখিয়াছিলেন, এবং অতীতের যাহা সর্কাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাহাকে কেন্দ্র করিয়া সে যুগের দার্শনিক চিত্র ঠাহার লেখনীর সাহায্যে পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছিলেন। কবি নিজে পাশ্চাত্য ভাবের কঠোর সমালোচক ছিলেন ; সে কঠোরতা এত দূর ছিল যে বঙ্কিমের উপন্যাসে ভারতীয় আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, বঙ্কিম-সাহিত্যে আদর্শ চরিত্রের একান্ত অসম্ভাব, তাহাও বলিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি নিজে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই উভয় দৃষ্টির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং এইরূপ চেষ্টায় অগ্রণী না হইলেও যথাসাধ্য দুই দিকের আলোকে পথ চলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপ ভাবে নূতন সাহিত্যের আদি যুগে মহাকবিগণ এপিকের আদর্শ কাব্য রচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং যথাসম্ভব সিদ্ধিলাভও করিয়া গিয়াছেন।

৫

মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের পর নানাবিধ-বিহগ-কাকলীমুখর বাংলার বিশাল সাহিত্যোদ্যানে এপিকের কি আর সৃষ্টি হয় নাই ? বাংলার কাব্যকুঞ্জ এপিক সম্বন্ধে কি গভীর নীরবতাই বিরাজ করিয়াছে ? আজও বাংলার প্রধান গর্ব তাহার সাহিত্য, তাহার প্রধান আশ্রয় কাব্য-সাহিত্য। তবে কেন এই এপিক-ভীতি, এই মহাকাব্যে বিরাগ ? যিনি আমাদের কবিসম্রাট তিনি নিজেই বে, এমন কি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশ সত্ত্বেও, জীবনযাত্রার প্রথম মুহূর্তে মহাকাব্যের কথা সাহিত্য-সাধনা হইতে বাদ

দিয়াছেন। ঋণিকায় তিনি বলিয়াছেন, মহাকাব্য রচনা করিবার কথা তাঁহার মনে উঠিয়াছিল,—

আমি নাব্ব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে,—

এমন সময় তাঁহার মানসী সুন্দরী আসিয়া বিরোধের সূচনা করিল, কবি তাঁহার অপূর্ব জীবন্ত ছন্দে সে অন্তর্বিবোধের কথা বলিয়া গিয়াছেন,—

ঠেকল কখন তোমার কাঁকণ
কিঙ্কিণীতে
কল্পনাটি গেল কাটি
হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাবা
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে জড়িয়ে আছে
কণায় কণায়।
আমি নাব্ব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে।

মহাকাব্যের বিধিনিয়ম সবই তাঁহার জানা ছিল, তবু প্রেমের কথায় তাঁহার প্রাণ ভরিয়া গেল, যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা লিখিবার আর অবসর রহিল না।

হায় রে কোথা যুদ্ধ কথা
হৈল গত
স্বপ্ন মত!

পুরাণ-চিত্র বীর-চরিত্র
অষ্ট সর্গ
কৈল খণ্ড তোমার চণ্ড
নয়ন-পড়ল!
রৈল মাত্র দিবা রাত্র
প্রেমের প্রলাপ
দিলেম ফেলে ভাবী-কৈলে
কীর্ত্তি-কলাপ!
হায় রে কোথা যুদ্ধ কথা
হৈল গত
স্বপ্ন মত।

উপন্যাস রচনা করিতে গিয়াও রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ঐতিহাসিক ঘটনা আশ্রয় করিয়াছিলেন, কিন্তু ‘ভাবী-কৈলে কীর্ত্তি-কলাপ’ তাঁহাকে বেশী দিন বাধিয়া রাখিতে পারিল না—তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটনার সূল আবরণ ত্যাগ করিয়া মানব-হৃদয়ের গূঢ়তম রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে থাকিলেন, মানব-মনের রহস্যলোক তাঁহাকে আকৃষ্ট করিল,—

মহাকাব্য বা এপিক তাঁহাকে পাইল না, কবির বাশরীতে গীতিকাব্য অপূর্ব শক্তি ও সৌন্দর্য্য লাভ করিল।

৬

বাংলা-সাহিত্যের এই সকল যশস্বী কবির কথা ছাড়িয়া দিলে আরও বহু কবির কথা আমরা জানিতে পারি; তাঁহারা প্রধানতঃ মধুসূদন নবীনচন্দ্রের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছেন, কেহ বা নবীনচন্দ্রের আদর্শে, কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দে, রচনা করিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে Paradise Lost-এরও বাংলায় অনুবাদ হইয়াছিল— ‘ত্রিদিব-চ্যুতি’ মহাকাব্যের পৃথি-সন্ধান পর্ব প্রকাশিত হইয়াছিল। গৌরীভার রাখালদাস সেন স্কটের Lay of the Last Minstrel-কে ‘শেখবন্দীর গান’ নাম দিয়া অনুবাদ করেন: মূলের সহিত এই অনুবাদ প্রতি চরণে মিলাইয়া দেখিতে পারা যায়।

হৃদয় সে পদ বাতাস শীতল,
প্রাচীন দুর্বল গায়ক তায়:
লোল গণ্ডদেশ বসন্তল ধবল,
ছিল ভাগ্যবান প্রকাশ পায়।
একমাত্র বীণা তাঁহার সম্বল,
রয়েছে অনাথ শিশুর করে,
একমাত্র তিনি গায়ক কেবল
জীবিত আছেন গীতের তরে।

কিন্তু অকৃত্র,—

আছে কি মানব কেহ হেন মুঢ়মতি,
আপনারে নিজে যেই বলেনি কখন,
এই দেশ, এই মোর দেশ, হর্মমতি,
অস্তুরে হৃদয় যার জ্বলেনি তখন,
গৃহমুখে পদ যবে করে সঞ্চালন,
দূরস্থিত বহুদেশ করিয়া ভ্রমণ?
... ..

দেখিতে যদ্যপি চাও মেলরোজ কেমন,
যাও, দেখ গিয়া এরে কোমুদী উৎসবে,
কেননা প্রথররশ্মি সূর্য্যের কিরণ,
দেখায় তাঁহার যত দোষগুণ সবে,
কাল হয়ে শোভে যত খিলান যখন,
স্তম্ভবৃত্ত দৃষ্ট হয় কিবা বাতায়ন।

ইংরেজী মূলের সহিত বাংলা অনুবাদের চমৎকার মিল আছে; বাঙালী অনুবাদকের নিষ্ঠা, ধৈর্য্য ও ইংরেজী কাব্যানুরাগের পরিচয় আমরা এখানে পাই, যদিও পাঠককে ইহা বলিয়া দিতে হইবে না যে ইহা মহাকাব্য নহে।

মেঘনাদবধ কাব্যের অনুসরণ অথবা অনুকরণে কয়েকখানি কাব্য রচিত হয়। দুই জন কবি তাহার পরিশিষ্ট পর্য্যন্ত রচনা করিয়াছেন; এক জনের নাম রাজকৃষ্ণ কুণ্ডার, এবং তাঁহার সম্বন্ধে পরিচয় দিতে গিয়া কেহ এত দূর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে ইহার কাব্য বাংলা ভাষায় বিদেশীয় যুদ্ধকৌশল বর্ণনায় মেঘনাদবধকেও পরাস্ত করিয়াছে। প্রথম সর্গ হইতে কয়েক চরণ উদ্ধৃত করিলে পাঠক ইহার ছন্দের ধরণ সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারিবেন :—

পুত্রের সৎকার করি দশানন বর্না,
উতরিল মণিময় ভবনে কাশর,
গুম্ভময় রাজালয় হেরিল চৌদিকে,
অধোমুখে ধরাসনে তাজি দীঘসাস,
কপোল বিষ্ণাস করি করতলে, যেন,
মূর্ত্তিমান শোক আসি ধরাতলে, ধরি
রক্ষ রূপ বসিয়াছে স্বর্ণ লক্ষাধামে।

ইত্যাদি

আর একখানি পরিশিষ্টের নাম 'দশাননবধ মহাকাব্য'। ১৩০০ সনে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় কিন্তু প্রচার হয় না, সুতরাং ১৩১০ সনে সাহিত্যসভা হইতে ইহা যখন পুনরায় প্রকাশিত হয় তখন ইহার কার্য্যতঃ দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছিল। মেঘনাদবধের পরিশিষ্ট হইলেও ইহা অনেকটা প্রাচ্য আদর্শে রচিত। ইহা দশ সর্গে সম্পূর্ণ, এবং যথারীতি মঙ্গলাচরণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। কবি ছন্দোনিষ্ঠানে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, নিজে ২১ প্রকার ছন্দ রচনা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার রচিত গীতিছন্দে (বর্ণনাদিতে এই ছন্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন) প্রথম সর্গের সূচনা করিয়াছেন :—

চমকি বিশ্ব নববীয়া-সূয়া-নূপ রজন-রাজ্য অবসরে,
উদিত উদয়গিরি-কনক-মঞ্চ'পরি গঞ্জি মঞ্জুমণিবর্গে।
দীপ্তরশ্মিচয় সৈশ্বনিচয়সম, (বিষমবৃগায়ি বিনিম্বে)
ভঙ্গিল হতকর-পতিত-রজনিকর-যোদ্ধা নিকর উড়ুবৃন্দে

ইত্যাদি

আর একখানি বাংলা মহাকাব্যের নাম উল্লেখযোগ্য; দিনাজপুরবাসী পণ্ডিত মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি নিবাত-কবচবধ নামে সপ্তদশ সর্গে এক মহাকাব্য রচনা করেন, তাহাকে তিনি "An Epic" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। প্রকাশকাল ৩০ আষাঢ়, ১৭৯১ শকাব্দ। রচনা কিন্তু সংস্কৃত মহাকাব্যের লক্ষণানুসারেই হইয়াছে। মেঘনাদ-

বধ প্রথম প্রকাশিত হইলে যখন সংবাদপত্রে তাহার ভূষ্ক প্রশংসা হয়, মহেশচন্দ্র তখন তাহার প্রতিবাদ করে এবং 'সোমপ্রকাশে' লেখেন যে দস্ত মহাশয় নূতন ভাষা 'আবিষ্কৃত করিয়াছেন' এবং মেঘনাদবধ কাব্যে অলঙ্কার শাস্ত্রমতে দোষও বহুতর। মহাভারতের বনপর্কাস্তর্গে নিবাতকবচবধ পণ্ডিতমহাশয়-রচিত এই অভিনব মহাকাব্যের মূল; উর্কণীর অভিশাপ যে অঙ্গী বীররসের পরিপন্থী বলিয়া বর্জিত হইল, গ্রন্থকার তাহা জানাইয়াছেন "নব্যপ্রথা" তাঁহার আদৌ মনঃপূত ছিল না, তাহা উৎসর্গ-পত্রের কথায় বিবৃত করিয়াছেন; "নব্যপ্রথানুসারে গ্রন্থখানি কাহারও নামে উৎসর্গ করা আমার কর্তব্য ছিল। কিন্তু ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না যে, গ্রন্থের কোন্ অংশ আমি উৎসর্গ করিব। গ্রন্থের স্বয়ং তো আমারই থাকিবে।" এই যুক্তি আমাদের নিকট অভিনব ঠেকিবে, কিন্তু ইহাতে তাঁহার মনোভাবের পরিচয় পাই। কবি সরস্বতীকে বন্দনা করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন এবং অলঙ্কারশাস্ত্রানুসারে সর্গান্তে ছন্দ পরিবর্তন করিয়াছেন। কবির ছন্দোনিষ্ঠানের পরিচয় নিয়ে উদ্ধৃত পদ্যাংশ হইতে পাওয়া যাইবে :—

এ হেন বচন শুনি পুনরপি ফাঙ্কনি
প্রণমি পুরন্দর পদযুগলগুস্তে,
বিষাবস-স্বত-সহিত হরিশষুত
পশিল গিয়া দ্রুত দিব্য নিশান্তে।
সমরসাজ সব পরিহারি পাওব
সৌধতলে বসি কোমল তলে।
শান্তি করিল হত হইয়া অভিরত
বন্ধুসনে রণ-বিষয়ক জঙ্গে ॥

৭

বিংশ শতাব্দীতেও বাংলা-সাহিত্যে যে উৎকৃষ্ট মহাকাব্য রচিত হইতে পারে তাহা কবিভূষণ যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রমাণ করিয়া দিলেন। যোগীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, জীবনের সায়াছে তিনি পর-পর 'পৃথ্বীরাজ' ও 'শিবাজী' নামে দুইটি মহাকাব্য রচনা করেন। উভয়েরই উদ্দেশ্য, স্বদেশপ্রেমিক হিন্দুকে তাহার সমাজের পতন ও উত্থানের ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া, আশা,—যদি কোন হিন্দু "জাতীয় অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধান ও প্রতি-

বিধানের উপায় অবলম্বনে” প্রবৃত্ত হন। বিষয়-নির্বাচনে ও কাব্য-রচনায় কবির ঐতিহাসিক জ্ঞান ও জাতীয়তাবোধের পরিচয় এইরূপে পাওয়া যাইতেছে। আর মহাকাব্যের বীজস্বরূপ যে মহাভাব, তাহাও আভাসে আভাসে পড়িতে গেলে ক্রমেই পরিস্ফুট হয়। “ভৌতিক শক্তি নহে নিয়ন্ত্রী বিশ্বের”—ইহা তিনি অন্তরে বিশ্বাস করেন। পৃথীরাজের গ্রন্থাভাসে তিনি মহাশূন্তে কম্পহীন স্পন্দহীন প্রসারিত ব্যোমে সপ্ত মহাঋষির মন্ত্রণাসভার যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা কল্পনার পরম উৎকর্ষ সূচিত করিতেছে। কবি সর্গে সর্গে ছন্দের বৈচিত্র্য আনিতে চাহিয়াছেন, এবং ছন্দ যাহাতে ভাব-অনুগামী হয়, সে-দিকেও তাঁহার দৃষ্টি আছে। সর্বাপেক্ষা দ্রষ্টব্য এই যে, কবি আশাবাদী; মিল্টন যেমন মানবজাতির চরম মুক্তির কথা বলিয়াছেন, যোগীন্দ্রনাথও তেমনি আৰ্য্য হিন্দু জাতির নিকট ভবিষ্যতে মুক্তির কথা বলিয়াছেন,—তবে প্রায়শ্চিত্ত চাই, সে প্রায়শ্চিত্তের জন্ত পশ্চিমে মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে, ঝটিকা আসিতেছে। ভাষা, ভাব, ঝঙ্কার—সকল বিষয়ে যোগীন্দ্রনাথ মহাকবির আসনে বসিবার যোগ্য, এবং তাঁহার জাতীয়তা শুধু ঋণিকের পুলক নহে, তাহা দীর্ঘদিন অনুভবের ফলে ভাবন হইয়া অন্তরে বিরাজ করিতেছে,—

ত্রিংশ বর্ষকাল, দেবি !
নানচিত্র ভব
রাখিয়াছি চোকে চোকে ;
পূজেছি গোপনে ;
জানে না অপর কেহ,
কিন্তু জানে তুমি।

শিবাজী রচিত হয় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে। ইহা কুড়ি সর্গে বিভক্ত; গ্রন্থাভাসে কবি সমস্ত কাব্যটির সুর বাধিয়া দিয়াছেন,—সহাদ্রিশিখরে গভীর রজনীতে পুরাণমতে সপ্ত চিরজীবীর অন্ততম ভার্গব, গৌরীশঙ্করের পূজা

করিতেছেন, হিন্দুর লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্ত প্রাণ বিসর্জন করিতে চাহিতেছেন, কিন্তু অশরীরী বাণী নৈতিক বিধানের প্রতি অঙ্গুলি-সঙ্কেতে হিন্দুর পুনরুত্থানের কথা সঙ্কেতে জানাইতেছেন,—আর নূতন যুগের বাণী ফুটিয়াছে বুদ্ধ তেজস্বী ব্রাহ্মণের মুখে,—

স্বদেশ-স্বজাতি-রক্ষা সর্বধর্মোত্তম।

৮

যোগীন্দ্রনাথের মহাকাব্য বর্তমান শতাব্দীর অমূল্য সম্পদ হইলেও পাঠকসমাজে ইহার তেমন আদর সর্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না কেন, তাহার কারণ চিন্তা করিলে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কথা মনে হয়,— “মহাকাব্যের মধ্যে একটা উন্মুক্ত অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা আছে, তাহা বোধ করি আর কখনও ফিরিয়া আনিবে না। সুনিপুণ শিল্পী এ-কালে তাজমহল গড়িতে পারেন, কিন্তু পিরামিডের দিন বুঝি একেবারে চলিয়া গিয়াছে। আমাদের সমাজে পিরামিডের দিন চলিয়া গিয়াছে বলিয়াই মুখে তাহার প্রশংসা করি, কিন্তু অন্তরে তাহার সাড়া পাই না। এখানে মহাকাব্যের মধ্যে অবশ্য রামায়ণ মহাভারত হোমরকেই ধরা হইয়াছে। আমরা যে-সকল মহাকাব্যের প্রধানতঃ আলোচনা করিলাম, তাহাদের বাদ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধেও এই মন্তব্য সমান ভাবে প্রযোজ্য। ব্যক্তিত্বকে নানা প্রকারে ফুটাইয়া তোলা, আর সমস্ত সমাজের মুখপাত্র হইয়া কবি হইয়া তাহার আদর্শ স্পষ্ট ও সর্বজনগ্রাহ্য করিয়া ধরা,— এই দুইয়ে প্রভেদ রহিয়াছে, এবং এই প্রভেদের উল্লিখিত আমরা বর্তমান যুগে মহাকাব্যের প্রশংসা করি, কিন্তু আদর করি না।

অবোধ

শ্রীশশধর রায়, এম-এ, বি-এল

সকলেই সুবোধ নহে, মানবসমাজে অবোধ অনেক আছে। অবোধগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :— প্রথম শ্রেণীর অবোধগণের প্রকৃত বয়স বাহাট হটুক, তাহারা বুদ্ধিতে, বিশেষতঃ আত্মরক্ষা করিবার শক্তিতে, দুই বৎসর অথবা তাহার কম বয়সের শিশুর ন্যায়। ইহাদিগকে প্রায় জড় বলিলেই হয়। আমেরিকায় এই প্রথম শ্রেণীর অবোধগণকে ঈডিয়ট (Idiot) নাম দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর অবোধগণ সাত বৎসর অথবা তাহার কম বয়সের বালকের ন্যায়। ইহাদিগকে ইম্বেসিল (Imbecile) নাম দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর অবোধগণ বার বৎসর অথবা তাহার কম বয়সের বালকের ন্যায়। ইহাদিগের নাম দেওয়া হইয়াছে মোরন (Moron)। অনেক ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর অবোধগণের কথা ভাল করিয়া কুটে না। ইহারা সমান্ত কারণে রাগে, কাঁদে এবং প্রায়শঃ আহার বৈশী করে। ইহাদিগের মলমূত্র তাগের স্থান অস্থান বিবেচনা নাই, লজ্জার ভাব হয় নাই, ভয় কিছু হইয়াছে, বিশেষ নহে। ইহাদিগকে কিছুই শিক্ষা দেওয়া যায় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর অবোধগণকে হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া যায়, যদিও অত্যন্ত কঠিন। যে-সকল হাতের কাজে বুদ্ধি খাটাইতে হয় না, শুধু নকল করিলেই চলে সেই সকল হাতের কাজ প্রায়শঃ শিক্ষা দেওয়া যায়। কিন্তু তাহাতে অনেক সময় লাগে। ইহাদিগের মতের বিরুদ্ধে শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। ইহারা সকল কথাই বলিতে পারে এবং ইহাদিগকে একটু পড়িতে ও লিখিতে শিক্ষা দেওয়া যায়। তৃতীয় শ্রেণীর অবোধগণকে মোটামুটি ভালই লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা দেওয়া যায়, এমন-কি ইহাদিগের দ্বারা দ্বিতীয় শ্রেণীর অবোধগণকে শিক্ষা দেওয়ার কার্য ভালই চলিতে পারে, কারণ ইহাদিগের ধৈর্য্য খুব বেশী।

তিন শ্রেণীর অবোধগণই মনে শিশুর ন্যায়। দেহে ও বয়সে যত বড়ই হটুক না কেন ইহাদিগের মন বয়সের অনুরূপ

বাড়ে না। দেহ বাড়ে, মন বাড়ে না। সচরাচর যে-সকল খর্সাকার ব্যক্তিগণকে বামন বলা হয়, তাহারা দেহে বাড়ে না, কিন্তু মনে বাড়ে। তাহাদিগের মন অনেক ক্ষেত্রে বয়সের অনুরূপই হইয়া থাকে।

গত জার্মান-যুদ্ধ আমেরিকা যখন যোগ দিয়াছিল তখন সৈনিক-বিভাগে ভর্তি করিয়া লইবার সময় যে-সকল ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা হইয়াছিল তাহাতে জানা গিয়াছিল যে, সতের লক্ষ পরীক্ষার্থীর মধ্যে শতকরা পঁয়তাল্লিশটি তৃতীয় শ্রেণীর অবোধ ছিল। অর্থাৎ সতের লক্ষ লোকের মধ্যে ৭,৬৫,০০০ হাজার লোক বুদ্ধিতে এবং আত্মরক্ষা-শক্তিতে বার বৎসর বয়স্ক বালক অপেক্ষা অধিক উন্নত ছিল না। এই সকল ব্যক্তি কথাবার্তায় আচার-ব্যবহারে সাধারণ লোকের মতই ছিল; তাহারা অবোধ বলিয়া সাধারণে পরিচিত ছিল না। দশ জনের মতই আমেরিকার যখন এই প্রকার অবস্থা তখন এতদেশে উহা অপেক্ষাও অন্তরত অবস্থা মনে করা বাইতে পারে। আমরা যে অঙ্গের অধিক লোক দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক বালকের প্রকৃতির ন্যায় তাহা বিজ্ঞাপনদাতাগণ, কোন কোন কবি ও উপন্যাস-লেখকগণ, কোন কোন নাট্যকার ও সিনেমা ও টকী প্রদর্শকগণ উত্তমরূপেই জানেন। কবি কুন্তিবাস বানর ও তাহার লেজ বিষয়ে নানারূপ হাস্যকর ভঙ্গী লিখিয়া লোক-চরিত্রের অভিজ্ঞতা এত দূর দেখাইয়াছেন যে, তাহার গ্রন্থ আজি আমাদের ঘরে ঘরে। কাশীরাম দাসের মহাভারত অপেক্ষা কুন্তিবাসী রামায়ণের কাটুতি অনেক অধিক। বিজ্ঞাপনদাতাগণ প্রায় সকলেই সংবাদ-পত্রে অথবা পথে পথে ঘেরপ ঢং ও ভঙ্গী করিয়া বিজ্ঞাপন দেয় তাহাতে বুঝা যায় যে, তাহারাও আমাদের মতই বার বৎসর বয়সের অধিক বয়স্ক মনে করেন না।

মোটামুটি সঙ্গত-অসঙ্গত কার্যের জ্ঞান পিতা মাতা ভ্রাতা অথবা অন্তের সহিত আচার-ব্যবহারে সুনীতি, দুর্নীতি, ধর্ম্মাধর্ম্ম বার বৎসর বয়স্ক বালক একরূপ

শিখিয়া উঠে। সে যে-পরিবারে ও যে-সমাজে প্রতিপালিত হয় তদনুরূপ হইয়াই গড়িয়া উঠে। ঐ বয়সের পরে সাধারণ বালকগণ অধিক কৰ্মকুশলতা শিক্ষা করিয়া থাকে, সত্য। কিন্তু বার-তের বৎসরের মধ্যেই বয়োবৃদ্ধগণের ভাব ও কৰ্ম অনুকরণ করতঃ বালকগণ অনেক শিক্ষা করে। তৎপরে উল্লিখিত বিষয়ে তাহাদের আর অধিক শিক্ষা করিবার থাকে না।* এ-কথা শুনিতে কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। কিন্তু কথা সত্য।

আমরা দেখিলাম মানবসমাজের কমবেশী প্রায় অর্ধাংশ ব্যক্তি বালক-প্রকৃতি, বৎসর গণিলে তাঁহাদিগের বয়স যাহাই হউক। প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ অনেকেই ঐরূপ। তাঁহারা কবি হইলে এবং কদাচিৎ বৈজ্ঞানিক হইলেও বালকের তায়ই কিছু অস্থিরমতি এবং বালা-সংস্কারাবদ্ধ হইয়া থাকেন।

এইরূপ হইবার কারণ কি? পূর্বে ইহার অনেক কারণ অনুমান করা হইত, কিন্তু এক্ষণে প্রধান প্রধান দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন যে, অবোধগণ দুর্বলমনা; তাহাদিগের মস্তিষ্কের কোন কোন কেন্দ্র দুর্বল অর্থাৎ বয়সের অনুরূপ পুষ্টিপ্রাপ্ত হয় না। এইরূপ হইবার প্রধান কারণ বংশানুক্রম। দুর্বলমনা অবোধগণের দুই-তৃতীয়াংশ বংশানুক্রমের ফল। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ সম্ভবতঃ শিশুকালে কোন কঠিন পীড়ায় পীড়িত হইয়াছিল অথবা কোন দৈবদুর্ঘটনার [অর্থাৎ হঠাৎ উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া বাওয়া কিংবা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণে] এইরূপ হইয়া থাকিবে। এইরূপ অজ্ঞাত কারণমধ্যে পিতামাতার অতিরিক্ত মদ্যপান অথবা উপদংশ পীড়ায় পীড়িত হওয়াকে ধরা যাইতে পারে না। এই দুইটি এখন আর অপত্যের অবোধ অবস্থার কারণ বলিয়া গণ্য হয় না।

মানব বংশানুক্রম ও বেষ্টনীর ফল। ডারুইনের সময়

* We have had time before 13 to take over the standardized sentiments of our elders, to learn all that they know, to accept their views of religion, politics, manners, general proprieties and respectabilities. The common run of mankind can, however, be taught tricks as time goes on and acquire special expertness. But a great part of our childish conceptions retain a permanent hold on us.—*Ency. Brit.* 14 Edition. Vol. 5, article "Civilization."

যাহাই বিবেচিত হইয়া থাকুক, পণ্ডিতবর ভাইজম্যানের (Wiseman-এর) সময় হইতে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে যে, বেষ্টনীর ফল বংশানুক্রম হয় না। ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে জাতকের দেহে ও মনে বাহিরের ক্রিয়ার ফলে যত প্রতিক্রিয়াই হয় তাহাকে বেষ্টনীর ফল বলা যায়। বেষ্টনী বলিতে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝা যায়। জাতক জীবিতকালমধ্যে দেহে ও মনে যে প্রতিক্রিয়া প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যাহা লাভ করে বা অর্জন করে, তাহা বংশানুক্রম হয় না। আমেরিকার অল্পসংখ্যক জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ব্যতীত শার্বস্থানীয় জীবতত্ত্ববিদগণ এই মত এক্ষণে অঙ্গীকার করিতেছেন। স্বেপার্জিত লক্ষণ-সকল বংশানুক্রম নহে, ইহাই এ-মতের স্থূল কথা।

বংশানুক্রম পুংকীট* ও স্ত্রী-ডিম্বের † সংমিশ্রণের ফল। জরায়ু-মধ্যে পুংকীট ও স্ত্রী-ডিম্বের মিশ্রণ-সময়ে জন্মের দেহে ও মনে যে উপকরণ সঞ্চিত হইল জাতক সমস্ত আয়ুষ্কালমধ্যে তদতিরিক্ত এমন কিছুই পাইতে পারে না যাহা তাহার পুত্র-পৌত্রাদিতে সংক্রমিত হইবে, এবং ঐ উপকরণ হইতে কিছু বাদ দেওয়াও অসম্ভব। জন্ম-তত্ত্বের আলোচনায় পণ্ডিতগণ এ-কথা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পুংকীট ও স্ত্রী-ডিম্বের কেন্দ্রবিদ্যুৎ মধ্যে যে-সকল বক্র আশ্রয় থাকে তন্মধ্যস্থ বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ পদার্থই বংশানুক্রমের নিয়ামক। কিন্তু এ-সকল কথা আর বিশেষ ভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই।

মস্তিষ্ক একটি যন্ত্র নহে। বহু যন্ত্রের সম্মিলনে মস্তিষ্ক গঠিত হয়। মস্তিষ্কের যে অংশ যে ক্রিয়া করে সেই অংশে ঐ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইবার উপযোগী কেন্দ্র আছে। যথা—দৃষ্টিকেন্দ্র, শ্রবণকেন্দ্র, বুদ্ধিকেন্দ্র** প্রভৃতি। এই কেন্দ্রগুলি মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ ধূসরবর্ণ স্তরে নিহিত থাকে। কোন একটি কেন্দ্রের ক্রিয়া নষ্ট অথবা মন্দ হইয়া গেলেও অন্য কেন্দ্রের ক্রিয়া উত্তম থাকিতে পারে। মস্তিষ্ক পদার্থই জীবাশ্মের বাহ্য বিকাশের যন্ত্র। সুতরাং মস্তিষ্কের যে কেন্দ্র নষ্ট অথবা মন্দ হইয়া যায়, সেই কেন্দ্রের উপযোগী কৰ্ম সম্বন্ধেই

* Spermatozoon. † Ovum

‡ Nucleus § Chromosome.

** Gland-kinesthetic centre.

ব্যক্তি অবোধের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে পারে, অল্প কেন্দ্রের কক্ষ সম্বন্ধে নহে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে প্রথম শ্রেণীর অবোধগণের প্রায় সকল কেন্দ্রেরই ক্রিয়া অতীব মন্দ হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও কন্সেন্দ্রিয় সবল থাকিতে পারে, যদিও জ্ঞানেন্দ্রিয় জড়বৎ হইয়া যায়। মস্তিষ্কের প্রত্যেক কেন্দ্রের সহিত তদুপযোগী স্নায়ু-তন্তুর যোগে কতিপয় কন্সেন্দ্রিয়ের পেশীমণ্ডল সংযুক্ত থাকে এবং তাহাতেই স্নায়ুর ক্রিয়ানুসারে পেশী ক্রিয়াবান হয়। এই হেতু পঞ্চ কন্সেন্দ্রিয় স্ব-স্ব উপযুক্ত স্নায়ু-তন্তুর অধীন। সুতরাং স্নায়ু-তন্তুর জড়বৎ হেতু পঞ্চ কন্সেন্দ্রিয়ই জড়বৎ প্রাপ্ত হয়। প্রথম শ্রেণীর অবোধগণের এই ভাব।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অবোধগণের মস্তিষ্ক-কেন্দ্রসকল এত দূর নিষ্ক্রিয় নহে। তাহাদিগের মস্তিষ্ক-কেন্দ্রস্থ কতিপয় স্নায়ু কক্ষ। তৃতীয় শ্রেণীর অবোধ আমরা প্রায় সকলেই। আমরাদিগের সকল মস্তিষ্ক-কেন্দ্রই কক্ষ। কিন্তু বার-তের বৎসর বয়সের মধ্যেই তাহাদিগের প্রতিক্রিয়া জ্ঞান সম্বন্ধে প্রায় শেষ হইয়া আসে; যদিও কক্ষকুশলতা সম্বন্ধে তাহাদিগের ক্রিয়া গড়ে পঞ্চাশ-পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত সবল থাকে। তৎপর অনেক ক্ষেত্রেই দুর্বলতা আসিয়া পড়ে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অবোধগণের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে যে লিখিতে বা পড়িতে শিখিবার যোগ্যতা নাই; কিন্তু গত এক শত বৎসরের মধ্যে কোন্ মাসের কোন্ তারিখে কি বার ছিল তাহা মুখে মুখে শুদ্ধরূপে বলিয়া দিতে পারে। কেহ-বা সহস্র বা অযুত সংখ্যক রাশিকে এরূপ রাশি দিয়া গুণন করিলে গুণফল কি হইবে তাহা অতি অল্প সময়মধ্যে মুখে মুখে বলিয়া দিতে পারে; অল্প কাগজ-কলম লইয়াও তত অল্প সময়ে বলিতে পারে না।*

প্রথম শ্রেণীর অবোধকে আমরা মানুষের মধ্যে গণ্য করিতে পারি না। দ্বিতীয় শ্রেণীর অবোধকে আমরা অত্যন্ত বেকুব বলি। তৃতীয় শ্রেণীর অবোধদিগকে

প্রথমে চেনা যায় না; কারণ তাহারা দশ জনের মতই কিছু দিন দেখিবার পর তাহাদিগকে বোকা বলিয়া চেনা যায়। তিন শ্রেণীর অবোধই প্রধানতঃ বংশানুক্রমের ফল একথা পূর্বেও বলিয়াছি। যদি বর এবং কন্যা কিংবা বর এবং কন্যার বংশ অযোগ্য অথবা অতি-অযোগ্য হয় তবে তাহাদিগের অপত্য কম-বেশী অবোধ হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। যে-বংশে কৃতী ব্যক্তি জন্মেই নাই, যে-বংশের ব্যক্তিকে স্বগ্রামের লোকেরাও যোগ্য বলিয়া মনে করে না, যে-বংশের লোক পুণ্ড্রিগত শিক্ষা অথবা কোন প্রকার কর্মশিক্ষায় কিংবা কর্মকুশলতায় স্বগ্রামেও কখনও প্রশংসা লাভ করে নাই তেমন বংশের বর অথবা কন্যা হইতে পর বংশ গঠিত করিতে গেলে সেই পর বংশে কেহ নূনাধিক অবোধ হইবেই। অতি-যোগ্য ও কৃতী বংশের সহিত উপরে লিখিত অযোগ্য বংশের উদাহিক সংমিশ্রণে অপত্য জাত হইলেও এ-ফল ফলিতে প্রায় সর্বদাই দেখা যায়। আর যদি দুই বংশই উপরের লিখিত অর্থে অযোগ্য হয়, তবে ঐ দুই বংশজাত ব্যক্তির যৌন-সংমিশ্রণে প্রথম শ্রেণীর অবোধ জন্মিবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক। আমি ইহার কতিপয় দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। কিন্তু নাম উল্লেখ করা সম্ভব হইবে না। আমি একটি ক্ষেত্রে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টান্তও দেখিয়াছি। পিতা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও কৃতী, মাতাও বুদ্ধিমতী, কিন্তু ভয়ানক নিষ্ঠুর। ইহাদিগের অপত্য সকলেই অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও কৃতী; কিন্তু একটি পুত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর অবোধ অর্থাৎ অত্যন্ত বেকুব হইয়াছিল।

যাহা হউক, ব্যক্তির উন্নতি করিতে গেলে, সুতরাং সমাজকে উন্নত করিতে হইলে যোগ্য বংশ হইতেই বরকন্যা বাছিয়া লইয়া বিবাহ দিতে হয়। নচেৎ অল্প পন্থা নাই। আমরাদিগের ন্যায় যে-সমাজে বিবাহক্ষেত্রে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং যোগ্য বংশের বরকন্যা বাছিয়া লইবার অবসর ও সুবিধা নাই, সে-সমাজকে উন্নত করিবারও পন্থা নাই। যত শীঘ্র বিবাহক্ষেত্রে প্রশস্ত করা যায় ততই আমরাদিগের মঙ্গল।*

* Thus an imbecile who had not learned to read or write was able to give accurately the day of the week for any date in the past century. Another was able to multiply mentally four or six place numbers in less time than most normal persons could do with pencil and paper. *Ency. Brit.* 14th Edition, Vol. 21, 499.

* এই প্রবন্ধে গণ্ডরস (Endocrine Secretion) মাত্রাজেদে কে-ভাবে ব্যক্তির বুদ্ধির হাস-বুদ্ধি করে তাহার উল্লেখ করিলাম না। পূর্বে পত্রান্তরে তাহার আলোচনা করিয়াছিলাম।

শ্রোত-বদল

শ্রীপারুল দেবী

অন্নদা লেখে ভাল। ছোট গল্প লেখায় তার হাত বেশ পাকা। সেই আই-এ ক্লাস থেকেই সে ছোট গল্প লিখে আসছে, এখন চাকরিতে ঢুকেও ছোট গল্প লেখায় তার লেখনীর মুক্ত ধারা বাধা পায় নি। ‘বিজলী’ মাসিক-পত্রিকার সম্পাদক মাসের প্রথম সপ্তাহ যেতে-না-বেতেই অন্নদাকে তাগাদা পাঠান লেখা পাঠাবার জন্ত। আগে আগে চার পয়সার খামে ক’রে তাগাদার পত্র আসত, সম্প্রতি খামগুলির পাঁচ পয়সা দাম হওয়াতে পোস্টকার্ডই আসে। অত্র এক মাসিক-পত্রে ‘বিজলীর’ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল,—“এ-মাসে বিজলীতে যে-সকল গল্প কবিতা প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সমালোচনা করিতে গেলে কেবল নিন্দাই করিতে হয়, অতএব সে অপ্রিয় কার্য না করাই ভাল। ভাগ্যে অন্নদা বাবুর ‘চোখের জল’ গল্পটি ছিল, তাই বিজলী এবারকার মত তরিয়া গিয়াছে। সম্পাদক মহাশয় দেখিতেছি পত্রিকার নামটি সার্থক দিয়াছিলেন। যেন অন্ধকারের মধ্যে পাঠক যখন দিশাহারা হইয়া যায়, তখন ‘চোখের জল’ গল্পটির পাতারূপ আকাশে একবার ক্ষণিকের জন্ত বিজলী-প্রভা চমকাইতে দেখিয়া চোখ একটু আলো দেখিয়া বাঁচে—অবশ্য তাহার পরেই আবার নিবিড় অন্ধকার।”

অন্নদা সমালোচনা পড়ে বোনকে ডেকে শোনায়; বললে, “দেখচিস্, কি লিখচে?” বোনটি হাসিমুখে বললে, “সত্যি দাদা, তোমার ‘চোখের জল’ গল্পটা পড়ে চোখের জল না-ফেলে থাকা যায় না, এত ভাল হয়েছে। তা আর ভাল বলবে না?”

অন্নদার লেখনী ‘চোখের জল’ থেকে ‘বিবাদের রাত্রি’—‘বিবাদের রাত্রি’ থেকে ‘মৃত্যুপারে’তে অগ্রসর হয়ে চলতে থাকে। বিজলীর সম্পাদক মহাশয় লেখককে উৎসাহিত ক’রে চিঠি লেখেন, পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত করেন না। মাঝে মাঝে করুণ-হৃদয়া পাঠিকা-সম্প্রদায়ের নিকট হতেও

অভিনন্দন-পত্র আসে—“আপনার বিবাদপূর্ণ লেখা পড়ে মনে হয়, না-জানি আপনার গভীর হৃদয়ের মাঝে কত বাথাই লুকান আছে। আপনার সেই গভীর দুঃখ আপনার লেখনীর ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট। এই অপরিচিতার সহানুভূতি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন।” অন্নদা উত্তরে লেখে, “আপনার করুণাপূর্ণ সহৃদয়তায় আমি ধৃত হইয়াছি। এ পৃথিবীর মধ্যে দুঃখই কেবল চিরস্থায়ী, নিজের জীবনে আমি তাহা অত্যন্ত সত্য বলিয়া জানিয়াছি। সুখ, হাসি, আনন্দ সকলই দু-দিনের—কিন্তু অনাদি কাল হইতে যে মৃত্যুশোক ও বিচ্ছেদ-বাথার চোখের জলে এ বিরহী পৃথিবী ভাসিয়া গেল, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার সেই প্রাণের বাথাই যদি নিজের মন্য দিয়া অনুভব না-করিতে পারিলাম, তাহা হইলে বুথাই জন্মগ্রহণ করিয়াছি—” ইত্যাদি ইত্যাদি। পৃথিবীর সকল দুঃখ ও শোকের কাহিনী অপরকে শোনাবার ভার ঘাড়ে নিয়ে অন্নদা একটা মহা আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

সে-বারে অন্নদার জ্বর হয়েছিল, সময়-মত গল্প পাঠান হয় নি। সম্পাদকের তাগাদার পর তাগাদার পত্র বোনটি দাদাকে তার জ্বরের মধ্যেই পড়ে শোনায়। মা বলতেন, “হ্যাঁ রে, কিসের এত চিঠি? ছেলেটা ক-দিন জ্বরে বেধোর, এখন কেন ওসব দিন্ ওকে?” বোনটি মাকে বুঝিয়ে বলত, “দাদার লেখা না হ’লে কাগজখানা যে চলে না মা। দেশের এই অবস্থায় একখানা মাসিক-পত্র চালান বড় সহজ কথা নয়ত—এই সেদিন কাগজে দেখলাম ‘বাণী’ উঠে গেল; আবার কাল শুনি ‘সেবা’ ব’লে মাসিক-পত্রটাও না-কি উঠে যাচ্ছে। ‘বিজলী’ কাগজখানা এই দাদার লেখার জন্তেই টিকে আছে—কাজেই দাদাকে না-জানিয়ে কি করি? পরের দিকেও ত তাকাতে হয়।”

মা অতশত বোঝেন না—রেগে বলেন, “রেখে দে

বাছা তোদের বিজলী-ফিজলী। মাথার কণ্ঠে ছেলেটা খুন হচ্ছে, তার উপর দিনরাত ঐ লেখা আর লেখা— জ্বর সারবে কি ক'রে? কাগজ উঠে গেল ত বয়েই গেল। কাগজ নিয়ে ত বাড়িতে ধরজা দেব না।”

অন্নদা বললে, “হুনি, তুই ঐ চেয়ারটা খাটের কাঁছে টেনে বোস, দরজাটা তেজিরে দে। লিখে নে, আমি বলি। মাকে ভাই বলিস নে কিছু, বকবেন। দেখচিসই ত একটা কাগজের ভার আমার হাতে, কি ক'রে চুপ ক'রে থাকি বল? মা ত বোঝেন না এ-সব।”

‘হুখে সাহসনা’ নাম দিয়ে গল্প শুরু হয়ে গেল। গল্পের শেষের দিকটা লিখতে লিখতে হুনীতির চোখের পাতা ভিজে আসে। সে চোখ মুছে হেসে বললে, “দাদা তুমি বড় হুখের কথা লিখতে ভালবাস কিন্তু। একটাও গল্প কি বাপু হুখে-স্বচ্ছন্দে শেষ করতে নেই?”

অন্নদা বললে, “জানিস নে, Sweetest songs are those that tell of saddest thoughts?”

জ্বর সারল। গল্প-লেখা অবোধেই চলছিল; ভাই লিখত বোনকে পড়ে শোনাত, বোন চোখের জল আঁচলে মুছে হেসে বলত, ‘কি সুন্দর লিখেচ দাদা।’ দাদা হাসিমুখে গল্পটা বিজলীর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিত। ঠিক সময়ে গল্পটি ছাপার অক্ষরে কাগজে বাহির হ'ত— নানা দিক থেকে নানা রকম চিঠিপত্র আসত—কোনও গোল ছিল না। গোল বাধালে বৌ এসে।

অন্নদার বিয়ে অনেক দিন হয়েছে। কিন্তু এত দিন তার বিরহের যুগ চলছিল। গল্পের বিষাদের যুগের সমস্তটা কালই বৌটি ছিল বাপের বাড়ি। ছোট মেয়, অন্নদার বাপ বললেন, “আহা থাক কিছু দিন বাপ-মার কাছে। এ-বর তো চিরদিনই করবে—তাড়া কি?” কিন্তু এবার বৌ এল। এখনও ছোটই আছে। নাম লীলা। নূতন খণ্ডরবাড়ি এসে মাঝে মাঝে কাঁদে, জিজ্ঞাসা করলে গাল ফুলিয়ে বলে, “মার জন্তু আর টুলুর জন্তে মন কেমন করচে।”

বৌ বাপের বাড়ির জন্তু কান্নাকাটি করচে শুনে অন্নদার মনটা খুব প্রসন্ন হয়ে উঠল না সত্য, কিন্তু সে ভাবুক মাসুখ, মনকে বোঝালে—তা হোক এই ত

ভাল। যে-মেয়ে আজন্মের বাস, আজন্ম-পরিচিত মা-বাপ ভাই-বোনকে ছেড়ে এসে দু-দিনে তাদের ভুলে যায়, নূতন গৃহকে আপনার ক'রে মনের মধ্যে নিতে যাদের দু-দিনও লাগে না, তাদের মনের গভীরতা কোথায়? দু-দিনে যারা বাপের বাড়ির স্নেহ ভুলতে পারে, আবার দু-দিনে যে তারা খণ্ডরবাড়ির মায়াও ভুলবে এ আর আশ্চর্য্য কি? তার চেয়ে এই ভাল। লীলার হৃদয় আছে, হৃদয়ে করুণা আছে, করুণায় গভীরতা আছে। হাল্কা মন অন্নদা ভালবাসে না।

হুনীতিকে ডেকে পুরানো ‘বিজলী’র তাড়া বাহির ক'রে তার হাতে দিয়ে অন্নদা বললে, “হুনি, এগুলো দিস তোমার বৌদিক পড়তে। তার মনে খুব মায়া— আমার লেখাগুলো বেছে দিস, পড়ে তার ভাল লাগবে নিশ্চয়।”

বিকালে আপিস থেকে এসে চলখাবার খেয়ে এ-মাসের বিজলীর জন্তু লেখা সদ্য শেষ করা গল্পটার আর একবার অন্নদা চোখ বুলাচ্ছে, এমন সময়ে হুনীতি ঘরে ঢুকে বললে, “দাদা, বৌদি তোমার ‘চোখের জল’ আর ‘মৃত্যুপারে’ গল্প দুটো পড়ে এমন বান্-ডাকানো কান্না কাঁদছিল যে কি বলব। বাবা কান্না শুনে এ-বরে এসে রেগে কত বকলেন তোমাকে—তুমি ত ছিলে না—শোন নি। সব বিজলীগুলো নিয়ে গিয়ে কোথায় চাবি বন্ধ ক'রে রেখে দিয়েচেন নিজের ঘরে। বৌদিকে সার্কাস দেখাতে নিয়ে গেচেন এখন। এমন মেয়ে বাবা, তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।”

অন্নদার মনটা ধড়াস ক'রে উঠল। শুধুমুখে জিজ্ঞাসা করলে, “কি বলছিলেন রে বাবা?” হুনীতি বললে, “বললেন, দু-বছর ধরে আপিসে প্রোমোশন বন্ধ, সেদিকে ছেলের খেয়াল নেই, এদিকে এই সব ছাই-পাঁশ যত থিয়েটারী গল্প লেখা হচ্ছে। ভারী লিখিয়ে হয়ে উঠেছে দেখতে পাচ্ছি। তা যা লেখে নিজেই যেন পড়ে ব'সে। মেয়েটা একেই কেঁদে সারা, কোথায় ছেলেমানুষকে একটু ভুলিয়ে রাখবে তা না এই-সব চোখের জল রে মৃত্যুপারে রে এর ঘাড় এনে চাপাল!—এই সব কত কি। বৌদি বেচারী অতশত বোধে না দাদা, তুমি কেন

ওকে ও-সব পড়তে দিতে গেলে? সাহিত্য কি সবাই বোঝে?”

হৃদয়ে এত বেশী কল্পনা, কল্পনার আবার এত বেশী রকম গভীরতা অল্পদার ভাল লাগল কি-না ঠিক বলা যায় না। রাত্রে নূতন লেখা ‘মনের ব্যথা’ গল্পটা হাতে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকল; লীলাকে নিজে পড়ে শুনিয়ে ভাকে ভাল ক’রে বুঝিয়ে দেবে যে ব্যথার ‘টাচ্’ না থাকলে গল্প কখনও ভাল হয় না।

লীলা ঘরে এলে অল্পদা তাকে বড় ক’রে খাটে বসিয়ে নিজে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। পকেট থেকে লেখা কাগজগুলো বার ক’রে জিজ্ঞাসা করলে, লীলা একটা গল্প শুনবে? লীলা ঘাড় নেড়ে জানাল শুনবে।

অল্পদা বললে, “কিন্তু তুমি আজ শুনলাম বিজ্ঞানীতে লেখা আমার গল্প প’ড়ে নাকি বড় কেঁদেছ? আবার এখন কাঁদবে না ত?”

লীলা কথার উত্তর দেওয়া বোধ করি আবশ্যিক বিবেচনা করলে না। কিন্তু অল্পদা থামে না, কেবলই জিজ্ঞাসা করতে লাগল, “কি লীলা কাঁদবে না ত? বল না, কাঁদবে না ত?”

শেষটা লীলা উত্তর দিলে, “দুঃখের কথা শুনলেই আমার বড় কান্না পায় যে। আমি কি করব, চোখের জল সামলাতে পাবি না।”

অল্পদা সাহসনার সুরে বললে, “দুঃখের কথায় কান্না আসে সে ত ভাল কথাই লীলা। যারা ভাল লেখক তারা সকলেই দুঃখের কথা লেখে, আর যারা ভাল পাঠক, তারা সকলেই দুঃখের কথা প’ড়ে কাঁদে, কিন্তু তাই ব’লে কি এমন কান্না কাঁদতে হয় যে ঘরে লোক জড় হয়ে যায়? ছিঃ!” লীলা চুপ করেই রইল। ভাব দেখে মনে হ’ল যে বুঝি আবার কাঁদবার কথাই ভাবচে।

অল্পদা বুঝিয়ে বললে, “আমি এই রকম কল্পনা গল্প ভাল লিখতে পারি ব’লে সব কাগজে দেখে আমার লেখার কত প্রশংসা করে। হাসিকোটকের লেখা হ’ল খেলো লেখা—যাদের মন গভীর, তারা কখনও ও-রকম হালকা লেখা লিখে আনন্দ পায় না। তুমি কি চাও না

যে আমি এক জন ভাল লেখক ব’লে লোকসমাজে আদর পাই?”

লীলা ঘাড়টি নেড়ে বললে, “হ্যাঁ।”

উৎসাহিত হয়ে অল্পদা বললে, “আচ্ছা, তাহ’লে এই গল্পটা প’ড়ে তোমাকে শোনাই, কেমন? দেখবে একটা মেয়ে মনের ব্যথা মনে রেখে রেখে শেষে আর সস্ত্র করতে না পেরে কি রকম ক’রে আত্মহত্যা ক’রে দুঃখের হাত এড়াল। পরের দুঃখ নিজের হৃদয় দিয়ে বুঝে তবে এ-সব লেখা লিখতে হয় লীলা, এ বড় শক্ত জিনিষ। তুমি বড় হ’লে বুঝবে সব। এখন গল্পটা পড়ি, শোন। মন দিয়ে মেয়েটির মনের ব্যথা বুঝতে চেষ্টা কর, কিন্তু কেঁদো না, কেমন?”

লীলার কাছ থেকে সাড়া পাওয়া গেল না।

অল্পদা পড়তে লাগল—মলিনা গরিবের মেয়ে; উদয়াস্ত সংসারের খাটুনি খাটে। মা-বাপ পরসার অভাবে মেয়ের বিবাহ দিতে পারে না। সেজন্য তারা মেয়েকেই দোষী মনে করে, নানা কটু কথা শোনায়। মেয়েটি ভাল খেতে পায় না, পরতে পায় না, একটু ভাল কথাও কাকুর কাছে শুনতে পায় না। শেষে একটি ছেলের সঙ্গে তার বিয়ের ঠিক হ’ল। মলিনা অনেক আশা করছিল এইবার তার বাপ-মায়ের ভার কমবে, তার নিজেরও হয়ত দুঃখ ঘুচবে। সমস্ত দিনের অবিশ্রান্ত খাটুনির মধ্যে, কষ্টের মধ্যে, অভাবের মধ্যে সে ঐ আশাটুকু মনে আঁকড়ে ধরে দিন কাটাত। এমন সময়ে হঠাৎ সে খবর পেল যে, সেই ছেলেটির তারই এক বছর সঙ্গে বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে। সে মেয়েটি সকল দিক দিয়েই মলিনার চেয়ে ভাল পাত্রী, তাই ছেলেটি এখানে বিয়ে করবে না ব’লে পাঠিয়েছে। একখানা ক্ষুদ্র চিঠিতে নিজের তুচ্ছ ও অনাদৃত জীবনের পরিসমাপ্তির কারণ অভ্যস্ত করণ ভাবে মা-বাপকে জানিয়ে মলিনা বিব খেয়েচে—এইখানেই গল্পেরও পরিসমাপ্তি।

কিন্তু শেষ অবধি অল্পদার আর এগোন হ’ল না। মলিনার দুঃখে লীলার এখন থেকেই প্রাণ কাঁদছিল, তবু কোনও রকমে চুপ ক’রে নিজেকে সামলে ছিল এতক্ষণ। কিন্তু যেই মলিনা চিঠি আরম্ভ করেছে, “মা জন্মাবধি আমি কেবলই তোমাদের কষ্ট দিয়াছি—” লীলার অশ্রু আর ব্যথা

মানিল না ; সে আচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। অন্নদা লেখা ফেলে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, “আরে চুপ, চুপ, চুপ। ও লীলা, ও কি করচ? মা-বাবা এই পাশের ঘরে—থাম থাম, ছিঃ! এ যে গল্প—এ যে মিথ্যে—বানান কথা। কাঁদছ কেন? ও লীলা—”

লীলা কাঁদতে কাঁদতে বললে, “তুমি মলিনাকে বিব খাওয়ালে কেন? শুধু শুধু একটা প্রাণ নষ্ট করা। কেন তুমি ত ইচ্ছা করলেই ওর সঙ্গে সেই ছেলের বিয়ে দিয়ে দিতে পারতে। তুমি বড় নির্ভুর—তোমার কেবল সকলের মনে কষ্ট দিতেই ভাল লাগে—হ্যাঁ, আমি বুঝেছি। তোমার মায়া নেই মোটে—!”

লীলা কাঁদতেই লাগল। অন্নদা ত্রস্তভাবে এদিক-ওদিক তাকিয়ে কি যে করবে ভেবে পেলে না। পাশের ঘরেই মা-বাবার গলা শোনা যাচ্ছে—দুপুরে একবার বকুনির পালা হয়ে গেছে, আবার যদি বাবার কানে এখন এই কান্না যায় তাহলে এই বুড়ো বয়েসে বৌয়ের সামনে বাপের কাছে মার খাওয়া কপালে থাকা কিছু বিচিত্র নয়। অন্নদা লীলার পাশে বসে প’ড়ে অত্যন্ত সঙ্কনার স্বরে বললে, “না, না, লীলা তুমি বুঝতে পারচ না। আচ্ছা, সে তোমায় আমি আর এক দিন এমন ভাল ক’রে বুঝিয়ে দেব, তুমি এখন চুপ কর লক্ষ্মীটি। বাবা কান্নাকাটি মোটে ভালবাসেন না, জানই ত—এই পাশের ঘরে রয়েছে, এখনই শুনতে পাবেন। কেঁদো না ছিঃ! একটা গল্প শুন এত কান্না! বড় মুস্থিল বাধালে তুমি। শেষ কি তোমার পায়ে ধরতে হবে।”

পাশের ঘরে শব্দ-মহাশয়ের উপস্থিতির কথা জেনেও লীলার মনে কোনরূপ ভাবান্তর হ’ল না। স্বামী যখন সত্যই পায়ে হাত দিল সে সমানে ফোঁপাতে ফোঁপাতে ভাঙা গলায় বললে, “তুমি ও-গল্প বদলে দাও। মলিনার শীগগীর ঐ ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দাও। তা হলেই ত সব সুখের হয়—কেমন খাসা গল্পটি হয়। ও মরামরি কান্নাকাটি আমি মোটে সহ্যে পারি নে। তুমি ও-সব ছিঁড়ে ফেল, ও-রকম গল্প আর কখনও লিখো না।”

লীলার ফোঁপানি কিছুতে থামে না দেখে নিরুপায় হয়ে অন্নদা কাগজগুলো তুলে নিয়ে বললে, “আচ্ছা

বাপু আচ্ছা, দিচ্ছি সব কেটে; এখন দয়া ক’রে থাম তুমি লীলা। মরবে না মলিনা—হবে তাহ’লে? বাপ রে, বাপ রে, ভাল লোককে লেখা প’ড়ে শোনাতে এসেছিলাম!—এই নাও, এই দেখ, কেটে দিয়েছি, হ’ল?”

লীলা চোখ মুছ বুললে, “বেশ করেচ। এ-রকম দুঃখ-কষ্টের কথা আর লিখবে না ত?”

অন্নদা বললে, “অবুঝ হয়ো না লীলা। এটা না-হয় তোমার কষ্ট হবে ব’লে বদলে দিচ্ছি, কিন্তু চিরকাল আমি এই রকম করণ ধরনেরই গল্প লিখে আসছি—এইতেই আমার নাম—এ-রকম গল্প লিখে আমি কত প্রশংসাপত্র পেয়েছি, তোমায় এক দিন দেখাব সব। এখন একেবারে হঠাৎ লেখার ধারা বদলাব কি ক’রে? এটা দেখ, এই কেটে দিয়েছি—মলিনার বিয়ে দিয়ে দেব এবার, তাহ’লে খুশী ত?”

লীলার গলা আবার কান্নায় ভেঙে এল—“এত ক’রে বলছি, তবু শুনবে না? অল্প লোককে কষ্ট দিয়ে দিয়ে যত নাম কেনা—কি হবে অমন নাম নিয়ে? তোমার কি দয়ামায়া নেই একটুও? নাম বড়, না মানুষ বড়?”

কান্নার শব্দ আবার পাশের ঘরে পৌঁছবার উপক্রম দেখে অন্নদা হতাশ হয়ে বললে, “আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। আমি হাল ছেড়ে দিচ্ছি, তুমি আর কেঁদো না লীলা, থাম। এবার না-হয় আর কষ্টের কথা লিখব না। ‘সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল’ ব’লে গল্প শেষ ক’রে দেব সব, তুমি চুপ করলে এখন বাঁচি—বাপ রে, এমন জেদী মেয়েও ত দেখি নি কোথাও। যা ধরবে তাই, আর না হলেই চীৎকার কান্না। ভাল বিপদেই পড়েছি। আমার যশমান সব গেল।”

সেই থেকে অন্নদার শ্রোত ফিরেচে। অপরিচিত সহৃদয় পাঠিকার কাছ থেকে চিঠি এসেচে, “আপনার গভীর হৃদয়ের অতলস্পর্শী দুঃখের অঙ্ককারের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে যে বিজলী-চমকের স্রাব আনন্দের আভা আজকাল দেখা যায়, তাহা হইতে মনে হয় আপনি এত দিনে বৃষ্টি এ-পৃথিবীর সুখের খনির সন্ধান খুঁজিয়া পাইয়াছেন।”

বাবার বকুনি ও লীলার কান্নার ভয়ে কত দুঃখে যে তাকে সুখের খনির সন্ধান করতে হয়েছে তা অন্নদাই বোঝে।

নক্ষত্রিক জগৎ

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ, এম-এ, পিএইচ-ডি

কোন জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সমগ্র আকাশকে অসংখ্য জ্যোতিঃকণাখচিত অতি বিস্তীর্ণ একখানি চিত্রপটের ন্যায় দেখা যায়। যে-সকল জ্যোতিঃকণা আকাশকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকে 'নক্ষত্র' বা 'তারা' কহে। নক্ষত্রগণের আলোক অতি ক্ষীণ; যখন আকাশে চন্দ্র উদ্ভিত হয়, তখন তাহার আলোকে পৃথিবী আলোকিত হয়, কিন্তু চন্দ্রের অভাবে অসংখ্য তারা একত্র মিলিত হইয়াও পৃথিবীকে তাহার শতাংশের একাংশ আলোকিত করিতে পারে না। বাস্তবিকপক্ষে তারাসকল চন্দ্র অপেক্ষা অল্প উজ্জ্বল নহে। উহারা বহু দূর অবস্থিত বলিয়া উহাদের আলোক ক্ষীণ দেখায় এবং অল্প কোন তীক্ষ্ণ আলোকের নিকট উপস্থিত হইলে উহাদিগকে একেবারেই দেখা যায় না; এই কারণে দিবাভাগে সূর্যের আলোকে আকাশে কোনও তারকা দৃষ্ট হয় না। অন্ধকার রাত্রিতে যত তারা দেখিতে পাওয়া যায়, জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে তত দেখা যায় না; তাহার কারণ তারার আলোকের তুলনায় চন্দ্রের আলোক তীক্ষ্ণতর। বৎসরের মধ্যে কোন কোন সময়ে সন্ধ্যাকালে একটি তারাগ্রহকে পশ্চিমাকাশে সর্বাধিক দীপ্তিমান দেখা যায়, ইহাকে 'সন্ধ্যাতারা' কহে। ইহার দীপ্তি সকল সময়ে সমান থাকে না; যখন তাহা অত্যন্ত প্রখর হয়, তখন উহাকে সূর্য্য অন্ত বাইবার বহু পূর্বে মুক্ত নেত্রে দেখা গিয়া থাকে। আবার কোন কোন সময়ে একটি উজ্জ্বল তারাকে সূর্য্যোদয়ের পূর্বে পূর্বাকাশে দীপ্তি পাইতে দেখা যায়, ইহাকে 'শুকতারা' বা 'প্রভাতী-তারা' কহে। কিন্তু আসলে 'শুকতারা' ও 'সন্ধ্যাতারা' উভয়ই এক। উহার গতিবশতঃ উহা সূর্য্যের নিকটে থাকিয়া কখনও সূর্য্যের অগ্রবর্তী হয় এবং কখন-বা সূর্য্যের পশ্চাদগামী থাকিয়া যায়। যখন সূর্য্যের অগ্রগামী হয়, তখন উহা সূর্য্যের পূর্বে উদ্ভিত হয়, এই সময়ে

উহা 'প্রভাতী-তারা' বলিয়া অভিহিত হয়। কখন কখন প্রভাতী-তারাকে সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ কাল পরেও আকাশে দেখা যায়। পূর্বাংশে ও অপরাহ্নে সূর্য্যের তেজ মধ্যাহ্নের ত্রায় প্রখর নয় বলিয়া, সূর্য্যোদয়ের পরে ও সূর্য্যাস্তের পূর্বে কিছু ক্ষণ সূর্যালোকের আপেক্ষিক ক্ষীণতা হেতু 'শুকতারা' দিবাভাগেও দেখা বাইতে পারে।

সকল নক্ষত্র সমান উজ্জ্বল দৃষ্ট হয় না। গগনমণ্ডলে সাধারণ চক্ষুর্দ্বারা মোটামুটি ৫০০০ নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। দূরবীক্ষণ-সাহায্যে ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক নক্ষত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতেরা আকাশের তারাদিগকে উজ্জ্বলতা অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। সর্বাধিক উজ্জ্বল তারাকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা হয়; তদপেক্ষা কম উজ্জ্বল তারাকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হয়; ইহা অপেক্ষা কম উজ্জ্বল তারাকে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হয়; এই প্রকারে কম কম উজ্জ্বল তারাকে অধিকতর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সাধারণতঃ যত তারা মুক্ত নেত্রে দেখা যায়, তাহাদিগকে ছয় শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। উত্তর-ধ্রুব হইতে বিষুববৃত্তের ৩৫ অংশ দক্ষিণ পর্য্যন্ত যে শ্রেণীর যতগুলি তারা সাধারণতঃ মুক্ত নেত্রে দেখা যায়, তাহার শ্রেণী-বিভাগ এইরূপ—

প্রথম শ্রেণী	২০টি নক্ষত্র
দ্বিতীয় শ্রেণী	৬৫টি নক্ষত্র
তৃতীয় শ্রেণী	১৯০টি নক্ষত্র
চতুর্থ শ্রেণী	৪২৫টি নক্ষত্র
পঞ্চম শ্রেণী	১১০০টি নক্ষত্র
ষষ্ঠ শ্রেণী	৩২০০টি নক্ষত্র
মোট তারা	৫০০০টি নক্ষত্র

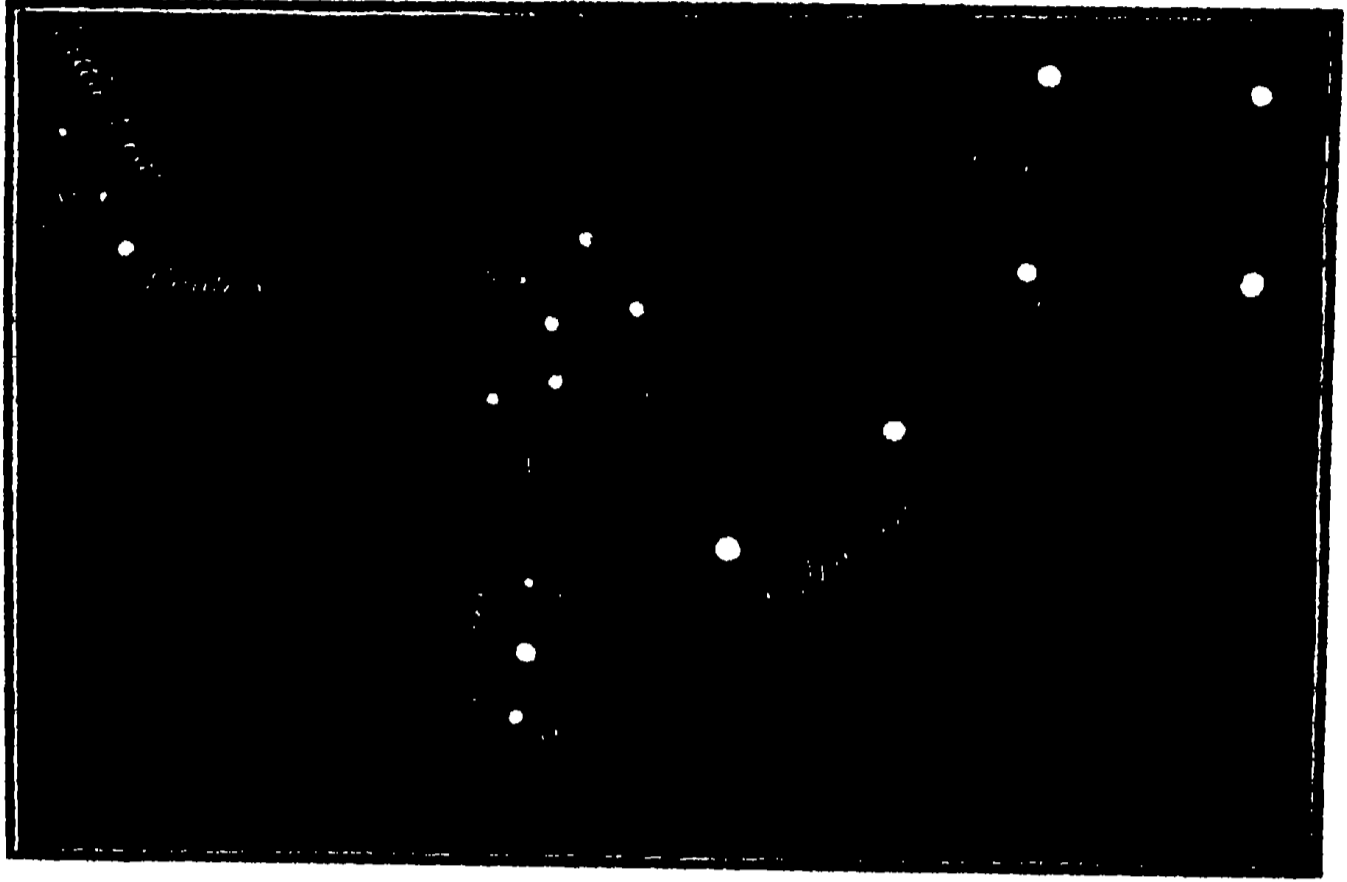
দূরবীক্ষণ-যন্ত্র ব্যবহার করিলে আকাশে ইহা অপেক্ষা

অধিকসংখ্যক নক্ষত্র দৃষ্ট হয়, এবং তাহাদিগের শ্রেণী-বিভাগও হইয়া থাকে। এই শ্রেণীবিভাগ অনেকটা ইচ্ছাকৃত, কারণ এক শ্রেণীর নক্ষত্রেরাও আকারে ও বর্ণে বিভিন্ন। আবার সকল মাহুষের দৃষ্টিশক্তিও সমান নহে; কাহারও দৃষ্টিশক্তি এত তীক্ষ্ণ যে তাহারা সপ্তম, অষ্টম এমন কি দ্বাদশ শ্রেণীর নক্ষত্র পর্য্যন্ত মুক্তনেত্রে দেখিতে পায়। অপর পক্ষে এমন লোকও আছে, যাহাদের দৃষ্টিশক্তি এত ক্ষীণ যে তাহারা পঞ্চম শ্রেণীর নক্ষত্র দেখিতেও চক্ষুর পীড়া অনুভব করে।

আকাশে এমন নয়টি নক্ষত্র আছে যাহারা উজ্জ্বলো অপর সকল নক্ষত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু পরস্পরের তুলনায় উহাদের দীপ্তি এত বিসদৃশ যে, তাহাদিগকে কিছুতেই একশ্রেণীভুক্ত করা যায় না, এই কারণে জ্যোতির্বিদগণ ইহাদিগের কোন শ্রেণীবিভাগ না করিয়া, ইহাদিগের নাম 'বিশিষ্ট তারা' রাখিয়াছেন। 'কালপুরুষ' (Orion) নামে একটি নক্ষত্রমণ্ডল আছে, তাহার পশ্চাৎপদপ্রান্তে একটি অতুজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়, ইহা বিশিষ্ট নক্ষত্রদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহার নাম 'সিরিাস' (Sirius)। হিন্দুদিগের বেদ ও পুরাণে কালপুরুষের দুইটি কুকুরের উল্লেখ আছে, এই নক্ষত্র তাহাদিগের অন্ততর বলিয়া পরিচিত। ইউরোপীয় জ্যোতিষেও ইহাকে 'কুকুর-তারা' আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

যে-যে সময়ে জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রচলন যে-যে দেশে হইয়াছে, সেই সময়ে সেই-সেই দেশে নক্ষত্রের তালিকা ও তাহাদিগের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য-মতে সর্বপ্রথম নক্ষত্র-সারণী টলেমির (K. Ptolemaios, আনুমানিক ১৪০ খ্রীঃ) 'আল্‌মাজেস্ট' পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। আল্‌মাজেস্টের নক্ষত্রগুলি টলেমির গুরু হিপার্কসের (Hipparchus, ১৮০-১০০ খ্রীঃ-পূ) দ্বারা লক্ষিত হইয়াছিল। হিপার্কসের নক্ষত্রাদি দর্শনের এই উদ্দেশ্য ছিল যে, পুরাকালের নক্ষত্রগুলি ঠিক ঠিক সেই স্থানে আছে না সরিয়া গিয়াছে, তাহা সম্যক্ অবগত হওয়া এবং তাহার পরবর্তী জ্যোতির্বিদদেরাও যেন

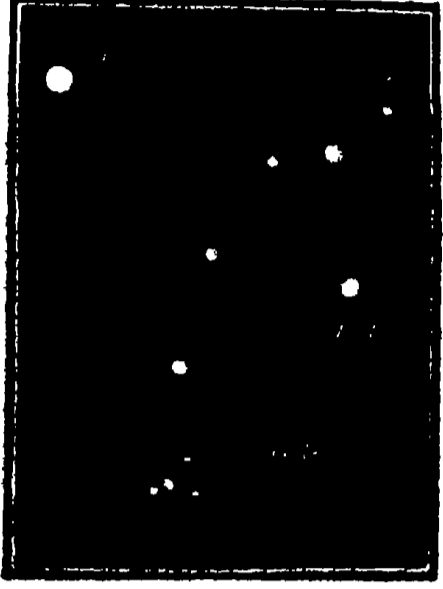
তাহাদিগের সময়ে নক্ষত্রসকল কি রকম স্থান অবস্থিত আছে তাহা জানিতে পারেন। হিপার্কসের তালিকায় ১০৮০ নক্ষত্র দেওয়া আছে। আল্‌মাজেস্ট পুস্তকে ১০৩০টি নক্ষত্রের অবস্থান বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পরের



কাসিওপিয়া, স্বাতি ও পেজাসস

নক্ষত্র-সারণী যাহা আমরা জানি, তাহা উলুবুগের (Ulu Beg) দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল। ইনি তাতার-রাজ তৈমুরলঙ্গের পুত্র। ১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি প্রাচ্যভূত হইয়াছিলেন। এই তালিকার নক্ষত্র প্রায় টলেমির নক্ষত্রের সহিত মিলিয়া যায়। এই উলুবুগ সমরথন্দে পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা নক্ষত্রের অবস্থান নির্ধারিত করিয়াছিলেন। ১০১৯টি নক্ষত্রের অবস্থান ইহার সারণীতে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার পরে টাইকোব্রাহী (Tycho Brahe, ১৫৪৬-১৬০১ খ্রীষ্টাব্দ) পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা ১০০৫টি নক্ষত্রের স্থান ঠিক সূক্ষ্মভাবে নির্ধারণ করিয়াছিলেন। আধুনিক সময়ে নক্ষত্র-সারণী দুই প্রকারের হইয়া থাকে। যে-সকল নক্ষত্রের অবস্থান (বিষুবংশ ও ক্রান্তি) যতদূর পারা যায় সঠিক নির্ধারিত হইয়াছে তাহা প্রথম প্রকার সারণীর অন্তর্ভুক্ত; আর যে-সকল নক্ষত্রের অবস্থান অনেকটা কাছাকাছি স্থানে দেওয়া আছে, যাহার দ্বারা নক্ষত্রকে যথাসম্ভব চিনিতে পারা যায়, তাহারা দ্বিতীয় প্রকার সারণীর অন্তর্গত। প্রথম প্রকার সারণীতে কুড়ি হাজার নক্ষত্র দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাদিগের অবস্থান অনেকটা সঠিকভাবে নির্ধারিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বিভাগে এক লক্ষ নক্ষত্র দেওয়া

হইয়াছে এবং ইহাদিগের অবস্থান যথাসম্ভব নিভুলভাবে নির্ধারিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বিভাগের নক্ষত্রের মধ্যে আর্জেলান্ডারের (Argelander, ১৭৯৯-১৮৭৫ খ্রীঃ)



কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জ

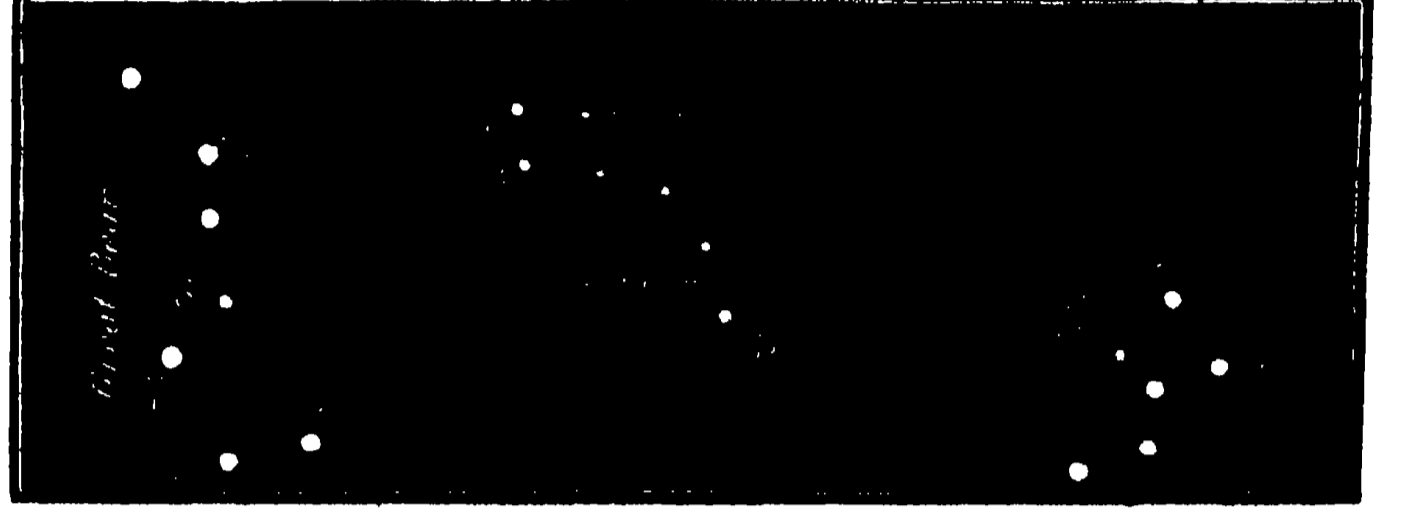
তালিকাই সর্বপ্রধান। উত্তর-ধ্রুব হইতে বিষুবাংশের দুই অংশ দক্ষিণ পর্য্যন্ত যে-সকল নক্ষত্র আছে তাহাদিগের মধ্যে নবম শ্রেণীর পর্য্যন্ত নক্ষত্র দেওয়া আছে। দক্ষিণ-ধ্রুবের নিকটস্থ দক্ষিণ-মেরুর নক্ষত্র সম্প্রতি গোল্ড সাহেবের দ্বারা (Dr. Gould) দক্ষিণ-আমেরিকার কর্ডোবায় দৃষ্ট হইয়াছিল।

আকাশে নক্ষত্রদিগকে চিনিয়া লইবার জন্ত তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলে বিভক্ত করা হইয়াছে। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কিংবা কোন দ্রব্যবিশেষের আকারে ঐ সকল মণ্ডল কল্পনা করিয়া, তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে, যথা—সপ্তর্ষিমণ্ডল, সাতভাই, কালপুরুষ, মিথুন, মেঘ, কর্কট, সিংহ, ধনুঃ, কুম্ভ প্রভৃতি। ইহাদিগের মধ্যে প্রথম তিনটি মণ্ডল সর্বসাধারণের নিকট পরিচিত। অপর কয়েকটিকে পুঞ্জ পুঞ্জ বিভক্ত করিয়া ‘রাশি’ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আকাশের নক্ষত্রগুলি গগনমণ্ডলে সমভাবে বিক্ষিপ্ত নাই। যেন স্থানে স্থানে একত্র পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। এই পুঞ্জীভূত নক্ষত্রগুলিকেই এক এক ‘রাশি’ কহে। পুরাকালে লোকেরা এই নক্ষত্রগুলিকে জীবজন্তুর আকারের ছায় কল্পনা করিয়া ইহাদিগের নামকরণ করিয়াছিল, যথা—বৃষের চক্ষু (The eye of the Bull), বৃহৎ ঋক্ষের পুচ্ছ, ওরায়ণের দক্ষিণ স্বক প্রভৃতি। আরবরা প্রত্যেক উজ্জ্বল নক্ষত্রের এক একটি নাম দিয়াছিল, অথবা গ্রীকদের নিকট হইতে ঐ নাম গ্রহণ করিয়াছিল, যথা—সিরিয়স (Sirius),

আর্কটিউরস্ (Arcturus), প্রোসিয়ন্ (Procyon), আল্দিবারান্ (Aldebaran) ইত্যাদি। আরও স্থানে স্থানে অনেকগুলি নক্ষত্র এত কাছাকাছি এবং একরূপভাবে মিলিয়া থাকিতে দেখা যায় যে, তাহাদিগকে নক্ষত্রপুঞ্জ বলা হইয়া থাকে, যেমন, কৃত্তিকা-নক্ষত্র। সাধারণ লোকেরা ইহা অনুমান করিতে পারে যে, কোন এক মণ্ডলে পরস্পরের নিকটবর্তী যে-সকল নক্ষত্র দেখা যায় তাহারা বৃষ্টি ঐরূপ সম্বন্ধভাবে একটি মণ্ডলাকারে অবস্থিত; বাস্তবিকপক্ষে এই অনুমান অমূলক। কারণ প্রত্যেক মণ্ডলে যে-সকল নক্ষত্র সংস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা পরস্পর হইতে বহু দূরে বিচ্ছিন্নভাবে বিশাল আকাশে অবস্থান করিতেছে। আমাদিগের নেত্র হইতে ঐ সকল নক্ষত্রে দৃষ্টিরেখা টানিলে তাহাদিগের মধ্যবর্তী কোণ (angle) যত সংকীর্ণ হইবে ঐ নক্ষত্রগুলিকে ততই পরস্পরের নিকটবর্তী দেখাইবে। যেমন, কোন বহুকোশব্যাপী সুদীর্ঘ সরল পথের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া উহার অপর প্রান্তের দিকে নেত্র স্থাপিত করিয়া ক্রোশাধিক দূরে অবস্থিত এক জন মানুষ ও তাহা হইতে আর এক ক্রোশ দূরবর্তী অপর এক জন মানুষকে দেখিলে দূরত্বশতঃ কেবল যে তাহারা ক্ষুদ্রাকার দেখাইবে তাহা নহে, পরন্তু তাহাদিগের পরস্পরের দূরত্বও অনুভব করা যাইবে না, মনে হইবে যেন তাহারা পরস্পরের নিকটে অবস্থিত রহিয়াছে। নক্ষত্রদিগকেও মুক্ত নেত্রে সেইরূপ কাছাকাছি দেখায় বলিয়া তাহাদিগের দৃষ্ট অবস্থান হইতে মণ্ডল কল্পিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ঐ সকল মণ্ডল সম্পূর্ণরূপেই মনুষ্যকল্পিত। পরস্পরের তুলনায় নক্ষত্রদিগের কোন গতি সহজে প্রত্যক্ষ করা যায় না, এই কারণে তাহাদিগকে ‘স্থির নক্ষত্র’ বলা হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগের দূরত্ব এত অধিক যে, বহু শত বৎসর অধ্যবসায়ের সহিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে পর্য্যবেক্ষণ ও গণনা না করিলে তাহাদিগের কোন স্বকীয় গতি আবিষ্কৃত হইতে পারে না। নক্ষত্রদিগের দূরত্বের তুলনায় সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব অতি অকিঞ্চিৎকর; কোন নক্ষত্র হইতে যদি সূর্য্য ও পৃথিবীকে যুগপৎ দৃষ্টিগোচর করিবার উপায় থাকিত, তাহা হইলে দেখা যাইত যে, পৃথিবী যেন সূর্য্যের গায়ে প্রায় সংলগ্ন রহিয়াছে।

সম্প্রতি 'আলোক-দূরত্ব' পরিমাপ করিবার নিয়ম উদ্ভাবিত হইয়াছে; ফুকো (Foucault) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের চেষ্টায় প্রমাণিত হইয়াছে যে আলোক গতিশীল এবং উহার বেগ সেকেন্ডে প্রায় ১৮৬,০০০ মাইল। আমরা যখন একটা আলোক দেখি, তখন ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ আলোকাধার হইতে আলোক একটা পথে সঞ্চরণ করিয়া আমাদের নেত্রে প্রবেশ করিতেছে। যতক্ষণ না এইরূপ ঘটিতেছে, ততক্ষণ আমাদের চক্ষু ঐ আলোকের ও আলোকাধারের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে না। গতিমাত্রই সময়সাপেক্ষ, অতএব আলোক-রশ্মিরও চলিতে সময় লাগিতেছে। প্রতি সেকেন্ডে ১৮৬,০০০ মাইল রশ্মির বেগ এইরূপ মানিয়া লইয়া গণনা করিলে দেখা যায় যে, সূর্য হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে প্রায় ৮ মিনিটের কিঞ্চিৎ কম সময় অতিবাহিত হয়, অর্থাৎ কোনও মুহূর্তে আমরা সূর্যকে ঠিক যে-স্থানে দেখিতে পাই, সূর্য তাহার প্রায় ৮ মিনিট পূর্বে ঐ স্থানে অবস্থিত ছিল। ইহা হইতে দেখা যায় যে পৃথিবীর কক্ষবাসের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আলোক পৌঁছিতে ১৬ মিনিটের অধিক ও ১৭ মিনিটের কিঞ্চিৎ কম সময় লাগিয়া থাকে। ইহাকে গণনার ভিত্তি ধরিয়া উহার সহিত তুলনায় কোন নক্ষত্র হইতে আলোক আসিতে যে সময় অতিবাহিত হয়, তাহার দ্বারা ঐ নক্ষত্রের দূরত্বের পরিমাপ হয় এবং ঐ দূরত্বকে সাধারণতঃ আলোক-দূরত্ব বলা হয়। যে-সকল নক্ষত্র মুক্ত নেত্রে দেখা যায় তাহাদিগের আলোক পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারা গিয়াছে যে, সৌরজগতের সর্বাঙ্গীক নিকটবর্তী যে নক্ষত্র, তাহা হইতে এই জগতে আলোক আসিয়া পৌঁছিতে প্রায় ৪৬ বৎসর অতিবাহিত হয়। কোন কোন নক্ষত্র হইতে আলোক আসিতে প্রায় বিশ, ত্রিশ, এমন কি পঞ্চাশ বর্ষ পর্যন্ত অতিবাহিত হয়। আকাশে সর্বাঙ্গীক উজ্জ্বল নক্ষত্র 'দুর্কক' (Sirius) হইতে সৌরজগতে আলোক আসিতে প্রায় ৬৬ বৎসর ব্যয়িত হইয়া থাকে এবং যে নক্ষত্রে 'ধ্রুবতারা' রহিয়াছে, উহা হইতে সৌরজগতে আলোক আসিতে প্রায় ৪৬৬ বৎসর অতিবাহিত হয়। সুতরাং আলোক-দূরত্ব গণনা করিলে

সহজেই বুঝা যায় যে, নাক্ষত্রিক জগৎ কত দূর বিস্তৃত এবং উহার বিস্তৃতির তুলনায় সৌরজগৎ কত ক্ষুদ্র, আর ইহাও অনুমান করা যায় যে নাক্ষত্রিক জগৎ যেমন বিশাল, তেমন নক্ষত্রগণও আমাদের সূর্য্যাপেক্ষা বহু গুণ বৃহৎ। এই



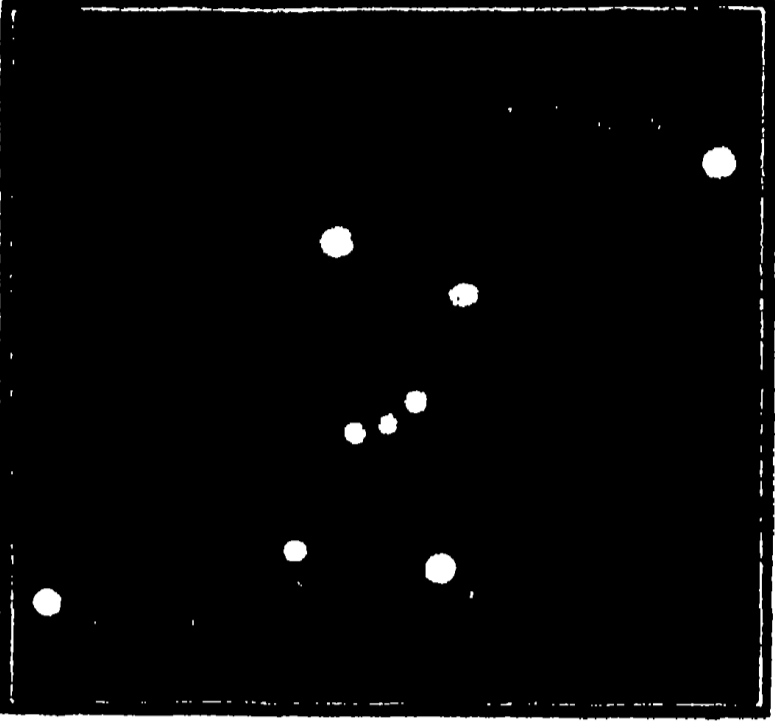
ধ্রুবতারা ও কাসিওপিয়া নক্ষত্রপুঞ্জ

যে ছোটবড় নানা শ্রেণীর নক্ষত্র দেখা যায়, তাহাদিগের আপেক্ষিক আকারের পরিচয় পাওয়া সম্ভব নহে। অনেক নক্ষত্র আকারে বৃহত্তর হইয়াও দূরত্বের আধিক্যবশতঃ ক্ষুদ্রতর দেখা যায়। বাস্তবিকপক্ষে নক্ষত্রজগতের সীমা নির্ধারণ করা এখনও পর্যন্ত মানুষের সাধ্যাতীত রহিয়া গিয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আকাশের মধ্যে মধ্যে নক্ষত্র-গুলি পুঞ্জীভূত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয় এবং সেই ধারণায় উহাদিগের আকার, নাম ইত্যাদি কল্পনা করা হইয়াছে। এই একত্রস্থিত নক্ষত্রগুলিকে নক্ষত্ররাশি বলা হইয়াছে। এই নক্ষত্ররাশিদিগের নামকরণ কি প্রকারে হইল এবং কখন, কোথায় ও কি অভিপ্রায়ে এই নাম দেওয়া হইল তাহা জানিবার বাসনা স্বতঃই মনে জাগে। কিন্তু উহার সন্তোষজনক উত্তর এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়া বিচার করিলে আমাদের জিজ্ঞাস্তা বিষয়-গুলির উত্তর অনেকটা পাইতে পারা যায়। প্রথম, জনশ্রুতি (folk-lore); দ্বিতীয়, লিপিবদ্ধ প্রমাণ (documentary evidence); তৃতীয়, আসিরিয়া দেশে এই সম্বন্ধে কি মূল প্রমাণ পাওয়া যায়, ইউক্রেটিজ্ উপত্যকায় সম্প্রতি যে স্মৃতিমন্দির বা খোদিত প্রস্তরাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে যাহা জানা যায়; চতুর্থ, নক্ষত্ররাশির নিজেদের মধ্যেই কি প্রমাণ পাওয়া যায়।

সূর্য্য ও চন্দ্রের স্থায় আকাশের অধিকাংশ নক্ষত্র

প্রতিদিন পূর্বদিকে উদিত হয় এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। বসন্তঃ, তাহারা যে দল বাঁধিয়া এইরূপ ভাবে পৃথিবীকে বেষ্টিত করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে এমত নহে; পৃথিবীর স্বীয় মেরুদণ্ডে আবর্তনই ইহার কারণ। কিন্তু



শুক্ল, কালপুরুষ, রোহিণী

আকাশের উত্তর-ভাগে পৃথিবীর ক্ষিতিক্ষ হইতে কিঞ্চিদূর্বে একটি নক্ষত্র দেখা যায়, তাহার কখনও উদয়াস্ত ঘটে না বলিয়া মনে হয়, উহা নিয়ত একস্থানে থাকে; ইহাকে 'ধ্রুবতারা' বলা হয়। যেমন কেহ নিজে নিজে ঘুরিবার সময়ে তাহার মাথার উপরিস্থিত কোনও দ্রবোর দিকে তাকাইলে দেখিতে পায় যে, সে যত দ্রুতবেগেই ঘুরিতে থাকুক না কেন, সেই দ্রব্যটিকে আদৌ ঘুরিতে দেখা যায় না; সেইরূপ ধ্রুবতারাকেও ঘুরিতে দেখা যায় না বলিয়া ইহা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, পৃথিবী ঐ ধ্রুবতারার দিকে মাথা রাখিয়া ঘুরিতেছে। ইহার নিকটে যে-সকল নক্ষত্র আছে তাহাদিগের উদয়াস্ত ঘটিতে দেখা যায় না; তাহারা এক অহোরাত্রে একবার ধ্রুবতারাকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলে, এই কারণে ইহাদিগকে 'ধ্রুবচর-তারা' (circumpolar stars) বলা হয়। ধ্রুবচর-তারািগের মধ্যে সপ্তর্ষিমণ্ডল (The Great Bear or the Dipper) সর্বাঙ্গা বিখ্যাত। সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতটি তারাই অতি সহজে চিনিয়া লওয়া যায় এবং ধ্রুবতারার জ্ঞান না থাকিলে এই মণ্ডলের সাহায্যেই ধ্রুবতারার সন্ধান জানিতে পারা যায়।

আকাশে নক্ষত্ররাশির সহিত পরিচয় নিম্নলিখিত উপায়ে লাভ করা যাইতে পারে। প্রথমে, উত্তর-ধ্রুবের নক্ষত্রগুলি দেখিতে হয়। দেখিবার সময়ে প্রথমেই

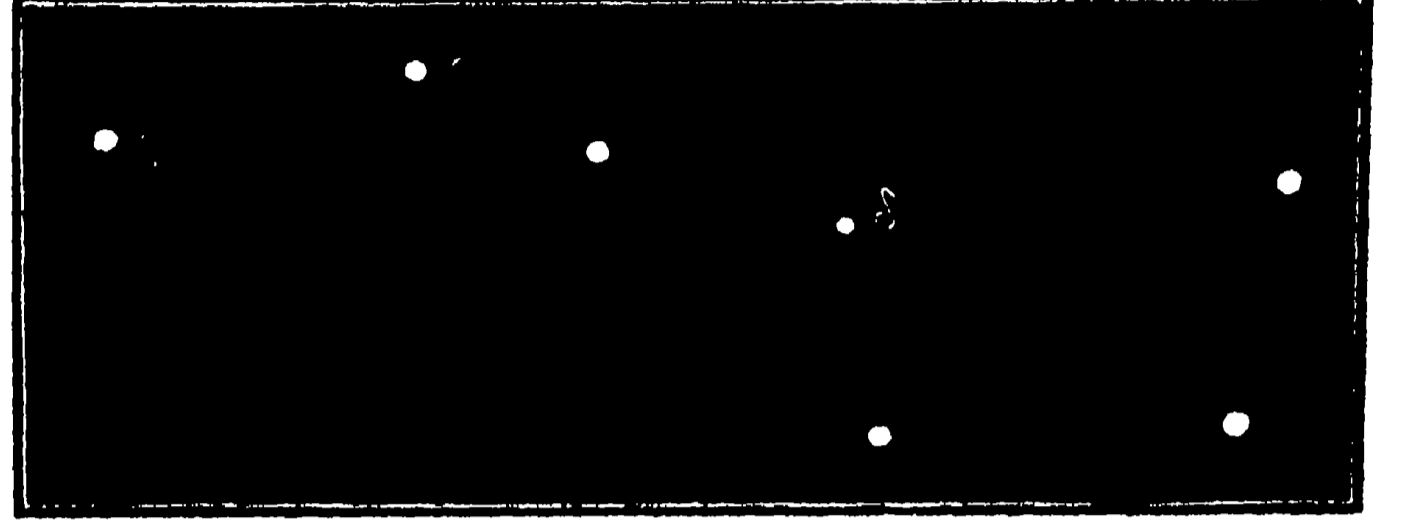
সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখা চাই। এই সপ্তর্ষিকে ঋক্ষ (The Great Bear or the Dipper) বলা হইয়া থাকে; ইহার মধ্যে ক্রতু ও পুলহ নক্ষত্র যোগ করিয়া যে সরল রেখা হইবে, তাহা পুচ্ছের যে-দিকে উন্নতদর সেই দিকে বর্দ্ধিত করিলে যে উজ্জ্বল নক্ষত্রে আসিয়া মিলিত হইবে, সেই নক্ষত্রই ধ্রুবতারা (Pole Star)। এই মণ্ডলটি দিগ্‌নির্ণয়ের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, কারণ ধ্রুব-নক্ষত্র জানিতে পারিলে উত্তর দিক জানা গেল এবং অত্র দিকগুলিও জানিবার অসুবিধা রহিল না। এই মণ্ডলটির একটি চিত্র প্রদর্শিত হইল; ইহাতে তারকাঙ্কন যোগ করিয়া রেখা টানিলে দেখা যায় যে, ঐ রেখা ধ্রুব-নক্ষত্রে আসিয়া মিলিয়াছে।

ইহার পর লঘুসপ্তর্ষি (The Little Bear) বা ছোট ঋক্ষ দেখিতে হয়; এই ছোট ঋক্ষের পুচ্ছের শেষের তারি ধ্রুব-নক্ষত্র। পরে কাসিওপিয়া দেখিতে হয়; ইহাকে লেডি ইন্‌ দি চেয়ার (Lady in the chair) বলা হইয়া থাকে। ইহা দেখিতে ঠিক W অক্ষরের স্তায়। পাশ্চাত্য পৌরাণিক মতে সিফিয়সের (ইহাও একটি নক্ষত্ররাশি) রাণী কাসিওপিয়া; আকাশে ইনি যেন একটি প্রকাণ্ড সিংহাসনে বসিয়া হুকুমজারি করিতেছেন। পরে পার্শিয়স (Perseus), সিফিয়স, কামোলোপার্ড, সিংহ, ড্রেকো (দৈত্য) ও লাসটা (টিকটিকি) দেখিতে হয়। কতকগুলি নক্ষত্ররাশি কয়েকটি বিভিন্ন সময়ে দেখিবার সুবিধা হয়। ২১ ডিসেম্বর মধ্যরাত্রি, ২১ জানুয়ারি রাত্রি দশটা, ২০শে ফেব্রুয়ারি রাত্রি আটটা ও ২১শে মার্চ সন্ধ্যা ছয়টায় সিগ্নস (রাজহংস), সিফিয়স, কাসিওপিয়া, পার্শিয়স, অরীজা (সারথি), বৃষ, মিথুন, কালপুরুষ, কেনিস্‌ মাইনর (ছোট কুকুর), কেনিস্‌ মেজর (বড় কুকুর), আর্গো নেভিস্‌ (আর্গো জাহাজ) ও কর্কট নক্ষত্ররাশি দেখিতে হয়। কালপুরুষ এখন প্রায় মাধ্যাহ্নিকে স্থিত। ইহাতে প্রথম শ্রেণীর দুইটি নক্ষত্র ও দ্বিতীয় শ্রেণীর চারিটি নক্ষত্র আছে, মধ্যে তিনটি নক্ষত্র এক রেখায় অবস্থিত; এই মধ্যের তিনটি নক্ষত্রকে ইষুত্রিখণ্ড অর্থাৎ যোদ্ধার কটিদেশ (belt) বলা হইয়া থাকে; প্রথম শ্রেণীর একটি নক্ষত্রকে আর্জো-নক্ষত্র (Betelgeuse) নামে অভিহিত করা হয়,

দ্বিতীয় [উজ্জ্বল নক্ষত্রটিকে Regel আখ্যা দেওয়া হয়। প্রথমটি যোদ্ধার স্বাক্ষর দিকে, আর দ্বিতীয়টি যোদ্ধার পায়ের দিকে। কেনিস্ মাইনর নক্ষত্র রাশিতে প্রোসিয়ন্ (প্রশ্না) উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কেনিস মেজরে সিরিয়াস্ (বুদ্ধক) নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাই সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল নক্ষত্র। বৃষ রাশিতে ক্লডিকা-নক্ষত্র (Pleiades) অবস্থিত, ইহাকে সাত-ভাই চম্পা কহে। আবার ২১শে মার্চ মধ্যরাত্ৰিতে, ২০শে এপ্রিল ১০টা রাত্ৰিতে, ও ২১শে মে ৮টা রাত্ৰিতে কন্না, তুলা, বৃশ্চিক, কোমা বেরেনিসী (রাণী বেরেনিসীর কেশদাম), বুটীজ (ভল্লুক পাল), কেনিস্ ভেনাটিসি (শিকারী কুকুর), করোণা বোরিয়ালিস্ (উত্তর দিকের মুকুট) দেখিতে হয়। আর ২১শে জুন মধ্যরাত্ৰিতে, ২১শে জুলাই রাত্ৰি ১০টার সময়ে ও ২১শে আগষ্ট রাত্ৰি ৮টার সময়ে সিগনস্, লায়রা (বীণা), ভ্যালেকিউসা (শৃগাল), সাগিটা (ধনু), আকুইলা (ঈগল), বৃশ্চিক, ধনু, মকর, হারকিউলিস্, ড্রেকো (দৈত্য) দেখিতে হয়। আর ২১শে সেপ্টেম্বর মধ্যরাত্ৰিতে, ২১শে অক্টোবর ১০টা রাত্ৰির সময়ে, ২০শে নবেম্বর ৮টা রাত্ৰে ও ২১শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় কাসিওপিয়া, সিফিয়স্, সিগ্নস্, লায়রা, আকুইলা, পার্সিযুস্, অরীজা, পেজাসস্ (Flying Horse), এণ্ড্রোমিডা (স্বাতি), সেটুস্ (হোয়েল্ মৎস্য) দেখিতে হয়।

আকাশে নক্ষত্রদিগের গঠনে বিশেষ বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোন নক্ষত্রের অবয়ব সূর্যের মত জমাট বাঁধিতেছে, কিন্তু কোন নক্ষত্র আবার এখন পর্য্যন্ত বাষ্পাকারে অবস্থিতি করিতেছে। এইরূপ প্রাকৃতিক বিভিন্নতা অনুসারে নক্ষত্রদিগকে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করা যায়। দূরবীক্ষণের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির উপরই নক্ষত্রদিগের এই জাতি-নির্বাচন নির্ভর করিয়া থাকে। সাধারণতঃ সকল নক্ষত্রই এক-একটি আলোক-বিন্দুরূপে প্রতীয়মান হয়; কিন্তু তীক্ষ্ণশক্তি দূরবীক্ষণেও যখন কোন নক্ষত্র একটি পরিষ্কৃত বিন্দুরূপে দৃষ্ট হয় না এবং অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট ধূমশিখার মত দৃষ্টিগোচর হয়, তখনই উহার বাষ্পীয় অবয়ব উপলব্ধি করা যায়। এমন নক্ষত্রও

দেখা গিয়াছে। যাহা ঠিক আলোক-বিন্দুরূপে নয়নগোচর না হইয়া একখণ্ড ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম মেঘের ন্যায় প্রতিভাত হয়; ইহাদিগকে 'নক্ষত্র' না বলিয়া 'নীহারিকা' বলা হইয়া থাকে। অনেকে অনুমান করেন যে, উহাদের গঠনকার্য্য



সপ্তর্ষি নক্ষত্রপুঞ্জ

এখনও শেষ হয় নাই, ইহারা এখনও অসম্বদ্ধ বাষ্পকণারূপে অবস্থিত এবং ক্রমশঃ জমাট বাঁধিয়া অবশেষে এককালে নক্ষত্রে পরিণত হইবে। আকাশে কোন-কোন স্থানে আবার এমন এক-একটি নক্ষত্র দেখা যায় যাহাকে সাধারণতঃ নীহারিকার মত দেখায়; কিন্তু বিশেষ তীক্ষ্ণশক্তি দূরবীক্ষণের দ্বারা নেত্রগোচর করিলে দেখা যায় যে, তাহা বাস্তুবিক অনেকগুলি নক্ষত্রের সমষ্টি মাত্র। মনে হয়, যেন বহুসংখ্যক নক্ষত্র একটি সঙ্কীর্ণ স্থান অধিকার করিয়া পরস্পরের নিকট ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছে, ইহাদিগকে 'নক্ষত্র-স্তূপ' (star clusters) বলা হইয়া থাকে। ইহারা প্রকৃতই পরস্পর সন্নিবিষ্ট বলিয়া অথবা ইহাদের দৃষ্টিরেখা প্রায় এক দিকে স্থাপিত বলিয়া এইরূপ স্তূপাকৃতি দেখা যায় কি না, তাহা সকল সময়ে স্থির করা সম্ভবপর নহে। হয়ত অনেক-স্থলেই নক্ষত্র-স্তূপ আমাদের দৃষ্টিবিস্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে এইরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত বা সত্য প্রতিপন্ন হইবে না। ক্লডিকা-নক্ষত্রটি (Pleiades) মুক্ত নেত্রে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, উহাতে ছয়টি নক্ষত্র রহিয়াছে, কিন্তু দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে উহাতে পঞ্চাশটির উপর নক্ষত্র রহিয়াছে দেখা যায়। পার্সিযুস-নক্ষত্র আর একটি দৃষ্টান্ত, দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের প্রয়োগে দেখা যায় ইহাতে বহুসংখ্যক নক্ষত্র ঘনসন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, উহা একটি চমৎকার দৃশ্য।

ইহা ভিন্ন আকাশে যুগ্ম নক্ষত্র বা যমক নক্ষত্র (double stars), তিস্র, চতুরস্র প্রভৃতি বহুবঙ্গিক নক্ষত্র (multiple stars), পরিবর্তক নক্ষত্র বা বহুরূপী নক্ষত্র (variable stars) দৃষ্টিগোচর হয়। আকাশে এমন কতকগুলি নক্ষত্র আছে যাহাদিগকে মুক্ত নেত্রে দেখিলে একটি নক্ষত্র মনে হয়, কিন্তু তীক্ষ্ণশক্তি দূরবীক্ষণ-সাহায্যে উহারা দ্বিখণ্ড হইয়া দুইটি নক্ষত্ররূপে প্রকাশ পায়। বহুকালের পর্যবেক্ষণে এইরূপ নক্ষত্রের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইয়াছে, ইহাদিগকে যুগ্ম বা যমক নক্ষত্র বলা হয়। উইলিয়ম হর্শেল প্রথমে এই জাতীয় নক্ষত্রের স্বরূপ আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং পঁচিশ বৎসর পর্যবেক্ষণের পর ইহাদের যমকত্ব সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নিদর্শন-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, লুকক (Sirius) নামক উজ্জ্বল নক্ষত্রটির একটি ক্ষীণ সহচর এবং সপ্তর্ষিদিগের মধ্যে এক জনের একটি অতি ক্ষীণ সহচর আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আকাশে কয়েকটি নক্ষত্র এমন আছে যে, উহাদিগকে বিশ্লেষণ করিলে তিন বা তদধিক সংখ্যক নক্ষত্র দৃষ্ট হয় এবং তাহারা যে তাহাদিগের মধ্যবর্তী কোন নির্দিষ্ট বিন্দুকে বেষ্টিত করিয়া চলিতেছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, উহারা যুগ্ম বা যমক নক্ষত্রের স্তায় কেবলমাত্র দ্বিখণ্ড না হইয়া বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পরস্পরের আকর্ষণে পরিক্রমণ করিতেছে; ইহাদিগকে বহুবঙ্গিক বলা হইয়া থাকে। নিদর্শনস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, লাইরা (বীণা) নক্ষত্রটিতে চারিটি নক্ষত্র পরিলক্ষিত হইয়াছে,—তিনটি গুত্রাকৃতি, আর একটি

লোহিতাকার; আবার কালপুরুষের অন্তর্গত একটি নক্ষত্রকে বিশ্লেষণ করিয়া উহাতে ছয়টি নক্ষত্র দেখা গিয়াছে। আকাশে আরও এক প্রকার নক্ষত্র আছে, তাহাদের গুঞ্জলা স্থির নহে; উহাদিগকে বহুরূপী বা পরিবর্তক নক্ষত্র নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলির নির্দিষ্ট সময়ানুসারে গুঞ্জলোর পরিবর্তন হয়। এই শ্রেণীর নক্ষত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত দুই প্রকারই বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যথা—মিরা (Mira=আশ্চর্য্য) ও আলগল (Algol)। মিরা-শ্রেণীর নক্ষত্রের গুঞ্জলা-পরিবর্তনের কাল ৩১ দিন। এই সময়ের মধ্যে উহা দ্বিতীয় শ্রেণীর নক্ষত্র হইতে একবারে ষষ্ঠ শ্রেণীর নক্ষত্রে পরিণত হয়, তারপর প্রায় পাঁচ মাসকাল উহা একেবারে অদৃশ্য হয় এবং পরে আবার ক্রমশঃ পূর্বাভাস্য উপনীত হয়। আলগল-শ্রেণীর নক্ষত্রের গুঞ্জলা-পরিবর্তনের মোট সময় দুই দিন, কুড়ি ঘণ্টা, আটচল্লিশ মিনিট, পঞ্চান্ন সেকেন্ড; এই সময়ের মধ্যে পার্সিফুস নক্ষত্রাশির আলগল-নক্ষত্র দুই দিন ১৩ ঘণ্টার জন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর নক্ষত্র থাকে, তার পর সাড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে ইহা ক্রমশঃ চতুর্থ শ্রেণীর নক্ষত্রে পরিণত হয়, কুড়ি মিনিট চতুর্থ শ্রেণীর নক্ষত্র থাকিয়া ইহা পুনরায় ক্রমশঃ উহার পূর্বের গুঞ্জলা লাভ করে এবং সাড়ে তিন ঘণ্টা পরে আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর নক্ষত্র হইয়া যায়।

নাক্ষত্রিক জগতের পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা অতি চিত্তাকর্ষক এবং দূরবীক্ষণের সাহায্যে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, নাক্ষত্রিক জগৎ সৌরজগতের তুলনায় কত বিশাল ও কত অদ্ভুত।

দৃষ্টি-প্রদীপ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

৩

এই ঘটনার পরে আমার ভয় হ'ল আমার সেই রোগ আবার আরম্ভ হবে। ও যখন আসে তখন উপরি-উপরি অনেক বার হয়—তার পর দিনকতকের জন্তে আবার একেবারেই বন্ধ থাকে। এই বার বেশী ক'রে শুরু হ'লে আমার চাকুরী ঘুচে যাবে—সীতার কোন কিনারাই করতে পারব না।

মেজবাবু হিসেবের খাতা লেখার কাজ দিলেন নবীন-মুহুরীকে। তার ফলে আমার কাজ বেছায় বেড়ে গেল—ঘুরে ঘুরে এঁদের কাজে খিদিরপুর, বরানগর, কালীঘাট করতে হয়—আর দিনের মধ্যে সতের বার দোকানে বাজারে যেতে হয় চাকরকে সঙ্গে নিয়ে। খাওয়া-দাওয়ার নিশ্চিষ্ট সময় নেই, দিনে রাতে শুধু ছুটোছুটি কাজ। এই দোকানের হিসেব নবীন-মুহুরীকে বুঝিয়ে দেওয়া একটা ঝগড়াট—রোজ সে আমাকে অপমান করে ছুতোয়-নাতায়, আমার কথা বিশ্বাস করে না, চাকরদের জিজ্ঞেস করে আড়ালে সত্যি সত্যি কি দরে জিনিষটা এনেচি। সীতার মুখ মনে ক'রে সবই সহ ক'রে থাকি।

কার্ত্তিক মাসে ওঁদের দেশের সেই মহোৎসব হবে—আমাদের সকলকে দেশে পাঠানো হ'ল। আমি অনেক আগে থেকেই শুনে আস্চি—অত্যন্ত কৌতূহল ছিল দেখ'ব ওঁদের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মানুষ্ঠান কি রকম।

গ্রামে এঁদের প্রকাণ্ড বাড়ি, বাগান, দীঘি, এঁরাই গ্রামের জমিদার। তবে বছরে এই একবার ছাড়া আর কখনও দেশে আসেন না। কুঞ্জ-নায়েব বাকী দশ মাস এখানকার মালিক।

একটা খুব বড় ফাঁকা মাঠে মেলা বসেচে—এখানকার দোকান-পসারই বেশী। অনেকগুলো খাবারের দোকান, মাটির খেলনার দোকান, মাছরের দোকান।

একটা বড় বটগাছের তলাটা বাধানো, সেটাই না-কি পীঠস্থান। লোকে এসে সেইখানে পূজা দেয়—আর বটগাছটার ডালে ও ঝুরিতে ইট বাধা ও লাল নীল নেকড়া বাধা। লোকে মানত করবার সময় ওই সব গাছের গায়ে বেঁধে রেখে যায়, মানত শোধ দেওয়ার সময় এসে খুলে দিয়ে পূজা দেয়। বটতলায় সারি সারি লোক ধর্না দিয়ে শুয়ে আছে, মেয়েদের ও পুরুষদের ধর্না দেওয়ার জায়গা আলাদা আলাদা।

বড়বাবু ও মেজবাবুতে মোহান্তের গদীতে বসেন—কর্ত্তা নীলাশ্বর রায় আসেন নি, তাঁর শরীর সুস্থ নয়। এঁদের বেদীর ওপরে আশপাশে তাকিয়া, ফুল দিয়ে সাজানো, সামনে ঝকঝকে প্রকাণ্ড রূপোর খালাতে দিন-রাত প্রণামী পড়চে। দুটো খালা আছে—একটাতে মোহান্তের নজর, আর একটাতে মানত শোধ ও পূজার প্রণামী।

নবীন-মুহুরী বেচারাম ও আমার কাজ হচ্চে এই সব টাকাকড়ির হিসেব রাখা। এর আবার নানা রকম রেট বাঁধা আছে, যেমন—পাঁচ সিকের মানত থাকলে গদীর নজর এক টাকা, তিন টাকার মানতে দু-টাকা ইত্যাদি। কেউ কম না দেয় সেটা মুহুরীদের দেখে নিতে হবে, কারণ মোহান্তরা টাকাকড়ির সম্বন্ধে কথা বলবেন না।

কাজের ফাঁকে আমি বেড়িয়ে দেখতে লাগলাম চারি ধারে, সবারই সঙ্গ মিশে এদের ধর্ম্মতটা ভাল ক'রে বুঝবার আগ্রহে যাদের ভাল লাগে তাদেরই নানা কথা জিজ্ঞাসা করি, আলাপ ক'রে তাদের জীবনটা বুঝবার চেষ্টা করি।

কি অদ্ভুত ধর্ম্মবিশ্বাস মানুষের তাই ভেবে অবাক হয়ে যাই। কতদূর থেকে যে লোক এসেচে পৌন্টলাপুটলি বেঁধে, ছেলেমেয়ে সঙ্গে নিয়েও এসেচে অনেকে। এখানে থাকবার জায়গা নেই, বড় একটা মাঠে লোকে

এখানে-ওখানে এই কার্তিক মাসের হিমে চট, সতরঞ্জি, হোগলা, মাত্র বে যা সংগ্রহ করতে পেরেচে তাই দিয়ে থাকবার জায়গা তৈরি ক'রে তারই তলায় আছে—কেউবা আছে শুধু গাছতলাতে। যে যেখানে পারে, মাটি খুঁড়ে কি মাটির ঢেলা দিয়ে উনুন বানিয়ে রান্না করচে। একটা সন্নে-গাছতলায় এক বুড়ী রান্না করছিল—সে একাই এসেচে হুগলী জেলার কোন গাঁ থেকে। তার এক নাতি হুগলীর এক উকিলের বাসায় চাকর, তার ছুটি নেই, বুড়ী প্রতিবছর একা আসে।

আমায় বললে—বড় জাগ্রত ঠাকুর গো বটতলার গোসাই। মোর মাল্‌সি গাছে কাঁটাল মোটে ধরতো নি, জালি পড়ে আর খসে খসে যায়। তাই বন্ধু বাবার থানে কাঁটাল দিয়ে আস্বো, হে ঠাকুর কাঁটাল যেন হয়। বললে না-পেতায় যাবে ছোট্ট-বড়য় এ-বছর সতেরো গণ্ডা এঁচড় ধরেচে গোসাইয়ের কিরুপায়।

আর এক জায়গায় খেজুরডালের কুঁড়েতে একটি বৌ ব'সে র'ধচে। আর তার স্বামী কুঁড়ের বাইরে ব'সে খোল বাজিয়ে গান করচে। কাছে যেতেই বসতে বললে। তারা জাতে কৈবর্ত, বাড়ি খুলনা জেলায়, পুরুষটির বয়েস বছর চল্লিশ হবে। তাদের ছোট্ট একটি ছেলে মায়ের কাছে ব'সে আছে, তারই মাথার চুল দিতে এসেচে।

পুরুষটির নাম নিমচাঁদ মণ্ডল। স্বামী-স্ত্রী দু-জনেই বড় ভক্ত। নিমচাঁদ আমার হাতে একখানা বই দিয়ে বলল—পড়ে শোনাও তো বাবু, দু-আনা দিয়ে মেলা থেকে কাল কেন্দ্রাম একখানা। বইখানার নাম 'বটতলার কীর্তন'। স্থানীয় ঠাকুরের মাহাত্ম্যসূচক তাতে অনেকগুলো ছড়া। বটতলার গোসাই ব্রহ্মার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এখানে এসে আস্তানা বেঁধেচেন, কলিরাজ ভয়ে তাঁর সঙ্গে এই সন্ধি করলে যে বটতলার হাওয়া বত দূর যাবে তত দূর পর্যন্ত কলির অধিকার থাকবে না। বটতলার গোসাই পাপীর মুক্তিদাতা, সর্বজীবের আশ্রয়, সাক্ষাৎ শ্রীহরির একাদশ অবতার।

কলিতে নতুন রূপ গুন মন দিয়!
বটতলে স্থিতি হৈল ভক্তল নিয়া
খেদে কহে কলিরাজ, এ বড় বিবম কাজ
মোর দশা কি হবে গোসাই

ঠাকুর কহিলা হেসে, মনে না করিহ ক্রেশে
ধান ত্যজি কোথাও না যাই।
শ্রীদাম সুবল সনে হেথায় আসিব
বটমূলে বৃন্দাবন সৃষ্টি করি নিব।

নিমচাঁদ শুন্তে শুন্তে ভক্তিগদগদকণ্ঠে বললে—আহা! আহা! বাবার কত লীললেখলা!

তার স্ত্রীও কুঁড়ের দোরগোড়ায় এসে বসে শুন্চে। মানে বৃন্দাম এরা নিজেরা পড়তে পারে না, বইপড়া শোনার আনন্দ এদের কাছে বড় নতুন, তা আবার ধীর ওরা ভক্ত, সেই বটতলার গোসাই সম্বন্ধে বই।

নিমচাঁদ বললে—আচ্ছা, বটতলার হাওয়া কত দূর যায় দা-ঠাকুর?

—কেন বল তো?

—এই যে বল্‌চে কলির অধিকার নেই ওর মধ্য, তা কত দূর তাই শুধুচি।

—কত দূর আর, ধর আধ কোশ বড়জোর—

নিমচাঁদ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কি ভেবে বললে—কি করবো দা-ঠাকুর, দেশে লাঙল-গরু ক'রে ফেলেচি, কুড়ো-তুই জমিতে এবার বাগুন রুইয়ে রেখে এসেচি—নয়ত এ বাবার থান ত বিন্দাবন, আপনি পড়লেন—এ স্বগ্গো ছেড়ে বিলির মোষের মত বিলি ফিরে যাই দা-ঠাকুর? কি বলিস রে তুই, সরে আয় না এদিকে, দা-ঠাকুরকে লজ্জা কি, উনি তো ছেলেমানুষ।

নিমচাঁদের স্ত্রী গলার সুরকে খুব সংবত ও মিষ্টি ক'রে, অপরিচিত পুরুষ-মানুষের সামনে কথা বলতে গেলে মেয়েরা যেমন সুরে কথা বলে, তেমনি ভাবে বললে—হ্যাঁ ঠিকই তো। বাবার চরণের তলা ছেড়ে কোথাও কি যেতে ইচ্ছে করে?

নিমচাঁদ বললে—হু-মণ কোষ্টা ছিল ঘরে, তা বলি বিক্রী ক'রে চল বাবার থানে বাবার ছিচরণ দর্শন ক'রে আসি আর অমনি গজাছেনটাও সারবো। টাকা বাবা যোগাবেন, সেজন্তে ভাবিনে। ওরে শোন, কাল তুই তো ধন্য দিবি সকালে, আজ রাতে ভাতে জল দিয়ে রেখে দিস্—

জিগ্যেস ক'রে জান্‌লাম ছেলের অসুখের জন্তে ধর্না দেবার ইচ্ছে আছে ওদের।



শিবাজী ও মুসলমান বন্দিণী

শ্রীশ্যামল গোস্বামী

নিমটাদের বৌ বললে—বুঝলেন দাদাঠাকুর, খোকার মামা ওর মুখ দেখে তিনটে টাকা দিলে খোকার হাতে। তখন পয়সার বড় কষ্ট বাচ্ছে, কোষ্টা তখন জলে, কাচলি তো পয়সা ঘরে আসবে? তো বলি না, এ টাকা খরচ করা হবে না। এ রইল তোলা বাবার থানের জন্টি। মোহন্ত-বাবার গদীতে দিয়ে আসব।

সেই দিন বিকালে নিমটাদ ও তার বৌ পূজো দিতে এল গদীতে। নবীন-মুহুরী তাদের কাছে রেট-মত প্রণামী ও পূজোর খরচ আদায় করলে অবিশ্যি—তা ছাড়া নিমটাদের বৌ নিজের হাতে সেই তিনটে টাকা বড়বাবুর সামনের রুপোর খালায় রেখে দিয়ে বড়বাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে কোলের খোকার মাথায় মুখে দিয়ে দিলে।

তার পর সে একবার চোখ তুলে মোহান্তদের দিকে চাইলে এবং এদের ঐশ্বর্যের ঘটতেই সম্ভব অবাক হয়ে গেল—বুদ্ধিহীন চোখে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে টাকা-পয়সাতে পরিপূর্ণ স্বকৃৎকে রুপোর আলোটার দিকে বার-কতক চাইলে, রঙীন শালু ও গাঁদাকুলের মালায় মোড়া থামগুলোর দিকে চাইলে—জীবনে এই প্রথম সে গোসাইয়ের থানে এসেছে, সব দেখে-শুনে লোকের ভিড়ে, মোহান্ত মহারাজের আড়ম্বরে, অনবরত বর্ষণরত প্রণামীর সম্বন্ধমানি আওয়াজে সে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। কতক ক্ষণ হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, বাইরে থেকে ক্রমাগত লোক চক্চে, তাকে ক্রমশঃ ঠেলে একধারে সরিয়ে দিচ্ছে, তবুও সে দাঁড়িয়েই আছে।

ওকে কে এক জন ঠেলা দিয়ে এগিয়ে আসতে গেল, আমি ওর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারি নি। ওর মুখচোখের মুগ্ধ ভক্তিস্তরু দৃষ্টি আমায়ও মুগ্ধ করেছে—এ এক নতুন অভিজ্ঞতা আমার জীবনের, এই বাজে শালুর বাহার আর লোকের হৈ চৈ আর মেজবাবু, বড়বাবুর চশমামণ্ডিত দাস্তিক মুখ দেখে এত ভাব ও ভক্তি আসে!—যে ঠেলা দিয়ে এদিকে আসছিল, আমি তাকে ধমক দিলাম। তার পর ওর চমক ভাঙতে ফিরে বাইরে বেরিয়ে গেল।

ওরা চলে গেলে একটি বৃদ্ধা এল, তার বয়েস অনেক হয়েছে, বয়েসে গলার সুর কেঁপে গিয়েছে, হাত কাঁপচে, সে তার আঁচল থেকে একটি আধুলি খুলে খালায় দিতে গেল। নবীন-মুহুরী বললে—রও গো, রাখ—আধুলি কিসের?

বুড়ী বললে—এই-ই ঠা-কুরে-র মা-ন-ত শো-ধে-র পে-র-ণা-মী—

নবীন-মুহুরী বললে—পাঁচ সিকের কমে ভোগের পূজো নেই—পাঁচ সিকেতে এক টাকা গদীর নজর—

বুড়ী শুনে পায় না, বললে—কত?

নবীন আঙুল দেখিয়ে চোঁচিয়ে বললে—এক টাকা—

বুড়ী বললে—আর নে-ই-ই, মা-হ-র কি-নে-লা-ম ছ-আ-না-র, আর—

নবীন-মুহুরী আধুলি ফেরৎ দিয়ে বললে—নিয়ে যাও, হবে না। আর আট আনা নিয়ে এস—

বড়বাবু একটা কথাও বললেন না। বুড়ী কাঁপতে কাঁপতে ফিরে গেল এবং ঘণ্টাখানেক পরে সিকিতে, ছুআনিতে, পয়সাতে একটা টাকা নিয়ে এসে প্রণামীর খালায় রাখলে।

ওরা চলে গেলে আমার মনে হ'ল এই সরল, পরম বিশ্বাসী পল্লীবধু, এই বৃদ্ধা ওদের কষ্টাজিত অর্থ কাকে দিয়ে গেল—মেজবাবুকে বড়বাবুকে? এই এত লোক এখানে এসেছে, এরা সবাই চাবী গরিব গৃহস্থ, কি বিশ্বাসে এখানে এসেছে জানি নে—কিন্তু অল্পান বদনে খুঁটার সঙ্গে এদের টাকা দিয়ে বাচ্ছে কেন? এই টাকায় কল্কাতায় ওঁদের স্ত্রীরা গহনা পরবেন, মোটর চড়বেন, থিয়েটার দেখবেন, ওঁরা মামলা করবেন, বড়মানুষী সাহেবিয়ানা করবেন—ছোটবাবু বন্ধুবান্ধব নিয়ে গানবাজনার মজলিসে চপ-কাটলেট্ ওড়াবেন, সেই জন্তে?

পরদিন সকালে দেখলাম নিমটাদের স্ত্রী পুকুরে স্নান ক'রে সারাপথ সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করতে করতে ধুলোকাদা-মাথা গায়ে বটতলায় ধর্ণা দিতে চলেছে—আর নিমটাদ ছেলে কোলে নিয়ে ছলছল চোখে তার পাশে পাশে চলেছে।

সেই দিন রাতে শুন্লাম মেলায় কলেরা দেখা দিয়েছে। পরদিন দুপুরবেলা দেখি বটতলার সামনের মাঠটা প্রায় কাঁকা হয়ে গিয়েছে, অনেকেই পালিয়েছে। নিমটাদের কুঁড়েঘরের কাছে এসে দেখি নিমটাদের স্ত্রী বসে—আমায় দেখে কেঁদে উঠল। নিমটাদের কলেরা হয়েছে কাল রাতে—মেলায় বাবা তদারক করে, তারা ওকে কোথায় নাকি নিয়ে যেতে

চেয়েচে, মাঠের ওদিকে কোথায়। আমি ঘরে ঢুকে দেখি নিমটাদ শুয়ে ছট্‌ফট্‌ করচে, খুব বাম্‌চে।

নিমটাদের স্ত্রী কেঁদে বললে—কি করি দাদাঠাকুর, হাতে শুধু বাবার ভাড়াটা আছে—কি করি কোথা থেকে—

মেজবাবুকে কথাটা বললাম গিয়ে। তিনি বললেন—লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি, ওকে সিগ্রিগেশন্‌ ক্যাম্প নিয়ে যাও—মেলার ডাক্তার আছে সে দেখবে—

নিমটাদের বৌ-এর কি কান্না ওকে নিয়ে বাবার সময়। আমরা বোঝালুম অনেক। ডাক্তার ইন্‌জেক্সন দিলে। মাঠের মধ্যে মাত্র দিয়ে সিগ্রিগেশন্‌ ক্যাম্প করা হয়েছে—অতি নোংরা বন্দোবস্ত। সেখান সেবাশুশ্রূষার কোনো ব্যবস্থাই নেই। ভাবলুম চাকুরী যায় যাবে, ওকে বাঁচিয়ে তুলব, অস্তুতঃ বিনা তদারকে ওকে মরতে দেবো না। সারারাত জেগে রোগীকে দেখাশুনো করলুম একা। সিগ্রিগেশন্‌ ক্যাম্প আরও চারটি রোগী এল—তিনটে সন্ধ্যার মধ্যেই মরে গেল। মেলার ডাক্তার অবিশ্বি নিয়ম-মত দেখলে। এদের পয়সা নিয়ে যারা বড়-মানুষ, তারা চোখে এসে দেখেও গেল না কাউকে। রাত্রিটা কোনো রকমে কাটিয়ে বেলা উঠলে নিমটাদও মারা গেল। সে এক অতি ক্লান্ত ব্যাপার! ওদের দেশের লোক খুঁজে বার করে নিমটাদের সংস্কারের ব্যবস্থা করা গেল। নিমটাদের স্ত্রীর দিকে আমি আর চাইতে পারি নে—বটতলায় ধর্ণা দেওয়ার দিন থেকে সেই যে সে উপবাস করে আছে, গোলমালে আর তার খাওয়াই হয় নি। কক্ষ চুল একমাথা, সেই ধূলিধূসরিত কাপড়—খবর পেয়ে সে ধর্ণা ফেলে বটতলা থেকে উঠে এসেচে—চোখ কেঁদে কেঁদে লাল হয়েছে, যেন পাগলীর মত দৃষ্টি চোখে। এখন আর সে কাঁদে না, শুধু কাঠের মত বসে আছে, কথাও বলে না, কোন দিকে চায়ও না।

মেজবাবুকে বলতে তিনি ওকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ধরচ দু-টাকা মঞ্জুর করলেন। কিন্তু সে আমি যথেষ্ট বললাম ও অনুরোধ করলাম বলে। আরও কত যাত্রী এ-রকম মরে গেল বা তাদের কি ব্যবস্থা হ'ল এ-সব দেখবার দায়িত্ব এদেরই তো। ওরাই রইল নির্ভিকার ভাবে ব'সে। আমার

কাছে কিছু ছিল, বাবার সময় নিমটাদের স্ত্রীর হাতে দিনুম। চোখের জল রাখতে পারি নে, যখন সে চলে গেল।

দিন-তাই পরে রাত্রে বসে আমি ও নবীন-মুহুরী হিসেব মেলাচ্ছি মেলার দেনা-পাওনার। বেশ জ্যোৎস্না রাত, কার্তিকের সংক্রান্তিতে পরশু মেলা শেষ হয় গিয়েচে, বেশ শীত আজ রাত্রে।

এমন সময় হঠাৎ আমার কি হ'ল বলতে পারি নে—দেখতে দেখতে নবীন-মুহুরী, মেলার আটচালা ঘর সব যেন মিলিয়ে গেল। আমি যেন এক বিবাহ-সভায় উপস্থিত হয়েছি—অবাক হয়ে চেয়ে দেখি সীতার বিবাহ-সভা। জ্যাঠামশায় কল্যাসম্প্রদান করতে বসেচেন, খুব বেশী লোকজনের নিমন্ত্রণ হয় নি, বরপক্ষেও বরযাত্র বেশী নেই। দাদাকেও দেখলুম—দাদা ব'সে মরদা টাস্‌চে।... আরও সব কি কি...যবা কাঁচের মধ্যে দিয়ে যেন সবটা দেখছি—খানিকটা স্পষ্ট, খানিকটা অস্পষ্ট।

চমক ভাঙল দেখি নবীন-মুহুরী আমার মাথায় ডল দিচ্ছে। বললে—কি হয়েছে তোমার, মাঝে মাঝে ফিট্‌ হয় না-কি?

আমি চোখ মুছে বললুম—না। ও কিছু না—

আমার তখন কথা বলতে ভাল লাগে না। সীতার বিবাহ নিশ্চয়ই হচ্ছে, আজ এখুনি হচ্ছে। আমি ওকে বড় ভালবাসি—আমার চোখকে কাঁকি দিয়ে জ্যাঠামশায় ওর বিবাহ দিতে পারবেন না। আমি সব দেখেছি।

নবীন-মুহুরীকে বললাম—তুমি আমাকে ছুটি দাও আড়, শরীরটা ভাল নেই, একটু শোব।

পরদিন বড়বাবুর চাকর কলকাতা থেকে এল। মায়ের একখানা চিঠি কলকাতার ঠিকানায় এসে পড়েছিল, মায়ের জবানি, জ্যাঠামশায়ের লেখা আসলে। ২রা অগ্রহায়ণ সীতার বিয়ে, সেই জ্যাঠামশায়ের ঠিক-করা পাত্রের সঙ্গেই। তিনি কথা দিয়েচেন, কথা খোয়াতে পারেন না। বিশেষ, অত বড় মেয়ে ঘরে রেখে পাঁচ জনের কথা সহ করতে প্রস্তুত নন। আমরা কোন্‌ কালে কি করব তার আশায় তিনি কতকাল বসে থাকেন—ইত্যাদি।

বেচারী সীতা! ওর সাবান-মাথা, চুলবাঁধা, মিথ্যে

সৌখীনতার অক্ষম চেষ্টা মনে পড়ল। কত ক'রে ওর মুখের দিকে চেয়ে এত কাল কিছু গ্রাহ্য করিনি! বেশ দেখতে পেলাম ওর ঘন কাল চুলের সিঁতিপাটি ব্যর্থ হয়ে গেল—ওর শুভ্র, নিষ্পাপ জীবন নিয়ে সবাই ছিনিমিনি খেললে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১

এখান থেকে কলকাতা যাবার সময় হয়ে এল। বিকালে আমি বটতলার পুকুরের ঘাটে বসে মাছ-ধরা দেখছি, নবীন-মুহুরী এসে বললে—তোমায় ডাকছেন মেজবাবু। ওর মুখ দেখে আমার মনে হ'ল গুরুতর একটা কিছু ঘটেছে কিংবা ও-ই আমার নামে কি লাগিয়েছে। নবীন-মুহুরী এ-রকম বার-কয়েক আমার নামে লাগিয়েছে এর আগেও। কারণ তার চুরির বেজায় অসুবিধে ঘটেছে আমি থাকার দরুণ।

মেজবাবু চেয়ারে বসে, কুঞ্জ-নায়েবও সেখানে দাঁড়িয়ে।

মেজবাবু আমাকে মানুষ বলেই কোনো দিন ভাবেন নি। এ-পর্যন্ত আমিও পারতপক্ষে তাঁকে এড়িয়েই চলে এসেছি। লোকটার মুখের উগ্র দান্তিকতা আমাকে ওর সামনে যেত উৎসাহিত করে না। আমায় দেখে বললেন—শোনো এদিকে। কলকাতায় গিয়ে তুমি অল্প জায়গায় চাকুরীর চেষ্টা করবে। তোমাকে এক মাসের নোটিশ দিলাম।

—কেন, কি হয়েছে?

—তোমার মাথা ভাল না, এ আমিও জানি, নবীনও দেখেছে বলছে। হিসেব-পত্রে প্রায়ই গোলমাল হয়। এ-রকম লোক দিয়ে আমার কাজ চলবে না। ষ্টেটের কাজ তো ছেলেখেলা নয়?

নবীন এবার আমায় শুনিয়েই বললে—এই তো সেদিন আমার সামনেই হিসেব মেলাতে মেলাতে মৃগীরোগের মত হয়ে গেল—আমি তো ভয়েই অস্থির—

মেজবাবুকে বিদ্বান ব'লে আমি সন্তানের চোখেও দেখতাম। বললাম—দেখুন, তা নয়। আপনি তো সব বোঝেন, আপনাকে বলছি। মাঝে মাঝে আমার কেমন একটা অবস্থা হয় শরীরের ও মনের, সেটা ব'লে বোঝাতে

পারি নে—কিন্তু তখন এমন সব জিনিস দেখি, সহজ অবস্থায় তা দেখা যায় না। ছেলেবেলায় আরও অনেক দেখতুম, এখন কমে গিয়েছে। তখন বুঝতাম না, মনে ভয় হ'ত, ভাবতাম এ-সব মিথ্যে, আমার বুঝি কি রোগ হয়েছে। কিন্তু এখন বুঝেছি ওর মধ্যে সত্যি আছে অনেক।

মেজবাবু কৌতুক ও বিদ্রূপ মিশ্রিত হাসি-মুখে আমার কথা শুন্ছিলেন—কথা শেষ হ'লে তিনি কুঞ্জ-নায়েবের দিকে চেয়ে হাসলেন। নবীন-মুহুরীর দিকে চাইলেন না, কারণ সে অনেক কম দরের মানুষ। ষ্টেটের নায়েবের সঙ্গে তবুও দৃষ্টি-বিনিময় করা চলে। আমার দিকে চেয়ে বললেন—কত দূর পড়াশুনা করেচ তুমি?

—আই-এ পাস করেছিলাম শ্রীরামপুর কলেজ থেকে—

—তাহ'লে তোমায় বোঝানো আমার মুশ্কিল হবে। মোটের ওপর ও-সব কিছু না। নিউরোটিক যারা—নিউরোটিক বোঝ? যাদের জায় দুর্বল তাদের ওই রকম হয়। রোগই বইকি, ও এক রকম রোগ—

আমি বললাম—মিথ্যে নয় যে তা আমি জানি। আমি নিজের জীবনে অনেক বার দেখেছি—ও-সব সত্যি হয়েছে। তবে কেন হয় এইটেই জানি নে, সেইজন্যই আপনাকে জিগোস করছি। আমি সেণ্ট ক্রাফিস্ অফ্, আসিসির লাইফ্-এ পড়েছি তিনিও এ-রকম দেখতেন—

মেজবাবু ব্যঙ্গের সুরে বললেন—তুমি তাহ'লে সেণ্ট হয়ে গিয়েচ দেখছি? পাগল কি আর গাছে ফলে?

নবীন ও কুঞ্জ দু-জনেই মেজবাবুর প্রতি সন্তম বজায় রেখে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসতে লাগল।

আমি নানা দিক থেকে খোঁচা খেয়ে মরীয়া হয়ে উঠলাম। বললাম—আর শুধু ওই দেখি যে তা নয়, অনেক সময় মরে গিয়েছে এমন মানুষের আস্থার সঙ্গে কথা বলেছি, তাদের দেখতে পেয়েছি।

নবীন-মুহুরীর বুদ্ধিহীন মুখে একটা অদ্ভুত ধরণের অবিশ্বাস ও ব্যঙ্গের ছাপ ফুটে উঠল, কিন্তু নিজের বুদ্ধির ওপর তার বোধ হয় বিশেষ আস্থা না থাকাতে সে মেজবাবুর মুখের দিকে চাইলে। মেজবাবু এমন ভাব দেখালেন যে, এ বদ্ধ উন্মাদের সঙ্গে আর কথা ব'লে লাভ কি আছে! তিনি কুঞ্জ-নায়েবের দিকে এভাবে চাইলেন যে একে আর

এখানে কেন? পাগলামি চড়ে বসলেই একটা কি ক'রে ফেলবে একুনি!

আমি আরও মরীয়া হয়ে বললাম—আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন আর নাই করুন তাতে যে-জিনিষ সত্যি তা মিথ্যে হয়ে যাবে না। আমার মনে হয় আপনি আমার কথা বুঝতেও পারেন নি। যার নিজের অভিজ্ঞতা না হয়েছে, সে এ-সব বুঝতে পারে না, এ-কথা এতদিনে আমি বুঝেছি। খুব বেশী লেখাপড়া শিখলেই বা খুব বুদ্ধি থাকলেই যে বোঝা যায়, তা নয়। আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে বলি, আমি যে-বরটাতে থাকি, ওর ওপাশে যে ছোট্ট বাড়িটা আছে, ভাঙা রোয়াক, যার সামনে—ওখানে আমি এক জন বুড়োমানুষের অস্তিত্ব অনুভব করতে পেরেছি—কি করে পেরেছি, সে আমি নিজেই জানি নে—খুব তামাক খেতেন, বয়েস অনেক হয়েছিল, খুব রাগী লোক ছিলেন, তিনি মারা গিয়েছেন কি বেচে আছেন তা আমি জানি নে। ওই জায়গাটায় গেলেই এই ধরনের লোকের কথা আমার মনে হয়। বলুন তো ওখানে কেউ ছিলেন এ-রকম?

কুঞ্জ-নায়কের সঙ্গে মেজবাবুর অর্থসূচক দৃষ্টি-বিনিময় হ'ল। মেজবাবু শ্লেষের সঙ্গে বললেন—তোমাকে যতটা সম্পূর্ণ ভেবেছিলাম, তুমি তা নও দেখছি। তোমার মধ্যে ভণ্ডামিও বেশ আছে—তুমি বলতে চাও তুমি এত দিন এখানে এসেচ, তুমি কারও কাছে শোন নি ওখানে কে থাকতো?

—আপনি বিশ্বাস করুন আমি তা শুনি নি। কে আমায় বলেচে আপনি খোঁজ নিনু?

—ওখানে আমাদের আগেকার নায়েব ছিল, ওটা তার কোয়ার্টার ছিল, সে বছর-চারেক আগে মারা গিয়েচে, শোন নি এ কথা?

—না আমি শুনি নি। আরও কথা বলি শুনুন, আপনার ছেলে হওয়ার আগের দিন কলকাতায় আপিসে আপনাকে কি বলেছিলুম মনে আছে? বলেছিলুম একটা খোকা দাঁড়িয়ে আছে—দরজা খুলে মেজবোরণী এসে তাকে নিয়ে গেলেন—এ-কথা বলেছিলুম কি না? মনে ক'রে দেখুন।

—হ্যাঁ আমার খুব মনে আছে। সেও তুমি জানতে না যে আমার স্ত্রী আসন্ন প্রসবা ছিল? যদি আমি বলি তুমি একটা বেশ চাল চেলেছিলে—যে কোনো একটা সম্ভান তো হ'তই—তুমি অঙ্ককারে টিল ছুঁড়েছিলে, দৈবাৎ লেগে গিয়েছিল। শার্লটানরা ও-রকম বৃজরুকী করে—আমি কি বিশ্বাস করি ওসব ভেবেচ?

—বৃজরুকী কিসের বলুন? আমি কি তার জন্যে আপনার কাছে কিছু চেয়েছিলুম? বা আর কোনোদিন সে-কথার কোনো উল্লেখ করেছিলুম? আমি জানি আমার এ একটা ক্ষমতা—ছেলেবেলায় দার্জিলিংয়ের চা-বাগানে আমরা ছিলাম, তখন থেকে আমার এ-ক্ষমতা আছে। কিন্তু এ দেখিয়ে আমি কখনও টাকা-রোজগারের চেষ্টা তো করিনি কারোর কাছে? বরং বলিই নে—

মেজবাবু অসহিষ্ণুভাবে বললেন—অল্ ফিডলস্টিক্—মনের ব্যাপার তুমি কিছু জানো না। তোমাকে বোঝাবার উপায়ও আমার নেই। ইট্ প্লেজ্ কুইয়ার্ টুক্ উইথ্ অাস্—যদি ধরে নিই তুমি মিথোবাদী নও—ইউ মে বি এ সেল্ফ্ ডিলিউডেড্ ফুল্ এবং আমার মনে হয় তুমি তাই-ই। আর কিছু নয়। যাও এখন—

আমি চলে এলাম। নবীন-মুহুরী আমার পিছু পিছু এসে বললে—তোমার সাহস আছে বলতে হবে—মেজবাবুর সঙ্গে অমন ক'রে তর্ক আজ পর্যন্ত কেউ ক'র নি। না! যা হোক, তোমার সাহস আছে। আমার তো ভয় হচ্ছিল এই বুঝি মেজবাবু রেগে ওঠেন—

আমি জানি নবীনই আমার নামে লাগিয়েছিল, কিন্তু এ নিয়ে ওর সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করবার প্রবৃত্তি আমার হ'ল না। কেবল একটা কথা ওকে বললাম। দেখ, নবীন-দা, চাকুরীর ভয় আমি আর করি নে। যে-দণ্ডে চাকুরী করছিলাম, সে কাজ মিটে গিয়েচে। এখন আমার চাকুরী করলেও হয়, না-করলেও হয়। ভেবো না, আমি নিজেই শীগগির চলে যাবো ভাই।

ক-দিন ধরে একটা কথা ভাবছিলাম। এই যে এতগুলো পাড়াগেয়ে গরিব চাষীলোক এখানে পুড়ো দিতে এসেছিল—এরা সকলেই মুর্থ, ভগবানকে এরা সে ভাবে জানে না, এরা চেনে বটতলার গোসাইকে। কে

বটতলার গোসাই? হয়ত এক জন ভক্ত বৈষ্ণব, গ্রাম্য লোক, বছর-পঞ্চাশ আগে থাকত ওই বটতলায়। সেই থেকে লৌকিক প্রবাদ এবং বোধ হয় মেজবাবুদের অর্থ-গুণ্যুতা দুটোতে মিলে বটতলাটাকে করেছে পরম তীর্থস্থান। কোথায় ভগবান, কোথায় প্রথিতবশ্য ঐতিহাসিক অবতারের দল—এই বিপুল জনসম্মুখ তাঁদের সন্ধানই রাখে না হয়ত। এদের এ কি ধর্ম? ধর্মের নামে ছেলেখেলা।

কিন্তু নিমচাঁদকে দেখি। তার সরল ভক্তি, তাদের তাগ। তার স্ত্রীর চোখে যে অপূর্ণ ভাবদৃষ্টি, যা সকল ধর্মবিধ্বাসের উৎসমুখ—এ-সব কি মূলহীন, ভিত্তিহীন জলজ শেওলার মত মিথ্যার মহাসমুদ্রে ভাসমান? এ-রকম কত নিমচাঁদ এসেছিল মেলায়। জ্যাঠাইমাদের আচারের শেকলে আঁপুড়ে বাঁধা ঐশ্বর্য্যের ঘট দেখানো দেবর্চনার চেয়ে, এ আমার ভাল লেগেচে। ঘুড়ির সেই যষ্ঠামন্দিরের মত।

কোন দেবতার কাছে নিমচাঁদের তিনটে টাকার ভোগ অর্থা গিয়ে পৌঁছলো জীবনের শেষনিঃশ্বাসের সঙ্গে পরম ত্যাগে সে যা নিবদন করলে?

আর একটা কথা বুঝি। কাউকে কোনো কথা বলে বুঝিয়ে বিশ্বাস করানো যায় না। মনের ধর্ম মেজবাবু আমায় কি শেখাবেন, আমি এটুকু জেনেছি নিজের জীবনে মানুষের মন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না সে জিনিষকে, যা ধরা-চোঁয়ার বাইরের। আমি যা নিজের চোখে কতবার দেখলুম, বাস্তব বলে জানি—বরে-বাইরে সব লোক বললে ও মিথ্যে। পণ্ডিত ও মুর্থ এখানে সমান—ধরাচোঁয়ার গণ্ডীর সীমানা পার হয়ে কারুর মন অনন্ত অজানার দিকে পাড়ি দিতে চায় না। যা সত্যি, তা কি মিথ্যা হয়ে যাবে?

২

কল্কাতায় ফিরে এলাম বড়বাবুর মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে। জামাইকে বিয়ের রাত্রে বেবি অষ্টিন্ গাড়ী যৌতুক দেওয়া হ'ল—বিবাহ-মণ্ডপের মেরাপ বাধতে ও ফুল দিয়ে সাজাতেই ব্যয় হ'ল আট-শ টাকা। বিয়ের পরে ফুলশয্যার তব্ব সাজাতে আট-দশ জন লোক হিমশিম

খেয়ে গেল। ছোটবাবুর বন্ধুবান্ধবদের এক দিন পৃথক ভোজ হ'ল, সেদিন সখের থিয়েটারে হাজার টাকা গেল এক রাত্রে। তবুও তো শুনলাম এ তেমন কিছু নয়—এরা পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থ জমিদার মাত্র, খুব বড়মানুষী করবে কোথা থেকে।

ফুলশয্যায় তব্ব সাজাতে খুব খাটুনি হ'ল। দু-মণ দই, আধ মণ ক্ষীর, এক মণ মাছ, লরি-বোঝাই তরিতরকারী, চল্লিশখানা সাজানো খালায় নানা ধরণের তব্বের জিনিষ—সব বন্দাবস্ত ক'রে তব্ব বার ক'রে ঝি-চাকরের সারি সাজাতে ও তাদের রওনা করতে—সে এক রাজস্ব বস্ত্রের ব্যাপার!

ওদের রঙীন কাপড়-পরা ঝি-চাকরের লম্বা সারির দিকে চেয়ে মন হ'ল এই বড়মানুষির খরচের দরুণ নিমচাঁদের স্ত্রী তিনটে টাকা দিয়েচে। অথচ এই হিমবর্ষী অগ্রহায়ণ মাসের রাত্রে হয়ত সে অনাথা বিধবার খেজুর-ডালের ঝাঁপে শীত আটকাচ্ছে না, সেই যে বুড়ী বার গলা কাঁপছিল, তার সেই ধার-করে দেওয়া আট আনা পয়সা এর মধ্যে আছে। ধর্মের নামে এরা নিয়েচে, ওরা স্বেচ্ছায় হাসিমুখে দিয়েচে।

সব মিথ্যে। ধর্মের নামে এরা করেছে বোর অধর্ম ও অবিচারের প্রতিষ্ঠা। বটতলার গোসাই এদের কাছে ভোগ পেয়ে এদের বড়মানুষ ক'রে দিয়েচে, লক্ষ গরিব লোককে মেরে—জ্যাঠামশায়দের গৃহদেবতা যেমন তাদের বড় ক'রে রেখেছিল, মাকে, সীতাকে ও ভুবনের মাকে করেছিল ওদের ক্রীতদাসী।

সত্যিকার ধর্ম কোথায় আছে? কি ভীষণ মোহ, অনাচার ও মিথ্যার কুহকে ঢাকা পড়ে গেছে দেবতার সত্যরূপ সেদিন, যেদিন থেকে এরা হৃদয়ের ধর্মকে ভুলে অর্থহীন অনুষ্ঠানকে ধর্মের আসনে বসিয়েচে।

দাদার একখানা চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। দাদা বেখানে কাজ করে, সেখানে এক গরিব ব্রাহ্মণের একটি মাত্র মেয়ে ছিল, ওখানকার সবই মিলে ধরে-পড়ে মেয়েটির সঙ্গে দাদার বিয়ে দিয়েচে। দাদা নিতান্ত ভালমানুষ, যে যা বলে কারও কথা ঠেলতে তো পারে না? কাউকে জানানো হয় নি, পাছে কেউ বাধা দেয়, তারাই জানাতে

দেয় নি। এদিকে জ্যাঠামশায়ের ভয়ে বাড়িতে বৌ নিয়ে যেতে সাহস করচে না, আমার লিখেচে সে বড় বিপদে পড়েচে, এখন সে কি করবে? চিঠির বাকী অংশটা নব-বধুর রূপগুণের উচ্ছ্বাসিত সুখ্যাতিতে ভর্তি।

“...জিতু, আমার বড় মনে কষ্ট, বিয়ের সময় তোকে খবর দিতে পারি নি, তুই একবার অবিগ্রি অবিগ্রি আসবি, তোর বউদিদির বড় ইচ্ছে তুই একবার আসিস। মায়ের সহস্কে কি করি আমার লিখবি। সেখানে তোর বৌদিদিকে নিয়ে যেতে আমার সাহসে কুলোয় না। ওরা ঠিক কুলীন ব্রাহ্মণ নয়, আমাদের স্ববরও নয়, অত্যন্ত গরিব, আমি বিয়ে না করলে মেয়েটি পার হবে না সবাই বললে, তাই বিয়ে করেচি। কিন্তু তোর বৌদিদি বড় ভাল মেয়ে, ওকে যদি জ্যাঠামশায় ঘরে নিতে না চান কি অপমান করেন, সে আমার সহ হবে না।...”

পত্র পড়ে বিষয় ও আনন্দ দুই-ই হ'ল। দাদা সংসারে বড় একা ছিল, ছেলেবেলা থেকে আমাদের জন্তে খাটতে, জীবনটাই নষ্ট করলে সেজন্তে, অথচ ওর দ্বারা না হ'ল বিশেষ কোনো উপকার মায়ের ও সীতার, না হ'ল ওর নিজের। ভালই হয়েছে, ওর মত স্নেহপ্রবণ ত্যাগী ছেলে যে একটি আশ্রয়নীড় পেয়েচে, ভালবাসবার ও ভালবাসা পাবার পাত্র পেয়েচে, এতে ওর সহস্কে নিশ্চিত হ'লুম। কত রাত্রে শুয়ে শুয়ে দাদার দুঃখের কথা ভেবেচি!

মাকে কাছে নিয়ে আসতে পত্র লিখে দিলাম দাদাকে। জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে রাখবার আর দরকার নেই। আমি শীগগিরই গিয়ে দেখা করবো।

* * * *

মাঝ মাসের প্রথমে আমি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মনে কেমন একটা উদাস ভাব, কিসের একটা অদম্য পিপাসা। আমার মনের সঙ্গে যা খাপ খায় না, তা আমার ধর্ম নয়। ছেলেবেলা থেকে আমি যে অদৃশ্য জগতের বার-বার সম্মুখীন হয়েচি, অথচ যাকে কখনও চিনি নি, বুঝি নি—তার সঙ্গে যে-ধর্ম খাপ খায় না, সেও আমার ধর্ম নয়।

অপচ চারিদিকে লেখচি সবাই তাই। তারা সৌন্দর্যকে

চেনে না, সত্যকে ভালবাসে না, কল্পনা এদের এত পসু যে, যে-খোঁটার বন্ধ হয়ে ঘাসজল খাচ্ছে গরুর মত—তার বাইরে উর্দ্ধের নীলাকাশের দেবতার যে-সৃষ্টি বিপুল ও অপরিমেয় এরা তাকে চেনে না।

বহরখানেক ঘুরে বেড়ালুম নানা জায়গায়। কত বার ভেবেচি একটা চাকুরী দেখে নেবো, কিন্তু শুধু ঘুর বেড়ানো ছাড়া কিছু ভাল লাগতো না। যেখানে শূন্যতাম কোনো নতুন ধর্মসম্প্রদায় আছে, কি সাধু-সন্ন্যাসী আছে, সেখানে যেন আমার যে-তাই হবে, এমন হয়ছিল। কালনার পথে গঙ্গার ধারে এক দিন সন্ধ্যা হয়ে গেল।

কাছেই একটা ছোট গ্রাম, চাষী কৈবর্তদের বাস। ওখানেই আশ্রয় নেবো ভাবলাম। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন খড়ের ঘর, বেশ নিকোনো-পুছোনো, উঠোন পর্যন্ত এমন পরিষ্কার যে সিঁড়র পড়লে উঠিয়ে নেওয়া যায়। সকলের ঘরেই ধানের ছোটবড় গোলা, বাড়ির সামনে পিছনে ক্ষেত-খামার। ক্ষেতের বেড়ায় মটরশুঁটির ঝাড়ে শাদা গোলাপী ফুল ফুটে মিষ্টি সুগন্ধে সন্ধ্যার অন্ধকার ভরিয়ে রেখেচে।

একজন লোক গোয়াল-ঘরে গরু বাধুছিল; তাকে বললাম—এখানে থাকবার জায়গা কোথায় পাওয়া যাবে? সে বললে—কোথেকে আসা হচ্ছে? আপনারা? ব্রাহ্মণ শুনে নমস্কার ক'রে বললে—ওই দিকে একটু এগিয়ে যান—আমাদের অধিকারী-মশাই থাকেন, তিনি ব্রাহ্মণ, তাঁর ওখানে দিব্যি থাকবার জায়গা আছে।

একটু দূরে গিয়ে অধিকারীর ঘর। উঠানের এক পাশে একটা লেবুগাছ। বড় আটচালা ঘর, উঁচু মাটির দাওয়া। একটি ছোট ছেলে বললে, অধিকারী বাড়ি নেই, হলুদপুকুরে কীর্তনের বায়না নিয়ে গাইতে গিয়েচে—কাল আসবে।

আমি চলে যাচ্ছি এমন সময়ে একটি মেয়ে ঘরের ভেতর থেকে বললে—চলে কেন যাবেন? পায়ের ধুলো দিয়েচেন যদি রাতে এখানে থাকুন না কেনে?

কথার মধ্যে রাত দেশের টান। মেয়েটি তার পর এসে দাওয়ায় দাঁড়াল, বয়েস সাতাশ-আটাশ হবে, রং ফর্সা, হাতের টেমির আলোর কপালের উর্দ্ধি দেখা যাচ্ছে।

মেয়েটি দাওয়ার একটা মাতুর বিছিয়ে দিয়ে দিলে, এক ঘটি জল নিয়ে এল। আমি হাত-পা ধুয়ে সুস্থ হয়ে বসলে মেয়েটি বললে—রান্নার কি বোগাড় ক'রে দেব ঠাকুর?

আমি বললাম—আপনারা যা র'ধবেন, তাই খাবো।

রাত্রে দাওয়ার শুয়ে রইলাম। পরদিন দুপুরের পরে অধিকারী-মশাই এল। পেছনে জন-তিনেক লোক, এক জনের পিঠে একটা খোল বাশ। তামাক খেতে খেতে আমার পরিচয় নিলে, খুব খুশী হ'ল আমি এসেছি বলে।

বিকেলে উল্লি-পরা স্ত্রীলোকটির সঙ্গে কি নিয়ে তার ঝগড়া বেধে গেল। স্ত্রীলোকটি বললে শুনলাম—অমন যদি করবি মিস্স, তবে আমি বলরামপুরে চলে যাব। কে তোার মুখনাড়ার ধার ধারে? একটা পেট চলে যাবে রে, সেজ্ঞে তোার তোয়াক্কা রাখি ভেবেচিস্ তুই!

আগুনে জল পড়ার মত অধিকারীর রাগ একদম শান্ত হয়ে গেল। রাত্রে ওদের উঠোনে প্রকাণ্ড কীর্তনের আসর বসল। রাত তিনটে পর্যন্ত কীর্তন হ'ল। আসরস্থ সবাই হাত তুলে নাচতে শুরু করলে হঠাৎ। দু-তিন ঘণ্টা উদ্ভগ্ন নৃত্যের পরে ক্লান্ত হয়ে পড়ার দরুণই হোক বা বেশী রাত হওয়ার জ্ঞেই হোক, তারা কীর্তন বন্ধ করলে।

আমি বেতে চাই, ওরা—বিশেষ ক'রে সেই স্ত্রীলোকটি—আমায় বেতে দেয় না। কি যত্ন তো করলে! আর একটা দেখলাম অধিকারীকেও সেবা করে ঠিক ক্রীতদাসীর মত—মুখে এদিকে যখন-তখন বা-তা শুনিয়া দেয়, তার মুখের কাছে দাঁড়াবার সাধি নেই অধিকারীর।

বাবার সময় মেয়েটি দিবিয়া করিয়ে নিলে যে আমি আবার আসবো। বললে—তুমি তো ছেলেমানুষ, যখন খুশী আসবে। মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যাবে। তোমাদের খাওয়ার কষ্ট হচ্ছে এখানে—নাছ মিলে না, মাংস মিলে না। বোশেখ মাসে এস, আম দিয়ে দুধ দিয়ে খাওয়াবো।

কি সুন্দর যে লাগল ওর স্নেহ!

আমার সেই দর্শনের ক্ষমতাটা ক্রমেই যেন চলে যাচ্ছে। এই দীর্ঘ এক বছরের মধ্যে মাত্র একটি বার জিনিষটা ঘটেছিল।

ব্যাপারটা যেন স্বপ্নের মত। তারই ফলে আটঘরায়

ফিরে আসতে হচ্ছে। সেদিন দুপুরের পরে একটা গ্রাম্য ডাক্তারের ডিম্পেন্সারী-ঘরে বেঞ্চিতে শুয়ে বিশ্রাম করছি—ডাক্তারবাবু জ্ঞাতিতে মাছিবা, সর্বদা ধর্মকথা বলতে ও শুনতে ভালবাসে বলে আমায় ছাড়তে চাইত না, সব সময় কেবল ঘান ঘান ক'রে ওই সব কথা পেড়ে আমার শ্রাণ অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিল—আমি ধর্মের কথা বলতেও ভালবাসি না, শুনতেও ভালবাসি না—ভাবছি শুয়ে শুয়ে কাল সকালে এর এখান থেকে চলে যাব—এমন সময় একটু তন্দ্রামত এল। তন্দ্রাঘোরে মনে হ'ল আমি একটা ছোট্ট ঘরের:কুলুঙ্গি থেকে বেদনা ভেঙে কার হাতে দিচ্ছি, যার হাতে দিচ্ছি সে তার রোগজীর্ণ হাত অতিকষ্টে একটু ক'রে তুলে বেদনা নিচ্ছে, আমি যেন ভাল দেখতে পাচ্ছি নে ঘরটার মধ্যে ধোঁয়া ধোঁয়া কুয়াশা—বারকতক এই রকম বেদনা দেওয়া-নেওয়ার পরে মনে হ'ল রোগীর মুখ আর আমার মায়ের মুখ এক। তন্দ্রা ভেঙে মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল এবং সেই দিনই সেখান থেকে আঠারো মাইল হেঁটে এসে ফুলসরা ঘাটে স্টীমার ধ'র পরদিন বেলা দশটায় কলকাতা পৌঁছলাম। মায়ের নিশ্চয়ই কোনো অসুখ করেছে, আটঘরা যেতেই হবে।

শেরালদহ স্টেশনের কাছে একটা দোকান থেকে আঙুর কিনে নেবো ভাবলাম, পকেটেও বেশী পয়সা নেই। পয়সা গুণটি দাঁড়িয়ে, এমন সময় দূর থেকে মেয়েদের বিশ্রাম-ঘরের সামনে দণ্ডায়মানা একটা নারীমূর্তির দিকে চেয়ে আমার মনে হ'ল ছাঁড়ানোর ভঙ্গিটা আমার পরিচিত। কিন্তু এগিয়ে গিয়ে দেখতে পারলাম না—আঙুর কিনতে চলে গেলাম। ফিরবার সময় দেখি ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের কাছে একটা পচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে শ্রীরামপুরের ছোটবৌ-ঠাকুরণ! আমি কাছে যেতেই বৌঠাকুরণ চমকে উঠলেন প্রায়। বললেন—আপনি! কোথেকে আসছেন! এমন চেহারা!

আমি বললাম—আপনি কি একটু আগে মেয়েদের ওয়েটিং-রুমের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন?

—হ্যাঁ, এই যে আমরা এখন এলাম এই যোগবাণীর গাড়ীতে—আমরা শ্রীরামপুরে যাচ্ছি। ইনি মেজদা—এঁকে দেখেন নি কখনও?

যুবকটি আমার বললে—আপনি তা হ'লে একটু দাঁড়ান দয়া ক'রে—আমি একটা ট্যান্ডি ডেকে নিয়ে আসি— এখানে দরে বনুচে না—

সে চলে গেল। ছোটবৌ-ঠাকরুণ বললেন—মাগো, কি কালীমুর্তি চেহারা হয়েছে! বড়দি বলছিল আপনি নাকি কোথায় চলে গিয়েছিলেন, খোঁজ নেই—সত্যি?

—নিতান্ত মিথ্যে কি ক'রে বলি! তবে সম্প্রতি দেশে যাচ্ছি।

ছোটবৌ-ঠাকরুণ হাসিমুখে চুপ ক'রে রইলেন একটু, তার পর বললেন—আপনার মত লোক যদি কখনও দেখেছি। আপনার পক্ষে সবই সম্ভব। জানেন, আপনি চলে আসবার পরে বড়দির কাছ থেকে আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞেস ক'রে ক'রে শুনেছি। তখন কি অত জানতাম? বড়দি বাপের বাড়ি গিয়েচে আশ্বিন মাসে—আপনার সঙ্গে দেখা হবে'খন। আচ্ছা, আর শ্রীরামপুরে গেলেন না কেন? এত ক'রে বললাম, রাখলেন না কথা? আমার ওপর রাগ এখনও যায় নি বুঝি!

—রাগ কিসের? আপনি কি সত্যি ভাবেন আমি আপনার ওপর রাগ করেছিলাম? ছোটবৌ-ঠাকরুণ নতমুখে চুপ ক'রে রইলেন।

—বলুন!

ছোটবৌ-ঠাকরুণ নতমুখেই বললেন—ও কথা বাক। আপনি এ-রকম ক'রে বেড়াচ্ছেন কেন? পড়াশুনো আর করলেন না কেন?

—সে সব অনেক কথা। সময় পাই তো বলব এক দিন।

—আমুন না আজ আমাদের সঙ্গে শ্রীরামপুরে? দিনকতক থেকে যান, কি চেহারা হয়ে গিয়েচে আপনার! সত্যি, আমুন আজ।

—না, আজ নয়, দেশে যাচ্ছি, খুব সম্ভব মা'য়ের বড় অমুখ—

ছোটবৌ-ঠাকরুণ বিষ্ময়ের হুরে বললেন—কই, সে কথা তো এতক্ষণ বলেন নি! সম্ভব মানে কি, চিঠি পেয়েছেন তো, কি অমুখ!

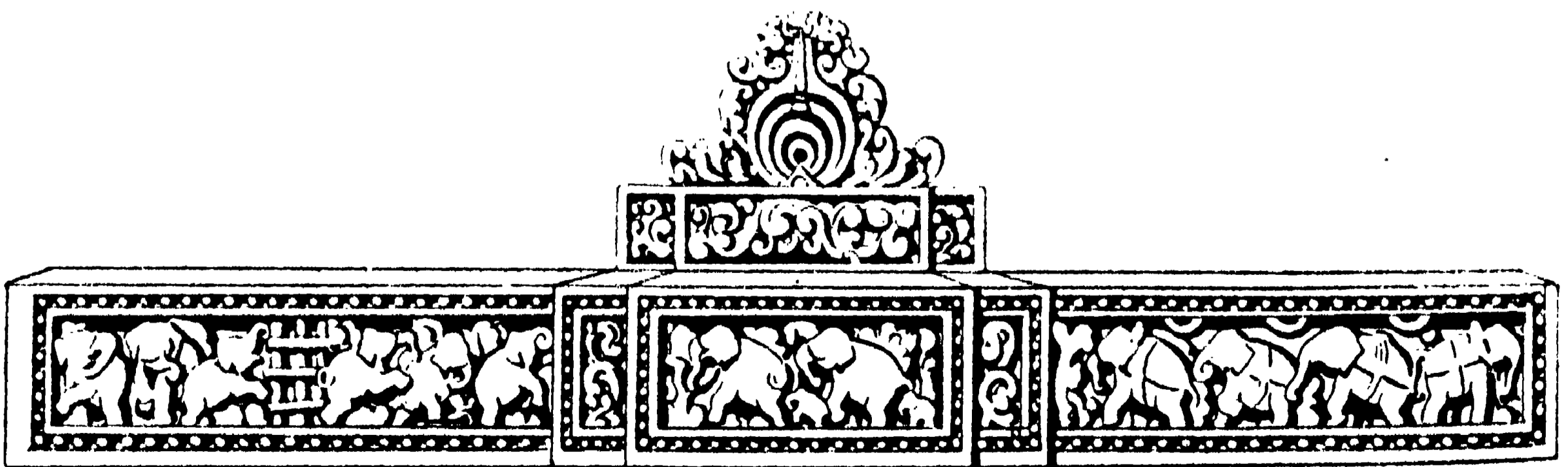
একটু হেসে বললাম—না চিঠি পাই নি। আমার ঠিকানা কেউ জানতো না। স্বপ্ন দেখেছি—

ছোটবৌ-ঠাকরুণ একটু চুপ ক'রে থেকে মূছ শাস্ত হুরে বললেন—আমি জানি। তখন জানতাম না আপনাকে, তখন তো বরেন্দ্রও আমার কম ছিল। বড়দি তার পর বলেছিল। একটা কথা রাখবেন? চিঠি দেবেন একখানা? অন্ততঃ একখানা লিখে খবর জানাবেন?...

ছোটবৌ-ঠাকরুণ আগের চেয়ে সামান্য একটু মোটা হয়েছেন, আর চোখে সে বালিকামূলভ তরল ও চপল দৃষ্টি নেই, মুখের ভাব আগের চেয়ে গভীর। আমি হেসে বললাম—আমি চিঠি না দিলেও, শৈলদির কাছ থেকেই তো জানতে পারবেন খবর—

এই সময় ঝঁর মেডদাদা ট্যান্ডিতে চড়ে এসে হাজির হ'লেন। আমি বিদায় নিলুম।

ক্রমণঃ

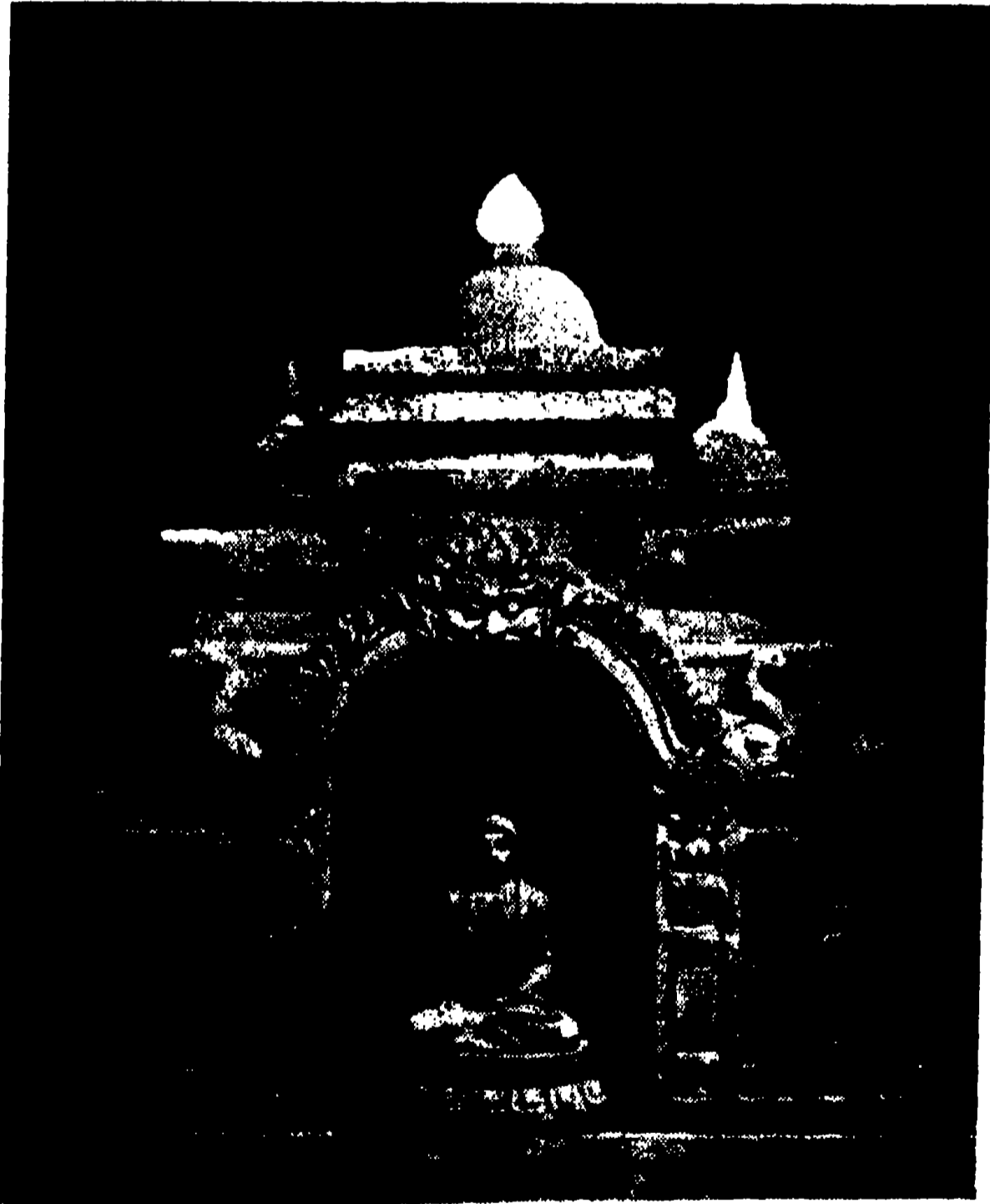


বাংলার মৃৎশিল্প ও কুস্তকার জাতি

শ্রী—

বাংলার মৃৎশিল্প আজ নূতন নহে—বহু যুগ হইতে বঙ্গদেশীয় মৃৎশিল্পিগণ নানা প্রকারের মন্ময়-মূর্তি, নানা প্রকারের দেবদেবী গঠন করিয়া বাঙালীর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন যুগেও এই মৃৎশিল্পে চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। আমাদের বাংলার মাটি মাটি নয়,— সোনা; আমাদের দেশে পূর্বে একরূপ বৃহদাকার মৃৎপাত্র নিশ্চিত হইত, যাহা দুই তিন মণ তরল পদার্থ ধারণ করিত। মাটির বাসন একরূপ মজবুত হইত যাহা বহুদিন যাবৎ উত্তাপ সহ্য করিয়াও ভাঙিত না। মোটের উপর বাংলার অভাব বাংলার মাটিতেই মোচন হইত—বিদেশী

মন্দিরগাত্রে যুগ-যুগান্ত ব্যঙ্গ-বৃষ্টির আঘাত সহ্য করিয়াও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এখনও প্রাচীন গোড়ে এবং বাকুড়া ও বিষ্ণুপুর অঞ্চলে এমন অনেক ধ্বংসোন্মুখ প্রাচীন সুবৃহৎ মন্দির দেখা যায় যাহার অস্তিত্ব অংশ ভাঙিয়া পড়িলেও



স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন ও বৃদ্ধ-মূর্তি

এলুমিনিয়ামের বাসন আমদানী করিয়া একরূপ বেকার-সমস্ত্রা উৎপাদনের প্রয়োজন হইত না। বাংলার মাটিতে বাঙালী কারিগর কত প্রকার শিল্পকৌশল দেখাইয়া লোককে স্তম্ভিত করিত, যাহার নমুনা এখনও কোন কোন প্রাচীন



রিইন্ফোর্সড পদ্ধতিতে নিশ্চিত যমুনা-মূর্তি

মন্ময়মূর্তি-সমন্বিত টালিগুলি অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রহিয়া বাংলার কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছে। প্রাচীন মৃৎশিল্পিগণের মধ্যে নদীয়ার কুস্তকারগণই চিরপ্রসিদ্ধ। এই বঙ্গদেশীয় কুস্তকার-গণ বহু প্রাচীন যুগ হইতে অতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বলিয়া



દેવ-સભા



દેવ-સભા

পরিগণিত হইয়া আসিতেছেন। কথিত আছে, স্বয়ং মহাদেব মঙ্গলবটের প্রয়োজন হওয়ায়, তাঁহার জটা হইতে রুদ্র-পালকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং সেই অবধি হিন্দু ধর্মের প্রত্যেক কার্যেই ইঁহার বংশধরগণ সংশ্লিষ্ট। ইঁহার ব্রাহ্মণের ন্যায় সমস্ত দেবদেবীর পান, রূপ, গঠন ইত্যাদির জ্ঞান শাস্ত্র-অভিজ্ঞ ছিলেন এবং শাস্ত্রানুযায়ী দেবদেবীর মূর্তি গঠন করিয়া হিন্দু ধর্মের অক্ষয়তা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কুমারটুলীস্থ শ্রীযুক্ত নিতাইচরণ পাল মহাশয় ও তাঁহার সহকর্মীগণ নদীয়ার মৎশিল্পী। বিশেষ ব্যাপকভাবে দেশবাসীর নিকট পরিচিত না হইলেও কার্য-কলাপে ইঁহারা ক্রমেই প্রীতিভাজন হইয়া উঠিতেছেন। হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তিগুলি বাহ্যতে ধানসম্মত হয় এবং তৎসঙ্গে প্রাচীন শিল্পকলাপদ্ধতি বজায় থাকে সে-বিষয়ে ইঁহারা বিশেষরূপ সচেতন: ইতিপূর্বে সরস্বতী-মূর্তি গঠন করিয়া তাহার সম্যক পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ও শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ প্রাচীনকলাশিল্পী ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ইঁহারা প্রাচীন স্থাপত্যকলার অন্তর্গত নানা রূপ খোদিত মূর্তির অনুকরণে আধুনিক পদ্ধতিতে concrete নানারূপ মূর্তি নিৰ্মাণ করিয়া শিল্পনৈপুণ্য দেখাইতেছেন। কলিকাতা শ্যামবাজারে 'চিত্রা' বঙ্গমঞ্চের উপরিস্থ ইন্দুসভা তাহার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন এবং কলিকাতা নগরীতে যে-কয়েকটি অটালিকা প্রাচীন

পদ্ধতিতে সম্প্রতি নিৰ্মিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের অধিকাংশ কার্যকার্য ইঁহাদেরই সৃষ্ট। শুনিলাম ইঁহারা জাপান, জার্মানী ইত্যাদি দেশ হইতে আনীত বহু উন্নত ধরনের



দক্ষ মূর্তিকা নিৰ্মিত গণেশ-মূর্তি

নানারূপ আদর্শের মডেলের অনুকরণে সচেতন হইয়াছেন, যথা—'পেপার পাল্পের রিলিফ ম্যাপ, সেলুলয়েড ও কাঠের খঁড়া দ্বারা প্রস্তুত নানারূপ পুতুল ইত্যাদি।



লুই পাস্তুর ও তাঁহার গবেষণা

আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীসত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী, ডি-এমসি

৩

জেনার কর্তৃক প্রবর্তিত টীকা লইবার প্রণালী প্রচারিত হইবার প্রায় এক শতাব্দী পরে পাস্তুর পরীক্ষাগারে টীকা লইবার সাধারণ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিলেন।* জেনারের আবিষ্কারের সহিত পাস্তুরের আবিষ্কারের প্রধান পার্থক্য এই যে, জেনারের পদ্ধতি অনুসারে টীকা দেওয়ার জীবাণুগুলি কোনও জীবন্ত প্রাণীর শরীরের মধ্যে কালচার করিতে হয়, কিন্তু পাস্তুর কর্তৃক প্রবর্তিত প্রণালী দ্বারা জীবাণুগুলি কৃত্রিম উপায়ে পরীক্ষাগারে কাচের পাত্রের মধ্যে প্রস্তুত করা সম্ভব।

পাস্তুরের এই আবিষ্কারের সহিত কতকগুলি তত্ত্ব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। প্রথমতঃ বেশ বোঝা গেল যে, উপযুক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা কোনও রোগের জীবাণুগুলির তীব্রতা ইচ্ছামত কমান সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ এই যে এই মন্দীভূত জীবাণু শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইবার পরে প্রাণীর শরীরে সাময়িকভাবে যে সামান্ত প্রকারের রোগ উৎপন্ন হয় তাহা ঐ প্রাণীকে ভবিষ্যতে উক্ত শ্রেণীর তীব্র জীবাণুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। যে জীবাণুর দ্বারা টীকা দেওয়া হইয়াছে তাহা ক্রমান্বয়ে যত তীব্র এবং যত বেশী টাটকা হয় উহার উপকারিতাও তত অধিক। পাস্তুর পরে দেখাইয়াছিলেন যে, বিভিন্ন প্রকারের জীবাণু প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিভিন্ন রকমের।

য়ান্থ্রাক্স (Anthrax) রোগে তখন ফরাসী দেশের গৃহপালিত গবাদি পশুদিগের মধ্যে শতকরা ১০টি মারা যাইতেছিল। চিকেন্, কলেরার (chicken cholera) জীবাণুর প্রকৃতি সম্বন্ধীয় পরীক্ষায় জয়লাভ করিয়া পাস্তুর য়ান্থ্রাক্স রোগের (গোবসন্তের প্রকারভেদ) প্রকৃতি-নির্ণয়ের জন্য নূতন উদ্যমে কাজ আরম্ভ

করিলেন। তিনি য়ান্থ্রাক্সের জীবাণুগুলিকে (Bacillus anthracis) কালচার করিলেন এবং উহা নানাপ্রকার জীবজন্তুর শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইতে লাগিলেন।

এই প্রসঙ্গে টীকাতত্ত্বের অভিজ্ঞতা তাঁহাকে এক নূতন পথ নির্দেশ করিয়া দিল। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন যে, যদি পঁচিশটি মেঘশাবকের শরীরে য়ান্থ্রাক্স রোগের মন্দীভূত জীবাণু (attenuated virus or vaccine) দ্বারা টীকা দেওয়া যায় এবং কিছুকাল পরে ঐ পঁচিশটি মেঘশাবকের শরীরে এবং তৎসঙ্গে 'টীকা লয় নাই' এরূপ ২৫টি মেঘশাবকের শরীরে অতি তীব্র য়ান্থ্রাক্স রোগের জীবাণু প্রবেশ করান হয়, তাহা হইলে প্রথম পঁচিশটি ভেড়া—যাহাদের টীকা দেওয়া হইয়াছিল—তাহারা বাঁচিয়া থাকিবে, কিন্তু শেষোক্ত পঁচিশটি মেঘশাবক—যাহা দর টীকা দেওয়া হয় নাই—তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

পাস্তুরের সহযোগী ও ছাত্রদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার এই অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশেষ বিচলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পাস্তুর ইহাতে আশাহত হন নাই। সত্য ও বিজ্ঞানের প্রতি অটল বিশ্বাস থাকায় তিনি স্থির করিলেন যে, সর্বসাধারণের সমক্ষে তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণীকে জয়যুক্ত করিতে হইবে।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে হেঁ মে পুইয়ি লা ফোর (Pouilly le Fort)-এর কৃষিক্ষেত্রে তাঁহার বিপক্ষবাদী বহুসংখ্যক কৃষক, চিকিৎসক ও পশুবৈদ্যের সম্মুখে তিনি তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী প্রতিপন্ন করিবার জন্য সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার বিপক্ষবাদীরা তাঁহাকে অবিশ্বাসের ভয় প্রদর্শন এবং অসংখ্য বিজ্ঞপবাণী বর্ষণ করিতে লাগিল। সেই দিন পঁচিশটি মেঘশাবককে একটি মন্দীভূত জীবাণুর কালচার দ্বারা টীকা দেওয়া হইল। বায়ো দিন পর্য্যন্ত ঐ মেঘশাবকগুলি ভাল থাকিবার পর ১৭ই মে তারিখে তাহাদের শরীরে পুনরায় আরও তীব্র জীবাণু

* সর্বপ্রথমে কুক্কটশাবকদিগের বিষচিকা রোগের প্রতিকার-স্বরূপ তিনি এই প্রণালী ব্যবহার করেন।

প্রবেশ করান হইল। পূর্বের প্রতিষেধক টীকা না দেওয়া হইলে দ্বিতীয় বারের টীকার তীব্র জীবাণু দ্বারা অন্ততঃ অন্ধেক মেষশাবক মারা যাইত। কিন্তু পাস্তুর ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে মেষশাবকগুলির শরীরে মন্দীভূত জীবাণু থাকার দরুণ উহাদের তীব্র জীবাণুগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পায়—এবং সেই জন্ত পরে শক্তিশালী জীবাণু শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেও কোনও অপকার বা অনিষ্ট হইবে না। সকলেই শঙ্কিত চিত্তে উক্ত ফলাফলের জন্ত উদ্গ্রীব হইয়া রহিলেন। এক পক্ষ কাল অতীত হইল, কিন্তু একটি মেষশাবকও অসুস্থ হইল না। চারি দিকে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। ৩১শে মে তারিখে শেষবার টীকা দেওয়ার জন্ত পুনরায় সকলে সমবেত হইলেন। পাস্তুরের বিরুদ্ধবাদিগণের ভিতরে অনেকেই তাঁহাকে সন্দেহ করিতেন। সেই সময়ে কেহ কেহ বলিলেন যে, পাস্তুর তীব্র জীবাণুর বদলে মন্দীভূত জীবাণু ব্যবহার করিতেছেন এবং যে স্থলে মন্দীভূত জীবাণু দেওয়ার কথা সেই স্থলে তিনি তীব্র জীবাণু ব্যবহার করিতেছেন। পরীক্ষাস্থলে কেহ কেহ জীবাণু রাখিবার পাত্রটিকে ‘ঝাঁকাইয়া’ দিলেন। কিন্তু পাস্তুর তাহাদের এই বিক্রম ও কটুক্তিতে তিলমাত্র বিচলিত হইলেন না। তাঁহার এই-রূপ দৃঢ় নিষ্ঠা দেখিয়া ক্রমে অনেক শত্রুপক্ষীয় লোক তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করিলেন। অবশেষে এই পরীক্ষার শেষ ফল দেখিবার জন্ত সর্বসম্মতিক্রমে ২রা জুন দিন নির্দিষ্ট হইল।

নির্দিষ্ট তারিখে সকলে একত্র হইয়া ফলাফল

দেখিবার নিমিত্ত কৃষিক্ষেত্রে আগমন করিলেন। তাঁহাদের বিন্ময়ের সীমা রহিল না। যে-পঁচিশটি মেষশাবককে পূর্বে মন্দীভূত জীবাণু দ্বারা টীকা দেওয়া হয় নাই, কিন্তু প্রথমেই তীব্র জীবাণু দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে



‘প্যাস্ দু ব্রতই’ নামক স্থানে আন্তর্জাতিক চাদার সাহায্যে নির্মিত পাস্তুরের মূর্তি

বাইশটি গতায়ু হইয়াছে, দুইটি মুমূর্ষুপ্রায় এবং বাকী একটি অসুস্থ, তবে মৃতপ্রায় নহে; আর যে পঁচিশটি মেষশাবককে প্রথমে মন্দীভূত জীবাণু দিয়া পরে তীব্র জীবাণু দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা সকলেই সুস্থ। কেহ কেহ বা পরস্পরের সহিত শক্তি-পরীক্ষায় ব্যস্ত।

এই ফল দেখিয়া উপস্থিত সকলেই সম্মুখে এবং উৎসাহ সহকারে পাস্তুরকে অভিনন্দিত করিল। সত্যের জয় এবং অসত্যের পরাজয় ঘটিল।

পাস্তুর কর্তৃক প্রবর্তিত য়ান্থ্রাক্স রোগের চিকিৎসা-প্রণালী ফরাসী দেশের কি প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে তাহা ফরাসী গভর্নমেন্টের ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের রিপোর্ট হইতে জানা যায়। ইহাতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাস্তুরের প্রণালী দ্বারা গবাদি পশুদিগের য়ান্থ্রাক্স রোগের চিকিৎসা করার ফলাফল লিপিবদ্ধ আছে। তাহাতে দেখা যায় যে, ৩,৪০০,০০০ ভেড়ার মধ্যে মাত্র শতকরা একটি এবং ৪৩৮,০০০ গবাদি পশুদিগের ভিতরে হাজারের মধ্যে একটিরও কম য়ান্থ্রাক্স রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, পাস্তুরের এই আবিষ্কারের ফলে উক্ত দশ বৎসরে ফরাসী দেশের মোট দুই লক্ষ আশী হাজার পাউণ্ড (প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা) লাভ হইয়াছিল।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যেমন কৃত্রিম উপায়ে রোগের জীবাণুগুলি মন্দীভূত করা হয় সেইরূপ কোন কৃত্রিম উপায় দ্বারা রোগের জীবাণুগুলিকে তীব্রতর করা সম্ভব কিনা? ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে পাস্তুর এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি দেখাইলেন যে য়ান্থ্রাক্স রোগের জীবাণুগুলির তীব্রতা নষ্ট করিবার পরে নবজাত কোমলাঙ্গ ইঁহরের দেহের মধ্যে এই মৃতপ্রায় জীবাণু সঞ্চারিত করিলে জীবাণুগুলি অধিকতর সতেজ হইয়া উঠে। তখন এই নবজাত ইঁহরের রক্ত একটি অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক ইঁহরের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয় এবং ক্রমান্বয়ে খরগোস, ভেড়া এবং পরিশেষে গরু অথবা অশ্বের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে জীবাণুগুলির তীব্রতা ও তেজ বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়। নানাপ্রকার রোগের জীবাণুকে এই প্রকারে ক্রমান্বয়ে তীব্র হইতে তীব্রতর করার পদ্ধতি জীবাণুতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে।

জীবাণু-তত্ত্ব-বিদ্যে উপরি উক্ত আবিষ্কার পাস্তুরের এক অতুল কীর্তি। পাস্তুর তাঁহার সমস্ত জীবনে যদি কেবলমাত্র এই একটি বিদ্যে গবেষণা করিয়া যাইতেন

তাহা হইলেও তিনি পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিগণিত হইতেন। কিন্তু পাস্তুরের প্রতিভা বহুশাখামুখী। তাঁহার প্রত্যেকটি আবিষ্কার বিজ্ঞান-জগতের এক একটি স্তম্ভ-স্বরূপ।

পাস্তুরের জীবাণু-সম্বন্ধীয় গবেষণা ও আবিষ্কার পৃথিবীতে যেকি মহত্বপূর্ণ সাধন করিয়াছে আধুনিক খাদ্যদ্রব্য রক্ষণ-প্রণালী তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। জীবাণুতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন যে, কোনও প্রকার আহাৰ্য্য দ্রব্যে নষ্ট হইয়া যায় তাহার একমাত্র কারণ হইতেছে, যে, যতই সময় যায় ততই পচনকার্য্যে সহায়ক জীবাণুগুলি ক্রমে আহাৰ্য্য দ্রব্যের মধ্যে বৃদ্ধিত হইতে থাকে। জলীয় বাষ্প ও উষ্ণতা—এই উভয়বিধ অবস্থা ঐ জীবাণুগুলির পোষণের ও বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল। দশ হইতে চল্লিশ সেন্টিগ্রেড্ ডিগ্রির উত্তাপের মধ্যে এই জীবাণুগুলি বাচিয়া থাকিতে পারে। ৬৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিলেই জীবাণুগুলি খুব অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেকের জানেন যে, সাধারণ অবস্থায় কোনও পাত্রের মধ্যে দুগ্ধ বেশী ক্ষণ রাখিয়া দিলে উহা নষ্ট হইয়া যায়। তাহার কারণ এই যে, ব্যাসিলাস্ এসিডি ল্যাক্টিসি (Bacillus acidi lactici) নামক এক প্রকার জীবাণু দুগ্ধের মধ্যে সংখ্যায় ও আকৃতিতে ক্রমেই বৃদ্ধিত হইতে থাকে। কিন্তু দশ সেন্টিগ্রেড্ ডিগ্রির উত্তাপের কমে ইহারা আদৌ সংখ্যায় বৃদ্ধিত হয় না। পনের ডিগ্রির উত্তাপের সময়ে হইতে ইহারা ধীরে ধীরে দুগ্ধের (lactic acid) প্রস্তুত করিতে থাকে এবং ৩৫ হইতে ৪০ ডিগ্রির মধ্যে এই জীবাণুগুলি সন্মাপেক্ষা ক্ষমতালী হইয়া ৪৬ ডিগ্রির উত্তাপের উপরে এই জীবাণুগুলির শক্তি একেবারে কমিয়া যায়। সুতরাং যদি আহাৰ্য্য দ্রব্যকে অল্পক্ষণের জন্য ১০০ ডিগ্রির উত্তাপে গরম করা যায় এবং তাহার পরে একরূপভাবে রক্ষিত করা হয় যাহাতে কোনও জীবাণু ঐ আহাৰ্য্য দ্রব্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহা হইলে চিরকালের জন্য ঐ আহাৰ্য্য দ্রব্যকে অবিকৃত ও সুগাঢ় অবস্থায় রাখা যাইতে পারে। আহাৰ্য্য দ্রব্যকে সংরক্ষিত রাখিবার এই প্রথাকে ইংরেজী কথায় 'sterilization' বলে। এই প্রণালী প্রধানতঃ

টিনের কোটা করিয়া নানা প্রকার ফল ও খাদ্যসামগ্রী সংরক্ষিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আহার্য্য দ্রব্যকে অবিকৃত ও সুখাদ্য অবস্থায় সংরক্ষিত রাখিবার দ্বিতীয় প্রথাকে ইংরেজী ভাষায় pasteurization বলে। এই প্রণালী অনুসারে আহার্য্য দ্রব্যকে ৬৫ হইতে ৭০ ডিগ্রিতে বিশ মিনিট ধরিয়৷ গরম করিতে হয়। ইহাতে আসল জীবাণু সমস্তই বিনষ্ট হইবে এবং ঐ সকল অপেক্ষাকৃত বড় বড় জীবাণু হইতে জাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণুগুলি (spores) মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। তাহার ফলে গাঁজন (fermentation) ও পচন (decomposition) প্রক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইবে এবং নূতন জীবাণু আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে চুকিয়া বর্দ্ধিত না হওয়া পর্য্যন্ত, অথবা শেযোক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণুগুলি ক্ষুরিত না হওয়া পর্য্যন্ত গাঁজন বা পচন প্রক্রিয়া দ্বারা আহার্য্য দ্রব্য নষ্ট হইবে না। য়ানথাক্স, টিটেনাস ও সম্ভবতঃ অতিসার উদরাময় (epidemic diarrhoea) বাতীত সকল প্রকার ব্যাধির জীবাণুই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু উৎপন্ন করে না। সুতরাং উপরি উক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা তাহারা বিনষ্ট হইবে। ত্রাণ্ডি প্রভৃতি পানীয় দ্রব্য, বিশেষতঃ দুগ্ধ রক্ষণার্থে, এই প্রণালী সকল দেশেই ব্যবহার করা হয়। এই প্রণালী দ্বারা রক্ষিত দুগ্ধ ব্যবহার করিলে ছোট ছোট ছেলেদের মধ্যে অজীর্ণতা অথবা স্কর্ভি রোগের সম্ভার হইবার সম্ভাবনা কম।

আহার্য্য দ্রব্য সংরক্ষণের আরও একটি প্রণালী আছে। ১০ সেন্টিগ্রেড্ ডিগ্রির নীচে আহার্য্য দ্রব্যকে রাখিলে জীবাণুগুলি সংখ্যায় ও আকৃতিতে বাড়িতে পারে না এবং উত্তাপ আরও বেশী না-বাড়া পর্য্যন্ত জীবাণুর প্রক্রিয়া সম্ভব হইবে না। এই প্রণালী সাধারণতঃ মাংস ও মাংসের পচন নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরা দেখিতে পাই যে দূর-দূরান্তর হইতে নানা প্রকার মাংস বরফের সাহায্যে ঠাণ্ডা করিয়া কলিকাতার বাজারে বিক্রয় করা হয়। বরফ দেওয়া মাছ ও মাংস টাটকা মাছ ও মাংসের মতই পুষ্টিকর ও সুপাচ্য। ইউরোপে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে দুগ্ধ সরবরাহ করিবার সময় এই প্রণালী বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।

এইখানে বলা অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না যে, উপরি উক্ত তিন প্রকার প্রণালী বাতীত নানারূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়া আহার্য্য দ্রব্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়। এই উদ্দেশ্যে লবণের ব্যবহার বহুকাল হইতেই চলিয়া



সোরবনে পাস্তুরের মূর্তি

আসিতেছে। মৎস, মাংস, মাখন, পনির প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্য রক্ষণের জন্য প্রচুর পরিমাণে লবণ ব্যবহৃত হয়। কোন কোন স্থলে লবণ ও সোরা (saltpetre) একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা হয়। অনেক সময়ে সোহাগা, বোরিক্ এসিড্ ও কন্স্যালডিহাইড্ এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দুগ্ধ, মাখন, মাছ ও মাংসের তৈরি নানা প্রকারের আহার্য্য দ্রব্য ও ঘনীভূত দুগ্ধ (condensed milk) এই উপায়েই সাধারণতঃ রক্ষিত হয় এবং এক দেশ হইতে অন্য দেশে প্রেরিত হইতে পারে।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে পাস্তুর জলাতক রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করিতে থাকেন। কিন্তু এই জীবাণু অত্যন্ত বিষাক্ত বলিয়া ইহা লইয়া কাজ করা বিপজ্জনক, তদুপরি আরও একটি বিশেষ অন্তরায় এই যে এই বিষ প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করাইবার পরে রোগ প্রকাশ হইতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। পাস্তুরের সময়ে লোকের ধারণা ছিল যে লালাশাবের সহিত এই জীবাণু নিঃসৃত হয়, কিন্তু পাস্তুর দেখাইলেন যে, এই জীবাণু মস্তিষ্কে ও মেরুদণ্ডে অধিষ্ঠান করে। তিনি প্রমাণ করিলেন, যে-কুকুর জলাতক রোগে মরিয়াছে তাহার ঘাড়ের শিরদণ্ড (Medulla Oblongata) লইয়া অন্ত প্রাণীর দেহে ঢুকাইলে সেই প্রাণীতে এই রোগ প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহাতেও আশানুরূপ ফল হইল না, কারণ ইহাতেও দেখা গেল যে, কোন কোনও ক্ষেত্রে উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিলেও এই রোগ প্রকাশিত হয় না। পাস্তুর স্থির করিলেন, এই জীবাণু দেহের অন্ত কোন স্থানের পরিবর্তে যদি মাথার ভিতর ঢুকাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে অবশ্যই এই রোগ প্রকাশিত হইবে, কিন্তু ইহাতে পশুটির অত্যন্ত যত্ন হইবে ভাবিয়া তিনি নিজ হাতে এ-কার্যটি করিতে পারিলেন না। এক দিন তিনি পরীক্ষাগার হইতে বাহির হইয়া গেলে তাহার সহকর্মী রাউক্স (Roux) এই কার্য সাধন করিলেন। এই প্রক্রিয়া দ্বারা উক্ত জন্তুটির শরীরে রোগ অনিবার্য প্রকাশিত হয়, এবং রোগ প্রকাশ হইতে কখনও বিশ দিনের বেশী লাগে না। পরে পাস্তুর বিভিন্ন প্রকার শক্তিসম্পন্ন জলাতকের জীবাণু প্রস্তুত করিয়া কুকুরের দেহে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, এই মন্দীভূত জীবাণু ইহার শরীরে প্রবেশ করাইবার পর ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনে কোন অপকার হয় না; কিছু দিন পরে তিনি আরও দেখিলেন যে, ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনের পরেও উক্ত জীবাণু আহত কুকুরের দেহে প্রবেশ করাইয়া দিলে আর কোনও অপকার হয় না।

প্রায় এক বৎসর ধরিয়া পাস্তুর পশুদেহের শরীরে এইরূপ পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু মনুষ্যদেহের উপর পরীক্ষা করিবার সাহস তাঁহার হইল না; অবশেষে ঘটনাচক্রে তাঁহার এক সুযোগ মিলিয়া গেল। যোশেফ্ মাইষ্টার

নামে বৎসর-নয়েকের একটি ছেলেকে পাগলা কুকুরে দংশন করিয়া তাহার দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিল। ঐ বালকটির মাতা বালকটিকে লইয়া ভাল্পিয়া (Vulpian) নামক একটি বিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকটে চিকিৎসার্থ উপস্থিত হইলেন। সমস্ত বিবরণ শুনিয়া তিনি বলিলেন



রাখাল বালক ও পাগলা কুকুর

যে ইহার কোনও চিকিৎসা নাই—তবে পাস্তুরের প্রবর্তিত মতে চিকিৎসা করিলে বালকটি বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। কিন্তু পাস্তুর ইহাতেও দ্বিধা বোধ করিতেছিলেন। অবশেষে তাহাদের একান্ত অনুরোধে উপরি উক্ত জীবাণু দ্বারা চিকিৎসা করিতে স্বীকৃত হইলেন। দুই তিন দিন তাহার শরীরে জীবাণু প্রবেশ করাইবার পর বালকটির ক্ষতস্থান শুকাইতে আরম্ভ করিল এবং সে উঠিয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু দুশ্চিন্তায় পাস্তুরের নিদ্রা হইত না। কারণ যতই প্রবিষ্ট জীবাণুসমূহ তীব্র হইতে

তীব্রতর হইতে লাগিল—পাস্তুরের ভয়ও তত বাড়িতে লাগিল। অবশেষে বালকটিকে যে দিন সর্কাপেক্ষা তীব্র জীবাণুর দ্বারা টীকা দেওয়া হইল সেদিন রাত্রিতে পাস্তুরের চক্ষুতে আর নিদ্রা আসিল না। সমস্ত রাত্রি তিনি ছটফট করিয়া কাটাইলেন। কেবলই মনে ভয় হইতে লাগিল—যদি কলা প্রত্যুষে গিয়া দেখি যে ছেলোটী জলাতঙ্ক রোগের দারুণ জ্বালায় চীৎকার করিতেছে, তবে কি করিব? কিন্তু ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দুশ্চিন্তার অবসান হইল। গিয়া দেখিলেন যে, ছেলোটী দিব্য নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যাইতেছে। বহুদিন পরে পাস্তুরও সুখে নিদ্রা গেলেন।

অনতিকাল মধ্যে এই অভিনব চিকিৎসা-প্রণালীর খ্যাতি পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল এবং ছয় মাসের মধ্যে ৩৫০টি রোগী এই প্রণালী দ্বারা চিকিৎসিত হইল। তন্মধ্যে কোন-একটি রোগী কুকুর-দংশনের সাঁইত্রিশ দিন পরে চিকিৎসার্থ আসিয়াছিল বলিয়া রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ২৬৭১টি রোগীর মধ্যে মাত্র পঁচিশটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই চিকিৎসায়

আশাতীত সাফল্য দর্শনে ফরাসী দেশের বিজ্ঞান সমিতি (Academie des Sciences) দ্বারা গঠিত এক কমিটি প্যারী শহরে পাস্তুরের ইনস্টিটিউট (Pasteur Institute) স্থাপন করিবার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এক বিরাট গৃহ নিৰ্মাণ করিয়া তাহার নাম দিলেন ‘পাস্তুর ইনস্টিটিউট’। এই বিজ্ঞান-মন্দিরের উদ্দেশ্য হইল জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসা করা এবং সেই প্রসঙ্গে অন্যান্য বহুপ্রকার রোগের জীবাণুর প্রকৃতি সম্বন্ধে পরীক্ষা করা।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ২৮শে সেপ্টেম্বর অসংখ্য নরনারীর আশীর্বাদ মাথায় লইয়া পাস্তুরের মহাপ্রস্থান করেন।

পাস্তুর শত শত সহযোগী বৈজ্ঞানিক ও ছাত্রকে সত্যের সন্ধানে অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন। আজ পৃথিবীর সকল দেশেই পাস্তুর ইনস্টিটিউটের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়া সহস্র সহস্র রোগীকে নীরোগ করিতেছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে পাস্তুর মানবজাতির যে মহত্বপূর্ণ করিয়া যে প্রভাব বিস্তার করিয়া গেলেন তাহা প্রবল পরাক্রান্ত শত শত সন্ন্যাসী, সেনাপতি বা রাজনৈতিকের প্রভাবের তুলনায় সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ।

প্রান্তর-লক্ষ্মী

শ্রীআশুতোষ সান্যাল, বি-এ

কে দিয়েছে তারে পরায়ে আদরে
গোধূম-যবের শাড়ী?
সবুজ আঁচল কাঁপে হাওয়া লেগে,
প্রাণ লয় মোর কাড়ি!
দেহের উজল রংটুকু কিবা—
নরঃ ফুলের কাঞ্চন বিভা!
মরি মরি আহা রূপের বিথার—
নিখিলের মনোহারী!

তিসির কুসুম নয় নয় কভু,
পান্নার খাঁটি ছল,
ধূতধূসর ঐ মেঘথর—
কুঞ্চিত কালো চুল।

হিজলের তরু সে যে অনুখন,
আলতার রাগে রাঙায় চরণ,
খেজুর-রসের মদির গন্ধে
আঁধি দুটি ঢুলু ঢুলু।

বোবন বুঝি দিয়েছে তাহার
বুকের ছয়ারে দোল,
এ কি মধুরিমা! শুধু শ্রামলিমা—
সবুজের হিল্লোল!
অপরূপ রূপ! প্রকৃতির হিয়া,
নিবিড় পুলকে উঠেছে নাচিয়া,
তার সনে যেন পরাণ আমার
হ'ল আজ উতরাল।

জয়, না পরাজয় ?

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ঘোষ

ছেলেবেলা হইতে তাহার ডাকনাম ছিল উক্ক— স্বভাবটাও ছিল তেমনি। যেখানে-সেখানে যখন-তখন ছুটোছুটি করিয়া বেড়াইত।

অপরূপ সুন্দরী সে—পাড়াগাঁয়ে ঘনবিন্যস্ত বনজঙ্গলের মধ্যে যখন সে প্রজাপতির পিছনে তাড়া করিয়া বেড়াইত, তখন তার দিকে চাহিলে চোখ ফিরানো যাইত না।

তার বাবা ছিলেন বড় গরিব—অধ্যাতনামা কোন-একটা মহকুমা কোর্টের সামান্য উকিল। পৈতৃক বাড়িটা থাকাতে কোন রকমে মাথা গুঁজিবার ঠাই ছিল। কিন্তু মন তাঁর তেজস্বী ছিল। তিনি কোন দিন তাঁর অর্থকষ্টের কথা বলিয়া কাহারও সহানুভূতি উদ্রেক করিবার চেষ্টা করেন নাই।

কিন্তু ভগবান তাঁকে সাহায্য করিতে কার্পণ্য করেন নাই। উক্কার বয়স যখন আট বছর, তখন গ্রামের প্রাক্ত জমিদার অবিনাশ বাবু তাঁর ছেলে অচলেশের সঙ্গে উক্কার বিবাহের প্রস্তাব করেন; বাগ্‌দান হইয়া যায়। উক্কা তখন বিবাহ কি বৃদ্ধিত জানি না, কিন্তু বিয়ে যে বাজী-বাজনার সঙ্গে একটা মজার জিনিষ এই ভাবিয়া সে ভারি আনন্দ পাইয়াছিল। গ্রামের অন্তান্ত লোকে তখন দয়াদ্র হইয়া বলিল, “বড়লোক কি আর গরিবের সঙ্গে সন্ধু করবে? দু-একটা বছর যেতে-না-যেতেই এ মতলব বদলে যাবে।”

কিন্তু দুই-একটা বছর যাইতে-না-যাইতেই অবস্থা বদলাইয়া গেল। আকস্মিক একটা রোগে অবিনাশ বাবু মারা গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বালক অচলেশেরও গ্রহবৈশিষ্ট্য আরম্ভ হইল। পার্শ্ববর্তী গ্রাম মনোহরপুরের চৌধুরীরা অবিনাশ বাবুর পুরাতন কর্মচারীদের সহায়তায় অনভিজ্ঞ বালকের হাত হইতে সবই আয়সাৎ করিয়া লইলেন। এদিকে উক্কার বাবা উমাশঙ্কর বাবুরও পসার-প্রতিপত্তি হইতে আরম্ভ হইল।

সে আজ অনেক দিনের কথা। উমাশঙ্কর বাবু এখন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠাবান্ উকিল। উক্কা এখন বড়লোকের মেয়ে। সে এখন নব্যতন্ত্রের অষ্টাদশী। সর্বদা বড়লোকের সমাজে মেলা-মেশা—গমনাগমন। পুরাতনের কথা সে বড়-একটা মনে করে না—সর্ববিষয়ে বাংলার নব্যতন্ত্রে দীক্ষিত ধনীসমাজের অনুগামিনী।

পুরাতনের একটা জিনিষ তাহাকে এখনও অঁকড়াইয়া আছে—সে অচলেশ। বাল্যবয়সে তাহার বিবাহের

বাগ্‌দানের কথা তাহার মনে ছিল। তাই সে মনে মনে ভাবিত বিবাহ করিতে হইলে অচলেশকেই সে বিবাহ করিবে।

অচলেশ পুরাতনতন্ত্রী হইলেও উক্কাকে বাস্তবিকই ভালবাসিত। তাহার কারণ বোধ হয় তাহার আবার্যের অর্জিত সংস্কার, উক্কার আনন্দময়ী প্রকৃতি, সর্বোপরি তাহার লীলাচঞ্চল স্বচ্ছ সরল গতি। উক্কা নিজের মনোভাব কোন দিনই তাহার কাছে গোপন করে নাই। তাই বোধ হয় আয়াসলভ্য বস্তুর দিকে অচলেশ আরও আকৃষ্ট হইয়া পড়িত; মনে মনে ভাবিত নিজের ভালবাসা দিয়া সে উক্কাকে জয় করিবে।

অচলেশের নিরাড়ম্বর প্রাণের তেজস্বিতা, নিরহঙ্কার সরলতা উক্কার ভালই লাগিত। কিন্তু তাহার পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধা সে মোটেই পছন্দ করিত না। সর্বোপরি অচলেশের হাসিমুখে দৈন্তবরণ তাহার কাছে অসহ্য লাগিত। সর্বপ্রকার উচ্চাশাকে বিদায় দিয়া, শান্ত নির্বিকারভাবে দীন জীবনযাপন—ইহাতে বাহাজুরী কি?

এক দিন সে অচলেশকে স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছিল—গরিব লোককে সে কোন দিন বিবাহ করিবে না। অচলেশ যদি তাহাকে যথার্থ ভালবাসে তাহা হইলে সে যেন প্রথমে বড় হইবার চেষ্টা করে।

উত্তরে অচলেশ শুধু হাসিয়াছিল; বলিয়াছিল, “উক্কা, অর্থে লোক কোন দিনই বড় হয় না। বড় হয় মনের সম্পদে।”

উক্কা রাগিয়া উঠিয়া জবাব দিয়াছিল, “কিন্তু হাত-পা থাকতেও যে অক্ষম, মানু্য হওয়া তার পক্ষে বিড়ম্বনা। আর যে নিজের জিনিষ পরে কেড়ে নিয়ে গেলেও রক্ষা করবার চেষ্টা না-করে, সে একটা কাপুরুষ।”

অচলেশ উক্কার রোযবহি তেমনি প্রশান্তভাবে সহিয়া বলিয়াছিল, “ঠিক বলেছ উক্কা, কিন্তু একের দোষে যে অন্তে কষ্ট পায় তা আমি চাই না। যিনি আমাদের সম্পত্তি নিয়েছিলেন, তিনি আর এখন জীবিত নেই। যারা আছে, তারা এ-সব তাদের নিজদের জিনিষ মনে ক’রে পরম শাস্তিতে আছে। সে পুরনো বিষয় খুঁচিয়ে তুলে কেন সে বেচারীদের আবার বিপন্ন করি?”

উক্কা কোনমতেই অচলেশের সাধু্য সহিতে পারে নাই; বলিয়াছিল, “কিন্তু আমি হ’লে কোনদিনই নিশ্চেষ্ট হয়ে

থাকতে পারতাম না। আপনার ভালমাসুখি আপনাতাই থাকুক। শুধু আমার একবার বলুন ত কে সে যে আপনাদের সমস্ত সম্পত্তি লুটে নিয়েছে?”

অচলেশ জবাব দিয়াছিল, “সে কথায় আর প্রয়োজন কি, উক্কী? আমি যে সে সম্পত্তি, সেই ঐশ্বর্য্য, এখন আর চাই না, এই কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়?”

উক্কী দারুণ রোয়ে মুখ বাকাইয়া চলিয়া গিয়াছিল।

তাই অচলেশ উক্কী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সে ধীর, চিন্তাশীল,—নিরুপদ্রব শান্তিতে থাকিতে চায়। উক্কী এখনও ষুর্গিহাওয়ার মত প্রবলোচ্ছ্বাসে ছুটিয়া বেড়ায়। অচলেশ দৈন্যের মধ্যে অপৌরুষ দেখিতে পায় না, উক্কীর কাছে দারিদ্র্য একটা মহাপাপ। অচলেশ সমস্ত পুরাতনের মধ্যে দোষ, আর সমস্ত নূতনের মধ্যে গুণ দেখিতে পায় না। উক্কীর কাছে প্রত্যেক পরিবর্তন, নূতনত্ব, কেবল কল্যাণের মূর্তি।

এহেন উক্কীর উপর অচলেশ প্রভুত্বের দাবি করে না, বন্ধুত্বটা তাহার সঙ্গে চলে মাত্র।

অচলেশ এম-এ পাস করিয়াছে। সে এখন কি-একটা বিষয়ে রিসার্চ করে ও কলিকাতার কোন-একটা কলেজে নামমাত্র বেতনে অধ্যাপনার কার্য্য করে। সম্প্রতি তাহার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পাইবার একটা সুযোগ আসিয়াছিল। উক্কী তাহাকে সে পদ গ্রহণ করিতে অনেক অনুরোধও করিয়াছিল। কিন্তু সে কাজ তাহার পোষাইবে না বলিয়া অচলেশ তাহা ছাড়িয়া দিয়াছে। ইহা লইয়া উক্কী তাহাকে ঠাট্টা করিয়াছে—শেষে বিরক্তও হইয়াছে। কিন্তু উক্কীর বিরক্তি অচলেশকে টলাইতে পারে নাই।

দিনের পর দিন সে কলেজে যায়, কক্ষান্তে জলযোগ সারিয়া খেলিতে বাহির হয়। আবার ফিরিয়া আসিয়া নিজের নিভৃত কোণটিতে পড়াশুনা করিতে বসে।

এইরূপ একবেয়ে দৈনন্দিন জীবনে সে অভ্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু হঠাৎ এক দিন তাহার প্রাণে নূতন সাড়া আসিয়া পড়িল। প্রতিদিনের মত সেদিনও কলেজের পথে যাইতে যাইতে অকস্মাৎ নূতন আশ্রমকুলের সৌরভ তাহার নাসারন্ধ্র প্রবেশ করিল। চাহিয়া দেখিল অদূরে দেওয়ালের ধারে সান্নয়িত আশ্রমশাখায় চ্যাতমুকুল মুগ্ধরিত হইয়াছে। মনে পড়িয়া গেল আশ্রম ফাল্গুন মাস—নব বসন্তের আগমন-সূচনা। তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন আশ্রম-মুকুলের সৌরভের ভিতর দিয়া বসন্তের আহ্বান অনুভব করিল। শিরায় শিরায় সমস্ত অনুভূতি যেন চ্যাতমুকুলের সহিত মিলিয়া গিয়া বাসন্তী সৌন্দর্য্য বিলীন হইয়া গেল।

আজ যেন প্রাণ আর একাকী থাকিতে চায় না, এত অসীম আনন্দ উপভোগ করিবার এক মন সাধী চায়।

তাই সে কোন রকমে দু-এক ঘণ্টা কলেজে থাকিয়া বাহির হইয়া পড়িল উক্কীর কাছে।

দ্বিপ্রহরের রোদ্দ খাঁ-খাঁ করিতেছে—পিচ্চালা রাস্তা রোদ্দতাপে গলিয়া উঠিয়াছে—সেদিকে তাহার ক্রক্ষেপ নাই। তাহার মনে হইল, ধরনী আনন্দ-সাগরে স্নান করিয়া উঠিয়া হাসিতেছে। জনবিরল রাস্তায় দু-এক জন যাহাকে দেখিল, ইচ্ছা হইল তাহার কাছে দৌড়াইয়া গিয়া তাহাকে আনন্দের খবর দেয়। বড় রাস্তার সামনে আসিয়া দেখিল, একখানা ট্রাম চলিয়া যাইতেছে। কোন রকমে ছুটিয়া গিয়া ট্রাম ধরিয়া ফেলিয়া এক লক্ষ্যে ভিতরে প্রবেশ করিল।

আলিপুরের অভিজাত পল্লীর নির্জনতার মাঝে উক্কীদের প্রাসাদোপম অট্টালিকা। বৃহৎ সদরদ্বারের ফটকের পার্শ্বে জমাদার লহমন সিং আহারের পর খাটিয়া পাতিয়া বসিয়া ‘থৈনি’ ডলিতেছিল। লহমন সিং অনেক দিনের পুরানো চাকর—অচলেশকে দেখিয়া সে সসন্ত্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। অচলেশ নিকটে আসিয়া ফটকের পার্শ্বে বিলম্বিত একটি ক্ষুদ্র বাকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জানিতে পারিল, উক্কী বাড়িতে নাই। লহমন সিং তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া বলিল,—দিদিমণি, আরও কয়েক জন সাহব, মেমসাহেবের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক হ’ল বাইরে গেছেন। সন্ধ্যার আগে চা খেতে ফিরবেন। দাদাবাবু কি তত ক্ষণ বসবেন? উক্কীর অনুপস্থিতি তাহার মন রিক্ততায় ভরিয়া দিয়াছিল। তাই সে লহমন সিংকে অন্য কথা না বলিয়া শুধু “না, লহমন, আমি আর বসব না” বলিয়া যেমনই আসিয়াছিল, তেমনই বাহির হইয়া গেল।

মুহূর্তের মধ্যে জগতের সমস্ত আনন্দ তাহার চোখে নিম্প্রভ হইয়া পড়িল। দ্বিপ্রহরের রুদ্ধহাস্তে বাসন্তী সৌন্দর্য্য তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল। মনে হইল, এত আগ্রহ এত আনন্দ সব বার্থ সব শূন্য। অচলেশ ঘুরিতে ঘুরিতে সে ময়দানে আসিয়া পৌঁছিল। এখানে-ওখানে বসিয়া, এদিক-সেদিক চলিয়া কার্জন-পার্ক ছাড়াইয়া গিয়া ইডেন উদ্যানের ছায়াশীতল এক বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িল।

দ্বিপ্রহর গড়াইয়া আসিয়াছে—সূর্য্যদেব পশ্চিমাকাশে হেলিয়া পড়িয়াছেন। বৃক্ষপত্র মুহ মুহ কাঁপিতেছে—নীতল জলকণাবাহী সমীরণ নদী হইতে আসিয়া মাঝে মাঝে মন্দ মন্দ বহিয়া যাইতেছে। অদূরে নদীগর্ভে স্তীমারের বংশীধ্বনি মাঝে মাঝে বিরাট দৈত্যের হুকারের মত শুনা যাইতেছে।

অচলেশের কোন দিকে সংজ্ঞা নাই—যেন সে জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে। মনে হইতেছে জীবন তাহার উদ্দেশ্যহীন নিরর্থক—তাহার কেহ নাই, কেহ তাহাকে চায় না। উক্কী

কর্তব্যবোধে তাহার সহিত আলাপ করে মাত্র—তাহাকে ভালবাসে না।

কত ক্ষণ সে এমনই অভিভূতের মত বসিয়া রহিল, নিজেই তাহা জানে না। হঠাৎ একটা ঘটনা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সে দেখিল, কিয়দূরে—অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে—যেখানে সর্পাকৃতি কৃত্রিম জলপ্রণালী ব্রহ্মদেশীয় দারুণ কাককর্য্যখচিত প্যাগোডার পাদমূল ধৌত করিয়া যাইতেছে সেখানে দুই জন নরনারী ভ্রমণ করিতে করিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিছু ক্ষণ পরে দুইটি গোরা সৈনিক পশ্চাৎ দিক হইতে আসিয়া ভদ্রলোকটির সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা আরম্ভ করিল। তর্কবিতর্কের শেষ হইল হাতাহাতিতে।

ব্যাপার সুবিধাজনক নয় বুঝিয়া অচলেশ যখন তাঁহাদের সান্নিধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে তখন পুরুষটিকে অক্ষম করিয়া বীরপুরুষদ্বয় স্ত্রীলোকটির দিকে ধাবমান হইতেছিল। স্ত্রীলোকটি চীৎকার করিয়া উঠিল, পুরুষটি “help, help” বলিয়া যথাসাধ্য শক্তিতে সাহায্য প্রার্থনা করিল। ঠিক এমনি সময় অচলেশের বজ্রমুষ্টি সজোরে এক জনের নাসিকার উপর পড়িল। অকস্মাৎ অক্রান্ত হইয়া দারুণ ব্যথা পাইয়া সে বসিয়া পড়িল। আর এক জন তত ক্ষণে ব্যাপার বুঝিয়া অচলেশের দিকে ছুটিয়া আসিল। ইতিমধ্যে দু-এক জন করিয়া লোক আসিয়া জমিতেছিল। গোরা দুইটি অবস্থা বুঝিয়া উঠিয়া পড়িয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে তাহার দিকে একবার রক্তচক্ষে চাহিয়া বিনাবাক্যব্যয়ে প্রশ্ন করিল। চারি দিক হইতে অজস্র প্রশংসার বাক্য অচলেশের উপর বর্ষিত হইতে লাগিল—ভদ্রলোকটি গভীর কৃতজ্ঞতায় তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। বিপন্ন রমণী ডাগর চলছিল চোখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অচলেশ যখন তাঁহাদের নিকট হইতে চলিয়া যাইতে চাহ তখন তাঁহারা কিছুতেই তাহাকে ছাড়িতে চান না। ভদ্রলোক কেবলই বলিতে থাকেন, “আপনি আমার পরম বন্ধু, ভাই; আপনি আজ আমার ধনমান রক্ষা করেছেন।” বিপন্ন ভাব কাটিয়া গেলে রমণী হইয়া স্বামীকে বলেন, “দেখ, সাহেবীয়ানার ফলেই তোমার আজ পরম শিক্ষা হ’ল। আর দাদার দলে ভিড়বে—সাহেব সাজবে, বীরপুরুষ?” পরে অচলেশের দিকে চাহিয়া বলেন, “আমি আসবার আগেই ঠুকে বলছিলাম—দু-এক জন চাকর-নারোয়ান সঙ্গ নিয়ে এস—তা উনি গুনবেন কেন? উনি চান সাহেব-মেমদের মত বেড়াতে। ভাগ্যে আপনি ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলেন—নইলে কি হ’ত বনুন তো?”

প্রশংসার অচলেশের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল—সে এখন কোনমতে পলাইতে পারিলে বাচে। কিন্তু উপকৃতরা

একেবারে নাছোড়বান্দা। শেষে যখন কোনমতেই তাঁহারা অচলেশকে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিলেন না, তখন তাহাকে তাঁহাদের নিজেদের নাম ও ঠিকানার কার্ড দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যে কাল অপরাহ্নে সে নিশ্চয়ই তাঁহাদের বাড়ি যাইবে।

অচলেশের মন তখনও স্থির হয় নাই। মন বলিতেছে, সব শূন্য, সব ব্যর্থ; পরক্ষণেই অস্তরের তৃপ্তি বলিতেছে, না, না, আত্মপরতায় সুখ নাই, আত্মদানেই আনন্দ, নিজেকে বিলাইয়া দেওয়াই চরম সার্থকতা। অনেক ক্ষণ পরে অচলেশের মনের ঝটিকা শান্ত হইয়া আসিল। আর সে উদ্ধাকে নিজের জন্ত বিরক্ত করিবে না—তাহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া কষ্ট দিবে না। তাহাকে সুখী করিবার জন্ত সে নিজের দাবি ছাড়িয়া দিতেও প্রস্তুত আছে!

* * *

মনোহরপুরের নবীন ভূম্যধিকারী শ্রামলবিকাশ বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া কলিকাতার উপকণ্ঠে বালিগঞ্জের সৌখীন পল্লীতে বাস করিতেছেন। তিনি অকৃতদার,—তবে বন্ধুমহলে তিনি এক জন অদ্বিতীয় মহিলা-মনোরঞ্জক (ladies’ man) বলিয়া খ্যাত; এবং বিলাতে কয়দিনে তিনি কয়টি মহিলার মস্তক চর্ষণ করিয়া ছিলেন, এ-বিবয়েও তাঁহারা সময়ে সময়ে গভীর গবেষণা করিয়া থাকেন। বাড়িতে আত্মীয়ের মধ্যে তাঁহার একমাত্র ভগিনী সুশীলা ও ভগিনীপতি সুরেশ থাকেন। মিস সুরেশ রায় কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট; তিনি ব্যারিষ্টারী-শিক্ষা মানসে কোনরকমে বাপমায়ের ব্যয় ভাঙিয়া বোম্বাই পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। কিন্তু পরে অর্থাভাবের দরুণ দারুণ মনোকষ্টে বোম্বাই হইতেই ফিরিতে হয়। তিনি শ্রামলবিকাশের উচ্চ আদর্শের আদর্শ অনুকরণ। একত্র থাকিয়া আহা-বিহারে, শয়নে-স্বপনে শ্রামলবিকাশের সাহেবীয়ানার উৎকট আদর্শ তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিয়াছেন। দু-জনেরই বড় ইচ্ছা—সুশীলাকে মনের মত করিয়া তোলেন। কিন্তু সে কিছুতেই মেম-সাহেব হইতে রাজী হয় না।

তখন শ্রামলবিকাশ ঘর ছাড়িয়া দেশকে সুশিক্ষিত করিবার জন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। ভারতের ঘরে মুক্তির বাতাস বহিবে—নর-নারী যদিচ্ছা আলাপ-আচরণ করিবে, বিলাতী অনুকরণে প্রতি গৃহে আনন্দ-নৃত্যের উৎসব বহিবে, যুবক-যুবতী স্বাধীন প্রেমের সুখ আশ্বাদন করিবে! এই না হইলে জীবন?

শ্রামলবিকাশ যথেষ্ট এমনি দীর্ঘজন্মে বাহির হইয়াছিল, সেই সময় হঠাৎ একদিন উদ্ধার সঙ্গে দেখা।

ব্যারাকপুরের রেসের পর উদ্ধা বাড়ি ফিরিতেছিল। একা সে মোটির লইয়া পবনের বেগে চলিয়াছে।

গতিবেগে তাহার আনন্দ—ক্রমশঃ সে মোটরের গতি বর্ধিত করিয়া দিল। খানিক ক্ষণ পরে পিছন ফিরিয়া দেখে একটা মোটর তাহার অনুসরণ করিতেছে। পরাজিতা হইবার পাত্রী উক্স নয়—সে গতিশক্তি আরও বর্ধিত করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল অনুসরণকারীও দ্রুততর বেগে আসিতেছে। উক্স আরও দ্রুত চলিল।

হঠাৎ পায়ের নীচে ভীম রবে যেন পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল—বিরাটকায় ধাবমান দৈত্য সহসা প্রচণ্ড ভাবে টল-মল করিয়া উঠিল—উক্স বুঝিল, টায়ার ফাটিয়াছে। এক মুহূর্ত সে চক্ষু মুদ্রিত করিল—কিন্তু পরক্ষণেই অতি ক্ষিপ্ৰ, কৌশলী চালকের মত দৃঢ় হস্তে মোটরের গতিবেগ কমাইয়া দিল। ভগবানের রূপায়ই হোক, কিংবা নিজের ক্ষমতাতেই হোক, সে-যাত্রী উক্স রক্ষা পাইয়া গেল।

তত ক্ষণে অনুসরণকারীরা নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি নামিয়া গ্রামলবিকাশ উক্সের কাছে গিয়া বলিল, “উঃ, আপনার সাহসকে ধন্যবাদ; আমি পুরুষ হয়েও আপনার কাছে হেরে গেছি। আশ্চর্য—আপনার একটুও ভয় হ’ল না?—ভাগ্যে গাড়ীটা খুব ভাল, আর আপনার মত সূক্ষ্ম চালনা, সেইজন্যই যা ওন্টোয় নি! কিন্তু তা না-হ’লে কি হ’ত মনে করুন ত?”

হাসিয়া উক্স বলিল, “মনে আর করবো কি? মরতেই যদি হ’ত, তো এই ভেবে মরতাম যে আমি জয় ক’রে মরেছি—সেইটাই আমার আনন্দ—সেই আনন্দই আমার জীবন।”

আনন্দে গ্রামলবিকাশ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, “ব্রেভো! এত দিনে একটা মানুষ পেলাম! এত দিন আমি আপনাকেই খুঁজছিলাম। দয়া ক’রে কিছু যদি মনে না করেন ত আমি আমার কার্ড আপনাকে দিচ্ছি—আপনিও যদি আমাকে আপনার সঙ্গে সময়-মত দেখা করতে অহুমতি দেন—”

সেই দিন থেকে উক্সের সঙ্গে গ্রামলবিকাশের আলাপ।

জনবিরল বালিগড়ের রাস্তা বহিয়া অচলেশ প্রায় গোধূলি-বেলায় পূর্বদিনের কথামত উপরতের দ্বারে উপস্থিত হইল। বেহারা লক্ষা সেলাম করিয়া রূপার ট্রেতে সুরেশ রায়ের নামাঙ্কিত কাউথানাই লইয়া গেল। অচলেশ নিজের নামের কার্ড রাখে না—বিশেষতঃ যাহার কার্ড এখন তাঁহার কাছে ফেরৎ পাঠাইলে নিজের আর কোন পরিচয়ের দরকার হইবে না, এই ভাবিয়া অচলেশ এইরূপ কাজ করিল।

সুশীলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুরেশ ড্রয়িং-রুমের প্রবেশ-দ্বারে তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু সুসজ্জিত কক্ষের ভিতরে আসিয়া অচলেশ একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেল—

সম্মুখে উপবিষ্টা উক্সকে দেখিয়া। উক্সও তাহাকে দেখিয়া প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া গেল; কিন্তু সে মুহূর্তমাত্র। পরক্ষণেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে অচলেশকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “কি আশ্চর্য!—আপনিই কালকের ‘হিরো’? আপনার পেটে এত বিদ্যে, তা তো জানতাম না?”

অচলেশ খানিক থামিয়া উত্তর দিল, “বিদ্যে তো আর দেখিয়ে বেড়াবার দরকার হয় না? সময়-মত কাজে লাগাতে পারলেই হ’ল।”

সুশীলা আগাইয়া আসিয়া বলিল, “এই যে, আপনার দেখিচি ওঁর সঙ্গে আগে থেকেই চেনা-শুনা আছে?”

অচলেশ শুধু বলিল, “হা”।

উক্স কিন্তু সেখানেই থামিল না। বলিল, “চেনা-শুনা আজকের নয়; অনেক দিনের। কিন্তু উনি যে কি, আক্ষণও তা বুঝলাম না। এতদিন আমি জানতাম উনি নেহাৎ নিরীহ-গোবেচারী; কিন্তু আজ দেখছি আবার adventurous-ও বটে! এ আমার কাছে একটা নূতন আশ্চর্য!”

সুশীলা বলিল, “যাক, কথা কাটাকাটি পরে হবে। আশুন, আগে দাদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।”

গ্রামলবিকাশের সঙ্গে অচলেশের পরিচয় হইল। “ইনিই আমাদের উদ্ধারকর্তা—মিষ্টার—” অচলেশ একটা নমস্কার করিয়া হাসিয়া কহিল, “মিষ্টার-টিষ্টার নই। পুরো বাঙালী—শ্রীঅচলেশ রায়, পিতা ৬অবিনাশ রায়; পৈতৃক নিবাস—মাধবগঞ্জ; আপাততঃ—নং বীডন ষ্ট্রীট।”

হঠাৎ গ্রামলবিকাশের মুখের ভাবান্তর হইল। কিন্তু হাসি-ঠাট্টার মধ্যে কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না।

সুশীলা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—“কেমন দাদা? এখন কেমন জুদ? কি ক’রে পরিচয় দিতে হয়, শুন্লে? কই, আর যে কথা বলছ না?” বলিয়া সুশীলা দাদার পরিচয় দিল—“ইনি শ্রীগ্রামলবিকাশ চৌধুরী, পিতা ৬নিমাইদাস চৌধুরী, মনোহর-পুরের নূতন ডমিদার। নূতন বিলাত-ফেরৎ ব্যারিষ্টার।”

অচলেশ হঠাৎ যেন চমকিয়া উঠিল।

সুশীলা বলিয়া উঠিল, “বা, রে, আপনি আমাদের পাশের গাঁয়ের লোক। ছেলেবেলায় আপনার বাবার নামও শুনেছি। অথচ এত দিন আপনাকেই জানি না?”

অচলেশ বলিল, “আমাকে জানবেন কোথা থেকে—আমি কি আর জ্ঞানবার মত লোক? বাবা হয়ত নাম-করা লোক ছিলেন, তাই তাঁর নাম শুনেছিলেন।”

অচলেশ ও সুশীলার কথায় বাধা দিয়া উক্স সকৌতুকে বলিয়া উঠিল, “বাঃ, আপনি বেশ ত, মিসেদ্ রায়?—আমরা যে এতগুলো লোক ব’সে রয়েছি, আমাদের সঙ্গে

কথাই কইচেন না? আজ দেখি, অচলেশ বাবুর সঙ্গেই মেতে গেছেন?”

সুশীলা সক্রভে বলিল, “বাঃ, এতদিন পরে এক জন দেশের লোকের মুখ দেখলাম, দুটো কথা বলব না?”

উক্কা তেমনি কৌতুকভরা হাস্তে বলিল, “আমি ভাবলাম বুঝিবা রুতজ্ঞতার আবেগে এত কথা বল্চেন। তা আমরাও ত দেশের লোক, আমাদের সঙ্গেই বসুন না?”

—কি, আপনি দেশের লোক?

পলকের ক্ষণ পুরাতনের ছবি উক্কার মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। পরিহাস-তরল হাসি অকস্মাৎ থামিয়া গেল; বলিল, “হাঁ, উনি আর আমি ত এক গাঁয়েরই লোক।”

শ্রামলবিকাশ ও সুরেশ একসঙ্গে সোজা হইয়া উঠিলেন। উক্কাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রামলবিকাশ বলিলেন “কি, আপনারা এক গাঁয়ের লোক? আপনি যে কোনদিন পাড়াগাঁয় থাকতে পারতেন, এ ত আমি ধারণাও করতে পারি না?”

* * *

বাস্তবিক আজকার এই উক্কাকে ছেলেবেলার সেই স্বভাবশিষ্ট উক্কা বলিয়া চিনিবার কোন উপায় ছিল না। সে এখন মহানগরীর সর্বসুসভ্য কাজের অগ্রণী—আধুনিক শিক্ষিতা নারীসমাজের হালফ্যাশ্যনের প্রবর্তিকা।

অচলেশের সহিত উক্কার বড়-একটা দেখা হইবার সুযোগ হয় না। দৈবাৎ কোনদিন দেখা হইয়া গেলেও তাহাকে একাকী পায় না। উক্কা তাহার হস্তস্থলিত হইতেছে—এই রকম একটা কথা মাঝে মাঝে অচলেশের মনে হয়। তাহার দৈন্ত, তাহার প্রতি উক্কার আচার-ব্যবহার আজকাল যেন একটা গোপন কাঁটার মত প্রায়ই তাহাকে বিধিতে থাকে।

দু-এক দিন প্রকাশ্যভাবে সে উক্কার সহিত আলাপ করিত গিয়া প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। মনে হয়, যেন সে এখন অচলেশের সান্নিধ্য এড়াইয়া চলিতে চায়। অচলেশের অভিমানক্ষুণ্ণ হৃদয় প্রতিবারেই বিরক্তিত স্বপ্নায় বলিয়া উঠে, “না, আর না, এখন আর উক্কার ছায়া মাড়ানো উচিত নয়; সে যাহা করিতে চায়, করিত দাও।” কিন্তু পর-মুহূর্ত্তে আবার মনের সুদীর্ঘ অধিকারের সংস্কার মনের কোনে উঁকি মারে।

সেদিন অচলেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উক্কার সহিত দেখা করিত গিয়াছিল। কিন্তু বাহিরের ঘরে আসিয়া যে তাহাকে সম্বন্ধনা করিল সে সুশীলা। একটা ছোট্ট নমস্কার করিয়া সহাস্তে সুশীলা বলিল, “এই যে অচলেশবাবু, আগুন, বহন। সেদিনের পর তো আর আপনার দেখাই পাইনি?”

প্রতিনমস্কার করিয়া অচলেশ বলিল; কোন কথা বলিল না।

তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সুশীলা কহিল, “কিন্তু আপনি যার খোঁজে এসেছেন, অচলেশবাবু, তিনি তো এখন এখানে নেই? তাঁরা তো সবাই নাটকের রিহার্শেল গেছেন। তাঁদের ডেকে পাঠাব কি?”

অচলেশ মৃদু হাসিয়া বলিল, “না, আর ডাকবার দরকার নেই। তাঁদের না-দাসা পর্যাস্ত আমি অপেক্ষা করবো। কিন্তু আমি কার খোঁজে এসেছি, আপনি জানলেন কি করে?” হাসিয়া সুশীলা কহিল, “সে কথা কি আর জানবার দরকার হয়? তারা যে আপনা থেকেই আপনাকে জানিয়ে দেয়?”

একটু দ্বিধাভরে অচলেশ বলিল, “বাঃ, তাহলে এর মধ্যে এ-সব কথা আপনাদের মধ্যে আলোচনা হয়ে গেছে?”

সুশীলা উত্তর দিল, “হাঁ, সে তো অনেক দিন আগেই হ'য়ে গেছে?—উক্কা তো সবই বলছেন? সেইজন্যই তো দাদার সঙ্গে কোন কথা এখনও ঠিক হয় নি?”

বিস্ত্রতভাবে অচলেশ বলিল, “আমিই তাহলে শুভকাজের প্রতিবন্ধক? কিন্তু আমি তো তাঁকে কোন বাধা দিই নি—কোন কথাতেও তাঁকে আবদ্ধ করিনি।”

সুশীলা বলিল, “ঠিক কথা; কিন্তু এখনও হয়ত তিনি নিজের মনের কাছে জবাবদিহি করতে পারেন নি—হয়ত বিবেক এখনও তাঁকে মাঝে মাঝে খোঁচা দেয়।”

অচলেশ যাহা শুনিতে আসিয়াছিল, আজ স্পষ্টভাবে সে-কথা শুনিতে পাইল। ক্ষণেক সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। হায় রে, দুর্বল মানুষের মন। মনের মধ্যে যে-সন্দেহ অহর্নিশ গোপন আক্রমণ করিতেছে, আজ তাহার স্পষ্ট প্রকাশে সে রুদ্ধবাক হইয়া রহিল।

ব্যথা পাইয়া সুশীলা বলিল, “বড় দুঃখ পোয়েছেন অচলেশবাবু? আমার বড় দুর্ভাগ্য যে আমার কাছ থেকে আপনাকে এ-কথা শুন্তে হ'ল। কিন্তু আপনি এ-সব জানেন, কি জানেন না, ভেবে আমি নিজেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো, ভেবেছিলম। সময় থাকতে আপনাকে সাবধান ক'র দেবার ইচ্ছাও ছিল।”

অচলেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, “না, আমাকে সাবধান করবার দরকার নেই। কারও নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ আমি চাই নে। এখন আমি চললাম। তিনি এ-ল বলবেন, তাঁর ইচ্ছার অনুযায়ী কাজ যেন তিনি করেন—আমি সেটা সর্বাঙ্গকরণে সমর্থন করবো। তাঁর ওপরে আমার কোন রকম দাবি আছে, এ যেন তিনি মনে না করেন।”

গমনোদ্গত অচলেশকে বাধা দিয়া সুশীলা বলিল, “এরই মধ্যে চলে যাবেন কি, অচলেশবাবু?—আপনাদের

এত দিনের পরিচয়, তাঁর মুখের একটা কথা না-শুনে কি করে যাবেন ? তিনি যদি একটা ভুলই করতে যান—হীরে ফেলে আঁচলে কাচ বাধেন তাহলে কি তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করবেন না ?”

—এ কি কথা বলছেন আপনি ?

—বলছি ঠিক কথাই। যাকে নিয়ে কথা হচ্ছে, তিনি আমার বড় ভাই, আমার পূজা, তাঁকে আমি জানি। কিন্তু যেখানে এক জন নারীর সমস্ত জীবন নির্ভর করছে, সেখানে তিনি যত বড় পূজাই হ'ন, তাঁর সম্বন্ধে সত্য বলাই উচিত। এ-সব কথা নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক অপ্রীতিকর প্রসঙ্গও আমাদের মধ্যে হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি আর একটু বসুন। উক্কাকে আপনাকে সমস্ত কথা বলবেন বলছিলেন—তিনি তো গোপন করতে চান না ?”

অচলেশ একটু গুচ্ছ হাসিয়া বলিল, “তাই তো এত দিন আশ্চর্য্য হচ্ছিলাম—উক্কার স্বভাবে তো গোপনতা নেই ?”

“কি গোপনতা দেখলেন তবে আজ ?” বলিয়া উক্কা সুশীলা ও অচলেশের সম্মুখে আসিয়া পড়িল।

পলকের জন্ত অচলেশের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, বলিল, “তা কি তুমি জান না ?”

—হ্যাঁ, কতকটা আন্দাজ করছি। কিন্তু আমি তো কারও কাছে সমস্ত কথা বলতে বাধ্য নই ?

—তা আমি জানি। সেইজন্তই আমি এঁকে বলছিলাম তোমায় বলতে যে আমি তোমার উপর কোন দিন কোন দাবি করি নি, আর তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ না কর, এই আমার ইচ্ছা।

শ্লেষের হাসি হাসিয়া উক্কা বলিল, “উপদেশের জন্ত অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমার অসাক্ষাতে আমার কোন গোপন কথা নিয়ে কেউ আলোচনা করে।”

নির্বিকার শাস্ত অচলেশ এত দিনে সহসা দপ্ করিয়া জলিয়া উঠিল ; বলিল, “কার কাছে তোমার কোন কথা গোপন হ'ল, উক্কা ?—এ'র কাছে তো নয় ? তবে আমার কাছেই আজ তোমার সব কথা গোপন হয়েছে ?”

মুখের কথা লুফিয়া উক্কা পাণ্টা জবাব দিল—“যদি বলি তাই ?”

অচলেশ ধৈর্য্যহারী হইয়া বলিয়া উঠিল, “কিন্তু সেদিন আমার কাছে তোমার কোন কথা গোপন ছিল, উক্কা, যেদিন তোমার পিতা আমার হাতে তোমায় সঁপে দিয়েছিলেন ? যেদিন গভীর ক্লান্ততার সঙ্গে তিনি আমায় বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন ? তার পরে অনেক বদলে গিয়েছে—তোমরা বড়লোক হয়েছ—আমায় আগে বড়লোক হয়ে তার পরে তোমায় বিয়ে করতে চাইতে বলেছ ; সবই জেনেছি, বুঝেছি—কিন্তু তখনও তো তোমার

কোন কথা আমার কাছে গোপন ছিল না ? আজ ছ-দিন নূতন বন্ধু পেয়ে সবই ভুলে গেছ ?”

ঝঙ্কার দিয়া উক্কা বলিল, “তাই বৃধি নির্জনে নূতন বন্ধুনার কাছে পুরানো বন্ধুত্বের বাহাজুরী করছিলে ?”

অচলেশ গর্জিয়া উঠিয়া বলিল, “উক্কা,—চূপ ! আর কোন কথা নয়। আমি চললাম। প্রার্থনা করি শ্যামল-বিকাশকে বিয়ে ক'রে তুমি সুখী হও।”

অচলেশ চলিয়া গেল। তাহার গমনপথের দিকে উক্কা রুদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। মনে হইল হঠাৎ কি যেন হইয়া গেল ! বাহা নিকটতম, চির আপনার, তাহাই যেন আজ দূরে—চিরবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ইচ্ছা হইল একবার ডাক ছাড়িয়া কাঁদে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলবিকাশের মোটরের হর্ণ তাহার কানে প্রবেশ করিল। আজ পুরাতনের বিদায়, নূতনের আহ্বান !

* * *

মাস-কয়েক কাটিয়া গিয়াছে। শ্যামলবিকাশের সহিত উক্কার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বাহাদের ইহাতে আনন্দে উৎফুল্ল হইবার কথা, তাহাদের মুখে বিশেষ আনন্দের আভাস দেখা যায় না। উক্কা যেন সর্বদাই উন্মনা, শ্যামলবিকাশ চিন্তামগ্ন। সুশীলারও যেন দূরে দূরে সরিয়া যাইবার ভাব। অথচ মুখে কেহ কিছুই প্রকাশ করে না।

সুশীলা যেন ইহাদের কাছে আর একটা রহস্য। সে উক্কাকে আর কোন কথা বল নাই বটে, কিন্তু সে যে তাহাদের বিবাহ বিশেষ অনুমোদন করিতেছে না, তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। কিছু দিন পরে উক্কার অসাক্ষাতে শ্যামলবিকাশের সহিত তাহার মস্ত একটা বোঝাপড়া হইয়া গেল।

শ্যামলবিকাশ স্থির থাকিতে না পারিয়া এক দিন সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা, তোর ব্যাপারখানা কি, বল দেখি ?”

—কেন, কি দেখলে ?

—সর্বদাই একটা আড়াআড়ি, ছাড়াছাড়ি ভাব, কি যেন মনের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে চলছিল ?

—এ আর আজ তোমায় নূতন ক'রে কি বলব দাদা ? তোমায় তো কোনদিন কোন কথা লুকোই নি ?

—ওঃ, আজও তোর সে ভাব গেল না ? কেন, আমাদের এ-বিষয়ে তুই খারাপটা কি দেখলি, বল দেখি ?

সুশীলা কথা কহিল। স্থির আয়ত নেত্রে শ্যামল-বিকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, “দাদা, এই আমার শেষ অনুরোধ রাখ। উক্কাকে তুমি বিয়ে ক'রো না।”

—কেন ?

—এতে তোমরা দু-জনেই অসুখী হবে।

—তার কারণ ?

—তার কারণ—উক্কা শুধু উত্তেজনার বশেই তোমায় বিয়ে করছে। আর সত্য কথা বলছি, মাফ করো দাদা, তুমি উক্কার উপযুক্ত নও।

শ্রামলবিকাশ রোষবহি দমন করিয়া একটু হাসিল, বলিল, “কিসে আমায় এমন অনুপযুক্ত দেখলি?”

—তোমার জীবনের সমস্ত কাজের মধ্যে—আমার তো কিছুই অজানা নেই দাদা? নূতনত্ব, পরিবর্তনত্বের দোহাই দিয়ে কি কাজই না এত দিন করেছে? শুধু বিদেশে নয়, এখানেও তো বড় কম করো নি?—তোমার সারাজীবন যে মিথ্যার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত? আমার খালি ভয় হয় যে কোনদিন তোমার ছদ্মবেশের মুখোস খুলে গিয়ে আসল রূপ বেরিয়ে পড়বে—সেদিন আর অপমানের অন্ত রইবে না।

বিকৃত স্বরে শ্রামলবিকাশ বলিল, “বটে?”

সুশীলা বলিয়া যাইতে লাগিল, “তার চাইতে তোমার পায়ে ধ’রে বলছি, দাদা, তাকে ছেড়ে দাও। এর চাইতে অনেক ভাল সুন্দরী মেয়ে তুমি পাবে—কিন্তু এ-মেয়ে তোমার জন্ত নয়। এর মনোভাব, তোমার আচার-ব্যবহার, দু-দিনে তোমাদের জীবন বিঘ্ন ক’রে তুলবে। এর সঙ্গে মিলতে দাও তাকে, যে এর জন্ত সৃষ্ট হয়েছিল—যে আকাশের মত নির্মল, স্বচ্ছ, অসীম।”

—কে সে?

—যে তার আবাণোর বাগদত্ত—ওই চিরদরিদ্র অচলেশ। ভগবান্ জানেন, কেন আমার মনে হচ্ছে, তার ওপর আমরা বড় অবিচার করছি। তাকে আমরা সর্বস্বহারা ক’রে ফেলছি।

এবার শ্রামলবিকাশ ধৈর্যহারা হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, “কি, আবার অচলেশের হয়ে ওকালতী করতে এসেছ? বার খাও, তারই ঘর পোড়াও! জান, এখনও তুমি আমার আশ্রয়ে আছ। এ-সব বলতে হয়ত বাইরে গিয়ে বল, আমার ঘরে নয়।”

সুশীলা কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, “তুমি, দাদা, আজ আমায় এমন কথা বললে? কেন তোমায় এ-সব বললাম, বললে না?”

হুঃখে, অভিমানে সুশীলা চলিয়া গেল।

শ্রামলবিকাশের সখিৎ ফিরিল তখন, যখন গাড়ী ডাকাইয়া আনিয়া জিনিষপত্র তুলিয়া দিয়া স্বামীর সহিত সুশীলা যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া আসিয়া তাহার পায়ে প্রণাম করিল, বলিল, “মনের হুঃখে অনেক কথা বলে ফেলেছি, দাদা, আমার মাফ ক’রো।”

শ্রামলবিকাশ তাহার পানে চাহিয়া বলিল, “একি রে,

সুশীলা নিরন্তর রহিল।

শ্রামলবিকাশ তাহার হাত দুখানা চাপিয়া বলিল, “ছোট বোনটি আমার, এবারকার মত দাদার দোষগুলো ক্ষমা কর দিদি।”

ধীরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া সুশীলা বলিল, “দাদা, দোষ কারও একলার নয়, সবই আমাদের অদৃষ্টের। তবে আমাদের যে আর একসঙ্গে থাকা হ’তে পারে না, এটা ঠিক।”

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া শ্রামলবিকাশ বলিল, “বুঝেছি, তোর আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে। কিন্তু এটা দু-দিন পরে করলে হ’ত না? আজই তোরা আমায় একলা ফেলে গেলি?” সুরেশের দিকে চাহিয়া বলিল, “কি হে, সুরেশ, তুমিও কি এর সঙ্গে পাগল হ’য়ে গেলে? আমার হ’য়ে ছুটো কথাই বল না?”

মিঃ সুরেশ রায় কি বলিবেন ঠিক করিতে না পারিয়া শুধু মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।

এবার সুশীলা হাসিয়া ফেলিল, শ্রামলবিকাশের পানে চাহিয়া বলিল, “আমরা কি তোমায় ফেলে যাচ্ছি, দাদা? তবে মনটা একটু খারাপ হয়েছে, তাই ভাবছি কয়েকটা দিন একটু ঘুরে আসি।”

—তবে এ-সব কাজকর্ম করবে কে?

—কিসের? বিয়ের? তোমাদের তো সাহেব, মেমসাহেবের বিয়ে, দাদা, এতে আর কাজকর্মের কিসের দরকার হবে? বিয়ের সময়-সময় খবর দিও। সেখানেই থাকি না কেন, তখন এলেই তো হ’ল?”

দাদার পদদুলি লইয়া সুশীলা ও সুরেশ বাহির হইয়া গেল।

উক্কা যখন শ্রামলবিকাশকে সুশীলাদের চলিয়া যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল, তখন শ্রামলবিকাশ বলিল, “তাহারা দিন-কয়েকের জন্ত বেড়াতে গেছে।”

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে যখন তাহারা ফিরিল না, তখন উক্কা একটু সন্দিগ্ধা হইয়া শ্রামলকে জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা, সত্যি ক’রে বল তো, কেন তারা চলে গেল?”

উক্কার সন্দেহে ভীত হইয়া শ্রামলবিকাশ খানিকটা অধিসত্য না বলিয়া পারিল না; বলিল, “সত্যিই তারা বেড়াতে যাচ্ছে বলে গেল। কিন্তু তার আগে তার সঙ্গে আমার একটু বচসা হয়েছিল।”

—কি নিয়ে?

—তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক হয়েছে, এখনও আমি তোমার কাছে একটা সত্য গোপন করছি, এই নিয়ে।

—কি সত্য গোপন করছো, আর কেনই বা করছো?

—কিছুই তোমার কাছে গোপন করার ইচ্ছে ছিল না, উক্লা ; নাইও।” বলিয়া একটু থামিয়া শ্যামলবিকাশ পুনরায় বলিল, “এ-সব কথা অনেক দিন আগে থেকেই তোমায় বলব ভেবেছিলাম, কিন্তু একটা সঙ্কোচ, কেমন একটা লজ্জা, সর্বদাই আমার বাধা দিত। এত দিন সে-কথা বলতে পারি নি বলে আমার ক্ষমা করো, উক্লা।”

একটু ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া উক্লা বলিল, “এখন বল।”

শ্যামলবিকাশ একটা ঢোক গিলিয়া আরম্ভ করিল, “দেখ, আমি যখন বিলাত যাই, তখন আমার প্রথম বোবন, পৃথিবীকে আমি সেই সর্বপ্রথম সুল্লর চোখে দেখছি। সে-সময় প্রথম প্রেমের নেশায় আমি এক ইংরেজ বালিকাকে ভালবেসেছিলাম।”

—তার পর ?

—আমার সঙ্গে তার বিয়ের কথা সব ঠিকঠাক হয়েছিল। কিন্তু বিয়ে হবার আগেই বাবা সে-কথা জানতে পেরে প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন। তার ফলে তাকে পরিত্যাগ ক’রে আমাকে ভারতবর্ষে ফিরে আসতে হয়—বিয়ে হয় নি।

—বেশ বীরপুরুষ তো ?—তোমরা সবাই দেখছি এক ছাঁচে গড়া ?

—আমার সে অসহায় অবস্থার দিনকার দুর্বলতা মাপ্ করো উক্লা। কিন্তু তার পরে খবর নিয়ে জানতে পেরেছি যে, তাকে বিয়ে না-করে আমি ভালই করেছি। এক জন ইংরেজ যুবককে বিয়ে ক’রে সে এখন সুখেই আছে।

উক্লা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল—কথা কহিল না। মনের গোপন কোণে তাহার কি কোন সন্দেহ জাগিয়া উঠিতেছিল ? হয়ত সমস্ত সত্য এখনও সে জানে নাই।

উক্লাকে নিরুত্তর দেখিয়া শ্যামলবিকাশ পুনরায় কহিল, “আমার সেই একটাবারের দুর্বলতা মাপ্ করো, উক্লা ; যা হয়েছে, ভালর জন্তই হয়েছে। তার সঙ্গে বিয়ে হ’লে তো আর তোমায় পেতেম না। আর আমার মনে কোন মলা নেই, গোপনতা নেই। সব ধুয়ে পুঁছে ফেলে এখন আমি তোমারই মিলনপ্রতীক্ষায় বসে আছি—আমার সব কথাই তোমায় বলেছি, উক্লা।”

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শ্যামলবিকাশের পানে পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া উক্লা বলিল, “তোমার সব কথাই বলেছ ? আর তো কোন কথা গোপন নেই ?”

দৃঢ়স্বরে শ্যামলবিকাশ বলিল, “না, কিছু গোপন নেই ; আমার তুমি বিশ্বাস করতে পার, উক্লা।”

উক্লা হাসিল, বলিল, “বেশ, স্বীকারোক্তির পুরস্কার-স্বরূপ তোমার একটাবারের দুর্বলতা মার্জনা ক’রে নিলাম।

কিন্তু দেখো, আর যেন অসত্য, গোপনতা, কিছু তোমার মধ্যে না থাকে ; আবার যেন কোন দুর্বলতা না আসে।”

* * *

সুশীলা ও সুরেশ এখানে-সেখানে ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতেছে। সম্প্রতি তাহারা মনোহরপুরে গিয়াছে—শ্যামলবিকাশ এ-সংবাদ পাইয়াছে। সে একটু চিন্তিত হইল। মনোহরপুরে সুশীলার পিতৃদত্ত একখানা বাড়ি ও আশপাশের দু-চারখানা গাঁয়ে কিছু বিষয়-সম্পত্তি আছে। সে-সব এতাবৎকাল শ্যামলবিকাশই রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছে।

কিন্তু শ্যামলবিকাশের চিন্তা চরমে পরিণত হইল তখন, যখন তাহার কাছে সংবাদ আসিল যে, সুশীলা তাহার ওকালতনামা (Power of Attorney) খরিজ করিয়াছে। কেন এ চিরপ্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম হইল ? সুশীলা চায় কি ? দাক্ষণ হুশিচিন্তায়, সংশয়ে শ্যামলবিকাশের মুখ মসীময় হইয়া উঠিল।

দু-এক দিন পরে হঠাৎ একখানা প্রকাণ্ড মোটরকার এক দিন অচলেশের জরাজীর্ণ ঘরের সম্মুখে থামিল। অচলেশ শ্যামলবিকাশের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া প্রথমে নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না।

শ্যামলবিকাশের মুখ ম্লান—কপালে চিন্তার রেখা। ছোট একটা নমস্কার করিয়া সে একটা গোলাপী রঙের খাম অচলেশের হাতে দিয়া বলিল, “আমি নিজেই আমার বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে এসেছি, অচলেশবাবু, আশা করি আপনি আসবেন—কোন বিবাদ-বিসম্বাদ মনে রাখবেন না।”

অচলেশ বলিল, “না, বিবাদ-বিসম্বাদ আর কি—তবে আমি ভেবেছিলাম, আপনাদের কাছে আমার আর না-বাওয়াই ভাল।”

অতি আগ্রহে শ্যামলবিকাশ বলিল, “না, সে কি হল, সে কি একটা কথা ? আর আপনি যে আমাদের কি, তা কি আমরা জানি না ?”

উত্তরে অচলেশ শুধু মাথা নাড়িল।

শ্যামলবিকাশ বলিয়া যাইতে লাগিল, “আজ বিশেষ ক’রে আপনার একটা দয়াভিক্ষা চাইতে এসেছি। বলুন, আপনি আমার কথা রাখবেন ?”

অচলেশ বলিল, “সাধ্য হ’লে রাখবো না কেন ?”

শ্যামলবিকাশ মুহূর্ত্তে কি যেন বলিল।

তার পর শ্যামলবিকাশ অচলেশের হাত-হুথানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “বলুন, তাহ’লে এসব কথা ঘণাক্ষরেও উচ্চার কাছে বলবেন না ? সুশীলা অল্পস্বল্প সন্দেহ করেছে যেন হয়, কিন্তু সমস্ত কথা জানে না।”

একটু খামিকা শামলবিকাশ অচলেশের মুখপানে চাহিল; অচলেশ কোন কথা কহিল না। শামলবিকাশ পুনরায় বলিল, “সুশীলা বোধ হয় সমস্ত না জানলে কোন কথা বলবে না; বললেও উক্কা শুনে না। কিন্তু আপনার মুখ থেকে কোন কথা শুনেই উক্কা বেঁকে দাঁড়াবে। আপনি তো জানেন, সে বড় অভিমানিনী, জেদী ধরণের মেয়ে। বলুন, আপনি কোন কথা বলবেন না—আমার জীবনের প্রধান সুখশাস্তি নষ্ট করবেন না?”

অচলেশ স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার বুকের মধ্যে যেন সহস্র হাতুড়ি একসঙ্গে ঘা দিতে লাগিল। ক্ষণেক শামলবিকাশের মুখপানে চাহিয়া ভাবিল—লোকটা বলে কি? কাহার কাছে এ-কথা বলিতেছে, কি পরিমাণে আত্মতাগ তাহার কাছে চাহিতেছে সে কি জানে না? অথবা এই হয়ত তাহার প্রকৃতি—হয়ত তাহার আত্ম-সুখের কাছে অপরের ক্ষয় কিছুই নয়! বাই হোক, উক্কাকে সে তো বলিয়াছে, তাহার উপর কোন দাবি রাখে না—আর এত দিন পরে সে কি ষণিত স্বার্থের জন্ত এমন বর্ষরোচিত কাজ করিবে?

অচলেশের নীরবতায় শামলবিকাশ ধৈর্যাহারা হইয়া পড়িল—তাহার হাত ছুথানা আবার সজোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “কি, আমায় কি এই দয়াটুকু করবেন না?”

অচলেশ সোজা হইয়া দাঁড়াইল; বলিল, “কোন দয়ার কথা নয়, শামলবাবু। আমি ত উক্কাকে অত্র কিছুর জোরে কোন দিনই আপনার করতে চাই নি?”

শামলবিকাশ তথাপি বলিল, “তাহ’লে উক্কাকে এর কোন কথাই বলবেন না, প্রতিজ্ঞা করুন।”

অচলেশের সহের সীমা উত্তীর্ণ হইল; বলিল, “ভদ্রলোকের কথাই প্রতিজ্ঞা—এর বাড়া আর কিছু বলতে পারি না।”

* * *

কাহাকেও কিছু না বলিয়া হঠাৎ শামলবিকাশ এত শীঘ্র বিবাহের দিন স্থির করায় উক্কা তাহাকে অনুযোগ করিল। হাসিয়া শামলবিকাশ বলিল, “এটা তোমাদের জন্ত একটা ‘সারপ্রাইজ্’। আরও তোমার জন্ত কত কি করবো, ঠিক করেছি, তার তুমি কি জান?”

নবীনত্বের নেশায় উক্কা নাচিয়া উঠিল, বলিল, “বলোই না একবার?”

ঘাড় নাড়িয়া শামলবিকাশ বলিল, “উঁহ; তা বলবো কেন?—তা’হলে আর মজাটা কি হ’ল? সময় বুঝে সব বলতে হবে তো?”

তারপরে কয়েকটা দিন যে কেমন করিয়া কাটিয়া গেল, উক্কা তাহা জানে না। সর্বদাই ছুটাছুটি, হাত-

পরিহালেক ভিতর দিয়া হ হ করিয়া দিনগুলো চলিয়া গেল। সুশীলা এখনও আসে নাই—বাধা-বিপত্তি ঘটাইবার কেহ নাই। শামলবিকাশের মুখেও হাসি ফুটিয়াছে। উক্কাকে লইয়া দোকান দোকান ঘুরিয়া সে প্রায় কাপড়-চোপড় অলঙ্কারপত্রে লাঞ্ছানেক টাকা খরচ করিয়া ফেলিল। এত টাকা খরচ করাতে উক্কা কৃত্রিম অনুযোগ করিল। সহাস্যে শামলবিকাশ তাহার গাল টিপিয়া দিয়া বলিল, “বেশ করছি, গো, বেশ করছি; আমার টাকা আমি খরচ ক’রে যদি তোমায় মনের মত সাজাই, তাতে তোমার বলবার কি আছে?”

উক্কা কৃত্রিম রোষে সক্রভঙ্গে শামলবিকাশের পৃষ্ঠদেশে ছোট্ট একটা কিল মারিল।

সম্পূর্ণভাবে দ্বিধা ত্যাগ করিয়া উক্কা এখন আপনাকে শামলবিকাশের সহিত মিলাইয়া দিয়াছে। আর অচলেশ?—হ্যা, অচলেশ বলিয়া কেহ ছিল বইকি! মাঝে মাঝে তাহার কথা মনে হয় বইকি! তাহাকে লইয়া শামলবিকাশ তাহার সহিত মাঝে মাঝে ঠাট্টাও করে! উক্কা অভিমান করিলে শামলবিকাশ তাহাকে খোঁচা দেয়—

“কি গো, অচলেশ-বিরহিণি!”

ক্রকুটি করিয়া উক্কা বলে, “ও আবার কি কথা?”

তরল হাসি হাসিয়া শামলবিকাশ জবাব দেয়, “কেন, ঠিক কথাই বলেছি ত? তুমি ত অচলেশেরই?”

পরিহাসের সুরে উক্কা বলে, “তাই যদি বোঝো, তবে পরস্ব অপহরণ কর কেন? আমি কিন্তু ও-জিনিষটা একদমই সহিতে পারি না, তুমি বাই বল না কেন!”

শামলবিকাশের বুকটা ছাঁৎ করিয়া ওঠে!

উক্কা ভাবে,—আহা, বেচারী! সে বড় কষ্টে আছে, না? কিন্তু উক্কা নিরুপায়, তাহার দ্রুত কি করিবে? মন ত তাহাকে চায় না? হ্যা সত্যই কি তাই? উদগত একটা দীর্ঘশ্বাস উক্কা চাপিয়া যায়। আহা কি কষ্টেই না সে আছে? কিন্তু তাহার কষ্ট সে নিজেই বোঝে না—এমন অপদার্থ, অক্ষম সে! বাই হোক, উক্কা তাহার জন্ত যথাসাধা চেষ্টা করিবে। শামলবিকাশকে বলিয়া তাহার ভাল একটা কাজকর্মের সংস্থান করিয়া দিবে—নিজে একটি সন্দরী মেয়ে দেখিয়া তাহার বিবাহ দিবে।

আজ উক্কার বিবাহ। অচলেশ গোলাপী রঙের খামখানা একবার গভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল; তারপর অতিসম্পূর্ণে সেটা বুকপকেটে রাখিল। বরাবর ছাদে উঠিয়া আকাশের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। কি তাহার হইয়াছে—কি তাহার গিয়াছে—সে তাহা উপলব্ধি করিতেও পারিল না! সর্বস্বহারা হইলেও মানুষ কি এমনি উদাস, আপনহারা হইয়া বসিয়া রয়?

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে পড়িল, এখন হয়ত উদ্ধার বিবাহ হইতেছে। সে কি করিবে, যাইবে কি ? একবার ভাবিল, না, যাইব না। পরক্ষণেই মনে হইল, না গেলে উদ্ধার তাহাকে কাপুরুষ মনে করিবে; এ-চিন্তা অচলেশের অসহ। না, উদ্ধার দেখুক, অচলেশ কাপুরুষ নয়।

অচলেশ প্রস্তুত হইয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় ডাকপিওন আসিয়া তাহার হাতে একখানা পত্র দিয়া গেল। খামের উপরকার হাতের লেখা সম্পূর্ণ অপরিচিত। পত্র আসিয়াছে, তাহার কলেজের ঠিকানায়, সেখান হইতে বুরিয়া দুই-এক দিন পরে তাহার গারে পৌঁছিয়াছে। খান খুলিয়া অচলেশ দেখিল, চিঠি লিখিয়াছে—সুশীলা। সুশীলা লিখিয়াছে যে সে অচলেশের ঠিকানা জানে না বলিয়া এত দিন চিঠি লেখে নাই। সম্প্রতি তাহার কলেজের নাম মনে পড়ায় সেই ঠিকানাতেই সে চিঠি দিতেছে। অগ্ৰান্ত কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করার পরে সুশীলা লিখিয়াছে যে, সে এত দিন পরে নিঃসন্দেহে জানিয়াছে তাহাদের প্রায় সমস্ত সম্পত্তিই অচলেশের। সুশীলার দুর্ভাগ্যক্রমে তার পিতাই সে-সম্পত্তির অপহারক। সুশীলাও সে-সম্পত্তির কতক অংশ পাইয়াছে। কিন্তু সুশীলা তাহার পিতার, তাহার পিতৃবংশের এ কলঙ্ক অপনোদন করিবে। অন্ততঃ তাহার অংশে অচলেশের যে-সম্পত্তি আছে তাহা তাহাকে ফিরাইয়া দিবে। তাই সে সমস্ত দলিলপত্র সংগ্রহ করিতেছে। অপেক্ষত দলিল ফিরিয়া পাইলে অচলেশ বৃষ্টিতে পারিবে যে, সে-সমস্ত একবার কোর্টে দাখিল করিলেই সম্পত্তি যে অচলেশের তাহা নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত হইবে।

অচলেশকে যেন একসঙ্গে সহস্র বৃষ্টিক দংশন করিল। হা ভগবান, এ কি করিলে ? আজ নিরাশার দ্বারে দাঁড়াইয়া এ আলোক কেন, দয়াময় ? সবই তো চলিয়া গিয়াছে, তবে এখন আর এ প্রলোভন কেন ? আপনা হইতে যদি দিলে, তবে সময় থাকিতে একবার দিলে না কেন ? অচলেশ উন্নতের মত হাসিয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গেই সে চমকিয়া উঠিল ! একি, কি করিতেছে সে, পাগল হইয়া গেল নাকি ? সে অচলেশ, অচলেশই রহিবে। ভগবান বল দাও, সে দুর্বলতা জয় করিবে। কিন্তু আজ নয়—আজ আর তাদের কাছে যাওয়া হবে না। কি জানি, আমিও তো মানুষ—বদি কিছু ক'রে বসি ?

* * *

শ্রামলবিকাশ বরবেশে বিবাহসভায় আসিয়াছে। মুখে তাহার হাসি খেলিয়া গেলেও সে যেন শঙ্কিত ভাবে এক-একবার এদিক-ওদিক চাহিতেছে। যাহারা তাহার নিতান্ত অন্তরঙ্গ, তাহাদের মধ্যে একটা কি গুঁজব শোনা যাইতেছে।—সে যাই হোক, সংবাদটা তখন জনরবের মধ্যেই রহিয়া

গেল। কেহ সেই কথা প্রকাশ করিয়া বিবাহের সময় গণ্ডগোল করিতে দিল না।

নির্ঝিন্দে শুভকার্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

পরদিন—তখনও অরুণোদয় হয় নাই। নিশান্তের শীতল বাতাসে রাত্রিজাগরণক্লিষ্ট অচলেশের চোখে সবেমাত্র একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। এমন সময় বুদ্ধ লছমন সিং আসিয়া অতি সন্তর্পণে তাহার উপাধান-নিম্নে কি একটা জিনিষ রাখিয়া দিল।

অচলেশের তন্দ্রা কাটিয়া গেল ; সে উঠিয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গে যেন সানাইয়ের বিদায়রাগিণী তাহার কানে প্রবেশ করিল—মনে পড়িল, আজ উদ্ধার নূতন জীবনের প্রথম প্রভাত।

লছমন সিং দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষা করিতেছিল। অচলেশ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কে, রে ?”

—দাদাবাবু আমি, লছমন।

—কি হয়েছে, রে, লছমন ?

লছমন সরিয়া আসিয়া মুহূর্ত্তের বলিল, “দিদিমনি একঠো চিঠি ভেজা। হাম হুঁয়ে পর রাখ দিয়া। আপু কাল কাহে নেহি আ রহা, দাদাবাবু ? দিদিমনি রোওনে লাগা।”

অচলেশ আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কেন, রে ?”

—মালুম নেহি, দাদা ! সাদি-ওদি হো যানেসে, হাম রাত দো বাজে খোড়া কাম্কা ওয়াস্তে ছাদে পর গিয়া ; দেখা দিদিমনি এক কোণামে খাড়া রহা। লগিজ্মে গিয়ে হাম দেখ্লে দিদিমনি রোতা। হামি পুছ্লে, ‘কি হইয়েছে, দিদি ?’ বল্লে, ‘কুছু হয়নি, তুই যা’। ব'লে নীচে চলে গেল।”

—বটে ?

লছমন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার মুহূর্ত্তের কহিল, “আপু চিঠি উঠ্টি পড়্কে খোড়া আস্বেন, দাদাবাবু ; দিদিমণিকো খোড়া দেখ্বেন ; গোস্মা রাখবেন না।” বলিয়া বুদ্ধ লছমন সিং আভূমি প্রণত সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

অচলেশ চিঠি খুলিয়া পড়িল ; উদ্ধার লিখিয়াছে—

চিরবন্ধু আমার, আবালোর সখা,

আজ তোমায় চিঠি লিখছি, আমার আনন্দের সংবাদ দিতে, আর তোমায় এ-আনন্দের অংশীদার করতে।

কাল তুমি আসবে ভেবেছিলাম, আসোনি কেন ? তুমি নির্ঝিন্দার, দার্শনিক। ছিঃ, তোমার এখনও এ কাপুরুষতা কেন ? হুঃ, হুঃ, হতাশা তো তোমার স্পর্শ করতে পারে না—তবে কেন তুমি কাল স'রে দাঁড়িয়েছিলে ?

আজ প্রথম যাত্রার পথে তুমি এসে আমার আশীর্বাদ করবে না ?

তুমি হয়ত অনুরোধ করবে, আমি তোমায় ভুলে গেছি। কিন্তু তা নয় ; বাল্যের বন্ধু, কৈশোরের সহচর আমার, তোমায় কি আমি ভুলতে পারি ?

তোমার আমরা ছুঁতে চাই, বিশ্বাস কর কি ?

আজ আমরা এখান থেকে বেরিয়েই চলে যাচ্ছি—একেবারে কয়েক মাসের জন্য যুরোপ-ভ্রমণে। সকলে কি 'সারপ্রাইজ'টাই না পাবে?—দেখ তে, কি নবীনত্ব, কি প্রাণবন্ত জীবন এখানে ?

অবিশ্বাস ক'রে একটি বারের জন্য দেখা দিয়ে যেও—দেখে যেও, নির্বাকনে আমি ভুল করেছি কি না।

তোমার চিরস্নেহের
উদ্ধা

পত্র যেন অচলেশের পরাজয় বহিয়া আনিয়াছিল। কাল রাত্রে আবার এই উদ্ধাই নাকি কাঁদিয়াছিল? কি ক্ষয়হীনা, প্রহেলিকাময়ী এই নারী!

উদ্ধা ও শ্যামলবিকাশের বিদায়ের সময় নিকটবর্তী হইয়াছে। গৃহের কর্ত্রীস্থানীয় সকলে তাহাদের প্রবাসগমনের সব উদ্যোগ-আয়োজন করিয়া দিবার জন্য বাহির হইয়া গিয়াছেন। পুরস্বীদের মঙ্গলাচরণ সম্পন্ন হইলে বরবধু বিদায় লইবে।

অচলেশ আসিয়াছে—একবার শেষদেখা সে উদ্ধাকে দেখিবে! ক্ষয়কে প্রাণপণ শক্তিতে সংযত করিয়া নিশ্চল পাষণমূর্তির মত সে দাঁড়াইয়া—তবু যেন তার সর্বাঙ্গে অবসাদের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে! চক্ষু ছুটি শ্রান্ত, তবুও শান্ত, হাসিমাখা।

মঙ্গলাচার সমাপ্ত হইলে শ্যামলবিকাশ একটা শান্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাহিরে আসিল—তুই চোখে তার সাক্ষ্যের দীপ্তি, মুখে ভয়গর্কের হাসি। সুসজ্জিত গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া অচলেশের সহিত দু-একটা কথা বলিতে লাগিল।

উদ্ধা আসিল—মহামহিমময়ীর মত। নব-অভিযুক্তা সম্রাজ্ঞীর মত দৃষ্ট চরণ-ভঙ্গীতে—কমলার মত লীলাচঞ্চল হাসিমুখে—শ্যামলবিকাশের পার্শ্বে দাঁড়াইল। দরিদ্র অচলেশ কি বলিব ?

দু-একটা কথা বলিয়া শ্যামলবিকাশ গাড়ীতে উঠিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। দুই জন ভদ্রলোক তাহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন—মুহূর্তের জন্য শ্যামলবিকাশের মুখ শবের মত পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই সে তাহা দমন করিয়া সহজভাবে জিজ্ঞাসা করিল—“কি চাই মশায়?”

—আপনি এঁদের কোম্পানীর টাকা আয়সাৎ ক'রে আজ বিলেত পালাচ্ছিলেন—আপনার নামে জরুরী সমন আছে।

উত্তেজনায় উদ্ধার মুখ লাল হইয়া গেল; তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল, “কি?”

একই সঙ্গে শ্যামলবিকাশ সরোখে গর্জন করিয়া উঠিল, “মুখ সামলে কথা বলবেন, মশায়!”

ভদ্রলোক সহাস্যে বস্ত্রাভ্যস্তর হইতে একখণ্ড কাগজ

বাহির করিয়া বলিলেন, “অনর্থক গণ্ডগোল করবেন না, মশায়; তাহ'লে আমরা আপনাকে পুলিশ দিয়ে ধরে নিয়ে যেতে বাধ্য হবো।”

শ্যামলবিকাশের গর্জন শুদ্ধ হইল। উদ্ধা স্বামীর মুখ চাহিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, “কি, তুমি ভণ্ড, প্রতারণক?”

শ্যামলবিকাশ উদ্ধাকে প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়া বলিল, “চুপ্ করো, উদ্ধা। যে কাজ তোমার নয়, তাতে কথা বলো না।”

উদ্ধা বেতসপত্রের মত কাঁপিতে লাগিল।

বিষদমুহূর্তের মধ্যে শান্তভাবে শ্যামলবিকাশ ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিল, “তাহ'লে কি করতে চান আপনি?”

—হয় অপকৃত পাঁচ লাখ টাকা ফেরৎ দিন, নতুবা আমাদের সঙ্গে ফাটকে আসুন। এখনও মিটিয়ে ফেলা যায়।

“দেখুন, প্রতারণা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, সে-টাকা আমি ঋণ-স্বরূপ নিয়েছিলাম।” বলিয়া প্রত্যুৎপন্নমতি শ্যামলবিকাশ একপার্শ্বে গিয়া একখানা দলিল লিখিয়া আনিয়া তাঁহার হাতে দিল।

ভদ্রলোক সেটা পড়িয়া দেখিলেন। সমাগত অন্য দু-চার জন ভদ্রলোককে ব্যাপারটা বুঝাইয়া সাক্ষ্য-স্বরূপ তাঁহাদের স্বাক্ষর লইয়া দলিল পাঠ করিয়া শুনাইলেন।

“আমি শ্রীশ্যামলবিকাশ চৌধুরী, পিতা শ্রীনিমাইদাস চৌধুরী, পৈতৃক নিবাস মনোহরপুর, মৎ কর্তৃক কোম্পানীর ক্যাশ্ হইতে গৃহীত পাঁচ লাখ টাকা, সুদসমেত প্রতিশোধ দেওয়া-স্বরূপ আমার বড় তরফ মাধবগড়ের সমস্ত সম্পত্তি উল্লিখিত—কোম্পানীর নিকট বিক্রয় করিলাম। অতঃপর উক্ত মাধবগড়ের সম্পত্তির উপর ভবিষ্যতে আমার আর কোন দাবি-দাওয়া রহিল না—”

“দাবি-দাওয়া ছেড়ে মাধবগড় কাকে বিক্রী করছো, দাদা, তা তো তুমি বিক্রী করতে পার না?” বলিয়া তন্মুহূর্তে সুশীলা উদ্ধা ও শ্যামলবিকাশের নিকট আগাইয়া আসিল।

সম্মুখে মাথার উপর উদাত্তকণা বিধর সর্প দেখিল লোকে যেমন বিবর্ণ হইয়া যায়, শ্যামলবিকাশ তেমনি বিবর্ণ হইয়া গেল।

উদ্ধা এত ক্ষণ স্বপ্নাভিভূতের মত চুপ করিয়া ছিল। কিন্তু হঠাৎ, কি জানি কেন, জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল—“কেন মাধবগড় বিক্রী করতে পারেন না?”

“কারণ সম্পত্তি দাদার নয়, অচলেশ বাবুর—এই দেখুন তার প্রমাণ।” সুশীলা ঝটিতি কতকগুলি কাগজপত্র বাহির করিয়া ফেলিল।

উদ্ধার মাথা ঘুরিতে লাগিল—চোখের সামনে পৃথিবী সরিয়া যাইতে লাগিল—“মা, গো” বলিয়া উদ্ধার মুচ্ছিত হইয়া পড়িল।

চারি দিকে যেন কি হইয়া গেল—কেহ জল, কেহ পাখা আনিতে ছুটিল। সুশীলা চকিতে বসিয়া পড়িয়া উদ্ধার মাথা কোলে তুলিয়া লইল।

হতভয়ের মত শ্যামলবিকাশ দাঁড়াইয়া আছে, মুখে তার কথা নাই—সব অস্ত্র তার শূন্য। এক-একবার নতদৃষ্টিতে অচলেশের পানে চাহিতেছে।

কিছু ক্ষণ পরে কোম্পানীর সেই ভদ্রলোক প্রথম কথা কহিলেন; শ্যামলবিকাশকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাই’লে এখন কি করবেন, বলুন?”

এত ক্ষণে সুশীলা মাথা তুলিয়া প্রশ্ন করিল, “ব্যাপারটা কি, আমায় বল ত দাদা?”

শ্যামলবিকাশ বিব্রত হইয়া পড়িল; ভদ্রলোক তাহার হইয়া জবাব দিলেন, “ইনি গোপনে কোম্পানীর পাঁচ লাখ টাকা নিয়েছিলেন; সেটা না দিয়েই আজ বিলাত যাবার বন্দোবস্ত করেছিলেন।”

“আজ বিলাত যাবেন, তা তো আমিও শুনেছি। সেইজন্যই তো এত তাড়াতাড়িতে এখানে চলে এসেছি। কিন্তু টাকা নিয়েছিলেন, তা তো জানি না?” বলিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, “কত টাকা বললেন?”

—পাঁচ লাখ।

সুশীলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “তাই ত, এখন উপায়?”

মজ্জমান ব্যক্তি তৃণখণ্ড সম্মুখে দেখিলে যেমন শেষ আশায় তাহার দিকে ধাবিত হয়, হতদর্প শ্যামলবিকাশও যেন তেমনি অসহায়ের শেষ দৃষ্টিতে অচলেশের করুণা-ভিক্ষা চাহিতে লাগিল।

সুশীলা অঞ্চলপ্রান্তে চকু মুছিয়া শ্যামলবিকাশকে বলিল, “আর পরের ধন অপহরণ ক’রো না, দাদা—অচলেশ বাবুর দিকে চেয়ো না। আজ, তোমার পাপে—আর, বলতে লজ্জায় ম’রে যেতে ইচ্ছা করে দাদা, আমাদের পিতার পাপে আমাদের এই শাস্তি। আর পাপের বাধা বাড়িও না দাদা? আমার সমস্ত অলঙ্কার নাও, আমাদের ধা-কিছু আছে, সব বিক্রী ক’রে দিয়ে ঋণ শোধ ক’রে দাও। তাতেও যদি না-হয়, তো যা বাকী থাকবে, তাই অল্প নিজেরা খেটে-খুটে সব পরিশোধ কর। এখন বিলাত যাবার আশা ছেড়ে দাও।”

বাধা দিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, “বিলাত যাওয়া তো এখন হতেই পারে না, যত দিন না এ-সব ব্যাপার মিটে য়, তত দিন তো উনি অন্ততঃ নজরবন্দী।”

এত ক্ষণ অচলেশ স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া ছিল। এইবার

সে সমস্ত কিনিবটা উপলব্ধি করিল। তাহার প্রাণে ভীষণ ঝটিকা বহিতেছে—একবার সে সুশীলার অনুকম্পাতরায় মুখের দিকে চাহিল, একবার মুচ্ছিত উদ্ধার মুদিত নেত্রের পানে দৃষ্টিপাত করিল। তার পর নীরবে একে কোণে সরিয়া গিয়া অপরের অলক্ষ্যে একখানা কাগজে খস্ খস্ করিয়া কয় লাইন লিখিয়া আনিয়া ভদ্রলোকের হাতে দিল।

তনুহুর্ভে উদ্ধার নয়ন মেলিল। একটা অক্ষুট কাতরোক্তি করিয়া বলিল, “হা ভগবান, একি করলে?”

ভদ্রলোক অচলেশ-প্রদত্ত কাগজখানা খুলিয়া পড়িলেন—

“আমি, শ্রীঅচলেশ রায়, পিতা অবিলাশ রায়, নিবাস মাধবগঞ্জ, স্বৈচ্ছায়, সজ্ঞানে আমার প্রাপ্য সমস্ত সম্পত্তি আমার পরম স্নেহের পাত্রী শ্রীমতী বিছায়েখা (ওরফে উদ্ধার) দেবার স্বামী শ্রীযুক্ত শ্যামলবিকাশ চৌধুরী মহাশয়কে দান করিলাম। উক্ত সম্পত্তিতে আমার, বা ভবিষ্যতে আমার কোন উত্তরাধিকারার, কোন দাবি রহিল না।

(স্বাক্ষর) শ্রীঅচলেশ রায়।”

বাধা দিয়া সুশীলা বলিয়া উঠিল, “একি করলেন, অচলেশ বাবু, দাদার ঋণ দাদাকেই শোধ করতে দিন। নইলে যে উনি ধর্ম্মে পতিত হবেন?”

প্রশান্ত হাশ্বে অচলেশ উত্তর দিল, “উনি উদ্ধার স্বামী ব’লে ঠুঁকে নিতে হবে—তাতে ঠুঁর অধম্য হবে না। আমি তো ঠুঁকে দিই নি—আমি দিয়েছি উদ্ধাকে—তা’র জীবন-যাত্রার পথ হুগম করত।”

অচলেশকে কি বলিতে গিয়া উদ্ধার উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু গভীর উত্তেজনার অবসাদে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল।

“তা কি হয়, অচলেশ বাবু, আমাদের জন্তে আপনি চিরজীবন ভিখারী হ’য়ে থাকবেন, এ আমরা কোন্ প্রাণে সহিবো?” বলিয়া সুশীলা ত্রস্তে উদ্ধার চোখ-মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিল।

সম্মিলিত জনতা তাগের গভীরতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া যখন চারি দিকে অচলেশের সন্মানে দৃষ্টিপাত করিল, তখন আর অচলেশকে দেখিতে পাওয়া গেল না।

দরদর ধারে চক্ষের দু-কূল ছাপিয়া অশ্রুশি উদ্ধার গণ্ড বহিয়া পড়িল—চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া গেল।—ক্লকর্ভে উদ্ধার বলিয়া উঠিল, “চলে গেলে?—আমায় একবার ক্ষমা চাইবারও সময় দিলে না, দেবতা?”

গভীর অনুকম্পাতরে উদ্ধার মস্তকের কেশ সরাইয়া দিতে দিতে বেদনাঙ্গুরে সুশীলা বলিল, “হায়, মন্দভাগিনি, এত কাছে থেকেও এত দিন মানুষ চিন্লে না!” একবিদু অশ্রুজল সুশীলার নয়নকোণ বহিয়া ঝরিয়া পড়িল।

কিন্তু অচলেশ তখন কোথায়?—সে তখন সমস্ত সুখ, হুঃখ, সহানুভূতির বাহিরে।

কে বলিবে, আজ তা’র জীবনযুদ্ধে জয়, না পরাজয়?

শেষের কবিতার লাবণ্য

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম-এ

ভুলোক ও ভাবলোক। আমরা একই কালে দুই লোকে বাস করি। প্রাত্যহিক পৃথিবী আমাদের বাঁচাইয়া রাখে, ক্ষুধা মিটায়, পুষ্ট করে, সুস্থ করে। ভাবলোকে আমরা বিহার করি, বিশ্রাম করি, নিজেদের বিস্তার করি, সামান্য হইতে নিস্তার পাই। ভুলোকে মাটি, ভাবলোকে আকাশ— সে আমাদের নিত্য-ঈপ্সিত দ্যালোক, আমাদের স্বর্গ। মাটি দেয় রস, আকাশ দেয় আলো। দেহ ও মন লইয়া মানুষ। মনের আকাশে মুক্তি, দেহের মুক্তিকায় বন্ধন। দেহের রাজ্যে সুখ, মনের রাজ্যে আনন্দ।

আনন্দ হইতে প্রাণের উৎপত্তি, আনন্দ হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি। জীব আনন্দে জাত, জগৎ আনন্দে স্থিত। যে জানিয়াছে সে অমৃতের সন্ধান পাইয়াছে, যে জানিয়াছে সে অমর হইয়াছে।

সংসারী মানুষ সুখী। তাই দুঃখকে সে ভয় করে, বেদনায় ব্যথিত হয়। যে সুখী সে-ই দুঃখী। আনন্দ যে পাইয়াছে সে দুঃখকে অতিক্রম করিয়াছে। কবি আনন্দের সন্ধানী, ঋষি আনন্দের অভিলাষী।—

উপরের অংশটুকু তত্ত্বকথার মত শুনাইলেও সত্য কথা। দেশ-বিদেশের কবি ও সাহিত্যিকবৃন্দ নানা-রূপে নানা-ভাবে নানা-ভাষায় এমনি-ধারা কথা ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন। ‘শেষের কবিতা’য় কথাসুলির প্রয়োগ কিরূপ?

শেষের কবিতা একাধারে কাব্য ও উপন্যাস। সকল রসসাহিত্যই কাব্যগন্ধি। কাব্য মাত্রই আবেগপ্রধান। অনুভূতিই কাব্যের প্রাণ। নামেও বটে, প্রাণেও বটে, শেষের কবিতায় অনন্তপূর্ণ রূপে ও রসে কাব্য উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। জীবনের কাব্য, যৌবনের কাব্য, প্রেমের কাব্য, মিলন ও বিরহের কাব্য।

চিরন্তন পুরুষ ও চিরন্তন নারী অনন্তকাল পরস্পরকে আহ্বান করিতেছে। কে কাহাকে কেমন করিয়া পাইতে চায়, তা তাহারা জানে না। দেহে না মনে, মুক্তিতে না বন্ধনে, প্রেমে না বিবাহে? এই দুই পাওয়া যেখানে একজনের মধ্যে আসিয়া মিলিয়াছে, সেইখানে জীবনের পরিপূর্ণতা, মানবের চরিতার্থতা।

সকল নারীর অন্তরে রহিয়াছে এক রাধা, সকল পুরুষের মধ্যে বিরাজ করিতেছে এক কৃষ্ণ। এক দিন জীবনের বাঁশী

বাজিয়া ওঠে। অভিসারিকা ছুটিয়া আসে। তার পর বাঁশী সাধিয়া সাধিয়া থামিয়া যায়, সংসারের কোলাহলে সেই অলোকের সুর চাপা পড়ে। থাকে তৃপ্তিহীন বাসনা এবং শেষহীন বিরহ।

Infinite passion,
And the pain of finite hearts that yearn.

অসীম হৃদয়াবেগ, অনন্ত বেদনা, এবং আকুল আকাঙ্ক্ষাময় সীমাহত হৃদয়ের অসহ অতৃপ্তি।

অমিত লাবণ্যকে ভালবাসিয়াছিল এবং লাবণ্য অমিতকে। মনের মধ্যে তাহারা পরস্পরকে লাভ করিল, সংসারে নয়।

এই পাওয়া ও না-পাওয়ার বেদনা ‘শেষের কবিতা’র শেষ কবিতায় কাব্যাকারে ব্যক্ত হইয়াছে।

কালের যাত্রার ধনি শুনিতে কি পাও
তারি রথ নিত্যই উধাও
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয়-স্পন্দন,
চক্রে পিষ্টে আঁধারের বন্ধ কাটা তারায় ক্রন্দন
ওগো বন্ধু,
সেই ধাবমান কাল
জড়ায়ে ধরিল মোরে ফেলি তার জাল,—
তুল নিল হৃৎসরধে
দুঃসাহসী জরণের পথ
তোমা হ’তে বহু দূরে।

* * *

কিরিবার পথ নাহি;
দূর হতে যদি দেখো চাহি’
পারিবে না চিনিতে আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

* * *

তবু সে তো স্বপ্ন নয়,
সব চেয়ে সত্য মোর, সেই মুহূর্ত্তায়,
সে আমার প্রেম।
তারে আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্তন অর্থা তোমার উদ্দেশে।
পরিবর্তনের শ্রোতে আমি বাই ভেসে

কালের যাত্রায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

* * *

যে আমারে দেখিবারে পার
অসাম কুমায়
ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি,
এবার পুজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি ।

* * * * *
হেথা মোর তিলে তিলে দান,
করণ মুহূর্তগুলি গণ্ডুঘ ভরিয়া করে পান
হৃদয়-অঞ্জলি হ'তে মম ।
ওগো তুমি নিরুগম,
হে ঐশ্বৰ্য্যবান,
তোমায়ে যা দিয়েছিগু সে তোমারি দান ;
গ্রহণ করেছে! যত ধৰ্ম্মী তত করেছে আমায় ।
হে বন্ধু, বিদায় ।

এ-কবিতা মরালীর অস্তিম বেদন-গীতি, লাভণ্যর কাব্যজীবনের সমাপ্তি-সঙ্গীত, রাজহংসীর শেষবিদায়ের গান ।

জীবনশৃঙ্খলার আদিতে সরলতা, শেষতম বিকাশ মানুষে জটিলতা । এম-এ, পি-আর-এস শোভনলাল বিয়ের বাজারের মহার্ঘ মাল । ব্যবহারিক দিক দিয়া এমন পতি লাভ করায় লাভণ্যর ক্ষতি ছিল না, বরং লাভ ছিল । গোড়ার দিকে, মিথ্যা আত্ম-সম্মানের বশীভূত না হইয়া সে যদি সন্তুষ্ট হইয়া পড়িত, তাহা হইলে সাধের সংসারে সোনা ফলাইয়া -ছেলেপুলের মা হইয়া সে নিশ্চিত ইহলোকে সুখ এবং পরকালে স্বর্গ লাভ করিত । কালের বোনা জালের মধ্যে পড়িয়া সবই জটিল হইয়া পড়িল । লাভণ্যর হৃদয়ের রুদ্ধ হ্রদয়ে কাব্য আসিয়া আঘাত করিল । এক মুহূর্তে সমস্তই উলট-পালট হইয়া গেল । জীবন অপূর্ণ বন্ধারে বাজিয়া উঠিল ।

শোভনলাল শাস্ত, কোমলপ্রকৃতি, আতিশয়বজ্জিত, প্রকাশবিমুখ, ইতিহাসচর্চারত, গল্প ও গবেষণা-প্রিয়, ধার-করা কবিতায় আহত হৃদয়ের বেদনা, নিবেদন করিত না, গোপন রাখিত । লাভণ্যর প্রতি প্রকাশহীন সুগোপন ভালবাসায় ব্যথাতুর জীবনে সে কাব্য-স্বর্গের আভাস পাইয়াছিল । জগতে শোভনলালদের আত্মসমাহিত নীরব কণ্ঠের সাধনা সার্থক হয় । অমিত-রা তাদের কাব্য, চাকল্য, প্রতিভা, মুখরতা লইয়া সংসারের প্রস্তর-প্রাচীরে মাথা খুঁড়িয়া মরে ।

অমিতের সঙ্গে হইল লাভণ্যর প্রেম, শোভনলালের সঙ্গে বিবাহ । এ কি মিলনান্ত জীবন-নাট্য, না এ ট্রাজেডি ?

অমিত-সম্পর্কে দেখিতে পাই লাভণ্যর ভালবাসার আত্ম-প্রকাশ, শোভনলাল-সম্পর্কে প্রেমের আত্মত্যাগ । লাভণ্য অমিতকে বলিতেছে,

তোমায়ে যা দিয়েছিগু তার
পেয়েছ নিঃশেষ অধিকার ।
হেথা মোর তিলে তিলে দান...

প্রেমের প্রকাশ প্রতিভার মত । মুহূর্তে মুহূর্তে নূতনতর অভিব্যক্তি, অতুলনীয় বিকাশ, নব নব উন্মেষ । আর এখানে তিলে তিলে দান, ধীরে ধীরে ক্ষয়, দিনে দিনে তাগ ।

অমিতের কথা,

'পূজামূর্তি ধরি প্রেম দেখা দিল হৃৎখের আলোতে ।'
এখানে সংসার সরিয় গিয়াছে, রহিয়াছে হৃদুর স্বর্গ ।
শেলীর ভাষায়

The devotion to something afar
From the sphere of our sorrow.

আমরা শুধুই মাটির মানুষ নই, আমরা ভাবলোক-বিহারী । এক দিকে আমাদের সংসারের মাধ্যাকর্ষণ, আর এক দিকে মন আকাশের মধ্যে ছাড়া পাইতেছে ।

প্রেম কি ?

প্রেম এক উপলব্ধি, একটি গভীর অনুভূতি ।

সংসারে বিবাহ শোভন । প্রেম পাগলামি, আতিশয়, অমিতাচার ।

সম্ভবতঃ নিজের গভীর অনুভূতির ভিতর দিয়া কার্লাইল বলিতেছেন,

Love is not altogether a Delirium. I call it rather a discerning of the Infinite in the Finite, of the Idea made Real.

সীমাবদ্ধ মানুষ যেখানে অন্তরের অসীম আনন্দে, মনের অসীম বেদনায় জাগিয়া ওঠে, মানসমূর্তি রূপ ধারণ করিয়া আমাদের জগতে অবতীর্ণ হয়, আমরা তখন প্রেমের সাক্ষাৎলাভ করি ।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ একটি প্রসিদ্ধ কবিতায় বলিয়া গিয়াছেন, শৈশবে স্বর্গের সঙ্গে আমাদের সংস্রব থাকে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা তার আভাস পর্যন্ত হারাইয়া ফেলি । কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয় । যৌবনে একবার আমরা স্বর্গকে নিকটে পাই, no-where does this Heaven on Earth so immediately reveal itself as in the young

maiden। সংসারের কূটযুক্তিজালে মুগ্ধ হইয়া, প্রলোভনে লুক হইয়া আমরা জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ যখন করি, স্বর্গ তখন সরিয়া যায়, স্বর্গ হইতে শেষ বিদায়ের দিনের সকল থাকে শেষের কবিতা।

পরম ক্ষণ জীবনে একবার শুধু আসে, পুষ্পবিকাশের তিথি, রূপে ও রসে, মধু ও মাধুরীতে পরিপূর্ণ, আসে— একবার শুধু, এক জনের জন্য, once and only once and for one only.

অমিতের পক্ষে তাহা আসিয়াছিল, লাবণ্যর পক্ষে তাহা আসিয়াছিল, কেতকীর পক্ষেও, শোভনলালের পক্ষেও।

শোভনলালের কাছে লাবণ্য ছিল আকাশের চাঁদ। সে দেখিয়াছিল লাবণ্যর এক দিক, আকাশের চাঁদের সেই দিক যে-দিক সকলেই দেখে, সকলেই দেখিয়াছে। ভালবাসিয়াছিল বলিয়া অপর দিকের জ্বলন্ত আভাস সে হয়ত পাইয়াছিল। অমিত দেখিয়াছিল লাবণ্যচন্দ্রমার অপর দিক, যে-ধারে থাকে স্বপ্নের অগোচর আলো-ছায়া, lights and darks undreamed of.

God be thanked, the meanest of His creatures
Boasts two soul-sides, one to face the world with,
One to show a woman when he loves her !
[This I say of me, but think of you, love !]

নিজের বিরহ-বাসনা-বেদনা দিয়া, আত্মপরিচয়ের ভিতর দিয়া, লাবণ্য শোভনলালকে বৃত্তিতে শিখিল। এ উপলব্ধি বুদ্ধিগত, সাংসারিক-জীবন-গত,—হৃদয়গত নয়। এখানে করুণা আছে, সহানুভূতি আছে, স্নেহ আছে, মমতা আছে, সাংসারিক শাস্তি আছে, ব্যবহারিক বন্ধন আছে— ভালবাসা নাই, সেই ভালবাসা বা সূর্যের মত এক, অনন্ত, অধিতীয়, বা সূর্যের মত বৃহৎ, প্রচণ্ড, সুদূর, সূর্যের মত সুন্দর, সূর্যের মত বহিমান, দীপ্তিমান, উত্তপ্ত, বা জলে আবার জ্বালায়, বা নিহত করে এবং সৃষ্টি করে।

লাবণ্য অমিতকে ছাড়িয়া শোভনলালকে বিবাহ করিল কেন? একি প্রেমের নিকট আত্মদান, ভাগ্যের উপর অভিমান, অমিতের একনিষ্ঠায় সন্দেহ, না মনের অজ্ঞাতে কেতকীর প্রতি দ্বেষ, না আর কিছু?

লাবণ্যর মনে ছিল একটি বিধা। সে এই বিধাকে কিছুতেই কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না। এমন কি,

বাহিরের বাধা কাটাইয়া অমিতের সহিত লাবণ্যর ঘনীভূত প্রেম সার্থকতার পথে যখন অগ্রসর হইল, সেই সময় লাবণ্য বলিয়া বসিল, 'তুমি তো সংসার ফাঁদবার মাহুষ নও, তুমি কচির তৃষ্ণা মেটাবার জন্তে ফেরো। ১০০-বিয়েটাকে তুমি মনে মনে জানো, যাকে তুমি সর্বদাই বলো ভাল্গার।'

লাবণ্য ও অমিতের চরিত্রে একটি মৌলিক প্রভেদ আছে। লাবণ্যর মন বুদ্ধিপ্রদীপ্ত, গৃহকেন্দ্রিক, সেবাপরায়ণ, শাস্ত, আর 'অমিতের ছল'ভ যুবকত্ব নির্জলা বোবনের জোরেই একেবারে বেহিসেবী উড়নচণ্ডী, বান ডেকে ছুটে চলেচে বাইরের দিকে।' দু-জনের মনের এই মৌলিক প্রভেদটুকু লাবণ্যর অজানা ছিল না।

'লাবণ্যর চোখের পাতা ভিজে এলো। তবু একথা মনে না করে থাকতে পারলে না যে অমিতের মনের গড়নটা সাহিত্যিক, প্রত্যেক অভিজ্ঞতায় ওর মুখে কথার উচ্ছ্বাস তোলে, সেইটে ওর জীবনের ফসল, তাতেই ও পায় আনন্দ।'

লাবণ্য বলে, 'জীবনের উত্তাপে কেবল কথার প্রদীপ জ্বালাতে আমার মন যায় না। জগতে যারা উৎসব-সভা সাজাবার হুকুম পেয়েচে কথা তাদের পক্ষেই ভালো। আমার জীবনের তাপ জীবনের কাজের জন্তেই।'

অমিতও মনের কাছে এ-কথা অস্বীকার করিতে পারে না। 'অস্তরাত্মার গভীর উপলব্ধি বাইরে প্রকাশ করতেই হয়, কেউ-বা করে জীবনে; কেউ-বা করে রচনায়,—জীবনকে ছুঁতে ছুঁতে অথচ তার থেকে সরতে সরতে, নদী যেমন কেবলি তীর থেকে সরতে সরতে চলে, তেমনি।'

অমিতকে পাবার ও না-পাবার ইচ্ছা, তাহাকে আপন করিবার ও মুক্তি দিবার ইচ্ছা একই কালে লাবণ্যর মনকে আন্দোলিত করিত। তাই সে ভাবে, 'পরম ক্ষণে শুভদৃষ্টি হলো, এর পর আর কি বাসবধর আছে?' তাই শিলঙে সমস্ত ঠিক করিয়া কলিকাতা যাইবার আয়োজন-কালে অমিত যখন বলিল, 'তোমার শেষ কথাটি একটি কবিতায় বলো', লাবণ্য একটুখানি আবৃত্তি করিল,

'তোমাতে দিই নি হৃদয়, মুক্তির নৈবেদ্য গেমু রাখি
রজনায় গুহ্র অবসানে। কিছু আর নাই থাকি,
নাইকো প্রার্থনা, নাই প্রতি মুহুর্তের নৈবেদ্য রাখি,
নাই অভিমান, নাই দান কান্না, নাই গর্ভ হাসি,

নাই পিছু ফিরে দেখা। শুধু সে মুক্তির ডালিপানি,
ভরিয়া দিলান আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি।’

অমিত বলিল, ‘আজকের দিনে তোমার মুখে বলবার
কথা এ নয়, কিছুতেই নয়।’

প্রেমের পরম মুহুর্তেও তাগের প্রেরণা লাভণ্যর মনকে
উদ্বেলিত করে।

‘সে-দিন তুমি বলেছিলে, জীবনে মানুষের প্রথম
সাধনা দারিদ্র্যের, দ্বিতীয় সাধনা ঐশ্বর্যের। তার পরে
শেষ সাধনার কথা বলে নি, সেটা হচ্ছে তাগের।’

কেটি মিটারের আবির্ভাবে তার মনের সব দ্বন্দ্ব মিটিয়া
গেল।

কেটি যখন বলিল, ‘অহঙ্কার ভাঙলে, এবারকার মত
আমার রেস দুরোলো, আগারি হার। মনে হচ্ছে অমিটকে
আর রাজি করতে পারব না। তা এমন অদ্ভুত করেই যদি
হারাবে সেদিন এত আদরে আঙুটি দিয়েছিলে কেন?’...
যখন তার ‘এনামেল-করা মুখের উপর দিয়ে দরদর ক’রে
চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো’, তখন লাভণ্যর স্বিধাহীন
চিত্ত তাগের সাধনাই গ্রহণ করিল।

হয়ত প্রেমের অন্তর্ভেদী আলোয় অমিত-চরিত্রের স্বরূপটি
লাভণ্যর চোখে পূর্ণরূপে ধরা পড়িয়াছিল, তাই সে বলিয়াছিল,
‘তোমার সঙ্গে আমার যে অন্তরের সম্বন্ধ তা নিয়ে তোমার
লেশমাত্র দায় নেই।’

এই চারিত্রিক প্রেরণাতেই যতিশঙ্করকে অমিত বলিতে
পারিয়াছিল,

‘যে-ভালবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে অন্তরের
মধ্যে সে দেয় সঙ্গ : যে-ভালবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের
সব-কিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে সংসারে সে দেয় আসঙ্গ। দুটোই
আমি চাই।’

‘আমার স্বর্গেও রয়ে গেল রোমান্স, আমার মর্ত্যেও
ঘটাবো রোমান্স।...আমি রোম্যান্সের পরমহংস। ভাল-
বাসার সত্যকে আমি একই শক্তিতে জলে স্থলে উপলব্ধি
করবো, আবার আকাশেও।’

অমিত আর লাভণ্যর জীবনে কবিতা শেষ হইল, আরম্ভ
হইল গদ্য—প্রাত্যহিক, প্রয়োজনীয়, অপরিহার্য। ফুলের
দিন শেষ হইল, সৌন্দর্যের বর্ণের বৈচিত্র্যের বিকাশের দিন,
মুক্ত অবকাশের দিন, যে-অবকাশ জীবনে শুধু একবার
আসে, যে-অবসর স্বপ্নপরিসর, তীব্র আনন্দ এবং গভীর
বেদনার বিজড়িত, মায়া-নিবিড়, স্বপ্নময়। তার পর আসে
জীবনের পরিণতি, ফলের দিন, সাংসারিক সার্থকতার দিন।

তাদের চন্দ্রালোকগীতিকা শেষ হইয়া গেল, তাদের
ফুলফোটার দিন, তাদের কোজাগর জাগরণ, তাদের
moon-light sonata। জীবনে আরম্ভ হইল তাদের
ব্যবহারিক দিবস, তাদের চিরপরিচিত প্রত্যহ। চন্দ্রালোকে,
স্বর্গালোকে, অসীম হুনীল আনন্দপ্রাপ্ত আকাশের তলে,
প্রকৃতির বাধাহীন বৃক্ষে, স্বপ্নের মধ্যে, কবিতার মধ্যে—
তাহারা একবার শুধু জাগিয়াছিল, যেমন জীবনে সকলেই
একবার জাগে, তার পর দিবসের রূঢ় আলোকে, প্রাত্যহিক
আচরণ-অভ্যাসের নিশ্চল আঘাতে, মর্ত্যের কর্তব্য-কোলাহলে
কাব্য-লোকে দৈবজাগ্রত দুটি নরনারী শেষের কবিতা আবৃত্তি
করিতে করিতে চিরদিবসের তরে ঘুমাইয়া পড়িল। অবকাশ-
হীন, সাড়হীন, য্গাস্ত নিদ্রা। শুধু সে অন্তহীন নিদ্রায়
মাঝে মাঝে সহসা হয়ত জাগিয়া ওঠে একটি বেদনাময় স্বপ্ন,
একটি সুখময় স্মৃতি।

বাহারা তাহাকে ভালবাসে, তাহারা জানে লাভণ্যদেবীর
জীবনে সে কি নিশ্চল ট্রাজেডি।

ময়নামতীর চর—বন্দে আলী মিয়া। ডি-এম-লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

একই গ্রামোফোন রেকর্ড দুই মেশিনে দুই জন বাজাইলে শ্রীর যে তারতম্য হয় জসীম উদ্দীনের কাব্য ও বন্দে আলী মিয়ায় দুইটি কাব্যের তফাৎ প্রায় ততখানিই। জসীম উদ্দীনের মেশিনে মাঝে মাঝে অপরূপ শুনাইলেও স্থানে স্থানে রেকর্ডটি কর্ণপীড়া জাগায়, বন্দে আলীর মেশিনের আওয়াজ ততটা মিঠা না হইলেও সর্বত্র সুস্পষ্ট করিয়া তোলে। রস-উপভোগের কোথাও বাধা হয় না।

বাংলা কাব্যসাহিত্য Narrative কাব্যের অভাব নাই—বোঝার উপর শাকের আঁচি তবুও গ্রাহ্য।

‘ময়নামতীর চর’ ‘ময়নামতীর বটগাছ’ প্রভৃতি কবিতার ছন্দ-গোলাযোগ আছে।

শ্রী সজনীকান্ত দাস

দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্ক—ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহার সহিত শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাথোপকথন। হৃদয়কেশ সিরিজ নং ১৫ ; ১০৭, মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস হইতে শ্রীযুক্ত রঘুনাথ শীল, বি-এ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকার বার আনা। ১৯৩০ সাল। ১১১ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধাই।

বাংলা ভাষাতে অর্থনীতি সম্বন্ধে বই বেশী নেই। ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে বই ত আরও বিরল। “দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্ক” এই অভাব অনেকটা দূর করবে। মার্কিন, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, ইটালী, জার্মানী, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে নানা তথ্য এই বইখানিতে আছে। ভাষা সহজ এবং সাবলীল। “Big five banks”-এর তর্জমা “বাংলা ব্যাঙ্ক” বেশ সুন্দর লাগল। কঠিন বিষয় সহজ করে বোঝানোর ক্ষমতা গ্রন্থকারবুগলের বেশ আছে। নানা বিষয়ের অবতারণা না করে মূল তথ্যগুলি নিকাচন করে সেই বিষয়গুলি বুঝিয়ে বলাতেই বইখানি এমন সুপাঠ্য হয়েছে। কলেজে কিম্বা চিহ্নিত (Chemistry) পড়বার সময়ে একখানা জার্মান বইয়ের তর্জমা পড়েছিলাম। মাস্টারে এবং ছাত্রের গুরুত্বের সঙ্গে কাথোপকথনের ভিতর দিয়ে সমগ্র রসায়নশাস্ত্রের মূলতথ্য সেই গ্রন্থখানিতে আলোচিত হয়েছিল। মাস্টারই বেশী পণ্ডিত কিংবা ছাত্রই বেশী পণ্ডিত এই সম্বন্ধে বার-বার মনে হয়েছিল। আলোচ্য বইখানিতেও প্রসঙ্গক্রমে সব সময়ে মামুলী প্রশ্ন করেন নি। তাঁর জিজ্ঞাসার ফলেই উত্তরগুলি স্পষ্ট বর্ণনা মাত্র হয়নি এবং এইজন্মেই বইখানি চিন্তাকর্ষক হয়েছে, সন্দেহ নাই।

“দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্ক” এতই ভাল লেগেছে যে, নিছক সমালোচনার খাতিরে এর দোষের কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। আবার এটিও মনে হচ্ছে যে, এর পরবর্তী সংস্করণে এই ত্রুটিগুলি দূর হ’লে ভাল হয়।

প্রথম অধ্যায়ে “ভারতে ব্যাঙ্কের প্রসার” সম্বন্ধে আলোচনা করার সময়ে দেশী ব্যাঙ্কগুলির কথা মনে রাখা হয়নি। যৌথ কারবার না হ’লেও এবং নামে ব্যাঙ্ক না হ’লেও অনেক দেশী বাবসায়ী অস্ত্রের টাকা আমানত রাখেন, মুদ্রতি হুণী ডিস্কাউন্ট করেন, এক জায়গা থেকে অল্পত হুণীর সাহায্যে টাকা পাঠান ইত্যাদি। এদের ব্যাঙ্কার বলা উচিত বোধ হয়, যদিও এ-কথা মানতেই হবে যে শুধু নিজের নিজের টাকা কর্তৃত্বদান যে-সব বাবসায়ীরা করেন তাঁদের ব্যাঙ্কার বলা উচিত নয়।

আর একটা কথা এই যে, ১৯৩০ সালে প্রকাশিত বইতে

১৯২৫ সালের তথ্য দেওয়া হয়েছে। Banking Almanac, Statist এবং Economist-এর Banking Supplements বা যে-কোনও জায়গাতেই আরও আধুনিক তথ্য এবং Statistics পাওয়া যেতে পারত। এটি না করার দরুণ কিছু কিছু তুলণ্ড হয়েছে। সিকিউরিটি রেখে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে ১৯৩০ সালে যে নোট ছাপান যেত তার পরিমাণ ১ কোটি ৯৭ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড নয় (২৬৫ পৃষ্ঠা), ২৬ কোটি পাউণ্ড (Currency and Bank Notes Act, 1928.) এক প ছোটখাট তুলণ্ড অস্থায়্য দেশ সম্বন্ধেও দু-চারটি চোখে পড়ল। এগুলি পরবর্তী সংস্করণে তি রাখত হবে আশা করি এবং এই সব নানা দেশের ব্যাঙ্কগুলির পর্যালোচনার ফলে আমাদের দেশে ব্যাঙ্কিংয়ের কি কি দিকে উন্নতি করা যেতে পারে সে-সম্বন্ধে একটি অধ্যায় যেন দেওয়া হয় গ্রন্থকার-বুগলের কাছে এই প্রার্থনাটাও জানাচ্ছি।

শ্রী হরিশ্চন্দ্র সিংহ

চেউয়ের পর চেউ—শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। কাত্যায়নী বুক ষ্টল, ২০৩ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

বিংশ শতাব্দীর নবজাগৃত নারীর নবীনতম চেতনা—আত্মোপলক্ষি। এর জন্ম সে আজ বিজোহী, কেন-না, বুগ-বুগের শত আচারের শৃঙ্খল, মাণ্ডব হিসাব নারীর যে অসম সম্ভাব্যতা, সেটাকে উপলক্ষি করিতে দিতেছে না। কিন্তু শুধু মৃত বিধি-আচারই নয়, আত্মপ্রসারের উদ্যাদনায় নারী আজ প্রাণপূর্ণ প্রেমকেও অস্বীকার করিয়া উঠিতেছে। “ভালবাসাটা মনের একটা আবহাওয়া, কতো দিন গুমোট করে থেকে কোনোদিন বা বড় উঠে যেতে পারে।”

একটি বিবাহিত। আর একটি অনুচা আধুনিকার জীবন-মনের মাতপ্রতিঘাতের কথা দিয়া লেখক তাঁহার প্রতিপাদ্যটি ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। নিলিন্দ্র সন্ন্যাসীর স্ত্রী ললিতার বিজোহীতা বরাবরই সুসঙ্গত, এবং গরীয়ানও ; কিন্তু সুমনার ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি, যাহা তাহার অমন সহিষ্ণু প্রেমকেও নিমেষে ম্লান কমিয়া দিল—তাহাকেও কি গোরবের জামন দেওয়া চলে? যে-নারী ললিতার প্রথর আত্মপ্রতিঘাতের মধ্যে মহায়সা হইয়া উঠিতেছিল, সুমনার মধ্যে সেই যেন সঙ্কুচিত নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছে।

ভাবার দিক দিয়া বইখানি এক-এক জায়গায় রেশপাঠ্য হইয়া পড়িয়াছে। ত্রুণাগত নূতনত্বের উৎকট প্রয়োগের মধ্যে পাঠকের মন হাঁফাইয়া ওঠে। লেখক এক-একটা শব্দের মোহে পড়িয়া গেছেন যেন ;—‘নিরাভ’, ‘নির্ভাজ’, ‘নারেখ’, ‘নিরবয়ব’—সবই তিন-চার বার করিয়া পাওয়া গেল ; ‘প্রেতায়িত’ পাচ-ছয় বার পাইলে একটা বিভীষিকার মতই হইয়া পড়ে ; এর উপর যখন আবার ‘নিশ্চায় গলা’ কয়েক পাতা ওণটাইলেই আসিয়া হাজির হয়, তখন সত্যসত্যই প্রাণ কঠাগত হইয়া ওঠে। ছাপা, বাঁধাই, কাগজ—সবই অনিন্দ্য।

গোধূলি—শ্রী রমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। হৃদয় বুক ষ্টল, ২২-এ, হরি ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ছয় আনা।

ক্ষুদ্র একটি রূপক নাটিকা ; ২৩ পাতায় তিনটি অঙ্কে শেষ। দিনের শেষে আলো-আঁধারের ক্ষণিক মিলনে একটি পরম মুহূর্ত জাগিয়া ওঠে। আলোর অবশুভাবী মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে বলিয়াই এই মুহূর্তটুকু বিষাদে সন্দর ; সৌন্দর্য্যে বিষয়।

কাঁচা হাত হইলেও লেখক গোধূলির এই ভাবরূপটি অনেকটা

ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শেষ করিবার পরও বইয়ের সুরটি মনে খানিক কণ লাগিয়া থাকে। ছাপা, বাধাই মামুলী।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

রূপ-সায়র—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ, ১২ নং পয়নাথ লেন, কলিকাতা। ১৫২ পৃষ্ঠা। দাম দুই টাকা।

এই পুস্তক পাঁচটি গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি পূর্বে “পুষ্পপাত্রে” ছাপা হইয়াছিল। গল্পগুলি নিতান্তই মামুলী। ‘মহাকাব্য রচনা’ গল্পে গ্রন্থকার তাঁহার ভাবুকতা প্রকাশ করিয়াছেন। ‘প্রেমের অভিব্যক্তি’ নারিকাঁ অনর্থক মনোবিচার বুলি আওড়াইয়াছেন। স্থানে স্থানে গ্রন্থকারের সুরুচির অভাব লক্ষিত হয়।

গৃহস্থের-সাধনা—ডাক্তার শ্রীচণ্ডাচরণ পাল কর্তৃক সঙ্কলিত। ১২ নং বৃন্দাবন পাল লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীমৎ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২০৭। মূল্য বার আনা।

গৃহস্থের সংসারের অন্তর্গত সকলে যাহাতে ধর্মপাথ চলিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ভগবদ্গীতার কতকগুলি শ্লোককে ভিত্তি করিয়া গ্রন্থকার প্রাঞ্জল ভাষায় নিজ উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নারী স্বাধীনতা সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মত অনুধাবন-যোগ্য। পুস্তক স্তম্ভপাঠ্য হইয়াছে।

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

অভিমান—শ্রীআশালতা দেবী প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য দেড় টাকা।

ছোট গল্পের বই। বিভিন্ন গল্পের ভিতর দিয়া লেখিকা আধুনিক যুগের নারী-চিত্তের চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সে চেষ্টা তাঁহার নিফল হয় নাই। কিন্তু যে-বিষয় লইয়া সতন্ত্র প্রবন্ধ লেখা চলে, ছোট গল্পের স্বল্প পরিসরে তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া আনিতে গল্পের গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং অনাবশ্যক ইংরেজী শব্দ প্রয়োগও রচনার শক্তি বা সৌর্ভব বৃদ্ধি করে না। কোন কোন গল্পে এই ত্রুটি বিদ্যমান। সামান্ত ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁহার লেখা আমাদের ভাল লাগিয়াছে। তাঁহার সাবলীল ভাষার অপূর্ব বিস্তার-ভঙ্গা ও চিন্তাশক্তির প্রখরতা সত্যি উপভোগ্য। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত—কোথাও কষ্ট-কল্পনার লেশ-মাত্র মনকে পীড়া দেয় না। বইয়ের ছাপা ও বাধাই ভাল।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি—শ্রীপ্রিয়নাথ সেন। প্রকাশক—শ্রীপ্রমোদনাথ সেন, ৮, নথুর সেন গার্ডেন লেন, কলিকাতা। মূল্য ২।০ টাকা।

স্বর্গীয় প্রিয়নাথ সেন ১৩২৩ সালে পরলোকগমন করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা ৫৬ বৎসরের বড় ছিলেন এবং শুধু রবীন্দ্রনাথ নহেন, বিজ্ঞাননাথের সঙ্গেও তাঁহার সমধুর খনিষ্ঠতা ছিল। বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, বলবিজ্ঞান, রবীন্দ্র—সকলেরই সাহিত্যিক প্রচেষ্টার সহিত তাঁহার গভীর সহানুভূতি ছিল বলিয়া তিনি তাঁহাদের প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যে তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা ছিল, কবিতা সাহিত্যে ছিল অতিশয় অনুরক্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে ও তাঁহার অবাবহিত পরে সমাজে যে বৈষ্ণবের আদর্শ সম্মান পাইয়াছিল, প্রিয়নাথ সেন তাঁহার জলন্ত দৃষ্টান্ত ছিলেন। প্রিয়নাথের পত্র ও প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথকে সুস্থিতে সাহায্য করিবে, কবির প্রথম

জীবনের কাব্যসৃষ্টির উপযুক্ত ব্যাখ্যা তো এখনও হয় নাই; আর সেই সঙ্গে আমরা সমগ্র বাংলা দেশের কিশোর-মন সে-যুগে কি করিয়া ফুটিয়াছিল তাহাও আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

নূতন পথে—শ্রীকনকলতা ঘোষ। জ্ঞান পাবলিশিং হাউস, ৪৪, বাহুড় বাগান স্ট্রীট কলিকাতা। পৃঃ ১৬২। মূল্য দেড় টাকা।

আটটি গল্পের সমষ্টি। গল্প কোনটাই হয় নাই, পাত্র-পাত্রীর যুগে কতকগুলি দীর্ঘ আলোচনা বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। কিন্তু ভাবের সারলো ও সুস্বাদু গুণিতায় এই আলোচনাগুলি অতি মনোরম হইয়াছে। ছাপা বাধাই চলনসই।

ভাগ্যলক্ষ্মী—শ্রীশরৎ চন্দ্র ঘোষ। প্রকাশক—শ্রীকানাইলাল চট্টোপাধ্যায়, ৩৬।৪।৩, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা। পৃঃ ১৭০। মূল্য দেড় টাকা।

ইণ্ডিয়ান কিনেমা আর্টসের তোলা ‘ভাগ্যলক্ষ্মী’ ছবির উপস্থান-সংস্করণ। বায়স্কোপের বইয়ের একটি বিপদ,—প্রচুর খটনা সমাবেশ করিতে গিয়া অনেক সময় উহা অস্বাভাবিকত্বের কোঠায় গিয়া পৌঁছায়। আলোচ্য বইটিতে কোথাও সে দোষ বটে নাই। ভ্রাম্যও বেশ কর্ণকরে। গতানুগতিক উপস্থান-সমুদ্রের মধ্যে এই বইটি কিছু বৈচিত্র্যের সঞ্চার করিবে বলিয়া মনে হয়।

ঝিকিমিকি—শ্রীযতীন সাহা প্রণীত। শ্রীসমর দে কর্তৃক চিত্রিত। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃঃ ৮২। দাম দশ আনা।

শিশুদের উপযোগী পাঁচটি গল্প। লেখক ও চিত্রকর উভয়েরই সুনাম আছে, এই বইটিতে সে সুখ্যাতি কমিবে না। যেমন লেখক তেমনি ছবি—পাশাপাশি চলিয়াছে। ঝকঝকে বাধাই। শিশুরা এই বই পাঠিয়া সুখী হইবে।

রাজ সিংহাসনে—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত। প্রকাশক—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, ২০।৮।১, অপার সাকুলার রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৭০। মূল্য এক টাকা।

অদ্ভুত ভাষা! হঠাৎ মনে হয়, অমিত্রাকর চন্দকে গল্পে ঢাল হইয়াছে। কিন্তু তাহারও কোন রকম সঙ্গতি নাই। ক্রিয়া, বিশেষ্য, বিশেষণগুলিকে যথেষ্ট উন্টাপাণ্টা করিয়া সাধু-অসাধু উভয় রূপের নির্দিষ্ট সংযোগে বইটাই অপূর্ণ বস্তু হইয়াছে। তাঁর উপর পাতায় পাতায় বিজ্ঞা রকমের ছাপার ভুল। ভাষার ব্যুৎপত্তি করিয়া গল্প পর্যন্ত পৌঁছানো একেবারেই দুষ্কর।

প্রেম ও প্রতিমা—শ্রীরমেশচন্দ্র দাস। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম এক টাকা। পৃঃ ৪৪।

কবি রমেশচন্দ্রের কবিতা অনেক দিন হইতে নানা মাসিকে বাহির হইয়া থাকে। শব্দ-বিস্তারের নিপুণতায় ও রসমাধুর্যে তাঁহার অধিকাংশ কবিতা এমন মায়াময় হইয়া উঠে যে, বহুকালের ব্যবধানেও তাহার স্মৃতিতে থাকিয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছুকাল আগে ‘প্রবাসী’তে ছাপা ‘বিরহিণী’ কবিতার উল্লেখ করা যায়।

বইগানিতে মোট আঠারোটি কবিতা। এক ‘রাত ভিগার’ ছাড়া

বাক্যগুলিতে প্রেম ও প্রিয়তার কথা। কিন্তু বিষয়-বস্তু মোটামুটি এক ধরণের হইলেও কবিতাগুলি একেধারে নয়। উদার কবি-দৃষ্টি উহারই মধ্যে বিভিন্ন আলোকপাত করিয়াছে। সেই প্রিয়া কখনও নিস্তরু রহস্যচ্ছন্ন, আবার কখনও তাহাকে দেখা যায় নিতান্ত সরল। পল্লীবালিকার রূপে। কখনও আসন্ন মাতৃ-ধর গরিমায় সে দেবী-প্রতিমার মত প্রিন্সেস—কখনও সে নির্গম কঠোর দেবতার মত—প্রেমিকের স্তব-গুণন তার প্রতি নিয়ত উৎসারিত হইতেছে, তবু সে ফিরিয়া চাহে না; তারপর প্রিয়া ক্রমে অশরীরী ধ্যানমূর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'রাত ভিগারা' কবিতাটি অল্প ধরণের হইলেও বিশেষত্ব আছে—রাত্রির পূজাভূত রহস্য যেন একটি ভিগারীর কণ্ঠে মুখর হইয়া উঠিয়াছে! বইখানির বহিরাবরণও প্রশংসনীয়।

শ্রীমনোজ বসু

ভক্তবাণী—শ্রীশিশিরকুমার রায় প্রণীত। প্রবন্ধক পাবলিশিং হাউস, ৬১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ৩০। মূল্য ১/০।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটিতে Thomas à Kempis-এর বিখ্যাত ভক্তিগ্রন্থ Of the Imitation of Christ-এর কিছু কিছু অংশ অনুবাদ করিয়া সংগ্রহ করা হইয়াছে। অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে। ভক্ত-পাঠক ইহা পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন।

মন্দির—শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ। প্রকাশক শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় : মুনসফ ডাঙ্গা, পুরুলিয়া। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫৫।

সাধক ও ভক্তকবি কিরণচাঁদ দরবেশের 'মন্দির' গ্রন্থটি বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুপরিচিত। ইহার তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে। সূত্রবাং বোকা যাইতেছে, গ্রন্থখানি বাংলার পাঠক-সমাজে যথাযোগ্য সমাদর লাভ করিয়াছে।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

নূতন সমাজের ইঙ্গিত—শ্রীবারাজকুমার ঘোষ প্রণীত ও ৮ডি, মোহনলাল স্ট্রীট, কলিকাতা, বিজলী সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত। দাম চার আনা।

পুস্তিকাখানিতে লেখক মুক্তি চাহিয়াছেন, 'শুধু রাজনৈতিক মুক্তি নয়, ধর্ম ও সমাজের মুক্তি' আরও বিশেষ করিয়া বলিতে গেলে নারীর মুক্তি। 'হিন্দুর আজ ম'রে বাচবার দিন এসেছে, সব ধর্মস ক'রে সব কলেবর ধরবার দিন এসেছে... আজও সামাজিক কমুনিজম...নারাজ্রোহ ও ভ্রাতৃদ্রোহের বিকল্প অভিযান।' কিন্তু সামাজিক বিপ্লব ঘটিলেই কি রাজনৈতিক পূর্ণ অধিকার লাভ করা যাইবে? মুক্তি কথাটি সব জায়গায় খাটে বাটে, কিন্তু রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই শব্দটি নূতন তাৎপর্থা গ্রহণ করে। যে-দেশে রাষ্ট্র ও সমাজ এক হইয়া গিয়াছে, সেখানে একের পরিবর্তনে অণ্ডের পরিবর্তন সহজ এবং স্বাভাবিক। যেখানে রাষ্ট্র ও সমাজ বিভিন্ন, সেখানে উচ্চম স্বিধা-বিভক্ত হয়। নূতন সমাজের স্পষ্ট রূপ কি, আদর্শ কি?

যুগ-শত্রু—শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী সঙ্কলিত ও কুমিল্লা রামমাল্য ছাত্রাবাস হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

বইখানিতে বক্রিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী,

চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি বহু দেশনায়ক ও চিন্তানায়কের বাণীর সঙ্কলন আছে। কিছু বেদ-বাণী, কয়েকটি গীতার শ্লোক, বৃদ্ধদেবের বচন এবং বিদেশী মনীষাদের বাণীও সঙ্কলিত হইয়াছে। সঙ্কলিত বাণীর ভাব অনুসারে স্বদেশ, সাধনা, সমাজ, সেবা প্রভৃতি নামে বইয়ের দশ অধ্যায়ের নামকরণ করা হইয়াছে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

চিকিৎসা-সঙ্কট—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন কর্তৃক নাট্যকাব্য-রূপান্তরিত। প্রকাশক—এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য ১/০ আনা।

পরশুরামের চিকিৎসা-সঙ্কট গল্পটির সঙ্গে পরিচয় নাই, এমন পাঠক শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে অল্পই আছেন। চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন মহাশয় ছবি আঁকিয়া মূল গল্পটিতে লোকগুলির রূপ দিয়াছিলেন। তিনিই আবার ইহা নাট্যকাব্য রূপান্তরিত করিয়া লোকগুলির জীবন্ত রূপ দিয়াছেন; ফলে ইহা পরম উপভোগ্য বস্তু হইয়াছে। এজন্য তিনি রসজ্ঞ পাঠকমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র। এই অতি চমৎকার ক্ষুদ্র নাট্যকাটি, শুধু বাংলায় কেন, বাংলার বাহিরেও কোন-কোন রূবে একাধিক বার অভিনীত হইয়াছে। ইহার অভিনয় দর্শনিকালে এমন লোকেরও মুখে হাসি দেখা গিয়াছে—যিনি অত্যন্ত গম্ভীর, অর্থাৎ সংজে যিনি হাসেন না।

নাট্যকাটির তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে, সূত্রবাং ইহা যে যথেষ্ট সমাদৃত হইয়াছে, ইহাই তাহার প্রমাণ।

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

মাতৃ-ঋণ—শ্রীমতী দেবী। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০০১/১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ৩১৭, মূল্য দুই টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসখানি 'প্রবাস'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার গল্পাংশটি পাঠকের মনে এমন কোঁতুহল জাগায় যে পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না-করিয়া বই রাখিয়া দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। লেখিকার নিপুণ তুলিতে প্রতাপের দারিদ্র্যময় মেসের জীবন অতি সুন্দর ফুটিয়াছে, আর ফুটিয়াছে ভবানাপুরে প্রতাপের পিসিমার গৃহস্থালীর ছবি। সমস্ত বইখানিতে প্রতাপ ও পিসিমার বাড়ির ছবি সত্যই যেন জীবন্ত। সামান্য দু-পাঁচটা কথাবার্তার ভিতর দিয় পিসিমা একেবারে রক্ত-মাংসের জীব হইয়া আমাদের চোখের সান্দনে দেখা দেন; আর এ-জাতীয় পিসিমার কাছে পাঠকেরা যতটুকু আশা করে, তিনি তার বেশীও নন, কমও নন। যামিনীর চরিত্র মধুর ও সরল বাটে, কিন্তু বৈশিষ্ট্যহীন। মনে বিশেষ দাগ রাখিয়া যায় না। এদের সংসারের মধ্যে জ্ঞানদার ছবি ফুটিয়াছে ভাল। জ্ঞানদা ধর্ম-গর্ভিত ও মুখর, কিন্তু সত্যিকারের মা। সুরেশ্বর একেবারেই অস্পষ্ট।

বইখানিতে লেখিকার নিপুণ বর্ণনাভঙ্গী, ভাষার সজীবতা ও সংযম, ঘটনাবলীর স্বাভাবিকতা আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দ দান করিয়াছে। প্রচ্ছদপটখানি সুদৃশ্য।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

যুক্তি

শ্রীআশালতা দেবী

১৮

যামিনী সেখান হইতে ঝড়ের বেগে আপন ঘরে আসিয়া আবার চলিয়া গেল। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়া সে অধিক রাতে যখন শয়নকক্ষে আসিল তখন উৎসব-অস্ত্রে সকলে যে ষাহার বাড়ি গিয়াছে। তাহার নিজের ঘরেও আলো নাই; অন্ধকার। সেই অন্ধকারে জানালার গরাদে ধরিয়া নির্মলা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মনও আজ ভাল নাই। নিমন্ত্রিতা মহিলা ষাহারা আসিয়াছিলেন, বড়বৌ তাঁহাদের কি যেন জানাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা কেহ কেহ এ উহার কান-কান ফিস-ফাস করিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে নির্মলার এক-একখানা গহনা হাত দিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া কহিতেছিলেন, “এখানি কে দিয়েছেন ভাই? তোমার বাবা, না তোমার উনি?”

সে যে দরিত্রের কণ্ঠা, তাহার পিতা যে ধনী নহেন এ-সকল কথা নির্মলা আগে কোনদিন ভাবে নাই। সে এত দিন তাহার বাবার সঙ্গে বে-জগতে ছিল, বে-সকল বিষয়ের আলোচনা করিত, তাহার বিষয় দেশ-দেশান্তের বাণ্ড, যুগ-যুগান্তের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। মগুনশ শতাব্দীতে ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে হঠাৎ কেমন করিয়া জোয়ার আসিয়াছিল, রোমাণ্টিসিজ্‌মের অতি গদগদ আইডিয়ার তাপে ইউরোপীয় সাহিত্যের কোন্‌ কিনারে কতটুকু আবিল বাপ সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহাদের আলোচনার স্রোত সংসার ছাড়া সেই সকল খাতেই বহিত। সেই জনহীন সংসার-সীমানার প্রান্তে কেবল পিতা এবং কণ্ঠা প্রতিদিন পরস্পরকে সঙ্গ দিত। সেখানে আর কোন সঙ্গ ছিল না। এমনি করিয়া সংসারে যেখানে বহুজনতার সংঘর্ষ, যেখানে অনেকের স্বার্থ, অনেক ভাল মন্দ ঈর্ষা কুটিলতা মেশামেশি হইয়া

পাশাপাশি রহিয়াছে সেখানকার সহিত নির্মলার কোনও পরিচয় ঘটে নাই। সে বড়লোকের বাড়িতে জন্মিয়াছে, না গরিবের গৃহে—এ-কথাটা ভাবিবারও প্রয়োজন তাহার কোনদিন হয় নাই।

কিন্তু আজ উপরের হলে যে-সব মহিলারা আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে এক দল নির্মলাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন যে নির্মলা দরিত্রের কণ্ঠা। এ-বাড়িতে তাহার প্রবেশাধিকার কিরূপে ঘটিল সেই কথাটাই তাঁহারা বিষয়ে হতবাক হইয়া ভাবিতেছেন, এবং তাঁহাদের এই বিষয়ের কথাটা খুব ভাল করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিবার জন্য যামিনীর বড়বৌদি উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা সার্থক হইয়াছিল। নির্মলা গভীর বেদনার সহিত বুঝিয়াছিল স্বপ্নরবাড়িতে তাহার অল্প জায়গেদের মত কোনো মর্যাদা কি সম্মান অধিকার তাহার নাই।

নির্মলার মনে আজ প্রথম ধাক্কা লাগিল। সে আস্তে আস্তে সেখান হইতে উঠিয়া নিজের শয়ন-ঘরে আসিল। আলো জ্বলাইয়া চারিদিকে চাছিল। দামী মেহগুনির পালঙ্কের উপর দামী নেটের মশারির ঝালর সঙ্ঘার বাতাসে একটু একটু কাঁপিতেছে। আনন্দ নির্মলার কাপড়ের জরির কঙ্কালোকে ঝলমল করিতেছে। ঘরের বেদিকে সে চায় সেইদিকেই আরাম এবং বিলাসের উপকরণ। সুখস্পর্শ সোফা তাহারই জন্য যেন নীচু করিয়া বাঁধান। অর্গানের কাছে মিউজিক্‌ টুলের উপর সেট মাপের একটা ভেলভেট্-দেওয়া কুশান্‌ যামিনী কালই বিকালে দর্জিক্‌ দিয়া করাইয়াছে। তাহার উপর নির্মলার জরির কাজ-করা মথমলের লঙ্কো চটি ছুতাটা রহিয়াছে। বোধ হয় বেয়ারাটা ঘর ঝাঁট দিবার সময় পুলা লাগিবার ভয়ে এখানে তুলিয়া রাখিয়াছে। নির্মলা শুক হইয়া ভাবিতে লাগিল, এই ঘরের কোন-কিছুকে

আজও সে বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথক করিয়া দেখে নাই। ঐ সোফাতে বসিয়া সে যামিনীকে বই পড়িয়া শুনাইয়াছে, টুলে বসিয়া গান গাহিয়াছে, ঐ জানালার কাছে কাউচটায় বসিয়া সূর্যাস্ত দেখিয়াছে। তাহার সমস্ত অস্তিত্বের সঙ্গে এই ঘরখানার সত্তা এমন করিয়া এই কিছুদিন মিশিয়া ছিল যে, নিজের প্রয়োজনের বাহিরে তাহাকে কোন ছলেই মনে পড়ে নাই। আজ মনে হইতে লাগিল এ শুধু বড়লোকের বাড়ির একখানা সাজান ঘর। কিন্তু বড়লোকের বাড়িরই এক জন যে সমস্ত হৃদয় ঢালিয়া ইহা সাজাইয়াছে, আপনার আদর দিয়া তাহাকে আবৃত করিয়াছে এ-কথাটাও নিশ্চল আজ আর ভাবিল না। কারণ এ-কথাটা ভাবিতে হইলে আর এক জনকে সর্বান্তঃকরণে যতটা গ্রহণ করিতে হয় নিশ্চল তাহার স্বামীকে এখনও তাহা করিতে পারে নাই। বিবাহের পূর্বে কাবা ছাড়া বাস্তব জীবনে প্রেম কি বিবাহ লইয়া সে কোন দিন মাথা ধামায় নাই। এ-সম্বন্ধে এই বয়সের মেয়ের হৃদয় সচরাচর যতটা সচেতন হয় নিশ্চলার মন বিবাহের পূর্বে তাহা হয় নাই। যেটুকু সচেতন তাহার হৃদয় হইয়াছিল, আজিকার প্রচণ্ড আঘাতে তাহার সব সড়ই যেন চলিয়া গেল।

যামিনী দরজার বাহিরে থমকিয়া দাঁড়াইল। আশা করিয়া আসিয়াছিল নিজের মনোভার শ্রেয়সী নারীর কাছে নিবেদন করিয়া ধরিবে। আসিয়া দেখিল ঘরে আলো নাই, শোকপরায়ণা নারী আপন মনোবাথা লইয়া শুক হইয়া মুক্তিটির মত জানালার গরাদেতে একটা হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তখন সে নিজের কথা ভুলিয়া গেল। কাছে আসিয়া নিশ্চলার কাঁধের উপর পিছন হইতে একটি হাত রাখিয়া স্নিগ্ধ স্বরে কহিল, “অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে কি করছ নিশ্চলা?” নিশ্চলা মুখ ফিরাইল। টাদের আলোয় তাহার চোখের জল চিক্-চিক্ করিতেছে।

“কি হয়েছে?”

“কিছু না।”

যামিনী তাহার মাথার চুল আঙুল দিয়া নাড়িয়া দিতে দিতে কহিল, “কি হয়েছে আমাকে বলো না। আমার কাছে কোন দিন কিছু লুকিও না। আমি যে তোমার

জন্মে কত ব্যাকুল।” তাহার কণ্ঠস্বরে কাতর স্নেহ প্রকাশ পাইতেছিল।

নিশ্চলা দৃঢ় পরিষ্কার স্বরে কহিল, “আচ্ছা, আমার বাবা যে খুব দরিদ্র সে-কথা কি তোমরা জানতে না?” যামিনীর কোন কথাই যেন তাহার কানে যায় নাই।

যামিনী অবাক হইয়া কহিল, “আজ হঠাৎ এ-কথা কেন? কিন্তু তোমার বাবা তো দরিদ্র নন। তাঁর মত হৃদয়ের প্রাচুর্য্য এবং মানসিক শ্রেষ্ঠতা ক’টা লোকের আছে?”

“সে-বিচার আমি তোমাদের সঙ্গে করতে চাইনে। কিন্তু তিনি যে দরিদ্র, তাঁর যে যথেষ্ট অর্থ নেই, এ-কথাটা কি তোমরা জানতে না?”

স্বীর কণ্ঠের কথায় যামিনী আহত হইল। নিশ্চলা যত দিন এ-বাড়িতে আসিয়াছে কখনও তাহার মুখে এমন কথা শোন নাই। কিন্তু নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া যামিনী কহিল, “আজ হঠাৎ এমন প্রশ্ন করবার প্রয়োজন তোমার কেন হ’ল?”

নিশ্চলা আর কোন কথা না বলিয়া সামনের চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল। তাহার অশ্রুব্যাকুল ধন নিঃশ্বাসে সঙ্কার শুক্ক আবরণ যেন উতলা হইয়া উঠিল। যামিনী সুইচ টিপিয়া আলো জালিল।

আরও একটা চৌকি টানিয়া তাহার পাশে বসিল। গম্ভীর স্বরে কহিল, “শোন নিশ্চলা, আমি আজ প্রতিজ্ঞা করেছি যত দিন না নিজে উপার্জন ক’রে তোমাকে প্রতিপালন করতে পারব তত দিন তোমাকে আর এ-বাড়িতে আনব না। তত দিন তোমার বাপের বাড়িতে থাকতে পারবে তো?”

নিশ্চলা কাঙালের মত বলিয়া উঠিল, “আমি কি আমার বাপের বাড়ি যেতে পাব? আমার বাবার কাছে থাকতে পাব তো?” যেন জীবনের এই নূতন সম্বন্ধের কথা সে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে এমনই ভাবে ব্যাকুল হইয়া সে প্রশ্ন করিল। তাহার এই ব্যাকুলতার কারণ ছিল। আজই সন্ধ্যাবেলায় অলঙ্কারের প্রসঙ্গে সমস্ত কথা জানিতে পারিয়া শান্তুড়ী দাঁতে দাঁত চাপিয়া কটু কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, “যা হবার হয়ে গেছে, কিন্তু আর কোন সূত্রেও সেই ছোট

লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। বৌ যেন বাপের বাড়ি যাবার নামও আর না করে।” কিন্তু যামিনী সে-কথা জানিত না। নিশ্বলার বাকুলতার কারণ সে বুঝল না।

যামিনী কিছুকাল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে নিশ্বলার দিকে চাহিয়া কহিল, “নিশ্বলা, এতই স্বচ্ছন্দে মায়া কাটালে? আমার কোনও কিছুর পরেই কি তোমার মায়া নেই? নিশ্বলা, তোমাকে এখন বিয়ে করি নি তারও আগে থেকে তোমার জন্তে এই ঘর সাজিয়েছি। এর সমস্তর সঙ্গে আমি এমন ক’রে জড়িয়ে গেছি যে কোথাও যদি একটা রাত্রি বাইরে কাটাতে হয়, তাহলে আমার এই ঘরের জন্তে মন কেমন করে। নিশ্বলা, আমার এ ঘর কি তোমারও ঘর নয়?”

নিশ্বলা চারি দিকে একবার শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, “না। এ ঘরে আমার কোনো অধিকার নেই।”

“কেন?”

“এত সব দামী জিনিষ দিয়ে সাজান ঘর আমি কোন কালে দেখি নি। এর কোন-একটা জিনিষ কিনে দিতে হ’লেও হয়ত বাবার টাকায় কুলোবে না।”

“কেবল জিনিষের ভীড়টাই দেখলে, কিন্তু এই-সব জিনিষের ঠেশাঠেশির পিছনে এক জন যে তার যা-কিছু সমস্তই তোমার হাতে তুলে দিতে চায় তাকে কি একটুও দেখতে পেলো না?”

নিশ্বলা ভাবিতেছিল, “আমার দরিদ্র পিতার সম্মান কি তাতে একটুও রক্ষা পাবে?” তু-জনেই কিছুকাল চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর যামিনী ধীরে ধীরে কহিল, “তোমাকে আজ না সহ্য করতে হয়েছে, সে সমস্তই আমি গুনলুম। কিন্তু এইটুকু তুমি জেনে রাখ, আমিও তার চেয়ে কিছু কম সহ্য করি নি। চল নিশ্বলা, আমরা এখান থেকে চলে যাই। কিন্তু...কিন্তু—”

“কিন্তু কি বল?”

“কিন্তু যেখানে তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন, যেখানে আমার আত্মীয়-পরিজনেরা তোমাকে অসম্মান করবে না, সেখানে, সেখানেও কি নিশ্বলা, তুমি তোমার সমস্ত ধন্য আমার দিকে মেলে ধরতে পারবে না?”

নিশ্বলা অনেক কণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “কখন

ক’রো, যদি কোন অপরাধ করে থাকি। কিন্তু আমি বার-বার চেষ্টা করেও বার-বার আপনাকে স’পে দিতে গিয়েও বার-বারই নানা আঘাত পেয়ে আপনার মধ্যে ফিরে এসেছি। এ কি আমি বুঝতে পারছি না।”

“কি বুঝতে পারছ না?”

“মনে হচ্ছে কোথায় যেন টান পড়ছে। কোথায় যেন বাধা রয়ে গেল। ঈশ্বর জানেন আমার কোন অপরাধ নেই। আমার যা কর্তব্য, শেষ পর্যন্ত আমি তার কোনখানে ত্রুটি রাখতে চাই নে।”

“থাক ওসব কথা—” যামিনী উঠিয়া পড়িয়া কহিল, “ওসব কথার মীমাংসা হবার জন্তে সমস্ত জীবনটাই পড়ে রয়েছে। আপাততঃ তুমি জিনিষপত্র গুছিয়ে রেখো, কাল বেলা ন’টার ট্রেনে আমি কলকাতা যাব, তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। মাকে বলে আসি গে।”

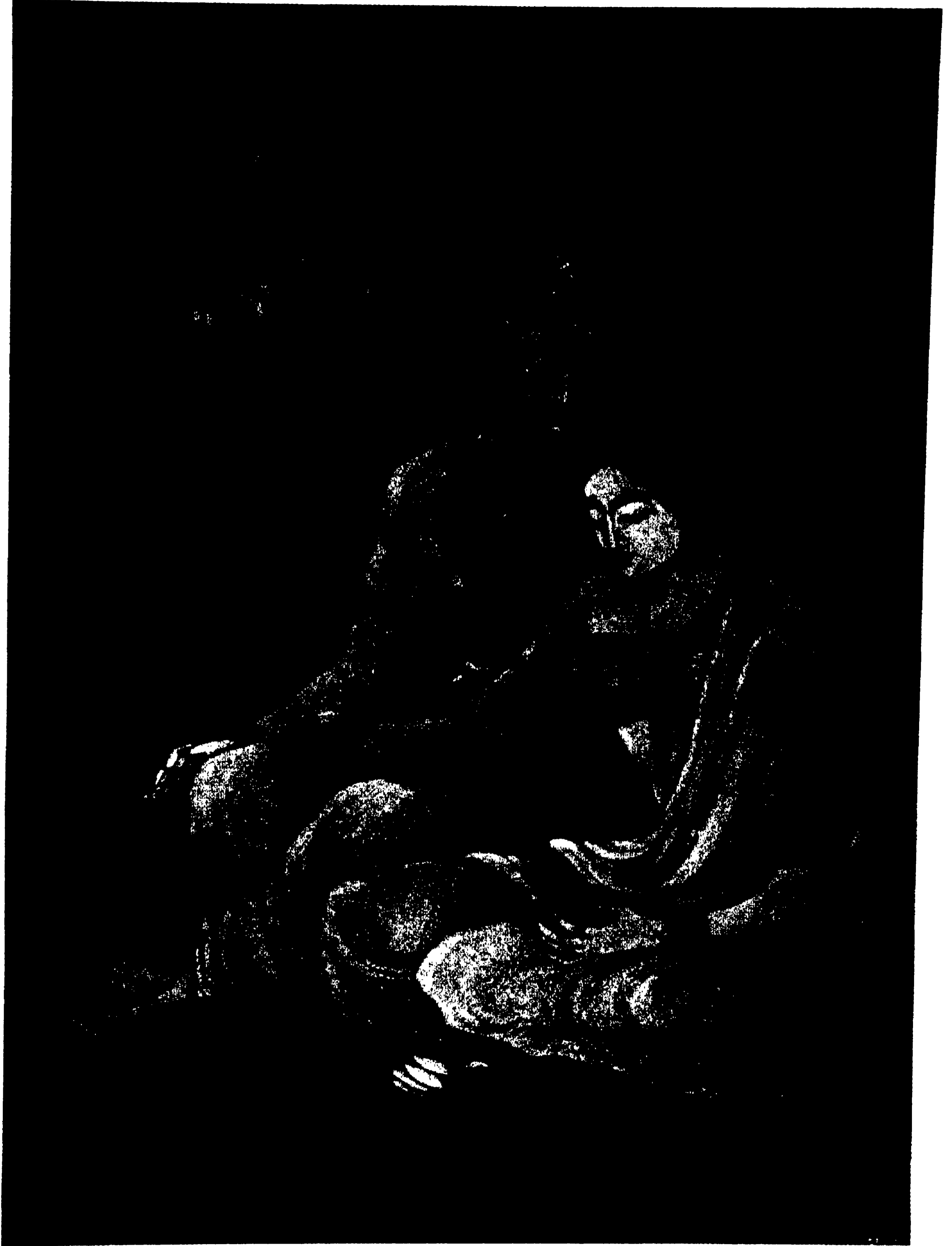
যামিনী তুয়ারের কাছ অবধি গিয়াছিল, নিশ্বলা ডাকিল, “শোন!”

সে ফিরিল। নিশ্বলা হাতের বালাটা খুঁটিতে খুঁটিতে কহিল, “আর দেখ, এই গয়নাগুলো...” বলিতে গিয়া সে থামিল। যেন সঙ্কোচে বাধিল। “এই গয়নাগুলো কি?” যামিনী একটা চেয়ারের উপর ভর দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এই গয়নাগুলো তুমি নেবে না। এই তো?”

“হা, তাই। এইগুলোর জন্তেই আমার বাবাকে ঠাঁই এত অপমান করেছেন। তা ছাড়া এ-সব জিনিষের উপর আমার বিন্দুমাত্র টান বা লোভ নেই।”

“বেশ, নিয়ো না। সেই ভাল। কিন্তু যদি জানতে, ওই গয়নাগুলোর জন্তে তোমার বাবার চেয়ে আমাকে চেব বেশী অপমান সহ্য করতে হয়েছে, তবুও তবুও—কিন্তু থাক সে-সব কথা। সে-কথা তুমি বুঝতে পারবে না। আমি বাই নিশ্বলা। রাত্রির মধ্যে তুমি ঠিক ক’রে নিও কি নেবে আর কি নেবে না।”

যামিনী নিজের অশান্ত ব্যথিত চিত্ত লইয়া শ্রীর কাছে সাহসনার জন্ত আসিয়াছিল, কিন্তু নিশ্বলা তাহার জগতে প্রবেশ করিতে পারিল না। কোন কথা না বলিয়া কোন প্রশ্ন না করিয়া এক জনের ক্ষয়-মনের সমস্ত বেদনা নিঃশব্দে অস্বস্ত্য করিবার, এক জনের সমস্ত চিন্তা হ আপন প্রশান্ত



মিলন
শ্রী.রামগোপাল বিজয়বর্গী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

হৃদয় সাগরে নিমজ্জিত করিয়া লইবার যে জ্বলন্ত শক্তি নারীর আছে, তাহারই কাছে প্রসাদপ্রার্থী হইয়া যামিনী আসিয়াছিল, কিন্তু নারী সাড়া দিতে পারিল না। সে আপন হৃদয়ভার লইয়া বাতায়ন-প্রান্তে একাকী দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকেও কেহ বুঝিল না, তাহারও হৃদয়ের স্বন্দ কেহ দেখিল না।

১৯

শুশীলা সেই সবেমাত্র গোয়ালঘরে ঘুঁটের আঙুনের ধোঁয়া দিয়া, তুলসীমূল সন্ধাদীপ জালিয়া দিয়া, হাতমুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া বঁটি পাতিয়া তরকারী কুটিতে বসিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ নিত্যকার মত তাঁহার পড়িবার ঘরে আলো জ্বলাইয়া চশমার খাপ হইতে চশমাখানা বাহির করিয়া কোঁচার খুঁট দিয়া মুছিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন এমন সময় বাহিরে একটা মোটর দাঁড়াইবার আওয়াজ পাওয়া গেল। হর্ণের আওয়াজ ঘন ঘন হইতে লাগিল। চন্দ্রনাথ চশমা পরিয়া তাড়াতাড়ি বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়া দেখিলেন নিশ্বলা ও যামিনী সিঁড়িতে উঠিতেছে। তাহাদের আসিবার কোনরূপ কথা ছিল না, এমন অপ্রত্যাশিতরূপে নিশ্বলাকে দেখিয়া বৃদ্ধ আনন্দে অর্ধমুগ্ধ হইয়া উঠিলেন। নিশ্বলা নত হইয়া সেই বারান্দাতেই তাঁহাকে প্রণাম করিতেছিল, তাহাকে দুই হাতে উঠাইয়া ধরিয়া একসঙ্গে তিনি অজস্র প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, “এস মা এস। কখন এসেছ? কোন্ ট্রেন ধরেছিলে? হঠাৎ এমন ক’রে আসা হ’ল যে...হঠাৎ বুঝি বুড়ো বাপকে মনে পড়ে গেল? এই যে যামিনী, থাক...থাক আর প্রণাম করতে হবে না। তারপর কি খবর?”

যামিনী সংক্ষেপে বলিল, “কলেজ খুলেছে। আসতেই হচ্ছিল তাই সঙ্গে ক’রে নিয়ে এলুম। জানি ওকে আনলেই আপনি খুশী হবেন। কিন্তু এবারে তো আপনার জিনিষ আপনার হাতে পৌঁছাল, এবারে আমি যাই।”

তাহার কণ্ঠস্বরে শেষের দিকে বেদনার আভাস। সমস্ত মুখে ক্লান্তির চিহ্ন সুপরিষ্কৃত। ঘরে ঢুকিয়া আলোতে চন্দ্রকান্তবাবুর নজরেও তাহা পড়িল। নিশ্বলার সঙ্গে বিবাহের আগে যামিনীর প্রতি তাঁহার মনোভাব যেমন

ছিল এখন যেন তাহার চেয়ে অনেক বদলাইয়া গিয়াছে। তাহার প্রতি একটি মুমিষ্ট সুকোমল স্নেহরস ভিতরে ভিতরে কখন উজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। সে কেবল আজ তাহার পানে চাহিবামাত্র তিনি টের পাইলেন। বাস্তব হইয়া উঠিয়া কহিলেন, “সে কি, বাবে কি? নিশ্বলা, যা ত মা, তোর মাকে বাড়ির ভিতর খবর দে।” প্রতিমাসুন্দরী কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়াছিল। নিশ্বলাকে দেখিবামাত্র হাসিমুখে কহিল, “ঠাকুরঝি ভাই, এলে? এরই মধ্যে ঠাকুরজামাইটিকে এমন বশ ক’রে নিয়েছ যে যেখানে যখন যান, সঙ্গে ক’রে নিয়ে যান। দু-দিনের অদর্শন সহ্য হয় না। সত্যি ভাই, তোর ক্ষমতা আছে অস্বীকার করবার জো নেই।” প্রতিমার কথার সুরে একটা অত্যন্ত অন্তরঙ্গতার সুর। সে বেচারার দোষ নাই। বিবাহের পন্থে মেয়েদের পরম্পরের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সূত্রপাত হয়। তখন আর বয়স বা সম্পর্কের জন্ত বড়-একটা আসিয়া যায় না। প্রতিমা তাই উচ্ছ্বসিত হইয়া মনে করিয়াছিল এই দু-তিন মাসের মধ্যেই নিশ্বলার নিশ্চয় একটা বড় বকম পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। আগেকার সেই স্তব্ধ, সমাহিত, পুস্তকলীন নিশ্বলা কখনই নাই। এখন মৃগুদশবর্ষীয়া যে-তরুণীকে প্রতিমা কল্পনার চক্ষে দেখিতে পাইয়া উৎকলিত হইয়া উঠিয়াছিল সে বসন্ত-ব্রততীর মত প্রেমে, চাঞ্চল্যে, অকারণ পুলকের হিল্লোলে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কথায়, হাসিতে, দৃষ্টিপাতে আনন্দ ঝরিয়া পড়িতেছে।

প্রতিমার সহিত নিশ্বলা ভিতর আসিল। আলোতে ভাল করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া কিন্তু প্রতিমার ভুল ভাঙিল। তাহার মনশ্চক্ষের সেই তরুণীর সঙ্গে কই নিশ্বলার ত কোথাও মিল নাই। বরঞ্চ সে যেন আগেকার চেয়ে আরও অনেক নিস্তব্ধ। সাজসজ্জাও তাহার যেমন অনাড়ম্বর তেমনি সাদাসিধা। হাতে আগেকার সেই সরু পেন্ন বালা দু-গাছি ছাড়া আর কোথাও কোন অলঙ্কারের চিহ্নমাত্র নাই।

প্রতিমা অবাক হইয়া ভাবিল, ইহাদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা। আজকাল সে শাণ্ডীর নির্দেশমত কাজক্মে খুব তৎপর হইয়াছে। তাড়াতাড়ি ষ্টোভ ধরাইয়া চায়ের জল বসাইয়া দিয়া যামিনীর জন্ত জলখাবার সাজাইতে প্রবৃত্ত হইল।

নির্মলা মাকে প্রণাম করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল। আলো না জ্বালাইয়াই অন্ধকারের মধ্যে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়া তাহাদের ত্রিতলের ছাদের এক কোণে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন আকাশে কক্ষপক্ষের চাঁদ উঠে নাই। মাথার উপর তারাগুলি অত্যন্ত দীপ্ত হইয়া ফুটিয়াছে। নক্ষত্রস্পন্দিত নিঃশব্দ অন্ধকারে নির্মলা তাহার মাথার অবগুষ্ঠন ফেলিয়া দাঁড়াইল, তাহার আশৈশব-অভাস্ত এই অব্যবহিত মুক্তিক সমস্ত হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিতে চাহিল। অন্ধকারে কত ক্ষণ এমনই করিয়া দাঁড়াইয়াছিল খেয়াল নাই। পায়ে শব্দে মুখ ফিরাইয়া দেখিল যামিনী আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়াছে। দু-জনেই অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। নির্মলা প্রথমে কথা কহিল, “আমাকে কিছু বলবে?”

“কিছু বোলো না। অন্ধকারের মধ্যে কেবল তোমাকে অনুভব করতে দাও।”

“আমি এক-এক সময় ভাবি, অবাক হয়ে কিছুতেই ভেবে পাইনে—” নির্মলা যেন আপন-মনে তন্ময় হইয়া বলিয়া চলিল, “আমার মধ্যে...”

“তোমাকে মিনতি করছি নির্মলা, চুপ করো। কত সুদূর থেকে তারার আলো এসে তোমার মুখে পড়েছে। রাত্রি শুষ্ক, অন্ধকার। এরই মাঝখানে আমার সমস্ত তোমাকে দিয়ে ভরিয়ে নিতে দাও। এখন কথা কওয়া সুইবে না। আশ্চর্য্য, আমি তোমার কাছে এলুম, নিজেকে উন্মোচিত করে তোমার সামনে ধরলুম অথচ তুমি যে আমার মাঝে কিছুই খুঁজে পেলেনা সে-কথাটা আজ এই অন্ধকারে চুপ করে তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যতটা টের পেয়েছি এর আগে কোনদিন তা পাই নি।”

নির্মলা চুপ করিয়া ছাদের আলিসায় ভর দিয়া যেমন দাঁড়াইয়াছিল তেমনই থাকিল। যামিনী বলিল, “এবারে আমি যাই।”

“কোথা যাবে?”

“আমার সেই সাবেক মেসে। নিখিলকে বলে রেখেছি আমার ঘর ছ’টো খুলিয়ে রেখেছে।”

নির্মলা যামিনীকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিত, কিন্তু তাহার যে-মন নবাবিকৃত সংসার হইতে মুক্তির জগু পাগল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই মনই যেন যামিনীর প্রতি

স্বল্পানুরক্ত নববধুর মন হইতে প্রবল হইল। নির্মলা শুধু বলিল, “মেসে কেন যাবে? এখানেও তো থাকতে পার।”

“না, পারি নে। নির্মলা তুমি রাগ করো না, কিন্তু আজ একটা কথা বলব। তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে গেলুম, মনে আশা ছিল আমার ঘর তোমারও ঘর হয়ে উঠবে। ভুল ভাঙলো। টের পেলুম সে তোমার হ’ল না। তাই আজ তোমারও আমন্ত্রণে সাড়া দিতে পারছি নে। তোমাদের ঘরে নিজের মনে করে থাকতে বাধে। কোথায় রয়ে গেল একটা অদৃশ্য বাধা। কোনদিন এটা কাটবে কি না জানি নে; কিন্তু এইটুকু আমার মনে সাস্থনা থাকবে মিথ্যাকে আমি চাই নি। যাকে চেয়েছিলুম তাকে সর্বতোভাবে সত্য করে পাব বলেই প্রতীক্ষা করে এসেছি আজও যদি প্রতীক্ষার দিন না ফুরিয়ে থাকে তাহলে জানব এখন আমার সাধনার পালা ফুরোয় নি। কিন্তু অভিযোগ করব না কারও কাছে। আমি চললুম নির্মলা।”

বাইবার সময়ে সে নির্মলার হাত দুইখানি আপনার হাতে টানিয়া লইয়া তাহাতে অধর স্পর্শ করিয়াই দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

সে চলিয়া বাইবার পরে ছাদে আবার তেমনি অথও নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। অন্ধকার ছিন্ন করিয়া সারি সারি বাড়ির ছাদগুলার এক প্রান্ত হইতে কক্ষপক্ষের এক খণ্ড চাঁদ উঠিল। কিন্তু নির্মলার মনে তাহার পূর্বদিনের প্রশান্তি আর ফিরিল না। মন হইতে লাগিল কে যেন অধীর বেদনায় ফিরিয়া গিয়াছে। তাহার সেই বেদনার ছায়ায় প্রকৃতি স্তম্ভিত, ভারাক্রান্ত। তাহাকে সমস্ত দিয়া গ্রহণ করিতে চাহিলেও মনের একটা দিক অতৃপ্তিতে ভরিয়া উঠে, মনে হয় মুক্তির অপরিসীম আকাশ হইতে যেন কাহার লালসাজীর্ণ অন্ধকার কারাগারের মধ্যে ঢুকিতে হইতেছে, আবার তাহারই নিরন্তর ব্যাকুলতায় তাহাকে ছাড়িয়া দিতেও মনের আর একটা দিক উদাস হইয়া যাইতেছে।

নির্মলা একাকী ছাদে ঘুরিতে লাগিল। কিন্তু তাহার মনের ভিতর যুগল নির্মলার স্বন্দ চলিতে লাগিল।

সকালবেলায় চায়ের পেয়ালায় চিনি মিশাইতে মিশাইতে যামিনীর পূর্বতন সহপাঠী বন্ধু নিখিল কহিল, “বাপারখান

কি বলো দেখি? কাল অত রাত্রিতে হটোপুটি ক'রে এসে হাজির। এদিকে চেহারাখানা দাঁড়িয়েছে যেন ঝোড়ো কাকের মত। কি হয়েছে? ঝগড়া? কিন্তু কার সঙ্গে? মা-বাপের সঙ্গে না নববধূর সঙ্গে? শেষেরটাই অবশ্য বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে। কারণ তানা হ'লে শুধু মা-বাপের কাছে ছুটা বকুনি খাওয়ার চেহারার উপর এতটা চিহ্ন থাকত না।”

যামিনী ক্ষীণ হাসিয়া কহিল, “ঝগড়া আবার কি? কেল করেছি পরীক্ষায়, বাজে কথার সময় নেই। উঠে পড়ে লাগতে হবে।”

এই বলিয়া তা খাওয়া শেষ হইবামাত্র সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজায় খিল দিল। নিখিল যামিনীর রুচি এবং প্রকৃতি জানিত। তাই দু-তিন দিন আগে খবর পাইলেও তাহার ছুইখানা ঘর যথাসাধ্য সাজাইয়া-শুছাইয়া রাখিয়াছিল। টেবিলের উপর সজ্জিত পুস্তকের কাছে একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া যামিনী বসিল। খুব নিবিষ্ট চিত্তে একটা বই টানিয়া লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। কিন্তু মনে পড়িতে লাগিল নিম্মলার কথা। সেই প্রথম তাহার সহিত কেমন করিয়া আলাপ হয়। কেমন করিয়া এক দিন তাহাকে হাম্লেটের কিয়দংশ আবৃত্তি করিতে শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সেই তাহার সরল আশ্বিন্মুত ভাব। পূর্ব দিকের জানালাটা খোলা ছিল সেই দিকে নজর পড়িতে চোখে পড়িল সামনের যে দোতলা বাড়িটা এতদিন খালি ছিল তাহারই উপরের মাঝখানকার ঘরটায় জানালায় জানালায় জাফরানি রঙের পর্দা উড়িতেছে, খোলা ছুয়ারের অবকাশ-পথ দিয়া সাজান ঘরের কিয়দংশ চোখে পড়িতেছে। পালঙ্কের উপর জুগুপ্ত বিছানা, মাটিতে চালাও বিছানার উপর জরির মছলন্দ পাতা। পায়ের দিকে কাহার এক জোড়া লাল মখমলের চটি। কে এ-ঘরের অধিবাসিনী যামিনী তাহা জানে না, কিন্তু সেই ঘরখানার পানে চাহিবামাত্র তাহার মনটা হু হু করিয়া উঠিল। মনে পড়িয়া গেল তাহার সেই ঘরের স্মৃতি। নিজের হাতে সে সাজাইয়াছিল, দেয়ালের কোন্ দিকে কোন্ ছবি টাঙাইবে, পর্দার রঙ কেমন হইবে এ লইয়া কত জল্পনা-কল্পনা কত আলোচনা,

নিজের মনে সে কত ভাগাভাগি। সারেঙের শব্দের সহিত স্ত্রী-কণ্ঠের কোমল স্বরের আওয়াজ আসিল। যামিনী কিছু কিছু হিন্দী জানিত, গানের প্রথম লাইনটা যুরিয়া-ফিরিয়া গাঁত হইতে শুনিতে লাগিল

“পলখন্ সো পাগে ঝারারীম্...
যব খর আওয়ে প্যারে মোরি...”

অনেক ক্ষণ ধরিয়া বুথা পড়িবার চেষ্টা করিয়াও যখন কিছুতেই মন বসিল না তখন বিরক্ত হইয়া যামিনী সশব্দে দরজাটা খুলিয়া নিখিলের কাছে গিয়া বলিল, “এ কোন্ হতভাগা ঘর ঠিক করলে আমার জন্তে? সামনের ওই বাড়িটা যে জানালার গায়ে লাগাও, আর গান-বাজনার শব্দ উঠছে অহর্নিশ।”

নিখিল মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, “জানি নে ভাই, আজ ক’দিন থেকে দেখছি কে একটা পার্সি মেয়ে ঐ ঘরটা ভাড়া নিয়েছে। তা তোমার আর এমন অশুবিধে কি? মে-স্বপ্নে এখন তোমার দিন কাটছে তাতে আইন মুখস্থ করার চেয়ে গানের ঝঙ্কার এমন কি মন্দ লাগবে?”

দরওয়ান একটা রেকার্ডে করিয়া একরাশ খাম ও পোষ্টকাট লইয়া সকালের ডাক বিলি করিয়া বেড়াইতেছিল। “চিচ্চি আপকা ভি হায় একটো” যামিনীর কাছে আসিয়া সে থামিল। যামিনীর বুকের ভিতরটা হঠাৎ ধক্ করিয়া উঠিল। নিম্মলা চিঠি লেখে নাই তো তাহাকে? কথাটা মনে হইতেই একটা মধুর সম্ভাবনায়, অধীর আগ্রহে তাহার সমস্ত মন ভরিয়া উঠিল।

চিঠিখানা হাতে লহতেই কিন্তু আশা নিবিয়া গেল। নিম্মলার চিঠি নয়। বাড়ি হইতে মা লিখিয়াছেন রাগ করিয়া যে, বৌ যখন এখানে থাকিতেই পারে না তখন তাহাকে আর এখানে না-আনাই ভাল। তাহার যামিনী বা নিম্মলা সশব্দে কিছু জানেন না। যামিনী যতদিন নিজে উপার্জন করিয়া তাহার স্ত্রীকে প্রতিপালন না করিতে পারে তত দিন সে যেন নিজের বাপের বাড়িতেই থাকে।

যামিনী চিঠিটা দলা পাকাইয়া জানালার বাইরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। ওবাড়ি হইতে গানের সুরের সঙ্গে অনেকের একত্র-মিলিত একটা হাসির গল্পা উঠিতেছিল। যামিনী বিরক্ত হইয়া ঘরের ওইদিককার

সমস্ত জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া ক্রকৃষ্ণিত করিয়া হাতের কাছে যে বইটা পাইল টানিয়া লইয়া এধারের ইঞ্জিনচেসারটার উপর আসিয়া বসিল।

২১

বরের আলো জলিতেছিল, নিশ্বলা পিতলের জয়পুরী ধূপদানিতে করিয়া ধরে ধূপধুনা দিতেছিল। কাজ শেষ হইয়া গেলে শেল্ফের উপর হইতে একটা বই বাছিয়া লইয়া পড়িতে বসিল। চন্দ্রকান্তও অনেকক্ষণ হইতে একটা পুঁথি খুলিয়া অল্পমনস্কের মত বসিয়াছিলেন। এইবারে আস্তে আস্তে সেটা হইতে চোখ তুলিয়া ডাকিলেন, “নিশ্বলা!”

“কি বলছ বাবা?”

কিছুক্ষণ ইতস্তত করিয়া চন্দ্রকান্ত কহিলেন, “তোদের মাঝে কি যেন একটা হয়েছে, মা। সেদিন অত রাত্রিতে বিস্তর অনুরোধ সত্ত্বেও বামিনী তাড়াতাড়ি মেসে চলে গেল। তার পরে একটি দিনও আর আসে না। চিঠিপত্র লেখে তো?”

নিশ্বলা মাথা নাড়িয়া কহিল, “না।”

“তবেই তো।” চন্দ্রকান্ত নিজের চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে কহিলেন, “তা হ’লেই যে দেখছি...”

নিশ্বলা হাসিয়া উঠিয়া কহিল, “তা হ’লে কি বাবা? আচ্ছা, তোমার আজ হঠাৎ এসব কথা মনে হচ্ছে কেন? তিন-চার মাস আগে যখন তুমি আর আমি এই ছোট টেবিলটির দু-পাশে বসে পড়াশোনা করতুম তখন তে কেউ আমাদের চিঠিপত্র লিখত না। তখন তো আমরা নিজেদের মধ্যেই বেশ ছিলুম। আমরা কি আবার আগেকার মত হ’তে পারি নে?” চন্দ্রকান্ত চাহিয়া দেখিলেন তাহার মুখমণ্ডল শাস্ত। নিশ্বলা স্বচ্ছ ললাট-খণ্ডটুকুতে কোন চিন্তা কিংবা অশান্তির ছায়া পড়িয়াছে কিনা বোঝা যায় না।

তিনি মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, “আগেকার মত কেন হ’তে চাইছ নিশ্বলা? আগে তো কেবল একমাত্র আমিই তোমার জীবনকে আবৃত করে ধরেছিলুম। কিন্তু আমার যা-কিছু দেবার, তোমাকে যা-কিছু শেখাবার সে সমস্তই নিঃশেষ

ক’রে এখন যে আমি চাইছি সংসারের মাঝে তুমি সাথক হয়ে ওঠ। এক-এক সময় আমি অবাক হয়ে ভাবি...” চুলের মধ্যে তাঁহার আঙুলগুলি থামিয়া গেল। চিন্তিত মুখে বৃদ্ধ উজ্জ্বল বিজলি বাতির দিকে চাহিয়া কি যেন ভাবিবার জন্য চুপ করিলেন।

“আমার জন্মে আজকাল তুমি মনে মনে কেন এত ভাব বাবা?”

“আমি এক-এক সময় ভাবি—” নিজের চিন্তার স্বত্র ধরিয়া তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন, “হয়ত তোমার উপর আমি অন্তায় করেছি, নিশ্বলা।”

“অন্ডায় কি করেছ, বাবা? আমাকে তুমি যত ভালবেসেছ, এত ভাল কেউ কাউকে বাসে না।”

“সে কথা নয় মা। আমি নিজেকে দিয়ে তোমাকে বড় বেশী ঢেকেছি নিশ্বলা। তোমার নিজের যথার্থ বিকাশ হয়ত তাতে বাধা পেয়েছে। তা নইলে...”

“তুমি আজ কথা বলতে বলতে এত থেমে যাচ্ছ কেন বাবা? তা নইলে কি?”

“তা নইলে বামিনীর মত ছেলের প্রতিও তোমার মন আকৃষ্ট হ’ল না কেন? তা ছাড়া যে-পরিবারে তুমি বধু হয়েছ সে-পরিবারের প্রতিও তোমার কিছু কষ্টবা রয়েছে।”

“সে কি কষ্টবা আমাকে বলে দাও না। আমি ত কিছুই বুঝতে পারি নে। তুমিও তো আমাকে এ-সম্বন্ধে আগে কিছু বল নি।”

“না, আগে আমি ভাবতেও পারতাম না তোমাকে বাদ দিয়ে আমার নিজের জীবনকে কখনও কল্পনা করতে হবে। কিন্তু এখন জন্মশঃ বুঝতে পারছি তোমারই সুখের জন্মে তার প্রয়োজন। আমি কেন আমার বার্থ জীবনের সমস্ত সম্ভাব নিয়ে অহনিশি তোমাকে ঘিরে থাকব? তুমি যে কালের মত সৌন্দর্যো, কল্যাণে, প্রেমে দুটে উঠেছ। তোমাকে কত লোকে কামনা করছে। আমার জীবন জীবনকে ত্যাগ ক’রে তুমি কি তোমার লক্ষীর আসন অধিকার ক’রবে না মা?” বলিতে বলিতে আবেগভরে চৌকি হইতে উঠিয়া তিনি নিশ্বলার কাছে দাঁড়াইয়া তাহার মাথায় হাত রাখিলেন। তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিতে

লাগিল। নিশ্চলার চক্ষু দিয়া টপ, টপ, করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কিছু ক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া কহিল, “বাবা, সংসার তুমি কাকে বলছ? সংসার মানে যা বোঝায় তা আমি বুঝতে চাই নে। সেখানে কেবল কুশ্রীতা, শুধু হিংসা, ঘেঘ, নীচতা। যে কয়েক মাস আমি খুশুরবাড়িতে ছিলাম সন্ধ্যা হ'লেই আমার মন ছটফট করত। মনে হ'ত খুব একটা বন্ধ কারাগারের মধ্যে কে যেন আমাকে বেধে রেখেছে। তোমার এই ছোট্ট ঘরখানির জন্তে এত মন কেমন করত। এই শাস্ত নিৰ্জনতায় আলোটি জ্বালিয়ে তুমি আর আমি বসে থাকি। তোমার মুখে আলো পড়েছে মধ্যে মধ্যে সেই মুখের দিকে চেয়ে দেখি। নেই সেই মুখে কোন বিকার কোন মলিনতা। বাবা, এর পরেও আর কি চাইবার থাকতে পারে? মনে মনে এইটুকুর জন্তেই যে আমি পিপাসান্ত হয়েছিলুম।”

চন্দ্রকান্ত অনেক ক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, “আমারই ভুল হয়েছে নিশ্চলা। তোমার বিয়ের পরে তুমি যখন চলে গেলে তখন নিজের এই অসহ্য কষ্টে বিস্মিত হয়ে একা বসে অনেক কথাই ভেবেছি। সেই সমস্ত ভাবনার কথা আজ তোমাকে বলি। প্রথম বয়সে সংসারের দিক থেকে খুব বড় রকম একটা বা খেয়েছিলুম। নিজের ধর্ম-বিশ্বাসের ফলে হিন্দুধর্মের নানারকম অর্থহীন লোকাচার, নানা ক্ষুদ্রতা অসাম্য আমাকে পীড়া দিত। ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আমি আকৃষ্ট হলাম। সংসার হ'ল আমার উপর বিরূপ। তোমার মায়ের সঙ্গে খটল আমার মন্বাত্তিক বিচ্ছেদ। যদিও প্রকাশ্য ভাবে কোন দিন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিইনি তবুও সংসারের অনুকূলতা কখনও পেলুম না। মাঝখানে যে বিদ্রব-রেখা পড়ল তার এক দিকে রইলুম আমি একা, অন্য দিকে তাঁর ছেলেপিলে লোক-লৌকিকতা ঠাকুরদেবতা সমস্ত সংসার নিয়ে তোমার মা। চিরদিনই এমনি একলা কাটিয়ে আসছিলুম, কিন্তু যেদিন একমুঠো ফুলের মত সুন্দর গুল্ল তোমাকে দেখলুম সেদিন কি যে লোভ হ'ল আবার আস্তে আস্তে নিজেকে জড়িয়ে ফেললুম। পুরুষের পক্ষে একলা থাকা তেমন শক্ত নয় মা। কিন্তু নিজের মধ্যেই নিজে চিরকাল আবদ্ধ হয়ে থাকা বড় কষ্টকর। সেই সঙ্কীর্ণ অবুদ্ধ অন্ধকার থেকে তুমিই আমাকে মুক্তি দিয়েছিলে,

মা। নিজেকে তিলে তিলে এক জনের কাছে দান করবার যে দুর্ভাগ্য অনন্দ সেই অনন্দে আমার দিন রাত্রি ভরেছিলে। কিন্তু.....” চন্দ্রকান্ত উঠিয়া ধরময় পায়চারি করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, “কিন্তু তোমাকে এত ভালবাসি নিশ্চলা, যে তোমার জন্তেই আমার এখন দিবারাত্রি ভাবনা। কিসে তুমি সুখী হবে, কেমন করে তোমার সমস্ত জীবন আনন্দময় কল্যাণপূর্ণ হবে? এই ভাবনাতেই আমার দৃষ্টিকে করেছে তীক্ষ্ণ, মনকে করেছে সজাগ। আমি এই তোমাকে বলছি মা, আমি তোমাকে দিলুম, উৎসর্গ করে দিলুম! তোমাকে আমার জীবন থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন করে, আমার জীবনের জাল থেকে সকল গ্রন্থি মোচন করে তোমাকে তোমার জীবন-বিধাতার হাতে সমর্পণ করলুম। তোমার বিধাতার যে অভিপ্রায় তোমার জীবনের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে উঠতে চায় তাই সফল হোক নিশ্চলা। তুমি সুখী হও, সুখী হও মা। আর আমি কিছু চাই না। আমার দিক থেকে কোন দায় কোন বন্ধন মনের মধ্যে রেখো না।”

নিশ্চলা কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। তাহার নিমীলিত চক্ষুর কোণ দিয়া অজস্র অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। কোন্ এক রহস্যময় অজানা ভবিষ্যতের ছায়া তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিয়াছিল আর তাহারই সঙ্গে অনির্ণয় একটা তীব্র বেদনা। নিজের জন্ত নয়, কাহার জন্ত তাহাও সে ঠিক বলিতে পারে না। কিন্তু চোখের উপর দিয়া বায়োস্কোপের ছবির মত ছোটবেলাকার কত ঘটনাই না একে একে ভাসিয়া যাঁতে লাগিল। সেই তাহার বাবার চিরকাল চুপচাপ একলা বসিয়া থাকা। তাহাকে বিপুল আবেগ-ভরে কাছে টানিয়া লওয়া। মনে হইতে লাগিল তিনি যেন চিরস্থায়ী, কেহ তাহাকে কোনদিন কাছে টানিয়া লয় নাই, কোনদিন বুঝিতে চায় নাই। নিশ্চলার সঙ্গেও আজই যেন তাহার চিরবিচ্ছেদের দিন নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছে। কিছু ক্ষণ পর চোখ মুছিয়া সে মুদুকণ্ঠে কহিল, “বাবা, তোমার জীবন থেকে আমাকে বিদায় দিলে কেন? আমাকে তোমার কাছে ধরে রাখলে না কেন চিরদিনই?”

“গাছ কি ফলকে চিরকাল ধরে রাখে মা? নিজের

প্রাণরস দিয়ে তাকে সে যখন নিটোল পরিপকু করে তোলে তখন প্রকৃতির নিয়মেই তো গাছ থেকে সে খসে পড়ে যায়, আসে তার বিচ্ছেদের সময়। সেই বিচ্ছেদেই যে তার সাধকতা। তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদও সেই রকম।”

“বেশ, তাই হবে। তুমি আমাকে যা বলবে আমি তাই মেনে চলবার চেষ্টা করবো। কিন্তু এইটুকুমাত্র তোমাকে মিনতি তুমি আমার জন্ত রাতদিন ভেবো না বাবা।”

“তোমার জন্তে যে ভাবতে পাই সেই তো আমার দুখ মা। কিন্তু মেনে চলার কথা কেন বলচ? আমি কামনা করি জীবনের বিধান কেবল মেনে চলে নয়, আনন্দময় স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতির মধ্য দিয়েই তাকে তোমার জীবনে সাধক করে তোলে তুমি। আমি এখন একটু ছাদে যাই নিশ্চল। তুমি বসে এই বইখানার বাকীটুকু পড়ে নানাও। যদি কোনস্থান বুঝিয়ে দেবার দরকার হয়, ফিরে এসে বুঝিয়ে দেব।”

চন্দ্রকান্ত চলিয়া যাইবার পরে নিশ্চল টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। আজ ক’দিন হইতে সুশীলার জ্বর হইয়াছে তাই রান্না করিবার জন্ত এক জন রান্ধুনি রাখিতে হইয়াছে। অন্দর হইতে ঠিকা ঝিয়ের সহিত রান্ধুনির কলহের জ্বর ক্রমশঃ উচ্চগ্রামে চড়িতেছে। নিশ্চল যে-যে করতলের ভিতর মগুক রাখিয়া বসিয়াছিল সেখানেও আওয়াজ আসিতেছে, “...ঃ লো বড় আমার দরদ রে! বাবুদের পাতে মাছভাজা কম পড়েছিল কেন? বলি ও বামুন ঠাকরণ, বলি শুনছ, কার চোখে ধুলো দেবে তুমি?...রাসু তেমন বাপের বিটি নয় বুঝলে? ভাতের মধ্যে মাছভাজা গুঁজে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।”

নিশ্চল গোলমালে বিরক্ত হইয়া একবার চুরারের কাছ পর্য্যন্ত আগাইয়া গেল তাহার পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া পরিত্যক্ত চেয়ারটায় বসিল। সংসারের এই সকল নিরতিশয় কুশ্রী গোলযোগ, অসুন্দর কলহ, ইতর বাক্যবিনিময় তাহাকে গভীর করিয়া বিধিল। কোথাও কি ইহার হাত হইতে রক্ষা নাই! গোলমাল ক্রমশঃ প্রচণ্ড হইয়া উঠিতেছে। না, অবহেলা করা চলিবে না। সংসারের প্রতিও যে তাহার একটা কর্তব্য আছে। যেমন করিয়া পারে এ সকল সে খামাইবে। নিশ্চল উঠিয়া ভিতরে গেল।

পাচিকার কাছে গিয়া কহিল, “কি হয়েছে নালুর মা? এত গোলমাল কিসের?”

পাচিকা হাত-মুখ নাড়িয়া ঝিয়ের উদ্দেশ্যে কহিল, “শতকথোয়ারি আবাগির মেয়ে, আমার নামে চোর অপবাদ দেয় গো! তোর নোলা খসে যাবে না!”

প্রত্যুত্তরে রাসু ঝিও গর্জন করিয়া উঠিল। নিশ্চল স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। দুই পক্ষ হইতে অতঃপর যে-সকল উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিতে লাগিল তাহার ভাষা যেমনই কদর্যা তেমনই অশ্লীল। সংসার-নাট্যশালার এই যে একটা টুকরা অকস্মাৎ তাহারই চোখের সামনে অভিনীত হইতে থাকিল সেই দিক পানে চাহিয়া নিশ্চল বিমনার মত স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল, সংসারে এ-সকলেরও প্রয়োজন আছে। এই-সব লইয়াই সংসার। সেখানে যাহারা থাকে এই ধরণের অসহ ইতরতার মাঝেই অহরহ তাহাদের বস করিতে হয়। নিশ্চল এইমাত্র রবীন্দ্রনাথের ত্রিবিষ্টি-লেকচারের রিলিজন অফ্ দি মান্ পড়িতে পড়িতে উঠিয়া আসিয়াছিল। যাহার মধ্যে সে মগ্ন হইয়াছিল সে কি সুন্দর, কি গভীর। সেই কুলহীন প্রশান্তির মাঝখান হইতে উঠিয়া আসিয়া এইখানে দাঁড়াইবামাত্র তাহার কষ্ট হইতে লাগিল। বহুক্ষণ অসাড়ের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে বাইবার সময় ঝিকে সম্বোধন করিয়া অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে কহিল, “ভদ্রলোকের বাড়িতে এ-সব কি কাণ্ড বলতে! বাও মুখ বুজে কাজ করো গো। ছিঃ, এখানে দাঁড়িয়ে অমন অভদ্র কাণ্ড করতে নেই।”

ঝি আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল, “ভদ্রলোকের বাড়ি কি দেখাচ্ছ গা দিদিটাকরণ। আজই কি নুতন তোমাদের বাড়িতে কাজ করছি। কলকাতায় অমন দশ-বিশটা ভদ্র নোকের বাড়ি কাজ করেছি। কেন কি করেছি আমি?” (চক্ষে অঞ্চল দিয়া) “কেন আমি কি নাচউলি না আমি বাজারের মেয়ে যে তুমি আমায় কথায় কথায় ভদ্র লোকের বাড়ির খোঁটা দিচ্ছ, দিদি?” নিশ্চল অপরিসীম স্নগায় সেখান হইতে সরিয়া গেল। সে চোখের অন্তরাল হইবামাত্র ঝি বামুনির দিকে ফিরিয়া আপন-মনেই বলিতে লাগিল, “ভদ্রলোকের বাড়ির কাণ্ডটা আমার সব জানা আছে। জানতে আর কিছু বাকী আছে কি এই রাসুর।”

তাহাকে চক্ষে অঞ্চল দিতে দেখিয়াই বামুন-ঠাকুরাণীর মন গলিয়াছিল। এখন সমস্ত ঝগড়াবিবাদ বিস্মৃত হইয়া তাড়াতাড়ি তাহার দিকে ফিরিয়া কহিল, “কেন কি হয়েছে রে বামু? হাঁ তাই বল ত ভাই। আমাদের মধ্যে আর বুকোছাপা কি? তোদের এই দিদিমণির কাণ্ডকারখানা আমারও যেন কেমন-কেমন থেকে। তবে বলতে তো আর পারিনে কিছু, নূতন লোক।”

“সব জানি, সব জানি। আমার চাকরি এই নিয়ে আজ দশ বছরের হ'ল। বিয়ের আগেও দেখেছি। সে কি কাণ্ড, পাস্তুর গাঁথবার জন্তে! এই তখনই মোটরে করে গে বেড়িয়ে নিয়ে আসছে। তখনই আসছে রাশ রাশ

গয়নাপাস্তুর। তার পরে মা ছু-দিনও গেল না, সব কেড়েকুড়ে নিয়ে বাপের বাড়িতে ছু ক'রে ফেলে দিয়ে গেল। দেখিস নে (খুব নিম্নকণ্ঠে) সারা অঙ্গে সেই আইবুড়ো বেলাকার লিক্লিকে ছু-গাছি বালা ছাড়া আর অল্প কিছুই নেই।”

হাতের বইটা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। যাইতে যাইতে সেইটা কুড়াইয়া লইবার জন্ত নিশ্চলা দাঁড়াইল, হেঁট হইয়া সেটা তুলিয়া লইবার সময় তাহারই বাড়ির পরিচারিকা-মহলে তাহার সম্বন্ধে কি আলোচনা হইতেছে কানে আসিল। নিমেঘের জন্ত পাবাণ-মূর্তির মত সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে সেখান হইতে চলিয়া আসিল।

ক্রমশঃ

শবরীর প্রতীক্ষা

শ্রীবাণী দেবী

আনন্দে দারাটি প্রাণ উঠিছে শিহরি
আসিবেন আসিবেন আসিবেন হরি।
আসিবেন আসিবেন আসিতেই হবে তাঁর
বৈকুণ্ঠ ত্যজিয়া দীন কুটীরে আমার।
এ যে ভক্তের ডাক প্রাণের আস্থান
এর চেয়ে দেবতার কোথা আছে স্থান।
হে আমার উপাসিত হে আমার নারায়ণ
কখন আসিবে তুমি কোন্ সেই মহাক্ষণ।
কোন্ ভাবে কোন্ বেশে দাঁড়াবে সমুখে এসে
উছলি বিমল জ্যোতি আলোকাবে প্রাণমন।
শৈশব উন্মেষ হ'তে বসে আছি প্রতীক্ষার
অগণিত কত শত সময় বহিয়া যায়।
গ্রীষ্মশেষে বর্ষা আসে, শরত হেমন্তে মিশে,
শীতান্তে বসন্ত আসি কত শোভা পায়,
ফলে ফলে ভরি ডালা ধরণী সাজায়।
তারি সনে মম চিত্ত নবসাজে সাজে নিতা,
তোমারি পূজার তরে ওগো প্রেমময়,
আশাপথ পানে চাহি দিন বহে যায়।
নারায়ণ নারায়ণ পূর্ণ কর প্রাণমন
ছুঃখ দূর করি কর চিত্ত ভরপুর
দয়া কর দয়াময় প্রাণের ঠাকুর।
বালিকা-বয়সে আমি শুনেছিহু ঋষিবাণী
“নারায়ণ আসিবেন ছয়ারে তোমার
শবরী সাজায় রাথ পূজার সস্তার।”
জানি নাথ! জানি আমি চণ্ডালতনয়া আমি
অপবিত্র দেহ মম পরশে না কেহ,
নীচ জাতি নাহি পাব মানবের মেহ।

তুমি ত গড় নি জাতি, তুমি ত দিয়েছ প্রাণ
তুমি কেন আসিবে না ভগবান ভগবান।
না না তিনি আসিবেন টলিবে আসন তাঁর
প্রাণের আস্থান এ যে নহে ব্যর্থ হইবার।
শৈশবে ডেকেছি তোমা শিশুর সরল মন
ভেবেছি খেলার সাথী তুমি বুঝি নারায়ণ।
বৌবনে তুলেছি ফুল এনেছি নদীর জল
পর্যব ফুলের মালা ধুয়ে দেব পদতল।
তুমি ফুল ভালবাস আপনি সেজেছি ফুলে,
তোমার মধুর নাম শিখিয়েছি পাখীকুলে।
আজিও বিহগদল আজিও নদীর জল
তোমার মধুর নামে করিতেছে চলচল।
বৌবন অতীত এবে ভরা আসিয়াছে নামি।
পূজার সস্তার লয়ে এখনও বসিয়া আমি।
নগ্ন সমুখে মম নামিয়া আসিছে ঘোর,
কতদূরে আছ তুমি প্রাণের দেবতা মোর।
এখনও প্রভাতে উঠি বনে বনে যাই ছুটি
পথের মলিন ধূলি দূর করি তায়,
কাঁটাটি কুড়ায়ে রাখি যদি বাজে পায়।
এই পথে আসিবেন আমার প্রাণের হরি
উথলিবে নদী জল চরণ পরশ করি।
প্রকৃতি সাজিবে ফুলে পাখীরা গাহিবে গান,
সে চরণ বৃকে ধরি সার্থক হইবে প্রাণ।
আগ্রহ উৎসুক প্রাণে চেয়ে আছি পথপানে
পদতলে প্রাণমন করিয়াছি নিবেদন,
তুলে লও বনফুল নারায়ণ নারায়ণ।

লগনের পত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু—

অজিত, তোমাদের ওখানে এক বাছ বই পাঠানো গেছে। তার মধ্যে একটা বই আছে বার্মিংহাম সঙ্ঘে, একটা অয়কেনের মত নিয়ে। পড়ে দেখো এবং যদি লিখতে চাও লিখো। অয়কেনের সঙ্গে আমার মতের যথেষ্ট মিল আছে; কিন্তু একটা বিষয়ে আমার মজা লাগে। অয়কেন খৃষ্টের দিব্যত্ব মানেন না, ত্রিভবদ মানেন না, মধ্যস্থবাদ মানেন না, খৃষ্টের পুনরুত্থান মানেন না, বাইবেলের বর্ণিত অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করেন না, অথচ বলেন তিনি খৃষ্টান এবং খৃষ্টান ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। অর্থাৎ অন্যান্য ধর্মকে অতীতের ইতিহাসে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেখেন এবং তার সঙ্গে এমন একটা ধর্মের তুলনা করেন যেটাকে তিনি নিজের আদর্শের দ্বারা গড়ে তুলছেন। অবশ্য হিন্দুধর্ম সঙ্ঘে আমারও এই রকমের মনোভাব। আমি বলছি যা কিছু মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শের সঙ্গে মেলে তাই হিন্দুধর্ম। কেন-না, হিন্দুধর্মে জ্ঞান ভক্তি কর্ম তিন পন্থাকেই ঈশ্বরের সঙ্গে যোগের পন্থা বলেছেন। খৃষ্টান ধর্মের চেয়ে হিন্দুধর্মের একটা জায়গায় শ্রেষ্ঠত্ব এই দেখি, হিন্দুধর্ম সন্ন্যাসবাদের ধর্ম নয়। খৃষ্টের উপদেশের ভিতরে যে ত্যাগের অনুশাসন আছে সেটা, নিশ্চয়ই পূর্ণতার বিরোধী। হিন্দুধর্মে গৃহধর্মকে একটা খুব আদরের স্থান দিয়েছে—অথচ তাকে দিয়েই সমস্ত জায়গা জোড়ে নি—তাকেও যথানিয়মে যথাকালে অতিক্রম করবার দ্বার খোলা রেখেছে। অতএব হিন্দুধর্মকে বাইরের দিকে যে-সব স্থল আবরণে আবৃত করেছে তাকে বাদ দিয়ে যে জিনিষটাকে পাঠ সে ত কোনো ধর্মের চেয়ে কোনো অংশে নিকৃষ্ট নয়। কেন-না, এতে মানুষের হৃদয় মন আত্মা এবং কর্মক্ষেত্র সমস্তকেই ভূমার দিকে আহ্বান করেছে। আমি এই জন্তেই হিন্দু নাম ছাড়তে পারি নে—ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্ম থেকে

স্বতন্ত্র করতে পারি নে—কেন-না, হিন্দুধর্মই যদি নিজের প্রাণশক্তির দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম হয়ে উঠে এ-কথা সত্য না হয় তবে এ মরীচিকা টিকবে না, কারো কোনো কাজে লাগবে না। অয়কেনের খৃষ্টান ধর্ম জিনিষটা যেমন, আমার হিন্দুধর্মও তেমনি; অর্থাৎ ওর মধ্যে বেটা নিত্য সত্য সেইটের দ্বারাষ্ট ওকে বিচার এবং গ্রহণ করতে হবে। বিজ্ঞানশাস্ত্রের ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখা যাবে বিজ্ঞান হাজার হাজার ভুলের ভিতর দিয়ে চলে এসেছে। সেই ভুলগুলোর দিকেই যদি তাকাই তাহলে ফিসিক্স মিথ্যা, কেমিস্ট্রী মিথ্যা, সত্য বিজ্ঞান নেই বললেই হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রাণের মূলে সত্য আছে। সেই দিকেই তাকিয়ে তাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু যোবতর বৈজ্ঞানিক যখন ধর্মকে বিচার করে তখন তারা ধর্মকে স্থির করে দাঁড় করায় এবং বিজ্ঞানকে চলনশীল করে দেখে। যেমন জীবনের গতি বন্ধ হবামাত্র এই বিকৃতির বোঝা ভারি হয়ে ওঠে, অথচ জীবন চলবার পথে যতক্ষণ থাকে সমস্ত রোগ বিকার অসম্পূর্ণতার ভিতর দিয়েও তার স্বাস্থ্য প্রতিভাত হয়—ধর্মও ঠিক সেই রকমই, তাকে দাঁড় করিয়ে দেখলেই মুক্তিলাভ। হিন্দুধর্মের শত্রু ও মিত্র উভয়েই তাকে দাঁড় করিয়ে দেখতে চায়—শশধর তর্কচূড়ামণিও তাকে খাড়া করে ধরে ফুলচন্দন দেয় আর মিশনারি সাহেবও তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে চূণকালি মাথায়। কিন্তু আমি তাকে চলবার মুখে দেখি, তখন সে তার সমস্ত পাক এবং দূষিত পদার্থের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে, তখন সে যথার্থই পতিতপাবনী স্রোতস্বিনী। আমার মুক্তিলাভ হয়েছে এই যে আমাকে গোড়া হিন্দুও একঘরে করে আমাকে গোড়া ব্রাহ্মও জাতে ঠেলে।

হঠাৎ এক বৈজ্ঞানিক ব'লে বসেছে প্রাণ জিনিষটাকে এক দিন নিশ্চয়ই ল্যাবরেটরীতে তৈরি করতে পারবে— শুনে ধার্মিক লোকের চিত্ত অত্যন্ত উষ্মজিত হয়ে

উঠেচে। অস্তুত এ-জায়গায় আমরা নিশ্চিত। বিজ্ঞান এমন কিছুই বের করতে পারবে না বাতে আমাদের ধর্মকে খামকা চমকে উঠতে হবে। মানুষশিল্পী ত নানা বস্তুর যোগাযোগ করে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করচে, সেটাতে যদি আঁকে ওঠবার কিছু না থাকে তবে মানুষ-বৈজ্ঞানিক অণুপরমাণুর যোগাযোগে প্রাণ সৃষ্টি করলেই বা বিপদ কোন্‌খানে? না-হয় এক দিন প্রমাণ হবে ধূলার মধ্যেও প্রাণ আছে—তাতে ধূলা বড় হয়ে উঠবে প্রাণ ছোট হয়ে যাবে না।

য়েটস্ যে বইটা এডিট্ করচেন তা বাদে আরো অনেক তর্জমা জমে উঠেচে—রোটেনষ্টাইন সেইগুলো দিয়ে আর একটা বই ছাপাতে চাচ্ছেন—তার মধ্যে তোমার তর্জমাগুলোও যেতে পারবে। রোটেনষ্টাইন বলেন, আমার তর্জমার নীচেই তোমার তর্জমা তাঁর সব চেয়ে ভাল লাগে। ইংরেজি তর্জমায় তোমাকে ছাড়াবার অভিপ্রায় আমার কোনোদিন ছিল না—এবং ছাড়িয়েছি বলে কোনোদিন কল্পনাও করিনি—গ্রহের চক্রান্তে গোলমালে কোনোদিন কেমন করে খটে গেছে তা জানি নে—অতএব এতে আমার কোনো দোষ নেই।

আমি, ১৩৩৯

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

21, Cromwell Road.
South Kensington
S. W.

কল্যাণীয়েষু—

সস্তোষ, দুই তিন মেল তোমার চিঠি পাইনি তাই তোমাকে লিখিনি, জানি যে আমার চিঠি তোমরা কোনো না কোনো নামে পাচ্। আমার এ চিঠি যখন শান্তি-নিকেতনে পৌছবে তখন শিউলি ফুলের গন্ধে তোমাদের বন আমোদিত হয়ে উঠেচে এবং সূর্য্যোদয় ও সূর্যাস্ত, শারদশ্রীর সোনার পদ্মবনের আশ্চর্য্য শোভা ধরে দেখা দিচ্ছে। সেই চিরপরিচিত আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে এখানকার আকাশের বিরুদ্ধে আমার মাথায় অত্যাঙ্কি জাগচে। আমার মন বলচে, এখানকার আকাশের মধ্যে রূপের খেয়াল নেই, সে মানুষের মন ভোলাতে চায় না। এখন জ্যোৎস্না-

রাত্রি কিন্তু সে কেবল পাজিতেই দেখি—নিশ্চয়ই আকাশে তারা আছে কেন-না অ্যাষ্ট্রনমিতে তার বিবরণ পাওয়া যায় এবং মেব যে আছে সে-সম্বন্ধে সন্দেহ করবার লেশমাত্র হেতু নেই। এখানকার আকাশ এই রকম কালো ফ্রক-কোট্ এবং কালো চিম্নিপট্ টুপি প'রে অত্যন্ত ভাব্যভাবে থাকে বলেই এখানকার লোকের কাজকন্মের কোনো ব্যাঘাত হয় না। আমাদের দেশের আকাশ আমাদের কাজ ভোলায়; শরৎকালের সোনালি আলোয় আপিস আদালত মাটি করে দেয়—আকাশ আপনার সমস্ত জানালা দরজা এমন ক'রে অহোরাত্র খুলে রেখে দিয়েছে যে মন সে আমদান একেবারে অগ্রাহ করতে পারে না। আমাদের বৈষ্ণব কাব্যে সেইজন্তে যে বাঁশি বাজে সে বাঁশি কুল-বধূর কুলের কাজ ভুলিয়ে দেয়—সে আমাদের সমস্ত ভালো-মন্দ থেকে বাহির ক'রে আনে। কিন্তু এমন কথা এদেশের লোকে মুখে আনতেই পারে না—এমন কি ভগবান আমাদের ভোলাচ্ছেন একথা শুনলে এরা কানে হাত দেয়। কেন-না এদের আকাশে এই বাঁশি অবরুদ্ধ। আমাদের আকাশ যে ছুটির আকাশ, এদের আকাশ আপিসের আকাশ। এদের আকাশে বণ্টা বাজে আমাদের আকাশে বাঁশি বাজায়। সেই জন্তে এরা বলে জীবনসংগ্রাম, আমরা বলি জীবলীলা। ভগবানের লীলার রূপ এখানে আবৃত হয়ে রয়েছে। এই জন্তেই এরা বলতে চায় তিনি নিজেকে পাবার জন্তে নিজে যুঝছেন। তাঁর মধ্যে কোন্‌খানে বিরাম নেই। কিন্তু আমরা যে নিজের চক্ষে দেখতে পাচ্ছি সমস্ত কাজকে ছাড়িয়ে একটি মনোমোহন আনন্দরূপ আপনার অহেতুক সৌন্দর্য্যের মধ্যেই প্রকাশ পাচ্ছে। সেই কাজের বাড়াতে যদি না দেখতে পাই তাহ'লে কাজের বেড়ি আঁটেপুটে বেধে ধরে। কাজের চেয়ে বড়কে হৃদয়ের পদ্মাসনে বসিয়ে তবে কাজ করতে হবে। আমরা সেই বিরামকে দেখেছি, সেই সুন্দরকে দেখেছি, আমরা সেই বাঁশি শুনেছি। কিন্তু বাঁশি যখন আমাদের টেনে আনে তখন যে পথ দিয়ে আমাদের নিয়ে আসে, সেই হুর্গম পথটাকে আমরা এড়িয়ে চলতে চেয়েছি। এইখানেই আমরা একেবারে ঠকে গেছি। কেবল বাঁশি শুনেই তো হয় না, বাঁশি

তুনে যে চলতে হবে; তখন যে ছুঃখের ভিত্তর দিয়ে যেতে হবে বাঁশির সুরের মোহনমন্ত্রে সেই ছুঃখই যে গলার হার হয়ে উঠবে। কাঁটা পায়ে ফুটবে—কিন্তু তাই যদি সহ্য করতে না পারব তবে বাঁশির সুর জন্মের মধ্যে প্রবেশ করলে কই? আজ পর্যন্ত ছুঃখের পথেই আনন্দের অভিসার হয়ে এসেছে, আর কোন পথ নেই। আরামের শয্যা থেকে আমাদের গে ডাক দিচ্ছে সে তো শমনের পিয়াদা নয়, সে বাঁশির সুর। তবে আর ভাবনা কিসের? ছুঃখ না-হয় পেলুম, যথাসর্ব্ব্ব না-হয় দিলুম কিন্তু পরিপূর্ণতার মোহন রূপ যে অমৃত রূপ ঢেলে দিচ্ছে সে তো কিছুমাত্র ম্লান হয়নি। আকাশ ভরে যে বাঁশি বাজছে সেইটেকে জীবনে বাজিয়ে নেবার শক্তি জেগে উঠুক—সেই শক্তিই প্রেম। সে কোনো বাধা-বিপত্তি মানে না,

সে সব বইতে চায়, সব সহিতে এগোয়—তাকে ঘরের কোণে বসিয়ে রাখে কার সাধ্য! আলস্যে তাকে ঘুম পাড়ায় না, বিলাসে তাকে মদ খাওয়ায় না। সেই প্রেমের কৰ্ম্ম, সেই সৌন্দর্য্যের শক্তি, সেই ছুঃখের আনন্দ পরিণামটি উপলব্ধি করবার জন্তেই মন ব্যাকুল হয়ে আছে। মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাও! আমাদের কাজকৰ্ম্ম সমস্তই ক্ষুধার দ্বারা মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত—তাকে অমৃতে মধ্য উত্তীর্ণ করে দাও—তার থেকে লোহার শিকলের ঝঙ্কার একেবারে ঘুচে যাক—বীণার তারই বাজতে থাক।

২৩ আশ্বিন, ১৩১৯

স্নেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত

বর-চুরি

শ্রীসীতা দেবী

সত্তর-আশী বৎসর আগের কথা। তখনকার দিনের কথা এখন উপকথার মত শোনায়, তবু ঘটনাটা উপকথা নয়, সত্যই।

তুই জমিদার বংশ—গুহ এবং মিত্র। পরম্পরের প্রতি ঘৃণা এবং হিংসাটা ইঁহারা পুরুবান্ধুক্রমে উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করিয়া আসিয়াছেন। কবে কি কারণে এই শত্রুতা প্রথম ঘটিয়াছিল, দোষটা কোন্ পক্ষে ছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে এই শত্রুতাটাকেও ধরিয় লওয়া বুদ্ধিমানের কাজ কি না, ইঁহা লইয়া কেহ মাথা ঘামায় না। বাড়ির কর্ত্তা হইতে নববিবাহিতা ছোট বধূটির মনেও এই বৈরিতার ভাব সমান বদ্ধমূল।

পাশাপাশি তুই জেলাতে ইঁহাদের জমিদারী, সুতরাং সংঘর্ষ হইবার অবকাশ ছিল প্রচুর এবং উভয় পক্ষের কেহই কোন দিন এদিককার কোন সুবিধাকে তুচ্ছ করিতেন না। আদালতে মোকদ্দমা লাগিয়াই ছিল,

লাঠিয়ালে লাঠিয়ালে মাথাফাটাকাটিটাও ঘটত তাহার চেয়ে বেশী বই কম নয়। আধ হাত জমি লইয়া মামলা করিয়া লক্ষ টাকা খরচ করিয়া দেওয়া বা দশ-বিশটা মানুষের প্রাণ নষ্ট করার মধ্যে ইঁহারা গোরব বই অগোরবের কারণ কিছু খুঁজিয়া পাইতেন না। দেখা-শুনা ইঁহাদের মধ্যে ছিলই না প্রায়, তবু সামাজিক বিবাহ শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে কোনো তৃতীয় ব্যক্তির গৃহে মধ্যে মধ্যে এই দুই কুলের প্রদীপদের সাক্ষাৎ হইয়াও ঘাইত। সন্মুখেও ভদ্রতার বালাই অপেক্ষা শত্রুতার বালাই বেশী হইয়া উঠিত এবং নিমন্ত্রণকর্ত্তাকে শঙ্কাকুল করিয়া তুলিয়া তাঁহারা সাক্ষাৎ ও পরোক্ৰ ভাবে উভয়ে উভয়ে কে বত রকমে পারেন অপদস্থ ও অপমানিত করিবার চেষ্টা করিতেন। প্রাণে অনেকখানি ভরসা না থাকিলে এই দুইটি বংশের মানুষকে একসঙ্গে নিমন্ত্রণ করিবার কথা কেহ ভাবিতও না।

মেয়েদের ঘরের বাহির হওয়ার রীতি তখন ছিল না, নিতান্ত আত্মীয় ঘর না হইলে এই দুই বনিয়াদী ঘরের বধু বা কস্তারা উৎসব উপলক্ষ্যেও অন্ত্র বাইতেন না। তবু শত্রুর গোষ্ঠীর সকল খবরই ইঁহারা ঘরে বসিয়াই রাখিতেন। কার কয় ছেলে কয় মেয়ে, কোথায় তাহাদের বিবাহ হইতেছে, নূতন কুটুম্ব কিরূপ অর্থ ও প্রতিপত্তিশালী, এ সকল খবর ত বাড়ির পুরুষদের নিকট হইতেই তাঁহারা পাইতেন। ইঁহা অপেক্ষাও অনন্দরমহলের খবর যাহা, যথা, কোন্ বধু কত অলঙ্কার লইয়া আসিল, কোন্ মেয়ের শ্রী কিরূপ, স্ত্রীপুরুষে কোথায় মনের মিল আছে এবং কোথায় নাই, তাহাও ইঁহারা নানা উপায়ে জানিয়া রাখিতেন। নিয় শ্রেণীর প্রজা যাহারা, তাহাদের ঘরের মেয়েরা ত অনন্দরমহলবাসিনী নয়, কাজের খাতিরে সর্বত্রই তাহারা ঘুরিয়া বেড়াইত। জমিদার-বাড়ির অন্তঃপুরেও ইঁহাদের গতিবিধি অবাধ ছিল। জেলেনী মাছ লইয়া, তাঁতিনী শাড়ী লইয়া, যখন-তখন দেউড়ির দরওয়ানকে অগ্রাহ করিয়া সোজাসুজি ভিতরে চলিয়া যাইত। সুতরাং বেশ সহজেই এক বাড়ির হাঁড়ীর খবর আর এক বাড়িতে গিয়া পৌঁছিত।

যে-সময়কার কথা হইতেছে, তখন গুহ-বংশ উজ্জ্বল করিয়া আছেন চন্দ্রকান্ত গুহ এবং মিত্র-বংশের মৈত্রীর অভাব সবচেয়ে জোরগলায় প্রচার করিতেছেন করালীকিঙ্কর মিত্র। পূর্বেকার ধনবল এবং জনবল অনেকটাই কমিয়া গিয়াছে, আশা আছে এই ভাবে চলিতে থাকিলে, যাহা-কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহাও শেষ হইতে বিলম্ব হইবে না, বড়-জোর আর দুই পুরুষ চলিবে। কিন্তু তাই বলিয়া পিতৃপিতামহের নাম ডুবাইয়া দেওয়া চলে না, তাঁহারা যে ভাবে যাহা করিয়া গিয়াছেন, ইঁহাদের আমলেও ঠিক সেই ভাবেই তাহা চলিতেছে।

করালীকিঙ্করেরই অবস্থা এই দুই বংশের মধ্যে একটু বেশী কাহিল হইয়া পড়িয়াছে। উপরি-উপরি কয়েকটা ভারি মামলায় তিনি হারিয়া গিয়াছেন, এবং ছয়টি কস্তার বিবাহে যাহা ব্যয় করিয়াছেন, দুইটি পুত্রের বিবাহ দিয়া তাহার শতাংশের একাংশও ঘরে ফিরাইয়া আনিতে পারেন নাই। সনাতন প্রথা অহুযায়ী তিনি উঠতি ঘর

দেখিয়া কস্তা দিয়াছিলেন, এবং পড়তি ঘর হইতে বধু আনিয়াছিলেন। সুতরাং কস্তাগণ শগুরবাড়ি বাইবার সময় অলঙ্কারে ও অর্থে উঠতি ঘরের বধুর উপযুক্ত ভাবেই গেলেন, বধুরা আসিলেন শুধু বিপুল কুলগৌরব লইয়া। এখনও এক পুত্র ও এক কস্তার বিবাহ বাকী। পুত্রটি দুর্ভাগ্যক্রমে পরিবারের উপযুক্ত নয়। দেখিতে সে ভাইদের চেয়ে ঢের কালো ও দুর্বল, আভিজাত্যের অল্প অনেক গুণ হইতেও বঞ্চিত। অল্প বয়স হইতেই মহিম-বলি দেখিলে সে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেয়, বাপের চাবুকের ভয়ও তাহাকে সেখানে ধরিয়া রাখিতে পারে না। উৎপীড়িত প্রজাকে লুকাইয়া অর্থসাহায্য করিয়া আসে, দণ্ডিত প্রজাকে রাতারাতি জমিদারীর সীমানা পার করিয়া দিয়া আসে। শিকার-খেলা, বাঙ্গনাচ দেখা, ও আনুষঙ্গিক আমোদ-প্রমোদে তাহার কোনই উৎসাহ দেখা যায় না, দিবারাত্রি বই পড়া ও বাগান করা লইয়াই তাহার দিন কাটিয়া যায়। বাড়িতে সকলেই তাহাকে রূপামিশ্রিত অবজ্ঞার চক্ষে দেখে, এক তাহার মা ছাড়া। মা ছেলের ব্যবহারে একটু যে লজ্জিত নয়, তাহা নয়, তবে তাহার প্রতি সহানুভূতির ভাবটাই বেশী। তাঁহারই বংশের কোনো এক পূর্বপুরুষ শাক্ত-বংশের মুখে কালি দিয়া বৈষ্ণব হইয়া নবদ্বীপে চলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। এই ছেলে তাঁহারই স্বভাব পাইয়াছে বলিয়া সকলে তাঁহাকেই খোঁটা দেয়। যাহার জন্ত অত কথা সহিতে হয়, তাহাকে একটু বেশী রকম ভাল না বাসিয়া মা পারেন না। ছেলের সব আবদার তাঁহারই কাছে ; এ-ছেলে পারতপক্ষে যেমন বাপের ছায়া মাড়ায় না, অল্প ছেলেরাও তেমনি মায়ের সংসর্গ অনেকখানি এড়াইয়া চলে। বিমল যে মায়েরই গোপন প্রশ্রয়ে এত-খানি মাটি হইয়াছে, এ-বিষয়ে কাহারও কোনো সন্দেহ নাই। ভাইরাও খোলাখুলি ভাবে তাহাকে বোষ্টম ঠাকুর বলিয়া ডাকে, এবং মালা তিলক ধারণ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যাইতে উপদেশ দেয়।

অল্প ভাইদের সব ষোল-সতের বৎসর বয়সেই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিমলের বয়স কুড়ি পার হইয়া একুশে চলিতেছে, তবু এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। মায়ের ইচ্ছা বিবাহ শীঘ্রই হয়, নয়ত ছেলে সত্যই হয়ত কোনদিন সন্ন্যাসী হইয়া

বাহির হইয়া যাইবে। বাপ বলেন, সমান ঘরে বিমলের সম্বন্ধ করতে তাঁহার লজ্জা বোধ হয়, ইহাকে নিজের পুত্র বলিয়া লোকের সম্মুখে তিনি বাহির করিবেন কিরূপে? ছেলের যেমন চেহারা, তেমন গুণ। দেখিলে বোধ হয় ঠিক যেন চালকলাভোজী ভট্টাচার্য্যের পুত্র, দিনরাত বই মুখে করিয়াও ঠিক তেমনই বসিয়া থাকিতে পারে। কেরাণীর কাজে ইহাকে মানাইবে ভাল, জমিদারী করা ইহার কৰ্ম নয়। মা বলেন, “না-হয় অসমান ঘর থেকেই বউ আন, এমনও ত চের হয়। প্রথম দুই ছেলেরই বিয়েতে কুল ত চের দেখা গেছে, এবার না-হয় থাক।”

করালীকিঙ্কর বলেন, “আমি থাকতে ত নয়। ও-সব চক্রকান্ত শ্বহর দ্বারা হয়, করালী মিস্ত্রির দ্বারা হয় না। টাকার লোভে সে নাকি নাপিতের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়েছে।” চক্রকান্তের নামে এই অপবাদটি প্রচার করিয়া বেড়াইতে করালীকিঙ্করের বড়ই ভাল লাগে। ক্রমাগত বলিয়া বলিয়া তিনি কথাটাকে প্রায় সত্য বলিয়া চালাইয়া দিয়াছেন। চক্রকান্ত সত্যই অবশ্য নাপিতের ঘরে ছেলের বিবাহ দেন নাই। অর্থের লোভে কিছু নীচু ঘরের মেয়ে তিনি আনিয়াছিলেন বটে। বধুর কুলগৌরবের অভাব, তাহার পিতা অর্থ দিয়া এমন ভাবে মিটাইয়া দিয়াছিলেন, যে, চক্রকান্ত কোনদিন এ-কাষের জন্ত অনুতাপ করেন নাই। প্রধানতঃ বেহাইয়ের নিকট হইতে লব্ধ অর্থের সাহায্যেই তিনি করালীকিঙ্করকে উপরি-উপরি দুইটি বড় মামলায় হারাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং বেহাইটিকে নাপিত প্রতিপন্ন করার দিকে করালীকিঙ্করেরই সবচেয়ে বেশী ঝোঁক ছিল। বিবাহ করিতে বিমলের ইচ্ছা আছে কি অনিচ্ছা আছে, তাহা অবশ্য কেহ কোনদিন জানিবার চেষ্টা করে নাই। এ-সকল কথা বর বা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রথা তখন ছিল না।

চক্রকান্ত করালীকিঙ্কর অপেক্ষা বয়সে অনেকটাই বড়। তাঁহার নিজের ছেলে-মেয়েদের বিবাহ অনেক কালই চুকিয়া গিয়াছে, এখন সবে নাতনীদের পালা শুরু হইয়াছে। বড়ছেলের বড়মেয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এখন মেজ ছেলের একটি মেয়ে এবং একটি দৌহিত্রী বিবাহ-যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের জন্ত পাত্র অনুসন্ধান

করা হইতেছে। দৌহিত্রীর মা, তাঁহার তৃতীয়া কন্যা। অল্পবয়সেই বিধবা হইয়া এই কন্যাটি মাত্র লইয়া সে আবার মা বাপের ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। শ্বশুরবাড়িতে যে তাহাকে ভাত দিবার মত অবস্থা নাই, তাহা নহে। তবে মেয়ে ভরসা করিয়া সেখানে থাকিতে পারে না। শ্বশুর-শাশুড়ী বাচিয়া নাই, ভাসুর-দেওরগুলি অতি দুর্দান্ত, তাহাদের নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। মেয়ের বিবাহের ভার তাহার মাতামহের উপরেই পড়িয়াছে। তিনি অবশ্য ইহাতে কিছু কাতর ন'ন। মেয়েটির রূপের খ্যাতি চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রূপ দেখিয়া মাতামহই সাধ করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন পূর্ণিমা। বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান, ইহাকে পরের ঘরে পাঠাইবার নামেই মায়ের বুক কাঁপিয়া উঠিত। তাই তখনকার দিনের আন্দাজে মেয়ের বয়স যথেষ্ট হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও তাহার তখনও বিবাহ হয় নাই। বাড়ির লোকে অবশ্য তাহার বয়স দশের বেশী হইয়াছে তাহা স্বীকার করিত না, কিন্তু পূর্ণিমা বাস্তবিক তখন ত্রয়োদশী। তাহার চেয়ে দুই বৎসরের ছোট মামাতো-বোন কনকলতারও যখন বিবাহের সম্বন্ধ প্রায় স্থির হইয়া আসিল তখন আর পূর্ণিমার বিবাহ না-দিয়া কি করিয়া চলে? সুতরাং চক্রকান্ত ঘটক-বটকীকে দৌহিত্রীর জন্তও পাত্র খুঁজিতে বলিয়া দিলেন। পৌত্রীর বিবাহ অপেক্ষা দৌহিত্রীর বিবাহে তিনি যে খরচ কিছুই কম করিবেন না, তাহাও জানাইতে ক্রটি করিলেন না। দুই-একটি করিয়া এধার-ওধার হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল।

কিন্তু পূর্ণিমার মা উমাশশী কোনো সম্বন্ধই আর পছন্দ হয় না। রকম দেখিয়া তাহার মা বলিলেন, “অত খুঁৎ-খুঁৎ করলে কি আর ছেলেমেয়ের বিয়ে হয় বাছা? একেবারে নিখুঁৎ মানুষ কি আছে? ওরই মধ্যে মন্দটুকু বাদ দিয়ে, ভালটুকুর দিকে তাকিয়ে কাজ করতে হয়। বাকী দৈবের হাত।”

উমাশশী বলিল, “মা, দৈব তোমার প্রতি সদয়, ভগবান করুণ সদয়ই থাক, তাই এ-কথা বলতে পারছ। আমি যে দৈবের দ্বার খেয়েছি মা, আমার অত ভরসা

নেই। সাতটা নয় পাঁচটা নয়, এই একটি ত মেয়ে, ওর অদৃষ্টে দুঃখ আর আমি দেখতে পারব না। তাই যতটা পারি ভাল দেখে দিতে চাই। বাংলা দেশে কি এই চারটি পাত্র ছাড়া পাত্র নেই?”

মা বলিলেন, “থাকবে না কেন? তবে শুধু ছেলে হলেই ত হয় না, আমাদের করণীয় বরও ত হওয়া চাই? সেরকম আর ক’টা আছে? তোমার বাবার মাথা হেঁট করে যেখানে-সেখানে মেয়ে দিয়ে দেওয়া যায় না ত?”

উমাশর্মা জানিত বাবার হেঁটমাথা টাকা পাইলেই আবার সোজা হইয়া যায়। কিন্তু সে-কথা ত আর মাকে বলা যায় না। সে শুধু বলিল, “তবু আর একবার ঘটক-ঘটকীদের একটু ঘুরতে বল। ছেলের বয়স খুব বেশী আমি চাই না, স্বাস্থ্যও যেন ভাল হয়। লেখাপড়া জানা হ’লে ভালই, একেবারে মূর্খ মানুষের স্বভাবচরিত্র প্রায়ই ভাল হয় না।”

মা মেয়ের বাথা কোথায় জানিতেন, নিজেরা তাহার জন্ত যে বরটি আনিয়া দিয়াছিলেন, তাহার না ছিল ঘোবন, না ছিল স্বাস্থ্য; স্বভাবচরিত্রেরও বিশেষ গৌরব করা চলে না। ইহা, তবে অর্থ ছিল, কুলগৌরব ছিল, এ না দেখিলে তাঁহাদের ত চলে না। হতভাগিনী মেয়ের অদৃষ্ট খারাপ, তা এখন অর্থ, বা কুলগৌরবের উপর রাগ করিলে কি হইবে? তিনি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, “তা বেশ, ঘটকীদের বলে দেব আমার রাঙা দিদিমণির জন্তে টুলো ভট্টাচার্য ধরে আনতে।”

করালীকিঙ্করের বাড়িতেও খবর পৌঁছিয়া গেল যে, চন্দ্রকান্ত গুহের পরিবারে জোড়া বিবাহের আয়োজন হইতেছে। তিনি হাসিয়া গোঁফে চাড়া দিয়া বলিলেন, “এবার গুহমশায় গোয়ালী কি তাঁতি কার বাড়ি কাজ করেন দেখা যাক। সৎ কায়স্থের জাত না মারলেই ভাল, তবে টাকায় আজকাল সব হয়।”

অন্ধরমহলেও ইহা লইয়া খুব আলোচনা চলিতে লাগিল। বিমলের বিধবা পিসীমা ভ্রাতৃজায়াকে গুনাইয়া গুনাইয়া বলিলেন, “ও বৌ, গুহর ত ঢাক বাজিয়ে জেলাসুদ্ধ সরগরম ক’রে তুলছে, বাড়িতে জোড়া বিয়ে। তোমাদের ঘরে কি ছেল-মেয়ে নেই, একেবারেই চুপ ক’রে থাকবে?”

করালী-গৃহিণী মুখ আঁধার করিয়া বলিলেন, “ও কথা আমায় গুনিয়ে কি হবে ঠাকুরঝি? আমি ত বিয়ে দেবার মালিক নই, বে মালিক তাকে শোনাও।”

ঠাকুরঝি বলিলেন, “এ-সব মেয়েদেরই ব্যাপার, তারা পিছন থেকে ঠেলা না দিলে কি বেটাছেলেয় এগোয়? তোমার গিরিজাও বেশ ডাগর হয়ে উঠেছে বাপু, আর চোখে দেখা যায় না, আমরা ও-বয়সে চার বছর খুশুর-ঘর ক’রে এসেছি, আর বিমলের ত বয়সের গাছপাথর নেই। ওর কি তোমরা বিয়ে দেবেই না? সত্যিই কষ্ট তিলক ধারণ করাতে চাও নাকি?”

ভ্রাতৃজায়া ননদের ছল ফুটানোর চেষ্টা দেখিয়া মুখ ভার করিয়া উঠিয়া গেলেন। রাত্রে স্বামীকে বলিলেন, “হ্যাঁ গা, তুমি ছেলেমেয়ের বিয়ে দেবে না, আর খোঁটা খেয়ে মরব কি আমি?”

করালীকিঙ্কর বলিলেন, “এ ত বিনা-পয়সায় হবার ব্যাপার নয়, পয়সা আসে কোথা থেকে? অবস্থা ত তোমার অজানা নেই। টাকা ধার করার কতরকম চেষ্টা করছি, পাচ্ছি কই?”

গৃহিণী বলিলেন, “তা বিমলেরই বিয়ে দাও না হয়, তাতে ত টাকা লাগবে না? বরং বরে কিছু আসতেও পারে। গিরির বিয়ে পরের বছর দিলেও হবে, তোমার বোন যাই বলুন, সে এমন কিছু অরক্ষণীয়া হয়ে ওঠে নি। বিমলের বিয়ে ভাল দেখে দিলে, গিরির বিয়ের খরচের ভাবনাও কিছু কমতে পারে।”

করালী ঠোঁটটা প্রায় উন্টাইয়া ফেলিয়া বলিলেন, “পাগল হয়েছ? তোমার ঐ ছেলের জন্তে কেউ টাকা দেবে? ওকে জমিদারের ছেলে বলে বিশ্বাসই কেউ করবে না।”

গৃহিণীর মুখ একেবারে অন্ধকার হইয়া গেল দেখিয়া, তাঁহাকে আবার একটু সুর বদলাইতে হইল। খোঁটা দিবার লোভটুকু ছাড়া যায় না, বড় মধুর জিনিষ, আবার খুব বেশী চটাইয়া দিতেও সাহস হয় না।

অগত্যা বলিলেন, “দেখা যাক, ঘটকচুড়ামণি বামাপদকে একবার ডাক দিই। বউ কি রকম চাও? অন্য বউদের মত কি আর পাবে?”

গৃহিণী বলিলেন, “অন্তগুলিই বা কি এমন স্বগ্গের অঙ্গরী মে তাঁদের জুড়ি মিলবে না।”

কর্তা বলিলেন, “অঙ্গরী ত খোঁজা হয়নি, ভাল ঘরের মেয়ে কি না সেইটাই দেখা হয়েছিল।”

গৃহিণী বলিলেন, “ভাল ঘরে আরও চের মেয়ে আছে, খোঁজ করলেই মিলবে। হাতের পাঁচটা আঙুল কিছু সমান হয় না, আর বিমল আমার কিই বা মন্দ ছেলে? গায়ের রং একটু শ্রাম এই ত তার দোষ? তা কালো কি তোমাদের গুপ্তিতে কেউ নেই না কি? ঐ যে তোমার সেজকাকা ছিলেন, তিনি ত বিমলের চেয়েও কালো।”

করালী বলিলেন, “হুঁ, কিসে আর কিসে। সেজকাকা ক্যাপাণ্ডের শিং ধরে দাঁড় করিয়ে দিতে পারতেন, আর তোমার ছেলে ত বেড়ালের ডাক শুনে চমকে ওঠে। পুরুষের দেহে-মনে শক্তি যদি না থাকে তবে কিসের মরদ? তোমার ছেলের আসল খুঁৎ ত সেইখানেই।” বিমলের উল্লেখ করিতে হইলে কর্তা সর্বদাই বলিতেন, “তোমার ছেলে।” গিন্নী মনে মনে রাগিলেও প্রকাশে প্রতিবাদ করিতেন না।

যাহা হউক, ঘটকচূড়ামণির আগমন দু-চার দিনের মধ্যেই ঘটিল এবং বিমলের পাত্রী খুঁজিতে তাঁহাকে বলিয়াও দেওয়া হইল। গৃহিণী লোকমারফতে বলিয়া পাঠাইলেন মেয়ে যেন সুন্দরী হয়, কারণ তাঁহার ছেলোট কিছু শ্রামবর্ণ। কর্তা ভাল ঘর দেখিতে ত বলিলেনই, টাকার কথাও বলিতে ভুলিলেন না। টাকার এখন প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী, ছেলের মাকে যতই খোঁটা দিন, বিমলকেও টাকা দিয়া জামাই করিতে সব মেয়ের বাপই রাজী হইবে, তাহা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন।

পাত্রীর সন্ধান অবশ্য অবিলম্বেই মিলিল, একটি নয় গুটি ছুই তিন। গৃহিণী সবগুলির বর্ণনা শুনিয়া বলিলেন, “মেয়ে একটিও ত বিশেষ সুশ্রী মনে হচ্ছে না?”

কর্তা বলিলেন, “এখন সাফাৎ উর্কশী না হ’লে বিয়ে দেবে না যদি পণ ক’রে ব’সো, তাহ’লে ত বিপদ। বাঙালীর ঘরে অত সুন্দরী মেয়ে কি ছড়াছড়ি যাচ্ছে? আমি ত রায়েদের বাড়ির সবকটা কিছু খারাপ মনে করছি না, তারা দেবেথোবেও বেশ।”

গৃহিণী বলিলেন, “তা ত হ’ল। তারপর একে ছেলে

কালো, তার একটি কালো পেছনী বউ এনে দাও, আর কালো-জিরের ক্ষেত হয়ে উঠুক আমার বাড়িতে। তখন খোঁটা খেতে আমিই ত খাব?”

কর্তা উত্তর না দিয়া উঠিয়া বাহির বাড়িতে চলিয়া গেলেন। গৃহিণী তাঁহার খাস দাসী মাধবীকে ডাকিয়া বলিলেন, “যা ত মাধী, বামাপদ ঘটকের কাছে।”

মাধবী চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, “ওমা তাঁকে আমি কোথায় পাব গিন্নীমা?”

“কোথায় আবার পাবি, বার-বাড়িতেই পাবি। এখনই কি আর সে বিদায় হয়ে গেছে? সারাদিন বসে তামাক টানবে আর কস্তার সঙ্গে কুম্ব-কুম্ব গুজুর-গুজুর করবে তবে ত? বলবি যে ঘর আলো করা বউ এনে দিতে পারেন ত ঘটক-গিন্নীকে আমি সোনার নথ গড়িয়ে দেব। হাতের কাছে প্রথমেই যা আসবে, তাই যদি শুধু এগিয়ে দেবে ত ঘটকের বাবসা নিয়েছে কেন? আগেকার দিনে ক’নে খুঁজতে খুঁজতে কাশী-কাশীমুদ্র তাই পার হয়ে যেত।”

মাধবী হেলিতে হুলিতে চলিয়া গেল। খানিক পরে হাসিয়া লুটাইতে লুটাইতে ফিরিয়া আসিল। গৃহিণী বলিলেন, “আ মর, রকম দেখ্। অত হেসে মরছিস কেন লা?”

মাধবী হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিল, “ওমা, এত রক্তও জানে বিটলে বামুন, হেসে আর বাঁচি না মা!”

বামুন যাহাই রক্ত করিয়া থাক, তাহা না শুনিয়াই সকলে হাসিতে লাগিল, মাধবীর রকম দেখিয়া। করালীর দিদি খালি তাড়া দিয়া বলিলেন, “আ গেল যা, কথাটা কি হয়েছে তাই বল না মাগী, তোর হাসি শুনে কি আমাদের পেট ভরবে?”

মাধবী বলিল, “খুলে পেতায় যাবে না পিসীমা, আমাকে বামুনটা বলে কিনা ‘গিন্নীমাকে বল গিয়ে অত যদি সুন্দরী বোয়ের সখ থাকে ত চন্দ্রকান্ত গুহ বাবুর নাত্নীকে বৌ করতে, তার মত সুন্দর মেয়ে ত এ বাংলা দেশে কারও ঘরে নেই।’ ওমা কথা শুনে আমি আর কোথায় আছি, যেন বিশ বাঁও জলের তলায় চলে গেলাম।”

পিসীমা মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন, “কথার ছিঁরি দেখ!

চালকলা-থেকে বামুন, কতই আর বুদ্ধি হবে? করালীর তেমন শাসন নেই, আমার বাপের আমলে হ'লে এ-কথা মুখে আর উচ্চারণ করতে হ'ত না বামুনের পোকে।”

গৃহিণী বলিলেন, “যাক্ গে দাসী-চাকরের সঙ্গে ঠাট্টা করেছে, আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে ত বলে নি? শুনেছি বটে গুহদের নাতনী ভারি ডাকসাইটে সুন্দরী, সেদিন ব্রজ-ঠাতির বউও বলছিল।”

বয়সকালে পিসীমারও সুন্দরী বলিয়া খ্যাতি ছিল, তাই পারতপক্ষে তিনি কাহাকেও সুন্দরী বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তিনি বলিলেন, “ওগো যার গান শুনি নি সে বড় গাউনি, আর যার রান্না খাই নি সে বড় রাধুনি। বাংলা দেশে না-কি আবার অমন মেয়ে নেই? বামাপদ-ঘটক বাংলা দেশের সব মেয়েকে দেখেছে না-কি? বিয়ে দিতে হবে, বাপমরা মেয়ে, কাজেই ও-রকম ভাল মন্দ ছ-চার কথা না রটালে চলবে কেন?”

বিমলের মা বলিলেন, “না গো ঠাকুরঝি, মেয়ে সুন্দর হওয়ারই কথা, ছোটবেলায় ওর মাকে দেখেছি খাসা দেখতে, এ ত তারই মেয়ে, সুন্দর হবে না কেন?” ননদিনী বান্ধকের দরজায় পৌছিয়াও যে অতীত রূপের জাঁক করিয়া বেড়ান, ইহা করালী-গৃহিণীর ভাল লাগিত না।

বাহা হউক, দুই পরিবারেই আসন্ন উৎসবের সাদা পড়িয়া গেল। চন্দ্রকান্তের ত দুইটিই কন্ঠাদানের ব্যাপার, সুতরাং জোগাড়টা খুব রাজকীয় ভাবেই হইতে লাগিল। উমাশশী নিজের যথাসর্বস্ব বাহির করিয়া দিল, গহনাতে টাকাতে তাহা নিতান্ত মন্দ হইল না। তা ছাড়া পূর্ণিমার মাতামহও ক্রটি রাখিবেন না বোঝা গেল। মেয়ের অকালবেধবা খানিকটা যে নিজের দোষে ঘটিয়াছে, তাহা অন্ততঃ নিজের কাছে ঠাহাকে স্বীকার করিতেই হইত, সুতরাং নাতনীর বিবাহে যথাসম্ভব খরচ করিয়া তিনি সে ক্রটিটার প্রায়শ্চিত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পাত্রটি পছন্দ হইলেই হয়, আর সব আয়োজন এক রকম সম্পূর্ণই হইয়া গেল।

বিমলের ক্ষত্ৰও এদিকে পাত্রীর পর পাত্রী আসিয়া জুটিতে লাগিল। দশ-বারোটিকে নামজুর করার পর একটি পাত্রীর কথা বিমলের মায়ের একটু মনে লাগিল। মেয়েকে

অবশ্য তিনি দেখেন নাই, বহুদিন পূর্বে কোন এক কুটুম্বের বাড়িতে তাহার মা-মাসীদের দেখিয়াছিলেন। তাহাদের ত চোখে ভালই লাগিয়াছিল, মেয়ে সেই রকম হইলে মন্দ হইবে না।

বিমলের পিসীমা বলিলেন, “মা-মাসীর মতই যে হবে এমন কি কথা আছে? তাই যদি সবাই হ'ত, তাহ'লে আর ভাবনা ছিল না।”

কথাটার ঠেশ্, কোথায়, তাহা আর কেহ বুঝুক বা নাই বুঝুক বিমলের মা বুঝিলেন। মনে মনে বলিলেন, “তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখনও ঠসক দেখ না। রূপ ত আর কারও হয় না?” প্রকাশ্যে কিছু বলিলেন না, কারণ ননদের মুখে উপর কথা বলার নিয়ম তখনও প্রবর্তিত হয় নাই।

পিসীমা নিজেই বলিয়া চলিলেন, “নিজেরা একবার দেখতে পারলে হ'ত। বেটাছেলেরা ওসব বোঝেও না, ওদের চোখে ধুলো দিতে কতক্ষণ? সেই যে আমার সেজদেওরের বিয়ের সময় কি ঠকানটাই না ঠকালে।”

ভ্রাতৃজায়া বলিলেন, “নিজেরা কি ক'রে আর দেখা যায়? সেই কোন্ রাজ্যে তাদের বাড়ি, ধারে কাছে হ'লে না-হয় ছুতো-নাতা ক'রে দাসী-টাসী পাঠিয়ে দেখা যেত।”

ননদ বলিলেন, “ওদের বাড়ি সেই জোড়তলা গাঁয়ে ত? আমাদেরও ত বাগানবাড়ি রয়েছে তার খুব কাছেই. চল না একটা ছুতো ক'রে দিন-কয়েক সেখানে থেকে আসি। তারপর মেয়ে দেখতে কতক্ষণ? কাছেই জগদ্ধাত্রী-মন্দির আছে, সেখানে পূজো দিতে গেলেই হ'ল?”

বিমলের মা মুখভার করিয়া বলিলেন, “তোমার ভাই যেতে দিলে ত? জোড়তলা যে গুহদের জমিদারীর মধ্যে বললেই হয়, সেই জন্তে ওদিকে আমাদের কোনদিনই যেতে দেন না।” ননদ বলিলেন, “তারা আছে নিজদের বিয়ের ভাবনা নিয়ে, তোরা কোথায় যাচ্ছিস, না-যাচ্ছিস, তাই দেখতে আসছে আর কি? হ'লই বা তাদের জমিদারীর কাছে? এখন কোম্পানীর মুলুক, সে দেশ আর নেই যে যখন যার খুশী ঘরে ঢুকে মাথাটা কেটে

নেবে। আচ্ছা দেখি, আমি করালীর মত করাতে পারি কি না।”

ভাইয়ের পিছনে বিধিমত লাগিয়া তিনি তাঁহাকে প্রায় রাজী করিয়া আনিলেন। দিন-কতক পরিবার-পরিজনকে দূরে পাঠাইয়া দিতে তাঁহার খুব বেশী আপত্তি হইল না। উপযুক্ত পরিমাণে দরোয়ান লাঠিয়াল অবশ্য সঙ্গে চলিল। এই মেয়েটি গৃহিণীর পছন্দ হইলে যথেষ্ট লাভ হইবার সম্ভাবনা ছিল, সেটাও আপত্তি না করার একটা কারণ। নিজেও দিন-কতক গিয়া বাগান-বাড়িতে থাকিয়া আসিবেন বলিয়া সকলকে তিনি আশ্বাস দিয়া রাখিলেন।

পূর্ণিমার এদিকে বিবাহ ঠিক হইয়া গেল। পাত্র, উমাশর্মীর খুব যে পছন্দ হইল তাহা নহে, কিন্তু এদিকে যে প্রায় ঠক বাঁচিতে গা উজাড় হইবার জোগাড়। পূর্ণিমার বিবাহ হইতেছে না বলিয়া কনকলতার বিবাহও পিছাইয়া যাইতেছে, এবং বাড়ির লোক চটিয়া খুন হইতেছে।

করালীকিঙ্কর ঘরে বসিয়া বসিয়া এই সম্বন্ধের কথা শুনিয়া রাগিয়া আশ্রয় হইয়া উঠিলেন। এই পাত্রটিকে তাঁহার নিজের কনিষ্ঠা কন্যা গিরিজার জন্ম মনে মনে বহুদিন হইতে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। শুধু হাতে টাকা না থাকায়, সম্বন্ধ করিতে অগ্রসর হন নাই। পাত্রটি কুলগৌরবে অতিশয় গরীয়ান, কিন্তু আর্থিক অবস্থা মোটেই সে অনুপাতে সচ্ছল নয়, সুতরাং কন্যার সঙ্গে যথেষ্ট রক্তকাক্ষণ যোগ না করিলে এ হেন পাত্রের আশা করা বৃথা। পাত্রটির শারীরিক শক্তি ও সাহস তখনকার দিনে দেশবিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। চব্বিশ বৎসর বয়সেই অনেকগুলি ব্যাঘ্র শিকার করিয়া সে “বাঘা সুরেন” নাম পাইয়াছিল। এমন পাত্র কিনা শেষে চন্দ্রকান্ত গুহ কয়েকটা টাকা বেশী দিয়া ভাঙাইয়া লইল? করালীকিঙ্কর একলা ঘরে বসিয়া আপনমনে গর্জাইতে লাগিলেন।

কিন্তু শুধু ঘরের কোণে বসিয়া গর্জন করিয়াই নিরস্ত থাকিবার মানুষ তিনি নহেন। মনে মনে মতলব স্থির করিয়া, তিনি কাজে লাগিয়া গেলেন। এই পাত্রটির

বাড়ি তাঁহার ঐ পূর্বোল্লিখিত বাগানবাড়ির খানিকটা কাছে পড়ে, অন্ততঃ এ-বাড়ি হইতে ত কাছে বটে। কথাবার্তার সুবিধা হইবে বলিয়া কিছুদিনের মত বড় ছেলের উপর জমিদারী-সংক্রান্ত সব কাজের ভার দিয়া তিনি বাগানবাড়ি যাত্রা করিলেন। গৃহিণী ও বিমল, তাঁহার দিদিকে লইয়া দিন দশ-বারো আগেই ওখানে গিয়া গুচাইয়া বসিয়াছিলেন।

করালীকিঙ্কর বাগানবাড়িতে পৌঁছিয়াই আর সময় নষ্ট না করিয়া চন্দ্রকান্ত গুহের যে জাতমান কিছুই নাই, তাহা প্রমাণ করিতে বসিয়া গেলেন। গৃহিণী ও দিদি তখন বিমলের ভাবী বধূটিকে কি উপায়ে দেখা যাক, তাহারই ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত ছিলেন, করালী কি করিতেছেন না-করিতেছেন সেদিকে তাঁহাদের খেয়াল ছিল না। অবশ্য তাঁহারা জানিলেই যে করালীকিঙ্করকে নিরস্ত করিতে পারিতেন তাহাও নয়।

মানুষের নিন্দাটা প্রশংসা অপেক্ষা সহজে লোকে বিশ্বাস করে, সুতরাং করালীর চেষ্টা একেবারে বিফল হইল না। পূর্ণিমার সম্বন্ধটা একেবারে পাকা হইয়া আসিয়াছিল, আবার যেন কাঁচিয়া যাইবার উপক্রম করিল। দেনাপাওনা একপ্রকার স্থির হইয়াছিল, আবার তাহা লইয়া তর্কাতর্কি শুরু হইল। কিন্তু করালীকিঙ্কর যেমন পণ করিয়াছিলেন এ-বিবাহ ঘটিতে দিবেনই না, চন্দ্রকান্ত তেমনি বোধ হয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, এই বিবাহ ঘটাইকেনই, কাজেই তই পক্ষের প্রচণ্ড টানাটানির মধ্যে পড়িয়া, পাত্রের বাড়ির লোকেরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া যাইবার জোগাড় করিল।

কিন্তু তর্কাতর্কি, ঝগড়াঝাঁটির মধ্যেই পূর্ণিমার বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল, নিমন্ত্রণ-পত্রও বিতরণ হইয়া গেল। চন্দ্রকান্ত ভাবিলেন পাত্রপক্ষ এবার আর কথা ঘুরাইতে ভরসা করিবে না। চন্দ্রকান্ত গুহকে অতখানি অপদস্থ করিতে সাহস করিবে, বাংলা দেশে এমন মানুষ আছে বলিয়া তিনি বিশ্বাসই করিতেন না।

বিবাহের দিন আসিয়া পড়িল। প্রকাণ্ড সাতমহলা বাড়ি লোকজনে গনগম্য করিতেছে। নহবৎখানার নহবৎ বসিয়াছে তিন-চার দিন আগে হইতে। ষরযাত্রীদের আদর-

অভ্যর্থনায় যাহাতে কোন খুঁৎ না থাকে তাহা তদারক করিবার জন্ত বুদ্ধ কর্তা নিজেই আসরে নামিয়াছেন, অন্য কাহারও উপর ভার দিয়া নিশ্চিত হন নাই। নানারকম সুখাদ্যের আয়োজন হইয়াছে, স্থানীয় পাচকে সব যদি না পারে, একজন্ত নানা স্থান হইতে পাচক ও ময়রা জোগাড় করিয়া আনা হইয়াছে। বিকাল হইতে পূর্ণিমারূপিণী পূর্ণিমা রক্তাশ্বরে মাল্যচন্দনে ও রত্নালঙ্কারে সাজিয়া বসিয়া আছে, সখীর দল তাহাকে ঘিরিয়া কলরব করিতেছে। চারি দিকেই উৎসবের আনন্দ ও শোভা, শুধু উমাশশীর মনে আশঙ্কা ও আনন্দ যেন পাশাপাশি রাজত্ব করিতেছে। চার হাত এক হইয়া না-যাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার আর শান্তি নাই।

সন্ধ্যার পরেই প্রথম লগ্ন। এখনও বরপক্ষীয়দের দেখা নাই। সকলেই একটু মেন উদ্বেগ অনুভব করিতে লাগিল। বাড়ি ত তাহাদের বেশী দূরে নয়, সময়মত বাহির হইলে এতক্ষণে আসিয়া পড়ার কথা। কি ব্যাপার কেহ বুঝিতে পারে না। চন্দ্রকান্তের মুখের দিকে তাকাইয়া সবাই ভয়ে ভয়ে এধার-ওধার সরিয়া যাইতে লাগিল, সাহস করিয়া কে তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে যাইবে? বর যেন আসিয়া পড়িল বলিয়া, এমন ভাবে তিনি সকলকে কাজ করিতে হুকুম করিয়া যাইতেছেন, তাঁহার আদেশ অমান্য করিবার কথাও কেহ ভাবিতেছে না।

লগ্ন আসিয়া পড়িল, কাহারও দেখা নাই। সকলের মানা অগ্রাহ করিয়া উমাশশী আসিয়া বাপের পায়ের উপর আছাড় খাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, “বাবা, আমার খুকীর কি দশা হবে?”

চন্দ্রকান্ত প্রলয়মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত মুখ তুলিয়া বলিলেন, “কাঁদিস নে, আরও লগ্ন আছে। বর এল ব’লে, তুই ভিতরে যা।”

উমাশশী ভিতরে চলিয়া গেল। চন্দ্রকান্ত একবার কাছারি-বাড়িতে গিয়া কাহার সহিত কি পরামর্শ করিলেন শোনা গেল না, তাহার পর বাহিরে আসিয়া বলিলেন, “আলো যেন একটি না নেবে, বাজনা যেন এক মুহূর্ত না থামে, আমি এক ঘণ্টার মধ্যে বর নিয়ে আসছি।”

উৎসব-ভবন কি এক নিদারুণ অজানা আশঙ্কায় যেন রুদ্ধ-

ধাসে অপেক্ষা করিতে লাগিল। পাচ-শ সশস্ত্র লাঠিয়াল, ঘোড়া ও হাতি লইয়া চন্দ্রকান্ত বাহির হইয়া গেলেন। অন্তরমহলে ক্রন্দনের রোল উঠিল, তাহাকে ডুবাইয়া নহবৎ সমানে বাজিতে লাগিল।

কিন্তু এক ঘণ্টা শেষ হইতে না-হইতে বর আসিয়া পড়িল। তুমুল শব্দ ও ছন্দবিনিতে আকাশ যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল, প্রচণ্ড শব্দে বোমা পটকা ফুটিয়া পশুপক্ষীকেও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। কান্নাকাটি ভুলিয়া মেয়েরা দলে দলে ছাদে ও জানলার ধারে ছুটিল বর দেখিবার জন্ত।

বরের হাতী ঐ যে। চন্দ্রকান্তের গৃহিণী আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন, “ওমা ও কে গো? এত আমাদের সুরেন নয়? কত কোথা থেকে এ শুকনো কালো ছোঁড়াকে নিয়ে এলেন?”

পাশ হইতে দাসী অন্নালি বলিয়া উঠিল, “হায়, হায়, কোথায় যাব মা! এ যে মিত্তিরদের ছোট ছেলে বিমল! কত একে কি ক’রে আনলেন গো গিন্নিমা? এখুনি যে খুনোখুনি বেধে যাবে? হায় হায় আমাদের রাঙা দিদিমাণির একি হ’ল মা?”

কিন্তু সকল আর্তনাদ, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও উত্তরের মধ্যে বিবাহ হইয়া গেল। চন্দ্রকান্ত পূর্ণিমাকে নিজে নামাইয়া লইয়া সভাস্থলে চলিয়া গেলেন। অন্তরমহলে আবার কান্না উঠিল, “ওমা, স্ত্রী-আচার হ’ল না, কিছু না, একি বিয়ে গো মা!”

সম্প্রদান আদি হইয়া গেল। কণ্ঠা জামাতাকে তুলিয়া আনিয়া চন্দ্রকান্ত বলিলেন, “নাও, এবার কত স্ত্রী-আচার করতে পার কর।” বিমলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, “নাতজামাই, ডাকাতি ক’রে এনেছি বটে তোমায়, তবে তুমিও আমার ধরের সব সেবা রত্ন লুটে নিয়ে চললে।”

পাঁচ-শ লাঠিয়াল সারারাত বাড়ি ঘিরিয়া রহিল। প্রতি মুহূর্তে সকলের মনে আশঙ্কা জাগিতে লাগিল এই বুঝি পুত্র-হরণের প্রতিশোধ লইবার জন্ত করালমূর্তি করালীকিঙ্করের আবির্ভাব হয়। আসন্ন সংঘর্ষের জন্ত সকলে প্রস্তুত হইয়া রহিল। বাসর-বরেও সকলে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া, শুধু বিমল এক-একবার চোরা চাহনীতে নবপরিণীতা পত্নীর অপূর্ণ

সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে।

ভোরের সঙ্গে সঙ্গে করালীকিঙ্করও দলবল লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হাকিয়া বলিলেন, “বের কর আমার ছেলে, নইলে একটিরও ঘাড়ে মাথা থাকবে না।”

চক্রকান্তের লাঠিয়ালরা কাহার যেন আদেশে ছুই কাঁক হইয়া পথ করিয়া দিল। বিমল ও তাহার বধু, ধীর পদক্ষেপে বাহির হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

করালীকিঙ্কর মুগ্ধ বিস্ময়ে পূর্ণিমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। বধুও অশ্রুসজল বিক্ষারিত নেত্রে ঋগুরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

খানিক পরে করালীই নিস্তকতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, “বাক্, খুব চাল চাললেন গুহ-মশায়। কিন্তু জিত্তেছি ত আমিই। এস মা, তোমার নূতন ছেলের বাড়ি নেতে হবে সে?”

বর ও বধু অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। উভয় পক্ষের লাঠিয়ালের দল তুমুল জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। উমাশশী সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। পূর্ণিমার হাত বিমলের হাতে সম্পিয়া দিয়া বলিল, “মা লক্ষী, আশীর্বাদ করি এই ঘর তোমার চিরদিনের ঘর হোক। সব অশান্তি চিরদিনের মত তোদের মিলনে খেন দূর হয়ে যায়।”

মাতৃতের আশ্রয় করালীর হাতী অগ্রসর হইয়া আসিয়া বসিয়া পড়িল। বরকনেকে তুলিয়া লইয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং মাস্তুলিক ছল ও শজা ধ্বনির ভিতর দিয়া ক্ষিরিবার পথে আবার চলিতে আরম্ভ করিল। উমাশশী অশ্রুসজল চোখে যাত্রাপথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী এস, এ, হুসেন ইক্বাল-উন্-নিসা বেগম মহীশূর সরকারের শিক্ষা-বিভাগে নিযুক্ত আছেন। তিনি সম্প্রতি বিলাতে লীড্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষাবিষয়ক উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি হাইট্‌সারলাও অন্তর্জাতিক বালিকা-গাইড-সম্মেলনে প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিয়া ছিলেন।



শ্রীমতী এস, এ, হুসেন

পৃথিবীর বৃহত্তম জন্তু

শ্রী অশেষচন্দ্র বসু, বি-এ

পৃথিবীর বৃহত্তম জীবের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে অনেকেই হয়ত হস্তীর বিষয় চিন্তা করিবেন, কিন্তু হস্তীর অপেক্ষাও বৃহদাকার প্রাণী যে পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে তাহা বোধ হয় অনেকেই প্রথম চিন্তায় ধারণা করিতে পারিবেন না। এই বৃহত্তম জীবের পূর্বপুরুষেরা স্থলচর হইলেও ইহারা এক্ষণে মহাসমুদ্রে আশ্রয় লইয়া পৃথিবীর সর্ববিধ জীবজন্তুর মধ্যে আকার-আয়তনে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। পৃথিবীর এই বৃহত্তম জীবের সাধারণ নাম তিমি এবং বৈজ্ঞানিক নাম সেটেসিয়া (Cetacea)। দেহের বিপুলতায় স্থলচর জলচর সর্ববিধ প্রাণীকে অতিক্রম করিয়া ইহারা মহাজলধির কক্ষিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

তিমি ও সীলকে সাধারণতঃ মৎস্য বলিয়া উল্লেখ করা হয়। কিন্তু বাড়ডকে পক্ষী বলিলে যেকোন লম্ব হয় তিমি ও সীলকে মৎস্য বলিলেও তদ্রূপ লম্ব পড়িতে হয়। জলে অবস্থান করিলেও তিমির আদৌ মৎস্য-জাতীয় নহে। চতুষ্পদ জীবের সহিত ইহাদের বাহ্যিক কোন সাদৃশ্য না থাকিলেও দেহের আভ্যন্তরিক গঠনে অনেক বিষয়ে ইহাদের সহিত তিমির মিল আছে। তিমির কুস্কুম, হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড, প্লীহা, বরুত, পাকস্থলী, অঙ্গ, মূত্রনালী এবং জননেন্দ্রিয় চতুষ্পদ প্রাণীদের অনুরূপ। চতুষ্পদ প্রাণীদিগের মত ইহারা কুস্কুমের দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস-কার্য সম্পন্ন করে। চতুষ্পদ জীবের মতই ইহাদের হৃৎপিণ্ড চারিটি কোষে বিভক্ত। এই হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়া ইহাদের বিপুল কলেবরে উষ্ণ শোণিত ধারা প্রবাহিত হয়। ইহাদের 'পাখনা,' পঞ্জর, মস্তক প্রভৃতির অস্তির সহিত চতুষ্পদের কঙ্কালের সাদৃশ্য আছে। ইহাদের দেহের দুই পার্শ্বের পাখনার অস্থিগুলি লক্ষ্য করিলে বেশ বৃষ্টিতে পারা যায় যে, উহা মৎস্যের সাধারণ পাখনার মত নহে। এই পাখনার কঙ্কাল দেখিতে আমাদের হস্তের কঙ্কালেরই মত। ইহার মধ্যে স্ক্কাস্থি, উর্ধ্ব ও নিম্ন বাহুর অস্থি, এবং পঞ্চাঙ্গুলির অস্থিসকল স্পষ্টই

দেখিতে পাওয়া যায়। পাখনা দুইটিকে ইহারা হস্তের মতই ব্যবহার করে। স্তন্যপান করাইবার সময় স্ত্রী-তিমিরা শাবককে পাখনার দ্বারা টানিয়া লয় এবং ভীত বা তাড়িত হইলে ইহা দ্বারা শাবককে ধরিয়া পলায়ন করে। চতুষ্পদদিগের মতই তিমিরা শাবক প্রসব করে এবং উহাকে এক বৎসরকাল স্তন্যপান করাইয়া থাকে। এই সকল কারণে মনে হয় তিমিদের পূর্বপুরুষেরা স্থলচর জীব ছিল এবং সে-কালের অতিকায় গোধা, অতিকায় সরীসৃপ এবং অতিকায় চতুষ্পদদিগের মত পৃথিবীর শৈশবে মেদিনী বিকম্পিত করিয়া বিচরণ করিত। যে আদিম মানবের অত্যাচারে মামগণ বা অতিকায় হস্তী প্রভৃতি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে সেই অসভ্য যুগযুগের আশ্রয় লইতে বাধা হইয়াছিল। শেষে যুগযুগান্তরের ক্রম-বিবর্তনের ফলে তাহাদের পূর্বাকৃতি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া জলে বাসোপযোগী হইবার নিমিত্ত মৎস্যের মত হইয়া গিয়াছে এবং হস্ত দুইটি পাখনার ও দেহের শেষাংশ মৎস্যপুচ্ছের মত রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছে।

জলে আসিয়া বাস করার নিমিত্ত তিমির দেহের আকার-পরিবর্তনের সহিত ইহাদের অস্থিসমূহের গঠনও বিভিন্নরূপ হইয়াছে। ৬০ ফুট দীর্ঘ তিমির ওজন প্রায় ১,৯০০ মণ বলিয়া অনুমান করা যায়। গ্রীনলাণ্ড-তিমিদের ওজন প্রায়ই এক শত টন বা প্রায় ২,৭৫০ মণ হইতে দেখা যায়। হস্তীর সহিত তুলনা করিলে এই প্রকার একটি তিমিকে প্রায় ৮৮টি হস্তী অথবা ৪৪০টি বৃহৎ ভল্লকের সহিত ওজনে সমান হইতে দেখা যায়। ইহাপেক্ষা বৃহৎ তিমির ওজন যে কিরূপ তাহা অনুমানসাপেক্ষ। এই প্রকার বিপুল দেহের অস্থিগুলি হস্তিকঙ্কালের মত নিরেট হইলে তিমিকে জলে আর সম্ভরণ দিতে হইত না। এই বিশাল দেহকে সমুদ্রের জলের মধ্যে ভাসমান রাখিবার

নিমিত্ত ইহাদের দেহের অস্থিগুলি ছিদ্রময় এবং চর্মের নিম্নে খুব পুরু বসার উৎপত্তি হইয়াছে। সুপারি বা নারিকেল গাছ কাটিলে গাছের গুঁড়িকে যেমন সছিদ্র দেখায় তিমির অস্থিগুলিও সেইরূপ ছিদ্রময়। এই



স্পাম' বা তৈলতিমি

ছিদ্রগুলি আবার তৈলে পূর্ণ থাকে। কলিকাতার ঘাটঘরে তিমির যে-সকল কঙ্কাল রক্ষিত হইয়াছে সে-গুলি লক্ষ্য করিলেই ইহাদের অস্থির গঠন উপলক্ষি করা যাইতে পারে।

জলে আসিয়া বাস করার ফলে অস্থির গঠন-পরিবর্তনের সহিত যে বসার উৎপত্তি হইয়াছে তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এক ইঞ্চি পুরু চর্মের নিম্নে প্রায় ১০ হইতে ১৫ ইঞ্চি পুরু বসা ইহাদের সমস্ত দেহটিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। কর্ক যেমন বৃক্ষের কাণ্ডকে চারি দিকে আবৃত করিয়া শীতাতপের আধিক্য হইতে গাছকে রক্ষা করে তিমির পুরু বসাও সেইরূপ ইহাদিগকে সহজে ভাসমান থাকিবার উপযোগী করিয়া জলের শৈত্য হইতে ইহাদের অঙ্গতাপ রক্ষা করে। তিমি ব্যতীত সীল এবং সিদ্ধুঘোটকদের দেহে এই উদ্দেশ্যে পুরু বসার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

প্রাণিতত্ত্ববিদেরা তিমিকে সাতটি প্রধান শ্রেণীতে

বিভক্ত করিয়া থাকেন। তিমিদের মধ্যে কতকগুলির দস্ত থাকিতে এবং কতকগুলিকে দস্তহীন হইতে দেখা যায়। প্রথমোক্ত শ্রেণীর মধ্যে বিষুবমণ্ডলের অন্তর্ভুক্তী সমুদ্র-সমূহের 'স্পাম' হোয়েল' বা তৈলতিমি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই তিমির আকারে সাধারণতঃ ৫৫ ফুট হইতে ৬০ ফুট অবধি দীর্ঘ এবং প্রায় ১৬ ফুট উচ্চ। ৭৬ ফুট দীর্ঘ তৈলতিমি ধৃত হইবার কথাও শুনা গিয়াছে। স্ত্রী-তৈল-তিমিরা কিন্তু এরূপ বৃহৎ হয় না। খুব বৃহৎ হইলেও স্ত্রী-তৈলতিমিকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফুটের অধিক দীর্ঘ হইতে দেখা যায় না। এই তিমিদের কেবল মাত্র নিম্ন চোয়ালের মাড়িতে দস্তের শ্রেণী থাকিতে দেখা যায়। উপর চোয়ালে দস্ত থাকে না। নিম্ন-চোয়ালে দস্ত বসিবার নিমিত্ত উপরকার চোয়ালে অনেকগুলি গহ্বর থাকিতে দেখা যায়। বৃহৎ তৈলতিমির এক একটি দস্ত ওজনে প্রায় এক সের হইতে দুই সের অবধি হইয়া থাকে।

তৈলতিমি ব্যতীত উত্তর-হিমকোট-মণ্ডলের সমুদ্র-বাসী নার্কালদিগেরও উপর-চোয়াল হইতে অদ্ভুত আকারের একটি পাকান দস্ত দেহের সহিত সমান্তরালে বাহির হইয়া থাকে। নার্কালেরা মাত্র বিশ-পঁচিশ ফুট দীর্ঘ হইলেও ইহাদের দস্ত ৯ হইতে ১৪ ফুট অবধি দীর্ঘ হইয়া থাকে। এই দস্ত ফাঁপা এবং দেখিতে গোলাকার সূক্ষ্মগ্র দস্তের মত। ইহার বর্ণ হস্তিদস্তের মত শুভ্র এবং অগ্রভাগ সূঁচের মত তীক্ষ্ণ। এইরূপ আকারের নিমিত্ত



গ্রীনলাণ্ডের বৃহৎ তিমি

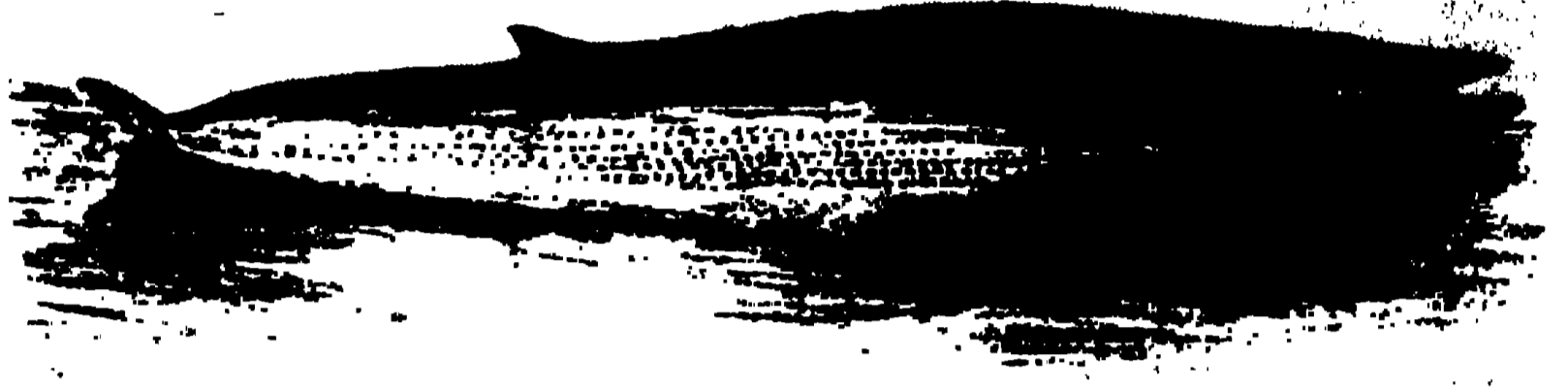
ইহাকে নার্কালের দস্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে বিধাবোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা উহাদের উপর-চোয়ালের রূপান্তরিত ছেদনদস্ত ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সাধারণতঃ নার্কালদের একটিনাত্র দস্ত থাকিলেও

ছই দন্তযুক্ত নার্কালেরও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কখন কখন এই দন্ত পাকান-ভাবের না হইয়া বেশ মসৃণ হইয়া থাকে।

দন্তহীন তিমির মধ্যে গ্রীনলাণ্ডের বৃহৎ তিমি এক নীল তিমি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রীনলাণ্ডের তিমির দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০ হইতে ৭০ ফুট। তিমি বলিতে সাধারণতঃ গ্রীনলাণ্ডের তিমিকেই বুঝাইয়া থাকে।

আবার অনেক সময় এই দন্তকে ঈষৎ বক্রাকারেও বর্জিত হইতে দেখা যায়। বর্ণ এবং গঠনে গজদন্তের মত হইলেও বস্তুহিসাবে ইহা গজদন্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ। গজদন্ত যেরূপ কালক্রমে হরিদ্রাভ হইয়া যায়, নার্কালের দন্ত সেরূপ হয় না। পূর্বে এই দন্ত মূল্যবান সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইত। এই দন্ত নার্কালের আকৃতিকে ভীতিপ্রদ করিয়া দিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহারা অতি নিরীহ প্রাণী। দন্ত দ্বারা শত্রু আক্রমণ করিতে বা আত্মরক্ষায় এই দন্ত ব্যবহার করিতে ইহাদিগকে বড় দেখা যায় না। কি উদ্দেশ্যে যে ইহাদের মুখে এই সুদীর্ঘ দন্তের উদ্ভব হইয়াছে তাহা এখনও বিশেষ বুঝিতে পারা যায় নাই। সম্ভবতঃ অবস্থায় ইহাদের ক্রীড়া-কৌতুক লক্ষ্য করিলে এই দন্তকে ইহাদের পক্ষে নিগ্রহ-স্বরূপ বলিয়াই গণনা করা যাইতে পারে।



ররকোয়াল বা নীল তিমি
মুকবদীর শ্রীমণীশনাথ পাল কর্তৃক অঙ্কিত

ইহাদের মুখে দন্তের পরিবর্তে পঞ্জরাস্থির মত অনেক-গুলি লম্বা লম্বা হাড় থাকিতে দেখা যায়। এই হাড়গুলি উপরকার চোয়াল হইতে চিরুণীর দাঁতের মত নীচের চোয়ালে নামিয়া আসে। এই হাড়গুলিকে ইংরেজীতে 'হোয়েল বোন' বলে। পূর্ণবয়স্ক তিমির মুখে হোয়েল বোনের সংখ্যা প্রায় ৫০০। ঝাঁজুরির শিকের মত এই হাড়গুলি ঠিক ইঞ্চি অন্তরাল করিয়া সাজান থাকে।

ইহাদের মধ্যে মাঝের হাড়গুলিকে দীর্ঘাকার এবং ছই পার্শ্বের হাড়গুলিকে ক্ষুদ্র হইতে দেখা যায়। হোয়েল বোনের এই সকল হাড়ের মাঝে মাঝে আবার ঘন পুরু রোমাবলীর উৎপত্তি হইয়া ইহাকে একটি প্রকাণ্ড ছাঁকুর মত করিয়া দিয়াছে।



তিমি-জাতীয় ক্রীড়াশীল ডলফিন

দন্তের সংরক্ষণে ইহাদের বিশেষ যত্ন দেখা যায় না। এই দন্তকে প্রায়ই সমুদ্র-শৈবালে জড়িত ও অপরিষ্কৃত অবস্থায় থাকিতে দেখা যায়। গ্রীনলাণ্ডের বৃহৎ তিমির প্রায়ই ইহাদের অনুসরণ করিয়া থাকে। এই কারণে সে-দেশের লোকেরা নার্কালকে তিমির অগ্রদূত বলিয়া থাকে। ডেভিস-প্রণালী ও ডিস্কো-উপসাগরে বহু নার্কাল দেখিতে পাওয়া যায়।

দন্ত না থাকায় এই তিমির হোয়েল বোনের সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামুদ্রিক শস্যাদি ধরিয়া আহার করে। গ্রীনলাণ্ডের চতুর্পার্শ্ববর্তী সমুদ্র এবং স্পীট্‌স্বার্জেন দ্বীপের জনহীন তুষার-সমুদ্রই ইহাদের প্রিয় বাসস্থান। পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের ৭৪ এবং ৮০ ডিগ্রির মধ্যে ইহাদিগকে অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। উষ্ণ সমুদ্র স্রোতের তাপে এই স্থানে অত্যধিক মাত্রায় ক্ষুদ্র সামুদ্রিক শস্যাদির

নিমিত্ত ইহাদের দেহের অস্থিগুলি ছিদ্রময় এবং চর্মের নিম্নে খুব পুরু বসার উৎপত্তি হইয়াছে। সুপারি বা নারিকেল গাছ কাটিলে গাছের গুঁড়িকে যেমন সছিদ্র দেখায় তিমির অস্থিগুলিও সেইরূপ ছিদ্রময়। এই



‘স্পাম’ বা তৈলতিমি

ছিদ্রগুলি আবার তৈলে পূর্ণ থাকে। কলিকাতার যাদুঘরে তিমির যে-সকল কঙ্কাল রক্ষিত হইয়াছে সে-গুলি লক্ষ্য করিলেই ইহাদের অস্থির গঠন উপলক্ষি করা যাইতে পারে।

জলে আসিয়া বাস করার ফলে অস্থির গঠন-পরিবর্তনের সহিত যে বসার উৎপত্তি হইয়াছে তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এক ইঞ্চি পুরু চর্মের নিম্নে প্রায় ১০ হইতে ১৫ ইঞ্চি পুরু বসা ইহাদের সমস্ত দেহটিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। কর্ক যেমন বৃক্ষের কাণ্ডকে চারি দিকে আবৃত করিয়া শীতাতপের আধিক্য হইতে গাছকে রক্ষা করে তিমির পুরু বসাও সেইরূপ ইহাদিগকে সহজে ভাসমান থাকিবার উপযোগী করিয়া জলের শৈত্য হইতে ইহাদের অঙ্গতাপ রক্ষা করে। তিমি ব্যতীত সীল এবং সিজুঘোটকদের দেহে এই উদ্দেশ্যে পুরু বসার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

প্রাণিতত্ত্ববিদেরা তিমিকে সাতটি প্রধান শ্রেণীতে

বিভক্ত করিয়া থাকেন। তিমিদের মধ্যে কতকগুলির দস্ত থাকিতে এবং কতকগুলিকে দস্তহীন হইতে দেখা যায়। প্রথমোক্ত শ্রেণীর মধ্যে বিষুবমণ্ডলের অন্তর্ভুক্তী সমুদ্র-সমূহের ‘স্পাম’ হোয়েল’ বা তৈলতিমি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই তিমির আকারে সাধারণতঃ ৫৫ ফুট হইতে ৬০ ফুট অবধি দীর্ঘ এবং প্রায় ১৬ ফুট উচ্চ। ৭৬ ফুট দীর্ঘ তৈলতিমি দৃ্ত হইবার কথাও শুনা গিয়াছে। স্ত্রী-তৈল-তিমির কিস্তি একরূপ বৃহৎ হয় না। খুব বৃহৎ হইলেও স্ত্রী-তৈলতিমিকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফুটের অধিক দীর্ঘ হইতে দেখা যায় না। এই তিমিদের কেবল মাত্র নিম্ন চোয়ালের মাড়িতে দস্তের শ্রেণী থাকিতে দেখা যায়। উপর চোয়ালে দস্ত থাকে না। নিম্ন-চোয়ালে দস্ত বসিবার নিমিত্ত উপরকার চোয়ালে অনেকগুলি গহ্বর থাকিতে দেখা যায়। বৃহৎ তৈলতিমির এক একটি দস্ত ওজনে প্রায় এক সের হইতে দুই সের অবধি হইয়া থাকে।

তৈলতিমি ব্যতীত উত্তর-হিমকোটি-মণ্ডলের সমুদ্র-বাসী নার্কালদিগেরও উপর-চোয়াল হইতে অদ্ভুত আকারের একটি পাকান দস্ত দেহের সহিত সমান্তরালে বাহির হইয়া থাকে। নার্কালেরা মাত্র বিশ-পঁচিশ ফুট দীর্ঘ হইলেও ইহাদের দস্ত ৯ হইতে ১৪ ফুট অবধি দীর্ঘ হইয়া থাকে। এই দস্ত ফাঁপা এবং দেখিতে গোলাকার সূক্ষ্মগ্র দস্তের মত। ইহার বর্ণ হস্তিদস্তের মত শুভ্র এবং অগ্রভাগ সূঁচের মত তীক্ষ্ণ। এইরূপ আকারের নিমিত্ত



গ্রীনলাণ্ডের বৃহৎ তিমি

ইহাকে নার্কালের দস্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে বিধাবোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা উহাদের উপর-চোয়ালের রূপান্তরিত ছেদনদস্ত ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সাধারণতঃ নার্কালদের একটিনাত্র দস্ত থাকিলেও

দুই দন্তযুক্ত নার্কালেরও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কখন কখন এই দন্ত প্রকার দন্ত বাহির হইয়া থাকে। কখন কখন এই দন্ত পাকান-ভাবের না হইয়া বেশ মসৃণ হইয়া থাকে।

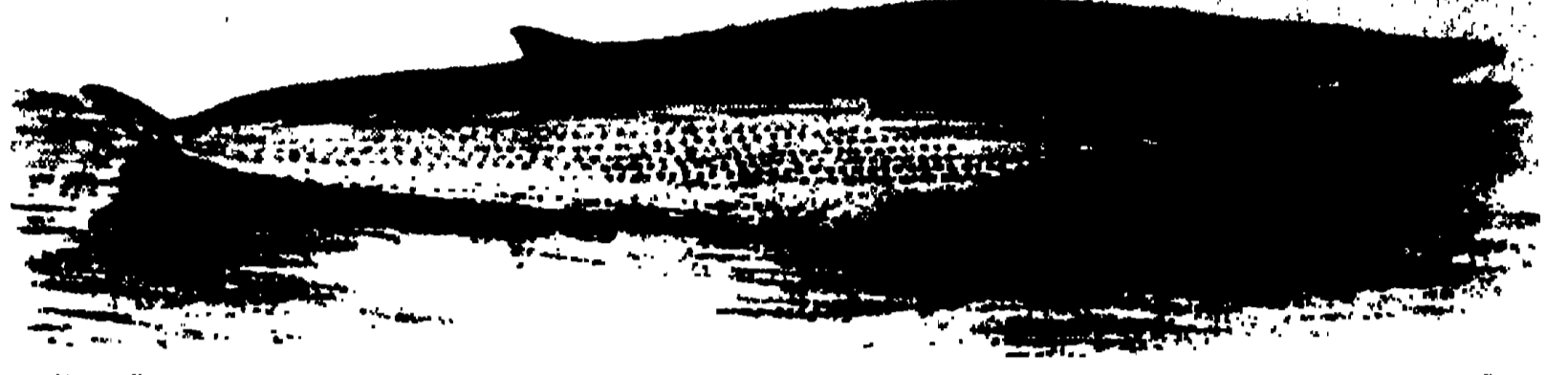
আবার অনেক সময় এই দন্তকে ঈষৎ বক্রাকারেও বর্ধিত হইতে দেখা যায়। বর্ণ এবং গঠনে গজদন্তের মত হইলেও বস্তুহিসাবে ইহা গজদন্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ। গজদন্ত যেরূপ কালক্রমে হরিভ্রাত হইয়া যায়, নার্কালের দন্ত সেরূপ হয় না। পূর্বে এই দন্ত মূল্যবান সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইত। এই দন্ত নার্কালের আকৃতিকে ভীতিপ্রদ করিয়া দিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহারা অতি নিরীহ প্রাণী। দন্ত দ্বারা শত্রু আক্রমণ করিতে বা আত্মরক্ষায় এই দন্ত ব্যবহার করিতে ইহাদিগকে বড় দেখা যায় না। কি উদ্দেশ্যে যে ইহাদের মুখে এই সুদীর্ঘ দন্তের উদ্ভব হইয়াছে তাহা এখনও বিশেষ বৃত্তিতে পারা যায় নাই। সম্ভবতঃ অবস্থায় ইহাদের ক্রীড়া-কৌতুক লক্ষ্য করিলে এই দন্তকে ইহাদের পক্ষে নিগ্রহ-স্বরূপ বলিয়াই গণনা করা যাইতে পারে।



তিমি-জাতীয় ক্রীড়াশীল ডলফিন

দন্তের সংরক্ষণে ইহাদের বিশেষ যত্ন দেখা যায় না। এই দন্তকে প্রায়ই সমুদ্র-শৈবালে জড়িত ও অপরিষ্কৃত অবস্থায় থাকিতে দেখা যায়। গ্রীনলাণ্ডের বৃহৎ তিমিরা প্রায়ই ইহাদের অনুসরণ করিয়া থাকে। এই কারণে সে-দেশের লোকেরা নার্কালকে তিমির অগ্রদূত বলিয়া থাকে। ডেভিস-প্রণালী ও ডিস্কো-উপসাগরে বহু নার্কাল দেখিতে পাওয়া যায়।

দন্তহীন তিমির মধ্যে গ্রীনলাণ্ডের বৃহৎ তিমি এবং নীল তিমি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রীনলাণ্ডের তিমিরা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬০ হইতে ৭০ ফুট। তিমি বলিতে সাধারণতঃ গ্রীনলাণ্ডের তিমিকেই বুঝাইয়া থাকে।



ররকোয়াল বা নীল তিমি
মুকবদীর আমর্গাননাথ পাল কর্তৃক অঙ্কিত

ইহাদের মুখে দন্তের পরিবর্তে পঞ্জরাস্থির মত অনেক-গুলি লম্বা লম্বা হাড় থাকিতে দেখা যায়। এই হাড়গুলি উপরকার চোয়াল হইতে চিরুণীর দাঁতের মত নীচের চোয়ালে নামিয়া আসে। এই হাড়গুলিকে ইংরেজীতে 'হোয়েল বোন' বলে। পূর্ণবয়স্ক তিমির মুখে হোয়েল বোনের সংখ্যা প্রায় ৫০০। ঝাঁজুরির শিকের মত এই হাড়গুলি ঠিক ইঞ্চি অন্তরাল করিয়া সাজান থাকে।

ইহাদের মধ্যে মাঝের হাড়গুলিকে দীর্ঘাকার এবং দুই পার্শ্বের হাড়গুলিকে ক্ষুদ্র হইতে দেখা যায়। হোয়েল বোনের এই সকল হাড়ের মাঝে মাঝে আবার ঘন পুরু রোমাবলীর উৎপত্তি হইয়া ইহাকে একটি প্রকাণ্ড চাঁকনির মত করিয়া দিয়াছে।

দন্ত না থাকায় এই তিমিরা হোয়েল বোনের সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামুদ্রিক শস্যাদি ধরিয়া আহার করে। গ্রীনলাণ্ডের চতুর্পার্শ্ববর্তী সমুদ্র এবং স্পীট্‌সবার্জেন দ্বীপের জনহীন তুষার-সমুদ্রই ইহাদের প্রিয় বাসস্থান। পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের ৭৪ এবং ৮০ ডিগ্রির মধ্যে ইহাদিগকে অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। উষ্ণ সমুদ্র স্রোতের তাপে এই স্থানে অত্যধিক মাত্রায় ক্ষুদ্র সামুদ্রিক শস্যাদির

উদ্ভব হয় বলিয়া এই স্থানেই ইহাদিগকে বহুসংখ্যায় দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতে দেখা যায়। উত্তর-আমেরিকার নদীগুলির মুখেও বহু তিমি দেখিতে পাওয়া যায়।

সমুদ্রের উপর এক জাতীয় পক্ষযুক্ত ক্ষুদ্র পতঙ্গকে



ভোঁতামুখো তৈলতিমি

ভাসিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। ইহাদের বর্ণ কালো এবং আকার সীমবীজের মত ক্ষুদ্র। সমুদ্রের উপরিভাগে ইহারা পুঞ্জীভূত ভাবে অবস্থান করে। লিনিয়স এই পোকের নাম দিয়াছিলেন 'মেডুসা'। পক্ষছারা মেডুসারা উড়িতে পারে না। এই পক্ষ ইহাদিগকে সমুদ্রের সহায়তা করিয়া থাকে। তিমিরা, বিশেষতঃ গ্রীনলাণ্ডের তিমিরা, পুঞ্জীভূত অবস্থায় ভাসমান এই মেডুসাকে ধরিয়া আহার করে। ইহাদের চোয়ালে প্রায় সকল সময়েই এই পোকাকে সংলগ্ন থাকিতে দেখা যায়। এই পোকা এবং পূর্বেকৃত ক্ষুদ্র সামুদ্রিক শস্যাদিই ইহাদের প্রধান আহার। ইহাদের পাকস্থলী বিদীর্ণ করিলে তন্মধ্যে সর্বদাই ননী বা মলমের মত এক প্রকার মেদবৎ পদার্থ থাকিতে দেখা যায়। নার্কালরাও গ্রীনলাণ্ডের তিমির মত সমুদ্রের পোকামাকড় খাইয়া জীবনধারণ করে।

তৈলতিমি বা স্পার্ম হোয়েলরা কিন্তু এরূপ পোকা ভক্ষণ করে না। ইহাদের জিহবার আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও ইহাদের গলনলী বিশেষ প্রশস্ত। এষ্ট গলনলীর আকার এরূপ বৃহৎ যে ইহারা অনায়াসে একটি বৃহৎ বৃষকে গলাধঃকরণ করিতে পারে। ইহারা বহু পরিমাণে নানা জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য ও কটল-ফিশ্ ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহাদের পাকস্থলী বিদীর্ণ করিলে

তন্মধ্যে সর্বদা সদ্যোগলাধঃকৃত বা অর্ধজীর্ণ ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু মৎস্য ও কটল-ফিশ্ থাকিতে দেখা যায়। ইহাদের পাকস্থলীর মধ্যে অনেক সময়েই আট-নয় ফুট লম্বা মৎস্য থাকিতে দেখা গিয়াছে। মৎস্য বাতীত শুণ্ডক ও ডলফিনকেও

ইহারা খাদ্যবোধে অনেক সময় তাড়া করিয়া থাকে। ইহাদের গলনলীর আকার ও মৎস্যহারের পরিমাণ হিসাব করিলে ইহাদিগকে সমুদ্রের রাক্ষস না বলিয়া থাকা যায় না। অক্রান্ত হইলে বা মৃত্যুর পরেই ইহারা কটল-ফিশ্ প্রভৃতিকে পাকস্থলী হইতে উদগীর্ণ করিয়া থাকে।

কাৎ অথবা চিং হইয়া ইহারা শিকার ধরিয়া থাকে। ক্ষুদ্র হইলে ইহারা নৌকা প্রভৃতি দংশন করিয়া চূর্ণ করিয়া দেয়।

দস্তহীন তিমির শ্রেণীতে যে নীল তিমির উল্লেখ করিয়াছি তাহার ইংরেজী নাম Rorqual, তিমিদের মধ্যে ইহারা আকারে সর্বাধিক বৃহৎ। ইহারা আকারে



নার্কাল বা খড়্গদস্তা তিমি

৮০।৮৫ ফুট হইতে ১০০ ফুট অবধি দীর্ঘ হইয়া থাকে। সিবল্ডস্ ররকোয়াল (Sibbald's rorqual) বর্তমানকালে পৃথিবীর বৃহত্তম জীব বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। আফ্রিকার ১১ ফুট উচ্চ বৃহত্তম হস্তীর সহিত এই তিমির তুলনা করিলে গজরাজকে একটি ক্রীড়নক বলিয়া বোধ হইবে। নীল তিমিরা তৈলতিমি এবং গ্রীনলাণ্ডের তিমির মত স্থলকায় না হইয়া অপেক্ষাকৃত সরু ও লম্বাকার হইয়া থাকে।

উত্তর-আটলান্টিক মহাসমুদ্র ইহাদিগের প্রধান বাসস্থান। বঙ্গোপসাগরেও নীল তিমির মত এবং ইহাদের নিকট-গোত্রীয় এক জাতীয় তিমি বাস করে। কলিকাতার বাছবরে নীল তিমির একটি বৃহৎ মস্তকাঙ্ঘি রক্ষিত

ইয়াছে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে সম্রাটের টে একটি ছোট 'ররকোয়াল' আসিয়া পড়িয়াছিল। জাপানগরে গ্রীনলাণ্ডের তিমির মত দস্তহীন তিমিও পিস করে। ইহার নাম 'বেলিন' তিমি। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে

আরাকান প্রদেশের নিকটবর্তী আম- ষ্টি' দ্বীপে ৮৪ ফুট দীর্ঘ একটি 'বেলিন' তিমির মৃতদেহ আসিয়া ডিয়াছিল। কলিকাতার যাজবরে ঐ তিমির নিম্ন-চোয়ালের অস্থি দুইখানি একটি ঘাবের দুই পাশে রক্ষিত

ইয়াছে। অস্থি দুইখানির আকার দেখিলেই ঐ তিমির বিশাল কলেবরের বিষয় কিঞ্চিৎ অনুমান করা হিতে পারে। এখানকার যাজবরে ক্ষুদ্র 'বেলিন' তিমির একটি সম্পূর্ণ কঙ্কালও রক্ষিত হইয়াছে। ঐ তিমিটি বঙ্গদেশের খেবুচং নামক স্থানে আসিয়া পড়িয়াছিল। ইহার হস্তাঙ্গুলির সংখ্যা চারিটি। আরব-সমুদ্র, মালাবার এবং সিংহলের উপকূলেও 'বেলিন' তিমিকে দেখিতে পাওয়া যায়।

সম্রাট বোম্বাইয়ের কোলাবা-পয়েন্টের তটে একটি ১৫৭ ফুট দীর্ঘ বেলিন তিমির মৃতদেহ আসিয়া পড়িয়াছিল। মৃতক ব্যতীত তিমিটির দেহের অবশিষ্ট অংশ সমুদ্রের জলে নমজ্জিত ছিল। দুই-তিন দিন এই ভাবে জলের মধ্যে পড়িয়া থাকায় ইহার পুচ্ছের অধিকাংশ অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তিমিটি মৃগ বাদান করিয়া পৃষ্ঠোপরি শয়ান থাকায় ইহার বৃহৎ মুখগহ্বরের আয়তনাদির কতক পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ইহার মুখগহ্বর একরূপ বৃহৎ ছিল যে, তাহার মধ্যে ছয় জন মানুষ অনায়াসে চলিয়া গাইতে পারিত। কিছুকাল পূর্বে সিন্ধুদেশের উপকূলে ইহার একটি তিমির মৃতদেহ আসিয়া আসিয়াছিল। ইহার মস্তক প্রায় ১৭ ফুট ৮ ইঞ্চির অধিক দীর্ঘ ছিল। তিমিটির মস্তকের অস্থিখানি করাচী শহরের যাজবরে রক্ষিত আছে।

নীল তিমি নাম হইলেও ইহাদের বর্ণ আদৌ নীল নহে। সাধারণ তিমিদের মত ইহাদের পৃষ্ঠের বর্ণ কালো এবং উদরের বর্ণ স্বেত। বিশেষত্বের মধ্যে ইহাদের চোয়ালের নিম্নভাগ হইতে উদরের মাঝামাঝি কতকগুলি

বোর লাল বর্ণের 'ডোরা' অঙ্কিত থাকিতে দেখা যায়। গ্রীনলাণ্ডের তিমির মত ক্ষুদ্র শম্বুকাদি ভক্ষণ না করিয়া নীল তিমিরা হেরিং, ম্যাকেবেল প্রভৃতি সামুদ্রিক মৎস্য ধরিয়া ভক্ষণ করে।



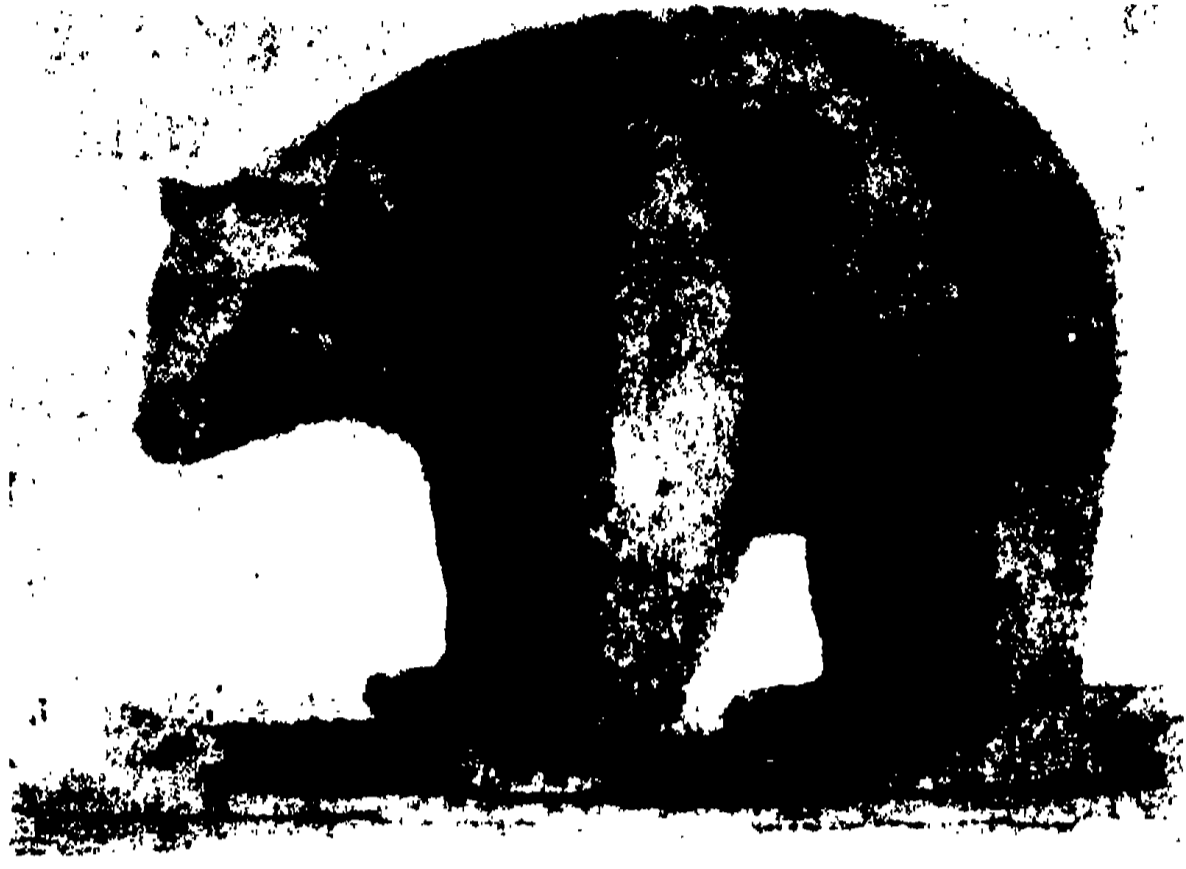
করাত মাছ—তিমির শক

উত্তর-সমুদ্রে আর এক জাতীয় স্বেত বর্ণের ক্ষুদ্র তিমি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের আর একটি নাম 'বেলুগা'। ইহারা বারো হইতে সোল ফুট অবধি দীর্ঘ হইয়া থাকে। গ্রীনলাণ্ডের চারি ধারে, সেন্ট-লরেন্স উপসাগর ও সেন্ট-লরেন্স নদীতে ইহাদিগকে দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতে দেখা যায়।

তিমিরা একরূপ প্রকাণ্ড প্রাণী হইলেও তিন-চারি ফুট দীর্ঘ শুকুকও তিমির গোষ্ঠীভূত জীব। নীল তিমি ব্যতীত অপর তিমিদের মস্তক ইহাদের দেহের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ স্থান অধিকার করিয়া থাকে। তৈলতিমির মস্তক অনেক সময় ইহাদের দেহের প্রায় অর্ধাংশ অধিকার করিয়া থাকে। এইরূপ প্রকাণ্ড মস্তকে মস্তিষ্কের আকারও খুব বৃহৎ হইয়া থাকে। ইহাদের মস্তিষ্ক দেখিতে গোলাকার ও তাহার উপর অনেক খাঁজকাটা থাকিতে দেখা যায়। এইরূপ প্রকাণ্ড মস্তকে মুখগহ্বরটিও অত্যন্ত বিশাল। মুখগহ্বর একরূপ বৃহৎ হইলেও তৈলতিমি ব্যতীত অপর তিমির গলনলী অত্যন্ত সক্ষীর্ণ। বৃহৎ গ্রীনলাণ্ড-তিমির গলনলী একরূপ ক্ষুদ্র যে, তাহার মধ্যে ছেলেদের বাছ ও প্রবেশ করান যায় না। এই কারণে ইহারা সমুদ্রের ক্ষুদ্র গেঁড়ী গুল্লী, শামুক, 'কটল ফিশ', 'স্কেট মাছ', ক্ষুদ্র চিংড়ী এবং পোকামাকড় ব্যতীত আর কিছুই ভক্ষণ করিতে পারে না।

তিমির মুখগহ্বর বেকরূপ বৃহৎ ইহার জিহ্বাও সেইরূপ প্রকাণ্ড। এই জিহ্বা সাধারণতঃ আঠার ফুট দীর্ঘ ও দশ ফুট প্রশস্ত হইয়া থাকে। ইহাদের জিহ্বা নিম্ন-চোয়ালের

সহিত একরূপ ভাবে সংযুক্ত থাকে যে, তিমিরা ইহাকে প্রায় সঞ্চালন করিতে পারে না। ইহাকে জিহ্বা না বলিয়া একটি প্রকাণ্ড পুরু চর্কির গদি বলিলেও অতুক্তি হয় না। এই জিহ্বা হইতে বহু পরিমাণ চর্কি পাওয়া



শ্বেত ভল্লুক—তিমির শত্রু

যায়। ইহাদের মুখের মধ্যে লালানিঃসারক গ্রন্থি নাট বুলিলেই হয়।

তিমিদের চক্ষু ইহাদের দেহের অন্তর্গতে একরূপ ক্ষুদ্র যে, তাহা লক্ষ্য করাই যায় না। ইহাদের চক্ষু বৃষচক্ষু অপেক্ষা বৃহৎ নহে। ৭৬ ফুট দীর্ঘ এবং ৩৮ ফুট উচ্চ তিমির মস্তকে এই প্রকার চক্ষু থাকিলে তাহা সহজে দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভবপর নহে। মৃত্যুর পর এই চক্ষু শুকাইয়া মটরের আকার ধারণ করে। চতুর্দশদিগের মত তিমির চক্ষুতে 'পাতা' থাকে এবং সেই পাতা হইতে অক্ষিপন্ন বাহির হয়। ইহাদের চক্ষু দুইটি মস্তকের পিছনে এমন স্থানে উদ্গত হয় যে, সম্মুখ পশ্চাৎ এবং উর্দ্ধ দিকের দর্শনে কোনও ব্যাঘাত ঘটে না। ইহাদের দৃষ্টিশক্তিও নিতান্ত মন্দ নহে।

ইহাদের শ্রবণশক্তি বিশেষ তীক্ষ্ণ। বহুদূরের সামান্য শব্দও ইহারা আশ্চর্যরূপে অনুভব করিতে পারে। মস্তকের উপর ইহাদের কর্ণের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। বাহিরের চর্খাবরণ তুলিয়া ফেলিলে চক্ষের পিছনে কালো দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দাগের নিম্নেই ইহাদের শ্রবণরন্ধ্র বর্তমান থাকে। প্রথর শ্রবণশক্তির নিমিত্ত ইহাদের নিকট অগ্রসর হওয়া সকল সময় সম্ভবপর

হয় না। ইহারা যখন সমুদ্রের উপর লাফাইয়া ক্রীড়া করে বা নাসারন্ধ্র দিয়া বেগে মুখমধ্যস্থ জলকে উৎসাকারে বাহির করিয়া দেয় শিকারীরা তখনই সম্ভবপূর্ণে ইহাদের সন্নিহিতে উপস্থিত হইয়া থাকে।

ইহাদের নাসারন্ধ্র মস্তকের পুরোভাগে অবস্থিত। অধিকাংশ তিমির মস্তকের উপরে একটি মাত্র নাসারন্ধ্র থাকিতে দেখা যায়। এই রন্ধ্রটি ভিতরে দুই ভাগে বিভক্ত। গ্রীনলাণ্ড-তিমির মস্তকের দুই পার্শ্বে দুইটি নাসারন্ধ্র আছে। ইহাদের নাসিকার রন্ধ্রগুলির আকার গোলাকার নহে। বেহালার খোলের উপরকার গর্তটির আকার ষেকরূপ বক্রভাবে ইহাদের নাসারন্ধ্রের আকৃতিও কতকটা সেইরূপ। শ্বাসপ্রশ্বাস বাতীত এই রন্ধ্রদ্বারা ইহারা মুখমধ্যস্থ জলকে বেগে উৎক্ষিপ্ত করিয়া বাহির করিয়া দেয়। জলে নিমজ্জিত হইবার সময় ইহারা নাসারন্ধ্রকে একটি মাংসপেশী দ্বারা একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে পারে।

তিমিরা সাধারণতঃ দুই-তিন মিনিট অন্তর শ্বাস-গ্রহণ করে এবং এই উদ্দেশ্যে ক্ষণে ক্ষণে জলের উপর



তলোয়ার মাছ - তিমির শত্রু

ভাসিয়া উঠে। ভীত বা তাড়িত হইলে অর্ধ ঘণ্টা কাল অবধি ইহারা সিন্ধুগর্ভে ডুবিয়া থাকিতে পারে। প্রশ্বাস-ত্যাগকালে কুস্কুমের উষ্ণ বায়ুরাশিকেও ইহারা ছয় হইতে আট ফুট উর্দ্ধে বাষ্পাকারে ফোয়ারার মত বাহির করিয়া দেয়। নাসাপথে ইহাদের ক্ষলোৎস্রেকপণের শব্দ দুই-তিন মাইল দূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। আহত তিমির ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও ঝড়ের মত বহুদূর হইতে শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে।

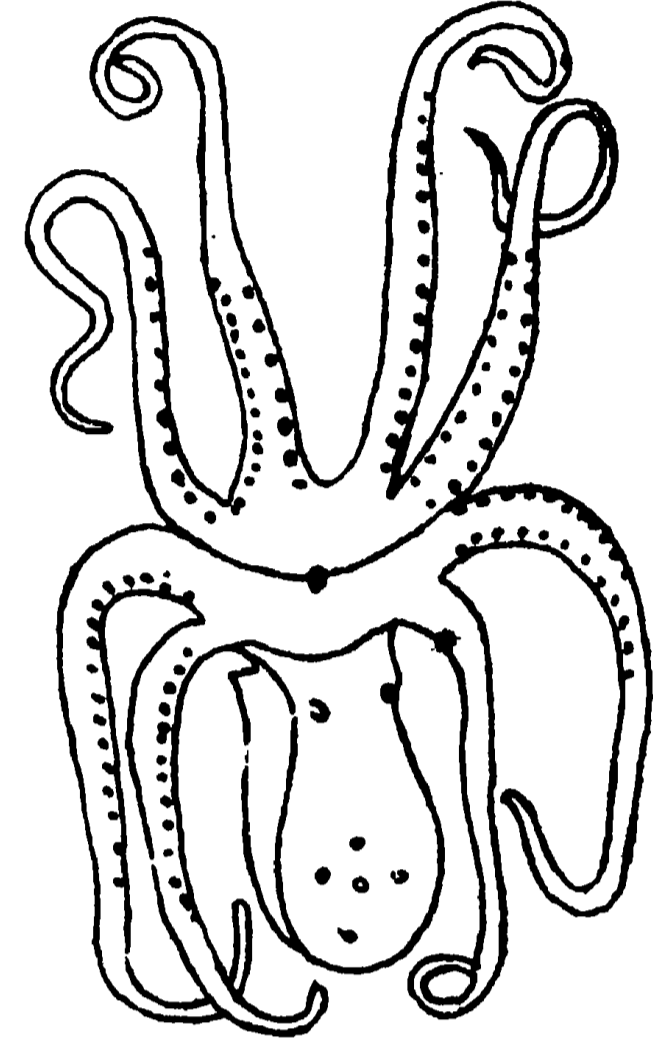
ইহাদের তিনটির অধিক 'পাখনা' থাকে না। এই পাখনা যে বাস্তবিকপক্ষে ইহাদের হস্ত তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। দেহের দুই পার্শ্বে দুইটি এবং

পৃষ্ঠের উপর মাত্র একটি করিয়া ইহাদের পাখনা থাকে। পাখের পাখনা দুইটি প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ হইয়া থাকে। এই পাখনার সাহায্যেই ইহারা ইচ্ছামত বামে বা দক্ষিণে ফিরিয়া থাকে। কোন কোন তিমির পৃষ্ঠের উপরকার পাখনাটি থাকে না। তৈলতিমির পাখের পাখনা ত্রিকোণাকার। দেহের তুলনায় ইহাদের পাখনা দুইটি অতি ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

ইহাদের চর্ম অত্যন্ত মসৃণ। পৃষ্ঠের উপরিভাগের চর্মের বর্ণ কৃষ্ণ এবং উদরের চর্মের বর্ণ শ্বেত হইয়া থাকে। চর্মের উপর আবার কখন কখন শ্বেত ও হরিদ্রা বর্ণের বহু দাগ থাকিতে দেখা যায়। পৃষ্ঠ ও পাখনার উপরেই এই বর্ণচিত্রণ বিশেষভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে। এই চিত্রণের মধ্যে কখন কখন ঘরবাড়ি ও গাছপালার মত অঙ্কিত থাকিতে দেখা যায়। একবার এক জন প্রাণিতত্ত্ববিদ একটি তিমির পৃষ্ঠের উপর ইংরেজী সংখ্যায় ১২২-এর মত চিত্রাঙ্কন থাকিতে দেখিয়াছিলেন।

তিমিদের দেহের উপরকার চর্ম তুলট কাগজের মত পুরু। এই চর্মের নিম্নে এক ইঞ্চি পুরু আর একটি চর্ম; এই শেষোক্ত চর্মটিই ইহাদের প্রকৃত চর্ম। এই পুরু চর্মের নিম্নেই ইহাদের দেহে দশ-পনের ইঞ্চি স্থল বসার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই বসা তুষারাবৃত উত্তর-মেরু-সমুদ্রে ইহাদের দেহতাপ রক্ষা করে। এই বসার স্তর তুলিয়া ফেলিলেই ইহাদের মাংস ও মাংসপেশাসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মাংসপেশীগুলি দেখিতে অবিকল চতুষ্পদদিগের মত। তিমির স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে ইহাদের বসা বেশ সুন্দর হরিদ্রা বর্ণের দেখাইয়া থাকে। তৈলতিমির মস্তকে ও গ্রীনলাও-তিমির দেহে অত্যধিক পরিমাণে বসার উৎপত্তি হইয়া থাকে। বসার নিমিত্তই কেবল মাত্র এই দুই জাতীয় তিমিকে অত্যধিক পরিমাণে শিকার করা হয়। ৬০ ফুট লম্বা একটি তিমির দেহ হইতে অল্পাধিক ৮০০ মণ বসা প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটি সুবৃহৎ গ্রীনলাও-তিমি হইতে প্রায় ৩৭৮০ মণ হইতে ৪৫২০ মণ অবধি তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৈলতিমির সুবৃহৎ মস্তকটি বসায় পরিপূর্ণ থাকে। এক-একটি তৈলতিমির মস্তক হইতে প্রায় ৫০০ গ্যালন বসা

বাহির করা হয়। ইহাদের মস্তকের বসাকে ইংরেজীতে 'স্পার্মাশেটি' (Spermaceti) বলে। বর্তিকা ও গন্ধ-দ্রব্যাদি নির্মাণের জন্তই তৈলতিমির মস্তকের বসা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই ভাবে বসায় পরিপূর্ণ না থাকিলে এই



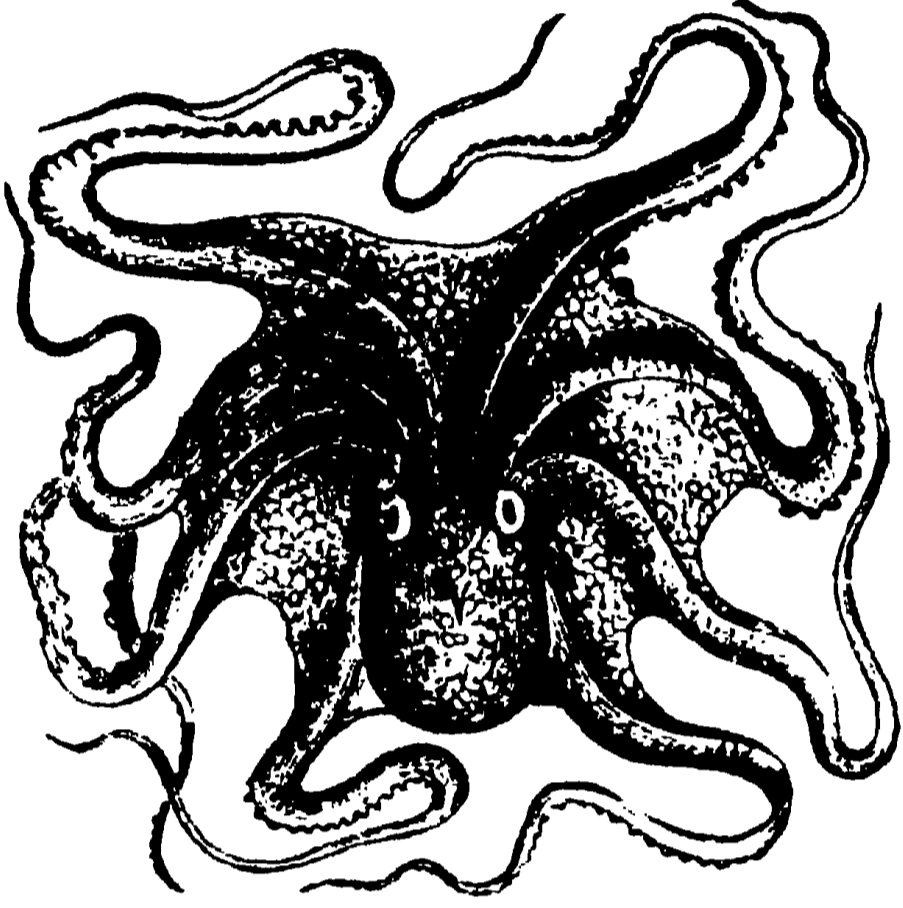
কটল্ ফিশ
তিমির খাদ্য

বৃহৎ মস্তক লইয়া চলাফেরা করা ইহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিত। বসায় পরিপূর্ণ থাকায় ইহাদের মস্তকটি লম্বু হইয়া ভাসিবার উপযোগী হইয়াছে।

তৈলতিমির দেহ হইতে গ্যাঙ্কারগ্রিস্ (ambergris) নামক একপ্রকার পদার্থ পাওয়া যায়। ইহাদের অঙ্গমধ্যে পিত্ত পাথরীর মত এই পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহা একটি তিন-চারি ফুট লম্বা খলির ভিতর তৈলাপেক্ষা এক প্রকার তরল পদার্থের মধ্যে বলের মত ভাসিতে থাকে। এই বলের বর্ণ হরিদ্রাভ এবং এক-একটি বল ওজনে অর্ধ সের হইতে দশ সের অবধি হইয়া থাকে। খলির মধ্যে চারিটির অধিক 'গ্যাঙ্কারগ্রিসের' বল থাকিতে দেখা যায় না। এক শ্রেণীর জীবতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, গ্যাঙ্কারগ্রিস্ পীড়িত তৈলতিমির বক্রতজ পদার্থবিশেষ। সকল তিমির উদরে গ্যাঙ্কারগ্রিস্ থাকে না। সর্বাপেক্ষা বলবান ও বয়স্ক তিমিদের উদরেই ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই পদার্থকে তিমির মধ্যে মধ্যে দেহ হইতে বিষ্ঠার মত বাহির করিয়া থাকে। ইহার গন্ধ ঈষৎ মিষ্ট ও 'মেটে' ভাবের। গ্যাটলাটিক

মহাসমুদ্রে, ব্রেজিল ও আফ্রিকার উপকূলে, ম্যাডাগাস্কার দ্বীপের সন্নিকটে ভারত-মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের তটদেশে এবং চীন ও জাপানের উপকূলে এই পদার্থকে ভাসিতে দেখা যায়। নানাবিধ গন্ধদ্রব্য নির্মাণে ইহার বিশেষ ব্যবহার হইয়া থাকে।

তিমির পুচ্ছ ইহাদের আয়রক্ষার প্রধান অস্ত্র ও সস্তরণের প্রধান অবলম্বন। ইহাদের পুচ্ছের আকার

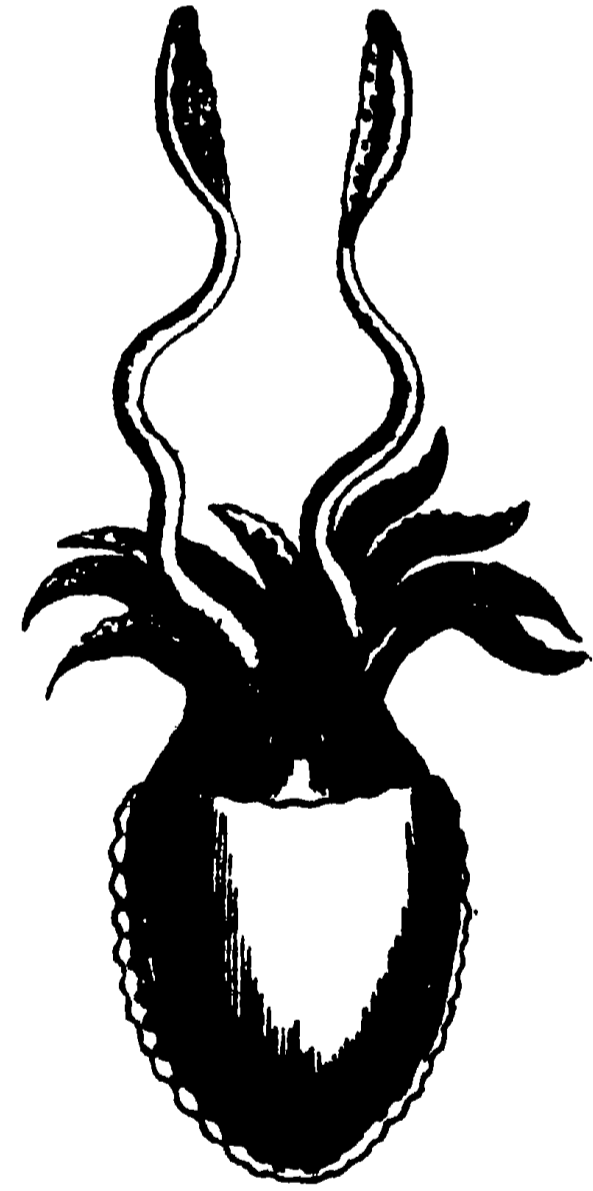


কটল্ ফিশ
তিমির খাদ্য

অনেকটা চিংড়ি মাছের লেজের মত। মৎস্যের পুচ্ছ সাধারণতঃ নেতাবে থাকে তিমির পুচ্ছ ঠিক তাহার বিপরীত ভাবে উদগত হইয়া থাকে। জলের উপর ইহাদের লেজ সমান ভাবে পড়িয়া থাকে। মৎস্যেরা যেমন লেজকে বামে ও দক্ষিণে সঞ্চালন করিয়া সস্তরণ দেয় তিমিরা তাহার বিপরীত পদ্ধতিতে পুচ্ছকে উর্দ্ধ ও অধঃ ভাবে চালনা করিয়া অগ্রসর হয়। শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে ইহারা পুচ্ছের আঘাতে তাহাকে বধ করিতে চেষ্টা করে। ইহাদের পুচ্ছের আঘাত এক্ষপ ভীষণ বে, ইহার এক আঘাতেই বৃহৎ বৃহৎ হাঙ্গর, করাত মাছ, তলোয়ার মাছ প্রভৃতির প্রাণবিয়োগ ঘটিয়া থাকে। এই সকল প্রাণী তিমিকে আক্রমণ করিলে ইহারা পুচ্ছের দ্বারা এক্ষপ ভাবে আঘাত করিতে থাকে যে, সমুদ্রের উপর সে-আঘাতের শব্দ দুই-তিন মাইল দূরেও বহুনির্ধেব বা কামানের শব্দের মত প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ইহাদের পুচ্ছ প্রসারে প্রায় ২৪ ফুট অবধি হইয়া থাকে। এই লেজের দ্বারা ইহারা শিকারীদের নৌকা

প্রভৃতিও জলমগ্ন করিয়া দেয় এবং ইহার সাহায্যে তিমিরা জলের মধ্য হইতে অনায়াসে উর্দ্ধে লাফাইয়া থাকে।

তিমি-জাতি, বিশেষতঃ তৈলতিমিরা, সর্বদা দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। ইহাদের এক-একটি দলে বিশ হইতে পঞ্চাশটি তিমিকে থাকিতে দেখা যায়। স্ত্রী-তিমি এবং তাহাদের শাবকদ্বারাই এই ক্ষুদ্র দল পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। এক-একটি দলে একটিনাত্র পুরুষ-তিমি দলের রক্ষকস্বরূপ অবস্থান করে। এই তিমিটির আকার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হইয়া থাকে। ভয় বা তাড়না পাইয়া পলায়ন করিবার কালে পুরুষ-তিমিটি দলের একেবারে পশ্চাৎগে চলিয়া যায় এবং পিছনে থাকিয়া সমস্ত দলটি চালনা করিয়া পলায়ন করে। দলের মধ্যে একটি তিমি আহত হইলে দলের অন্ত তিমিরা ভয়ে পলায়ন না করিয়া আহত তিমির চারি দিকে ঘুরিতে থাকে এবং এইরূপে বহু তিমি এককালে সহ-জুই নিহত হয়। গ্রীনলাণ্ড-তিমিদের



কটল্ ফিশ
তিমির খাদ্য

মধ্যে কিন্তু এইরূপ দল বাধিয়া সস্তরণ করার রীতি লক্ষিত হয় না। ইহাদের মধ্যে মাত্র স্ত্রী ও পুরুষ তিমিকে একত্র হইয়া ভ্রমণ করিতে দেখা যায়।

আকারে বড় হইলেও তিমিরা, বিশেষতঃ গ্রীনলাণ্ড-তিমিরা, অত্যন্ত ভীক। সমুদ্রে 'ডলফিন' নামে

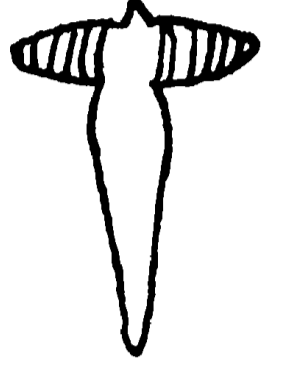
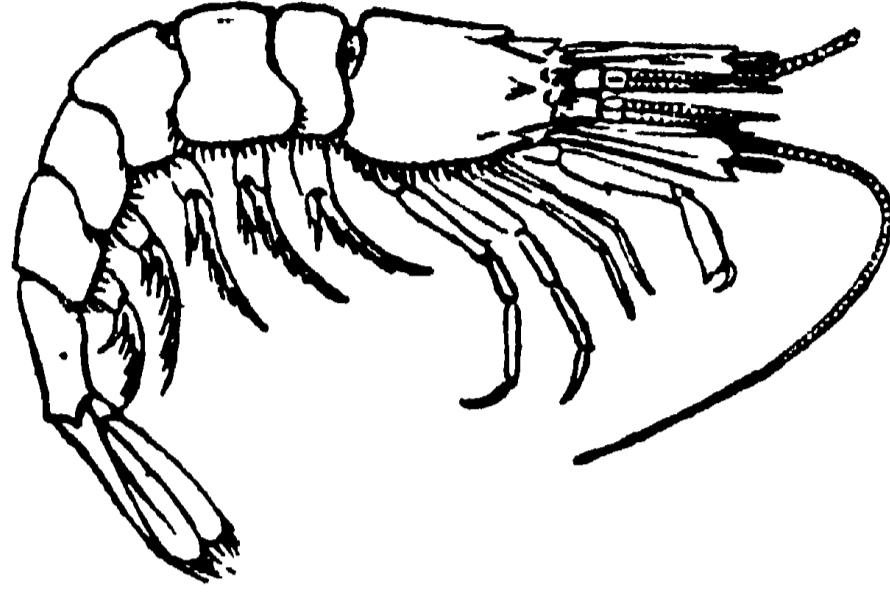
তিমি-জাতীয় এক প্রকার জীব আছে। ইহারা মাত্র ১০ ফুট অবধি দীর্ঘ হইয়া থাকে। গ্রীনলাণ্ডের তিমিরা ইহাদের নিকটে দেখিতে পাইলেই একেবারে ভয়ে সঙ্গস্ত হইয়া পলায়ন করে। ১০ ফুট দীর্ঘ ডলফিনকে দেখিয়া ৬০।৭০ বা ৮০ ফুট দীর্ঘ তিমির পলায়ন অবশ্যই হাশ্বকর। স্থলের বৃহত্তম জন্তু হস্তীরা নির্ভয়ে ব্যাঘ্রাদির দম্মুখীন হইলেও সামান্ত মুষিক ও শশককে বিশেষ ভয় করে এবং ইহাদের দর্শনে একেবারে অধীর হইয়া পড়ে। এ-বিষয়ে হস্তী-চরিত্রের সহিত তিমি-প্রকৃতির কতক সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। বিপদের কোনও আশঙ্কা না থাকিলে তিমিরা সমুদ্রের উপর অনেক সময় স্থির ভাবে ভাসিয়া থাকে বা লক্ষ্য দান করিয়া এবং নাসারন্ধ্র দ্বারা উৎসাকারে উল্কে জলোৎক্ষেপণ করিয়া

ক্রীড়াশীলতার পরিচয় দিয়া থাকে। কখন কখন আবার বৃদ্ধকে ধরিয়৷ ছেলেদের লাফালাফি করার মত তিমিকে ধরিয়৷ সীলদের সমুদ্রে লাফালাফি করিতে দেখা যায়।

ইহাদের গতি সাধারণ অবস্থায় দণ্টায় চারি মাইলের অধিক নহে। কিন্তু শিকারীর বল্লমে বিদ্ধ হইলে ইহারা একরূপ বিহ্বল-বেগ সমুদ্রে ভে না মিতে থাকে যে, সে-সময়ে নৌকার গায়ে বল্লমের দড়ির ঘর্ষণ লাগিয়া নৌকার কাছে আগুন লাগিয়া যায়। এই কাবণে বহু ম বিদ্ধ করিয়াই শিকারীরা বল্লমের দড়ির উপর ভল ঢালিতে থাকে। বর্তমানকালে নুতন পদ্ধতিতে তিমি শিকার করা হয়। তিমিরা যখন সমুদ্রের উপর স্থিরভাবে ভাসিয়া থাকে তখন কামানের মুখ হইতে তিমি-শিকারের বর্ষাসকল বারুদের সাহায্যে নিক্ষেপ করিয়া ইহাদিগকে নিহত করা হয়।

তিমিদের আচরণে দাম্পত্য প্রেমের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। তিমি-দম্পতীর মধ্যে একটিকে আহত করিলে অপরটি আহত তিমির সঙ্গ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে না। তাহার সহিত শেষ পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রণয়-সক্তির পরিচয় দিয়া থাকে। পুরুষ-তিমিরা নিজ নিজ

শ্রেণীর স্ত্রী-তিমির সঙ্গাশ্বেষণ করিয়া থাকে। স্বশ্রেণী ব্যতীত ভিন্ন শ্রেণীর স্ত্রী-তিমির সহিত ইহারা সন্নিগিত হইতে চাহে না। নয়-দশ মাস গর্ভধারণের পর স্ত্রী-তিমি শাবক প্রসব করে। গর্ভধারণকালে, বিশেষতঃ শাবক-



১। চিংড়ি মাছ
২। হুম্বক

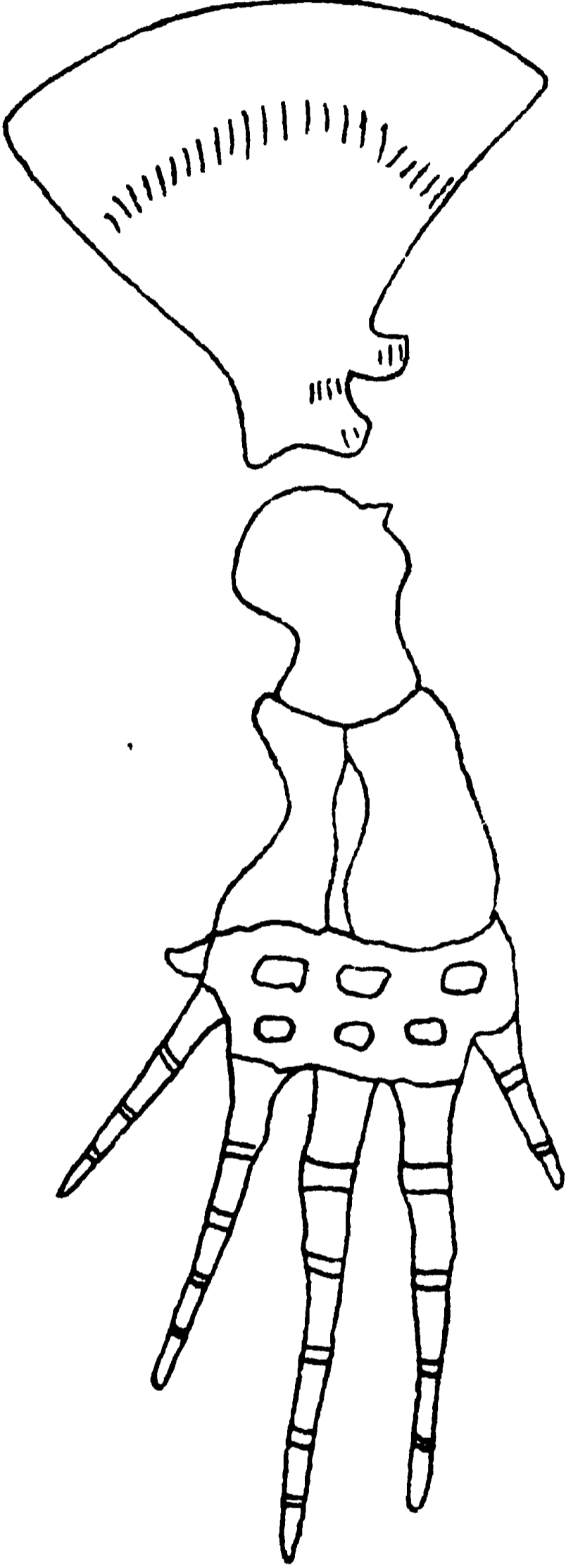


১। শমুক
২। তিমি উকুন

প্রসবের কিঞ্চিৎ পূর্বে, ইহাদিগকে অল্প সময় অপেক্ষা স্থলতর দেখা যায়। গর্ভের মধ্যে ক্রণের বর্ণ প্রথমে সাদা থাকে। প্রসবকালে শাবকের বর্ণ কিন্তু কাল দেখাইয়া থাকে। জরায়ুর মধ্যে ক্রণকে প্রথমে মাত্র ১৭ ইঞ্চি দীর্ঘ দেখা যায়। এই ক্রণ জরায়ুর মধ্যে পরিপুষ্ট হইয়া প্রসবকালে ১০ ফুট দীর্ঘ আকার ধারণ করে। স্ত্রী-তিমি সাধারণতঃ এককালে একটির অধিক শাবক প্রসব করে না। এই শাবকের পালন ও সংরক্ষণে স্ত্রী-তিমি অপত্য-স্নেহের বিশেষ পরিচয় দিয়া থাকে। শাবক আহত হইলে স্ত্রী-তিমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে না। ইহারা সর্বদা শাবককে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করে। শিকারীর দ্বারা তাড়িত হইলে পাখনার মধ্যে শাবককে ধরিয়৷ পলায়ন করে। শাবক সঙ্গে থাকিলে অল্প সময় অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র ইহারা সমুদ্রের উপর স্বাস গ্রহণের জন্য উঠিয়া আসে।

ইহাদের দুইটিমাত্র স্তন থাকে এবং স্তনের আকার গবাদি পশুর মতই হইয়া থাকে। সাধারণতঃ স্তন দুইটি উদরের মধ্যে গুটান থাকে। স্তন্যদানকালে এই স্তনকে ইহারা দেড় ফুট হইতে দুই ফুট অবধি বাহির করিয়া

থাকে। সমুদ্রের উপর কাৎ ভাবে অবস্থান করিয়া ইহার শাবকে স্তন্যপান করাইয়া থাকে। স্তনে দুধের পরিমাণও বড় কম থাকে না। গবাদির দুধের সহিত এই দুধের অনেক সাদৃশ্য আছে। তিমিশাবক প্রায় এক



তিমির হস্তাঙ্গি

নরহস্তাঙ্গির সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

বৎসর কাল স্তন্যপান করিয়া থাকে। এই সময় সাধারণ চতুষ্পদদিগের শাবকের মত ইহার বেণ স্তন্যপুষ্টি হয় এবং ইহাদের দেহে পর্যাপ্ত পরিমাণে মেদ সঞ্চিত হইয়া থাকে। এক-একটি শাবকের দেহ হইতে এই সময়ে প্রায় পঞ্চাশ ব্যারেল বসা পাওয়া যাইতে পারে। অত্যধিক স্তন্যদান করার ফলে স্ত্রী-তিমি কিছু অপেক্ষাকৃত ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

স্তনত্যাগের পর তিমি-শাবকের দেহ আর সেরূপ শীঘ্র বর্ধিত হয় না।

জীব-জন্তুর শরীরের উকুনের মত তিমিদের দেহে এক প্রকার পরভোজী কীট থাকিতে দেখা যায়। ইহার তিমির পৃষ্ঠদেশ ও পাখনার নিম্নে সংলগ্ন হইয়া রস রক্ত শোষণ করিয়া থাকে। এই সকল রসশোষক কীট হইতে মুক্তি পাইবার জন্ত বহু চেষ্টা করিলেও তিমিরা ইহাদিগকে কোনও মতে বিদূরিত করিতে পারে না। এক জাতীয় সামুদ্রিক পক্ষী এই সকল কীটকে উদরস্থ করিয়া তিমির প্রভূত কল্যাণ সাধন করে।

জাহাজের খোলে যেমন শামুক ও গঁড়ী লাগিয়া থাকে তিমিদের দেহেও সেইরূপ এই উকুন বাতীত এক জাতীয় পুষ্কভূজকে সংলগ্ন থাকিতে দেখা যায়। ইহার একরূপ ভাবে তিমিদের শরীরে লাগিয়া থাকে যে, তিমির নীলাভ বা কৃষ্ণ নীল চর্মে একবারে ইহাদের শ্বেত বর্ণে আবৃত হইয়া পড়ে। অনেক সময় তিমিদের চোয়ালে বিস্তারিত সামুদ্রিক তৃণাদি সংলগ্ন থাকে। এইরূপ তৃণসংলগ্ন তিমিকে অনেক সময় এক অদ্ভুত শুল্কল জীব বলিয়া ভ্রম হয়। একরূপ বিশাল আকার এবং একরূপ শক্তিশালী জীব হইলেও তিমিদের শত্রুসংখ্যা বড় কম নহে। সমুদ্রের তলোয়ার মাছ (Sword fish) ইহাদের সর্বপ্রধান শত্রু। তলোয়ার মাছের প্রায় ১০ হইতে ১৫ ফুট অবধি দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহাদের মুখের উপর চোয়ালটি তলোয়ারের মত লম্বাকারে বর্ধিত হয় বলিয়াই ইহাদের এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। ইহাদের মুখের তলোয়ারটি প্রায় চার-পাঁচ ফুট দীর্ঘ হইয়া থাকে এবং ইহার অগ্রভাগ অত্যন্ত ধারাল। এই তলোয়ারের দ্বারাই ইহার তিমিকে আক্রমণ করিয়া বিপর্যস্ত করিয়া থাকে। অনেক সময় ইহাদের সম্মিলিত আক্রমণের ফলে তিমির জীবননাশ ঘটিয়া থাকে।

গ্রীনলাণ্ডের তিমিকে উত্তর-আর্টিক্-সমুদ্রের এক জাতীয় হাঙ্গর আক্রমণ করিয়া সংহার করে। এই হাঙ্গরের নাম গ্রীনলাণ্ড শার্ক। ইহার জীবন্ত তিমির দেহ হইতে মাংসখণ্ড ছিন্ন করিয়া ভক্ষণ করে এবং তাহার ফলে শেষে তিমির প্রাণবিয়োগ ঘটিয়া থাকে।

তলোয়ার মাছের মত সমুদ্রের করাত মাছেরাও তিমির

বিশেষ শত্রু। ইহাদিগকে মাছ না বলিয়া হাঙ্গর বলা উচিত। দৈর্ঘ্যে ইহারা প্রায় ১৫ ফুট অবধি হইয়া থাকে। তলোয়ার মাছের মত ইহাদের উপর চোয়ালটি অত্যধিক বর্দ্ধিত হইয়া করাতের আকার ধারণ করে। কলিকাতার যাহুঘরে করাত মাছ রক্ষিত হইয়াছে। তিমিকে দেখিতে পাইলেই উহার দেহে ইহারা করাত বিদ্ধ করিয়া দেয়। ইহারা এমন বেগে তিমির সঙ্গে করাত বিদ্ধ করে যে, অনেক সময়েই উহাকে আর বাহির করিতে পারে না এবং করাত তিমির শরীরের মধ্যে ভাঙিয়া রহিয়া যায়।

তিমির আর একটি প্রবল শত্রু গ্রাম্পাস্ (grampus)। ইহারা তিমি-জাতির অন্তর্ভুক্ত জীব। দৈর্ঘ্যে গ্রাম্পাসেরা প্রায় বিশ-একুশ ফুট হইয়া থাকে। ইহারা হাঙ্গরের মতই হিংস্র। বৃহদাকার তিমিকে দেখিতে পাইলে ইহারা বৃকের মত দলবদ্ধ হইয়া উহাকে আক্রমণ করে। বারংবার আক্রমণের ফলে শেষে তিমির প্রাণবিয়োগ ঘটিলে উহার মেদ-মাংসে ইহারা উদরপূর্তি করিয়া থাকে। তলোয়ার মাছ, করাত মাছ এবং গ্রাম্পাসদের ভয়ে তিমিদের সর্বদাই সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়।

মেরুপ্রদেশের শ্বেত ভল্লুককেও তিমির শত্রুমধ্যে গণনা করা যাইতে পারে। সীল ও ওয়ালরাসের মাংস যেমন ইহাদের প্রিয় আহার, তিমির বসা ও মাংসও তেমনই ইহাদের বিশেষ প্রলোভনের সামগ্রী। সমুদ্রের তীরে তিমি আসিয়া পড়িলে বা সমুদ্রের জল জমিয়া বরফের মধ্যে তিমি ধরা পড়িলে ইহারা দলবদ্ধ হইয়া তাহাকে আক্রমণ করে।

উত্তরমেরু প্রদেশের ও উত্তর-ইউরোপের শিকারীরা তিমির সর্বপ্রধান শত্রু। তিমির বসা ও মাংস গ্রীনলাণ্ড-বাসী এন্টিমোদের প্রধান খাদ্য। লাপলাণ্ডবাসীরাও জীবন-

ধারণের জন্ত তিমির মেদ ও মাংসের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। ইহাদের অবিরাম হননের ফলে তিমির সংখ্যা বিশেষ ভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্বে সমুদ্রের যে-সকল অংশে বহু তিমি দৃষ্ট হইত, এক্ষণে সে-সকল স্থানে ইহারা একবারেই বিরল। সপ্তদশ শতাব্দীতে দিনেমারেরা অসংখ্য তিমি বধ করিয়াছিল। তিমি শিকারের জন্ত তাহাদের ২৬৬ খানি জাহাজ ও চৌদ্দ হাজার শিকারী নাবিক এক সময় নিযুক্ত ছিল। তাহার পরে অত্যন্ত জাতিরাও বনার লোভে ইহাদের শিকারে প্রবৃত্ত হয়।

সুইডেনের একবারে দক্ষিণে বাল্টিক সমুদ্রের উপর ইষ্টাড্ নামে একটি বন্দর আছে। কিছুকাল পূর্বে এই বন্দরের নিকট একটি ষাট ফুট দীর্ঘ তিমির প্রস্তরীভূত দেহ মুক্তিকামধা হইতে বাহির করা হইয়াছিল। উহার দেহ আধুনিক যুগের ঐ আকারের তিমি-দেহের প্রায় সাতাশ গুণ বৃহৎ এবং ভারী।

তিমির সহিত স্থলের বৃহত্তম জীব হস্তীর কতকটা চরিত্রগত সাদৃশ্য আছে। উভয় প্রাণীই বেশ শাস্ত ও নিরীহ, কিন্তু ক্রুদ্ধ বা উত্তেজিত হইলে উভয়েরই প্রকৃতি অতীব ভীষণ হইয়া উঠে। একটি তৈলতিমি একবার আক্রান্ত হওয়ায় নয়খানি নৌকা দংশন করিয়া চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। আক্রান্ত তিমির পুচ্ছাবাতের দৃশ্য দেখিলে পরম নির্ভীকেরও হৃদয় ভয়ে কাঁপিয়া উঠে। আবার সাধারণ অবস্থায় এই উভয় জীবই অনেকটা ভীক-প্রকৃতির। হস্তী ও তিমি উভয়ের দেহ হইতেই মূল্যবান সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায়। মৃত হস্তীর মূল্য লক্ষ টাকা হইলে একটি তিমির মূল্য সে-হিসাবে কোটি টাকা ধার্য করা যাইতে পারে।

মনের গহনে

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

এ-পাশে শিবের মণ্ডপ। মাঝখানে একটা ডোবা। ও-পাশে নদাই ঘোষের ছোট্ট কুঁড়ে ঘর।

শিবের মণ্ডপ জরাজীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ছাদের খানিকটা অংশ ভাঙিয়া পড়িয়াছে। থামগুলো সরু হইয়া আসিয়াছে, গাঙ্গনের ঢাক বাজিলে বৃড়া মানুষের দাঁতের মত হন্ হন্ করিয়া নড়ে। তথাপি বে ভাঙিয়া পড়ে না, সে নিশ্চয় বাবা ধর্মরাজের মহিমা। প্রতি বৎসর গাঙ্গনের সময় মণ্ডপের স্নাতকরেরা মণ্ডপ সংস্কারের জন্য চাঁদা সংগ্রহের চেষ্টা করে। গাঙ্গন কাটিয়া যায়, কিন্তু চাঁদা ওঠে না। আবার যে কে সেই। এমনি করিয়া বছরের পর বছর কাটে। মণ্ডপের অবস্থা জীর্ণ হইতে জীর্ণতর হয়। মণ্ডপের 'দেয়াসীন' ঢাকের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে মাথা কোটে। বাবা ধর্মরাজ অবশেষে তাহার স্বন্ধে ভরু করেন। 'দেয়াসীন' মণ্ডপের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে গড়াগড়ি দেয়। ভক্তেরা ঘন ঘন 'বলো শিবো ধর্মরাজ' বলিয়া সীংকার করে, কেহবা দেয়াসীনকে বাতাস করে, কেহবা বেতের ছড়িটা দিয়া ভিড় সরায়।

—বাবা, কি অপরাধ হয়েছে বলুন?

দেয়াসীন পাশের গ্রামের চাঁড়ালদের একটি আধা-বয়সী মেয়ে। পরনে রক্তাঙ্গুর। গলায় এবং হাতে অনেকগুলি রুদ্রাক্ষের মালা। মাথায় জটা। কথা কহিলেই ভক্ ভক্ করিয়া মদের গন্ধ বাহির হয়। বাবা সন্মোহন করা হইল তাহাকে নয়, তাহার মাথায় যে দেবতা ভরু করিয়াছেন তাঁহাকে।

বাবা দেয়াসীনের মুখ দিয়া বলিলেন—আমার ঘরের কি করলি? কতদিন থেকেই তো বলছি। কি করলি? কি করলি? জল হবে ভেবেছিল? হবে না ত। তোদের ধান হবে বলে কি আমি ভিজব নাকি? হবে না তো? আমার ঘরের কি করলি বল?

বাবা বহুদিন হইতে এমনি ধারা শাসাইয়া আসিতেছেন।

গ্রামের ঘোলে আনার বাবার উপর শ্রদ্ধাও অটুট। কিন্তু তথাপি মণ্ডপের সংস্কার আর এই কয়েক বৎসরে কিছুতে হইয়া উঠিতেছে না। তবু এ-পর্যন্ত এই অপরাধে বাবার রুদ্ররোষ কাহারও উপর নামে নাই। গ্রামের লোকে বাবার মন্দিরের ধূলা জিহ্বার অগ্রভাগ হইতে ললাট পর্যন্ত ভক্তিতরে স্পর্শ করে। বলে,—বাবা আমাদের সদাশিব। নইলে এত অপরাধের বোঝা নিয়ে কোন দিন ভরাডুবি হয়ে যেত। ছেলেপুলে নিয়ে ...

না, বাবার সদাশিবত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই। এতগুলি সন্তানের সম্বৎসরের সমস্ত অপরাধের বিষ তিনি নিজের কণ্ঠে তুলিয়া লইয়া গাঙ্গনের কয়টা দিন বিনা আপত্তিতে রৌদ্রে পোড়েন এবং বৃষ্টিতে ভেজেন। তাঁহার পক্ষে মুখের কথা এই যে, বেশী দিন এই ভাঙা মণ্ডপ তাঁহাকে বাস করিতে হয় না। বারো মাসই পুরোহিত-গৃহে থাকেন।

মণ্ডপের অবস্থা এইরূপ।

ডোবার অবস্থাও তাহার চেয়ে ভাল নয়। এ-পাড়ার এইটাই খিড়কী বলিলে খিড়কী, সদর বলিলে সদর। বাসনমাজা, হাত-পা ধোওয়া এই জলেই হয়। মুখে দিবার উপায় থাকিলে মুখ ধোওয়াও চলিত। কিন্তু সে উপায় নাই। শুধু এই বাটের দিকটা ছাড়া বাকী সাড়ে তিন দিকে দুর্ভেদ্য বাশের ঝাড় এমন অঙ্কার করিয়া আছে যে, ভলে সূর্যালোক পড়িবার কোন প্রকার আশঙ্কা নাই।

এ-কণা গুনিয়া শহরের লোকে নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু সমস্ত ব্যাপার ত তাঁহারা জানেন না। পাড়াগায়ে বাশ নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু। ঘর ছাওয়া, খুঁটি তৈরি করা আছেই। বাশের পাতা জলে পড়িয়া জল নষ্ট করে এ-তথ্য তাহাদের নিজেদেরও অবদিত নয়। কিন্তু উপায় কি? প্রতিবেশীরা কেহই

ভাল লোক নয়। চোখের স্মৃথ হইতেই বাশ চুরি করিয়া পলায়ন করিতেছে; দূরে চোখের আড়াল হইলে কি আর ঝাড়ের চিহ্ন রাখিত ?

শুধু তাহাই নয়। এই অতি তুচ্ছ ডোবাটিই এ-পাড়ার একটি মূল্যবান সম্পত্তি। সম্বৎসরের শাক ইহাতেই উৎপন্ন হয়। তাহা তুচ্ছ করিবার বিষয় নয়। ঘাটের উপর সন্মুখ দিকে হাত দুই মাত্র স্থান ছাড়া বাকী সমস্তই শাক, শাক, শাক—ফল নজরে পড়ে না। এক-এক পরিবার এক-একট মাত্র কঞ্চির সাহায্যে অদ্ভুত কৌশলে নিজের নিজের শাক আটকাইয়া রাখিয়াছে। এদিকের শাক ওদিকে বাইবার উপায় নাই। তাও কি আর যায় না! কিন্তু সে কচিং! তখন এই শাক লইয়াই একটা ফৌজদারী বাধিয়া যায়।

কিন্তু শুধুই কি শাক! অ'পনি নয়টা-দশটার সময় যদি এদিকে আসেন, দেখিবেন,—অবশ্য একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে,—দেখিবেন, একটি বৃদ্ধ সেই বাশবনের নীচে অক্ষকারে অক্ষকারে বাকের মত সম্ভরণে পা ফেলিয়া মাছ ধরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার বা-হাতে একটা ভাঙা এনামেলের বাটিতে কতকগুলি কেঁচো এবং একটা সরু তালপাতায় গাথা কতকগুলি ক্রাটা, মাগুর ইত্যাদি মাছ। তিন-চারিটি মাত্র। এই কয়টি সংগ্রহ করিতেই তাহাকে বার-তুই ডোবার ধারে ধারে পরিক্রমণ করিতে হইয়াছে।

এই লোকটিই নদাই ঘোষ!

বয়স পঞ্চাশের বেশী হইবে না। কিন্তু দেখিলে মনে হয় ঘাটের কাছাকাছি। মাথার চুলগুলি সব পাকিয়া গিয়াছে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। শীর্ণ, দীর্ঘ দেহ,—কোমর বাকিয়া গিয়াছে। চোখ কোটর-প্রবিষ্ট, চর্ম লোল এবং কর্কশ। বা-পাখানা অস্বাভাবিক রকম সরু। সেজন্য খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হাঁটে। মুখে দাঁত বলিতে একটুও নাই। শীর্ণ, ভাঙা গাল একেবারে মুখের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে।

ডোবার ওধারে তাহার বাড়ি এবং এই ডোবাটি শুধু শাক নয়, তাহার সম্বৎসরের মাছও সরবরাহ করে। অর্থাৎ কেবল অন্ন এবং বস্ত্রের। কিন্তু সে আর কতই

বা! এক জোড়া বস্ত্রে তাহার দিবা একটা বৎসর চলিয়া যায়। আর অন্ন? একটা পেটে কতইবা লাগে? সপ্তাহে দুইটা দিন মুনিস খাটিলেই সে-অন্নের সংস্থান হইত। যত দিন শরীরে সামর্থ্য ছিল তার বেশী সে কখনও খাটেও নাই। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া যদি কখনও কেহ মাঠে খাটিবার জন্ত তাহাকে ডাকিতে আসিত, পেটের ব্যথার অঙ্কুহাতে প্রায়ই তাহাকে সে ঘুরাইয়া দিত। লোকটা উহারই মধ্যে একটু শযাবিলাসী। বেলা নয়টার আগে আর তাহার অতি-পুরাতন ছিন্ন মলিন শয্যার বাহিরে পারতপক্ষে আসে না। যখন শরীরে সামর্থ্য ছিল তখনও আসিত না, এখনও না।

অবশ্য শরীরে সামর্থ্য ছিল বলিতে এ-কথা বুঝিলে ভুল হইবে যে, এককালে তাহার শরীরে যথেষ্ট সামর্থ্য ছিল। যথেষ্ট সামর্থ্য তাহার কোন কালেই ছিল না। চিরদিনই অমনি ঢাঙা এবং লিকলিকে দেহ, কোলের কাছে কুঁজো। গত পঁচিশ বৎসর কাল বছরে ছয় মাস মালেরিয়ায় ভুগিলে সামর্থ্য আর থাকে কি করিয়া? তা নয়, তবে পেটের ভাতের সংস্থানের জন্ত সপ্তাহে দুই তিন দিন মাঠে খাটিতে যেটুকু সামর্থ্যের প্রয়োজন হয় সেটুকু সামর্থ্য এতকাল ছিল। কিন্তু গত দশ বৎসর হইতে আর তাহাও নাই। এখন আর মাঠে খাটিতে পারে না।

সে একপক্ষে ভালই হইয়াছে। সকালবেলায় মাঠে খাটিতে বাইবার জন্ত এখন আর কেহ অকালে নিদ্রাভঙ্গ করিয়া বিরক্ত করিতে আসে না। বেলা নয়টা পর্যন্ত নিরীক্সে ঘুমটা হয়। ডোবার মাছ এবং শাক ত আছেই। আর আছে ডোবার ধারে কয়েক ঝাড় বাশ। তাহা বিক্রয় করিয়া তাহার বৎসরের কাপড় জুখানির দাম ওঠে। আর...

এইখানেই তাহার ভাগ্যকে অসাধারণ বলা চলে।

যৌবন নদাই ঘোষের বিবাহ হয় নাই। কতকটা কল্পাপক্ষীয়দের দোষে। পণ না লইয়া কেহই এই সুপাত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদান করিতে সন্মত হয় নাই। কতকটা তাহার নিজের অলসতায়। তাহার নিজের তরফ হইতেও কোন আগ্রহ দেখা যায় নাই। আর কতকটা আত্মীয়-

জনের অভাবে। মা-বাপ ছেলেবেলাতেই হারাইয়াছে। বড় কিংবা ছোট একটা ভাই পর্যন্ত নাই, যে খুঁজিয়া-পাতিয়া ভায়ের জন্য একটা বধু সংগ্রহ করিয়া আনিবে। বৌবনটা এমনি করিয়াই কখন যে কাটিয়া গেল বোঝাই গেল না। অবশেষে, চল্লিশ বৎসর বয়সের সময়, ম্যালেরিয়ার হাতে পড়িয়া শরীর যখন জীর্ণ, একমাত্র প্ৰীহাবিপুল উদরপ্রদেশ ছাড়া দেখাইবার মত কিছুই যখন অবশিষ্ট নাই, তখন অকস্মাৎ এক শুভলগ্নে তাহার বিবাহ হইয়া গেল। ছোটবাবুর বহু কীর্তির মধ্যে এই এক কীর্তি। পাত্র এবং পাত্রী দেখা, লগ্নপত্র সম্পাদন, আশীর্বাদ, গাত্রহরিদ্রা, শোভাযাত্রা, বিবাহ, বাসরশয়ন, পাকস্পর্শ, ফুলশয্যা,— এক কথায় সংবাদপত্রে সংবাদটি প্রকাশিত হওয়া ছাড়া সমারোহ বলিতে আর যাহা-কিছু বোঝায় তাহার কোথাও ক্রটি ছিল না। নহবৎ বসিল। ঢাক, ঢোল, সানাই, কাঁশি বাজিল। এমন কি ছেলেরা তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া শেষে কতকগুলি টিন আনিয়া বান্ধাইতে লাগিল। একত্র একটা পয়সাও নদাইকে ব্যয় করিতে হয় নাই। সমস্ত ছোটবাবু নিজের পকেট হইতে দিয়াছেন। পাঁচ জনের কাছে কিছু টাঙ্গাও উঠিয়াছিল। নদাই মনে মনে খুলী হইলেও খুব লজ্জিতই বোধ করিতেছিল। এ-বয়সে আর কেন এ-সব?

নদাই মিথ্যা বলে নাই। সত্যই এ-বয়সে আর এ-সবের প্রয়োজন ছিল না, এবং শেষ পর্যন্ত সেই কথার সত্যতাই প্রমাণিত হইল ফুলশয্যার সকালে বহুকণ্ঠে অনেক খোঁজাখুঁজির পর কেবল নদাইকে পাওয়া গেল,—হস্তপদবন্ধ অবস্থায় খাটের নীচে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। বধু নাই। ঘরে, বাহিরে, কোথাও নাই। এমন কি ছোটবাবু নিজে লোক নামাইয়া ডোবার জলে পর্যন্ত খোঁজ করিলেন। সেখানেও নাই! সম্ভব অসম্ভব সকল স্থানেই খোঁজ করা হইল। কোথাও পাওয়া গেল না।

নদাইয়ের জ্ঞান যখন হইল তখন বেলা দশটা। এই রকম সময়েই সাধারণতঃ তাহার ঘুম ভাঙে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল।

তখনও তাহার কথা কহিবার শক্তি নাই। রেচারার

ভয়ানক ভয় হইয়াছে। দুই চোখের কোণ বাহিয়া কেবল অশ্রু গড়াইতেছে। উত্তরে সে শুধু হাতের তালু উল্টাইয়া জানাইল, বধু নাই।

কোথায় গেল?

জানে না।

তাহাকে এমন হাত-পা বাধিয়া ফেলিয়া গেল কে?

নদাই আঙুল দিয়া খাটের নীচেটা দেখাইয়া দিল।

আরও বেলা হইলে কথটা স্পষ্ট করিয়া জানা গেল:

বৌভাতের হাঙ্গাম মিটাইয়া এমনিতেই ফুলশয্যার দেরি হইয়া গিয়াছিল। বর-বধুর শুইতে রাত্রি এগারোটা কি বারোটাই হইবে। নদাই বধুর একটা হাত ধরিয়া প্ৰীতি-সম্ভাষণ করিতে যাইবে, বউ এক ঝটকা দিয়া হাত টানিয়া লইল। ঠোঁটে হাত দিয়া ইঙ্গিতে বলিল, চুপ।

নদাই ভাবিল, বোধ করি কেহ জানালার গোড়ায় আড়ি পাতিতেছে। সেই ভয়েই বধুর এই সতর্কতা। আড়ি পাতিবার অবশ্য তাহার কেহ নাই। তবু পাড়ার মেয়েরা কি আর ছাড়িবে?

বধু পা বুলাইয়া খাটের উপর নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। নদাইও আর কথা না কহিয়া যেমন ছিল তেমনি বসিয়া রহিল।

এমনি বোধ করি ঘণ্টাখানেক কাটিল।

নদাই আর থাকিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে ডান হাতখানি বধুর কাঁধের উপর রাখিল।

—এই—বলিয়া বধু কাঁধের এক ঝাঁকুনীতে নদাইয়ের হাতটা ফেলিয়া দিল।

আরও অনেক ক্ষণ কাটিল। ছোটবাবুদের বালাখানার ঘড়িতে চং চং করিয়া দুইটা বাজিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে নদাইয়ের চোক ঘুমে ঢুলিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু বধু ঠায় তেমনি বসিয়া আছে।

নদাই ফিস্ ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার ঘুম পায় নি?

বধু ধাড় নাড়িয়া জানাইল—না, পায় নাই।

—তুটো বান্ধে যে।

—বাকুক।

—হ্যা, বাজবে বইকি? এস—বলিয়া নদাই যেমন বধুকে বাহুপাশে বাঁধিতে গাইবে অমনি বধু তড়াক্ করিয়া নীচে লাফাইয়া পড়িয়াই ফস্ করিয়া আলো নিবাইয়া দিল। তারপর কোথা দিয়া কি হইল, ভাবিলে এখনও হৃৎকম্প হয়, যম-দূতের মত কতকগুলো লোক পট্, পট্, করিয়া তাহাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাধিয়া বোধ হয় বউ লইয়া চলিয়া গেল। নইলে বউ গেল কোথায়? মোট কথা, ইহার পরে ঠিক কি যে হইল তাহা আর স্মরণ নাই।

ছোটবাবু অনেক ভাবিয়া বলিলেন—সেই যমদূতগুলো নিশ্চয় এর নীচে ছিল। বলিয়া আঙুল দিয়া খাটের নীচেটা নির্দেশ করিলেন।

নিতান্ত ভালমানুষের মত নদাই বলিল—বোধ হয়।

সে যাহাই হউক, সময় এবং স্রোতের মত বধুও একবার গেলে আর ফিরিয়া আসে না। বধু আর কোন দিন স্বামীর ঘর করিতে আসিল না। নদাইও স্বপ্নায় লজ্জায় তাহার কথা আর জিজ্ঞাসা করিল না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বধু না-আসিলেও বধুর পিতৃগৃহ হইতে মাসের মধ্যে দুইবার কোন-না-কোন পর্ক উপলক্ষে চাল, ডাল, নুন, তেল হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষের নিত্যাবহাৰ্য্য প্রত্যেক দ্রব্য এত পরিমাণে আসিতে লাগিল যে, নদাইয়ের অন্নসম্ভার চিহ্নমাত্র রহিল না। এইজন্যও বধুর বিয়োগব্যথা নদাইয়ের বুক হইতে অনেকটা দূর হইল। আর বাকীটা দূর হইল ছোটবাবুর আশ্বাসে।

ছোটবাবু এ-গ্রামের হস্তা-কস্তা-বিধাতা বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। এ-গ্রামের যোলো আনারই তিনি জমিদার। বছর চল্লিশ বয়স। দিবা সূপুরুষ চেহারা। লেথাপড়া বিশেষ করেন নাই। কিন্তু গানে, বাজনায়ে, বক্তৃতায় অদ্বিতীয়। বস্তুতপক্ষে এখানকার থিয়েটার পার্টির ইনিই প্রাণ-স্বরূপ। অত্যন্ত আমুদে লোক,—তাহাকে বলে মজলিসী। নদাই তাঁহার অত্যন্ত মেহভাজন।

কিছু দিন নদাই মুখ বুজিয়াই কাটাইল। পাড়ার লোকেরা তাহার স্ত্রী-ভাগের জন্ম হুঃখ প্রকাশ এবং শশুর-ভাগের জন্ম আনন্দ জ্ঞাপন করে।

—মেয়মানুষের কথা ছেড়ে দাও ঘোষ, ওঁদের চরিত্র দেবতার পর্যান্ত বৃত্তিতে পারেন না। কিন্তু এমন শশুর ক'জনের হয় বল ত? মাসে দু-বার তত্ত্ব করা কি এই বাজারে সোজা ব্যাপার না কি?

নদাই হ্যা না কোন কথাই বলে না। কিন্তু আলোচনাটা শুনিবার জন্ম বসে। লোকে এই হুঙ্কারের পাণ্ডা কে কে তাহা অহুমান করিবার জন্ম বহুলোকের নাম করে। তাহার পাড়ারই ছেলে-ছোকরা। কথাটা নদাই ঘোষের মনে লাগিলেও সে মুখ ফুটিয়া সমর্থন করিতে ভয় পায়। ছেলেগুলো সত্যই হুঃশমন-প্রকৃতির। নদাই চুপ করিয়া থাকে। মনে মনে ভাবে, অমন সুন্দরী মেয়ে তাহার কপালে সহিবে কেন? মেয়ের মুখ সে দেখিয়াছে।

অবশেষে নদাই এক দিন ছোটবাবুকে ধরিয়া বসিল। বিবাহ না করিলে তাহার একটি দিনও চলিতেছে না। এই বয়সে নিজের হাত পোড়াইয়া রান্না করার ঝকমারি কি সহজ!

এই কথা!

ছোটবাবু তৎক্ষণাৎ তাহাকে আশ্বাস দিলেন, এক পক্ষের মধ্যে বিবাহ দিয়া তবে তাঁহার অন্ত কাজ।

ছোটবাবু ইচ্ছা করিলে, কি না হয়। এক পক্ষও অপেক্ষা করিতে হইল না। দুই-তিন দিনের মধ্যেই কোথাকার কে এক জন আসিয়া পাত্র দেখিয়া গেল। দেখামাত্র পাত্র পছন্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে আশীর্বাদ এবং দিন স্থির।

পাড়ার আবালবৃদ্ধবনিতার মনে খুশী আর ধরে না। কেবল নদাই নিজে একটু খুঃখুঃ করিতে লাগিল। মেয়েটি নাকি কালো। নদাইয়ের স্মৃতিপটে তখনও তাহার প্রথম পত্নীর অপরূপ রূপলাবণ্য ভাসিতেছিল। কিন্তু এ-আপত্তির কথা মুখ ফুটিয়া কাহাকেও বলিতে সাহস করিল না।

শুভদৃষ্টির সময় মনে হইল, মুখ ফুটিয়া বলিলেই ভাল ছিল। প্রথম পত্নীর শুধু রংটাই ফর্সা ছিল না, মুখ-গানিও বেশ কচি কচি। এ-মেয়ে যেমন কালো, তেমনি কুৎসিত। মুখের গড়ন একেবারে পুরুষালি। গাল ভাঙিয়া গিয়াছে। চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে,

এক শুভদৃষ্টির সময় এমন কটমট করিয়া চাহিল যে নদাই শিহরিয়া উঠিয়া ভয়ে চক্ষু বন্ধ করিল।

বউ দেখিয়া পাড়ার মেয়েরা নদাইকে শুনাইয়া বলিয়া গেল,—বেশ বউ হয়েছে। কালো হ'ল তো কি হ'ল? রূপ নিয়ে কি মানুষ ধুয়ে থাকবে? বেশ বউ হয়েছে। এ-মেয়ে নিয়ে দু-দিন তবু ঘর করতে পাবে।

কিন্তু তাহাদের কথায় নদাই কিছুমাত্র আশ্বাস পাইল বলিয়া মনে হইল না। তাহার মনে পড়িতে লাগিল, সেট কোটর-প্রবিষ্ট চোখের জলস্ত দৃষ্টি। মনে পড়ে, আর ভয়ে চোখ বোজে।

সেদিন 'কালরাত্রি'। বধু-সম্ভাষণের বাল্যই নাট মন কাটিল না। কিন্তু পরের দিন সকাল হইতেই জ্বর-জ্বর করিতে লাগিল। রাত্রে তাহাকে এক প্রকার জোর করিয়া ঠেলিয়া ঘরে পাতানো হইল। বধু তখন দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা শুঁজিয়া দেওয়ালে ঝেঁসান দিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। মেয়েদের সম্বন্ধে নদাইয়ের অবশ্য কোন প্রকার অভিজ্ঞতা নাই। তথাপি এই ভাবে যে কোন রমণী কখনও বসিতে পারে তাহা সে জীবনে দেখে নাই।

বধুটির বোধ করি একটু নিদ্রার ভাব আসিয়াছিল। নদাইয়ের পদশব্দ টের পায় নাই। নদাই দরজাটা বন্ধ করিতেই বধু জাগিয়া উঠিয়া ভাল করিয়া বসিল। নদাই খাটের দিকে আগাইয়া আসিতেছিল। বধুর চোখে চোখ পড়িতেই থমকিয়া দাঁড়াইল।

নববধুই আগে কথা কহিল। মেঝের যে মাদুরখানি পাতা ছিল সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, ওইখানে শুয়ে চুপটি ক'রে ঘুমিয়ে পড়। এদিকে এসেছ কি খেংরে বিষ ঝেড়ে দোব।

কণ্ঠ ত নয়, যেন একসঙ্গে অনেকগুলি ভাঙা গালা-বাসন ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। আচ্ছা মেয়ের পাল্লায় পড়িয়াছে বা হোক:

—আমার কাছে এসেছ কি, তোমারই এক দিন আর আমারই এক দিন। বুঝলে?

নদাই বিনা বাক্যব্যয়ে মেঝের মাদুরে শুইয়া পড়িল এবং অনেক ক্ষণ পর্যন্ত জাগিয়া জাগিয়া শুনিতে লাগিল, নব-বধুর নাসিকা বিচিত্র হুরে গর্জন করিতেছে। তার পরে

সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর কখন এক সময় সে নিজেও ঘুমাইয়া পড়িল।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সকালে দেখা গেল এই 'মেয়েটিও কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। বহু লোক জড় হইল। ছোটবাবু নিজে আসিয়া সকলকে শুনাইয়া বোধ করি বাতাসকে শাসাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু তথাপি তাহাকে পাওয়া গেল না। সকলের চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নদাই বধুর শোকে প্রকাণ্ডভাবে এমন কান্না কাঁদিতে লাগিল যে, সমস্ত লোককে শুধু হাসি চাপিবার জন্য ছুটিয়া পলাইতে হইল।

এই ঘটনার পর কয় দিন পর্যন্ত নদাই বিছানা ছাড়িয়া ওঠে নাই,—জরের জন্ম নয়, শোকে। ছোটবাবুর চাকর প্রত্যহ ভাত লইয়া আসিয়া বহু সাধা-সাধনা করিয়া তবে তাহাকে ছুটি অন্ন গ্রহণ করাইতে সমর্থ হয়।

দেখিতে দেখিতে নদাই একেবারে উন্মাদ হইয়া গেল।

রাস্তায় বাহির হইলেই ছেলেরা পিছনে লাগে। প্রথম প্রথম নদাই হুট, কাঠ, হাতের কাছে বাহা পাইত, তাহা লইয়া তাড়া করিত। কিন্তু সব সময় হুট, কাঠ হাতের কাছে পাওয়া যায় না দেখিয়া অবশেষে লাঠি লইয়া বাহির হইত। শেষে দেখিল কিছুতেই তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। নাগালের বাহিরে থাকিয়া তাহারা কেবলই বিরক্ত করে। নদাই বাহিরে বাহির হওয়া ছাড়িয়াই দিল। দিন-রাত্রি বাড়ির মধ্যেই থাকে এবং আপন মনে বিড় বিড় করিয়া কি বকে।

তাহার অবস্থা দেখিয়া ছোটবাবু বলিলেন—আমি বলি কি, নদাই, তুমি আর একটা বিয়ে কর। এত বয়সে যত্ন-আপত্তি করার লোক নইলে চলে?

নদাই একেবারে আফ্লাদে আটখানা হইয়া উঠিল।

—কি যে বলেন ছোটবাবু? আবার...হ'?

ছোটবাবু দু-হাত নাড়িয়া তাহার কথা উড়াইয়া দিয়া বলিলেন,—না, না, আমি তোমার কথা শুনব না। দেখ তো, আমি এমন মেয়ে আনছি...

নদাই আর আপত্তি না করিয়া হাত কচলাইতে লাগিল।

অবশ্য এবার আর বিবাহ হইল না। নদাইয়ের বিয়ঃ মনটা বিবাহের নামে খুশী হইবে বলিয়াই কেবল কথাটা ছোটবাবু পাড়িয়াছিলেন।

আগের রাতে নদাইয়ের জ্বর হইয়াছিল। তখনও একটুখানি জ্বর ছিল। নদাই আর বসিয়া থাকিতে পারিতেছিল না।

ছোটবাবু তাহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। ভিতরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—জ্বর কি খুব বেশী নদাই?

নদাই রোগবস্তুগায় মুখখানা বিকৃত করিয়া উত্তর দিল,—নাঃ! ছেড়ে যাবে এক্ষুণি।

ম্যালেরিয়া জ্বর। মানুষ আর কত উপবাস পালন করিবে? এদিকের সকলেই জ্বর ছাড়িয়া গেলেই তুঁটিখানি ভাত খায়।

ছোটবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাহ'লে তোমার পাওয়া দাওয়ার।

—পাক, হবে এখন।

ছোটবাবু একটু ক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—তাহ'কে আমি বরং তোমার ভাত পাঠিয়ে দোব। কি বল?

কশালের বয়ঃ দুইটা টিপিয়া ধরিয়া নদাই বলিল— তাই করবেন।

ছোটবাবুর আর অপেক্ষা করিবার সময় ছিল না। মধ্যে দুইটা দিন, তার পরেই পূজা। নহবৎ বসিয়া গিয়াছে। প্রতিমা-তৈরিও শেষ হইয়া আসিল। এখন হঠতেই বাড়িতে সমাবোহ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে বলা চলে,—বিশেষ করিয়া ছেলেরা এবং মেয়েমতলে। তিনি চলিয়া গেলেন।

সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী তিন রাত্রি গান হয়,—ছোটবাবুর নিজেরই থিয়েটার পার্টের। কিন্তু পাশের গ্রামে সে মথের যাত্রার দল আছে, এ-আসরে কখনও তাহারা গান করে নাই। এবারে তাহারা ধরিয়া পড়িয়াছে, দুর্গাপূজাতে তাহারা এক দিন গান করিবে। ছোটবাবু তাহাদের 'না' বলিতে পারেন নাই। স্থির হইয়াছে, অষ্টমীর রাতে তাহাদের গান হইবে।

বঙ্গী এবং সপ্তমী এই দুইটা দিন নদাই ভাল ছিল।

অষ্টমীর দিন আর থাকিতে না পারিয়া ঠুক ঠুক করিতে করিতে নাটমন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইল।

তখন সন্ধ্যা অনেক ক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গান আরম্ভ হয় নাই, কিন্তু বিস্তীর্ণ শামিয়ানার নীচে ভিড় বেশ জমিয়াছে, এবং সেখানকার জনকল্লোল অনেক দূর হইতেই শ্রুতিগোচর হয়। প্রবেশপথের মুখেই দুই পাশে দুটি 'হুমভূমি' স্বল্প আলোক এবং প্রচুর ধূম উদ্গীরণ করিতেছে। লোকে আসিবার সময় সেখানে একবার দাঁড়াইয়া বিড়ি ধরাইয়া লইতেছে। তাহারা অপেক্ষাকৃত সৌখীন লোক এবং ছোকরা বয়সের। মাথায় ঢেউ-খেলানো এলবার্ট টেরী আছে। কাহারও গায়ে পাঞ্জাবী, কাহারও কোট। তাহার উপর কাপড়খানি কোমরে 'গোয়ালছাঁদে' বাঁধা। তাহাদের গায়ে কিছুই নাই তাহারা আসরের পশ্চিম দিকটা জুড়িয়া বসিয়া আছে। খড়ের ধোঁয়ায় সেদিকটা অন্ধকার,—দৃষ্টি চলে না। দলের পর দল আসিতেছে। আসিয়া পরস্পরের সঙ্গে কলহ অথবা কুশল প্রশ্নের পরেই তামাক পাওয়ার পালা। তুকা, কলিকা, তামাক এবং বথেষ্টসংখ্যক পাকানো খড়ের 'হুটি' সঙ্গেই আছে। বক্রমকি ঠুকিয়া অগ্নিগভ শোলায় উপর সে 'হুটি' বসাইয়া দুইটা ফুঁ দিলেই গল্গল্ করিয়া ধোঁয়া ওঠে। ভাগ্য ভাল যে, শুধু মাথার উপরের দিকটাই শামিয়ানা দিয়া বন্ধ। চারিপাশ বন্ধ থাকিলে, যে-পরিমাণ ধোঁয়া উদ্গত হইতেছে তাহাতে নাটমন্দির-সমেত সমস্ত স্থানটা বেগুনের মত উষ্ণে উঠিতে থাকিলেও বিঘ্নিত হইবার কোন কারণ ঘটিত না।

ওদিকের বড় বারান্দার চিক টাড়াইয়া মেয়েদের জায়গা করা হইয়াছে। আর সমাগত ভদ্রলোকদের বসিবার জায়গা হইয়াছে দক্ষিণ দিকের বারান্দায়। নদাই সেই দিকে আসিয়া উপস্থিত হইল। ছোটবাবুর কাছে বসিয়া গান না শুনিলে নদাইয়ের সুখ হয় না। বারান্দার এক পাশে গোটাকয়েক তাকিয়া লইয়া ছোটবাবু বসিয়া থাকেন। তাহার পাশেই বারান্দায় পাঝুলাইয়া একটা খামে ঠেস দিয়া নদাই মাঝে মাঝে ধুমায় এবং মাঝে মাঝে গান শোনে। নদাইকে দেখিয়া

ছোটবাবু উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। এত দিনের অভ্যাসে তিনিও ঘেন কোথায় একটু ফাঁক অনুভব করিতেছিলেন। নদাই তাহার চিরদিনের বিনীত হাসি হাসিয়া নিজের জায়গাটিতে গিয়া বসিল।

গোটা-হুই কনসার্টের পরেই অভিনয় আরম্ভ হইয়া গেল, —ধ্রুব চরিত্র। জীমূতবর্ণ, বিপুলকায় মহারাজা ধীরগম্ভীর পদক্ষেপে প্রবেশ করিয়া আসরেই গড় হইয়া মা-তুর্গাকে প্রণাম করিয়া চেয়ারে আসিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে দীর্ঘশ্রীব, অত্যন্ত শীর্ণকায় মন্ত্রী এবং বাম পার্শ্বে বেঁটে, কাঠ-কাঠ গড়নের সেনাপতি আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজার দৃষ্টি সম্মুখে স্থির ভাবে নিবদ্ধ। মন্ত্রীর নিতান্ত নিরীহ স্বভাব ভালমানুষ ভদ্রলোক। আসরে আসিয়া সেই যে চোখ নামাইলেন আর তুলিলেন না। সেনাপতির বয়স অল্প। আসিয়াই একবার চারি দিকে চাহিয়া লইলেন। উপরের আলো এবং তরবারির দৈর্ঘ্য মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিলেন, রণোন্মত্ততায় তরবারির খোঁচা লাগিয়া আলোটা ভাঙিয়া যাইতে পারে কিনা। অল্প আসরে একবার সে-তর্ঘটনাও ঘটয়াছে।

রাজা জলদগম্ভীরকণ্ঠে রাজ্যের বিবরণ জানিতে চাহিলেন। মন্ত্রীর আধ-আধ শীর্ণকণ্ঠে তাহার যথায়থ উত্তর দিয়া খামিতেই সেনাপতি অমিত্রাকর ছন্দে বিস্তৃত বাংলায় প্রায় পাঁচ মিনিটকাল অনর্গল এত কথা বলিয়া গেলেন এবং তরবারিটা এতবার আক্ষালন করিলেন যে, সমস্ত লোক মুগ্ধ হইয়া গেল। আসর নিস্তব্ধ। মাছিটি নড়িলে জানিতে পারা যায়।

ছোটবাবু তাকিয়া ঠেস দিয়া শুইয়াছিলেন, উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—নাঃ! গান এরা জন্মাবে দেখছি।

মূঢ়কণ্ঠে সকলেই সে-কথায় সায় দিলেন। বস্তুতপক্ষে সেনাপতির বীররসোদগারের পরে সে-বিষয়ে আর কাহারও মনে সংশয় ছিল না।

রাজা সেনাপতির মতেই মত দিলেন। তাহাই হয়। পৃথিবীতে কোন কালেই ভালমানুষের জয় হয় না। দর্শকদেরও মন্ত্রীর উপর সহানুভূতি ছিল না। লোকটার একটা ভাল পোষাক পর্য্যন্ত নাই।

সে যাহাই হউক, কিয়ৎকাল বাদানুবাদের পর মন্ত্রী

এবং সেনাপতি উভয়েই প্রস্থান করিলেন এবং ম্যানেজার বংশীধ্বনি করিবামাত্র সুয়োরাণী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। নদাই চমকিয়া ছোটবাবুর পায়ে হাত দিল।

—কি হ'ল?

—কিছু নয়। বলিয়াই নদাই হাতখানি সরাইয়া লইল।

আশ্চর্য্য মিল! অবিকল তাহার দ্বিতীয়া স্ত্রীর মত! তেমনই ভাঙা গাল, কোটর-প্রবিষ্ট জলন্ত চোখ যেন দপ্, দপ্, করিয়া জ্বলিতেছে; মুখের গড়নও তেমনি পুরুযালি। সুয়োরাণী আসিয়াই চোঁচাইতে লাগিলেন। ধ্রুব এবং তাহার জননী সন্মুখে তাঁহার যাহা কিছু অভিযোগ ছিল তাহা এমন হাত নাড়িয়া বিবৃত করিতে লাগিলেন যে, দর্শকেরা পর্য্যন্ত তাঁহার উপর জুড় হইয়া উঠিল। নদাই কিন্তু সে-সকল কথার এক বর্ণও শুনিতেন না। তাহার দ্বিতীয়া স্ত্রীর কণ্ঠস্বর সে একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিল। ইহার চীৎকার শুনিয়া তাহার মনে পড়িয়া গেল, দ্বিতীয়া স্ত্রীর কণ্ঠস্বরও অবিকল এইরূপ। এমনি করিয়া কটমট করিয়া চাহিয়া সে এক দিন তাহাকেও ধমকাতিয়াছিল। আশ্চর্য্য মিল বটে!

অনেক ক্ষণ ধরিয়। চীৎকার করিয়া অবশেষে সুয়োরাণী চলিয়া গেল। গান জমিয়া গিয়াছে। আসর নিস্তব্ধ। নদাই উঠিয়া বসিয়াছিল, সুয়োরাণী চলিয়া যাইতে আবার থামে ঠেস দিল।

অতঃপর আসিলেন সুয়োরাণী, ধ্রুবের হাত ধরিয়। এ-ছোকরার বীররসের বক্তৃতা নয়, কল্পণ রসের। 'মহারাজ' বলিয়াই ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। কিন্তু কল্পণ রসের বক্তৃতা ইহাকে মানায় ভাল। রংটি করসা, মুখখানি বেশ চল্চলে, গলার স্বরও মিষ্টি। এক নম্বর বক্তৃতা করিয়াই মাতা-পুত্রে গান আরম্ভ করিল। সে গানের সুরে পাষণ্ডও দ্রব হইল।

কিন্তু নদাই একবার আলস্তভরে আড়চোখে তাহার দিকে চাহিয়াই সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। স্থান-কাল-পাত্র সমস্তই সে বিস্মৃত হইয়া গেল। এই বিচিত্র আলোক-মালা, অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের বিবিধ বর্ণের রঙীন পরিচ্ছদ, বাদ্যযন্ত্রের মধুর ধ্বনি, সমস্ত মিলিয়া তাহাকে যেন কোন কল্পলোকে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল।

নদাই সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। লোকটা কি একেবারেই ক্ষেপিয়া গেল না কি? তাহার স্পষ্ট মনে হইল, সম্মুখের ওই অভিনেত্রীটি তাহার প্রথমা পত্নী ছাড়া আর কেহ নয়, —কেহ হইতে পারে না। সেই বড় বড় চোখ, সুচিকণ ক্রয়গল, চলচলে মুখ। এমন কি চোখের নীচের সেই কাটা দাগটি পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। উত্তেজিত ভাবে নদাই ছোটবাবুর হাত ধরিয়া টান দিল।

ছোটবাবু বিরক্তভাবে বলিলেন—ও কি করছ? একবার হাত ধরে টানছ, একবার পা ধরে টানছ। তোমার হ'ল কি?

কথা বলিতে নদাইয়ের যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। খাস রুদ্ধ করিয়া বলিল—অনেকটা সেই রকম দেখতে নয়? অনেকটা?

নদাইয়ের মনের কথা বুঝিয়া ছোটবাবুর হাত সংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠিল। প্রাণপণ চেষ্টায় গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—পাগল নাকি!

ধমক খাইয়া নদাই আমতা-আমতা করিয়া বলিল—না, তাই বলছিলাম।

নদাই উসখুসু করিতে লাগিল এবং কখন একটু একটু করিয়া সরিতে সরিতে আসরের একান্ত সন্নিকটে আসিয়া বসিল। হ্যা, অবিকল সেই রকম। কাছে হইতে দেখিয়া তাহার মনে আর কোন সংশয়ই রহিল না। মেয়ে দুটি যখনই আসরে আসে, দেখে, বুড়া তাহাদের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে। চোখে চোখ পড়িলেই তাহার ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলে। বুড়ার কর্ণমূল পর্য্যন্ত গরম হইয়া ওঠে। শরীরের মধ্যে কি যে এক বিজ্ঞানপ্রবাহ

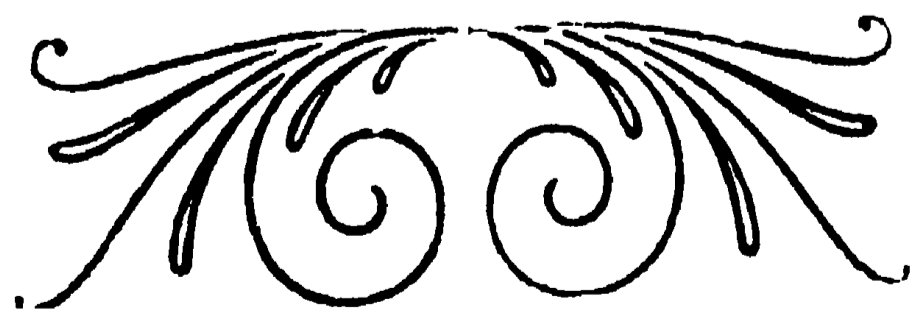
বহিয়া যায়—সে একেবারে অস্থির হইয়া ওঠে। লোকের পর লোক আসে। কেহ গান গায়, কেহ যুদ্ধ করে। কেহ কাঁদে, কেহ হাসে। দৃশ্যের পর দৃশ্য অভিনীত হইয়া যায়। বুড়ার সংজ্ঞা নাই। একদৃষ্টে ঠায় চাহিয়া আছে। পালা শেষ হইয়া গেল। লোকজন সে যাহার বাড়ি চলিয়া গেল। বুড়া বসিয়াই আছে। একা। দৃষ্টি তেমনি দূরের দিকে নিবদ্ধ। চাকরেরা যথাসময়ে আলো লইয়া চলিয়া গিয়াছে। সূর্য্য উঠিয়াছে। নদাই সেইখানেই শতরক্ষির উপর শুইয়া পড়িল।

কত ক্ষণ এমনভাবে শুইয়া ছিল কে জানে। হঠাৎ বাবুদের বাড়ির এক জন চাকরের নজরে পড়িয়া গেল। সে শতরক্ষি তুলিতে আসিতেছিল। ডাকাডাকি করিতে নদাই জবাবুলের মত লাল চোখ মেলিয়া চাহিল। ডান হাতখানি বাড়াইয়া বত দূর খোঁজা যায়, কি যেন হাতড়াইয়া খুঁজিল। তার পর বলিল—কোথায় গেল?

—কে?

—আমার বো! এই যে এখুনি এখানে আমার পাশে বসে মাথা টিপে দিচ্ছিল। এরই মধ্যে আবার পালিয়ে গেল। ওরা কি কেবল পালিয়েই বেড়াবে?

নদাই আবার চোখ বন্ধ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। চাকরটা ছোটবাবুকে ডাকিয়া আনিল। তিনি গায়ে হাত দিয়া দেখেন, ভীষণ জ্বর। অবশ্য ভয়ের কিছু নাই। ম্যালেরিয়ার কথায় কথায় এক-শ পাঁচ ডিগ্রী জ্বর ওঠে। ছোটবাবু তখনই তাহাকে নিজের বাড়িতে উঠাইয়া আনিয়া ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইলেন। ইহার পর আর তাহার বিবাহের চেষ্টা হয় নাই।



স্বরলিপি

নির্ভয়

আমরা ছুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না পরণাতে.

মুগ্ধ ললিত অশ্রু গলিত গীতে ।

পঞ্চশরের বেদনা-মাধুরী দিয়ে

বাসর রাত্রি রচিব না মোরা, পিয়ে :

ভাগের পায়ে তর্কল প্রাণে ভিক্ষা না সেন বাচি ।

কিছু নাই ভয় জানি নিশ্চয় তুমি আছ আমি আছি ।

উড়াব উর্ধ্বে প্রেমের নিশান তর্কম পথ মাঝে

তদম বেগে, তুঃসহতম কাজে ।

কক্ষ দিনের তুঃ পাইতো পাবো

চাই না শান্তি, সাঙ্ঘনা নাহি চাবো ।

পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি ছিন্ন পালের কাছি

মৃত্যুর মুখে দাড়ায়ে জানিব তুমি আছ আমি আছি .

তুঃনের চোখে দেখেছি জগৎ

দোহারে দেখেছি দৌহে,—

মরুপথ-তাপ তুঃনে নিয়েছি স'হে ।

ছুটি নি মোহন মরীচিকা পিছে পিছে,

ভলাই নি মন, সত্যেরে করি' মিছে,—

এই গৌরবে চলিব এ ভাবে

বত দিন দৌহে বাচি

এ বাণী প্রেমসী, হোক মহীমসী

তুমি আছ আমি আছি ॥

“মহয়া”

কথা ও সুর— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি— শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

II সী রী রী । সী গা ধা । পা মা মা । মা মা গা ।

আ ম্ রা ছু জ না স্ব র্ গ খে ল না

I সা রা গা । মা পা মা । গা মা -। -। -। -। I মা পা পা । পা পা পা
গ ড়ি ব না ধ র ণী তে ০ ০ ০ ০ মু গ্ ক ল লি ত

I	পা না ধা । ধা গা ধা I	পা ধা না । না না -না II	গা রী রী । সী গা ধা I
	অ ০ ক্র গ লি ত	গৈ তে ০ ০ ০ ০	আ ম রা হু ক না ইত্যাদি
II	মা ধা ধা । ধা ধা না I	না সী সী । সী রী সী I	না সী না । না না না I
	প ন্ চ শ রে র	বে দ না মা ধু রী	দি য়ে ০ ০ ০ ০
I	না না না । না না না I	নসী না না । না না না I	না সী সরা । রী সী সী I
	বা স র রা ০ ০	ত্রি ০ ০ ০ ০ ০	র চি ব না মো রা
I	না স - । গা ধা না I	সা মা মা । মা মা মা I	সা মা মা । মা মা মা I
	প্রি য়ে ০ ০ ০ ০	ভা ০ গো র পা য়ে	হু র্ ব ল প্রা গে
I	সা মা মা । মা মা গা I	মা পা না । না না না I	মা ধা ধা । ধা ধা ধা I
	ভি ০ ক্ষা না বে ন	যা চি ০ ০ ০ ০	কি কু না ই ভ র
I	ধা ধগা গা । গা গা গা I	গা সী সী । সী ধা না I	না সী না । না গা ধা I
	ক্কা নি নি শ্ চ স	তু মি আ চ জা মি	আ ছি ০ ০ ০ ০
I	গা গরা রী । সী সী রা I	না সী না । না না ধা II	
	তু মি জা চ জা মি	আ ছি ০ ০ ০ ০	
II	সী গী গী । গী সী গী I	গীমা মপী পী । মী গী গী I	
	উ ড়া ব উ র্ কে	প্রৈ মে র নি শা ন	
I	গী মা মা । গী রা সী I	না সী না । সী ধা না I	সী না গী । রী সী সরা I
	হু র্ গ ম প থ	মা ষে ০ ০ ০ ০	হু র্ দ ম বে গে
I	না না রী । সী সী সরা I	না সী না । না না না I	মা ধা ধা । ধা ধা না I
	হু ০ স হ ত ম	কা জে ০ ০ ০ ০	ক ০ ক্র দি নে র
I	না না সী । সী রী সী I	না সী না । না না না I	না না না । না না সী I
	হু ০ থ পা ই তো	পা বো ০ ০ ০ ০	চা ই না শা ০ ন্
I	সী না না । না না না I	না না রী । সী সী সী I	না সী না । গা ধা না I
	ভি ০ ০ ০ ০ ০	সা ন্ ত না না হি	চা বো ০ ০ ০ ০
I	সা সমা মা । মা মা মা I	সা মা মা । মা মা গা I	
	পা ডি দি তে ন দী	হা ল্ ভা জে ষ দি	

I সা মা মা । মা মা গা I মা পা - । - । - । - । I মা ধা ধা । ধা ধা ধা I
 ছি ন্ ন পা লে র কা ছি ০ ০ ০ ০ ম ০ ত্তা র মু থে

I ধা ধা গা । গা গা গা I গা সা সা । সা ধা না I না সা - । সা গা ধা I
 দাঁ ডা রে জা নি ব ত্তু মি আ ছ আ মি আ ছি ০ ০ ০ ০

I গা গরী রী । রী সা স'রী I না সা - । - । - । - II
 ত্তু মি আ ছ আ মি আ ছি ০ ০ ০ ০

II সা সা রা । রা রা রা I রা গা রা । গা গা - । I
 হু জ নে র চে থে দে থে ছি জ গ ২

I সা সা রা । রা রা গা I রা গা - । - । - । - I মা মপা পা । পা পা প
 মো হা রে দে থে ছি দৌ হে ০ ০ ০ ০ ম ক প থ তা প্

I পা ধা গা । সা গা ধা I পা ধা - । - । - । - I মা ধা ধা । ধা ধা না
 হু জ নে নি থে ছি স হে ০ ০ ০ ০ ছু টি নি মো হ ন

I না সা সা । সা রী সা I না সা - । - । - । - I না - । - । না - না
 ম রী চি কা পি ছে পি ছে ০ ০ ০ ০ হু ০ ০ না ই নি

I নসী - । - । - । - I না রী সা । সা সা - I না সা - । গা ধা -
 ম ন্ ০ ০ ০ ০ স তো রে ক রি ০ মি ছে ০ ০ ০ ০

I সা সা মা । মা মা মা I সা সমা মা । মা মা মা I
 এ ই গৌ ০ র বে চ লি ব এ ভ বে

I সা সমা মা । মা মা গা I মা পা - । - । - । - I মা ধা ধা । ধা ধা ধা
 য ত দি ন্ দৌ হে বা চি ০ ০ ০ ০ এ বা গী প্রে য সা

I ধা ধগা গা । গা গা গা I গা সা সা । সা ধা না I
 হো ক ম হী য সা ত্তু মি আ ছ আ মি

I না সা - । - । - গা ধা I গা গরী রী । সা সা রী I
 আ ছি ০ ০ ০ ০ ত্তু মি আ ছ আ মি

না সা - । - । গা ধা II II
 আ ছি ০ ০ ০ ০



सद्य्या-प्रदीप
श्रीनन्दलाल बख्श

प्रवासी प्रेस, कलिकाता



বাংলা

কৃতী প্রবাসী বাঙালী

শ্রীযুত নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন কৃতী ছাত্র। তিনি সম্প্রতি 'মোরকাসিম' সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা



শ্রীযুত নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়

করিয়া লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন।

বিলাতে সামরিক শিক্ষায় বাঙালী বালকের কৃতিত্ব—

শ্রীমান্ দেবেল্লনাথ ভাড়া বিলাতের স্কুলে অধ্যয়ন কালে ও-টি-সি অর্থাৎ 'অফিসার' টেনিং কোর্স-এ যোগ দিয়াছিল। দেবেল্লনাথ সম্প্রতি ও-টি-সি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া লওনে সমর বিভাগ হইতে সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছে। অতঃপর সে পরিপূরক রিজার্ভ টেরিটোরিয়াল আর্মি, টেরিটোরিয়াল আর্মি রিজার্ভ অফিসার, বা এ্যাক্টিভ মিলিশিয়া অব ক্যানাডা নামক সেনাদলে

ভর্ষি হইতে পারিবে। আকস্মিক বিপৎপাতের সময় যখন নানা সেনাদলকে সম্মিলিত হইতে হইবে তখন শ্রীমান্ দেবেল্লনাথও সমর-বিভাগের অস্ত্র সেক্টরের নিকট সৈনিকের কাছের জন্ত যাহাতে পদবাবহার করে সেইজন্ত সার্টিফিকেটে অধুরোধ করা হইয়াছে।

যে-সব বালক এ-বৎসর ও-টি-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সমর-বিভাগ হইতে সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে দেবেল্লনাথ বয়ঃকনিষ্ঠ। দেবেল্লনাথ চতুর্দশ বৎসর বয়সে 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বন্দুক-ছোড়া প্রতিযোগিতায়' প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। এই সংবাদ



শ্রীমান্ দেবেল্লনাথ ভাড়া

প্রবাস—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। তদবধি প্রতি বারই বন্দুক-চালনা প্রতিযোগিতায় দেবেল্লনাথ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইতেছে।

ফরিদপুরে ব্রতচারী-বিদ্যালয়—

শ্রীযুত গুরুসঙ্গর দত্ত, আই-সি-এস, ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্তক। আদর্শ নাগরিক প্রস্তুত করিয়া সমাজ-সেবায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য। অশ্রান্ত অকলের স্বায় ফরিদপুরেও গত ২২এ জাম্বুয়ারী একটি ব্রতচারী সমিতি গঠিত হইয়াছে।



ବ୍ରତଚାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ -ଫରିଦପୁର



ବ୍ରତଚାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ—ଫରିଦପୁର

- (୧) ସି: ଏ, ଇ. ପୋର୍ଟାର, ଆଇ-ସି ଏମ୍ (ସଭାପତି) (୨) ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବନୀଧର ବଲ୍ଲୋପାଧ୍ୟାୟ (ପ୍ରଧାନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ତକ)
(୩) ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ (ସମ୍ପାଦକ) । ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଗଣ ନିତ୍ୟମାନ ଓ ଉପସ୍ଥିତ ।

সমিতির সভাপতি ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মি: এ. ই. পোর্টার, সম্পাদক ফরিদপুর হিট্‌সবী স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ক্ষিতাজ্জামল দত্ত, এবং জেলার জিশ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ইহার সভ্য।

ব্রতচারীর আদর্শ ব্যাপকভাবে বিস্তারের জন্ত গত ২১এ মার্চ ফরিদপুর একটি ব্রতচারী শিক্ষা-কেন্দ্রও স্থাপিত হইয়াছিল। মাসাধিক কাল যাবৎ জেলার সাতাশটি স্কুল হইতে চৌত্রিশ জন শিক্ষক ও তেতাল্লিশ জন ছাত্র ইহাতে যোগদান করেন। এখানে ব্রতচারী বায়াম, সমষ্টি-সঙ্গীত, রাইবেঁশে নৃত্য ও সঙ্গীত, জারী নৃত্য ও সঙ্গীত, বাউল নৃত্য ও সঙ্গীত, রাইবেঁশে কসরৎ প্রভৃতি বিষয় গোল, গুব-গুব-গুব, মাদল ও কাশির সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। নিখিল-বঙ্গ ব্রতচারী শিক্ষাকেন্দ্রের প্রধান পন্থবেক্ষক শ্রীযুক্ত নবনোদর বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, বি-টি এখানে থাকিয়া শিক্ষানানে সহায়তা করেন। শিক্ষার্থীগণের মধ্যে মোল জন শিক্ষক ও উনিশ জন ছাত্র প্রথম শ্রেণী, এগার জন শিক্ষক ও সাত জন ছাত্র দ্বিতীয় শ্রেণী, ছয় জন শিক্ষক ও দুই জন ছাত্র তৃতীয় শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন। বিগত ২৪এ এপ্রিল বাংলার শিক্ষা-বিভাগের তৎকালীন ডিরেক্টর মি: জে. এন্. বটমলি শিক্ষার্থীগণকে যোগ্যতানুসারে ট্রেনিং সার্টিফিকেট, পদক ও ব্রতচারী ব্যাজ প্রদান করেন।

শিল্প-কলা প্রদর্শনী—

গত ২২এ আগষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর চারি দিবস কলিকাতার বিদ্যাসাগর কলেজের শাশিক্ষা-বিভাগের প্রযত্নে একটি শিল্পকলা প্রদর্শনার অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

বাংলার অন্ততম শিল্পী শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার নাগ মহাশয়ের ঐকান্তিকতায় প্রদর্শনার উদ্বোধন হয়। নাগ মহাশয়ের বহু ছাত্র ও ছাত্রী তাঁহাদের শিল্প-কলার নিদর্শন স্বরূপ মনোরম শিল্পসম্ভার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যথা—মাছের আঁস, ঝিঙ্ক, কড়ি, সামুক, ছেঁড়া কাগজ, গাছের পাতা, মোম, মাটি, রঙীন পাথর, ভাস্কর্য কাচ প্রভৃতি অকিকিৎকর বস্তু সমূহ হইতে প্রস্তুত নানারকম উৎকৃষ্ট ও মনোমুগ্ধকর শিল্পকাৰ্য। তুলা হইতে প্রস্তুত তাজমহল, পশু, পক্ষী প্রভৃতি বস্তুসমূহ, রেশম ও পশম হইতে জাত বিভিন্ন হুচা-শিল্প ও গালিচা, আসন প্রভৃতিতে বিচিত্র চিত্রণের কাজও প্রদর্শনী অলঙ্কৃত করিয়াছিল। ইহা ছাড়া নাগ মহাশয়ের চিত্রকলা, দেশীয় ফুল ও ফল হইতে চিত্রণের কাজের কাঙ্ক্ষনিক রঙীন নকশা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বৈচিত্র্যময়ী ও পরিবর্তনশীল রাগ-রেখার চিত্রণ প্রদর্শনাতে দেখান হয়।

বিদ্যাসাগর কলেজের কর্তৃপক্ষ শাশিক্ষা-বিভাগে শিল্পকলা-শিক্ষা প্রবর্তনের মহান উদ্দেশ্য লইয়াই প্রদর্শনার আয়োজন করিয়াছিলেন। জীবিকা সংস্থানের উপযোগী এইরূপ একটি শিল্পশিক্ষা-কেন্দ্র দেশের কলাগণকর হইবে সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষ

এলিফ্যান্টা গুহার ত্রিমূর্তি শিব—

প্রবাসী ১৩৪০, শ্রাবণ সংখ্যায় পঞ্চ-শত্ৰু বিভাগে চতুমুখ শিবের উল্লেখ আছে। এই প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—“শিবকে আমরা পঞ্চমুখ বলিয়া জানি। তবু প্রাচীনকালে সময়ে সময়ে তাঁহার চতুমুখ মূর্তিও গঠিত হইত। মধ্যভারতের অজয়গড় রাজ্যে নাচনা নামক



ত্রিমূর্তি শিব



ত্রিমূর্তি শিব



ত্রিমূর্তি শিব

স্থানে চতুমুখ শিবের একটি অতি সুন্দর মূর্তি আছে। এই মূর্তিটি অনুমান ৩২০-৩৫০ খৃঃ অব্দে গঠিত হয়। এলাহাবাদ হস্তশিল্প শিল্পী দেবেশ্বরকুমার সেন সম্প্রতি আমাদেরকে জানাইয়াছেন যে, এলিফাণ্টা গুহায় একটি ত্রিমূর্তি বা তিন-মুখা শিবও দেখিতে পাওয়া যায়। এই ত্রিমূর্তি স্থিতি-স্থিতি-নায়ের প্রতীক-স্বরূপ। এলিফাণ্টার ত্রিমূর্তি শিবের সহিত অজয়গড়ের চতুমুখ শিব-মূর্তির সাদৃশ্য আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে এই শিব-মূর্তি ৬০০-৮০০ খৃষ্টাব্দে পোদিত।

অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ

ওটোমো চুক্তি সম্পর্কে ভারতীয় কমিটির রিপোর্ট—

ওটোমো চুক্তি সম্পর্কে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ যে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহার রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। কমিটি একমত হইতে পারেন নাই। স্যর জোসেফ ভোর, কাপ্টেন লালচাঁদ, স্যর ফ্রাঙ্ক নয়েস, ভাই পরমানন্দ, ডাঃ ডি স্ক্র্যা, মিঃ এইচ পি নোদী, মিঃ আর পি বাগলা, মিঃ এক ই জেমস্, ও শেঠ হাজি আবছুলা হাক্কান, ইহার রিপোর্টে স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই সংবাদগরিষ্ঠ দলের মত এই যে,

(ক) যুক্তরাজ্য (ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, ওয়েলস ও নর্থ আয়ারলেণ্ড) যে সমস্ত পণ্য আমদানির জন্য “সুবিধা” ভোগ করে, সেগুলি ভারতের রপ্তানি পণ্যের মধ্যে প্রধান।

(খ) অষ্ট্রােল দেশ অপেক্ষা যুক্তরাজ্যই “সুবিধা ভোগী” ও অষ্ট্রােল পণ্যের ভাল বাজার বলিয়া দেখা যাইতেছে—

(গ) এই “সুবিধা” বন্দোবস্ত (preferential scheme) প্রচলিত হইবার পর হইতে, ভারতে যুক্তরাজ্যের পণ্য আমদানির অধোগতি রুদ্ধ হইয়াছে ও বৃদ্ধির দিকে চলিয়াছে।

(ঘ) প্রথম বৎসরের বিনিময়ের পারস্পরিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(ঙ) সুবিধার বন্দোবস্ত ভারতবর্ষের বহির্দেশীয়ের সম্পদ মূল্যবান।

(চ) ভারতবর্ষে যে সুবিধা প্রদান করিতেছে তাহাতে ইংলণ্ডের বেশ সাহায্য হইতেছে।

(ছ) ভারতবর্ষ যে সুবিধা দিয়াছে তাহাতে ভারতের রাজস্ব কোনই ক্ষতি হয় নাই।

(জ) ভারতবর্ষ যে সুবিধা দিয়াছে তাহাতে ভারতের কোম্পানীর অসুবিধা হয় নাই।

অর্থাৎ কমিটির মত এই যে সুবিধা দান বন্দোবস্ত ভারতবর্ষ ও যুক্তরাজ্য উভয়েরই উপকার করিতেছে।

এই কমিটির দুইজন বাঙালি সদস্য স্যর আবদুল রহিম শীলুত ফিতাশচন্দ্র নিয়োগী স্বতন্ত্র বিরুদ্ধিতে বলেন যে, যুক্তরাজ্য ভারতবর্ষের কৃষিজাত দ্রব্যে যে সুবিধা দিয়াছে তাহাতে ভারত উপকার হয় নাই কিন্তু ভারতবর্ষ যুক্তরাজ্যকে যে সুবিধা দিয়াছে তাহাতে ভারতের বহির্দেশীয়ের ক্ষতি হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের মন্তব্য এই যে যুক্তরাজ্য ও অষ্ট্রােল বিদেশ সম্পর্কে “কোটা” প্রথা প্রচলিত হওয়া উচিত। শীলুত সীতারাম রাজু বলেন যে চুক্তির ফলে ভারতে উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ বাড়ে নাই, যে পণ্য উৎপন্ন হয় তাহারও বন্দোবস্ত বৃদ্ধি পায় নাই কিন্তু কতিপয় ভাল ভাল ক্রেতার সহিত কলহ বাড়িয়াছে মাত্র! তর্কের পরিহরে যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, যুক্তরাজ্যের বাজারই আমাদের একমাত্র প্রধান বিদেশ স্থান, তবুও ভারত যে দেশের অধীন তাহারই উপর একান্ত নির্ভর করা এবং পৃথিবীর অষ্ট্রােল বাজারকে লোপ করা ভারতের অর্থনৈতিক সম্পদ বৃদ্ধির সহায়ক হইবে না।

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মধ্যে কেহ-কেহ কোন-কোন বিষয়ে সতন্ত্র মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ডাঃ ডি হুজা বলেন—এই স্থানীয় ভারতের চাউল, কফি ও নারিকেলের ব্যবসায়কে আঘাত করিয়াছে। ভাই পরমানন্দ বলেন এ অল্পসঙ্কান বড়ই তাড়াতাড়ি হইয়াছে—আরও এক বৎসর পরে হইলে ফলাফল আরও ভাল বুঝা যাইত। মিঃ এফ, উ, জেমস বলেন যে এই ব্যবস্থায় ভারতে চাউল ব্যবসায়ের ক্ষতি হইয়াছে।

পাটের সংশোধিত পূর্বাভাস—

সম্প্রতি পাটের সংশোধিত পূর্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছে যথা—

জিলা	পরিমাণ—চাষের (অনুমান)		উৎপন্নের (অনুমান)	
	হাজার একর		হাজার বেল	
	গত বৎসর	এ-বৎসর	গত বৎসর	এ-বৎসর
বাংলা				
২৪ পরগণা	৬১	৫৭.১	২০০	১৭৮.৭
নদীয়া	৩৬	৩০	৯৫	৮৪
মুর্শিদাবাদ	২১	১৭.৮	৬৫	৫০
যশোহর	৭০	৬৬	২১৫	২০৩
পুলনা	৩১	২৩	৮৫	৬০
বর্ধমান	৩	১.৫	১১	৫
মেদিনীপুর	৫	৩.২	১৫	১২
হুগলী	৩৪	২৯	১২৭	৮৯
হাওড়া	৪	৩	৯	৯
রাজশাহী	৯১	৮৬.৬	২৮০	২৭০
দিনাজপুর	৫৭	৫৫	১৯০	১৭১
জলপাইগুড়ি	৩৩	৩২	১১০	১০২
দার্জিলিং	২	২	৭	৬.৫
রংপুর	২৫২	২৪২	৮৫০	৮৮২
বগুড়া	৮৫	৮৪.৭	২৫৫	২০১
পাবনা	৮০	৮২.৩	২৭০	২৯৬
মালদহ	৩০	২৩	৮০	৫০
কোচবিহার	২৫	২৩.৩	৯৪.২	৭০
ঢাকা	২৬৫	২৬০	৮৭৫	৮৯৬
ময়মনসিংহ	৫৬৬	৫৫৫	১,৯০৪.৯	১,০২৭
ফরিদপুর	১৫০	১৪০	৫০১	৫০০
বাখরগঞ্জ	৩২	৩৩	১০০	১০০
চট্টগ্রাম	১৩	১৩	১০	১২
মির্জাপুর	১৮৩	১০৪	৬২৫	৬০০
নোয়াখালী	৫০	৫০	১৫৫	১৬০
ত্রিপুরা রাজ্য	১.৪	১.৪	১.৩	১.৬
মোট বাংলা প্রদেশ	২,১৬৮.৭	২,১৮৬.১	৭,০৯২.১	৭,২১৬
বিহার-উড়িষ্যা	১৯২.১	১৬৫.৬	৪৭৩.২	৪৫০
আসাম	১৫৬.৭	১৪৫.৩	৪৪৬.৮	২৯৭.৮
মোট	২,৫১৭.৫	২,৪৯৭	৮,০১২.১	৭,৯৬৩.৮

পূজার সময় নানা কারণেই নগদ টাকার প্রয়োজন বলিয়া কৃষকগণ পাট বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়, তাহাতে দর অতি নিম্নস্তরেই থাকে তদুপরি এই পূর্বাভাস প্রকাশ পাইলে ক্রেতাগণ দর কমাইয়া লইবার আরও সুযোগ পায়। এই সকল পূর্বাভাস যে নিতুল এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই! পাট তদন্ত কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ ও

সংখ্যালিষ্ঠ উভয় দলই এই পূর্বাভাস সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন যে ইহা কল্পিত এবং সত্য হইতে দূরে।

পাটের মাসিক রপ্তানি—

পাটের দরের জন্ত কৃষকগণ দালাল, ফরিয়া বা আড়তদারের দয়ার উপরই নির্ভর করেন। তাহারি পাটের চাহিদা নির্ণয় করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম কারণ তাহারি জানেন না যে কোন মাসে কি পরিমাণ পাট বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। নিম্নের তালিকা হইতে কাচা পাটের রপ্তানির হিসাব পাওয়া যাইবে— (হাজার টন)

মাস	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১	১৯৩১-৩২	১৯৩২-৩৩	১৯৩৩-৩৪
এপ্রিল	৫০.৫	৪২.৯	৪৫.৫	৩৩.৪	৪২.০
মে	৩৫.৭	৪১.৫	৩৮.০	৩০.৭	৪৬.৬
জুন	৩৯.৯	৪০.৫	৩১.৭	১৯.৫	৬০.৫
জুলাই	৩৫.৭	৩১.১	৪৩.৮	৩০.৪	৫৭.২
আগষ্ট	৪১.৮	২৪.৭	৩৩.৭	২৭.২	৪৮.১
সেপ্টেম্বর	৮৮.৫	৩৬.৫	৪০.২	৪৮.৪	৪৯.৯
অক্টোবর	১২৯.১	৬৬.১	৬১.৩	৬২.৩	৬৭.৩
নবেম্বর	১৩৫.৮	৭৮.৮	১০৩.১	৬৪.৮	১১২.৩
ডিসেম্বর	৯১.২	৮৬.৯	৯৩.১	৮১.৩	৮২.৩
জানুয়ারী	৭২.৩	৬৮.৯	৪৩.৭	৬৩.৯	৬৬.০
ফেব্রুয়ারী	৫৭.৬	৫০.৩	২১.৫	৫১.৮	৬০.২
মার্চ	৪৪.৮	৫১.৪	২৯.৯	৪৮.৬	৫৫.৯
	৮০৬.৯	৬১৯.৬	৫৮৬.৬	৫৬৩.১	৭৪৮.৩

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে পূর্বাভাসে বৎসর অপেক্ষা ১৯৩৩-৩৪ কাচা পাটের রপ্তানি অধিক হইয়াছে কিন্তু পাটের দর বৃদ্ধি পায় নাই। অর্থাৎ দর সম্পূর্ণরূপে চাহিদার উপর নির্ভর করে নাই। এই বৎসর এপ্রিল ও মে মাসে যথাক্রমে ৬০.৩ ও ৫৯.৮ হাজার টন পাট রপ্তানি হইয়াছে, পূর্বাভাসে বৎসরের এপ্রিল ও মে মাসের তুলনায় বেশী স্তরাং আশা করা যায় যে এই ভাবে চলিলে এ-বৎসরও রপ্তানির পরিমাণ বাড়িবে। কিন্তু দর দেখা যাইতেছে তুলনায় অনেক কম।

গত বৎসর কলিকাতায় পাটের দর ক্রমশ উঠি-পড়ি হইয়াছিল তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে। (এক বেলের দর)

	প্রথম শ্রেণী	ইটনিং	রেড (ঢাকাস)
মে ১৯৩৩	৩৩.০	৩২	৩৫
জুন	২৯.০	২৮	৩৩
জুলাই	২৯.০	২৭.০	৩৩
আগষ্ট	২৮.০	২৬.০	৩১.০
সেপ্টেম্বর	২৫	২৩	২৮
অক্টোবর	২৫	২২.০	২৮
নবেম্বর	২৫	২১	২৬.০
ডিসেম্বর	২৬	২৩	২৭.০
জানুয়ারী ১৯৩৪	২৮.০	২৫.০	৩১
ফেব্রুয়ারী	২৯.০	২৬	৩১.০
মার্চ	২৮.০	২৫	৩০.০
এপ্রিল	২৭	২৩.০	৩০
মে	২৪.০	২২	২৭.০

গত নবেম্বর মাসেই পাট রপ্তানি হইয়াছে সব চেয়ে বেশী কিন্তু তখনই দর ছিল সব চেয়ে কম।

বাংলা দেশে ঘোঁষ-মণ্ডলী—

গত চারি মাসে—এপ্রিল হইতে জুলাই—ভারতীয় কোম্পানী

আইনের বিধান মতে অংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ একানকইটি ঘোঁষ-মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। যথা—

	মণ্ডলীর সংখ্যা					মূলধন (হাজার টাকায়)				
	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	মোট	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	মোট
ব্যাঙ্কিং	১	-	৬	১	৮	১০০	-	৩,২০০	২০	৩৩২০
জীবন, অগ্নি, সামুদ্রিক বীমা	১	-	-	-	১	২০	-	-	-	২০
'প্রভিডেন্ট' বীমা	৪	৮	৪	৩	১৯	২৪০	৪৮০	২০০	১৪০	১১০০
মুদ্রণ, পুস্তক-প্রকাশ ইত্যাদি	১	১	১	৩	৬					
রাসায়নিক দ্রব্য ও তদানুসঙ্গিক ব্যবসায়	৩	-	১	-	৪	১০০	১০০	৫০	৬০	৩১০
লৌহ, ইস্পাত, জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি	১	-	-	-	১	১৪০০	-	৩০	-	১৪৩০
মাটি, পাথর, সীমেন্ট, চূণ ও অপরাপর দ্রব্য	১	-	-	-	১	২০	-	-	-	২০
এজেন্সী (ম্যানেজিং এজেন্সী) কোম্পানী সহ	৩	৪	১	২	১০	১০০	-	-	-	১০০
কয়লার খনি	১	-	-	-	১	১৪০	৮০	২	১২০	৩২২
হোটেল, নাট্যশালা, প্রামাদ-স্থান	১	-	২	-	৩	১৫০০	-	-	১০০	১৬০০
মোটর গাড়ীর সংক্রান্ত	-	১	-	১	২	৩০০	-	২০০০	-	২৩০০
ইন্জিনিয়ারিং	-	১	-	১	২	-	১০০	-	১০০	২০০
পিস্তল, তামা প্রভৃতি	-	১	-	-	১	-	৫০	-	৪০	৯০
কাপড়ের কল	-	১	-	-	১	-	৩০০	-	-	৩০০
সোনার খনি	-	১	-	-	১	-	১৫০০	-	-	১৫০০
জমিদারী, ভূমি	-	১	-	১	২	-	৪০০০	-	-	৪০০০
টেনারি ও চামড়ার ব্যবসায়	-	-	১	-	১	-	১৫০	-	৬০০	৭৫০
বরফ ও এয়ারকন্ডিশন	-	-	১	-	১	-	-	১০০	-	১০০
পাটের কল	-	-	১	-	১	-	-	১৫	-	১৫
পাটের প্রেস	-	-	১	-	১	-	-	১৬০০	-	১৬০০
অস্ত্রাস্ত্র মিল ও প্রেস	-	-	১	-	১	-	-	৭০০	-	৭০০
নেবিগেশন	-	-	-	১	১	-	-	২০	-	২০
কাঁচ	-	-	-	১	১	-	-	-	১০০০০	১০০০০
'স' ও কার্ঠের মিল	-	-	-	১	১	-	-	-	১০০	১০০
অস্ত্রাস্ত্র ব্যবসায়	২	২	১০	৫	১৯	৩০০	৬৫	১৫২৫	৪৪০	২৫৩৫
মোট	১৯	২১	৩০	২১	৯১	৪২,২০	৬৮,২৫	২৫,৮২	১,১৯,২০	৩,২৫,৪৭

বাংলা দেশে গঠিত হইয়াছে বলিয়া প্রত্যেকটিই যে বাঙালীর মূলধনে বা উদ্যোগে গঠিত তাহা নহে। সবগুলির কর্মক্ষেত্রও বাংলা দেশে সীমাবদ্ধ নহে। সবগুলি যে নূতন তাহাও নহে, কতকগুলি পূর্বে হইতেই কার্যক্ষেত্রে ছিল, নূতন ভাবে গঠিত হইল মাত্র। সব চেয়ে বেশী মূলধন লইয়া গঠিত হইয়াছে একটি নেবিগেশন কোম্পানী। ইহা

বাঙালীর নহে। সব চেয়ে বেশী সংখ্যক গঠিত হইয়াছে প্রভিডেন্ট কোম্পানী।—মোট উনিশটি। এগুলি অল্প সবই বাঙালীর। দেশের শিল্প উৎপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত কোম্পানীতে এখনও বাঙালীর আগ্রহ আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই।

নৃত্যরতা ভারতী

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

সভ্যতার বিকাশের সময় মানুষের কোন ধর্ম কিংবা কোন জাতি ছিল না। অপরিচিত অপরিচিতায় দেখা হ'লে জিজ্ঞেস করত, “কি নাচ তুমি নাচ?”

নৃত্যের ভঙ্গী দিয়ে তারা বুঝত কে কোন্ দলের, কোন্ পাহাড় বা কোন্ দ্বীপে থাকে। তার পর সভ্যতার প্রথম আলোকে তাদের মনে ধর্মভাব জেগে উঠল, নৃত্যের সঙ্গে ধর্মকেও তারা জড়িয়ে ফেলল এবং এর মধ্য দিয়ে তারা জানত কে ভূতপ্রেতের উপাসনা করে বা কে দেবদেবীর উপাসনা করে। উপাসনা এবং ধর্মানুষ্ঠানই ছিল তাদের নৃত্য।*

জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক কাজেও বীজ-রোপণ, শস্য-কর্জন, পরিণয়ে নৃত্য ছিল তাদের একটি অপরিহার্য অনুষ্ঠান। মহেনজোদাড়োতে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন বহু নৃত্যপরা নগ্ন নারীমূর্তি পাওয়া গেছে—এইরূপ আদিম যুগ থেকেই ভারতে নৃত্যকলার নানা রূপ চর্চা হয়ে আসছিল।

তার পর ঐতিহাসিক যুগে অর্যসন্তানেরা ভারতের নিবিড় বিজন ঘন বনপ্রান্তর, প্রভাতের নবোদিত সূর্যের স্বর্ণাভ আকাশ, মধ্যাহ্নের প্রদীপ্ত ভাস্করের রুক্ষ ও গভীর রূপ আর অস্তায়মান দিনের অন্ধকারভরা নিস্তরক আকাশের বৈচিত্র্যের মধ্যে তাদের অন্তর-দেবতার বিকাশ উপলব্ধি করেছিলেন।

তাই দেখি বৈদিক যুগে প্রথম ঋক্ থেকে নৃত্য, তার পর সাম থেকে গীত, যজু থেকে অভিনয় এবং অথর্ব থেকে রস। ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা একটি নাট্যশালা তৈরি করলে এর প্রয়োগভার ভারতের ওপর গিয়ে পড়ে। প্রয়োগকালে

শিব সেখানে ছিলেন। সকলের অহরোধে শিব তত্বকে ডেকে এনে ভারতকে অঙ্গহারগুলোর প্রয়োগ দেখাতে আদেশ দেন। সেখানে তত্ব যে-সব নৃত্য দেখান তাই বিশ্ববিখ্যাত প্রসিদ্ধ তাণ্ডব। এদিকে পার্কতী সঙ্ঘট হয়ে



উদবহিত এবং একপদ ভ্রমরা ভঙ্গী—বরবুদর

*“The dance was, in the beginning, the expression of the whole man, for the whole man was religious. Thus dancing was born with religion and worship. The other intimate association of dancing was with love.”—(Westermorek ; *History of Human Marriage*)

লাস্য নামে কমনীয় নৃত্য ভারতকে দেখান। ভারত ঐ তাণ্ডব নৃত্য মনুষ্যালোকে আনেন আর পার্কতী নিজে বাণ-

ছহিতা উৎসাহে লাগু নৃত্য শিখিয়ে দেন। ওদের নিকট থেকে সুরাষ্ট্রের রমণীরা ঐ নৃত্য শিক্ষা করেন। ক্রমে ক্রমে ইহা ভারতের সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু নটরাজের কল্পনা বোধ হয় অর্য্য-অনার্য্যের যুদ্ধ এবং শিবকে বৈদিক

হাতের ডমরুর গুরু গুরু শব্দ মহাব্যোমে ব্যাপ্ত; বা-হাতের যজ্ঞাধি হ হ শব্দে জ্বলছে—এ যেন মহাকালের বিরাট ধ্বংসের প্রলয় নাচন।

তার পর ভারতে ধর্ম্মনৃত্যের বেশী প্রচলন হয় পুরাণের সময়। কালীর অপূর্ব নৃত্য, গণপতি-নৃত্য, পুরাণের ঘটনাবলী নিয়ে শিল্পকশলীরা নিত্য নূতন নৃত্য উদ্ভাবন করতে লাগলেন। প্রাচীন ভারতের এই-সব শিল্পীরা যেমন নৃত্যকশলী ছিলেন তেমনি এক-এক জন মনোবিদও



সুন্দরী এবং পরিবাহিত ভঙ্গী—অঙ্গু



প্রণয়-নৃত্য

ছিলেন। একটি ভৈরবী কিংবা পূর্ববীর রূপকে নৃত্যে কি ভাবে রূপান্তরিত করা যায় তা তাঁরা জানতেন। দেবসভায় অপ্সরাদের সৃষ্টি হ'ল সেই সময়। শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিয়ে এই যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত ভারতে নৃত্যের বহুল প্রচলন চলেছে।

ক.দ্রর সঙ্গে এক ক'রে নেওয়া। সে বা হোক, শিব যে ভারতের নৃত্যজগতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে এসেছেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তিনি ভারতের মহানট, নটরাজ, নটেশ্বর। তাঁর তাণ্ডব নর্তনে ত্রিভুবন কল্পিত; ছিন্নভিন্ন আলোড়িত জটাজলি দূর দিগন্তে প্রসারিত হ'য়ে এঁকে বেঁকে মহাচেউ তুলছে; ডান

এই সময় ভারতে বহুল পরিমাণে প্রণয়-নৃত্যের বিকাশ হয়, এ-নৃত্যের প্রধান ভঙ্গী দোলন। এখন বাংলার পাড়াগায়ে যে বিবাহ-নৃত্য হ'য়ে থাকে বোধ হয় ইহা প্রাচীন প্রণয়-নৃত্যেরই রূপান্তর। সাঁওতাল কিংবা ঐরূপ অনেক প্রাচীন জাতির মধ্যে এখনও অনেক কুমারী শিখিল কবরীকে কটি-সঞ্চালনে গানের তালে তালে নাচায় বাহা বৈদিক যুগে প্রথম ধর্ম্ম ও আনন্দ বিকাশ

জ্ঞান করা হ'ত, অভাবের তাড়নায় তারই দৌলতে অর্থসমস্তার সমাধান হ'তে লাগল। উপাসনার অঙ্গ রূপে তখন যে-নৃত্যের প্রচলন ছিল এবং যে-নৃত্যের দ্বারা পূজার বিধান আছে,

“নৃত্যং দক্ষ! তথাপ্রাপ্তি রুদ্রলোক অসংশয়ম্
স্বয়ং নৃত্যেণ সংপূজ্য তদৈবাম্বচরো ভবেৎ।”

(বিষ্ণু ধর্মোত্তর)

ইহা এখন দেবদাসীর নৃত্যে এসে দাঁড়িয়েছে।

নৃত্যের এই ওলটপালটের ফলে আগন্তুক নট ও অভ্যাগতা নটীরা দেশের প্রত্যেককে নৃত্যগীত শোনাতে লাগল। যাদের আগেই ঠিক করা হ'ত তারা বেতনভোগী ব'লে নিজেদের কলানৈপুণ্য নির্দিষ্ট দিনে দেখাত (বাৎসায়ন)। রামায়ণে দেখতে পাই, কুশীলব নৃত্য ও গীতের সাহায্যে সমস্ত রামায়ণের উপাখ্যান ব'লে বেড়াত। ভারতের নৃত্যের ইতিহাসে এই বোধ হয় প্রথম কুশীলব নৃত্যের সঙ্গে গীতিকার যোগ হয় এবং উহা অর্থকরীও বটে। এই অর্থকরী নৃত্যবিদ্যার মধ্যে আবার দুইটি রূপ আছে—একটি উদ্দেশ্যসাধন (indirect) আর একটি অভাবপূরণ (direct)।

ঋষাশৃঙ্গ মুনিকে আনার জন্য যে-সব রমণী পাঠান হয়েছিল তারা সবাই নৃত্য দিয়ে ঋষাশৃঙ্গকে ভুলিয়েছিল, এদিকে সুন্দরী উর্কশী যখন বিশ্বামিত্রের ধান ভাঙলেন সেও নৃত্য দিয়ে। একরূপ পেশাদার নর্তক-নর্তকীদের কথা দু-হাজার বছর পূর্বের কোটিলোর ‘অর্থশাস্ত্রে’ দেখতে পাওয়া যায়।

মহাভারতে গাণ্ডীবধারী অর্জুন চমৎকার নৃত্যকলা শিখেছিলেন। তিনি রণ-তাণ্ডব অর্থাৎ যুদ্ধ-নৃত্যেই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। বৈদিক যুগে আর্য্য-অনার্য্য যুদ্ধেও কিছু কিছু যুদ্ধ-নৃত্যের প্রচলন ছিল, কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারতের সময়েই ইহার সমধিক উৎকর্ষ দেখা গিয়েছিল। পঞ্চপাণ্ডবের ছদ্মবেশে অজ্ঞাতবাসের সময় অর্জুন বৃহস্পতি নামে নর্তকীর বেশ ধারণ করে বিরাট-অস্ত্রপুরে নৃত্যশিক্ষা দিতেন। মহাভারতের সময় পুতুল-নাচ ভারতে প্রচলিত হয়। রাবণ সীতার প্রতিমূর্ত্তি পুতুল-নাচে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

ভারতীয় নৃত্য বহু রকম এবং এর দুটি রূপ—তাণ্ডব ও

লাশ্র। তাণ্ডবের দুটি রূপ ‘লেবলি’ ও ‘বহুরূপ’। লাস্ত্রেরও তাই ‘ক্ষুরিত’ ও ‘যৌবত’। ভারতীয় নৃত্য অত্যন্ত অনুষ্ঠানবহুল এবং আগাগোড়াই ঝরঝরে ও সুসংযত। লেবলি নৃত্যে অভিনয় কম, কিন্তু অঙ্গসঞ্চালন বেশী



উদয়শঙ্কর

বহুরূপ ভাবপ্রদান এবং চোখ-মুখের নানারূপ ভঙ্গীর সমাবেশ। ক্ষুরিত নৃত্য আলিঙ্গন ও চুষন আর যৌবত তান-লয়-মান দ্বারা নিয়মিত হয়। আবার ভারতীয় নৃত্যের অঙ্গসঞ্চালন অনেক রকম, শুধু মথুরা হেলনই চব্বিশ রকম। যেমন, অধোমুখম্, অবধূত, কল্পিত, সম, অকল্পিত, পরাবৃত, উৎক্লিপ্ত, লোলিত, আলোলিত, সৌন্দর্য্য, প্রকল্পিত ইত্যাদি।

(১) সম—যখন মস্তক নত কিংবা উখিত নয়—
অচঞ্চল, তখন তাহাকে সম-মস্তক বলা হয়। সম-মস্তক—

নৃত্যের প্রারম্ভে প্রার্থনা, কার্যাবিরতি কিংবা প্রণয়ে রূপট-
ক্রোধ প্রকাশ করবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

(২) অধোমুখম্—যখন মস্তক নত করা হয় তাকে



নর্তকী

নর্তকী

(ত্রীপুরণচাদন হিার মহাশয়ের সৌজশ্চে)

অধোমুখম্ বলা হয়। অধোমুখম্—লজ্জা, ভংগ, উদ্বেগ,
মূর্ছা ইত্যাদি ভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়।

দৃষ্টি চল্লিশ রকম। যেমন ধীর,
রোদ্দ, তৃপ্ত, ককণ, বিশ্রয়, শঙ্কিত,
শূন্ত, উগ্র, শাস্ত, মলিন, রান,
মুকুল, কুঙ্কিত, মদির, লজ্জিত, স্তম্ভ,
সার্চী ইত্যাদি।

সার্চী—চক্ষুর মণি যখন এক
কোণে আনা হয় তখন তাহা
সার্চী-দৃষ্টি। সার্চী-দৃষ্টি কোন বিষয়
সম্বন্ধে আন্দাজে কিছু বলা, কোন
কাজ স্মরণ করা ইত্যাদি ভাব
প্রকাশ করে।

(২) নিম্নীলিত—অন্ধনিম্নীলিত
চক্ষুকেই নিম্নীলিত বলা হয়।

নিম্নীলিত দৃষ্টি, প্রার্থনা, ধ্যান, ইত্যাদি ভাব প্রকাশ
করে।

গ্রীবার দোলন চার রকম। যেমন, মুল্লরী, তিরস্মিণ,
পরিবর্তিতা এবং প্রকম্পিতা।

প্রকম্পিতা—ময়ূরের স্তায় পিছনে এবং সামনে দোলন
করার নাম প্রকম্পিতা। প্রকম্পিতা দোলনে 'তুমি ও
আমি' এই অক্ষুট মন্বরপনি প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়া
মুখের পরিবর্তন চার রকম, ক্র-বিকার সাত রকম এবং
বাহু-সঞ্চালন আটশ রকম।

বাহুসঞ্চালন, যেমন অক্ষুপতাক, পতাকা, ত্রিপতাকা,
ময়ূর, অরাল, চন্দ্রকলা, মুকুল, ত্রিশূল ইত্যাদি।

যখন উক্ক হস্তের সমভাবে বক্র এবং অঙ্গুলীগুলি
বিস্তৃত থাকে তাহার নাম পতাকা। পতাকা—মেঘ,
বন, নদী, বায়ু, প্রপন্ন সূর্য্যারশি, সমুদ্র, বৎসর, মাস
ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করে।

অরাল—যখন পতাকার তর্কনী-অঙ্গুলী বক্র ভাবে
অবস্থান করে তাহাকে অরাল বলা হয়। অরাল—বিশপান,
অমৃত এবং বর্টিকা ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়।

নৃত্যে ভাবপ্রকাশক অঙ্গুলী-বিন্যাসকে বলা হয় হস্তক।
সংযুক্ত হস্তক আটত্রিশ রকমের। যেমন—সূচীমুখম,
মৃগশীর্ষম, শিখরম, মুকুলম, অঙ্কলি, নিতম্ব, লতা, কেশবন্ধ,
নলিনী পদ্মকোথ, বচমান, লীনমুদ্রা দোল ইত্যাদি।



সান্তালা নৃত্য

অঞ্জলি—যখন পতাকা হস্তদ্বয় সংযুক্ত করা হয় তাহাকে বলা হয় অঞ্জলি। অঞ্জলি নম্র, নমস্কার, বিনয় প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

দোল—যখন পতাকা হস্তদ্বয় উর্ধ্ব উপর স্থাপন করা হয় তখন দোল হস্ত হয়। ইহা নৃত্যের প্রথম ভঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়।

অসংযুক্ত হস্তক ও নৃত্য হস্তক বত্রিশ রকমের। বাঁশী, ধানদুর্কা, বস্ত্র, ফুল ইত্যাদি নিয়ে যে নৃত্যের অনুষ্ঠান হয় তাকে বলা হয় চালক। হাতে হাতে, পায়ে পায়ে বা হাতে পায়ে যে মিলন তার নাম করণ। করণ ও রেচক সংযুক্ত হয়ই অঙ্গহারের সৃষ্টি। এই অঙ্গহারগুলো নৃত্যের মুখো প্রধান জিনিষ। অঙ্গহার বত্রিশ রকমের। যেমন— অপরাঙ্গিত, দ্রব, অলাতক, গতি-মণ্ডল, বৈশাখরেচিত, বিদ্যাভ্রান্ত ইত্যাদি। করণ আবার এক শত আট রকমের। যেমন—

ললাটিভিলক, গঙ্গাবতরণ, বলিতক, সমনথ, লীন, কটিমম, উর্দ্ধজামু, নিকৃষ্ণিত, বলিত, লোলিত, চতুর, তালবিলসিত, দোলপাদক, সর্পিত, নিতম্ব, জনিত, নিবেশ ইত্যাদি।

এই এক শত আটটি করণ নৃত্যে, যুদ্ধে, নিযুদ্ধে সর্বত্রই প্রযুক্ত হবে। আবার মে-সমস্ত হাত নৃত্যে চালনা করা হয়ে থাকে তাকে বলা হয় মাতৃকা। কটিদশ মগন কর্ণম এবং বক্ষ উন্নত হ'লে তাকে বলা হয় সৌষ্ঠব। করণের এই এক শত আটটি ভঙ্গী নৃত্যে প্রধান স্থান অধিকার ক'রে এসেছে। এই করণ মুগ্ধভাব বুঝানোর জন্যই করা হয়ে থাকে। বলিতকতে হাত দুটি শুকতুণ্ড অবস্থায় ঘুরিয়ে নেওয়া চলবে এবং উর্ধ্বদ্বয় দৃঢ় করতে হবে, শুকতুণ্ড আবার ঠিক এইরূপ,

“আস্তাধুনতা কার্ষা, কৃষ্ণিতোহসুষ্ঠ কস্তথা।
শেবা জিন্মববলিতা হারা লেহঙ্গলয়ং করে ॥”

বক্ষস্থলে পতাকাঞ্জলি, মস্তক ও অধর সংস্পর্শিত এবং

অসংকট কৃষ্ণিত থাকলে লীনকরণ হয়। নৃত্যের এই অঙ্গবিক্ষেপ ছাড়া আরও কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে বিশেষ ভঙ্গী করতে হয়। যেমন—বিষ্ণুকে নৃত্যে দেখাতে হ'লে ত্রিপতাকা হস্তদ্বয়ে ধারণ করতে হয়, পার্বতীকে বোঝাতে



নৃত্য—(কমারী অমলা নন্দা)।

হ'লে ডান হাত উর্ধ্ব ক'রে অক্ষচক্র এবং বাঁ-হাত নীচু ক'রে অক্ষচক্র ধারণ করতে হয় এবং এই হস্তদ্বয় অভয়া ও বরদা ভাবে স্থাপন করতে হয়। এই ভাবে ব্রহ্মা, শিব, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিকেয়, ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বরুণ, বায় প্রভৃতি প্রত্যেক দেবদেবীকে নৃত্যে দেখাতে হ'লে স্বতন্ত্র ভাব সন্নিবেশিত করতে হয়।

দশ অবতারের মৎশ, কৃষ্ণ, বরাহ, নসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বৃদ্ধ (বলরাম), কৃষ্ণ এবং কল্কি প্রভৃতি ভঙ্গীতেও স্বতন্ত্র ভাবে নৃত্য করতে হয়। যেমন বাঁ-হাত কটিতে এবং অঙ্গপতাকা ডান হাতে থাকলে পরশুরাম মনে করতে হবে। ব্রাহ্মণ, শূদ্র, কত্রিয়, বৈশ্য, চন্দ্র, সূর্য্য, বৃধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহ, স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা পুত্রকন্যা, ভাই-ভগ্নী ইত্যাদিও বিভিন্ন ভঙ্গীতে প্রত্যেকের ভাব প্রক্ষিপ্ত করতে হয়।

ভারতীয় নৃত্যে পদসঞ্চালন প্রধান চার ভাগে বিভক্ত। যথা—মণ্ডল, উৎপ্ৰাবন, ভ্রমরী এবং পদচারী। মণ্ডল পদসঞ্চালন আবার দশ ভাগে বিভক্ত। যেমন—মোখিত, শ্রেঙ্কান, প্রেরিত, স্বস্তিক ইত্যাদি।

স্বস্তিক—পদবিক্ষেপে ডান পা বাঁ-পায়ের উপরে স্থাপিত



বরণ-নৃত্য—(কুমারী অক্ষয়কামা রায়)

ক'রে ডান হাত বাঁ-হাতের উপর রাখতে হয়। উৎপ্ৰাবন পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যেমন—অলভ, কর্তরি, মোখিত ইত্যাদি।

ভ্রমরী পদবিক্ষেপ সাত ভাগে বিভক্ত। যেমন—উৎপ্লুত, চক্র, একপদ, কুঞ্চিত, অঙ্গ ইত্যাদি।

কুঞ্চিত—হাঁটুকে নির্ভর ক'রে নৃত্য করার নাম কুঞ্চিত ভ্রমরী।

পদচারী আট ভাগে বিভক্ত। যথা—চলন, বিষম, লোলিত ইত্যাদি।

লোলিত—পৃথিবীকে পদস্পর্শ করেও করে না অথচ পা কাঁপতে থাকার নাম লোলিত।* ইহা ছাড়া বহু প্রকার পদ স্থাপন আছে। যেমন—ময়ূর, মৃগ, হস্তি, অশ্ব, সিংহ, সর্প, ভেক, বীরোচিত প্রভৃতি। আবার নৃত্যের উদ্দেশ্য হবে,

“দেবরুবা প্রতীতো যন্তালমান
রসাশয়ঃ সবিলা সোচকঃ
বিক্ষেপা নৃত্যমিত্যুচ্যত বৃধিঃ
লয়াচুস্তিষ্ঠতে বাদ্যঃ
বাদ্যচুস্তিষ্ঠতে লয়ঃ
লয়ঃ তাল সমারকঃ
ততো নৃত্য প্রবর্ততে।” (সংগীত দামোদর)

আবার নৃত্য যে করবে সে হবে,

“নৃত্যো নালমরূপেন সিদ্ধিনা টাঙ্গ রূপতঃ
চার্কাধিষ্ঠান বন্যত্যং নৃত্যমশুচিড়ম্বনা।”
(মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

যেহেতু রূপহীনের নৃত্য বিড়ম্বনা। রূপবতীর দেহ হবে ক্ষীণ, সুন্দর, এবং নবীন মন হবে আত্মবিশ্বাসী, প্রফুল্ল। বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে তাল-লয়-মান ঠিক রাখবে এবং সুমোহন পরিচ্ছদে ভূষিত হবে তবেই সে নর্তকী।

“শুনীলশিখুবিস্তীর্ণকেশপাশনিবেশিতঃ।
গ্রস্থিবিললিত পৃষ্ঠে লসত পুষ্পাবতঃ সকঃ।
বেণী বা সরলা দীর্ঘা মুক্তাজালবিরাজিতৈঃ।
কলিতং পুণ্ডলৈর্ভালং কস্তুরীচন্দনাদিনা।।
রচিতং চিত্রকং ভালে নেহে ভ্রমরীনাঙ্জিতে।
উলসত কাস্তিবলয়ে তালপাশে চ কর্ণরোঃ।।”—ইত্যাদি।

আবার নর্তকীর এই দশটি গুণ থাকার প্রয়োজন। সে দৃঢ়চেতা, ভ্রমরী গতিতে অভিজ্ঞা, রেখাযুক্তা, মেধাবী, সঙ্গীতনিপুণা হ'বে; তার চক্ষু দুটি উজ্জ্বল, চারুকলার প্রতি একাগ্রতা ও সহগুণ থাকা চাই। এই সব গুণ নর্তকীর মধ্যে আছে শুধু সে-ই কাংসনির্মিত কিঙ্কিনী পারে নৃত্যের প্রারম্ভে পুষ্প অঞ্জলি দিয়ে নৃত্য আরম্ভ করতে পারি।

ভারতীয় শিল্পসাধনার ভারতে যেকোন একটি নিজস্ব অধ্যায় সাধনার বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় সেরূপ ভারতের

* এইগুলির অনেক বিষয় শ্রীমনোমোহন ঘোষ সম্পাদিত নন্দিকেশ্বর-বিরচিত 'অভিনয়-দর্পণম্' থেকে সাহায্য পেয়েছি।

এই নৃত্যও ভাবপ্রধান। ভারতের এই যুগে নৃত্যকলার চর্চা প্রায় ধরে ধরেই হ'ত, জীবনের অস্বাভাবিক নানারূপ অনুষ্ঠানের সঙ্গে ইহা অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত ছিল। এরই ফলে ভারতে নৃত্যের চরম উন্নতি হয়।

আজকাল যেমন গণিকাদের স্থান সমাজের নিম্নস্তরে, তখন ছিল এর বিপরীত। বাৎসায়ন বলেন যে স্ত্রী-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে-সব কলাবিদ্যা আবদ্ধ হয়ে আছে সেগুলি জেনে নেবার জন্তেই গণিকাদের গোষ্ঠীতে স্থান দেওয়া উচিত। গোষ্ঠী সমবায়ের প্রধান অঙ্গ ছিল গণিকা। কারণ তারা নৃত্যবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিল এবং তাদের নৃত্য ও কলানৈপুণ্য দেখার জন্তে তাদের ঘরে যাওয়া একটা সামাজিক প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মহর্ষি দত্তক অনেক দিন গণিকাদের ঘরে থেকে তাদের বৃত্তিরহস্য ও সাম্প্রদায়িক কলানৈপুণ্য নিজে আয়ত্ত করেছিলেন। এমন কি বৌদ্ধ যুগেও মহারাজ অশোক যখন দেশভ্রমণে যেতেন তখন তাঁর সঙ্গে এক বিরাট গণিকাবাহিনী থাকত।

মরণ যখন মানুষের আসে তখন না-কি চার দিক থেকেই আসতে শুরু করে দেয়। ভারতের জীবনসন্ধ্যা যতই ঘনিষ্ঠে আসতে লাগল ততই তার দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান, কলা ধীরে ধীরে তমসচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্যের



নটরাজ

বিষয়, এই অধঃপতনের যুগেও কৃষ্ণলীলার উৎসব ভারতের জনসাধারণ বহুল পরিমাণে ক'রে আসছিল। শিব বহুদিন থেকেই ভারতের নৃত্যের আসর থেকে উঠে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এই কৃষ্ণলীলা তখনও নেবে নাই। শ্রীহর্ষ-রচিত 'রত্নাবলী' নাটকে মদনোৎসবের বর্ণনা থেকেই বুঝতে

পারা যায় যে, কত প্রাচীন যুগ থেকেই কৃষ্ণলীলা এইরূপ উৎকর্ষ লাভ ক'রে আসছিল।

“কেহ নৃত্য করিতে করিতে পিচকারীর জল ছুঁড়িয়া মারিতেছে, কেহ তাঁর শিথিল দেহ লইয়া গাছে দোল



রাস-নৃত্যে রাধাকৃষ্ণ

পাইতেছে, কেহ কেহ আবার নৃত্যে মাতামাতি শুরু করিয়াছে—কাহারও খোঁপা এলোমেলো, পায়ের নূপুর নৃত্যের তালে তালে এদিকে-সেদিকে ঝন্ ঝন্ শব্দে ছিটকাইয়া পড়িল। কিছুই আজ লক্ষ্য নাই, নৃত্যে তারা মাতোয়ারা, ক্রমাগত দোঁহুলামান দেহে গলার হার বুকের 'পর আছড়াইয়া পড়িল।”

কিন্তু পৌরাণিক আখ্যানের অধিকাংশ রূপসাধনা ভারতের পরবর্তীকালে যে ধীরে ধীরে লোপ পেতে বসেছিল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হিন্দু রাজত্বের শেষভাগে ভারতের ইতিহাসে বৈদেশিক রাজাদের বার-বার আক্রমণে ভারতকে এত বাস্তব থাকতে হয়েছিল যে, প্রায় পাচ শত বৎসর শুধু নৃত্যকল নয় কোন দিকেরই অহুশীলন মোটেই হ'তে পারে নি।

তার পর মোগল-রাজত্বের সময় মুসলমানী নাচ ঢুকে পড়ে। মোগল-রাজত্বের সময় নৃত্যের আদর্শ একেবারে ক্ষুণ্ণ হ'লেও, মোগল সম্রাটগণ চাকরকলার চর্চায় বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। মোগল আমলে সঙ্গীত ইত্যাদির ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়, কিন্তু নৃত্য-সম্বন্ধে এরূপ কিছু বিশেষ পাওয়া যায় না। তবে মোগল

আমাদের খুব-মুলাবান্ জলভ কয়েক খানি নৃত্যের ছবি শ্রদ্ধের শ্রীমুক্ত পুরণচাঁদ নাহার মহাশয়ের নিকট আছে। কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সময় নৃত্যকলা খুব পিছনে পড়ে। সে এসে দাঁড়াল বাহ্যিক চাকচিক্যে, মাহুষের মন ভ্রমানোর জন্তে।

দিনের পর দিন দেশ যখন এলোমেলো, তখন বাংলার শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম হ'ল। তিনি সারা বাংলার মাঠে ঘাটে বইয়ে দিলেন এক নতুন আবহাওয়া, সহজধারার দিলেন প্রাণ মাতিয়ে। ভাগবতের মস্তাই ছিল,

“যো নৃত্যতি প্রকৃষ্টায়া ভাবে বহুমুভক্তিঃ
স নির্দহতি পাপানি জন্মান্তর শতেষুপি।”

এই বৈষ্ণবমূলক নৃত্যে দেখতে পাই বাউল, কীর্তন, জাগের গান, ধামালী, শ্লোকনৃত্য, কুমুর, ইত্যাদি। কুমুর চার ভাগে বিভক্ত, ব্রজলীলা, আগম (ভবানী বিষয়ক), লহর (কৌতুক), খেউড় (অল্লীল)। তার পর সৃষ্টি হ'ল কুশল, গভীরী ইত্যাদি গান ও নাচ। অধুনা এই সব গান ও নাচকে পল্লী-নৃত্য ও গীত এবং মেয়েদের সংক্রান্ত ব্যাপারকে বলি হয় ব্রত নিত্য ও ব্রতকথা।

পল্লীনৃত্যে আজকাল কোন কোন গানের সঙ্গে নাচ আছে অথবা নাচ আছে গান নাই। সব গানেরই একটি নিষ্কের রূপ ও একটি ধারা আছে, সব গানের সঙ্গে সব নাচ কিংবা সব নাচের সঙ্গে সব গান মেলে না। বাংলার বরবিরাগী বাউল ঘুরে ঘুরে নেচে বলে,

আমার ছপের কথা বলব কোথ'
শোনরে ও ভাই সকল।
এ দলের আগম নিগম কেউ জানে না রে
আমি তাই ভেবে হ'লাম পাগল।
এসেছিলি পালি হাতে
এ দলের আসে বন্দী রলিস রে,
তোয় আসা যাওয়া সমান হ'ল।
হলি দিনে কাণা মিছে তোয় তানা নান'
সাধের জনম বুখাই দিলি রে
টানলে টুনলে তোয় রথ চলে না
হয়েছিল্ অচল।
জায়গার বসে ন'ড়ে চড়ে
তাই দেখে পাগলা কানাই হেসে মরে
ওরে নেচে নেচে আপন মনে
দেখলি না রূপ নেহার করে
ও ভাই সকল।
(মলিয়া গ্রাম থেকে সংগৃহীত)

“সূর্য নাচে চন্দ্র নাচে আর নাচে তারা
পাতালে বাসুকী নাচে বলি গোয়াল গোয়াল।”

বৈষ্ণব যুগে পুরাণের দটনাবলী নিয়ে নৃত্যের প্রচলন হয়েছিল দেখতে পাই দশ অবতারের নৃত্য—নাহা আজও প্রচলিত। ‘কুমুর’ নৃত্য বহুধা বিভক্ত। বোধ হয় কুমুর কুমুর শব্দ থেকেই ‘কুমুর’-নৃত্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং এই ‘কুমুর’ নৃত্য থেকে বাংলা দেশে বহু নৃত্য ও গীত প্রচলিত হয়েছিল—আবার কুমুর নামে একটি সুর হ'তেও ‘কুমুর’-নৃত্যের সৃষ্টি হতে পারে, যেমন,

“মদন মোহন হেরি মাতল মনসি
বুতী যখনত গায়ত ‘কুমুরী’।” (পদকল্পতরু)

কিংবা

“চরণে চরণ বেড়া ত্রিভঙ্গ হইয়ঃ
মদন গায়িছে গ্রাম বাশরী বাজাইঞ।”

আমাদের অনেকের ধারণা পুরুষ ও নারীর একসঙ্গে নৃত্য করা পাশ্চাত্য দেশের সৃষ্টি; কিন্তু আমাদের দেশেও প্রাচীন কাল থেকেই পুরুষ-প্রকৃতির, শিবভবানীর, কন-রাধার যুগ্মনৃত্য শুরু হয়েছে। বৈষ্ণব যুগেও দেখতে পাই,

নৃত্যক গোপিনী আছিল তত হৈল কাণ্ড
নাচিতে লাগিল সবে ডগমড তণ্ড
পায়ের নেপুয় বাজে হাতের ককণ
মধুর বাশরী বাজায় মদনমোহন
নাচিতে নাচিতে ওঠে গানের তরঙ্গ
গভীর শব্দে বাজে রসের সুদঙ্গ
ভূবন ভরিয়া গেল এ রসের গানে
ভাঙিল শিবের ধ্যান উঠে দেবী মনে
পক্ষ্মুখে গান গায় উথরু বাজায়
নাচে শিব ত্যাস দিয়া ভবানীর গায়।

বৈষ্ণব-যুগে মেয়েদের ব্রতনৃত্য ও ব্রতকথা ছাড়াও তাদের জীবনকে মধুর ও সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তোলবার জন্তে বহু ছড়া, গাথা ও নৃত্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিবাহিত জীবনে বাংলা দেশে পরিণয়-উৎসবে মে নৃত্যগীত হয়ে থাকে তা সর্কজ্ঞানবিদিত। শুধু বাংলার নয়, ভারতের অন্যান্য দেশেও লোকনৃত্যের সৃষ্টি হয়েছিল, যেমন গুজরাটী গল্পবা, ও ব্রহ্মদেশের নৃত্য। বাংলার বরণ-নৃত্যের খুব উৎকর্ষ হয়, বরণের ভঙ্গীর তালে তালে মেয়েরা বলে ওঠেন,

কি বরণ বয়েলো ও রানের সোহাগিনী।
সোহাগী বরণ বয়ে

হাতের কঙ্কণ বিকমিক করলো
কি বরণ বরেলো ও বামের সোহাগিনী।
সাহাগী বরণ বর

হেলকে চুলে মাজ' পড়লে
কি বরণ বরেলো ও বামের সোহাগিনী
সোহাগী বরণ ববে

গলাব হাব টলমল কাব,
নুখেতে মবুর হাসি
দশনোত খেলে দামিনা গা
কি বরণ বরেলো ও বামের সোহাগিনী
সোহাগী বরণ ববে

নুকেব কাপড় পাস প।
। ঠা ঠা থোপা সো।

পায়ের নুপুব পাস পাড়লে
কি বরণ বরেলো ও বামের সোহাগিনী

(নববিয়াগাম গৌ ৪ সংগৃহীত)

প্রথম বাঙালী নৃত্যকে শ্রদ্ধাব চোখে দেখলেন,
বঙ্গানন্দ কেশবচন্দ্র। তাঁর 'নববন্দাবন' নাটকে নৃত্যের
স্থান অতি উচ্চে ছিল। তাব পব রবীন্দ্রনাথ শুধু চোখের
দেখা দেখলেন না, তাব পচলন শুরু ক'বে দিলেন তাব
শাস্তিনিকেতনে। বর্তমানে উদয়শঙ্কর ও তিমিবববগের।
পভাবে দেশে নৃত্যেব একটা নবজাগরণ শুরু হযেছে।
উদয়শঙ্করের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত কুমারী অমলা নন্দীও
কলিকাতাব কোন-একটি বিশিষ্ট অন্ত্রানে নৃত্য শিক্ষা
দিচ্ছেন *।

* প্রবন্ধের সাঙতান • গ্য, প্রণয়-প্রণয় ছবি দুখানি শিষ্টা

* কলকাতাব অন্ত্রানে চৌধুরা কর্তৃক শিষ্টা।

আলোচনা

“অস্পৃশ্যতা”

কুমার সত্যজিৎ দাশ ওলন ২৩০ লিখিয়াছেন।—গ• খাষাট
সংখ্যা' প্রবাসীতে প্রযুক্ত শব্দব বায় অস্পৃশ্যতা নামক প্রবন্ধে
লিখিয়াছেন যে, বাকুজী জাতি পূর্বে সর্বত্র অচল ছিল, বর্তমান সর্বত্র
আচরণীয় হইয়াছে।

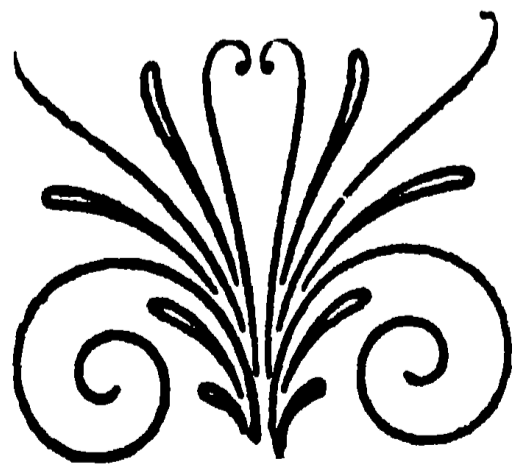
বাংলা দেশ বস্তুত দুই জাতি আছে বলা যায় বাকুজী ও শূদ্র।
শূদ্রের কতিপয় জাতি জল-চল, কতিপয় জল-অচল। বাকুজী জাতি
কখনই কোথাও জল-অচল শব্দ নহে। তথ্যেব দিক দিয়া এ-কথ
বলিতে পারি যে বাকুজী জাতি অবিসংবাদিত ভাব নবশাখ বলিয়
সর্বত্রই পরিগণিত এবং নবশাখ জল-চল-শূদ্র। আচার্য বাবহাব,
দর্শন ও কার্য বাকুজী জাতি হিন্দুসমাজেব প্রচলিত সমাজ-সংস্থানে
জল-চলের সম্মান পাটাইছেন, তাহাকে চল-অচল বলিলাল গাথাব
অবমাননা কনা হয়।

“পবলোকে পুর্কলিযাব হবিপদ দাঁ”

‘হবিপদ সাহিত্য মন্দির’ ব বৃ•পদ সম্পাদক শযরু সুরবোধকুমার
সেন দাঁনাউয়াছেন

বর্তমান ভাদ্র মাসেব প্রবাস ত পুর্কলিযাব হবিপদ দাঁ মহাশয়েব
সম্বন্ধ যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়া ছ তাহাৎ নিম্নলিখিত বিষয়টিব
দায়িত্ব থাক উচিত ছিৎ—

গ• ১৩৩১ সালে হবিপদ দাঁ মহাশয় পুস্তকাগারটি নিভ বায়ে নির্মাণ
কবিয় দেন এবং সাধাবণ পাঠাগার গৃহটি কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ
মুখোপাধ্যায় মহাশয় আপন ব্যয়ে তাহাব যতপড়া স্থলীল দেবীর
স্মৃতি বক্ষাথ গন ১৩৩০ সালে প্রস্তুত কবিয়া দেন। সেই কারণে
পুস্তকাগারব নাম ‘হবিপদ-সাহিত্য-মন্দির’, ও ‘সাধাবণ পাঠাগার’ গৃহ
‘স্থলীল দেবী-স্মৃতি’ নামক একটি প্রস্তব ফলক সংলগ্ন রাখিয়াছে।



স্পষ্ট কথা

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী

ওগো-ও সমাজ-রাজা,
দেশের দেওয়া মুকুট যে নেওয়া—
রাজারও হয় সাজা !
শুচি-বাই-রোগী, ছুঁতের বাতিক
আর ত চলে না !—দেখি' বেগতিক
শাস্ত্রে শস্ত্র ! ঢীকা অধুনিক

চল-ইতিহাস অতীতের !
দেশটা বানাবে পতিতের ?

তুর্য়ানিনাদ দ্বারে !
মুক্তি-সূর্য্য অন্ধের জাগি,
ধন্ধেব অন্ধকারে ।
ক্লেশ ঘানি চির-অপমণেব
সয় বয় যারা সারা দেশের !
ভারা বে বন্ধু দিন-শেষের—

যারা না-মান সে ঋণ
আদাত তারাই হীন !

দোষের সহস্র ধোপ
পুরুষেরই বেলা ! নারী নিয়ে ফেলা ?
কিন-দোষে তার বিলোপ !

অবলা নাম-ত কিনেছ চের,
বাড়ালে অত্যাচারেরই জেব
তুমি যে মুক্তি শক্তি দেশেব
যদি নিজ মুষ্টি ধব
দানবে মানব কর !

চেতন, না অচেতন ?
হাসি পায় রোষে, সহিছ কি দো'য়ে
অপমান-অপহরণ ?
বোঁচকা-পুঁটলী পবেব অধীন—
নও যে তুমি,—দেখাবে যে দিন,
হাতে হাতে শোধ পীড়নের ঋণ !—
সেই-ত তোমাব রূপ !
পশুব কম্বু চূপ !

আত্মঘাতিনী দল !
ভাঙাবে মান পায়ে ধ'র আজ
কবির অশ্রু-জল !
ভাত-কাপড়ের অলীক-মালিক তোরে
রূপ-বোবন তব্ব-যৌতুক ধাবে
দেয় ছুটি, যাও নিজ পায়ে ভর ক'বে
বাঁচো, কত কাজ শত খাতে !
মরে ভে'ব, কেউ মরে ভাতে !

চিত্র-পরিচয়

শিবাজী ও মুসলমান বন্দিনী

মরাঠা সৈন্যধাক্ক আবাজী কল্যাণ-দুর্গ অধিকার
করিলে বিজাপুরী কিল্লাদার আহমেদের পরিজনবর্গ
বন্দী হইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে আহমেদের পুত্র-
বধুর রূপ-লাবণ্য আবাজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি
এই তরুণী রূপসীকে মরাঠারাজ ছত্রপতি শিবাজীর

নিকট প্রেরণ করেন। তরুণীও সৌন্দর্য্য শিবাজীর হৃদয়ে
অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিল। শিবাজী বলিয়া উঠিলেন—
আমার মাতা যদি তোমার স্ত্রী রূপবতী হইতেন তবে
আমিও রূপবান হইতাম।

জনকোচিত ব্যবহারে আপ্যায়িত করিয়া শিবাজী প্রচুব
উপচোকনসহ এই তরুণীকে বিজাপুরে প্রেরণ করেন।

বহির্জগৎ

জাপানে মহিলা প্রগতি

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মহিলায় শিক্ষা-দীক্ষায় পুরুষের স্থায় অগ্রসর হইতেছে। পরিবারের গভীর ভিতরে তাহাদের কাঁধ এখন আবদ্ধ নয়। সমাজ-সেবার বিভিন্ন বিভাগে তাহা বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। জাপান বর্তমান জগতের অগ্রতম প্রধান রাষ্ট্র। সে দেশের নারীগণও কয়েক নানা ক্ষেত্রে যোগদান করিতেছে।



জাপানী মহিলা পূজা-নিবেদন করিতে মন্দিরে গমন করিতেছেন।

জাপানী মহিলায় নানা বিষয়ে উন্নতি লাভ করিলেও তাহাদের সহজ বৈশিষ্ট্যগুলি এখনও সম্পূর্ণ অবাহিত আছে। জাপানী মহিলা পিতৃকুল ও পতিকুল উভয়কেই সমান সম্মানের চক্ষে দেখে। তাহার মত পিতৃভক্ত, পতিব্রতা নারী অশ্রুত বিরল। সন্তান-প্রতিপালনেও তাহার সমবিক আগ্রহ। মধ্যযুগের মত বর্তমানেও জাপানী মহিলা পরিবারের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করিয়া থাকে।



১মারা এম্ শিম্পা লস এন্জেলসের বিশ্ব-অলিম্পিক ক্রীড়ায় বর্ষা ছে। ডা প্রতিযোগিতায় চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছেন।



কুমারী এইচ মিহাতা লস এন্জেলসের বিশ্ব-অলিম্পিক ক্রীড়ায় সস্তরণ-প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।



প্রতি পক্ষতে জাপানী বসিবার চা'য়র পানী তুলিবার ছবি।



উহানায়ের (১৭৭৪-১৮০৫) অশিত জাপানী জেলেন (কা'থোদাই) :



জাপানী নারীগণকে স্বাভাৱিক গৃহস্থালী শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা গৃহমধ্যেই আবদ্ধ থাকে না। তাহারা গৃহের বাহিরে নানা শ্রমসাধ্য কার্যেও লিপ্ত হয়। জাপানী কৃষক কুলবধুর চাষ-আবাদের সময় ভোর হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত ক্ষেত্রে কায়া করে। সেখানকার কতকগুলি কামে পুরুষের অপেক্ষা নারী পরিশ্রম করে বেশী। জাপানী জেলেনীরা সমুদ্রে ভ্রম দিয়া মণি-মুক্তা আহরণ করে। এই কায়া তাহাদের একরূপ একচেটিয়া।

প্রাচীন কালের ভারতীয় মহিলায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করিত। অন্ততঃ হাজার বৎসর পূর্বেকার জাপানী মহিলারাও যে এইরূপ বিদ্যার চর্চা করিত তাহা নিদর্শন আছে। সে-যুগে রাজপ্রাসাদে মহিলা কন্সচারী নিযুক্ত হইত। মহিলায় শখ কেবানীসিবি করিয়াই দাস্ত হইত না,

প্রাসাদের দৈনন্দিন ঘটনাবলী—রাতা-রাণা কি বলিতেন করিতেন সং তাহাও লিখিয়া রাখিত। এই সকল কাহিনী এখন বড়ই আদি নামগ্রী। একদিন ৬য় পরিমিত 'ওয়াকা' কবিতা রচনায়ও সেই মহিলায় সিজ্জহস্ত ছিল। স্বী-পুরুষের মধ্যে এই কবিতার আদান-ও হইত। রাজ-দরবারের মহিলায় সকলেই কবি। এই সকল কবিতা নামচা, কবিতা ও কাহিনীর কতকাংশই মূল এখন পাওয়া যায়। তাহাদের সাহিত্যিক উৎকর্ষ সেকালের পুরুষের রচনা অপেক্ষা যে নিকৃষ্ট নয়। সে-যুগের মুরাসাকী শিকিবু 'গেঞ্জী কাহিনী' শিশোনাগনের 'মাকুরানোসোশী' নামক সংকলন-পুস্তক তা সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

নাটকের অভিনয়েও তাহারা কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিল।

শতাব্দী পূর্বে ইজু-মো-নো-ওকুনি নামে এক অভিনেত্রী ছিল। 'ওকুনি কাব্যিক' অভিনয়ে ইহার বেশ সন্মান হয়। জাপানের বর্তমান 'কাব্যিক' অভিনয় 'ওকুনি কাব্যিক' হইতে উদ্ভূত।

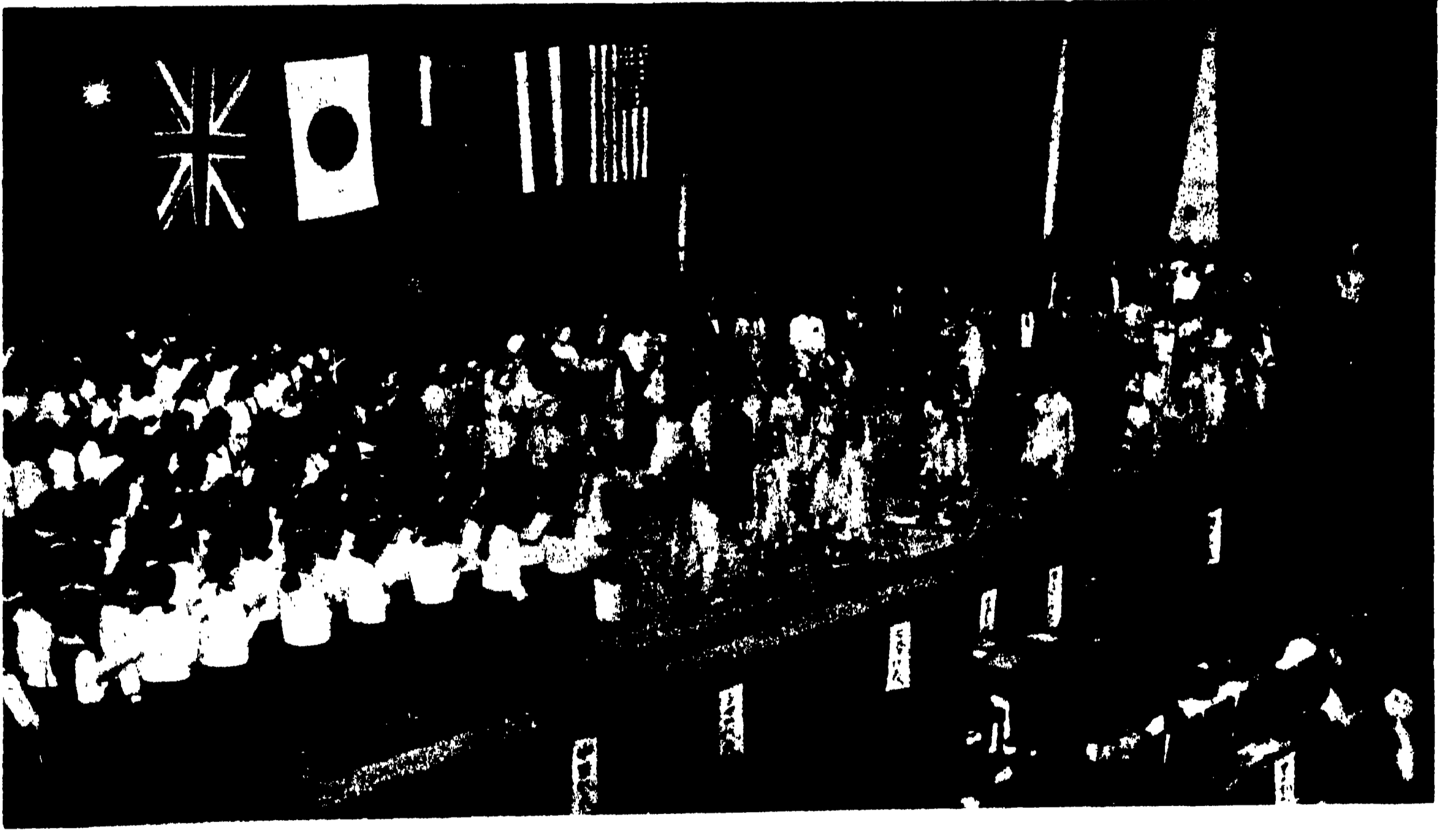
জাপানী মহিলার শারীরিক শক্তির আভাস ইতিপূর্বেই পাওয়া গিয়াছে।
ইন্দোনী: ইহাদের শরীর চর্চার কথাও প্রকাশ পাওয়াছে। কুমারা

হিতোমি ও কুমারী মিহোতার কথা সকলেরই অল্প-বিস্তর জানা। হিতোমি এক জন প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি এখন পরলোকে। কুমারা মিহোতা সম্ভরণে বহু বিদেশী সম্ভরণ-বীরকেও হারাইয়া দিয়াছেন। জাপানী নারীরা জুজুৎসু ও অস্ত্রবিধ ক্রীড়া-কৌতুকের চর্চা বহুদিন পরিয়া করিয়া আসিতেছে। আমরা সম্প্রতি তাহা সবিশেষ জানিতে পারিয়াছি।

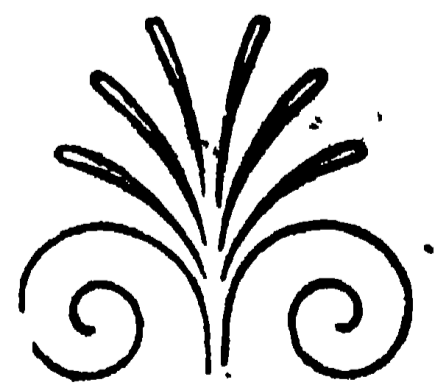
টোকিও বৌদ্ধ মহাসম্মেলন

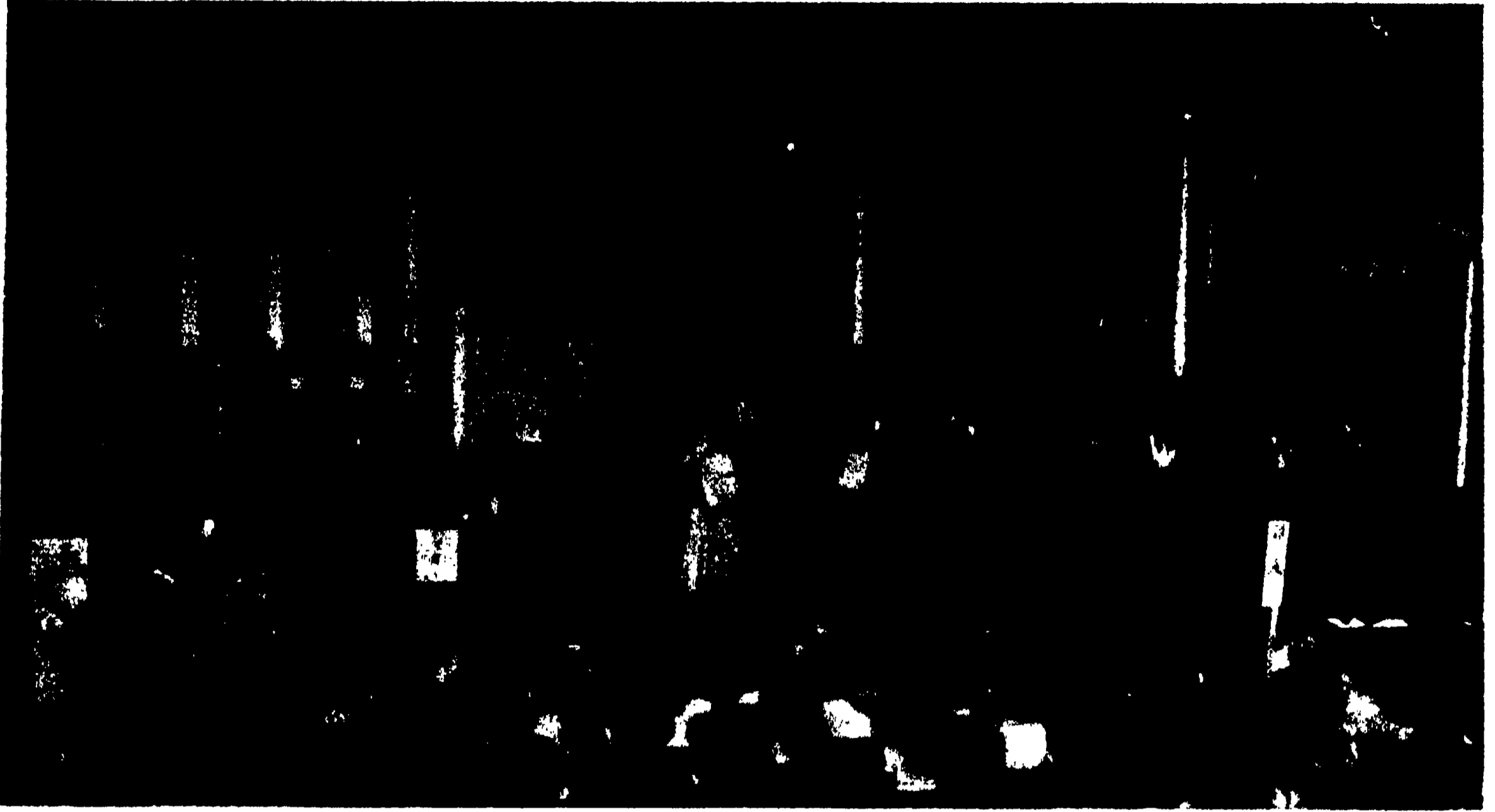
গত ১৮ই জুলাই হইতে ২৫এ জুলাই পর্যন্ত জাপানের টোকিও নগরে বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধগণের এক মহাসম্মেলন হওয়া গিয়াছে। সম্মেলনে অনূন সাত শত প্রতিনিধি সমবেত হন। ভারতবর্ষের

পক্ষ হইতেও দুই জন প্রতিনিধি ইহাতে যোগদান করেন। সম্মেলন সম্পর্কীয় তিনখানি চিত্র এখানে দেওয়া হইল।

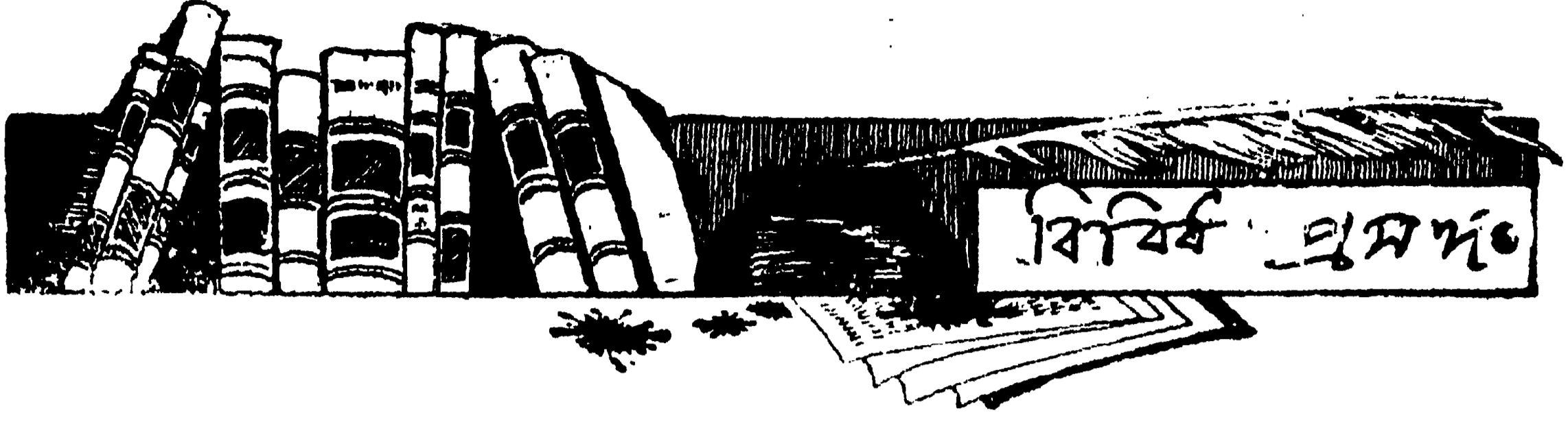


জাপানী মহিলারা মুক্তা-পান-সহকারে বৌদ্ধ মহাসম্মেলনের বিদেশী প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করিতেছেন





১। বৌদ্ধ মহাসম্মেলনের উদ্বোধন-উৎসব।
২। সম্মেলন-সংগ



রাজস্ব সম্বন্ধে বঙ্গের প্রতি অবিচার

বাংলা দেশে যত রাজস্ব আদায় হয়, তাহার অধিকাংশ—মোটামুটি দুই-তৃতীয়াংশ—ভারত-গবর্নেন্ট গ্রহণ করেন এবং তাহা প্রধানতঃ ভারতবর্ষের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অংশে স্থিত প্রদেশসমূহে ব্যয় করেন। প্রথমতঃ, বঙ্গে সংগৃহীত রাজস্বের এত অধিক অংশ ভারত-গবর্নেন্টের লওয়া অনুচিত, এবং দ্বিতীয়তঃ, তাহা লইয়া যে-যে বিভাগে ও যে-যে প্রকারে তাহা ব্যয়িত হয় তাহা হইতে পরোক্ষভাবে বাঙালীদিগকে বঞ্চিত রাখা অনুচিত। ভারত-গবর্নেন্টের সম্বন্ধে প্রথম বায় সামরিক। সৈন্যদলে এবং সৈন্যদের অনুচরদের মধ্যে বাঙালী নাই বলিলেই হয়। সুতরাং তাহাদের বেতন বাবতে প্রদত্ত সরকারী টাকার কোন অংশ বঙ্গে আসে না বলিলেই হয়। সৈন্যদলের জন্ত নানাবিধ সাজ সরঞ্জাম পোষাক ইত্যাদি ক্রয় করিতে গবর্নেন্টের অনেক টাকা খরচ হয়। এই সকল জিনিষ বঙ্গে প্রাপ্ত করান হয় না। সুতরাং সেদিক দিয়াও বাংলা দেশ লাভবান হয় না। যদিও আমরা ইহা স্বীকার করি না, যে, বরাবর বাঙালীদিগকে সৈন্যদলে লইলে তাহারা যুদ্ধ করিতে পারিত না, তথাপি যদি ইহা মানিয়া লওয়া যায়, যে, বাঙালী রণনিপুণ নহে, তাহা হইলেও বাঙালীকে সামরিক এইরূপ অনেক বিভাগে কাজ দেওয়া যায়, যুদ্ধ করা যে-সকল বিভাগের কর্মচারীদের প্রধান কাজ নহে। যেমন, হিসাব বিভাগ, নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক বিভাগ, রসদসংগ্রহ ও বণ্টন বিভাগ, এবং নানা প্রকার কেরানীর কাজ। গবর্নেন্ট কোন প্রদেশের বা ধর্মের লোকদিগকে বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া অন্যান্য প্রদেশের ও ধর্মের লোকদের প্রতি অবিচার করুন, ইহা আমরা চাই না। কিন্তু এরূপ দাবি গ্রহণসঙ্গত, যে, কোন প্রদেশের প্রতি কোন দিকে ও কোন প্রকারে অবিচার হইয়া থাকিলে ও

হইতে থাকিলে, অন্য দিকে ও অন্য প্রকারে সেই অবিচার-জনিত ক্ষতি পূরণ করা হউক। সেই জন্ত আমরা বলি, ভারত-গবর্নেন্টকে বাংলা দেশের গবর্নেন্টের বলা উচিত, সামরিক বিভাগের জন্ত আবশ্যিক জিনিষপত্র যথাসম্ভব বাংলা দেশে প্রাপ্ত করান ও বাংলা দেশ হইতে সংগ্রহ করা হউক, সামরিক হিসাব বিভাগ, নানা বৈজ্ঞানিক বিভাগ, রসদ-সংগ্রহ ও বণ্টন বিভাগ প্রভৃতিতে এরূপ বাঙালীদিগকে নিযুক্ত করা হউক যাহারা অন্য দেশ বা প্রদেশের প্রার্থীদের সমকক্ষ বা তাহাদের চেয়ে যোগ্যতর।

সামরিক বায় ছাড়া বঙ্গের বাহিরে ভারত-গবর্নেন্টের আরও নানা রকম বায় আছে যাহা হইতে বাংলা দেশ লাভবান হয় না। সেই সব বায়ের বৃত্তান্ত সংবাদপত্রে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হওয়া আবশ্যিক, এবং কি করিলে বাংলা দেশ ও বাঙালী লাভবান হইতে পারে, তাহারও পথ এই সকল বিষয়ের বিশেষজ্ঞেরা প্রদর্শন করিলে ভাল হয়।

মহিলা “বেদতীর্থ”

বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশ্যনের সংস্কৃতপরীক্ষামানদান-পরিষদের গত অধিবেশনে, অর্থাৎ, চলিত কথায়, সংস্কৃত উপাধি-পরীক্ষার উত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগকে উপাধিদানের সভায়, সভাপতি মাননীয় বিচারপতি মনোমোহন মুখোপাধ্যায় পণ্ডিত সংস্কৃত অভিভাষণে বলেন,

“এতদস্মাকং বয়ঃশ্মিন্ মহৎগৌরবকারণং জাতং যদেকা ব্রাহ্মণকুমারী সংস্কৃতমহাবিদ্যালয়গবেষণবিভাগীয়াস্তেবাসিনী ‘বেদতীর্থ’ ইতুপাধিনা সমলঙ্কিতা। ইত্যং প্রাক্ কদাপি কাহাপি মহিলা পরীক্ষার্থিনী অনেনোপাধিনা নৈব ভূষিতাহতবৎ।”

“এই বৎসর আমাদের এই মহৎ গৌরবের কারণ উৎপন্ন হইয়াছে, যে, সংস্কৃতমহাবিদ্যালয়ের গবেষণাবিভাগের ছাত্রী একটি ব্রাহ্মণকুমারী ‘বেদতীর্থ’ উপাধিতে সমলঙ্কিতা হইয়াছেন। ইহার পূর্বে কখনও কোন মহিলা পরীক্ষার্থিনী এই উপাধির দ্বারা ভূষিতা হন নাই।”

মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ইংরেজী অভিভাষণে অধিকন্তু বলেন, যে, ছাত্রীটি অল্পকর্মে ডক্টর অব ফিলসফি “দর্শনাচার্য্য” উপাধি লাভের জন্ত ইংলণ্ড বাইতেছেন এবং তন্নিমিত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের “যৌব ভ্রমণবৃত্তি”



শ্রীমতী শকন্তলা দেবী

চারি হাজার টাকা পাইয়াছেন; মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথমে এই বৃত্তি পাইয়াছেন।

এই মহিলা শ্রীমতী শকন্তলা দেবী, এম্, এ। ইনি ইংরেজী ও সংস্কৃত এই দুই বিষয়ে এম্, এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এবং “শাস্ত্রী” উপাধি লাভের জন্ত পরীক্ষা দিয়াছেন। তিনি প্রভুতত্ত্ব অনুশীলনে নিবৃত্ত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাসিক এক শত টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তিনি যেমন বিদ্যা, সর্বপ্রকার গৃহকর্মে সেইরূপ নিপুণ। পিতা স্বর্গগত আচার্য্য হেমচন্দ্র সরকার মহাশয়ের বহুবর্ষব্যাপী পীড়ায় অসাধারণ সেবা করিয়া ভক্তি ও সেবাপরায়ণতারও পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

অতুলপ্রসাদ সেন

লক্ষ্মৌয়ের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়ের মৃত্যুতে অযোধ্যা, আগ্রা-অযোধ্যা, ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তিনি বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া ও শিক্ষালাভ করিয়া পরে ব্যারিষ্টার হইবার জন্ত বিলাত যান। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার পর দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করেন। পরে তিনি লক্ষ্মৌ চাক কোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে যান। কালক্রমে তিনি তথাকার প্রধান আইনজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হন, এবং সেখানকার বার-এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। লক্ষ্মৌতেই তিনি স্থায়ী বাসগৃহ নিৰ্ম্মাণ করেন। যে রাস্তায় তিনি বাড়ি করেন, লক্ষ্মৌ মিউনিসিপালিটি তাঁহার সম্মানার্থে তাঁহার নাম রাখেন অতুলপ্রসাদ রোড্। তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন, দানও তদ্রূপ করিতেন। কোনও সংকল্পের আবেদন, কোন বিপ্লবের প্রার্থনা তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি ধনী অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন নাই।

আইনজ্ঞান ও প্রচুর অর্থ উপার্জনের জন্তই যে তিনি লক্ষ্মৌয়ে সম্মান পাইতেন তাহা নহে, তিনি লক্ষ্মৌয়ের প্রধান নাগরিক (“First Citizen”) বলিয়া স্বীকৃত হইতেন (এবং মৃত্যুর পর বহু শোকসভায় এই নামে অভিহিত হইয়াছেন) এই জন্ত, যে, তিনি মানুষটি জাতি সমৃদ্ধ, অমায়িক, সচ্ছন্দ, বিদ্বান, সমৃদ্ধ হিতপ্রচেষ্টার ও সকল সদৃষ্টানের সহায় এবং সকল দম্মসম্প্রদায়ের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুর অভাব ছিল না, শত্রু কেহ ছিল না। তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে উদারনৈতিক ছিলেন, এবং সমগ্রভারতীয় উদারনৈতিক সংঘের এক অধিবেশনের সভাপতি, আগ্রা-অযোধ্যার প্রাদেশিক উদারনৈতিক সভার সভাপতি এবং উক্ত প্রদেশের উদারনৈতিক কনফারেন্সের দুই অধিবেশনের সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি পাঁচ “স্বদেশী” ছিলেন এবং স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার বিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন।

শিক্ষাবিস্তারকার্য্য তাঁহার প্রিয় ছিল। লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের কান্সেলর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল

তঁাহাকে উহার ভাইস্-চ্যান্সেলারের পদ দিবার প্রস্তাব হয়। তিনি তাহা গ্রহণ না-করিয়া ডক্টর রঘুনাথ পুরুষোত্তম পরাঙ্গপোকে উহা দিতে বলেন। তদনুসারে পরাঙ্গপো মহাশয় উহাতে নিগত হন।

তিনি যেমন আগ্রা-অমোঘ্য প্রদেশকে নিজের বাসভূমি করিয়াছিলেন, তথাকার লোকেরাও তেমনি তঁাহাকে আপনার জন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। অল্প দিকে তিনি আবার সেই প্রদেশের প্রবাসী বাণালীদের এক জন নেতা ও লক্ষ্যেয়ের বাণালীদের নেতা ছিলেন। তঁাহাদের সব সামাজিক কাজে, সব সংস্কৃতিমূলক কাজে, বিশুদ্ধ আমোদ-পমোদে, শিক্ষায় তঁাহারা তঁাহার সহযোগিতা লাভ করিতেন। প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের তিনি অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন, এবং ইহার ৩৩ অবিবেশনে সভাপতি হইয়াছিলেন। প্রবাসী বাণালীদের মাসিকপত্র 'উদ্ধরা'র তিনি প্রথম সম্পাদক ছিলেন।

বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের বাণালীদের মধ্যে তঁাহার স্মৃতি জাগরুক থাকিবে গানরচয়িতা, সুগায়ক, এবং কবি বলিয়া। তিনি প্রাণের গভীর আবেগে গান ও কবিতা রচনা করিতেন, এবং তিনি যে গান করিতেন তাহাতে তঁাহার প্রাণের ও মর্মবেদনার পরিচয় পাওয়া যাইত। তঁাহার গান ও কবিতার "কাকলী" "কয়েকটি গান" ও "ঐতিকুণ্ড" এই তিনখানি বহি মূদ্রিত হইয়াছে। তঁাহার অনেকগুলি গান বাণালী সমাজে সুপরিচিত। তাহার ৩৩ একটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। এগুলি "জাতীয়-সঙ্গীত"-শ্রেণীর। একটি এই :—

হও ধরমের বার, হও করমেতে ধীর,
হও উন্নতশির, নাহি ভয়
ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান, হও সবে আশ্রয়ান,
সাথে আছে ভগবান—হবে জয়।
তেজিশ কোটি মোরা, নহি কভু ক্ষীণ,
হতে পারি দীন, তবু নহি মোরা হীন,
ভারতে জনম, পুনঃ আসিবে সুদিন :
এ দেখ প্রভাত উদয়।
নানা ভাব, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান ;
দেখিয়া ভারতে মহাজাতির উত্থান, জগজন মানিবে বিশ্বয়।
জ্ঞায় বিরাজিত ষা'দর করে, বিশ্ব পরাজিত তাদের শরে,
সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ডরে, সত্যের নাহি পরাজয়।

আর একটি এইরূপ—

বল বল বল নবে, শত বাণা বেণু-রবে,
ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন নবে,
কল্পে মহান হবে, ধামে মহান হবে,
নব দিনমণি উদিকে আবার প্রবাসন এ পুরবে।



অতুলপ্রসাদ সেন

আজো গিরিবাজ র যছে প্রহর,
শিরি তিন দিক নাচিছে নহর।
যায়নি স্বকায় গঙ্গা গোদাবরী,
এখন! অনুতবাতিনা,
প্রাণি প্রাপ্তর প্রাণি জীবন, প্রাণি জনপদ,
তাপ অগণন,
বহিছে গৌরবকাহিনী।
বিহ্বা মেহেয়া, ক্ষণে নালাবর্তী,
সতী, সাবিত্রী, সোতা, অরুণতী,
বহু বীরবানী বীরেন্দ্রপ্রসূতি,
আমরা তাদেরি সন্ততি,
জনলে দহিয়া যারা রাখে মান,

পতিপুত্র তরে হুখে ভাজে প্রাণ,

আমরা তাদেরি সন্ততি ।

নিম্নোক্ত তৃতীয় গানটি খুব বেশী সভাসমিতিতে গীত
হইয়া থাকে ।

উঠগো ভারতলক্ষ্মী, উঠ আদি জগতজনপূজা.

দুঃখদৈশ্ব সব নাশি কর দূরিত ভারতলক্ষ্মা,

ছাড়গো ছাড় শোকসজ্জা- কর সজ্জা,

পুনঃ কনককমলধনধায়ে.

জননীগো লই তুলে বক্ষে,

মাংসনাবাস দেহ তুলে চক্ষে.

কাঁদি ছ'তব চরণতলে,

ত্রিশতি কোটি নরনারীগো ।

কাণ্ডারী নাহিক কমল!

দুঃখলাঞ্ছিত ভারতবর্ষে,

শক্তি মোরা সব যা নী,

কালসাগরকম্পন দেশে.

তোমার অভয়পদস্পর্শ, নব হয়ে.

পুনঃ চলিব তরণী স্তম্বলক্ষ্মা :

জননীগো ইত্যাদি .

ভারতশাসন কর পূর্ণ,

পুনঃ কোকিলকুজিত কণ্ঠে,

শেষ হিংসা করি চূর্ণ,

কর পূরিত প্রেম অলিগুঞ্জে.

দূরিত করি পাপপুঞ্জে, তপঃ তুঞ্জে

পুনঃ বিমল কর ভারত পুণ্য.

জননীগো ইত্যাদি ।

“জাতীয়-সঙ্গীত” এবং অন্ত সাধারণ সঙ্গীত ছাড়া তাহার
রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত অনেকগুলি আছে । তাহার মধ্যে একটি
উদ্ধৃত করিব । তাহার ব্রহ্মসঙ্গীতগুলির মধ্যে তাহা সর্বশ্রেষ্ঠ
বলিয়া নহে, কারণ সর্বশ্রেষ্ঠ কোনটি বলা কঠিন, কিন্তু
এই বলিয়া, যে, তিনি, ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ অনুসারে,
উপেক্ষিত অনাদৃত অনন্নত লোকদের সেবা বহুপূর্ণ হইতেই
করিয়া আসিতেছিলেন, যখন হারিজনদের সেবার আধুনিক
আন্দোলন আরম্ভ হয় নাই, এবং এই গানটিতে তাহার দীন-
সেবক স্বয়ংরূপে ছাপ পড়িয়াছে ।

নীচুর কাছে নাচু হ'তে শিখলি না রে মন !

(ভূই) সূখা জনের করিস পূজা, দুখীর অযতন, (মুঢ় মন) :

লাগেনি যার পায়ে ধূলি, কি নিবি তার চরণধূলি,

নয়রে সোনায়, বনের কাঠেই হয়রে চন্দন, (মুঢ় মন) !

প্রেমধন মায়ের মতন, দুঃখা স্মৃতেই অধিক যতন,

এই গানেতে ধনী যে জন, সেই ত মহাজন, (মুঢ় মন) !

বৃথা তোর কৃচ্ছ সাধন, সেবাই নায়ের শ্রেষ্ঠ সাধন !

মানবের পরম তার্থ দানের শ্রীচরণ, (মুঢ় মন) !

নতানতের তর্কে মত্ত, আছিস তুলে পরম সত্য,

সকল ঝরে সকল নরে আছেন নিরঞ্জন, (মুঢ় মন) !

এই গানটি অভুলপ্রসাদের “কাকলী” নামক গ্রন্থে
আছে । বাউলের সুর, দাদরা ।

প্রদেশসমূহে শিক্ষার সরকারী ব্যয়

বঙ্গে সংগৃহীত রাজস্বের অধিকাংশ ভারত-গবন্মেণ্ট
গ্রহণ করায় একটি কুফল এই হইয়াছে, যে, বাংলা দেশে
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি জাতিগঠনমূলক বিভাগে
ব্যয় অত্যন্ত কম হয় । বঙ্গের রাজস্ব প্রধানতঃ বঙ্গই ব্যয়িত
হইলেও এই সব বিভাগ রাজস্বের জায়া অংশ পাইত কি না,
তাহা অনুমান করিয়া আলোচনা করা নিফল । হুতরাং
তাহা করিব না ।

শিক্ষার জন্য বঙ্গে সরকারী ব্যয় কিরূপ কম হয়, তাহা
ভারত-গবন্মেণ্টের আধুনিক পঞ্চবার্ষিক রিপোর্ট হইতে
দেখাইব । ইহা ১৯২৭-৩২ সালের রিপোর্ট । নীচের
তালিকার অঙ্কগুলি এই রিপোর্ট হইতে গৃহীত । ব্যয়
১৯৩১-৩২ সালের ।

প্রদেশ ।	লোকসংখ্যা ।	সরকারী শিক্ষা-ব্যয়
মাদ্রাজ	৭,৬৭,৪০,১০৭	২,৫৫,৭১,৭১৫
বোম্বাই	২,১০,৫৭,৮৬১	২,১৩,০১,৬০০
বাংলা	৫,০১,১৭,০০১	১,৭৪,৫৭,০০০
আগ্রা-অযোধ্য	৪,৮৭,০৮,৭৬৩	২,১৭,০৭,০০০
পঞ্জাব	১,৩৫,৮৭,৮৫১	১,৬৭,০২,৬৮২
বিহার-উড়িষ্যা	৩,৭৬,৭৭,৮৫০	৫৫,৬৭,৮২০
মধ্যপ্রদেশ	১,৫৫,০৭,৭০০	৮৭,৬২,০২০
আসাম	৮৩,২০,০০১	৩৮,৮২,৫০০

বঙ্গের লোকসংখ্যা সব প্রদেশের চেয়ে বেশী । অথচ প্রধান-
কার সরকারী শিক্ষাব্যয় মাদ্রাজ, বোম্বাই, আগ্রা-অযোধ্য ও
পঞ্জাবের চেয়ে কম । বঙ্গের লোকসংখ্যা বোম্বাইয়ের আড়াই গুণ,
কিন্তু বোম্বাই-গবন্মেণ্ট বাংলা-গবন্মেণ্টের চেয়ে শিক্ষাব্যয়
বেশী করেন । বঙ্গের লোকসংখ্যা পঞ্জাবের দ্বিগুণের অধিক ।
পঞ্জাবেও বঙ্গের চেয়ে সরকারী শিক্ষাব্যয় বেশী । এই সব
প্রদেশের প্রত্যেকটিতেই মোট রাজস্ব আদায় বঙ্গের চেয়ে
কম হয়, এবং ভারত-গবন্মেণ্ট কোন প্রদেশ হইতেই বঙ্গের
রাজস্বের মত এত বেশী অংশ গ্রহণ করেন না ।

বিহার-উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও আসামের লোকসংখ্যা
ও সরকারী শিক্ষাব্যয় বঙ্গের চেয়ে কম ; কিন্তু এই সব প্রদেশে
রাজস্ব-আদায়ও বঙ্গের চেয়ে খুব কম হয় ।

১৯২৬-২৭ সালে বঙ্গে সরকারী শিক্ষাব্যয় ছিল ১,৪৭,৯৪,৬৮৬ টাকা। পাঁচ বৎসর পরে ১৯৩১-৩২ সালে তাহা কমিয়া হয় ১,৪৪,৫০,০৩৯ টাকা। অর্থাৎ শিক্ষার ব্যয় কোথায় ক্রমাগত বাড়িবে, তাহা না হইয়া ৩,৪৪,৬৪৭ টাকা কমিয়াছে! ভারত-গবর্নমেন্টের পঞ্চবার্ষিক রিপোর্টে ১৯৩১-৩২ সালে বঙ্গের সরকারী শিক্ষাব্যয় ১,৪৪,৫০,০৩৯ লেখা হইয়াছে, কিন্তু ১৯৩২-৩৩ সালের বঙ্গীয় শিক্ষারিপোর্টে তাহা ১,৪৪,৪৬,৮৫১, অর্থাৎ আরও কম, লিখিত হইয়াছে। সরকারী শিক্ষাব্যয়ের হ্রাস এখানেই থামে নাই। ১৯৩২-৩৩ সালে উহা আরও কমিয়া ১,৩৫,২১,৪৩৩ টাকা হইয়াছিল—আরও নয় লক্ষের উপর কমিয়াছিল!!

শিক্ষাব্যয়ের ছাত্রদত্ত অংশ বঙ্গে অধিকতম

বাংলা দেশে ১৯৩১-৩২ সালে মোট শিক্ষাব্যয় হয় ৪,২২,৮৭,০৩৬ টাকা। ইহার মধ্যে গবর্নমেন্ট দেন ১,৪৪,৫০,০৩৯, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডগুলি দেন ১৬,৪৮,৬৬২, মিউনিসিপ্যালিটিগুলি দেন ১৫,০৪,৯৪৩ (মোট পাব্লিক টাকা ১,৭৬,০৩,৬৪৪), ছাত্রেরা বেতন বাবতে দেন ১,৮০,০২,৫৭৯ এবং আয়ের অন্তান্ত সংস্থান হইতে পাওয়া যায় ৬৬,৮০,৮১৩ টাকা। অল্প কোন প্রদেশেই ছাত্রদের নিকট হইতে এত বেশী টাকা আদায় হয় না। নীচের তালিকা দেখুন।

১৯৩১-৩২ সালের হিসাব—

প্রদেশ।	ছাত্রদত্ত বেতন।	প্রদেশ।	ছাত্রদত্ত বেতন।
মাল্লাজ	৯৭৪১৯২০	পঞ্জাব	৭২১৫০২৭
বোম্বাই	৮১১৭৫৩০	বিহার-উড়িষ্যা	৪০৬০৫০৭
বাংলা	১৮০০২৫৭৯	মধ্যপ্রদেশ	১৭৫৪৮৫৭
আগ্রা-অযোধ্যা	৬৭৫৭৬১৭	আসাম	৮৩৩২৪৯

১৯৩২-৩৩ সালের বঙ্গীয় শিক্ষারিপোর্টে এই বৎসর জুলাই মাসে বাহির হইয়াছে। তাহাতে দেখিতেছি, ছাত্রদত্ত বেতনের সমষ্টি ১৯৩২-৩৩ সালে পূর্ব বৎসর অপেক্ষা বাড়িয়া, ১,৮০,০২,৫৭৭ টাকার জায়গায় ১,৮২,৬৫,১৭৭ টাকা হইয়াছে। অর্থাৎ গবর্নমেন্ট ক্রমশঃ শিক্ষাব্যয়ের নিজ অংশ কমাইতেছেন, এবং ছাত্রদের অভিভাবকেরা ক্রমশঃ অধিকতর দিতেছেন। তাহার আর একটি প্রমাণ এই, যে, ১৯২৬-২৭ সালে বঙ্গে ছাত্রদের প্রদত্ত বেতনের সমষ্টি ছিল ১,৬২,১৯,৫৯৩, এবং তাহা

বাড়িয়া ১৯৩২-৩৩ সালে হয় ১,৮২,৬৫,১৭৭ টাকা। অবশ্য ইহা ঠিক বটে, যে, ছাত্রের সংখ্যা বাড়িতেছে বলিয়া তাহাদের প্রদত্ত বেতনের সমষ্টিও বাড়িতেছে। কিন্তু ছাত্র যেমন বাড়িতেছে, গবর্নমেন্টেরও তেমনি শিক্ষাব্যয়ের নিজ অংশ বাড়ান উচিত; নতুবা শিক্ষার উৎকর্ষ কি প্রকারে সাধিত হইবে? এক হাজার ছাত্রের জন্য গবর্নমেন্ট যত ব্যয় করেন, বার শত ছাত্রের জন্য তার চেয়ে কম ব্যয় করিলে শিক্ষার উন্নতি কেমন করিয়া হইবে?

শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গের স্থান

বঙ্গে শিক্ষার বিস্তার ও শিক্ষার উন্নতি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গের অগ্রগণ্য প্রধানতঃ বাঙালীদের শিক্ষানুরাগ ও শিক্ষার জন্য দানে ঘটিয়াছে বা ঘটিয়াছিল। শিক্ষানুরাগ বাঙালীর এখনও আছে, যদিও শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বেশী হওয়ায় সেই অনুরাগে প্রবল আঘাত লাগিতেছে। কিন্তু শিক্ষানুরাগ সমান থাকিলেও শুধু অনুরাগেই ত শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি হইতে পারে না; তাহার জন্য ব্যয় করিবার সামর্থ্য থাকা চাই। আগেই দেখাইয়াছি, বঙ্গের গবর্নমেন্ট শিক্ষাব্যয়ের নিজ অংশ কমাইতেছেন। ছাত্রদত্ত বেতনের সমষ্টি বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু অভিভাবকদের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতেছে। বঙ্গে দীর্ঘকাল ধরিয়া ধনী ছিলেন জমিদারেরা। ধনী জমিদার কিছু এখনও আছেন। কিন্তু শ্রেণী হিসাবে এখন জমিদাররা ছরবস্থাপন্ন। আগে যে-সব জমিদার শিক্ষার জন্য ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের বংশধরদের সে ব্যয় করিবার ক্ষমতা নাই। বঙ্গের বাণিজ্যও প্রধানতঃ অবাঙালীদের হস্তগত—অনেক ছোট ছোট ব্যবসা পর্যন্ত অবাঙালীদের হাতে গিয়াছে। এই জন্য শিক্ষার নিমিত্ত ব্যয় করিবার ক্ষমতা বঙ্গে বাঙালীদের চেয়ে অন্তান্ত প্রদেশে তথাকার লোকদের বেশী।

এই কারণে দেখিতে পাইতেছি, লোকসংখ্যা হিসাবে বঙ্গে ছাত্রছাত্রীর মোটসংখ্যা অল্প যে-কোন প্রদেশের চেয়ে বেশী হওয়া উচিত হইলেও বস্তুতঃ অল্প প্রত্যেক প্রদেশের চেয়ে বেশী নয়। নীচের তালিকায় তাহা দেখাইতেছি। ইহা ১৯৩২ সালের হিসাব।

প্রদেশ।	মোট ছাত্রছাত্রী	লোকসংখ্যার শতকরা কয় জন।
মাদ্রাজ	২৯,২৪,৮৮২	৬.২৫
বোম্বাই	১৩,৩৫,৫৪৭	৬.১১
বাংলা	২৭,৮৩,২২৫	৫.৫৫
আগ্রা-অযোধ্যা	১৫,১৭,৯৮৮	৩.১৩
পঞ্জাব	১৩,৩৩,৫৬৭	৫.৬১

এই তালিকায় দেখা যাইতেছে, যে, বঙ্গের লোকসংখ্যা অন্য প্রত্যেক প্রদেশের চেয়ে বেশী হইলেও, ইহার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মাদ্রাজের চেয়ে কম। মোট লোকসংখ্যার শতকরা কয় জন কোন-না-কোন শিক্ষালয়ে শিক্ষা পাইতেছে, তাহার হিসাবেও দেখিতে পাই, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও পঞ্জাব বাংলা দেশের চেয়ে অগ্রসর।

ভারতের কোন প্রদেশই উচ্চশিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, বা প্রাথমিক শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার হয় নাই। সুতরাং উচ্চশিক্ষা বা মাধ্যমিক শিক্ষা স্বগিত রাখিয়া বা কমাইয়া প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে আরও মন দেওয়া হউক, আমরা মোটেই এরূপ ইচ্ছা করি না। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা সকল শিক্ষার ভিত্তি বলিয়া উহার যথেষ্ট বিস্তার হইতেছে কি না, তাহা দেখা একান্ত আবশ্যিক। বালিকাদের মধ্যে উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তার সামান্যই হইয়াছে; অধিকাংশ বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। এই জন্ত প্রাথমিক শিক্ষার হিসাবে কেবল বালকদের সংখ্যা দেখাইব। সকল বয়সের ও শিক্ষাশ্রেণীর ছাত্রীদের সংখ্যা একত্র দেখাইব। ১৯৩১-৩২ সালের সংখ্যা দিব।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পাইতেছে মাদ্রাজে ২২,৬৫,৯৬০ জন বালক, বোম্বাইয়ে ৯,৭৫,৮৬৬, বঙ্গ ১৬,৮২,৫০৩, আগ্রা-অযোধ্যায় ১১,৩৬,৬৪৯, পঞ্জাবে ৩,৮৬,৪৭০। প্রাথমিক শিক্ষাতেও মাদ্রাজ অগ্রণী। জনবহুলতম বাংলা অগ্রণী নহে।

নারীরাও মানুষ বলিয়া তাহাদের জ্ঞানলাভ শিক্ষালাভ আবশ্যিক। তত্ত্বিন্ন, বে-পরিবারের গৃহিণী শিক্ষিতা সে-পরিবারে বালকবালিকা সকলকেই শিক্ষা দিবার প্রয়াস থাকে। এই জন্ত কোন প্রদেশ কত অগ্রসর তাহার খবর লইতে হইলে নারীশিক্ষার বিস্তার কোন প্রদেশে কিরূপ হইতেছে তাহা জানা দরকার।

১৯৩২ সালের হিসাবে দেখিতে পাইতেছি বিশ্ববিদ্যালয়

হইতে প্রাথমিক পাঠশালা পর্যন্ত মোট ছাত্রীর সংখ্যা মাদ্রাজে ৭,৪২,৫৩৬, বোম্বাইয়ে ২,৯২,৬৫৮, বঙ্গে ৫,৫৯,৭১২, আগ্রা-অযোধ্যায় ১,৬৭,৬১১, পঞ্জাবে ২,১৩,২৮৭। এক্ষেত্রেও মাদ্রাজ প্রথমস্থানীয়, বাংলা নহে। মোট নারীসংখ্যার শতকরা কয় জন শিক্ষা পাইতেছে, সে-হিসাবে দেখি, মাদ্রাজে শতকরা ৩.১ জন, বোম্বাইয়ে ২.৮, বঙ্গে ২.৩। মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে বঙ্গের চেয়ে পর্দার প্রকোপ কম, এবং ক্রীশিক্ষানুরাগী হিন্দুদের অনুপাত বেশী। তা ছাড়া, এই দুই প্রদেশে সহশিক্ষার চলন বেশী। মাদ্রাজে ছেলের শিক্ষালয়ে শিক্ষা পায় ৩,৭৯,৪৩৪ জন মেয়ে, বোম্বাইয়ে ১,০৫,৮৭৮ জন, এবং বঙ্গে ৯৭,৯২৬ জন।

বঙ্গে মেয়েদের শিক্ষার জন্ত সরকারী বায় অপেক্ষাকৃত কম। ১৯৩২ সালে উহা ছিল মাদ্রাজে ৪৪,৭১,০৯১ টাকা, বোম্বাইয়ে ২৫,৬৩,১১২, বঙ্গে ১৮,০৯,৩২৮, আগ্রা-অযোধ্যায় ১৫,৪৮,৭৭৯, এবং পঞ্জাবে ১৭,৬৭,১২২।

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষায় বঙ্গের স্থান স্থির করিতে হইলে জানিতে হইবে, যে, বঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় দুটির ও কলেজগুলির ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ২৭,৬২৩, মাদ্রাজে ২০,৯৭৬, বোম্বাইয়ে ১৪,৪৯৯ এবং পঞ্জাবে ১৬,৯৭১। শুধু সংখ্যা দেখিয়া মনে হইতে পারে, বাংলা এক্ষেত্রে অগ্রসরতম, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বঙ্গের লোকসংখ্যা বোম্বাইয়ের প্রায় আড়াই গুণ। সুতরাং বোম্বাইয়ের হিসাবে বঙ্গের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মোটামুটি পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হাজার হওয়া উচিত ছিল। পঞ্জাবের লোকসংখ্যা বঙ্গের অধিকের কম। সুতরাং পঞ্জাবের হিসাবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসকলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নূনকল্পে চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার হওয়া উচিত ছিল।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়সকলে ছাত্রসংখ্যা ১৯৩১-৩২ সালে মাদ্রাজে ছিল ২,০৬,৩২২, বোম্বাইয়ে ১,২৪,১৬৭, বঙ্গে ৪,৫১,৬৭২, আগ্রা-অযোধ্যায় ২,১৭,১২০ এবং পঞ্জাবে ৬,৭৯,৫৮০। প্রদেশগুলির প্রত্যেকটির লোকসংখ্যা মনে রাখিলে বুঝা যাইবে, যে, মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও বঙ্গের আরও উন্নতি হওয়া উচিত। পঞ্জাবের হিসাবে আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে চৌদ্দ-পনের লক্ষ ছাত্রছাত্রী হওয়া উচিত।

আমরা তুলনার জন্ত যে-সব সংখ্যা দিয়াছি, তাহার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি সকলকেই ধরা হইয়াছে। সকলের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার হইলে তবে সে দেশ বা প্রদেশকে উন্নত বলা যায়। বঙ্গে হিন্দুরা শিক্ষায় মুসলমানদের চেয়ে কিছু অগ্রসর বলিয়া বাংলা দেশটাই উন্নত, এরূপ মনে করা ভুল।

আমরা আগেই বলিয়াছি, শিক্ষাবিবয়ে বঙ্গের উন্নতি প্রধানতঃ বঙ্গের লোকদের—বিশেষতঃ হিন্দুদের—চেষ্টিয় হইয়াছে। গবন্মেণ্ট শিক্ষার ব্যয়ের নিজের অংশ ক্রমশঃ কমাইতেছেন। গবন্মেণ্ট নিজের দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। কিন্তু গবন্মেণ্ট শিক্ষাদান বিষয়ে নিজের কর্তব্য করুন বা না-করুন, আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য আমাদেরই করিতে হইবে। একা একা বা মাত্র দশ জনের সহিত মিলিত হইয়া আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া সাধানুসারে উচ্চতর শিক্ষালয় স্থাপন ও পরিচালন করিতে পারি। প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষিত পুরুষ ও নারীরা তা শিক্ষাবিস্তারকল্পে অনেক কাজ করিতে পারেনই; যে-সব ছেলেমেয়ে বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ শেষ করিয়াছে, তাহারা পর্যাপ্ত নিরক্ষর ছেলেমেয়ে ও প্রাপ্তবয়স্ক লোকদিগকে অ আ ক খ চিনাইয়া দিতে পারে।

শারদীয় অবকাশে কর্তব্য

শারদীয় অবকাশে হাজার হাজার প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলা এবং হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী নিজদের গ্রামে ও শহরে যাইবেন। তাঁহারা ছুটির আনন্দ উপভোগ করুন। সেই সঙ্গে নিরক্ষর লোকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কিছু চেষ্টা তাঁহারা করিতে পারিলে তাঁহাদের আনন্দ বাড়িবে।

বঙ্গে উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে সরকারী জ্ঞাপনী

বঙ্গে উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য ও মন্তব্য বাংলা-গবন্মেণ্ট প্রেস-অফিসারের মারফৎ খবরের কাগজের সম্পাদকদিগকে জানাইয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে, যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা প্রকার সুবিধা সত্ত্বেও

ছাত্রসংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। ইহা দুঃখের বিষয়। ঢাকায় শিক্ষার ব্যয় কম; অথচ ভাল ভাল অধ্যাপক আছেন, লাইব্রেরী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও গবেষণার বন্দোবস্ত ও সরঞ্জাম বেশ আছে। স্বাস্থ্যও ভাল। আমরা এ-সব কথা ইতিপূর্বে লিখিয়া এই মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, যে, ঢাকায় ছাত্র ও ছাত্রী আরও বেশী হওয়া উচিত। তাহা না হইবার কারণ সম্বন্ধে আমাদের অনুমান এই, যে, অভিভাবকদের আর্থিক অবস্থা ধারাপ হইয়াছে, এবং কতকগুলি ঘটনা ও সরকারী ব্যবস্থার দরুন ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক আশঙ্কা আছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্র্যাডুয়েট বিভাগে ছাত্র বেশ বাড়িয়া আবার যে কমিয়া গিয়াছিল ও ধীরে ধীরে বাড়িতেছে, সরকারী মতে তাহার কারণ আর্থিক ও রাজনৈতিক।

১৯৩২ সালে পোষ্ট-গ্র্যাডুয়েট বিভাগে ছাত্রীসংখ্যা ৫৬ ছিল। তাহা ১৯৩৩ সালে দ্বিগুণ হয়। ইহা সন্তোষের বিষয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজসমূহে ১৯৩২-৩৩ সালে ২০,৩২৩ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে হিন্দু ১৭,০৯০, মুসলমান ২,৮১৮ এবং অত্যাগ ৪১৫ ছিল। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আরও বেশী হওয়া উচিত—বিশেষতঃ মুসলমানদের মধ্যে।

কলেজগুলিতে ১৯২৭ সালে ২২,২৪০ জন ছাত্রছাত্রী ছিল, তাহা কমিয়া ১৯৩২ সালে ১৯,৭৪৪ হয়। সরকারী মতে ইহার প্রধান কারণ কৃষিজাত সামগ্রীর মূল্যহ্রাস ও তজ্জনিত অভিভাবকদের আর্থিক অবস্থার অবনতি।

সরকারী কাগজটিতে বলা হইয়াছে—

“It will be seen, therefore, that, taking all colleges together, more than half the cost of educating a student comes from provincial revenue.”

তাৎপর্য। “অতএব, ইহা দৃষ্ট হইবে, যে, সব কলেজ একত্র লইলে, এক-একটি ছাত্রকে শিক্ষা দিবার ব্যয়ের অর্ধেকেরও বেশী প্রাদেশিক সরকারী রাজস্ব হইতে আসে।”

সরকারী কলেজগুলির ছাত্রসমূহের শিক্ষাব্যয় ১৩,৩৬,০৩২ টাকার দুই-তৃতীয়াংশ—৯,১৬,৯৮৪ টাকা—গবন্মেণ্ট দেন। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজগুলির ছাত্রদের শিক্ষাব্যয় ১২,১১,২৮৭ টাকার মধ্যে ২,১৭,৮০৫ অর্থাৎ প্রায় ষষ্ঠ অংশ গবন্মেণ্ট দেন। বেসরকারী কলেজগুলির

ছাত্রদের শিক্ষাব্যয় ৭,৭৭,৫৬৪ টাকার মধ্যে সরকার কিছু দেন নাই। সব রকম কলেজের সব ছাত্রদের শিক্ষাব্যয়ের মোট পরিমাণ ১৯৩২-৩৩ সালে ছিল ৩৩,২৪,৮৮৩ টাকা। তাহার মধ্যে গবর্নেন্টে দিয়াছেন ১১,৫৫,৪৯১ টাকা এবং ছাত্রেরা বেতন বাবদে দিয়াছে ১৮,৭৫,৪৫৮ টাকা। সুতরাং গবর্নেন্টে অর্ধেকের উপর দিয়াছেন কি প্রকারে, বুঝা গেল না। সরকারী কলেজে অর্ধেকের উপর দিয়াছেন মত, অন্ত কোন কলেজে নহে। এই সমস্ত সংখ্যা সরকারী জ্ঞাপনীতেই আছে।

উপসংহারে এই সরকারী মত প্রকাশ করা হইয়াছে, যে,

“So far as higher education is concerned, Bengal has no reason to be anything but proud of her record.”

তাৎপর্য। “উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে বাংলা দেশ তাহার কৃতিত্বের জন্ত গর্ব অনুভব করিতে পারে।”

“শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গের স্থান” প্রসঙ্গে আমরা দেখাইয়াছি, যে, লোকসংখ্যা ধরিলে, বোম্বাই ও পঞ্জাবে উচ্চশিক্ষার বিস্তার বাংলা দেশ অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। সুতরাং বঙ্গের গর্ভিত হইবার বিন্দুমাত্রও কারণ নাই।

ব্রিটেনে ও বঙ্গে উচ্চশিক্ষা

উচ্চশিক্ষায় ভারতবর্ষের মধ্যেই বঙ্গের কৃতিত্ব সর্বাধিক নহে, তাহা পূর্বে দেখাইয়াছি ও বলিয়াছি। বিলাতের তুলনায়, যে, উহা কত কম, তাহা এখন বাঙালীদিগকে এবং বাংলা-গবর্নেন্টকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যিক।

কারখানায় শিল্পদ্বারা নানাবিধ পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্ত ইংল্যান্ডে নাই বলিলেই চলে, তদ্বিবয়ক উচ্চশিক্ষার কলেজ মোটেই নাই। ইংলণ্ডে, ওয়েল্‌সে ও স্কটল্যাণ্ডে এরূপ স্কুল-কলেজ অনেক আছে। তাহাদের সংখ্যা ও তাহাদের ছাত্রদের সংখ্যা সম্বন্ধে এখন কিছু বলিব না। আমাদের কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন প্রধানতঃ কেতাবী বিদ্যা শিখান হয়, তাহার প্রয়োগ শিখান হয় না, বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়-সকলেও প্রায় সেইরূপ। বিজ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা দ্রব্য উৎপাদন শিখাইবার বন্দোবস্ত বিলাতে আলাদা আছে।

এখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া ও তাহাদের অঙ্গীভূত কলেজগুলিতে কত ছাত্র আছে, এবং বিলাতী ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে কত ছাত্র আছে, তাহা বলিতেছি। তাহার আগে জানান দরকার, যে, বঙ্গের লোকসংখ্যা পাঁচ কোটির উপর, এবং ইংলণ্ড, ওয়েল্‌স ও স্কটল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা ৪,৪৭,৯০,৪৮৫, অর্থাৎ বাংলা দেশের চেয়ে কম।

১৯৩২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহার কলেজগুলিতে ২৭,৬২৩ জন ছাত্রছাত্রী ছিল। উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্রছাত্রী ১৯৩০-৩১ সালে বিলাতে কত ছিল, ১৯৩৪ সালের হাইটেকার্স স্যালম্যান্ডার অনুসারে (পৃষ্ঠা ৪০৫) তাহার হিসাব এই—

ইংলণ্ডের ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে	৩৪,৯৬০
ওয়েল্‌সের ১টি	৩,০৭০
স্কটল্যাণ্ডের ৪টি	১১,৬৫০
১৬	৪৯,৬৮০

অর্থাৎ বঙ্গের চেয়ে কম লোকসংখ্যা বিশিষ্ট ঐ তিনটি দেশে—ব্রিটেনে—বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজসমূহে বঙ্গের প্রায় দ্বিগুণ ছাত্রছাত্রী পড়ে। তা ছাড়া, ব্রিটেনে নানাবিধ শিল্প ও বৃত্তি শিখিবার উচ্চ বহুসংখ্যক শিক্ষালয়ে যত ছাত্রছাত্রী শিক্ষা পায়, বঙ্গে বাহার সমতুল্য কিছু নাই, তাহাদের উল্লেখ করিলাম না।

অতএব, গর্ভিত হইবার মত কিছু বাংলা দেশ ও তাহার গবর্নেন্ট করেন নাই।

সমগ্র ব্রিটিশ-ভারতের সরকারী শিক্ষাব্যয় শুধু লণ্ডনের চেয়ে কম!

সমগ্র ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ২৭,১৭,৮০,১৫১। লণ্ডন কোণ্টী অর্থাৎ লণ্ডন জেলার লোকসংখ্যা ৪৩,৯৬,৮২১। পাঠশালার ছেলেমেয়েরাও জানে, লণ্ডন ইংলণ্ডের ও ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের রাজধানী। এই রাজধানীর আশপাশের কিছু শহরতলী তাহাতে যুক্ত করিয়া একটি কোণ্টী বা জেলা গঠিত হইয়াছে, এবং তাহার শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্পর্কীয় কাজ লণ্ডন কোণ্টী

কৌশিল বা লণ্ডন জেলাবোর্ড দ্বারা নির্বাহিত হয়। তাহার শিক্ষাসম্বন্ধীয় কাজের বিষয়ে ১৯৩৪ সালের হুইটেকাস' র্যালম্যানাকের ৬৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে :—

“The Education service involves an annual expenditure of nearly £ 13,000,000.”

“কৌশিলের শিক্ষাবিষয়ক কাজে বাধিক প্রায় এক কোটি ত্রিশ লক্ষ পৌণ্ড খরচ হয়।”

এই বহির ৬৭৪ পৃষ্ঠায় লণ্ডন কোর্টা কৌশিলের শিক্ষাবিষয়ক ব্যয়ের ঠিক পরিমাণ দেওয়া আছে। তাহা ১,২৭,১৭,৩৫৪ পৌণ্ড। বিলাতী এক পৌণ্ড আমাদের ১৩৫ টাকার সমান। ১,২৭,১৭,৩৫৪ পৌণ্ড আমাদের ১৬,৯৫,৬৪,৭২০ টাকার সমান। তাহা হইলে লণ্ডন জেলা বোর্ড ৪৩,৯৬,৮২১ জন অধিবাসীর শিক্ষার জন্ত প্রায় সতর কোটি টাকা খরচ করেন।

ভারত-গবন্মেণ্টের এডুকেশনাল কমিশনার শ্রী জর্জ এণ্ডার্সন ১৯২৭-৩২ সালের যে পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা-রিপোর্ট লিখিয়াছেন, তাহার দ্বিতীয় ভলুমের ৭১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, যে, ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশের ১৯৩১-৩২ সালের শিক্ষাব্যয়ের বৈ-অংশ গবন্মেণ্ট দেন, তাহার পরিমাণ ১২,৪৬,০৭,০৯৩ টাকা। এই বার কোটি টাকালণ্ডন জেলার যোল কোটির চেয়ে কম। কথা উঠিতে পারে, যে, জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপালিটিসমূহ শিক্ষার জন্ত বাহা ব্যয় করেন, তাহাও সরকারী টাকা এবং তাহাও সরকারী শিক্ষাব্যয় বলিয়া গণিত হওয়া উচিত। তথাস্ত। ব্রিটিশ-ভারতের সমুদয় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডগুলি ২,৮০,০১,৩১৩ টাকা এবং মিউনিসিপালিটিগুলি ১,৫৮,১৭,২২২ টাকা শিক্ষার জন্ত ব্যয় করিয়াছিলেন। এই দুটি টাকা গবন্মেণ্টের টাকার সহিত যোগ করিলে মোট সরকারী শিক্ষাব্যয় হয় ১৬,৮৪,২৫,৬২৮ টাকা। কিন্তু সমগ্র ব্রিটিশ-ভারতের সরকারী শিক্ষাব্যয় এই ১৬,৮৪,২৫,৬২৮ টাকাও লণ্ডন জেলাবোর্ডের শিক্ষাব্যয় ১৬,৯৫,৬৪,৭২০ টাকার চেয়ে কম।

ব্রিটিশ-ভারতের ২৭,১৭,৮০,১৫১ জন অধিবাসীর শিক্ষার নিমিত্ত এদেশে সরকারী ব্যয় যত হয়, বিলাতের একটি জেলাবোর্ড তাহার চুয়াল্লিশ লক্ষ লোকের জন্ত তাহা অপেক্ষা বেশী ব্যয় করেন। এক দিকে সাতাশ কোটি মানুষ, অন্য দিকে চুয়াল্লিশ লক্ষ মানুষ!

বিলাতে শিক্ষার জন্ত যে এত বেশী খরচ হইতে পারে, তাহার কারণ তথাকার লোকেরা ধনী ও স্বশাসক; তাহারা বেশী ট্যাক্স দিতে সমর্থ এবং এই ট্যাক্সের টাকা কিরূপে খরচ হইবে, তাহার চূড়ান্ত নির্দেশ তাহাদের প্রতিনিধিরাই করে। আমাদের দেশে শিক্ষার জন্ত বেশী খরচ হইতে পারে না এই জন্ত, যে, আমরা ধনী ও স্বশাসক নহি; বেশী ট্যাক্স দিতে পারি না এবং যাহা দিই, তাহা কিরূপে ব্যয়িত হইবে তদ্বিষয়ে চূড়ান্ত নির্দেশ করিতে আমরা বা আমাদের প্রতিনিধিরা অসমর্থ। ব্রিটেনের ধনী হইবার একটি কারণ, ভারতবর্ষ অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহার অধিকারে আসিয়াছিল এবং এখনও অধিকারে আছে। যে-দেশ ব্রিটেনের অধিকারে আসা ও থাকি ব্রিটেনের ধনী হইবার একটি কারণ, সে-দেশের নিজেরও ধনী হইবার সম্ভাবনা আছে। এবং পৃথিবীর কোনও দেশের পক্ষেই স্বশাসক হওয়া অসম্ভব নহে। উদ্যোগ ও একাগ্র চেষ্টা থাকিলে আমরা স্বশাসক ও ধনী হইতে পারি, এবং শিক্ষার জন্ত যথেষ্ট ব্যয় নিজেরা করিতে পারি ও গবন্মেণ্ট, মিউনিসিপালিটি ও জেলাবোর্ড প্রভৃতিকে করাইতে পারি।

শিক্ষার উপর এত জোর আমরা দিতেছি এই জন্ত, যে, শিক্ষা ব্যতিরেকে আমরা পৃথিবীর অন্ত সত্য ও বড় জাতিদের সমকক্ষ কখনও হইতে পারিব না। অতএব, আমরা দরিদ্র হইলেও, সুস্থ সবল থাকিবার খরচ ছাড়া অন্য সব খরচ কমাইয়া বা ছাটিয়া দিয়া, শিক্ষাতে অর্থ, সময় ও শক্তি নিয়োগ করা আমাদের কর্তব্য।

নারীহরণাদি অপরাধ বৃদ্ধি

১৯৩৩ সালের বঙ্গীয় পুলিশ রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, যে, ঐ সালে নারীহরণাদি অপরাধ বাড়িয়াছে। ১৯৩২ সালেও যে উহা বাড়িয়াছিল, তাহাও প্রসঙ্গতঃ ঐ রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে। ১৯৩২ সালের পুলিশ রিপোর্টে তাহা লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু সেই সালের বঙ্গীয় শাসন রিপোর্টে প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, যে, ঐরূপ অপরাধ বাড়ে নাই।

১৯৩৩ সালের পুলিশ রিপোর্টের উপর সর্কৌন্সিল গবর্নর বাহাদুরের মন্তব্যে লিখিত হইয়াছে :—

“It is deplorable that offences against women coming under sections 366 and 354 of the Indian Penal Code, again show an increase. There were 52 cases more compared with the figure of the previous year, or an increase of 7.5 per cent. The increase reported in 1932 as compared with 1931 was 94 or 15.7 per cent, so that, though the position is far from satisfactory, the rate of increase has declined.”

তাৎপর্য। “ইহা শোচনীয়, যে, ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৬৬ ও ৩৫৪ ধারা মতে দণ্ডনীয় নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ আবার বাড়িয়াছে। ১৯৩২এর তুলনায় ১৯৩৩ সালে ৫২টা মোকদ্দমা অর্থাৎ শতকরা ৭.৫টা বাড়িয়াছে। ১৯৩১এর তুলনায় ১৯৩২ সালে ৯৪টা অর্থাৎ শতকরা ১৫.৭ বাড়িয়াছিল। অতএব, অবস্থাটা সন্তোষজনক না হইলেও, অপরাধ-বৃদ্ধির হার কমিয়াছে।”

এরূপ অপরাধ দমন সম্বন্ধে সরকারী মন্তব্যে বলা হইয়াছে—

“The matter is one which continues to engage the attention of Government, and the question whether the Whipping Act of 1909 should not be amended so as to make persons convicted of offences against women liable to the punishment of whipping is now under examination. The attention of local officers will be drawn to the necessity of putting down the evil in those districts where the number of cases shows an increase.”

তাৎপর্য। “এই বিষয়টি গবর্নমেন্টের মনোযোগ পাইয়া চলিতেছে। ১৯০৯ সালের বেত্রাঘাত আইন এরূপভাবে সংশোধিত হওয়া উচিত কিনা, যাহাতে নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধীদেরকে বেত্রাঘাত দণ্ড দেওয়া চলে—এই প্রশ্নটি এখন বিবেচিত হইতেছে। যে-সব জেলায় এই অপরাধ বাড়িয়াছে, তথাকার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদেরকে ইহা দমন করিবার দিকে মন দিতে বলা হইবে।”

বঙ্গের অস্থায়ী গবর্নর স্যর জন উড্‌হেড্‌, ঢাকায় পুলিশ-কর্মচারী ও কনেষ্টেবলদিগকে পুরস্কারদানকালে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে বলিয়াছেন—

“There is a particular form of crime to which Sir John Anderson made special reference last year and which still gives cause for anxiety, and that is crime against women. I have noticed with concern that there was an increase in this class of crime during 1933. It is not possible to say how far the increase is real or how far it may be due to a greater readiness on the part of interested parties to report cases of this kind, but it is clear that a remedy is called for. The matter is one which continues to engage the attention of Government and, as has already been announced in the resolution on the working of the Police Department for the year 1933, the question of making offences against women punishable by whipping is under consideration. But, whatever decision is arrived at on that thorny question, there is much that the police can

do to discourage and prevent these despicable crimes. I do not doubt that you are already fully alive to this fact, but it is evident that there is room for improvement and I look to all ranks to co-operate in removing what is rapidly becoming a serious blot on this province.”

তাৎপর্য। “বিশেষ রকমের একটা অপরাধের বিষয় স্যর জন এন্ডারসন গত বৎসর বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন, বাহা এখনও উদ্বেগ জন্মাইতেছে; তাহা নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ। ১৯৩৩ সালে এই শ্রেণীর অপরাধ বাড়িয়াছিল, ইহা আমি উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। এই বৃদ্ধি কতটা প্রকৃত, কতটাই বা ইহা, যাহারা এইরূপ দুর্কর্ম দমনে ইচ্ছুক তাহারা আগেকার চেয়ে তাহার খবর দিতে বেশী প্রস্তুত হইয়াছেন বলিয়া তাহার কল, বলা সম্ভব নহে। কিন্তু ইহা স্পষ্ট, যে, ইহার প্রতিকার চাই। এই বিষয়টিতে গবর্নমেন্ট আগেকার মত মনোযোগ করিতেছেন, এবং, পুলিশ রিপোর্টের উপর সরকারী মন্তব্যে যেমন বলা হইয়াছে, নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধে বেত্রাঘাত দণ্ড দেওয়া হইবে কিনা তাহা বিবেচনাধীন আছে। কিন্তু এই বিষয়সকল প্রশ্নটি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত বাহাই হউক, পুলিশ এরূপ অনেক কিছু করিতে পারে, যাহাতে এই ঘণিত দুর্কর্মসকলের দমন ও নিবারণ হইতে পারে। আমার মনে হইতেছে, যে, আপনাদের ইতিমধ্যেই সচেতন আছেন; কিন্তু ইহাও স্পষ্ট, যে, আপনাদের কর্তব্যসাধনে অনেক উন্নতির অবসর আছে। এবং আমি সর্বশ্রেণীর পুলিশ কর্মচারীর নিকট ইহা আশা করিতেছি, যে, তাহারা, যাহা বঙ্গের একটা গুরুতর কলকে পরিণত হইতে চলিয়াছে, তাহা দূরীকরণে সহযোগিতা করিবেন।”

উড্‌হেড্‌, সাহেব প্রবীণ সিভিলিয়ান। অনেক জেলায় ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করিয়া পুলিশের কার্যকারিতা এবং অবহেলা বা অকর্মণ্যতা দুই দিকই ভাল করিয়া জানেন। তিনি, উপরে উদ্ধৃত বাক্যগুলির শেষের দিকে বাহা ভদ্রভাষায় বলিয়াছেন, তাহার সোজা অর্থ এই, যে, নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ দমনে পুলিশের যাহা কর্তব্য তাহা পূর্ণমাত্রায় সাধিত হয় না, অনেক কিছু করিবার আছে যাহা পুলিশ করে নাই কিন্তু তাহাদের করা উচিত। অবশ্য পুলিশ-বিভাগের উচ্চকাজে নিযুক্ত এমন অনেক লোক আছেন, যাহারা এই শ্রেণীর অপরাধের গুরুত্ব বুঝেন এবং তাহার দমন ও নিবারণ চান। নীচের দিকেও এরূপ কর্মচারী একেবারেই নাই, এমন বলা যায় না। কিন্তু মোটের উপর স্যর জন উড্‌হেডের এ-কথা সত্য, যে, পুলিশের দ্বারা এই-সব দুর্কর্ম দমন ও নিবারণকল্পে বাহা হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই। এখন যদি তাহা হয়, তাহা হইলে মঙ্গল।

“সৌভিন্দী”র সম্পাদক বার্কক্যাসকেও নারীহরণাদি

নিবারণ ও দমনকল্পে বিশেষ পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। এই বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান অনতিক্রান্ত। তিনি লিখিয়াছেন—

পুলিশের সাহায্য না পাইলে নারীহরণ বাঙ্গলাদেশ হইতে কখনও দূর করা যাইবে না। সার জন তাহা জানেন, সুতরাং পুলিশকে এই দুষ্কর্ম নিবারণ বিষয় মনোযোগ দিতে বলিয়াছেন। অনেক সময়ে নিম্নশ্রেণীর পুলিশ নারীহরণ অপরাধ দমন করিতে অবহেলা করে, নারীহরণ যে অপরাধের বিষয়, তাহা দমন করা যে পুলিশের কর্তব্য, তাহাও তাহারা মনে করে না। ভূতপূর্ব পুলিশ-ইনস্পেক্টার জেনারেল মিঃ লোম্যান ও গবর্নর সার জন এণ্ডার্সন প্রভৃতি অনেকে পুলিশকে তাহাদের কর্তব্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন কিন্তু আমরা অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি উচ্চ শ্রেণীর পুলিশ কর্মচারীরা নারীহরণ যেমন গুরুতর অপরাধ বলিয়া মনে করেন, নিম্নশ্রেণীর অনেক কর্মচারী তেমন মনে করেন না। কোন কোন স্থলে থানায় খবর দিতে গেলে পুলিশ এজাহার গ্রহণ না করিয়া অভিযোগকারীদিগকে তাড়াইয়া দেন। সে যাহা হউক, আমরা অতীতের কথা আলোচনা করিতে চাই না। ভবিষ্যতে বাঙ্গলার সমস্ত থানায় পুলিশ নারীহরণ দমনের জন্ত মনোযোগী হইবেন এবং সার জন উডহেড যেমন বাঙ্গলার কলঙ্ক দূর করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, ছোট বড় সকল শ্রেণীর পুলিশ সেইরূপ প্রয়াসী হইবেন। গবর্নমেন্টের নিকট আমাদের অনুরোধ এই, শীঘ্র অপরাধীদিগকে বেত্রদণ্ড দানের ব্যবস্থা করুন। কিন্তু কেবল বেত্রদণ্ড নয়, তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত না করিলে তাহাদের মনে ভয় হইবে না।

অপরাধীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করাও যে উচিত, আমরাও তাহা আগে আগে লিখিয়াছি। অনেক সময় অপহৃত নারীকে গোপনে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, গৃহ হইতে গৃহান্তরে লইয়া রাখা হয়। বাহারা এইরূপে বদমায়েসদের সহায় হইয়া অপহৃত নারীকে নিজ নিজ গৃহে লুকাইয়া রাখিতে দেয়, তাহাদেরও শাস্তির ব্যবস্থা হওয়া উচিত, ইহাও আমরা অনেক বার লিখিয়াছি।

এক সময়ে অষ্ট্রেলিয়ায় দলবদ্ধ ভাবে নারীহরণ ও নারীধর্ষণের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় তথাকার গবর্নমেন্ট অপরাধীদের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। তাহাতে এই অপরাধ বন্ধ হইয়া যায়। কলিকাতা হাইকোর্টের পরলোকগত জজ সৈয়দ আমীর আলী এদেশেও দলবদ্ধ ভাবে নারীর উপর অত্যাচারের জন্ত প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা চাহিয়াছিলেন। আমরা সাধারণতঃ প্রাণদণ্ডের পক্ষপাতী নহি। কিন্তু এইরূপ অপরাধে যাবজ্জীবন নির্দাসন দণ্ড নিশ্চয়ই হওয়া উচিত।

—

নারীনিগ্রহের প্রতিকারে সামাজিক কর্তব্য

নারীদের উপর অত্যাচার দমন ও নিবারণের জন্ত

গবর্নমেন্ট কি করিতে পারেন, তাহার আলোচনা রাজপুরুষেরা করিয়াছেন, গবর্নমেন্টের প্রধান ব্যক্তি বক্তৃতায় ও পুলিশ রিপোর্টের উপর মস্তব্য করিয়াছেন। এই আলোচনায় প্রধানতঃ পুলিশ কি করিতে পারে এবং অপরাধীদের শাস্তি কিরূপ হওয়া উচিত, তাহাই আলোচিত হইয়াছে। গবর্নমেন্টের এবং সর্বসাধারণের আর এক দিকেও কর্তব্য আছে। নারীদিগকে আত্মরক্ষায় সমর্থ করিবার চেষ্টা যত করা যাইবে, এই কর্তব্য ততই সাধিত হইবে।

অনেক স্থলে দেখা যায়, কোন বালিকা হয়ত খণ্ডরালয়ে উৎপীড়িতা, তাহাকে পিতৃগৃহে লইয়া যাইবার লোভ দেখাইয়া ছুর্ত্ত লোকেরা তাহাকে খণ্ডরালয় হইতে লইয়া যায় এবং তাহার উপর অত্যাচার করে। কখনও বা কোনও বধূকে ছুর্ত্ত লোকেরা এই মিথ্যা সংবাদ দেয়, যে, তাহার পিতা, মাতা, বা অন্য স্বজন পীড়িত, এবং তাঁহার সহিত দেখা করিতে লইয়া যাইবার ছলে তাহার সর্বনাশ করে। শিক্ষিতা বালিকা বা মহিলাকে এই প্রকারে ঠকান সহজ হয় না। সুতরাং নারীশিক্ষার বিস্তার এইরূপ প্রতারণা ও প্রতারণার দ্বারা অত্যাচারের একটা প্রতিকার। যেখানে অন্তঃপুরে বধূদের উপর অত্যাচার হয়, সেখানে পিতৃগৃহে লইয়া যাইবার ছল চলে। অতএব সমাজের এরূপ সংশোধন ও সংস্কার আবশ্যক যাহাতে অন্তঃপুরে বধূদের উপর অত্যাচার না হয়। বিবাহে বরপক্ষ বাঞ্ছিত বরপণ ও যৌতুক না পাইলে অনেক সময় বধুর উপর অত্যাচার করে। বিবাহ সম্বন্ধে নীচ ধারণা থাকায় এবং কতকটা আর্থিক কারণে এইরূপ অত্যাচার হয়। এ-বিষয়ে লোকমতের উন্নতিসাধন আবশ্যক।

বালিকা ও তরুণী বিধবাদিগকে প্রেমের প্রলোভন দেখাইয়া পরে ছুর্ত্তেরা তাহাদের উপর অত্যাচার করে। বাল্যবৈধব্য ঘটতে পারে না যদি বাল্যবিবাহ না থাকে। অতএব বাল্যবৈধব্যের প্রতিকার দ্বিবিধ—বাল্যবিবাহ বন্ধ করা এবং যাহাদের বাল্যে বিবাহ ও পরে অল্পবয়সেই বৈধব্য ঘটিয়াছে, তাহাদের পুনর্বার বিবাহ দেওয়া। বালিকা ও তরুণী বিধবাদের বিবাহ আগেকার চেয়ে বেশী প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার আরও অধিক প্রচলন দরকার।

অনেক স্থলে কোন প্রকার প্রলোভন না দেখাইয়া, কোন রকম ছল প্রতারণা না-করিয়া বলপূর্বক বাড়ির বাহিরে বা বাড়ির মধ্য হইতে হরণ করিয়া কুমারী, সধবা ও বিধবাদের উপর দুর্বৃত্ত লোকে অত্যাচার করে। এসকল স্থলে, যদি আত্মীয়-স্বজন বা অন্ত লোক কেহ থাকেন, তাঁহাদের সংখ্যা খুব কম হইলেও দুর্বৃত্তদের কাজে বাধা দেওয়া উচিত। তাঁহাদের সংখ্যা ও শক্তি যথেষ্ট হইলে দুট লোকেরা পরাক্রান্ত ও হত হইবে। যথেষ্ট না-হইলে হয়ত তাঁহারা আহত বা হতও হইতে পারেন। এরূপ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বদম্যাসদের কাজে বাধা দেওয়া উচিত। এই কর্তব্যবোধ মুসলমান সমাজে ও হিন্দু সমাজে সর্বত্র জাগ্রত হওয়া আবশ্যিক। যে-যে গ্রামে ও শহরে এরূপ দুর্বৃত্ত লোক আছে বলিয়া জানা যাইবে বা সন্দেহ হইবে, সেখানেই নারীরক্ষক দল গঠিত হওয়া কর্তব্য।

দুর্বৃত্তদের দুর্কর্মে বাধা দিবার লোক থাকিলে যদি তাঁহারা হত বা আহত ও অক্ষম হন, কিংবা যদি সেরূপ লোক না-থাকেন, কিংবা অন্ত যে-কোন অবস্থায়, নারীর উপর অত্যাচারের উপক্রম হইলেই, তিনি যাহাতে প্রাণপণে তাহাতে বাধা দিতে পারেন, সামাজিক মতের দ্বারা ও শিক্ষার দ্বারা নারীদের মনে তদনুরূপ যথেষ্ট সাহস ও শক্তি উৎপাদনের চেষ্টা করা আবশ্যিক, এবং তাঁহাদের শরীরও পটু করিয়া তাঁহাদিগকে আত্মরক্ষার্থ অন্তব্যবহারে দক্ষ ও অভ্যস্ত করা উচিত। অন্ত ও সর্বদা তাঁহাদের কাছে থাকা চাই। এ-সব কথা নিতান্ত পুরাতন, নূতন নয়। কিন্তু পুরাতন কথা পুনঃপুনঃ স্মরণ করিবার প্রয়োজন আছে।

অন্তঃপুরে বা বাহিরে, সম্পর্কিত লোক বা নিঃসম্পর্ক লোক যাহারা নারীদের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করে, তাহাদের বিরুদ্ধে জনমত খুব প্রবল হওয়া উচিত। দুট লোকেরা ধনী ও পদমর্যাদাবিশিষ্ট হইলে তাহাদের সামাজিক শাসন হয় না। ইহা নিতান্ত লজ্জার বিষয়।

নারীরক্ষাবিষয়ে হিন্দুসমাজের কতকগুলি লোক ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে (অর্থাৎ সভা সমিতি আদি গঠন করিয়া) উদ্যোগী হইয়াছেন। আরও অধিক লোকের উদ্যোগী হওয়া উচিত। নারীরক্ষাকল্পে যে-কয়টি সভাসমিতি গঠিত হইয়াছে, অর্থাভাবে তাঁহারা

যথেষ্ট কাজ করিতে পারেন না। আমরা তাঁহাদিগকে অর্থ-সাহায্য করি না। ইহা গুরুতর ত্রুটি।

মুসলমান সমাজের কেহ কেহ ব্যক্তিগত ভাবে নারীরক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইয়াছে, কেহ কেহ নিজেকে বিপন্ন করিয়াও নারীরক্ষা করিয়াছেন, এরূপ সত্য সংবাদ খবরের কাগজে পড়িয়া প্রীত হইয়াছি, এবং এই সংলোকগুলির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা অনুভব করিয়াছি। যে-সব বিপন্ন বা অক্রান্ত নারীর সাহায্য ইহারা করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে হিন্দুনারী। ইহাতে আরও স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, যে, তাঁহারা নারী বলিয়াই নারীকে সম্মান করিতে, বিপন্ন মাতৃষের সাহায্য বিপন্ন বলিয়াই করিতে জানেন।

সমষ্টিগতভাবে অর্থাৎ সভাসমিতি গঠন করিয়া মুসলমান সমাজের লোকেরা এ-বিষয়ে কোন কর্তব্য করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। যদি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কেহ আমাদের অজ্ঞতা দূর করিলে উপকৃত হইব।

একবার একটি মুসলমান কাগজে পড়িয়াছিলাম, যে, মুসলমান সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকায় এবং নারীহরণাদি না-হওয়ায় বা খুব কম হওয়ায় এ-বিষয়ে কিছু করিবার প্রয়োজন সে-সমাজে অনুভূত হয় নাই। কিন্তু সরকারী বিবরণে যে-সব সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায়, অত্যাচারিতা নারীদের মধ্যে মুসলমান নারীর সংখ্যাই অধিক। অতএব, যদি সাম্প্রদায়িক ভাবেই এ-বিষয়টির আলোচনা করা যায়, তাহা হইলেও মুসলমানদের সমষ্টিগতভাবে, দলবদ্ধভাবে, কিছু করা উচিত। হিন্দুসমাজে, সকলের দ্বারা অনুমৃত ও পালিত না-হইলেও, যেমন “যত্র নারীস্ব পূজ্যস্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ,” “যেখানে নারীরা পূজিত হন সেখানে দেবতারা আনন্দ পান,” এই বাক্য প্রচলিত আছে, তেমনি মুসলমান সমাজে, “স্বর্গ জননীর পদতলে” বা এতরূপ বাক্য শুনিতে পাওয়া যায়।

আমরা মুসলমান সমাজে শিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যেই নারীরক্ষার বিষয়ে অগ্রণীষ দেখিবার আশা করি।

হিন্দুসমাজ সভাসমিতি গঠন করিয়াছেন বলিয়া বলিয়াছি, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের লোকদিগকেও ধরিয়াছি। যে নারীরক্ষাসমিতির প্রধান কর্মী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র,

তাহা হিন্দুমুসলমান-নির্বিশেষে সকল অত্যাচারিতা নারীর সহায় হইয়া থাকেন।

আগে অত্যাচারিতা হিন্দুনারীদের স্থান হিন্দুসমাজে প্রায়ই হইত না। এখন অনেক স্থলে স্থান হয়। সব স্থলে হয় কিনা বলিতে পারি না। সব স্থলেই হওয়া উচিত ও আবশ্যিক।

উপরে প্রসঙ্গতঃ নারীর উপর অত্যাচারের কারণ যে প্রধানতঃ দুর্বৃত্ত লোকদের পাশব দুশ্চরিত্তি তাহা পরোক্ষভাবে বলা হইয়াছে। তা ছাড়া, অন্য কারণও আছে। পৃথিবীর সব মহাদেশের বিস্তর দেশে পাপ-বাবসা চালাইবার জন্য অনেক বালিকা ও তরুণীকে ছলে-বলে-কৌশলে সংগ্রহ করা হয়। ভারতবর্ষে এবং বাংলা দেশেও হয়। বঙ্গে অপহৃত্তা অনেক নারীর ঘে আর কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না, তাহার কারণ, হয় তাহাদিগকে কোন দুর্বৃত্ত লুকাইয়া রাখিয়াছে, কিংবা সামাজিক পাপের দালালদের কাছে দূরে বিক্রী করিয়াছে, কিংবা প্রাণবধ করিয়াছে। বালিকা ও তরুণীদিগকে পাপবাবসার জন্য পণ্যদ্রব্যের মত ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধে লীগ অব নেশনসের বিস্তৃত রিপোর্ট আছে। ইহা দমন করিবার চেষ্টা নানা দেশে হইতেছে। আমাদের দেশে একবারেই হইতেছে না, এমন নহে। ভারতের মহিলাদেরও দৃষ্টি এদিকে পড়িয়াছে।

কোন কোন নারীহরণের আর একটি উদ্দেশ্য, ধর্মাস্তর গ্রহণ করাইয়া সেই ধর্মসম্প্রদায়ের সংখ্যাবৃদ্ধি বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

বোধনা-নিকেতন

মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে স্থাপিত বোধনা-নিকেতনের নাম প্রবাসীর পাঠকেরা জানেন। ইহা জড়বুদ্ধি ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য যাহা করিতে চায়, তাহা পূর্বে পূর্বে প্রবাসীতে লিখিত হইয়াছিল। ইহার দ্বিতীয় বার্ষিক রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। তাহা সচিত্র এবং ইংরেজীতে লিখিত। বাঙালী ছাত্র ভিন্ন বাংলা দেশের বাহির হইতে অবাঙালী দুটি ছাত্র এখানে ভর্তি হইয়াছে। ইহাতে যে-কাজ আরক হইয়াছে, তাহার প্রয়োজনীয়তা এবং কাজ

কিরূপ চলিতেছে, তাহা যাহারা জানিতে চান, তাহারা ইহা পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। বঙ্গের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর বটমলী সাহেব ইহা দেখিয়া কি বলিয়াছিলেন, স্টেট্‌সম্যান কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগের অগ্রতম কর্মচারী অধ্যাপক ওআর্ড্‌সোআর্থ ইহা দেখিয়া কি লিখিয়াছেন, এবং এইরূপ অগ্রতম লোকদের মত এই রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে। ছাত্রদের কিরূপ উন্নতি হইতেছে, চিত্রের দ্বারা বুঝান হইয়াছে। যাহাদের বাড়িতে জড়বুদ্ধি ছেলেমেয়ে আছে, তাহাদের এই রিপোর্টটি দেখা উচিত। জনহিতৈষী অগ্র লোকদেরও ইহা দ্রষ্টব্য। ৩৫ বিজয় মুখ্যো গলি, ভবানীপুর, কলিকাতা, এই ঠিকানায় ইহা সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট বিনামূল্যে পাওয়া যায়। যাহারা ইহা ডাকে লইতে চান তাহারা তাহাকে পাঁচ পয়সার ডাক-স্ট্যাম্প পাঠাইবেন। এই প্রতিষ্ঠানটির খুব অর্থের প্রয়োজন, এবং ইহা সাহায্যের যোগা। যাহারা সাহায্য করিতে চান, তাহারা টাকাকড়ি গিরিজাভূষণ বাবুর নামে পাঠাইবেন।

শ্রীযুক্ত জলধর সেনের সম্বন্ধনা

শ্রীযুক্ত জলধর সেন প্রথমতঃ হিমালয়ে ভ্রমণের বৃত্তান্ত লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আমরা যখন তাঁহার ভ্রমণকাহিনীর কথা, “চড়াই উৎরাই” প্রভৃতির কথা, আগ্রহের সহিত “সাহিত্যে” পড়িতাম, সেদিন এখনও মনে পড়ে। পরে তিনি অগ্রতম রচনার দ্বারা ধ্যাতিলাভ করেন। সম্পাদকের কাজও তিনি বহু বৎসর করিতেছেন। তাঁহার পঁচাত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ায় বধ্যাযোগ্যভাবে তাঁহার সম্বন্ধনা করা হইয়াছে। ইহা ঠিকই হইয়াছে। গবর্নেন্টও তাঁহার সমাদর করিতে ক্রটি করেন নাই— তাঁহাকে রায়-বাহাদুর খেতাব দিয়াছেন।

মিস্ মেয়োর আবার ভারত-ভ্রমণ ?

কেহ কেহ খবর পাইয়াছেন, কুবিখ্যাতা মিস্ মেয়ো আবার ভারতভ্রমণ করিতে আসিতেছে। তাহার আগেকার দুটি কীর্তি আছে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের লোকেরা ৩৫।৩৬ বৎসর আগে আমেরিকানদের অধীন হয়। তদবধি তাহারা স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছে।

আমেরিকার কতক লোক তাহাদের এই চেষ্টার বিরোধী, কারণ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকার অধীন থাকিলে তাহারা ধনী হইতে পারে। মিস্ মেয়ো এই দ্বীপপুঞ্জিতে বেড়াইয়া এক খানা বহি লিখিয়া দেখায়, যে, তথাকার লোকেরা হয় ও স্বাধীনতার অযোগ্য, যদিও সত্য কথা তাহা নহে। বাহা হউক, এই ভাড়াটিয়া লেখিকার লেখা সশ্বেও আমেরিকার ব্যবস্থাপক সভায় ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতার অনুকূল আইন পাস হইয়া গিয়াছে। কারণ, আমেরিকার অধিকাংশ লোক—কতক লোক তাহাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্ত এবং কতক লোক খাঁটি নরহিতৈষণা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা বশতঃ—এখন ফিলিপিনোদের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে।

মিস্ মেয়ো দ্বিতীয় কীর্তি ভারত-ভ্রমণের পর “মাদার ইণ্ডিয়া” (“ভারত জননী”) নামক পুস্তক রচনা। ইহাতে ভারতীয়দের প্রাচীন ও আধুনিক বহু কুৎসা আছে। এরূপ বহি লিখিবার কারণ, কয়েক বৎসর হইতে ভারতীয়দের স্বরাজ্যলাভ আন্দোলন প্রবল হইয়াছিল এবং ইংলণ্ডের অল্পসংখ্যক লোক ভারতবর্ষকে স্বরাজ্য দিতে চায় এই রকম একটা আভাস রচিত হইয়াছিল; কিন্তু অগণিত ইংরেজ ভারতবর্ষের স্বরাজ্যলাভের বিরোধী ছিল এবং এখনও আছে। পরোক্ষ প্রমাণ হইতে ইহা অনুমিত হইয়াছে, যে, মিস্ মেয়ো ইহাদের চর রূপে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল ও “মাদার ইণ্ডিয়া” লিখিয়াছিল। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে ইহার খুব কাট্টি হইয়াছিল এবং ইহা ক্রেঞ্চ জার্মান প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। এ-দেশের অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু এবং তাহারাই প্রধানতঃ স্বরাজ্যলাভের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। এই জন্ত মিস্ মেয়ো বিশেষ করিয়া তাহাদেরই দোষোদ্ঘাটন করিয়াছে। কোন দেশের কোন জাতিই নিখুঁত নয়—আমরাও নই। কিন্তু অবিমিশ্র দোষের আকরও কোন জাতি নয়। বাহা হউক, মিস্ মেয়ো বহি পড়িয়া অনেক ইংরেজ ও অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতির লোকদের ধারণা হইয়াছে, যে, ভারতীয়েরা—বিশেষতঃ হিন্দুরা—অতি অধম জাতি এবং স্বরাজ্যের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

শ্বেতপত্র অর্থাৎ হোয়াইট পেপারে এবং সম্ভবতঃ তদপেক্ষাও নিকট অদূর ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য জয়েন্ট প্যারলিমেন্টারী কমিটির রিপোর্টে ত ভারতবর্ষকে স্বরাজ্য দিবার কোন আভাস নাই। সুতরাং তাহাতে বাধা দিবারও কোন প্রয়োজন নাই। অতএব, মিস্ মেয়ো বহি আবার বহি লিখাইয়া ভারতীয়দিগকে হয় ও স্বরাজ্যের অযোগ্য বলিয়া পুনর্বার প্রমাণ করিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে না। অথবা, একটা প্রয়োজন থাকিতেও পারে। জয়েন্ট প্যারলিমেন্টারী কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর একবার, এবং তদনুসারে প্যারলিমেন্টে ভারত-শাসন আইনের খসড়া উপস্থাপিত হইবার পর আর একবার ভারতীয়দের পক্ষ হইতে তাহাদিগকে স্বরাজ্য দেওয়া হইল না বলিয়া আন্দোলন হইতে পারে। এই দুই সময় ইংলণ্ডের কতিপয় ভারত-স্বরাজ্য-পক্ষপাতীকে এবং ইংলণ্ডের বাহিরের ভারত-স্বরাজ্যের পক্ষপাতী লোকদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক হইতে পারে, যে, ভারতীয়েরা অতি অধম, মনুষ্য নামের অযোগ্য।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র-সচিব বলিয়াছেন, মিস্ মেয়ো পক্ষ হইতে ভারতবর্ষে আসিবার কোন অনুমতির দরখাস্ত গবন্মেণ্ট পান নাই। কিন্তু দরখাস্ত আসিলে তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইবে কি না, তাহা তিনি বলেন নাই। তিনি খবরের কাগজে পড়িয়া থাকিবেন, যে, কয়েক দিন পূর্বে নোবেল-প্রাইজ-প্রাপ্ত আমেরিকান ঔপন্যাসিক সিন্‌ক্লেয়ার লুইসের পত্নীকে জার্মেনী হইতে চলিয়া যাইবার আদেশ হইয়াছে, যেহেতু জার্মান কর্তৃপক্ষের ধারণা, তিনি সাংবাদিকরূপে খবরের কাগজে জার্মেনীর নিন্দা রটাইতেছিলেন। ভারতবর্ষ জার্মেনীর মত স্বাধীন দেশ হইলে মিস্ মেয়ো প্রতি কি ব্যবস্থা হইত, সিন্‌ক্লেয়ার লুইসের পত্নীর প্রতি জার্মেনদের আদেশ হইতে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। নোবেল-প্রাইজপ্রাপ্ত লেখকের পত্নী মিস্ মেয়ো মত যে-সে লোক নহেন।

অথচ তাহার গত বারের ভারতভ্রমণের সময় এই স্ত্রীলোককে গবন্মেণ্ট প্রাসাদে থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল

এবং গবর্নেন্টের লোকদের ও সরকারী কাগজপত্রের সাহায্য সে পাইয়াছিল। বঙ্গে তখন লর্ড লিটন লার্ডসাহেব ছিলেন। তাঁহার প্রাসাদ হইতে এক জন ইংরেজ কর্মচারী মিস্ মেয়োর কোন কোন স্থান দর্শন করিবার সুবিধা করিয়া দিবার নিমিত্ত ব্যক্তিবিশেষকে যে চিঠি লেখা হইয়াছিল, আমরা মডার্ন রিভিউ ও প্রবাসীতে তাহার ফোটোগ্রাফিক নকল ছাপিয়াছিলাম। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি বলিয়াছেন, ভ্রমণকারীদিগকে বে-সব সুবিধা দেওয়া হয়, মিস্ মেয়োর জন্ত তার বেশী কিছু করা হয় নাই। সব বা অধিকাংশ বিদেশী ভ্রমণকারীকে কি গবর্নেন্ট প্রাসাদে রাখা হয় এবং সরকারী উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা কি তাহাদের ভ্রমণ দর্শন প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া দেন?

মিস্ মেয়ো আমাদের কুৎসা করিলেই আমরা ছোট হইয়া বাইব না। প্রকৃত ছোট বা বড় হওয়া আমাদের নিজের হাতে। কিন্তু আমাদের প্রদত্ত টাকায় পরোক্ষ সাহায্যে আমাদের অপমান হয়, ইহা আমরা চাই না। পরোক্ষ সাহায্য বলিতেছি এই জন্ত, যে, গবর্নেন্ট প্রাসাদ ও অন্ত সমুদয় সরকারী বাড়ি ভারতবর্ষের টাকায় নিম্নিত হইয়াছিল ও রক্ষিত হইতেছে এবং এদেশের উচ্চতম হইতে নিম্নতম সরকারী কর্মচারী ভারতবর্ষের টাকা হইতে বেতন পান; ভারতীয়েরা চায় না, যে, তাহাদের প্রদত্ত টাকায় নিম্নিত ও রক্ষিত বাড়িতে আশ্রয় পাইয়া তাহাদের বেতনভোগী লোকদের সাহায্যে তাহাদের মিথ্যা কুৎসা প্রচারিত হয়।

শরৎচন্দ্র চৌধুরী

সাতাশী বৎসর বয়সে ময়মনসিংহের শরৎচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুতে ময়মনসিংহের শিক্ষিত সমাজের প্রাচীনতম ব্যক্তির তিরোভাব ঘটিল। তিনি গত কয়েক বৎসর বার্লিনে বসতঃ অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। যখন সামর্থ্য ছিল, তখন নানা সমাজহিতকর কার্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। বিদ্যালয়পাঠ্য কয়েকখানি ভাল বহি তিনি লিখিয়াছিলেন। ময়মনসিংহে তিনি একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাহা বর্তমান বিদ্যাময়ী বালিকা-বিদ্যালয়ের সূত্রপাত করে। তিনি স্বাধীনচিত্ততা ও উদার ক্ষয়ের জন্ত পরিচিত ছিলেন।

বৈপ্লবিক অপরাধের হ্রাস

১৯৩৩ সালের বঙ্গীয় পুলিশ রিপোর্ট ও তাহার উপর সর্কৌলিল গবর্নর বাহাদুরের মন্তব্য এবং ঐ সালের

কলিকাতার পুলিশ রিপোর্ট ও তাহার উপর সর্কৌলিল গবর্নর বাহাদুরের মন্তব্য দেখিলাম, যে, বঙ্গে বৈপ্লবিক অপরাধ ঐ বৎসর আগেকার চেয়ে অনেক কমিয়াছে।

বঙ্গীয় পুলিশ রিপোর্টের উপর গবর্নেন্টের মন্তব্য আছে—

“Excluding cases that occurred within the jurisdiction of the Calcutta Police, there were 41 outrages and other crimes committed in Bengal by terrorists against 74 in the previous year.”

“কলিকাতা পুলিশের এলাকার মধ্যে যাহা ঘটে তাহা বাদে সন্যাসকরা এ বৎসর ৪১টা অপরাধ করে, পূর্ব বৎসর ৭৪টা করিয়াছিল।”

কলিকাতা পুলিশ রিপোর্টের উপর গবর্নেন্টের মন্তব্য আছে—

“The year under review was one of notable success against terrorist organizations.”

“এই বৎসর সন্যাসকদলসমূহের বিরুদ্ধে সাকল্যের বিশেষ একটি বৎসর।”

এই প্রকারে কমিয়া বঙ্গে বর্তমান হিংসামূলক বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ লোপ পাইলে নানা দিক দিয়া দেশ লাভবান হইবে। এইরূপ কাজের দ্বারা দেশের স্বাধীনতালাভের বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নাই। অথচ এইরূপ কাজ করিতে গিয়া অনেক বালক ও যুবক নরহত্যা ও ডাকাতি করিতেছে, এবং প্রাণদণ্ডে, কারাদণ্ডে, ও নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে। ইহাতে অন্নের প্রাণ ও সম্পত্তি নষ্ট হইতেছে, তাহাদের নিজের জীবনও ব্যর্থ হইতেছে। অধিকন্তু, বিস্তর লোক সন্দেহভাজন হইয়া নানা দুঃখ ভোগ করিতেছে। আর একটি ক্ষতি এই হইতেছে, যে, বঙ্গের অর্থশক্তি প্রাদেশিক রাজস্বের বৃহৎ একটি অংশ হিংসামূলক বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা দমনে নিযুক্ত পুলিশ কর্মচারীদের বেতনাদি বাবতে ব্যয়িত হইতেছে। এই প্রচেষ্টা লুপ্ত হইলে এই টাকা শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যোন্নতি, কৃষিশিল্পবাণিজ্যের উন্নতি প্রভৃতি কার্যে ব্যয়িত হইবার অন্ততঃ সম্ভাবনা ঘটে, কিন্তু এই প্রচেষ্টা থাকিতে সে সম্ভাবনাও নাই।

বাঞ্ছনীয় রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও

আর্থিক অবস্থা

পুলিস এবং সৈন্যদলের শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে প্রযুক্ত হইলে বর্তমান হিংসামূলক বৈপ্লবিক সন্যাসক কার্যাবলীর সম্পূর্ণ বিলোপ সাধিত হইতে পারিবে, এইরূপ ধারণা

আমাদের থাকায় আমরা ইতিপূর্বে একাধিক বার তাহা প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু আমরা ইহা অপেক্ষা বেশী কিছু, আরও কিছু, চাই। আমরা চাই, দেশের একরূপ রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, এবং আর্থিক ব্যবস্থা ও অবস্থা যাহা থাকায় কৈশোর ও যৌবনে উপনীত ব্যক্তির হিংসামূলক কার্য করিতে প্ররোচিতও হইবে না। একরূপ অবস্থা একদিনে আনিয়া যায় না। তাহার জন্য সময় চাই, বুদ্ধিমত্তা সহকারে পরিশ্রম করা চাই। সেরূপ পরিশ্রম করিতে হইলে সাফল্যের আশাও চাই।

সম্ভাসক প্রচেষ্টার একটা প্রধান কারণ নৈরাশ্র। গবর্নেন্ট সরকারী ব্যবস্থা ও কার্য দ্বারা এই আশার উদ্বেক করুন, যে, দেশের যুবা বয়সের লোকদের সমুদয় শক্তি ও পৌরুষ অহিংসার পথ দিয়াই উপযুক্ত কার্যক্ষেত্র পাইবে যেমন অল্প সব সভ্যদেশের ঐ বয়সের লোকেরা পাইয়া থাকে।

জামশেদপুরে বাঙালী

ইহা সত্য নহে, যে, জামশেদপুরে লোহা-ইস্পাতের কারখানা ও তৎসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে বাঙালীর অতি-বাহুল্য ঘটিয়াছে, যদিও রাষ্ট্রপরিষদের (কৌন্সিল অব স্টেটের) এক জন মুসলমান সদস্য দিল্লীতে এই মন্ত্রের পুস্তিকা বিতরণ করিয়াছেন, যে, জামশেদপুরে বাঙালীরাই একচেটিয়া প্রাধান্ত স্থাপন করিয়াছে। কেমন করিয়া করিবে? কারখানাটার মালিক, উহার অধিকাংশ অংশের মালিক, বাঙালীরা নহে। বেশীর ভাগ অংশ বোম্বাই-ওয়ালাদের। প্রধান ম্যানেজার বাঙালী নহেন, আমেরিকান। সুতরাং বাঙালীরা যত কাজ সেখানে পাইয়াছে, তাহা যোগ্যতার জোরে আর, অধিকাংশ কাজ যদি বাঙালীরা পাইত, তাহাতেই বা অন্তায় কি হইত? রাজনৈতিক কারণে জামশেদপুর এখন বিহারের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়া থাকিলেও উহা বঙ্গের অংশ। বঙ্গেও বাঙালীর প্রাধান্ত কোন দিকেই থাকি কি অন্তায়?

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের লোহার খনি হইতে লোহা আনিয়া এই কারখানা চলে। খনি আবিষ্কার করেন স্বর্গীয় প্রমথনাথ বসু। স্বর্গীয় জামশেদজি টাটা কারখানা অন্তর্গত স্থাপন করিতে চান। বসু মহাশয় তাঁহাকে তথ্য ও যুক্তি সহকারে বুঝাইতে সমর্থ হন, যে, বর্তমান জামশেদপুরেই উহা স্থাপন করা সমীচীন হইবে। জামশেদজি টাটা মহাশয় প্রমথবাবুর পরামর্শ অনুসারে কাজ করেন। স্থানটি অরণ্যাবৃত ও খাপদসম্বুল ছিল। তখন কারখানার কাজে অভিজ্ঞ শিক্ষিত লোকও ভারতবর্ষে এখনকার চেয়ে কম ছিল। সেই

সময়ে বেঙ্গল টেক্সটাইল ইন্সটিটিউটের শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েক জন বাঙালী যুবক ইহাতে কাজ করিতে যান।

গোড়া হইতেই, গোড়ার পূর্ব হইতেই, এই কারখানার সম্মে বাঙালীদের যোগ রহিয়াছে।

বাঙালীর প্রতি ঈর্ষ্যা-বিষেধ খুব বিস্তার লাভ করিতেছে। যাহারা ঈর্ষ্যা করে, বিষেধ করে, তাহাদের পক্ষে ইহা ভাল নয়; ভারতীয় মহাজাতি গঠনের পক্ষেও ইহা ভাল নয়।

আমরা যদি বলি, বঙ্গের বাণিজ্যে বাঙালীর স্থান এখন অতি সামান্য; উত্তরে শুনিতে পাই, তোমরা অযোগ্য বলিয়াই যোগ্যতর লোকদের দ্বারা ঐ ক্ষেত্র হইতে তাড়িত হইয়াছ। আমরা যদি বলি, বঙ্গের বাণিজ্যে প্রধান স্থান বাঙালীর নাই; উত্তরে বলা হয়, তোমাদের যোগ্যতা না-থাকায় তোমরা উহা দখল করিতে পার নাই। আমরা যদি বলি, বঙ্গের প্রধান পণ্যশিল্প পাটের কারখানায় বাঙালীর স্থান নগণ্য; উত্তর পাই পূর্ববৎ। যদি বলি, সৈন্সদলে বাঙালীর স্থান নাই; উত্তর পাই, তোমরা অযোগ্য।

এই সমস্ত উত্তর সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও ইহা স্বীকার করা যায় না, যে, বাঙালী কোনও কাজেরই যোগ্য নহে, কোনও দিকেই তাহার যোগ্যতা নাই। সুতরাং জামশেদপুরে যতগুলি বাঙালী কাজ পাইয়াছে, তাহারা অযোগ্যতার জোরেই বা অযোগ্যতা সত্ত্বেও কাজ পাইয়াছে, ইহাও স্বীকার করা যায় না।

যদি ইহা সত্য হইত, যে, বাঙালীরা জামশেদপুরে খুব বেশী পরিমাণে কাজ পাইয়াছে, তাহা কি একটা অসাধারণ দোষের বিষয় হইত? বাণিজ্যে কোন কোন জাতির প্রাধান্ত ঘটিয়াছে, বাণিজ্যে কাহারও কাহারও ঘটিয়াছে, সৈন্সদলে কাহারও কাহারও ঘটিয়াছে, তথাপি কেবল একটা শহরের একটা কারখানায় বাঙালীদের সত্য বা কল্পিত প্রাধান্ত লোকদের চোখ টাটাইবার কারণ হইয়াছে!

বাঙালীদিগকেও ত বাচিয়া থাকিতে হইবে; যোগ্যতার দ্বারাও তাহারা কাজ পাইবে না? বাঙালীরা যদি একেবারে নিঃশ্ব ও কপর্দকহীন হয়, তাহা হইলে যাহারা তাহাদের জন্মভূমিতে ব্যবসায়াদি দ্বারা লাভবান হয়, সে-লাভের পথ কোথায় থাকিবে, তাহাও ত ভাবিয়া দেখা উচিত।

কাশীতে বাঙালী বালিকা-বিদ্যালয়

আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী বাঙালী থাকেন কাশীতে। যাহারা সেখানে আছেন,

তাহারা যে সবাই মুমুকু, মুমূর্ষু, বাংলা দেশ হইতে প্রেরিত অর্থের উপর নির্ভরশীল, তাহা নহে। সেখানে উপার্জনক, কর্মিষ্ঠ বাঙালী অনেক আছেন। অনেকে আছেন যাহারা পুরুষানুক্রমে তথায় সপরিবারে বাস করিতেছেন। এই কারণে বাঙালী বালক ও বালিকাদের শিক্ষার জন্ত সেখানে শিক্ষালয় আবশ্যিক। বাঙালী বালিকাদের জন্ত বিদ্যালয় সেখানে নাই, বলিতেছি না। আছে। কিন্তু, যেমন বাঙালী ছেলেদের জন্ত প্রবেশিকা পরীক্ষা পড়িয়া প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত উচ্চ বিদ্যালয় আছে, বালিকাদের জন্তও আমরা সেইরূপ বিদ্যালয় চাহিতেছি। এরূপ উচ্চ বিদ্যালয় যাহা আছে, তাহাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার সুবিধা নাই। আমরা হিন্দী শিখিবার বিরোধী নহি, বরং তাহা আবশ্যিক মনে করি। কিন্তু মাতৃভাষা বাংলা অবহেলা করা কাহারও উচিত নহে। বিশেষতঃ, বালিকারা ইহার চর্চা না করিয়া অন্য কোন ভাষার চর্চা করিলে তাহাদের নিজের বাঙালীত্ব ত থাকেই না, অধিকন্তু তাহারা বে-গৃহপরিবারের কর্তী হইবে, তাহারও বাঙালীত্ব থাকিবে না।

আমরা কাশীস্থ বাঙালী সমাজের নেতৃবর্গের নিকট এ-বিষয়ে আমাদের অনুরোধ জানাইতেছি। এলাহাবাদে বাঙালীর সংখ্যা কাশীর চেয়ে কম। সেখানে প্রবেশিকা পরীক্ষা পড়িবার ও প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার বালিকা-বিদ্যালয় আছে। তাহা সরকারী সাহায্য পাইয়া থাকে। কাশীতে এরূপ বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে, বা বর্তমান কোন বালিকা-বিদ্যালয় উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হইলে, তাহারও সরকারী সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা আছে।

ঢাকার আনন্দ আশ্রম

ঢাকার আনন্দ আশ্রমে মেয়েদের সর্বাঙ্গীন শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। শ্রীমতী চাক্রশীলা দেবী প্রাণ দিয়া ইহার কাজ চালাইয়া থাকেন। এই

“আশ্রমের উদ্দেশ্য বিস্তৃত জীবন সংগঠন, জ্ঞান অর্জন, স্বাবলম্বন। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, যে, আশ্রমের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ—দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক।” “সর্বতোভাবে স্বাবলম্বী হইবার জন্ত মেয়েরা বাসন-মাজা হইতে আরম্ভ করিয়া রান্না, পরিবেশন, ঠাকুরঘরের কাজ পর্যন্ত নিজের হাতে করিয়া থাকে এবং গৃহস্থালীর সকল কাজ সারিয়া নানাপ্রকার শিল্প শিক্ষা এবং আশ্রমসংলগ্ন বিদ্যালয়ীতে রীতিমত নিয়মিত ক্লাসে ১২টা হইতে ৩টা পর্যন্ত পড়াশুনা করিয়া থাকে। কস্তা এবং বধূরাও যাহাতে নিজেদের সাংসারিক কর্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতে পায়েন, সেইজন্ত এইরূপ সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে।”

সাধারণ লেখাপড়া এখানে অনেক দূর পর্যন্ত শিখান হয়। “এ বৎসর বিদ্যালয়ী হইতে দুইটি মেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইয়াছে।”

ইহার শিল্পবিভাগটি—“দুইটি উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। শিক্ষাও হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু উপার্জনও হইতেছে। অনেকে, শুধু আশ্রমবাসিনী কেন, যাহারা বাহির হইতে আসিয়া বিদ্যালয়ীতে পড়াশুনা করিতেছেন তাহারাও এই সকল শিল্পশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এমন কিছু উপার্জন করিতেছেন যদ্বারা তাহাদের হাতখরচ এবং স্কুলের বেতন চলিয়া যাইতেছে। প্রতি বিভাগের বিক্রয় ও মজুরীর হিসাব দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্ত এখনও কিছুই ভাবিতে হয় না, এখন হইতেই সব বিক্রয় হইয়া যায়।”

শিল্প-বিভাগে কয়েকটি উপবিভাগ আছে। যথা—দিয়াশলাই, রঞ্জন, দরজি, বয়ন, সূচীশিল্প, কারুশিল্প, মিষ্টান্ন, গান ও বাজনা, চিত্রাঙ্কন। স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও খাদ্য সম্বন্ধে প্রতি শুক্রবারে বক্তৃতা হয়।

বস্ত্র সংহার মূর্তি

প্রতি বৎসরই ভারতবর্ষে কোন-না-কোন প্রদেশে বস্ত্র সংহার মূর্তি দেখিয়া লোকে আতঙ্কগ্রস্ত হয়। দয়ালু জনসেবকগণ খবরের কাগজে বস্ত্র বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থ আবেদন প্রকাশ করেন। টাকা-কড়ি আসে, সাহায্যও দেওয়া হয়। এ বৎসর ত বিশেষ করিয়া আসাম, বাংলা ও বিহারে খুবই বস্ত্র হইয়াছে। আবেদন এবং ভিক্ষা-সংগৃহীত টাকা-কড়ি কাপড়-চাল বিতরণও হইতেছে।

কিন্তু বস্ত্র সম্বন্ধে ইহা একমাত্র কর্তব্য নহে, প্রধান প্রতিকারও নহে। বিজ্ঞানের এবং এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার এরূপ উন্নতি হইয়াছে, যে, বন্যাকেও বাগ-মানান এখন আর মানুষের কল্পনার অতীত নহে। কিরূপে তাহা করিতে হইবে, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে ইউরোপের জার্মানী প্রভৃতি দেশে, এবং আমেরিকার ইউনাইটেড্‌ স্টেট্‌সে তাহার পরীক্ষা হয় এবং পরীক্ষার ফল অনুসারে কাজ হয়। ভারতবর্ষে এইরূপ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষার একান্ত প্রয়োজন সম্বন্ধে অধ্যাপক মেদনাদ সাহা একাধিক বার মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের আয়ুর সপ্ততিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারক-বহিতে সাহা মহাশয় একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বিষয়ে গবর্নমেন্টের দৃষ্টি পড়ে নাই। জননায়কদিগের এবং সংবাদ-পত্র-সম্পাদকদিগেরও এদিকে দৃষ্টি পড়ে নাই। আমরা বাংলা ও ইংরেজীতে এ-বিষয়ে বার-কয়েক কিছু লিখিয়াছি

বটে, কিন্তু কোন বিষয়ে আন্দোলন করিবার পক্ষে মাসিক পত্র উপযুক্ত সাধন নহে।

অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ যখন বঙ্গের আবহ-সংবাদবিষয়ক কর্মচারী ছিলেন, তখন গবর্নেন্ট তাঁহাকে উত্তর-বঙ্গে জলপ্লাবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে বলেন। তিনি বিশেষ পরিশ্রম করিয়া, যতটা মনে পড়িতেছে, পঞ্চাশ বৎসরের তথ্য সংগ্রহ করিয়া একটি বিস্তারিত রিপোর্ট লেখেন। তাহা মুদ্রিতও হয়। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। অনুসন্ধানী কোন কাজ করা হয় নাই। এবং ঐ রিপোর্টটির মূল্যও এত বেশী রাখা হইয়াছে (অনুন কুড়ি টাকা?) যে উহা সর্বসাধারণের হ্রদ্বিগম্য হইয়া আছে। উহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সম্পাদকমহলেও প্রায় অবিদিত।

পাটের দর

পাট এ বৎসর কত গাঁট উৎপন্ন হইবে, তাহার একটা সরকারী অনুমান প্রকাশিত হওয়ায়, পাটের দর কমিয়া গিয়াছে। ইহাতে পাটচাষীদের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে ও হইবে। দুর্গাপূজার ছুটির মাস-খানেক আগে এই অনুমান প্রকাশিত হওয়ায় চাষীদের বিশেষ অনুবিধা হয়। তাহাও আবার চূড়ান্ত ও শেষ অনুমান নহে; তাহা ১২ই সেপ্টেম্বর বাহির হইবে। কোন সময়েই যে চাষীদের উচ্চতর দরের অপেক্ষায় পাট কিছু দিন অবিক্রীত রাখিবার মত অবস্থা থাকে, এমন নয়। কিন্তু পূজার আগে তাহাদের টাকাকড়ির বিশেষ দরকার হওয়ায় তাহারা যত বেশী সম্ভব পাট বেচিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়, সুতরাং দর কম পায়। পূর্বে ও উত্তর বঙ্গের পাটচাষীদের মধ্যে মুসলমান ও হিন্দু দুই-ই আছে। মুসলমান বেশী। মুসলমান চাষীদের, তাহাদের শাস্ত্র অনুসারে, দুর্গাপূজা মানিবার কথা নয়। কিন্তু বাৎসরিক এই উৎসবের সময় বিশেষ ধরচ ধর্মসম্প্রদায়নির্বিশেষে অস্ত্রের মত তাহাদেরও হয়।

পাট উৎপন্ন কত হইবে, তাহার অনুমান ঠিক বা কাছাকাছি হয় না। কারণ অনুমানগুলো জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হইতে আসিলেও শেষ পর্য্যন্ত আন্দাজটা আসে গ্রামের চৌকীদারদের কাছ থেকেই। তাহাদের কাছ থেকে সঠিক অনুমান আশা করা যায় না। কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর কোন কোন বড় হোসের অনুমানও বিবেচনা করেন। কিন্তু উৎপন্ন বেশী হইলে দর কমিবে, এবং কম দরে কিনিতে পারিলেই লাভ বেশী, এরূপ চিন্তা যাহাদের মনে থাকে, তাহাদের অনুমান খাঁটি না হইবার সম্ভাবনা আছে।

উৎপন্ন কত হইবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে গবর্নেন্ট যদি চাহিদা কত হইবে, তাহারও একটা অনুমান প্রকাশ করেন, তাহা হইলে বিক্রেতাদের কিছু সুবিধা হইতে পারে। অবশ্য, চাহিদার অনুমানটা যথাসম্ভব সঠিক হওয়া চাই। উৎপন্নের অনুমান অপেক্ষা চাহিদার অনুমান সঠিক করা অপেক্ষাকৃত কম হুঃসাধ্য। কারণ, পাটের বড় বড় ক্রেতা জানা আছে, তাহারা পূর্বে পূর্বে বৎসরে কত কিনিয়াছিল তাহা জানা বাইতে পারে, এবং এ-বৎসর কত কিনিবে তাহা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা বাইতে পারে।

পাটচাষীদের স্বার্থরক্ষা দ্বারা তাহাদের কল্যাণসাধন অত্যাবশ্যক। পাটকলের ধনী মালিকদিগকে যদি কিছু বেশী দাম দিয়াও পাট কিনিতে হয়, তাহা হইলেও তাহাদের ক্ষতি হইবে না, লাভ কিছু কম হইবে মাত্র। কারণ, পাটের দাম যখন চড়া ছিল তখনও কলের মালিকদের বেশ লাভ হইত।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও তলোয়ার

সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার দুই কক্ষে (“চেম্বারে”) ভারতীয় সৈন্যদলে ভারতীয় অফিসারদের কমিশন বেতন ইত্যাদি বিষয়ক বিলের আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এখন স্মর ফিলিপ চেট্‌ওড্‌ ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি। তিনি যোদ্ধা কেমন জানি না, কিন্তু তাঁহার কথাগুলো খুব চোখা চোখা। তাহার পরিচয় আগে পাওয়া গিয়াছিল, সম্প্রতিও রাষ্ট্রীয় পরিষদে পাওয়া গিয়াছে। তিনি বলেন, যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে “গুলির কাঁড়নী” (“whine of the bullet”) শুনে নাই, আরাম-চেয়ারে উপবিষ্ট সেই-সব সমালোচকদের সৈন্যদলের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার নাই। এটা রাষ্ট্র-পরিষদের সদস্যদের প্রতি প্রযুক্ত শিষ্ট বাক্য। কিন্তু জঙ্গী লাটকে জিজ্ঞাস্য, যদি সদস্যদের কিছু বলিবার অধিকারই নাই, তাহা হইলে আইনের খসড়াটা আলোচনার জন্ত তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত করা হইয়াছিল কেন? গবর্নেন্ট তাঁহাদের কাছে বিলটা উপস্থিত করিয়া তাঁহাদের বক্তব্য জানাইতে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। তদনুসারে তাঁহারা নিজের নিজের মত বলায় গবর্নেন্টেরই এক জন প্রধান ব্যক্তি বলিতেছেন, “তোমরা সব আনাড়ি, এ-সর তোমাদের অনধিকার চর্চা; আদার ব্যাপারী তোমরা, জাহাজের ধবর কি জান?” মজা মন্দ নয়! রাষ্ট্রপরিষদের মাননীয় সদস্যদের মান জঙ্গী লাট খুব বাড়াইয়া দিয়াছেন।

এটা শুধু মান-অপমানের কথাও নয়। যাহারা যুদ্ধব্যবসায়ী তাহারা ছাড়া অন্য কেহ সামরিক ব্যাপার

বুকে না, এরূপ মনে করা ভুল ও অজ্ঞতার পরিচায়ক। এপর্যন্ত যত যুদ্ধ হইয়াছে, গত মহাযুদ্ধ তার কোনটার চেয়ে ছোট নয়। সেই যুদ্ধে বে-কয় জাতির জয় হয়, ব্রিটিশ জাতি তাহাদের অন্ততম। এবং যুদ্ধের কয়েক বৎসর সামরিক সব ব্যাপারের কর্ণধার ছিলেন মিঃ লয়েড জর্জ, যিনি কখনও যুদ্ধব্যবসায়ী ছিলেন না।

ভারতের জঙ্গী লাট স্তর ফিলিপ চেট্‌ওড্‌ তাঁহার বক্তৃতায় আর একটা কথা বলিয়াছেন—“ইংরেজরা তাহাদের সাম্রাজ্য তলোয়ারের দ্বারা জিনিয়াছে এবং তলোয়ারের দ্বারা রক্ষা করিয়াছে” (“have won their Empire at the point of the sword and have kept it by the sword”)। তাঁহার এই উক্তির কোন অংশের নশ্বকেই আমরা তর্ক করিতে চাই না। মূল যে-সব কাগজ-পত্র ও পুস্তক অবলম্বনে ভারতবর্ষ ইংরেজ-রাজত্ব স্থাপনের ইতিহাস লিখিত হয়, তাহা ইংরেজদের কলম হইতে বাহির হইয়াছে। সেইগুলি পড়িলেই জঙ্গী লাটের বাক্যের প্রথমার্ধের মূলা নিরূপিত হইতে পারিবে। মূল কাগজপত্রও বাঁটিতে হইবে না। তাহা অবলম্বন করিয়া লিখিত একাধিক ইতিহাসের বহিও আছে।

স্তর ফিলিপের উক্তির দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজ জাতির পৌরুষ গর্ভ প্রকাশিত হইয়াছে। গর্ভ করা যদিও ভাল নয়, তথাপি তাহাদের পৌরুষ নাই ইহা বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু তাঁহার উক্তির দ্বিতীয়ার্ধের যে সত্য অর্থ হইতে পারে, তাহা তাঁহার ভাবা উচিত ছিল। অনেক বড়লাট এবং অন্ত ব্রিটিশ রাজপুরুষ ও রাজনীতিজ্ঞ বলিয়াছেন, ব্রিটিশ শাসনের গুণে ভারতীয়েরা রাজভক্ত এবং ইংরেজদের ভারত-শাসন শাসিতদের সম্মতিক্রমে শাসন। অন্ত দিকে জঙ্গী লাট বলিতেছেন, ভারতবর্ষ ব্রিটিশ জাতি তলোয়ারের দ্বারা স্বাধিকারে রাখিয়াছে। যে সাম্রাজ্যের ভিত্তি শাসিতদের সম্মতির উপর স্থাপিত, তাহা রাখিবার জন্য তলোয়ারের প্রয়োজন হইবার কথা নহে। অতএব, জঙ্গী লাটের কথা সত্য হইলে, মৌলিক ব্যক্তিদের কথা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, আবার তাহাদের কথা সত্য হইলে জঙ্গী লাটের উক্তি ভ্রান্তিগ্রস্ত মনে হইবে।

বাঁশবেড়িয়ায় অবৈতনিক আবশ্যিক শিক্ষা

ইতিপূর্বে কেবল চট্টগ্রাম মিউনিসিপালিটিতে বালকদের আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এ-বৎসর কলিকাতার নবম-সংখ্যক অঞ্চলে উহা প্রবর্তিত হইবে। সম্প্রতি কুড়ি বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপালিটি বালকদের জন্য অবৈতনিক আবশ্যিক শিক্ষা প্রবর্তনার্থ ৩,৫১০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই মুচেষ্টার জন্য বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপালিটি ও তাহার চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় ধন্যবাদভাজন। মহাশয়-বংশ নামে মহাশয়, কাজেও মহাশয়। বাঁশবেড়িয়া পূর্বে বিদ্যাবতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই গ্রামটিতে ৩২টি টোল ছিল। বঙ্গ পুস্তকালয় সম্বন্ধীয় প্রচেষ্টার ইহা আধুনিক পীঠস্থান। ইহাতে অতঃপর যে একটি বালকও নিরক্ষর থাকিবে না, ইহা আনন্দের বিষয়। বালিকাদের এই সৌভাগ্য কখন হইবে? শ্রীযুক্তা লেডী অবলা বহু, শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী প্রভৃতি উদ্যোগী হউন। অন্ত সব মিউনিসিপালিটি আবশ্যিক শিক্ষার নিয়ম প্রবর্তিত করুন।

সংস্কৃত শিক্ষার জন্য সাহায্য

সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে উপাধিদান সভায় সভাপতি শ্রীযুক্ত মনুথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় টোলের শিক্ষার জন্য অধিকতর সরকারী সাহায্য চাহিয়াছেন ইহা সত্য দাবি। টোলের শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা পরে কিছু লিখিব। সরকারী অর্থসাহায্য সম্বন্ধে বক্তব্য এই, যে, ১৯৩২-৩৩ সালে গবর্নমেন্ট মুসলমানদের মন্তব্যগুলিতে দিয়াছিলেন ৭,৯৬,৫৮৭ টাকা, কিন্তু হিন্দুদের টোলসমূহে কেবলমাত্র ৬৬,৫৩৪ টাকা। বাংলা দেশে টোলের চেয়ে মন্তব্যের সংখ্যা অনেক বেশী, এই কারণে মন্তব্যসমূহ টোলসকলের চেয়ে মোট টাকা বেশী পায়, ইহা সত্য কথা; কিন্তু ইহা সত্যের এক অংশ মাত্র। মন্তব্য স্থাপন করিলে সরকারী সাহায্য যত সহজে ও যত বেশী পাওয়া যায়, টোল স্থাপন করিলে তত সহজে ও তত বেশী পাওয়া যায় না, ইহাও কি সত্য নহে?

কতকগুলি মন্তব্য ও টোল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের

সংস্কৃত ভাষায় 'শিবের ক্রিয়াকর্মের প্রেরিত' বুলি
 লেখা আছে। এই বিষ্ণু বিরাই টোলের সংখ্যা 'বাড়াইবার
 করা উচিত। সংস্কৃতের চর্চা বেশে রক্ষা করা
 উচিত। বাড়ান ত আবশ্যিক বটেই; অধিকতর বেশে নিরক্ষরতা
 এক অধিক, যে, সকল রকমে নিরক্ষরতা দূর কবিবার জন্যও
 উপায়রূপ টোলসংখ্যা বৃদ্ধি আবশ্যিক।

ত্রিপুরা সেবাসমিতি

ত্রিপুরা সেবাসমিতি বস্তার বিপন্ন লোকদের সাহায্য
 কল্পনার চেষ্টা করিতেছেন। যাহারা কাপড় টাকাকড়ি
 কুলাইতি দিয়া এই সমিতির সহায় হইতে চান, তাহারা
 ১৫ নং কলেজ রোয়ার, কলিকাতা, এই ঠিকানায় সমিতির
 সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন গুপ্তকে সকল রকম সাহায্য
 পাঠাইলে তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অসুত যুক্তি

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক
 ভাবধারার কারণে এই কারণ দেখাইয়া গ্রহণ করেন নাই
 করেন নাই, যে, মুসলমানরা সাধারণতঃ উহা
 গ্রহণ করে। কমিটির যুক্তি এই, যে, যাহা সব দলের
 লোক অগ্রাহ্য করে নাই, কোন বা কোন কোন দল যাহা
 গ্রহণ করে, তাহারা তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না;
 কারণ তাহারা ভারতীয় সব দল, জাতি, শ্রেণী ও ধর্ম-
 সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। ভাল কথা। তাহা হইলে তাহারা
 হোরাইট পেপারটাকে অগ্রাহ্য করিলেন কেন? উহা
 বিধিব্যতীর্ণ মুসলিম লীগ এবং নিখিলভারতীয় মুসলিম
 লীগের গ্রহণযোগ্য মনে করিয়াছেন, এবং তাহারা
 বহু অধিকসংখ্যক মুসলমানের প্রতিনিধি, অতঃপর কোন
 সমিতির সমিতি হইতে মুসলমানের প্রতিনিধি নহে।

যদিও হোরাইট পেপারের বে-কোন আপত্তিকর অংশ

সত্তর হাজার বেশী হইবে, এই ভারতীয় কোন-বা-কোন শ্রেণী,
 শ্রেণী, জাতি বা ধর্মসম্প্রদায় তাহা গ্রহণ করে ও চায়।
 হুতরাং হোরাইট পেপারটাকে কংগ্রেস 'ওয়ার্কিং' কমিটির
 অগ্রাহ্য করা উচিত হয় নাই।

যদি বলেন, মুসলমানেরা ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে বড়
 ও শক্তিশালী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলিয়া তাহাদের পক্ষ না-
 পছন্দই দেখা চাই বা সর্বাগ্রে দেখা চাই, তাহা হইলে তাহাব
 এই জবাব ত আগেই দিয়াছি, যে, মুসলমানদেরই সকলের চেয়ে
 বড় ছুটি সমিতি হোরাইট পেপারটাকে গ্রহণীয় বিবেচনা
 করিয়াছেন। অতএব তাহাও অগ্রাহ্য করা কংগ্রেস ওয়ার্কিং
 কমিটির উচিত হয় নাই।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

যাহারা বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্যন্ত বাৎসরিক গ্রাহক
 আছেন, আশা করি, আগামী ছয় মাসের জন্যও তাহার
 গ্রাহক থাকিবেন এবং আগামী ছয় মাসের মূল্য ৩০ সপ্ত
 তিন টাকা মনি-অর্ডার যোগে পাঠাইয়া দিবেন। মনি-অর্ডার
 কুপনে তাহাদের স্ব-স্ব গ্রাহক নব্ব উন্নয়ন না করিলে টাক
 জমা করিবার পক্ষে অসুবিধা হয়।

যাহারা আগামী ১০ই আশ্বিনের মধ্যে টাকা পাঠাইবে
 না, তাহাদের নামে কার্তিক সংখ্যা তিঃ-পিঃতে পাঠাতে
 হইবে। ঐ সংখ্যা ১৬ই আশ্বিন প্রকাশিত হইবে। যাহা
 অতঃপর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক তাহারা সে-কথা দ
 করিয়া ১০ই আশ্বিনের পূর্বেই আমাদিগকে জানাইবেন

তিঃ-পিঃতে টাকা পাঠিতে কখন কখন বিলম্ব হই
 হুতরাং 'প্রবাসী' পাইতে মুসলমান হয়। মনি-অর্ডারে
 টাকা পাঠানো সুবিধাজনক। ইতি—

শ্রীমান...
 ...

